প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৩৪

৬ষ্ঠ সংখ্যা

মিলন

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল ব'য়ে,
তাহাতে মোর যা-হয় হোক্ ক্ষতি।
অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হ'য়ে,
চরণে তব গোপনে তা'র গতি।
লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল, ভরিল তব ডালি,
গন্ধভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি',
প্রদীপ ছিল মলিন-শিখা, ধোঁয়াতে ছিল কালী,
দীপ্ত হ'য়ে উঠিছে তার জ্যোতি।
বাহির হ'তে না যদি লও পূজার এই ডালি
চরণে তব গোপনে তার গতি॥

না-হয় তুমি ওপারে থাকো, এপারে আমি থাকি,
নীরব এই নীরস মরুতীরে।
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা নয়নে দেয় আঁকি'
সুদূর তব উদার আঁখিটিরে।
ব্যথায় মম তোমারি ছায়া পড়িছে মোর প্রাণে,
বিরহ হানি' তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে,
অলখ্ স্রোতে ভাবনা ধায় তোমার তটপানে
এপার হ'তে বহিয়া মোর নতি।
যে বীণা তব মন্দিরেতে বাজেনি তানে তানে
চরণে তব নীরবে তার গতি॥

আম্বোয়াজ জাহাজ
১ শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল।

আলাপ-আলোচনা*

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুপর-বেলা আমাদের খাওয়া শেষ হ'লে কবি বল্লেন,—"শিল্পকলার উদ্দীপনা নিয়ে নন্দলালের সঙ্গে আমার যে, কথাটা হয়েছিল সেটা ভেবে দেখ্‌বার।

"বৈদিককালে বিশেষ মন্ত্রে যে-সকল বিশেষ যজ্ঞবিধি ছিল ইষ্টলাভের কল্পনা ছিল তার লক্ষ্য। ধর্ম্মের আকারে সে একরকম বৈষয়িকতা। বৈষয়িকতায় মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাতে পারে না। কামনার বিষয়কে সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে ভোগ করা চলে না। তাই সেইদিন পুণ্য-ফলের সঙ্গে পণ্য-ফলের তফাৎ ছিল না, গো-কাঞ্চনের দরে তার কেনা-বেচা চল্‌ত।

"বৌদ্ধধর্ম্ম ধর্ম্মের ক্ষেত্রে মানুষকে মিলিয়েছিল, কেননা ভোগ তার লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল মুক্তি। সেই মুক্তির ডাকে মানুষ জেগে উঠ্‌ল।

"যখন ঘুমোই তখন আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্যের বেড়ার মধ্যে বেঁচে থাকি মাত্র, আপনাকে জানিনে। সকলের মধ্যে নিজেকে জানাই হচ্চে জানা। তাই বৌদ্ধযুগে সর্ব্বজনীন জাগরণের আলোতে মানুষ আপনাকে যখন প্রবল ক'রে জান্‌লে তখন আপনাকে প্রচুর ক'রে জানাতে চাইলে। সেই জানাতে চাওয়ার একটা অজস্র পরিচয় পাওয়া গেল তখনকার শিল্পকলায়।

"য়ুরোপে খৃষ্টধর্ম্ম যখন সজীব ছিল তখন সে ধর্ম্মও কি রকম অনিবার্য্য বেগে কলাসৃষ্টির উদ্রেক করেচে তার ব্যাখ্যা করা বাহুল্য। আমাদের পৌরাণিক ধর্ম্মে ভক্তির আহ্বানে সর্ব্বসাধারণের মিলন, সেই মিলনে যে আত্ম-প্রকাশের উদ্যম জেগেছিল তাও মূর্ত্তিকলায়, চিত্রকলায়, গীতিকলায় উচ্ছ্বসিত না হ'য়ে থাক্‌তে পারেনি।"

দিলীপকুমার বল্লেন, "এই রকম হ'য়ে থাকে এটা তো ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু কেন হয় সেটা তো জানা চাই।"

কবি বল্লেন, "বই পড়্‌তে পড়্‌তে পাঠক কোনো একটি বিশেষ বাক্যে বিশেষ আগ্রহ বোধ কর্‌লে সেটার নীচে লাইন টেনে দেয়। যদিও সে বাক্যের রচয়িতা সে নয় তবু নিবিড় উপলব্ধির দ্বারাই তার প্রতি সে নিজের স্বত্ব অনুভব করে। এম্‌নি ভাবে বিশ্ব-সংসারে যে বিষয়টিতে চিত্তের স্বত্ব বোধ করি তার গায়ে এমন চিহ্ন দিতে চাই যা চিরকালের। সেই চিহ্নকে বলে আর্ট্‌। সাধারণ বিশ্বলোকে যে অসংখ্য জিনিষ আছে—আর আমার বিশেষ চৈতন্য-লোকে যা কিছু উদ্ভাসিত, দুইয়ের তফাৎ কেমন, যেমন চাঁদের যে-পিঠ পৃথিবীর দিকে ফেরানো, তার সঙ্গে বিমুখ পিঠের যে-তফাৎ। এই আলো-করা পিঠটিকে নিয়েই পৃথিবীর গান, তার উৎসব। বিশ্বের যেখানে আমাদের চিত্তের আলো বিশেষ ক'রে পড়ে, সেইখানেই বিধাতার সৃষ্টিকে নানা রূপে রসে রঙে গানে বরণ ক'রে নিয়ে নিজের সৃষ্টি ক'রে নিই। বর আসে বিয়ে করতে, নেহাৎ-সাধারণ মানুষ, কিন্তু সেদিন বাজনা বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে বুঝিয়ে দিই সকল মানুষেরই অসামান্য মূল্য আছে, যথাস্থানে যাচাই কর্‌লেই ধরা পড়ে। ক'নের বাড়ির নিকটে বরের দাম রাজা মহারাজের চেয়ে বেশী,—মায়ের কোলের নিকষে ছেলের দাম তেম্‌নি। দামটা বাইরে নয় ভিতরে, আমাদের চিত্তের স্বীকৃতিতে।

"নন্দলালের জিজ্ঞাস্য ছিল এই যে, আধুনিক রূপকারের কাছে, রসস্রষ্টার কাছে এখনকার যুগের ডাকটা কি? বৌদ্ধযুগে, খৃষ্টযুগে যে-আহ্বানে মানুষের সৃষ্টিশক্তিকে জাগিয়েচে তার ছাপ তখনকার কালের সকল কাজেই;—তখন কলাসৃষ্টির প্রেরণাতে যে ঐক্য তার রচনাতেও সেই ঐক্য ছিল। আজ আমাদের কাজে ডাকের মধ্যেই বা ঐক্য কি, আর কোথায় ঐক্য তার সাড়ায়?

"উত্তর দেবার আগে ভেবে দেখ্‌তে হবে এখনকার কালে কোন্ কথাটা সব-চেয়ে বড়ো।

"পূর্ব্বেই বলেচি বৈষয়িকতায় মানুষকে এক করে না।

---

* সমস্ত আলোচনাটি সম্পূর্ণ নিজের ভাষাতেই লিখ্‌তে হয়েচে।
ইপো। ১১ অগষ্ট ১৯২৭ — শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শঙ্করাচার্য্য বলেচেন, অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং। অর্থের মধ্যে মানবাত্মার বা বিশ্বজগতের অর্থ পাওয়া যায় না। আজকের দিনে বড়ো বড়ো মুনফার লোভে বড়োবড়ো ব্যবস্থাতন্ত্র পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে ব্রণের মতো ফুলে উঠেচে। কিন্তু এইসকল পৃথুলকায় ব্যবস্থা,এই সকল যন্ত্রবাহিনী ব্যবসা সর্ব্বত্রই মানুষের সৌন্দর্য্যবোধকে আচ্ছন্ন ও তার সৃষ্টিশক্তিকে পীড়িত করেচে। অর্থ জিনিষটা বাইরের দিক থেকে সুবিধামাত্র, অন্তরের দিক থেকে সার্থকতা নয়। ধনী দেবমন্দিরে যায় মোটর গাড়ীতে, বাহ্য সুযোগের দিকে তার দাম, ভক্তিযোগের দিক থেকে কোনো দাম নেই। অতএব মোটরগাড়ীগত সম্পত্তি ভক্তি-অর্ঘ্যরচনায় কোনো সৌন্দর্য্য দিতে পারে না।

"আসল কথাটা এই, বাইরের দিক থেকে মানুষের অধিকার ভেদ ঘুচে গেছে এইটেই এখনকার যুগের প্রধান সত্য। মানুষের মধ্যে শক্তির স্বাভাবিক পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য অনুসারে তার সিদ্ধির পরিমাণে পার্থক্য, কেউ উপরে ওঠে, কেউ নীচে নামে। কিন্তু সাধনার অধিকার সকলেরই কাছে সমান, সে-সাধনা অর্থেরই হোক্, জ্ঞানেরই হোক্, কর্ম্মেরই হোক্। বৌদ্ধধর্ম্ম মোক্ষের দিকে এই পথই খুলেছিল। আজ সেই পথ সকল প্রকার ব্যবহারের দিকে। একজন মানুষ যা পেয়েচে আরেকজন মানুষের তা আশা করবার কোনো বাধা নেই, সেই আশা করবার গৌরবে মানুষের প্রধান মূল্য। সেইজন্যে আজ অবিচার ঘট্‌লে মানুষ জোর ক'রে বিচারের আবেদন করে। এইটে সেকালে ছিল ভিক্ষে, একালে হয়েচে দাবী। আইনে যদি পক্ষপাত থাকে তবে আজ জোর ক'রে বল্‌তে পারি এটা অন্যায়,—ব'লে সব সময়ে ফল হয় না, কিন্তু যত সামান্য লোকই হইনে কেন, আমার কাছেও আইনের জবাবদিহী আছে। আজকের দিনের সব-চেয়ে বড়ো জ্ঞানসম্পদ হচ্চে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞানের সাধনায় মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই।

"বিজ্ঞানের সাধনা শুধু যে অবাধ তা নয় বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা সর্ব্বব্যাপী। বিজ্ঞান যে-তত্ত্ববুদ্ধির সৃষ্টি করে তার কাছে উঁচু নীচু নেই। নৃতত্ত্বের কাছে এমন মানুষ নেই যে অগ্রাহ্য। জ্ঞানের সাধনায় মানুষের চিত্ত আজ সমস্ত বিশ্বকে অধিকার করচে। জ্ঞানের এই কর্ত্তৃত্বে প্রত্যেক মানুষেরই আজ দাবী আছে যদি তার শক্তি থাকে। শক্তির আন্তরিক পার্থক্য চিরদিন যেমন ছিল আজও তেম্‌নি আছে, কিন্তু অধিকারের বাহ্য পার্থক্য আজ প্রায় নেই। যদি থাকে সেটা অপরাধ আকারে, অন্যায় আকারে আছে, তার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষের কাছে নালিশ চলে।

"বিজ্ঞানের নিষ্কাম কৌতূহল অপক্ষপাতে বিশ্বের সকল পদার্থেরই অনুধাবন করচে, আমাদের দেশের পারমার্থিক সাধনারই মতো কুকুরে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে ভেদ রাখ্‌চে না। বিজ্ঞানের এই জানার সঙ্গে অধ্যাত্মতত্ত্বের ঐক্য উপলব্ধির মিল থাক্‌তে পারে, কলা-বোধের মিল নেই। বিজ্ঞানের জানা নৈর্ব্যক্তিক, আর্টের জানা ব্যক্তিগত। বিজ্ঞান বলে, আমি মনে জান্‌লুম; আর্ট বলে, আমার মনে লাগ্‌ল। মনে লেগেচে এই কথাটা বল্‌বার জন্যেই ছবি মূর্ত্তি গান কাব্য। আমার একটি গানের শেষ অংশে আছে :

দেখি গে তার মুখের হাসি,
ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
ব'লে আসি বাঁশি আমার প্রাণে বেজেছে।

"আর্টিষ্ট্ এই কথাটাই বলে, আর ফুলের মালা পরায়, সর্ব্ব মানুষের বরণডালা সাজাবার ভার তার পরে।

"কিন্তু ঐ মনে লাগ্‌বার শক্তিটার সঙ্কোচ ও প্রসার হ'তে পারে। মানুষের মনে লাগ্‌বার শক্তি আজ তার সীমানা চারদিকে বাড়িয়েচে তার পরিচয় পাওয়া যায়। একসময়ে দেবদেবী, দৈত্যদানব, রাজা ঋষি, বীরপুরুষ মানুষের মনে বেশী ক'রে লাগ্‌ত, সামান্য মানুষের সাধারণ জীবযাত্রা চিত্তকে এড়িয়ে যেত। আজ সকল মানুষই আমাদের মনে লাগ্‌বার অধিকার নিজের জোরে দাবী করে। তারা গুণী ব'লে, জ্ঞানী ব'লে, ধনী ব'লে, মানী ব'লে বা সাধু ব'লে নয়, তারা মানুষ ব'লেই, মানুষের চিত্তগোচর হ'বার যোগ্য। চারদিকের অনেক কিছুই সহজেই যার চোখে পড়ে, মনে লাগে সেই এখনকার যুগের যোগ্য আর্টিষ্ট। চীনদেশে থাক্‌তে সে-দেশের একজন বন্ধু আমার জুটেছিল, তিনি কবি। তাঁর সঙ্গে যখন মোটরে বেড়াতে যেতুম তিনি হঠাৎ আমাকে ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌তেন, দেখ দেখ, একটা গাধা—কিম্বা অমনি আর-একটা

কিছু। আর কিছু নয়, গাধার বিশেষ কোনো সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্ব আছে তা নয়, কিন্তু তার সত্তা তাঁর চিত্তকে সুস্পষ্টভাবে স্পর্শ কর্‌ত ব'লেই তিনি অমন ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তেন। তিনি যদি আর্টিষ্ট হ'তেন তাঁর নিজের মনের ব্যগ্রতা দিয়েই গাধাটাকে আঁক্‌তেন, গাধাটা ষোড়শী নারী ব'লে নয় বা পরমধার্ম্মিক তপস্বী ব'লে নয়, কিন্তু সে তাঁর চোখে-পড়া, মনে-লাগা গাধা ব'লেই। নিষ্কাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ঐ গাধাটার ফোটোগ্রাফ নেয় কিন্তু আর্টিষ্টের সাগ্রহদৃষ্টি ছবি আঁকে,—ফোটোগ্রাফে গাধাটাকেই দেখি, বৈজ্ঞানিকের চিত্ত দেখিনে—ছবিটিতে গাধাটাকে দেখি আর্টিষ্টের চিত্তের মধ্যে—অর্থাৎ শুধু তার সংবাদ জান্‌তে পাইনে, তার আদর বুঝ্‌তে পাই।

"বর্ত্তমান যুগে আর্টিষ্টের এই আদরটি দূরে-নিকটে বড়োয়-ছোটোয় ছড়িয়ে যাচ্চে। যে আদর ধন-মান কুলশীল রূপ-গুণের দর যাচাই করে, এ তার চেয়ে অনেক বড়ো; এ সত্তার আদর। এই জিনিষটার দাম এত বেশী যে, এখনকার অনেক আর্টিষ্ট ইচ্ছা ক'রেই তাঁদের চিত্র ও মূর্ত্তি থেকে শিবকে সুন্দরকে বর্জ্জন করেন, পাছে কেউ মনে করে তাঁরা লোভে না পড়্‌লে সত্যকে দেখ্‌তে পান না, পাছে কেউ ভাবে তাঁরা সত্তার বিশুদ্ধ সম্মান দেখাতে চান না, মানুষকে লোভ দেখাতে চান। এটাও হ'ল বাড়াবাড়ি। মনে আছে আমার কোনো আত্মীয়ার সাংঘাতিক পীড়ায় বাধ্য হ'য়ে এক-জন বিশেষজ্ঞ মিশনারী চিকিৎসককে ডাক্‌তে গিয়েছিলেম—তিনি বল্‌লেন, তিনি ধনীর চিকিৎসা করেন না। অর্থাৎ পাছে কেউ বলে ধনীর মর্য্যাদা রাখ্‌বার লোভে বা ধনের লোভে তাঁর চিকিৎসা, এইজন্য পরম বিপদেও ধনীর ঘরে তিনি যান না, ভুলে যান ধনীও মানুষ, দরিদ্রতম মানুষেরই মতো। ইস্কুলে-পড়া এক বালিকা আমার নামতা পরীক্ষার উপলক্ষে জিজ্ঞাসা করেছিল তিন পাঁচে কত, আমি জবাব দিয়েছিলেম পঁয়তাল্লিশ। এই উত্তরে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করাতে তর্ক ক'রে বলে-ছিলেম, খুব সরু সরু পাঁচেও পনেরো আর তার চেয়ে তিন গুণ বহরের পাঁচেও পনেরো, এও কি সম্ভব? আমার কুতর্কের উত্তরে বালিকা বলেছিল পনেরোর প্রত্যেক এককতো একই, তা সে সরুই হোক্ আর মোটাই হোক, আধুনিক আর্টিষ্টের কুতর্কেরও সেই উত্তর,—অর্থাৎ সত্তার আদর যদি আর্টের লক্ষ্য হয় তবে সুন্দর সত্তাকেও সত্তা ব'লে মানতে হবে।"

আদ্যা শক্তি

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সকল শক্তির আধার যিনি, যাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া আমরা নমস্কার করি, তাঁহা হইতে শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কল্পনার কারণ কি? এই দুই বিশ্বাসে কালের দীর্ঘ ব্যবধান, বেদান্তের স্তর পুরাণের স্তর অপেক্ষা অনেক গভীর। বিশ্বের সর্ব্বত্র যেমন ক্রমবিকাশের নিয়ম ধর্ম্ম-জগতেও সেইরূপ, প্রথমে উন্মেষ, কালে পূর্ণ বিকাশ। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে বিক্ষেপের অবস্থা, বিস্ময়ের বিহ্বলতা, নিসর্গের ক্রিয়া-বৈচিত্র্যে বহু দেবতার কল্পনা। অগ্নিতে এক দেবতা, বায়ুতে আর, বজ্রধারী পর্জ্জন্যদেব তৃতীয় দেবতা। ইঁহাদের তুষ্টির জন্য হোম যজ্ঞের সৃষ্টি। ক্রমে দৃষ্টি বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে আকৃষ্ট হইল। উপনিষদ-কারগণ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। এক তিনি, অদ্বিতীয় তিনি, নিত্য তিনি, অক্ষর তিনি। প্রগাঢ় চিন্তা, গভীর ধ্যানের ফল স্বরূপ ব্রহ্মবাদের বহু শাখা-প্রশাখা হইল। আবার কালক্রমে বিশ্বাসের সম্প্রসারণ হইল। পৌরাণিক যুগে বেদান্ত কালের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, ভাষার সংক্ষিপ্ত সারবত্তা কতক পরিমাণে লুপ্ত হইল। কল্পনার প্রসার বাড়িল, অবতারবাদের সৃষ্টি

হইল, অলৌকিক ঘটনার প্রাচুর্য্যে ধর্ম্ম-সাহিত্য ভারাক্রান্ত হইল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সূচনা দেখা দিল। এইরূপ তরলতা ও চঞ্চলতার অবস্থায় শক্তিবাদের ভিত্তি স্থাপনা। তন্ত্রের উচ্চ অঙ্গে শক্তির ব্যাখ্যা অতি পবিত্র, কিন্তু কোন জটিল শাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সহজ কথায় শক্তির কল্পনা বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

কোন ব্যক্তি যদি একটি পাটকেল তুলিয়া ছুড়িয়া ফেলে তাহা হইলে সেই লোষ্ট্রখণ্ড কিছু দূরে গিয়া পড়ে। নিক্ষেপকারী ও পতিত পাটকেলের মধ্যে ব্যবধান হইল কেমন করিয়া? যদি সে-ব্যক্তি পাটকেল তুলিয়া লইয়া আর-এক স্থানে রাখিত তাহা হইলে মানুষে ও পাটকেলে সম্বন্ধ বেশ বুঝিতে পারা যাইত। কিন্তু এই যে বল-প্রয়োগ তাহার প্রক্রিয়া প্রয়োগকর্ত্তা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গেল। পাটকেলটি ফেলিলে আর ফিরান যায় না, যে ফেলে তাহারও সে সাধ্য নাই। এইজন্য শাস্ত্রে কথিত আছে যে, উক্ত বাক্য আর মুক্ত বাণ নিবৃত্ত করা যায় না, অতএব এই দুই কাজ বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত। পাটকেলটি নিজের শক্তিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায় নাই। যে ফেলিয়াছে তাহার নিক্ষেপ-শক্তি তাহার শরীর হইতে মুক্ত হইয়া পাটকেলকে আশ্রয় করিয়াছে এবং তাহাকে বহন করিয়া দূরে লইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান বলে যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকিলে সেই পাটকেলের কোন কালে পতন হইত না। নিতান্ত স্থূল কথায় শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এইরূপ করিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে।

আর একদিক হইতে শক্তি বলিতে সৃষ্টির স্ত্রী ভাব বুঝিতে হইবে। এই কারণে সৃষ্টির মূলে পুরুষ ও প্রকৃতির কল্পনা। বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই ত্রিবিধ ভার ত্রিমূর্ত্তির হস্তে ন্যস্ত, ইঁহাদের তিন ভার্য্যা শক্তিস্বরূপা। যেমন গৃহ-সংসারে গৃহিণীর ক্ষমতা অধিক, গৃহিণী না থাকিলে সংসারের অসংখ্য খুঁটিনাটির সামঞ্জস্য হয় না সেইরূপ এই বৃহৎ বিশ্ব-সংসারে শক্তিরূপিণী দেবীদিগের কার্য্যকরী ক্ষমতা ও প্রাধান্য অধিক। উপাসনা-পদ্ধতিতে প্রত্যেক দেবী অথবা শক্তির স্বতন্ত্র স্থান। ব্রহ্মার পূজা নাই সুতরাং ব্রহ্মাণীরও পূজা হয় না। গঙ্গার পাবনী শক্তির উপাসনা। স্বর্গের অলকনন্দা, মহাদেবের জটাবিহারিণী, ভগীরথের শঙ্খনাদের অনুবর্ত্তিনী হইয়া ভস্মাবশিষ্ট সগর-বংশকে উদ্ধার করেন। সেই কারণে ভাগীরথী কলুষনাশিনী, আবহমান পুরাকাল হইতে কোটি কোটি নরনারী গঙ্গার খরস্রোত-সলিলে পাপ মনোমালিন্য ক্ষালন করিয়া আসিতেছে। লক্ষ্মীর পূজা পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য নয়, ইহ সংসারে বিত্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে। গৃহস্থ এই চঞ্চলা দেবীকে নানা উপচারে পূজায় প্রসন্ন করিয়া গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিয়া রাখিবার প্রয়াস করে। লক্ষ্মীর পূজা ঘরে ঘরে, কিন্তু কেহ তাঁহার নিকট পরলোকে কুশল প্রার্থনা করে না, কেহ তাঁহার নিকট মুক্তি-কামনা করে না, তাঁহার সেবায় ত্যাগ-স্বীকার করে না। তিনিও কাহারও ঘরে বাঁধা থাকেন না। যে ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত মূঢ় মনে করে, সে হীরামাণিক্যের লৌহপেটিকায় লক্ষ্মীকে বন্দিনী করিয়াছে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত পথের ভিখারী করিয়া হাস্যচঞ্চলা দেবী লঘু পদক্ষেপে গৃহান্তরে প্রবেশ করেন।

শক্তিদিগের মধ্যে শিবানী প্রধান। ইনি সকল শক্তির মূলীভূতা, সকল শক্তি ইঁহাতে নিহিত আছে। ধর্ম্মক্ষেত্রে সকল বিশ্বাসেই এইরূপ পরম্পরা দেখা যায়। বহু হইতে এক, এক হইতে বহু, আবার বহু একের আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্ততঃ এ দেশে এইরূপ ঘটিয়াছে। বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ধর্ম্ম-চিন্তার বিরাম ছিল না, সেইজন্য ধর্ম্মের ধারা বহুমুখী। শিবের শক্তি বলিতে প্রধানতঃ সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা পার্ব্বতীকেই বুঝায়। যুগল মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র হর-গৌরীর উল্লেখ—অর্দ্ধেক গলায় হাড়মালা, অর্দ্ধেকে গজ-মুক্তার মালা; অর্দ্ধাঙ্গে বিভূতি, অপরার্দ্ধে মলয়জ পঙ্ক, অর্দ্ধ দিগম্বর, অর্দ্ধ পট্টবস্ত্র। যুগল নাম করিতে হরপার্ব্বতী, গৌরীশঙ্কর, শিবদুর্গা বলি। প্রাচীন কাব্যে নগেন্দ্র-নন্দিনী উমার রূপ বর্ণনা অতুলনীয়—পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব—প্রচুর পুষ্পস্তবকে নম্রা পল্লব-যুক্তা গতিশালিনী লতার ন্যায় দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা এই ত্রিবিধ রূপে মহেশ্বরের শক্তি প্রকাশিতা। শিব শব্দের অর্থই শুভ, এই কারণে তাঁহার মঙ্গলময় সৌম্য মূর্ত্তি। তিনি আদিনট এইজন্য তিনি নটনাথ। কিন্তু ভোলানাথ মহাদেবের আর-এক মূর্ত্তি আছে, ত্রিশূলধারী, সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর, সংহার-মূর্ত্তি, ভৈরব, রুদ্র, মহাকাল। এই রুদ্র-

দেবের শক্তি রুদ্রাণী, কালের জায়া কালী। কাল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় যোগ করিয়া কালী শব্দ সাধিত হয়। কালী আদ্যা শক্তি। রামকৃষ্ণ পরমহংস স্থির জলের সহিত ব্রহ্মের ও সেই জল বায়ু-সংযোগে চঞ্চল হইলে শক্তির সহিত উপমা করিতেন। কালীর কৃষ্ণবর্ণের উপমায় কহিতেন, সমুদ্রের জল দূর হইতে কৃষ্ণ অথবা নীলবর্ণ দেখায়, নিকটে গিয়া সেই জল হাতে করিলে কোন বর্ণই থাকে না।

এই দেবীকে ভক্তগণ, কবিগণ শ্যামা বলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে শ্যামা অর্থে সুন্দরী—তন্বী, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা। আদ্যা শক্তিকে শ্যামা বলিতে কৃষ্ণা বুঝিতে হইবে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কালীর বর্ণনা আছে। ঐ পুরাণের মতে কোপে দেবীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে—

কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ
—কোপে ইঁহার বদন মসীবর্ণ হইল।

পুরাণকার কালীকে শক্তির অপর মূর্ত্তি না বলিয়া তাঁহাকে অম্বিকার ললাটফলকোদ্ভবা কৃষ্ণবর্ণা দেবী কল্পনা করিয়াছেন। অম্বিকা ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার ভ্রুকুটী-কুটিল ললাট হইতে কালী করালবদনা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মতান্তরে, সতী দক্ষযজ্ঞে গমনকালে কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তখনও তিনি কুপিতা। অথচ কুমারসম্ভব কাব্যে দেখিতে পাই,কবি পার্ব্বতী ও কালীকে দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেবী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিব যখন বরের উপযুক্ত বেশে সজ্জিত হইয়া, তরবারি-মধ্যে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, গৌরীর পাণিগ্রহণার্থ শৈলরাজের প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন সে-সময় সপ্তমাতৃকাগণ মহাদেবের অনুগমন করিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাতে নৃমুণ্ডমালিনী কালী গমন করিতেছিলেন—

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং কালী কপালাভরণা চকাশে।

সে-সময় সখীগণবেষ্টিত পার্ব্বতী বধূবেশে পিত্রালয়ে বিরাজ করিতেছেন। এই কালী যে মহাদেবের শক্তি অথবা রুদ্রাণী সে-কথার কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কালিদাসের কল্পনায় কালী ও অনূঢ়া পার্ব্বতী দুই স্বতন্ত্র দেবী, অধিকন্তু এই কালী রুদ্রাণী হইলে এই সময় বরের অনুগমন সম্ভব মনে হয় না, কারণ কোন পত্নীর পক্ষে সপত্নী হওয়া সুখের সংবাদ নয় এবং স্বামীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ-স্থলে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। কালিদাসের কালে তন্ত্র শাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল কি না এবং তাহার বিস্তৃত প্রসার হইয়াছিল কি না সে-কথা নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করা যায় না, কিন্তু ভবভূতির মালতীমাধব নাটকে তান্ত্রিক মতের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশযানগামিনী ভীষণোজ্জ্বলবেশা কপালকুণ্ডলা যোগিনী, রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া শক্তিনাথ শিবের জয় উচ্চারণ করিতেছেন।

তন্ত্রশাস্ত্র গ্রন্থের সংখ্যা অনেক, কিন্তু ঐ শাস্ত্র সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে নাই। নেপালে ও মিথিলায় অনেকগুলি পাওয়া যায়, বাকি কতকগুলি দেশান্তরে প্রচলিত। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তান্ত্রিক মতের বিস্তৃত প্রচলন হয় নাই। অষ্টবিধ আকারে কালীমূর্ত্তির পূজাবিধি আছে, তাহার অধিক সংখ্যক পূজার প্রথায় ভয়ের সঞ্চার হয়। দুষ্কর্ম্মকারীদিগেরও উপাস্য ও ইষ্টদেবী কালী। সেকালে বাংলা দেশে ডাকাতের দল ডাকাতে-কালীর পূজা করিত। নরহত্যাকারী ঠগেরা হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে কালীর উপাসক হইত। এই পূজাপদ্ধতি ত্রাসজনিত ও ইহার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা।

অপর পক্ষে কালী-উপাসকের মধ্যে অনেক পরম প্রেমিক ভক্ত ও মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কেন কালীর উপাসনা করেন এই প্রশ্নের উত্তরে কোন যুক্তি আছে কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। কালী বলিতেই পটের কালিকা মূর্ত্তি অথবা কোন মন্দিরের কালীমূর্ত্তি মনে পড়ে। এই মূর্ত্তি মানস-চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত না করিলে আদ্যা শক্তির গূঢ় অর্থ ধারণা করা অসম্ভব। পটকারের পটের ছবি কিংবা কুম্ভকারের গঠিত অথবা ভাস্করের খোদিত মূর্ত্তি দেখিয়া কোন দেবতার অবয়ব কল্পনা করিলে ভ্রান্তি হয়। এদেশে যাহারা দেবদেবীর মূর্ত্তি চিত্র করে বা নির্ম্মাণ করে তাহাদের কলাবিদ্যা ও ললিতকলার জ্ঞান যৎসামান্য, আদর্শ ধারণা এবং কল্পনা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেবদেবী মূর্ত্তি যে অনেক সময় দেখিতে বীভৎস হয় সে অপরাধ তাঁহাদের নয়, চিত্রকর বা সংগঠনকারীর কলা-কুশলের

অভাব। কল্পিত দেবদেবীর সংখ্যা বিস্তর হইলেও তাঁহারা অমূর্ত্ত, যাঁহার মূর্ত্তি নাই তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ অথবা মূর্ত্তিমতী করিলেই দেবতা লঘু হইবেন। মূর্ত্তিপূজার মূলে ধর্ম্মভাবের দৈন্য, সে-ভাব বলশালী ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই মূর্ত্তিপূজার আর স্থান থাকে না। দেবতার মাহাত্ম্য ধ্যান-ধারণার বস্তু, কোন ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত নয়। বেদের কালে দেবতার মূর্ত্তি কল্পিত হইত, হস্ত দ্বারা প্রতিফলিত হইত না। এই বিক্ষিপ্ত দেবকল্পনা উপনিষদে এক ব্রহ্মে কেন্দ্রীভূত হইল, কিন্তু এই দেবতাকে মানুষে কেমন করিয়া বুঝিবে? নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা—তাঁহাকে বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা বা চক্ষু দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না*। তবে মানব তাঁহাকে কেমন করিয়া জানিবে? যে কয়েক ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ হইয়াছে ইহা ব্যতীত সাধারণ মানবের আর কি ক্ষমতা আছে? উপনিষদের যুক্তি, উপনিষদের গভীরতা সাধারণ লোকের উপলব্ধির অতীত, এবং সেই কারণে বিশ্বাসে ক্রমে শৈথিল্য দেখা দিল। এইসকল নীরস, সংক্ষিপ্ত কঠিন মন্ত্রে সাধারণ লোকের তৃপ্তি হইল না। তাহার পর বৃহদায়তন, রূপকে উপকথায় পরিপূর্ণ, অভূতপূর্ব্ব, অলৌকিক ঘটনাবলী-সম্বলিত, অতিরঞ্জিত পুরাণ-সমূহ বিরচিত হইল। বেদবেদান্ত অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ রহিল, পুরাণ উপপুরাণ লোকসাধারণে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

আদ্যা শক্তির অস্তিত্ব-রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে মূর্ত্তিকল্পনা চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে হইবে। নিরাকারাকে সাকারা করিতে পারা যায় না, অমূর্ত্ত মূর্ত্তির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয় না। পুরাণের মতে ক্রোধের আতিশয্যে দেবীর গৌর বর্ণ মসীবর্ণে পরিণত হয়। ক্রোধে বর্ণ সচরাচর আরক্ত হয়, কৃষ্ণ হয় না। আর-এক আপত্তি আরও সমীচীন। যদি স্বীকার করা যায় যে, কোন কারণে শিবানীর বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে আদ্যা শক্তি কে? দেবীর মুখের বর্ণ অন্যরূপ হইবার পূর্ব্বে যে বর্ণ ছিল তাহাই ত তাঁহার আদি রূপ, বিবর্ণ আকৃতি কেমন করিয়া আদি হইতে পারে? প্রথমেই এই কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহার কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই। আমরা বলি কৃষ্ণ একটি বর্ণ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণতা সকল বর্ণের বিলুপ্তি। আলোকের প্রতিফলনে নানা বর্ণ দেখা যায়, আলোক না থাকিলে কোন বর্ণ থাকে না, সমস্তই মসীলিপ্ত হয়। সৃষ্টি-প্রকরণের পূর্ব্বে যে অবিভাজ্য গাঢ় অন্ধকার ছিল তাহাই আদ্যাশক্তির কল্পিত বর্ণ। বেদ-বর্ণিত সেই অতি গম্ভীর বর্ণনা স্মরণ করিতে হয়। তখন অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না, রজরূপী বায়ু ছিল না, ব্যোম ছিল না, না ছিল মৃত্যু না ছিল অমৃত, না রাত্রি না দিন। কালপ্রবাহের কোন চিহ্ন ছিল না, ত্রিকাল নির্ণয়ের কোন উপায় ছিল না। তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়ং—অদৃশ্য অন্ধকারে অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিল, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। সৃষ্টির প্রণব বাণী সেই সর্ব্বব্যাপী স্তব্ধতায় উচ্চারিত হয় নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঘোরা তমসাতিমিরমধ্যবর্ত্তিনী যে শক্তি তাহাই আদ্যাশক্তি।

আবার এই শক্তি অসুরদলনী, মহিষমর্দ্দিনী, শুম্ভনিশুম্ভ-ঘাতিনী। রূপকে রূপকে পৌরাণিক ধর্ম্ম-সাহিত্য সমাচ্ছন্ন, কিন্তু এখন সেইসকল রূপকের গূঢ়ার্থ লোকে সহজে বুঝিতে পারে না, হয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, না হয় অবিশ্বাস-যোগ্য উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দেয়। হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য স্তম্ভ ভেদ করিয়া নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাব গভীর ও সদর্থপূর্ণ রূপক। কিন্তু সে-কথা কয় জন বিচার করে? চণ্ডিকা মূর্ত্তিতে কালীর দৈত্যবিনাশ, তাঁহার বিভূতিতে সৈন্যসৃষ্টি সবই রূপক এবং সেই সকল রূপকের অর্থ বুঝিতে পারিলে কালীভক্তের মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারা যায়। চণ্ডিকার যুদ্ধের রঙ্গস্থল মানুষের হৃদয়ে, মানুষের প্রকৃতিতে যে-সকল রিপু আছে তাহারাই অসুর। রক্তবীজ কে? যে রিপুকে দমন করিয়া আমরা মনে করি তাহার বিনাশ হইয়াছে অথচ পর মুহূর্ত্তেই সেই রিপু আবার প্রবল হইয়া উঠে সেই রক্তবীজ। তান্ত্রিকের শবাসনা ভৈরবীর কল্পনা সংহারিণী দেবীর উৎকট উপাসনা।

রামপ্রসাদ সেনের ন্যায় ভক্ত কবি অথবা রামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় লোকগুরু মহাপুরুষ কালীকে এ ভাবে দেখেন নাই। জগজ্জননীর যে শক্তি, দেবীতে তাঁহারা সেই আদ্যা মাতৃশক্তি দেখিতেন। তাঁহাদের উপাসনা মাতৃবৎসল সন্তানের পূজা। ধর্ম্মে বিস্ময়মার্গ, ধ্যানমার্গ, জ্ঞানমার্গ বেদ-বেদান্তে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এখন ভক্তি

* কঠোপনিষৎ।

ও প্রেমমার্গের পথ হইল। একদিকে কালীর মাতৃরূপ ধারণা, অপর দিকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের উন্মাদনা। বৈষ্ণব শাক্ত সম্প্রদায় স্বতন্ত্র, কিন্তু মূলে ত সেই এক, যিনি হর তিনিই হরি, যিনি শিবানী তিনিই নারায়ণী। শ্রীচৈতন্য কিরূপ ভক্তি-প্রেমের বন্যা আনিয়াছিলেন মনে করিলে এখনও পুলকাঞ্চিত হইতে হয়। কোথায় গেল নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান ও তর্ক-প্রবণতা! হরি নামের স্রোতে ন্যায় ব্যাকরণ সব ভাসিয়া গেল। নবীন সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের প্রেমোন্মত্ততায় নবদ্বীপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়! হরিবাসরের সমস্ত রাত্রিব্যাপী সঙ্কীৰ্ত্তন, পথেঘাটে হরিনাম-মাহাত্ম্যের ঘোষণা। ভক্তির গদ গদ ভাব, সাত্বিক ভাবের স্বেদ, অশ্রু, পুলক, কম্প দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইল, গৌর নিতাইয়ের কৃপায় কত জগাই মাধাই তরিয়া গেল।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে সাধনার ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। তপস্যার কঠোর আত্মসংযম ও আত্মপীড়ন বিস্ময় উদ্রেক করে,কিন্তু নিস্পৃহ তপস্যার দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সকাম তপস্যারই উল্লেখ আছে। কেহ ইন্দ্রত্বের জন্য, কেহ অমরত্বের জন্য, কেহ ব্রাহ্মণত্বের জন্য, কেহ বলবান শত্রুকে পরাজয় করিবার জন্য তপস্যা করিত। তপস্যা ও ধ্যানে প্রভেদ এই যে, তপস্বী প্রার্থনাকারী, কোন বরলাভের জন্য তপস্যা করিতেন, ধ্যানী কেবল মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ধ্যান করিতেন। কঠোর তপশ্চরণ করিয়া তাহাতে কোন ফল হয় না দেখিয়া বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ হইলেন, ধ্যানে নির্ব্বাণের আলোক প্রাপ্ত হইলেন। বহুতর বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধদেবের সমাধিস্থ অবস্থার বার বার উল্লেখ আছে। নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষা প্রথমে গীতায় দেখিতে পাই, এই অপূর্ব্ব গ্রন্থে প্রথমে প্রচারিত হয় যে মানব সাধনা করিবে, কিন্তু সে সিদ্ধির অধিকারী নয়, ধর্ম্মবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাতে নিত্য জল সেচন করিবে, কিন্তু ফল ভগবানকে সমর্পণ করিবে। সাধনার এই উচ্চতম আদর্শ। ধর্ম্মসাধনের বিবর্ত্তনে প্রেমার্দ্র সাধনাই সর্ব্বশেষের বিকাশ, জীব ও ব্রহ্মে দূরতা তিরোহিত হইয়া নৈকট্য স্থাপিত হয়। জ্ঞান দ্বারা সাধিত অদ্বৈতভাব স্বতন্ত্র, কারণ তাহাতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে না। এ বিশ্বাসে জ্ঞানের গৌরব আছে, ভক্তির প্রেম নাই। ধর্ম্মের যুগযুগান্তরে এইরূপ বিশ্বাস ও সাধনার পর্য্যায়।

দেবতার রুদ্র রূপের কল্পনা পুরাণ হইতে আরম্ভ নয়। উপনিষদে রমণীকুলে ধন্যা মৈত্রেয়ী তাঁহার অতুলনীয় প্রার্থনা মন্ত্রে ব্রহ্মকে রুদ্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। অসতোমা-সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়—অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও। প্রার্থনাসমাপ্তিতে মৈত্রেয়ী বলিতেছেন, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তদ্দ্বারা আমাকে সতত রক্ষা কর। দেবতার বাম, অপ্রসন্ন, রুদ্র মূর্ত্তি প্রথমেই মৈত্রেয়ীর স্মরণ হইতেছে, কিন্তু সেই দেবতা প্রসন্ন হইলে রক্ষা করেন। রুদ্র মূর্ত্তিতে যিনি সংহারকর্ত্তা, প্রসন্ন মূর্ত্তিতে যিনি রক্ষাকর্ত্তা, সেই দেবতার উভয় মূর্ত্তি মৈত্রেয়ী যুগপৎ কল্পনা করিতেছেন।

অতএব এই পরস্পর বিরুদ্ধ দ্বৈত ভাব দেবতার সনাতন কল্পনা। শম্ভুর শিবসুন্দর রূপ, আবার তাঁহারই প্রলয়ঙ্কর, সর্ব্বদহনকারী মহাকাল মূর্ত্তি। যিনি করালী, চামুণ্ডা, রণরঙ্গিণী তিনিই আবার অনাদ্যা, আদিভূতা, অভয়া, সর্ব্বমঙ্গলা, ভুবনেশ্বরী। রুদ্র অথবা রুদ্রাণীর উপাসনায় কিংবা প্রচারে প্রতিষ্ঠা অথবা লোক-শিক্ষা হয় না। কোন কাপালিক অথবা উগ্র তান্ত্রিক, কোন শ্মশানবাসিনী তেজস্বিনী ভৈরবী লোক-সমাজে বহু সম্মান পান না। দেবতায় শ্রদ্ধার মূলে ভীতি নয়, প্রীতি। যাহাকে সর্ব্বদা ভয় করিব তাঁহাকে ভালবাসিব কেমন করিয়া? দেবতাকে ভয় করিলে কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইব? এই কারণে শিবের উপাসনা যেরূপ সাধারণে প্রচলিত রুদ্রের উপাসনা সেরূপ নয়।

শক্তির উপাসনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও শক্তির কল্পনা প্রাচীন। কেন-উপনিষদে কথিত আছে দেবগণ দৈত্যদিগকে পরাভব করিয়া গর্ব্বপূর্ণ হইলে যক্ষরূপী ব্রহ্ম অগ্নি ও বায়ুর দর্প হরণ করিলেন এবং ইন্দ্র তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তিরোহিত হইলেন। ইন্দ্র দেখিলেন, যে-স্থলে যক্ষ দণ্ডায়মান ছিলেন সেই স্থলে হৈমবতী উমা দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যক্ষ কে?" উমা উত্তর করিলেন, "ইনিই ব্রহ্মণ্।" তখন দেবতারা জানিতে

পারিলেন। এই উমাই শক্তিরূপিনী এবং উপনিষৎকার দেখাইতেছেন, ইঁহার অন্তর্দৃষ্টি দেবতাদিগের অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। উমা হিমবৎকন্যা ও পরমা সুন্দরী। অদিতিও সংহারকারিণী শক্তির কল্পনা, আবার এই অদিতিই দেব ও দৈত্যকুলের প্রসূতি।

ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতা উপনিষদ-সমূহে যেরূপ লক্ষিত হয় আর কোনও দেশের কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই গভীর তত্ত্ব যেমন চিন্তাপূর্ণ ইহার উপলব্ধিও সেইরূপ কঠিন। উপনিষদের একমাত্র দেবতাকে ঋষিগণ নানা নামে সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি পূষন্, তিনি প্রাজাপত্য, তিনি কল্যাণতমম্, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। তিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং, তিনি সর্ব্বাজ্ঞে, তিনি অন্তর্যামী। কিন্তু মনুষ্য-লোকে যে পিতৃমাতৃসম্বন্ধ আছে সেরূপ সম্বন্ধ ব্রহ্মে আরোপিত হয় নাই। ইহুদীদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের নৈকট্য অনুভব করা যায়, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহাকে প্রভু অথবা প্রভু ঈশ্বর নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট প্রথমে ঈশ্বরকে পিতৃনামে সম্বোধন করেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া অপরসাধারণকে সে-অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রার্থনা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই আবৃত্তি করে। সেই প্রার্থনার প্রারম্ভেই আছে—

Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name—**হে আমাদের স্বর্গস্থিত পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র হউক।**

যিনি জগতের স্রষ্টা, জগৎপিতা, তিনি মানব-লোকেরও পিতা, অতএব পিতৃসম্বন্ধে তাঁহার প্রার্থনা করিলে চিত্তের প্রসাদ হয়। ব্রহ্মবাদীও পিতৃসম্বোধনে ব্রহ্মের উপাসনা করেন। কোন ধর্ম্মের উপাদানে চিন্তার একটা প্রবাহ আছে, কোন ধর্ম্মে তাহা নাই। ইস্লাম ধর্ম্মে কোরাণে যাহা প্রচারিত হইয়াছে তাহাই ধর্ম্মের আদি ও তাহাই শেষ, ইহাতে কোনরূপ সম্প্রসারণ বা বিবর্ত্তন হইতে পারে না। ইহুদীয় ধর্ম্মেও তাহাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ করিব না কারণ ঐ ধর্ম্মেও অন্যান্য ধর্ম্মে মৌলিক প্রভেদ আছে। এই ভারতে শুধু বিশ্বাস বহুমুখী দেখা যায়। এমন কোন কাল হয় নাই যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ততা বা উদাসীনতা দেখা দিয়াছে। যদি জ্ঞানের সোপান দেখা যায় তাহা হইলে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদের সোপানই সর্ব্বোচ্চ। ঔপনিষদ-ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন, এসম্বন্ধে আয়ত্ত শব্দ ব্যবহার করাই অপরাধ, এবং সেই কারণে জ্ঞানমার্গের পথিক অল্প। যে-তীর্থে শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া উপনীত হওয়া যায়, সে-তীর্থের অনেক যাত্রী, কিন্তু যে-তীর্থের জন্য বুদ্ধি, চিত্ত ও মেধার কঠিন শাসনের প্রয়োজন সে-পথে যাত্রী অধিক হয় না। এইজন্য উপনিষদ-সমূহ বহু প্রাচীন হইলেও উহাদের কোন কালে বহুল প্রচার হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা নাই।

পিতৃভাবে দেবতার উপাসনা একটি সোপান। সে সোপান ঊর্দ্ধদিকে কি অধোমুখে সে-সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। তবে যাঁহাকে পুরুষ বলা হইত তাঁহাকে পিতা বলাতে মানুষ তাঁহাকে পূর্ব্বের অপেক্ষা একটু নিকটে পাইল। পিতা দেবতুল্য, পিতৃ-ভক্তিতে মানুষ ধন্য হয়, পিতা প্রধান গুরু, পিতার আদেশে সন্তান নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশ্বপিতাকে পিতৃনামে সম্বোধন করিলে শান্তি লাভ হয়, বিভুপাদপদ্মে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে গভীর আনন্দ অনুভূতি হয়। ধর্ম্মের উচ্চতম শিখরেও প্রেমের অভাব নাই, কেননা যথার্থ ঈশজ্ঞান প্রেমশূন্য হয় না, কিন্তু যেরূপে দেবতাকে স্মরণ করিবে সেই অনুসারে প্রেমের তারতম্য হইবে। ইহাতে কোন সম্প্রদায় অথবা কোন উপাসনাপদ্ধতির প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ নাই। এই ভাব নাই বলিয়াই এদেশে ধর্ম্মের এত রূপ বিশ্বাস বিনা বিরোধে স্থান পাইয়াছে। অদ্বৈতবাদী, উপনিষদোক্ত ব্রহ্মোপাসক, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, মূর্ত্তিপূজক সকলের এই মুক্ত ক্ষেত্র। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে ঔদ্ধত্য নাই। ধর্ম্মের কোন নিষেধ নাই, বিশ্বাসে কোন বাধা নাই, এই মূল মহামন্ত্র আর্য্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা।

আর-এক সোপান মাতৃভাবে দেবতার আরাধনা। পিতা পরমগুরু কিন্তু মাতার তুলনায় তিনি অনেক দূরে। পিতা গম্ভীর, মাতা আনন্দময়ী; পিতা শাসন করেন, মাতা লালন করেন; পিতা কঠোর, মাতা কোমল; পিতা দুর্লভ-দর্শন, মাতা দৃষ্টির অতীত হন না; পিতা গুরু, মাতা দেবী। পৃথিবীতে প্রায় সকল ভাষাতে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া মাতা শব্দই ব্যবহার হয়। মা—এই একাক্ষর

শব্দ—ভাষায় কি ইহার তুল্য আর একটি কথা আছে? এমন নরাধম কে আছে মা বলিতে যাহার কণ্ঠ অন্তর্বাষ্প-জড়িত না হয়? যেমন মুকুরে প্রতিবিম্ব পড়ে তেম্‌নি এই একটি কথায়, এই মা নামে মানুষের ইহজীবনের লীলা প্রতিবিম্বিত হয়। যে অতীতের স্মৃতি মনের মধ্যে সর্ব্বদা ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাকে জিজ্ঞাসা কর কাহার মুখখানি প্রথমে মনে পড়ে, কাহার কণ্ঠস্বর স্মৃতির বীণা-তন্ত্রীতে প্রথম শোনা যায়? জীবন-প্রভাতের প্রথম আলোকে মায়ের করুণাময়ী মূর্ত্তি, বাল্যকালের সকল অবস্থায় মা, সংসারের প্রবেশ-দ্বারে সেই মমতাময়ী মা পথ দেখাইয়া দেন। রোগের যন্ত্রণার সময় শুষ্ক, তপ্ত, ক্লিষ্ট কণ্ঠে কাহার নাম মুখে আসে? প্রভাতকালে গাছের ডাল নাড়া দিলে যেমন শিশির-বিন্দু পড়ে মনের মধ্যে মায়ের স্মৃতি আন্দোলিত হইলে সেইরূপ চক্ষে অশ্রু ঝরে। যিনি জননীর জননী, আদি জননী সেই বিশ্বজননীকে মাতৃভক্তি, মাতৃপূজা অর্পণ করিলে কিরূপ আনন্দ হয়!

ইংরেজী ভাষার একটি বিশেষ প্রসাদগুণ এই যে, ঈশ্বরকে "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিলে কোন দোষ হয় না। তাঁহাকে এইরূপ সম্বোধন করাই প্রথা। যীশু খৃষ্টের প্রচলিত প্রার্থনায় আছে,—Hallowed be thy name. Thy kingdom come। বাংলায় যদি ইহার অনুবাদ করা যায়—তোর নাম পূত হউক, তোর রাজ্য স্থাপিত হউক, তাহা হইলে শুনিতে কেমন অসঙ্গত হয়। ইংরেজিতে তুই শব্দ ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে উহার কেমন একটি স্বাতন্ত্র্য গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হয়। ইংরেজিতে ঈশ্বরকে you (তুমি) বলিলেই শুনিতে অসঙ্গত হয়। অপর পক্ষে বাংলায় ব্রহ্মকে তুই বলিলে অসম্মানসূচক হয়। তুই শব্দের তাচ্ছিল্য বা কটুতা বাদ দিলে ঐ শব্দ স্নেহ-ব্যঞ্জক, বড় ছোটকে তুই বলিয়া সম্ভাষণ করে। ছোট বড়কে তুই বলিতে পারে না। জীব কোন্ সাহসে ব্রহ্মকে তুই বলিবে?

যতক্ষণ ব্রহ্মকে পুরুষ অথবা পিতৃভাবে অনুধ্যান করা যায় ততক্ষণ ভাষার সংযম লঙ্ঘন করা যায় না। কিন্তু একবার মাতৃভাবে তাঁহার ধারণা করিতে পারিলেই সব বাঁধন ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যায়। মাতৃবক্ষে সন্তান ঝাঁপাইয়া পড়ে, দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষান্ত হয় না। যাঁহার উপর আব্‌দারের সীমা নাই তাঁহাকে কতক্ষণ সমিহা করিবে? প্রাণের সমস্ত আকুলতা-ব্যাকুলতা, হৃদয়-ভরা অভিমান তাঁহার চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়ে। শোকতাপ পাপের ভরা ভারি হইলে তাঁহার পাদপদ্মে নামাইয়া ভার-মুক্ত হই। রামপ্রসাদ যখন গাহিয়া উঠিলেন,

> মা আমায় ঘুরাবি কত
> কলুর চোকঢাকা বলদের মত?

তখন কানে প্রাণে বড় মধুর লাগিল। ভক্ত জগন্মাতাকে তুই বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ইহাতে অসমঞ্জস কিছুই ঠেকে না। এই যে কাতর প্রাণের অনুযোগ, নিয়ত নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণ্যমান কর্ম্মচক্র হইতে নিষ্কৃতির প্রার্থনা, সংশয় হইতে বিশ্বাসে নীয়মান হইবার আবেদন, ইহাও সেই বহুযুগবাহিনী উপনিষদের প্রার্থনার প্রতিধ্বনি। ঘুরিয়া ফিরিয়া, রুদ্রের পরিবর্ত্তে রুদ্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া, মৈত্রেয়ীর সেই চিরন্তনী বাণী, রুদ্রাণি, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। ব্রহ্মবাদিনীর যে-কথা কালিভক্তেরও সেই কথা। আবৃতচক্ষু বলদের মত অন্ধকারে ঘুরিতেছি, তমসো মা জ্যোতির্গময়! যাঁহাকে এই নিবেদন তিনি ভীমা ভয়ঙ্করী নন, তিনি প্রসন্নময়ী, মঙ্গলময়ী। আগম নিগম ধেয়াওত নহি পাওয়ত মহিমা-সমুহ—আগম নিগম তাঁহার ধ্যান করে, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ মহিমা পায় না।

দেবতাকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করা সাম্প্রদায়িকতা নয়। ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন রোগের শেষ অবস্থায়, মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে যন্ত্রণায় ক্ষীণ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "মা, কোথায় তুমি?" জননী পাশে বসিয়াছিলেন, গায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "এই যে, বাবা, আমি তোমার পাশে ব'সে আছি।" কেশবচন্দ্র মায়ের পায়ের ধূলি লইয়া মাথায় দিলেন, তাহার পর কহিলেন, "এ মা নয়!" অতঃপর মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন মায়ার সকল বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে, অন্তরাত্মা জীর্ণ, ক্লিষ্ট দেহ হইতে মুক্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছে। মহাপ্রাণ মহাপুরুষ ইহলোক হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া লোকান্তরে অর্পণ করিতেছেন। ইহসংসারে যাহারা আপনার বলিবার ছিল তাহারা ইহসংসারে রহিল। মহাপ্রস্থানের সময় কে কার

সঙ্গে যায় ? মা ব্রহ্মময়ী, কোথায় তুমি ? এই সংসার-ক্লান্ত সন্তানকে কোলে তুলিয়া লও ! যে-কর্ম্মের জন্য পাঠাইয়াছিলে তাহা পূর্ণ হইয়াছে এখন তোমার চরণারবিন্দের চির-শান্তিময় ছায়ায় সন্তানকে আশ্রয় দাও !

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে জননীরূপিনী আদ্যা শক্তির উপাসনার পূর্ণ বিকাশ ও পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এই চিন্ময়ী দেবীকে যে-ভাবে আত্ম-সমর্পণ করেন তাহাতে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। যে-গ্রন্থে তাঁহার বাণী সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে, তিনি জানিতেন ও বলিতেন, যিনি পরব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই মা। রামকৃষ্ণ পরমহংসের পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না, সাধুভাষাতে তিনি কথাবার্ত্তাও কহিতে জানিতেন না, কিন্তু এই যুগে এমন মর্ম্মস্পর্শী অমৃতময়ী বাণী আর কাহারও মুখ হইতে নিঃসারিত হয় নাই। পর্ব্বতের অন্তর্দেশ হইতে যেমন মধুরসলিলা নির্ঝরিণী প্রবাহিত হয় রামকৃষ্ণের হৃদয়ের উৎস হইতে সেইরূপ জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম শিক্ষার অমৃতধারা প্রবাহিত হইত। এমন এক সময় ছিল যখন তাঁহার মুখে অন্য কথা ছিল না, শয়নে স্বপনে জাগরণে কেবল মা, মা, মা ! সময়ে সময়ে তিনি মা বলিয়া এমন রোদন করিতেন যে, লোকে দেখিয়া অবাক্ হইত। এই যে আবেগপূর্ণ আর্ত্তি, কাতরতা, ইহাই প্রেমের পথ। আবার এই মহাপুরুষ নিজের সাধনায়, নিজের বিশ্বাসে এমন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় দেখাইয়া গিয়াছেন যে, তাহার তুলনা নাই। সকল ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা, সকল ধর্ম্মে তাঁহার প্রীতি। সকল সম্প্রদায়ের ভক্তকে তিনি শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। সমাধি অনেক দিনের শোনা কথা, পূর্ব্বে ধ্যানস্থ মুনিদিগের সমাধি হইত, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এরূপ লেখা আছে। প্রধান কালীভক্ত কাহারও কাহারও সমাধি হইত এমনও শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীনন্দকুমারের গানে আছে—

কবে সমাধি হব শ্যামা-চরণে,
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা সনে।

যাঁহারা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সমাধি অবস্থাও দেখিয়াছিলেন। সমাধি বুঝিবার নয়, বুঝাইবারও নয়, কিন্তু রামকৃষ্ণ স্বয়ং শিষ্য ও শ্রোতাদিগকে যেরূপ বুঝাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সমাধিতেও বিচিত্র সমন্বয়; কখন অরূপের আলোচনায়, কখন সচ্চিদানন্দময়ীর ভক্তি-উচ্ছ্বাসে, কখন রাধাশ্যামের প্রেমের মত্ততায়, সকল অবস্থাতেই সমাধি, কথা কহিতে কহিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, নিস্পন্দ দেহ, স্থির মুখে ও অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে অপূর্ব্ব আনন্দ-ভাতি !

এই সর্ব্বতোমুখী প্রীতি, ভগবদ্ভক্তির তন্ময়তা ভক্তশ্রেষ্ঠের পক্ষেই সম্ভব। গীতায় উক্ত হইয়াছে,

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।

অন্য কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করেন। কেহ কেহ অভিন্ন ভাবে, কেহ কেহ স্বতন্ত্র ভাবে, কেহ কেহ সর্ব্বাত্মক ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন লোকে নানা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমার আরাধনা করিয়া থাকে।

অরূপ ব্রহ্মের রূপভেদও গীতায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,

পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥

আমি এই জগতের পিতা ও মাতা, বিধাতা ও পিতামহ, আমিই বেদ্য ও পবিত্র বস্তু, এবং আমিই ওঁকার ও ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ স্বরূপ।

পৃথিবীর পাশ্চাত্য খণ্ডে যে-সকল দেশে ঐশ্বর্য্য ভোগ বিলাসের মদগর্ব্বে পরব্রহ্মে বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে সেখানেও চিন্তাশীল লোকেরা স্বীকার করেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে, নিসর্গ লীলার তিরস্করণীর অন্তরালে কোনও মহাশক্তি বিদ্যমান। সেই মহাশক্তি আদ্যা শক্তি।

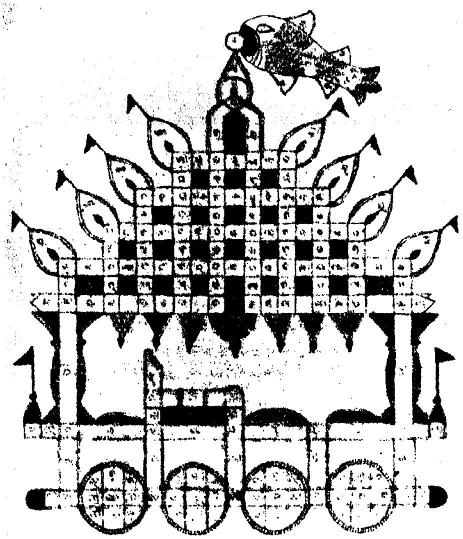
এই শক্তিরূপিণী, মাতৃরূপিণী দেবীতে ভক্তি অচলা হইলে, বিশ্বাস দৃঢ়রূপে মূলীভূত হইলে এই পৃথিবী পুণ্যভূমি হইয়া উঠে, সকল স্থানই তীর্থস্বরূপ মনে হয়, মৃত্যুভয় অপনীত হয়। তখন ভক্ত আনন্দের আবেগে গাহিয়া উঠেন,

শ্যামা মা বলে যথায় তথায়, প্রাণ যদি যায়
ভূদেব বারাণসী কি করে গয়ায় !
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, পায় সে চতুর্ব্বর্গ,
শিবত্ব লইয়া শিব পিছু পিছু ধায় !

উড়িষ্যার আল্‌পনা

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

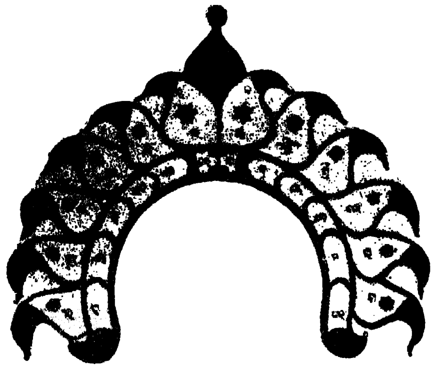
উড়িষ্যার শিল্পের দিকে শিল্পরসিকদের দৃষ্টি পড়েছে অনেকদিন থেকে। বাঙালী সমঝ্‌দারদের মধ্যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথম এসম্বন্ধে আলোচনার সুরু করেন।



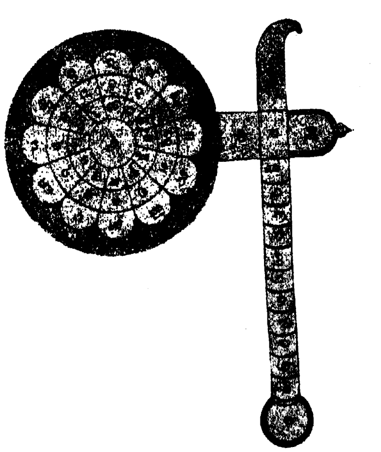
চিত্র নং ১

তাঁর পরে যে-সব পণ্ডিত এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মনোমোহন গাঙ্গুলীর নাম উল্লেখযোগ্য। এখনও যে একদল উৎসাহী কর্ম্মী এবিষয়ে আলোচনা কর্‌ছেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি শ্রীযুক্ত নির্ম্মল-কুমার বসুর নতুন বই 'কণারকে'। যে-সব শিল্পীরা উড়িষ্যার শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করেছিল, তাদেরই বংশধর এখনও পুরী, ভুবনেশ্বর ও যাজপুরে আছে। কলিকাতার প্রাচ্য-শিল্পকলার সমিতিতে তাদেরই দুএকজন শিল্পীকে এনে, সেই লুপ্ত শিল্পবিদ্যার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে যে আল্‌পনা দেওয়ার প্রথা রয়েছে, সেই আল্‌পনা সংগ্রহ কর্‌বার চেষ্টা তেমন হয়নি। কিছু কাল আগে ডাক্তার এনান্‌ডেল (Dr. Anandale) চিল্কা হ্রদের নিকটে যে-আল্‌পনা সংগ্রহ করেন, সেগুলি তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটীর Memoirsএ প্রকাশ করেন।

উড়িষ্যার যে-সব শিল্পীদের পূর্ব্বপুরুষরা পুরী, ভুবনেশ্বর



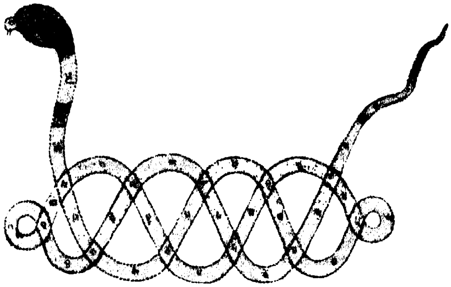
চিত্র নং ২



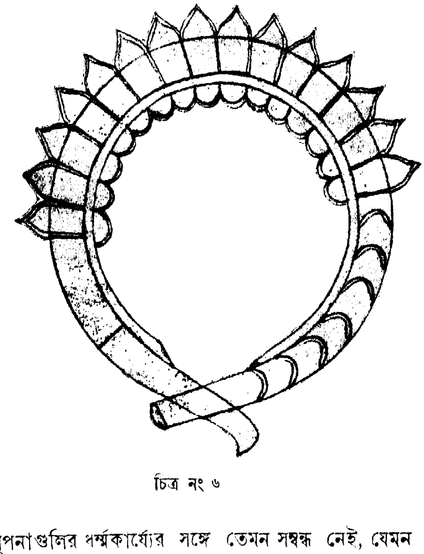
চিত্র নং ৩

বা কণারকের মন্দির তৈরি করেছিল, আল্পনা তাদের হাতের কাজ নয়। আল্পনা হচ্ছে অন্তঃপুরের মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তি। এখানে পুরুষ শিল্পীরা নিজেদের কৌশল দেখাবার অবকাশ পায় না। মেয়েরাই নিজের হাতে পূজা-পার্ব্বণে এই-সব আল্পনা এঁকে দেয়। কিছুদিন আগে আমি ময়ূরভঞ্জের আল্পনার নমুনা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছিলাম। আজ উড়িষ্যার জনসাধারণের মধ্যে যে-রকম আল্পনা দেবার প্রথা আছে তারই কিছু পরিচয় দেবো।

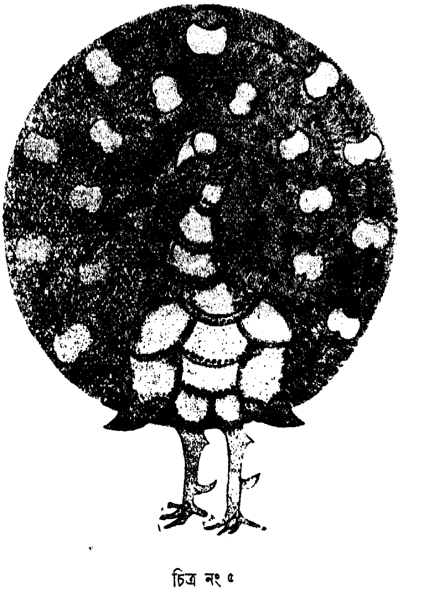
উড়িষ্যায় আল্পনা "ঝুঁটী" নামে পরিচিত। এইসব ঝুঁটী দেয়ালের গায়ে সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজার সময় দেখা যায়। কিন্তু পূজা-পার্ব্বণ ছাড়াও অনেক সময় শুধু দেয়াল সাজাবার জন্যও অনেক রকম আল্পনা দেয়ালে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে পূজার বা ধর্ম্মকার্য্যের কোন সম্বন্ধ নেই। যেমন অনেক সময় দেয়ালে শুধু এক রথের আল্পনা (চিত্র নং ১) দেওয়া হ'ল। এর সঙ্গে অবশ্য ধর্ম্মের একটু সম্বন্ধ আছে। কারণ, উড়িষ্যায় রথের সঙ্গে সাধারণে খুব পরিচিত, বিশেষ জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে। জগন্নাথের প্রিয় ব'লে রথ দেয়ালে আঁকা খুব স্বাভাবিক। রথের চূড়ায় যে পতাকা দেওয়া হয়েছে সেটির মাছের আকার, বোধ হয় "মীনকেতন" বোঝাবার জন্যেই দেওয়া হয়েছে। অন্য



চিত্র নং ৪



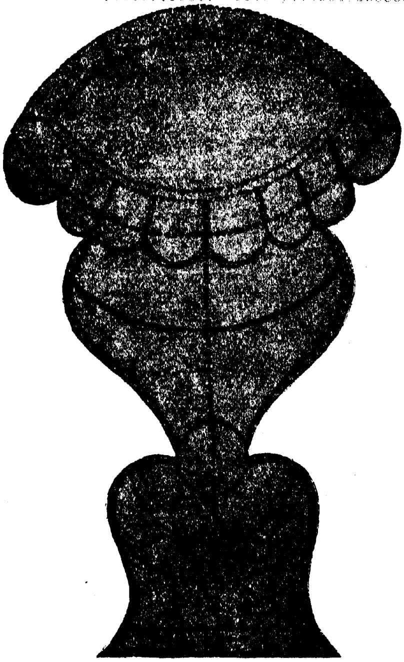
চিত্র নং ৬



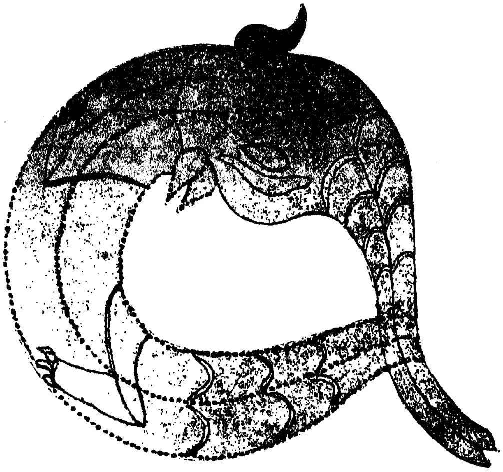
চিত্র নং ৫

আল্পনাগুলির ধর্ম্মকার্য্যের সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ নেই, যেমন মুকুট (চিত্র নং ২) বা পাখা (চিত্র নং ৩) বা সাপ (চিত্র নং ৪) বা ময়ূর (চিত্র নং ৫)। অপর আল্পনাগুলি সম্বন্ধে (চিত্র নং ৬, ৭, ৮) ঐ কথাই প্রযোজ্য।

এই আল্পনার বিশেষত্ব এই যে, এগুলি একান্তই মেয়েদের সম্পত্তি। যদিও তাঁরা কোন আর্টস্কুলে শিক্ষা পান না, তবুও খুব সুন্দরভাবে তাঁরা এগুলি আঁকেন। এই যে জনসাধারণের শিল্প এটি অভিজাত সম্প্রদায়ের শিল্প থেকে বিভিন্ন। যে-সব শিল্পীরা রাজার বা ধনীর জন্য শিল্পরচনা করেছে, তাদের সমুংখ্যা ষ্টিমেয়। তাদের শিল্পকলা সেই



চিত্র নং ৭



চিত্র নং ৮

শিল্পীদলের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু এই আলপনা জনসাধারণের সম্পত্তি, এটি লৌকিক শিল্প। এ কোন দল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বা কোন রাজা বা কোন ধনীর আদেশে দৃষ্ট নয়। দেবপূজার সময় বা আনন্দ-উৎসবের সময়েই এই আলপনার আবির্ভাব হয়।

এই প্রবন্ধে যে আলপনার নমুনাগুলি দেওয়া হইল, সেগুলি "প্রবন্ধ চিত্রকাব্য" নামে একখানি উড়িয়া বই হইতে দেওয়া হইয়াছে। যদিও এখানি একটি উড়িয়া কাব্য, তবু এতে অনেক ছবি দেওয়া আছে। সেইসব ছবি আলপনার মত দেওয়ালে আঁকা হয়। আমার কাছে যে "প্রবন্ধ চিত্রকাব্য" আছে, সেটি হাতে লেখা ও ছবি-গুলিতে রং দেওয়া আছে। এখানি ময়ূরভঞ্জের আমার এক বন্ধু আমাকে ধার দিয়েছেন।

হিন্দু বিদ্যার্থী (Hindu Students)

এই ছবিখানি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বিলাতের তৎ-সাময়িক প্রসিদ্ধ চিত্রকর আর্, এ, স্কান্‌লন (R. A. Scanlon, R. A.) কর্তৃক অঙ্কিত হয়। ছবিতে যে চারজন ছাত্রের প্রতিকৃতি আছে তাঁহারা সকলেই বাংলাদেশের কৃতী সন্তান। ইহাঁরাই প্রথম বিদ্যার্জ্জনের জন্য এদেশ থেকে বিলাত যাত্রার সূচনা করেন।

গভর্ণার জেনরল্ লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিঙ্কের নাম নানা কারণে এদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার অনেক কীর্ত্তির মধ্যে, এই ছবিখানি সম্পর্কে দুইটির বিষয় বলা যায়।

প্রথম, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারিতে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্থাপনা; দ্বিতীয়, ঐ বৎসরের ৭ই মার্চ্চ

তারিখে এতদ্দেশবাসীদের ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধীয় গভর্ণমেণ্ট অর্ডার। তাঁহার এই সৎকার্য্যের মূলে রাজা রামমোহন রায়, সার্ চার্লস ট্রেভেলিয়ান, লর্ড ম্যাকলে ও রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডফ এই কয়জন ছিলেন। ইহাঁদের পরামর্শ ও চেষ্টা না থাকিলে তাঁহার পক্ষে এইসকল কার্য্য করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ তাঁহার দ্বারা স্থাপিত হইবার পরে ঐরূপ অন্যান্য কলেজও স্থাপিত হয়। যে-সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এদেশের শিক্ষা ও উন্নতির পথের কুসংস্কারমূলক বাধা-বিপত্তি উচ্ছেদ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অন্যতম এইসকল মেডিক্যাল কলেজ। ইহাদের জন্যই এদেশীয় ছাত্রেরা শবব্যবচ্ছেদ আরম্ভ করে ও ইহাদেরই দরুন্ বিদ্যাশিক্ষার্থে সমুদ্রপথে বিদেশ-যাত্রারও সূচনা হয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় প্রথম বার বিলাত-যাত্রার সময় দুইজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রকে নিজের খরচে বিলাতে লইয়া যাইয়া শিক্ষাদান করিতে চাহেন। কিন্তু সেইবার কেহই তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। তিনি দ্বিতীয় বার যাইবার সময়ও পুনর্ব্বার ঐ প্রস্তাব করেন। ডাঃ মুয়াট (Dr. Mouat) মেডিক্যাল কলেজের সমবেত ছাত্রবৃন্দের সম্মুখে এই প্রস্তাবের কথা বলেন ও সঙ্গে-সঙ্গে এইরূপে বিদ্যালাভের সুফল সম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ফলে, তিনজন ছাত্র বিনাসর্ত্তে বিদেশ যাত্রার জন্য অগ্রসর হয়েন।

ইহার পর ঐ কলেজের প্রফেসর (Dr. Goodeve) গুডিভ কয়েকটি সর্ত্তে ঐ ছাত্রদের অভিভাবকরূপে সঙ্গে যাইতে ও আরো একজন ছাত্রের খরচ জোগাইবার ভার গ্রহণ করিতে চাহেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সর্ত্তে রাজী হওয়ায় তিনি আরও ৭৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করেন। এই টাকার অর্দ্ধেকের উপর মহামহিম বাংলার নবাব নাজিম মহোদয় দান করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ প্রফেসার গুডিভ ও ঐ চারি জন ছাত্র বেণ্টিঙ্ক ষ্টীমারে বিলাতযাত্রা করেন। এই চিত্রে উক্ত চারিজনের প্রতিমূর্ত্তি ও স্বাক্ষর রহিয়াছে। তাঁহাদের নাম, ধাম, বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইল।

(১) সূর্য্যকুমার (গুডিভ) চক্রবর্ত্তী। ইনি ঢাকার বিক্রমপুর পরগণায় কোমুখা গ্রামে ১৮২৫ (?) খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বৎসর বয়সে, পিতৃমাতৃহীন অবস্থায়, তিনি এক আত্মীয়ের আশ্রয়গ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় বাংলা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষা শিক্ষা করার পর ১৩ বৎসর বয়সে তিনি ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন, কিন্তু আত্মীয়েরা আর সাহায্য করিতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাকে শিক্ষায় সাহায্য দানের পরিবর্ত্তে, এক ভদ্রলোকের পাচক রূপে নিযুক্ত হইতে হয়। সেখানে সুবিধা না হওয়ায় ১৭ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া মিঃ আলেকজাণ্ডার নামক এক সিবিলিয়ানের শরণাপন্ন হয়েন এবং তাঁহার সাহায্যে ১৮৪৩ খৃঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। দুই বৎসর পর তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে চার বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-বি, ও এম্-ডি, দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং ইংলণ্ডের কলেজ অব্ সার্জ্জন্স্এর সদস্য পদলাভ করেন (Member of the College of Surgeons of England)। ইতিমধ্যে তিনি ইয়োরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁহার বিলাতের শিক্ষকগণের চেষ্টায় ও প্রশংসাবাদে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এদেশে ফিরিবার পর মেডিক্যাল কলেজে এসিষ্টাণ্ট ফিজিসিয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ১৮৫৪ খৃঃ তিনি অস্থায়ী প্রফেসার (মেটিরিয়া মেডিকা ও ক্লিনিকাল মেডিসিন) পদলাভ, ও ১৮৫৫ খৃঃ বিলাতে যাইয়া এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন্সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার ফলে, ১৮৫৭ খৃঃ অস্থায়ী সাধারণ প্রফেসার পদে নিযুক্ত হয়েন। নয় বৎসর অস্থায়ী প্রফেসার থাকার পর ১৮৬৬ খৃঃ তিনি স্থায়ীরূপে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তিনি ১৮৪৯ খৃঃ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ও উক্ত ধর্ম্মমতে এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ডাঃ গুডিভ তাঁহাকে সম্প্রদান করায় তিনি তাঁহার নাম গ্রহণ করেন।

১৮৭০ খৃঃ স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিলাত যাত্রা করিতে হয়। এবং সেইখানে লণ্ডনসহরে ১৮৭৪ খৃঃ ২৯শে

সেপ্টেম্বর চার পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোক যাত্রা করেন।

তিনি অধ্যাপনায় অতিশয় যত্নবান ছিলেন ও ছাত্র এবং সহকর্ম্মী বিদেশী শিক্ষক সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতেন। এনিউরিজম্ রোগে পটাসিয়াম্ আইওডাইড্ প্রয়োগ তাঁহারই আবিষ্কার।

(২) ভোলানাথ বসু। ইনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ব্রামলি ও গুডিভের চেষ্টায় ১৮৪০ খৃঃ ইঁহার মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ ঘটে। ১৮৪৫ খৃঃ বিলাতে যাইয়া ১৮৪৮ খৃঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-ডি, উপাধি লাভ করেন (ইনিই ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রথম এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন)। দেশে ফিরিয়া তিনি ফরিদপুরে গভর্ণমেণ্টনিযুক্ত ডাক্তারের পদ লাভ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি সামরিক চিকিৎসা-বিভাগে কার্য্য করেন। চিলিয়ানওয়ালা যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত ছিলেন ও তজ্জন্য পদক লাভ করেন। যুদ্ধ-শান্তির পর তিনি নিজ পদে ফিরিয়া যাইয়া তথায় ১৮৭৭ খৃঃ পর্য্যন্ত থাকেন। তাহার পর দুই বৎসরের ছুটিতে বিলাতে থাকিয়া, ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার নিকট নারিকেল-ডাঙ্গায় তিনি জীবনের শেষাংশ যাপন করেন। ১৮৮৩ খৃঃ ১লা অক্টোবর তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তিনি অতিশয় সহৃদয় দক্ষ ও পরোপকারী চিকিৎসক ছিলেন। এদেশীয় ঔষধাবলী সম্বন্ধে তিনি অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। তাঁহার নামে একটি পদক, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ক্লিনিকাল মেডিসিনের শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে প্রতিবৎসর দেওয়া হয়।

(৩) গোপালচন্দ্র শীল। ইনি ১৮৪৭ খৃঃ লণ্ডনের এম্-বি, পরীক্ষা প্রথমবিভাগে পাশ করেন। তখন এম্-ডি, পরীক্ষায় লাটিন্ লজিক ও ফ্রেঞ্চ এই তিন বিষয়ে পাশ করিতে হইত। ইনি হাঁসপাতালে শিক্ষালাভে ব্যস্ত থাকায় ঐসকল বিষয় অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহার এম্-ডি, পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নাই; কিন্তু ব্যবহারিক চিকিৎসাশাস্ত্রের (Practical medicine) দুরূহ পরীক্ষায় তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হয়েন। এদেশে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্ত্রীচিকিৎসা বিভাগে রেসিডেণ্ট সার্জ্জন পদ দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন।

(৪) দ্বারকানাথ বসু। ইনি এদেশে থাকিতেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও জেনারেল এসেম্ব্লীতে শিক্ষালাভ করেন। বিলাতে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি রয়েল কলেজ অব্ সার্জ্জন্‌সের ডিপ্লোমা লাভ করেন। ফিরিবার পর (১৮৪৭ খৃঃ) তিনি প্রথমে মেডিক্যাল কলেজের স্ত্রীচিকিৎসা বিভাগের রেসিডেণ্ট সার্জ্জনের পদে ও পরে ইংরাজী ক্লাশে এসিষ্টাণ্ট ডিমনষ্ট্রেটর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। উভয় পদেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান। তাঁহার ডাক্তার হিসাবেও কলিকাতায় যথেষ্ট পসার ছিল।

দ্বারকানাথ অল্পদিন পরেই ফিরিয়া আসেন, কিন্তু তাঁহার সতীর্থরা প্রত্যেকেই নানারূপ প্রশংসাপত্র, পদক ও সুনাম অর্জ্জন করিয়া ফিরেন। তৎকালীন শিক্ষা-বিভাগ (Council of Education) এবিষয়ে মন্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন "... The highest honor on Dr. Goodeve, as well as on the successful graduates themselves and the institution in which they received the ground work of their professional education."

অর্থাৎ "এই ব্যাপারে, ডাক্তার গুডিভ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দ ও যে প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়, সকলেরই যশ ও সম্মান লাভ হইয়াছে।"

ক

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

১১

শোভাবতীকে আনিবার জন্য যে গাড়ী গিয়াছিল, সেটা ঘণ্টা দুই পরে ফিরিল। সুবীর ততক্ষণে বাহির হইয়া গিয়াছে। ভানুমতী সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া দিদিকে অভ্যর্থনা করিল, "মেজদি, উপরে উঠে এস, সোজা। ডাক্তারে ত আমার নীচে যাওয়া বারণই ক'রে দিয়েছে, আমি পারতপক্ষে আর সিঁড়ি মাড়াই না।"

শোভাবতী অতিকষ্টে একটা একটা করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়ও ছিল একটি শিশুকন্যা, এবারেও তাই। তফাতের মধ্যে প্রথমবারের সঙ্গিনীটি ছিল তাহার কন্যা, এবারেরটি তাহার নাত্‌নী, দুর্গার কন্যা ইলা। শোভাবতীর নিজের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ক্রমে ম্লান হইতে হইতে একরকম কালোই হইয়া গিয়াছে। চব্বিশ বৎসর বয়সের সে 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'র মত দেহযষ্টি আর নাই, এখন সে বিপুলায়তনা বাঙালী গৃহিণী। মাথার সাম্‌নের চুলে পাক ধরিয়াছে, টাকও একটুখানি দেখা দিয়াছে, সেটা ঢাকিবার জন্য সীমন্তে খুব চওড়া করিয়া সিন্দূর লেপা। পরণে তাহার সেমিজের উপর বিপুল লালপাড়যুক্ত গরদ; ব্লাউস্, পেটিকোট পরার উৎপাত সে অনেকদিন চুকাইয়া দিয়াছে। গিন্নি মন্ষেের আর সে সবে প্রয়োজন কি? অঙ্গে কয়েকটি খুব মোটা মোটা সোনার গহনা। সচরাচর এগুলি ব্যবহার না করিলেও, ভানুমতীর বাড়ী আসিতে হইলে শোভাবতী সর্ব্বদাই যথাসাধ্য গহনা পরিয়া আসে। নাই বা সেখানে কেহ থাকিল, তবু একে জমিদারবাড়ী, তাতে কুটুম্বের বাড়ী।

ইলাকে লইয়া উপরে উঠিতে শোভাবতী হাঁপাইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ভানুমতী বলিল, "নামিয়ে দাও মেজদি, ইলাকে। এদানীং যা মোটা হ'য়ে পড়েছ, আর ছেলে পিলে কোলে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙা তোমার পোষায় না। ওরে ও মাধি, এদিকে আয়, ইলাকে উপরে দিয়ে যা।"

মাধবী ছুটিয়া আসিয়া ইলাকে বহন করিয়া আনিল। শোভাবতী কোনোমতে উপরে উঠিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "কেন রে চোখ দিচ্ছিস্? মোটা হব না ত কি? মোটা হবার ত বয়েসই হয়েছে, নাতী নাত্‌নীর মুখ দেখেছি। তোর মত কি চারকাল প্যাকাটীর মত শরীরই থাক্‌বে? দেখিস্ এখন, বৌ এলে তোকে কি রকম বেমানান দেখাবে তার পাশে।" শোভাবতীকে মোটা বলিলে সে বড়ই চটিয়া যায়।

ভানুমতী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আগে বউই আসুক, তারপর আমায় যেমন দেখাবার দেখাবে। চল ঘরে বস্‌বে চল, একেবারে হাঁফিয়ে পড়েছ। মাধী, খুকীকে নিয়ে তুই নীচে যা, ভবানীকে বল্ ওকে মিষ্টি দিতে। উপরে পান আর খাবার জল পাঠিয়ে দে।"

কথা বলিতে বলিতে, দুইবোনে আসিয়া ভানুমতীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। দিনের বেলার অসহ্য গরম কাটিয়া গিয়া, এখন সন্ধ্যার সময় বেশ একটুখানি ঝিরঝির করিয়া হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেঝের উপর একখানা মাদুর পাতিয়া ভানুমতী বলিল, "বোস ভাই মেজদি। তারপর, তোমার কর্ত্তাটির খবর কি? আর যে একেবারেই এ-মুখো হন না?"

শোভাবতী বলিল, "আছেন একরকম। শীতটা গিয়ে বাতের বেদনাটা খানিকটা গিয়েছে। কোন্ মুখোই বা হন? সারাদিন ত আছেন নিজের কাগজপত্র, মক্কেল আর আদালত নিয়ে। ছেলেটার ক'টা ভাল ভাল সম্বন্ধ এসে ফিরে গেল, তা সেদিকেও খেয়াল নেই। নিজের কেশ্ নিয়েই আছে। আমি আছি ব'লে তাই, তা না হ'লে খাওয়া-নাওয়াও এতদিনে উঠে যেত বোধ হয়।"

ভানুমতী উৎসুক হইয়া বলিল, "অনেক সম্বন্ধ আস্‌ছে নাকি সুশীলের? ওমা, তা বাপ একবার খেয়ালও করে না? বিয়ে দেবার মতলব নেই নাকি ছেলের?"

শোভাবতী তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "কে জানে! বল্‌লে বলেন রোস, রোস, এরই মধ্যে তোমার ছেলের বিয়ের বয়েস উৎরে গেল নাকি? ক'হাজার কামাচ্ছে তোমার ছেলে? বিয়ে ক'রে বৌকে খাওয়াতে পার্‌বে ত?"

ভানুমতী বলিল, "আহা, ঘরে খাবার বড় ভাবনা, সেই দুঃখে আর ছেলের বিয়েই হচ্ছেনা! আজকালকার পুরুষ-মানুষগুলির ধরণই হয়েছে এক অদ্ভুত! যেমন ছেলে, তেমনি বুড়ো। খোকাটাকে দেখনা, একবার বিয়ের নাম কর্‌লেই যেন মারমুখো হ'য়ে আসে। এবার তবু কত কষ্টে একটুখানি নিমরাজী মতন হয়েছে। সেইজন্যেই আজ তোমায় আস্‌তে বল্‌লুম, এই বেলা যদি কিছু পাকাপাকি ক'রে নেওয়া যায়।"

শোভাবতী উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা রাজী হয়েছে তা হ'লে? ওরা ত শুন্‌লে বর্ত্তে যাবে। আমার ত গায়ের মাংস খুব্‌লে খাচ্ছে, কবে মেয়ে দেখ্‌তে আসবে, কবে মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বে ক'রে। এইবার তাহ'লে ব'লে দেব। কি বল্‌লে খোকা?"

ভানুমতী বলিল, "পুরোপুরি রাজী আর কৈ? তবে অনেক বলা-কওয়াতে মেয়ে দেখে আস্‌তে রাজী হয়েছে। আমি বলেছি মেয়ে যদি তার পছন্দ না হয়, তবে আমি আর কথাটি কইব না। মেয়ে খুব সুন্দর ত? আমি ত সেই আশায় আছি। তা না হ'লে যে মাথা-পাগ্‌লা ছেলে আমার, কোন্ দিন এক মেম বউ এনেই হয়ত হাজির কর্‌বে। বড় ভয়ে ভয়ে আছি।"

মাধবী পান ও জল আনিয়া রাখিল গোটা দুই পান একসঙ্গে মুখের ভিতর ফেলিয়া দিয়া, অস্পষ্ট স্বরে শোভাবতী বলিল, "তা মেয়ে কিছু নিন্দের নয়, আমার নিজের চোখে দেখা মেয়ে। তোদের ঘরের কিছু অযুগ্যি হবে না। রং খুব ফরশা, তোর মত হবে। চুল খুলে দেখিনি, তবে খুব চুল আছে ব'লে শুনি। তা কবে সুবিধে হবে ব'লে দিস্, ওরা দিন দেখে সব ঠিক কর্‌বে।"

ভানুমতী বলিল, "শনি-রবিবারের মধ্যে যদি ভাল দিন থাকে, তাহ'লে তখনই যেন ঠিক করে। অন্য দিন আবার খোকার কলেজ থাকে, সে যেতে চাইবে না। দু চারজন বন্ধু-বান্ধব তার সঙ্গে যাবে বোধ হয়। তাছাড়া দেওয়ানজি-কে আস্‌তে লিখ্‌তে হবে, সময় ঠিক ক'রে, তিনিও যাবেন। একজন বোঝা-শোনা মানুষও সঙ্গে থাকা ভাল।"

শোভাবতী বলিল, "তবে তাই ব'লে দেব। ওদের বড় মেয়েটার শ্বশুরবাড়ী আমার বাড়ীর খুব কাছেই, রোজই ছাতে উঠে কথাবার্ত্তা বলে। তাকে বল্‌লেই সে তখুনি খবর পাঠিয়ে দেবে। তারপর, তুই আছিস্ কেমন? একটু যেন ভালই দেখ্‌ছি। এবার একাদশীর পর আর অসুখ করেনি ত?"

ভানুমতী বলিল, "না, এবার ত অনেকটা ভালই আছি। গরমটা কম্‌লে আর একটু সারব বোধ হয়। ডাক্তারে বল্‌ছে পূজোর ছুটীতে হাওয়া বদল করতে যেতে, কোথায় যাব তাই ভাবছি। আমার ইচ্ছা পুরী যাই, তা খোকা যেতে চায় না; বলে, 'ওখানে দেখবার জিনিষের মধ্যে সমুদ্র আর উড়ে, দুটোই আমার দেখা আছে, আর দেখ্‌তে চাই না।'"

শোভাবতী বলিল, "আমরা এবার দেওঘর যাচ্ছি, চল্ না আমাদের সঙ্গে? খোকা না হয় তার যেখানে খুসি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেড়িয়ে আস্‌বে। তুই গেলে ত আমিও বাঁচি, একজন কথা বল্‌বার লোক পাওয়া যায়।"

ভানুমতী বলিল, "সে হ'লে ত আমিও বাঁচি। যাক্, সে এখনও মাস দুই তিন পরের কথা। এখন আগে খোকার বিয়ের একটা ব্যবস্থা যেমন ক'রে হোক কর্‌তে হচ্ছে। যা ত শরীর, কবে আছি, কবে নেই। এখন একটি নাতী দেখে যেতে পার্‌লে আর দুঃখ থাকে না। নিজের সব গহনাগুলো দিয়ে সাজিয়ে, একটি টুকটুকে বৌ-এর মুখ দেখ্‌তেও বড় সাধ যায়।"

শোভাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অত সাধ ক'রে তোর জন্যে সব গড়িয়েছিল রে! ক' দিনই বা পর্‌তে পেলি? এখন কোন্ ঘরের কোন্ বেটী এসে সব জুড়ে বস্‌বে।"

ভানুমতী বলিল, "যাক্ গে ভাই, সে কথা আর তুলিস্

নে। আমার অদৃষ্টে যা ছিল ঘটেছে, এখন বৌএর অদৃষ্টে যেন শাঁখা, সিঁদুর, গহনা, সব অক্ষয় হ'য়ে থাকে। তুমি আজই ওদের খবর দিও কিন্তু।"

শোভাবতী বলিল, "তা ঠিক দেব। তোর গাড়ীটা একটু ব'লে দে, আমায় দিয়ে আসুক গিয়ে। আজ আবার দুর্গার দেওর দুটোকে খেতে বলেছি, একটু রান্নাবান্নাগুলো না দেখ্‌লে চল্‌বে না।"

শোভাবতী চলিয়া যাইবার পর, সুবীরের অপেক্ষায় ভানুমতী খানিকক্ষণ বসিয়াই রহিল। কিন্তু মাসীমার সহিত দেখা হওয়ার ভয়েই হোক, কি সিনেমাতে গিয়াছিল বলিয়াই হোক, সুবীর সেদিন অনেক দেরী করিয়াই ফিরিল। তাহার পূর্ব্বেই ভানুমতীকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, ভবানী জোর করিয়া শুইতে পাঠাইয়া দিল। কারণ ডাক্তার তাহাদের বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, রাত ন'টার বেশী যেন ভানুমতীকে কিছুতেই জাগিতে না দেওয়া হয়। সুতরাং সে রাত্রে আর মাতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হইল না।

সকাল হইবামাত্র সুবীর মায়ের মুখে খবর পাইল যে, সাম্‌নের শনিবারেই তাহাকে ক'নে দেখিতে যাইতে হইবে। সে দিন ভাল লগ্ন আছে, দেওয়ানজিকেও আসিতে খবর দেওয়া হইয়াছে। এখন সুবীর কাহাকে কাহাকে সঙ্গে লইতে চায়, যেন ঠিক করিয়া রাখে। "আচ্ছা, আচ্ছা," বলিয়া সে তাড়াতাড়ি কলেজ যাইবার ছুতা করিয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিল।

কলেজে গিয়া চন্দ্রনাথ এবং প্রবোধ বলিয়া আর একটি ছেলেকে সে এই বিজয়যাত্রার সঙ্গী নির্ব্বাচন করিল। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, বড় যে সুশীল ও সুবোধ বালকের মত মায়ের নির্ব্বাচিত কনে দেখতে চলেছিস্? তোর এত সব বক্তৃতা গেল কোথায়?"

সুবীর বলিল, "ক'নে দেখার বিরুদ্ধে ত আমি কোন বক্তৃতাই করিনি। বিয়ে কর্‌ব এমন কোনো কথা আমি দিই নি।"

প্রবোধ বলিল, "বিয়েই যদি কর্‌বে না ত মেয়ে দেখতে গিয়ে লাভ? এ ত সার্কাস বা বায়োস্কোপ নয়?"

সুবীর বলিল, "তাঁরা এবং আমার মা যখন আমাকে সে মেয়ে না দেখিয়ে ছাড়বেন না, তখন আমি দেখাটা চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই। তা না হ'লে ভদ্রলোকের মেয়েকে অকারণ সংএর মত সাম্‌নে এনে দাঁড় করাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই।"

চন্দ্রনাথ বলিল, "মেয়ে যদি খুব সুন্দরী হয়, এবং তোর পছন্দও হয়, তাহ'লেও তুই বিয়ে কর্‌বি না?"

সুবীর বলিল, "আমার পছন্দ হবে না, পরীর বাচ্ছা হ'লেও না। বারো-তেরো বছরের মেয়েকে বিবাহের purposeএ পছন্দ হওয়াটাকে আমি চরিত্রের একটা criminal weakness মনে করি। যাদের মা বাবার কোলে থাক্‌বার কথা, তাদের ছেলের মা হ'তে বাধ্য করাটা আইনে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।"

প্রবোধের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বৌ এখন পর্য্যন্ত কিশোরীই। সে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "তুমি বড় strong language ব্যবহার কর হে। অমন বলেও সবাই, বিয়েও শেষে ছোট মেয়েকে করে সবাই। যে দেশের যা। আমাদের পাচজনের ঘরে একেবারে পাকা-পোক্ত ঝানু মেয়ে নিয়ে এসে, নিজেদেরও অসুবিধা, তাদেরও অসুবিধা।" অপ্রিয় প্রসঙ্গ বলিয়া কথাটা তিন বন্ধুতে ঐখানেই চাপা দিল।

শনিবার দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। ক'নের বাড়ীর লোক খুব খুসী হইয়াই দিনক্ষণ সব তাতেই রাজী হইয়াছে। বৃদ্ধ দেওয়ানজীও সময় মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুবীর ও তাহার দুই বন্ধু তাহার বসিবার ঘরে বসিয়া সময়োপযোগী গোলমাল করিতেছে। অন্তঃপুরে শোভাবতী, দুর্গা, বিজনবালা, তাহার ছোটজা প্রভৃতি মিলিয়া বিধিমতে ছেলেকে যাত্রা করাইয়া পাঠাইবার আয়োজনে ব্যস্ত। একমাত্র ছেলে, কোথাও যেন বিন্দুমাত্র ক্রিয়া-কলাপের ত্রুটী না হয়, এই ভানুমতীর ইচ্ছা। সে বিধবা, তাহার শুভকর্ম্মের কোথাও ছায়াপাত করিতে নাই, সে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

নিতান্তই ক'নে দেখিতে যাইবার ব্যাপার, তাহা লইয়া কত আর ঘটা করা যায়? শীঘ্রই সুবীরের ডাক পড়িল। সে বন্ধুদের বসিতে বলিয়া ভিতরে আসিবামাত্র, তাহার মা, মাসী, দিদি, কাকী প্রায় সমস্বরে কথা বলিয়া উঠিলেন। শোভাবতী বলিলেন, "এই এক আমাদের ভট্‌চায্ বামুন

ছেলে হয়েছেন! কেন রে, একখানা ভাল কাপড়-জামাও কি পরতে নেই? এ কি কারো বাপের শ্রাদ্ধে মন্ত্র পড়াতে যাচ্ছিস্?"

ভানুমতী বলিল, "কোথায় পাবে বল? মাত্র তিন আলমারী কাপড়, জামা, চাদর ওর? সে সব কার জন্যে জমা কর্‌ছিস্?"

সুবীর কথা না বলিয়াই ফিরিয়া গেল, এবং মিনিটকয়েক পরে ঢাকাই ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, বেনারসী চাদরে সজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। ভানুমতীর ইচ্ছা ছিল, দামী রিষ্ট-ওয়াচ, হীরার আংটি, বোতাম প্রভৃতিগুলোও ছেলের গায়ে ওঠে; কিন্তু বেশী বকাবকি করিলে পাছে ছেলে একেবারেই বাঁকিয়া বসে, এই ভয়ে সে আর কিছু বলিল না। শীঘ্রই বিধিমতে যাত্রা করিয়া, মোটর-হর্ণের শব্দে পাড়া কাঁপাইয়া সুবীর ক'নে দেখিতে বাহির হইয়া গেল। বৃদ্ধ দেওয়ানজী এবং তাঁহার সঙ্গী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর একখানা ধার-করা মোটরে করিয়া পিছনে চলিলেন।

মেয়ের বাপ রাধিকাপ্রসাদ মিত্র ওকালতী করিয়া নিতান্ত কম পয়সা রোজগার করেন নাই। আজকাল কর্ম্ম হইতে একরকম অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ভবানীপুরেই কিছু দূরে তাঁহার বাড়ী। আত্মীয়স্বজন লইয়া পরিবারটি নিতান্ত ছোট নয়।

বৈঠকখানায় তখন বাড়ীর লোক, আত্মীয় কুটুম্ব, পাড়া-প্রতিবেশী মিলিয়া রীতিমত ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে। জমিদার-পুত্র ভাবী বরকে দেখিতে মেয়েদেরও উৎসাহের অন্তঃ নাই, কাজেই অন্তঃপুরও কোলাহল-মুখরিত। দুইটি ঘরে লোক জমা হইয়াছে সব চেয়ে বেশী। ভাঁড়ার ঘরে যেখানে জলখাবার সাজানো হইতেছে, সেখানে বাড়ীর যত বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ার সঙ্গে পাড়ার যত গৃহিণীর দল আসিয়া যোগ দিয়াছেন। অবাধে সমালোচনা চলিতেছে। আর একটি বড় ঘরে, সেটি বাড়ীর এক বৌএর শয়নকক্ষ, ক'নে সাজানোর জের এখনও চলিতেছে। বার পাঁচ ছয় সাজ বদল করিয়া ক'নে বেচারী এতক্ষণে যেন একটু নিষ্কৃতি পাইয়াছে। ঘরভরা বালিকা, কিশোরী ও তরুণী। এখনও কেহ বা কনের চুলটা একটু টানিয়া সামনে নামাইয়া দিতেছে, কেহ বা গালে ও কপালে অল্প একটু পাউডার যোগ করিয়া দিতেছে, এখানের ব্রোচটি টানিয়া ওখানে করিয়া দিতেছে।

এমন সময় বাহিরে মোটরের বাঁশী শোনা গেল। "ঐ রে, এসে পড়েছে," বলিয়া বালকবালিকার দল বাড়ী কাঁপাইয়া সদরের দিকে দৌড় দিল। কিশোরী ও যুবতীর দল দরজা জানলার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিয়াই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুবীরদের মোটর দুইখানা বাড়ীর সাম্‌নে আসিবামাত্র, বৈঠকখানা হইতে তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রায় শ'খানিক লোক বাহির হইয়া আসিল। বিপুল সমারোহ করিয়া তাহাদের লইয়া গিয়া বসানো হইল। মেয়ের বাপ খুড়ো প্রভৃতির সঙ্গে দেওয়ানজী ও তাঁহার বৃদ্ধ সঙ্গীটিই কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, ছেলেরা একটু দূরেই বসিল। পাড়ার যুবকের দল তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য আসিয়া জুটিল।

প্রথমে আসিল জলখাবারের ডাক। সকলকে পাশের ঘরে উঠিয়া যাইতে হইল। চারজনের জায়গা পাশাপাশি করা হইয়াছে, মার্ব্বেল-মণ্ডিত মেঝের উপর। আসনগুলি কালো মখমলের, বাসনগুলি রূপার এবং শ্বেত পাথরের। এক একজনের জন্য যাহা জলখাবার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গোটা চার মানুষ পেট ভরিয়া খাইতে পারে। থালা, রেকাবী, বাটি, গেলাস বহুদূর জুড়িয়া সাজানো হইয়াছে। সুবীর বসিয়াই চন্দ্রনাথের কানে কানে বলিল, "কি হে হামাগুড়ি দিতে হবে নাকি শেষে? এত দূর পর্য্যন্ত হাত ত পৌঁছবে না। ক'নের বাড়ীর লোকেরা কি আমাদের মানুষের আদিপুরুষ ব'লে ভ্রম কর্‌ছেন?"

প্রবোধ বলিল, "গল্প শুনেছি, অনেক বনিয়াদী বাড়ীতে এইরকম করে খাবার সাজালে, সঙ্গে একটা বাঁকানো কাঠের লাঠি দিয়ে দেয়, যাতে দূরের বাটিগুলো টেনে নিতে পারে।"

সুবীর বলিল, "ভাগ্যে আমাদের তা দেয়নি। আমি অন্ততঃ লাঠি দেখলে তার অর্থ অন্য রকম কর্‌তাম।"

হাস্যালাপের ভিতর জলযোগ শেষ হইয়া গেল। যাহা খাইল, তাহার দশগুণ জিনিষ নষ্ট করিয়া, নিমন্ত্রিতের দল উঠিয়া গেল। বৈঠকখানায় গিয়া বসিবামাত্র মেয়ের এক খুড়া হাঁকিয়া বলিলেন, "ওরে নলি, পান দিয়ে যা।"

কন্যা পান-লইয়া প্রবেশ করিল। ইহাই রীতি, অতএব বাড়ীতে একশ' জন চাকর-বাকর থাকিলেও মেয়েকে পান লইয়াই আসিতে হইবে। অবশ্য তাহার হাতে মাত্র একটি মাঝারী গোছের রূপার ডিবা; বেশীর ভাগ পান, মশলা দাসীতেই বহন করিয়া আনিল। মেয়ে পান আনিয়া বৃদ্ধ দেওয়ানজীর সামনে রাখিল, কোনোমতে একটা প্রণামও তাঁহাকে করিয়া ফেলিল।

চার পাঁচ জোড়া চোখ আসিয়া পড়িল মেয়েটির মুখের উপর। সুবীর দেখিল, সামনে একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া, তাহার রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুখশ্রীও সুন্দর। তবে সে নিতান্তই বালিকা, বয়স কিছুতেই তেরোর বেশী হইবে না। তাহার মনে হইল একটু কম করিয়া সাজাইলে ইহার স্বাভাবিক শ্রী অনেক খানিই ধরা পড়িত। মূল্যবান বেগুনী রঙের বেনারসী শাড়ী, জামা, ও ধারকরা মণিমুক্তার ভারের তলায় মেয়ে যে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে তাহাকে প্রায় খুঁজিয়া পাওয়াই ভার। তবু মেয়েটি যে সুন্দরী সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

মেয়ের সহিত কথা বলার ভার বৃদ্ধ দেওয়ানই গ্রহণ করিলেন। ক'নের নাম নলিনী, সে ফোর্থ ক্লাশে পড়ে। রান্নাবান্না শিখিতেছে, আলুর দম ও মাংস রাঁধিতে জানে, শিঙাড়া পান্তুয়া প্রভৃতিও অল্প জানে। শেলাই শেখে সে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রীর কাছে। তাহার হাতের কাজ কয়েকটা পরীক্ষার্থে উপস্থিতও করা হইল। মোটের উপর সে বেশ প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সুবীর বা তাহার বন্ধুরা কন্যাকে কোন প্রশ্নই করিল না।

চন্দ্রনাথ বলিল, "কি হে কেমন দেখ্‌ছ? আমার ত সব দিক দিয়ে বেশ ভালই মনে হচ্ছে।"

সুবীর বলিল, "ভালই ত।"

প্রবোধ বলিল, "তবে চাঁদ, পথে এসো। এই না ছোট মেয়ে তোমার ভারি অপছন্দ? এবার কেমন?"

সুবীর বলিল, "আমার মতের কোনো পরিবর্ত্তন হয়েছে ব'লে ত বুঝছিনা। মেয়েটি দেখতে ভাল, লেখাপড়া, কাজ-কর্ম্ম শিখেছে, কিছুই অস্বীকার করা যায় না। আমার যদি মেয়ে adopt কর্‌বার সখ থাক্‌ত, তাহলে একে ঠিক পছন্দ কর্‌তাম। বেশ কচি মুখ, গাল টিপ্‌লে দুধ বেরয়।"

তাহার বন্ধুরা বলিল, "তোমার মত ফাজিল দুনিয়ায় নেই হে! কি চাও তুমি?"

সুবীর বলিল, "জানিনা। হয়ত কখনও কাউকে দেখে মনে হবে 'একে চাই'। তখন বুঝবে আমার আদর্শটা কি।"

মতামত পরে জানান হইবে বলিয়া বরপক্ষ প্রস্থান করিলেন। কন্যাপক্ষে তখন বরের চেহারা স্বভাব চরিত্র প্রভৃতি লইয়া মহা সমালোচনা লাগিয়া গেল। সুবীর যে নিশ্চয়ই বেশ কিছু অহঙ্কারী এ বিষয়ে প্রায় সকলেরই একমত দেখা গেল। হইলই বা জমিদারের ছেলে, তাই বলিয়া এত নাক সিঁট্‌কাইবার ঘটা কেন; তাহারা কি এতই ফেল্‌না? তাহাদের মেয়ে পাইলেও অনেক লোকে লুফিয়া নেয়।

১২

স্কুলের ঘণ্টা পড়িতে তখনও কিছু দেরি ছিল, কৃষ্ণা সেই অবসরে নিজের ঘরখানা গোছাইয়া-গাছাইয়া একটু ভদ্র করিয়া তুলিতেছে। সবে কাল সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কাজেই জিনিষপত্র যেমন-তেমন ভাবে ঘরময় ছড়ানো। বাক্স এখনও তালাবন্ধ, সুট্‌কেস্‌টাও তাই, কেবল বিছানাটা খোলা হইয়াছে।

কৃষ্ণার ঘরখানা ছোটই, বাতাসও বিশেষ নাই, তবে আলো আছে এই যা রক্ষা। ঘরের দেওয়ালে কৃষ্ণার নিজের, তাহার সহপাঠিনী বন্ধুদের এবং তাহার পালিকা মাতার অনেকগুলি ছবি, সুদৃশ্য কালো ফ্রেমে বাঁধানো। এক কোণে একটি কালো মেহগনির ড্রেসিং চেষ্ট্‌, আর এক কোণে আয়না। ঘরের সব আস্‌বাবই খুব চক্‌চকে কালো পালিশের।

স্যুট্‌কেস্ খুলিয়া তাহার ভিতরের কাপড়, ব্লাউস পেটি-কোট প্রভৃতি কৃষ্ণা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। সেগুলি পরিপাটি করিয়া আল্‌নায় গোছাইতেছে, এমন সময় দরজায় টোকা দিয়া মিহি গলায় কে জিজ্ঞাসা করিল, "কৃষ্ণাদি, আস্‌ব?"

কৃষ্ণা বলিল, "এসো।" মেয়েটি ঢুকিয়া একখানা চিঠি আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "দরোয়ান এখুনি দিয়ে গেল।"

উপরের হস্তাক্ষর দেখিয়াই কৃষ্ণা বুঝিল চিঠিখানা লাবণ্যর। মনে মনে হাসিয়া বলিল, "বাপ্ রে, কি অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি! সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় চিঠি হাজির!"

ঠিক এই সময় ঢং ঢং করিয়া স্কুলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। হাতের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া চিঠিখানা বন্ধ অবস্থাতেই একটা দেরাজে ঢুকাইয়া দিয়া, কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি জুতা মোজা পরিয়া নীচে নামিয়া গেল। লম্বা ছুটি-ভোগের পর, আবার একটানা পাঁচ ঘণ্টা চীৎকার করিয়া পড়াইতে তাহার বেশ পরিশ্রম বোধ হইতে লাগিল। মেয়েগুলি দেড়মাস মা-বাপের আদর খাইয়া আরো যেন বেয়াড়া হইয়া আসিয়াছে। অধিকাংশই ছুটির পড়া কিছুই করে নাই। অনেক বকুনি এবং শাস্তি বিতরণ করিয়া, একেবারে শ্রান্ত হইয়া চারটার সময় কৃষ্ণা আবার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

চা না খাইয়া আর কাজে হাত দিবেনা ঠিক করিয়া সে খাটের উপর একটু গড়াইয়া লইল। লাবণ্যর চিঠি তখনও পড়া হয় নাই। দেরাজ হইতে সেটা টানিয়া বাহির করিয়া শুইয়া শুইয়াই পড়িতে লাগিল।

গিরিডি

বাণীকুঞ্জ

ভাই কৃষ্ণা,

তুই গিয়ে গিরিডিটা একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে। তুই নামে কালো, কিন্তু কাজে ছিলি আলো। যা হোক, আর দিন পাঁচ পরে আমিও যাব মনে ক'রে, বিরহটা কোনোমতে সহ্য ক'রে যাচ্ছি। বেড়ানোটা বন্ধই আছে, কার সঙ্গেই বা বেড়াব? রাতদিন সেলাই ক'রে ভাই-বোন্‌দের একবছরের মত কাপড় চোপড় ক'রে দিচ্ছি, যাতে পূজোর ছুটিতে এসে আবার না সিঙ্গারের কল নিয়ে বস্‌তে হয়।

লীলা, বেলা, নূতন ফ্রক প'রে একদিন বেড়াতে এসেছিল, দুজনকেই বেশ মানিয়েছে। খোকা নাকি তার খেল্‌না এরই মধ্যে ভেঙে ফেলেছে।

এখন আসল কথা পাড়া যাক্। তুই আমায় কাজের সন্ধান পেলে চোখ কান খোলা রাখতে বলেছিলি, না? আমি কল্‌কাতায় না গিয়েই এক কাজের সন্ধান পেয়েছি। মাইনে বেশ আছে, তোর আমেরিকা যাবার জাহাজ ভাড়াটাড়া গোছাবার সুবিধাই হবে। তবে কাজটা তোর সুবিধার লাগ্‌বে কিনা তা জানি না।

আমাদের বাড়ীর সাম্‌নের লালবাড়ীটা এতকাল খালি থেকে, হটাৎ এক ভাড়াটে লাভ করেছে দেখেই গিয়েছিলি। কাল অকস্মাৎ তাদের বাড়ীর এক পাল মেয়ে সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী এসে হাজির। তুই তখন সবে বিদায় হ'য়ে গিয়েছিস। সন্ধ্যাটা একরকম ক'রে কেটে যাবে, আশা ক'রে, তাদের সাদরেই অভ্যর্থনা করেছিলাম। দুটি বউ, একটি গিন্নি, এবং গোটাচার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। গিন্নির স্বামী মস্ত বড় মানুষ, লাখপতি একেবারে। বর্ম্মাতে কাঠের ব্যবসা করেন। তিনি নানা স্থানে ঘোরেন, গিন্নি ছেলে পিলে বউ ইত্যাদি নিয়ে রেঙুনেই বাস করেন। তা না হ'লে ছেলে-পিলের পড়ানোর সুবিধা হয় না। বড় ছেলেদুটি বিলাতে আছে, বউদের গিন্নি নিজের কাছেই রেখেছেন। এদের ইংরেজী পড়াতে এবং গান বাজনা শেখাতে চান। তাঁদের ভয়, পাছে বিলাত থেকে এসে অশিক্ষিত স্ত্রীদের ছেলেরা পছন্দ না করে। কিন্তু মেমের কাছে পড়াতে সম্পূর্ণ নারাজ। একটি বাঙালী টীচার চান, ব্রাহ্ম কি হিন্দু হ'লেই ভাল, ক্রীশ্চান্ হ'লেও খুব বেশী আপত্তি নেই। তবে গরু-টরু না খায়, এমন হ'লেই ভাল। তাকে থাকার ঘর, খাওয়া-দাওয়া বাদে দু'শো টাকা মাইনে দিতে রাজী আছে, যদি সেলাই, গান বাজনা, পড়ানো, সবেরই ভার নিতে পারে।

শুন্‌বামাত্র আমার তোর কথা মনে হ'ল। একাধারে এত গুণ এক তোর আছে ব'লেই জানি। দেখ, কর্‌বি নাকি? খাওয়া-দাওয়ার কোনো খরচ নেই, বাবুগিরি ক'রে যদি একশ টাকাও ওড়াস্, তাহ'লেও একশ' টাকা মাসে save কর্‌তে পার্‌বি। বছর খানেক কাজ কর্‌লেই তোর Passage money জমা হ'য়ে যাবে।

ভেবে চিন্তে কাজ করিস্ কিন্তু বাপু। আমি শুধু সন্ধান ব'লে দিচ্ছি, এদের সঙ্গে আমার চেনা-শোনাও নেই, কেমন মানুষ, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানি না। মগের মুল্লুক, নিতান্ত কাছেও নয়। তোর বয়স অল্প, রূপের বালাইও কম নেই, বিপদের আশঙ্কা আছে। তবে এদের বাড়ীটা একেবারে

প্রমীলার রাজ্য, নিতান্ত বাচ্চা ছাড়া, পুরুষ জাতীয় কোনো জীব নেই, সে দিক দিয়ে খানিকটা safe ; আর রেঙ্গুনে আমাদের চেনা-শোনা বাঙালী আরো দু-চার ঘর আছেন, তাঁরাও তোর খোঁজ খবর নিতে পার্‌বেন। দেশে থাক্‌লে বেশী মাইনে তুই পাবি না। বড় জোর একশ', তাও পাওয়া খুব শক্ত।

গিন্নীটিকে মানুষ ভাল মনে হ'ল, তাই তোর কথা বল্‌লাম। তিনি ত তোকে না দেখেই রাজী, এখন তুই রাজী হ'লেই হয়। এরা মাস খানিক পরে কল্‌কাতা যাবে, সেখান থেকে বর্ম্মায় ফির্‌বে। তুই যদি কাজটা নিতে চাস্, তা হ'লে আমি তোকে নিয়ে গিয়ে এদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে দেব। তাদের কথায়-বার্ত্তায় বুঝলাম বেশ smart, up-to-date মানুষই এরা চায়, তবে অতিশয় বেশী modernism বোধ হয় তাদের হজম হবে না। এক কথায় তারা ঠিক তোর মত একটি মানুষ চায়। এখন তোর পছন্দ হ'লেই হয়।

চিঠির উত্তর এখানেও দিতে পারিস্, কি আমি ফিরবার পর মুখেও বল্‌তে পারিস্।

কেমন আছিস্? আমরা সব এক রকম। বৃষ্টির জ্বালায় কিছু আর ভাল লাগে না।

ইতি

লাবণ্য

চিঠিখানা শেষ করিয়া কৃষ্ণা ভাবিতে লাগিল কি তাহার করা উচিত। টাকার লোভ যে না আছে তা নয়, আবার দেশ ছাড়িয়া যাইতেও ইচ্ছা করে না। কিন্তু চিরকালই এই পঞ্চাশ টাকার কাজে তাহার চলিবে নাকি? আমেরিকা কি বিলাত যাইতে পারিলে যথেষ্ট সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু টাকা যোগাড় করিতে হইবে তাহার নিজেকেই। সুতরাং এই ধরণের চাকরী করা ছাড়া উপায় কি?

মানুষগুলি কেমন কে জানে? কোনো বিপদ আপদ ঘটিবে না ত? বাড়ীতে পুরুষমানুষ কেহ নাই, এ একটা সুবিধার কথা। কিন্তু তবু অনেকখানি বিপদের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াই তাহাকে যাইতে হইবে। জগতে তাহার আপনার বলিতে যখন কেহই নাই, তখন অত ভাবিলে আর চলে কই? তাহাকে আগ্‌লাইবার মানুষ যখন ভগবান রাখেনই নাই, তখন ক'নে বউ হইয়া থাকার লোভ তাহাকে ছাড়িতেই হইবে। মনে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া সংসারে অকুণ্ঠিতভাবে চলাফেরা করা ছাড়া উপায় কি? সে চাকরীটা লইবেই ঠিক করিয়া ফেলিল, যদি বাড়ীর লোকগুলিকে দেখিয়া শুনিয়া তাহার পছন্দ হয়। লাবণ্যকে চিঠি লিখিয়া আর কাজ নাই। দুদিন পরে ত সে আসিয়াই পৌঁছিবে।

ঢং ঢং করিয়া চায়ের ঘণ্টা বাজিয়া গেল। খাট ছাড়িয়া উঠিয়া, পাদুখানা একজোড়া মখমলের চটীর ভিতর ঢুকাইয়া কৃষ্ণা নীচে চলিয়া গেল। আহারান্তে ফিরিয়া আসিয়া তাহার আর ঘর গোছানোর কাজে ভিড়িতে মোটেই মন গেল না। কেবলি মনে হইতে লাগিল, এঘরে আর ক'দিন আছি? দুদিন বাদেই পোঁট্‌লাপুঁটুলি বাঁধিয়া কোন্ পথে যাত্রা করিতে হইবে ঠিকানা নাই। নিতান্ত না করিলে নয়, এমন গোটা কয়েক কাজ সারিয়া সে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

মাঝের ক'টা দিন অনেকরকম ভাবনাই সে ভাবিয়া লইল। কিন্তু যাওয়াটাই শেষ পর্য্যন্ত স্থির রহিল। শুধু কল্‌কাতা আর গিরিডি, গিরিডি আর কল্‌কাতা করিয়া কতদিন কাটান যায়? অচেনা অদেখা দেশের টান যেন তাহার শিরায় শিরায় এখন হইতেই বাজিতে আরম্ভ করিল।

লাবণ্য ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত সে বড় অস্থিরভাবে দিন কাটাইতে লাগিল। কোনো কাজেই সে মন দিতে পারে না। কেবলি মনে হয়, দুদিনের জন্য কেন আর এত হাঙ্গাম করা। অথচ চারিদিকের অব্যবস্থা আর বিশৃঙ্খলা ভিতরে ভিতরে কেবলি তাহাকে পীড়া দিতে থাকে।

যাই হোক, কোনমতে মাঝের চারপাঁচটা দিন কাটিয়া গেল, লাবণ্যও কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। স্কুলের কাজ সারিয়া ফেলিয়া, চা খাইয়া সে লাবণ্যের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ফিরিতে রাত হইলেও হইতে পারে, এজন্য মেট্রনকে তাহার ঘরে খাবার রাখিয়া দিতে, এবং দরোয়ানকে গেট খোলা রাখিতে উপদেশ দিয়া গেল।

কৃষ্ণা লাবণ্যর স্কুলে পৌঁছিয়া দেখিল, মেয়েরা মাঠে বেড়াইতেছে, লাবণ্য তাহার চিরসঙ্গী সেলাই হাতে করিয়া বেঞ্চে বসিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছে। কৃষ্ণাকে দেখিয়া, সে সেলাই রাখিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কাজটা নিবিই মনে হচ্ছে। তা না হ'লে শুধু কি আর আমার টানে, এত সাত তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিস্?"

কৃষ্ণা তাহার পিঠে এক কিল মারিয়া বলিল, "তুই ভারি মিথ্যাবাদী। কবে আমি তোর সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌তে এক বছর দেরি করেছি শুনি?"

লাবণ্য বলিল, "তা অবশ্য করিস্‌না। তাই ব'লে যেদিন আসি, সেই দিনই কিছু তোর দেখা পাই না। আচ্ছা, ঝগড়া থাক্ এখন। এই খানেই বসা যাক, আমার এখন ঘরে ঢোক্‌বার জো নেই। তারপর, তুই কি ঠিক কর্‌লি বল্?"

কৃষ্ণা বলিল, "আমি ত যাবই ভাব্‌ছি। দুশো টাকা, আর পঞ্চাশ টাকায় ঢের তফাৎ। তবে অবশ্য মানুষ-গুলিকে না দেখে কিছু বল্‌তে পারি না। হাজার হোক, মেয়ে মানুষ ত? তার উপর আবার বাঙালীর মেয়ে। প্রাণে ভয়-ডর আছে ত?"

লাবণ্য বলিল, "আমার ত বিশ্বাস তোর ভালই লাগ্‌বে। আমি যেটুকু দেখলাম, তাতে আমার কিছু মন্দ লাগেনি। গিন্নিটি একটু হাবা-গোবা ধরণের, তবে মনটা ভাল। মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা দুচারটা বল্‌বেন, সেগুলো তোকে সয়ে যেতে হবে। বৌ দুটি বেশ, বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, মিশুক প্রকৃতির, তোর ভালই লাগ্‌বে। খোঁজখবর নিয়ে যতদূর জান্‌লাম, ওরা মানুষ ভালই। রেঙ্গুনে আমার এক কাকা থাকেন, তাঁর কাছেও চিঠি লিখেছি খোঁজ নেবার জন্যে। ওরা আর দশ-পনেরো দিন পরেই কল্‌কাতা আস্‌বে, এখানে মাস খানেক থেকে, তারপর রওনা হবে।"

কৃষ্ণা বলিল, "তবে সে ক'দিন অপেক্ষা ক'রেই দেখি। এখনি কাজে নোটিস্ দেবনা। শেষে একূল ওকূল দুকূল যাবে?"

লাবণ্য বলিল, "নোটিস্ দেবার ঢের সময় পাবি; ওরা কল্‌কাতায় একমাস থাক্‌বে ত? সেই এক মাসের নোটিস্ দিলেই চল্‌বে। আমি বলি, তুই কাজ নে। তোর স্বভাবে পঞ্চাশটাকার কাজকরা বেশীদিন সইবে না। এর থেকে বেশ বড় সুবিধা তোর হ'তে পারে।"

কৃষ্ণা বলিল, "দেখাই যাক। আচ্ছা, ওদের সব কেমন দেখে এলি? লীলা, বেলা কেমন আছে? খোকাটা আরো দুষ্টু হয়েছে নাকি?"

দুই সখীতে তখন ঘরোয়া গল্প আরম্ভ হইয়া গেল। মেয়ের দল তাহাদের সামনে দিয়া ক্রমাগত যাওয়া আসা করিতেছিল। কৃষ্ণার রূপ সম্বন্ধে যে খুব গভীর আলোচনা চলিতেছে, তাহা ইহারা বসিয়া বসিয়াই টের পাইতেছিল। লাবণ্য হাসিয়া বলিল, "দেখ, মেয়েমানুষেরই মুণ্ডু ঘুরে যায় তোর চেহারা দেখে, ছেলের পালের মধ্যে পড়লে, তাদের যে কি দশা হয়, তাই ভাবছি।"

কৃষ্ণা বলিল, "অকারণ ভাবনা খরচ ক'রে কি কর্‌বি, আমি ত আর কোনো ছেলের কলেজে কাজ নিচ্ছিনা?"

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া একটা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মেয়ের দল আস্তে আস্তে বোর্ডিংএর দিকে চলিল। লাবণ্য বলিল, "খেয়ে যা না এখানেই? তোকে যে অপূর্ব্ব খানা খেতে হয়! একটু মুখ বদল ক'রে যা।"

কৃষ্ণা বলিল, "তা লোভ হচ্ছে বটে। আমাদের মেট্রনটির বাংলা রান্না সম্বন্ধে যা জ্ঞান, দেখ্‌লে তোর পেটে ব্যথা ধ'রে যাবে, হাস্‌তে হাস্‌তে। আমিও তার চেয়ে বেশী জানি। কাল সুক্ত রাঁধতে বলেছিলাম, তাতে একরাশ লঙ্কাবাটা দিয়ে এমন এক সুখাদ্য তিনি তৈরী করিয়ে দিলেন, যে, আমার ত চক্ষুস্থির!"

লাবণ্য বলিল, "আমাদের সে সুখটা আছে ভাই। মাইনে কম পেলেও, আরাম ক'রে খেতে পাই। মাসীমা এখন অবস্থায় প'ড়ে বোর্ডিংএ মেট্রন-গিরি কর্‌তে এসেছেন, কিন্তু আগে খুব গোঁড়া হিন্দু ঘরের বৌ ছিলেন। শক্ত শাশুড়ীর হাতে প'ড়ে রান্না বান্না খুব ভালই শিখেছেন। সামান্য শাক পাতা দিয়ে যা রাঁধেন, তাই যেন অমৃত মনে হয়।"

দুই বন্ধু উঠিয়া লাবণ্যর ঘরে চলিল। অতিথি আসিয়াছে বলিয়া লাবণ্য আজ আর খাবার ঘরে খাইতে গেলনা, দুইটি মেয়েকে ডাকিয়া তাহার ঘরেই দুজনের খাবার দিয়া যাইতে

বলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা সাজাইয়া গুছাইয়া দুজনের ভাত দিয়া গেল। লাবণ্য বলিল, "তোর আসার খবর মাসীমার কাছে পৌঁছে গেছে, দেখেছিস্? অন্যদিন যেখানে তিন চারটার বেশী তরকারী থাকে না, সে স্থলে আজ আটটা নটা তরকারী। এরই মধ্যে ভদ্রমহিলা কখন এত রাঁধ্‌লেন জানিনা।"

কৃষ্ণা বলিল, "খুব চমৎকার রাঁধেন সত্যিই, আমার ঘাস-পাতা খাওয়া মুখে খুবই ভাল লাগ্‌ছে।"

যে মেয়ে দুটি ইহাদের পরিবেশন করিতেছিল, তাহাদের ভিতর একটি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল এবং অল্পপরেই বাটীতে করিয়া আরো তরকারী আনিয়া উপস্থিত করিল। কৃষ্ণা ত ব্যাপার দেখিয়া, প্রায় পাওয়া ছাড়িয়া পলাইবার জোগাড় করিল। বলিল, "রান্না ভাল বলেছি ব'লে কি আমি একলাই বোর্ডিং শুদ্ধ মানুষের খাবার খেয়ে যাব? তোদের মাসীমা কি ভেবেছেন আমি ভাট-বামুনের মেয়ে?"

মেয়েরা এবং লাবণ্য মিলিয়া অনুরোধ-উপরোধ করিয়াও তাহাকে আর বেশী কিছু খাওয়াইতে পারিল না।

কৃষ্ণা যখন বোর্ডিংএ ফিরিল তখন রাত অনেক। মেয়েরা সব শুইতে চলিয়া গিয়াছে, দুএকটি শিক্ষয়িত্রীর ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। নিজের ঘরে ঢুকিয়া জুতা-মোজা ছাড়িয়া কৃষ্ণা ঘুমাইবার জোগাড় করিতে লাগিল। জানলাগুলা ভাল করিয়া খুলিয়া দিল যাহাতে একটু বাতাস ঘরে আসিতে পারে। তাহার পর বিছানায় শুইয়া পড়িয়া আবার নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মন দিল। অর্থের প্রলোভনে সে ত চলিল্, কোথায় কোন্ অচেনা অজানা মানুষের মধ্যে। ইহার পর তাহার ভাগ্যে কি যে আছে তা কে বলিতে পারে? কিন্তু জন্মাবধিই ত তাহার প্রতি বিধাতা বিরূপ, তাহার জন্য প্রথম হইতেই ঘর কোথাও ছিল না। এখন আর ঘরের মায়া করিলে তাহার চলিবে কেন? দুদিনের অতিথির মতই সে সব জায়গায় যাইবে, আসিবে, মায়ার বন্ধনে বাঁধিতে কেহই তাহাকে চাহিবে না। মরণের দিন পর্য্যন্ত এমনই একাকিনীই হয়ত সে থাকিবে। ভালবাসা পাইবার আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসিবার আকাঙ্ক্ষা, নারীর হৃদয় জুড়িয়া থাকে সর্ব্বদাই, সে আকাঙ্ক্ষারও পরিতৃপ্তি কি কখনও হইবে না? সকলের বাহিরের ঘরের অতিথি সে হইবে, আদরও পাইবে, কিন্তু কাহারও হৃদয়ের অন্তরতম স্থানে তাহার প্রবেশাধিকার কি ঘটিবে না?

ভাবিতে-ভাবিতে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা নিজেই বুঝিল না। সকালে উঠিয়া মন হইতে সকল দ্বিধা সংশয় সে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। নিতান্ত কিছু অলঙ্ঘনীয় বাধা যদি না জোটে তাহা হইলে সে বর্ম্মায় যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিল। সংশয়ের দোলায় দুলিয়া লাভ নাই কিছুই। একবার সাহসে ভর করিয়া সে দেখিতে চায়, অদৃষ্টে তাহার ভাল কিছু আছে কি না। যাই হোক, এই স্কুলের চাক্‌রীতে সে ইস্তফাই দিবে।

সেই দিনই সে পদত্যাগপত্র লিখিয়া সেক্রেটারীর কাছে পাঠাইয়া দিল। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা মহা ঠাট্টার ধূম লাগাইয়া দিল। লাল সাড়ী, জামা, কিনিয়া দিবার, গহনা গড়াইয়া দিবার জন্য সবাই তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এ কথা সে ক্রমাগতই শুনিতে লাগিল।

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "লাল না হোক, অন্য রংএর শাড়ী জামা কিছু হয়ত শীগ্‌গিরই দরকার হ'তে পারে। তখন আপনাদের সাহায্য নিশ্চয়ই পাব। গহনাটার সম্প্রতি ত কিছু দরকার দেখছি না, পরে যদি হয় ত, আপনাদের জানাব।"

একজন শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্ রায় কি সাহেবের ঘর আলো কর্‌তে যাচ্ছেন? গহনা-গাঁটির দরকার নেই?"

কৃষ্ণা বলিল, "সাহেবের এমন মতিচ্ছন্নে ধরেনি। আমি অন্য একটা ঘরে যাচ্ছি বটে, এবং কতকটা আলো দান করার উদ্দেশ্যেই, কিন্তু সাহেবকে নয়, দুটি ছোট মেয়েকে।"

তাহার সখী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "নাঃ, আপনি নেহাৎ বেরসিক। এতদিনেও সাহেব জোটাতে পার্‌লেন না?"

(ক্রমশঃ)

রস ও রুচি

শ্রী ব্রজদুর্ল্লভ হাজরা

রুচি অনুসারে রসের আয়োজন হয়, না, রসের অনুগামী রুচির আবির্ভাব হয়? দুই কথাই সত্য। রস ও রুচি দুইটিরই পৃথক্ শক্তি আছে। উভয়ই পরস্পরকে বলিতে পারে—

> —"leave your power to draw
> And I shall have no power to follow you."

রসনার্থ রসের ব্যাপার স্বতন্ত্র—অনেকটা স্বভাব ও অভ্যাসের অধীন। স্বভাব ও অভ্যাস অনুসারে রসবিশেষে রুচি হয়। যে রস লইয়া মানুষের মন ও হৃদয় চালিত ও দলিত হয় তাহারও নিয়ম অনেকটা সেইরূপ—তবে রুচির লীলা বিশেষ বিভিন্ন।

নানা বিষয়ে জন্তুদের মধ্যেও রুচির লীলা দেখা যায়। সাধারণত জীবনের অহিতকর কোনও বিষয়ে তাহাদের রুচি দেখা যায় না। মানুষ জন্তুদিগকে তাহাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ নানা সাজে সাজাইতে পারে, নানা কাজে লাগাইতে পারে, তাহাদিগকে নানা খাদ্য খাওয়াইতে পারে। কিন্তু যখন তাহারা স্বভাবত জগতে স্বাধীন ভাবে নগ্ন দেহে বিচরণ করে তখন তাহারা স্ব-স্ব জীবনের ও স্বাস্থ্যের উপযোগী বিষয়ই উপভোগ করে। তাহাদের পরিচ্ছদের সৃষ্টি বা রুচির বিকার নাই। প্রকৃতি-পুরীতে পশুপক্ষিগণ সঙ্গীতধ্বনি করে কিন্তু তাহাদের রাগ-রাগিণী বা তালমানের বিকৃতবিন্যাস বা অপব্যবহার নাই। তাহারা অভাবে ক্লেশ পায়, কাঁদে; আর আনন্দে সুখ পায়, হাসে। তাহারা দাম্পত্য-প্রণয় বা অপত্যস্নেহে অনভিজ্ঞ নয়! সকল বিষয়েই তাহাদের নিরূপিত স্থান ও নিয়মিত কাল আছে।

তবে তাহারা লেখাপড়া বা শিল্প জানে না। তাহাদের বর্ণমালা, বা মাত্রামিলন নাই। ছন্দ বা কাব্যশাস্ত্র নাই। কোনও ভাবের বা ভঙ্গীর বিবরণ বা ছবি সময়ান্তরে অপরের নিকট ধরিতে পারে না।

মানুষের সেই শক্তি ও সুবিধা আছে। মানুষ নানা ভাষায়, নানা ছন্দে, নানা রঙ্গে, নানা রসে মিশাইয়া জগতের নানা ব্যাপারের কথা লিখিতে পড়িতে ও আঁকিতে শিখিয়াছে। মানুষের প্রায় সকল ব্যাপারেই—আহারে পরিচ্ছদে, গতি-বিধিতে, কাজকর্ম্মে, দীক্ষাশিক্ষায় রুচির লীলা লক্ষিত হয়। রস ও রুচির আলোচনায় উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের তুলনা হয়, মঙ্গল-অমঙ্গলের বিবেচনা হয়, সাধু-অসাধু বিচার হয়। রুচিতেই ব্যক্তিমাত্রের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

কত ভাবুক মনের ভাব প্রকাশ করিতে কত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইয়া কত মহাত্মা ভাষার অলৌকিক সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। মনের ভাবের আবেগে অথবা পরের শিক্ষা ও উপকারের জন্য, মনে চিন্তার স্রোত পরিচালন ও হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার ও ভাষার বিস্তার করিবার জন্য কত পুরাণ স্মৃতি ও কাব্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। বিবিধ গ্রন্থে বিবিধ রসের সমাবেশ পূর্ব্বক হৃদয় আকর্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংসার ও সমাজের চিত্র প্রদর্শন উদ্দেশ্যেও বহু নাটক ও চরিতাবলীর রচনা হইয়াছে।

আজকাল অসংখ্য উপন্যাস ও অভাবনীয় গল্প ও কথার অজস্র বর্ষণ হইতেছে। লেখার লালিত্য ও লেখকের নিপুণতার নিত্যনব পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সুলভ গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকার অন্ত নাই। কবিতার ও ছড়ার ছড়াছড়ি। কিন্তু অধিক স্থলেই সদুদ্দেশ্য বা সুরুচির লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। সেগুলি পাঠ করিলে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপভ্রংশ আধুনিক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর রীতি-নীতির কথা মনে পড়িয়া যায়। লেখা-পড়ার বহু বিস্তার হইয়াছে; নানা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু ভাবের সাধুতা, ভাষার সৌন্দর্য্য এবং কথার সুরুচি বড় বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

সুন্দর সামগ্রী যতই বৃদ্ধি পায় ততই সুখের কথা। যখন পড়িবার লোক ছিল না তখনও বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

এখনও তাহার আবিষ্কার, মুদ্রাঙ্কন, প্রকাশ ও প্রচার চলিতেছে। যে-সকল গ্রন্থে শিখিবার ভাবিবার ও চরিত্র গঠন করিবার অনেক বিষয় আছে তাহার প্রচারও পাঠক বিরল। এখন রাজনীতির চর্চ্চাতে যেমন শিশু ও তরুণ, ছাত্র ও বেকার ব্যক্তি সতত নিরত, উদারনীতি লইয়া বয়োজ্যেষ্ঠগণ ততোধিক বিব্রত। তাহার বশে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করিতে বসিয়া লেখক বহুপাঠক আকর্ষণের চিন্তাতেই আকুল। সুতরাং দৃষ্টি সেই দিকে থাকায় অন্যদিক্ হইতে স্বতই ভ্রষ্ট হইয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষার কথা মনে নাই। অবসর-রঞ্জন ও সহজে সাধারণের হৃদয়-বিনোদন ও দৃষ্টি আকর্ষণই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

দোকানদারী বিজ্ঞাপনের বিকৃত-রুচি ছবির অনুকরণে সাধারণের উন্নতি শিক্ষা বা পাঠের জন্য প্রবর্ত্তিত অনেক মাসিক পত্রিকা এবং অনেক গ্রন্থও সুরুচি-বিগর্হিত বিচিত্র চিত্রে পরিপূর্ণ। পত্রিকার বা গ্রন্থের মলাট উল্টাইলেই নূতন পঞ্জিকার মত বহু বিজ্ঞাপনপত্র পার হইতে পারিলে তবে আসল পত্রিকার খোল দেখা যায়। এইসকল বিজ্ঞাপনে যে কুরুচিপূর্ণ ছবি বা কুৎসিৎ ভাষা ব্যবহার হয় তাহার কথা দূরে। আসল পত্রিকায় বা গ্রন্থের আচ্ছাদিত কলেবরে তাহারই প্রবন্ধাবলির মধ্যে ক্বচিৎ প্রাসঙ্গিক অধিক স্থলে অপ্রাসঙ্গিক, ভাবে নানা রঙ্গের দৃষ্টি গ্রাহী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক কবিতা কুরুচি-রচিত। সুরুচির পরিচয় দুষ্প্রাপ্য।

এইরূপ বিধানের উপযোগিতার বিচার কে করিবে? বোধ হয় কোনও সাধুভাবাপন্ন ব্যক্তি ইহার নিন্দা করায় একটি মাসিক পত্রিকা এই রুচিবিচারের টিপ্পনি করিতে গিয়া আদর্শ মাতৃমূর্ত্তির চিত্র দিয়াছেন—কেবল মস্তকটি এবং মস্তকেই হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সংলগ্ন—অন্যান্য অঙ্গ লুপ্ত। কি সুরুচি ও পবিত্রতার পরিচয়!

অনেক দেশে দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে দেবালয়ের সন্নিকটে বা প্রাঙ্গণেই মেলা বসে। অনেকে দেব-দর্শন ও কলা-বিক্রয় উভয় উদ্দেশ্যেই যায়। অনেকে কেবল দেব-দর্শন উদ্দেশ্যেই যায়। অধিকাংশ লোকই কিন্তু নাগর-দোলায় চড়িতে, পাঁপর ভাজা খাইতে, মুখস প'রতে বা জুয়া খেলিতে যায়। ইহাদের মধ্যে কাহারও দেব-দর্শনে মতি জন্মে কিনা বলা যায় না, তবে দেব-দর্শকের মধ্যে অনেকে পাঁপর ভাজা খায়। দোকানীর কি? সে ত সাধারণের রুচির অনুযায়ী সামগ্রীর আহরণ করিয়া লাভের জন্যই আসে। লোকের রুচি বুঝিয়াই দোকানদার দোকান সাজায়।

লেখাপড়ার বিষয়েও নানা লোকের নানা রসে রুচি। কিন্তু তাই বলিয়া মাসিক পত্রে সকল রসের সমাবেশ কেন? যাহার যেটাতে রুচি সে সেইটা পাঠ করিবে বলিয়া? না সকল পাঠকের সকল রসে রুচি জমাইবার জন্য? শিখিবার পড়িবার অনেক বিষয় আছে। সেইসকল বিষয়ের বিস্তারই সকলের উপকারী। কোনও কোনও প্রবন্ধে ভাষা, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, দেশবৃত্তান্ত বা বিজ্ঞানের আলোচনা থাকে। তাহা পাঠ করিয়া অনেকের উপকার ও শিক্ষালাভ হয় ও চিন্তাশক্তি জন্মে। কিন্তু তাহার সঙ্গে কুভাব-উদ্দীপক এক নর-নারীর ছবি ছাপার উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারা যায় না। অনেক পত্রিকায় যে কুরুচিপূর্ণ গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয় তাহাতে সাধারণের অপকার-সাধন অনিবার্য্য। ভাষার লালিত্য, সৌন্দর্য্য বা ওজস্বিতা দেখাইতে অনেক বিষয় আছে। সংসারে নানা চরিত্রের লোক আছে এবং লোকের হৃদয়ে নানা ভাবের স্ফুলিঙ্গ আছে। কুচরিত্রের চিত্রও তাহার অলঙ্কার ও অঙ্গ-ভঙ্গীর অঙ্কন করিয়া এবং কুভাবের উদ্দীপনা করিয়া লেখক বা সম্পাদক সাধারণের কি উপকার করেন তিনিই জানেন। লেখক তাঁহার স্বীয় কীর্ত্তি স্বয়ং প্রকাশ ও উপভোগ এবং স্বীয় শিষ্য ও দলভুক্ত ব্যক্তিকে নেপথ্যে তাঁহার প্রিয় রসের আস্বাদন করাইতে পারেন। কিন্তু সাধারণের জন্য প্রবর্ত্তিত স্থানে তাঁহার নিমন্ত্রণ বা আসন সমীচীন বোধ হয় না।

সকল দেশেই সকল শাস্ত্র অনুসারে অমঙ্গল রিপুর দমনই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য; যিনি তাহা করিতে পারেন তিনিই আদর্শ চরিত্র। সচ্চরিত্রেই সুরুচির সঞ্চার হয়। কুরুচি অসচ্চরিত্রের পরিচয় দেয়। অসচ্চরিত্র বা কুরুচিগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য সুরুচিজনক রস তাহার সম্মুখে ধরা উচিত। সে যদি তাহার প্রিয় রসের অনুসরণ করিয়া লেখক বিশেষের দ্বারে যায় সে স্বয়ং যাইতে পারে।

অন্তের তাহাকে বরং ফিরাইবার প্রয়াস করা উচিত, তাহা হইলে তাহার সে রসে বিতৃষ্ণা কমিয়া গেলেও যাইতে পারে। কিন্তু সচ্চরিত্রের সম্মুখে কুরুচিপ্রসূত কুরুচিজনক রসের অবতারণা তাহার সুরুচিতে কলুষ মিশাইয়া চরিত্রের হানি করে না কি? ব্যবসায়ে অর্থের প্রয়াস করিয়া অপরের অমঙ্গল সাধন কি সাহিত্যিক সজ্জনের বিধি? ইহা লেখক ও সম্পাদক উভয়েরই চিন্তার বিষয়।

রঙ্গমঞ্চে সুরুচি কুরুচি, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সংসারী সন্ন্যাসীর সাজে পুরুষ-রমণীর নৃত্যগীত দেখিলে শুনিলে কি আত্মদর্শনের ক্ষমতা জন্মে? যাহার আত্মদর্শনের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা আছে তাহার আত্মদর্শন আপনা হইতেই ঘটে অন্তর্য্যামী বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর নশ্বর মনুষ্যজীবনেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাকে আত্মদর্শনের ছলে রঙ্গভূমিতে বারবণিতার নৃত্যগীতময় অভিনয় দেখিতে যাইতে হয় তাহার আত্মজ্ঞান ও উন্নতির আশা বৃথা। কটুরসকে মধুমণ্ডিত করিলে তাহার অভ্যন্তর বা গুণ পরিবর্ত্তিত হয় না। তাহার ক্রিয়া ও ফল নিষেধ বা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। রচয়িতার ও অভিনেতার অর্থাগম যেমন নিশ্চিত সাধারণের অমঙ্গলসাধনও তেমনই অনিবার্য্য।

মানুষ প্রকৃতি ও সংসারের মাঝে আছে। প্রকৃতি ও সংসার লইয়াই তাহার আলোচনা। প্রকৃতি ও সংসারে নিত্য নূতন জ্ঞানলাভই তাহার পরম লাভ। সেই লাভেই তাহার অসীম আনন্দ। যাবতীয় বস্তু বিষয় ব্যক্তি ও আত্মা হইতে পরমাত্মার জ্ঞানলাভে যে আনন্দ তাহাই জীবনের সার। এইসকলই লেখার ও পড়ার বিষয়। তাই লিখিয়া আনন্দ, তাই পড়িয়া আনন্দ। মানুষ, সময় ও সামর্থ্য ইহা অপেক্ষা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে পারে না।

শরীর ও মন এবং যাবতীয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংস্রবে থাকিয়া মানুষ বিবিধ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়। পবিত্র প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন এবং অধম বৃত্তিগুলির দমনই তাহার কর্ত্তব্য। সংসার ও সমাজে থাকিয়া সংযম ও সন্ন্যাস শিক্ষাই তাহার ব্রত। স্বভাবজাত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতেই বহু শক্তির আবশ্যক। তাহার পর কল্পিত, সৃজিত, রচিত শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিবার প্রয়োজন ঘটিলে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। তাহা কোথা হইতে আসিবে? যাঁহারা এইরূপ শত্রুর সৃজন ও সংরক্ষণ করিতেছেন তাঁহারা একবার আপনাদের অর্থাগম ও রচনা-নিপুণতার কথা ছাড়িয়া অপরের কথাটা ভাবিয়া দেখুন।

মীরাবাঈ ও অন্যান্য হিন্দী কবি

শ্রী সূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

হিন্দী সাহিত্যের মণিকোঠায় বহু যুগের অক্ষয়-অমূল্য সম্পদ জমা হ'য়ে আছে, চন্দ-বরদাই, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, হ'তে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় "বঘেলখণ্ডের মরমিয়া কবি জ্ঞানদাসের" পর্য্যন্ত লেখা সঞ্চিত আছে এবং তা ক্রমে বেড়েই চলেছে।

মীরাবাঈ ও তুলসীদাস, তানসেন্ ও সুরদাসের মধ্যে পত্র-ব্যবহার ছিল। এখানে তাঁদের কিছু পরিচয় দিয়ে তাঁদের লিখিত দুটি চিঠির নিদর্শন দেওয়া যাবে। হিন্দী-প্রেমিক বাঙ্গালী পাঠক দেখ্‌তে পাবেন, কি মধুরভাবপূর্ণ এই পত্রাবলী। যখন মীরাবাঈকে রাণার পক্ষ থেকে নানাপ্রকারের উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন করা আরম্ভ হ'ল, তাঁর সাধন-পথের জয়-যাত্রায় নানা বিঘ্ন-বিপদ এসে পড়্‌ল,

তখন তিনি দুঃখে দুশ্চিন্তায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি অবশেষে তুলসীদাসকে নিম্ন-লিখিত পত্র দেন—

"শ্রী তুলসী সুখনিধান, দুখহরণ গুঁসাই,
পাইঁপর প্রণাম করু, অব হরো শোক সমুদাই।
ঘর কে স্ব-জন হমারে যেতে, সবন উপাধি বাঢ়াই,
সাধুসঙ্গ অরু ভজন করত মোহি দেত কলেশ মহাই।
বালপনে সে মীরা কীন্হা গিরধরলাল মিতাই,
সোতো অব ছুটত নহি কৈসে, লগি লগন বরিয়াই।
মেরে মাত পিতাকে সম হো, হরিভক্ত ন সুখদাই,
হমকো কহা উচিত করিবো হয় সো লিখিয়ে সমুঝাই।"

অর্থাৎ "হে দুঃখহরণ সুখনিধান গোস্বামী তুলসীদাস, আমি বারংবার তোমায় প্রণতি জানাচ্ছি। তুমি আমার সকল শোক হরণ করো। আমার স্ব-জন আমার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করছে আর তারা আমার সাধুসঙ্গ ও ভজন করতে অনেক ক্লেশ দেয়। শৈশব হ'তে মীরা গিরিধরলালের সহিত মিত্রতা করেছে এবং তা ক্রমেই গভীরতর হচ্চে। অনেক চেষ্টা ক'রেও তা এখন ছাড়তে পারি না। তুমি আমার মাতা-পিতা সদৃশ এবং তুমি হরিভক্তদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তুমি আমায় বুঝিয়ে লিখে পাঠাও যে, এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত।"

গোস্বামী তুলসীদাস উত্তরে লিখে পাঠান—

"যাকে প্রিয় না রাম বৈদেহী।
তজিয়ে তাহ কোটি বৈরী সম, যদ্যপি পরম সনেহী।
তজে পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহতারী।
বলি গুরু তজে, কন্ত ব্রজবনিতা, ভয়ে সব মঙ্গলকারী।
না তো নেহ রাম সো মনিয়ত, সুহৃদ সুসেব্য যহাঁলো;
অঞ্জন কহাঁ আঁখ যো ফুটে বহুতক কাহাঁ কহাঁলো।
তুলসী! সো সব ভাঁতি পরমহিত, পূজ্য প্রাণতে প্যারো;
যা সোঁ হোয় সনেহ রামপদ এহী মতো হমারো।"

অর্থ—"তোমার রাম নাম নেওয়ার পথে যে বাধা জন্মায় সে যদি তোমার পরম স্নেহের পাত্রও হয় তবুও তাকে তুমি কোটী বৈরী অর্থাৎ পরম শত্রু ব'লে অবিলম্বে ত্যাগ করবে। প্রহ্লাদ পিতাকে, বিভীষণ বন্ধুকে, ভরত মাতাকে, বলি গুরুকে, ব্রজবনিতা নিজের কান্তকে, ভগবদ্-আরাধনায় বিঘ্ন হয় ব'লে চিরদিনের জন্যে ত্যাগ ক'রেছিলেন এবং তা তাঁদের পরম মঙ্গলকর হ'য়েছিল। চোখে জ্ঞানাঞ্জন লাগলে চোখের দীপ্তি উজ্জ্বল হয় এবং রামপদে ভক্তি বাড়াবার জন্যে পরম সুহৃদকেও যদি ত্যাগ করতে হয় তবে তাও ত্যাগ করবে—আর আমি কত তোমায় বোঝাব। যে-সব কাজ করলে তোমার রামের উপর অচলা ভক্তি হয় তা তুমি অবিলম্বে করবে—এই আমার মত।"

কবিতা দুটি এতই উচ্চভাব-গৌরবান্বিত যে, তার ঠিক যথাযথ অনুবাদ করা অসম্ভব। উভয়ের অতুল কবিত্ব-প্রতিভা কবিতা দুটিতে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে।

এর পরই মীরাবাঈ সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনে চ'লে যান এবং জীব গোস্বামীর সহিত মিলিত হন।

জীব গোস্বামী মেয়েদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না। মীরাবাঈ যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন তিনি স্পষ্টই ব'লে পাঠালেন যে, মেয়েদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন না।

মীরাবাঈ তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন যে,

"ম্যয় নহী জানতী কি গিরধর লাল কে সিবায় ইহাঁ আউর ভি পুরুষ হয়।"

অর্থাৎ আমি জানিনা যে, গিরধর লাল ছাড়া আর কোনো পুরুষ এখানে আছে।

এ কথা শুনে জীব গোস্বামী নগ্নপদে গিয়ে সাদরে মীরাবাঈকে নিজের আশ্রমে নিয়ে আসেন।

সাধক-কবি রৈদাসকে মীরাবাঈর দীক্ষাগুরু ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে।

রৈদাসের আসল নাম ছিল রবিদাস। লোকমুখে রূপান্তরিত হ'তে হ'তে রৈদাসে ক্রমে পরিণত হয়েছিল।

রৈদাস জাতিতে চামার ছিলেন; তাঁর পিতার নাম রঘ্ঘু অর্থাৎ রঘুনাথ আর মাতার নাম ঘুরবিনিয়া ছিল। রৈদাস মুচীর কাজ ক'রে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন এবং সাধু-সজ্জনের সেবা ক'রে দিন কাটাতেন। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন এবং কথিত আছে যে, তাঁর ১২০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

রৈদাস হিন্দী ভাষায় বিখ্যাত কবি ছিলেন। কবীর ও রৈদাস রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। কবীর ও রৈদাসের মধ্যে প্রায়ই বাগ্‌বিতণ্ডা, বাদানুবাদ হ'ত অথচ উভয়েই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

গুজরাত প্রদেশে এখনও রৈদাসের লক্ষ লক্ষ শিষ্য আছেন। তাঁরা নিজেদের "রবিদাসী" ব'লে উল্লেখ ক'রে থাকেন।

রৈদাসের অমূল্যবাণী ও উপদেশাবলী হিন্দী ভাষার পরম গৌরবের সামগ্রী।

সুরদাসের ও তানসেনের মধ্যে পরম বন্ধুত্ব ছিল উভয়ে উভয়ের প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং তা ক্রমেই নিবিড়তর হয়েছিল। সুরদাসকে হিন্দী ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ব'লে উল্লেখ করা হয়।

"সূর সুরজ, তুলসী শশী, উড়গণ কেশোদাস,
অব কে কবি খদ্যোৎসম, যহাঁ, তহাঁ হোত প্রকাশ।"

অর্থাৎ—"হিন্দী সাহিত্য-গগনে সুরদাস সূর্য্যের ন্যায়, তুলসীদাস চন্দ্রের ন্যায় ও কেশোদাস তারকার ন্যায় বিরাজ করছেন। আর আজকালকার কবি খদ্যোৎসম অর্থাৎ জোনাকী-পোকার ন্যায় যেখানে সেখানে একটু আলোক বিকিরণ ক'রে চিরতরে লয় প্রাপ্ত হয়।"

মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্যের আদেশানুযায়ী সুরদাস শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন এবং তাই পরে "সুরসাগর" ব'লে সর্ব্বজন-সমাদৃত হয়েছে।

সুরদাসের রচিত অনেক গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে উল্লিখিত অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সুরসাগর" ছাড়া, শিবের বিবাহ, নল-দময়ন্তী ও হরিবংশের টীকা বইগুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

বিস্তারিত ভাবে সুরদাসের জীবন কথা ও কাব্য-মাধুর্য্য আলোচনা করতে গেলে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কুলাবে না। কেবলমাত্র তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু এ প্রবন্ধে বলা আবশ্যক তার-ই উল্লেখ করতে চাই।

সুরদাসের অনুপম কবিত্বশক্তি, কবিতার লালিত্য ও মাধুর্য্য, লেখার ছটা ও সলীল গতি, তাঁর লেখা পড়তে গেলেই মনকে মুগ্ধ করে।

সুরদাস ও তুলসীদাস হিন্দী-ভাষা-ভাষীদের নিকটে যে সমাদর পেয়েছেন তা সকল কবিগণের চিরকালের আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী হ'য়ে থাকবে।

সুরদাসের জন্ম দিল্লীর নিকটে সোঁহী নামক একটা গণ্ডগ্রামে হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল রামদাস। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন।

সুরদাসেরা ছিলেন সাত ভাই। ছয় ভাই লড়াইয়ে গিয়ে মুসলমানের হস্তে নিহত হ'ন। সরদার কবি সুরদাসকে মহাকবি চন্দবরদাইয়ের বংশজাত ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন।

'ভক্তমাল' গ্রন্থে সুরদাসকে জন্মান্ধ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্য ব্রজভাষার আটজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত-কবির নাম দিয়ে "অষ্টছাপ্" স্থাপিত করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে,—সুরদাস, কৃষ্ণদাস, পরমানন্দদাস, কুম্ভনদাস, চতুর্ভুজ দাস, ছীত স্বামী, নন্দদাস আর গোবিন্দ স্বামী।

বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে সুরদাসের আসন ও মান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

সুরদাস প্রসিদ্ধ 'সুরসাগর' গ্রন্থে সওয়া লক্ষ পদ রচনা করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচ হাজার পদ সংগ্রহ করা হয়েছে।

সুরদাসের ভক্তগণের বিশ্বাস যে,সুরদাস উদ্ধবের অবতার ছিলেন এবং শুধু তারি জন্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সখ্যভাব ছিল।

সুরদাস শ্রীকৃষ্ণকে সখা ভাবেই আজীবন পূজা ক'রে গেছেন।

সঙ্গীতের রাজা তানসেনের কথা বেশী ক'রে না বললেও চলে।

তানসেনের গুরু ছিলেন বৈজু-বাওরা। বৈজু-বাওরার বিস্তৃত জীবন-কথা এখনও প্রকাশিত হয়নি।

তানসেন সুরদাসের পরম বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তানসেন 'নওরতনের' সামিল হ'য়ে প্রায়-ই দিল্লীতে থাকতেন ব'লে সুরদাসের সঙ্গে তাঁর বড় দেখা হ'ত না।

একবার বহুদিন পরে সুরদাসের একটি ভজন তানসেন গেয়ে ভারি খুসী হ'য়ে সুরদাসকে নিম্নলিখিত চিঠি লিখে পাঠান—

"কি ধোঁ সুর কো শর লগেও কী ধো সুর কি পীর,
কি ধোঁ সুর কি তন লগেও তনমন দহত শরীর।"

অর্থাৎ—"বহুদিন পরে সুরদাসের রচিত গান গেয়ে বন্ধুকে মনে পড়েছে, তাই লিখ্‌ছেন—আজ আমার অঙ্গে কি সুরের (অর্থাৎ বীরের) তীর (শর) লাগ্‌ল না সুরদাসের বেদনা আমায় অধীর করেছে। আজ কি সুরদাসের সহিত আমার মিলন হয়েছে যে, আমার শরীরে একটি অনুভূতি জেগেছে।"

উত্তরে সুরদাস নিম্নলিখিত চিঠি লিখে পাঠান—

"বিধ্‌না এহ জিয়া জান কর, শেষ ন দিয়ে কান,
ধরা মেরু সব ডোল্‌তো, তান্‌সেন্‌-কি তান।"

অর্থ—"বিধাতা পূর্ব্বে জেনেইত শেষকে (অর্থাৎ বাসুকী নাগ যার মস্তকে এই পৃথিবী অবস্থিত আছে) কান (কর্ণ) দেননি। শেষ নাগকে কান দিলে সে তানসেনের অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনে মাথা দোলাতো আর সমস্ত পৃথিবীটা পাছে চুরমার হয়ে যেতো।"

উভয় উভয়ের গুণে ও নিবিড় প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে বোধহয় এই পত্রগুলি লিখেছেন।

হিন্দীভাষাকে যে-সব মুসলমান কবি আপনার মাতৃভাষা ক'রে নিয়েছিলেন তাঁদের নাম এখানে দিচ্ছি। তাঁরা হচ্ছেন —আমির খুসরু, মালিক মুহম্মদ জায়সী, বাদশাহ আকবর, কাদের বখ্‌স্‌, আবদার রহীম খান্‌খানা, উসমান, সৈয়দ ইব্রাহিম, মুবারক, আহম্মদ, আবদর্‌ রহমান্‌, জলীল, ইয়াকুব খাঁ, জুল্‌ফিকর, অনওর খাঁ, আজম শাহাজাদা, সৈয়দ গুলাব নবী, তালেব আলী, নবী ও আলম।

এঁরা খুব উচুঁদরের কবি প্রতিভাশালী সাহিত্যিক ছিলেন এবং এঁদের রচিত গ্রন্থাবলী হিন্দী ভাষায় গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে।

হিন্দীভাষাতে নানা প্রকারের প্রবাদ-বচন, আখ্যায়িকা, ভিখারীর গান, বারমাস্যা ও স্ত্রীআচারের বহুপ্রকারের গান পাওয়া যায়।

তুলসীদাসের ভাই নন্দ দাসও একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর গানে বাৎসল্য-রসের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। এখানে তাঁর একটি গান উদ্ধৃত করছি।

"চিড়িয়া চুহঁ চাই।
চকহী কি শুন বাণী, কহত যশোদা রাণী
জাগো মেরে লালা।
রবি কি কিরণ জানি, কমলিনী বিকাশানি,
কুমুদিনী সকুচানি, দধি মথত্‌ বালা।
সুবল, সুবাহু যত, বস্ত্র পরগত,
দোরে ঠাড়ে টেরত লাল গোপালা।
নন্দদাস বলিহারী, উঠো বৈঠো গিরিধারী
এসেঁ কোই দেখে চাহে নয়ন বিশালা।"

মর্ম্মার্থ :—"পাখী ডাকছে। চক্রবাকীর স্বর শোনা যাচ্ছে। যশোদারাণী তাঁর ছেলেকে বল্‌ছেন—জাগো খোকন—এখন বিছানা ছেড়ে ওঠো। সূর্য্যকিরণ দেখে কমলিনী বিকশিত হ'ল আর কুমুদিনী সঙ্কুচিত হ'ল। ঘরে ঘরে এখন ব্রজঙ্গনাগণ দধি মন্থন করছে। শ্রীকৃষ্ণের সুবল সুবাহু যত সখা বস্ত্র প'রে দ্বারে দাঁড়িয়ে গোপাল ব'লে ডাকছে। নন্দদাস প্রভাতী সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে বল্‌ছেন গিরিধর এখন তুমি উঠে বোসো—এমন স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে নয়ন চরিতার্থ করো।"

এক ভাষার কবিতা বা সঙ্গীত অন্য ভাষায় যথাযথ অনুবাদ করা যায় না। হিন্দী-প্রেমিক বাঙ্গালী পাঠক দেখ্‌তে পাবেন—কী মাধুর্য্যই না নন্দদাস এই কয় লাইনের গানে ঢেলে দিয়েছেন। অপার, অফুরন্ত মাতৃস্নেহের প্রস্রবণ যেন মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—এই কয় লাইন পড়্‌তে গেলে তাই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের "শিশু ভোলানাথ" ও দাশরথি রায়ের "শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে" প্রভৃতি কয়েকটি গান বাদ দিলে বাঙ্গলায় বাৎসল্য-ভাবের বা মাতৃস্নেহের বড় বেশী গান বা কবিতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হিন্দী সাহিত্যের রত্নাগারের এক-একটি রত্ন এমনি চোখ ঝল্‌সিয়ে দেয় আর মনে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করে।

ময়ূর-সিংহাসন

অধ্যাপক শ্রী কমলকৃষ্ণ বসু, এম-এ

কলাশিল্পপ্রিয় শাহজাহানের জগদ্বিখ্যাত "তখ্ তে তাউস" বা ময়ূর-সিংহাসন মোগল-কীর্ত্তির একটি অন্যতম নিদর্শন। এই অসাধারণ সিংহাসনটি জনসাধারণের একটি বড়ই কৌতূহলের বিষয়। পারসিক কবিগণের অতিশয়োক্তি-দোষ থাকিলেও, ময়ূর-সিংহাসনের বিষয় কবি যাহা গাহিয়াছেন, তাহা বোধ হয় নিতান্ত অতিরঞ্জিত নহে। এই রাজসিংহাসনটি যে চন্দ্র বা সূর্য্যকেও সৌন্দর্য্যে পরাভূত করিয়াছিল তাহাই দেখাইবার জন্য কবি লিখিয়াছেন :—

বসানদ গর ফলক খুদ রা বপায়শ
দেহদ খুর্শিদ ও মাহ রা রু নমায়শ্।

অর্থাৎ, আকাশ যদি ময়ূর-সিংহাসনের নীচে দাঁড়ায় তাহা হইলে এই সিংহাসনটি চন্দ্র বা সূর্য্যকেও উজ্জ্বল কান্তি প্রদান করিতে পারে।

মোগল শিল্পকলার চরম আদর্শ না হইলেও ময়ূর-সিংহাসন যে বাদশাহের অতুল সম্পত্তির পরিচায়ক তাহা অস্বীকার করা যায় না। এ সম্বন্ধে প্রকৃত ও মূল তথ্য জানিতে হইলে, প্রথমে রাজদরবারের সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরীর "পাদশাহনামা" (১) এবং মীর মহম্মদ মাসুম লিখিত "তারিখ-শাহ সুজাএ" (২) আমাদিগের পাঠ করা উচিত। এ বিষয় পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গাহনওয়াজ খাঁও তাঁহার "মাসির উল্ ওমরা"য় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (৩)। তাহা ছাড়া, ব্যার্ণিয়ে (৪), তাভ্যার্ণিয়ে (৫) ও মানুচ্চি (৬) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পরিব্রাজকগণ ইহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া ও তাহা তাঁহাদিগের ভ্রমণ-কাহিনী মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া আমাদিগের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

হামিদের মতানুসারে (৭) মনে হয় যে, আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া শাহজাহানের শাসনকাল পর্য্যন্ত রাজকোষে যে সকল অপরিমেয় মহার্ঘ্য মণিমুক্তাদি ও প্রচুর ধনরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করিয়া তাহার সার্থকতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ময়ূর-সিংহাসন নির্ম্মিত হয়। "মাসির উলওমরা"র গ্রন্থকারও এই কথারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (৮)। তাঁহার মতে মণিমাণিক্যখচিত বহুমূল্য সিংহাসনের ব্যবহারে বাদশাহী গরিমা বাড়াইবার অভিপ্রায়ে সম্রাট এই সিংহাসন তৈয়ারী করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

পাদশাহনামা পাঠে জানা যায় যে, শাহজাহান প্রাদেশিক ও রাজকীয় কোষাগার হইতে দুই কোটী টাকা মূল্যের হীরা জহরৎ আনিতে আদেশ দেন। তাহা হইতে তিনি প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হীরকাদি সিংহাসনের জন্য বাছিয়া লন। মীর মহম্মদ মাসুম সিংহাসনের হীরকাদির মূল্য এক কোটী টাকারও অধিক নির্ণয় করিয়াছেন (৯)। "মাসির উল্ওমরা" গ্রন্থে সিংহাসনের জন্য নির্ব্বাচিত জহরতের মূল্য ৮৬ লক্ষ টাকা উল্লিখিত আছে। তাহা ছাড়া, এক লক্ষ তোলা ওজনের

---

(১) Bibliotheca Indica Series. এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(২) India Office Persian Mss. no 33. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, সি, আই, ই মহোদয়ের পাঠাগারে ইহার এক প্রতিলিপি আছে। শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয়ের নিকট এই পুঁথিখানি ব্যবহার করিবার অনুমতি পাই।

(৩) Bibliotheca Indica Series এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৩ খণ্ড।

(৪) Bernier's Travels Ed. by A. Constable (1891). Second Edn. revised by V. Smith. Publishers Humphrey Milford.

(৫) Tavernier's Travels in India. Ed. by V. Ball. Pub. by Macmillan & Co. 1889 (two vols.)

(৬ Storia Do Mogor (Indian Text Series). Ed. by W Irvine.

(৭ পাদশাহনামা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮-৮৩

(৮) মাসিরউল্ওমরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫

(৯) "তারিখ শাহ সুজাএ" ৭৭এ পৃষ্ঠা।

এবং চতুর্দ্দশ লক্ষ টাকার মূল্যের বিশুদ্ধ স্বর্ণ বাদশাহের কাছে আনা হয়। হামিদ এই স্বর্ণখণ্ডের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ৩৷৷ গজ এবং প্রস্থে ২৷৷ গজ অনুমান করিয়াছেন।

ময়ূর-সিংহাসন কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক বেবদল খাঁর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শাহনওয়াজ খাঁ লিখিয়া গিয়াছেন। (১০) বেবদলের পূরা নাম ছিল, বে বদল খাঁ সায়িদা গিলানি। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা কবি। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া রাজদরবারে প্রথম প্রবেশ লাভ করেন। পরে শাহজাহান তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বেবদল খাঁ খেতাব দেন ও পরে স্বর্ণকার বিভাগের কর্ত্তৃত্বপদে অভিষিক্ত করেন।

সিংহাসনটির নিম্নলিখিত বিবরণ পারসিক সরকারী কাগজ-পত্র হইতে পাওয়া গিয়াছে। সিংহাসনে ব্যবহৃত বহুবিধ হীরকগুলির মধ্যে যে-কোনটি সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করিতে পারিত। তাই কবি বলিতেছেন,

"যে অনওয়া জোয়াহির গওহরা অনওয়া
চেরাগে আলমে হর্ দানয়ে আঁ।"

সুরূপা রমণীকুলের ঈর্ষা উৎপন্নকারী, সিংহাসনে জড়িত চুণি বা মোহিতকগুলির মূল্য নির্ণয়ের বহির্ভূত ছিল। কবির ভাষায়,

"যে ইয়াকুতশ কে দর কয়দে বহানিস্ত
লবে লালে বুতাঁ রা দিল বজা নিস্ত।"

সিংহাসনটির ছাতের ভিতর দিকে কলাই করা এবং সোনা ও হীরা দিয়া মোড়া; বাহিরের দিকে চুণি ও নীলকান্তমণির জড়োয়া কাজ; পান্না-বিজড়িত দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর ছাতটি স্থাপিত। ছাতের দুই পার্শ্বে হীরক-নির্ম্মিত দুইটি ময়ূর; তাহাদের মাঝখানে মণি, হীরা, চুণি ও পান্না রচিত একটি বৃক্ষ। সিংহাসনে আরোহণের জন্য অত্যুজ্জ্বল-হীরক-শোভিত তিনটি সোপান। হেলান দিয়া বসিবার জন্য একাদশটি বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত ফলক; তন্মধ্যে মাঝেরটির মূল্য প্রায় দশলক্ষ টাকা। পারস্যের নৃপতি শাহ আব্বাস সফ্ভি, এক লক্ষ টাকার যে পদ্মরাগ মণিটি উপঢৌকন স্বরূপ জাহাঙ্গীরকে প্রেরণ করেন, তাহা ঐ মাঝের ফলকটিতে সন্নিবিষ্ট ছিল। ঐ মণিটির উপরে আমির তৈমুর, মিরজা শাহরুখ, মিরজা উলুগবেগ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম খোদিত ছিল। অবশেষে জাহাঙ্গীর ইহার উপর নিজের ও তাঁহার পিতা অকবরের নাম খোদাই করান।

মীর মহম্মদ মাসুম বেশ একটি সম্পূর্ণ নূতন ও একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের খবর দিয়াছেন (১১) এবং অন্য কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইহার উল্লেখ করেন নাই। সিংহাসনটির প্রত্যেক অংশ খোলা যাইত এবং ঐ অংশগুলি রাজভাণ্ডারে রক্ষিত থাকিত। বিশেষ বিশেষ দিনে, বাদসাহের এই সিংহাসনে উপবেশন সময়ে, ইহার বিভিন্ন খণ্ডগুলিকে জোড়া দেওয়া হইত। মাসুম একটি বড়ই হৃদয়স্পর্শী কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। বৃদ্ধ শাহজাহান যখন আগ্রাদুর্গে বন্দী ছিলেন, তখন মহম্মদ সুলতান তাঁহার পিতামহের নিকট হইতে ময়ূর-সিংহাসনটি আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার পিতা অওরঙ্গজেব কর্তৃক আদিষ্ট হন। কিন্তু সিংহাসন প্রদানে অনিচ্ছুক ও অসহায় সাহজাহান তাঁহার বড় সাধের সিংহাসনটি হস্তান্তরিত করিবার পূর্ব্বে একবার ইহা স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং মহম্মদকে বিভিন্ন খণ্ডগুলি নিজের সম্মুখে একবার আনিতে আদেশ দেন। মহম্মদ পিতামহের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে, শাহজাহান সিংহাসনের দুইটি খণ্ডাংশ লইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া যান। পৌত্রের কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও আপাততঃ সেগুলি প্রত্যর্পণ করেন নাই। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে বন্দী বাদশাহকে অংশ দুইটি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

নিজ রাজত্বের অষ্টম বর্ষের ১০৪৪ হিজরীর (১৬৩৪ খৃঃ) শওয়ালের তৃতীয় দিবসে একটি আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত নওরোজের দিনে, এই অতুলনীয় সিংহাসনে শাহজাহান প্রথম আরোহণ করেন। সিংহাসনটির উপরে হাজী মহম্মদ

(১০) Carr Stephen তাঁহার Archaelogy of Delhi (পৃঃ ২৩১) নামক পুস্তকখানিতে অষ্টিন দ বুর্ডোকে ময়ূর-সিংহাসন নির্ম্মাণ-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(১১) "তারিখ-শাহ সুজাএ" পৃঃ ৭৮এ; J. N. Sarkar, C. I. E.—Nadir Shah in India. P. 75. Patna University Readership Lectures, 1922.

জান কুদ্‌শি (১২) রচিত মিত্রাক্ষর ছন্দের একটি কবিতা আছে। তাহার শেষ দুই চরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ১০৪৩ হিজরীতে সিংহাসনটির নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে কবি বেবদল খাঁ ১৩৪টি মিত্রাক্ষর ছন্দের শ্লোক রচনা করেন। ইহার প্রত্যেক দ্বাদশ চরণের একটি শেষ পঙক্তি বাদশাহের জন্মতারিখ নির্ণয় করে। ৩২শ চরণটি বাদশাহের সিংহাসন আরোহণ বিষয়ে ও অবশিষ্ট চরণগুলিতে সম্রাটের আকবরাবাদ (আগ্রা) হইতে কাশ্মীরে গমন ও আগ্রায় পুনরাগমন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

পাশ্চাত্য পরিব্রাজকগণ স্বচক্ষে ময়ুর-সিংহাসন দেখিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার আলোচনা করা যাউক। ফ্রাঁস্ হইতে আগত হীরা খোদাইকারক ও জহুরী তাভ্যার্ণিএ ১৬৫১-১৬৬৯ খৃঃ ভারত ভ্রমণ করেন। ১৬৬৫ খৃঃ মোগল রাজধানীতে বাসকালীন তাঁহার ময়ুর-সিংহাসন দেখিবার সুযোগ ঘটে। তাভ্যার্ণিয়ের মতে বাদশাহের সাতটি সিংহাসন ছিল (১৩)। তাহার মধ্যে একটি হীরায় মোড়া এবং অন্যগুলি চুণি ও মুক্তার দ্বারা তৈয়ারী। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসনটি দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট এবং প্রস্থে ৪ ফুট; ২০ হইতে ২৫ ইঞ্চি উচ্চ চারিটি পায়ার উপর সংরক্ষিত; পায়াগুলি চতুষ্টয় দণ্ডের সহিত সংযুক্ত। উল্লিখিত চারিটি দণ্ডের উপর দ্বাদশটি স্তম্ভ এবং স্তম্ভশীর্ষে তিনদিক আবৃত আচ্ছাদন—অর্থাৎ সিংহাসনটির সম্মুখ অনাবৃত। পায়া ও দণ্ডগুলি স্বর্ণ, পদ্মরাগমণি মরকত বা পান্নার দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক দণ্ডের মধ্যভাগ পান্না চতুষ্টয় পরিবৃত এক একটি "বদক্‌শান" মণির দ্বারা পরিশোভিত। অক্‌সন্ নদীর শাখা "শিগনান্" সচরাচর যে স্থানকে "বদক্‌শান্" বলা হয় সেই স্থানের বিখ্যাত মণিকে "বদক্‌শান্ মণি" বলে। সিংহাসনের নিম্নভাগ যথাক্রমে চতুষ্টয় পান্না বেষ্টিত মণি এবং মণি-বেষ্টিত পান্নার দ্বারা সংবদ্ধ। সিংহাসনটির উপর তিনটি গদি থাকিত। মধ্যেরটি, যাহার উপর বাদশাহ হেলান দিয়া বসিতেন, সেইটি ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গোলাকৃতি। দুই পার্শ্বের দুইটি গদিও আকারে বেশ প্রশস্ত ছিল। ইহা ব্যতিরেকে বহুমূল্য প্রস্তরাদির দ্বারা খচিত একটি তরবারী ও একটি করিয়া গদা, ঢাল, ধনুক ও সর্ব্বপরিশেষে একটি শরপূর্ণ তূণ সিংহাসনে বিলম্বিত থাকিত।

চাঁদোয়ার অভ্যন্তরটি হীরা ও পান্নার দ্বারা এবং ইহার চারিধার পান্নার ঝালর দ্বারা নির্ম্মিত। চন্দ্রাতপটি চতুষ্কোণ গম্বুজের মত—ইহার ঊর্দ্ধদেশে একটি ময়ূরপুচ্ছ উত্তোলন করিয়া আছে। ময়ূরটির পুচ্ছদেশ নীলকান্ত মণি এবং অপর পর নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তর দ্বারা তৈয়ারা; ইহার দেহ স্বর্ণ এবং বহুবিধ মূল্যবান প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ময়ূরটির দুই পার্শ্বে সমউচ্চ দুইটি ফুলের তোড়া; সেগুলি স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা খচিত। এই স্থলে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, পারসিক ভাষায় লিখিত ইতিহাসগুলি, যথা "পাদশাহনামা" বা "মাসিরউলওমরা"য় সিংহাসনটির ছাদের উপরিভাগে দুইটি ময়ূরের উল্লেখ পাওয়া যায়, পরন্তু তাভ্যার্ণিএর বিবরণীতে মাত্র একটি ময়ূরের কথাই লেখা আছে।

সিংহাসনের অগ্রভাগে একটি হীরা এবং তৎসংলগ্ন চুণি বা পান্না দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষা করিত। ইহার উভয় পার্শ্বে প্রায় চারি ফুট ব্যবধানে দুইটি রক্তবর্ণের রাজছত্র; ইহার চতুর্দ্দিকে মতির ঝালর। লোকমুখে তাভ্যার্ণিএ অবগত হয়েন যে, এই সিংহাসনটির মূল্য প্রায় একশত সাত কোটী টাকা (১৪)।

---

(১২) হাজি মহম্মদের উপনাম ছিল "কুদ্‌শি"। তিনি ছিলেন শাহজাহানের আমলের রাজকবি বা "মালিকুশ শোয়ারা"। ১০৫৫ হিঃ বা ১৬৪৫ খৃঃ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। Archaeological Survey Report, 1911-1912. Bibliographical Dictionary—T. W. Beale. Lond. 1894.

(১৩) Tavernier's Travels in India, vol I, p. 384.

(১৪) "নাদির নামা" বা নাদিরের ইতিহাসে ময়ূর-সিংহাসনের মূল্য ২,০০০,০০০ পাউণ্ড নির্ণীত হইয়াছে। ইংরাজ বণিক জোনাস্ হ্যানওয়ে (Jonas Hanawy) তাঁহার An Historical Account of the British Trade over the Caspian Sea, Two vols. Dublin 1754, London 1762 (vol II. Chap. X) বইখানিতে মোগল বাদশাহের ময়ূর-সিংহাসন, তাঁহার অপরাপর নয়টি সিংহাসন এবং হীরা জহরতের আসবাবপত্র এই সমস্ত জিনিষগুলির মূল্য ১১,২৫০,০০০ পাউণ্ড বলিয়াছেন। Scott সাহেব কেবল ময়ূরসিংহাসনের মূল্য ১,০০০,০০০ পাউণ্ড বলেন। Persia and the Persian Question by Hon. G. N. Curzon. Longmans Green & Co. 1892. P, 318. fn.

ফরাসী চিকিৎসক ব্যার্ণিএ ১৬৫৬-১৬৫৮ খৃঃ ভারত পরিভ্রমণ করেন। ইনি তাভ্যার্ণিএর মত দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। ব্যার্ণিএর নীতিদীর্ঘ বিবরণীতে নিম্নলিখিত তারতম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ তাঁহার মতে সিংহাসনটির ছয়টি পায়া ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ইহার মূল্য চারি কোটী টাকা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বপরিশেষে তাঁহার বিবরণে আর-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৃত্তান্ত এই যে, সিংহাসনটি তৈয়ারী হয় তাঁহার এক স্বদেশবাসীর তত্ত্বাবধানে। বার্ণিএ এব্যক্তির নামোল্লেখ করেন নাই, মাত্র এই বলিয়াছেন যে, সে ইউরোপের বহু নৃপতিবৃন্দকে ঝুটা মণি-মাণিক্য-সাহায্যে প্রতারিত করিয়া পরিশেষে মোগল দরবারে আশ্রয় পাইয়া উন্নতির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হয়। তবে সে নিশ্চয়ই অষ্টিন দ বুর্ডো।

মানুচ্চি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া নিজের বিবরণীতে সিংহাসনের বিষয় বিশেষ কিছু বিবৃত করেন নাই। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিয়াছেন যে, (১৫) সিংহাসনটির নির্ম্মাণকর্ত্তা সাহজাহানের ইহার উপর উপবেশন করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। তাঁহার পুত্র অওরঙ্গজেবই প্রথম এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। এ কথা সত্য নহে। শাহজাহানের সমসাময়িক পারসিক ইতিহাসে স্পষ্টই লেখা আছে যে, তিনি নিজে ঐ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন।

১৭৩৬ খৃঃ বিজয়ী বীর নাদির শাহ দিল্লীতে পঞ্চ দিবস-ব্যাপী লুণ্ঠনের পর মোগল বাদশাহের বড় সাধের ময়ূর-সিংহাসনটি বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। জনসাধারণের ভ্রান্ত বিশ্বাস এই যে, পারস্য দরবারে ইহা রক্ষিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটদিগের সে অতীত গৌরব ও লুপ্তকীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট স্বর্গীয় লর্ড কর্জ্জন তাঁহার লিখিত এক পুস্তকে (১৬) পারস্যের রাজধানী তেহেরানে রক্ষিত ময়ূর-সিংহাসনটির একটি বিবরণী দিয়াছেন এবং ইহা যে বাদশাহ শাহজাহানের ময়ূর-সিংহাসন নয় তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

কর্জ্জন সাহেব তেহেরানে রক্ষিত ময়ূর-সিংহাসনটিকে স্বচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সিংহাসনটি ছিল আগা-গোড়া সোনা দিয়া মোড়া; তাহার উপর চুণি ও পান্না বসান ছিল। সমগ্র আসনটি সাতটি পায়ার উপর রক্ষিত; উপরে উঠিবার জন্য দুইটি সিঁড়ি ইহাতে গিরগিটি জাতীয় এক প্রকার জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সিংহাসনটির চারি পার্শ্ব ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা সজ্জিত—একটি আর একটির সহিত খোদিত লিপিযুক্ত তক্তার দ্বারা সংবদ্ধ। সিংহাসনটির পশ্চাদ্‌ভাগ খুব উন্নত; ইহার শিখরদেশে উজ্জ্বল প্রভাশালী হীরক নির্ম্মিত একটি ঘূর্ণায়মান তারকা। দুই পার্শ্বে হীরক নির্ম্মিত দুইটি পক্ষীর প্রতিকৃতি।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহা সহজেই অনুমান হয় যে, তেহেরানের সিংহাসনটির সহিত মোগল বাদশাহ শাহাজাহানের ময়ূর-সিংহাসনের সহিত সাদৃশ্য খুবই কম। পূর্ব্বোক্ত সিংহাসনটি যে ময়ূর-সিংহাসন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ইহা দেখাইবার জন্য কর্জ্জন সাহেব যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পরিব্রাজক বার্ণিএর মতে মোগল বাদশাহের সর্ব্বশুদ্ধ ৭টি সিংহাসন ছিল। ইংরাজ বণিক হ্যান্‌ওয়ে বলিয়াছেন যে, নাদির শাহ স্বদেশ-প্রত্যাগমন সময়ে, মোগলদিগের ৯টি সিংহাসন সঙ্গে লইয়া যান। কর্জ্জন সাহেবের মতে, পারস্যের সিংহাসনটি যে ভারত হইতে আনীত সিংহাসন-গুলির মধ্যে অন্যতম, এইরূপ সিদ্ধান্তে বড় বেশী ভুল না থাকিতে পারে, তবে ইহা যে ময়ূর-সিংহাসন নয় ইহা নিশ্চিত।

তাভ্যার্নিএর মতানুসারে শাহজাহান কৃত ময়ূর-সিংহাসনের চারিটি পায়া ছিল। তেহেরানে রক্ষিত সিংহাসনটির ৭টি পায়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

পারস্যে প্রেরিত ইংরাজ প্রতিনিধি ম্যাল্‌কম (১৭)

(১৫) Storia Do Mogor, vol II., P. 348.

(১৬) Persia and the Persian Question, vol I., pp. 317-322,

(১৭) Malcolm's History of Persia vol. II., 37 n. Pub. by John Murray, Lond. MDCCCCXXIX.

বলেন যে, নাদিরশাহ ভারত হইতে নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়া মোগলদিগের কতকটা অনুযায়ী একটি সিংহাসন তৈয়ারী করান। কিন্তু ইহাও এই বাদশাহের মৃত্যুর পর নষ্ট হয়।

ফ্রেজার সাহেবের মতে নাদিরের হত্যার পর ভারত হইতে আনীত সমুদয় লুণ্ঠন-সামগ্রী মৃত বাদশাহের সেনাগণ পরস্পরের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। ভারতের ময়ূর-সিংহাসনটিও সেই সময় বিভক্ত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যে প্রেরিত ইংরাজ প্রতিনিধি জি, উজ্‌লে তাঁহার লিখিত একটি পুস্তকে বলেন যে, তিনি যে-সময় পারস্যে যান সেই সময় সেইখানকার ময়ূর-সিংহাসনটির মূল্য লোকপরম্পরায় ১০০,০০০ তুমান (পারস্যের মুদ্রা) বা এক লক্ষ পাউণ্ড অবগত হন (১৮)। এখন কথা হইতেছে এই যে, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সিংহাসনটির মূল্য খুব সম্ভবতঃ পারস্যে নির্ম্মিত রাজ-সিংহাসনেরই মূল্য বলিয়া ধারণা হয়, কারণ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে ভারত হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনীত ময়ূর-সিংহাসনের যে ইহা মূল্য তাহার সম্ভাবনা বড়ই অল্প।

কর্জ্জন সাহেব পারস্যের ভূতপূর্ব্ব জনৈক রাজমন্ত্রীর নিকট অবগত হয়েন যে, পারস্যের এই সিংহাসনটি ইস্পাহানেই নির্ম্মিত হয়। ইসপাহানের প্রধান পুরোহিত (সদর) মহম্মদ হোসেন খাঁ, পারস্যের বাদশাহ ফৎ আলী খাঁর (১৯) সহিত "তাউস খানুম" নাম্নী জনৈক ইস্পাহান মহিলার পরিণয় উপলক্ষে একটি সিংহাসন নির্ম্মাণ করান এবং এই সিংহাসনটি তাউস খানুমের নাম হইতেই "তখ্‌তে তাউস" বা ময়ূর-সিংহাসন বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

ভারতের ময়ূর-সিংহাসনটিকে পারস্যের বাদশাহ আগা মহম্মদশাহ, নাদির শাহের প্রপৌত্র শাহরুখের নিকট হইতে টুকরা অবস্থায় প্রাপ্ত হয়েন। পরে আগা মহম্মদ এই প্রাপ্ত টুকরাগুলিকে একত্র করিয়া এক নূতন ধরণে তেহেরানের ময়ূর-সিংহাসনটি তৈয়ারী করান।

বস্তুতঃ, ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ ময়ূর-সিংহাসন জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়াছে এবং ইহার খণ্ডাংশ হইতে নূতন ধরণে নির্ম্মিত তেহেরানে রক্ষিত রাজসিংহাসনটি সেই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। "মাসির উল্ ওমরা"র গ্রন্থকার অতিশয় গর্ব্বের সহিত লিখিয়াছিলেন—

পানশ ব চস্‌ম দর নিআমদ্
হরচন্দ নজ্জারা করদ আহ ওয়াল।

অর্থাৎ, ময়ূর-সিংহাসনের অনুরূপ অলঙ্কৃত সিংহাসন অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। এখন কোথায় সে মোগল-গরিমা! কোথায় বা সে-সব ঐশ্বর্য্য! আর কোথায় বা সে অতুলনীয় ও অত্যুজ্জ্বলপ্রভা-বিশিষ্ট সিংহাসন। কালের স্রোতে তৃণখণ্ডের ন্যায় সবই ভাসিয়া গিয়াছে। আছে কেবল স্মৃতিটুকু!

---

(১৮) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একলক্ষ তুমান, একলক্ষ পাউণ্ডের তুল্য ছিল। কর্জ্জনের সময়ে ইহা দুই লক্ষ পাউণ্ডের তুল্য হয়।

(১৯) কাজর বংশের ফৎ আলীখাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রাজত্ব করেন। Lt. Col. P.M. Sykes—History of Persia (vol. II., p, (393) Pub. Macmillan & Co. 1915.



বোধিসত্ত্ব

শিল্পী—শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[বেহালা-নিবাসী ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য ও আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের নিয়মিত পত্রালাপ চলিত। তাহার মধ্যে যতগুলি চিঠি আছে, তাহা ১৭৮৪ শক (খৃঃ ১৮৬২) হইতে ১৮০৬ শকের (খৃঃ ১৮৮৪) মধ্যে লিখিত। এই পত্রগুলি ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নেই ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। সে-যুগের ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিতে এবং সেই সময়কার কাগজপত্র যথাসম্ভব রক্ষা করিতে শ্রদ্ধেয় চিন্তামণি-বাবু যে-পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। তাঁহার অনুগ্রহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই পত্রগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হইল। অনেকগুলি পত্র এমনই জীর্ণ ও কীটদষ্ট অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে যে, পাঠোদ্ধার করা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। উপস্থিত ১৭৯১ শক (১৮৬৯ খৃঃ) হইতে লেখা চিঠিগুলি ছাপা আরম্ভ হইল—তখন বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ আট বৎসরের বালকমাত্র। আশা করি এই পত্রগুলি সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবে।

—প্রবাসীর সম্পাদক]

ওঁ

গাজীপুর

২৮ পৌষ, ১৭৯১ শক

প্রীতিভাজনেষু—

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

তোমার ২ অগ্রহায়ণের পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা ৩০ কার্ত্তিকের বেহালায় ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ উপভোগ করিলাম। ৩০ কার্ত্তিকে যদিও আমার দুর্ব্বল শরীর তোমাদের সন্নিধানে যাইতে পারে নাই, তথাপি আমার মন তথায় বিচরণ করিতেছিল। আমি তো অল্পে অল্পে এপর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ১১ মাঘের উৎসব তোমার হৃদয়ের উৎসাহের উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি ও উদার ভাব ও সবিনয় বাক্য সেদিন অনেক কার্য্য করিবে। তোমার মঙ্গল হউক, তোমার সাধু কামনা-সকল পূর্ণ হউক। ইতি

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ওঁ

জলন্ধর

২৫ ফাল্গুন, ১৭৯১ শক

প্রীতিভাজনেষু—

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

তোমার সুবিস্তার পত্র সকল নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি। হৃদয় মন প্রাণে তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারের জন্য দিবানিশি যে পরিশ্রম করিতেছ ঈশ্বর তাহার ফল মুক্তহস্তে বিধান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার যাহার সঙ্গে একবার আলাপ হয় তাহাকেই তুমি তোমার হৃদয়ের গুণে বদ্ধ করিয়া রাখ। এই প্রকারে ক্রমাগত তোমার বন্ধুবর্গের বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার-কার্য্যে তোমার বলবৃদ্ধি হইতেছে। আমি তোমাকে সর্ব্বদা পত্র লিখিতে পারি বা না পারি তোমার পত্র যেন আমি নিয়তই পাই এই আমার প্রার্থনা। তুমি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগ্রৎ হইয়া আছ এবং আমার আন্তরিক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার-কার্য্যের প্রশস্ততা তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বর তোমার শরীর মন আত্মাকে নিয়তই বলবীর্য্য প্রেরণ করুন। ইতি—

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ওঁ

ধর্ম্মশালা

১ বৈশাখ, ১৭৯২ শক

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।

নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ॥

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥।

প্রীতিভাজনেষু—

অদ্য নববর্ষের প্রথম দিনে তোমাকে সমালিঙ্গন করিয়া নমস্কার করিতেছি। তোমার প্রতি আমার মনের প্রীতি ও

আদর গ্রহণ কর। এই ১৭৯২ শকেও এই দেহ-পঞ্জর মধ্যে থাকিয়া এই ভূলোক হইতে তোমাকে যে এই পত্র লিখিতেছি —এইই আশ্চর্য্য !

"বর্ষগেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে"

চৈত্র মধুমাসে তিনখানি তোমার মধুময় পত্র দ্বারা সর্ব্বত্র কুশল সংবাদ পাইয়া মনের উল্লাসে আছি। তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ শ্রীযুক্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে—শ্রীরাম-বাবু প্রভৃতি বন্ধুবর্গের যত্নে তোমার আবাস-বাটির কণ্টকোদ্ধার হইয়াছে—ব্রাহ্মণ সদ্বংশ-জাত শান্তপ্রকৃতি ব্রাহ্মদিগের আন্তরিক অনুরাগে বেহালা ব্রাহ্ম সমাজ উত্তম চলিতেছে—ইহা তোমার হৃদয়ের সদ্ভাবের ফল। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগের প্রতি এ প্রকার প্রসাদ বিতরণ করেন যে, তাহার শত্রুরা ভয় পায় এবং বন্ধুরা আকৃষ্ট হয়।

"তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত প্রতিষ্ঠাবান ভবতি। তন্মহ-ইত্যুপাসীত মহান্ ভবতি। তন্মন-ইত্যুপাসীত মানবান্ ভবতি। তন্নম-ইত্যুপাসীত নম্যন্তেস্মৈ কামাঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যু-পাসীত ব্রহ্মবান্ ভবতি।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও পাকড়াশীর পরামর্শে বর্দ্ধমানের ট্রাষ্টডীড প্রস্তুত করিবে এবং তাহার ব্যয় জ্যোতির নিকট হইতে লইবে।

ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারি-সংক্রান্ত খৃষ্টিয়ানদিগের কীর্ত্তন শুনিয়া অতীব কৌতুকাবিষ্ট হইলাম। এইক্ষণে হরি-সভার উপায় কি ?

হেমেন্দ্রের রচিত নূতন গান একটি অদ্য তোমাকে উপহার দিতেছি।

আনন্দ-ধারা প্রবাহে কিবা আজি,
হৃদাকাশ-মাঝে শত চন্দ্রমা বিরাজে ॥
দেখ রে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময় ;
এক দৃষ্টে আত্মার পানে মাতা হয়ে
অবনত আছেন প্রেমভাবে তাকায়ে ;
শূন্য পূর্ণ আজি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ওঁ

ধর্ম্মশালা
২৫ আষাঢ়, ১৭৯২ শক

প্রীতিভাজনেষু

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

বর্ষশেষের দিনে তুমি আদি সমাজে যে উপদেশ দিয়াছিলে তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল—তাহাতে নিষ্প্রয়োজনীয় কথা একটিও নাই। তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্যামবাজারের ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য তুমি এত পরিশ্রম করিয়াও তাহার নেতা হইতে পারিলে না---ইহা অতি দুঃখের বিষয়।

অগ্রসর ব্রাহ্মেরা খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদিগের অনুকরণ করিতে ভালবাসেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের টিকি কাটিতে চান ও সমাজকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলেন ; তুমি আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে উপাসনার সময়ে খালি পায়ে উপাসকদিগের সহিত একাসনে বসাইয়া সমাজের গৌরব রক্ষা করিয়াছ—ইহা তোমারই কাজ। ঐ সাহেবকেও ভক্তিমান ও বিচক্ষণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুমি আর একটি পুত্রের মুখ দর্শন করিয়াছ—ঈশ্বর তোমাকে প্রজার দ্বারা, কীর্ত্তির দ্বারা মহান্ করিতেছেন। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কি নাম রাখিয়াছ এবং তাহার বয়স কত হইল ? তোমার পুত্রেরা দীর্ঘায়ু হইয়া যথাকালে ঈশ্বর-প্রেম লাভ করিয়া ভাগ্যবান হউক, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে তুমি যে-প্রকার উৎসাহের সহিত নিপুণরূপে সূত্রপাত করিতেছ ইহাতে আমি অতীব সন্তুষ্ট হইতেছি। ঈশ্বর তোমাকে চিরজীবী করিয়া এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের শ্রী ও ধর্ম্মের উন্নতি করুন—এই আমার

প্রার্থনা। তুমি যাহা কল্যাণ বলিয়া জানিবে তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবে ; ঈশ্বর তোমার শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবেন।

ইতি—

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মনঃ

ওঁ

তারা পর্ব্বত
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৩ শক

প্রেমাস্পদেষু

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

তোমার পত্রসকল এই অরণ্য মধ্যে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিতেছে। আমার প্রতি তোমার যে-প্রকার অটল অনুরাগ ইহাতে আমার স্নেহ তোমার প্রতি সহজেই ধাবিত হইতেছে। তোমার হৃদয় মন প্রসন্ন থাকুক—তোমার সকল কামনা সফল হউক—তোমার জয় হউক।

গোকুলকৃষ্ণ-বাবুর যেমন হৃদয় তাঁর তেমনি কার্য্য। তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠাজনিত সদ্ব্যবহারে তিনি সকলেরই মনকেই আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার নম্রতা, তাঁহার বিনয়ে সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছে। তাঁহার মনের ভক্তির প্রভাবে সমাজ-স্থলে উপাসনা-সময়ে দীপমালা আরো উজ্জ্বল ও পরিশোভিত হইয়াছিল। এমত স্থলে তোমার হৃদয় সম্যক্ পরিতৃপ্ত হইবে না তো আর কোথায় হইবে?

তুমি লিখিয়াছ ব্রাহ্ম বিবাহের নিয়ম লইয়া মহা গোলযোগ হইতেছে। তোমরা তাহার প্রতিবাদের চেষ্টা করিতেছ—উত্তম। কত লোকের স্বাক্ষর সেই নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা আমাকে জানাইবে। সারদা ও নবগোপালবাবু এতদিনে কি সিমলাতে সেই আবেদন-পত্র লইয়া যান নাই? * * * *

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ওঁ

বাক্রোটা শেখর
২৯ আষাঢ়
১৭৯৩ শক

প্রীতিভাজনেষু

সাদর নমস্কার—

বিশ্বাসের নিকট হইতে তোমার পীড়ার সম্বাদ পাইয়া অবধি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ছিলাম। পরে তোমার এই ২২ আষাঢ়ের পত্র পাইয়া প্রাণ পাইলাম। তোমার শরীরের উপর তুমি কিছুই যত্ন কর না। কখনো ঝড়ের মধ্যে যাইয়া হাত ভাঙ্গো, কখনো বা বৃষ্টিতে ভেজো—হয়ত উপরি উপরি রাত জাগো—ইহাতে শরীর কি প্রকারে ভাল থাকিতে পারে? সাবধান হইয়া চলিবে, সম্প্রতি অধিক পরিশ্রম করিবে না।

তারপরে ব্রাহ্ম বিবাহের আইন হইবার বিষয় কি শুনিয়াছ আমাকে অবগত করিবে।

রাজনারায়ণ-বাবু মধ্যে মধ্যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে বসিয়া উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমাকে লিখিয়াছেন—আমি তাঁহাকে এই উত্তর দিয়াছি—

"তুমি এখন এক একদিন সমাজের প্রকাশ্য উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত আছ—অতি আহ্লাদের সহিত ইহাতে আমি অনুমোদন করিতেছি"—অতএব তুমি তাঁহার সঙ্গে উপাসনা করিবার জন্য এক বুধবার প্রথমতঃ স্থির করিবে এবং সেদিন তাঁহাকে তুমি সমাদরপূর্ব্বক বেদীতে বসাইয়া দিবে * * * ইতি—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

ওঁ

অমৃতসর
১৭ পৌষ, ১৭৯৩ শক

প্রীতিভাজনেষু

সাদর নমস্কার—

তোমার পত্রসকল প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের যে বর্ণনা করিয়া আমাকে সবিশেষ সকল সংবাদ অবগত করিয়াছ, তাহাতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সমান আমার নিকটে সে-সকল প্রতীতি হইল। ইহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই ক্ষণে ১১ মাঘের উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইলে হয়।

রবীন্দ্র প্রভৃতি বালকেরা বেহালাতে পারায়ণে যে যোগ দিয়াছিল তাহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। তাহাদের

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি প্রকার শিক্ষা হইতেছে তাহা আমি কিছুই শুনি নাই। তোমার পাথেয় ব্যয়ের আদেশ এই পত্র মধ্যে পাঠাইতেছি গ্রহণ করিবে এবং তোমার শারীরিক কুশল সম্বাদ লিখিয়া আমাকে সন্তোষ রাখিবে। মঙ্গলদাতা তোমাকে সকল প্রকার বিপদ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়া তোমার হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ প্রেরণ করিতে থাকুন। ইতি—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

যবদ্বীপে ভারতীয় উপনিবেশ

শ্রী বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, পি, এইচ-ডি (লণ্ডন) ও শ্রী নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ

ভারতবর্ষের ইতিহাস ধীরে ধীরে তাহার এক অজ্ঞাত অখ্যাত অধ্যায়ের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতেছে। সুদীর্ঘ কৃষ্ণাবরণ টানিয়া যে আপনাকে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সেই বহুদিন-বিস্মৃত রাজলক্ষ্মী আজ তাহার গোপন-রহস্যের মধ্যে ধীরে ধীরে সকলকে আমন্ত্রণ জানাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকেরা প্রথম হইতে এই কথাটাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন, যে, ঐতিহাসিক যুগের প্রথম হইতেই ভারতবর্ষ অপূর্ব্ব অদ্ভুত কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে ; বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো সম্বন্ধই ছিল না, নিজের মধ্যে নিজেকে গুটাইয়া লইয়া, সকল ছোঁয়া বাঁচাইয়া ভারতবর্ষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাহার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভারত-ইতিহাসের এই সর্ব্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা ও দুরপনেয় কলঙ্ক আজ ইতিহাসের সত্য দৃষ্টির সম্মুখে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়াছে। ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করিয়াছে, ইতিহাসের প্রথম প্রভাত হইতেই ভারতবর্ষ দিকে দিকে তাহার সাধনা ও সভ্যতার বাণী প্রেরণ করিয়া তাহার ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের বিস্তীর্ণ লীলাক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করিয়াছে ; তাহার শিল্পী ও ধর্ম্ম-প্রচারককে পাঠাইয়াছে উত্তর এশিয়ার মরুভূমিতে, প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি চীনে জাপানে, প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে, আর চিররহস্যাবৃত চম্পা কম্বোজ শ্যাম ব্রহ্মে। শুধু কি সে তাহার শিল্পী ও পণ্ডিত, প্রচারক ও পুরোহিতকে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত ছিল, নিজের অতি প্রিয় সন্তান কত রাজরাজেশ্বরকেও রাজবংশের সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে দেশে বিদেশে প্রতিদিন ভারতের নব নব উপনিবেশ স্থাপনায়। ভারত-ইতিহাসের এ তথ্য এক অপূর্ব্ব বিস্তৃত অধ্যায়। সে অতীত ইতিহাসের যতই অনুশীলন হইতেছে ততই নব নব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে এবং সকলকে বিস্ময়ে পুলকে স্তব্ধ করিয়া দিতেছে। এই বৃহত্তর ভারতের অপূর্ব্ব আভাস আমরা ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিতেছি।

ভারতমহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে যবদ্বীপের ইতিহাস এই বৃহত্তর ভারতের সুমহান ইতিহাসেরই এক অধ্যায়। প্রাচীন কাল হইতেই যবদ্বীপে ভারতবর্ষের এক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার, শিল্প ও সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ও রাজবংশ আপনার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে যেন একটি ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ রচনা করিয়াছিল। কত শতাব্দী পরে দেখি আজও সর্ব্বত্র তাহার নিদর্শন ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার এই অপূর্ব্ব নিদর্শনের প্রতি আমাদের দেশের বিবুধজনের সম্প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ বাঙালী অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতরা জাভায় বালীতে চম্পায় কম্বোজে গিয়া ফরাসী ও ডচ্ পণ্ডিতদের সহযোগে এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন এবং আমাদের দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথও এই

উদ্দেশ্যে জাভা যাত্রা করিয়াছেন। জাভার ইতিহাস ও জাভায় ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার উপনিবেশ স্থাপনার অপূর্ব্ব অদ্ভুত তথ্য তাঁহার কবিচিত্তকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে।

খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে বোধ হয় জাভার সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে—সুগ্রীব যেখানে তাঁহার বানর সৈন্যকে পাঠাইতেছেন চারিদিকে সীতার অন্বেষণে—যবদ্বীপের উল্লেখ আছে, কিন্তু ফরাসী পণ্ডিত সিঁল্ভ্যাঁ লেভি বলেন, রামায়ণের ঐ অংশ-টুকু প্রক্ষিপ্ত এবং এই প্রক্ষেপ কিছুতেই খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আগে নয়। গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদ্ টোলেমি (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) 'যবদিউ' বলিয়া যবদ্বীপের উল্লেখ করিতেছেন। 'যবদিউ' যে যবদ্বীপ এসম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না যখন দেখি 'যবদিউ' অর্থে তিনি বলেন, যে-দ্বীপে যব উৎপন্ন হয়। চীনা সাহিত্যে এ কথার উল্লেখ আছে যে, ১৩২ খৃষ্টাব্দে ইয়ে-তিয়োর (Yetio) এক রাজা, তিয়াওপিয়েন, (দেববর্ম্মণ?) চীন দেশে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; চীন-সম্রাট তিয়াওপিয়েন্‌কে একটি স্বর্ণ-মোহর দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই ইয়ে-তিয়ো নিশ্চয়ই যবদ্বীপ। এইজন্য মনে হয় খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই সংস্কৃত যবদ্বীপ নাম বিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

যবদ্বীপের ইতিহাস সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাচীন শিলালিপি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা যবদ্বীপে নয়—বোর্ণিও দ্বীপে। তাহাতে কোনো তারিখ খোদিত নাই, কিন্তু অক্ষরের নমুনা দেখিয়া মনে হয় তাহার বয়স খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে কিছুতেই হইতে পারে না এবং সে অক্ষর অনেকটা দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন পল্লব শিলালিপি ও চম্পাকম্বোজের সর্ব্বপ্রাচীন শিলালিপি অক্ষরের অনুরূপ। বোর্ণিও দ্বীপের এই শিলা-লিপিগুলি বেশ শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং তাহা হইতে কোনো এক রাজবংশের পরিচয় আমরা পাই—যাহার প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন অশ্ববর্ম্মণ এবং তাঁহার পুত্র রাজাধিরাজ মূলবর্ম্মণ। মূলবর্ম্মণ বাহুসুবর্ণক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন, সেই যজ্ঞের যুপ-কাষ্ঠও শিলালেখগুলির সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে।

তার পরেই আরও কতকগুলি শিলালিপিতে পশ্চিম যবদ্বীপের রাজা পূর্ণবর্ম্মণের নাম পাওয়া যায়। অক্ষর দেখিয়া অনুমান হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তিনি রাজত্ব করিতেন এবং এই অক্ষরগুলিও প্রাচীন পল্লব গ্রন্থাক্ষরের অনুরূপ। এই শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, পূর্ণবর্ম্মণ বর্ত্তমান ব্যাটাভিয়ার সন্নিকটে তরুম নগরের রাজা ছিলেন এবং তিনি চন্দ্রভাগা ও গোমতী নামে দুইটি খাল কাটাইয়াছিলেন। দুইটি শিলালিপিতেই পূর্ণবর্ম্মণের পদচিহ্ন খোদিত আছে—সেই পদচিহ্নকে আবার বিষ্ণু-পদচিহ্নের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। দুইটি কথা এস্থানে লক্ষ্য করিবার বস্তু—চন্দ্রভাগা ও গোমতী এই দুইটিই উত্তর ভারতের দুইটি নদীর নাম। অনুমান হয়, এই রাজবংশ উত্তর ভারতের কোনো রাজবংশের শাখা। এই ঔপনিবেশিক রাজবংশের রাজারা কি করিয়া মাতৃভূমির সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলিতেন এই নামগুলি হইতে তাহাও অনুমান করিতে পারা যায়। আর-একটি জিনিসও লক্ষ্য করিবার মত—শিলালিপিতে আপন পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহার সঙ্গে বিষ্ণুপদের তুলনা করিবার মতন দুঃসাহসও এই ঔপনি-বেশকদের ছিল; ভারতবর্ষের কোনো রাজা অথবা সম্রাটের এতবড় স্পর্দ্ধার প্রমাণ আমরা কোথাও পাই না।

খুব সম্ভব এই পূর্ণবর্ম্মণের সময় অথবা তার কিছু পূর্ব্বে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ সিংহল হইতে পশ্চিম জাভায় আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান্ তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে বলিয়াছেন যে, সে-সময় যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের ততটা ছিল না। যবদ্বীপ হইতে দুইশত হিন্দু বণিকের সঙ্গে জলপথে জাহাজে চড়িয়া তিনি ক্যান্টনে গিয়াছিলেন ৪১৩ খৃষ্টাব্দে।

কাশ্মীরকুমার শিল্পী গুণবর্ম্মণ ৪২৩ খৃষ্টাব্দে জাভা গিয়াছিলেন এবং খুব সম্ভব তিনিই সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। জাভা হইতে তিনি চীনে গিয়াছিলেন জাহাজে চড়িয়া—"নন্দী" নামধারী একজন হিন্দু ছিলেন তার মালিক।

তার পরে জাভার উল্লেখ যেখানে পাই সেও চীনা সাহিত্যে। প্রথম সুঙ বংশের ইতিহাসে দেখা যায়, ৪৩৫

খৃষ্টাব্দে থ-ব-দ'র এক রাজা শ্রী-প-দ-দো-অ-ল-প-মো ('শ্রীপদ ধরবর্ম্মণ ?) চীন-সম্রাটের সভায় এক রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের জাভার ইতিহাসের খবরও আমরা পাই চীনা বিবরণে। জাভার উত্তর-পশ্চিমাংশে তখন লন-গ-সু নামে এক রাজ্য ছিল। লোকেরা বলে—"চার শত বৎসর আগে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল ; এক সময় এমন হইল যে, এক রাজা তাঁর শাসনে সকলকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার এক আত্মীয় ছিলেন খুব বুদ্ধিমান্—প্রজারা তাঁহারই অনুগত হইয়া পড়িলেন * * * রাজা তখন সেই আত্মীয়কে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন ; সেই নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ভারতবর্ষে গিয়া এক রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া বসিল। লন্-গ সু'র রাজা যখন মারা গেলেন তখন দেশবাসীরা সেই নির্ব্বাসিত রাজাত্মীয়কে রাজা হইবার জন্য ডাকিয়া আনিল।" এই রাজার পুত্র চীন-সম্রাটের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন—সেই পত্রটি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শান্ত স্নিগ্ধ সুরে সিক্ত।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম জাভার প্রতিপত্তি কমিয়া মধ্য-জাভাই শ্রী ও সমৃদ্ধিতে উন্নত হইয়া উঠিতেছিল। চীনের তাঙ বংশের ইতিহাসে দেখিতে পাই, মধ্য-জাভায় কলিঙ্গরাজ্য বলিয়া এক নূতন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জাভার এই বালী ও কলিঙ্গরাজ্য হইতে চীন-সম্রাটের সভায় ৬৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বারবার দূত প্রেরিত হইয়াছিল।

৬৭৪ খৃষ্টাব্দে এই কলিঙ্গরাজ্যের প্রজাসাধারণ 'সীমা' নামে এক মহিয়সী নারীকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাঁহার সুশাসন এমনই ছিল যে, পথে কোনো জিনিস পড়িয়া থাকিলেও কেউ কুড়াইয়া তুলিয়া লইত না। একজন আরব সর্দ্দার একবার একটি স্বর্ণথলিকা এই রাজ্যের সীমার মধ্যে পথের উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন। পথযাত্রীরা কেহই উহা কুড়াইয়া তুলিয়া লয় নাই এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত উহা এমন করিয়াই পড়িয়া ছিল। একদিন রাজকুমার উহার উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া রাণী 'সীমা' এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি কুমারের হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন। পরে একটা মীমাংসা হয় এবং কুমারের পদতলের যে অংশ ঐ স্বর্ণথলি স্পর্শ করিয়াছিল তাহা কাটিয়া ফেলা হয়।

জাভার এই কলিঙ্গ রাজ্যের কথা এর পরে আমরা আর শুনিতে পাই না। জাভায় প্রাপ্ত সর্ব্বপ্রাচীন শিলালিপির তারিখ ৬৫৪ শকাব্দ (৭৩২ খৃষ্টাব্দ); সেই শিলালিপি হইতে আমরা সেই সময়কার কিছু কিছু খবর পাই এবং ইহার অক্ষর একেবারে এই সময়ের কম্বোজরাজ ভববর্ম্মণের শিলালেখ'র অক্ষরের অনুরূপ। ইহাতে কুঞ্জরকুঞ্জ নামক পবিত্র তীর্থে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা আছে এবং সন্নহ ও সঞ্জয় (পিতা ও পুত্র) নামে মধ্য-জাভার দুই রাজার নাম আছে। ডিয়েঙ্ উপত্যকার শৈব-মন্দির-গুলি বোধ হয় এই সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল। সঞ্জয় সুমাত্রা, বালি, মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশে আপন প্রভূত প্রভাব ও রাজত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া জাভার অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সাহিত্যে বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়।

পূর্ব্ব জাভার 'দিনয়' নামক স্থানে ৬৮২ শকের (৭৬০ খৃষ্টাব্দে) আর-একটি শৈব শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে অগস্ত্য ঋষির একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার খবর জানিতে পারি। ব্রাহ্মণভক্ত, অগস্ত্য-পূজক রাজা গজয়নের আদেশে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল—"এই বৎসর বর্ষার বারি-পাতের আকাঙ্ক্ষায় সুদৃশ্য মহর্ষিভবনে কুম্ভলগ্নে দৃঢ়চিত্ত রাজা কর্ত্তৃক এই অগস্ত্য কুম্ভযোনির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।" একশত বৎসর পরের আর একটি শিলালিপিতেও আমরা অগস্ত্য ঋষির উল্লেখ দেখিতে পাই (৭৮৫ শক ৮৬৩ খৃষ্টাব্দ)। এই শিলালিপি কিছু সংস্কৃত ও কিছু কবি ভাষায় লিখিত। জাভায় অগস্ত্যের নাম হইতেছে 'বেলাইঙ্'; এই নামেও সেখানে তাঁহার পূজা হইত। ঋষি অগস্ত্য স্বয়ং "ভদ্রলোক" নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া এই শিলালিপিতে উল্লেখ আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অগস্ত্য ঋষির এক বন্দনা-গীতিও তাহাতে স্থান পাইয়াছে।

মধ্য-জাভায় এই সময় খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরাতন শৈববংশের পতনের পর সুমাত্রার এক মহাযান-পন্থী বিরাট্ রাজবংশের অভ্যুদয় হইতেছিল। চীনদেশের

সাহিত্য ও ইতিহাস হইতে জানা যায় খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দীতে সুমাত্রায় 'পালেম্‌বাঙ' নামে এক হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ফরাসী পণ্ডিত মসিয়ো সেদেশ্ (Coedes) প্রমাণ করিয়াছেন, এই 'পালেঙবাঙ্' ও চীনা সাহিত্যের সন্-ফট-সি অর্থাৎ শ্রীবিজয় একই জিনিস। তাঁহারই গবেষণার ফলে আজ ভারতমহাসাগরের দক্ষিণ পূর্ব্বে বৃহত্তর ভারতের এক অপূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও মধ্য-জাভা ও সুমাত্রা জুড়িয়া এই শ্রীবিজয় রাজ্যের শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজারা এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই শৈলেন্দ্রবংশের কোনো রাজা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে তদানীন্তন চোলসম্রাটের অনুমতি লইয়া বর্ত্তমান মান্দ্রাজের সন্নিকটে নেগাপট্টমে একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নালন্দায় আবিষ্কৃত দেবপালের এক তাম্রশাসনেও দেখিতে পাই, শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা পরম সুগত বালপুত্রদেবের ইচ্ছায় নালন্দায় একটি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পালসম্রাট দেবপাল এই বিহারের পালনোদ্দেশ্যে পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মনে হয় ইৎসিঙের পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতেই সুমাত্রা মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের এক বিরাট কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

মধ্য-জাভাতেও এই শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ৭০০ শকের (৭৭৮ খৃষ্টাব্দের) একটি শিলালিপিতে দেখা যায়, মধ্য-জাভার 'কালাসনে'র তারামন্দিরটি কোনো শৈলেন্দ্র সম্রাটের আদেশে তাহারই বিজয়-রাজ্যের মধ্যে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খুব সম্ভব শৈলেন্দ্রাধিকৃত এই মধ্য-জাভা কোনো রাষ্ট্রীয়শক্তি দ্বারা শাসিত হইত। ঐতিহাসিকের কাছে এ তথ্য খুবই মূল্যবান্ যে, এই শিলালিপি উত্তর ভারতের ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা, দক্ষিণ ভারতের পল্লবাক্ষরে নয়। এই শৈলেন্দ্র-বংশের শ্রীবৃদ্ধির যুগেই কম্বোজেও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও উত্তর ভারতের ব্রাহ্মী অক্ষর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। উত্তর ভারতের এই ব্রাহ্মীলিপি অনেকটা বঙ্গাক্ষর লিপির অনুরূপ—দেবনাগরীর সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য খুব কম। তাছাড়া এই সময়কার জাভা, কম্বোজ, সুমাত্রার মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে শৈব ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। ইহা হইতেই অনুমান হয়, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর হইতেই এইদিকে দক্ষিণ ভারতের প্রভাব কমিয়া আসিতেছিল এবং তাহার ধর্ম্ম ও শিল্প ক্রমেই বঙ্গ ও মগধের পালরাজবংশের সাধনা ও সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িতেছিল।

এই শৈলেন্দ্রাধিপত্যই মধ্য-জাভার স্বর্ণযুগ। এই যুগেই বরবুদরের বিরাট বৌদ্ধমন্দির গড়িয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডি মেণ্ডুটে (জাভার অধিবাসীরা মন্দিরকে চণ্ডী বলে) যে-অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা গঠন-ভঙ্গীতে ভাবরূপে সুষমা ও সৌন্দর্য্যে গুপ্তযুগের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য-নির্শনের সম্মুখে সগর্ব্বে দাঁড়াইতে পারে। সংস্কৃত-সাহিত্যানুরাগী কোনো শৈলেন্দ্ররাজ "কবি"-ভাষায় (জাভার প্রাচীন ভাষা) একটি সংস্কৃত পুঁথির তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জাভায় এই শৈলেন্দ্রাধিপত্য প্রায় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

শৈলেন্দ্র-প্রভুত্ব দ্বারা তাড়িত হইয়া যে-শৈবরাজারা পূর্ব্ব জাভায় আসিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাই এই সময় মধ্যজাভার শৈলেন্দ্র প্রতিনিধিদের হাত হইতে জাভার একাধিপত্য কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু বরবুদরের সময় হইতেই মধ্য-জাভায় যে স্থাপত্য-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছিল তাহা এই শৈবাধিপত্যে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব-সময়েও বিপুল উৎসাহে অনুসৃত হইতে লাগিল। 'প্রম্বানামে'র মন্দিরশ্রেণী ও তাহার প্রাচীর-গাত্রে রামায়ণের যে বিচিত্র কাব্যগাথা চিরকালের অক্ষরে খোদিত হইয়া আছে তাহা এই যুগেই নির্ম্মিত ও রূপায়িত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই, যে-কারণেই হউক, মধ্য-জাভার অপূর্ব্ব শ্রী ও সমৃদ্ধির যুগের অবসান হয়।

এই সময় হইতে পূর্ব্ব জাভা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বসে এবং সেখানে ম্পুসিন্দক্ নামক জনৈক রাজার অধীনে এক প্রবল রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সিন্দকের প্রপৌত্রী মহেন্দ্রদত্তা'র বিবাহ হইয়াছিল বালিদ্বীপের "রাষ্ট্রীক" (প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা) উদয়নের সঙ্গে। এই বালিদ্বীপ ইতিমধ্যেই পূর্ব্ব জাভার

রাজাদের প্রভুত্বাধীনে আসিয়া পড়িয়াছিল। উদয়ন ও মহেন্দ্রদত্তার পুত্র ছিলেন মহাপুরুষ ঐর্লঙ্গ। ১৫ বৎসর বয়সেই ঐর্লঙ্গ শত্রুহস্ত হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য বন-গিরি-অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া সেইখানে অরণ্যবাসী সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। একবার তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, যদি তিনি হৃতসিংহাসন আবার ফিরিয়া পান তাহা হইলে বনবাসী সাধুসন্তদের জন্য একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন। পরবর্ত্তী কালে এ প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। শিলালিপিতে তাহার উল্লেখ আছে। ৯৫৭ শক, ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সকল শত্রুর বিনাশ সাধন করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং সমগ্র যবদ্বীপের রাজপদে বৃত হন। তাঁহার রাজত্বকালেই "কবি"-ভাষায় লিখিত 'অর্জ্জুন-বিবাহ,' 'বিরাট পর্ব্ব' প্রভৃতি কাব্য ও মহাভারতের একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। খুব সম্ভব রামায়ণও এই সময় অনূদিত হইয়াছিল।

১০৪২ খৃষ্টাব্দে ঐর্লঙ্গ তাঁহার দুই পুত্রকে রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া আবার বনবাসী হন; ভরদ নামক এক সিদ্ধ সন্ন্যাসী দুই পুত্রের রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া জাভায় জনশ্রুতি আছে। ইহার একটি রাজ্যের নাম জঙ্গল—আর-একটি কেদিরি অথবা 'ডাহি'। 'জঙ্গল' রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নাই; কিন্তু জাভার প্রাচীন "কবি"-সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন কেদিরি'র কবিরা। জাভার জাতীয় ভাব ও কল্পনাকে সার্থক করিয়াছিল এই কেদিরি রাজ্য—আজও জাভার অধিবাসীরা সে-কথা ভুলিতে পারে নাই। ১১০৪ খৃষ্টাব্দে রাজসভায় রাজকবি ছিলেন ত্রিগুণ। 'সুবনসন্তক' ও 'কৃষ্ণজন' নামক দুইখানি কাব্য ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ১১২০ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন কাম্বেশ্বর—তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তিকাহিনী-বিজড়িত স্মৃতি আজিও জাভার কথায় গাথায় বাঁচিয়া আছে। 'জঙ্গলে'র রাজকুমারী চন্দ্রকিরণকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন—দুইজনে একসঙ্গে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার রাজকবি ম্পু ধর্ম্মরাজ "স্মরদহন" (মদনভস্ম) নামক এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

১১৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কেদিরি'র রাজা ছিলেন জয়বয়। তাঁহারই রাজত্বকালে কবি পেন্নুলুহ্ "ভারতযুদ্ধ ও হরিবংশ" নামক দুইখানি কাব্য প্রকাশ করেন। "ভারতযুদ্ধে" জয়বয় খুব বীরযোদ্ধা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং সুমাত্রা-বিজয়ী বলিয়া তাঁহার উল্লেখ আছে। জয়বয় ছিলেন বৈষ্ণব; জাভার লোকেরা আজিও বিশ্বাস করে জয়বয় পুনর্জন্ম লাভ করিয়া কেদিরি'র স্বর্ণরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।

কেদিরি'র রাজারা জাভার বাহিরেও সম্মান এবং প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১১২৯ খৃষ্টাব্দে কামেশ্বর চীন-সম্রাটের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। আরবী পুঁথিপত্র হইতে জানা যায় যে, জাভার অধিবাসীরা এই সময় আফ্রিকার উপকূল পর্য্যন্ত বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিস্তার সাধন করিয়াছিল। এমন-কি কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জাভা ও সুমাত্রার হিন্দু অধিবাসীরাই মাদাগাস্কারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কেদিরি রাজ্য কেন্ অরোক নামক জনৈক দুর্দ্ধর্ষ বীরের কর-কবলিত হয়। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া জাভার ইতিহাস "কবি"-ভাষায় লিখিত গ্রন্থ জুড়িয়া বহু বিচিত্র তথ্যে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। "পর রতন" নামক গ্রন্থে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ হিন্দুরাজ বংশের শেষ পর্য্যন্ত জাভার সমগ্র ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ আছে; নগর কৃতাগম গ্রন্থেও জাভার ইতিহাসের অনেক তথ্য আছে, কিন্তু তাহা ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দ হয়মবুরুকের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত।

কেন্ অরোক্ ছিলেন সিঙ্গসারি ও মজ্জপহিত্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পূর্ব্বপুরুষ। ব্রহ্মার পুত্র, বিষ্ণুর অবতার ও শিবের পরমাত্মীয় বলিয়া "পররতনে" তাঁহার উল্লেখ আছে। পৃথিবীতে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহার অনুষ্ঠান তিনি করেন নাই, কিন্তু যেহেতু এতগুলি দেবতার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ, সেই হেতু কোনো পাপই তাঁহাকে স্পর্শ করিত না। ভারতবর্ষ হইতে আগত কোনো ব্রাহ্মণের সহায়তায় তিনি 'সিঙ্গসরি'র সামন্ত রাজ-সভায় পারিষদরূপে প্রবেশ লাভ করেন; সিঙ্গসারি'র রাজা তখন কেদিরি'র সামন্ত রাজ। রাজসভার পারিষদরূপে ক্রমে তিনি রাজরাণীর অত্যন্ত প্রিয়-

পাত্র হইয়া উঠেন; রাজরাণী দেদিস্ ছিলেন অপরূপ রূপসী, জাভায় তাঁহার মতন রূপসী আর কেউ ছিল না। অনেক চক্রান্ত, অনেক ষড়যন্ত্রের পর, কেন্ অরোকে'র গুপ্ত-ছুরিকার আঘাতে কেদিরি-রাজ নিহত হন এবং ১২২০ খৃষ্টাব্দে কেন্ অরোক্ সিঙ্গসারি'র সিংহাসন অধিকার করিয়াই বিধবা রাণী দেদিসের পাণিগ্রহণ করেন। রাজা হইয়াই কেন্ অরোক্ জঙ্গল ও কেদিরি রাজ্য অধিকার করেন, এবং সিঙ্গসারি রাজ্যকে সমৃদ্ধির শিখরে তুলিয়া দিয়া "রাজস সঙ অমূর্ব্বভূমি" উপাধি গ্রহণ করেন। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। জাভায় প্রজ্ঞাপারমিতার যে অপূর্ব্ব সুষমা ও সৌন্দর্য্যাভিষিক্ত ভাস্কর্য্য-নিদর্শনটি রহিয়াছে তাহা এই কেন্ অরোকের রাজত্বকালেই নির্ম্মিত। পণ্ডিতেরা বলেন, রূপসী রাণী দেদিসেরই ইহা রূপমূর্ত্তি।

সিঙ্গসারি'র চতুর্থ রাজা ছিলেন কৃতনগর (১২৬৮-১২৯২ খৃষ্টাব্দ)। কৃতনগর জাভার ইতিহাসকে একটি নূতন রূপ প্রদান করেন, কিন্তু তাহাতেই সিঙ্গসারি'র রাজ-বংশের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। "শিব-বুদ্ধ" বলিয়া তিনি দেশের লোকের নিকট হইতে পূজা পাইতেন, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অসংযমী ও দুর্ব্বল-চিত্ত। তিনি বিজয়-অভিযান পাঠাইয়াছিলেন 'মলয়ু'তে (সুমাত্রায়), বালিতে, বকুলপুরে (দক্ষিণ-পশ্চিম বোর্ণিও); অথচ তাঁদের নিজের ঘরে, নিজের রাজ্যে সমস্ত শক্তি দরাজ হস্তে অপব্যয়িত হইতেছিল, কোনো সঞ্চয়, কোনো শৃঙ্খলাই ছিল না। এদিকে আপন গর্ব্বে দর্পিত রাজা চীন-সম্রাট কুবলাই খাঁ'র দূতকে অপমান করিয়া বিদায় দিলেন। সুযোগ বুঝিয়া কেদিরি'র সামন্তরাজ জয়কতোঙ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। কৃতনগরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন রাদেন্ বিজয়। এই রাদেন্ বিজয় বিদ্রোহী জয়কতোঙকে বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীবীরের অমিত বিক্রমের সম্মুখে রাদেন্ বিজয়ের ক্ষুদ্র শক্তি স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। জয়কতোঙ কৃতনগরকে হত্যা করিয়া সিঙ্গসারি অধিকার করিলেন, রাদেন্ বিজয় জাভার উত্তরে মাদুরা দ্বীপে পলাইয়া গেলেন। কয়েক দিন পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বশত্রু জয়কতোঙ'র রাজ-সভায় অন্যতম মন্ত্রীরূপে প্রবেশ করিলেন এবং রাজার অনুমতি লইয়া এক জনবিরল বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে এক নূতন নগরী প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই নগরীই পরে মজ্যপহিত্ নগরী নামে খ্যাত হয়। বিজয় প্রতি মুহূর্ত্তে হৃতরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন—১২৯৩ খৃষ্টাব্দে সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন পরে কৃতনগর চীন-দূতকে যে অপমান করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য কুবলাই খাঁ তাঁহার সৈন্য প্রেরণ করিলেন; রাদেন্ বিজয়ের পরামর্শানুসারে এই চীন-সৈন্য-বাহিনী জয়কতোঙ'র কেদিরি রাজ্য আক্রমণ করিল—যুদ্ধক্ষেত্রেই জয়কতোঙ প্রাণত্যাগ করিলেন। রাদেন্ বিজয় এইবার এই চীনা সৈন্যদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করিলেন—হঠাৎ আক্রমণে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া চীনা সৈন্য স্বদেশে পলায়ন করিল।

জাভায় ভারতীয় উপনিবেশ

সমস্ত শত্রু চারিদিক হইতে এইভাবে নিঃশেষ করিয়া লইয়া রাদেন্ বিজয় ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আপনার প্রতিষ্ঠিত মজ্যপহিত রাষ্ট্রে আপন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। এবং 'কৃতরাজস জয়বর্দ্ধন' উপাধি লইয়া পূর্ব্ব জাভার কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। মজ্যপহিতের এই সর্ব্বপ্রথম রাজার একটি সুন্দর শিল্প-মূর্ত্তি আছে—বিষ্ণুর প্রতিরূপে তিনি রূপায়িত। মৃত রাজাদিগকে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার রূপে রূপায়িত করার প্রথা জাভাতে যেমন, কম্বোজেও তেমনি ছিল।

কৃতরাজস'র পুত্র পিতার সম্মান ও সুকৃতির মূল্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সে সম্মান ও সুকৃতিকে শুধু রক্ষা নয়, তাহাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন মজ্যপহিতের তৃতীয় শাসনকর্ত্তা কৃতরাজস'র কন্যা ত্রিভুবনোত্তুঙ্গ দেবী জয়বিষ্ণু-বর্দ্ধনী। এই মহীয়সী নারী তাঁহার মাতা গায়ত্রীদেবী ও ভগিনী রাজদেবীর সঙ্গে একযোগে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন—তাঁহার স্বামী ছিলেন রাজ্যের মহাদণ্ড নায়ক। কিন্তু বীরত্বে ও পৌরুষে সকলের অপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিলেন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী গজমদ। একদিন এক শুভ মহূর্ত্তে সকল সভাসদ্‌বর্গের সমক্ষে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, যতদিন

পশ্চিম জাভার সমগ্র ভূখণ্ড, বালি, বকুলপুর (দক্ষিণ-পশ্চিম বোর্ণিও) সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্য এবং সিংহপুর (শিঙাপুর) মজ্যপহিত্ করতলগত না হয়, ততদিন রাজকোষের একটি সুবর্ণকণাও আমি স্পর্শ করিব না। সভার সকলে বিদ্রূপের কলহাস্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। অপমানাহত গজমদ রাণী ত্রিভুবনোত্তুঙ্গ দেবীর নিকট অপমানের বিচার প্রার্থনা করিলেন—রাণীর বিচারে সকল বিদ্রূপমত্ত সভাসদ্ বহিষ্কার-দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। গজমদ নির্ব্বিঘ্নে রাজাদেশ মস্তকে লইয়া বিজয়াভিযানে বাহির হইলেন।

১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে বালিদ্বীপ মজ্যপহিত-বশ্যতা স্বীকার করিল; বালি'র বীর রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে জাভা, মাদুরা ও সেলিবিস্ দ্বীপের সমগ্র ভূখণ্ড মজ্যপহিত্-সাম্রাজ্যের করতলগত হইল। ত্রিভুবনোত্তুঙ্গ দেবীর রাজদণ্ড ত্যাগের পর হয়মবুরুক মজ্যপহিত সিংহাসনে আরোহণ করেন—ইঁহার রাজত্বকালেও গজমদই প্রধান মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই সময়েই পূর্ব্ব ভারত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপগুলিও একে একে মজ্যপহিত্ সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করে।

সুমাত্রার রাজা আদিত্যবর্ম্মণের এই সময়কার একটি অদ্ভুত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শিলালিপিটির ভাষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু জাভা ও সুমাত্রায় কি করিয়া তান্ত্রিক মহাযান ও বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম্ম অতি ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিতেছিল, এই লিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "১২৬৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে কুমার আদিত্য-বর্ম্মণ শ্মশান-ভূমিতে শ্রেষ্ঠ অভিষেকোৎসবে দীক্ষা লাভ করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেন এবং 'বিশেষ ধরণী' নাম গ্রহণ করিয়া পরম মুক্তি লাভ করিলেন। জনহীন রাজ্যের রাজসিংহাসনে (অসংখ্য নরমুণ্ডের উপর) বসিয়া, বিকট হাস্যে সকল দিক কম্পিত করিয়া তিনি নররক্ত পান করিতেন এবং তাঁহার মহাপ্রসাদ (নরমেধ-যজ্ঞ) ঊর্দ্ধে ধূমায়িত হইয়া চতুর্দ্দিক উৎকট দুর্গন্ধে ভরিয়া তুলিত; কিন্তু যাহারা দীক্ষিত ও লব্ধমন্ত্র তাহাদের কাছে এই দুর্গন্ধ অগণিত পুষ্পের নন্দন-সুরভি বলিয়া মনে হইত।" ইহার ঠিক্ অর্থ বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্মের আভাস ইহার মধ্যে অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। মৃত্যুর পর আদিত্যবর্ম্মণ, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

জাভায় তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রসারের প্রমাণ অন্যত্রও আছে। সিঙ্গসারির শেষ রাজা কৃতনগরের রাজসভায় বাস করিতেন কবি প্রপঞ্চ। "কবি"-ভাষায় লিখিত তাঁহার 'নগরকৃতাগম' গ্রন্থেও রাজা কৃতনগরের তান্ত্রিক ধর্ম্মাচরণের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কৃতনগর শিব বুদ্ধেরই প্রতীক বলিয়া জাভায় পূজিত ও সম্মানিত হইতেন; তিনি শ্মশানভূমিতে দীক্ষা লাভ করিয়া জিন 'অক্ষোভ্য'র মানব-প্রতীক্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কৃতনগর তান্ত্রিক চক্রের পূজা করিতেন এবং আরো ভীষণ জটিল তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন—নগরকৃতাগম গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। ঠিক এই সময়েরই মন্ত্রযান মহাযান ধর্ম্মের আর-একটি গ্রন্থেও (সঙ হ্যাং কমহযানিকন্) তান্ত্রিকধর্ম্মের চিহ্ন বেশ সুপরিস্ফুট। এই গ্রন্থেরই এক স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের অংশসম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, জাভা ও সুমাত্রায় দিনের পর দিন বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে নানান কুৎসিত আচার ও বিকৃত বিদুষ্ট অনুষ্ঠানের মরু-বালিরাশির মধ্যে কি করিয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল এবং ভারতবর্ষের এই সদ্ধর্ম্মের বিলোপ কি করিয়া ধীরে ধীরে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রসারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছিল।

১৩৫০ খৃষ্টাব্দে হয়ম্‌বুরুকের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাণী জয়বিষ্ণুবর্দ্ধনী রাজদণ্ড পরিত্যাগ করেন। এই হয়ম্‌বুরুকের রাজত্বকালেই মজ্যপহিত্ রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি লাভ ঘটিয়াছিল। নগরকৃতাগম ও পরবতোন্ গ্রন্থে তাঁহার রাজ্যজয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। জাভা হইতে আরম্ভ করিয়া নিউগিনি পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া বোর্ণিয়ো, দক্ষিণ ও পশ্চিম সেলিবিস, বুটন, বুরু, মেরাম, বান্দা, বঙ্গ্‌গই, মলুক্কাদ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমস্তই মজ্যপহিত্ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মালয় দ্বীপপুঞ্জের কেদাহ্, কেলাঙ্, সিঙাপুর, পাহাঙও কেলান্তন্ এবং সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্যও হয়ম্‌বুরুকের করতলগত হইয়াছিল। গজমদের সগর্ব্ব প্রতিজ্ঞা হয়ম্‌বুরুকের রাজত্বে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল। এই

সুবিস্তৃত বিজিত রাজ্যের তালিকা ছাড়া নগর কৃতাগম গ্রন্থে মজ্যপহিত্-রাজ্যের মিত্রশক্তিপুঞ্জেরও উল্লেখ আছে—শ্যাম-দেশের অযোধ্যা ও রাজপুরী; ব্রহ্মদেশের মরুৎমা (মার্ত্তামান্), কম্বোজ, চম্পা ও যবন রাজ্য (উত্তর আনাম) ইহারা সকলেই মজ্যপহিত্ শক্তির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

বিজিত দ্বীপের রাজারা নিয়মিতভাবে মজ্যপহিত্ রাজ-সভায় কর প্রেরণ করিতেন। হয়মবুরুক‌ও এইসকল রাজ্য অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক স্থানে তিনি রাজকার্য্য পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রী ও ভুজঙ্গদের (গুণী ব্রাহ্মণ) প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতেন। শৈব ভুজঙ্গেরা রাজকার্য্য পরিদর্শন ছাড়া সর্ব্বত্র শৈবধর্ম্মের প্রচারে সাহায্য করিত। কিন্তু পশ্চিমজাভায় বৌদ্ধ ভুজঙ্গেরা কোনো আমল পাইত না, সেখানে প্রাচীন কালে বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বী কেহ ছিল না। পূর্ব্বজাভায় ও পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে, ইহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ভরদ ও কুটরন্ নামে দুই বৌদ্ধ ভিক্ষু বালিদ্বীপে মজ্যপহিত্ রাজ্যের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছিলেন।

ভুজঙ্গদের রাজকার্য্য পরিদর্শনের ব্যবস্থায় মজ্যপহিত্ রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজাদেশ অমান্য করিবার সাহস কাহারও হইত না—করিলে "জলধি মন্ত্রী"-দের হাত হইতে কাহারও নিস্তার ছিল না।

নগরকৃতাগম গ্রন্থের মত রাজ্যপরিচালনার ভার ছিল দোষলেশসংস্পর্শহীন পাঁচজন মন্ত্রীর উপর। রাজ-কুমারেরাও রাজ্যের কোনো কোনো অংশে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন—ইঁহাদেরও মজ্যপহিত্ রাজসভায় আসিয়া কর ও প্রণতি নিবেদন করিতে হইত। হয়ম্-বুরুকের রাজমহিষী ছিলেন শ্রীপরমেশ্বরী সুষম্না দেবী--- নগরকৃতাগম গ্রন্থে তিনি রতির মানবী প্রতিরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

মজ্যপহিত রাজ্যের রাজ্যবিস্তৃতি-গরিমাই শুধু গর্ব্বের বিষয় ছিল না। প্রপঞ্চ-লিখিত গ্রন্থে রাজ-ধানীর অপূর্ব্ব সমৃদ্ধির বিবরণও আছে—সুদৃশ্য-সুগভীর জলাশয়ে কেশর-চম্পকবীথিকায়, বিস্তৃত পুষ্পোদ্যানে, প্রাসাদে, হট্টমন্দিরে, রাজবিতানে মজ্যপহিত্ রাজধানী হসিত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ-বিতানে বসিয়া রাজ্যপতি (প্রধান মন্ত্রী), আর্য্য, ও পঞ্চমন্ত্রীতে মিলিয়া রাজার সম্মুখে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রাজধানীর পূর্ব্ব প্রান্তে শৈব ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন—তাঁহাদের নেতা ছিলেন ব্রহ্মরাজ। দক্ষিণ প্রান্তে বাস করিতেন বৌদ্ধেরা—এই বৌদ্ধ-সংঘের কর্ত্তা ছিলেন রেঙ্কন্নদি। পশ্চিম প্রান্তে বাস করিতেন ক্ষত্রিয় ও মন্ত্রীরা। সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিপত্তি ছিল—এই সময়কার ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুমাত্র প্রসার ছিল না। জাভার সাহিত্য বহুলপরিমাণে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত; বৌদ্ধ কবিরা পর্য্যন্ত এই সময় রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিতেন।

এই সময়কার জাভার ভাস্কর্য্যে ভারতীয় প্রভাব কমিয়া গিয়া পলিনেশিয়ান্ প্রভাবই অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব জাভার চণ্ডী পানাতরমে রামায়ণের যে-সব প্রস্তর-চিত্র খোদিত আছে তাহাতে এই পলিনেশিয় প্রভাব অত্যন্ত নিপুণ ভাবে আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। মেঘের জটাজালের অলঙ্কার রূপের মধ্যে দৈত্য-দানব, নর-বানর অপূর্ব্ব অদ্ভুত উপায়ে রূপায়িত হইয়া আছে। কিন্তু এই পলিনেশীয় প্রভাব মন্দিরের বাহিরের প্রাচীর-গাত্রের উপরই আবদ্ধ—মন্দিরের ভিতরের দেবদেবীর শিল্পরূপ একেবারে মধ্য জাভার ভারতীয় প্রভাবে সমৃদ্ধ। এইসব মূর্ত্তির পাদপীঠে প্রায়ই উত্তর ভারতের ব্রাহ্মীলিপি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়—অক্ষরগুলি নাগরী হইতে রূপান্তরিত হইতে হইতে প্রায় বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে হয়মবুরুক দেহত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই মজ্যপহিত্ রাজবংশের ধ্বংস-লীলা সুরু হইল। স্বীয় পুত্র ও জামাতার মধ্যে গৃহ-বিবাদের সূত্রপাত হইয়া এই ধ্বংসলীলার প্রথম অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল। উত্তর বোর্ণিও, সুমাত্রার ইন্দ্র গিরি ও মালাকা সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং তাহার পরেই দারুণ দুর্ভিক্ষে সমগ্র মজ্যপহিত রাজ্য

বিলুপ্তির শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল। মজ্যপহিতের সর্ব্বশেষ রাজা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। হয়ম্‌বুরুকের পৌত্রী সুহিত'র রাজত্বকালে কেদিরি রাজ্য মজ্যপহিত্‌ অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিল। সুহিত'র কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃতবিজয় চম্পারাজ্যের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। এই রাণী ইস্‌লাম ধর্ম্মের অত্যন্ত পোষকতা করিতেন এবং ইঁহারই কল্যাণে ইস্‌লাম ধর্ম্ম জাভায় সর্ব্বপ্রথম প্রতিপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করে। ইনি ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

চম্পা-রাজকুমারীর ইস্‌লাম ধর্ম্মের এই পোষকতার সমুচিত প্রতিদান মুসলমানেরা দিতে পারে নাই—তাহাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মজ্যপহিতের শেষ সম্রাট অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে মজ্যপহিত্‌ রাজ্যের ধ্বংসের পর সম্রাট মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া শুইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি স্বপ্নচক্ষে দেখিতেছি সমুদ্রের ওপার হইতে বিজাতীয়েরা আসিয়া এই রাজ্য অধিকার করিয়া লইবে'—ওলন্দাজেরা আসিয়া তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল করিয়াছে।

কিন্তু শিলালিপি বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয় মজ্যপহিত্‌ রাজ্যকে ধ্বংসের কুক্ষিগহ্বরে টানিয়া নামাইয়াছিলেন জনৈক হিন্দু রাজা রণ-বিজয়। রণ-বিজয় ছিলেন কেদিরি'র রাজা; এই কেদিরি রাজ্য রাণী সুহিত'র রাজত্বকালেই সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ১৫২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মজ্যপহিত্‌ রাজধানী অটুট ছিল, কিন্তু প্রধান প্রধান রাজবংশ সকলই বালিদ্বীপে পলাইয়া গিয়াছিলেন। রণ-বিজয়ের বংশ বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই—ইস্‌লামের মুক্তস্রোত সকল রাজ্য, রাজবংশকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতেই জাভা ও সুমাত্রায় ইস্‌লাম-আধিপত্যের সূত্রপাত হইল।

বালিদ্বীপের ইতিহাস ইতিমধ্যে অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে মজ্যপহিত্‌ রাজ্য ধ্বংসের কিছুকাল পূর্ব্বেই কয়েকজন শৈব ব্রাহ্মণ বালিদ্বীপে পলাইয়া গিয়াছিলেন। বালির ব্রাহ্মণেরা বলেন তাঁহারা পদণ্ড (পণ্ডিত) বাহু রভু (অচিরাগত) নামক জনৈক ব্রাহ্মণের বংশ-সম্ভূত। এই ব্রাহ্মণের পঞ্চপন্থা ছিলেন। তাঁহারই পাঁচপুত্র হইতে বর্ত্তমান বালির ব্রাহ্মণের পাঁচটি শাখা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বালিদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও বিদ্যমান, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের মত এতটা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। উৎসব উপলক্ষে চারিজন শৈব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে একজন পঞ্চম বৌদ্ধ ভিক্ষুকও আহ্বান করা হয়। ব্রাহ্মণদের বলা হয় ইদা, ক্ষত্রিয়দের বলা হয় দেব, বৈশ্যদের বলা হয় 'গুষ্টি' এবং শূদ্রদের বলা হয় 'বাপে মেমে' (বাবা মা)। বালির হিন্দুরা বহুদিন জাভাকে ভুলিতে পারে নাই, অসীম কৃতজ্ঞতায় তাহাকে স্মরণ রাখিয়াছিল, কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধের আর বিরাম ছিল না। দিনের পর দিন যুদ্ধে ও রক্তপাতে পূর্ব্ব জাভা ও পশ্চিম বালি জনশূন্য প্রান্তরে পরিণত হইল; এবং তাহাতেও যখন জাভাদ্বাপে বালিরাজ্যের বিস্তৃতি সম্ভব হইল না তখন বালির রাজার পূর্ব্বদিকে লম্বক প্রভৃতি দ্বীপ বিজয়ের চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। বালিদ্বীপে হিন্দু রাজারা আজও রাজ্য করিতেছেন—ভারতবর্ষের বাহিরে একমাত্র বালিদ্বীপেই আজও হিন্দুরাজত্ব বিদ্যমান আছে।

বেদের কোনো কোনো অংশ মাত্র বালিদ্বীপে প্রচারিত ও প্রচলিত আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের সমগ্রটুকুর সহিতই বালিদ্বীপের হিন্দুরা পরিচিত। সেখানে প্রচলিত "তুতুর" নামক গ্রন্থভাগ-সমূহে ভারতবর্ষের ধর্ম্মশাস্ত্র, দণ্ডনীতি, রাজনীতি বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক হইতে বিবিধ সংগ্রহ সন্নিবিষ্ট আছে। বালিদ্বীপে সংস্কৃত সাহিত্য প্রচলনের প্রমাণ ইহা হইতে অধিক আর কিছু আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

বালিতে "কবি"-ভাষার রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড ছাড়া) প্রচলিত আছে। রামায়ণের (উত্তরকাণ্ড) লইয়া পৃথক্ গ্রন্থ আছে। বালির লোকেরা মহাভারতের নামও জানে না, কিন্তু "কবি"-ভাষায় লিখিত মহাভারতের ছয়টি পর্ব্বের প্রচলন আছে।

জাভা, সুমাত্রা ও বালিদ্বীপে ভারতীয় রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস পূর্ব্ব ভারতমহাসমুদ্রে বৃহত্তর ভারতের এক অধ্যায় মাত্র। রাজার নাম, রাজ্যের নাম, রাজবংশের

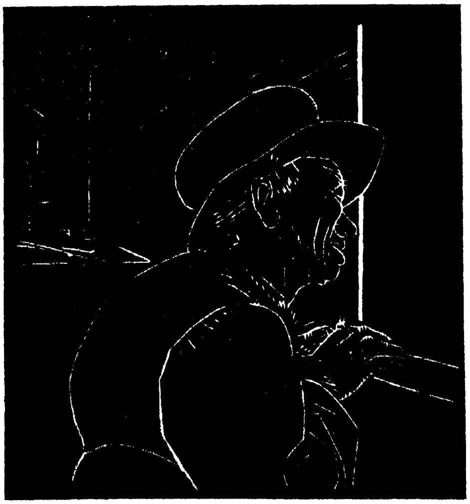
নাম, রাজকার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা, মন্ত্রী-পরিষৎ প্রভৃতি একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ভারতবর্ষ এই দ্বীপগুলির প্রত্যেকটির সীমার মধ্যে আপনার সুবৃহৎ রূপকে এক এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূর্ত্তি দান করিয়াছিল। কিন্তু, বৃহত্তর ভারতের ইতিহাসে রাজা ও রাজবংশের ইতিবৃত্ত নিতান্তই তুচ্ছ। কোনো রাজা বা রাজবংশ বৃহত্তর ভারতের গৌরবময় ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে নাই— রাখিয়াছে শিল্পী ও কবি, পুরোহিত ও প্রচারকেরা— যাহারা সত্য বৃহত্তর ভারত রচনা করিয়া তাহার মধ্যে প্রচার করিয়াছে ভারতের ধর্ম্ম ও সাধনা, শিখাইয়াছে ভারতের ভাষা ও সাহিত্য, গড়িয়াছে মূর্ত্তি ও মন্দির। সেই ধর্ম্ম ও সাধনার ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, মূর্ত্তি ও মন্দিরের ইতিহাসই বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস। জাভা, সুমাত্রা ও বালিদ্বীপে বৃহত্তর ভারতের সেই সত্য ইতিহাস অপূর্ব্ব সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল— সে-সমৃদ্ধির কাহিনী ইতিহাসের আর-এক বিস্তৃত অধ্যায়। *

* বৃহত্তর ভারত-পরিষদে পঠিত।

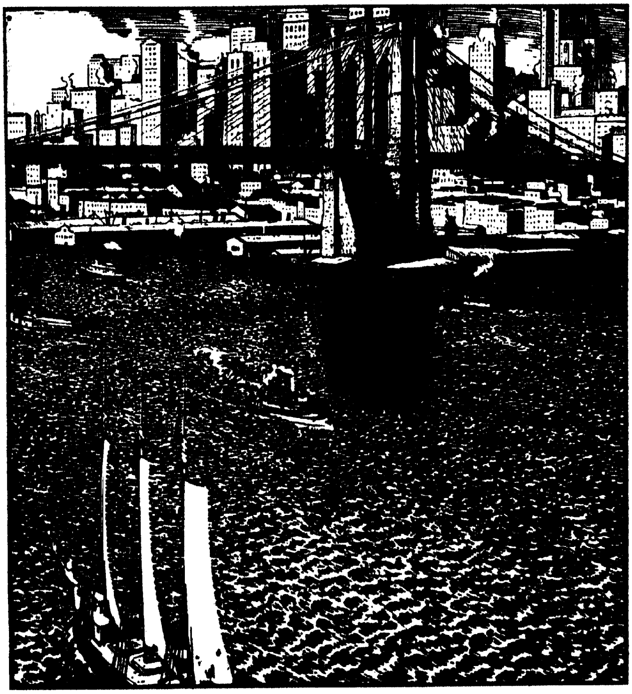
আধুনিক কাঠ-খোদাই-চিত্র
(Wood-cuts)

শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রী সজনীকান্ত দাস

পাশ্চাত্য ইয়োরোপীয় শিল্পকলা তত্রত্য শিল্পীদের অদম্য উৎসাহ ও প্রবল প্রাণশক্তির প্রভাবে দিনে দিনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগের মত প্রাচীন কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতিরও যেন পুনর্জ্জন্ম ঘটিয়াছে। মাত্র গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চিত্রশিল্পের এই বিশেষ বিভাগটি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতির ইতিহাস বহুদিনের। প্রাচ্য চীন দেশেই কাঠ-খোদাইয়ের প্রাচীনতম নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের একটি কাঠ-খোদাই-চিত্র স্যার আউরেল ষ্টাইন্ তুন-হুয়াঙ-এ আবিষ্কার করিয়াছেন। শিল্পবিদেরা অনুমান করেন সম্ভবতঃ এই চিত্রটি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে খোদিত। ইয়োরোপের কাঠ-খোদাইয়ের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে ইহা ইয়োরোপে প্রবর্ত্তিত হয়। চীনা শিল্পীরা এ-বিষয়ে ইয়োরোপীয় শিল্পীদের গুরু কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতির ক্রমপরিণতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই পৃথক্ ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়াছে। প্রাচ্য-ভূখণ্ডের পূর্ব্বসীমান্তে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই শিল্পের অস্তিত্ব



১নং চিত্র। মার্সিয়া লেন ফষ্টার কর্ত্তৃক খোদিত। আনাতোল ফ্রাঁসের কোনো পুস্তকের জন্য প্রস্তুত



'ব্রুক্লিন ব্রীজ'
পি, রুশিকা কর্ত্তৃক খোদিত

শিল্প-বিভাগে কোনো নিপুণ শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সময়ে কাঠখোদাই-শিল্প কতকটা গতানুগতিক যন্ত্রশিল্পে পরিণত হয়। যে-কোনো ধরণের অঙ্কিত চিত্র আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহার অনুকরণে কাঠে যথাযথ খোদাই করিয়া আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পীদের মত রঙে রেখায় বাহ্যতঃ আসলের একটা নকল খাড়া করিয়া তোলাই তখন শিল্পীদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ক্যামেরা ও নানাধরণের প্রসেস এন্‌গ্রেভিং (তাম্র, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর উপর বিশেষ বিশেষ দ্রাবক প্রয়োগে আলোকচিত্রের অনুরূপী আলো ও ছায়ার নিবিড়তার তারতম্য অনুযায়ী যে-ফলক উৎকার্ণ হয় তাহার সাহায্যে ছবি ছাপান) আবিষ্কৃত হওয়াতে গ্রন্থাদি এইভাবে চিত্র-সম্বলিত করা অল্প পরিশ্রমে ও অনেক কম খরচে হইতে লাগিল ; সুতরাং এইরূপ গতানুগতিক ভাবেও কাঠখোদাই-পদ্ধতির অস্তিত্ব বজায় রহিল না।

অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া জাপানের চমৎকার রঙীন-ছাপচিত্রে (Colour Print) পর্য্যবসিত হইয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইয়োরোপে, এই শিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া ষোড়শ শতাব্দীতে ডুরেরে ও হোল্‌বাইন এই দুই প্রখ্যাত শিল্পীর হস্তে চরম গৌরবলাভ করিয়া হঠাৎ যেন সমাপ্ত হইয়া সৃজন-শিল্প-(creative art) শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এই প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র কাঠ-খোদাই-শিল্পের ইয়োরোপীয় ধারা লইয়াই আলোচনা করিব। বস্তুতঃ এই শিল্পের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই ভিন্ন ধারা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বিচার করিলে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া অনুমিত হয়। ইয়োরোপে রঙীন কাঠ-খোদাই-চিত্র (colour wood-cuts) অপ্রচলিত ত নহেই, এমন-কি বহুল পরিমাণে দেখা যায়। তবুও ইয়োরোপীয় কাঠখোদাই-শিল্প বলিতে আমরা সাদা ও কালোর সমাবেশে অঙ্কিত ছবিই বিশেষ করিয়া বুঝিয়া থাকি। ডুরেরে ও হোল্‌বাইনের পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এই

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, একদিক্ দিয়া যাহা ক্ষতিকর বিবেচিত হইল অর্থাৎ ব্যবসার দিক্ দিয়া এই কাঠখোদাই-শিল্পীদের যে অনিষ্ট হইল যেন তাহারই ক্ষতি-পূরণস্বরূপ এই পদ্ধতি সূক্ষ্মশিল্পকলা শ্রেণীতে পুনর্ব্বার স্থান পাইল। ব্যবসায়ের আবরণ খসিয়া যাওয়াতে ইহার স্বাধীন মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। আজকাল আমরা অনেক পুস্তকই কাঠখোদাই-চিত্র-শোভিত দেখিয়া থাকি। ইহার কারণ এই নয় যে, এই পদ্ধতিতে অল্পমূল্যে আসল ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি দেওয়া যায়। আসলে ইহাতে পুস্তকের শোভা যথার্থ বর্দ্ধিত হয়। কেবলমাত্র প্রয়োজনের খাতিরে কোনো পুস্তকে কাঠখোদাই-চিত্রের সমাবেশ হয় না। যেদিন এইভাব লোকের মনে বদ্ধমূল হইল সেদিনই যেন এই শিল্পের নবজাগরণ হইল। ফরাসীদেশে সর্ব্বপ্রথমে এই

জাগরণের সূচনা হয়, সম্প্রতি পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ইহার অনুশীলন হইতেছে। এমন-কি শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগে যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন ব্র্যাঙ্গিন ও ডেরেনের (Brangwyn ও Derain) মত প্রথিতনামা শিল্পীরাও কাঠ-খোদাইকে সূক্ষ্ম কলাশিল্পের অন্তর্গত বিবেচনা করিয়া ইহাতে হাত দিয়াছেন।

(১)

খোদাই-শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ কথা ও কাঠ-খোদাই-শিল্পপদ্ধতি—

সচরাচর পুস্তক বা সংবাদপত্রাদিতে আমরা যে ছবি দেখিয়া থাকি তাহা কাগজের উপর পেন্সিল কলম বা তুলি-দ্বারা হস্তাঙ্কিত ছবিরই আলোকচিত্র ও প্রসেস্ এন্‌গ্রেভিংয়ের সাহায্যে নির্ম্মিত ফলকের ছাপ মাত্র। এই সকল ছবিতে আমরা শিল্পীর ছবির আদর্শে যন্ত্র-সাহায্যে প্রস্তুত প্রতিকৃতিরই পরিচয় পাই—আসলে এইসকল ছবিতে শিল্পীর হাতের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই। কাঠ-খোদাই ছবি ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ইহার সহিত শিল্পীর প্রত্যক্ষ যোগ আছে। কাষ্ঠখণ্ডের উপর হাতে খোদাই করিয়া শিল্পী যে ছাঁচ নির্ম্মাণ করেন, কাঠ-খোদাই ছবি তাহারই ছাপ (Print)। অর্থাৎ কাঠখোদাই ছবি আসল ছাঁচের ছাপ মাত্র। কাঠ-খোদাই এন্‌গ্রেভিং বা তক্ষণ শিল্পের অন্তর্গত। এই দুই ধরণের ছাপে বিস্তর প্রভেদ।

সকল ছাপা ছবিকেই আমরা দুইটি বৃহৎ ভাগে ভাগ করিতে পারি ; এক, যন্ত্রনির্ম্মিত ফলকের ছাপ (অর্থাৎ 'প্রসেস্'), দুই, হাতে খোদাই-করা ফলকের ছাপ (অর্থাৎ এন্‌গ্রেভিং)। প্রথম শ্রেণীর ছাপ-চিত্র যে-ভাবে প্রস্তুত হয় তাহাতে এইগুলিকে কোনো ক্রমেই শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত বলা চলে না। 'প্রসেসে' ছাপা ছবি প্রস্তুতের প্রকার-ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ কখনো অল্প মূল্যের স্থূল হাফটোন হইতে পারে, কখনো বা মূল্যবান্ সূক্ষ্ম রঙীন কোলোটাইপ ছবিও হইতে পারে। স্থূল, সূক্ষ্ম যে-ভাবেই এগুলি প্রস্তুত হোক্—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এগুলি প্রাণহীন ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত ছবির যান্ত্রিক (instrumental) প্রতিকৃতি মাত্র। এইসকল প্রণালীর আসল উদ্দেশ্য কোনো হস্তাঙ্কিত রঙীন কিম্বা রেখা-চিত্রের, খোদিত চিত্রের,



'সাম্রাজ্য-বিস্তার'
জাঁ কেফালিনোস কর্ত্তৃক খোদিত

আলোক-চিত্রের অথবা যে-কোনো ছাপা বা হস্তলিখিত পৃষ্ঠার রঙ, রেখা ও ধরণধারণ সর্ব্বতোভাবে আসলের অনুরূপ করিয়া তোলা। মূল্যবান 'প্রসেসে' ছাপা ছবিতে, (যেমন মেদীচি ছাপের ছবি) এমন সুকৌশলে ছাপ লওয়া হইয়া থাকে যে, যাঁহারা এইসকল ছাপ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা অদ্ভুত যন্ত্র-কৌশলের তারিফ না করিয়া পারিবেন না। কিন্তু এইসকল ছাপের প্রশংসার এইখানেই শেষ। ছাপা ছবিতে শিল্পনৈপুণ্য যা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা আসল ছবিখানির বস্তু। কিন্তু শিল্প-সমালোচনায় খোদাই-করা ছাঁচের ছাপা ছবি (এন্‌গ্রেভিং) সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা হাতে খোদাই-করা কাষ্ঠ বা ধাতু-ফলকের ছাপ মাত্র। এই খোদাই-কার্য্যে সাতটি বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হয়।



'গোলা ঘর'
এথেলবার্ট হোয়াইট কর্তৃক খোদিত

অংশ কাটিয়া ফেলা হয় ছাপ লওয়ার সময় সেগুলি সাদা দেখায় ; অকর্ত্তিত অংশ কালো চিহ্নিত হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, কাঠখোদাই পদ্ধতির গোড়ার কথা এই সাদা রেখা। এক নম্বর চিত্রে যে ছাপের প্রতিকৃতি দেখান হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র এই সাদা ও কালো রেখায় চিত্রিত। সাধারণ হস্তাঙ্কিত চিত্র ঠিক উহার উল্টা, তাহাতে সাদা পটভূমির উপর মানুষের বাহ্যাবয়ব কালো রেখা দ্বারা চিহ্নিত হয়। কিন্তু এই ধরণের চিত্রে, শিল্পীর যাহা আসল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যে-চেষ্টা তাহা কতকটা ব্যর্থ হয়, অধিকন্তু, ছবির বর্ণোজ্জ্বলতা বা চটক সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। কাঠ-খোদাই-শিল্পে শূন্য কালো পটভূমির উপর সাদা রেখার সাহায্যেই শিল্পী বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের প্রতিকৃতি ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হয় ; হস্তাঙ্কিত চিত্রে যেমন কালো রেখা বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, কাঠখোদাইয়ে তেমনি সাদা রেখা বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞাপক। সাদা-রেখার সাহায্যে চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার সুবিধা এই যে, ইহার বহুল প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না, তাছাড়া, শিল্পীর অন্য কিছু কৌশলের সাহায্যও লইতে হয় না ; কালোর উপর সাদার সমাবেশে সহজেই সমগ্র জিনিষটি সুস্পষ্ট করিয়া তোলা সহজ হয়। কাঠ-খোদাই ছাপে আমরা যখনই এই শিল্পের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের—অর্থাৎ সাদা রেখার যথাযথ প্রয়োগের অভাব দেখি তখনই বুঝিতে পারি শিল্পী অন্য কোনো শিল্পকে আদর্শ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন। এই ধরণের ভ্রমাত্মক কাঠখোদাইয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—মিঃ রিকেট্‌স্ খোদিত "হিমনেরেটো মেকিয়া পলিফিলি" (১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ) বিষয়ক ছাপগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইসকল ছাপ হস্তাঙ্কিত 'পেন্সিল ড্রইং'য়ের হুবহু অনুকরণ মাত্র।

এই সাদা রেখার কাজে পারদর্শিতা লাভ করিয়া কাঠ-খোদাই শিল্পী ক্রমে ক্রমে কালোর উপর সাদা জমি (spaces), কালো রেখা, কালো জমি, কালো ও সাদার

এই সাত প্রণালীর কোনোটিতেই কোনো আদর্শকে অনুসরণ করিয়া তাহার যথার্থ প্রতিলিপি গড়িয়া তোলা হয় না। খোদাইকার বা শিল্পীর মন—রেমব্রাণ্ট্‌ ও ডুরেরের মত শিল্পীর বিরাট্ চিন্তাশক্তি—এইসকল প্রণালীর অন্তরালে কাজ করিতে থাকে। তাঁহাদের অন্তর্লোকে প্রতিফলিত দৃশ্যই তাঁহারা সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতির সাহায্যে উপকরণের উপর অঙ্কিত করিয়া দেন। শিল্পীর শিল্পচিন্তাকে রূপে ফুটাইয়া তুলিবার যে, অন্তর্নিহিত ক্ষমতা উপকরণের আছে, তাহা এবং শিল্পীর আপন স্বাতন্ত্র্য এই দুই মিলিয়া সকল খোদিত-চিত্রকে (এন্‌গ্রেভিং) এমন একটি শিল্প-সুষমা প্রদান করে যাহা সাধারণ যন্ত্র-নির্ম্মিত প্রসেস্ ছাপে পরিলক্ষিত হয় না।

জাইলোগ্রাফী বা কাঠ-খোদাইয়ের বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে আমাদিগকে কাঠখোদাই-শিল্পের 'আঙ্গিক* বা টেক্‌নিকের আলোচনা করিতে হইবে।

শিল্পী তাঁহার প্রয়োজন-মাফিক আয়তনের ও নরম বা শক্ত একখণ্ড কাষ্ঠফলক লইয়া তাহার উপরে ছুঁচ বা পেন্সিল দিয়া তাঁহার কল্পিত ছবির একটি খস্‌ড়া প্রস্তুত করিয়া লন। সেই খসড়াটির উপর ইহার পর ছুরী বা বুরিন (খোদাইয়ের যন্ত্রবিশেষ) চালাইয়া খোদাই করা হয়। যে যে

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রয়োগ।



'পোলাণ্ডীয় কৃষিজীবী'——ভ্লাডিস্লস্ স্কক্জিলাস কর্ত্তৃক খোদিত

সংমিশ্রণ, এবং বিন্দু ও রেখার সাহায্যে শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। কাহার পর কি প্রয়োগ করা আবশ্যক তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া বলা কঠিন। শিল্পীর কল্পনা ও কারু-ক্ষমতা দ্বারাই পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। হার্ম্মান পাউল একজন নিপুণ উচ্চ শ্রেণীর কাঠ-খোদাই শিল্পী, —ইনি কালোর পাশে সাদা জমির বৈষম্য পরিস্ফুট করিয়া তাঁহার খসড়া (Design) গড়িয়া তোলেন। কিন্তু বিখ্যাত ইংরেজ-শিল্পী গর্ডন ক্রেগ তাঁহার কাঠখোদাইয়ের আদর্শ বিবৃত করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"আমি সাদা জমি ও কালো-রেখা, দুটিকেই এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলি যে, সমগ্র ছবিখানি উগ্র ধূসর বর্ণে চিত্রিত মনে হয়।"

(২)

শিল্পীর কল্পনা-শক্তির উপর উপকরণ বস্তুর প্রভাব

প্রত্যেক শিল্পীর সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য তাঁহার অনুসৃত বিশেষ শিল্পকলার যথাযথ ধারা বজায় রাখিয়া চলা



'স্বর্গচ্যুতির পর'—ব্রুণো গোলড্‌স্মিট কর্ত্তৃক খোদিত

এই প্রাথমিক সূত্রটি ঠিক মত আয়ত্ত হইলে শিল্প-দীক্ষা-হীন লোকের অনেক অন্ধসংস্কার দূর হইত। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, কল্পনাকে অবাধে ছাড়িয়া দিলেই শিল্প হয় না, শিল্প-সংক্রান্ত কতকগুলি রীতিনীতি মানিয়া না চলিলে শিল্পের অঙ্গহানি হয়। সাধারণ লোকের কাছে সেই ছবিই সব-চেয়ে মূল্যবান্ যাহা দৃশ্যজগতের বস্তু বা বিষয়কে চোখে প্রত্যক্ষ দেখাইতে সক্ষম।

প্রত্যক্ষ বিশ্বে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিন দিকের



২নং চিত্র। 'হরিণ'—প্লাগেনহাউজেন কর্তৃক খোদিত

আয়তন প্রসার লইয়া প্রত্যেক বস্তু অবস্থিত; ছবির কাগজের সমতল ভূমির উপর যখন সেই বস্তুই চিত্রিত হয় তখন তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ব্যতীত তৃতীয় দিকটি (dimension) লুপ্ত হয়। এখানেই শিল্পীর প্রথম অসুবিধা, কিন্তু নিপুণ শিল্পী অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া পারিপ্রেক্ষিক (perspective) ও ছায়ালোক রচনা করিয়া দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রম দ্বারা এই তৃতীয় দিকের অভাবের বোধ দূর করেন। সিনেমা বা চলচ্চিত্রে এই কৌশল চরম সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যখন এই চলচ্চিত্রের সহিত রঙীন ফোটোগ্রাফী ও গ্রামোফোন যুক্ত হইবে তখন শিল্পকলায় যাঁহারা আসলের নিখুঁত নকল সন্ধান করেন তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, দৃশ্য জগতকে প্রত্যক্ষগোচর করাইবার জন্য চিত্র-শিল্পের মত প্রাচীন ও অসম্পূর্ণ পন্থার অনুসরণ করার প্রয়োজন নাই। চিত্রশিল্পের সমর্থনকারীদের পূর্ব্বের মত আবার বিশ্বাস করিতে হইবে যে, চিত্র-শিল্প দৃশ্য-জগতের কোনো বস্তু বা বিষয়ের যথার্থ

প্রতিকৃতি নহে। রঙীন চিত্র অথবা খোদাই, রেখাচিত্র ইত্যাদি যে-কোনো চিত্রশিল্পই হউক না কেন ইহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য রঙ রেখা ইত্যাদির সমাবেশে একটি সুসমঞ্জস রূপোন্মেষশালী সুদৃশ্য চিত্র গড়িয়া তোলা ;—বাস্তব জগতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ না থাকিতে পারে, চিত্রাঙ্কিত বস্তুর বাস্তব জগতে অস্তিত্ব না থাকাও অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ দর্পণে বা বাতায়নের ভিতর দিয়া আমরা বাস্তব জগতকে যেমন প্রত্যক্ষ করি ছবিতে সেরূপ করি না। সমতল জমির উপর রঙ ও রেখার আলঙ্কারিক সমাবেশে বা রূপোন্মেষিণী মূর্ত্তির অঙ্কনে চিত্র প্রস্তুত হয়।

শিল্পীর কল্পনায় বাস্তবের যে ছাপ বা ইম্প্রেশন ছবি তাহারই প্রকাশ মাত্র ;—চিত্রাঙ্কণের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রশিল্প বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে ; সকল দিকেই সাধারণ কোনো একটি নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। অঙ্কন-কালে যে আঙ্গিক বা টেকনিক্ অনুসরণ করা হয় ছবি তাহার অনুযায়ী হইবে। কোনো শিল্পী তৈলচিত্রের বিশেষত্বকে জলরঙা (water-colour) ছবিতে ফুটাইয়া তুলিতে ব্যস্ত নহেন, রেখাচিত্র ও বর্ণচিত্রের পার্থক্যও তিনি ভুলেন না। তেম্‌নি খোদাই-শিল্পের সাতটি বিভাগের পার্থক্য ভুলিলেও চলিবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাঠখোদাই শিল্পীর উপকরণ অধিক নহে। রঙ বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র সাদা-কালোর সমাবেশে তাঁহাকে আলো ও বর্ণের খেলা দেখাইতে হয়। সুতরাং তাঁহাকে এমন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় যাহাতে মূর্ত্তির সতেজ প্রকাশে রঙের অভাব প্রকাশ না পায়। এই কারণেই কাঠ-খোদাই ছাপের আকর্ষণী শক্তি অধিক, কারণ আমরা জানি যে, কেবলমাত্র বাহ্য মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি বস্তু নিরপেক্ষ হইয়া করিতে হয় এবং ইহার জন্য সাধনা আবশ্যক। রঙ সাধারণ মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে এবং রংএর প্রভাবে ছবি অনেক সময় যেন দেহ ধরিয়া উঠে, কিন্তু শিল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি রঙের এই সহজ আকর্ষণে প্রলুব্ধ হন না, তাই কাঠখোদাই ছাপ যখন তাঁহাকে আকৃষ্ট করে তখন তাহা বস্তু-নিরপেক্ষ বা abstract ভাবেই করিয়া থাকে ; সুতরাং এই আকর্ষণ প্রবলতর হয়। কাঠখোদাই শিল্পীর অন্য বিশেষ অসুবিধা এই যে, কাঠের উপর ছুরীর সাহায্যে তাহাকে কাজ করিতে হয়—কাগজের উপর পেন্সিল বা কাপড়ের উপর তুলির প্রয়োগের মত তাহা সহজ নহে। প্রথমতঃ কাঠ জিনিষটিই যথাসাধ্য বাধা দিয়া থাকে, তাছাড়া যন্ত্রগুলিও এমন নহে যাহাতে কাঠখোদাই-শিল্পী এচিং-শিল্পীর মত সহজ স্বাধীনতা পাইতে পারে। বস্তুত, কাঠখোদাই-শিল্প শিল্পের 'আঙ্গিক' বা টেকনিকের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, শিল্পীকে আপন কল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া খোদাই কার্য্য চালাইতে হয়। শ্রেষ্ঠ কাঠখোদাই-শিল্পীরা কাঠের উপর পেন্সিল দিয়া খসড়া না আঁকিয়াই একেবারে ছুরী চালাইয়া থাকেন। মিঃ গর্ডন ক্রেগের কথায়—"অনেকে শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, কাষ্ঠফলকের আয়তন ইত্যাদিই আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বিশেষ বিশেষ ছবি খোদাই করিতে সাহায্য করে। কাষ্ঠফলককে সাদা কাগজ কল্পনা করিয়াই যদি আমাকে কাজ করিতে হয় তাহা হইলেই আমার মাথা ঘুরিয়া যায়।" কাঠখোদাই কার্য্যে যে ভয়ঙ্কর মানসিক নিয়মানুবর্ত্তিতা (discipline) প্রয়োজন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুনম্বর ছবিতে যে কাঠ-খোদাইছাপের প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে বলি। রৌদ্রালোক ও ছায়ার যে অপূর্ব্ব সমাবেশে ছবিটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কাষ্ঠফলকের প্রকৃতি অনুযায়ী কল্পিত হইয়াছিল।

(৩)

কাঠখোদাইকার্য্যে শিল্পসৃষ্টি

খোদাই বা এনগ্রেভিং মাত্রই হয় অনুকরণ, নয় স্বতন্ত্র সৃষ্টি। অনুকরণ খোদাই বলিতে কোনো একটি অঙ্কিত চিত্রকে আদর্শ করিয়া খোদাইয়ের বিশেষ পদ্ধতি (সাতটির মধ্যে একটি) অনুসরণ করিয়া খোদিত চিত্র বুঝায়। তেমনি কোনো কিছুকে আদর্শ না করিয়াই শিল্পী মন হইতে যাহা গড়িয়া তোলে তাহাকেই সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। এই অর্থে আধুনিক অধিকাংশ কাঠ-খোদাই ছাপই শিল্পীর সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বে কাঠ-খোদাই শিল্প 'শিল্প সৃষ্টি' পর্য্যায়ভুক্ত

ছিল না। হস্তাঙ্কিত চিত্রের সস্তা অনুকরণ-স্বরূপ এগুলি বাজারে প্রচলিত ছিল। যাহারা অর্থাভাবে দামী ছবি কিনিতে অক্ষম ছিল অথচ কুমারী মেরী প্রভৃতির ছবি ঘরে রাখিতে যাহাদের সখ হইত তাহারাই তখন এইসকল কাঠ-খোদাই-শিল্পীর (জার্ম্মানীর) পৃষ্ঠপোষক ছিল। তাহাদের সকল কাজই সাদা জমির উপর কালো রেখার সমাবেশে প্রস্তুত; ইহাতে বুঝা যায় যে, পেন্সিল ড্রইংয়ের অনুকরণে এগুলি খোদিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম ডুয়্যের ও হোলবাইন এই দুই জন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী কাঠ-খোদাই করিতে আরম্ভ করেন। তবে ইঁহারা স্বহস্তে খোদাই করিতেন, কিম্বা আদর্শ চিত্র আঁকিয়া দিয়া অন্যের দ্বারা খোদাই করিয়া লইতেন তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। তাঁহাদের ছাপের আঙ্গিক বা টেকনিক লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেগুলি হুবহু রেখা-খোদাই ছাপের অনুরূপ। তবে ইঁহারা উভয়েই যে, তাঁহাদের নামে প্রচলিত কাঠখোদাই ছাপগুলিতে শিল্পসৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহাদের পর ইম্প্রেশনিষ্ট দলের কয়েকজন শিল্পী উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কাঠখোদাই-শিল্পের পুনরুদ্ধার করেন। জার্ম্মানীতে মুনক্ ও ফ্রান্সে গোগ্যাঁ প্রথমে এই শিল্পের যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারেন ইহা যে উচ্চশ্রেণীর সূক্ষ্মশিল্প-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ইঁহারা তাহাই প্রচার করিতে থাকেন। একখণ্ড কাঠফলকের উপর আপন সুবিধা ও কল্পনা অনুযায়ী কোনো সূক্ষ্মভাব ফুটাইয়া তুলিবার অধিকার যে শিল্পীর আছে তাঁহারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সেইদিন হইতে কাঠখোদাই-শিল্প যে যন্ত্রশিল্প বা অন্য ধরণের চিত্রের হীন অনুকরণ নহে তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। যথার্থ শিল্পীর ও সাধকের হাতে এই কাঠখোদাই-শিল্প কি চমৎকার হইয়া উঠিতে পারে তাহা তাঁহাদের হাতের কাজ দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। এখানে আমরা কয়েকটিমাত্র নমুনার প্রতিকৃতি দিলাম। এই নূতন শিল্পের আসন ইয়োরোপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে বাঙালী শিল্পীর দৃষ্টি যদি এই দিকে আকর্ষিত হয় তাহা হইলে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বাঙালী শিল্পীরা এই শিল্পকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন, একথা অবশ্য আজকাল বলা চলে না।

গিরিবালার জীবন-পঞ্জী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

১

গিরিবালাকে জানিতাম। গ্রামের নদীটির বাঁকের মুখে বেত-ঝোপের ছায়ার অন্ধকার আশ্রয় করিয়া ছুটির সময় যখন সন্ধ্যাকালে বোয়াল মাছের সন্ধানে ছিপ ফেলিয়া বসিতাম তখন সে ঘাটে প্রদীপ ভাসাইতে আসিত। এক-খানি গোল মুখ, টীকল নাক, তাহাতে একটি ছোট নোলক—নিতাই জেলের আট বছরের মেয়ের নাম গিরিবালা; প্রতি সন্ধ্যায় সে নদীর স্রোতে ভাগ্যের প্রদীপ ভাসাইয়া মাটির ছোট কলসীতে জল ভরিয়া মৃদুস্বরে 'বন্দে মাতা সুরধনী' গাহিতে গাহিতে ঘরে ফিরিয়া যায়;—গিরিবালার বাল্য জীবনের এই বৈচিত্র্যবিহীন ইতিহাসটুকুই আমার জানা ছিল।

ইহার পর যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। দশ বৎসর যখন বয়স তখন গিরিবালার বিবাহ হইল এবং সেই বৎসরেই পিতা নিতাই ও স্বামী সদানন্দ পদ্মায় মাছ ধরিতে গিয়া আর ফিরিল না। মায়ের সঙ্গে গিরিবালাও কাঁদিল। তাহার পর নিতাই মাঝির জাল শুকাইবার চালাখানিতে ঢেঁকি পাতিয়া মাতা ও পুত্রী পাড়ার লোকের ধান ভানিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

২

বৎসর চার পাঁচ পর একদিন রায়বাবুদের আঙ্গিনায় আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া গিরিবালার মাতা কাঁদিয়া জানাইল যে, আজ একমাস হইতে রাত্রিতে তাহার ঘুম নাই। সমস্ত রাত্রি তাহার বাড়ীর চারিপাশে লোকের পায়ের শব্দ শোনা যায়, ভয়ে তাহার গা ছম্‌ ছম্‌ করিতে থাকে। তিনপুরুষ আগে রায়বাবুরা ছিলেন গ্রামের জমিদার; জমিদারী এখন বাস্তুভিটার সাড়ে সাত বিঘা জমিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। দেউড়ী এখনও আছে কিন্তু দারোয়ান নাই। তথাপি এখনও বদন রায় মহাশয়কে অনেক অভিযোগ শুনিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও বিচার করিয়া জরিমানা ও নজর বাবদ কিছু প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ফজল মিঞা বাঁশচিটা ইউনিয়ানের প্রেসিডেণ্ট হওয়াতে প্রাপ্তির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই এখন বিচার না করিয়া রায়-বাবু শুধু পরামর্শ দিয়া থাকেন। দারোগাকে সকল কথা জানাইবার উপদেশ দিয়া তিনি বুড়ী মানদাকে বিদায় করিয়া দিলেন, দরকার হইলে তাহার পক্ষে হইয়া দারোগাকে দুই কথা বলিবেন, এ ভরসা দিতেও ত্রুটি করিলেন না।

এইবার মানদা বিপদে পড়িয়া গেল। দারোগা হাকিম। তাঁহার সহিত কি করিয়া কথা বলা যায়? অনেক ভাবিয়া একদিন সে এক কাঠা সরু ধানের চিঁড়া লইয়া গ্রামের চৌকীদার নছর সেখের শরণ লইল। উপঢৌকন পাইয়া খুসী হইয়া নছর সেখ দিন কয়েক রোঁদ হইতে ফিরিবার পথে নিতাই মাঝির বাড়ীর নিকটে হাঁক দিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাতেও গিরিবালার মাতার অস্বস্তির কারণ ঘুচিল না। অবশেষে বিনা পারিশ্রমিকে নছর সেখের ধান ভানিয়া ও গাছের মর্ত্তমান কলা উপহার দিয়া বুড়ী একদিন তাহাকে দারোগার নিকট লইয়া যাইতে নছর সেখকে রাজী করিল।

সুযোগও ঘটিয়া গেল। পাশের গ্রামেই দারোগা সাহেব তদন্তে আসিয়াছিলেন। নছর সেখকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কালী গাইয়ের এক ঘটি দুধ হাতে বুড়ী গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সম্মুখে আসামী ও ফরিয়াদী পক্ষের অনেকগুলি সাক্ষী যুক্তকরে দণ্ডায়মান; তাহাদের সম্মুখে সদ্যগঠিত ছোট বংশমঞ্চে দারোগা সাহেব বসিয়া। মঞ্চের সম্মুখ দিক্‌কার একটা খুঁটিতে বাঁধা একজোড়া মুরগী, পিছনের খুঁটিতে বিরাট্‌ কৃষ্ণকায় এক খাসী বাঁধা। গম্ভীর মুখে দারোগা সাহেব লিখিতেছিলেন। মুরগী ও খাসীর সহিত এক ঘটি দুধের তুলনা করিয়া বুড়ী মনে মনে শঙ্কিত হইল; পরক্ষণেই নছর সেখের ইঙ্গিত মাত্রে দারোগা সাহেবের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপাতের সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ী আপনার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিল।

দারোগা সাহেব অর্দ্ধেক শুনিয়াই কহিলেন, "মেয়ের বয়স কত?"

"এই ষোল বছর, হুজুর! সোমত্ত—"

"এখন যাও। সরেজমিন তদন্ত কর্‌ব। হ্যাঁ, তারপর আসামীর দুই নম্বর সাক্ষী বাঁটু দপ্তরী।"

বাঁটু দপ্তরী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। নছর বুড়ীকে লইয়া গিয়া কানে কানে কহিল, "সাঁঝে বাড়ী থেকো জেলের বেটী, দারোগা সাহেব যাবেন।"

বুড়ী অকূলে কূল পাইয়া মা মনসার নামে পাঁচ পয়সার বাতাসা মানৎ করিয়া ঘরে ফিরিল। মায়ের মুখে সমস্ত শুনিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে গিরিবালা খানিক কাঁদিল। তাহার পর বেড়ায় টাঙ্গানো সত্যনারায়ণের ছবিখানির সম্মুখে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া কহিল, "লজ্জা-নিবারণ হরি! লজ্জা নিবারণ কর, ঠাকুর!"

তখন সন্ধ্যা। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া গললগ্ন বস্ত্রাঞ্চলে বার বার মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া গিরিবালা সম্ভবতঃ কোনো প্রার্থনা জানাইতেছিল, এমন সময় দারোগা সাহেব আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। জুতার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দারোগাকে দেখিয়া গিরিবালা মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরের পিছনে অদৃশ্য হইয়া গেল। মানদা রান্নাঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছাইয়া দিল। দারোগা সাহেব আসন লইয়া সমস্ত শুনিয়া গিরিবালাকে ডাকিলেন। পরণের ছোট কাপড়খানির চারিদিক সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে সঙ্কুচিতা গিরিবালা আসিয়া দাঁড়াইল। দুই চক্ষুর সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকেও দারোগা সাহেব ভালো করিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া লইলেন। মেয়েটি দেখিতে নিতান্ত মন্দ

নহে। তখন তাহার মনের গতিটা কোন্ দিকে বুঝিবার জন্য দুই একটি প্রশ্ন করিতেই লজ্জায় মরিয়া গিরি একেবারে ঘরের অন্ধকার বেড়ায় গিয়া মুখ লুকাইল। মানদা ক্রমাগত ঘরের মধ্য হইতে ঠেলিতে লাগিল, কিন্তু কোনোক্রমেই কন্যাকে বাহিরে পাঠাইতে পারিল না।

অগত্যা কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দারোগা সাহেব উঠিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সন্ধান লইবেন—মৃদু হাসিয়া এই প্রতিশ্রুতিটা দিয়া গেলেন। দারোগা চলিয়া গেলে বাহির হইতে নছর চৌকীদার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া কহিল, "বেঁচে গেলে জেলে-বৌ, হাকিম তোমার সহায় হ'য়েছেন।"

বুড়ী নিশ্চিন্ত হইয়া দুই কর কপালে ঠেকাইয়া দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল, কিন্তু গিরি সেদিন আর শয্যা ছাড়িয়া উঠিল না।

৩

ইহার পর দিনকয়েক নানা স্থানে তদন্তে যাইবার পথে দারোগা সাহেব প্রতিশ্রুতি মত বুড়ী ও তাহার কন্যার সন্ধান লইতে আসিলেন। কিন্তু সন্ধানের মুখ্য বস্তুটি ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাইলেই ঘরের পিছনের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত তাহা মানদাও আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিত না। কন্যার এই অকৃতজ্ঞতায় বুড়ী লজ্জিত হইত ও কন্যার পক্ষ হইতে হাকিমের কাছে ক্ষমা চাহিয়া তাঁহার জন্য প্রতিবারই ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত। বলা বাহুল্য, এই একঘেয়ে নীরস ক্ষমাভিক্ষা দারোগা সাহেবের বেশী দিন ভালো লাগিল না এবং বাঁশ-চিটার হাটের পথে তাঁহার গতিবিধি ক্রমে ক্রমে বিরল হইয়া আসিল।

ইহাতে অবশ্য গিরিবালার অবস্থার কোনো ইতর-বিশেষ হইল না; জীবন-ধারা যেমন বহিতেছিল তেমনই বহিয়া যাইতে থাকিল। সমস্ত দিন নানা কাজের মধ্যে আপনার অবস্থার কথাটি বিশেষ মনে থাকিত না, কিন্তু সূর্য্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গেই জগতের দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিত এবং পৃথিবীটাকে মনে হইত একটি জীবন্ত প্রেতপুরী। সহসা একদিন গিরিবালার সমস্ত দুর্ভাবনার সমাপ্তি হইল।

সেদিন শ্রাবণের বর্ষণ প্রভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ষার রাত্রি। প্রথম প্রহরেই পল্লীর বুকে নিশীথের নিস্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গিরিবালার মাতার কুটীর-প্রাঙ্গণ হইতে সহসা এক আর্ত্ত চীৎকারধ্বনি উঠিল। শ্রাবণের বর্ষণ-রব ছাপাইয়া সে আর্ত্তনাদ সুখ-সুপ্ত ভদ্র পল্লীকে পর্য্যন্ত ধ্বনিত করিয়া তুলিল এবং পল্লীর নিদ্রার জড়তা টুটিবার পূর্ব্বেই ভরা নদীর তরঙ্গ-কল্লোলে ডুবিয়া গেল।

গ্রামে যে একেবারে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল না তাহা নহে। ও পারের ঝাউ-বনের অন্ধকারের অন্তরালে যখন গিরিবালাকে বহিয়া পাল্কী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে তখন পথের মোড়ে নছর চৌকীদারের ভীম গর্জ্জন শোনা গেল। এদিকে গণেশ মাঝির মুখে সংবাদ পাইয়া হারু ঘোষাল আসিয়া রায়-বাবুকে ডাকিয়া তুলিয়া কহিলেন, "যা ভেবেছিলাম, রায়-বাবু, তাই হ'ল, নিতাই মাঝির মেয়েকে নিয়ে গেল!" রায়-বাবু চক্ষু মুছিয়া রাম নাম জপিতে জপিতে বাহিরে আসিলেন। ক্রমে ক্রমে রায়বাড়ীর বৈঠকখানায় গ্রামের ভদ্রসন্তানদের একটি ছোট সভা বসিয়া গেল। মাখন ভৌমিকের বয়স অল্প। শখের থিয়েটারে ক্রমাগত লক্ষ্মণের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে বিপন্না স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার এক-রকম মমত্ব-বোধ জন্মিয়াছিল, সভাস্থ একজন থানায় সংবাদ দিবার প্রস্তাব করিতেই সে কহিল, "থানায় খবর দেওয়া কিছু নয়। আমি যাচ্ছি আপনারা আসুন!" হারু ঘোষাল ধমক দিয়া কহিলেন, "ওই কাজটি কোরো না, বাবাজী! থিয়েটার করতে গিয়ে চিস্তে চাঁড়ালের পা' ধ'রে 'দাদা' 'দাদা' ব'লে চেঁচাও, সেটা বরং সওয়া যায়, কিন্তু ছোট লোকের হাতে মার খেয়ে আর আমাদের মুখ হাসিও না।" ছোট লোকের হাতে মার খাওয়ার আশঙ্কায় অকস্মাৎ মাখন ভৌমিকের উৎসাহ দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল এবং অতঃপর থানায় সংবাদ দেওয়াই যে, সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তি সে-বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ রহিল না।

গিরিবালার চরিত্র সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা সর্ব্বপ্রকার আলোচনা হইয়া যখন ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল তখন একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, গিরিবালাকে বারখালির আমীর শেখের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। গ্রাম আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং যদিও হাট-বার তথাপি বাঁশচিটা ইউনিয়ানের প্রেসিডেণ্ট চামড়ার দালাল ফজল মিঞার

বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় কৌতূহলী দর্শকের ভিড় জমিয়া গেল।

ক্লান্তবর্ষণ শ্রাবণ-দিবসের রক্তসন্ধ্যা সমস্ত আকাশকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গী চৌকীদার দুজনের কাঁধে হাত রাখিয়া টলিতে টলিতে গিরিবালা আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যর্থ অশ্রুপাতের চিহ্ন তখনও তাহার কপোলে শুখায় নাই, জাগরণরক্তিম নিষ্প্রভ চক্ষুদুটি তখনও সন্ধ্যার রক্তদীপ্তিতে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। চারিপাশের চিরপরিচিত মূর্ত্তিগুলি গিরিবালা একবার দেখিয়া লইল, কিন্তু সেকালের মত আজ আর মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল না। ক্ষণিকের জন্য গ্রামের লোকের মনে হইল এ যেন সে গিরিবালা নহে। এইসময় জনতার পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া উন্মাদের মত কন্যার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মানদা চীৎকার করিয়া উঠিল, "তোর এ দশা কে করেছে, গিরি!" উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিমেষ-কালের জন্য মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া গিরিবালা অঙ্গুলি তুলিয়া আকাশের দিকে দেখাইয়া দিল, কথা কহিল না।

ফজল মিঞার হুকুমে আসামী আমীর শেখ হাজির হইল। ফজল মিঞাকে পায়ের নাগরা খুলিতে দেখিয়াই আমীর শেখ দুই হাত জুড়িয়া কহিয়া উঠিল, "হুজুর ও আমার 'নেকার' বিবি।"

সহসা এই কথা শুনিয়া গিরিবালা শিহরিয়া উঠিল এবং সমস্ত দেহভার ফজল মিঞার পদতলে নিক্ষেপ করিয়া অস্ফুটস্বরে কি কহিল তাহা বোঝা গেল না। তাহার মাথায় হাত দিয়া সংক্ষিপ্ত একটি আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিয়া ফজল মিঞা আমীর শেখকে থানায় লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। থানা বহুদূর, কাজেই সে-রাত্রি ফজল মিঞার জিম্মায় গিরিবালাকে রাখিয়া মেম্বারেরা হাট করিতে চলিয়া গেলেন।

গভীর রাত্রে ফজল মিঞার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান্ কাদের শুনিতে পাইল কে যেন তাহার মনিবের বাহিরের কোঠাঘরে মিনতির স্বরে কহিতেছে, "আপনার পায়ে পড়ি হুজুর, আপনি আমার ধর্ম্মবাপ"। তাহার পরই মেঘ-গর্জ্জনের সাথে সাথে শ্রাবণ-রাত্রির ধারা নামিয়া আসিল, আর-কিছু শোনা গেল না।

৪

ইহার পর থানা। অভিযোগ দণ্ডবিধি আইনের অনেকগুলি ধারা ঘেঁসিয়া গিয়াছে; মামলা সঙ্গীন। আসামীর একরার লইতে হইবে। কাজেই গিরিবালাকেও একরাত্রি থানায় অপেক্ষা করিতে হইল। পরদিন প্রভাতে যখন চৌকীদারের সাথে সে গরুর গাড়ীতে গিয়া উঠিল তখন থানার বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট দারোগা সাহেব এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান শৃঙ্খলিত আমীর শেখ এই উভয়ের মধ্যে গিরিবালা কোনও প্রভেদ দেখিতে পাইল না।

ইহার পর সাহেব ডাক্তার লেডী ডাক্তার পুলিশের বড় কর্ত্তা উকীল মোক্তার কয়েকদিন ধরিয়া তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বপ্নাবিষ্টের মত গিরিবালা তাহার উত্তর দিয়া গেল। কি বলিল, তাহাও মনে রহিল না। কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আসামী আমীর শেখ ও তাহার ছয়টি সহচরকে দেখাইয়া আপনার জীবনের কলঙ্কের প্রত্যেকটি কাহিনী সে অতি স্পষ্ট ভাষায় কহিয়া গেল, বলিতে কোথাও বাধিল না। গ্রাম হইতে যে দুই একজন ভদ্র-সন্তান মানদাকে সঙ্গে লইয়া মামলা উপলক্ষে সহরে আসিয়াছিলেন তাঁহারা নিতাই মাঝির কন্যার এই নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

বিচার সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আদালতের বটতলায় মানদার গরুর গাড়ী গ্রামে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল। গিরিবালা ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে চলন্ত গাড়ীর চাকা ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "আমাকে ফেলে যাস্‌নি, মা! নিয়ে চল্!"

ইহার উত্তরে গাড়ীর মধ্যে একজন হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহাকে ধমক্ দিয়া হারু ঘোষাল গাড়ীর পর্দ্দা তুলিয়া দাঁত খিঁচাইয়া কহিলেন, "তা বটেইতো! বুড়ী তোমাকে নিয়ে এখন পরকাল খোয়াক্!"

গরুর গাড়ীর চাকা হইতে গিরিবালার শিথিল মুষ্টি খুলিয়া পড়িল, গাড়ী চলিয়া গেল।

লোকের মুখে এই পর্য্যন্তই শুনিয়াছিলাম, ইহার পর বিচিত্র পুঁথির বিবিধ তথ্যের নীচে পুরাতন কাহিনীটা একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

আজ সহসা গিরিবালার কথা মনে হইবার হেতু আছে। কাল বদলী হইয়া আসিয়া প্রাতে প্রাথমিক পরিদর্শনের কাজে বাহির হইয়াছিলাম, এমন সময় কে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ছেড়ে দাও গো, ছেড়ে দাও! আমার দেশের মানুষ যাচ্ছে, ছেড়ে দাও!" মুখ ফিরাইয়া দেখি একটি রমণী পাগ্‌লা গারদের মোটা লোহার শিক্ দুই হাতে ধরিয়া টানিতেছে। নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম, চিনিতে বিলম্ব হইল না। মাটিতে জানু পাতিয়া বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো আমার দেশের মানুষ, এমন কেন হ'ল?"

আমার ডাক্তারী বিদ্যায় আর এ প্রশ্নের উত্তর জুটিল না, নীরবে ফিরিয়া গেলাম।

যবদ্বীপের পথে

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২। জাহাজে—মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর—১৪-২০শে জুলাই

অঁবোয়াস (Amboise) জাহাজ
১০ই জুলাই ১৯২৭

জাহাজখানা বেশ বড়ো, পনেরো হাজার টনের জাহাজ। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী সবে মিলে প্রায় পাঁচ শ' যাত্রী এতে যেতে পারে; এ ছাড়া দুটি খোলা ডেক আছে। সেই ডেক দুটি জল আর রোদ্দুর আট্‌কাবার জন্যে ক্যাম্বিসের শামিয়ানা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, তাতে আরও শতখানেক যাত্রী যায়; এই খোলা ডেক হ'ল চতুর্থ শ্রেণী। কম বেশী শ' তিনচার, আনামী আর ফরাসী সেপাই এই জাহাজে যাচ্ছে, জাহাজটা একেবারে ভর্তি। হরেক রকম জা'তের হরেক রকম মানুষের সমাবেশ। ফরাসী তো আছেই; তা ছাড়া ভারতবাসী—পণ্ডিচেরীর তামিল, আর অন্য তামিল হিন্দু, তামিল খ্রীষ্টান, তামিল মুসলমান; মোপলা মুসলমান; মালাবার থেকে, মালয়ালী ভাষী দুচার জন তেলুগু; আমরা ক'জন বাঙালী হিন্দু; আনামী—এদের আবার দুই ভাগ—এক, উত্তুরে টন্‌কিন-এর লোক, এরা সব দাঁত কালো রঙে রঙিয়ে থাকে; আর দুই, দক্ষিণে, কোচিন-চীনের লোক, এরা দাঁত স্বাভাবিক সাদাই রাখে; জন ষাট-সত্তর আরব, কেউ আল্‌-জয়াইর বা (Algeria) আলজিরিয়ার লোক, কেউ-বা (Aden) আদন অঞ্চলের লোক। এরা জাহাজের কলঘরে কাজ করে, ফরাসী ফিরিঙ্গী তরবেতর, ফরসা রং, কালো রং, যাদের Creole ক্রেওল বলে, মাদাগাস্কার থেকে, মরীচ দ্বীপ থেকে, অন্য অন্য ফরাসী উপনিবেশ থেকে; জনাকতক কাফরী, এরা রসুইয়ে আর পরিবেষক; আর দু পাঁচ জন চীনেম্যান। খাঁটি ইউরোপীয়-দের মধ্যে বোধ হয় ফরাসী ছাড়া আর অন্য জা'ত নেই।

মার্সেয়ি (Marseilles) থেকে এই জাহাজ ছেড়েছে জুন মাসের বাইশে তারিখে; এবং গন্তব্য স্থান হ'চ্ছে টন্‌কিনের হাইফং বন্দর, সেখানে পৌঁছুবে সেই জুলাইয়ের উনত্রিশে-ত্রিশে নাগাদ; মস্ত লম্বা পাড়ি। এতগুলি জা'তের লোক, তাদের নিজ-নিজ ভাষা, নিজ-নিজ মনোভাব, নিজ-নিজ চিন্তা; কিন্তু বেশ মিলে মিশে সবাই চ'লেছে। ভদ্রভাবে থাক্‌বার ইচ্ছে থাক্‌লে, অপরের সঙ্গে বনিয়ে চল্‌বার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিজের জা'তের prestige নামক গর্ব্ব বা ধর্ম্মান্ধতা যদি এসে খর্ব্ব না ক'রে দেয়, তা হ'লে ভাষার অভাবেও মানুষের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্য আট্‌কায় না। এই জাহাজে তাই দেখ্‌ছি। ভারতীয় যাত্রীদের রাঁধ্‌বার জন্য চার জন রাঁধুনী আছে, তার দু'জন হচ্ছে মোপলা মুসলমান, একজন তামিল মুসলমান, একজন তেলুগু হিন্দু; এরা সব মাহে, কারিকালের লোক। (এইসব টুকিটাকি খবর পেলুম তেলুগু হিন্দু বাবুর্চিটীর কাছ থেকে, সে হিন্দী বল্‌তে পারে, তার নাম লচমীনারায়ণ নায়ুড়ু)। এখানে হিন্দু-

মুসলমানের বিরোধ নেই, তামিল মুসলমানের সঙ্গে এক চেটাইয়ের উপর শুয়ে তামিল হিন্দু যাচ্ছে, সুর ক'রে ক'রে তার প্রাচীন তামিল শৈব সাধকদের পদ আর তাঁদের জীবন-চরিত প'ড়্ছে।

মুসলমান যাত্রীদের জন্যে একটি ভেড়া জবাই ক'রে তার ছাল ছাড়াচ্ছে এক মোপলা বাবুর্চী, খোলা ডেকের এক কোণে, এক পাল ফরাসী আর আনামী সেপাই আশে-পাশে দাঁড়িয়ে লোলুপ-দৃষ্টিতে এই চর্ম্মোৎপাটন ব্যাপার দেখ্ছে। আমাদের লচমীনারায়ণ মস্ত বড়ো মাদ্রাজী শিল-নোড়া দিয়ে লঙ্কা হলুদ আদা জিরে মরিচ বেঁটে তাল ক'রে ক'রে রাখ্ছে, আমি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে বেশ দোস্তি ক'রে হিন্দুস্থানীতে আলাপ জমাচ্ছি। ফরাসীদেরও সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা ক'চ্ছি। তামিল মুসলমান বাবুর্চী একজন একরাশ আলু নিয়ে ছুরী দিয়ে কুট্ছে, আর-একজন পাশে পেঁয়াজ-রসুনের কাঁড়ি নিয়ে বাছ্ছে। ইঙ্গিতের ভাষায় দুজন আনামী আর একজন ফরাসী সেপাই তার কাছ থেকে একটা ক'রে রশুন চেয়ে নিয়ে হাতে ক'রে খোসা ছাড়িয়ে কাঁচা খেতে সুরু ক'রে দিলে। এইসমস্ত নানা জাতের লোক দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সদ্ভাব রেখে যে চ'লেছে এটা দেখে আমাদের দেশের স্বার্থান্ধ লোকেদের প্ররোচনায় মুসলমানে হিন্দুতে যে প্রায় নরখাদক জাতের মতই নরক সৃষ্টি ক'রছে সে-কথা স্মরণ ক'রে নিজেদের উপরে আর মনোভাব বিশেষের উপরে বিশেষ ক'রে ধিক্কার দিতে হয়।

এতগুলি মানুষের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কতকগুলি প্রতিষ্ঠাপন্ন ভাষাকে লোকে সহজেই মধ্যস্থ ব'লে মেনে নিয়েছে। ফরাসীর জাহাজ,—ফরাসী ভাষা তো আছেই। ভাগ্যিস্ পারিসে আট ন' মাস ছাত্রাবস্থায় কাটিয়ে আস্বার সুযোগ হ'য়েছিল আমার, তাই ফরাসীতে কাজ-চালানো গোছ কথাবার্ত্তা ক'য়ে বাঁচা যাচ্ছে। আনামী হাবিলদার শ্রেণীর ওদেদাররাও কিছু কিছু ফরাসী বলে; আর পণ্ডিচেরীর তামিল দুচার জনের সঙ্গে বেশীর ভাগ ফরাসীতেই কথা হ'য়েছে। ইংরেজী-জানিয়ে খুব কমই আছে—কিন্তু তবুও দেখ্ছি ইংরেজীর মধ্যস্থতা ফরাসীকেও স্বীকার ক'র্তে হ'য়েছে—ফরাসী সেপাইদের মধ্যে দুচার জন ইংরেজী শেখার বই নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'র্ছে দেখলুম। জাহাজের খানসামা খিদ্মৎগারেরা দুচার বচন ইংরেজী জানে, ভালো ইংরেজী জানা একটি ফরাসী সেনানীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে মিল ঘটিয়ে দেবার জন্য এখন ইংরেজীই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মধ্যস্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একথা মুখে স্বীকার ক'র্তে ফরাসীদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগ্লেও, কার্য্যতঃ ইংরেজী শেখবার চেষ্টার দ্বারা এই অবস্থাকে এঁরা স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। বহুপূর্ব্বে একখানা ফরাসী বইয়ে একটি কথা বেশ গর্ব্বের সঙ্গে উদ্ধৃত দেখেছিলুম—লেখক ফরাসী, তিনি ব'ল্ছেন, কে এক বিখ্যাত বৈদেশিক অ-ফরাসী ফ্রান্সদেশের প্রশংসা ক'রে ব'লেছেন Tout homme a deux patries la sinne, et puis la france—সব মানুষের দুটি ক'রে স্বদেশ আছে; তার নিজের মাতৃভূমি, আর তারপরে ফ্রান্স। একথা এখন কতদূর সত্য জানি না। কিন্তু এমন দিন আস্ছে মনে হয়, আর আন্তর্জাতিক মেলামেশার সুবিধার পথে সে-দিনকে আমি সানন্দে অভিনন্দন ক'র্বো, যখন পৃথিবীর তাবৎ সভ্য লোকের সম্বন্ধে একথা বলা চ'ল্বে, যে সকলের দুটো ক'রে ভাষা; এক, তার নিজস্ব মাতৃভাষা আর দ্বিতীয়, ইংরেজী। অবশ্য এর মানে আমি এই বুঝিনা যে, এই দ্বিতীয় ভাষাটি আর সমস্ত প্রাচীন আর অর্ব্বাচীন সভ্যতার বাহন বড়ো বড়ো ভাষাগুলিকে মেরে ফেল্বে, তাদের চর্চ্চাকে বন্ধ ক'রে দেবে। হিন্দুস্থানীয়ের ব্যবহার ভারতবাসীদের মধ্যেই নিবদ্ধ—তামিল আর অন্য দক্ষিণী সবাই এ ভাষা জানে না, দু' চারজন মাত্র "তোরা তোরা ইস্তস্তানি শান্‌ত।" এই ভাষা উত্তর ভারতের লোকেদের মধ্যে চলে, দক্ষিণ ভারতে প্রায় চলে না, আর ভারতের বাইরে একেবারেই অচল।

জাহাজে ফিরে আসা যাক্। প্রথমেই জাহাজে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তারা হ'চ্ছে যাদের কাছ থেকে সেবা পাওয়া যায়। জাহাজ ছাড়্বার খানিক পরে জিনিষপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য ভিতরে ক্যাবিনে নামা গেল। বাক্স-টাক্স নাড়া-নাড়ি ক'র্ছি, এমন সময়ে একটি রং ফর্সা ফরাসী ফিরিঙ্গি Creole (ক্রেওল) জাতীয় ছেলে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে এক গাল

হেসে স্বাগত ক'রে ফরাসীতে ব'ল্‌লে—"নমস্কার, আপনারা তো তিনজন এই দুই ক্যাবিনে থাক্‌বেন? আমি হ'চ্ছি আপনাদের ক্যাবিনের চাকর আর খানসামা। যখনি কিছু দরকার হবে ক্যাবিন ঘরের কোণের বিজলীর ঘণ্টার বোতাম টিপ্‌বেন, আওয়াজ পেলেই আমি হাজির হবো।" আমি ব'ল্‌লুম, "বেশ, বেশ; তোমার নাম কি? আর তোমার বাড়ীই বা কোথায়?" তার বাড়ীর খোঁজ বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কেউ নেয়নি; সে এই জিজ্ঞাসাতে তার প্রতি দরদের আভাস পেয়ে বেশ খুসিই হ'ল। বল্‌লে, তার নাম (Marcel) মার্সেল, বাড়ী মাদাগাস্কারে। আলাদীনের প্রদীপ ঘষ্‌লেই দৈত্যভৃত্যের আবির্ভাব হ'ত অন্যথা নয়; আমাদের মার্সেলেরও সেই অবস্থা; ঘণ্টা টিপে না ডাক্‌লে সে আসে না, এবং সময়ে সময়ে সে না এসে অন্য কেউ আসে। কিন্তু তা ব'লে কাজ আটকায় না।

মার্সেলের বদলে অন্য যে Slave of the bell (ঘণ্টার দাসটি, কবি বল্‌ছেন "ঘণ্টাকর্ণ"—যে ঘণ্টাকে আকর্ণ করে) ক বার দর্শন দিয়েছেন সেটি একটি দাস নয়, দাসী। প্রথম দিনেই মার্সেলকে স্মরণ ক'রে ঘণ্টার বোতাম টেপা গেল—তার পরেই ক্যাবিনের দরজায় টোকামারা শব্দ শুন্‌লাম। (Entrey) "আঁত্রে" অর্থাৎ "ভিতরে এসো" বল্‌তেই বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে একেবারে আমাদের একটি আহ্লাদী পুঁতুলের মুখ ঢুক্‌ল। মুখখানির সঙ্গে আহ্লাদী পুতুলের মুখের যে অবিকল নিকটতম সাদৃশ্য আছে সেটা ধ'রে ফেলেছিল সুরেনবাবুর মতন সুপটু পটুয়ার রসজ্ঞ চোখ।* একটি ক্রোঢ় খুব মোটাসোটা ঠান্‌দিদিগোছ চেহারার স্ত্রীলোক, সাদা পোষাক পরা, চোখে উজ্জ্বল স্নেহ-মাখা দৃষ্টি, মুখখানা ভালমানুষীতে ভরা, ফরাসীতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে আমাদের কি চাই—আর নিজের পরিচয় দিলে যে, সে জাহাজের ঝী, ডাক্‌লে পর মার্সেল অন্য কাজে থাক্‌লে সেই আস্‌বে, তার নাম (Louise) লুইজ। এই ঝীটি একটি খাঁটি ফরাসী মানুষ—পারিসে এর জাতের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল,—পরের বাছাকে আরতি করবার জন্যেই যেন এদের সৃষ্টি। আমাদের পারিসের বাড়ীর কর্ত্রীটি চেহারায় ভাবেভঙ্গীতে বোধ হয় এরই বোন্ ছিল—সে আমাদের কী যত্নই না ক'র্‌ত। এখানে জাহাজে অবশ্য তার যত্ন-আরতি করবার সুযোগ নেই, কিন্তু একে দেখ্‌লে বোধ হয় যে, এ ছোট ছোট নাতিপুতিদের আদর-দিয়ে তাদের মাথা-বিগ্‌ড়ে-দেওয়া একটি আসল দিদিমা। ইনি আবার হালফ্যাশানে ইউরোপীয় মেয়েদের মতন ক'রে চুল ছেঁটেছেন, তাতে মুখ-খানা এর কৌতুকময় হাসির সঙ্গে মিলে অদ্ভুত দেখায়। বড্ড মোটা ব'লে যখন হাসে তখন গুরখা বা চীনের মুখের মত চোখ দুটির জায়গায় খালি দুটি সরল রেখা মাত্র দেখা যায়। জাহাজে প্রথম শ্রেণীর দু-তিনটি ছোট ছোট ছেলে যাচ্ছে। লুইজকে দেখি বেশীরভাগ সময় তাদের নিয়েই ব্যস্ত—তাদের খাওয়ানোর ভার এর উপর। যখন দেখা যায় দুরন্ত ছেলেদের তাদের মায়েদের কাছ থেকে হাত ধ'রে এ পরম-স্নেহের সঙ্গে খাওয়ার ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন লুইজ যে একজন পয়লা নম্বরের দিদিমা সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কবিকে দেখে এর ভারি ভক্তি হ'য়েছে—বলে, "কি চমৎকার চেহারা, ঠিক যেন হিব্রু ঋষি মুসা। কি মহত্ত্বাবব্যঞ্জক কপাল, চোখ, মুখ!" আহ্লাদীর সঙ্গে দিনে ৪।৫ বার ক'রে দেখা হয়। প্রথম দেখা হ'লেই একগাল হেসে (bon jour monsieur) "বঁ ঝুর, মসিও" বলা তো আছেই। জবাবে আমিও বলি, "বঁ ঝুর, লুইজ"—তার পর চোখাচোখি হ'লেই ঘাড় নেড়ে হাসা আছে।

জাহাজের অন্য খানসামারা সকলেই কবির একটুখানি কাজ ক'র্‌তে পেলে যেন কৃতার্থ হয় ব'লে মনে হয়। সবাই যে তাঁর ভক্ত পাঠক তা নয়, তবে কবিকে দেখেই এদের মনে যে একটু বিশেষ শ্রদ্ধা হ'য়েছে তা নিশ্চয়। কবির খাস খিদমৎগারটিকে দেখেছি, ঘণ্টা টিপ্‌তেই সিঁড়ি বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসেছে। এই খিদমৎ-গারটির সঙ্গে আমি দু'দণ্ড আলাপ ক'রে নিয়েছিলুম। এটি বেশ লম্বা চওড়া সুশ্রী যুবক একটি; কবির ঘরের কাজের জন্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত এই কথা ব'ল্‌লে, আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে যে কবি জারমান জানেন কি না; ফরাসী তিনি কইতে পারেন না সেটা শুনেছিল। ফরাসী ছাড়া জার্‌মান ভাষা এ নিজে ব'ল্‌তে পারে, ব'ার দুই একথা

* গত সংখ্যার প্রবাসীতে 'যবদ্বীপের পথে' প্রবন্ধে এই ছবিটি ভ্রমক্রমে ছাপা হয়েছে।

ব'ল্‌তে বোঝা গেল এ জাত-ফরাসী নয়, আর জার্‌মান ব'ল্‌তে পার্‌লে যেন খুসি হয় মনে হ'ল। জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেই আমার অনুমান যে ঠিক তা প্রমাণ হ'ল—এর বাড়ী Alsace আলসাস্‌ প্রদেশে, নববিজিত জার্‌মানভাষী অংশে ম্যুল্‌-হাউজ্‌ন্‌ (Mulehousen)এ। আমার ভাঙা ভাঙা জার্‌মানকে মাঝে মাঝে ফরাসীর জোড়াতাড়া দিয়ে খানিক এর সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। তার জার্‌মান জাতীয়ত্ব সম্বন্ধে বেশ সচেতন আর সাভিমান ব'লে মনে হ'ল, আর ফরাসীরা যে এই জার্‌মান ভাষার—তার মাতৃভাষার—ইস্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ ক'রে দিয়েছে, সে-বিষয়ে এর যে প্রচ্ছন্ন একটু দরদও আছে, সে-কথা স্পষ্ট ক'রে না বল্‌লেও ধরা গেল। এই যুবক যে লেখাপড়া ভালো জানে তা নয়; তবে কবির নাম শুনেছে। জার্‌মান ভাষার বইও দুচার খানা প'ড়েছে। জার্‌মান যার মাতৃভাষা তাকে তা জোর ক'রে ভুলিয়ে ফরাসী বানাতে হবে, এই যে ফরাসী সরকারের কার্য্যনীতি আলসাসে অনুসৃত হ'চ্ছে, এর অন্তরালে জার্‌মান-ভাষী লোকেদের যে চাপা একটা আপত্তি এবং রাগ আছে, সেটা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে উঠে আবার যুদ্ধের দাবাগ্নিরূপে হয় তো কোনও দিন দেখা দেবে। এইরকম বর্ব্বরতা—একটা জাতের ভাষা আর সভ্যতাকে আর-একটা ভাষার আর সভ্যতার চাপে নিষ্পেষিত ক'রে তাকে ধ্বংস ক'রে দেবার চেষ্টা—এটা অনেক বার অনেক জাতের মধ্যে ঘটেছে; ইংরেজ এ চেষ্টা করেছে আয়ার্লণ্ডে, রুষ করেছে পোলাণ্ডে, জাপান এখন নিষ্ঠুরভাবে ক'র্‌ছে কোরিয়াতে। ভারতের বাইরে প্রায় সব জাত ক'রেছে—ক'র্‌ছে।

জাহাজের অন্য চাকর-বাকরদের মধ্যে আনামী রাঁধুনী আছে, তাদের উপরে ফরাসী হেড-রাঁধুনি (chef) শেফ। আনামী লোক খুব। এরা সব চুপেসারে নিজ নিজ কাজ ক'রে যাচ্ছে, সকলের মুখগুলি কোনও রকম ভাব-দ্যোতক নয়,—মোঙ্গোল ধাঁজের মুখ, যার থেকে মনের ভিতরের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না বলে। কিন্তু মোটের উপর এদের—যাকে বলে good humoured, অর্থাৎ খোলাখুলি দিল্‌খুশ প্রাণ, দেখে তাই ব'লেই মনে হয়।

আমাদের জাহাজ ছাড়্‌লে বৃহস্পতিবার বিকালে। জাহাজের কতকগুলি অফিসারের মধ্যে প্রিয়-দর্শন একটি ভদ্রলোক এসে আমায় বল্‌লেন, "মসিও তাগোর-এর যাতে কোনও কষ্ট না হয় আপনারা দেখবেন।" আমি ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর এই কুশল-দেখানার প্রত্যুত্তর কর্‌লুম। তারপর তিনি বল্‌লেন যে, এই জাহাজে তাঁর একটি বন্ধু যাচ্ছে, সে ফরাসী সেনাদলের অফিসার, নামটি Jean Jacques Neuville (ঝাঁ-ঝ্যাক্‌ ন্যোভিল্‌)। ইনি একজন চিন্তাশীল লেখক, ইংরেজী জানেন, কবির সঙ্গে এঁর আলাপ হ'তে পারে কি? এই ব'লে এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকটি বেশ। অল্প-বয়সী যুবক, মরক্কোতে কিছুকাল ছিলেন, মরক্কোর জীবন আর ওখানকার মুসলমান জগতের ভাব-পরম্পরাকে অবলম্বন ক'রে একখানা উপন্যাস লিখেছেন। এঁর সঙ্গে ২।৩ দিন ধ'রে বেশ খানিকক্ষণ ক'রে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল—কতক ফরাসীতে, কতক ইংরেজীতে। ইনি বল্‌লেন যে, ফরাসীদের মধ্যে আর ফরাসী প'ড়ে বুঝ্‌তে পারেন এমন অন্য ইউরোপীয়দের মধ্যে কবির সম্বন্ধে তাঁর জীবনী তাঁর লেখা ইত্যাদি জান্‌বার জন্য খুব একটা কৌতূহল আছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় তেমন ভালো বই একখানাও এ পর্য্যন্ত লেখা হ'ল না—যাতে যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কবি বড়ো হ'য়ে উঠেছেন তার একটা স্পষ্ট ছবি থাকে, আর তাঁর সব বইয়ের গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর তাবৎ লেখার একটা ধারাবাহিক পরিচয় থাকে, আর আরও ভালো ক'রে খুঁটিয়ে আলোচনা ক'র্‌তে সাহায্য কর্‌বার জন্য যথোপযুক্ত প্রমাণ-পঞ্জী থাকে। তিনি ইংরেজ লেখক Thomson (টম্‌সনের) ছোটো বই যেখানা ভারতবর্ষের এক খৃষ্টীয় মিশনরী সম্প্রদায়ের প্রকাশিত একটি গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে বেরিয়েছে, সেখানা প'ড়ে দেখেছেন, কিন্তু সে-বইখানি তাঁর আদৌ ভালো লাগে-নি—টম্‌সন-এর সহানুভূতির অভাব আছে ব'লে তাঁর মনে হয়, আর ভাবে বোধ হয় লেখক কবির ভাষাও ভালো বোঝেন না। আমি বল্‌লুম যে, তিনি অনুমান করেছেন ঠিক, আর টম্‌সন হালে আর-একখানা বই বা'র করেছেন, সেটা আরও বড়ো, কিন্তু সেটাও ভালো হয়নি—বইখানাতে খবর যা আছে তা বেশীর ভাগ পরের কাছ থেকে নেওয়া—

আর লেখক কিছু ভালো ক'রে না বুঝে কেবল নথ নেড়ে গিন্নীপনা ক'রেছেন যেন তিনি মস্ত একজন সমঝদার। রবীন্দ্রনাথ এখন আমাদের এত কাছে আছেন যে, আমরা তাঁকে জার্ম্মান পণ্ডিতের অনুমোদিত পথ ধ'রে তাঁর জীবনী-কথা আর তাঁর কাব্যকথা বিশ্লেষ ক'র্‌তে পারি না। তবে আমাদের লেখকদের মধ্যে দু-চার জনে তাঁর সম্বন্ধে ছোটো-খাটো প্রবন্ধ লিখে তাঁর কবি-প্রতিভার দিগ্‌দর্শন করাতে চেষ্টা করেন—যদিও বড়োভাবে কেউ কিছু করেন নি। আর আমাদের মধ্যে দু-চার জন আমাদের বয়সের রসজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা নিজেদের মাতৃভাষার সাহিত্য বেশ ভালো জানেন, তার ঐতিহাসিক চর্চ্চাও ক'রেছেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত আর এক বা একাধিক ইউরোপীয় সাহিত্যের রীতিমত ভাষাজ্ঞান নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন, —খামখেয়ালী ভাবে নয়, discipline হিসাবে অর্থাৎ উদ্দেশ্যবান্ শ্রমশীল শিশিক্ষু হ'য়ে আলোচনা ক'রেছেন,—আমাদের আশা আছে যে,তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভাকে শিক্ষিত অভিরূপোচিত রস-বিশ্লেষের দ্বারা, বিশ্বের রসিক লোকের সামনে অনেকটা এই প্রতিভারই উপযুক্ত প্রয়োগ-বিজ্ঞানের দ্বারা উপস্থিত ক'র্‌তে পারবেন। স্বদেশবাসী ও বিশ্ববাসী যাঁদের কাছ থেকে এই কাজ আশা ক'র্‌তে পারে, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ক'রে সুহৃদ্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, আর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথাই মনে হ'চ্ছিল।

বিদ্যাপতি-সম্পাদক বঙ্গসাহিত্যিকাগ্রগণ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যে উপাদেয় প্রবন্ধটি গত জুলাই মাসের মডার্ণ-রিভিউতে প্রকাশিত হ'য়েছে, যাতে অন্য বিষয়ের মধ্যে কবির "উর্ব্বশী" কবিতার একটি চমৎকার ইংরেজী অনুবাদ আছে, আর বাঙলা তথা বিশ্বসাহিত্যের ঐ চরম রসসৃষ্টিটির একটি সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য-বিচার আছে, সেটি মডার্ণ-রিভিউ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে সঙ্গে রেখেছিলুম, দরকার হ'লে যোগ্য পাত্রের কাছে তার আলোচনা ক'র্‌বো ব'লে। সেটি আমার হাতে কাছেই ছিল, আর ছিল সঙ্গে সঙ্গে পরলোকগত রবিদত্তের কৃত ঐ "উর্ব্বশী" কবিতারই আর একটী অনুবাদ—এই দুটী শ্রীযুক্ত ন্যোভিল-কে প'ড়্‌তে দিই। তিন দিন এই প্রবন্ধ আর অনুবাদ তিনি রাখেন, চতুর্থ দিনে ব'ল্‌লেন যে তাঁর চমৎকার লেগেছে,—এগুলি যদি আমি তাঁকে স্বত্বত্যাগ ক'রে দিতে পারি তাহ'লে অতি আনন্দের সঙ্গে তিনি গ্রহণ ক'রে নিজের কাছে রাখেন। বলা বাহুল্য, আমি তাঁকে এগুলি তখনি দিয়ে দিলুম।

কবির সঙ্গে ন্যোভিল্-এর আলাপ করিয়ে দিলুম। দু-একদিন অনেকক্ষণ ধ'রে কবির সঙ্গে এঁর কথাবার্ত্তা হয় —বিশেষ ক'রে ইউরোপের আজ-কালকার লড়াইয়ের পরের অবস্থা নিয়ে—কোন্ দিকে ইউরোপের মনের গতি এখন চ'ল্‌ছে, শ্রেয়ঃ কি, কি ক'রে তার সাধনা চ'ল্‌তে পারে—এই সব বিষয় নিয়ে।

একটা বিষয়ে ইনি কবিকে একটী প্রশ্ন ক'র্‌লেন—(yellowperil) পীতাঙ্ক বা পীত-ভয় অর্থাৎ চীন জাত থেকে কোনও সত্যিকারের আশঙ্কা ইউরোপের আছে কি না। কবি ব'ল্‌লেন, peril ব'ল্‌লে যে কথা বোঝায়, যে, একটি শক্তিশালী জা'ত তার মানোয়ারী জাহাজ, তার সেপাই বন্দুক কামান, তার মিশনারী ঔপনিবেশিক বেনে, যত রাজ্যের লোক লস্কর নিয়ে আর একটি জা'ত, যে জা'ত মোটেই এদের চায় না, তার ঘাড়ের উপর একটি উৎপাতের মতো প'ড়্‌ল আর তার মধ্যে একটা কায়েমী স্থান নিয়ে আরব্য রজনীর সিন্দবাদের উপাখ্যানের(Old Man of the Sea) সাগর পারের দ্বীপের বুড়োর মতন তার ঘাড়ে চেপে দু-হাতে তার গলা-টিপে রেখে গট হ'য়ে ব'সে রইল, এই যে (predatory instinct) শ্যেন বুদ্ধি এটা হ'চ্ছে ইউরোপীয় জা'তেরই কীর্ত্তি। ইউরোপ এই ক'রে সারা দুনিয়াটার উপরে চেপে ব'সে আছে, জগতে একটি মস্ত সত্যিকারের white peril র'য়েছে। এশিয়ার কোনও জা'ত কখনও এমন ক'র্‌তে চেষ্টা করেনি—হালে যদি কেউ ক'রে থাকে তো কোরিয়াতে জাপান ক'রেছে, তাও ইউরোপের অনুকরণে। চীনেরা শান্ত শিষ্ট জা'ত—এরাই একমাত্র সভ্য জা'ত যাদের মধ্যে কাটাকাটি যাদের ব্যাবসায় এমন সৈনিক-সেনানীর স্থান সমাজে উচ্চ স্থানে কস্মিন-কালেও ছিল না—সেপাইকে এরা ভারাটে গুণ্ডা আর গলাকাটার সামিল ক'রে দেখেছে। এই চীন চায় যে, সে তার নিজের বিরাট দেশের মধ্যে তার প্রাচীন রীতিনীতি নিয়ে নিজের

ইচ্ছে মতো চলে, তার যা যা দরকার এই দেশের মধ্যেই সে পায়। বাইরের জিনিষের দিকে তার লোলুপ দৃষ্টি নেই দেশের মধ্যে তার খালি জায়গাও কিছু কিছু আছে কিন্তু খামকা যদি ইউরোপের লোকেরা তাদের উপরে চরাও হ'য়ে তাদের ঘরের ভিতরে ঢুকে তাদের উপরে অত্যাচার করে, যেমন আজকাল ইংরেজ আর জাপান আর অন্য জা'তে মিলে ক'র্‌ছে, তা হ'লে চীনের আপত্তি করাটাতে ন্যায়-বিচার নিয়ে দেখ্‌লে কারু রাগ করা চলে না। তবে রুষের মতন কোনও চঞ্চল দুর্দ্দান্ত ইউরোপীয় জা'তের পরিচালনায় জাপানে-চীনে মিলে গিয়ে বন্যার মতন সত্যিকারের ইউরোপীয় ধরণের একটা পীত-ভয় সৃষ্টি করা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সে রকমটা যে হঠাৎ হবে কবি তা মনে করেন না (—এখানে কিন্তু অবান্তর ভাবে ব'লে রাখি, কবি যেভাবে এই চীন-সমস্যাটীকে দেখেছেন, আমি নিজে কিন্তু ব্যাপারটী ঠিক সেভাবে দেখি না—এ সম্বন্ধে যে তথ্য আমার চোখে প'ড়েছে, তাকে আমি আমার ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশঙ্কাজনক ব'লেই মনে করি—যাক্। সিঙ্গাপুরে নেমে মালয় দেশে এ সম্বন্ধে আরও কিছু চোখে দেখে আর কানে শুনে পরে কি মনে হয় লেখা যাবে—কবির সঙ্গে এবিষয়ে আজ কালের মধ্যে আলোচনাও কিছু ক'রেছি—তিনি কতকগুলি বিষয়ে আমার তথ্যগুলি যদি সত্য হয় তা হ'লে আমার আশঙ্কাগুলি অমূলক নয় একথা স্বীকার ক'রেছেন)।

এঁর লেখা একখানি ফরাসী উপন্যাস ইনি কবিকে উপহার দিলেন। মোট কথা, এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে মিশে একটি বেশ সুশিক্ষিত হৃদয়বান্ বিচারশক্তিশালী ফরাসী যুবকের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ হ'ল। এঁর সঙ্গে এঁর রেজিমেণ্টের আর একটি অফিসার ছিলেন, ইনি ইংরেজি জানেন না। হিন্দুধর্ম্মের মূল কথাটা কি, সংক্ষেপে জান্‌তে চাইলেন। আমার অসম্পূর্ণ ফরাসীতে তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম, আত্মা, কর্ম্মবাদ সগুণ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, নিত্যধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, প্রতিমা পূজা, হিন্দু সমাজ, জাতিতত্ত্ব জ্ঞান, ভক্তি—প্রভৃতি স্থূল কথাগুলি যথাসম্ভব গুছিয়ে বল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লুম। ইনি কিছুই জানেন না, মন দিয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লেন। আমি বল্‌লুম যে, হিন্দুধর্ম্ম ব'ল্‌লে একটা system of culture, একটা বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি বা সভ্যতাকে বোঝায় যেটা গত তিন হাজার বছর ধ'রে ভারতবর্ষে নানা জা'তের ভাব-সম্ভারে পুষ্ট হ'য়ে বিকশিত হ'য়ে আস্‌ছে; এতে কোনোও dogma বা creed, কোনও ধরাবাঁধা অবশ্য স্বীকৃতব্য মতের বালাই নেই। তবে এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত বেশীর ভাগ লোক যে কতকগুলি ভাবকে সবচেয়ে যুক্তি তর্কানুমোদিত ব'লে মেনে থাকে, সেগুলি ব্রহ্ম, আত্মা, দেবতাবাদ ইত্যাদি নিয়ে। সেগুলির সংক্ষেপে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা দিলুম। আর সব মতবাদের মূলে সব ধর্ম্মসাধনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা হিসাবে যে নিত্যধর্ম্ম—দম, ত্যাগ, মৈত্রী প্রভৃতি আছে—ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধি আর সদনুষ্ঠানকে মুখ্যস্থান দেওয়া হ'য়েছে, কোনও বাদ—জ্ঞান বা ভক্তি প্রভৃতি এগুলি যে গৌণ, "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং"—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথা ভজাম্যহং"—এই কথাটা বুঝোতে চেষ্টা কর্‌লুম। "হিন্দুধর্ম্ম" যে এতটা উদার, এর মধ্যে যে খৃষ্টোপাসক ভক্তেরও স্থান আছে—এ কথা ভদ্রলোক বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লেন।

প্রথম শ্রেণীর জন্য যাত্রীদের মধ্যে আনাম-যাত্রী কতকগুলি ফৌজী অফিসার আর ফরাসী সরকারের কর্ম্মচারী, ডাক্তার ব্যবসায়ী। এঁদের চার পাঁচজনের সঙ্গে স্ত্রীরা আছেন। সকলেই ফরাসী, অন্য উইরোপীয় যাত্রী কেউ বোধ হয় নেই। এরা এমন কিছু বিশেষত্বসম্পন্ন ব্যক্তি নয়। তবে এদের মধ্যে আভিজাত্যের শিক্ষা আর ভব্যতার দিক থেকে—বেশ একটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। একটী যুগল স্বামী-স্ত্রী আছেন—চালচলন সবচেয়ে aristocratic বা অভিজাত ব'লে মনে হয়। দুজনেই আধাবয়সী লোক। বিশেষ ক'রে স্ত্রীটীর মুখ দেখে একেবারে বাঙালীর মেয়ে ব'লে মনে হয়। স্ত্রীটী আবার একখানা বাঙালী ধরণের সাদা সাড়ী সরু কালো কল্কাপাড়কে পিন্‌টিন দিয়ে ঘাঘরার মতন ক'রে প'রে সকালে ডেকে স্বামীর সঙ্গে ঘোরেন, পিছন থেকে বাঙালীর মেয়ে বলে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। এই মহিলাটী ডেকে চলাফেরার সময়ে কেমন যে একটি সম্ভ্রমপূর্ণ চোখে ডেক-চেয়ারে ব'সে আমাদের সঙ্গে কথা কইছেন কবির প্রতি নেত্রপাত ক'রে অবিসংবাদিত ভাবে শান্তভাবে

তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে যান—সেটী ভারী সুন্দর লাগে। বাঙালী ভদ্রগৃহস্থঘরের গিন্নীর মত স্নেহময় প্রশান্ত দৃষ্টি ব'লে সুরেন-বাবু এর নামকরণ ক'রেছেন "বেনে-বউ"। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে দেখ্‌ছি, ডেকের উপর এক কর্কশ-ধ্বনি গ্রামোফোনে যত সব মার্কিন (Jazz) জায ঠাটের বিকট গান আর উৎকট বাদ্য একটা শব্দের তাণ্ডব সৃষ্টি করে—যেন নোতুন খোয়া-বিছানো মেরামতী বড়ো রাস্তার উপর দিয়ে রোলার ইঞ্জিন তার সব রকম আর্ত্তনাদ নিয়ে চল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে, আর আমাদের প্রথম শ্রেণীর চার পাঁচটি বিবাহিতা, কুমারী আর অবীরা প্রৌঢ়া, তরুণী আর অজ্ঞেয়-বয়স্কা, পীনা, তন্বঙ্গী আর স্থূলোর্দ্ধমধ্য-ক্ষীণ নিম্নাঙ্গী ততগুলি অতি সাধারণ ফরাসীর মত মোটা-সোটা থপ্‌থপে unromantic শ্রীছাঁদ-বিহীন পুরুষের সঙ্গে (এদের কারু-কারু বত্রিশ পাটী দাঁতের মধ্যে যোলো পাটীই সোনা বাঁধানো—কবি ব'ল্‌ছেন, বহুমূল্য এদের হাসি, সোনার হাসি কি না!) ধপাধপ ক'রে যত আজকালকার ইতর ভাব-দ্যোতক মার্কিন নাচ নাচতে সুরু করে—তখন দেখি, এই দম্পতী তাতে যোগ দেয় না। এই রকম আর একটি দম্পতী আছে, স্বামী ইন্দোচীনের একটি বড়ো সেনানী হ'বেন, জবরদস্ত গোঁপওয়ালা ভারিক্কে চেহারা, যেন নেপোলিয়নের বিখ্যাত অশ্বারোহী দল (Chasseurs) শাস্তর-দলের একজন সওয়ার—স্ত্রীটী একটী ক্ষীণাঙ্গী মধ্যবয়সের মহিলা, এঁরাও একটু আল্‌গোছা থাকেন। এই দম্পতীর একটি ভারী সুন্দর শ্রীমান ছেলে আছে, তার সঙ্গে ভাব ক'রেছি—তার নাম (Louis) লুই, বয়স ন'বছর, জ্যাঁদো শীন-এ ছেলেবেলায় কবে ছিল মনে নেই—খালি ফরাসী দেশের ইতিহাস আর ফরাসীদেশের ভূগোল প'ড়েছে—তার একটী দাদামশায় আছে, তার মায়ের বাপ, তিনি একে বড্ড ভালো বাসেন—এতদিন ধ'রে জাহাজে ক'রে জলে জলে আস্‌ছে কিন্তু তবুও তার খারাপ লাগে না, কারণ এই বেশ আর তার দুটি ছোটো ছোটো বন্ধু জুটেছে তাদের সঙ্গে সারাদিন যখন ইচ্ছে খেল্‌তে পারে—এইসব খবর তার কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রেছি; আর ছেলের সঙ্গে ভাবের ফলে তার বাপের সঙ্গেও আলাপ হ'য়েছে। বাপটী ব'ল্‌লেন—"বেশ, vous etes deja des camarades—এরি মধ্যে বেশ দোস্ত হ'য়ে পড়েছে।" এই থেকে সকালে এর সঙ্গে দেখা হ'লে পরস্পর অভিবাদন করি, আর কবির সাম্‌নে যাবার সময়ে এর বিরাট সোলার টোপা বা টোপর—সেটীকে টুপী ব'ল্‌লে তাতে ক্ষুদ্রতা আরোপ ক'রে তার অপমান করা হয়—সেটীকে ডান হাতে তুলে কবিকে অভিবাদন ক'রে যান। শাড়ীওয়ালা মহিলাটীর স্বামী একদিন আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌লেন—ইনি জান্‌তে চাইলেন কবির পৈতৃক বাসভূমি কোথায়—আর তাঁর মাতৃভাষা কি। যখন শুন্‌লেন যে, কলিকাতায় এঁর বাড়ী তখন বল্‌লেন যে, তাহ'লে তো ইনি "ব্যাগালি" অর্থাৎ বাঙালী। আমি বল্‌লুম, "আপনি ফরাসী, কিন্তু ভারতবর্ষে যে বাঙালী আর অন্য অন্য ভাষা-ভাষী বিভিন্ন জাতীয় লোক আছে এখবর আপনি রাখেন তাহ'লে দেখ্‌ছি।" ইনি উত্তরে বল্‌লেন—"আমি পণ্ডিচেরীতে কিছুকাল ছিলুম (এঁর স্ত্রীর শাড়ী-প্রীতির কারণ এতক্ষণে বুঝ্‌তে পারা গেল)—সেখানে যে বিখ্যাত বাঙালী political refugee (বাঙলায় কি ব'লবে—"রাজনৈতিক কাশীবাসী"? গশ্‌ (অর্থাৎ শ্রী অরবিন্দ ঘোষ) আছেন। শহরটা অতি বাজে—একটুও (vie intellectuelle) বুদ্ধিবৃত্তির সাড়া পাওয়া যায় এমন জীবন নেই—একজন ইংরেজ ব'লেছে যে, এই শহর হ'চ্ছে (a city of ghosts) প্রেতাত্মার পুরী সেটা ঠিক কথা—দেখ্‌তুম যে অরবিন্দের দলটিতেই কিছু সচ্চিন্তা আছে।" শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে (Paul Richard) পোল্ রিশার্ ব'লে একজন ফরাসী আর তাঁর স্ত্রী থাক্‌তেন, এঁরা তিনজনে মিলে (Arya) "আর্য্য" ব'লে একখানি দার্শনিক মাসিকপত্র ইংরেজীতে বা'র ক'র্‌তেন—এঁদের নাম শুনেছেন, তবে আলাপ হয়নি এদের সঙ্গে।

প্রথম শ্রেণীর অন্য যাত্রীদের মধ্যে পুরুষদের দুই এক-জনের সঙ্গে ক্বচিৎ কখনও একটা-আধটা বাক্যালাপ হ'য়েছে মাত্র—"বঁঝুর" বা পরস্পরের জন্য শুভদিন কামনা—বা কপালে হাত ঠেকিয়ে আধা-ফৌজী কায়দায় নমস্কার করা—এইটুকু যা। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা এদিকে আসে না,—তাদের জন্য জাহাজের পিছন দিক্‌কার খোলা ডেকটার ব্যবস্থা, যেখানে জাহাজের সুকানী বা হাল-ঘর চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাম্‌নের কম্পাসের নির্দ্দিষ্ট দিশা দেখে জাহাজকে

তার গন্তব্যের অভিমুখী ক'রে রাখ্‌ছে। তৃতীয় শ্রেণীও একেবারে আলাদা, এদের জন্য বিশেষ কোনও খোলা ডেক নেই—এরা সাম্‌নের আর পিছনের সাধারণ খোলা ডেক-গুলিতে খালাসী, আগুনঘরের মিস্ত্রী, ফরাসী, আরব, মোপলা, আনামী, বাবুরচী, যত হরেক রকমের লোকের মধ্যে আর খোলা ডেকের চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রীদের পাতা শতরঞ্জী, কম্বল আর চ্যাটাইয়ের ফাঁকে একটু আধটু যা দাঁড়াবার জায়গা পায়, তাতে দাঁড়িয়ে আবশ্যক মনে করলে বাইরের খোলা হাওয়া একটু ক'রে সেবন ক'রে যায়।

কোইয়া-সানের যাত্রী

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী

যে-দিন কোইয়া-সানের তীর্থযাত্রী হ'য়ে নারা (Nara) থেকে বেরিয়েছিলাম সে-দিনকার কথা ভুলবার নয়। আজ পাঁচ বছরের কথা। দিন পঞ্জিকা রাখিনি। কিন্তু মনের



শো-তোকু তাইশি

পটে যে-ছবি আঁকা রয়েছে—ইতিহাসের স্মৃতি যে-ছবিকে সজীব ক'রে দিয়ে গেছে সে ছবি মুছবার নয়। সেদিন প্রাতে উঠে আমরা নারার তপোবনের পথ বেয়ে চলেছি—কোইয়া-সান রওনা হ'ব ব'লে। বসন্তের হাওয়া এসে তখন এই 'উদীয়মান-সূর্য্যে'র দেশে লেগেছে। জাপান ফুলে ফলে সেজে উঠেছে। জাপানের ঘাটে বাটে, বনে ও কন্দরে সে শোভা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। সুন্দরীর কিমোনোতে (Kimono) বসন্তের সে রাগ ধরা পড়েছে। নারার তপোবনের তখন এক অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে। তপোবন-তরু পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে। সাকুরা-হানায়* গাছ ভ'রে উঠেছে। উমো তখন কুঁড়ি থেকে সব বেরোয় নি। শীতের বাতাসে আড়ষ্টতা তখনো তার কাটেনি।

এমন পথ বেয়ে আমরা চলেছি। ঝিলের পাশ থেকে হরিণশিশু এসে তার অভিবাদন জানিয়ে গেল। আশ্রমের মন্দির থেকে ভিক্ষু শাকা নিয়োরাইয়ের (Shaka-niyorai-শাক্য তথাগত) গুণগান করলেন—ও পশ্চিমমুখী হ'য়ে বুদ্ধের জন্মভূমির উদ্দেশ্যে তাঁর ভক্তির অঞ্জলি দান করলেন। মন্দির-চূড়ায় ব'সে পাখী তার সহানুভূতি জানিয়ে গেল। আমাদের মনটাও শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠলো। ভারতের হারাণো ও চিরপ্রিয় আদর্শ নিয়ে গড়া এই আশ্রমকে জাপান কেমন

* Sakura-no-hana ; Cherry flowers

† Ume-no-hana—plum flowers



কোইয়া-সানের মঠে—পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ

ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছে ভেবে হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো।

পুরাণো স্মৃতির এই পবিত্র স্পর্শে পুলকিত হ'য়ে আমরা কোইয়া-সান যাত্রা কর্‌লাম। জাপানের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু কো-বো দাইশির জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দেখে চক্ষু সার্থক করবো—ও আশ্রমের ভিক্ষুদের সংস্পর্শে এসে ধন্য হ'ব এই বাসনা নিয়েই আমাদের এই তীর্থযাত্রার আয়োজন। জাপানের অভ্যুদয়ের প্রত্যূষে যুবক কো-বো দাইশি চীনে রওনা হ'য়েছিলেন—সত্যকার ভারতের খোঁজে। জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি দেখে তাঁর মনে ক্ষোভ হয়েছিল—জাতির অধোগতি দেখে তাঁর দুঃখ উপস্থিত হয়েছিল। যে ভারতবর্ষ থেকে বুদ্ধবাণীর সত্য জগতে প্রচারিত হ'য়েছিল সে-দেশ পর্য্যন্ত তিনি যেতে পারেন নি। তবে চীন দেশের মন্দিরে মন্দিরে সেই সত্যের সন্ধান পাবেন ভরসায় ও ভারতীয় ভিক্ষুদের সংস্পর্শে আস্‌তে পার্‌বেন এই আশায় তিনি বিদেশ যাত্রা করেছিলেন। ভারতের সেই সত্য এনে স্বদেশকে জাগিয়ে তুলেছিলেন—এক অভিনব জাতীয়তার সৃষ্টি করেছিলেন—জাপান আজও কৃতজ্ঞতাভরে তাঁর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানায়। সেই ভারতসন্তান হ'য়ে যদি আমি কো-বো দাইশির সমাধিস্থানে আমার নমস্কার না জানিয়ে যাই তবে তার চেয়ে আর দুঃখ নাই। তাই কোইয়া-সান তীর্থের যাত্রী হ'য়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

* * *

কোইয়া-সানের অপর নাম তাকানো ইয়ামা (Takano yama)। সান্‌ বা ইয়ামা হচ্ছে পর্ব্বত। সান্‌ চীনা কথা —জাপানীতে চল্‌তি হ'য়ে গেছে। ইয়ামা খাঁটী জাপানী



কনফুসিয়স্

কথা। এই কোইয়া পর্ব্বত প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু—ইয়ামাতো (Yamato province) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ইয়োশিনো-গাওয়া (Yoshino gawa) বা ইয়োশি নদীর ধারে অবস্থিত।

নারা থেকে আমরা ৯টার ট্রেণে রওনা হ'লাম। পথের দু'ধারে জাপানের মনোহর প্রকৃতি—পাতায়, ফুলে ভ'রে হাস্‌ছে। মাঝে মাঝে ছোট পাহাড় পল্লবিত দেবদারুতে শোভিত হ'য়ে অভিনব দৃশ্য উৎপাদন করেছে। নীচে ছোট ছোট নদী ছুটে চলেছে। এই প্রকৃতিই জাপানকে সুন্দর ক'রে তুলেছে; জাপানীকে আর্টিষ্ট করেছে। তাই জাপানী চিত্রকরের তুলিকাপাতে এই প্রকৃতি সহজভাবে মূর্ত্তি পেয়েছে—জাপানী কবির গানে ইয়ামা-কাওয়ার (পাহাড়ীয়া নদীর) প্রতিধ্বনি ধরা দিয়েছে।

কোইয়া-সানের পথে হোরি-উ-জীর বিখ্যাত মন্দির। নারার থেকে সাত মাইল দূর। এই হোরি-উ-জীই হচ্ছে জাপানের সব চেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির—৬০৭ খৃঃ অব্দে রাজকুমার শো-তোকু নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। এটা জাপানী বৌদ্ধদের সব চেয়ে বড় তীর্থস্থান। প্রায় দেড় হাজার বছর ধ'রে এই মন্দির দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক অংশ তার জীর্ণ হ'য়েছে। কিন্তু জাপানী বৌদ্ধদের মনে সে-মন্দির বর্ত্তমান যুগেও নিত্য নূতন ভাব জাগিয়ে তোলে। হোরি-উ-জীতে ভারতের অনেক খাঁটি জিনিষের সন্ধান মেলে। সেগুলি চীনেদের হাত দিয়ে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে আসে-নি। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর লেখা সংস্কৃত পুঁথী এখান থেকেই পাওয়া গেছে। ভারতে বা চীন দেশে কোথাও এত পুরাতন সংস্কৃত পুঁথী মেলে নি। শুধু মধ্য-এসিয়ার মরুভূমিতে সম্প্রতি এর থেকে পুরাণো সংস্কৃত পুঁথীও কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। হোরি-উ-জীতে খাঁটী ভারতীয় শিল্পের নিদর্শনও মেলে। সম্প্রতি আচার্য্য সিলভাঁ-লেভি জানিয়েছেন যে, হোরি উ-জীর ভিক্ষুদের ভিতর কেহ কেহ ভারতীয় সঙ্গীতকলার খোঁজ রাখেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ভিক্ষুরা জাপানে যে-সব সুর আমদানী করেন, ভিক্ষু-পরম্পরায় হোরি-উ-জীতে তার আলোচনা ও শিক্ষা ছিল এবং এখনও কিছু আছে। আচার্য্য লেভি হোরি-উ-জীর ভিক্ষুদের গীত সেই সুরের স্বরলিপি ক'রে নিয়েছেন এবং তা' শীঘ্রই প্রকাশ করবেন লিখেছেন। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের দুই একটি রাগ কি ভাবে গীত হ'ত তার আভাস কিছু এর থেকে মিলবে আশা করা যায়।

* * * *

আমরা কোইয়া-সানের যাত্রী। হোরি-উ-জীতে বেশী থাম্‌বার সময় নেই। ফুলেভরা বনভূমি দিয়ে দেবদারুভরা উপত্যকা দিয়ে ও ছোট ছোট স্রোতস্বতীদের বুকের উপর দিয়ে প্রায় দু' ঘণ্টা পরে কোইয়া-গুচি (Koya-guchi) ষ্টেশনে পৌছলাম। গুচি মানে হচ্ছে দ্বার। কোইয়া-

গুচি হ'য়ে কোইয়া পাহাড়ে চড়তে হয় ব'লে ষ্টেশনটির এই সুন্দর নামকরণ হয়েছে—'কোইয়া'র দরজা। নারা থেকে কোইয়া-গুচি প্রায় ৪০ মাইল পথ।

আমরা যখন কোইয়া-গুচি পৌছলাম তখন আকাশে মেঘ জমেছে ও অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে। 'উদীয়মান-সূর্য্যে'র দেশে সূর্য্যের আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কোইয়া-গুচি থেকে আমাদের হেঁটে পাহাড়ে উঠ্‌তে হবে। কোইয়া-গুচি ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা ছোট একটি নদীর ধারে এসে পড়লাম। নদীটির নাম কানো-কাওয়া (Kano-Kawa)। এই নদীর ধার বেয়ে কিছুদূর উঠ্‌লেই একটি ছোট গ্রামে এসে পৌছা যায়। গ্রামের নাম শিদে (Shide)। স্থানটি খুবই সুন্দর। নদী-প্রপাতের দুই ধারে অবস্থিত। একটি সেতু দিয়ে পার হ'তে হয়। ছোট গ্রামটির চারিদিকে ঘন দেবদারু বন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে। আশে পাশে দুই একটি সাকুরা গাছও দেখা যাচ্ছে। কোইয়ার পাহাড়ে তীর্থযাত্রীরা এই পথ দিয়ে যায়। পাহাড়ে উঠ্‌তে হয় পায়ে হেঁটে। ভাল সময় প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। এমন সুন্দর রাস্তা আর দেখিনি। কিন্তু এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার উপায় আমাদের ছিল না। আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। অল্প বৃষ্টির সঙ্গে তখন তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে। শীতের ঝাপ্‌টা-হাওয়ায় হাত পা আড়ষ্ট হ'য়ে আস্‌ছে। এপ্রিল মাসের প্রথম। জাপানে বসন্ত ঋতুর সমাগম হয়েছে। কিয়োতো ও নারাতে সাকুরা ফুল দেখা দিয়েছে। জাপানী মেয়েরা রঙ-বেরঙের কিমোনো প'রে বেরোতে আরম্ভ করেছে। তাই আমরাও সাহস ক'রে সেদিন গরম পোষাক নারায় ফেলে এসেছি। সেজন্য শীতের চোট্‌টা খুব বেশী সইতে হ'ল—উপায় নাই। শিদের পান্থনিবাসে বসে "ও-চা" * খেয়ে শরীরটা একটু গরম ক'রে নিলাম ও আমরা ক'জন বীরদর্পে বেলা ১১ টায় কোইয়া-সানে চড়া আরম্ভ করলাম। আচার্য্য লেভি, কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক সাকাকি, ও



জিমু-তেন্নো—জাপানের প্রথম সম্রাট্‌

আমি। আচার্য্য পত্নীর জন্য খোঁজ ক'রে একখানি ডুলি পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং তিনি তা'তেই চল্‌লেন। কোইয়া-সানের আশ্রমে বেলা ১২।১ টা নাগা'ত পৌছে খাওয়া-দাওয়া করব ঠিক ছিল। মাত্র ৪ মাইল চড়াই। কিন্তু তুষার ও বৃষ্টিপাতে এই পথ এমনি পিছিল হ'য়ে উঠ্‌লো যে, এক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করতে আমাদের চার ঘণ্টা লাগ্‌লো। তার ওপর সারাদিনের উপোস ও শীতের কষ্ট ত আছেই। কোইয়া নগরের পাদদেশে যখন আমরা পৌছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমরা আশ্রমের অতিথি। পূর্ব্বেই খবর দেওয়া ছিল। সুতরাং নগরদ্বারেই

* জাপানে ও-চাই বেশী চল্‌তি। গরমজলে চায়ের কাঁচা পাতা ভিজিয়ে এ চা তৈরী হয়। দুধ বা চিনি দেওয়া হয় না। "ও" কথাটি সম্মানসূচক। এ চায়ের চাষ জাপানে হয়—তাই তা'কে সম্মানসূচক নাম দেওয়া হয়েছে। দুধ চিনি দিয়ে যে চা তৈরী হয় তাকে "কো চা" বলা হয়; "কো" মানে "ছোট"।



কোইয়া-সানে কো-বো দাইশির প্রথম আগমন

কয়েকজন আশ্রমবাসী ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হ'ল। সিক্ত ও ক্লান্ত দেহে ধীরে ধীরে আমরা আশ্রমে প্রবেশ কর্‌লাম ও নির্দ্দিষ্ট পান্থনিবাসে আশ্রয় নিলাম। তখন কোইয়ার মন্দিরে-মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। আশ্রম-বাসী ভিক্ষুদের সমবেত হ'বার সময় হয়েছে। শাক্যমুনি ও কোইয়া আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কো-বো-দাইশির পূত স্মৃতিতে আশ্রমবাসী ভিক্ষুদের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে—মন আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে। তা'দের আনন্দধ্বনির স্পর্শে আমাদেরও শ্রান্তি যেন অনেকটা লঘু হ'য়ে এল।

* * * *

কো-বো দাইশির কার্য্যকলাপ ভাল ক'রে বুঝ্‌তে গেলে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার গোড়ার খবর কিছু জানা দরকার, কারণ এই থেকেই জাপানে এক নূতন জাতীয় জীবনের গঠন আরম্ভ হয়—ও এক নূতন যুগের সূচনা হয়। এই গঠনের মূলে হচ্ছেন এক রাজকুমার নাম শো-তোকু (Sho-toku)। তিনি নিজে কোনোদিন রাজপদ না পেলেও প্রায় ত্রিশবৎসর ধ'রে (৫৯৩-৬২২খৃঃ অঃ) অপ্রাপ্তবয়স্কা সাম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধি হ'য়ে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেছিলেন।

শো-তোকু যখন জন্মগ্রহণ করেন (৫৭৩ খৃঃ অঃ) তখন জাপানে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয়দলের ভিতর গণ্ডগোল চল্‌ছে। তাদের ভিতর যে দল মাথা উঁচু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌তো তার ক্ষমতাতেই রাজ্য পরিচালিত হ'ত। সম্রাটের ক্ষমতা একপ্রকার ছিল না। শো-তোকু যখন রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বৎসর। স্থিরবুদ্ধির ব'লে তিনি নানা দলের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে শাসন-সংস্কারে মন দিলেন। প্রথমেই তাঁর চোখে পড়্‌ল জাতীয় একতার অভাব। এই একতা স্থাপন কর্‌তে হ'লে জাতের মনকে আগে তৈরী করা ও একটা সাধারণ আদর্শ সাম্‌নে দিয়ে সেই মনকে পল্লবিত ক'রে তোলা দরকার। বৌদ্ধধর্ম্মই এ কাজে সবচেয়ে বড় সহায় হ'বে শো-তোকু সেটা বুঝ্‌তে পারলেন।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা অনেকদিন থেকেই চল্‌ছিল। ৫২২ খৃঃ অঃ শিবা তাচিতো (Sbiba Tachito) নামে একজন চীনা ভিক্ষু কেরিয়া হ'য়ে জাপানে আসেন। কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের অনেকদিন থেকেই আদান প্রদান চল্‌ছিল। সেই সূত্রেই শিবা-তাচিতো জাপানে পদার্পণ করেন। তাচিতো ইয়ামাতো বিভাগে (Yamato province) বৌদ্ধ মন্দির স্থাপনা ক'রে শক্যবুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার সুরু করেন। ইয়ামাতো জাপানীদের আদি বাসভূমিও তখন জনবহুল। তাচিতোর বহু চেষ্টায়ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রসার হয়্‌নি। জাপানীরা এই বিদেশী ধর্ম্মগ্রহণে তখন বিশেষ ঔৎসুক্য

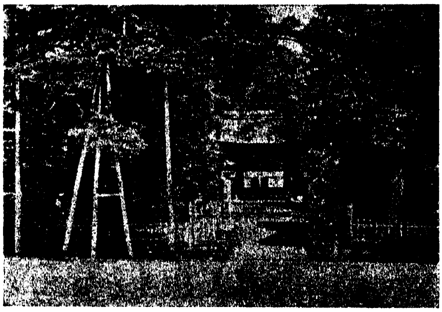
দেখায়নি। এর প্রায় পঁচিশ বছর পরে (৫৪৫-৫৫২ খৃঃ অঃ) কোরিয়ার অন্তঃপাতী কুদারা (Kudara) জনপদের রাজা জাপান-সম্রাটের সাহায্যপ্রার্থী হন ও সেই সময়ে দু'বার বুদ্ধমূর্ত্তি, ও বৌদ্ধশাস্ত্রের গ্রন্থ উপহার স্বরূপ পাঠান। এই সূত্রে জাপানের সঙ্গে একটা নিকট-সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছাই তাঁর বেশী ছিল। জাপান প্রথমে বিশেষ আগ্রহ না দেখালেও কুদারার রাজা ভগ্নোৎসাহ হ'লেন না। ৫৭৭ খৃঃ অঃ তিনি



কোয়ান্নন্—অবলোকিতেশ্বর

পুনরায় জাপানে উপহার পাঠালেন—প্রায় দু'শো বৌদ্ধগ্রন্থ, বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য ভাস্কর, ও মন্দির নির্ম্মাণের জন্য স্থপতি। মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতীয় ভিক্ষু ভিক্ষুণী দু'জনকে এই সঙ্গে জাপানে পাঠান হ'ল। নানি-ওয়া (Nani-wa-বর্ত্তমান ও-সাকা O-saka) নগরে বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা হ'ল এবং কোরিয়া থেকে প্রত্যাগত কয়েকজন জাপানী রাজকর্ম্মচারী এতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ কর্‌লেন। এর পরই শো-তোকু তাইশির আবির্ভাব।

শো-তোকুর হাতে ক্ষমতা আস্‌বার পরই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে জাতীয় ধর্ম্ম ব'লে ঘোষণা কর্‌লেন। বহু সমারোহে সমুদ্রতীরে "শি-তেন্-নো জির" (Shi-tenno-ji চতুর্দ্দিক্‌পালের মন্দির—'জি' মানে মন্দির) মন্দির নির্ম্মাণ করা হ'ল। সেই সঙ্গে ভিক্ষুদের জন্য শিক্ষা-বিভাগ খোলা হ'ল। বৃদ্ধ ও দরিদ্রের বাসস্থান, রোগীর আরোগ্য-শালা ও ভৈষজ্যালয়ের ব্যবস্থাও হ'ল।



কোঙ্গো-বু-জি মন্দির—কোইয়াসান্

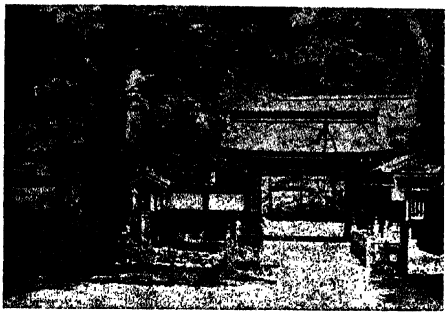
কোরিয়া ও চীন থেকে যে-সব অর্ণবপোত জাপানে আস্‌তো সেগুলি প্রথমে এই স্থানে ভিড়্‌তো। সেইজন্য বিদেশীদের অবস্থানের জন্য পান্থনিবাসেরও সৃষ্টি হ'ল। অতিথি-সৎকারের কার্য্যে কোনো ত্রুটী না হয় সে-বিষয়ে মন্দিরের পুরোহিতেরা দৃষ্টি রাখ্‌তেন। এই আতিথেয়তার ধারা জাপান আজও বজায় রেখেছে।

শো-তোকু দেশের শাসন-প্রণালীর সংস্কার করেন। এই নূতন শাসন-প্রণালীর প্রথমেই তিনি ধর্ম্মের কথা তুলেছেন। প্রজার নৈতিক উন্নতিই প্রথম দরকার।



কোইয়াসানের পথে—মন্দির

ধর্ম্মবিশ্বাসই সেই উন্নতির মূল। এর ভিতর দিয়েই রাজা-প্রজার একটা নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে পারে একথা তিনি ভাল ক'রে বুঝেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মত উদার ধর্ম্ম নাই। সুতরাং জাপান যদি এই ধর্ম্মের ত্রিরত্নকে বরণ ক'রে নেয় তাহ'লে রাজাপ্রজা সকলে এক সূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারে ও সেইটাকে অবলম্বন ক'রে একটা জাতি গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে।



কোইয়া-সান্ বিদ্যামন্দিরের প্রধান দ্বার

নূতন শাসন-প্রণালীর আরম্ভেই তিনিই এই মহান্ আদর্শকে বুঝিয়েছেন। * এই অভিনব শাসনসংস্কারে শো-তোকু কয়েকজন সহৃদয় সহায় পেয়েছিলেন এবং তাঁদের সাহায্যেই জাতির সংগঠন-কার্য্যে অনেকটা সফল হ'য়ে যেতে পেরেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি চীনের সঙ্গে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ক'রে জাপানের ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত ক'রে গিয়েছিলেন। অশোকের মত তাঁর হৃদয় প্রজার দুঃখে কাঁদ্‌ত। দেশের দুর্দ্দশা দেখে তিনি ব্যথিত হতেন। তাই জাপানের জন্যে তিনি এতটা কর্‌তে পেরেছিলেন। সেজন্য দেশের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট



অমিদা—অমিতাভ বুদ্ধ

ভক্তি ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। পরবর্ত্তী যুগের জাপানী বৌদ্ধেরা অবলোকিতেশ্বরের অবতার ব'লে তাঁকে পূজা দিয়েছে।

কিন্তু শো-তোকুর কাজ সম্পূর্ণ হ'তে সময় লেগেছিল। তাঁর মহান্ উদ্দেশ্যের চরম পরিণতি হয়েছিল প্রায় দু'শো বছর পরে। শো-তোকুর চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল কিন্তু তা'তে নূতন দলাদলিরও সৃষ্টি ক'রেছিল। ধীরে ধীরে জাতির মন গ'ড়ে উঠ্‌ছিল বটে, কিন্তু রাজকীয় দলের বিবাদ মিট্‌তে অনেক সময় লেগেছিল। এঁদের দলবিশেষের প্রভাবে বৌদ্ধসংঘেরও কিছু অবনতি হয়েছিল—রাজপুরোহিতেরা ধর্ম্মচর্চ্চা ছেড়ে রাজনীতিতে

* জু শিচি কেম্পো (Jushichi Kempo) বা সপ্তদশ শাসন-প্রণালীর (৬০৪ খৃঃ অং) প্রথম সূত্রেই তিনি বল্‌ছেন—

"জনসাধারণ একতার সমাদর কর্‌বে। শাসন-বিষয়ে অযথা বাধা প্রদান কর্‌বে না। ত্রিরত্নকে বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘকে—ভক্তিভাবে পূজা কর্‌বে। ত্রিরত্নই চার জগতে ধর্ম্মের সবচেয়ে বড় আদর্শ। জনসাধারণ যদি এই ত্রিরত্নকে ভক্তি করে তাহ'লে তাদের মন সরল হ'বে, তারা সত্যের আশ্রয় নেবে শো-তোকু জনসাধারণকে তিনখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ পড়্‌বার আদেশ দিয়েছিলেন—১। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক সূত্র। ২। বিমলকীর্ত্তি-নির্দ্দেশ। ৩। শ্রীমালা দেবীসিংহনাদ সূত্র। তিনখানিই মহাযান গ্রন্থ।

মনোনিবেশ করছিলেন ও নানা ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে সুরু করেছিলেন। ধর্ম্মপ্রচার চল্‌লেও মহানুভব ভিক্ষুদের সংখ্যা কমে আস্‌ছিল। ঠিক এই সময়ে (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জাপানে দু'জন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। এঁদের নাম দেঙ্গীয়ো (Dengyo) ও কো-বো। এঁরা এসেই জাপানের উন্নতির দু'টি নূতন ধারার সৃষ্টি করেন ও সেই ধারা বেয়ে জাপান বড় হ'য়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শো-তোকুর ইচ্ছাই পূর্ণ করেন। দেঙ্গীয়া ও কো-বোর কীর্ত্তিকলাপ ও কো-বোর প্রতিষ্ঠিত কোইয়াসান আশ্রমের কথা বারান্তরে বল্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লো।

সনেট-গুচ্ছ

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

পয়ার

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী !
কত কাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরু-ধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতা-হাসিনী ?
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রা-বিনাশিনী,
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি' হৃদ্‌-পদ্মাসনে—
যে-বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হুতাশনে,
পশে পুনঃ রসাতলে—মানুষের মর্ম্ম-নিবাসিনী !

করি' উচ্চ শঙ্খধ্বনি, এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্তধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে,
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতি-ভঙ্গী ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে !
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর-নিক্কণ ?
কোথায় জাহ্নবী-ধারা—কূলে যার দেবতারা ভ্রমে ?

পৌর্ণমাসী

আজ দীর্ঘ পৌর্ণমাসী যাপিয়াছি বিজন-বাসরে—
সুন্দরের কোজাগর, নিদ্রাহারা নিদাঘ-শর্ব্বরী !
পরিণাম-রমণীয় দিবসের দীপ্তি অনুসরি'
উঠেছিল পূর্ণশশী মেঘমুক্ত গাঢ় নীলাম্বরে।
বিধু পিয়াইল যবে জ্যোৎস্না-সীধু যামিনী-অধরে—
খুলে' ছিঁড়ে' খসে' গেল তারকার সিঁথী সাতনরী !
তার পর সম্বরিল নীবি-বাস চমকি' শিহরি'—
হেরিয়াছি সেই রঙ্গ রূপসীর, প্রহরে প্রহরে !

শেষ হ'ল সুধাপান,—ম্লান হাসি আরও যে মধুর !
পাণ্ডুর কপোলতলে পূর্ব্বাশার আসন্ন আভাস,
একটি অশ্রুর মুক্তা দোলে হের, নয়নে বধূর—
পূর্ণ-সুখ পূর্ণিমার মুখে সে কি মাধুরী উদাস !
অস্ত গেল নিশানাথ, বনে বনে পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
দিগন্তে ছড়ায়ে প'ল বিধবার কৌটার সিঁদুর !

ভোরের আলো

নিশা অবসান হ'ল। যত পাখী আছিল যেখানে
ডাকিতেছে একসাথে, আনন্দের কি কলকূজন !—
দিকে দিকে মৌন-স্তব্ধ অপ্সরার নূপুর-নিক্কণ
স্ফটিক-আকাশে যেন সচকিত প্রতিধ্বনি হানে !
বাতায়নে দাঁড়াইনু শয্যা ত্যজি' উষার আহ্বানে,
শিশুর ক্ষীরাম্বুগন্ধী অধরের হাসি অতুলন
হেরিলাম দিবামুখে—প্রভাতের প্রথম কিরণ,
নিষ্কলঙ্ক,বর্ণহীন—শুধু আলো, নিশা-অবসানে !

সে যেন বিষ্ণুর বুকে নীলকান্ত কৌস্তভ-আভাস !
সৃষ্টির আহ্লাদ যেন, জগতের নিগূঢ় চেতনা !
পরিব্যাপ্ত বিভা শুধু ! জড়বক্ষে প্রাণের বিকাশ !
মৃত্যুময়ী ধরণীর শিরে যেন আশীষ-সান্ত্বনা !
সেই নির্ব্বিশেষ জ্যোতি ভরিয়াছে সকল আকাশ,
ভরিয়াছে মোর নেত্র সেই প্রভা স্নিগ্ধ নিরঞ্জনা !

বন-ভোজন

দিবা-বধূ পরিয়াছে বাকলের শাড়ী, কড়ি-হার,
আর্দ্র চুল এলো করি' খুলিয়াছে বিপুল কবরী—
তপন-প্রেয়সী আজ সাজিয়াছে মলিনা শবরী,
সিঁদুর মুছিয়া পরে কালাগুরু ললাটে তাহার !
আজ কাননের ভোজ, তারি হাতে করিবে আহার
যত বৃদ্ধ বনস্পতি ; তাই যত্নে অঞ্চল সম্বরি'
কটিতটে, সুবৃহৎ থালিকায় পায়সাম্বু ভরি,'
ফিরিছে নিকটে দূরে, গুণ্ঠন খসিছে বার বার।

হেরিতেছি সেই শোভা—ধরণীর সে বন-ভোজন !
নিদাঘার্ত্ত তরুরাজি, উপবাসে বিশীর্ণ মলিন—
কি হাসি বিকাশে মুখে, হেরিয়া পারণ-আয়োজন !
পল্লবে পল্লবে স্নিগ্ধ মেঘালোক কি বর্ণে বিলীন !
হরিত, ঈষৎ-পীত, কারো দেহ গাঢ় নীলাঞ্জন—
পিয়িছে শ্যামল-সুধা আঁখি মুদি', বিরাম-বিহীন !

জ্যোৎস্না-নিশুতি

রজনী গভীর হ'ল, কৃষ্ণপক্ষ-দ্বিতীয়ার শশী
উঠিয়াছে ঊর্দ্ধনভে—স্রোতোহীন নীলের পাথারে !
মন্ত্র-স্তব্ধ চরাচর, তরুশ্রেণী কাতারে কাতারে
দাঁড়াইয়া তন্দ্রাতুর—নিস্তরঙ্গ তিমির-সরসী !
মনে হয়, ধরা যেন শুক্লাম্বরা বিধবা-রূপসী—
এলাইয়া রুক্ষকেশ, অসহ্য সে বেদনার ভারে
পড়ে' আছে সংজ্ঞাহারা, রজনীর নিশুতি-আগারে—
ধূধূ করে রূপ-মরু দিশাহীন দিগন্ত পরশি' !

একি কান্তি ভয়ঙ্করী ! এর চেয়ে ভালো অন্ধকার,
প্রাণহীনা ধরিত্রীর সকরুণ লজ্জা-নিবারণ,
এযে মৌন-অট্টহাস, মরণের জ্যোৎস্না-জাগরণ !
যৌবন—দেহের ব্যাধি, রূপ যেন তাহারি বিকার !
মনে হয়, খুলে গেছে প্রকৃতির মুখ-আবরণ—
দিবসের লীলা-শেষে নিশাকালে একি হাহাকার !

শেষ-বাসর

আজ সখি, সাঙ্গ হ'ল আমাদের মিলন-বাসর ;
বাদলের কৃষ্ণা তিথি, আর্দ্রবায়ু উঠিতেছে শ্বসি,'
লুকায় মেঘের আড়ে পলাতক শীর্ণ ম্লান শশী,
তোমারও কাঁপিছে হিয়া—ওই বুঝি কাঁপিছে বেসর !
চুরি করে' এসেছিনু, ভেটিবারে নাহি অবসর—
জানো সে করুণ কথা, অয়ি মোর দুখের প্রেয়সী !
এবার সাজানু তোরে তাপসিনী ছন্দ-চতুর্দ্দশী,
বিনা ফুলে বিনাইয়া দিনু তোর কুন্তল ধূসর !

যদি পুন দেখা হয় চন্দ্র-কান্ত চৈত্র-রজনীতে,
ফুলে-ফুলে ভরি' দিব ফাগে-রাঙা বাসন্তী দুকূল,
গাব গান প্রাণ-ভরা, দুলি' দোঁহে স্বপ্ন-তরণীতে !
আজ জ্যোৎস্না ম্লান সখি, সুপ্ত অলি, মুদিত মুকুল—
ওই যে ডাকিছে পাখী সারারাত কাতর সঙ্গীতে,
ওরি সুরে রয়ে গেল এবারের বাসনা ব্যাকুল।

উপসঙ্গা

শ্রী সীতা দেবী

লম্বা গ্রীষ্মের ছুটী পাইয়া শিশু কন্যা ও পত্নী সহ হীরেন দেশে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। রেঙ্গুনে থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের স্বামীস্ত্রীর একেবারে অভক্তি জন্মিয়া গিয়াছিল। যেমন দেশ তাহার তেমন মানুষ! প্রভা ত মনে করিতেই পারে না যে, এই দীর্ঘ ব্রহ্মপ্রবাসের মধ্যে, সে দুইটা, বড় জোর তিনটার বেশী নূতন মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে। করিবার দরকারও সে বিশেষ অনুভব করিত না।

এবার বেশ কিছুকাল দেশে কাটাইয়া আসিবে আশা করিয়া, যথাসাধ্য জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া, বাদবাকি এক বন্ধুর বাড়ী রাখিয়া, বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া তাহারা যাত্রা করিল। কথা ছিল, ছুটী শেষ হইলে হীরেন ফিরিয়া আসিয়া মেসে থাকিবে, প্রভা পাঁচ ছয় মাস পরে একেবারে পূজার ছুটী পার করিয়া ফিরিবে।

গ্রীষ্মের ছুটী দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া আসিল, আর দিন দশ বাকি। আহারান্তে মাদুর পাতিয়া শুইয়া হীরেন খবরের কাগজ হাতে ঘুমের আয়োজন করিতেছিল। প্রভা খুকীকে কোলে করিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল। বলিল, "বাবা, যা গরম। দুপুর-বেলা আমার মাথা যেন পাগল হ'য়ে ওঠে। একটু যে ঘুমিয়ে কাটাব, তারও যো নেই, যা লক্ষ্মীর অবতার মেয়ে।" হীরেন বলিল, "ওকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও, তাহ'লে বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে পারবে। আমারও একটা দিনান্তে গল্প করবার লোক থাকবে।"

প্রভার মুখখানা একটুখানি ম্লান হইয়া আসিল, বলিল, "সত্যি, এইত সেদিন এলাম। এর মধ্যেই ফিরবার দিন এসে পড়ল। আবার সেই হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি, পুঁটলি বাঁধ আর খোল। জাহাজের ছোট খুপরী আর খুকীর চীৎকার মনে করলেই আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।"

হীরেন বলিল, "তোমার প্রাণ এখনি হাঁপাবার ত কোনো সঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যাবে ত ছ'মাস পরে। আমি বরং কাল সকালে একবার 'বার্থ এনগেজ' করার চেষ্টায় বেরলে পারি। সুখের বিষয়, আষাঢ় মাসে বঙ্গোপসাগরে ঘোল খাবার জন্যে কিছু যাত্রীর হুড়োহুড়ি প'ড়ে যাবে না।"

প্রভা মুখ আরো বেশী গম্ভীর করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ছ'মাস পরে যাব, না আরো কিছু! তোমায় রেজিষ্ট্রি ক'রে লিখে দিয়েছি আর কি!"

হীরেন একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তার মানে?"

প্রভা বলিল, "মানেটা ত বেশী কিছু শক্ত নয়। আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

অতিশয় ভীত সন্ত্রস্ত হইবার ভান করিয়া মাথায় হাত দিয়া হীরেন বলিল, "আঃ সর্ব্বনাশ। তাই নাকি?"

প্রভা বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ তাই। আপনার যে একেবারে মাথায় বাজ পড়ল দেখছি। ছুটীর পরে গিয়ে খুব ফুর্ত্তিতে কাটাবার সব ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলে বুঝি? আমি গেলে বাধা পড়বে?"

গৃহিণীর চোখে জলের আবির্ভাব হইতে আর দেরি নাই দেখিয়া হীরেন বুদ্ধিমানের মত সুর ফিরাইয়া লইল।

বলিল, "আচ্ছা, গেলেই না হয় ধরিলাম। বাড়ী ঘর ত সব ঘটা ক'রে উঠিয়ে দিয়ে এলে। এখন ফিরে গিয়ে উঠ্‌বে কোথায় শুনি? মেসে না দুর্গাবাড়ীতে?"

প্রভা সব কথারই উত্তর ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, সে বলিল, "কেন, গিয়ে মধু-বাবুদের বাড়ী উঠ্‌ব, তার পর বাড়ী খুঁজে নেব।"

হীরেন বলিল, "বাড়ী পাওয়া অমনি সোজা কিনা? বাড়ীওয়ালারা সব তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছে। হঠাৎ এমন মত পরিবর্ত্তন হ'ল কেন শুনি?"

উত্তরে শুনিল, যে, মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে গৃহিণীর খুসি। এবং কারণ যদি সে না বুঝিতে পারে তবে তাহার বুঝিয়া কাজ নাই।

বাহিরে মুখ হাঁড়ি করিয়া, এবং মনে অত্যন্ত খুসি হইয়া হীরেন ঘুমাইয়া পড়িল। বিকালে উঠিয়া, চা খাইয়া বলিল, "তাহ'লে একবার কেবিনের চেষ্টায় বেরনো যাক?"

প্রভা বলিল, "হ্যাঁ, আগের থেকে চেষ্টা করা ভাল, তা না হ'লে আবার এক কেবিনে জায়গা পাব না।"

হীরেন বলিল, "নাই বা পেলে? ছ'মাস দূরে থাক্‌বার ব্যবস্থা ছিল, তার জায়গায় তিনটা দিন কি আর থাক্‌তে পার্‌বে না?"

প্রভা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা, সেই ভয়ে ত আমি একেবারে ম'রে গেলাম। খুকীটা হাড় জ্বালিয়ে খায়, একলা সাম্‌লাতে পারি না, তাইনা। তা না হ'লে তিন দিন ছেড়ে, তেত্রিশ দিন তুমি থাকনা গিয়ে যেখানে খুসি।"

হীরেন বলিল, "স্ত্রী জাতি। এই পাঁচ মিনিট আগে ছেড়ে থাক্‌বার আতঙ্কে হাঁপিয়ে উঠেছিলে, আর এখনি উল্টো বক্তৃতা কর্‌ছ। তোমাদের বিশ্বাস কর্‌তে যে শাস্ত্রে মানা করেছে, তা ঠিকই করেছে।"

উত্তরে গুছাইয়া কিছু বলিবার না পাইয়া, প্রভা এমন মুখ করিয়া চলিয়া গেল যেন হীরেন এমনি একটা বাজে কথা বলিয়াছে, যাহার উত্তর দিবারও প্রয়োজন নাই।

বর্ষাকালে যাত্রীর ভীড় থাকে না, কাজেই এক কেবিনে জায়গা পাওয়া সহজেই ঘটিয়া গেল। দিন তিন চার ঢেউয়ের দোল খাইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন ভাবে, চতুর্থ দিনে তাহারা রেঙ্গুনে আসিয়া পৌছিল।

মধু-বাবুকে আগেই পত্র লিখিয়া হীরেন তাহাদের শুভাগমনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছিল। দেখা গেল, তিনি জাহাজ-ঘাটেই অপেক্ষা করিতেছেন।

পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া প্রভা আসিয়া মধু-বাবুর বাড়ী উঠিল বটে, কিন্তু দুদিন যাইতে-না-যাইতেই তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। মধু-বাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া রেঙ্গুন সহরে বাস করেন, সম্বল মাত্র দু-শ' টাকার চাকরী। কাজেই প্রচুর বাড়ীভাড়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়া যে কাঠের খাঁচাটিতে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আলো এবং বাতাসের কোনো স্থান নাই। ভাড়া দেয় না বলিয়াই যেন তাহাদের প্রবেশ নিষেধ হইয়া গিয়াছে। একপাল লোকের মধ্যে শিশু কন্যা সহ প্রভার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। এমন ভাবে থাকা তাহার কোনোকালে অভ্যাস নাই। ছেলেমেয়েগুলির চীৎকার আর হুড়াহুড়িতে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। নিজের মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে তান ধরিয়া, তাহার দুর্গতির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া দিল।

এত লোকের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত সাক্ষাতের কোনো উপায় ছিল না। খাইবার সময় ভিতরে আসিয়া হীরেন স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি, তোমার অসুখ করেছে নাকি?"

প্রভা বলিল, "না, কিন্তু দোহাই তোমার যেমন হোক, বাড়ী একটা শীগ্‌গির ঠিক কর। এখানে আর দু'দিন থাক্‌লে আমি নিশ্চয় ক্ষেপে যাব।"

হীরেন বলিল, "তখনই বলেছিলাম এমন অব্যবস্থার মধ্যে এসো না। তা, কারো কথা শুন্‌বার মেয়ে ত তুমি নও। বাড়ী এখন হুট্‌ কর্‌তেই কোথায় পাই?"

কিন্তু প্রভার মুখ দেখিয়া তাহার কষ্ট হইতেছিল। আহারান্তে স্ত্রীকে না বলিয়াই সে বাড়ীর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

বিকালবেলা আসিয়া মধু-বাবুর বড় মেয়েকে দিয়া প্রভাকে

বাহিরের ঘরে ডাকাইয়া পাঠাইল। সে আসিলে বলিল, "দেখ, বাড়ী একটা পাওয়া গেছে—নং ষ্ট্রীটে। তোমার হয়ত পছন্দ হবে না, কিন্তু সম্প্রতি ত আর কোনো বাড়ী খালি দেখ্‌ছি না।"

প্রভা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "যে কোনোরকম বাড়ীই আমার এখন পছন্দ হবে। তার চারটে দেয়াল আর একটা ছাদ আছে ত?"

হীরেন বলিল, "প্রথমে উৎসাহ দেখাতে তুমি কখনও ত্রুটি ক'র না, কিন্তু উৎসাহটা পাঁচ মিনিটের বেশী টেঁকে না, এই যা দুঃখ। একটু দেখে শুনে তারপর চল, বাপু। গিয়েই যে বল্‌বে ফের বাড়ী বদল কর, তা হ'বে না। আমার দুদিন বাদে কলেজ খুল্‌বে, অত টো টো ক'রে ঘুর্‌বার সময় পাব কখন?"

প্রভা একটু দমিয়া গিয়া বলিল, "কেন বাড়ীর খুঁৎটা কি?"

হীরেন বলিল, "বাড়ীর খুঁৎ বিশেষ কিছু না, ভাড়ার পক্ষে ভালই। দুটো ঘর বড়, আলো বাতাস আছে, নূতন বাড়ী, ছারপোকা-আরশুলার আড্ডা নয়। কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশী ভাল না। পিছন দিকটা যত মুসলমান আর মান্দ্রাজীর বাস, পাশে থাকে ফিরিঙ্গী। সেইটিই নাকি সব-চেয়ে ভয়ানক। যে ঘরে আমরা যাব ভাব্‌ছি, তাতে আগে এক বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন, এই ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে পালাচ্ছেন। কালই তিনি যাবেন সকালে, সুতরাং ইচ্ছা কর্‌লে তুমিও কাল যেতে পার। তবে এইটা বুঝে যেও।"

প্রভা একটু ভীত ভাবে বলিল, "সাহেবটা কি খুব মাতাল?"

হীরেন হাসিয়া বলিল, "সাহেবও নয়, মাতালও নয়।" প্রভা অবাক্ হইয়া বলিল, "তবে কি?"

হীরেন বলিল, "কালো মেম সাহেব। অতি উগ্রচণ্ডা। ভয়ে কেউ তার সাম্‌নে এগোয় না।"

প্রভা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "ওমা, মেয়েমানুষ, তাকে এত ভয়? তুমি বাড়ী নাও গো, আমি বেশ থাক্‌তে পার্‌ব। ঝগড়া ক'রে না পারি, ভাব ক'রে নেবো।"

হীরেন হাসিয়া বলিল, "সেই ভাল। ঐ ক'রেই ত তোমরা নামে অধীন হ'য়েও, কার্য্যতঃ প্রভু হ'য়ে আছ। আচ্ছা, তাহ'লে গোছগাছ ক'রে নাও, আমি সেই ভদ্রলোককে কথা দিয়ে আসি।"

পরদিন সকালে আহারাদি করিয়া সকলের কাছে বিদায় লইয়া হীরেনরা নূতন বাসার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। গাড়ীতে উঠিয়াই প্রভা বলিল, "বাঁচলাম বাবা।"

হীরেন বলিল, "আগে বাড়ীতে তিন রাত্রি কাটাও, তার পর বোঝা যাবে, বাঁচলে কি মর্‌লে।"

বাড়ীতে ঢুকিয়াই, স্তূপাকার জিনিষ পত্র আর আসবাব গোছাইতে প্রভা এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িল, যে, পাড়া প্রতিবেশী দেখিবার তাহার একটুও সময় হইল না। সারাদিন অবিশ্রান্ত খাটিয়া রাত্রে সে কোনো মতে দুইটা ভাত মুখে গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন ঘুম ভাঙিল তাহার অনেক বেলায়। বেলাটা আরো যথেষ্ট বেশী হইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একটা চেঁচামেচির শব্দে তাহার ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। গলাটা পুরুষালি ধরণের মেয়ের। প্রথম কথাই সে শুনিল, "How dare you? It is my money, not yours!"

তারপরই ঝন্‌ঝন্ করিয়া একটা চীনামাটির বাসন ভাঙিয়া পড়িল।

প্রভা তাড়াতাড়ি খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। খোলা জান্‌লা দিয়া পাশের বাড়ীর দিকে তাকাইয়া দেখিল, তাহাদেরও জান্‌লা খোলা, কিন্তু একটা আধ-ময়লা ছিটের পরদা ঘরটার আব্‌রু রক্ষা করিতেছে। ঘরের ভিতর যে একটা হুড়াহুড়ি দাপাদাপি চলিতেছে, তাহা বেশ বোঝা গেল। প্রভা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের জান্‌লাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

জান্‌লা বন্ধ করার শব্দে জাগিয়া উঠিয়া হীরেন্দ্র বলিল, "কি অত ঘটা ক'রে জান্‌লা বন্ধ কর্‌ছ কেন? বৃষ্টি সুরু হয়েছে নাকি?"

প্রভা বলিল, "বর্ষণ নয়, গর্জ্জন।" তাহার স্বামীর তখনও বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, সে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "পাশের বাড়ীর বুঝি? দিলে ভোরবেলা ঘুমটা ভাঙিয়ে।"

"আহা, কিবা ভোর, আটটা বেজে গেছে কোন্‌কালে।" বলিয়া প্রভা রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি চায়ের জোগাড় করিতে ও ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিতে গেল।

চাকরটা তাহার অনেককালের, তাহাকে বেশী কিছু দেখাইয়া দিতে হইত না। কাজেই ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিয়া, চা খাইয়া এবং বাজারের পয়সা দিয়া প্রভা অনেকখানি নিশ্চিন্ত মনে সাম্‌নের ছোট বারান্দাটিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীখানার সাম্‌নে, রাস্তার ওপাশে একটি খৃষ্টিয়ান মিশনারী স্কুল। গাছের সারে তার সাম্‌নের দিকটা অনেকটাই ঢাকা, বাড়ীখানা বিশেষ চোখে পড়ে না। মেয়েদের খেলিবার মাঠটা অনেকখানি দেখা যায়। তখনও স্কুল বসিতে অনেক দেরী, মেয়েরা আসিয়া জুটে নাই, কেবল বোর্ডিংএর দুই চারিটি ছোট ছোট মেয়ে দোল্‌নায় ছলিয়া ও একটা কাঠের তক্তায় চড়িয়া খেলা করিতেছিল। প্রভাদের বাড়ীর নীচের তলাটা সবটাই দোকান, মুসলমান দোকানদার লুঙ্গি ও টুপি পরিয়া, বাহিরে একটা ভাঙা টুল লইয়া বসিয়া আছে।

তাহার একপাশে দোতলায় একটি মান্দ্রাজী পরিবার ও তিনতলায় একটি মেম সাহেব থাকে বোঝা গেল। মান্দ্রাজীর বারান্দায় একপাল ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ছেলেমেয়ে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় মহা কলরব করিয়া খেলা করিতেছিল। মেমটি একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই ভিতরে চলিয়া গেল।

প্রভা যতক্ষণ ইহাদের দেখিতেছিল, ততক্ষণ অন্য পাশের বারান্দা হইতে দুইজোড়া চোখ তাহাকেও যে খুব ভাল করিয়া দেখিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ এধারে মুখ ফিরাইতেই সে দেখিতে পাইল, একটি বছর চল্লিশ বয়সের স্ত্রীলোক, কোমরে দুই হাত দিয়া দাঁড়াইয়া, তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছে। পরণে তাহার মেমের পোষাক, রংটা বেশ কালো, মুখ দেখিয়া বুঝিবার যো নাই তিনি কোন্ জাতীয়া। দো-আঁশ্‌লা হওয়াই সম্ভব, ব্রহ্মদেশের রক্ত যে তাঁহার শরীরে খানিকটা আছে, তাহাও বোঝা যায়। চোখ দুইটা ছোট, মুখ দেখিলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড রাগী। ইনিই যে সেই স্বনামধন্যা মহিলা, তাহা বুঝিতে প্রভার দেরি হইল না। ফিরিঙ্গী মহিলার পিছন হইতে আর-একটি অল্পবয়স্কা মেয়েও প্রভাকে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হয়, সে বয়োজ্যেষ্ঠাটিরই ছোট বোন। প্রভা তাহাদের দিকে ফিরিতেই তাহারা গুরুগম্ভীর ভাবে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

প্রভা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, হীরেন খাট ছাড়িয়া উঠিয়া, চা খাইবার জোগাড় করিতেছে। স্ত্রীকে দেখিয়া বলিল, "এতক্ষণ অত মন দিয়ে কাকে দেখছিলে?"

প্রভা বলিল, "যাঁর গুণের সৌরভে মুগ্ধ হ'য়ে এখানে এসেছি, তাঁকেই।"

হীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম? প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়া চলে?"

প্রভা বলিল, "আমি ত পড়িনি, তবে তুমি চেষ্টা ক'রে দেখতে পার।"

হীরেনের সেদিকে বিশেষ উৎসাহ আছে বলিয়া মনে হইল না। সে চা-পানান্তে, কাপড় জামা বদ্‌লাইয়া বাহির হইয়া গেল।

মেয়েকে সকালের খাওয়া খাওয়াইয়া প্রভা একটু রান্নাবান্নার তদারক করিতে চলিল। রান্নাঘরের পিছনে একটি বারান্দা, একটি ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়া তাহাতে ওঠা যায়। প্রভা বাহির হইয়া দেখিল, বাড়ীটার মস্ত গুণ এই যে, পিছনে রেঙ্গুনের বিখ্যাত কাঁচড়া গলি নাই। বাংলা দেশ হইতে আসিয়া প্রথমেই এই আঁস্তাকুড়ের অত্যাচারে প্রভা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। রেঙ্গুনের সর্ব্বত্রই প্রায় দুই সার বাড়ীর মাঝখানে এই জাতীয় একটি গলি থাকে। দুই পাশের বাড়ীর সব ক'টি তলা হইতে তাহার মধ্যে সর্ব্বজাতীয় ময়লা এবং আবর্জ্জনা বর্ষিত হয়। ম্যুনিসিপ্যালিটির মেথর সকালে একবার তাহা পরিষ্কার করিয়া যায়, কিন্তু পাঁচ মিনিট যাইতে-না-যাইতেই তাহা আবার উনুনের ছাই, উচ্ছিষ্ট ডাল, ভাত, তরকারী, ঘর ঝাঁট দেওয়া ধূলা, বালি, কাগজের টুক্‌রা এবং দুই সার বাড়ীর শিশুদের বিষ্ঠায় ভরিয়া ওঠে। নীচের তলায় অধিকাংশ স্থলেই ব্রহ্মদেশীয়েরাই বাস করে, কারণ তাহারা সিঁড়ি ওঠা-নামা করিতে একান্তই নারাজ। তাহাদের কিন্তু এই আবর্জ্জনা

স্তূপের মধ্যে বাস করিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি দেখা যায় না। প্রভা প্রায়ই দেখিত ঐ সুগন্ধে আমোদিত গলির ময়লার রাশের মধ্যে কোনো মতে একটুখানি স্থান করিয়া লইয়া কোনো একটি বর্ম্মিনী লোহার উনুনে রান্না করিতে বসিয়া গিয়াছে। উপর হইতে এখনি যে তাহার ডেক্‌চিতে অতি অকথ্য রকম ময়লা আসিয়া পড়িতে পারে, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই নাই। দেখিয়া প্রভার গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিত, ভাবিত, "তোমরা কেবল পালিশ ক'রে খোঁপা বাঁধতে, আর রং বেরঙের রেশমী লুঙ্গি পরতেই শিখেছ, কিন্তু আসলে এতবড় পেত্নীর জাত জগতে নেই।"

এ বাড়ীটিতে ময়লা ফেলিবার গলি নাই, দেখিয়া সে খুসিই হইল। পিছনে একটা উঠানের মত জায়গা, সেখানে তিন চার সার তারের উপর নানা রংএর এবং নানা ফ্যাশনের কাপড় শুকাইতেছে। প্রভা বুঝিল পাশেই কোথাও ধোপার আড্ডা আছে। উঠানের পরেই কতকগুলি কাঠের ঘর, তাহাতে বাড়ীওয়ালার দারোয়ান চাকর প্রভৃতি থাকে, দুচার ঘর গরীব ভাড়াটিয়াও থাকে। প্রভার আগমন জানিতে যে এ পাড়ায় কাহারও বাকি নাই, তাহা সে বাহির হইয়াই বুঝিতে পারিল। কাঠের ঘরের দোতলা হইতে একটি পশ্চিমী মুসলমান স্ত্রীলোক তাহাকে এক দৃষ্টে দেখিতেছিল। তাহার কোলে একটি ক্ষুদ্র শিশু। স্ত্রীলোকটির বয়স হইয়াছে, সাম্‌নের চুল কিছু কিছু পাকা। প্রভাও তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া, সে ভাব জমাইবার ইচ্ছায় এক গাল হাসিয়া বলিল, "সেলাম, আম্মা।" কি ভাবে তাহার সহিত আলাপ করিবে ভাবিতেছে এমন সময় ঘোরতর কালো রংএর একটি মান্দ্রাজী বালিকা, এক রকম ছিট্‌কাইয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। উঠানের মধ্যে পড়িয়া, পা আছ্‌ড়াইয়া সে যেরকম তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল, তাহাতে বোঝা গেল ঘরের ভিতর একটা বিষমরকম বিপ্লব বাধিয়া থাকিবে।

হঠাৎ পাশের বারান্দায় সেই কালো মেমসাহেব আসিয়া দাঁড়াইল। চীৎকার করিয়া বলিল, "এ মান্দ্রাজী শূয়ারকা জাত, ক্যা দিনরাত চিল্লা-চিল্লি কর্‌তা? চুপ্‌সে রহো।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই বালিকার অমন প্রবল আর্ত্তনাদ একেবারে থামিয়া গেল। তাহার মাও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া মেয়েকে হিড়্‌হিড়্ করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। প্রভার মেয়েও মায়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দুজনের দিকে আগের মত গম্ভীর ভাবে



হঠাৎ বারান্দায় সেই কালো মেম সাহেব আসিয়া দাঁড়াইল

তাকাইয়া মেমসাহেব ঘরে চলিয়া গেল। প্রভা দেখিল, মহিলাটি মিথ্যা খ্যাতি অর্জ্জন করেন নাই। গালাগালির ওস্তাদী অন্ততঃ তাঁহার যথেষ্টই আছে।

সেদিন আর উগ্রচণ্ডার বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বেলা বারোটা-একটায় দরজা জান্‌লা বন্ধ করিয়া তিনি গাড়ী চড়িয়া কোথায় যেন বাহির হইয়া গেলেন। রাত্রে প্রভারা ঘুমাইবার পর ফিরিয়া থাকিবেন, কারণ, তাঁহার আগমন-সংবাদ তাহারা জাগিয়া থাকিতে আর পাইল না।

পরদিনও দিনের বেলাটা একরকম কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার সময় পাশের বাড়ীতে আবার আসর জমিয়া উঠিল। কলহের

শব্দে ছুটিয়া আসিয়া প্রভা পরদার এ পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, মেমের শয়নকক্ষে রীতিমত মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। একটি ছোক্‌রা সাহেবের গলার গলাবন্ধ মুঠি করিয়া ধরিয়া মেমসাহেব তাহাকে অনবরত চড়



ছোক্‌রা সাহেবের গলাবন্ধ ধরিয়া চড় লাগাইতেছেন

লাগাইতেছেন, সাহেব কি যেন একটা বলিয়া প্রাণপণে তাঁহার কবল হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা করিতেছে। মাঝে মাঝে সেও মেমের পিঠে দুই একটা কিল লাগাইতেছে কিন্তু বীররসে মাতিয়া তিনি তাহা গ্রাহ্যও করিতেছেন না। অল্পবয়স্ক মেয়েটি চুপ করিয়া অন্য ঘরের জানলার ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

বাঙালীর মেয়ে প্রভার এ রকম দৃশ্য দেখা অভ্যাস ছিল না। পুরুষ মানুষে মারে এবং মেয়ে মানুষে মার খায়, এই তাহারা জানে। হঠাৎ এ রকম ব্যাপার দেখিয়া সাহেবটার জন্য তাহার মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। জান্‌লা বন্ধ করিয়া সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের বারান্দায় পূর্ব্ব দিনের দৃষ্ট সেই মান্দ্রাজী বালিকাটি দিব্য জমাইয়া বসিয়া আছে। ইহা যেন তাহার বাপ-দাদার ঘর। তাহার বেশটি একটু নূতন ধরণের। মাথার চুল খুব টানিয়া বাঁধা, কিন্তু তাহার খোঁপার উপর মস্তবড় এক লাল রিবনের ফুল সেফ্‌টিপিন দিয়া আট্‌কানো। কানে লাল পাথরের ফুল, হাতে পাঁচ ছয় গাছা করিয়া কালো কাঁচের চুড়ী, পায়ে রূপার মল। পরণে একটি বেগুনী রংএর ফ্রক, উহা তাহার গোড়ালী পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। পায়ে মলের উপরেই একজোড়া জুতা। অত্যন্ত পাকা গিন্নির মত মুখ করিয়া সে বসিয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া প্রভার অত্যন্ত হাসি পাইল। সে কিন্তু প্রভাকে দেখিয়া দিব্য সপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আম্মা, আণ্ডা মাংতা? হামরা মাকো পাশ বহুৎ আণ্ডা হ্যায়; রোজ ফজরমে হামরা বাবা একঠো খাতা, মা একঠো খাতা, হাম্‌কো আধাঠো দেতা, মগর, হাম্‌রা চাচা লোগকো একদম নেহি দেতা।"

প্রভা তাহার কথার কিছু উত্তর দিবার আগেই বালিকার মা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চেহারাটা নিতান্ত মন্দ না। পরণে বিশাল লালপাড়যুক্ত হল্‌দে রংয়ের শাড়ী, কানে দুই সার সোনার মাক্‌ড়ী, নাকেও দুই ধারে দুইটা নাক-ফুল। বালিকার হাত ধরিয়া এক টান দিয়া উঠাইয়া বলিল, "ছোক্‌রী বহুৎ বদ্‌মাস হ্যায় আম্মা, সব আদ্‌মী কো সাথ আকে বাত্‌ করেগা, কোই কো নেহি ডর্‌তা।"

প্রভা বলিল, "উয়ো ঘরকো মেমকো ত বহুৎ ডর্‌তা?"

মান্দ্রাজী রমণীটি বলিল, "উয়ো মেম? উয়ো আদ্‌মী নেহি, শয়তান হ্যায় আম্মা! মরদ লোককোভি পকড়কে আচ্ছা সে মার্‌তা।"

মান্দ্রাজীনীর কাছে প্রভা শুনিল যে সাহেব ছোক্‌রা ঐ মেমের স্বামী। বসিয়া বসিয়া স্ত্রীর পয়সায় খায় বলিয়া চাট্‌নী স্বরূপ মারধোরও তাহাকে মাঝে মাঝে হজম করিতে হয়। ছোট মেয়েটি মেমের বোন্। তিনিও ভগিনীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হননা! চাকর-বাকর কেহ ভয়ে এ বাড়ীতে আসেনা বলিয়া, সব কাজকর্ম্ম ইঁহারা নিজেরাই করেন। মেমসাহেব পোষাক শেলাই করেন, তাহাতেই ইঁহাদের সংসার চলে। সাহেবটি ফুর্ত্তি করিয়া বেড়ায়,

এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর প্রহার খায় ও তাঁহাকেও প্রহার করিবার চেষ্টা করে।

উগ্রচণ্ডার মেজাজ সেদিন বড়ই সপ্তমে চড়িয়াছিল, রাত্রেও তাঁহার কাংসকণ্ঠের চোটে প্রভার ঘুম ভাঙিয়া গেল। মহিলাটি থাকেন দোতলায়, তিনতলায় এক গুজরাটী পরিবার বাস করে, তাহাদের অনেকগুলি ছেলে মেয়ে। রাত্রে তাহারা একটু বেশী উৎসাহে খেলা করিতেছিল। হঠাৎ চীৎকার শোনা গেল, Damned Madrasi swine! একদম্ শোনে নেহি শেক্‌তা! ক্যা উপর ধুম্ ধুম্ কর্‌তা?" সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেবের শয়নকক্ষের জানলাটা হড়াৎ করিয়া খুলিয়া গেল, এবং অকথ্য ইংরেজী এবং রেঙুনী হিন্দিতে অনবরত গালাগালির স্রোত বহিয়া চলিল।

প্রভা বলিল, "মাগো মা, উপরের মানুষগুলো কি? এসে ওর দাঁত ক'টা কিলিয়ে ভেঙে দিতে পারে না? এত মা বাপ তোলা গাল হজম করছে কি ক'রে? আমি যে বাঙালীর মেয়ে, আমারই রক্ত গরম হ'য়ে উঠ্‌ছে। তোমার রাগ হচ্ছে না।"

হীরেন বলিল, "ওরা যদি দিব্য গাল হজম করতে পারে ত করুক না? আমি ওদের হ'য়ে রাগ করতে যাই কেন? আমি কেবল ভাবছি, যে, এই কালিন্দী মেম সাহেবটি ভারতীয়মাত্রকেই মান্দ্রাজী ঠিক কর্‌ল কি ক'রে?"

প্রভা বলিল, "ওপরের গুজরাটীগুলির জুতার তলায়ও মেম দাঁড়াতে পারে না। হিংসেয় বোধ হয় জ্ব'লে মরে তাই অত গাল দেয়। তা না হ'লে ছেলেপিলের হুড়োহুড়িতে মেয়ে-মানুষের মাথায় ঘুম চ'ড়ে যায়, এতো কখনও দেখিনি। আমার নন্দিনীটিরও সাপ্তাহিক চীৎকারের রাত ত ঘনিয়ে এল, সেদিন বোধ হয় মেম আমার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করবে।"

হীরেন বলিল, "খুব ত সাহস দেখিয়ে এলে, এখন কেমন ক'রে আত্মরক্ষা কর দেখা যাবে। আমি কিন্তু মোটেই এগোবোনা, তা ব'লে রাখছি।"

প্রভা বলিল, "আচ্ছা, এগিয়োনা। তুমি কি ভাব্‌ছ আমার সাহায্য করবার লোক নেই? আমার আয়াকে সেই রাত্রে রেখে নেব এখন। সে গালাগালিতে মেম সাহেবকেও হার মানাতে পারে। আর হাতাহাতি হয় যদি, ত আমি নিজেই পার্‌ব। পশ্চিমে মানুষ হয়েছি বাপু, কোনো কালো পেত্নীকে ডরাই না।"

হীরেন হাসিয়া বলিল, "দেখাই যাবে।" কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রণরঙ্গিনীর সঙ্গে প্রভার যুদ্ধে ডাক পড়িল না। তাহার মেয়ে রাত্রে যথারীতি চীৎকার করিয়া গেল, এবং সারা রাত মা বাবাকে নাচাইয়া ফিরিয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু এত গোলযোগের মধ্যেও পাশের বাড়ীর মেম সাহেব দিব্য ঘুমাইয়া রহিলেন। বেলা ন'টায় ঘুম হইতে উঠিয়া প্রভা বলিল, "থাক্, মেম সাহেব মান্দ্রাজী না হ'লে গাল দেন না বোঝা গেল। কিন্তু গুজরাটীকে তিনি যখন মান্দ্রাজী ভাবেন, তখন বাঙালীকেও মান্দ্রাজী ভাবতে তাঁর বেশী কষ্ট পেতে হ'ত না।"

হীরেন বলিল, "ছোট ছেলের কান্না ভেবে হয়ত কিছু বলেনি।"

প্রভা বলিল, "থাক্ না। ওর মধ্যে অতটুকু মনুষ্যত্ব আছে কিনা? সেদিন উপর তলার ছেলেদের গোলমালে গাল দিল না?"

হীরেন বলিল, "গোলমালে তার মা-বাবাও বেশ খানিকটা যোগ দিয়েছিলেন। আর গাল ত ও ছেলেদের দেয়নি, দিচ্ছিল তার মা-বাবাকেই। অথবা এও হ'তে পারে, তিনি গত রাত্রে খুব বেশী খোশ মেজাজে ছিলেন।"

হঠাৎ রাস্তায় বিকট কোলাহল শুনিয়া স্বামী স্ত্রী দু-জনেই ছুটিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল। দেখা গেল মেম সাহেবের মেজাজ রাত্রে যেমনই থাকিয়া থাক, সকাল বেলায় মোটেই প্রসন্ন নাই। গাড়ী চড়িয়া সবে তিনি কোথা হইতে ফিরিয়াছেন এবং বারান্দায় দাঁড়াইয়া গাড়ীওয়ালাকে তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির নমুনা দিতেছেন। গাড়ীওয়ালাকে চার আনা মাত্র পয়সা দেওয়ায় সে তাহা লইতে অস্বীকার করিতেছে, মেম তাহাকে বুঝাইতেছেন যে কুলীর গাড়ীকে তিনি ইহার বেশী দিতে পারেন না। "চলা যাও ম্যান্, চলা যাও। কুলী গাড়ীকো কেতনা মিলেগা? ক্যা ইয়ে তুমারা মোটর গাড়ী হ্যায়?"

ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "আরে বহুৎ বড়া মেম হ্যায়! মোটর মে তুম্ কভি চড়া মেম্?"

মেম সাহেব ঘরে ঢুকিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই বাহির হইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা খালি condensed milk এর টিন ঠন্ করিয়া গাড়ীওয়ালার কামানো মাথার উপর আসিয়া পড়িল। দর্শকবৃন্দ সমস্বরে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। গাড়োয়ান সুবিধা নয় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ীর উপর চড়িয়া বসিল এবং মেম সাহেবের উদ্দেশে অতি অশ্রাব্য গালিবর্ষণ করিতে করিতে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। "হাম্ অভি যাতা থানামে রিপোর্ট করনে কো।" রাস্তার লোকে হাসিয়া বিদায় হইল।

প্রভা বলিল, "লক্ষ্মীছাড়ীকে চুলের মুঠি ধ'রে কেউ আচ্ছা করে দু-ঘা দেয় ত আমি তাকে বক্‌শিস্ দিই। সবাই এটাকে এত ভয় করে ব'লে এর আস্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যাচ্ছে। আজ গাড়োয়ানকে মার্‌ছে, কাল ভদ্রলোককে ঠ্যাঙাবে।"

হীরেন বলিল, "পুরুষ মানুষের জাত কি রকম chivalrous দেখলে? টিন্ ছুঁড়ে মার্‌লেও ফিরে মারে না।"

প্রভা বলিল, "মুখে আগুন chivalryর। ওটা কি মেয়ে মানুষ নাকি? আর জন্মে ভাল্লুক ছিল নিশ্চয়।"

মেমসাহেবের মেজাজ বড় অল্পেই ওঠে-নামে দেখা গেল। চা খাইয়া, সাম্‌নের ঘরে আসিতেই প্রভা শুনিতে পাইল তিনি বেশ মোলায়েম গলায় আয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বেবী রাত্রে এত কান্নাকাটি করিয়াছে কেন? প্রভা ভাবিল, "একটু মেয়ে মানুষের প্রাণ ধড়ে আছে দেখছি।" আয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল মেমসাহেবের বেশ ভাল ওষুধ জানা আছে বাচ্চাদের পেট-ব্যথার। দরকার হইলে তাঁহার কাছ হইতে আনা যাইবে।

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল। উগ্রচণ্ডার কল্যাণে মাঝে মাঝে বিনা পয়সায় তামাসা দেখা যাইত বলিয়া প্রভার দিনগুলা নিতান্ত একঘেয়ে ভাবে কাটিত না। বারান্দায় চেয়ার লইয়া বসিয়া সে ইঁহার কাণ্ড-কারখানা দেখিত। সাহেবটির বিশেষ কাজ কর্ম্ম না থাকায়, তিনিও বেশীর ভাগ সময় বারান্দায় দাঁড়াইয়া আসের-পাশের লোক দেখিতেন; তাঁহার উৎপাতে প্রভাকে মাঝে মাঝে ঘরে চলিয়া আসিতে হইত। তবে স্ত্রী ঘরে থাকিলে সাহেব ভরসা করিয়া আর প্রতিবেশিনী দর্শনে বাহির হইতেন না। সাম্‌নের ঘরে একটা গ্রামোফোন শোভা পাইত, তাহাতে বিলাতী হাল্‌কা নাচের সুর বাজাইয়া, মনের দুঃখে একলাই ঘরময় নাচিয়া ফিরিতেন। মেম সাহেব ইচ্ছা করিলেই নাচের দোসর হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সেরূপ কোনো ইচ্ছা দেখা যাইত না। পিছনের ঘরে সেলাইয়ের কল টানিয়া লইয়া বসিয়া তিনি অত্যন্ত উৎসাহ-সহকারে সেলাই করিয়া যাইতেন, এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া স্বামীর নাচের তাল ভঙ্গ করিয়া দিতেন।

কত রকম-বে-রকমের মানুষই যে ইঁহার কাছে পোষাকের অর্ডার দিতে আসিত, তাহাও প্রভার এক দেখিবার জিনিষ ছিল। দুইটি অতিকায় মেমকে প্রায়ই দেখা যাইত। তাঁহাদের দোতলার সিঁড়ি উঠিতেই লাগিত পুরা দশ মিনিট। তারপর মিনিট পাঁচ চেয়ারে বসিয়া তাঁহারা হাঁপাইতেন, অতঃপর আসিত কাজের কথা। অন্য মানুষে যেমনই কাপড়ের ফরমাইশ্ দিক, ইঁহারা সর্ব্বদাই খুব ডগ্‌ডগে রঙের পাতলা কাপড়ের পোষাকের ফরমাইশ্ দিতেন। তাহার ঘাঘরা হইত অতি ছোট, এবং উপরেও যে খুব বেশী কিছু থাকিত তাহা নহে। উগ্রচণ্ডা খুব গম্ভীরভাবে ইঁহাদের কথা শুনিয়া যাইতেন, সম্ভবতঃ ইঁহারাই তাঁহার সবচেয়ে বড় মানুষ খরিদ্দার, কাজেই খাতির না করিয়া উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর প্রায়ই ইহার হাঁড়িমুখে একটু হাসি দেখা যাইত।

সেদিন সন্ধ্যাটা বর্ষাকালের পক্ষে বেশ একটু পরিষ্কার ছিল। এমন সময়টা বিফল হইতে না দিয়া প্রভা আর হীরেন বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। তাহাদের মেয়ে অনেক আগেই তাহার চট্টগ্রামবাসী বাহনটির কাঁধে চড়িয়া ভ্রমণে চলিয়া গিয়াছিল। বাড়ী আগ্‌লাইতে রহিল কেবল আয়া।

বেড়াইয়া এবং বায়োস্কোপ দেখিয়া প্রভারা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত প্রায় ন'টা। গাড়ীখানা বাড়ীর কাছাকাছি আসিতেই হীরেন বলিয়া উঠিল, "ওরে বাপ্‌রে, বাড়ীর সাম্‌নে লোক ত মন্দ জমা হয়নি, ব্যাপারখানা কি?"

প্রভা আতঙ্কিত হইয়া বলিল, "ওমা, আমার বাড়ীতে কিছু হয়নি ত? মেয়েটাকে রেখে গিয়েছি।"

হীরেন বলিল, "এখানে লোক জমা কর্‌বার জন্যে আমার মেয়ের ডাক পড়্‌বে না। আমাদের গুণবতী প্রতিবেশিনীই রয়েছেন।"

প্রভা বলিল, "কিন্তু আয়াকে বারান্দায় দেখছি না যে? সে ত রাস্তায় একটা কিছু শব্দ শুন্‌লেই তখনি ছুটে এসে হাজির হয়।"

বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী দাঁড়াইতেই তাহাদের মিথ্যা আশঙ্কাটা দূর হইয়া গেল। প্রভার ঘরের নীচেই যে দোকান, তাহারই সাম্‌নে দাঁড়াইয়া দুই হাত কোমরে দিয়া মেমসাহেব এক বিচিত্র নাচ নাচিতেছেন, এবং তাঁহার মুখ হইতে হিন্দী, ইংরেজী এবং বর্ম্মায় অনর্গল গালাগালি বাহির হইতেছে। তাঁহার সাহেব স্বামীটি সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বীরাঙ্গনা স্ত্রীর সাহায্যে অগ্রসর হইবেন, না, সোজাসুজি উপরে চম্পট দিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন। আশে-পাশের যত দোকানদার, কুলী, মজুর, রিক্‌শওয়ালা, সব ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

প্রভা এবং হীরেন গাড়ী হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। বারান্দায় আসিয়া তাহারা নীচের বীররসাত্মক অভিনয়টির কারণ অনুসন্ধান করিতে দাঁড়াইল।

শোনা গেল মেমসাহেবের একটি ভাগ্নে প্রায়ই এ বাড়ীতে আসে যায়। সে নীচের দোকান হইতে চার আনার সোডাওয়াটার কিনিয়া খাইয়াছে এবং পয়সা দেয় নাই। দোকানওয়ালা পয়সা চাওয়াতে বলিয়াছে যে, তাহার মাসী দিবে। মাসীমার কাছে পয়সা চাওয়ায় তিনি স্বভাবোচিত মধুর ভাবে জানাইয়াছেন যে, জিনিষ যখন তিনি লন নাই, তখন পয়সা দিবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন না। দোকানওয়ালা দুই চারি দিন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া চুপ করিয়াছিল। আজ বিকালের দিকে মস্তবড় এক ট্রাঙ্ক লইয়া উগ্রচণ্ডা সম্ভবতঃ কাপড় কিনিতে বাজার যাইতেছিলেন। দোকানদারের হঠাৎ মনে হইল মেম বুঝি প্রস্থান করিতেছেন, তাহার চার আনা পয়সা জলেই গেল। ঝোঁকের মাথায় সে বলিয়া বসিল, "এই গাড়োয়ান, গাড়ী রোকো। মেমসাহেব, হামরা পয়সা দে কে যাও।"

ইহাতেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। মেম বাজার যাওয়া সেদিনকার মত স্থগিত রাখিলেন। ট্রাঙ্ক নামাইলেন এবং নিজেও নামিয়া আসিলেন। তাঁহার রকম দেখিয়া দোকানদার ফুটপাথ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, এবং সেইখানে থাকিয়াই আত্মরক্ষার বিফল প্রয়াস করিতে লাগিল। প্রভারা যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন প্রায় নাটকের পঞ্চমাঙ্ক। মেম হাঁকিতেছেন, "এ কুলিকা বাচ্চা, হাম্‌ লিয়া তুমারা মাল? নিকল্‌ কে আও, তুমকো জুতীসে মারেগা। আচ্ছাওয়ালা ঘর হোনে সে হাম্‌ ভিতর্‌ যাতা, মগর্‌ কুলীকো ঘরমে হম্‌ নেহি যানে শেকৃতা।"

দোকানদার ভিতর হইতে বলিল, "বেটা বোল্‌তা মা পয়সা দেগা, মা বোল্‌তা বেটা পয়সা দেগা, এ ক্যায়সা? ওর কোন্‌ শালা তুম্‌লোগ্‌কো মাল বিক্রী করেগা।"

সাহেবের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল, তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দেখো, শালা শালা মৎ বোলো।"

দোকানদার তাহার ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করিল না। আরো দু-চারবার তাহার মুখ হইতে উক্ত বাক্যটি শোনা গেল। সাহেব কোট খুলিয়া সিঁড়িতে রাখিলেন, গলাবন্ধটাও ত্যাগ করিলেন। শার্টের আস্তিন গুটাইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আও ম্যান্‌, বাহর্‌ আও।"

দোকানদার ত তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলই না, তাঁহার পত্নীও স্বামীর এই আকস্মিক প্রীতির পরিচয়ে মোটেই খুসি হইলেন না। একলাই আত্মরক্ষায় সমর্থ নন এমন ইঙ্গিতেই তিনি চটিয়া গেলেন। স্বামীকে এক ঠেলা দিয়া বলিলেন, "You need n't butt in. I have got my shoe for him. Get away!" সাহেব বেচারা সরিয়া গিয়া আবার কোট পরিতে এবং গলাবন্ধ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

মেমসাহেবের পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণেও হিন্দুস্থানী-নন্দন যখন বাহিরে আসিল না, তখন তিনি তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে অকথ্য গালি দিতে দিতে উপরে উঠিয়া গেলেন এবং বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাস্তার লোককেও অভিনন্দন করিতে

আরম্ভ করিলেন। নীচের ভীড়ের মধ্যে খুব অবাধে হাসি টিট্‌কারি চলিতেছে দেখিয়া সাহেব একবার স্ত্রীকে ঘরে লইয়া যাইবার জন্য হাত ধরিয়া একটান দিল, কিন্তু প্রবল এক গুঁতা খাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

প্রভা বলিল, "আয়াটা গেল কোথায়? খুকী ত দিব্যি শুয়ে ঘুমচ্ছে।"

চাকরের কাছে খোঁজ লইয়া জানা গেল, নীচের তলার মান্দ্রাজী স্ত্রীলোকটির হঠাৎ কি অসুখ হওয়ায় তাহার মেয়েটা আসিয়া আয়াকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। সে তখন হইতে আর উপরে আসে নাই। চাকরকে বলিয়া গিয়াছিল, খুকী কান্নাকাটি করিলে তাহাকে যেন ডাকিয়া আনে। খুকী নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে দেখিয়া চাকরও আর তাহাকে ডাকিতে যায় নাই।

প্রভা বলিল, "যা গিয়ে ডেকে আন্। দিব্যি ব'সে আড্ডা দিচ্ছে আর কি?"

চাকর নীচে চলিয়া গেল আয়াকে ডাকিতে। একটু পরে আয়া তাহার সহিত উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভা শুনিল মান্দ্রাজী স্ত্রীলোকটির হঠাৎ প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ঘরে তাহার স্ত্রীলোক আর কেহই নাই। অগত্যা সে আয়ার শরণাপন্ন হইয়াছে। গৃহিণীকে বহুৎ সেলাম জানাইয়া সে অনুরোধ করিতেছে যেন আয়াকে আজ রাতটা তাহার কাছে থাকিতে দেওয়া হয়। প্রভা আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া তাড়াতাড়ি আয়াকে নীচে পাঠাইয়া দিল। রাত্রেও দুই একবার সে নীচের তলার কাত্‌রানির শব্দে জাগিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া দেখিল আয়া কখন আসিয়া স্নানাদি করিয়া কাজে লাগিয়া গিয়াছে। প্রভা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওর বাচ্চা হ'য়ে গেছে? কি বাচ্চা হ'ল? ছেলে না মেয়ে?"

আয়া বলিল, মেয়েই হইয়াছে। তাহার গলার স্বরে ভয়ানক একটা নিরুৎসাহ প্রকাশ পাইল। প্রভা ভাবিল, ছেলে না হইয়া মেয়ে হইয়াছে, তাই বুঝি এত দুঃখ। সে বলিল, "ছেলেও যা মেয়েও তা। মেয়ে হ'লে কি আর হয়েছে?"

আয়া বলিল, সুস্থ সবল মেয়ে হইলে ত কথাই ছিল না। কিন্তু এ মেয়ে হইয়াছে কুৎসিৎ বিকলাঙ্গ, এ বাঁচিয়া থাকিলে মা বাপের অশেষ দুঃখের কারণ হইবে।

প্রভা দুঃখিত হইয়া বলিল, "ওমা, তাই নাকি? আমি আবার মেয়ে দেখতে যাব ভাবছিলাম।"

আয়া বলিল, "যেয়োনা মা, ওর মা লজ্জা পাবে, এমন মেয়ে হওয়া মায়েরই লজ্জা। কেউ দেখতে গেলে বড় কান্নাকাটি ক'রবে। তার খুব জ্বর এসেছে, এখন চুপ চাপ থাকাই ভাল।"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, শিশুটি কি রকম বিকলাঙ্গ। আয়া বলিল, তাহার ঠোঁট কাটা, এবং একটা পা বাঁকা। জন্ম গ্রহণ করিতে সে মাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়াছে। মেয়ের বাবা এমন সন্তান হওয়াতে রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, স্ত্রীলোকটিকে দেখিবার কেহ নাই।

প্রভা বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! মানুষ এমন শয়তানও হয়? এই নে দুটো টাকা, মেয়ে মানুষটাকে দুধটুধ কিনে দিয়ে আয়। তার কাছে এখন কে আছে?"

আয়া বলিল যে, উপর তলার মুসলমানী এখন আছে, সে এখনও খানিকক্ষণ থাকিতে পারিবে, দুপুরে আয়া যাইবে। ততক্ষণে আশা করা যায়, স্ত্রীলোকটির গুণধর স্বামী ফিরিয়া আসিবেন। আয়া টাকা লইয়া দুধ ইত্যাদি কিনিতে চলিয়া গেল।

প্রভা শয়নকক্ষে ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় মেম-সাহেবের গলা শুনিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া কাহাকে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মান্দ্রাজী আওরতের কি বাচ্চা হইয়াছে। উপর তলার সেই মুসলমান মেয়েটি তাঁহার কথার উত্তর দিয়াই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল। মেমসাহেবের কৌতূহল তখনও চরিতার্থ হয় নাই বোঝা গেল, কারণ তিনি সব বিষয় বিশদভাবে জানিবার জন্যই বোধ হয় পিছনের লোহার সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রভা খানিকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াইয়াই রহিল। নীচের তলায় অকস্মাৎ ভয়ানক চেঁচামেচি সুরু হইয়া গেল। হিন্দি, ইংরেজী এবং তামিল ভাষার ঝড়ের মধ্যে সে বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না যে, ব্যাপার কি হইতেছে। কিন্তু মেম সাহেবের গলা চাপা পড়িবার নয়, তাঁহার মিহিসুরের

"Madrasi swine! শূয়ারকা বাচ্চা।" সকল গোল-মালের উপরেই শোনা যাইতে লাগিল। ফটাফট্ কয়েকটা চড়ের শব্দও শোনা গেল, প্রভা যদিও বুঝিল না কে কাহাকে ঠ্যাঙাইতেছে। তবে মেম উপস্থিত থাকিতে মারা এবং গাল দেওয়ার কাজে আর কেহই অগ্রসর হইবে না, এটা সে ধরিয়াই লইল।

খানিকক্ষণ পরে উগ্রচণ্ডা হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার কালো মুখ একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে। প্রভার আয়াও এক রকম তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিল। প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "নীচের তলায় অত গালা-গালি মারামারি কর্‌ছিল কারা?"

আয়া বলিল, যে, মান্দ্রাজী পুরুষটা খুব একচোট মদ খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে এমন বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব করার জন্য স্ত্রীকে গালি দিতেছিল এবং মারিতে যাইতেছিল। তাহার মেয়ে কাড়িয়া লইয়া নদীতে ফেলিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছিল। আয়া এবং ঐ ঘরের মুসলমান স্ত্রীলোক দুইজন তাহাকে গালি দিতেছিল, মান্দ্রাজীর বড় মেয়ে এবং স্ত্রী কান্না জুড়িয়াছিল। এমন সময় মেমসাহেব গিয়া রঙ্গমঞ্চে হাজির হন। ব্যাপার শুনিয়া তিনি মান্দ্রাজীটাকে খুব কুৎসিৎ ভাবে গালি দেন। সে মাতাল হইয়া ভয়ডর ভুলিয়া গিয়াছিল, সেও তাঁহাকে একটা অতি বিশ্রী গাল দেয়। ইহাতে তিনি তাহাকে আচ্ছা করিয়া চড় মারিয়া এবং পায়ের জুতা খুলিয়া পৃষ্ঠে তাহার বাড়ি এক ঘা দিয়া উপরে চলিয়া আসিয়াছেন।

প্রভা বলিল, "বেশ হয়েছে! অমন মানুষের কাছে মেমসাহেবের মত মানুষেরই যাওয়া ভাল। মেয়েমানুষটা কেমন আছে?"

আয়া বলিল যে, প্রসূতি সম্প্রতি ভালই আছে। কিন্তু মেয়ের কোনো কাপড়-চোপড় নাই, স্ত্রীলোকটিও শুধু মাদুর পাতিয়া পড়িয়া আছে। তাহার স্বামীও মেমের মার খাইয়া পলায়ন করিয়াছে, আবার কখন এ মুখো হইবে তাহা বলা কঠিন। আম্মার কাছে যদি বেবীর ছেঁড়া জামাটামা থাকে তাহা হইলে তিনি যেন কয়েকটা ঐ গরীবের বাচ্চাদের জন্য দেন।

প্রভা জামা খুঁজিবার উদ্দেশ্যে ঘরে ঢুকিতে যাইতেছে, এমন সময় দেখা গেল মেমসাহেব আবার পিছনের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছেন। তাঁহার হাতে একটা মোটা বিলাতী কম্বল এবং ভারি একটা স্যুট্‌কেস্। আয়া কৌতূহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। প্রভার কাজ ছিল, সে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরেই আয়া একেবারে উঠিতে পড়িতে ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। মেমসাহেব নাকি একেবারে সবাইকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন। মান্দ্রাজী স্ত্রীলোক-টাকে একখানা কম্বল দিয়াছেন, তাহার দাম কম হইলেও কুড়ি পঁচিশ টাকা। আর ঐ বাচ্চাটাকে এক বাক্স ভর্ত্তি জামা, টুপি, মোজা, কত কি দিয়া আসিয়াছেন। সেগুলি অতি সুন্দর দেখিতে, কতক রেশমের, কতক সূতী এবং গরম কাপড়ের, সব মেমের নিজের হাতের শেলাই, তাহাতে তিনি কতরকম ফুল, লতা পাতার নক্সা উঠাইয়াছেন। ঐ রকম শিশুর অঙ্গে এ সব পোষাক একেবারেই মানাইবে না, এই যা দুঃখ!

প্রভা অবাক হইয়া বলিল, "ওমা, চার আনা পয়সার জন্যে যে মানুষের মাথায় টিন ছুঁড়ে মারে, তার হঠাৎ এমন মতি হ'ল যে? আমি ওটার সঙ্গে কথা বলি না তা না হ'লে জিগ্‌গেষ কর্‌তাম।"

আয়া বলিল, কোনো ভাবনা নাই, সে মেমসাহেব বাহিরে গেলেই তাহার ছোট বোনের কাছ হইতে সব খবর জোগাড় করিয়া আনিবে।

সৌভাগ্যক্রমে সে সুযোগ শীঘ্রই মিলিয়া গেল। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া অন্য দিনের আগেই মেমসাহেব বাক্স লইয়া বাজার করিতে চলিয়া গেলেন। তাহার বোন বারান্দায় দাঁড়াইয়া বোনের যাত্রা দেখিতে লাগিল। আয়া তৎক্ষণাৎ হাতের কাজ ফেলিয়া তাহার সহিত গল্প জমাইতে বসিল। প্রভারও ব্যাপারটা জানিতে একটু কৌতূহল ছিল, সেও আয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঐ কাপড়গুলি কাহার জিজ্ঞাসা করাতে ছোট মেমসাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইংরেজীতে বলিল, "আমার বোনের মেয়ের।"

প্রভা দুঃখ করিয়া বলিল, "আহা, মেয়েটি নেই বুঝি?"

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।" এ বিষয়ে তাহার কথা বলিতে হয় ত কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া প্রভা ঘরে চলিয়া গেল।

আয়ার অতটা ভদ্রতা জ্ঞান ছিল না, সে দাঁড়াইয়া কথা বলিয়াই চলিল। উগ্রচণ্ডার অনেক কথাই সেদিন সে শুনিয়া আসিল। অল্প বয়সে ইহার এক মাতাল মান্দ্রাজী সাহেবের সঙ্গে বিবাহ হয়। তাহার টাকা ছিল অনেক, কিন্তু মদ খাইয়া সে প্রায় সবই উড়াইয়া দিয়াছিল। মেমের বয়স তখন অল্প, এতখানি মেজাজও হয় নাই, স্বামীকে সে ভয় করিয়াই চলিত, তাহার প্রহারও মুখ বুজিয়া সহ্য করিত।

বিবাহের তিন চার বৎসর পরে ইহার একটি সন্তান হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে জন্মিল বিকলাঙ্গ হইয়া। সাহেব ত রাগে প্রায় পাগল হইয়া উঠিল, এবং রাগটা ঝাড়িল সবই স্ত্রীর উপর। শিশুর উপর ঝাড়িতেও তাহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু স্ত্রী মাঝে পড়িয়া সব রাগটা নিজের গায়ে টানিয়া লইত, কাজেই ছোট মেয়েটা বাঁচিয়া যাইত। এই রুগ্ন বিকলাঙ্গ শিশুকে কেহই দেখিতে পারিত না, ভালবাসিত না, তাই সে যেন মায়ের বড় একান্ত আপনার ধন হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাঘ্রীর মত হিংস্র স্নেহে সে সন্তানকে আগ্‌লাইয়া থাকিত, কাহাকেও মেয়েকে দেখিতে শুদ্ধ দিত না। স্বামী বাড়ী হইতে বাহির হইলেই সে মেয়ের জন্য শেলাই করিতে বসিত। সেলাইয়ে হাত ছিল তাহার অসাধারণ। পাড়ায় এত সুন্দর পোষাক আর কোনো শিশুর ছিল না। কিন্তু হায়, এমন অসাধারণ কুৎসিৎও আর কোনো শিশু ছিল না। মেয়েকে সাজাইয়া-গুজাইয়া সে ঘরের ভিতরই লইয়া ফিরিত, কখনও কাহারও সামনে বাহির করিত না। কিন্তু হতভাগিনীর ভাগ্যে এই সামান্য সুখটুকুও সহিল না। অতিরিক্ত মদ খাইয়া আসিয়া সাহেব একদিন কন্যাকে খাট হইতে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। দুর্ব্বল শিশু এ আঘাত সাম্‌লাইতে পারিল না, তাহার জীবন-দীপ সেইখানেই নিভিয়া গেল।

উগ্রচণ্ডার জ্ঞান হইল পরদিন থানার এক ঘরে। সে না কি স্বামীকে কাঠ কাটিবার দা দিয়া এমন এক ঘা লাগাইয়াছে যে, তাহার এখন জীবন সংশয়, সে হাঁসপাতালে আছে। বিচারে অবশ্য সে খালাস পাইল, কিন্তু স্বামীর ঘর আর তাহাকে করিতে হইল না। যে আইনের বন্ধনে সে বাঁধা ছিল, সে আইনই তাহাকে স্বামীর কবল হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

খাওয়া পরার ভাবনা তাহার হইল না, সেলাই করিয়া সে বেশ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু স্বভাব তাহার একেবারে বদলাইয়া গেল। মানুষ জাতটাকেই সে যেন কাটিয়া-কুটিয়া শেষ করিতে পারিলে বাঁচে। পুরুষ মানুষ দেখিলে তাহার হাড় জ্বালা করিত, সুস্থ সুন্দর শিশু দেখিলে সে ঘৃণায় মুখ ফিরাইত। তাহার মুখও যেমন খুলিল, হাতও তেমনি চলিল।

অথচ এমনি মানুষের মন, যে, মানুষকে এত ঘৃণা করা সত্ত্বেও সে নিঃসঙ্গ থাকিতে পারিল না। বসিয়া খাইবার লোভে এই সাহেব ছোকরা তাহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মারও দিব্য খাইয়া চলিয়াছে। ছোট বোনেরও থাকিবার জায়গা নাই, তাই সেও এখানে পড়িয়া মার হজম করে।

এমন সময় বড় মেমসাহেব বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বোনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "What are you staring at like an owl?" সে বেচারী তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর পলাইয়া গেল।

প্রভা ভাবিল, বাহিরটা ত কালো পাথরের পাহাড়, কিন্তু আজ ইহার অন্তরের স্নেহনির্ঝরিণীর সন্ধান পাওয়া গেল। কত কালের হারানো মেয়ের স্মৃতি আজও তাহাকে মাঝে মাঝে নারীর আসনেই টানিয়া আনে। ইহার পর হইতে উগ্রচণ্ডাকে গাল দেওয়া সে ছাড়িয়াই দিল।



শিশুর শিক্ষাপদ্ধতি—মাতার কর্ত্তব্য

শিশুর ভরণপোষণ করা, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ণয় করা, তাহার পীড়া হইলে অর্থব্যয় করা যেমন পিতার বৃহৎ কর্ত্তব্য, তেমনি তাহার শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাহার স্বভাব-চরিত্র গঠিত করিয়া তোলা, তাহার হৃদয় উন্নত করা, স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা, মাতার বৃহৎ কর্ত্তব্য। অনেক সময় বালিকা জননী, অর্থাৎ চৌদ্দ পনের ষোল বৎসরের বালিকা, রাত্রি জাগিতে বিরক্ত হইয়া অবুঝ শিশুকে অর্থাৎ মাত্র ২।৩ মাসের শিশুকেও গালি দিয়া থাকে, আর অবুঝ শিশু ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। ইহাতে শিশুচিত্তে ভীরুতা জন্মে, ফলে সে শিশু বড় হইয়াও ভীরু হইবেই, অনেক সময় শিশুর প্রতি রাগ করিয়া বালিকা জননী তাহাকে ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাঁদাইতে থাকেন, ইহাতে শিশুর স্নায়ুতে ও মস্তিষ্কে আঘাত লাগে, কাঁদুনে স্বভাব ধরিয়া যায়, ফলে সে বদ্-মেজাজী হয়।

শিশুর স্বভাব ও চরিত্র গঠন সম্বন্ধে কয়েকটা কথা—

১। শিশুকে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরভক্তি শিখাইতে হইবে, কারণ পুণ্যের প্রতি আকর্ষণই সৎপথে রাখিবার প্রধান সহায়।

২। শিশুকে কখনো নিরাশার বাণী শুনাইবে না; কারণ তাহাতে শিশু-হৃদয় নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, উদ্যম নষ্ট হয়।

৩। কখনো ভয়ের কাহিনী শুনাইবে না, তাহাতে শিশুর সাহস জন্মিতে পারে না, কারণ হৃদয় তাহাতে দমিয়া যায়, দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করে। সব সময় বকুনীতেও শিশু-হৃদয় দমিয়া যায়।

৪। তাহাকে ফাঁকি দিয়া ফাঁকি শিখাইবে না, তাহাতে সে ফাঁকি শিখিয়া রাখিবে।

৫। তাহাকে বাজে কথা বা বাজে গল্প অর্থাৎ যাহাতে সার নাই, শুনাইবে না, তাহাতে বুদ্ধি হাল্কা হইয়া যায়।

৬। শিশুকে ভ্রমেও পয়সা চিনাইবে না। অল্পবয়সে টাকা পয়সার আসক্তি কুপথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, কারণ অল্পবয়সে সংযম শিক্ষা হয় না, আরো এই যে, টাকা পয়সা চেনার সঙ্গে সঙ্গে জগতের অনেক কিছুই শিখিতে বুঝিতে পারে।

৭। শিশুর সম্মুখে যা তা বলিবে না। এটুকু জানিবে—শিশু অবিশ্বাস করিতে জানে না, সে যাহা শুনিবে, তাহাই বিশ্বাস করিবে এবং সেই বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহার চিত্ত গঠিত হইবে। সাংসারিক কথাবার্ত্তা বালক-বালিকার সম্মুখে না বলাই শ্রেয়।

৮। শিশুকে এটা করিও না, ওটা করিও না, প্রতি পদে এমনি নিষেধের জোরে বাঁধিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বকে নষ্ট করিবে না। এইভাবে যে শিশুকে দমাইয়া দেওয়া হয়, ভবিষ্যতে দরকার হইলেও সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। হৃদয়ে শক্তি না থাকিলে ভবিষ্যতে সে ন্যায়-অন্যায় বুঝিয়াও চলিতে পারিবে না। মন্দের সহিত যুঝিয়া চলিতে হৃদয়-বলের অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশুকালে হৃদয়-বল নষ্ট হইলে সে-বল আর জাগে না।

৯। শিশুর প্রফুল্লতা যাহাতে বাধা না পায় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১০। শিশু যাহাতে কুসঙ্গে না পড়ে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১১। মন্দকে ঘৃণা করিতে ও ভালকে ভালবাসিতে শিশুকাল হইতেই শিক্ষা দিতে হইবে। মিথ্যা কথা বলা মন্দ; ইহা বলিলেই মিথ্যা কথা কি শিশু বুঝিবে না, শুধু বুঝিবে মিথ্যা কথা মন্দ। কিন্তু ইহাও বোধ হয় ভাল যে, মন্দ বলিয়া কিছু আছে ইহা একেবারে জানিতে না দেওয়া।

১২। শিশুকে কখনো পাগল বোকা বজ্জাত বলিয়া গালি দিবে না। তাহাতে উহার ধারণা হইবে যে, সে ঐ রকমই একটা কিছু।

১৩। মাতা শিশুর সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া সাহিত্যের গুণাবলী ও উপকারিতা কহিয়া তাহাকে সাহিত্যানুরাগী করিয়া তুলিবে।

শিশুকে গল্প বলিবে, পরে সেই গল্প তাহাকে অন্য সময় বলিতে বলিবে এবং লিখিয়া দিতে বলিবে। ইহাতে তাহার গল্প লিখিবার শক্তি জন্মিবে, বা রচনা-শক্তি জন্মিবে। শিশুকে শাসন করিবে বাক্যের দ্বারা, মারিয়া নয়। মার খাইলেই প্রকৃত শিক্ষা হয় না। শৈশব হইতে ন্যায় অন্যায় বুঝাইয়া, হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, বাক্যের দ্বারা, গল্পের দ্বারা, কথায় কথায় এমন ভাবে শিক্ষা দিবে যে, তাহার কর্ণ দৃষ্টি হৃদয় আকর্ষণ করে। এইসব কথার মূলে ভবিষ্যতের উচ্চ আশা এমন ভাবে ফুটিয়া উঠা চাই যে, সেই আশার আকর্ষণে শিশু-হৃদয় আকৃষ্ট হইবে।

শিশুকে যখন মারিতে উদ্যত হওয়া যায়, তখনই সে যে ভয় পায়, সে ভয় সহজ নয়। তাহার উপর যখন প্রহার পড়িতে থাকে, তখন তার অন্তঃকরণের অবস্থা জানিতে পারিলে হাতের লাঠি খসিয়া পড়িবে। এই দারুণ ভয়ে শিশু হৃদয়-বল হারাইতে থাকে এবং দুঃখ পাইয়া তাহার হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট হয়, কিন্তু লাভ ততখানি হয় না।

শিশু যাহার নিকট মার খায়, স্বভাবতঃ তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া ওঠে, এবং অপরাধের গুরুত্ব না বুঝিয়া মার খাইলে বা অল্প অপরাধে অধিক শাস্তি পাইলে, তাহার চিত্তের এরূপ অবস্থা হওয়ার আরো অধিক সম্ভাবনা। এজন্য শিশু পিতামাতার নিকট অধিক মার খাইলে পিতামাতার প্রতিও ভক্তিহীন হইতে পারে; এমনও হইতে পারে যে, পরে বুঝিতে পারিলেও সে-ভক্তি আর ফিরিয়া আসে না। অবশ্য গুরুতর অপরাধ করিলে শিশুকে মারিতে হইবে, কিন্তু অধিক নয়। যে শিশুর অল্প শাসন হয় সে অল্পেই শুধরাইতে পারে, কিন্তু যাহাকে অধিক শাসন করা হয় সে শাসনকে ভয় করে না। সেটা তার অভ্যাসের ভিতর দাঁড়াইয়া যায়। আর দুষ্ট শিশুকে মারিয়া শুধরাইতে চাহিলে সে আরো মন্দ হয়, পিতামাতাকে ফাঁকি দিয়া চলিতে শিখে। ভালবাসায় তাহার চিত্তবৃত্তি কোমল করিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা ভাল। পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীন হইলে তাহার পতনের সম্ভাবনা, কারণ পিতামাতার আকর্ষণ সন্তানকে গৃহের বাহির হইতে বাধা দেয়।

পুত্র ও কন্যাকে ভিন্ন চক্ষে দেখিবেন না। মনে রাখিবেন কন্যাই একদিন পুরুষ ও নারীর জননী হইবে।

পিতামাতা মনে করিবেন না যে, শিশু কেবল তাঁহাদের জন্য জন্মিয়াছে। সে বিশ্বপতির—দেশের, সমাজের, জাতির। তাহার উপর পৃথিবীর অনেক বিষয়ই নির্ভর করে।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪) মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকা

—

ওমর খৈয়ামের জন্মভূমি

খোরাসান—নিশাপুর

পারস্যের ইতিহাসে খোরাসান ও তাহার রাজধানী নিশাপুর পারস্যের মধ্যযুগে ও পরেও দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, বাণিজ্য,রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। খোরাসান পারস্যের উত্তর-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

খোরাসানের উত্তর দিকে রাজধানী নিশাপুর। নিশাপুর পারস্যের মধ্যে অতি প্রাচীন সহর। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশ্ববিখ্যাত।

অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, জ্যোতির্ব্বিদ, চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকের প্রতিভালোকে খোরাসান ও তাহার রাজধানী নিশাপুর আলোকিত হইয়াছিল। পারস্যের প্রথম ও দ্বিতীয় কবি পয়গম্বর যথাক্রমে ফার্দ্দৌসী ও আনওরী, ফের্দ্দৌসী-সাহিত্যগুরু কবি আসাদী, সুফীকবি ফরিদউদ্দিন আত্তর, কবি নিজামই আশিরী, কবি-সাহিত্যিক নিজামী আরুজি, কবি রাফি ই নিশাপুরী, জ্যোতির্ব্বিদ হকিম-ই-মওসিলি, কবি-জ্যোতর্ব্বিদ ওমর খৈয়ম, দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক হাবান, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক হাসান ঈশাক্, দার্শনিক আবু ইমাম গাজ্জালি, চিকিৎসক মুহম্মদ দখিম্, খাজাইমাম প্রভৃতি অসংখ্য মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া খোরাসান ও তাহার রাজধানী নিশাপুরকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া "প্রতিভার সূতিকাগার" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

নানাবিষয়িনী বিদ্যানুশীলনের কেন্দ্রস্থান রূপে যেমন নিশাপুর প্রসিদ্ধ ছিল, তেম্নি শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তুলা, পশম অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইত। পশম-নির্ম্মিত নয়নমনবিমোহন সূক্ষ্ম বস্ত্র জগতের নানা দেশবাসীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রাষ্ট্রনৈতিক জগতেও নিশাপুর যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আরবীয় গণিতজ্যোতিষতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেলজুক বংশীয় রাজধানী নিশাপুরে আসিয়া উপনীত হওয়ায় নিশাপুর বিদ্যাপীঠরূপে পরিগণিত হয়।

(বাঁশরী, আষাঢ় ১৩৪৪) শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী

—

পুরুষসিংহম্

রাজা মরিলেন। কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে রাজকুমারের হাতে সাতটি মহলের সাতটি চাবিকাঠি দিয়া গেলেন। আদেশ রহিল এই যে, ছয়টি মহল খুলিয়া যাহা কিছু দেখিবে, যাহা কিছু পাইবে, সকলই তোমার। কিন্তু সপ্তম মহলের প্রান্তদেশে যে ছোট কুঠরীটী আছে তাহা কদাপি খুলিও না।

রাজকুমার কাহারও নিষেধ না শুনিয়া একদিন সপ্তম কুঠরীর কুলুপে চাবি পরাইলেন। বহুদিনের পুরাতন দ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল।

রাজকুমার তন্ময় হইলেন। এ কি স্বপ্নমাত্র? কখনো না। এই ত সেই। সেই কে? চিরদিন যাহাকে চাহিয়াছি। কেমন করিয়া পাওয়া যায়? খুঁজিয়া বাহির করিব। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে যেখানে যে-অবস্থাতেই থাকুক, উহাকে চাই-ই চাই। রাজকুমার বাহির হইলেন। রাজকুমার কন্যার সন্ধানে বাহির হইলেন। রাজকুমার যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার সঞ্চিত গতির বেগে সমস্ত বাধা-বিপত্তি ততই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

তারপরে পাতাল ভেদ করিয়া মায়াপুরীর সন্ধান, কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া পালঙ্কের উপর সেই সুষুপ্ত কন্যার দর্শনলাভ। কিন্তু কন্যাকে একেবারে আয়ত্ত করিতে হইলে রাক্ষসের কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে হয়।

বাংলার যৌবন আজ ঐ সপ্তম কুঠরীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। সে আজ সমস্ত কথার মধ্যে শুধু এই কথাটাই ভুলিয়াছে যে, জীবনের অপর সকল কামনার ন্যায় রমণীও সাধনার বস্তু। বয়স হইলেই তাহাকে অনায়াসে ভিক্ষা পাইবার জন্মগত অভ্যাস রহিয়াছে বলিয়াই তাহাকে নূতন করিয়া চাহিবার যে বিপুল সাধনা তাহার সত্যমূর্ত্তি বাংলার যৌবনের চিত্ততলে যথার্থ রূপ-পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। তাই প্রচুর অশ্রুপাতকেই ব্যথার শ্রেষ্ঠ পরিচয় এবং পুরুষ ও নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষাকেই মনুষ্য-জন্মের পরম গতি স্থির করিয়া অবিরত যে-চিত্র অঙ্কিত করিয়া চলিয়াছে, তাহা অনভ্যস্তের তিলক-ধারণের ন্যায় তাহার নিজের কপালকেও বিড়ম্বিত করিয়া তোলে, অপরের চক্ষের সম্মুখেও কোনও স্বপ্নের সৃষ্টি করিতে পারে না। নির্বীর্য্য, অস্থিতলক্ষ্য, সঙ্কল্পবিহীনের জীবনে যদি কাম্যলাভ না ঘটে তাহার একমাত্র পরিণতি দাঁড়ায় "ভবিতব্য"-কে স্বীকার করিয়া লওয়ায় অথবা যক্ষ্মা, আত্মঘাত প্রভৃতির সাহায্যে মৃত্যুর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করায়। মাঝে মাঝে যদি ভাগ্য দৈবাৎ প্রসন্ন হন, কিম্বা নায়িকা কোনরূপে নায়কের ভাগ্যে আপনি ফলিয়া উঠেন তবেই যা শেষরক্ষা ঘটে। নতুবা বিধিপ্রহসিত বিরহের নিরাভরণ দেহকে যথাসাধ্য অলঙ্কার দ্বারা মনোজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রতিটি অঙ্গ প্রচুর পরিমাণে দীর্ঘ-নিশ্বাস, অশ্রুবারি, যৌন-আকুতি, মর্ম্মব্যথা প্রভৃতি দ্বারা খচিত করিতে হয়।

পুরুষ ও নারীর মিলনাকাঙ্ক্ষা যে চিরন্তন, ইহা ধ্রুবসত্য। এই মিলন-প্রয়াসের বিচিত্র ব্যথার ইতিহাসই জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু সে কোন্ ব্যথা? কন্যার পটলিখা দেখিয়া মুগ্ধ রাজকুমার যদি সেই ঘরেরই আঙিনায় বসিয়া বসিয়া স্বপ্নের পর স্বপ্নমালা গাঁথিয়া চলিতেন অথবা উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় পটখানি বুকে চাপিয়া যথায় তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইয়া দিতেন, তবে যে-ব্যথা প্রকাশ পাইত তাহা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খোরাক জোগাইতে পারিলেও রাজকুমারের ভাগ্যে কন্যালাভ ঘটাইতে পারিত না। কন্যার চিত্রদর্শন অবধি তাহাকে পাইবার অদম্য বাসনাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিশ্বভুবনে তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আশা ও নৈরাশ্যের যে অবিরত দ্বন্দ্ব; সোনালি, রূপালি, সবুজে, সুনীলে আশ্চর্য্য, মনোহর, নির্ব্বাক্ মায়ারাজ্যে কন্যাকে পাইয়াও না-পাওয়ার যে দুঃখ; এবং শেষরাক্ষসের প্রাণপাখীটিকে বধ করা পর্য্যন্ত বহুতর সংগ্রামের মধ্যে আনন্দ-সংশয়ের তীব্রদোলার যে ব্যথা; এক কথায় রাজকুমারের কন্যালাভ-সাধনার অন্তরে যে বিপুল বেদনা নিহিত আছে তাহাই ব্যথার যথার্থ পরিচয়।

সীতাহরণের পর রামচন্দ্র যদি তাঁহাদের দুইজনের দণ্ডকারণ্যে একত্রবাসের রমণীয় কয়টি দিনের বিগত কথা স্মরণ করিয়া লক্ষ্মণকে লইয়া বনে বনে শুধু বিলাপ করিয়াই বেড়াইতেন ও নির্ব্বাসন-অন্তে সীতার পরিহিত বসনের ছিন্ন অঞ্চল সংগ্রহ করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিতেন তবে রামায়ণ রচনা হইত না। দিনের পর দিন উদ্গত অশ্রুর বাধা চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত করিতে করিতে জটায়ুর রক্তাক্ত ছিন্নপক্ষ ও সীতার উন্মোচিত অলঙ্কার-চিহ্নিত পথে ব্যাকুল চিত্তে সীতান্বেষণের যে সুদীর্ঘ যাত্রা, তাহার প্রতি পদক্ষেপে যাহা বাজিয়া উঠিয়াছে তাহারই নাম ব্যথা বা বেদনা। উহা নির্ব্বেদের দ্বারা নিরন্তর আচ্ছন্ন নহে, লঙ্কাবিজয় ও সীতার উদ্ধার উহার মাথায় মুকুট পরাইয়া দিয়াছে।

পুরুষ ও নারীর পরস্পরসম্বন্ধে দেহ বড় কি মন বড় এইটাই একমাত্র সমস্যা নহে। বড় কথা এই যে, তোমাকে আমি চাই কি না। যদি চাই তবে তোমাকে পাইবার জন্য আমার মধ্যে বাসনা উদ্দাম, সাধনা উদ্যত হইয়াছে কি না। যদি তোমাকে পাওয়ার পথে বাধা থাকে তবে ভাগ্য-দেবতার সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসা না করিয়া সেই বিপর্য্যয়ের বিস্তৃত অরণ্য পায়ে পায়ে ভেদ করিয়া অগ্রসর হইব—যাবৎ তোমাকে না আয়ত্ত করি। সে অরণ্য যদি অসীম হয় তবে এ জীবন একটি সুদীর্ঘ যাত্রাতেই পর্য্যবসিত হইবে, রক্তাক্ত গতি থামিবে না।

এই যাত্রারই একটা জড়, প্রাণহীন, প্রয়াসহীন, বিকৃত ছায়ামাত্র বাংলার যৌবন-সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। তাই আজ বাংলার তরুণ প্রেমিক কেবলমাত্র আপনার ভগ্নহৃদয়ের ভেলা সাজাইয়া তাহাতে দুই টুকরা ছিন্ন প্রেম-পত্রের পাল উঠাইয়াছেন এবং সেই পালে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের বাতাস দিয়া দুস্তর জীবন-সমুদ্র পার হইবার বাসনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মী যখন ঘরে আসিবেন তখন তাঁহাকে কোথায় যে ঠাঁই দিব সে-চিন্তার একটি বড় অবকাশ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু লক্ষ্মী আসিবেন কেমন করিয়া? যাচিয়া লক্ষ্মী কাহারও ঘরে আসেন না। রাজকুমার ছয়টি মহলের সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন, কিন্তু সপ্তম মহলের অধিষ্ঠাত্রী যে মানসলক্ষ্মী তাঁহার কোনও উত্তরাধিকারযোগ নাই, দেশাচার বা লোকাচার তাঁহাকে করতলগত আমলকীবৎ পাওয়াইয়া দিতে পারে না। সে লক্ষ্মীকে উদ্যোগের দ্বারা উপায়ত্ত করিতে হয়, শৌর্য্যের দ্বারা জয় করিতে হয়। জগতের আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত যখন যে-জাতি জীবন্ত থাকিয়াছে, তাহার জীবনের বিশাল সমুদ্রমন্থনের মধ্যে এই লক্ষ্মীকেই লক্ষ্য করিয়া জয়-পরাজয়ের বিচিত্র কাহিনী তাহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছে।

জীবনে ও সাহিত্যে এই লক্ষ্মীকে লাভ করিতে হইলে পুরুষসিংহের একাগ্র উদ্যোগ ও সাধনার দ্বারাই পাওয়া যাইবে, কেবলমাত্র মেঠো বংশীধ্বনি দ্বারা নহে।

(শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৩৪) শ্রী যোগানন্দ দাস

—

১২৭৯ বঙ্গাব্দের কয়েকখানি গ্রন্থ

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। বিখ্যাত বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের কিঞ্চিৎ সমালোচন সমেত প্রথম ভাগ। শ্রী রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। হুগলী।

ধ্রুবচরিত্র। শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত। নাটক।

নটনন্দিনী। শ্রীহরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। একখানি উপন্যাস।

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ। শ্রীতারকনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্র।

মেঘদূতম্। শ্রীপ্রমথনাথ পণ্ডিতেন প্রকাশিতম্ ভাষান্তরিতঞ্চ। কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্র।

প্রথম শিক্ষা বীজগণিত। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, সঙ্কলিত।

ইউরোপে তিন বৎসর। ইংরাজি গ্রন্থ।

মুখর্য্যার মাগেজিন। কলিকাতা রেরিনি কোং। দশ বৎসর পরে ইহার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন।

বেঙ্গাল মাগেজিন। কলিকাতা বিক্‌টোরিয়া প্রেস। উপরোক্ত পত্রখানি, এবং এখানি উভয়ই ইংরাজি। শ্রীযুক্ত রেবেরেণ্ড লালবেহারী দে কর্ত্তৃক এখানি সম্পাদিত।

সঙ্গীতলহরী। কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁন প্রণীত। এখানি গীত-পুস্তক।

কাব্যমালা। কলিকাতা। বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানি।

স্বাস্থ্য-কৌমুদী। অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য স্বাস্থ্য-বিষয়ক নূতনবিধ গ্রন্থ। প্রথম ভাগ। ডাক্তার শ্রীভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ঢাকা গিরীশ যন্ত্র।

ললিত কবিতাবলী। কাব্যমালার রচয়িতৃ-প্রণীত। কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

কাব্যমঞ্জরী। শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত। কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

আর্য্য প্রবর। তত্ত্ববোধক মাসিক পত্র। পাতুরিয়াঘাটাস্থিত সাহিত্য যন্ত্র। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অবলা-বিলাপ। শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী দাসী প্রণীত। শ্রীযুক্ত হৃদয়শঙ্কর রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পরিত্যক্ত পত্নী। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত।

প্রবন্ধকুসুমাবলী। শ্রীঈশানচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

ভর্ত্তৃহরি কাব্য। শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত।

জ্ঞানাঙ্কুর। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। রাজসাহী, বোয়ালিয়া। রাজসাহী প্রেস।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান। শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভবানীপুর।

সঙ্গীতরত্নাকর। শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

হরিবংশ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়া হোগলকুড়িয়া সাহিত্যসংগ্রহভবন হইতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পদ্যময়। প্রথম ভাগ। শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত। কলিকাতা বি, পি, এনস্ যন্ত্র।

পদ্যমালা। উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা, দ্বৈপায়ন যন্ত্র।

কবিতাকুসুম। প্রথম ভাগ। শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে।

সদ্ভাবকুসুম। শ্রীশ্রীনাথ চন্দ্র প্রণীত। কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

প্রথম চরিতাষ্টক। শ্রীকালীময় ঘটক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। হুগলী বুধোদয় যন্ত্র।

ঐতিহাসিক নবন্যাস। অঙ্গখণ্ড। মাধবমোহিনী। শ্রীগজপতি রায় দ্বারা সঙ্কলিত। কলিকাতা সুচারু যন্ত্র।

শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস। বর্গীর হাঙ্গামা হইতে লর্ড নর্থব্রুকের আগমন পর্য্যন্ত। শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ভারত যন্ত্র।

সৌদামিনী উপাখ্যান। শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। এখানি কাব্য।

গান্ধারী বিলাপ কাব্য। শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত।

প্রণীলাবিলাস। গুপ্তপল্লী-নিবাসী শ্রীমহিমাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরামপুর আল্‌ফ্রেড প্রেস। এখানিও কাব্য।

নলদময়ন্তী কাব্য। শ্রীকিশোরীলাল রায় বিরচিত। কলিকাতা, স্কুলবুক প্রেস।

(বঙ্গদর্শন, ১২৭৯)

ময়মনসিংহ জেলার যুবকসম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীসুধেন্দুরঞ্জন হোম রায় অনুলিখিত]

আমার দুর্ভাগ্য, যে, আমি আমার দেশকে ভাল ক'রে দেখি নাই, বাংলাদেশটিকে পর্য্যন্ত ভাল ক'রে চিন্‌তে পারি নাই, নিজের জেলাতেও অনেক দিন যাই নাই। এইজন্যই গত বৎসরে যখন কর্ত্তব্যের আহ্বানে সমুদ্র পার হ'য়ে বিদেশে যেতে হ'ল, তখন সেটা আমার কাছে খুব সুখের বিষয় হয় নাই। দেশকে ভাল ক'রে না চিনেই আমি বিদেশে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। আমার উচিত ছিল, যৌবনে যখন আমার শক্তি বেশী ছিল. উৎসাহ ছিল, নানা বিষয় জান্‌বার কৌতূহল ছিল, সেই সময়ে নিজের দেশকে ভালরূপে চেনা ও জানার চেষ্টা করা। যা হোক, এবিষয়ে আমার অনেক দেরী হ'য়ে গেছে বটে, কিন্তু ভাল কাজ না করার চেয়ে দেরীতে আরম্ভ করাও ভাল। সেইজন্য আজকাল আমাকে দয়া ক'রে কেহ কোন জায়গায় ডাক্‌লে আমি সেখানে যেতে চেষ্টা করি। কেন না, এতে আমার নিজের খুব উপকার হয়, নূতন যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁদের উৎসাহ হ'তে আমি উৎসাহ পাই, নূতন জ্ঞান লাভ করি; নিজের ঘরের কোণে টেবিলের পাশে ব'সে সেই উৎসাহ, সেই জ্ঞান পাওয়া যায় না। এই-জন্য আপনারা যে আমাকে আহ্বান ক'রে এনেছেন, আপনাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন কর্‌ছি।

আমার এই একটা বিশ্বাস আছে, যে, চেষ্টা কর্‌লেই আমরা নীচে হ'তে উপরে উঠ্‌তে পার্‌ব, আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই অনেক কাজ ক'রে যেতে পার্‌ব। ময়মনসিংহ জেলার অনেক গৌরবের কথা, মহিমার কথা অদ্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়, এখানে বলেছেন। সে-সব আমার আর বল্‌বার প্রয়োজন নাই, আমার তেমন জানাও নাই। তবে মোটের উপর এইটুকু জানি, যে, বাংলা দেশের মধ্যে ময়মনসিং সবচেয়ে বড় জেলা, এ জেলায়, এ সহরে অনেক বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁদের খ্যাতি বাংলাদেশ ও ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ময়মনসিংহের আর-একটা দিক দেখাব, তা নিন্দাচ্ছলে নয়। এখানে এসে যে প্রাণ দেখ্‌লাম, যে উৎসাহ দেখ্‌লাম, সেইজন্যই আমি আপনাদিগকে বল্‌ছি আপনাদের আদর্শকে বড় ক'রে দেখ্‌তে হবে। ভগবান যেখানে বেশী দিয়েছেন, সেখান থেকেই বেশী আশা করা যায়। একথা ভাব্‌লে আপনাদের চল্‌বে না, যে, এশিয়া পৃথিবীর একটা অংশ, ভারতবর্ষ এশিয়ার একটা অংশ, বাংলা দেশ ভারতের একটি অংশ, সেই বাংলাদেশের একটি জেলা ময়মনসিংহ। এত ছোট ক'রে দেখ্‌লে চল্‌বে না। বড় আদর্শ স্থাপন কর্‌তে হবে আপনাদের সামনে। এখানে যে উৎসাহ, যে প্রাণবত্তা দেখ্‌লাম, তাতে আপনাদের কাছে বেশী দাবী করি। সেইজন্যই কয়েকটা নীরস কথা আমি বল্‌ব।

ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা ৪৮ লক্ষের উপর, কিন্তু শিক্ষার বিস্তার এখানে কিরূপ? সুখের বিষয়, এই ছোট সহরটিতে অনেকগুলি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে—তিনটি বালিকাবিদ্যালয় আছে, কলিকাতা ছাড়া বাংলার আর কোন সহরে বোধ হয় এতগুলি বালিকা-বিদ্যালয় নাই। সেন্সাস রিপোর্ট থেকে দেখ্‌তে পাই, লেখাপড়া-জানা লোকের শতকরা সংখ্যা হিসাবে ময়মনসিংহের স্থান বাংলাদেশের সব জেলার নীচে, এক শুধু মালদহের উপরে। এখানে শতকরা মোটে ৬ জন লোক লিখ্‌তে পড়্‌তে জানে। বঙ্গে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা কলিকাতা ছাড়া হাওড়া জেলায় সবচেয়ে বেশী, তাও কিন্তু মাত্র শতকরা ১৬ জনের উপর। ময়মনসিংহ জেলায় লিখনপঠনক্ষম লোকের অনুপাত এত কম হবার একটা কারণ এই, যে, এ জেলার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার খুব কম। কাজেই গড়পড়তায় এ রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা হিন্দুদিগকেও কর্‌তে হ'বে। প্রাচীন যে প্রশ্ন

আছে "Am I my brother's keeper ?" "আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক, অভিভাবক" ? তার মূলগত মনোভাবের বশবর্ত্তী হ'লে চলবে না। আমরা সকলেই অন্য সকলের হিতাহিতের জন্য দায়ী। প্রতিবেশীর উন্নতি না হ'লে অন্য সবাইকেই তার ফলভোগ করতে হয়।

আমি এখন কয়েকটা দেশের কথা বলব, যাদের লোকসংখ্যা ময়মনসিংহের চেয়ে কম বা তার কাছাকাছি বা কিছু বেশী। এগুলি সবই স্বাধীন দেশ। এদের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে ময়মনসিংহ কি করতে পারে। ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা ১৯২১ সালের গণনা অনুসারে ৪৮ লক্ষের উপর, এখন আরো বেশী হয়েছে। আফগানিস্তান, যাকে বৃটিশরাজ পর্য্যন্ত ভয় করেন, তার লোকসংখ্যা কত ? কেহ কেহ বলেন, মোটে ৫০ লক্ষ।* আলবানিয়া এখন সাধারণতন্ত্র, ইহার লোকসংখ্যা ৮,৩০,৮৭৭ ; আর্ম্মেনিয়ার ৮,১০,০০০ ; অষ্ট্রিয়ার ৬৫ লক্ষ, দক্ষিণ আমেরিকার বোলিভিয়ার ৩০ লক্ষ, ডেন্‌মার্কের ৩৪ লক্ষ। এই ডেন্‌মার্কেরই লোক শ্রীরামপুরে এসে জায়গা দখল করেছিল। এরা মানুষ ; সেইজন্যেই যে দেশের ৩৪ লাখ লোক, সেই দেশের মানুষ এসে ৩২ কোটি লোকের দেশে নিজের স্থান ক'রে নিতে পেরেছিল। তারপর দেখুন, ডোমিনিকায় থাকে ৯লক্ষ লোক, এস্তোনিয়ায় ১১ লক্ষ, ইকুয়েডরে ১৫ লক্ষ, ফিন্‌ল্যাণ্ডে ৩৫ লক্ষ। লীগ্ অব নেশন্‌সে হন্দুরাসের পর্য্যন্ত প্রতিনিধি আছে, যদিও তার লোক-সংখ্যা ৭,৭৩,৪০৮ এবং তারা প্রধানতঃ লাল ইণ্ডিয়ান বংশীয়। আইরিশরা, যাঁরা স্বাধীনতার সংগ্রামে সফলকাম হয়েছেন, সংখ্যায় মোটে ২৯ লক্ষ ৭২ হাজার ৮০২। ময়ময়নসিংহ জেলায় যে এত পাট উৎপন্ন হয়, এতে ধনী হ'য়ে যায় তো প্রধানতঃ স্কট্‌লণ্ডের লোক। স্কটলণ্ডের লোকসংখ্যা ৪৯ লক্ষ। এদের সম্বন্ধে একটা তামাসা আছে, যে, কেউ যদি উত্তর মেরু আবিষ্কার করতে যান, তিনি গিয়ে দেখ্‌তে পাবেন, সেখানে আগে থাক্‌তেই একজন স্কচ্ স্কটলণ্ডের পতাকা গেড়ে ব'সে আছে। অর্থাৎ সেখানেই কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে, সেখানেই স্কট্‌লণ্ডের লোক আছে। খুব ছোট দেশও মনুষ্যত্বের জোরে ও অবস্থার গুণে স্বাধীন হয়, যেমন লুক্‌সেমবুর্গ, লোক-সংখ্যা মোটে ২ লক্ষ ৬০ হাজার। তাদেরও প্রতিনিধি আছে লীগ্ অব নেশন্‌সে। নরওয়ের লোকসংখ্যা ২৬ লক্ষ, পেরুর ৩৫ লক্ষ। বহুবার আক্রান্ত হ'য়েও যে-দেশ আজ পর্য্যন্ত পরাধীন হয় নাই, সেই সুইজারল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ। মানুষ যখন নিজকে বড় ক'রে ভাবে, তখন সে চেষ্টা করলে সত্যি বড় কিছু করতে পারে। আর যদি ভাবে, আমি নগণ্য, আমার যা বাস্তভিটা তা পৃথিবীর ছোট্ট একটি টুক্‌রার টুক্‌রা তস্য টুক্‌রা, তবে তার দ্বারা কিছুই হয় না। আমি অবশ্য আপনাদিগকে অহঙ্কারে স্ফীত হ'তে বল্‌ছি না ; কিন্তু বল্‌ছি, নিজের নিজের মনুষ্যত্বের উপর শ্রদ্ধা থাকা চাই।

এখন কয়েকটি দেশের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে কিছু বলব। কোন সুবিখ্যাত সুসভ্য ইউরোপীয় দেশের কথা আগে না ব'লে অন্য একটি দেশের কথা বলি। চাষবাসের সঙ্গে যাঁদের কিছু সম্পর্ক আছে তাঁরা দক্ষিণ আমেরিকার চিলির কথা জানেন। চিলির সোডা-নাইট্রেট সারের ব্যবসায়ীরা তাদের কলিকাতা আফিসে একটা ল্যাবরেটরী রেখেছে। সেখানে যে-কোন জায়গার মাটি পাঠিয়ে দিলে তারা সেই মাটি বিশ্লেষণ ক'রে ব'লে দেয়, সেই মাটিতে কি রকম সার দরকার ও আবশ্যকানুযায়ী সার বিক্রী করে। এই চিলিতে সকলকে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার লোকসংখ্যা আনুমানিক ৩৯ লাখ। এখানে ১৯২০ সাল হ'তে আইন করা হয়েছে যে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দিতে তাদের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবককে বাধ্য করা হবে। এদের মধ্যে কিছু অসভ্য আদিম অধিবাসী থাকা সত্ত্বেও শতকরা ৬০ জনের উপর লোক লিখনপঠনক্ষম। সুসভ্য বঙ্গে শতকরা ১০ জন, ময়মনসিংহে শতকরা ৬জন লিখনপঠনক্ষম। চিলিতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, নানারকম শিল্পশিক্ষার জন্য অন্য দুটি বিশ্ব-বিদ্যালয়, কৃষিবিদ্যালয়, ভূতত্ত্ব-বিদ্যালয়, সঙ্গীত-বিদ্যালয় ইত্যাদি অনেক আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩৮০০। জাতীয় লাইব্রেরীতে বই আছে ৩,২৭,৮৮১। বাংলাদেশে ১৯২৬ সালে শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়েছিল ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। তার অর্দ্ধেকেরও কম গবর্ণমেণ্ট দিয়েছেন, বাকী ছাত্র-বেতন ও সাধারণের দান হ'তে প্রাপ্ত। চিলিতে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই উহার গবর্ণমেণ্ট ১৯২১ সালে ১৷॰ কোটি টাকা দিয়েছিল, অন্যান্য শিক্ষার খরচও ঐ সালে ১ কোটির উপর। এখন আরও বেশী। অথচ চিলির লোকসংখ্যা ৩৯ লক্ষ, বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪৬৭ লক্ষ। ময়মনসিংহে ৩ খানা সাপ্তাহিক ও ১ খানা মাসিক কাগজ আছে। চিলিতে ১৯২৪ সালে ৬২৭ খানা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র ছিল ; তার মধ্যে ৯১ খানা দৈনিক, ও ১৭৬ খানা সাপ্তাহিক। বাংলা প্রদেশ ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে রাজস্বের ভাগ পান পৌনে ১১ কোটি টাকা ; চিলির রাজস্ব ১৯২৫ সালে হয়েছিল ২৷॰ কোটি পাউণ্ডের উপর, অর্থাৎ প্রায় ৩৮ কোটি টাকা। ৩৯ লক্ষ লোক তাদের সব রকম রাষ্ট্রীয় কাজ চালানর জন্য এত টাকা খরচ করতে পারে। এতেই বুঝা যায়, কিসে তাদের এত উন্নতি হয়।

ডেন্‌মার্কের সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক সাদৃশ্য আছে। ডেনমার্ক ভারতের ও বঙ্গের মত কৃষিপ্রধান। অনেকে বলেন, ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতি হ'তে পারে না, কারণ জোতগুলো সব ছোট ছোট ক'রে ভাগ করা। ইহার মধ্যে সত্য আছে। কিন্তু ডেন্‌মার্কে তো আইন ক'রেই জমি ছোট ছোট টুকরা করা হয়েছে। এই কৃষিপ্রধান ৩৪ লক্ষ লোকের বাসভূমি ডেন্‌মার্কেও উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানেও ৭ বছর হ'তে ১৪ বছর পর্য্যন্ত বালক-বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হয়। তারা আমাদের প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণদের চেয়ে বেশী ও ভাল শিক্ষা বিনি পয়সায় পায়। একটা দেশের উন্নতির জন্য যত রকমের বিদ্যালয় দরকার—শিল্প-বিদ্যালয়, কৃষি-বিদ্যালয়, চিকিৎসা-বিদ্যালয়, ললিতকলা বিদ্যালয়, তার সবই এখানে আছে। ১৯২১-২২ সালে এর আয় হয়েছিল ২৷॰ কোটি পাউণ্ড ; প্রায় ৩৭ কোটি থাকা। ডেনমার্কের প্রধান ব্যবসা পনির, মাখন, দুধ, ডিম শস্য ইত্যাদি চালান দেওয়া। খনিজ সম্পত্তি নাই। শুধু কৃষিতেই এদেশ ধনী। আমেরিকায় যেমন সুবিস্তৃত জমি এক সঙ্গে চাষ করে, ডেনমার্কে তেমনভাবে চাষ হয় না ; আমাদের দেশের মতই ছোট ছোট জমিতে কিন্তু আধুনিক উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করা হয়।

নরওয়েতে ২৬ লক্ষ লোক, সেখানেও অবৈতনিক শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য সব রকমের বিদ্যালয় আছে। ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঐ দেশের সব ছেলেমেয়ে বিনি পয়সায় যে শিক্ষা পায়,

---

* ইহা আনুমানিক। হুইটেকার্স পঞ্জিকায় এক জায়গায় আছে ৫০ লাখ, এক জায়গায় ৪৬ লাখ। চেম্বার্সের এন্সাইক্লোপীডিয়াতে আছে আনুমানিক ৬৪ লাখ। ভারতবর্ষের ১৯২১ সালের সেন্সাসে আছে আনুমানিক ৬৩ লাখের উপর। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌স ইয়ার বুক অনুসারে আনুমানিক ৮০ লাখ।

তা এদেশের প্রবেশিকার শিক্ষার চেয়ে ভাল ও বেশী। নরওয়ের জমি অনুর্ব্বরা; তবু ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা, খনিজ সম্পত্তি ও শিল্প দ্রব্যের দ্বারা ঐদেশ ধনী হয়েছে। নরওয়েরই অধ্যাপক ষ্টেন্ কোনো অনেক বৎসর আগে আমাদের দেশে গবর্ন্মেণ্টের প্রাচীনলিপি-পাঠক হ'য়ে এসেছিলেন এবং পরে বিশ্বভারতীর সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়েছিলেন। আমাদের, দেশে নানা রকমের লিপি আগে প্রচলিত ছিল, সে-সব পড়্‌বার সুদক্ষ লোক আমাদের দেশে যথেষ্ট ছিল না। এইজন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট নরওয়ের য়ুনিভার্সিটি থেকে এঁকে এনেছিলেন। ইনি বিশ্বভারতীতেও কিছুদিন ছিলেন। এঁরা নিজের দেশের সাহিত্যাদির চর্চ্চা ক'রেও অন্য দেশের ভাষা ও সাহিত্যচর্চ্চা করেন, এমন শিক্ষাবিস্তার হয়েছে এদেশে। চেষ্টা থাক্‌লেই মানুষ বড় হয়। ১৯২১-২২ সালে এদের রাজস্ব হয়েছিল প্রায় ৬০ কোটি টাকার সমান। ২৬ লক্ষ লোকের জন্য এত টাকা খরচ হ'তে পারে। নরওয়ের সম্পদের প্রধান কারণ অরণ্যানী এবং মাছ ধরার ব্যবসা। ময়মনসিংহ জেলায়ও তো মাছের ব্যবসা হ'তে পারে। অরণ্য থেকেও আয় হ'তে পারে। কিন্তু সেগুলোর মালিক আমরা নই।

সুইজার্‌ল্যাণ্ডে ৪০ লাখ লোকের জন্য সাতটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তা ছাড়া অন্য সব রকমের স্কুল কলেজ আছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক। এরা যে কতটা সভ্য জাতি, তা বোঝা যায় এতে, যে, এদেশে ৬০০০ লাইব্রেরী আছে, আর বই আছে প্রায় ৯৪ চুরানব্বই লাখ। এদেশের রাজস্ব ১৯২২ সালে হ'য়েছিল প্রায় ২৫ কোটি টাকার সমান।

এতক্ষণ যে-সব দেশের কথা বলা হ'ল, সেগুলা সবই ভারতবর্ষের মত মাটির দেশ, সোনারূপার নয়; এবং তাদের অধিবাসীরাও মানুষ, দেবতা বা অতিমানুষ নয়। শিক্ষিত, ধনী ও শক্তিশালী আমরাও হ'তে পারি, যদি চরিত্রবান, জ্ঞানী, পরিশ্রমী, ও স্বাধীন হ'বার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি।

আমার নীরস বক্তব্য এখানে শেষ হ'ল। এখন অন্য কয়েকটি কথা বল্‌তে চাই। এটা তরুণ-সম্মিলনী। সেইজন্য তরুণ যাঁরা বিশেষ ক'রে তাদেরই আমি কিছু বলব। কালিদাসের রঘুবংশের প্রথমেই আছে, "বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥" সেই শ্লোকটি পড়বার সময়ে আমরা শিখেছিলাম, "পিতরৌ" শব্দে মাতা ও পিতা দুজনকেই বোঝাচ্ছে, যদিও মাতা শব্দের উল্লেখ নাই। তেমনি আমি যখন তরুণদের কথা বলব, তখন বুঝ্‌তে হবে আমি শুধু পুরুষদের কথা বল্‌ছি না, মাতৃ-জাতির কথাও বল্‌ছি। তাঁদেরও শক্তি আছে, তাদেরও কর্ত্তব্য আছে। অবশ্য শিক্ষার অভাবে সকলের মধ্যে সে-শক্তির উপযুক্ত স্ফুরণ হয় নাই। আমাদের দেশে নারীই তো শক্তিরূপিনী ব'লে বর্ণিত হয়েছেন। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও নারী। অথচ এখন নারীদের মধ্যেই শিক্ষার বিস্তার নাই। এটা মস্ত প্রহসন। আমার যা নিবেদন তা তরুণ তরুণী উভয়েরই প্রতি।

আমরা ত মৃত্যুর আহ্বান শুনেছি, মৃত্যুর দূত যে কোনো সময় আস্‌তে পারে, কিন্তু অনেক কাজ আমাদের করতে বাকী র'য়ে গেছে। কিন্তু আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা চেষ্টা করলে সে-সব করতে পারবে। কেউ কেউ বল্‌তে পারেন, আমি স্বদেশপ্রেমে অন্ধ হ'য়ে এ কথা বল্‌ছি। কিন্তু আমি স্বদেশপ্রেমে অন্ধ হ'লেও সব কথা বিচার ক'রে বল্‌তে চেষ্টা করি। আমি ভারতের অনেক জায়গায় গিয়েছি, বিদেশেরও কিছু কিছু দেখেছি। আমার মনে হয় না, বাংলার ছেলেমেয়েরা অন্তর্নিহিত শক্তিতে অন্য কোন দেশের ছেলেমেয়ের চেয়ে নিকৃষ্ট। আমি অবশ্য বাঙালী যুবকদের তরুণীদের অহঙ্কারী করতে চাই না। আমি আমার কাগজে খুব রূঢ় কথা লিখে অনেককে বেদনা দি বটে, কিন্তু আমার মনে বাংলার শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে সকলের প্রতি প্রীতি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। আমি যদি কবি হ'তাম,তা'হ'লে তা ভাল ক'রে প্রকাশ করতে পার্‌তাম। কবি যখন নই, নীরস গদ্যেই জানাব। যাঁদের বয়স বেশী হয়েছে অথচ প্রাণটা নবীন রয়েছে, যাঁরা প্রাণে চিরবসন্তের আহ্বান শুনেছেন, তরুণের প্রতি আমার যে প্রার্থনা, সেটা তাঁদের কাছেও পৌঁছাতে চাই। ময়মনসিংহ জেলার যাঁরা তরুণ, নারী কি পুরুষ,তাদের কাছে আমি এই দাবী করছি, আয়তনে ও লোকসংখ্যায় ময়মনসিংহ সে-সব ভূখণ্ডের সমতুল্য, অন্য সব রকমেই এ জেলাকে সেইসব দেশের সমতুল্য করতে হবে। ২৬ লাখ, ৩০ লাখ, ৪০ লাখ লোক কি হ'তে পারে, করতে পারে, তা' আমি দেখিয়েছি। তা আমাদের দ্বারা কেন হবে না? বল্‌তে পারেন, আমাদের সুযোগ নাই, অবস্থা প্রতিকূল। সুযোগ কখন কখন নিজ থেকে দ্বারে ধাক্কা দেয় বটে, কখন কখন অবস্থা অনুকূল হ'য়ে পড়ে বটে, কিন্তু অনেক সময়েই সুযোগ ক'রে নিতে হয়। এক 'স্ববিরোধী' জিনিস ছাড়া মানুষের পক্ষে আর কিছুই অসম্ভব নয়। আপনারা তো দেখ্‌ছেন, আগে যা কল্পনা ছিল, তা' সবই এখন হয়েছে। পুষ্পকরথ তো আর এখন কল্পনার জিনিস নয়। কথিত আছে, ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করেছিল। অনেক মানুষ আজকাল এরূপ যুদ্ধ করে, বাঙালীর ছেলেও ফ্রান্সে এরোপ্লেনের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। এখন রেডিওর সাহায্যে প্রতিনিয়তই আকাশবাণী শোনা যাচ্ছে। সুতরাং কিছুই অসম্ভব বলা যেতে পারে না।

সংস্কৃতে আছে 'যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ'। ইংরেজীতে তেমনি আছে, The glory of a young man is his strengh। দুটি একই কথা। যুবকেরা ধর্ম্মশীল হবে, এ কথার মানে এ নয় যে, যুবকেরা বনে গিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করবে; এর অর্থ আমরা এই বুঝ্‌ব যে, যৌবনের ধর্ম্ম যা তাই তাদের গ্রহণ করতে হবে। তরুণের ধর্ম্ম বা লক্ষণ হচ্ছে শক্তি, সেই শক্তি আপনাদিগকে অর্জ্জন করতে হ'বে। শিকড় মাটিতে সুপ্রোথিত হ'লে গাছ পত্রপুষ্পফলে সুশোভিত হয়। একটা বড় বাড়ী করতে হ'লে তার ভিত বেশ পাকা চওড়া ক'রে করতে হয়। তেমনি শক্তির গোড়ার জিনিস সতেজ শক্তিমান দেহ। অবশ্য যে ব্যক্তি চিররুগ্ন, সে যে কোন কাজ করতে পারে না, তা নয়। কিন্তু রুগ্ন দুর্ব্বল জাতি বড় কিছু কখনও করতে পারে না। শিক্ষানীতির একটা গোড়ার কথা আছে, সুস্থ বলিষ্ঠ মনুষ্যনামধারী প্রাণী তৈরী করা। খুব সোজা সত্যি কথাও অনেকে বড় লোকের নাম না ক'রলে মান্‌তে চান না। তাই বলি, হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে একথা বলেছেন। আপনারা তরুণেরা সকলের আগে শরীরটা তাজা করুন। আমি এখানকার সিটী ইস্কুল দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, সেখানে ছেলেদের মুখ দেখে অনেককেই বেশ সুস্থ মনে হ'ল, এতে আমি বড় সুখী হয়েছি। ভাল ক'রে খেতে দিতে পারলে, একটু খেলার জায়গা দিলে, আমাদের দেশের ছেলেরাও মানুষ হ'তে পারে, তাদের শরীর ও মনের শিরদাঁড়া খাড়া থাক্‌তে পারে। দেহকে সুস্থ রাখার জন্য যা' যা' করা দরকার তার কথা তো আমাদের ছেলেমেয়েরা পাঠশালা থেকেই পড়্‌ছে, কেবল কাজে করলেই হয়। সংযম, অবিলাসিতা খুব দরকার। ঋষিরা যে ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলে গিয়েছেন,

তরুণদের সেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা উচিত। ব্রহ্মচর্য্য মানে অবশ্য সন্ন্যাসী হওয়া বা কৃচ্ছ্রসাধন করা নয়। মানুষকে ভগবান যে-সব শক্তি দিয়েছেন সেগুলির ঠিক্ ভাবে সুব্যবহার করাই ব্রহ্মচার্য্য। গীতাতেও সন্ন্যাসী হ'তে বা কৃচ্ছসাধন করতে বলা হয় নাই। "যুক্তাহারবিহারশ্চ" হ'তে হবে, উপযুক্ত রূপ আহার-বিহার করতে হবে, আর জীবনে আনন্দকে পেতে হবে। উপযুক্ত কোন কোন লোকের সন্ন্যাসী হওয়ার বিরোধী আমি নই। একটা জাতির কি করা উচিত, তারই কথা হ'চ্ছে। ১০।১১ বৎসর বয়সে বাংলা ইস্কুলে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুরাবৃত্তসারে আমরা পড়েছিলাম, স্পার্টার লোকদের দৃঢ় করবার জন্য লাইকার্গাস খুব কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন, স্পার্টাবাসীরা দৃঢ় ও বীর হয়েছিলও বটে। কিন্তু এথেন্সের লোকেরা সকল রকম বিদ্যায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ভাস্কর্য্যে, কৃতিত্ব লাভ করেছিল। তাদের আদর্শ জগতে এখনো চল্‌ছে, অথচ বীরত্বেও তারা স্পার্টার সমকক্ষই ছিল। আমাদের আদর্শ সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া চাই। আনন্দ আর বিলাস ও আমোদপ্রিয়তা এক জিনিস নয়। আনন্দ খুব উঁচু জিনিস। বিলাসী সেই আনন্দ পায় না, তারা যা পায় তা মেকী। উপনিষদে আছে, আনন্দ থেকেই সব উৎপত্তি, আবার যেদিন সব লুপ্ত হবে সেদিন সবই আনন্দের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করবে। আনন্দের ভিতর দিয়েই আত্মা পুষ্টিলাভ করে। ডাক্তারেরা বলেন, আনন্দের সঙ্গে যা খাওয়া যায় তা যেমন সহজে পরিপাক হয়, জোর ক'রে গিলিয়ে দিলে তেমন হয় না। শিক্ষাতত্ত্ব-বিদেরাও বলেন, বালকদিগকে শিক্ষা দিতে হবে আনন্দের ভিতর দিয়ে, নইলে সহজে নূতন জ্ঞান হৃদয়মনপ্রাণের জিনিস ক'রে ফেলা যায় না। এজন্যই আমি বলেছি, সংযমের সঙ্গে আনন্দ চাই।

তরুণের অন্য কয়েকটি লক্ষণ, সাহস, অভয়, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভর। তা নইলে কিছু করা যায় না। আর দরকার শ্রদ্ধাবান হওয়া—শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্রূপের ভাব, ব্যঙ্গের ভাব থাক্‌লে শিক্ষা হয় না। দুঃখের বিষয়, বঙ্গের কোথাও কোথাও এই বিদ্রূপের ভাবটা, অকালবিজ্ঞতাটা কিছু বেশী।

তরুণের আর-এক লক্ষণ মরণের চিন্তাকে মনে স্থান না দেওয়া। অন্তর্নিহিত অমরত্বে বিশ্বাস তরুণের লক্ষণ। সময়ের হিসাব ক'রে, বয়সের হিসাব ক'রে তাঁরা কোন কাজে প্রবৃত্ত হন না। আজ সকল দেশেই একটা ইয়ুথ মুভমেণ্ট অর্থাৎ তরুণ-প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। যাদের মনটা বুড়ো হ'য়ে গেছে, অনেকের ১৫।১৬ বছরেও হ'য়ে যায়, তাদের কিছু বল্‌বার নাই। অতীতের উপাসক যারা, তাদের কাজের পরিচয় তো আপনারা দেখ্‌ছেনই, জরাগ্রস্ততার ও প্রাচীনতার কীর্ত্তির পরিচয় তো আপনারা পেয়েছেনই। এখন তাজা লোকদের কাজ নূতন পথ খুঁজে বের করা। ভীরু হ'লে চল্‌বে না। শিশু প্রথম পৃথিবীকে দেখে বিস্ময়ভরে একটা নূতন জিনিস হিসাবে। শিশু যখন হাঁট্‌তে শিখে তখন সে বারবার প'ড়ে গিয়েও দমে না, কিছুতেই কোলে থাক্‌তে চায় না, নিজে হাঁট্‌তে চায়। শিশুর মতন মন ও চোখ দিয়ে প্রাচীন পৃথিবীকে নূতন করে দেখ্‌তে হবে, নূতন ক'রে তাকে গড়্‌তে হবে। পুরোনো জিনিসকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে বল্‌ছি না, তাকে নূতন ক'রে গ্রহণ করতে হবে। পুরাতনের অভিজ্ঞতাকে অবশ্য শ্রদ্ধা কর্‌তে হবে, কিন্তু তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস ক'রে নিজের প্রত্যক্ষজ্ঞানলাভের ক্ষমতা বাদ দিলে চল্‌বে না।

তরুণের অন্য এক লক্ষণ—আইডিয়্যালিজ্‌ম্ বা আদর্শে বিশ্বাস। অর্থাৎ যা বাস্তব, চোখে যা দেখি, কানে যা শুনি, তাই সত্য নয়, যা হওয়া উচিত তাই সত্য। Fact is not truth. সত্য যা' তা' ধ্যানের জিনিষ। ময়মনসিংহের সম্বন্ধে যা সত্য তাকে ধ্যানের ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে হবে, দেখ্‌তে হ'বে ৪৮ লক্ষ লোক সাহসে নবীন, জ্ঞানে প্রবীণ হয়েছে; স্বাধীন হ'য়ে বিশ্বপ্রেমিকের ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেছে। আজ যা তথ্য (fact), তা তো চ'লে যাচ্ছে সময়ের সঙ্গে। ময়মনসিংহের শতকরা ৯৪ জন লোক নিরক্ষর, এই তথ্য দিনের পর দিন মিথ্যা হচ্ছে। কিছুদিন পরে এই তথ্য বদ্‌লে যেতে পারে, একেবারে মিথ্যা হ'য়ে যেতে পারে। আর যা সত্য তা ক্রমে প্রকাশ পায়। সত্যকে মনশ্চক্ষুতে ধারণা ক'রে নিতে হবে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে নানারকম তথ্য দেখিয়ে পাশ্চাত্যেরা যখন আমাদের অভিভূত কর্‌তে চায়, বলে, যে, "তোমরা এত অশিক্ষিত, দুর্ব্বল, সামাজিক কুপ্রথায় জর্জ্জরিত, তোমাদের মধ্যে এত গৃহবিবাদ," তখন আমাদের বল্‌তে হবে, "তোমরা যা বল্‌ছ তা তথ্য হ'তে পারে বটে; কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তাই সত্য নয়, আমরা যা হ'তে চাই, যা হ'তে চেষ্টা করছি, তাই হচ্ছে সত্য।" তরুণেরা ধ্যানের ভিতর দিয়ে স্থির করুন কি তাঁদের হওয়া উচিত এবং তারই উপাসনা করুন। কিন্তু শুধু আইডিয়্যালিজম্ হ'লেই চল্‌বে না। মানসী মূর্ত্তিকে বাইরের রূপ দিতে চেষ্টা কর্‌তে হবে। যা হওয়া চাই করা চাই ব'লে মনের ভিতর স্থির কর্‌বেন, বাইরে তাই হতে হবে করতে হবে।

তারপর আশাশীলতা—সবকিছুই হতে পারে ও হবে। ভারত-বর্ষ যত মহৎ, যত ভাল, যত স্বাধীন হ'তে পারেন, ঠিক কি প্রণালী অবলম্বন কর্‌লে তা হ'তে পারেন, সে-বিষয়ে আমি আমার অজ্ঞতা স্বীকার কর্‌ছি, ঠিক কোনো প্রণালীই আমি ব'লে দিতে পার্‌ছি না। কিন্তু তা ব'লে কোন প্রণালীই নাই, একথা আমি মানি না। আমি মৃত্যুর দ্বারে এসে পড়েছি, তবু আমি আশাহীন হইনি। তরুণেরাও আশা রাখুন, উপায় বের করুন। বাধা বিঘ্ন তো আছেই, কিন্তু বাধা বিঘ্ন আছে অতিক্রম কর্‌বার জন্য। সংগ্রাম ক'রেই তো মানুষের শক্তির বিকাশ হয়। এমার্সন বলেছেন, He who wrestles with me strengthens me, "যে আমার সঙ্গে কুস্তি লড়ে, সে আমাকে বলিষ্ঠ করে।" কোনমতেই দম্‌বেন না, অদম্যতা তারুণ্যের লক্ষণ।

তরুণের পঞ্চম লক্ষণ, অমরত্বে বিশ্বাস। চিরবসন্তের হাওয়া তরুণদের উপর বয়ে যাচ্ছে, অনির্ব্বাণ অগ্নি রয়েছে তাদের মধ্যে। তরুণরা যে আত্মাহুতি দিতে পারে, কেন পারে? কারণ তারা জানে, যে, সেবা অমর, নিষ্ফল সেবা নিষ্ফল আহুতি ব'লে কিছু নেই, সেবা যে দেবাধি-দেবের চরণে প্রদত্ত অঞ্জলি, তিনি অবিনাশী, তিনি যৌবনের দেবতা, তরুণদের রাজাধিরাজ। আমি যদি ঋষি হতাম, কবি হতাম, চির-তরুণতার বন্দনা রচনা ক'রে আপনাদের শোনাতাম। কিন্তু সে সামর্থ্য আমার না থাক্‌লেও শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌বার অধিকার আছে। তরুণকে ও চিরতরুণতার উৎসকে আমি নমস্কার কর্‌ছি।

সত্তর বৎসর

কলিকাতা ছাত্রাবাসে

(১৮৫৭-১৯২৭)

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

কলিকাতার পথে

আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি, কহিয়াছি তখন পদ্মার ওপারে রেল বসা দূরে থাকুক তাহার কল্পনাও হয় নাই। চায়ের কারবারের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাহাজেই ইংরেজ কোম্পানীদের মাল আমদানী ও রপ্তানী হইত। জাহাজেই বেহার অঞ্চল ও সাঁওতাল পরগণা হইতে চা-বাগানের কুলীও চালান হইত। এই জাহাজেই আমি প্রথমে শ্রীহট্ট হইতে গোয়ালন্দ আসি। ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে জাহাজ বদ্‌লী হইত। কলিকাতার যাত্রীরা ঢাকায় বা নারায়ণগঞ্জে গোয়ালন্দের জাহাজে চাপিতেন। এখন গোয়ালন্দ হইতে ৬।৭ ঘণ্টায় নারায়ণগঞ্জে যাওয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিনেও যাওয়া যাইত না। এখন জাহাজ দিন রাত চলিতে পারে। সেকালে বিজ্‌লীর আলো আবিষ্কৃত হয় নাই। সন্ধ্যার পরে জাহাজ চালান সম্ভব ছিল না। এইজন্য ঢাকা হইতে গোয়ালন্দের পথে যাত্রীদিগকে এক রাত্রি জাহাজেই কাটাইতে হইত। শ্রীহট্ট হইতে নারায়ণগঞ্জ আসিতে পাঁচ দিনের কম নয়, কখনো কখনো ৭।৮ দিন লাগিত। মাল বোঝাই করিবার জন্য সে-সকল জাহাজ বড় বড় বন্দরে কখনো কখনো দুই দিন, এবং সর্ব্বদাই অন্ততঃ একদিন আটকিয়া থাকিত। কাজেই শ্রীহট্ট হইতে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিতে ৭।৮ দিন লাগিত।

এই ৭।৮ দিন চিঁড়া চিবাইয়া কাটানো আমার মত লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শ্রীহট্টে থাকিতেই আমার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দুয়ানীর বন্ধন একেবারে টুটিয়া গিয়াছিল। শ্রীহট্টেই মুসলমানের রুটী বিস্কুট খাইতে আরম্ভ করি, পূর্ব্বেই ইহা কহিয়াছি। মুসলমানের ভাত খাইতেও নিজের ভিতরে কোন সঙ্কোচ ছিল না। তবে আমার প্রথম জাহাজ যাত্রায় জাতের বাঁধন একেবারে নষ্ট করিতে হয় নাই। সে জাহাজে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কেরাণী ছিলেন—বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায়। জাহাজের পেছনে যে জালিবোট বাঁধা থাকিত তাহাতেই তাঁর রান্না হইত। আমরা তাহার উপরে ভাগ বসাইতাম। এইরূপে কায়ক্লেশে ভাঙ্গা জাতের যতটুকু ছিল তাহা বাঁচাইয়া নারায়ণগঞ্জে পৌছিলাম।

নারায়ণগঞ্জ—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে

আমি প্রথমে যে-নারায়ণগঞ্জ দেখিয়াছিলাম সে-নারায়ণগঞ্জ আজ আর নাই। সে নারায়ণগঞ্জ ছিল একটা গ্রাম ও বাজার। আজিকার নারায়ণগঞ্জ হইয়াছে একটা বড় বন্দর ও সহর। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে তখনও রেল হয় নাই। পাটের গুদাম দুই একটা হইয়াছে। বোধ হয় রালীব্রাদার্সের আফিস বসিয়াছে, আর ছাতকের ইংলিশ কোম্পানীরও একটা বড় আফিস ছিল। নারায়ণগঞ্জে তখন হোটেল ছিল না। কতকগুলি আখড়া ছিল। এইসকল আখড়াতেই যাত্রীরা আশ্রয় ও আহার পাইত। এজন্য যথাসম্ভব প্রণামী দিতে হইত। এই প্রণামীর উপরে প্রসাদের গুণাগুণ নির্ভর করিত। সামান্য প্রণামী দিলে সাধারণ ডাল ভাত মিলিত; বেশী প্রণামী দিলে উৎকৃষ্ট আতপান্ন, গব্যঘৃত, দৈ, সর, দুধ এবং মিষ্টান্ন মিলিত। আখড়ার নাট-মন্দিরে শুইবার স্থান মিলিত। নারায়ণগঞ্জে নামিয়া এইরূপ একটা আখড়াতেই আতিথ্য গ্রহণ করি।

ঢাকা—গোয়ালন্দের জাহাজ

ঢাকা হইতে গোয়ালন্দে তখন দুইখানা জাহাজ চলাচল করিত। যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় সপ্তাহে দুবার ঢাকা

হইতে গোয়ালন্দ যাওয়া যাইত। জাহাজ দুখানির নাম এখনও ভুলি নাই। একখানি ছিল "Prince of Wales," আর একখানি ছিল "Princess Alice"। শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় যে-সকল মালের জাহাজ চলিত এ দুখানি জাহাজ তার চাইতে অনেক ভাল ছিল। এ দুখানি যাত্রী-জাহাজ ছিল। মাল-জাহাজ প্রায়ই দুই পাশে দুখানা অতিকায় আঁধা বোট বা গাধা বোট বাঁধিয়া টানিয়া নিত, ঢাকা-গোয়ালন্দের যাত্রী-জাহাজে সচরাচর কোন গাধাবোট বাঁধা থাকিত না। তবুও একদিনে ঢাকা হইতে গোয়ালন্দে যাওয়া যাইত না। নারায়ণগঞ্জে যাইয়া গোয়ালন্দের জাহাজের জন্য পথ চাহিয়া থাকিতে হইত। শ্রীহট্টের জাহাজে জাহাজের কেরাণী হরমোহন-বাবুর অনুগ্রহে কোনো রকমে জাত বাঁচাইয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু গোয়ালন্দের জাহাজে হরমোহন-বাবুর মত কোনো কর্ম্মচারী ছিলেন না। সুতরাং এখানে মুসলমান খালাসীদের আতিথ্য স্বীকার করিতে হয়। এই আমার প্রথম মুসলমানের অন্নপ্রাশন। এসকল জাহাজে তখনও দেশীয় লোকেরা ইংরেজী ধরণে খানা খাইতে আরম্ভ করেন নাই। উচ্চ শ্রেণীতে দেশীয় যাত্রীও চলাচল করিতেন না। উচ্চশ্রেণীর যাত্রীর এখনকার মতন কোন ব্যবস্থাও ছিল না। এখন আমাদের নদীর জাহাজে দেশীয় লোকেরাই কাপ্তানের বা সারেংয়ের কাজ করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁদের এশিক্ষা লাভ হয় নাই। তখন তাঁরা খালাসীর কাজই কেবল করিতেন। জাহাজের কাপ্তান এবং এন্‌জিনিয়ার দুইই বিদেশীয় ছিলেন। ইংরেজ যাত্রী আসিলে তাঁহারা কাপ্তানের ক্যাবিনেই আশ্রয় পাইতেন এবং কাপ্তানের টেবিলেই খানা খাইতেন। দেশীয় যাত্রীদের সে-লোভও জন্মে নাই আর ইংরেজের সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া বসিবার-দাঁড়াইবার সাহস এবং অভ্যাসও হয় নাই। সুতরাং আমাদের মতন আচার-ভ্রষ্ট হিন্দুদিগের পক্ষে মুসলমান খালাসীদের আতিথ্য গ্রহণ করা ব্যতীত আহারাদির জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না।

খালাসীদের আতিথ্য

তবে এই খালাসীর খানা খাইতে যাইয়া মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে কিছু কিছু গোলমালও বাধিত। আমাদের মতন ছেলেদের উদর পূর্ণ করা তাঁদের পক্ষে সর্ব্বদা সহজ ছিল না। বিশেষতঃ আট আনায় এত পরিমাণ কারী-ভাত জোগাইতে গেলে অতিথি-সেবাই করিতে হইত, লাভবান ব্যবসা করা সম্ভব ছিল না। এইজন্য প্রায়ই তাঁদের সঙ্গে আমাদের খটাখটি বাধিয়া যাইত। আমরাও ছাড়িবার পাত্র ছিলাম না। কারীর বরাদ্দ যথেচ্ছা বাড়ান যখন অসম্ভব হইল তখন ভাতের দাবী চড়ান গেল। এ ভাত যে সকলই আমাদের পেটে যাইত তাহা নহে। প্রকাশ্যে খালাসীর হাতে খাইবার সাহস তখনও হয় নাই! সারেংয়ের ক্যাবিনেই, আর কখনো কখনো জাহাজের চাকার উপরে যে ছোট ঘর থাকিত তাহাতে, বসিয়া খাইতে হইত। আর ভাত দিয়া গেলেই সে ভাত আমাদের পেটে না যাইয়া অনেক সময় পদ্মা-গর্ভে যাইয়া অদৃশ্য হইত। এইরূপে খালসী যখন দেখিল যে ব্যঞ্জনাদির সাহায্য ব্যতীতও আমরা এত পরিমাণ অন্ন ধ্বংস করিতে লাগিলাম তখন আমাদের কারীর মাত্রা সম্ভব মত বাড়াইয়া একটা রফা করিল। এইরূপে অনেক সময় অনেক কৌতুকের সৃষ্টি হইত।

গোয়ালন্দের রেল—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে

এইরূপে জাত খোয়াইয়া কোনো প্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে দুই দিন পরে গোয়ালন্দ পৌঁছিয়া রেল গাড়ীতে উঠিলাম। আমরা রেলের কর্ত্তাদের নিকট হইতে যে সুখ-স্বচ্ছন্দতার দাবী করি তাহা পাই নাই। কিন্তু প্রথম যে রেলগাড়ীতে চড়ি, সে গাড়ীর তুলনায় আজি-কালিকার গাড়ী কত যে শ্রেষ্ঠ তাহা মনে করিলে অসন্তোষের কারণ অনেকটা কমিয়া যায়। তখন নিম্নতম শ্রেণীর গাড়ীগুলিকে চতুর্থ শ্রেণী কহিত। মধ্যম শ্রেণীর বা Intermediate গাড়ী তখনও হয় নাই। তবে পূর্ব্বে যাহা তৃতীয় শ্রেণী কহিত তাহাই কার্য্যতঃ এখন মধ্যম শ্রেণী হইয়াছে। নিম্নতম শ্রেণীর গাড়ীতে কাঠের জানালা ছিল, কাচের জানালা তখনও হয় নাই। এখনও তাহাতে গদী নাই, তখনও ছিল না। পায়খানা গাড়ীর ভিতরে হয় নাই। ষ্টেশনে নামিয়া মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিতে হইত। ইহাতে কখন কখন যাত্রীদের পথের মাঝখানে পড়িয়াও থাকিতে হইত। এ অভিজ্ঞতাও যে আমাদেরও হয় নাই এমন নয়।

যাত্রীর ভিড় এখনকার চাইতে বোধ হয় বেশী হইত। এখন যতগুলি ট্রেন প্রতিদিন গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় আসে সেকালে তাহার ব্যবস্থা ছিল না। বোধ হয় দিনে একখানা ও রাত্রিতে একখানা,—এই দুইখান ট্রেনই গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিত। সেকালের রেলের যাতায়াতের কথা মনে করিলে এবিষয়ে যাত্রীদের সুখ-সুবিধা কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা অনুভব করিয়া ভবিষ্যতের অনেক আশা হয়।

কলিকাতায় প্রথম প্রবেশ

কলিকাতার প্রথম দর্শনে মনে কি ভাব জন্মিয়াছিল বলিতে পারি না। তবে বিলাতের পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া প্রথম লণ্ডনের আলো দেখিয়া ইংরেজ-বালকের মনে যে-সকল ভাবের উদয় হয়, কেতাবে পড়িয়াছি,—কলিকাতার প্রথম দর্শনে আমার অন্তরে সেরূপ কোন ভাব জন্মে নাই, একথা বলিতে পারি। শিয়ালদহ হইতে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চাপিয়া সুন্দরীমোহনের সঙ্গে শ্রীহট্টের ছাত্রাবাসে যাইয়া উঠিলাম। সেকালে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীই সচরাচর পাওয়া যাইত। ছোট্ট ছোট্ট ঘোড়া আর নড়্‌ঝড়্‌ গাড়ী; ইহাই, এখন যেমন তখনও প্রায় সেরূপই, কলিকাতার সেকড়া গাড়ীর লক্ষণ ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী বোধ হয় রাজপথে বেশী বাহির হইত না। কুক্ কোম্পানীর আড়গড়া ছাড়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ী কোথাও পাওয়া যাইত না। আর বিবাহের মিছিল ব্যতীত কেহ কুকের বাড়ীর গাড়ী ভাড়াও করিত না।

ইংরেজীতে কলিকাতাকে City of Palaces কহে। কিন্তু প্রথম কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া ইহার প্রাসাদাবলী দেখিয়া আমার মনে কোনো বিশেষ বিস্ময় বা উল্লাস জন্মে নাই। তখন কলিকাতার এখনকার চেহারাও ছিল না। অধিকাংশ রাজপথেই সারি সারি খোলার-ঘর ছিল। শিয়ালদহ হইতে বাহির হইয়া বহুবাজারের রাস্তা দিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে পড়িয়া মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে নিমু খানসামার লেনে শ্রীহট্টের ছাত্রদের মেসে (mess) যাইয়া উঠিলাম।

এখন এ-রাস্তায় দুধারেই পাকা বাড়ী হইয়াছে। সুসজ্জিত দোকান-পাটে রাজপথের নূতন শ্রী ফুটিয়াছে। সেকালে এরূপ ছিল না। নিমু খানসামার লেন বহুদিন কলিকাতার মানচিত্র হইতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কেবল তাহার নাম লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে; বস্তুরও শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত আজ আর নাই। নিমু খানসামার লেন এখন মেডিকেল কলেজের ভিতরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। মেডিকেল কলেজও তখন এত বিস্তৃতি লাভ করে নাই। পুরাতন বড় বাড়ীটা মাত্র ছিল। উত্তরে ও দক্ষিণে খালি জায়গা পড়িয়া ছিল। উত্তরে সে-জায়গায় এখন শ্যামাচরণ লাহার চোখের হাঁসপাতাল হইয়াছে। দক্ষিণে আগেকার হাতার বাহিরে অনেকগুলি নূতন বাড়ী উঠিয়াছে। এইরূপে মেডিকেল কলেজ উত্তরে কলুটোলার রাস্তা হইতে দক্ষিণে বর্ত্তমান ইডেন হাস্‌পাতাল রোড পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ইডেন হাস্‌পাতাল রোডের পূর্ব্ব নাম ছিল চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন। এই চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন পশ্চিম মুখে যাইয়া চুনাগলিতে পড়িয়াছিল। চুনাগলির নামও বদ্‌লিয়া গিয়াছে। এখন ইহা ফিয়ার লেন হইয়াছে। সহরের রাস্তায় এই নাম-বিপর্য্যয়ে কলিকাতার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের কতটা যে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতেছে এখনকার সহরের মিউনিসিপাল কর্ত্তারা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। চাঁপাতলা নামের পিছনে একটা পুরাতন ইতিহাস ছিল। চুনাগলির নামের পিছনেও একটা ইতিহাস ছিল। চুনা-গলি বলিতে আমরা সেকালের কলিকাতার ফিরিঙ্গিপাড়া বুঝিতাম। চুনাগলির সাহেব, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা বিশেষ পরিভাষা ছিল। ফিয়ার লেন সে-স্মৃতিকে জাগায় না। নিমু খানসামার লেন নামের পিছনেও সেরূপ একটা স্থানীয় সামাজিক ইতিহাস লুকাইয়া ছিল। খানসামা হইলেও নিমু একদিন কলিকাতার ঐ পল্লীতে একজন সমাজপতি ছিল। এইরূপ কত অলিগলির প্রাচীন নামের সঙ্গে কলিকাতার পুরাতন সামাজিক ইতিহাস জড়াইয়া ছিল। নূতন বাবুদের আত্মীয়-স্বজনবর্গের নাম জাহির করিবার বলবতী পিপাসাতে সে-সকল ঐতিহাসিক চিহ্ন লোপ পাইতেছে। যাঁরা এমন সস্তায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা স্বজন-প্রীতির পরিতৃপ্তি সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁরা একথা ভাবেন না যে, তাঁদের পরে যাঁরা কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তা হইবেন তাঁরাও আবার নিজেদের

আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য আজিকার এই নামগুলি মুছিয়া ফেলিয়া পথঘাটের অন্য নামকরণ করিতে পারেন এবং করিবেন। আমার মনে হয়, এর চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে সেদিন যেদিন কলিকাতার কোন পথের নামে কোন লোকের নাম যুক্ত থাকিবে না এবং মার্কিনের নিউইয়র্ক প্রভৃতি সহরের মতন আমাদের সহরেও রাজপথের নাম ১ নং, ২ নং, ৩ নং, এইরূপ নম্বর ওয়ারী হইবে।

সিলেট মেস্

আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানাধীনে কোন ছাত্রাবাস বা মেস্ ছিল না। মফঃস্বল হইতে যে-সকল ছাত্র কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিতেন, তাঁহারা নিজেরাই বাড়ী ভাড়া করিয়া একসঙ্গে বাসা বান্ধিয়া কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন জেলার ছাত্রেরা নিজদের এক-একটা ছাত্রাবাস গড়িয়া তুলিতেন। এইরূপে ত্রিপুরা হইতে যাহারা আসিতেন তাঁরা ত্রিপুরা মেসে থাকিতেন। ঢাকার অনেক-গুলি যুবক কলিকাতায় পড়াশুনা করিতেন; এইজন্য ঢাকার দুটা মেস্ ছিল। ইহার মধ্যে ৩৩নং মুসলমান পাড়া লেনের মেসই সর্ব্বপ্রধান ছিল। এই মেসের সঙ্গে সে-কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্রের স্মৃতি জড়িত ছিল। বোধ হয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় এইখান হইতেই গণিতে অনরস্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। ৺রজনীনাথ রায়, ৺শ্রীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, প্রভৃতি সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জলতম রত্ন-সকল, অনেকেই ৩৩নং মুসলমান পাড়ার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। এইজন্য সে-যুগের কলিকাতার ছাত্রাবাস-সমূহের মধ্যে মুসলমান পাড়ার এই মেস্ একটা আভিজাত্য লাভ করিয়াছিল। বরিশালেরও বোধ হয় একটা স্বতন্ত্র মেস্ ছিল। তখনও যশোর ও খুলনা পৃথক্ হয় নাই। একই জিলা ছিল। যশোর-খুলনার একটা মেস্ ছিল। আমাদের শ্রীহট্টেরও একটা মেস্ ছিল। আমি এইখানেই আসিয়া প্রথম উঠিলাম। সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় আমার একবৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। তিনি সিলেট মেসেতেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আসিয়া আমিও এই দলেই ভিড়িয়া গেলাম।

তখন ১৫ নং নিমু খানসামার লেনে শ্রীহট্টের ছাত্রদের আড্ডা ছিল। একতালা বাড়ী। অনেকগুলি ঘর। বাড়ীর দুটো খণ্ড ছিল। সিলেট-মেস্ হইলেও এখানে অন্য জেলারও কেহ কেহ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কুমারখালীর তিন-জন ছিলেন। ঢাকার একজন, এবং উত্তর বঙ্গের এক-জন। ঢাকার শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। ইনি ডাক্তারী পাশ করিয়া এম-বি উপাধি লইয়া সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বহুবৎসর পরে (১৮৯৪) ইহঁার সঙ্গে মথুরায় সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি মথুরায় সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। সম্ভবতঃ সে-জেলার সিভিল সার্জ্জনের পদই লাভ করিয়াছিলেন। কুমারখালীর নবদ্বীপচন্দ্র পাল মহাশয়ও ডাক্তারী পড়িতেন। ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া ইনি নিজের গ্রামে যাইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বহুকাল পরে কুমার-খালীতে ইহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। পরলোকগত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ও আমাদের সিলেট-মেসে ছিলেন এবং এখান হইতেই ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া কিছুদিন মফঃস্বলে চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শেষে কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তবে এই ছাত্রাবাসের অধিকাংশ সভ্যই শ্রীহট্ট হইতে আসিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য ছাত্রেরাই এই মেসে থাকিতেন। শ্রীহট্ট সাহা-প্রধান স্থান। সাহাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণকায়স্থা-দির মতনই উচ্চ শিক্ষা বিস্তার হইতেছিল। প্রাচীন সমাজে ইহঁাদের জল চল ছিল না বলিয়া নিমু খাসামার লেনের মেসে ইহঁাদের কেহ ছিলেন না, স্বতন্ত্র মেসে অথবা অন্যান্য জেলার মেসে ইহঁাদের কেহ কেহ থাকিতেন।

মেস্-জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা

জীবনের প্রথমে বিদেশে-বিভুমে আসিয়া নিঃসম্পর্কিত লোকের সঙ্গে এই আমার প্রথমে একত্র বসবাস করিতে হয়। আর প্রথম দিন এই ছাত্রাবাসে আহার করিতে বসিয়া আমার ভিতরে এমন একটা আঘাত লাগে যাহা আজও

ভুলিতে পারি নাই। আমাদের পরিবারে সকলে, আত্ম-পর-বিচার-বিরহিত হইয়া একই খাদ্য খাইতাম। এমন-কি ভৃত্যেরা ও আমার বাবা এবং আমরা যে-চাল খাইতাম সেই চালই খাইতেন। মনে পড়ে, একবার একটা জমিদারী কিনিয়া বাবার অল্প-বিস্তর অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। সে-সময়ে আমাদের বাসার বরাদ্দ দুধ বন্ধ হইয়া যায়। বাবার শরীর তখন ভাল ছিল না। এই কারণে তাঁহাকে নিজের জন্য কিছুটা দুধের ব্যবস্থা করিতে বলা হয়। ইহার প্রতিবাদ করিয়া বাবা কহিয়াছিলেন, যে, তিনি জন্মে কখনও নিজে যাহা খাইতেন তাহা কমই হউক বেশীই হউক বাড়ীর অপর সকলকে—চাকরদের পর্য্যন্ত না দিয়া খান নাই। যতদিন পর্য্যন্ত বাসার চাকরবাকরদেরও দুধের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না, ততদিন তিনি নিজে কখনও দুধ খাইতে পারেন না। এই ভাবেই আমি বড় হইয়া উঠিয়াছিলাম। কলিকাতায় ছাত্রাবাসে প্রথম দিন খাইতে বসিয়া দেখিলাম যে, সকলের জন্য মামুলী রকমে ভাল ভাজা মাছের ঝোল ও অম্বলের ব্যবস্থা; কিন্তু কেহ কেহ ইহারই মধ্যে ডিম খাইতেছেন কেহ বা ঘি খাইতেছেন কেহ বা দই খাইতে-ছেন। ইহা দেখিয়া আমার কি যে বিরক্তি হইয়াছিল আজ পর্য্যন্ত সে-কথা ভুলি নাই। বলা বাহুল্য, যে ক্রমে আমাকেও এই বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের পয়সায় বিশেষ বিশেষ আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রথম দিনের কথা চিরদিনের মতন প্রাণের উপরে দাগিয়া রহিয়াছে।

ছুঁৎমার্গ পরিহার

শ্রীহট্টে থাকিতেই হিন্দুয়ানির বন্ধন আলগা হইয়া যাইতেছিল। কলিকাতায় আসিয়া তাহা একেবারে খসিয়া পড়িল। শ্রীহট্টে লুকাইয়া হিন্দুর অখাদ্য খাইতাম। কলিকাতায় আসিয়া প্রকাশ্যভাবে খাদ্যাখাদ্যের বিচার পরিহার করিলাম। কিন্তু আমাদের ছাত্রাবাসের কেহ কেহ হিন্দুয়ানী ছাড়িতে রাজি ছিলেন না। বোধ হয় তাঁদের অভিভাবকেরাও এবিষয়ে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান ও শাসন করিতে চেষ্টা করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের এই ছাত্রাবাসে দুইটা দল গড়িয়া উঠিল। একদল কোন প্রকারের বন্ধন স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না; আর একদল সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যে কোন অনাচার করিতে সাহস পাইতেন না। শ্রীহট্টে মুসলমানের পাঁউরুটী বিস্কুট লুকাইয়া খাইতাম। এখানে যাঁরা হিন্দুয়ানির আবরণ রাখিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন তাঁরাও মিশ্রিগঞ্জের পাঁউরুটি ছাড়িয়া বামনের পাঁউরুটী খাইতে পারিতেন না। প্রতিদিন বিকাল বেলা, রুটীওয়ালা ঘরে ঘরে যাঁর যেমন ব্যবস্থা সেইরূপ তাঁর টেবিলে বা বিছানায় রুটী রাখিয়া যাইতেন। একদিন বৈকালে শ্রীহট্ট হইতে একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমাদের মেসে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই আত্মীয়ের বিছানাতেও টাটকা গরম পাঁউরুটী পড়িয়াছিল, ইনি আর কোন উপায়ে এই রুটীখানি লুকাইতে না পারিয়া তাহার উপরে বসিয়া পড়িলেন! এইরূপ কৌতুককর ঘটনা মাঝে মাঝে হইত।

শিক্ষিত বাঙ্গালীর সত্যানুরাগ

সেকালে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে অসাধারণ সত্যানুরাগ ছিল। ফলতঃ দেশের সাধারণ লোকের মনেও এই ধারণা ছিল যে, ইংরেজানবীশবাবুরা কখনও মিথ্যা কথা কহেন না। আমাদের ছাত্রাবাসে যাঁহারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রায় অনেকেই মিথ্যা কথা কহিতে চাহিতেন না। যাঁহারা হিন্দুর অখাদ্য খাইতেন না তাঁরাও মনে মনে খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না। মুসলমানেরা যাহা খান তাহা খাইলে যে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, এ বুদ্ধি তাঁহাদের বিন্দু পরিমাণেও ছিল না। সমাজের বিরুদ্ধে যাইবার সাহস তাঁহাদের ছিল না। তাঁরা নিজেরাই সরল ভাবে ইহা স্বীকার করিতেন। অন্যদিকে সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া আপনার জাত বাঁচাইবার জন্য ইহাঁরা মিথ্যার আশ্রয় লইতে চাহিতেন না। এইজন্যই এক মুসলমানের পাঁউরুটি ছাড়া হিন্দুর অখাদ্য অন্য কোন খাদ্য ইহাঁরা খাইতেন না। আর পাঁউরুটি বিস্কুট খাইতেন এইজন্য যে একথা লইয়া শ্রীহট্টের সমাজে কোন কথা উঠিবার আশঙ্কা ছিল না। একবার আমাদের মেসের পাচক ব্রাহ্মণ আসেন নাই, কে রাঁধিবে এই প্রশ্ন উঠিল। একরূপ বাল্যকাল হইতেই

আমার রান্নার বেশ সখ ছিল। বাবাও রান্ধিতে ভাল বাসিতেন। আমি বাল্যাবধিই মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার রান্নাবাড়া দেখিতাম। আজি পর্য্যন্তও আমার রান্নার সখ যায় নাই। আমাদের মেসে যখনই পাচক ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত থাকিতেন তখন অনেক সময়ই আমি সে-কাজ করিতাম। আমাদের একজন ব্রাহ্মণ-বন্ধুকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর খাওয়ার কি ব্যবস্থা হইবে। তিনি বলিলেন, ভাত ছাড়া আর যা-কিছু তুমি গিয়া রান্ধ, ভাতের ফেন গড়াইবার সময় আমাকে ডাকিও। আমি যাইয়া ভাত নামাইব। শুনিয়া, আমরা হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, এ কেমন? ডাল তরকারী সবই আমাদের হাতে খাইতে পারেন, ভাতের বেলাই অপরাধ? তিনি গম্ভীর ভাবে কহিলেন—ভাত খাইতেও আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু বাড়ী যাইয়া মিছা কথা কহিতে পারিব না। অব্রাহ্মণের হাতে ভাত খাইয়াছি কি না, লোকে এই কথাটাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে। ডাল, ভাজা খাইয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিবে না। সুতরাং ভাত না খাইলে আমি তোমাদের সহিত ভাত খাই নাই, স্বচ্ছন্দচিত্তে এ কথা বলিতে পারিব।

জাত বাঁচাইবার রফা

আমাদের মেসে হিন্দুয়ানী রক্ষা করিবার জন্য ক্রমে এক নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হয়। বেশী কষাকষি করিলে মেস্ ভাঙ্গিয়া যাইবে, যাঁরা হিন্দুয়ানী মানিতেন না তাঁদের সংখ্যাই বেশী ছিল। তাঁরা সে-অবস্থায় মেস্ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন। অতএব উভয় পক্ষের মধ্যে একটা রফা হইল। রফাটা এই হইল যে, মেসের কোন সভ্য হিন্দুর কোন অখাদ্য মেসের ভিতরে আনিতে পারিবেন না। বাহিরে যাঁর যেমন ইচ্ছা সেইরূপই খাইতে পারেন।

এই রফার ফলে সুন্দরীমোহন এবং আমাকে একদিন বড় মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। বোধ হয় তখন পূজার ছুটি। একদিন ঝি বামুন কেহই আসে নাই। বাজার হইতে লুচি ও সন্দেশ আনিয়া খাইতে আমাদের প্রবৃত্তি হইল না। এখন কলিকাতার প্রায় সর্ব্বত্র রান্না মাছ মাংস প্রভৃতির খাবার দোকান হইয়াছে। সেকালে কেবল মদের দোকানের নিকটেই এইরূপ রান্না মাছ মাংস প্রভৃতি পাওয়া যাইত। বহুবাজারের নিকটে, মদন বড়ালের লেনে, আমাদের বাসা ছিল। আর বহুবাজারের রাস্তায় অনেকগুলি মদের দোকান ও তারই আশেপাশে রান্না মাছ মাংসের দোকানও ছিল। সুন্দরীমোহন এবং আমি খাদ্য অন্বেষণে বহুবাজারের রাস্তায় যাইয়া এইরূপ একটা চাটের দোকান হইতে গরম লুচি ও মাংসের কারি কিনিয়া লইলাম। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথাও বসিয়া খাবার জায়গা আছে কি না। সে-ব্যক্তি আমাদিগকে একটা ফটক দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐ দিকে একটি খাবারের ঘর আছে। আমরা সেই ফটক দিয়া যাইয়া একটা একতালা ঘরে ঢুকিলাম। সেখানে একটা কেরোসিনের আলো ঝুলিতেছিল। মাঝখানে একখানা টেবিল পাতা, তার দুদিকে দুখানা লম্বা বেঞ্চি। আমরা ভাবিলাম যে বেশ জায়গা পাওয়া গেল, এখানে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাত্রের খাওয়াটা সারিতে পারিব। এই ভাবিয়া আমরা যেই লুচির চুপড়ী ও মাংসের মালসা টেবিলের উপরে রাখিয়া খাইতে বসিব, এমন সময় একজন বয়স্ক ব্যক্তি একটা গ্লাস হাতে ও একটা বোতল বগলে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাকে দেখিয়া আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। আমরা তখন তাড়াতাড়ি আমাদের লুচি মাংস হাতে তুলিয়া লইলাম। আমরা চলিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছি দেখিয়া সেই ব্যক্তি বলিলেন—লজ্জা কি বাবা তোমরা যা কর্ত্তে এসেছ, আমিও তাই কর্ত্তেই এসেছি। তাহাকে দেখিয়াই আমাদের পিত্তি শুকাইয়া গিয়াছিল। আমরা সেখানে আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তারপর সমস্যা হইল, কোথায় বসিয়া খাইব। বাসায় লইয়া যাইবার হুকুম নাই, রাস্তায় দাঁড়াইয়া লুচি মাংস খাওয়া যায় না। আমাদের বাসার সাম্‌নেই এক প্রতিবেশীর বৈঠকখানা ঘরের পাশে একটা রোয়াক ছিল, সেখানে যাইয়া কোনও মতে খাওয়া গেল; তারপর বাসায় যাইয়া ঘরের কুঁজার জলে সেই খাদ্য গলাধঃকরণ করিলাম। ঐ রোয়াকটা প্রতিদিন প্রত্যুষে মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারীদের যে কাজে লাগিত, সে কথা মনে না করাই ভাল।

(ক্রমশঃ)

লেপ-চিত্রাঙ্কণ

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাদ আছে যে, "কালি, কলম ও মন" এই তিন একত্র হইলে পরে লেখা হয়। চতুর্থ একটি পদার্থ, তাহা ভূর্জ্জপত্র বা কাগজ বা ঐরূপ অন্য কিছুই হউক, আধাররূপে যে নিতান্ত প্রয়োজন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চিত্রাঙ্কণেও কল্পনা, লেখনী বা তুলি, তরল বর্ণ (তুলির সাহায্য বিনা শুষ্ক বর্ণদ্বারাও হয়) ও চিত্রাঙ্কণের আধার-স্বরূপ কিছু একটা থাকা চাই। আদিম প্রাগ্‌ঐতিহাসিক



ভারতীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। সিন্ধু প্রদেশ।

যুগের মানব তাহার বাসস্থল বা পর্ব্বত-গুহার গাত্রে প্রথমে স্থায়ী চিত্রাঙ্কণ করে। এখনও সেই গৃহ-চিত্রাঙ্কণ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ক্রমে চিত্রাঙ্কণ আরও সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠে। তখন যে কোন পদার্থের সমতল ও বর্ণসংযোগ-উপযোগী গাত্র আছে, সে-সকলই আধাররূপে গৃহীত হয়।

ললিতকলার প্রধান উদ্দেশ্য—বোধ হয় কল্পনা-চক্ষুর পরিতৃপ্তি। যদি কেবল মাত্র ইহাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে চিত্রাঙ্কণে স্থায়িত্বের কোনই প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, ব্যবসায়ের খাতিরেই হউক বা নিজ কার্য্যের নিদর্শন স্থায়ী করিবার জন্য শিল্পীর ইচ্ছার দরুণই হউক, আধার-ভেদে চিত্রাঙ্কণ (বা অন্য কলা-পদ্ধতির) পদ্ধতি ও উপকরণ-ভেদ হয়। এবং এইরূপ ভেদের উদ্দেশ্য—যাহাতে বর্ণ বা আলেখ্যের বিকৃতি বা ক্ষয় সহজে না হয়।

মানুষের সংসার ও গৃহস্থালীর আবশ্যকীয় সামগ্রী সকলের মধ্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যাদি খুবই প্রচলিত। শয্যাসনরূপ গৃহসজ্জা, সিন্ধুক, পেটিকা ইত্যাদি মানবের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের সামগ্রীতে কাঠের ব্যবহার অতিশয় সাধারণ। অতএব সে-সকল সর্ব্বদাই দৃষ্টির মধ্যে পড়ে; এবং সেইজন্য, বাসগৃহের প্রাচীর যে-কারণে চিত্রিত করা হয়, সেই কারণে প্রত্যেকেরই, রূপরসের অনুভূতির মাত্রা অনুসারে, সে-সকলকে অল্পাধিক কারুকার্য্য বা আলেখ্য দ্বারা শোভিত করার ইচ্ছা হয়।

এই ইচ্ছার ফলে সাধারণ উপায়ে আলেখ্য আলপনা হইতে বিশেষ পদ্ধতিতে ও বিশেষ উপকরণ সাহায্যে লেপ-চিত্রাঙ্কণ পর্য্যন্ত দারুশিল্পের একটি প্রধান বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার আরম্ভ সাধারণ উদ্ভিজ্জ বা খনিজ বর্ণে কাষ্ঠগাত্র রঞ্জন, ও চরম উৎকর্ষ জাপানী শিল্পীর লেপ-চিত্রাঙ্কণ।

এই লেপ-চিত্রাঙ্কণ কি?

বেনারসের কাঠের খেলনা, ব্রহ্মদেশের কাঠের কৌটা ইত্যাদি অনেকেই দেখিয়াছেন। কাঠের উপর রঙ্গীন গালা বা অন্য পদার্থের লেপ দ্বারা ঐসকল সামগ্রী চিত্রাঙ্কণ বা আলেখ্য-ভূষিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার কারুকার্য্যের নাম লেপ-চিত্রাঙ্কণ (Lacquer work)।

বিভিন্ন দেশে নানা উপায়ে ও নানা প্রথা অনুসারে ঐ প্রকার কারুকার্য্য হয়। তন্মধ্যে চীন ও জাপানের লেপ-কারুকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, জটিল ও বিখ্যাত।

যদিও কাঠের স্বাভাবিক শোভা অনেক স্থলে অতি সুন্দর, কিন্তু তাহা বর্ণ হিসাবে অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে

বদ্ধ এবং কাঠের স্বাভাবিক কয়েকটি দোষের কারণে তাহার উপর সাধারণ উপায়ে চিত্রাঙ্কণও সম্ভব নহে। কারণ অধিকাংশ কাঠেরই সকল অংশ সমান ভাবে বর্ণ গ্রহণ করে না এবং কাঠ স্বভাবতই ক্ষয়-প্রবণ।

ঐসকল দোষের প্রতীকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কাঠের উপর লেপ দ্বারা তাহাকে আবরণযুক্ত করা হয়। কাষ্ঠগাত্র আবরণে আচ্ছাদিত থাকায় তাহার ক্ষয়প্রাপ্তি হয় না এবং উপযুক্ত উপকরণের সাহায্যে যথাযথভাবে লেপ-প্রদান করিলে ঐ আবরণ রন্ধ্রশূন্য ও নির্ম্মল এবং নানা বর্ণে ও ছায়ায় চিত্র বা আলেখ্য অঙ্কনের উপযুক্ত হয়।



জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কণ। প্রসিদ্ধ শিল্পী রিট্সুয়ো কৃত।

লেপ-কারুকার্য্যের উপকরণ নানা প্রকার। এদেশে প্রধানতঃ লাক্ষা হইতে প্রস্তুত নানা বর্ণের গালার ব্যবহার হইয়া থাকে। চীন ও জাপানে Rhus Vernicifera নামক বৃক্ষের ধূপজাতীয় নির্য্যাস (Gum and Resin) ব্যবহৃত হয়। ইয়োরোপীয় শিল্পিগণ সুরাসারে দ্রবীভূত গালা বা গালার সহিত অন্য পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

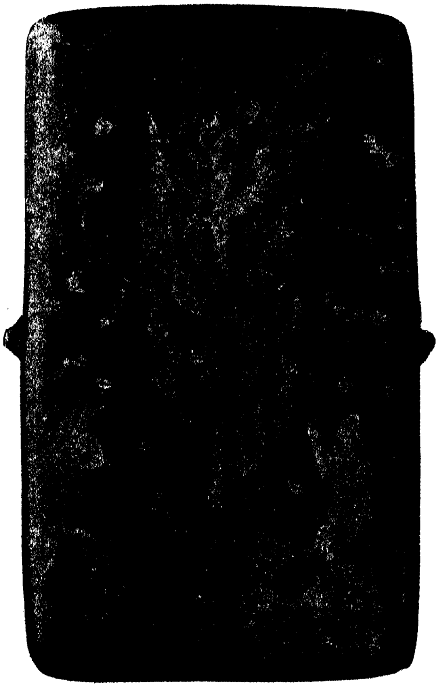
চীন ও জাপানের লেপ-চিত্রাঙ্কণে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হয় তাহার প্রয়োগ অতি কঠিন, কিন্তু তাহার ফলে উৎপন্ন কারুকার্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে লেপ-চিত্রাঙ্কণের প্রধান উপায় নানাবর্ণের গালা।



ইয়োরোপীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। প্রসিদ্ধ অভিনেতা ডেভিড্ গ্যারিকের আলমারীর পাল্লা।

যে-কাঠের দ্রব্যটি চিত্রাঙ্কিত করিতে হইবে, প্রথমে তাহা রেঁদা ও শিরীষ কাগজ, বা খরাদ যন্ত্রের (Lathe) সাহায্যে মসৃণ করা হয়। তাহার পর উপযুক্ত বর্ণের গালা তাহার উপর দ্রুত ঘর্ষণ করা হয়। ঘর্ষণের উত্তাপে গালা

(অতি অল্প পরিমাণ) গলিয়া কাঠের উপর লেপভাবে সংলগ্ন হয়। এইরূপে গালা সংযোগের পর তাল বা খেজুর ডালের খণ্ডের দ্বারা গালার লেপ ঘষিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার পালিশ করা হয়। তাহার পর তৈলের প্রলেপ দিয়া ঘর্ষণের দ্বারা সমস্তটি মসৃণ করা হয়। ইহার পর এই উপায়ে ভিন্ন বর্ণের গালার দ্বারা প্রথম লেপের উপর অন্য একটি লেপ দেওয়া হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে চার পাঁচটি বা ততোধিক লেপ দ্বারা কাঠের দ্রব্যটি আচ্ছাদিত করা হয়।



জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কণ। ফুজিওয়ারা যুগ
(খৃঃ ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দী)

পরে এই লেপ আচ্ছাদনের উপর বুলি (graver, engraving tool) চালাইয়া আলেখ্য বা চিত্রাঙ্কণ করা হয়। বুলি দ্বারা উপরের আচ্ছাদন কাটিয়া যে যে বর্ণ প্রয়োজন সেই বর্ণের লেপ অনাবৃত করা হয়। মনে করুন, প্রথম লেপ সবুজ, দ্বিতীয় লোহিত, তৃতীয় হরিদ্রা, চতুর্থ নীল ও সর্ব্বোপরি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ লেপ দেওয়া হইয়াছে। আলেখ্যের যে-অংশ সবুজ সে-অংশে কৃষ্ণ, নীল, হরিদ্রা ও লোহিত বর্ণের লেপ কাটিলেই সবুজ বর্ণ দেখা দিবে, যে-অংশ লোহিত তাহার জন্য কৃষ্ণ, নীল ও হরিদ্রা বর্ণের লেপ কাটিলেই হইবে। আলেখ্যের "জমী" কৃষ্ণ বর্ণই থাকিবে।

কখন কখন "জমী" লেপে রঙীন রাংতা (tinfoil) বা অভ্রের খণ্ড বার্ণিশের সাহায্যে যুক্ত করা হয়। মসৃণ কারুকার্য্য শেষ হইলে পরে সর্ব্বোপরি স্বচ্ছ বার্ণিশের মসৃণ প্রলেপ দিয়া লেপ-চিত্রাঙ্কণ শেষ করা হয়।

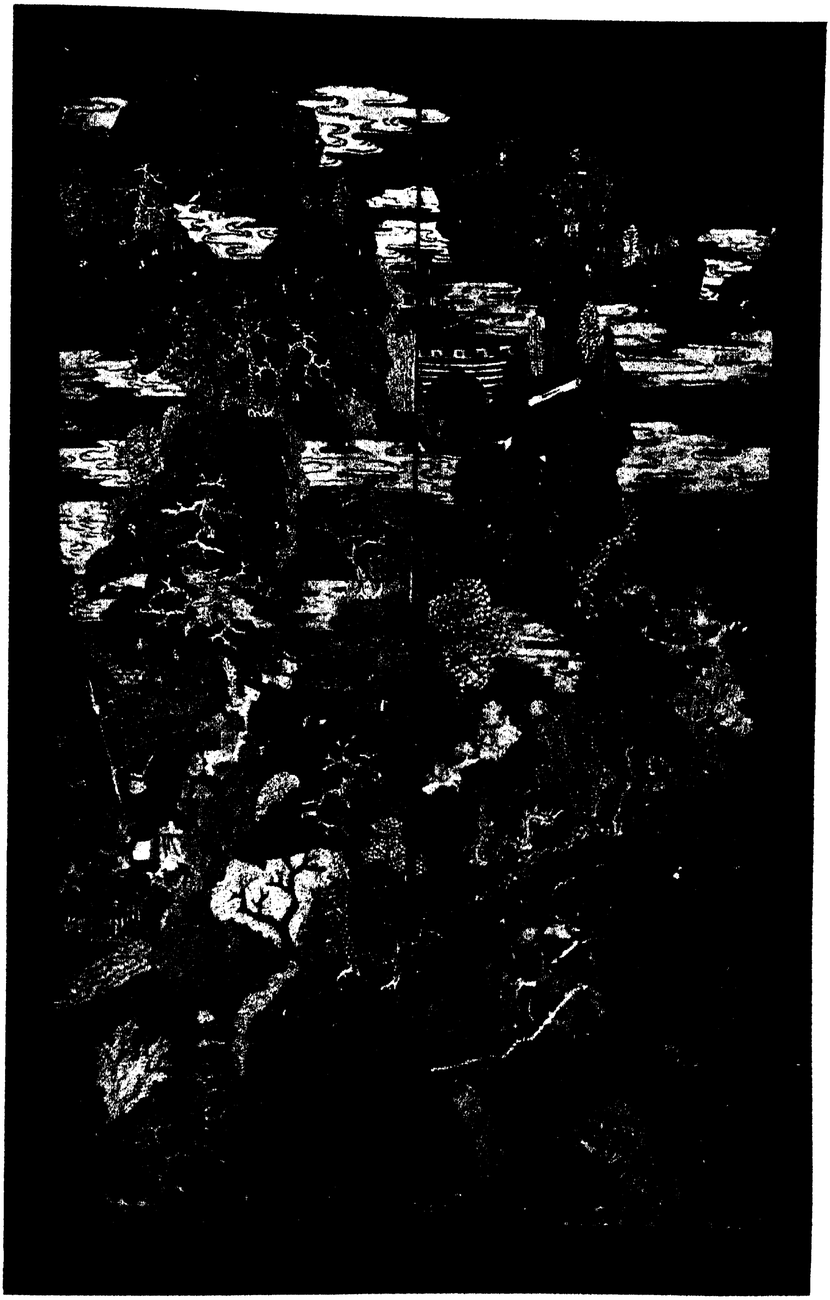
কোন কোনও প্রদেশে সুরাসার বা অন্য তরল পদার্থে দ্রবীভূত বর্ণযুক্ত গালার দ্বারা এই লেপ দেওয়া হয়। এই



ভারতীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। সিন্ধু প্রদেশ।

প্রথানুসারে লেপ-চিত্রাঙ্কণ সিন্ধুদেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, কাশ্মীর (কাশ্মীরে কাগজের মণ্ড—papier maché—হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের উপরই উৎকৃষ্ট লেপ-চিত্রাঙ্কণ হয়), যুক্ত-প্রদেশে বেরেলী, বেনারস, মান্দ্রাজে কার্নুল, মান্দ্রাজ, মহীশূর ও সাওয়ান্টবাড়ি, এই সকলস্থানে হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশে এইরূপ লেপচিত্রাঙ্কিত কাষ্ঠদ্রব্যের ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত। সাধারণ গৃহস্থালীর ব্যবহারের তৈজস-পত্রাদিতেও এই শিল্পের নিদর্শন সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। কাঠ, বাঁশ বা বেতের চাঁচরি দ্বারা বোনা (woven) দ্রব্যাদির উপর গালা এবং (তৈল ও বৃক্ষ-নির্য্যাস হইতে উৎপন্ন) বার্ণিস দ্বারা লেপ-কারুকার্য্য করা



চীনদেশে লেপ-চিত্রাঙ্কণ

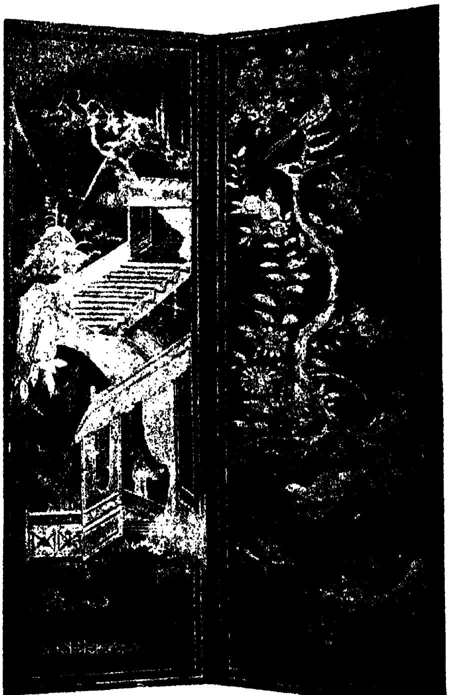
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

হয়। বহুল প্রচলনের ফলে সে দেশের এই কার্য্যের শিল্পী-দিগের উৎসাহ বা ক্রেতার অভাব নাই, সুতরাং সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশের লেপ-চিত্রাঙ্কণের নিদর্শন সকল ভারতবর্ষে প্রস্তুত ঐ প্রকার দ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সংস্কৃত (well-finished)। তবে এদেশের কারিগর উৎসাহ পাইলে কি প্রকার কার্য্য করিতে পারে তাহার পরিচয় দেশী রাজন্যবর্গের প্রাসাদাদির আস্‌বাব-পত্রে পাওয়া যায়।

এদেশের দুই একটি স্থলে কয়েক ঘর মাত্র শিল্পী এখনও আছে, যাহাদের লেপ-কারুকার্য্য-প্রথা উপরোক্ত পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

রাজপুতানায় শাহপুরা নামক ক্ষুদ্র সহরে কয়েক ঘর শিল্পী আছে (অন্ততঃ পক্ষে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ছিল)। তাহারা প্রধানতঃ উট বা গণ্ডারের চর্ম্মনির্ম্মিত ঢালের বা অস্ত্র-শস্ত্রের খাপের উপর লেপ কারুকার্য্য করে। তাহাদের ব্যবহৃত উপকরণের সহিত গালা ইত্যাদির বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। ইহারা বৃক্ষ-নির্য্যাস হইতে প্রাপ্ত ধূপ বা "গঁদ" জাতীয় নানা পদার্থের সহিত তৈল মিশ্রণে কয়েক প্রকার বার্ণিস (varnish) প্রস্তুত করে। ঐ বার্ণিস নানা প্রকার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহা দ্বারা নানা বর্ণের লেপ দান করা যায়। চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যটি পরিষ্কার ও উত্তমরূপে মসৃণ করিয়া তাহার উপর ঐরূপ লেপ দান করা হয়। লেপ শুকাইয়া যাইবার পর তাহা অতিশয় যত্নের সহিত "পালিশ" করিয়া মসৃণ ও উজ্জ্বল করা হয়। পরে তাহার উপর ভিন্ন বর্ণের বা একই বর্ণের আরো দুই চারিটি লেপ প্রদান করিয়া প্রত্যেক লেপ শুকাইবার পর মসৃণ করিয়া লইলে পর জমী প্রস্তুত হয়। তাহার পর অপেক্ষাকৃত গাঢ় ও নানা বর্ণে রঞ্জিত বার্ণিস এবং সোণার পাত ইত্যাদি উজ্জ্বল পদার্থের সাহায্যে ঐ জমীর উপর রীতিমত চিত্র অঙ্কিত হয়। চিত্রাঙ্কণের পর উহার উপর ক্রমে ক্রমে নানাবর্ণের ও নানা ছায়ার পঁচিশ-ত্রিশটি লেপ সংযোগ করা হয়। কখন কখন কয়েকটি লেপ প্রদান, পরে চিত্রাঙ্কণ বা আলেখ্য, পুনর্ব্বার লেপ প্রদান ও চিত্রাঙ্কণ, এইরূপে স্তরে স্তরে লেপ ও খণ্ডে খণ্ডে চিত্রাঙ্কণ দ্বারা কারুকার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

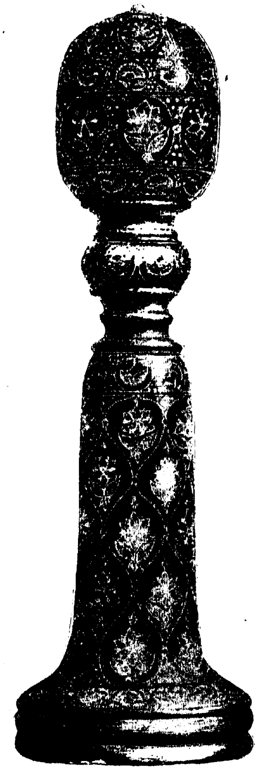
মান্দ্রাজ প্রদেশের গাঞ্জাম, কৃষ্ণা ও কার্ণুল অঞ্চলে কয়েক ঘর কারিগর আছে, যাহাদের প্রথা অন্য আর এক রূপ। ইহারা প্রথমে হরিণের চর্ম্মখণ্ড জলে দুই তিন দিন ভিজাইয়া পরে তাহা ফুটাইয়া ও ছাঁকিয়া শিরীষ (glue) প্রস্তুত করে। ঐ শিরীষের সহিত শ্বেত ডামার (Dammer এক জাতীয় ধূপ) গুঁড়াইয়া উত্তম রূপে মিশান হয় এবং পরে তাহাতে জল দিয়া উপযুক্ত রূপ "আঠা" প্রস্তুত হয়। এই



লেপ-চিত্রাঙ্কিত আবরণী (screen)।

আঠার সহিত অতিশয় মিহি মৃৎভাণ্ডচূর্ণ ও ঘৃতকুমারী জাতীয় উদ্ভিদের নির্য্যাস (aloes)—তিন ভাগ চূর্ণ ও এক-ভাগ নির্য্যাস—মিশাইয়া গাঢ় "কাই" (paste) প্রস্তুত হয়। যে দ্রব্যের উপর লেপ-চিত্রাঙ্কণ হইবে সেটি প্রথমে উত্তমরূপে মসৃণ করিয়া, তাহার উপর তূলীর ঐ "কাই" দ্বারা চিত্রাঙ্কণ করা হয়। চিত্রের রেখাসকল ক্রমাগত কাই সংযোগে জমী হইতে উৎক্ষিপ্ত (standing out in relief) করা হয়। চিত্রাঙ্কণের পরে সমস্ত দ্রব্যটির উপর এক "পোঁচ" শ্বেত "তেল রং" দেওয়া হয়। তৈল-বর্ণ

প্রয়োগের পর সমস্ত জমী রৌপ্যপাতদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া অঙ্কিত অংশ নানারূপ তৈলবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করা হয়। জমী ও আলেখ্য মধ্যে গিল্টী ও কাচখণ্ড প্রয়োগ দ্বারা বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৰ্দ্ধন করা হয়।



ভারতীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। সিন্ধু প্রদেশ।

চীন ও জাপানের লেপ কারুকার্য্যের অন্যতম উপাদান উরুশি (Rhus Vernicifera) নামক বৃক্ষের নির্য্যাস। এই নির্য্যাস তাহারা ঐ বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা, সকল অংশ হইতেই পায়। তাহা কর্ত্তনক্ষত (incision) হইতে নির্গত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন সময় ও আহরণ-প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নির্য্যাসের গুণের যথেষ্ট প্রভেদ হয়।

উরুশি নির্য্যাস সংগ্রহের পরে তাহা নানা প্রক্রিয়া—যথা হীরাকষ, টুংতৈল, সিরকা (Vinegar) ইত্যাদি প্রয়োগ—দ্বারা শোধিত ও গুণযুক্ত করা হয়। ইহা দ্বারা উক্ত নির্য্যাস বিভিন্ন পরিমাণে স্বচ্ছতা, তারল্য, ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদি গুণ প্রাপ্ত হয়।

জাপানী শিল্পী প্রথমে অতি যত্নের সহিত কাঠ বাছাই করে। কঠিন, সূক্ষ্মআঁশ, ব্রণহীন, নির্ম্মল কাঠের তক্তা বা খণ্ড প্রথমে অতি যত্নের সহিত কৰ্ত্তিত ও সংযোজিত হয়। তাহার পর শোধিত উরুশি নির্য্যাসের সাহায্যে ঐ কাষ্ঠ-গাত্রের সহিত একখণ্ড মিহি ঠাসবুনন ক্ষৌমবস্ত্র (linen) সংলগ্ন করা হয়। তাহার পর সমস্ত দ্রব্যটির উপর (অন্ততঃ তাহার যে অংশে চিত্রাঙ্কণ হইবে তাহাতে) উরুশি নির্য্যাসের সহিত অন্য উপাদানের মিশ্রণে প্রস্তুত "কাই"য়ের মোটা দুই তিন স্তর লেপ দান করা হয়। ঐ সকল লেপ শুকাইলে পরে তাহা "শান-পাথর" (whetstone) দ্বারা ঘষিয়া উত্তমরূপে মসৃণ করা হয়।

ইহার পর প্রকৃত লেপ-চিত্রাঙ্কণ আরম্ভ হয়। প্রথমে "চ্যাপ্টা" ক্ষুদ্রলোমযুক্ত (মানুষের চুল এ স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে) তুলির দ্বারা, সূক্ষ্ম ও সমভাবে, শোধিত উরুশি নির্য্যাসের একটি লেপ বিস্তার করা হয়। তাহার পর আর্দ্র অবস্থায় দ্রব্যটি গরম ও স্যাঁৎসেঁতে কুলুঙ্গী বা আলমারীতে শুকাইবার জন্য রাখা হয়।

শোধিত উরুশি নির্য্যাস হইতে প্রস্তুত বার্নিশের একটি বিশেষ গুণ আছে। উহা আর্দ্র উষ্ণ বাতাসেই উত্তমরূপে শুষ্ক হয়। একবার শুকাইলে তখন জল, বাতাস, উত্তাপ (১৬০° সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত) কোন কিছুতেই নষ্ট হয় না।

শুকাইবার পর তাহাকে কাঠকয়লা গুঁড়া দ্বারা হাতে ঘষিয়া সমানভাবে মসৃণ করা হয়। একটি লেপ বিস্তার শুকান ও মসৃণ করিতে এক হইতে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সময় লাগে। এইরূপে চিত্র বা আলেখ্যবিহীন সাধারণ লেপযুক্ত দ্রব্যে ত্রিশ হইতে সত্তর বা আশী স্তর লেপ দত্ত হয়।

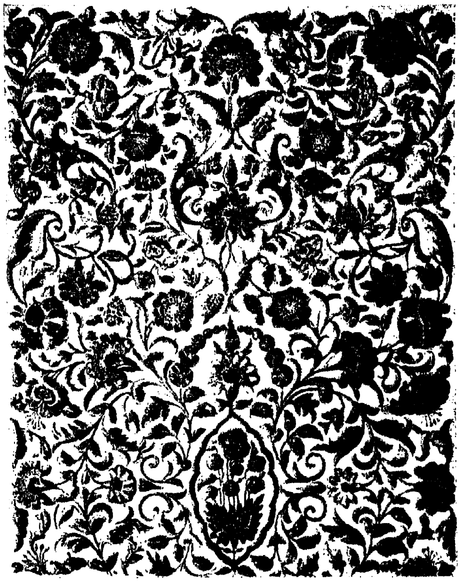
চিত্র বা আলেখ্য অঙ্কন ইত্যাদির নানারূপ প্রথা জাপান ও চীনে প্রচলিত আছে। স্তরে স্তরে ভিন্ন বর্ণের লেপ দিয়া পরে উপরের স্তরে কর্ত্তন দ্বারা নীচের বর্ণের প্রকাশ; কাষ্ঠগাত্র ক্ষোদিত করিয়া তাহাতে বর্ণযুক্ত লেপ প্রয়োগ; "জমীতে" সোনালী বা রূপালী পাত কিম্বা মুক্তাশুক্তি যোজন দ্বারা রচনা; উদ্ভিজ্জ বা খনিজ বর্ণমিশ্রিত গাঢ় হইতে অতি তরল নানাপ্রকার উরুশি বার্ণিসের সাহায্যে

উৎক্ষিপ্ত (in relief) বা সাধারণ চিত্রাঙ্কণ; চিত্র বা আলেখ্যের মধ্যে উজ্জলবর্ণ ধাতু, খনিজ, মুক্তাশুক্তি ইত্যাদি ঘন পদার্থের (solid) খণ্ড সংযোজন;—এইরূপ বিভিন্ন প্রথায় ভূষিত লেপ কারুকার্য্যের নিদর্শন জাপানে পাওয়া যায়।

চীনদেশেও নানা প্রকার লেপ কারুকার্য্যের প্রথা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কোরোমাণ্ডেল (Coromandel Lacquer) প্রথায় প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদিই প্রসিদ্ধ। এই প্রথামতে প্রথমে মসৃণ কাষ্ঠগাত্র শ্বেতাভ মৃত্তিকাজাত বর্ণ ও বার্ণিসের সংমিশ্রণে প্রস্তুত "কাই" দ্বারা (স্তরে স্তরে) আচ্ছাদিত হয়। তাহার উপর কয়েকস্তর কৃষ্ণ বর্ণ বার্ণিসের আচ্ছাদন দেওয়া হয়, যাহাতে লেপ আচ্ছাদনের উপরিভাগ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।

চিত্রাঙ্কণের সময় শিল্পী উপরের কৃষ্ণবর্ণ লেপ বুলি দ্বারা কাটিয়া নীচের শ্বেতবর্ণ প্রকাশ করে। তাহার পর সেই অনাবৃত অংশ নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া অঙ্কনকার্য্য সমাপ্ত করে। এই প্রকার লেপ-চিত্রাঙ্কণ সৌন্দর্য্য হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু স্থায়িত্ব হিসাবে জাপানী শিল্পের কাছেও আসে না।

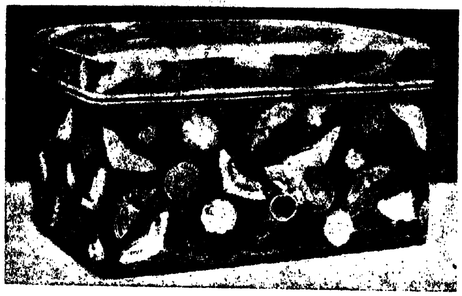
পাশ্চাত্য দেশসকলে চীন ও জাপানের শিল্পের সমাদর বহুকাল হইতেই আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দেশে ঐরূপ শিল্পের অনুকরণেরও সূত্রপাত হয়। কিন্তু চীন ও জাপানের শিল্পীর সহিষ্ণুতা, পুরুষানুক্রমগত অভিজ্ঞতা ও উরুশি নির্য্যাস ব্যবহারের গুপ্ত সঙ্কেত তাহারা কোথায় পাইবে? সুতরাং সে দেশের লেপ-শিল্প অনুকরণ হিসাবেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, শিল্প হিসাবে বিশেষ কিছু নয়। সেখানের শিল্পী সুরাসারে দ্রবীভূত নানাবর্ণের ও বর্ণহীন গালা, ও তাহার সঙ্গে কর্পূর, নানা প্রকারের ধুপ ইত্যাদির মিশ্রণ (Mixture) দ্বারা লেপ কার্য্য করে। প্রথমে কাঠের গাত্র শিরীষ কাগজ ইত্যাদি দ্বারা মসৃণ করা হয়। তাহার পরে এক "পোঁচ" মিশ্রিত লাক্ষাদ্রব প্রয়োগ করা হয়। ইহার উপর জিলাটিন, বিশেষভাবে প্রস্তুত "সফেদা" ও জল এই তিনের মিশ্রণে প্রস্তুত আচ্ছাদন-উপাদান (undercoat) বেশ সমভাবে মোটা তুলির সাহায্যে লেপিত হয়। আচ্ছাদনের গাত্র অতিযত্নের সহিত মসৃণ করিয়া তাহার উপর তুলি দ্বারা একস্তর লাক্ষাদ্রব লেপন করা হয়। লেপস্তর শুকাইলে তাহা শিরীষ কাগজ ও। পামিস্ পাথরের গুঁড়া (Pumice Powder) দ্বারা মসৃণ করিয়া তাহার উপর আবার আর এক স্তর লাক্ষাদ্রব, এইরূপে পাঁচ ছয় স্তর লেপ দান করা হয়। উহার উপর তৈলবর্ণ (Painter's oil colour) ও তুলির দ্বারা সাধারণ তৈলচিত্রাঙ্কণের প্রথায় চিত্র বা আলেখ্য অঙ্কিত এবং তাহা শুকাইলে তাহাকে অতি সন্তর্পণের সহিত মসৃণ করিয়া সর্ব্বোপরি এক স্তর তৈল বার্ণিসের আচ্ছাদন সংযোগ করিলেই পাশ্চাত্য প্রথা মতে লেপ-চিত্রাঙ্কণ সমাপ্ত হয়।



ভারতীয় লেপ চিত্রাঙ্কণ। মান্দ্রাজের কার্নুল অঞ্চল।

সাধারণ চিত্রাঙ্কণে কেবল মাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিস্তার (two dimensions) থাকে। নিপুণ শিল্পী, চিত্রে বর্ণের ছায়া ও বিভিন্ন অংশের আয়তনপ্রভেদ অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) দ্বারা তৃতীয় দিকে বিস্তারের (third dimension) একটি কৃত্রিম অনুভূতি দান করেন। ভাস্কর্য্যশিল্পে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও স্থূলতা বা বেধ এই তিন দিকেরই প্রকৃত বিস্তার থাকে।

কিন্তু তিনদিকে প্রকৃত রূপে বিস্তার রাখিবার কারণেই ভাস্কর্য্যশিল্পের ব্যবহারের ক্ষেত্র ও তাহার উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে চিত্রশিল্প হইতে বিভিন্ন। চিত্রশিল্পে, প্রতিকৃতি অঙ্কনে (Portraiture) অল্পসংখ্যক প্রতিরূপের সন্নিবেশ ও বিন্যাস হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রণে (Landscape-painting এ) বহুসংখ্যক প্রতিরূপের সংযোজন পর্য্যন্ত, সমস্তই সম্ভব ; ভাস্কর্য্যশিল্পে তাহা নহে। চিত্রশিল্পে বর্ণ, আলোক ও ছায়ার প্রভেদে একই পদার্থের বিভিন্ন রূপ প্রদর্শন সম্ভব ; যথা রাত্রির অন্ধকার মধ্যে ক্ষুদ্র শিখায় আলোকিত এবং মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত একই



জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কন। (খৃঃ ১২শ শতাব্দী)।
স্বর্ণ-নির্ম্মিত প্রজাপতি ও পুষ্প শোভিত কারুকার্য্য।

সুন্দরীর দুইটি বিভিন্ন রূপের চিত্র। ভাস্কর্য্যশিল্পে সে প্রকার প্রভেদ প্রদর্শন করা যায় না। আবার ভাস্কর্য্যশিল্পে গুরুত্ব (mass), শক্তি (energy), অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদির প্রতিরূপ যেরূপ বিকশিত হয়, চিত্রশিল্পে তাহা সম্ভব নহে।

উৎক্ষেপ (relief work) প্রথানুযায়ী শিল্প, (দোষ-গুণহিসাবে) চিত্র ও ভাস্কর্য্যশিল্প, এই দুইয়ের মধ্যস্থলে স্থিত। চিত্রশিল্পের ন্যায় পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা আপেক্ষিক অবস্থানের আভাস দেওয়া, বা ভাস্কর্য্যশিল্পের প্রথায় তিন দিকের বিস্তার (কিয়ৎপরিমাণে) দিয়া প্রতিরূপবিন্যাসে দৃঢ়তা ও রচনায় লালিত্য (Strength in composition and grace in form) প্রদর্শন, এই দুইই উৎক্ষেপ প্রথায় সম্ভবপর হয়।

উৎক্ষেপন, তক্ষণ বা উৎকীরণ (engraving) এবং বর্ণযোগে চিত্রাঙ্কণ এই তিন প্রথার সমাবেশে যে ললিতকলা-নিদর্শনের সৃষ্টি, তাহাতে একাধারে বর্ণচ্ছায়ার রম্যতা, গঠন ও রচনার লালিত্য ও প্রতিরূপবিন্যাসের সমতা ও দৃঢ়তা সকলই পাওয়া যায়, এবং নিপুণ শিল্পী কর্তৃক যথাযথ ভাবে ও সামঞ্জস্যের সহিত পরিকল্পিত ও নিষ্পন্ন হইলে তাহা যে বিশেষভাবে নয়নসুখকর হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

যে সকল শিল্পপ্রথায় এইরূপ সমাবেশ দেখা যায়, তাহার মধ্যে মিনা ও লেপ-চিত্রাঙ্কণ (বিশেষে জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কণ) সর্ব্বোত্তম। তরল ও স্নিগ্ধ বর্ণযুক্ত আভাময় স্বচ্ছ মিনা বা লেপ-রাশি ; তাহার আবরণের ভিতরে উজ্জ্বল হইতে নিষ্প্রভ নানাবর্ণে ও ছায়ায় অঙ্কিত চিত্র ; চিত্রের বিভিন্ন অঙ্গ যথাযথভাবে উৎক্ষিপ্ত ও উৎকীর্ণ ; এবং সেই শিল্পদ্রব্যের সর্ব্বাঙ্গের, আলোকরশ্মির বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে প্রতিফলন কারণে, ঘনীভূত বর্ণ ও দীপ্তিপুঞ্জসদৃশ প্রকাশ ;—কলাশিল্পে ইহা অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ কল্পনা করা কঠিন।

অবশ্য এইরূপ কলাশিল্পে ললিতকলার প্রধান প্রধান অঙ্গের ন্যায় অবিমিশ্র ও শুদ্ধ ভাব নাই ; সুতরাং ইহা লঘু কলা (Minor arts) নামে খ্যাত। কিন্তু চীনদেশীয় বা জাপানী (বিশেষে জাপানী) লেপচিত্রে শিল্পীর ঋজু দৃঢ় রেখাপাত, বর্ণসমাবেশে অসাধারণ বর্ণসামঞ্জস্য ও ছায়া-প্রভেদ-জ্ঞানের পরিচয়, বা তাহাদের উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ, শীতল ও উষ্ণ (warm & cold colours and tones) এবং পরস্পর-বিরোধী (contrasting) বর্ণসমুচ্চয়ের স্বভাবজাত বিশিষ্টতার সহিত সংস্থাপন, দেখিলে তাহাদিগকে ললিতকলার সভায় উচ্চাসনের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

ত্রিবর্ণ চিত্র-পরিচয় :—

প্রথম চিত্র—চীনদেশের লেপ-চিত্রাঙ্কণ

দ্বিতীয় চিত্রের উপরের অংশ—শাহপুরের কারিগর খুদাবক্স নির্ম্মিত লেপ-চিত্রাঙ্কিত একটি ঢালের ছবি

নীচের অংশ—বিকানীরের লেপ-চিত্রাঙ্কিত টেবিল

মহিলা-সংবাদ

শিক্ষার দিক্ দিয়া নানাবিভাগে ভারতীয় মহিলারা অগ্রসর হইতেছেন। বোম্বাইএর ডাক্তার কুমারী কুমদা মেহেতা এডিনবরা হইতে এল্, এম্, এবং ইংলণ্ড হইতে এম্, আর, সি, পি, উপাধি ভূষিতা হইয়াছেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী ডিগ্রী লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। গুজরাতী মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এইরূপ সম্মান পাইলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পরলোকগত হীরালাল সান্যাল মহাশয়ের দুহিতা শ্রীমতী অশ্রুকণা দেবী এবার ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি বিবাহের



কুমারী মনীষা সেন



ডাক্তার কুমারী কুমদা মেহেতা



শ্রীমতী ক্যাথারিন সুদ্রায়দু



শ্রীমতী তারাবাঈ মাণেকলাল প্রেমচাঁদ



শ্রীমতী মায়া দেবী



শ্রীমতী ইন্দ্রানী বালসুব্রহ্মণ্যম্

পরও নিজে উৎসাহী হইয়া পড়াশুনা করিয়াছেন। এই কারণে ইঁহার কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুনন্দা সেনের কন্যা কুমারী মনীষা সেন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি সঙ্গীত-কলা বিদ্যালয়ের সিনিয়র বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। পিয়ানো বাদনের জন্য তিনি এই বৃত্তি লাভ করিলেন।



শ্রীমতী ললিতা বালসুন্দরম্

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী বালসুব্রাহ্মণ্যম্ মাদ্রাজ প্রদেশের গার্ল গাইডের সহকারী নেতৃত্ব পদ পাইয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এইরূপ সম্মান পাইলেন।

ফৌজদারী বিচার বিভাগে ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহে ভারতীয় নারীদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাইয়ের ভগ্নীসমাজের সভানেত্রী শ্রীমতী তারাবাঈ মানেকলাল প্রেমচাঁদ বোম্বাইয়ের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কোইম্বাটোরের বিখ্যাত সমাজ-সেবা কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ললিতা বালসুন্দরম্ তত্রত্য জেলা শিক্ষা-পরিষদের ও শ্রীমতী ক্যাথারিণ সুদ্রায়হ কৃষ্ণা জেলা বোর্ডের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।



শ্রীমতী অশ্রুকণা দেবী

কলিকাতায় বিগত মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে দুইজন বাঙালী মহিলা—শ্রীমতী মায়া দেবী ও শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী—সদস্য পদ প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই পুরুষ ভোটারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনে এ-পর্য্যন্ত একজনও মহিলা নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না, ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। বোম্বাইয়ের পুরুষ ভোটারগণ এ-বিষয়ে খুব উদার।

প্র-

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(১০)

সকাল না হইতেই গৌরী উঠিয়া পড়িয়াছে। মেঘটা কাটে নাই, সূর্য্যও সহরের বাড়ীর আড়ালে অনেক নীচে পড়িয়া; কাজেই তখনও চারিদিকেই অন্ধকার। সেই আধ-অন্ধকারেই গৌরী স্নানাদি শেষ করিতে চলিল; আলো হইলেই কলেজের বই কয়খানা একবার দেখিয়া লইবে; তারপর ভূষণ-বাবুদের আতুরআশ্রম ঘুরিয়া আসিয়াই তাহাকে আহারপর্ব্ব সমাপন করিয়া কলেজ রওনা হইতে হইবে।

সবে যখন উঠানে আসিয়া রোদ পড়িয়াছে তখনই সঞ্জয় আসিয়া হাজির। পরের জন্য বেগারখাটা তাহার চিরদিনেরই কাজ, তাহাতে তাহাকে কোনদিন পরাঙ্মুখ দেখা যায় না; কিন্তু কাজে এমন ঘড়ির কাঁটার মত তৎপরতা ইতিপূর্ব্বে তাহার কেহ দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। প্রতিদিন ভোর হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত কাজগুলা তাহার দরজায় ষ্টেশনের থার্ড-ক্লাশ যাত্রীদের মত ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেকটির প্রতি নজর দিতে দিতে প্রত্যেকেরই নির্দ্দিষ্ট সময় কখন যে পার হইয়া যায় তাহার ঠিক নাই। অনেক সময় ট্রেন ছাড়িবার পর টিকিট দেওয়ার মত অবস্থাও সে অনেকের ভাগ্যে ঘটাইতে বাধ্য হইয়াছে; কারণ সূর্য্যদেব একটা দিনরাত্রিতে চব্বিশ ঘণ্টার বেশী এক মিনিট সময় দেন না, কিন্তু আহার-নিদ্রা ও কাজ কর্ম্মে ছত্রিশ ঘণ্টার উপযুক্ত দৈনিক খোরাক সঞ্জয় অনেক সময়ই সংগ্রহ করিয়া বসে। সঞ্জয়কে যে দুই দশদিন দেখিয়াছে সেই বুঝিবে যে, আজ সমস্ত কাজকে নিষ্ঠুরভাবে পিছনে ঠেলিয়া দিয়া সে পলাতক আসামীর মত লুকাইয়া এখানে আসিয়া জুটিয়াছে।

ইতিহাসের মোটা বইখানা কোলে করিয়া, তাহার ঘন-সন্নিবিষ্ট অক্ষরগুলায় চঞ্চল মনটাকে নিবিষ্ট করিবার চেষ্টায় গৌরী বোধহয় দুই মিনিটও বসে নাই, এমন সময় সঞ্জয়কে উঠানে ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া উপরের বারান্দা হইতেই ডাকিয়া বলিয়া উঠিল, "ওকি, আপনি যে এত সকাল বেলাতেই!"

সঞ্জয় বলিল, "সকাল বেলাতেই ত আস্‌তে বলেছিলেন, রাত্রে এলে চল্‌বে কি ক'রে?"

গৌরী একটু অপ্রস্তত হইয়া বলিল, "আমি ত বলেছিলাম, কিন্তু চপলা বল্‌লে 'সঞ্জয়বাবুকে সকালে আস্‌তে বল্‌লে রাত্রে আসেন, এইটাই হচ্ছে আমাদের দেশের কর্ম্মীদের নিয়ম'।"

সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সেকথাটা ঠিক বটে। কর্ম্মীরা যে-কাজটা কর্‌তে সব-চেয়ে বেশী উৎসাহ দেখান, কাগজে কাগজে জয়-দুন্দুভি বাজিয়ে নিজেদের কীর্ত্তি ঘোষণা করেন, সেই কাজটাই কর্‌বার বেলা তাঁদের টিকির ডগাও দেখা যায় না। এটা আমার জাতভাইদের একটা ধর্ম্ম বটে, কিন্তু আমি নিজেও যে ঐ পথের পথিক অপরে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে তা বিশ্বাস হয় না।"

গৌরী নীচে আসিয়া বলিল, "আজ যে আপনি ঠিক সময় আস্‌বেন তা আমি কিন্তু ধ'রেই রেখেছিলাম। অবশ্য এত আগে আস্‌বেন তা ভাবিনি। আপনি ঘরে বসুন, আমি যাই চট্ ক'রে মাসিমাকে খবর দিয়ে আসি গে; নাহ'লে শুধু শুধু খানিকটা সময় নষ্ট হ'বে।"

সঞ্জয়ের মুখে আসিল, "না হয় খানিকটা সময় জীবনে নষ্টই হ'ল; সব সময়টাকেই পাট-গুদামের বস্তার মত আগাগোড়া কাজে ঠেসে দিতে হবে বিধাতা কি আমাদের উপর এমন কোনো আইন জারি করে দিয়েছেন!"

কিন্তু তাহার কিছুই বলা হইল না। কাজের সূত্র ধরিয়াই গৌরীর সঙ্গে তাহার পরিচয়, কাজের সহায় বলিয়াই গৌরীর তাহার সহিত কথাবার্ত্তা, কাজে আপনাকে পিষিয়া ফেলিবার উপায় খুঁজিতেই তাহার সহিত গৌরীর পরামর্শ; তাহারা দুইজন যে কাজের মানুষ বলিয়াই মানুষের কাছে পরিচিত, তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা অপরেও ভাবে না, তাহাদের

নিজেদেরও যেন ভাবিতে লজ্জা হয়; এমন অবস্থায় হঠাৎ অকাজের গুঞ্জনে সময় নষ্ট করিতে গৌরীকে সে ডাকিবে কি বলিয়া? কিন্তু তবু আপনার কাছে তাহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, এই অলস গুঞ্জনের লোভেই সে আজ কাজের সময়ের আগেই কাজের অভিসারে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু কাজটুকু মনে থাকিলে তাহার অপর দশটা হাতের কাছের কাজ ফেলিয়া এতদূরে সে সবার আগে ছুটিয়া আসিত না।

ছুই মিনিট না যাইতেই গৌরী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মাসিমার এখনও আধঘণ্টা খানেক দেরী আছে। আপনি একলাটি চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বেন? কাউকে ডেকে দিলে হয় না!"

ডাকিবার মানুষের মধ্যে মেয়েদের আশ্রমে চঞ্চলা ছাড়া আর যে দ্বিতীয় প্রাণী থাকিতে পারে না, তাহা গৌরীও জানিত, সঞ্জয়ও বুঝিল। কিন্তু চঞ্চলার নামটা করিতে গৌরীর কেমন যেন বাধিয়া গেল। সঞ্জয়ের সহিত তাহার যে কেবল কাজের সম্পর্ক এইটুকু সঞ্জয়কে সে বুঝাইতে চায়, অথচ যাহার কাছে সে এত কাজের সেবা আদায় করিতেছে তাহাকে কাজের অভাবে অবসর সময়টুকু একলা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেও ভদ্রতায় বাধিতেছিল। মনের নিভৃত কোণে এই ক্ষুদ্র অবসর-কালটুকু সঞ্জয়ের সঙ্গে যাপনের যে একটা লোভ লুকাইয়াছিল ভদ্রতাজ্ঞান তাহারই সহায় হইয়া উঠিল দেখিয়া গৌরী আপনার মনকে শাসন করিবার একটা উপায় খুঁজিতেছিল। মনে হইল, চঞ্চলাকে ডাকিয়া দিলে তাহার ভদ্রতা রক্ষাও হইবে এবং সঞ্জয়ও হয়ত বেশী খুসীই হইবে। কিন্তু তবু একেবারে তাহার নামটা সে করিতে পারিল না, যদি সঞ্জয় মনে করে গৌরী ইহার দ্বারা কিছু ইঙ্গিত করিতেছে, অথবা যদি সে ভাবে গৌরী চঞ্চলাকে হিংসা করে। সঞ্জয় বলিল, "কাকে আর ডাক্‌বেন? সকলেরই কাজ আছে। তা ছাড়া আশ্রমের মেয়েদের পুরুষ অভ্যাগতদের সামনে আস্‌বারও নিয়ম নেই।"

গৌরী বলিল, "সকলের সাম্‌নে আস্‌বার নিয়ম নেই বটে, কিন্তু আপনাদের সাম্‌নে ছুই একজনের আস্‌বার নিয়ম আছে বৈকি! চঞ্চলা চপলারা ত সর্ব্বদা আপনাদের সঙ্গেই কাজ করছে।"

সঞ্জয় এবার একটু ঠেস্ দিয়া বলিয়া ফেলিল, "সেই-জন্যেই ত মনে হয় আপনারই মত তাদেরও অকাজে সময় নষ্ট কর্‌বার অবসর কম।"

গৌরী চুপ করিয়া গেল। কথাটা তাহার লাগিয়াছে বুঝিয়া একটু লজ্জিত হইয়াই সঞ্জয় বলিল, "হ্যাঁ, চঞ্চলাকে সেই চিঠিখানার কথা একবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে হ'ত। তাকে একবার ব'লে দেখ্‌তে পারেন যদি সময় হয় কাজটা সেরে নিই।"

কি কাজ ও কি চিঠি সঞ্জয় যেন তাহা গৌরীকে শুনাইবার জন্যই কথাগুলা ঐভাবে বলিল, কিন্তু তবু গৌরী কোনো কৌতূহল না দেখাইয়া শুধু চঞ্চলাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য উঠিয়া চলিয়া গেল।

কি-একটা আনন্দের সৌরভ সকালবেলা কাজের ছুতা করিয়া সঞ্জয়কে বহুদূর হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিল; কিন্তু কাছে আসিতেই সে সুবাসটুকু ফুরাইয়া গিয়া তাহার বেদনার ক্ষতগুলি নানা স্মৃতির কণ্টকক্লিষ্ট হইয়া উঠিল দেখিয়া মনটা তাহার অনেকখানি মুস্‌ড়াইয়া গেল।

চঞ্চলা চিঠিখানা হাতে করিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। আজ আবার অনেকদিন পরে তাহারা ভীড়ের বাহিরে পরস্পরের কাছে আসিয়াছে, বহুদিন তাহার সুযোগ হয় নাই, একথা বুঝিয়াই গৌরী দূরে সরিয়া গেল। এই ছুইটি মানুষকে গৌরী আগে আপনার কল্পনায় যে-সূত্রে বাঁধিয়াছিল, এখন তাহার ভিতর নানা খট্‌কা আসিয়া সূত্র ছিঁড়িয়া দিতে লাগিল। তাহার কল্পনা যদি সত্য হইত তাহা হইলে সঞ্জয়ের ব্যবহারে যে-আগ্রহ প্রকাশ পাওয়ার কথা আজ ত সে তাহার বিপরীতটাই দেখিল। আর যদি ইহা মিথ্যা হয় তবে তাহার নিজ কর্ণকেই অবিশ্বাস করিতে হয়। তৃতীয় আর-একটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, চঞ্চলার জন্ম-পরিচয় পাইয়া সঞ্জয়ের মন ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু সঞ্জয়ের মত পুরুষের সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্তটা মনে আনা অসম্ভব বলিয়াই গৌরীর বোধ হইল। তা ছাড়া সঞ্জয়ের ব্যবহারে কোনো লজ্জা কি কুণ্ঠার পরিচয়ও ত সে দেখে না, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, সে চঞ্চলার সহিত বোঝা-পড়ায় একটা ভুল কি ভ্রান্তি পাকাইয়া বসিয়াছে। আপনার কল্পনাটাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা মনে করিয়া তাহার জায়গায় একেবারে নূতন

একটা কিছুকে খাড়া করিতে তাহার নিজের ইচ্ছা হইত বলিয়াই প্রণয়ের পথের বিচিত্র কুটিল গতির দোহাই দিয়া সে আপনার প্রথম কল্পনাটাকেই প্রাণপণে সত্য বলিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। মনকে বলিত, "চঞ্চলার সহিত সঞ্জয়ের সম্বন্ধটাই সত্য ; আমার স্বার্থান্বেষী মন তাহাকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে চায় বলিয়াই সত্যের দিকে অন্ধ হইয়া বসিয়াছে।"

গৌরী ঘরের বাহিরে যাইতেই চঞ্চলা বলিল, "চিঠিখানা ভাগ্যিস তুমি আমাকে পড়তে দিয়েছিলে, নাহ'লে একে পর তাতে আমার মত হেয় অস্পৃশ্য পরকে যে কেউ কোলের মেয়ে হারানো মাণিক বল্‌তে পারে তা বিশ্বাস কর্‌তেই পার্‌তাম না। পিতৃস্নেহ যাই হোক, মাতৃস্নেহ যে একেবারে মিথ্যা নয় এটা আজ আমাকে স্বীকার কর্‌তে হবে। আমার মা যখন আমাকে ফেলে চ'লে গেল, তখন তার হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়েই বিদ্রূপ করেছিলাম, আজ পর্য্যন্ত ভাবিনি কতবড় প্রেম তাকে এ ত্যাগ-স্বীকার করিয়েছে। আজ আর-এক মায়ের মুখে শুনে প্রথম ভেবে দেখছি যে, সত্যিই 'সন্তানের সঙ্গে বুকের শিরাগুলা পর্য্যন্ত উপড়ে ফেল্‌তে তাকে হয়েছিল যাতে তারই মত ঘৃণ্যজীবন না তার জীবনমণিকে যাপন কর্‌তে হয়। মাতৃত্বের গৌরবের সঙ্গে কলঙ্কটাও যদি সে সগর্ব্বে লোকের চক্ষের সম্মুখে তুলে ধ'রে দেখাবার স্পর্দ্ধা কর্‌ত তাতে ত তার সন্তান-কেই অপমান করা হ'ত। নির্দ্দোষী সন্তানকে চিরকলঙ্কের টিকা সে পরাতে চায়নি, তাই অসীম সাহস নিয়েই জীবনের একমাত্র সুখ ও অবলম্বনকেও সে ত্যাগ ক'রে দূরে চ'লে যেতে পেরেছিল।' তোমার মার চোখ দিয়ে না হ'লে আমার মাকে এমন ক'রে আমি কোনোদিন দেখতে শিখ্‌তাম না। আমার মাকে যিনি চিনিয়ে দিলেন সেই নূতন-পাওয়া মাকে তোমার হাতে প্রণাম পাঠাচ্ছি।"

সঞ্জয় বলিল, "কিন্তু মা যে তাঁর হারানো মণিকে দেখবার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠ্‌লেন তার কি করা যায় ?"

চঞ্চলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, সে হ'বে না। আমার অমন মাকে নিজের মা ব'লে পরিচয় দেবার যখন ভাগ্য আমার নেই, তখন দশজনের মাঝখানে তাঁকে দেখ্‌বার অধিকারও আমি চাই না। মাকে বোলো ভাগ্যে থাক্‌লে তাঁর মেয়ে তাঁকে নিজেই কোনোদিন দেখে ধন্য হ'য়ে আস্‌বে।"

সঞ্জয় বলিল, "তোমার ভার আমার মত অর্ব্বাচীনের হাতে দিয়ে মা নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছেন না। তিনি নিজে না তদারক কর্‌লে নাকি কোনো সুব্যবস্থাই হবে না।"

চঞ্চলা একটু আনন্দের হাসি হাসিল। তারপর বলিল, "কিন্তু মা কি জানেন না যে, তাঁর অপার স্নেহও সমাজে আমার জাত ফিরিয়ে দেবে না ? আমার যেটুকু সুব্যবস্থা সে আমার নিজের শক্তি ও চরিত্রের জোরেই ক'রে নিতে হবে। এখানে কেউ আমার সহায় হ'তে পারে না। একজনের শুভ ইচ্ছা ত শতজনের গঠিত সমাজকে ঠেলে ফেল্‌তে পারে না।"

সঞ্জয় বলিল, "ঠেলে ফেলে দেওয়ার ত কোনো দরকার নেই। মা'র শুভ ইচ্ছা অপরের মনে শুভ ইচ্ছা আর সহানুভূতিকে জাগিয়ে তুল্‌তে পারে ; তেম্‌নি ক'রেই তোমাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে মা সবচেয়ে বড় সহায় হ'তে পারেন।"

চঞ্চলা বলিল, "আমার পরিচয় অপরের কাছে প্রকাশ করতে যখন আমি পাব না এবং আমার অর্দ্ধ পরিচয় অর্থাৎ হীন জন্মমাত্রের পরিচয় যখন আমি কাউকে দিতে চাই না, তখন আমার সমাজে প্রতিষ্ঠা না খোঁজাই উচিত। পৃথিবীতে আমার একলা থাকাই ভাল। পরকে ছলনা ক'রে অথবা পরের করুণা উদ্রেক ক'রে পতিতোদ্ধারের কার্য্যে তাদের আমি লাগাতে চাই না।"

সঞ্জয় শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "ছিঃ চঞ্চলা, নিজের সম্বন্ধে অমন ক'রে কথা তুমি বোলো না। আমাদের চেয়ে একবিন্দুও নীচে যে তুমি নও, তা কি তোমাকে ব'লে দিতে হবে ? সত্যি, চঞ্চলা, এমন ক'রে দিন চল্‌বে না। তুমি আমাকে অনুমতি দাও আমি মার সাহায্যে তোমাকে আপনার বল্‌বার অধিকারটুকু যেমন ক'রে পারি সংগ্রহ ক'রে নি। মা ত লিখেইছেন, "আমি হাতে পায়ে ধ'রেও তোমার বাবার কাছ থেকে আমার হারানো মেয়েটিকে ফিরে নিতে চাই।" '

চঞ্চলা বলিল, "সে হয় না।"

সঞ্জয় বলিল, "কেন হবে না চঞ্চলা? মা যদি তাঁর সন্তানকে ফিরে পাবার জন্যে সংগ্রাম করতে চান, তুমি কেন তাতে বাধা দেবে?"

চঞ্চলা বলিল, "মনে হবে আমিই যেন চক্রান্ত ক'রে তোমাদের দলে টেনেছি।"

সঞ্জয় বলিল, "যা সত্য নয় তা মনে হবে ব'লে তুমি কোনো মানুষের আন্তরিক ইচ্ছায় বাধা দিতে পারো না। তা ছাড়া তুমি জান না যে, আমার মা কত সাবধানী। তিনি যখন একথা তুলবেন তখন তাঁর কথার ভাবে তুমিই একথা জান কি না বাবার সন্দেহ হবে।"

চঞ্চলা বলিল, "আমি যে সমস্তই জানি তা তিনি জানেন।"

সঞ্জয় বলিল, "কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার চাক্ষুষ পরিচয়ও আছে তা তিনি জানেন না। তুমি আর কোনো আপত্তি কোরো না, লক্ষ্মীটি; আমি কাউকে কোনো অনুরোধ করব না—কিন্তু মা নিজ ইচ্ছায় যা করতে চাইছেন তাতে আমি বাধা দিতে চাই না।"

চঞ্চলা বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। এখন আমি চল্‌লাম, নইলে নানা কথা উঠতে পারে।"

চঞ্চলা দ্রুত পদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সঞ্জয় আপনার কথা ও ঘরের কথা কোনো দিন ভাবে নাই, পরের কথা ভাবাই তাহার কাজ। আজ কিন্তু আপনাকে কেন্দ্র করিয়াই নানা চিন্তা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। কোথা হইতে এই চঞ্চলা আজ তাহার জীবনের সহিত এমন করিয়া জড়াইয়া পড়িল যে, তাহাকে ছাড়িয়া এক পাও কোনো দিকে সরিয়া যাইবার তাহার উপায় নাই? এই স্বেচ্ছার্জ্জিত দায়ীত্বের বোঝার জন্য ইহ কি পর জগতে কাহারও নিকট সে দায়ী নহে বলিয়াই ইহার সম্বন্ধে এতটুকু অবিচারের ভয়ে সে পদে-পদে আপনাকে অপরাধী করিতেছে। পাছে সে স্বার্থপরের মত আপনার সুখ খুঁজিতে গিয়া চঞ্চলাকে অবহেলা করে এই ভয়ে আপনার সকল কাজকেই সে ওজন করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুদিন আগে এমন দিন ছিল যখন বাস্তবিকই পরহিতচিন্তাই তাহার একমাত্র চিন্তা ছিল, আত্মসুখ বলিতে ভিন্ন আর-এক পর্য্যায়ের জিনিষ তখন তাহার মনোরাজ্যে দেখা দিত না; সুতরাং আপনাকে স্বার্থপর বলিয়া দোষ দিবার তাহার কোনো প্রকৃত কারণ ছিল না।

কিন্তু প্রথম যৌবনে সকল মানুষেরই মত যে একটা সুখ-কল্পনা তাহার মনটাকে রাঙাইয়া তুলিয়াছিল এবং তাহার পর কর্ম্মক্ষেত্রের একটানা ভিড়ের ভিতর মাঝে মাঝে কেবল ক্ষণিকের মত চোখের সমুখ দিয়া যাহা ঝলকিয়া গিয়াছে মাত্র আজ এতদিন পরে সেই সুখ-স্বপ্ন তাহাকে শয়নে জাগরণে ঘিরিয়া ধরিতেছে। সকলের জন্য নয়, কেবল নিজের জন্য আর আর-একটি মাত্র মানুষের জন্য জীবনটাকে একবার পরিপূর্ণরূপে পাইতে সাধ হইতেছে। এই কাজের ভীড়ের বাহিরে কোনো-একটা মানুষ তাহাকে কাজের জন্য নয়, গুণের জন্য নয়, কেবল তাহারই জন্য, তাহার দোষ-গুণ, অপূর্ণতা, ক্ষ্যাপামি, পাগ্‌লামি সব-কিছুর জন্যই আপনার বলিয়া কাছে টানুক, কর্ম্মীর যোদ্ধবেশ ছাড়িয়া ভদ্রতার ছদ্মবেশ ছাড়িয়া আপনার ঘরোয়া সরল বেশে যাহার বুকের কাছে পড়িয়া অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকা যায় এমন একটা একান্ত নিজের মানুষ নিরালায় তাহাকে লইয়া সকল ভুলুক এই কামনা মনে আজ জাগিয়াছে বলিয়া আপনার সকল চিন্তা সকল কাজেই স্বার্থের গন্ধ পাইয়া সে চমকিয়া উঠিতেছে।

গৌরীকে সেই স্বপ্নরাজ্যের রাণীরূপে যেন সে দেখিয়াছে এ সন্দেহটা তাহার মনে ক্রমেই বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। সুখ-চিন্তার হাত হইতে এই তরুণ যৌবনেই আপনাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য যে আপনার চারিদিকে কেবল প্রহরীর পর প্রহরী খাড়া করিতেছে, সেই পুষ্প-পেলবার কঠোর তপস্যা সঞ্জয়ের মনে এমন একটা আঘাত দিতেছিল যাহাকে করুণা বলিতে তাহার লজ্জা হয়, সহানুভূতি বলিলেও ঠিক বোঝানো যায় না, অথচ যাহা গৌরীর সম্বন্ধে তাহাকে সর্ব্বদা জাগরূক করিয়া তুলিতেছিল। তাহার স্বপ্ন-সাধের সহিত এই তপঃক্লিষ্টার প্রতি মমতাটা এমন এক হইয়া উঠিতেছিল যে, এখানে সাধটাকে কেবল মাত্র আপনার একটা স্বার্থের প্রকাশ বলিয়া সে ছাঁটিয়া ফেলিতেও পারিতেছিল না। আপনার স্বার্থ ভুলিব বলিলে যাহা ভোলা সহজ, গৌরীর আত্মনিপীড়িত সুকুমার মুখখানি মনে করিলে তাহা ভোলা ত তত সহজ থাকে না। এই

সমস্যার মীমাংসা সে কি করিয়া করিবে? গৌরীর তপস্যার হাত হইতে গৌরীকে রক্ষা করিবার অধিকার তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে, আবার চঞ্চলার নির্ব্বাসন হইতে তাহাকে মুক্তিও সঞ্জয়কেই আনিয়া দিতে হইবে। কিন্তু একলা সে এই দুই পথের মাঝখানে স্বার্থের গন্ধ যেদিকে সেই দিকেই যদি বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে?

গৌরী আসিয়া বলিল, "মাসিমার হয়েছে ; এইবার তবে চলুন যাওয়া যাক্।"

সঞ্জয়ের ইচ্ছা করিল বলে, "আমি কি কেবল তোমার আশ্রমের পথ দেখাতেই এসেছি? তপস্বিনী হ'য়ে বিশ্বের সেবার চিন্তায় কাছের মানুষগুলোকে এমন ক'রে অবজ্ঞা কর কি ক'রে?"

কিন্তু মুখে বলিল, "হ্যাঁ, চলুন, আপনার আবার কলেজ আছে। ফির্‌তে দেরী হ'লে খাওয়া-দাওয়ারও সময় পাবেন না।"

তিনজনে পথে বাহির হইয়া পড়িল। গৌরীর পথ হাঁটার কোনো দিন বিশেষ অভ্যাস ছিল না ; কিন্তু তবু সকল সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া সে হৈমবতী ও সঞ্জয়ের সঙ্গে স্বচ্ছন্দেই রাজপথ বাহিয়া চলিল।

(১১)

ছোট একটি তিনতলা বাড়ী। তিনতলায় তিনখানি মাত্র ঘর; তাহার একখানিতে তিনটি পুরুষ কর্ম্মী এবং অন্য দুইখানিতে সপরিবারে ভূষণ-বাবু থাকেন। তাঁহার দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র। গৃহিণী ও বড়মেয়েটি সংসারের সমস্ত কাজ করেন, তাহার উপর আছে রোগীর সেবা।

একতলায় ও দুতলায় পাঁচখানা করিয়া ঘর, সবই রোগীদের থাকিবার জন্য। একতলায় পুরুষেরা থাকে, দোতলায় থাকে মেয়েরা।

হৈমবতী, সঞ্জয় ও গৌরী বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিতেই ভূষণবাবু ষ্টোভের উপর হইতে ফুটন্ত জলের কেট্‌লিটা ও টেবিল হইতে একটা তুলার প্যাকেট হাতে করিয়াই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দুইটা হাতই জোড়া, সুতরাং সহাস্যমুখে কেবল একবার মাথাটা নোয়াইয়াই নমস্কারটা সারিয়া লইলেন। তারপর হৈমবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদের মত তিনজন মানুষকে সকালবেলাই আমাদের মাঝখানে পেলাম। আপনারা ত্যাগী, কর্ম্মী, আপনাদের আদর্শেই আমাদের মাথা তুলে চল্‌তে হবে।"

হৈমবতী বলিলেন, "আপনি সস্ত্রীক সন্তান-সন্ততি নিয়েও যে ত্যাগ ও নিষ্ঠা দেখিয়েছেন তার তুলনায় আমার সন্ন্যাসী মানুষের এ সামান্য কাজ ত কিছুই নয়।"

ভূষণ-বাবু সলজ্জ সম্ভ্রমে চকিত হইয়া বলিলেন, "আপনি অমন কথা বল্‌বেন না। আসুন, সকলে ভিতরে আসুন।"

সকলে রোগীদের ঘরগুলি দেখিতে দেখিতে চলিলেন। ছোট ছোট ঘর, একখানা ঘরে তিনখানার বেশী খাট ধরে না। ভূষণ-বাবু বলিলেন, "রোগী কম থাক্‌লে ঘরে ঘরে দুজন ক'রেই আমরা রাখি। নেহাৎ যখন বেশী হয় তখন ওরি মধ্যে তিনজনকে স্থান দিতে হয়। যদিও তাতে ওদেরই স্বাস্থ্যের ভয় আছে।"

হৈমবতী বলিলেন, "আপনারও ত লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কর্‌তে হয়, একটা আপিসঘর রাখেন-নি?"

ভূষণ-বাবু হাসিয়া বলিলেন, "গৃহিণীর ভাঁড়ার-ঘরের কোণেই আমার আপিসের সমস্ত সাজ-সরঞ্জামকে স্থান দিতে হয়েছে ; আর দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা ওই বারাণ্ডাতেই সেরে নিতে হয়।"

বারাণ্ডার কোণে একটা চৌকা টেবিল, একটা মোটা কাঠের চেয়ার ও দুইখানা ধূসর রঙের বার্ণিশকরা বেঞ্চি ঝড়জলের চিহ্ন বুকে করিয়া বিরাজ করিতেছিল।

দোতলায় মেয়েদের ঘরগুলি পার হইয়া সকলে তিনতলায় উঠিলেন। মেঝেতে বসিয়া ভূষণ-বাবুর ছোট মেয়েটি একটা লালপাড় দিয়া তাহার পুতুলের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছিল এবং কোমরে একটা কাপড়ের পুঁটলি লইয়া সেঁক দিতেছিল। বাবাকে দেখিয়া সে পরম গম্ভীর ভাবে বলিল, "বাবা আমার ছেলেটার বাত বড় বেড়েছে, কালী ডাক্তারকে একবার খবর দাও না!"

সঞ্জয় তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "এই যে আমি একজন ডাক্তার, কি হয়েছে দেখি তোমার ছেলের।"

খুকী বলিল, "সারারাত চ্যাঁচাচ্ছে, দিনে রুগীর সেবা কর্‌ব আবার রাত্তিরে ছেলে চেঁচালে কি বাঁচা যায় ?"

ভূষণ-বাবু গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমার তোতাপাখী মেয়েটি যে তোমার সব গোপন কথা প্রকাশ ক'রে দিলে !"

গৃহিণী বলিলেন, "ওটা অমনি বাঁদর, আমি যা বল্‌ব যা কর্‌ব সব ওর করা চাই।"

হৈমবতী বলিলেন, "এইসব কচি কচি ছেলে-পিলে নিয়ে আপনি রুগীর সেবা করেন কি ক'রে? ও কাজটার জন্য কর্ত্তার কাছে ছুটি নিতে পারেন না।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "তা আর কি ক'রে হয়! তাহ'লে একেবারে গোড়াতেই ছুটি নিতে হ'ত। এ রোগ ত আর ওর আজকের নয়। আমার বিয়ের আগের থেকেই এসব চল্‌ছে। জেনেশুনেই ত ঘরে এসেছিলাম। কেবল বড় খুকী হ'বার সময় থেকে ওঁর কাছে কথা নিয়েছিলাম যে, বাড়ীতে সংক্রামক রুগী আন্‌তে পার্‌বেন না। দেখবেন এখন, আমার রুগীদের বেশীর ভাগের রোগই বার্দ্ধক্যের রোগ। ওদের সেবা মানে বাতের মালিশ, ফোমেণ্ট, দুধবার্লি জোগানো আর বুড়োবয়সের প্রলাপ শোনা।"

গৌরী বলিল, "ঘরের কাজকর্ম্ম কে করে?"

গৃহিণী বলিলেন, "একটা মেথর আর মেথরাণী আছে, তারাই মোটামুটি করে। উপরি তদারকটা আমাকেই কর্‌তে হয়। বড়খুকীটা ইস্কুল যাবার আগে ভাত ডাল ফোটানোটা একটু দেখে ততক্ষণে আমি ওদিক সেরে আসি। দুপুরে আবার ছেলেপিলেদের সেলাই ফোঁড়াই আছে, তার উপর ওদেরও চিঠিটা এটা সেটা নিয়ে লেগে থাক্‌তে হয়। সেই হয়েছে বিপদ।"

সঞ্জয় বলিল, "আপনার সেই কাজের সহায় হ'বার জন্যেই ইনি এসেছেন। উনি এখানে থাক্‌বেন না বটে, কারণ ওঁর আবার কলেজে পড়া, নাইট ইস্কুল পড়ানো ইত্যাদি নানা কাজ আছে। তবু রুগীদের চিঠিপত্র লেখা পড়া, এদিক-ওদিক একটু দেখা-শুনা করা এগুলো উনি ক'রে যেতে পার্‌বেন নিজের সুবিধা-মত।"

গৌরী বলিল, "আমি সেলাই-ফোঁড়াইও একটু-আধটু জানি, দর্‌কার হ'লে তাও আমাকে দিয়ে মাঝে-মাঝে করিয়ে নেবেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "এত কাজের উপর আপনি আবার অত কাজ কখন কর্‌বেন ভাই? আমাদের মত শুধু ঐ নিয়ে থাক্‌লেই ত আপনার চল্‌বে না। আমাদের ভবিষ্যৎ বাঁধা হ'য়ে গেছে, এখন কেবল কলের মত একভাবে কাজ ক'রে যাওয়া, ভাবনা চিন্তা সমস্যা মীমাংসা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামাতে হয় না, কাজেই কাজটা সহজ হ'য়ে গেছে। আপনারা ছেলে মানুষ, আপনাদের সাম্‌নে সমস্ত ভবিষ্যৎ প'ড়ে আছে, তার জন্যে সকল দিকে প্রস্তুত হ'তে নানা ব্যবস্থা কর্‌তেও ত আপনাদের সময় চাই।"

গৌরী বলিল, "আমার ভবিষ্যৎও অন্য ভাবে একেবারে কচি বয়সেই বাঁধা হ'য়ে গেছে,তার জন্যে বড় বয়সে ভাববার আর আমার কোনো দরকার নেই। বাকি দিনগুলো সমস্তই এখন কোনো ফাঁক না রেখে কাজের কলে নির্ব্বিচারে ফেলে দেওয়া যায়।"

ভূষণগৃহিণী বিস্মিত হইয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি গৌরীকে কুমারী মনে করিয়াছিলেন; ভাল করিয়া তাকাইয়া সে যে বিধবা এ সন্দেহটা তাঁহার মনে আসিল। মনটা ব্যথা পাইল, এভাবে কথাটা না তুলিলেই হইত। বলিলেন, "আপনার বয়স এত কচি, কত বড় বড় কাজ আপনার পথ চেয়ে প'ড়ে আছে। আপনারা মাথা খাটিয়ে কত নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি কর্‌বেন। আমরা ছেলেপিলে নিয়ে বাঁধা কাজেই সুবিধে পাই। তা ব'লে কলের চাপে নিজেকে পিষে বাঁধা কাজ বার কর্‌বার সময় এখনও আপনার হয়নি।"

গৌরী বলিল, "কিন্তু কাজের মানুষ হওয়ারও ত একটা সাধনা আছে। নিজেকে আষ্টে-পৃষ্ঠে যদি কাজ দিয়ে না বেঁধে ফেল্‌তে পারি, যদি খেয়াল-খুসীর ফাঁকে মনটাকে অন্যপথে ভেসে যেতে দিই তাহ'লে সাধনায় যে বাধা পড়বে, মনটা অলস হ'য়ে উঠ্‌বে, নিজেকে আপনাদের মত বড় ক'রে গ'ড়ে তুল্‌ব কি ক'রে?"

সঞ্জয় বলিল, "মনুষ্যধর্ম্মকে বলি দিয়ে যে-সাধনা, তাকে কি সাধনা বলে? মানুষের দেহ-মনকে আনন্দ দেওয়া

অবকাশ দেওয়াকে যদি আলস্য বল্‌ত তাহ'লে পৃথিবীতে প্রতি পদে পদে এত আনন্দ এত অবকাশের উৎস বিধাতা খুলে রাখ্‌তেন না।”

হৈমবতী বলিলেন, “গৌরী আমার একেবারে তপস্বিনী গৌরী হ'য়ে উঠ্‌তে চায়। দেখ্‌ছ না মা, এই যে এঁদের এমন সেবা আর কর্ম্মের সংসার এর ভিতরও খোকা-খুকীদের সঙ্গে খেলার খেলুড়ী হ'য়ে মাকে যোগ দিতে হচ্ছে, হাসি-গল্পে আনন্দে সময় কাটাতে হচ্ছে। সেটা কি সাধনা থেকে চ্যুতি? পৃথিবীর আনন্দ পৃথিবীর হাসি খেলা, বিশ্রাম সৌন্দর্য্য এই সব কিছুকেই যদি ছেঁটে ফেলে দাও তাহলে বুঝ্‌বে কি করে কোন মানুষটা দুঃখী আর কোন মানুষটা সুখী? বিধাতা আমাদের জন্যে চারিদিকে যে আনন্দের ভাণ্ডার খুলে রেখেছেন তার স্বাদটুকু গ্রহণ করতেও যদি ভয় পাও, তাহ'লে হতভাগ্য বঞ্চিত মানুষগুলোর ব্যথা যে কি তা জান্‌বে কি উপায়ে? বড় রকম ত্যাগ করতে হলে সকল আনন্দের বন্ধনকেই স্বীকার কর্‌তে হবে না হ'লে যে আনন্দ কখনও নিজের জীবনে ভোগ করনি, সেটা ত্যাগের কোনো অর্থ হয় না। সন্তানকে কোলে একদিন পেয়েছিলুম ব'লেই তাকে যেদিন হারালাম সেদিন মাতৃহীনের দুঃখ খানিকটা বুঝলাম। জীবনে পরের ছেলের জন্যে যেটুকু কর্‌তে পেরেছি, সেটুকু নিজের ছেলেকে ভালবাস্‌তে তাকে নিয়ে ধূলা-খেলা কর্‌তে শিখেছিলাম ব'লেই।”

ছোট খুকী আসিয়া বলিল, “মাগো, বাইরের মানুষদের চা খেতে বল্‌বে না? খালি বকর্ বকর্ কর্‌ছ কেন সবাই? দিদি কতো—ক্ষণ চায়ের জল ক'রে ব'সে আছে।”

খুকীর মা বলিলেন, “সত্যি ত, খুকী আমাকে আসল কাজের কথাটা মনে করিয়ে দিলে। আপনারা কোন্ সকালে বেরিয়েছেন, এখনও মুখে জল পড়েনি, সেটা আমার আগে ভাবা উচিত ছিল।”

মায়ের ডাকে দশ এগার বছরের মেয়ে বড় খুকী ট্রেতে করিয়া চা পেয়ালা পিরিজ ইত্যাদি আনিয়া হাজির করিল। গৌরী চা খায় না, কিন্তু ইঁহাদের তাহা সে বলিতে পারিল না। কারণ সে বেশ বুঝিল যে, যদি সে খাইবে না বলে তবেই এই শত অসুবিধার ভিতরও ইঁহারা তাহার জন্য অন্য আয়োজনে লাগিয়া যাইবেন। গৌরী হৈমবতীকে বিস্মিত করিয়া সকলের সঙ্গে চা রুটি ও মাখন খাইল।

সাধনা ও ত্যাগের প্রসঙ্গটা চাপা পড়িয়া গেল। গৌরী যে কঠিন একটা পণ করিয়াছে তাহা তাহার এই দুই চার কথাতেই সঞ্জয় বুঝিল। এই কঠিন পণের ভিতর হইতে এই তপস্যার দুর্ভেদ্য বর্ম্মের অন্তরাল হইতেই তাহার হৃদয়টিকে উন্মুক্ত করিয়া দেখিতে তাই যেন সঞ্জয়ের রোখ চাপিয়া গেল। হৃদয়-আবেগের উৎসাহ যাহার দুরন্ত বন্যার মত ছুটিয়া বাহির হইতে না চায় সে কখনও এমন গুরুভার শিলার তলে হৃদয়ের মুখ চাপিয়া ধরিতে চায় না। প্রাণ যে তাহার নিপীড়িত দেহ-পিঞ্জরের বন্ধনের ভিতর দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে যে মুক্ত স্বাধীনরূপে পূর্ণ আলোকের মাঝখানে বাঁচিয়া উঠিতে চায় তাহা আর লুকাইয়া রাখা পাছে না যায় তাই বুঝি এত বাঁধাবাঁধি এত বাড়াবাড়ি! সেই ভালো, সঞ্জয় ভাবিল সহজে সস্তায় যে নারীর মনকে পাওয়া যায় তাহার মূল্য দেশের মানুষ কোনো দিন বুঝে নাই, সেই কি বুঝিবে? এই তপস্বিনীর তপস্যার বিরুদ্ধে তপস্যা করিয়া সাধনাকে সাধনা দিয়া জয় করিয়া তাহাকে নারীর মনের দুয়ার খুলাইতে হইবে, তবেই সে নারীর মূল্য নারীর মর্য্যাদা বুঝিবে।

ফিরিবার সময় হইল। ভূষণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি যদি এখানে কাজের জন্য আসেন, তাহ'লে এঁর এখানে আসা-যাওয়ার ত একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।”

ভূষণবাবুর গৃহিণী শৈবলিনী বলিলেন, “আমাদের গাড়ী-পাল্কীও নেই, লোকজনও নেই। কেই বা নিয়ে আস্‌বে যাবে? আমার যদি সময় থাক্‌ত ত আমি সঙ্গে ক'রে আন্‌তাম।”

গৌরী হাসিয়া বলিল, “আপনি যদি আমার তদারক কর্‌তে বসেন তাহ'লে ত আমি আপনার মস্ত সহায় হ'লাম দেখ্‌ছি।”

সঞ্জয় বলিল, “সস্তায় একটা পাল্কীর ব্যবস্থা কর্‌লে হয় না।”

গৌরী বলিল, “তাতেও ত আবার পয়সা খরচ আছে। কাজে যখন নেমেছি, তখন পায়ে হাঁট্‌তে হবে এটা ধ'রে নিয়েই বেরোনো দরকার।”

হৈমবতী বলিলেন, "পায়ে হাঁটো আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গী হবে কে ?"

গৌরী বলিল, "কেন, আমি একলাই যাব আস্‌ব। আমার সঙ্গে আর একটা মানুষকে জোড়া কর্‌লে তার কাজ ত পণ্ড হবে।"

হৈমবতী বলিলেন, "কিন্তু তোমার বাড়ীর লোকে তাতে রাজি হবেন না যে।"

গৌরী বলিল, "ভবিষ্যতে আরো অনেক বিষয়েই হয়ত বাড়ীর লোককে চটাব, এইটুকুতেই এখন ভয় পেলে চল্‌বে কেন ? যখন আশ্রমে এসেছিলাম, তখনও বাড়ীর সকলে না হোক্ অনেকে রাগ করেছিলেন। এখন তাঁদের সয়ে গেছে। নূতন আর-একটা কাজ কর্‌লে হয় ত সকলেই রাগ কর্‌বেন, কিন্তু সে-রাগ প'ড়ে যাবে। বাবাই ত আমাকে নিজের উপর নির্ভর কর্‌বার মন্ত্র দিয়েছিলেন, আজ কাজের বেলা তার একটুকুমাত্র প্রকাশ দেখ্‌লে যদি তিনি রাগ করেন তাহ'লে আমাকে সে-রাগ মাথায় পেতেও কাজে বেরোতে হবে ; কারণ এ শিক্ষা ত প্রথম আমার তাঁর কাছেই।"

ভূষণবাবু বলিলেন, "আপনারা ভেবে দেখুন, যদি ওর একলা আসা-যাওয়াই মত হয় এবং তাই স্থির করাও হয়, তবু প্রথম কয়েকদিন সঙ্গে কারুর থাকা দরকার হবে, কারণ পথে-ঘাটে চলা ত ওঁর কোনো দিন অভ্যাস নেই।"

সঞ্জয় বলিল, "আমি শঙ্করকে ব'লে দেখ্‌ব ; সে যদি নিজে দু চার দিন সাহায্য কর্‌তে রাজি থাকে এবং আমার সাহায্যে আপত্তি না করে তা হ'লে কয়েকটা দিন আমরাই চালিয়ে নিতে পার্‌ব। তারপর ত আর আমাদের দর্‌কারই থাক্‌বে না।"

হৈমবতী বলিলেন, "আচ্ছা, তাই বলে দেখ কি হয়।" যাইবার সময় হইল। গৌরী শৈবলিনীকে বলিল, "আপনার ঘর-সংসারটা একবার দেখে যাই।"

বড় ঘরখানি শুইবার বসিবার পড়িবার খেলিবার সকল রকম সাজ-সরঞ্জামে ঠাসা। পাশে ছোট একটি ঘরে আধখানা ভাঁড়ার, তরিতরকারী চাল ডাল জল নুন তেল সব তাহারই ভিতর অত্যন্ত অল্প জায়গায় গায়ে গায়ে সাজানো। অপর কোণে ছোট একটি চেয়ার ও টেবিল, দুইটা বেতের বাক্সে দুই বোঝা কাগজ, দুই তিনটা ফাইল, একটা ক্যাশ-বাক্স, কাগজ কলম পেন্সিল খাতাপত্র প্রভৃতি আপিসের সরঞ্জাম। মাঝখানে স্বল্পপরিসর একটুখানি জায়গায় তিন চারখানা পিঁড়ি, সেইটুকু সকলের আহারের স্থান। তাহার পাশে টালির চাল দেওয়া ছোট একটি রান্নাঘর, বড় খুকী তখনও উপক্রমণিকা হাতে করিয়া সেখানে ভাতের হাঁড়িটা তদারক করিতেছে। সব দেখিয়া শুনিয়া গৌরী বলিল, "বেশ আপনার সংসারটি।"

শৈবলিনী বলিলেন, "আপনাকে ছোট বোনের মত মনে ক'রে একটি কথা বল্‌ছি, কিছু মনে কর্‌বেন না। এই ছোট দুখানি ঘরের ভিতর এই যে গরীবের সংসার দেখ্‌ছেন, এর সঙ্গে অনেক দুঃখ-কষ্টের যোগ আছে, চোখের জলও এর জন্যে ফেল্‌তে হয়েছে। ছোট ছোট ছেলে নিয়ে কাজের পথে কত যে ঘা খেতে হয়েছে কত কাজ আট্‌কা পড়েছে তার ঠিক নেই, কিন্তু তবু কাজ বন্ধ হয়নি ; কারণ আমার সকল কাজের সকল সাধনার এই হ'ল প্রেরণা। যদি কাজের সকল সরঞ্জাম সংগ্রামের সকল অস্ত্র সকল বর্ম্ম খুলে ফেল্‌বার একটা স্থান না থাক্‌ত, কাজের শেষে দুঃখের পারে কেবল নিজের বল্‌বার কোনো আনন্দ না থাক্‌ত তাহ'লে হাজার নির্ঝঞ্ঝাট হ'লেও শুক্‌নো কাজ এমন ক'রে আমায় বাঁধ্‌তে পার্‌ত না। শুধু তাই নয়, এমন ক'রে স্বামী পুত্র কন্যাকে যদি না ভালবাস্‌তে শিখ্‌তাম তাহ'লে পরের দুঃখ যে কি হৃদয়ে দিয়ে তা কোনো দিন বুঝতাম না। তাই আমার মনে হয়, ঘর-সংসার আমাদের সাধনারও একটা অঙ্গ। একথা মেয়েরা ভুল্‌লে তাই চলে না। অবিশ্যি তাই ব'লে সকলকেই যে সেটা কর্‌তে হবে তা বল্‌ছি না। মানুষ কত কারণে কত পথ ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হয় তা জানি, কিন্তু যা কিছু আমরা করি তাই যে নিন্দের নয় এইটাই আমার বল্‌বার উদ্দেশ্য।"

গৌরী চুপ করিয়া শুনিল। তারপর বলিল, "আপনি ত আজ থেকে আমার দিদি হ'লেন। কাজের কথা সেবার কথা এর পর আপনার কাছে নূতন ক'রে অনেক শুন্‌ব, অনেক শিখ্‌ব।"

(ক্রমশঃ

ভবঘুরেয়র চিঠি

(রাজা রামমোহন রায়-স্মৃতিভাণ্ডার)

শ্রী তারকনাথ দাস

২০শে জুন তারিখে বার্লিন হইতে এই সংবাদ প্রচার হইল যে, আগামী ২রা অক্টোবর তারিখে, জার্ম্মনির প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড্ মাব্সাল্ ভন্ হিন্ডেন্বর্গের ৮০ বৎসরের জন্মদিন ; উক্ত দিনে সমস্ত জার্ম্মন তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কিছু টাকা প্রেসিডেণ্টকে ডালি দিবে এবং উক্ত টাকা দ্বারা হয়ত প্রেসিডেণ্ট জার্ম্মন জাতির আর্থিক উন্নতির জন্য একটা ফাউণ্ডেশন্ গঠন করিবেন। প্রত্যেক জার্ম্মন যাহাতে কিছু-না-কিছু টাকা দান করে তাহার জন্য দেশব্যাপী কমিটি গঠন হইবে। এই খবরটি পড়িয়া বিশ্ব-রাজনীতি-বিশারদ্ বিস্মার্কের জীবনীর একটা ঘটনা মনে হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী প্রুসিয়ার যুদ্ধের জয়ের পর জার্ম্মনির লোকেরা বিস্মার্কের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কয়েক লক্ষ টাকা দেয়। আমার যতদূর জানা আছে, উক্ত টাকা বিস্মার্ক জার্ম্মনজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে ওরিয়াণ্টাল সেমিনার স্থাপন করিবার জন্য দান করেন। জার্ম্মনদের মধ্যে দেশভক্তি "মুখের কথা" নয়, কাজের দ্বারা তাহারা দেশভক্তি দেখায়।

এইসঙ্গে একটা কথা বলিয়া লই। বর্ত্তমান যুগে ভারতের জননেতাদের মধ্যে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের এবং হিন্দু সমাজের কল্যাণের জন্য যে-সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই এবং যদি কোন দিন ভারত পুনরায় উন্নত হইতে চায় তাহা হইলে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মগুলিকে ভারতব্যাপী করিতে হইবে। বর্ত্তমান ভারতে, বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে, প্রকৃত "শ্রদ্ধা" নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে-হিন্দু সমাজে গুরুদক্ষিণার জন্য শিষ্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইত, সেই ভারতে কেবল "বাক্যে শ্রদ্ধা এবং কার্য্যকালে ভণ্ডামির প্রাধান্য" দেখা যায়। রাজা রাম-মোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য নানা প্রকারের সভা হয়, কিন্তু কার্য্য বড় বেশী হয় নাই।

আগামী ১৯২৮ সালে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের শত বৎসরের উৎসব হইবে। এ সময়ে ইংলণ্ড আমেরিকা ও বিভিন্ন দেশ হইতে প্রসিদ্ধ লোকেরা ভারতে আসিবেন। এই উৎসব উপলক্ষে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য যদি রাজা রামমোহন রায়-স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপিত হয় তাহা হইলে খুব ভাল হয়। ভারতের যত ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা এবং ভারতের যে-সমস্ত উদারচেতা হিন্দুরা রাজা রামমোহন রায়কে হিন্দু সমাজের সংস্কার-ক্ষেত্রে সহকর্ম্মী বলিয়া মনে করেন তাঁহারা, যে-সমস্ত ভারতবাসী রাজা রামমোহন রায়ের সর্ব্ব-ধর্ম্মের-সার সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াসকে মানবজাতির মঙ্গলজনক জ্ঞান করেন তাঁহারা, যে-সমস্ত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা অপর ভারতবাসী রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের প্রথম রাজ-প্রতিনিধি, যিনি ভারতের কল্যাণের জন্য এবং দিল্লীর বাদসাহের স্বত্ব রক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন এবং বিদেশে নিজের জীবন দেন, তাঁহারা, সকলেই যদি গড়পড়তা এক টাকা করিয়া চাঁদা দেন তাহা হইলে অক্লেশে তিন লক্ষাধিক টাকা রাজা রামমোহন রায়-স্মৃতি-ভাণ্ডারে উঠান সম্ভব। আশা করি, সময় নষ্ট না করিয়া রাজা রামমোহন রায়-স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটি হইবে না।

যদি রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপিত হয় তাহা হইলে উক্ত স্মৃতিভাণ্ডারের টাকার দ্বারা কি করা উচিত ? প্রথমত :—স্মৃতিভাণ্ডারের মূলধনের একটি টাকাও কোন বিষয়ে যাহাতে খরচ না হয় সে-দিকে নজর

রাখিতে হইবে। স্মৃতিভাণ্ডারের মূলধন যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহা করিতে হইবে। বাঙ্গলায় একটা চলিত কথা আছে যে, "জলপূর্ণ কল্‌সী থেকে যদি প্রত্যেক দিন একটুখানি ক'রে জল ব্যবহার করা হয় এবং কলসী পূর্ণ করিবার জন্য যত্ন করা না হয়, তা হ'লে সময়ে কলসী শূন্য হয়।" ভারতে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ও জাতীয় অভ্যুদয়ের জন্য কয়েকটা স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের অবস্থা আজ শোচনীয়। জাতীয় ভাণ্ডার, তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের টাকা সব প্রায় খরচ হইয়া গিয়াছে—কাজ কিছুই হয় নাই—এবং ভবিষ্যতে কাজের আশা নাই। কিন্তু যখন স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত মহাশয় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের জন্য একটি ফণ্ড স্থাপন করেন তখন উহার প্রধান সর্ত্ত এই হয় যে, কেহ মূলধন খরচ করিতে পারিবে না। মূলধন খরচ করিতে পারিবে না—এই সর্ত্ত না রাখিলে হয় ত উক্ত টাকা বিজ্ঞান-বিভাগের বাড়ী বা যন্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য এতদিন শেষ হইয়া যাইত এবং বিজ্ঞান-চর্চ্চার কাজ বন্ধ হইত। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক্রোড়াধিক টাকা উঠান হইয়াছে; উহার অধিকাংশ টাকা বাড়ী তৈয়ার করিতে ব্যবহার করা হইয়াছে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় দেনায় জড়িত এবং নানা প্রকারের শিক্ষা-প্রচারের কাজে হাত দিতে পারে না। কাজেই আমার মনে হয়, কেবল মূলধন রক্ষার জন্য যত্ন করিলেই হইবে না। মূলধন বাড়াইবার জন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায়-স্মৃতিভাণ্ডার যদি স্থাপিত হয় তাহার মূলধন বৃদ্ধির জন্য কি করা প্রয়োজন? প্রথমতঃ স্মৃতিভাণ্ডারের মূলধন দ্বারা খুব ভাল ব্যবসায়ের শেয়ার বা গভর্ণমেণ্ট কাগজ ক্রয় করা দরকার। অর্থাৎ মূলধন হইতে যাহাতে ভাল আয় হয়, অথচ মূলধন নষ্ট হইবার ভয় না-থাকে তাহার জন্য যত্ন করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ—মূল-ধনের আয়ের দশমাংশ প্রত্যেক বৎসর মূলধন বৃদ্ধির জন্য মূলধনে জমা দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়তঃ—প্রত্যেক বৎসর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিনে ভারতে ও বিদেশে অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা ফণ্ডে জমা দেওয়া চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি ব্রাহ্মসমাজের শত বৎসরের উৎসব উপলক্ষে তিন লক্ষ টাকা মাত্র রাজা রামমোহন রায়-স্মৃতি-ভাণ্ডারের জন্য উঠান যায় এবং মূলধন বৃদ্ধির জন্য পূর্ব্ব প্রস্তাবিত পন্থা অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে উক্ত মূলধন পাঁচ লক্ষ হইতে দশ লক্ষ বা ততোধিক হইবে। মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি হইবে এবং নানা প্রকারের সৎকার্য্য বাড়িবে।

এখন কথা উঠিবে, যে, যদি রাজা রামমোহন রায়-স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপিত হয় তাহা হইলে উক্ত ভাণ্ডারের মূল-ধনের আয় কি ভাবে ব্যবহার করা উচিত। ভারতের কল্যাণের জন্য শত পন্থায় কাজ করা যাইতে পারে। তবে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে তিনি যে-কার্য্যের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন সেই কার্য্যগুলির জন্য এই স্মৃতি-ভাণ্ডারের আয় ব্যয় করা উচিত। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে তিনটি প্রধান কার্য্যপন্থা দেখা যায়। প্রথমতঃ, তিনি একজন ধর্ম্মবীর; তিনি বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে নূতন জীবন আনেন এবং তিনি সর্ব্বধর্ম্মের সার বুঝিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ভারতের সর্ব্বপ্রধান সমাজ-সংস্কারক, তাঁহার যত্নে সতীদাহ বন্ধ হয়; তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে, স্ত্রীশিক্ষার জন্য বাল্যবিধবা-বিহারের জন্য শত বৎসর পূর্ব্বে যত্ন করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয়তঃ—তিনি ভারতবাসীকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্র অনুসরণ করিবার ব্যবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি পতিত দিল্লীর বাদসাহের উকিল হইয়া, ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রথমে ইংলণ্ডের রাজদরবারে ভারতের দাবী বুঝাইতে যত্ন করেন এবং ভারতের সেবায় বিদেশে প্রাণ দেন। আজ ভারতের হিন্দু যুবক ও যুবতীরা "কালাপানীর পারে" গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া নিজেদের এবং দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করিতেছেন এবং ইহা শক্ত কাজ বলিয়া বুঝিতেও পারেন না। কিন্তু শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করিয়া পথ দেখাইয়া গিয়াছেন তাই আজ এসব কাজ সুসাধ্য। রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান **বৃহৎ-ভারতপন্থী**। মোটা কথায় রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের আয় হইতে উক্ত তিন প্রকার কাজ করিতে হইবে।

ধর্ম্মবীর রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিশ্বভারতীতে বা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে) Chair of Comparative Religion, সর্ব্বধর্ম্ম সাধনার ও অধ্যাপনার জন্য একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় প্রফেসর অফ্ কম্প্যারেটিভ্ রিলিজন্ জন্য বাৎসরিক বেতনের ভার বহন করিতে হইবে।

সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, হিন্দুসমাজে বাল্য বিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচার ও ছুৎকারবাদ দূর করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে হইবে। এই বিভাগের কার্য্যের জন্য বাৎসরিক লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও কার্য্যের কূল-কিনারা দেখা যায় না। কাজেই শক্তিমত ও সাধ্যমত কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। **নূতন কাজে হাত না দিয়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অবলা বসু, সরলা দেবী প্রভৃতি বঙ্গীয় নারীরা স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য এবং সমাজ-সংস্কারের জন্য যে-যত্ন করিতেছেন, তাহাদের কাজের-সাহায্যের জন্য রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের আয়ের কতকাংশ ব্যয় করা উচিত।**

ভারত-প্রতিনিধি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য (Raja Rammohon Rai fellowships) রাজা রামমোহন রায় ফেলোসিপ স্থাপন করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের ব্যয়ের কতকাংশ হইতে প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ একজন ভারতের উন্নতমনা দূরদর্শী বিদ্বান অধ্যাপককে বিশ্বভ্রমণের জন্য পাঠাইতে হইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপিত হয় এবং এই তিন পন্থায় কার্য্যারম্ভ করা যায় তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের যুবক যুবতীর মধ্যে, শত শত কর্ম্মীর মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের আদর্শ জাগিবে। পতিত ভারতে, হিন্দু সমাজে প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগ সমাজ সংস্কার ও বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম-প্রয়াস আবার জাগিয়া উঠিবে। রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে দীক্ষিত "বৃহৎ-ভারতপন্থী" নূতন নূতন কর্ম্মী চাই। দূরদেশ হইতে ভবঘুরে তারকনাথ, রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য' করযোড়ে ভারতের হিন্দু জৈন বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান্ শিখ ও ভারতের বৃহৎ ভারতপন্থী নেতাদের নিকট ভিক্ষা করিতেছে। ইতি

আপনাদের

ভবঘুরে তারকনাথ দাস

জননী

শ্রী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

ওদের যাকে শুদোই সেই বলে—"আমার বাড়ী? আমার বাড়ী, মা, মেহেরপুর।" কথার সুরটা টানে টানে কেমন যেন পেঁচিয়ে চলে। কারু গালভরা হাসি, কারু মুখ থেকে বিষ ঝরে; কেউ হাজারো গরীবানার মধ্যেই একটু সৌখীন—পানে দোক্তায় ধোপকাপড়ে; কেউ মোটেই তা' নয়।

মেহেরপুর কতবড় দেশ তা' জানিনে; খুব বড়ই হবে; সেই দেশ থেকেই দেশবিদেশে বছর-বছর ঝিয়ের রপ্তানি আসে, শ' দু'শো। তাই ভাবি, আমাদের চন্দনপুরের চেয়ে সেটা খুবই বড় হ'বে।

আবার সবারই বাড়ী যে, মেহেরপুরেই তাও আমার মনে হয় না; উনিও বিশ্বাস করেন না; আশ্‌পাশের

দশবিশ কোশের লোকে ঐ কথাই বলে; ভাবে, কে চেনে সে পাড়াগাঁ !······তাই সবাই মেহেরপুরের নামই করে ; বল্‌তেই লোকে চিন্‌বে।

নাম সবারই কিছু মানান্‌সই হয় না।

যে খুব কালো, তার নাম সুন্দরী ; যার মাথাজোড়া টাক্‌, তার নাম এলোকেশী, হাস্‌তে যার ময়লা মাড়ি বেরিয়ে পড়ে, তার নাম সুহাস।······এম্‌নি কিম্ভুত সব নাম !

কেউ কাজের লোক—শীতে বাদলে সমান।······ বন্‌ বন্‌ ক'রে ঘোরে আর কাজ করে ; বলে,— "এই ত' আমার ঘর, বৌমা ; যে অন্ন দেয় সেইত' আপন।"···কেউ আবার গতর বাড়ানে', নড়্‌তেই চায় না— যেন রাজরাণী ; কুটোটা কেটে দু'খান কর্‌তেই বলে,— "গা আর বয়না, মা ; মরণ হ'লেই বাঁচি ; যমে—"

ব'লেই, "মাগো, খেয়ে ফেল্‌লে" চেঁচিয়ে লাফিয়ে ওঠে, যেন ডাকৃতে ডাকৃতেই যম এসেছে······

চেয়ে দেখি, আরশোলা !

আবার ঝগড়াও করে—বলে,—"দুঃখে প'ড়ে গতর দিয়ে দাসীগিরি কর্‌তে এসেছি, তাই ব'লে কি মুখনাড়া সইব ? উঁ হুঁঃ, তেমন বাপের বেটি আমি নই।" বলে আর মাথা নাড়ে।—

কথার দামটা ধর্‌তে পারিনে, বেটির বাপ্‌কে চিনিনে ব'লে।

এদের একটিকে নইলে আমার চলে না।

তিন্‌টি ত' আমরা মানুষ—উনি আমি আর বুড়ু। কিন্তু ওতেই উন্‌কোটি ভবিষ্যত কাজ।···ভোর থেকে কাজের সুরু, আর শেষ সেই রাত বারোটায়। কাজের কি ফন্দ দেওয়া যায় !···খামখাই কাজ কত বাড়ে তা' গেরস্ত মানুষই জানে। গরু নেই, বাছুর নেই···তবু কাজ যেন দ্রৌপদীর বস্ত্র···কেবলি কোথা থেকে খুলে' খুলে' সাম্‌নে আস্‌ছে···তার শেষ নেই।—

মন্দা বলে,—"তিনটে লোকের আবার কাজ কি লা ? তার আবার একটা ঝি !" শুনে' গালে হাত দি'।······

আমার এদি· · হাত পা টাটিয়ে ওঠে ; মনে হয় ভেঙ্গে বুঝি প'ড়ি।—

নূতন ঝিকে ঝি ব'লেই ডাকি

কে এখন বুড়ো মেয়েকে নিস্তার নিস্তার করে। কেমন বাধে।

নিস্তারের বাড়ী কিন্তু হঠাৎ মেহেরপুরে নয়।

তাকে নিয়ে এল মেহেরপুরেরই মুক্ত, দুগ্যো চ'লে গেলে।····· জবাব আমি তাকে দেইনি।

"ভেয়ের অসুখ ; দেশের লোক এসেছে, সেই বল্‌লে" —ব'লে দুগ্যো কাঁথা দিয়ে বালিশ জড়িয়ে, আর কাপড়ের এক বোঁচ্‌কা নিয়ে ভাইয়ের জন্যে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে চ'লে গেল।—

দুগ্যো লোক ছিল ভাল ; মেয়ের মতন দেখ্‌তো আমায় ; ধম্‌কে' কথাও কইত, যেন হাতে ক'রে মানুষ করেছে।······বুড়ুকে নাওয়ানো-ধোয়ানো, কাজল-পরানো থেকে যত সব সে-ই কর্‌ত·········জামাজুতো-পরানো পর্য্যন্ত।—

অযত্ন দেখ্‌লে বল্‌ত,—"যত গেরো আমার, আর যত গরজ আমার। নিজের মেয়ে যদি পরের কাছে মানুষ হ'ত তবে আর ভাবনা ছিল না। কাজ, কাজ, কাজ—কাজ একটু রাখো গো রাখো, এটাকে আগে দেখো······"

কিন্তু আমাকে উঠ্‌তেও হ'ত না, বক্‌তে বক্‌তে সে নিজেই দেখ্‌ত।

ওঁর আসার আগে, ঘটিতে পা-ধোবার জল ভ'রে ঘটির মুখে গামছাখানা তাওয়া ক'রে রেখে দিত ; বল্‌ত,— "বেটাছেলে কি সহজে তুষ্টু হয়, মা ! শিব তুষ্টু হন্‌ ত' ওরা হয় না।—"

আবার বল্‌ত,—"বেশ বশ করেছ বাবুকে ; কেবল চেয়ে চেয়ে হাসে·····ভারি মিষ্টি।····· "

কিন্তু এই দুগ্যো চ'লে গেলে মুক্ত এসে বল্‌লে,— "শুনেছ, বৌমা, অবাক্‌ কথা। দুগ্যোর সব মিছে কথা ; ভেয়ের অসুখ-ফসুখ সব মিছে কথা দুগ্যোর ; ছল ক'রে

চ'লে গেল। বড় দারোগার বাসায় লেগেছে।...... ঝাঁটা মারি নেমকহারামীর মুখে।—"

নিস্তার আরো ভালো।

ভাবনাই ছিল, না জানি এ আবার কেমন হবে।...... একটা ক'রে ঝি পালায়, আর আমার বুক কাঁপে।...... সবারই দেখেছি, গোড়ার দিক্‌টায় দিনকতক বেশ বনিবনাও, হাসি-খুসী; তারপর যত দিন যায় তত তাদের নিজের নিজের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু নিস্তার বেশ—ভারিক্কি ভদ্দর চেহারা, যেন জজ্‌গিন্নি, মুখখানা গোল, চোখ্ ছুটো ভাসা ভাসা, আঁট্‌সাট্ মোটাসোটা, রং আধ ফর্সা; হাত-পায়ের গড়নে দিব্যি একটা শ্রী।—

নিস্তারের বাড়ী গৌটে। গৌটে কোথায় কে জানে? নিস্তার বল্‌লে,—"সে নৈহাটি থেকে সাত কোশ পূবে।" ...তারপর একটুখানি কি ভেবে বল্‌লে, "বড় দুঃখু, মা।"

কোথায় যে দুঃখু টের পাইনে। নৈহাটি থেকে গৌটে সাতকোশ পূবে, সেটা এমনই কি দুঃখের কথা!—কিন্তু বল্‌তে বল্‌তে তার চোখের কোণে জল জমে; দেখে' মনে হয়, দুঃখটা তার গাঁয়ের ভিতরে কোথাও, নৈহাটি থেকে সাতকোশ পূবে ব'লে নয়।......

কি বল্‌ব তাই খানিক্ ভেবে বল্‌লাম, "দুঃখু কার নেই বলো, মেয়ে! আমার কি কম দুঃখু—একটা দিন এমন যায় না যেদিন মনটা স্বচ্ছন্দ ঠেকে, যা' চাই আজ সব আমার আছে।"

নিস্তার কথা কইলে না, ঘাড় নামিয়ে রইল।

আমি বল্‌লাম,—"নেই-নেই দুঃখু আর ঘোচে না; কেবলি হাত্‌ড়ে' বেড়াই, কিসে দু'পয়সা সাশ্রয় হবে।... বুড়ু আদুল গায়ে থাকে, তার আর দুটো পেনি হ'লে ভালো লাগে; দুটো ইজার তার চাই; উনি ছেঁড়া জামা প'রে বেড়ান; বুড়ুর দুধে দি বার্লি মিশিয়ে; বুক ফাট্ ফাট্ করে —এমন হতভাগীর পেটে এসেছিলি—"

হঠাৎ থেমে যেতে হয়, আমার চোখেও জল এল।

নিস্তারের দুঃখের কারণটা একদিন সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে পড়্‌ল।...বুড়ু ঘুমিয়েছে, উনি প্রাইভেট্ পড়া'তে বেরিয়ে গেছেন; আমি রাঁধ্‌ছি—

ভাত চাপিয়ে হাওয়ায় এসে একটু বসেছি। নিস্তার বল্‌লে,—"এই পোড়া পেট কেন বিধি দিয়েছিল জানিনে, মা। পেটের দায়ে মানুষ কি না কর্‌ছে বলো! লাঠালাঠি, ফাঁকিবাজি, মাম্‌লা মাদালত—সবই ত ঐ পেটের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে; গাড়ী বলো ঘোড়া বলো, হাওয়াগাড়ী বলো, রেলগাড়ী বলো, নৌক' বলো, জাহাজ বলো—মানুষের পেটের খোরাকে বোঝাই হয়েইত সব ছুটোছুটি কর্‌ছে; তাতেও কুলোয় না—আবার শুন্‌ছি উড়ো জাহাজ হয়েছে। নয়, বৌমা?"

আমি বল্‌লাম, "তা' ত' সত্যিই। পেট না থাক্‌লে কে কার বলো। পেট আছে ব'লেই ত' মানুষ মানুষের বশ।"

নিস্তার বল্‌লে, "পেট মানে না ব'লেই ত ছুটে' বেরিয়েছি ছেলে দুটোকে এক্‌লা ফেলে।"

—"তোমার ছেলে আছে নাকি?"

—"তোমাদের পায়ের ধূলোর আশীর্ব্বাদে আছে, মা, দুটি।"

—"বড় হয়েছে তারা?"

—"বড়টি আঠারো বছরের, ছোটটি গেল মাঘে চোদ্দোয় পড়েছে।" ব'লে নিস্তার ফোঁস্ ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

—"কি কর্‌ছে দুটো ছেলেমানুষ একা একা তাই আমি ভাবি দিনরাত, মা। তাদের পিসি আছে, সে চোখে ভালো দেখে না। অসুখ আছে বিসুখ আছে···। সেবার ধীরুর হাম হ'ল বোশেখ্ মাসে, হামের পর হ'ল আমাশ... সেই থেকে তার কাহিল ভাবটা যায়নি আজও। কি যে কর্‌ছে তারা, আর কেমন আছে কে জানে।—" ব'লে দুর্ভাবনায় নিস্তার যেন মুষ্‌ড়ে' পড়্‌ল।

শুনে আমারও মনে হ'ল মা-হারা হ'য়ে ছেলেরা সহায়হীন হ'য়ে পড়েছে ঠিকই।...আমার বুড়ু যত বড়ই হোক্, আমি তার কাছে নেই, তার এমন দুরবস্থা ত ভাব্‌তেই পারিনে। বিয়ের পর আলাদা কথা; তখন ত

সে পরের হবে…তবু ত' মন জুড়বে। ছেলে হোক্‌, মেয়ে হোক্‌, তারা কি কিছু বোঝে? নিজের খোঁজ কি তারা নিজে রাখ্‌তে পারে, না জানে।

উনিই ত' একটি বুড়ো ছেলেমানুষ, নিজের কাপড় গামছা জামা জুতো, টাকা পয়সার হিসেব রাখা দূরে থাক্‌, খেয়ে পেট ভর্‌ল কি না তাই কি ছাই ভালো ক'রে বোঝেন? …খেয়ে উঠ্‌ছেন, এমন সময় আরো দুটি ভাত দিলে, না না করেন, কিন্তু ভাতক'টি উঠে যায়, হামেসা দেখেছি …ঐ দু'টির ক্ষিদে ত' পেটেই থাক্‌ত। ছেলেরা ত আরো কাঁচা, আরো অবোধ।

এই কথাগুলোই আমি নিস্তারকে বল্‌লাম।

নিস্তার বল্‌লে, "তাই মা; যা' বলেছ তাই। বেটা-ছেলেরা কি মানুষের মত মানুষ, না, তাদের জ্ঞানগম্যি আছে। খাওয়ালে ত' খেলে, না খাওয়ালে ত চাওয়া নেই। বড়ছেলে সুরু বড় মা-ন্যাওটা; যেদিন চ'লে আসি সেদিন আমার আঁচল চোখে দিয়ে সে কি তার কান্না!" ব'লে নিস্তার গালের ওপর থেকে চোখের জলের ধারা আঁচল দিয়ে মুছে ফেললে। আবার বল্‌লে—"সে-ও যত কাঁদে আমিও তত কাঁদি। কিন্তু ধীরু আমার সুবোধ; সে বল্‌লে—"দাদা, কাঁদিস্‌নি, মা আমার আস্‌বে শুনে আমি একচোখে হাসি, একচোখে কাঁদি। … … … " ব'লে নিস্তার একটু থাম্‌লে … কিন্তু তখনি আবার বলতে লাগ্‌ল,—"খেয়ে তাদের পেট ভর্‌ছে না, এ আমি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি এখান থেকে।" নিস্তার ফুঁপিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌ল।

নিস্তার বলে,—"সুরুর রং ফর্সা, ধীরু আমার কালোটি। তবে সুরু কেমন আপনভোলা, ধীরু বেশ গোছালো। ধীরুই তার দাদাকে চালিয়ে নেবে।"…ব'লে নিস্তার হাস্‌তে থাকে।

কাজে কর্ম্মে বড় ভাই ছোট ভাইয়ের তাঁবেদার এ বড় তামাসার কথা।—

নিস্তার বল্‌ছিল, "দুটিতে ঝগড়াঝাটি হয়, আবার মিলও বেশ।'

আমি বল্‌লাম, "লেখাপড়া শেখালে ত'—"

নিস্তার বল্‌লে, "পাঠশালে দিয়েছিনু দুটিকেই। পণ্ডিতের চাল ডাল মাইনে পাব্বনীর হুকুম-হাঙ্গামা যে নিত্যি নিত্যি কত তার ঠিক নেই।…কেবল দাও আর দাও…কোথা পাই বলো মা, অত যে খালি জোগাব' আর জোগাব'। ছাড়িয়ে নিলাম; ভাব্‌লাম, যদি উপোস ক'রে পড়ার খরচ জোগা'তে হয়, তবে পড়া শেষ না হ'তে যে ম'রেই যাবো।"

বুড়ুকে শিখিয়ে দিয়েছি, নিস্তারকে পিসি ব'লে ডাক্‌তে। শুনে নিস্তার ভারি খুসী। বল্‌লে, মেয়েছেলে হওয়ার ঐ ত' মজা, বৌমা, কেউ না ডাক্‌লে তার ফাঁকা ফাঁকা শন্যি শন্যি লাগে। তোমার যদি ঐ সোনাটুকুন না হ'ত, তবে কি শুধুই ওগো-হ্যাগোয় বুক ভরত ভেবেছ!…তা আর হ'তে হয় না।"…এই ব'লেই বুড়ুর গালে আল্‌গোছে একটা চুমু খেল।

নিস্তার বলে,—"তোমাদের চরণের আশীর্ব্বাদে আমার সুরু ধীরু একদিন রোজগার কর্‌বেই।…… তখন আমি রাজ-মাতা হ'ব বৌমা—তুমি যেমন এখন রাজরাণী।"… এই কথা ক'টি বল্‌তেই তার চোখ ডাগর হ'য়ে ঝক্‌ঝক্‌ করে; আবার পরক্ষণেই নিবে' যায়। নিস্তার বল্‌ত—"সে দেখতে পাবে না তার সুরু ধীরু রোজগার কর্‌ছে, টাকা আন্‌ছে… …"

দুঃখে নিস্তারের চোখে জল আস্‌ত।

আমি বল্‌তাম, "তিনি স্বর্গ থেকে দেখ্‌বেন; দে'খে তোমার সুখে তাঁর আত্মা সুখী হবে।"

হঠাৎ মুক্ত এসে হাজির—

বল্‌লে, "লা লা ওলা—কি করছিস্‌ লা নিস্তার?" তারপর ঢিপ ক'রে আমায় একটা নমস্কার ক'রে গা এলিয়ে দিয়ে ধপ ক'রে ব'সেই পা ছড়িয়ে দিলে।

মুক্তর অমনি, কলকল্যানি স্বভাব।

নিস্তার বল্‌লে—"বৌমায়ের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কইছি, বোন্‌। ছেলে দুটো—"

মুক্ত চেঁচিয়ে উঠলে—"দু—টো …?"

চোখ বড় ক'রে ও-কারের গোল সুরটা অনেকক্ষণ টেনে চল্‌ল।

নিস্তার থম্‌কে' গেল, যেন মুক্ত নজর দিচ্ছে।

মুক্ত বল্‌লে—"ছেলের মুখে দি' মুড়ো জেলে'। আমার হাড় গুঁড়িয়ে তবে শত্তুররা মরেছে…"

কিন্তু মনে হ'ল মুক্ত যেন একটি নিঃশ্বাস চেপে' গেল।

ভারি গলায় নিস্তার বল্‌লে—"ছেলের মাকে অমন কথা বলিস্‌নি, মুক্ত।"

—"বল্‌ব না কেন তাই বল্ আমাকে। ছেলে—ছেলে—ছেলে—মায়ের গায়ে হাত তোল্‌বার আগে তারা আঁতুড়ে মরে না কেন!"—ব'লে মুক্ত আঙ্গুল মট্‌কাতে লাগ্‌ল।

নিস্তারের মুখের দিকে চেয়ে আমি তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়্‌লাম।

উনি বল্‌ছিলেন, "বুড়ুর পিসির ছেলেদের কি খবর?"

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল; বল্‌লাম, "ভালো কথা, নিস্তার আগাম্ তিনটি টাকা চেয়েছে, ছেলেরা আস্‌তে চায়; বলে, দাও বৌমা, বাবুকে ব'লে তিনটে টাকা আমার আগাম; একবার এসে তারা তোমাদের পায়ের ধূলো নিয়ে যাক্।"

উনি হাস্‌লেন, বল্‌লেন,—"পায়ের ধূলোর দাম আরো বাড়াও; ভদ্দর-লোকের ভেতর চালাবার চেষ্টা করো।"

কিন্তু টাকাটাও দিতে বল্‌লেন।

নিস্তার টাকা নিয়ে, খুঁটে বাঁধ্‌লে; তারপর আর কিছু দেখিনে। বল্‌লে—"টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি, বৌমা, ধীরুর নামে পাঠিয়েছি। দু'ভেয়ে ঐ নিয়ে সখের ঝগড়া হবে……"

নিস্তার সুখের হাসি হাস্‌লে।

ছেলে দু'টি টাকা তিন্‌টে নিয়ে খেলা ক'রে ঝগড়া কর্‌ছে, এ যেন তার মুখের ভাবে আমিও দেখ্‌তে পেলাম।

রোজই তাগিদ্ দিতাম—"কই নিস্তার তোমার সুরু ধীরু এল কই?—"

ছেলেরা এসে পৌছুতে দেরী কর্‌ছে এ যেন তারই বড় অপরাধ। নিস্তার কাতর হ'য়ে বল্‌লে, "কেন যে দেরী কর্‌ছে—তাই আমিও ভাব্‌ছি বৌমা দিনরাত। আস্‌বে নিশ্চয়। টাকার রসিদ যখন এসেছে।"…ব'লেই সে কাজে চ'লে গেল।

আবার তখনই ঘুরে' এসে বল্‌লে,—"আস্‌বে তারা নিশ্চয়, বৌমা। আমি দেখ্‌তে চেয়েছি,—খরচ পাঠিয়েছি, তারা না এসে পারে

ছেলেরা এলে যে আনন্দ হবে তারি ঢেউয়ে সে এখনই ভ'রে উঠেছে।

আমার মনের কথা বোধ হয় নিস্তার টের পেয়েছিল; বললে, "টাকা তারা বাজে খরচ কর্‌বে না, আমার ছেলেরা তেমন নয়।---"

সুরু ধীরু এল না।

কিন্তু মুক্ত একদিন যাকে নিয়ে এল, সে একেবারে নতুন মানুষ।

মুক্ত চেঁচাতে লাগ্‌ল—"কই লা, নিস্তার, দেখ এসে কে এসেছে"…

আমি বেরিয়ে এলাম।

মুক্ত তাকে বল্‌লে,—"পেন্নাম কর্ আবাগী।"

প্রণাম ক'রে মেয়েটি বল্‌লে,—আমার বাড়ীও গোঁটে, নিস্তারের দেশের মানুষ।—"

মুক্ত গলা ফাটাতে লাগ্‌ল—"কৈলা নিস্তার…নিস্তার…নিস্তার…"

কিন্তু নিস্তারের আর দেখা নেই।

আদর-আপ্যায়িত পান-সুপুরি আর একথা-সেকথার পর শুদোলাম,—"তুমি এলে, নিস্তারের ছেলে দুটিকে কেন নিয়ে এলে না?"

মেয়েটি আমার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। আমি বল্‌তে লাগ্‌লাম—"নিস্তার তাদের আসার খরচ পাঠিয়েছে তিন টাকা। আমি বল্‌লাম বাবুকে, নিস্তার তার ছেলেদের

না দেখে দেখে বড় কাতর হ'য়ে উঠেছে...আসুক তারা একবার, দেখা দিয়ে যাক্ মাকে।"

নতুন মেয়েটি একবার আমার মুখের পানে, একবার মুক্তর মুখের পানে চাহিতে লাগিল; শেষে বল্‌লে,—"অবাক্ করলে, মা, নিস্তারের ত' ছেলেপিলে নেই।"

—"নেই? সুরু ধীরু"........

কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে হেঁয়ালি, মাথামুণ্ডু তার কিছুই বোঝা গেল না।

নিস্তার অল্প বয়সেই বিধবা হয় ছেলে হ'বার বয়স তখন তার হয়নি।

আমার মুখে সব শুনে' "নিস্তার, নিস্তার" ক'রে মুক্ত বাড়ী তোলপাড় ক'রে তুল্‌ল, এ-ঘর, ও-ঘর, সব জায়গা পাঁতি পাঁতি ক'রে খোজা হ'ল, নিস্তার কোথাও নেই।—

মুক্ত বল্‌লে,—"পালিয়েছে মাগী ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়ে।—"

কিন্তু তা ত নয়, উল্টে সেই টাকা পাবে।

উনিও শুনে অবাক্ হ'য়ে গেলেন।

যে শোনে সেই অবাক্ হ'য়ে যায়।

তিনদিন পরে ভিন্নপাড়া থেকে নিস্তারকে মুক্তই গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এল।

এসেই নিস্তার কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, বল্‌লে,—মিছে কথা কয়েছি বৌমা, আমায় মাপ করো। আমার যে ছেলে নেই এ-কথা আমি ভাব্‌তে পারিনে যে।......

না হওয়ার জ্বালা ঐখানেই। বল্‌লাম,—"তুমি আমার কাছেই থাকো"—

নিস্তার বল্‌লে,—"না, তুমি ত' আমার ছেলের গল্প আর শুন্‌বে না!—"

বাঁকুড়ার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাঁকুড়ার অভয়-আশ্রম লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি বাঁকুড়া গিয়াছিলাম। অভয়-আশ্রম ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দর্শন করিয়া তদুপলক্ষে কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। বক্তৃতাগুলির কিছু আভাস দিব। এ বৎসর বাংলা দেশে কলিকাতার বাহিরে যে-যে জায়গায় গিয়াছি, তথাকার লোকেরা আমার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহাদের ধারণা তদনুযায়ী হইলেও আমার নিকট তাহা খুব বেশীরকম অতিশয়োক্তি মনে হইয়াছে। বাঁকুড়ায় অভয়-আশ্রম লাইব্রেরীতেও এইরূপ নানা কথা আমার সম্বন্ধে উক্ত হওয়ায় আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য নীচে লিখিত হইতেছে। অন্য দুটি প্রতিষ্ঠানেও ঐরূপ কথা বলা হইয়াছিল; তাহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা লিখিবার প্রয়োজন হইবে না।

"পরিবারে যে-সব শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহারা রূপবান, গুণবান না হইলেও স্নেহের পাত্র হইয়া থাকে। তাহারা ঘরের ছেলে বলিয়াই ভালবাসা পাইয়া থাকে। তাহাদের ভালবাসার দাবী তাহাদের কোন-প্রকার যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। তাহারা ঘরের ছেলে বলিয়াই সকলের স্নেহের অধিকারী হয়। আমি বাঁকুড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া এখানেই লালিত পালিত হই, বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষাও এইখানেই লাভ করি। আমার জীবনের নানা মধুর-স্মৃতি এই সহরের নানা স্থানের সহিত জড়িত। আমার কোন কৃতিত্ব, কোন যোগ্যতা আছে কিনা, তাহার বিচার না করিয়াই বাঁকুড়ার সকল লোকের প্রীতির দাবী করিতে পারি। সেই প্রীতি পাইলে আনন্দিত হইব। সম্মানের দাবী আমি করিতে পারি না। আপনারা আমার যোগ্যতা ও কৃতিত্বের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি সামান্য পরিমাণে সত্য হইলেও হইতে পারে, না হইতেও পারে। তাহার বিচার না করিয়া, আমি সেই বর্ণনায় আনন্দিত হইয়াছি এই কারণে, যে, উহা হইতে ইহা বুঝা যায়, যে, আপনারা মনে করেন, অনুন্নত বাঁকুড়া জেলাতেও আপনাদের ঐরূপ প্রশংসা ও সম্মান পাইবার উপযুক্ত লোক জন্মগ্রহণ করিতে পারে। বাঁকুড়ার প্রতি এই যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, ইহা মূল্যবান। আপনাদের আদর্শ যে উচ্চ, তাহা ঐ বর্ণনা হইতে বুঝা যায়। আদর্শ যেখানে রহিয়াছে, সেখানে তাহার সহিত একাগ্র চেষ্টার যোগ হইলেই, আমরা বৃদ্ধেরা যাহা করিতে পারি নাই, বাঁকুড়ার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বালক ও যুবকগণ তাহা করিতে সমর্থ হইবেন।"

অভয়-আশ্রম মেথর-পাড়ায় কতকগুলি ছেলেকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেখানে আমি গিয়াছিলাম। "বাংলার মাটী বাংলার জল পুণ্য হউক" এই মর্ম্মের রবীন্দ্রনাথের যে গান আছে, মেথর ছাত্রেরা সেই গান করিল। তাহাদের পিতামাতা ও অন্য গুরুজন উপস্থিত

ছিলেন। আমি বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া খুব সোজা চলিত কথায় অল্প কিছু বলিয়াছিলাম। তাহার প্রধান কথা এই :— "আমাদের সকলেরই শৈশবে আমাদের মা ও অন্য পূজনীয়া মহিলারা আমাদিগকে এবং ঘরবাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য যাহা করেন, মেথরেরা সমগ্র সমাজের জন্য তাহাই করেন। আমাদের মা ভগিনীরা কেহ ঘৃণিত, অনাচরণীয় বা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হন না; কিন্তু মেথরদিগকে তাহাই মনে করা হয়। ইহা সামাজিক ব্যবস্থার দোষ। আমরা যখন জাহাজে চড়িয়া বিদেশে যাই, ইউরোপের হোটেলে থাকি, তখন দেখি অনেক জাহাজে এবং সব হোটেলে ইংরেজ-দের মত সাহেব মেম আমাদের ও অন্য সকলের মেথরের কাজ করেন। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহারা নিজের নিজের জাতির ও দেশের মধ্যে ঘৃণিত একটা শ্রেণী হইয়া থাকেন না। তাঁহারা ও তাঁহাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া অন্য দশজনের ন্যায় ভদ্রলোকের মত থাকেন। আমাদের দেশেরও ব্যবস্থার ও অবস্থার পরিবর্তন হইবে। তোমরাও লেখাপড়া শিখিয়া সচ্চরিত্র ও সদাচারশীল হইয়া অন্য সকলের সমান হইতে পারিবে। বাংলার মাটী, বাংলার জল এবং বাংলার বায়ুকে পুণ্য করিবার ভার তোমাদের উপর। ইহা খুব উচ্চ কাজ। এরূপ পবিত্র কাজকে ঘৃণিত মনে করিয়া তোমাদিগকে পায়ে ঠেলিয়া রাখা আমাদের দেশের ও সমাজের দুর্দশার একটি কারণ।"

অন্য বক্তৃতাগুলির তাৎপর্য্য নূতন করিয়া লিখিয়া দিবার অবসর হইবে না। এইজন্য শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ যে-যে অংশ সংলগ্ন ভাবে লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাহা প্রায় তাঁহারই অনুলিখন অনুসারে দিতেছি। আমি কি বলিয়াছিলাম, সমস্ত ঠিক মনে নাই। সেইজন্য অনুলিখনের সমুদয় অংশগুলিকে পরস্পরের সহিত সুসংলগ্ন এক-একটি প্রবন্ধের আকার দিতে পারিলাম না।

অভয় আশ্রম লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত বক্তৃতা

অভয়-আশ্রম যে যে কাজে হাত দিয়েছেন সেগুলি খুবই বড় এবং খুবই দরকারী। একটা জাতিকে বেঁচে থাকতে হ'লে এইসব কাজই করতে হবে। একাজ একটি সমিতি, একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা হ'তে পারে না; দেশে এরূপ বহু প্রতিষ্ঠান ও সমিতির প্রয়োজন। অভয়-আশ্রম জাতি-গঠনের অনেক কাজে হাত দিয়েছেন।

অভয়-আশ্রম যে কাজে হাত দিয়েছেন, সে হ'চ্ছে বেঁচে থাকার কাজ। কি করলে নিজে বাঁচা যায়, একটা জাতিকে বাঁচান যায়, কেঁচোর মতন নয় ঠিক ঠিক মানুষের মত বাঁচা যায়, সেটা দেখাতে অভয়-আশ্রম অনেক কিছু ক'রেছেন ও করছেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" শরীর হ'চ্ছে ধর্ম্মসাধনের গোড়া। প্রাচীন রোমক জাতির মধ্যেও একটি প্রবাদ-বাক্য চলিত ছিল, "Mens sana in corpore sano", "সুস্থ শরীরে সুস্থ মন"। মানুষের আদর্শ সুস্থ মন ও সুস্থ শরীর। সুস্থ মন ও শরীর ব্যতীত জগতে কোন বড় কাজই করা যায় না। চিররুগ্ন দু একজন অনেক কাজ করতে পেরেছে বটে; কিন্তু একটা রুগ্ন জাত কোন বড় কাজ ক'রেছে, তা দেখা যায় না। বড় জাত হ'য়ে বেঁচে থাকতে হ'লে প্রত্যেককে মানুষ হ'তে হবে, আর মানুষ হ'তে হ'লে শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

অভয়-আশ্রম লাঠি-খেলা প্রভৃতির বন্দোবস্ত ক'রেছেন স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্যে; বিদ্যালয় লাইব্রেরী ক'রেছেন শিক্ষার জন্যে, জ্ঞানের জন্যে,—নিম্ন শ্রেণীর মেথর বাউরী ইত্যাদির পানদোষ নিবারণের চেষ্টা, শিক্ষাদান ইত্যাদি আরও নানা কাজে হাত দিয়েছেন। ঠিকই ক'রেছেন। কারণ, সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ।

আমাদের দেশে বেশী লোক রুগ্ন পীড়িত হয়, তার একটা কারণ আমাদের দারিদ্র্য। অল্পস্বল্প জমী নিয়েই অধিকাংশ লোক তার উপরই নির্ভর ক'রে থাকে—কেবল তাতে বিশেষ কিছু হয় না। বিদেশী প্রতিযোগিতা ও রাজনৈতিক কারণে দেশীয় অনেক শিল্প নষ্ট হওয়ায় অনেকে আবার ভূমিশূন্য মজুর হ'য়ে কোন প্রকারে কিছু কাল বেঁচে থাকে। চাষীবাসী দিনমজুরদের দু পয়সা রোজগার চরকায় সুতা কেটে, হাতে তাঁত বুনে হ'তে পারে। সুতা কেটে কম রোজগার হয় বটে। কিন্তু চুপ্ চাপ্ ব'সে থাকার চেয়ে সামান্য রোজগারও ভাল। অন্য কাজের দ্বারা বেশী লাভ হয়, কেউ যদি দেখাতে পারেন, সে ত আরও ভাল। তবে, ঘরে ব'সে কম মূলধনে কাজ চরকায় বেশ হয়। সেইরকম অন্য কাজ চাই, যা চাষবাসের সঙ্গে কম মূলধনে গ্রামে থেকেই চলতে পারে।

জগতে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় যদি যৌবন থাকে। এমন অনেক মানুষ আছে যারা চিরযৌবনশালী, আবার এমনও আছে যারা ১৮।২০ বছর বয়স হ'লেই বিজ্ঞ প্রবীণ প্রাচীন হ'য়ে ওঠে। তারা সৌভাগ্যশালী যাদের বয়সও কাঁচা, মনও তাজা, যারা পৃথিবীতে সব কঠিন কাজই করতে প্রস্তুত। বাংলার এই ছোট জেলা বাঁকুড়ার যৌবনের যা শক্তি, ভাল কাজ করবার যা শক্তি, তা জাগাতে হবে, অসাধ্য সাধন করতে হবে।

হাত পা না থাকলেও কত কাজ করতে পারা যায়, তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। চেকোশ্লোভাকিয়া আগে অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল। তার রাজধানী প্রাগের একটি স্কুলে গেলাম। সেটি হ'চ্ছে বিকলাঙ্গ বা অঙ্গহীন বালকবালিকাদের স্কুল। কারও একটা হাত নাই, কারও বা দুটো হাতই নাই, কারও পা নাই—এমনি সব ছেলে মেয়েদের নিয়ে সে স্কুল চলে। অধ্যাপক বাকুলে একজন মহৎ ব্যক্তি। তিনি তাঁর ছেলেদের কাজ দেখাবার জন্যে আমাদের নিয়ে গেলেন। দেখলাম একটি ছেলের দুটি হাতই নাই। ছেলেটি তক্তাপোষের উপর ব'সে পায়ের আঙুলের দ্বারা সব কাজই করে। একটা কাঠের আসবাব সুন্দর কুঁদে বিদ্যুতের তার পায়ে ধ'রে তা' দিয়ে তার উপর ছবি আঁকছে। আমাদের দেখাবার জন্যে ছেলেটি দেশলাইয়ের একটি বাক্স নিয়ে এক পায়ে ধ'রে অন্য পায়ে একটি কাঠি জ্বেলে একটি চুরুট ধরালে, পরে ফেলে দিলে। সে যে-সব জিনিষ তৈয়ারী করে, তা অতি সুন্দর। তারা ভিখারী নয়, তারা পরপ্রত্যাশী নয় ও নীচ নয়। তারাও দশ জনের মত আত্মসম্মানসম্পন্ন কর্ম্মী। আমাদের দেশ হ'লে যারা ভিখারীর ব্যবসা করে তারা তাদের কেরোসিনের বাক্সে চাপিয়ে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়াত, আর ভিক্ষালব্ধ অর্থের অতি সামান্যই এদের জন্যে ব্যয়িত হ'ত। ঐ স্কুলের ডিরেক্টর মিঃ বাকুলে পূর্ব্বে চাকরী করতেন সরকারী এমনি একটি স্কুলে। তাঁর নিজের শিক্ষার এক নূতন প্রণালী ছিল।

সরকার ব'ললেন—তোমার প্রণালী চলবে না, আমাদের প্রণালীতে পড়াতে হবে। কাজেই তিনি ইস্তফা দিলেন। যাবার সময় তাঁর প্রিয় বিকলাঙ্গ অঙ্গহীন ছাত্রছাত্রীরা—যারা তাঁকে ভালবাসত, তারাও সঙ্গে চ'ল্ল। তাঁর শিক্ষার গুণে তারা নানাকাজে নিজেদিকে উপযুক্ত ক'রে—চমৎকার গান শিখে—নিজেদের খরচ নিজেরা চালাতে এবং তাঁর বিদ্যালয়ের খরচও চালাতে লাগল। প্রমাণ হ'ল, হাত পা বা অন্য কোন অঙ্গ না থাকলেও মানুষ নিজের ভরণ-পোষণ চালাতে পারে। তখন তাঁরা সাহায্য নিতে রাজী হ'লেন।

এইরূপ ছেলেমেয়েদের দ্বারা যদি অতি কঠিন কাজ অসম্ভব না হয়,

তবে ভগবানের কৃপায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আমরা চেষ্টা করলে কি খুব কঠিন কাজও করতে পারি না ?

আজ মেথর-পাড়া গিয়েছিলাম। মেথর ছেলেরা দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রের রাখী-উৎসবের সেই পরিচিত—বাঙলার মাটী ইত্যাদি, গানটী গাইলে। শুনে মনে হ'ল—সত্যি মাটী যাদের দ্বারা পূণ্য হ'তে পারে তাদের আমরা দূরে রেখেছি। যখন ছোট ছিলাম, মা, দিদি, দিদিমা এঁরা সব ক'রেছেন যা মেথররা করে, কিন্তু তাঁরা ছোট হননি। বিদেশীরা আমাদের নোংরা ব'লে খোঁটা দেয়, আমরা রাগ করি। কিন্তু বস্তুতঃ ভ্রমণ করতে করতে দুর্গন্ধ পেলেই আমরা বুঝতে পারি কোন গ্রামের নিকটে এসেছি। বাংলার মাটী বাংলার জল পবিত্র রাখ্‌বার দিকে আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি নাই।

অনেক আগে থাক্‌তেই জান্‌তাম, বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। শুনেছি, সেন্সাস রিপোর্টে যা লেখা আছে তার চেয়ে ৪।৫ গুণ বেশী। কি ক'র্‌লে আর না বাড়ে তার চেষ্টা করা উচিত।

সমস্ত চেষ্টা গ্রামের লোকদের নিজেদের করা উচিত। যাদের কুষ্ঠ হ'য়েছে তাদের সমস্ত আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত। তাদের ব্যবহৃত গেলাস, খাবার পাত্র, কাপড়-চোপড় অন্যকে ব্যবহার করতে দিতে নাই—এবিষয়ে হিন্দু আচার ভাল ছিল; তা আজকাল আমরা মানি না। এঁটো পাত্রে জল ইত্যাদি খাওয়া, ছোট ছেলেদের মুখে মুখের পান দেওয়া, এসব অনেকেই করে—কে ব'ল্‌তে পারে কার শরীরে কি রোগ আছে ? কুষ্ঠ সম্বন্ধে খুবই সাবধান হওয়া উচিত।

ঘরকন্নার অনেক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের পাশ্চাত্য লোকদের কাছে শিখ্‌বার আছে। পাশ্চাত্য দেশে দেখেছি—পরিষ্কার তক্‌তকে রান্নাঘর, আমাদের দেশে এঁদো ভিজে রান্নাঘর—এবিষয়ে তারা শ্রেষ্ঠ। তাদের পায়খানা—স্নানের ঘর—সবই পরিষ্কার। আমাদের দেশের যারা বড় লোক, তাদের অনেকের এবিষয়ে দৃষ্টি কম। আর অনেক ক্ষেত্রে তা অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস থেকেই হ'য়েছে। একটি বাড়ীর কথা বলি, সেখানে পূর্ব্বে মধ্যভারতের এক রাজা ছিলেন। স্নানের ঘর, শৌচাগার কী বিশ্রী অপরিষ্কার ক'রে রেখে গিয়েছিলেন! তা রাজা হ'লে কী হয়। মেথর গেলে অপবিত্র হবে! অনেক দিন মেথর লাগিয়ে তবে তাকে ব্যবহার্য্য করতে হ'য়েছে।

আমি জেনীভায় যখন ছিলাম, তখন সেখানে স্নানের খরচ রোজ হ'ত পাঁচসিকা, একটাকা দু আনা। আমি বাঙালী, কাজেই দণ্ডটা আমার রোজই দিতে হ'ত। পরিষ্কার খট্‌খটে ঘর। টব প্রভৃতি অতি পরিষ্কার। নিত্য নূতন ধোওয়া তোয়ালে। একদিন দেখি, স্নানের ঘরে খট্টায় খুব ভাল বিছানা পাতা রয়েছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম, পূর্ব্ব রাত্রে খুব লোক বেশী হওয়ায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় ঐ ঘরেও জায়গা দিতে হয়েছে—তা ব'লে ঘরটি মোটেই শোবার অনুপযুক্ত নয়। এসব দিকে দৃষ্টি রাখা খুবই দরকার। একবার জনৈক বিখ্যাত ডাক্তার ব'লেছিলেন, "সভ্যতার একটি মাপকাঠী পায়খানা কোন্ দেশে কী রকম।"

ইউরোপের সর্ব্বত্র পাকপ্রণালী ও খাইবার সময় যতটা এক, আমাদের দেশের একটা জেলা, সহর, গ্রামেও কখন কখন ততটা এক নয়। যে যে কারণে ইউরোপে কাজের সুবিধা হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এই দুটি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে পাকপ্রণালীর এত প্রভেদ আছে, যে, ঝাল খাইতে অনভ্যস্ত লোকেদের কোন কোন প্রদেশে ও জেলায় যাওয়াই কঠিন হয়। খাইবার সময়ের পার্থক্যও খুব বেশী। অনেক বাড়ীতে এক-একজন এক-একসময়ে খান। ইহাতে কাজের অসুবিধা হয়, এবং খাওয়াইবার ভার যাহাদের উপর, তাহাদেরও অসুবিধা হয়।

বাঁকুড়া কলেজ হষ্টেল ছাত্রসম্মিলনী কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর

অতীতের গৌরবকে ভিত্তি ক'রে কেবল তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক্‌তে চেষ্টা করা হিতকর নয়। অতীত-গৌরব-স্মৃতির একমাত্র সদ্ব্যবহার এই, যে, উহা আমাদের এই বিশ্বাস জন্মায়, যে, আমাদের দেশের এই মাটী, জল, বাতাস, আকাশেই, যাঁদের রক্ত আমাদের শিরায় প্রবাহিত, তাঁদেরই দ্বারা মহৎ কাজ হয়েছিল; সুতরাং আমাদের দ্বারাও হ'তে পারে। পূর্ব্বাপেক্ষা বড় উন্নত মহৎ অবস্থাতেও পৌঁছতে পারা যায়। সংস্কৃত শ্লোকে আছে—'মানুষ সর্ব্বত্র জয়ের ইচ্ছা করে; কেবল দুটি জায়গা ছাড়া—শিষ্য ও পুত্রের নিকট ছাড়া। মানুষ চায়, সে যা কিছু বড় জিনিষ ক'র্‌বে, তার থেকে বড় কাজ ক'র্‌বে তার শিষ্য, তার পুত্র। তারা তাকে পরাস্ত ক'র্‌বে, বেশী জ্ঞান কীর্ত্তিলাভ ক'র্‌বে, মহৎ হবে, এ আশা মানুষ করে। আমাদেরও পূর্ব্বপুরুষদের মুখ উজ্জ্বল গৌরবময় ক'র্‌তে হবে। অবনত মূর্খ ছেলে হ'য়ে থাক্‌লে কি তা পারা যায়? যায় না। আমরা তাঁদের থেকেও বড় কীর্ত্তি স্থাপন ক'র্‌ব। তাঁদের উপদেশ পালন ক'রে আরও বড় কাজ ক'রে যাব—জগৎ জান্‌তে পার্‌বে—এঁরা তাঁদেরই সন্তান যাঁরা বড় কবি হ'য়েছিলেন, বড় দার্শনিক হ'য়েছিলেন, যাঁরা ঋষিত্বে পৌঁছেছিলেন। কেবল পূর্ব্ব-গৌরব স্মরণ ক'রে চুপ ক'রে থাক্‌লে বা তা নিয়ে অহঙ্কার ক'র্‌লে বড় হওয়া যায় না। খুব বড় জমিদারের ছেলে সব হারিয়ে কুঁড়ে-ঘরে বাস করার সময় যদি পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবমাত্র সার ক'রে দম্ভ ক'রে বেড়ায়, তাতে কি কেউ মনে করে যে সে পূর্ব্ব-পুরুষদের গৌরব ঠিক রাখ্‌তে পেরেছে? স্মৃতি রক্ষা করতে হবে, তাকে উজ্জ্বল করতে হবে। উপায় জ্ঞান, কর্ম্মপ্রেরণা, সাধনা। জ্ঞান যে জিনিষ, প্রেরণা যে জিনিষ, সেটা ভগবানের প্রদত্ত আলো-বাতাসের মত—তাকে ভাগ করার যো নাই। এটা জাপানের আলো কি জার্ম্মানীর আলো সে বিচারের উপায় নাই—সব জায়গার জ্ঞানই নিতে হবে। শুধু গ্রহণে অপমান আছে, দানও করতে হবে। যে জ্ঞান পাশ্চাত্য থেকে পাব, সেটা উপায় স্বরূপ ক'রে তাকে আরও বেশী পুষ্ট ক'র্‌ব। তার উপায়ও চেষ্টা করতে হবে। একটা চরিত্রগত গুণ চাই—যাতে জ্ঞানলাভ হয়; তার জন্যে শ্রদ্ধাবান্ হ'তে হবে। শ্রদ্ধাবানেরাই জ্ঞানলাভ করতে পারে। অন্য দিকে অন্ধবিশ্বাস ও অনুকরণ ত্যাগ করতে হবে, প্রয়োজন হ'লে পুরাতনের মায়া ত্যাগ করতে হবে। যুবকদের সাম্‌নে দীর্ঘ জীবনপথ প'ড়ে রয়েছে। মহতী চেষ্টা তাঁরা করুন; তাঁদের সিদ্ধিলাভ হবে ও দেশ ধন্য হবে। বিধাতা তাঁর পতাকা যাদের হাতে দেন, পতাকা-বহনের শক্তিও তাঁদের দেন।

বাংলার অন্য অনেক স্থান অপেক্ষা বাঁকুড়ার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল, তা যুবকদের চেহারা দেখ্‌লেই বুঝা যায়। পূর্ব্বে বাঁকুড়া আরও স্বাস্থ্যকর ছিল। তখন এখানে কলেজ ছিল না। কাজেই আমাকে ক'লকাতা গিয়ে প'ড়্‌তে হ'ল আর সাথী পেলাম ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। এখানে ক'লকাতার ছেলেদের থেকে ভাল স্বাস্থ্য ও তাজা ভাব দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই যে সুযোগ, এটা একটা ঋণ। এ সুযোগ আমরা ছেলেবেলা পাই নাই। যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা যেন শিক্ষা সাঙ্গ হ'বার পর তা শুধ্‌বার চেষ্টা করেন। এক-একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যত খরচ হয়, তা কেবল ছাত্রদের বেতন থেকে কুলায় না। কাজেই কিছু টাকা ঐ গরীব রুগ্ন নিরক্ষর প্রজাদের নিকট প্রাপ্ত টেক্স থেকে দেওয়া হয়। কতক এদেশের ও বিদেশের অন্য লোকেরা দেন।

শিক্ষা পেয়ে সকলেরই ঋণ শোধ করতে হবে। অনেক সময় আমরা ২।১টা ছেলেকে ক খ শিখিয়ে একটু সেবা ক'রে ভাবি বড় কাজ করলাম, বড় অনুগ্রহ ক'রলাম। সত্যিই কি আর এ বেশী কিছু করা ?

বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুলের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর

এ জেলায় শিক্ষার যে অভাব আছে তা আমি জানি এবং কাল কিছু কিছু ব'লেওছি। এমন স্বাধীন দেশ আছে, যেখানে লোক-সংখ্যা খুবই অল্প, অথচ সেখানে ২।৩টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, বহু স্কুল কলেজ আছে, বাণিজ্য, শিল্প, যন্ত্রবিজ্ঞান, চিকিৎসা ইত্যাদি শেখাবার জন্যেও অনেক কিছুই আছে। আমাদের অপেক্ষা অনেক অল্পসংখ্যক লোকের দেশে যদি তা সম্ভব হ'য়ে থাকে, তবে আমাদের সকলের কোন-না-কোন রকম শিক্ষা পাবার আশা করা আর বেশী কি ?

কোন প্রতিষ্ঠান কেবল ছাত্র-বেতনে চলে না, অনেক স্থানে অন্য সাহায্যও পাওয়া যায়। পাওয়া না গেলে নিরুপায় হ'য়ে বেতন অনেক স্থানে বেশী করতে হয়। উপায় কি ? বাঁকুড়া মেডিক্যাল ইস্কুলের অনেক টাকার দরকার। কিন্তু টাকা পাওয়া বড় কঠিন। কেননা, টাকা নিতে ভাল লাগে, দিতে ভাল লাগে না ! আপনারা যে-শিক্ষা লাভ ক'রছেন, এতে জগতের বহু কল্যাণ সাধন হ'তে পারবে। মানুষ নিজের রোগে, আত্মীয়স্বজনের রোগে যখন সাহায্য পায়, তা কোন দিনই ভুলতে পারে না।

বাঁকুড়ায় কুষ্ঠ-রোগ ভারতবর্ষের সকল স্থান অপেক্ষা বেশী। এখানে যাঁরা শিক্ষা পাচ্ছেন তাঁরা কেউ কেউ অন্যত্র এবিষয়ে আরো শিক্ষা লাভ ক'রে এবিষয়ে বাঁকুড়ার উন্নতি সাধন করুন। গঙ্গাজলঘাটীতে শুনলাম, এই স্কুলের একটি ছাত্র সেই চেষ্টায় আছেন। শুনে অত্যন্ত খুসী হ'লাম। দেহমনের কল্যাণে মানুষের কল্যাণ। দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর আত্মার সুস্থতা নির্ভর করে, আবার আত্মার সুস্থতার উপরও শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে। তাহ'লেও মানুষের কল্যাণকে মোটামোটি মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক স্বাস্থ্য, এই দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। তার একটা ভাগের ভার আপনাদের উপর। আমরা আশা করি, আপনারা এই ভার বহনের উপযুক্ত হবেন।

[বাঁকুড়া মেডিক্যাল ইস্কুলটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর খোলা জায়গায় অবস্থিত। হাঁসপাতালে শক্ত শক্ত রোগের অস্ত্রচিকিৎসা ও অন্য চিকিৎসা হইতেছে। বিস্তর রোগীর উপকার হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের ইহার অর্থসাহায্য করা উচিত।]

অভয়-আশ্রমের প্রাঙ্গণে লাঠিখেলার পর বক্তৃতা

অনেকে মনে করিতে পারেন, যুদ্ধে যা কাজে লাগে না, এমন যে লাঠিখেলা, তার কি প্রয়োজন আছে ? কিন্তু এটা ভুল। লাঠিখেলায় শরীর সুস্থ ও দৃঢ় হয়, সঙ্গে সঙ্গে মানসিক জড়তা দূরীকরণে সাহায্য হয়, দুর্বৃত্ত লোকদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও দুর্ব্বলের রক্ষার ক্ষমতা জন্মে। এরূপ ক্ষমতা জন্মিলে সাহসও বাড়ে। কোন সভ্য দেশেই আজকাল তীরধনু লইয়া যুদ্ধ হয় না। কিন্তু এখনও জাপানে ইহা শিক্ষা হিসাবে যোদ্ধাদের শিক্ষার প্রথম ধাপ বলিয়া কার্য্যতঃ স্বীকৃত হয়। ইংলণ্ডে অনেক তীরধনুর ক্লাব আছে; মেয়েরাও সেখানে তীর ছুঁড়িতে শিখে। আমেরিকাতেও তাই। শারীরিক ও মানসিক উপকার হয় বলিয়াই জাপানে ও পাশ্চাত্য নানা দেশে তীর-ধনুর আদর রহিয়াছে, যদিও যুদ্ধে ইহার প্রচলন আর নাই। তেম্নি লাঠিখেলাও, যুদ্ধে প্রচলিত না থাকিলেও, অন্য নানাপ্রকারে হিতকর।

[ইহার পর যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা অন্যত্র প্রকাশিত ময়মনসিংহের বক্তৃতার যুবকদের জন্য অভিপ্রেত শেষ অংশের মত।]

গঙ্গাজলঘাটী অমরকানন আশ্রম

গঙ্গাজলঘাটী গ্রাম বাঁকুড়া ও রাণীগঞ্জের মধ্যপথে অবস্থিত। এই গ্রামের নিকটে "অমর-কানন আশ্রম" নামক একটি জাতীয় বিদ্যালয় আছে। তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। স্থানটি রম্য। কোন গ্রামের খুব নিকটে বা দূরে বা মধ্যে নহে। নিকটে হরীতকী, মহুয়া প্রভৃতির স্বাভাবিক উদ্যান আছে। আশ্রমের নিজের ধানের ও আকের জমী ও চাষ আছে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া সূতা কাটা ও হাতের তাঁতে কাপড় বোনা শিখান হয়। গোশালাও আছে। বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের গৃহ, লাইব্রেরী ও ঔষধবিতরণ গৃহ ছাড়া স্বতন্ত্র একটি উপাসনার গৃহ আছে। অল্প দূরে একটি পাহাড়ের উপর হুগলী জেলার এক ভদ্রলোক একটি পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কখন কখন বাস করেন। তদ্ভিন্ন ঐ পাহাড়ের উপর একজন বাঙালী ব্রহ্মচারী থাকেন। স্বাস্থ্যকর-প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থানে অবস্থিত এই জাতীয় বিদ্যালয়টির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রার্থনীয়।

আলোচনা

"কলিকাতার ভাইস্-চ্যান্সেলারের উপর আক্রমণ"

এই শীর্ষক টিপ্পনীটি সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। টিপ্পনীটিতে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি উপস্থিত করা হইয়াছে :—

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল "চাঁই" আছেন। তাঁহারা শ্রীযুক্ত যদুবাবুর বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা রটাইতেছেন। অভিযোগটি অনির্দ্দিষ্ট ও গুরুতর নয় কি ? কিন্তু ইহার প্রমাণ কোথায় ? প্রথমতঃ কি কি মিথ্যা প্রচারিত হইয়াছে, এবং সেগুলি যে মিথ্যা তাহার প্রমাণ কি ? কেহ সেগুলি মিথ্যা এই কথা বলিলেই কি সেগুলি মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে ?

(২) "আগেবার কর্ত্তার আমলে পরীক্ষায় খুব বেশী পাশ তাঁহার আদেশে হইত"। এই আগেকার কর্ত্তাটি কে ? তাঁহার আদেশে যে বেশী পাশ হইত তাহার প্রমাণ ? ভূতপূর্ব্ব কর্ত্তার

আদেশে যদি বেশী পাশ সম্ভব হইত, তাহা হইলে নব কর্ত্তার আমলের অন্যরূপ অবস্থা যে তাঁহার আদেশের ফল নহে, তাহার প্রমাণ কোথায়? যদুবাবুর পক্ষ হইতে অন্য কাহারো ওকালতীই কি যদুবাবুর পক্ষের যথেষ্ট প্রমাণ?

(৩) যদুবাবুর বিরুদ্ধ পক্ষীয় একদল "চাঁই" আছেন; যাঁহাদের আশ্রিতদের "উপরি পাওনা" ছিল, এখন গিয়াছে। অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতর। ইহার প্রমাণ কি? অথবা বিপক্ষে "চাঁইগিরি" করাই দোষের, অন্য প্রকারের "চাঁইগিরি"তে বোধ হয়, দোষ হয় না?

(৪) "মোটের উপর ফেলও বেশী হয় নাই"। কিন্তু বাস্তবিক ইহা কি সত্য? এক ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার ফলাফলের নিম্নলিখিত তালিকটিই সত্য নির্দ্ধারণে সাহায্য করিবে :—

সন	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাশের গড়
১৯২৩	×	৭৪ ০৮
১৯২৪	×	৭৭'৫
১৯২৫	১৯,০৮২	৭৩ ৮
১৯২৬	১৬,৪০৬	৫৭'২
১৯২৭	১৫,৬৬৭	৫৩ ৯

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও গড় পাশের সংখ্যায় হ্রাস হয় নাই কি? এবং এই হ্রাসের কারণ কি? যাঁহারা শ্রীযুক্ত যদুবাবুর "চাঁই", তাঁহাদের উত্তর দেওয়া উচিত।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়

সম্পাদকের মন্তব্য

কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রধানতঃ মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীকেই করিতে হইত। তখন প্রত্যেক ব্যাপারের বিস্তৃত বৃত্তান্ত ও প্রমাণাদি আমরাই দিতাম। এখন অনেক বাংলা ও দৈনিক কাগজ এই কাজ করিতেছেন। সুতরাং বিস্তৃতভাবে প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করা আমরা আর আবশ্যক মনে করি না।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধে কি কি মিথ্যা কথা প্রচারিত হইতেছে, এবং সেগুলি যে মিথ্যা, তাহার প্রমাণ আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুমতী, বেঙ্গলী প্রভৃতিতে বহুবার বিস্তৃত ভাবে লেখা হইয়াছে। তৎসমুদয়ের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

"আগেকার কর্ত্তা" পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ইহা বহুজনবিদিত কথা এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তখন লিখিয়াছিলেন, যে, আশুবাবু নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সীণ্ডিকেট আদিতে এমন লোক ঢুকাইয়াছেন যাঁহারা তাঁহার মুঠার ভিতর। এইজন্য তাঁহার জীবিত-কালে তাঁহার আদেশে কাজ হইত এবং হইতে পারিত। এবিষয়ে তাঁহার কোন লিখিত বা মুদ্রিত আদেশ নাই, থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেক প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ইহা অবগত আছেন। পরীক্ষায় বেশী ছাত্র যে কৃত্রিম কারণে পাস্ হইত, তাহার একটা ভাল প্রমাণ এই, যে, আশুবাবুর মৃত্যুর পর হইতে পাস্ কম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা প্রতিবাদকারীর তালিকাতেই দেখা যাইতেছে। ১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৫ সালে যথাক্রমে শতকরা ৭৪'০৮, ৭৭'৫ এবং ৭৩'৮ জন পাস্ হইয়াছিল। তাহার পর কমিয়া ১৯২৬ সালে একেবারে শতকরা ৫৭'২ জন পাস্ হইল। হঠাৎ স্কুলগুলির শিক্ষার এত অবনতি কিংবা হঠাৎ স্কুলগুলিতে অল্পবুদ্ধি বিস্মৃতিপরায়ণ ছাত্রবৃন্দের আবির্ভাব হইতে পারে না। প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষকদের মধ্যেও বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই। কম পাস্ হইবার কারণ এই, যে, যাঁহার প্রভাবে বেশী পাস্ হইত, তাঁহার অবর্ত্তমানে ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির অনুযায়ী স্বাভাবিক ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ১৯২৭ সালেও সেইরূপ ফল হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব কর্ত্তার আদেশে বেশী পাস সম্ভব হইত এই কারণে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল এবং প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক-আদির নিয়োগ তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে হইত। ১৯২৭ সালের পরীক্ষাগুলির প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক নিয়োগ যদুবাবুর আমলে হয় নাই। নিজের ব্যক্তিগত হুকুমে বেশী বা কম পাস করাইবার মত প্রবৃত্তি যদুবাবুর আছে কি না তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু তাঁহার সেরূপ প্রবৃত্তি যদি থাকিত, তাহা হইলেও কাজ তদনুসারে হইত না; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুবাবুর মত তাঁহার প্রভাব নাই, হুকুমও খাটে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য যে বেশ চলে, তাহার একটা মাত্র প্রমাণ দিলেই হইবে। অন্য বোর্ডের কথা দূরে থাক্, ইতিহাসের বোর্ড অব্ হাইয়ার ষ্টাডিজে পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্বাচিত হন নাই। তিনি যে পরীক্ষায় কম বা বেশী পাস্ করা সম্বন্ধে পরীক্ষকদিগকে মৌখিক বা লিখিত চাঁইদের আশ্রিত লোকদের উপরি পাওনা কোন আদেশ দেন নাই, তাহা কোন কোন পরীক্ষক খবরের কাগজে লিখিয়াছেন। চাঁইদের আশ্রিত লোকদের উপরি পাওনা ছিল, ইহা গুরুতর অভিযোগ বটে,; কিন্তু সত্য। কোন কোন চাঁইয়ের বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অভিযোগ যাহা আছে, তাহা আমরা লিখি নাই। খুব বেশী উপরি পাওনা যাহার ছিল, তাহার রোজগারের পথ, অন্ততঃ কতকটা, বন্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য কমিটি বসিলে প্রমাণ উপস্থিত করিবার চেষ্টা হইবে। প্রতিবাদকারীর প্রশ্নের উত্তরে প্রমাণের সন্ধান দিলে অসৎলোককে প্রমাণ নষ্ট করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। আমাদের সন্দেহ হয়, ইতিমধ্যেই কিছু কিছু প্রমাণ নষ্ট হইয়াছে।

"মোটের উপর ফেলও বেশী হয় নাই", এই কথা যখন আমরা লিখিয়াছিলাম, তখন ম্যাট্রিকুলেশ্যন, আই-এ ও আই-এস্-সির ফল বাহির হইয়াছিল। পরীক্ষার্থীর সংখ্যার হ্রাসের বিষয় আমরা কিছু লিখি নাই; ইহা প্রতিবাদকারী নিজে উত্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, ১৯২৫ সালের ১৯০৮২ জন হইতে কমিয়া ১৯২৬ সালে ১৬৪০৬ জন পরীক্ষার্থী কেন হইয়াছিল। তখন যদুবাবু ভাইস্-চ্যান্সেলার হন নাই। প্রতিবাদকারী নিজে নিজেকে ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে, ১৯০৮২ ও ১৬৪০৬ এ যত প্রভেদ তাহা যদি যদুবাবুর প্রভাব ব্যতিরেকে কোন স্বাভাবিক কারণে ঘটিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে ১৬৪০৬ ও ১৫৬৬৭ এর মধ্যে তদপেক্ষা কম প্রভেদ যদুবাবুর প্রভাব ব্যতিরেকে পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক কারণে ঘটিতে পারে কি না।

ফেল একটুও অধিক হয় নাই, এরূপ কথা আমরা লিখি নাই; মোটের উপর বেশী হয় নাই, লিখিয়াছিলাম। তাহা সত্য কথা। শতকরা ৭৪, ৭৭, ও ৭৩ এর অধিক সংখ্যক পাশের পরেই শতকরা ৫৭ পাস্ হওয়াতেও প্রতিবাদকারী বা চাঁইদের দলের অন্য কোন লোক তাহাকে "বেশী ফেল" মনে করিয়া চীৎকার জুড়িয়া দেন নাই; কেননা, তখন ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন জজ গ্রীভ্‌স্, যদুবাবু নয়।

কিন্তু এখন ৫৭·২ এর পর ৫৩,৯কেও বড় বেশী ফেল বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করা হইতেছে ; যেহেতু এখন ভাইস্‌-চ্যান্সেলার যদুবাবু !

—

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে ধনীদের কর্ত্তব্য

আষাঢ়ের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "অন্য অনেক লোকে যেরূপ আয় ও আরামের জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, জমিদারেরা বিনাপরিশ্রমে সেইরূপ আয় ও আরাম পান। ইহার জন্য তাঁহারা কৃষক ও শ্রমিকদের নিকট ঋণী অতএব জমিদারীর প্রত্যেক গ্রামে পাঠশালা চালান প্রত্যেক জমিদারের কর্ত্তব্য।" এসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে ; তাহা নিম্নে লিখিতেছি। প্রথমতঃ, বাংলা দেশের প্রত্যেক জমিদারই যে (প্রায় নহে, সম্পূর্ণ) বিনা পরিশ্রমে আয় ও আরাম ভোগ করিতেছেন একথা সত্য নহে। প্রজাদের নিকট হক পাওনা আদায়ের জন্যও অনেক জমিদারকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতে হয়। যাঁহারা সেই পরিশ্রমের ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করেন, তাঁহাদিগকে বহুদিন আয় ও আরাম ভোগ করিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, পৈত্রিক জমিদারীর মালিক পুরাতন জমিদার সম্বন্ধে কোন কোনও ক্ষেত্রে পরিশ্রমের অভাবের দোষ বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহারা নিজে জমিদারী উপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐ দোষ আরোপিত হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, জমিদার ব্যতীত বাংলা দেশে অন্য শ্রেণীর লোকও আছেন যাঁহারা আয় ও আরামের জন্য, প্রত্যক্ষে নাই হউক পরোক্ষে, কৃষক ও শ্রমিকদের নিকট ঋণী, কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া যাঁহারা পায়ের উপর পা তুলিয়া আরামে দিন কাটাইতেছেন, তাঁহাদের আয় অংশতঃ হইলেও কৃষক ও শ্রমিকগণের কষ্টার্জ্জিত অর্থ হইতে আসিতেছে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। চতুর্থতঃ, কায়িক পরিশ্রমের অভাব লক্ষ্য করিয়া যদি সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য লেখা হইয়া থাকে, তবে কায়িক পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ, অথচ আয় ও আরাম ভোগকারী ব্যারিষ্টার, উকীল, মোক্তার ও সম্পাদকগণ গ্রামে গ্রামে না হউক, অন্ততঃ নিজ নিজ গ্রামেও ত পাঠশালা স্থাপন করিতে পারেন। আয় ও আরামের জন্য কায়িক পরিশ্রম করা একান্তই কর্ত্তব্য, আশা করি, সম্পাদক মহাশয় সেরূপ মনে করেন না। পঞ্চমতঃ, কঠোর চেষ্টা সত্ত্বেও মহালের বাকী বকেয়ার অনাদায়ে যে-সমস্ত জমিদারকে ঋণ করিয়া লাট রক্ষা করিতে হইতেছে, সেইসমস্ত জমিদারগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় কি একই উপদেশ দিবেন ? এসম্বন্ধে বক্তব্য বহু আছে। সব জমিদারই কিছু পরিশ্রমে কাতর নহেন। অনেক জমিদারেরই প্রজাদের প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সব দিক বিবেচনা না করিয়াই সম্পাদক মহাশয় জমিদার শ্রেণীর উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকের মন্তব্য

শিক্ষা-বিস্তারে জমীদারদের খুব সুযোগ আছে। এইজন্য সে-বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কি কি উপায়ে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকের দ্বারা হইতে পারে, সে-বিষয়ে আমরা যদি একখানা বহি কিংবা অন্ততঃ একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতাম, তাহা হইলে তাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের উল্লেখ না থাকিলে তাহা বিশেষ ত্রুটি মনে করা যাইতে পারিত। কিন্তু "বিবিধ প্রসঙ্গে" কোন বিষয়েরই আলোচনা নিঃশেষে করা যায় না। সুতরাং যদি শিক্ষা-বিস্তারে জমীদার ছাড়া অন্য কোন কোন শ্রেণীর লোকের কর্ত্তব্যের উল্লেখ না করিয়া থাকি, তাহা গুরুতর অপরাধ নহে।

জমীদারদের মধ্যে পরিশ্রমী, শিক্ষা-বিস্তারে উদ্যোগী লোক আছেন, জানি। আমরা কথাটা শ্রেণীগত ভাবে বলিয়াছি; তাঁহাদের মধ্যে কেহই পরিশ্রমী নহেন বা শিক্ষা-বিস্তারে মনোযোগী নহেন, এরূপ অপ্রকৃত কথা বলি নাই। অধিকাংশ জমীদার শিক্ষা-বিস্তারে মনোযোগী, ইহা কেহ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলে কৃতজ্ঞ-চিত্তে আহ্লাদের সহিত আমাদের মন্তব্য প্রত্যাহার করিব।

খাজানা আদায়ের জন্য জমীদারদের বা তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের পরিশ্রম, সমান পরিমাণ টাকা রোজগারের জন্য অন্য অনেক শ্রেণীর লোকদের দৈহিক-মানসিক শ্রমের সমতুল্য নহে।

যাঁহারা ঋণ করিয়া লাট রক্ষা করেন, জমীদারী মোটের উপর লাভজনক না হইলে তাঁহারা তাহা করিতেন না,—করিতে পারিতেনও না। কারণ, যাহা লাভজনক নহে, তাহা বন্ধক রাখিয়া মহাজন ঋণ দেয় না।

যাঁহারা নিজে জমীদারী উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা ওকালতী ব্যারিষ্টারী প্রভৃতি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া করেন। ওকালতী প্রভৃতি কাজ শিক্ষা সাপেক্ষ। শিক্ষিত লোকেরা সবাই গরীব শ্রমজীবী প্রভৃতির নিকট শিক্ষার জন্য অংশতঃ ঋণী। শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা এই ঋণ শোধ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এইরূপ কথা আষাঢ়ের "বিবিধ প্রসঙ্গে" আমরা লিখিয়াছি। সুতরাং নিজে জমীদারী-উপার্জ্জক, বা উকীল, বা ব্যারিষ্টার, বা মোক্তার প্রভৃতি শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের কর্ত্তব্য ঐরূপ কথা দ্বারাই উল্লিখিত হইয়াছে ; প্রত্যেক শ্রেণীর পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ না করায় কোন দোষ হয় নাই। যাঁহারা কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া তাহার সুদ হইতে আরামে কালক্ষেপ করেন, তাঁহারা শিক্ষিত লোক হইলে, তাঁহাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে ধরিতে হইবে। যদি তাঁহারা অশিক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের উল্লিখিত কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন বটে। ইহা দেখাইয়া দেওয়ায় আমরা প্রতিবাদকারীর নিকট কৃতজ্ঞ।

জমীদারদের মধ্যে সকলেই শিক্ষিত কি না জানি না, অনেকে শিক্ষিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের দায়িত্ব বেশী—শিক্ষিত বলিয়া দায়িত্ব, জমীদার বলিয়া দায়িত্ব।

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে, জমীদারদের যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা বলিয়াছি তাহা বাস্তবিক তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিনা, তাহাই আসল প্রশ্ন। যে কারণে, আমরা তাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়াছি, সে কারণটা যদি ঠিক্ না হয়, তাহা হইলেও কর্ত্তব্যটি অকর্ত্তব্য হইয়া যাইবে না। অন্য কাহারও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ আমরা যদি না করিয়া থাকি, কেবল মাত্র সেই কারণেও জমীদারদের কর্ত্তব্যটি অকর্ত্তব্য হইবে না। অতএব শিক্ষা-বিস্তার তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি না, তাহা তাঁহারা, তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা ও তাঁহাদের পক্ষ-সমর্থকেরা বিবেচনা করিলে ভাল হয়।



গৌরীশঙ্কর অভিযান—

ক্ষুদ্রদেহ মানব বিপুল প্রতিভা ও অমিততেজবলে জ্ঞানবিজ্ঞানের সহায়তায় জীবজগৎ ও জড়জগৎকে করায়ত্ত করিয়া কি অসাধ্য সাধন করিতেছে ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু তাহাদের তুহিন-শীতলতা লইয়া তাহার আক্রমণ রোধ



গৌরীশঙ্করের পথে

করিতে পারিল না; উত্তাল তরঙ্গ ও বিশালকায় সামুদ্রিক জন্তু-সঙ্কুল বারিধি এখন স্থলপথ অপেক্ষা কম নিরাপদ্ নহে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং মধ্য আফ্রিকার গহনতম অরণ্যও মানবের পদচিহ্ন বক্ষে ধরিতেছে। সুদূর আকাশলোকে এখন সে নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করে। সমুদ্রের অতল গহন হইতে সে মুক্তা সংগ্রহ করিতেছে,

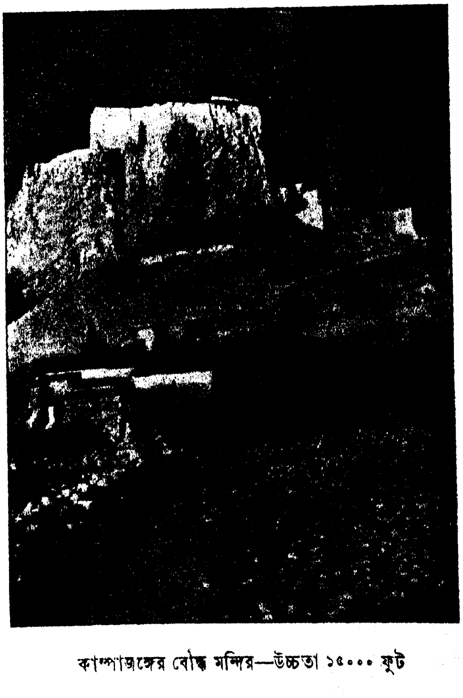


দুর্গম পথে যাত্রীদিগের সহযাত্রী—ইয়াক

ধরণীর বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া খনিজ দ্রব্য আহরণ করিতেছে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম, সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ যে তুষারাবৃত হিমালয় মানুষ তাহাকেও রেহাই দিল না। হিমালয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক শিখরে সে বাসভূমি নির্ম্মাণ করিয়া নির্ভয়ে বাস করিতেছে। অভ্রংলিহ



গৌরীশঙ্করে সন্ধ্যা



কাম্পাজঙ্গের বৌদ্ধ মন্দির—উচ্চতা ১৫০০০ ফুট

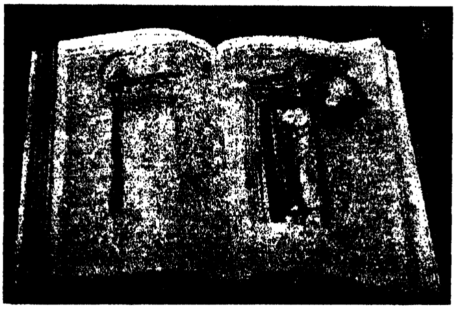
গৌরীশঙ্কর বা এভারেষ্ট্ এতকাল মনুষ্য-পদচিহ্নে কলঙ্কিত হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশের কয়েকটি মানবদেহধারীর হাতে তাহার মাহাত্ম্যও নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু হিমালয়ও প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই। যাহারা তাহার সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছিল তাহারা জয়ী হইয়াও জীবন লইয়া ফিরিতে পারে নাই। তাহাদের সহযাত্রী ক্যাপ্টেন জে, বি, এল, নোয়েল তাহাদের সেই বিজয়-অভিযান ও গৌরবময় মৃত্যুর ইতিহাস চলচ্চিত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রদর্শন করিয়া ফিরিতেছেন।

তৃতীয় এভারেষ্ট্ অভিযানে ম্যালোরী, আর্ভিন, নর্টন, ক্রুস, সোমারভেল্, প্রভৃতি বীরগণ কিভাবে জীবন বিপন্ন করিয়া দুর্গম তুষার-সমাচ্ছন্ন গিরিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ম্যালোরী ও আর্ভিন কিভাবে এভারেষ্টের অভ্রংলিহ শিখরে আরোহণ করিবার পর চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যান, এইসকল বিবরণ 'এভারেষ্টের মহাকাব্য' নামক পুস্তিকায় বাহির হইয়াছে। আমরা আগামী সংখ্যায় এই অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ দিব, এখন কেবল মাত্র চারিটি চিত্র দিতেছি।

—

মাদক দ্রব্যের আমদানি—

আইন-সঙ্গত উপায়েই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ মাদক দ্রব্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছে; ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক কোন-না-কোন বড় মাদক দ্রব্যের দাস। আইন-সঙ্গত সরকারানুমোদিত উপায় ছাড়াও আরো কত ভাবে যে মাদক দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী



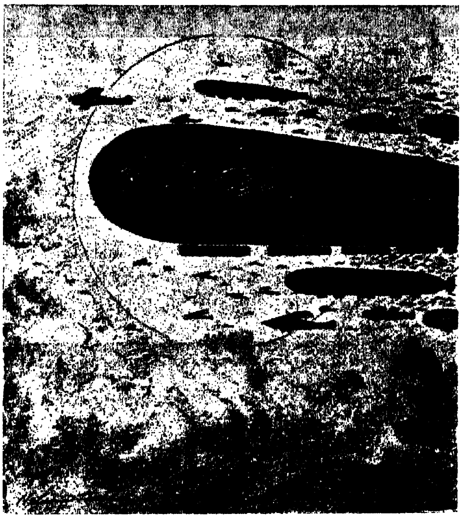
মাদক দ্রব্য প্রচারে ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যবহার

হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইসকল লোকের বুদ্ধি দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এই বুদ্ধি সৎকার্য্যে নিয়োজিত হইলে দেশের অনেক উন্নতি হইত। বিদেশ হইতে ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যে কেমন করিয়া মাদক দ্রব্যের চালান আসিতেছে এখানে তাহার একটি নমুনা দেখান হইল।

—

ব্যোমযান-ভীতি—

এরোপ্লেন, জেপেলিন ইত্যাদির সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইয়া আকাশপথ রোধ করিতেছে ইহা দেখিয়া একজন ব্যঙ্গ-চিত্রকর ইংলন্ড পত্রিকায় এই ব্যঙ্গ-চিত্রটি প্রকাশ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে গ্রহ উপ-



ভবিষ্যতের সূর্য্যগ্রহণ—কোন সালে ; ১৯— ?

গ্রহের ছায়া-আলোক-পাতে আর গ্রহণ হইবে না। পৃথিবীর এই সুবৃহৎ যন্ত্রগুলিই সূর্য্যকে অন্তরাল করিবে, চিত্রকর ইহারই আভাস দিতেছেন।

—

বৃহত্তম সুড়ঙ্গ—

পূর্ব্বে মার্শেঈ বন্দর হইতে বেরে নগরে জলপথে যাইবার উপায় ছিল না। এই ১৫ মাইল পথের মধ্যে প্রায় পাঁচ মাইলব্যাপী একটি খাড়া পাহাড় বর্ত্তমান ছিল। প্রায় ১৫ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ফরাসী



পাঁচ মাইলব্যাপী 'সুড়ঙ্গ'

ইঞ্জিনিয়ারগণ এই পর্ব্বত ভেদ করিয়া একটি সুড়ঙ্গ জলপথ (টানেল) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই সুড়ঙ্গ ৭২ ফুট চওড়া। ইহা প্রস্তুত করিতে প্রায় ২৫ কোটী টাকা খরচ পড়িয়াছে। এই সুড়ঙ্গ-পথে যে-নৌকাটি প্রথম প্রবিষ্ট হয় ইহা তাহারই ফোটো।

—

গন্ধবহ প্রজাপতি—

প্রজাপতিরা যে শুধু ফুলে ফুলে মধু পান করিয়াই ফেরে তাহা নহে, গন্ধ সংগ্রহ করিবার ও বিতরণ করিবার ক্ষমতা এক শ্রেণীর প্রজাপতির আছে। ইহারা দেখিতেই শুধু ফুলের মত সুন্দর হয় না, ফুলের মত সুগন্ধও ছড়াইয়া থাকে। মার্জ্জোরী ম্যাকডিল প্রজাপতি



গন্ধবহ প্রজাপতি

সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেন, এই গন্ধবহ প্রজাপতি সকলগুলিই জাতিতে পুরুষ। বস্তুতঃ, পক্ষী-জগতে দেখা যায় পুংজাতিই মহিলাদের অপেক্ষা বেশভূষায় অধিকতর জাঁকজমকশালী হইয়া থাকে। গন্ধ বিতরণের কাজও এই পুরুষ প্রজাপতিদের। সাধারণতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা, জ্যামাইকা, সিংহল ও আসামে এই শ্রেণীর প্রজাপতি দৃষ্ট হয়। জ্যামাইকার প্রজাপতি সিরিঙ্গাফুলের গন্ধ এত অধিক পরিমাণ সংগ্রহ করে যে,ইহারা যে-স্থানে উড়িয়া বেড়ায় সেইস্থান অপূর্ব্ব



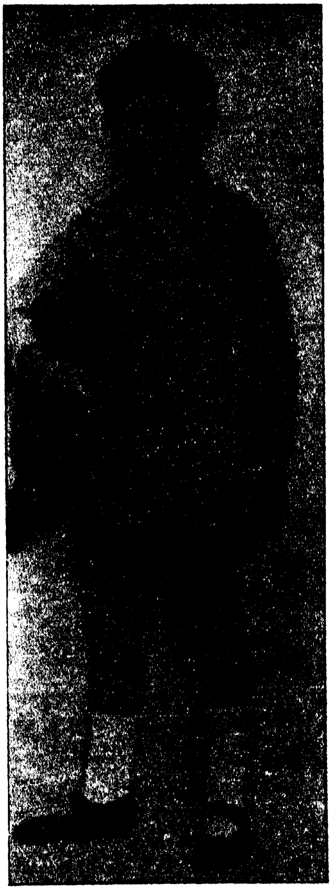
গন্ধবহ 'রাত্র'-প্রজাপতি

সৌরভে আমোদিত থাকে। আমরা এখানে গন্ধবহ প্রজাপতির দুইটি চিত্র দিলাম।

—

পৃথিবীর কনিষ্ঠতম সম্রাট—

রুমানিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট প্রথম মাইকেল পৃথিবীর কনিষ্ঠতম রাজা। ইঁহার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। ইনি ইংরেজী, ফরাসী ও



রুমানিয়ার সম্রাট্ প্রথম মাইকেল

রুমানিয়ান এই তিন ভাষায় কথা বলিতে পারেন। রাজ্যাভিষেকের সময় ইনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মাকে বলিয়াছিলেন, "মা, আমার ক্ষিধে পেয়েছে, বাড়ী চ'ল না।"

—

চীনে ভারতীয় সৈন্য—

চীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইংরেজ-প্রসাদিত ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধ করা উচিত কি অনুচিত ইহা লইয়া কিছুকাল পূর্ব্বে



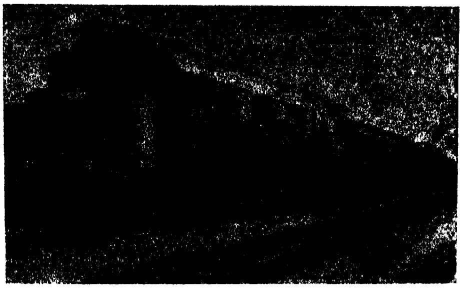
চীনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈনাদল

আমাদের দেশের সংবাদপত্রাদিতে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। ভারতের জনমত চীনের বিরুদ্ধে নহে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন। আমরা এখানে চীনে ভারতীয় সেনাদলের একটি চিত্র দিলাম। ভারতে যে বাদ-বিতণ্ডাই হউক ইহারা বেশ আনন্দেই আছে মনে হইতেছে।

—

তৈলচালিত রেলগাড়ী—

জার্ম্মানিতে সম্প্রতি একটি রেলগাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা কয়লার বদলে তৈল দ্বারা চালিত হয়। রাসিয়ান ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক লোমোনোসফ ১২০০ হর্স পাওয়ারের একটি এঞ্জিন নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ইঞ্জিনে একটি ডীজেল মোটরযুক্ত আছে—



তৈলচালিত রেলগাড়ী

এই মোটর তৈল সাহায্যে কাজ করে। অব্যবহার্য্য কয়লা হইতে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করিয়া তাহারই সাহায্যে এই এঞ্জিনের তৈল প্রস্তুত হয়। এই ফোটোটি বার্লিনের নিকটে গৃহীত হইয়াছিল। ভিতরের মোটরটি ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য বাহিরের প্রকাণ্ড রেডিয়েটরটি দ্রষ্টব্য। গাড়ীতে ১০০০ মাইল পথের উপযুক্ত তৈল লইবার ব্যবস্থা আছে। গাড়ী চলিবার সময় ধোঁয়া উড়িয়া রেলযাত্রীদের চোখে গুঁড়া পড়িয়া কোন অসুবিধা ঘটায় না।

—

শ্রবণ-শক্তিবর্দ্ধক যন্ত্র—

বক্তৃতা-সভা, থিয়েটার ইত্যাদির পিছনের দিকে বসিয়া অনেক সময় বক্তৃতাদি শুনিতে পাওয়া যায় না। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক একটি সহজবহ অল্প

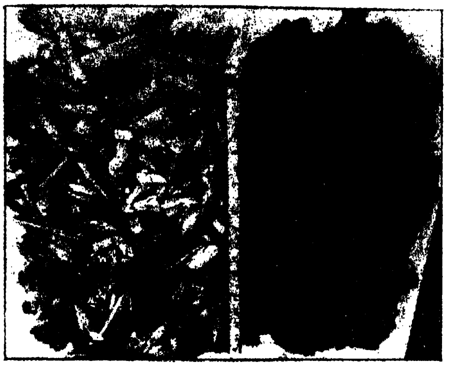


শ্রবণশক্তিবর্দ্ধক যন্ত্র

মূল্যের শ্রবণশক্তি-বর্দ্ধক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। মহিলাটি এই যন্ত্র কানে লাগাইয়া আছেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে যেমন দূরের জিনিষ স্পষ্ট দেখা যায় এই যন্ত্র-সাহায্যেও তেমনি দূরের কথা স্পষ্ট শোনা যাইবে।

পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ব্যবহার—

কাঠের কারখানায় কাঠের গুঁড়া ও টুকরা টুকরা কাঠ অনেক সময় অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। উইলিয়াম এইচ ম্যাসন এগুলিকে কাজে খাটাইবার একটি বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কাঠের টুকরা ও গুঁড়াগুলিকে একত্র করিয়া বারুদের সাহায্যে একটি চাপে পরিণত করা হয়। তখন ইহা অনেকটা পশমের



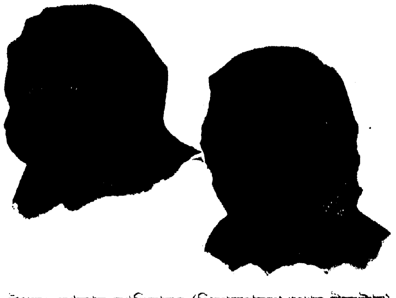
অব্যবহার্য্য কাষ্ঠখণ্ডের ব্যবহার
বামদিকে। বারুদ-সংযোগের পূর্ব্বাবস্থা
ডানদিকে। পরের অবস্থা

মত দেখিতে হয়। এই জিনিষটিকে লইয়া যথাযথ চাপ-প্রয়োগে নানা কাজে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ছবিতে বামদিকে বারুদ-সংযোগের পূর্ব্বের অবস্থা এবং ডানদিকে বারুদ-সংযোগের পরের অবস্থা দেখানো হইয়াছে।

বনমানুষ কি মানুষের পূর্ব্বপুরুষ ?

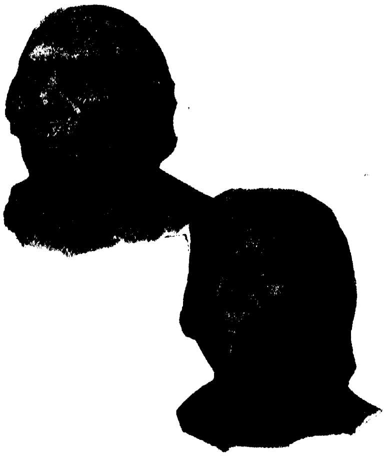
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারুইনের মতবাদ অনুসারে আমরা এতকাল জানিয়া আসিতেছিলাম যে, বনমানুষই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। পরে এই তত্ত্বই রূপান্তরিত হইয়া এইরূপ দাঁড়ায়—মানুষ ও বনমানুষ উভয়েই বনমানুষেরই মত কোনও ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

কিন্তু সম্প্রতি জীব-বিজ্ঞানে পৃথিবীর অগ্রগণ্যব্যক্তিদের অন্যতম নিউইয়র্ক সহরের যাদুঘরের অধ্যক্ষ অধ্যাপক হেনরী ফেয়ারফিল্ড ওস্বর্ণ প্রচার করিতেছেন যে, মানবের পূর্ব্বপুরুষ এই বনমানুষও নহে আবার বর্ত্তমানে মানুষ নামে খ্যাত কোন মানুষও নহে। তাঁহার মতে মানবের পূর্ব্বপুরুষ 'আদি মানব' (dawn men) বনমানুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক আজিও অনাবিষ্কৃত কোন প্রাগ্-ঐতিহাসিক জীব হইতে ক্রমবিবর্ত্তন-ধর্ম্মানুযায়ী গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই মতবাদ লইয়া তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিষ্য ডাঃ উয়িলিয়াম কে, গ্রেগরীর সহিত বিবাদ সুরু হইয়াছে। তিনি ডারুইনের পক্ষ সমর্থন করেন।



উপরে, জাভার আদিমানুষ (পিথেক্যানথ্রোপাস ইরেক্টাস)
নীচে, ইংলণ্ডের 'পিল্‌ট্ ডাউন' মানুষ

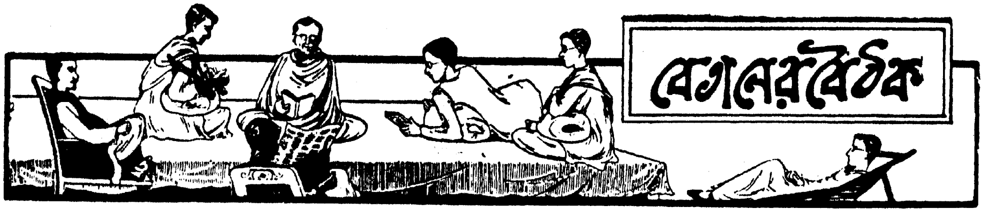
অধ্যাপক ওস্বর্ণ বলিতেছেন যে, কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবের পূর্ব্ব পুরুষ এই আদি মানবের সংখ্যা প্রায় ১ কোটী ১৬ লক্ষ ছিল। তখন এই আদি মানবও ছিল আবার বন মানুষেরও অভাব ছিল না। তিনি বলেন যে, মধ্য এশিয়ায় বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে ইহাদেরও পূর্ব্বপুরুষের সন্ধান পাওয়া যাইবে।



উপরে, ইয়োরোপের নিয়াণ্ডারথ্যাল মানুষ
(২৫০০০—৫০০০০ বৎসর পূর্ব্বে)
নীচে, ক্রোম্যাগনন মানুষ (২০০০০ বৎসর পূর্ব্বে)

তাঁহার মতে এই 'আদি মানব' মঙ্গোল, নিগ্রো ও ককেশিয়ান জাতিদের জন্মদাতা। ইহারা মাটির উপর বাস করিত, অতিশয় ধূর্ত্ত ও যন্ত্র-নির্ম্মাণে পারদর্শী ছিল। মধ্য এশিয়ার সমতল ভূমি ও অধিত্যকা ভূমি-সমূহে ইহারা দল বাঁধিয়া বাস করিত। ইয়োরোপের 'নিয়াণ্ডারথাল' মানুষ, জাভার 'পিথেক্যানথ্রোপাস ইরেক্টাস' ও ইংলণ্ডের 'পিল্ট ডাউন' মানুষ ইহাদেরই বংশধর।

অধ্যাপক ওস্বর্ণের এই মতের একটি প্রমাণ স্বরূপ তিনি নেব্রাস্কা পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রায় তিনশত রকমের প্রস্তরীভূত অস্থিযন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এইগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অন্ততঃ ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও মানুষের অস্তিত্ব ছিল।



জিজ্ঞাসা

(২৩)

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

বাঙ্গলায় + প্লাস,—মাইনাস, = ইকুয়াল টু প্রভৃতি চিহ্ন আছে। কিন্তু তাহা আমি পড়িতে জানিনা। অক্সিজেন + হাইড্রোজেন = জল। ইহা কিরূপে পড়িয়া শুনাইতে হয়? বিজ্ঞানের positive এবং negative এর বাঙ্গলা কি?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(২৪)

মহাভারতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

মহাভারতের এক স্থানে পারসীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আভাষ আছে। ইহা কোন পর্ব্বের কোন্ অধ্যায়ে আছে?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(২৫)

মূল মহাভারত

মূল মহাভারতের এমন কোন বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে Contents Index এবং প্রতি অধ্যায়ে Heading আছে?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(২৬)

পুরাণের ভৌগলিক নাম

পার্জিটর প্রণীত ইংরেজী পুস্তকে যেরূপ আছে বাঙ্গলায় সেই রূপ কোন পুস্তক আছে কি না যাহাতে পুরাণোক্ত ভৌগোলিক নামের বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত নাম পাওয়া যায়?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(২৭)

য়্যালুমিনিয়মের পাত্র

কেহ কেহ বলেন য়্যালুমিনিয়মে লেড আছে। এজন্য ইক্‌মিক কুকারের রাঁধা খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করা দূষণীয় কিনা এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল কিনা?

শ্রী অঘোরচন্দ্র তালুকদার

(২৮)

"মেয়ে" শব্দ

"মেয়ে" শব্দে সাধারণতঃ কন্যাকে বুঝায়, কিন্তু বীরভূম জেলায় কোন কোন অংশে "মেয়ে" শব্দ স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কোন্ সংস্কৃত শব্দ হইতে এই "মেয়ে" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এবং আর কোনো অঞ্চলে এই মেয়ে শব্দ স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত হয় কি না? বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যে কোথাও এই অর্থে "মেয়ে" শব্দের প্রয়োগ আছে কিনা?

শ্রী গৌরসুন্দর রায়

(২৯)

দেশ-মাতৃকার বোধ

কোন্ দেশের লোকের মনে সর্ব্বপ্রথমে দেশের প্রতি মাতৃবোধ জন্মিয়াছিল? ভারতবর্ষের কোন্ প্রাচীনতম পুস্তকে এই ভাব-সূচক রচনা দেখিতে পাওয়া যায়?

শ্রী রামনারায়ণ মজুমদার

(৩০)

ক। লেবু রাখার উপায়

কমলা লেবু বৎসরের সকল সময় পাওয়া যায় না। তাহা সর্ব্বদা রাখিবার উপায় কি? এমন কোন জিনিষ প্রয়োগ করা যায় কিনা যাহাতে লেবু সর্ব্বদা সতেজ থাকে এবং আস্বাদনের পরিবর্ত্তন না হয়।

খ। দুধ রাখার উপায়

দুধ সময় মত গরম বা জ্বাল না দিলে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কোন জিনিষ প্রয়োগ করা যায় কিনা যাহাতে দুধ নষ্ট না হয় এবং ২।১ দিন রাখা যায় এবং স্বাদেরও পরিবর্ত্তন না হয়।

শ্রীমতী ঊলাবতী সেন।

(৩১)

বিধবা-আশ্রম

ভদ্রঘরের অনাথা, অল্পবয়স্কা বিধবা মহিলা যাহাতে স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা ও শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নিষ্ঠাচার প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন করার জন্য নানা রকম শিল্পকার্য্য ও লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারেন বাংলাদেশে তজ্জন্য কোনও প্রতিষ্ঠান আছে কিনা? থাকিলে তাহার ঠিকানা কি? প্রবেশার্থীদিগকে এখানে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয় কিনা? শিক্ষালাভেচ্ছুগণ এখানে কত দিন বাস করিতে পারেন তাহার কোন নিয়ম আছে কি? শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃপক্ষ এই মহিলাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করেন কি?

শ্রী অন্নদাচরণ ভৌমিক

—

মীমাংসা

(১৫)

আলকাতরার দাগ

১। কাপড়ের যেস্থানে আলকাতরার দাগ পড়ে, সেস্থানটি কতকগুলি আমরুল শাকের পাতাদ্বারা (এই পাতার রসে 'অক্‌জালিক' নাম কএক প্রকার এসিড পাওয়া যায়। উহা কোনও দাগ

উঠাইবার এক প্রধান উপাদান) খুব জোরে জোরে ঘষিয়া দিন। তৎপর কেরোসিন বা ভাল সরিষার তৈল দ্বারা বারবার ঘষিতে থাকুন। অবশেষে সোডা ও কাপড়-কাচা সাবান দ্বারা কাচিয়া লইলে আল্‌কাতরার দাগ উঠিয়া যাইবে। পরীক্ষিত।

২। জামিরের রসের ভিতর দাগযুক্ত স্থানটি কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ভাল সাবান ও সমপরিমাণ চূণ গরমজলের সহিত মিশাইয়া লউন। এই মিশ্রিত জল দ্বারা কাপড় ধুইলে দাগের চিহ্নও থাকিবে না। পরীক্ষিত।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৭)

ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার স্কুল

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীযুত সন্তোষ নাথ শেঠ মহাশয় **Maharajah Kasimbazar's Polytechnic Institute, 1-3 Nanda Lal Bose Lane, Calcutta** তে হাতেকলমে ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা-দিবার ভার লইয়াছেন। উপরোক্ত ঠিকানায় চিঠি লিখিলে সমস্ত বিষয় জানা যায়।

শ্রীমতী বীণাপাণি দত্ত

(১৯)

শব্দের ব্যুৎপত্তি

"সাবেক" শব্দটী বিদেশীয়। আরবীয় ভাষা হইতে আসিয়াছে। "বাহার" সম্বন্ধেও ঐ কথা।

"পয়মন্ত", "টের" ও "হেঁসেল" শব্দ দেশজ বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় ও সম্বন্ধে কোন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাওয়া যায় না। চলতিতেই প্রচলিত।

"আইবুড়"—সংস্কৃতের অপভ্রংশ অব্যূঢ় হইতে আসিয়াছে। "গড়" শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিখা; ক্ষরিত অর্থেও দেখা যায়। প্রণাম অর্থ-ভাবে ব্যবহৃত হয়।

"ঘর" শব্দ সংস্কৃত গৃহ শব্দের অপভ্রংশ।

"ফলাহারের" প্রকৃতিগত অর্থ—ফলভোজন (ফল+আহার) [যদিও অধুনা ঐ অর্থে কলার অর্থাৎ দধ্যাদি সংযোগে চিপিটকাদি ভোজন বা লুচিসন্দেশ ভোজনই বুঝায়।]

"কবুল" ও আহাম্মুক" শব্দ আরবীয়। শেষোক্ত শব্দটি আহাম্মুক নহে—(যদিও আমরা ঐ শব্দের সহিত পরিচিত) 'আহ্‌মক্‌ প্রকৃতরূপ।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায়

আহাম্মুক, আহাম্মুক এই শব্দ আরবী 'আহ্‌মক্‌' শব্দজ 'আহ্‌মক্‌' শব্দের অপভ্রংশ 'আহাম্মুক'। উহার অর্থ নির্ব্বোধ অর্থাৎ বেওকুফ।

আইবুড়ো—প্রকৃতিবাদ অভিধানে ইহা আরব শব্দজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে ইহাকে সংস্কৃত অব্যূঢ়' (অর্থ অবিবাহিত) শব্দজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ সোজা কথায় বলিতে গেলে 'অব্যূঢ়' শব্দের অপভ্রংশে 'আইবুড়ো' আইবুড়ো বা 'আইবড় পদ হইয়াছে (এখানে বলিয়া রাখি যে, সংস্কৃত 'বৃদ্ধ' হইতে প্রাকৃত 'বুড্ঢ' বা 'বুড্‌ঢো এবং হিন্দী 'বুড্‌ঢা' হইতে গ্রাম্য 'বুড়া,' 'বুড়ো' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে)।

"বাহার" দেওয়া—"বাহার" শব্দটী ফারসী 'বহার' শব্দজ অর্থাৎ 'বহার' শব্দের অপভ্রংশে "বাহার"; উহার অর্থ সৌন্দর্য্য, চটক। 'বাহার দেওয়া'=যাহাতে সুন্দর দেখায়, এমন সাজ-করা।

পয়মন্ত—পয়+মন্ত। 'পয়' শব্দটী সংস্কৃত 'পদ' হইতে হিন্দী 'ও' হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় 'পয়' হইয়াছে। 'পয়' অর্থ সৌভাগ্য, সুলক্ষণ, আর 'মন্ত' যুক্ত। অতএব 'পয়মন্ত' শব্দের অর্থ ভাগ্যবান্‌, সুলক্ষণা-ক্রান্ত।

'টের' পাওয়া—সংস্কৃত 'তির্য্যক্‌' (অর্থ বক্র) শব্দের অপভ্রংশে (হিন্দী টেঢ়া শব্দজ) 'টের'। 'টের পাওয়া' অর্থ জানিতে পারা।

'গাদা' করিয়া রাখা—হিন্দী 'গাদ্‌না' হইতে উত্তম পুরুষে 'গাদি,' মধ্যম পুরুষে 'গাদ' ১ম পুরুষে 'গাদেন' এবং পরিশেষে প্রাদেশিক অসমাপিকা ক্রিয়ায় 'গাদা' করিয়া রাখা (অর্থাৎ গাদিয়া বা স্তূপাকার করিয়া ঠাসিয়া রাখা) হইয়াছে।

'গড়' হইয়া প্রণাম—সংস্কৃত 'গঠন,, হিন্দী 'গঢ়না', প্রাকৃত 'গঢ়ো' শব্দ হইতে বাঙ্গলায় 'গড়' হইয়াছে। গড় হইয়া প্রণাম করার অর্থ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা।

'কবুল' করা—'কবুল' আরবী 'কবুল' শব্দোৎপন্ন। কবুল করা অর্থ—স্বীকার পাওয়া; সম্মত হওয়া।

'সাবেক'—আরবী 'সাবিক্‌' হইতে 'সাবেক' হইয়াছে। সাবেক শব্দের অর্থ পূর্ব্বের, পুরাতন।

'হেঁসেল—হাড়িশাল' (রন্ধনস্থান, পাকশাল) হইতে 'হেঁসেল শব্দের উৎপত্তি। উহার অর্থ রন্ধনাগার।

ফলাহার—ফলের আহার হইতে (ফলাদির ভক্ষণ, অন্ন ভিন্ন অন্যান্য আহারীয় সামগ্রী ভোজন) ফলাহার এবং সংক্ষেপে 'ফলার' ('ফলার') গ্রাম্য শব্দ হইয়াছে।

N. B, বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান"এর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পয়মন্ত শব্দ 'পদমন্ত' হইতে। পদমন্ত>পঅমন্ত>পয়মন্ত।

'সাবেক' আরবী শব্দ=পূর্ব্বের।

'বাহার' ফার্সী শব্দ=বসন্ত; তারপর এখন বাংলায় সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গড়—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে দেশী শব্দ। গত>মাগধী প্রাকৃতে গট>গড় (কৃষ্ণকীর্ত্তন) কোথাও যাইবার সময় যে প্রণাম বোধ হয় পূর্ব্বে তাহাই বুঝাইত। এখন অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গাদা—সং গাধ স্তূপ>গাদ+আ>গাদা। টের—দেশী শব্দ।

আইবুড়ো—<অব্যূঢ়; অথবা সুনীতি-বাবুর মতে সংস্কৃত আয়ুর্বৃদ্ধ শব্দ হইতে।

হেঁসেলঘর<হাড়িশালা, হাণ্ডিশালা, হাড়্‌সাল>হেঁস্শেল>হেঁসেল

কবুল আরবী শব্দ=স্বীকার

আহাম্মক—আরবী আহ্‌মক্‌ শব্দ হইতে, অর্থ নির্ব্বোধ।

সুরেশচন্দ্র দাস।

(২০)

সেলাই শিক্ষা

শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সহজ সেলাই শিক্ষা" সর্ব্বপ্রকার পোষাকের ছাঁট কাট ও সেলাই শিখিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট পুস্তক। চারিখণ্ডে মূল্য মাত্র ৩৷৷৵০।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।



বিদেশ

চীনের ভবিষ্যৎ—

চীনের জাতীয়-দলের সেনাধ্যক্ষ চ্যাং কাইসেকের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হঠাৎ অবসর-গ্রহণের সংবাদে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে, ভারতবর্ষের মীরজাফরের মত নাকি চ্যাং কাইসেক অর্থের লোভে দেশ শত্রুহস্তে তুলিয়া স্বদেশে পলায়ন করিয়াছেন। যে বিজয়ী সেনাপতি যুদ্ধের পর যুদ্ধে শত্রুদলকে বিধ্বস্ত করিয়া ইয়াংসি উপত্যকায় জাতীয়-দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহার এই শোচনীয় অধঃপতনে, জাতীয়-দলের বিচক্ষণ পররাষ্ট্রসচিব ইউজেন চেনের হঠাৎ পদত্যাগে ও জাতীয়দলের রুশ বন্ধু বরোদিনের চীন পরিত্যাগে চীনের জাতীয় দল নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। ইতি-মধ্যেই নাকি তাহাদের মধ্যে গৃহ-বিবাদের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

ইংরেজও এই সুযোগে চীনের সহিত গোলযোগ বাধাইবার জন্য চেষ্টিত। সম্প্রতি একখানি ইংরেজ উড়ো-জাহাজ চীনের জমীর উপর দিয়া বে-আইনি ভাবে উড়িয়া যাইবার সময় ভাঙ্গিয়া পড়ে। চীনারা জাহাজখানি সরাইয়া লইতে আইন সম্মত ভাবে বাধা দেয়। ফলে ইংরেজ রুষ্ট হইয়া সংঘাইয়ের রেলপথ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ইংরেজের এইরূপে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করাতে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

চ্যাং কাইসেকের সন্দেহ-জনক অবসর গ্রহণের পর হইতে হ্যাংকাইয়ের জাতীয়- দলের উপর চীনের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। চীনের ভাগ্য এখন হ্যাংকো সরকারের দৃঢ়তা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও সাহসের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহাদের দেশনিষ্ঠা ও শ্রমিক শক্তির লোকবলই এই দারুণ বিপদের সময় চীনের জাতীয়-দলের সম্বল। জাতীয়দলের বর্ত্তমান নেতারা যদি সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া বিদেশী-অর্থ বশীভূত গৃহশত্রুদের দমন করিতে না পারেন ও একযোগে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে পরাঙ্মুখ হন তবে নবীন চীনের জাতীয় জাগরণ ম্লান হইবে সন্দেহ নাই।

আয়র্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় সমস্যা—

আয়র্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় সমস্যা লইয়া এক ভীষণ গোলযোগের সূচনা হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজার আনুগত্য স্বীকার করিয়া শপথ করিতে অসম্মত হইয়া ডি ভেলেরার দল(Fianna Fail Party-আয়র্ল্যাণ্ডের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক দল) এতদিন নির্ব্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও আইরিশ রাষ্ট্র-সভায় যোগদান করেন নাই। আয়র্ল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র ও বিচার সচিব কেভিন ও হিগিন্সের হত্যার পর ফ্রি ষ্টেট সরকার এইরূপ আইন প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন যে, যাঁহারা ইংলণ্ডের রাজার আনুগত্য স্বীকার করিয়া শপথ লইতে স্বীকৃত হইবে কেবলমাত্র তাহারাই রাষ্ট্রসভায় নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে পারিবেন। সরকারের নূতন চাল বুঝিতে পারিয়া ডি ভেলেরা সদলবলে আইন সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন তাঁহাদের এই শপথ আগ্রহ করিয়া গ্রহণ আন্তরিক নহে।

ডি ভেলেরার দল, জাতীয়দল ও শ্রমিকদল একযোগে আয়র্ল্যাণ্ডের বর্ত্তমান সরকার কসগ্রেভ দলের পতনের জন্য চেষ্টিত হইয়াছে। সম্প্রতি একটি ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট ও বিপক্ষদল সমান সমান ভোট পাওয়ায় সভাপতির নিষ্পত্তি ভোটে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ জয় লাভ করে। গবর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকায় কৃষকদল শ্রমিকদলের সহিত যোগ দেয় নাই।

সভাপতির নিষ্পত্তি ভোটের জোরে রাজ্য চলা অসম্ভব। তাই আয়র্ল্যাণ্ডের ভাগ্য এখন অনিশ্চিত। নূতন নির্ব্বাচনে যে-পক্ষ জয়লাভ করিবে তাহারাই রাষ্ট্র পরিচালন করিবে।

জগলুল পাশার মহাপ্রয়াণ—

সকল দেশেই জাতীয় জাগরণের সময় সেই জাতি একটি বিশিষ্ট নেতাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। সেই নেতার জীবন-কাহিনীই সেই দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস রূপে পরিগণিত হয়। সেই কারণে চীনের সুন ইয়াৎ সেন, রুষের লেনিন, তুরস্কের কামাল, ইতালীর মুসোলিনী, আয়র্ল্যাণ্ডের ডি ভেলেরা, ভারতের মহাত্মা গান্ধী দেশে দেশে পূজিত। এই সকল একনিষ্ঠ দেশসেবকদের মধ্যে যেন জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শ মূর্ত্ত হয় এবং তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ জীবন উৎসর্গ করে।

জগলুল জাতিতে কপ্ট, ধর্ম্মে খৃষ্টিয়ান এবং ব্যবসায়ে আইনজীবী ছিলেন। কিন্তু মুসলমান-প্রধান মিশরের জাতীয় দলের নেতার পদে মিশরবাসীরা খৃষ্টিয়ান জগলুলকেই বরণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে জগলুল পাশার বয়ঃক্রম ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। কৈশোরের প্রারম্ভ হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি মিশরের স্বাধীনতার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কখনও সংবাদ-পত্র-সেবী রূপে, কখনও শাসন বিভাগের কর্ম্মচারী রূপে, কখনও আইন উপদেষ্টা রূপে, কখনও শিক্ষক রূপে তিনি দেশ-সেবা করিয়া গিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরেজের দৃষ্টি মিশরের উপর পরে। ইংরেজ বুঝিল সুয়েজখাল ও কার্পাস-ক্ষেত্র-সমৃদ্ধ সুদানে একাধিপত্য বিস্তার করিতে হইলে মিশরকে করতলগত করা দরকার। তখন মিশর নামমাত্র তুর্কীর অধীন ছিল। তুরস্ককে সরাইয়া দিয়া ইংরেজ মিশরের উপর শ্বেতকায়দিগের জন্মগত অভিভাবকত্ব দাবী করিতে দেরী করিল না। কিন্তু মিশরবাসী তাহাতে স্বীকৃত হইল না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিশরীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। জগলুল পাশা সেই বিদ্রোহে মিশরবাসীদের সহিত যোগ দিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা ব্যর্থ হইল। মিশরে ইংরেজের প্রভুত্বের সূচনা হইল। ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতাকামী মিশরবাসীরা শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জগলুলের নেতৃত্বে তাহারা মিশরে ইংরেজের আধিপত্য বিস্তারের বিপক্ষতাচরণের জন্য বিদ্রোহী হইল।

এবারেও তাহারা পরাজিত হইল এবং জগলুল ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু মিশরের অশান্তি দমন হইল না। জগলুলের অবর্ত্তমানে তাঁহার সহচরগণ দেশবাসীকে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ইউরোপে মহাসমর বাধিল। যুদ্ধের অবসানে মিশর সন্ধি-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের দাবী উত্থাপন করিল, কারণ রাষ্ট্রপতি উইলসনের জাতীয় স্বরাষ্ট্রবাদের কথায় তখন পরাধীন জাতিরা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আশা যে সন্ধি-সভায় নিজেদের জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত করাইবে। কিন্তু ইংরেজ এই দাবী অগ্রাহ্য করিল। জাতীয় দলের নেতা জগলুল প্রত্যেক মিশরবাসীকে 'হয় স্বাধীনতার গৌরব-মুকুট কিম্বা স্বদেশের মুক্তি কামনায় আত্মবিসর্জ্জনের মহিমাময় মৃত্যু বরণ' করিতে আহ্বান করিলেন। জগলুলকে আবার অন্তরায়িত করা হইল। মিশরের জাগ্রত জনমত ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। জগলুলের অনুচরদলের ইঙ্গিতে মিশরের জাতীয়দল সরকারের সহিত অসহযোগ করিলেন। ফলে মিশরের অবস্থা সঙ্গীন হইল। ইংরেজ কমিশন বসাইয়া মিশরে দেশী রাজা স্বীকার করিয়া এই প্রবল আন্দোলন কিছুকালের জন্য থামাইলেন।

কিন্তু জগলুল ও তাঁহার দেশবাসী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবার জন্য ব্যগ্র। তাহারা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া আরও আন্দোলন করিতে লাগিল। নির্ব্বাচনে জগলুলের দল জয় লাভ করিয়া জগলুল প্রধান মন্ত্রী হইলেন। মন্ত্রী-সভা মিশরে ইংরেজের সামরিক কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করিবার দাবী করিলেন। এই সময় হঠাৎ সুদানের ইংরেজ শাসন-কর্ত্তা স্যার লি ষ্ট্যাক নিহত হইলেন। ইংরেজ মিশর-উপকূলে সাজোয়া জাহাজ পাঠাইয়া বিপুল ক্ষতিপূরণ ও জগলুলের পদত্যাগে দাবী করিল। জগলুল পদত্যাগ করিলেন কিন্তু পুনর্নির্ব্বাচনে আবার জয়ী হইলেন। ইংরেজ আবার নিতান্ত অসঙ্গত ভাবে দাবী করিল যে জগলুলকে মন্ত্রী গঠন করিতে দেওয়া হইবে না। বলদৃপ্ত ইংরেজের দাবীতে জগলুল ভীত হইলেন না কিন্তু দেশে অশান্তি ঘটাইতে নারাজ বলিয়া তিনি মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিলেন না—মধ্য-পন্থীরা মন্ত্রীগঠন করিল। জগলুল আইন সভায় সভাপতি হইলেন।

গার্হস্থ্য জীবনে জগলুল খুব সুখী লোক ছিলেন। তাঁহার পত্নী সদাসর্ব্বদা স্বামীর কার্য্যে সহায়তা করিতেন। জগলুল-মহিষী মিশরের নারী-জাগরণের প্রধানা নেত্রী। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানে জগলুল ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণের নির্ব্বাসনের পর এই মহিয়সী নারী দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন এই বলিয়া, "ইংরেজদিগকে অস্বীকার কর। তাহাদিগকে কোনও রকমে সাহায্য করিও না। হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, তুমি আমাদের পরম অন্তরঙ্গ নির্ব্বাসিত-দিগকে আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ কর। তাঁহারা যেন মুক্ত স্বচ্ছ উজ্জ্বল স্বাধীনতার আলোকের সঙ্গে শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।" বীর স্বামীর মহাপ্রয়াণের পর তিনি স্বামীর আরব্ধ কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন। সমগ্র মিশরবাসী জগলুল-মহিষীর সহায়তা করিবেন সন্দেহ নাই।

জগলুলের জন্য মিশরবাসীর দেশজোড়া শোকচ্ছ্বাস দেখিয়া কতকটা অনুমান করা যায় তিনি মিশরবাসীর কিরূপ প্রিয় ছিলেন। মিশরের জাতীয় জীবনের এক অতি সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্তে রাষ্ট্রবীর জগলুল পাশার পরলোক-গমন সংবাদে স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক নরনারীই মর্ম্মাহত হইবেন।

কানাডায় হীরক-জুবিলি-উৎসব—

সম্প্রতি ইংলণ্ডের যুবরাজের উপস্থিতিতে অত্যন্ত ধুমধামের সহিত কানাডায় জাতীয়তার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ষাট বৎসর হইল ঐ প্রদেশের বিভিন্ন প্রদেশগুলি এক হইয়া একটি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া এই উৎসব। ১৮৬৭ সালে ইংরেজের ইঙ্গিতে এই একত্রীকরণের সময় যদিও কোন কোন প্রদেশ যথা নোভাস্কোশিয়া, নিউব্রান্সউইক প্রভৃতি রাষ্ট্র আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। এখন যুক্তকানাডায় আর কোন অসন্তোষের বীজ নাই। কিন্তু এই ষাট বৎসরে সংযুক্ত কানাডা জাতীয় স্বাধীনতার দিক দিয়া ও দেশের ধন-সম্পদের দিক দিয়া অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখন কানাডা আর ভারতের মতন সব বিষয়ে ইংরেজদের অধীন নহে। কানাডার গভর্ণর বিলাত হইতে প্রেরিত হইলেও তিনি কানাডা রাষ্ট্র-পরিষদের অমতে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। কানাডায় মন্ত্রী-সভা বিলাতের মন্ত্রীসভার সহিত রাজকার্য্যের আদান প্রদান করে ও বিদেশে রাজদূত পাঠায়। ১৯২৬ সালের ডোমিনিয়ন কন্‌ফারেন্সের আলোচনার ফলে কানাডা, আয়ার্ল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার এইরূপ জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষ এই সভায় আহুত হইয়াছিল, কিন্তু সে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল।

প্রবাসী ভারতবাসীদের কথা—

কেনিয়া

কেনিয়া স্বায়ত্তশাসন বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে ভবিষ্যতে নাইরোবি ও মোম্বাসা মিউনিসিপ্যালিটিতে ভারতীয়গণ অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইবে। কিন্তু ঐ দুই প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয় বণিকদের জন্য প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কেনিয়ার ভারতীয় সম্প্রদায় এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে তাহা জানা যায় নাই।

নেটাল

নেটালের 'ইণ্ডিয়ান ভিয়ুস' নামক সংবাদ-পত্র লিখিতেছেন যে, তথাকার শতকরা ৭৩ জন ভারতীয় বালক-বালিকা অশিক্ষিত। উক্ত পত্র লিখিতেছেন যে ভারতবাসীরা প্রাচীনকালের গৌরবের বড়াই না করিয়া যেন ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হন। নেটালের ভারতীয় শিশুদের সুশিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি গ্রাজুয়েট পাঠাইলে ভাল হয়।

ডারবান

নাইরোবির 'ডিমোক্রাট' সংবাদপত্রে প্রকাশ যে প্রায় ৪০০ ভারতীয় শ্রমিক ডারবান হইত বসত উঠাইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে।

পূর্ব্ব-আফ্রিকা

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। সেখানকার ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বিপুল ষড়যন্ত্র হইতেছে। স্যার সিড্‌নি হেন নামক একজন পার্লামেণ্টের সদস্য সম্প্রতি লণ্ডনের একটি সভায় পূর্ব্ব-আফ্রিকার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কতকগুলি অযথা ও মিথ্যা কুৎসা আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়া-ছেন, "পূর্ব্ব আফ্রিকার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। ব্যবসা সম্পর্কে ও ব্যক্তি-গত ব্যাপারে তাহাদের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত হীন এবং তাহাদের দেখাদেখি পূর্ব্ব-আফ্রিকার অধিবাসীরাও অধঃপতনে যাইতেছে।"

এদিকে তথাকার গবর্ণর স্যার এডোয়ার্ড গ্রীগ্‌স্ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও ভারতীয়দের স্বার্থহানী ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে পূর্ব্ব-আফ্রিকার প্রদেশগুলিকে লইয়া একটি রাষ্ট্র-সমষ্টি করিতে হইবে। এই রাষ্ট্র-সমষ্টি যদি হিল্‌টন্ ইয়ং কমিটির নির্দ্দেশানুযায়ী হয় তাহা হইলে ভারতবাসীদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। মিঃ এণ্ড্রুজ ও মিঃ ওকা এজন্য ভারতের জনমত উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

ট্রান্স্‌ভাল

পণ্ডিত বেনারসী দাস চতুর্ব্বেদী 'লীডার' পত্রে ট্রান্‌স্‌ভালে ভারতীয় শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কিত একখানি চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ ১৯১৩ সাল হইতে ট্রান্‌স্‌ভালে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই বৎসর জনসন্‌বার্গে মাত্র একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, বর্ত্তমানে ঐ প্রদেশে ৬টী বিদ্যালয় আছে। কিন্তু সেখানকার জনসংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প। ট্রান্‌স্‌ভালে ৯৩৫৯ জন বালক ও ৫,০৪৬ জন বালিকা আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে মাত্র ৬০০ জন বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। ঐ অঞ্চলে একটিও বালিকা-বিদ্যালয় নাই।

অষ্ট্রেলিয়া

দেওয়ান বাহাদুর রঙ্গচারিয়ার সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সেখানে ভারতীয়দের স্বার্থসংরক্ষণার্থ একজন এজেন্ট্ প্রেরণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

স্কটলাণ্ড

এডিনবার্গের থানা ও উৎসবঘরসমূহে ভারতীয় ছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ইংলণ্ডপ্রবাসী সমস্ত এশিয়াবাসীর স্বার্থরক্ষার্থ এডিনবার্গে এশিয়াসঙ্ঘ নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ডি, এল, মমতালী সংবাদপত্রে একখানি চিঠি লিখিয়া জানাইতেছেন :—

"ভারতবর্ষ স্বাধীন নহে। পরদেশী শাসকদের নিকট আমাদিগকে অনেক অপমানেই অপমানিত হইতে হইয়াছে ; কিন্তু আজ আমরা যে দেশে বাস করিতেছি ব্রিটিশ জাতি সে দেশকে স্বাধীন বলিয়া বড়াই করে। কিন্তু এই স্বাধীন দেশেও কি আমরা স্বাধীন ? যে সমস্ত পাঠক এডিনবার্গে বর্ণবিদ্বেষের কথা অবগত আছেন আমি তাঁহাদিগকেই ইহা বিচার করিয়া দেখিতে বলিতেছি। এই বিদ্বেষ এখন বিদ্যমান।

"এই বিরূপ মনোভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমরা এশিয়া-সঙ্ঘ নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। পাঠক ও অনুগ্রাহকবর্গ হইতে আমরা অর্থ সাহায্য চাহিতেছি। আমাদের সঙ্ঘ এই বর্ণবিদ্বেষ দূর করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার নীতিসঙ্গত চেষ্টা করিবে। অনেক সঙ্কীর্ণমনা লোক আমাদের অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া আমাদিগকে বিদ্রূপ করিবে। কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া আমাদিগকে স্বাধীনতার চর্চ্চা করিতে হইবে।"

সম্প্রতি এডিনবরার টাউন কাউন্সিলের একটি অধিবেশনে লর্ড প্রোভষ্ট ষ্টিফেন্সন্ বলেন যে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে এডিনবরার বর্ণবিদ্বেষ আন্দোলনের বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে বর্ণবিদ্বেষ আন্দোলনকে অন্যায় বলিয়া মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে।

—

ভারতবর্ষ

সীমান্তে হিন্দু-বহিষ্কার—

পেশোয়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে—সীমান্তের আফ্রিদি মুল্লুকে ও অন্যান্য স্থান হইতে হিন্দু ও শিখ্‌গণ বিতাড়িত হইয়া দলে দলে পেশোয়ারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পাঠানদের বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। লাণ্ডিকোটালের আফ্রিদিরা হিন্দুদের নিকট লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণী—সে টাকা তাহারা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। "রঙ্গিলা রসুলের" আন্দোলনের ফলে কিছুদিন যাবৎ পঞ্জাব হইতে মোল্লা মৌলবীরা গিয়া সীমান্তের অল্পসংখ্যক হিন্দুদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য পাঠানদিগকে প্ররোচিত করিতেছিল, এতদিনে তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছে। দিল্লীতে এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করিয়া এবং গৃহহীন হিন্দুদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লালা কিন্নরীনাথের সভাপতিত্বে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

—জনশক্তি

বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত—

কানপুর মিউনিসিপালিটীতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মিউনিসিপালিটী-পরিচালিত বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবে। বালকগণের কোমল হৃদয়ে দেশপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার এই চেষ্টা অতি প্রশংসনীয়।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

সরকারী কর্ম্মচারীর পোষাক—

সরকারী কর্ম্মচারিগণের পোষাকের জন্য দেশী কাপড় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এই মর্ম্মে বিহার আইন সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সরকার পক্ষে প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছিল যে, মিতব্যয়িতার দিক্ দিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণীয় নহে।

—পল্লীবাসী

কুলীর জীবনের মূল্য—

আসামের একটি চা-বাগানের এক মিস্ত্রীসাহেবের অনুগ্রহে, পুর্সা নামক একজন কৃষ্ণাঙ্গ কুলী ভবলীলা সম্বরণ করে। মিস্ত্রী সাহেব হেণ্ডারসন মাতাল অবস্থায় কুলীকে জলের মধ্যে ফেলিয়া দেয়, ফলে কুলীটির মৃত্যু হয়। বিচারে ডেপুটি কমিশনার বলিয়াছেন যে, যদিও গৌণভাবে হেণ্ডারসনই কুলীটির মৃত্যুর কারণ, তবুও ভাল প্রমাণের অভাবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গেল। এই মাম্‌লা উপলক্ষে সহযোগী আনন্দবাজার মন্তব্য করিতেছেন—"ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের গণ্ডী পার হইয়া মোকদ্দমা সেসনে গেলেও শ্বেতাঙ্গ জুরীদের বিচারে হেণ্ডারসন খুব সম্ভব মুক্তিলাভ করিত! অতএব আপশোষ করিবার কিছু নাই। কালা কাদমীর প্রাণের মূল্য বহুবার ঐ আসামের আদালতেই যাচাই হইয়া, ঘসা পয়সার সমান বলিয়া ঠিক হইয়াছে। গরীব কুলী পুর্সার হত্যাকাণ্ডের বিচারে নূতন কিছু হয় নাই।"

বাংলা

হুগলী ঐতিহাসিক সম্মিলন—

গত মাসে হুগলী ঐতিহাসিক সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। সভাপতি মহাশয় হুগলী জেলার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করেন। ডাক্তার কালিদাস নাগ ছায়াচিত্র সাহায্যে "বৃহত্তর ভারত" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

—আত্মশক্তি

ঐতিহাসিকের মৃত্যু—

গত মাসে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বহুকাল স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। —শক্তি

বাঁকুড়া অভয়-আশ্রম—

অভয় আশ্রম পুস্তকাগারের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত মাসে বাঁকুড়া আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শোভাযাত্রার সহিত আশ্রমে লইয়া যাওয়া হয়। কলেজ ছাত্রাবাসের এবং মেডিকেল ছাত্রাবাসের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দান করা হয়। তিনি গঙ্গাজলঘাটী অমরকানন আশ্রম পরিদর্শন করেন। —যুগদীপ

বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ—

বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এস. সি. মিত্র আমাদিগকে জানাইতেছেন :—

এই বিভাগ হইতে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক একটি হাতে চালান ধানভাঙ্গা কল প্রস্তুত হইয়াছে; ইহার কার্য্যকারিতা গ্রাম্য প্রচলিত ঢেঁকির কার্য্যের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ। এই কলে নানা-প্রকার পরীক্ষা করিয়া মোটামুটি এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে—

১। পনের মিনিটে ইহাতে প্রায় দেড় সের ধান ভাঙ্গা এবং তাহা হইতে এক সের আন্দাজ চাউল পাওয়া যায়।

২। এক পোয়া চাউল হইতে ১৩৩টি চাউল ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ৭৮টি দানার দুই মুখ মাত্র ঈষৎ ভাঙ্গা এবং বাকী ৫৫টি দানার দু আধখান হইয়া ভাঙ্গা। ইহাতে খুদের পরিমাণ নাই বলিলেই চলে। অপরতঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ৩০ সের ঢেঁকি ভাঙ্গা চাউলে এক সের হইতে তিন সের পর্য্যন্ত চাউল ভাঙ্গটা অবস্থায় পাওয়া যায়।

৩। এই কলে কেবল মাত্র একটি লোকের দ্বারা এক ঘণ্টায় ছয় সের পর্য্যন্ত চাউল পাওয়া যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের সময় ধরিলেও এই কল হইতে ঘণ্টায় গড়পড়তা চার সের হিসাবে চাউল পাওয়া যায়। কিন্তু ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গিতে হইলে অন্ততঃ তিনজন লোকের আবশ্যক এবং মাত্র ৩০ সের চাউল তাহারা চার ঘণ্টা যাবৎ একত্র পরিশ্রম করিলে প্রস্তুত করিতে পারে।

বঙ্গীয় সরকারে শিল্প-বিভাগের রসায়নবিৎ শ্রীযুক্ত ডাঃ রসিকলাল দত্তের তত্ত্বাবধানে একটি রাসায়নিক গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। দেশীয় শিল্পীরা এই বিভাগের নিকট যে কোনরূপ সাহায্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ, ৪০।১ এ, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

"ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী"—

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত, শিক্ষক, ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল, পোঃ বরাহনগর, জিঃ ২৪ পরগণা আমাদিগকে লিখিতেছেন :—

"বেঙ্গল আম্বুলেন্স কোর" "ডবল কোম্পানী", "৪৯ সংখ্যক বঙ্গবাহিনী", "ভারতরক্ষী সৈন্যদল", ইউনিভারসিটী কোর", ইত্যাদি যাবতীয় সমর-সংক্রান্ত বিভাগে যোগদানকারী বাঙ্গালীদিগের কার্য্যকারিতার যাবতীয় বিবরণ যিনি যতটুকু জানেন আমাকে লিখিয়া জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বিধবা বিবাহ—

গতমাসে কুমিল্লা-বিধবা-বিবাহ সভার উদ্যোগে ৬টি বিধবা-বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। বাংলার নানাস্থান হইতে আমরা আরও অনেকগুলি বিধবা-বিবাহের সংবাদ পাইয়াছি।

দান—

(১) ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত বুড়িচঙ্গ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে স্থানীয় তালুকদার শ্রীযুত বাবু মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় নগদ ৪০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। স্কুলটি যেরূপ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার এই আশাতীত দানে স্কুলটি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়াছে। স্কুল কমিটী কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ মণীন্দ্রবাবুর পিতার নামানুসারে বিদ্যালয়ের নাম "বুড়িচঙ্গ আনন্দ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়" রাখিতে স্থির করিয়াছেন।

(২) বাঁকুড়া জেলার অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট রামসাগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজদুর্ল্লভ হাজরা মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু মহিমানুকূল হাজরা মহাশয় রামসাগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দুই হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পল্লীবাসী দরিদ্র ছাত্রদিগের শিক্ষাবিধানোদ্দেশ্যে এই মহৎ দান।

হিন্দু রমণীর সাহস—

মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত ইসলামপুরের নিকটবর্ত্তী পড়মা গ্রামের যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি তাহার বাড়ীর সংলগ্ন বাড়ীর বাবুরাম শীলের স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই। গত ২৯শে শ্রাবণ বেলা ১০টার সময় বাবুরামের অনুপস্থিতির সুযোগে উক্ত বিশ্বাস তাহার বাড়ীতে ঢুকিয়া কাষ্ঠকর্ত্তন নিরতা উক্ত শীলের স্ত্রীকে ধরিতে যায়। স্ত্রীলোকটি সতীত্ব রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া হস্তস্থিত দা দ্বারা বিশ্বাসের গলায়, হাতে ও অন্যান্য স্থানে কোপ বসাইয়া দেয়। বিশ্বাসের তখনই মৃত্যু হইয়াছে। বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন।

—শান্তিবার্ত্তা

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার অবিনাশ তেলী নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে একদল ডাকাত হানা দেয়। ডাকাতেরা বাড়ীতে প্রবেশ করিলে অবিনাশের স্ত্রী উপায়ান্তর না দেখিয়া একখানি খড়্গ লইয়া রণরঙ্গিনী বেশে ডাকাতদের সম্মুখে দাঁড়াইলে ডাকাতেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে। —জনশক্তি

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের বার্ষিক উৎসব—

বিগত জন্মাষ্টমীর তারিখে পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বিগ্রহ-মূর্ত্তি ও বাদ্যভাণ্ডসহ জনতাপূর্ণ শোভাযাত্রা পরিচালনা এবং নিয়মিত রূপ সত্যাগ্রহীর আত্মসমর্পণ দ্বারা সত্যাগ্রহের বিশেষত্ব রক্ষা করা হইয়াছিল। পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের পরিচালকগণ সম্বৎসরকাল যেরূপ উৎসাহ, অধ্যবসায়, আত্মত্যাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সত্য রক্ষার জন্য যে কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছে, তাহার উদ্‌যাপন ও সুসমাপ্তির পক্ষে হিন্দু মাত্রেরই সাহায্য ও সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন।

পটুয়াখালিতে ও ঢাকায় জন্মাষ্টমীতে এবার কোন গোলমাল হয় নাই। কিন্তু কুমিল্লায় হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। কুমিল্লায় শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বীর যুবক উন্মত্ত মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে পরিবারস্থ মহিলাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছেন। এই দাঙ্গার ফলে কুমিল্লা অভয়-আশ্রমের অনেক কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

[পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনার সমালোচনা না ছাপাই আমাদের নিয়ম —সম্পাদক]

হালুম বুড়ো—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রবাসী-কার্য্যালয়, ৯১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা। ১৩৩৪।

সুকবি প্যারীমোহন-বাবু ইতিপূর্ব্বে "কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়" নামক পুস্তকে আফ্রিকার জঙ্গল-মরুভূমিতে জীব-জন্তুদের লড়াইয়ের কথা লিখিয়া শিশুদের আপনার জন হইয়াছিলেন। ছেলেদের উপযোগী রচনায় তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। এবারে তিনি প্রবাসী, মৌচাক, সন্দেশ প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত তাঁহার লিখিত শিশুদের উপযোগী কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার "হালুম বুড়ো" পুস্তক বাহির করিলেন। এই বহুচিত্রিত মজাদার বইএ শিবঠাকুরের বিয়ে ও তাঁর ভূতপেত্নী বরযাত্রীদের কথা, ছেলে-যাত্রার দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের হাসির কবিতা, বাঘ-ভালুকের ছেলেচুরির কাহিনী, কাঠের পুতুলের ঝগড়ার গল্প ও ঘুমপাড়ানীর গান, বর্ষার ছড়া ইত্যাদি কবিতাগুলি ছেলেমেয়েরা খুব উপভোগ করিবে ও হাসিয়া গড়াইবে। কবিতাগুলি নানা ছন্দে লেখা; সমস্ত ছন্দই ছেলেদের উপযোগী; তাহারা নাচিয়া নাচিয়া সুর করিয়া পড়িবে ও মাতিয়া যাইবে। মলাটের চিত্রটি ও ভিতরের ছবিগুলি খুব সুন্দর হইয়াছে। পূজার সময় ছেলেমেয়েরা এই মজাদার কবিতার বই পড়িয়া আনন্দ পাইবে।

ব

বীরত্বে বাঙালী ; ব্যায়ামে বাঙালী—দুইখানিরই প্রণেতা শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, এম-এ, ১৩ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রত্যেকখানির মূল্য এক টাকা।

সুপুষ্ট শরীরে সুস্থ মনের যদি অবস্থান ঘটে তাহা হইলেই মানসিক উৎকর্ষের সম্ভাবনা অত্যধিক। আমাদের বাংলা দেশে কয়েকটি মনীষী ও মহাপুরুষের জন্ম ঘটিলেও আজ অবধি বাঙালী জাতিটা সুদৃঢ় জ্ঞানে বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সম্যক্‌রূপে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার মুখ্য কারণ, বাঙালীর দেহ সুপরিপুষ্ট নয়,—দুর্ব্বল ও শিথিল। আমরা শরীরবলের যত বেশী উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিব, মানসিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা সেই পরিমাণেই উন্নতি লাভ করিতে পারিব। সেইজন্য জাতিকে শরীরগঠন-চর্চ্চার কার্য্যে যাঁহারা উৎসাহিত করিতেছেন তাঁহারা জাতির গোড়া পত্তন কায়েমি করিতেছেন। আলোচ্য পুস্তক দুইখানি হাতে পাইয়াই আমরা আনন্দিত হইয়াছি, কেননা এই বই দুইটির উদ্দেশ্য শক্তিলাভে বাঙালীকে প্রলুব্ধ করা। বই দুইটিতে পৌরাণিক যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল অবধি বাঙালীর শক্তিকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। বহু বীর ও কুস্তিগীর বাঙালীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ও কর্ম্মকথার বিবৃতি ছাড়াও বই দুইটিতে ব্যায়ামে, ক্রীড়া-কৌশলে, ধনুর্ব্বিদ্যায়, অসিখেলায় ও লাঠিখেলায় বাঙালীর পারদর্শিতা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক অনেক বীরের ছবি থাকায় বই দুইটি লোভনীয় হইয়াছে। আমরা বই দুইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

বিধবা-বিবাহ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রকাশক শ্রীরাজকুমার ভট্টাচার্য্য। প্রাপ্তিস্থান—৬২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও সমস্ত পুস্তকালয়। মূল্য পাঁচ সিকা।

পুণ্যশ্লোক মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল-বিধবার দুর্দ্দশা মোচনের জন্য যে দুঃখ ও পরিশ্রম স্বীকার করেন, তাঁহার জীবিতকালে তাহা সমাদৃত না হইলেও বর্ত্তমানে বাংলা দেশে ও সারা ভারতবর্ষে তাঁহার সে সংস্কার-চেষ্টা সাফল্য-লাভের পথে অগ্রসর। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা। যে-সমস্ত যুক্তি ও শাস্ত্রমীমাংসা প্রয়োগে তিনি বালবিধবার বিবাহ অনুমোদন করেন তাহা আবার দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন বোধ করিয়া প্রকাশক মহাশয় গ্রন্থখানির পুনঃ প্রকাশ করিয়া বাঙালী জাতিকে উপকৃত করিয়াছেন। জাতীয়বোধ-জাগ্রত বাঙালী এ পুস্তকের যথাযোগ্য সমাদর করিবে, সন্দেহ নাই।

ভিখারিণী—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত। প্রকাশক শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ি, ৩৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা। এক টাকা।

কবিতার বই। কবিতাগুলি খুব মন্দও নয়, খুব ভালোও নয়। কবিতাগুলিতে সারল্য আছে।

সমাজ—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। বর্দ্ধন্ পাব্‌লিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

ব্রহ্মবান্ধবের অপ্রকাশিত রচনাগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। প্রবর্ত্তক-কার্য্যালয় হইতে তাঁহার "আমার ভারত উদ্ধার" প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রকাশকও বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন। বইটি প্রচারিত হইয়া বাঙালীকে সুচিন্তা প্রদান করুক—ইহাই আমাদিগের কামনা।

বঙ্কিম-চিত্র—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী। প্রকাশক শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কমলালয়, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। এক টাকা।

বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় যখন "প্রাচীন চিত্র" নামক পুস্তকে সংস্কৃত কাব্যাবলীর মনোরম পরিচয় প্রদান করেন তখন আমরা তাঁহাকে তাঁহার অধিকারক্ষেত্রেই বিচরণ করিতে দেখি, এবং সেখানে তাঁহার কৃতিত্বে মুগ্ধ হই। এখন হঠাৎ তাঁহার প্রণীত "বঙ্কিম-চিত্র" হাতে পাইয়া উৎসুক হইয়া উঠিলাম তাঁহার আধুনিকত্বপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধানে। বইটি পড়িয়া দেখিলাম, তাঁহার চিত্ত একেবারে আধুনিক ভাবে প্রভাবিত। তাঁহার বেদান্তশাস্ত্রী উপাধিতে ভড়্‌কাইবার হেতু নাই, তাহা নারিকেলের ছোব্‌ড়ার মত, ভিতরে কোমল শাঁস ও স্নিগ্ধ জল বেশ আছে। শৈবলিনী, কুন্দনন্দিনী, রোহিণী, দলনী, গোবিন্দলাল প্রভৃতি কাহারও চরিত্রালোচনায় তিনি পিছ্‌পাও হন নাই। তাঁহার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও মধুর। চরিত্র-ব্যাখ্যা অতিশয় স্বাভাবিক,

চিত্তাকর্ষক, আড়ম্বরহীন ও সংক্ষিপ্ত। সাহিত্য-সম্রাটের সৃষ্ট চরিত্রের আলোচনা করিয়া তিনি নিজে ত উপকৃত হইয়াছেনই, বাংলা সাহিত্যকেও যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। শাস্ত্রী-মহাশয়ের বিরুদ্ধে একটি কথা বলিবার আছে। নায়ক-নায়িকার সহজ সম্বন্ধের আলোচনা করিতে গিয়া তিনি কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন ও সমাজশাসনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তথাপি মোটের উপর, আমরা বহুদিন এমন সুন্দর মনোজ্ঞ বঙ্কিম-পরিচয় পাঠ করি নাই। বাংলা সাহিত্যে বইটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

প্রবাদ-পদ্ম (প্রথম ও তৃতীয় ভাগ)—শ্রী চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল। ২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত। মূল্য প্রত্যেকখানি চার আনা।

বাংলা দেশের প্রবাদ অর্থাৎ নীতিকথার রত্নগুলি অপর্য্যাপ্ত। সেগুলি এক জায়গায় করিয়া সেগুলির প্রয়োগ-পরিচয় প্রদান করা দুরূহ কাজ। অথচ সে-কাজের অত্যন্ত প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার সেই অভাব বোধ করিয়া প্রমাণ অর্থাৎ গল্প প্রয়োগে অনেকগুলি প্রবাদ-বাক্য একত্র করিয়াছেন। প্রবাদ-পরিচায়ক গল্পগুলি সহজ, সুন্দর ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। আমরা গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড পাই নাই। সেইটি পাইলেও গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ মনে করিবার কারণ হইবে না। কেননা, বিষয়টি এতই ব্যাপক যে, তাহা বহু খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবার যোগ্য। আমরা এই গ্রন্থের ক্রমশঃ প্রকাশ্য খণ্ডগুলির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। পুস্তকটি প্রয়োজনীয় ও সুন্দর। তবে বইটির ছাপা ও বাঁধান আরো পরিষ্কার এবং গল্পগুলির ভাষা আরো সরল হওয়া দরকার।

ব্রতকথা—(প্রথম ভাগ) শ্রী যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক শ্রী কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ৪, গোপাল বসু লেন, ঝামাপুকুর, কলিকাতা। ছয় আনা।

পুস্তকটিতে ১৩টি ব্রতের পরিচয় ও উৎপত্তি-কথা বিবৃত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম।

গুপ্ত

আমরা কি ও কে (ছোট গল্পের বই)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৩ পৃঃ। মূল্য দুই টাকা।

ইহাতে 'আমরা কি ও কে,' 'আনন্দময়ী দর্শন,' 'দেবীমাহাত্ম্য', প্রভৃতি নয়টি কথা আছে। লেখকের পরিচয় অনাবশ্যক। কয়েক বৎসর হইল আমরা এই প্রবীণ ব্যক্তিটিকে নবীন লেখকরূপে পাইয়াছি। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল; এখন 'তরুণ' না হইলে লেখক হওয়ার গৌরব নাই। কেদারবাবু যে এতকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে আর আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই, ইহা বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। তাঁহার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে, তিনি তথা-কথিত তরুণ না হইয়াও চির তরুণ। আধুনিক সাহিত্যের রুগ্ন ও কৃত্রিম ভাববিলাস এবং বিকৃত আর্টের কুৎসিত কসরতের মধ্যে যখন কেদারবাবুর আপন-ভোলা রসিকতা ও তাহার অন্তরালে জমাট অশ্রুবাষ্পের ইন্দ্রধনু-শোভা দেখিতে পাই, তাঁর খোলা-প্রাণের উচ্চহাসি যখন ছাপার অক্ষর ছাপাইয়া উঠে, তখন সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়। গল্পগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম আর্টের নিদর্শন হয় ত নাই, মনস্তত্ত্ব ও মৌলিক চরিত্র-চিত্রণ অথবা নির্লিপ্ত-হৃদয় শিল্পীর বাস্তব রসসৃষ্টির নিখুঁত নমুনাও হয় ত' নাই—কিন্তু এমন একটা কিছু আছে, যাহা পাঠকের মর্ম্মস্পর্শ করে, এবং পাতার পর পাতা উল্টাইয়া শেষ ছত্রে পৌঁছিলে একজন আত্মীয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপের পর হঠাৎ বিচ্ছেদের মত দুঃখ বোধ হয়। তাঁহার বলিবার ভঙ্গিটি নিজস্ব। ভাষার এমন একটি সহজ সজীব গতি আছে তাহা এমন বিশুদ্ধ ও অনাড়ম্বর, যে, তাহাতেই তাঁহার ভাবাবেগ সংক্রামক হইয়া পাঠকের হৃদয় জয় করে। বইখানির নামকরণ সার্থক হইয়াছে। যে সমাজ-জীবন ও ভাবধারা হইতে আমরা কৃত্রিম উপায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, পিতৃপিতামহদের রক্তধারায় যে প্রবৃত্তি ও সংস্কার মগ্ন হইলেও লুপ্ত হইতে পারে না, যে ভাব-সাধনা ও স্বপ্নবিলাস উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দুর্ব্বলতা বাঙ্গালী প্রকৃতির মজ্জাগত, তাহারই ইঙ্গিত লেখকের উচ্ছ্বাসময়ী কল্পনার হাস্য-পরিহাসের আবরণে সব গল্পগুলিতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয় ইংরাজীশিক্ষার ভরা-জোয়ার একটি অতিশয় স্বজাতি-প্রেমিক বাস্তুপ্রিয় বাঙ্গালীকে ভয়ানক নাড়া দিয়াছিল—সমাজ, সাহিত্য ও প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় এই নব ভাবের বন্যায় তিনিও ভাসিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার হৃদয়-ধর্ম্ম তাঁহাকে কোথাও বাধা পাইতে দেয় নাই; কিন্তু এই বিপরীত ভাব-সংঘর্ষের মধ্যেও তিনি নিজের সমাজ ও বাস্তুর মায়া এক মুহূর্ত্তের জন্য কাটাইতে পারেন নাই। আজ জীবন-সন্ধ্যায় সেই বন্যার উপকূলে দাঁড়াইয়া, যাহা ছিল ও রূপান্তরিত হইয়াছে, যাহাকে তিনি অতিদূরে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন---তাহারই স্মৃতির আবেগে তাঁহার হৃদয় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। তাই 'আনন্দময়ী দর্শন', 'পুর-সুন্দরী' ও 'থাকো' লিখিয়া তিনি নিজের পিপাসাও হৃদয়ের তর্পণ করিয়াছেন। এই তিনটি গল্পে তাঁহার ভাবদৃষ্টি ও ইষ্টকল্পনার পরিচয় আছে। আমাদের মতে 'পুরসুন্দরী' গল্পটিই এই সংগ্রহের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা।

ম

কীর্ত্তিলতা—মহাকবি বিদ্যাপতি বিরচিত, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌-এ, সি-আই-ই সম্পাদিত। হৃষীকেশ সিরিজ, নং—৯। ১৫৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনচন্দ্র পাল, বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥০।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা হিসাবে বিদ্যাপতির নাম বাঙলায় সুপরিচিত হইলেও তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ বাঙলায় এতাবৎকাল দেখা যায় নাই। মহামান্য সার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন্ সাহেব বিদ্যাপতি রচিত 'কীর্ত্তিলতা' ও 'কীর্ত্তিপতাকা' নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থের নাম শুনিয়াছিলেন কিন্তু পুস্তকগুলি এতদিন পর্য্যন্ত ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাই নাই। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া অনেক পণ্ডিতের সহায়তায় প্রাপ্ত পুঁথির পাঠ উদ্ধার করিয়া এই কীর্ত্তিলতা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য তিনি সমগ্র ভারতের সাহিত্যসেবী-মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

প্রথমে তিনি ১৮৯৮ সালে নেপাল রাজদরবারে উপরোক্ত কাব্য দুইখানিই দেখিয়াছিলেন ও তাহার নকল লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু নকল ঠিকমত হয় নাই মনে করিয়া পুনরায় ১৯২২ সালে মহারাজা সার চন্দ্র সমশের জঙ্গ মহাশয়ের অনুগ্রহে পুঁথি পাইয়া কীর্ত্তিলতা প্রকাশ করিয়াছেন। অসম্পূর্ণ কীর্ত্তিপতাকার পাঠোদ্ধার করিতে না পারায় তাহা প্রকাশ করেন নাই।

কীর্ত্তিলতা একখানি বহুমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে ভৃঙ্গ-ভৃঙ্গীর গল্পচ্ছলে তদানীন্তন ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। অনেকটা বাঙলা উপকথার

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পের মত। রায় গএনেশের পুত্র কীর্ত্তিসিংহ ভূপালের ইতিহাস কাব্যের বিষয়। ইহাতে তখনকার দিনের দরবারের কথা, লৌকিক আচার আচরণ, হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ, তুরস্কদের কথা ইত্যাদির চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। পুঁথির সকল স্থানের যথাযথ পাঠ উদ্ধার হয় নাই বলিয়া অর্থ সর্ব্বত্র স্পষ্ট না হইলেও শাস্ত্রী মহাশয় বহু পরিশ্রমে বাঙলায় কীর্ত্তিলতা পুস্তকের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙালী পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়ে কীর্ত্তিলতা পুস্তকের চুম্বক বাঙলায় দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। ইহাতে তাঁহার জীবনী কবিত্বশক্তি ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ ও প্রামাণিক আলোচনা আছে। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ উপাদেয় প্রবন্ধ আমরা পাঠ করি নাই।

তারপর বিদ্যাপতির আমলে প্রচলিত মৈথিল ভাষায় কীর্ত্তিলতা গ্রন্থ। বাঙলা অক্ষরে ছাপা হওয়াতে ইহা পড়িতেও আমাদের কষ্ট হয় না। অবশ্য স্থানে স্থানে অর্থ করা অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় যথাসাধ্য টীকা করিয়া দিয়াছেন।

এই পুস্তকখানি প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। এমন সুসম্পাদিত গ্রন্থ আমরা এদেশে কম দেখিয়া থাকি। আমরা প্রকাশক ও সম্পাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানাইয়া পারিতেছি না। ছাপাই সুন্দর।

শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণদাস বিরচিত। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী সং ৭৩। মূল্য সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণপক্ষে ১॥০।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া অনেক কাব্য প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধি-লাভও করিয়াছে। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, মালাধর বসু ও মাধব আচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গল ; কাশীরামদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণবিলাস প্রভৃতি সুপরিচিত গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থটি খুব সুপ্রচারিত না হইলেও কৃষ্ণের জীবনী সম্বন্ধে ইহা একটি উপাদেয় চমৎকার কাব্য। এই বহুমূল্য গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মাধব আচার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত সুকবি কৃষ্ণদাস বিরচিত। এই কাব্যগ্রন্থে বহু স্থলে অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন এই কাব্যটি তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য। বইখানির সম্পাদনকার্য্যও সুন্দর হইয়াছে। টীকার সাহায্যে পড়িতে কষ্ট হইবে না। ছাপাও সুন্দর হইয়াছে।

চৈতন্য-পরবর্ত্তী সহজিয়া তত্ত্বানুশীলনের প্রবেশিকা (An Introduction to the Study of the Post Caitanya Sahajiya Cult)—শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ প্রণীত, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্তব্য।

বহিখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইলেও বাঙ্গলা সাহিত্য-সেবীর পক্ষে এখানি বাদ দিয়া চলিবার উপায় নাই। বাঙলার সহজিয়া-বাদ সম্বন্ধে আমরা সত্যমিথ্যা অনেক কথাই শুনিয়া থাকি। সহজিয়া তত্ত্ব আসলে কি বস্তু, ইহার প্রসার কতদূর, এই মতবাদী লোকের সংখ্যা কত, আচার আচরণ কিরূপ, ইহাদের গ্রন্থ সংখ্যা কত, গ্রন্থগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি ইত্যাদি সম্বন্ধে কাহারো সঠিক ধারণা নাই। চলিত কথার উপর নির্ভর করিয়া সহজিয়াদিগকে 'নেড়ানেড়ী বলিয়া গালি দেওয়ার একটা হুজুক আজকাল দেখিতে পাই। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে তেমন আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি কাহারো দেখি না। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের প্রচারিত গ্রন্থ ইত্যাদিও এমন গোপনে প্রচারিত হয় যে ইহাদের সম্বন্ধে ঠিকমত তথ্যলাভ করা সহজ নহে। ইহাদের পুস্তকাদিও গুহ্য ভাষায় লিখিত বলিয়া সাধারণে বুঝিতে পারে না। মণীন্দ্রবাবু এই পুস্তকখানিতে ইহাদের সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সত্য সংবাদ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের মতবাদকে পরিস্ফুট করিয়া ইনি সাধারণের উপকার করিয়াছেন। পরিশিষ্টে প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকাটিও বহুমূল্য। সহজতত্ত্ববাদীরা যাই হউক বাঙলা সাহিত্যকে যে ইহারা বহুদিক দিয়া সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে সত্য আলোচনা করার প্রয়োজন হইয়াছে। মণীন্দ্রবাবু, দেহতত্ত্ব, স্ত্রী-সাধন, পরকীয়া তত্ত্ব, সহজ-তত্ত্ব, তন্ত্রবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অমৃতরসাবলী নামক গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া সহজ-ধর্ম্ম-পুস্তকের একখানি আদর্শ দেখাইয়াছেন। পরিশিষ্টে 'রস কদম্ব' বহিখানির আলোচনা ও বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা উপকৃত হইয়াছি। গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ।

রসকদম্ব—কবিবল্লভ বিরচিত। শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্-এ ও শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১।০, সদস্য-পক্ষে ১৲।

প্রাচীন বাঙলা কাব্যসাহিত্যের রত্নাগার হইতে যে কয়েকটি বহুমূল্য পুঁথীরত্ন গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও কবিবল্লভের এই "রসকদম্ব" গ্রন্থখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বোধহয় শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের পরেই ইহার স্থান। ইহা সহজ-তত্ত্ব-বিষয়ক বহি হইলেও কাব্য হিসাবে খুব উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ। সকলকেই এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই বইখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর An Introduction to the study of the Post Caitanya Sahajiya Cult পুস্তকের পরিশিষ্টে এই পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বাঙলার সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার এতটুকু শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে তিনি যেন এই বইখানি পাঠ করিয়া দেখেন।

সচিত্র কাশীধাম— পুণ্যতীর্থ বারাণসীর সচিত্র ইতিবৃত্ত। মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত (২য় সংস্করণ) ২৫৭ এ বউবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷০।

এই চমৎকার বইখানিকে কাশীর একটী সুবৃহৎ ইতিহাস বলিলেও হয়। কাশী দর্শনাভিলাষীদিগের সঙ্গী হইবার উপযুক্ত। পুণ্যধাম কাশীর মন্দির, ঘাট, মস্জিদ্ এক কথায় সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানের বিস্তৃত বিবরণ ও চিত্র এই পুস্তকে আছে। সামাজিক ও ধর্ম্মসংস্কারের ইতিহাসও সুলিখিত।

স

গো-জাতি—শ্রীঅমিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৫৯ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। আট আনা।

গোজাতি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ সুন্দর পুস্তক। ইহাতে গো-পালন, গোময়, গো-মূত্র, গো-অস্থি ইত্যাদির কার্য্যকারিতা, গোব্যাধি ও তাহার চিকিৎসা, দুগ্ধবৃদ্ধির উপায়, দুগ্ধ অবিকৃত রাখার

উপায়, গোগণকে শৃঙ্গহীন করার উপায়, বলদ করার প্রণালী, ইত্যাদি গো-সম্বন্ধে বহু বহু শিক্ষাপ্রদ আধুনিক-জ্ঞান-সম্মত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। বইটি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় অধিকতর মূল্যবান হইয়াছে। বইটি বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইলে দেশের যথার্থ উপকার হইবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব—(প্রথম খণ্ড) শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার, প্রবাসী-প্রেস, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩৯২। দুই টাকা।

পুস্তকটিতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের জন্ম ও বিকাশ, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, চৈতন্যদেবের বিশেষত্ব, চৈতন্যদেবের জীবন-কথা ও ধর্ম্মমত ইত্যাদি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। বাংলার এই মহাপুরুষের জীবন ও ধর্ম্মভাবের প্লাবনে বাংলা দেশ উজ্জীবিত এবং বাংলার সাহিত্য পল্লবিত হইয়া উঠে। এ হেন ধর্ম্মোপদেষ্টার জীবন আলোচনা অর্থে বাংলা দেশের ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অংশ লিপিবদ্ধ করা। আলোচ্য গ্রন্থের প্রবীণ লেখক মহাশয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসীম শ্রদ্ধা ও প্রাঞ্জল লিপিকুশলতায় চৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম্মকথার সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইচ্ছা সত্ত্বেও স্থানাভাবে আমরা বইটির বিশদ পরিচয় দিতে পারিলাম না। আমরা বইটি পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। যাঁহারা চৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম্মের নিরপেক্ষ সরল আলোচনা দেখিতে চান তাঁহারা এই পুস্তকটি পাঠ করুন।

গুপ্ত

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ প্রণীত। বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০। ১৩৩৩।

ছাত্রবন্ধু ত্যাগী অধ্যাপক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন-কথা। বৈজ্ঞানিক হিসাবে, সমাজ-সংস্কারক হিসাবে, জাতীয় শিক্ষার প্রধান প্রবর্ত্তক ও খাদির প্রচারক রূপে এবং অক্লান্ত দেশ-সেবকরূপে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ভারতের জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার জীবন কথা আলোচনা করিয়া ফণীন্দ্রবাবু সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন আচার্য্য রায় "সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-মন্দিরে যোগ দিয়েছেন।" আচার্য্য রায় প্রেসিডেন্সী কলেজের চাকুরী ছাড়িয়া দেন নাই—কার্য্যকাল শেষ হইলে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফণীন্দ্রবাবুর বর্ণনা ভঙ্গীতে বই-খানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা আশা করি পুস্তকখানি পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করিবে।

মাধবীর বিদ্রোহ (উপন্যাস)—শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। স্বাস্থ্যায়ন সাহিত্য মন্দির, মহেশপুর যশোহর। মূল্য ১৷০। ১৩৩৪

সচিত্র উপন্যাস। গোলামীর মোহে অন্ধ যুবকগণের চৈতন্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যেই নাকি গ্রন্থখানি লেখা। আমাদের মনে হয় লেখকের বর্ণনাভঙ্গীতে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

প্রবাল (উপন্যাস)—শ্রী সরসীবালা বসু। গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় এণ্ড্ সন্স। ১৩৩৪। মূল্য ২৲।

উপন্যাসখানি ১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়াছিল।

পদ্মলোচন (সচিত্র উপন্যাস)—এস জি মজুমদার। ডি, এম্ লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০। ১৩৩৪।

কিছুদিন পূর্ব্বে লেখকের ত্রিলোচনের পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা মজুমদার সাহেবের বর্ণনা-কৌশলের প্রসংশা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান বইখানিতেও তাঁহার সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উপন্যাসখানির প্লট সুন্দর হইয়াছে, ভাষাও বেশ ঝরঝরে। ছাপা, বাঁধাই ও মলাট-চিত্র সমস্তই বেশ হইয়াছে। লেখক আমাদিগকে প্রথমে ত্রি-লোচন পরে পদ্মলোচন উপহার দিলেন। ইহার পরে কি রক্ত-লোচন দেখাইবেন? গ্রন্থখানির সহিত লেখকের ফটো-চিত্র আছে।

প্র

পুষ্পরথ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বাগ্‌চী, এম-এ। রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, ২০ নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥৵০ আনা।

ক্ষিতীশবাবুর বইখানি একটা মস্ত অভাব পূরণ করিল। উড়ো জাহাজের আজ খুব বড় দিন। তার নিত্য নূতন উন্নতি বিধান হইতেছে। কোন জাতির সব-চেয়ে বড় শক্তি এখন উড়ো-জাহাজে নিবদ্ধ। সেই তার ব্রহ্মাস্ত্র। এই উড়ো জাহাজের উদ্ভাবনের গল্প আজ ক্ষিতীশবাবু আমাদের সুকুমার বালকদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। উড়ো-জাহাজের সম্বন্ধে যদি তারা কিছু জানিতে উৎসুক হয় তবে এই বইটা পড়িলে চলিবে। বইখানা তাহাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইবে না—কারণ ক্ষিতীশ-বাবুর ভাষা অতি প্রাঞ্জল। সাধারণের মত করিয়া লেখা। লেখক তাঁহার নিবেদনে বলিয়াছেন যে, বইখানি Claxton's Mastery of the Air নামক সুন্দর পুস্তক অবলম্বনে রচিত। তা' ছাড়া অন্যান্য তথ্যও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। বইখানি পড়িলে অনুবাদের কোনরূপ লক্ষণ দেখা যায় না।

শুধু উড়ো-জাহাজের উদ্ভাবনের গল্পেই বইখানি ভরা নয়। উড়ো-জাহাজ কত রকমের তাদের বর্ণনা তাদের নানা প্রকারের কলকব্জার প্রভেদ নানারূপ নক্সা দিয়া, তার ভবিষ্যৎ ক্ষিতীশ বাবু বইখানিতে বলিয়াছেন। উড়ো-জাহাজ সম্বন্ধে সব খবরই ইহাতে পাওয়া যাইবে।

উড়োর পরিভাষা সম্বন্ধে যে-পরিচ্ছেদ লেখা হইয়াছে তাহাও বেশ হইয়াছে। লেখক ইংরেজী কথাগুলির অনুবাদ করিবার চেষ্টা না করিয়া ভালই করিয়াছেন।

প

জপজী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, বি-এল, কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য ১৲ এক টাকা। গ্রন্থকারের নিকট, মোজাফ্ফরপুর, অথবা গুরুদাস লাইব্রেরী কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। পৃঃ /০-৪৲+১-৯৪।

'জপজী' শিখ সম্প্রদায়ের আরাধ্য গ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেবের' প্রথম মহলা, আদি গুরু শ্রীনানকের গীত-সংগ্রহ। নানকশাহীদের পঞ্চম গুরু শ্রীঅর্জ্জুনদেব তাঁহার নিজের রচিত ও তাঁহার অগ্রগামী গুরু-চতুষ্টয়ের রচিত গীত সমূহ প্রথম সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। শ্রীনানকের রচনা এই 'জপজী', মহলা ১, এবং এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদেবের রচনা 'সুখমণী' মহলা ৫ নামে প্রচলিত হয়। দশম গুরু গোবিন্দের পর আর শিখ সম্প্রদায়ে নূতন গুরু নির্ব্বাচিত হন নাই, তখন অর্জ্জুনদেবের কাল হইতে অন্যান্য গুরুদেবের যে রচনা ক্রমান্বয়ে সন্নিবিষ্ট হইতেছিল, তাহা একত্র সম্বদ্ধ হইয়া পুণ্যগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' আকার গ্রহণ করে। শিখদের এই গুরু-বাক্যাবলীই বর্ত্তমানে সমস্ত

শিখের গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছে, এই পবিত্র মন্ত্রগুলির পাঠ ও গীত পূজা ও আরাধনা শিখমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সকল গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ভারতবর্ষ যখন আপনার অভিন্ন, পরিপূর্ণ সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় উন্মুখ হইয়াছিল, নানকদেব ইতিহাসের সেই মহাক্ষণে তাহার এই সাধনার অন্যতম নেতারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই, তাঁহার সেইদিনকার মন্ত্র ৪৫৮ বৎসর পরেও এমন অম্লান ও অপরূপ রস-সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে, শুধু শিখ নয়, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান যে কোনো ধর্ম্মাবলম্বী, যে কোনো দেশবাসী, তাহার মধ্যে আপনার স্বাধীন জীবনের প্রতিরূপ ও আপনার ভক্ত-জীবনের প্রেরণা পাইতে পারেন। 'জপজী' গুরুমুখী ভাষায় লিখিত ও সাধারণত গুরুমুখী বর্ণমালায় মুদ্রিত হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় বাঙ্গালা অক্ষরে মূল গীতগুলি মুদ্রিত করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সংযোজিত করিয়াছেন। ইহাতে বহু বাঙ্গালীর পক্ষে মূল পাঠও সুসাধ্য হইবে, এবং ব্যাখ্যা ও অনুবাদের সহায়ে অর্থ গ্রহণ সহজ হইবে। অনুবাদ যেমন সরল, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী; মূল সঙ্গীতের ভাব ও রেশ তাহার ভিতর দিয়া পাঠককে স্পর্শ করে। ইহা ছাড়া গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে অনুবাদক শিখগুরু নানক, তাঁহার জীবন, ও তৎসম্পর্কে প্রচলিত আখ্যায়িকাগুলি, এবং তাঁহার ধর্ম্মমত, আত্মা, কর্ম্মফল জন্ম-মরণ, সদগুরু-তত্ত্ব প্রভৃতি উপদিষ্ট তত্ত্বগুলি সম্পর্কে একটি বিশদ নাতিদীর্ঘ রচনা সন্নিবদ্ধ করিয়া পাঠক-মাত্রকেই বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার একটি অমূল্য রত্নরূপে ভক্ত, সাধক, ও রসিকজন সকলেরই অশেষ আদরের হইবে।

সুখমণী—অনুবাদক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, বি-এল। মূল্য ১৲ এক টাকা। পৃঃ ৵+২১৪। প্রাপ্তিস্থান, গ্রন্থকার, মোজাঃফরপুর, অথবা, গুরুদাস লাইব্রেরী, কলিকাতা।

'গ্রন্থসাহেবের' অন্তর্গত মহলা, পঞ্চমগুরু অর্জ্জুনদেবের রচিত এই গীতচয় 'সুখমণী' নামে পরিচিত। এই নামের বিভিন্ন তাৎপর্য্য আছে, কিন্তু তথাপি ইহার অর্থ সাধারণত স্পষ্ট নয়। 'সুখমণী' মোট ২৪টি শ্লোকে সম্পূর্ণ,—প্রত্যেকটি শ্লোক 'অষ্টপদীতে' অর্থাৎ আটটি খণ্ডাংশে বিভক্ত। এবং এইরূপ প্রত্যেক পদে আবার দশটি পংক্তি। বর্ত্তমান অনুবাদের এই দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম সংস্করণ বোধ হয় বাঙ্গালা ১৩১৬ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলেমনে হয়, গ্রন্থখানা বাঙ্গালী সমাজে আদৃত হইয়াছে। ইহাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দ-লাভ করিলাম। যদিও অনুবাদক মহাশয়ের অনূদিত 'জপজী' গ্রন্থখণ্ডের মত ইহাতে, ব্যাখ্যা সংযোজিত হয় নাই, তথাপি ইহার অনুবাদাংশ মূলের অনুরূপে পংক্তি হিসাবে বিভক্ত হওয়ায় পাঠকের আরো সুবিধা হয়। গ্রন্থশেষে ('জপজী'র সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য) যদি গুরুমুখী বর্ণমালার এক প্রতিলিপি ও কোনো পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি অনুবাদক সন্নিবেশ করেন, তাহা হইলে কোনো কোনো কৌতূহলী পাঠকের কৌতূহল বোধহয় নিবৃত্ত হইবে।—'সুখমণী' বাঙ্গালার রস-পিপাসুদের চিত্তে সুখ-সঞ্চার করিবে, এবং বাঙ্গালার ভক্তি-সাধকদের প্রাণ স্পর্শমণির ন্যায় স্পর্শে ভক্তি-উজ্জ্বল করিবে।

গ

বিশ্ব-বৈতালিক (কবিতা)—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচসিকা। পৃ—১৭৪।১৩৩৪।

চকচকে মলাট, তকতকে ছাপা এবং আকারের স্ফীতিত্ব যদি কাব্য-কলার পরিমাপ হয়, তাহা হইলে এই বইখানি চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু গুণের দিক হইতে বলিতে গেলে বলিতে হয়—সুন্দর শিমূল! রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণে ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত। যেন কোরা কাপড়ের উপর ধার-করা ধোপ-দোস্ত জামা পরিয়া কোন দেমাকী পাড়াগেঁয়ে সহরে চলিয়াছে;—লক্ষ্য নাই, যে, জামাটি দেহের মাপে বড় এবং বেমানান। কবিতার ভাব ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের ধার-করা, কিন্তু প্রকাশের অক্ষমতায় এবং ছন্দজ্ঞানের অভাবে তাহা ভ্যাংচানিতে পরিবর্ত্তিত। যথা—

"অন্তরের সুর অনাহত
বাইরের তানে ক্রমাগত
মিলে, মিশে প্রবাহিত হের সুরধুনী;
স্নান কর জ্ঞানী গুণী,
• মহানন্দে প্রাণ হউক পাগল!"

চমৎকার! অথচ সুদীর্ঘ চারপৃষ্ঠা ব্যাপী একটি দার্শনিক ভূমিকায় কবিবরের নির্লজ্জ আমিত্ব প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার একটি আলোকচিত্রে গ্রন্থের প্রবেশ-দ্বার অলঙ্কৃত। ধন্যবাদ!

র

আলুপোড়া—(ছেলেদের গল্প)—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা, ৬৯ পৃষ্ঠা।

যাহারা শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের জন্য গল্প উপন্যাস কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া যশ অর্জ্জন করা কঠিন নহে; অন্ততঃ লেখকের সমমনোভাববিশিষ্ট একদল লোক যে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ওই শ্রেণীর পাঠকদের সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তি সজাগ; নানা জিনিষ দেখিয়া শুনিয়া ও পাঠ করিয়া, সংসারের বহু বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তাহারা প্রত্যেকের মতকে ও মতবাদকে শ্রদ্ধা করিতে ও তাহার যথাযথ মূল্য দিতে শিখিয়াছে। কিন্তু শিশু ও কিশোরদিগকে সন্তুষ্ট ও তাহাদের মনকে অধিকার করিতে গেলে মত বা তথ্য লইয়া ফাঁকি দেওয়া চলে না! সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল শিশু ও কিশোরের এক মন, এক ভাব। গল্প উপকথা বা কবিতা তাহাদের মনকে নাড়া দিতে না পারিলে তাহারা সেগুলি ঠেলিয়া রাখে, সেগুলিকে এতটুকু শ্রদ্ধা করিবার মত উদারতা তাহাদের নাই।

সুরেশবাবুর এই বইখানি শিশুমনকে জয় করিবার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমাদের বাড়ীর শিশুরা আলুপোড়া লইয়া দল বাঁধিয়া হল্লা করিতেছে, টানাটানি হৈচৈড়াহৈচড়ি সুরু করিয়াছে। একজন মহাউৎসাহে গল্পগুলি পড়িতেছে, বাকী সকলে চুপ করিয়া শুনিতেছে, হাসিতেছে এবং মাঝে মাঝে কোলাহল করিয়া উঠিতেছে। শিশুদের মন এত সহজে অধিকার করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া এই বইখানিকে অন্য কোনো অগ্নি-পরীক্ষায় না ফেলিয়া আমরা ইহাকে নিঃসন্দেহে সার্টিফিকেট দিতেছি, সকল শ্রেণীর শিশু ও কিশোর-সম্প্রদায় ইহাকে আদর করিবে।

আমাদের মনের এক অংশ এখনো শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করে নাই। আলুপোড়া পড়িয়া আমিও যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি, বিশেষ করিয়া আলুপোড়া, কেল্লার জুতো ও বুদ্ধির ঢেঁকি পড়িয়া মনে হইল আলুপোড়াগল্পটি ত আমাদেরই কথা, চৌআর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, পাঁচু ত আমাদেরই বাড়ীর চাকর!

বইটি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। যে তিনটি গল্প বিদেশী গল্পের ছায়া লইয়া লিখিত সেগুলি যেন একটু আড়ষ্ট, দেশী গল্পগুলি চমৎকার উৎরাইয়াছে। এই ছ আনার মূল্যের বইখানির জন্য আমরা শিশুদের তরফ হইতে গ্রন্থকার ও প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ছেলেবয়সে (উপন্যাস),— শ্রী শিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক ডি, এম লাইব্রেরী ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য দেড় টাকা।

১৬২ পৃষ্ঠাব্যাপী এ উপন্যাসখানি গ্রন্থকারের মনোবিকারের একটি ইতিহাস। কদর্য্যতার আবর্ত্তে গ্রন্থকারের স্বদেশ-প্রেম হাবুডুবু খাইয়াছে। ক্ষমতার অপব্যবহার দেখিয়া আমাদেরও মন ক্লিষ্ট হইয়াছে।

মুক্তপথের যাত্রী—উপন্যাস, শ্রী ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। প্রকাশক বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা মূল্য ১॥০

গ্রন্থকার প্রাচীনপন্থী লেখক। মনস্তত্ত্ব ও আধুনিকতম টেকনিকের বালাই না থাকাতে আমরা এই উপন্যাসখানি পড়িয়া খুসী হইয়াছি। সহজ কথা সহজ করিয়া বলিবার ক্ষমতা লেখকের আছে অথচ তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও সহজে বহন করিয়া লইয়া যান। সরিৎ ও শোভনার চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে।

আলোর কমল (উপন্যাস),—শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। ১৬নং নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা, মেটকাফ প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৸০

ব্যোমকেশবাবুর এই উপন্যাসখানিও সুলিখিত। মাঝে মাঝে চরিত্রচিত্রণ একটু অস্বাভাবিক হইলেও শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে কষ্ট হয় না। মাধবের চরিত্র ভালই লাগিল।

ব্রাহস্পর্শ (উপন্যাস),—শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন লিখিত। প্রকাশক শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ম্যানেজার, মাস্তদ এণ্ড কোং সদরঘাট চট্টগ্রাম। মূল্য দেড় টাকা।

ব্রাহস্পর্শে যাত্রা করিয়া গ্রন্থের নায়ক ননীবাবু কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পত্নী উষার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ও পরে সমুদ্রতীরে শোভার সহিত প্রণয় ঘটিয়া তাঁহাকে যে মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল—এই উপন্যাসে তাহা চমৎকার ফুটিয়াছে। উপন্যাসটির পরিকল্পনা সুন্দর। গ্রন্থকারের লিখনভঙ্গীও ভাল।

স

প্রাথমিক প্রতিবিধান (২য় সংস্করণ)—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲। ১৯২৭

আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রথম প্রতিকার-কল্পে কি উপায় করা কর্ত্তব্য (First Aid) সেই সম্বন্ধে উপদেশ। অল্পদিনের মধ্যেই বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। তাহাতেই বোঝা যায় পাঠক সমাজে ইহার আদর হইয়াছে। আমরা প্রথম সংস্করণেই বইখানির যথাযোগ্য প্রশংসা করিয়াছি। আমরা ইহার সমাদর ও বহুল প্রচার কামনা করি।

হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন—শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২॥০।

অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন, "হিন্দু নর-নারী ৭০০ বৎসর ধরিয়া গণতন্ত্রের 'রাজ' চালাইতেছে—আর ষোল সতের শ' বৎসর ধরিয়া রাজতন্ত্রের "রাজ" চালাইতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির "পাবলিক ল" বা রাষ্ট্র-শাসন এই গ্রন্থে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।" গ্রন্থকার অনেক প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় শক্তিযোগের ইতিহাস দেখাইয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু সমাজপতিরা রাষ্ট্র গঠনের দিক দিয়া যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই রাষ্ট্রধুরন্ধরদের চিন্তার ধারা লেখক পাঠকসমাজের নিকট উপস্থিত করিয়া দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

আবর্ত্ত—অধ্যাপক শ্রীহরিপদ পাণ্ডে। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি, কলিকাতা। ১৩৩৩

উপন্যাস। হরিপদ-বাবুর বোধ হয় এইখানি উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস। তাই অনেক স্থলে technique এর দোষ দেখিলাম। তাঁহার লিখিবার শক্তি আছে। আশা করি ভবিষ্যতে এ সমস্ত ত্রুটী সংশোধিত হইবে।

সুভাষচন্দ্র – শ্রীহেমন্তকুমার সরকার সঙ্কলিত। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য ১।০। ১৩৩৪

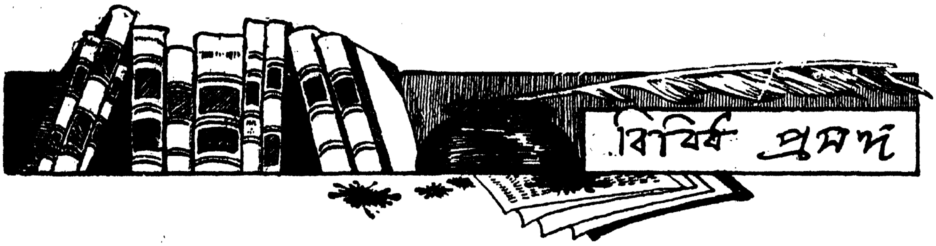
সঙ্কলনকারী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বাল্যবন্ধু, তিনি চিঠি পত্রাদি উদ্ধৃত করিয়া সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। বইখানিতে আরও অধিক সংবাদ আশা পাইব। করিয়াছিলাম। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

প্র

ভ্রমসংশোধন

শ্রাবণ

পৃঃ	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮৭	১	নিম্ন হইতে ৩য় পঙ্‌ক্তি	সর্ব্বদেশে	সর্ব্বশেষে
৪৯১	২	ঐ	"বলিয়া" শব্দটি নিম্ন হইতে ৫ম পঙ্‌ক্তিতে "সুবিধা হয়" শব্দের পরে বসিবে।	
৪৯৪	২	নিম্ন হইতে ১৬শ পঙ্‌ক্তি	যেটি বিশ্বাস সে	যেটি সে
৪৯৬			ঋষি টলষ্টয়ের একখানি চিঠি প্রবন্ধের অনুবাদকের নাম "শ্রী কালিদাস নাগ" ভ্রমক্রমে ছাপা হয় নাই।	
৪৯৬	১	নিম্ন হইতে ১৬শ পঙ্‌ক্তি	গায়ে গায়ে ঘসিয়া আধুনিক	গায়ে গায়ে আধুনিক
৫০১	১	উপর হইতে ৫ম পঙ্‌ক্তি	এককালের	এতকালের
৫০২	১	ঐ	তাকাইয়া মেয়েটি বলিল	তাকাইয়া বলিল



সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধে লর্ড আরুইনের বক্তৃতা

গত ২৯শে আগষ্ট, ১২ই ভাদ্র, বড়লাট লর্ড আরুইন সিমলায় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের সম্মুখে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি প্রকাশ করেন, যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তিস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার বক্তৃতাটি ভাল। তাহাতে ধর্ম্মোপদেশ আছে। তাঁহার অনেক কথায় আমরা সায় দিতে পারি। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অধিকার লাভে ও রাজনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা পড়িবে, সে-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, যে, ভারতবর্ষ আত্মশাসক না হইলে বিবাদ-ভঞ্জন হইবে না। এবিষয়ে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ আছে ও থাকিবে। তাঁহারা বলেন, আগে তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মিটাও, তবে স্বরাজ পাইবে; আমরা বলি, ঝগড়ার প্রধান কারণ সকল দূর করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় সব ব্যাপারে আমাদের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকা দরকার, কেননা ঝগড়ার মূলে রাজনৈতিক কারণ আছে। এই কারণ তৃতীয় পক্ষ প্রভু থাকিতে দূর করা দুঃসাধ্য, হয় ত অসাধ্য।

লর্ড আরুইন যদি ধর্ম্মোপদেষ্টা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশিত সাধু ইচ্ছার পূরা প্রশংসা করিতে পারিতাম। কিন্তু তিনি রাজপ্রতিনিধি ও দেশের শাসন-কর্ত্তা। সেইজন্য তাঁহার বক্তৃতায় অকপটতা প্রকাশ পাইতেছে, ইত্যাদি মন্তব্যের বিশেষ কোন মূল্য নাই। তিনি রাজপ্রতিনিধি বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা করা ছাড়া অন্য দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যও আছে। তিনি যে শান্তিস্থাপন-প্রয়াসী, কাজে তাহার কি পরিচয় দিয়াছেন? কার্য্যতঃ কিছু করিবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই বড়লাটের আছে। যদি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পদত্যাগ করা উচিত। কারণ, তাঁহা অপেক্ষা ভাল বক্তা ও উপদেষ্টা পাদরীদের মধ্যে অনেক আছেন যাঁহারা তাঁহা অপেক্ষা খুব কম বেতনে উপদেশ দিতে রাজী হইবেন।

গূঢ় রাষ্ট্রনীতি বা শাসননীতি সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান;—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যান, কিংবা আহুত হইয়া যান। যে আঠার মাসের সাম্প্রদায়িক বিরোধে হতাহতের সংখ্যা বড়লাট দিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনি একবারও একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সহিত সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন কি? করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত নহি। গত বৎসরের কলিকাতার খুনাখুনির সময় লাট লিটন দার্জিলিঙে বসিয়াছিলেন; পুলিস এ বৎসর শান্তিরক্ষার যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিল, গত বৎসর তাহা করে নাই; রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময়, ইংলিশম্যান ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পর্য্যন্ত বলিয়াছিল, যে, মুসলমানেরা আগে হইতে পরামর্শ আঁটিয়া সরকারী হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া হিন্দুদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিয়াছিল; পাবনায় অরাজকতা ঘটিয়াছিল; ইত্যাকার নানা শোচনীয় ব্যাপারের কোন কৈফিয়ৎ গোপনেও বড়লাট লইয়াছিলেন কি? লইয়াছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। লইয়া থাকিলে ও প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়া থকিলে, এখনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা কেন চলিতেছে? অন্যান্য প্রদেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণের জন্যই বা তিনি কি করিয়াছেন? সত্য, এই কাজ প্রথমতঃ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের, কিন্তু তাঁহারা যখন অকৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখা যাইতেছে, তখন বড় কর্ত্তা কিছু করেন নাই কেন?

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে দেখা যাইতেছে, শান্তিভঙ্গের

আশঙ্কার অছিলায় হিন্দুদের ধর্ম্মসম্পৃক্ত কাজে বাধা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু তাহা এ আশঙ্কায় নহে, যে, হিন্দুরা শান্তিভঙ্গ করিবে ;—এই আশঙ্কায়, যে, হিন্দুরা শোভাযাত্রা করিলে মুসলমানেরা শান্তিভঙ্গ করিবে। অতএব, যাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী আইন মানে, তাহাদের অধিকার লোপ করাই সরকারী কর্ম্মচারীরা অধিকতর সুবিধাজনক ও আরামদায়ক এবং ন্যায়সঙ্গত মনে করে! বড় কর্ত্তা এবিষয়েও ত কিছু বলেন না, দেখিতে পাই।

বস্তুতঃ, তিনি যে একটা গোল টেবিলের বৈঠকের আভাস দিয়াছেন, তাহাতে কেবল হিন্দুমুসলমান নেতাদের ডাকিবার কথাই ভাবিয়াছেন বলিয়াছেন ; কিন্তু অপর এক পক্ষ যে-সব সরকারী কর্ম্মচারীদের অকর্ম্মণ্যতায় অবহেলায় বা অন্য দোষে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারিত হয় না, তাঁহাদিগকে ডাকিবার কথা তাঁহার চিন্তাপথে আবির্ভূত হয় নাই।

হিন্দুরা মনে করে, মুসলমানদেরও কেহ কেহ মনে করে, ব্যবস্থাপক সভা-আদিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্রয় দেওয়ায়, সরকারী চাকরীতে নিয়োগের বন্দোবস্ত সর্ব্বত্র যোগ্যতা অনুসারে না হইয়া অনেক স্থলে সম্প্রদায় অনুসারে ভাগাভাগি হওয়ায়, শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বত্রই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগাভাগির দাবী উত্থাপিত হইয়াছে ; বিরোধের তাহা একটা মূলীভূত কারণ। অতএব হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তি অনুসারে নির্ব্বাচন, চাকরীতে নিয়োগ, ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী। অন্যদিকে শিক্ষিত মুসলমানদের অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক হিসাবে নির্ব্বাচন ব্যবস্থাপক সভা হইতে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রচলনের পক্ষপাতী। সরকারী চাকরীর সব বিভাগেও তাহারা সম্প্রদায় হিসাবে ভাগাভাগির পক্ষপাতী। ইহা বিরোধের মূলীভূত একটা প্রধান কারণ। এইসব কারণ যখন ভারতের একটা দুটা প্রদেশে নয়, প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তখন ইহার প্রতিকার প্রাদেশিক কোন শাসনকর্ত্তার সাধ্যায়ত্ত নহে ; ইহা বড় কর্ত্তারই এলাকা।

পরিশেষে আমরা বলিতে চাই, বিরোধের জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নির্বুদ্ধিতা দোষ ও দায়িত্ব আছে, কিন্তু দোষ, দায়িত্ব কেবল তাহাদেরই নহে। সরকারী নীতি, সরকারী ব্যবস্থা, সরকারী কাজ, সরকারী অবহেলা, সরকারী পক্ষপাতিত্ব, প্রভৃতির দোষেও বিরোধের উৎপত্তি হইয়াছে, বিরোধ বাড়িতেছে, বিরোধ লোপ পাইতেছে না। সুতরাং হিন্দুমুসলমানকে গম্ভীর ভাবে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিলেই সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপিত হইবে না, সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তার সকল কর্ত্তব্য পালিত হইবে না।

ক্যাথারিন মেয়োর একজন পূর্ব্বগ

কুমারী ক্যাথারিন মেয়োনাম্নী এক মার্কিন স্ত্রীলোক ভারতবর্ষের কেবল মাত্র মন্দ দিকটা দেখাইয়া "মাদার ইণ্ডিয়া" নামক একখানা বহি লিখিয়াছে। যদি তাহাতে লিখিত সব কথা সত্য হইত, তাহা হইলেও কোন দেশের কেবল দোষগুলা দেখাইয়া বহি লিখিলে সেটা কুকাজ বলিয়া বহিখানা নিন্দনীয় হইত। কিন্তু বহিখানাতে অনেক মিথ্যা কথা আছে, তাহা উহার নানা কাগজের সমালোচনায় উদ্ধৃত অনেক কথা হইতে বুঝা যায়। পুস্তকবিক্রেতার নিকট হইতে বহিখানা পাইলে আরও কত মিথ্যা কথা আছে, জানিতে পারিব।

এই বহিতে আবে দুবোআ নামক গত শতাব্দীর এক ভারতপ্রবাসী পাদরীর বহি হইতে কিছু কিছু উপকরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। পাদরীরা নিজের ধর্ম্মের ও নিজ নিজ সমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এবং ধর্ম্মপ্রচারার্থ স্বদেশ হইতে অর্থসংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম ও সমাজের অনেক নিন্দা প্রচার করিয়াছেন। আবে দুবোআও তাঁহার একখানা বিখ্যাত পুস্তকে তাহা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় হিন্দুসমাজের সত্য দোষ যে তাহাতে কিছু নাই, এমন নয়। ভারতীয়দের নাড়ীনক্ষত্র ঘরের কথা জানিবার জন্য তিনি ইউরোপীয় সমাজ ও ইউরোপীয় পোষাক ছাড়িয়া দেশী লোকদের সঙ্গে দেশী পোষাক পরিয়া মিশিতেন। ভারতীয়রা বেশী বোকা কিম্বা বেশী কূটবুদ্ধিরহিত সরল প্রকৃতির বলিয়া, ঐ জন্য দুবোআ ভারতীয়দের প্রিয় হইয়া উঠেন, এবং তাহার প্রতিশোধস্বরূপ তাহাদের সব দোষ একখানা বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি যদি শুধু পাদরী হইতেন, তাহাতেই রক্ষা ছিল না।

কিন্তু, একে মা মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ--তাঁহাকে দেশের তৎকালীন রাজা ঈষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানী টাকাও খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি ফরাসী বলিয়া তাঁহার বহিখানা ফরাসী ভাষায় লিখিয়াছিলেন। এই ফরাসী বহির হস্তলিপি তৎকালীন বড় লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আট হাজার টাকা দিয়া কিনিয়া লন। ইহা পরে কোম্পানীর ব্যয়ে ইংরেজীতে অনুবাদিত হয় এবং অনুবাদ মুদ্রিত হয়। দ্যুবোআ যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান, তখন ভারতবর্ষের ইংরেজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে পেন্সান দিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে ইংরেজদের অর্থক্রীত চর মনে করিলে অন্যায় হইবে না। আমরা যাহা লিখিলাম, তাহার প্রমাণ এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার একাদশ সংস্করণের অষ্টম খণ্ড ৬২৪ পৃষ্ঠা হইতে নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"But his great work was his record of *Hindu Manners, Customs and Ceremonies.* Immediately on his arrival in India he saw that the work of a Christian missionary should be based on a thorough acquaintance with the innermost life and character of the native population. Accordingly he abjured European society, adopted the native style of clothing, and made himself in habit and costume as much like a Hindu as he could. He gained an extraordinary welcome amongst people of all castes and conditions, and is still spoken of in many parts of South India with affection and esteem as "the prince's son, the noblest of Europeans." Although Dubois modestly disclaimed the rank of an author, his collections were not so much drawn from the Hindu sacred books as from his own careful and vivid observations, and it is this, united to a remarkable prescience, that makes his work so valuable. It is divided into three parts: (1) a general view of society in India, and especially of the caste system, (2) the four states of Brahmanical life; (3) religion—feasts, temples, objects of worpship. Not only does the abbe give a shrewd, clear-sighted, candid account of the manners and customs of the Hindus, but he provides a very sound estimate of the British position in India, and makes some eminently just observations on the difficulties of administering the Empire according to Western notions of civilization and progress with the limited resources that are available. Dubois's French Ms. was purchased for eight thousand rupees by Lord William Bentinck for the East India Company in 1807; in 1816 an English translation was published, and of this edition about 1864 a curtailed reprint was issued. The abbe, however, largely recast his work, and of this revised text (now in the India Office) an edition with notes was published in 1897 by H. K. Beauchamp. Dubois left India in January 1823, with a special pension conferred on him by the East India Company, and on reaching Paris was appointed director of the Missions Etrangeres, of which he afterwards became superior (1836-1839)."

"পাশ্চাত্য সভ্যতা ও প্রগতি সম্বন্ধীয় ধারণা অনুসারে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করা কঠিন", ইত্যাকার মন্তব্যপ্রকাশও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে দ্যুবোআর ৮০০০ টাকা ও পেন্সানরূপ বক্‌শিশ পাইবার একটা কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। গোপনে আরও টাকা তিনি ইংরেজদের নিকট হইতে আগে আগে পাইয়াছিলেন কিনা, জানি না। কিন্তু একজন ফরাসী দেশের পাদরীকে ইংরেজ গবর্মেণ্টের পেন্সান প্রদান হইতেই বুঝা যায়, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত যোগ ছিল।

—

আর এক ভারতহিতৈষিণী পাশ্চাত্য স্ত্রীলোক

কয়েকমাস হইল কুমারী নেভিল্ রল্‌ক্ নাম্নী একটি স্ত্রীলোক ভারতবর্ষে কোন কোন কুৎসিৎ ব্যারামের চিকিৎসা ও হ্রাসের উপায় নির্দ্দেশের জন্য সামাজিক স্বাস্থ্য (Social hygiene)-বিধান ব্রত লইয়া আসিয়াছিলেন। অবশ্য, ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধনার্থ শাদা চামড়ার কোন লোক আমাদের দেশে আসিলেই, আমরা বুদ্ধিমান্ বলিয়া তাহাকে খুব আদর-যত্ন করিয়া থাকি। এই স্ত্রীলোকটিকেও করা হইয়াছিল। কাগজে দেখিলাম, ভারতবর্ষে অল্পদিন থাকিয়াই এই ভারতহিতৈষিণী ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন যে, চরিত্রহীনতাজনিত ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ভারতবর্ষে ইংলণ্ডেরও চার গুণ বেশী। কি উপায়ে বত্রিশ কোটি লোকদের গোপনীয় ঘৃণিত ব্যাধির এতটা ঠিক্ ঠিক্ খবর তিনি পাইলেন, জানি না। কিন্তু ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ কেহ এবিষয়ে কিছু লিখিলে ভাল হয়। আমরাও পরে লিখিতে পারি। আমাদের সন্দেহ হইতেছে, এই স্ত্রীলোকটির মতসমূহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে। বলা হইবে, যে-দেশে দুর্নীতি এত বেশী, তাহা স্বরাজের উপযুক্ত নহে। ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ প্রকৃত সামাজিক, নৈতিক, দৈহিক ব্যাধি দূরীভূত হউক, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চাই। কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয়দের রাজনৈতিক অধিকার বাড়ান না কমান হইবে, তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত কমিশন বসিবার সময় আসিতেছে, সেই সময়েই

ভারতবর্ষের সকল রকম দোষ আবিষ্কার ও সংশোধন করিবার আগ্রহ পাশ্চাত্য ভারতহিতৈষীদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠা আকস্মিক মনে হইতেছে না।

—

ক্যাথারিন মেয়োর বহির উদ্দেশ্য

ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভে বাধা দেওয়া যে ক্যাথারিন মেয়োর বহির উদ্দেশ্য, সে-বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

"মাদার ইণ্ডিয়া" বহি লিখিবার পূর্ব্বে এই স্ত্রীলোক ফিলিপিনোদের সমস্ত দোষত্রুটির বর্ণনাপূর্ণ "দি আইল্‌স্ অব্ ফীয়ার," নামক এক বহি লেখে। আত্মশাসন-ক্ষমতার প্রমাণ প্রদর্শন করিলেই ফিলিপিনোদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, আমেরিকার জোন্স্ আইনে এই অঙ্গীকার আছে। কিন্তু আমেরিকার সাম্রাজ্যোপাসকেরা সেই অঙ্গীকার পালন করিতে চায় না। সেইজন্য তাহারা জেনার‍্যাল উড্ নামক এক ব্যক্তিকে ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠায়। সে-ব্যক্তি ফিলিপিনোদের যোগ্যতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে, এবং নানা-প্রকারে তাহাদের স্বাধীনতা লাভ আন্দোলনে বাধা দেয়। ক্যাথারিন মেয়ো ফিলিপিনো-দিগকে আমেরিকান্ ও অন্যান্য জাতিদের চক্ষে হেয় প্রমাণ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বহিখানা লেখে। সমালোচনার জন্য উহা আমাদের ও অন্যান্য ভারতীয় দেশী সম্পাদকদের নিকট আসিয়াছিল। উহার ভূমিকা ভারতে ডায়ার্কি বা দ্বৈরাজ্য প্রবর্ত্তনের অন্যতম মূল উদ্যোক্তা লায়নেল কার্টিসের লেখা। ভারতীয় দেশী সম্পাদকেরা ফিলিপিনো নহে বলিয়া এবং ফিলিপিনোদের স্বাধীনতা-লাভ-অঙ্গীকার ভারতীয়েরা নিজেদের স্বাধীনতা লাভের একটা নজীরের মত মনে করে বলিয়া, ফিলিপিনোদের অযোগ্যতাপ্রদর্শক এই বহি আমাদের ও অন্য কোন কোন সম্পাদকের নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, "মাদার ইণ্ডিয়া" বহি ভারতীয় দেশী কোন সম্পাদকের নিকট সমালোচনার জন্য আসে নাই; আমরা উহা থ্যাকার কিম্বা কলিকাতার অন্য কোন দোকানেও পাই নাই। অথচ য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সম্পাদকরা ও খৃষ্টিয়ান মিশনারীরা উহা পাইয়াছেন। বহিখানা আমেরিকায়, ইংলণ্ডে, ইউরোপের জার্ম্যানী, সুইজার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছে। ইংলণ্ড আমেরিকার নানা কাগজে উহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইয়াছে। ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টের সভ্যদিগকে ঐ বহি বিনামূল্যে এক এক খানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইসকল তথ্য হইতে অনুমান করা ন্যায়সঙ্গত, যে, লেখিকার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে "সভ্য" জগতের লোকদের মনে অবজ্ঞার উদ্রেক করা; তাহা হইলে ঐ "সভ্য" জগৎ ইংরেজদের ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলিত রাখার বিরোধী হইবে না। ইংরেজ সম্পাদক-দের সঙ্গে সঙ্গে দেশী সম্পাদকদের নিকটও যদি বহিখানা সমালোচনার্থ আসিত, তাহা হইলে বুঝিতাম, যে, লেখিকা আমাদের উপকারার্থ আমাদের দোষ আমাদিগকে জানাইতে চাহিতেছে, এবং যেটা দোষ নয় তাহা দেখাইয়া দিবার এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ আমাদিগকে দিতেছে। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। উদ্দেশ্য এই, যে, জগতের লোক আমাদিগকে আগেই জঘন্য বর্ব্বর মনে করুক, আমরা যেন সঙ্গে সঙ্গে লেখিকার ভ্রম দেখাইবার সুযোগ না পাই।

লেখিকার স্বাধীন জীবিকা (independent means) আছে, উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইংরেজের টাকা খাইয়া লিখিবার দরকার তাহার নাই। "ঠাকুর-ঘরে কে?" "আমি কলা খাই নাই।" সাম্রাজ্যোপাসক আমেরিকান ও ইংরেজদের টাকা খাওয়ার অপবাদ দিবার আগেই সাফাই! লেখিকার টাকা আছে স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ, যে, কেবল নিঃস্ব লোকেরাই টাকার লোভে অপকর্ম্ম করে, কোন ধনীর লোভ নাই ও কোন ধনী টাকার জন্য অপকর্ম্ম করে না?

ক্যাথারিন মেয়ো এদেশে আসিবার আগে বিলাতি ইণ্ডিয়া আফিসে গিয়াছিল এদেশের ইংরেজ রাজপুরুষদের নিকট পরিচয়পত্র লইবার জন্য। আচ্ছা, তাহা না হয় সরকারী চোখে ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য দরকার। কিন্তু বেসরকারী মত জানিবার জন্য ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক, সামাজিক, ধার্ম্মিক, শৈক্ষিক প্রভৃতি প্রচেষ্টার নেতাদের সঙ্গে ত লেখিকা দেখা করে নাই। ভারতে ভাল কি কিছুই নাই?

একজন খুব উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর নিকট শুনিয়াছি তিনি যখন দিল্লী গিয়াছিলেন, তখন তথাকার বড় বড় ইংরেজ আমলাদের সঙ্গে ক্যাথারিন মেয়োর খুব দহরম মহরম। লেখিকা কলিকাতায় কর্নীলিয়া সোরাবজী নাম্নী ভারতবিদ্বেষী অন্য এক লেখিকার অতিথি ছিল। ক্যাথারিন মেয়োকে কালীঘাটের মন্দিরের ও শ্মশানের সব-কিছু দেখাইবার ভার পড়িয়াছিল বাবু হরিদাস হালদারের উপর। খবরের কাগজে প্রকাশিত সরদার শার্দ্দূল সিংহের চিঠি হইতে জানা যায়, পাঞ্জাবে ক্যাথারিন মেয়ো টিকটিকি পুলিসের সাহায্য পাইয়াছিল। বুঝা যাইতেছে, সরকারী বন্দোবস্ত এরূপ হইয়াছিল, যাহাতে ভারতবর্ষের মন্দ সব কিছু বিকৃতভাবে ক্যাথারিন মেয়ো দেখিতে পায়। ভারতবর্ষে অগণিত সুন্দর দেবমন্দির আছে, যাহার স্থাপত্য উৎকৃষ্ট এবং যেখানে পশুবলি হয় না। তাহা না দেখিয়া ক্যাথারিন মেয়ো দেখিল কেবল কালীঘাটের মন্দিরে পাঁঠা বলি, ও তাহার ফোটোগ্রাফ তুলিয়া বহিতে ছাপিল।

—

ক্যাথারিন মেয়োর প্রথম মিথ্যা কথা

ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার কাগজের সমালোচনায় দেখিলাম, "মাদার ইণ্ডিয়া" বহির দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাক্যেতেই বলা হইতেছে, যে, কলিকাতায় অনেক বহির দোকানে রাশীকৃত রুশীয় রাজনৈতিক পুস্তিকা বিক্রীর জন্য রাখা হয়, তাহার উপর মাছির আড্ডা, এবং রক্তহীন অপ্রশস্তবক্ষ ধুতিপরা ছাত্রেরা নিবিষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করে। আমরা জানি, ইহা নির্জলা মিথ্যা কথা। কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে একজনও রুশীয় ভাষা জানে কিনা সন্দেহ। সুতরাং রুশীয় ভাষায় লেখা চটি-বহি রাশি রাশি বিক্রীর জন্য আনিবে, এমন আহাম্মক দোকানদার এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। রুশীয় ছাড়া আমাদের ছাত্রদের জানা অন্য কোন ভাষায় লেখা রুশীয় রাজনৈতিক পুস্তিকাও কলিকাতার কোন দোকানে থাকে না; কেননা, গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারেই এরকম বহি আমদানী করা নিষিদ্ধ। কিন্তু মনে করুন, যদি কোন দোকানদার কোনপ্রকারে গোপনে সেরূপ বহি আমদানী করে (যাহা করিবার কোন কারণ নাই), তাহা হইলেও এমন বেকুব কে আছে, যে, সেগুলা প্রকাশ্যভাবে বিক্রীর জন্য টেবিলে সাজাইয়া রাখিবে? রুশীয় পুস্তিকাগুলার উপর এত মাছিই বা বসিবে কেন? সেগুলা কি রক্তমাখা?

ক্যাথারিন মেয়োর মতে ভারতীয়েরা আফ্রিকার বর্ব্বরদের চেয়েও নিকৃষ্ট, ঠিক্ মানুষ নয়, মনুষ্যের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর এক রকম জীব; ইংরেজরাজত্ব আছে বলিয়া এই প্রাণীগুলা টিকিয়া আছে, নতুবা ভারতের উত্তরপশ্চিম-সীমার ওপার হইতে মনুষ্যনামধারী জীবেরা আসিয়া ভারতীয়দেয় উচ্ছেদ সাধন করিত। ইংরেজরাজত্বের এমন মিথ্যা ও হাস্যকর সমর্থন পূর্ব্বে কখন শুনি নাই। ভারতীয়দের ইতিহাস ইংরেজরাজত্বের কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। ইংরেজরা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে তাহা হইলে ভারতীয়েরা টিকিয়াছিল কেমন করিয়া?

ক্যাথারিন মেয়োর বহির এবং পিল্চার নামক লোকটার ভারতীয় বিধবাদের কুৎসার একটা কুফল এই হইয়াছে, যে, ভারতীয়েরা উত্তেজিত হইয়া আমেরিকার ও বিলাতের সামাজিক সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির প্রতিই বেশী করিয়া দৃষ্টিপাত করিতেছে। অধিকন্তু আমাদের সত্য সত্য যে-সব দোষ আছে, তাহা নাই, বা তাহা দোষ নয়, বা তাহা যতটা অনিষ্টকর বা নিন্দনীয় বলা হয় ততটা অনিষ্টকর ও নিন্দনীয় নহে, এই-প্রকার কথা বলিবার আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিতেছে। তাহা হিতকর নহে। পাশ্চাত্য সমাজ নির্দ্দোষ নহে। কোন কোন দিকে আমাদের দেশের চেয়ে ইউরোপ-আমেরিকার সামাজিক ব্যাধি গুরুতর। কিন্তু তাহার আলোচনার চেয়ে পাশ্চাত্যেরা তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও রাজনীতির কিগুণে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিতেছে, তাহার আলোচনা কল্যাণকর। কেবল পাশব বলে, অস্ত্রশস্ত্রের বলে, পাশ্চাত্য প্রাচ্যের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে না। কোন জাতির পাশব বলও তাহারা বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত হইলে অধিক দিন টিকিতে পারে না; যেমন প্রাচীন রোমকদের বল টিকে নাই। পাশ্চাত্যেরা বিজ্ঞানের বলে, বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রের বলে, বুদ্ধির বলে, এবং একতার বলে বলীয়ান্। বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে, বৈজ্ঞানিক অস্ত্র-

শস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে কতকগুলি মানসিক ও নৈতিক গুণের প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যতিরেকে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় না, উহা মার্জ্জিত হয় না। শিক্ষা দান ও লাভ করিতে হইলে, জ্ঞানবান হইতে হইলে, কতকগুলি মানসিক ও নৈতিক গুণের প্রয়োজন। একতার জন্যও কতকগুলি গুণের প্রয়োজন। পাশ্চাত্য জাতিসকলের, সকল রকম কৃতিত্বের মূলীভূত গুণসমূহের প্রতি মনোনিবেশ এবং আমাদের অন্তর্নিহিত সেইসব গুণের সম্যক্ বিকাশ সাধন আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাহার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে উত্তেজিত করিয়া যে পাশ্চাত্যের দোষ আবিষ্কার ও বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত করা হইতেছে, ইহাতে আমাদের অনিষ্ট হইতেছে। আমাদের সত্য দোষসকল সংশোধনের পরিবর্ত্তে তৎসমুদয়ের সমর্থন বা লঘুকরণে যে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মান হইতেছে, তাহাও অনিষ্টকর।

আশা করি, ভারতীয়েরা অপরের নিন্দা-কুৎসায় বিচলিত না হইয়া নিজ নিজ সদ্‌গুণ-সমূহের বিকাশসাধন ও দোষ-সমূহের উন্মূলনরূপ কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবেন।

স্বাধীনতালোপ ও জাতীয় দোষ

যে যে কারণে এক-একটা জাতির স্বাধীনতা লুপ্ত হয়, সামাজিক নানা দোষ তাহার অন্তর্গত বটে। কিন্তু তাহাই একমাত্র কারণ নহে। ইতিহাসে ইহাও দেখা গিয়াছে, যে, সামাজিক কোন কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট জাতির দ্বারা সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট জাতি পরাজিত হইয়া অধীনতা-পাশে বদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং সামাজিক কতকগুলি দোষ থাকিলেই কোন জাতির আত্মশাসন-অধিকার লুপ্ত হওয়া উচিত, ইহা সত্য নহে।

গত মহাযুদ্ধের ফলে কতকগুলি দেশকে স্বাধীন হইতে দেওয়া হইয়াছে, বা স্বাধীন করা হইয়াছে; পরাজয় সত্ত্বেও কোন কোন জাতিকে স্বাধীন থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। যাহারা স্বাধীন থাকিতে পাইল বা পরাধীন অবস্থা হইতে স্বাধীন অবস্থায় উপনীত হইল, কমিশন বসাইয়া তাহাদের সামাজিক সুনীতি দুর্নীতি সম্বন্ধে আগে অনুসন্ধান করিয়া তাহার পর তাহাদিগকে স্বাধীন থাকিতে বা হইতে দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ জয়ী জাতিরা এরূপ কোন একটা সিদ্ধান্ত করে নাই, যে, যাহারা চরিত্রবান্, যাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা নিখুঁত, যাহাদের দেশে কোন কুৎসিৎ রোগ নাই, যাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তাহারাই স্বাধীন হইতে বা থাকিতে পারিবে; এবং এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা কমিশন বসাইয়া জাতিসমূহের চারিত্রিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যবস্থার অনুসন্ধানের ফল অনুসারে কাহারও স্বাধীনতা এবং কাহারও বা অধীনতার ব্যবস্থা করে নাই। সুতরাং ক্যাথারিন মেয়ো আমাদের বিরুদ্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছে, সমুদয় সত্য হইলেও আমাদের স্বাধীন হইবার অধিকার লুপ্ত হইতে পারে না। আমাদের যাহা কিছু দোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অতীত কালের ও বর্ত্তমান সময়ের বড় বড় স্বাধীন জাতিদের সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। তা ছাড়া, ঐ সকল স্বাধীন জাতিদের মধ্যে এমন অনেক দোষ আছে, যাহা আমাদের নাই।

জানি, তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমরা স্বাধীন হইতে পারিব না। সেইজন্য, আমাদিগকে চরিত্রে, জ্ঞানে, একতায়, দৃঢ়তায়, স্বার্থত্যাগে ও শক্তিতে ইংরেজদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে। ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু দুঃসাধ্য বটে। কিন্তু দুঃসাধ্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ মনুষ্যত্বের চরম পরিণতি ও পুরস্কার। এই সাধনা আমাদের হউক।

মহাভারতে আছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নল রাজা শুচি ছিলেন, ততক্ষণ শনি বা কলি তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। অশুচিতার ছিদ্র অবলম্বন করিয়া তবে শনি তাঁহার দেহে প্রবেশ করে। আমরা যে-পরিমাণে নির্দ্দোষ হইব, যে পরিমাণে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ভাল হইবে, সেই পরিমাণে আমরা আমাদের শত্রুদের নিন্দা ও অনিষ্ট-চেষ্টা অগ্রাহ্য করিতে পারিব। শত্রুদের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়; তাহাদিগকে তর্কে পরাজিত করা দরকার। কিন্তু তার চেয়েও আবশ্যক নিজেদের সত্য দোষ সংশোধন।

গঙ্গাজলঘাটীর কর্ম্মীর প্রতি অবিচার

বাঁকুড়ার "যুগদীপ" কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হইয়াছে।

বাকুড়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ত্যাগী কর্ম্মী অহিংস অসহযোগী শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের নামে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অজুহাতে যে ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ জন্য কাপিষ্টা গ্রামে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল সিংহের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্ব-সর্ম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :—

"সরকার-পক্ষ পূতচরিত্র গোবিন্দ-বাবুর নামে গঙ্গাজলঘাটীর বিদ্যালয়-গৃহে প্রবেশ নিষেধ করিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার অজুহাতে যে ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছেন, এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। উক্ত বিদ্যালয়-গৃহটি বর্ত্তমানে জাতীয় বিদ্যালয় কমিটির অধীনে আছে। গোবিন্দ-বাবু জাতীয় বিদ্যালয় কমিটির সম্পাদক ; উক্ত বিদ্যালয় গৃহে তাঁহার কথনও অনধিকারপ্রবেশ হয় না। কর্ত্তৃপক্ষ অজ্ঞতা-বশতঃ তাঁহার নামে যে প্রবেশনিষেধাত্মক নোটিশ দিয়াছেন, এই সভা তাহার নিন্দা করিতেছে।"

আমরা গোবিন্দ-বাবুকে জানি। যে অমর-কানন আশ্রমে তাঁহার দেশহিতৈষণা ও স্বার্থত্যাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। গোবিন্দ-বাবু শ্রদ্ধেয় লোক। তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা প্রয়োগ শোচনীয় ভ্রম। তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলিতে চাই না। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নোটিশ প্রত্যাহার করিলে ভাল হয়। অতঃপর কি আমাদিগকে শুনিতে হইবে, যে, অমুকের উপর, নিজের বাসগৃহে প্রবেশে দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনা আছে বলিয়া, ১৪৪ ধারা প্রযুক্ত হইয়াছে ? হাকিমি অন্যায়াচরণ হাস্যকর হইলে তাহাতে গবর্ন্মেণ্টের সুখ্যাতি হয় না।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় বাঙালী জাতির দুর্নাম হইয়াছে—যদিও উহা ফেল হইয়াছে কয়েকজন প্রতারকের দোষে। যাহাদের বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণিত হইবে, তাহাদের শাস্তি হইবে। সে-বিষয়ে এখন কিছু বলিবার নাই।

অবাঙালীরা যাহাই মনে করুন, একটি ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাহা হইতে আমরা নিজে যেন স্বজাতির সকল লোকের উপর বিশ্বাস না হারাই। ইংরেজদের এবং অন্য সব ধনী জাতিদের অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে ; ভদ্রবেশধারী চোরদের দোষেও অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া তাহারা স্বজাতীয় সব লোকের উপর বিশ্বাস হারায় নাই। তাহারা যেমন কর্ম্মে অসমর্থ বা অনভিজ্ঞ কিংবা প্রবঞ্চকদিগের সম্বন্ধে খুব বেশী সাবধান হইয়াছে, আমাদিগকেও তাহাই হইতে হইবে। কিন্তু সব রকম কাজ দক্ষতা, সাবধানতা ও সাধুতার সহিত করিয়া যাইতে হইবে ; হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কেবল বিদেশী জাতিদের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা একথা বলিতেছি না। কলিকাতায় ও বাংলাদেশের মফঃস্বলের নানা স্থানে বাঙালীদের অনেক ব্যাঙ্কের কাজ চলিতেছে। সবগুলি যে খুব ছোট, তাহাও নহে। সেগুলির কাজ নৈপুণ্যের সহিত চলাতে বুঝা যাইতেছে, যে, সব বাঙালী এবিষয়ে অকেজো, অনভিজ্ঞ বা প্রবঞ্চক নহে। ইহাতে আমাদের উৎসাহবৃদ্ধি হওয়া উচিত।

বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল্‌স্ ফেল হইতে হইতে যে রহিয়া গেল, ইহা সুখের বিষয়। নতুবা বিস্তর ধনীদরিদ্রের টাকা যাইত এবং বাঙালীর কলঙ্ক আরও বাড়িত। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে কিরূপ লাভ কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা জানি না। কিন্তু বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্ যে খুব লাভের জিনিষ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার জিনিষের কাট্‌তি বরাবরই খুব ছিল। অনেক সময় চাহিদার অনুরূপ মাল কল জোগাইতে পারিত না। ফলে অংশীদারদিগকে মুনফা দিয়াও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে ২৯ লক্ষ টাকা জমা ছিল, এবং বিক্রেতার নিকটও ৭।৮ লাখ টাকা পাওনা ছিল। তা ছাড়া, অনেক লাখ টাকা চুরিরও অভিযোগ আছে। সততার ও দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইলে কলের শ্রীবৃদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

মন্ত্রী অপসারণ, দ্বৈরাজ্যবিনাশ নহে

যাহাদের ভোটে চক্রবর্ত্তী-গজনবীর মন্ত্রিত্ব গেল, তাহারা সকলে দ্বৈরাজ্য বিনাশের জন্য ভোট দেয় নাই। কেহ কেহ সেইজন্য দিয়াছে বটে ; কিন্তু অন্য কেহ কেহ, যেমন রহিমী দল, গজনবীর প্রতি ব্যক্তিগত অনাস্থা বা আক্রোশ বশতঃ

ভোট দিয়াছে। তাহাদের মনোমত অন্য মন্ত্রীদের দ্বারা দ্বৈরাজ্য শাসনপ্রণালী চলায় তাহাদের আপত্তি নাই, বরং মত আছে। সুতরাং দ্বৈরাজ্য ধ্বংস করিলাম বলিয়া উল্লাসের কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

কেহ যদি দ্বৈরাজ্যকে স্বায়ত্তশাসন বলিয়া দেশের লোককে বুঝাইতে চায়, কিম্বা বুঝাইতে চায়, যে, দ্বৈরাজ্য-সূত্রে স্বরাজ পাওয়া যাইবে, বা উহা স্বরাজের পথে আধ-রাস্তার পান্থশালা, এবং যদি তাহার সে-চেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে দ্বৈরাজ্য জিনিষটা একজনের স্বৈর-রাজ্য অপেক্ষাও খারাপ। কেননা, একজনের স্বেচ্ছাচার জিনিষটাকে লোকে চেনে, ঘৃণা করে, ভয় করে ও তাহার সম্বন্ধে সাবধান থাকে। কিন্তু যাহা গণতন্ত্র নহে, তাহাকে গণতন্ত্র বলিয়া চালাইবার চেষ্টা সফল হইলে মানুষ, অসাবধান হইয়া পড়ে, এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আলস্য করিতে পারে।

কিন্তু ভারতে প্রচলিত দ্বৈরাজ্য যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটা উপায় নহে, ইহা মনে রাখিতে পারিলে (তাহা সহজও বটে) দ্বৈরাজ্য নিরবচ্ছিন্ন আমলাতন্ত্র বা স্বৈর-রাজ্য অপেক্ষা কিছু ভাল। ইহার দ্বারা কিছু দেশহিত হইতে পারে, কিছু অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে।

সেইজন্য আমরা মনে করি, কেহ যদি দ্বৈরাজ্য সত্য-সত্যই বিনষ্ট করিতে পারেন, এবং অধিকন্তু প্রকৃত স্বরাজ্য স্থাপন করিতে পারেন, অন্ততঃপক্ষে স্বরাজ্যের পথ পরিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি প্রশংসার্হ। কিন্তু বাংলাদেশে শুধু যেমন মন্ত্রীর অপসারণ হইতেছে, দ্বৈরাজ্যের পরিবর্ত্তে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও স্বৈরতা বাড়িতেছে, তাহা ভাল নয়। কর্ম্মঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, তেজস্বী মন্ত্রীদের দ্বৈরাজ্য তার চেয়ে ভাল। চক্রবর্ত্তী ও গজনবী সেরূপ মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মে নাই।

বাংলা দেশে এখনও যে হিন্দুমুসলমানে বিরোধ চলিতেছে, তাহার জন্য গজনবী অনেকটা দায়ী। তিনি মন্ত্রী হইবার আগে মসজিদের সামনে হিন্দুদের গীতবাদ্য সহকারে গমন বন্ধ করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন—যদিও কোরানে কোথাও মসজিদের সম্মুখে এরূপ গীতবাদ্য নিষিদ্ধ হয় নাই এবং যদিও হিন্দুদের এই অধিকার প্রীভিকৌন্সিলের রায়ে পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে। মুসলমান বলিয়াই কাহারও মন্ত্রী হওয়ায় আপত্তি হইতে পারে না; কিন্তু ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতার জন্য নামজাদা কোন হিন্দু, মুসলমান বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে মন্ত্রী করা উচিত নহে। চক্রবর্ত্তীর বেঙ্গলন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এবং তাঁহার জামাতার নামে নানা অভিযোগ তিনি মন্ত্রী থাকিতে থাকিতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এইজন্য নিজের বিরুদ্ধে ভোটের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি পদত্যাগ করিলে ভাল করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এই দুই কারবার সম্পর্কে কোন অপরাধের কথা অবশ্য উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু তিনি যদি কারবারে মনোযোগী, সাবধান ও সুদক্ষ হইতেন, তাহা হইলে এগুলির এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। তিনি যে ঐ দুটির জন্য নিজে ৪৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত জামীন হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার প্রশংসার কথা।

—

প্রাচ্যের বিরুদ্ধে নিন্দা-অভিযান

হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধ, পৃথিবীর এই তিনটি প্রধান ও প্রাচীন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় ভারতবর্ষে। ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এশিয়া-মাইনরে। মুসলমানদের ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় আরবদেশে। বৌদ্ধধর্ম্ম ছাড়া চীনের নিজের প্রধানতঃ নীতিমূলক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কংফুচ বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক। চীন, হিন্দু, ইহুদী ও আরব এই চার প্রাচীন সভ্য জাতি এখনও জীবিত আছে। চীনদের বিরুদ্ধে ত অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ এবং তদুপরি লেখনীর যুদ্ধ চলিতেছে। অন্যেরা সকলে সর্ব্বত্র স্বাধীন না হইলেও নানাদিকে তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত ও অনুভূত হইতেছে। এইজন্য ঠিক একই সময়ে হিন্দু, মুসলমান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে মসীযুদ্ধের অবতারণা দেখিয়া এই যুগপৎ আক্রমণের কারণ সম্বন্ধে কৌতূহল হয়। একই সময়ে সকলের প্রতি আক্রমণ কি সম্পূর্ণ আকস্মিক?

হিন্দুকে আক্রমণ করিয়াছেন বার্ণার্ড শ, ক্যাথারিন মেয়ো, পিল্চার, প্রভৃতি। সম্প্রতি "থামিল্লা" (*Thamilla*

নামক একখানা ফরাসী বহির ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। উহার প্রকাশকেরা বলেন,

"Above all else, Thamilla is a revelation of the blighting effect of Moslem law on Moslem womanhood. The French original was written in order to compel attention to the rights of women, and it was reproduced in English, as the translators (both American women) state, because we heard in it the poignant and inarticulate cry of the women in all the East, without hope in the world."

তাৎপর্য্য। "মুসলমান আইন মুসলমান নারীদের উপর কিরূপ সর্ব্বনাশক প্রভাব বিস্তার করে, থামিল্লায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মূল ফরাসী বহিটি নারীর অধিকার বিষয়ে মনোযোগ দিতে বাধ্য করিবার জন্য লিখিত হয়। এবং অনুবাদকেরা (উভয়েই আমেরিকান্ স্ত্রীলোক) বলেন, যে, উহা ইংরেজীতে অনুবাদ করা হইয়াছে এইজন্য, যে, উহাতে আমরা মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বপ্রকার আশা-বিহীন সমুদয় প্রাচ্যের স্ত্রীলোকদের তীব্রজ্বালাময়ী অব্যক্ত ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলাম।"

প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্য লোকদের প্রভুত্ব করিবার নবতম ওজুহাত, প্রাচ্য নারীদিগকে তাহাদের পিতাভ্রাতা-স্বামীদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা!

ক্যাথারিন মেয়ো বার্ণার্ড শ প্রভৃতির আক্রমণ হিন্দুদের উপর, কারণ ইংরেজদের অধীন জাতিদের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী, শিক্ষায় অগ্রসর, এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশী তৎপর। ফরাসী গ্রন্থকার আক্রমণ করিয়াছেন মুসলমানদিগকে (এবং আনুষঙ্গিকভাবে সমুদয় প্রাচ্যকে) বোধ হয় এইজন্য, যে, সীরিয়ায় মুসলমানেরা ফ্রান্সের অভিভাবকত্ব অগ্রাহ্য করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল এবং স্পেনের সাহায্য করিতে গিয়া ফরাসীদিগকে মুসলমান রিফ্‌দের সহিতও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লিখিত ফরাসী বহিটির ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইবার কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, পরাধীন মুসলমানদের অধিকাংশ ইংরেজের প্রজা, সুতরাং তাহাদিগকে কেন ইংরেজের অধীন করিয়া রাখা দরকার, তাহার একটা কারণ দেখান চাই।

বাকী থাকে ইহুদীরা। পাশ্চাত্য খৃষ্টিয়ান্‌রা বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের নিন্দাবাদ ও শত্রুতা করিয়া আসিতেছে। এমন কোন নিষ্ঠুর অত্যাচার নাই, যাহা তাহাদের উপর না হইয়াছে। সুসভ্য আমেরিকার কু ক্লুক্স ক্ল্যান নামক সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ইহুদী-দিগকে তাড়ান বা বধ করা। ইহুদীদের বিরুদ্ধেও সম্প্রতি রডেরিক্ ষ্টোলথেইম্ নামক এক জার্ম্মান "ইহুদীদের সিদ্ধিলাভের হেঁয়ালি" ("Riddle of the Jews' Success") নামক এক বহি লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, যে, কলেরা-বীজাণুর মত ইহুদীরা ইউরোপীয় সভ্যতার জীবনোৎসকে বিষাক্ত করিয়াছে। তাঁহার মতে গত মহাযুদ্ধটা সম্পূর্ণরূপে ইহুদীরা ঘটাইয়াছিল; তাহারা জার্ম্মানীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাটকে তাঁহার রাজত্বের শেষ পনর বৎসর ধরিয়া ঘিরিয়াছিল ও তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিয়াছিল। ইহুদীদিগকে এই পুস্তকে নীতিহীন ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, যে, প্রধানতঃ তাহারাই পাপব্যবসার জন্য বালিকা ও নারী সংগ্রহ করে। ইহুদীদের মধ্যে খুব দুষ্ট লোক আছে, অন্য জাতির মধ্যেও আছে। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, ইহুদীরা সংখ্যায় কম হইলেও অনেক শতাব্দী হইতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ অনেকে ইহুদী।

—

ছোট ছোট স্বাধীন দেশ ও বঙ্গের ছোট ছোট জেলা

অন্যত্র প্রকাশিত ময়মনসিংহের বক্তৃতায় দেখাইয়াছি, যে, পৃথিবীর অনেক স্বাধীন দেশের লোকসংখ্যা ময়মনসিংহের চেয়ে কম, এবং সেইসকল দেশে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি ময়মনসিংহ অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। ধনশালিতাতেও তাহারা ময়মনসিংহের অনেক উপরে। অন্য কোন কোন বড় জেলার লোকেরাও দেখিতে পাইবেন, যে, ঐ বক্তৃতায় উল্লিখিত কোন কোন স্বাধীন দেশের লোকসংখ্যা তাঁহাদের জেলার চেয়ে কম বা তাহার সমান। বঙ্গের ছোট জেলাগুলির লোকদেরও জানা উচিত, যে, কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র আছে, যাহার লোকসংখ্যা তাঁহাদের জেলাগুলির চেয়ে কম। নিম্নলিখিত জেলাগুলির লোকসংখ্যা অন্য সবগুলির চেয়ে কম।

জেলা	লোকসংখ্যা
হুগলী	১০,৮০,১৪২
বগুড়া	১০,৪৮,৬০৬

জেলা	লোকসংখ্যা
বাঁকুড়া	১০,১৯,৯৪১
হাবড়া	৯,৯৭,৪০৩
মালদহ	৯,৮৫,৬৬৫
জলপাইগুড়ী	৯,৩৬,২৬৯
বীরভূম	৮,৪৭,৫৭০
দার্জিলিং	২,৮২,৭৪৮
চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল	১,৭৩,২৪৩

লোকসংখ্যা ১৯২১ সালের সেন্সাস্ অনুসারে দেওয়া হইয়াছে।

ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত যে যে দেশে প্রধানতঃ শ্বেত অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনাধিকার আছে, তাহারা কার্য্যতঃ স্বাধীন। তাহাদের নাম না করিয়া ছোট ছোট সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ সকলের নাম করিব।

আলবানিয়া। লোকসংখ্যা ৮,৩১,৪৭৭। তন্মধ্যে শতকরা ৭১জন মুসলমান। এই দেশে ৫৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চতর বিদ্যালয় ১৪টি আছে। শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং কলেজ একটি আছে। একটি আমেরিকান শিল্পশিক্ষালয় এবং মেয়েদের জন্য কলেজ আছে। ১৯২৬-২৭ সালের রাজস্ব ২,৩০,০৯,২৬০ সোনার ফ্রাঙ্ক।

কোষ্টা রিকা। লোকসংখ্যা ৫,০৭,১৯৩। ৪৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি বালকদের উচ্চতর বিদ্যালয়, ১টি বালিকাদের কলেজ, ১টি নর্ম্যাল স্কুল, দুটি সাধারণ কলেজ, এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ১৯২৬ সালে রাজস্ব হইয়াছিল ১৩,৯৩,০২০ পাউণ্ড।

ডোমিনিকা। লোকসংখ্যা ৮,৯৭,৪০৫। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। এখানে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়; নর্ম্যালস্কুল, ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সরকারী বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ৯৭২। ১৯২৬সালে রাজস্ব ১,১৯,৬৮,০০০ ডলার।

হণ্ডুরাস। লোকসংখ্যা ৭,৭৩,৪০৮। অধিবাসীরা প্রধানতঃ আদিম লাল আমেরিকান্। ৭ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালকবালিকাদের শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। ১৯২৪-২৫ সালে ৯৮৭টি বিদ্যালয় ছিল। ছাত্রসংখ্যা ৪৩,২৯৬, ছাত্রীসংখ্যা ৩৫,৫৬১। একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তাছাড়া, যুদ্ধবিদ্যা, আকাশযান-চালন, আইন, শিক্ষারিদ্যা, বাণিজ্য, কৃষি, প্রভৃতি শিখাইবার বিদ্যালয় আছে।

লুক্সেম্বুর্গ। লোকসংখ্যা ২,৬০,৭৬৭। ৬ হইতে ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সব বালকবালিকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৯৯৫ জন শিক্ষক আছেন। তার মধ্যে ৪৮২ জন শিক্ষয়িত্রী। তা ছাড়া উচ্চতর বিদ্যালয় আছে ৩৮টি, দুটি শিল্প বাণিজ্য কলেজ, ২টি মেয়েদের কলেজ, একটি শিল্পবিদ্যালয়, একটি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষার কলেজ, একটি খনি-বিদ্যালয়, একটি কৃষি বিদ্যালয়, এবং একটি সংগীত পরিষৎ আছে। ১৯২৬ সালের রাজস্ব ১৬,৮৪,৭৭,৩৪৭ ফ্রাঙ্ক।

নিকারাগুয়া। লোকসংখ্যা ৬,৩৮,১১৯। অনেকে আদিম লাল আমেরিকান্। শতকরা ৫০ জন লিখন-পঠনক্ষম, বঙ্গে শতকরা ১০ জন লিখনপঠনক্ষম। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সব রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৮৯।

পানামা। লোকসংখ্যা ৪,৪২,৪৮৬। ৭ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত সব বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ৫০২টি স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হয়। বালক বালিকারা একত্র শিক্ষা পায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মেয়েদের জন্য নর্ম্যাল স্কুল এবং ছেলেদের জন্য নানাবিধ শিল্প কারিগরী ও ব্যবসা শিখাইবার স্কুল আছে। অনেক যুবা ছাত্র-ছাত্রী ইউরোপ ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে পানামা গবর্ন্মেণ্টের ব্যয়ে শিক্ষা পাইতেছে। ১৯২৩-২৪ সালে রাজস্ব ২১, ২৪, ৮৩৬ পাউণ্ড।

পারাগুয়ে। লোকসংখ্যা ৮,৫৩,৩২১। শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২০৪; ছাত্রসংখ্যা ৪০,১৫৯, ছাত্রী ৩০,৬৬১। তাছাড়া বেসরকারী ৩১টি স্কুল আছে। তিনটি ন্যাশন্যাল কলেজ আছে। ১টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৬টি নর্ম্যাল স্কুল আছে। এতদ্ভিন্ন শিক্ষাবিভাগের অধীন জাতীয় লাইব্রেরী, জাতীয় প্রাণিবিদ্যা মিউজিয়ম, এবং বোটানিক্যাল-জুলজিক্যাল উদ্যান আছে।

মোনাকো। লোকসংখ্যা ২২,১৫৩ (বাইশ হাজার একশত তিপ্পান্ন)।

উপরে যে-সব ছোট ছোট স্বাধীন দেশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিলাম, তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত যে প্রকার, বঙ্গের ছোট বা বড় জেলাগুলিতে তাহা নাই। তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্তের সহিত আমাদের জেলাগুলির শিক্ষার বন্দোবস্তের কত প্রভেদ, আমরা কত নীচে, তাহা প্রত্যেক জেলার লোকেরা চেষ্টা করিলেই নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। আমাদের অনুন্নত অবস্থার রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণও অনুমান করিতে পারিবেন। আমরা তুলনার জন্য পৃথিবীর সুসভ্য, সমুন্নত, শক্তিশালী, ধনী দেশসমূহের উল্লেখ করি নাই। ছোট ও অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা দেশ কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছি। তাহাদের সহিত তুলনাতেও আমরা পশ্চাতে পড়িয়া আছি। আমাদের অনেক নেতা দেশের জন্য প্রাণ দিবার নিমিত্ত যুবকদিগকে আহ্বান করিয়া থাকেন। আমরা বৃদ্ধ; প্রাণ দিবার প্রবৃত্তি (এবং অনেকে বলিবেন সাহস) আমাদের নাই। সুতরাং তাহার জন্য আহ্বানও কাহাকেও করি না। কিন্তু দুটি অবস্থায় আমরাও সে আহ্বানের অর্থ বুঝিতে পারি। প্রথম, নারীর সম্মান ও সতীত্ব রক্ষার জন্য। বঙ্গে, এবং অন্য কোন কোন প্রদেশেও, প্রাণপণ করিয়াও নারীর সম্মান ও সতীত্ব রক্ষার প্রয়োজন অনেক স্থলে ও অনেক সময় হইতেছে। রক্ষার চেষ্টায় প্রাণ যে যাইবেই, এমন নয়। চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র কুমিল্লার পুণ্যবান্ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হত হইয়াছেন। সর্ব্বত্রই নারীরক্ষার চেষ্টা হওয়া চাই। এপর্য্যন্ত আত্মরক্ষার চেষ্টায় যত জন বঙ্গনারীর প্রাণ গিয়াছে, নারীরক্ষাচেষ্টায় ততজন বঙ্গীয় পুরুষের প্রাণ যায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ স্বাধীনতার জন্য যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং অন্য কোন কোন দেশ যেরূপ স্বাধীনতা-যুদ্ধ করিয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ যুদ্ধের যদি সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে দেশের জন্য প্রাণ দিবার আহ্বানের একটা সোজা মানে বুঝা যাইত। কিন্তু সেরূপ সম্ভাবনা আমাদের জীবিতকালে দেখি নাই।

এইজন্য আমরা পরিশ্রমে সমর্থ সকল পুরুষ ও নারীকে দেশের উন্নতির জন্য জীবনের প্রত্যেক দিন, সপ্তাহ, মাস ও বৎসর উৎসর্গ করিতে দেখিলে আনন্দিত হইব। দেশের জন্য খাটিতে খাটিতে যাহার মৃত্যু হইবে, তিনি ধন্য। জানি, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথায় মন যেমন মাতিয়া উঠে, এমন আর কিছুতে নহে। আমরাও স্বাধীনতা চাই। ইতিহাসে পড়িয়াছি, কোন্ দেশ কি উপায়ে স্বাধীন হইয়াছে। তাহার কোনটারই আমাদের দেশের অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নাই। এইজন্য যে যে দিকে অগ্রগতির ও উন্নতির পথ ভাল করিয়া দেখিতে পাই, তাহার কথাই বলি। হয় ত সেই সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইতে স্বাধীনতার পথও দেখিতে পাওয়া যাইবে। আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান হওয়ার আমরা পক্ষপাতী নহি। অবশ্য, আমরা যাহাকে আলেয়া মনে করি, অন্য অনেকে তাহা মনে না করিতে পারেন। তাঁহারা যে আলো দেখিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহাদের আছে।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ে দল পাকান

অনেক জনের পরামর্শ ও মত অনুসারে যে-সব প্রতিষ্ঠানের কাজ হয়, তাহাতে প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেক ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিয়া তৎসম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহাকেই কার্য্যনির্ব্বাহের আদর্শ প্রণালী মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানে লোভ, ভয়, চক্ষুলজ্জা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, অনির্দ্দিষ্ট নানাপ্রকার লাভের আশা, টাকার বা অন্যকিছুর ঘুষ ইত্যাদি নানা কারণ বশতঃ স্বাধীন মত প্রকাশ হয় না। তা ছাড়া নানা উপায়ে দল পাকানও হইয়া থাকে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা উপায়ে আশুবাবু নিজের লোক এত ঢুকাইয়াছিলেন, যে, তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার ও তাঁহার দলের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন তাঁহার দলের প্রভাব কিছু কমিয়াছে বলিয়া দল পাকাইবার চেষ্টা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিতে হয়। কাজে কাজেই গবর্ন্মেণ্টের যদি কোন একটা কাজ হাসিল করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সরকারী প্রধান শিক্ষা-কর্ম্মচারীদিগকেও দল পাকাইতে হয়। তখন আশুবাবুর উত্তরাধিকারীরা চীৎকার জুড়িয়া দেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে

সরকারের গোলাম করিবার চেষ্টা হইতেছে। আশুবাবুর উত্তরাধিকারীদের দলপাকান যদি মন্দ না হয়, তাহা হইলে শিক্ষা-সেক্রেটরীর বা ডিরেক্টরের দল-পাকানটা কেন মন্দ হইবে? অবশ্য দুটাই মন্দ। কিন্তু চালুনী ও ছুঁচের ঝগড়াটা সুশোভন নহে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ সাহেব যখন শিক্ষা-বিভাগের ইংরেজের কর্তৃপক্ষের দলপাকানর নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন যদি মুখুজ্যে-বাঁড়ুজ্যেদের দল-পাকানরও নিন্দা করিতেন, তবে বুঝিতাম তিনি ন্যায়বান, নিরপেক্ষ লোক। মুখুজ্যে-বাঁড়ুয্যে দলের গোলামীও গোলামী, লিণ্ডসে-ওটেনের গোলামীও গোলামী। মুখুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে দলের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতারক্ষার ধুয়া এবং ঐদলের প্রাধান্য-রক্ষা সমার্থক। তাঁহারা নিঃস্বার্থ কর্ম্মীও নহেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বেতন, কাগজ-পরীক্ষার ফী ইত্যাদি বাবতে বেশ দুপয়সা রোজগার করেন। আত্মোৎসর্গ জিনিষটা ভাল; কিন্তু এক মুরগী যেমন তিন চার পাঁচ জায়গায় জবাই করা যায় না, তেমনই একই মানুষ হাইকোর্টে, ল-কলেজে, পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে, সেনেটে সীণ্ডিকেটে, ফ্যাকাল্টিতে বোর্ডে, একটা দেহকে মনকে উৎসর্গ করিতে পারে না।

একটা যুক্তি শুনিয়াছি, যে, বেসরকারী কতকগুলি লোকের প্রভাব হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করা সোজা, কিন্তু সরকারী প্রভুত্ব একবার স্থাপিত হইলে সহজে নিষ্কৃতি নাই। কথাটা আপাততঃ শুনিতে বেশ লাগে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া লওয়া দরকার। কুড়ি বৎসরের অধিক পূর্ব্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে কন্সটিটিউশ্যন হইয়াছে, তাহাতে সরকারের মনোনীত সভ্যদের সংখ্যাই বেশী। লর্ড কার্জ্জনের আইন বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের করতলস্থ করিবার জন্যই প্রণীত হইয়াছিল। তথাপি দীর্ঘকাল ধরিয়া আশুবাবু প্রভুত্ব করিয়াছেন, এবং এখন তাঁহার উত্তরাধিকারীরা করিতেছেন। সুতরাং সরকারী প্রভুত্ব বিনষ্ট করা যায় না, ইহা ঠিক্ নয়। সত্য বটে, সরকারী চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য সকল সময়ে আশুবাবুর মত ক্ষমতাশালী ও ফন্দীবাজ লোক পাওয়া যাইবে না। সেইজন্যই ত আমরা বহুবৎসর হইতে বলিয়া আসিতেছি, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ব্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা ন্যূনকল্পে শতকরা আশী জন করা হউক। তাহা হইলে সর-কারী মৎলব সিদ্ধি দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু তাহা হইলে আবার আশুবাবুরও প্রভুত্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকায় তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনার্থ প্রস্তুত সকল বিলেরই ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারই দলের লোকেরা নূতন বিল পেশ করিবেন বলিতেছেন!

যদুবাবুর উপর মুখুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে দলের বড় আক্রোশ; কেননা, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক সংস্কার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রভুত্বে স্বার্থে আঘাত লাগিবে। তাঁহারা যদুবাবুর ভাল কাজের সপক্ষে ভোট দেন না, অন্যে তাঁহার পক্ষে ভোট দিলে চীৎকার জুড়েন, যে, সরকার পক্ষ তাঁহার দিকে ভোট দিতেছে, তিনি সরকারের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন! যে স্বরাজ্য দলের লোকদের সঙ্গে মুখুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে দলের এখন দহরম মহরম, সেই স্বরাজ্য দলও ত কোন কোন আইন প্রণয়নের সময় ব্যবস্থাপক সভার সরকারী ও মনোনীত সভ্যদের সহিত এক দিকে ভোট দিয়াছেন। এইরূপ সহযোগিতার দ্বারা কি তাঁহারা তাহা হইলে গবর্ন্মেণ্টের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন বলিতে হইবে? যদুবাবুর কিম্বা অন্য কাহারও কোন ভুল হইতে পারে না বলিতেছি না। কিন্তু কোন একটা বা একাধিক কাজে গবর্ন্মেণ্ট পক্ষের সহযোগিতা করিলে বা পাইলেই তাহা হইতে অধীনতা বা আত্মবিক্রয় প্রমাণিত হয় না।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুপদাধিকারী

এক-একটা কাজে যদি অনন্যকর্ম্মা লোক লাগিয়া থাকেন, তাহা হইলে কাজ ভাল হয়। অনন্যকর্ম্মা লোক না পাওয়া গেলে অবশ্য অন্য কাজে নিযুক্ত লোকও অগত্যা লইতে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে ও অন্যান্য আইন কলেজে যাঁহারা অধ্যাপকের কাজ করেন, তাঁহারা ওকালতী ব্যারিষ্টারী করেন, তাহা দোষের বিষয় নহে; বরং, ওকালতী ব্যারিষ্টারীতে যাঁহাদের

কার্য্যলব্ধ অভিজ্ঞতা আছে, এরূপ অধ্যাপক কতকগুলি না হইলে ছাত্রদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না। সেইরূপ যাঁহারা মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল সমূহে এবং আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সমূহে অধ্যাপকতা করেন, তাঁহারা যে চিকিৎসাও করেন, তাহাতেও ছাত্রেরা অভিজ্ঞ লোকদের উপদেশ পাইবার সুযোগ পায়। কিন্তু যাঁহারা ওকালতী ব্যারিষ্টারী করেন, তাঁহারা আইন কলেজের অধ্যাপকতা ছাড়া যদি আবার ইংরেজী সাহিত্য প্রভৃতিরও অধ্যাপক হন, তাহা হইলে নানা দিক্ দিয়া তাহা আপত্তির কারণ হয়।

ওকালতী ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য আইন জানা ও আইনের চর্চ্চা রাখা আবশ্যক। এই জ্ঞান ও চর্চ্চা আইন কলেজে অধ্যাপনার সময় কাজে লাগে। কিন্তু আইনের ব্যবসা করিতে করিতে, আইন কলেজের অধ্যাপকতা করিতে করিতে, যাঁহারা কেবলমাত্র সাহিত্যাদির অধ্যাপকতা করেন, সাহিত্যাদি বিষয়ে তাঁহাদের সমকক্ষ হওয়া দুঃসাধ্য। তা ছাড়া, আইনব্যবসায়ী লোককে সাহিত্যাদির অধ্যাপক করিলে, অধ্যাপকতাকেই যাঁহারা জীবনের কার্য্য করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত, এরূপ লোকেদের উপর অবিচার করা হয়।

যাঁহারা উকিল ব্যারিষ্টার নহেন, কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যাদি শ্রেণীতে অধ্যাপকতা করিতে প্রস্তুত এবং করিবার যোগ্য, এরূপ লোক কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেক আছেন, এবং বাহিরেও আছেন। সেরূপ লোক থাকিতে, কোনও উকীল বা ব্যারিষ্টারকে আইন-কলেজের অধ্যাপকের পদের উপর আরও অন্য অধ্যাপকতা দেওয়া উচিত নহে, দিবার আবশ্যকও নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বৎসর হইতে এক একজন মানুষের বহুপদ-অধিকার কুপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইহা বন্ধ করা উচিত। এই কুপ্রথার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে আইন কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি দেখিতে পাইতেছি :—

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল ; রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল ; রাধাবিনোদ পাল, এম-এ, ডি-এল ; মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল ; অজয় দত্ত, এম্-এ, বি-সি-এল ; এম্-এ খুদা বখ্‌শ্, এম্-এ, বি-সি-এল্ ; শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল (ছুটীতে)।

ইহাঁদের মধ্যে মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য ও রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আবার ইংরেজীর অধ্যাপক, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ছুটীতে) আবার ভারতীয় দেশভাষার অধ্যাপক, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ইতিহাস এবং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই দুটি বিভাগের অধ্যাপক, অজয় দত্ত ও খুদা বখ্‌শ্ আবার ইতিহাসের অধ্যাপক, এবং রাধাবিনোদ পাল আবার বাণিজ্যের অধ্যাপক। আমরা ইঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই জানিতে চাই, যে, যাঁহারা কেবল অধ্যাপকতা করেন বা করিতে প্রস্তুত, এমন আটজন যোগ্যলোক কি বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে ইহাঁরা যে-বেতন পান সেই বেতনে সপ্তাহে ইহাঁদের সমান সময় ইহাঁদের অধ্যাপনার কাজগুলি করিবার জন্য পাওয়া যায় না? নিশ্চয়ই আগেও পাওয়া যাইত, এখনও পাওয়া যায়।

—

বাংলা দেশে নারীনিগ্রহ

বাংলা দেশে দুর্বৃত্ত লোকদের দ্বারা নারীদের উপর যত অত্যাচার হয়, তাহার সবগুলা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় না, সবগুলার জন্য আদালতে মোকদ্দমাও হয় না। লোকলজ্জার ভয়ে, সামাজিক পাতিত্যের ভয়ে, দুর্বৃত্তদের প্রতিহিংসার ভয়ে এবং সাক্ষীদের ভীরুতায় অনেক ঘটনা চাপা পড়িয়া যায়। বাকী যাহা প্রকাশিত হয়, সঞ্জীবনী কাগজে তাহার তালিকা অনেক সপ্তাহ ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছিল। ১৩২৯ সাল হইতে ১৩৩৩ পর্য্যন্ত যত ঘটনা ঘটিয়াছে, সহযোগী তাহার তালিকা দিয়া সংক্ষেপে কয়েকটি তালিকায় তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কতকগুলি সংখ্যা সংকলন করিয়া দিতেছি। প্রথমে দিতেছি কোন্ জেলায় কোন্ সালে কতগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সংখ্যা।

জেলা	১৩২৯	১৩৩০	১৩৩১	১৩৩২	১৩৩৩	মোট
কলিকাতা	১	৫	১২	৩১	৩৯	৮৮
২৪ পরগণা	০	০	১৯	২০	৩২	৭১
নদিয়া	০	০	৫	১১	২৪	৪০
মুর্শিদাবাদ	০	০	৩	৩	২	৮
যশোর	০	১	৯	৮	৬	২৪
খুলনা	০	১	২	৩	১০	১৬
হাবড়া	০	১	৫	৫	৪	১৫
হুগলী	০	০	২	৩	৬	১১
বর্দ্ধমান	০	০	৫	৩	৪	১২
মেদিনীপুর	০	০	৪	২	৪	১০
বীরভূম	০	০	৪	০	১	৫
বাঁকুড়া	০	০	১	১	২	৪
রাজসাহী	০	০	৯	৪	১২	২৫
পাবনা	০	০	৬	৩	৭	১৬
বগুড়া	০	০	৬	৩	১১	২০
রংপুর	০	৯	২০	১৭	১৬	৬২
দিনাজপুর	০	০	২	৬	৫	১৩
জলপাইগুড়ি	০	০	৩	০	০	৩
দার্জ্জিলিং	০	০	১	২	১	৪
ময়মনসিংহ	০	১	২৫	২৪	২৮	৭৮
ঢাকা	০	২	১৬	৯	১৫	৪২
ফরিদপুর	০	০	৪	৬	১৬	২৬
বাখরগঞ্জ	০	০	২	৫	১৬	২৩
ত্রিপুরা	০	০	৪	৭	১	১২
নোয়াখালি	১	০	২	১	৩	৬
চট্টগ্রাম	০	০	৬	৫	৫	১৬
শ্রীহট্ট	০	১	৮	৮	১৪	৩১

নারীর উপর অত্যাচার যে বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বসাধারণের এ বিষয়ে অধিকতর সজাগ ভাব ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা বশতঃ হয় ত আগেকার চেয়ে এখন বেশী ঘটনা আদালতের গোচর করা হয়। কিন্তু শুধু এই কারণ দ্বারা সমুদয় বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা যায় না। ইহাও বলিলে চলিবে না, যে, বঙ্গের লোকেরা উত্তরোত্তর অধিকতর ভীরু হইয়া চলায় নারীদের উপর অত্যাচার করিতে দুর্বৃত্তদের সাহস বাড়িয়া চলিয়াছে; কেননা, দেশের লোকেদের ভীরুতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রমাণ নাই। অত্যাচার দমনের জন্য যে বিশেষ উপায় অবলম্বন করা এবং বেশী চেষ্টা করা উচিত, সে-বিষয়ে গবর্ন্মেণ্টের ঔদাসীন্য দুর্বৃত্তদিগকে বহুসংখ্যক কুমারী সধবা ও বিধবার উপর অত্যাচার করিতে উৎসাহিত করিতেছে মনে করিবার কারণ আছে। এইরূপ পৈশাচিক কাজ যে দুর্বৃত্তেরা দলবদ্ধ ভাবে করিতেছে, তাহার প্রমাণ নিম্নে একটি তালিকায় পাওয়া যাইবে।

এই পাঁচ বৎসরে নিগৃহীতা কুমারীর সংখ্যা ৬৬, ৫৪ জনের বয়স ৫ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত, ১২ জনের বয়স অজ্ঞাত। নিগৃহীতা সধবার সংখ্যা ৩০৮ জন; তন্মধ্যে ২১৪ জনের বয়স অজ্ঞাত, বাকী ৯৪ জনের বয়স ১১ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত। নিগৃহীতা বিধবাদের সংখ্যা ৯৬ জন; ৬৩ জনের বয়স অজ্ঞাত, ৩৩ জনের বয়স ১৩ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত।

নিগৃহীতাদের ধর্ম্ম

	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টিয়ান	অজ্ঞাত	মোট
কুমারী	৪০	২১	২	৩	৬৬
সধবা	২১৩	৮২	০	৮	৩০৮
বিধবা	৮৭	৫	০	৪	৯৬
অজ্ঞাত	১৩৭	৩৮	১	৩০	২০৬

হিন্দু নারীদের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার হইয়াছে দেখা যাইতেছে। তালিকাতে সধবাদের উপরই অত্যাচার বেশী দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যত ঘটিয়াছে, তাহাতে হয়ত বিধবাদের উপর অত্যাচার আরও বেশী হইয়া থাকিবে; তাহাদের পক্ষ হইতে মোকদ্দমা করিবার লোক সধবাদের পক্ষ হইতে মোকদ্দমা করিবার লোক অপেক্ষা হয় ত অনেক কম।

দলবদ্ধ নিগ্রহের তালিকা। অত্যাচারী হিন্দুর দল ৮০টা; ২ হইতে ৪ জনের দল ৫৪টা, ৫ হইতে অধিক লোকের দল ২৬টা। অত্যাচারী মুসলমানের দল ২২৭টা; ৮৮টা ২ হইতে ৪ জনের দল, ১৩৯টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল। অত্যাচারী খৃষ্টিয়ানের দল ১টা, সংখ্যা ২ হইতে ৪জন। হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত অত্যাচারীর দল ৩৯টা; ১৭টা ২ হইতে ৪জনের দল, ২২টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল। খৃষ্টিয়ান ও হিন্দু ৫ হইতে অধিক লোকের দল ১টা। খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান ৫ হইতে অধিক লোকের দল ১টা। অজ্ঞাতধর্ম্মাবলম্বী অত্যাচারীর দল ৮৪টা; ১২টা দুই হইতে ৪ জনের দল, ৭২টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল। মোট দল ৪৩৩টা; ১৭২টা ২ হইতে ৪ জনের, এবং ২৬১টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল।

প্রত্যেক দল একটি করিয়া স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছে। বাংলা দেশের এই পাপ যে কিরূপ পৈশাচিক, তাহা এই দলবদ্ধ নারকীয় অত্যাচার তালিকা হইতে বুঝা যাইতেছে।

বাংলা দেশের নেতারা, বাংলা দেশের গবর্মেণ্ট ইহা দমন করিতে চেষ্টা করিবেন না? বাংলা দেশের নারী-দিগকে রক্ষা করিবার কি কেহই নাই?

হিন্দু দ্বারা	হিন্দু	নারীর	নিগ্রহ	১৫২টা
”	মুসলমান	”	”	৯টা
”	খৃষ্টিয়ান	”	”	১টা
”	অজ্ঞাতধর্ম্মী	”	”	১৫টা
			মোট	১৭৭
মুসলমান দ্বারা	হিন্দু	নারীর	নিগ্রহ	২২২টা
” ”	মুসলমান	”	”	১১০টা
” ”	পার্শি	”	”	১টা
” ”	খৃষ্টিয়ান	”	”	১টা
” ”	অজ্ঞাতধর্ম্মী	”	”	১৭টা
			মোট	৩৫১
হিন্দুমুসলমান দ্বারা	হিন্দু	নারীর	নিগ্রহ	৩৬টা
”	মুসলমান	”	”	২
			মোট	৩৮
অজ্ঞাতধর্ম্মী দ্বারা	হিন্দু	নারীর	নিগ্রহ	৬৭টা
”	মুসলমান	”	”	২৩
”	অজ্ঞাতধর্ম্মী	”	”	২২
”	খৃষ্টিয়ান	”	”	১
			মোট	১৩৩
খৃষ্টিয়ান দ্বারা	মুসলমান	নারীর	নিগ্রহ	১
অজ্ঞাত ,,	খৃষ্টিয়ান	”	”	১
খৃষ্টান ”	”	”	”	১
” ”	অজ্ঞাতধর্ম্মী	”	”	১
” ”	হিন্দু	”	”	১
			সর্ব্বমোট	৬৯৪

সকলের চেয়ে অধিক সংখ্যক অত্যাচার হইয়াছে কলিকাতা সহরে। তাহার কারণ নানাবিধ হইতে পারে। এখানে পারিবারিক ও সামাজিক শাসনের বাহিরে হাজার হাজার পুরুষ বাস করে; গুণ্ডা আছে অগণিত; পাপব্যবসার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। সুতরাং এখানে নারীর উপর অত্যাচার বেশী হইবারই কথা। অন্যদিকে কিন্তু বঙ্গের সব জায়গার চেয়ে কয়েক বর্গমাইল জায়গায় সাধারণ পুলিস ও টিকটিকি পুলিস এখানে বেশী। লাটসাহেব বৎসরের অন্ততঃ কিছু সময় এখানে থাকেন। তাঁহার নাকের উপর এত নারীর সর্ব্বনাশ হইতেছে, অথচ বিশেষ কোন উপায় অবলম্বিত হইতেছে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

আমরা অবগত হইয়া প্রীত হইলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিষয়ের এম-এ ক্লাসে অনেকগুলি ছাত্রী পড়িতেছেন। ঠিক্ সংখ্যা জানিতে পারি নাই। শুনিলাম ইংরেজী সাহিত্যই পড়িতেছেন নয় জন। অন্যান্য বিষয়েও কয়েক জন পড়িতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দুবাড়ীর মেয়ে কয়েক জন আছেন।

ছাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্রামকক্ষ এবং তৎসংলগ্ন হাতমুখ ধুইবার ঘর প্রভৃতি আছে কিনা, এবং থাকিলে তাহা কিরূপ, জানি না। এ বিষয়টির প্রতি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট আর্টস্ কৌন্সিলের সভাপতি অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের দৃষ্টি পড়িয়াছে কিনা, জানি না।

ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য একটি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিলে হয়ত ছাত্রীর সংখ্যা আরো বাড়িতে পারে। ছাত্রীরা হাঁটিয়া ক্লাসে যাতায়াত করেন, তাহা বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু দূর হইতে তাহা করা তাঁহাদের পক্ষে সুসাধ্য নয়। ইংরেজ ও ইউরেশীয়েরা পর্দ্দা মানে না। কিন্তু তাহাদের সমাজের ছাত্রীদের জন্যও তাহাদের বিদ্যালয়গুলির গাড়ী আছে। এইজন্য গাড়ীর কথাটি তুলিলাম। জানি, ইহা ব্যয়সাধ্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বহুৎ বাজে খরচ করেন। যে-বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয় না, এবং যাহার পরীক্ষা লওয়া বা উপাধি দেওয়া হয় না, যাহার

কোন ক্লাস নাই, তাহার জন্য বহুবৎসর ধরিয়া হাজার হাজার টাকা খরচ হইয়া আসিতেছে। এইজন্য ছাত্রীদের নিমিত্ত আবশ্যক কিছু খরচ করিতে বলিতেছি।

—

বঙ্গের নদীতে ষ্টীমার কোম্পানী

বাংলাদেশের নদীগুলিতে ইংরেজদের যে-সব ষ্টীমার আছে, তাহাতে যাত্রীদের যত রকম অসুবিধা ও লাঞ্ছনা হয়, তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম, যে, দেশের লোকেরা এইসব অন্যায় ব্যবহার মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছে। সহ্য করিতে হইতেছে, ইহা সত্য; কিন্তু দেশের লোকেরা মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছে, ইহা ঠিক নয়। একটি ইংরেজী পুস্তিকায় দেখিতেছি, ছয় বৎসর পূর্ব্বে মৌলভী এ এইচ এম্ ওয়াজির আলি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ষ্টীমার কোম্পানীগুলিকে ভাড়া কমাইতে এবং সমুদয় ষ্টেশনে প্রতীক্ষাশালা নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য করিবার কথা তুলিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, যে, বড় বড় ষ্টেশন-সমূহেও কোন প্রতীক্ষাশালা নাই। তিনি ইহাও দেখাইয়াছিলেন, যে, অনেক স্থলে ভাড়া খুব বেশী লওয়া হইতেছে। মধ্যে মধ্যে অন্যায় রূপে ভাড়া বাড়ানও হইয়া থাকে। যথা, ভাড়ার নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন-গুলি দেখুন।

বরিশাল হইতে ভাড়া

	১৯১৩	১৯১৪	১৯১৮	১৯২১
চট্টগ্রাম	১৷৶৹	১৸৵৹	২৵৹	২৸৹
মাদারিপুর	৸৹	৸৵৹	২/৹	২।৬

ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে, যে, কোম্পানীরা কোন ন্যায়সঙ্গত নিয়ম অনুসারে ভাড়া নির্দ্ধারণ করে না। ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ে তর্কবিতর্কের সময় তৎকালীন সরকারী বাণিজ্য সদস্য মিস্টার কার নিম্নলিখিত অদ্ভুত উত্তর দেন :—

হোয়াইটেওয়ে লেডল কোম্পানীকে তাহাদের ক্রেতাদের জন্য প্রতীক্ষাশালা নির্ম্মাণ করিতে এবং কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহাদের জিনিষ বিক্রী করিতে বাধ্য করিতে যেমন আমাদের ক্ষমতা নাই, ষ্টীমার কোম্পানীসমূহকে প্রতীক্ষাশালা নির্ম্মাণ করিতে বা ভাড়া কমাইতে বাধ্য করিতেও তেমনি ক্ষমতা নাই।

এখন পর্য্যন্ত ষ্টীমার কোম্পানী সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে, হইতে পারে তাহাতে 'গবর্ন্মেণ্ট উক্তপ্রকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন নাই; গ্রহণ না-করায় ইংরেজ ব্যবসাদারদের সুবিধাই হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ক্ষমতা থাকা উচিত। সমুদয় রেলকোম্পানী ষ্টেশনে ষ্টেশনে প্রতীক্ষাশালা নির্ম্মাণ করে, এবং রেলওয়ে বোর্ডের অজ্ঞাতসারে ভাড়াও বাড়াইতে পারে না। ট্রাম কোম্পানী পর্য্যন্ত প্রতীক্ষাশালা নির্ম্মাণ করিয়াছে। ষ্টীমার কোম্পানীরা যে যে খানে প্রতীক্ষাকক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির বেশী বেশী অর্থসাহায্যে করিয়াছে।

ষ্টীমার কোম্পানীগুলার প্রবঞ্চনার একটা দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তিকায় দৃষ্ট হয়। গাবখাঁ-ভরণী খাল সাত লক্ষের উপর সরকারী টাকা ব্যয়ে খনিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেকগুলি ষ্টেশনের মধ্যে জলপথের দৈর্ঘ্য কম হইয়া যায়। কিন্তু কোম্পানী পথের দৈর্ঘ্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও ভাড়া কমায় নাই; এমন-কি তাহাদের টিকিটগুলাতে পথের দৈর্ঘ্য আগে যাহা ছিল, তাহা কমাইয়া ছাপে নাই, পূর্ব্বের দৈর্ঘ্যই রাখিয়া দেয়! কোম্পানীর জুয়াচুরি প্রমাণ করিবার জন্য একটা মোকদ্দমা করা হয়, তাহাতে কোম্পানীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়।

কোম্পানীর জাহাজগুলা জীর্ণ ও পুরাতন, গত ঊনবিংশ শতাব্দী যখন আশী ও নব্বইয়ের কোটায় সেই সময়ে নির্ম্মিত। এরূপ জাহাজে যাতায়াত শুধু অসুবিধা-জনক নহে, ঝড়ের সময় বিপজ্জনকও বটে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট পারত পক্ষে ইংরেজ ব্যবসাদারদের প্রভূত লাভ যাহাতে যথেষ্ট লাভের সীমায় আসে, এমন কিছু করিতে অনিচ্ছুক। বাংলা গবর্ন্মেণ্টের দ্বারা ইহার কোন প্রতিকার হইবার আশা নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিবেন, যাহার প্রধান দুটি ধারার তাৎপর্য্য এই, যে, সকৌন্সিল গবর্ণর জেন্যারেল ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপিত করিয়া নদীর জাহাজের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন যাত্রীভাড়া ও মালভাড়া

নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন, এবং প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট যাত্রীদের স্বার্থসম্বন্ধীয় বিষয়ে জাহাজের মালিককে পরামর্শ দিবার জন্য পরামর্শ-কমিটি নিয়োগ এবং তাহাদের গঠনবিধি ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন। নিয়োগী মহাশয়ের এই বিলটি পাস হইলে দেশের খুব উপকার হইবে। সর্ব্বত্র সভা-সমিতি হইতে ইহার সমর্থন হওয়া উচিত।

—

কুমিল্লার দাঙ্গা

বড়লাট হিন্দুমুসলমানকে অতি উচ্চ উপদেশ শুনাইয়াছেন; দেশের নানাস্থানের হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা তাহার প্রকৃত প্রতিধ্বনি রূপে জগতের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। এত জায়গায় সংঘর্ষ খুন জখম হইতেছে, যে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করাও মাসিক পত্রের পক্ষে কঠিন। আমরা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কুমিল্লার দাঙ্গার উল্লেখ এই কারণে করিতেছি, যে, স্বাভাবিক অবস্থায় এখানে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া না হইবারই কথা। কুমিল্লার অভয়-আশ্রমে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে শিক্ষা ও চিকিৎসার দ্বারা সকলের সেবা করা হয়। মেথরে ও ব্রাহ্মণে, হিন্দু ও মুসলমানে কোন প্রভেদ করা হয় না। বার্ষিক রিপোর্ট-গুলিতে দেখিতে পাই, কোন কোন বৎসর কোন কোন দিকে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরা বেশী পরিমাণে সেবা পাইয়াছেন, যদিও প্রতিষ্ঠানটি হিন্দুদের দ্বারা স্থাপিত এবং হিন্দুদের অর্থে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত সুতরাং মনের সুস্থ অবস্থায় এখানে মুসলমানদের হৃদয়ে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ না থাকাই উচিত। বস্তুতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের অন্যত্রও দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন প্রভৃতিতে বিপন্ন লোকদের যে-সেবা হিন্দুরা করিয়াছে, তাহার ফলভাগী হইয়াছে প্রধানতঃ মুসলমানেরা। কিন্তু তদ্দ্বারা বিদ্বেষবুদ্ধি প্রশমিত হয় নাই। তথাপি মহাভারতে ও বুদ্ধদেবের বাণীতে অপ্রেমকে প্রীতি দ্বারা জয় করিবার যে-উপদেশ আছে, তাহাই অনুসরণীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন বটে, "অমুক ব্যক্তি আমাকে কেন গালাগালি দেয়? আমি ত কখনও তাহার উপকার করি নাই।" কিন্তু তাহা বলিলেও উপকার করিতে কখনও বিমুখ হয় নাই।

হিন্দু নারীর দায়াধিকার

ঢাকা যুবক সম্মিলনীর এক অধিবেশনে কুমারী শকুন্তলা চৌধুরী এই প্রস্তাব করেন, যে, দায়ভাগ অনুযায়ী উত্তরাধিকার ব্যবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত যাহাতে হিন্দু নারীরা পিতৃসম্পত্তির ন্যায্য অংশ পাইতে পারে। এই প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত। শ্রীমতী শকুন্তলা ইহাও ঠিক্ বলিয়াছিলেন, যে, হিন্দু নারীদের পিতৃসম্পত্তির ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়া বরপণ প্রথার অন্যতম পরোক্ষ কারণ।

ইংরেজ গবর্মেণ্ট যাহাকে হিন্দু আইন বলিয়া চালাইতেছেন, তাহাই একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ হিন্দু আইন নহে। প্রাচীন অনেক সংহিতাদিতে হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা যে উৎকৃষ্টতর ছিল, তাহা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার নিম্নলিখিত দুটি পুস্তিকায় মূল সংস্কৃত শ্লোক-সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন :—

(1) Brief Remarks regarding Modern Encroachment on the Ancient Rights of Females, according to the Hindoo Law of Inheritance.

(2) Essay on the Rights of Hindus over Ancestral Property according to the Law of Bengal: Appendix, Hindoo Law of Inheritance.

যাঁহারা এবিষয়ে আলোচনা করিতে চান, তাঁহারা রামমোহনের ঐ দুটি পুস্তিকা পাঠ করিবেন।

—

বৃহত্তর ভারতে রামায়ণ

ভারতের আদি কবি বাল্মীকির অমর কাব্য রামায়ণ ভারতবাসীদের চিরন্তন আনন্দের উৎস হইয়া আছে। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়ত খবর রাখি না, যে, একদিন বিরাট এসিয়া মহাদেশের বিচিত্র জনসংঘের মর্ম্মস্থল অধিকার করিয়াছিল আমাদের এই রামায়ণ। দশরথ জাতক ও অন্যান্য কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণ প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্থলপথে মধ্য-এসিয়া অতিক্রম করিয়া চীনদেশে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেই সময়েই জলপথে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ ভারত মহাসাগরের অন্যান্য উপদ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জে এই মহাকাব্যখানি হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ধন বলিয়া সযত্নে লইয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্যই সুদূর কাম্বোজ রাষ্ট্রে শিল্পিগণ বাপুয়োন (Bapuon

ও অঙ্‌কোর ভাট্ (Angkor vat) মন্দির-গাত্রে রামায়ণের প্রস্তর-চিত্র অঙ্কিত করিয়া তক্ষণ-শিল্পের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। কম্বোজ হইতে শ্যামরাজ্যে রামায়ণের প্রভাব প্রসারিত হয় এবং "রামকীন" (Ramakien) নামে রামায়ণ আজও লক্ষ লক্ষ শ্যামবাসীর চিত্তবিনোদন করিতেছে। মলয় উপদ্বীপ এবং সুমাত্রায় ইহার অন্য সংস্করণ প্রচলিত; তাহার নাম "হিকাইয়াৎ শেরী রাম" (Hikayat Seri Rama)। জাভা ও মাদুরা দ্বীপে ইহার নাম "রাম কেলিঙ্" (Rama-keling)। প্রাচীন জাভা ও বলী দ্বীপে উক্ত প্রাকৃত সংস্করণগুলি ছাড়া বাল্মীকির মূল কাব্যের আংশিক অনুবাদ "শেরৎ রাম" (Seret Rama) নামে বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এমন কি সুদূর সেলিবিস্ দ্বীপে (Celebes) কাপড়ের ছাপে রামায়ণ চিত্র দেখা যায়। ক.ন।

—

প্রাম্বানান্ মন্দিরে রামায়ণের প্রস্তর-চিত্র*

যবদ্বীপের প্রাচীন ভাষা "কবি"তে আদি কবির এই অমর রচনা প্রায় ১২০০ বিভিন্ন সংস্করণে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, রামায়ণ জনসাধারণের হৃদয় কতখানি অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা কেবল কাব্যখানি পাঠ, অনুবাদ, অভিনয় করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, প্রাচীন মন্দির গাত্রে এই মহাকাব্যের ভাস্কর্য্যানুবাদ যাহা শিল্পীরা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। খৃষ্টীয় নবম শতকে মধ্যজাভায় "প্রাম্বানান" মন্দিরে রামায়ণের ধারাবাহিক যে প্রস্তর-চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা তক্ষণ-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। রামায়ণের আদিভূমি ভারতেও এমন সুন্দর সুসঙ্গত রামায়ণ-চিত্রের পরিকল্পনা কোথাও দেখা যায় না। এই প্রাম্বানান্ মন্দির ভূমিকম্পে অনেকটা ভাঙ্গিয়া যায় এবং রামায়ণের প্রস্তর-চিত্রাবলী (bas relief) নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আনুপূর্ব্বিক চিত্র আমরা পাই না। তবু কয়খানি প্রস্তর ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাহা আমাদের শিল্পের ইতিহাসের অতুলনীয় সম্পদ। আশা করি এই চিত্রগুলি সাধারণের চিত্ত বিনোদন করিবে। সবগুলি আমরা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করিব। এবার দশখানি প্রকাশিত হইল। ক.ন।

—

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে গান্ধীজির মত

মান্দ্রাজের পাচেইয়াপ্পা কলেজের ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে গান্ধীজি অন্যান্য কথার মধ্যে বিধবাবিবাহের সমর্থন করিয়া কিছু বলেন। তিনি বলেন, হিন্দুশাস্ত্রে বালিকা বিধবাদের বিধবা-অবস্থায় রাখা ও থাকার সমর্থক কিছু নাই। "আমি ঈশ্বরকে গোপনে অনেকবার বলিয়াছি, 'তুমি যদি চাও যে 'আমি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে এই শোচনীয় ব্যাপার কেন আমাকে দেখিতে বাধ্য কর।'" তিনি সমবেত ছাত্রদিগকে প্রচলিত রীতি ভাঙিতে ও এই অশুভ প্রথা উন্মূলিত করিতে বলেন; বলেন, তাহারা যেন কেবল বিধবা বালিকাদিগকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করে।

—

মিস্‌টার জেম্‌সের জাভা যাত্রা

ইয়ং মেন্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশ্যনের মিস্‌টার জেম্‌স্ শীঘ্রই জাভা যাইতেছেন বলিয়া খবরের কাগজে সংবাদ বাহির হইয়াছে। জাভা ডচ্‌দের শাসনাধীন, এবং এই শাসন কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ডচ্‌রা খৃষ্টিয়ান ছিল। কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, ডচ্ গবর্মেণ্ট নাকি জাভায় ইয়ং মেন্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান্ এসোসিয়েশ্যনের কাজের প্রবর্ত্তনের জন্য মিস্‌টার জেম্‌সকে ডাকিয়াছেন। হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জাভা যাত্রার পরই ডচ্ গবর্মেণ্টের হঠাৎ এত খৃষ্টীয় ধর্ম্মে মতি কেন হইল, এবং তাহার জন্য জেম্‌স্‌কে ডাক পড়িল, বুঝা যাইতেছে না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারে অনুরাগ ত তাহাদের অনেক আগেই হইবার কথা। গত বৎসর যখন লীগ্ অব্ নেশ্যন্‌স্ য়্যাসেম্ব্লীর অধিবেশন উপলক্ষ্যে জেনীভায় ভারতবর্ষের কতকগুলি লোক গিয়াছিল এবং আমরাও গিয়াছিলাম, তখন এই মিস্‌টার জেম্‌স্‌ও গিয়াছিলেন। তাহাতে বোধ হয়, তিনি ভারতীয়দের সঙ্গ কোন কারণে খুব ভালবাসেন।

এই প্রসঙ্গে ইয়ং মেন্‌স ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশ্যনের

সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। কিছু দিন পূর্ব্বে উরোপীয় সভায় উক্ত সমিতির রাজনৈতিক মতামত কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে অভিযোগ হওয়ায়, একটি তদন্ত কমিটি বসে। কমিটি উক্ত খৃষ্টীয়ান সমিতিকে ভারতানুকূল রাজনৈতিক মতপোষণ ও কার্য্যকরণ রূপ গুরুতর অপরাধে নিরপরাধ বলিয়াছেন। ইহা খৃষ্টীয় সমিতি প্রশংসা বা নিন্দা মনে করিবেন, জানি না। আমরা কিন্তু মনে করি, যে সমিতি এরূপ সার্টিফিকেট আবশ্যক মনে করে, তাহা আধা-সরকারী সমিতি। অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারের ন্যায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারেও কোন আপত্তি করিবার কাহারও কোন অধিকার নাই। কিন্তু খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া কতকগুলি ভারতীয় যুবকের উপর যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করা ও তাহাদের উপর নজর রাখা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহা ভারত গবর্মেণ্টের ও তাহার সমর্থক ভারতধনশোষক ইউরোপীয় বণিকদের মতামতের তোয়াক্কা না রাখিয়া করা উচিত। ধর্ম্মসমিতির সহিত বিদেশী রাজশক্তির ও বণিকশক্তির বিন্দুমাত্র পরোক্ষ যোগও সন্দেহ উৎপাদন করে।

ভারতবর্ষ ও লীগ অব নেশ্যন্স

লীগ অব নেশ্যন্সের এই বৎসরের য়্যাসেম্ব্লীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। তদুপলক্ষে ব্রিটিশভারত-গবর্মেণ্টের (ভারতবর্ষের নহে) অন্যতম প্রতিনিধি স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার যে বক্তৃতা করিয়াছেন, রয়টার তাহার নিম্নলিখিত তাৎপর্য্য পাঠাইয়াছে :—

In the League Assembly, Sir C. P. Ramaswami Ayyar opening the debate on the work of the past year, congratulated the League on its having realised the importance of India and the eastern problems ; but it was not easy for his countrymen, remote and absorbed in their own problems, to realise concretely how the ideals of the League were being converted into practice. He would welcome any increase in the relations between the practical work of the League and the actual interests of India. He believed that it was through the technical organisations of the League that the ideals of the League could be more adequately realised in non-European countries.

He dwelt on the importance of health organisations, particularly the bureau at Singapore, in assisting in the control of epidemics and welcomed the projected tour in India of medical officers associated with the League, from which he anticipated valuable results.

He emphasised the special interest of India in the Economic Conference and said that the present fiscal policy of India showed that it was in harmony in principle with the conclusions of the Conference. He hoped that the attitude of the League towards the work of the Conference would demonstrate its interest in the problems and conditions of the countries far removed from Europe, but forming important factors in the sum-total of world economy. He concluded by saying that India was most anxious to participate in the labours of the League.

এইরকমের ভুয়ো খোসামোদপূর্ণ বক্তৃতা পড়িলে গা জ্বালা করে। লীগ ভারতের গুরুত্ব বুঝিয়াছেন বলা হইয়াছে। তাহার পরিচয় ও প্রমাণ কোথায়? ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগ দূর করিতে, ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার করিতে, লীগের এক কাণাকড়ির ক্ষমতাও নাই। ভারতবর্ষের লোকেরা লীগকে নিজের কোন কথা জানাইতে পর্য্যন্ত পারে না; বিদেশী ভারত-গবর্মেণ্ট নিজের স্বার্থে যাহা জানাইতে চায় তাহাই লীগ জানিতে পারে। লীগের স্বাস্থ্য বিভাগ, শ্রম বিভাগ, অর্থনৈতিক বিভাগ প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তাহাদের আলোচনাদির ফলে ভাল প্রস্তাব যাহা হয়, তাহা ভারতবর্ষের লোকেরা স্বয়ং নিজের দেশে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না; বিদেশী ইংরেজ গবর্মেণ্ট যদি মনে করে, যে, তাহা ইংরেজের স্বার্থের ক্ষতি করিবে না, তবে তদনুসারে ভারতবর্ষে কাজ হইতে পারে। যাহাতে ইংরেজদের সুবিধা, ভারতীয়দের অসুবিধা, ভারতবর্ষে তাহার প্রয়োগ ও প্রবর্ত্তন অবিলম্বেই হইয়া থাকে।

লীগের সহিত সংযুক্ত চিকিৎসা-কর্ম্মচারীদের ভারতবর্ষে আগমন আমাদের লীগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও অকর্ম্মণ্যতার অভিযোগের ফল বলিয়া মনে করি। তাঁহারা আসুন, দেখুন; কিন্তু দেখিবেন ইংরেজ আমলা-

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩৪

৫ম সংখ্যা

আহ্বান

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার তরে পথের পরে কোথায় তুমি থাকো
সে কথা আমি শুধাই বারে বারে।
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখো
আমার লাগি নিভৃতে একধারে।
বাতাস বেয়ে ইসারা পেয়ে গেছি মিলন আশে
শিশির-ধোওয়া আলোতে ছোঁওয়া শিউলি-ছাওয়া ঘাসে,
খুঁজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলী-কল ভাষে
অধীরধারা নদীর পারে পারে।
আকাশকোণে মেঘের রঙে মায়ার যেথা মেলা,
তটের তলে স্বচ্ছ জলে ছায়ার যেথা খেলা,
অশত্থশাখে কপোত ডাকে সেথায় সারা বেলা
তোমার বাঁশি শুনেছি বারে বারে॥

কেমনে বুঝি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাকো,
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরী।
সরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলিনাকো,
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি।

ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেই খানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে ।
পাষাণ ভিৎ টলিছে যেথা ক্ষিতির বুক ফাটি'
ধূলায় চাপা অনলশিখা কাঁপায়ে তোলে মাটি,
নিমেষ আসি বহুযুগের বাঁধন ফেলে কাটি',
সেথায় ভেরী বাজাও বারে বারে ॥

আম্বোয়াজ জাহাজ
সিঙাপুর বন্দর
৪শ্রাবণ, ১৩৩৪

আলাপ-আলোচনা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে নানা প্রসঙ্গে যে-সকল আলাপ হ'য়েছিল তিনি তা লিপিবদ্ধ ক'রে আমাকে দেখ্‌তে দিয়েছেন। একজনের কথা শুনে আর-একজনের যে-ধারণা হয় তার মধ্যে দুই মনের কাজ—যে-লোক বলে এবং যে-লোক সেটা শুনে লেখে। রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের মতোই এই সাহিত্যিক যৌগিক পদার্থেও মূল উপাদানের বিশুদ্ধ পরিচয় পাওয়া স্বভাবতই কঠিন। কেননা যে মন শুনচে সে ফোনোগ্রাফের লেখ্য ফলকের মত অনাত্ম্য অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল নয়। সেও প্রতিক্ষণে নিজে কথা কইচে, তার নিজের ভাষাকে ক্ষান্ত রাখা তার সাধ্য নয়। এই জন্ত ইণ্টারভিয়্যু জাতীয় ব্যাপারে যে-ইতিহাস পাওয়া যায় সে ধারণার ইতিহাস, তাকে মূল বাণীর ইতিহাস ঠিকমত বলা যায় না।

আমরা যাকে স্মৃতি বলি সে আমাদের মনের একটি রচনা। স্মরণের বিষয়টা তার একটি উপকরণ মাত্র। জনশ্রুতির দ্বারা মানুষের যে-ইতিহাস নিত্যই গ'ড়ে উঠ্‌চে তার মধ্যে প্রভূত পরিমাণেই থাকে এই ব্যক্তিগত রচনা। আমি মানুষটা সম্বন্ধে যে-ধারণা সংসারে প্রত্যহ প্রচলিত হচ্চে বহু লোকের রচনার দ্বারা সেটা সৃষ্ট—বস্তুত অন্যের কাছে আমি-পদার্থের পরিচয় অত্যন্ত মিশ্রিত সামগ্রী।

কোন মুদ্রিত লেখার শেষ প্রুফ দেখা হ'য়ে যাবার পরেও ছাপবার সময় কখনো কখনো অক্ষর উঠে যায়, তখন মুদ্রাকর সেই অক্ষরটা যেখানে ফাঁক পায় গুঁজে দেয়। সে যে ভুল করচে তা জানে না, তাতে একটা শব্দ আর-একটা হ'য়ে ওঠে। আমাদের স্মৃতি-মুদ্রাকর সর্ব্বদাই এই কাজ করচে, গোলেমালে যে-অক্ষরটা উঠে যায় সে তাকে যেখানে সেখানে বসিয়ে দেয়। তাতে ফাঁকটা বোজে কিন্তু কেবলি এক আর হ'য়ে ওঠে।

ঘটনার চেয়ে বাক্য সম্বন্ধে একথা আরো বেশি খাটে। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের ভাষার বিশেষত্ব আছে। আমাদের নিজের ভাব্‌বার বিশেষত্ব অনুসারেই সেই ভাষার গড়ন তৈরি হয়। আর-একজনের চিন্তাকে সেই ভাষার মধ্যে প্যাক্‌ কর্‌তে গেলে তার চিন্তার গড়ন ঠিক থাকে না। কেউ কেউ হয়ত ভাব্‌তে পারেন যে, চিন্তার বস্তুটাই আসল, তার গড়নটা কিছু নয়, আমি তা একেবারেই মনে করি না। চিন্তার প্রধান প্রকাশ চিন্তার আকৃতি দ্বারা। সকল সজীব পদার্থই আপনার আকৃতি-ক্ষেত্রেই আপনার পরিচয় দিয়ে থাকে। সেই আকৃতি কেবল বাহ্যিক নয়, তার একটা আভ্যন্তরিক দিক আছে। অর্থাৎ আমি যে-সব চিন্তা প্রকাশ করি তার চেহারা কেবল যে ভাষায় তা নয়, তার প্রকৃতিগত স্বরূপের মধ্যেও। অর্থাৎ, আমার চিন্তা যে-ভাবে ঝোঁক দেয়, তার যে-সব ইসারা ইঙ্গিত, ভাবকে সহজে সে যেরকম ক'রে সাজায় সেটার দ্বারা সে একটা আন্তরিক রূপ পায়। এই দুয়ের যোগে তবে তার যথার্থ প্রকাশ হ'য়ে থাকে। স্মৃতি থেকে আমার বাহ্য মূর্ত্তি আঁকৃতে গেলে অল্প পরিমাণেও আমার নাক-চোখের এদিক-ওদিক হ'য়ে গেলেই সেটাকে আর আমার চেহারা বল্‌বার জো থাকে না। চিন্তারও তেম্‌নি অতি সূক্ষ্ম বদলেও তার এমনি গভীর বদল ঘটে যে, কেবল মাত্র বস্তু-বিচার ক'রে তার নীচে আর নিজের নাম সই ক'রে দেওয়া চলে না।

অনেক আলাপের প্রসঙ্গ আছে যার গুরুত্ব তেমন নেই; যার বিষয়টা মোটামুটিই কোন একরকমে ব্যক্ত হ'লেই চলে, এমনকি যার সম্বন্ধে ভুল কর্‌লেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু যে আলাপটির ভূমিকা লিখ্‌ছি সেটা তেমন জাতের নয়। এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে লোকের মতামত প্রবল, সেইজন্যেই যেটা বল্‌চি সেটাকে ঠিকমত শোন্‌বার পক্ষে লোকের মনের মধ্যেই বাধা আছে। এই কারণে, এই বিষয়টা যে-মানুষ চিন্তা করেচে সেই মানুষই নিজের ভাষায় সেটা ব্যক্ত কর্‌লে বিপদ কিছু পরিমাণে বাঁচে।

দিলীপকুমারের একটি মস্ত গুণ আছে, তিনি শুন্‌তে চান, এইজন্যেই শোন্‌বার জিনিষ তিনি টেনে আন্‌তে পারেন। শুন্‌তে চাওয়াটা অকর্ম্মক পদার্থ নয়, সেটা সকর্ম্মক। তার একটা নিজের শক্তি আছে, বল্‌বার শক্তিকে সে উদ্বোধিত করে। যে-মানুষ বলে তার পক্ষে সে বড় কম সুযোগ নয়। কেননা, বলার দ্বারাই আপন মনের সঙ্গে আমাদের সত্যকার পরিচয় হয়। দিলীপকুমার অনেক সময়ে আমাকে এই আত্ম-চিন্তা আবিষ্কারের আনন্দ দিয়েছেন। যখন তাঁকে কথা শুনিয়েছি তখন বস্তুত সে-কথা আপনিই শুনেচি। বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে ঘরে ব'সে প্রবন্ধ লেখ্‌বার সময় এই ব্যক্তিগত আহ্বানের দাবীটা স্পষ্ট ক'রে থাকে না ব'লেই সব কথা বলা হয় না এবং বলা হয়নি ব'লে নিজেই জান্‌তে পারিনে। এইজন্য দিলীপ যখন আমাকে কথা কইয়েচেন তখন শ্রোতা-রূপে আমার নিজের কাজ হ'য়ে গেচে। আজ তিনি এইটেকে অন্যের শ্রুতিগোচর কর্‌তে চান। এইখানে আমি উদ্বিগ্ন। নিজের কথা আমি নিজে যেরকম শুনেচি লেখায় সেটা আর একরকম শুন্‌চি। আমার রচনারীতি থেকে দিলীপকুমারের রচনারীতি স্বতন্ত্র প্রকারের ব'লেই যে সেটা ঘট্‌চে তা নয়—স্মৃতি জিনিষটা সজীব সচল ব'লেই স্বভাবতই বাণীর বিপর্য্যয় ঘটে। বস্তুত আমাদের স্মৃতির অনেকটা অংশই বিস্মৃতি। মন আপন শক্তিকে ভারাক্রান্ত কর্‌তে অনিচ্ছুক, কেবলি তাকে চল্‌তে হয় ব'লেই ফেল্‌তে হয়। তাতে মোটামুটি সংসারের কাজ ভালই চলে, কিন্তু প্রতিলিখনের কাজটার সঙ্গে মনের এই অভ্যাস ভাল নয়।

এই কথা ভেবে নিজের কথা আবার নিজেকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। সেদিন ঠিক যে কথাগুলি বলেছিলুম তাকে অনুলিখিত করা শক্ত। একেতো মনে নেই, দ্বিতীয়তঃ কথাগুলি যে-পরিবেষ্টনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল সেই পরিবেষ্টনটি শুদ্ধ ভাষায় তুলে দিতে যে সময়ের দরকার তা আমার হাতে একেবারেই নেই।

সমাজে নারীশক্তির প্রভাব

৪ঠা এপ্রিল ১৯২৭ সাল। ফাল্গুনের সন্ধ্যা।

একটু চুপ ক'রে থেকে কবি আমাকে বল্‌লেন—

"পূর্ব্ববঙ্গে এবার আগরতলা থেকে তোমায় সেদিন

যে চিঠিখানি লিখেছিলাম সে চিঠিটা লেখবার সময়ে আমার চিন্তার নানান্ ফাঁক দিয়ে বসন্ত-প্রকৃতির নানান্ ইসারা আমার চিত্তকে কি রকম ঘরছাড়া কর্‌বার চক্রান্ত করেছিল, সে আর কি বল্‌ব!" * আমি বল্‌লাম, "আপনার লেখার প্রতিছত্রে বোঝা যায় প্রকৃতির সঙ্গীত আপনার কতখানি প্রিয়। আপনার একটি প্রবন্ধে আপনি আক্ষেপ করেছেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে নাগরিক জীবনের বিচ্ছেদ ক্রমেই গভীর হ'বার উপক্রম কর্‌ছে।† এ আক্ষেপে আপনার চরিত্রের এই দিকটা বড় সুন্দর ফুটে উঠেচে।"

কবি বল্‌লেন, "মনের যে দুর্গম গহনে তার আত্ম-বিস্মৃত বাণী ছায়াপথে বিচরণ করে নিভৃত প্রকৃতির ডাক সেইখানে পৌঁছে তাকে উতলা ক'রে বের ক'রে আনে। এক কালে দিনের পর দিন আমার এম্‌নি ক'রে কেটেচে। পঞ্চভূত, গল্পগুচ্ছ, চিরকুমার-সভা প্রভৃতি যখন লিখি তখন সেইরকম ধ্যানাবিষ্ট মন নিয়ে আমি নৌকাবক্ষে একান্ত একলা দীর্ঘকাল কাটিয়েচি। সকাল-বেলা আমার একটি স্বল্পভাষী বুড়ো চাকর, তার নাম ছিল ফটিক, আমার টেবিলের উপর কেবল একবাটি ডালের যুষ রেখে যেত। সমস্ত দিন, সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত সেই আমার একমাত্র খাওয়া ছিল। মনটা পাকযন্ত্রের দাবী থেকে সম্পূর্ণ ছুটি নিয়ে কেবল লেখার কাজই ক'রে যেত।" আমি বল্‌লাম, "মাঝে কিছু খেতেন না?"

কবি বল্‌লেন, "না; একেবারে সন্ধ্যা সাতটার সময়ে পতঙ্গের অনাহূত প্রবেশের উৎপাত থেকে ভোজনটাকে নিরুপদ্রব কর্‌বার জন্যে মস্ত একটা জালের মশারির মধ্যে লুচি জাতীয় খাবারে প্রবৃত্ত হ'তাম। তখন ছিলাম নিরামিষাশী। তাই চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যখন নিরামিষ খাদ্যের আধ্যাত্মিক বাখ্যা নিয়ে আমার মতে অত্যুক্তি করেছিলেন আমি নিষ্কাম ভাবে তার প্রতিবাদ কর্‌তে পেরেছিলাম। কৌতুকের বিষয়টা হচ্ছে এই যে, চন্দ্রনাথ-বাবু তখন আমিষ খেতেন।"

আমি বল্‌লাম, "এতে আপনার শরীর খারাপ হ'ত না?"

কবি বল্‌লেন, "আমার শরীরের উপর তখন আমার একটা আশ্চর্য্য জোর ছিল। মনে হ'ত শরীর নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। টাকা যে আছে সেটা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে টাকা উড়িয়ে দেবার বুদ্ধি একে বলে। ধনীর পক্ষে দেউলে হওয়া সহজ।"

আমি বল্‌লাম, "কি রকম?"

কবি বল্‌লেন, "এই দেহটাকে আমি অনেক দুঃখ দিয়েচি, কারণ বিধাতা আমাকে যে শরীর দিয়েছিলেন সে শরীর অত্যাচারে কাবু হ'তে জান্‌ত না ব'লেই তার বিপদ ঘট্‌ল। যে-শরীর কথায় কথায় ষ্ট্রাইক্ করে, তারি মাইনে বাড়ে, খাটুনি কমে, সে আদর পায় বেশী। প্রকৃতি এবিষয়ে কেমন জানো? অনেকটা কাবুলিওয়ালার মতন, দাবী আদায় কর্‌তে দেরী করে, কিন্তু হিসাব রাখ্‌তে ভোলে না। যখন যৌবনে দেহটাকে নানা প্রকারে উপেক্ষা করি, তার উপরে অন্যায় দায় চাপাতে থাকি, প্রকৃতি স্মিত-হাস্যে তখন ধার দিয়ে যেতে থাকেন; বুঝ্‌তে দেন না একদিন দেনা বন্ধ ক'রে পাওনায় লাগ্‌বেন। অবশেষে কাবুলিওয়ালার মতো লাঠি নিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দে যখন দরজায় ঘা দিতে সুরু করেন তখন হঠাৎ দেখা যায় সুদটা আসলকে ছাড়িয়ে গেছে।"

আমরা হেসে উঠ্‌লাম। খানিক একথা সেকথার পর কবিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আচ্ছা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগের উচ্ছ্বাস-প্রবণতা কি ক'মে আসে? না বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের সরসতার সম্পর্ক আদায় কাঁচ-কলায়?"

কবি বল্‌লেন, "যাদের ভাঁড়টা কাঁচা চুইয়ে চুইয়ে তাদের বুদ্ধিও কমে আবেগও কমে। কিন্তু যাদের আধারে

---

* চিঠিটির তারিখ ছিল ১২ই ফাল্গুন ১৩৩২। তাতে একস্থলে ছিল, "নিরতিশয় ক্লান্তির সময়ে এখানে নির্জ্জন কুঞ্জবনে বসন্তের প্রথম সমাগমের রসাবেশ আমার সমস্ত দেহ-মনকে আবিষ্ট করেছে। উদ্যমের প্রাচুর্য্য যখন থাকে তখন স্বরচিত কর্ত্তব্যের কারখানা-ঘরে নানা প্রকার কেজো সঙ্কল্পের ঢালাই-পেটাই নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে থাকি, শেষকালে রিক্ত মনটা যখন কারবার বন্ধ কর্‌তে বাধ্য হয়, তখনই প্রকৃতির দ্বারে আতিথ্য নেবার সুসময় আসে। আজ সেই মোহিনীর হাতে সহজেই ধরা দিয়েছি; ঠিক সুরে বল্‌তে পারছি, "শিশুকাল হ'তে তোমাতে আমাতে পরাণে পরাণে লেহা।"

† "বর্ষারম্ভে" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দোষ নেই তাদের আবেগের সঞ্চয়টা ক্ষয় হয় না, হয়তো বয়সের সঙ্গে তার ব্যবহারটা ক'মে আসে।''

আমি বল্লাম, ''কি রকম ?''

কবি বল্লেন, "শিশুর প্রধান কাজ হ'চ্ছে বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ধারণা সঞ্চয় করা। বিচার ক'রে অর্জ্জন করা তার কাজ নয়। আবেগের চঞ্চলতা তার মনকে জান্‌বার বিষয়ের উপরে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে ফেল্‌তে থাকে। যে-সব জানা কেবল মাত্র বোধ-পটের ছাপ, যাকে বলে ইম্প্রেশন, এই রকম বেগের চোটে তাদের দেগে তার কাজ চল্‌তে থাকে। জীবনের অসংখ্য অত্যাবশ্যক পরিচয়ের বিষয় কেবল ইম্প্রেশনের রেখায় রেখায় চিত্তফলকে অঙ্কিত। বয়স যখন বেশী হয় তখন বুদ্ধির এই প্রাথমিক আহরণ ব্যাপার অনেকটা সাঙ্গ হ'য়ে আসে। তখনকার অভিজ্ঞতা অন্তরতর অভিজ্ঞতা। তখন প্রধানত যাচাই কর্‌বার বাছাই কর্‌বার কাজ, তখন বাইরের বোধের কাজটা গৌণ হয়, ভিতরের বুদ্ধির কাজটা মুখ্য হ'য়ে ওঠে। তখন শোষণ ক'রে পান করা নয়, চর্ব্বণ ক'রে আহার করা।''

আমি বল্লাম, ''সেটাতে কি কোন ক্ষতি নেই ?''

কবি বল্লেন, "ইম্প্রেশন গ্রহণ কর্‌বার যে সহজ সচেতন শক্তি, বিশ্লেষণী-বুদ্ধির একান্ত চর্চ্চায় যারা সেটা হারিয়ে ফেলে তারা দুর্ভাগ্য। জীবনে যতদিন বুদ্ধির কাজ আছে তত দিন তার মধ্যে শিশুর শক্তি আছে, বুদ্ধির কাজ বন্ধ হ'লেই তখন মরণ-দশা আসে, শিশুর প্রকৃতিদত্ত পাথেয় তখনি নিঃশেষ হয়। যাদের চিত্ত-ফলক শুকিয়ে কঠিন হয়েচে, বোধের ছাপ সহজে নেয় না, তারা আপন ভাবনাকে নিয়ে ইটের মতো ইমারৎ গাঁথ্‌তে পারে, কিন্তু তাকে নিয়ে মূর্ত্তি গড়্‌তে পারে না।"

আমি বল্লাম, "কিন্তু কবির ক্ষেত্রে তো দেখা যায় যে, তাঁরা জীবনের শেষ অবধি হৃদয়াবেগের তারুণ্য বজায় রাখ্‌তে সক্ষম হন ?"

কবি বল্লেন, "ঐখানেই তো কবির সঙ্কট। স্বভাবের নিয়মে যে-বয়সে আবেগের একাধিপত্য, সে-বয়সটা কেটে গেলেও যদি তারি হাতে জীবনটাকে সম্পূর্ণ সঁপে রাখা হয় তবে সেটাতে লজ্জাও যেমন বিপদও তেম্‌নি। বিধাতা যার প্রতি সদয় তিনি তার মধ্যে নবীনকে বাঁচান, প্রবীণকেও সমাদর করেন। তার চিত্তক্ষেত্রে জল ও স্থল দুইয়েরই ব্যবস্থা থাকে, তাজা মন নিয়ে সে ধারণা কর্‌তে পারে, পাকা মন নিয়ে তার ভাবনা।"

আমি বল্লাম, "আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই যদি—"

কবি বল্লেন, ''ব'ল না, অত কুণ্ঠা কেন ?''

আমি বল্লাম, "বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগ উচ্ছ্বাসের যেটুকুও অবশিষ্ট থাকে সেটুকুও প্রকাশ কর্‌তে আমরা উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ি কেন ? অল্প বয়সে যে-সব উচ্ছ্বাস প্রকাশ কর্‌তে এতটুকুও বাধে না, বয়সের অনুপাতে সে-সব উচ্ছ্বাস কেন আমাদের উত্তরোত্তর বিব্রতই ক'রে তুল্‌তে থাকে অনেক সময়ে ঠিক বুঝ্‌তে পারি না। কারণ, আমার প্রায়ই মনে হয় যে, উচ্ছ্বাস আবেগ আন্তরিক হ'লে তার প্রকাশে আমাদের সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয়।"

কবি বল্লেন, "পরিণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির কাজ যখন সম্পূর্ণ আরম্ভ না হয়েছে তখন আবেগকে আমরা অসঙ্গত পরিমাণে বিশ্বাস করি। আমার ভালো লাগ্‌চে কিম্বা লাগ্‌চে না এইটেকেই আমরা যুক্তির জায়গায় বসাই। ক্রমে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, হৃদয়াবেগ সংসারে আমাদের অনেক ঠকান্ ঠকায়। এইজন্যে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ আপন আত্মপরিচয়ে সেইটেকে প্রাধান্য দিতে সঙ্কুচিত হয়। অন্তত সে এটা জানে যে, তার আবেগের উপলব্ধিকে কেউ যদি অবিশ্বাস করে তবে কোনো উপায় নেই। শুধু তাই নয়, যে-জিনিষটার প্রমাণ যুক্তির অধীন সেটা আমারও যেমন তোমারও তেম্‌নি। সেখানে আমার উপলব্ধি নিয়ে তোমার উপরে জোর খাটাতে পারি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমার আবেগের জিনিষ আমার একান্ত ব্যক্তিগত—সেখানে ইচ্ছা কর্‌লেও আর কেউ প্রবেশ কর্‌তে পারে না। এইজন্যেই হৃদয়াবেগেও একটি গোপনীয়তা আছে। তার নিজের রাজ্যে সে যতবড়ই হোক তার এলাকার বাইরে তাকে মুকুট পরাতে গেলে তার অপমানেরই সম্ভাবনা।"

আমি বল্লাম, "কাব্যে তো কবির হৃদয়াবেগ সকলের কাছে প্রকাশ্য।"

কবি বল্লেন, "কখনই না। যেটা প্রকাশ্য সেটা

হৃদয়াবেগ না, সেটা কাব্য। সেই কাব্যটা সর্ব্বজনীন। যে-নারী নৃত্য করচে সে আপন দেহ দিয়েই নাচচে। এই দেহটা তার ব্যক্তিগত, এখানে তার লজ্জা আছে। কিন্তু নৃত্যটা সর্ব্বজনীন, সুতরাং নৃত্যের বাহনরূপে দেহটা যখনি উপলক্ষ্য হয় তখনি দেহ প'ড়ে যায় অন্তরালে, সে হয় গৌণ।...এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা আমি বল্‌তে চাই—সেটাকে বর্ত্তমান সভায় উপস্থিত কোনো কোনো যুবক যদি অত্যন্ত বেশি ব্যক্তিগত ব'লে গ্রহণ করেন তাতেও আমি পিছপাও হ'ব না। হৃদয় ব'লে, রসবোধ ব'লে, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ব'লে আমাদের একটা বালাই আছে। আমরা অবজ্ঞার ভাণ ক'রে সেটাকে ছাড়তে চাইলে কম্‌লি ছাড়ে না, এমন কি আরো বেশি ক'রেই জাপ্‌টে ধরে। ঐ বিধিদত্ত জিনিষটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে শুকিয়ে ফেল্‌লে তবেই কি তোমাদের দেশের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-সাধনা নিরাপদ ও সুসম্পূর্ণ হবে মনে করচ? জীবনের অসম্পূর্ণতাতেই কি সাধনার সম্পূর্ণতা? তুমিও কি এখনকার সেই সমস্ত দেশাত্মবুদ্ধদলের মধ্যে যাঁরা বলেন সংসারে হৃদয়কে উপবাসী না রাখলেই দেশের কাজে জোর পাওয়া যায় না?"****

আমি একটু বিব্রত স্বরেই বল্‌লাম, "না তা নয়, আপনি ভারি অপ্রস্তুত করেন। তবে কি জানেন? আপনিইত একবার লিখেছিলেন যে বিবাহ সম্বন্ধে যত কুণ্ঠা-ভয় সে কেবল অবিবাহিত তরুণের; যাদের একবার বিবাহ হয়েছে তাদের বুকের পাটা বেড়ে গেছে। সত্তর আশি বছর বয়স পর্য্যন্ত দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংসার করাটা তাদের কাছে সন্দেশ গেলার মতো সহজ হয়েচে—তাতে না আছে খোলা না আছে আঁটি।"

কবি বল্‌লেন,"ব্যস্ত হয়োনা,আমি তোমাকে ব্যাপ্‌টাইজ করতে আসিনি। বিবাহ সম্বন্ধে তুমি হীদেন থাকো,পেগান থাকো, তা নিয়ে অনুযোগ করা আমার ব্যবসা নয়, আমার কেবল কৌতূহল মাত্র। কোন্‌খানে তোমাদের বাধ্‌চে? দ্বিধাটা কি নিয়ে?"

আমি বল্‌লাম, "দেখুন আমার মনে হয় যে আজকাল যুগধর্ম্মের গুণেই বা অন্য যে কোন কারণেই হোক আমরা বিবাহে যা খুঁজি আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ ঠিক সে জিনিষটি খুঁজ্‌তেন না। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা, আদর্শ প্রচেষ্টা এককথায় চরিত্রের সমগ্রতাটুকু সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে একটা অন্তর্দৃষ্টি আশা করি। আগেকার যুগে হয়ত মানুষ স্ত্রীর কাছে এতটা দাবী করত না ও কাজেকাজেই সে-সময়ে বিবাহ করাটা ঢের সহজ ছিল। কিন্তু এখনকার দিনে আমাদের দাবীদাওয়ার উপদ্রব বেশী হ'য়ে পড়েছে ব'লে সেটা পূরণ করবার মানুষ মেলাও একটু ভার হ'য়ে উঠেছে এই আমার বল্‌বার কথা। জানি না কথাটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পার্‌লাম কিনা?"

কবি বল্‌লেন, "আমি বুঝেছি তুমি কি বল্‌তে চাইছ। কিন্তু শোনো বলি—তুমি স্ত্রীর কাছে যে-জিনিষটি পাওয়াকে এতবড় ক'রে দেখ্‌ছ সে-বস্তুটি আসলে তত বড় নয়।"

আমি বল্‌লাম, "বড় নয়!"

"—না, শোনো। তুমি বল্‌তে চাও এই যে, আমাদের চরিত্রের মধ্যে যতরকমের বিচিত্রতা আছে তার সমস্তটাই স্ত্রী যদি সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারেন তবেই তাঁর ভালবাসাও মূল্যবান হ'য়ে ওঠে?—ভেবে দেখ, মানুষ নীহারিকা-মণ্ডলের মতো। তার অনেকটা আছে যা তার নিজের কাছেও ঝাপসা, যা সে কাজে খাটাতে পারে না; যা স্বপ্নের বাষ্পে এলিয়ে আছে, যাকে চোখ বুজে সে মনে করে সত্য, দায়ে ঠেক্‌লেই দেখে ব্যবহারে তার নাগাল মেলে না। আর এক অংশ আছে যেখানে আমার জীবন দানা বেঁধে গেছে—সেটা প্রাত্যহিক ব্যবহারের পক্ষে সত্য, কিন্তু আকস্মিক বিপ্লবে হঠাৎ দেখি সেটা হয়তো সত্য নয়। একটা পুরো মানুষ তো এইরকম ভাবেতে বস্তুতে, কল্পনায় ও সত্যে মিশোনো,এই মানুষকে নির্ম্মোহ নির্ভুল ভাবে যদি কোনো স্ত্রী ধারণা করতে পারে, তবে মানুষটি সত্যই খুসি হয় মনে কর? আসলে তোমার কথাটা হচ্ছে তুমি নিজেকে যে মানুষ ব'লে বিশ্বাস কর, কোন মেয়ে যদি তোমার সেই স্বকপোলকল্পিত সত্যকে চোখ বুজে মেনে নেয় তাহ'লেই তুমি তাকেবিবাহ করবে। এ যে তুর্কির সুলতানের চেয়েও বেশী সুলতানী। কিন্তু এতো গেল এক পক্ষের কথা। পুরুষরাই কি মেয়েদের বিয়ে করে? মেয়েরা কি পুরুষদের বিয়ে করে না? কিন্তু মেয়েরা যে সব সময়ে আদর্শ বিচার ক'রে পুরুষদের ভালোবাসে আমি তা বিশ্বাস করিনে।

কেননা, আদর্শ জিনিষের বিচার হয় বুদ্ধিতে কিন্তু ভালবাসার যোগ্যতা বিচার বুদ্ধিতে করে না, কর্‌লে অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই বিপদ ঘট্‌ত—কারণ বুদ্ধি বড় নির্ম্মম।”

আমি বল্‌লাম, “তবে আপনি কি বলেন?” কবি বল্‌লেন, “প্রেমের রহস্য মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের এক অভাবনীয় রহস্য। যে-দৃষ্টিতে মানুষ প্রেমের মিল দেখে, সে-দৃষ্টির তত্ত্ব কোনো সজ্ঞার দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। তুমি পুরাতত্ত্ব নিয়ে থাকো ব'লেই তোমার স্ত্রীর মধ্যে পুরাতত্ত্বানুরাগের আমেজ না পেলে যে তোমার চোখে ঘোর লাগ্‌বে না, তোমার মনে নেশা জম্‌বে না এমন কোনো কথাই নাই। দৈবাৎ যদি তোমার স্ত্রীর পুরাতত্ত্বে সখ থাকে সেটা উপরি পাওনা। আজ তুমি মনে কর্‌চ, তোমার সঙ্গে তোমার পরিচিত কোন স্ত্রীলোকের বিদ্যায় জ্ঞানে কর্ম্মে রুচিতে মিল্‌চে না ব'লেই তোমার বিবাহযোগ্য স্ত্রী জুট্‌চে না।—এটা বাজে কথা। ভিতরের দিক থেকে তুমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসোনি ব'লেই বাইরের দিক থেকে ভালোবাসার যোগ্য গুণের একটা লম্বা ফর্দ্দ খাড়া করেচ। এখনকার কালেও রামচন্দ্র যখন সীতাকে বিয়ে করেন তখন তিনি নিজেই হরধনু ভঙ্গ করেন, সীতার কাছ থেকে হরধনু ভঙ্গের প্রত্যাশা করেন না।”

—“কিন্তু আমাদের নানামুখী চিন্তা ও কর্ম্মের নানা দিকের বিকাশের সঙ্গে স্ত্রী যদি সহানুভূতি প্রকাশ কর্‌তে একেবারে না পারে তাহ'লে —”

—“তাহ'লেও ব্যাপারটা অত্যন্ত শোকাবহ হয় না। তৎসত্ত্বেও তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রাণমন দিয়ে ভালবাস্‌তে পার। নিজের সঙ্গে নিজের স্ত্রীর মারাত্মক অনৈক্য নিয়ে কঠিন দুঃখ পেতে-পেতেও পুরুষ তাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছে পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্তের অন্ত নেই। মেয়ের পক্ষেও তাই। তুমি যদি বৈজ্ঞানিক হও তবে স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক বন্ধু জোটাবার ইচ্ছে হবে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রেয়সী না হ'লে যদি তোমার মন খুঁৎ খুঁৎ করে, তাহ'লে বুঝ্‌ব তুমি স্ত্রীকে ভালোবাসো না। ইন্দুমতীর যে গুণে অজ মুগ্ধ ছিলেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে ‘প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ’, তার প্রধান কারণ ললিত-কলাবিধির সঙ্গে ভালোবাসার একটা নাড়ীর যোগ আছে। কিন্তু ধনু-র্ব্বিদ্যায় তা নেই, ভূতত্ত্বে নেই, নৃতত্ত্বে নেই। সেদিকে মিলন হ'লে সেটা সোনায় সোহাগা, কিন্তু তবুও সেটা সোহাগা, সোনা নয়।”

আমি বল্‌লাম—“তবে কি আপনি বল্‌তে চান যে, স্ত্রীর কাছে গভীর সহানুভূতি পাবার আশা করাটার মানেই নেই?”

কবি বল্‌লেন—“অনুভূতি জিনিষটা হৃদয়ের জিনিষ। ভালবাসার ক্ষেত্রে সেটা পাবার আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয় থাকে। কিন্তু ভাগ্যদোষে যদি নাও পাই তবু আমার দিক থেকে ভালবাসার অভাব না হ'তেও পারে। কতকগুলি জিনিষ না থাকলে ভালোবাসা হ'তেই পারে না ব'লে তার যে একটা ফর্দ্দ টেনে দিয়েচ সেই ফর্দ্দেই আমার আপত্তি। প্রিয়জনের কাছ থেকে প্রার্থনীয় জিনিষ যা পাব তাতে আনন্দ হবে—কিন্তু যদি নাও পাই? এমন কি, স্ত্রী যদি ভাল ডাক্তারি কর্‌তে পারে, যদি নিখুঁৎ আইনের পরামর্শ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হয় তবে দোষ কি? তবু সেটা অত জোর ক'রে বলা চলে না। সর্ব্বগুণবতীকে ভালোবাসা হয়ত দুঃসাধ্য। ভালো-বাসা হয়ত গুণের কিছু অভাবে খুসি হয়। অভাব না থাক্‌লে সে যে বেকার হ'য়ে পড়ে। পরস্পরের মিলের উপরেই ভালোবাসা, এও একটা বানানো কথা—তার গভীরতর ভিত্তি অমিলের উপর।”

আমি বল্‌লাম—“আর একটু খোলসা ক'রে বলুন।”

কবি বল্‌লেন—“দুই বিপরীত তাড়িতে মেল্‌বার ঝোঁক প্রবল, একথা জানা আছে। তার মধ্যে একটাকে বলে হাঁ-ওয়ালা একটাকে বলে না-ওয়ালা।

“সৃষ্টিকাণ্ডে যে দ্বৈত আছে তার মধ্যে একদিকে গ্রহণ আর একদিকে দান। সঙ্গীতব্যাপারে সুর সমাবেশ থাকে স্থির, তার মধ্যে চঞ্চল তাল প্রবেশ ক'রে তাকে সক্রিয় ক'রে তোলে, তাকে মূর্ত্তি দেয়, চরিত্র দেয়, সজীব করে। তেম্‌নি জৈবসৃষ্টি কার্য্যে পুরুষের শক্তি অপেক্ষাকৃত গৌণ ভাবে স্ত্রীর সৃষ্টি-শক্তিকে সক্রিয় ক'রে তোলে।

“কিন্তু স্ত্রীপুরুষের সত্তা শুধু কেবল দেহকে নিয়ে ত নয়।

তাদের মনঃশরীর আছে এই মনঃশরীরের প্রকৃতিতে সাধারণতঃ যে একটি প্রভেদ আছে, তার সত্তা নির্ণয় না ক'রেও তাকে বুঝ্‌তে বাধে না। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে যে প্রার্থনা করে তার মধ্যে মনঃশরীরের এই গভীর আহ্বানটি বড় কম নয়। এখানে তাদের মধ্যে যে মিলন হয় সে মিলনেও সৃষ্টি-শক্তিকে জাগরুক করে। সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ধর্ম্মতন্ত্র গঠন, অর্থ অর্জ্জন, তত্ত্বান্বেষণ, জ্ঞান ও কর্ম্মের যোগসাধন, ভাবকে রসকে রূপদান প্রভৃতি নানা উদ্যোগ নিয়ে মানব-সভ্যতাকে সৃষ্টি ক'রে তোলা মুখ্য ভাবে পুরুষের দ্বারা ঘটেচে। এই সৃষ্টি কার্য্যে মেয়েদের ব্যক্তিরূপের যে প্রভাব সে হচ্চে পুরুষের চিত্তকে গৌণ ভাবে সক্রিয় ক'রে তোলা। আমাদের দেশের জ্ঞানীরা স্ত্রী-পুরুষের মনো-মিলনের এই রহস্যকে স্বীকার করেচেন তাই মেয়েদের বলেচেন শক্তি অর্থাৎ জৈব-সৃষ্টিতে পুরুষের যে স্থান মানস-সৃষ্টিতে সেই স্থান মেয়েদের।

"য়ুরোপের মতো দেশে যেখানে মেয়েরা সমাজের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে থাকে সেখানে পুরুষদের কর্ম্মোদ্যমের মধ্যে মেয়ে-দের এই প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি ব্যাপকভাবে কাজ করে। যেখানে সমাজে সেই ব্যবস্থা নেই সেখানে মেয়েদের দুই ভাগ করেচে—গৃহধর্ম্মচারিণী ও শক্তিসঞ্চারিণী। তারা পৃথক হ'য়ে আছে।

"পুরুষ নারীর কাছে থেকে কেবল যে সেবার আনন্দ চায় তা নয়, তার কাছ থেকে প্রেরণা চায়। গৃহ-ব্যবস্থার মধ্যে যে শান্তিময় সুশোভন স্থিতি, পুরুষের আরামের জন্যে তার যতই দরকার হোক, পুরুষের কর্ম্ম-সাধনার পক্ষে এ যথেষ্ট নয়, যে আন্দোলনে তার সমস্ত প্রকৃতিকে উদ্যত ক'রে তোলে, বিচিত্র কর্ম্ম-চেষ্টার পৌরুষ প্রকাশের জন্য সেটা তার অত্যাবশ্যক।"

আমি বল্‌লাম, "কিন্তু এ প্রেরণা দেওয়াটা কি কেবল অসাধারণ নারীর পক্ষেই সম্ভব নয়?"

—"না তা নয়। একথাটার আলোচনা প্রথমেই হ'য়ে গেছে। মেয়েরা যে রহস্যময় আকর্ষণে পুরুষদের চিত্তকে টানে তাকে ইংরেজিতে বলে charm, বাংলায় তাকে বলা যেতে পারে হ্লাদিনী শক্তি। বস্তুত এ নামের দ্বারা অর্থ ব্যাখ্যা করা হ'ল না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যেমন ধ্বনিতে গন্ধে উত্তাপে আলোতে স্পন্দনে কম্পনে বর্ণচ্ছটায় মিলিত হ'য়ে একটা অপরূপ অতি সূক্ষ্ম জাল নিরন্তর বিস্তারিত ক'রে রেখেচে, যা আমাদের দেহ মন প্রাণকে অহরহ নানারকম ক'রে শিউরে দিচ্ছে, বাজিয়ে তুল্‌চে, জাগিয়ে রাখ্‌চে, মেয়েদের হ্লাদিনী শক্তিও তেমনি, তাকে সুস্পষ্টরকম ক'রে নির্দ্দেশ করা সহজ নয়। অনির্দ্দিষ্ট হ'লেও তার প্রভাব প্রবল। স্ত্রী পুরুষের এই বিভাগের ভিতর দিয়ে জীবজগতের যে একটা প্রকাণ্ড বেগের সৃষ্টি হয়েচে যে-সমাজ তাকে নানা প্রকার বাধার দ্বারা প্রতিহত ক'রে দেয়, তার অপরিসীম প্রভাবের অধিকাংশকেই তুচ্ছতার বেড়ার মধ্যে পুষে রাখে, তারা থাকে আধমরা হ'য়ে পুরুষের জীবন-ক্ষেত্রে তারা মজুরী ক'রে কাটায়, সৃষ্টি করতে পারে না।"

আমি বল্‌লাম—"সমাজের অবস্থা যেমনই হোক ভারত-বর্ষে গ্রীসে রোমে পুরুষের কর্ম্ম যে দুর্ব্বল ছিল এমন কথা তো বলা যায় না।"

কবি বল্‌লেন, "আমি সেই কথাটাই বল্‌তে যাচ্ছিলাম। এই সকল দেশে সমাজে ব্যাপকভাবে স্ত্রী-প্রকৃতি আপন প্রশস্ত স্থান পায়নি ব'লেই পুরুষ আপন স্বভাবের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনেই এমন একদল মেয়ের জন্যে একটি বিশেষ স্থান প্রস্তুত করেছিল যারা নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ। খাদ্যের ভিতর দিয়ে আমাদের দেহ সহজ প্রকরণে নিজের প্রয়োজনীয় যে তাপ-পদার্থ আত্মসাৎ করে তার যদি অভাব ঘটে তাহ'লে দেহ আপনিই বিশেষভাবে কম্বল খুঁজে মরে। ঘরের স্বকীয় প্রয়োজনে প্রদীপ জ্বেলে উনুন জ্বেলে কাজ চলে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রাণের আনন্দ সাধনের জন্য আকাশব্যাপী সূর্য্যালোকের প্রয়োজন আছে। সেটা ব্যক্তিবিশেষের শিলমোহর করা আপন সম্পত্তি নয়; সেটা সর্ব্বসাধারণের, এই জন্যেই প্রত্যেক ব্যক্তির। পাশ্চাত্য সমাজে সাধারণ পুরুষ-প্রকৃতির বিকাশের অনুকূল সেই নারীশক্তি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ভাবেই আছে, সেখানকার পুরুষকে নিত্যই উদ্যমশীল ক'রে রেখেচে। [illegible] যেখানে নারীশক্তিকে সেইরকম ব্যাপক [illegible] প্রচারে বাধা দিয়েচে সেখানে কৃত্রিম উপায়ে তাকে পাবার ব্যবস্থা রেখেচে। এখনকার কালের পথযাত্রীদের আহ্বানে

তখনকার কালের মোহিনীদের বিচার করা ভুল। দেহতৃষ্ণা নিবারণের জন্যেই যে তারা তা নয়, তারা চিত্ততৃষ্ণা নিবারণের জন্যে। কাপুরুষের কাছেই স্ত্রীলোকেরা লালসার সামগ্রী, বীরের কাছে নয়। কাপুরুষ নিজের হীন প্রয়োজনেই স্ত্রীলোককে হীন ক'রে ফেলে। যেখানে সেই প্রয়োজনের দাবীই একান্ত নয়, সেখানে পুরুষের পৌরুষই নারীমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার কথা চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেই একথা স্পষ্ট হবে। চারুদত্তের মতো শ্রদ্ধার-যোগ্য, গৃহস্থ পুরুষের পক্ষে বসন্তসেনার সঙ্গ যে হেয় এমনতর বিচারের আভাস মাত্র এই নাটকে কোথাও নাই। শুধু তাই নয় ; বসন্তসেনার যে চরিত্র বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব নেই বটে, কিন্তু রমণীর দায়িত্ব আছে। তাকে অশ্রদ্ধা কর্‌বার জো নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় তখন এই রকম নারীরা সতর্কভাবে আপন সম্ভ্রম রক্ষা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ত, নইলে তাদের যেটি আসল কাজ সেটাই ব্যর্থ হ'ত।"

আমি বল্‌লাম—"সমাজের আশ্রয় থেকে মেয়েদের এরকম বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া কি তাদের প্রতি অত্যাচার নয় ?"

কবি বল্‌লেন—"পূর্ব্বেই বলেছি, বাঁধ বেঁধে যদি নদীর ধারা বন্ধ কর, তবে জলের জন্যে জলাশয় খুড়্‌তে হয়। অবরুদ্ধ স্বভাবের নিয়মই কৃত্রিম প্রণালীকে খুঁজে খুঁজে বের করে। মেয়েরা যেখানে গৃহিণী সেখানে বিশেষ গৃহেই তাদের অধিকারের সীমা, যেখানে তারা হ্লাদিনী সেখানে তারা সমস্ত বিশ্বের। যে-মেয়ের মধ্যে এই হ্লাদিনী শক্তির বিশেষ প্রতিভা আছে সে আপনার এই শক্তিকে জানে। সে যদি এই শক্তিকে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ ভাবে প্রয়োগ কর্‌বার সহজ ক্ষেত্র না পায় তাহ'লেই তার রুদ্ধ শক্তি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটায়। সমাজের গৃহবায়ু-মণ্ডলকে এই বিকৃতির বাষ্প থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্যেই দুই একটা জানলা একদা খোলা হয়েছিল। একদিক থেকে দেখ্‌তে গেলে সেটাতে সমাজকে এবং এই শ্রেণীর মেয়েকে কঠোর আঘাত থেকে বাঁচানোই হয়েছে। পুরুষের চিত্তে শক্তির প্রেরণা সঞ্চার যে-মেয়েদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক,স্বক্ষেত্রে তারা আপন অপ্রাতিহত মহিমা অনুভব কর্‌তে পার্‌লে তবে তাদের প্রকৃতি সার্থক হ'তে পারে। প্যারিসে যেসকল নারী তাদের স্যালঁ-সভায় মনীষী পুরুষ-মণ্ডলীকে নিজের মোহিনীশক্তির দ্বারা টেনে নিয়ে তাদের চিত্তকে আন্দোলিত ক'রে আলাপ-আলোচনার তরঙ্গ তুল্‌তেন তাঁরা এই জাতের। তাঁরা অনেকে বিবাহিতা হ'লেও গৃহধর্ম্মের গণ্ডীকে স্বভাবতই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সূর্য্যের আলো সহজেই যেমন গাছের মজ্জায় মজ্জায় প্রাণ সঞ্চার করে তেমনি ক'রেই তাঁরা তাঁদের সমকালবর্ত্তী গুণীদের মনের ভিতর নারী-লাবণ্যের কিরণ বিকীর্ণ ক'রে তাঁদের মধ্যে সফলতা সঞ্চার কর্‌তেন। নারী-প্রকৃতি থেকে প্রবাহিত এই জীবনীধারার জন্যে পুরুষ-চিত্ত আপন সার্থকতার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করে একথা আমরা সব সময়ে জানি না,—এরই অভাবে যে আমাদের কৃতিত্বের কৃশতা ঘটে সে সম্বন্ধেও সব সময়ে আমরা সচেতন নই। কিন্তু একথাটা আমরা ধ'রে নিতেই পারি পুরুষচিত্তের সম্পূর্ণতার জন্যেই নারীশক্তির প্রভাব নিতান্তই চাই। এমন কি আধ্যাত্মিক সাধনাতেও। বুদ্ধদেবের শুষ্ক তপস্যার অন্তে সুজাতার যে সুন্দর সেবাটুকু এসেছিল এর মধ্যে সেই অর্থটি আছে ; যিশুখৃষ্টের প্রকৃতি আপন তৃপ্তির পূর্ণতার জন্যেই মেরি মার্থার ভক্তি নিবেদনের বিশেষ অপেক্ষা করেছে। যুদ্ধে পুরুষ প্রাণ দেয় তার পিছনেও মেয়েদের প্রেরণাবাণী থাকে, রাজপুতদের ইতিহাসে তা দেখা যায়, মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়দের বিবরণেও তা পাই। পুরুষ এই শক্তির প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকে যখন সমাজধারায় বঞ্চিত হয় তখনি ধর্ম্মতন্ত্রের ছদ্মপথ দিয়ে তৃপ্তির উপায় খোঁজে এবং সেই সব কৃত্রিম উপায়ে তার পৌরুষকে পুষ্ট করে না, বিকৃত করে, আমরা তার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখ্‌তে পাই।"

ব'লে একটু থেমে বল্‌লেন, "প্রেয়সীর কাছ থেকে বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের সহযোগিতা দাবী করাটাই সব চেয়ে বড় ক'রে তুলো না—বিবাহ রাত্রিটা নাইট স্কুলে Extension lectureএর প্রথম প্রতিষ্ঠার উৎসব নয়। নারীর কাছ থেকে যদি তার প্রেমের আত্মনিবেদন পাও তাহ'লে সেটা তোমার পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান

জিনিষ। তার কারণ এ নয় যে তাতে তোমার হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন হয়, তার কারণ এই যে তাতে তোমার বুদ্ধিতে, তোমার কর্ম্মশক্তিতে তোমার প্রকৃতির সকল অংশেই পূর্ণতা সাধন হয়।"

আমি বল্লাম—"যখন কথা আপনি তুল্লেনই তখন এ বিষয়ে আমার মনে যে, দু-একটা প্রশ্ন প্রায়ই জাগে সে-গুলি আপনার কাছে একটু খোলাখুলি ভাবেই বলি।

"এই যে স্ত্রীর ভালবাসা বল্‌ছেন, সেটা কি বিবাহের পর প্রায়ই নষ্ট হ'য়ে যায় না?—বিশেষতঃ আমাদের দেশের বিবাহে পুরুষ যেখানে স্ত্রীর ভালবাসা পাবার চাইতে তাকে নিশ্চিন্ত ভাবে অধীনে রাখ্‌বার গৌরবটাই বেশী কাম্য মনে করে? আমি ত আমার আত্মীয় বন্ধুর ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিবাহেরই যা শুষ্ক পরিণাম লক্ষ্য করেছি তাতে আমার মনে হয়েছে বিবাহের মধ্যে যে সম্পত্তি-ভোগের ভাবটা গ্রথিত আছে সেটা সত্যিকার ভালবাসার মস্ত অন্তরায় না হ'য়েই পারে না। যাঁদের আমরা স্বামী হিসাবে সচরাচর উদারপন্থী ব'লে প্রশংসা ক'রে থাকি তাঁদের মধ্যেও এই সম্পত্তি-ভোগের ভাবটা যে কি দৃঢ়মূল সে সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দেব।

"আমার এমনি একটি বন্ধু একদিন তাঁর স্ত্রীকে আমার সাম্‌নেই বলেছিলেন, 'তুমি অমুক যে জায়গায় যাবে ব'লে আজ বেরিয়েছিলে সেখানে গিয়েছিলে কি?' স্ত্রী বল্লেন যে, সেখানে তাঁর যাওয়া হয়নি, অন্য এক জায়গায় আগে যাওয়ার দরুণ। তাতে স্বামী বল্লেন, 'কিন্তু এ দ্বিতীয় জায়গায় যাওয়ার জন্যে তোমার আমার কাছে অনুমতি নিয়ে বেরুনো উচিত ছিল।'

"এখন দেখুন, একথাটায় অধিকাংশ পুরুষই হয় ত সায় দেবেন যে স্ত্রীর কাছে এই অনুমতি চাওয়ার দাবী স্বামীর পক্ষে খুবই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তিনি স্ত্রীকে এই যে মৃদু খোঁচাটি দিয়ে জানিয়ে গেলেন যে, 'স্ত্রীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চিরকালই স্বামীর দয়ার দান মাত্র, জন্মস্বত্ব নয়'—বিবাহের মধ্যে এই মনোভাবটি আমাকে বড় আঘাত করে। জানি না বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের এই দাবী-দাওয়াকে আপনি অকিঞ্চিৎকর মনে করবেন কি না।"

কবি বল্লেন, "স্ত্রীর প্রতি আপন কর্তৃত্ব-গৌরব সপ্রমাণ কর্‌বার সুখটাকে পুরুষ যে আপন প্রাপ্য ব'লে মনে করে এটা আমাদের দেশে কেবল নয়, ন্যূনাধিক সকল দেশেই। শরীর-তত্ত্ব, বা মনস্তত্ত্বঘটিত যে কোনো কারণেই হোক স্ত্রীলোককে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্যে পুরুষের উপর নির্ভর কর্‌তে হয়। সেই কারণটাকে অবলম্বন ক'রে পুরুষ যথেচ্ছা তার দাম আদায় ক'রে নিতে চায়। পেটের দায়ে যে পুরুষ অন্য পুরুষের মুখ তাকাতে বাধ্য তাকেও সেই নির্ভরের পরিমাণে আপন স্বাতন্ত্র্য বিকিয়ে দিতে হয় —এমন কি তার চেয়েও অনেক বেশী। এই নিয়েই ত য়ুরোপে আজকাল ধনিকে শ্রমিকে হাতাহাতি চল্‌চে। এবং সেই একই লড়াই আজকের দিনে সেখানে মেয়ে পুরুষে। অন্নের দিক থেকে মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যা পায়, মানস-ক্ষুধার দিক থেকে তারা যে পুরুষকে তার চেয়ে অনেক বেশী জুগিয়ে থাকে এই সূক্ষ্ম কথাটি বোঝ্‌বার শক্তি অল্প লোকেরই আছে, কেন না এটা চোখে দেখ্‌বার জিনিষ নয়। প্রভুত্ব নিয়ে মানুষ বড়াই করে কেন না প্রভুত্ব বর্ব্বরতার অঙ্গ, প্রভাব নিয়ে বড়াই করে না, সেটা গায়ের জোরের উপরের কথা।"

আমি বল্লাম, "কিন্তু তাহ'লে কি বলা চলে না, যে, আমাদের দেশেই হোক্ বা অন্য দেশেই হোক্ সকল ক্ষেত্রেই নারীকে একান্তভাবে পাওয়াটা প্রেমের মস্ত অন্তরায় হ'তে বাধ্য?"

কবি বল্লেন, "বাইরের দিক থেকে পাওয়ার একটা বিপদ নিশ্চয় আছে, তা গভীরতর পাওয়াকে অনেক সময় ম্লান করে। ইংরেজ ভারতবর্ষকে হস্তগত করেচে ব'লেই সেই বাহ্য শক্তির অহঙ্কারে ভারতবর্ষকে সর্ব্বতো-ভাবে জানা তার পক্ষে এত দুরূহ। নিজের অধিকারের দলিলে প্রমাণিত স্বত্বগুলির ফর্দ্দ ধ'রে যে পুরুষ স্ত্রীর মূল্য যাচাই করে তার মধ্যে মানব-ইতিহাসের আদিম যুগের স্থূল বর্ব্বরতা প্রবল হ'য়েই আছে; সেই মানব মানস-পৃথিবীর আফ্রিকাবাসী। কিন্তু, তাই ব'লেই বাইরের পাওয়াটাকে বাদ দিয়ে চলাই স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের পরি-পূর্ণতা, এ কথাটা মিথ্যে। মানুষের আধ্যাত্মিক মানুষের আধিভৌতিকের উপরের জিনিষ ব'লেই যে সে আধি-ভৌতিকের বাইরে তা নয়। আধিভৌতিককে যখনি

সে আপন অঙ্গীকৃত ক'রে নেয় তখনিই সে আপন সম্পূর্ণতা পায়। দেহহীন প্রেতের অবস্থা যে আত্মাহীন দেহের চেয়ে ভালো তা আমি মনে করি না। শেষোক্ত পদার্থটা দিনের বেলায় উৎপাত করে তাকে ঠেকানো যায়, প্রথমোক্তটার উপদ্রব অন্ধকার রাত্রে। তাকে দাবিয়ে রাখ্‌বার জন্যে মানুষ কত শাস্ত্র থেকে কত মন্ত্র পাড়ে তার ঠিক নেই কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে না। সেই জন্যেই মানুষের যথার্থ সাধনা হচ্চে শব্দকে ত্যাগ ক'রে অর্থকে শূন্যে খুঁজে বেড়ানো নয় শব্দের মধ্যেই অর্থকে পাওয়া। বিবাহে তার সাধনা হচ্চে, স্ত্রীকে মন্ত্র প'ড়ে পেয়েছি ব'লেই তাকে স্থূল বস্তুর মতো পেয়েছি এমন কথা মনে করার অপরিসীম মূঢ়তা ঘুচিয়ে দেওয়া, এই কথা অন্তরের সঙ্গে জানা যে, মানুষকে দখল না করলেই তবেই তাকে লাভ করা সম্ভব হয়। পরকীয়া-সাধনের তত্ত্বটা মিথ্যা নয়,—তার মানেই হচ্চে পরকীয়া নারী আমার বাধ্য নয় ব'লেই আমার পরে তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত মূল্য। এইজন্য বিবাহ যখন বর্ব্বরযুগের স্থূল শাসনের থেকে মুক্তি পাবে তখন সকল বিবাহেই পরকীয়া-সাধন প্রচলিত হবে, তখন স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য আছে ব'লেই তার মূল্য পুরুষের কাছে বেশী হবে। বিবাহে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এই পরকীয়া-সাধনার যুগ এসেচে ব'লেই আশা করি। যদি এসে থাকে তবে মূঢ়তা ক'রে আমরা যেন সেই সাধনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই।"

ধর্মের গান কতকালের ?

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

ধর্ম-মঙ্গল নামে অনেক পুথী লেখা হইয়াছিল। মঙ্গল মাত্রেই গানের পালা। ধর্ম-মঙ্গল, ধর্মের গানের পালা। ধর্ম-ঠাকুরের গাজনের সময় ধর্মের মাহাত্ম্য গান করা হইত। কদাচিৎ কোন ভক্ত ঘটা করিয়া মানসিক শোধের সময় গান করাইত। এখন কালের স্রোত ভীষণ বেগে নূতন পথে ছুটিয়াছে; ধর্মের গায়ন আছেন কি না, সন্দেহ। বাল্যকালে দুর্গা-পূজার সময় রামায়ণ গান, চণ্ডীর গান, মহাভারত গান শুনিতাম; এখন থিয়েটরী ঢঙের থিয়েটরী গান ভিন্ন কথা নাই। রামায়ণ মহাভারত চণ্ডী ধর্ম প্রভৃতির গায়নের আর উদয় হইবে না, পালাও রচিত হইবে না।

ধর্ম গায়নের মধ্যে মাত্র তিন গায়নের পালা ছাপা হইয়াছে। এক, মাণিকরাম; দুই, ঘনরাম; তিন, রামাই পণ্ডিত। অলৌকিক ঘটনায় ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। প্রথমে লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, পরে তাহা কবির গানে প্রচারিত হয়। সংস্কৃত-জানা কবির কলমে পুরাণ রচিত হয়, পুরাতন পুরাণে প্রবিষ্ট হয়, কদাচিৎ নূতন উপ-পুরাণের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন কাহিনী এই রূপে সংস্কৃত শ্লোক-বদ্ধ কিংবা দেশ ভাষায় গীত-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

মেদিনীপুর জেলায় তমলুকের দক্ষিণ পশ্চিমে ময়না নামে এক রাজ্য ছিল। একদা এক গৌড়েশ্বরের অধীনে কর্ণসেন ময়নার রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র অজয়ার তীরে মঙ্গল-কোটের নিকট ঢেকুরের রাজা ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে হত হন, পুত্র-শোকে কর্ণসেনের রাণী প্রাণ-ত্যাগ করেন। তখন কর্ণসেন বৃদ্ধ। গৌড়েশ্বর সেই বৃদ্ধের সহিত তাঁহার শ্যালী রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন। পুত্র হয় না; রঞ্জাবতীর এক পিসতাত প্রবীণা ভগিনী ছিলেন, নাম সামুলা; তিনি ধর্মের ব্রত জানিতেন। তাঁহার উপদেশে রঞ্জাবতী ধর্মের ব্রত করিয়া লাউসেন নামে পুণ্যবান পুত্র লাভ করেন। ধর্মের ব্রত অতিশয় কঠিন, তাহাতে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হয়। রঞ্জাবতী ধর্মের দাসী;

লাউসেন ধর্মের সেবক। গৌড়েশ্বরের এক কূট-বুদ্ধি শ্যালক, নাম মহামদ, গৌড়ের পাত্র। এই মন্ত্রী রাজ্য চালাইতেন, লুঠিয়া খাইতেন, গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ, নামে মাত্র ঈশ্বর ছিলেন। কর্ণসেন ভূপতি গৌড়েশ্বরের প্রিয়, লাউসেন ততোধিক। মহামদ ঈর্ষাবশে লাউসেনের সর্ব্বনাশের নানা প্রবন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ধর্মের কৃপায় লাউসেনের জয় হয়, তাঁহারই বাহুবলে একদিকে কামরূপ অন্যদিকে কলিঙ্গ রাজ্য গৌড়ের অধীন হয়। মহামদের মন্ত্রণাহেতু লাউসেনকে বিপদে পড়িতেও অসাধ্য সাধন করিতে হইয়াছিল। পশ্চিমে সূর্য্য যথারীতি অস্ত গিয়াছেন, রাত্রির অন্ধকারের সময় সূর্য্যের প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। এমন ঘটনা, পশ্চিমে উদয়, কেহ কখনও দেখে নাই, শোনে নাই। ধর্মের মাহাত্ম্যের এমন নিদর্শনও কেহ কখনও আর পায় নাই। এই অদ্ভুত-কর্ম্মা লাউসেনকে ধরিয়া মাণিকরাম ও ঘনরামের গান।

আর এক পালা ছিল। হরিচন্দ্র রাজা ও তাঁহার পাট-রাণী মদনা অপুত্রক ছিলেন। মনে সুখ নাই, বনে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন বল্লকা (বা বল্লুকা) নদীর তীরে ধর্মপূজা দেখিতে পান। ধর্মঠাকুর সন্ন্যাসীর বেশে রাজা-রাণীকে দেখা দিয়া ধর্মপূজা করিতে বলেন; আর, পুত্র জন্মিলে তাহাকে ধর্মের নিকটে বলি দিতে বলেন। রাজা-রাণী ভাবিলেন, আগে ত পুত্রমুখ দেখিয়া পুন্নাম-নরক এড়াই, পরে ঈশ্বর যা করেন। পুত্র জন্মিল, নাম হইল লুহিচন্দ্র। রাজা-রাণী পুত্র-বলিদানের অঙ্গীকার ভুলিয়া গেলেন; কিন্তু ঠাকুর ভুলিবার পাত্র নহেন, সেই বল্লুকার সন্ন্যাসী সাজিয়া রাজা-রাণীকে ছলনা করিতে গেলেন, লুহিচন্দ্রের মাংস রাণীকে দিয়া রাঁধাইয়া রাজারাণীর ভক্তি পরীক্ষা করিলেন। একদিকে অপুত্রক রাজারাণার পুত্রলাভ, অন্যদিকে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার, দাতাকর্ণের পুত্রবলিদানকেও পরাজয় করে। এই পালা ঘনরাম দিয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের যে গান "শূন্যপুরাণ" নামে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে হরিচন্দ্র রাজা ও মদনা রাণীর কৃত ধর্মের দেউল ও পূজা সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে।

এখন গায়নদিগের কাল দেখি। মাণিকরামের কাল সম্বন্ধে গত বৎসর কার্ত্তিকের 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগে (১৩১৫ সালের) সবিস্তরে দেখাইয়াছি, মাণিকরাম দেড়শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। ইহার তিন প্রমাণ আছে। (১) ভাষা, (২) মাণিকরামের বংশলতা, (৩) গীতসাঙ্গ কাল। কোনটাতে তাঁহাকে তিন চারি শতবৎসর পূর্ব্বে লইয়া যাইতে পারে না। যে মাতৃকা দেখিয়া তাঁহার ধর্মমঙ্গল ছাপা হইয়াছে, তাহার লিপিকাল ১৭৩১ শক। এখানে তর্ক উঠিতে পারে, লিপিকর পুরাতন কবির ভাষা নিজের সময়ের ও স্থানের মতন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এমন লিপিকর কদাচিৎ আছে, যে ছাপায় ২২৭ পৃষ্ঠার পুথীর আগাগোড়া একই নিয়মে শব্দের ও বিভক্তি-প্রত্যয়ের রূপান্তর করিয়া যাইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সামান্য কথা তার্কিকেরা ভুলিয়া যান। ভাষা দেখিয়া কালনির্ণয়ে ভুল না হইতে পারে, এমন নয়; কিন্তু বংশ-লতা যে আছে। কবির বর্ত্তমান বংশধরের গৃহে পুথীর এক নকল আছে। কি জানি ছাপা বইএর গীতসাঙ্গ কালে ভুল থাকিতে পারে। এই আশঙ্কায়, সে নকল হইতে পয়ারটি আনাইয়াছিলাম। তাহাতে আছে,—

সাকে রী ত্ত সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সির্দ্ধসহ জোগ দক্ষে যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্ব্বরি সপ্তাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত॥

ছাপা বহিতে আছে,

সাকেন্দ্রি ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধসহ যুগ দক্ষে যোগতার সনে॥ ইত্যাদি

এখানে 'সির্দ্ধি' নাই, 'সিদ্ধা' নাই; আছে 'সিদ্ধ'। 'সিদ্ধা,' এই শব্দ সংস্কৃতে অজ্ঞাত। সিদ্ধ = ২৪, যদিও প্রয়োগ অধিক পাওয়া যায় না। কিন্তু 'যোগ' না 'যুগ'? 'দক্ষ' না 'পক্ষ'? 'দক্ষ' আঙ্কিক শব্দ নয়; আর প'কে দ পড়া আশ্চর্য্য নয়। পক্ষ = ২। এখন যোগ = পাঁজির ২৭ যোগ ধরিলে পাঁচটা অঙ্ক হইয়া যায়, সেটা অসম্ভব। তা ছাড়া, যোগ = ২৭, এমনও কোথাও পাই নাই। একটি শব্দে ২৭ অঙ্ক জানাইতে হইলে 'ভ' বা 'নক্ষত্র' চিরন্তন আছে। অতএব 'যুগ' মনে করিতে হইতেছে। যুগ = ৪।

অর্থাৎ ৬৪৭+২৪২৪=৩০৭১; সুতরাং ১৭০৩ শক। বংশলতাও এই কাল দেখাইতেছে।

উক্ত শক পরীক্ষার উপায় নাই। 'তিথি অব্যাহিত' যে কি, তাহা বলা দুষ্কর। মাসের নাম না পাইলে তিথির নাম বৃথা। এমন যদি তিথি থাকে, যাহা বৎসরে একটী মাত্র ঘটে, তাহা হইলে শক পরীক্ষা চলিত। 'অব্যাহিত' শব্দটা পুথীর ভুল মনে হয়। হয়ত অব্যাহৃত তিথি যে তিথিতে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে নাই। কিন্তু তাহাতেও পরীক্ষার উপায় নাই।

"বঙ্গবাসীর" কল্যাণে ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল বহু প্রচারিত হইয়াছে। ইহার সমাপ্তিকাল স্পষ্ট লেখা আছে,—

শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি॥

রাম=৩, গুণ=৩, রস=৬, সুধাকর=১। অর্থাৎ ১৬৩৩ শক। এখানে এই শক পরীক্ষার উপায় আছে। মার্গক—মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের আদ্য অংশে হংস—সূর্য্য ছিলেন (১লা কি ২রা), শুক্রবার, সুলক্ষণ শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি। পাঁজি গণিয়া দেখিতেছি, ১৬৩৩ শকে ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্ল তৃতীয়া। ১লা হওয়াতে 'আদ্য অংশ'ও বটে। 'যাম সংখ্য দিনে'—'যাম' অর্থে প্রহর। এক প্রহর বেলার সময় সঙ্গীত সাঙ্গ হয়। ঘনরাম বহু স্থানে 'যাম' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র অর্থ, প্রহর। যাম আহ্নিক শব্দও নয়। যম=২ বটে, কিন্তু ২রা শনিবার।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থভাগে (১৩০৪ সালের) হুগলী জেলার ভাঙ্গা-মোড়া নিবাসী ৺অম্বিকাচরণ গুপ্ত সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলের বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে নানা পুরাতন বিষয় আছে। শূন্যপুরাণ, শিবায়ণ, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতির বিষয়ের সহিত ধর্ম্মের মঙ্গল যুক্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের আরম্ভকাল এইরূপ লেখা আছে,—

দ্বিজ সহদেব গান পূর্ব্বতপ ফলে।
যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে।
*　　　　*

আগমের কথা ইহা কে বলিতে পারে।
কালাচাঁদ স্বপনে সদয় হৈলা যারে॥
চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈলা যুগপতি।

৺গুপ্তমহাশয় দেখাইয়া গিয়াছেন, সালটি ১১৪১=১৬৫৬ শক। এই শকের ৪ঠা চৈত্র কিন্তু পূর্ণিমা ছিল না, ছিল কৃষ্ণ চতুর্থী। ১১৪১ সালের একশত বৎসর পূর্ব্বে ও পরেও কিংবা ১৬৪১ শকে ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা ছিল না। অতএব অর্থ, ১৬৫৬ শকের চৈত্রের চতুর্থ দিন, এবং পূর্ণিমার পর চতুর্থ তিথি। বোধ হয় এই হেতু 'পূর্ণিমা' না লিখিয়া 'পূর্ণিমার' আছে। বারের উল্লেখ না থাকাতে শকপরীক্ষা হইতে পারিল না।

পূর্ব্বকালের কবি যদি ভাবিতে পারিতেন, আমরা তাঁহার গান পড়িতে বসিব, তাহা হইলে সন তারিখ নাম-ধাম স্পষ্ট লিখিয়া যাইতেন। ঘনরাম গাহিয়াছেন, "ময়ুরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।" "হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ুরভট্টের পথে জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম্মসভায়।" মাণিকরাম গাহিয়াছেন, "বন্দিয়া ময়ুরভট্ট আদি রূপরাম। দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্মগুণ গান।" শুধু তাই নয়, জগৎঈশ্বর মাণিকরামকে শুনাইয়াছেন, "ময়ুরভট্টের কথা মন দিয়া শুন। বৈকুণ্ঠে রেখেছি তাকে বিষ্ণুভক্তি দিয়া।" অতএব দেখা যাইতেছে, ময়ুরভট্ট এক অসাধারণ কবি ছিলেন, এবং সে কালে অমর বিবেচিত হইতেন। তাঁহার রচিত ধর্ম্মমঙ্গল কোথাও আছে কি না, জানি না। মাণিকরাম রূপরামের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার জাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত মৃগাঙ্কনাথ রায় রূপরামের সমগ্র পালা পাইয়াছেন। এটি ১২৪৯ সালে লিখিত গোরাচাঁদ দাস মাইতি নামক এক লিপিকরের। রূপরামের খণ্ডিত পালা আরও আছে। ১২৩৫ সালে নফরঘোষ নামক লিপিকরের লিখিত ইছাই-ঘোষ-বধ পালা আমার এক বন্ধুর নিকটে আছে। আমি পড়িয়াছি। মৃগাঙ্কনাথ-বাবু তাঁহার সংগৃহীত পুথী আমার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু অবসর অভাবে পড়িতে পারি নাই। রূপরাম তাঁহার গীত সমাপ্তিকাল হেঁয়ালীতে লিখিয়াছেন,—

সাকে সিমে জড় হৈলে জত সক হয়।
চারি বাণ তিন যুগে বেদে যত রয়।
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই সকে গিত হৈল লেখা কর্য্যা লেহ।
সন্তাজন চায়্যা ধর্ম্ম করিবে কুসল।
বারমতি সাঙ্গ হৈল ধর্ম্মের মঙ্গল।
বিসম ধর্ম্মের মায়া কহনে না যায়।
রূপরাম ঠাকুর ধর্ম্মের গীত গায়।

এই শক 'লেখা করা' আমার দুঃসাধ্য। কাজেই অন্ধকারে ঢিল ছুড়িতে যাইতেছি। শাগ ও সীম, জড় হইলে, এক বর্ণ হেতু এক দেখায়। অতএব শকের আদ্য অঙ্ক ১। চারি বাণ=২০, তিনযুগ=১২, বেদ=৪; "রসের উপরে রস"=৬+৬=১২। একত্রে ৪৮। "তাহে রস দেহ", ৬ বসাইতে হইবে। ৪৮ অঙ্কের বাঁয়ে বসাইলে ১৬৪৮ শক, ডাইনে বসাইলে ১৪৮৬ শক। দুই পক্ষেই যুক্তি আছে। কিন্তু প্রথম পক্ষে বল অধিক আছে। সমগ্র পুথী পড়িয়া ভাষা, উদ্দেশ, অনুষঙ্গ বিচার করিলে প্রথম পক্ষের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমি যে ইছাইঘোষ-বধ পড়িয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে ১৬৪৮ শক। মাণিক রাম, অন্ততঃ ইছাইঘোষবধ পালায়, রূপরামের পেছু পেছু গিয়াছেন, দুই তিন স্থানে রূপরামের পদ তুলিয়া লইয়াছেন।

শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল পুথী হইতে তুলিয়াছেন,

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।

অর্থাৎ খেলারামের কাল ১৪৪৯ শক। কিন্তু শরের বাহন কি? স্মর কন্দর্পের? কিন্তু কন্দর্পের বাহন কি ছিল? তিনি মীনকেতন। মীনবাহন ছিলেন না। 'শরের' কি শিবের? খেলারাম ৪০০ বৎসরের বৃদ্ধ হইতেছেন। তাঁহার পুথী, বিশেষতঃ কাল ভাল করিয়া দেখা উচিত।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার নিকটবাসী সীতারাম দাসের এক ধর্ম্মমঙ্গল আছে। আনাইয়া একবার দেখিব মনে করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম থানার এক দারোগা বাবু পুথী খানি লইয়া গিয়াছেন, পাইবার জো নাই। শুনিয়াছি, সীতারাম ৩০০ বৎসরের বৃদ্ধ। দীনেশ-বাবু লিখিয়াছেন, সীতারাম ১০০৪ সালে=১৫১৯ শকে পুথী সমাপ্ত করেন। তিনি এই সাল কোথায় পাইলেন, তাহা লেখেন নাই।

১৩০৪ সালে অম্বিকা চরণ গুপ্ত লিখিয়াছেন, "এ পর্য্যন্ত আটখানি ধর্ম্মমঙ্গলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা গিয়াছে। ময়ূরভট্ট, খেলারাম, ঘনরাম, রূপরাম, রামচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র, রমাই পণ্ডিত এবং সহদেব চক্রবর্ত্তী, এই আট জনের লিখিত আটখানি।" ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে (=১৩১৫ সালে) তৃতীয় বার সংস্কৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন,"রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি, হাকন্দ পুরাণ, ময়ূরভট্ট, রামচন্দ্র, মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম, প্রভুরাম, রূপরাম, সীতারাম, দ্বিজরামচন্দ্র, সেন পণ্ডিত, রামদাস আদক, ঘনরাম, বলদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কবির ধর্ম্ম-মঙ্গল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।" এই ১৪ জন ছাড়া তিনি শ্যাম পণ্ডিতের "সুবৃহৎ" ধর্ম্ম-মঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি কেহ এই ১৫ খানি পুস্তকের বিষয়ের ও কালের পূর্ব্বাপরত্ব শোনান নাই। হাকন্দ পুরাণ ও ময়ূরভট্টে, কি লেখা আছে, তাহা জানিলেও কৌতূহল নিবৃত্তি হয়। বোধ হয়, অধিকাংশ ধর্ম্মমঙ্গলের "দাঁড়া" এক, কিন্তু যত গায়ক তত রূপ; ভাষায় ও ছন্দে একটু আধটু প্রভেদ। কৃত্তিবাস রামায়ণ রচিলেন; গায়নে রামায়ণী দাঁড়া পাইল, কৃত্তিবাসের নানা রূপ আবির্ভূত হইল। গানের পালার এই পরিণাম কিছুমাত্র নূতন নয়। এই কথা বুঝিতে কিন্তু বহু পুস্তক-সম্পাদকের বহুকাল গিয়াছে।

ঘনরামের মতে, বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বের ময়ূরভট্টের মতে, গৌড়ের ঠাকুর ধর্ম্মপাল স্বর্গগত হইলে তাঁহার "বীর্য্যবন্ত" পুত্র গৌড়েশ্বর হন। তিনি লাউসেনের মেসো। বাঙ্গালার ইতিহাসে এক ভিন্ন দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের নাম পাই না। লাউসেনী পালার নিমিত্ত দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল অন্বেষণের আবশ্যকতাও দেখি না। ধর্ম্মপালের পুত্রের নাম দেবপাল; দেবপাল খ্রীষ্টের নবম শতাব্দীতে রাজ্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমানে দেবপাল ৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গল মতে লাউসেনের কীর্ত্তিসময়ে গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ। এই দুই হইতে পাই, লাউসেনের জন্ম ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের

নিকটবর্ত্তী সময়ে হইয়াছিল। ইহার পর অন্ততঃ একশত বৎসর অতীত হইলে তাঁহার জীবন চরিতে ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছিল। অতএব অনুমান হয়, লাউসেনী দাঁড়া খ্রীষ্টের দশম এবং শকের নবম শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদিত "শূন্য পুরাণ" যে বস্তুতঃ ধর্মের গান, একখানি বই নয়, ছয়খানি পুথীর সমষ্টি, তাহা পরিষৎ পত্রিকার ষোড়শ ভাগে (১৩১৬ সালের) দেখাইয়াছি। কোন্ কালের কোন্ কোন্ গায়নের টুক্‌রা টুক্‌রা পালা একত্র হইয়া গিয়াছে, কে জানে। কৃত্তিবাসের নামে যেমন অনেক গায়ন পালা বাঁধিয়াছিলেন, এখানেও তেমন রামাই পণ্ডিতের নামে অনেক গায়নে পালা বাঁধিয়াছিলেন। অপুত্রক হরিচন্দ্র রাজা ও মদনা রাণী (বোধ হয়) পুত্র লাভের পর ধর্মের দেউল ও ঘটায় পূজা দিয়াছিলেন, ইহা এই গানের মুখ্য বিষয় ছিল, একাধিক গায়নের একাধিক পালায় তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পূজার সময় রামাই পণ্ডিত ছিলেন মনে হয়। কিন্তু তাহার এতকাল পরে গানের উৎপত্তি যে লোকে পূর্বের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছিল, গায়নে কখনও রামাইকে দিয়া পূজা এবং কখনও গান করাইতেন। কবিকথা কখনও ইতিহাস নয়। ইহা গীতবদ্ধ শ্রুতি-পরম্পরা। ইহার ধর্মই এই, ইহাতে দেশ কাল পাত্রের প্রকৃত সম্বন্ধ মিশ্রিত হইয়া যায়। মূল "শূন্য পুরাণে"র সময়ে পাঁচ পণ্ডিত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্বেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই, গোসাঞি। এই পাঁচজনের মধ্যে রামাই ও গোসাঞি পরে লাউসেনী দাঁড়ায় স্থান পাইয়াছেন, অন্য তিন পণ্ডিত পান নাই। ইহাঁরা রামাইর বহু পূর্ববর্ত্তী, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের বিবেচিত হইতেন। শ্বেত, নীল, কংস বা কাংস্য নাম দেখিয়া শ্বেত নাল পীতবর্ণ মনে করিবার হেতু নাই। মনঃকল্পিত হইলে শ্বেত, রক্ত বা তাম্র, পীত, নীল এই পর্য্যায় হইত, পঞ্চমেরও স্থান হইত না। ধর্মমঙ্গলের কবিকুলে কত রাম নামের গায়ন জন্মিয়াছিলেন। খেলারাম, সীতারাম, ঘনরাম, রূপরাম, মাণিকরাম ইত্যাদি পাইয়া তাহাদিগকে কল্পিত মনে করা যেমন, রামাইকে রাঙ্গাই মনে করাও তেমন। রামাই তাম্র দিয়া "পণ্ডিত" করিতেন, সে বিধি এখনও চলিয়া আসিতেছে। কে জানে নীলাই লৌহ দিয়া, শ্বেতাই রৌপ্য দিয়া, এবং কংসাই কাংস্য দিয়া দীক্ষা দিতেন না, কিংবা তাহাদের প্রকৃত নাম এই ছিল না। কাঁসার ও লোহার তাগা ও বালা লোকে পরিত। সে যাহা হউক, তাঁহারা এই এই নামেই রামাই ও গোসাঞির পূর্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

লাউসেনের সময়ে রামাই ও গোসাঞি ছিলেন কি ? ঘনরামের মতে ছিলেন। কিন্তু এটা যে ভুল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তখন গোসাঞি পণ্ডিতও ছিলেন না ; তাঁহার পূজা-পদ্ধতি কিন্তু চলিতেছিল, এবং তাহার প্রমাণে সামুলা প্রথমে রঞ্জাবতীকে এবং পরে লাউসেনকে ধর্মের ব্রত শিখাইয়াছিলেন। অতএব খ্রীষ্টের নবম শতাব্দীর পূর্বে গোসাঞির এবং গোসাঞির পূর্বে রামাইর আবির্ভাব হইয়াছিল। গৌড়েশ্বর ধর্মপালের সহিত রামাইর কাল-সম্বন্ধ কল্পনার হেতু নাই।

রামাই ও গোসাঞির নিবাস কোথায় ছিল, কোথায় হরিচন্দ্র রাজা ধর্মের দেউল তুলিয়াছিলেন, এবং কোথায় রঞ্জাবতী পুত্র-লাভের আশায় লৌহ কণ্টকের উপর শুইয়াছিলেন ? রামাই পণ্ডিতের জন্ম ও দীক্ষা সম্বন্ধে এক আখ্যায়িকা আছে, "শূন্য পুরাণে"র ভূমিকায় শ্রীযুত বসুজ মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে দেখি, তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। সে ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয়, কি স্মার্ত, কি শাকদ্বীপী ছিলেন, তাহা জানা নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন, নইলে গানের ভণিতায় দ্বিজ রামাই বলিতে পারিতেন না। তাঁহার পৈত্রিক বাস দ্বারিকাপুরীতে। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় ; তাঁহাকে ধর্মঠাকুর পালন করেন, এবং যথা বয়সে তাম্র-দীক্ষা দেন। তখন তিনি ধর্মের পণ্ডিত হইয়া ধর্মপূজা প্রচার করিতে থাকেন। বংশ না থাকিলে কে তাঁহার পর পণ্ডিত হইবেন, এই চিন্তায় তিনি বৃদ্ধ বয়সে এক কন্যা বিবাহ করেন। এই কন্যার জাতিকুল লেখা নাই।

তাঁহার ধর্মদাস নামে এক পুত্র জন্মে। ইনিই পরে গোসাঞি পণ্ডিত নামে খ্যাত হন। বোধ হয়, তিনি পিতা রামাইর পূজা-পদ্ধতির বিস্তার করেন, এবং পদ্ধতি মূলে রামাইর হইলেও তাঁহার পুত্রের উপাধি গোসাঞি নামে প্রসিদ্ধ হয়। ধর্মদাসকেও বিবাহ করিতে হয়, নইলে পণ্ডিত বংশ লুপ্ত হয়। কালিন্দী নদীকূলে সদা নামে এক ডোম বাস করিত, ধর্মদাস তাহার কন্যা বিবাহ করেন। ক্রমে রামাইর বংশ বিস্তৃত হয়। রামাই ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার পুত্র ধর্মদাস শূদ্রকন্যা জাত। সেকালে প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। ধর্মদাসের পুত্র ডোম কন্যা বিবাহ করেন। কাজেই তাঁহার বংশ ডোম তুল্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা ডোম বা বেণুকর বংশ বলিতে পারা যায় না।

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর হইতে ১২ মাইল পূর্বদক্ষিণে ময়নাপুর গ্রামে রামাই পণ্ডিতের বংশ আছে। বাঁকুড়ায় ধর্ম-পণ্ডিতকে পঁড়িত বলে, পণ্ডিত বলিলে কেহ বুঝিতে পারে না। এই অপভ্রংশ পুরাকালের সাক্ষী। ময়নাপুর বৃহৎ গ্রাম, এখানে ২২ পাড়া এবং তিনচারি হাজার লোকের বাস আছে। গ্রামের মাঝে অতি পুরাতন এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। নাম হাকন্দ পোখর। বারুণীর সময় ইহার পাড়ে মেলা বসে, যাত্রীরা ইহাতে স্নানের জল পায় না, পুখর বুজিয়া গিয়াছে, কাদা জলই মাথায় দেয়। ময়নাপুরের তিন পাশে এখনও বন। উত্তরে ও পূর্বে মাইল খানেক দূরে এক জোড় (ক্ষুদ্র খাল) বহিয়া গিয়াছে, নাম আমুল নদী, নীচে নাম আমোদর, মান্দারণ দিয়া গিয়াছে। ময়নাপুরের ৭।৮ মাইল উত্তরে এবং আর একটু দূরে পূর্বে দ্বারিকেশ্বর নদী বাঁকিয়া বহিয়া গিয়াছে। আমি ময়নাপুর দেখি নাই, কিন্তু ময়নাপুর-বাসীর মুখে শুনিয়া মনে হইয়াছে, গ্রাম পুরাতন, আপনি বড় হয় নাই, পূর্ব্বকালে কেহ বসাইয়াছিল। বোধ হয়, রামাইর পৈত্রিক বাস ময়নাপুরের পূর্বদিকে দ্বারিকেশ্বর নদী কূলে ছিল। এই নদীর প্রাচীন নাম দারকেশী। বল্লুকা কোথায় ছিল জানা নাই। হয়ত সেটা এখন আমুল বা আমোদর নাম পাইয়াছে। ময়নাগড় হইতে রঞ্জাবতীকে সে স্থানে আসিতে হইয়াছিল। তমলুক হইতে ৮ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে ময়নাগড়। এই গড়ে যাইতে হইলে কালিন্দীনদী পার হইতে হইত। সেটা মেদিনীপুরের কংসাই নদীর একটা শাখা ছিল, এখন ময়নাগড়ের কাছে কালিন্দী বুজিয়া গিয়াছে। ময়নাগড় হইতে রঞ্জাবতী তমলুক দিয়া প্রথমে রূপনারায়ণ এবং উপরে দ্বারিকেশ্বর দিয়া রামাইর বাসস্থানে আসিয়াছিলেন। তখন সেটা তীর্থ হইয়া পড়িয়াছে। হরিচন্দ্র রাজা বল্লুকার বনভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; দৈবক্রমে মনে হয় না, রামাইর ধর্মঠাকুরের প্রসিদ্ধি শুনিয়া আসিয়াছিলেন। দ্বারিকা পুরী, বোধ হয়, বর্তমান দ্বারকা নামের গ্রাম। কিন্তু এই নাম প্রাচীন নহে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বৈষ্ণব হইবার পর শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থলের নামে দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন নামে নিকটে নিকটে গ্রামের নাম রাখিয়াছিলেন।

রামাইর নিবাস পাইলাম, কাল কত? রামাইর জন্ম বৃত্তান্তে আছে,

> বৈশাখীয় শুক্লপক্ষে জনম তাহার।
> পঞ্চমীর তিথি ছিল নক্ষত্র ভরণী।
> রবিবার শুভদিনে প্রসব হইলা ব্রাহ্মণী।

এই পদের ভাষা আধুনিক বটে, কিন্তু দিনজ্ঞাপনের রীতি প্রাচীন। বৈশাখীয় শুক্ল পঞ্চমী—এই যে চান্দ্রমাস ও দিন গণনা, এইটি প্রাচীন। সৌর মাস ও দিন গণনা—যেমন আষাঢ় মাসের ৯ দিন—কোন্ শকে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা জানা নাই। এক দিনে হয় নাই, অল্পে অল্পে হইয়াছে; বোধ হয় ১৫০০ শকের অধিক পূর্বে হয় নাই। আরও দেখা যাইতেছে, উক্ত জন্মদিনের বর্ণনা গ্রহাচার্য্যের লিখিত। কৃত্রিম কিনা, কে জানে। একটু খাটিলে ধরা পড়িতে পারে, এবং ৮০০—৯০০ শকের মধ্যে উক্ত তিথি নক্ষত্র বার পাইলে শকও ঠিক হইয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে যাঁহাদের চর্চা আছে, তাঁহারা দেখিতে পারেন।

ঘনরামের মতে ধর্মের অনুগৃহীত ও বিখ্যাত ভক্ত বার জন ছিলেন। (১) ভোজ মহারাজা, (২) ধূপ দত্ত, (৩) মথুর ঘোষ, (৪) মহীমুখ ব্রাহ্মণ, (৫) কালুঘোষ, (৬) হরিচন্দ্র রাজা, (৭) সদা ডোমের পুত্র, (৮) আসাই চণ্ডাল, (৯) দ্বিজ মহীপাল, (১০) শিবদত্ত বারুই, (১১) হরিহর বাইতি, (১২) লাউসেন। ইহাঁদের প্রত্যেকের জীবনে ধর্মের মহিমা

প্রকাশিত হইয়াছিল, পূর্বকালের লোকেরা জানিত। ঘনরামের সময়ে, কিংবা তাঁহার গুরু ময়রভট্টের সময়ে সে-সব কাহিনী ক্ষীণ পড়িয়াছিল,কেহ গানে বাঁধিয়া রাখে নাই, কিংবা রাখিয়াছিল আমরা পাই নাই। ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের পূজ্য হইলে সে-সব কাহিনী সংস্কৃত পুরাণে প্রবিষ্ট হইত, কিংবা উপপুরাণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। তথাপি পরম্পরায় ভোজ মহারাজা, ধর্মের আদ্য পূজা, মহারাজার যোগ্য ঘটায় দিয়াছিলেন। ধূপদত্ত মাণিক দ্বীপের মাঝে ধর্মের দেউল দিয়াছিলেন; হরিচন্দ্র রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র বলি দিয়াছিলেন; সদা ডোমের ঘরে ব্রাহ্মণঅতিথি-রূপে ধর্ম দেখা দিয়াছিলেন, আসাই চণ্ডালের সিজান ধানের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল; ইত্যাদি। অকিঞ্চনের ভক্তি ও তাহার প্রতি ভগবানের কৃপা যতই হউক, রাজা মহারাজার ভক্তি, বিশেষতঃ তাহার বাহ্য বহুমূল্য নিদর্শন লোকের চোখেও কানে শীঘ্র পহুঁছে; এই হেতু হরিচন্দ্র ও লাউসেন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ভোজরাজা এত পুরাতন যে লোকে তাঁহার কীর্তি ভুলিয়া গিয়াছিল। হয়ত বা "শূন্য পুরাণের" "আদ্য ভূপতির" ধর্মের দেহারা নির্মাণে তিনি লক্ষ্য হইয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় রাঢ় অঞ্চলের রাজা ছিলেন। মাণিক দ্বীপই বা কোথায়? দ্বীপ অর্থে জল-পরিবেষ্টিত ভূ-খণ্ড নয়। নিম্ন ভূমির মধ্যে উচ্চ ভূ-খণ্ডের নামও দ্বীপ ছিল। এখন তাহা ডিহি। হরিচন্দ্র রাজার সময়ে রামাই ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি কখন্ কোন্ ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন? ময়না শব্দ যাহাতেই যুক্ত থাকুক, 'মদনা' ভিন্ন আর কিছু নয়। ময়নাপুর কি মদনা রাণীর স্থাপিত? ময়নাগড় কি হরিচন্দ্র রাজার নিজ গড়? আশ্চর্য, ময়নামতী গানের ময়নামতী, মদনাবতী; আবার, শূন্য পুরাণে মদনাযুবতী। সে-গানের ওড়িয়া সংস্করণে হরিচন্দ্র রাজা আছেন; আর ধাড়িচন্দ্র যে হরিচন্দ্র নহেন, তাহাও নির্ভয়ে বলিবার জো নাই। শূন্য পুরাণেও দেখিতেছি, ধর্মপূজার যজ্ঞে মীননাথ, (হাড়ী) সিদ্ধা, চৌরঙ্গিনাথ ভোজন করিয়াছিলেন। আরও আশ্চর্য, ইতিহাসে লেখে, ধর্মপালের রাণীর নাম রন্না দেবী। তিনি সাধুভাষায় রঞ্জা হইয়া পড়েন। এই রূপ, কার স্কন্ধে কার মুণ্ড যোজিত হইয়াছে, কে জানে। তবে বুঝি, ভাগ্যে, সেকালের লোকে গায়নের গান শুনিত, ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি করিত, তাই আমরা একালে প্রাচীন মন্দিরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই এক টুকরা ভাঙ্গা ইট দেখিতে পাইতেছি। নিরঞ্জন-করতারের ভক্ত রামাই ধন্য, যিনি ছত্রিশ জাতিকে তাম্র দিয়া, ব্রাহ্মণের অবজ্ঞাত অস্পৃশ্য পরিত্যক্ত জাতিকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া লইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার মহত্ত্ব এখনও বুঝিতে পারি নাই; তিনি ব্রাহ্মণ কি বাইতি ছিলেন, সে বিচারে বসিয়া গিয়াছি। তিনিও হঠাৎ আবির্ভূত হন নাই। তাঁহার পূর্বে অন্ততঃ তিনজন পণ্ডিত জন্মিয়া পতিতের কানে নিরঞ্জনের নাম শোনাইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কেবল এইটুকু বুঝিতেছি, ধর্মের গান বহু, বহু কালের।

ভবঘুরেয়ের চিঠি

মার্কিনে ভারতবাসীদের পৌর অধিকার রক্ষার জন্য যতদূর করা সম্ভব, তাহা করিয়া আমার স্ত্রী ও আমি ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৭) তারিখে নিউইয়র্ক হইতে নর্থ জার্মান্ লয়েড্ কোম্পানীর "বার্লিন" নামক জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমরা বার্লিন জাহাজে একবার ফ্রান্সের সেরবুর্গ বন্দর হইতে নিউ ইয়র্কে গিয়াছিলাম; জাহাজের কাপ্তেন, প্রধান ষ্টুয়ার্ড ও ডাক্তার আমাদের বিশেষভাবে জানিতেন। কাজেই আমাদের বিশেষ খাতির করিয়া যাহাতে কোন প্রকারের কষ্ট না হয় তাহার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। নিউইয়র্ক হইতে ইউরোপ যাত্রা করিবার সময় আমার স্ত্রীর ব্রঙ্কাইটিস্ অসুখ ছিল, সমুদ্রের হাওয়ায় ২।৩ দিনের মধ্যে অনেক উপকার হইল।

আমাদের জাহাজে আমি একমাত্র ভারতবাসী এবং আমার সহযাত্রীদের মধ্যে ইংরেজ, জার্ম্মান ও আমেরিকান্। জাহাজের কাপ্তেন আমার স্ত্রী ও আমাকে কয়েকবার তাঁহার ক্যাবিনে লইয়া গিয়া নানা প্রকারের আলাপ করেন এবং একদিন আমাদের তিনজনের এক সঙ্গে ফোটো লইলেন। যতদিন জাহাজে ছিলাম প্রত্যেক দিন আমার মনে এই কথা শতবার উঠিত—"ভারতবাসীর সংখ্যা ৩২ কোটী; কিন্তু ভারতবাসীর মধ্যে একজনও জাহাজের কাপ্তেন নাই, ভারতবাসীদের বাণিজ্য-পোত, রণপোত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।



ডাক্তার ও মিসেস্ তারকনাথ দাস ও
বার্লিন জাহাজের কাপ্তেন "মিঃ রেম"

ভারতবাসীরা যখন ব্যবসার জন্য, বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে যান তখন তাঁহাদিগকে পরনির্ভরশীল হইয়া শত প্রকারের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। আমি কখনও ইংরেজের জাহাজে চড়ি নাই; তবে শুনিয়াছি, যে, ইংরেজের জাহাজে ভারতবাসীকে নানা প্রকারের কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যতদিন ভারতবাসীরা নিজেদের জাহাজে বিদেশ যাত্রা করিতে সুযোগ পাইবেন না ততদিন তাঁহারা জাপানি জাহাজ, জার্ম্মান জাহাজ বা সুইডিস্ জাহাজে ভ্রমণ করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার পাইবেন, ইহা আমার বিশ্বাস।"

আমাদের জাহাজ প্লিমথ্ (ইংলণ্ড) এবং সেরবুর্গ (ফ্রান্স) হইয়া ১লা মার্চ্চে ব্রেমন (জার্ম্মানি) পৌঁছিল। জাহাজ হইতে নামিবার পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে এক তার পাইলাম, যে, আমাদের বন্ধু শ্রদ্ধেয় রিচার্ড হিল্গার, যিনি আমার অনুরোধ অনুসারে গত বৎসর ঋষি রবীন্দ্রনাথকে ডুসেল্ড্রফের সুবৃহৎ মেলায় বক্তৃতা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করেন, হঠাৎ মারা গিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, কারণ মিষ্টার ও মিসেস্ হিল্গার অতি অমায়িক এবং প্রকৃত সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক এবং আমরা তাঁহাদের বাড়িতে নিজেদের ঘরের মত ছিলাম। আমরা পর দিন সোজাসুজি ডুসেল্ড্রফে যাত্রা করিলাম এবং তথায় মিসেস্ হিল্গার ও তাঁহার পুত্র-কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং আমাদের মৃত বন্ধুর কবরের উপর আমাদের শ্রদ্ধা-ব্যঞ্জক ফুল ইত্যাদি দিয়া—পর দিন "বাদেন-বাদেন" সহরে যাত্রা করিলাম। পথে আমারা ফ্রাঙ্কফুট সহরে রাত্রি যাপন করিলাম। জার্ম্মানিতে আসার পর থেকে একটু শান্তির ভাব প্রাণে আসিল—জার্ম্মানিতে কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ নাই বলিলেই হয়। তারপর শিক্ষিত জার্ম্মান মাত্রেই ভারতের অতীত গৌরব ও ভারতের দর্শন সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু জানে এবং তাহারা প্রাণের সহিত ইচ্ছা করে যে, ভারতবাসীরা একদিন স্বাধীন হউক। বর্ত্তমানে জার্ম্মানি এক পক্ষে শক্তিহীন; জার্ম্মানদের দেশে বৈদেশিক সৈন্য (ইংরেজ ও ফরাসী) রাইন নদীর প্রদেশে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া আছে। জার্ম্মানির রাজকর হইতে বাৎসরিক প্রায় ক্রোর টাকা জার্ম্মানির পুরাতন শত্রুদের দিতে হয়। জার্ম্মানি ইচ্ছামত জল স্থল ও বায়ু-যুদ্ধের সরঞ্জাম বৃদ্ধি করিতে পারে না। জার্ম্মানির কতকগুলি দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছে এবং জার্ম্মান জনসাধারণ করভারপীড়িত। কিন্তু জার্ম্মান জাতির মধ্যে একটা অসীম শক্তির চিহ্ন দেখা যায় এবং এই পতিত ও যুদ্ধে পরাজিত জাতির উদ্যম, অধ্যবসায় এবং আত্মোদ্ধারের অদম্য প্রয়াস দেখিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। কোন জার্ম্মান তাহাদের যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য তাহাদের পুরাতন শত্রুদের দোষ দেয় না। সাধারণতঃ তাহারা বলে, "আমাদের দেশের রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রিগণ যদি অন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের যোদ্ধাদের

মত দক্ষতা দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদের এই পরাজয় হইত না।" জার্ম্মানিতে লোকে অতীতের কথা চর্চ্চা করিতে চায় না। কি করিয়া পুনরায় জগতের মধ্যে মহাশক্তিশালী জাতি হইতে পারিবে সেইজন্য জার্ম্মান্ শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, সংবাদপত্র-সম্পাদক, অধ্যাপক ও জনসাধারণ খাটিতে প্রস্তুত। আমার বিশ্বাস এই যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মানি অর্থনীতি-ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, শিক্ষা-বিষয়ে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজের শক্তিতে সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তির মধ্যে পুনরায় গণ্য হইবে। জার্ম্মান্ জাতি জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য সাধনা করিতেছে। সাধনার ফলে উন্নত হইবে, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

জার্ম্মানির জাতীয় সাধনার সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা এই চিঠির মধ্যে সম্ভব নয়। শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কিভাবে উন্নতি-প্রয়াস চলিতেছে, তাহা যাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিতে চান, তাঁহারা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সভ্য সার ফিলিপ ডসনের লিখিত নূতন পুস্তক জার্ম্মান শিল্পের পুনরভ্যুদয় (Germany's Industrial Revival) পড়িবেন। তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলিতে চাই। যদি কোন জাতি কখন বড় হইতে চায়, সে-জাতিকে অপর দেশের সঙ্গে নানা প্রকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে-জাতিকে ব্যবসাক্ষেত্রে নামিতে হইবে এবং জাতীয় বাণিজ্য-পোত গড়িয়া তুলিতে হইবে। পুরাকালে ভারত, চীন, গ্রীস্ অন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল; পরে ইতালি, স্পেন, তুর্কি, হলণ্ডের বাণিজ্য-পোত এবং রণতরী জাতীয় উন্নতির ও প্রতাপের প্রধান সহায় হইয়াছিল; বর্ত্তমানে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানের রণতরীর ও বাণিজ্য-পোতের প্রভাব সকলের জানা আছে। যদি গত যুদ্ধে জার্ম্মানির রণতরী ও বাণিজ্যতরী শত্রুহস্তগত না হইত, তাহা হইলে জার্ম্মানি আজ মহাবলশালী রাজশক্তির মধ্যে গণ্য হইত। ভার্‌সাই সন্ধির ফলে জার্ম্মানি বড় বড় রণতরী নির্ম্মাণ করিবার অধিকার হারাইয়াছে এবং জার্ম্মানির অধিকাংশ বাণিজ্যতরী জয়ী জাতিরা বিশেষতঃ ইংলণ্ড লইয়াছিল; কিন্তু অদম্য প্রয়াসের ফলে আজ জার্ম্মান্ জাতি বাণিজ্যে উন্নতির পথে চলিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ নর্থ জার্ম্মান লয়েড্ কোম্পানির অতীতের এবং বর্ত্তমানের কথা বিচার করা যাউক। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই কোম্পানি স্থাপিত হয় এবং ১৯১৪ সালে যুদ্ধের পূর্ব্বে সমস্ত জগতের মধ্যে চতুর্থ বৃহৎ জাহাজ লাইনের স্থান অধিকার করে এবং সেই সময় এই কোম্পানির ৪৯৪ খানা জাহাজ ছিল; তাহার মোট "গ্রোস্ টনেজ" ৯২৫,০০০ টন্ ছিল। যুদ্ধের শেষে এই কোম্পানীর মাত্র ৫৭,০০০ টনের ছোট জাহাজ ছিল।



জার্ম্মানিতে ব্যায়াম-শিক্ষার নমুনা

গত ৭৮ বৎসরের যত্নে আজ এই কোম্পানির জাহাজ ও বাণিজ্য পুনরায় খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯২৫ সালের শেষে এই কোম্পানির মোট "গ্রোস্ টনেজ" ৬১৩,০৫৬ টন্ এবং ৪১৮ খানি জাহাজ ছিল। এই জাহাজগুলির মধ্যে ১১৭ খানি সমুদ্রগামী বাণিজ্যতরী এবং তাহাদের মোট "গ্রোস্ টনেজ" ৩৫৮,০৯৩ টন্। ১৯২৫ সালের শেষ সময়ে এই কোম্পানী ১২,৭৩৪ জন লোককে চাকরী দিয়াছে। ১৯২২ সালে এই কোম্পানী ২৩,৭৭৮ জন যাত্রী, ১৯২৩ সালে ৫৩,৮২০, ১৯২৪ সালে ৬০,৮০২, এবং ১৯২৫ সালে ৯১,০৯৬ জন যাত্রী বহন করিয়াছে। এই কোম্পানির সমৃদ্ধির চিহ্ন এই যে, ১৯২৪ সালে ইহার শেয়ার ৬০ বা ৭০ মার্কে বিক্রয় হইতেছিল এবং বর্ত্তমানে উহা ১৪০ মার্কে বিক্রয় হইতেছে। যুদ্ধের পর এই কোম্পানি ৩২,০০০ টনের "কলম্বস্" নামক জাহাজ গড়িয়াছে এবং ১৯২৮ সালের মধ্যে "ইউরোপ" ও

"ব্রেমেন্" নামক দুইখানি ৪৬,০০০ টনের জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জাহাজ তৈয়ারী সম্পূর্ণ হইবে।

আমরা যদি হামবুর্গ আমেরিকা লাইন্, হান্‌সা লাইন্ ও অন্যান্য জার্ম্মান জাহাজ লাইনের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, যে, তাহাদের ক্রমোন্নতি হইতেছে। পরাজিত এবং বিপন্ন জার্ম্মানির রাজসরকার জাহাজ কোম্পানিগুলির উন্নতির জন্য সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, ১লা এপ্রিল ১৯২৭ সাল হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য, যে-সমস্ত কোম্পানি নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ করিবে, তাহাদের মধ্যে বার্ষিক প্রায় ১৩০,০০,০০০ এক ক্রোর ত্রিশ লক্ষ টাকা সরকারের তহবিল হইতে সাহায্য স্বরূপ বাঁটিয়া দেওয়া হইবে। ইহার ফলে জার্ম্মানির জাহাজ-নির্ম্মাণ-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মানিতে ৬০০,০০০ ছয় লক্ষ বা ততোধিক টনের জাহাজ-নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে।

জার্ম্মানির অন্যান্য শিল্পের যে অবস্থা ভাল, তাহা কোম্পানির অংশের মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা বেশ বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স, বেলজিয়াম্, লুক্সেমবুর্গ জার্ম্মানির সহিত লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছে; পটাশ ব্যবসায়ে ফ্রান্স ও জার্ম্মানি যৌথ কারবার আরম্ভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের বড় বড় ব্যবসায়ীরা জার্ম্মানির সঙ্গে মিলিয়া ব্যবসার প্রস্তাব করিতেছে। আমেরিকা জার্ম্মানিকে টাকা ধার দিতেছে, কারণ আমেরিকার ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়িগণের দৃঢ়বিশ্বাস যে, জার্ম্মানীর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

জার্ম্মানির লোকসংখ্যা ছয় কোটী বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দিতেছেন। পূর্ব্বে জার্ম্মানির প্রত্যেক যুবককে সামরিক শিক্ষা করিতে হইত; বর্ত্তমানে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়ে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক সহরে, নানা প্রকারের ব্যায়াম—ছেলে, মেয়ে যুবক যুবতীদের জন্য—শিক্ষার বন্দোবস্ত চলিতেছে। জার্ম্মানীতে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রণালী শিখাইবার জন্য প্রত্যেক বড় বড় সহরে **স্বাস্থ্যরক্ষা প্রণালীর প্রদর্শনী** স্থাপিত হইয়াছে এবং "সিনেমাতে" নানা প্রকারের ব্যায়ামের ছবি এবং রোগ-নিবারণের প্রণালীর ছাব দেখাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। জগতের মধ্যে জার্ম্মানিতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে এবং হাঁসপাতাল, স্যানিটোরিয়াম্, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের রোগের বিশেষ চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। এই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-প্রণালী ধনী ও দরিদ্রের আয়ত্তাধীন। অর্থাৎ গরীবলোক গরীব ভাবে থাকিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট জল বায়ু পরিবর্ত্তক স্থানে (watering place) সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা পাইতে পারে।

আমার স্ত্রীর ব্রংকাইটিস্ চিকিৎসার জন্য আমরা বাদেন্-বাদেন্ সহরে প্রায় একমাস অবস্থান করিলাম এবং ১লা এপ্রেল আমরা কার্লস্‌রু সহর ও ষ্টুটগার্ট হইয়া মিউনিক আসিলাম। আমরা মিউনিকে দুইমাস কাল অবস্থান করি এবং ১লা জুন "বাদ রাইসেন হল্"-এ আসিয়াছি। আমরা যখন মিউনিকে ছিলাম তখন প্রত্যেক সপ্তাহে কোন পাহাড়ে বা সুন্দর স্থানে যাইতাম। এই ছোট ছোট ভ্রমণ-সময়ের কয়েকটি ঘটনার কথা বলিব।

একদিন প্রাতে আমরা মিউনিক হইতে "পার্টেন কির্‌খেন্" গ্রামের নিকটস্থ "ব্যাভেরিয়ান্ আল্পসের চূড়া" যাহাকে "ঝুগস্ স্পিট্‌সে" বলে, দেখিতে যাইতেছি, ট্রেনে একজন ভদ্রলোক জার্ম্মান ভাষায় আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ব্রাজিলিয়ান্?"। ভদ্রলোকটি একজন ব্রাজে-লিয়ান ব্যবসায়ী। তিনি তাঁহার স্ত্রী ও চারটি পুত্র লইয়া জার্ম্মানিতে কয়েক মাসের জন্য আসিয়াছেন। নানা কথা-বার্ত্তার পর তিনি বলিলেন, "শিক্ষিত ভারতবাসী যদি ব্রাজিলে যান্ তাঁহাদের কোন প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে না। ব্রাজিলে কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ নাই; অনেক নিগ্রো বড় বড় রাজনৈতিক পদ অধিকার করে। ব্রাজিলে শতকরা ৭০ জন লোক ইউরোপীয়ান্ ও নিগ্রো, বা ইউরোপীয়ান্ ও ব্রাজিলের আদিমবাসী, অথবা নিগ্রো ও আদিমবাসীর মিশ্র-বিবাহের ফল। ব্রাজিলের সরকার লোক চায়। কাজেই গতবৎসর প্রায় ছয় হাজার জাপানি—

দের জমি দিয়া বসবাস করিবার জন্য সুযোগ দিয়াছে। ব্রাজিলের প্রত্যেক ধনী ও মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে-মেয়েরা কৃষ্ণাঙ্গ ধাইর দুগ্ধে পুষ্ট হয় এবং এই চাকরাণীদের "ব্লাক মাদার" "কৃষ্ণাঙ্গ মাতা" বলিয়া থাকে এবং সম্প্রতি এই কৃষ্ণাঙ্গ চাকরাণীদের বা কৃষ্ণাঙ্গ মাতাদের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রায় এক ক্রোর টাকার স্মৃতি-মন্দির গঠনের জন্য জনসাধারণ টাকা উঠাইতেছে। **ইংরজের রাজ্যে ভারতবাসীর সম্মানের স্থান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া বাঙ্গালী যুবক জগতে বাহির হইয়া পড়—আমাদের বিশ্বজয় করিতে হইবে; কেবল ঘরে বসিয়া কাঁদিলে চলিবে না।**

আর একদিন আমরা ব্যাভেরিয়ান্ আল্পসের মধ্যস্থিত "মিটেন্ ওয়াল্ড্" (মধ্যবন) সহরে যাই। আমরা যখন ষ্টেসনে আসিয়া প্ল্যাটফর্মে বেড়াইতেছি হঠাৎ দুইটি ১৬।১৭ বৎসরের বালিকা আমাদের কাছে আসিল। ইহাদের মধ্যে একজন আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি কি একজন ইংরেজ মহিলা?" আমার স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "না, বালিকা, আমি একজন মার্কিন মহিলা; আমার স্বামী একজন ভারতবাসী।" বালিকা তখন বলিল, "আমি একটি ইংরেজ বালিকা, প্রায় তিনমাস পূর্ব্বে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি এখানে একটি জার্ম্মান বালিকাদের বোর্ডিং স্কুলে থাকি; আমি জার্ম্মান শিখিতেছি এবং আমার নিকট হইতে মেয়েরা ইংরেজী শিক্ষা করে। আমার সঙ্গী আমার স্কুলের ছাত্রী। আজ তিন মাসের পর আপনাদের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা কহিয়া কত আনন্দ হইল।" আমি তখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একলা বিদেশে আসিতে তোমার ভয় হয় নাই? জার্ম্মানিতে তোমার কোন কষ্ট হয় কি?" মেয়েটির মুখখানা লাল হইল এবং সে বলিল—"ইংলণ্ড ছাড়িবার সময় মনে মনে একটু সন্দেহ হইয়াছিল, যে, জার্ম্মান মেয়েরা আমায় হয়ত ইংরেজ বলিয়া ঘৃণা করিবে। গত যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে জার্ম্মানীর লোককে বর্ব্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; কিন্তু আমার জীবনে এত দয়া, মমতা এবং সখ্যভাব অন্য কাহারও কাছে পাই নাই। আমার সহপাঠী জার্ম্মান



বাদ্ রাইফেন হলের নিকটস্থ ব্যাভেরিয়ান আল্পসের একটি চূড়া

বালিকারা আমায় নিজেদের বোনের মত ভালবাসে এবং এই জার্ম্মান বালিকা আমার বন্ধু।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কিজন্য জার্ম্মানিতে আসিয়াছ?" তদুত্তরে ইংরেজ বালিকা বলিল, "আমি জার্ম্মান শিখিতে চাই, এবং আমাদের ইচ্ছা, যে, ইংরেজ ও জার্ম্মানের মেয়েদের মধ্যে সখ্যভাব বৃদ্ধি হয়; কাজেই জার্ম্মানিতে আসিয়া জার্ম্মান শিক্ষা ও জার্ম্মন জাতিকে ভাল করিয়া জানা আমার উদ্দেশ্য।" এই সময়ে আমাদের ট্রেন আসিয়া পড়িল, আমরা বিদায় অভিবাদন করিয়া গাড়িতে উঠিলাম এবং ট্রেনে ভাবিতে লাগিলাম ইংরেজ ভারতে অত্যাচারী সত্য; কিন্তু ইংরেজের শক্তি, সাধনার ফল। ১৭ বৎসরের ইংরেজ মেয়ে একলা বিদেশে শিক্ষার জন্য সাধনা করিতে ভীত বা উৎকণ্ঠিত নয় আর ভারতে হিন্দু সমাজ সতীত্বের ধুয়া ধরিয়াও স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার ভান করিয়া, মেয়েদের শিক্ষা দিবার সুযোগ দেয় না এবং ৫।৭।৮।১০ বৎসরের বালিকাদের

বিবাহ দেয় এবং স্ত্রীধর্ম্ম রক্ষার ধুয়া দিয়া নবীন বালিকাদের জান্তব-বৃত্তি চরিতার্থের বস্তুতে পরিণত করে! ভারতে সমাজের গলিত অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য সমাজ-বিপ্লবের প্রয়োজন। এবং যুবক ও যুবতীদের উদ্যমের উপর পতিত ভারত-সমাজের মুক্তি নির্ভর করে।

আর একদিন আমরা "ব্যাভেরিয়ান্ আল্‌পসের" এক ছোট গ্রামে যাই এবং সেখানে এক সুন্দর বাড়ীতে "ক্যাথলিক নার্‌সিং সিস্‌টারবৃন্দের" আবাসস্থান দেখিলাম। এই ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীরা সেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং রোগীর সেবা করিয়া জীবন যাপন করেন। এই পাহাড়ের শত শত স্থানে যিশু খৃষ্টের কাষ্ঠের মূর্ত্তি দেখিলাম এবং ছোট ছোট মন্দিরে যিশুর ও তাঁহার মাতা মেরির পূজার জন্য বাতি জ্বলিতেছে, দেখিলাম। এসমস্ত দেখিয়া বুঝিলাম যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে "সেবা-ধর্ম্মের" অভাব নাই এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিশেষতঃ ক্যাথলিকদের মধ্যে ভক্তি-মার্গের লোক যথেষ্ট আছে। হিন্দুদের মধ্যে আজ ধর্ম্মের "খোসা" লইয়া লড়াই হয়, হিন্দুরা সেবা-ধর্ম্ম প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না; তাই না আজ আমাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনে এত দৌর্ব্বল্য।

৪ঠা জুন, ১৯২৭ ভারতপন্থী

শ্রী তারকনাথ দাস

সত্তর বৎসর

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

৩১

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। এইজন্য এ বৎসর পূজার পরে শ্রীহট্টে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই আবার আমাদিগকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধ পাকা দেখার দিনেই ভাঙ্গিয়া যায়। তখনও আমাদের দেশে বর পণের উৎপীড়ন আরম্ভ হয় নাই। তবে যে-ক্ষেত্রে বরের পক্ষ কন্যাপক্ষ অপেক্ষা কুল-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে 'কুলমর্য্যাদা' স্বরূপ স্বল্পবিস্তর অর্থোপহার দিতে হইত। কত দিতে হইবে, সম্বন্ধের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহা উভয় পক্ষের মধ্যে স্থির হইত। আমার ভগিনীর সম্বন্ধ হয় ত্রিপুরা জেলায় সরাইল-পরগণার একটা বিশিষ্ট গ্রামে। পূর্ব্বেই বোধ হয় কহিয়াছি যে, শ্রীহট্ট অঞ্চলে বৈদ্য ও কায়স্থে বিবাহ হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত্রিপুরা এবং পূর্ব্ব ঢাকার বৈদ্যেরা শ্রীহট্টের কায়স্থদিগের অপেক্ষা বেশী কৌলীন্যের দাবী করিয়া থাকেন। যাঁহার সঙ্গে আমার ভগিনীর বিবাহের কথা স্থির হয়, তাঁহারা বৈদ্য এবং এইজন্য কুল-মর্য্যাদায় আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই হিসাবে একটা বর-পণ দিবার কথা হইয়াছিল। কত টাকা ঠিক মনে নাই, বোধ হয় ২০০ টাকা হইবে। ইহাতেই বর-পক্ষীয়েরা রাজী হন, এবং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাহের দিন ধার্য্য হয়। আমাদের অঞ্চলে বিবাহের প্রথম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে 'পানে-খিলি' কহে। এই দিন বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে ভেট আসে। এবং বোধ হয় ইহার পরে কন্যার বাড়ী হইতেও বরের বাড়ীতে যথাযোগ্য উপঢৌকনাদি যায়। কলিকাতায় যাহাকে পাকা-দেখা বলে তাহাতে বর-পক্ষীয়েরা কন্যাকে এবং কন্যা-পক্ষীয়েরা বরকে যাইয়া "আশীর্ব্বাদ" করিয়া আসেন। আমার মনে হয়, আমাদের এই "পানে-খিলিও" কতকটা ইহারই মতন। তবে "পানে-খিলি" অনুষ্ঠানের আড়ম্বর অনেক বেশী। এই দিনে বর কন্যা উভয়ের বাড়ীতেই নহবৎ বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের অন্যান্য অনুষ্ঠানও হয়। আমার যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় এই উপলক্ষে কন্যাপক্ষীয়েরা পল্লীর

স্ত্রীলোকদিগকে—ভদ্রাভদ্র নির্ব্বিশেষে—পান সুপারী এবং ভাঁড়ে করিয়া তৈল উপহার দিয়া থাকেন। পুরুষেরাও নিমন্ত্রিত হইয়া তাম্বুলাদির দ্বারা অভ্যর্থিত হন—ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞাতি ভোজনও হইয়া থাকে। বাবা এই অনুষ্ঠানের সকল আয়োজন করিয়াছিলেন। বোধ হয় গ্রামের সামাজিকেরা যথারীতি আমন্ত্রিতও হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে নহবৎ বসিয়াছিল। অন্তঃপুরে পুরস্ত্রীরা আসিয়া জড় হইয়াছিলেন। ·বর-পক্ষের লোকের অপেক্ষায় আমরা পথ চাহিয়াছিলাম। এমন সময় বরের পিতার নিকট হইতে একটি লোক একখানি পত্র লইয়া আসিল। তিনি পূর্ব্বকার অঙ্গীকৃত টাকা অপেক্ষা আরও দুই শত টাকা বেশী—বর-পণের হিসাবেই হউক বা কুলমর্য্যাদার হিসাবেই হউক—চাহিয়া বসিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আমার বাবাকে ভাল করিয়া চিনেন নাই। চাপ দিয়া টাকা লইবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবার প্রকৃতি এরূপ ছিল যে, তিনি কখনও এরূপ ছল-চাতুরী বা কল-কৌশল সহ্য করিতে পারিতেন না। বাবা ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়া তখনই এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। বরের পিতাকে লিখিলেন যে, পূর্ব্বে যদি তিনি চাহিতেন, তাহা হইলে আরও দু'শ কেন হয়ত তার চাইতে বেশী টাকাও দিতে রাজী হইতে পারিতেন; কিন্তু বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া, সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—দেশময় এ কথা রাষ্ট্র করাইয়া এরূপ চাপ দেওয়াতে তিনি এক পয়সাও দিতে রাজী নন। উৎসবের আয়োজন সকলই বন্ধ হইয়া গেল। আমাদের বাড়ীতে যেন একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া ঘেরিল।

পর দিবস বাবা সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন যে, এই অগ্রহায়ণ মাসেই যেরূপ করিয়া হউক কন্যার বিবাহ দিবেন। সে-সময়ে আট দশ বৎসরের মধ্যেই সচরাচর ভদ্র পরিবারের বালিকাদিগের বিবাহ হইত। কিন্তু আমার বাবা আমার ভগিনীকে যেমন তৎকালোচিত বাংলা লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন, সেইরূপ একটু বেশী বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে অনূঢ়াও রাখিয়াছিলেন। আমাদের অঞ্চলে সে-কালে বালিকাদের বিবাহ অল্প বয়সে হইলেও পুরুষেরা বেশীদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতেন। ২৪।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত কেহই প্রায় বিবাহ করিতেন না। ২৪।২৫ বৎসরের বর ও ৮।১০ বৎসরের কন্যা বড়ই বেমানান হইত। বোধ হয় এইজন্যই বাবা আমার ভগ্নীকে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত—বোধ হয় তার চাইতেও আরেকটু বেশী অনূঢ়া রাখিয়াছিলেন। আর বেশী দিন তাহাকে ঘরে রাখা যায় না। বিশেষতঃ আদালত হইতে কন্যার বিবাহের জন্য ছুটি লইয়া আসিয়াছিলেন। বিবাহ না দিয়া সহরে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন না। এই সম্বন্ধের পূর্ব্বেও আরও অনেক সম্বন্ধের কথা আসিয়াছিল। সে কালের লোকেরা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধেই মানুষের বিবাহ হয় বিশ্বাস করিতেন। কার ভাগ্যে বিধাতা কোন্ বর লিখিয়াছেন বলা যায় না। এইজন্য ভাল মন্দ যে-সম্বন্ধই আসুক না কেন তাঁহারা কোনটাই খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করিতেন না। এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে পূর্ব্বে যে-সকল প্রস্তাব আসিয়াছিল তাহারই মধ্য হইতে একটি বাছিয়া সেইখানেই কন্যার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। বরের বয়স ২৫।২৬ হইবে। নিকটবর্ত্তী কাছাড় জেলায় পুলিশে কর্ম্ম করিতেন—ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। বংশ-মর্য্যাদায় আমাদেরই সমকক্ষ। বরের খুল্লতাত বাঁচিয়াছিলেন। তিনিই বিবাহের প্রস্তাব করেন। বাবা এইখানেই কন্যার বিবাহ দিবেন মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু আমি তখন বড় হইয়াছি। পুত্র যে-বয়সে মিত্রের মর্য্যাদা লাভ করে সেই বয়সে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমার বড় মামা তখন আমাদের বাড়ীতে। আমার এক জ্ঞাতি জ্যেঠ্‌তুত ভাই বাবার কাজ-কর্ম্ম করিতেন। আর বাবার পরিবারভুক্ত দাসী-পুত্র দাগু সিং ইঁহারা সকলেই তাঁহার অমাত্যের মত ছিলেন। পারিবারিক কোন ব্যাপারে বাবা ইঁহাদের অনুমতি না লইয়া কেবল নিজের রায়ের উপরে কখনও কোন কাজ করিতেন না। নিজের মনে নূতন সম্বন্ধ করা স্থির করিয়া সকলের আগে মাকে যাইয়া কহিলেন, এবং মার সম্মতি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা সম্মতি দিলেন। তারপর আমার বড় মামাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। আমার জ্যেঠ্‌তুত ভাই, "দাদা" (দাগু সিং) এবং আমি

—আমরা সকলেই তাঁহার রায়ে রায় দিলাম। আমাদের সম্মতি পাইয়া বাবা বরের খুল্লতাতকে লিখিলেন যে, ২২শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যদি তাঁহারা বিবাহের দিন স্থির করেন এবং ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আপনার কন্যা সম্প্রাদন করিতে রাজী আছেন। পাইকের হাতে অমনি এই চিঠি গেল। সেদিন বোধ হয় ৯ই কি ১০ই অগ্রহায়ণ। এই চিঠি যাওয়ার পরেই আমাদের সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমাদের কারই ইচ্ছা নয় যে, এখানে বিবাহ হয়। কারণ বরটি শ্রীহট্ট এবং কাছাড় দুই জেলাতেই বদ্ধ মাতাল বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাবার মুখের উপরে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে আমাদের সাহস হয় নাই। এখন সকলে মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। বরকে কাছাড় হইতে আসিতে হইবে, কর্ম্ম হইতে ছুটি লইয়া। যদি কোন হেতুতে ২২শে তারিখের মধ্যে না আসিয়া পৌঁছিতে পারেন, তবেই সকল দিক রক্ষা পায়। বরের খুল্লতাত মহাশয় বাবার চিঠির জবাবে ২২শে অগ্রহায়ণই বিবাহের দিন ঠিক করিলেন, এবং বরকে তখই ছুটী লইয়া বাড়ী আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছেন এ কথা জানাইলেন। তখন আমরা অনন্যোপায় হইয়া আরেকটা টেলিগ্রাম জাল করিয়া বরকে তখনই ছুটী লইয়া আসিতে বারণ করিব স্থির করিলাম। সে জাল তার লেখা হইয়াছিল মনে পড়ে, কিন্তু পাঠান হইয়াছিল কিনা মনে পড়ে না। "পানেখিলির" দিন ধার্য্য হইল। নির্দ্ধারিত দিনে বিবাহের এই পূর্ব্ববৃত্ত অনুষ্ঠান সব হইল। বাড়ীতে আবার নহবৎ বসিল। গ্রামের আত্মীয় স্বজনে ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকে আমাদের বাহিরবাড়ী ভরিয়া গেল। পুরস্ত্রীরা অন্তঃপুরে আসিয়া জড় হইতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ জামাতার অনেক কীর্ত্তি-কথা নানা লোকের মুখে মায়ের কানে পৌঁছিয়াছিল। আমাদের গ্রামের অনেক ভদ্র এবং ভৃত্যশ্রেণীর লোকেরা কাছাড়ে চাকুরী করিতেন, তাঁরা বরের স্বভাব-চরিত্রের কথা জানিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এই সময়ে গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। ইহাদের কারও কারও মুখে সে সকল কথা আমাদের অন্তঃপুরে মায়ের কানে পৌঁছিল। যে-দিন হইতে মা এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন সেই দিন হইতেই তাঁহার আহার-নিদ্রা একরূপ বন্ধ ছিল। এই 'পানে-খিলি'র দিন প্রাতে তিনি আর আপনাকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। বাহিরে যখন নহবৎ বাজিতেছে, লোক-সমাগমে বহির্ব্বাটী কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে, অন্তঃপুরে পুরস্ত্রীরা আসিয়া জুটিয়াছেন, সেই সময়ে মা চীৎকার করিয়া 'মড়াকান্না' জুড়িয়া দিলেন। একখানা বঁটি সম্মুখে রাখিয়া কহিতে লাগিলেন যে, এই পাত্রে কন্যার বিবাহ দিবার পূর্ব্বে, কন্যাকে আপনি হত্যা করিয়া নিজে আত্মঘাতী হইবেন। বাবা মহাসঙ্কটে পড়িলেন। একদিকে কথা দিয়াছেন। আর সমগ্র দেশের লোকে জানিত তাঁহার কথা কখনও টলে না। অন্যদিকে মার এই সাংঘাতিক আপত্তি। মার সম্মতি ব্যতিরেকে এই শুভ-কর্ম্মের সূত্রপাত হইতেই পারে না। কোন পারিবারিক ব্যাপারে পতি পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না —এষো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ—বাবার ইহাই আদর্শ ছিল। সুতরাং তাঁর নিজের কথা থাকুক বা যাক্ তাঁর মানই থাকুক বা অপমানই হউক—কন্যার বিবাহ-ব্যাপারে বাবা সহধর্ম্মিণীর এই ঘোরতর আপত্তি কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। মর্ম্মন্তুদ উৎকণ্ঠায় একবার অন্তঃপুরে ও একবার বহির্ব্বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা দেখিয়া আমরা সকলেই অস্থির হইয়া উঠিলাম। অবশেষে আমি মার কাছে যাইয়া তাঁকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, এতটা পাকা কথার পরে এই বিবাহও যদি ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, বাবা এ আত্মগ্লানি কিছুতেই সহিতে পারিবেন না। এ আঘাতে তাঁহার জীবন-সংশয় উপস্থিত হইবে। আমার তখন সেইরূপ ধারণাই হইয়াছিল। মা আমার কথা শুনিয়া কহিলেন,—"আর করিব কি—কপালে যাহা ছিল তাহাই হউক। বল গিয়া 'পানেখিলি' দিতে।" আমি বাবাকে আসিয়া সে-কথা বলার পর বিবাহের এই প্রাথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান হইল। এইরূপে বিষাদের ছায়াতলে আমার ভগিনীর বিবাহ হইয়া গেল। বরের রূপ কন্দর্পের মত ছিল। তখনকার হিসাবে লেখাপড়াও বেশ জানিতেন। স্বভাবচরিত্রও অন্যান্য হিসাবে একরূপ নিষ্কলঙ্ক ছিল।

কিন্তু এক অতিশয় পানাসক্তিতে সকল গুণ নষ্ট করিয়াছে। ইহাই তাহার অকাল-মৃত্যুরও কারণ হয়। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে আমার ভাগিনী বিধবা হয়। বৈধব্যের চারি পাঁচ মাস পরে তাহার একটি কন্যাসন্তান হয়। সকলেই তারা এখন ওপারে গিয়া পৌছিয়াছে।

৩২

ইহার বৎসরখানেক পূর্ব্বে (১৮৭১ ইংরাজীর নভেম্বর মাসের শেষে) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শ্রীহট্টে যান। বিলাত ও ভারতবর্ষ এখন প্রায় "এঘর-ওঘর" হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ প্রথম যখন বিলাতে যান তখন এইরূপ ছিল না। রাজা রামমোহনই প্রথম বিলাতযাত্রী বাঙ্গালী। তাঁহার পরে তাঁহার বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ য়ুরোপে গিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই শিক্ষার্থীরূপে বোধ হয় প্রথম বিলাত যান। সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম বাঙ্গালী সিভিলিয়ান্। তবে তাঁহার কর্ম্মজীবন বোম্বাই প্রদেশেই অতিবাহিত হয়, বাংলায় নহে। ইঁহার পরে তিনজন বাঙ্গালী এক জাহাজে বিলাতে যাইয়া একই-সঙ্গে সিভিলিয়ান্ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন—৺রমেশচন্দ্র, ৺বিহারীলাল গুপ্ত এবং ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকালের বিলাত-ফেরতা বাঙ্গালীরা পোষাক-পরিচ্ছদে, আহারে বিহারে, চালচলনে—সকল বিষয়েই ইংরাজের অনুকরণ করিয়া চলিতেন। ইঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াই নবীনচন্দ্র 'অবকাশরঞ্জিনী'তে লিখিয়াছিলেন :—

"সিংহচর্ম্মে তুমি মেষ অল্প-প্রাণ"

সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে যাইয়া সাহেবীভাবেই চলিতে ফিরিতে আরম্ভ করেন। দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের সঙ্গেও বাংলায় কথা কহিতেন কি না সন্দেহ। ইংরাজ সিভিলিয়ানেরা যে-ভাবে থাকিতেন, সুরেন্দ্রনাথও সেই-ভাবেই চলিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যেরূপ সর্ব্বদা সাহেব সাজিয়া থাকিতেন, তাঁহার ব্রাহ্মণীও সেইরূপ বিবি সাজিয়া বেড়াইতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়িয়া সহরের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন। তাঁহার গৃহিণীও সে-যুগের ইংরাজ মহিলাদের মত মেয়েজিনে (Lady's Saddle) এ চড়িয়া অশ্বপৃষ্ঠে অপরাহ্ণে হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন। সে-সময়ে ম্যাক্‌কার্টিস (McCartis) নামে একজন আর্ম্মেণী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীহট্টে ছিলেন। ইঁহার সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতির বিশেষ আত্মীয়তা জন্মে। ইঁহারা তিন জনে যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন, তখন আমরা বালকের দল তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য প্রায়ই রাস্তার ধারে আসিয়া দাঁড়াইতাম। সেই সময়ে সাদারল্যাণ্ড (Sutherland) নামে একজন ফিরিঙ্গী সিভিলিয়ান্ শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সাদারল্যাণ্ড একজন আতকায় পুরুষ ছিলেন। এরূপ গল্প শোনা গিয়াছে যে, ইনি যখন প্রথমে শ্রীহট্টে বদলী হইয়া যান, তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের দপ্তরে বা এজলাসে এমন চৌকী ছিল না যা তাঁহার বিশাল বপু ধারণ করিতে পারে বা তাঁহার ভার সহ্য করিতে পারে। আরও গল্প আছে যে, সাদারল্যাণ্ড সাহেব প্রতিদিন সান্ধ্য ভোজের সময় একটা আস্ত মিষ্টি কুমড়া নিঃশেষ করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে শ্রীহট্টে গেলে সাদারল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার সঙ্গে অতিশয় সস্নেহ ব্যবহার আরম্ভ করেন। সুরেন্দ্রনাথের ইহা বড় ভাল লাগে নাই। এই স্নেহের আবরণের ভিতর দিয়া একটা অনুকম্পার ভাব উঁকি মারিত। সুরেন্দ্রনাথকে সাদারল্যাণ্ড্ ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের মর্য্যাদা না দিয়া এইরূপে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথের আত্ম-সম্মানে ও স্বাজাত্যাভিমানে আঘাত লাগে। এইরূপে কিছুদিন ধরিয়া শ্রীহট্টের ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের এবং সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে একটা অসন্তোষ এবং বিরোধ অলক্ষ্যে ঘনাইয়া উঠিতে থাকে। এই সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইয়া যে-মঞ্চে ইংরাজ বিবিরা বসিয়াছিলেন সেই মঞ্চে আপনার স্বামীর পদোচিত আসন দখল করিয়া বসেন। এই হইতেই সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির আয়োজন আরম্ভ হয়। সুরেন্দ্রনাথ এমন কোন গুরুতর অপরাধ করেন নাই যাহার জন্য ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ তাঁহার উপরে এমন কঠোর দণ্ড বিহিত হইতে পারিত। মূল ব্যাপারটা কিছুই নহে। একটা ফৌজদারী মামলার নথীতে যে-সকল কথা লিখা

ছিল সুরেন্দ্রনাথ নিজে তাহার প্রত্যেক কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ না করিয়া সহি করিয়াছিলেন। ম্যাস্‌প্রেট (Muspratt) নামে একজন সিভিলিয়ান তখন শ্রীহট্টের জজ ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ আনা হইয়াছিল তাহার সমুদায় নথী-পত্র পরীক্ষা করিয়া বলেন, সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ অনবধানতা (carelessness)। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও কহেন যে, যে-সময়ে তিনি এই ভুল নথী সহি করেন তখন তাঁহার উপরে অত্যধিক কাজের চাপ পড়িয়াছিল। জজ সাহেব হাইকোর্টকে লেখেন যে, সুরেন্দ্রনাথকে কিছু-দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলেই তাঁহার এই সামান্য অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইবে। হাইকোর্ট এবিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করেন জানি না। তবে গবর্মেণ্ট এই সামান্য অপরাধের বিচার করিবার জন্য একটা বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের মন্তব্যের ফলে সুরেন্দ্র-নাথকে অযথা কলঙ্কের ডালি মাথায় দিয়া সিভিল সার্ভিস্ হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। আমি তখন শ্রীহট্ট জেলা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। মোটামুটি সুরেন্দ্রনাথের মকদ্দমার সকল কথাই জানিতে পাই। তখনই এই ধারণা জন্মে যে, ইংরাজের রাজ্যে, ইংরাজের আইনে ও আদালতে ইংরাজ যদি বাঙ্গালীর পিছনে লাগে তবে বাঙ্গালীর পক্ষে সুবিচার লাভ একরূপ অসম্ভব। এই-খানেই আমার প্রথম যৌবনের স্বাদেশিকতা এবং স্বাজাত্যাভিমানের উন্মেষ হইতে আরম্ভ করে।

৩৩

শ্রীহট্টের স্কুলে পড়াশুনায় আমি কোন দিনই আমার শিক্ষকদিগের কি আমার সহপাঠীদিগের গণনায় আসিতাম না। তবে মোটের উপরে বাংলা এবং ইংরাজীতে নিতান্ত হীন ছিলাম না। যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি তখন জজ সাহেব,—তাঁহার নাম আমার মনে নাই—একদিন আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া ইংরাজী রচনায় আমার ক্লাশের ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমার রচনার তারিফ করিয়াছিলেন। কথাটা মনে আছে এই-জন্য যে, আমার সতীর্থেরা জজ সাহেবের এই প্রশংসাবাদ আমার লেখার গুণে পাই নাই, কিন্তু পিতৃপরিচয়ে পাইয়া-ছিলাম ইহা বলিয়া জজ সাহেবের উপরে পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ করিয়াছিল। আসল কথাটা এই যে, আমি বাংলা কি ইংরাজী কোন ব্যাকরণই মন দিয়া পড়ি নাই এইজন্য আমার লেখাতে বিস্তর ব্যাকরণ-ভুল থাকিয়া যাইত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তাহার মধ্যে একটা প্রাঞ্জলতা থাকিত। আমি সর্ব্বদাই কান দিয়া ভাষার বিচার করিতাম, ব্যাকরণের জ্ঞান দিয়া নহে। আর ব্যাকরণ শুদ্ধই হৌক আর অশুদ্ধই হৌক আমার মনোভাব প্রকাশ করিতে কখনও শব্দের অভাব অনুভব করিতাম না। প্রথম প্রথম শব্দেরও অপপ্রয়োগ হইত, কিন্তু মোটের উপরে লেখা শুনাইত ভাল। ক্লাশের বই অপেক্ষা বাহিরের বই বেশী পড়িতাম। আর এবিষয়ে আমার প্রধান শিক্ষক মহাশয় রায় সাহেব দুর্গাকুমার বসু—বছর-খানেক হইল ইনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—সর্ব্বদাই আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। শ্রীহট্ট জেলা স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা তাঁহার প্ররোচনায় নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া বাহিরের অনেক বই পড়িত। সেগুলি প্রায় সকলই ইংরাজী কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত ছিল। এ ছাড়া—অন্যান্য স্কুলের কথা জানি না—আমাদের হেড মাষ্টার মহাশয় ইংরাজী শিখাইবার সময় শব্দের মূল ধাতু সর্ব্বদাই শিখাইতেন। Bishop Trenchএর Study of Words আমরা তাঁহার নিকট মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলাম। প্রচলিত ইংরাজী শব্দের প্রাচীন ইতিহাস পড়িতে আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিত। একজন অতিবড় পণ্ডিতের নাম হইতে অত্যন্ত মূর্খতাব্যঞ্জক ইংরাজী Dunce শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা পড়িয়া আমার অত্যন্ত অদ্ভুত আনন্দ-কৌতূহল হইয়াছিল। লণ্ডনবাসী ছোটলোক ইংরাজেরা "হেয়ারকে" "এয়ার" বলে আর "এয়ারকে" "হেয়ার" বলে এবং nকে হেন্ উচ্চারণ করে এসকল কাহিনী পড়িতে বড়ই আমোদ হইত। এক ব্যক্তি ইতালীয় নগর ভেনিস্—Venice লিখিতে যাইয়া একটার জায়গায় দুটো n দিয়াছিলেন। এই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিতে যাইয়া একজন লণ্ডন-বাসী ইংরাজ

বলিয়াছিল, "There is only one 'hen' in Venice"। তাহার উত্তরে আরেকজন জিজ্ঞাসা করিলেন—ভেনিসের লোকেরা তবে ডিম পায় কোথা হইতে। Trenchএর পুস্তকে এরূপ অনেক গল্প আছে। এসকল পড়িতে বড়ই আমোদ হইত। শ্রীহট্টের স্কুলে থাকিতেই এইরূপে দুর্গাকুমার বসু মহাশয় আমাদিগকে যে ইংরাজী শিখাইয়াছিলেন সেই ভিত্তির উপরেই পরজীবনে ইংরাজী ভাষার উপরে যা কিছু দখল লাভ করিয়াছি তাহা গড়িয়া উঠে। স্কুলে থাকিতেই বাহিরের ইংরাজী বই কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম—আর ৺বসু মহাশয়ের প্রসাদেই শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীর প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় ইংরাজীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলাম।

আমার ছাত্রাবস্থায় ছেলেদের মধ্যে একটা সংস্কার ছিল যে, ইংরাজীতে যারা একটু ভাল হয়, গণিতে তারা কিছুতেই অধিকাংশ সময় ভাল হইতে পারে না। আমারও সেই দশাই হইয়াছিল। পাটীগণিত এবং বীজগণিত আমি কিছুতেই ভাল করিয়া পড়িতে পারিতাম না। এসকল অঙ্ক কষিতে হইলে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইত, কিন্তু ইহারই সঙ্গে আবার জ্যামিতি পড়িতে খুবই ভাল লাগিত। কেন এরূপ হইয়াছিল তখন বুঝি নাই। এখন বুঝিয়াছি যে, যাহাতে কোন একটা সার্ব্বজনীন তত্ত্বের সন্ধান পাইতাম তাহাই আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিত। শুষ্ক হিসাব-পত্রে কিছুতেই মন বসিত না। পাটীগণিত এবং বীজগণিতেরও মূল তত্ত্বের সন্ধান পাইলে, বোধ হয়, তাহার প্রতি আমার এত বিতৃষ্ণা জন্মিত না। আজিকালি কিরূপে এসকল শেখান হয় জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় যে, প্রথম হইতেই যদি কেবল কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম (formula) মুখস্থ না করাইয়া গণিতের মূল তত্ত্বগুলি শেখান হয় তবে অনেক বালক, যারা গণিত বিদ্যাকে তিক্ত কষায়রূপে বর্জ্জন করিয়া চলে, তাহারা তাহাতেও রস পাইতে পারে।

৩৪

যেমন ইংরাজী সম্বন্ধে সেইরূপ বাংলা সম্বন্ধেও স্কুলে থাকিতেই আমি অনেক বাহিরের বই পড়িয়াছিলাম। শ্রীহট্টের স্কুল ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টার ৺নবকিশোর সেন মহাশয় আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। তিনি আমাদের বাড়ীর এক অংশে বাস করিতেন, একথা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। তিনি "স্কুল বুক সোসাইটির" একজন এজেন্ট ছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটি প্রথম বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহারাই বহু ইংরাজী গ্রন্থের সরল বাংলা অনুবাদ করিয়া দেশময় প্রচার করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে ইঁহাদের প্রকাশিত গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলী বাক্স বোঝাই হইয়া বিক্রয় এবং বিতরণের জন্য সেন মহাশয়ের নিকটে যাইত। এই সূত্রে অনেক বাহিরের বাংলা বই পড়িতে পাইয়াছিলাম। "চীনদেশীয় রাজকন্যার কথা", "চীনদেশীয় তন্তুবায়ের কথা", এসকল "স্কুল বুক সোসাইটি"র গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ ছাড়া তখনকার খাঁটি বাংলা কথা-সাহিত্যের "গুলে বকোয়ালী" এবং "কামিনীকুমার" এই জাতীয় পুস্তকও বাল্যেই পড়িয়াছিলাম। "অন্নদা-মঙ্গল" এবং "বিদ্যাসুন্দর"ও আদ্যোপান্ত পড়িয়াছিলাম। স্কুল পাঠ্যে "চারুপাঠ"-"পদ্যপাঠ", কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "সদ্ভাব-শতক", রঙ্গলালের "পদ্মিনীর উপাখ্যান" কিছু কিছু পড়িতে হইয়াছিল। বাংলা বর্ণমালা অভ্যস্ত হইলেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত মোটের উপরে সবটাই বাড়ীতে পড়ি। ৺নবকিশোর সেন মহাশয় নূতন বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। যখন যে-বই প্রকাশিত হইত তখনই তিনি তাহা কিনিতেন। এই সূত্রে, শ্রীহট্টে থাকিতেই মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাদ-বধ", "ব্রজাঙ্গনা" এবং "চতুর্দ্দশ পদাবলী" পড়িতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি তাহার পরিচয় লাভ করি। সকলটাই যে বুঝিতাম এমন নহে। কিন্তু বুঝি বা না বুঝি, সেকালের বাংলা সাহিত্যের যখন যাহা হাতে পড়িত তখনই তাহা আগ্রহাতিশয্য-সহকারে পড়িতাম। প্রথম সংখ্যার বঙ্গদর্শনের "ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল" সকলের চাইতে ভাল লাগিয়াছিল।

৩৫

১৮৭৩ ইংরাজীতেই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কথা ছিল। সেকালে ১৬ বৎসর পূর্ণ না

হইলে এই পরীক্ষা দিবার নিয়ম ছিল না। নভেম্বর মাসের প্রথম দিকেই পরীক্ষা হইত। শারদীয় পূজার পূর্ব্বেই পরীক্ষার্থীর আবেদন ও ফিস্ পাঠাইতে হইত। ঐ সময় আমার বয়স ১৬ পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আমাকে সে বৎসর হেডমাষ্টার মহাশয় পরীক্ষা দিতে দিলেন না। তবে আসল কথাটা ছিল, আমি পরীক্ষা পাশ করিতে পারিব বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মে নাই। এইজন্য ভাল পড়া-শুনা করিয়া ভালরূপেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব এই আশায় আর-এক বছর আমাকে স্কুলে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এ বারও স্কুলের পড়াতে আমি বেশী মন দেই নাই।

তবে এই বৎসরে আমি সংবাদপত্রে একটু-আধটু লিখিতে আরম্ভ করি। তখনও শ্রীহট্টে ছাপাখানা হয় নাই। স্থানীয় কোন সংবাদপত্র ছিল না। ঢাকায় দুখানি বাংলা সাপ্তাহিক ছিল,—"ঢাকাপ্রকাশ" ও "হিন্দুহিতৈষিণী"। তখন পূর্ব্ববঙ্গের আর কোথাও কোন সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমি ১৮৭৪ ইংরাজীতে ঢাকাপ্রকাশ এবং হিন্দু-হিতৈষিণীতে দুই একটি লেখা পাঠাইয়াছিলাম। একটি কবিতা; হাইকোর্টের জজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমন উপলক্ষে লিখিত; হিন্দু হিতৈষিণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঢাকাপ্রকাশেও দুইএকটা গদ্য লেখা প্রকাশিত হয়। এগুলি আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। কবিতাটি পয়ার মাত্র ছিল। বড় হইয়া অবধি আমি অনেক সময় কহিয়াছি যে, ১৮ বৎসরের পূর্ব্বে যে কবিতা লেখে না সে মানুষ নয়। ১৮ বছরের পরে যে কবিতা লেখে সে হয় পাগল না হয় কবি। আমি এ দুয়ের একটাও আশা করি নই। সুতরাং সে-কবিতার কোন মূল্য ছিল না। তবে আমার প্রথম যৌবনের এই প্রয়াস উল্লেখযোগ্য দুই কারণে, প্রথম, এই সময়েই আমার অন্তরে একটু দেশাত্মবোধ জন্মিতে আরম্ভ করে। তাহারই প্রেরণায় জীবনের প্রথমে এসকল রচনাতে প্রবৃত্ত হই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমার এই অতি অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার আকাঙ্ক্ষার সূত্রেই শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাসের সঙ্গে প্রথম যৌবনের সখ্য-সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। সুন্দরীমোহন ১৮৭৩ ইংরাজীতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ বৃত্তি লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হয়েন। এ বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেলে আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যসেবার কথা শুনিয়া বিশেষভাবে আমাকে তাঁহার সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করেন। এই বৎসরই নভেম্বর মাসে আমিও প্রবেশিকা পরীক্ষা দেই এবং কোনরকমে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই।

১৮৭৪ ইংরাজীতেই শ্রীহট্ট বাংলার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নব প্রতিষ্ঠিত আসাম শাসনের এলাকাভুক্ত হয়। শ্রীহট্টের শিক্ষিত সমাজ এই ব্যবস্থার গুরুতর প্রতিবাদ করেন। আমার বাবা প্রতিবাদীগণের অগ্রণী-দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হয়। শ্রীহট্ট আসাম ভুক্ত হওয়াতে আমার পক্ষে বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়ে। তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াও এইজন্য আমি মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া ১৮৭৫ ইংরাজীর প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হই।

৩৬

১৮৭৪ ইংরাজী ডিসেম্বর মাসে আমার শ্রীহট্টের ছাত্রজীবনের শেষ হয়। এই মাসের শেষ ভাগে আমি আত্মীয় পরিবারবর্গ সকলকে ছাড়িয়া একাকী সুদূর কলিকাতা প্রবাসে যাত্রা করি। এখন শ্রীহট্টের পথে রেল হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। আমার বাবা তীর্থ করিবার জন্য এবং বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে একাধিক বার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে নৌকায় আসিতে হইয়াছিল। গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত তখন রেল হয় নাই। কুষ্টিয়াই পূর্ব্ববঙ্গ রেলের শেষ সীমানা ছিল। তারও পূর্ব্বে বাবা যখন সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসেন তখন পূর্ব্ববঙ্গ রেলেরও পত্তন হয় নাই। সর্ব্বপ্রথমে তিনি নৌকাযোগে কাশীপর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলও তখন খোলে নাই। সেকালে কাশীর ত কথাই নাই, কলিকাতায় যাতায়াত করাও সহজ ছিল না। গঙ্গাস্নান



দর্পণে

(জাপানী চিত্র)

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

করিতে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাও একরূপ পরিবার-পরিজনের নিকট হইতে চিরাবদায় লইয়াই আসিতেন। কলিকাতা সেকালে বিসূচিকার একরূপ নিত্যবিলাসভূমিই হইয়াছিল। আমি যখন প্রথম কলিকাতা যাত্রা করি তখন কলিকাতা শ্রীহট্টের অনেক কাছে যাইয়াছে। রেল হয় নাই বটে, কিন্তু মাসে দুবার করিয়া শ্রীহট্ট হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় এবং সপ্তাহে দুবার করিয়া ঢাকা হইতে গোয়ালন্দে ষ্টীমার (Steamer) চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ষ্টীমারেই আমি শ্রীহট্ট হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম।

প্রথম যখন শ্রীহট্টের নদীতে জাহাজ যায় তখন আমি শ্রীহট্ট স্কুলে পড়ি, সেকথা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। কিন্তু জাহাজে চড়িয়া বিদেশযাত্রা আমার এই প্রথম। শীতকালে জল শুকাইয়া যায় বলিয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত এসকল জাহাজ যাতায়াত করিত না। শ্রীহট্টের প্রায় দশ ক্রোশ নীচে ছাতক পর্য্যন্তই জাহাজ যাইত। এসকল জাহাজে যাত্রীর জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। মাল বোঝাই হইয়াই আসা-যাওয়া করিত। শ্রীহট্টে ও কাছাড়ে নূতন চায়ের কারবার খুলিয়াছে। এই চায়ের ব্যবসায়ের প্রয়োজনেই বিশেষভাবে এসকল জাহাজ প্রথম আমাদের অঞ্চলে যাতায়াত আরম্ভ করে। ক্রমে অন্যান্য মালও জাহাজ বোঝাই করিয়া কলিকাতার দিকে আসে। শ্রীহট্টের নিকটের পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর তেজপাতার গাছ ছিল; চায়ের সঙ্গে-সঙ্গে এই তেজপাতাও শ্রীহট্ট হইতে রপ্তানী হয়। শ্রীহট্টে নারিকেল ভন্মায় না বলিলেও চলে। কিন্তু সর্ব্বত্রই প্রচুর সুপারী উৎপন্ন হয়। এই সুপারীও জাহাজে করিয়া রপ্তানী হইতে আরম্ভ করে। আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি সে-সময়ে খাসীয়া পাহাড় হইতে নানা জাতীয় অর্কিড (orchid) সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় চালান হইতে আরম্ভ করে। এ ছাড়া শ্রীহট্টের সংলগ্ন চেরাপুঞ্জী পাহাড়ে পাথরিয়া চুণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই চুণ বেশীরভাগই বড় বড় নৌকা বোঝাই হইয়া কলিকাতায় আসিত;—কিয়ৎ-পরিমাণে জাহাজেও আসিত। এই মালজাহাজ চড়িয়াই আমি সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা রওয়ানা হই।

শ্রীহট্ট সহর হইতে ছাতক প্রায় কুড়ি মাইলের পথ। এই কুড়ি মাইল ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া ছাতকে জাহাজে চাপি। শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাসের বাড়ী শ্রীহট্ট হইতে ছাতকের পথে পড়ে। শীতের ছুটীতে সুন্দরীমোহন বাড়ী গিয়াছিলেন। তাঁহারই একসঙ্গে আমি কলিকাতায় আসিব, বাবা এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একদিন পৌষমাসের পূর্ব্বাহ্নে বেলা দশটার সময় যথাবিহিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া আমি সুদূর প্রবাসে শুভযাত্রা করি। যাত্রার মন্ত্রটা আজিও ভুলি নাই। বাসগৃহের দরজায় আসন পাতিয়া মঙ্গলঘটের সামনে নবধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিতে হইয়াছিল। সম্মুখে একখানা থালায় ধান, দুর্ব্বা, ফুলের মালা, দধি, মধু, একটা টাকা রাখা হইয়াছিল। পুরোহিত পাশে বসিয়া মন্ত্র পড়াইলেন—

"দ্বিজ-নৃপ-গণিকা,
পুষ্পমালা পতাকা
সদ্যমাংসম্ ঘৃতং বা
দধি-মধু-রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্টা, শ্রুত্বা, পঠিত্বা বা
ফলমিহ লভতে মানবঃ গন্তুকামঃ"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে নাক দিয়া নিশ্বাস পড়ে সেই পা আগে বাড়াইয়া দুর্গা দুর্গা বলিয়া ঘরের বাহির হইলাম মা অন্দর হইতে বাহির বাড়ী যাইবার পথে আসিয়া মঙ্গল-চণ্ডীর 'খিলি' হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার উত্তরীয়ের কোণে সেই খিলি বাঁধিয়া দিলেন। তার পর মাটীতে একটু থুথু ফেলিয়া বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়া সেই থুথু ঘসিয়া বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়া তাহা তুলিয়া লইয়া আমার কপালে টীপ কাটিয়া দিলেন। তখন আমি তাঁর পায়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বাড়ীর বাহির হইলাম। মা কেবল আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলকামনায় এক-মাত্র পুত্রকে বহুবিপদসঙ্কুল বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁর ভিতরে কি কঠোর সংগ্রাম চলিতেছিল তখন তার ইঙ্গিতমাত্রও পাই নাই। প্রথম বিদেশযাত্রার কুতূহলে আমার মন ভরপুর হইয়াছিল, সুতরাং বাবা মাকে ছাড়িয়া

আসিতে একটুও ক্লেশ ত দূরের কথা বিশেষ ভাবনা পর্য্যন্ত হয় নাই। ৬ মাস পরে প্রথম গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়া যাইয়া শুনিলাম আমি ঘোড়ায় চড়িয়া যেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, মা অমনি গিয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত জল স্পর্শ করেন নাই। অথচ তাঁর প্রাণের যে অসহ্য যাতনা হইতেছিল আমাকে কিছুতেই তাহা বুঝিতে দেন নাই। অথচ মা আমার লেখাপড়া জানিতেন না!

রবীন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথন

শ্রী নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত রায় বাহাদুর

শিলং—প্রথম দিন—২৯ বৈশাখ, ১৩৩৪

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে কথা উঠিলে কবিবর বলিতে লাগিলেন :—

"দেখুন, এ সমস্যা সহজসাধ্য নয় এবং এত জটিল যে, এর সমাধান ভাবতেই পারছি না। উভয় সম্প্রদায়ই fanatics (গোঁড়া)—হিন্দুরা প্যাসিভ (নিষ্ক্রীয়) আর মুসলমানেরা য়্যাক্টিভ (সক্রিয়)। অথচ উভয় সম্প্রদায়ের 'ধর্ম্মই' হচ্ছে দাঁড়াবার ভূমি! আর যেন কোন দাঁড়াবার সাধারণ ভূমি নেই। য়ুরোপে ধর্ম্ম ত রয়েছে 'বস্তু' যার যে ধর্ম্ম ইচ্ছা গ্রহণ করে, ত্যাগ করে, অনুসরণ করে, পালন করে, কিন্তু ইংরেজ-ইংরেজই থাকে, ফরাসী ফরাসীই থাকে। তারা দাঁড়ায় 'জাতীয়তার'; উপরে কাজেই ধর্ম্ম নিয়ে এরূপ কোন বিরোধ নেই। আর এদেশে সবই 'ধর্ম্ম'। রাজনীতিতে ধর্ম্ম, অর্থনীতিতে ধর্ম্ম, শিক্ষায় ধর্ম্ম, আচারে ধর্ম্ম। শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা এ-সমস্যার সমাধান হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু শিক্ষার অভাব এত বেশী ও লোক এতই নিরক্ষর যে, কতদূর ভবিষ্যতে যে শিক্ষা দেশ-ব্যাপী হ'বে, তা ভাবা কঠিন।"

আমি বলিলাম—"বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে সমস্যার সমাধান ত দূরের কথা—আরো জটিলতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। অশিক্ষিত কৃষক শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে ত কিছু পূর্ব্বে আমাদের কোন বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমানে তথাকথিত শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও তাদেরই প্ররোচনায় এই সাম্প্রদায়িক কলহটা বেশ জেগে উঠেছে।"

কবিবর (একটু নীরব থাকিবার পর)—"সকলের মধ্যেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাবটা জাগছে। দেখুন না মাদ্রাজের সেই ব্রাহ্মণ ও নন্-ব্রাহ্মণ মুভমেণ্টটা (তখন আমি বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের নমঃশূদ্রদের কথা উল্লেখ করলাম) ও নমঃশূদ্রদের উত্থান। ধর্ম্মের বিশ্ব-জনীন ভাবটা কি আমাদের নেতাদের মধ্যেই আছে? কংগ্রেস্ প্লাটফর্ম্মে কি অন্যত্র 'সাম্য' ও 'ঐক্য' সম্বন্ধে নেতারা যতই বক্তৃতা করুন না কেন, ভেতরে ভেতরে সেই 'ধর্ম্মান্ধতা' রয়ে গেছে, মনে মুখে এক না হ'লেও সেই ধর্ম্মান্ধতা দূর না হ'লে, কিছুতেই কিছু হ'বে না এবং এ সমস্যারও সমাধান সম্ভব হ'বে না। ভরতপুরের হিন্দী সাহিত্য সভায় আমাকে বলতে হয়েছিল যে, ভাষার ঐক্যের উপরেও 'জাতীয়তা' প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। ভাষা ত হ'চ্ছে আত্ম-প্রকাশের উপায় বৈ আর কিছু নয়? আমি হিন্দী শিখলে হিন্দীতে আপনারা যা বলবেন সেটা হয়ত বুঝব, কি আমি যতটুকু হিন্দীতে বলতে পারব—আপনারা সেটুকুই বুঝবেন, কিন্তু আমার প্রাণের বা মনের খোঁজ পাবেন কি ক'রে? আমার আত্ম-প্রকাশের বিশিষ্ট ও একমাত্র উপায় যখন "বাংলা", তখন বাংলা বে আমাকে আপনারা ঠিক্ চিন্‌তে ও জান্‌তে পারবেন না। আমি হিন্দীতে বক্তৃতা করতে না পারায় যেমন আপনাদের কাছে লজ্জিত ও দোষী, আপনারাও তেম্‌নি বাংলা না জানলে দোষী! আর হিন্দী চর্চ্চার দ্বারাই যে, জাতি-গঠনের পথ সুগম হ'বে, তা মনে করি না। যাঁরই কোন একটা 'বাণী', দেশবাসীকে দিতে হ'বে, তাঁরই ঐ পূর্ণভাবে (অংশতঃ নয়) আত্ম-প্রকাশ করা চাই, সেটা কখনও ঐ প্রকার 'শেখা' ভাষায় হ'তে পারে না। আমি কি হিন্দীতে আত্ম-প্রকাশ করতে পারি? যাঁর যেটা মাতৃভাষা সেটাতেই তাঁর আত্ম-প্রকাশ সম্ভব হয় এবং সেটা অন্য ভাষা-ভাষীরাও গ্রহণ করতে পারেন। ইংরেজী ত আমাদের শিখতেই হ'বে এবং হ'চ্ছে। ইংরেজীটা হ'চ্ছে রাজ-নীতির ভাষা। আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় রাজনীতি-চর্চ্চা চলে না। ইংরেজী ত পড়তেই হ'বে—বাংলা ও সংস্কৃতও পড়তে হ'বে, তার উপর হিন্দীর বোঝা চাপালে—বালকেরা সে বোঝা কি বহন ক'রে উঠতে পারবে?"—এই পর্য্যন্ত কথোপকথন হইলে কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া কবিবরের অন্যত্র যাওয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে—সে-দিনের কথা-প্রসঙ্গ স্থগিত থাকে।

দ্বিতীয় দিন—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

সম্ভাষণাদির পরে কবিবরের হাতে আমার উপহৃত একখণ্ড স্মৃতি-পথে ও 'প্রবাসী' দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার জীবন-স্মৃতি কি আবার লেখা হচ্ছে?"...কবিবর..."না...ওটা হয় না। আমরা গল্প লিখতে পারি, একটা চরিত্র বানিয়ে তোলা যায়, কিন্তু...আপনাকে objectify ক'রে আত্ম-চরিত লেখা বড়ই শক্ত। কত স্তরে স্তরে যে আমার 'আমিত্ব' ডুবে আছে, তাকে টেনে তোলা অসম্ভব। জীবন-চরিত লেখকই বা অপরের জীবনের কতটুকু দেখতে পান্ যে, তিনি যথাযথ ভাবে 'চরিত' টা আঁকবেন? জীবন-চরিত লেখা (তা স্ব-রচিতই হোক্ বা অপরের রচিতই হোক্) দুই-ই অসম্ভব!" আমি বলিলাম... "আমার "স্মৃতি-পথে" টা এইভাবে লিখেছি যে, যাঁর সংস্পর্শে যতটুকু এসেছি তাঁর বিষয় মাত্র সেটুকুই লিখেছি; বেশী কিছু লিখতে চেষ্টা করিনি...Bertrand Russell-এর Behaviouristic Philosophy অনুসরণ ক'রে"...

কবিবর…"ঐ ঠিক করেছেন…আপনার 'বইটে' প'ড়ে দেখ্‌ব। বিপিনবাবু (বাবু বিপিনচন্দ্র পাল) তাঁর জীবন-কথা লিখ্‌ছেন। আপনাকে জানাই ত শক্ত কথা। বাহ্য-ব্যবহার দেখে অপর মানুষকে কতটা জানা যায়?"

আমি…"সেই 'আমি' কে খুঁজে খুঁজে…'এটা আমি নয়, ওটা আমি নয়'…দেখে এ সেই চিন্তা-পথেই আমাদের ঋষিরা সেই 'ভূমা'য় ও মহান্ সত্যে উপস্থিত হয়েছিলেন।"

আমি তখন কথাটা অন্য দিকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—"কিছু দিন হয়—অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণানের "Philosophy of the Upanishads" পড়ছিলুম এবং তার forewordটা যা আপনি লিখে দিয়েছেন সেটাও পড়েছি, বইটা বেশ হয়েছে। পাঠাবস্থায় গাফ্ সাহেবের বই প'ড়ে সেটার উপর কি ঘোর বিতৃষ্ণাই জন্মেছিল!"

কবিবর—"জানেন্ কি? ওঁরা আমাদের মধ্যে কোন মৌলিকতা দেখ্‌তে পান্ না এবং স্বীকার করেন না! এমন-কি আমাদের 'সভ্যতা ও শাস্ত্রের' প্রাচীনত্বটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত নন্! 'এটা গ্রীক্‌দের থেকে নেওয়া, ওটা বেবিলোন থেকে ধার-করা' ইত্যাদি বাক্যে আমাদের যা কিছু তার প্রতিই অবজ্ঞা—কারণ আমরা যে Subject-people, British subjects। ঘৃণা ও অবজ্ঞার মূল সেখানে।"

আমি—"প্রাচীন ভারতের যা কিছু জ্ঞান-সম্পদ তার খোঁজ নেয় য়ুরোপের অন্যান্য সভ্য জাতিরা, যতদূর বর্ণনা থেকে দেখায়—তাতে আপনার য়ুরোপের Continental countries সমূহে অভ্যর্থনায় ও ইংলণ্ডের অভ্যর্থনায় কত আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলাম।"

কবিবরের ঈষৎ হাস্য।

আমি—"Continentএ কোন সম্রাট বা রাজাও কখন সে ভাবে অভ্যর্থিত হয়নি। যুক্ত-রাজ্যে (United States) ও দক্ষিণ আমেরিকায়ও ত আপনাকে কত সম্মানে অভ্যর্থনা করেছে। মৃত লর্ড নর্থক্লিফের 'জগৎ-ভ্রমণ' বৃত্তান্ত পড়্‌তে পড়্‌তে বেশ বুঝেছিলাম যে, ইংরেজদের কত বড় অহঙ্কার ও স্ব-প্রাধান্যের ভাব অন্ততঃ আমাদের সম্বন্ধে।"

কবি—"লর্ড নর্থক্লিফের আত্মাভিমান ও আত্মম্ভরিতার কথা আর তুল্‌বেন্ না—সেটা বড়ই পীড়া-দায়ক।"

আমি—(কথাটা অন্য দিকে প্রধাবিত কর্‌তে বিশ্ব-ভারতীর কথা তুলে) "আপনার বিশ্ব-ভারতীর স্থায়িত্ব, ভবিষ্যৎ ও ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? যখন বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর ছিলাম তখন ভবানীপুরে মাঝে মাঝে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তুম্। আমি তাঁর বাড়ীর অতি নিকটে 'রসারোডের' অপর পারে থাক্‌তুম্। একদিন বোলপুর হ'তে 'বিশ্ব-ভারতীর' কয়েকটি যুবক—পালি কি তিব্বতীয় অথবা চৈনিক ভাষায় লিখিত একখানা হস্ত-লিখিত পুঁথির খোঁজে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। আশুবাবু বল্‌লেন যে, সেইটে অতি যত্নে কোন 'লামা' কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়েছে—সেটাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা সম্ভবপর নয়। তাঁরা তাঁদের গবেষণার জন্য কলিকাতায় এসে তার ব্যবহার কর্‌তে পারেন। তার পরেই বল্‌লেন, দেখুন, রবিবাবু আর কতকাল বিশ্ব-ভারতীর জন্য দেশে দেশে ঘুরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবেন? তাতে কি আর বিশ্ব-ভারতীকে স্থায়িত্ব দিতে পার্‌বেন? সেটা সম্ভব নয় ব'লেই আমি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় নিয়ে লেগে প'ড়ে আছি?"

কবিবর (একটু মুচ্‌কি হেসে)—"জগতে ত কিছুই স্থায়ী নয়, বিশ্ব-ভারতী ত কোন্ ছার! ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর যে 'আদান ও শিক্ষা' ভারতে দিয়েছিলেন এবং যে-শিক্ষা ও উপদেশ অশোকের ন্যায় রাজ-চক্রবর্ত্তীর উৎসাহে ভারতে ও জগতে প্রচার হয়েছিল, সেটা কি 'ভারতে'ই স্থায়ী হয়েছিল? তার নামটি পর্য্যন্ত ভারতবাসী ভুলে গিয়েছিল! আর 'বিশ্বভারতী' স্থায়ী হ'বে? 'শিক্ষা' সম্বন্ধে আমার যে-ধারণা সেটাকে একটা 'আকার' দেওয়া ও মূর্ত্ত ক'রে তোলাই আমার উদ্দেশ্য এবং সেইজন্যই চেষ্টা। স্থায়ী হবে কি অস্থায়ী হবে—ফলে কি দাঁড়াবে, সেটা ত আমার হাতে নয়, আমার সেটাই 'কর্ম্ম'; 'ফলে' আমার 'অধিকার' নেই। আশুবাবু ত গবর্ণমেণ্টের সৃষ্ট—তৎকর্ত্তৃক পুষ্ট ও পৃষ্ঠ-পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনার মতে গ'ড়ে তুল্‌তে প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু তিনি যেতে না যেতেই তার কত পরিবর্ত্তন! পরিবর্ত্তন সব সময়েই হ'চ্ছে ও হবে।"

আমি—"সবই ত 'নামরূপের' খেলা।"

কবিবর—"হাঁ—তার মধ্যে যেটুকু 'চিরন্তন' তার অন্বেষণই আমাদের কাজ। ধরুন—গ্রাম-সংস্কারের কথাটা, সে-সম্বন্ধে আমার যে-মনোভাব—তার কিছুকে 'আকার' দেওয়া কি মুক্ত ক'রে তোলাই ত 'শ্রীনিকেতনে' চলেছে।"

আমি—"গ্রাম-সংস্কার ও গঠনটা ত আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতারই 'বিষয়'—কাজে ত কিছু দেখ্‌ছি না। গবর্ণমেণ্টকে গাল্ দিলেই কি গ্রাম-সংস্কার হ'বে?"

কবিবর—"বুঝ্‌ছেন না—ঐ গালের ভেতরেই গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতায় আমাদের শ্রদ্ধা কতটা পরিস্ফুট হ'চ্ছে। ভাবটা এই—আমরা ত কিছুই কর্‌তে পারি না এবং কর্‌ছিও না। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অসীম—সবই কর্‌তে পারে এবং কর্‌ছে না—সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে গাল্ দিই। আমরা কি গবর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হ'য়ে একটা গবর্ণমেণ্ট দাঁড় করিয়ে—আমাদের মতে স্বাস্থ্য-বিধান ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি দূর করার চেষ্টা ক'রে—শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারি না? তবে কর্‌ছি কি? মোহটা কাটানো কি সহজ ব্যাপার?"

বর্ত্তমান 'রাজনৈতিক' কথা-প্রসঙ্গে কবিবর বলেছিলেন—"আমরা অনেকেই মনে করি যে শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে 'জন-মতের শাসন' বা 'Democracy'ই যেন চূড়ান্ত কথা, সেটা নাও হ'তে পারে।"

তৃতীয় দিন—১১ই জ্যৈষ্ঠ

বাঙ্গলার আইনসভার বিগত নির্ব্বাচনের কথা উঠিল—তখন তিনি বলিলেন।—

"দেখুন্ না ঐ ব্যাপারে কত টাকারই না অপব্যয় ও শ্রাদ্ধ হ'চ্ছে! ঐ 'ছেলেমানষির' জন্যে! যাঁরা স্বভাব-কৃপণ—কোন একটা সৎকার্য্যে দুটো পয়সা ব্যয় করেন না—তাঁরাই এই কাজে অজস্র টাকা-হাজারে হাজারে, ব্যয় করেছেন! আমি জানি কোন জেলার কোন 'রাজা' (জমীদার) যাঁর নিকটে কোন সৎকার্য্যে হাত্ পেতে দুটো পয়সা বের করা যায়নি, তিনিই শুনেছি ইলেক্সান-ব্যাপারে (সে ছাই আবার কাউন্সিলেরও নয়—ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ইলেক্সানে!) নাকি প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন! যেটা দেশের আসল কাজ—যাকে গঠনমূলক কার্য্য বলা হ'য়ে থাকে—সেজন্য টাকা নেই!

রাজনৈতিক কথা চাপিয়া আমি 'গভীরতর বিষয়ে' কবিবরের 'বাণী' শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেখুন্ যতই বয়স বেড়ে যাচ্ছে—ততই মৃত্যু-চিন্তাটা এত প্রবলা হ'য়ে উঠ্‌ছে কেন? যৌবনে কি জীবনের মধ্যাহ্নে—ও চিন্তাটা একটিবারও মনে ওঠেনি।"—

কবিবর—"জানেন, ওটা ত একটা সোজা পাটীগণিতের কথা! আয়ুষ্কাল ত আমাদের পূর্ণ হয়েছে; গড়পড়তা (average life) যা-তা ঢের ছাড়িয়েই! (বলা বাহুল্য-কবিবর ও আমি প্রায় সমবয়স্ক—তিনি বছর দুয়ের 'বড়' হ'তে পারেন) এখন আমরা ত extension এর উপরে আছি। সুতরাং যে সমস্ত কাজ্ আরম্ভ করেছি, সেগুলোই পূর্ণ ও শেষ কর্‌তে পার্‌ব কি না সন্দেহ; তাতে আবার, যে কাজ সম্পন্ন

করতে বহুদিন লাগবে—সেগুলো কি আর হাতে নেওয়া যায়? তাল-গাছ রুয়ে তাল খেয়েছি—এখন আর ত সে সম্ভাবনা নেই।"

আমি—"আপনার ন্যায় মহাপুরুষের Extension-এর প্রয়োজন আছে। জগতে যা দিয়েছেন—তার চেয়ে ঢের বেশী জগৎ চায়—আপনার ন্যায় লোকের কাছে;—যতটা 'আদায়' ক'রে রাখা যায়, আমাদের সম্বন্ধে ত সে কথা খাটে না। আর 'মৃত্যু' ত "আরম্ভ"ই হয়েছে—স্মৃতি-বিভ্রম নাকি "অস্তিত্বের সুরু" তাত হয়েছে-ই।"

কবিবর—"হাঁ, সে কথা ঠিক—যারা গতর খাটিয়ে হাতের শ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করে তারা বুড়ো হ'লে শুধু ভাবে কি ক'রে খাবো; তার যোগাড় থাকলেই তারা তৃপ্ত। আমরা যারা মাথার কাজ করি—তাঁদের সে ক্ষমতাটা হ্রাস পেলে, আর বেঁচে থাকার দরকার কি? সে ক্ষমতা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। (এ স্থলে আমি তাঁর পরিবারের আপেক্ষিক দীর্ঘ-জীবনের কথা তুললে তিনি তা স্বীকার ও আলোচনা ক'রে বললেন যে, "এক 'বড়দাদা'—যিনি বিষয়-কর্ম্মে প্রায় কখনও অভিনিবিষ্ট ছিলেন না—তিনি-ই সবাইর চেয়ে দীর্ঘ-জীবী ছিলেন।)"। দেখুন পাঁচ জনে ব'সে একটা 'কাজের কথা' হ'লে যিনি অল্পবয়স্ক বা তরুণ,—তিনি হয়ত বলবেন ৫।১০ বছর পরে ওর 'সুফল' ফলতে পারে—কিন্তু আমাদের মনে সেভাবের উদয় হবে কেন? তখন আমরা ত সে 'সুফল' ভোগ করতে বা দেখতে পাব না—সুতরাং সেকাজে আমাদের উৎসাহী হওয়া অস্বাভাবিক।"

অত মৃত্যুর কথা আলোচনা করার চেয়ে অন্য কথা তোলা ভাল বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম…"অবতার-বাদ সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

কবিবর—"এই জগতের সবাই ত তাঁর সৃষ্ট-ছায়া; বৃক্ষ লতা, কীট পতঙ্গ, জীব-জন্তু, সবই ত তাঁর…মানুষেও তিনি তবে আর 'অবতারের' প্রয়োজন কি? সমস্ত পদার্থে ও এই নিখিল বিশ্বে তিনিই ত 'ওতপ্রোত'?…বিকাশ বা manifestation বললে তাও ত সর্ব্বভূতে। যাঁরা বলেন, যে, কোন ব্যক্তিবিশেষে তাঁর পূর্ণ-প্রকাশ, তাঁরা যে কি ভয়ানক একটা অসম্ভব ও অযৌক্তিক কথা বলেন তা আমি ভাবতেই পারি না…আমার কাছে ওর চেয়ে একটা অর্থশূন্য কথা আর নেই।"

আমি—"অবতার-বাদটা যেন আমাদের (ভারতবাসী ও বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালীর) মজ্জাগত। "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু" ত অনেকের মতে ভগবান্ স্বয়ং।"

কবিবর—"আমরা যে কতবড় একটা ভাব-প্রবণ জাতি তা আর কি বলব। ওর জন্য দায়ী বাংলার মাটি। শ্রীচৈতন্যদেব ত 'অবতারত্বের' দাবী করেননি। আর করলেও, তিনি ত এই ভূয়ে জাত। দেখুন না…ভারতের অন্যান্য প্রদেশের 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে কত তফাৎ। আমাদের শুধুই emotionalism…পরকীয়া প্রেমের রসাস্বাদনে পর্য্যন্ত! যেমন বাঙ্গালীর ধর্ম্মে তেমন কর্ম্মে। সর্ব্বত্রই ঐ ভাব প্রবল (dominating)। আমরা হয় "ভেঃ" "ভেঃ" রবে কাঁদব কি 'মা' 'মা'-শব্দে আকাশ ফাটাব…এইত? শাক্তেরা 'মা' 'মা' ক'রে কেঁদে মাটি ভেজাচ্ছেন—আর বৈষ্ণবেরা 'প্রেমে' গড়াগড়ি যাচ্ছেন—সে গানেই হোক্, আর কীর্ত্তনেই হোক্। 'অমুকে'—আঃ—কি বক্তৃতাই করেছেন-যে, না কেঁদে আর থাকা গেল না—বক্তাও কাঁদেন শ্রোতাও কাঁদেন। আমি বলি—এই কান্নাকাটার প্রয়োজনটা কি? কি কাজ হয় ওতে? এই ভাব-প্রবণতাই আমাদের সেরেছে—কথায়—কাজে—লেখায়—পড়ায়, রচনায়—গদ্যে-পদ্যে সর্ব্বত্রই সেই ভাব-প্রবণতা।"

আমি "আপনি যদি বিলেতে না যেতেন ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র এতটা ঘোরা-ফেরা না করতেন—তবে এতদিনে হয়ত একটা মস্ত 'অবতার' হ'য়ে বসতে পারতেন।"

কবিবর…"তা নয়, বরং ওখান হ'তে ফিরে, কি ওখানে থেকেই আরো জাঁদরেল অবতার হওয়া যেতো, যদি 'কৌপীন্-টৌপীন্' প'রে সেই ভাবে চলা যেত। ওদের সার্টিফিকেটের ঢের আদর।"

আমি…"বরিশালটা বেশ হুজুগের জায়গা—এই 'অবতার' বা 'গুরু'দের নিয়ে। যে কোন 'সাধু' 'সন্ন্যাসী' সেখানে পদ-ধূলি দেবেন তাঁর পেছনেই শত শত লোক জড়ো হবে ও বহু শিষ্য-সেবক জুটবে।"

কবিবর…"তবে ত সেখানে একবার যেতে হবে। আপনি 'চেলা'-গিরি করতে রাজী আছেন ত?"…

আমি—"খুব রাজী…চলুন্ না তা হ'লে আমায় কে পায়? 'দোতলা-তেতলা' বাড়ীটে…চৌতলা পাঁচতলা ক'রে ফেলব যখন ইচ্ছা তখন। আর কি 'অর্থ' 'অর্থ' ক'রে ঘুরে বেড়াতে হবে?"…

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

(১)

গ্রীষ্মের ছুটীর পর মহানগরীর স্কুল কলেজগুলি সবে খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনও সব ছাত্র-ছাত্রী বাড়ী হইতে ফেরে নাই। ক্লাশগুলিতে ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যা বেশী নয়। পড়াশুনাও তেমন ভাবে আরম্ভ হয় নাই।

সাড়ে তিনটা বাজিতে-না-বাজিতে কলেজ ষ্ট্রীটে কলেজের ছাত্রের ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে। ক্লাশ বসিবার সময় অত কেহ এক সঙ্গে আসে নাই, যার যেমন সুবিধা তেমনই আসিয়াছে, কে যে আসিল, কে যে আসে নাই, তাহারও খোঁজ বড় একটা লওয়া হয় নাই। এখন সকলে এক সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দীর্ঘ অবকাশের পর বন্ধু-বান্ধবের মুখ দেখিয়া মহা কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। রৌদ্রের তেজ তখনও অতি প্রখর, ছেলেদের

মুখ আরক্ত ও পরিচ্ছদ ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সে-দিকে কেহ বিশেষ লক্ষ্য রাখিল না। তরুণ বঙ্গের দল ছাতা বহিয়া বেড়ানকে বড়ই সেকেলে মনে করে। কাজেই রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া তাহাদের গতি কি? কেহ কেহ খাতা এবং বই মাথায় করিয়া বন্ধুর দলের সহিত চলিতে আরম্ভ করিল, যাহাদের বাড়ী কিছু বেশী দূরে, তাহারা ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল। যাহাদের তখনি তখনি বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা নাই, তাহারা কলেজ স্কোয়ারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

একটি ছেলে দল হইতে একটু পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়া ভবানীপুরের ট্রামের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব আর কিছুই ছিল না, কেবল লম্বায় সে সাধারণ বাঙালীঘরের ছেলের চেয়ে কিছু বড়। রঙ তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বেশ-ভূষার পারিপাট্য খানিকটা আছে। হাতে দামী 'রিষ্টওয়াচ', বুক পকেটের ভিতর হইতে একটি সোনা-বাঁধানো ফাউণ্টেন পেন্ উঁকি মারিতেছে।

পিছন হইতে তাহার পিঠে চড় মারিয়া আর-একটি যুবক বলিয়া উঠিল, "কি হে, রাজপুত্তুর কখন এলে? ক্লাশে তোমায় দেখেছি ব'লে ত মনে হ'চ্ছে না?"

ছেলেটি পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, "কি ক'রে দেখবে? আমি ঠিক আড়াইটার সময় smartly এসে পৌঁছেছি। তারপর চন্দর, বাড়ীর খবর কি? নোলক-পরা মুখটুখ কিছু হৃদয়ে বহন ক'রে এনেছ? আমি ত সারা ছুটী গোলাপী চিঠির প্রত্যাশায় ছিলাম, কিছুই ত এসে পৌছল না?"

চন্দ্রনাথ বলিল, "চিঠিগুলো এখনও ছাপা হয়নি, আর নোলকটা যদিও তৈরি হ'য়ে এসেছে তবু সেটা ঝুল্‌বার উপযুক্ত একটা খ্যাঁদা নাক এখনও পাওয়া যায়নি। তা তোমার নিজের খবর কি শুনি? এত যে বক্তৃতা ঝাড়লে যে ক্যাল্‌ক্যাটা ইউনিভার্সিটির এম্-এ কিছুতেই পড়বে না, এখন ত দেখছি বেশ সুড়সুড় ক'রে দ্বারভাঙা বিল্ডিং থেকে বেরুচ্ছ?"

আর একজন যুবক বলিল, "একি Son proposes but mother disposes হ'ল নাকি, সুবীর? তোমার নামখানা বিশেষ সার্থক হয়নি, বাপু। বাঙালীর ছেলের এক মাত্র বীরত্ব ফলাবার ক্ষেত্র যা অন্তঃপুর। সেখানেও তুমি জয়লাভ কর্‌তে পার না?"

সুবীর বলিল, "অত সস্তায় বীর নাম কিনে কি হবে? সেইজন্যে সব বীরত্ব সঞ্চয় ক'রে রাখছি যখন ভাল occasion জুটবে সবটা এক সঙ্গে ঝেড়ে দেব। যাক, এতক্ষণে একটা ওদিককার ট্রাম আস্‌ছে ব'লে মনে হ'চ্ছে। রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত মাথার চাঁদি উড়ে যাবার জোগাড় হ'ল। চন্দর চলনা হে আমার সঙ্গে? মেসের ঠাকুর আর চাকর ছাড়া তোমার পথ চেয়ে থাক্‌বার ত আর কেউ নেই?"

চন্দ্র বলিল, "কি তাজ্জব কাণ্ড! কলিযুগের ninth wonder রাজপুত্তুর আজ ট্রামে চড়্‌বে নাকি? ট্রাম কোম্পানীর বাপ দাদা এমন কি পুণ্যি করেছিল? কেন তোমার 'শেভরলে' খানা কি হ'ল?"

সুবীর বলিল, "মা সেখানা আজ দখল ক'রে কালিঘাটে পুণ্য অর্জ্জন কর্‌তে গিয়েছেন। কাজেই ট্রাম কোম্পানীকে অনুগ্রহ করা ছাড়া আমার উপায় নেই। চল, চল, ট্রাম এসে পড়ল!"

দুই বন্ধু লাফ দিয়া ট্রামে চড়িয়া বসিল। চন্দ্রনাথ বলিল, "নিয়ে ত চল্‌লি। গিয়ে কর্‌ব কি আমি?"

সুবীর বলিল, "কিঞ্চিৎ জলযোগ কর্‌বে, খানিকক্ষণ আড্ডা দেবে, এবং মা যদি দয়া ক'রে সময়মত ফেরেন, তা হ'লে সাড়ে ছটার সময় পিক্‌চার প্যালেশে রুডলফ্ ভ্যালাষ্টিনোর প্রেম করা দেখতে আস্‌বে। এই subjectএ ওর মত ভাল টিচার একটিও নেই।"

চন্দ্র কৃত্রিম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়েই বা লাভ কি? আমাদের অদৃষ্টে অপূর্ব্ব সুন্দরী ফরাসী নর্ত্তকী, সাহারা মরুভূমিতে আরব ডাকাতের সঙ্গে মারামারি, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে সুন্দরীর পশ্চাদ্ধাবন, এসব কিছুই জুটবার সম্ভাবনা নেই। আমরা দশটা থেকে পাঁচটা মারচ্যাণ্ট অফিসে কলম পিশব, আর বাড়ী এসে শুনব, খোকার জ্বর,

টে'পীর কান কটকট, গিন্নির মাথা-ধরা, বাড়ীওয়ালার দরোয়ান তাগিদ দিতে এসেছিল, ইত্যাদি।"

সুবীর বলিল, "আরে, এখনি হাল ছাড়লে কি চলে? এখন অন্ততঃ কল্পনা ক'রেও একটু thrilled হও। আমি ত সারাক্ষণ যত রকম আজগুবী আর অসম্ভব কল্পনা করা যায়, তাই নিয়েই থাকি। তারপর realityতে যা হ'বার তাত হ'বেই। তাই ব'লে, সেই ভাবনা ভেবে এখন থেকে আধমরা হ'য়ে থেকে লাভ কি?"

চন্দ্রনাথ বলিল, "তোর পক্ষে তবু কিছু সম্ভাবনা থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। আর কিছু না হোক, টাকার ছালার ওপর ত বসে আছিস্! এদেশে romance না জোটে, ত ওদেশে গিয়ে দিব্যি ফূর্ত্তি মেরে আস্‌তে পার্‌বি, যতদিন খুসি। তোর বিলাত যাওয়ার প্ল্যান্ কি একেবারেই ভেস্তে গেল?"

সুবীর বলিল, "একরকম তাইই, যে-সব conditionএ মা আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী, তাতে আমি যেতে রাজী নই। কাজেই এখনকার মত কথাটা ধামা-চাপা রয়েছে।"

চন্দ্র বলিল, "তুই জোর ক'রে চ'লে যা না! এখন ত আর নাবালক নেই। মা না হয় রাগই কর্‌বেন, কিন্তু একমাত্র ছেলের উপর রাগ ক'রেই বা কতদিন থাক্‌বেন?"

কথা বলিতে বলিতে ট্রাম এস্‌প্লানেডে তাহাদের নামিবার জায়গায় আসিয়া পড়িল। বই খাতা গুছাইয়া এক হাতে ধরিয়া নামিতে নামিতে সুবীর বলিল, "না হে, তা করা চলে না। চল বাড়ী গিয়ে সব শুন্‌বে। এঃ, এখনও বেজায় রোদ রয়েছে। দেখ্, আর ট্রামে উঠ্‌বি না হেঁটে যাবি বাকিটুকু? বেশী দূর না।"

ট্রামের রাস্তা হইতে তাহাদের বাড়ী অতি অল্পই দূরে। চন্দ্র হাঁটিতে আপত্তি করিল না। সেইটুকু পথ দ্রুতপদে অতিক্রম করিয়া দুই বন্ধু একটি লাল ইটের গাঁথনী গেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। বাড়ীটি খুব বেশী বড় নয়, তবে দেখিতে সুন্দর। চারি পাশে খানিকটা জমি। গেট হইতে লাল সুরকী ঢালা পথ বাড়ীর সিঁড়ির পদতলে গিয়া থামিয়াছে। পথটির দুই ধারে ফুলের বাগান;—ডান পাশে বিলাতী মরশুমী ফুল তাহাদের নীল নয়ন খুলিয়া অভ্যাগতের দিকে চাহিয়া আছে। শ্বেত গোলাপের ঝাড় বায়ুভরে কাঁপিয়া উঠিতেছে, মার্ব্বেল পাথরের মূর্ত্তি বিচিত্র লীলায় দাঁড়াইয়া, ফোয়ারা হইতে গলানো হীরকের স্রোতের ন্যায় জল সবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। একটি উড়ে মালী এইসকলের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। কোথাও ঘাস একটু বড় হইয়া গিয়াছে, সে ছোট একটি 'লন্-মোয়ার' লইয়া সব কাটিয়া ছাঁটিয়া সমতল করিতেছে।

বাম পার্শ্বেও ফুলের বাগান, কিন্তু সেদিকে আধুনিক রুচির প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয় না। বেলা, জুঁই, রজনীগন্ধা, শ্বেত করবী, কাঞ্চনের সেখানে রাজত্ব। মার্ব্বেল পাথরের মূর্ত্তি, ফোয়ারা বা রঙীন মাছ কিছুই সেখানে নাই। একটি শাদা কাবুলী মার্জ্জারী আপনার স্থূল দেহ লইয়া ঘাসের উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে, ক্রীড়াপরায়ণ দুইটি শাবক, তাহার পাশে পশমের বলের মত এদিক ওদিক গড়াগড়ি দিয়া খেলিতেছে, মাঝে মাঝে মায়ের কাছে দুই একটা চড়চাপড়ও লাভ করিতেছে। বাড়ীর পিছনে ফলের বাগান এবং ছোট একটি পুষ্করিণী আছে বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু এসকল বাহির হইতে চোখে পড়ে না।

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়াই সম্মুখে পড়ে মস্ত 'হল'। ইহা খুব দামী আস্‌বাব দিয়া সাজানো, তবে সবগুলি আধুনিক রুচি-সঙ্গত নয়। বড় বড় গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো ছবির ভারে ঘরের ছাদ শুদ্ধ যেন নামিয়া পড়িয়াছে মনে হয়। চারিদিকের দেয়ালে চারখানা বৃহৎ আয়না; ঘরে ঢুকিবামাত্র চারিপাশেই নিজেকে দেখিয়া হঠাৎ অবাক হইয়া যাইতে হয়। পিতলের কাজকরা জয়পুরী টেবল্, লাল মখমলে মোড়া ভারী ভারী চেয়ার এবং সোফা, উপরে সারি সারি বাতির আধার প্রকাণ্ড ঝাড় লণ্ঠন, নীচে বহুমূল্য তুর্কী কার্পেট, কিছুরই অভাব নাই। ঘরখানিতে ঢুকিয়া মনে হয়, হাঁ এবাড়ীর লোকেরা বড় লোক বটে, তবে এখানে বসিয়া দু'দণ্ড হাত পা ছড়াইয়া আরাম করিবার কথা কাহারও মাথায় আসে না।

চন্দ্রনাথ বলিল, "বাপ্‌রে, এ ঘরে কেউ বসে নাকি?"

সুবীর বলিল,"না,এটা আমাদের পরিবারের bad taste আর vulgarityর museum। কাঠে আর কাচে কতরকম ক'রে টাকা নষ্ট করা যায় আমার বাপ ঠাকুরদাদারা তারই competition করেছেন এর মধ্যে। নিতান্ত হোম্‌রা-চোম্‌রা অথচ বুদ্ধিহীন কোন জীব এলে আমি মায়ের আজ্ঞায় তাঁকে নিয়ে এখানে বসাই, তা না হ'লে এটা আমাদের passageরূপেই ব্যবহার হয়। আমার উপরের বস্‌বার ঘরটা আমি নিজের ইচ্ছামত সাজিয়েছি, অর্থাৎ সাজাইনি। কিন্তু সেখানে বস্‌লে কারো অন্তরাত্মা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে না।"

কথা বলিতে বলিতে দুই বন্ধু উপরে উঠিয়া আসিল। সিঁড়ির বাম পার্শ্বের ঘরগুলি সুবীরের, ডানদিকের গুলি অন্তঃপুর, যদিও সম্প্রতি সেখানে অন্তঃপুরিকার একান্তই অভাব। সুবীরের মা ও তাঁহার দুই তিনটি দাসী ভিন্ন এখন আর এদিকে কেহই বাস করে না।

সুবীরের বসিবার ঘরে খান চার কাল কাঠের পালিশ করা চেয়ার ছাড়া আর বড় বেশী কিছু আস্‌বাব নাই। আর আছে, সারি সারি বইয়ের আল্‌মারী। দেওয়ালের গায়ে গোটা দুই ফোটোগ্রাফ ও গোটা দুই লাল্‌চে বাঁশের ফ্রেমে বাঁধানো জাপানী ছবি ভিন্ন অন্য কোন ছবি নাই। ঘরের দরজা জানালাগুলি পরদার ধার ধারে না। তাহাদের ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর হাওয়া যতটা না প্রবেশ করিতেছিল, রৌদ্রের উত্তাপ প্রবেশ করিতেছিল তাহার চেয়ে বেশী। ঘরের মাঝখানে সিলিংএ আঁটা একটি বৈদ্যুতিক পাখা। সুবীর ঘরে ঢুকিয়াই সেটি চালাইয়া দিল।

তাহাদের দেখিয়াই একজন চাকর ছুটিয়া আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সুবীর বলিল, "যা, আমাদের দুজনের চা এই ঘরে দিয়ে যেতে বল্‌। মা ফিরেছেন নাকি?"

চাকর বলিল, "আজ্ঞে, তিনি এখনও ফেরেন্‌নি। ফির্‌তে সন্ধ্যে হ'বে ব'লে গেছেন।"

সুবীর চন্দ্রনাথকে বসাইয়া, নিজেও বসিয়া বলিল, "তা হ'লে সিনেমায় যাওয়াটা কালকের জন্যে তুলে রাখা যাক্‌। এই রোহিণী, ভবানীদিদিকে বল্‌গে যা আমাদের খাবার ঠিক ক'রে দিতে। আর দেখ্‌, চা কর্‌বার মত বুদ্ধি যখন তোর মাথায় নেই, তখন বৃথা চেষ্টা না ক'রে, পেয়ালা, টি-পট, গরম জল, চিনি-টিনি সব এইখানে দিয়ে যা, আমি ক'রে নেব।" চাকর চলিয়া গেল।

চন্দ্র বলিল, "এত বড় বাড়ীতে থাক্‌বার মধ্যে শুধু তুমি আর তোমার মা? এ বড় বেমানান লাগে হে! শিগ্‌গীর আরো লোক জোটাও।"

সুবীর বলিল, "সে চেষ্টা ত আমি ছাড়া আর সকলেই কর্‌ছে। আমারই কেবল ওদিকে উৎসাহের অভাব। শুধু বাড়ী ভরাবার খাতিরে লোক জুটিয়ে আন্‌লে, বাড়ী শেষে এমনই মারাত্মক রকম ভ'রে উঠবে, যে, আমাকেই হয়ত বেরিয়ে যেতে হ'তে পারে।"

চন্দ্র বলিল, "যাতে সেরকম অঘটন না ঘটে, তার ব্যবস্থা ক'রেই আন না হয়। ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান যদি না চলে, ত' কলকাতায় হিন্দু মেম সাহেবেরও আজকাল কিছু অভাব নেই। বি-এ, এম-এ, যা চাও, তাই পাবে। তোমার মত সুপাত্র হাতছাড়া করবে, এমন পাত্রী বা পাত্রীর বাপও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। বলত ঘটকালি করি। আমার সন্ধানে দু-চারটি মেয়ে আছে। বিদুষী তাঁর হওয়াই চাই, এটা আমি ধ'রেই নিচ্ছি, রূপসীও খুব হওয়া দরকার বোধ হয়? টাকাকড়িও চাই নাকি?"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ, একাধারে সরস্বতী, উর্ব্বশী এবং কুবেরনন্দিনী। এর কম দাবী কর্‌ব কেন? কিন্তু কার্য্যতঃ জুটবে হয়ত একটি খুকী, যাঁর গরুর মত ড্যাবা চোখ এবং খাঁদা নাক, নাকের গোড়া অবধি চুল দিয়ে ঢাকা, এবং বাকিটা ঢাকা ঘোমটা দিয়ে। তাঁর বিদ্যা কথামালা অবধি, এবং স্বামীর চেয়ে পুষী মেনীকে তিনি সঙ্গী হিসাবে preference দেবেন। এই ভয়েই ত ওধার মাড়াতে ইচ্ছা হয় না।"

চন্দ্র বলিল, "তুমি বিয়ে না কর্‌লে ত আর ঐ রকম একটি জীব নিজের থেকে তোমার ঘাড়ে এসে পড়তে পারে না? যেমন চাও, তেমন দেখেই কর্‌বে। তোমার ত আর বাপ খুড়ো, ঠাকুরদাদা দশ গণ্ডা বেঁচে নেই যে,

জোর ক'রে গলায় একটি গৌরীদানের দুগ্ধপোষ্য শিশু ঝুলিয়ে দেবে ?"

সুবীর বলিল, "দশ গণ্ডাকে পারা যায়, বিশেষ তারা যদি পুরুষ হয়। কিন্তু একটি মায়ের সঙ্গে পারা শক্ত, বিশেষ তিনি যদি বিধবা হন, আর তাঁর একটি মাত্র সন্তান থাকে। আইনতঃ আমি এখন সাবালক, যা খুসি করবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ এত বড় অক্ষম এবং নিরুপায় জীব আর নেই হে। যা করতে যাই, তাতেই মনে হয় মা দুঃখ পেলেন বা। অত্যন্ত অল্প বয়সে বিধবা হ'য়েছিলেন, সংসারের কোনো সাধই তাঁর মেটেনি। এখন সব সাধ তাঁর আমাকে দিয়েই মেটাবার ইচ্ছা। একটা মানুষের সমস্ত স্নেহ-মমতার অধিকারী হওয়া বড় মুস্কিলের জিনিষ। আমি এক এক দিকে তাঁর ভগবানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছি মনে হয়। তুই বলছিস্ আমি জোর ক'রে বিলাত যেতে পারি ? তা পারি হয়ত। কিন্তু ফিরে এসে মাকে আর দেখব কি না সন্দেহ। তাঁর কিছুকাল যাবৎ heart troubles জুটেছে, এত বড় 'শক্' সইবে না। কাজেই চুপচাপ ব'সে আছি, যতদিনে তিনি মত দেন। চাকরীর জন্যে বিলাত যেতে হবে না, এই এক রক্ষা।"

ইতিমধ্যে জল-খাবার আসিয়া পড়িল। রূপার, পাথরের এবং চীনমাটির বাসনে টেবলটা সবখানা ত ভরিয়া গেলই, তাহাতেও জায়গায় কুলায় না দেখিয়া ভৃত্য ছুটিয়া পাশের ঘরে গেল, আর একটা ছোট টেবল আনিতে। দুইজন দাসী ততক্ষণ আধ ঘোমটা টানিয়া খাবারের রাশ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। টেব্‌ল্ আনা হইলে পর সব খাবারের পাত্র তাহার উপর গুছাইয়া রাখিয়া দাসীদ্বয় চলিয়া গেল। চাকরটি, যদি তাহাদের আরও কোনো কিছু প্রয়োজন হয়, তাহারই অপেক্ষায় দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্র বলিল, "আরো জন দশ বারো খাবে ব'লে মনে হচ্ছে হে; তাদের ডেকে পাঠাও, অনর্থক দেরি ক'রে লাভ কি ? ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ তেড়ে।"

সুবীর হাসিয়া বলিল, "তুমি আরম্ভ ক'রে দাও, মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিতে নেই। অন্যদের আস্‌বার সময় হ'লেই তারা আসবে। দেখ, চা ঢাল্‌ব নাকি ? না, এই সরবতেই চল্‌বে ?"

চন্দ্র বলিল, "দেখা যাক্। এ কিন্তু তোদের অন্যায় বাপু! টাকা আছে ব'লে কি তা নর্দ্দমায় ঢেলে দিতে হবে ? দুটো মানুষের জন্যে যা জলযোগের ব্যবস্থা দেখছি, তাতে দশটা মানুষ বেশ পেট ভ'রে খেতে পারে। এর কতখানি ফেলা যাবে, আন্দাজ কর্ ত' ? তুই রোজই এইরকম জলযোগ করিস্ ত ? দুই প্লেট ফল, লুচি ভাজা, তরকারী, চাট্‌নী; সরবৎ দুই রকম, পায়েস ক্ষীর এবং কমলালেবু; সন্দেশ দু-রকম, রসগোল্লা, এবং পিঠে; তার ওপর চা। এই ত দেখ্‌ছি জলযোগের ব্যবস্থা, তোমরা পেট ভ'রে খেতে হ'লে তা হ'লে কি খাও ?"

সুবীর বলিল, "রোজই কি আর অত খাই ? আজ তুমি এসেছ শুনে ভবানী দিদির একটু বিশেষ রকম দিল্ খুলে গেছে দেখ্‌ছি। নাও, আরম্ভ কর, তোমার ক্ষিদে না পাক্, আমার পেট চোঁ চোঁ করছে।"

দুই বন্ধু আহার সুরু করিল; খাইতে খাইতে চন্দ্রনাথ বলিল, "ভবানী দিদিটি কে হে ? বাড়ীতে ত এক তোমার মা আছেন ব'লেই জান্‌তাম।"

সুবীর বলিল, "ভবানী দিদির পরিচয় দেওয়া শক্ত ব্যাপার। তিনি জন্মেছিলেন রাজপুতানী হ'য়ে, কিন্তু জীবনটা কাটিয়ে দিলেন বাঙালীর ঘরে। আমার দাদা মহাশয় যখন রাজপুতানায় কাজ করতেন, তখন ইনি তাঁদের বাড়ী ঝি হ'য়ে আসেন। কিন্তু বেশীদিন ঝি ভাবে এঁকে কাটাতে হয়নি, বাড়ীর পাঁচ জনের একজনের মতই তিনি ছিলেন! চেহারা দেখ্‌লে বা কথাবার্ত্তা শুনলে বোঝাই যায় যে, ভগবান তাঁকে দাসী বৃত্তি করবার জন্যে সৃষ্টি করেননি। আমার মায়ের বিয়ে হ'বার পর, ভবানী দিদি তাঁর সঙ্গে আমাদের বাড়ী আসেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে ইনিই আমাদের সংসারের অভিভাবিকা হ'য়ে আছেন। একাধারে তিনি house-keeper, manager এবং cashier. তিনটে লোক রাখ্‌লেও এর চেয়ে ভাল ক'রে কাজ চল্‌ত কিনা সন্দেহ। মা ত কোনো দিনই কিছু দেখেননি সংসারের। আমাকে

মানুষকরার কাজটাও তিনি যতটা না ক'রেছেন, তার বেশী ক'রেছেন ভবানী দিদি।"

চন্দ্র বলিল, "বেশ remarkable ত হে! তাঁকে আমার একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে।"

সুবীর বলিল, "স্বচ্ছন্দেই দেখ্‌তে পারিস্, তিনি ত আর অসূর্য্যম্পশ্যা বঙ্গললনা নন, তার উপর বয়সও হ'য়েছে প্রচুর। মা আজ বাড়ী নেই। এর পর একদিন তোকে নিয়ে এসে তাঁর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব, ভবানী দিদিকেও দেখিয়ে দেব!"

এতক্ষণে ইহাদের খাওয়া শেষ হইল। সুবীর চা ঢালিবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "থাম, থাম, আর জায়গা নেই। এর পর নাক মুখ দিয়ে সব বেরিয়ে আস্‌বে। ওহে বাপু রোহিণী, না অশ্বিনী, কি তোমার নাম? এগুলি সব সরিয়ে নিয়ে যাও ত; আর ওগুলোর দিকে তাকাতে পার্‌ছি না।" ভৃত্য তাড়াতাড়ি আসিয়া প্লেট্, গেলাস প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া গেল।

টেবলের উপর পা উঠাইয়া দিয়া পানের মশলা চিবাইতে চিবাইতে চন্দ্র বলিল, "বাড়ীতে "Smoking prohibited" নাকি হে?"

সুবীর হাসিয়া বলিল "Prohibit আর কে কর্‌বে হে? বিশেষ ক'রে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ smoking কেন, আর যতরকম যা কিছু আছে, সবই যখন অবাধে চালিয়ে গেছেন। তবে আমিও পাছে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, এবিষয়ে মায়ের ভয়ানক একটা ভয় আছে দেখি। তাই পাছে তিনি কষ্ট পান ভেবে বাড়ীতে আর উল্কামুখী হবার ব্যবস্থাটা রাখি না। বাইরে অবশ্য তোমাদের পাল্লায় প'ড়ে যে ক'গণ্ডা সিগারেট ধ্বংস করি তার খবর ত' আর তিনি রাখ্‌তে যান না। মায়ের বিশ্বাস, সব দিক দিয়েই আমি এখনও Sir Gallahad আছি। একদিন থিয়েটারে গিয়েছি শুনে মহা shocked হ'য়ে গিয়েছিলেন।"

চন্দ্র বলিল, "তোমাদের পক্ষে extra-careful হ'লেও ক্ষতি নেই। Heredity যদি মান্‌তে হয়, তাহ'লে রক্তের মধ্যে যে পাপের বীজ থাকে, তাকে রোগের বীজের মতই ভয় করে চল্‌তে হয়। আমরা হয়ত যদি একবার গেলাশে চুমুক দিই, তা হ'লে থেমে যেতে কিছুই কষ্ট হবে না। কিন্তু তোমরা যদি একবার স্বাদ পাও,তাহ'লে চিরজীবনের মত দাসখৎ লিখে দেবে। সাবধান থাকাই ভাল।"

সুবীর বলিল, "যাঃ, যাঃ, সব বাজে। আমি bet কর্‌তে পারি সব-চেয়ে দামী আর সুস্বাদু মদও যদি আমি খাই, শুধু একবার নয়, পাঁচ ছ'বারও, তাহ'লেও আমার ছাড়তে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হবে না। ওবিষয়ে আমার এক-ফোঁটাও টান নেই। নাচওয়ালীর ঘাঘ্‌রার পেছনে ছুট্‌বার সখও আমার কোনোদিন হয়নি, হবেও না, এ আমি পরীক্ষা ক'রেই দেখেছি। Ideaটাই আমার nauseating লাগে। Heredity আমি মানি বটে, তবে তাই নিয়ে যে যেখানে যত ন্যাকামী আর বোকামী করেছে, সব কিছু আমি মা'ন্‌তে রাজী নই। তাহ'লে ত বেঁচে থাকাই দায় হয়, এবং দিবারাত্র মায়ের আঁচলের তলায় নিজেকে চাপা দিয়ে রাখ্‌তে হয়। তাঁর যদিও ইচ্ছা তাইই, নিতান্ত সেটা যখন সম্ভব নয়, তখন বেরতে দেবার আগে গলায় একটি রক্ষাকবচ ঝুলিয়ে দিতে চান।"

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "রক্ষাকবচটি সজীব ত?"

সুবীর হাসিয়া বলিল, "তা না হ'লে আর এত আপত্তি কর্‌ব কেন? তামার কি পিতলের কবচ হ'লেত বাড়ীর বাইরে গিয়েই খুলে পকেটে পুর্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু রক্ত-মাংসের জীব বড় ভয়ানক জিনিষ হে। 'শেষ কালেতে মাথার রতন, লেপ্‌টে রইবেন আঠার মতন,' এমনই, যে, প্রাণ একেবারে আইঢাই কর্‌বে। অনেক কাল আগে পুরনো বঙ্গ-দর্শনের একটা গল্পে পড়েছিলাম যে, একজন চাকর নিজের স্ত্রীর বর্ণনা কর্‌ছে মনিবপুত্রের কাছে, 'কি কর্‌ব দাদা ঠাকুর? এ মা নয় যে তেড়িয়ে দেব, বাপ নয় যে খেঁদিয়ে দেব। এ যে ইস্তিরী, অঙ্গ্‌ড়ঙ্গ।' নইলে আর বিলাত যাওয়ার লোভও ছেড়ে দিই?"

চন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল, "মা বুঝি ঐ conditionএ যেতে দিতে রাজী আছেন?"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু যে-ধরণের বৌ আমার পছন্দ, সেটা তাঁর ঘোরতর অপছন্দ। কাজেই, এখন

আমার চুপচাপ ব'সে থাকা ছাড়া উপায় কি? তা না হ'লে ত দিব্যি বিয়ে ক'রে honeymoon trip এই বিলাত চ'লে যাওয়া যেত। সে কি grand হ'ত ব'ল ত? কল্পনা ক'রেই জিবে জল আসে!"

চন্দ্র বলিল, "আরে, সবুরে মেওয়া ফলে। এখন থেকে অত ঘাবড়াস্ কেন? চল্ একটু বাইরের থেকে ঘুরে আসা যাক্। এই গরমে কি ঘরে টেঁকা যায়?"

দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

(১০)

জমিদার-বাড়ীতে তখনও সবাই নিদ্রিত, ঝি-চাকরগুলির শুদ্ধ নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। ভোরের আলো সবে খোলা জানালার ফাঁকে ফাঁকে ঘুমন্ত অধিবাসীদের চোখের উপর জাগরণের তাগিদ বহন করিয়া আনিতেছে। দ্বিতলের একটি বড় ঘরে দুইটি মানুষ ঘুমাইতেছিল। এই আধ-আলো আধ-অন্ধকারেও বুঝা যায় যে দু'জনেই রমণী।

একজনের ঘুমের পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সে দু' চারবার এপাশ ওপাশ করিয়া আলস্য ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল। চোখ রগ্ড়াইতে রগ্ড়াইতে ডাকিল, "ভানু-ও ভানু, ওঠ গো। কাল সারাটা দিন ত দাঁতে কুটো দিয়ে কাটিয়েছ। এখন উঠে চান ক'রে, মুখে কিছু দাও, তা না হ'লে আবার শরীর খারাপ কর্‌বে। কাল রাত্তিরেই আমি সব জোগাড় ক'রে রেখেছি।"

আর-একটি রমণীও ডাকাডাকিতে খাটের উপর উঠিয়া বসিল। দিনের আলো এখন বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল, ঘরের ভিতরটায় আর আব্ছায়া ছিল না। ঘরের একধারে একটি ছোট অথচ মূল্যবান পালঙ্ক, তাতে একটি মানুষই শুইতে পারে, অন্য দিকে একটি তক্তপোষ। একটা আল্‌না দেয়ালের গায়ে খাড়া হইয়া আছে, তাহাতে তিন চারখানি থান ধুতি, একটি গরদের চাদর এবং একটি সেমিজ রক্ষিত। ছোট একটি আল্‌মারী এক কোণে, তাহাতে সারি সারি বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক। ঘরের অন্য এক কোণে, একটি লোহার সিন্ধুক, তাহার ভিতরে যে কি আছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যে দুইটি মানুষ এতক্ষণ এ ঘরে ঘুমাইতেছিল, তাহারা যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা ভবানী এবং ভানুমতী, তাহা বোধহয় আর বলিয়া দিতে হইবে না।

ভবানী এখন বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে। মাথার চুল পাকা, মুখ গভীর বলিরেখায় অঙ্কিত। গায়ের রং হলদে তুলট কাগজের মত হইয়া উঠিয়াছে। দাঁড়াইলে বোঝা যায়, তাহার দীর্ঘ দেহ অনেকখানিই নুইয়া পড়িয়াছে। দেখিলেই তাহাকে এখন আর পুরুষবেশী নারী মনে হয় না। শরীরে সে-শক্তি আর নাই। ভিতর হইতে কিসে যেন তাহার শরীর-মনের বল শুষিয়া খাইতেছে। তাহাকে এখন সাধারণ বাঙালী ঘরের একটি বৃদ্ধা বলিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে চালাইয়া দেওয়া যায়, যদিও চোখের দৃষ্টিতে আগেকার দিনের রুদ্র তেজের ঝলক এখনও মাঝে মাঝে জ্বলিয়া ওঠে। আগের চেয়ে সে কথাবার্ত্তাও ঢের কম বলে।

ভানুমতী এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অকাল-বৈধব্য ও সংসারের নানা দুঃখ-দুশ্চিন্তার আঘাত তাহাকে বয়সের চেয়েও দ্রুতগতিতে বার্দ্ধক্যের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। তবুও এখনও হাজার লোকের মাঝে দাঁড় করাইলে সকলে একবার সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখে। সে যে রাণী হইতেই জন্ম লইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাহার শুভ্র রক্তহীন মুখে, দৃপ্ত চলার ভঙ্গীতে, আয়ত চোখের দৃষ্টিতে এখনও বর্ত্তমান। ঝরিয়া-পড়ার মুখে শ্বেত শতদলের যে শোভা, তাহা এখনও তাহার দেহকে ত্যাগ করে নাই। মাথার চুলে এখনও পাক ধরে নাই, অন্ততঃ উপর হইতে দেখিয়া কিছুই বোঝা যায় না।

ভবানীর ডাকে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ওমা, এরি মধ্যে দিব্যি রোদ উঠে গেছে দেখছি। কাল অত ঘোরাঘুরি ক'রে এমন দশা হ'য়েছিল যে একেবারে মড়ার মত ঘুমেয়েছি। অত যে স্বপ্ন দেখি রোজ রাতে, কাল তাও দেখিনি। যাই স্নানটা ক'রে আসি।"

ভবানী ইতিমধ্যে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। বিছানা উঠাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "রোস, তেল

এনে দিই। বারণ করলুম যে, একাদশীর দিনটা অমন টো টো ক'রে বেড়িও না বাপু, শেষে নিজেই ভুগবে, তা কারো কথা শুনবার মেয়ে ত তুমি নও! এখন কিছু ভাল মন্দ না হ'লেই হয়। ওরে ও মাধী, তেল দিয়ে যা না। নবাবের বেটিদের এখনও ঘুমই ভাঙেনি নাকি?"

নবাবের বেটীদের ঘুম ভাঙিয়াই ছিল। একজন ঝি তেলের বাটি হাতে তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর আসিয়া হাজির হইল। ভানুমতী খাট হইতে নামিয়া একখানি পাটির উপর বসিল। গলা হইতে একগাছি সরু বিছা-হার খুলিয়া পাশে রাখিয়া বলিল, "নে, তেলটা দিয়ে দে। জানিস্ ভবানী, এইটুকু যে পরি, তাও লোকের পোড়া চোখ এড়ায় না। ভাবে, বুড়ো মাগী, বিধবা হয়েছে, তবু গয়না পরার সখ যায় না। এক এক সময় ভাবি খুলে রাখি, কিন্তু মন ওঠে না রে।"

যে ঝিটি তাহার সুদীর্ঘ চুল খুলিয়া তেল দিয়া দিতেছিল সে বলিল, "লোকের মুখে আগুন মা, তাদের কথায় তুমি কান দিও না। তোমার ছেলে রয়েছে অমন রাজপুত্তরের মত, গলা খালি করলে তার অকল্যাণ হবে।"

পুত্রের নাম হইতেই ভানুমতীর মুখের উপর একটি গভীর স্নেহের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। সে হাসিয়া বলিল, "মনে আছে রে ভবানী, যেদিন প্রথম থান কাপড় পরলুম, সেদিন খোকা কি রাগারাগিটাই না করলে। বলে তোমার হাতে আর আমি খাব না, তুমি বিচ্ছিরি। তখন ত তবু ছোটটি ছিল, বড় হ'য়েই কি জ্ঞান-বুদ্ধি কিছু বেশী হয়েছে? ও বছর বললুম, 'প্রয়াগে গিয়ে এবার চুল ক'টা ফেলে আসব, বয়েস ত হ'চ্ছে, এখন তিথি-ধর্ম্ম কিছু করি,' তাতে বলে কি, 'অমন বেলের মত মাথা ক'রে যদি তুমি এসো, তা হ'লে আমি বাড়ীর থেকে বেরিয়ে যাব, তোমার মুখ দেখবো না। বাবা যে কেন তোমাকে টাকাকড়ি খরচ ক'রে লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন তা জানি না, সবই তোমার পাড়াগেঁয়ে বুড়ীদের মত।'"

ভানুমতী সব কথাই প্রায় ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, কিন্তু সে কোনো কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া নীরবে আপনার কাজ করিতেছিল। পারতপক্ষে কথা না বলাই তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উত্তর দিবার ভার লইয়াছিল মাধবী ঝি। সে বলিল, "দাদাবাবুর যা কথা, মা! সেটের কোলে বড়টি হ'য়েছেন, এখন বিয়ে-থাওয়া দিয়ে দিলে বেশ হয়। তখন আর মাকে কেমন দেখাচ্ছে, সে-কথা বেশী ভাববেন না। যে বয়সের যা মা; একটি বৌরাণী এলে আমাদেরও বাড়ী সাজন্ত হয়। এত বড় বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করছে, লোক নেই, জন নেই।"

ভানুমতী বলিল, "আমারই কি অসাধ বাছা? বয়সও হয়েছে, রোগেও ধরেছে, এখন খোকার বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারি। কিন্তু নাতি-নাতনী দেখে মরার সুখ কি আর এ পোড়া কপালে আছে? যা সন্ন্যাসী ছেলে, ওর জমিদার-বাড়ীর ছেলের মত কোনো হাল-চাল নেই! বিয়ে করতেও রাজী হয় না, তা না হ'লে মিত্তিররা কি কম সাধাসাধি করছে মেয়ে নিয়ে? ঘরও ভাল, মেয়েও ভাল। তবে একটু ছোট, এই যা। তা বাঙালীর ঘরে কিছু অসাজন্ত হ'ত না, কিন্তু ছেলের পছন্দই অন্য রকম।"

ভবানী এতক্ষণে কথা বলিল, "যে-সময়ের যেমন, তেমন ত হ'বে বাছা? আজকালকার কোনো ছেলেই কচি বৌ পছন্দ করে না, তা তোমার ছেলেই বা করতে যাবে কেন? তারা চায় বৌ তাদের সঙ্গে সব বিষয়ে সমানে চলুক! আমি ত ভালই বলি সেটা, ঘরে বৌ ঘোম্টা টেনে শাশুড়ী-ননদের মধ্যে ব'সে থাকবে, আর ছেলে ওদিকে কোথায় বাইজি, কোথায় নাচওয়ালী এই সব নিয়ে ঘুরবে, সেই কি ভাল? বউ যদি সব দিক দিয়ে মন জোগাতে পারে, তাহ'লে কি আর ছেলেদের ওসব বদ্‌খেয়াল হয়? তুমি বাপু, ছেলের অমতে বৌ জোটাতে যেও না, তাতে ভাল হবে না, এই তোমাকে ব'লে দিলুম। দেখতে না জানদা কেমন করত তোমাকে ইংরিজি শেখাবার জন্মে, গান-বাজনা শেখাবার জন্মে? তোমার শ্বশুর চালাক মানুষ ছিলেন, কোনোদিন আপত্তি করেন-নি।"

ভানুমতী বিষণ্ণ মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সত্যি কত চেষ্টাই যে ক'রেছিলেন! আমি ছাইকপালী তবু পিশ্‌শাশুড়ীর ভয়ে তাঁর কথা শুনতে চাইতুম' না। কিন্তু হিন্দুর ঘরে অমন মেয়ে পাওয়া যাবে কোথায়? মিস্তির-দের মেয়েটি নাকি দেখতে খাসা, ফোর্থ ক্লাস অবধি পড়েছে, গান-বাজনাও কিছু কিছু জানে। তবে বয়স কম, মাত্র তেরো বছর। তা ওরা মেজদিদির কাছে বলেছে আমরা যদি কথা দিই, তবে ওরা মেয়ে আরো বছর দুই রাখতে পারে, তার বেশী আর পারবে না। বনেদী ঘর, তাদের আবার আত্মীয়-স্বজনে ছি ছি করবে। খোকাকে আজ আর-একবার ব'লে দেখতে হ'বে। মেজ-দিদি আজকালের মধ্যে একবার আসবে ব'লেছিল, তাকে নাকি ওরা অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।"

ভবানী বলিল, "যাও বাছা, চান ক'রগে। পরের ভাবনা, পরে ভেবো। তবে এইটুকু ব'লে রাখি, হিন্দু-য়ানীর ঘটা করতে গিয়ে ছেলের মন ভেঙে দিও না। না হয় ব্রাহ্ম কি খ্রীষ্টান মেয়েই বিয়ে করবে, তারাও ত মানুষ।"

ভানুমতী হাসিয়া উঠিয়া পড়িল, "বুড়ো হ'য়ে তোর ভীমরথী ধরেছে দেখছি। খ্রীষ্টান বিয়ে করবে কি রকম? তাহ'লে আর আমায় এ বাড়ীতে টিঁকতে হ'বে না। সাতটা নয় পাঁচটা নয়, আমার ঐ এক ছেলে, তার বৌ নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না? খোকা আমার বেঁচে থাক, সে মাকে অমন দুঃখ কখনও দেবে না।"

মাধবী বিস্ময়ের আতিশয্য দেখাইবার জন্য গালে হাত দিয়া বলিল, "দিদি, কি যে বলে তার ঠিক নেই! এ কি হেঁজি-পেঁজির ঘর যে যা খুসি করলেই হ'ল! এই বংশে শেষে খ্রীষ্টান বউ আসবে! ওমা!"

ভবানী তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "নে নে, ন্যাকা সাজতে হ'বে না। তুমি যাও বাবু, চান ক'রে এসো, আমি ফলটলগুলো গুছিয়ে আনি।" বলিয়া সে শয়ন-কক্ষ ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। ভানুমতী চলিল স্নানের ঘরে, পিছনে তোয়ালে, ধুতি প্রভৃতি লইয়া চলিল মাধবী।

স্নানান্তে খাইতে বসিয়া ভানুমতী বলিল, "মাধী, রোহিণীকে ডেকে জিগ্‌গেস কর্‌ত রে, খোকা উঠেছে নাকি, তার চা-টা খাওয়া হ'য়েছে নাকি? নিজের পোড়া পেট নিয়েই ব্যস্ত আছি, ছেলেটার এখন 'অবধি খোঁজই নিলুম না।"

ভবানী বলিল, "সে এখনও ওঠেনি গো ওঠেনি, তুমি খাওত।" মাধবী তবু গৃহিণীর আজ্ঞাপালনার্থ রোহিণীর সন্ধানে চলিয়া গেল।

খাইতে খাইতে ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিল, "আম আনাস্‌-নি যে বড় এবার?"

ভবানী বলিল, "এনেছিলুম। সবে উঠেছে, দাম বেশী ব'লে গোটা দুই মোটে এনেছিল। ভাবলুম একটা খোকাকে দেব, একটা তোমার জন্যে রাখব। তা খোকা কাল বিকেলে আর-একটি ছেলেকে নিয়ে এল, একসঙ্গে জল খেল, তা দুটোই তাদের দিলুম।"

ভানুমতী বলিল, "ওমা, তাই নাকি? কে ছেলেটি?" ভবানী বলিল, "নাম ত জানি না।" রোহিণী বলিল, 'দাদাবাবুর সঙ্গে আর-এক বাবু এসেছে।' উঁকি দিয়ে দেখলুম, ওরই বয়সী একটি ছেলে, একসঙ্গে পড়ে বোধ হয়। তুমি থাকলে বোধ হয় এদিকে নিয়ে আসত; খোঁজ করছিল, মা আছেন নাকি।"

ভানুমতার খাওয়া শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। মাধবী থালা বাটি উঠাইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেই ভবানী বলিল, "এখন আর ঘোরাঘুরি করো না। একটু জিরোও, তা না হ'লে আবার বুক ঢিপ্‌ঢিপ সুরু হ'বে। খোকা চা খাওয়া হ'লেই আসবে এখন এদিকে। না হয় আমি তাকে ব'লে আসছি। হার-ছড়া গলায় দাও, ফেলে রেখেছ পাশে, আবার কোথা দিয়ে কে নিয়ে যাবে।"

হারটি সরু, তাহাতে মস্ত ভারী এক পদক ঝুলিতেছে। স্প্রিং টিপিলেই তাহার উপরের ডালাটি খোলা যায়, ভিতরে জ্ঞানদারঞ্জনের একটি ক্ষুদ্র ছবি। ভানুমতী একবার ডালা খুলিয়া ছবিটি দেখিয়া লইল, তাহার পর হার উঠাইয়া গলায় পরিল। ভবানী বাহির হইয়া গেল, সুবীরের সন্ধানে।

মিনিট দশ পনেরো পরেই সুবীর আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সবে ঘুম ভাঙিয়াছে তাহার চিহ্ন এখনও তাহার

চোখ মুখ আর পোষাকে বর্ত্তমান। ঘরে ঢুকিয়াই মায়ের পিঠে মৃদু একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "কি মা, কালত খুব মস্ত এক বস্তা পুণ্য সঞ্চয় ক'রে এসেছ শুনলাম। এখন ডাঃ ভৌমিককে ডাকতে হবে নাকি তাই ব'ল। তোমার পুণ্যে সবচেয়ে লাভবান হ'ন তিনিই, বেশ call এর উপর call জুটতে থাকে।"

ভানুমতী হাসিয়া বলিল, "বোস্ বোস্, এখনি ডাক্তার ডাকতে হ'বে না, শরীর ত কিছু খারাপ করছে না। চা-টা খেয়েছিস?"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ, লাল সরবৎ খেয়েছি। তোমার চাকরটি যা চমৎকার চা করে তার সঙ্গে কুল্‌ফী মালাইয়ের তফাৎ বোঝা শক্ত। রোজ বলি আমাকে চা, চিনি দুধ আর গরম জল দিয়ে যেতে, তা ভক্তির আতিশয্যে কোনো দিনই সে সেটা ক'রে উঠতে পারে না। ওর জ্বালায় আমার এত দিনের বন্ধুকে না ত্যাগ করতে হয়।"

ভানুমতী বলিল, "তা, চা না খেলেই বা ক্ষতি কি? ওতে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় ডাক্তারে বলে। আমরা যে চা খাই না, তাতে আমাদের ত কোনো অসুবিধা হয় না?"

সুবীর বলিল, "সুবিধা যে কি হয়, তাও ত দেখি না। ডাঃ ভৌমিক তোমার কল্যাণে মাসে এক শ' টাকা অন্ততঃ পান, আমার এই যে তেইশ বছর বয়স হ'তে চলল, আমার জন্যে তেইশ টাকাও ডাক্তারকে দিতে হয়েছে কিনা সন্দেহ।"

ভানুমতী স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিল, "যা যা, আর বড়াই করতে হ'বে না। ভারি না ভাল স্বাস্থ্য, তাল-পাতার সেপাই কোথাকার! কাল কে এসেছিল রে তোর সঙ্গে?"

সুবীর বলিল, "ও, আমার সঙ্গে পড়ে, চন্দ্রনাথ ব'লে একটি ছেলে। নিয়ে এসেছিলাম, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব ব'লে, তা তুমি ত রাত দশটায় ফিরলে। আজ আর কোথাও বেরুচ্ছ না ত? গাড়ীখানা আমার চাই।"

ভানুমতী বলিল, "আমি কোথাও যাব না। তবে মেজদিদিকে সন্ধ্যের সময় একবার আনতে পাঠাবার কথা আছে। তা সে আর কতক্ষণ লাগবে? আধ ঘণ্টা বড় জোর। তারপর তুই গাড়ী নিস্ এখন।"

সুবীর বলিল, "কাজ নেই বাপু, তুমি গাড়ী রাখ, আমি ট্যাক্সি ক'রে যাব এখন। মেজ মাসীমা আসবার আগেই আমি চম্পট দেব। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমি বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত নেই।"

ভানুমতী বলিল, "পাগলের কথা শোন! কেন রে? মেজ মাসী তোকে কামড়ায় নাকি? সে আসবার আগে পালাবি কেন?"

"তিনি ত এসেই কোন দুগ্ধপোষ্যা খুকীর রূপ-গুণ বর্ণনা করতে বসবেন, সে শুনতে আমি আর রাজী নই। দুই কান প'চে গেছে!"

ভানুমতী বলিল, "তবে তুই কি বিয়ে করবিই না একেবারে ঠিক করেছিস? একমাত্র ছেলে তুই এ বংশের, তুই এ রকম ক'রে জেদ ধরলে চলে? আমাকে নাতির মুখ দেখে মরতে দিবি না?"

সুবীর বলিল, "বুড়ী হওনি, তবু বুড়ী-গিরি না ফলালে তোমার চলে না। এখনি না মরলে তুমি কিছুতেই চলবে না?"

ভানুমতী বলিল, "আর বুড়ী হ'তে বাকিই বা কি? বাঙ্গালীর মেয়ে কুড়ি পার হ'লেই বুড়ী আর আমার ত দুকুড়ি কোন্ কালে পার হ'য়ে গিয়েছে। জানিস্, কাল কালীঘাটে মিত্তিরের জ্যোঠীর সঙ্গে দেখা হ'ল।"

সুবীর বলিল, "তবে ত আমি কৃতার্থ হলাম। কি তাঁর বক্তব্য?"

ভানুমতী হাসিয়া বলিল, "কবে আমাদের দিক থেকে মেয়ে দেখতে যাবে তাই খোঁজ নিচ্ছিল। মেয়ে নাকি খুব সুন্দর রে।"

সুবীর বলিল, "সুন্দর হ'লেই তাকে গিয়ে দেখতে হবে? আচ্ছা শুধু দেখলে যদি তুমি খুসি হও ত গিয়ে দেখে আসব।"

ভানুমতী বলিল, "আচ্ছা, দেখেও যদি তোর পছন্দ না হয়, তবে আমি আর কথা কইব না। তা হ'লে একটা দিন ঠিক ক'রে মেজদিদিকে আজ ব'লে দেব।"

সুবীর বলিল, "যা খুশী ক'রগে, আমি এখন চল্‌লাম। আজ যেন বেশী ঘোরাঘুরি কোরো না। এমন-কি বামুনঠাকুরুণের রান্নার তদারক কর্‌বার লোভও ত্যাগ কোরো। প্রতি একাদশীর পর অসুখ করা ত তোমার এক রুটীন্ দাঁড়িয়ে গেছে। অন্ততঃ বৈচিত্র্যের খাতিরেও দু একবার সেটা বাদ দাও।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ভানুমতী ভবানীকে ডাকিয়া বলিল, "রান্না-বান্না-গুলো দেখিস্ একটু আজ। আমার অভিভাবক বাবাটি আমার আজ নীচে নামা বারণ ক'রে দিয়ে গেলেন। নতুন বাম্‌নী মাগীর যা রান্নার ছিরি, তা ভূতেও খেতে পারে না। মেয়ে মানুষের হাতে যে আবার এমন অখাদ্য সৃষ্টি হয় তাও জানুতুম না। আর পাশের বাড়ীর বুড়োঠাকুরুনকে একটু ডেকে দিয়ে যা, গল্প-স্বল্প করি, একলা হাঁ ক'রে ব'সে থেকে আর কি করব?"

ভবানী ঘাড় নাড়িয়া নীচে নামিয়া গেল। এ বাড়ীর রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, খাইবার ঘর প্রভৃতি সবই নীচে। তবে বাড়ীতে লোকের সংখ্যা এত কম যে, আজকাল আর ঘটা করিয়া খাইবার ঘরে কেহই খাইতে যায় না। সাহেবী ধরণে সজ্জিত খাইবার ঘরটি তালা বন্ধই থাকে, কারণ সাহেব-সুবাকে খানা দিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ অর্জ্জনের দিকে বর্ত্তমান জমিদারটির একটুও উৎসাহ নাই; নিজেও সে উপরেই খায়, বসিবার ঘরে পড়ার টেব্‌লের উপর। বাহারের ডাইনিং রুমটি মাঝে মাঝে খোলা হয়। দামী রূপার বাসন, চীনা মাটির বাসন প্রভৃতি ভবানীর তদারকে একবার ধুইয়া, মুছিয়া, ঝাড়িয়া ভৃত্যেরা আবার আলমারী সাজাইয়া রাখে, তারপর দরজায় আবার তালা চাবী বন্ধ হয়। ভানুমতী ত নিজের শুইবার ঘরেই খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া লয়, ডাক্তারের হুকুমে তাহার দিনে দুইবারের বেশী সিঁড়ি ওঠা-নামা করা বারণ।

বেলা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। সুবীর খাইয়া-দাইয়া, গাড়ী চড়িয়া কলেজে চলিয়া গেল। ভানুমতীরও খাওয়া-দাওয়া শীঘ্রই চুকিয়া গেল। বাকি রহিল কেবল বাড়ীর ঝি-চাকরের দল। তাহারা ইচ্ছামত যখন খুসি খাইয়া, মাদুর, কম্বল, চট্, খবরের কাগজ যে যা পাইল, তাহাই পাতিয়া সুখে নিদ্রা দিল। উপরের তলায় ঘরে ঘরে গরম হাওয়ার ভয়ে দরজা জান্‌লা বন্ধ হইয়া গেল। বৈদ্যুতিক পাখার ডানার ঝপ্‌টায় বিশেষ কিছু যে আরাম পাওয়া গেল তাহা নহে, তবু মন্দের ভাল বলিয়া ভানুমতী পাখার তলায় শীতলপাটী বিছাইয়া, একখানা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বাংলা অনুবাদ হাতে করিয়া দীর্ঘ দুপুরবেলাটা কোনো গতিকে কাটাইয়া দিল।

ক্রমে রৌদ্রের ঝাঁজ কমিয়া আসিল। জান্‌লা-দরজা একে একে খুলিতে লাগিল। বই মুড়িয়া রাখিয়া ভানুমতী উঠিয়া বসিয়া, তাকাইয়া দেখিল দেয়ালের গায়ে ঝোলানো বড় ঘড়িটার দিকে। তাহার পর দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে মাধী, ফলটলগুলো, আর মিষ্টি সব দিয়ে যা, অমনি ছোট বঁটিটাও আনিস্। খোকা কলেজ থেকে ফিরেছে কি না একটু খবর নে ত।"

মাধবী আসিল, রঙীন বেতের ডালায় নানারকম ফল ও একটি বঁটি লইয়া, পিছনে মিষ্টি লইয়া আসিল ভবানী। ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ছেলের আজ্ঞা মেনে আজ ভালই আছ দেখ্‌ছি। না হয়, আমিই আজ ফলটলগুলো ছাড়িয়ে দিই?"

ভানুমতী বলিল, "না, না, আমি বেশ পারব, তুই দে। সারাদিন কি হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাকা যায়? খোকা ফিরেছে, মাধী?"

নীচে মোটরকার থামিবার ও দরজা-খোলার শব্দ শোনা গেল। "এই এলেন", "এই এলেন," বলিয়া মাধবী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ভানুমতী বঁটি লইয়া ফল কাটিতে বসিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ঠিকঠাক করিয়া ঝির হাতে দিয়া ভানুমতী ছেলের ঘরের দিকে চলিল।

সুবীর মুখ ধুইতেছিল। মায়ের পদশব্দে তোয়ালে দিয়া মাথা-মুখ ঘষিতে ঘষিতে বসিবার ঘরে আসিয়া বলিল, "এই যে আজ দিব্যি লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়েছ, অসুখ-বিসুখ কিছু করেনি ত? মাসীমার জন্যে গাড়ী পাঠাতে পার এখন, আমার আর দরকার নেই।"

ভানুমতী বসিয়া বলিল, "এই যে পাঠাব আর-একটু

পরে। যা ভয়ানক রোদ এখন। তুই খেতে বোস্। মেজদিদিকে কিন্তু আজ মেয়ে দেখার কথা আমি বল্‌ব, তারপর যেন আমাকে বিপদে ফেলো না।"

সুবীর বলিল, "না, না, তোমার ভাবনা নেই, দেখব যখন বলেছি তখন দেখবই, যা থাকে কপালে। আমাকে কি একলাই যেতে হ'বে নাকি? কবে এবং কোন্ সময়ে? শনি কি রবিবারে দিন ঠিক কোরো, তা না হ'লে আমি কিন্তু পার্‌ব না।"

ভানুমতী বলিল, "আচ্ছা, আস্‌চে শনিবারের কথাই ব'লে দেব। একলা যাবি কেন, বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিস্। দেওয়ানজীকেও ব'লে পাঠাব, তিনিও আস্‌বেন। এক-আধজন বুড়ো মানুষ সঙ্গে থাকা ভাল।"

সুবীর বলিল, "একজন কেন দশজন বুড়ো তুমি সঙ্গে দিও। আর খুকীটিকে কি কি জিগ্‌গেস কর্‌তে হ'বে, তাও শিখিয়ে দিও। তা না হ'লে আমি হয়ত কি যা তা প্রশ্ন কর্‌ব, সে ভয়ে কেঁদেই ফেল্‌বে।"

ভানুমতী বলিল, "যা, যা, সব তাতে ফাজলামি! আমারও ত অল্প বয়সে বিয়ে হ'য়েছিল, কৈ কত কেঁদে-ছিলাম? বাঙালীর মেয়ে তেরো বছরেই বেশ পাকা-পোক্ত হ'য়ে যায়। দেখিস্ এখন, কিছু খুকী নয়।"

সুবীর নীরবে খাইতে লাগিল। "যাই, মেজদিদির জন্যে গাড়ীটা পাঠিয়ে দিইগে," বলিয়া ভানুমতী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

যবদ্বীপের পথে

১। রেলে মাদ্রাজ

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১২—১৪ই জুলাই।
আঁবোআজ (Amboise) জাহাজ
শনিবার ১৬ই জুলাই।

উপরে পরিষ্কার আকাশ—ফিকে নীল, ধারে ধারে দিক্‌চক্রবালের উপরেই সাদা সাদা মেঘ; সকালের বাল-সূর্য্যের মিষ্টি রোদ্দুর সমস্ত উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে—নীচে সমুদ্রের কালাপানি আর এখন ঘন নীল নয়; সকালের সূর্য্যের কোমল স্পর্শে তার গাঢ় রঙটাও একটু হাল্‌কা হ'য়ে চমৎকার দেখাচ্ছে—এ যেন একেবারে ভূমধ্যসাগরের সমুদ্র। কাছে কাছে, দূরে সব জায়গায় টগ্‌বগে ফেনায় ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে প'ড়ছে—এরি মধ্যে জল কেটে কেটে আমাদের জাহাজ চ'লেছে। এই জল কেটে যাওয়ায় একটা একটানা আওয়াজ বরাবর আমাদের জাহাজের জীবনের background বা চিত্র-ভিত্তির মতন হ'য়ে র'য়েছে—জলোচ্ছ্বাসের শব্দ, মাঝে মাঝে যেন একটা সজোর ফোঁস-ফোঁসানি—সমস্ত আওয়াজটা মিশে মনে যে-ভাব আনে সেটা হ'চ্ছে কবির কথায় "অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।"

আকাশ প্রসন্ন দৃষ্টিতে সাগরের দিকে স্নিগ্ধভাবে চেয়ে আছে। আমাদের বাঙালী কবি রবিদত্তের একটি ছোট ইংরেজী কবিতার একটি লাইন এখন মনে আস্‌ছে,—Jove on Neptune smiles দ্যৌঃপিতা বরুণ-দেবের উপর স্মিতহাস্যে নেত্রপাত কর্‌ছেন। কালকের দিনটা বিকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সারা বিকাল আর সন্ধ্যা আমরা উপরের ডেকে রেলিংয়ের ধারে ব'সে ব'সে বৃষ্টির কুহেলী দেখে আর জলের উপর বৃষ্টি-বিন্দুপাতের শব্দ শুনে কাটিয়েছি। সন্ধ্যার সময়ও মেঘ কাটেনি, যদিও সূর্য্য অস্ত যাবার কালে এক চমৎকার ফিরোজা রঙের

খেলা আকাশে আর সমুদ্রের উপর দেখেছিলুম—সন্ধ্যার crepusale বা আলো-আঁধারিতে কে যেন হালকা নীলের তুলি দিয়ে আকাশ আর সাগরের উপর এক পোঁছ রঙ বুলিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। আজকের দিনটাও ঐ রকম জলে-ঝাপটায় কাট্‌বে ব'লে মনে হ'য়েছিল, কিন্তু ভোরে উঠে প্রসন্ন আকাশ দেখে মনটা খুসী হ'য়ে গেল।

জাহাজে আমরা চড়েছি পরশু, বেস্পতিবার; ১১ই তারিখে। বেলা সাড়ে পাঁচটায় আমাদের জাহাজ ছেড়েছিল—বারবেলা কাটিয়ে, আশা করি। মাদ্রাজ সহরে সকাল আট্‌টায় আমাদের প্রবেশ, সেখান থেকে পাঁচটায় আমাদের প্রয়াণ। কল্‌কাতা থেকে তার দুদিন আগে, মঙ্গলবার ১২ই তারিখে আমরা যাত্রা করি। এই মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, তিন দিন ধ'রে একটানা রেলযাত্রা ক'রে আর মাদ্রাজে ঘোরাঘুরি ক'রে, জাহাজে যখন চড়লুম তখন শরীর মন দুই অবসন্ন। জাহাজ ছাড়্‌তে সকলে একটু আরামের নিশ্বাস ফেললুম—অন্ততঃ চার পাঁচদিন শুয়ে ব'সে হাত-পা ছড়িয়ে যেতে পারা যাবে, এই মনে ক'রে। বিদেশে যাচ্ছি, তিন মাস ধ'রে আমাদের ভারত-ভূমি বা বঙ্গভূমির মনঃকোকনদ যে আমাদের ক'জন-হীন হ'য়ে থাকতে পারে সে-কথা আদৌ মনে হয়নি। ১৯১৯ সালে যখন ছাত্র হ'য়ে দীর্ঘ মেয়াদ নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করি, তখন বোম্বাইয়ের আপোলো-বন্দরের ঘাট ছাড়বার সময় মনটা একটু ভার-ভার হ'য়েছিল, চোখের কোলও বোধ হয় একটু ভারি হ'য়েছিল। এবার কিন্তু সে-রকম কিছু হ'তে পারেনি। কারণ যে বিদেশে আমরা এখন চ'লেছি তার বৈদেশিকত্ব আমাদের কাছে ততটা নেই—এ বিদেশ আমাদেরই দেশের একটুকু অংশ এই রকম একটা ধারণা (যেটা historical sense বা ঐতিহাসিক অনুভূতির ফল) আমরা নিয়ে চ'লেছি। কাজে কাজেই দূর বিদেশ-প্রবাসের একটা চাপা আতঙ্ক মনের মধ্যে নেই।

কল্‌কাতা থেকে মাদ্রাজ—চল্লিশ ঘণ্টার এই রেল-যাত্রা আমরা তিনজনে মোটের উপর বেশ আনন্দেই ক'রেছি। কবি আমাদের পাশের গাড়ীতে, একখানি কামরায় তিনি একা ছিলেন। খড়্গপুরে আমাদের কামরায় ঢুক্‌ল দুজন ফিরিঙ্গি রেলের লোক—মালপত্র নিয়ে। এরা যাবে মাদ্রাজ অবধি। এদের ঢুক্‌তে দিতে হ'ল। ওদিকে কবির গাড়ীতে একদল কলেজের আর ইস্কুলের ছেলে ঢুকে প'ড়ল। এরা মেদিনীপুর থেকে আস্‌ছে। কবি আস্‌ছেন মনে ক'রে কালকেও এসেছিল, আজ এঁর দেখা পেয়েছে। Autograph hunting বা বড় লোকের হস্তাক্ষর সংগ্রহের বাতিক দেখলুম ভীষণ সংক্রামক হ'য়ে পড়েছে। ছেলেরা চায় কবির হস্তাক্ষর,—তাঁর সাম্‌নে ছোট বড় বাঁধান খাতা, চার-পয়সানে এক্‌সারসাইজ-বুক, ঘরে সেলাই খাতা চার পাঁচ খানা খুলে ধরা হ'য়ে রয়েছে দেখ্‌লুম। একটী সাহিত্য-রসিক ছেলে চায়, তখনি কবি দু'ছত্র রচনা ক'রে তার খাতায় লিখে দেন। ছেলেদের বিমুখ কর্‌তে তিনি চান না, অথচ দেশ কাল আর শরীর মন ঠিক কবিতা রচনার উপযুক্ত নয়। তিনি একটু কাতর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। মনে পড়্‌ল, কে একজন নবীন নাট্যকারযশঃপ্রার্থী তার নাটকের গানগুলিতে সুর দেবার জন্য কবির কাছে এসেছিল। বেশী নয়, গোটা বাইশেক গান। প্রত্যেকটিতে সুর দিতে, এমন আর কি, বড় জোর আধ-ঘণ্টা ক'রে সময় লাগবে—এটা কি তাঁর স্নেহাস্পদ অনুগামীকে বাধিত কর্‌বার জন্য তিনি কর্‌তে পারেন না? সুখের বিষয় ছেলে কয়টী উক্ত উদীয়মান নাট্যকারের মতন নাছোড়বান্দা ছিল না। তাদের বাইরে ডেকে নিয়ে এসে মিষ্টি কথায় বল্‌তে, তারা সন্তুষ্ট মনে কবিকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। খড়্গপুর থেকে গাড়ী ছেড়ে দিলে; সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, রাত্রিটা কবি নির্ব্বিঘ্নে কাটালেন।

আমাদের গাড়ীতে যে দুটি ফিরিঙ্গি উঠ্‌ল তারা দুয়ে মিলে দু-জন মানুষ বটে, কিন্তু একজন হ'চ্ছে দেড়, আর একজন আধ। রেলের ড্রাইভার কিংবা গার্ড হ'বে। গরীব, ভালো মানুষ। বাঙ্গালোরের দিকে বাড়ী। মোটা লোকটী খুব লম্বা চওড়া, দোহারা গড়ন, তার খোঁচা খোঁচা গোঁফ; আর তার সহযাত্রী রোগা লোকটী আকারে খর্ব্বকায়, বিরল-গোঁফদাড়ী। তারা একসঙ্গে যাচ্ছে, হয় আত্মীয় নয় সহকর্ম্মী। এই যুড়ীটী দেখে মনে হ'ল The long and short of it। বড়টি (চেহারায় ভারিক্কে ব'লে বোধ হয়)

ছোটটীর boss বা কর্ত্তা হ'য়ে, ওইটির দ্বারা নিজের বিছানা পাতানো প্রভৃতি কাজ করিয়ে নিতে লাগল। আমাদের খাবার থেকে কিছু কিছু ভাগ দিতে ধন্যবাদের সঙ্গে নিয়ে তার সদ্ব্যবহার ক'রলে। পথে বিশেষ ক'রে অন্ধ্র দেশ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় প্রতি বড় ষ্টেশনে কবিকে দেখ্‌তে-আসা লোকের ভীড় দেখে, তাঁর সম্বন্ধে এদের সম্ভ্রমপূর্ণ কৌতূহল হ'ল।—তাঁর নামটীর সঙ্গে এদের আবছা-আবছা পরিচয় ছিল। বড়টী ব'ল্‌লে, "আমার এক uncle (খুড়ো কি মামা যা হোক একটা কিছু) ছিলেন, তিনি বেশ পণ্ডিত লোক ছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যে। তিনি থাক্‌লে কবির কদর বুঝতেন, তাঁর নাম ছিল মিষ্টার শেপার্ড।—আপনারা কি তাকে চেনেন?—আমরা মুক্‌খু সুক্‌খু মানুষ, আমরা যে কিছুই জানি না।" মান্দ্রাজের কাছে একটা ষ্টেশনে বৃহস্পতিবার ভোরে যখন গাড়ী থাম্‌ল, দেখি প্লাট্‌ফর্ম্মে হিন্দু রিফ্রেশ্‌মেণ্ট রুমের সামনে এক টেবিলের উপর গরম গরম ডালের বড়া, চালের গুঁড়োর পিঠে আর একটা তরকারীর পসার খুলে, মস্ত এক হাঁড়ীতে চিনি দেওয়া গরম কফি আর তার পাশে বড় এক আলুমিনিয়মের খোলা পাত্রে দুধ রেখে ঝুঁটী-বাঁধা তামিল ব্রাহ্মণ হোটেলওয়ালা ষ্টল খাড়া ক'রে ব'সেছে। যত তামিল তেলুগু যাত্রী আলুমিনিয়াম আর পিতলের বাটী ঘটী নিয়ে কফি আর বড়া আর পিঠে কিন্‌তে ভীড় ক'রেছে। আমাদের ফিরিঙ্গি দুটি ব'ল্‌লে—"এরা চমৎকার কফি করে, আর ডালের বড়াও এদের চমৎকার। কিন্তু আমরা খ্রীষ্টান ব'লে কাছে গেলে আমাদের পাত্রে কফি দেবে না, হয় তো খাবারও বেচ্‌বে না—আপনারা দয়া ক'রে আমাদের কিছু খাবার আর কফি এনে দেবেন?"

বুধবার দিন ১৩ই তারিখে সকালটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু দুপুরে এখন অসহ্য গরম হ'ল। অন্ধ্র দেশে কবির অনুরাগী আর ভক্তের সংখ্যা দেখ্‌লুম অনেক। দেখে মন যে খুসী হ'ল না এ কথা বল্‌তে পারি না, যদিও এইসব কবি-দর্শনকামী লোকেদের ভীড় অনেক সময়ে তাঁর পক্ষে খুব আরামদায়ক হচ্ছিল না। The penalties of greatness—এটা তাঁকে মেনে নিতেই হয়, উপায় নেই। প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনে লোকে তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে উদ্দেশে প্রণাম করছে। আর যেখানে যেখানে গাড়ী বেশীক্ষণ থেমেছে সেখানে তাঁর কামরার দরজা খুলে দিতে হ'য়েছে—লোকে ঢুকে প্রণাম করেছে, প্রশংসাবাণী তাঁকে শুনিয়েছে, তাঁর লেখা প'ড়ে তাদের আনন্দ আর মনে উৎসাহ লাভের জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। শ্রদ্ধা আর ভক্তির আতিশয্যে তাঁর গাড়ীর সামনে বহুস্থলে আগত লোকেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি হ'য়েছে; জায়গায় জায়গায় আশঙ্কা হ'চ্ছিল যে, লোকে হুড়মুড় ক'রে তাঁর গাড়ীতে ঢুকে না পড়ে। তাই সুরেন-বাবু আর আমি পালা ক'রে ক'রে তাঁর গাড়ীতে গিয়ে দরজা আটকে দাঁড়াতে লাগলুম। তেলুগুদের মধ্যে দুচার জন পরিচিত লোকও এলেন। এক ষ্টেশনে কোকনদ কলেজের ইংরেজির প্রফেসার একটি ভদ্রলোক এলেন; ক'লকাতায় ইনি কিছুকাল ছিলেন,—ক'লকাতায় থাক্‌বার কালে বাঙলা শিখেছেন; একটি তেলুগু-মহিলা এসে বাঙলায় কবির সঙ্গে কথা কইলেন—এইরকম সব লোক এলেন। অন্য অপরিচিত লোকেদের মধ্যে সকলেই বেশ সম্ভ্রমপূর্ণ। একটী ষ্টেশনে এক ভদ্রলোক গাড়ীর ভিতরে লা-পরওয়া ভাবে ঢুক্‌লেন—আর একজন পিছু পিছু এসে তাঁর পরিচয় দিলেন যে, ইনি স্থানীয় এক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। কবির খবর যে ঠিক রাখেন তা মনে হ'ল না; কিন্তু উঠেই পরিচিতের মতন জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আপনি না কোকনদের কংগ্রেসে এসেছিলেন?" প্লাটফর্ম্মের ইতরজনের প্রতি সগর্ব্ব দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে ম্যাজিষ্ট্রেটপ্রবর গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। আর-একটি ষ্টেশনে একজন বৃদ্ধ তেলুগু ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে হাত জোড় ক'রে কবির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তেলুগু ভাষায় কি বল্‌তে লাগ্‌লেন। শুন্‌লুম ইনি স্থানীয় উকিল একজন, নামটি বায়াম্মাপন্তুলু না কি, তেলুগু ভাষার একজন কবি। ইনি ভারতের কবিগুরুকে নিজের ভাষায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রতে এসেছেন। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা অন্তর সব জায়গায় এইরকম লোকেদের সঙ্গে শিষ্টাচার ক'রতে ক'রতে যাওয়া আর তার উপর একেবারে ভাদ্দুরে গুমট—এটা যে কি অস্বস্তিকর তা আমরাও হাড়ে হাড়ে

টের পেলুম। রাজমহেন্দ্রীতে দুশো আন্দাজ কলেজের ছাত্র এসে হাজির। এরা সকলেই কাগজে কবির যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে ভুল খবর প'ড়ে আগের দিনেও ষ্টেশনে এসেছিল। অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে একটি সাদাসিধে ধরণের লোক জানালা দিয়ে কবিকে একটি লেবু, একটি কাঠের উপর রঙকরা একাধারে ফুলদানী আর ধূপদানী,—তাতে কিছু ফুল আর কিছু দক্ষিণী ধূপ জ্বালিয়ে দেওয়া আছে—আর একটি রঙীন কাঠের নলে ক'রে ধূপ দিয়ে নীরব ভাষায় কবির প্রতি প্রীতি জানিয়ে নমস্কার ক'রে ভীড়ের মধ্যে মিশে চ'লে গেল। কবির এই অজ্ঞাত ভক্তের এইরকম নির্ব্বাক্ অনাড়ম্বর বাহ্য-উচ্ছ্বাসবিহীন শ্রদ্ধা-নিবেদনটি আমাদের বড় ভালো লাগ্‌ল। রাজমহেন্দ্রী গোদাবরীর উপর। গোদাবরী হ'চ্ছে দক্ষিণের গঙ্গা। মাহাত্ম্যে গঙ্গার চেয়েও বেশী তো কম নয়। এখানে স্নান ক'রলে বিশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। রাজমহেন্দ্রীতে নেমে একদিন থেকে স্নান কর্‌বার জন্য বিশুদ্ধ-সংস্কৃত-বহুল তেলুগু ভাষায় (যার আশয় বুঝতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হ'ল না) অনুরোধ এল এক পাণ্ডার কাছ থেকে। লোকটি সরেও না, আর তার সঙ্গের কলেজের ছাত্রেরাও তার কথায় সায় দিয়ে মাদ্রাজী কায়দায় মাথা নাড়ে, আর ইংরেজিতে বলে—"আপনি দয়া ক'রে নামুন, এখানে থাকুন একদিন। আমাদের কিছু বলুন—এ স্থানটি কাশীর চেয়েও বড় পুণ্যক্ষেত্র—এখানে তো আপনি কখনও আসেননি।" রাজমহেন্দ্রীতে নামা অসম্ভব তা বুঝিয়ে বলা গেল। তখন তারা বলে, "তাহ'লে কবি আমাদের কিছু উপদেশ দিন—কোনও message বা বাণী বলুন—" তাঁর বক্তব্য যা বল্‌বার তিনি অন্যত্র ব'লে আসছেন। হঠাৎ ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে পলিটিক্যাল সর্দ্দারের মতন দু-মিনিটের দাঁড়া বক্তৃতা দেওয়া তাঁর ধাতে সয় না, এ-কথা বলা গেল। পাণ্ডাটি কিন্তু নাছোড়বান্দা—জানালা ধ'রে দাঁড়িয়ে তার তেলুগু গোদাবরী-মাহাত্ম্য শোনাতে লাগল। আমি এগিয়ে গিয়ে আমার "বৈয়ী" (অর্থাৎ বি-এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়া) সংস্কৃত নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হ'লুম—"যা ব'লতে চাচ্ছ বাপুহে, সংস্কৃতে বল, আমরা তোমার ভাষা বুঝি না—সংস্কৃত জানো না দেখ্‌ছি, তীর্থগুরু হ'তে এসেছো, সংস্কৃত জানোনা?" পাণ্ডা সংস্কৃত জানে না, খালি তেলুগু জানে, এই কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের মত অত বড় যজমান পাক্‌ড়াবার আশা নেই দেখে, আর পিছনের ছেলেদের ধাক্কাধুক্কিতে স'রে গেল। ছেলেরা এসেছিল নিজেরাই, এদের বড়োরা তেমন কিছু সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা ক'রে উঠ্‌তে পারেননি। গাড়ী ছাড়বার সময়ে "রবীন্দ্রনাথ কী জয়" আর "বন্দে মাতরম্‌" ধ্বনি উঠ্‌ল।

রাজমহেন্দ্রীর পরেই গোদাবরী নদীর প্রশস্ত হৃদয়—আর লম্বা রেলের সাঁকো। তখন সন্ধ্যা হ'ল প্রায়। মেঘের আড়ালে সূর্য্য অস্তে যাচ্ছেন। ঘোলা জল, হ'লদে বালির রঙ গোদাবরী, দূরে পাহাড়,—দৃশ্যটি চমৎকার লাগ্‌ল। গাড়ীর খোলা জান্‌লা আর দরজা দিয়ে বেশ মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া আস্‌তে লাগ্‌ল। কবির ক্লান্ত শরীরের পক্ষে এই হাওয়া বিশেষ শ্রান্তিহর হ'ল। আমি তখন তাঁরই গাড়ীতে ছিলুম—কবি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্‌লেন—"আঃ, এই হাওয়াটুকুন এসে বাঁচালে। এমনি অবসন্ন ক'রে ফেলেছিল এই গরম আর এই গাড়ীর ঝাঁকানি আর লোকের ভীড়—এখন আর কোনও কষ্ট নেই—আমার সব শ্রান্তি যেন এখন দূর হ'য়ে গেল।" দূরে অস্তগামী সূর্য্যকরোদ্ভাসিত পাহাড়ের আর গাছ-পালার দৃশ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বল্‌লেন—"দেখো হে, যাই বল, এই দেশের প্রতি স্বাভাবিক নাড়ীর টান ছাড়া এর সৌন্দর্য্যের জন্য আরও একটা টান আছে—এ দেশ ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না—মনে হয় আবার ঘুরে এসে যেন এই দেশেই জন্ম নিই।"

কবির কাছে আমাদের দেশের সম্বন্ধে তাঁর এই গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার পরিচয় বহুবার পেয়েছি—কিন্তু দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার পথে তাঁর মুখে এই কথাগুলি আন্তরিক দৃঢ়-আস্থাপূর্ণভাবে শুনে আমার মন খুবই অভিভূত হ'ল। আমিও তাঁকে ব'ললুম—"আমাদের দেশ এখন ভিতরে আর বাহিরে এই রকম হীন আর উপেক্ষিত হ'য়ে আছে। ভিতরে আমাদের এত দৈন্য, এত আত্মবিশ্বাসের অভাব, এত নীচতা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা, আত্ম-কলহ আর পরাভব। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে আমার

জা'তের পূর্ব্বকথা স্মরণ ক'রে, আর আমার জা'ত বেঁচে-ব'র্ত্তে থাকলে পিতৃপুরুষদের পুণ্যস্মৃতি অনুসরণ ক'রে আরও কত বড় কাজ ক'রে জগতের কাছে নিজের অস্তিত্বকে সার্থক ক'রতে পারত, একথা মনে ক'রে যখন এ বিষয়ে চিন্তা করি তখন স্বতঃই মনে হয়, যে যদি পুনর্জ্জন্ম সত্য হয় তা হ'লে যত হীন অবস্থায়ই দেশ পড়ুক না কেন, এই ভারতবর্ষেই ফিরে এসে যেন এই দেশকে সেবা করবার সহজ অধিকার পাই।" কবির সান্নিধ্য-লাভের যে সুযোগ আমার ঘ'টেছে, তার মধ্যে মাঝে মাঝে অনেক সময়ে তাঁর সঙ্গে এইরকম বহু বিষয়ে আমার ভাব-সাম্য এই সুযোগকে আরও কাম্য, আরও মহনীয় ক'রে তোলে।

রাত্রি নটার দিকে আমরা বেজওয়াডায় এলুম। সেখানেও লোকসমাগম। তাঁর কামরা অন্ধকার ক'রে দেওয়া ছিল, তা সত্ত্বেও লোকে খুঁজে বার ক'রলে তাঁকে। আলো জ্বালিয়ে তাঁকে দর্শন দেওয়াতে হ'ল। প্রৌঢ় বয়সের একটি তেলুগু ভদ্রলোক ইংরেজিতে বক্তৃতা সুরু ক'রে দিলেন—"আমরা শেক্স্পিয়ার প'ড়েছি, কিন্তু আপনাকে পেয়ে আর আমাদের ক্ষোভ নেই, আমরা ঢের বড়ো কবি পেয়েছি।" এদের সকলের প্রশস্তির আন্তরিকতা বুঝতে দেরী লাগে না। বেজওয়াডার পরে কবিকে আর জাগবার আবশ্যকতা থেকে মুক্ত করবার জন্য তাঁর কামরার দরজা বন্ধ ক'রে ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দেওয়া হ'ল, আমরাও আমাদের গাড়ীতে এসে শোবার ব্যবস্থা কর্‌লুম। সমস্ত পথে জিজ্ঞাসু লোকদের সঙ্গে কিছু কিছু ব'কতে হ'য়েছিল—যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে যাচ্ছেন কেন, "বৃহত্তর ভারত"-এর সঙ্গে আমাদের দেশের যোগ, বিশ্ব-ভারতীর উদ্দেশ্য কি, কেমন চ'ল্‌ছে বিশ্বভারতীর কাজ —ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৪ই তারিখের ভোরে খবর নিলুম—দুরাতের গাড়ীর ভীষণ ঝাঁকানিতে, গরমে, পরিশ্রমে, অনিদ্রায় কবির শরীর বড়ই খারাপ—অত্যন্ত অসুস্থ আর দুর্ব্বল অনুভব ক'রছেন। তাঁর এই সাতষট্টি বছর বয়সেও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমের শক্তি রাখেন, সহজে কাতর হন না; কিন্তু আমাদের একটু আশঙ্কা হ'ল। মান্দ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে এসে পৌছুলুম। প্লাটফর্মে বিস্তর লোকের ভীড়—ছাত্র আর খবরের কাগজের লোক আর অন্য বিশিষ্ট ভদ্রলোক কতজন। মান্দ্রাজ শহরে সাধারণতঃ কবি যাঁর আতিথ্য স্বীকার ক'রে থাকেন সেই শ্রীযুক্ত টী, ভী, রামস্বামী মহাশয় তাঁর মোটর নিয়ে এসেছিলেন। কবিকে ট্রেণ থেকে কোনও মতে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে তাতে চড়ানো গেল। এরি মধ্যে তাঁকে মাল্য-বিভূষিত ক'রলে আর সিনেমায় ছবি তুললে। আমরা মালপত্রের ব্যবস্থা ক'রবার জন্য ষ্টেশনে র'য়ে গেলুম। আমাদের সাহায্য ক'রতে লাগলেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুন্‌হনরাজা; ইনি শান্তিনিকেতনে কিছুকাল গবেষক-ছাত্র আর শিক্ষক হিসাবে বাস ক'রেছিলেন; এখন আডিয়ার থিওসফিকাল সোসাইটীর পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ,—আর শ্রীযুক্ত অয়্যস্বামী, ইনি শান্তিনিকেতন গ্রন্থালয়ের পুঁথিশালার কার্য্যে ছিলেন। প্রেসের রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা কইতে হ'ল। আর যে ফরাসী কোম্পানীর জাহাজে আমরা যাব সেই মেসাঝ্যার মারিতীম (Messageries Martines) কোম্পানির তরফ থেকে তাঁদের মান্দ্রাজের আফিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এ রাজরত্নম্ পিলৈ ব'লে একটি তামিল ভদ্রলোক এলেন। কবিকে তাঁর আপিসের তরফ থেকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এসেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে কবির প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তি মিশ্রিত হওয়ায় আপিসের কাজ যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সেবার আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, তার কতকগুলি অন্তরঙ্গ পরিচয় পরে পেলুম। এঁর হাতে বড়ো বড়ো বাক্‌স পেটরাগুলি তুলে দিয়ে, আমরা তিন জনে—সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি, শ্রীযুক্ত কুন্‌হনরাজা আর অয়্যস্বামীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত রামস্বামীর আর-একখানি মোটরে ক'রে তাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হ'লুম।

মান্দ্রাজে আমার এই প্রথম আগমন। মৈলাপুরে শ্রীযুক্ত রামস্বামীর বাড়ী,—এটা যেন মান্দ্রাজের বালীগঞ্জ। ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালায় ঘেরা বাগান আর হাতার মধ্যে সব অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী। মান্দ্রাজকে বেশ একটি পরিষ্কার শহর ব'লে মনে হ'ল। মাত্র ঘণ্টা কয়েকের অবস্থান। বেশী কিছু অবশ্য দেখা হয়নি। পাহারা-ওয়ালারা সব খাকী পোষাক পরা। তামিল পাহারাওয়ালা,

মাথায় সোনার বড়ো টুপী, কারুর কানে মাদ্রাজী কানফুল, কেউ বা তিলক-ধারণ ক'রেছে—সোলা-হ্যাটের নীচে এগুলি অদ্ভুত দেখালেও মোটের উপর এদের বেশ চটপটে হুঁশিয়ার ব'লে বোধ হ'ল।

শ্রীযুক্ত রামস্বামী মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন প্রথিত-নামা উকিল। ভদ্রলোকের স্বল্প পরিচয় পেয়ে বড়ো প্রীত হ'লুম আমরা। অতি মৃদুভাষী লোক, মোটেই নিজেকে কবির সামনে জাহির ক'রতে চান না, অথচ সর্ব্বদাই তাঁর অতিথিদের সেবার জন্য হাজির। কবির সঙ্গে নানান রকমের লোক সদা সর্ব্বদা দেখা ক'রতে আসছে—ইনি বিশেষ সঙ্কুচিত—এদিকে কবিকে বিরক্ত যাতে না করা হয় আবার ওদিকে দর্শনার্থী লোকেরা যাতে মনে না করে যে কবি তাঁর অতিথি ব'লে তিনি কবির সঙ্গে একত্র অবস্থিতির সুযোগ পেয়ে তাঁকে একান্ত অধিকার ক'রে আছেন। আমরা ভালো দিনেই শ্রীযুক্ত রামস্বামীর অতিথি হ'য়েছিলুম। তাঁর বাড়ীতে এক বিবাহ-উৎসব ছিল, তাঁর এক পিস্তুতো ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে। বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে তিন দিন পূর্ব্বে; বৃহস্পতিবার যেদিন সকালে আমরা পৌঁছুলুম সেটী হ'চ্ছে বিবাহ-উৎসবের চতুর্থ এবং শেষ দিন—চার দিন ধ'রে আমোদ অনুষ্ঠান, কুটুম্ব ভোজন ইত্যাদি চলে।

একটু বিশ্রাম ক'রে, আমাদের কার্য্য ঠিক ক'রে নিলুম। কবিকে সুস্থভাবে বিশ্রাম ক'রতে দেখে আমরা ঠিক ক'রলুম যে, কাছেই কপালেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে, প্রায় ৩।৪ শ' বছরের পুরাতন মন্দির, সেইটীই দেখে আসা যাবে। নীচে নেমে, তামিল ব্রাহ্মণদের বিয়ের একটী অনুষ্ঠান দেখার অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটল। বিয়ে-বাড়ী, সদরের ফটকে নহবৎখানা তৈরী হ'য়েছে; ফটকের দু-পাশে কলার কাঁদিওয়ালা দুটি কলাগাছ, আমপাতা দিয়ে তোরণ রচনা হ'য়েছে। প্রশস্ত হাতার মধ্যে সামিয়ানা টাঙিয়ে কালো বাঁকা কাঠের চেয়ার দিয়ে অতিথিদের বসবার জন্য সভামণ্ডপ তৈরী র'য়েছে। এই সভামণ্ডপের মধ্যে বাড়ীর বারান্দার সামনে সালকাঠের দুই থামের উপর আড়কাঠ থেকে মোটা লোহার শিকলে ক'রে এক রঙান পদ্ম-আঁকা কাঠের পিঁড়ির দোলনা টাঙানো হ'চ্ছে। শুনলুম যে বর-কনেকে এই দোলনায় বসিয়ে দোলানো হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটী অতি সুন্দর স্ত্রী-আচার হবে —ক'নের সখী-সম্পর্কীয়ারা গান গাইবে। তেলুগু কানারী তামিল মালয়ালীদের মধ্যে মেয়েদের অবরোধ-প্রথা নেই। দক্ষিণ ভারতে এটী সব-চেয়ে বেশী ক'রে আমাদের চোখে লাগে—মেয়েরা দিব্যি উন্নত মস্তকে স্বাভাবিক ভাবে চলা-ফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে। তাদের দেখে মনে হয় যে, তারা জানে যে, তাদের উপযুক্ত সম্মান স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় পুরুষদের কাছ থেকে তারা পাবেই। এটা দেখে—যে-দেশ বহুস্থলে বর্ব্বর ধর্ম্মান্ধতার দ্বারা অনুমোদিত নারী-নিগ্রহের আধিক্যহেতু সভ্য নামের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার অবস্থায় এসেছে, বিশেষ ক'রে সেই বাংলা দেশ থেকে এসে মনে বিশেষ বিস্ময়-পুলকের সঞ্চার করে। বাইরে বর ক'নের দোলবার দোলার আশেপাশে চেয়ারে কবি-দর্শনেচ্ছু অনেক অনিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ব'সে আছেন। যখন দেখলুম যে তাদের থাকা সত্ত্বেও এই দোলার অনুষ্ঠানটী হবে, তখন আমরা বাড়ীর একটী ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম যে, আমরাও অনুষ্ঠানটি দেখতে পারি কি না। ছেলেটীর চমৎকার বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত মুখ—তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে এরকম উজ্জ্বল-সুন্দর মূর্ত্তি খুবই দেখতে পাওয়া যায়। সে বল্লে—"নিশ্চয়ই—এদেশে গোশা (অর্থাৎ পরদা) নেই।" ইতিমধ্যে বরটীকে দেখলুম। আঠারো উনিশ বছরের ছেলে, সুন্দর মুখশ্রী, ধনীর ঘরের ছেলে, বি-এ পড়ছে। লুঙ্গীর মতন ক'রে একখানা জরীপাড় সাদা মাদ্রাজী ধুতি পরা, গায়ে একটা টুইল শার্ট, দুহাতে নিরেট সোনার মোটা পাত কেটে তৈরী বালা, গলায় সোনার হার, মাথাটি উড়ে-কামানো; ঝুঁটি ক'রে খোঁপার আকারে চুল বাঁধা, তাতে একছড়া বেলফুলের মালা জড়ানো আছে। একপাল ছোটো-ছোটো মেয়ে আর ছেলে—এরা তার শালী আর শালা হবে, তাকে নিয়ে টানাটানি ক'রছে, আর সলজ্জ হাস্যের সঙ্গে বর তাদের চিরন্তন অধিকার এই উৎপাত উপদ্রব সহ্য ক'রছে। ঠিক বাঙলা দেশেরই মতন। আমরা চেয়ারে ব'সলুম, এমন সময়ে কটি ছেলে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সমস্ত লোকের সামনে একটা থালায় ক'রে কয়েক গোছা আস্ত পান,

কাটা সুপুরী, জাফরান-দেওয়া চিকি সুপুরীর কুঁচি, আর চুন নিয়ে এল—অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্য। সকলে এক এক গোছা পান তুলে নিলেন, চূণ দিয়ে সুপুরী দিয়ে পানের বিড়া তৈরী ক'রে খেতে লাগলেন। এইই হ'চ্ছে রীতি। আর একজন একটা থালায় ক'রে কতকগুলি ছোবড়া বাদ আস্ত ঝুনো না'রকল নিয়ে এল, সকলে এক একটি ক'রে নিলে। আর একজন একটা বড়ো রূপোর বাটিতে ক'রে খানিকটা জাফরান মিশানো গোলা চন্দন নিয়ে এল—অভ্যাগতেরা হাতে ক'রে একটু একটু তুলে নিয়ে কপালে আর খালি গা যাদের তারা গায়েও মাখলে। ইতিমধ্যে মেয়েরা বারান্দায় ব'সে গান আরম্ভ করলেন, আর বরের শালীরা কনেকে এনে বরের পাশে দোলার পিঁড়িতে বসিয়ে দিলে। তাদের নির্দ্দেশ মত বর একটি মালা নিজে প'রলে, একটি মালা ক'নের গলায় পরিয়ে' দিলে। দক্ষিণের মেয়েরা কেউ মাথায় ঘোমটা দেয় না—তাই ক'নেটিকে ভালো ক'রে দেখতে পেলুম। দশ এগারো বছরের পাতলা গড়নের মেয়ে, বেশ সুন্দরী, পরণে লাল আর হ'লদে রেশমের চওড়া-জরী-আঁচলা এক সাড়ী, গায়ে প্রচুর গয়না, পিঠে বেণী দুল্‌ছে, মাথায় প্রাচীন ঢঙের অতি সুন্দর একটি গয়না—ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে ব'সে হাস্‌তে লাগল। বাড়ীর মেয়েরা যত আত্মীয়া আর নিমন্ত্রিতা, আমাদের সাম্‌নে অসঙ্কোচে গান ক'র্‌তে লাগলেন,—যেন আত্মীয়দের সামনেই। মেয়েদের চলা-ফেরার প্রতি ভঙ্গিতে মনে হ'ল যে, এঁরা সকলের কাছ থেকেই সসম্ভ্রম ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত। শুনলুম গান হচ্ছিল রামলীলা আর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। সুরেন-বাবুর ক্যামেরা ছিল সঙ্গে, বর-কনের ছবি তুল্‌তে চাওয়ায় তখনি বাড়ীর লোকেরা রাজী হ'লেন; আর একটি মেয়েকে ব'লতেই সে ছুটে গিয়ে ক'নের গয়না আরও খানকতক—বিশেষ ক'রে সাবেক ধরণের নাকের গয়না একখানি—নিয়ে এসে পরিয়ে দিলে। সুরেন-বাবু দু'তিনখানা ছবি তুললেন।

এদিকে মেয়েরা দু'চার জনে মিলে প্রচলিত বিয়ের গান ক'রছেন—এই গান ঠিক গান নয়, যেন সুর ক'রে ক'রে ছড়া বা কবিতা পড়ার মতন ব'লে বোধ হ'ল—এমন সময়ে একটি নব-যুবক—বাড়ীর এক জামাই হ'তে পারে—আমাদের জিজ্ঞাসা ক'রলে, "আপনারা অন্ধ্র গান শুন্‌বেন? কর্ণাটী বা দক্ষিণী ধরণের গান শুন্‌বেন, না হিন্দুস্থানী বা উত্তর ভারতীয় পদ্ধতির?" কর্ণাটীই শুন্‌লে খুসী হবো, ব'ল্‌তে এই ছোকরা মেয়েদের মধ্যে গিয়ে ক'লকাতার অতিথিদের জন্যে গান ক'র্‌তে কাকে



"আহ্লাদী"
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত

অনুরোধ ক'র্‌লে। তখন তরুণীদের মধ্যে একজন হারমোনিয়ম নিয়ে বেশ শিক্ষিত আর মিষ্টি গলায় আলাপ ক'রে গান ক'র্‌লেন। কে গাইলেন তা একটা থামের আড়াল থেকে আমরা ঠিক দেখ্‌তে পে'লুম না, আর বলা বাহুল্য আমরা দেখবার জন্য চেষ্টা করাটা উচিত মনে ক'র্‌লুম না। তারপর দুটি পাঁচ ছয় বছর বয়সের ছোটো ছোটো মেয়ে, পরণে তাদের উত্তর ভারতের লহঙ্গার মতন ঘাগ্‌রা, তার উপরে পাঞ্জাবী মেয়েদের ধরণের

কোর্ত্তা আর কোমরে ভারী সোনার পাতায় তৈরী কোমরবন্ধ, তার মাঝে দুই পাশে দুই হাতীতে কুম্ভে ক'রে মাথায় জল ঢাল্‌ছে এই রকম লক্ষ্মীমূর্ত্তি খোদাই করা, তারা একটা ছোটো গান আমাদের শোনালে। এইরূপে কবির সঙ্গীদের বিশেষভাবে সৌজন্য দেখানো হ'ল। সমস্ত জিনিষটি এমনি সহজভাবে হ'ল যে কি আর ব'ল্‌বো। ভারী হৃদ্য আর মনোজ্ঞ লাগ্‌ল এঁদের এই আতিথ্য।

তামিল রসুনচৌকীর দলে একটি ছোক্‌রা সানাই বাজাচ্ছিল, খালি গায়ে সোনার হার আর বালা পরা। কালো রঙের উপরে এই সোনার রেখায় তার সুশ্রী মুখ নিয়ে ছোকরাকে ভারী নয়নাভিরাম দেখাচ্ছিল;—এই বাজনার দলের ছবিও নেওয়া হ'ল। এইরূপে মাদ্রাজে পৌঁছে প্রথম দিনেই এই চমৎকার কবিত্বপূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠানটি দেখে পরম পরিতোষ লাভ করা গেল। যে সব জিনিস আমরা এখন প্রাচীন ভারতের কল্পলোকে ফেলে কাব্যরসাস্বাদের কোঠায় রেখে দিয়েছি, আমাদের বাঙালী হিন্দুর ব্যবহারিক জীবনে যে-সমস্ত সুন্দর শোভন রীতি লোপ পেয়েছে, রক্ষণশীল তামিলদের মধ্যে সেগুলি কত সহজ, কত অবলীলভাবে এখনও বিদ্যমান। Tradition বা চিরাচরিত রীতি ধ'রে চ'লে আসছে এইসব মনোহর কবিত্ব-মাখা অনুষ্ঠান; তাই উৎসবের সহজ ও স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে এর মধ্যেকার সরলতাটুকু ঠিক র'য়ে গিয়েছে। প্রাচীনের সঙ্গে এই সূত্র ছিঁড়ে ফেলার পরে যদি আমরা এখন এই জিনিসটির পুনরানয়ন কর্‌বার চেষ্টা করি,—যে বর-ক'নেকে দোলায় বসিয়ে দোল খাওয়ানো হবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মেয়েদের দিয়ে বিবাহের মাঙ্গলিক গীতি গাওয়া চ'ল্‌বে—তা হ'লে বহু স্থলে এটা কত-না "আধুনিক" আর বিসদৃশ ঠেক্‌বে—এর সারল্যের বদলে একটা সচেতন কৃত্রিমতা এসে জিনিসটিকে একেবারে অন্যরকম ক'রে তুল্‌বে। বাঙালী হিন্দুর ঘরে প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে মাঙ্গলিক গীতি গিয়েছে, নাচ গিয়েছে—মেয়েদের মধ্যে সখী-পরিবৃত হ'য়ে দোলায় চড়ার পাটও নেই। শুনলুম মাদ্রাজে সমস্ত ভদ্রঘরে এই দোলন-পিঁড়ির ব্যবস্থা আছে—মেয়েরা দেখা-সাক্ষাৎ কর্‌তে এলে আবশ্যক মতন এই দোলা টাঙানো হয়, ধীরে ধীরে দুল্‌তে দুল্‌তে তাঁরা কথাবার্ত্তা রহস্যালাপ কাজকর্ম্ম ক'রে থাকেন। এইরূপ দোলার ব্যবহার উত্তরভারতে কোথাও কোথাও এখনও আছে, গুজরাটে আছে, মহারাষ্ট্রেও আছে। বাঙলা দেশের মেয়েরা এই আনন্দ-রস থেকে এখন একেবারে বঞ্চিত। আমাদের ভাগ্যে তামিল জীবনের সঙ্গে প্রথম শুভ-পরিচয় এইরূপে ঘ'ট্‌ল, বর-কনের দোলায় চড়া দেখে।

তারপর আমরা কপালেশ্বরের মন্দির দেখে এলুম। প্রকাণ্ড এক "টেপ্পকুলম্" বা মন্দিরের সাম্‌নেকার পুষ্করিণী—চারদিকে লম্বা অনেকগুলি ক'রে ধাপ, এত লম্বা সোজা-সোজা রেখার সমাবেশ চোখকে যেন পীড়া দেয়। সাধারণ যেমন গোপুরম্-যুক্ত দ্রাবিড়রীতির মন্দির হয়, মন্দিরটি তেমনি। পাথরের কাজগুলি মন্দ নয়—চলনসই রকমের প্রাচীনকালের পাথরের মূর্ত্তির উপর হালে বালি-চূণকাম করে আর রং দিয়ে সেগুলিকে সুন্দর থেকে কিম্ভূত, এমন কি বর্ব্বর ক'রে ফেলা হ'য়েছে। শিবের মন্দির; ভিতরে লিঙ্গমূর্ত্তি, তার সাম্‌নে বৃষ নন্দীর মূর্ত্তি। নন্দীর পিছনে দু'হাত আন্দাজ উঁচু দুই হাতে মস্ত প্রদীপ ধ'রে র'য়েছে এক চমৎকার পুরুষমূর্ত্তি, পিতলের। মন্দির প্রদক্ষিণ কর্‌বার সময়ে দেখলুম ছোটোখাটো পার্শ্বের মন্দিরের মধ্যে বড়ো বড়ো সব পিতলের মূর্ত্তি,—ময়ূরে-চড়া কার্ত্তিকেয় দক্ষিণ মূর্ত্তি শিব, পার্ব্বতী, আর ১০৮ শৈব ভক্তদের সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি,—দু'সেট—একটি পিতলের, আর একটি পাথরের। দক্ষিণে দেবতার ভক্তি এখনও পুরোপুরি বিদ্যমান—মন্দিরে আগত পূজার্থীদের মুখ দেখলেই সে কথা বোঝা যায়। বড় মন্দিরের আঙিনার মধ্যেই আলাদা মন্দিরে দেবীর মূর্ত্তি; দূর থেকে দেখা গেল, চমৎকার কালো পাথরে কাটা মানুষের আকারের একটি প্রমাণ মূর্ত্তি। মুখখানি আর হাতগুলি ছাড়া কাপড় পরানো ব'লে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। দেবীর বাহন সিংহ সাম্‌নে আছে, আর সিংহের পিছনে শিবের মন্দিরের দীপধারী পুরুষের অনুরূপ দীপধারিণী নারীর অপূর্ব্ব এক পিতল-মূর্ত্তি। দ্রাবিড়দেশে এইরকম

দীপধারিণীর মূর্ত্তি খুবই সাধারণ—কিন্তু এই বড়ো মূর্ত্তিটা দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল।

মৈলাপুরের নাম এসেছে একটি ময়ূরের থেকে—তামিলে ময়ূরকে "ময়িল" বলে। বহু পূর্ব্বে নাকি এখানে একটা গাছের তলায় এক ময়ূর একটী শিবলিঙ্গের সেবা ক'রত, তাই থেকে এই জায়গার এই নাম। বিশ্বাস করাবার জন্য মন্দিরের ভিতরে আঙিনায় এখনও "ক্ষীরফল" জাতীয় একটা গাছ আছে,—এই গাছের তলায় শিবলিঙ্গটী ছিল। এখন শিবলিঙ্গটীকে আর পাথরের একটা ময়ূর-মূর্ত্তিকে পাশে একটা ছোট মন্দির তুলে তার ভিতরে রাখা হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত রামস্বামীর বাড়ীর যে দুটি ছেলে মন্দির দেখাবার জন্য আমাদের সঙ্গে এসেছিল এই ময়ূর-পুরাণ তারা বুঝিয়ে দিলে।

মন্দির দেখে শ্রীযুক্ত রামস্বামীর বাড়ীতে ফিরলুম। স্নান সেরে আহারে বসা গেল। আমাদের গৃহস্বামী নিষ্ঠাবান তামিল ব্রাহ্মণঘরের কর্ত্তা; তাহ'লেও তিনিও তাঁর অতিথিদের সঙ্গে ব'সে গেলেন। ভোজনটাতে ইঙ্গ-ভারতীয় আর দ্রাবিড়ী রান্নার অপূর্ব্ব মিশ্রন ছিল। শ্রীযুক্ত রামস্বামীর খানসামা মাছের আর মাংসের দু' তিনটি জিনিস তৈরী ক'রেছিল। বলা বাহুল্য, গৃহস্বামী এ জিনিসগুলি স্পর্শও করেননি। তারপর তাঁর আত্মীয় একটি ছোক্‌রা আমাদের ভাত আর মাদ্রাজী তরকারী পরিবেষণ ক'রলে—দালে টক-ঝাল দেওয়া যূষ, যাকে "রসম্" বলে—আর টক আর নানারকম মশলা দেওয়া একটা বেশ মুখরোচক দাল। তিন চার রকমের ভাজী, পাঁপর, কলাইয়ের দালের বড়া, দই, ঘোল, একরকম মিষ্টি দালপুরী যেটা নাকি বিয়ের ভোজের এক অবশ্য কর্ত্তব্য অঙ্গ, আর মেঠাই—এই সব দিলে। কবির শরীর অসুস্থ ছিল, তিনি খালি একটু দই দিয়ে দুটী ভাত খেলেন।

নীচে কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে বিস্তর লোক এসেছে। তাঁর দুদিন অনিদ্রার পর একটু বিশ্রাম দরকার। বোলপুরের ভূতপূর্ব্ব একটি ছাত্রের ভাই এসে দেখা ক'রলে। মালয়ালী জাতীয়, বাঙলাদেশে কখনও "না আসিয়া বেশ ভাল বাঙ্গালা বলিতে শিখিয়াছে;" খুব বুদ্ধিমান ছেলে, এই ষোল সতের বছর বয়সেই এখন বি-এ প'ড়ছে। একটি মুসলমান যুবক এসে কবির হস্তাক্ষর নিয়ে গেল, দূর থেকে তাঁকে দেখে অভিবাদন ক'রে গেল। বিকালে জাহাজে উঠ্‌তে হবে, সেখানে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে, এই কথা শুনে বাকী সকলে চ'লে গেল। ইতিমধ্যে জাহাজ কোম্পানীর শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্



জাহাজে ফরাসী যাত্রী
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত

পিল্লৈ মহাশয় এলেন। তিনি ব'ল্লেন যে, তাঁদের কোম্পানীর বড় কর্ত্তা মসিও কোদিয়্যার্ (M. Caudiere) কলম্বোর হেড্-আপিস থেকে এসেছেন। তিনি, আর মাদ্রাজের আপিসের কর্ত্তা মসিও ঝোবার্ (M. Jobard), আর জাহাজের কাপ্তেন, সাড়ে চারটের সময়ে কবিকে জাহাজে সংবর্দ্ধনা ক'রে গ্রহণ ক'র্‌বেন। আমাদের প্রথম শ্রেণীর টিকিট, কিন্তু জাহাজ

কোম্পানী বিশেষ ক'রে প্রথম শ্রেণীর উপরে Cabine de luxe (কাবিন-দ্যো-লুক্‌স্) এ কবির থাকবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাঁরা সকলেই কবির আগমনে আনন্দিত—ব্যক্তিগতভাবে আর কোম্পানীর তরফ থেকে তাঁরা কবিকে অভ্যর্থনা ক'রতে চান। জাহাজে উঠে, প্রথম শ্রেণীর পাঠাগারে কবি তাঁর প্রত্যুদ্‌গমনের জন্যে আগত সহরের সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে যাতে ব'সে আলাপ ক'রতে পারেন, তার ব্যবস্থাও হ'য়েছে। জাহাজ থেকে কোম্পানী এই অভ্যাগতদের স্বাগতের জন্য সরবৎ আর বরফের ব্যবস্থা করেছেন।

চারটের সময় কবির রওনা হবার কথা স্থির ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মোটরচালক আস্‌তে দেরী ক'রেছে দেখে আমাদের গৃহস্বামী স্বয়ং তাঁর মোটরে আমাদের নিয়ে বেরুলেন—অশেষ তাঁর সৌজন্য। কিন্তু পথে তাঁর এক আত্মীয়ের গাড়ী পাওয়ায় তিনি আমাদের তাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কবির কাছে ফিরে যেতে পারলেন। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে তিনি বর ক'নেকে কবির কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে প্রণাম করালেন, কবি এদের আশীর্ব্বাদ ক'রলেন। বাড়ীর লোকেরা মেয়ে পুরুষে সকলে তাঁকে প্রণাম ক'রলে। তিনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রলেন।

মাদ্রাজের দক্ষিণ ভারতের শিল্প ও কারুকার্য্যের নিদর্শনের সরকারী সংগ্রহভাণ্ডারটি দেখলুম। সেখানে বিক্রীর জন্য রাখা দুচারটি পিতলের নোতুন আর পুরানো জিনিষ কেনা গেল। সুরেন-বাবু শান্তিনিকেতন কলা-ভবনের জন্যও কিছু নিলেন। তারপর মিউজিয়াম দেখে আসা গেল। মিউজিয়মে বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস হ'চ্ছে অমরাবতীর স্তূপের ধ্বংসাবশেষ গুটিকতক পাথরে কাটা খোদাই চিত্র, আর প্রাচীন পল্লবযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে এখনকার কাল পর্য্যন্ত কতকগুলি প্রস্তর-মূর্ত্তি। এর মধ্যে দূর থেকে তোরণের ফ্রেমে যেন বাঁধা একটী মানুষের আকারের চেয়ে কিছু বড় পুরাতন বিষ্ণুমূর্ত্তি ; এটি পল্লব আমলের হবে—অপূর্ব্ব বিরাট-দর্শন ! বিষ্ণুর এই মহনীয় পরিকল্পনা দেখে প্রসন্ন ভাবে মন যেন ভ'রে গেল। আর দেখবার জিনিস হচ্ছে এখানকার ব্রঞ্জ আর পিতলের মূর্ত্তির সংগ্রহ। কতকগুলি অতি সুন্দর নটরাজমূর্ত্তি, যেগুলির সঙ্গে ছবির মারফৎ আমাদের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল—সেগুলি দেখলুম ; আর সেইরকম অন্য অন্য ছোট বড় অনেক মূর্ত্তি, আর তা ছাড়া বিস্তর অন্যান্য পিতলের জিনিস।

ছবির সংগ্রহ সামান্য কিছু এই মিউজিয়মে আছে ; রবিবর্ম্মার ভাই রাজবর্ম্মার আঁকা দু-একটি মালয়ালী ঘরোয়া ব্যাপারের ছবি—সাধারণ ইউরোপীয় ঢঙে আঁকা genre বা ঘরগৃহস্থালীর ছবি হিসাবে মন্দ নয়। কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার লাগ্‌ল একখানি পুরাতন দ্রাবিড়ী পট। ঠিক যেন একখানি রাজপুত যুগের আদি কালের (primitive) ছবি ! একই পটে কতকগুলি বৃন্দাবন-লীলা আঁকা—শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলা প্রভৃতি। লাল জমীর উপর কী স্থির হাতে পাকা ওস্তাদের শক্তির সঙ্গে মানুষের গাছ-পালার আদ্‌রার সলীল সতেজ রেখাপাত—কী চমৎকার গাছপালা আর ফুলপাতা আঁকার ভঙ্গী ! সবশুদ্ধ জড়িয়ে ছবিটির মধ্যে কি একটী যে ভাবশুদ্ধ আন্তরিকতায় পূর্ণ সরল সচল মাধুর্য্য ছিল তা আর কি বল্‌বো। এই ছবির একখানা আলোকচিত্র পেলে কত আনন্দই হ'ত !

মিউজিয়ম থেকে সরকারী শিল্প ও কারু বিদ্যালয়ে গেলুম, সেখানেও কতকগুলি সুন্দর জিনিসের সমাবেশ দেখা গেল ; দক্ষিণী হাতের কাজ নিয়ে বেশ খাসা আর একটী ছোট মিউজিয়ম তৈরী হ'য়েছে। কতকগুলি ছোটো ছোটো দীপধারিণী নারীমূর্ত্তি বড়ো সুন্দর ব'লে বোধ হ'ল।

এই ইস্কুলের সংগ্রহশালা দেখে, এর সহকারী প্রধান কর্ম্মচারী রাও সাহেব শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ মুদালিয়ার মহাশয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে, আমরা জাহাজমুখো হ'লুম। জাহাজে যখন পৌঁছুলুম, তখন চারটে। এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে মাদ্রাজে মিউজিয়ম প্রভৃতি, যা নিয়ে আমাদের কৌতূহল তা মোটামুটি দেখে নেওয়া গেল। এটা অবশ্য শ্রীযুক্ত রামস্বামী মহাশয়ের অনুগ্রহেই সম্ভব হ'য়েছিল।

জাহাজে গিয়ে দেখি আমাদের মালপত্র সব এসে গিয়েছে। কবির অনুগত ভৃত্য বনমালী তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় নীচে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্ পিলৈ মহাশয় আমাদের অপেক্ষায় আছেন। তিনি কবির জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনে আমাদের নিয়ে গেলেন। দেখলুম তাঁর বস্‌বার ঘরে একরাশ পদ্মফুল দেওয়া হ'য়েছে। এটি শ্রীযুক্ত রাজরত্নম পিলৈ মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে। কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের এই সুন্দর উপায়টি দেখে তাঁকে সাধুবাদ দিলুম।

শ্রীযুক্ত রাজরত্নম, মসিও ঝোবারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, আর জাহাজের কর্ম্মাদা বা কাপ্তেন M. Gabrillargues (মসিও গাব্রিয়ার্গ্)এর সঙ্গে। ঝোবারের সঙ্গে আর কাপ্তেনের সঙ্গে ফরাসীতে আলাপ ক'রলুম। এঁরা যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ ক'রলেন। এদিকে নীচে ডকের উপর কবির বিদায় দেখতে অনেকগুলি লোক এসে জড়ো হ'য়েছে। ঠিক সাড়ে চারটেয় কবিকে নিয়ে শ্রীযুক্ত রামস্বামী মোটরে ক'রে এলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আর একটু পরে মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন জজ সস্ত্রীক, আর মাদ্রাজের বোধ হয় অ্যাডভোকেট জেনেরাল, আরও কতকগুলি বিশিষ্ট লোক এলেন, আর কতকগুলি তামিল মহিলা। জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তেই মসিও ঝোবার আর মসিও কোদিয়্যার কবিকে স্বাগত ক'রলেন, কাপ্তেনের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন আর কবিকে আর তাঁর সঙ্গের অভ্যাগতদের জাহাজের প্রথম শ্রেণীর বসবার ঘরে এনে বসিয়ে দিয়ে বাইরে গেলেন, যাতে কবি এঁদের সঙ্গে অসঙ্কোচে আলাপ ক'রতে পারেন। এ জাহাজের সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে ভালো ঘরটি কবির খাস ব্যবহারের জন্য দেওয়া হ'ল, আর জাহাজ থেকে বরফ সরবৎ বিতরণ হ'ল অভ্যাগতদের মধ্যে। ফরাসী জাহাজওয়ালা কোম্পানী এইভাবে জগদ্বরেণ্য বিশ্বকবির সমাদর ক'রলেন। ইটালীয়ান, জাপানী আর অন্য জাতের জাহাজে সর্ব্বত্রই কবিকে এই রকম ক'রে সম্মান দেখিয়ে কবির হ'য়ে তাঁর বন্ধুদের আতিথ্য-সৎকারের ভার নিয়ে তারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছে। এইরূপ শ্রদ্ধা একটা বড়ো জাতেরই লক্ষণ ব'লে মনে হয়।

জাহাজ ছাড়তে পাঁচ মিনিট বাকী, বাইরে ডেকে এসে একটা গ্রুপ ফোটো তোলা হ'ল—কবিকে মাঝখানে রেখে' জাহাজ-কোম্পানীর সাহেবেরা, আর কবির প্রত্যুদ্‌গমনকারীরা দাঁড়ালেন। তারপরে অভ্যাগতেরা একে একে নেমে গেলেন, আমাদের বনমালী নীচে থেকে কবিকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। সিঁড়ি তোলে তোলে, এমন সময়ে আর একজন ভদ্রলোক মাথায় নীল রেশমের বাঁধা পাগড়ি, সৌম্যমূর্ত্তি, সাদাসিধে পোষাক, উপরে ডেকে এসে কবির দুহাত ধ'রে আলাপ ক'রলেন। ইংরেজীতে "আপনি ভারতের আত্মার প্রতীক, আমাদের গর্ব্বস্থল, দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তা আপনি বাহিরের জগৎকে দান ক'রছেন—ইত্যাদি" প্রশস্তি ব'লতে লাগলেন। ইনি মাদ্রাজের ছোট একটী দেশী রাজ্য পানাগলএর রাজা। ইনিও নেমে গেলেন, আর জাহাজের সিঁড়ি তুল্‌তে আরম্ভ করলে।

নঙ্গর তুল্‌তে, আর জাহাজঘাটা থেকে জাহাজ ছাড়তে আরও আধঘণ্টা লাগ্‌ল। বন্ধুরা সকলেই প্রায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষে জাহাজ চ'ল্‌ল। মাদ্রাজের হাইকোর্ট আর অন্য অন্য বাড়ীর চূড়ো ক্রমে দূর থেকে ভালো ক'রে দেখা যেতে লাগ্‌ল। আমরা মাদ্রাজ বন্দরের পাথরে গাঁথা পোস্তার বাইরে এসে পড়লুম। সিঙ্গাপুর-মুখো হ'য়ে জাহাজ চল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। আমরা সত্যিসত্যিই দ্বীপময় ভারত (Island India) আর ভারতচীনের (Indo-China) দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

রাজরোষ

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১

অপরাহ্ণকালে প্রয়াগ-সঙ্গমে বালুকাতটে বসিয়া প্রশান্ত-ললাট নিগ্রন্থ নাথপুত্র* শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ও দুই পার্শ্বে পঞ্চাশ জন শিষ্য বসিয়া নীরবে, অবহিত চিত্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। কয়েক জন গৃহস্থও উপস্থিত ছিলেন।

গুরু কহিতেছিলেন, 'গ্রন্থি ইহ-সংসারে বন্ধন। অনেক প্রকার জটিল গ্রন্থিতে মানুষের স্বভাব আবদ্ধ, চিত্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে না। এইসকল গ্রন্থি মোচন করিতে হইলে আয়াস ও সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু তাহা ব্যতিরেকে মুক্তির উপায় নাই। যাহার চরণে শৃঙ্খল বদ্ধ সে অনায়াসে পথ পর্য্যটন করিতে পারে না। এই ভার বহন করিয়া জীবনের দীর্ঘ পথ কেমন করিয়া অতিবাহিত করিবে? সংযম অভ্যাস কর—বাক্যে সংযম, চিত্তে সংযম, আহার-বিহারে সংযম। বাক্য শাণিত অস্ত্রের ন্যায়, সংযম না করিলে অপরের মর্ম্মে আঘাত করে। চিত্ত চঞ্চল অশ্বের ন্যায়, বল্গা সংযত না করিলে অপথে-কুপথে ধাবিত হইবে। আহারের জন্য ধরণী নানা সামগ্রী দান করে, অপর ভক্ষ্যের কি প্রয়োজন? মানুষ কি ব্যাঘ্র যে মাংস ভোজন করিবে? আর বিহার? সাধু-সঙ্গই বিহার।'

একজন গৃহস্থ প্রশ্ন করিল, 'প্রভু, যাহারা সংসারে লিপ্ত, গৃহস্থ-আশ্রমে রহিয়াছে তাহাদের প্রতি কি আদেশ?'

'গৃহাশ্রমে ত সকলেই রহিয়াছে, কয়জন গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারে? গৃহস্থের পক্ষেও যথাসাধ্য সংযম ব্যবস্থা। সংযম ত্যাগ করিলেই সমূহ বিপদ। এই যে সংসার, ইহা পর্ব্বতের পার্শ্বের ন্যায়, অত্যন্ত পিচ্ছিল, গমনাগমনের পক্ষে বড় কঠিন। অসাবধান হইলেই পতন ও বিনাশ। কোন জীবের হিংসা করিবে না, পিপীলিকাকেও পদদলিত করিবে না।'

যমুনার কালো জলে অস্তমান সূর্য্যের রশ্মি জ্বলিতেছিল, সিতাসিত সঙ্গমে গঙ্গার শুভ্র, তীব্র স্রোত ও যমুনার অলস, মন্থর, কৃষ্ণ প্রবাহ লক্ষিত হইতেছিল। পূর্ব্বদিকের বাতাস, তাহাতে জল ঠেকিয়া ছোট ছোট তরঙ্গ রচনা, যমুনার পারে হরিদ্-বর্ণ ক্ষেত্র। কিছু দূরে ঘাটে কয়েকটি নৌকা বাঁধা, নাবিকেরা নৌকায় কিংবা তীরে বসিয়া গল্প করিতেছে, গ্রামের বালকবালিকা বালুকায় খেলা করিতেছে।

দুই তিনখানি সজ্জিত রথ বেগে চালিত হইয়া যমুনা-তীরে উপনীত হইল। ছয় জন উত্তম-বেশ-পরিহিত যুবক রথ হইতে অবতরণ করিয়া শিষ্যপরিবৃত গুরুর অভিমুখে হাস্য-কৌতুক করিতে করিতে আগমন করিলেন। সকলের অগ্রে যে-যুবক আসিতেছিলেন তাঁহার বেশ-ভূষার পারিপাট্য কিছু অধিক। উপবিষ্ট শ্রোতার মধ্যে একজন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কহিল, 'রাজা বিরূপাক্ষ!' সে নাম শুনিয়া সকলেই কিছু শঙ্কিত হইল। একা নাথপুত্র বিচলিত হইলেন না, নবাগত যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যেমন মধুর গম্ভীরস্বরে উপদেশ দিতেছিলেন সেইরূপ দিতে লাগিলেন।

রাজা বিরূপাক্ষের বয়স চব্বিশ বৎসর। দেখিতে সুপুরুষ, কিন্তু বিলাসিতার আতিশয্যে চক্ষু কোটরগত, রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল শ্রীবিহীন। সাঙ্গোপাঙ্গও তদ্রূপ। বিরূপাক্ষ দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠাশূন্য, নিষ্ঠুর, প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী। নিকটে আসিয়া সঙ্গের এক ব্যক্তিকে ব্যঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহারা কে? এখানে কি করিতেছে?'

হয়ত সেই ব্যক্তি বিদূষক। মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল,

---

* নিগ্রন্থ নাথপুত্র প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর।

পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছে। মধ্যস্থলে পুরোহিত বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে।'

আর একজন কহিল, 'না হে, ইহারা নটের দল। আজ রাত্রে প্রেতপঞ্চাশিকা নাটক অভিনয় হইবে তাহাই আবৃত্তি করিতেছে। এই শ্মশানভূমি তাহার উপযুক্ত স্থান।'

নাথপুত্র মৌনাবলম্বন করিয়া অবনত মস্তকে বসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি? ব্রাহ্মণ?'

গুরু মাথা তুলিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, 'আমি তোমার দাস।'

রাজা পারিষদদিগকে কহিলেন, 'এই দেখ, এক রকম। কতকগুলা অনার্য্য, এখানে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। আর এক দল হইয়াছে, দেখিয়াছ? মুণ্ডিত শির, মুণ্ডিত তুণ্ড, পীতবস্ত্র ধারণ করিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে ঘুরিয়া বেড়ায়।'

রাজার সঙ্গিগণ হাসিতে লাগিল, একজন কহিল, 'জানি বই কি! তাহাদের গুরু শাক্যবংশীয় রাজপুত্র, উন্মাদ, বীভৎস আচার, চণ্ডালের গৃহ হইতে অন্ন ভিক্ষা করে।'

যুবকেরা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। একজন হাসিতে হাসিতে কহিল, 'রাজসুখের অপেক্ষা ভিক্ষাভোগ উত্তম, ইহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু এই যে লোকগুলা, ইহারা কে? রাজদ্রোহী নয় ত?'

আবার হাস্যের তরঙ্গ উঠিল। বিদ্রূপ-বাক্য শুনিয়া নাথপুত্র আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক যুবক ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,'সাধু-সন্ন্যাসীকে বিদ্রূপ অপমান করা রাজার উচিত কর্ম্ম বটে!'

যুবা তেজস্বী, বলবান, অথচ সৌম্যমূর্ত্তি। সে স্বয়ং ক্ষত্রিয়, দূর সম্বন্ধে রাজার জ্ঞাতি, তাহাকে দেখিয়া রাজা চিনিলেন। ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, 'উদয়ন, তুমি এখানে? যেমন দলে মিশিয়াছ সেইরূপ তোমার প্রকৃতি হইয়াছে। কাহার সহিত কথা কহিতেছ, তোমার স্মরণ নাই? তোমার মুখে এরূপ কথা?'

উদয়ন কহিলেন, 'সকলের মুখে এইরূপ কথা। গুপ্তচরেরা সে-সংবাদ দেয় না?"

রাজার সঙ্গিগণ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উদয়নের অভিমুখে অগ্রসর হইল। নাথপুত্রের শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ উদয়নকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। এরূপ স্থলে বলপ্রকাশ যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া রাজার মোসাহেবরা ক্ষান্ত হইল।

নাথপুত্র হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন, 'মঙ্গল হউক!'

এই বলিয়া তিনি সে-স্থান পরিত্যাগ করিলেন। শিষ্য ও শ্রোতাগণ তাঁহার সঙ্গে গেল। রাজা চীৎকার করিয়া কহিলেন, 'উদয়ন, আজিকার অপমান আমার স্মরণ থাকিবে।'

উদয়ন কোন উত্তর দিলেন না।

২

রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া রাজা বিরূপাক্ষ কিছু দূরে বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে প্রমোদ-ভবনে বাস করিতেন। রাজমাতা বর্ত্তমান, রাজবংশের কয়েকজন বৃদ্ধও জীবিত, রাজ-বাটীতে বিরূপাক্ষ যথেচ্ছাচার করিতে পারিতেন না। উদ্যানে তাঁহাকে নিষেধ করিবার বা বুঝাইবার কেহ ছিল না। প্রমোদ-ভবনে কি হইত রাজ-বাটীতে সংবাদ আসিত, কিন্তু রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজ্যভার তাঁহার হস্তে, কে তাঁহাকে নিষেধ করিবে? রাজা কখন কখন রাজবাটীতে গিয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া আসিতেন, অধিক কথাবার্ত্তা হইত না। রাজমাতা মনে করিতেন বিবাহ হইলে এরূপ উচ্ছৃঙ্খল থাকিবে না, এই ভাবিয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুত্র অসৎসঙ্গে প্রমোদে মত্ত, বিবাহের জন্য কোনরূপ আগ্রহ ছিল না।

উদয়নের কথায় রাজা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। বাগানে ফিরিবার পথে আর কোন কথা হইল না। 'দেখিয়াছ, কতকগুলা ভিখারীর সম্মুখে আমাকে অপমান করিল! উহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, সর্ব্বত্র এই কথা রাষ্ট্র করিবে।'

প্রজ্বলিত অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার লোক অনেক আছে, রাজার বয়স্যদিগের ত কথাই নাই। কেহ বলিল, উদয়নকে বন্দী করা হউক, কেহ বলিল তাহাকে শূলে দেওয়া হউক। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজনের একটু বিবেচনা ছিল। সে বলিল, 'যদি উদয়নকে এখন শাস্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রজারা জানিতে পারিবে যে, সে একজন প্রধান সন্ন্যাসীকে বিদ্রূপ করা হইতেছে দেখিয়া আপত্তি করিয়াছিল। প্রজাদের মনের ভাব জান ত, সাধু-সন্ন্যাসীকে অপমান করিলে তাহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিছু একটা কৌশল করিয়া উদয়নকে শিক্ষা দিতে হইবে।'

একজন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, 'মন্ত্রী মহাশয় ত উপস্থিত রহিয়াছেন, তবে আর ভাবনা কি! মহাশয়, পরামর্শ দিন।'

রাজা রাগিয়া কহিলেন, 'পরামর্শে কি প্রয়োজন? আমার আজ্ঞা যথেষ্ট। কোন প্রজা আপত্তি করিলে তাহাকেও চণ্ডালের হস্তে সমর্পণ করিব।'

এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া অভিবাদন করিল, 'জয় মহারাজ!'

রাজা ভ্রূভঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি?'

'মহারাজ, রাজমাতা মহারাণী আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।'

'এমন সময়? এখন আমি যাইতে পারিব না।'

'মহারাজ, বিশেষ কোন প্রয়োজন হইবে। পুরোহিত অপেক্ষা করিতেছেন।'

'পুরোহিত? আর কোন লোক ছিল না? উত্তম, ডাক তাঁহাকে।'

পুরোহিত আসিলেন, উন্নত, শীর্ণ দেহ, উজ্জ্বল, আয়ত চক্ষু, বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা এখনও দেখা দেয় নাই। রাজা ও তাঁহার সঙ্গিগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা প্রণাম করিলেন।

পুরোহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন, বসিলেন না। কহিলেন, 'মগধরাজের প্রধান দূত সশস্ত্র অনুচর-বর্গ লইয়া রাজপ্রাসাদে উপনীত হইয়াছেন। অবিলম্বে মহারাজের দর্শনকামনা করেন।'

আকাশে বাজপক্ষীর কণ্ঠ শুনিলে ও তাহার প্রসারিত পক্ষ দেখিলে পারাবতকুল যেমন চঞ্চল, ত্রস্ত ও শঙ্কিত হয় রাজা ও তাঁহার সখাগণ সেইরূপ বিচলিত হইলেন। মহাপ্রতাপান্বিত মগধরাজের এখানে কি প্রয়োজন?

শুষ্ক মুখে বিরূপাক্ষ কহিলেন, 'মগধরাজ কেন দূত পাঠাইয়াছেন?'

'যাইলেই জানিতে পারিবেন। কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, তবে কালবিলম্ব করিবেন না। রাজবাটীতে আপনাকে দেখিতে না পাইয়া দূত কিছু বিস্মিত হইয়াছেন।'

রাজা বিলম্ব করিলেন না, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তখনই পুরোহিতের সঙ্গে গমন করিলেন।

তাঁহার বয়স্যগণ কোন কথা না কহিয়া আপন আপন গৃহে গমন করিলেন।

রাজবাটীতে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া মগধ-রাজদূত রাজা বিরূপাক্ষের অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পুরোহিত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্ভাষণাদির পর রাজা বিরূপাক্ষ কহিলেন, 'আমার পরম সৌভাগ্য যে, মগধরাজ আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ শুনিতে পাই?'

দূত মধ্যবয়স্ক, তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষ। কহিলেন, 'রাজাধিরাজ আপনার সহিত পারিবারিক সম্বন্ধ কামনা করেন। তাঁহার কন্যা নাই, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী পরমা সুন্দরী। মহারাজের ইচ্ছা আপনি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।'

বিরূপাক্ষ পুরোহিতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি চক্ষু নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মুখ তুলিলেন না। চিন্তা করিয়া বিরূপাক্ষ কহিলেন, 'মাতা-ঠাকুরাণী রহিয়াছেন, এ প্রস্তাব তাঁহাকে জানাইব। তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া আমি কিরূপে উত্তর দিব?'

দূত কহিলেন, 'সাধু, আপনি মাতৃবৎসল পুত্রের উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন। রাজমাতার আপত্তির কোন কারণ দেখি না। পুরোহিত মহাশয় কি বলেন?'

রাজা এবং দূত উভয়ে পুরোহিতের অভিমুখে দৃষ্টিপাত

করিলেন। স্মিতমুখে পুরোহিত কহিলেন, 'এমন কুটুম্বিতা কাহার বাঞ্ছনীয় না হইবে? মগধরাজের প্রস্তাবে রাজ-মাতা পরম সম্মানিত ও অনুগৃহীত হইয়াছেন।'

বিরূপাক্ষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি অবগত আছেন?'

দূত কহিলেন, 'তাঁহার অবগতির জন্য প্রথমেই নিবেদন করা হইয়াছে।'

'তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন তাহাই হইবে।'

দূত এবং তাঁহার অনুচরদিগের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা বিরূপাক্ষ পুরোহিতকে একান্তে কহিলেন, 'ইহা আপনারই কাজ। মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া আপনি এই সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন।'

'ইহা ত কোন গর্হিত কর্ম্ম নয়। বাল্যকাল হইতে তোমাকে দেখিয়াছি, তোমাকে সুখী দেখিলে আমাদের আনন্দ। চক্রবর্ত্তী মহারাজার জামাতা হইবে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে?'

'আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই আমাকে জড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিবাহে আমার সম্মতি নাই।'

'সঙ্গদোষে। বিবাহ হইলে সুবুদ্ধি হইবে।'

রাজা রাগিয়া কহিলেন, 'আপনার বড় স্পর্দ্ধা! যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিতেছেন!'

'ব্রাহ্মণের মুখ কাহারও ভয়ে বন্ধ হয় না। সত্য কাহাকে ভয় করিবে?'

রাজা উদ্যানে চলিয়া গেলেন। রাজমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

৩

সন্ন্যাসীদের সহিত কিছু দূর গমন করিয়া উদয়ন নগরে প্রবেশ করিলেন। নিজের গৃহে না গিয়া রাজবাটীর নিকটে আর-একটি প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। ইহাতেও রাজবংশীয়েরা বাস করেন। এ বাটীতে উদয়নের সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল। বাহির বাটীতে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া উদয়ন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহকর্ত্রী মহাশ্বেতা প্রকোষ্ঠদ্বারে বসিয়াছিলেন। উদয়নকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে বলিলেন। কহিলেন, 'তুমি যে কর্ম্ম শিখিতেছিলে তাহার কি হইল?'

'শিক্ষা প্রায় শেষ হইয়াছে, এইবার কর্ম্ম আরম্ভ করিব।'

'পূর্ব্বে সকলে রাজকর্ম্মের চেষ্টা করিত। এখন রাজার নিকটে কর্ম্ম প্রার্থনা করিতে কে যাইবে?'

'কেমন রাজা জানেন ত?'

'সে কথায় কাজ নাই! হতভাগ্য রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!'

তাঁহাদের কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একজন যুবতী রমণী আসিয়া মহাশ্বেতার পাশে দাঁড়াইলেন। রমণী সুন্দরী, মহাশ্বেতার ভগিনীর কন্যা, পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়াতে মাসীর কাছে থাকেন। মহাশ্বেতা কহিলেন, 'তোমরা কথা কও, আমি গৃহদেবতার কর্ম্ম সারিয়া আসি।' এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

উদয়ন কহিলেন, 'সুজাতা!'

সুজাতা কহিলেন, 'কি?'

দুই জনে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিলেন। উভয়েরই কিছু সঙ্কোচ, কিছু বাধার ভাব। দুই জনে চক্ষু নত করিলেন।

উদয়ন কহিলেন, 'একটা কথা তোমাকে বলিতেছি, তোমার মাসী কিংবা অপর কেহ যেন জানিতে না পারেন। তাঁহাকে আমি কিছু বলি নাই।'

সুজাতার কপোল ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল, আবার সে-আভা মিলাইয়া গেল। কিছু উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কথা?'

'রাজা আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।'

সুজাতার মুখ মলিন হইয়া গেল, চক্ষে ভীতি-সঞ্চার হইল, হস্তের অঙ্গুলি কাঁপিল। কহিলেন, 'রাজরোষ? কি অপরাধ?'

'সব কথা তোমাকে বলিব বলিয়াই আসিয়াছি। আর কাহাকেও বলি নাই, বলিবও না।'

উদয়নের সাগ্রহ দৃষ্টিতে সুজাতার চক্ষু আবার নত হইল, মুখ আবার আরক্তিম হইল।

উদয়ন কহিলেন, 'আজ বৈকালে প্রয়াগ-সঙ্গমে নিগ্রন্থ

নাথপুত্র উপদেশ দিতেছিলেন, শ্রোতাদের মধ্যে আমিও ছিলাম।'

'তিনি ত মহাপুরুষ, সকলেই জানে।'

'সকলে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিতেছিল, এমন সময় রাজা তাঁহার কয়েক জন অসদাচারী বন্ধু লইয়া উপস্থিত।'

'রাজার আচরণে ত প্রজারা সকলেই ভয় পাইয়াছে।'

'তাঁহারা আসিয়াই সাধুকে বিদ্রূপ ও অপমান করিতে লাগিলেন। গৌতম বুদ্ধদেবেরও নিন্দা আরম্ভ হইল। আমার অসহ্য বোধ হওয়াতে একটা কথা বলিলাম।'

'কি বলিলে ?'

'আমি বলিলাম, সাধু-সন্ন্যাসীকে বিদ্রূপ করা রাজার পক্ষে অনুচিত। প্রজারা তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট, সে-কথাও বলিয়াছিলাম।'

সুজাতা সভয়ে কহিলেন, 'রাজার প্রকৃতি ত জান ? তিনি ত কখন ক্ষমা করিবেন না। তাঁহার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই। তোমাকে কিরূপ লাঞ্ছনা করিবেন কে বলিতে পারে ?'

'তাই ত ভাবিতেছি। এখন উপায় ?'

'কিছু দিন আর কোথাও গিয়া বাস করিলে হয় না ? রাজার বিবাহের কথা হইতেছে, বিবাহ হইলে শান্ত-প্রকৃতি হইতে পারেন।'

'কোথায় বিবাহের কথা হইতেছে ?'

'সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বে মগধরাজের দূত রাজপথ দিয়া রাজবাটীতে গিয়াছেন। মাসী বলিতেছিলেন, মগধরাজ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত রাজার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।'

'রাজমাতার মুখে শুনিয়া থাকিবেন ?'

'সেইরূপ অনুমান হয়।'

'তুমি যে স্থানান্তরে যাইতে বলিতেছ, কোথায় যাইব ? যে-কর্ম্ম শিখিয়াছি দুই চারি দিনে আরম্ভ করিবার কথা। এখন যদি কোথাও চলিয়া যাই যাঁহার সহিত কর্ম্ম করা স্থির হইয়াছে তিনি কি বলিবেন ?'

'রাজা এখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কখন কি করিয়া বসেন তাহার ত স্থিরতা নাই ! তুমি কর্ম্ম আরম্ভ করিলে এমন সময় সহসা যদি তোমায় কারাবন্দী করেন কিংবা আর কোন শাস্তি দেন তাহা হইলে তুমি কি করিবে ? তখন ত কর্ম্ম বন্ধ হইয়াই যাইবে, তুমিও বিপদে পড়িবে।'

'তুমি যেমন বলিতেছ সেইরূপ করিব। আমার বন্ধুকে বলিয়া কাল বারাণসী চলিয়া যাইব।'

'আজ রাত্রে কোন আশঙ্কা নাই ত ?'

'রাত্রে গৃহে থাকিব না, আর কোথাও গিয়া শয়ন করিব।'

'সেই কথা ভাল।'

কিছুক্ষণ কথা স্থগিত হইল। আবার উদয়ন কহিলেন, 'সুজাতা !'

'উদয়ন !'

'আমাদের নিজের একটা কথা আছে।'

সুজাতা নখে নখ খুঁটিতে লাগিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

'তুমি ত আমার মনের কথা জান।'

সুজাতা পূর্ব্বরূপ। উদয়ন তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, কহিলেন, 'আমাদের বিবাহে ত কোন বাধা নাই। তুমি স্বীকৃত হইলেই হয়।'

মুষ্টিমধ্যে ধৃত ক্ষুদ্র পক্ষিণীর ন্যায় উদয়নের হস্তের মধ্যে সুজাতার হস্ত কম্পিত হইতেছিল। মৃদুস্বরে কহিলেন, 'এ-কথা আমাকে কেন বলিতেছ ? এখন ত স্বয়ম্বরের প্রথা নাই যে, প্রকাশ্য-সভায় তোমার গলায় আমি বর-মাল্য পরাইয়া দিব ?'

উদয়ন সুজাতার হস্ত মুক্ত করিলেন। মহাশ্বেতা ফিরিয়া আসিলেন। উদয়ন তাঁহাকে কহিলেন, 'বৈকালে বাহির হইয়াছি, এখনও গৃহে ফিরি নাই। অনুমতি হয় ত এখন গৃহে যাই।'

মহাশ্বেতা সস্মিত মুখে কহিলেন, 'এ কি তোমার গৃহ নয় ?'

'আপনাদের স্নেহেই ত আমি প্রতিপালিত।'

উদয়ন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৪

পর দিবস প্রাতে দূত মগধে ফিরিয়া যাইবেন সংবাদ পাইয়া রাজা বিরূপাক্ষ রাজ-প্রাসাদে আসিলেন। তাঁহাকে

দেখিয়া দূত কহিলেন, 'বিবাহে আপনার সম্মতি জানিয়া মগধরাজ আনন্দিত হইবেন। শুভ দিন স্থির হইলে যথোচিত সমাদরের সহিত আপনাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন।'

ক্রোধে বিরূপাক্ষের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ওঝার সম্মুখে সর্প ফণা তুলিয়া কি করিবে? প্রকাশ্যে রাজা কহিলেন, 'কিছু দিন পরে হইলে ক্ষতি কি? ব্যস্ত হইবার কি প্রয়োজন?'

'সে কি কথা মহারাজ! শুভ কর্ম্মে কি বিলম্ব করিতে আছে? আপনি লজ্জার অনুরোধে এমন কথা বলিতেছেন।'

স্থির অথচ সতর্ক পুরোহিত পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। কহিলেন, 'মগধরাজ যেরূপ আদেশ করিবেন তাহাই হইবে।'

রাজা একবার পুরোহিতের দিকে আর একবার দূতের দিকে চাহিয়া বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন। দূত অনুচরদিগের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। তখন রাজা মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া সক্রোধে পুরোহিতকে কহিলেন, 'এ সমস্ত আপনাদের ষড়যন্ত্র!'

পুরোহিত কহিলেন, 'ষড়যন্ত্র ত অসৎ কর্ম্মের জন্য করে। সদ্বংশে বিবাহের ব্যবস্থা করা কি অসৎ কর্ম্ম?'

'বিবাহ করা না করা, যে কোন সময় করা আমার ইচ্ছা। এ বিবাহ আমি করিব না।'

'মহারাজের ইচ্ছা; প্রতিশ্রুত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিলে মগধরাজ কারণ জানিতে চাহিবেন।'

'আমাকে আপনি শাসাইতেছেন?'

'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার সাধ্য কি, মহারাজ! কিন্তু মগধরাজ রাজান্নে প্রতিপালিত পুরোহিত নহেন, এ কথা আপনি কেমন করিয়া বিস্মৃত হইবেন?'

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পদব্রজে নগরে চলিলেন। তিনি একা যাইতেছেন দেখিয়া দুইজন ভল্লধারী রাজসৈনিক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

উদয়ন প্রভাত-কালে উঠিয়া নিজের গৃহে আসিয়াছেন, রাত্রে কোন বন্ধুর গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন। এখন যে ব্যক্তির সহিত কর্ম্ম করিবার কথা তাহার গৃহে গমন করিতেছিলেন। পথে রাজার সহিত দেখা! উদয়ন পথ ছাড়িয়া দিয়া বিনীতভাবে অভিবাদন করিলেন।

যে ক্রোধানল রাজার হৃদয়ে এতক্ষণ ভস্মাচ্ছাদিত ছিল উদয়নকে দেখিবা মাত্রই তাহা হবিযুক্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। গর্জ্জন করিয়া সৈনিকদ্বয়কে কহিলেন, 'এই ব্যক্তিকে বন্দী কর!'

সৈনিক দুইজন এমন চমকিয়া উঠিল যে, তাহাদের ভল্ল হস্ত হইতে পড়িতে পড়িতে রহিল। সংযত হইয়া একজন কহিল, 'কাহাকে, মহারাজ?'

প্রশ্নের কারণ ছিল। পথ সঙ্কীর্ণ, লোকের গমনাগমন ত ছিলই, আবার রাজার সিংহনাদ শুনিয়া পথিক চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। দুই চারি জন উদয়নের পাশেই দাঁড়াইল।

রাজা অঙ্গুলি দিয়া উদয়নকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

সৈনিকেরা তখনও বুঝিতে পারে না। পথ চলিতে যাহাকে-তাহাকে বন্দী করা কি রকম বিচার! উদয়ন চোর-দস্যু নহেন, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, রাজার জ্ঞাতি, কোথাও কিছু নাই, পথের মধ্যে তাঁহাকে বন্দী! রাজার মস্তিষ্কের বিকার হয় নাই ত! হয়ত রাত্রে প্রমোদের অধিক বাড়াবাড়ি হইয়া থাকিবে!

নাগরিকগণও বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল। রাজার চরিত্র সকলেই জানিত, প্রজার শ্রদ্ধা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছিল।

একজন সৈনিক সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি অপরাধে, মহারাজ?'

রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'তোমরা আদেশ পালন করিবে, প্রশ্ন করিবার কে?'

সৈনিক স্তব্ধ হইল। একজন পথিক কহিল, 'আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কি অপরাধে এই ব্যক্তিকে বন্দী করিতেছেন?'

'তাহা হইলে তুমিও বন্দী হইবে।'

পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি কহিল, 'এমন রাজা না হইলে এমন বিচার করে কে? নগরসুদ্ধ লোককে বন্দী করিলেই ত হয়!'

রাজা কহিলেন, 'এ ব্যক্তি রাজদ্রোহী।'

সৈনিকেরা উদয়নকে ধরিতে উদ্যত হইল। মাঝে আর কয়েকজন লোক আসিয়া পড়িল। একজন উদয়নের কাণে কাণে বলিতেছিল, 'পশ্চাতে মহামায়ার মন্দির-দেখিতে পাইতেছ না? মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ কর, সেখানে বন্দী করিবার আদেশ নাই।' সে ব্যক্তি উদয়নকে পশ্চাৎদিকে ঠেলিতে লাগিল। মন্দিরের বৃহৎ দ্বার, তাহার পর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। উদয়ন বেগে প্রাঙ্গণ পার হইয়া, মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। কহিলেন, 'আমি ভীত, আমি দেবীর শরণার্থী!'

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। দীর্ঘ, সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘকেশ, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখশ্রী, কোমল গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'বৎস, আশ্বস্ত হও, অশরণকে শরণ দিবার জন্যই মা আছেন।'

উদয়ন কহিলেন, 'রাজা মিত্রদলের সহিত সন্ন্যাসীকে অবমাননা করাতে আমি আপত্তি করিয়াছিলাম। এই অপরাধে তিনি আমাকে রাজদ্রোহী বলিয়া বন্দী করিতে আসিতেছেন।'

'এখানে?'

'সৈনিকদিগকে লইয়া রাজা মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন।'

'এখানে রাজরাজেশ্বরীর রাজ্য, এখানে রাজা-প্রজা সকলেই সমান।' পুরোহিতের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। 'মন্দির-প্রাঙ্গণে সৈনিক! রাজদ্রোহী? রাজা স্বয়ং যখন নিজের শত্রু, অপর শত্রু হইতে কতক্ষণ?' অপর পুরোহিতকে কহিলেন, 'আমি বাহিরে যাইতেছি, দ্বার রুদ্ধ কর। আমি না আসিলে দেবীর দর্শন হইবে না।'

পুরোহিত বাহিরে আসিলেন। ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুরোহিত দেখিলেন, প্রাঙ্গণে লোক ঠেলিয়া প্রবেশ করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে রাজা, হস্তে মুক্ত অসি, তাঁহার পশ্চাতে সৈনিক, সঙ্গে সঙ্গে জনতা-স্রোত। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সকলে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, কেবল রাজা দ্রুতপদে মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, সৈনিকেরাও অগত্যা তাঁহার অনুগমন করিল।

রাজা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পুরোহিত মুক্ত কণ্ঠে, সকলকে শুনাইয়া, কহিলেন, 'মহারাজ, অসি হস্তে সশস্ত্র সৈনিক সঙ্গে আপনি এখানে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কি দেবীর স্থান না শত্রুর রণস্থল?'

বিরূপাক্ষ উন্মত্ত বলিলেই হয়। অসংযত যৌবন, সকল প্রকার অত্যাচার, তাহার উপর মগধরাজের দূতের ভয়ে সমস্ত রাত্রি আত্মনির্যাতন। রুদ্ধ চিত্ত মুক্ত হইয়া রাজা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান তিরোহিত হইল। কহিলেন, 'আমি দেবীর মন্দিরে আসি নাই, পলাতক অপরাধীকে বন্দী করিতে আসিয়াছি।'

পুরোহিত পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, 'এখানে কেহ কাহাকেও বন্দী করিতে পারে না। এ স্থান অভয়ার, ভীত ব্যক্তিকে তিনি অভয় দেন, শরণাগতকে শরণ দেন।'

রাজা একেবারে মন্দিরের সোপানের উপর উঠিয়া, হস্তের অসি না নামাইয়া, তীব্র, রুক্ষ স্বরে কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ, পথ ছাড়! ভিতরে প্রবেশ করিব, দ্বার রুদ্ধ থাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব!'

জনতা শিহরিয়া উঠিল। পুরোহিত দুই বাহু উত্তোলন করিয়া, দুই হস্তে বক্ষের কাষায়-বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, রাজার তরবারির সম্মুখে প্রশস্ত বক্ষ পাতিয়া দিলেন। তূর্য্যধ্বনির ন্যায় কণ্ঠনিনাদে কহিলেন, 'প্রথমে ব্রহ্মহত্যা কর, তাহা হইলে দেবীর দ্বার সহজে ভাঙ্গিতে পারিবে।'

সমবেত জনসংঘ হাহাকার করিয়া উঠিল। 'সর্ব্বনাশ হইল! সর্ব্বনাশ হইল!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, অনেকে দুই হস্ত দিয়া শ্রবণ রোধ করিল, অনেকে মন্দিরের অভিমুখে ধাবিত হইল।

সৈনিক দুই জন ভল্লে ভল্ল যোজনা করিয়া, পুরোহিতের সম্মুখে রাজার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। রাজা দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া কহিলেন, 'তোমরাও রাজদ্রোহী, শূলে যাইবে।'

'রাজদণ্ড মস্তকে পাতিয়া লইব, দেবীর অভিশাপের ভাগী হইতে পারিব না। দেবীর অপমান হইলে নগর ধ্বংস হইবে।'

রাজা বিরূপাক্ষের ওষ্ঠে ফেন এবং ওষ্ঠ-প্রান্তে শোণিত-বিন্দু দেখা দিল।

প্রজাদিগকে পুরোহিত কহিলেন, 'তোমাদের কোন চিন্তা নাই, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। দেবীর মর্য্যাদা তিনি স্বয়ং অক্ষত রাখিবেন।'

প্রজারা চলিয়া গেল। তখন পুরোহিত রাজাকে কহিলেন, 'মহারাজ, আপনিও গৃহে ফিরিয়া যান। অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মহামায়া প্রসন্ন হইবেন।'

রাজা কোন কথা না কহিয়া উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন।

৫

রাজা বিরূপাক্ষের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। মন্দিরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর অভিসম্পাতের ভয়, তাহার অপেক্ষাও ভয় প্রজাদের অসন্তোষ ও বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া। উদয়নকে তিনি বিনা কারণে রাজদ্রোহী বলিয়াছিলেন, এখন যদি সত্য সত্যই প্রজারা বিদ্রোহী হয়? দেবীকে তুষ্ট করিবার জন্য তিনি উদ্যান হইতে নগ্ন পদে, কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিয়া, মন্দিরে গিয়া মহা সমারোহে দেবীর অর্চ্চনা করিলেন, দেবীকে ও পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া মন্দিরে বহু অর্থ প্রদান করিলেন। প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিবার আশায় নানাবিধ উৎসবের আয়োজন করিলেন, উৎসবে আহারের ও বস্ত্রাদি দানের মুক্ত হস্তে ব্যবস্থা করিলেন। অপর দিকে বিলাসের মাত্রা বাড়িল, রাজকর্ম্মে কিছু মাত্র মনোযোগ নাই।

উদয়নকে নগর ত্যাগ করিতে হইল না। সকল কথা শুনিয়া মহামায়ার মন্দিরের পুরোহিত তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি নির্ভয়ে থাকুন, আশঙ্কার কোন কারণ নাই। রাজা মন্দিরে আগমন করিলে তাঁহাকে নিভৃতে কহিলেন, 'উদয়নকে শাস্তি দিবার বাসনা পরিত্যাগ করুন। দোষ আপনার, নিরপরাধী সন্ন্যাসীদিগকে অকারণে অবমাননা করিয়াছিলেন। ইহাতে আপত্তি করায় উদয়নের কি অপরাধ? সেখানে অপর লোক উপস্থিত ছিল, উদয়নের প্রতি অবিচার করিলে তাহারা সকল কথা প্রকাশ করিবে, প্রজাগণ আরও রুষ্ট হইবে।'

রাজা উদারভাবে কহিলেন, 'আমি উদয়নকে ক্ষমা করিয়াছি।'

পুরোহিত স্মিতমুখে কহিলেন, 'সেই কথাই উত্তম।'

উদয়ন নিজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। গৃহে মাতা ছিলেন, আর কেহ না। মধ্যবিত্ত সম্পত্তিপন্ন গৃহস্থ, বিশেষ কোন অভাব ছিল না, উদয়নের অলস স্বভাব নহে বলিয়া তিনি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মাতা কহিলেন, 'উদয়ন, এইবার বিবাহ কর, নিজের সংসার কর, আমিও পুত্রবধূর মুখ দেখি।'

উদয়ন হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, 'বিবাহ কোথায় স্থির করিলে?'

'পাত্রীর জন্য অধিক দূরে অন্বেষণ করিতে হইবে না। মহাশ্বেতার বোন-ঝি সুজাতা মেয়েটি দেখিতে মন্দ নয়, কি বল?'

মাতার হাস্যপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া উদয়ন মস্তক অবনত করিলেন, কহিলেন, 'তুমি যেখানে স্থির করিবে সেখানেই বিবাহ করিব।'

'তোমার নিজের কোন মতামত নাই?'

অপ্রতিভ হইয়া উদয়ন কহিলেন, 'আমারও মত আছে।'

মাতা আনন্দে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'তোমার মত জানিয়াই সম্বন্ধ করিয়াছি।'

'আমার মত কেমন করিয়া জানিলে?'

'আমার চক্ষু আছে, মহাশ্বেতারও চক্ষু আছে, জানিতে কতক্ষণ?'

আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ে উদয়ন জননীকে প্রণাম করিলেন।

সেই রাত্রে উদয়ন স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, চারিদিকে নিবিড় অরণ্য, কণ্টকময় মহাতরুতে পরিপূর্ণ, অরণ্যে অসংখ্য সর্প ও শ্বাপদকুল বিচরণ করিতেছে। লোলজিহ্ব, নরমাংস-লোলুপ, বিপুলদেহ রাক্ষসগণ বিশাল বাহু প্রসারিত করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। কোথাও আর্ত্ত প্রাণীর চীৎকার, কোথাও কম্পিতকায় জীবের পলায়ন। শোণিতের ন্যায় লোহিত রাগে আকাশ আচ্ছন্ন, বায়ুতে রোদনের স্বর প্রবাহিত হইতেছে।

সহসা সেই ভয়াবহ স্থানে অভয় বাণী শ্রুত হইল। আকাশ নির্ম্মল হইয়া উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিল, ত্রাস-

সঙ্কুল অরণ্য অদৃশ্য হইল। দেবী মহামায়া উদয়নের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। মন্দিরে উদয়ন যে-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন সে-মূর্ত্তি নহে, কিন্তু দেবী সেই, সংশয়ের লেশমাত্র রহিল না। পাষাণময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময়ী, মঙ্গলময়ী, করুণাময়ী মূর্ত্তি! উদয়নের প্রতি কোমল, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'ভীত হইয়া তুমি আমার নিকটে শরণ প্রর্থনা করিয়াছিলে। দেখিতেছ না, এ স্থানে নিত্য ভয়! আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে চিরাভয় প্রদান করিব।'

দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উদয়নের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবশিষ্ট রাত্রি তাঁহার আর নিদ্রা হইল না। স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন জাগ্রত হইয়াও বার বার তাহাই দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নদৃষ্ট প্রত্যেক দৃশ্য মানস-চক্ষে স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হইল।

৬

প্রভাতে উঠিয়া উদয়ন স্বপ্নবৃত্তান্ত কাহাকেও বলিলেন না। নিত্যকর্ম্ম যেমন করিতেন সেইরূপ করিলেন। একবার মনে করিলেন মন্দিরে গিয়া পুরোহিতকে স্বপ্নকথা বলিবেন, কিন্তু সে কল্পনা ত্যাগ করিলেন। কত সময় কত স্বপ্ন দেখা যায়, সকল স্বপ্নেরই কি অর্থ আছে?

বৈকালে কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিবার সময় উদয়ন নগরের বাহিরে অল্পক্ষণ ভ্রমণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ মেঘ উঠিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া আসিল। তাহার পরেই প্রবল ঝঞ্ঝা, ধূলিতে চারিদিক ভরিয়া গেল। ঝড়ের বেগ প্রশমিত হইবার অপেক্ষায় উদয়ন পথের পাশে বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইলেন।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিল, তাহার পর মেঘগর্জ্জন। উদয়ন দেখিলেন, দূর হইতে একটা অশ্ব ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অশ্বারোহী কোন মতে অশ্বকে সংযত করিতে পারিতেছে না। উদয়ন চিনিলেন, রাজা বিরূপাক্ষ, ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত, অশ্বপৃষ্ঠে স্থির হইতে পারিতেছেন না। উদয়ন মুহূর্ত্ত-কাল বিলম্ব না করিয়া, লম্ফ দিয়া অশ্বের বল্গা ধারণ করিলেন। অশ্ব লাফাইয়া উঠিয়া, কিছু দূর গিয়া স্থির হইল। রাজা বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। দেখিলেন, উদয়ন অশ্বের পদতলে পতিত হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে অপর অশ্বারোহিগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। উদয়নের উঠিবার ক্ষমতা নাই। রাজার আদেশে সত্বর শিবিকা আনীত হইল। রাজা কহিলেন, 'রাজ-প্রাসাদে লইয়া চল।'

উদয়ন ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, 'না, আমার নিজের গৃহে।'

বাহকেরা উদয়নকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেল। রাজা ও তাঁহার সঙ্গিগণ নীরবে শিবিকার সঙ্গে গমন করিলেন। গৃহে উপনীত হইয়া রাজা ও তাঁহার বন্ধুগণ উদয়নকে সাবধানে তুলিয়া গৃহের ভিতরে শয্যায় শয়ন করাইলেন। উদয়নের মাতা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে?'

রাজা সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন, 'আমাকে রক্ষা করিতে গিয়া উদয়ন আহত হইয়াছেন।'

উদয়নের মাতা কহিলেন, 'নিজের প্রাণ দিয়াও রাজাকে রক্ষা করা প্রজার কর্ত্তব্য।'

উদয়নের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া রাজা অধোবদন হইলেন।

রাজবৈদ্য দেখিতে আসিলেন। উদয়নকে দেখিয়া, নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, বাহিরে আসিলেন। রাজাকে কহিলেন, 'শরীরের ভিতর কোথাও গুরুতর আঘাত লাগিয়া থাকিবে। শ্বাসের লক্ষণ দেখিতেছি। রক্ষা পাইবার কোনও আশা নাই।'

বৈদ্য চলিয়া গেলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে আবার আসিবেন বলিয়া রাজাও বিদায় লইলেন।

ঝটিকার পর আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে। সূর্য্য অস্ত-প্রায়। মৃদুমন্দ, শীতল বায়ু বহিতেছে, তরুশাখায় পক্ষিগণ সন্ধ্যার বন্দনা করিতেছে। বাহিরে দিবাবসানে প্রকৃতির প্রশান্ত মূর্ত্তি, ভিতরে নিঃশব্দে মৃত্যুর আগমন!

সংবাদ পাইয়া মহাশ্বেতা ও সুজাতাও আসিয়াছিলেন। মহাশ্বেতা উদয়নের মাতার সহিত উদয়নের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন, সুজাতা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না।

উদয়নের মাতা শোক সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন, নীরবে অশ্রু মোচন করিতেছিলেন। মহাশ্বেতা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিলেন।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে উদয়নের ক্লেশ হইতেছিল। মৃদুস্বরে কহিলেন, 'মা, মহামায়া আমাকে ডাকিয়াছেন।'

মহাশ্বেতা কহিলেন 'অমন কথা বলিতে নাই। মহামায়ার আশীর্ব্বাদে তুমি আবার সারিয়া উঠিবে।'

উদয়নের মুখে অতি ক্ষীণ, অতি মধুর, অতি নির্ম্মল হাসি দেখা দিল। কহিলেন, 'কাল রাত্রে দেবী স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। একবার রাজার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেবীর মন্দিরে শরণ লইয়াছিলাম। স্বপ্নে দেবী চিরাভয় দিবার নিমিত্ত আমাকে দেবলোকে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। আর অধিক বিলম্ব নাই, তোমরা দুই জননী আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন মহামায়ার চরণে আমি মুক্তি লাভ করি।'

উদয়নের মাতা ও মহাশ্বেতা কি বলিবেন? নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্তের পর উদয়ন কহিলেন, 'একবার সুজাতা—'

উদয়নের মাতা ও মহাশ্বেতা গৃহের বাহিরে গমন করিলেন। সুজাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। উদয়ন কহিলেন, 'ব'স।'

সুজাতা উদয়নের পাশে বসিলেন। চক্ষের জলে দেখিতে পাইতেছিলেন না। উদয়ন তাঁহার হস্তের উপর হস্ত রক্ষা করিলেন। সুজাতা দুই হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

উদয়নের কণ্ঠস্বর আরও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। কহিলেন, 'সুজাতা, মহামায়ার আদেশ, তাঁহার কাছে আমাকে যাইতে হইবে।'

সুজাতা মস্তক নত করিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার অশ্রু উদয়নের বক্ষে পতিত হইল।

উদয়ন কহিলেন, 'আর আমাদের দেখা হইবে না— ইহলোকে।'

অশ্রুজড়িত স্বরে সুজাতা কহিলেন, 'লোকান্তরে!'

উদয়নের চক্ষে আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছিল। কহিলেন 'বিদায়!'

সুজাতার মুখ আরও নমিত হইয়া ওষ্ঠাধর উদয়নের ললাটে স্পৃষ্ট হইল।

মরণোন্মুখ, মর্ম্মরিত বায়ুর ন্যায় উদয়নের শেষ নিঃশ্বাসের সহিত কথা আসিল, 'ছায়ায়! ছায়ায়!'

দেবীর করুণা ও মানবীর প্রেম-মমতার ছায়ায় ছায়ায় উদয়ন আনন্দলোকে গমন করিলেন।



বিগত কুম্ভমেলায় জনতার পেষণে মৃত ব্যক্তি (৩০শে চৈত্র, ১৩৩৩)

[শ্রী হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সৌজন্যে

ভাগ্যচক্র

শ্রী সীতা দেবী

পরীক্ষা শেষ করিয়া কলিকাতায় বসিয়া থাকা যে কি বিরক্তিকর ব্যাপার, তাহা গিরীশ আগে ভাবিয়া দেখে নাই। ভাবিলে বোধ হয় সহর ছাড়িয়া যাইবার পুরাপুরি ব্যবস্থা আগে হইতেই করিয়া রাখিত। তাহার বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী সকলেই যে যার পথ দেখিয়াছে, তাহাকে সঙ্গদান করিবার জন্য কেহই এখানে বসিয়া নাই। পাশের বাড়ীর বসুরা গরম পড়িতে-না-পড়িতেই পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া দার্জ্জিলিং চলিয়া গিয়াছে। গিরীশের সঙ্গে সে-বাড়ীর কোন মানুষেরই সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় নাই, কিন্তু মনে মনে সে তাহাদের সকলকেই বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিত। এত নিকটের বন্ধু বুঝি তার পরিচিতদের মধ্যেও কেহ ছিল না। এতখানি মানবপ্রীতির অবশ্য একটা কারণ কোথাও-না-কোথাও ছিল। কারণটির নাম ললিতা, বয়স বছর পনেরো ষোলো হইবে। সে বসু মহাশয়ের ভাগ্নী, কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করে, এবং প্রতিবেশী যুবক গিরীশের কবিতার খোরাক জোটায়। গিরীশের টেবলের দেরাজ ত নীলরংএর মলাটের খাতায় ঠাশা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু রাজধানীতে জ্যৈষ্ঠ মাসের আরম্ভটা কাব্যচর্চ্চার পক্ষে একেবারেই উপযোগী নয়। এত গরমে কাব্য-লক্ষ্মীও হয়ত মূর্চ্ছা যাইবার জোগাড় করিতেছিলেন। ঘরের ভিতর গিরীশ ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছিল। বিছানাটা যেন আগুন হইয়া আছে, শুইতে গেলে পিঠে ফোস্কা পড়ে। বাবার কি অন্যায়, বাড়ী যাইবার খরচ কোন্-কালে পাঠাইবার কথা, আর এখন পর্য্যন্ত একটা পয়সার সন্ধান নাই। আচ্ছা, টাকা আসুক, তাহার পর কে বাড়ী যায়, দেখা যাইবে। তাহার আর যাহারই অভাব থাক, বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই, এবং বন্ধুগুলির বাড়ীঘরেরও অভাব নাই। গিরীশকে অন্ততঃ তাহার গোটা দশ বারো বন্ধু গ্রীষ্মের ছুটী কাটাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছে। কাহারও-না-কাহারও বাড়ী গিয়া সে দু-টা মাস অতি স্বচ্ছন্দেই কাটাইয়া আসিতে পারিবে।

কিন্তু সম্প্রতি দুপুর-বেলাটা যে কি করিয়া কাটান যায়, তাহাই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। হোষ্টেলের যত ঘরে যত উপন্যাস, গল্পের বই, মাসিক পত্র, সংবাদপত্র ছিল, সব তাহার বার দশ করিয়া পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। বাহিরে ত অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে, সেদিকে পা বাড়াইবার জো নাই। বিছানা এত গরম এবং গৃহ-স্বামীটির মেজাজও এত উত্তপ্ত যে, ঘুমের কথা ভাবিয়াও লাভ নাই। চাকর হতভাগাকে ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ত তাহার প্রায় ভাঙিয়া গেল, কিন্তু তাহার টিকির সন্ধানও মিলিল না। কোথাও বেড়াইতে বাহির হইয়াছে বোধ হয়। গিরীশ নিজেই নীচে গিয়া চা করিয়া ফেলিবে, প্রায় প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছে এমন সময় সদর দরজার শিকলটা ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

গিরীশ মিনিটখানিক অপেক্ষা করিল, যদিই চাকরটা নীচে থাকে। কিন্তু দরজা খুলিবার কোনো শব্দ ত শোনা গেল না, বাহিরের শিকলটা আরও অধৈর্য্যভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। গিরীশকেই নীচে গিয়া দরজা খুলিতে হইবে, তাহা বেশ ভাল করিয়াই বোঝা গেল। ছেঁড়া চটি জোড়ার ভিতর পা ঢুকাইয়া বিরক্তমুখে সে দরজা খুলিতে চলিল।

দরজা খুলিয়াই দেখিল সাম্‌নে দাঁড়াইয়া তাহার পরম বন্ধু অতুল। বিরক্তিটা তাহার তখনই সূর্য্যালোকভীত কুয়াসার মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। সে কোথায় ভাবিতেছে অতুল গ্রামে বসিয়া মায়ের রান্না মাছের মুড়া ধ্বংস করিতেছে, না হতভাগা এই গরমে কলিকাতায় দাঁত বাহির করিয়া হাজির!

অতুলের পিঠে এক চড় মারিয়া সে চীৎকার করিয়া

বলিল, "তুই লক্ষীছাড়া এখানে কি ক'রে এলি রে? আমি ত ভাব্‌ছি যে, মাসখানেক হ'ল তুই দূর হ'য়েছিস্।"

অতুল ভিতরে ঢুকিয়া রুমাল দিয়া মুখ ও ঘাড় মুছিতে মুছিতে বলিল, "দূর ত হয়েইছিলাম, কিন্তু কাল আবার সেখান থেকেও দূর হ'য়ে এসেছি। ঢের মাতৃপিতৃস্নেহ উপভোগ করা গিয়েছে বাবা। হাড় জ্বালিয়ে তুলেছিল। না ব'লে ক'য়ে, সোজা লম্বা দিয়েছি।"

গিরীশ বলিল, "বেশ আছিস্ ছোঁড়া। এদিকে যে বুড়ো মা বাবা ভেবে মর্‌বে?"

"আরে, একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছি, বিশেষ কিছু ভাববার নেই। একটু চট্‌বে এই যা।" বলিয়া অতুল সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

গিরীশ তাহার সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল, "কিন্তু ব্যাপারখানা কি খুলে বল্ ত? বাড়ী যাবার জন্যে ত হেদিয়ে মর্‌ছিলি। তার পর হঠাৎ এসব কি?"

অতুল বলিল, "বিয়ে হে বিয়ে। তাঁরা আমার জন্যে এক ক'নে ঠিক করেছেন। খুব নাকি যোগ্য পাত্রী, অবশ্য তাঁদের মতে। কিন্তু টাকার জন্যে আর সব বিসর্জ্জন দিতে আমি অন্ততঃ রাজী নাই। তাও যদি টাকাটা আমার হাতে আস্‌ত ত কথা ছিল। যাবেত বুড়ো বাপের পকেটে। কিন্তু সে যাক্। আসল কথা হচ্ছে যে, আমার আর একটি মেয়েকে ভারি পছন্দ। কিন্তু কর্ত্তা-গিন্নির মোটেই মত নেই। বক্‌বকানি শুনে যখন দুই কান ভর্ত্তি হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন সোজাসুজি স'রে পড়লাম।"

সিঁড়ি পার হইয়া দুইবন্ধুতে গিরীশের ঘরে আসিয়া পৌঁছিল। গিরীশ বলিল, "পাঁচ মিনিট সবুর কর্। চাকর হতভাগা কোথায় যে গিয়েছে ঠিকানা নেই, ষ্টোভটা আমিই ধরিয়ে ফেল্‌ছি। এক টিন বিস্কিট ছিল সেটা গেল কোথায়?"

অতুল ধপ্ করিয়া গিরীশের বিছানায় বসিয়া পড়িয়া, ভাঙ্গা তালপাতার পাখায় হাওয়া খাইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "ধুত্তোর, রাখ্ এখন তোর আতিথ্য। গরমে গ'লে যাবার জোগাড় হ'লাম, এখন আমার চায়ের দরকার নেই। চাকর আসুক, তারপর বরফ লেমনেড আনিয়ে খাওয়া যাবে। এখন বোস্ দেখি, একটু কথা বলতে দে।"

গিরীশ তাহার পাশে বসিয়া বলিল, "কি বল্‌বি বল্।"

অতুল বলিল, "দেখ্ তুই ত এক মস্ত কবি মানুষ। রোমান্সে তোর মাথার থেকে পায়ের কড়ে আঙুল অবধি ঠাসা। আমার একটু কাজ ক'রে দে না? এ বেশ তোর লাইনেই হবে।"

গিরীশ বলিল, "কি কর্‌তে হবে শুনি? তুমি বাছা যদি ভেবে থাক, যে, খুব ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা ক'রে, আমি তোমার মা বাবার মত বদ্‌লে দেব, আর তাঁরা টাকা-কড়ির সব ভাবনা ভুলে তোমায় যত খুসি কবিত্ব কর্‌তে দেবেন, তা হ'লে তোমার একটু ভুল হয়েছে। বক্তৃতা করাটা আমার লাইন মোটেই নয়। বরং বিয়ের কবিতা-টবিতা লিখ্‌তে হয় ত বল।"

অতুল পাখার বাড়ী তাহার মাথায় এক ঘা দিয়া বলিল, "যে আজ্ঞে, কবিতার অর্ডার দেবার জন্যেই আমি এতদূর ছুটে এসেছি আর কি? বাজে ইয়ার্কি না মেরে, এখন কথাটা শোন্। আমার পিতাঠাকুর যে ক'নেটি ঠিক করেছেন, সেটি দেখ্‌তে নাকি সাক্ষাৎ রক্ষাকালী। কিন্তু মেয়ের বাপ আমার বাবার ছেলেবেলাকার বন্ধু, আদ্যিকালে এক ক্লাশে প'ড়েওছিলেন বুঝি। তাছাড়া বুড়োর টাকাকড়ি বেশ কিছু আছে ব'লে শোনা যায়। আমার বাবার আশা যে, মেয়েই টাকাকড়ি সব পাবে, কিন্তু সে গুড়ে বালি হে! আমি তলে তলে সব সঠিক খবর পেয়েছি। বিয়ের সময় গহনাগাঁটি, টাকাকড়ি কিছু পাবে অবশ্য, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। মেয়ের মা মরেছে অনেক কাল, বাপ বুড়ো আবার বিয়ের চেষ্টায় আছে, মেয়ের বিয়ে অবধি অপেক্ষা। তবে বল্ দেখি, শুধু শুধু এক কাল-পেঁচা ঘাড়ে কর্‌বার আমার কি দরকার?"

গিরীশ নারীজাতির মহা ভক্ত। এমন অবজ্ঞার সুরের কথা শুনিয়া সে অতুলের উপর মহা চটিয়া গেল। বলিল, "তুমি নিজেও ত আর ময়ূরবাহন কার্ত্তিকটি নও? অন্যের রূপের বেলা বড় যে কড়াকড়ি দেখছি?"

অতুল বলিল, "আমি কার্ত্তিক কি হনুমান সে কথা হচ্ছে না। আমি যেমন আছি, আছি। কাউকে

আমি জোর ক'রে আমাকে বিয়ে কর্‌তে বাধ্য কর্‌ছি না ?"

গিরীশ জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটিকে নিজে দেখেছ ?" তাহার কবিত্ব-প্রবণ মন এরই মধ্যে একটি অবজ্ঞাতা, অনাদৃতা, কালো মেয়েকে ঘিরিয়া উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। করুণায় তাহার মন বেশ খানিকটা ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

অতুল বলিল, "আমি দেখিনি হে, তবে আমার এক ফ্রেণ্ড্ দেখেছে। সেই-ই ত সব খবর আমায় এনে দিল।"

গিরীশ বলিল, "তা বেশ। কিন্তু আমায় যে কি কর্‌তে হবে, সেইটাই মাঝখান থেকে শোনা হ'ল না।"

তাহার বন্ধু বলিল, "সেসব এখনও ঠিক করিনি ভেবে। মোট কথা, তুই চল্ আমার সঙ্গে, তারপর একটা প্ল্যান্ জুটেই যাবে। তোর মাথায় ত নানারকম বুদ্ধি খেলে, একটা কিছু কি আর ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌বি না ?

গিরীশ বলিল, "বেশ, আমি যাচ্ছি চল্। আমার ত গরমে আর বিরক্তিতে হাড় ভাজা হ'য়ে এল। কিন্তু ট্যাঁক আমার খালি, তা ব'লে রাখছি বাবা। রেলওয়ে কোম্পানী ত আমার শ্বশুর নয় যে মুখ দেখেই যেতে দেবে ?"

অতুল বলিল, "নে নে আর রসিকতা কর্‌তে হবে না। চারটে টাকার জন্যে সব অচল হ'য়ে যাবে আর কি ? কাল সন্ধ্যায় ট্রেন, বুঝলি ? ঠিক সাড়ে ছটায়। এখান থেকে তোকে নিয়ে যাব, না তুই সোজা ষ্টেশনেই যাবি ?"

"আমি সোজা ষ্টেশনেই যাব এখন, তোকে আর এতদূর আস্‌তে হবে না," বলিয়া গিরীশ বন্ধুকে বিদায় করিয়া দিল। সে যাইবামাত্র নিজের মাথায় একটা চড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, "যাঃ ছোঁড়াকে বরফ লেমনেড দিতে ভুলেই গেলাম। যাক্, বিয়ের চিন্তায় এখন এত ভরপূর হ'য়ে আছে, যে, ও সব গ্রাহের মধ্যেই আন্‌বে না।"

পরদিন সন্ধ্যায় গাড়ী ডাকিয়া, পোঁটলা পুঁট্‌লি সমেত তাহাতে চড়িয়া গিরীশ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অতুলের বাড়ী যে গ্রামে, সেটি বিশেষ বড় নয়, কিন্তু দেখিতে বেশ ছবিখানির মত। ট্রেন হইতে তাহার শোভা দেখিয়াই ত গিরীশ মজিয়া গেল। বন্ধুকে বলিল, "এমন জায়গায় লোকে সুখী না হ'য়ে যায় না। কি চমৎকার দৃশ্য দেখ ত ! চোখ যেন জুড়িয়ে যায় !"

অতুলের তখন কবিত্ব করিবার অবকাশ মোটেই ছিল না। সে তখন টাকা আনা পাইয়ের হিসাবে ব্যস্ত। গিরীশের কথার উত্তরে সে অতি সংক্ষেপে বলিল, "দৃশ্যতে পেট ভরে না হে !"

অতুলের বাবা মা গিরীশকে সাদরেই অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার আকস্মিক আবির্ভাবে তাঁহারা যে বেশ খানিকটা অবাক হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের ধরণ-ধারণে বোঝাই গেল। অতুল কিন্তু বাঁচিয়া গেল। পরের ছেলের সামনে ঘরের ছেলেকে গালাগালি করা চলেনা, কাজেই তাহার মা বাবা মনের রাগ মনেই রাখিয়া দিলেন।

খাওয়া দাওয়া সারিয়া দুই বন্ধুতে গিয়া অতুলের ঘরে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। অতুলের একটি ছোট বোন আসিয়া তাহাদের জন্য পান রাখিয়া গেল। এখন তাহাদের ব্যূহভেদ করিবার উপায় ঠিক করার পালা। কিন্তু গিরীশ চট্ করিয়া কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

অতুল অত্যন্ত আশান্বিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে বলিল, "কিছু প্ল্যান কর্‌বার আগে আমার ত সব কথা ভাল ক'রে জানা দরকার ?"

অতুল বলিল, "তোমার জান্‌তে বাকি আছে কি ?" গিরীশ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এটা ত ঠিক যে তুই সে মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে কর্‌বি না ? এবং আর একটি মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে তুই একেবারে জীবন পণ ক'রে বসেছিস্ এটাও ঠিক ত ?"

অতুল একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তা এক রকম ঠিকই।"

গিরীশ বলিল, "তা হ'লে তুই তোর বাবার কাছে সব কথা খুলে বল্ না ? তিনি যদি জানেন যে, তুই অন্য

একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করতে চাচ্ছিস্, তাহ'লে কি আর তিনি তোকে এই মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে জোর করবেন?"

অতুল মুখটা অত্যন্ত বাঁকা করিয়া বলিল, "আহা, কিযে প্ল্যানই বের করলে! আমার বাবাকে তুমি কি একটি রোমান্সভক্ত নব্য ছোক্‌রা ঠিক করেছ? তাঁর কাছে গিয়ে এই সব কথা বললে, তিনি খড়মের এক বাড়ীতে আমার পিলে না ফাটিয়ে দেন ত ঢের। তাঁরা হচ্ছেন সব মান্ধাতার আমলের মানুষ, বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে স্বাধীনতার পক্ষপাতী মোটেই নন। স্ত্রী শুধু স্বামীর পত্নী নয়, সে পরিবারের বউ, সুতরাং সমস্ত পরিবার মিলে তাকে নির্ব্বাচন করবে, এই হচ্ছে তাঁদের আইডিয়া।"

গিরীশ বলিল, "তা বেশ ত। কিন্তু তুইও ত সে পরিবারের একজন? তোরই বা কোন কথা খাটবে না কেন? যাই বল্, তোকেই ত স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে হবে?"

অতুল বলিল, "নিজের বিয়ের কথায় কথা বল্‌তে যাওয়া নাকি ভয়ানক বেহায়ামী।"

গিরীশ বলিল, "তবে কি ঘোড়ার ডিম আমাকে দিয়ে করাতে চাস্, তাই বল্ না।"

অতুল বলিল, "বাবা বলছেন, তিনি তাঁর বন্ধুকে কথা দিয়ে রেখেছেন ব'লে সে ভদ্রলোক মেয়ের জন্যে আর অন্য পাত্র খোঁজেননি। এখন আমি যদি বিয়ে না করি তাহ'লে বাবার মাথা অত্যন্ত হেঁট হ'য়ে যাবে। তবে আমি যদি মেয়েটির জন্যে অন্য উপযুক্ত পাত্র ঠিক ক'রে দিতে পারি, তাহ'লে তিনি আর আমাকে বিয়ের জন্যে জোর করবেন না, একথাও তিনি বলেছেন। মেয়ের বাপের টাকাকড়ির খ্যাতি আছে, কাজেই বর পাওয়া বাংলা দেশে বেশী শক্ত হওয়া উচিত নয়।"

গিরীশ খাট ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "তুই এই মতলবে আমাকে এখানে নিয়ে এলি নাকি?"

অতুল বলিল, "তাই যদি হয় ত ক্ষতি কি? তুই না বলিস্ যে, সব ভদ্র বাঙালী ছেলেরই এখন পূর্ব্ব পুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কালো আর গরীব মেয়ে বিয়ে করা উচিত? এত তবু শুধু কালো, গরীব নয়। তুই সব দিক দিয়েই ঠক্‌বি না।"

গিরীশ ভাবিয়া দেখিল সে এই রকম কথা বলিয়াছে বটে। কিন্তু তখনও সে ললিতাকে দেখে নাই। এখন তাহার পক্ষে অন্য মেয়ে বিবাহ করা অসম্ভব। ললিতা হয়ত হিমালয়ে বসিয়া তপস্বিনী গৌরীর মত তাহারই ধ্যান করিতেছে। আর সে কি না টাকার লোভে অন্য মেয়ে বিবাহ করিতে যাইবে? এমন মহা পাপ সে কখনও করিতে পারিবে না।

অতুলের কথার উত্তরে সে বলিল, "সে তখন যা বলেছি, বলেছি। আমার মত এখন বদলে গেছে।"

অতুল অবজ্ঞাভরে বলিল, "জানাই ছিল। বক্তিমে করা এক, আর কাজে করা এক। কিন্তু তোর সঙ্গে ত ঢের ঢের ছেলের আলাপ আছে; তার মধ্যে এমন একটাও কি খুঁজে বার করতে পারবি না যে রূপের বদলে রূপো নিয়েই খুসি থাকবে?"

গিরীশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা পারব না কেন? কিন্তু সে ত আর এখানে ব'সে হবে না। আমায় তাহ'লে কল্‌কাতায় ফিরতে হয়। টাকার লোভে বিয়ে করবে, এমন ছেলের অভাব কি? বেশীর ভাগ বাঙালীর ছেলেই তা করতে রাজী হবে।"

অতুল বলিল, "মেয়ে যে দেখতে একান্ত কুৎসিৎ, তা তাদের নাই বা বল্‌লি। মাঝারী গোছের বল্লেই চল্‌বে। টাকার কথাটা খুব ফলিয়ে বলিস্।"

গিরীশ বলিল, "আচ্ছা, কাল্‌কের ট্রেনেই তা হ'লে ফেরা যাবে।"

অতুল বলিল, "বাপ্‌রে, তাড়া দেখ। রীতিমত ভড়কে গিয়েছিস্ দেখছি। এখন কলকাতায় গিয়ে কাকে পাবি? সব ত যে যার বাড়ী চ'লে গেছে, কলেজ খুলবার আগে কোনো শর্ম্মার টিকিও দেখতে পাবি না। তার চেয়ে আর দুটো দিন থেকে যা না? একলা একলা আমার ত পেট ফুলে মরবার জোগাড় হয়।"

বন্ধুর সঙ্গসুখ উপভোগ করার উৎসাহ গিরীশের অত্যন্তই জুড়াইয়া গিয়াছিল। তবু ভদ্রতার খাতিরে সে

বলিল, "আচ্ছা, দেখা যাক্। এখন একটু ঘুমনো যাক, কাল ট্রেনে একেবারে ঘুম হয় নি!"

অতুল নিজের মনেই বকবক করিয়া চলিল, "বুড়ো বাপটারও আক্কেল দেখনা। তাঁর এই বুড়ো বয়সে সাধ হ'ল বিয়ে কর্‌তে। মেয়েকে সব টাকাকড়িগুলো দিলে তার একটা ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারত।"

গিরীশের মেজাজ গরম ছিল, সে বলিল, "ভদ্রলোক নয়, চামার বল্। টাকার লোভে যারা বিয়ে করে, তারাই তোর মতে ভদ্রলোক না কি?"

অতুল উত্তর দিল না। গিরীশ খানিক পরে দিব্য নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিল।

বিকাল বেলা অতুলের নিমন্ত্রণ ছিল, তাহারই এক কাকার বাড়ীতে। সে গিরীশকে জিজ্ঞাসা করিল, "একলাই ঘরে ব'সে থাক্‌বি না কি রে?"

গিরীশ বলিল, "ঘরে ব'সে থাক্‌ব কি দুঃখে? আমি খানিকটা ঘুরে আসি। তোদের গ্রামটা বেশ ছবির মত দেখ্‌তে, একটু ভাল ক'রে ঘুরে আসা যাক্।"

দুই বন্ধুতে এক সঙ্গেই বাহির হইল। অতুলকে তাহার কাকার বাড়ী ঢুকাইয়া দিয়া গিরীশ সোজা চলিতে লাগিল। বিকাল বেলাটা আর তত গরম ছিল না। গ্রামের পথে চলিতে চলিতে তাহার মনটা বেশ কবিত্বরসে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। পল্লী-লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য তাহার হৃদয়-লক্ষ্মীকে বড় বেশী মনে পড়াইয়া দিল। সে তাহার চিন্তায়ই তন্ময় হইয়া চলিতে লাগিল।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের উচ্চ হাস্যধ্বনি তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া দিল। গিরীশ চারিধারে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল যে, সে চলিতে চলিতে গ্রামের একটি বড় পুকুরের পাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। এইটিই বোধ হয় গ্রামের মেয়েদের বৈকালিক সভার স্থান। ভাগ্যে অনেক গুলি ঝোপঝাড় ঘাটটিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা না হইলে গিরীশকে অত্যন্তই অপ্রস্তুতে পড়িতে হইত। তাহার তখনই চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহার পা দুটা বিদ্রোহ করিয়া কিছুতেই নড়িতে চাহিল না।

"দেখ, রমা, শীগ্‌গীর চ'লে আয় বল্‌ছি, তা না হ'লে পিসীমা গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেবেন। সন্ধ্যে যে হ'য়ে এল।"

উত্তরে শোনা গেল, "বাবারে বাবা! পাঁচ মিনিট আর সবুর কর্‌তে পার না? আঁধার হবার আগে বাড়ী ফির্‌লেই হ'ল, পিসীমা তাহ'লে কিছু বল্‌বেন না।"

গলার স্বরটা বড় বেশী পরিচিত যে! গিরীশের সারা শরীরে পুলকের শিহরণ খেলিয়া গেল। সে এখানে আসিল কি করিয়া? কোথায় দেবতাত্মা নগাধিরাজের অভ্রভেদী শিখর আর কোথায় বাংলা দেশের ক্ষুদ্র পাড়াগাঁ। কিন্তু গলার স্বর যে একেবারে হুবহু এক! এরকম হওয়া কি সম্ভব? নামটি রমা, ললিতা নয়। কিন্তু রমা নামটিও বেশ মিষ্ট।

ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবার কৌতূহল তাহাকে প্রবলবেগে সেইদিকে টানিতে লাগিল। নিতান্ত ভদ্রলোকের ছেলে, তাই সে কোনো প্রকারে সাম্‌লাইয়া গেল। কিন্তু সেখান হইতে নড়িলও না। কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীটিকে না দেখিয়া সে যাইবে না, সংকল্পই করিয়া লইল।

সৌভাগ্যক্রমে তাহাকে বড় বেশী দেরি করিতে হইল না। মেয়ের দল গল্প এবং স্নান শেষ করিয়া, কলসে জল ভরিয়া যে যার গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। গিরীশের উচিত ছিল পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাওয়া, সে তাহা না করিয়া হাঁ করিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। ফলে মেয়েগুলি পথের উপর আসিয়াই তাহাকে দেখিতে পাইল এবং তাহাতে বিশেষ খুসিও হইল না।

"দেখ্ একবার লোকটার রকম, মেয়েদের পুকুরের কাছে কি রকম হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।"

রমা নামধারিণীটি অসভ্য মানুষটাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে ফিরিয়া তাকাইল। গিরীশ দেখিল সে ললিতা। মেয়েটিও তাহার কলিকাতার প্রতিবেশীটিকে এখানে দেখিয়া চম্‌কাইয়া গেল।

তাহার সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটাকে চিনিস্ নাকি? দেখে অমন চম্‌কে গেলি যে?"

রমা বলিল, "চিন্‌ব আবার কোথা থেকে? কল্‌কাতায় আমাদের পাশের বাড়ীতে একটা ছেলে থাকে,

তার মতন অনেকটা দেখ্‌তে, তাই একটু অবাক লাগ্‌ছিল। চল্‌ বাড়ী যাই, একেবারে আঁধার হ'য়ে এল।" মেয়ে দুটি দ্রুতগতিতে গিরীশের দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া গেল।

গিরীশের এতক্ষণে যেন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, অন্য কেহ তাহাকে দেখিবার আগে সে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল। কোথা দিয়া কোথায় সে যে চলিল, তাহা লক্ষ্যও করিল না। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করিয়া অবশেষে সে যখন বাড়ী ফিরিল, দেখিল অতুল তখনও আসে নাই।

চাকর আসিয়া ঘরে আলো দিয়া গেল। গিরীশ ফিরিয়াছে দেখিয়া সে আবার অন্তঃপুরে চলিল, তাহার জন্য কিছু জলখাবার আনিতে। গিরীশ মনে মনে অতুলকে গাল দিতে দিতে সবে জলযোগ আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় অতুল ফিরিয়া আসিল। তাহার সঙ্গে আর একটি যুবক।

গিরীশের সঙ্গে নবাগত যুবকের পরিচয় করাইয়া দিতে দিতে অতুল বলিল, "এই আমার বন্ধু সুবোধ হে, যার কথা তোমায় সেদিন বল্‌ছিলাম।"

সুবোধ বসিয়া বলিল, "আশা করি আমার নামে বেশী কিছু আপানার কাছে ও বলেনি?"

গিরীশ হাসিয়া বলিল, "বরং আপনার প্রশংসাই কর্‌ছিল। আপনি নাকি ওকে খুবই সাহায্য করেছেন।"

ছেলেটি হাত নাড়িয়া বলিল, "আরে কিছু না, মশায়, কিছু না, কয়েকটা খবর এনে দিয়েছিলাম মাত্র।"

অতুল হাসিয়া বলিল, "গিরীশের সাম্‌নে কিছু লুকোবার নেই হে, তাকে সব কথাই আমি বলেছি।"

সুবোধ বলিল "তা আর বল্‌বিনা? ভয়ে তোর দেখ্‌ছি হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে যাবার জোগাড় হয়েছে।"

অতুল চটিয়া বলিল, "আমার মত দশা হ'লে, তুমি কেমন ভয় না পেয়ে থাক্‌তে, দেখতাম। কথা নেই বার্ত্তা নেই, হঠাৎ এক রক্ষাকালী ঘাড়ে চড়বার উপক্রম, এতে মানুষের মাথার ঠিক থাকে?"

সুবোধ আর এ বিষয়ে কিছু না বলিয়া, তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িয়া বসিল। তাহার ধরণ ধারণ গিরীশের কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকিল, কিন্তু মনের ভাব মনেই চাপিয়া রাখিয়া সেও গল্পে মাতিয়া উঠিল।

সুবোধ খানিক পরে চলিয়া গেল। পল্লীগ্রামের পথ শীঘ্রই জনবিরল হইয়া আসিল। জানালা দিয়া বাহিরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া গিরীশ ভাবিতে লাগিল, জায়গাটি দেখিতে বেশ বটে, কিন্তু থাকিবার পক্ষে খুব যে ভাল তাহা বলা যায় না। সন্ধ্যার পর পেট ভরিয়া খাওয়া এবং নাক ডাকাইয়া ঘুমানো ছাড়া আর যে কি করা যায়, তাহা ত ভাবিয়া পাওয়াই শক্ত। অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছিস্‌ হাঁ ক'রে?"

গিরীশ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোর বন্ধুর বিয়ে হয়েছে রে?"

অতুল বলিল, "না, কিন্তু হঠাৎ তার বিয়ে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?"

গিরীশ বলিল, "বিশেষ কোনো কারণ নেই, এম্‌নি। সে কথা যাক্‌। তুই একদিন আমার ক'নে দেখার ব্যবস্থা করে দিতে পারিস্‌? আমি কল্‌কাতায় ফিরে গিয়ে যে ছেলেটির শ্রাদ্ধের জোগাড় কর্‌ব, তাকে একটু first-hand information দিতে চাই।"

অতুল বলিল, "সে আর শক্ত কি? তারা ত মেয়ে দেখাবার জন্যে দেড় পা বাড়িয়ে আছে। আমরা মুখের কথা খসালেই হয়।"

এমন সময় খাবার ডাক আসিল। রান্নাঘরের সাম্‌নের দাওয়ায় দুখানি পুরানো শতরঞ্চির আসন পাতা। সাম্‌নে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন, ভাঙা চিম্‌নীর ভিতর দিয়া ক্ষীণ আলো এবং প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। এভাবে খাওয়ার অভ্যাস গিরীশের অনেক দিনই চলিয়া গিয়াছিল। হোষ্টেলের প্রকাণ্ড ঘর, ইলেক্‌ট্রিক্‌ বাতি, খাবার টেবল্‌ প্রভৃতি স্মরণ করিয়া সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ভাবিল, মাছের কাঁটা বাছিতে পারিলেই হয়, এবং অন্নব্যঞ্জনের সহিত গুটি দশ বারো পোকামাকড় পেটে না যায় ত ঢের।

কিন্তু অন্নব্যঞ্জনের সাক্ষাৎ যখন মিলিল, তখন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার তাহার অবসর রহিল না। কলিকাতার হোষ্টেল আর যে দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠ হোক, তাহাদের

রাঁধুনী ব্রাহ্মণ-তনয়টি যে অতুলের মায়ের বাঁ পায়ের ক'ড়ে আঙুলেরও যোগ্য নয়, একথা সে সত্যের খাতিরে স্বীকারই করিল। আর এখানকার পুকুরের মাছের সঙ্গে রাজধানীর বিদেশাগত বরফবিহারী মৎস্যবৃন্দের যে তুলনা হয় না, তাহাও না মানিয়া উপায় নাই।

পরদিন ভোর হইতে-না-হইতেই অতুল বন্ধুকে ক'নে দেখাইবার জোগাড়ে লাগিয়া গেল। সোজাসুজি বাপের কাছে গিয়া ত আর একথা বলা যায় না। কাজেই একটু বাঁকা পথ ধরিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে তাহার দিদি তখন বাপের বাড়ী বাস করিতেছিলেন, সে তাঁহার দরবারে হাজির হইল। দিদি কথার ধরণে বুঝিলেন, ভাইয়ের আবার মতি ফিরিয়াছে, এখন বিবাহটা ঘটিলেও ঘটিয়া যাইতে পারে। একটুখানি হাসিয়া তিনি পিতার সম্মতিটা আদায় করিয়া দিলেন।

ক'নে দেখার দিন ইত্যাদি চট্ করিয়াই ঠিক হইয়া গেল। গিরীশ ত আর একলা যাইতে পারে না, কাজেই অতুলের এক বৃদ্ধ খুড়া তাহার সঙ্গী হইলেন। বাড়ী হইতে বাহির হইবার আগে গিরীশ অতুলকে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ, মেয়ে হয়ত খুব কুৎসিত নাও হ'তে পারে। যদি চলনসই গোছের হয়, তুই বিয়ে কর্‌বি?"

অতুল বলিল "তাহ'লে না হয়—" কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্বর বদ্‌লাইয়া বলিল, "না, না, অসম্ভব! আর এক জায়গায় নিজের কাছে আমি সত্যবদ্ধ, আমি আর কাউকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না।"

গিরীশ অতুলের বৃদ্ধ খুড়ার সহিত বাহির হইয়া পড়িল। ক'নের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তাহার বুক ধড়াশ্ ধড়াশ্ করিতে লাগিল। হয়ত বা ক'নের বাড়ীর মেয়ে-মহলে সেও আছে।

যথাস্থানে পৌঁছিবামাত্র সে যে সাদর অভ্যর্থনা পাইল, তাহাতে তাহার মনের ভিতরটা খুসি না হইয়া পারিল না। বাঙালীর ছেলের ভাগ্যে রাজসমাদর এই একবার মাত্রই আসে, কাজেই সেটা পুরোপুরি উপভোগ করিবার জন্য গিরীশ মনটাকে অন্যদিক হইতে ফিরাইয়া আনিল। মেয়ের পক্ষের কয়েকটি যুবক তাহার সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হইল, সেও শীঘ্রই নানা গল্পে ডুবিয়া গেল। কিন্তু চোখ দুইটা তাহার দরজা জানলার ফাঁকে ফাঁকে কেবলি কাহার যেন সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু সে কি ধরা দিল? অনেক হরিণনয়ন নলিননয়ন যে অন্ধিসন্ধি দিয়া তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহা সে বুঝিতেই পারিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টিও কি আছে ইহার মধ্যে?

হঠাৎ গহনার রিনিঝিনি তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল, ঘরখানি যেন শত সহস্র ফুলের সৌরভে ভরিয়া উঠিল। গিরীশ চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ক'নে ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে।

বাহিরের আকাশে তখন গোধূলি ছিল কি না জানা নাই, কিন্তু আমাদের যুবকটির বুকের ভিতর যে গোধূলির বর্ণচ্ছটা ঝল্‌মল্ করিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে চিরজীবন এইক্ষণটিকে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ শুভক্ষণ বলিয়া স্মরণ করিত। তাহার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কে এ? এ কি রমা? না ললিতা? পরণে তার পদ্মরাগ মণির রঙের শাড়ী, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনের অলকা-তিলকা। দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র তাহার মুখখানি ফুল্ল গোলাপের লালিমায় ছাইয়া গেল।

গিরীশ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। সৌভাগ্য-ক্রমে তাহার বৃদ্ধ সঙ্গীটিই ক'নেকে পরীক্ষা করার ভার নেওয়াতে সে বাঁচিয়া গেল। তাহা না হইলে সে কিসের উত্তরে যে কি বলিত তাহার ঠিকানাই নাই। মেয়ের নাম, সে কি পড়ে, ঘরের কাজ জানে কি না, শেলাই করিতে পারে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া মেয়ে যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল তখন গিরীশ যেন আশমান হইতে মাটিতে নামিয়া আসিল।

ক'নের বাপ বলিলেন, "মেয়ের আমার, আপনাদের আশীর্ব্বাদে পাত্রের অভাব নেই, অনেকগুলো সম্বন্ধই এসেছে। একটি ছেলে তার মধ্যে বেশ উপযুক্ত। কিন্তু কথা দিয়ে কথা ভাঙবার মানুষ আমি নই। মহেশবাবু যদি কথা রাখেন, আমিও রাখব। অন্ততঃ তাঁর কাছে সোজা জবাব পাবার আগে আর কোথাও মেয়ের সম্বন্ধ কর্‌ছি না।"

"কাদের ছেলে মশায়?" অতুলের খুড়া এই প্রশ্নটি করিবার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না।

ক'নের বাবা বলিলেন, "আরে এই যে আমাদের ও পাড়ার সুবোধ, বুড়ো অধর মিস্তিরের ছেলে। ছেলে পড়াশুনায় বেশ ভাল শুনেছি।"

গিরীশ মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ না করিয়া পারিল না। সে সুবোধের মতলব ঠিকই ধরিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিবামাত্র অতুল ছুটিয়া আসিয়া গিরীশকে হিড়হিড় করিয়া নিজেদের ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, অত মুখ হাঁড়ি ক'রে রয়েছিস্ কেন? মেয়ে ভয়ানক কুৎসিৎ নাকি? তা তোকে ত আর জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে না কেউ। সুবোধকে আমি রাজী ক'রে দিতে পারি, সে টাকা পেলে আর কিছু চায় না।"

গিরীশ মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, তোমায় কিছু কর্‌তে হবে না। মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে আমি যথেষ্টই রাজী আছি।"

অতুল সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "এঃ মহা ব্যস্ত যে দেখি। আচ্ছা, সত্যি কথা বল্‌ত? মেয়ে কেমন দেখতে?"

গিরীশ একটু বিপদে পড়িল। যদি বলে সুন্দর, তাহা হইলে ত অতুলের মত বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রাণ ধরিয়া ললিতাকে কুৎসিৎই বা সে বলে কি করিয়া? ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "কুৎসিৎ যাকে বলে তা নয়।"

অতুল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "তবে সুবোধ লক্ষ্মীছাড়া আমার কাছে মিথ্যে কথা বল্‌ল কেন?"

গিরীশ বলিল, "তিনি স্বয়ং মেয়েটির পাণিপ্রার্থী কি না তাই।"

অতুল রাগে লাল হইয়া বলিল, "তা হ'লে, তার বাপ আবার বিয়ে কর্‌বে, মেয়ে টাকা পাবে না, এসবও তার বানান কথা?"

গিরীশ ভয় পাইয়া গেল। অতুল যদি মেয়ে দেখিতে চায়, তাহা হইলেই হইয়াছে। সে বলিল, "না, না, ওগুলো বানান নয়, আজ যা শুন্‌লাম তাতে আমারও ঐ রকমই মনে হ'ল।"

অতুল প্রাণ খুলিয়া সুবোধকে গাল দিতে আরম্ভ করিল। গিরীশ বলিল, "তুমি বাপু, যখন অন্য জায়গায় হৃদয়দান ক'রে বসে আছ, তখন এত চট্‌বার কি আছে? তোমার কি ইচ্ছে যে জগতের সব মেয়ের তুমি একমাত্র পাত্র হ'য়ে থাক?"

অতুল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "মোটেই তা নয়, তবে পাজীটা আমার কাছে মিথ্যা কথা বল্‌ল কেন? সে বিয়ে কর্‌তে চায় একথা খোলাখুলি বল্‌লেই পার্‌ত? আমি ত বলেইছিলাম যে আমি ও মেয়েকে বিয়ে কর্‌ব না। দাঁড়াও, বাছার গুড়ে আমি বালি দিচ্ছি। বাবাকে জানালেই হবে যে, তুমি বিয়ে কর্‌তে রাজী, আর বিয়েটা শীগ্‌গিরই যাতে হয়, তাই চাও। পাঁচদিনের ভিতর বউ নিয়ে দেশে ফির্‌তে পার্‌ব হে।"

গিরীশ বলিল, "আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই।" অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু তোমার বাবা মাকে খবর দেবে না?"

গিরীশ বলিল, "তা দিলে হয়। টাকা-কড়ির গন্ধ যখন আছে, তখন বাংলা দেশের কোন্ বুড়া-বুড়ী আপত্তি কর্‌বে? ছেলে চায় রূপ, ছেলের বাপ চায় রূপো।"

বিয়ের দিন দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। গিরীশের বাবা এই বিবাহে আপত্তিজনক বিশেষ কিছু দেখেন নাই কাজেই তিনিও আসিয়াছেন। শুক্লপক্ষেই দিন পড়িয়াছিল, কাজেই রাত্রিটি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। বর তখনও যাত্রা করে নাই, বাড়ীতে উৎসবের কোলাহল পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে। অতুলের মা বাবা ছেলের বন্ধুর বিবাহ দিয়াই যেন ছেলের বিবাহের সাধ মিটাইতে বসিয়াছেন। রসুনচৌকী শুদ্ধ বাদ যায় নাই।

গিরীশ ঘরে বসিয়া কল্পনাকে একেবারে লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার বন্ধুর দল তখনও আসিয়া জোটে নাই।

হঠাৎ অতুল ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "কি হয়েছে জানিস্?"

গিরীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি রে?" অতুল বলিল, "সে এখানে এসেছে। একটু আগে যখন তোর শ্বশুর-

বাড়ীর পাশ দিয়ে আসছিলাম দেখ্‌লাম এক পাল মেয়ের মধ্যে সেও ঘুরছে। ওদের কোনো আত্মীয় হবে বোধ হয়।"

গিরীশ তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া বলিল, "বেশ বেশ, আমার জন্যে যে রসুনচৌকীর আমদানী হয়েছে, সেটাকে আর বিদায় করতে হবে না, একেবারে তোর বিয়ের বাজনা বাজিয়ে বিদায় হবে।"

বরযাত্রী বাহির হইবার সময় হইয়া আসিল। মহা-কোলাহলে পল্লীপথ সচকিত করিয়া গিরীশ চলিল বিবাহ করিতে। পরের কয়েকটা ঘণ্টা কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল তাহা সে বুঝিতেই পারিলনা। তাহার মন জুড়িয়া কেবল এই কথাই জাগিতে লাগিল, ললিতা তাহার হইয়াছে, জগতে আর কেহ, কিছু তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিবে না।

বাসরঘরে বসিয়া ক'নের বাড়ীর মেয়ের দল আর প্রতিবেশিনীবৃন্দের ঠাট্টা-তামাসার চোটে বর বেচারা ঘামিয়া উঠিল। কল্পনার নেশা তাহার ছুটিয়া গেল। বাসরঘরে বর ছাড়া অন্য পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, কাজেই গিরীশের বন্ধুর দল দরজার কাছে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া রসিকতার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হঠাৎ মেয়ে-পুরুষ সকলের ভীড় ঠেলিয়া অতুল ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সোজা বরের কাছে গিয়া, তাহার হাত ধরিয়া একটান দিয়া সে উত্তেজিতভাবে বলিল, 'বাইরে আয় একটু।"

গিরীশ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু অতুলের অবস্থা দেখিয়া সে আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, মেয়ের দলের প্রবল আপত্তিতেও কান দিল না।

বাহিরে আসিবামাত্র অতুল বলিল, "তুই শেষে আমার এই সর্ব্বনাশ কর্‌লি? সুবোধকে বৃথাই সেদিন গাল দিলাম, তোরা সবাই সমান।"

গিরীশ অবাক হইয়া বলিল, "আমি তোর সর্ব্বনাশ কর্‌লাম? কি বল্‌ছিস্ তুই?"

অতুল বলিল, "আর ন্যাকা সাজতে হবে না। তুই মেয়ে দেখে গেলি যখন, কেন বল্‌লি না যে, সে তোর হোষ্টেলের পাশের ডাক্তারের ভাগ্নী ললিতা?"

গিরীশ বলিল, "হঠাৎ সে খবরে তোমার দরকার হবে তা আমি কি ক'রে জান্‌ব?"

অতুল মুখ লাল করিয়া বলিল, "না, তা আর জান্‌বে কি ক'রে? মিথ্যে কথায় তুমিও সুবোধের চেয়ে কম যাও না। মেয়ের নাম রমা বল্‌লে কেন আমার কাছে? পাছে আসল নাম বল্‌লে আমার মুখের গ্রাস কাড়্‌বার সুবিধা না হয়?"

গিরীশ চটিয়া বলিল, "শুধু শুধু idiot এর মত গালাগালি করিস্‌নে। ওর নাম যদি কলকাতায় এক, আর এখানে আর এক হয়, সেটা কি আমার দোষ? তাছাড়া তুই আমাকে বলেছিলি নাকি যে ললিতাকে বিয়ে করতে চাস্?"

অতুল বলিল, "হ্যাঁ, এখন ঢের বাজে ওজর বেরবে। আমি যেমন তোমার মত বন্ধুকে ডেকেছিলাম সাহায্য করতে, তেমন তার ফল পেলাম।"

গিরীশ হাসিয়া বলিল, "আরে চটিস্ কেন? তুই-ই না মেয়েটিকে আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টায় ছিলি? ঘাড় পেতে নিলাম ব'লে এখন গাল দিচ্ছিস্ কেন?"

অতুল ক্রুদ্ধ জলন্ত দৃষ্টিতে গিরীশের দিকে চাহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। বর বাসরঘরে ফিরিল।



সাহিত্য-ধর্ম্ম

কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, রাজপুত্র এই তিন জনে বাহির হন রাজকন্যার সন্ধানে। বস্তুতঃ রাজকন্যা ব'লে যে একটি সত্য আছে তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।

কোটালের পুত্রের ডিটেক্‌টিভ্‌-বুদ্ধি, সে কেবল জেরা করে। করতে করতে কন্যার নাড়ীনক্ষত্র ধরা পড়ে; তার রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণের ভিতর থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলেকায় তিনি পৃথিবীর সকল কন্যারই সমান দরের মানুষ—ঘুঁটেকুড়োনীর সঙ্গে তাঁর প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা।

আর একদিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ। তিনি রাঁধেন বাড়েন, সুতো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনেন। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে-চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রশ্ন; আছে অর্থের হিসাব।

রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন—অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি—তিনি উত্তীর্ণ হয়েচেন, বোধ করি, চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েচেন জ্ঞানের জন্যে না, ধনের জন্যে না, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাট-বাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে, যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে। যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞানির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারি প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ, কোনো সমজ্‌দার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, "তুমি কেন?" সে বলে, "তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট।" রাজপুত্রও রাজকন্যার কানে-কানে এই কথাই বলেছিলেন। এই কথাটা বল্‌বার জন্যে সাজাহানকে তাজমহল বানাতে হয়েছিল।

যাকে সীমায় বাঁধ্‌তে পারি তার সংজ্ঞানির্ণয় চলে; কিন্তু যা সীমার বাইরে, যাকে ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাইনে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ্ ব্রহ্মসম্বন্ধে বলেচেন, তাঁকে না পাই মনে, না পাই বচনে, তাঁকে যখন পাই আনন্দবোধে, তখন আর ভাবনা থাকে না। আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপকলায়।

দেয়ালে-বাঁধা খণ্ড আকাশ আমার আপিস-ঘরটার মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা প'ড়ে গেছে। কাঠা-বিঘের দরে তার বেচা-কেনা চলে, তার ভাড়াও জোটে। তার বাইরে গ্রহতারার মেলা যে-অখণ্ড আকাশে—তার অসীমতার আনন্দ কেবলমাত্র আমার বোধে। জীব-লীলার পক্ষে ঐ আকাশটা যে নিতান্তই বাহুল্য মাটির নীচেকার কীট তারই প্রমাণ দেয়। সংসারে মানব-কীটও আছে—আকাশের কৃপণতায় তার গায়ে বাজে না। যে-মনটা গরজের সংসারের গরাদের বাইরে পাখা না মেলে বাঁচে না সে-মনটা ওর মরেচে। এই মরা-মনের মানুষটারই ভূতের কীর্ত্তন দেখে ভয় পেয়ে কবি চতুরাননের দোহাই পেড়ে বলেছিলেন:—

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

কিন্তু রূপকথার রাজকন্যার মন তাজা। তাই নক্ষত্রের নিত্যদীপ-বিভাসিত মহাকাশের মধ্যে যে-অনির্ব্বচনীয়তা তাই সে দেখেছিল ঐ রাজকন্যায়। রাজকন্যার সঙ্গে তার ব্যবহারটা এই বোধেরই অনুসারে। অন্যদের ব্যবহার অন্যরকম। ভালোবাসায় রাজকন্যার হৃৎস্পন্দন কোন্ ছন্দের মাত্রায় চলে তার পরিমাপ কর্‌বার জন্যে বৈজ্ঞানিক অভাবপক্ষে একটা টিনের চোঙ ব্যবহার কর্‌তে একটুও পীড়া বোধ করেন না। রাজকন্যা নিজের হাতে দুধের থেকে যে নবনী মন্থন ক'রে তোলেন সওদাগরের পুত্র তাকে চৌকো টিনের মধ্যে বন্ধ ক'রে বড়োবাজারে চালান দিয়ে দিব্য মনের তৃপ্তি পান। কিন্তু রাজপুত্র ঐ রাজকন্যার জন্যে টিনের বাজুবন্ধ গড়াবার আভাস স্বপ্নে দেখ্‌লেও নিশ্চয় দম আট্‌কে ঘেমে উঠ্‌বেন। ঘুম থেকে উঠেই সোনা যদি নাও জোটে, অন্ততঃ চাঁপাকুঁড়ির সন্ধানে তাঁকে বেরোতেই হবে।

এর থেকেই বোঝা যাবে সাহিত্যতত্ত্বকে অলঙ্কারশাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ কর্‌তে গেলেই অলঙ্কার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হ'ল সাহিত্যের।

অলঙ্কার জিনিষটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা,—তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজে-সজ্জাতেই শিশু-দেহে অনুপ্রকাশিত ক'রে দেন। ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাঁধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপ্‌নি জেগে ওঠে ভাষায় অলঙ্কার, কণ্ঠের সুরে অলঙ্কার, হাসিতে অলঙ্কার, ব্যবহারে অলঙ্কার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলঙ্কৃত বাণীতে। সেই বাণীর সঙ্কেতঝঙ্কারে বাজ্‌তে থাকে, "অলম্"—অর্থাৎ "বাস্, আর কাজ নেই।" এই অলঙ্কৃত বাক্যই হ'চ্চে রসাত্মক বাক্য।

ইংরেজিতে যাকে real বলে, বাংলায় তাকে বলি যথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ সত্য হ'ল এক, আর সার্থক সত্য হ'ল আর। সাধারণ সত্যে একেবারে বাছ-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই-করা। মানুষমাত্রেই সাধারণ সত্যের কোঠায়, কিন্তু যথার্থ মানুষ "লাখে না মিলল এক।" করুণার আবেগে বাল্মীকির মুখে যখন ছন্দ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল তখন সেই ছন্দকে ধন্য কর্‌বার জন্যে নারদঋষির কাছ থেকে তিনি একজন যথার্থ মানুষের সন্ধান করেছিলেন। কেননা ছন্দ অলঙ্কার। যথার্থ সত্য যে বস্তুতই বিরল তা নয়, কিন্তু আমার মন যার মধ্যে অর্থ পায় না আমার পক্ষে তা অযথার্থ। কবির চিত্তে, রূপকারের চিত্তে এই যথার্থবোধের সীমানা বৃহৎ ব'লে সত্যের সার্থকরূপ তিনি অনেক ব্যাপক ক'রে দেখাতে পারেন। যে-জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিষই সার্থক। এক টুক্‌রো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত। অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়্‌লে তাকে তোল্‌বার জন্যে বৈদ্য ডাক্‌তে হয়, ভাতে পড়্‌লে দাঁতগুলো আঁৎকে ওঠে; তবু তার সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। পদ্ম কনুই দিয়ে বা কটাক্ষ দিয়ে ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না, তবু আমার সমস্ত মন তাকে আপনি এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করে।

যে-মন বরণীয়কে বরণ ক'রে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজ্‌নেফুলে সৌন্দর্য্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজ্‌নে-ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য, এই খর্ব্বতায় কবির কাছেও সজ্‌নে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারাল। বকফুল, বেগুনের ফুল, কুম্‌ড়ো ফুল এইসব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে, রান্নাঘর ওদের জাত মেরেচে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে সজ্‌নে-মঞ্জরী পর্‌তে দ্বিধা করেন, বকফুলের মালায় তাঁর বেণী জড়ালে ক্ষতি হ'ত না, কিন্তু সে-কথাটা মনেও আমল পায় না। কুন্দ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলকার মহলে তাদের দ্বার খোলা—কেননা পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয়নি। বিম্ব যদি ঝোলে-ডাল্‌নায় লাগ্‌ত তাহ'লে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হ'ত। তিসিফুল শর্ষেফুলের রূপের ঐশ্বর্য্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি ব'লেই কবি-কল্পনা তাদের নম্র নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না। শিরীষফুলের সঙ্গে গোলাপজামফুলের রূপে-গুণে ভেদ নেই, তবু কাব্যের পংক্তিতে ওর কৌলীন্য গেল, কেননা গোলাপজাম নামটা ভোজন-লোভের দ্বারা লাঞ্ছিত। যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাত-বিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বুবনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল। কাব্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভক্ষণে রসজ্ঞ দেবতাদের বিচারে মদনের তূণে আমের মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি অমৃতে অনটন ঘটে না ব'লেই আমের প্রতি দেবতাদের আহারে লোভ নেই। স্বচ্ছ জলের তলে রুইমাছের সন্তরণলীলা আকাশে পাখী ওড়ার চেয়ে কম সুন্দর নয়, কিন্তু রুইমাছের নাম কর্‌বামাত্র পাঠকের রসবোধ পাছে নিঃশেষে রসনার দিকেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে এই ভয়ে ছন্দোবন্ধনে বেঁধে ওকে কাব্যের তীরে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হ'ল। সকল ব্যবহারের অতীত ব'লেই মকর বেঁচে গেছে—ওকে বাহনভুক্ত ক'রে নিতে দেবী জাহ্নবীর গৌরবহানি হ'ল না, নির্ব্বাচনের সময় রুই কাৎলাটার নাম মুখে বেধে গেল। তার পিঠে স্থানাভাব বা পাপ্‌ড়িতে জোর কম ব'লেই এমনটা ঘটেছে তা'তো মান্‌তে পারিনে। কেননা লক্ষ্মী সরস্বতী যখন পদ্মকে আসন ব'লে বেছে নিলেন তার দৌর্ব্বল্য বা অপ্রশস্ততার কথা চিন্তাও করেননি।

এইখানে চিত্রকলার সুবিধা আছে। কচুগাছ আঁক্‌তে রূপকারের তুলিতে সঙ্কোচ নেই। কিন্তু বনশোভাসজ্জায় কাব্যে কচুগাছের নাম করা মুস্কিল। আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই, তবু বাঁশবনের কথা পাড়্‌তে গেলে "বেণুবন" ব'লে সাম্‌লে নিতে হয়। শব্দের সঙ্গে নিত্যব্যবহারগত নানা ভাব জড়িয়ে থাকে। তাই কাব্যে "কুর্‌চি" ফুলের নাম কর্‌বার বেলা কিছু ইতস্ততঃ করেচি, কিন্তু কুর্‌চিফুল আঁক্‌তে চিত্রকরের তুলির মানহানি হয় না।

এইখানে এ-কথাটা বলা দরকার, য়ুরোপীয় কবিদের মনে শব্দ সম্বন্ধে শুচিতার সংস্কার এত প্রবল নয়। নামের চেয়ে বস্তুটা তাঁদের কাছে অনেক বেশি, তাই কাব্যে নাম-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের লেখনীতে আমাদের চেয়ে বাধা কম।

যা হোক্ এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিষটাকে কাজে খাটাই তাকে যথার্থ ক'রে দেখিনে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়। রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বজনের কাছে গৃহস্থ ঐ দুটো ঘর গোপন ক'রে রাখে। বৈঠকখানা না হ'লেও চলে, তবু সেই ঘরেই যত সাজসজ্জা, যত মালমস্‌লা; গৃহকর্ত্তা সেই ঘরে ছবি টাঙিয়ে কার্পেট পেতে তার উপরে নিজের সাধ্যমত সর্ব্বকালের ছাপ মেরে দিতে চায়। সেই ঘরটিকে সে বিশেষভাবে বাছাই করেছে, তার দ্বারাই সে সকলের কাছে পরিচিত হ'তে চায় আপন ব্যক্তিগত মহিমায়। সে-যে খায় বা খাদ্যসঞ্চয় করে এটাতে তার ব্যক্তিস্বরূপের সার্থকতা নেই। তার একটি বিশিষ্টতার গৌরব আছে এই কথাটি বৈঠকখানা দিয়েই জানাতে পারে। তাই বৈঠকখানা অলঙ্কৃত।

জীবধর্ম্মে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ নেই। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রকৃতিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না। তাই ভোজনের ইচ্ছা ও সুখ যতই প্রবল হোক, ব্যাপক হোক, সাহিত্যে ও অন্য কলায় ব্যঙ্গের ভাবে ছাড়া শ্রদ্ধার ভাবে তাকে স্বীকার করা হয়নি। মানুষের আহারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক-সত্য নয়। পেট-ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তার কলালোকের অমরাবতীতে স্থান দেয়নি।

স্ত্রী-পুরুষের মিলন আহার-ব্যাপারের উপরের কোঠায়, কেননা ওর সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ। জীবধর্ম্মের মূল প্রয়োজনের দিক থেকে এটা গৌণ, কিন্তু মানুষের জীবনে তা মুখ্যকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটুকুতে সেই দীপ্তি নেই। তাই শরীর-বিজ্ঞানের কোঠাতেই তার প্রধান স্থান। স্ত্রী-পুরুষের মনের মিলনকে প্রকৃতির আদিম প্রয়োজন থেকে ছাড়িয়ে ফেলে, তাকে তার নিজের বিশিষ্টতাতেই দেখ্‌তে পাই। তাই কাব্যে ও সকল প্রকার কলায় সে এতটা জায়গা জুড়ে বসেচে।

যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা "প্রজনার্থং" নয়, কেননা সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপন পুরো খাজ্‌না আদায়ের দাবী ক'রে পশুর হাত মানুষের হাত উভয়ে একসঙ্গেই অগ্রসর হ'য়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারী মাম্‌লা চল্‌চেই।

উপরে যে পশু-শব্দটা ব্যবহার করেচি ওটা নৈতিক ভালমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আত্মবোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে। বংশরক্ষাঘটিত-পশুধর্ম্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু সে হ'ল বিজ্ঞানের কথা—মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রসবোধ নিয়ে যে-সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না। অশোকবনে সীতার দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া হওয়া উচিত ছিল, এ-কথাও বিজ্ঞানের, সংসারে এ-কথার জোর আছে, কিন্তু কাব্যে নেই। সমাজের অনুশাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে-তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক্ থেকে তার সমাধান হ'বে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে। অর্থাৎ যৌনমিলনের মধ্যে যে দুটি মহল আছে মানুষ তার কোন্‌টিকে অলঙ্কৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায় সেইটিই হ'ল বিচার্য্য।

মাঝে মাঝে এক-একটা যুগে বাহ্যকারণে বিশেষ কোনো উত্তেজনা প্রবল হ'য়ে ওঠে। সেই উত্তেজনা সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার ক'রে তার প্রকৃতিকে অভিভূত ক'রে দেয়। য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সাময়িক আন্দোলনের অনেকটাই সাহিত্যের নিত্যবিষয় হ'তেই পারে না—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা বিলীন হ'য়ে যাচ্চে। ইংলণ্ডে পিউরিটান্ যুগের পরে যখন চরিত্র-শৈথিল্যের সময় এল তখন সেখানকার সাহিত্য-সূর্য্য তারি কলঙ্কলেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্যকালের নয়। যথেষ্ট পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাক্‌লেও প্রতিমুহূর্ত্তে সূর্য্যের জ্যোতিস্বরূপ তার প্রতিবাদ করে, সূর্য্যের সত্তায় তার অবস্থিতিসত্ত্বেও তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্চে আলোতে।

মধ্যযুগে এক সময়ে য়ুরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে একথা বল্‌তে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল—ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য—তার সিংহাসন ধর্ম্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজ্‌কের দিনে তার বিপরীত হ'ল। বিজ্ঞান প্রবল হ'য়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মান্‌তে চায় না। তার প্রভাব মানব-মনের সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তক্‌মা প'রে কোথাও সে অনধিকার-প্রবেশ কর্‌তে কুণ্ঠিত হয় না।

বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জ্জিত—তার ধর্ম্মই হচ্চে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধর্‌চে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্চে তার পক্ষপাত ধর্ম্ম ;—সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা। বিজ্ঞানের নির্ব্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ-ক'রে-নেবার স্বভাবকে পরাস্ত কর্‌তে উদ্যত। আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব-যে একটা উপদ্রব চল্‌চে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন্ যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটীকা চিরদিনের মতো পায়নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিঁকতে পারে না।

একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের যথেষ্ট আদর দেখেছি। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মধ্যেও সে ঝাঁজ ছিল। তখনকার দিনের নাগরিক-সাহিত্যে এ জিনিষটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে। যারা এই নেশায় বুঁদ হ'য়ে ছিল তারা মনে কর্‌তে পার্‌ত না যে, সেদিনকার সাহিত্যের রসাকাঠের এই ধোঁয়াটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিষ নয়, তার আগুনের শিখাটাই আসল। কিন্তু আজ দেখা গেল, সেদিনকার সাহিত্যের গায়ে যে কাদার ছাপ পড়েছিল সেটা তার চামড়ার রং নয়, কালস্রোতের ধারায় আজ তার চিহ্ন নেই। মনে তো আছে, যেদিন ঈশ্বরগুপ্ত পাঁঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন নূতন ইংরেজরাজের এই হঠাৎ-সহর কল্‌কাতার বাবুমহলে কি রকম তার প্রশংসাধ্বনি উঠেছে। আজ্‌কের দিনে পাঠক তাকে কাব্যের পংক্তিতে স্বভাবতই স্থান দেবে না ;—পেটুকতার নীতিবিরুদ্ধ অসংযম বিচার ক'রে নয়, ভোজনলালসার চরম মূল্য তার কাছে নেই ব'লেই।

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউকেউ মনে কর্‌চেন নিত্য পদার্থ ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বল্‌চে, ঐ আব্রুটাই দৌর্ব্বল্য, নির্ব্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধূলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই,—পিচ্‌কারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে রাস্তার ধূলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চীৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগ্‌লামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেচে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন্ করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না এমন কথা বলিনে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্য্য-কারণ বহুযত্নে বিচার্য্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্ব্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসঙ্গত ব'লেই আপত্তি কর্‌ব, অসত্য ব'লে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ-সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি? এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাৎলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত গর্জ্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ কর্‌তে থাকে তখন আর্ত্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে, এটা সত্য কিনা, যথার্থ প্রশ্ন হচ্চে, এটা সঙ্গীত কিনা। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে এক রকম উল্লাস হয়, কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোরও আছে। মাধুর্য্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মান্‌তে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্। এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্য-কলার নয়।

উপসংহারে এ-কথাও বলা দরকার যে, সম্প্রতি যে-দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসন-মূর্ত্তি ধ'রে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবী কর্‌চে, সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে, বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে? ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায়, "তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন?" উত্তর পাই, "হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেচে!" ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, "হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী।"

(বিচিত্রা, শ্রাবণ—১৩৩৪) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেদ-কথা

৩। ঋগ্বেদ-সংহিতা

ঋক্ মন্ত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কালে ঋক্-সংখ্যা বহুল হইয়া পড়িল। সকল ঋক্ সকলের জানিবার সম্ভাবনা থাকিল না, অনেক ঋক্ লুপ্ত হইতে চলিল, এমন সময় তৎকাল-প্রচলিত ঋক্‌গুলি সঙ্কলন করিয়া ও শ্রেণী-বিভাগ করিয়া সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম ঋগ্বেদ-সংহিতা।

গ্রন্থ বলিলে লিখিত গ্রন্থ বুঝিতে হইবে না। গ্রন্থ লিখিয়া রাখিবার প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল না, আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিনা তাহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে। সঙ্কলিত হইলে পর এই সংহিতাও অধ্যাপকেরা ও অধ্যয়নকর্ত্তারা মুখেই রাখিতেন। কালভেদে ও স্থানভেদে এই সংগ্রহের মধ্যে পাঠাদি ভেদ জন্মিয়া শাখাভেদ উৎপন্ন হয়। এককালে হয়ত এই-রূপ একুশখানি শাখা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই শাখাসমূহের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ? বাঙ্গলার রামায়ণের সহিত যেমন বোম্বাই সংস্করণ রামায়ণের প্রভেদ, কতকটা সেইরূপ।

চরণব্যূহের সময় পাঁচখানি মাত্র শাখা অবশিষ্ট ছিল। এখন কেবল একখানি মাত্র আছে, তাহাই শাকল শাখা। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র সম্ভবতঃ উহাকেই ভিত্তি করিয়া প্রণীত হইয়াছিল, সায়নাচার্য্য উহারই

ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সায়নভাষ্যসমেত এই শাকল শাখা মুদ্রিত করিয়া আচার্য্য মোক্ষমূলর যশস্বী হইয়াছেন। অন্যান্য শাখার নাম মাত্র বা স্মৃতি মাত্র, অবশিষ্ট আছে। কিন্তু সেইসকল শাখা যে বর্ত্তমান শাকল শাখা হইতে অধিক ভিন্ন ছিল, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। হয়ত কতিপয় মন্ত্র অন্য শাখাতে ছিল, যাহা শাকল শাখায় নাই, অথবা তাহাতে ছিল না, শাকল শাখায় আছে। হয়ত অন্য শাখার মন্ত্রগুলি ও সূক্তগুলি যেরূপ পর পর সজ্জিত ছিল, শাকল শাখার ঠিক সেরূপ হয় নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই কতিপয় মন্ত্রের প্রয়োগ আছে, শাকল শাখায় তাহা পাওয়া যায় না। বুঝিতে হইবে সেই মন্ত্রগুলি অন্য কোন শাখায় বর্ত্তমান ছিল।

প্রচলিত ঋগ্বেদ-সংহিতার মন্ত্রগুলি কিরূপে সাজান হইয়াছে? কতকগুলি মন্ত্র একত্র করিয়া একটি সূক্ত। কতকগুলি সূক্ত একত্র করিয়া একটি মণ্ডল। এইরূপ দশটি মণ্ডলে শাকলশাখার ঋগ্বেদ-সংহিতা সমাপ্ত হইয়াছে। অন্যরূপ বিভাগও আছে। সমুদয় সংহিতা যেমন দশ মণ্ডলে বিভক্ত, সেইরূপ আটটি অষ্টকে বিভক্ত। কোন এক সূক্তের মন্ত্রগুলি একজন ঋষির দৃষ্ট, কোন এক ছন্দে গ্রথিত ও কোন এক দেবতার উদ্দিষ্ট। কোন্ দেবতার উদ্দিষ্ট, তাহা সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য ও অর্থ বিচার করিলেই প্রায় বুঝিতে পারা যায়। যথা প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত প্রথম সূক্তে নয়টি ঋক্ আছে। ঐ ঋক্গুলি সমস্তই গায়ত্রী ছন্দে গ্রথিত, উহাদের ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা, উহাদের উদ্দিষ্ট দেবতা অগ্নি। "অগ্নি-মীড়ে পুরোহিতম্" ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রেই বুঝা যায়, উহা অগ্নি দেবতার উদ্দিষ্ট।

ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু এই নিয়মের বহুস্থলে ব্যতিক্রম আছে। একই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি একাধিক ঋষির দৃষ্ট, একাধিক দেবতার উদ্দিষ্ট, একাধিক ছন্দে গ্রথিত এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। যথা—তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত ২৮ সূক্তের ছয়টি মন্ত্রেরই ঋষি বিশ্বামিত্র, দেবতা অগ্নি; কিন্তু ১, ২, ৬ এই তিন মন্ত্রের ছন্দ গায়ত্রী, ৩ মন্ত্রের ছন্দ উষ্ণিক্, ৪ মন্ত্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ, ৫ মন্ত্রের ছন্দ জগতী। ঐ মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ১, ২, ৩ মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্রাবরুণ, ৪, ৫, ৬ মন্ত্রের দেবতা বৃহস্পতি, ৭, ৮, ৯ মন্ত্রের দেবতা পুষা, ১০, ১১, ১২ মন্ত্রের দেবতা সবিতা, ১৩, ১৪, ১৫ মন্ত্রের দেবতা সোম, ১৬, ১৭, ১৮ মন্ত্রের দেবতা মিত্রাবরুণ।

প্রথম মণ্ডলে অনেকগুলি ঋষির প্রণীত মন্ত্র বা সূক্ত স্থান পাইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন ঋষি শতাধিক মন্ত্রের দ্রষ্টা। তাঁহাদের নাম শতর্চ্চী। ২ হইতে ৬ পর্য্যন্ত মণ্ডলের প্রত্যেক মণ্ডল কোন একজন ঋষি বা তাঁহার বংশীয় ঋষির দৃষ্ট। যথা—তৃতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্ত বিশ্বামিত্র দৃষ্ট; অবশিষ্ট তাঁহার পিতা গাথী বা তাঁহার পুত্র "কত" ইত্যাদি ঋষির দৃষ্ট।

প্রথম মণ্ডলের সূক্তগুলির ঋষির মধ্যে যাঁহারা শতাধিক মন্ত্র দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম শতর্চ্চী। শতর্চ্চী ঋষি ষোলজন :—মধুচ্ছন্দা, মেধাতিথি, শুনঃশেপ, হিরণ্যস্তূপ, কণ্ব, প্রস্কণ্ব, সব্য, নোধাঃ, পরাশর, গোতম, কুৎস, কশ্যপ, কক্ষীবান্, পরুচ্ছেপ, দীর্ঘতমা, ও অগস্ত্য। তদ্ভিন্ন জেতাদি ঋষির মন্ত্রও প্রথম মণ্ডলে আছে, তাঁহারা শতর্চ্চী নহেন।

দ্বিতীয় মণ্ডল হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্য্যন্ত ছয় মণ্ডলের নাম মধ্যম মণ্ডল, ঐ ঋষিদের নাম মধ্যম ঋষি।

দ্বিতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্রের ঋষি শৌনক গৃৎসমদ।
তৃতীয় মণ্ডলের ,, ,, ,, গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র।
চতুর্থ মণ্ডলের ,, ,, ,, গৌতম বামদেব।
পঞ্চম মণ্ডলের ,, ,, ,, ভৌম অত্রি।

দ্বিতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্রের ঋষি শৌনক গৃৎসমদ।
ষষ্ঠ মণ্ডলের ,, ,, ,, বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজ।
সপ্তম মণ্ডলের ,, ,, ,, মিত্রাবরুণপুত্র বশিষ্ঠ।
অষ্টম মণ্ডলের ,, ,, ,, কণ্বংশীয় ঋষিগণ।

নবম মণ্ডলের ঋষি অনেক, কিন্তু সকল সূক্তেরই দেবতা সোম পবমান, অর্থাৎ ঐ দেবতার উদ্দিষ্ট ঋক্গুলি এই মণ্ডলে সঙ্কলিত হইয়াছে। দশম মণ্ডলের বহু ঋষি ও বহু দেবতা।

কালক্রমে বেদের শাখাভেদ ঘটায় বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়োজন লক্ষিত হইয়াছিল। এই বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ বেদের অনুক্রমণী রচনা করিয়াছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ শৌনক ঋষির প্রণীত অনুক্রমণী অনেকগুলি এখনও প্রচলিত আছে। এইসকল অনুক্রমণীতে ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মন্ত্রের ছন্দ, দেবতা, ঋষি প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে। ছন্দোঽনুক্রমণীতে প্রত্যেক মন্ত্রের ছন্দ, আর্যানুক্রমণীতে প্রত্যেক মন্ত্রের ঋষি, অনুবাকানুক্রমণীতে দশটি মণ্ডলের অন্তর্গত ৮৫ অনুবাকের প্রত্যেকের প্রতীক (প্রথম চরণ বা চরণাংশ) ও প্রত্যেক অনুবাকে সূক্ত-সংখ্যা দেখান হইয়াছে। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা প্রদর্শিত হইয়াছে; প্রসঙ্গক্রমে নানা উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। শৌনক শাকল শাখা ঋগ্বেদ-সংহিতার মন্ত্র-সংখ্যা, সূক্ত-সংখ্যা, পদ-সংখ্যা ও অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। এই গণনা তাঁহার নিজ ভাষায় উদ্ধৃতিযোগ্য।

অধ্যায়ানাং চতুঃষষ্টি মণ্ডলানাং দশৈব তু।
বর্গানাং তু সহস্রে দ্বে সংখ্যাতে চ ষড়ুত্তরে॥
ঋচাং দশসহস্রানি ঋচাং পঞ্চশতানি চ।
ঋচামশীতিঃ পাদশ্চ পারণং সহস্র কীর্ত্তিতম্॥
শাকল্য দৃষ্টে পদলক্ষমেকং
সার্দ্ধঞ্চ বেদে ত্রিসহস্রযুক্তম্।
শতানি চাষ্টৌ দশকদ্বয়ঞ্চ
পদানি ষট্ চেতি চ চর্চ্চিতানি॥

* * *

চত্বারি বা শতসহস্রানি দ্বাত্রিংশচ্চাক্ষর সহস্রানি।
অর্থাৎ

শাকল্য দৃষ্টে ঋগ্বেদ-সংহিতা মধ্যে ১০ মণ্ডল, ৬৪ অধ্যায়, ২০০৬ বর্গ, ১০১৭ সূক্ত আছে। ১০৫৮০ ঋক্ মন্ত্র এবং ১৫০০০০ (সার্দ্ধ লক্ষ)+৩০০০+৮০০+২০ (দশকদ্বয়)+৬=১৫৩৮২৬ পদ এবং চারিশত সহস্র বা চারিলক্ষ এবং দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বা বত্রিশ হাজার (৪৩২০০০) অক্ষর আছে।

মুদ্রিত শাকল শাখার সহিত মিলাইলে দেখা যায়, শৌনক যে ঋগ্বেদ সংহিতার আলোচনা করিয়াছেন, ঠিক সেই সংহিতাই অপরিবর্ত্তিতভাবে আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। কাত্যায়ন-প্রণীত সর্ব্বানুক্রমণী গ্রন্থে ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রত্যেক সূক্তের প্রতীক সহিত উহার ঋষি, দেবতা ও ছন্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৪। যজুর্ব্বেদ-সংহিতা

ঋগ্বেদ-সংহিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। তৎপরে যজুর্ব্বেদ-সংহিতা। মনে হইতে পারে ঋগ্বেদসংহিতা যেমন ঋক্মন্ত্রগুলির সংগ্রহ, যজুর্ব্বেদ-সংহিতা সেইরূপ যজুর্মন্ত্রের সংগ্রহ। কিন্তু ঠিক তাহা নহে। ইহা আংশিক ভাবে সত্য। যজুর্ব্বেদ-সংহিতা অধ্বর্য্যু ও তাঁহার

সহকারীদের যজ্ঞানুষ্ঠানে সাহায্য করিবার জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল; এইজন্য ইহা আধ্বর্য্যব বেদ। অধ্বর্য্যুগণ মুখ্যতঃ যজুর্মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু তাহাদিগকে ঋক-মন্ত্রও ব্যবহার করিতে হইত। কাজেই তাঁহাদের জন্য সঙ্কলিত গ্রন্থে ঋকমন্ত্র ও যজুর্মন্ত্রও উভয়ই স্থান পাইয়াছে। যজুঃসংহিতার সংগৃহীত ঋকের সংখ্যা অল্প নহে, প্রায় ৭০০। তাহার মধ্যে অনেক ঋক্ ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও বর্ত্তমান, অবশিষ্ট নূতন ঋক্। কাজেই ঋক্ সংহিতা যেমন ঋক্ মন্ত্রেরই সংগ্রহ, যজুঃ সংহিতা সেইরূপ কেবল যজুঃসংগ্রহ মাত্র নহে যজুর্মন্ত্র ত আছেই, অনেক ঋক্‌ও আছে।

যজুঃসংহিতা আবার দ্বিবিধ। কৃষ্ণ যজুঃসংহিতা ও শুক্ল যজুঃ-সংহিতা। কৃষ্ণ যজুঃসংহিতার অধ্বর্য্যু ব্যবহার্য্য মন্ত্রে (যজুঃ ও ঋক্ দ্বিবিধ মন্ত্র) সংগৃহীত আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার মন্ত্রের নিয়োগ প্রদর্শক ও ব্যাখ্যায়ক ব্রাহ্মণও আছে। কাজেই যজুর্মন্ত্র ও ঋক্‌মন্ত্র ও তাহাদের অনুযায়ী ব্রাহ্মণ একত্র করিয়া কৃষ্ণ যজুঃসংহিতা। এইরূপ গণ্ডগোল আছে বলিয়াই বোধ-করি বিশেষণ হইয়াছে কৃষ্ণ। শুক্ল যজুঃসংহিতাতে কিন্তু ব্রাহ্মণ নাই। কেবল মন্ত্রগুলি (যজুঃ ও ঋক্) সংগ্রহ করিয়া শুক্ল যজুঃসংহিতা রচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাংশ সংহিতা হইতে সরাইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থে স্থান দেওয়া হইয়াছে; ঐ গ্রন্থও শুক্ল যজুঃ-সংহিতার অনুযায়ী ব্রাহ্মণ। উহার নাম শতপথ ব্রাহ্মণ।

ঋক্ সংহিতা ও যজুঃসংহিতার সঙ্কলন-প্রণালীতেও প্রভেদ আছে। কৃষ্ণ যজুঃসংহিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া শুক্লযজুঃসংহিতার সহিত ঋগ্বেদ সংহিতার তুলনা করা যাইতে পারে। ঋক্‌সংহিতার সঙ্কলনে মন্ত্রের ঋষি ও দেবতার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। একই সূক্তের অন্তর্গত কোন মন্ত্র কোন যজ্ঞে কোন মন্ত্র বা ভিন্ন যজ্ঞে প্রযুক্ত হইতে পারে। তৃতীয় মণ্ডলের সমুদয় সূক্তই বিশ্বামিত্র বা তদ্বংশীয় ঋষির দৃষ্ট। নবম মণ্ডলের সমুদয় সূক্ত পবমান সোম দেবতার উদ্দিষ্ট। এখানে সঙ্কলন-প্রণালী এইরূপ। যজুঃসংহিতায় ঋষি বা দেবতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয় নাই। যথা শুক্ল যজুঃসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে সংগৃহীত সমুদয় মন্ত্রই (যে দেবতার উদ্দিষ্ট হউক না) দর্শ পূর্ণমাস যাগে ব্যবহার্য্য, কোন অধ্যায়ের সমুদয় মন্ত্র অগ্নিষ্টোমে ব্যবহার্য্য ইত্যাদি।

শুক্লযজুঃসংহিতা অপেক্ষা কৃষ্ণযজুঃসংহিতা প্রাচীন, ইহা পুরাণ-সম্মত। কৃষ্ণযজুঃসংহিতার ব্রাহ্মণাংশ সরাইয়া ফেলিয়া শুক্লযজুঃ-সংহিতা প্রণীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণাদিতে একটি উপাখ্যান আছে। মহামেরুতে ঋষি-সমাজে উপস্থিত হন নাই বলিয়া ঋষি বৈশম্পায়ন পাতকগ্রস্ত হন। পাপক্ষালনার্থ তিনি শিষ্যদিগকে ব্রত অনুষ্ঠানে আদেশ দেন। শিষ্যদের মধ্যে ব্রহ্মরাতপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য দর্পের সহিত অন্যকে অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, আমি একাকী ব্রত সাধন করিব। বৈশম্পায়ন ক্রোধে বলিলেন, তুমি বিদ্বান্‌দের নিন্দাকারী, তুমি অধীত বিদ্যা ফিরিয়া দাও। যাজ্ঞবল্ক্যও অধীত বিদ্যা বমন করিয়া ফেলিলেন ও অধ্যাপককে ফিরিয়া দিলেন আবার শিষ্যগণ তিত্তিরিরূপ ধরিয়া তাহা তুলিয়া লইল। তদবধি ঐ বিদ্যার নাম হইল তৈত্তিরীয় বেদ। এ দিকে যাজ্ঞবল্ক্য স্তুতি দ্বারা সূর্য্যকে প্রসন্ন করিলেন। সূর্য্য বাজী অর্থাৎ অশ্ব সাজিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার বরে তিনি নূতন যজুর্বিদ্যা লাভ করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা সেই নূতন যজুর্বিদ্যা লাভ করিলেন। ও অশ্বরূপধারী সূর্য্যের নামানুসারে বাজী নামে খ্যাত হইলেন। বৈশম্পায়নের শিষ্যেরা যাঁহারা পুরাতন বিদ্যা পাইলেন তাঁহারা ঐ "আচরণ" হেতু নাম পাইলেন চরকাধ্বর্য্যু।

ঐ চরকাধ্বর্য্যুদের বেদ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ। আর বাজীদিগের বেদ শুক্ল-যজুর্ব্বেদ। উভয় বেদই কালে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণ-যজুঃসংহিতার প্রধান শাখা তৈত্তিরীয় সংহিতা; উহাই এখন প্রচলিত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া যে গ্রন্থ প্রসিদ্ধ উহা প্রকৃতপক্ষে তৈত্তিরীয় সংহিতার দ্বিতীয় খণ্ড; কেননা তৈত্তিরীয় সংহিতা (কৃষ্ণ যজুঃসংহিতা) মধ্যে যেমন কতকগুলি যজ্ঞের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আছে তথাকথিত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও সেইরূপ অন্য কতকগুলি যজ্ঞের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা বিশুদ্ধ মন্ত্রগ্রন্থ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ নহে। অন্য শাখার মধ্যে মৈত্রায়নী সংহিতা ও কাঠক সংহিতা এখনও বর্ত্তমান; তাহার সহিত তৈত্তিরীয় সংহিতার অধিক প্রভেদ নাই।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মন্ত্রভাগ শুক্লযজুঃসংহিতা নামান্তর বাজসনেয়ি সংহিতা—যাজ্ঞবল্ক্যের অপর নাম বাজসনেয়। ব্রাহ্মণ ভাগ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। ইহার বহুশাখার মধ্যে দুই শাখা এখন বিদ্যমান আছে—মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব—উভয়ের মধ্যে পাঠভেদ যৎসামান্য।

৫। সামবেদ-সংহিতা

যজুর্ব্বেদসংহিতার পর সামবেদ-সংহিতা। যে-সকল ঋক্‌মন্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠানকালে-মুখ্যতঃ সোম যাগের অনুষ্ঠানে—গান করা হইত, সেইগুলিই এই সংহিতাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই ঋক্-সমূহের অধিকাংশ আবার প্রচলিত ঋগ্বেদ-সংহিতা মধ্যেই পাওয়া যায়। অধিকাংশ ৮ ও ৯ মণ্ডল মধ্যে পাওয়া যায়। কেবল ৭৫টি ঋক্ নূতন ঋক্। কাজেই ইহাকে একখানা নূতন গ্রন্থ বলাই চলে না। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতারই কিয়দংশ বাছাই করিয়া বিশেষ কার্য্যের জন্য সঙ্কলিত করা হইয়াছে।

ঋক্‌মন্ত্র কিরূপে অক্ষর যোগাদি দ্বারা সামে পরিণত করিতে হয়, তাহার জন্য স্বতন্ত্র গান গ্রন্থ আছে। একই ঋক্ একাধিক সামে গান চলিতে পারে; কাজেই এই হিসাবে সাম মন্ত্রের সংখ্যা ইচ্ছামত বাড়ান যাইতে পারে।

৬। অথর্ব্ববেদ-সংহিতা

তারপর অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। এখানি কিরূপ গ্রন্থ? ইহা মন্ত্রের সংগ্রহ। অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্, অল্পাংশ (প্রায় ষষ্ঠাংশ) যজুঃ। যে সকল ঋক্ মন্ত্র শান্তি, পুষ্টি অভিচারাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইত; শ্রৌতযাগে ব্যবহৃত হইত না সেই মন্ত্রই মুখ্যতঃ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ ঋক্‌ই ঋগ্বেদ-সংহিতায় নাই। প্রায় ১২০০ ঋক্ ঋগ্বেদ-সংহিতার ১, ৮ ও ১০ মণ্ডল মধ্যে পাওয়া যায়; অন্যান্য মণ্ডলেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদ-সংহিতার শৌনক শাখার গ্রন্থ প্রচলিত আছে। পিপ্পলাদ শাখার একখানি সংহিতাও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৪)

—

আকবরনামায় চাঁদ রায় কেদার রায়

প্রসিদ্ধ ইতিহাস 'আকবর-নামায়' চাঁদ রায় কেদার রায়ের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

আকবর-নামার উদ্ধৃত অংশ হইতে জানিতে পারি যে, ১৫৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে চাঁদ রায় ভূষণা দুর্গে বাস করিতেছিলেন। চাঁদ রায় কেদার রায়ের পুত্র ছিলেন। রাজা মানসিংহ উড়িষ্যার আফগান বিদ্রোহীগণকে

পরাভূত করিবার পর খাজা সুলেমান, খাজা উস্‌মান্‌, সেরখাঁ ও হায়বৎ খাঁ নামক পরাজিত পাঠান সর্দ্দারগণকে খলিকাবাদে (দক্ষিণ যশোর ও পশ্চিম বাখরগঞ্জ) জায়গীর প্রদান করিয়া সেই দিকে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে তাহারা অবগত হইল যে, তাহাদিগকে জায়গীর দেওয়ার আদেশ প্রত্যাহৃত হইয়াছে। তাহারা খড়্গপুরে আসিয়া বিদ্রোহী হয়। রাজা মানসিংহ তাঁহার পুত্র হিম্মৎসিংকে বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আফগানেরা লুঠ করিতে করিতে সাতগাঁয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সাতগাঁও অধিকারে অসমর্থ হইয়া ভূষণায় চাঁদ রায়ের বাড়ীর অভিমুখে প্রস্থান করে। আফগাণেরা ভূষণা দুর্গের ৪ ক্রোশের মধ্যে আসিলে চাঁদ রায় তাহাদিগকে অভ্যর্থনার ভাণ করে। আফগানগণের মধ্যে দিলওয়ার ও সুলেমান ভূষণাদুর্গে আতিথ্য গ্রহণ করে। দিলওয়ার (রাত্রিকালে) শৌচকার্য্যের জন্য উঠিয়া বাহিরে আসিলে তাহাকে ধৃত করা হয়। সুলেমান তাহা দেখিয়া সাহসপূর্ব্বক অসিহস্তে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আইসে। এবং অশ্বে আরোহণ করতঃ নিজ আড্ডার অভিমুখে ফিরিয়া যাইতে থাকে। চাঁদ রায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। উস্‌মান্ সুলেমানের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। চাঁদ রায়ের সৈন্যগণ আফগান জাতীয় ছিল, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বজাতির সহিত যোগদান করে; এবং সকলে মিলিয়া চাঁদ রায়কে নিহত করে। তৎপর আফগানেরা ভূষণা দুর্গ অভিমুখে গমন করে। দুর্গের দ্বারে আসিলে দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণ চাঁদ রায় আসিয়াছে মনে করিয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া দেয়। দুর্গ তাহাদের হস্তগত হয়। পরে ঈশাখাঁর কৌশলে আফগানেরা তাঁহার বশীভূত হইয়া ভূষণা দুর্গ ও সম্পত্তি কেদার রায়কে (চাঁদরায়ের পিতা) ছাড়িয়া দেয়।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ঈশাখাঁ পরলোক গমন করেন। অতঃপর ১৬০২ খৃষ্টাব্দে আমরা পুনরায় কেদার রায়ের সাক্ষাৎ পাই। রাজা মানসিংহ ঢাকায় ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন যে, বিদ্রোহী উসমানখাঁ বহুসংখ্যক সৈন্য সহ ব্রহ্মপুত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ঐ প্রদেশের থানাদার রাজবাহাদুর কালমাক্ (Qalmaq) তাহার থানা পরিত্যাগ করিয়া ভাওয়ালে হটিয়া আসিয়াছে। এই সংবাদের অহোরাত্র মধ্যে রাজা ভাওয়ালে আসিলেন এবং (ভৈরব) নদীতীরের যুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন; এবং তারপর (ঈশাখাঁর পুত্র দায়ুদখাঁ) ও বিক্রমপুর ও শ্রীপুরের ভূমিক কেদার রায়কে আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্যের প্রতি আদেশ দিলেন। বিদ্রোহী আফগানগণ দায়ুদখাঁ ও কেদার রায়ের সহিত যোগ দিয়া জলপথ বন্ধ করিয়া দিল। মোগলসৈন্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অবশেষে রাজা মানসিংহ স্বয়ং আসিয়া বহু যুদ্ধের পর বিদ্রোহীগণকে পরাস্ত করিলেন। দায়ুদ ও আফগানগণ সোনার গাঁয়ে প্রস্থান করিল। রাজা মানসিংহ বিক্রমপুর ও শ্রীপুরে আসিলেন। এবং অনেক আশা ভরসা দেখাইয়া কেদার রায়কে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন।

১০১১ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ সংবাদ পাইলেন যে, কেদার রায় তাঁহার সুবৃহৎ নৌবাহিনী সহ মগরাজের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং শ্রীনগরে যে মোগল থানা ছিল ঐ থানার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মানসিংহ বহুসংখ্যক কামানসহ একদল সৈন্য কেদার রায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কেদার রায় তাঁহার বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। বিক্রমপুরের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কেদার রায় অনেকগুলি গোলার আঘাতে আহত হইয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ধৃত হইয়া রাজা মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিছু পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

(কায়স্থ সমাজ, শ্রাবণ ১৩৩৪) শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(৮)

ঘরের ভিতর এককোণে একটা হ্যারিকেন আলো খুব টিম্‌টিম্ করিয়া জ্বলিতেছিল; তাহার পাশে একখানা বই আড়াল করা। তাহারই বিরাট ছায়ায় সমস্ত ঘরখানাই প্রায় অন্ধকার। সঞ্জয় দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, গৌরী ভিতরে ঢুকিয়া গেল। অন্ধকারেই চঞ্চলার গায়ে হাত দিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "চঞ্চলা, চঞ্চলা!"

বিছানার উপর উপুড় হইয়া চঞ্চলা পড়িয়া আছে। রাত প্রায় ন'টা, তবু তাহার চুল বাঁধা, মুখ ধোওয়া হয় নাই। গৌরীর ডাকে ধরাধরা ভাঙাগলায় সে সাড়া দিল, "কি বলছ?"

গৌরী বলিল, "চঞ্চলা, রাত পর্য্যন্ত ঘরের ভিতর প'ড়ে প'ড়ে কি পাগলামি হচ্ছে? ওঠ, দেখ, সঞ্জয়-বাবু তোমাকে দেখতে এসেছেন।"

চঞ্চলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আমাকে দেখতে? কেন, কি দরকার? আমি কারুর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।"

সঞ্জয় বাহির হইতে তাহার প্রত্যেকটি কথা শুনিতে পাইল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল এখনি চলিয়া যায়; কিন্তু গৌরীকে কিছু না বলিয়া সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। শুনিল ভিতরে গৌরী বলিতেছে, "দেখ, তোমার শরীর খারাপ ব'লে আমি সঞ্জয়-বাবুকে ডেকে

আন্‌লাম ; এখন যদি তুমি দেখা না কর, তাহ'লে সঞ্জয়-বাবুই বা কি মনে কর্‌বেন আর মাসিমাই বা আমাকে কি বল্‌বেন ? এটা করা অত্যন্ত বিশ্রী হবে। লক্ষ্মীটি, একবার উঠে দেখা কর ; দু মিনিটেই হ'য়ে যাবে।"

চঞ্চলা আর 'না' বলিতে সাহস করিল না ; আপত্তি করা মানেই গৌরীর মনে কিছু একটা সন্দেহ জাগাইয়া তোলা। সে উঠিয়া হাত দিয়া এলোচুলগুলি চোখমুখ হইতে সরাইয়া আঁচলটা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া ঠিক হইয়া বসিল। গৌরী সঞ্জয়কে লক্ষ্য করিয়া গলার স্বরটা একটু উঁচু করিয়া বলিল, "ভিতরে আসুন।"

ঘাড়টা অনেকখানি হেঁট করিয়া সঞ্জয় আসিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। তখনও ভিতরটা তেমনই অন্ধকার। কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পায় না ; শুধু ছায়ার মত তিনটি মূর্ত্তি। সঞ্জয় অন্ধকারের মাঝখানেই খাটের দিকে মুখ করিয়া বলিল, "কেমন আছেন আপনি ? কি হয়েছে ?"

তাহার গলার স্বরটা যে অস্বাভাবিক রকম ধরা ও অস্পষ্ট এবং প্রতি কথার শেষে কাঁপিয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতে গৌরীর বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হইল না। এই বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ত শক্তিমান অক্লান্তকর্ম্মী যুবকের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে যে বেদনার সুরটি বাজিয়া উঠিল, তাহা যেন গৌরীর বুকের ভিতর গিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পুরুষের চোখের জল যে কি জিনিষ তাহা সে বুঝিত। কিন্তু আজ এই পুরুষটির না-দেখা অশ্রুর আমেজই যে তাহাকে এমন করিয়া টলাইবে তাহা সে ভাবে নাই। নিজের দুর্ব্বলতা ত তাহার জানা ছিল না। গৌরী ঘরের আলোটা আড়াল হইতে বাহির করিয়া সঞ্জয়ের মুখের দিকে না তাকাইয়াই বাহিরে চলিয়া আসিল। ঘরে থাকিতে তাহার কেমন যেন লাগিতেছিল। যাহার সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয় তাহার হৃদয়াবেগের পরিচয় পাইতে তাহারই সঙ্কোচ হইতেছিল। তাহার উপর আবার একথাও মনে হইল যে ঘরের ভিতর সে দাঁড়াইয়া থাকিলে ত ধরাবাঁধা কথা ছাড়া সঞ্জয়ের কিছুই বলা হইবে না।

অন্ধকারের অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তির উপর অকস্মাৎ এতখানি আলো আসিয়া পড়িয়া চঞ্চলার মুখের সমস্ত ক্লান্তি, বেদনা, অবসাদ ও সংগ্রামের চিহ্নগুলি যেন দশগুণ বাড়িয়া উঠিল। চঞ্চলার সে মুখ চোখে পড়িতেই সঞ্জয় বাহিরের ভদ্রতা ভুলিয়া গেল। একেবারে কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "চঞ্চলা," একদিনে এ কী হ'য়ে গেছ ?"

চঞ্চলা মনে করিয়াছিল খুব প্রলয়-গম্ভীর মুখ করিয়া একেবারে অপরিচিত চিকিৎসকের মত দুই কথায় সঞ্জয়কে বিদায় করিয়া দিবে। কিন্তু ইহার পর তাহার গাম্ভীর্য্য টিঁকিল না। সে চোখের জলে সঞ্জয়ের হাতখানা ভাসাইয়া দিল। কাল সারারাত ও আজ সারাদিন ধরিয়া পিতামাতার আদুরে দুলাল, নিষ্ঠুর সমাজের হাতের ক্রীড়নক যে সঞ্জয়কে সে মনে মনে আপনার পরম শত্রুরূপে খাড়া করিয়া আপনার সমস্ত আক্রোশ তাহার উপর ঢালিয়াছিল আজ অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তেই দেখিল এ ত সে সঞ্জয় নয়। পিতা যাহাকে আপনার কলঙ্ক ভাবিয়া স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিয়া সকল দায়িত্বের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছেন সেই অজ্ঞাত অপরিচিত পিতৃমাতৃত্যক্ত ভগিনীর বেদনায় যে একদিনে এতখানি বিচলিত হইতে পারে, যে এমন করিয়া আসিয়া সকল ভুলিয়া তাহার হাত ধরিতে পারে, পিতৃপাপের আগুন যাহাকে একরাত্রে এমন করিয়া দগ্ধ করিতে পারে সেই সঞ্জয়কে চঞ্চলার জানা ছিল না। কাল যে হাস্যবিকসিত মুখের আলোয় তাহার সুপ্ত ভ্রাতৃস্নেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল, চঞ্চলা দেখিল আজ সে মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। এই মানুষকে এমন করিয়া আচম্‌কা অতবড় কঠিন বেদনা দেওয়ার জন্য চঞ্চলার মনে একটা অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল। তাহার বেদনা ত তাহারই রহিল, মাঝখান হইতে এই নিষ্পাপ মনটাতে এতবড় ঘা সে না দিলেও ত পারিত।

খানিক পরে মুখ তুলিয়া চঞ্চলা বলিল, "কাল আপনাকে অমন ক'রে বিদায় ক'রে দিলাম ; আপনি আমাকে তার জন্যে ক্ষমা কর্‌বেন। সত্যি, সেটা আমার ভারী অন্যায় হ'য়েছিল। আমার এতদিনের দুঃখের ও লজ্জার ইতিহাসটা একদিনে অমন ক'রে আপনার উপর এনে ফেলাটা যে কতখানি নিষ্ঠুরের কাজ তা আজ আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কাল আমার মাথার ঠিক ছিল না, তাই আমি অমন কাজ কর্‌তে পেরেছিলুম। তার জন্যে আমাকে কি আপনি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বেন ?"

সঞ্জয় বলিল, "চঞ্চলা, ক্ষমা কর্‌বার অধিকার আর অহঙ্কার কি আমার সাজে? ক্ষমা তুমি কোরো, আমার অপরাধী পিতাকে ক্ষমা কোরো, আর না জেনেও তোমার নিকট যে অপরাধী সেই তোমার হতভাগ্য ভাইকেও ক্ষমা কোরো। যা তোমার ও আমার দুজনের তা যে আমি তোমাকে বঞ্চিত ক'রে এতকাল ভোগ করেছি এবং পরেও কর্‌ব এ অপরাধ আমায় ক্ষমা কোরো। পিতামাতার সম্পত্তির কথা বল্‌ছি মনে কোরো না; সেটা ত্যাগ করা অত্যন্ত সহজ; আমি বল্‌ছি আমার সন্তানত্বের দাবীর কথা। তোমাকেও আমার সঙ্গে সমানে যতদিন আমি তা না দিতে পার্‌ব ততদিন আমার লজ্জা রাখ্‌বার ঠাঁই থাক্‌বে না। অথচ নিজে তা পরিত্যাগ কর্‌বার উপায় আমার নেই, হয়ত বা সে মহাশক্তিও আমার নেই।"

চঞ্চলা বিস্মিত হইয়া সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকাইল। সেই পিতার পুত্র হইয়া সঞ্জয় এতবড়! চঞ্চলা বলিল, "আর কেউ কোনো অধিকার না দিক্, তাতে আমার দুঃখ নেই। যারা সন্তানের চেয়ে যশকে বড় করে, তাদের কাছে জোর ক'রে পাওয়া অধিকারই কি মস্ত জিনিষ? তার চেয়ে তুমি স্বেচ্ছায় এসে আমার হাত ধ'রে আজ আমায় যে অধিকারটি দিলে সেইটে আমার কাছে অনেক বেশী মূল্যবান।"

সঞ্জয় ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, 'আপনি' ছেড়েছ বাঁচ্‌লাম, চঞ্চলা। কিন্তু সত্যি কি আমি তোমায় কোনো অধিকার দিতে পেরেছি? এ'ত সমস্তই লুকোচুরির অধিকার, কেবল আড়ালে-আব্‌ডালে চল্‌চে। সত্য অধিকার দিতে হ'লে সবার আগে তোমার হৃত অধিকারই আমাকে উদ্ধার ক'রে আন্‌তে হবে, কারণ সেইটাই যে আমাদের সকল অধিকারের মূল ভিত্তি। ভাই হ'বার আমার ক্ষমতা কোথায়, যদি না তোমাকে আমাদের ঘরের মেয়ে কর্‌তে পারি? তুমি বাইরে থেকে গেলে তোমায় শুধু নিজের ইচ্ছায় ত বোন্ ব'লে স্বীকার কর্‌তে পার্‌ব না।"

চঞ্চলার মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল, "সত্যি, তোমার কাছে একটুখানি করুণা ছাড়া আর ত কিছু পাবার অধিকার আমার নেই। ও কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি যে সেই বড় ঘরের ছেলে। আমি তোমার কেউ হব কোন্ স্পর্দ্ধায়?"

সঞ্জয় ব্যথিত হইয়া বলিল, "চঞ্চলা, অমন ক'রে কথা বোলো না। তুমি ত দেখছ ভাগ্য আমার দুই হাত বেঁধে রেখেছে। আমার কোন শক্তি এখানে কিছু কর্‌তে পারে না, যদি না আমি বাবার মন ফেরাতে পারি।"

চঞ্চলা বলিল, "এতদিনের আক্রোশ কি একদিনে যায়? সুযোগ পেলেই তাই রাগটা ফোঁস ক'রে ওঠে। তুমিও কি বোঝ না যে, সেটা আসলে তোমাকে বলা নয়? বল্‌বার আর কাউকে ত পাব না জানি; তাই যেটা তোমাকে বলা সকলের চেয়ে অন্যায় সেটাও তোমাকেই বল্‌ছি। তুমিই যে কেবল এক্‌লা ধরা দিয়েছ।"

সঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল। চঞ্চলা আবার বলিল, "তা ব'লে মনে করো না যে, আর কারুর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার জন্যে আমি সাধ্‌ছি।"

সঞ্জয় বলিল, "তুমি যে সাধ্‌তে পার না তা আমি জানি। যদি ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হন তা'হ'লে আমিই একদিন তোমাকে সাধ্‌ব আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার কর্‌বার জন্যে।"

চঞ্চলা একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "কিন্তু যাঁর সাহায্যে তুমি আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন কর্‌তে চাইছ তাঁর সাহায্য নেবার আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই। তার চেয়ে আমি এতকাল যেমন একলা ছিলাম চিরকালই তেমনি থাক্‌ব।"

সঞ্জয় একটুখানি স্মিতহাস্যে চঞ্চলার রাগটা ঠাণ্ডা করিয়া দিয়া বলিল, "তোমার কোনো ভয় নেই চঞ্চলা; আমি আমার মা ছাড়া আর কারুর শরণ নেব না। তুমি চিরকাল একলা থাক্‌তে চাইতে পার; তোমার অভিমানের যে অতখানি শক্তি আছে তাও স্বীকার করি। কিন্তু আমি যে তোমাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে চাই। তোমার জন্যে সোনার ঘর-সংসার পেতে দেওয়া যে আমার কাজ! সে কাজে মা না সহায় হ'লে কি চলে?"

চঞ্চলা লজ্জা পাইয়া বলিল, "যার ত্রিকুলে কেউ নেই

তাকে নিয়ে আর তোমায় ঠাট্টা করতে হবে না। তুমি চুপ কর দেখি।"

সঞ্জয় কি একটা বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু বাহির হইতে গৌরী ডাকিল, "চঞ্চলা, তোমার জন্যে একটু গরম দুধ এনেছি, খেতে হবে কিন্তু।"

দুধটা আর একটু পরে আনিলেও চলিত, কিন্তু গৌরীর আর বেশীক্ষণ সঞ্জয়কে একলা রাখিয়া যাইতে ভরসা হইতেছিল না। কি জানি যদিই কেহ কিছু দেখে কিম্বা শোনে তাহা হইলে আশ্রমে তাহাদের তিনজনেরই বিশেষ সুনাম হইবে না।

গৌরী ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল চঞ্চলা আরক্ত মুখখানা নীচু করিয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিতেছে, সঞ্জয়ের মুখও প্রসন্ন! ঝড়-ঝঞ্ঝার দারুণ দুর্য্যোগের মাঝখানে কি একটা আশার আলো দেখা দিয়াছে। আপনার উদ্দেশ্য খানিকটা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গৌরী খুসী হইল। বঞ্চিত জীবনের বেদনা যে কি তাহা ত সে বোঝে। তাই সে বেদনার হাত হইতে ইহাদের পরিত্রাণ দিবার পথ সে খুঁজিতেছিল। বাহিরের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকেও হৃদয় জয় করিতে পারে কি না একবার দেখিতে চাহিয়াছিল। মনে হইল হয়ত পারিতেও পারে। সফলতার একটা আনন্দে তাহারও মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্তরে কি একটা বেদনা কাঁটার মত বিঁধিয়া-বিঁধিয়া উঠিতে লাগিল। সে নিঃসঙ্গ, সে চিরবঞ্চিত, সংসারে শুষ্ক কর্ত্তব্যমাত্রেই তাহার সকল আনন্দের খোরাক খুঁজিতে হইবে। হাসিয়া সঞ্জয়কে সানন্দ অভিবাদন করিতে গিয়া অলক্ষিতে একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিল। বলিতে আসিয়াছিল দুইটা মিষ্ট কথা, কিন্তু কিছুই তাহার বলা হইল না।

একদিন গৌরী মনে করিয়াছিল বিলাস ও ভোগের মোহেই সংসারের সকল কিছু আঁকড়াইয়া সে বাল্য ও কৈশোরটা কাটাইয়াছে। সেই ভোগ ও ঐশ্বর্য্য হইতে পাছে সে আজীবন বঞ্চিত থাকে, তাই বুঝি তাহার পিতা তাহার জীবনের বৈধব্যের অভিশাপের কথা তাহার নিকট হইতে এত সাবধানে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন; পাছে সে ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীর বেশে পার্থিব সকল ভোগসুখের মাঝখানেই তাহা হইতে দূরে মরণকাল পর্য্যন্ত তৃষিতের মত পড়িয়া থাকে আর পাছে তাহার অন্ন জুটাইয়া দিবার লোক না থাকে, তাই বুঝি তাহার পিতা তাহাকে আবার ঘরসংসার পাতিয়া দিবার লোভে সেই ফাঁদে অনেকখানি পা বাড়াইয়াছিলেন। একদিন নৃপেন্দ্র তাহাকে ইহারই লোভ দেখাইয়াছিল, ক্ষিতিধর তাহাকে এইজন্যই লোভী বলিয়া নিষ্ঠুর শ্লেষ করিয়াছিল। সেদিন তাই সে সকলকে দেখাইতে চাহিয়াছিল যে, তুচ্ছ ভোগ-ঐশ্বর্য্য ও বিলাসকে সে অনায়াসে পায়ের নখে ঠেলিয়া চলিয়া আসিতে পারে, আপনার অন্নও সে আপনি অর্জ্জন করিতে পারে; এই সকলের উর্দ্ধে উঠিয়া সংসারকে সে দেখাইতে চাহিয়াছিল যে, সংসারের ভোগসুখ তাহার কাছে কত ছোট জিনিস। পিতার উপরও একবার তাহার রাগ হইয়াছিল যে, এইসকল সামান্য জিনিষের জন্য পৃথিবীর চোখে তিনি তাহাকে এত ছোট করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ তাহার অন্তর বলিতেছে যে, পিতা ভুল করেন নাই। ভোগসুখ বলিতে যে ধনরত্ন, বস্ত্র-অলঙ্কার, বিলাস-আয়াসের ছবি সে কল্পনা করিয়াছিল সেই সুখের অভাবে তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে এমন মূর্খের কথা তিনি চিন্তাও করেন নাই। শৈশবে, কৈশোরে এই দিয়াই তিনি তাহাকে ভুলাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু কন্যার কোন্ জীবনব্যাপী দুঃখে যে তাঁহার মন কাঁদিয়াছিল আজ তাহা গৌরী বুঝিয়াছে। পরের উপকার করিতে আসিয়া আজ সে বুঝিয়াছে কত গভীরভাবে সেই বেদনা তাহার অন্তরে ক্ষতসৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। ঐশ্বর্য্য ও আরামের সুখের চেয়ে বড় যে মহাসুখ যে-আনন্দকে না পাওয়ার বেদনায় তাহার অন্তরের ক্ষতটা খোঁচা দিয়া উঠিতেছে, মূর্খ সে একদিন তাহার অস্তিত্বটাকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে নাই। কেবলমাত্র একটা মানুষের মুখের মধুর হাসি ও চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টির জন্যই যে আজন্ম মানুষের মন কাঁদিতে পারে, ইহা সে বিশ্বাস করিতেও পারিত না। জীবনে অন্তত কোনো একদিন একজন মানুষ কেবল তাহাকেই লইয়া সকল ভুলিয়া থাকিবে, তাহাকে পাওয়ার জন্য আপনার জন্ম পর্য্যন্ত সার্থক মনে করিবে, পৃথিবীর সকল দুঃখদ্বন্দ্বের ভিতর

তাহার সহিত মিলনের ক্ষণিক মুহূর্ত্তগুলিকে পারিজাতের মালার মত অন্তরের আভরণ করিতে চাহিবে, মনে করিবে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অনন্ত আনন্দ-খনি সে, এ কল্পনা পূর্ব্বে কোনোদিন গৌরী করে নাই। মানুষের মনে এই স্বর্গসুখের কামনা যে সুপ্ত থাকে তাহা সে জানিত না।

মানুষ বন্ধুসঙ্গ চায় বটে, তাহার চেয়েও নিজের কাহাকেও খোঁজে বটে; একথা সে মানিত, কিন্তু ঐশ্বর্য্য আয়াস ত্যাগ করার চেয়ে এই ত্যাগে জীবন যে এমন করিয়া শূন্য নিরর্থক অঙ্গহীন হইয়া যায়, ইহা ক'দিন আগেও তাহাকে বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত।

চঞ্চলার মুখের সলজ্জ হাসি দেখিয়া গৌরীর আজ সবার আগে মনে পড়িল, আজ হইতে এই মানুষটা হয়ত জগতে আর একা নয়। ইহার সুখদুঃখ, হাসিকান্না, মানঅভিমান আর কেবল মাত্র ইহার জীবনের বোঝা বাড়াইতেছে না আর একজনের আবির্ভাবে এই সমস্তই ইহার জীবনটা রসে ও আনন্দে বিচিত্র সুন্দর করিয়া তুলিবে। আর এই স্পর্শমণির অভাবেই তাহার জীবনের প্রতিদিনের সঞ্চয় কেবল নিরর্থক ভার হইয়া উঠিবে মাত্র।

গৌরীকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, "এই দেখুন, একবারে; চাক্ষুস চিকিৎসাতেই আপনার রুগীকে অনেকখানি সারিয়ে তুলেছি।" গৌরী তাহাদের সকল কথা না জানুক, তবু সে যে এই দেখাশুনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াই, বন্ধুভাবেই তাহাদের পরস্পরের কাছে আনিয়া দিয়াছিল, ইহা অনুভব করিয়াই সঞ্জয় বন্ধুর মত হাসিয়া স্বচ্ছন্দে এমন কথা বলিল। চঞ্চলার রোগটা যে শারীরিক নয় তাহা লুকাইবার সে কোনো চেষ্টাই করিল না।

চঞ্চলা কিন্তু ইহাতে একটু অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। গৌরীর কাছে এমন করিয়া ধরা পড়িয়া যাইতে তাহার ভয় ছিল। সে বলিল, "সত্যি, এতক্ষণে মাথাটা একটু ছাড়ল তবু। ক'মে আস্‌বে আগেই বুঝতেপারছিলাম।"

চঞ্চলার দিকে একবার হাসিয়া তাকাইয়া, "আচ্ছা, আসি।" বলিয়া সঞ্জয় গৌরীর পিছন পিছন বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইবার সময় কাছে আর কেহ নাই দেখিয়া সঞ্জয় গৌরীর মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "আপনি আজ আমার যে উপকার করলেন কোনো দিন তার প্রতিদান আমি দিতে পারব না।" সঞ্জয়ের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। গৌরী কেন না বুঝিয়াও মুখটা নামাইয়া লইল। গৌরীর অন্তরে একটা আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই খোঁচাটাও তাহাকে বিঁধিতে থাকিল।

৯

চঞ্চলা একটু সাম্‌লাইয়া উঠিতেই বাহিরের কাজেকর্ম্মে পড়ায় শুনায় ও আশ্রমের কাজে আগেকার মত ঘুরিতে লাগিল। ছেলেদের পড়ানোর সময় ছাড়া সঞ্জয়ের সহিত তাহার বড় দেখা হইত না। যতটুকু বা দেখা হইত তাহাও তাহারা পরস্পরকে এড়াইয়াই চলিত, কারণ সকলের কাছে তাহাদের আত্মীয়তাটা প্রকাশ হইয়া পড়িবার দুই জনেরই ভয় ছিল; কিন্তু গৌরীর সম্বন্ধে সঞ্জয় অকস্মাৎ অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিল। এই মেয়েটির যে বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে তাহা সে আগেই জানিত, নূতন আবিষ্কার করিল তাহার নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। তাহাতেই সকল কাজে গৌরীকে টানা তাহার বাতিক হইয়া উঠিল। মেয়েদের সঙ্গে মিশিতে সে লজ্জা পাইত, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনার সঙ্কোচকে সে জোর করিয়া জয় করিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিল। হৈমবতী প্রায়ই বলিতেন, "সঞ্জয়, তুমি দেখ্‌ছি আমার আশ্রমে ভাঙচি দেবে, চঞ্চলাকে ত তোমাদের দলে আগেই টেনেছিলে, এখন গৌরীকেও সরালে। ওরা আর আমার ঘরের কোনো কাজই করবে না।"

প্রথমেই কথাটার অর্থ ভাল করিয়া না বুঝিয়া ভুল সন্দেহে সঞ্জয় লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত; কিন্তু তারপর তাহার উৎসাহ আরোই বাড়িয়া যাইত। পরে চঞ্চলার সহিত সাক্ষাৎ করানোতে যেদিন সে গৌরীর হৃদয়ের

পরিচয়টুকুও পাইল, সেদিন হইতেই শুধু কাজে নয় অকাজেও গৌরীকে তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে বুদ্ধিমতী, শক্তিশালিনী কি কর্ম্মিষ্ঠা এইটুকুই মাত্র আর তাহার সংজ্ঞা রহিল না; সে মানুষের বিচিত্র পরিচয়ের একটি আধার, একথাও বার বার তাহার মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল। চোখের সাম্‌নে দেখিয়াও যাহা সে এতদিন দেখে নাই, অনুভবেই গৌরীর এমন অনেক পরিচয় সে আবিষ্কার করিতে লাগিল।

সাধিয়া গায়ে পড়িয়া সে গৌরীর ফরমাস খাটিতে আরম্ভ করিল; তাহার বাড়ীর চিঠি লইয়া যাওয়া, শঙ্করকে খবরাখবর দেওয়া, আবার বাড়ী হইতে তাহার মনে ছোটখাট জিনিষপত্র আনা, এত কাজের মধ্যেও এসব সঞ্জয় যাচিয়া করিতে লাগিল। কাছে আসার একটা নূতন বাতিক তাহাকে পাইয়া বসিল।

গৌরী অবাক হইত তাহার কাণ্ড দেখিয়া। কি এমন সে করিয়াছে যাহার জন্য এত করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে? আবার ভাবিত—না, ইহা কৃতজ্ঞতা হইতে পারে না, একদিনের জন্য এত দিন ধরিয়া কৃতজ্ঞতা পাগলেও দেখায় না, তা ছাড়া তাহাতে এমন প্রাণ. এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় থাকিতে পারে না। সঞ্জয় তাহার দাদার বন্ধু, বুঝি তাই তাহারও বন্ধু হইয়া উঠিতেছে। বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী আরো কিছু কল্পনা করিবার সাধ মাঝে মাঝে আপনা হইতেই তাহার মনে উঁকি দিয়া উঠিত। কিন্তু তখনি সে আপনাকে শাসন করিত— সকল লোভকে ত্যাগ করিবার স্পর্দ্ধা দেখাইয়া শেষে এই কি তাহার পরিণাম? চঞ্চলার বন্ধু সাজিয়া এই কি তাহার প্রতিদান? আপনাকে জপাইত, আমি তুচ্ছতার উপরে উঠিবার জন্য, লোভকে জয় করিবার জন্য, মানুষের মত মানুষ হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছি; ও পথ আমার নয়, নয়, নয়।

তবু মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিত। অতীতের যে জীবনকে সে না দেখিয়াই হারাইয়াছে, ভবিষ্যতের যে জীবনকে পাইবার ক্ষীণ আশাটুকুও আজ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে দুই-ই তাহাকে কাঁদাইত। অতীত ও ভবিষ্যতের অশ্রু তাহার কর্ম্মনিষ্ঠ সংযত জীবনের হিমের আগল ভাঙিয়া চোখ ছাপাইয়া উঠিত। সমাজ তাহার জীবনের ভবিষ্যৎটার একটা বিরাট কক্ষ অন্ধকারেই রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছে, তবু পিতৃস্নেহ সে অন্ধকার হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক অল্প বয়সে সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। তাই তাহার এই জীবনই হয়ত আজ সকলে মানিয়া লইয়াছে। সে নিজে ত যাচিয়াই ইহা বরণ করিয়াছে। তবু মনে হয় জীবনের আনন্দ-খনিরূপে কিছু একটা সে পাইবেই। কিছু না পাইয়াই জগৎ হইতে বিদায় লইবে ইহাও কি সম্ভব? কিন্তু কেনই বা হইবে না? অনেক মানুষই ত তেমন গিয়াছে; তাহাদের মত তাহারও সান্ত্বনা হইবে, "দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন।" কিন্তু হায়, যৌবনধর্ম্ম এ সান্ত্বনায় শান্তি পায় না, ইহজীবনের এ নিঃস্বতাকে বিশ্বাস করে না। জীবন-জোড়া সুখ না হউক, তবু দু-দিনের জন্যও সর্ব্বহারা আনন্দের উন্মত্ত প্লাবনে একবার আপনাকে ভাসাইয়া দিবার সাধ মানুষের থাকে।

কাজের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া এসব খেয়ালকে ভুলিতে হইবে গৌরী সংকল্প করিল। সে হৈমবতীকে গিয়া ধরিল, "মাসিমা, আমাকে খুব শক্তরকম একটা কাজ দিতে হ'বে। এমন স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে কাটিয়ে আমি বড় কুঁড়ে হ'য়ে যাচ্ছি।"

হৈমবতী বলিলেন, "তোমার কলেজের পড়া রয়েছে মা, এই ত আস্‌ছে বছরই বি-এ দেবে; তার উপর বাড়ীর কাজের পালা ত আছেই। এতেও যদি তুমি নিজেকে কুঁড়ে মনে কর তাহ'লে তোমাকে ঘানিতে যুতে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

গৌরী বলিল, "পূজোর ছুটিত এল ব'লে, তখন কলেজও থাকবে না, এখানেও অনেকে বাড়ী চ'লে যাবে; সব কাজই হাল্কা হ'য়ে যাবে। তখন আমি ব'সে ব'সে কর্‌ব কি? পরীক্ষার পড়া ত সেই শীতের পর থেকে সুরু কর্‌লেই চল্‌বে।"

হৈমবতী গৌরীর রকম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সে যে নিজের হাত হইতে নিজে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই নিজেকে পিষিয়া মারিতে চাহিতেছে তাহা বুঝিতে তাঁহার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষের দেরী হইল না। না-জানি

কি দুঃখজালে সে জড়াইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া মমতায় ও চিন্তায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল।

হৈমবতী মনের বেদনা মনে চাপিয়াই বলিলেন, "মেয়েদের কাজ ত মা, অনেকই আছে। বরং যত কাজ তার তুলনায় মানুষ মোটেই মেলে না, এই দুঃখ। কিন্তু হাঁসপাতালে কি আতুর-আশ্রমে সেবার কাজের মত কাজ ত পড়াশুনার মাঝখানে তুমি পারবে না। না হ'লে সেদিন ভূষণ-বাবু আমাকে বল্লেন যে, তাঁদের আতুর আশ্রমে তাঁরা পুরুষ তিনজন আর তাঁদের গিন্নীরা তিন জন ছাড়া দিনরাত্রি রোগীদের খবর নেবার কেউ লোক নেই। অথচ ভূষণ-বাবুর স্ত্রীর তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে। এইসকল কাজের উপর ছোট ছেলের মা'র পক্ষে যে-কোনো রোগের সেবা করা কম শক্ত কথা নয়; তবু ব্রত নিয়েছেন ব'লে তিনি কোনোদিন কোনো কাজে আপত্তি করেন না। তাঁরা চান একটি অল্পবয়স্কা তোমারই মত মেয়ে। কিন্তু তোমাকে ত অন্য জায়গায় কাজের জন্য এখন পাঠানো যায় না। তাতে অনেক হ্যাঙ্গাম বাধ্‌বে, তাছাড়া তোমার পড়ার সময়ও পাবে না।"

গৌরী বলিল, "কেবল অবসর সময়-গুলোয় করা যায় আর ছুটিটা পুরো করা যায় এমন কোনো কাজ জোটে না?"

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন, "কি জানি মা, আমাকে ত লোকে ইস্কুল, হাঁসপাতাল, পতিতোদ্ধার এই সবেরই জন্য লোক দিতে বলে। আর কিছুর কথা ত এখন শুনিনি। তবে সঞ্জয় আমাদের মস্ত 'কর্ম্মখালি'র গেজেট আছে; তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে হয়ত তোমার ফর্‌মাস মত কাজ জুটিয়ে দিতে পারে।"

গৌরী বলিল, "আচ্ছা তাই আজ খোঁজ কর্‌ব।"

সন্ধ্যায় সঞ্জয় আসিতেই গৌরী তাহাকে গিয়া ধরিয়া বসিল, "আমার জন্যে কিছু কাজ জুটিয়ে দিতে হবে।"

সঞ্জয় অকারণে খুসী হইয়া বলিল, "বলুন না, কি কাজ চাই, আমার দপ্তরে অনেক কাজ আছে। কিন্তু আপনি হঠাৎ এত শীঘ্র স্বাবলম্বী হ'তে চাইছেন যে! পড়াশুনোয় আর মন যায় না?"

গৌরী যেন ধরা পড়িয়া গিয়াই একটু লজ্জিত ভাবে বলিল, "না, না, চাকরী চাইছি না, অন্য কাজ।"

সঞ্জয় বলিল, "ওঃ খয়রাতী! তা দিতে পারি যত চান।" কিন্তু পরক্ষণেই একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "আপনার ত কাজের কম্‌তি নেই; তার উপর আবার কাজ চাপানো মানে আত্মহত্যার একটা চেষ্টা করা। কি হবে অমন ক'রে নিজেকে মেরে? আপনার এই ত বয়স, এখনও কাজ কর্‌বার অনেক দিন প'ড়ে আছে। এখন যা কাজ কর্‌ছেন সেগুলো শেষ হ'য়ে যাক্‌, তারপর অন্য কাজ কর্‌বেন।"

সঞ্জয়ের এই দরদে গৌরীর দুইচোখ সজল হইয়া আসিল। সত্যই ত সে আত্মহত্যা করিতেছে। শরীরটাকে হত্যা করিতেছে না বটে কিন্তু মনটাকে ত গলা টিপিয়া মারিতেই চাহিতেছে। কিন্তু না মারিয়াই বা উপায় কি? কি হইবে তাহার সে মন লইয়া যাহা কেবল পাগলের মত স্বপ্ন দেখে, আর অসম্ভব আকাশ-কুসুম রচনা করিয়া তাহারই জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরে? মনের ত তাহার কোনো প্রয়োজন নাই; কাজের জন্য একটা নিখুঁত কল যদি সে হইতে পারে তবেই জগতে যাহা সে হইতে চাহিতেছে, অপরেও যাহা তাহাকে করিতে চায়, সেটা সম্ভব হইবে।

গৌরী চোখটা নামাইয়া বলিল, "না, সঞ্জয় বাবু, আমি শরীরের খুব যত্নই করি। আত্মহত্যা আমি কর্‌তে চাইছি না। কিন্তু কাজের মানুষ হতে হ'লে মনটাকে খুব শক্ত ঘানিতে দিবারাত্রি যুতে রাখা দরকার।"

একথাটা গৌরী বলিতে চাহে নাই। তবু ফস্‌ করিয়া এই কথাটাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। সঞ্জয়ও এরকম উত্তর আশা করে নাই। সে ব্যথিত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার গৌরীর দিকে তাকাইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি আপনাকে ঠিক কাজ খুঁজে দেব, যদি আপনি কথা দেন যে শ্রান্ত হ'লেই বিশ্রাম নেবেন এবং মনটাকেও একেবারে জেলখানার কয়েদীর মত নিষ্ঠুর ভাবে বিচার কর্‌বেন না।"

গৌরী শেষ কথার কোনো উত্তর না দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, শ্রান্ত হ'লে ত নিশ্চয়ই বিশ্রাম কর্‌ব। আমাদের

আশ্রমের দুজন ডাক্তার অভিভাবক রয়েছেন ; তাঁরা কি আর তাহ'লে আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন ?"

সঞ্জয় বলিল, "আপনি ভূষণবাবুকে চেনেন ? তাঁদের একটা আতুর-আশ্রম আছে।"

গৌরী উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, মাসিমা আজই তাঁদের কথা বল্‌ছিলেন। আমি না চিন্‌লেও তাঁরা যে খুব মহৎ লোক তা বুঝেছি।"

সঞ্জয় বলিল, "তাঁদের আশ্রমে যে-সব রুগীরা থাকে, তাদের চিঠিপত্র প'ড়ে শোনাবার আর লিখে দেবার কোনো লোক নেই। এর অভাবে ভূষণ-বাবুর স্ত্রী বড় মুস্কিলে পড়েছেন। রোজ সকালে সব চিঠি প'ড়ে দিয়ে আস্‌বে এমন একজন লোক আমি ঠিক ক'রে দিয়েছি। কিন্তু পড়ার চেয়ে লেখায় সময় লাগে বেশী, অথচ সেটা অবসর মত করা চলে। আপনি যদি সপ্তাহে দুদিন কি তিনদিন এই কাজটা ক'রে দেন ত ওঁদের খুব উপকার হয়। কিন্তু য' খানা চিঠি লেখার পর আপনার শ্রান্তিবোধ হবে ত' খানা লিখেই আপনি সেদিন থাম্‌তে পার্‌বেন। এমন কি দর্‌কার কিম্বা ইচ্ছা হ'লে দিনক্ষণ সব বদ্‌লে নিতে পার্‌বেন। এতে কারুরই কিছু ক্ষতি হবে না।"

গৌরী বলিল, "হ্যাঁ, আমি নিশ্চয় কর্‌ব। তার আগে একদিন আমি আশ্রমটা দেখ্‌তে চাই।"

সঞ্জয় উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি আপনাকে কালই নিয়ে যাব।"

গৌরী হাসিয়া বলিল, "মাসীমা আপনার সঙ্গে আমায় যেতে দেবেন বুঝি, ভাব্‌ছেন ?"

সঞ্জয় এ উত্তরে শুধু শুধুই লাল হইয়া উঠিল। তারপর বলিল, "মাসিমাকে শুদ্ধই নিয়ে যাব। আপনাকে একলা যেতে তিনি দেবেন না তা জানি।"

চঞ্চলা একরাশ বই হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "এই বইগুলো একজন আশ্রমের নাইটস্কুলে দান করেছেন, কিন্তু ওদের পক্ষে এগুলো শক্ত হবে। আপনি যদি বইগুলো বিক্রী ক'রে দিয়ে এদের মত বই কিছু সেই পয়সা দিয়ে জুটিয়ে দিতে পারেন তাহ'লে খুব ভাল হয়।"

গৌরী দেখিল চঞ্চলার মুখ আশ্চর্য্য গম্ভীর। সঞ্জয়ও খুব প্রফুল্ল নয়। সে বই কয়খানা লইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি চেষ্টা ক'রে বিক্রী করিয়ে দেব।" তারপর পকেটের ভিতর হইতে একখানা খোলা চিঠি বাহির করিয়া চঞ্চলার হাতে দিয়া বলিল, "এই চিঠিখানা প'ড়ে দেখ্‌বেন।"

চঞ্চলার মুখ অদ্ভুত রকম কঠিন হইয়া উঠিল। গৌরীর সাম্‌নেই তাহার হাতে চিঠি দেওয়াতে সে অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকাইল। চিঠিখানাও ফিরাইয়া দিতে যাইতেছিল। কি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি পড়্‌ব পরে। আশ্রমের কথা বুঝি কেউ লিখেছেন ?"

সঞ্জয় পাছে কোনো উত্তর দেয় এই ভয়ে সে কথাটা বলিয়াই চলিয়া গেল। তাহার এ ছলনাটুকু বুঝিতে গৌরীর একটুও অসুবিধা হইল না। কিন্তু সে বিস্মিত হইল তাহাদের দুইজনের দুই বিভিন্ন রকম ব্যবহার দেখিয়া। সঞ্জয়ই বা তাহার কাছে সব প্রকাশ করিতে উন্মুখ কেন আর চঞ্চলাই বা সব লুকাইতে চাহে কেন ? এ যদি কেবল কুমারীর স্বাভাবিক লজ্জার জন্যই হইত, তাহা হইলে এমন তীব্র বিরক্তি তাহার সহিত আসিয়া জুটিত না। তাছাড়া সঞ্জয়কে এমন করিয়া এড়াইয়া চলাও অত সহজ হইত না। কি হইয়াছে ইহাদের মধ্যে ভাবিয়া সে স্থির করিতে পারিতেছিল না। অথচ ইহাদের ভাবনাটা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতেছিল না।

চঞ্চলার আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধানে সঞ্জয় যেন একটু লজ্জিত হইয়া কৈফিয়তের সুরে বলিল, "বড় রকম দুঃখ পেলে মানুষের সব সময় মাথার ঠিক থাকে না।"

গৌরী প্রশ্ন করিয়া এবিষয়ে নূতন কিছু জানিবার কৌতূহল আর দেখাইল না।

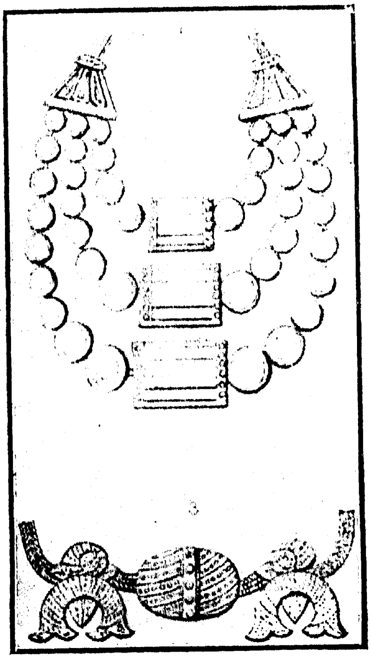
(ক্রমশঃ)

গহনা

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

(২)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে উত্তর ভারতের প্রাচীন সভ্যতা শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইল। এই সকল আক্রমণ বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এদেশের সীমান্ত প্রদেশ সকলে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা এতকাল



প্রাচীন বৌদ্ধযুগের হার।

কেবলমাত্র লুণ্ঠন বা সাময়িক বিজয়ে পরিণত হইত। এদেশে শত্রু কর্ত্তৃক স্থায়ীভাবে রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সফল হইল। পর্ব্বতের অন্তরালে স্থিত উত্তর ভারতের কয়েকটি জনপদ ভিন্ন প্রায় অন্য সকল স্থানেই হিন্দুরাজত্বের উচ্ছেদ সাধিত হইল।

সুতরাং উত্তর ভারতের সকল প্রকার শিল্পের অবনতিও সেই সময় হইতে আরম্ভ হইল। এই অবনতির এক কারণ এই যে, হিন্দু-শিল্পের ও ললিত কলার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট নিদর্শন ঐ সময় লুণ্ঠিত, নষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং পরবর্ত্তী যুগের শিল্পীর সম্মুখে আদর্শরূপে কিছুই ছিল না। অবনতির অন্য কারণ এই যে, প্রাচীন হিন্দুরাজন্যবর্গের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর উৎসাহদাতৃবর্গও লোপ পাইল। যাহারা পুরাতনের উচ্ছেদ করিয়া নূতন রাজত্ব স্থাপন করিল, তাহাদের লুণ্ঠন ও বিনাশের শক্তিই প্রবল ছিল। শিল্পে উৎসাহদান করিবার, বা তাহাতে নূতন ধারা আনিবার মত সভ্যতা, রুচি বা যোগ্যতা, কোনটাই তাহাদের ছিল না।

ইহার ফলে উত্তর ভারতের গহনায় ক্রমে পরিকল্পনা-বৈচিত্র্য, গঠন-লালিত্য, কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য ইত্যাদির দারুণ অভাব ঘটিতে লাগিল। ক্রমে হিন্দু গহনা-শিল্পে আদিমযুগের দোষসকল ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। শিল্পিগণও উৎসাহদাতার অভাবে কেবলমাত্র নিয়োগসাধকে (Order Supplier) পরিণত হইল। ফলে উপকরণের মূল্যই গহনার বিচারের একমাত্র নিবষরূপে গৃহীত হইল এবং গহনাধারণে বাহুল্যদোষ ও গহনার আয়তনে বিপুলতা ইত্যাদি দোষ পুনর্ব্বার দেখা দিল।

যে ভারতীয় শিল্পের উদ্বোধন সভ্যজগতের আদিম শৈশবকালেই সাধিত হয়, খৃঃ প্রথম শতাব্দীতেই যাহার উৎকর্ষ এরূপ উচ্চস্তরে উপনীত হয়, যে তাহার খ্যাতি সুদূর গ্রীস ও রোমেও প্রচারিত হয়, এবং খৃঃ সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যাহার পূর্ণ বিকাশ, এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যপ্রভাযুক্ত ছিল যে কলা-কৌশলে, শিল্পচাতুর্য্যে বা কল্পনাবৈচিত্র্যে তাহার

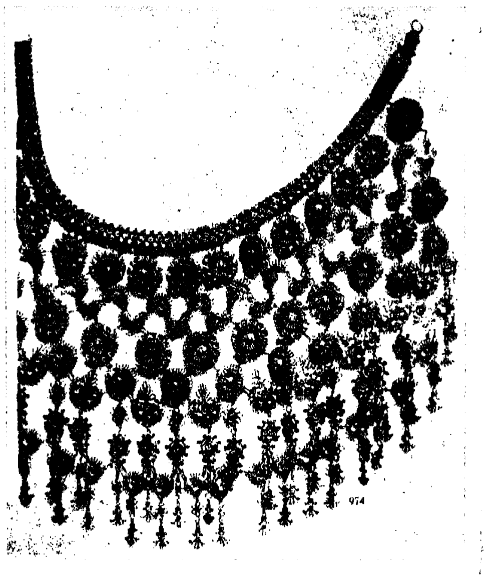
প্রতিযোগিতা করা আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীর পক্ষেও নিতান্ত দুঃসাধ্য, অসভ্য শত্রুর দস্যুবৃত্তির ফলে সেই শিল্পের এইরূপে অকালে ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটিল।

দাক্ষিণাত্যে ও সিংহলে বিদেশীয় আধিপত্য বা প্রভাব অনেক পরে বিস্তারিত হয়, সুতরাং সে সকল দেশে ললিতকলা ও কলাশিল্প উত্তর ভারত অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। সেইজন্য সেখানে খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চিত্রে মূর্ত্তিতে ও ধাতব শিল্পাদিতে প্রাচীন ভারতীয় কলাশিল্পের ক্রম লক্ষিত হয়। কিন্তু ঐ সকল নিদর্শনে জীবন্তশিল্পের অগ্রমুখী গতির কোনও চিহ্ন নাই। কেবলমাত্র ইঙ্গিতমাত্রিক (Rule of thumb) অনুকরণের জড়ভাব, বা স্থলে স্থলে বৈদেশিক প্রভাব বিস্তারের আভাস পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের ভারতীয় গহনার বাস্তব নিদর্শনের অতি অল্পই এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান; এবং যাহা আছে তাহাও দেশীয় রাজন্যবর্গের রত্নাগার সকলে লুক্কায়িত। সুতরাং ঐ যুগেরও গহনার পরিচয় সমসাময়িক চিত্র বা মূর্ত্তি সকল হইতে লইতে হইবে।

দাক্ষিণাত্যের প্রস্তর ও ধাতব মূর্ত্তি সকলে যে সকল গহনার পরিচয় পাওয়া যায়, সে সকলের অধিকাংশই ত্রয়োদশ যুগের গহনার অনুকরণ মাত্র। এবং এইরূপ অনুকরণ-প্রবৃত্তির ফলে যেরূপ অবপাত (decadence) অবশ্যম্ভাবী, তাহারও পরিচয় ঐ সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট আছে। ঐ সকল নিদর্শনে কয়েকটি মাত্র নূতন গহনার পরিচয় পাওয়া যায়; যথা, মাদুরায় বৃহৎমন্দিরস্থ নটরাজ মূর্ত্তির উরুদেশের উপরিভাগের (upper part of thigh) গহনা, উক্ত মন্দিরের তিরুমল্ল চৌলত্রিতে, নৃপতি তিরুমল্লের রাণীর সম্মুখে পরিহিত চন্দ্রহার, বেঙ্কটপতি রায়ের কাংস্যমূর্ত্তির কর্ণাভরণ ইত্যাদি, এবং রামেশ্বর মন্দিরের কয়েকটী স্ত্রীমূর্ত্তিতে নাসিকার গহনা। এইসকল গহনায়, সূক্ষ্ম রেখাপাত বা কারুকার্য্য-খচিত, সুগঠিত বহুসংখ্যক খণ্ডের, আয়তন অনুপাতে সুন্দর বিন্যাস, ইত্যাদি প্রাচীন গহনাশিল্পের বিশেষত্বের পরিচয় কিছুই নাই।

ঐ যুগের উত্তর ভারতের মূর্ত্তি সকলের গহনায় নূতনত্ব, বিশেষত্ব বা বিশুদ্ধ রূপরসজ্ঞান, ইহার কোনটিরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে ইহা বলা উচিত, যে, ঐ অঞ্চলের দেশীয় নৃপতিবর্গের অধিকারে যে সকল মন্দির বা প্রাচীন প্রাসাদাদি আছে, সে সকলে আমাদের অজ্ঞাত অনেক কিছু থাকিতে পারে, যাহা হইতে এ বিষয়ে আমাদের অনেক নূতন জ্ঞান লাভ সম্ভব।



স্বর্ণময় হার। ব্রহ্মদেশ। বিশুদ্ধ হিন্দু গহনার বিদেশী সংস্করণ

মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রকলায় অনেক প্রকার গহনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা অসম্ভব। কেননা এক্ষেত্রে অনেক কিছুই এখনো আমাদের নিকট সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞাত।

প্রথমতঃ, চিত্রের মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞাত শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত। সে সকল চিত্রের সময় ও কলারীতি (School) নিরূপণ সম্বন্ধে নানারূপ মত প্রচলিত, এবং সে সকল মতামতের কোন্‌টি নির্ভুল তাহা বলা দুরূহ।

তবে মুঘল বাদশাহদিগের আমলের (আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জহান) কয়েকটি পুস্তক ও চিত্রসমষ্টি

(album) আছে, যেগুলির সময় ও শিল্পী নির্দ্দেশ করা সম্ভব। সে সকলের মধ্যে সমন্বিত চিত্রসকলে সম-সাময়িক গহনার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়।



দাক্ষিণাত্য (বা সিংহল ?) স্বর্ণময় রুদ্রাক্ষমালা ও মণিমুক্তাখচিত পদক। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

এই সকল পুস্তকের মধ্যে, সম্রাট আকবরের আদেশে অনূদিত পারসীভাষায় লিখিত মহাভারতের (রজম্‌নামাহ Razmnamah) চিত্রই বোধ হয় এই সকল চিত্রের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম। ঐ পুস্তকে নানা শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রাবলী আছে, তন্মধ্যে কয়েকজন হিন্দু ও অন্য সকলে নানাদেশীয় মুসলমান। ইহা ভিন্ন আকবরনামাহ্‌, বাকিয়াৎ-ই-বাবরি ও অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক ও চিত্রসমষ্টিও এই মুঘল সম্রাটের আদেশে চিত্রাঙ্কিত হইয়াছিল।

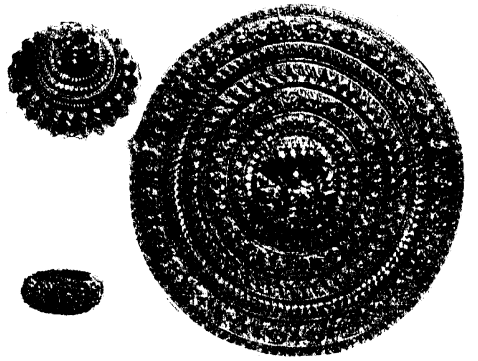
আকবরের পরে জাহাঙ্গীর ও তাহার পর শাহ্‌জহানও অনেক চিত্রকরকে রাজ-অনুগ্রহে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ও ইহাদের সময়ের অনেক চিত্রসমষ্টি এখনো এদেশে ও বিদেশে রহিয়াছে।

এই সকল চিত্রের মধ্যে যাহা কিছু হিন্দু শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত, তাহা হইতে সে সময়ের এদেশীয় গহনা-শিল্পের বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। দুঃখের বিষয় ঐ সকল চিত্রের মধ্যে যাহা কিছু জ্ঞাত তাহার অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। এদেশে কি আছে বলা যায় না। কারণ এদেশের রাজন্যবর্গের অধিকারে যাহা কিছু আছে তাহা এদেশীয় জনসাধারণের চক্ষুর অগোচর। বিদেশীয়ের নিকট—বিশেষে ইয়োরোপীয়ের নিকট—তাহার প্রকাশ সহজেই হয়। সুতরাং ঐরূপ চিত্রের পরিচয় লাভের একমাত্র উপায় বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশিত ঐ সকল প্রামাণিক চিত্রের প্রতিরূপ দর্শন।

ঐ উপায়ে ভারতীয় গহনার কিছু পরিচয় যাহা পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে, জাহাঙ্গীরের আমলের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত ভারতীয় গহনায় বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার বিশেষ হয় নাই। যথা, রজম্‌নামাহ্‌তে দেখা যায় যে (Jeypore Memorials) বিশুদ্ধ হিন্দু ভাবযুক্ত গহনার মধ্যে গ্রথিত ও মুক্তা-শোভিত হার, কঙ্কণ ও বাজু ইত্যাদি তখনও প্রচলিত ছিল। রাজকুমার খুর্‌রমের (পরে শাহ্‌জহান) বিবাহের চিত্রে গায়িকাদিগের অঙ্গেও বিদেশী প্রভাবযুক্ত গহনা—যথা বিপর্য্যস্ত ত্রিকোণ (inverted triangle) আকারে রচিত-দুইটি মুক্তা উপরের দুই কোণে এবং নিম্ন কোণে মণিদোলক।—কর্ণের দোলক,যাহা প্রাচীন বাইজাণ্টীয় গহনা—বা সম্পূর্ণ বিদেশীয় গহনা, যথা, নাসিকার অলঙ্কার বা পদাঙ্গুলীর অলঙ্কার বিশেষ, ইত্যাদির প্রচলন তখনও হয় নাই। জাহাঙ্গীরের সময় হইতেই বিদেশীয় (মুসলমানী) প্রভাব গহনা শিল্পে বিশেষ লক্ষিত হইতে থাকে।

নাসিকার গহনা যে বোধহয় হিন্দু নহে এইরূপ মন্তব্য গতমাসের প্রবাসীতে "গহনা" প্রবন্ধে লিখিত হইবার পর অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লেখককে বলেন যে, বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় N. B. Divatia নামক একজন লেখক ঐ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সন্ধান পাইয়া লেখক ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। উহা ১৯২৪খৃঃ

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (The Nose ring as an Hindu Ornament, by N. B. Divatia, B A, C S.)। ঐ প্রবন্ধ লেখক বলেন যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নথের কোনও বর্ণনা তিনি পড়েন নাই এবং তাঁহার বিশ্বাস যে, ঐ গহনা মুসলমান কর্ত্তৃক এদেশে আনীত হইয়াছে। তাহার প্রমাণে তিনি দেখাইয়াছেন, যে, ঐ গহনার প্রচলিত নাম প্রায় সকলই মুসলমানী (আরবী, পারসী ইত্যাদি) শব্দ হইতে উৎপন্ন। দিভাটিয়া মহাশয় আরও বলেন, যে, হিব্রু ও



অঙ্গুরী ও শির-অলঙ্কার। বোম্বাই।

মিডিয়ানাইটদিগের মধ্যে (মিডিয়ানাইট পুরুষদিগের পর্য্যন্ত) নাসিকার গহনার ব্যবহার প্রচলিত ছিল এরূপ কথা ডি কুইন্সির "হিব্রু মহিলার প্রসাধন" (De Quincey, "Toilette of the Hebrew Lady") নামক পুস্তকে আছে। তিনি আরও বলেন যে, যদিও অনেকে বলেন পারস্য দেশের ভাষায় বা সাহিত্যে নথ-জাতীয় গহনার উল্লেখ নাই, কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আসফ-উল-লুগত (Asaf-ul-lugat) এবং গয়াসউল লুগত (Gayas-ul-lugat) এই দুই পারসী অভিধানেই ঐরূপ গহনাবাচক শব্দ রহিয়াছে এবং তাহা আরবী বা তুর্কি ভাষাজাত বলিয়া উল্লেখ আছে। অতএব দিভাটিয়া মহাশয়ের মতে নথ বা বুলাক মুসলমান কর্ত্তৃক আনীত গহনা।*

বর্ত্তমান লেখকের সংস্কৃত জ্ঞান অতি সামান্য। পারসী, আরবী, ইত্যাদি ভাষায় কিছুমাত্রই অধিকার নাই। সুতরাং বিগত মাসের প্রবন্ধে "নাসিকার গহনা বোধহয় হিন্দু নহে" এইরূপ সাবধান মন্তব্য (guarded statement) করিতে হইয়াছিল। দিভাটিয়া মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে লেখকের ধারণা নিঃসন্দেহ হইয়াছে।

যে সকল প্রমাণ পাইয়া, নাসিকার গহনা হিন্দু নহে, লেখক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

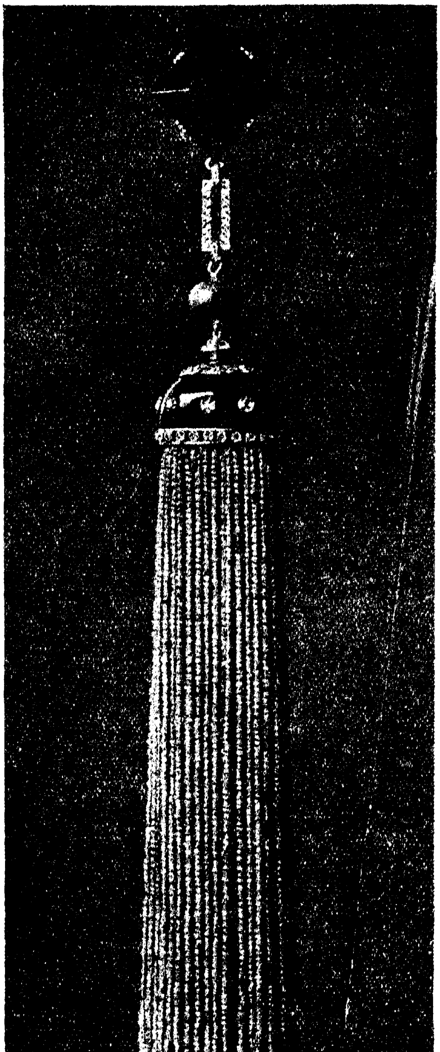


আধুনিক শিরসজ্জা। সভ্য ও অসভ্য।
ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ

অমরকোষে প্রত্যেক অঙ্গের গহনার নাম ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। নাসিকার গহনার নাই।

অর্থশাস্ত্রে মণিমুক্তারচিত নানা অঙ্গের গ্রথিত গহনার বিবরণে, শিরঃদেশ, মণিবন্ধ, গলদেশ, কটি, গুল্ফ ইত্যাদি অঙ্গের উল্লেখ আছে; নাসিকার নাই। দিভাটিয়া মহাশয়ের মতে সংস্কৃত কাব্য বা অভিধান সকলেও নাই। অজণ্টাগুহাচিত্রাবলির মধ্যে নাসিকার গহনার নিদর্শন নাই (Griffiths' Ajanta, and Lady Herringham's Ajanta)। সাঁচি, ভারুট, অমরাবতী, এলুরা, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, উদয়গিরি খণ্ডগিরি, মথুরা, কান্হেরি, দেওগড়, বেস্‌নগর, বাদামি, এলিফাণ্টা, মামল্লাপুরম, ভুবনেশ্বর, কোনার্ক, এই কয়টি স্থানের ভাস্কর্য্য-শিল্পের মধ্যে নাসিকার গহনার নিদর্শন নাই। অন্ততপক্ষে Archaeological Survey of India কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলির মধ্যে, এবং কুমারস্বামী, William Cohn, Vincent Smith, Havell, Fergusson প্রমুখ সুধীবর্গ লিখিত পুস্তকাবলির

* শোনা যায় যখন শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "গনেশজননী" চিত্র প্রকাশিত হয়, তখন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গণেশজননীর নাকে নথ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, উহা আর্য্য অলঙ্কার নহে।



বুকের গহনা। অত্যাধুনিক প্যারি ফ্যাসন। প্রবাল, মুক্তা, হীরা ও অনিক্স (স্বল্পমূল্য কৃষ্ণ উপরত্ন)

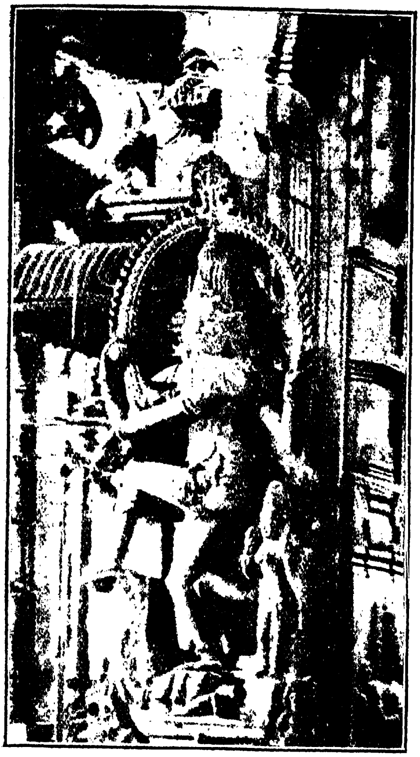
মধ্যে, সে সকল স্থানের ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন স্বরূপে যে সকল চিত্র আছে, সেগুলিতে নাসিকার গহনা নাই।

রজমুনামাহ্‌র চারখানি চিত্র লেখকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। সে কয়টি হিন্দু শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত এবং তাহাতে স্ত্রীমূর্ত্তিতে নাসিকার গহনা নাই। "রাজকুমার খুররমের বিবাহ" চিত্রের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অনেক প্রাচীন হিন্দু চিত্র আছে যাহাতে অঙ্কিত স্ত্রীমণ্ডলী মধ্যে কাহারও নাসিকার গহনা নাই, যদিও অন্যান্য অঙ্গে যথেষ্ট গহনা রহিয়াছে।

নাসিকার গহনা যে মুসলমান কর্ত্তৃক আনীত তাহার প্রধান প্রমাণ দিভাটিয়া মহাশয়ের উল্লিখিত, De Quincey লিখিত পুস্তকে (Toilette of the Hebrew Lady) সেমিটিক জাতির মধ্যে নাসিকার গহনার কথা (আরব দেশে মুসলমান ধর্ম্মের জন্ম এবং আরবরা সেমিটিক জাতি)। Old Testament এ নাসিকার গহনার উল্লেখ আছে বলিয়া লেখকের ধারণা আছে, কিন্তু তাহা পুনর্ব্বার না দেখা পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। আরব ও মিশর দেশের নানাজাতির মধ্যে নানা প্রকার নাসিকার গহনার প্রচলন এখনও আছে, ইহা লেখক কর্ত্তৃক স্বচক্ষে মিশর দেশে দৃষ্ট হইয়াছে। পারস্য দেশের প্রসিদ্ধ চিত্রকর শাপুর (Shapur) কর্ত্তৃক অঙ্কিত মুহাম্মদ তুঘলকের রাজসভার একটি চিত্রে প্রত্যেক নর্ত্তকীর নাসিকায় গহনা আছে, (অতএব নাসিকার গহনার প্রচলন ঐ সময়ে ঐ দেশে ছিল) যদিও তাহার অনেক পরবর্ত্তী কালে (আকবরের আমলে) এদেশে হিন্দু চিত্রকর অঙ্কিত চিত্রে নাসিকার গহনা নাই। জাহাঙ্গীরের ও তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের এদেশীয় চিত্রকরগণের অঙ্কিত চিত্রাবলীতে নাসিকার গহনা পাওয়া যায়। এবং তৎপরবর্ত্তী সময়ের প্রায় সকল চিত্রে বিভিন্ন প্রকার অন্য মুসলমান প্রভাবযুক্ত অলঙ্কারও দেখা যায়।

সুতরাং নাসিকার গহনা যে অহিন্দু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং এদেশের গহনা-শিল্পে বৈদেশিক মুসলমানী প্রভাব বিস্তারের সময়, উক্ত নাসিকার গহনা সকলের প্রচলনের সময় দ্বারা নির্দ্দেশ করাও বোধ হয় ভ্রমাত্মক হইবে না।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এদেশের গহনা সম্বন্ধে মানুচির মুঘল কাহিনীতে (Storia Do Mogor) কিছু কিছু



মাদুরা বৃহৎ মন্দির। নটরাজ মূর্ত্তির উরুদেশে নূতন প্রকার গহনা।

পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের স্ত্রীলোকের গহনার মধ্যে মান্থচি, কর্ণের গহনার বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নাই; এইমাত্র বলিয়াছেন যে, কর্ণের ছিদ্র অতি বৃহৎ (বোধ হয় বৃহৎ কুণ্ডল ধারণের জন্য)। গলদেশে নানা প্রকার হার, পায়ে মণিযুক্ত অলঙ্কার এই কয়টির কথা মাত্র তিনি বলিয়াছেন, নাসিকার গহনার উল্লেখ করেন নাই। অল্পবয়স্কাদিগের গহনার মধ্যে কটিদেশে হার, গুল্‌ফে ঘুঙুর ও পদাঙ্গুলীতে আংটি ইহার কথাও তিনি বলিয়াছেন।

দিল্লী রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরবাসিনীদের গহনার বর্ণনা মান্থচি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণভাবে দিয়াছেন। কিন্তু সে-বর্ণনার সত্যাসত্য বিচার করা কঠিন, কেন না বর্ণনার কিছু পরেই তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বুঝা য় যে, সেই মহিলাদিগকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন না সন্দেহ। তবে বোধ হয় তাঁহার বর্ণনা কতক অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের গহনা দেখিয়া এবং রাজপ্রাসাদের বাঁদি-দির নিকট শুনিয়া লিখিত। বর্ণনা এইরূপ যথা—

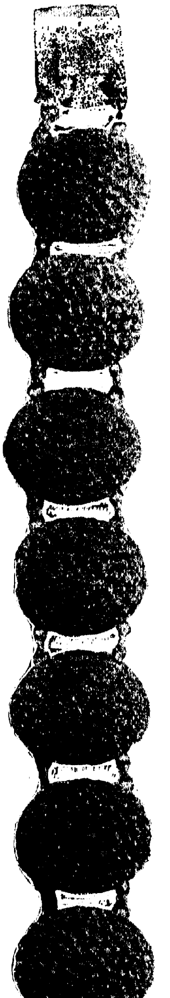
তাঁহারা দুই স্কন্ধে তিন ছড়া করিয়া মুক্তা ও গলাবন্ধের (sirf) আকারে গঠিত মণিহার পরেন। কণ্ঠ হইতে তলপেট (lower part of the stomach) পর্য্যন্ত অবস্থিত, তিন হইতে পাঁচ ছড়া মুক্তার হার, তাঁহারা সচরাচর ব্যবহার করেন। সিঁথিতে এক থোকা মুক্তা



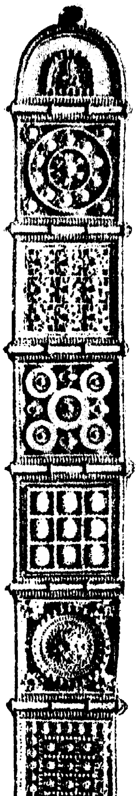
মাদুরা বৃহৎমন্দির। নৃপতি তিরুমল্লের স্ত্রীর সম্মুখে পরিহিত চন্দ্রহার, নাসিকায়ও গহনা আছে।

ও তাহার সহিত সংলগ্ন চন্দ্র, সূর্য্য বা তারার আকারে গঠিত গহনা পরিহিত হয়। এই গহনা অতিশয় মানানসই। তাঁহারা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ছোট গোলাকৃতি গহনা (boucle—buckle)—যাহাতে দুইটি মুক্তার মধ্যে একটি

ছোট চুণীযুক্ত থাকে—ধার
বরেন। কর্ণে মহামূল্য মণি
গলদেশে বৃহৎ মুক্তা বা মণি
মালা,এবং সর্ব্বোপরি, কে:



পাহঁচি (ব্রেসলেট) স্বর্ণময়। দিল্লী।



ইতালীয় ব্রেসলেট
(Bracelet by Castellani)

মহার্ঘ হীরা, চুণী বা পান্নার খামীযুক্ত, অতি মূল্যবান গহনা থাকে। বাজুতে দুই ইঞ্চি চৌড়া বাজুবন্দ থাকে; বাজুবন্দ মণিখচিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে ছোট ছোট মুক্তার থোপা সংযুক্ত থাকে। মণিবন্ধে মূল্যবান বালা বা কঙ্কণ (bracelets) অথবা মুক্তার ছড়া পরিহিত হয়। মুক্তার ছড়া নয় হইতে বারোবার ফের দেওয়া থাকে। প্রত্যেক অঙ্গুলীতে মণিযুক্ত আংটী থাকে; কেবলমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আংটীতে মণির পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র একটি মুকুর থাকে।

"তাঁহাদের কটিবন্ধ দুই অঙ্গুলী চওড়া, স্বর্ণময় ও বৃহৎ মণিযুক্ত হইয়া থাকে, এবং তাঁহাদের পায়জামার (drawers) বন্ধনিসূত্র সকলের মুখে পাঁচ অঙ্গুলি প্রমাণ পনেরো ছড়া লম্বা মুক্তার গঠিত থোকা থাকে। গুল্‌ফে মহার্ঘ মণি বা মুক্তার মালা থাকে।"

যাহা হউক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে এদেশে মুঘল ও অন্য মুসলমানী গহনা ও গহনার পরিকল্পনার বিস্তার সম্পূর্ণ হইল। এই সকল গহনার মধ্যে কতক খাঁটি বিদেশী—যথা বুলাক, বাইজান্তীয় দুল—এবং কতকের জন্ম এদেশে কিন্তু পরিকল্পনা মুসলমানী।

নূরজাহান সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি শিল্পী নিয়োগ করিয়া নূতন অনেক গহনার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। হয়ত অন্য অনেক মুঘল অন্তঃপুরচারিণীও এইপ্রকার গহনার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

নূতন গহনার সৃষ্টি হউক বা না হউক, উত্তর ভারতে মুঘল রাজধানী দিল্লী গহনা-শিল্পের পীঠস্থান হইয়া পড়িল; এবং ক্রমে, দিল্লী ও লাহোর হইতে শিল্পী লইয়া যাইয়া, জয়পুরও গহনা-শিল্পে—বিশেষে মণিকর্ত্তন ও সংযোজন এবং মীনা কার্য্যে—প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

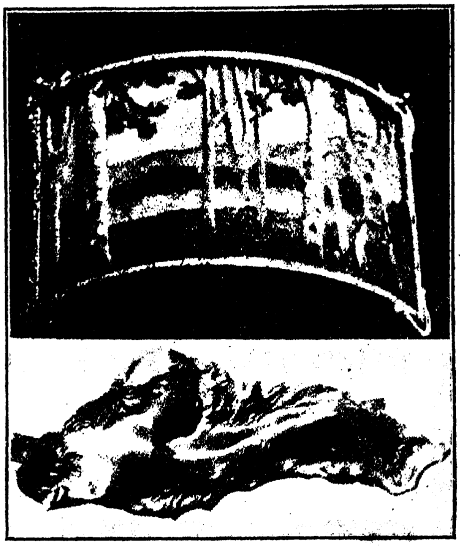
দক্ষিণে মান্দ্রাজ, সিংহল ও মহারাষ্ট্রের পুণা ইত্যাদি কয়েকটী স্থলের গহনায় হিন্দুপ্রভাবের আধিক্য অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাহার কারণ ঐ সকল স্থলে হিন্দু রাজত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক দিন ছিল। বোধ হয় ঐ সকল মধ্যযুগের হিন্দু রাজত্বের মধ্যে বিজয়নগরই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ছিল। দুঃখের বিষয় ঐ নগর ধ্বংসকার্য্যে মুসলমান বিজেতা যেরূপ অসভ্য

বর্ব্বরোচিত পটুতা দেখাইয়াছিল, তাহা ভারতের চিতোরগড় ভিন্ন অন্য কোথাও তাহারা দেখাইয়াছে কি না সন্দেহ। সুতরাং যদিও ঐ জনপদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তথাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ হইতে ললিতকলা বা কলাশিল্পের নিদর্শন বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই।

খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়, যাহার ফলে দেশে বিষম অরাজকতা ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। এদেশে যদিও বা আকবর জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জহানের রাজত্বের মধ্যে ললিতকলা ও কলাশিল্পের পুনরুত্থান হইয়াছিল, এবং যদিই বা তাহা ধর্ম্মান্ধ আওরং-জেবের বিদ্বেষ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিত, এপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে তাহা অসম্ভব হইল। নূতনের সৃষ্টি এই প্রকার অত্যাচার ও অরাজকতার মধ্যে অসম্ভব হইয়া পড়িল এবং পুরাতন যাহা কিছু ছিল, তাহার অধিকাংশ শতাব্দীব্যাপী লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য্যের ফলে নষ্ট হইল। অল্প যাহা রক্ষা পাইল তাহা ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশে বিভক্ত হইয়া এদেশে ও বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপে যে সকল ললিতকলা ও গহনা-শিল্পের সম্পদ মুঘল রাজধানী দিল্লী ও মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রাদেশিক রাজধানী সকলে সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা সুদূর পারস্য দেশ পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইল।

মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে যে সকল স্বাধীন রাজত্ব স্থাপিত হয় সে সকলে মুঘলদিগের সঞ্চিত ধনের অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা রক্ষিত হয়। কিন্তু সে সকল রাজত্ব আবার বৈদেশিক বিজেতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। ভরতপুর, অযোধ্যা, মুর্শিদাবাদ, দিল্লী, লাহোর, মহারাষ্ট্র-রাজধানীসকল, হায়দরাবাদ, মহীশূর, ইত্যাদি সকল স্থানই ধনলুব্ধ ইয়োরোপীয় যুদ্ধব্যবসায়ী বা বণিক-সম্প্রদায় ও তাহাদের নিযুক্ত সেনানী দ্বারা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। সুতরাং প্রাচীন গহনা-শিল্পের নিদর্শন যে এদেশে এতই বিরল, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

ধনরত্ন লুণ্ঠিত হওয়ায় এদেশের অতি নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিজেতার অবহেলা ও অবজ্ঞা, ও তদপেক্ষা সাংঘাতিক বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার, এই সকল কারণে এদেশে শিল্পের যে ক্ষতি ও অবনতি হইয়াছে তাহাও অতি প্রচণ্ড। এই হিসাবে ইংরাজ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতি আমাদের যেরূপ ক্ষতি করিয়াছে মুসলমান বোধ হয় ততটা করে নাই। কারণ মুসলমান জাতি সকল যখন এদেশে প্রবেশ করে তখন শিল্প ও ললিতকলা ইত্যাদিতে এদেশ সমৃদ্ধিশালী, বিজেতার, যুদ্ধ বিগ্রহ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে, তাহাকে শিক্ষা দান করি-

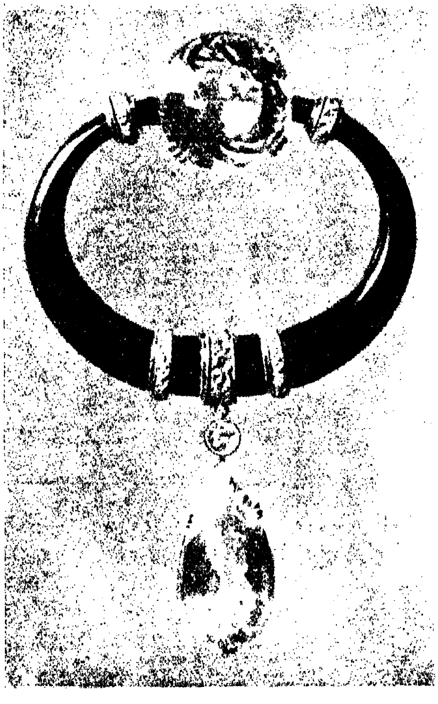


অত্যাধুনিক জর্ম্মাণ গহনা। উপরে মিনাচিত্রাঙ্কিত কঙ্কণ (Bracelet) নীচে স্ত্রীমূর্ত্তি উৎক্ষিপ্ত স্বর্ণময় ব্রুচ। (relief work in gold)

বার ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না, কিন্তু ইয়োরোপীয়েরা যখন বিজয় আরম্ভ করে তখন এদেশ বহুযুগ বহুশতাব্দী-ব্যাপী লুণ্ঠন, অত্যাচার ও বিপ্লবের ফলে অতি দীন দরিদ্র গতগৌরব হতশ্রী অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ইয়োরোপীয়ের পক্ষে ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

এই অবজ্ঞার ফলে এদেশের শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদি অনাদৃত ও নষ্ট হইতে থাকে; এবং তাহার বিনাশে দুঃখ করিবার কেহই ছিল না। কারণ, যদিও তাহা আমাদের নিজস্ব সম্পদ, কিন্তু বিদেশী বিজেতার মতামত প্রচারের ফলে আমাদেরই এই বিশ্বাস জন্মায় যে উহা সম্পদ নহে, আবর্জ্জনা মাত্র। এইরূপ মত

প্রচারের মূলে বিদেশীর স্বার্থও ছিল—এবং এখনও আছে—ইহা কেবলমাত্র অবজ্ঞা-প্রসূত নহে। কেননা ইয়োরোপীয়েরা মুঘলদিগের ন্যায় এদেশে বসবাস করিতে আসে নাই, সুতরাং এদেশের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য বিস্তারের জন্য শিল্প ও কলাবিদ্যায় উৎসাহ প্রদানের কারণ রূপ যাহা কিছু স্বার্থ মুঘলদিগের ছিল, তাহা ইহাদের নাই। ইহাদের উদ্দেশ্য, স্বদেশজাত সুলভ ও অপকৃষ্ট শিল্প ও পণ্য দ্রব্যাদির বিনিময়ে এদেশের স্বভাবজাত ধনসম্পদ আহরণ



"প্যারিক্যাদন" অত্যাধুনিক। স্বল্পমূল্য ও বহুমূল্য উপকরণের সংমিশ্রণ
(Fibule-onyx, aquamarine and brilliants)

করা। ফলে এদেশের শিল্পের অবনতি ইয়োরোপীয়দিগের আমলে অতি দ্রুত হইয়াছে। গহনাশিল্পে যে এই অবনতি চরমে পৌঁছিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

আদিতে অবিমিশ্র হিন্দু গহনাশিল্প কিছু ছিল কিনা এখনো বলা যায় না। আসীরীয় বা গ্রীক প্রভাব গহনা শিল্পে প্রবেশ করিয়াছিল কি না এবং করিলে কখন ও কতটা প্রবেশ করে, তাহাও বলা কঠিন। কিন্তু ইহা সত্য যে, অজণ্টা হইতে কোনার্ক ভুবনেশ্বরের সময় পর্য্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চদশ শতাব্দী বা ততোধিক কাল ধরিয়া ভারতীয় গহনাশিল্পের একটি ধারা চলিয়াছিল যাহার মধ্যে পরিকল্পনা, কারুকার্য্য, গঠন-বিন্যাস, বা শিল্প-কৌশল, সমস্তই এদেশের শিল্পিগণের উদ্ভাবিত।

মুঘলদিগের সময় এই শিল্পের পুনরুত্থান হয়, যদিও তখন আর তাহাতে বিশুদ্ধ হিন্দুভাব ছিল না, এবং ইহা সম্ভব যে, আকবর হইতে শাহ্‌জহান পর্য্যন্ত মুঘলসম্রাটগণ যেরূপ রূপরসানুরাগী ছিলেন, পরবর্ত্তী সম্রাটেরা সেরূপ হইলে এবং ঐ সম্রাটগণের ন্যায় সাম্রাজ্যরক্ষায় ও প্রজাপালনে সক্ষম হইলে, হয়ত ভারতীয় গহনা এবং অন্য কলাশিল্পে নব্য মুঘল ও প্রাচীন হিন্দু এই দুই প্রভাবের মিশ্রণে একটি নূতন ধারা আসিত, যাহার ফলে প্রাচীনই নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় নিজগুণে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিত।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় গহনাশিল্পের অবস্থা কি? কবির কথায় তাহার উত্তর—

"গতগৌরব, হৃতআসন, নতমস্তক লাজে"

কোন গহনাটি বিশুদ্ধ হিন্দু, কোনটি বিশুদ্ধ অহিন্দু, কোনটি বা উভয়ের মিশ্রণসম্ভূত, তাহার খবর যাঁহারা এদেশের ললিতকলা ও শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহী, তাঁহারা পর্য্যন্ত রাখেন না।

কোন বাংলা মাসিক পত্রে জনৈক লেখক—যিনি ললিতকলা সম্বন্ধে লিখিয়া থাকেন—কথাপ্রসঙ্গে "শ্রীরাধিকার নাকের নোলক" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন।

শ্রীরাধিকা এখনো ঐতিহাসিকের অধিকারে আসেন নাই, তিনি এখনো কবি ও ভক্তের হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার বংশানুক্রম ইত্যাদি, নীরস ভূগোল বা জাতিতত্ত্বের নির্দ্দেশের মধ্যে আসে নাই, কিন্তু ইহা বোধ হয় বলা যায়, যে যদি তিনি ম্লেচ্ছ বা অনার্য্যবংশোদ্ভবা না ছিলেন, তবে নোলকজাতীয় কোন গহনা তাঁহার রূপলাবণ্যবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় নাই।

এখনো আমাদের দেশে বিদেশীর অনুকরণই শ্রেষ্ঠতার পরিচয়, যদিও ক্রমে অতি ধীরে সে মতের পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের মত এ-

বিষয়ে কি তাহা বোধ হয় নিম্নলিখিত (গ্রাম্য ?) "আগমনী" গানে প্রকাশ পায়।

"বাপের বাড়ী আস্‌বে উমা চড়ে এবার জুড়ী গাড়ি।"
"অর্ডার দেব হ্যামিল্টনে (!) গড়বে গয়না নিউ ফ্যাশনে"
"নেকলেস দেবে পার্ল সেট করা, হাতে ডায়মন কাটা চুড়ি।"

যদি কেহ ইহা অবিশ্বাস করেন ত তিনি যে কোন ধনীগৃহের ললনার অলঙ্কার দেখিয়া আসুন। তিনি দেখিবেন যে গহনার মধ্যে—

শিরে :—টায়রা (ফিরিঙ্গি বিলাতী) খোঁপায় কাঁটা বা চিরুণি (বিলাতি প্রাচীন ও পরিত্যক্ত গঠনের অনুকরণে প্রস্তুত)।

কর্ণে :—য়িহুদি মাকড়ি (জাতিনির্দ্দেশ নিষ্প্রয়োজন), ইয়ারিং (এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান), ড্রপ (তথৈবচ), দুল (মুসলমানী) এবং যদি কর্ণফুল থাকে তবে সেটা হিন্দু হইলেও হইতে পারে।

নাসিকায় :—নোলক, লবঙ্গ, বেসর, "গোঁড়া হিন্দু বাড়ি" হইলে নথ, ইত্যাদি সকলই মুসলমানী।

গলায় :—নেকলেস্ (প্রাচীন, কুৎসিৎ ও পরিত্যক্ত বিলাতি গঠন) মুক্তার কলার (বিলাতি)। মফ্ চেন ইত্যাদি (বিলাতি)।

বাহুর উপরিভাগে—বাজুবন্দ (হিন্দু গহনা কিন্তু মুসলমানী ধরণে প্রস্তুত), তাগা (ঐ), অনন্ত (হিন্দু কিন্তু "ডায়মন কেটে জাত মারা")।

মণিবন্ধে—ব্রেসলেট (৬০ বৎসর আগেকার বিলাতি), ডায়মন কাটা চুড়ি (ঐ), বালা (হিন্দু কিন্তু বিলাতি কারুকার্য্যের দরুণ জাতিচ্যুত)।

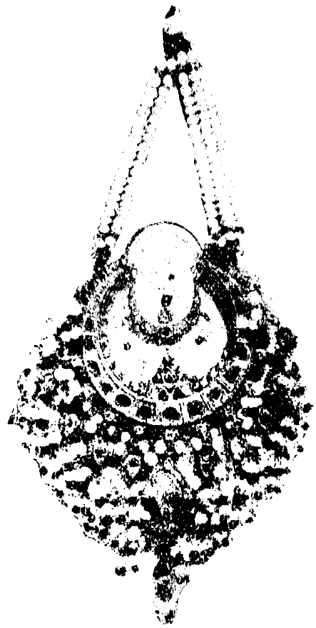
অঙ্গুলিতে—অঙ্গুরী (রিং বলা উচিত কেননা বিলাতি হিসাবে প্রস্তুত)।

কটিদেশ—আধুনিক হইলে শূন্য। নহিলে অতি আদিম কদর্য্য মিশ্রজাতীয়, "টাকার পরিচয়" স্বরূপ স্থূল গোট বা চন্দ্রহার। অথচ প্রাচীনকালের ভারতীয় কটি-অলঙ্কার অতি সুন্দর !

গুল্‌ফে—যদি হিন্দুয়ানি ও বয়স থাকে তবে এই খানেই একমাত্র অতি প্রাচীন ও আদিম হিন্দু গহনা "মল" বিরাজ করে।

আবার যদি জড়োয়া গহনা হয় তবে প্রত্যেকটি মণি ইয়োরোপে, ও ইয়োরোপীয় প্রথায়, কর্ত্তিত এবং হয় মুসলমানী নয় বিলাতী প্রথায় সংযোজিত।

সুতরাং ইহা অনায়াসে বলা যায় যে পরিচ্ছদ হিসাবে নব্য ভারতের পুরুষ যতটা বিদেশী ভাবাপন্ন, নব্যা ভারতমহিলাবৃন্দ গহনা হিসাবে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বিদেশী প্রভাবযুক্তা।



দিল্লীর জড়োয়া দুল।
স্বর্ণ, মুক্তা এবং কোণশূন্য মণি সংযোজন

এই বিষয়ে আরও অদ্ভুত ব্যাপার এই, যে উক্ত বিদেশী গহনা সকলের যে সকল দেশে জন্ম, সে সকল দেশে সে-গুলির অধিকাংশই বহুকাল যাবৎ পরিত্যক্ত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। এদেশের শ্রেষ্ঠ 'জুয়েলার" বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের সচিত্র গহনা-তালিকাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে একটিও আধুনিক পরিকল্পনায় রচিত গহনার চিত্র দেখা যায় না !

ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এদেশে সকল বিষয়েই জনসাধারণের রূপরসজ্ঞান অতি নিম্নস্তরে নামিয়াছে সুতরাং শিল্প কার্য্যের যাচাই, উপকরণের মূল্য দ্বারাই হইয়া থাকে। মোটামুটি একটা জাতি-বিচারও হয়, তাহা জিনিষটা দেশী (অর্থাৎ নিকৃষ্ট) বা বিলাতী (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) এই সম্পর্কে।

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে (শ্রাবণের প্রবাসীতে) এই-রূপ অবস্থার বিচারে বলা হইয়াছে যে, ইহার কারণ এ দেশের শিল্পকলায় সজীব, জাগ্রত ভাবের বা প্রাণের অভাব।

বস্তুতঃই চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এদেশে অলঙ্কার শিল্পের (ও অন্য শিল্পেরও) প্রাণ-বিয়োগই ঘটিতেছে। এই সময়ের মধ্যে বিদেশজাত বা বিদেশী প্রভাবজনিত অনেক কিছু নূতন পদার্থ এদেশে আসিয়াছে। কিন্তু সে সকল নিদর্শনের আসার ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। মুমূর্ষু রোগীর উপর উত্তেজক (stimulant) প্রয়োগের ফলে সাময়িক বলাধানের ন্যায় সে সকল দ্রব্য এদেশীয় শিল্পীর ক্ষণস্থায়ী আর্থিক উন্নতি-মাত্র করিয়াছে। ক্ষণস্থায়ী এই কারণে, যে, বিদেশী দ্রব্যের অন্ধ অনুকরণ মাত্র এদেশে হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শিল্পীর পরিকল্পনার বা রচনা-কৌশলের মৌলিকত্ব অধিকারের কোনও চেষ্টা হয় নাই।

মুঘল বাদশাহদিগের সময়ে পারস্য, তাতার, আরব ইত্যাদি নানা দেশের গহনা এদেশে প্রচলিত হয়, কিন্তু সেদেশীয় গহনা-শিল্পের পরিকল্পনা বা রচনাবৈচিত্র্য এদেশের শিল্পী স্থায়ীভাবে গ্রহণ বা অধিকার করিতে পারে নাই। হুমায়ুন বাদশাহের মহারাণী, ও সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান, ইঁহারা বিদেশ হইতে কারিগর আনাইয়া গহনা নির্ম্মাণ করান। ভারতীয় কারিগর তাহা দেখিয়া "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" মতে তাহার অন্ধ অনুকরণ করিয়াছে। সে গহনার দোষ গুণ বিচার, তাহা কোন প্রথানুসারে পরিকল্পিত ও রচিত, তাহার রচনায় বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহার উৎকৃষ্টতর নিদর্শন প্রস্তুত করিতে হইলে কিরূপে পরিকল্পনা করা উচিত, বিদেশীয় কারিগরের গহনা নির্ম্মাণ প্রথার মধ্যে গ্রহণ বা পরিত্যাগ-যোগ্য কি আছে, এ সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান বা ইহাতে অধিকার লাভের চেষ্টা কোনটাই সে করে নাই।

ফলে এ দেশের গহনাশিল্পী বিদেশী শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন মাত্র পাইয়াছে, বিদেশী শিল্পের প্রভাব বা জ্ঞান কিছুই পায় নাই। *

এখন এদেশে সকল শিল্পেই ইয়োরোপীয় আদর্শ, রীতি ও মতবাদের সজ্ঘর্ষ চলিয়াছে, যাহার ফলে ক্ষীণপ্রাণ হিন্দু শিল্পকলার সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ আসন্ন। বিদেশী শিল্প যে তাহার স্থান অধিকার করিতেছে তাহা নহে, কেন না প্রথমতঃ তাহা শিল্পের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তৎপরে দেশীয় শিল্পের ও শিল্পীর এতই অবনতি হইয়াছে যে, বিদেশীয় রীতি বা পদ্ধতি শিক্ষা দূরের কথা, বিদেশীয় নিদর্শনের যথাযথ অনুকরণও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

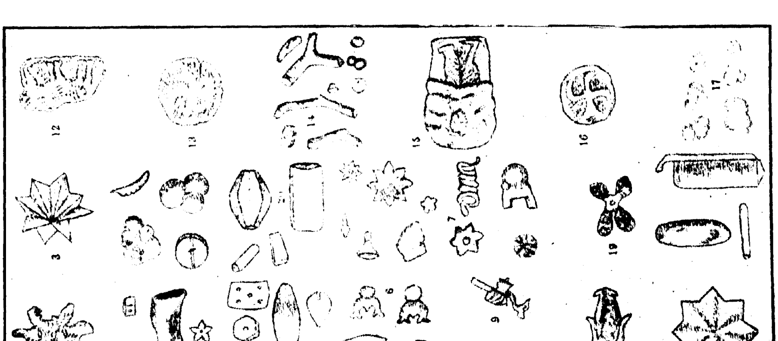
শিল্প ও শিল্পীর এরূপ অবস্থা হওয়ার প্রধান কারণ এই, যে, এদেশে রূপরসজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। শিল্প কলা কৌশলের উৎকৃষ্ট নিদর্শন কয়জনের মনে আনন্দ আনে? উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, মৌলিক পরিকল্পনা ও অন্ধ অনুকরণ, এই সম্বন্ধে প্রভেদ বিচার, শিল্পীর পোষক স্থানে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে, লক্ষে কয়জনের আছে?

স্থাপত্যকলার অলঙ্কার প্রসঙ্গে রস্কিন বলিয়া গিয়াছেন:—"অলঙ্কারের রম্যতার দুইটি কারণ আছে, প্রথম তাহার রূপ ও গঠনসৌন্দর্য্যরূপী সূক্ষ্ম গুণ, দ্বিতীয় তাহার রচনা ও নির্ম্মাণ ব্যাপারে মানবের যত্ন ও প্রয়াসের পরিচয়।......ইহার নির্ম্মাণ কালে কতবার কত চিন্তা, কত ইচ্ছা, কত ব্যর্থ চেষ্টা ও মর্ম্মান্তিক হতাশ, ও সর্ব্বশেষে আশা ফলপ্রদ হওয়ায়, কত সুখ ও আনন্দ, গিয়াছে ও আসিয়াছে, সে সকলের বিবরণ অলঙ্কারের প্রতি অংশে দেখাই তাহার আনন্দদানের প্রকৃত কারণ। বিচক্ষণের চক্ষের সম্মুখে তাহার এই ইতিহাস সহজেই প্রকট হয়। কিন্তু যদিই বা তাহা অজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলেও কল্পনাসাহায্যে উহা অনুমান করা হয়। কেননা

* নূরজাহান গহনা-শিল্পের উৎকর্ষ সাধন ও নূতন মতাদি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন শোনা যায়। বোধ হয় তিনি অল্প মাত্রায় সফলও হইয়াছিলেন। কেননা পোষক ও পুরস্কর্ত্তার (Patron) উপর এই শিল্পের উন্নতি বা অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে।



উপরে তিনটি ব্রুচ (হস্তীমূর্ত্তিযুক্ত যুগ্ম ব্রুচ)—মান্দ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুড়। মধ্যে কঙ্কণ ও টাকার থলি—মান্দ্রাজ। নিম্নে রুদ্রাক্ষ (স্বর্ণ) মালা—মান্দ্রাজ



শাক্য স্তূপে (Sakiya tope) প্রাপ্ত প্রাচীন ভারতীয় গহনা (বাস্তব নিদর্শন)



রাজকুমার খুর্‌রমের বিবাহে গীতবাদ্য ইত্যাদি। ১৬১০ খৃঃ ভারতীয় গহনা।
নাসিকার গহনা নাই (মূল চিত্রের অংশমাত্র)।



সুলতান মুহাম্মদ তুগলকের সভায় নৃত্যগীতের চিত্র (খোরাসানবাসী শাপুর কর্তৃক অঙ্কিত)।
মুসলমানী গহনা। নাসিকার গহনা দ্রষ্টব্য (মূলচিত্রের অংশমাত্র)।

অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্যের ন্যায় এই সামগ্রীটিরও মূল্য ঐ আয়াস প্রয়াস ও যত্নের দ্বারা নিরূপিত হয়। (Ruskin, The Lamp of Truth.)

অন্য এক স্থলে রস্কিন বলিয়াছেন :—

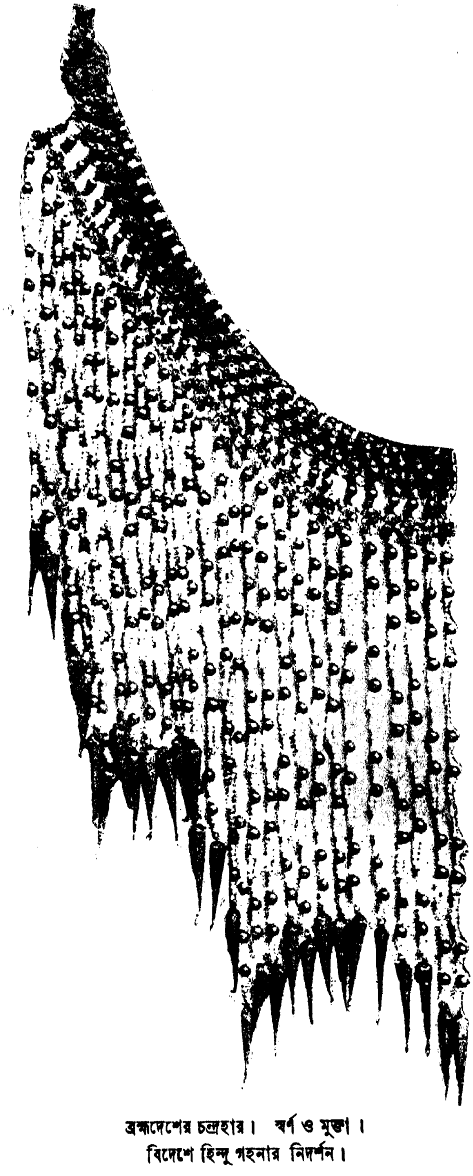
"অত্যাবশ্যক ভিন্ন এমন কোন দ্রব্যের নির্ম্মাণে উৎসাহ বা সমাদর দিবে না যাহার পরিকল্পনায় বা নির্ম্মাণে উদ্ভাবনী শক্তি বা কল্পনার কোনও স্থান নাই। অতীত-যুগের উৎকৃষ্ট কীর্ত্তির নিদর্শন গঠন বা স্মৃতিরক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কারণে অনুকরণের প্রশ্রয় দিবে না।"

বিদেশে শিল্পী তাহার পরিকল্পনার জন্য যে-উপকরণ উপযোগী তাহাই ব্যবহার করে। উপকরণের মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন তাহার নাই। কেননা তাহার নির্ম্মিত দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ রূপরসজ্ঞানের বিচারে হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার নিকট উপাদানের আপেক্ষিক মূল্যের কোনও সার্থকতা নাই।

আর এদেশে? এদেশে সেইরূপ দ্রব্যের আদর বা মূল্য নিরূপণ হয় নিক্তি, বাজারদর ও কষ্টিপাথরের বিচারে। এখানে গিনি বা খাঁটি, চুণী বা পান্না, আটভরী বা দশভরী এই হিসাবে আদর কদর ও মূল্য স্থির হয়। শিল্পীর কল্পনা বা নৈপুণ্যের "রেট" বাঁধা আছে। "প্লেন" কাজে ৪৲ হইতে ৫৲ টাকা, "ডাইসের" কাজে কিছু বেশী, সে অতি সুন্দর, নিখুঁত, নূতন পরিকল্পনাই হউক বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের পাশ্চাত্য কদর্য্য ফ্যাশনের অসংস্কৃত অনিপুণ জঘন্য অনুকরণই হউক!

গহনা বিচারের কেবলমাত্র দুইটি নিকষ (test) থাকা উচিত। প্রথম, তাহা যিনি ধারণ করিবেন তাঁহার পক্ষে "মানানসই" কিনা, দ্বিতীয়, উহাতে শিল্পীর কল্পনা-বৈচিত্র্য বা কারুকৌশল কতটা আছে।

অর্থবল প্রদর্শনের জন্য যে গহনার সৃষ্টি তাহার মূলেই রুচির অভাব। তাহার নির্ম্মাণ, ধারণ বা বিচার সবই মিথ্যা।

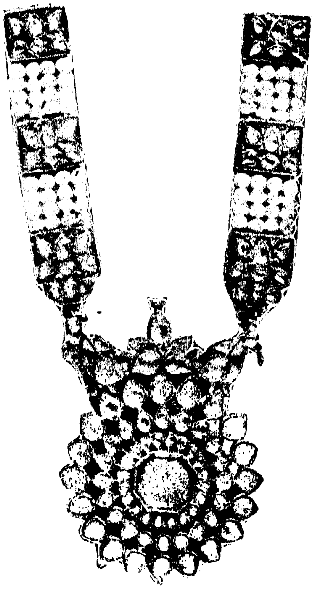


ব্রহ্মদেশের চন্দ্রহার। স্বর্ণ ও মুক্তা।
বিদেশে হিন্দু গহনার নিদর্শন।

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে (শ্রাবণের 'প্রবাসী' দ্রষ্টব্য) এদেশে গহনার উপকরণের জাতি বিচারের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ঐ লোকাচার অনুসারে এদেশে গহনা নির্ম্মাণের উপকরণ সামান্য গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আছে, ফলে শিল্পীর কল্পনা সীমাবদ্ধ হইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা কিছু স্থায়ী শ্রী ও শোভা যুক্ত, যাহা কিছু অল্প আয়তনের মধ্যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে সমর্থ, সে-

সকল পদার্থই গহনার উপকরণ হিসাবে ব্যবহারের যোগ্য। মূল্য হেতুক অন্ধদেশাচার-নির্দ্দিষ্ট এইরূপ জাতি-বিচারকে প্রকৃত শিল্পী ও রূপরসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই হেয়জ্ঞান করা উচিত। বিদেশে ঐরূপ অন্ধবিচার নাই, সুতরাং তথাকার শিল্পীর পরিকল্পনায় হীরক ও মুক্তা শুক্তি, মুক্তা ও কচ্ছপের খোলা একত্রে স্থাপিত হইয়া পরস্পরের শোভা বর্দ্ধন করে।



কোণশূন্য মণি-সংযোজিত হার ও দোলক (ধুকধুকি), দিল্লী

মণিমুক্তার এই জাতি-বিচারের ফলে লোকের রুচি এতই বিকৃত হইয়াছে, যে, মণিমুক্তা সংযোজন বা ব্যবহারের সহিত কলাকৌশল বা সৌন্দর্য্যজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে। সাধারণতঃ যে-সকল জড়োয়া গহনা দেখা যায়, সে-সকলের মধ্যে শতকরা ৯৯টি দৃষ্টিকটু অশোভন, যথেচ্ছভাবে সংযোজিত, এবং মণিসকলের আয়তন ভিন্ন অন্য সকল গুণ নির্ব্বিচারে সংস্থাপিত। "চোখ-ঝলসান" বা "তাক্‌লাগান" ভিন্ন অন্য কোনও কারণে এইরূপ গহনার অস্তিত্বের সার্থকতা নাই। মণিসংযোজনে আমাদের গহনাশিল্পের পূর্ব্বকালের বিশেষত্ব সকল লোপ পাইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুগহনাশিল্পে বহু কোণ, স্বল্প-কোণ, ও কোণবিহীন এই তিন প্রথায় কর্ত্তিত মণিরই ব্যবহার ছিল। স্ফটিক-ভাবাপন্ন মণিমাত্রই যথাযথভাবে বহুকোণ-সমন্বিত আকারে কর্ত্তন করিলে তাহার জ্যোতিস্ফুরণ (glitter) ও প্রভা (radiance) বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু এই জ্যোতি ও প্রভা উগ্র ও কঠোর; কোণশূন্য বা স্বল্পকোণ, মসৃণ, পিণ্ড, বর্ত্তুল, ডিম্ব বা ফলক, ইত্যাদি আকারের মণির বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি ও প্রভা তাহাতে নাই। কিন্তু এখন "লোক-দেখান"ই মণি ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং স্নিগ্ধ অপেক্ষা কঠোর উগ্রভাবেরই সমাদর। গহনায় স্নিগ্ধতা বা কোমলভাবের যে কোনও সার্থকতা আছে, সে-বিচার কেহই করে না।

চিত্রাঙ্কনে যেরূপ মৃদু হইতে অত্যুজ্জল সকল ছায়ার বর্ণ সমীচীন ভাবে প্রয়োগ করিতে হয়, অলঙ্কারেও সেইরূপ নানাবর্ণ ও ছায়াযুক্ত উপকরণ সকলের যথাযথ ব্যবহার কর্ত্তব্য। এককালে এইরূপ নানাবর্ণ ও ছায়ার বিভিন্নভাবে কর্ত্তিত মণির ব্যবহার দ্বারা অলঙ্কারের শোভাবর্দ্ধন কার্য্যের জন্য এদেশের গহনাশিল্পী ভুবন-প্রখ্যাত ছিল। এখন কেবল মাত্র উৎসাহদাতা ও পোষকের অভাবে এই শিল্প ও শিল্পী উভয়েই মরণোন্মুখ।

"ভারতীয় শিল্পীদের রচনা, কারুনৈপুণ্য ও কারুকার্য্য সম্বন্ধে এতই জ্ঞান আছে যে, অল্পপরিমাণ স্বর্ণ ও স্বল্পমূল্য মণিমুক্তার দ্বারা তাহারা অতি উচ্চশ্রেণীর অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে সমর্থ। পরিকল্পনায় রূপ, রুচি, শোভন ও অশোভনের সম্বন্ধ বিচার তাহাদের এতই সূক্ষ্ম, যে, প্রভূত পরিমাণ মণিরত্ন ব্যবহার এবং অতি জটিল কারুকার্য্য থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারাদি নয়ন-সুখকর হয়। ইয়োরোপীয় গহনার তুলনায় তাহাদের গহনার এই বিশেষত্ব অতীব প্রশংসনীয়, কেননা ইয়োরোপীয় শিল্পীর ধারণায় "উচ্চশ্রেণীর গহনা" বলিতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ উপকরণে, অতি অল্প কারুকার্য্য-শোভিত দ্রব্য।"

এখন এই দুই দেশের শিল্পীর, জ্ঞান ইত্যাদির হিসাবে, স্থান-বিপর্য্যয় হইয়াছে।

"ভারতবাসীদের স্বাভাবিক সুরুচির পরিচয় তাহাদের অলঙ্কার ও মণিকাঞ্চন-ভূষিত অস্ত্রে যেরূপ পাওয়া যায় সেরূপ আর কিছুতেই নহে। ঐসকল দ্রব্য যে, কেবলমাত্র দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ উপকরণে প্রস্তুত তাহা নহে, পরন্তু সে-সকল, কলাবিদ্যার সীমার মধ্যে যতটা যত্ন, আয়াস, সুরুচি, লালিত্য ও প্রভা সম্ভব, তাহার সহিত নির্ম্মিত।"

উপরোক্ত মন্তব্য, সার জর্জ্জ বার্ডউড ১৮৮০ খৃঃ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (Birdwood, The Industrial Arts of India) অথচ তিনি এদেশের শিল্পকলার ভক্ত ত ছিলেনই না, বরঞ্চ তাঁহাকে বিশেষ নিন্দুক বলা চলে। তাঁহার, Journal of the Royal Society of Arts (Feb. 4, 1910) এ লিখিত এদেশীয় কলা, শিল্প, ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞাসূচক তীব্র নিন্দাবাদ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

এদেশের গহনা-শিল্পের অবনতির কারণও বার্ডউড দেখাইয়াছেন, যথা :—"দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কারের কাজ ইয়োরোপীয় প্রভাবের দরুণ নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা ক্ষীণপ্রভ হইলেও (এখনও) যথেষ্ট সুন্দর।"

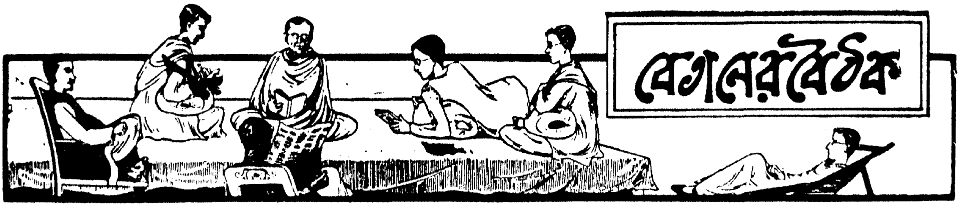
ইহা প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের কথা, ঐ সময়ের মধ্যে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে, যাঁহারা স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দমনে গহনা ক্রয় করেন—অর্থাৎ যাঁহারা কন্যাদায় বা তদ্রূপ যন্ত্রণাদায়ক বাধ্যতামূলক অবস্থায় পড়িয়া ক্রয় করেন না, তাঁহারা যদি বহুমূল্য অথচ কুরুচিসঞ্জাত বিদেশী গহনার কদর্য্য অনুকরণ, ও জগৎশ্রেষ্ঠ ভারতীয় গহনা-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এই দুয়ের পার্থক্য অনুভব করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় এই লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে। বিদেশের যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা



আধুনিক বিলাতি গহনা ও তাহার ধারণ-পদ্ধতি

সুন্দর, তাহা স্বচ্ছন্দে তাঁহারা গ্রহণ করুন, কিন্তু প্রথমে এদেশের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের সহিত তাহার তুলনা করিয়া বিচার করুন যে, কোন্‌টির ব্যবহার প্রকৃত সুরুচি ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচায়ক হইবে।



জিজ্ঞাসা

(১৬)

বিদেশে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি

ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদিগকে শিক্ষার নিমিত্ত বৃত্তি দিয়া ইয়োরোপে (Europe) প্রেরণ করিবার কোন সমিতি আছে কি না এবং থাকিলে কোথায় কোথায় আছে ও তাহাদের ঠিকানা কি? ঐ সকল সমিতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় বহন করেন কি না? সরকার হইতে ঐরূপ কোন বৃত্তি পাইতে হইলে কি গুণ থাকা আবশ্যক ও সরকারী বৃত্তির জন্য কোথায় আবেদন করিতে হয়? শ্রী রেণু দাসগুপ্তা

(১৭)

ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার স্কুল

এদেশে এমন কোন স্কুল বা কলেজ আছে কি না; যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। থাকিলে কোথায় ও তাহার ঠিকানা কি? শ্রী শশীকুমার মজুমদার

(১৮)

"জ্যোতির্ম্ময় কাষ্ঠ"

পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আমি এক-প্রকার "জ্যোতির্ম্ময় কাষ্ঠ" সংগ্রহ করিয়াছি। উহা অন্ধকারে 'রেডিয়াম'এর মত আলোকিত হয়। ইহা আর কোন্ কোন্ স্থানে পাওয়া যায়? উহার জ্যোতি ১৫।২০ দিবস পরে (কোন পাত্রে রাখিলে) আস্তে আস্তে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু ১০।১২ ঘণ্টা কাল মাটিতে রাখিলে উহার জ্যোতি পুনঃ বাহির হয়। ইহা কি পদার্থ এবং আলো ইহার কোথা হইতে আসে?

শ্রীসুকুমার পৈত

(১৯)

শব্দের ব্যুৎপত্তি

নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি কি বা কোন্ ভাষা হইতে শব্দগুলি আসিয়াছে?

পয়মন্ত, সাবেক, "বাহার" দেওয়া, "গড়" হইয়া প্রণাম, "গাদা" করিয়া রাখা, "টের" পাওয়া, আইবুড়ো, "হেঁসেল" ঘর, ফলাহার (ফলার), "কবুল" করা, আহাম্মুখ। শ্রীবিভূতি সিংহ

(২০)

সেলাই শিক্ষা

সেলাই এবং জামা ইত্যাদি কাটা সম্বন্ধীয় বাঙলা ভাষায় কি কি পুস্তক আছে এবং কোন্ পুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও তাহা কোথায় পাওয়া যায়? শ্রীমতী রেণুকা মিত্র

২১

তৈলচিত্র সংস্কার

রংজ্বলা তৈলচিত্র কি ভাবে সংস্কার করা যায়?

কুমারী রাণু সেন

(২২)

পৌরাণিক উল্লেখ

১। রাধিকা রুক্মিণী রমা সত্যভামা দেবী।
স্বামিভাবে ভজে কৃষ্ণে তুয়া (দুর্গা) পদ সেবি'॥

২। আশী লক্ষ জন্ম আগে করিয়া গ্রহণ।
পশ্চাৎ মানব-দেহ।

৩। হিরণ্যকশিপু ও রাবণের ন্যায় কংসও অমরকল্প বর চাহিলে মহাদেব তাহার নিধনের ছিদ্র রাখিয়া বর দিয়াছিলেন।

৪। বিবাহে বর ও বধূর হাতে সূত্র বন্ধন করা হয়।

৫। অন্ন-মেরু দান।

৬। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ।

৭। যেমন বলির পিতা বিরোচন দৈত্যে।
বধিল দেবতাগণে বন্দী করি' সত্যে॥

*　　*　　*

অপর বলির পিতা বিরোচন দৈত্য।
অকাতরে প্রাণ দিল করেছিল সত্য॥

এই পৌরাণিক উল্লেখগুলির বিবরণ কোন্ কোন্ পুরাণের কোথায় কোথায় আছে কেহ সন্ধান করিয়া জানাইলে উপকৃত হইবো।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মীমাংসা

(১২)

পশু পক্ষী সম্বন্ধীয় পুস্তক

বঙ্গভাষায় পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত পুস্তকখানি দেখা যায়—

১। পাখীর কথা—ডাক্তার শ্রী সত্যচরণ লাহা,
এম্-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি,
এফ্-জেড্-এস্ প্রণীত।

উক্ত পুস্তক কলিকাতার "প্রকৃতি" কার্য্যালয় ২৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

তরুণ শক্তি সাহিত্য মন্দির, কাশীপুর।

(১৪)

আল্‌কাত্‌রার দাগ

কাপড়ের যতখানি স্থানে আল্‌কাত্‌রার দাগ লাগিয়াছে ততখানি স্থান সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়া যায়, এরূপ পরিমাণ সরিষার তৈলে সেই স্থান, দাগ না উঠা পর্য্যন্ত ঘসিতে হইবে। তৎপর দাগ উঠিয়া গেলে তথায় তৈলের দাগ থাকিবে। ঐ দাগ উঠাইবার জন্য কিছু সোডা ও কাপড় কাচা সাবান সমান পরিমাণে এবং তাহা অপেক্ষা কিছু চুণ লইয়া একত্র মিশাইতে হইবে। তৎপর সেই কাপড়খানা তাহার মধ্যে ভিজাইয়া প্রায় ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া কাচিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

শ্রী শান্তিরাণী দেবী

আলকাত্‌রা (Coal-tar) দাগযুক্ত জায়গাটায় Benzene দ্বারা ভাল করিয়া ধুইলেই ক্রমশঃ দাগ উঠিয়া যায়। তবে কাল একটা আভা থাকে, তাহা সাবান দ্বারা ধুইলেই সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায়।

কুমারী কুন্তলা সেন
শ্রী রেণুকা মিত্র
শ্রী বীণাপাণি দত্ত

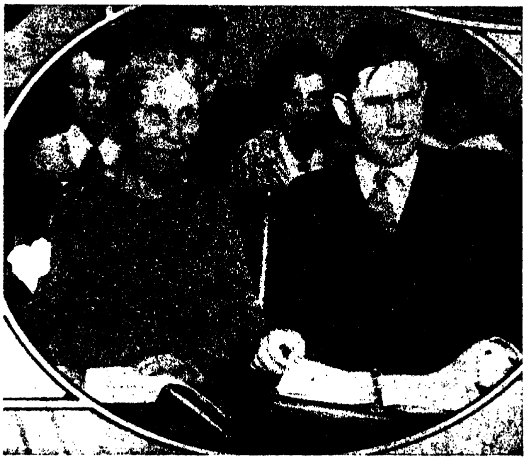
মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী এন্!ও ক্রীম্যানের বয়স ৭৭ বৎসর। কিন্তু এখনও তাঁর অদম্য উৎসাহ। এই বয়সে তিনি ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন ও ইংরেজী সাহিত্য পড়া সুরু করিয়াছেন। নাতি-নাতনীর বয়সী অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখন ইঁহার সহপাঠী। জ্ঞান-পিপাসা বয়সের বাঁধন মানে না।

শুধু বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ও বাংলার মফঃস্বলের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। স্ত্রীলোকদিগকে ট্যাক্স দিতে হয়, ব্যবস্থাপক সভা অনুমোদিত আইন মানিয়া চলিতে হয় কাজেই সে-সব প্রতিষ্ঠানে এক তরফা শুনানী হওয়া উচিত নয়। ঘরের বাহিরেও নারীদের কার্য্যক্ষেত্র আছে। সম্প্রতি কয়েক জন ভারতীয় নারী ফৌজদারী বিচার বিভাগে ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত



ম্যাদময়জেল জুলিয়েট ভিলিয়ার



শ্রীমতী এন্ ও ক্রিম্যান

প্যারীর মহিলা-ব্যারিষ্টার ম্যাদময়জেল জুলিয়েট ভিলিয়ারের নাম এখন পাশ্চাত্য জগতে আইনজ্ঞ-মহলে সুপরিচিত। সম্প্রতি ফরাসী আদালত খুলিবার সময় তিনি মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ সন্দর্ভ পাঠ করেন। প্যারীর আইনজ্ঞসম্মেলনে তিনিই প্রথম নারী বক্তা।

বুদ্ধিতে ও কার্য্যকরী ক্ষমতায় ভারতীয় মহিলারাও যে পুরুষের সমকক্ষ তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই ব্যবস্থাপক সভায় ও স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারীরা প্রবেশাধিকার পাইয়াছে।

হইয়াছেন। নিম্নে আমরা কতকগুলি সংবাদ দিলাম :—

শ্রীমতী অলমেলুমাঙ্গাথা অমল মাদ্রাজে এবং বিচার-পতি মাদগাওনকারের পত্নী শ্রীমতি ভদ্রবাই মাদগাওন-কারও বনিতা আশ্রমের প্রধানা কর্ম্মী শ্রীমতী শিবগাবরী গঞ্জর বোম্বাইএর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

শ্রীমতী লক্ষ্মী একাম্বরম্ মাদ্রাজের অন্তর্গত টিউটি-কোরিন মুউনিসিপ্যালিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। দেওয়ান বাহাদুর কে, এস্ ঃন্দ্রশেখর আইয়ারের পত্নী

শ্রীমতী পার্ব্বতী অমল বাঙ্গালোর জেলা-বোর্ডের সদস্য হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কয়েকজন কৃতী ভারতীয় ছাত্রীর কথাও উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যার চিমনলাল শীতলবাদের কন্যা শ্রীমতী শারদা দেওয়ান সসম্মানে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উক্ত পরীক্ষায় তিনি ভারতের লোকসংখ্যা সমস্যা শীর্ষক একটি সন্দর্ভ লিখিয়া প্রশংসা পাইয়াছেন। ইনি বিবাহিতা হইয়াও স্বামীর উৎসাহে এত দিন পড়া-শুনা করিয়াছেন—সংসার-ধর্ম্ম ইঁহার জ্ঞান লাভের পথে বিঘ্ন ঘটায় নাই। গুজরাতী হিন্দু ঘরের মেয়েদের ভিতর তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই ডিগ্রী পাইলেন।



কুমারী শীলা রায়



শ্রীমতী মাদগাওনকার শ্রীমতী গজ্জর



শ্রীমতী লক্ষী একাম্বরম্

কুমারী সুলভা পানান্ডিকর এই বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'চ্যান্সেলার পদক' এবং অন্যান্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরীক্ষায় তিনি "ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব" শীর্ষক গবেষণা পূর্ণ একটি সন্দর্ভ লিখিয়া পরীক্ষক মণ্ডলীর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। অধ্যাপক আর ডি, রাণাডের পরে তের বৎসরের মধ্যে তিনিই দর্শনশাস্ত্রে এরূপ কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছেন। কুমারী পানান্ডিকার



শ্রীমতী পার্ব্বতী অমল



কুমারী শ্যামকুমারী নেহেরু

বর্ত্তমান আমালনের দার্শনিক গবেষণাগারের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই বিদ্যামন্দিরের তিনি সর্ব্বপ্রথম গবেষক ছাত্রী।

এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত শ্যামলাল নেহেরু-দুহিতা কুমারী শ্যামকুমারী নেহরু বি-এ ও এম্-এ প্রাথমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রাথমিক এল্-এল্, বি পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম হইয়াছেন। প্রকাশ যে, তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদেই আইন ব্যবসা করিবেন।

কুমারী নেহেরু কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষায় অঙ্ক শাস্ত্রে ও উর্দ্দ ভাষায় প্রশংসার সহিত পাশ করেন ও শেষ পরীক্ষায় উর্দ্দ ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা সহকারে উত্তীর্ণ হন। তারপরে তিনি চিকিৎসক হইবার মানসে এলাহাবাদের "মিয়ুর সেণ্ট্রাল কলেজে" ভর্ত্তি হন, কিন্তু ১৯১৯ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তিনি ১৯২৪ সালে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন ও রমণীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া—মাসিক ২০৲ টাকা সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৬ সালে বি-এ, পরীক্ষায় সমস্ত পরীক্ষার্থী-দের মধ্যে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পদক এবং মাসিক ৩০৲ টাকা সরকারী বৃত্তি পান। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের সম্পাদক ও সহকারী-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; এবং প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মহিলা ছাত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান পাইয়াছেন। 'ইণ্টার-হোষ্টেল' তর্ক-সভায় এবং "অল্-ইণ্ডিয়া কন্‌ভোকেশন্ তর্ক-সভায়" তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুবক্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। ভাল বক্তৃতার জন্য তিনটি পদকও পুরস্কার পাইয়াছেন।

এ-দেশী ছাত্রীরা সাধারণত বিজ্ঞান-চর্চ্চার দিকে যায় না। কুমারী শীলা রায় সে অপবাদ ঘুচাইলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক এম্, এস্-সি পরীক্ষায়



শ্রীমতী অলমেলুমাঙ্গাথা অমল



শ্রীমতী সারদা দেওয়ান

তিনি রসায়ন-বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী শীলা পরলোকগত ডাক্তার পরেশ-রঞ্জন রায়ের কন্যা।

আফ্‌গানিস্তানে সকল বিভাগেই দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সেখানকার নারী-সমাজেও অগ্রসরশীল যুগের এই পরিবর্ত্তনের ঢেউ লাগিয়াছে। আফ্‌গান মহিলারা প্রায় ঘোমটার সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিয়াছেন। আলীগড় মেইল কাগজে দেখিলাম, সম্প্রতি একদল আফ্‌গান যুবক উচ্চশিক্ষার্থ ফ্রান্সে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের যে আলোক-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রথমেই একটি ক্ষীণাঙ্গী কিশোরীর উপর নজর পড়ে। দেখিবা মাত্র মনে হয় যেন কিশোরী ইউরোপের কোন দেশের অধিবাসিনী। তাঁহার হাতে কায়দা-মাফিক হাত-ব্যাগ ঝুলিতেছে, পোষাক-পরিচ্ছদও ইংরেজ বালিকার মত। কিন্তু ফটোর নীচে চিত্র-পরিচয় পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, কিশোরী ছাত্রদলের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদেশ-যাত্রা করিয়াছেন। আফগানিস্তানের এই উন্নতির যুগে ভারতের ইস্‌লাম গৌরবী মুসলমানগণ নারী-সমাজকে বোরখা-পর্দ্দার আড়াল করিতেই ব্যস্ত!

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৪ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছেন। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২ জন মুসলমান বালিকা—তাহাদের নাম কুমারী সরওয়াৎ আরা বেগম ও কুমারী আমিনা বাটু। কুমারী সরওয়াৎএর বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী আমিনার বয়স মাত্র সাড়ে ১৩ বৎসর।

বাংলায় ঢাকার নবাব বাড়ীর কুমারী জুলেখা বানু

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আকিয়াব আদালতের দোভাষী মহম্মদ মজিদের কন্যা কুমারী আসীমজিদ চট্টগ্রাম কলেজ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কলেজে তিনি পুরুষ ছাত্রদের সহিত একত্রে পড়িতেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের য্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী বাড়ীতে পড়িয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং গণিতে খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বর্ত্তমান বৎসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ঢাকা ইডেন হাই স্কুলের ছাত্রী কুমারী করুণাকণা গুপ্তা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। মধ্য পরীক্ষাতেও (ইণ্টারমিডিয়েট) কুমারী চারুপমা বসু প্রথম হইয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কৃতিত্বে আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মোট ১৬৩ জন ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; ছাত্রীদের পরীক্ষার এবার ফল ভালই হইয়াছে। কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয় বালিকা বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ১৩ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বৎসরের বি-এ পরীক্ষাতে ৩০ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ১৫ জন সম্মানের সহিত পাশ হইয়াছেন। বেথুন কলেজ হইতে শ্রীমতী আভা সেন সংস্কৃতে এবং ডায়োসিসেন কলেজ হইতে শ্রীমতী স্নেহময়ী সেনগুপ্তা ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যের সম্মান-তালিকাতে দশজন ছাত্রীর নাম দেখিলাম; তন্মধ্যে লোরেটো হাউস হইতে কুমারী ক্লেটন ডোরোথি এবং বেথুন কলেজ হইতে শ্রীমতী মালতী দত্ত যথাক্রমে চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।



শ্রীমতী সুলতা পানান্ডিকার

প্র

পঞ্চশস্য

পিঙ্কি—

এই চিত্রটি একটি বিখ্যাত রঙান চিত্রের একরঙা প্রতিচ্ছবি। ইহা প্রসিদ্ধ ইংরেজ শিল্পী স্যার টমাস লরেন্স কর্ত্তৃক অঙ্কিত। এই ছবিটি বিগত ২৯শে নভেম্বর লণ্ডনের একটি নিলামে প্রায় ১১ লক্ষ



স্যার টমাস লরেন্স অঙ্কিত 'পিঙ্কি'

টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। ক্রেতা একজন আমেরিকান কোটীপতি। এই চিত্র সম্বন্ধে আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এটি যাঁহার আলেখ্য তিনি ভবিষ্যৎজীবনে বিখ্যাত কবি ব্রাউনিংজায়া এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের মাতুলানীর পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

—

শিশু-শিক্ষায় মেরিয়েটা জন্‌সন্—

মিসেস্ মেরিয়েটা জন্‌সনের নাম আজ বহুস্থলে অপরিচিত হইলেও অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র পরিচিত হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিশু-শিক্ষার যে সহজ পন্থা তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন ও তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে সেই প্রথা অনুযায়ী শিক্ষাদান করিয়া তিনি যে সুফল পাইয়াছেন তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। যাঁহারা অন্তরে অন্তরে দেশের কল্যাণ কামনা করেন বাহিরে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথমে শিশুশিক্ষার সৌকর্য্য বিধান করা কর্ত্তব্য। এবং এবিষয়ে মিসেস্ জন্‌সনের মতামত ও পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিলে সুফল লাভ করা কঠিন হইবে না। মিসেস্ জন্‌সন্ শুধু বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, তাঁহার আবিষ্কৃত পদ্ধতি তিনি হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতির মূল তত্ত্ব হইতেছে—শিশুকে শিশু রাখিয়াই শিক্ষা দেওয়া, গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিতে তিনি নিতান্তই নারাজ। শিশুর সহজ সরল বুদ্ধিকে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টান্ত দ্বারা জাগ্রত করিয়া তোলাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য; তাহার স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তাহাকে হঠাৎ দিগ্‌গজ করিয়া তোলার বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান।



মিসেস্ মেরিয়েটা জন্‌সন্

তিনি উত্তর আমেরিকার বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ছয় হইতে বিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শিশু ও যুবকদিগকে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিতেছেন। তাঁহার ছাত্রদিগকে দেখিলেই শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সহজেই বুঝা যায়। ইতিমধ্যেই শিক্ষাবিভাগের রথীরা আমেরিকার অন্যান্য বিদ্যালয়েও তাঁহার পদ্ধতি অনুযায়ী শিশুশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

মিসেস্ মেরিয়েটা জন্‌সন্ একজন দূরদৃষ্টি ও মনীষা-সম্পন্ন মহিলা। প্রেম ও মাধুর্য্যের যেন তিনি অবতার। শিশুদের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব। বস্তুতঃ তাঁহার ব্যক্তিত্বের গুণে শুধু শিশু কেন বয়স্কেরাও মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার মুখশ্রী মানব-প্রেমের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়াই আছে।



খেলাচ্ছলে ভূগোলশিক্ষা

তাঁহার পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা ও খেলা-ধুলা এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যে, শিশুরা খেলিতে খেলিতেই অনেক বিষয় শিক্ষা করে। পরিশ্রম করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা গিলিতে হয় না।

চারিটি বিখ্যাত চিত্র—

এই বৎসরের (ইংরেজি) প্রারম্ভে লণ্ডনের বার্লিংটন হাউসে ফ্লেমিশ ও বেল্‌জিয়ান্ শিল্পের একটি প্রদর্শনী হয়। নানাদেশের শিল্প-সংগ্রহকারীরা বহু বিখ্যাত চিত্র এই প্রদর্শনীতে ধার দেন। এই প্রদর্শনীতে যে-সকল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল বিশেষজ্ঞেরা তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ



ভগবানের কোলে পুত্র যীশুর মৃতদেহ—রবার্ট ক্যাম্পিন অঙ্কিত



'ম্যাডোনা'—রোজার ভ্যান ডার ভেডেন অঙ্কিত



জ্যান ভ্যান আইক অঙ্কিত তাঁহার পত্নীর আলেখ্য



রোজার ভ্যান ডার ভেডেন অঙ্কিত মহিলামূর্ত্তি

করিয়াছেন প্রায় ১৫ কোটী টাকা। সেই প্রদর্শনী হইতে চারিটি চিত্রের প্রতিচ্ছবি এখানে প্রকাশিত হইল।

প্রথম ছবিখানি রোজার ভ্যান ডার ওয়েডেনের শুরু রবার্ট ক্যাম্পিনের হস্তাঙ্কিত। বেলজিয়ামের লুভে সহর এই ছবিটি ধার দিয়াছেন।

দ্বিতীয় ছবিখানি বিখ্যাত চিত্রকর জ্যান ভ্যান আইকের অঙ্কিত ও তাঁহার পত্নীর আলেখ্য। এই ছবিটির মূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

তৃতীয় ছবিখানি রোজার ভ্যান ডার ওয়েডেনের। এই চিত্রের স্বত্বাধিকারী মিঃ মেলন যুক্ত আমেরিকার কোষাধ্যক্ষ।

চতুর্থ ছবিখানিও রোজার ভ্যান ডাঃ ওয়েডেন অঙ্কিত ও আমেরিকার সম্পত্তি। ইহা বিখ্যাত ম্যাডোনা মূর্ত্তি।

—

বর্ত্তমান রুষিয়া—

'বোলশেভিজম্'-বাদের কৃপায় বর্ত্তমান রুষিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রুষিয়া বলিতেই আমাদের মনে কতকগুলি



সেন্ট পল ও সেন্ট পিটার গীর্জ্জা—এই দুই গীর্জ্জার অভ্যন্তরে রোমানফ-বংশীয়দের কবর অবস্থিত



ককেশাস পর্ব্বতের পাদদেশে কৃষকপল্লী



মস্কোর বাজারদৃশ্য

ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়া উঠে। রুষিয়াতে যখন সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রবল ছিল তখনকার সহিত বর্ত্তমান রুষিয়ার বিস্তর প্রভেদ ঘটিয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা। এসম্বন্ধে একজন ইংরেজ মহিলা পর্য্যটক 'দি উওম্যান সিটিজেন' নামক কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইনি বিগত মহাযুদ্ধের সময় পেট্রোগ্রাডের হাঁসপাতালে কাজ করিয়াছিলেন। ইহার ছয় বৎসর পরে তিনি সেখানে (লেলিনগ্রাড ও মস্কো) গিয়া বোলশেভিক-তন্ত্রের প্রভাবে যে-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাও দেখিয়াছেন; সম্প্রতি তিনি আবার সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

বোলশেভিক আন্দোলনের প্রারম্ভে রুষিয়ার অবস্থা দেখিয়া আসিবার প্রায় চারি বৎসর পরে আমি পুনরায় সে-দেশে ভ্রমণ করিতে যাই। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পরিবর্ত্তন আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রুষিয়ার সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার জন্তই গিয়াছিলাম। এই বিরাট্ জাতির দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না তাহা দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

মস্কোতে পদার্পণ করিয়া আমি পথঘাট প্রভৃতি সাধারণ দৃশ্যের উন্নতিই লক্ষ্য করিলাম। বাড়ীগুলির সংস্কার করা হইয়াছে। জনসাধারণ বেশ ভাল অবস্থায় আছে বলিয়াই মনে হইল; দারিদ্র্যের চিহ্ন বিশেষ নাই, লোকের আহার্য্যের অভাব আছে বলিয়া মনে হইল না। আহার্য্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে, জিনিষের মূল্যও হ্রাস পাইয়াছে। অধিকাংশ লোকই নিজেদের কাজ



মস্কো



মস্কোর বৃহত্তম গীর্জ্জা

লইয়া ব্যস্ত। বেশভূষা সম্বন্ধে দারিদ্র্য লক্ষিত হইল। বস্ত্রাদি বাহির হইতে চালান আসে বলিয়া এবং বাহিরের চালানি দ্রব্যের উপর শুল্ক খুব বেশী বলিয়া বস্ত্র খুব মহার্ঘ্য; একটি ওভারকোট কিনিতেই প্রায় চারিশত টাকা খরচ পড়ে।

লেনিনগ্রাডে গিয়া সর্ব্বত্র এই উন্নতি লক্ষিত হইল না; সহরের সকল আড়ম্বর যেন নষ্ট হইয়াছে, তবে মজুরি চাষা ও ইহুদিরা পূর্ব্ববৎ রাস্তায় ভিড় জমাইতেছে। নেভা নদীর তীরে গির্জ্জা-চূড়ার স্বর্ণদণ্ডগুলি সূর্য্যালোকে তেম্‌নি ঝলিতেছে। বাজারে অদ্ভুত মূর্ত্তি ও সস্তা কাচের মালা বিক্রয়ের ধূম পূর্ব্ববৎ লাগিয়া আছে, তবে বিক্রেতাদিগকে দেখিয়া মনে হয় তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল। বৃদ্ধদের ও বেকারদের জীবন বড় দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। লেনিনগ্রাড সহরটি দেখিয়া আমার চিত্ত পীড়িত হইল; সমৃদ্ধির উচ্চ শিখর হইতে ইহার অনেকখানি পতন হইয়াছে। মস্কোতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়াই ইহার প্রধান কারণ।

রুষিয়াতে গৃহ-সমস্যা এখন সব-চাইতে বড় সমস্যা। বিশেষ করিয়া মস্কোতে লোকের বাসগৃহের বড় টানাটানি পড়িয়াছে। দেশের নেতারা এই সমস্যা সমাধানের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, অনেক ভাঙাগড়া চলিতেছে; যুদ্ধের পর মস্কোর জনসংখ্যা শতকরা ৪০ জন বাড়িয়াছে। প্রত্যেক পরিবারের জন্য ৯ বর্গফুট জায়গা নির্দ্ধারিত হইতেছে এবং সরকার হইতে এইসকল গৃহের ভাড়া বাবদ প্রত্যেকের উপার্জ্জনের শতকরা দুই অংশ কাটিয়া লওয়া হইতেছে। কিন্তু এত করিয়া গৃহ-সমস্যার সমাধান হইতেছে না, বহুস্থলে দেখিলাম এক-একটি বৃহৎ পরিবার একটি মাত্র কামরায় কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া আছে।

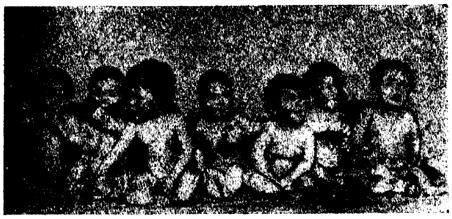
গৃহ-সমস্যা ঘটায় বিবাহ-সমস্যাও দেখা দিয়াছে। গৃহসমস্যার দরুণ বিবাহ-বিচ্ছেদে অসুবিধা ঘটিতেছে, কারণ স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাসগৃহও ভাগ করিয়া লইতে হইতেছে।

বর্ত্তমানে রুষিয়ার শিক্ষা বিস্তার বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সকল বিষয়ে শিখিবার প্রবৃত্তি যুবকদের মধ্যে প্রবল। নেতারাও ও বিষয়ে দৃষ্টি দিয়াছেন। বস্তুতঃ রুষিয়া যে-ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে রুষিয়া পৃথিবীর এক প্রবলতম জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

—

"জগৎ-পারাবারের তীরে—"

নিউইয়র্কে শিশুমঙ্গল সমিতির অনুষ্ঠিত মেলায় প্রদর্শিত একদল শিশুর চিত্র এখানে প্রদর্শিত হইল। মিসেস্ আইডা ডি একটা রুট এই



নিউইয়র্ক শিশু-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত একদল শিশু

চিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদেশে মাতা ও শিশুর মঙ্গলামঙ্গলের দিকে কিরূপ দৃষ্টি দেওয়া হয় এই চিত্র হইতেই অনুমিত হইবে।

—

জ্যোতির্বিদ্যা কি মানুষের কাজে লাগে?

আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, জ্যোতির্বিদ্যা কতকগুলি বৈজ্ঞানিকের খেয়াল চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র, আসলে আকাশমাঝে



মাউণ্ট উইলসন্ মানমন্দিরে ফার্ডিনাণ্ড এলারম্যান্ সূর্য্যাঙ্কত সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন

াল ফেলিয়া এই তারা-ধরার ব্যবসায়ের কোন মূল্য প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জগতে নাই। অন্ধকার আকাশের নিঃসীম শূন্যে চাহিয়া চাহিয়া (যন্ত্রযোগে) রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত করা কতকটা বাতুলতারই সামিল। ঈশপের গল্পেও জ্যোতির্বিদ্‌দিগকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। আপাতদৃষ্টে জ্যোতির্বিদের এই রাত্রি-জাগরণ যতই অকারণ মনে হউক, প্রণিধান করিয়া দেখিলে মানব-সমাজে এই বৈজ্ঞানিকদের দানের তুলনা হয় না। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান যে-সকল 'আবিষ্কার' করিয়াছে তাহার অনেকগুলিই এই বাতুলদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। বেতার-বার্ত্তা ইহার মধ্যে একটি। বৃহস্পতি গ্রহের



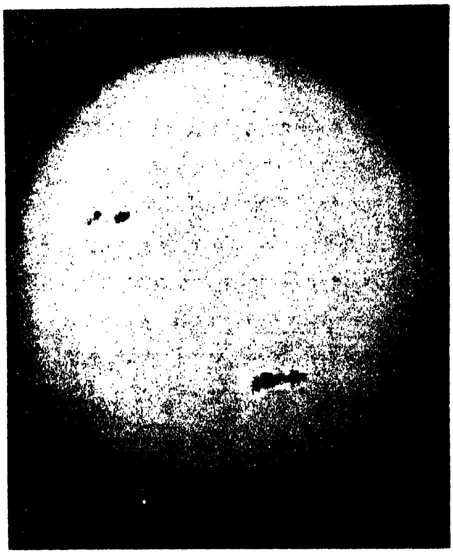
সূর্য্যবক্ষে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণ্যমান আবর্ত্ত,—সূর্য্যক্ষত

অষ্টচন্দ্রের গ্রহণ পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া একজন জ্যোতির্বিদ্‌ই বেতার-বার্ত্তা সম্বন্ধীয় প্রাথমিক আবিষ্কার করেন। আকাশে মেঘলোকে উড্ডীয়মান বিমানপোত দেখিয়া আমরা বিজ্ঞানের মহিমাকীর্ত্তনে আত্মহারা হই বটে, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, যে হিলিয়াম্ গ্যাসের সাহায্যে আকাশে ইহার গতিবিধি তাহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ্—সূর্য্যরশ্মির বর্ণ বিভাগ করিতে গিয়া।

কিন্তু এই যে-সকল আবিষ্কার সাধারণের এত কাজে লাগিয়াছে জ্যোতির্বিদের কাছে তাহাদের মূল্য খুব অধিক নহে। তাঁহাদের সাধনা দূরকে লইয়া, অতি নিকটের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহাদের নাই। দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে তাঁহারা এত দূরের নক্ষত্রমণ্ডলী বা নীহারিকা লইয়া কারবার করেন যে, সেইসকল স্থানে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল গতিবেগযুক্ত আলোকরশ্মি পৌঁছাইতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ সময় লাগে। তাঁহারা এমন সব আলোক-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করেন যাহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আমাদের এই পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সবেমাত্র এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

যে ভূমাকে লইয়া, বৃহৎকে লইয়া জ্যোতির্বিদের সাধনা, আমরা তাহার কল্পনা করিতে গিয়া দিশাহারা হইয়া পড়ি। অসীম আকাশে আমাদের এই পৃথিবীর স্থান কতটুকু তাহা ভাবিয়া দেখিলে নিজেদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হয়। আমাদের সূর্য্যকে যদি একটি টেনিস্-বল রূপে কল্পনা করা যায় তাহা হইলে আমাদের পৃথিবী তাহার ২৩ ফুট দূরে ঠিক একটি বালুকণার মত মনে হইবে এবং আমাদের নিকটতম তারকা ১১০০ মাইল দূরে অন্য একটি টেনিস্-বলের মত বোধ হইবে।

সূর্য্যে হিলিয়াম্ গ্যাস আবিষ্কার ব্যবহারোপযোগী হিলিয়াম্ গ্যাস আবিষ্কারের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। অনেক সময় কোন নূতন আবিষ্কারকে কাজে খাটাইতে আরো বেশী সময় লাগে এবং বহু ক্ষেত্রে আবিষ্কারগুলি ব্যবহারিক জগতে আমাদের প্রয়োজনেই লাগে না। ১৮৬৮ সালে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ লকেয়ার সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া একটি নূতন গ্যাস আবিষ্কার করেন তাহাই হিলিয়াম্। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ক্যানসাস ও টেক্সাসএর গৃহিণীদের কল্যাণে ব্যবহারোপযোগী পরিমাণে এই গ্যাস প্রস্তুত হইতে থাকে। রেডিও বা



সূর্য্য ও সূর্য্যক্ষত

বেতারের আবিষ্কারও এইরূপ। রোয়েমার বৃহস্পতির চন্দ্রগুলির গ্রহণ লক্ষ্য করিতে গিয়া দেখেন যে, অঙ্কশাস্ত্র মতে ঠিক যে-সময়ে গ্রহণ লাগা দরকার তাহার ১৬ মিনিট পরে গ্রহণ লাগিতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি আলোকরশ্মির গতিবেগ নির্দ্ধারিত করিতে সমর্থ হন। তাঁহার এই অনুসন্ধানের সাহায্য লইয়া ম্যাক্সওয়েল স্থির করেন যে, প্রচণ্ড-গতিবেগ-সম্পন্ন এই আলোক-তরঙ্গ চুম্বক ও বৈদ্যুতিক প্রভাবযুক্ত না হইয়া পারে না এবং আমরা চোখে দেখি না এরূপ অনেক আলোকতরঙ্গ আমাদের চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাঁহার শিষ্য হার্ট্‌জ এইরূপ অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গের আবিষ্কার করিয়া নিজের নামে নামকরণ করেন, মার্কনি সেই তরঙ্গের দ্বারা সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন ও ডি ফরেষ্ট সোজাসুজি শব্দ প্রেরণের সুবিধা করিয়া দেন।

এই পৃথিবীর ঝটিকা বাত্যা ইত্যাদির সহিত সূর্য্যের সম্বন্ধ নির্ণয়ে অধুনা জ্যোতির্বিদ্‌গণ সচেষ্ট আছেন। তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইলে ভবিষ্যতে ঝটিকা বাত্যা ইত্যাদির কথা সঠিকভাবে বহু পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস যে, সূর্য্যক্ষতের সহিত ইঁহাদের যোগ আছে। ইঁহারা সূর্য্যক্ষতের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে ব্যস্ত আছেন। সূর্য্যক্ষত সম্বন্ধে তাঁহাদের মত এই যে, এগুলি প্রবলবেগে ঘূর্ণ্যমান বাষ্পপুঞ্জ ব্যতীত কিছুই নহে। এইসকল আবর্ত্তের চতুর্দ্দিকের বাষ্প পরস্পর সংঘর্ষে প্রজ্বলন্ত বলিয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহকে কালো দেখায়।

এইরূপ নানাভাবের আবিষ্কারে জ্যোতির্বিদ্‌গণ নিয়ত ব্যস্ত আছেন; আমরা সকল সময়ে তাঁহাদের কার্য্যের কার্য্যকরী দিকটা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ তাঁহাদের আবিষ্কারগুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং ইঁহাদের এই নিশাজাগরণ যে মানবেরই কল্যাণ-কামনায় তাহার সাক্ষ্য দেয়।

রণ-সঙ্গীত*

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

১

জাগো ভাই জাগো, জাগো হে বন্ধু, হাজার হাজার,
বরিতে নবীন উজ্জ্বল যুগ হও আগুসার,
চল দলে দল, চল দৃঢ় পদে, নাহিক ভয়,
চল চল ত্বরা ন্যায়ের যুদ্ধে লভিতে জয়;
হৃদয়-শোণিতে কিনিব সে জয় কাম্য অতি,
এ সাগর হতে অপর সাগর জানাবে নতি।
এ সারা ইতালী জুড়িয়া আমরা সকলে ভাই,
এক ভাষা আর এক সুখ আশা, দ্বিতীয় নাই।

*

যৌবন ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে সুন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়!
তোমারি লীলার স্ফূর্ত্তি এই এ ফ্যাসিষ্ট্-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।

২

এই বলে বলী জাগ্রত আজি স্বদেশ মোর
লাঞ্ছনা ক্লেশ আর না সহিছে দুঃখ ঘোর।
নবীন জীবনে জেগেছে আজিকে সুপ্ত দেশ,
গরীয়ান আজি মহীয়ান সে যে দৃপ্ত-বেশ!
জীবন-মশাল উজ্জ্বল করি' উচ্চে জ্বালো,
ঘুচিবে আঁধার, অভিযান-পথ হইবে আলো।
চল দৃঢ় ধীর চল সুস্থির শান্ত-গতি,
মুক্তি লভিবে তবে ত পূর্ণ শুদ্ধ-জ্যোতি।

*

যৌবন ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে সুন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়!
তোমারি লীলার স্ফূর্ত্তি এই এ ফ্যাসিষ্ট্-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।

৩

পরিখা-গহ্বরে রজনী জাগিয়া কাটিয়া পথ
গুলির দাহন দলিয়া চলিব, কে করে রদ?—
বহিয়া বহিয়া পতাকা আমরা চলিব দ্রুত,
সমর-ঘূর্ণী মথিয়া বহিব পতাকা পূত;
বিজয়-লক্ষ্মী লবেন পতাকা—দণ্ড তাঁর;
মানুষ আমরা মানুষের মত দুর্নিবার।
মোদের ইতালী ইতালী বলিছে—'কর রে রণ,'
ইতালীর নামে লড়িয়া জিনিব দুর্দ্দমন।

*

যৌবন ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে সুন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়!
তোমারি লীলার স্ফূর্ত্তি এই এ ফ্যাসিষ্ট্-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।

* ইতালীর ফ্যাসিষ্ট্-দলের রণ-সঙ্গীত



দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

জেনীভা নৌবহর বৈঠক—

জেনীভার নৌবাহিনী-হ্রাস-বৈঠক ভাঙিয়া গেল। ইংরেজ মার্কিন ও জাপান এই তিন শক্তির প্রত্যেকের ক্রমবর্দ্ধনশীল নৌবল হ্রাস ও নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি মীমাংসার জন্য এই বৈঠকের অবতারণা। কারণ, বিভিন্ন শক্তির মধ্যে প্রবল সন্দেহ যে, একের অন্য অপেক্ষা নৌবল বেশী থাকিলে সে তাহার সাম্রাজ্য-বিস্তার-লিপ্সা চরিতার্থ করিবার সুযোগ খুঁজিবে।

বৈঠকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বলিলেন, তাঁহাদের ইংরেজের সমান নৌবল প্রয়োজন, কাজেই, তাঁহাদের পক্ষে সমর-পোত-সংখ্যা কম সম্ভব নহে। ইহাতে ইংরেজ আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য দ্বীপপুঞ্জ লইয়াই গঠিত, কাজেই তাঁহার যে-পরিমাণে যুদ্ধ-জাহাজ প্রয়োজন আমেরিকার তাহা নহে। সুতরাং আমেরিকার আব্দার অসঙ্গত। জাপানও প্রকৃত প্রস্তাবে নৌবল অযথা হ্রাস করিতে রাজী নহেন। কাজেই নৌবল-নিয়ন্ত্রণ বৈঠকের অভিনয় পণ্ড হইয়া গেল।

ব্যাপার যে এইরূপ দাঁড়াইবে ইহা অনেক আগেই ধারণা করা গিয়াছিল। নিউইয়র্কের 'নেশ্যন' বৈঠক করিবার সময়ই বলিয়াছিল, "এই শক্তিত্রয়ের নিরস্ত্রীকরণ বা নৌবল হ্রাসের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই। ব্যয়সঙ্কোচ বা শান্তির নামে তাঁহাদের প্রিয়তম ক্রীড়া-সামগ্রী নৌবাহিনীগুলি হ্রাস করিবার কথা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন না। নিজেদের যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারা সকলেই বজায় রাখিতে চান এবং সেই সঙ্গে আশা করেন যে, অন্যে যেন শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারেন।...এই শক্তিত্রয় যেন পৃথিবীর লোকের ভাগ্য লইয়া দ্যূতক্রীড়া করিতেছে।" বৈঠক ভাঙিয়া গেল, কিন্তু বিলাতী কাগজগুলি এখনও আস্ফালন করিতেছে যে, সাফল্যের আশা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কুলিজ সমস্ত ধাপ্পাবাজি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "১৯২৯ সালে তিনি আর নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক আহ্বান করিবেন না।"

সুতরাং শান্তি স্থাপনের ও বিশ্ব-মৈত্রী ঘটাইবার আর একটি অভিনয় পণ্ড হইল। ওয়াশিংটনের ১৯২২ সালের নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক, জেনিভার নৌবল হ্রাস বৈঠক দুইটি ত একেবারে ভাঙিয়া গেল। এবার লীগ্ অব নেশ্যন শান্তিস্থাপনের আর কোন্ উপায় দেখিবেন?

সাকো ও ভ্যান্‌জেটি—

শান্তিবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী সাকো ও ভ্যান্‌জেটির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ লইয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে তুমুল আন্দোলন হইতেছে। নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া ও বাল্‌টিমোরে এই ব্যাপার লইয়া দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থলে এমন কি বিলাতে পর্য্যন্ত আন্দোলনের ঢেউ গিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে ম্যাসাচুসেটস্ রাষ্ট্রের অন্তর্গত দক্ষিণ ব্রেনটিং সহরের পারমেনটার ও বেরাডেলী নামক দুইজন ইতালীয়ান্ জুতার ব্যবসায়ী ৪ হাজার পাউণ্ড লইয়া তাহাদের প্রভুর কারখানা অভিমুখে যাইতেছিল। পথিমধ্যে দুইজন লোক তাহাদিগকে হত্যা করিয়া টাকার বাক্স সহ চম্পট দেয়। ঐ অঞ্চলে ঐরূপ লুট-তরাজ নূতন নহে। এই হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন পর পুলিস সাকো ও ভ্যান্‌জেটিকে গ্রেপ্তার করে।

প্রাথমিক বিচার শেষ হইতে এক বৎসর সময় লাগে। অবশেষে তাহাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের হুকুম হয়। কিন্তু আসামীরা এক আদালত হইতে অন্য আদালতে আপীল করে। ফলে ব্যাপারটির আজ সাত বৎসর ধরিয়া আদালতে শেষ মীমাংসা হইল না। কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ গুজব উঠিল, তাহাদিগকে শীঘ্রই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে। অভিযুক্ত আসামী দুইজন সমাজতন্ত্রবাদী ও শান্তিবাদী দলের লোক এবং বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহারা প্রকাশ্য ভাবে সেনাদলে যোগদান করিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের অরাজক-পন্থী বলিয়াও প্রচার করিয়াছে। তাহাদের ফাঁসীর আদেশ হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী এবং শান্তিবাদী দল আশঙ্কা করিতেছেন যে আমেরিকান বুদ্ধিজীবীরা তাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপর অসন্তুষ্ট—কাজেই আদালত অভিযুক্তদের প্রতি ন্যায্য ও পক্ষপাতশূন্য বিচার করেন নাই। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক মিঃ ফ্রাঙ্কফার্টারও মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসামীরা সুবিচার পায় নাই। তাঁহার মতে পূর্ব্বোক্ত হত্যাকাণ্ড ম্যাসাচুসেট্সের মোরেলী দলের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ, তিনি ঐ দলের ম্যাডিরস্ নামক এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সাকো যে-জেলে অবরুদ্ধ আছে উক্ত ম্যাডিরসও সেই জেলের বন্দী। সাকোর স্ত্রী-পুত্রের শোকাবেগ দেখিয়া সে একান্ত অভিভূত হইয়া স্বীকার করিয়াছে যে, সেই এই হত্যা করিয়াছে। এই স্বীকারোক্তির বলে ও অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া অধ্যাপক ফ্রাঙ্কফার্টার বলিতেছেন যে, বিচারক থেয়ার আসামীদের প্রতি অবিচার করিয়াছেন এবং তাঁহার রায় পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট। তাঁহার মতে জুরীরাও বিচারের পূর্ব্বে হইতে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মত পোষণ করিত।

আমেরিকায় বিচারাদালত সম্বন্ধে এরূপ উক্তি যদি সত্য হয় তবে তাহা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। বিচারালয়ের নিরপেক্ষতার আদর্শে

বিশ্বাসী লোকদের নিকট ইহা অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কিন্তু ১৩৩০ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীর সম্পাদকীয় মন্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের লিবারেটর নামক কাগজ হইতে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখান হইয়াছিল যে, "আমেরিকান্‌রা সকলেই তাহাদের জজদিগকে নিরপেক্ষ মনে করে না।"

সাকো ভ্যান্‌জেটির মৃত্যুদণ্ডের হুকুম লইয়া সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ভিতর যে সংঘর্ষ সুরু হইয়াছে তাহার শেষ কোথায় তাহা এখনও বলা যায় না। চারিদিকে দাঙ্গা, ধর্ম্মঘটের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদী ও শান্তিবাদীরা এই অবিচারের বিরুদ্ধে লড়িতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। দণ্ড কিছুদিনের জন্য স্থগিত রহিয়াছে। এখনও আপীলের চেষ্টা হইতেছে।

প্রবাসী ভারতবাসীদের কথা

প্রবাসী-ভবন—

দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী স্বামী ভবানী দয়াল ১৯২৫ সালে মিঃ আব্দুর রহমানের দলের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি সাহাবাদ জেলার বাহুরা গ্রামে দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রত্যাগত আশ্রয়হীন ভারতীয়দের জন্য একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই গৃহটির নাম হইয়াছে প্রবাসী-ভবন।

সম্প্রতি এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন যে বিহারের কতিপয় জমিদারের আনুকূল্যে তিনি কেনিয়ায় ৩৩,০০০ একর জমী ক্রয় করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার যে-সকল ভারতবাসী আর ভারতে ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক অথবা অক্ষম, এই জমীতে তাহাদিগকে বসবাস করিতে দেওয়া হইবে।

ব্রেজিল—

দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেজিল রাজসরকার তাঁহাদের দেশে ইউরোপ হইতে লোক আমদানী করিতে অক্ষম হইয়া এখন এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। বোম্বাইএ সম্প্রতি মিঃ সাণ্টা আনা নামক ব্রেজিল দেশীয় সাংবাদিক আসিয়াছেন। তিনি কর্ম্মঠ ভারতীয়দিগকে ব্রেজিলে যাইয়া বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। সংবাদপত্রের মারফতে তিনি প্রচার করিয়াছেন যে, ব্রেজিলের স্বাস্থ্য খুব ভাল ও সেখানকার উর্ব্বরা জমীতে কোকো, চিনি, তামাক প্রভৃতি চাষের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু সেদেশের আয়তন অনুসারে লোক-সংখ্যা অল্প। কাজেই সেখানে এখন বিদেশীদের যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। ব্রেজিল দেশের বোম্বাইস্থ রাজদূত সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ডেলী মেলের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, ব্রেজিল-সরকার সে-দেশে উত্তরভারতের কর্ম্মঠ ভারতবাসীদের জন্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে প্রস্তুত। তিনি বলিয়াছেন ব্রেজিলে ভারতীয় বিদ্বেষ একেবারেই নাই। সেখানকার রাজসরকার ভারতীয়দিগকে সমস্ত নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে প্রস্তুত। যাহারা সেদেশে নূতন যাইবে রাজসরকার হইতে তাহাদিগকে কিছুদিন আহার ও বাসস্থান দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ব্রেজিলে ২০।২৫ জন ভারতবাসী আছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন জুতার ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

ফিজি—

লাউটোকা (ফিজি) হইতে শ্রীযুক্ত ভিঃ দেও আমাদিগকে একখানি পত্র দিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই :—

ফিজি-প্রবাসী ভারতীয়দের দুরবস্থার কথা সকলেই অবগত আছেন। সেখানকার ভারতীয়দিগকে একতাবদ্ধ করিতে হইলে সুশিক্ষিত সমাজ-সেবক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীর আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন যে, কয়েকজন ফিজি-প্রবাসী ভারতীয় যুবককে যদি উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিয়া কর্ম্মী করিয়া তোলা যায় তবে প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থার অনেক উন্নতি হইবে। সুতরাং এবিষয়ে ভারতবর্ষের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্র—

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ আজ ১১ বৎসর যাবত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়া আছেন। সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহে তিনি তাঁহার নির্য্যাতন-কাহিনীর কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী সকল ভারতবাসীর অদৃষ্টেই সেইরূপ লাঞ্ছনা লাভ ঘটিতেছে। বিনা বিচারে কারাবাস, গুপ্তচরের অত্যাচার প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আরও অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা নির্য্যাতন তাঁহাকে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু তিনি ইহাতেও দমিবার পাত্র নহেন। কতিপয় আমেরিকান বন্ধুর সাহায্যে তিনি "ভারত-স্বাধীনতা-বান্ধব-সমিতি" নাম দিয়া একটি সমিতি স্থাপন করিয়া ভারতীয়দের দুর্দ্দশা-মোচন-চেষ্টায় ব্রতী হন। অনেক প্রকার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি এই কার্য্যে কিছু কিছু সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু তাহার পরেই ১৯২৩ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী ভারতীয়দিগকে পৌর অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়।

সম্প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় কোপল্যাণ্ড ব্যবস্থাপক সভায় "হিন্দু-পৌর-অধিকার-বিল" নামক আইনের খসড়া পেশ করা হইতেছে। এই আইন পাশ হইলে যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঘোষ মহাশয় এই প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রসমিতি ও ভারতবাসীরা এই ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ইংলণ্ড—

ডাঃ কার্ণাণ্ডেজ বিলাতের একটি মিউনিসিপ্যালীটীর সহকারী যক্ষ্মা-চিকিৎসকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 'কালা আদমী,' কাজেই তাঁহাকে উক্ত পদ হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা হইতেছিল। অবশেষে ব্যাপারটি স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। বিগত ৯ই জুলাই তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ যে স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ডাঃ কার্ণাণ্ডেজকে পদচ্যুত করিবার অনুকূলে মত দিয়াছেন। এই আদেশ পাইয়া সিটি কাউন্সিল তাঁহাকে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতে বলিয়াছেন।

নেটাল—

নেটালের সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে ৩১২ জন পুরুষ, ১২ জন স্ত্রীলোক ও ১৯৩ জন শিশু (ভারতবাসী) সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সরকারী দপ্তরে এখনও ৪০০ বসত উঠাইবার দরখাস্ত পড়িয়া আছে।

—

ভারতবর্ষ

বন্যা—

গুজরাট প্রদেশে ভীষণ বন্যা হইয়া দেশবাসীর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ভারতের দৈন্যের দৈন্য নাই, তাহার উপর ভগবানের অভিশাপ যে অসহ্য। গুজরাটবাসীর এই দুর্দ্দিনে সমগ্র দেশবাসীর

সাহায্য প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য। উড়িষ্যা প্রদেশেও প্রবল বৃষ্টিপাতে উড়িষ্যাবাসিগণ বিষম ক্লেশ ভোগ করিতেছেন।

ডিব্রুগড় ও ধুবড়ীতে বন্যা হইয়া শস্য নষ্ট ও কয়েকজনের প্রাণ-বিনাশ হইয়াছে।

—ত্রিস্রোতা

গণিকাবৃত্তি রহিত করিবার আইন—

মান্দ্রাজ ভিজিলেন্স সমিতি সহরের গণিকা-বৃত্তি দমন জন্য একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। আইন-সভার সভ্যগণের অভিমতের জন্য উহা তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। ঐ বিষয় আলোচিত হইবার পরে বর্ত্তমান বৎসরের শেষ ভাগে উহা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে। বর্ত্তমানে মান্দ্রাজে যে সিটি পুলিশ আইন প্রচলিত আছে, তাহা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ আইনে পুলিসকে যথোচিত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। প্রস্তাবিত আইনানুসারে পুলিশ গণিকালয় খানাতল্লাস করিয়া অপরাধিগণকে ধৃত ও তাহাদের হস্ত হইতে নাবালিকা-গণের উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন। গণিকালয়ের মালিকগণের বিরুদ্ধে পুলিস মামলা রুজু করিতে পারিবেন। উপযুক্ত নোটিশ দ্বারা পুলিশ কমিশনার কোনও কোনও বাড়ী নীতিবিগর্হিত অভিপ্রায়ে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতে পারিবেন। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলিবে না। ঐ আদেশ অমান্য করিলে অত্যধিক অর্থদণ্ড হইবে। ইন্‌স্পেক্টারের নিম্নতন পুলিশ কর্ম্মচারী গণিকালয় হইতে বালিকাগণকে বেশ্যাগণের হাত হইতে উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন না। পুলিশ নাবালিকগণকে আদালতে উপস্থিত করিবেন এবং ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদিগের ভরণপোষণ ও রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। কুপথে আনয়ন জন্য যাহারা বালিকাদিগকে সহরে আনিবে, তাহারা বেত্রদণ্ড, ২ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড এবং অনধিক ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। গণিকাগণের উপার্জ্জিত অর্থে যাহারা জীবনধারণ করিবে, তাহাদিগের জন্যও ঐরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ আইন বর্ত্তমানে সহরে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে সুফল লাভ হইলে সমগ্র প্রদেশে উহা প্রচলিত হইবে।

—ঢাকা-প্রকাশ

গণিকাবৃত্তি রহিত করিবার জন্য কলিকাতা ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন এবং কলিকাতার মেয়র চেষ্টিত হইয়াছেন। সহযোগী 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় প্রকাশ—

সারা ভারতে ন্যূনকল্পে তিরিশ লক্ষ গণিকা তাহাদের হীনবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। প্রতিনিয়ত ইহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। কত অসহায় নিষ্কলঙ্ক বালিকা আড়কাটির ফাঁদে পড়িয়া তাহাদের জীবনকে মরুভূমি করিয়া ফেলিতেছে। যাহাতে এই হীন ব্যবসা অচিরে বন্ধ করা হয়, দেশবাসীর সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি—

আগামী ১৮ই আগষ্ট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। ঐ অধিবেশনে আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

—

বাঙলা

বঙ্গে বিধবা-বিবাহ—

বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ সভার উদ্যোগে গত মাসে ১৫৭টি বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে হইতেও কয়েকটি বিধবা-বিবাহের সংবাদ উদ্ধৃত করা হইল :—

জলপাইগুড়ির শ্রীযুত সীতানাথ প্রামাণিকের শ্রীমতী হরিদাসী নাম্নী এক বিধবার সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

—যুগদীপ

গত ৮ই শ্রাবণ পাবনা শিল্পসঞ্জীবনীর হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সাহার সহিত পাবনা বনগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় মনমোহন সাহার ষোড়শ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী কালীদাসীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

—স্বরাজ

বিগত শ্রাবণ মাসে রাজসাহী টাউনের নিকটবর্ত্তী মতিহার গ্রামে গোপ সমাজে ছয়টি বালবিধবার বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বরকন্যার পরিচয়—

শ্রীমতী সুবাসিনী দাসী, ১৩ বৎসর ৫ মাস বয়সে বিধবা। বর্ত্তমান বয়স ১৪ বৎসর ৫ মাস। বর—শ্রী শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, বয়স ৪০ বৎসর, দ্বিতীয় বিবাহ।

২। শ্রীমতী ব্রজবালা দাসী, ৭ বৎসর বয়সে বিধবা। বর্ত্তমান বয়স ১৮। বর—শ্রীকোকনচন্দ্র ঘোষ বয়স ৩১ বৎসর, ২য় বিবাহ।

৩। শ্রীমতী কুসুমবালা দাসী, ১২ বৎসর বয়সে বিধবা। বর্ত্তমান বয়স ২০ বৎসর। বর—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বয়স ৪০ বৎসর, ১ম বিবাহ।

৪। শ্রীমতী রাইসুন্দরী দাসী, ১২ বৎসর বয়সে বিধবা। বর্ত্তমান বয়স ১৯। বর—শ্রীরামকান্ত ঘোষ, বয়স ২৫ বৎসর, ১ম বিবাহ।

৫। শ্রীমতী যোগমায়া দাসী, ১৩ বৎসর বয়সে বিধবা। বর্ত্তমান বয়স ১৭ বৎসর। বর—রতিকান্ত ঘোষ, বয়স ১৯ বৎসর, ১ম বিবাহ।

৬। শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাসী, ৮ বৎসরে বিধবা। বর্ত্তমান বয়স ২০ বৎসর। বর—শ্রীহরেরাম ঘোষ, বয়স ৩২ বৎসর, ২য় বিবাহ।

—হিন্দুরঞ্জিকা

গত ১২ই আগষ্ট শুক্রবার, বাঁকুড়া বেলেতোড় গ্রাম নিবাসিনী বালবিধবা শ্রীমতী আশালতা ঘোষের সহিত ঐ গ্রামনিবাসী শ্রীযুত প্রমথনাথ দত্তের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর বয়স উনিশ ও পাত্রের বয়স উনত্রিশ বৎসর। পাত্রীর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীযুত হরিহর নিয়োগী। এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয় সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্‌-বি মহাশয়ের গৃহে হিন্দু আচার মতে সম্পন্ন হয়।

এই প্রসঙ্গে সহযোগী বাঁকুড়া-দর্পণ লিখিতেছেন—

"আমাদের বাঁকুড়া জেলার সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর গোয়ালা আছে—পল্ল-গোপ, মেড়েলি, করঞ্জ ও আহীর। শেষ শ্রেণীর সংখ্যা অতি কম। এই গোয়ালাদের মধ্যে কন্যা বিক্রয় প্রথা অনেক স্থানে আছে বলিয়া অনেক গোয়ালার বংশ লোপ হইতেছে। যাহাদের জমী জায়গা বেশী নাই তাহাদের বিবাহ হইতেছে না। আমরা করঞ্জ গোয়ালাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখিয়াছি যাহাদিগকে কেহ কন্যা দিতেছে না। পণ-প্রথা রহিতের চেষ্টা হইতেছে, সভা-সমিতি হইতেছে, মন্তব্য গঠিত হইতেছে কিন্তু কোন ফল হইতেছে না। চাষী কৈবর্ত্ত গোয়ালা প্রভৃতি অনেক জাতির মধ্যে লোকসংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে।

ইহার একটি কারণ অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ও কন্যার অল্পতা। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।"

যুবক সম্মিলনী—

গত মাসে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মৈমনসিংহ যুবক সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছে। সভায় মৈমনসিংহ জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সম্পর্কিত কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গত মাসে ঢাকা যুবক-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ—

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ সমিতির সম্পাদক আমাদিগকে লিখিয়াছেন, আগামী ২রা ভাদ্র জন্মাষ্টমী তিথিতে এই আন্দোলনের এক বৎসর পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষ্যে কর্ম্মীরা সেই তারিখে একটি উৎসব করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা এই উৎসবে দেশবাসীর সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ কামনা করেন।

পরলোকগত সাহিত্যিক পরমেশপ্রসন্ন রায়—

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরমেশপ্রসন্ন রায় বি-এ, বিদ্যানন্দ গত ১লা আষাঢ় বৃহস্পতিবার ঢাকায় তাঁহার নিজ বাস-ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সাহিত্যিকরূপে তাঁহার নাম সুপরিচিত ছিল। তাঁহার রচিত "মেয়েলী ব্রত-কথা," "বিয়ের বই," "পঞ্চামৃত" প্রভৃতি পুস্তক পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার ন্যায় সাহিত্যসেবীর মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

পুস্তক-পরিচয়

[পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনার সমালোচনা না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —প্রবাসী-সম্পাদক]

কাঠের কাজ—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ, হস্তশিল্প-শিক্ষক, শান্তিনিকেতন। ৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ সিকা।

গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, এই বই "দেশের ও বিশেষ করিয়া শিক্ষাবিভাগের কাজে লাগিলেই" তিনি "শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন।"

দেশের কাজে লাগিবার আশা বুঝিতে পারি, দেশে কাষ্ঠকারুর অভাব আছে, কাষ্ঠকর্ম শিখাইবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগে কাষ্ঠকর্ম শিক্ষার কি বিশেষ প্রয়োজন ঘটিতে পারে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালা ও ইংরেজী ইস্কুল এবং কলেজ লইয়া শিক্ষাবিভাগ। কলেজের মধ্যে কেবল ইঞ্জিনিয়রী কলেজে কাষ্ঠকর্ম শেখান হয়; কিন্তু সেটা কলেজ, সুতরাং সেখানে বাঙ্গালা বহির স্থান নাই। ইস্কুলে বাঙ্গালা বই চলে; কিন্তু সেখানে কলাশিক্ষার স্থান নাই। সেখানে ছেলেরা কান থাকিতেও বধির, চোখ থাকিতেও অন্ধ। সেখানে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জনের কোনও প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় নাই, পুস্তকস্থা বিদ্যাই যথেষ্ট। অনেক ইস্কুলে প্রতিরূপ লিখনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রায়ই এই পর্য্যন্ত। কারণ এটা কালক্ষেপ মাত্র, পরীক্ষার পাসে চিত্রের মূল্য নাই। তবে, শুনিতেছি, ইংরেজী ইস্কুলে কত কি কর্ম শেখান হইবে, ইস্কুল ছাড়িলেই ছেলেরা কত কি কর্ম করিয়া টাকা রোজগার করিতে থাকিবে। জানি না, এই অসম্ভব কাণ্ড ঘটিবে কি না। কিন্তু বুঝি, এই প্রস্তাবের উৎপত্তি ইংরেজী তর্জ্জমায়। বাল্যকাল হইতে সহরে বসিয়া মাথার কোটরগুলি তর্জ্জমায় পূর্ণ করিলে তাহাতেই মন মাতিয়া থাকে, বাহিরের বস্তুর প্রতি দৃষ্টি থাকে না। বিদ্যার আলয়ে কলাকে প্রবেশ করিতে দিলে দুই নৌকায় পা পড়িবে। কারণ বিদ্যায় মনঃসিদ্ধি, কলায় হস্তসিদ্ধি লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্যভেদ করিতে গেলেই বিপত্তি ঘটে। বর্ত্তমানে ইস্কুলের শিক্ষায় যা বোঝাই হইয়াছে তাহাতেই ছেলেরা ভয়ে আড়ষ্ট, অভিভাবকেরা ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন। কারণ সেখানে প্রকৃতির সহিত পরিচয় হয় পুস্তকে, শিক্ষকের নিমিত্ত রচিত ভূগোল নিম্নতমশ্রেণীর বালকে পড়ে, ব্যাবহারিক জ্যামিতির সংজ্ঞায় তাহার কণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়, শিক্ষার নিত্য নূতন আবিষ্কৃত ক্রমের পরীক্ষা হয়; আর নিত্য নূতন বহির ও বাঁধা খাতার পয়সা জোগাইতে পিতামাতা ব্যতিব্যস্ত হন। দেখিলে শুনিলে মনে হয় বাতিকগ্রস্ত লোকে শিক্ষাতরীর কর্ণধার হইয়াছেন। আশঙ্কাও হয়, "কাঠের কাজ" বোঝার উপর শাগের আটিই বা হয়।

আমি বহুকাল হইতে শায়-শিক্ষার (manual training) পক্ষপাতী, দুই একটা ইস্কুলে কাঠ দিয়া শায়-শিক্ষা দেখিয়াছি, শায়-শিক্ষকের গুণে এবং প্রধান শিক্ষকের অনুমোদনে অনেক ছেলের চোখ ফুটিয়াছে, হাত খেলিয়াছে। কিন্তু সে ইস্কুলের ছেলেরা প্রতিরূপ লিখন ও চর্ম-চক্ষে দর্শন, এই দুই ক্রিয়ার সাহায্য পাইয়াছে। এই দুইর যোগ না ঘটিলে চেষ্টা বিফল হইত। বলা বাহুল্য শায়-শিক্ষা আর "কাঠের কাজ" (wood-working) এক বস্তু নয়। শায়-শিক্ষাকে বিদ্যা-শিক্ষার এবং বিদ্যা-শিক্ষাকে শায়-শিক্ষার অঙ্গ করা যেমন-তেমন কর্ম নয়। সে অনেক কথা, আর সেজন্য যে বই পড়ার দরকার আছে, তাও নয়। বরং ছেলেদের হাতে শায়-শিক্ষার বই দিলেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

এখন দেখি, "কাঠের কাজ" পড়িয়া কেহ কাষ্ঠকর্ম শিখিতে পারিবে কি না, অ-তক্ষা তক্ষা হইতে পারিবে কি না। যাহারা ছুতারের কর্ম জানে, করিতেছে; তাহারা এই বইতে শিখিবার মতন কিছু পাইবে না; যাহারা জানে না, কিন্তু শিখিতে চায়, তাহারাও এই বই পড়িয়া শিখিতে পারিবে না। কেন পারিবে না, তাহা পরে বলিতেছি। শিক্ষার্থীর আর-এক শ্রেণী কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহারা "ভদ্রলোক", সখ করিয়া শিখিতে চায়। এখানেও সেই উত্তর; বইখানি ইযুক্লিডের জ্যামিতি হইয়াছে, যে প্রণালীতে লেখক তাঁহার জ্ঞান 'প্রণালীবদ্ধ' করিয়াছেন, সে প্রণালীর দোষেই প্রথম শিক্ষার্থীর হাত পা গুটাইয়া পড়িবে।

পুস্তকের ভূমিকায় শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, লেখক "ভদ্রলোকের ভয়ে" বইখানির নাম "ছুতারের কাজ" রাখিতে পারেন

নাই। কিন্তু গ্রন্থকার ভুলিয়াছেন, ভীরু গুরুর শিষ্য জোটে না। যিনি নিজে ভদ্রলোকের ভয় করিতেছেন, কোন্ ভদ্রলোক-শিষ্য সে ভয়ে ভীত না হইবেন? সে যাহা হউক, কথাটা ঠিক বটে, ঠিক নয়। ঠিক বটের উদাহরণ অনেক আছে। 'বিদ্যা' ও 'বিজ্ঞান' শব্দ দ্বারা ভদ্রতা রক্ষার চেষ্টা দেখিয়াছি। "বয়ন বিদ্যা", "দর্জ্জী বিজ্ঞান" এই এই নামের বইর বিজ্ঞাপন পড়িয়াছি। একবার "ভারতবর্ষে" সূচীকর্ম নয়, "সীবনাঞ্জলি" নামে এক প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল। এইমাত্র এখানে একটা বিজ্ঞাপনে পড়িলাম, বাঁকুড়ায় "ব্যায়াম বিদ্যালয়" স্থাপিত হইয়াছে, ছেলেরা সেখানে ব্যায়ামবিদ্যা শিখিতে পারিবে। কিন্তু ব্যায়াম বিদ্যা ও ব্যায়াম শিক্ষা এক পদার্থ নয়। বিদ্যা আমাদের শিরে এমন ভর করিয়াছেন, আমরা সারা জগৎ বিদ্যাময় দেখিতেছি। কি জানি, মল্লক্রীড়া, কুস্তি আখড়া বলিলে ভদ্রতা নষ্ট হয়, ব্যায়াম বিদ্যা বল, মাল হইতে হইবে না। Physical Training School বল, ভদ্রতা রক্ষার চূড়ান্ত হইবে। দর্জী বলা হইবে না, টেলার; দপ্তরী বলা হইবে না, বুক্-বাইণ্ডার; ইত্যাদি। এই যে আত্মগোপনের ইচ্ছা, সেটা কেবল দর্জী ও দপ্তরীর নয়; সাহেবী সাজায় সেই ইচ্ছা।

সকল ইচ্ছার নিদান এক নয়। বাবুর বাড়ীর মেয়েরা যখন কল ঘুরাইয়া কাপড় সেলাই করেন, তখন তাঁহারা দর্জী হন না। আমার এক বিদ্বান বন্ধু কামারের কর্ম বেশ করিতে পারেন, তিনি কামার হন নাই। গন্ধীজী নাকি আপনাকে তাঁতী বলেন; কিন্তু কেহ কি তাঁহাকে তাঁতী বলে? তাঁত বোনা তাঁহার পেশা হইলেও কেহ কি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত? কিন্তু যে ব্যক্তি কোন রকমে কেবল কাপড় বুনিতে শিখিয়াছে, সে তাঁতী বই আর কি? বিলাতেও দোকানী পসারী, ছুতার কামার, প্রভৃতির পদ-গৌরব আছে কি? যেদিন কারু বিদ্যাবান্ হইবেন, সেদিন তাঁহার সম্মান আপনি বাড়িয়া উঠিবে। এইগুণে পটুয়ার কম এখন সভ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশে আর এক অন্তরায় আছে। সেটা এমন প্রচ্ছন্নভাবে আছে যে সহজে চোখে পড়ে না। মানুষের জাতিভেদ আছে, সুতরাং কর্মেরও জাতিভেদ ঘটিয়াছে। শূদ্র ছিল কারু। শূদ্র হীনবর্ণ,জঘন্য; তাহার বৃত্তিও জঘন্য। যে অপ্রিয়, তাহার কর্ম নিন্দিত। এদিকে কিন্তু কারু না থাকিলে ব্রাহ্মণের দিন চলিত না। কাজেই সে অধম হইলেও তাহার নির্মিত দ্রব্য তাঁহার নিকট শুদ্ধ গণ্য হইল। চর্মকার অস্পৃশ্য, কিন্তু উপানহ দেহে ধারণীয়। "ছোট" লোকে করিত বলিয়াই কারুকর্ম— "ছোট" হইয়া গিয়াছিল। সে কর্ম আর্য "ভদ্রলোকে" করিলে "ছোট" হইত না। মৃগয়া রাজধর্ম; নিষাদে করিলেই প্রাণিহিংসা। তখনও কিন্তু সখের আর্য ছিলেন, রাজপুত্রও ছেলেবেলায় ধূলা-বালি লইয়া খেলা করে। প্রকৃতির প্ররোচনায় আর্যও খেলা করিতেন। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রভু ও দাসে হিন্দুসমাজ বিভক্ত, যখন শূদ্র মাত্রেই দাস গণ্য হইত; তখন দেখি আর্যের, বিলাসী সভ্য আর্যের সখের কম ছিল তক্ষকর্ম। তক্ষকর্ম ছোট হইলে কোন্ আর্য দাসের সম্মুখে করিতে পারিতেন?

আমাদের সূত্রধর বাস্তবিক ইঞ্জিনিয়র। ইঞ্জিনিয়রের মান আছে, সূত্রধরেরও ছিল। তাঁহার অধীনে ও আদেশে তক্ষা কাজ করিত। কারণ তক্ষকর্মের মূলে যন্ত্রবিদ্যা (mechanics), সে বিদ্যা সূত্রধরের। গ্রামে গ্রামে যে অসংখ্য ঘর আছে, সূত্রধর সে সব গড়িয়া দিয়াছেন; তাহাঁরই বিদ্যায় ঘরের চাল নির্মিত হইয়াছে। বাড়ই ও ঘরামি, ছুতার ও কামার ঘরের কাষ্ঠকর্ম করিতেছে বটে; সেটা কিন্তু সূত্রধরের নিকট শেখা।

বস্তুতঃ যে কর্ম যে জাতিই করুক, গুণীর আদর চিরকাল আছে। তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার দলে অগণ্য অগুণী ঢুকিয়াছে। আরও দুর্ভাগ্য, "ভদ্রলোকে" মুড়ি-মুড়কির প্রভেদ জানেন না, বাইরের রঙ্গ-চঙ্গে ভুলিয়া যান। কলিকাতার বাজারে এমন জুতা পাই নাই, যার তলা চাঁচা ঘষা হয় নাই। সৌখিন ক্রেতা জানেন না, সে তলা কার্পেটের উপর টিকিতে পারে; বালি কাঁকরে চলিতে হইলে চমের "নীল" আরও দুইমাস টিকিত। তক্ষকর্ম ছুতারে করে বটে কিন্তু দরজা জানালা মজবুত করিয়া গড়িতে পারে কপাট ঠিক মত ঝুলাইতে পারে, এমন ছুতার সহসা মেলে না। কপাট ঝুলানার দোষে গৃহস্বামীকে পাগল হইতে হয়; কিন্তু তিনিই আনাড়ীর দল বাড়াইয়াছেন, মুড়ি-মুড়কির সমান দর করিয়াছেন।

আনাড়াই বা পাই কই? বহু বহু গ্রাম আছে, যেখানে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে ছুতার নাই। পূর্বকালের কারুকুল রোগে ও অনাহারে হ্রাস পাইয়াছে; এখন দিন ফিরিয়াছে বটে, দিন বেতন এক টাকা, কোথাও পাঁচসিকা দিয়াও কিন্তু ছুতার পাওয়া যায় না। টেবিল চেয়ার কয়খানা চাই? দুই দশ দিন পরে পাইলেও চলে; কিন্তু গৃহ-নির্মাণে বিলম্ব সয় না। গোরুর গাড়ীর চাকার পুঁঠি কি আরা ভাঙ্গিয়া গেলে কাজ অচল। অথচ গ্রামে বহু বহু লোক আছে, কাষ্ঠকর্মে যাহাদের জাতি খোয়াইবার ভয় নাই। কিন্তু কে শেখায়? বই কই যে পড়িয়া শিখিয়া লইতে পারে? অন্ন-সমস্যা সমাধানের নানাপথ থাকিতেও নাই।

এখানে একটা ঘটনা বলি। কয়েক বৎসর পূর্বে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে এক উৎসাহী ডেপুটি আসিয়াছিলেন। সেখানে একটা টেক্নিকাল ইস্কুল খুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। এই নাম শ নিয়াই আমার মনে কেমন খটকা লাগে। শুনিলাম বিশ পঁচিশ হাজার টাকা খরচে পাকা বাড়ী হইতেছে। এই সংবাদে খটকা আরও বাড়িয়া ওঠে। একদিন দৈবক্রমে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তখন ইস্কুলে শিক্ষা কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। জিজ্ঞাসিলাম, কে শিখিতেছে, কি শিখিতেছে। "ইস্কুলের ছেলেরা শিখিতেছে, ফটো-ফ্রেম করিতেছে।" এই উত্তর আমার খটকার সময়েই মনে হইয়াছিল। পরে শুনিলাম তিনি বিষ্ণুপুরে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। আর, মাস ছয়েক পূর্বে বিষ্ণুপুরের সংবাদে পড়িয়াছিলাম, ইস্কুলটির ভগ্নাবস্থা। হয়ত তিনি থাকিলে এত অল্পকালের মধ্যে ইস্কুলটির এই দশা হইত না। ব্যয় ও আড়ম্বরের তুলনায় দেশে কয়জন ছুতার বৃদ্ধি হইয়াছে?

"কাঠের কাজ" বইখানি এইরূপ টেক্নিকাল ইস্কুলের জন্য লিখিত। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "যাহাদের উদ্দেশ্যে বইখানি লেখা, সেই আগত, আহূত,অনাহূত ও রবাহূত শিক্ষার্থীদের হাতে বইখানি উৎসর্গ করিলাম।" জানিনা, কে সে শিক্ষার্থী, যে গুরু-নিরপেক্ষ হইয়া এই বই পড়িয়া কাঠের কাজ করিতে পারিবে। গ্রন্থকারের আরম্ভ-বাক্য এই,— "আমাদের দেশে কাঠের কাজ শিক্ষার বিশিষ্ট কোন নিয়ম বা কর্ম্মপদ্ধতি নাই।" এটা ত ঠিক কথা নয়, লেখা-পড়ায় নাই কিন্তু কর্ম্মপদ্ধতি বিলক্ষণ আছে। সেটা স্বাভাবিক ক্রম, এবং সে ক্রমই শ্রেষ্ঠ। গুরুর শিষ্য হইয়া হাতে-হেতেরে শিক্ষার তুল্য আর কি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি আছে? এই হেতু হস্তসিদ্ধির বই লেখা ভারি কঠিন।

গ্রন্থকার প্রথমেই আবশ্যক যন্ত্রের ফর্দ দিয়াছেন। এই ফর্দ ও পরে লিখিত স-হর্স্, ক্লেম্প, চারিজনে একত্র কাজ করিবার বেঞ্চি ইত্যাদি উপকরণ দেখিলেই বুঝি টেক্নিকাল ইস্কুল তাঁহার লক্ষ্য। ফর্দে নাই, এমন অনেক যন্ত্র তাঁহার আলমারিতে দেখিতে পাইতেছি। গ্রন্থকার যদি দাম ধরিয়া মোট খরচ দিতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন, কলিকাতার দুই পাঁচজন ভাল কারিকর ছাড়া দেশের সাধারণ ছুতারের তত টাকা

নাই। খরচ করা আবশ্যকও মনে করি না। দেশটা বিলাত নয় যে, তাহাকে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হইবে। একখান মোটা পাটা ভুঞে ফেলিলেই তাহার বেঞ্চি হয়; লম্বা রেঁদা করিবার সময় একটা বেঞ্চি পাইলে ভাল, না পাইলে কাজ অচল হয় না। সে স্বচ্ছন্দে পা মুড়িয়া হাতে পায়ে কাজ করে, জুতা মোজা পরিয়া থাকে না। করাতের সুতায় কালী মাখাইতে বাকস, রীল প্রভৃতি অনাবশ্যক বাহুল্য দেখিলে মনে হয়, ঝাঁকড়া চুলে টেরি কাটিয়া শাদা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া সৌখিন বালকে সৌখিন কর্ম করিবে। হাতে কালী লাগার ভয় থাকে, চা-খড়ি ত ছিল।

কাষ্ঠকর্ম সাধারণতঃ দ্বিবিধ, গড়ন ও জোড়ন। গড়নের কাজ বলিলে চলিতভাষায় বাটালী দিয়া মূর্ত্তি গড়া বুঝায়। পূর্ব্বকালের স্বষ্টৃকর্ম। তাহা হইলেও কাঠ সাইত করা গড়নের মধ্যে আসে। গ্রন্থকার আশা করেন আমাদের কৃষকেরা লাঙ্গল মই ঘরের খুঁটি দরজা নিজে গড়িয়া লইতে শিখিবে। কিন্তু তাঁহার আলমারিতে বাইস দেখিতে পাইতেছি না। সেই বেদের কালের বাসি, যাহা একাধারে বিলাতী দুইটা যন্ত্র, উপযোগে করাত বাটালী রেঁদা, সে বাইস নইলে গাঁয়ের ছুতারের হাত বন্ধ। তাঁহার আলমারিতে ভ্রমরই বা কই? তাঁহাকে বলিতে হইবে না, দেশী ভ্রমরের কাছে বিলাতী রাচেট, গ্রাম্য ভাষায়, কলিকাও পাইতে পারে না। বাইস, করাত, বাটালী, ভ্রমর ধরিতে যে না শিখিয়াছে, সে কিছুই শেখে নাই। ছুতার অ-নাড়ী কি স-নাড়ী তাহা বুঝিবার তিন সোজা উপায় আছে। এক, তাহার হেতেরের ধার দেখা। অ-নাড়ীর হেতেরের ধার মোটা। দ্বিতীয় উপায়, তাহাকে একটা বাজে কাঠে ইস্ক্রুপ আঁটিতে বলা। অনাড়ী সোজা বিঁদ করিতে পারে না; যদি বা পারে গায়ের জোরে ইস্ক্রুপ বসায়। তৃতীয় পরীক্ষা, প্রাবীণ্য পরীক্ষা, যেটা গড়িবে, সেটার রেখাচিত্র লেখা। দেখিতেছি, গ্রন্থকার হেতেরে ধার দিতে বলিয়াছেন, ইস্ক্রুপে গায়ের জোর লাগাইয়াছেন, আর "অঙ্কন"টা বিবিধ মধ্যে ফেলিয়াছেন। তাহাঁর ছাত্র প্রথম পরীক্ষায় পাস, অন্য দুই পরীক্ষায় ফেল হইবে। প্রাণপণে ইস্ক্রুপ কষিতে দেখিলে বুঝি, ইহার মর্মস্থান জানে না। আর যে, ভুঞে বা কাগজে জিনিসটি লিখিয়া দেখাইতে না পারিব, সে কাঠে আর কি দেখাইবে?

যন্ত্রের চলিত নাম, ও নানাবিধ জোড়নের নাম দেওয়ায় একটু মুস্কিল আছে। স্থানভেদে অল্প স্বল্প নামভেদ আছে। তথাপি 'রেত' নয়, রেতী বা উখা বা উখা। (রেতী নাম হিন্দী)। 'অগর' নয়, আগর; 'অগরবিট' নয়, আগরের ফলা; 'তৈল পাথর' নয়, তেলশিল; '২ ফিট লম্বা মাপিবার যন্ত্র' নয়, দু-ফুটে, গজ, (বাঙ্গালার ফুট্‌ফিট্ নাই, সব ফুট); tennon saw টেন্‌ সা। টানা করাত বলিলে করাতীর লম্বা করাত বুঝায়। ঠেলা করাত আর টানা করাত, দুই রকম হাত করাত আছে। সে টানা করাত কোলের দিকে টানিতে হয়। এজন্য পৃথক করিতে হইলে কোলটানা করাত বলিতে হয়। গ্রন্থকার screw driver কেন মার্ত্তুল বলিয়াছেন, জানি না। বাঙ্গালায় বলে তিরুজু। কিন্তু ওড়িয়া নাম পেঁচ-কষ বেশ লাগে। আমি শুনিয়াছি হাতুড়ীকে মাতল বলে। হেতেরের ফর্দে ১৪ ইঞ্চি রেঁদা আছে, ছোট রেঁদা কই; 'পোক রেঁদা' আছে, চেন্না কই? পলুও দেখিতেছি না।

যাহাঁরা প্রথম লেখক হইবেন, ভাষার প্রতি তাহাঁদের একটু কর্ত্তব্য আছে। গ্রন্থকার যাবতীয় জোড়নের ইংরেজী নাম চালাইয়াছেন। হেতেরের ইংরেজী নামে ক্ষতি নাই, কিন্তু কর্মের ইংরেজী নাম দিলে বিষয়জ্ঞানে বিঘ্ন হয়। বাঙ্গালা নাম ছিল না, কিংবা সার্থক নাম রচনা কঠিন, তাও নয়। তথাপি, করাতের 'দানা' নয়, দাঁত; 'স্ক্রু' নয়, ইস্ক্রুপ; পাথরে ধার দেওয়া নয়, ধার করা বা শিলানা; 'পলিশ করা' নয়, 'পালিশ লাগানা' (পালিশ-করা-মসৃণ করা); 'পাশাপাশি' আঁশে' নয়, এড়ো দিকে; 'কুদ করা' নয়, কোঁদা; ইত্যাদি। 'পুনর্পালিশ' কথাটা বুঝিতে আমার সময় লাগিয়াছিল। কাঠে পালিশ লাগানা, কাঠ কোঁদা, একাই এক এক কলা। এখানে তাহার স্থান নাই। তুলি দিয়া, কি নেকড়ার পুঁটলী দিয়া পালিশ মাখানা আর রং বা বার্নিশ লেপা একই। সেটা পালিশ নয়।

পুস্তকের শেষ অধ্যায়, "কাঠ পরিচয়।" কিন্তু পরিচয় করাইতে হইলে গুণ বর্ণনা চাই। সেদিকে লেখক না গিয়া কাঠের নাম মাত্র দিয়াছেন। কাঠের রংও বলেন নাই। সেগুন কাঠ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহার আঁশ খুব ঘন, কাজ করিতে বেশ মোলায়েম।' শিশু-কাঠের "আঁশ খুব শক্ত ঘন এবং স্থায়িত্বগুণসম্পন্ন।" এই পরিচয় ঠিক নয় কাজেরও নয়। গাছের নাম করিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিত। এখানেও একটু বাধা আছে। বাঙ্গালাদেশে শিশুকাঠ দেখিতে পাই না, যেটা দেখি সেটা সিতিসার (সং সিতি এখানে কৃষ্ণবর্ণ)। গাছটার দেশে এই নাম চলিত আছে। দেখিতেছি, লেখকের কতকগুলি গাছ আসাম অঞ্চলের। যে গাছ যে দেশে জন্মে, তাহার সেদেশী নাম অবশ্য দিতে হইবে; তারপর তাহার সংস্কৃত নাম থাকিলে সে নাম। সে নাম পাইলে অন্য দেশের লোক গাছটি চিনিতে পারিবে। সংস্কৃত নাম না থাকিলে সংস্কৃত নামের কোন্ গাছের জ্ঞাতি, তাহা বলিলে কিছু জানা যাইবে। তা বলিয়া শিমুলের নাম 'তূলা' লেখা, কিংবা ব্রহ্মদেশীয় ইংরেজী Ironwood এর বাঙ্গালা তর্জমা 'লৌহকাঠ' একেবারে অচল। স্মরণ হইতেছে এই "লৌহকাঠ"কে নোয়াখালি ও চাটিগাঁয়ে পিঙ্গাড়ু বলে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

হিজলীর মসনদ্-ই-আলা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত। প্রকাশক ক্ষেমানন্দ কুটীর, ভাঙ্গনমারি, জানুকা পোষ্টঃ মেদিনীপুর। ২৭১+৩৪ পৃষ্ঠা। ২২ খানা চিত্র ও মানচিত্র।

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ কূলের মাঝামাঝি হিজলী দ্বীপ এখন ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত চাষের ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার ইতিহাসে হিজলী বিখ্যাত ছিল। গঙ্গার এক শাখা যেখানে শেষ হইয়াছে, পূর্ব্বে সাগরদ্বীপ এবং পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার বিস্তৃত জমি, ঠিক এইরূপ স্থানে থাকায় হিজলী বঙ্গোপসাগরের নাবিকদের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধার স্থান ছিল, এবং ইহার মুসলমান রাজা অনেক দিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। আওরংজীবের রাজত্বের প্রথমে হিজলীর শেষ বিদ্রোহ দমন হয়, এবং তাহার ২৫।২৬ বৎসর পরে ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গের সুবাদার শায়েস্তা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে এই হিজলীতে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সাবাড় হইয়া যায়।

যে-সব বিদেশী জাহাজ বঙ্গদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিত তাহাদের পক্ষে হিজলীর সাহায্য না লইলে চলিত না, এজন্য পুরাতন পর্ত্তুগীজ ও ইংরেজ ভ্রমণ-বৃত্তান্তে হিজলী (Injelly)র অনেক কথা জানা যায়। বঙ্গোপসাগরের আর কোন বন্দর সম্বন্ধে এত বেশী সংবাদ পাওয়া যায় না। তাহা ভিন্ন, হিজলীর মসজিদে স্থানীয় রাজবংশের একখানি পুরাতন ফার্সী ইতিহাসের হস্তলিপি রক্ষা পাইয়াছে, ইহার অনেক অংশই বিশ্বাসযোগ্য।

এইসব উপাদান একত্র করিয়া বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মহেন্দ্রবাবু তাঁহার জন্মভূমির এই ইতিহাসখানি রচনা করিয়াছেন। ইহা শুধু হিজলী গ্রামের ইতিহাস নহে, ইহাতে বঙ্গোপসাগরের পার্শ্ববর্ত্তী অপর দেশগুলির সম্বন্ধেও অনেক সংবাদ আছে। গ্রন্থকার সমস্ত উপাদান বেশ

বিজ্ঞভাবে সমালোচনা করিয়া গ্রহণ বা ত্যাগ করিয়াছেন, কোন সংস্কারের প্রভাবে সত্যের হানি করিতে সম্মত হন নাই। ইহাতে গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য বাড়াইয়াছে। হিজলীর ইতিহাস এই গ্রন্থে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা বেশী সংবাদ দেওয়া বা শ্রেষ্ঠতর প্রণালীতে রচনা করা সম্ভব মনে হয় না।

পাঠান যুগে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা সামন্তরাজগণকে "মসনদ্-ই-আলা (=উচ্চ-আসনধারী) এই উপাধি দেওয়া হইত। বঙ্গে পাঠান যুগের অবসানের সময় এক মসনদ্-ই-আলা পূর্ব্ববঙ্গের ("ভাটি-দেশের") ইসার্খা ছিলেন। আর এক বংশ হিজলীতে রাজত্ব করেন। এই শেষোক্ত বংশের সঙ্গে একদিকে উড়িষ্যা রাজ্যের অপর দিকে বঙ্গের মুঘল সুবাদারের সংঘর্ষ হয়। প্রকৃতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত কোণে আশ্রয় পাইয়া হিজলীর মসনদ্-ই-আলা, দেশ বিস্তার, মসজিদ স্থাপন, কল্প-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক স্মরণীয় কাজ করেন। গ্রন্থের এই অংশ সুখপাঠ্য হইয়াছে।

গ্রন্থকার শয্যাগত কাতর এবং গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের ব্যয়ে ঋণগ্রস্ত। আশা করি বঙ্গের পাঠকগণ তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন, কারণ এই গ্রন্থখানি আমাদের প্রদেশের ইতিহাসের ভাণ্ডারে স্থায়ীভাবে স্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রী যদুনাথ সরকার

সপ্ত গোস্বামী—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত। ১ম সংস্করণ, ১৯২৭, আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃঃ ৩৫৯, মূল্য ২৲

অধ্যাপক মিত্র মহাশয় ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি বাঙলার বৈষ্ণব গোস্বামীপাদদিগের জীবনী ভক্ত-প্রসঙ্গ হিসাবে লিখিয়াছেন। ইহাতে বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও তপস্যার উজ্জ্বল চিত্র একস্থানে পাওয়া যাইবার সুবিধা হইয়াছে। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবদিগের ন্যায় বাঙালীর আধ্যাত্মিকতার অনুরাগী পাঠকদিগেরও আনন্দ বিধান করিবে। গ্রন্থে কয়েকখানা চিত্র আছে। ঐতিহাসিক গ্রন্থকার ইতিহাসকে একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। তাই তিনি বৃন্দাবনে বাঙালীর একটি কীর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞ করিয়াছেন—উহা রাজা বসন্তরায়ের পিতা গুণানন্দের নির্ম্মিত মন্দির।

পরিহাস—শ্রীরসময় লাহা। ১৩৩৩। পৃঃ ৯২, মূল্য ৮৹

রসময়-বাবুর রঙ্গ, ব্যঙ্গ ও সরস কবিতায় নিজস্বতা আছে। তাঁহার এই গ্রন্থেও কতকগুলি উপভোগ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। অতিকাব্য, হাতুড়ে, হিতে বিপরীত, স্বাপ্নদর্শন, দোষ কার, প্রভৃতি কবিতা বেশ হইয়াছে। ঘোড়া কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্কুলের ছেলেরা প্রথম প্রথম রচনা লিখিতে শিখিয়া ঘোড়া সম্বন্ধে যে অমূল্য ও অসাধারণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে এই রসিক গ্রন্থকার সেইরূপ রচনাকে পদ্যের গ্রথিত করিয়াছেন।

শ্রীরমেশ বসু

রামায়ণে আর্ট—(ত্রয়াঙ্ক ব্যঙ্গনাট্য)—শ্রী শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় প্রকাশক শ্রীনৃসিংহপদ মুখোপাধ্যায়, ৬ গোপীকৃষ্ণ পালের লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা। আট আনা।

একখানি ব্যঙ্গনাট্য। নাটিকাখানি গতানুগতিক মামুলি ছাঁদের নয়। ভাবে বিন্যাসে ও রচনা-কৌশলে—সর্ব্বত্রই ইহার নূতনত্ব ও বিশেষত্ব পরিস্ফুট। আমরা নাটকখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমরা আশা করি ইহা সাহিত্যরসিক ব্যক্তিকে আনন্দ দান করিবে।

ঝরাফুল—শ্রীমতী রত্নমালা দেবী। প্রকাশক শ্রীবিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, ছোট কেল্লা বাড়ী, মুঙ্গের। আট আনা।

কবিতার বই। কবিতাগুলিতে ছন্দের ও মিলের ত্রুটি আছে এবং ভাবে ও কল্পনায় নূতনত্বও নাই। তথাপি লেখিকার অনুভূতি ও তাহার প্রকাশ এতই সরল ও স্বাভাবিক যে, তাহা চিত্ত স্পর্শ করে। পুস্তকের নামনির্ব্বাচনে লেখিকার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, কেননা এই নামে কবি করুণানিধানের একখানি কাব্যগ্রন্থ আছে।

পারের গান—শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল। প্রকাশক সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

বহু কবি ও সাহিত্যিক অমর ছন্দে ও প্রবন্ধে মৃত প্রিয়ার স্মৃতি অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছেন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে প্রিয়াবিচ্ছেদকাতর কবি অতিশয় করুণ ভঙ্গীতে ও মর্ম্মস্পর্শী আবেগে প্রিয়ার মনোরম স্মৃতিচিত্র আঁকিয়াছেন। বিষয়টি এতই পবিত্র ও গভীর যে, ইহার আলোচনায় চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়ে। কবিতাগুলিতে স্থানে স্থানে ছন্দপতন সত্ত্বেও বইখানির আদর হইবে।

আমীনা (নাটক); রাধাকৃষ্ণ (নাটক); রমা (নাটক)—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ৫ নং উড ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে এক টাকা, এক টাকা, এক টাকা।

তিনখানি নাটক। নাটকগুলির উদ্দেশ্য উচ্চ। রচনা ভাল হইয়াছে।

নারী-মঙ্গল—শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ। ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ও পটুয়াটুলী, ঢাকা। বারো আনা।

কবিতার বই। নয়টি কবিতায় নারীর গুণ কীর্ত্তিত ও বর্ণিত হইয়াছে। পরিমলবাবু বহু পূর্ব্বেই বাংলা দেশে কবিখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার ছন্দ সাবলীল এবং শব্দসম্পদ তাঁহার যথেষ্ট। আলোচ্য নারী-স্তোত্রগুলিতে কবির নারীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি অনাড়ম্বর আবেগে ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাসে সুন্দর ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উপর ছাপা ও বাঁধন মনোরম হওয়ায় বইখানি উপহারের সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াছে।

বদরীনারায়ণের পথ—শ্রীবিধুভূষণ দত্ত। তত্ত্বমন্দির, হরিদ্বার হইতে প্রকাশিত। বারো আনা।

ভ্রমণ-কথা। ঘরে বসিয়া যাঁহারা বদরীনাথের তথ্য জানিতে চান তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

যুগ-সমস্যা—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বর্ম্মন্ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা।

বর্ত্তমান রাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মের খিচুড়ী, যুবকগণের স্বাধীন মনোবৃত্তি অর্জ্জনের উপায়, ইত্যাদি সমস্যার সুন্দর চিন্তাপ্রসূত সমাধানের ইঙ্গিত এই পুস্তকে আছে। বইখানি দেশহিতৈষীর অবশ্য পাঠ্য।

প্রথম শিক্ষা ইংলণ্ডের ইতিহাস—শ্রীপঞ্চানন সিংহ। আশুতোষ কলেজ, ভবানীপুর। ছয় আনা।

বইখানি ছেলেদের জন্য রচিত এবং ছেলেদের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।

হিন্দু সংগঠন—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন। ১৯ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা। এক টাকা।

ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থকার কয়েকখানি সুচিন্তিত গ্রন্থ লিখিয়া চিন্তাশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তাশীলতা, গবেষণা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে আজ অবধি হিন্দু জাতির গঠন ও সমাজব্যবস্থার সুন্দর পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রত্যেক হিন্দু যুবক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাঁহার হিন্দুত্ব-বোধ উদ্বুদ্ধ করুন এবং হিন্দুর শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করুন।

গুরু গোবিন্দ—শ্রীগিরিজাকান্ত গোস্বামী। প্রকাশক গ্রন্থকার স্বয়ং। কমলা প্রেস, নাটোর। বারো আনা।

ঐতিহাসিক নাটক। রচনায় দোষ থাকিলেও গুরু গোবিন্দের চিত্র মন্দ লাগিল না।

বলাকা ; শিশু ভোলানাথ ; মুকুট ; সঙ্কলন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে এক টাকা বারো আনা ; এক টাকা ; ছয় আনা ; এক টাকা চোদ্দ আনা।

রবীন্দ্রনাথের চারখানি গ্রন্থের নব সংস্করণ। ছাপা ও বাঁধন রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের যোগ্য হয় নাই। বিশ্বভারতী এবিষয়ে আর-একটু অবহিত হইবেন কি ?

কহ্লার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ১৬।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বারো আনা।

কবিতার বই। এই গ্রন্থে যে-কবিতাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে সেগুলি প্রবাসী, মানসী, নারায়ণ, ভারতী, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং সেগুলির গুণবিচার হইয়া গিয়াছে। কবিতাগুলি সরল, সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী। কবির ছন্দ যেমন স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন, তাঁহার ভাবও তেম্নি কষ্টকল্পনাজাত নয়, অতি স্বাভাবিক। কাব্যামোদী মাত্রেই বইটি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

অভিশাপ—শ্রী বিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী। দি বুক ষ্টল, পি-৮১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, বারো আনা।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লাষ্ট ডে অব্ পম্পিয়াই অবলম্বনে ছেলেদের জন্য রচিত গল্প-পুস্তক। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন—"...ইংরিজি কিম্বা বাঙ্গালার নামজাদা বইয়ের 'শিশু সংস্করণ' বাজারে নেই বল্লেই চলে। বিলাতে এ রকম বইয়ের প্রচলন খুব বেশী। সেই অভাব পূরণের জন্যেই...... 'অভিশাপে'র জন্ম।" লেখক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাই বলিয়াছেন। আমরা জানি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের বরদা এজেন্সী হইতে এই জাতীয় 'শিশু সংস্করণ' কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক, আলোচ্য পুস্তকখানি সহজ সরল বর্ণনাগুণে, সহজ সরল ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি-গুণে ছেলেদের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে। বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাত, ও পম্পিয়াই অধিবাসিগণের সেই অগ্নি হইতে আত্মরক্ষার ব্যাকুলতার কাহিনী ছেলেদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করিবে।

বাসন্তিকা—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত। জগন্নাথ হল সাহিত্য সমিতি, রমণা, ঢাকা। এক টাকা।

"বাসন্তিকা জগন্নাথ-নিকেতনের মুখপত্র।" এই সংখ্যা সেখানকার চতুর্থ বাৎসরিকী। পূর্ব্বেকার সংখ্যাগুলির ন্যায় এবারেও বাসন্তিকা তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বর্ত্তমান কালের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার ও কবিগণের সুনির্ব্বাচিত রচনা-সম্ভারে বাসন্তিকা সুসমৃদ্ধ, ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই সংখ্যার বিশেষত্ব এই যে, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দ্দেশে দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে রচিত বহু কবির সুন্দর সুন্দর কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে পত্রিকাখানির 'বাসন্তিকা' নাম সার্থক হইয়াছে। এখানিকে পত্রিকা বলিলে ভুল বলা হইবে। ইহাকে প্রবন্ধ-কবিতাসংযুক্ত একটি মনোরম সাহিত্য-পুস্তক বলা যাইতে পারে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শিক্ষাবিজ্ঞান—আবদুর রহমান খাঁ, এম-এ, বি-টি। প্রকাশক গোপীমোহন দত্ত, ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ঢাকা। দুই টাকা।

খাঁ সাহেবের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বহুদিন যাবৎ তাঁহাকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি আলোচ্য যে পুস্তকখানি আজ বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষায় অভিনব সামগ্রী। পুস্তকখানি শিক্ষা-বিজ্ঞান, অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে শিক্ষা কি জিনিস এবং কি করিয়া তাহা প্রদত্ত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে পুস্তকখানি একটি তথ্য-ভাণ্ডার। পুস্তকখানির আলোচ্য বিষয়—শিক্ষা-বিজ্ঞান পাঠের আবশ্যকতা, শিক্ষার অর্থ ও উদ্দেশ্য, শিক্ষার বিধান, বিষয় নির্ব্বাচন, শিশুর মানসিক বিকাশ, বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধান, শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও কৌশল, পাঠদানের কার্য্যক্রম, শ্রেণী-শাসন, নানা বিষয় শিক্ষা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ অতি-জ্ঞাতব্য, অতি-শিক্ষণীয় তথ্যপূর্ণ পুস্তক বাংলা সাহিত্যে বিরল। পুস্তকখানি শিক্ষাবিষয়ক একটি বিশেষ অভাব দূর করিল। আমাদের দেশের শিক্ষকরা কোন রকমে পাশ-করা ব্যক্তি মাত্র। শিক্ষা কি জিনিস ও তাহা প্রদান করার জ্ঞান লাভের সুযোগ তাঁহাদের ঘটে না, অথবা শিক্ষাবিভাগের সে-বিষয়ে ব্যবস্থা নাই। সেইজন্যই আজকালকার ছাত্রগণ এত শিথিল-জ্ঞানসম্পন্ন। আমাদের দেশের ভাবী শিক্ষকগণ শিক্ষকতা করিবার পূর্ব্বে খাঁ সাহেবের এই পুস্তকখানি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া যদি কার্য্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষাদান সার্থক হইবে ও দেশে প্রকৃত শিক্ষিত যুবকের উদ্ভব হইবে। আমরা এই পুস্তকখানি শিক্ষিত ও শিক্ষাদানেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রকেই পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে অনুরোধ করি।

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—(২য় খণ্ড) শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বর্ম্মন পাব্লিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

শ্রীঅরবিন্দের গীতা (২য় খণ্ড)—শ্রীঅনিলবরণ রায়। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আড়াই টাকা।

উক্ত দুইখানি পুস্তকেরই প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, এই দুই দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য তাহাই। পুস্তক দুইখানিই অতীব প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয়। দুইখানি পুস্তকেরই বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান আছে।

গুপ্ত

পাবনা জেলার ইতিহাস—শ্রীরাধারমণ সাহা, বি-এল প্রণীত। সরস্বতী লাইব্রেরী, পাবনা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ছয় খণ্ডে প্রায় আটশত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৮৲০।

ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের অধিকার বিস্তার মঙ্গলময় বিধাতার অভিপ্রেত কিনা বলিতে পারি না, তবে ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করাতে ভারতবর্ষে কতকগুলি বৃহৎ পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে যাহা চোখে দেখা যায়। পরিবর্তনের সকলগুলিই যে মন্দের দিকে তাহা নহে, তবে মন্দের ভাগ বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল অনিষ্টের মধ্যে সব-চেয়ে মারাত্মক হইতেছে বৈদেশিক শিক্ষা-দীক্ষা-আচার-আচরণ, আহার-বিহার, বিলাস-বাসন, বেশ-ভূষা প্রভৃতির প্রতি একটা প্রবল মোহ। আফিমের নেশার মত এই মোহ তিলে তিলে আমাদের অধিকার করিতেছিল এবং এখনও হয়ত করিতেছে। ফলে আমরা ভারতবর্ষের জল-মাটি হাওয়ার মধ্যে মানুষ হইয়াও প্রকৃতিতে অভারতবর্ষীয় হইয়া উঠিতেছি। ইংরেজ তাহাদের দুর্বহ শাসনভার আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়াই ক্ষান্ত নহে, আমাদের মানসচিত্তও তাহাদের কবলিত। আঙুল কাটিয়া ভারতীয় শিল্পের বিনাশ সাধন, বৎসরে বৎসরে ভারতবর্ষের রক্তশোষণ এইগুলিই ভারতবর্ষে ইংরেজ ইতিহাসের বড় কথা নহে, সবচেয়ে কুফল দেখা দিয়াছে ভারতবর্ষের চিত্ত-বিকৃতিতে। এই বৈদেশিক প্রভাব এমনই ভয়ঙ্কর যে, গত দুইশত বৎসরের মধ্যেই আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের সংস্কার ভুলিয়া আমরা মনে প্রাণে বিদেশী হইতে বসিয়াছি। ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডবাসীরা আমাদের নিকট যতটা সত্য ভারতবর্ষ ততটা সত্য নহে, এবং এখন হইতে সাবধান না হইলে যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ কেবলমাত্র আকৃতিতেই ইংরেজ হইতে পৃথক থাকিবে, ভাবে-ভঙ্গিমায় চিন্তায় মনে কোন পার্থক্য ইংরেজের সহিত থাকিবে না, কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে এই বৈদেশিক প্রভাব ভারতীয় সভ্যতার পরাজয়ই ঘোষণা করিতেছে, দুর্বল, হীন সভ্যতা যেন প্রবল সভ্যতার নিকট পরাজিত হইয়া তাহাকে আপনার আসন ছাড়িয়া দিয়াছে। এবং এইজন্যই আমাদের আপনাদের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়াছে। কিন্তু আসলে এই মনোভাব সত্য নহে, আমরা নিজেরাই দেহে ও মনে হীন হইয়াছিলাম, ভারতীয় সভ্যতার তাহা অপরাধ নহে। আমাদিগকে সবল হইয়া পুনরায় দেশকে, দেশের সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেকে যেন দেশকে চিনিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। খণ্ড খণ্ড গ্রাম, জিলা প্রদেশ ইত্যাদি মিলিয়া আমাদের অখণ্ড ভারতবর্ষ। প্রত্যেক গ্রাম জিলা প্রদেশ খালবিল নদনদী ইত্যাদির সহিত দেশের লোকের পরিচয় সাধন করাইয়া, গ্রামভেদে দেশভেদে আচার বিচার রুচি সংস্কার শিক্ষাদীক্ষা শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতির বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে চিনিতে হইবে। বাড়ীর পাশে আস্তাকুঁড় অপরিষ্কৃত রাখিয়া নন্দনকাননের স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিলেও ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে হয় এই সত্য আমাদের শিখিতে হইবে। স্কুল কলেজের ছাত্রদের, এমন কি, শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সহিত দেশের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমাদের শিক্ষার দৈন্য প্রকট হইয়া পড়ে। তাঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় উত্থানপতন, নায়গারা জলপ্রপাত, অষ্ট্রেলিয়ার পশুপালন, ডেনমার্কের সমবায়, ম্যানচেষ্টারের কোন মিলের জন্মইতিহাস, হেনরী ফোর্ডের কুলজীকুষ্ঠী কিম্বা ইউজিন চেনের ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতে পারিবেন, কিন্তু মালদহ মুর্শিদাবাদ বীরভূম বাঁকুড়ার রেশমশিল্প, সিরাজগঞ্জের পাটের কলগুলি কিভাবে পরিচালিত হয়, চলন বিলের অবস্থা কিরূপ, বাখরগঞ্জে কি পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয় এসম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলিতে পারিবেন না। ইঁহাদিগকে মাদারিপুর তিব্বতে কি ত্রিহুতে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পান না। দেশের সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারেই দেশবাসীর এইরূপ জ্ঞান। দেশের প্রাণশক্তি যেখানে সেখানকার সম্বন্ধে, মাটি জল হাওয়া সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নাই বলিয়াই বৈদেশিক প্রভাবে আমরা এত সহজে অভিভূত হইয়া পড়ি। দেশকে ভালমত চিনিতে পারিলে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হইবে না।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা কিছুকাল হইতে দেখিতেছি, বাঙলা দেশে কয়েকজন দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি স্বদেশবাসীকে স্বদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত আছেন। কেহ বা প্রাচীন ভারতবর্ষের, বৃহত্তর ভারতবর্ষের সহিত আমাদের যথার্থ পরিচয় করাইতেছেন, কেহ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া গবেষণার ফলাফল আমাদের গোচর করিতেছেন, আবার কেহবা কোন একটি জিলা গ্রাম বা বিভাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেশের অংশবিশেষের সহিত আমাদের সত্য পরিচয় করাইয়া দেশের অন্যান্য অংশ সম্বন্ধেও আমাদের অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তুলিয়া দেশ সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিতেছেন। শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা এই শেষোক্ত শ্রেণীর দেশহিতৈষীদের দলে। তিনি আপনার সকল চেষ্টা ও অধ্যবসায় পাবনাজেলার প্রাচীন ও নূতন ইতিহাস সঙ্কলনে ব্যয়িত করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন, এই ভাবের জিলা বা বিভাগের ইতিহাস কেবলমাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষেই প্রয়োজনীয়, বাহিরের লোকের কাছে এই সকলের মূল্য অধিক নহে। কিন্তু আমাদের মতে এ ধারণা সত্য নহে। এই ধরণের এক-একটি ইতিহাস জ্যামিতির এক-একটি প্রতিপাদ্যের মত, একটি সবিশেষ আয়ত্ত হইলে অন্যগুলি আয়ত্ত করা সহজ হয়। রাধারমণ-বাবুর পাবনা জিলার ইতিহাস যে শুধু পাবনা-বাসীরই পক্ষে অবশ্য পাঠ্য তাহা নহে এইরূপ সুলিখিত ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় থাকিলে বাঙলার অন্যান্য জিলা সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়।

অনেকে ইহাও মনে করিতে পারেন যে, জেলা-বিশেষের ইতিহাস সংগ্রহ করা খুব গুরুতর কার্য্য নহে। অল্প পরিশ্রমে অল্পকালেই ইহা করা সম্ভব, কিন্তু রাধারমণবাবু যে ইতিহাসখানি লিখিয়াছেন তাহা ক্ষুদ্র পাবনা জিলার ইতিহাস হইলেও এতগুলি জ্ঞাতব্য কথা তিনি ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে, তাহা বস্তুতই একজনের এক জীবনের সাধনার কাজ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। রাধারমণ-বাবুও দীর্ঘ সপ্তদশবর্ষের পরিশ্রম ও সাধনার ফলে বহু ত্যাগ-স্বীকার করিয়া, বহু অর্থব্যয় ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া এই পুস্তকের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এত করিয়াও তিনি যে পুস্তকখানিকে সম্পূর্ণ মনে করেন, তাহা নহে। অনেক কথা হয়ত এখনও তাঁহার বলা হয় নাই। বস্তুতঃ, এরূপ একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার নিজের পরিশ্রম ও সাধনাকে সার্থক মনে করিতে পারেন।

রাধারমণবাবু পাবনা জিলা সম্বন্ধে কোন বিষয়কেই বাদ দিয়া চলেন নাই। তাঁহার পুস্তকের ছয়টি খণ্ডের নিম্নলিখিত সামান্য পরিচয় হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে।

প্রথম খণ্ডে—জেলার সাধারণ বিবরণ—অবস্থান ও প্রাচীনত্ব, পাবনা নামের উৎপত্তি; প্রাকৃতিক বিবরণ—চতুঃসীমা ও আয়তন, স্থল জল ও বায়ু, নদীসমূহের বিবরণ, খাল, বিল ও চর; যাতায়াতের উপায়—স্থলপথ, কোম্পানীর আমলের রাস্তা, ইম্পিরিয়াল ও লোক্যাল রোড, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড রোড, রেলপথ, হালট ও জাঙ্গাল, জলপথ, ষ্টীমারপথ, নৌকাপথ, সেতু ও খেওয়া, হার্ডিঞ্জ ব্রীজ, ইলিয়ট ব্রীজ, ইমারসন ব্রীজ, খেয়াঘাট, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, থানা ও গ্রামাদি থানাসমূহ, প্রধান প্রধান বাজারাদি, আদালত ও আফিসাদি।

দ্বিতীয় খণ্ডে—ঐতিহাসিক বিবরণ; হিন্দু রাজত্বকাল—জৈন ও বৌদ্ধযুগ, পাল রাজত্বকাল, সেন রাজত্বকাল ও মুসলমান অধিকারকাল—পাঠান আমল, মোগল আমল; ইংরেজ শাসনকাল—ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বাবস্থা, বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা, বর্ত্তমান ইংরেজ শাসনকাল।

তৃতীয় খণ্ডে—মসজিদ ও মন্দির; প্রাচীনত্বের নিদর্শন—চিহ্নাদি, জলাশয় ও দীর্ঘিকাদি, প্রাচীন জাঙ্গাল ও রাজবর্ত্ম। প্রাচীন মুদ্রা; তাম্রশাসন ও সনন্দ; জমিজমা ও জমিদারগণ—জমির স্বত্ব, খাজনা, প্রজাবিদ্রোহ, জেলাবাসী জমিদারগণ, ভিন্ন জেলাবাসী জমিদারগণ।

চতুর্থ খণ্ডে—কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্য; শিল্প ও বাণিজ্য; শিল্পজীবীগণ ও তাহাদের অবস্থা, শিল্পজাত দ্রব্য; বাণিজ্যাদি; শিক্ষা—সাধারণ বিবরণ, বিদ্যালয় ও শিক্ষিত সংখ্যা, সংবাদপত্র, লাইব্রেরী ও প্রেস, পণ্ডিত, কবি ও সাহিত্যিকগণ, বিশিষ্ট ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ; সভ্য-সমিতি ও প্রদর্শনী, পাবনাবাসী—বিদেশে।

পঞ্চম খণ্ডে—পাবনা সদর—পাবনা, সাঁড়া, আটঘরিয়া, চাটমহর, ফরিদপুর, সাঁথিয়া, বেড়া, সুজানগর, সিরাজগঞ্জ—সিরাজগঞ্জ, রায়গঞ্জ, উল্লাপাড়া, সাহাজাদপুর।

ষষ্ঠ খণ্ডে—আদম সুমারি—সাধারণ বিবরণ, লোকসংখ্যা, বিভিন্নজাতি ও সমাজ, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়, লোকের আকৃতি, প্রকৃতি উপজীবিকা, জীবজন্তু; দেশের অবস্থা—সামাজিক নৈতিক আর্থিক, লোকের সুখশান্তি, প্রাকৃতিক বিপ্লবাদি, ক্রীড়া ও ব্রত পূজাদি; শাসন সংরক্ষণাদি—সাধারণ শাসনবিভাগ, রাজস্ববিভাগ, বিবিধবিভাগ, স্বায়ত্ত-শাসন, ডাকবিভাগ।

এই ছয়খণ্ডের বিষয় বিভাগ দেখিয়াই বহিখানির মূল্য বুঝা কঠিন হইবে না। পুস্তকান্তর্গত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটির উল্লেখ বা আলোচনা করা সম্ভবপর নহে, প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি এই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেখিলেই রাধারমণ-বাবুর কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের কিছু খবর পাইবেন। দেশের শিল্পবাণিজ্য, জমিজায়গা কিভাবে ধীরে ধীরে বিদেশীর করকবলিত হইতেছে, প্রাচীন কারুশিল্প ও কুটীরশিল্প কিভাবে নষ্ট হইতেছে ইত্যাদি অনেক বিষয়ই এই পাবনা জিলার ইতিহাস পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই ইতিহাসের মূলকথাগুলি বাঙলার অন্যান্য জিলা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

মোটকথা, এরূপ একখানি বহির মূল্য টাকা আনা পাই দিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় না, গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এটি প্রণয়ন করিয়াছেন পাঠকের মনেও যদি সেই ভাবের উদ্রেক হয়, যদি সামান্য-মাত্রও দেশপ্রীতি জাগরিত হয়, তাহা হইলেই এই পুস্তকের যথার্থ মূল্য দেওয়া হইবে। আমরা এই সুলিখিত বৃহৎ ইতিহাসখানির বহুল প্রচার কামনা করি এবং বাঙলার অন্যান্য জিলা সম্বন্ধেও যাহাতে এই ধরণের ইতিহাস বাহির হয় তাহার জন্য প্রত্যেক জিলাবাসীকে সচেষ্ট হইতে বলি।

বইখানির ছয়টি খণ্ডই পাবনা সহরে ছাপা হইয়াছে, এই হিসাবে বহিখানির ছাপাই বাঁধাইয়েরও প্রশংসা করিতে হয়। সিরাজগঞ্জে প্রস্তুত যে কাগজের নমুনা গ্রন্থকার এই বহিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় সিরাজগঞ্জে কাগজের কল সহজেই চলিবে। আমরা এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভগবদ্‌গীতিমালা—রায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর এম-এ, বি-এল, সংগৃহীত। প্রকাশক শ্রীললিতমোহন ঘোষ, ২৩।১।৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে যাহা দিবেন তাহাই মূল্য।

এই পুস্তকে প্রাচীন ও আধুনিক ৬০৬টি সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে ও প্রত্যেকটির সুর নির্দ্দেশিত হইয়াছে। গুরুনানক, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ সেন, দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ, গোবিন্দ অধিকারী, রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞ-দিগের গান ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তক ধর্ম্মপরায়ণ ভক্তদিগকে বিশেষ আনন্দ দিবে। ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

স

বিবিধ প্রসঙ্গ

যোগীন্দ্রনাথ বসু

স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত লেখক বলিয়াই বাংলা দেশে সমধিক পরিচিত, যদিও তিনি আরও অনেক বহি লিখিয়াছেন। এই ভাবে পরিচিত হইবার কারণ এই, যে, তাঁহার লেখা এই জীবনচরিতটিই পাশ্চাত্য অনেক জীবনচরিতের সহিত তুলনীয় প্রথম উৎকৃষ্ট বাংলা জীবনচরিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

আমার সহিত যোগীন্দ্রবাবুর পরিচয় হয় এই পুস্তক লিখিত হইবার পূর্ব্বে। তিনি তখন বৈদ্যনাথ-দেওঘর বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার ছিলেন। হনোলুলুতে ফাদার (পাদরী) ডামিয়েন কুষ্ঠরোগীদের সেবা করিতে গিয়া নিজে ঐরোগে আক্রান্ত হন, এবং তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই মহাত্মার আত্মোৎসর্গে মুগ্ধ হইয়া যোগীন্দ্রবাবু তাঁহার সমনামা বন্ধু (রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র) যোগীন্দ্রনাথ বসুর সহিত মিলিত হইয়া "অমরকীর্ত্তি" নামক পুস্তক রচনা করেন। ইহা ফাদার ডামিয়েনের জীবনচরিত। পরে আমি যখন দেওঘরে তাঁহার বাড়ীতে একবার অতিথি হই, তখন তাঁহার নিকট ডামিয়েনের সমাধিপার্শ্বস্থ গাছের কয়েকটি পাতা তাঁহার নিকট দেখিয়াছিলাম। তিনি তাহা হনোলুলু হইতে আনাইয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথে তখন বিস্তর কুষ্ঠরোগী যাইত, এখনও গিয়া থাকে। উহা তীর্থস্থান এবং তথায় শিবের মন্দির আছে। মহাদেবের কৃপায় রোগমুক্ত হইবার আশা তাহাদের সেখানে যাইবার কারণ। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বৈদ্যনাথে তাহাদের কোন আশ্রয়-স্থান ছিল না, যত্ন করিবার লোক ছিল না; পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দিরে তাহারা থাকিত, রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইত, অনেক সময় যথেষ্ট ভিক্ষা না পাওয়ায় উপবাসী থাকিত, এবং কখন কখন মৃত্যুর পূর্ব্বেই শৃগালকুকুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত। ইহাদের এইরূপ নানা দুর্দ্দশা দেখিয়া যোগীন্দ্রবাবুর দয়ালু হৃদয় সাতিশয় ব্যথিত হয়। তিনি স্বয়ং কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য করিতেন, কখন কখন তাহাদের ক্ষত ধুইয়া ঔষধ লাগাইয়াও দিতেন, কিন্তু তাহাতে সকলের যথেষ্ট সাহায্য বা কষ্টের লাঘব হইত না। এই জন্য তিনি, রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও বৈদ্যনাথের অন্যতম পাণ্ডা শিক্ষিত, সদাশয় ও সাধুচরিত্র গিরিজানন্দদত্ত ওঝা মহাশয়ের সহযোগে, বৈদ্যনাথে একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনে উদ্যোগী হন। ইহার জন্য টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত খবরের কাগজে সর্ব্বসাধারণের নিকট আবেদন প্রকাশ করিয়া ভিক্ষা চাওয়া হয়। সেই উপলক্ষে আমি যোগীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখি ও তখন হইতে তাঁহার সহিত পরিচিত হই। প্রধানতঃ স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের অর্থসাহায্যে কুষ্ঠাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়



যোগীন্দ্রনাথ বসু

এবং তাঁহার পত্নীর নামে উহার নাম রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম রাখা হয়।

যোগীন্দ্রবাবু যখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত লিখিতেছিলেন, তখন কিছুদিন বৈদ্যনাথে কলেজের ছুটির সময় তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম। তখন উনবিংশ শতাব্দী নব্বইয়ের কোঠায় চলিতেছে। সেই সময় তাঁহার শ্রমশীলতা, সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করিবার রীতি, এবং নানা শ্রেণীর লোকের উপকার করিবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তখন বৈদ্যনাথে কলিকাতার ও বঙ্গের অন্য অনেক জায়গার অনেক বাঙালী বাড়ী তৈয়ার করাইতেছিলেন। কেহ কেহ তাহার ভার দিয়াছিলেন বসু মহাশয়ের উপর। তিনি প্রত্যেকের হিসাব আলাদা আলাদা করিয়া রাখিতেন, এবং রোজকার হিসাব এমন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিতেন, যে, যে-কোন সময়ে কেহ হিসাব চাহিলে আধপয়সাটির পর্য্যন্ত হিসাব দেখাইতে পারিতেন।

মধুসূদনের জীবনচরিতের অনেক উপাদান তখন তাঁহার নিকট দেখিয়াছিলাম। কাহারও জীবনচরিতের জন্য যত উপাদান সংগৃহীত হয়, সমস্ত প্রকাশিত হয় না; কারণ পুস্তকের কলেবর একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখিতে হয়, এবং তদ্ভিন্ন এমন অনেক জিনিষ থাকতে পারে যাহা মৃত ও জীবিত অনেকের গ্লানিকর। যাঁহারা উপকরণ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মধুসূদনের বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক অন্যতম। ইঁহার বন্ধুপ্রীতিতে বিস্মিত হইয়াছিলাম। ইনি যখন মধুসূদনের সহিত হিন্দুস্কুলের নীচের ক্লাসে একত্র পড়িতেন, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া তারিখ অনুসারে পর পর তাড়া বাঁধা সমুদয় চিঠিপত্র তিনি যোগীন্দ্রবাবুকে দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে লেফাফার কোণছেঁড়া চৌরকুটে ক্লাসে বসিয়া লেখা দুই বন্ধুর ইয়ারকিও ছিল। ইহা হইতে যেমন বসাক মহাশয়ের বন্ধুপ্রীতির ও কর্ম্মশৃঙ্খলার প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি ইহাও বুঝা যায়, যে, মধুসূদনের প্রকৃতিতে এমন কিছু ছিল যাহাতে নানা ভিন্নপ্রকৃতির লোকে তাঁহার গুণমুগ্ধ অকপট বন্ধু হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তি মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন।

যোগীন্দ্রবাবু গদ্যে রাণী অহল্যাবাঈর জীবন-চরিত, তুকারামের জীবনচরিত এবং কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। বিদ্যালয়পাঠ্য কবিতার পুস্তকও তিনি কয়েকখানি লিখিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ, শিবাজী ও মানবগীতা তাঁহার রচিত বৃহৎ তিনখানি কাব্য। প্রথম দুইখানির একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। কবিতার পুস্তক রচনা করিয়া তিনি কবিভূষণ উপাধি লাভ করেন। এই সকল কবিতার বহি ছাড়া "একাদশ অবতার" নামক তাঁহার একটি ব্যঙ্গকাব্য আছে। তাহা যৌবনকালে রচিত।

তিনি রিপনকলেজে, দেওঘর স্কুলে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের বাংলার ক্লাসে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন।

এই সকল কাজ ভিন্ন অন্য একদিকেও কৃতী বলিয়া তিনি পরিচিত হন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তিনি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও স্নেহের সহিত এই কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। পরে প্রফুল্লনাথের বিস্তৃত জমিদারীর তত্ত্বাবধান কার্য্যও তিনি নিপুণতার সহিত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ হিন্দু সামাজিক রীতি অনুসারে করিতেন। স্বদেশপ্রীতি তাঁহার হৃদয়ের ভূষণ ছিল।

—

জ্যোতিভূষণ সেন

জ্যোতিভূষণ সেনের নাম বাংলা দেশে অল্প লোকেই জানে। তিনি একজন প্রকৃত অকপট ও উৎসাহী দেশসেবক ছিলেন। তিনি এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর গোখলে-প্রতিষ্ঠিত ভারতভৃত্য সমিতির (The Servant of India Societyর) শিক্ষাধীন সভ্য হন। এক বৎসর শিক্ষাধীন থাকিবার পর সমিতি তাঁহাকে পাকা সভ্য করিতে চান। কিন্তু তিনি আরো দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবেচনা করিবার অনুমতি চান। তাহা তাঁহাকে দেওয়া হয়। চারি বৎসর পরে যখন আবার তাঁহাকে সভ্য করিবার কথা উঠে, তখন তিনি বলেন,

যে, সমিতির সভ্যদিগকে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, তাহা তাঁহার পক্ষে ভয়োৎপাদক; এবং সেই জন্য তিনি সমিতির সভ্য না হইয়াও সেবক থাকিতে চান। সমিতি তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা শ্রদ্ধার সহিত পূর্ণ করেন, যদিও উহার সকল সভ্যই জানিতেন, যে, জ্যোতিভূষণ অপেক্ষা সমিতির সভ্য হইবার যোগ্যতর যুবক অল্পই আছেন। একবার একজন সভ্য এইরূপ অনুমান প্রকাশ করেন, যে, সমিতির আর্থিক অবস্থা ভাল নহে বলিয়া জ্যোতিভূষণ উহার সভ্য হইতে চাহিতেছেন না। তাহাতে তিনি এই ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যথা পান, যে, এরূপ সন্দেহ দ্বারা তাঁহার উপর বড় অবিচার করা হইতেছে। বাস্তবিকও টাকা-কড়ির সম্বন্ধে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর বৈরাগ্য কাহারও ছিল না। তাঁহার বেশ লোভজনক চাকরী অনেক জুটিয়াছিল, তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। কারণ, তিনি ভারতভৃত্য সমিতির সভ্য না হইয়াও ততদিন উহার কাজ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যতদিন সমিতি করিতে দিবেন, কিম্বা যে-পর্য্যন্ত-না তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে তাঁহার মতের আর পরিবর্ত্তন হইবে না সুতরাং তিনি অসঙ্কোচে সমিতির সভ্য হইতে পারেন। তথাপি সমিতির সভ্যেরা তাঁহাকে নিজেদের একজন এবং সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষাও নিকটতম মনে করিতেন। তাঁহাদের মুখপত্র সার্ভ্যাণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া কাগজে লেখা হইয়াছে, যে, তাঁহা অপেক্ষা প্রেমিক ও প্রীতির যোগ্য মানুষ কেহ জন্মে নাই ("A more loving and lovable soul never breathed")। সমিতির লাইব্রেরী উহার একটি গৌরবের জিনিষ। আমাদের নিকট কেহ ভারতীয় বা অন্য রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ভাল ভাল পুস্তকের তালিকা চাহিলে আমরা ভারতভৃত্য সমিতির লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা দেখিতে বা উহার পুস্তকাধ্যক্ষকে চিঠি লিখিতে বলিয়া থাকি। গত চারি বৎসর জ্যোতি-বাবু এই লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে উহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। তৎসমুদয় একমাত্র জ্যোতি-বাবুর কাজ। সার্ভ্যাণ্ট্ অব্ ইণ্ডিয়া সাপ্তাহিকে তিনি অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সমিতির দুই লক্ষাধিক টাকার



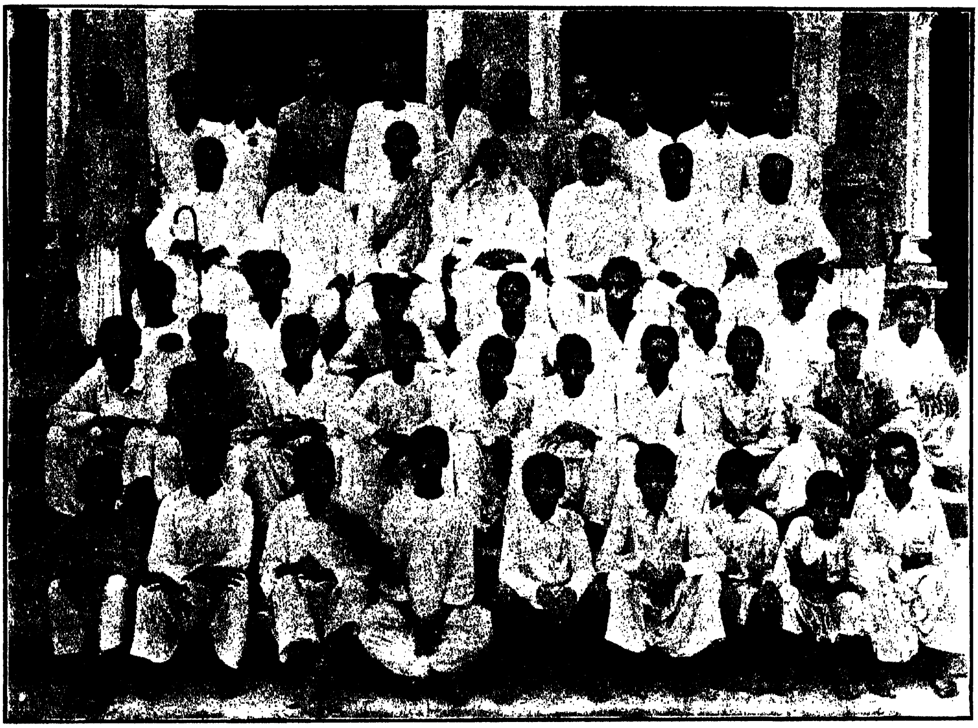
জ্যোতিভূষণ সেন

সম্পত্তি আর্য্যভূষণ ছাপাখানা পুড়িয়া যাওয়ার পর টাকা তুলিবার জন্য জ্যোতিভূষণ ও ভারতভৃত্যসমিতির অন্য কেহ কেহ ভারতভ্রমণে বাহির হন। তখন কলিকাতায় তাঁহার সহিত পরিচিত হই। তাঁহার বিনয়নম্র মূর্ত্তি, সাদাসিধা পরিচ্ছদ, অমায়িক ব্যবহার কখনও ভুলিবার নহে। যৌবনকালে তাঁহার অকালমৃত্যুতে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ একটি খাঁটি সন্তান ও সেবকের ভক্তি ও সেবা হইতে বঞ্চিত হইল।

—

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ যুবকসম্মিলনীর সৌজন্যে আমার ময়মনসিংহ সহর অল্পস্বল্প দেখা ঘটিয়াছে। তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এখানে খুব উৎসাহ দেখিলাম। ইহা সুশৃঙ্খলভাবে সৎকার্য্যে নিয়োজিত হইলে ময়মনসিংহ সহরের ও জেলার এবং বাংলা দেশের খুব উপকার হইবে।



ময়মনসিংহ যুবক-সম্মিলনীর সভাপতি ও কর্ম্মিবৃন্দ
[শ্রীযুক্ত প্রেমরঞ্জন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে

এই জেলাটি শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতবর্ষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় জেলা ; লোকসংখ্যা ৪৮,৩৭,৭৩০। তার নীচেই ঢাকা ; লোকসংখ্যা ৩১,২৫,৯৬৭। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বৃহত্তম জেলা গোরখপুর ; লোকসংখ্যা ৩২,৬৬,৮৩৩। ময়মনসিংহ লোকসংখ্যায় সকল জেলা অপেক্ষা বড় হইলেও হাজারকরা লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা এই জেলায় কেবল মালদহ ভিন্ন বঙ্গের অন্য সব জেলার চেয়ে কম। হাবড়ায় এই সংখ্যা ১৬৮, চব্বিশপরগণায় ১৫০, ময়মনসিংহে ৬০, মালদহে ৫৫। এই সংখ্যাগুলি পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত সংখ্যা। ময়মনসিংহের এরূপ নিরক্ষরতার কারণ, ইহার শতকরা ৭৪·৯১ জন অধিবাসী মুসলমান এবং তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা অত্যন্ত কম। ইহার হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে হাজারে যথাক্রমে ২৩১ ও ৩৮ জন লিখনপঠনক্ষম, মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে যথাক্রমে ৫৯ ও ৩ জন লিখনপঠনক্ষম। তুলনার জন্য বলা যাইতে পারে, যে, ঢাকায় হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে হাজারে ৩২৭ ও ৭১ জন এবং মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে ৮৩ ও ৫ জন লিখনপঠনক্ষম। ময়মনসিংহ জেলায় শিক্ষাবিস্তারের খুব আবশ্যক আছে। এবিষয়ে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই বিশেষ মনোযোগ একান্ত আবশ্যক।

ময়মনসিংহ সহরের লোকসংখ্যা যেরূপ, সে হিসাবে বাংলা দেশের ঐরূপ বড় অন্যান্য সহরের তুলনায় শিক্ষালয়ের সংখ্যা কম নয়, যদিও শিক্ষায় অগ্রসর পাশ্চাত্য দেশসকলের তুলনায় অত্যন্ত কম। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ বেশ প্রশস্ত জায়গায় নির্ম্মিত। ঘরবাড়ী ভাল, ছাত্রাবাস ভাল। ইহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলি কাজ চালাইবার উপযোগী এবং লাইব্রেরীও তদুপযোগী।

ছাত্রদের বসিবার পড়িবার জায়গা আরও বড় হওয়া দরকার। খেলিবার বিস্তীর্ণ মাঠ আছে। কলেজটিতে বি-এসসি পড়াইবার বন্দোবস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও অধ্যাপনার গৃহ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র কিছু বাড়াইলেই ইহা করা যায়। তাহার জন্য এক লক্ষ টাকাও লাগিবে না। ময়মনসিংহ বড় বড় জমিদারের জন্য প্রসিদ্ধ। এই টাকা তাঁহারা অনায়াসে দিতে পারেন। যাঁহারা পাটের কারবারে ধনী হইয়াছেন, তাঁহাদের হাতে নগদ টাকা আরও বেশী থাকিবার কথা। উকীলেরাও কেহ কেহ ধনী। নূতন বিজ্ঞানাধ্যাপক ও সহকারী যাহা নিযুক্ত করিতে হইবে, তাঁহাদের বেতন বৈজ্ঞানিকছাত্রদত্ত বেতন হইতে উঠিতে পারে। কলিকাতায় ছাত্রদের ভীড় বাড়া অপেক্ষা মফঃস্বলে সকল রকম বিদ্যা শিখিবার ছাত্র বাড়া ভাল। এই জন্য মফঃস্বলের সর্ব্বত্র বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ময়মনসিংহে কোন একজন উৎসাহী লোক একাগ্রতার সহিত এই কাজটিতে হাত দিলে সফলকাম হইবেন।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকজ্ঞানসাধ্য পণ্যশিল্প শিখাইবার একটি প্রতিষ্ঠান হইলে আরও ভাল হয়। এখন যে শিল্পবিদ্যালয়টি আছে, তাহারই বিস্তৃতি ও উন্নতি দ্বারা ইহা হইতে পারে। আনন্দমোহন কলেজে উদ্ভিদ্-বিদ্যা শিখান হয়। সুতরাং তৎসম্পর্কে কৃষিবিদ্যা শিখাইবার শ্রেণী খুলিলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে উহা শিখান যায়।

ময়মনসিংহ সহরে বালকদের বিদ্যালয় যে কয়টি আছে, তাহার সবগুলির নিজের প্রশস্ত বাড়ী ও খেলিবার জায়গা নাই। প্রত্যেকটির প্রশস্ত খেলিবার জায়গা, ব্যায়ামাগার, এবং ব্যায়াম ও ক্রীড়ার শিক্ষক থাকা আবশ্যক।

বালিকাবিদ্যালয় তিনটি দেখিলাম। তাহার মধ্যে বিদ্যাময়ী বালিকাবিদ্যালয়ের বাড়ী ভাল, এবং খেলিবার জায়গাও কিছু আছে। অন্য দুটির খেলিবার জায়গা নাই। মেয়েদের ইস্কুলে খেলিবার জায়গার বিশেষ দরকার। তাহারা বাড়ীতে সংকীর্ণ জায়গায় থাকে, ছেলেদের মত স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া অঙ্গচালনা করিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল হয় না। এই কারণে তাহাদের খেলিবার জায়গা ও ব্যায়ামাগার ছেলে-দের চেয়েও প্রশস্ত ও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। বড়োদা রাজ্যে ভারতবর্ষীয় বালিকাদের উপযোগী অনেক নূতন খেলা ও ব্যায়াম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাংলা দেশের সমুদয় বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের বড়োদা হইতে এইসব খেলা ও ব্যায়ামের বৃত্তান্ত ও ছবি আনান উচিত।

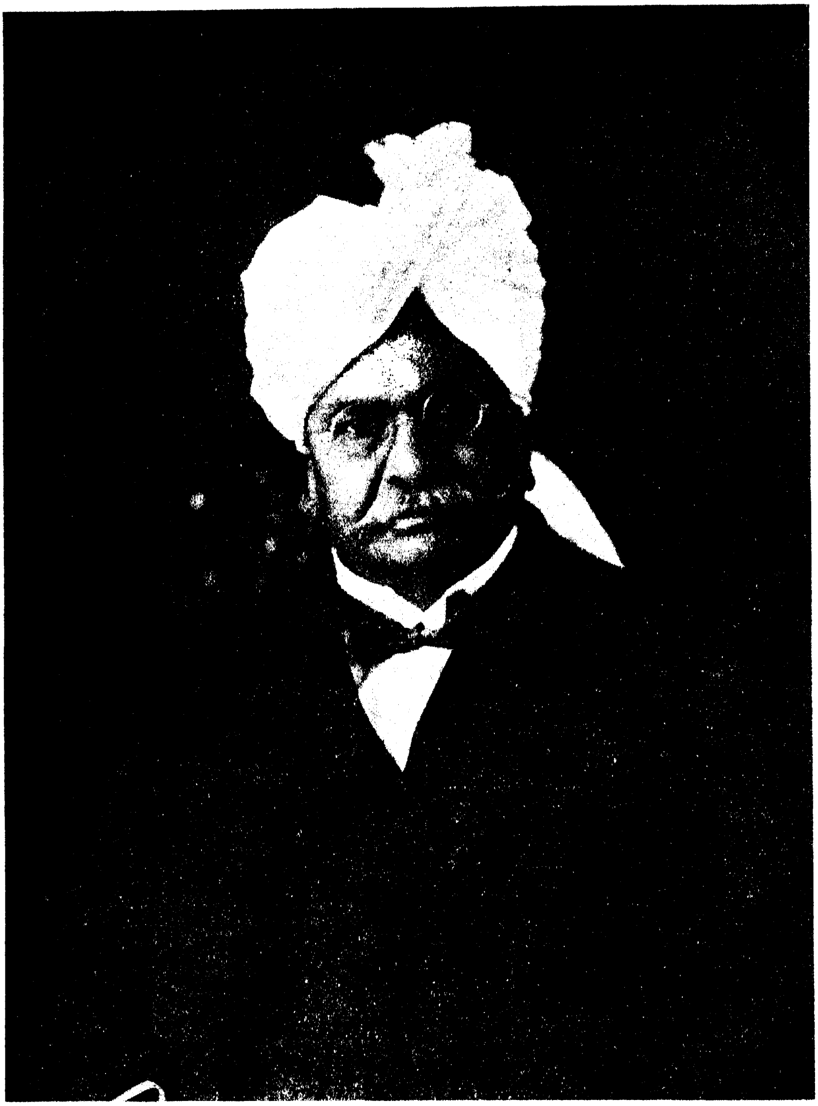
বাংলাদেশের মত স্ত্রীশিক্ষায় অনগ্রসর প্রদেশে ময়মন-সিংহের মত ছোট সহরে তিনটি বালিকাবিদ্যালয় থাকা প্রশংসনীয়। কলেজের শিক্ষা পাইবার জন্য অনেক বালিকাকে কলিকাতা আসিতে হয়। কিন্তু সকলের স্থান হয় না; ছাত্রীনিবাসে যাহাদের স্থান হয়, তাহারা কোন কোন ছাত্রীনিবাসে ভাল করিয়া খাইতেও পায় না। অধিকন্তু বেথুন কলেজের ইংরেজ মহিলা-প্রিন্সিপ্যালের প্রকৃতি ঐ পদ অপেক্ষা নারীপুলিস বিভাগের অধিকতর উপযোগী। এই সকল কারণে মফঃস্বলেও যেখানে যেখানে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত হইতে পারে, সেখানে তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ময়মনসিংহে ছাত্রীর সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে সেখানে আই-এ ক্লাস খুলিলে বড় ভাল হয়। ছাত্রীর অভাব মোটেই হইবে না। এবিষয়েও কাহারও একাগ্রতার সহিত মন দেওয়া দরকার। যেখানে তিনটি বালিকা বিদ্যালয় চলিতেছে, সেখানে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী লোক আছেন, সহজেই বুঝা যায়।

—

লালা স্যার গঙ্গারামের দানশীলতা

শ্রাবণের প্রবাসীতে লালা স্যার গঙ্গারামের বিষয় কিছু লিখিয়াছিলাম। তখন তাঁহার ছবি হস্তগত না হওয়ায় ছবি দিতে পারি নাই। এবার এই কর্ম্মবীর ও দানবীরের ছবি দিলাম।

১৮৫১ সালে তাঁহার জন্ম ও ১৯২৭ সালে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ হইয়াছিল। তখনও তিনি কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন। রাজকীয় কৃষি কমিশনের সভ্যরূপে বিলাতে গিয়া সেখানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পিতা কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। সৎলোক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল; লালা গঙ্গারাম যে লক্ষ লক্ষ টাকা



লালা স্যার গঙ্গারাম

দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত। তিনি মোট কত টাকা দান করিয়াছেন, ঠিক জানিবার উপায় নাই; কারণ গুপ্ত দান অনেক ছিল। ১৯২৩ সালে তিনি ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে স্যার গঙ্গারাম ট্রষ্ট বা ন্যস্তসম্পত্তি রেজিষ্টরী করেন। এই ট্রষ্টকে তিনি ঘরবাড়ী ও অন্য রকম সম্পত্তি দান করিয়া আসিতেছিলেন। এই সব সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহার দ্বারা স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি চলে। যে-সব অট্টালিকা তিনি ট্রষ্টকে

দান করিয়াছেন, তাহার আনুমানিক মূল্য উনত্রিশ লক্ষ টাকা। তাহা হইতে বার্ষিক প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা আয় হয়। ট্রষ্টের অধীনে নিম্নলিখিত সাতটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাহাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আছে।

১। বিধবাবিবাহসহায়ক সভা, লাহোর। ১৯১৪ সালে ইহার প্রতিষ্ঠার পর সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইহার প্রভাবে ১১৮১৫টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইহার ৬৯১টি শাখা আছে। হরিদ্বার, লাহোর, মথুরা ও জয়পুরে বিধবা-আশ্রম আছে। এইসকল আশ্রমে এপর্য্যন্ত ১৪৫জন বিধবা স্থান পাইয়া বিবাহিত হইয়াছেন। ইহা লালা গঙ্গারামের প্রিয়তম প্রতিষ্ঠান ছিল। তিনি মনে করিতেন, বিধবাদের সাহায্য করাই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কারণ। এই প্রতিষ্ঠানটির ১৯২৭ সালের ব্যয়ের জন্য ২৬০০০ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

২। বিনামূল্যে চিকিৎসার হাঁসপাতাল। ১৯২১ সালে ১,৩১,৫০০ টাকা ব্যয়ে ইহার জন্য বাড়ী তৈরী হয়। ১৯২৬এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইহাতে ৫,৭৪,৮৯৫ জন বাহিরের রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে এবং ২,৭৭৪ জন হাঁসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে। রোগীদের অধিকাংশ মুসলমান। বর্ত্তমান বৎসরে ইহার বরাদ্দ ৩৩,৫০০০ টাকা।

৩। হিন্দু ছাত্রদের বৃত্তিশিক্ষা সমিতি। ইহা হইতে হিন্দু ছাত্রদিগকে ওকালতী ছাড়া ভারতবর্ষে অন্য বৃত্তিশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়। উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বৃত্তির টাকা ফেরত দিবার ব্যবস্থাও আছে। এঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসা, পশুচিকিৎসা, কৃষি, আরণ্যবিদ্যা, বাণিজ্য, খনিজ-উত্তোলন বিদ্যা প্রভৃতির জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৯২৬এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২৪,৬১৬৸/৩ বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে বৃত্তিপ্রাপ্ত রোজগারী লোকেরা এপর্য্যন্ত ৩৩৮৪৻৩ ফেরত দিয়াছেন। এবৎসর এপর্য্যন্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত পাঁচজন ছাত্র সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং, ৩জন জলসেচন, একজন রেলওয়ে ও একজন পূর্ত্ত-বিভাগে কাজ পাইয়াছেন, এবং একজন এম্‌-বি পাস করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। ১৯২৭সালের বরাদ্দ ১১,২০০।

৪। ব্যবসাবাণিজ্যশিল্পাদি বিষয়ক আফিস ও লাইব্রেরী। ইহার সাহায্যে অনুসন্ধিৎসু লোকেরা নানাবিধ ব্যবসা প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদ ও জ্ঞান লাভ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন। ইহাতে এখন নানাবিধ পণ্যশিল্প, কারিগরী, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক ২৫০০ বহি আছে, ঐসকল বিষয়ের ৭০খানি সাময়িক পত্র নিয়মিতরূপে রাখা হয়, ভারতবর্ষ, বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিল্পাদিশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানপত্র রাখা হয়, এবং সরকারী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও চাকরীর সংবাদ পাওয়া যায়। এপর্য্যন্ত ৪৭ জন ভদ্রলোক এই আফিসের সহিত পরামর্শ করিয়া বা ইহার পুস্তকাদির সাহায্য লইয়া রোজগারী হইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যহ ৩০।৪০ জন লোক এই আফিসে আসেন। ১৯২৭ সালের বরাদ্দ ৭,০০০৲ টাকা।

৫। অপহৃত আশ্রম। ইহার জন্য দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। যে-সব শিশু, বালকবালিকা, স্ত্রীলোক ও পুরুষ অঙ্গবৈকল্য দুরারোগ্য পীড়া বা অতিবার্দ্ধক্যাদি কারণে নিজেদের ভরণপোষণে অসমর্থ এবং নিরাশ্রয়, তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া পালন করিবার জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৪৪জন লোকের জন্য ইহাতে স্থান আছে। ইহার সব বন্দোবস্ত আধুনিক উৎকৃষ্ট রকমের। ইহাতে এখন ২০জন পুরুষ, ৪জন স্ত্রীলোক, এবং ১টি শিশু আছে। ইহাদের মধ্যে ৭জন অন্ধ, ১টি বালক খঞ্জ, ১জন মূকবধির। রাস্তার ভিখারীদিগকে এখানে রাখা হয় না। প্রত্যেক আশ্রমীকে পরিচ্ছদ, বিছানা ও আস্‌বাব দেওয়া হয়। সাধারণ খাদ্য ছাড়া প্রত্যহ দুগ্ধ এবং মধ্যে মধ্যে মিষ্টান্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর ফল দেওয়া হয়। এই বৎসরের বরাদ্দ ৯,০০০ টাকা।

৬। শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যের দোকান। ইহা ১৯২৬ সালের মে মাসে খোলা হয়। লালা গঙ্গারাম জানিতেন, যে, অনেক বিধবা ও গরীব মহিলা বাড়ীতে অনেক জিনিষ প্রস্তুত করেন, কিন্তু তৎসমুদয় লাভ রাখিয়া বিক্রীর বন্দোবস্ত না থাকায় তাঁহারা নিজে উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারেন না। এইজন্য তিনি দশহাজার টাকা দান করিয়া এই দোকান

খুলেন। এখানে শ্রমশিল্পবিদ্যালয়ে প্রস্তুত সামগ্রী এবং বিধবা ও গরীব মহিলাদের তৈরী জিনিষ বিক্রী হয়, এবং তৎসমুদয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কাঁচা মাল ও কল তাঁহারা এখানে কিনিতে পারেন। ইহার অধীনস্থ কারখানায় যন্ত্রাদি ও কাঁচা মালও রাখা হয়। তাহার সাহায্যে স্ত্রীলোকেরা দিনমজুরী হিসাবে রোজগারও করিতে পারেন। আগে আগে এইরকম দোকান ফেল হওয়ায়, ক্রেতা আকর্ষণ করিবার জন্য ইহাতে সাধারণ পণ্যদ্রব্যও রাখা হয়। তাহাতে ইহাও প্রমাণ হইয়া যায়, যে, এই-সকল জিনিষের তুলনায় ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরা কিরূপ উৎকৃষ্ট জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারেন।

৭। গরীব বিধবা, অন্য গরীব লোক এবং দুঃস্থ পরিবার, যাঁহারা অপহজ আশ্রমে আসিতে পারেন না, মাসিক বৃত্তি পান। ১৯২৭ সালের বরাদ্দ ৫,০০০ টাকা।

এই সমুদয় ছাড়া লালা গঙ্গারাম আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। যথা—

ক। লাহোরের হিন্দু বিধবাশ্রম। ১৯২১ সালে তিনি ১,৮৮,২০০ টাকা ব্যয়ে একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হিন্দু বিধবাশ্রম ও শিল্পবিদ্যালয় পরিচালনার্থ তাহা পঞ্জাব গবর্ন্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। ৮৩জন বিধবা এখানে থাকিয়া শিক্ষা পান। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ১২ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। এপর্য্যন্ত ৮৭জন বিধবা এখানকার শিক্ষা সমাপন করিয়াছেন এবং প্রায় সকলেই সরকারী বা বেসরকারী ইস্কুলে ৩০ হইতে ৮০ টাকা বেতনের কাজ পাইয়াছেন।

খ। হিন্দু ও শিখ নারী ও বালিকাদের জন্য লেডী মেনার্ড শিল্পবিদ্যালয়। লালা গঙ্গারাম ৭৭,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া এই শিল্পবিদ্যালয় চালাইবার জন্য গবর্ন্মেণ্টের হাতে দেন। ইহাতে কার্য্যদক্ষ যথেষ্ট শিক্ষক ও যন্ত্রাদি আছে। এখানে সকল বয়সের নারী ও বালিকাদিগকে মোজা বুনা, দরজির কাজ, কাপড়ে ফুল তোলার কাজ, গেঞ্জী বোনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা সুগৃহিণী হইতে ও উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারেন। কেহ কেহ চাকরী পাইয়াছেন। অন্যেরা জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ১২০জন এখানে শিক্ষা পান। কোন বেতন লওয়া হয় না।

গ। লাহোরের হেলী বাণিজ্য কলেজ। ইহার অট্টালিকা নির্ম্মাণের ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১,৬০,০০০।

এই তিনটি অট্টালিকা যে উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত, তাহার জন্য ব্যবহৃত না হইলে স্যার গঙ্গারাম ট্রাষ্টের ট্রষ্টীদের হাতে ফিরিয়া আসিবে, এবং তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা করিবেন।

ঘ। ইহা ছাড়া নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক ও কৃষিসম্বন্ধীয় গবেষণা এবং দরিদ্রের সেবার্থ অনেক ব্যয় লালা গঙ্গারাম করিয়াছেন। কৃষিসম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য তিনি ২৫,০০০ টাকা দান করিয়া মেনার্ড-গঙ্গারাম গবেষণা বৃত্তি স্থাপন করেন। আকের ত্বক্ ছাড়াইয়া তাহা নরম করিয়া ও তাহাতে ঝোলাগুড় প্রবেশ করাইয়া তাহা গোরুর উৎকৃষ্ট খাদ্যে পরিণত করা যায় কিনা, তাহার পরীক্ষা তিনি করাইয়াছিলেন। পরীক্ষা সফল হইয়াছিল।

এইসকল দান ব্যতীত তিনি গরীব ছাত্র ও গরীব ভদ্র পরিবারের লোকদিগকে গোপনে শত শত কম্বল, লেপ, লুই, বালাপোষ, গরম কোর্ত্তা, টাকা, কাপড় প্রভৃতি দিতেন। বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি তাঁহার উইল খোলা হইবার কথা। তাহাতে তিনি পঞ্জাবকে আরো কিছু দিয়া গিয়াছেন কিনা, জানা যাইবে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যে, আরো ১০ বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার ট্রষ্টের সম্পত্তি ৩০ লক্ষ টাকা হইতে এক কোটি টাকায় পরিণত করিবেন। এই ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে।

বাংলাদেশে কেহ দান করেন নাই, বলিতেছি না। কিন্তু নিজের জীবিতকালে, সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য-নির্ব্বাহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং স্থায়িত্ব ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া এরূপ নানাবিধ কাজ বঙ্গের কোন দাতা আগে করিয়া গিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি।

বর্ত্তমানে বাঙালী দরিদ্র হইলেও, স্যার গঙ্গারামের মত ধনী একজন বাঙালীও নাই বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারা কেহ লালাজির মত হৃদয়বান্ নহেন। বাংলার অবাঙালী বাসিন্দাদের মধ্যে স্যার গঙ্গারাম অপেক্ষা ধনী ত অনেক লোকই কলিকাতায় আছেন। তাঁহাদের

মধ্যে ২।৪ জন দানশীলও বটে। কিন্তু কেহই স্যার গঙ্গারামের সহিত তুলনীয় নহেন।

—

পঞ্জাবীর সহিত বাঙালী বিধবার বিবাহ

যাহাদের মাতৃভাষা ও রীতিনীতি এক নহে, সাধারণতঃ এরূপ পুরুষ ও নারীর বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে। তাহা হইলেও, বাঙালী হিন্দু বিধবার বিবাহ সচ্চরিত্র হিন্দু বাঙালীর সহিত না হইলে, যে-কোন প্রদেশের হিন্দু সজ্জনের সহিত হওয়া মন্দ নহে। পঞ্জাবে ও সিন্ধু-দেশে বিবাহযোগ্যা নারীর অভাব বেশী; এবং পঞ্জাবীরা জাতিবিচার না করিয়া বাঙালী হিন্দু বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তুত। এইজন্য এইরূপ কতকগুলি বিধবার পঞ্জাবীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। পরে আরও হইবে। ভাল কাজ হইলেই তাহার নকল মন্দ কাজ হয়। ভাল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে তাহার নকল মন্দ তথাকথিত প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়। সৎকাজের নাম করিয়া প্রবঞ্চক লোকেরা চাঁদা আদায় করিয়া থাকে। পঞ্জাবে সৎলোকদের দ্বারা সুপরিচালিত বিধবাবিবাহসহায়ক সভা আছে। তাহার নকল বিধবা সরবরাহ করিবার ব্যবসাও সেখানে আছে, এবং তাহার সহায় বাংলাদেশে (যেমন শুনিয়াছি নবদ্বীপে) আছে। ফলে কোন কোন বাঙালী হিন্দু বিধবা অসৎলোকের হাতে পড়িয়া বিক্রীত ও চরম দুর্গতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অতএব, বাংলাদেশে যাঁহারা বিধবার বিবাহ দানে উৎসাহী, তাঁহারা অনুসন্ধান-পূর্ব্বক বিশেষ খবর না জানিয়া যেন কোন বিধবার বিবাহ—বিশেষতঃ দূরস্থ ভিন্নপ্রদেশবাসীর সহিত বিবাহ—যেন না দেন।

—

বাংলার জেলা ও পৃথিবীর স্বাধীন দেশ

পৃথিবীর এক অংশ এসিয়া মহাদেশ, তাহার এক অংশ ভারতবর্ষ, তাহার এক অংশ বাংলা, তাহার এক একটি অংশ জেলাগুলি; এই ভাবে বিবেচনা করিলে এক এক জেলার অধিবাসী আমাদের সহজেই মনে হয়, আমরা অতি নগণ্য, টুক্‌রার টুক্‌রা, তস্য টুক্‌রা এক এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধিবাসী। কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখি, যে, অনেক স্বাধীন দেশের লোকসংখ্যা আমাদের জেলাগুলির সমান, জেলা-গুলির চেয়েও কম, তাহা হইলে আমাদের এই আশা হইতে পারে, যে, তাহারা যখন শক্তিতে, শিক্ষায়, জ্ঞানে, কৃতিত্বে এত বড়, তখন আমাদের পক্ষেও মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব দুর্লভ নহে।

নীচে বাংলার জেলাগুলির লোকসংখ্যা (১৯২১ সালে) এবং তাহার নীচে কতকগুলি স্বাধীন দেশের লোকসংখ্যা দিতেছি।—

ময়মনসিংহ	৪৮,৩৭,৭৩০	খুলনা	১৪,৫৩,০৩৪
ঢাকা	৩১,২৫,৯৬৭	বর্দ্ধমান	১৪,৩৮,৯২৬
ত্রিপুরা	২৭,৪৩,০৭৩	পাবনা	১৩,৮৯,৪৯৪
মেদিনীপুর	২৬,৬৬,৬৬০	মুর্শিদাবাদ	১২,৬২,৫১৪
২৪ পরগণা	২৬,২৮,২০৫	হুগলী	১০,৮০,১৪২
বাখরগঞ্জ	২৬,২৩,৭৫৬	বগুড়া	১০,৪৮,৬০৬
রংপুর	২৫,০৭,৮৫৪	বাঁকুড়া	১০,১৯,৯৪১
ফরিদপুর	২২,৪৯,৮৫৮	হাবড়া	৯,৯৭,৪০৩
যশোর	১৭,২২,২১৯	মালদহ	৯,৮৫,৬৬৫
দিনাজপুর	১৭,০৫,৩৫৩	জলপাইগুড়ি	৯,৩৬,২৬৯
চট্টগ্রাম	১৬,১১,৪২২	বীরভূম	৮,৪৭,৫৭০
রাজসাহী	১৪,৮৯,৬৭৫	দার্জ্জিলিং	২,৮২,৭৪৮
নদিয়া	১৪,৮৭,৫৭২	চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ	১,৭৩,২৪৩
নোয়াখালি	১৪,৭২,৭৮৬		

এখন পৃথিবীর কতকগুলি দেশের লোকসংখ্যা দিতেছি।

আফগানিস্থান	৪৬,০০,০০০	লাটভিয়া	২৮,০০,০০০
আলবেনিয়া	১০,০০,০০০	লাইবীরিয়া	২০,০০,০০০
আর্মীনিয়া	২০,০০,০০০	লুক্সেমবুর্গ	২,৬০,০০০
বোলিভিয়া	২৮,০০,০০০	নীড জীল্যাণ্ড	১২,০০,০০০
বুলগেরিয়া	৪৮,৬১,৪৩৯	নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	২,৫০,০০০
চিলি	৪২,০০,০০০	নিকারাগুয়া	৬,৪০,০০
কোষ্টা রিকা	৪,৬০,০০০	নরওয়ে	২০,৬০,০০০
কিউবা	২৬,০০,০০০	পানামা	৪,০০,০০০
ডেন্‌মার্ক	৩০,০০,০০০	পারাগোয়ে	৮,০০,০০০
ডোমিনিকা	৭,০০,০০০	পেরু	৩৫,০০,০০০
ইকোয়েডর	২০,০০,০০০	সালভাডর	১৩,০০,০০০
এস্থোনিয়া	১২,৫০,০০০	স্কট্‌ল্যাণ্ড	৪৮,৮২,২৮৮
গোয়াটিমালা	১৬,০০,০০০	সুইজারল্যাণ্ড	৪০,০০,০০০
হাইটি	২৫,০০,০০০	উরুগোয়ে	১৪,০০,০০০
হণ্ডুরাস	৬,৫০,০০০	ভেনিজুয়েলা	২৪,২০,০০০
আয়ার্ল্যাণ্ড	৪৩,৯০,২১৯	ওয়েল্‌স্	২২,০৬,৭১২

আমাদের বাংলা দেশের গবর্ণ্মেণ্ট বৎসরে ১১ কোটি টাকাও সরকারী সব রকম কাজের জন্য খরচ করিতে

পান না। বাংলা দেশ মরুভূমি নহে, কৃষিজাত ধন অনেক হয়, আরও হইতে পারে। শিল্পজাত পণ্যও এখানে কোটি কোটি টাকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু রাজস্বের অধিকাংশ টাকা ভারত গবর্ন্মেণ্ট শোষণ করেন। কৃষি-বাণিজ্যশিল্পের লাভেরও অধিকাংশ কোটি কোটি টাকা বিদেশীরা আত্মসাৎ করে—অধিকাংশ বাঙালীর ভাগে পড়ে ছিন্ন বস্ত্র, অর্দ্ধাশন ও অনশন। কিন্তু বাঙালী যদি উদ্যোগী হয়, আত্মশাসনের শক্তি ও অধিকার যদি বাঙালী অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে বাংলা দেশ কিরূপ শিক্ষিত, উন্নত, ধনশালী হইতে পারে, তাহা ময়মনসিংহ জেলা অপেক্ষা কম লোকের বাসভূমি দুএকটা দেশের দৃষ্টান্ত হইতে দেখাইতেছি।

বাংলাদেশের নারী ও পুরুষ উভয় অধিবাসী একত্র গণনা করিয়া হাজারে ১০৪ জন লিখনপঠনক্ষম। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯০ জন নিরক্ষর। চিলি দক্ষিণ আমেরিকার একটি ছোট দেশ, বেশী কিছু সভ্যদেশ বলিয়া পরিচিত নহে। লোক-সংখ্যা মোটে ৪২ লাখ, ময়মনসিংহ জেলার চেয়েও কম। অথচ ইহার পুরুষনারীদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন, হাজার-করা ৬০০ জন লিখিতে পড়িতে পারে। এই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। বঙ্গের একটি জেলার চেয়েও কম লোকদের জন্য দুটি সাধারণ ও দুটি শিল্প বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে। তা ছাড়া নানারকম বিদ্যালয় চারি হাজারের উপর আছে। লাইব্রেরী, মিউজিয়ম প্রভৃতি আছে। ১৯২৬ সালে বাংলার ৪,৬৬,৯৫,৫৩৬ জন অধিবাসীর জন্য শিক্ষার ব্যয় হইয়াছিল মোট ১,০৯,৩৯,২৭৩ টাকা। তাহার মধ্যে গবর্ন্মেণ্ট দিয়াছিলেন শতকরা ৪৮.৯৫ অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও কম। চিলির ৪২ লক্ষ লোকের জন্য ১৯২১ সালে সরকারী শিক্ষাব্যয় হইয়াছিল প্রায় দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। ১৯২১ সালে চিলির মোট রাজস্ব হইয়াছিল ২,৪০,৯৬,২২৫ পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় ছত্রিশ কোটি টাকার উপর। ইহার মানে এই, যে, চিলির ৪২ লক্ষ লোকের জন্য বৎসরে ৩৬ কোটি টাকার উপর রাজস্ব ব্যয় হয়, আর বঙ্গের ৪৬৭ লক্ষ লোকের জন্য পৌনে এগার কোটি টাকা রাজস্ব ব্যয় হয়। বাংলাদেশে চিলির চেয়ে কম ধন উৎপন্ন হয় না; কিন্তু তাহা বাঙালীর ভোগে আসে না, বাঙালীর হিতের জন্য ব্যয় হয় না।

ডেন্মার্কের মোট রাজস্ব ১৯২১-২২ সালে হইয়াছিল প্রায় ৩৭ কোটি টাকা; মোট লোক-সংখ্যা ৩০ লক্ষ, অর্থাৎ ময়মনসিংহ জেলার চেয়ে কম; ঢাকা জেলার চেয়ে কম! বঙ্গের লোকসংখ্যা ডেন্মার্কের ১৫ গুণেরও বেশী, কিন্তু বাংলা গবর্ন্মেণ্ট রাজস্ব খরচ করিতে পান ডেন্মার্কের চতুর্থাংশের চেয়ে কিছু বেশী। ডেন্মার্কের শিক্ষাদির বন্দোবস্তের বিষয় পরে ছাপা হইবে। শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও প্রায় অবৈতনিক।

নরওয়েয়ের লোকসংখ্যা ২৬লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, বাখরগঞ্জ ও রংপুর, এই কয়টি জেলার প্রত্যেকটির চেয়ে কম। কিন্তু ১৯২১-২২ সালে রাজস্ব হইয়াছিল ৬০ কোটি টাকা—বঙ্গের প্রায় ছয়গুণ! অন্যান্য ব্যবস্থার কথা পরে ছাপা হইবে।

সুইজারল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ, ময়মনসিংহের চেয়ে কম। কিন্তু রাজস্ব হয় ষোলকোটি টাকার উপর। সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। লাইব্রেরী আছে ছয় হাজার এবং তাহাতে বহি আছে ৯৪ লক্ষ।

এই রকম আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্গের এক একটি জেলার চেয়ে কম লোক এই যে-সব দেশে বাস করে, তাহারা পৃথিবীতে স্বনামধন্য, জগৎসভায় তাহাদের স্থান আছে; আমাদের স্থান নাই। আমাদের পরিচয় আমরা ব্রিটিশ প্রজা!

যে-সব দেশের কথা বলিলাম, তাহার কোনটিই বঙ্গের বা ভারতবর্ষের চেয়ে উর্ব্বরা বা খনিজসম্পত্তি আরণ্য-সম্পত্তি ও অন্য প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে ধনশালী নহে। তবে তাহারা উন্নত ও আমরা অবনত কেন? আমাদের জ্ঞান কম, মনুষ্যত্ব কম, একতা কম।

—

বঙ্গের প্রতি অবিচার

আমরা মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে অনেকদিন হইতে বহুবার বঙ্গের প্রতি অবিচারের বিষয় লিখিতেছি। জুলাই মাসে এ বিষয়ে ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা করিয়া প্রায় সমস্তটি ছাপাইয়া নানা খবরের কাগজে পাঠাইয়া-

ছিলাম। তা ছাড়া মডার্ণ রিভিউতেও ছাপিয়াছিলাম। আমরা যতদূর অবগত আছি, বঙ্গের কয়েকটি ইংরেজী দৈনিকে বক্তৃতার মর্ম্ম বাহির হইয়াছিল, তদপেক্ষা কম কাগজে সম্পাদকগণ ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। একখানি ইংরেজী দৈনিক বক্তৃতাটি ছাপেন নাই, কোন মন্তব্যও করেন নাই, কিন্তু নিজেদের দলের একজন লোকের ঐ প্রকারের একটি প্রবন্ধ কয়েকদিন পরে ছাপিয়াছিলেন। বঙ্গের নেতারা কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

বঙ্গের বাহিরে বক্তৃতার যে অতিক্ষুদ্র চুম্বক দৈনিক কাগজগুলিতে ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের প্রায় সব প্রধান প্রধান কথাই বাদ পড়িয়াছিল। বোম্বাইয়ের একটি কাগজে আসল কথাগুলি বাদ দিয়া বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল। কেবলমাত্র মান্দ্রাজের একটি দৈনিকে বক্তৃতার পূর্ণ তাৎপর্য্য বাহির হইয়াছে বলিয়া আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু বঙ্গের বাহিরের কোন কাগজে বক্তৃতার বিষয়টি সম্বন্ধে একপংক্তি সম্পাদকীয় মন্তব্যও আমাদের চোখে পড়ে নাই। এসব কথা ব্যক্তিগত অভিযোগ বা দুঃখ প্রকাশ কেহ যেন মনে না করেন। সকল দিক্ দিয়া বঙ্গের প্রতি অবিচার হইয়া আসিতেছে, বঙ্গকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইতেছে—অথচ এবিষয়ে বঙ্গের নেতাদের সমুচিত দৃষ্টি নাই, এবং বঙ্গের বাহিরে কোন নেতা বা সম্পাদক এই অবিচারে বঙ্গের প্রতি সামান্য সহানুভূতিও দেখাইলেন না, বা বঙ্গের দাবীর অংশমাত্রেরও সমর্থন করিলেন না, তাহার কারণ কি এবং তাহা হইতে আমরা কি শিখিতে পারি, তাহা পাঠকদিগকে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে অনুরোধ করা আমাদের উদ্দেশ্য। বিষয়টি যে তুচ্ছ নহে, তাহার প্রমাণ, আমাদের উহা আলোচনা করিবার পর, মহাজন সভা, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা, বঙ্গের গবর্ণর ও এংলোইণ্ডিয়ান কাগজ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ একটি অবিচার সম্বন্ধে আলোচনা ও মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কাহারও সহানুভূতি ও সমর্থন না পাইলেও বাঙালীকেই নিজেদের প্রতি অবিচারের প্রতিকারে সচেষ্ট ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। বাঙালী নেতাদের ও অন্য সকল বাঙালীর বুঝা উচিত, যে, বাঙালীদের প্রতি এখন সব দিক্ দিয়া যে অবিচার হইতেছে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদিগকে যে অত্যন্ত কম প্রতিনিধি দেওয়া হইতেছে, এখন বাঙালীরা তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার না করিলে, ভবিষ্যতে, স্বরাজ্যলাভের পরও, বর্ত্তমান অবস্থার নজীরে অবিচার স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এখনই খুব উদ্যোগী হওয়া দরকার।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা নির্ব্বাচন

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-এ ও এম্‌-এস্‌সি পরীক্ষায় অধ্যাপকদিগকে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষক বলা হয়। সাহিত্য ইতিহাসাদি বিভাগকে আর্টস্ বিভাগ এবং রসায়ন পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি বিভাগকে বিজ্ঞান বিভাগ বলা হয়। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ আর্টস্ শিক্ষা বিভাগের ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের এক একটি কৌন্সিল আছে। প্রতিবৎসর এই কৌন্সিল তাহার সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এবৎসর আর্টস্ কৌন্সিল অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্‌কে এবং বিজ্ঞান কৌন্সিল ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ এবং স্যার নীলরতন সরকার যোগ্য ব্যক্তি। তাঁহাদের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে খবরের কাগজে কোন বাদানুবাদ হয় নাই।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহার বক্তৃতায় এইমত প্রকাশ করেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি নাই। তাঁহার নির্ব্বাচনে দলাদলি হয় নাই, ইহা ঠিক্ কথা। কিন্তু যেদিন শিক্ষকরা তাঁহাকে নির্ব্বাচন করেন, সেই দিনই তাঁহারা, অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের নাম চারিটি উচ্চতর বিদ্যানুশীলন বোর্ডের অন্যতম সভ্যরূপে প্রস্তাবিত হওয়ায়, একটিরও উপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে মনে করেন নাই। তিনি একটিতেও নির্ব্বাচিত হন নাই, অন্য কেহ কেহ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার মত পণ্ডিত লোক একটিতেও নির্ব্বাচিত না হওয়ার কারণ দলাদলি বলিয়া আমাদের ধারণা। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি নাই, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের এই উক্তি ভ্রান্ত মনে করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশ্যন্সের মধ্যে উচ্চতর বিদ্যানুশীলন বোর্ডগুলির নিম্নলিখিত কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে :—

The Board of Higher Studies in each subject shall, for purposes of Post-graduate teaching and Post-graduate examination, make proposald regarding.

(a) courses of study ;
(b) text-books or recommended books ;
(c) standards and conduct of examinations ;
(d) teaching requirements from year to year and preparation of the time table ;
(e) distribution of work among the members the staff in that department ;

(*f*) appointment of Examiners ; and

(*g*) such other matters as may, from time to time, be specified by the Council with the approval of the Senate.

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার সিকি শতাব্দীর অধিককাল সাতিশয় যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত অধ্যাপকের ও পরীক্ষকের কাজ করিয়াছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহুভাষাবিৎ। তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধতম ছাত্র। উচ্চতর বিদ্যানুশীলনের বোর্ডের যে-সকল কর্ত্তব্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতে তিনি সমর্থ। তাঁহার অন্য কি কি দোষ গুণ, যোগ্যতা অযোগ্যতা আছে, না আছে, তাহা এক্ষেত্রে বিচার্য্য নহে। এইসকল কারণে আমরা মনে করি, শিক্ষকদের তাঁহাকে নির্ব্বাচন করা উচিত ছিল। তিনি নির্ব্বাচিত না হইয়া চারিটি বোর্ডের মধ্যে কোন্‌টিতে অন্য কে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন জানি না। জানিলে এবং নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদের যোগ্যতার বিষয় আমরা অবগত থাকিলে সে-বিষয়ে কিছু লিখিতে পারিতাম। শুনিয়াছি, ইতিহাসের বোর্ডেও তাঁহার নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল, কিন্তু ইতিহাসেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত শিক্ষকগণ তাঁহাকে না-লায়েক মনে করিয়াছেন—তাঁহা অপেক্ষা কাহাকে অধিকতর লায়েক মনে করিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ক্যালেণ্ডারে ইতিহাসের শিক্ষক এবং ইতিহাসের বোর্ডের সভ্যদের তালিকায় তাঁহা অপেক্ষা যোগ্য কাহাকেও দেখিলাম না। তাঁহার সমান যোগ্যও কেহ আছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। সুতরাং অন্ততঃ পক্ষে ইতিহাসের বোর্ডে তাঁহার স্থান হওয়া উচিত ছিল। ইংরেজী সাহিত্য, আরবী-ফারসী, নৃতত্ত্ব, প্রভৃতি কোন কোন বোর্ডেও যে-সকল ব্যক্তির নাম দেখিতেছি, তাঁহারাও ঐ ঐ বিষয়ে প্রত্যেকেই যদুবাবু অপেক্ষা পণ্ডিত নহেন।

আমরা আগেই বলিয়াছি, যে, বোর্ডের নির্দ্দিষ্ট কাজের যোগ্যতা কাহার কিরূপ আছে, তাহাই বিচার্য্য, অন্য কিছু বিচার্য্য নহে। কিন্তু কু-তার্কিকেরা অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলিয়া অনেক সময় ভ্রম বা জ্ঞানকৃত দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রেও তাহা হইতেছে। যদুবাবুর বিরোধী-দলের বলিয়া অনুমিত একজন গুপ্তনামা লেখক একখানি ইংরেজী দৈনিক খবরের কাগজে লিখিয়াছেন, যে, যদুবাবু ভাইস্-চ্যান্সেলার হইবার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে তোষামোদকারী, দাস প্রকৃতির লোক, ইত্যাদি বলিয়াছিলেন। সকলকে বলেন নাই, কতকগুলি লোককে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রকৃতি ঐরূপ বটে, তাহা আমরা এখনও বলিতেছি। সত্য কথা বলা দোষ নহে। সত্যকথন উচ্চতর বিদ্যানুশীলন বোর্ডের সভ্য হইবার পক্ষে একটা অযোগ্যতা নহে। অবশ্য যাঁহারা ঐরূপ প্রকৃতির লোক, তাঁহারা যদুবাবুর প্রতি প্রসন্ন থাকিতে পারেন না।

আর-একটা কাগজে সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্ভবতঃ ঐ দলেরই কোন লোকের দ্বারা লিখিত হইয়াছে, যে,

"it is in the constitution of the Boards that the voice of the teachers is predomihant......The Vice-Chancellor is appointed by the Governor-Chancellor ......But in the constitution of the Boards of studies, the teachers' vote is supreme."

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের **স্বাধীন** মত কবে হইতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা হয়। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে আগে হইত এক কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, এখন না হয় দুই তিন কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হইয়া থাকে। শিক্ষকেরা প্রায় সকলেই বা প্রত্যেকেই কবে হইতে স্বাধীনচেতা স্বাধীনকর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ তদ্বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য পাঠাইতে পারিবেন। যদুবাবুকেই লাটসাহেব সর্ব্বপ্রথমে ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন নাই, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক ভাইস-চ্যান্সেলার কোন না কোন লাটের দ্বারা নিযুক্ত। সুতরাং যদুবাবুকে বোর্ডে নির্ব্বাচন করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম শিক্ষকদের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইত মনে করিবার কোন কারণ নাই।

আমরা শিক্ষকদিগকে দুষিতে অনিচ্ছুক। যাঁহাদের কিছুকাল অন্তর অন্তর পুনর্নিয়োগ অন্যের কৃপাসাপেক্ষ, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই স্বাধীনচেতা হইবেন, এমন আশা করা যায় না। অন্যান্য কারণের মধ্যে এই কারণে অনেকে চান যে, শিক্ষকদের পদের স্থায়িত্ববিধান হয়, যাহাতে তাঁহারা

নিরুদ্বেগে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন। যদুবাবু যে এইরূপ স্থায়িত্ববিধানের পক্ষপাতী, তাহা তাঁহার কন্‌ভোকেশ্যন বক্তৃতায় বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত কাগজে যদুবাবুর পাণ্ডিত্যের ও অধ্যাপনা-নৈপুণ্যের প্রতি উচ্চতম শ্রদ্ধা ("highest respect") ঘোষিত হওয়ার পর বলা হইতেছে, যে, তিনি ভাল নেতা ও ভাল কার্য্যপরিচালক বা শাসনকর্ত্তা ("a good leader and good administrator") নহেন। তাহা যদি সত্য বলিয়া মানিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য, বোর্ডের সভ্যদের কর্ত্তব্যের মধ্যে কোথায় লেখা আছে, যে, প্রত্যেক সভ্যকে নেতা ও শাসনকর্ত্তা হইতে হইবে? তাঁহাদের সব কর্ত্তব্যের তালিকা উপরে ছাপিয়া দিয়াছি। তাহাতে ত নেতৃত্ব ও শাসনকর্ত্তৃত্বের উল্লেখ দেখিতেছি না। যদুবাবুকে নির্ব্বাচন না করিয়া অন্য যাঁহাকে যাঁহাকে শিক্ষকেরা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাঁহারা যে তাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেতা ও কার্য্যনির্ব্বাহক বা শাসনকর্ত্তা, তাহা ঐ কাগজে প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উহার লেখক তাহা করিতে পারেন নাই। আমরা নির্ব্বাচিত চারিজনের নাম জানিলে তাহা করিতে চেষ্টা করিতাম। পরে জানিতে পারিলে চেষ্টা করিব। উক্ত কাগজের লেখক প্রথমে "ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই নাই।" প্রবাদবাক্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেন,

"It cannot be said that in the matter of the constitution of the Boards of Studies the teachers acted in the way they did in malice."

তাহার পর কিন্তু বলিতেছেন:—

"Before he became Vice-Chancellor he abused the teachers of the University in a bad way. After he became Vice-chancellor, he has followed a policy and has sought to shut out some of the teachers from the Senate or the Syndicate in a way that is hurtful to the feelings of the teachers. It is not unnatural for the teachers to give their reply."

শেষ বাক্যটিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যে, যদুবাবুকে নির্ব্বাচন করা হইবে কিনা বিবেচনা করিবার সময় তাঁহার যোগ্যতা অযোগ্যতা বিবেচিত হয় নাই; যেহেতু তিনি কতকগুলি লোককে নিন্দার্হ বলিয়াছিলেন এবং কাহাকেও কাহাকেও সেনেট বা সীণ্ডিকেটের সভ্য হইতে দেন নাই বলিয়া তাঁহাদের ধারণা, অতএব তাঁহার কাজের পাল্টা জবাব স্বরূপ শিক্ষা করা তাঁহাকে নির্ব্বাচন করেন নাই!

আমরা আগেই বলিয়াছি, তিনি সকল শিক্ষককে তোষামোদকারী ইত্যাদি বলেন নাই, কতকগুলি লোককে বলিয়াছিলেন ইহা সত্য কথা। ইহাতে স্বাধীনচিত্ত শিক্ষকদের রাগের কোন কারণ নাই। সকল শিক্ষকের সেনেটের বা সীণ্ডিকেটের সভ্য হওয়াতেও তিনি বাধা দেন নাই। হয়ত কাহারও কাহারও ঐরূপ সভ্য হওয়ায় তাঁহার মত না থাকিতে পারে, অপরের সম্বন্ধে মত থাকিতে পারে। শিক্ষকের পরিবর্ত্তে অশিক্ষককে তিনি ঢুকান নাই। প্রত্যেক ভাইস্-চ্যান্সেলারেরই এইরূপ কাহারও সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা, কাহারও সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণা থাকিতে পারে। তাহাতে শিক্ষক মাত্রেরই রাগের কারণ নাই। যদি কোন ভাইস্-চ্যান্সেলার অযোগ্য লোককে কোন পদ বা কাজের জন্য নির্ব্বাচন বা সুপারিস করেন, তাহা হইলে অবশ্য তাহা অসন্তোষের কারণ হইতে পারে। কিন্তু যদুবাবু কোন অযোগ্য লোককে কোন কিছুর জন্য সুপারিস্ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, যে, তাঁহার বিরোধী দলের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার দোষ বলিয়া যে-সব কথার উল্লেখ করিতেছেন, সেগুলি যদি প্রকৃতই তাঁহার দোষ বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলেও তাঁহার বোর্ডের সভ্যত্বের যোগ্যতার বিচারস্থলে তৎসমুদয়ের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইত। তাঁহাকে নির্ব্বাচন না করিয়া দলাদলিপরায়ণ লোকেদের তৃপ্তি হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই, তাঁহার যশ ও সম্মানের লাঘব হয় নাই; ক্ষতি হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের, প্রতিপত্তি কমিয়াছে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট আর্টস্ কৌন্সিলের।

ষ্ট্যাট্যুটরী কমিশন

১৯১৯ সালে ভারতশাসনের যে নূতন আইন জারী হয়, তাহার কোন পরিবর্ত্তন দরকার কিনা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ১৯২৯ সালে বা তাহার পূর্ব্বে একটি কমিশন বসিবার ব্যবস্থা আছে। বিলাতের বর্ত্তমান

টোরি গবর্মেণ্ট উহা এই কারণে তাড়াতাড়ি বসাইতে চাহিতেছেন, যে, তাহা হইলে তাঁহারা স্বয়ং তাঁহাদের মনোমত লোক বাছিয়া বাছিয়া উহার সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন ; ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে যদি তখন পার্লেমেণ্টে শ্রমিকদল প্রবল হয়, তাহা হইলে শ্রমিক গবর্মেণ্ট এমন সব লোককে সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া বসিতে পারেন, যাহারা ভারতীয়দিগকে ভয়ানক বেশী রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়া ফেলিতে পারে—যদিও আমাদের সেরূপ কোন সম্ভাবনায় বিশ্বাস নাই।

খবরের কাগজে রাষ্ট্র হইয়াছে, যে, বর্ত্তমান বিলাতী গবর্মেণ্ট কমিশনে একজনও ভারতীয় সভ্য নিযুক্ত করিবেন না, সব সভ্যই বিলাতী মনুষ্য হইবেন। অন্য-দিকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি বিলাত হইতে সদ্য-প্রত্যাবৃত্ত পটেল মহাশয় বলেন, যে, কমিশনে জন-কতক ভারতীয় সভ্য থাকিবেন, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা বিলাতী মনুষ্যদের চেয়ে কম হইবে। আমাদের বোধ হয় পটেল মহাশয়ের কথাই ঠিক্ হইবে। কারণ, যদি এক-জন ভারতীয় লোককেও সভ্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলাতী গবর্মেণ্ট জগতের কাছে একথা ঘোষণা করিতে পারিবেন না, যে, ভারতবর্ষের লোকদের মতও শুনা হইয়াছে। ইহা করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কেন না, যদিও ইংরেজ জাতি নিজেদের মত ও স্বার্থ অনুসারে ভারতশাসন করে, তথাপি জগৎকে জানান দরকার মনে করে, যে, ইংরেজ রাজত্ব ভারতীয় লোকদের অনুমোদিত, কেবল দুচারজন বিকৃতমস্তিষ্ক, বা নগণ্য, বা বাজে লোক তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। জনকতক ভারতীয় লোককে কমিশনের সভ্য করিলে, ইংরেজের কোন স্বার্থহানিও হইবে না। কারণ, প্রথমতঃ ভারতীয় কিরূপ লোককে সভ্য নিযুক্ত করা হইবে, তাহা বিলাতী গবর্মেণ্টই স্থির করিবেন ; দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সভ্যেরা সকলে একমত হইলেও তাঁহারা সংখ্যায় ন্যূন হইবেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা সেই কারণেই অগ্রাহ্য হইতে পারিবে ; তৃতীয়তঃ, ভারতীয় সভ্যেরা সংখ্যায় বেশী হইলেও বিলাতী গবর্মেণ্ট তাঁহাদের কথা অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য নহেন—অনায়াসে অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

কমিশনের সব সভ্য বিলাতী, কিম্বা কমসংখ্যক কয়েক-জন সভ্য ভারতীয় হওয়ার ফল কার্য্যতঃ একই হইবে। তবে বিলাতী মনুষ্যদের মধ্য হইতে সব সভ্য নির্ব্বাচিত হইলে, একটি যে অসুবিধা হইবে, তাহা আগে বলিয়াছি ; আর-একটির উল্লেখ করিতেছি। ইংরেজরা বলে, রুশিয়া সর্ব্বদাই ভারতে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রাদি করিতেছে। সে-বিষয়ে আমাদের সাক্ষাৎ কোন জ্ঞান নাই। কিন্তু ইংরেজদের বিশ্বাস যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কমিশনের সব সভ্য ইংরেজদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিলে তাহা রুশিয়াকে স্পষ্ট ভাষায় বেশী করিয়া ষড়যন্ত্রাদি করিতে বলার সমান হইবে। কারণ, শুধু রুশিয়া কেন, ইংরেজদের মিত্র দেশের লোকেরাও মুখে না বলিলেও মনে মনে বুঝিবে, যে, ভারতশাসন-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তন বিষয়ে কমিশনের সভ্যরূপে ভারতীয়দের মত প্রকাশের সুযোগটুকুও না থাকিলে ভারতবর্ষে খুব বেশী অসন্তোষ ও ইংরেজশাসন হইতে কল্যাণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নৈরাশ্য জন্মিবে ; সুতরাং ইংরেজবিরোধী বিদেশী শক্তির তাহাতে ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার খুব সুবিধা হইবে।

আমাদের নিজের মত এই, যে, জনকতক ভারতীয় কমিশনের সভ্য হইলেও আমাদের কোন লাভ নাই। তাঁহাদের কথা ইংরেজরা শুনিবে না। এই কারণে সব সভ্য বিলাতী হওয়াই ভাল। কূটনীতির খাতিরে ভারতের জনকতককে সভ্য করিয়া জগতের কাছে ইহা প্রচার করিবার সুবিধা ইংরেজ গবর্মেণ্টের না হইয়াই ভাল, যে, আমাদের কথা দস্তুরমত শুনিবার পর একটা সিদ্ধান্ত ভারতের শাসনকর্ত্তারা করিয়াছে। তার চেয়ে, ইংরেজরা যে সম্পূর্ণ নিজের মতলব অনুসারে কাজ করে, তাহাই বিনা আবরণে জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হওয়া শ্রেয়ঃ।

যদি সকল বা অধিকাংশ সভ্য ভারতীয় হইবার ও তাঁহাদের ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, এবং তাঁহাদের রায় অনুসারেই কাজ হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমরা কমিশন হইতে অন্ততঃ কিছু সুফলের প্রত্যাশা করিতাম। কিন্তু যখন ওরূপ কোন সম্ভাবনা

নাই, তখন কমিশন হইতে কোন সুফলের আশা আমরা করি না, কুফলের আশঙ্কাই করি।

এখন যেরূপ ব্যবস্থা অনুসারে ভারতবর্ষ শাসিত হইতেছে, তাহা প্রবর্ত্তিত করিবার সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষকে আস্তে আস্তে যতটুকু যতটুকু করিয়া যখন যখন রেস্পন্সিব্‌ল গবর্মেণ্টের (দায়ী গবর্মেণ্টের—কাহার কাছে দায়ী তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।) অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে, তাহার পরিমাণ ও সময় নির্দ্ধারণের অধিকার বিলাতী পার্লেমেণ্টের অর্থাৎ ইংরেজ জাতির থাকিবে। আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হইবার বিদেশীদের এই অধিকার এবং তাহার ন্যায্যতা আমরা কোন কালেই স্বীকার করি নাই। কিন্তু স্বীকার না করিলেও তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং স্বাধীনতার দিকে কার্য্যতঃ অগ্রসর হইবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। সুতরাং কমিশনের সব সভ্য ইংরেজ হইলেও আমরা নাচার, অধিকাংশ হইলেও নাচার। আমাদের কেবল মত প্রকাশের কিছু স্বাধীনতা আছে। সেই জন্য আবার বলিতেছি, আমাদের দেশের কাজ কি প্রণালী অনুসারে কাহাদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে, তাহা স্থির করিবার স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার একমাত্র আমাদেরই আছে। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ ও তাহাদের মিত্রজাতিরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিল, যে, পৃথিবীর জাতি সমূহের নিজনিজ মত ও অভিপ্রায় অনুসারে স্বস্বদেশীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করিবার অধিকার (self-determination) প্রতিষ্ঠিত করা ঐ মহাযুদ্ধের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর, তাহাদের দ্বারা ঘোষিত ঐ উদ্দেশ্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যের কথা জেতারা আর বলে না; তাহারা যুদ্ধের ফলে যত জাতি, ভূখণ্ড ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক হইয়াছে, তাহাই হজম করিতে ব্যস্ত। ইংরেজরা বিপদের সময় ভারতীয়দিগকে কৌশলপূর্ণ দ্ব্যর্থ ত্র্যর্থপূর্ণ ভাষায়ও যে একটু আশা দিয়াছিল, সম্পদের সময় তাহা চাপা দিতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয় নাই, হইবে না। ভারতবর্ষে যদি বেশী চীৎকার হয়, তাহা হইলে অনির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোক বিনা-বিচারে বন্দীকৃত নিশ্চয়ই হইবে।

একটা কথা উঠিয়াছিল, যে, কমিশনের সভ্যদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া দরকার, সুতরাং ভারতীয় কাহাকেও এবং ভারতবর্ষের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন ইংরেজকে উহার সভ্য করা উচিত নয়। ব্যবস্থা হইবে ভারতীয়দের ও তাহাদের দেশের সম্বন্ধে, কিন্তু সেবিষয়ে তাহারা কিছু বলিতে করিতে পাইবে না, ইহা চূড়ান্ত নিরপেক্ষতার আদর্শ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু বিলাতী ইংরেজরা নিরপেক্ষ, ইহা ততোধিক মিথ্যা ও হাস্যকর কথা। সম্পূর্ণ ন্যায়বান ইংরেজ কেহ নাই, এরূপ কথা বলিতে পারি না; কেননা তাহা মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সাধারণতঃ ও জাতিহিসাবে ইহা সত্য, যে, ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রনৈতিক ও শিল্পবাণিজ্যিক অধীনতায় ফেলিয়া রাখা ইংরেজদের সাংসারিক স্বার্থের অনুকূল; সুতরাং ইংরেজরা ভারতবর্ষকে আত্মশাসনের অধিকার না দিবার কারণ আবিষ্কার বা ওজর সৃষ্টি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেই। তাহারা নিরপেক্ষ নহে, হইতে পারে না। এমন যদি কোন সভ্য জাতি থাকে, যাহারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক অধীনতা-জাত শিল্পবাণিজ্যিক অক্ষমতার দরুন ভারতবর্ষে নিজেদের মাল রপ্তানী করিয়া প্রভূত লাভবান্ হয় না, এবং যাহাদিগকে ইংরেজ জাতি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে লোভ বা ভয়ের বশবর্ত্তী করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে জ্ঞানবান্ ন্যায়পরায়ণ লোক আমরা নির্ব্বাচিত করিলে নিরপেক্ষ লোক পাওয়া যাইতে পারে।

আর একটা কথা উঠিয়াছে, যে, যে সব প্রদেশে এক জন করিয়া ডেপুটী গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন। তিনি আইন ও শান্তিশৃঙ্খলা (law and order) রক্ষার কর্ত্তা হইবেন, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিকট তিনি জবাবদিহি হইবেন না, তাঁহার কোন কাজের আলোচনা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় হইতে পারিবে না, প্রাদেশিক গবর্ণরের অধীন না হইয়া তিনি সাক্ষাৎভাবে ভারত-গবর্মেণ্টের অধীন হইবেন। ইহার সোজা মানে এই, যে, প্রাদেশিক লোকেরা যত ইচ্ছা বলুন লিখুন, তাঁহাদের প্রতিনিধিরা কৌন্সিলনামক বিতর্কসভায় যত ইচ্ছা বাগ্‌যুদ্ধ করুন, কিন্তু সকলকে শাসাইয়া আটকাইয়া ঠেঙাইয়া দুরস্ত করিবার একজন লোক থাকিবে যে একেবারে

নিরঙ্কুশ। আমাদের বিবেচনায় এরূপ ব্যবস্থা প্রকৃত বা ইংরেজদের মনঃকল্পিত রুশিয়ার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। আমাদের পক্ষেও মঙ্গলজনক এই হিসাবে হইবে, যে, আমাদিগকে চিরপরাধীন রাখিবার নিমিত্ত ইংরেজরা যত রকম বুদ্ধি আঁটিতে পারে, তাহা শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত ও কার্য্যে পরিণত হওয়া মন্দ নয়।

ষ্ট্যাটুটরী কমিশনটা শীঘ্র নিযুক্ত হইয়া শীঘ্র তাহার সাক্ষ্যগ্রহণাদি অভিনয় সমাপনানন্তর রিপোর্ট প্রকাশ ও তদনুযায়ী বা তদ্বিরোধী কাজ শীঘ্র শীঘ্র হইয়া গেলে ভাল হয়। তখন হিন্দুমুসলমানের ঝগড়া গালাগালি দাঙ্গা, বার্নার্ড শ ও ক্যাথেরিন্ মেয়ো প্রমুখ নিরপেক্ষ মনুষ্যদের দ্বারা ভারতবর্ষের মুখে মসীলেপন, এক সম্প্রদায়ের দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের নারীহরণ ও নারীধর্ষণ, ইত্যাদি শোচনীয় ব্যাপার ক্রমে ক্রমে কমিতে পারে। তাহার পূর্ব্বে কমিবে ত না-ই, বাড়িয়াই চলিতেছে।

—

ক্যাথেরিন্ মেয়োর "ভারত মাতা"

ক্যাথেরিন্ মেয়ো নামক এক মার্কিন স্ত্রীলোক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে "ভীতিজনক দ্বীপপুঞ্জ" ("The Isles of Fear") নাম দিয়া একখানা, বহি লিখিয়াছিল। তাহাতে ফিলিপিনোদের সম্বন্ধে এরূপ সব কথা লেখা আছে, যাহাতে মনে হইতে পারে, যে, তাহারা, এখন কেন, কোন কালেই জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব বা স্বাধীনতা-লাভের উপযুক্ত হইবে না। এখন আবার ঐ লেখিকা "ভারত-মাতা" ("Mother India") নাম দিয়া আর একখানা বহি লিখিয়াছে। তাহাতেও ভারতীয়দের—বিশেষতঃ হিন্দুদের—যে চিত্র আঁকা হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকদের এই ধারণা জন্মিবে, যে, তাহারা আত্মশাসন ও আত্মরক্ষার সম্পূর্ণ অযোগ্য, অতিশয় নোংরা, ও অসভ্য লোকদের চেয়েও অধম মানুষ। স্বাধীনতাপ্রয়াসী জাতিদের কুৎসা করা লেখিকার পেশা মনে হইতেছে, যদিও তাহার আত্মপরিচয় এই, যে, তাহার আর্থিক অবস্থা স্বাধীন ও সচ্ছল। এই আত্মপরিচয়টাই সন্দেহজনক।

আমরা এই বহি দেখি নাই। যে যে দেশী কাগজে ইহার উল্লেখ দেখিলাম, তাহার সম্পাদকেরা ইহা সমালোচনার জন্য পান নাই। অথচ ইহার সমালোচনা ও খুব প্রশংসা বিলাতের ও ভারতের ইংরেজদের কোন কোন কাগজে দেখিলাম। লেখিকা ও তাহার প্রকাশক ধূর্ত্ত লোক। যাঁহারা বহিখানার ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারেন, তাঁহাদের কাছে ইহা প্রেরিত হয় নাই। কিন্তু যাহাদের মধ্যে ইহার প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা জন্মান দরকার, তাহাদের মধ্যে প্রচারের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে।

ইহার সমালোচনা হইতে যাহা বুঝিলাম, তাহাতে এধারণা হয় না, যে, ইহার সব কথাই মিথ্যা। সত্য কথা আছে। কিন্তু যাহা কখন কখন ঘটে, কোথাও কোথাও ঘটে, তাহাকেই ভারতবর্ষের সব জায়গার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাল্যবিবাহের কুফলস্বরূপ বালিকাদের উপর অত্যাচারের ভীষণ ফোটোগ্রাফবৎ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বাল্যবিবাহের সব কুফল আমরা অবগত আছি, তাহার বিরুদ্ধে বহুবহু সংস্কারক লিখিয়াছেন, বলিয়াছেন, আইন করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু ইংরেজ গবর্মেণ্ট এইরূপ চেষ্টার সহায় না হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, হরবিলাস সর্দ্দার বাল্যবিবাহ-নিষেধক আইনের প্রতিকূলাচরণ করিবেন বলিয়া ভারতগবর্মেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব শাসাইয়া রাখিয়াছেন, সম্মতি আইনে মেয়েদের বয়স বাড়াইবার চেষ্টায় গবর্মেণ্ট বাধা দিয়াছেন, এ সব কথা ত ক্যাথেরিন মেয়োর বহিতে নাই। তাহাতে আছে, ইংরেজ-শাসনের স্তুতি ও খোসামোদ এবং ভারতীয়দের কুৎসা। বাল্যবিবাহের ভীষণতম, সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জাকর ও শোচনীয় কুফল কখন কখন ফলিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও, সর্ব্বত্র বা অধিকাংশস্থলে ঐরূপ কুফল ফলিয়াছে, ইহা সত্য নহে।

শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাবে প্রসূতিরা অশিক্ষিতা ধাত্রীদের হাতে কিরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, তাহার ফোটোগ্রাফিক বর্ণনা "ভারতমাতা" বহিতে আছে, উহার সমালোচনায় দেখিলাম। কিন্তু, কারণে অকারণে ইংরেজ গবর্মেণ্ট যুদ্ধে কোটি-কোটি টাকা ঢালে, শ্বেত সামরিক

অসামরিক কর্ম্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির জন্য কোটি-কোটি টাকা খরচ করে, কিন্তু ভারতবর্ষে চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা শিখাইবার জন্য যথেষ্ট শিক্ষালয় স্থাপন করে না, বেসরকারী লোকেরা স্থাপন করিলে বা করিতে চাহিলে তাহাতে নানা আপত্তি, বাধা-বিঘ্ন জন্মায়, একথা ক্যাথেরিন্ মেয়ো লেখে নাই। ইহাও লেখে নাই, যে, গত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য নানা দেশে প্রসূতিদের দুরবস্থা ছিল। তাহার পর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের, স্বাস্থ্যরক্ষা-বিজ্ঞানের, ও ধাত্রীবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় প্রসূতিদের দুঃখকষ্ট কমিয়াছে। ইংরেজরা এদেশটা দখল করা, ঠাণ্ডা করা ও রাখা এবং ইহা হইতে অর্থ আহরণ করাতেই নিমগ্ন থাকায়, আধুনিক সমুদয় বিজ্ঞানের সুবিধা ভারতীয়দিগকে পিস্তিরক্ষা হিসাবে ধীরেসুস্থে সামান্য কিছু দিয়াছে, যথেষ্ট পরিমাণে দেয় নাই। এদেশে এখনও প্রসূতিদের দুঃখদুর্দ্দশা বেশী পরিমাণে থাকিবার যে ইহা একটা কারণ, তাহা লেখিকার বহিতে নাই। আমরা নিজে দেশের কর্ত্তা হইলে অন্ততঃ তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থানের সমান কিছু চেষ্টা করিয়া প্রসূতিদের দুর্দ্দশা কিছু লাঘব করিতে পারিতাম।

যাহা হউক, আমরা যখন পরাধীন তখন সব দোষটা আমাদেরই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। স্বাধীন হইলেও একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইতাম না,—কোন দেশের লোকই নিষ্কলঙ্ক নহে। তফাৎ এই, যে, স্বাধীন দেশের লোকদের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে দুর্দ্দশায় ফেলিয়া রাখিবার সহায়তা করিবার কোন প্রলোভন নাই, পরাধীনকে পরাধীন রাখিবার চেষ্টায় সহায় হইলে টাকা এবং খ্যাতি—অন্ততঃ পক্ষে খ্যাতি— পাওয়া যায়।

—

ভারতবর্ষে জলপ্লাবন

গুজরাতে, বড়োদায়, কাঠিয়াবাড়ে, ওড়িষায়, বঙ্গে, সিন্ধুদেশে,—ভারতের নানা অঞ্চলে জলপ্লাবন হইয়াছে। অনেকের ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়াছে, গোধন নষ্ট হইয়াছে; অনেক মানুষের প্রাণও গিয়াছে। বিপন্ন যে সকল লোক বাঁচিয়া আছে, তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য চাঁদা উঠিতেছে এবং কর্ম্মীরা কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়া নানা ভাবে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সকল প্রদেশ হইতেই সকল প্রদেশের লোকদের জন্য সাহায্য প্রেরিত হওয়া দরকার। নগদ টাকা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বেশী আছে। এজন্য তথাকার লোকেরা খুব বেশী সাহায্য করিতেছেন। অন্যত্র মাড়োয়ারীদের হাতে টাকা বেশী আছে। তাঁহারাও সাহায্য করিতেছেন। অন্য সকলেরও যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।

জলপ্লাবন আমেরিকার মত ধনী, স্বাধীন ও বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানবিশিষ্ট দেশেও এখনও হইতেছে। কিন্তু তথাকার লোকেরা এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার সাহায্যে নানা উপায়ে ভবিষ্যতে জলপ্লাবন নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। কোথাও কোথাও এই প্রয়াস সফল হইয়াছে। আমাদের দেশের গবর্ন্মেণ্টেরও এইরূপ চেষ্টা করা উচিত। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ উত্তর বঙ্গে ১৮৭০ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত বারিপাত ও জলপ্লাবন সম্বন্ধে মানচিত্রাদি সহ একটি বিস্তারিত রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন। তাহা গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তদনুসারে প্লাবন নিবারণের চেষ্টাও গবর্ন্মেণ্টের করা কর্ত্তব্য হইবে। নতুবা অধ্যাপক মহলানবীশের প্রভূত পরিশ্রম এবং তাঁহার রিপোর্ট ছাপাইবার জন্য গবর্ন্মেণ্টের অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে। ভারতবর্ষের সব অঞ্চলের প্লাবন সম্বন্ধে এইরূপ রিপোর্ট লিখিত ও তদনুযায়ী কার্য্য আরব্ধ হওয়া উচিত।

বড়োদার মহারাজা গায়কবাড় নিজের রাজ্যের জন্য বিদেশলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত অনেক কাজ করিয়াছেন। তিনি বড়োদা হইতে যোগ্য দেশী দুএকজন এঞ্জিনীয়ার আমেরিকায় পাঠাইয়া যদি তথাকার প্লাবন-নিবারক এঞ্জিনীয়ারিং নানা উপায় সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে জ্ঞান লাভ করিয়া আসিতে বলেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যের ও ভারতবর্ষের অন্য নানাস্থানের উপকার হইতে পারে।

—

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হিন্দুর উপর অত্যাচার

পঞ্জাবে রঙ্গীলা রসুল নামক একখানা উর্দ্দু বহি এক জন হিন্দু লিখিয়াছিল। তাহাতে মুসলমানদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের প্রতি বিদ্রূপাদি ছিল। তাহার লেখক হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লড়িয়া খালাস পায়। তাহার জন্ম মুসলমানেরা জজকে বরখাস্ত করিবার জন্য বা তাঁহাকে ইস্তফা দেওয়াইবার জন্য আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছে। "রসিলা বর্ত্তমান" নামক খবরের কাগজে ঐ পঞ্জাবেই "নরক-যাত্রা" নামক এক প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহাতে নরকে মহম্মদ ও তাঁহার পত্নীদের যন্ত্রণা প্রভৃতি বর্ণিত আছে। লেখকের শাস্তি হইয়াছে। এই দুটা জিনিষের কোনটাই আমরা দেখি নাই। জজদের রায় এবং মুসলমানদের আন্দোলনের বৃত্তান্ত হইতে যতটুকু জানিয়াছি, তাহা হইতে ঐ দুটাতে লিখিত বিষয়ের কিছু ধারণা জন্মিয়াছে।

লেখক দু-জনকে সমগ্র ভারতবর্ষের বা ভারতের কোন অংশের হিন্দুরা এরকম জিনিষ লিখিতে বলে নাই। তাহারা হিন্দু-সমাজের বা তাহার কোন অংশের প্রতিনিধি নহে, তৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও লেখে নাই। জজদের রায়ে বা অন্য কোথাও এরূপ কোন প্রমাণ নাই, যে, তাহাদের কাজের জন্য সমগ্র হিন্দু-সমাজ বা তাহার কোন অংশ দায়ী। হাইকোর্টের যে জজ দলীপ সিংহ "রঙ্গীলা রসুলে"র লেখককে আপীলে খালাস দিয়াছেন, তিনি খৃষ্টিয়ান্। অথচ পঞ্জাবে ও অন্যত্র এরূপ আন্দোলন হইয়া আসিতেছে, যেন হিন্দু সমাজ লেখা দুটার জন্য এবং ঐ লেখকের খালাস পাওয়ার জন্য দায়ী। উত্তেজনা-প্রবণ মুসলমানদের মধ্যে এই আন্দোলনের ফল উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুদের পক্ষে ভীষণ হইয়াছে। তথাকার হিন্দুরা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নিগৃহীত হইয়া ধন-প্রাণমানধর্ম্ম সবই যাইবার ভয়ে ঘর-বাড়ী সম্পত্তি সব ছাড়িয়া দলে দলে পঞ্জাবে পলাইয়া আসিতেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানেরা যে কিরূপ অসভ্য, উত্তেজনাপ্রবণ এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বিচারবিহীন, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। পঞ্জাবের মুসলমানদিগের কোন কোন প্রকৃত পরিচালক এই সকল বর্ব্বর লোক-দিগকে ক্ষেপাইয়া অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে। এই আন্দোলনের প্রকৃত কারণ যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নহে, অর্থ-লোভপ্রসূত, তাহাও বুঝা যাইতেছে। তাহার অনেক প্রমাণের মধ্যে দুটির উল্লেখ করিতেছি। আন্দোলকদের এক দাবী এই, যে, জজ দলীপ সিংহকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হউক, এবং একজন মুসলমানকে জজ নিযুক্ত করা হউক। দ্বিতীয় প্রমাণ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে। পরের ধন লুণ্ঠন করা কি ইস্লামের উপদেশ? মুসলমানদের নেতাদিগের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত ও ন্যায়পরায়ণ, তাঁহারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন প্রশমিত করিলে সুবুদ্ধির কাজ হইবে, প্রতিবেশীর উপযুক্ত কাজ হইবে। উত্তরপশ্চিমসীমান্তে মুসলমানেরা সংখ্যায় খুব বেশী, এবং গবন্মেণ্টও হিন্দুদিগকে রক্ষা করিতে তৎপর নহে। সুতরাং হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা সহজ। কিন্তু ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, এরূপ অত্যাচার দ্বারা লাভ কি হইবে। সমগ্র মুসলমান সমাজকে এই অত্যাচারের জন্য আমরা দায়ী মনে করি না বলিয়াই ধীর চিন্তার প্রয়োজনের কথা লিখিতেছি। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ হইতে যদি সমুদয় হিন্দু বিতাড়িত হয়, তাহা হইলেও তথাকার মুসলমানেরা লাভবান হইবে না। অন্য জায়গার মুসলমানেরাও লাভবান্ হইবে না। ভারত-বর্ষে হিন্দুর সংখ্যা এত বেশী, যে, তাহাদিগকে নির্ম্মূল করা যাইবে না। যদি উত্তরপশ্চিম সীমান্তে হিন্দুদের বর্ত্তমান সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও এই লুণ্ঠিত ধন কয়দিন টিকিবে? ধনী হইতে হইলে তথাকার মুসলমানদিগকে উপার্জ্জক ও সঞ্চয়ী হইতে হইবে; তাহারা হিন্দুদিগকে না তাড়াইয়াও তাহা হইতে পারে। কারণ, হিন্দুরা তথায় শতকরা সাতজন মাত্র এবং ইংরেজদের মত দেশের প্রভুও নহে।

উত্তরপশ্চিমসীমান্তে হিন্দুর উপর অত্যাচার হওয়ায়, প্রতিহিংসাবশতঃ হিন্দুবহুল প্রদেশসকলে মুসলমানদের উপর ঐরূপ অত্যাচার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অন্যত্র সধর্ম্মীদের উপর অত্যাচারের ভাবনায়

বিরত হইয়া পাঠানরা অত্যাচারবিমুখ হইবে না। অন্যত্র মুসলমানদের উপর অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাদের অতটা দরদ হইত না। তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিতে কতকটা গবর্ন্মেণ্ট পারেন, এবং সম্পূর্ণরূপে পারেন তাহাদের পরিচালকেরা, এবং ভারতীয় মুসলমানদের নেতারা।

যে কারণেই হউক, হিন্দুবহুল প্রদেশসকলে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হইবে না। হওয়া উচিত নহে। হইলে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হইত। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, উত্তরপশ্চিমসীমান্তে হিন্দুর উপর অত্যাচার হওয়ায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব খুব বাড়িতেছে। এরূপ অসদ্ভাব-বৃদ্ধি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে কল্যাণকর নহে, পরন্তু অমঙ্গলজনক।

"জমীন্দার" নামক একখানা কাগজে মহাত্মা গান্ধীর নামে এক খোলা চিঠি বাহির হইয়াছে। উহা মাস্দ, আফ্রিদি, ওয়াজিরি প্রভৃতি পাঠান উপজাতির নেতাদের দ্বারা লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। লেখার ধরণধারণ ও বাঁধুনি দেখিয়া কিন্তু উহা কোন ইংরেজী শিক্ষিত চতুর মুসলমানের লেখাই মনে হয়। উহাতে হিন্দুমহাসভার সংগঠন ও শুদ্ধি-প্রচেষ্টা এবং আর্য্যসমাজীদের প্রচারাদি কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য গান্ধীজি কিছু করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে খোঁটা দেওয়া হইয়াছে! যেন তিনি বলিলেই ঐ সব প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যাইত এবং যেন আর সব ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই স্বধর্ম্মপ্রচার, স্বদলবৃদ্ধি, স্বদলের সংখ্যাহ্রাস নিবারণ, স্বদলকে শক্তিমান করিবার অধিকার আছে, কেবল হিন্দুদেরই নাই! যাহা হউক, সে-বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য এই চিঠিটির উল্লেখ করিতেছি না। উল্লেখের কারণ এই, যে, উহা হইতে অনুমান হয়, শুদ্ধি সংগঠন প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারাও পাঠান উপজাতি (tribes) সকলকে ক্ষ্যাপান হইয়া থাকিবে। কিন্তু যাহারা মনে করে, কোন জায়গায় হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়া শুদ্ধি সংগঠন প্রভৃতি বন্ধ করা যাইবে, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাহাতে বরং হিন্দুরা শুদ্ধি ও সংগঠনের প্রয়োজন আরও বেশী করিয়া উপলব্ধি করিবে। অত্যাচারীরা ও অত্যাচারের প্ররোচকেরা ইতিহাস পড়ে না; নতুবা, মানুষের মাথা কাটিয়া, মানুষকে তেলে ভাজিয়া, মানুষকে জীয়ন্ত পুড়াইয়াও ধর্ম্মপ্রচেষ্টা বিনষ্ট করা যায় না, তাহার প্রমাণ তাহারা দেখিতে পাইত।

"জমীন্দারে" প্রকাশিত চিঠির একটু নমুনা নীচে দিতেছি।

"The Jamrud incidents were just a few drops out of the ocean of our activities. Still, if your community is incapable of divining its own future, think what will happen to the seven percent of the Hindu population here that is absolutely at our mercy. If in the Punjab, Bengal and other parts of India, a common demonstration of Islamic brotherhood took place, what arrangements have you Mahatma Gandhi, or your community made to withstand it ?"

লেখক বা লেখকেরা বোধ হয় মনে করে, সংখ্যায় ন্যূন হিন্দুদিগকে অত্যাচারের ভয় দেখান ইস্লামিক ভ্রাতৃসংঘের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতার সুস্পষ্ট প্রমাণ!

—

বঙ্গে নারীনির্য্যাতন

ঘরে অমানুষ আত্মীয়দের দ্বারা, বাহিরে পশুপ্রকৃতি অন্য লোকদের দ্বারা অনেক বঙ্গনারীর নির্য্যাতন চলিতেছে। ইহা জঘন্য কাপুরুষতা; এবং পশুত্বেরও অধম, কারণ পশুরা এরূপ অত্যাচার করে না। এইসকল অত্যাচারের সুযোগ যে-সকল সামাজিক প্রথা বা অন্য রীতিনীতি হইতেই হউক না কেন, তাহার উল্লেখ দ্বারা নরাধমদের দুষ্কার্য্যের আংশিক দোষক্ষালনও নিন্দনীয়। ভদ্রলোকের মত ঐসব কুপ্রথা ও কুরীতির উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা করিবার অধিকার অবশ্য সকলেরই আছে।

প্রতি সপ্তাহের "সঞ্জীবনী"তে আমরা এইসকল অত্যাচারের তালিকা দেখিয়া থাকি। দেখিতেছি, আগেকার কয়েক বৎসরের চেয়ে ১৩৩৩ সালে অত্যাচারের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। উহার তালিকা এখনও চলিতেছে। বৃদ্ধির কারণ কি?

প্রতি সপ্তাহেই তালিকায় দেখি, অত্যাচরিতাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান নারী দুই-ই আছেন। হিন্দু নারীরা যে অধিকসংখ্যায় অত্যাচরিতা হন, ইহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয়; মুসলমান নারীরা যে কয়জন অত্যাচরিতা হন, তাহাও লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। মুসলমান অত্যাচরিতারা যে সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম, ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু কোন সম্প্রদায়েরই একটি নারীও নিগৃহীতা না হইলে

দেশের লজ্জা দূর হইত। অত্যাচারীদের মধ্যে প্রতি সপ্তাহের তালিকাতেই হিন্দু অনেক দৃষ্ট হয়, যদিও অত্যাচারীর সংখ্যায় প্রতি সপ্তাহের তালিকাতেই মুসলমান তাহাদের চেয়ে বেশী। অধিকাংশ স্থলে হিন্দু ও মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করে মুসলমান, কোথাও কোথাও হিন্দুমুসলমান বদমায়েসেরা একজোট হইয়া অত্যাচার করে। হিন্দুপুরুষ দ্বারা হিন্দুনারীর উপর অত্যাচারের সংখ্যা বড় কম নয়। হিন্দুপুরুষ দ্বারা মুসলমাননারীর উপর অত্যাচার একেবারে হয় না, এমন নয়; তবে খুব কম স্থলে হয়। খৃষ্টান অত্যাচারীর নামও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কুমারী ইলিস্ নাম্নী একটি ইংরেজ বালিকা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে অপহৃতা হইয়া স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন পাঠানদিগের দেশে নীতা হয়। তাহার উদ্ধার সাধন করিবার জন্য সাম্রাজ্যময় সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া তবে ইংরেজ ক্ষান্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই যে কত বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশে কত কুমারী, সধবা, বিধবা নারী অপহৃতা ধর্ষিতা হইতেছে, কাহাকেও কাহাকেও খুঁজিয়াই পাওয়া যাইতেছে না, কাহারও কাহারও প্রাণবধ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহের যথেষ্ট কারণ জন্মিতেছে—এত বড় যে ভীষণ, লজ্জাকর ও শোচনীয় ব্যাপার, তাহাতে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাদের কাহারও টনক নড়িতেছে না। অপহৃতা নারীদের উদ্ধারসাধনের জন্য, ফেরার বদমায়েসদিগকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়াইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপর, পুলিশের উপর কোন তম্বী তাগাদা পড়িতেছে না। বদমায়েসেরা অনায়াসে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অপহৃতা নারীদিগকে লুকাইয়া লুকাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, এমন-কি কখন কখন মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকা কালেই উদ্ধৃতা নারীকে পুনর্ব্বার অপহরণ করিতেছে। গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদের এই ঔদাসীন্য বা অক্ষমতার কারণ কি?

এখনও বোধ করি এক বৎসরও হয় নাই, পূর্ব্ব আফ্রিকায় কোন দুর্বৃত্ত নিগ্রো এক ইংরেজ মহিলার সম্ভ্রম হানি করে। অবিলম্বে সেখানে আইন হইয়া গেল, যে, ভবিষ্যতে কোন কৃষ্ণকায় কোন শ্বেতকায়ার ঐরূপ অপমান করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ভারতবর্ষে শত শত নারীর সতীত্বনাশ সর্ব্বনাশ ও নানা লাঞ্ছনা, প্রাণবধ হইতেছে। কিন্তু আইনের কঠোরতা সাধন দূরে থাক্, বর্ত্তমান আইন অনুসারে তৎপরতার সহিত সমুচিত দণ্ডবিধানের চেষ্টাও হইতেছে না। গবর্মেণ্টের এপ্রকার ঔদাসীন্য বা অক্ষমতার কারণ কি?

—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের শিক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশ্যান্ উপলক্ষে ভাইস্‌চ্যান্সেলার মিস্‌টার ল্যাংলী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, মুসলমান ছাত্রদের বাসের জন্য মুস্‌লিম হল নির্ম্মাণ শীঘ্র আরম্ভ হইবে এবং তাহাতে ৭,৩০,২৮৫ টাকা ব্যয় হইবে। তাহাদের বাসগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, ইহা সন্তোষের বিষয়। কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া মনে হইতেছে, খুব জাঁকাল রকম বাড়ী হইবে। সাদাসিধা স্বাস্থ্যকর মজবুত বাড়ী তৈয়ার করিতে যত খরচ হয়, তাহা করিয়া বাকী টাকায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তি স্থাপিত করিলে অর্থের সদ্ব্যয় হইত, এবং প্রাসাদ নির্ম্মাণে সব টাকা খরচ করা অপেক্ষা তদ্দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বিস্তার অধিক পরিমাণে সাধিত হইত। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই যে গরীব, তাহা ল্যাংলী সাহেবের বক্তৃতাতেই আছে। তিনি বলেন, অধ্যাপক যোগীশচন্দ্র সিংহ ছাত্রাবাসের ৪০১ ছাত্রের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তাহাদের মধ্যে ২৮৩ জন হিন্দু, ১১৭ জন মুসলমান। অধ্যাপক সিংহ পরিবারের এক এক জনের বাঁচিয়া থাকিবার খরচ মাসিক নয় টাকা ধরেন। ইহা বেশী ধরা হয় নাই। বাঁচিয়া থাকিবার খরচ এত কম ধরিয়াও তিনি দেখেন, যে, মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৬২ জন এরূপ সব পরিবারের ছেলে যাহাদের আয় বাঁচিয়া থাকিবার উক্ত আয় অপেক্ষাও কম, শতকরা ৬ জনের বাড়ীর আয় বাঁচিয়া থাকিবার মত, এবং শতকরা ৩১ জনের বাড়ীর আয় তার চেয়ে বেশী। তা ছাড়া, ইহাদের মধ্যে শতকরা ১২ জনের বাড়ীর আয় জমী হইতে প্রাপ্ত। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জনের বাড়ীর আয় বাঁচিয়া থাকিবার আয় অপেক্ষা কম, শতকরা ৭ জনের বাড়ীর আয় বাঁচিয়া থাকিবার মত, এবং শতকরা ৬০ জনের বাড়ীর আয় তার চেয়ে বেশী। অতএব দেখা যাইতেছে, মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশ বড় গরীব। তাহাদের জন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ না করিয়া খুব স্বাস্থ্যকর সাদাসিধা মজবুত বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাকী টাকার আয় হইতে তাহাদিগকে বৃত্তি দিলে ভাল হয়। এখনও নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ বদান্য ধনী মুসলমানদিগকে গরীব ছাত্রদের জন্য বৃত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সরকার বাহাদুর স্বয়ং সেবিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইলে অনুরোধের ফল বেশী ফলিবে মনে হয়। মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র লোক খুব বেশী, কিন্তু টাকা যে কাহারও নাই, তাহা নহে। বিদেশী

মুসলমানদের সাহায্যের জন্য যখন লক্ষ লক্ষ টাকা প্রেরিত হইতে পারে, খিলাফৎ ফণ্ডের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা উঠিতে পারে, তখন মুসলমান সমাজে নিশ্চয়ই টাকা আছে। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে, যে, যাঁহারা ধনী বা সঙ্গতিপন্ন তাহারা বিদ্যানুরাগী নহেন। তাঁহাদের বিদ্যানুরাগ জন্মিলে মঙ্গল হইবে।

অর্থাভাববশতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থাভাব প্রকৃত বা একমাত্র কারণ না হইতেও পারে।

মুস্‌লিম হল নির্ম্মাণে এত বেশী টাকা খরচ করিবার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, বাড়ীটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য সব বাড়ীর মত করা হইবে। সেগুলি ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী স্থাপন উপলক্ষে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন শিক্ষিত মুসলমান সমাজ হয় ত জাঁকাল বাড়া অপেক্ষা সাদাসিধা বাড়ী ও অধিকতর শিক্ষাবিস্তার পছন্দ করিবেন। তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিলে কেমন হয়?

—

চামার ছাত্রের উপর ন্যায্য ব্যবহার

লাহোরের আর্য্যসমাজীদের কলেজে একটি চামার ছাত্র ভর্ত্তি হয় ও তাহাকে কলেজের ছাত্রাবাসে স্থান দেওয়া হয়। তাহাতে অন্যজাতীয় ছাত্রেরা আপত্তি করে নাই। কিন্তু পাচক ব্রাহ্মণেরা তাহাতে আপত্তি করে, এবং তাহার জন্য রাঁধিতে ও পরিবেষণ করিতে হইবে বলিয়া তাহারা ইস্তফা দেয়। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে অনেক বুঝান, কিন্তু তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় তাহাদের ইস্তফা গৃহীত হয়।

শান্তিনিকেতনে একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটে। সেক্ষেত্রে ছাত্রটি ছিল মুসলমান, এবং আপত্তি করিয়াছিল হাড়িজাতীয় ভৃত্যেরা। কর্ত্তৃপক্ষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

—

বঙ্গের নদীতে ষ্টীমার যাত্রীর দুর্দ্দশা

আমার বাড়ী পশ্চিম বঙ্গে, জীবনের অধিকাংশ সময় বাঁকুড়া, কলিকাতা ও এলাহাবাদে কাটিয়াছে। আমি গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, উট গাড়ী ও রেল গাড়ীতে ভ্রমণে অভ্যস্ত ছিলাম। সম্প্রতি দুই একবার অল্প সময়ের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের নদীতে ষ্টীমারে যাতায়াত করিয়াছি। ষ্টীমারগুলির প্রথম শ্রেণীর কক্ষগুলি চলনসই, কিন্তু প্রথম শ্রেণী নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। পাখা নাই। তাহার স্নানাগার ও শৌচাগার অপকৃষ্ট। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কামরা আছে দেখিলাম একটি পুরুষদের ও একটি মেয়েদের জন্য। সিন্ধুকবৎ, বায়ুচলাচল নাই, এবং প্রায় এঞ্জিনের উপর স্থাপিত বলিয়া খুব গরম। পাখা নাই। স্নানাগার শৌচাগার কোথায় আছে দেখি নাই। শুনিয়াছি নীচের তলায় আছে। এরূপ বন্দোবস্ত অত্যন্ত অসুবিধাজনক, বিশেষতঃ নারীদের জন্য। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য বসিবার কোন বন্দোবস্তই নাই, এবং ছাদ এরূপ যে ঝড়বৃষ্টিতে মাথা বাঁচান দায়। আমরা রেলগাড়ীর কর্ত্তাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীনতার জন্য দোষ দি; কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা ষ্টীমারের কর্ত্তৃপক্ষদের চেয়ে ভাল। ষ্টীমারের তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য শৌচাগার যাহা আছে শুনিয়াছি, তাহার আলাদা আলাদা দরজা কপাট নাই। ইহা ব্যবহার করা পুরুষদের পক্ষেও লজ্জাকর, নারীদের পক্ষে অসম্ভব। বাঙালী এরূপ সহিষ্ণু অথবা জড়প্রায় জাতি, যে, এইরূপ বন্দোবস্ত ও ব্যবহার বহু বহু বৎসর ধরিয়া মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছে। পরাধীনতা মানুষের এমনি ক্ষতিই করে!

—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের মুক্তি

বিনা বিচারে রাজবন্দী সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিনাসর্ত্তে খালাস পাইয়াছেন। তিনি যে আবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইলেন, জনসেবার সুযোগ পাইলেন, ইহা আনন্দের বিষয়। তাঁহার নিকট হইতে, রাজবন্দীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, সে-বিষয়ে সর্ব্বসাধারণ অনেক খাঁটি খবর পাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে দেখা যাইত, যে, রাজবন্দীরা কোন কোন সর্ত্তে দস্তখত করিলে গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে খালাস দিতে রাজী আছেন। তাঁহার নিকট হইতে জানা গিয়াছে, যে, সর্ত্তগুলি এরূপ, যে, তাহাতে দস্তখত করিলে পরোক্ষভাবে নিজেকে অপরাধী বা অপরাধপ্রবণ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়; এবং ইহা মোটেই সত্য নহে, যে, দস্তখত করিলেই মুক্তি পাওয়া যায়। দস্তখত করান হইয়া গেলে গবর্মেণ্ট মুক্তি দিতে পারেন, না দিতেও পারেন।

খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, গবর্মেণ্টের সর্ত্তগুলি একজন রাজবন্দীর নিকট উপস্থিত করায় তিনি নিজে সরকার বাহাদুরকে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি পালন করিতে অনুরোধ করেন:—

১। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বন্দী করিয়া অন্যায় করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করুন ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন;

২। এতদিন তাঁহার স্বাধীনতা হরণ করার জন্য ক্ষতিপূরণ করুন;

৩। ভবিষ্যতে বিনাকারণে বিনাবিচারে তাঁহার নিগ্রহ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করুন।

সরকার বাহাদুর এই ন্যায্য অনুরোধের কি উত্তর দিয়াছেন, কাগজে তাহা লিখিত হয় নাই।

রাজবন্দীদের মধ্যে যাঁহারা বিখ্যাত লোক, তাঁহাদের মুক্তি আগে আগে হইতেছে, ইহা অসন্তোষের বিষয় নহে; কিন্তু তাঁহাদেরই সমান নির্দ্দোষ ও তাঁহাদের চেয়ে অধিকতর ভগ্নস্বাস্থ্য ও ব্যাধিগ্রস্ত রাজবন্দীদিগকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি না দেওয়ার কোন ন্যায্য কারণ দেখা যাইতেছে না।

—

অবলা-আশ্রম

খবরের কাগজে দেখিলাম, কলিকাতায় অবলা-আশ্রম নামে একটি আশ্রম আছে, তাহা দ্বারা অনেক বিপন্ন, সঙ্গীহারা, প্রতারিতা ও নানাভাবে নিগৃহীতা নারীর উপকার হইয়াছে, এবং আশ্রম স্থানাভাবে অনেককে জায়গা দিতে পারেন নাই। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন বৃত্তান্ত জানি না বলিয়া লিখিতে পারিলাম না। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে ইহার সাহায্য করিলে প্রীত হইব। ইহার ঠিকানা ও কর্ম্মীদের নাম সর্ব্বসাধারণকে জানান উচিত। আমরা কখনও ইহার রিপোর্ট পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। ইহা সত্য কথা, যে, আমাদের দেশের লোকেরা—বিশেষতঃ বাঙালীরা—জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট সাহায্য করেন না। কিন্তু সাহায্য-লাভার্থ বঙ্গের সকল প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট কর্ম্মিষ্ঠতা ও উদ্যোগ আছে, তাহাও বলিতে পারি না। আমাদের অজ্ঞতা অবশ্য অবলাআশ্রম ও তদ্বিধ অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের কারণ হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু সমস্ত দোষই যে বঙ্গীয় জনসাধারণের, এমন বোধ হয় না।

উদ্যোগিতা কাহাকে বলে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পাঞ্জাবের জালন্ধর কন্যামহাবিদ্যালয়ের কর্ম্মীরা একাধিকবার ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ও ব্রহ্মদেশে চাঁদা আদায় করিয়া বেড়াইয়াছেন। অন্য নানা উপায়েও দান সংগ্রহ করেন। সম্প্রতি ২৯শে শ্রাবণ রাখীবন্ধন (রক্ষাবন্ধন) শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁহারা তাঁহাদের সকল পরিচিত লোকের নিকট একটি রাখী, হিন্দী ও ইংরেজীতে একটি চিঠি এবং একটি করিয়া মনি-অর্ডারের ফারম পাঠাইয়া দিয়াছেন। হিন্দী চিঠিটির কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হমারে রক্ষকোঁ—

কন্যাওঁ কী রক্ষা করনা দেশ ঔর জাতি কা পরম ধর্ম্ম হৈ। দেশমর্য্যাদা কন্যাওঁকে সুরক্ষিত হোনে সে হী স্থির ঔর উন্নতিশীল রহ সকতী হৈ, অন্যথা নহীঁ।

ইস্ সময় কন্যাশিক্ষা মেঁ সহায়তা দেনা হমারী পরম সহায়তা হৈ। ইসী সে দেশ ঔর জাতি কী সেবা কে লিয়ে হম তয়্যার হো সকেঙ্গী।

হমারা কন্যামহাবিদ্যালয় হমারা পালন কর রহা হৈ। আপ ইস্ কী সহায়তা কী জিয়ে, ঔর ইস্ সে হমারে সচ্চে রক্ষক বনিয়ে।

আপ কী কন্যায়েঁ কন্যামহাবিদ্যালয় জালন্ধর কী ছাত্রায়েঁ।

—

অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিবিধায়ক সভা

এই সভা ১৯০৯ সাল হইতে অনুন্নত শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। ইহার ৪০৫টি বিদ্যালয় আছে। তাহাতে ১২,৫৯৮ জন ছাত্র ও ৩,৬৭৬ জন ছাত্রী শিক্ষা পায়। বঙ্গের ও আসামের ২০টি জেলায় এই বিদ্যালয়গুলি অবস্থিত। ইহার বার্ষিক ব্যয় ১৬০০০ টাকা। আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই সভাকে ৪,৫০০ টাকা খরচ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার হাতে এখন মোট ৩০০০ টাকা আছে। বাকী ১৫০০ টাকা শীঘ্র চাই। সভার কর্ম্মীদিগকে আমরা বিশেষভাবে জানি। একটি পয়সাও তাঁহারা অপব্যয় করেন না। সভার রিপোর্ট ১৪নং বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা, এই ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাওয়া যায়। যিনি যত বেশী টাকা পারেন তাঁহার নামে অবিলম্বে পাঠাইলে সভা ও সভার মারফৎ দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হইবেন। খুব কম সাহায্যও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

—

দুটি রেখাচিত্রের পরিচয়

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'যবদ্বীপের পথে' প্রবন্ধে যে দুইখানি রেখা-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয়ে কোনো কথা এই স্থলপথের বর্ণনায় নাই। আশ্বিনে সুনীতিবাবুর যে জাহাজের বর্ণনা বাহির হইবে, তাহাতে ইহাদের বিষয় লিখিত আছে।

—

চিত্র-পরিচয়

আনারকলি

লাহোরে আনারকলি বেগমের সমাধিমন্দির আছে। কথিত আছে যে, আকবর বাদশাহ তাঁহাকে ভাল বাসিতেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং যুবরাজ সলিমের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। আনারকলির প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

কালিম্পং-এর ভুটিয়া ভিখারী

কালিম্পংএর পথে পথে এই অন্ধ ভিখারীটিকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া যন্ত্রযোগে সে গান গায়, পথিকেরা যে যাহা দিয়া যায় তাহাই তাহার উপজীবিকা। চিত্রকর এই আত্মভোলা অন্ধ ভিখারীটির চিত্র তুলির সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। P. 144. 27.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩৪

৪র্থ সংখ্যা

ধর্ম্মবোধ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

কিছু দিন হ'ল আমার কাছে আমেরিকা থেকে দু'টি মহিলা এসে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন যে, ধর্ম্মশিক্ষা কি প্রণালীতে দেওয়া যেতে পারে। এই প্রশ্ন আমি নতুন শুনিনি, পাশ্চাত্যদেশে অনেকবার এ প্রশ্ন আমায় শুন্‌তে হয়েছে। বস্তুত আধুনিক কালে এই প্রশ্ন কঠিন হ'য়ে উঠেছে ব'লে উপলব্ধি করি। যখন তার কারণ চিন্তা করি তখন দেখি মানুষ তার নানা আকাঙ্ক্ষা, নানা উপকরণ, নানা উপায়ের মধ্যে নিজেকে বিক্ষিপ্ত ক'রে ফেলেছে। প্রকৃতি যে-পথ সহজে উন্মুক্ত ক'রে রেখেছিল, সে-পথে বাধা রোপণ ক'রে এখন তাকে চল্‌তে হয় পথ খুঁড়ে। সূর্য্যের আলোর মধ্যে একটি সহজ আরোগ্যশক্তি আছে, তার জন্য আমাদের চিন্তা কর্‌বার কোনো প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু যখন মানুষ নিজের চতুর্দ্দিকে দেয়াল তুল্‌তে লাগ্‌ল, সূর্য্যের আলোর পথ রুদ্ধ হ'য়ে গেল, তখন বাধা সত্ত্বেও প্রকৃতির সহজ শুশ্রূষার সুযোগ কি ক'রে পাওয়া যেতে পারে এই সমস্যা তাকে সমাধান কর্‌তে হয়। আকাশের সহজ রাস্তা বন্ধ ক'রে দুর্ম্মূল্য চিকিৎসাপ্রণালীর দুর্গম রাস্তা সন্ধান করার সময় আসে।

সচেতন জীবমাত্রকেই জ্ঞান সঞ্চয় কর্‌তে হয়। প্রকৃতি সহজেই তার মনের মধ্যে কৌতূহল উদ্রেক ক'রে দিয়ে এই কাজটি আদায় ক'রে নেয়। এই জানাটা সমস্যা নয় এটা আনন্দ। আমাদের আহার কর্‌বার ইচ্ছা আছে; সহজ অবস্থায় এটাকে বানিয়ে তুল্‌তে হয় না। যেমন খাদ্যের রসবোধ তেম্‌নি জ্ঞানের রসবোধ স্বাভাবিক। কিন্তু যেমনি স্বভাবের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে জ্ঞানশিক্ষাকে ক্লাসের মধ্যে পুরি, যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধি, তখনি জ্ঞানের স্বাদ চ'লে যায়। তাই এখন একটা চিন্তার কারণ হয়েছে বালক-বালিকাদের শিক্ষায় অনিচ্ছাকে কি কর্‌লে আবার ইচ্ছায় ফেরানো যেতে পারে, শিক্ষার সঙ্গে তার সহজ আনন্দকে আবার মেলানো যাবে কি ক'রে? শিক্ষা যে ঠিক পথে চল্‌ছে না, সকল দেশেই এসম্বন্ধে বোধ জেগেছে। জ্ঞানলাভ-ক্রিয়ায় বিদ্যালয়মাত্রেই আমার

মনের স্বধর্ম্মকে এতকাল উপেক্ষা ক'রে এসেছি, তাই আজ শিক্ষা একটা সমস্যা হ'য়ে উঠেছে।

জ্ঞানের সম্বন্ধে যে-কথা, ধর্ম্মবোধ-চর্চ্চার সম্বন্ধে তা' আরো বেশি ক'রে খাটে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা কারখানায় তৈরি পদার্থ হ'লে তা আপনি আপনার প্রতিবাদ করে। তাকে যদি বাহ্য পদার্থ ক'রে তুলি তবে তা ব্যর্থ হবে, কেননা সেটা আধ্যাত্মিক। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা সে তো ক্লাসে শেখাবার বিষয় নয়, বিশ্বের সর্ব্বত্র থেকেই যে তার উদ্বোধন। বন্ধুত্ব জিনিষটি কি তা জান্‌বার জন্যে বৈজ্ঞানিক বা তত্ত্বজ্ঞানীর দ্বারে যেতে হয় না, সহজ কথাটি এই যে, বন্ধু আনন্দ দেন। তেমনিই সহজ ক'রে উপনিষদের ঋষি বলেছেন,—এষহ্যেবানন্দয়াতি,—ইনিই আনন্দ দিয়ে থাকেন। বিশ্বে আমাদের আত্মা যা কিছুতেই আনন্দ পায় তার মধ্যে দিয়েই সেই পরমাত্মীয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। বিশ্বের মধ্যে যদি কোথাও আনন্দতত্ত্ব না থাকৃত তাহ'লে আপনার চরম-সত্যকে সন্ধান কর্‌বার ইচ্ছামাত্র থাকৃত না—তাহ'লে জড়নিয়মের চরকায় আমাদের জীবনের মুহূর্ত্তগুলি ঘুরে ঘুরে একটা লম্বা সুতো কেটে চল্‌ত যে পর্য্যন্ত না মৃত্যু এসে হঠাৎ তাকে নিরর্থক বিচ্ছিন্ন ক'রে দিত। "নিয়মের কল চলেছে" ব'লে মানুষের আত্মা কোনো দিন গান গায়নি। সে গেয়েছে, এষহ্যেবানন্দয়াতি—ইনিই আমাদের আনন্দ দেন। আনন্দের স্পর্শেই আত্মা আপন আত্মীয়ের সন্ধান পায়, বলে "এষোঽস্য পরম আনন্দঃ" আমাতে এতে আনন্দের সম্বন্ধ,—আইনের সম্বন্ধ নয়। যে অংশে আমি জড়, যে অংশে আমি অনাত্মা, সেই অংশেই আমি আইনে চালিত; যে অংশে আমি আত্মা, আমি স্বাধীন, সেই অংশে বিশ্বের মধ্যে আমি সেই সম্বন্ধের স্বাদ পাই যে-সম্বন্ধ আনন্দের। আমাদের চিত্তশক্তির অপূর্ণতাবশত সত্যের সুগভীর অনির্ব্বচনীয় রূপটি আমরা সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাইনে। পরম পুরুষ যিনি পরম এক তাঁর বাণী আমরা সেখানেই পাই যেখানে আমাদের অভিজ্ঞতায় একের উপলব্ধি একান্ত ভাবে ঘটে। সেই একই অনির্ব্বচনীয়। আমরা যাকে ভালোবাসি আমার চৈতন্যের মধ্যে সে একটি পরিপূর্ণ এক। পথের লোক, যারা হাজার হাজার নানাবিধ কত কীর সঙ্গে মিলিয়ে আছে, আমার কাছে যারা একরূপে স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়, তারা কেউ কেউ হয়ত আমার পরিচিত, কেউ কেউ হয়ত আমার কাজে লাগে, কিন্তু তাদের চরম ঐক্য আমার কাছে উপলব্ধিগোচর নয় ব'লে তারা আমাদের আত্মাকে আহ্বান করে না—অর্থাৎ আমার আত্মা আমার কাছে যেমন সুনিশ্চিত স্বপ্রকাশ এক, তারা তেমন নয়। কিন্তু আমার বন্ধু এক সত্যরূপে আমার আপনারি মত, এমন কি আমার আপনার চেয়েও সুস্পষ্ট। এইজন্যেই ভগবানকে ভক্ত বলেছেন, বন্ধু। বন্ধু অনির্ব্বচনীয়, বন্ধু আপনিই এক, আপনাতেই আপনি চরম। সত্যের সেই আত্ম-পর্য্যাপ্ত চরমতার রূপ আমরা সুন্দর পদার্থের মধ্যে দেখি। আমার চক্ষু হাজার হাজার জিনিষের উপর দিয়ে চ'লে যায়, কাউকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার করে না। পদ্মফুলকে করে। পদ্মফুল আপন রূপের ছন্দে আপনারি মধ্যে সম্পূর্ণ একটি এককে প্রকাশ কর্‌ছে। আমার কাছে সে বস্তু-নীহারিকার অংশ নয়, সে আপনিই চরম। সেখানে আমি সত্যের অনির্ব্বচনীয় একরূপকে দেখ্‌তে পাই—তাকেই বলি সুন্দর,—সে আমার কাছে আপনাকে এক-স্বরূপে উপলব্ধ করায় আপন সত্তাতেই,—কোনো প্রয়োজনের প্রলোভনে নয়, কোনো উপকারের আশ্বাসে নয়। তখন আমার মধ্যে যে-এককে জানি আমার বাইরে সেই এককে দেখ্‌তে পাই—সুন্দরের মধ্যে আত্মা আপনাকেই প্রসারিত দেখে, তাতেই আনন্দ। সত্যের এই অনির্ব্বচনীয় এক-স্বরূপকে বিশুদ্ধভাবে, নিষ্কামভাবে দেখ্‌বার জন্যে মনকে বিশুদ্ধ কর্‌বার প্রয়োজন আছে, কেননা সত্যের সুন্দর প্রকাশকে নিষ্কামভাবে অহৈতুকভাবে অনুভব করাতেই তার যথার্থ উপলব্ধি। এইজন্যেই ধর্ম্মসাধনার একদিকে চারিত্রের বিকাশ, আর একদিকে বোধশক্তির বিকাশ। জলাশয় খনন করা যেমন দরকার, জলধারা তার চেয়ে কম দরকার নয়।

যিনি সত্য, তত্ত্বরূপে তিনি এক, বোধরূপে তিনি আনন্দ। সেই অসীম এককে জ্ঞানের দ্বারা জেনে শেষ করা যায় না, আনন্দকে বোধের দ্বারা অনুভব করা যায়। তাই উপনিষদ বলেছেন :—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥

সত্যের সুগভীর রসরূপকে আত্মার মধ্যে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা, এবং সেই বোধের পূর্ণতা দ্বারাই সংসারের কর্ম্মকে পবিত্র করা, সুন্দর করা, মানুষের সঙ্গে জগতের সঙ্গে সম্বন্ধকে কল্যাণময় প্রীতিপূর্ণ করা এই যদি মানুষের জীবনের লক্ষ্য হয়, এবং সেই লক্ষ্যসাধনকেই যদি ধর্ম্ম-সাধন বলে, তবে তার প্রথম সরল শিক্ষাবিধি মনকে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত করা। সে তো ক্লাসের মধ্যে না, পুঁথির শ্লোকের মধ্যে সমাহিত হয়ে না। বিশ্বের মধ্যে অনির্ব্বচনীয়ের উপলব্ধি সেই বিশ্বের ক্ষেত্রেই কর্‌তে হবে। নানা কৃত্রিম বাধায় যদি তার সঙ্গে আমাদের আনন্দের পরিচয় প্রতিহত হয় তাহ'লে দিনে দিনে আমাদের চিত্তের সহজ বোধশক্তি অসাড় হ'তে থাকে, তখন বিশ্বব্যাপারে কেবল আমরা যন্ত্রকে দেখি, আত্মীয়কে দেখিনে, অর্থকে দেখি, পরমার্থকে দেখিনে। সেই বোধশক্তির বিকার যখন ঘটে তখনি ঈশ্বরকে কেমন ক'রে পাওয়া যেতে পারে এই প্রশ্নটি কঠিন সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। কেননা পূর্ব্বেই বলেছি আনন্দময়কে বোধের দ্বারাই পাওয়া যায়, জ্ঞানের দ্বারা নয়। সেই বোধকে উদ্বোধিত কর্‌বার প্রেরণা বিশ্বের সর্ব্বত্র আছে। আকাশে আলোকে তার বাণী। সেই বাণীর কাছে দ্বার খুলে রেখে দেওয়া, মনকে জাগ্‌তে দেওয়ার অবসর দেওয়া আমাদের সাধনার গোড়ার পথ। অধিকাংশ স্থলে সে পথ বন্ধ হয়েছে ব'লেই আমরা নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে পথ খুজে বেড়াই,—তাতে ফল যদি না পাই তাহ'লে চিত্তের অসারতা ও উপায়ের কৃত্রিমতাকে দোষ না দিয়ে ধর্ম্মের সত্যকেই অবিশ্বাস করি,—দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে আলোককে অস্বীকার করি, একথা ভুলে যাই, আলোক তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না, বোধের দ্বারাই পাওয়া যায়।

(২)

আমাদের ভারতবর্ষের সাধনার একটি বিশেষত্ব আছে। সে আমাদের জানায় বিশ্বের মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে, সেই আনন্দকে আপন চৈতন্যের ভিতর অনুভব করাতেই মুক্তি। আমি যখন ইউরোপে ছিলেম তখন এই বাণীটিই আমাকে প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষের দিকে টেনেছিল। সেখানে নানা চিন্তা ও কর্ম্মের ক্ষেত্রের মধ্যে জীবন-সমস্যা সমাধানের বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেম, কিন্তু মনের একটি ক্ষুধা কিছুতেই যাচ্ছিল না। উন্মুক্ত আকাশের মধ্যে, তরুলতার সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমাদের চিত্ত আনন্দিত হ'য়ে যে অমৃত গ্রহণ করে, তারই অভাব অনুভব করেছি। এবং এইটেও অনুভব করেছি যে, যারা লোক সমাজে নানা কাজে ব্যাপৃত, তারা এ অমৃতকে ভু'লে যায়। একে সমস্ত জীবনের অন্তর্গত ক'রে নিতে জানে না, একে বাইরের ভাবে দেখে। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যবশত য়ুরোপীয় প্রকৃতিতে কর্ম্মোদ্যম প্রবল। য়ুরোপীয় সাধক সেই কর্ম্মোদ্যমের মধ্যেই ব্রহ্মের সেবা কর্‌তে চান। এইটিও খুব বড় কথা, এইটিকে যেন আমরা শ্রদ্ধা করি, এই চেষ্টা যাঁদের মন থেকে প্রতিনিয়ত আকার পাচ্ছে তাঁদের প্রণাম করি। সেই সঙ্গে একথাও বল্‌তে হয় যে, ভারতবর্ষে যাঁরা বিশ্বের মধ্যে আত্মাকে প্রসারিত ক'রে ব্রহ্মকে অন্তরতম কর্‌তে চেয়েছেন, তাঁরাও বড় সাধনা করেছেন। যখন সমুদ্রপারে সেই লোকালয়ে নানা কোলাহলের মধ্যে ব্যস্ত হ'য়ে ছিলুম তখন আকাশের ডাকে ভারতবর্ষ আমাকে ডেকেছিল। আমার মনে একটি ক্ষুধা ছিল, সে-ই প্রবলরূপে আমাকে টেনেছিল। য়ুরোপের বড় বড় শহরের মধ্যে, জনতার কোলাহল ও কর্ম্ম-ব্যাপারের প্রবলতার মধ্যে প্রতিনিয়তই অন্তরে একটি আহ্বান শুন্‌তে পাচ্ছিলুম সেই সুবিপুল বস্তুবিরল অবকাশের, যার মধ্যে দাঁড়িয়ে ঋষিরা প্রণাম করেছিলেন :—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপসু যো বিশ্বং
ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়
নমো নমঃ।

—এই নমস্কারটির অভাব অত্যন্ত অনুভব করেছি। বারেবারে মনে পড়েছে আমার আবাস-গৃহের দ্বারে যে-গাছটি প্রত্যহ বাড়্‌ছে সে কি বাণী নিয়ে অপেক্ষা কর্‌ছে সূর্য্যোদয়ের ও সূর্য্যাস্তের আকাশের তলে দাঁড়িয়ে? সেই গাছটি একটি সহজ তানপূরার মত, তাতে জীবনসঙ্গীতের

একটি মূল সুর বাজ্‌ছে, যে সুর শান্তির সুর, সামঞ্জস্যের সুর। এই গাছ প্রাণের প্রথম জয়সঙ্গীত নিয়ে পৃথিবীকে প্রাণীদের বাসযোগ্য ক'রে তুলেছে। এর ফুলে পাতায় প্রাণের প্রথম সৌন্দর্য্য-বিকাশকে সব-চেয়ে সহজরূপে দেখ্‌ছি। এতেই যেন সুন্দরের মূল সুর, তাই যা কিছু সুন্দর, ফুলের সঙ্গে কবি তাকে যাচাই ক'রে দেখে। এই যে প্রাণ আপনার দুর্জ্জয় শক্তিকে সুন্দর ক'রে বিশ্ব জু'ড়ে নিয়ত প্রকাশ কর্‌ছে—এ যেন একটি গানের ভূমিকা, তার ধুয়া। এই ভূমিকা প্রাণ-সঙ্গীতের বিক্ষিপ্ত সুরগুলিকে সুন্দর একের পরিণতিতে সহজে মিলিয়ে দেবার কথা বল্‌ছে। সেইজন্যেই মানুষের ক্লান্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তকে বনস্পতি শান্তিতে অভিষিক্ত করে। বনের মধ্যে প্রাণের যে বেদমন্ত্র, শান্তিমন্ত্র অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে, আমাদের দেশের বনচারী ঋষিরা নিয়ত তা শুনেছেন, এই তরুচ্ছায়ায় নানা ঋতুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে এই নমস্কার-বাণী তাঁরা শুনেছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু যো বিশ্বং
ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়
নমো নমঃ।

—এবং এই বাণীদ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আত্মার যে যোগ সেটি সহজ হয়েছে। যেন মন দিই, যেন শুন্‌তে পাই সকাল-বেলার আলোক যে-সুরে বাজ্‌ছে, প্রত্যেক পল্লব পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, তৃণরাশি অঞ্জলি তু'লে ধ'রে আকাশকে বল্‌ছে—দাও দাও দাও, ভ'রে দাও। সেই সুর বাজে তোমার ঘরের দ্বারে যে গাছ দাঁড়িয়ে আছে তাতে, প্রভাতের আলোকে, রাত্রির অন্ধকারে, পত্রের মর্ম্মর-ধ্বনিতে, নানা ঋতুর উৎসবে। মনে মনে ভাবি কত বড় বাণী নেমে এল ধরণীতে, যেদিন তরু শ্যামল বেশে কিশোর প্রাণকে বহন ক'রে নিয়ে এল, প্রাণের পদধ্বনি দিনে দিনে ধ্বনিত হতে লাগ্‌ল বর্ণে গন্ধে রূপে। সেই গাছ আমার ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে। আমার যা প্রার্থনা তার আনুকূল্য কর্‌ছে। কৃতজ্ঞচিত্তে আনন্দিতভাবে সহজবোধের সঙ্গে এটিকে যদি দেখি তবে পৃথিবীতে আনন্দ-লোককে ঘরের দ্বারে পেতে পারি, নইলে অন্য কোথাও তা পাব না। গানে আছে "বাজাও আমারে বাজাও," যে সুর সহজ হ'য়ে বাজ্‌ছে তরুলতার মধ্যে, অবিকৃত হয়ে বাজ্‌ছে শিশুর প্রথম হাসিতে, যে সুর বাজ্‌ছে সন্ধ্যা-মালতীর গোপন সুরে, যে সুর বাজ্‌ছে ধরণীর ধূলিতে বিচিত্র বর্ণে বর্ণে—সেই সহজ সরল সুরের মত ক'রে সুন্দর কর, সার্থক কর, বাজাও আমারে বাজাও।

প্রাচীন ভারতীয় রাজকোষের আয়-ব্যয়

অধ্যাপক শ্রী রাধাগোবিন্দ বসাক

প্রাচীনকালে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা কত হারে বাৎসরিক বেতন উপভোগ করিতেন এবং তাহা কিরূপে রাজসরকারে আয়-ব্যয়-তালিকার (Budget) খরচ দিকে ভুক্ত হইত তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শাসন সংরক্ষণে প্রধান কর্ম্মচারীদের বেতন

ঋত্বিক্, আচার্য্য ও মন্ত্রী (Prime-minister), রাজ-পুরোহিত, সেনাপতি (Commander-in chief), যুবরাজ (Crown-Prince), রাজমাতা (Dowager Queen) ও পট্টমহিষী এই আটজনের প্রত্যেকের বাৎসরিক বেতন ৪৮০০০ পণ (১ পণের মূল্য আনুমানিক ৷৵০ হিসাবে ধরিলে বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ৩০০০০৲ টাকা) অর্থাৎ মাসিক প্রায় ২৫০০৲ টাকা করিয়া ধার্য্য ছিল। দৌবারিক (Lord Mayor of the Palace or Inspector-

General of Palace Police), অন্তর্বংশিক (অন্তঃপুরের শ্রেষ্ঠ রাজভৃত্য), প্রশাস্তা (বন্ধনাগারাধিকৃত), রাজস্ব-বিভাগের সমাহর্তা (Collector-General of King's revenue) ও সন্নিধাতা (কৃত্যাকৃত্যবিষয়ে অর্থের বিনিয়োক্তা = Chancellor of the Exchequer), এই পাঁচজনের প্রত্যেকে ২৪০০০ পণ লইতেন। অন্যান্য রাজকুমার ও তাঁহাদের মাতারা (অর্থাৎ যাহারা পট্টমহিষী নহেন), নাগরিক (City Governor), পৌর-ব্যবহারিক (Chief Justice of the City), কার্মান্তিক (খনি প্রভৃতি রাজকীয় শিল্পবাণিজ্যাদির প্রধান অধ্যক্ষ), মন্ত্রিপরিষদের অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রপাল ও অন্তপাল—ইঁহারা প্রত্যেকে ১২০০০ পণ হিসাবে পাইতেন। শ্রেণীমুখ্য, হস্তিমুখ্য, রথমুখ্য ও প্রদেষ্টা (কণ্টকশোধনাধিকৃত, District Executive Officer) প্রত্যেকে ৮০০০ পণ হিসাবে এবং সেনাবিভাগের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির অধ্যক্ষগণ প্রত্যেকে এবং দ্রব্যবনপাল (Chief forest-conservator) ও হস্তিবনপাল ৪০০০ পণ হিসাবে পাইতেন। রথচর্য্যাশিক্ষক, রাজভিষক্, অশ্বদমক, বর্দ্ধকী, (Chief Engineer), যোনিপোষক (Firm overseer) ইহাদের বেতন ২০০০ পণ হিসাবে। সুরাধ্যক্ষ, সূণাধ্যক্ষ প্রভৃতি নিম্নবর্ত্তী অধ্যক্ষগণের প্রত্যেকের বেতন ১০০০ পণ। সংখ্যায়ক (Accountant), লেখক, প্রভৃতি ছোট ছোট রাজভৃত্যেরা বৎসরে ৫০০ পণ পাইতেন। এইভাবে নিয়োগের তারতম্যানুসারে কর্ম্মচারীরা ৫০০, ২৫০, ১২০ ও এমন-কি ৬০ পণ পর্য্যন্ত বেতন লাভ করিতেন। কিন্তু কাপটিক প্রভৃতি চারগণের প্রত্যেকের বেতন ছিল ১০০০ পণ করিয়া। কেবল যে আজকালই উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারীদের কর্ম্মকরণাবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু ঘটিলে—রাজা মৃত ব্যক্তির পোষ্য পুত্রদারাদির ভরণ-পোষণের সহায়তার জন্য রাজকোষ হইতে অর্থাদি দানের ব্যবস্থা করেন তাহা নহে, প্রাচীনকালেও এরূপ মৃত ব্যক্তির পুত্রদারগণ ও তাহার পোষ্যবর্গের মধ্যে যাহারা বালবৃদ্ধ বা ব্যাধিত তাহারাও রাজার অর্থানুগ্রহ লাভ করিতেন। ["কর্ম্মসু মৃতানাং পুত্রদারা ভক্তবেতনং লভেরন্ · বালবৃদ্ধব্যাধিতাশ্চৈষাং অনুগ্রাহ্যাঃ" ইতি কৌটিল্যঃ]। রাজসরকারে বিভিন্ন বিভাগের স্থিতি-নিবন্ধন এইরূপ রাজকোষের ব্যয়ের বিধান ব্যবস্থিত ছিল। রাজভৃত্যগণের কার্য্যপটুতা ও পারদর্শিতা লক্ষিত হইলে—তাহাদের বেতন-বৃদ্ধির ব্যবস্থাও হইত।

সরকারী ঋণ

নৃপতিগণ সংগৃহীত রাজস্বের এক চৌথদ্বারা শাসন-ব্যয় নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টাই করিতেন। সে-কালে রাজগণ সঞ্চয়প্রথা বেশ মানিয়া চলিতেন। কামন্দক তাঁহার নীতিসারে লিখিয়াছেন, কোষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই কোষেরই প্রশংসা করিতেন যাহা প্রয়োজনীয় ব্যয় সহিতে পারিত—"ধর্ম্মার্জ্জিতঃ ব্যয়-সহঃ কোষঃ কোষজ্ঞ-সম্মতঃ"। কি কি উদ্দেশ্যে কোষ-সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাহার উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন "ভৃত্যানাং ভরণং দানং ভূষণং বাহনক্রয়ঃ। স্থৈর্য্যং পরোপজাপশ্চ দুর্গসংস্কার এবচ ॥ সেতুবন্ধ-বণিক্‌কর্ম্ম-প্রজামিত্র-পরিগ্রহঃ। ধর্ম্মকর্ম্মার্থ-সিদ্ধিশ্চ কোষাদেতৎ প্রবর্ত্ততে ॥ কোষ-মূলো হি রাজেতি প্রবাদঃ সার্ব্বলৌকিকঃ এতৎ সর্ব্বং জহাতীহ কোষব্যসনবান্ নৃপঃ ॥" (১৪।৩১-৩৩) উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত বিষয়গুলির ব্যয়-বহন করিতে হইলে রাজকোষ সর্ব্বদাই নানারূপ ধনরত্নে পূর্ণ রাখিতে হইত; এবং রাজকোষ পূর্ণ থাকিত বলিয়াই সম্ভবতঃ রাজগণকে যুদ্ধবিগ্রহ কিম্বা জনসাধারণের যোগক্ষেমকর অন্য কোনও আত্যায়িক কার্য্যের খরচ কুলাইবার জন্য সরকারী-ঋণ (Public debt) পদ্ধতির আশ্রয় লইয়া ধারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার সুদ দেওয়ার জন্য ও পরে মূলটাকার পরিশোধের জন্য রাজকোষের ব্যয় বৃদ্ধি করিতে ততটা বাধ্য হইতে হইত না। তবে আপদকালে বৃদ্ধি বা সুদ দ্বারা অর্থগ্রহণ যে কতকটা বিধেয় ছিল, তাহা শুক্রাচার্য্যও বলিয়াছেন, যথা—"ধনিকেভ্যো ভৃতিং দত্বা স্বাপত্তৌ তদ্ধনং হরেৎ। রাজা স্বাপৎসমুত্তীর্ণস্তৎ স্বং দদ্যাৎ সবৃদ্ধিকম্ ॥ (৪।২।১১) অর্থাৎ বিপদ উপস্থিত হইলে ধনিকের নিকট হইতে বৃদ্ধিস্বীকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, পরে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলে তিনি তাহা সুদ সহ পরিশোধ করিবেন। কিন্তু দণ্ড-সম্ভূত অর্থ ও ভাগধেয় ও শুল্ক যদি নাও লাভ করেন,

তথাপি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত সৈন্য রক্ষিত হইতে পারে এতটা অর্থ সর্ব্বদা তিনি কোষে সঞ্চিত রাখিবেন ["দণ্ড-ভূভাগ শুল্কৈস্তু বিনা কোশাদ্ বলস্য চ। সংরক্ষণং ভবেৎ সম্যগ্ যাবদ্ বিংশতি বৎসরম্। তথা কোশস্তু সন্ধার্য্যঃ স্বপ্রজা-রক্ষণক্ষমঃ" ॥ (৪।২।১৩)

অর্থ ব্যসনে "প্রণয়" সংজ্ঞক করাদি

রাজকোষের যতটা আয় হইবে তদপেক্ষায় অল্প ব্যয়ে শাসনকার্য্য সমাধা করিয়া রাজা অবশিষ্ট নীবী নামক ধন-কোষে প্রবেশ করাইয়া রাখিবেন, যেন বিপদে তদ্দ্বারা উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। পূর্ব্বে একবার কথিত হইয়াছে যে, রাজা শাস্ত্রানুমোদিত কর ব্যতীত অন্য কোন অত্যাচারমূলক করাদি নিরুপদ্রব সময়ে সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। কিন্তু রাজ্যে যুদ্ধাদিরূপ কোন উপদ্রব ও উপপ্লবাদি উপস্থিত হইলে কিম্বা রাজকোষে কোন কারণে ধনের হ্রাস লক্ষিত হইলে, তিনি প্রজা-বর্গকে তাহা না জানিতে দিয়া, কিরূপ কৌশলে কোষবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন তাহার কিছু উল্লেখ এই স্থানে করা হইতেছে। এইসমস্ত উপায় সম্পূর্ণভাবে ন্যায়ানুমোদিত না হইলেও বিপদ্-সময়ের আত্যয়িক উপায় বলিয়া তাহা ক্ষন্তব্য বিবেচিত হইতে পারে। দৃশ্যতঃ অন্যায্য হইলেও, রাজা যে ইহা অবলম্বন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বে নৃপতিগণ প্রচলিত শাস্ত্রবিহিত করাদির আয় দ্বারা অনেক সময় রাজ্যশাসন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া উঠিতে সমর্থ হইতেন না,—তাই অর্থব্যসন উপস্থিত হইলে রাজগণ যে যে উপায়ে কোষ পূর্ণ করিতে পারেন তাহারও বর্ণনা প্রাচীন রাজ-নীতি-শাস্ত্রে লিখিত পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ অবগত আছেন যে, প্রাচীন রাজারা কেহ কেহ অর্থকৃচ্ছ্রে পড়িয়া অবিশুদ্ধ ধাতু-মুদ্রাও নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা বাজারে প্রচলিত করাইয়াছেন। মুসলমান আমলেও প্রত্যেকের বাধ্যতামূলক যে কর রাজদেয় ছিল তাহা 'আসল' বলিয়া গৃহীত হইত এবং অর্থব্যসনসময়ে রাজা যে অতিরিক্ত কর উঠাইয়া লইতেন তাহাকে 'আবওয়াব' বলা হইত। প্রাচীন রাজগণ এইরূপে যে অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করিতেন—তাহার নাম ছিল 'প্রণয়'-কর, ইহা মাগিয়া বা যাচ্ঞা করিয়া লইতে হইত। কি কর্ষক শ্রেণী, কি বণিক্ শ্রেণী যাহাদের উপর যে হারে ভাগ ও করাদি দেওয়া নিয়মিত ছিল কৃচ্ছ্রসময়ে তাহাদের নিকট হইতে তদপেক্ষা বর্দ্ধিত হারে করাদি যাচ্ঞা দ্বারা বাড়াইয়া লইতে পারা যাইত। কর্ষকগণের নিকট ষড্ভাগের পরিবর্ত্তে তৃতীয় বা চতুর্থ ভাগও যাচিত হইত। এই অতিরিক্ত করের সংগ্রহ-ব্যাপারে অরণ্যজাত দ্রব্য ও শ্রোত্রিয়ের অর্থ স্পৃষ্ট হইতে পারিত না। অনেক বিপদের সময় রাজস্ব-বিভাগের রাজকর্ম্মচারিগণ কৃষকগণ দ্বারা গ্রীষ্মে ক্ষেত্রের অতিরিক্ত আবাদ করাইয়াও অর্থলাভের উপায় করিয়া লইতেন। এমন-কি কুশীলব (নাট্যব্যবসায়ী ও রূপাজীবা (বেশ্যা) নিজ নিজ স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধ-ভাগ রাজাকে বিপদ্ সময়ে দিতে বাধ্য হইত। মনে রাখিতে হইবে যে, এই বর্দ্ধিত হার অস্থায়ী। বৎসরে একবারের অধিক এইরূপ প্রণয় করের সংগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। ব্যসন কাটিয়া গেলেই পূর্ব্ব প্রচলিত হারে কর চলিতে থাকিবে। এইভাবে বিশেষ অর্থলাভ না হইলে, সাধনীয় কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যের ভাণ করিয়াও রাজা সমাহর্ত্তার সহায়তায় পৌরজানপদগণের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিতে পারেন এবং নিজ কর্ম্মচারিগণকে সর্ব্বাগ্রে সেই কার্য্যের নিষ্পাদন জন্য চাঁদারূপে অতিমাত্রায় অর্থ দেওয়াইতেন। তৎপর ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট নগদ টাকা চাঁদারূপে চাহিয়া লইতেন। রাজকোষের এইরূপে কৃচ্ছ্রসময়ে যাঁহারা অর্থ-সাহায্য করিতেন রাজা তাঁহাদিগকে পদ-পদক-ভূষণাদিরূপ বহুমান চিহ্ন প্রদান করিতেন। অর্থ-ব্যসনে পাষণ্ড দ্রব্য, সংঘদ্রব্য ও দেবদ্রব্যও ছলে গৃহীত হইত। দেবতাধ্যক্ষের সমায়ত্তা লইয়া রাজা নগরে ও জন-পদে প্রতিষ্ঠিত দেবতাগণের সম্পত্তি ও অর্থও একত্র সংগৃহীত করাইয়া লইতেন। অনেক সময় এক রাত্রির মধ্যেই দেবতার চৈত্য ও সিদ্ধ পুরুষের পীঠস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসমীপে যাত্রা-তামাসার ব্যবস্থা করাইয়াও অর্থ সংগ্রহের উপায় করিতেন। দেবতা ও দানবের নানারূপ দৃষ্টি-ভয় দেখাইয়া তৎপ্রতীকারার্থ নগদ টাকা উঠাইয়া লইয়া তদ্দ্বারাও রাজকোষে অর্থাগমের

চেষ্টা করিতে ত্রুটি করা হইত না। প্রাচীন ভারতের চার প্রথা যে কিরূপ পাকাভাগে গঠিত ছিল—অর্থকৃচ্ছে অর্থলাভ জন্য উদ্ভাবিত উপায়ের প্রসঙ্গেও তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গূঢ়পুরুষ বা গুপ্তচরদিগের সাহায্য দ্বারাও রাজা ও রাজামাত্যগণ অনেক অসাধু উপায়ে টাকা উঠাইয়া লইতেন। তবে এই উপায়গুলি দূষ্য অর্থাৎ রাজদ্বেষী ও অধার্ম্মিক ব্যক্তিদের উপরই প্রযুক্ত হইত—ধার্ম্মিক বা সাধুপ্রকৃতিক ব্যক্তিদের উপর নহে। কখন সিদ্ধ পুরুষের বেশধারী চর জম্ভকবিদ্যা বা মায়াবিদ্যার বলে লোককে ধনাঢ্য করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখে বলিয়া প্রকাশ করিয়া রাজদ্বেষীকে কৌশলে সর্ব্বস্ব-হরণের পথে আনয়ন করিত। কখন বণিকের বেশধারী চর বৃহদাকার কোন বাণিজ্যের ছলে অন্যের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া নগদ টাকা ঋণস্বরূপ লইয়া পরে সেই উত্তমর্ণের অর্থশোষণের উপায় করিয়া লইত। কখনও সাধ্বী নারীর বেশধারিণী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক দ্বারা দূষ্যজনকে উন্মাদিত করিয়া গুপ্তচরেরা সেই স্ত্রীলোকের বাড়ীতেই সেই ব্যক্তিকে ধরাইয়া দিয়া রাজদ্বারে তাহার সর্ব্বস্ব-হরণের ব্যবস্থা করাইতে পারিত। এইরূপ মাতৃব্যঞ্জনা স্ত্রীলোকদ্বারা ও ভৃত্যব্যঞ্জন, কর্ম্মকরব্যঞ্জন, চিকিৎসকব্যঞ্জন প্রভৃতি গূঢ়পুরুষ দ্বারা—পুত্রমারণ বেতন দানে কূট মুদ্রাদান, কূটমুদ্রা নির্ম্মাণার্থ যন্ত্রাদি উপকরণ প্রাপ্তি, ঔষধছলে বিষ প্রয়োগ প্রভৃতি নানাপ্রকার ছল প্রযুক্ত দোষের উদ্ভাবন করিয়া দুষ্ট লোকদের সর্ব্বস্ব হরণ করাইয়া রাজা অর্থকৃচ্ছ্র-সময়ে কোষসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রের কার্য্যবশতঃ এইরূপ অন্যায্য রীতিদ্বারা অর্থসংগ্রহ অনেকেই সমর্থন করিতে পারেন। মহাভারতের একস্থানে উল্লিখিত আছে—"ন কোশঃ শুদ্ধশৌচেন ন নৃশংসেন জাতুচিৎ। মধ্যমং পদমাস্থায় কোশ-সংগ্রহণং চরেৎ।" সুতরাং কেবল পবিত্র উপায়ে সর্ব্বদা কোষসঞ্চয় সম্ভাবিত নহে। শুক্রাচার্য্যের মতেও বিপদ উপস্থিত হইলে রাজা দণ্ডলব্ধ ও ভূমিলব্ধ করের ও বাণিজ্যলব্ধ শুল্কের বৃদ্ধিদ্বারা অর্থাগমের উপায় করিয়া লইতে পারিতেন ; এমন-কি তীর্থভূমি ও দেবদর্শনজনিত করও গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—"দণ্ডভূভাগ শুল্কানামাধিক্যাৎ কোশবর্দ্ধনম্। অনাপদি ন কুর্ব্বীত তীর্থদেবকরগ্রহাৎ॥" শত্রুর বিনাশ জন্য সৈন্য সংরক্ষণে উদ্যত নৃপতির বিশিষ্ট দণ্ড ও শুল্কাদির গ্রহণ তিনি অনুমোদন করেন।

রাজকোষ-সম্পর্কীয় রাজকর্ম্মচারী—সন্নিধাতা সমাহর্ত্তা প্রভৃতি

রাজকোষ-সম্পর্কীয় রাজভৃত্যগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইলেন "সন্নিধাতা"। কোষে প্রবেশ্য সর্ব্ববিধি দ্রব্য ও নগদ টাকা তিনি সম্যগ্‌ভাবে নিধান করেন বলিয়া তাহার নাম "সন্নিধাতা।" নানা শ্রেণীর নিম্নস্থ কর্ম্মচারী সহায়রূপে লইয়া নিচয় কর্ম্ম অর্থাৎ দ্রব্য-হিরণ্যরূপ রাজস্ব সংগ্রহ করাই তাহার কাজ ছিল। তিনি অষ্টাদশ "তার্থের" একতম,—মহামাত্য বা মহামাত্র পর্য্যায়-ভুক্ত রাজকর্ম্মচারী। ইংরেজীতে তাঁহাকে "Chancellor of the Exchequer" বলা যাইতে পারে। রাজার কোষ-গৃহ (স্বর্ণরত্নাদি নিধানস্থান) পণ্যগৃহ (বিক্রেয় দ্রব্য সন্নিবেশ স্থান), কোষ্ঠাগার (উদরোপযোগী তৈল-ঘৃতাদি-নিক্ষেপস্থান) কুপ্যগৃহ (সারদারু বেণু প্রভৃতি রক্ষণস্থান), আয়ুধাগার ও বন্ধনাগার এই ছয়টি বিভাগের উপর অবেক্ষণ-ভার তাঁহার উপর সমর্পিত থাকিত। সুতরাং কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি ছয়টি অধ্যক্ষের উপরেও তাঁহার অধিকার বিস্তৃত ছিল। তাঁহাকে রূপ-দর্শকের পরীক্ষিত রত্ন ও হিরণ্য এবং মাপ-বিষয়ে অন্যূন ও নূতন ধান্য, পণ্য, কুপ্য ও আয়ুধ সংগ্রহ করিতে হইত। এই ধনের আহরণ ব্যাপারে কোনও প্রকারের বিপর্য্যয় ঘটিলে তিনি অপরাধীকে দণ্ড-বিধি আইনঅনুসারে দণ্ড দেওয়াইতে পারিতেন। সন্নিধাতার আরও একটি চমৎকার কর্ত্তব্য ছিল। বিগত এক শত বৎসরের জনপদোত্থিত ও নগরোত্থিত আয়ের হিসাব তাঁহাকে জানিয়া রাখিতে হইত। জিজ্ঞাসা মাত্র তাহা তিনি বলিয়া দিতে পারিতেন। কোষের ব্যয়িতাবশিষ্ট (balance) তাঁহার জানা থাকা চাই।

নানাভাবে উৎপন্ন রাজস্বের পারিভাষিক নাম সমুদয় (Revenue)। এই সমুদয়ের প্রবর্ত্তনকারী উচ্চপদস্থ মহামাত্যের নাম সমাহর্ত্তা। দুর্গাদি পূর্ব্বোল্লিখিত সাতটি

ধনাগম স্থানের অধিপতিরূপে তিনি কাজ করিতেন। রাজবিধি অনুসারে প্রাপ্য যাবতীয় রাজস্বের সমাহরণ-কার্য্য এই অমাত্যের উপর ন্যস্ত থাকিত। তাঁহার এক-মাত্র লক্ষ্য থাকিত কেমন করিয়া রাজ্যের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংক্ষেপ হয়। তদ্বিপরীত কিছু হইলে তাহার প্রতীকার-চেষ্টাও তাহার কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জনপদের চতুর্ভাগের উপর স্থানীক নামক যে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন এবং যাঁহার অধীনস্থ হইয়া দশগ্রামাধিপতি বা পঞ্চগ্রামাধিপতিরূপে গোপনামক রাজ-পুরুষ কার্য্য করিতেন তাঁহারা সকলেই এই সমাহর্ত্তার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া রাজাদের কর-শুল্কাদি সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু দুর্গ বা নগরের স্থানীক ও গোপগণ সমাহর্ত্তার তত্ত্বাবধানে না থাকিয়া নাগরিকের (City-governer) অধীন থাকিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। নগরের গোপগণের অধিকার স্থান-বিশেষে দশকুল, বিংশতিকুল অথবা চত্বারিংশৎ কুলের উপর বিস্তৃত। সে যাহা হউক,—কোন গ্রাম বা কুল হইতে রাজার কি পরিমাণ ধান্য, পশু, হিরণ্য কুপ্য ও বিষ্টি উত্থিত হয়, কোন গ্রাম বা কুল পরিহার (কর-মুক্তি) ভোগ করে, কোন গ্রাম বা কুল সৈন্য-বিভাগের জন্য কত লোক যোগাইয়া দেয়, কোন গ্রাম বা কুলের সীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, নানাবিধ শস্যাদির উৎপত্তি জন্য কোন গ্রামে কত প্রকার ক্ষেত্র আছে, কোথায় কতটি কর্ষক, গোরক্ষক, বণিক, কারুকর, কর্ম্মকর ও দাস আছে, এবং কত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু আছে, প্রত্যেক বাড়ীতে কত সংখ্যায় কুলপুরুষ ও কুলস্ত্রী আছে এবং তন্মধ্যে কাহার কত বয়স, ব্যবসায় ও চরিত্র, কাহার কিরূপ জীবিকা দ্বারা কত আয় ও কুটুম্ব ভরণের জন্য কাহার কত ব্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলি এই কর্ম্মচারিগণ নিবন্ধ-পুস্তকে (record) লিখাইয়া রাখিতেন। নিয়মিত ভাগধেয় ও শুল্কাদি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলে সমাহর্ত্তা প্রদেষ্টা-পুরুষদের সহায়তা লইয়া প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে পারিতেন। অর্থ লোভে রাজকর্ম্মচারিগণ রাজার প্রাপ্য অর্থের কোনরূপ ক্ষয় ঘটাইয়া দেন এবং প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন না করেন তজ্জন্য সমাহর্ত্তৃগণ নানা-ব্যঞ্জন-গূঢ় পুরুষদের সাহায্য লইয়া কাজ করিতে পারিতেন।

গাণনিক প্রভৃতি হিসাব রক্ষকগণ

প্রত্যেক বিভাগীয় অধ্যক্ষকে তাঁহার অধীনস্থ কার্ম্মিক কারণিক প্রভৃতি কর্ম্মচারী দ্বারা যথা-সময়ে নিজ বিভাগের সর্ব্বপ্রকার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিবন্ধ-পুস্তকে লিখাইয়া লইতে হইত এবং বৎসরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা অক্ষপটলে (record office) গণনানিযুক্ত রাজপুরুষদের (গাণনিকদের) ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মহাক্ষপটলিকের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইত। যথাসময়ে হিসাব না দিতে পারিলে কার্য্যের প্রকার-ভেদে অধ্যক্ষগণের বিভাগীয় হিসাব-রক্ষকগণকে হিসাব প্রস্তুত করিবার জন্য অতিরিক্ত সময় লইয়াও দিতে পারা যাইত। হিসাবে ভুল-ভ্রান্তি লক্ষিত হইলে তাঁহাদিগকে, এমন-কি, তাঁহাদের অধ্যক্ষকেও দণ্ডভোগ করিতে হইত এবং রাজ-সরকারের কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাহাদিগকে তাহা যথানিয়মে পূরণ করিয়া দিতে হইত।

রাজকোষ হইতে অর্থ ব্যয়ের মূল ক্ষমতা কাহাতে পর্য্যবসিত ?

রাজকোষ হইতে প্রজাহিতকর প্রয়োজনীয় কার্য্যে অর্থ ব্যয় করার জন্য মূল দায়িত্ব কাহার ছিল এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদয় হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে রাজস্ব-সচিবই (Finance Member) প্রধানতঃ রাজস্ব কমিটির (Finance Committee) সহায়ে এই ব্যাপারে দায়ী ও ক্ষমতাবান্ এবং প্রজার যোগক্ষেমবহ কার্য্যাবলীতে অর্থ-ব্যয়ের অর্থ নির্দ্দেশ তিনিই করিয়া দিতে পারেন সত্য, কিন্তু ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যগণের অনুমোদন ও সমর্থন না পাইলে অনেক বিষয়ে তিনি সেই খরচ করিয়া বা করাইয়া লইতে পারেন না। তারপর শাসন-কর্ত্তাদের যে অসীম ক্ষমতা রহিয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহারা সর্ব্ব-প্রকার আয়-ব্যয়ই সিদ্ধ করিয়া লইতে পারেন। প্রাচীন কালেও দেখা যায় যে, নূতন দুর্গ-নগর-জনপদ-নিবেশ, নূতন ক্ষেত্রাদির আবাদ, কি সন্ধি-বিগ্রহাদিরূপ ব্যয়বহুল ক্রিয়াকলাপে তজ্জন্য তৎতদ্-বিভাগীয় সরকারী অধ্যক্ষ-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া সন্নিধাতৃ-নামক যে প্রধান অমাত্যের কথা এই মাত্র বলা হইয়াছে, তিনি না হয় রাজকোষ হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ বাহির করিয়া দিলেন,

কিন্তু কোষসম্বন্ধীয় আয়ব্যয়ব্যাপারে মূল ক্ষমতা মন্ত্রি-পরিষদের হস্তেই পর্য্যবসিত ছিল, কারণ রাজা মন্ত্রি-পরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়া রাজকোষ-সম্বন্ধে কোন নীতিই অবলম্বন করিতে পারিতেন না। মনুর মতও এই বিষয়ে স্পষ্ট। তিনি বলেন (মনুসংহিতা, ৭।৫৬ ইত্যাদি) সমুদয়-নিরূপণ (রাজস্ব-নিরূপণ) ও লব্ধ-প্রশমন অর্থাৎ লব্ধকোষের সৎকার্য্যে বিনিয়োগ এই উভয় কার্য্যে রাজা সচিবগণের সহিত চিন্ত-পরামর্শ করিবেন। তদীয় অর্থশাস্ত্রে রাজতন্ত্র রাজ্যেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া মহামতি কৌটিল্য পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত উত্থাপন করিয়া ইহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে-সমস্ত গুরুতর বিষয়ের জন্য রাজাকে অমাত্যবর্গের পরামর্শের উপরই নির্ভর করিতে হইত তন্মধ্যে রাজ্যের আয়-ব্যয় কর্ম্ম একতম। সুতরাং প্রাচীন কালে করাদি-দ্বারা রাজকোষে হিরণ্যাদির উৎপাদন ও উৎপাদিত হিরণ্যাদির প্রয়োজনীয় কার্য্যে বিনিয়োগ এই উভয় কার্য্যই মন্ত্রি-পরিষদের উপরই মূলতঃ অর্পিত ও পর্য্যবসিত ছিল। অন্য ভাবে দেখিতে গেলে ইহাও বলা যায় যে, রাজস্ব সেকালে প্রজার আয়ত্ত ছিল, কারণ রাজা অত্যুৎপীড়ক হইলে প্রজাবর্গ রাজদেয় কররূপ ভৃতি বন্ধ করিয়া দিয়া নূতন রাজ নির্ব্বাচনের উদ্যোগী হইয়া উঠিত। প্রাচীন রাজনীতি-শাস্ত্রে এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

উপসংহার

উপসংহারে এই বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বকালের ভারতীয় নৃপতিগণ রাজকোষ কি প্রকারে রাজপুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষিত হইতে পারে, কি উপায়ে রাজ-প্রাপ্য শস্য ও পণ্য-সম্পৎ বৃদ্ধি পায়, কিসে দৈব-জনিত উপসর্গাদি নিবারিত থাকে, কিসে পরিহার-ভূমির হ্রাস পায়, কি রকমে বা নগদ মুদ্রার সঞ্চয় ঘটে ইত্যাদি বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন এবং কোন নিযুক্ত রাজভৃত্য রাজকোষস্থিত ধন-সম্পত্তি গোপনে নিজলাভের লোভে বৃদ্ধি বা সুদে প্রয়োগ না করেন, রাজ-পণ্য দ্বারা নিজে বাণিজ্য ব্যবসায় না করেন, উৎকোচাদি লোভে আদায়ের নিয়মিত সময়ে রাজস্ব আদায় না করেন, নির্দ্দিষ্ট আয়ের পরিহানি না ঘটান ও ব্যয়বৃদ্ধি না করেন, অথবা রাজ-দ্রব্যের ভোগ স্বয়ং না করেন, রাজার প্রাপ্য উত্তম দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে রাজকোষের জন্য অসার বস্তু গ্রহণ না করেন, কিম্বা উৎপন্ন সম্পূর্ণ আয় নিবন্ধ-পুস্তকে আরোপিত না করেন বা পুস্তকারোপিত ব্যয় জন্য চিহ্নিত অর্থ খরচ করিতে না দেন এবং আয়-ব্যয়ের পর অবশিষ্ট নীবী নামক শুদ্ধ আয় রাজকোষে প্রবেশ না করেন তৎপ্রতিও তাঁহারা সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিতেন। যেখানে প্রজার মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সভ্যতা প্রবিষ্ট, যেখানে জাতির বিদ্যাবুদ্ধিজনিত গৌরব অক্ষুণ্ণ—সেখানে, কি প্রাচীনকালে, কি মধ্যযুগে, কি বর্ত্তমানে সর্ব্ব সময়েই রাজগণকে প্রায় একই উদ্দেশ্যে—প্রজার হিতের জন্যই—রাজ্য পরিচালন করিতে হইয়াছে ও হয়, তবে বিভিন্ন, সময়ের কার্য্য-প্রণালীর পার্থক্য মাত্র লক্ষিত হয়—এই বিশেষ।

চণ্ডীদাস-গণ

শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু

প্রাচীন কবিগণের ভণিতা পর্য্যালোচনা করিলে, নানা-প্রকার গরমিলের মধ্যেও, অনেক কবির ভণিতা দেওয়ার যে এক-একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা ছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। যেমন কাশীরাম দাসের বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি "অমৃত-সমান মহাভারতের কথা পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণকে" শুনাইয়াছেন। কৃত্তিবাস নিজেকে "পণ্ডিত" "বিচক্ষণ" প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন, মালাধর বসু "গুণরাজ খান"—ভণিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন;

ইহা ব্যতীত শিবের গানে কালিদাস, মনসামঙ্গলে বংশীদাস, চণ্ডীকাব্যে কমললোচন ও মাধবানন্দ, ধর্ম্মরাজের গীতে ঘনরাম, মহাভারতে অভিরাম প্রভৃতি কবিগণ—সাধারণতঃ "দ্বিজ" আখ্যায় নিজেকে বিভূষিত করিয়াছেন; ধর্ম্মমঙ্গলে রামাই পণ্ডিত, শিবায়নে রামেশ্বর, মনসামঙ্গলে নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, মহাভারতে সঞ্জয়, ভাগবতে নরহরি প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণ নিজ নিজ নামের সঙ্গে কোন বিশেষণ ব্যবহার করেন নাই। আবার ইহাও দেখা যায় যে, একই কবি একাধিক নির্দ্দিষ্ট প্রথায় নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন, যেমন, শিবায়ণে রামকৃষ্ণদেব নিজেকে রামকৃষ্ণদাস ও কবীচন্দ্র উভয়রূপেই ভণিতায় প্রকাশ করিয়াছেন; সেইরূপ আমরা একই পুথিতে কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দের ভণিতা পাইতেছি; চণ্ডীকাব্যে "কবিকঙ্কন" ও "মুকুন্দ" এই উভয় প্রকার ভণিতার বিশিষ্টতাই অধিক। কিন্তু এইরূপ নানা-প্রকার বিভিন্নতার মধ্যেও প্রত্যেক কবির এক-একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা কষ্টকর হয় না।

বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে এইরূপ বিশিষ্টতা আরও স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

এইরূপ ভণিতা চরিতামৃতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইতেছে। চৈতন্য ভাগবতের ভণিতা

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ নিম্নলিখিত প্রকার ভণিতা দিয়াছেন—

চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পদ-দ্বন্দ্ব।
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ ॥

লোচনদাস সর্ব্বত্রই তাঁহার গুরু নরহরির উল্লেখ করিয়াছেন যেমন,—

শ্রীনরহরিদাস—পদ করি আশ
লোচনদাস গুণ গায়। ইত্যাদি।

কর্ণানন্দে যদুনন্দনদাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতার উল্লেখ করিয়া ভণিতা দিয়াছেন—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেম-কল্পবল্লী কিবা নিরমল ধাতা ॥
সে দুই চরণ-পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

এইরূপ ভণিতার একটা বিশেষ মূল্য আছে। কোন প্রকার পালাগানে, অথবা কাব্যে, যেখানে একটা আখ্যায়িকা লইয়া ধারাবাহিক রচনা আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে কোন কোন পদ বা অধ্যায়ের অন্তে কোন ভণিতা অথবা ভণিতার বিশিষ্টতার নিদর্শন না থাকিলেও, সেই সেই পদ বা অধ্যায় যে ঐ পালা বা কাব্য রচয়িতার রচনা তাহা বুঝিতে কোনই কষ্ট হয় না। কিন্তু বৃহৎ পদাবলী সাহিত্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদের প্রকৃত রচয়িতার সম্বন্ধে স্থির ধারণা করিবার জন্য আমরা প্রথমেই ভণিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি। যাঁহারা পদাবলী সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইহাতে কত গলদ ঢুকিয়াছে। এক কবির পদ অন্য কবির ভণিতায় চলিয়া যাইতেছে, কোন কোন অর্ব্বাচীন লেখক স্বরচিত পদ ইচ্ছা করিয়া অন্যের ভণিতায় চালাইয়াছেন, কোন কোন সম্প্রদায় বিশেষ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য যে ভাবে বৈষ্ণব মহাজনগণের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এইসকল আবর্জ্জনার মধ্যেও প্রকৃত সত্য খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে আমরা যে-সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি, ভণিতা পর্য্যবেক্ষণ তাহাদের অন্যতম। মনে করুন, কোন রচনা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নামে চলিয়া যাইতেছে; যদি তাহাতে রূপরঘুনাথের উল্লেখ করা ভণিতার ধারা আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমরা সাধারণতঃ এই ধারণা করিতে পারি যে, ঐ রচনা সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজেরই হইবে। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কেবল এই প্রকার ভণিতা দেখিয়াই আমরা সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইতে পারি না; কারণ অনেক ভণিতার মধ্যে যে জুয়াচুরি আছে তাহাও আমরা বলিয়াছি। তবে ভণিতা দ্বারা যে একটা প্রাথমিক ধারণা হইতে পারে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই—; তৎপর অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এইরূপ ভণিতার কষ্টিপাথরে ঘসিয়া পদাবলীর মধ্যে প্রকৃত চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় কি না আজ আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৮৬ ও ৮১৫ সংখ্যক পদে আমরা আদি চণ্ডীদাসের ভণিতা পাই, ২৯১, ৩৮৩ সংখ্যক পদে কবি চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে; ২, ২৭, ৩০ প্রভৃতি সংখ্যক অনেক পদে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়; ২৭৩, ৪৬১ প্রভৃতি সংখ্যক বহুপদে আবার দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে; ৪৮৩, ৫২২ সংখ্যক পদে দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে; এবং ৬২৬ সংখ্যক পদ দীন হীন চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত। ইহা ব্যতীত বাসুলীপূজক চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, ও শুধু চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত পদের সংখ্যাও অনেক। অতএব আমরা আদি চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, বাসুলীগণের চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস, দীনহীন চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, ও শুধু চণ্ডীদাস উল্লেখ করা ভণিতা পাইতেছি। এখন দেখা যাউক, চণ্ডীদাসের রচিত কোন পুস্তকে ভণিতার কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা পাওয়া যায় কি না।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রকার ভণিতা দৃষ্ট হয়—

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ।
অথবা, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-গণে।
অথবা, বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।

উক্ত গ্রন্থে ৪১৫টি পদ আছে তাহার একটি পদেও দ্বিজ, দীন, দীনহীন, আদি, কবি প্রভৃতি বিশেষণ-যুক্ত ভণিতা পাওয়া যায় না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই বাসুলীগণের বড় চণ্ডীদাসের ভণিতা দেওয়ার একটি নির্দ্দিষ্ট ধারা ছিল। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আমরা এই একটি আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইতেছি, অতএব আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিব। উক্ত ভণিতা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারিতেছি যে, বাসুলীগণের চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস অভিন্ন ব্যক্তি, অর্থাৎ বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীর সেবক ছিলেন, এবং তিনি নিজেকে বাসলীগণের চণ্ডীদাস রূপে ভণিতায় প্রচার করিয়াছেন। যেহেতু কৃষ্ণকীর্ত্তনের একটি পদেও দ্বিজ, দীন প্রভৃতি বিশেষণ-যুক্ত ভণিতা পাওয়া যায় না, অতএব আমরা বলিতে পারি যে, বড়ু চণ্ডীদাস এইসকল আখ্যায় কখনও নিজেকে প্রচার করেন নাই। কাজেই এই ভণিতা-সূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রভৃতি বড়ু চণ্ডীদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। আমাদের এই প্রাথমিক ধারণা কতদূর সত্য, এখন তাহাই বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব।

যে দুইটি পদে আমরা আদি চণ্ডীদাসের ভণিতা পাইতেছি সেই দুইটি পদই হেঁয়ালীর মত। কিন্তু যখন আদি চণ্ডীদাস বলিয়া ভণিতা আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই দুইটি পদের একটিও আদি চণ্ডীদাসের রচিত নয়,—সেই আদি চণ্ডীদাস যিনিই হন না কেন, তিনি এই পদদ্বয় রচনা করেন নাই। কারণ তাঁহার সময়ে নিজেকে "আদি" আখ্যায় প্রচার করিবার কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারে না। "আদি" শব্দ ব্যবহারের দ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যখন এই পদদ্বয় রচিত হইয়াছিল, তখন একাধিক চণ্ডীদাসের প্রচার হইয়াছে; তাই এই আদি আখ্যাদ্বারা কোন একজন চণ্ডীদাসকে বুঝান হইয়াছে, যিনি অন্যান্য চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। কোন তার্কিক হয়ত বলিতে পারেন যে, আদি চণ্ডীদাসের সময়েই যদি অন্যান্য চণ্ডীদাসের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদি চণ্ডীদাসের এইরূপ ভণিতা প্রদানের সার্থকতা অনুমান করা যায়। আমরা বলিব যে, এই অনুমানও প্রমাণ-বিরুদ্ধ; কারণ চরিতামৃতে যে ভাবে রামানন্দ রায় ও বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের কথা উল্লিখিত আছে, তাহাতে একজন চণ্ডীদাসের কথাই মাত্র জানা যায়; বিশেষতঃ এমন কোন রচনা এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই যাহাতে একই সময় একাধিক চণ্ডীদাস বিদ্যমান ছিলেন, এমন কথা আমরা জানিতে পারি। আর এই আদি চণ্ডীদাসের রচিত কেবল মাত্র দুইটি পদই যখন আমরা পাইতেছি, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই দুই পদের চণ্ডীদাস হইতে অন্যান্য চণ্ডীদাসকে এইভাবে পৃথক করিবার কোনই দরকার ছিল না, কারণ এই দুইটি পদের অসাধারণ বিশেষত্ব কিছুই নাই, তাহাদের লোপেও পদ-সমুদ্রের কোন বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই দুইটি পদ এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল যখন একাধিক চণ্ডীদাস প্রতিষ্ঠা

অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং ইহা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের কবির দ্বারা রচিত, যে সম্প্রদায়ের সাধনার আভাস আমরা এই দুই পদে কিছু কিছু পাইতেছি। সেই কবি নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই দুই পদ চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়াছেন; কিন্তু আদি চণ্ডীদাসের স্কন্ধে এই রচনার ভার চাপাইলে বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অধিকতর সুবিধা হইবে, এই ভাবিয়া তিনি অন্যান্য চণ্ডীদাসকে বাদ দিয়া একেবারে সেই আদিগুরুর অন্তরালেই আত্মগোপন করিয়াছেন। সাহিত্যের বাজারে ইহা দিনে-ডাকাতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে এই দুইটি পদ বাদ দেওয়া সঙ্গত, কারণ তাহা কোন চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াই বিশ্বাস করা যায় না। এবং আদি চণ্ডীদাস বলিয়া যে কোন চণ্ডীদাস প্রচারিত হইয়াছিলেন তাহাও আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রায় একশত পদে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। উক্ত পদাবলীতে ৮৩০টি পদ আছে, তাহার মধ্যে যখন প্রায় ১০০ পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই দ্বিজ চণ্ডীদাসকে দুই কথায় বিদায় দেওয়া চলে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের একটি পদেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা না পাওয়াতে আমাদের মনে এই সন্দেহ জাগিয়াছে যে, বড়ু চণ্ডীদাস দ্বিজ চণ্ডীদাস নহে। বাসুলী-সেবক চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তিনি রামী ধোবানীর সহিত সহজিয়া সাধনা করিতেন; চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এই রামী ধোবানীকে উল্লেখ করা সহজিয়া সাধনার অনেক পদও চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। এইসকল প্রমাণের উপরে যদি আমরা নির্ভর করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, বাসুলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাস একজন সহজিয়া সাধক ছিলেন। অনেকেই অবগত আছেন যে, সহজিয়ারা জাতিভেদ মানে না, অতএব সহজিয়া চণ্ডীদাসের নিকট দ্বিজ আখ্যার কোন বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে না। কাজেই যে চণ্ডীদাস দ্বিজ বলিয়া নিজের আভিজাত্য প্রচার করিয়াছেন, তিনি কখনই সহজিয়া-পন্থী ছিলেন না, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বাসুলী-পূজক বড়ু চণ্ডীদাস দ্বিজচণ্ডীদাস হইতে ভিন্ন-ব্যক্তি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কি এইজন্য একটি পদেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায় না? সাহিত্যসেবীমাত্রকেই আমরা এই বিষয়টা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

কিন্তু এই সম্বন্ধে আমাদের আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিবার আছে। পদাবলীর হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাতে এমন অনেক পদ আছে যাহা দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তাহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা-সমন্বিত হইয়া স্থান পাইয়াছে। দুই একটি এই প্রকার পদ আমরা এই স্থানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৯৪ নম্বরের পুথির প্রথম পদটি নিম্নলিখিত আকারে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

সৈ, কি আজু দেখিনু রঙ্গ।
আজু গিয়াছিনু জোমুনা সিনানে
দুই চারি সখি সঙ্গ॥
একে কাল দেহ বসন ভূষণ
চূড়াটি টালিএ বামে।
হেরয় অনুজ তাহে য়ারপিত
বেড়িয়া কুসুম দামে॥
তার মাঝ দিয়া মউরের পাখা—
হেলিছে দুলিচে বায়।
জেমন রবির শুতার তরঙ্গ
লহরি তেমতি প্রায়॥
তাহে সদধর মলয় চন্দন
তার মাঝে গোরচনা।
তাহার সৌরভ পায়্যা অলিকুল
তাহে করে য়ানাগনা॥
... ...
এতদিন বসি গোকুল নগরে
না দেখি না শুনি কানে॥
এমন মুরতি গড়ে কোন বিধি
দিন চণ্ডিদাসে ভণে॥

কিন্তু পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত পদাবলীর ৫৬ নম্বরের পদটি প্রায় এইরূপ আকারেই আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাইতেছি। উক্ত ২৩৯৪ নম্বরের পুথির ষষ্ঠ পদটি দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়; কিন্তু পদাবলীর ২৬৯ নম্বরের পদে তাহাই সামান্য পরিবর্তনের

সহিত দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় উল্লিখিত আছে। এই-সকল ঘটনা দৃষ্টে আমাদের ইহাও সন্দেহ হয় যে, দীন চণ্ডীদাসের অনেক পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কাজেই এই দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিয়া আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে শেষ কথা বলিতে পারিতেছি না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ নম্বরের পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের রচিত একখানা গীতি-কাব্যের ২১ পত্র সংগৃহীত আছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছি, এবং তাহা পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এইস্থানে ঐ কাব্যের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইল। তাহাতে প্রায় ৬০টি পদ আমরা পাইয়াছি। ঐ ২১ পত্রের মধ্যে ৭৫০ নম্বরের পত্রে ২০০১ সংখ্যক পদ পাওয়া যায়। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, এই দীন চণ্ডীদাসের একমাত্র এই কাব্যখানিতেই যত পদ আছে, তাহা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নামে প্রকাশিত পদাবলীর সংখ্যার প্রায় সমান। উক্ত ৬০টি পদের মধ্যে কয়েকটি পদে "দিন চণ্ডীদাস" "দিনখিন চণ্ডীদাসের" ভণিতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু "বড় চণ্ডীদাস" কি "দ্বিজ চণ্ডীদাস," ভণিতাযুক্ত পদ, একটিও পাওয়া যায় না, এবং কোথাও বাসলীর নাম উল্লেখ করা ভণিতা নাই। এই-সকল কারণে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, দীন চণ্ডীদাস বাসলীগণের বড়ু চণ্ডীদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। নরোত্তম বিলাসে নরোত্তম ঠাকুরের চণ্ডীদাস নামে এক শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—

> জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
> পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ, দয়া অতি দীনে॥

এই চণ্ডীদাসই যদি দীন চণ্ডীদাস হন, তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে, বড়ু চণ্ডীদাসের অনেক পরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পদগুলি পাঠ করিয়াও আমাদের এই ধারণা হয় যে, তিনি পরবর্ত্তী কালেরই লোক। কিন্তু দীন চণ্ডীদাস যিনিই হউন না কেন, তিনি যে শক্তিশালী লেখক ছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ৬০টি পদ আমরা পাইতেছি, তাহার একটি পদ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজদেবীগণ রাস উৎসবে যোগদান করিবার জন্য যে ভাবে ছুটিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা পদাবলীর ৩৯৩ নম্বরের পদে এই ভাবে রহিয়াছে—

> কেহ বা আছিল　　দুগ্ধ আবর্ত্তনে
> চুলাতে রাখি বেশালি।
> ত্যজি আবর্ত্তন　　হই আগুয়ান
> ঐছন সে গেল চলি॥
> কেহ শিশু লয়ে　　কোলেতে করিয়ে
> দুগ্ধ করায় পান।
> শিশু ফেলি ভূমে　　চলি গেল ভ্রমে
> শুনি মুরলীর গান॥　ইত্যাদি

প্রায় এইরূপেই এই পদটি আমাদের দীন চণ্ডীদাসের পুথিতে পাইতেছি। ইহাতে এই সন্দেহটাই আমাদের মনে উঠিতেছে, যে, দীন চণ্ডীদাসের পদ লইয়াই দ্বিজ চণ্ডীদাসের সৃষ্টি হইয়াছে। যে কবির দুই হাজারের বেশী পদের সন্ধান আমরা একখানা পুথিতেই পাইতেছি, তাহার সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইলে নিশ্চয়ই এই প্রশ্নের সুমীমাংসা হইবে; কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আরও একটা শেষ কথা আমরা এই স্থানে বলিয়া রাখিতেছি। অনন্তপ্রায় পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে আমরা দ্বিজ ভণিতার কবি প্রায় পাইতেছি না। বৈষ্ণব কবিগণের প্রচলিত ভণিতা "দীন হীন" "অধম" "মূর্খ" দাসানুদাস" ইত্যাদি। এইরূপ বিনয়ের সহিতই বৈষ্ণব কবিগণ নিজকে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন বড় কবিই নিজকে "দ্বিজ" আখ্যায় বিভূষিত করেন নাই। বস্তুতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্রোত যে-ভাবে বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহাতে গা ভাসাইয়া যে ব্যক্তি "দ্বিজ" আখ্যা লইয়া গৌরব অনুভব করিতে পারে, সে কবিও নহে, বৈষ্ণবও নহে, ইহা দৃঢ়স্বরে বলা যাইতে পারে। তবে কিনা "দ্বিজ মাধব" "দ্বিজ ভীম" "দ্বিজ শ্যামাদাস" প্রভৃতি গুটিকতক নগণ্য কবির দুই একটি বৈষ্ণব পদ আছে, তাহা জানা যায়। ইঁহারা কেহই দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই দুই একটি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন

বলিয়া মনে হয়। এইসকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, দ্বিজ চণ্ডীদাসের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অনেকে "বড়ু" ও "দ্বিজ" একার্থবোধক বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু বাসলী-সেবক চণ্ডীদাস চৈতন্য দেবের অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে জয়দেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করেন। সেই সময়ে "বড়ু" কি অর্থে ব্যবহৃত হইত তাহা আজও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই; আর সেই চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে আমরা প্রায় অজ্ঞই রহিয়াছি। অতএব সেই "বড়ু" শব্দ লইয়া আমরা এখানে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। তথাপি সত্য নির্দ্ধারণের জন্য আমরা বলিতেছি যে, যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে, চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কোন বৈষ্ণব কবি "দ্বিজ" ভণিতায় নিজকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য রহিলাম।

কবি চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পরিষদ সংস্করণের পদাবলীর ২৯১ ও ৩৮৩ নং পদে কবি চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। এই ২৯১ নং পদটি পদকল্পতরুর (পরিষদ সংস্করণ) দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৫-৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২ নং পুথির ৪৭ সংখ্যক, ২৯৮ নং পুথির ২১ সংখ্যক, এবং ৩৩০০নং পুথির ৪৫ সংখ্যক পদেও এই পদটি পাওয়া যাইতেছে। এইসকল পুস্তকে শেষ চরণ দুইটির কি কি বিভিন্ন পাঠ আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

বিষ খাইলে দেহ যাইবে, রব রহিবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে॥ প:সং

বিষ খাইলে দেহ যাবে, রব রবে দেশে।
বাশুলী-আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ তরু।

বিষ খাইলে দেহ যাবে, রব রহিবে দেশে।
কলঙ্ক ঘুষিব লোকে নিশেধিল চণ্ডিদাসে॥ বি পু ২৯২

বিষ খাইলে দেহ জাবে রব রৈব দেশে।
বাশুলি আদেশে কহিব, কহে চণ্ডীদাষে॥ বি পু ২৯৮

বিস খাইলে দেহ জাবে, রব রহিবে দেষে।
বাশুলি আদেশ কবি কহে চণ্ডীদাসে॥ বি পু ৩৩০০

এই পাঁচখানা পুথির তিন খানাতে "কবি" ভণিতা পাওয়া যায় না। ৩৮৩ নং পদেও "কবি চণ্ডীদাসের" ভণিতা নাই, কেবল পাঠান্তরে আছে। অতএব আমরা "কবি চণ্ডীদাসের" অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ পোষণ করি।

অধুনা আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি। আদি ও কবি চণ্ডীদাসের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বাসলী-সেবক চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি। "দীন চণ্ডীদাস" "দীনহীন চণ্ডীদাস" "দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস" ইহা একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা, এবং এই দীন চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাসের অনেক পরবর্ত্তী কালের লোক। দ্বিজ চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব নাই, দীন চণ্ডীদাসের পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলিতেছে।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ *

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

আজকাল আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো বিষয় বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিতে হইলে পশ্চিমের পণ্ডিতগণের দিকে না তাকাইলে উপায় নাই। ভাষা বা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশী খাটে। ভারতবর্ষের পাহাড়-পর্ব্বতেও কোথায় কোন্ জাতির কি ভাষা এবং তাহা কেমন কি, এ তত্ত্ব ভারতবাসী অল্পই আলোচনা করিয়াছেন; যাঁহারা উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু করিয়াছেন তাঁহারা পশ্চিম দেশের। বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলেও মানবজাতির তত্ত্বসংগ্রহে অসাধারণ অনুরাগ থাকায় তাঁহারা যে যত পারিয়াছেন অদ্ভুত অধ্যবসায়ে

* The Origin and Development of the Bengali Language: by Suniti Kumar Chatterji, M. A. (Calcutta), D. Lit. (London), Khaira Professor of Indian Linguistics and Phonetics and Lecturer in English and Comparative Philology in the University of Calcutta, in Two Parts, Part I, Introduction, Rhonology; Part II, Morphology. Calcutta University, Pp. xci+1179; Rs. Twenty.

ও পরিশ্রমে আমাদের নিজেরই ভাষা-বিভাষার বহু তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া মাথা হেঁট করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে গ্রিয়ার্সন, বীমস্‌, হরন্‌লে, জুল-ব্লক প্রভৃতি যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনায় ভারতবাসীর কার্য্য অতিসামান্য—যদিও রবীন্দ্রনাথ, ভাণ্ডারকর, রামেন্দ্রসুন্দর, ও যোগেশচন্দ্র প্রভৃতি কতক-কতক উপাদেয় তত্ত্ব আমাদিগকে দিয়াছেন। যাহাই হউক, বৈজ্ঞানিক ভাবে কোনো ভারতীয় ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত বা সমর্থ হইয়াছেন এমন কোনো ভারতবাসীকে ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ নামে পুস্তকখানি রচনা করিয়া কেবল বঙ্গবাসীর নহে, সমগ্র ভারতবাসীরই ঐ কলঙ্ক দূর করিয়া মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকখানি নির্দ্দেশ করিয়া আজ আমরা গর্ব্বের সহিত বলিতে পারিব যে, কিরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাকরণ রচনা করিতে হয় ভারতবাসী তাহা জানে।

গ্রন্থকার অতি যুক্তিযুক্ত-ভাবেই প্রথমে পথপ্রদর্শক পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষি-গণকে ঋকেরই ভাষায় নমস্কার করিয়া নিজের আরাধ্যকে আবির্ভূত হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, আর তাঁহার প্রতিপাদনীয় যে বাক্ তাঁহার সম্বন্ধে নিরুক্তকার যাস্কের মত একটি ঋক্ তুলিয়া বলিয়াছেন যে, কেহ ইঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, শুনিয়াও শুনিতে পায় না; আবার কাহারো নিকটে নিজেই ইনি নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করেন। মূল ঋক্‌টি অতি চমৎকার। পাঠকগণ নিজেই ইহার মাধুর্য্য অনুভব করুন :—

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে
জায়েব পত্যে উশতী সুবাসাঃ॥

বঙ্গবাক্ যে অধ্যাপক সুনীতিকুমারের নিকটে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার এই ব্যাকরণের পাঠককে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এই গ্রন্থখানি প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত—ভূমিকা, ধ্বনিপ্রক্রিয়া (Phonology), ও রূপপ্রক্রিয়া (Morphology)। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যাহা কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাঠকের জ্ঞাতব্য হইতে পারে গ্রন্থকার তাহা পূর্ব্ব-পশ্চিমের পণ্ডিতগণের মতামত পর্য্যালোচনা করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভূমিকায় দেখাইয়াছেন। ভূমিকার পাঁচটি পরিশিষ্ট আছে। গ্রিয়ার্সন সাহেব ভারতের নব্য আর্য্য ভাষাগুলির বর্গীকরণ করিয়া কতকগুলিকে বাহ্যবর্গ (Outer Group) নাম দিয়া ভাগ করিয়াছেন। ইহার অনুকূলে তিনি যে-সমস্ত যুক্তি দিয়াছেন গ্রন্থকার সে-সমস্তকে প্রথম পরিশিষ্টে অতি দক্ষতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ভারতীয় নব্য আর্য্যভাষার সহিত দ্রাবিড়ীয় ভাষার সাদৃশ্য আলোচনা করিয়া প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টির কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে দেখান হইয়াছে। অনুশাসনসমূহে লব্ধ বঙ্গদেশের প্রাচীন স্থানগুলির নাম তৃতীয় পরিশিষ্টে সংগৃহীত হইয়াছে। চতুর্থ পরিশিষ্টে বঙ্গভাষার শব্দাবলীর (তৎসম, অর্দ্ধ তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী) আলোচনা। আর পঞ্চম পরিশিষ্টে বাঙলার বর্ণ ও বানানের আলোচনা। ধ্বনি-প্রক্রিয়া ও রূপপ্রক্রিয়ার আলোচ্য ঐ নাম দুইটিই প্রকাশ করিতেছে। সমগ্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটা তালিকাতেই সূক্ষ্মাক্ষরে মুদ্রিত ৯৯ পৃষ্ঠা লাগিয়াছে। অতএব গ্রন্থকার কি কি আলোচনা করিয়াছেন ইহা বলা অপেক্ষা কি কি আলোচনা করেন নাই ইহাই বলা সহজ।

আমরা দেখিতেছি, বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ জানিতে হইলে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য গ্রন্থকার তাহার কিছুই বাদ দেন নাই। সংক্ষেপে ও অসঙ্কোচে বলিতে হইলে ইহাই বলিব, বর্ত্তমান সমালোচক এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনেক নূতন কথা শিখিয়াছেন, গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যে তিনি বহুস্থানে মুগ্ধ হইয়াছেন, বাঙলা ভাষা আলোচনার জন্য এই গ্রন্থখানি তাঁহার নিত্য সহচর হইয়া থাকিবে। পুস্তকখানির একটি গুরুতর ত্রুটি তীব্ররূপে লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে আলোচিত বিষয়-সমূহের বর্ণানুক্রমে একটি বিস্তৃত সূচীপত্র দেওয়া হয় নাই। পাঠককে এজন্য অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

এই বিপুল গ্রন্থের প্রত্যেকটি কথায় গ্রন্থকারের সহিত প্রত্যেকে একমত হইবেন, ইহা আশা করা যায় না; আর অনৈক্য হইলেই যে, সেই-সেই স্থানে গ্রন্থকারেরই ত্রুটি, যাঁহার অনৈক্য হইতেছে তাঁহার নহে, ইহারও নিয়ম নাই। তবে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া ভাল, ইহাই মনে করিয়া নিম্নে দুই-একটা কথার উল্লেখ করিতেছি।

ধ্বনিপ্রক্রিয়ায় (পৃঃ ৩০২) উক্ত হইয়াছে মধ্যবর্ত্তী ভারতীয় আর্য্য-ভাষার অ অ বাঙলায় ওকার-রঞ্জিত অ অথবা ও হয় আর আ অ হয় আ। যেমন, শ ত > শ অ > শ; ঘা ত > ঘা অ > ঘা। এ নিয়মটি একবারে ঠিক বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকারেরই উদাহরণ লওয়া যাউক। কা ল অথবা কা লো 'কৃষ্ণবর্ণ' < কা ল অ < কা ল ক কিন্তু কা লা? তিনি বলেন, * কা লা ক > কা লা অ > কা লা। এইরূপে তাঁহার মতে এ কা < * এ ক্কা ক = * এ কা ক। এতাদৃশ স্থলে তিনি যে,—আ ক যোগে এক-একটি কল্পিত পদ গ্রহণ করিতেছেন তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। রূপপ্রক্রিয়ায় (পৃঃ ৬৫৮) এই বিষয়টির পুনরুল্লেখ করিয়া না গা ক, ধ মা ক, বি সি আ ক প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ তুলনার জন্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে প্রাদেশিক ভাষার মূল নাম না গা, ধ মা, বি সি আ (তুলনীয় প দ্মা, প দ্ম ক) প্রভৃতিকে সংস্কৃত করিয়া (সম্ভবত বিভক্তিযোগ করিবার সুবিধা হইবে এই উদ্দেশ্যে) ঐরূপ আকার প্রদান করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা * কা লা ক প্রভৃতি কল্পনার অনুকূল কিছু পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। বাঙলায় চাঁ পা, কাঁ টা প্রভৃতি আছে। সুনীতি-বাবুর মতে ইহাদের মূল বলিতে হয় * চ ম্পা অ < *চ ম্পা ক, * ক ণ্টা অ < * ক ণ্টা ক। কিন্তু আমরা প্রাকৃতে পাই চ ম্প অ < চম্পক, ক ণ্ট অ < ক ণ্ট ক। এই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া কল্পনা আশ্রয় করিবার হেতু নাই। মা থা ম স্ত ক (> ম থ অ) হইতে না হইয়া * ম স্তা ক (> *ম থা অ) হইতে, শা লা শ্যা ল ক (> সা ল অ) হইতে না হইয়া * শ্যা লা ক (> *সা লা অ) হইতে, গো রা গৌ র ক (> গো র অ) হইতে না হইয়া * গৌ রা ক (> * গো রা অ) হইতে, গো য়া লা গো পা ল ক (> গো আ ল অ) হইতে না হইয়া * গো পা লা ক (> * গো আ লা অ) হইতে হইয়াছে বলা যায় না। পেঁ চা পে চ ক হইতে, পি ঠা পি ষ্ট ক হইতে, পেঁ ড়া পে ট ক হইতে, পো য়া পা দ ক হইতে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। স্বয়ং সুনীতি-বাবুও ইহা বলিতেছেন (পৃ, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩০)। এখানে যদি এরূপ হয়, তবে কা লা, চে লা (পৃ, ৩২৭) প্রভৃতি স্থলে এরূপ না হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না।

"প্রাচীন ভারতীয়-আর্য্যভাষায় ব হে ট ক (?)··· > মধ্য ভারতীয় আর্য্যভাষায় ব হে ড় অ > প্রাচীন বাঙলায় ব হে ড়া, ব হ ড়া (সর্ব্বানন্দ) > নবীন বাঙলায় ব য় ড়া (পৃ, ৩৩৪)।" ইহা দ্বারা সুনীতি-বাবু আমাকেই সমর্থন করিতেছেন। প্রাচীন বাঙলা * অ খা ড়া (অ ক্ষ বা ট ক), নবীন বাঙলা আ খ ড়া (পৃ, ২৪২); প্রাচীন ভারতীয়-আর্য্যভাষা বি তী ত ক (বি তী র্ ক)···>*

বিভীটক ▷ মধ্য ভারতীয়-আর্য্যভাষা বহেড়অ ▷ নবীন ভারতীয় আর্য্যভাষা বহেড়া ; প্রাচীন ভারতীয়-আর্য্যভাষা আম্রাতক ▷* আম্রাটক ▷ মধ্য ভারতীয়-আর্য্যভাষা অম্বাড়অ ▷ নবীন ভারতীয়-আর্য্যভাষা আমড়া ; ইত্যাদি (পৃ, ৬৯০) ; আবার, ভাড়া (ভাটক) (পৃ, ৫১৫) ; সুনীতি-বাবুর এইসকল উক্তি আমারই অনুকূল, তাঁহার নহে। *সরিসব (⊲সর্ষপ) হইতে সরিসা (পৃ, ৩৭৪), ইহারও দ্বারা তিনি আমাকেই সমর্থন করিতেছেন, নিজেকে নহে। এই হিসাবে পারা শব্দ পারদ হইতে না হইয়া* পারাদ হইতে (পৃ, ৩৫০) ইহা তিনি বলিতে পারেন না।

তিনি লিখিয়াছেন খাজা (খাদ্য-), (পৃ, ৩১৬) ; শাঁখা (শঙ্খ-), (পৃ, ৩২২)। মূল শব্দের শেষে হাইফেন দেওয়ার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বলা হয় নাই ; অনুমান হয়, খাজা ও শাঁখার শেষ আকারের সমাধানের জন্য মূল শব্দটিতে আরো কিছু যোগ করিতে হইবে। অন্যথা ঐ দুইটি শব্দ হইতে যথাক্রমে খাজ, শাঁখ হইতে পারে, খাজা, শাঁখা নহে। আমার মনে হয় এখানে আসল শব্দ দুইটি হইতেছে খাদ্যক, শঙ্খক। সংজ্ঞার্থে -ক প্রত্যয় (এ সম্বন্ধে পাণিনি বহু আলোচনা করিয়াছেন, ভাণ্ডারকরও তাহা হইতে ইহা বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন।) বিশেষ রকমের খাদ্যই খাজা, বিশেষ রকমের শঙ্খই শাঁখা।

অন্যত্র (পৃ ৩৪৮) এই বিষয়টির পুনরুল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে : "the আ in the form কালা is an affiix giving a definite force, *the black one* and this can only be from some affiix like আক with a definiteness that come to be 'associated with a আ: Cf. ঘোড়াটা *horse-that-big-one that horse ;* but ঘোড়াটি *horse-that-litile-one-that nice little horse.*"

কেবল কালা কালাটি 'the black one' বুঝায় কি ? কালা, ধলা ; কালা, গোরা ; এখানে কোনো definite force আছে বলিয়া তো মনে হইতেছে না। বৈষ্ণব পদাবলীর যোগে বা তাদৃশ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে কালা পদে বুঝায় সত্য, কিন্তু, তাহা স্বতন্ত্র কথা। তখন তাহা বিশেষণ নহে, বিশেষ্য। আর যদি বা এখানে ঐরূপ কোনো definiteness থাকে, তথাপি কাঁটা, চাঁপা, ইত্যাদি স্থলে আছে কি ?

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল তাহাতে মূল বিচার্য্য বিষয়টি এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, মধ্য ভারতীয়-আর্য্যভাষায় অন্ত্য অ অ বাঙ্‌লায় কখনো ওকাররঞ্জিত অ অথবা ও, কখনো বা আ হইয়া থাকে। বিভিন্ন পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধেয়।

পৃ, ৩০৬, মাজকাঠ ; সুনীতি-বাবু বলেন, এখনে মাজ মজ্জা হইতে। মজ্জার অর্থ এখানে পাই না। মধ্য হইতে বলিলে কোনো ক্ষতি দেখা যায় না।

পৃ,-৩১৩, সওয়ার শব্দের আলোচনায় ঐ অর্থেই অশ্ববার শব্দটিকে মনে করা যাইতে পারে। মাঘ ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন। শেষ অংশের সহিত ভৃ ধাতুর সম্বন্ধ মনে হয় না, √বৃ ধাতুর সম্বন্ধ।

পৃ,-৩১৫, হালকা শব্দের সমাধানে লাঘব শব্দের কোনো স্থান আছে মনে হয় না। এখানে মূলত লঘুক হইতে বর্ণবিপর্য্যয়ে হলুক, তাহার পর ক্রমশ *হলুক্কঅ, হালকা। আলতা প্রভৃতির আদ্য আকারের ন্যায় (পৃ, ৩১৪) এখানেও আদ্য আকারের সমাধান হইতে পারে।

পৃ,-৩২০, [illegible] শব্দের ভাবরতি শব্দের যোগ দেখান হইয়াছে ; কিন্তু আমার মনে হয় ইহা ভাতি (√ভা) হইতে হইয়াছে।

পৃ,-৩২৪, আমি মনে করি দিয়াশলাই শব্দের পূর্ব্ব অংশ দীপশ নহে, দীপক। ইহাতে আকারের সমাধান হয়, অর্থও সঙ্গততর হয়।

পৃ,-৩২৮, "জেঠা (জ্যেষ্ঠতাত) ; পৃ,-৩২৬ "খুড়া (খুল্ল-ক্ষুদ্র+তাত)।" আমার মনে হয়, জেঠার মূল জ্যেষ্ঠক, খুড়ার মূল ক্ষুদ্রক (▷খুড্ডঅ)। সংজ্ঞার্থে ক প্রত্যয়। যেমন, আর্যক হইতে আজা 'মাতামহ' (আর্যিকা হইতে আই 'মাতামহী')। জেঠতাত, খুড়তাত (বিশেষণ), ইত্যাদি স্থলে তাত শব্দের যোগ আছে জেঠ-তাত=জ্যেষ্ঠতাতক, খুড়তাত=ক্ষুদ্রতাতক। নীচে দেখুন। মরাঠীতে চুলতা 'খুড়া' (চুলতী 'খুড়ী')। এখানে শেষ অংশ তা ⊲তাঅ ⊲তাত। আমরা বলি জেঠতুতা, (অথবা জাঠ°), খুড়তুতা (অথবা তু° ত)। সুনীতি-বাবু বলেন (পৃ,-৫০৩, দ্রষ্টব্য পৃ-৬৯২) জাঠ-উতা, খুড়-উতা ইত্যাদির মধ্যে একটা তকার আসিয়া জুটিয়াছে ("t is intrusive")। আমার মনে হয় (দ্রষ্টব্য পৃ-৬৯২), এখানে তকার আগম নহে। জেঠতা ⊲ জেঠতাঅ ⊲ জ্যেষ্ঠতাত ; খুড়তা ⊲ খুড্ডতাঅ ⊲ ক্ষুদ্রতাত ; যেমন পূর্ব্বোদাহৃত মরাঠী চুলতা ⊲*চুল্লতা ⊲*ছুল্লতাঅ ⊲ ক্ষুদ্রতাত। -উত ⊲*উত্তঅ ⊲ পুত্রক। জেঠতা+উত= জেঠতুত, খুড়তা+উত=খুড়তুত। পূর্ব্বোক্ত জেঠতাত, খুড়তাত যথাক্রমে জেঠতা+উত, খুড়তা+উত হইতে অসম্ভব মনে হয় না।

পৃ,-৩৬৪, উক্ত হইয়াছে বাঙলা পিঁজরার মূল সংস্কৃত পিঞ্জর, কিন্তু বস্তুত ইহা পঞ্জর (পঞ্জরক)। অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অকার কখনো-কখনো ইকার হয় ; যথা, মজ্জা ▷* মজ্জা ▷ মিঞ্জা (পালি)। এ সম্বন্ধে সন্ধ্যাক্ষর তত্ত্বে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

পৃঃ ৬৮১, মাউগ (মাগু, মাউগী, মাগী, ইত্যাদি) শব্দের সহিত মার্গ শব্দের সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। আমার ইহা মনে হয় না। ঈশান-বাবুর জাতক অনুবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কারণ এখনো দেখিতেছি না।

স্ত্রী-জাতি বুঝাইতে বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালিতে যথাক্রমে মাতৃগ্রাম ও মাতুগাম শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। আমার মনে হয়, আলোচ্য শব্দটির মূল ইহাই। ইহার বিরুদ্ধে একটা আপত্তি উঠিতে পারে, মাতুগাম শব্দের শেষ মকারের লোপ সম্বন্ধে। সুনীতি-বাবু নিজেই এইরূপ লোপের উদাহরণ দিয়াছেন, যথা কদম হইতে কাদা, (পৃ ৩৪৭), নাম হইতে না (পৃ, ৫০২)। এইরূপে মাতৃগ্রাম (▷ মাতুগাম) ▷ *মাউগাঅ ▷ *মাউগ্গ ▷* মাউ্গগ⊲ মাউগ ▷ মাগা। ঠিক যেমন ভ্রাতৃজায়া হইতে ক্রমশ ভাউজ ▷ ভাজ, (পৃ,-৩০৭)। অর্থের পরিবর্ত্তন কারণবিশেষে পরে হইয়াছে।

পৃ, ৪৭২, আমার বিশ্বাস, ছোট শব্দের মূল ক্ষুদ্র (ক্ষুদ্রক)। অন্য সময়ে এই পত্রিকাতেই ক্ষুদ্রের খেলা প্রবন্ধে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

পৃ, ৪৯৩, "ঠ seems to be intrusive in ঠোঁট (▷ ওট্‌ঠ, ওষ্ঠ)।" ইহা মনে লাগে না। ইহার মূল হইতেছে তুণ্ড।

পৃ, ৫০২, বহুত শব্দের যোগ বহুবস্তু শব্দের সহিত, ইহা মনে হয় না। হেমচন্দ্র প্রভূত শব্দের সহিত যোগ বলিয়াছেন।

পৃ ৫০৭, ধাঁধাঁ শব্দের মূল কি ? পালিতে দন্ধা ⊲

-স দ্ধা সংস্কৃত আকার ধারণ করিয়া ধদ্ধা, ধ দ্ধি কা ("ধদ্ধিকয়া প্রবৃত্তো লোকঃ"—স্থায়কুসুমাঞ্জলির হরিদাসটীকা)।

পৃ ৬৫৪, দাঁ ত ন শব্দের মূল দ ন্ত প ব ন (সুশ্রুত-প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ), পালি দন্ত পোন।

পৃ ৬৬৪, উ জা ন (* উ দ্যা প ন); কিন্তু পালিতে পড়িয়াছি উজ্জ্ব ন।

পৃ.-৬৬৩,"পো আ তী, পো য়া তী, পো হা তী।" মনে হয়, সুনীতি-বাবুর মতে ইহার ব্যুৎপত্তি পো ত+আ ত+ঈ। স্থানান্তরে (জা ত-কে র বঙ্গানুবাদ-সমালোচনায়) বলিয়াছিলাম ইহার মূল প্র জা ব তী (পালি প জা প তী)। ইহার বিরুদ্ধে একটা প্রধান আপত্তি এই যে, প্রাকৃতে শেষের -তী-টার -ঈ অথবা-দী হইবার কথা। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, তৃতীয় অক্ষরে ঝোঁক পড়ায় শব্দটি প আ ব ত্তী হওয়ায় ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে নাই। তুলনীয় স ব ত্তী <স প ত্নী, মরাঠী স-ব র তী; ম ত্তি ম তি, স র স্‌ স ত্তী (স র স্ব তী), পৃ ৭০২।

পৃঃ ৬৯৯, খো ল স ও মুখস (অনেক স্থানে খো লো স, মু খো স) শব্দের ব্যুৎপত্তি, পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিতেন, যথাক্রমে খ লি ত কো শ, ও মু খ কো শ।

এই গ্রন্থখানির বাঙলা অনুবাদ দেখিবার জন্ত আমরা উৎসুক হইয়া থাকিলাম। গ্রন্থকার ইহা দ্বারা বহু উপকার করিবেন।

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

১

উশ্রী নদীটি নামে নদী হইলেও, তাহাতে গরমের সময় জল বড় দেখা যায় না। বালির চড়া প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়িয়া পড়িয়া আছে, মাঝে কেবল সরু রূপার হারের মত একটি ক্ষীণ জলস্রোত ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে। গিরিধির বার-গণ্ডা পল্লীর যত মানুষ রোদ পড়িতে-না-পড়িতে এই নদীটির ধারে আসিয়া জোটে। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আসে স্বাস্থ্যের খাতিরে বায়ু সেবন করিতে, যুবক যুবতী বালক বালিকারা আসে ফুর্ত্তি করিতে। ছোট জলস্রোতটির মধ্যে নামিয়া পড়িয়া, জলের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া একটা মস্ত আমোদ।

তিন চারিটি বালক বালিকা সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে নদীতে নামিয়া মহা কোলাহল সহকারে খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের শ্যামবর্ণ কচি কচি হাত-পা-গুলি জলের মধ্যে প্রবলবেগে সঞ্চালিত হইতেছিল। পরস্পরের গায়ে জল আর ভিজা বালি ছুঁড়িয়া মারা ছিল তাহাদের খেলার প্রধান অঙ্গ। বালক দুটি একেবারে বেপরোয়া হইয়া খেলায় মাতিয়াছিল। বালিকাদুটি খেলায় যোগ দিলেও যাহাতে কাপড়-চোপড় একেবারে না ভিজিয়া যায়, এবং মাথার চুলের চেয়ে বালির পরিমাণ বেশী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবারও একটু একটু চেষ্টা করিতেছিল।

সান্ধ্য সূর্য্যালোক যখন ক্রমে নিভিয়া আসিল, বালির চর, জল ও দুইতীরের গাছপালার উপর হইতে রক্তাভ আলো মুছিয়া গিয়া, ক্রমে কালিমার অবগুণ্ঠন নামিয়া আসিতে লাগিল, তখন চরের উপর উপবিষ্ট একটি তরুণী ডাকিয়া বলিল, "লীলা, বেলা, শিগ্‌গির উঠে এস জল থেকে। একেবারে আঁধার হ'য়ে এল, এরপর বাড়ী গিয়ে তোমাদের মায়ের কাছে খুব বকুনি খাবে।"

ছোট মেয়ে দুটি শাড়ীর প্রান্ত হইতে জল নিঙ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া, চুল ঝাড়িয়া জল হইতে উঠিবার জোগাড় দেখিতে লাগিল। ছেলে দুটি উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না, দ্বিগুণ উৎসাহে মস্ত বড় বড় বালির গোলা পাকাইয়া সকলের গায়ে ছুঁড়িতে লাগিল। সব ছোট মেয়েটি তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শেষে কাঁদ-কাঁদ গলায় বলিয়া উঠিল,"মাসিমা, দেখ পঙ্কু একেবারে আমার চোখ কানা ক'রে দিচ্ছে, বারণ কর্‌লেও শোনে না।"

যে যুবতীটি তাহাদের জল হইতে উঠিবার জন্ত ডাক দিতেছিল, সে এই বার সঙ্গিনীর সঙ্গে গল্প ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। জলের ধারে আসিয়া, ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া বলিল, "উঠে আয়, ভিজে একেবারে ভূত হয়ে গেছিস্‌ যে! পঙ্কু, তুমি ওর চোখে বালি দিয়েছ কেন?"

পঞ্চু বলিল, "ও আসে কেন ছেলেদের সঙ্গে খেল্‌তে? ঘরে ব'সে পুঁতুল খেল্‌লেই পারে! ছিঁচ্‌কাঁদুনী খুকি! কই বেলা ত কাঁদ্‌ছে না?"

যুবতী একটু হাসিয়া মেয়েটিকে টান দিয়া জল হইতে উঠাইয়া লইয়া চলিল। বড় মেয়েটি নিজেই উঠিয়া কাপড়-চোপড় ঝাড়িয়া তাহাদের সঙ্গ লইল।

যে যুবতীটি এতক্ষণ একলাই বালির উপর বসিয়াছিল সে জিজ্ঞাসা করিল, "চল্‌লি নাকি, কৃষ্ণা? তাহ'লে আমিও উঠি।"

কৃষ্ণা বলিল, "তোর এত সাত তাড়াতাড়ি উঠ্‌বার কি দরকার? আমি এগুলোকে বাড়ী পৌঁছে আবার আস্‌ছি। এই ত সবে সন্ধ্যে হ'ল, এরি মধ্যে ঘরে ঢুকে কি কর্‌বি? আর ত ক'টা দিন মাত্র ছুটীর বাকি আছে, একটু গল্প-স্বল্প ক'রে নেওয়া যাক, এরপর ত আবার ঘানিতে জুত্‌তে হবেই নিজেদের।"

অন্য মেয়েটি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "তা চল্ বরং তোদের বাড়ীর সাম্‌নেই ঘোরা যাবে। এখানে একলা ব'সে থাক্‌তে, গাটা কেমন ছম্‌ছম্ করে। পাড়ার ছোঁড়াগুলোও বড় বদ্. সেদিন প্রভা বল্‌ছিল সন্ধ্যার সময় কে একটা তার গায়ে ফুল না কি ছুঁড়ে মেরেছিল।"

কৃষ্ণা বলিল, "প্রত্যেক মেয়ের উচিত বেড়াতে বেরবার সময় একটা চাবুক সঙ্গে রাখা, আর এরকম বাঁদরামি দেখ্‌লে আর কথাটি না ব'লে এইসব রসিক-চূড়ামণিদের আগাগোড়া চাব্‌কে দেওয়া। তা হ'লে এঁদের রসাধিক্য একটু কমে বোধ হয়। আমার গায়ে অবশ্য কেউ কিছু ছোঁড়েনি, কিন্তু গুটি দুই তিন ছেলে ঠিক ক'রে নিয়েছে যে, আমার একটা guard of honour দরকার। যখন যেখানে যাই, দেখি অন্ততঃ চারগজের মধ্যে তারা কোথাও-না-কোথাও আছে।"

কৃষ্ণার সঙ্গিনী লাবণ্য হাসিয়া বলিল, "অমন রাণীর মত চেহারা দেখ্‌লে আমাদেরই সখ হয় guard of honour হ'তে, ওরা ত পুরুষ মানুষ! তোর নাম কে যে কৃষ্ণা রেখেছিল আমি তাই ভাবি। আমাদের দেশে কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন ঢের দেখা যায়, কিন্তু তোর বেলা হয়েছে দেখ্‌ছি পদ্মলোচনের নাম কাণা। তোর নাম কৃষ্ণা না হ'য়ে তপতী হ'লে ঠিক মানাত।"

কৃষ্ণা বলিল, "আর ত বুড়ো বয়সে নাম বদ্‌লানো চলে না, তা না হ'লে তোর দেওয়া নামটাই বাহাল কর্‌তাম। ইউনিভার্সিটির কল্যাণে নামটা ছাপার অক্ষরেও উঠে গেছে অনেকবার, এখন বদ্‌লালে আমারই মুস্কিল। কৃষ্ণা রায় ব'লে বি-এ পাশ ক'রে, তপতী রায় ব'লে চাক্‌রী নিতে গেলে কেউ ত চাক্‌রী দেবে না?"

লাবণ্য বলিল, "তুই আর কদিন চাক্‌রী কর্‌বি? দু'দিন পরেই লাল বেণারসী পরে কার-না-কার ঘর আলো কর্‌তে চ'লে যাবি। নিতান্ত মা বাবা নেই তাই এতদিন ছাড়া আছিস্, পিছন থেকে ঠেলা দেবার লোক থাক্‌লে এতদিনে তিন ছেলের মা হ'য়ে বস্‌তিস্।"

কৃষ্ণা বলিল, "ভাগ্যে নেই! আমার বিয়ে কর্‌বার উৎসাহ খুব যে বেশী তা বল্‌তে পারি না। বিয়ে ত আমাদের দেশে সব মেয়েই করে, কিন্তু তাতে তাদের লাভটা যে কি হয় তাত দেখি না। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে আরো ক'টি অনাহারে কাটাবার প্রাণী জুটিয়ে দিয়ে যায় মাত্র। বিয়ে ক'রে শারীরিক, মানসিক, বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে, এমন একটা মেয়ের নাম কর ত?"

লাবণ্য বলিল, "যা, যা, পাকামি কর্‌তে হবে না। উন্নতির জন্যেই সবাই বিয়ে করে আর কি? একদলের মা বাপে বর জুটিয়ে দেয়, মেয়ের খাওয়া-পরার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার ভেবে, আর একদল নিজেই জোটায় প্রাণের দায়ে, না জুটিয়ে তাদের শান্তি থাকে না ব'লে।"

কৃষ্ণা বলিল, "আমি দুই দলেরই বাইরে পড়ব। মা বাপও নেই যে ঘাড় থেকে নামিয়ে নিশ্চিন্ত হবে, আর আমারও এখন এত ভূতে ধরেনি যে, একটি হাড় জ্বালাবার লোক না জুট্‌লে শান্তিই পাব না। আমি ত ভাবছি সেই আমেরিকা যাবার স্কলারশিপটা জোগাড় কর্‌ব, এর পরের বছর। চাক্‌রী ক'রেই যখন চালাতে হবে, তখন যাতে একটু ভদ্র গোছের মাইনে পাওয়া যায়, তার চেষ্টা করা উচিত। এ কি আর একটা জীবন! কোন রকমে বেঁচে থাকা, তক্তপোষের ছারপোকাগুলো যেমন থাকে।"

কথা বলিতে বলিতে তাহারা বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। মাঠের মাঝখানে, ছোট বাংলো-ধরণের বাড়ীটি। তাহাদের প্রতি খোলা দরজা জানালার পথে আলোর স্রোত ক্রীড়াচঞ্চল শিশুর মত ছুটিয়া আসিয়া যেন বাহিরের তৃণশয্যার উপর লুটাইয়া পড়িতেছিল। রান্নার গন্ধে সাম্‌নের জমিটি ভরপুর। কৃষ্ণা বলিল, "বাঙালীর বাড়ী যে তা লোকে একমাইল দূর থেকে বুঝবে। এমন ফোড়নের গন্ধ বার কর্‌বার সাধ্যি আর কোনো জাতের নেই।"

লাবণ্য বলিল, "তুই এক মহা মেমসাহেব। আমার ত খুব ভাল লাগে রান্নার গন্ধ। সব-কিছুতেই তুই এতও নাক সিঁট্‌কে থাক্‌তে পারিস বাপু! মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানিস্? হয়ত রবিবাবুর গোরার মত তুইও কোনো সাহেবের মেয়ে, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে বাঙালীর ঘরে এসে পড়েছিস। রংটা ত মেমের কাছাকাছি আছেই, মেজাজ এবং পছন্দগুলিও ঠিক সেইরকম।"

বাড়ীর সাম্‌নে বসিবার জন্ম খান দুই অর্দ্ধ পুরাতন তক্তপোষ পাতা ছিল। তাহারই একটা রুমাল দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে কৃষ্ণা বলিল, "বোস্ এইখানে। মাগো কি ধূলো! সাধে এখানে একখানা শাড়ী এক-দিনের বেশী দুদিন পরা যায় না? পাড়গুলোর কাছে আধ হাত ক'রে লাল ধূলোর আর একটা পাড় তখুনি দেখা দেয়।"

লাবণ্য বসিয়া বলিল, "আমাদের ধূলোর দেশ, ধূলো ত থাক্‌বেই? একটা সাহেব বিয়ে ক'রে বরফের দেশে চ'লে যা না? আচ্ছা সত্যি বল্, আমি যা বল্‌ছিলাম তাই হ'লে তুই খুসি হ'স্? তোর ত দেশী কোনো জিনিষের উপর বিন্দুমাত্রও টান দেখি না?"

কৃষ্ণা তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "মোটেই হই না, এবং তোর আলনস্করের স্বপ্ন সত্যি হ'বার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। আমার মা বাপ নেই বটে, নিকট আত্মীয়ও কেউ আছে ব'লে জানা যায় না। কিন্তু আমি যে কাদের মেয়ে কোথা থেকে মাসীমা আমায় জুটিয়ে ছিলেন, সবই পরিষ্কার ক'রে জানা আছে, সে-সব নিয়ে রহস্যাবৃত উপন্যাস সৃষ্টি কর্‌বার কিছু মাত্র উপায় নেই। দেশী জিনিষ আমার ভাল লাগে না তাই বা তোকে কে বল্‌ল? দেশের মন্দগুলো ভাল লাগে না ব'লে কি দেশের ভালগুলোও ভাল লাগে না?"

লাবণ্য বলিল, "তোর কাছে কি যে ভাল, আর কি যে মন্দ তা বুঝবারও আমার সাধ্যি নেই। থাক্ গে। তুই ফির্‌ছিস কবে রে?"

কৃষ্ণা বলিল, "পরের 'উইকে' যে-দিন ভাল সঙ্গী পাব, সেদিনই যাব। মাঝে চেঞ্জের ভাবনা না থাক্‌লে একলাই যেতাম, কিন্তু কুলি ডাকাডাকি, জিনিষ টানাটানি কর্‌তে ভাল লাগে না, তাই কারো সঙ্গেই যাব। দেখ এদিকে আমি একেবারে আর্য্য নারী, মেমসাহেবী 'ফর্‌ওয়ার্ডনেস্' আমার একেবারে নেই।"

লাবণ্য বলিল, "অন্ততঃ এজন্যও ত তোর একটা বর দরকার। পথে ঘাটে জিনিষপত্র বইবে, আর তোর মত রূপসীর একটা দরোয়ান দরকার, সে কাজও কর্‌বে।"

কৃষ্ণা বলিল, "কেন রে? আমি কি ট্র্যাফিক সুপারিন্টেনডেণ্ট হ'তে যাচ্ছি? চিরজন্ম আমি কি ট্রেনেই ঘুর্‌ব যে তার জন্যে এত পাকাপাকি ব্যবস্থা!"

বাড়ীর ভিতর হইতে একটি প্রৌঢ়ারমণী বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "ওমা, কৃষ্ণাও ফিরেছ যে! আমি ভাবি মেয়েগুলো একলাই এল বুঝি। বিকেলে ত কিছু খেয়েও বেরোওনি এক পেয়ালা চা ছাড়া। চল গরম গরম লুচি ভাজছে দুখানা খেয়ে নেবে, বেগুন ভাজা দিয়ে। লাবণ্য, এস মা। তোমাকে যে আর এ দিকে দেখি না বড়?"

লাবণ্য বলিল, "এই বাড়ীর বাইরেই সকলের সঙ্গে দেখাটা হ'য়ে যায় কিনা, কাজেই বাড়ী আস্‌বার আর চাড় থাকে না। আজ কৃষ্ণা সকাল সকাল ফির্‌ল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে এসে জুটলাম।"

বাড়ীর গৃহিণীর পিছন পিছন কৃষ্ণা আর লাবণ্যও ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। রান্নাঘরের বারাণ্ডায় দুখানা বড় বড় পিঁড়ি পাতিয়া তিনি বলিলেন, "এইখানে বোসো মা, ভিতরে যা গরম। বামুন ঠাক্‌রুন, দিদিমণিদের জল-খাবার দিয়ে যাও।"

কৃষ্ণা জুতা খুলিয়া পায়ে জল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "বাবা, কি পরিমাণ বালিই জমেছে জুতোর মধ্যে। একখানা বাড়ী প্ল্যাষ্টার করা হ'য়ে যায়। এদেশে হয় 'টপবুট' পরা উচিত, নয় খালি পায়েই হাঁটা উচিত।" সে পা মুছিয়া লাবণ্যের পাশের পিঁড়িতে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

লাবণ্য বলিল, "তোর আসনে কি পিঁড়িতে বসা দেখলে, সত্যি আমার পেট ফেটে হাসি আসে। যেন শুবি কি বস্‌বি, ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিস না। না মামীমা?"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "অভ্যেস নেই কিনা মা! ওর মাসীর ঘরে চিরকালই টেবেলেই খেয়েছে। আমাদের যদি এখন কেউ কাঁটা চামচে খেতে বলে তাহ'লে আমরা খোঁচাখুচি ক'রে রক্তপাত ক'রে বসি। তবু ত কৃষ্ণা খুব মানিয়ে চল্‌তে জানে। মেমেদের স্কুলে বোর্ডিংএ মানুষ কোনোরকম ফিরিঙ্গী-আনার ধার ধারে না। আমাদের সঙ্গে সমানে ডাল ভাত খাচ্ছে, খালি পায়ে বেড়াচ্ছে। কেবল কোথাও নোংরামী দেখলে বড় খুঁৎ খুঁৎ করে।"

মেয়েরা খাওয়া সারিয়া উঠিয়া পড়িল। কৃষ্ণা যে ঘরে শোয় সকলে সেই ঘরে আসিয়া বসিল। ঘরখানি ছোট, গৃহসজ্জাও কিছুমাত্র নাই, কিন্তু কোথাও ধূলার কণাটি নাই। দুটি ছোট তক্তপোষ ঘরের দুইধারে, বিছানাগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মাঝে একটি ছোট টেবল্, তাহার উপর কাগজেমোড়া মস্তবড় এক পুলিন্দা। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "এটা ত দেখে যাইনি? কখন এল?"

গৃহিণী বলিলেন, "তুমি বেরিয়ে যাবার পরেই এসেছে। আমি অমনি রেখে দিয়েছি, খুলে আর দেখিনি, ভিতরে কি আছে।"

কৃষ্ণা দড়াদড়ি কাটিয়া পার্শেল খুলিয়া ফেলিল। বাহির হইল এক মস্ত বড় ছবি।

কৃষ্ণা বলিল, "ওমা মাসীমার ছবি, যেটা কলকাতার ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেন্ট কর্‌তে দিয়ে এসেছিলাম। বাঁধিয়ে পাঠাল না কেন ছাই! আমি ত তাই কর্‌তে বলে এসেছিলাম। আবার গিয়ে আমাকে বাঁধাতে দিতে হবে।"

লীলা বেলার মা বলিলেন, "তা ছবিটা বেশ ভালই হয়েছে। নিতান্ত শেষ বয়সের নয় দেখছি, বছর চল্লিশ বয়সের হবে। এদানীং বড় রোগা হ'য়ে গিয়েছিলেন, চুলটুলও সব উঠে গিয়েছিল। এ ছবিটাতে বেশ মোটা-সোটা, সাজ-পোষাকও বেশ আছে দেখছি।"

লাবণ্য বলিল, "হ্যাঁরে কৃষ্ণা, তোর মাসীমা ত দেখছি বেশ সাবেক কালের গহনা গাঁটি পর্‌তেন, কাপড়খানাও গরদ ব'লে মনে হচ্ছে। তা তোকে এত মেম বানিয়ে গেলেন কেন?"

কৃষ্ণা বলিল, "নিজে হয়ত কোনো কারণে মেম হ'য়ে উঠ্‌তে পারেননি, অথচ ইচ্ছাটা ছিল। আমাকে দিয়ে সে সাধটা মিটাবার চেষ্টা করেছিলেন আর কি? চৌদ্দ পনেরো বছর অবধি ত শাড়ীর মুখ দেখিনি। তালগাছের মত লম্বা আর শিড়িঙ্গে রোগা ছিলুম, হাঁটু বের ক'রে বেড়াতে ভয়ানক লজ্জা কর্‌ত, অথচ মাসীমা কিছুতেই শাড়ী কিনে দিতেন না। বোর্ডিংএ অন্য মেয়েদের খোসামোদ ক'রে তাদের শাড়ী চেয়ে নিয়ে পর্‌তুম। আমার নাম রেখেছিলেন 'ক্রিষ্টিনা,' আমি গায়ের জোরে তাকে কৃষ্ণা ক'রে নিয়েছি।"

লাবণ্য বলিল, "কোথাকার গোঁড়া হিন্দুঘরের মেয়ে, তোর এ সব ধাতে সইবে কেন? বীফ্‌টিফ্‌ খাস্?"

কৃষ্ণা বলিল, "দূর হ, এমনি মাছ মাংসই আমার ভাল লাগে না তা বীফ খাব। মাসীমার কাছে শুনেছি আমার মা বাবা নাকি ভারি সাত্বিক বৈষ্ণব ছিলেন, সেই রক্তের গুণ থেকে গেছে আর কি?"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "সবটা থাকেনি। তোমার স্বভাবে মা বৈষ্ণবের মাথা হেঁট ক'রে থাকার ভাব একেবারে নেই। নিতান্ত তোমার মাসীর কথা অবিশ্বাস করা যায় না তাই; তা না হ'লে তোমার চেহারা ধরণ-ধারণ, পছন্দ কিছুই গরীব বৈষ্ণবের ঘরের মত নয়। কোনো রাজা-রাজড়ার বাড়ীর মেয়ে হ'লেই তোমাকে ঠিক মানাত।"

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, রাজার মেয়ে আমি যা, তাত

দশা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তা হ'লে আর মা মরতেই ধাত্রীর হাতে ফেলে সবাই স'রে পড়ত না। ভাবলে আমার কি যে রাগ হয় মাসীমা, কি বলব! মা বাপই না হয় ছিল না, তাদের তিনকুলেও কি কেউ ছিল না? এমন ক'রে বিলিয়ে দিতে তাদের মনে একটু বাধল না। মাসীমা যদি আমায় না নিতেন, তাহ'লে তারা হয়ত আমাকে নর্দ্দমাতেই ফেলে দিত। কে জানে, হয়ত বা কখনও দেশ বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে আমার কোনো গুণবান আত্মীয়ের সন্ধান মিলে যাবে। যদি চিনি, তাহ'লে তাদের যা শোনান শোনাব তা আমি মনে মনেই ঠিক ক'রে রেখেছি। মনে করেছি বিলাত হ'য়ে এসে ভাল কাজকর্ম্ম যদি কিছু পাই, টাকাকড়ি কিছু করতে পারি, তাহ'লে তাঁদের সন্ধানে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব। বাঙালী ঘরের আত্মীয় ত, টাকার গন্ধ পেলে ঠিক এসে জুটবে।"

লাবণ্য বলিল, "তা আশ্চর্য্য নয়। আচ্ছা, এখন উঠি। ছবিখানা তু'লে রাখ তা না হ'লে বাচ্চারা দেখলে এখনি টানাটানি ক'রে নষ্ট করবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "দাঁড়াও মা, একলা যেও না। ভজুয়া তোমাকে আলো নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসুক। পাড়াটা ভাল না, রাত-বিরাতে মেয়েদের একলা পথে ঘাটে না চলাই ভাল।"

লাবণ্য চলিয়া গেল, গৃহিণীও কাজে গেলেন। ঘরের জান্‌লা-দরজাগুলি বেশ ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া কৃষ্ণা আসিয়া নিজের বিছানায় বসিল। এতক্ষণ নিজের অতীত জীবনের গল্প করিয়া, এখন সেইসকল স্মৃতিচিত্রই একটার পর একটা তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

অতি শৈশবের কথা তাহার কিছুই মনে পড়ে না। বাল্যকালের স্মৃতি তাহার এই গিরিধির সঙ্গেই জড়িত। এখানের পথে ঘাটে মাঠে খেলা করিয়াই সে মানুষ হইয়াছে। তাহার মাসীমাকে বিশেষ কাজকর্ম্ম করিতে সে দেখে নাই, কালেভদ্রে নিতান্ত টানাটানি করিলে তিনি একটা-আধটা 'কলে' যাইতেন। অথচ তাহাদের দিন বেশ স্বচ্ছলভাবেই কাটিত। বাড়ীটা অবশ্য তাঁহার নিজের ছিল, কিন্তু অন্যান্য দিকেও বিশেষ ব্যয়সঙ্কোচ প্রকাশ পাইত না। কোথা হইতে টাকা আসিত সে খবর জানিতে পাড়া প্রতিবেশী সকলেরই কৌতূহল ছিল, কিন্তু কেহই বোধ হয় সেটা জানিয়া উঠিতে পারে নাই।

মিসেস্ মিত্র নিজে খ্রীষ্টান ছিলেন। কৃষ্ণাকেও তিনি সেই সমাজের মতে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ ছিল না। সামান্য রকম বাংলা লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়া যায়। স্বামীর সহিত খুব যে তিনি সুখে ঘর করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে মনে হইত না। একরকম রাগারাগি করিয়াই তাঁহারা পৃথক্ হইয়া যান। মিসেস্ মিত্রকে তাঁহার বাপের বাড়ীর সকলে জোগাড় করিয়া ধাত্রীবিদ্যা পড়িতে পাঠাইয়া দেন। পাশ করিবার পর তিনি নাকি আর একবার স্বামীর ঘর করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু খোঁজ করিয়া জানা যায় যে, স্বামীটি ইতিমধ্যেই একটি গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-করনা করিতেছেন। ইহার পর আর তিনি কখনও স্বামীর খোঁজ করেন নাই। কলিকাতায় তাঁহার প্র্যাক্‌টীশ ভালই ছিল, পয়সার জন্য কোনোদিন তাঁহাকে ঠেকিতে হয় নাই।

কৃষ্ণা যখন তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনে আসিয়া জুটিল, তখন তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা। কাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া, তিনি গিরিধিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণাকে অতি যত্নেই তিনি পালন করিয়াছিলেন। মাতার স্নেহ হয়ত তাঁহার কঠোর স্বভাবে ছিলই না, কাজেই সে দিক দিয়া এই নিজ-নীড়চ্যুতা শাবকটি কিছু বঞ্চিতই হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার আদর-যত্ন, পড়াশোনা, কোনো কিছুরই ত্রুটী হয় নাই। অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়ই ইহার জন্য তিনি করিতেন। নিজে ভাল লেখাপড়া শেখেন নাই এ দুঃখ তাঁহার থাকিয়াই গিয়াছিল। কৃষ্ণাকে তিনি কলিকাতার খুব ভাল মেয়ের স্কুলে দিয়াছিলেন, যাহাতে তাহার খুব ভাল শিক্ষা হয়। শিক্ষা বলিতে অবশ্য তিনি মেমসাহেবীই বুঝিতেন। তাহার নাম, তাহার চাল-চলন, সব যাহাতে নিখুঁৎ ফিরিঙ্গী ভাবের হয়, সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে সর্ব্বদা তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। সে থাকিয়া থাকিয়া এমন বাঁকিয়া

বলিত যে, হাজার শাসনেও তাহাকে বাগ মানান যাইত না।

এইরূপে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার আগেই নিজের ক্রীষ্টিনা নাম বদ্‌লাইয়া করিল কৃষ্ণা। ফ্রকগুলি নীচের ক্লাশের মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করিয়া, 'পকেট মনি' জমাইয়া, শাড়ী কিনিয়া পরিল। সখ করিয়া দিন কতক মাছমাংস শুদ্ধ ছাড়িয়া দিল। মিসেস্ মিত্র মেয়ের রকম-সকম দেখিয়া তাহাকে খাঁটি মেম করা সম্বন্ধে বড়ই হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে সে যখন বছর সতেরো বয়সে বলিয়া বসিল, "আমি গীর্জ্জা ফির্জ্জা যাব না, আমার ভাল লাগে না," তখন তিনি একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই কৃষ্ণার এই পালিকা মাতাটি পরলোকে গমন করেন। তাহার পর হইতে জগতে কি একেলা সে! নিতান্ত বন্ধুত্বের খাতিরে সে ছুটিতে দিন কাটাইবার একটা স্থান পায় মাত্র, কিন্তু বিশ্বসংসারে তাহার দাবী কোথায়? কাহাকেও সে জোর করিয়া কি বলিতে পারে, "আমার ভার তোমায় লইতে হইবে, না লইয়া তুমি যাইবে কোথায়?" তাহার জন্মের জন্য দায়ী যাঁহারা, তাঁহারা ত আজ সকল নালিশের পরপারে। পালনের জন্য দায়ী যিনি তিনিও ইহলোকে নাই, থাকিলেও তাঁহার উপর কোনো দাবী চলিত না। সমাজ বা সংসারও তাহাকে এখনও কাহারও সহিত এমন বন্ধনে বাঁধে নাই, যাহাকে সে কিছু দিতে পারে বা যাহার কাছে জোর করিয়া কিছু চাহিতে পারে। একেলা, একেলা, এই মায়ার বন্ধনময় জগতে সে একেবারে বন্ধনহীন। সে কাহারও নয়, তাহারও কেহ নয়।

ভাবিতে ভাবিতে, আপনার অজ্ঞাতসারে, কখন তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। লীলার ডাকে তাহার চমক ভাঙিল। চোখ মুছিয়া সচেতন হইয়া দেখিল, মৃদু জ্যোৎস্নার আলো ঘরখানিকে ভরিয়া ফেলিয়াছে। রাস্তা প্রায় জনশূন্য, অনেক রাত হইয়া থাকিবে। পাশের ঘরে ছোট খোকাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা সজোরে এবং সরবে চলিতেছে।

কৃষ্ণা উঠিয়া পড়িল। ছেলেমেয়েরা এখনি খাইতে বসিবে, গৃহিণীকে তখন একটু সাহায্য করা দরকার, তা না হইলে ছেলে-মেয়েরা ভাত খায় যতখানি, মার খায় তাহার দ্বিগুণ, এবং ঘুমাইতে তাহাদের বারোটা বাজিয়া যায়।

৮

পাড়ারই এক ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতা যাইতেছিলেন। কৃষ্ণারও ছুটী প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল, আর সপ্তাহখানিক মাত্র বাকি। সেটুকু এইখানে কাটাইয়া যাইতে পারিলে অবশ্য সে খুসিই হইত, কারণ কলিকাতায় ফিরিতে বেশী আগ্রহ হইবার তাহার কোনোই কারণ ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে আবার হয়ত সুবিধা মত সঙ্গী নাও মিলিতে পারে। কাজেই আর সাতটা দিন গিরিধিতে কাটাইবার মায়া ত্যাগ করিয়া সে সকালে উঠিয়াই পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের সহিত যাওয়ার সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিতে। তাহার সঙ্গী ছিল লীলা।

বেলা সাড়ে সাতটার বেশী হইবে না, কিন্তু এরই মধ্যে রৌদ্রের তেজ বেশ একটুখানি প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখ থাকিয়া থাকিয়া আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল, রেশমী ছাতাতেও তাহার কোনোই সুবিধা হইতেছিল না। লীলা রোদ গরম সব অগ্রাহ্য করিয়া মনের আনন্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছিল, এবং মাঝে মাঝে কৃষ্ণার ডাকে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিতেছিল। গিরিধির পথের লাল ধূলা তাহার চঞ্চল চরণাঘাতে উড়িয়া উড়িয়া তাহার মাথার চুল অবধি রাঙা করিয়া তুলিয়াছিল।

নিতান্ত এলোথেলো নিরাড়ম্বর ভাবে বাড়ীর বাহির হওয়া কৃষ্ণার কুষ্ঠিতে লেখে নাই। এত সকালেও তাহার চুল বেশ পরিপাটী করিয়া এলো খোঁপা বাঁধা। পরণে একটি সবুজ রঙের ভয়েলের ব্লাউজ এবং সবুজ পাড়ের একটি শাড়ী। কাঁধে বেশ চওড়া একটি 'গোল্ড ষ্টোনে'র ব্রোচ্। পায়ে সাদা রেশমী মোজার উপর উঁচু হীলের সাদা জুতা। পথে যে দুই চারিটি মানুষ তখন চলিতেছিল, প্রত্যেকেই এই রূপসী তরুণীকে বেশ একটু ভাল করিয়া না দেখিয়া গেল না, কারণ তাহার সৌন্দর্য্যটা বাঙালী

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের অপেক্ষা অনেকখানিই উচ্চদরের ছিল, এবং উহা সম্বন্ধে কৃষ্ণার সচেতনতারও অভাব ছিল না। মেয়ে মহলে ইহা লইয়া সমালোচনা চলিত যথেষ্ট। কৃষ্ণা যে খুবই সুন্দরী কি না, সে-বিষয়ে মতভেদ অনেক সময় দেখা গেলেও, সে যে অবস্থার অতিরিক্ত বিলাসিতা করে, এ বিষয়ে কোনই মতভেদ দেখা যাইত না। কোথাকার কুড়নো মেয়ে তার ঠিক নাই, তাহার আবার অত বিবিয়ানা কেন বাপু? এ সব সমালোচনা কখনও যে কৃষ্ণার কাণে না যাইত, তাহা নহে, কিন্তু নিজের সুন্দর সমুন্নত নাসিকা অবজ্ঞায় কুঞ্চিত করিয়া সে যেন আরো দ্বিগুণ উৎসাহে আপনার মতেই চলিতে থাকিত।

নির্দ্দিষ্ট গৃহে পৌছিয়া, কৃষ্ণা ছাতা মুড়িয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। একটি ছোট ছেলে তাহাকে খবর দিল যে মা বাড়ী নাই, বাবা বসিয়া কাগজ পড়িতেছেন। অভাবপক্ষে তাঁহারই সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সব স্থির করিয়া লওয়ার আশায় কৃষ্ণা ছেলেটির পিছন পিছন বসিবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কৃষ্ণা বলিল, "আমি একজন সঙ্গী খুঁজছি। আপনারা যাচ্ছেন শুনে, জান্‌তে এলাম কবে যাবেন। আমি সঙ্গে এলে কি আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে?"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "অসুবিধা হবে কি রকম? অসুবিধা হ'লে আপনারই হবে। আমার ছেলে-মেয়েগুলো কি রকম জানোয়ার দেখেছেন ত? আপনার হাড় জ্বালিয়ে তুল্‌বে এক ঘণ্টার মধ্যেই। পঙ্কু নাকি সেদিন বেলার চোখে বালি দিয়ে দিয়েছে?"

কৃষ্ণা বলিল, "কোথায়? খেল্‌তে খেল্‌তে একটুখানি লেগে গিয়ে থাক্‌বে। আমার হাড় খুব শক্ত, সহজেই জ্বলে না। আপনারা কি পরশু যাবেন?"

পঙ্কুর বাবা বলিলেন, "গাড়ী রিসার্ভ ক'রে যেতে হবে আমাকে, তা না হ'লে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে গিন্নির বড় অসুবিধা হয়। পরশু না পাই, ত তার পরদিন যাব।"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা, আমি আসি তাহ'লে। আমার টিকিটটাও আপনি তাহ'লে ক'রে দেবেন। আমি বাড়ী গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

গৃহস্বামী বলিলেন, "টাকার জন্যে কিছু তাড়াতাড়ি নেই। একটা 'এক্‌ট্রা' টিকিট আমার গাড়ী রিসার্ভের জন্যে নিতেই হয়েছে, আপনি যখন হয় টাকা দিলেই হবে।"

কৃষ্ণা আবার লীনাকে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। পথ এখন তাতিয়া গরম হইয়া উঠিয়াছে। লীনার খালি পায়ে পাছে ফোস্কা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে কৃষ্ণা তাহার হাত ধরিয়া খুব হন্‌হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে হিসাব করিতে করিতে চলিল, তাহার হাতে কত টাকা আছে, এবং তাহার খরচ কত পড়িবে। ধোপা এখনও তাহার কাপড় দিয়া যায় নাই, সেও এক মুস্কিলের কথা। বাড়ী গিয়াই চাকরটাকে তাহার সন্ধানে পাঠাইতে হইবে। টাকার হয়ত একটু টানাটানিই পড়িবে। টিকিটের দাম দিয়া, গাড়ীভাড়া, কুলিভাড়া, প্রভৃতির জন্য টাকা দশ হাতে রাখিলে, লীনা, বেলাদের কিছুই কিনিয়া দেওয়া চলিবে না। নিতান্ত দুই চারি আনা দামের জিনিষ দিতে তাহার কিছুতেই মন ওঠে না। প্রতিবার ছুটীর সময়েই প্রায় তাহাকে ইঁহাদের বাড়ী আশ্রয় লইতে হয়। তাঁহারা কিছু কৃষ্ণার কাছে থাকিবার বা খাওয়ার খরচ লন না। তাই, পরের অন্ন ধ্বংস করার লজ্জা কাটাইবার জন্য কৃষ্ণা প্রতিবারেই ছেলেমেয়েদের জন্য বেশ কিছু খরচ করিয়া উপহার কিনিয়া আনে, অথবা যাইবার সময় কিনিয়া দিয়া যায়। ইঁহারা তাহার পালিকা মাতার অনেক কালের বন্ধু। সেই হিসাবে কৃষ্ণাকে বাড়ীর মেয়ের মতই আদর যত্ন করেন, কিন্তু বিনা প্রতিদানে কেবল উপকার গ্রহণ করিতে কৃষ্ণার দৃপ্ত মন বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাই সে এই উপায় বাহির করিয়াছে। কিন্তু এবার তাহার যে রকম টাকার টানাটানি, কি করিয়া যে সে কি করিবে, কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

পিছন হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, "কি গো সুন্দরী, এত ঊর্দ্ধশ্বাসে কোথায় চলেছ?"

কৃষ্ণা পিছন ফিরিয়া লাবণ্যকে দেখিয়া বলিল, "কোথাও চল্‌ছি না, বাড়ী ফির্‌ছি। পঙ্কুদের বাড়ী গিয়েছিলাম যাওয়ার ঠিক কর্‌তে। তুই কোথায় যাচ্ছিস এখন? কবে যাওয়া ঠিক কর্‌লি? আয় না।"

লাবণ্য বলিল, "না ভাই, এখন আর যাব না, অনেক-গুলো সেলাই বাকি, বাড়ী গিয়ে তাই নিয়ে পড়ব এখন। জানিস্ ত মা এসব কিছুই পারেন না, ভাইবোনদের সব সেলাই আমাকে ছুটীর সময় এসে ক'রে দিতে হয়। তা পঞ্চুদের বাড়ী যাবার জন্যেই এত সাজ করেছিস্? কার মনোহরণ কর্‌বার জন্যে এত ঘটা? বাড়ীর জ্যেষ্ঠতম যুবকটিরত বয়স আট বছর, তাকেই ফাঁদে ফেল্‌বার চেষ্টায় আছিস্ নাকি? বাবা, শাড়ী, ব্লাউজ, ম্যাচ্ করিয়েই অন্য লোকে পরে, তোর আবার জুতো মোজা ছাতা অবধি ঠিক মানান-সই হওয়া চাই। "সবুজ" ছাতার নীচে টুক্‌টুকে মুখখানি বেশ ফুলের মত দেখাচ্ছে। দিনে ক'ঘণ্টা এ বিষয়ে study করিস্ রে?"

কৃষ্ণা তাহাকে চিম্‌টি কাটিয়া বলিল, "চব্বিশ ঘণ্টাই। আমার আর ভাববার কি আছে বল্? তুই কবে যাচ্ছিস্, বল্‌লি না?"

লাবণ্য বলিল, "দিন পাঁচ সাতের মধ্যেই যাব হয়ত। এবার বাবাই দিয়ে আস্‌বেন, বল্‌লেন, কাজেই আর সঙ্গীর ভাবনা ভাব্‌ছি না।"

কৃষ্ণা বলিল, "এবার কিন্তু গিয়েই চোখ কান খাড়া রাখিস্। যদি কোন কাজ খালি হয়, তখনি আমাকে জানাবি। আমার আর ঐ খ্রীষ্টানী স্কুলে কাজ কর্‌বার মোটে ইচ্ছা নেই। তা ছাড়া মাইনেও বড় কম, আমার একলা মানুষেরই খরচ চালানো দায় হ'য়ে ওঠে। সত্যি এবার আমেরিকা যাবার স্কলারশিপটা পেলে বেঁচে যাই। এই আধ পয়সার হিসাব ক'রে চল্‌তে চল্‌তে আমার ত প্রাণ গেল।"

লাবণ্য বলিল, "মেয়ে-স্কুলের চাকুরী ত হরদমই খালি হচ্ছে, ভাই। আসল চাকুরীর সন্ধান পেলেই সব লেজ তু'লে চম্পট, বিশেষ ক'রে অল্পবয়সী টীচার-গুলি। তাদের চাকুরী নেওয়া নিতান্ত একটা সময় কাটাবার occupation, বর যতদিন না জোটে। মিসেস্ চন্দ ত বলেন, এবার সব married টীচার নেবেন, নয়ত এমন দেখে নেবেন, যাদের বছর পঞ্চাশ বয়স হ'য়ে গিয়েছে, তা হ'লে তারা আর ছ'মাস কাজ ক'রেই পালাবে না। সত্যি, term-এর মাঝখানে কাজ ছেড়ে দিলে মেয়েদের বড় ক্ষতি হয়। তা মাইনে কিন্তু এখানেও খুব বেশী না, তা আগে থেকে ব'লে রাখছি। ওখানে যা পাচ্ছিস্, তার চেয়ে বড় জোর দশ পনেরো টাকা বেশী হ'তে পারে।"

কৃষ্ণা বলিল, "তাই বা মন্দ কি? তেল সাবান ইত্যাদির খরচটা ত উঠে যাবে?"

লাবণ্য তাহার পিঠে এক চড় মারিয়া বলিল, "নে নে, থাম্, আর বেশী বড় মানুষী ঢং দেখাতে হবে না। তুই বুঝি মাসে দশ পনেরো টাকার তেল সাবান মাখিস্? এইজন্যে সবাই তোর এত নিন্দে রটায়, যা বা না কর্‌বি, তাও ব'লে বেড়াবি।"

কৃষ্ণা বলিল, "নিন্দে করুক ত বয়ে গেল! আর কারো টাকায় ত করি না? নিজের টাকায় যদি আমি মাসে আড়াই মণ তেলও মাখি, তাতে তাদের গায়ে ফোস্কা পড়ে কেন রে? আমার কেউ নেই ব'লে বুঝি আমাকে সারাক্ষণ ছেঁড়া কাপড় প'রে আর ছাই মেখে বেড়াতে হবে! দেখ, এইজন্যে আমার আরো অনেক বেশী টাকা হাতে পেতে ইচ্ছা করে। যদি ইচ্ছা হয়, আমি মুঠো মুঠো ক'রে রাস্তায় ফেলে দেব, ইচ্ছা হয়ত কাউকে পাঁচশ টাকা কি হাজার টাকা দিয়ে দেব। সংসারে মজা এই দেখি যে, পরের দুঃখটা লোকে খুব উপভোগ করে, পরের সঙ্গে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌বার লোক সর্ব্বদাই জুটবে, কিন্তু পরের সুখসমৃদ্ধিতে হাস্‌বার লোক বড় কম। কারো কিছু সুখের কারণ হয়েছে শুন্‌লে বেশীর ভাগ লোকেরই যেন গলায় ভাত আট্‌কে যায়।"

লাবণ্য বলিল, "তা ত যাবেই। সংসারে হিংসুটের ত অভাব নেই? আচ্ছা, তুই এগো, গরমে একেবারে লাল হ'য়ে গেছিস্। আজ বিকেলে যাব এখন।"

কৃষ্ণা লীলাকে লইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। বাড়ী পৌঁছিয়া, জুতা মোজা খুলিয়া, কাপড় বদ্‌লাইয়া সে জিনিষ গোছানোর কাজে লাগিয়া গেল। বই খাতা প্রভৃতি যাহা কিছু বাহিরে ছিল, সব জোগাড় করিয়া এক জায়গায় আনিয়া রাখিল। চাকরটাকে ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া নিজের ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাহার ভিতরকার জিনিষ-

পত্র সব বেশ পরিপাটি করিয়া গুছাইতে লাগিল, তাহা না করিলে সব জিনিষ ইহার ভিতর কুলায় না। কাপড়-চোপড় নাড়ানাড়ি করিতে করিতে দুই টুক্‌রা রেশম বাহির হইল। একটি ফিকা নীল রংএর অন্যটি সোণালী। নিজের ব্লাউস তৈয়ারী করিবে বলিয়া কৃষ্ণা এ দুটি টুক্‌রা কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু ছুটীর মধ্যে আলস্য করিয়া আর সে কিছু করে নাই। এখন হঠাৎ এগুলির উপর চোখ পড়াতে তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। ভাবিল, "এইগুলো দিয়ে লীলার একটা, বেলার একটা জামা হ'য়ে যাবে। কিছু খেলো জিনিষও হবে না, বেশ দামী সিল্ক। তা হ'লে এখনকার মত টাকার টানাটানির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। খোকাকে এখান থেকেই কিছু ভাল দেখে কিনে দেব এখন। কিন্তু সময়ই বা কোথা? আজ দুপুরেই যদি লাবণ্যর ওখানে গিয়ে সেলাই সুরু করি, তা হ'লে হয়। দেখা যাক্।"

ইতিমধ্যে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে, ধোপা আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাপড় লইয়া আসিবে। খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণা তখন স্নান করিতে চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া, তাড়াতাড়ি ডাল ভাত যাহা পাইল, মুখে দুটা গুঁজিয়া, সে রেশমের টুক্‌রা দুটি ও শেলাইয়ের সব সরঞ্জাম লইয়া লাবণ্যদের বাড়ী যাইবার জন্য পথে বাহির হইয়া পড়িল। আর বেশী দেরি করিলে হয়ত গরমের জন্য আর রাস্তায় চলাই যাইবে না।

লাবণ্য বলিল, "কিরে, হঠাৎ যে এমন অসময়ে?" কৃষ্ণা বলিল, "মহা কাজ নিয়ে এসেছি। লীলা, বেলার এ জামা দুটো কালকের মধ্যে শেষ কর্‌তেই হবে। তোর প্যাটার্ন বইটা শিগগির বার কর্।"

সারা দুপুর কেবল কাটা, জোড়া দেওয়া, সেলাই করা চলিতে লাগিল। দুই সখীরই যেন আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। লাবণ্য মাঝে একবার নাওয়া-খাওয়া করিতে উঠিয়া গেল। তাহার ছোট ভাই বোনরা দু-চার বার ঘরের ভিতর ঘোরাঘুরি নাচানাচি করিয়া গেল, কিন্তু কৃষ্ণার বিষম গম্ভীর ভাব দেখিয়া আর বেশী কিছু করিতে সাহস করিল না।

বিকালের দিকে কৃষ্ণার ঘাড় পিঠ সব ব্যথা করিতে আরম্ভ করিল। আর কাজ করা চলিবে না বুঝিয়া সে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া উঠিয়া পড়িল। লাবণ্য বলিল, "এই চা খেয়ে যা! সারাদিন ব'সে থেকে ঠিক এই সময় উঠ্‌ছিস্ যে বড়? এখন তোকে না খাইয়ে ছেড়ে দিলে মা আমাকে খুব বক্‌বেন।"

কৃষ্ণা মিনতি করিয়া বলিল, "না ভাই যাই এখন। গরমে মাথা কেমন কর্‌ছে, বাড়ী গিয়ে আর একবার স্নান কর্‌ব। আর ধোপাটাও কাপড় দিয়ে গেল কিনা দেখতে হবে। আমার আবার কালকের মধ্যে সব গোছগাছ হওয়া চাইত? পরশু যদি ওরা গাড়ী রিসার্ভ পায় ত পরশুই চ'লে যাবে, সেদিন আর কিছু গোছাবার সময় পাবো না।"

লাবণ্য বলিল, "তা হ'লে কাল রাত্রে এসে আমাদের সঙ্গে খাবি, কথা দিয়ে যা। কবে থেকে ভাব্‌ছি, তোকে একদিন খেতে বল্‌ব, তা এর অসুখ, ওর অসুখ লেগেই আছে। আর এই ছোট ফ্রকটা রেখে যা, আমি ওটা শেষ ক'রে রাখব।"

কৃষ্ণা রাজী হইয়া জিনিষ-পত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, ধোপা কাপড় দিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার খুব ভাল একটা ঢাকাই শাড়ী দেয় নাই। চাকর আসিয়া খবর দিল যে, ধোপা বলিয়াছে শাড়ী সে কাল পরশুর মধ্যে নিশ্চয় আনিয়া দিবে, "আচ্ছাসে তৈয়ার" হয় নাই বলিয়া সে আজ আনে নাই।

"পরশু আসলে ত আমি কৃতার্থ হ'য়ে যাব একেবারে," বলিয়া বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। গরমে তখন তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। একখানা খবরের কাগজ পাট করিয়া বাতাস খাইতে খাইতে সে ভাবিল, "এত রোদের মধ্যে না এলেই পার্‌তাম।"

খানিক পরে উঠিয়া পড়িয়া সে স্নান সারিয়া আসিল। কালো চুলের রাশে বাতাস করিতে করিতে জিনিষ-পত্র গোছানয় মন দিল। বেলা ছুটিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণি, তুমি চ'লে যাচ্ছ? এবারে আমায় খেলনা দিয়ে গেলে না?"

কৃষ্ণা বলিল, "এবার তোর জন্যে সুন্দর সিল্কের ফ্রক তৈরি কর্‌ছি। দেখিস্ এখন কাল।"

বেলা উৎসুক হইয়া বলিল, "না, এখনি দেখব।" কৃষ্ণা বলিল, "এখন ত এখানে নেই। সেটা লাবণ্য দিদির কাছে আছে, সে শেলাই কর্‌ছে। কাল শেলাই হ'য়ে গেলে নিয়ে আস্‌ব।"

রাত্রি হইয়া আসিল। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া জিনিষ-পত্র বেশীর ভাগ গোছাইয়া, কৃষ্ণা আজ কিছু সকাল সকালই শুইয়া পড়িল। ধোপা তাহার শাড়ী না দেওয়াতে মনটা তাহার একটু বিরক্ত হইয়াই রহিল। সারা রাত প্রায় স্বপ্ন দেখিল যে, হারানিধির অন্বেষণে সে গিরিধিময় ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই পঙ্কুদের বাড়ীর চাকর খবর দিয়া গেল যে, কালই গাড়ী রিসার্ভ পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাদের যাত্রা স্থির। কৃষ্ণার মহা তাড়াতাড়ি লাগিয়া গেল। চাকরকে আবার ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া সে ছুটিল লাবণ্যদের বাড়ী শেলাই শেষ করিতে। সারাদিন দুই বন্ধু অবিশ্রাম খাটিয়া ফ্রকগুলি শেষ করিয়া ফেলিল। বিকাল হইয়া আসিল দেখিয়া লাবণ্য বলিল, "আর এখন বাড়ী গিয়ে কি কর্‌বি? মুখ হাত এখানেই ধুয়ে নে, কাপড় ছাড়তে চাস্ তাও দিচ্ছি। একেবারে রাত্রে খেয়ে দেয়ে যাস্। আমাদের বাড়ী খেতে বেশী দেরি হয় না, সব বাচ্চা-কাচ্চার দল, ন'টার মধ্যেই খাওয়া চুকতে হয়।"

চুল বাঁধিয়া, মুখ হাত ধুইয়া দুই সখীতে বাড়ীর সাম্‌নেই একটু বেড়াইতে চলিল। লাবণ্য বলিল, "লীলার ফ্রকটাই বেশী ভাল হয়েছে, তবে মেয়েকে কেমন মানাবে বল্‌তে পারি না। ব্লুরংটা শ্যামবর্ণে সব সময় মানায় না।"

কৃষ্ণা বলিল, "কেন, লীলা এমন কিছু ত কাল নয়, একরকম মানিয়ে যাবে এখন। কিই বা করি বল? এখানে ত আর ইচ্ছামত জিনিষ সব সময় পাওয়া যায় না? খোকাকে খেলনা কিনে দিলাম, আট দশ টাকা খরচ ক'রে, তাও কিছু পছন্দ মত জিনিষ হ'ল না।"

খাওয়ার ডাক পড়ায় তাহারা ভিতরে চলিল। ফিরিতে রাত হইয়া গেল, কাজেই আসিয়া শুইয়া পড়া ছাড়া কৃষ্ণার আর কিছু করিবার রহিল না।

বিদায়ের সময় বাড়ীর সকলের মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। লীলা, বেলা, দিদিমণির দেওয়া নূতন সিল্কের ফ্রক পরিয়া তাহার সহিত ষ্টেশনে যাইতেছিল, কাজেই তাহাদের মুখে তখনও হাসি। কৃষ্ণা অনাত্মীয়া হইলেও, এবাড়ীতে আত্মীয়ার ব্যবহার পাইত এবং করিতও। তাহারও মনটা এই শিশুগুলিকে ছাড়িয়া যাইতে একটু কাতর হইয়া উঠিল। কিন্তু জগতে কিছুরই প্রতি মমতা করিয়া লাভ কি তাহার? সে ছোট খোকাকে কোলে লইয়া, চুমা খাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গৃহিণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এবার গিয়েই একটা তার ক'রে দিও মা। সেবার তোমার চিঠি আস্‌তে ছ' সাত দিন দেরি হ'ল, আমি ত ভাবনায় মরি। মেয়ে ছেলে হাজার শক্ত-সমর্থ হ'লেও তাদের পথে ছেড়ে দিয়ে প্রাণে স্বস্তি থাকে না।"

ট্রেন ছাড়িতে একটু দেরি আছে দেখা গেল। কৃষ্ণা সে সময়টুকু লীলা, বেলাকে লইয়া প্ল্যাটফর্মে ঘুরিয়া বেড়াইল। যখন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, তখন লীলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "জান দিদিমণি, মা বলেছেন, এর পরের বছর থেকে আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতা যাব আর আস্‌ব। আমিও স্কুলে ভর্ত্তি হব কি না?"

কৃষ্ণা বলিল, "পরের বছর আমি হয়ত বিলেত চ'লে যাব, কি ক'রে তুমি যাবে আস্‌বে আমার সঙ্গে?"

লীলা বলিল, "ই, তুমি বিলেত যাবে কেন? সেখানে ত কেবল মেমরা যায়।"

কৃষ্ণা বলিল, "আমিও ত মেম? দেখিস্ না, লাবণ্য-দিরা আমায় মেম সাহেব ব'লে ডাকে?"

বেলা ঝাঁকড়া চুল শুদ্ধ মাথাটা দোলাইয়া বলিল, "না, তুমি কক্ষনো মেম না। তুমি ত শাড়ী পর। মেমরা

ঘাঘরা পরে, আর শাদা মোজা পরে, পা বার ক'রে বেড়ায়।"

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। চাকরের হাতে লীলা, বেলাকে গছাইয়া দিয়া কৃষ্ণা গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীর ভিতর ইতিমধ্যেই মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পঙ্কু ও তাহার ছোট ভাই জান্‌লার পাশে বসিবার অধিকার সাব্যস্ত করিতে মুষ্টিযোগের স্মরণ লইয়াছে। কৃষ্ণা ভিতরে আসিতেই তাহাদের পিতা হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখুন, কি রকম সব জন্তু নিয়ে আমায় যাওয়া আসা কর্‌তে হয়। আপনি আবার আমাদের অসুবিধা করার ভাবনা ভাব্‌ছিলেন।"

ক্রমশঃ

পল্লী-সংস্কার-কার্য্যে অর্থের কথা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

এ-কথা আজ জলের মত সহজ সরল বোধ হইতেছে যে, পল্লীর সমষ্টিগত উন্নতিই হইল দেশের উন্নতি—দেশোন্নতি পৃথক্ কোনও জিনিষ নহে। পল্লীগুলাকে ধর্ম্মে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, ধন-সম্পদে উন্নত করিতে পারিলে দেশকেই উন্নত করা হইল। সুতরাং পল্লীর উন্নতি ভিন্ন দেশোন্নতি অপর কিছু নহে। তাই বিশ পঁচিশটা সহর শিক্ষায়-দীক্ষায়, ধনসম্পদে উন্নত হইলেও দেশ যে, তাহার পশ্চাতে পল্লীর সর্ব্ব প্রকার দীনতায় কুণ্ঠিত হইয়া থাকে একথাটা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। পল্লীর সংস্কার অত্যাবশ্যক, এজন্য কর্ম্মী চাই, ধন চাই। কর্ম্মীর কথা বলিব না, তাহার অভাব নাও হইতে পারে। সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্ যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, পল্লীতে কর্ম্মীর অভাব নাই, তা হ'লে অর্থই বা আসিবে কোথা হইতে? সংস্কারের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। পল্লীবাসীর নিকট পল্লীজীবনই ভারাক্রান্ত দুর্ব্বহ বোধ হইতেছে, দু'বেলা পেট ভরিয়া অন্নের সংস্থান হইয়া উঠিতেছে না, অন্নচিন্তা চমৎকারা। অন্য বিষয়ে ভাবিবার চিন্তিবার অবসর নাই—তা সে যতই ভবিষ্যৎ উন্নতিকর হোক্ না কেন। আজ বাঁচিলে ত কাল। আজকের বাঁচাটাকেই জিয়াইয়া রাখা মুস্কিল। দু'চারজন ত্যাগী কর্ম্মীকে বাদ দিয়া, এইত হইল পল্লীর সাধারণ লোকের ভিতরকার কথা। যেমন চলিতেছে সেইটাইত ক্রমে অচল হইয়া আসিতেছে—তাহা হইতে কতটুকুই বা দেওয়া চলে যার উপর নির্ভর করিয়া পল্লী-সংস্কারের জগন্নাথের রথ সচল হইয়া উঠিবে? আমাদের অনেক অনুষ্ঠান সভা সমিতির তিরোধানের একমাত্র কারণ অর্থাভাব, সুতরাং পল্লীসংস্কারের অর্থের দিক্‌টা যদি আমরা প্রথমেই খুব ধীরতার সহিত সমাধা করিয়া না লই তবে অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পল্লীসংস্কার-প্রচেষ্টাও মধ্যপথে অচল হইয়া পড়িবে, দেশবন্ধু দাশ পল্লীসংস্কার কল্পে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ কত জানি না, তাঁর বাঞ্ছিত পল্লীসংস্কার কল্পে যে পল্লীসমিতি গঠনের চেষ্টা চলিতেছে—কাগজেপত্রে দেখা যায়, কয়েকটি পল্লীতে পল্লীসমিতি স্থাপিতও হইয়াছে—ঐ সকল সমিতির গঠনকার্য্যে অর্থের সংকুলান কোথা হইতে হইবে বা হইতেছে? উপরোক্ত ধনভাণ্ডার হইতে ত? অপর কোথাও হইতে ঢালা টাকা আসিতেছে এবং পল্লীতে পল্লীতে তাহার দ্বারা শিক্ষা, চিকিৎসা, জলাশয় খনন, খানাডোবা জঙ্গল—কি পরিষ্কার করা ইত্যাদি কার্য্য চলিতে থাকিল ইহাতে যেমন দেশাত্ম-বোধের কম্‌তি থাকে তেম্‌নি স্বাবলম্বনের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হয়। এত অর্থই বা সংগ্রহ হইবে কোথা হইতে? সেইজন্য মনে হয় প্রত্যেক সমিতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যদি একটি করিয়া অর্থকরী ব্যবসায় চলিতে থাকে ত তাহার লাভ হইতে গঠন-কার্য্য সুচারুরূপে চালিত হইতে পারে। মাসিক বা বাৎসরিক চাঁদা কিম্বা ত্যাগীকর্ম্মীদের শারীরিক পরিশ্রমে কার্য্য বেশীদূর আগাইবে বলিয়া মনে হয় না, কোনও ২।১ টা পল্লীতে বিশেষ কোনও দেশভক্তের দানের অর্থে কতক কার্য্য হইতে পারে মাত্র কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। সর্ব্বত্র ইহা সম্ভবও নয়, এই ব্যবসায়ের মূলধন Share Systemএ শেয়ার হিসাবে, তোলা হউক, তাহাতেও আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ সম্ভবপর নয়, কারণ গঠন-কার্য্য বহুল ব্যয়সাধ্য। অন্ততঃ ২।৩ হাজার টাকা মূলধন চাই, Share Systemএ যত অল্পই হউক তোলার আবশ্যকতা এই যে, ইহাতে ব্যবসায়ে প্রত্যেকের স্বার্থঘটিত একটা যোগ থাকিবে, বাকি অর্থ দেশবন্ধু-পল্লীসংস্কারের ধন-ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হউক। বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে 'ভাণ্ডার' হইতে উদ্ধৃত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত "সমবায় ও আদর্শ-পল্লী" প্রবন্ধে উপরোক্ত Share Systemএ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায়ে খাটাইয়া তাহার লভ্যাংশে পল্লীসংগঠন কার্য্য চালাইবার আলোচনা আছে, তবে তিনি মাত্র Share বিক্রয় দ্বারা মূলধন তোলার কথা বলিয়াছেন, সেইখানেই বিশেষ সন্দেহ, কারণ কোনও পল্লীর এমন সচ্ছল অবস্থা নহে যে, Share শেয়ার বিক্রয়ে অন্ততঃ ২।৩ হাজার টাকা সংগ্রহ হইতে পারে। তিনি যে দুগ্ধ সরবরাহ, Poultry প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন তাহা খুব সুচিন্তিত, মোটামুটি কথা—প্রত্যেক সমিতির সহিত একটি করিয়া অর্থকরী ব্যবসায় চালাইবার ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত দরকার, উহার মূলধন কতক—যতটা সম্ভব—পল্লীবাসীদের কাছে Share বিক্রয় দ্বারা সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট অর্থ—সেই অঙ্কটাই বেশী হইবে—দেশবন্ধু-পল্লীসংস্কারের ধনভাণ্ডার হইতে বিনা সুদে দেওয়া হউক। এমন নিয়মও অসঙ্গত নয় যে, পল্লীবাসীরা যত অর্থ সংগ্রহ করিবেন তাহার ৩ কি ৪ গুণ অর্থ ধন-ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হইবে কি এমনি কিছু। এই ব্যবসায় পরিদর্শন পরপর উপরিতন সমিতি—যেমন পল্লীগুলির মহকুমা, মহকুমাগুলির জেলা সমিতি কিম্বা বোর্ড করিবেন, এ বিষয় চিন্তা করিবার জন্য দেশবন্ধু-পল্লীসংস্কার সমিতির প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পুরাতনী

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

১

পুরাতন বাস্তু-ভিটা, অতি উচ্চ শিখরে তাহার
প্রভাতে সন্ধ্যায় বসি' রচি গান ; বিজন-বিধুর
চেয়ে থাকি মুগ্ধনেত্রে, নভোতলে যেথায় সুদূর—
মিশে গেছে অরণ্যের অনন্ত পল্লব-পারাবার,
নভোন্নত তরুশির—নীলে ও শ্যামলে একাকার !—
তারি 'পরে ফেলে ছায়া নবমেঘ গম্ভীর মেদুর।
অশ্বত্থ, তিন্তিড়ী, তাল, শিমূলের কচিৎ সিঁদুর,
বেণুশীর্ষ, আম্র আর পনসের ঘনপত্রভার
ঢেকে আছে ধরণীরে। ঊর্দ্ধে শূন্য মহা নীলাম্বর,
নিম্নে হরিতের মেলা ; সারাবেলা বিহঙ্গের গান,
রহি' রহি' বায়ুমুখে কাননের উদাস মর্ম্মর,
নীরব উদয়-অস্ত, মধ্যদিন নিশীথ-সমান !—
এই মৌনী প্রকৃতির সুনিবিড় অরণ্য-বাসর,
এই মোর কবি-ধাত্রী—জনহীন সবুজ শ্মশান !

২

আমার নয়নে শুধু বর্ণ আর বিপুল প্রসার—
নিস্তব্ধ রূপের ছায়া, মেঘ-মায়া সন্ধ্যায় প্রভাতে,
দৃষ্টি মোর ডুবে যায় নীর-হীন নীরদ-শোভাতে—
ধরণীর চতুঃসীমা-ভরা ওই বিটপী-বিথার।
কাণে নয়—প্রাণে জাগে সুগম্ভীর ধ্বনি অনিবার,
বসি যবে মহামৌনী সুবিরাট কানন-সভাতে—
সুদূর-কালের স্রোত মেঘ-মন্দ্র মৃদঙ্গ-আঘাতে
আছাড়িয়া পড়ে বুকে—অতীতের স্তব্ধ হাহাকার !
দাঁড়ায় আমারে ঘিরে' মোর সেই পিতৃ-পিতামহ—
বৃহৎ-কালের সাক্ষী, বহুযুগ-যুগান্ত স্বপন
ভরি' দেয় আঁখিপাতা। জন্ম-মৃত্যু-ভাবনা দুঃসহ
ভুলে যাই, চিত্তে মোর কল্পনার নীল আলেপন
স্নিগ্ধ করে সর্ব্ব ব্যথা ; পুরাতন এ বন-ভবন
বহিছে কত না স্মৃতি, তারি ধ্যান করি অহরহ।

৩

জ্যোৎস্নারাতে, ভগ্ন পূজামণ্ডপের খিলান-প্রাচীরে
যে গভীর কালো ছায়া প্রেতসম উঠিছে গুমরি',
হেরি' তারে মনে হয় আজও সেই উৎসব-বাঁশরী
বাজিছে করুণ সুরে, আধ'-আলো অন্ধকার-তীরে—
সেদিনের প্রতিবিম্ব কাঁপে মোর নয়নের নীরে।
গৃহে আসি' কবে কোন্ নববধূ নূপুর বিমরি'
রেখেছিল পা' দুখানি যে ইষ্টক-ফলক উপরি—
সে ওই রয়েছে পড়ি' এক কোণে ভবন-বাহিরে !
স্মৃতির সমাধি 'পরে বসে' দেখি সেদিনের ছবি,
এদিনের কলরব পশে না যে আমার শ্রবণে,
চেয়ে থাকি, যেই দিকে অস্ত গেছে গৌরবের রবি,
গাঁথি যে তারার মালা অন্ধকারে নিশীথ-স্বপনে।
যে সুর ফুরায়ে গেছে, ফিরিবে না কভু এ ভুবনে,
আজিকার গানে তার কিছু দিব—আমি সেই কবি।

উর্ব্বশী ও পুরূরবা

শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

(২)

পুরূরবার গৃহ হইতে উর্ব্বশী স্বর্গে চলিয়া যাইতেছে। আসন্ন-বিরহ-কাতর পুরূরবা উর্ব্বশীকে পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিতেছেন—হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে—

"দাঁড়াও, জায়া! গহন তোমার মনোভাব, বিরূপ আমার উপর। এস পরস্পরের মনের কথা আমরা খুলিয়া বলি, আমাদের উভয়েরই ভবিষ্যৎ কল্যাণের ও সুখের জন্ম।"

মানুষের মনোময় চেতনায় নামিয়া আসিয়াছিল বৃহতের অতিমানসের আনন্দময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী উষা। উপরের দিব্যসত্তা যখন এই জগতে প্রথম প্রকাশ পায়, তখন সাধকের প্রাকৃত স্বভাব তাহাকে চাহে প্রাকৃত চেতনারই মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে তাহার দ্বারা প্রাকৃত বৃত্তি চরিতার্থ করিতে। * চিরন্তন সংস্কার-বশে, অতীতের অভ্যাসের বশে মানুষ তাহার প্রাকৃত প্রকৃতিতে দেহ-প্রাণ মনকে প্রথমেই এই দিব্য চেতনায় তুলিয়া ধরিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইতে চাহে না, পারে না। উপরের যাহা কিছু উপলব্ধি হয় তাহা নীচের ক্ষুদ্র অহমিকার তৃপ্তির জন্য, ভোগের জন্য ব্যবহার করিতে সে চেষ্টা করে। মনোময় পুরুষের এই প্রয়াসের ফলে বৃহতের অধ্যাত্ম চেতনা লোপ পাইতে থাকে, স্ব-স্থানে প্রস্থান করে। কিন্তু একবার বৃহৎ আনন্দ আস্বাদন করিয়া, মানুষ সহজে তাহা ছাড়িতে চাহে না, তাহার সহিত বুঝা-পড়া করিতে চাহে, কেন, সে দিব্য উষা তাহার অনুগত হইবে না, তাহার মানুষী চেতনার আনন্দ ও কল্যাণ বর্দ্ধন করিবে না।

তখন দিব্য উষা উত্তর দিতেছে—

"আর আমাদের কথাবার্ত্তায় কি হইবে? আমি যে তোমার জগৎ ছাড়িয়া স্ব-স্থানে পরপারের প্রতিষ্ঠানে চলিয়া অসিয়াছি। হে জীবপুরুষ! তোমারও সত্য সত্তা এই পারান্তরেই, এখান হইতে উদ্ভূত হইয়া তুমি অপরা প্রকৃতির মধ্যে নামিয়া জন্ম লইয়াছ। আমাকে পাইতে চাও, আবার তবে আমার এখানে উঠিয়া এস; আমি ত সহজে ধরা দিবার জিনিষ নই—পুনরস্তং পরেহি, দুরাপনা বাত ইবামহস্মি।"

ইন্দ্রও এক সময়ে ঋষি অগস্ত্যকে এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলেন (১ মণ্ডল, ১৭০ সূক্ত)। শুধু চিন্তাশক্তির জোরে ইন্দ্রের যে দিব্য-জ্ঞান তাহা পাওয়া যায় না (অধীতং বিনশ্যতি); মানুষের ভুল এইখানে যে মনের সহায়ে সে মনের উপরে উঠিতে চায় (অতি মন্যসে), মনকে উপরের কাছে শান্ত করিয়া উৎসর্গ করিয়া দেয় না (অস্মভ্যমিম্ন দিৎসসি।) তাই মধুচ্ছন্দাও বলিতেছেন (১-৪-৪) দিব্যদ্রষ্টা (বিপশ্চিতং) ইন্দ্রের জ্ঞানে যদি জ্ঞানী হইতে চাও তবে উঠিয়া পারান্তরে চল (পরেহি)।

বৃহতের, ভূমার আনন্দ ভোগ করিতে হইলে মানুষকে দেহ প্রাণ মনোময় প্রকৃতির অপরার্দ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া সৎ-চিৎ আনন্দময় পরার্দ্ধে (পরে অর্দ্ধে ১-১৬৪ ১২) উঠিয়া যাইতে হইবে—একথা সত্য, মানুষের মধ্যে মানুষী সত্তার এই জাগ্রত আয়তনেই দিব্যের প্রতিষ্ঠা চাই, কিন্তু সেই-জন্য ঐ পরার্দ্ধে সম্পূর্ণ স্থিতি লাভ করিয়া তবে অপরার্দ্ধকে শুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, দিব্যের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেখান হইতে তাহারই প্রতিভার মানুষী তনুকে দিব্যরূপ দিতে হইবে। নতুবা প্রাকৃত প্রকৃতিকে অসংস্কৃত রাখিয়া তাহারই মধ্যে থাকিয়া দিব্য প্রকৃতিকে নামাইতে চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা সফল হয় না। কিন্তু জীবপুরুষের প্রশ্ন, উপরে সে উঠিবে কোন্ শক্তিতে? উপরের দেবী নামিয়া আসিয়াছিল সকল শক্তি লইয়া, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে

---

* সরমা-পণি কথোপকথনেও (১০ মণ্ডল-১০৮ সূক্ত) এই তথ্যটি ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রাকৃত চেতনার শক্তি পণিরা উপরের জ্যোতি চুরি করিয়া নিজেদের পর্ব্বত-গুহায় কঠিন জড়চেতনায় লুকাইয়া রাখিয়া-ছিল—স্বর্গের দূতী সরমাকেও লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইতে চাহিয়াছিল। সরমা হইতেছে সাক্ষাৎ বুদ্ধি, বৌদ্ধেরা হয়ত ইহাকেই 'বোধি' নাম দিয়াছেন, পাশ্চাত্যের ভাষায় Intuition।"

চাহিলাম সেও চলিয়া গেল, আমার শক্তি-সামর্থ্যও দেখি লোপ পাইল—

"উদ্ধ গতির প্রেরণা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর বেগ নাই, আর তাহার দ্বারা জ্ঞানজ্যোতি অধিগত হইতেছে না। কোন অধ্যাত্ম সম্পদই লাভ হইতেছে না। তপঃশক্তি হীনবীর্য্য, ইন্ধন পাইতেছে না। দিব্যশক্তি সব আমাকে উর্দ্ধে চালাইয়া লইতেছে না, বৃহৎকে সচেতন করিয়া তাহার উদার অবকাশে আমার জীবনের নূতন জ্ঞানময় রূপ গড়িয়া তুলিতেছে না।"

এ রকম হইতে বাধ্য, যদি সাধক নিজে না উঠিয়া, উপরকে নীচে নামাইয়া নীচের প্রকৃতি দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে গড়িতে চেষ্টা করে। উর্ব্বশী এ কথার উত্তরে পুরুরবাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছে—

"আমি যে তোমাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহা তোমার কল্যাণের জন্য। আমার শ্বশুর-গৃহের জন্যই আমি দিব্যসম্পদ হাতে করিয়া আছি—তাই ঐ ঐহিকের গণ্ডী পার হইয়া আমি চাহিতেছি বৃহৎ গতি, আমি চলিয়াছি স্বগৃহে। তথায় যদি আমার সহিত মিলিত হইতে পার, তবে দিবারাত্রে কখন আমাদের আর বিচ্ছেদ হইবে না, তবেই নিরবচ্ছিন্ন দিব্য আনন্দের ভোগ তোমার হইবে।"

বৃহৎ আনন্দের দিব্য ভোগের স্ব-গৃহ (স্বং দমং) বা স্বস্থান-(অন্তঃ অর্থাৎ যেখানে বা যাহা সত্য সত্তা) হইতেছে তুরীয় মহর্লোক, অতি-মানসের ভূমি—পরা বা দেবী প্রকৃতি। তাহার অস্তিক, এ পারেই যে ব্যক্ত আধার বা অপরা প্রকৃতি তাহাই হইতেছে উর্ব্বশীর শ্বশুরের ঘর। বৃহৎ চেতনা প্রথমে নামিয়া আসিয়াছিল মনোময় চেতনায় পূর্ব্ব চিত্তিরূপে, তাহাকে উপরের চেতনার পূর্ব্বাভাস পূর্ব্বাস্বাদ দিবার জন্য, সেইদিকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য, আবার সে উঠিয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করিতেছে, মনোময় চেতনাকে সঙ্গে করিয়া উর্দ্ধে রূপান্তরিত করিয়া লইবার জন্য। তাই উর্ব্বশী আবার বলিতেছে—

"আমি যখন তোমার গৃহে ছিলাম তখন দিনে তিনবার তুমি আমাকে উপভোগ করিয়াছ, তাহাতেই তুমি আমার তৃপ্তি সাধন করিয়াছ। তোমার ভিতরের যে উর্দ্ধমুখী আকাঙ্ক্ষা তাহারই আহ্বানে আমি তোমাতে প্রকট হইয়াছিলাম—তুমি বীরসাধক, তাই তুমি আমার দিব্য তনুর রাজা হইতে পারিয়াছিলে।"

সাধকের পক্ষে দিন হইতেছে প্রকাশের কাল * অর্থাৎ যে অবস্থায় সাধক পায় নব নব উপলব্ধি সিদ্ধি ক্রমগতি; আর রাত্রি হইতেছে সাধকের সাধনা যখন বাহ্যতঃ স্তম্ভিত হয়, অন্তর্মুখী হইয়া আবার নূতন প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়। সাধনা দিবানক্তের পরম্পরায় এই রকমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রকাশের সময় জীবপুরুষ তিনবার দিব্য প্রকৃতিকে আলিঙ্গন দিয়া থাকে—কারণ প্রকাশের তিনটি ক্ষেত্র—দেহ প্রাণ মন; বৈদিক ঋষির ভাষায়, পৃথিবী অন্তরীক্ষ দ্যৌ।

উপরের চেতনার প্রথম বিকাশ দ্যুলোকে বা মানস প্রতিষ্ঠানে—মানস রূপান্তর দিয়াই দিব্যজীবনের আরম্ভ, সূর্য্য বা জ্ঞান দেবতা ইহার অধিষ্ঠাতা। তারপর সাধকের মধ্যে সেই চেতনা আরও নামিয়া আসে, আরও গাঢ় হয়, তখনই প্রাণস্তরের রূপান্তর, বায়ু বা প্রাণশক্তি তাই অন্তরীক্ষের অধিদেবতা। সকলের শেষে দৈহিক প্রতিষ্ঠানে জীবের দিব্য নবরূপ জাগ্রত মূর্ত্ত অটুট হইয়া দাঁড়ায়—দিব্যকে এই পার্থিব সত্তায় কুঁদিয়া তুলিতেছেন যে দেবতা—তিনিই অগ্নি, এইজন্যই অগ্নির এত প্রাধান্য, আমরা ইতিপূর্ব্বে বসিষ্ঠের জন্মকথা যে সূক্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি সেইখানেই বলা হইয়াছে—

"তিনজনে ভুবনে ভুবনে রেতসৃষ্টি করে (রেত অর্থ আনন্দ-ঘন—রম্ ধাতু), তিনটি সন্তানের উৎপত্তি তাহাতে—তাহারাই হইতেছে আর্য্য, যাহারা জ্যোতিকে সম্মুখে করিয়া চলিয়াছে। তিনটি তপ্তজ্যোতি উষার সহিত সর্ব্বদা সম্মিলিত।" *

অন্যত্রও আছে, "হে রূপজ্ঞ অগ্নি! তিনটি তোমার আয়ু, তিনটি উষা তোমার জনয়িত্রী।"†

উর্ব্বশীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যে রাত্রি—নক্তং—আসিতেছে, তাহার মধ্যে সাধকের জাগ্রত অনুভূতি আশার কিছু দেখিতেছে না; উপরের আশ্বাসবাণীতেও আর শ্রদ্ধা হইতেছে না। তাই পুরুরবা আবার বলিতেছে—

"তোমার আবির্ভাবে যে দীপ্ত সুসংবদ্ধ শক্তিরাজি আমার মধ্যে সবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, আমার কল্যাণের জন্য যাহারা আমার সাথী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যাহারা আনিয়া দিয়াছিল হৃদয়ের সাক্ষাৎদৃষ্টি, নব জাগরণের সেইসব তীব্র আবেগ এখন দেখি স্তিমিত হইয়া গিয়াছে, জ্যোতির ধারা-সমূহও দিব্যশ্রীর দিকে চাহিয়া আর গর্জ্জিয়া উঠিতেছে না।"

* ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাং—৩-২৩-৪ ; ইলার পদ বা প্রতিষ্ঠান কি পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

* ত্রয়ঃ কৃণ্বন্তি ভুবনেষু রেতঃ, তিস্রঃ প্রজাঃ আর্য্যাঃ জ্যোতিঃ-অগ্রাঃ। ত্রয়ঃ ঘর্মাসঃ উষসং সচন্তে— ৭-৩৩-৭

† ত্রীণি আয়ূংষী তব জাতবেদঃ তিস্রঃ আজানীঃ উষসঃ তে—৩-১৭-৩।

উর্ব্বশী তখন পুরূরবাকে তাহার সত্যস্বরূপ, তাহার জীবন-ব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া শ্রদ্ধান্বিত হইতে উপদেশ দিতেছে—

"জীবপুরুষ যেদিন জীবন-প্রতিষ্ঠানে নামরূপ ধরিয়া জন্ম লইয়াছে, সেই দিনই তাহার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে দেবশক্তিরাও জন্ম লইয়াছে। তাহার দেহ-প্রাণ-মনের নিগূঢ় সত্তায় আপনা হইতেই প্রবাহিত হইয়াছে উপরের জ্যোতির্ম্ময় রসায়িত ধারা—স্বর্লোকের অমৃতনিস্যন্দ (স্বর্ব্বতী-রূপঃ—৫-২-১১); এই অমৃতত্ব, এই দিব্য আনন্দরসেই পুষ্ট হইতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে মানুষের সত্যপুরুষ। পুরূরবাকে দিয়া দেববৃন্দ চাহিতেছে দস্যুদলকে—অজ্ঞানের প্রাকৃত চেতনার শক্তিরাজীকে ধ্বংস করিতে, বৃহতের আনন্দে মানস চেতনাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে (স্বর্গলোকে অমৃতং দুহানা—কাঠক সংহিতা)।"

কিন্তু কই সে দিব্যশক্তি সব? মানুষ হইয়া দেবতাকে ধরা যায় কি প্রকারে? হাত বাড়াইলেই যে তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। মনোময় জীব দেখিতেছে—

"অমানুষী সত্তা সব যেই মানুষের চেতনায় আসিয়া ধরা দিয়াছে, মানুষ যেই চেষ্টা করিয়াছে তাহাদিগকে আত্মাধীন করিতে, অমনি তাহারা নিজের দিব্যরূপ বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহারা বাণের মুখে হরিণীর মত, রথের সম্মুখে অশ্বিনীর মত ভয়ে পলায়নপর হইয়াছে।

"তাই ত, মরজীব আমি, সেই সব অমর সত্তাকে স্থূলভূমিতে, জাগ্রত কর্ম্ম-প্রেরণায়, আমার অঙ্গের স্পর্শে স্পর্শে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে পারিলাম না—স্বর্গের এই দিব্য শক্তিরা তাহাদের স্বরূপ প্রকট করিল না, আমার পার্থিব প্রাণশক্তিও দিব্য আবেগে উচ্ছল চঞ্চল হইয়া উঠিল না।"

কিন্তু একদিন এক সময়ে তাহার বিশ্বাস শ্রদ্ধা যেন আসিয়াছিল—

"উর্ব্বশী যেদিন বিদ্যুতের মত জ্বলিতে জ্বলিতে আমার মধ্যে অবতীর্ণ হইল, সেদিন আমার সকল কাম্য অমৃত-ধারায় বহিয়া আনিয়াছিল, সেদিন যেন বীর দিব্যপুত্র আমার কর্ম্মের জাগ্রত আয়তনে জন্মিল—বোধ হইল আমার সে দিব্যজন্ম উর্ব্বশীই পার হইতে পারান্তরে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে।"

উর্ব্বশীর কথা—

"যথার্থ পুরূরবা! তোমার এই নবজন্ম সত্যধর্ম্মের জ্যোতি ধারণ করিবার, পালন করিবার জন্য। সেই উদ্দেশ্যেই আমার ওজঃশক্তি তোমার মধ্যে আমি ঢালিয়া দিয়াছি। তোমার সাত্ত্বিক চেতনার প্রতিমুহূর্ত্তে আমার দিব্যজ্ঞান তোমাতে ব্যক্ত করিয়া ধরিয়াছি। কিন্তু তুমি ত শেষ পর্য্যন্ত অবহিত হইয়া আমার কথা শুনিলে না—আগে কর সত্যরক্ষা, পরে অন্য কথা।"

দিব্যলোকের দুহিতাকে—স্বর্গের জ্যোতি দোহন করিয়া আনে যে শক্তি তাহাকে—মরজীব যদি আকাঙ্ক্ষা করে তবে সর্ব্বপ্রথমে এবং সর্ব্বশেষেও চাই এই পণ যেন মরদৃষ্টি দিয়া তাহাকে সে না দেখে, প্রাকৃত ধর্ম্মকে সুসিদ্ধ করিবার জন্য যেন দিব্যধর্ম্মের অনুরাগী সে না হয়। কিন্তু উর্ব্বশীর এ কথা পুরূরবা শুনিয়াও শুনিতেছে না। মানুষ ব্যস্ত আশু ফলের জন্য, উপরের সত্যকে কোন রকমে ধরিতে কি না ধরিতেই তাহাকে সরাসরি কর্ম্মজীবনে রূপ দিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে সে ব্যগ্র হইয়া পড়ে। পুরূরবা দেখিতেছে তাহার মধ্যে "দেব সূনু" জন্মিয়াছিল, দিব্য জ্যোতির তিরোধানে সে এখন ম্রিয়মান, যেন কাঁদিয়া আকুল, মানুষের এই দিব্যপুত্র হইতেছে তাহার তেজোময় সত্যস্বরূপ, তাহার হৃৎস্থিত জীবপুরুষ; এই অগ্নিরূপী দিব্যজীব তাহার মধ্যে জন্মিয়া পুরাতন মানুষটিকে (খৃষ্টানদের the old Adam এবং the son of man এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে) ভস্মসাৎ করিতে করিতে, সেখানে নূতন দিব্য মানুষকে বিকশিত করিয়া চলে। পুরূরবা ব্যস্ত এই দেবপুত্রের জন্য—পুত্র-লাভেই ত সিদ্ধি, জীবনের সার্থকতা। সিদ্ধির মোহে তাহার আর বিলম্ব সহিতেছে না—অথবা তাহার ব্যাকুলতা যেন নিজের জন্য কিছু নয়, পুত্রই যেন জন্ম লইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাহার এই ত্বরা—

"কবে আমাদের পুত্র সত্যই ভূমিষ্ঠ হইবে? পিতা বলিয়া আমাকে জানিবে, আলিঙ্গন দিবে; আর সে রোদন করিবে না, অশ্রুপাত করিবে না। হে স্বর্গের দেবী! তোমার আমার এক মন প্রাণ—এ দম্পতীকে কে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে তবে? অগ্নিময় পুত্র তোমার কেন তবে ঐহিকের জীবনের আয়তনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে না?"

উর্ব্বশী সান্ত্বনা দিয়া আশ্বাস দিয়া বলিতেছে—

"কোন আশঙ্কা করিও না। পুত্রের অমঙ্গল হইবে না। আপন লক্ষ্যে সে একাগ্রচিত্ত, তাহাতে সার্থকতার জন্য, কল্যাণের জন্য তাহার কণ্ঠে ঐ বার্হস্পত্য গর্জ্জন—ক্রন্দন তাহা নয়।* আমি যে বৃহৎ সত্য গর্ভে ধারণ করিয়া আছি, তাহা তোমার জন্য তোমারই অভিমুখে প্রচালিত করিতেছি। কিন্তু তুমি এপারে চলিয়া এস—মোহের বশীভূত হইয়া থাকিলে তুমি আমাকে কখন পাইবে না।"

মরিয়া হইয়া, প্রাণপণ করিয়া পুরূরবা তখন বলিয়া উঠিলেন—

"আজ এখন হইতেই তবে এই দিব্যপুরুষ পরপারস্থ পরমের দিকে চলুক উঠিয়া পড়িয়া—আর যেন তাহাকে ফিরিতে না হয়। তাহা না পারে, মৃত্যুরই কোলে যেন সে শায়িত হয়, উদ্দাম উল্লাসে বৃকেরা যেন তাহাকে উদরসাৎ করে।"†

---

* অন্যত্র আছে—"বৃহস্পতিঃ…মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্… রবেন অধমৎ তমাংসি…কনিক্রদৎ"—৪-৫০-৪,৫।

† এই পারান্তরের পরম হইতেছে স্বর্লোকের সত্তায় পরিপূর্ণ, অজর জ্যোতি, অক্ষয় মঙ্গলস্থিতি—স্বর্বৎ জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি (৬-৪৭-৮); এই সেবন্ধে পরিপূর্ণ যে-জ্যোতি এখানে বৃকের দৌরাত্ম্য নাই, ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া মানুষ চলিয়াছে—স্বর্বৎ জ্যোতিঃ অবৃকং নশীমহি (১০-৩৬-৩)।

উর্ব্বশীর কথা—

"কেন, পুরূরবা, তুমি ভয় করিতেছ? ঊর্দ্ধের পথে চলিতে তোমার পতন হইবে না, মৃত্যুও হইবে না, অমঙ্গলের শক্তি—বৃকেরাও তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তোমার সহায় যে-সব দিব্যশক্তি তাহারাও কিছু স্ত্রীলোকের মত দুর্ব্বল নয়, বৃকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে গৃহবৃক।"*

উর্ব্বশী যে মর্ত্ত্যে আসিয়াছিল তাহা বিনা উদ্দেশ্যে নয়, বৃথায় নয়—

"আমি স্বরূপ ছাড়িয়া মানুষী চেতনার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছি, মানুষী চেতনার যে রাত্রি তাহাতে আমি চারি বৎসর‡ কাটাইয়াছি। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তোমাতে বৃহৎ জ্যোতির প্রকাশ যতটুকু হইয়াছে দিব্যদিবসের সেই ততটুকু তপঃবিন্দুই আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে তাহা দিয়াই তুমি এখনও আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছ।"

উপরের জ্যোতি সর্ব্বদাই নীচে অবতরণ করিতে চাহিতেছে, জাগ্রতের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া ধরিতে—রূপের মধ্যে আপনাকে ধরিয়া দেওয়াতেই যেন স্বরূপের সার্থকতা। মানুষ তাহার প্রাকৃত চেতনার মধ্যে এই উপরের আলো যতটুকু স্বীকার করে, আপন তপ্ততপস্যা দিয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করে, ততটুকুতেই উপরের সত্তার যেমন তৃপ্তি মানুষের নিজেরও তেমনি সার্থকতা। তাই বৈদিক ঋষি বলেন, মানুষ দেবতাকে নিজের মধ্যে জন্ম দিতেছে, দেবতাও মানুষকে নিজের মধ্যে তুলিয়া জন্ম দিতেছে—গীতার কথায়, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ; উভয়ে উভয়কে সৃষ্টি করিতেছে, সমৃদ্ধ করিতেছে। এই পরস্পরের স্বীকরণ ও আদানপ্রদান যতটুকুই হউক না কেন—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

তখন পুরূরবার চেতনা হইল, হৃদয় গ্রন্থি তাহার টুটিয়া গেল; নিজের স্বরূপ, উর্ব্বশীর স্বরূপ, তাহাদের সত্য সম্বন্ধ বুঝিয়া অনুভব করিয়া পুরূরবা বলিয়া উঠিল—

"উর্ব্বশী আমার প্রাণের মধ্যে নামিয়াছে, তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে; আমার সকল আয়তনই সে মুক্ত প্রচারিত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। উর্ব্বশীর নিকটে আমি জ্ঞান পাইয়াছি তাই আমি এখন 'বসিষ্ঠ' পরম জ্যোতির্ম্ময়। আমার সিদ্ধি আসিয়াছে—আমার আনন্দ উপভোগ উর্ব্বশীর মধ্যে, উর্ব্বশীর স্পর্শে হৃদয় আমার তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

বৃহতের খ্যাতি প্রথমে নামে মনের মধ্যে—মন পাইয়াছে দিব্য চেতনার কিছু আভাস, কিন্তু প্রাণ তাহা কিছু পায় নাই, প্রাণ রহিয়াছে পূর্ব্বের অসংস্কৃত প্রাকৃত অবস্থায়—তখন মন চাহে উপরের আনন্দ বটে, কিন্তু সে মনের পিছনে যে আবেগ তাহা অশুদ্ধ প্রাণের বাসনা। এই প্রাণকে যতক্ষণ খুলিয়া ধরা হইতেছে, এই প্রাণের বাসনাময় ক্ষেত্র যতক্ষণ বৃহত্তর স্পর্শ না পাইতেছে ততক্ষণ উর্ব্বশী চঞ্চলা অনধিগম্যা—প্রাণ যখন উর্ব্বশীর বৃহৎ চেতনায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে তখনই জাগ্রত স্থূলে অব্যর্থ রূপ লইয়া জীবের প্রকট হইবে।

উর্ব্বশী তখন মানুষের জীবনব্রতের লক্ষ্য কি, তাহা উদ্‌যাপন করিবার উপায় কি—সিদ্ধি কোথায় ও সাধনা কি তাহার মূলসূত্র বলিয়া উপসংহার করিল। লক্ষ্য হইতেছে বৃহতের চেতনায় স্বর্গলোকে অমৃতত্ব উপভোগ করা। সেজন্য লাভ করিতে হইবে দেবত্ব—দেবত্ব লাভ করিতে হইলে, চাই নব জন্ম—এই নবজন্ম আসিবে পুরাতন জন্মকে দেবতাদের কাছে আহুতি দিতে দিতে, দেবতাদের নিকট হইতে কল্যাণকে আনিতে আনিতে, ইহাই যজ্ঞ। মানুষকে অমৃতত্ব দিতে চায় না, পুরাতন জন্মের প্রাকৃত স্বভাবের মধ্যে বাঁধিয়া নিজেদের ভোগে ব্যবহার করিতে তাহাকে এইভাবে ধ্বংস করিতে চায় মৃত্যুর অসত্যের তামস শক্তি সব। দেবশক্তিকে ধরিয়া ধরিয়া এই দস্যুশক্তিকে প্রতিনিয়ত সজাগ সতর্ক অপ্রতিহতভাবে হটাইয়া চলিতে হইবে—জীবপুরুষের এই ক্ষমতা নৈসর্গিক, কারণ সে ইলার পুত্র—ইলা* হইতেছে দিব্যজ্ঞান, ঋষিদৃষ্টি মানুষের অন্তরাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইলায়াস্পদে।

"হে ইলার তনয়! এখন তবে দেবতাদের ইঙ্গিত তুমি বুঝিলে। তাঁহারাই তোমাকে শিখাইয়া দিতেছেন কিরূপে তুমি মৃত্যুর সব শক্তিকে বশে আনিতে পার, কেমন করিয়া তোমার সন্তান দেববৃন্দকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করিবে, আর তুমিই বা কোন্ পথে স্বর্গে যাইয়া বৃহতের জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ উপভোগ করিবে।"

---

* 'বৃক' অর্থ নেকড়ে বাঘ, আর 'গৃহবৃক' হইতেছে গৃহ-রক্ষক সারমেয়। বৈদিক সারমেয় আবার সরমার তনয়। সরমা কে তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের শেষ পাদটীকাও দ্রষ্টব্য।

‡ 'চার'—এই সংখ্যা পূর্ণতাজ্ঞাপক। মানুষের পূর্ণ সত্তারও আছে চারিটি স্তর—দেহ প্রাণ মন আর তুরীয় (বেদে যাহাকে বলা হয় 'ত্রিধাতু' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় মহলোক)।

* ইলা, সরস্বতী আর মহী বা ভারতী—এই দেবীত্রয়ের নাম ঋগ্বেদে প্রায়ই একত্র পাওয়া যায়—১-১৩-৯; ১-১৪২-৯; ২-৩-৮; ৫-৫-৮। দিব্যবাক্; সত্যের যে ছন্দময় বাঙ্ময় প্রকাশ তাহারই ত্রিমূর্ত্তি ইঁহারা। ইঁহাদের সহিত আরও দুইজনকে যোগ করিতে হয়, তাঁহারা সরমা ও দক্ষিণা। এই পাঁচজনে দিব্যজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা—মহী=Vast consciousness, ইলা=Revelation, সরস্বতী=Inspiration, সরমা=Intuition, দক্ষিণা=Discrimination (অরবিন্দ)। যাহা হউক, ইলা সম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলিতেছে, ইলা যেষাং গণ্যা মাহিনা গীঃ (৩-৭-৫)—সেই বৃহতের বাণী যখন বৈচিত্র্যের মধ্যে গণনায় বিষয়ীভূত বা গোচরীভূত হইয়া প্রথম দেখা দিয়াছে তখনই তাহা ইলা; ইলা হইতেছেন "দেবী ঘৃতপদী (১০-৭০-৮), তেজোঘন গতি তাহার; মানুষের মধ্যে মানুষের পিতা হইয়াও পুত্ররূপে যখন অগ্নির জন্ম তখনই মনোময় পুরুষের জীবের বিশেষ সত্য প্রকাশের জন্য ইলার অবির্ভাব—ইলাং অকৃণ্বন্ মনুষ্যস্য শাসনীং, পিতুর্যৎ পুত্রো মমকস্য জায়তে (১-৩১-১১)।

ঋষি টলষ্টয়ের একখানি চিঠি

রম্যাঁ রলাঁ

মহাত্মা টলষ্টয়কে আমি প্রথম চিঠি লিখি সে আজ চল্লিশ বছর আগেকার কথা; ১৮৮৭ সালের মে মাসে তাঁকে চিঠি লিখিবার একটা তাগিদ আসে; তরুণ যৌবনের সংশয়-সন্দেহের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা নির্ভরভূমি খুঁজিতেছিলাম। আমি **আছি—**কারণ আমি **অনুভব** করিতেছি—এই অপরোক্ষ অনুভূতির উপর ভূমায় আমার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম—সেই প্রচেষ্টার ইতিহাস আমার *Credo Zunia Verum* শীর্ষক প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে। ("আত্মদর্শন," প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২ দ্রষ্টব্য)।

সে সময় টলষ্টয় 'শিল্প বস্তুটা কি?' (*What is Art*) লিখিয়াছেন। শিল্পীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া মনের মধ্যে বিষম একটা খট্‌কা লাগিল; টলষ্টয়কে আমি বুঝিতে পারিলাম না। সেই সময় তাঁকে যে চিঠিখানি লিখি তার দুই চারিটি টুকরা মাত্র আমার ডায়েরীতে টোকা ছিল। তার সাহায্যে আমার মনের অবস্থাটার কিছু আভাস দিই :—

আমার চিঠি

মহাত্মন্! আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমায় আপনাকে চিঠি লিখিবার দুঃসাহস দিয়াছে। অপরিণতমতি এই দীন ভক্ত আপনাকে কতকগুলি নিরর্থক উচ্ছ্বাস শুনাইতে আজ আপনার সম্মুখে আসে নাই। সে ভাবে আপনার প্রতি অমর্য্যাদা দেখাইতে আমি পারি না, কারণ আমি আপনাকে নিবিড় ভাবে চিনি··· ··· ··· ···

মৃত্যু আমার চারিদিকে যেন এক কুহকজাল বিস্তার করিয়াছে; আপনার গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অনুভব করিয়াছি যেন প্রতিছত্রে মৃত্যুর ছায়াপাত—বিশেষত আপনার আইভান্ ঈলিচ্ (Ivan Ilitch) পাঠে আমার মন যেন অস্থির হইয়াছে। ··· ··· আমি বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছি এই যে প্রতিদিনের কেজো জীবন এটা আমাদের সত্য জীবন নয় ··· ···। এক দিকে জীবে জীবে স্বার্থঘটিত সংঘর্ষ, অন্যদিকে এক অখণ্ড শাশ্বত জীবনের মধ্যে গভীর সমন্বয়; সংঘর্ষ কমাইয়া এই সমন্বয়ের দিকে যতই অগ্রসর হইব জীবন ততই সত্য হইয়া উঠিবে। আমাদের খণ্ড সত্তাকে অখণ্ড অসীম প্রাণের সাগরে ডুবাইয়া বিলীন করিয়া দিতে হইবে—ইহাইত আপনার বাণী। এ বাণীকে আমার সমস্ত প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছি—আমার সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা আপনার পদাঙ্কানুসরণ করিতেছে···। আমি বুঝিয়াছি আমাদের স্বার্থ আমাদের অহংবোধকে দূর করিতে হইলে, সেই মহান্ ত্যাগটি সত্য করিতে হইলে একটি জিনিষ প্রয়োজন—সমস্ত সৌখিন কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাস দূর করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণব্রতে নিযুক্ত হওয়া। আপনি বলিয়াছেন—চিন্তার ক্ষমতা, হৃদয়ের প্রশান্তি আনিতে হইলে, ক্ষুদ্র আমিত্বের অশুভ চেতনার জাল ছিন্ন করিতে হইলে আমাদের একমনে পরসেবায়, লোক-হিতকর কার্য্যে—শারীরিক শ্রমসাধনে লাগিতে হইবে। সেই ত জীবনের পরম আশীর্ব্বাদ······ক্ষুদ্র আমিকে ভুলিয়া যাওয়া। মহাত্মন্! আমি প্রাণপণে ভুলিতে চাই—আমি বিশ্বাস করি ক্ষুদ্র আমিকে ভুলিতে পারিব।

কিন্তু একটি প্রশ্ন কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছি না; তুচ্ছ অহমিকার কবল হইতে মুক্তি **কেবল হাতের কাজের** ভিতর দিয়া হইবে একথা এতটা জোরের সঙ্গে আপনি কেন বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না; এই প্রশ্ন আমার সমস্ত হৃদয় মনকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। শিল্পের প্রতি আপনি নির্দ্দয় হইয়াছেন কেন? শিল্প কি আত্মোৎসর্গ-সাধনের একটি প্রকৃষ্ট-উপাদান নয়? আপনার নূতন প্রবন্ধ **"কি করা**

দরকার," পাঠ করিয়া দেখি তার মধ্যে শিল্পের স্থান সব কিছুর নীচে! শিল্পসৃষ্টিকে আপনি আক্রমণ করিয়াছেন অথচ আপনার বিরুদ্ধতার কোন কারণ দেন নাই। যদি আমি আপনাকে কারণ জিজ্ঞাসা করি আমার বাচালতা ক্ষমা করিবেন। বুঝিতেছি আপনি শিল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতা ও ভোগলিপ্সা দেখিয়াছেন; আপনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে শিল্প যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে, শিল্পমাদকতা ততই আমাদের স্বার্থপরতাকে বাড়াইয়া চলে! হায়, স্বীকার না করিয়া উপায় নাই তথাকথিত শিল্পীদের মধ্যে অনেকেরই কাছে শিল্প আভিজাত্যগর্ব্বী ইন্দ্রিয়লিপ্সা মাত্র!

কিন্তু শিল্প কি ইহা ছাড়া আরও কিছু নয়? ক্ষুদ্র একদল সত্য শিল্পীর কাছে ইহা কি সব নয়? তাহাদের কাছে একমাত্র শিল্পই যে স্বার্থকে ভুলিতে, ভূমার মধ্যে ডুব দিয়া সৃষ্টির অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে দেয়। সেই অবস্থায় মৃত্যুই বা আমাদের কি করিতে পারে? মৃত্যু যে তখন মরিয়াছে, শিল্পী যে মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে।

আমি কি ভুল বকিতেছি? যদি ভুল করিয়া থাকি আমায় শুধ্রাইয়া দিন। আমি শিল্পের প্রেমে ডুবিতে চাই—কারণ উহার সাহায্যে আমার এই দীনহীন 'আমির' কারা-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া শাশ্বত প্রাণের সঙ্গে এক হইয়া মিলিতে পারি। যে-সব কালবৃদ্ধ জাতি সভ্যতার চাপে মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে তাহাদের আরোগ্যের একটি বড় উপায় কি খাঁটি শিল্প নয়?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। হাতের কাজকে আপনি মস্ত বড় স্থান দিয়াছেন, কিন্তু সেই কাজের সঙ্গে যদি মনের যোগ না থাকে আপনি কি তাহাকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবেন? চিন্তাকে বলি দিতে, শিল্পকে অস্বীকার করিতে আপনার কি কোন অনুশোচনাই হইবে না? আর শুধু আমরা চাহিলেই কি চিন্তাকে ও শিল্পকে উড়াইয়া দিতে পারি?

আমার দেশ ফ্রান্সে, এবং ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র দেখি অবিশ্বাসীদের ভিড়, পল্লবগ্রাহীদের ফড়ফড়ানি,—চারিদিকেই ঔদাসীন্যের অন্ধকার! ইহার মধ্যে একজনকেও পাইতেছি না—যিনি গুরু হইয়া হাত ধরিয়া লইয়া যান। আপনার উপদেশ আমার বিশেষ প্রয়োজন......

রম্যাঁ রলাঁ

টলষ্টয়ের চিঠি

৪ঠা অক্টোবর ১৮৮৭

সোদরপ্রতিমেষু

রম্যাঁ রলাঁ! তোমার প্রথম পত্রখানি পাইয়াছি; ইহা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বেই উত্তর দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু সময় পাই নাই। তাহা ছাড়া ফরাসী ভাষায় জবাব লিখিতে আমার বেশ পরিশ্রম হয়। বড় করিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কারণ আমার বক্তব্যটি ভাল করিয়া না বুঝার দরুনই তোমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা।

প্রশ্ন করিয়াছ: আমাদের স্থায়ী সুখের জন্য হাতের কাজ একান্ত প্রয়োজন কেন? সেই কাজের সঙ্গে যে-সব জিনিষের ঘনিষ্ঠ যোগ নাই যেমন শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি—সেইসব মানসিক ক্রিয়া-কর্ম্ম কি তাহা হইলে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে হইবে?

এই ধরণের প্রশ্নের জবাব আমার সাধ্যমত আমার (What to Do?) গ্রন্থে দিয়াছি; সে বইখানির ফরাসী অনুবাদ বাহির হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। শারীরিক শ্রম বা হাতের কাজকে আমি একটা নূতন ধর্ম্ম বলিয়া খাড়া করিতে চাই নাই; শুধু ইহা যে একটি সহজ প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রকারভেদ এবং ইহার প্রয়োগ যে সকল অকপট মানুষের কাছেই প্রথম হইয়া দেখা দেয়, সেই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমাদের সভ্যতাস্পর্দ্ধী সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বার্থ ও নীচতায় ধ্বংসোন্মুখ; ইহার মূল কারণ এই যে, দীনদরিদ্রের পরিশ্রমের সুযোগ লইয়া আমরা ভদ্রদল অধিকাংশই সকল শ্রমের দায়ীত্ব অস্বীকার করিয়া বসিয়াছি; শুধু এই মারাত্মক ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্যই শ্রমভার সকলেরই স্বীকার করা উচিত। অশিক্ষিত মন্দভাগ্য যে অগণ্য মানুষ পুরাকালের ক্রীতদাসের মত আমাদের জন্য প্রাণপাত

করিতেছে তাহাদের আত্মবলিদানের তুলনায় আমরা ভদ্র সভ্যেরা কতটুকু করি তাহা ভাবি কি?

এই মূলগত বৈষম্য দূর করিতে যদি চেষ্টা করি তবেই বুঝা যাইবে আমরা কতটা সরল এবং খৃষ্টের ধর্ম্ম (দার্শনিক দিকেই হোক আর লোকহিতের দিকেই হোক) আমাদের জীবনে কতটা সত্য হইয়াছে।

এই বৈষম্য নিবারণে সফল হইতে হইলে প্রথমেই এই উপায় এই ব্রত লইতে হইবে যে, আমাদের নিজের কাজের ভার অপরের ঘাড়ে না চাপাইয়া যেন নিজে করিতে চেষ্টা করি। শারীরিক নানা হেয় কার্য্যে অন্যের সাহায্য আমরা লইতে যতদিন দ্বিধা বোধ করিব না ততদিন কি দার্শনিক কি হিতানুষ্ঠানিক কোন ধর্ম্মই আমাদের সত্য হইয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিব না।

অপরের সেবা যথাসম্ভব কম গ্রহণ করা, এবং যতটা বেশী সেবা অপরকে করা যায় তাহার বিধান করা, সর্ব্বাপেক্ষা কম দাবী করা ও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দান করা, ত্যাগ করা, ইহাই আমার কাছে সহজতম সরলতম নীতি।

এই নীতিই আমাদের জীবনকে একটি সুসঙ্গত তাৎপর্য্য দেয়। ইহা হইতে যে সুখ আসে তাহা সকল দ্বিধা বাধা ও সন্দেহকে ভাসাইয়া দেয়। মানুষের মানসিক বৃত্তি শিল্প বিজ্ঞানাদির স্থান লইয়া তোমার মনে যে-সমস্যা জাগিয়াছে তাহাও একদিন ঐ অনুপম তৃপ্তির প্লাবনে ভাসিয়া যাইবে।

সুতরাং ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যতক্ষণ না আমরা আমাদের কাজে অপরকে উপকৃত হইতে দেখি ততক্ষণ আমরা সত্য সুখ ও তৃপ্তি অনুভব করিতে পারি না। যাহাদের জন্য আমরা কাজ করিতেছি তাহারা যদি সুখী হয় তাহা হইলে সুখের উপর সুখ হইল। কিন্তু তাহারা যদি হুঁস নাও বা করে তাহা হইলেও আমাদের সেবা করিয়া যাইতে হইবে। আমার আত্মতৃপ্তির ভিত্তিই যে ঐখানে—আমার কাজ অপরের কাছে নিরর্থক নয়, অকল্যাণকর নয় এই বিশ্বাসেই যে আমার সুখ।

শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কাজ ছাড়িয়া মানুষ যদি এই সাধারণের সেবার কার্য্যে নামিয়া আইসে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার সরল নৈতিক দায়ীত্ববোধ আপনা হইতেই তাহাকে টানিতেছে। গ্রন্থকার বই লেখেন, ছাপিতে ছাপাখানার মানুষদের খাটাইতে হয়; সুরজ্ঞ সঙ্গীত রচনা করেন, সেগুলির প্রচার করিতে কত ওস্তাদ-বাজনদারকে খাটান প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবেন তাঁর যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে খাটিবে কত লোক; চিত্রী ছবি আঁকিবেন তার জন্য তুলি রঙ পট প্রস্তুত করিতে হাজার লোক ব্যস্ত! এইসব শিল্প-বিজ্ঞানের কাজ মানুষের কাজে লাগিতে পারে আবার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়—অনেক সময় অকল্যাণকরও হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমার এক দিকে এই-সব কাজ যাহার জন্য অপরকে খাটাইতে হয় অথচ যাহার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সন্দেহ-জনক; অন্যদিকে আর-এক শ্রেণীর কাজ যাহার জন্য কাহাকেও খাটাইতে হয় না অথচ যাহার সবগুলিই মানুষের উপকারে আসিবে। এমনি কত কাজ চারিদিকে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের টানিতেছে! ঐ দেখ কে একজন শ্রান্ত হইয়া হাঁপাইতেছে—উহার বোঝাটা খানিক বও; গরীব চাষী রোগে অকর্ম্মণ্য, তার ক্ষেতের কাজ খানিক করিয়া দাও; দেখ, ঐ কে আহত, তার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দাও;—এমনি কত সহস্র ছোটখাট সেবার আহ্বান চারিদিক হইতে আসিতেছে, সেগুলি করিতে কারো সাহায্য দরকার নাই। একা করিয়া যাও। তখনি যে সেবা করিল এবং যাহার সেবা করা হইল দুজনেই পরম তৃপ্তি পাইবে। নিজের হাতে গাছ পোঁতা, পশুদের সেবা করা, কূপ পরিশোধন করা—এই-সব কাজে মানুষের উপকার যে হইবে তার সন্দেহ নাই সুতরাং এরকম কাজে প্রত্যেক খাঁটি মানুষের আগেই যাওয়া উচিত। অনেক কাজই সবার সেরা বলিয়া বড় গলায় প্রচার করা হয় কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় তাহার অনেকগুলাই ভুয়ো।

ভবিষ্যৎদর্শী ঋষিদের স্থান আমাদের মাথার উপরে; কিন্তু ঐ নামটায় যথেষ্ট সুবিধা হয় যে-সব ধর্ম্মব্যবসায়ী ঋষিত্বের মুখোস পরিয়া ভাবে—তাহারা সত্যই ঋষি হইয়াছে বলিয়া তেমন লোকের অভাব এ জগতে নাই এবং তাহারা বেশ ঋষির ব্যবসা চালাইতেছে।

শিক্ষার বলে কেহ ঋষি হইতে পারে না! যাঁহার

গভীর বিশ্বাস আছে যে, সত্য তাঁহার ভিতর দিয়া প্রকাশ হইবেই, সত্যের বাহন না হইয়া তাঁর উপায় নাই—এমন মানুষই ঋষি হন। এই বিশ্বাস কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায় এবং এই বিশ্বাসসিদ্ধ হইতে হইলে কর্ম্মের ক্ষেত্রে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।

খাঁটি শিল্প খাঁটি বিজ্ঞান এই ত্যাগ এই আত্মোৎসর্গের উপর গড়িয়া ওঠে। প্রসিদ্ধ গুণী লুল্লী (Lulli) যখন পাচকের স্থায়ী কাজ ছাড়িয়া বেহালা হাতে করিয়া অনিশ্চয়তার বুকে ঝাঁপ দেন, কত বিপদ কত দুঃখ তাঁকে ঘিরিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যেই সঙ্গীতজ্ঞের আদর্শ আঁকড়াইয়া ধরিয়া সহস্র ত্যাগের দ্বারা তিনি তাঁহার গুণী নাম সার্থক করিয়াছেন, তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গীত-পরিষদের যে মামুলী ছাত্র, মামুলী গৎ বাজাই। তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল ভাবে, কোথায় তার ত্যাগের অবকাশ? তাহার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ত দেখি না শুধু দেখি বেশ আরামে তার সৌখীন অবস্থাটি উপভোগ করিয়াই সে খুসী!

হাতের কাজ একদিকে প্রত্যেক মানুষের একটি কর্ত্তব্য, অন্যদিকে সেটি বহুলোকের জীবনে আশীর্ব্বাদের মত হইয়া আছে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে মস্তিষ্কের কাজ অল্পসংখ্যক লোকের অধিকার ও কল্যাণের আধার। কাহার উহাতে অধিকার আছে কাহার নাই তাহার বিচার হইবে ত্যাগের দ্বারা। শিল্পী বা পণ্ডিত তাহার আদর্শ-জীবনের জন্য তাহার অবকাশ ও তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য কতটা উৎসর্গ করিয়াছে? যে মানুষ হাতের কাজ করিয়া আপনার ও স্বজনবর্গের জীবিকানির্ব্বাহ করে এবং সেই সঙ্গে তার ক্ষুদ্র বিশ্রামক্ষণ, তার নিদ্রার সময়টুকুও চিন্তা ও সৃষ্টিকর্ম্মে নিয়োজিত করে সেই সত্য মানসিক ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার অধিকারটি প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু যে মানুষের সহজ নৈতিক দায়ীত্ব এড়াইয়া, শিল্প বিজ্ঞান-প্রীতির অছিলা করিয়া সমাজতরুর পরগাছা হইয়া বাঁচিতে চায়, সে শুধু মেকী শিল্প ও ঝুঁটো বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি করিবে। খাঁটি শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস সুখ সুবিধা নয় আত্মদান।

"কিন্তু তাহা হইলে শিল্প-বিজ্ঞানের দশা কি হইবে?" এই প্রশ্ন কত বার শুনিয়াছি! এমন লোকেরা প্রশ্ন করেন যাদের না আছে শিল্প-বিজ্ঞানের বালাই, না আছে উহাদের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয় যেন বিশ্বমানবহিত ছাড়া তাঁহাদের অন্য চিন্তাই নাই—যেন তাঁহাদের মনগড়া শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি ছাড়া মানব-সভ্যতার আর উন্নতি নাই।

শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না এমন সুবুদ্ধি মানুষের অভাব নাই, আবার এমন মজার লোকও আছে যে সেটা স্বীকার করানই জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে! এমন মতভেদ হয় কেন? ঐ ত চাষী চাষ করিতেছে, মজুর খাটিতেছে, কৈ তাহাদের কাজের আবশ্যকতাটা অস্বীকার ত কেউ করে না। আবার তাহার প্রয়োজনীয়তাটা প্রমাণ করিতেও কেউ ক্ষেপে না। কাজ হইয়া যায়—কাজটা দরকারী এবং সকলেরই তাহাতে উপকার এটা আমরা বুঝি, ইহার আবশ্যকতায় আমরা সন্দিহান হই না, সেটা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হওয়া ত দূরের কথা! শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কর্ম্মীদেরও ঠিক এক অবস্থা, তবু তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তাটা প্রমাণ করিতে এত লোক এত গলদঘর্ম্ম হয় কেন?

আসল কথাটা এই:—খাঁটি কর্ম্মী শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ অধিকারের দাবী করে না; তাহারা সৃষ্টি করিয়া যায়, সেই সৃষ্টিতে সকলের কল্যাণ হয় সেই যথেষ্ট; তাহার জন্য কোন দাবীদাওয়া অথবা তার দলিল ও প্রমাণের দরকার আছে তাহা ভাবে না। কিন্তু তথাকথিত অনেক পণ্ডিত ও শিল্পী যাহারা জানে যে, সমাজের যত জিনিষ গ্রাস তাহারা করে তার তুলনায় তাহাদের সৃষ্টি একেবারেই নগণ্য। তারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, তাহাদের কাজ ছাড়া বিশ্ব-মানবের কল্যাণ আর নাই! এই জায়গায় পুরুতের দলের সঙ্গে ওদের একটা মিল দেখা যায়।

খাঁটি শিল্প খাঁটি বিজ্ঞান মানুষের অন্য কর্ম্মপ্রচেষ্টার মতন চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে; তাহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা বা অপ্রমাণ করা দুই নিরর্থক।

বিজ্ঞান ও শিল্প যে আজ সমাজে মিথ্যার মুখোস পরিয়া

ভণ্ডামী করিতেছে তাহার একটা গুরুতর কারণ এই যে, শিল্পী জ্ঞানী প্রভৃতি তথাকথিত "সভ্য" দল সকলে মিলিয়া একটা নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্ম্মান্ধ 'পুরুত'দের মত গর্ব্বান্ধ এই দলটি আভিজাত্যের মোহে অধীর! এদের জাতটা মামুলী জাতের মতই অশুভকর, কারণ যে-আদর্শের দোহাই দিয়া এরা জাতিভেদ সৃষ্টি করে সেই আদর্শই ইহাতে ধূলায় লুটাইতে থাকে। সেইজন্যই খাঁটি ধর্ম্ম শিল্প বিজ্ঞানের জায়গায় মেকিতে সমাজ ভরিয়া যাইতেছে।

শিল্প ও সাহিত্য এক্ষেত্রে যথেষ্ট অপরাধ করিয়াছে; যে বস্তু সাধারণ মানুষকে পৌঁছাইয়া দিবার ব্রত লইয়া শিল্প ও সাহিত্য আবির্ভূত হয় এবং যাহা প্রচার করিতে মহা ব্যস্ত বলিয়া ভাণ করে ঠিক সেই বস্তু হইতে শিল্প ও সাহিত্যই মানুষকে কতটা বঞ্চিত করিয়াছে ভাবিলে লজ্জা হয়। অথচ অন্তত মুখেও যে দায়ীত্বটা স্বীকার করে তাহাতেই প্রমাণ হয় তথাকথিত শিল্প ও সাহিত্য কত অপরাধী ও নৈতিক দায়ীত্ব বোধে কত দুর্ব্বল।

"শিল্পের জন্যই শিল্প" "বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান" বলিয়া এক দল লোক কত বুলিই কপ্চাইল! কিন্তু এখন মানুষ বুঝিয়াছে, তাদের সার্থকতা এইখানে যে শিল্প বিজ্ঞান নিখিলমানবের চিরন্তন উত্তরাধিকার। সকল মানুষেরই উহাতে অধিকার আছে এটি সভ্যতার পাণ্ডাদের স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কখন ঐ বস্তুগুলি কি মানবের চিরন্তন সম্পত্তি হইয়া উঠে? আসল আর ঝুটোর মধ্যে প্রভেদটা ধরা যায় কিরূপে? এসব প্রশ্নের জবাব ত বড় একটা পাণ্ডারা দেন না! বরং তাঁহারা চাল দিয়া বুঝাইতে চান যে, সত্য সুন্দর ও কল্যাণ যে আসলে কি তাহা প্রকাশ করা যায় না; তাহাদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা শক্ত।

কিন্তু এটা মিথ্যা কথা। যুগে যুগে বিশ্বমানব তার অপরিসীম বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যদি কিছু করিয়া থাকে ত সে এই সুন্দর ও কল্যাণের ধ্যান ও ধারণা। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি সভ্যতার পাণ্ডাদের পক্ষে সুবিধার হয় না কারণ ইহা প্রমাণ করিয়া দেয় যে সুন্দর ও কল্যাণকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের জায়গায় শিল্প ও বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা শুধু নিরর্থক নয় অনিষ্টকর। যুগে যুগে মানুষ শিবসুন্দরের রূপটি নির্দ্ধারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সাধকগণ চীন ইহুদী ও মিশর দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানীর দল গ্রীক দর্শন ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রত্যেকেই স্পষ্টভাবে শিবসুন্দরের ধ্যান ধারণার সাক্ষ্য দিতেছেন।

যাহা কিছু মানুষকে মানুষের সঙ্গে এক-প্রাণ হইয়া মিলিতে সাহায্য করে তাহাই শিব-সুন্দরের দান; যাহা কিছু ভেদের সৃষ্টি করে তাহাই অশিব, তাহাই অসুন্দর।

এই অমোঘ মন্ত্রটি সকল জীবই জানে, সকলের প্রাণে ইহা গ্রথিত আছে।

মিলন যাহার সাহায্যে গড়ে তাহাই সুন্দর তাহাই বিশ্বমানবের কল্যাণকর। এই কল্যাণ যদি শিল্প ও বিজ্ঞানের পাণ্ডাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এটি তাঁহাদের ভোলা উচিত নয়; যে শিল্প ও যে বিজ্ঞানের সাধনায় ঐ কল্যাণ হয় শুধু তাহারই চর্চ্চা যদি পাণ্ডারা করেন তবেই স্বীকার করিব তাঁরা সত্যধর্ম্মী। কিন্তু তাহা হইলে ভেদমূলক আইন বিজ্ঞান, অর্থ-শোষক অর্থনীতি ও ধন-বিজ্ঞান ও মৃত্যুমূলক যুদ্ধবিজ্ঞান কোথায় দাঁড়ায়? ইহাদের যে একমাত্র উদ্দেশ্য একদল মানুষের উচ্ছেদ করিয়া অন্য এক দলকে সাময়িকভাবে বাড়ান। সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে ইহাদের ত কোন যোগই দেখি না, তবু কেন এইসব তথাকথিত বিজ্ঞান এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে? আজকাল দেখি শিল্প-ভোগে অশক্ত অথর্ব্বদের লালসার অবলম্বন অথবা হৃষ্ট-পুষ্ট নিষ্কর্ম্মাদের খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তবু এই শিল্প কেন এত লোককে টানিতেছে? এ শিল্পের দ্বারা কোন কল্যাণ সাধিত হইতেছে?

কতকগুলা বিষয়ে খবরের সংখ্যা বাড়াইয়া গেলেই "জ্ঞান" মিলে না। জানিবার বস্তু এ জগতে অসংখ্য; অনেকের চেয়ে বেশী জানিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। কোন্ জিনিষ কতটা মানব-কল্যাণের সহায়ক তাহাদের গুরুত্ব ও ক্রমানুসারে নিজের জ্ঞানের মধ্যে গ্রহণ করা ইহাই একমাত্র পন্থা।

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশাল অরণ্যে কোন্‌টিকে বাছিব? যাহার সাহায্যে এমন জীবন গঠন করা যায় যাহাতে মানুষকে সব-চেয়ে কম দুঃখ ও সব-চেয়ে বেশী আনন্দ দিতে পারি তাহাই আমার কাছে সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞান; এবং আমাদের তুচ্ছতম কাজেও যখন শিব সুন্দরের ছায়া পড়িবে, তখন সেই জীবনকেই সর্ব্বোচ্চ শিল্প বলিব। কিন্তু যে-সব ভণ্ড শিল্প-বিজ্ঞান বিশ্বমানবকে ঠকাইয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে কল্যাণধর্ম্মী শিল্প-বিজ্ঞানের স্থান কোথায়?

আজকাল সমাজে শিল্প ও বিজ্ঞান বলিয়া যে-সব জিনিষ চলে তাহার অধিকাংশই একটা বিরাট বুজরুকী মাত্র। এককালে ছিল ধর্ম্মের বুজরুকী এখন তাহার স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে শিল্প-বিজ্ঞানের বুজরুকী। চোখে ঠুলী দিয়া দিব্য আরামে আমরা আছি! কিন্তু মনে নাই যে, অনেক জিনিষই চোখে পড়িতেছে না। চোখের ওই ঠুলীটা দূর করিয়া ফেলিয়া একেবারে গোড়া হইতে নূতন চোখে সব জিনিষ দেখিতে হইবে। গন্তব্য পথের সন্ধান করিতে হইবে। কত প্রলোভন পথ ভুলাইতে চেষ্টা করে। হাত অথবা মাথা খাটাইয়া আমরা খাই, ক্রমশঃ সামাজিক মর্য্যাদার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছি, ক্রমশ বনিয়াদী-দের ধাপে উঠিয়া সভ্যতার নব্য পাণ্ডা হইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। জার্ম্মানদের মত 'কাল্‌চারে'র নামে প্রায় মূর্চ্ছা যাই আর কি! এত কষ্টে জাতে উঠিয়া এত বাম্‌নাই করিয়া হঠাৎ আগাগোড়া সবটাকে অবিশ্বাস করিতে হইলে অনেকখানি সরলতা ও সত্য নিষ্ঠা থাকা দরকার; সত্য ও কল্যাণের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা না থাকিলে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। কিন্তু নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়; যে কেহ প্রাণের মধ্যে সাড়া পাইয়াছে জীবনের সমস্যা তোমার মত যাহাদিগকে আকুল করিয়াছে, তাহাদের সত্যের পথ না ধরিয়া গতি নাই। মোহের আবরণ যতই মধুর হউক, সকল কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিত্তকে মুক্ত করিয়া স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। যে মানুষ অন্ধভাবে তার গোঁড়ামিকে আঁকড়াইয়া থাকে তাহার কথা বলিয়া লাভ নাই। যুক্তির ক্ষেত্র যদি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত না হয়, তাহা হইলে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক অনেক সুন্দর বক্তৃতা হইতে পারে কিন্তু সত্যের দিকে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না। সমস্ত যুক্তি গোঁড়ামির খোঁটায় ধাক্কা খাইবে, সকল সিদ্ধান্ত ভুল হইবে। গোঁড়ামী শুধু ধর্ম্মে নয় তথাকথিত সভ্যতার রাজ্যেও আছে, দুই-ই মূলতঃ এক বস্তু। গোঁড়া ক্যাথলিক বলিবে, "আমরা কি যুক্তি মানি না? মানি বই কি; তবে যুক্তিকে শাস্ত্র ও আচারের উপরে যাইতে দিই না, কারণ তাহাদের মধ্যে পূর্ণ ধ্রুব সত্য রহিয়াছে।" সভ্যতার পাণ্ডা বলিবে, "আমার সমস্ত যুক্তি শিল্প ও বিজ্ঞান পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়া যায়। কারণ উহাদের মধ্যে আমি সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ দেখি। মানবের সমস্ত জ্ঞান আমাদের বিজ্ঞানে পর্য্যবসিত; পূর্ণসত্যকে এখনও বিজ্ঞান ধরিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে পারিবে এবং আমাদের শিল্পের উদার ভিত্তির উপর সত্যশিল্পের একমাত্র প্রতিষ্ঠা।" ক্যাথলিক বলিবে, "মানুষের বাহিরে একটি মাত্র বস্তু পূর্ণ ভাবে আছে সেটি হইতেছে সঙ্ঘ (church)।" আর সংসারী বলিবে, "মানুষের বাহিরে আছে শুধু সভ্যতা!" ধর্ম্মে অন্ধসংস্কার লইয়া আলোচনা করিতে যুক্তির দুর্ব্বলতাটা আমরা সহজেই ধরিতে পারি, কারণ, সেই সংস্কার আমরা কাটাইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু যে করে তার কাছে একটি মাত্র ধর্ম্ম, একটি মাত্র সত্য আছে যেটি বিশ্বাস সে বিশ্বাস করে! অথচ সেটা যুক্তিদ্বারা সে প্রতিপন্ন করিয়াছে বলিয়া তার ধারণা। সভ্যতা-সংস্কার লইয়াও আমাদের সেই একই অবস্থা; আমরা বিশ্বাস করি যে, জগতে শুধু একটি মাত্র খাঁটি সভ্যতা আছে, সেটি আমাদের; অথচ নিজেদের অযৌক্তিকতাটা মোটেই আমরা দেখিতে পাই না। আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি সকল যুগ সকল জাতির মধ্যে আমাদের এই যুগ এই জাতিই সত্য সভ্যতার অধিকারী। যে কয়েক কোটি লোক ইউরোপ খণ্ডে বাস করে তাহারাই সকল খাঁটি বিজ্ঞান ও শিল্পের মালিক!

জীবনে সত্যের প্রকাশ অতি সহজ; এই সত্যকে ধরিতে বিজ্ঞান দর্শনের গভীর জ্ঞান না হইলেও চলে, কিন্তু একটি জায়গায় নাস্তিবাদী না হইলেই নয়—সমস্ত মূঢ় সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকে "নেতি" বলিয়া উড়াইয়া দিয়া পূর্ণ মুক্ত চিত্তে দাঁড়াইতে হইবে। হয় শিশুর মত সরল হইতে

হইবে, অথবা দেকার্ত (Descartes) এর মত বলিতে হইবে, "আমি কিছু জানি না, কিছু বিশ্বাসের বশে মানিয়া লই না; আমি অন্য কিছুই চাই না, শুধু বুঝিতে চাই এই যে, যে-জীবন আমরা ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি, ইহার অর্থ কি, ইহার সত্য সার্থকতা কোথায়?"

এই প্রশ্নের সরল স্বচ্ছ ও পূর্ণ উত্তর মানুষ যুগের পর যুগ পাইয়াছে। আমার স্বার্থ আমাকে শিখায় যে, জগতের যত ধনসম্মান সৌভাগ্য আমার হউক। কিন্তু আমার জ্ঞান আমায় দেখাইয়া দেয় যে, ঐ ইচ্ছাটি শুধু আমার একলার নয়, প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক প্রাণীর। সুতরাং আমি একা সমস্তটা দখল করিতে গেলে ইহারা আমায় পিষিয়া মারিবেই। যে-সুখের জন্য আমি লালায়িত তাহা আমি একচেটিয়া করিতে পারি না। কিন্তু সুখের পিছনে ধাওয়াটাই ত জীবন! সুখ না পাওয়া, সুখ পাওয়ার জন্য চেষ্টা মাত্র না করা—সে ত মৃত্যু।

যুক্তি বলে: জগতের নিয়মে সকলেই নিজের নিজের সুখ চায় সুতরাং আমি একা সব সুখ কখনও পাইব না এবং পুরাপুরি বাঁচাও সেইজন্য আমার অদৃষ্টে নাই। কিন্তু এই নিখুঁত যুক্তিটা অটল থাকিলেও দেখি আমি দিব্য বাঁচিয়া আছি এবং সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের বলিতে হয়—মানুষ নিজেকে যতটা ভালবাসে তার চেয়ে আমাকে যদি ভালবাসে তবেই আমার সুখ-সমৃদ্ধি সম্ভব হয়। কিন্তু এটা যে অসম্ভব ব্যাপার। ইহা কখনও হয় না; তবুও আমরা ত পাশাপশি আছি; আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা আমাদের শক্তি সৌভাগ্য ও সম্মানের অন্বেষণ কিসের আভাস দেয়? আমরা ঐ সবের ভিতর দিয়া পরকে আপন করিতে চেষ্টা করিতেছি—নিজেকে মানুষ যতটা ভালবাসে তাহা অপেক্ষা আমাকে বেশী ভাল বাসাইতে প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু সকলেই দেখি আমা অপেক্ষা নিজেকে বেশী ভালবাসে সুতরাং সেই চরম তৃপ্তি আর ভাগ্যে ঘটিল না। কত মানুষ এমনি অনুভব করে—এ সমস্যার সমাধান করিতে পারে না—হতাশ হইয়া জলিয়া পুড়িয়া বলে—এ জীবন কিছুই না, শুধু একটা নিষ্ঠুর পরিহাস।

কিন্তু তবু বলি ঐ সমস্যার সমাধান অতি সহজ এবং আপনা হইতে আমাদের কাছে দেখা দেয়; একটি মাত্র অবস্থায় আমরা সুখী হইতে পারি যখন পৃথিবীর জীব নিজেদের যত ভালবাসে তাহা অপেক্ষা অন্যকে বেশী ভালবাসিবে। এইটি সত্য হইলে নিখিলবিশ্ব আনন্দময় হইয়া উঠিবে।

আমি মানুষ এবং আমার চৈতন্য আমাকে সর্ব্বসাধারণের সুখের মর্ম্মগত নিয়মটি দেখাইয়া দিতেছে। সে নিয়ম আমাদের মানিতে হইবে—আপনাকে যতটা ভালবাসি তাহা অপেক্ষা অপরকে ভালবাসিতে হইবে।

এই ভাবে জীবনকে চালাইলে তাহার এমন একটি অপূর্ব্ব তাৎপর্য্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হইবে যাহা আমরা কখনও দেখি নাই। সৃষ্টির মধ্যে জীবে জীবে হিংসা দেখি—এক অন্যকে ধ্বংস করিতেছে দেখি, কিন্তু ইহাও সত্য যে, জীবে জীবে প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে—এক অন্যকে সাহায্য করিতেছে। ধ্বংসের সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই—প্রাণের ধারা পুষ্ট হইতেছে প্রেমের আদান-প্রদানে। এই প্রেম বাহিরে জীবে জীবে মৈত্রী ও অন্তরে অনুপম মাধুর্য্যের রূপ ধরিয়া দেখা দেয়। বিশ্বমানবের ইতিহাস আমি যতটুকু বুঝিয়াছি—আমি দেখিয়াছি যে, মানবসভ্যতা সম্মুখপানে চলিয়াছে একটি শক্তির প্রেরণায়—সেটি পরস্পরের প্রতি প্রীতির টান; এইখানেই জীবের ঐক্য-সিদ্ধির অটল ভিত্তি। এইটি ক্রমশঃ পরিস্ফুট করা এবং এই অনুপম নিয়মটি জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা—ইহাই আমার কাছে ইতিহাসের যথার্থ স্বরূপনির্দ্দেশ। মানুষ তার অন্তরের অনুভূতি ও বাহিরের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিয়া ঐ সত্যটিকেই ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শুধু বোধের মধ্যে ধরা নয়—প্রাণের গভীরতম প্রেরণায় ঐ সত্যের অসন্দিগ্ধ প্রামাণ্য দেখা। মানুষের সব-চেয়ে বড় তৃপ্তি, বড় মুক্তি, বড় আনন্দ **ত্যাগ ও প্রেমে**। এই অনন্য পথটি দেখাইয়া দেয় প্রজ্ঞা, এবং হৃদয়ের আবেগ মানুষ সেই দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

যাহা তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যদি তাহা তোমার কাছে অস্পষ্ট বোধ হয় তাহার কঠোর সমালোচনা করিও না। আমার আশা আছে রমাঁ রলাঁ!

একদিন তুমি এ জিনিষটি পরিষ্কার ও স্পষ্ট করিয়া ধরিবে। আমি এখন যে ভাবে দেখিতেছি তাহার একটু আভাস তোমায় দিলাম। ইতি

লিও টল্‌ষ্টয়

[ঋষি টলষ্টয়ের যে চিঠিখানির অনুবাদ আজ বাঙলার পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিতেছি, সেই মহামূল্য লিপি রলাঁ মহোদয় প্যারিসে আমায় দেখান। ইহা তাঁর জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ বলিয়া তিনি কাছে রাখেন; কোন এক অপরিচিত ফরাসী যুবকের সমস্তা দূর করিতে এবং তাহাকে নিজের প্রেমের আদর্শটি বুঝাইতে টলষ্টয় কি পরিশ্রম করিয়াছেন। এইখানেই ত তাঁহার মহত্ব। এই ঋষি-ঋণ রলাঁ পরিশোধ করিয়াছেন টলষ্টয়ের জীবনী লিখিয়া। এই লিপির উপর রলাঁর মন্তব্য ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ঘরে ও বাহিরে

শ্রী দ্বিজরাজ শর্ম্মা

বাড়ীটা বহু কালের পুরানো। সেকেলে ধরণের নীচু নীচু ছাদওয়ালা পাঁচ ছয় মহল বাড়ী। তাহারি সব শেষের মহলটিতে পূর্ণিমাদের বাস। ছাদের কড়িগুলা বাঁকিয়া ছাদটা কাপড়ের সামিয়ানার মত মাঝখানে খানিকটা ঝুলিয়া আসিয়াছে। তাহার উপর মাঝখান ঢালু জায়গা পাইয়া বৃষ্টির জল ক্রমাগত ছাদে বসিয়া ভিতরটা অনেক-খানি ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে। ফাঁপা চুণ সুরকির চাবড়া-গুলা খসিয়া বরগার গায়ে গায়ে খসিয়া আধুনিক শিল্পীদের রহস্যঘন চিত্রের মত অনেক কিম্ভুত-কিমাকার নক্‌সা কাটিয়াছে। বহু বর্ষার জলধারা ছাদের ফাঁকে ফাঁকে অল্পে অল্পে গড়াইয়া আসিয়া হলদে সাপের গায়ের খোল-সের মত আঁকা-বাঁকা ও কুদৃশ্য সারি সারি বিবর্ণ রেখা টানিয়া গিয়াছে। মেজের সান উঠিয়া উঠিয়া প্রতি ঘরেই তিন চারিটা করিয়া গামলা-প্রমাণ গর্ত্ত। কত কালের রোদ ও বৃষ্টি খাইয়া দরজা জানালাগুলি আপন ইচ্ছামত প্রতি বৎসর বাড়িয়া কমিয়া বাঁকিয়া-চুরিয়া বদ্‌লাইয়া যায়। এখন তাহাদের বন্ধ করিতে গেলে কোনটা বা লাগে না কোনোটা বা মাঝখানে এক বিঘৎ ফাঁক হইয়া থাকে। জানালার গরাদে ও চৌকাঠের লোহার আংটার সহিত নারকেলদড়ি কি ছেঁড়াকাপড়ের পাড় বাঁধিয়া কপাটের শিকলের সঙ্গে কোনো প্রকারে তাহাদের যোগাযোগ রাখিতে হয়। তিন চার পুরুষের পদচিহ্ন বুকে ধরিয়া ইট বার-করা সিঁড়িগুলি যেন আপনাদের দীনতা স্মরণ করিয়া ক্রমে ধরিত্রীর কোলে মিশাইয়া যাইবার চেষ্টায় তলার দিকে চার পাঁচ আঙুল করিয়া নামিয়া গিয়াছে।

উঠানে একটা গোয়াল-ঘর ও একটা ঢেঁকিশাল ছিল। বহু বৎসরের অব্যবহার ও অমেরামতীতে আজ তাহা দুইটা ভাঙা ইঁটের স্তূপ মাত্র। কিছু কাল এক জোড়া গোখুরা সাপের বাসাও সেখানে হইয়াছিল।

বাড়ীর অপর সরিকেরা নিজেদের মহলগুলি কেহ আগাগোড়া ভাঙিয়া আধুনিক বিলাতী-ফ্যাসানে গড়িয়াছে, কেহবা দুইতলার উপর তিনতলা তুলিয়াছে, কেহ বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা দালান আনাচ কানাচ ঘিরিয়া বাসস্থান বাড়াইয়া স্থাপত্যশিল্পের মুণ্ডপাত করিয়াছে, কেহ পুরানো বাড়ীকে খাড়া রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর নূতন নূতন জায়গায় নূতন নূতন তালি লাগাইয়া চলিয়াছে আর কেহ বা পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির উপর হস্তক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাহাকে তিলে তিলে ধ্বংস-স্তূপ হইয়া যাইতে দিতেছে। সব জড়াইয়া সাবেক বাড়ীখানা এখন একটা খিচুড়ীস্থাপত্যের অপূর্ব্ব ও রহস্যময় গোলক-ধাঁধা।

সেই বিচিত্র বাড়ীর ভগ্ন-প্রায় শেষ মহলটাতেও আজ অন্যান্য বাড়ীর মত ভাইফোঁটার উৎসব। একটি মাত্র বোনের দুইটি ভাই। ছোটটি নিতান্ত ছোট, পাঁচ বৎসর সবে পার হইয়াছে। বড়টি বছর কুড়ি। তাহাকেই ভাইফোঁটার উপহার দিবার জন্য পূর্ণিমার সমস্ত

আয়োজন। কাল হইতে এই লইয়াই সে ব্যস্ত। পাড়ার অন্য মেয়েদের মত শান্তিপুরে ধুতি-চাদর লইয়া পঁচিশ-ত্রিশ টাকার বাজার-খরচ হাতে করিয়া সে বাপের বাড়ী আসে নাই,স্বামীর ঘরে ভাইদের ডাকিয়া আদর-আপ্যায়ন করাও তাহার সাধ্য নাই। সে যে বিধবা মায়ের বিধবা মেয়ে। তাহার উৎসবের যত ঘটা, যত প্রাচুর্য্য তাহার অধিকাংশেরই বাহিরে কোনো প্রকাশ নাই।

সারা বৎসর দাদার ছেঁড়া ধুতিগুলির মাঝখান সেলাই ও রিপু করিয়া সে পরিত। পূজার সময় জ্যাঠা মহাশয়ের বাড়ী হইতে তাহারা তিন ভাইবোন তিনখানা নূতন কাপড় পাইত, কারণ জ্যাঠামহাশয় ছিলেন সওদাগর আপিসের বড়-বাবু এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর পিতৃহীনদের প্রতি এ কর্ত্তব্যটা করা তিনি উচিত মনে করিতেন। কিন্তু পূর্ণিমা কোনো দিন সে নূতন কাপড় পরে নাই। পূজার পর দেখিতে দেখিতে ভাই-ফোঁটা আসিয়া পড়ে। তাহার ভাইদের সেই একটি মাত্র বোন কি করিয়া ভাইদের শুধু হাতে সে ফোঁটা দিবে? ছোট ভাইটিকে আট আনা পয়সা খরচ করিলেই একখানা কাপড় দেওয়া যায়। মাকে লুকাইয়া জ্যাঠামহাশয়ের বাড়ীর ঝিকে দিয়া মাঝে মাঝে বড়ি বিক্রি করিয়া সে যে দুই চার আনা সংগ্রহ করে তাহারই পুঁজি হইতে সে কাপড় একখানা আনানো চলে। কিন্তু দাদাকে ত আর ধোলাই-করা কাপড় একখানা না দিয়া পারা যায় না! কোথায় পাইবে সে তাহার জন্য আড়াই টাকা তিন টাকা? ভবিষ্যতের আশাও তাহার কিছু নাই যে, আজ না হউক দুই বৎসর বাদে দিবে? তাহার যে জীবন-প্রভাতেই অদৃষ্ট লিখন আগাগোড়া জানা হইয়া গিয়াছে। তাই বৎসরান্তের ঐ একটি মাত্র নূতন কাপড়ও সে রাখিয়া দেয় ভাই-ফোঁটায় দাদাকে দিবে বলিয়া।

কাল রাত জাগিয়া সে রসবড়া ও নারিকেলের সন্দেশ করিয়া রাখিয়াছে; ছানার খাবারের বড় দাম; বেশী দেওয়া যায় না। সকালে দাদার জন্য চার পয়সা দামের দুইটি ও খোকার জন্য দুই পয়সা দামের দুইটি সন্দেশ আনাইয়াছে। একটি দিলে খোকা বড় রাগ করিবে, তাই কম দামের দুটিই আনাইতে হইল। খোকা ত এম্‌নিতেই বলে, "দিদিটা পচা, আমাকে কিচ্ছু দেয় না।"

বেলা হইতে চলিল। পূর্ণিমা সেই সকাল হইতে ধান দূর্ব্বা চন্দন ইত্যাদি সাজাইয়া স্নান সারিয়া বসিয়াই আছে। দাদা রাজীবের দেখা নাই। খোকাটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আল্‌পনার গণ্ডীর বাহির হইতে খাবারগুলির দিকে লুব্ধ দৃষ্টি দিয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকে নাচিতেছে। কি অনুযোগের সুর!

"দিদি, আমাকে দাও না ভাই, ওই সন্দেশটা। আমার খুব ভাল লাগবে। আচ্ছা, এখন একটা দাও, অন্যটা পরে দিও।"

দিদি বলিল, "যাঃ বোকা ছেলে! বড় ভাইয়ের আগে ছোটকে ফোঁটা নিতে নেই।"

খোকা বলিল, "ফোঁটা ত চাইনি, সন্দেশ নেব খালি। ওই বড়টা দিলেই হ'বে।"

দিদি বেচারী তাহার সঙ্গে আর পারে না। চোখ ফিরাইলেই হয়ত ছোঁ মারিয়া দৌড় দিবে। অথচ দাদার কি বুদ্ধি! আজকার দিনেও সকাল-বেলা সাত তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। কখন যে আসিবে, স্নান করিবে তাহার ঠিক নাই। কাজের মানুষের কাজ থাকে, পাঁচ জন ভদ্র লোকের সঙ্গে যাওয়া-আসা করিতে হয় জানি; কিন্তু আজ বছরকার দিনের এই সকাল বেলাটুকুও কি ঘরে থাকিলে ভদ্রলোকেদের কিছু অসম্মান করা হইত? কাল রাত হইতে পূর্ণিমা যে উৎসাহ সঞ্চয় করিয়াছিল, ভোর হইতে এই বেলা দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত তাহাকে জিয়াইয়া রাখিয়া রাখিয়া ক্রমশই তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ইচ্ছা করিতেছে আল্‌পনাটার উপর জল ঢালিয়া খাবারের থালাটা খোকাকে ধরিয়া দিয়া কাপড়খানা আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দেয়।

বেলা ঠিক এগারোটার সময় অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একতোড়া ফুল হাতে করিয়া রাজীব আসিয়া ঘরে ঢুকিল। পায়ের ধূলিমলিন জুতা জোড়া প্রায় পূর্ণিমার আলপনার উপরই ছিট্‌কাইয়া ফেলিল, গায়ের চাদর ও ঘর্ম্মসিক্ত জামাটা ফেলিল খোকার নূতন কাপড়-খানার উপর। তার পর চীৎকার জুড়িল, "মা, শীগ্‌গির

আমার তেল আর সাবানটা দাও; আমাকে এখুনি কাজে বেরুতে হ'বে। এই পূর্ণি, আমাকে একখানা ধোপ কাপড় দিতে পারিস? এ প'রে ত আর ভদ্রলোকের সাম্‌নে বেরোনো যায় না।"

মা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "এইত্ত ঘরের মধ্যেই কুলুঙ্গিতে তেল সাবান রয়েছে, বাবা; নিজে দেখে কি কোনোদিন জিনিষ নিতে শিখবি না? বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত কত আর আমি হাতে হাতে তেলটি জলটি খড়কেটি জুগিয়ে আস্‌ব? এই আঁশহাত করেছি, এখনই কি ধুয়ে আবার ঘরে ছুট্‌তে পারি?"

রাজীব রাগিয়া বলিল, "না পার, আমি অমনিই চান কর্‌ছি। তোমরা কোথায় যে কি রাখ, অত আমি খুঁজ্‌তে পারি না।"

সে হন্‌ হন্‌ করিয়া কলতলায় ছুটিয়া চলিল। পূর্ণিমা ধোলাইকরা নূতন কাপড়খানা হাতে করিয়া আনিয়া বলিল, "আজ যে ভাইফোঁটা তা কি ভুলে গেছ? নেয়ে এই কাপড়খানা প'রে এস, ফোঁটাটা নিয়ে তবে বেরিও।"

রাজীব খুসী হইয়া বলিল, "যাক্, বাঁচিয়েছিস্। আজ সরমাদিদির বাড়ী আমার ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন আছে, ভাগ্যে নূতন কাপড়খানা রেখেছিলি, তাই লোকের বাড়ী যেতে পার্‌ব। মস্ত ভোজ সেখানে আজ। আমাদের সমিতির সব কর্ম্মীরা আস্‌বে।"

পূর্ণিমার মুখখানা ম্লান হইয়া গেল। সে কিছু না বলিয়া কাপড়খানা দাদার হাতে তুলিয়া দিল। মা তেল সাবান হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভারি আমার মস্ত সাতমহলা বাড়ী, তাই ছেলে তেলটা খুঁজে বার কর্‌তে পার্‌লেন না।"

রাজীব বলিল, "আমার অনেক কাজ আছে, তেল খুঁজে খুঁজে বেড়াবার সময় হয় না।"

মা চলিয়া গেলেন। ছেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিতে গেলে মাছটা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, শেষে ছেলেরাই খাইতে পাইবে না।

রাজীব স্নান সারিয়া চুল আঁচ্‌ড়াইয়া হাতঘড়িটা হাতে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "পূর্ণি, দেখ্‌ত মা'র হাত-বাক্সে আনা দুই পয়সা আছে কি না। অনেকটা দূর যেতে হ'বে, হেঁটে হেঁটে আর পারি না।"

পূর্ণিমা বিস্মিত হইয়া বলিল, "এখুনি বেরোবে কি, দাদা? ফোঁটাটা নিয়ে যাও।"

রাজীব হাসিয়া ঘরের ভিতর অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ তাইত! ভুলে গিয়েছিলাম। এই দাঁড়াচ্ছি, চট্ ক'রে দিয়ে দে। বেশী বেলা হ'য়ে গেলে সরমাদি আবার রাগ কর্‌বেন।"

পূর্ণিমার চোখে জল ভরিয়া আসিল। জুতাপায়ে চৌকাঠের গোড়ায় দাঁড়াইয়া আপন মা'র পেটের বোনের ফোঁটা লইতেও তর সহিতেছে না, কোথাকার এক পাতানো বড়মানুষ দিদির নিমন্ত্রণের তাড়ায়। ইচ্ছা করিল বলে, "আমার ফোঁটা মনে মনেই রইল, যাও, তোমার আর অত হতশ্রদ্ধা করে' নিতে হ'বে না।" কিন্তু বলা হইল না। অমন কথা বলিলে মা রাগ করিবেন; তাছাড়া দাদার মুখের উপর অমন করিয়া কথা সে ত কোনোদিন বলে নাই। পূর্ণিমা বলিল, "জুতাজোড়া খুলে বোস, নইলে দেব কেমন ক'রে?"

"আঃ, তোদের শাস্তরের জ্বালায় আর পারি না," বলিয়া রাজীব হুড়মুড় করিয়া পিঁড়ির উপর গিয়া বসিয়া পড়িল।

ফোঁটা লইয়া বলিল, "একটা মিষ্টি হাতে তুলে দে। এত বেলায় অতগুলো খেলে সেখানে আর কিছুই খাওয়া হ'বে না।"

পূর্ণিমা হাত না তুলিয়া বলিল, "তোমার যা খুসী তুলে নাও, আমি খোকাকে ডাক্‌তে যাচ্ছি।"

রাজীব তাহার কথায় লক্ষ্য না করিয়া একটা নারিকেলসন্দেশ গালে পুরিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিতে ফেলিতে তোড়াটা বগলে করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। পূর্ণিমা আসিয়া দেখিল পিঁড়ির সাম্‌নে সাজানো থালা রেকাবগুলি ঠিক তেমনি রহিয়াছে, কেহ যে স্পর্শ করিয়াছে তাহা বোঝা যায় না।

খোকা দেখিয়াই আনন্দে নাচিয়া উঠিল, "দিদি, আমি তোমার আঁকা পিঁড়িতে ব'সে এইবার সব সন্দেশগুলো খাই। কি মজা, দাদা আজ সব রেখে দিয়েছে।"

খোকাকে ফোঁটা দিয়া দিদি বলিল, "সব কি খেতে পারবি, ভাই? আচ্ছা, যতগুলো পারিস্ খা।"

খোকা দুই হাতে তুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার স্মৃতিতে এমন কাণ্ড সে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। মা কিম্বা দিদি কোনোদিন তাহাকে একটার বেশী দুইটা মিষ্টি ত দেয় না। মিষ্টিটা বড় হইলে আবার আধখানা ভাঙিয়া রাখিয়া দেয়। আজ একি হ'ল? দিদি একটাও ত তাহার পাত হইতে সরাইয়া রাখিল না।

কিন্তু ভাতের কাঠিটা হাতে করিয়া মা 'হাঁ, হাঁ,' করিয়া আসিয়া পড়িলেন। "করলি কিরে হাবা মেয়ে; খোকা যে সব এঁঠো ক'রে দিলে। আচ্ছা নবাবের ঘরের বৌই তুই হয়েছিস বাছা! ওই দুথালা খাবার কি ব'লে নষ্ট করলি?"

পূর্ণিমা কথা কহিল না। মা আবার বলিলেন, "রাঁধতে রাঁধতে এঁটোটা ছুঁই কি ক'রে? ওরে পূর্ণি নে আর রাগ দেখাতে হবে না। ছেলেমানুষ এঁঠো করেছে করেছে, একটু আলাদা ক'রে রাখ্। আমরা না হয় না খাব; ওরা দুভাই খাবে এখন। ও চারপাঁচ দিন ঠিক থাক্‌বে।"

পূর্ণিমা সেদিকে না তাকাইয়া রাজীবের ছাড়া কাপড় গামছা গেঞ্জিগুলা কাচিয়া রোদে মেলিয়া, তেল সাবান কলতলা হইতে সরাইয়া ময়লা চিরুনী পরিষ্কার করিয়া ছাদে বড়ি শুকাইতে চলিয়া গেল।

"ছেলেটা সত্যি বড় অবুঝ" বলিয়া মা নিজেই খোকার হাতে চার পাঁচটা মিষ্টি গুঁজিয়া দিয়া থালাটা সরাইয়া লইলেন।

পূর্ণিমার ভাই-ফোঁটার উৎসব শেষ হইয়া গেল। পাশের বাড়িগুলাতে তখন দই মিষ্টি মাছ তরকারী লইয়া হাঁকাহাঁকি চলিতেছিল। রান্নার গন্ধে সমস্ত পাড়াটা ভরিয়া গিয়াছে।

* * * *

কলেজে রাজীবের নাম ছিল 'ব্রিলিয়ান্ট' ছেলে বলিয়া। কিন্তু সে ঠিক সময় ক্লাশে আসিত, নোট লিখিত, টিউটোরিয়াল ক্লাশে খাতা জমা দিত এবং অধ্যাপকের সংশোধনগুলি দাগ দিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিত। ইহাতে ছেলেমহলে তাহার সুনামের হানি হইতে লাগিল। একদল ছেলে বলিত, "ওটা ব্রিলিয়ান্ট-না কচু! 'বুকওয়ার্ম' কোথাকার, শুধু মুখস্থ বিদ্যা কপ্‌চায়! পৃথিবীর কোনো খবর রাখে না! কেবল নোট আর বই, বই আর নোট। কলেজে যেন ওকে কেউ ঝাড়ুদারের কাজ দিয়েছে, তাই সবার আগে এসে ধন্না দিতে থাকে! ডিগ্রী নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? ঐ ক'রেই বাঙালী জাতটা গেল।"

রাজীব মনে করিল, সত্যই সে বড় সেকেলে। দেশের এত বড় বড় সমস্যার কথা ভুলিয়া, মানব প্রেম, বিশ্বমৈত্রী, সোসিয়ালিজ্‌ম্, সমাজসংস্কার,সাহিত্য, শিল্প, কোনো কিছুর কথা না ভাবিয়া সে কিনা মূর্খের মত বই মুখস্থ করিতেছে। তাহার মত মস্তিষ্ক যদি এমনি অপব্যয়ে নষ্ট হয় তবে আর দেশ রসাতলে যাইবে না কেন?

কিন্তু ভাবিল না যে মস্তিষ্কটার আর একটু উৎকর্ষ সাধন করিয়া দেশকে রসাতল হইতে স্বর্গে প্রমোশন দিবার চেষ্টা করিলে এই দুই চার বৎসরেই রসাতলের উপর তিনচার প্রস্থ মাটি পড়িয়া নাও যাইতে পারে। অগত্যা রাজীব ব্যাকরণ শেষ হইবার আগেই সাহিত্যচর্চ্চা সুরু করিল, লাইন টানিতে না শিখিয়াই আর্ট ক্রিটিক্ হইয়া উঠিল। ইংরেজী বই আর সে পড়ে না, 'কন্টিনেণ্টাল' আধুনিক সাহিত্যের অনুবাদই তাহার নিত্য সহচর। ঘরের জগদ্ধাত্রীর ছবিটা সরাইয়া ফরাসী আর্টিষ্টের একটা ছবির একরঙা ছাপা কপি আনিয়া টাঙাইয়াছে, কারণ সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে জাগাইতে হইলে ভিতরে বাহিরে সেই রকম আবহাওয়ার দরকার। কিন্তু একলা কি জগতে কোনো কাজ হয়? বিশ্বমৈত্রী কিম্বা সোসিয়ালিজম্ কোনোটাই খোলে না বিনা সঙ্গে। রাজীবের একটি দল জুটিল। তাহার ভিতর দুটি একটি কলেজের ছেলে। বিশেষ বন্ধুরা কিন্তু বেশীর ভাগই এই অকেজো জীবনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক অনেককাল চুকাইয়াছে। তাহাদের দুই চারজনের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ অনেক দিন পার হইয়াছে, তাই আঠারো কুড়িদের গলা ধরিয়া ছাড়া তাহারা হাঁটে না।

রাজীব তাহার সেকেলে মনটাকে পালিশ করিয়া করিয়া শীঘ্রই এই ত্রিশ-বত্রিশদের সমকক্ষ হইয়া উঠিল; এমন কি অনেকে বলিত আধুনিকতায় রাজীব আর বছর

খানিকের ভিতরই ইহাদের ছাড়াইয়া উঠিবে। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ বত্রিশের কাছে কুড়ি যে অনেক আধুনিক।

বি-এ, পরীক্ষায় রাজীবের সফলতা সম্বন্ধে অধ্যাপকেরা যতই সন্দিহান হইতে লাগিলেন, তাহার শিংভাঙা বন্ধুরা ততই তাহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। দলের পাণ্ডা প্রভঞ্জন বলিল, "রাজীব, কলেজটা ছেড়ে দাও হে; পাঠশালার পড়া আর কত কাল আওড়াবে? এটা নন্‌কোঅপারেশনের যুগ, জান ত?"

প্রস্তাব শুনিয়া মা বলিলেন, "হ্যাঁরে, দু-বচ্ছর যে মাইনের টাকা গুন্‌লাম, সে কি সব জলে দেবার জন্যে?"

ছেলে বলিল, "জলে যা গেছে তাত গেছেই। পরীক্ষা দিতে হ'লে আরো ত এক শ' দেড় শ' তার উপর জলে যাবে।"

মা বলিলেন, "তোদের পেটে ধরেছিলুম; আমার যা কিছু তোদেরই পিছনে গিয়েছে দুঃখ নেই। কিন্তু ওই বিধবা মেয়েটার গলার হারছড়াও যে বাঁধা দিতে হ'ল তোর মাইনে দেবার জন্যে, সেটা কি তোকে উদ্ধার ক'রে দিতে হ'বে না?"

ছেলে বলিল, "পাশ ক'রে ত চল্লিশ টাকা মাইনের কেরাণীর চেয়ে উচ্চ পদের আশা নেই; সে আমি অম্‌নিও আন্‌তে পারব।"

মা কান্নাকাটি জুড়িয়া দিলেন; অগত্যা রাজীব পরীক্ষা দিল, কিন্তু পাশ হইল না। বলিল, "ফিসের এই টাকা ক'টা আমি বাঁচিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, তাও মার জন্যে নষ্ট হ'ল।"

রাজীব পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিয়া পুরাপুরি সমিতির কাজে লাগিল। দেশের স্বর্গারোহণের সিঁড়ি আরো এক ধাপ বাঁধাইতে আর দেরী নাই।

* * *

সমিতির অন্যতমা নায়িকা শ্রীমতী সরমাসুন্দরীর বাড়ী আজ সভ্যদের ভাই-ফোঁটার নিমন্ত্রণ। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ী, দেউড়ীতে পাগড়ী-বাঁধা গালপাট্টাওয়ালা দরোয়ান দাঁড়াইয়া, বাবুদের সে-ই আনিয়া বসিবার ঘরে বসাইতেছে। ঘরের আস্‌বাবপত্র বিলাতী কেতায় সাজানো, কোথাও কোনো খুঁৎ নাই। কিন্তু অতিথিদের অধিকাংশেরই বেশ-ভূষায় দারিদ্র্য উঁকি মারিতেছে। অভাবের দীনতার উপর বিলাসের একটা পালিশ পড়িয়া দারিদ্র্যের অনাড়ম্বর সহজ শ্রীটুকুও চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বিলাসের পূর্ণাঙ্গ আয়োজনের কাছে তাহা একটা ভেঙচানির মত দেখাইতেছে।

সরমাসুন্দরীর শ্বশুর পাটের দালালী করিয়া অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। স্বামীর ব্যবসায় সেই অর্থ উপভোগ ও অপব্যয় করা। যতদিন শ্বশুর বাঁচিয়াছিলেন, বধূকে অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া দাসীপরিবৃতা অন্দরমহলে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি আপনার নবার্জ্জিত আভিজাত্যটা সযত্নে বাঁচাইয়া চলিতেন। সরমার সন্তান হয় নাই; বিরাট একটা বাড়ীর অন্দরের অতল গহ্বরে শুধু একদল দাসীর মধ্যে সে একলা হাঁপাইয়া উঠিত। একটু বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল; ইংরেজী ও বাংলা নাটক নভেল পড়িবার মত বিদ্যা সে-বয়সে সে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহার ধনী শ্বশুরের বাড়ীতে হীরা জহরত অপেক্ষাও পুস্তক দুর্লভ ছিল। তাই সরমার কাজ ছিল খড়খড়ি ও ছাদের আলিসার পাশ হইতে লুব্ধনেত্রে বাহিরের পৃথিবীর পানে তাকাইয়া থাকা আর আপন মনে সম্ভব অসম্ভব উপন্যাসের জাল বোনা। তাহার পর্দ্দার বহর দিনকার দিন যত বাড়িতেছিল, বাহিরের উপর তাহার লোভটা ততই দুরন্ত হইয়া উঠিতেছিল। পাইলে সে যেন এখনি সমস্ত পৃথিবীটাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ঘুলঘুলির ভিতর হইতে সরমা এ বাড়ীর সমস্ত অতিথি অভ্যাগত, দেনদার, পাওনাদারের চেহারা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। পথে যে কলেজের ছেলের দল, কেরাণীবাবুর পাল, কাবুলী মহাজন, খোট্টা মুটে, উড়িয়া ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টিয়ান নার্স, নিত্য আনাগোনা করিত তাহাদের কেহ সরমাকে কোনো দিন দেখে নাই, কিন্তু তাহারা সকলেই ছিল সরমার পরিচিত। কে কখন কোন্ পথে আনাগোনা করে তাহা সরমা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া দিতে পারিত। সরমার বৃদ্ধ শ্বশুর যখন তাঁহার অগাধ সম্পত্তি নিষ্কর্ম্মা পুত্রের হাতে তুলিয়া দিয়া সরমার কারাগারের

প্রহরীর কাজ ফেলিয়া মরজগতের মায়া কাটাইয়া গেলেন তখন সরমার বেশ বয়স হইয়াছে। সাধারণ বাঙালীর ঘরের মেয়েরা সে বয়সে গিন্নী বান্নী হইয়া মেয়ের বিয়ের ভাবনায় আহার নিদ্রা ভুলিয়া বসে। সরমার ছেলে-মেয়ের বালাই ছিল না; এককালের বাঞ্ছিত মুক্তির স্বাদ পাইয়া সে নিজেকে লইয়াই মাতিয়া উঠিল। কৈশোরে কি প্রথম যৌবনে যে স্বাধীনতা তাহাকে সহজ আনন্দ দিতে পারিত, আজ অসময়ে তাহা যেন তাহাকে উদ্দাম মত্ততায় নাচাইয়া তুলিল।

সরমা এখন আর খোলা গাড়ী ছাড়া চড়ে না, বায়োস্কোপ থিয়েটার না দেখিয়া দিন সমাপন করে না। বাজারে কোনো জিনিষের দরকার হইলে সে মাইনে-করা সরকারদের ছুটি দিয়া আপনি গাড়ী চড়িয়া বাজারে যায়, সভাসমিতিতে মেয়েদের জায়গায় না বসিয়া নিরীহ স্বামীটিকে টানিয়া লইয়া পুরুষদের মাঝখানে আপনার স্বাধীনতা সগৌরবে ঘোষণা করিয়া আসন লয়। কারণে অকারণে সর্ব্বঘটে তাহার আনা-গোনার শেষ নাই।

কিন্তু স্বাধীনতার এই রকম নিরুদ্দেশ আস্ফালনে সরমার মনে একটা খট্‌কা লাগিতেছিল। তাহার সাময়িক উদ্দামতার ভিতর তাহার বয়সের স্থৈর্য্যটা এক একবার মাথা জাগাইয়া উঠিতেছিল। লজ্জা আসিয়া বলিতেছিল, "একি পাগলের খেলা?" অথচ ইহাকে ছাড়িয়া স্থির হইয়া ঘরেও সে বসিতে পারিতেছিল না।

সরমার দূর সম্পর্কের দেবর নীরদ বৌদিদির স্বাধীনতার উৎসবের একজন উৎসাহী কর্ম্মী ছিল। নীরদ বলিল, "বৌদি, তুমি একটা কাজে নাম। তোমার এত বুদ্ধি, এমন অখণ্ড অবসর, তার উপর এই প্রচণ্ড উৎসাহ, তোমার মত মেয়ের জন্যই দেশ তাকিয়ে আছে।"

সরমা তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেল। কি কাজ সে করিবে, কেমন করিয়া করিবে, কাহাদের লইয়া করিবে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। সে তাহার দেবরের উৎসাহী-সমিতিতে নাম লিখাইয়া ফেলিল। কারণ সমিতির প্রধান মূলধন উৎসাহের অভাব সরমার ছিল না। উৎসাহীরা তাহাদের নূতন লাভে আনন্দে অধীর। তাহারা আজ চরকা কাটা, কাল সাহিত্যের স্বপ্ন দেখা, পরশু সঙ্গীতসজ্জ্বত করা, পরদিন সমাজসংস্কারের বক্তৃতা করা ইত্যাদি যে কাজে যখন লাগিত সরমা মহা উৎসাহে তখনই তাহাতে যোগ দিত। সরমার কথার ধার ছিল খুব। কাজেই সকল বিষয়ে তাহাকে দিয়া একটা প্রবন্ধ পড়াইয়া কার্য্যারম্ভ করিলে সভা জমিত ভাল। ইহাতে সরমার মনটা খুব খুসী ছিল। কাজের একটা অছিলায় নিত্য খানিকটা নূতন মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া বহুকালের কারারুদ্ধ মনকে খোরাক জোগানাও হইত আবার অযথা চাপল্যের আত্মগ্লানি হইতে মনকে মুক্ত রাখাও চলিত। এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল মন্দ নয়।

কার্য্যকরী সভা ও উৎসবসভা মিলাইয়া উৎসাহী সমিতির সভার বৈচিত্র্য ছিল অসাধারণ, প্রায় প্রতিটাই নূতন। সেদিন ছিল ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার উৎসবসভা।

*　　*　　*

বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বসিবার ঘরে কোচে কুসিতে জন পনের কুড়ি পুরুষ ও তিন চারটি মহিলা তখনও ধৈর্য্য সহকারে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। দেয়ালে টাঙানো পুষ্প-স্তবকও ও মালা এবং ফুলদানির ভিতরের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের গন্ধে রন্ধনশালার গন্ধ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

নীরদ রান্নাঘর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "বৌদির এখনও চিংড়িমাছের কাটলেট ভাজা হয়নি; প্রভঞ্জন-বাবু, আপনার বোধহয় ক্ষিধের চোটে পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত হজম হ'য়ে গেল! রাজীব-বাবুর ত মুখ শুকিয়ে এতটুকু!"

রাজীব ক্ষুধার জ্বালা চাপিয়া সহাস্যে বলিল, "আমরা উৎসাহী, এত অল্পেই খাবার উৎসাহ কি নিভ্‌তে পারে? বাড়ী থেকে না খেয়ে বেরিয়েছি, যাতে এখানে এসে খাবারের উপর সম্পূর্ণ সুবিচার কর্‌তে পারি।"

তন্বী সুন্দরী ছোট একটি মেয়ে ঘাড় ঘুরাইয়া বলিল, "বাড়ী থেকে না খেয়ে বেরিয়েছেন, কি রকম? আজ না ভাইফোঁটা? আপনার বোন আপনাকে অমনি

ছেড়ে দিলে ? আমার ত ভাইদের খাইয়ে আস্‌তেই বেলা একটা হ'য়ে গেল।"

রাজীব একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "গরীবের বোনের ভাইফোঁটা, খাওয়াও যা, না খাওয়াও তা।"

মেয়েটি রাজীবের মুখের দিকে তাকাইয়া মেয়েটি বলিল, "তবুত কষ্ট ক'রে করা!"

রাজীব কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, 'কষ্টলাঘবের একটা মস্ত উপায় হচ্ছে, কিছু না থাকা; আমার বোনের সেই উপায়টা আছে, কাজেই কষ্ট তাকে কর্‌তে হয় না।"

রন্ধনশালার তদারক শেষ করিয়া সুসজ্জিতা সালঙ্কারা সরমা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার হাতে একরাশ ফুলের মালা ও রূপার থালায় ধানদূর্ব্বা ও চন্দন। পিছন পিছন একটি ভৃত্য একটা পিতলের বড় থালার উপর একটা শাঁখ, তামার একটি ঘট ও নানা রকম খোলা ফুল লইয়া ঘরের মাঝখানের টেবিলের উপর রাখিল। ভক্তবৃন্দ সরমাকে দেখিয়া নম্রহাস্যে মুখ আলোকিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সরমা রূপার থালাটা নামাইয়া বাজুবন্দ-পরা তাহার শুভ্র সুন্দর হাতখানি দোলাইয়া বলিল, "আজ আমি সকলের বড়; আমি কাউকে প্রণাম কর্‌তে-টর্‌তে পার্‌ব না। আমায় যারা প্রণাম কর্‌বে, তাদের অনেক আশীর্ব্বাদ কর্‌ব।"

চারিধারে ঘুরিয়া তাকাইয়া হাসির প্রসাদে বন্ধুবর্গকে তৃপ্ত করিয়া সরমা বসিয়া পড়িল। নিমন্ত্রিতা আর তিনটি মেয়েকে কাছে ডাকিয়া সরমা একজনের হাতে চন্দনের বাটি, একজনকে ধানদূর্ব্বা ও একজনকে চূর্ণ ফুলগুলি দিল। সরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সকলের গলায় এক এক ছড়া ফুলের মালা পরাইয়া দিল। নীরদ হাসিয়া বলিল, "বৌদি, ভাইফোঁটার এটাও কি একটা অঙ্গ? দাদা কিন্তু রাগ কর্‌তে পারেন।"

সরমা সুন্দর তর্জ্জনীটি রঞ্জিত ওষ্ঠাধরের উপর রাখিয়া বলিল, "খবরদার! একটিও কথা বল্‌বে না। আজ তোমরা সবাই আমার ছোট ভাই।" রাজীব ও তাহার বয়স্যরা কৃতার্থ হইয়া গেল। প্রভঞ্জনের মত শিংভাঙার দল একটু মুখ ফিরাইয়া মুচ্‌কি হাসিল।

শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণের মধ্যে অল্পবয়স্কা সেই মেয়েটি সকলকে এক একটা চন্দনের ফোঁটা পরাইয়া দিল। মেয়েরা সকলে সরমার দুইধারে একটা বৃত্তের মত ঘিরিয়া বসিল। ছেলেরা একে একে তাহাদের পুষ্পগুচ্ছের অর্ঘ্য হাতে নমস্কারের ভঙ্গীতে আসিয়া যুক্তকরে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে লাগিল। প্রথমজনের পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়েদের ঘিরিয়া ছোট ছোট বিজলীর বাতি বৃত্তাকারে পায়ের তলায় জ্বলিয়া উঠিল। বাহির হইতে একবার রাজীব শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল।

তারপর আহারের পালা। মেয়েদের পরিবেশনে আকণ্ঠ আহার করিয়া সকলে যখন উঠিল তখন চারটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রভঞ্জন বলিল, "আজকার ব্যাপারটা ত খুব 'সক্‌শেশফুল' হ'ল, সরমাদি। এর পরেরটা ত এমন সরস জিনিষ নয়। কিন্তু তোমাকে সেটা সরস করে' তুল্‌তে হ'বে।"

সরমা বলিল, "কি এবার সাহিত্যসভা, সঙ্গীতসভা, শ্রমিকসভা, আনন্দসভা, দেশহিতসভা না কোন্‌টা?"

প্রভঞ্জন বলিল, "না, এবারকার মত ও সভাগুলো ত হ'য়ে গিয়েছে; এবার আমাদের দরিদ্রবন্ধু সভার 'ওপনিং মিটিং'। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ গরম গরম লেখা চাই।"

নীরদ বলিল, "রাজীব খুব একটা করুণ রকম গান লিখে দিতে পার না?"

সরমা বলিল, "প্রবন্ধটা আমি লিখব। কিন্তু দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ফ্যাক্টস্ আমার বেশী জানা নেই।"

প্রভঞ্জন বলিল, "তাতে কি? এবছর ত সবই আমাদের প্রায় ওপনিং সেরিমনির উপর দিয়েই গেল। তাতে বেশী খুঁটিনাটির দরকার হয় না। উৎসাহ আর উত্তেজনা জাগাতে পার্‌লেই হ'ল।"

অল্পবয়স্কা মেয়েটি টিপ্পনি কাটিয়া বলিল, "আপনাদের যেরকম সভার বহর দেখছি, তাতে এক বছর ত সব কটার উদ্বোধন কর্‌তেই লেগে' যাবে। তারপর এবছরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতরা আসছে বছর পর্য্যন্ত আপনাদের সাহায্যের আশায় ব'সে থাক্‌বে?"

রাজীব বলিল, "তা কেন? আমাদের সভাগুলি ত সাময়িক কার্য্যউদ্ধারের জন্য নয়। আমাদের দেশে

শ্রমিকদের দুঃখ, দুর্ভিক্ষের কান্না, ইত্যাদি ত নিত্য লেগে আছে। এগুলির উচ্ছেদসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। এবছর সব গোড়াগুলো বেঁধে নি, তারপর আস্‌ছে বছর থেকে আসল কাজ হ'বে।"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "শ্রমিক সভার অধিবেশনের সময় দুর্ভিক্ষপীড়িতেরা যদি কাঁদে তবে কি আপনারা তাদের সাহায্য করবেন না?"

প্রভঞ্জন বলিল, "নিশ্চয়ই না। প্রত্যেক ছোট দুঃখের কান্নায় যদি কাঁদি তবে বড় দুঃখ মোচন করতে কখনও পারব না।"

সরমা বলিল, "কালইত তোমার সভার দিন পড়ছে। দরিদ্রবন্ধুসভার দিন ত আবার চাঁদা সংগ্রহ আছে। তা' বাজে তর্ক না করে' চাঁদার পরিমাণটা ঠিক করে' নেওয়া যাক্ এস; যাতে কাল সবাই শূন্যহাতে না আসে।"

নীরদ বলিল, "এক টাকার কম চাঁদা নেই; তারপর বেশী যে যা পারে দেবে।"

সরমা তাহার সুন্দর হাত ঘুরাইয়া বলিল, "আমি পঁচিশ টাকা দেব, যদি আপনারা সব জড়িয়ে একশ' তুলে দিতে পারেন।"

ছোট মেয়েটি টিপ্পনি কাটিয়া বলিল, "উদ্বোধনে অত টাকা এখন কি হ'বে?"

রাজীব বলিল, "আমাদের স্থায়ী ফণ্ডে জমা থাকবে। আপনি কত দেবেন?"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "আপনি যত দেবেন তত।" তাহার খোঁপা হইতে একটা ফুল খসিয়া পড়িল। রাজীব তুলিয়া পকেটের ভিতর রাখিল। তাহার বুক ঠেলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

সভা ভাঙিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। যাইবার সময় ছোট মেয়েটি বলিল, "রাজীব-বাবু, আস্‌ছে-সভায় সব লেখার চেয়ে আপনার গানটা কিন্তু সুন্দর হওয়া চাই।"

রাজীব একটু ম্লান হাসি হাসিল।

* * *

রাজীব যখন ঘরে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিয়াছে। উঠানে পা দিয়াই দেখিল মা রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়িটা তাকে তুলিয়া রাখিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া মা বলিলেন, "ওমা, রাজীব এতক্ষণে এলি? আমি বলি, আজ বুঝি তুই আর বাড়ীতে খেলি না। তাই এই শেষ বেলায় হাঁড়িটা তুলে রাখছিলাম।'

রাজীব বলিল, "ওমা, আমার ত দুপুরে নেমন্তন্ন ছিল, তা তুমি জান্‌তে না?"

মা একটু রাগ করিয়াই বলিলেন, "কই বাছা, আমাকে আর তুমি বল্‌লে কোথায়? আমি আরো আজ ভাই-ফোঁটা ব'লে চার আনা দিয়ে ভাল মাছটা আন্‌লাম; তা তুমি এগারটায় এলে, যেই আমি মাছটা নামালাম অম্‌নি হট হট ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেলে। মিথ্যে আমি সারাটা দিন হাঁড়ি কোলে ক'রে বসে রইলুম; বিকেলটায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, উঠে দেখি সূয্যি ডুবে গেছে, আজ আর ভাত খাওয়া হ'ল না।"

রাজীবের মনে কিসের একটা খোঁচা লাগিল। সে চর্ব্ব চোষ্য গিলিয়া আসিল, আর তাহার মা আজ অনাহারেই রহিয়া গেলেন। কিন্তু আবার পূর্ণিমার উপর রাগ হইল। সে ত নিমন্ত্রণের কথা দুপুরে শুনিয়াছিল; রান্না না হয় হইয়া গিয়াছিল, তবু মাকে খবরটা ত দেওয়া যাইত।

রাজীব বলিল, "পূর্ণিকে ত আমি ব'লে গিয়েছিলুম। তার কি একটু ঘটে বুদ্ধি ক'রে বলা উচিত ছিল না?"

মা বলিলেন, "তুই তার খাবার খাস্‌নি ব'লে সে রাগ ক'রে আজ কারুর সঙ্গে কথাই কইলে না। এই সন্ধ্যেয় উঠে দেখি তারও ভাত খাওয়া হয় নি।"

রাজীব লজ্জিত ভাবে বলিল, "তুমি গোটা কয়েক মিষ্টি দিয়ে জল খাওনা একটু।"

মা বলিলেন, "খোকা সেই দু'থালা শুদ্ধই এঁঠো ক'রে দিয়েছে।"

রাজীব বলিল, "বাজার থেকে কিছু আনিয়ে নিলে হয় না?"

মা বলিলেন, "এই এত পয়সার মাছ তরকারি মিষ্টি একদিনে খরচ হ'য়ে গেল, আবার আজ পয়সা খরচ করব আমার জন্যে? সিকেয় দুটো পাটালি গুড় তোলা আছে, তাইতেই হ'বে এখন।"

রাজীব মনে মনে ভাবিল, সাহিত্যে করুণরস সৃষ্টি

কর্‌তে হলে, জীবনে দুঃখ দারিদ্র্য বেদনার স্বাদ পাওয়া দরকার। এই দুঃখই আমার সম্পদ; এর জন্যে কেঁদে লাভ নেই।

সকালে উঠিয়া রাজীব পূর্ণিমাকে বলিল, "পূর্ণি, তোর সেই খাবারগুলো আন্, আমি খাব।" পূর্ণিমা একটা কথাতেই গলিয়া গেল। থালা দুই খানা দাদার পাতের কাছে সাজাইল। রাজীব যত পারিল খাইয়া পূর্ণিমাকে বলিল, "শোন্‌রে, একটা বড় মুস্কিলে পড়েছি; আমাকে চারটে টাকা দিতে পারিস্?"

পূর্ণিমার রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "সেই হার-বাঁধার আর পাঁচটা টাকা প'ড়ে আছে। শীত আসছে, মনে করেছিলাম একটা গরম গায়ের কাপড় কিন্‌ব।"

রাজীব বলিল, "আচ্ছা, তুই এখন দে, আমি পরে তোকে দেব।"

মনে মনে বলিল, "যদি না পারি, তাতেই বা দুঃখ কি? ছোট দুঃখের কান্নায় কাঁদ্‌লে বড় দুঃখ মোচন কর্‌তে পার্‌ব না কোনোদিন। আমাদের দুর্ভিক্ষের স্থায়ী ফণ্ডে এ টাকা জমা থাক্‌বে, সে পূর্ণিরও পরম ভাগ্য।"

* * *

দরিদ্রবন্ধুসভায় রাজীব চারটাকা দিয়া সভায় হৈ হৈ বাধাইয়া দিল। প্রভঞ্জন বলিল, "রাজীব, তোমার প্রাণটা এত বড় জান্‌তাম না।"

সরমা বলিল, "রাজীব-বাবু, আপনি যে কেবল গানই সুন্দর লিখেছেন তা নয়, দানও করেছেন সুন্দর। যে-দুঃখ হৃদয়কে টলায় না তাতে সাহিত্যের রস জমে না। আপনি সত্যিই দরিদ্রের বন্ধু।"

রাজীব একটু ম্লান হাসি হাসিল। তাহার মার অনাহারক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া সে দেশজননীর প্রতি আজকার এই গানটি লিখিয়াছিল।

ফিরিবার পথে সেই ছোট মেয়েটি ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "রাজীব-বাবু, আপনার ভারী অন্যায়! আমি ঠাট্টা কর্‌লুম ব'লেই অমনি চারটে টাকা আপনি জলে দিলেন। আপনার মা হয়ত কত অসুবিধায় পড়বেন।"

রাজীব মুখখানা নীচু করিয়া পকেট হইতে সেই ফুলটা বাহির করিয়া একবার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল।

* * *

সে শীতে পূর্ণিমার গরম কাপড় হয় নাই।

'গ্রাম্য গীতি-কবিতায় বারাষে'

শ্রী হিরণ্ময় মুন্‌সী

বাংলার গ্রাম্য গীতি-কবিতা কাব্যকুসুমোদ্যানের শ্বেত শতদল, ভাব-জগতের বহুমূল্য সম্পদ। বাঙ্গালী ও বাংলার বিশেষত্ব যাহা কিছু তাহার অনেকখানিই এই গ্রাম্য গীতি-কবিতা বা ছড়া পাঁচালীতেই নিহিত। যদিও বর্ত্তমান বঙ্গভাষা বা কাব্যসাহিত্য দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে, তথাপি পুরাতনকে ছাড়িয়া দিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই বলিতে হইবে।

ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে, বিশ্ববাণীর পাদপীঠতলে, ইহার আসন বড় করিতে হইলে, বাংলার শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করিয়া বাংলার কবি ও সাহিত্যিকদের একটা বিরাট কর্ত্তব্য সম্মুখে রহিয়াছে। বাংলার গ্রাম্য গীতি-কবিতা, গাথা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন ও দীনা, কাঙ্গালিনী বঙ্গবাণীকে নব নব ভাবশ্রীতে জগৎপূজ্যা রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে সাজাইয়া তুলুন।

মৈমনসিংহের পল্লীগাথা সংগ্রহ করিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সেই কর্ত্তব্যের কতকটা সম্পাদন করিয়াছেন। সম্প্রতি আমিও এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।

পল্লীপ্রধান বাংলার ছায়াশীতল পল্লীতে নিরক্ষর কৃষাণ সম্প্রদায়ের মুখে মুখে এইসব পল্লীগাথা গীতিকবিতা প্রভৃতি শোনা যায়। অসংখ্য প্রকারের গ্রাম্য গীতি-কবিতা আছে, তন্মধ্যে একটির কথা প্রবাসীর পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই গ্রাম্য গীতি-কবিতাকে 'বারাষে' কহে। যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার সর্ব্বত্রই এই গীতিকবিতা বিশেষ ভাবে প্রচলিত।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের বৈকালে যখন খররৌদ্রের তাপ অস্তগামী সূর্য্যের সহিত ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসে, তখন মাঠে মাঠে 'সবুজের' ছড়াছড়ির মাঝখান হইতে এই গানের সুরের রেশ 'গাজুড়ান' বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া কেমন যেন পাগল করিয়া তোলে।

মাঠে নিড়ানী বা টাঙ্গি দিতে দিতে সারিবন্দীভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া বসিয়া মাথাল মাথায় সমবেত চাষী 'পরিয়াত' গণ মিলিতকণ্ঠে এই গান গাহিতে থাকে। তবে বাঁশের আড়বাঁশীতেই এই গান শোনায় ভাল।

বারাষে প্রায় ৩০।৪০ রকমের আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি কাব্যাংশে অতি উচ্চস্তরের। এই গানেরও বিভিন্ন পদ বা পালা আছে। পদবিশেষের সুরবিন্যাসও বিভিন্ন। সাধারণতঃ—ইহা ভাটিয়াল সুরেই গাওয়া হয়। নিম্নে একটি 'বারাষে' দিলাম। বারাষেটি পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া বর্ণিত।

বসন্ত বৈশাখে রাধা ভাবিত সদায়
কৃষ্ণের বিরহ প্রাণে সহন না যায়।
বলিয়া গেলেরে কৃষ্ণ 'আসিব ত্বরিত'
বিলম্ব দেখিয়া নিরীক্ষণ করি পথ।
জ্যৈষ্ঠের যন্ত্রণা যত সহন না যায়,
খিয়ের * অনল ওঠে জ্বলিয়া সদায়।
আষাঢ়ে নবীন মেঘ ডাকে গরজিয়ে,
এত দুঃখ দিলি বিধি মোর মাথা খেয়ে।
শ্রাবণে অশেষ দুঃখ হেন নাহি মোর মনে,
এ ছার জীবন আমি রাখি কি কারণে।
ভাদ্দরে ভরিল জলে যমুনার কূল,
তাহাতে উঠিল ফুটি কমলের ফুল।
ভ্রমর ভ্রমরী যেমন মধু করে পান,
এইমত ছাড়িয়া গেছেন শ্রীকৃষ্ণ আমার।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘর,
আনন্দের অবধি নাই গোকুল নগর।
কার্ত্তিকে করিলেন প্রভু বৃন্দাবনে রাস,
কৌতুকে বসেছেন কৃষ্ণ গোপী চারিপাশ।
অগ্রহায়ণে অশেষ দুঃখ হেন নাই মোর মনে,
অনুক্ষণ পড়ে মনে নন্দসুত ধনে।
পৌষমাসের পীড়া ওঠে বিপরীত,
প্রভুর বিরহশীতে তনু হয় কম্পিত।
মাঘমাসে মোর মরণ হ'ত সেও ছিল মোর ভাল,
শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া যবে মথুরাতে গেল।
ফাল্গুনে ফুটিল যত নানাবিধ ফুল,
ভ্রমর ভ্রমরী ডাকে একে সমতুল।
চৈত্রেতে চিন্তিত রাধা চিত্ত নাহি রে স্থির,
অসুর রামধন…পিরীত।*
অক্রূর হরিয়া নিল রথে নারায়ণ,
ফিরিয়া না দিলে কৃষ্ণ আমায় দরশন।
শ্রীকৃষ্ণ পেয়েছিলাম অতিবড় সাধে,
ছাড়িয়া গেলরে কৃষ্ণ কোন্ অপরাধে।

এই বারাষেকে "রাধার বারাষে" বলে। ইহা শ্রীমতী রাধার বিচ্ছেদপদের একাংশ। বিচ্ছেদপদ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে। সুমিষ্ট সুর সংযোগে সমবেত কণ্ঠে সবুজ মাঠের মাঝে কৃষকগণ যখন এই বারাষে ধরে, তখন প্রকৃতই যেন রাধার বিরহ-বেদনা ঘনীভূত মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া বিরহিনী রাধার প্রতি সমবেদনায়, ব্যথায় শ্রোতার প্রাণ বিবশ করিয়া তুলে।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি, 'মেঘদূতের' কবির কাব্য নিরক্ষর চাষারা বোঝে না। সুতরাং তাহার প্রকৃত রস বা সৌন্দর্য্য কতিপয় শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ গ্রাম্য গীতি-কবিতা প্রভৃতির প্রকৃত রস কোন সমাজ বিশেষের মাঝে আবদ্ধ নয়। পাড়ার ঢুলে বাগ্দী হইতে তর্করত্ন, বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয় সকলেই এ রস পানে সমান অধিকারী। ইহাই প্রকৃত গণসাহিত্য।

'রাধার বারাষেতে' আমরা পাই, রাধার বিরহ-বিধুর হৃদয়ের আবেগময় ভাবোচ্ছ্বাস। নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী রাধা একেবারে উন্মাদিনী হইয়াছেন। মাসের পর মাস কাটিতেছে, রাধিকার হৃদয় শ্যামবঁধুর বিরহানলে তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইতেছে।

এই গ্রাম্য গীতি-কবিতায় সেই ভাবটি কেমন ফুটিয়াছে! এখন এইসব গীতি-কবিতার মূল্য কতটুকু বাংলার কবিসমাজ তাহার বিচার করুন।

পূর্ব্বে যে ৩০।৪০টি বারাষের কথা বলিলাম একে একে সবগুলি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে, দুঃখের বিষয় আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও এইসব গাথার রচয়িতার নাম জানিতে পারি নাই। তবে মনে হয়, এইসব নাম অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়েরই রচিত।

* খিয়ের—মানে বুঝিলাম না, বোধ হয় হিয়ার হইবে।

* সম্পূর্ণ পদটির মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারি নাই।

মেঘ

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস

মেঘ সম্বন্ধে মানুষের মনে রহস্যের অন্ত নেই; সৃষ্টির আদিম প্রাতে সদ্যজাত মানবশিশু চকিতে একদিন বর্ষার ঘনঘটা দেখে কি ভেবেছিল জানি না, কিন্তু মানুষ যেদিন আপনাকে প্রকাশ করবার ভাষা পেল সে দিন হ'তে আজ পর্য্যন্ত এই মেঘ নিয়ে অনেক কবিতা ও কাব্য সে ক'রে



সিরস মেঘ

"ওই চেয়ে দেখ, যেমন করিছে খেলা
বায়ুতে বৃষ্টিতে, শ্যামবর্ষা হানিতেছে
নিমেষে সহস্র শর বায়ুপৃষ্ঠ 'পরে—
তবু সে দুরন্ত মৃগ মাতিয়া বেড়ায়
অক্ষত অজেয়——"

—রবীন্দ্রনাথ

এসেছে। আমাদের দেশের ঋগ্‌বেদেই নাকি সর্ব্বপ্রথম মানুষের মনের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই ঋগ্‌বেদে মেঘের বন্দনা আছে। এই বন্দনা থেকে মেঘসম্বন্ধে আদিমানবের মনোভাব আমরা কতকটা কল্পনা ক'রে নিতে পারি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিজ্ঞান ও সভ্যতার এত উন্নতি সত্ত্বেও মেঘসম্বন্ধে আমাদের মনোভাব প্রায় ঠিক সেই রকমই আছে। সেখানে মেঘকে পর্জ্জন্য নাম দেওয়া হয়েছে। "পর্জ্জন্য অর্থে বৃষ্টির মেঘ ও তাহার দেবতা। তাঁহার আকৃতি গাভীর পালান বা কোষা বা জলের দৃতি অর্থাৎ মোশকের ন্যায় (৫।৮৩।৮-৯; ৭।১০১। ৪)। তিনি বৃষরূপী (৫।৮৩।১)। তিনি ওষধি ও পৃথিবীকে বীর্য্যবতী করেন। তিনি রথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জলভরা মোশকের মুখ খুলিয়া নিম্নে জলবর্ষণ করেন; বিদ্যুৎ ও বজ্র তাঁহার সঙ্গে বিচরণ করে। তিনি উদ্ভিদ্-পোষক ও পশু-পোষক।……পর্জ্জন্যদ্বারা উদ্বোধিত হইয়া ভেকগণ রব করে (৭।১০৩।১১)।"

[বেদবাণী—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়]

ঋগ্‌বেদের ৫ মণ্ডল ৮৩ সূক্তে পর্জ্জন্যের যে বর্ণনা আছে নিম্নে তাহার অংশবিশেষের অনুবাদ দেওয়া হ'ল—

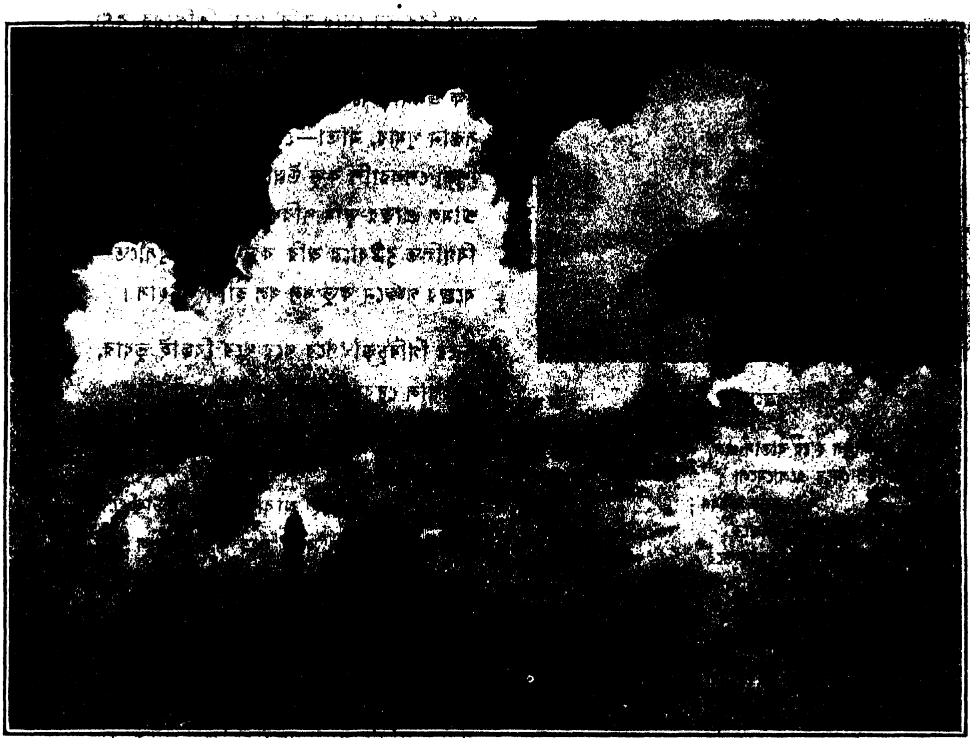
…বৃষের মত সেই আরাবে হুঙ্কারি' ছুটিয়া ধেয়ে যায়
বরষি' জল—
সে জল শক্তির আধার ও মূর্ত্তি, গর্ভ লভে তায় ওষধি-
দল।

*　　*　　*　　*

রথী সে কশাঘাতে যেমন প্রশাসিয়া অশ্বে দ্রুত পথে
চালায়ে ধায়,
এই এ নভোদেব তেমনি লয়ে যান সলিলদায়ী দূতে
প্রবল বায়;
আকাশ আবরিয়া যখন তিনি ঘন করেন বর্ষার অন্ধকার
তখন চৌদিকে ফুকারি' উঠে যেন সিংহগর্জ্জন বারম্বার।

*　　*　　*

শব্দ কর মেঘ, তোল হে হুঙ্কার, ধরার গর্ভে জাগুক প্রাণ,
চড়িয়া জলরথে এস হে ঘুরি' ঘুরি' বেড়াও চৌদিকে
শক্তিমান,
সলিল-ভরা যেই মোশক রহে তব বাঁধন খুলি' কর নিম্নমুখ,
অঝোর জলধারে সমান করি' দাও উচ্চ নীচ সব, হে জল-
মুক!



কুমুলাস বা পশমগাঁঠ মেঘ

"ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চ'লে আসে
বাধা-বন্ধ-হারা,
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি' দীর্ঘ ধারা।
*
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি,
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী।"
—রবীন্দ্রনাথ

হে মেঘ সুমহান্! জলের কোশ তব উপুড় করি' দাও
ধরণী' পর,
নদী ও খাল বিল সলিলে ভরি' ভরি' উছলি' ছুটে যাক
উত্তরোত্তর—
কর হে সিঞ্চন তোমার শীত স্নেহ, ঘৃতের সাথে তাহা
মিশিয়া যাক্,
যে গাভী বৎসহীন তাদের তরে আজ সুপেয় জলাশয়
ভরিয়া যাক্।
[বেদবাণী—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ]

ঋক্‌বেদের ১০ মণ্ডল ১২৩ সূক্তে বেন নামক এক দেবতাকেও জল-দেবতা বলা হ'য়েছে।

বেদের-ঋষি হ'তে আরম্ভ ক'রে আধুনিকতম কবি পর্য্যন্ত সকলেই মেঘের গান গেয়েছেন। কালিদাসের মেঘদূত জগৎ-প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর ঋতুসংহার কাব্যেও মেঘের চমৎকার বর্ণনা আছে।

বাঙলার আদি কবি জয়দেবও মেঘের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ষা-অভিসার-গানে



বজ্রমেঘ

"পাগল হ'য়ে বাতাস এল,
ছিন্ন মেঘে এলোমেলো
হচ্ছে বরিষণ ;
জানি না দিগ্-দিগন্তরে
আকাশ ছেয়ে কিসের তরে
চল্‌ছে আয়োজন ;
পথিক গেছে ঘরে ফিরে,
পাখীরা সব গেছে নীড়ে,
তরণী সব বাঁধা ঘাটের কোলে,
আজি পথের দুই কিনারে
জাগিছে গ্রাম রুদ্ধ দ্বারে,
দিবস আজি নয়ন নাহি খোলে।"
—রবীন্দ্রনাথ

মেঘের যে মূর্ত্তি কবিরা কল্পনা করেছেন তা অপূর্ব্ব। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ মেঘ সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-বিষয়ক কবিতা পৃথিবীতে অতুলনীয়।

ইংরেজ কবি শেলীর মেঘ সম্বন্ধে একটি কবিতা আছে। এই কবিতার কাব্য ও বিজ্ঞান উভয়ই চমৎকার। আমরা নীচে সেই কবিতাটির প্রায় যথাযথ অনুবাদ দিলাম।—

মেঘ

তৃষা-দগ্ধ পুষ্প লাগি' আমি আনি নব জলধারা—
বারিধি তটিনী হ'তে, বক্ষে বহি' সলিল-সম্ভার ;
নিদাঘের রৌদ্রে যবে বৃক্ষপত্র স্বপ্নে মাতোয়ারা,
আমি তাহাদের লাগি' স্নিগ্ধ ছায়া করি যে বিস্তার।
পক্ষ-বিধূননে মোর ঝরি' পড়ে শিশিরের কণা,
স্পর্শে তার বিকশিয়া উঠে যত কোরক কোমল—
বৃক্ষ জননীর বক্ষে দোল খেয়ে যবে শান্তমনা
সন্তান ঘুমায়, মাতা—রৌদ্রালোকে নর্ত্তন-চঞ্চল !
শিলা-শেলরাশি কভু উল্লসিয়া ঢালি ধরণীতে,
শ্যামল প্রান্তর-ভূমি পরিধান করে শ্বেতবাস
বিগলিত বৃষ্টিধারে ঝরি কভু আপন খুসীতে—
বজ্রের গর্জ্জনে কভু খল খল হাসি অট্টহাস।

নিম্নে গিরিচূড়া 'পরে থরে থরে বিছাই তুষার,
সুবিশাল দেবদারু গুমরিয়া উঠে বেদনায় ;
শুভ্র গিরি-উপাধানে ন্যস্ত করি' ক্লান্ত শিরভার
ঘুমাই সুদীর্ঘ রাত্রি আলিঙ্গিয়া রুদ্র ঝটিকায়।
অভ্রভেদী মোর সেই আবাস-মন্দির-চূড়া 'পরে,
বিদ্যুৎ সারথি মম, বসি' রহে স্তব্ধ অচপল ;
নিম্নে গুহাগর্ভে কোন শৃঙ্খলিত অশনি গুমরে—
মুক্তি লাগি' রহিরহি পণ্ডশ্রমে গর্জ্জন-বিহ্বল !
মৃত্তিকা, সলিল ঊর্দ্ধে মৃদুমন্দ সমীর দোলায়—
মোর কর্ণধার মোরে নিয়ে যায় গগনে গগনে—
সুনীল বারিধি-গর্ভে অশরীরী প্রিয়া ডাকে তায়—
প্রেমের আহ্বান, আহা, উপেক্ষিবে প্রেমিক কেমনে !
কত নদী নির্ঝরিণী, পাহাড় পর্ব্বত-চূড়া কত,
মনোহর সরোবর, তৃণ শ্যাম শস্তেক প্রান্তর—
গিরি-শিরে, নদী-বুকে স্বপ্ন শুধু দেখে অবিরত,
প্রেয়সী সর্ব্বত্র তার—তবু নিত্য রহে অগোচর।
আমি যবে নীলাম্বরে নীল হাসি কুড়াই সতত—
বিগলিত হ'য়ে সে যে ধরণীতে ঝরে ঝর ঝর।

রক্তরাঙা সূর্য্যোদয়—উল্কা-চক্ষু মেলিয়া গগনে
ঝাঁপ দেয় প্রজ্বলন্ত পক্ষের পালক বিস্তারিয়া
মোর পৃষ্ঠদেশে যবে ভাসি আমি মন্থর পবনে,
মৃতকল্প শুকতারা পাণ্ডুহাসি উঠে যে হাসিয়া।
ভগ্ন গিরি চূড়ে, যথা মুহূর্ত্তের তরে রয় ব'সে
সুদৃশ্য ঈগল পাখী স্বর্ণ ডানা করিয়া বিস্তার—
গিরি-চূড়া কম্পমান, ভূমিকম্প সঘনে নির্ঘোষে
ভগ্ন মেঘ-চূড়ে তথা নবারুণ শোভে চমৎকার।

আলোকিত বারিধির বক্ষ হ'তে গোধূলি-বেলায়
অস্তগামী সূর্য্য ফেলে তৃষাতুর আতপ্ত নিঃশ্বাস ;
সুদূর অম্বর হ'তে ধীরে যবে নামে এ ধরায়—
শব-আচ্ছাদন সম সায়াহ্নের আরক্তিম বাস।
গুটাইয়া ডানা মোর অভ্রভেদী গিরির চূড়ায়
কপোত-মাতার মত ঝিমাইয়া ক্লান্তি করি নাশ।

সুন্দরী রজতময়ী ভাস্কর-প্রতিমা অলকার—
মর্ত্ত্যের মানুষে যারে নাম দিল জ্যোৎস্নাময়ী শশী,
আমার অঙ্গন-তলে নৃত্য করে অতি লঘুভার—
নিশি-বায়ু বিস্তারিত শুভ্র মেঘ উঠে যে উল্লসি'—
ছেঁড়ে আস্তরণ যবে নিঃশব্দ সে চরণ প্রহারে—
নৃত্য-শব্দ শুনিবারে পায় বুঝি স্বর্গের অপ্সরী ;
আবরণ খুলে যায় ছিন্ন পথে ভয়ে উঁকি মারে
চাঁদের পশ্চাতে রহি' কুতূহলী তারকাসুন্দরী ;
আমি ছুটে যাই বেগে পিছে তারা করে গুঞ্জরণ—
ছুটে যায় পুঞ্জে পুঞ্জে যেন স্বর্ণ-ভ্রমরের দল ;
বিস্তারিয়া চলি আমি ছিন্ন-মেঘ নভ-জালায়ন—
ক্রমে মনে হয় যেন বারিধি, সায়র, নদীজল,
ছিদ্র-পথে খসে-পড়া খণ্ড খণ্ড সুনীল গগন—
চন্দ্র তারা প্রতিবিম্ব তারি মাঝে শোভিছে চঞ্চল।

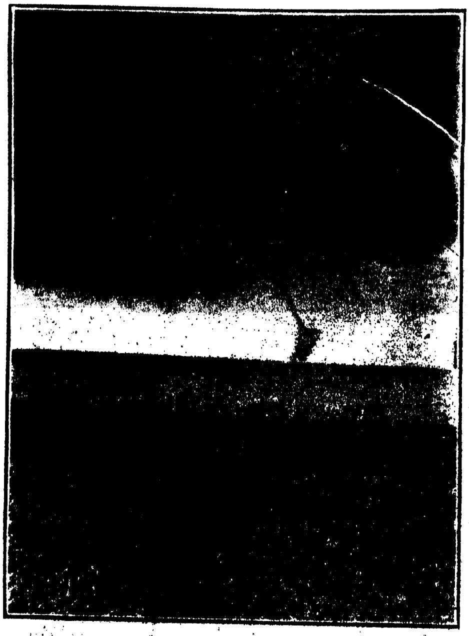
রবি-সিংহাসনে আমি ঘিরি কভু আগুন-শোভায়—
শশীরে ঘিরিয়া রাখি ঝলমল দীপ্ত মুক্তাহারে ;
মোর গাত্রবাস যবে খুলে যায় প্রবল বাত্যায়—
অগ্নি-গিরি-স্রাব ম্লান, তারা কাঁপে প্রচণ্ড প্রহারে।
আমি রচি উচ্চসেতু বারিধির একূলে ওকূলে,
উত্তাল তরঙ্গ নিম্নে করে যবে উন্মত্ত নর্ত্তন—
নিরস্ত্র সে চন্দ্রাতপ রবিকর নাহি পশে ভুলে,
স্তম্ভরূপী শৈলমালা উচ্চে করে আমারে ধারণ।
লক্ষরঙে রঞ্জিত সে বিজয়-তোরণ-দ্বার দিয়া
আমি ছুটে যাই বেগে সঙ্গী মোর হিম অগ্নি ঝড় ;
পবনের শক্তি যবে মিলে মোর সঙ্গেতে আসিয়া
সূর্য্য অগ্নিচক্র উর্দ্ধে বিচ্ছুরিত করে স্নিগ্ধ কর—
রঙে রঙে সে তোরণ দীপ্ত হাসি উঠে যে হাসিয়া
বৃষ্টিস্নাত ধরা নীচে-হাস্য করে অপূর্ব্ব সুন্দর।



করোনা বা মুকুট মেঘ

রবি-সিংহাসনে আমি ঘিরি কভু
　　আগুন শোভায়,—
শশীরে ঘিরিয়া রাখি ঝলমল
　　দীপ্তমুক্তাহারে।

মাটি ও জলের কন্যা মেঘ আমি হাস্যলাস্যময়—
উর্দ্ধ নীল আকাশের আমি প্রিয় পালিত-কুমারী,
বৃষ্টিরূপে মৃত্তিকা ও বারিধির রন্ধ্রে পাই লয়,
নাহিক বিনাশ মম আমি শুধু বহুরূপধারী।
বৃষ্টি অবসানে যবে নিষ্কলঙ্ক সুনীল গগন—
দিগন্ত প্রাঙ্গণতল দিকে দিকে বাধাবন্ধহারা ;
উর্দ্ধে শূন্য নীলাম্বর চন্দ্রাতপ করে বিরচন,
শান্ত সমীরণ আর দীপ্তকায় রবিরশ্মিধারা।
আমি হাসি সকৌতুকে আপন সমাধি-স্তম্ভ 'পরে,—
সদ্যজাত শিশু কিম্বা কবরের প্রেতমূর্ত্তিসম
সলিল-গহ্বর হ'তে পুনঃ উঠি সুনীল অম্বরে—
ভাঙি নীল চন্দ্রাতপ আরবার, উল্লাসে নির্ম্মম।



জলস্তম্ভ মেঘ

"নিবিড় ঘনঘটা আকাশ ঘিরে—
গগনে গজরাজ গরজি' ফিরে।
তার তৃষায় ফাটে বুক—
শুষ্ক জলমুক্—
সহসা পড়ে দিঠি নদীর নীরে—
ভাবিছে ধরণীতে নামিবে কিরে।
তীরেতে থমথম কাশের বন।
আকাশে মেঘে মেঘে চলিছে রণ—
সহসা গজরাজ
ভুলিয়া সব লাজ
ডুবাল শুঁড়খানি নদীর নীরে
নিবিড় ঘনঘটা গগন ঘিরে—।"

মেঘদূতের যক্ষ মেঘের জন্ম ও বংশাবলী দিয়েছিলেন—"জাতংবংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাম্" ইত্যাদি। তবে বেচারা যক্ষের অবস্থা শোচনীয় ছিল তাই কবি তাঁর প্রতি কটাক্ষপাত ক'রে বলেছেন, "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ—এবং যক্ষের এ রকম করার কারণ দেখিয়েছেন যে, কামার্ত্তা হি প্রকৃতি-কৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

কিন্তু এ গেল কাব্যের দিক। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে মেঘের আলোচনা এবার করা যাক। ত্রিভুবনবিদিত পুষ্কর বংশে জন্ম কিনা, কিম্বা মেঘদূতের কার্য্য করতে পারে কিনা বিজ্ঞান তার বিচার করে না। বিজ্ঞান মেঘের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও একেবারে অন্ধ। সে দেখে, প্রকৃতির কোন্ বিপর্য্যয় হেতু নীলাকাশে হঠাৎ এই বিজাতীয় পদার্থটির আবির্ভাব হয়, কি কি কারণে এর উদ্ভব, কত কাল এবং কত উর্দ্ধে এর স্থিতি, কিসে এর পরিণতি; আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে এর শ্রেণী বিভাগ ও নামকরণ; মেঘের অট্টহাসি নামে কাব্যে যে জিনিষটার বর্ণনা আছে সেই বিদ্যুতেরই বা স্বরূপ কি ইত্যাদি।

এখনকার দিনে বিদেশে মেঘের জন্ম সম্বন্ধে মতভেদ বিশেষ নাই। কিন্তু মেঘের নামকরণ অনেক রকম হ'য়ে গেছে। এ সব নামকরণ প্রধানতঃ তার আকৃতি আর তারপর তার প্রকৃতি অনুযায়ী।

জে বি লামার্ক নামক একজন বৈজ্ঞানিক ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম মেঘের শ্রেণীবিভাগ ও ফরাসী ভাষায় নামকরণ করেন, কিন্তু তাঁর দেওয়া নাম প্রচলিত হয়নি। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লুক হাওয়ার্ড মেঘের শ্রেণী বিভাগ ক'রে ল্যাটিন নাম দেন। বর্ত্তমানে বিভিন্ন জাতীয় মেঘ প্রধানতঃ তাঁর দেওয়া নামেই চ'লে আসছে। তার পরে নানা বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যে নামগুলি বর্ত্তমানে চ'লে গেছে তা এই—

ক্যুমুলস্ (Cumulus) বা "পশমগাঁঠ" (wool pack)। জোর এক পশলা বৃষ্টি হবার খানিক পরে আকাশে এ রকম মেঘ দেখা যায়। সাধারণতঃ এটার উপরের ভাগ ক্রমেই ছড়াতে আরম্ভ করে, তখন এর কোলে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। উপরের অংশ বেশ মোটা হ'য়ে ছড়িয়ে কামারশালের নেহাই (anvil) এর মত হ'লে বাজ পড়া ও জোরে বৃষ্টি পড়া খুবই সম্ভব হয়। এ রকম মেঘের নাম—ক্যুমুলো-নিম্বস্ (Cumulo-nimbus) বা বাজপড়া মেঘ। অল্টো-ক্যুমুলস (Alto-cumulus) ক্যুমুলসের মতই কিন্তু অনেক উপরে থাকে।

সিরস্ (Cirrus) অত্যুচ্চ মেঘ। তুষার-জালে

পরিপূর্ণ এই মেঘ ২৫০০০ থেকে ৩৬০০০ ফুট উপরে থাকে।

ম্যামাটো-ক্যুমুলস্ (Mimato cumulus)—ক্যুমুলস্ মেঘ ভেদ ক'রে বায়ুস্রোত নীচে নাম্‌তে থাকলে মেঘের এই প্রকার আকৃতি হয়।



কোদালে-কুড়ুলে মেঘ—ম্যামাটো ক্যুমুলাস

"অম্লান উজ্জ্বল দিন বৃষ্টি অবসান।
আমি ভাবিতেছি আজি কি করিব দান।
মেঘখণ্ড ধরে ধরে
উদাস বাতাস ভরে
নানা ঠাঁই ঘুরে মরে
হতাশ সমান।
সাধ যায় আপনারে করি শতখান্।"

রবীন্দ্রনাথ

জলস্তম্ভ (water spout) এক প্রকার মেঘ। ঘূর্ণী-বায়ুর মধ্যে বাতাসের চাপের প্রভেদ হওয়ায় এই মেঘ জন্মায়। করোনা (Corona—মুকুট) সূর্য্য বা চন্দ্রের পাশে আলোর চক্রের নাম। পাতলা মেঘের জালে সূর্য্যের বা চন্দ্রের আলো পড়ায় এ রকম হয়। মেঘে জলের বিন্দু যত ছোট থাকে তত বড় চক্র হয়।

এ রকম নামকরণের প্রধান উদ্দেশ্য, কোন মেঘে কি হয় তাই ঠিক করার চেষ্টায়। যেমন কোন মেঘে বাজ পড়ে বেশী, কোনোটায় বৃষ্টি হয় বেশী, আবার কোনটা শিলা-বৃষ্টির প্রধান কারণ। মেঘের এ রকম জাতিভেদ করার মূলে আব-হাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর চেষ্টা।

ক্রিমীয়ার যুদ্ধের সময় (১৮৫৪ খৃঃ) ফরাসী নৌবাহিনী রুশিয়ার সিবাস্তোপল বন্দরের সামনে নোঙর ফেলে অবরোধ করেছিল। হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠে ঐ বাহিনীকে একেবারে বিধ্বস্ত ক'রে ফেলে। ঐ ঘটনায় ফরাসী বৈজ্ঞানিক মহলে একটা সাড়া প'ড়ে যায়। ইঁহাদের মধ্যে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ লেভেরিয়ে (Leverrier) প্রথমে ঠিক করেন যে ঐ ঝড়ের উৎপত্তির ব্যাপার একেবারে গোড়া থেকে খোঁজ নেওয়া উচিত। তিনি জানতে পারেন যে, ঐ ঝড় মহাসমুদ্রের ধার থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত মধ্য-ইয়োরোপের উপর দিয়ে তুমুল কাণ্ড ক'রে গিয়েছে। সুতরাং তিনি ঠিক করলেন যে, গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঐ ঝড়ের ইতিবৃত্ত খোঁজ করা দরকার, তা হ'লে কিসের জন্য অমন ভয়ানক ঝড় হ'ল আর কেনই বা সেটা থেমে গেল তা জানা যেতে পারে। এই অনুসন্ধানেই আবহাওয়ার তত্ত্ব-বিজ্ঞান (Metereology and Weather Forecast) জন্মগ্রহণ ক'রে ও মেঘের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের একটা সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়।



রৌপ্য-পাড় মেঘ

"যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যতফণা বিকাশে।"

রবীন্দ্রনাথ

তারপর ধীরে ধীরে অনেক তথ্য বেরিয়েছে, যদিও এখনও এ বিষয়ে খুব বেশী জ্ঞান আমাদের হয়নি এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য অঙ্গের মত এটার এখনো নিয়ম-কানুন ভাল ক'রে বোঝা যায়নি।



কুমুলাস মেঘ ও ষ্ট্রাটাস মেঘ

"স্নিগ্ধ সজল মেঘ-কজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে ;
শশিতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী
কোথা তোরা পুর-কামিনী—
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী;
শূন্য শয়নে কোথা জাগে পুর-কামিনী।"

রবীন্দ্রনাথ

মেঘের জন্ম বাতাস ও অদৃশ্য বাষ্পকণা থেকে। কি ক'রে তা হয় বল্‌ছি।

এক পাত্র ঠাণ্ডা জল নিয়ে তাতে আস্তে আস্তে সোরা মিশাতে থাকুন। ধীরে ধীরে সোরা জলে দ্রব হ'য়ে মিশে যাবে। কিছুক্ষণ পরে দেখবেন যে আর জলে সোরা গোলা যাবে না। এ রকম হওয়ার কারণ এই যে কোনও নির্দ্দিষ্ট তাপে কতটা জলে কতটা সোরা দ্রব হয় তার একটা অনুপাত আছে। সেই অনুপাত পার হ'লে সোরা জলে আর মিশবে না, জলের নীচে প'ড়ে থাক্‌বে।

এখন ঐ জলের পাত্রটি গরম করুন। দেখবেন জলে আরও সোরা দ্রব হচ্ছে। কারণ গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের সোরা দ্রবীভূত করার ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে। এখন ক্রমে ক্রমে জল গরম ক'রে সোরার পরিমাণ বাড়িয়ে যান। শেষে দেখবেন যে, জল ফুটছে কিন্তু আর সোরা গুল্‌ছে না। এখন ঐ ফুটন্ত জল ছেঁকে অন্য পাত্রে ঢালুন, প্রথমে দেখবেন, পাত্রে শুধু নির্ম্মল জল রয়েছে। পরে যতই জল ঠাণ্ডা হবে ততই সোরা দ্রব হ'য়ে পৃথক হ'য়ে নীচে পড়্‌বে। তাহার কারণ জলের তাপ কমে যাওয়াতে সোরা দ্রব ক'রে রাখবার ক্ষমতাও কমে যায় সুতরাং যতটা সে দ্রব ক'রে রাখতে পারে তার অধিক যা কিছু সোরা সেটা আলাদা হ'য়ে পড়ে।

বাতাসও ঠিক এই রকমে জল (বা জলীয় বাষ্প) শোষণ করে এবং বাতাসের তাপ যত বাড়ে ততই জল শোষণের ক্ষমতাও বাড়ে। এখন গরম অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে, বাতাস হঠাৎ কোনও কারণে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে সে পরিমাণ থাক্‌তে পারে না, সুতরাং সেখানে (বায়ু-মণ্ডলের সেই অংশে) যতটা বাষ্প বেশী আছে সে সব পৃথক হ'য়ে যায়। এই পৃথকীকৃত বাষ্পই কুয়াশা বা মেঘ।

কুয়াশা বা মেঘের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য নেই তবে সাধারণতঃ বিভিন্ন কারণে এদের উৎপত্তি। পৃথিবীর উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধির জন্যে কুয়াশা হয়। কিন্তু মেঘের জন্ম সাধারণতঃ বাতাসের চাপের হ্রাস বৃদ্ধির দরুণ শৈত্য-হেতু।

এই জলীয় বাষ্প বায়ুস্রোতে খুবই উপরে শীতল অংশে গেলে তুষার (snow) বা শিলা (hail) রূপ ধরে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টম্‌সনের বহি

শ্রী বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর পক্ষে বাংলা দেশের গঙ্গা শুধু তো জলের ধারা নয়, তাহার চেয়ে অনেক বেশি। জলের ধারা বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু সেই অনেক বেশিটি অনির্বচনীয়, তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। এইজন্য গঙ্গা বাঙালীর মনে প্রাণে যে বিচিত্র ও গভীর আনন্দ আনে, তাহার প্রতি আমাদের যুগযুগান্তরব্যাপী যে নিরতিশয় মমত্ববোধ আছে, ঠিকটি তাহার রস বোঝা এমন কোনো বিদেশীয়ের পক্ষে সম্ভবপর নয় বাঙালীকে অন্তরঙ্গভাবে যে জানে না। এইজন্য ডাণ্ডিবাসী বণিক টেম্‌স্ নদীর তীরকে উৎপীড়িত ও তাহার জলপ্রবাহকে কলুষিত করিতে যে পরিমাণে সঙ্কোচ বোধ করে, গঙ্গাতীরে তাহা করে না।

ভাষামাত্রের মধ্যেই একটা আভিধানিক অর্থের এবং ব্যাকরণগত নিয়মের ধারা আছে, বিদেশী শব্দতত্ত্ববিদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ; কিন্তু সেই ভাষার মধ্যে আর একটি ঐশ্বর্য্য আছে, যাহা তাহার বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি, যাহা পৃথিবীর চারদিকের বায়ুমণ্ডলের মত, যাহার ভিতর দিয়া আলো আসে, বর্ণ বিভাসিত হয়, যাহা প্রাণকে সমীরিত করে, অথচ যাহাকে পকেটে লওয়া যায় না, সিন্দুকে ভরা চলে না, যাহাকে রক্তের মধ্যে পাই, নিঃশ্বাসের মধ্যে অনুভব করি, যাহা আমাদের প্রাণের সামগ্রী।

ইংরেজি শিখিবার জন্য বাঙালীর যে প্রাণপণ গরজ, তাহার মধ্যে তাহার জঠরজ্বালার তাগিদ আছে ; কলেজের পরীক্ষা ও জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে এই ভাষাই তাহার প্রধান অবলম্বন। একথা এক রকম জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, যে-কোনো ইংরেজ যে-পরিমাণে বাংলা জানে, তাহার চেয়ে যে-কোনো শিক্ষিত বাঙালী অনেক বেশী পরিমাণেই ইংরেজি জানে। তবু ইংরেজি ভাষার যে স্বরূপটি চর্ম্মগত নয়, যাহা তাহার মর্ম্মগত, যাহা তাহার বস্তু নয়, যাহা তাহার প্রাণ, অর্থাৎ শব্দসাধনায় যাহা আর্থিক নহে যাহা পারমার্থিক, যাহা ইংরেজের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, খেলাধূলা, স্মৃতিসংস্কার, পুরাণ ইতিহাস, আলাপ আলোচনার বিচিত্র প্রাণময় তন্তুদ্বারা গ্রথিত, অতি অল্প বাঙালীই তাহাকে ঠিক মতো আপন করিয়া লইতে পারিয়াছে। এই ইংরেজিই রস-সাহিত্যের ইংরেজি। এই ইংরেজি ঘনিষ্ঠ ভাবে না জানিলেও তবু মোটামুটি ইংরেজি সাহিত্য ভোগ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে গভীর ভাবে, নিঃসংশয় ভাবে তাহার সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া ভোগ ও বিচার করা যায় না। তাহা লইয়া কাজ চলে, খবরের কাগজ চলে, এমন কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার উপাধি লওয়াও চলে, যদি তাহার পরীক্ষক সাহিত্যরসজ্ঞ ইংরেজ না হয়, কিন্তু তাহা লইয়া ইংরেজি সাহিত্যগত আত্মীয়তা চলে না। অর্থাৎ যদি সেইটুকু বিদ্যা লইয়া কোনো একজন ইংরেজ কবির নাড়ীনক্ষত্র, প্রাণের কথা অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে যাই, তবে তাহা একই কালে হাস্যজনক ও শোকাবহ হইয়া উঠে। বাঙালী তাহার বাবু-ইংরেজী লইয়া ইংরেজ মহলে অনেক হাসি হাসাইয়াছে, কিন্তু এত বড়ো প্রকাণ্ড স্পর্দ্ধা ও হাস্যকরতার সৃষ্টি সে আজও করে নাই, তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি সাহিত্য যে কি তাহা সে যথেষ্ট জানে, শ্রদ্ধার সহিত সে উপলব্ধি করিতে পারে, যে, ইহাকে লইয়া মুরুব্বিআনা করিতে গেলে সেটাতে নিজেকেই অপদস্থ করার সাংঘাতিক বিপদ আছে।

কিন্তু বাংলা কাব্য সম্বন্ধে ইংরেজের মনে সেরকম শ্রদ্ধাপূর্ণ দ্বিধা বোধ হয় স্বাভাবিক নয়। তাহারই প্রমাণ দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টম্‌সনের বইখানাতে। এই দীর্ঘায়তন গ্রন্থের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সুদীর্ঘ তিনি টানাছেঁড়া করিতে করিতে চলিয়াছেন, মনে একটুও ভয়

ভর সঙ্কোচ অথবা আপন অপরিহার্য্য অক্ষমতা সম্বন্ধে নম্রতার লেশমাত্র লক্ষণ কোথাও নাই। এই দুঃসাহসিকতার পুরস্কারও তিনি পাইয়াছেন, ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খেতাব পাইয়াছেন; যাঁহারা পরীক্ষক তাঁহারা বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে টম্‌সনের অপেক্ষাও আনাড়ি। তাঁহাদের অন্ধ সাহসের একটি মাত্র কারণ এই, যে, পরীক্ষার বিষয়টি বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী কবি—পরীক্ষার্থী ইংরেজ এবং বাংলার কোনো বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন ইস্কুলমাষ্টার। বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানই বা কি রকম, বোধই বা কি রকম, তাহা জানা তাঁহাদের পক্ষে বাহুল্য এবং সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা মনে করিতে পারেন না। যদি কোনো ফরাসী কবিকে লইয়া টম্‌সন্ এতখানি প্রগল্‌ভতা করিতেন, তবে পরীক্ষকেরা নিশ্চয়ই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। কোনো জর্ম্মন কবির কথা বলিলাম না। কারণ জর্ম্মন কাব্যের প্রতি যথেচ্ছাচার করিলে বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডে সেটা সাহিত্যিক দণ্ডবিধির কোঠায় আসে কিনা সন্দেহ আছে, অন্তত জুরিদের ন্যায়বোধকে জাগরুক না করিতেও পারে। বাংলা কাব্যবিচারে একজন ইংরেজের যোগ্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষকগণ গোড়াতেই যেমন নিঃসংশয়, ফরাসীসাহিত্য-বিচারে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে গোড়াতেই তাঁহাদের তেমনি সংশয় হইত। কারণ বিদেশীর পক্ষে পরভাষার মর্ম্মস্থানে প্রবেশ দুঃসাধ্য, একথা জানিবার জন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক-সভার সদস্য হইবার প্রয়োজন হয় না।

উপাধিপরীক্ষায় মার্কালাভ করিবার পক্ষে একটা গুণ হয়তো এই গ্রন্থে আছে। সেটা তথ্যসংগ্রহ। এই সংগ্রহের যে অংশ পরীক্ষার্থীর সে অংশ ভুলে জীর্ণ, যে অংশ শ্রদ্ধার যোগ্য তাহা একেবারেই তাঁহার নিজের নয়। শুধু তথ্য নহে, কবির রচনা সম্বন্ধে অনেক অভিমতও তিনি তাঁহার বাঙালী বন্ধুদের নিকট হইতে খাপছাড়া ভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকল মতের সহিত তাঁহার মত সম্পূর্ণ মেলে নাই, মাঝে মাঝে এমন কথা বলিয়া তিনি আপন স্বাধীন বুদ্ধির মর্য্যাদারক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যার দৌড়ের চেয়ে কলমের দৌড় যেখানে বেশি হয়, সেখানে আত্মাভিমানের খাতিরে সমালোচককে এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। এক পক্ষ যেখানে জানে এবং অন্য পক্ষ জানে না, সেখানে উভয়ের মধ্যে অনৈক্য স্বাভাবিক, কিন্তু শেষ পক্ষ যদি বিচারকের পদ পান, তবে সেই অনৈক্যটাকে সহজেই তিনি নিজের গৌরবের বিষয় করিয়া লইতে পারেন।

বাঙালী পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভালো-মন্দ বিচার করা অনাবশ্যক। কেবল এইটুকু বলা দরকার, যে, এখনো পণ্ডিতী ভাষায় ইহার শ্রেণী নির্ণয় করিয়া ইহাকে জাদুঘরের নমুনা-ভাণ্ডারের মধ্যে বাক্সবন্দী করিবার সময় হয় নাই। যে সকল পাঠক যথার্থই বাঙলা বোঝে, তাহাদের কাছে এখনো ইহা ছায়ায় আলোয় বিচিত্র রংয়ে প্রকাশিত। সুতরাং কেবলমাত্র তথ্যতালিকা ও ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত অভিমতগুলা জোড়া দিয়া ইহার আলেখ্য রচনা করা অভিজ্ঞ বাঙালী লেখকের পক্ষেও দুঃসাধ্য। ছবির টুক্‌রাগুলিকে জোড়া দিয়া তাহাকে সমগ্র করিয়া তুলিবার যে ইংরেজি খেলা আছে, সে খেলা খেলিতে হইলে টুক্‌রাগুলাকে কোনোমতে জড় করিলেই চলে না—ছবির ঐক্যবোধটা মনে থাকা চাই। টম্‌সন্ টুক্‌রাই জুড়িয়াছেন, কোনো ছবিকে জুড়িয়া তোলেন নাই। কেননা গুরুতর অনভিজ্ঞতা বশত ছবিকে সম্পূর্ণভাবে চেনা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। জোড়া দিয়া কাঁথা তৈরি হইতে পারে। সে কাঁথায় ঢাকা দেয়, প্রকাশ করে না। কবির কাব্য ও জীবন লইয়া টম্‌সন্ যেমন জবড়জঙ্গ করিয়া জোড়াতাড়া দিয়াছেন, সে যেন একটা অন্ধ টর্ণেডো ঝড়ের লীলা, বটগাছ চড়িয়াছে ইমারতের মাথায়, ঘরের চাল পড়িয়াছে দীঘির জলের মধ্যে—আছে সকলি, কিন্তু সেই থাকার দ্বারা জ্ঞানের বা ভোগের বিষম অসুবিধা ঘটে। অজিতকুমারের মত কোনো কোনো বাঙালী রবীন্দ্রনাথের রচনাবৈচিত্র্যকে একটা সহজ ঐক্য দান করিবার জন্য জোড়াগাঁথার পথে না গিয়া কাব্যকে নিছক তত্ত্বে চোলাই করিয়া লইয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাস্যুটিক্যাল কোম্পানি তাঁহাদের নিমের আরকের বোতলের মধ্যে নিমগাছকে যেমন অত্যন্ত সহজ ঐক্য দান করিয়াছেন এও সেই রকম। কিন্তু যাই হোক,

ইঁহারা বাঙালী, বাংলা ভাষাটা জানেন, বাংলাসাহিত্যকে আত্মীয়ের মতো বোঝেন, আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে কবির কাব্যকে ইঁহারা কোনো-না-কোনো দিক হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন; সে উপলব্ধির মূল্য আছে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের নিঃসংশয়তা অন্যায় নহে। তা ছাড়া ইহার মধ্যে যদি ঐকদেশিকতা থাকে তবে অন্য পাঠকদের উপলব্ধিগত বিচারের দ্বারা তাহার পূরণ ও সংশোধন ঘটে। সকল দেশের সাহিত্যেই এইরূপ ক্রিয়া চলিতেছে।

কিন্তু যে মানুষ বাংলা অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে জানেন এবং বাঙালীর আন্তরিক জীবনযাত্রা যাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র যে অন্ধকার তাহা নহে, যাহা তাঁহার সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত সংস্কারের দ্বারা বিকৃতভাবে দৃশ্যমান—তিনি যদি নানা তথ্য ও মতের উঞ্ছবৃত্তির যোগে কোনো বাঙালী কবির একটা মূর্ত্তি ও বাংলাকাব্যের একটা চিত্র অসংশয় আত্মবিশ্বাসের সহিত রচনা করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে একটা বিস্তৃত ব্যাপার না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। কবির কাব্য ও তাঁহার জীবনের সমস্ত কাজের উপর তিনি ক্রমাগতই কেবল থাবল মারিয়াছেন। নারিকেলের রস ও শাঁস কোথায় আছে তাহার সমগ্র ধারণা যাহার নাই, সে উক্ত ফলটাকে যেমন অদ্ভুত অনভিজ্ঞতার সহিত কখনো কামড় দিয়া, কখনো মুঠা দিয়া থাবল মারিতে থাকে এও তেমনি। নিজের অক্ষমতার অত্যাচার সে নারিকেলের উপর প্রয়োগ করে। অন্যত্র এই অপরাধের দায়িত্ব তেমন অমার্জ্জনীয় না হইতেও পারিত;—কিন্তু যে সভায় অন্যান্য ভোগার্থী অতিথিদের নারিকেল সম্বন্ধে ধারণা আরো অসম্পূর্ণ, সেখানে এই ফলের রসতত্ত্ব বিচারে নিজেকে গুরু বলিয়া প্রচার করা ন্যায়সঙ্গত নয়। কিন্তু কোনো কবির প্রতি নম্রতার সহিত ন্যায়াচরণ করিবার ইচ্ছাও সেই ক্ষেত্রে অনেকের মনে অলস হইয়া উঠে যেখানে বিচারের অযোগ্যতা ধরা পড়িবার আশঙ্কা অল্প।

এই গ্রন্থ ছাপা হইবার পরে আমাদের কোনো ইংরেজ বন্ধু আমাদিগকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, এই বই কয়েক পাতা পাঠ করিয়া ইহা শেষ পর্য্যন্ত পড়া তাঁহার পক্ষে একেবারে দুঃসহ হইয়াছিল। তাহার কারণ, এই গ্রন্থে লেখকের যে স্পর্দ্ধিত আত্মাভিমান প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার যোগ্যতার সহিত তাহার কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই।

টম্‌সন্ তাঁহার ৩২৫ পৃষ্ঠা বোঝাই করিয়া যে সব ভুল সংবাদ ও ভুল তর্জ্জমা জমা করিয়াছেন, যদি প্রশস্ত স্থান ও দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়, তবে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইবে। তবুও, to err is human, এবং বিদেশী সাহিত্য ও কবি সম্বন্ধে তথ্যের ভুল করা গুরুতর অপরাধ নয়। কিন্তু যেখানে তাঁহার চিরাভ্যস্ত ইস্কুলমাষ্টারের চৌকিতে বসিয়া আন্দাজের উপর সম্পূর্ণ জোর দিয়া তিনি বাঙালী কবির প্রতি য়ুরোপীয় লেখকদের প্রভাব কল্পনা করিয়াছেন সেখানে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন। "রাজা ও রাণী"র মধ্যে তিনি ইব্‌সনের Dolls' House-এর আঁচ পাইয়াছেন। তিনি কি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইংলণ্ড ইব্‌সন্‌কে যে চিনিয়াছে সে বেশি দিনের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন "রাজা ও রাণী" লিখিয়াছিলেন তখন কয়জন ইংরেজ ইবসন্ পড়িয়াছিলেন! হয় তো ভুল বলিতেছি, হয়তো অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন—টম্‌সনের মতো আন্দাজে কথা বলিবার ঔদ্ধত্য আমাদের নাই,—কিন্তু এ কথা নিশ্চিত, ইব্‌সনের খ্যাতি তখনো বাংলাদেশে আসিয়া পৌঁছে নাই। এই জাতের আন্দাজী কথা তাঁহার গ্রন্থে আরো অনেক আছে; তাহার কারণ যেখানে সঙ্কোচ নাই, ভয় নাই, যেখানে পদবী পাইবার পন্থা অত্যন্ত সহজ, সেই জমিতেই আন্দাজের আগাছা প্রবল হইয়া জন্মে।

এ তো গেল আন্দাজের কথা। তার পর যেখানে তিনি কাব্যগত কোনো তত্ত্বকথা সম্বন্ধে দুই চক্ষু বুজিয়া গম্ভীর গলায় রায় দিয়াছেন সেখানে তাঁহার যে অহমিকা সেটা সাহিত্যিক নহে, সেটা সাম্প্রদায়িক। কবির কাব্যে জীবনদেবতার যে আইডিয়া নানাস্থানে নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই একথা স্বীকার করিলে ক্ষতি ছিল না। ভারতবর্ষে আমরা গ্রামদেবতা, কুলদেবতা, গৃহদেবতা, ইষ্টদেবতাকে মানি। সে মানা fetish মানা নয়। আমাদের ভক্তিতত্ত্বে সীমাশূন্যতাকে

অসীম বলে না। সকল সীমার মধ্যেই তিনি অসীম, এই জন্য ভক্তগণ সীমায় সীমায় তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হন। অসীম আকাশ আমার গৃহসীমার মধ্যে খণ্ড আকাশরূপেই আমার বিশেষ প্রিয়—অথচ পরমার্থত সেই আকাশ সীমাধর্ম্মী নহে—পরমাকাশ অসীম না হইলে প্রত্যেক গৃহেরই মধ্যে তাহা খণ্ডাকাশ হইতেই পারিত না। তেমনি পরমাত্মা অসীম বলিয়াই প্রত্যেক জীবাত্মায় তিনি বিশেষ,—সেই কারণেই বিশেষ আত্মায় পরমাত্মার সহিত বিশেষ মিলনেই,—সুতরাং সীমাবদ্ধ মিলনেই,—আমাদের আনন্দ। বস্তুত খৃষ্টান ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে এই তত্ত্বই প্রধান। খৃষ্টানরা ঐতিহাসিক দেশে কালে সীমাবদ্ধ খৃষ্টের মধ্যেই পরম পুরুষের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া পরিত্রাণ কামনা করেন। ঘনিষ্ঠ আশ্রয় প্রত্যাশায় অনন্ত আকাশকে আমরা গৃহমধ্যে খণ্ড আকাশ করিয়া ধরিয়াছি, কিন্তু নিজের সীমার দোষে সেই খণ্ডতাকে আমরা বিকৃত করিতে পারি। আকাশকে একান্ত অবরুদ্ধ করিয়া কারাগারের আকাশ করা অসম্ভব নহে, তাহাকে আলোকহীন আকাশ করিতে পারি, তাহাকে বিরূপের মধ্যে বদ্ধ করিয়া অসুন্দর আকাশ করিতে পারি। কবি তাই তাঁহার কাব্যে মাঝে মাঝে বলিয়াছেন, "হে আমার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমাকে কি আমার জীবনের বিকৃতির দ্বারা পীড়িত করিয়াছি? যদি করিয়া থাকি আমার এই জীবনের সীমাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া পুনরায় ইহাকে নূতন রূপ দাও।" অর্থাৎ আমার জীবনের সীমার মধ্যে যদি ছন্দের সুষমা থাকে, তবে যিনি অসীম তাঁহাকে সুন্দর করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া আমারই জীবনে প্রকাশ করিতে পারি। সেই প্রকাশেই আমার চরিতার্থতা। আর জীবনে যদি ছন্দের বিকার ঘটে তবে অসীমের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়।

এই জীবনদেবতাকে কবি কখনো পুরুষভাবে কখনো স্ত্রীভাবে দেখিয়াছেন। ইহাতেও টম্‌সনের বুদ্ধি কিছু হুঁচট খাইয়াছে। যেমন গাছের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে এমন কি অচেতন বিশ্ববস্তুর সঙ্গে পরস্পর নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধি করিতে ভারতীয় বুদ্ধিতে বাধে না, তেমনি ভগবানের স্বরূপের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ-প্রকৃতিকে একই সত্যের প্রকাশ বলিয়া অনুভব করিতে সে আতঙ্কিত হয় না। কবিও নিজের জীবনের মধ্যে যে সকল পরম আবির্ভাব, যে সকল নিবিড় রস নানা উপলক্ষ্যে অনুভব করিয়াছেন নিঃসন্দেহেই তাহার মধ্যে কখনো পুরুষের কখনো নারীর ভাব পাইয়াছেন। সেই উভয় ভাবের মধ্যেই আনন্দের অসীমতা। এই জন্যই জীবনদেবতাকে তাঁহার পক্ষে প্রিয়তম বলাও যত সহজ, প্রেয়সী বলাও তত সহজ।

এই গেল তত্ত্বের দিকের কথা। কাব্যের রূপ সম্বন্ধেও যেখানে কথা কহিয়াছেন সেখানেও ইস্কুল-মাষ্টারের জোর গলায়। বাঙালী পাঠকমাত্রেই জানেন কবির লেখা গান-গুলি প্রায়ই বারো লাইনের। টম্‌সন্ ইহার মধ্যে নিছক কৃত্রিমতার আভাস পাইয়াছেন। কাব্যসমালোচকের মুখে এমন কথা প্রত্যাশাই করা যায় না। কবিমাত্রেই নিজকৃত শাসন নিজের লেখার উপর প্রচার করেন। সেটাতে অধীনতা নাই, সেটাতে কর্তৃত্ব। এই স্বপ্রতিষ্ঠিত শাসনের সীমার দ্বারাই স্বয়ং বিশ্ববিধাতাও সৃষ্টি করেন। তিনি মানুষের দেহে নাকের দুই পাশে দুই চক্ষু, মাথার দুই পাশে দুই কর্ণ, বক্ষের দুই ধারে দুই বাহু, যোজনা করিয়াছেন। করতলের পাঁচ পাঁচ আঙুল দুই হাতে কেবল যে সমান করিয়া গণিয়া দিয়াছেন তাহা নহে, এ-হাতের আঙুলের সঙ্গে ও-হাতের আঙুলের আকৃতিও একই রকমের। এই সমস্ত বিচার করিয়া আমার বিশ্বাস টম্‌সন্ সাহেবও বলিবেন না যে, নরদেহ রচনা করিবার সময় বিশ্বকবির প্রতিভা ক্লান্ত হইয়াছিল, তাই তিনি পুনরাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। টম্‌সন্ সাহেব এই প্রসঙ্গে সনেট কাব্যরূপের চতুর্দ্দশ পদের কোনো উল্লেখ করেন নাই। সনেটের পদশাসনসঙ্কীর্ণতায় টম্‌সন্ সাহেব কোনো অবজ্ঞা বোধ করেন না। তার কারণ, স্কুলমাষ্টারের কাছে সনেট সুপরিচিত,—কিন্তু দ্বাদশপদীর কোনো নজিরের দলিল তাঁহার জানা নাই। সে কথাও থাক্। টম্‌সন্ যদি তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর বাহিরে অল্পমাত্র অনুসন্ধান করিতেন, তবে খবর পাইতেন যে, আস্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি ভাগ অনুসারে আমাদের সঙ্গীতের একটা কলেবর-বিভাগ আছে। তাহারই অনুসরণ

করিয়া কবিতাগুলিকে সাধারণত দ্বাদশ পদ আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

ইস্কুল-মাষ্টারীর চূড়ান্ত হইয়াছে যেখানে নৈবেদ্য গ্রন্থের কবিতাগুলিকে একশো সংখ্যায় আবদ্ধ দেখিয়া কবির প্রতি সমালোচক হুঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। চৌকিদার লাফ দিয়া উঠিয়াছে, যেন তাহার বৃষচক্ষু লণ্ঠনের অনিমেষ দৃষ্টিতে বমালসুদ্ধ চুরি ধরা পড়িল। চিন্তা করিয়া, চেষ্টা করিয়া ঠিক একশো'টা কবিতা টানাটানি করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন তাহার কোনো আভ্যন্তরিক প্রমাণ কি তিনি এই গ্রন্থের মধ্যে পাইয়াছেন? কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে খবর পাইতেন, একশো'র অনেক বেশি কবিতা লেখা হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু ছাপা হয় নাই, কিছু কিছু এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমওয়ালার ঝুড়িতে ঠিক একশোটা করিয়া আম গণিয়া যে খরিদদার বলে, যেহেতু বাংলা দেশের আমগাছ আঙুল গণিয়া গণিয়া একশো'টা করিয়া আম ফলায় অতএব এ আম পান্‌সা, নিশ্চয় বুঝিতে হইবে আমগাছকে সে আপনার ছাত্র বলিয়াই কল্পনা করে, এবং সেই আমগাছকে ফুল মার্ক না দিয়া ফেল করিবার পক্ষে তাহার বিশেষ আনন্দ আছে।

এ তো গেল বাহিরের কথা। তারপরে লেখক কবিতার গুণ দোষ বিচার এমনভাবে করিয়াছেন যাহাতে উপাধিপরীক্ষার পরীক্ষকেরা সন্দেহমাত্র না করিতে পারে যে, তিনি বাংলাকাব্যকে নিশ্চিত ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে গভীরভাবে বুঝিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ইংরেজি সাহিত্যকে যদি খাস বাংলার ভিতর দিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যায়, ইংরেজি সাহিত্যকে যদি ইংরেজের জ্ঞান, বোধ ও দৃষ্টি দিয়া দেখিবার শক্তি একটুও না থাকে, যদি ইংরেজি ভাষার মধ্যে যে জাদু আছে তাহা অনুভব করা আমাদের পক্ষে স্বভাবত বা অশিক্ষাবশত অসাধ্য হয় তবে এই সাহিত্যের কতই অল্প অংশ বাঙালীর অধিগম্য হইতে পারে। শুধু তাই নয়, তাঁহাদের ভাষায় যাহাকে banal বলে, তা ছাড়া এ সাহিত্যে আর কোনো বিশেষণের যোগ্য হইতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত বোধ করি তাঁহার জানা আছে। যদিও নিশ্চিত বলা কঠিন তবু আশা করি তিনি এতটুকু বাংলা জানেন যাহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, বাইবেলের যে বাংলা তর্জ্জমা সাধারণ্যে প্রচলিত তাহাতে বাইবেলের মতো এমন গ্রন্থেরও কিরূপ হাস্যকর দুর্গতি ঘটিয়াছে। তাহার কারণ এ নয় বাংলায় ভালো তর্জ্জমা হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা জানেন না যে, বাংলা তাঁহারা জানেন না, তাঁহারা তাঁহাদের অশিক্ষার ভিতর দিয়া এক জিনিষকে আর এক জিনিষ করিয়া তুলিয়াছেন। অভিধান মিলাইলে শব্দার্থের কোনো অপরাধ পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাষার রস, যাহাকে ইংরেজিতে taste বলা যাইতে পারে, তাহা তাহার অর্থবস্তুর চেয়ে অনেক বেশি। তাহার উপলব্ধি যদি না থাকে তবে অন্ধ রসদৃষ্টির যোগে সাহিত্যের ব্যবহার করিতে গেলে তাহা নিতান্ত ক্রিমিনাল যদি নাও হয়, অন্তত সিভিল মাম্‌লার অধীনে আসিতে পারে। টম্‌সন্‌ বাংলা ভাষার যে অগাড় বোধের ভিতর দিয়া বাংলা কাব্যকে দেখেন তাহাকে তাঁহার ইংরেজির ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া লইবার সময় যে, কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। এমন অবস্থায় যখন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্বন্ধে মাঝে মাঝে এক কথায় ডিক্রি ডিস্‌মিস্‌ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার হাকিমী সম্বন্ধে নালিষ কার কাছে তুলিব? সে কি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপরীক্ষা-সমিতির কাছে?

এমন কোনো ইংরেজি কাব্যসংগ্রহ নাই যাহার মধ্যে টেনিসনের The Lady of Shallott আদরের স্থান পায় নাই। ইংরেজি ভাষা, ভাব, তাহার পৌরাণিক ইতিহাসের সঙ্গে যাহার নিরতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই এমন সাহিত্য-রসজ্ঞ বাঙালী পাঠকের কাছে ইহা যে কতদূর নীরস ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে তাহা, যে-ইংরেজের কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি আছে তিনিও বুঝিতে পারিবেন। উক্ত পাঠক "Bearded Barley" কে "দাড়িওয়ালা যব' তর্জ্জমা করিয়াও যদিবা হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন তবু সমস্ত কবিতাটির মধ্যে সর্ব্বজনীন চিত্তের ব্যবহারযোগ্য খাদ্যের অভাব দেখিয়া তিনি যদি

ইহাকে অশ্রদ্ধা, এমন কি, অবজ্ঞা করেন, তবে তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু তবু উক্ত বাঙালী পাঠক অবজ্ঞা করেন না; বলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। অবজ্ঞা যে করেন না, তাহার কারণ এ নয় যে, করিলে উপাধিপরীক্ষায় তাঁহার পাস্ করা অসাধ্য হইবে। তাহার কারণ এই যে, তিনি জানেন, ইংরেজ এই কবিতার মধ্যে যে-রস পান, কেবল মাত্র অনভিজ্ঞতাবশতই সেই রস পাইবার অধিকার তাঁহারও নাই। সে তাঁহার ভাগ্যের দোষ, কাব্যের দোষ নয়। টেনিসনের "In the Valley of Cauteretz" নামক কবিতাটিও ইংরেজ সংগ্রহকারদের বরমাল্য পাইয়া থাকে। জানিনা ফরাসী বা জর্মান ভাষায় ইহার তর্জ্জমা হইয়াছে কি না—এবং সেই তর্জ্জমার জোরে ইহা সেই সেই ভাষায় শ্রদ্ধেয় সাহিত্যের একটা ক্ষুদ্র কোণও অধিকার করিতে পারিয়াছে কি না। ইহার সম্পদ যে কি, এবং "All along the Valley," ও "Living Voice" ও "Voice of the Dead" বাক্যের বারবার পুনরাবর্ত্তনের মধ্যে কি যে জাদু আছে তাহা অতি অল্প বিদেশীর কাছেই অনুভবগম্য। কিন্তু নিঃসন্দেহই ইহার শব্দযোজনার মধ্যে এমন একটি সঙ্গীত আছে যাহা অধিকারী ব্যক্তির মনে রস জোগাইয়া তোলে। "Deepening thy voice with the deepening of the night" ইহার মধ্যে যদি কোনো মাধুর্য্য থাকে তাহা শব্দার্থের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, ভাষার অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে তাহা অবগুণ্ঠিত, ভাষার দরদ নাই যে বিদেশী বর্গী সমালোচকের মনে, সে যখন ইহার অবরোধ ভাঙিয়া চৌথ আদায় করিতে আসে তখন হতাশ হইয়া সে কি ক্ষাপা হইয়া উঠিবে না? টম্‌সন্ সাহেব তেমনি মেজাজ লইয়া মাঝে মাঝে যখন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন তখন সেটাকে তাঁহার সাহিত্যিক ন্যায়পরতা বলিব, না, কথাটা রূঢ় হইলেও, সেটাকে অন্যায়পরতা বলিব? যথার্থ ভাবে সাহিত্যরসের বিচার করিবার শক্তি যে সকলেরই আছে তাহা বলি না। অতএব তাহার অভাব দেখিলেও সহ্য করা চলে, কিন্তু উপকরণ ও শিক্ষার অভাবে সাহিত্যের বাহির দ্বারেই যে মানুষ বাধা পায়, সে যদি সেখানেই আপন হাতে উচ্চ মাচা বাঁধিয়া বিচারকের আসন খাড়া করে সেটা কি সুদৃশ্য? কেবল কল্পনাশক্তির অনুজ্জ্বলতাবশত নয়, অজ্ঞতার অশক্তিবশত যখন সমালোচক নিজের আত্ম-বিশ্বাসকে খর্ব্ব না করিয়া কবির কাব্যকে খর্ব্ব করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার ভদ্র কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় না। কারণ এই স্পর্দ্ধা দ্বারা বাঙালী কবির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ পায়, অনুরূপ ভাষাজ্ঞান লইয়া কোনো য়ুরোপীয় কবির প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে এই ইংরেজ লেখক সাহস করিতেন না। আমাদের দেশের খ্যাতনামা কবির প্রতি এই অসঙ্কোচ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া বাঙালী জাতির প্রতি পদে পদে তিনি অহঙ্কৃত অসম্মান প্রকাশ করিবার একটা সুযোগ পাইয়াছেন।

রেভারেণ্ড টম্‌সনের পণ্ডিতম্মন্যতা

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টম্‌সনের বহির বিষয়ে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া একটি হাস্যোদ্দীপক কবিতার কথা মনে পড়িয়া গেল। একজন তরবারিচালননিপুণ ব্যক্তি অন্ত এক জনের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তলোয়ারটা এমন পাতলা ও এমন তীক্ষ্ণ ছিল এবং তলোয়ারী এমন লঘু হস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির মাথা কাটিয়াছিলেন, যে, সে বুঝিতেই পারে নাই, যে, তাহার মাথা কাটা গিয়াছে। দর্শকেরাও বুঝিতে পারে নাই। তলোয়ারী তখন কি করেন? নিজে যে খুব দক্ষতার

সহিত অস্ত্র চালনা করিয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য একটু নস্য কর্ত্তিতমুণ্ড ব্যক্তির নাকের কাছে ধরিলেন। অমনি সে হাঁচিতে না হাঁচিতেই তাহার মাথাটা মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ হইলেও এত সূক্ষ্ম, যে, তাহা রেভারেণ্ড টম্‌সন্ অনুভব করিতে পারিবেন না। তাঁহার পণ্ডিতম্মন্যতার মাথা কাটা গেলেও তিনি জীয়ন্ত মানুষেরই মত বেশ চলা-ফিরা করিতে থাকিবেন। কিন্তু তাহা বাঙালী কবি ও অন্যান্য লেখকদের পক্ষে নিরাপদ নহে;—কখন্ কাহার উপর চড়াও করিয়া বসিবেন, বলা ত যায় না। শুনিলাম, শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নস্য ব্যবহার করেন না। কিন্তু টম্‌সন্ সাহেবের বহিতেই তাহার মাল মশলা আছে। একত্র করিয়া ব্যাখ্যার হামানদিস্তায় পিষিয়া ঘুঁটিয়া দিলেই চলিবে। তখন সেই নস্য টম্‌সন্ নিজে ব্যবহার করিতে পারিবেন, অন্য কেহও তাঁহার নাকের কাছে ধরিতে পারিবেন।

রবীন্দ্রনাথের উপর এটি টম্‌সনের দ্বিতীয় বহি। প্রথমটির দীর্ঘ সমালোচনা প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। হয় ত তাহারই ফলে তিনি দ্বিতীয় বহিটিতে স্বীকার করিয়াছেন, যে, প্রথমটিতে কোন কোন বিষয়ে কিছু ভ্রম আছে।

টম্‌সন্ সাহেবের সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে। কিছু চিঠি লেখালেখি এবং কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। একবার তিনি বাংলায় কথোপকথনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাঙা বাংলায় দুই তিনটা বাক্য বলিয়াই সে চেষ্টা ছাড়িয়া দেন। ভারতবর্ষে থাকিবার সময় তাঁহার এই ধারণা ছিল, যে, রবীন্দ্রনাথের বাংলা বহি কোন বিদেশী ভাষায় তর্জ্জমা করিবার জন্য বিদেশী অনুবাদকের ভাল করিয়া বাংলা জানিবার দরকার নাই; কোন বাঙালীকে বহিটির মানে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া বিদেশী অনুবাদক নিজের মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে পারেন। তবে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন বটে, যে, বিদেশী অনুবাদকের নিজের মাতৃভাষায় দখল থাকা দরকার। অনুবাদ কার্য্যের সহজ-সাধ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার এই অদ্ভুত ধারণা এখনও বোধ হয় আছে। নতুবা তাঁহার এই অপূর্ব্ব দ্বিতীয় বহিটি তিনি লিখিতেন না।

টম্‌সন্ সাহেবকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য কোন বাঙালী জ্যাঠা ছেলে গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে কতকগুলি শব্দের অদ্ভুত অনুবাদ করিয়া দিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও টম্‌সনের বাংলা-বিদ্যার দৌড় যে কত দূর, তাহা প্রমাণিত হইতে বাকী থাকে না। কিন্তু তাঁহার বহিটির কোন কোন জায়গা পড়িয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, হাসির উপকরণগুলি তিনিই স্বয়ং যোগাইয়াছেন। তাহার কয়েকটি পাঠকদের সাম্‌নে ধরিবার আগে অন্য দু-একটা কথা বলি।

পুস্তকখানির ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন, যে, তিনি রবিবাবুর সব বহি পড়িয়াছেন, যদিও পুস্তকতালিকায় তিনি একথাও কতকগুলি বহি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে, সেগুলি তিনি দেখেন নাই। পড়ার মানে যদি চোখ বুলান হয়, তাহা হইলে তাহা তাঁহার দৃষ্ট বহিগুলি সম্বন্ধে তিনি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যদি তিনি অধ্যয়ন অর্থে পাঠ (reading) কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি? বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন, মানুষের টাকা থাকিলে তাহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতিও হয়—"অর্থাদ্ ভবতি পণ্ডিতঃ"। তিনি আজ-কালকার দিনে বাঁচিয়া থাকিলে অধিকন্তু ইহাও বলিতেন, যে, রাজনৈতিক প্রভুত্ব কোন জাতির লোকদের থাকিলে সেই জাতির লোকেরা পরাধীন জাতির ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন, যে, টম্‌সন্ যত অল্প বাংলা জানিয়া বাঙালী কবির উপর মুরুব্বিয়ানা করিয়াছেন, ফরাসীভাষা তত অল্প জানিয়া কোন ফরাসী কবি সম্বন্ধে বহি লিখিতে সাহস করিতেন না—তেমন আস্পর্দ্ধা ও দুঃসাহস তাঁহার হইলে দুর্দ্দশাও কি হইত তাহা আমরা জানি। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, যেহেতু আমরা ইংরেজের অধীন এবং তিনি ইংরেজ, সেই কারণে তিনি আমাদের ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষোত্তীর্ণ ছেলেদের চেয়েও

কম বাংলা জানিয়া জগদ্বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক হইয়াছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের উপর বহি লিখিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব্ ফিলসফি উপাধি পাইয়াছেন। তিনি দর্শনের আচার্য্য না হইতে পারেন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যাচার্য্য যে নিশ্চয়ই, তাহা এই উপাধির প্রভাবে আমাদিগকে মানিতেই হইবে!

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পদবী "ঠাকুর" কেন হইল, তাহার বড় চমৎকার কারণ টম্‌সন্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সেকালে সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীরা দেশী ব্রাহ্মণ চাকরদিগকে "ঠাকুর" বলিত, এবং তাহা হইতেই কবির পূর্ব্ব পুরুষরা "ঠাকুর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন! কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বাংলা-দেশের আরও শত শত ব্রাহ্মণ পরিবারের যে সব লোক সেকালে ইংরেজের চাকরী করিত, তাহারা কেন "ঠাকুর" বলিয়া পরিচিত হয় নাই? কবি নিজে এই অপূর্ব্ব ইতিহাসটি ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই, যদিও তাঁহার নিজের পারিবারিক ইতিহাস এবং বাংলা শব্দার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান টম্‌সন্ অপেক্ষা অল্প স্বল্প বেশী হইবারই সম্ভাবনা। টম্‌সন্‌কে অতঃপর কোন হাস্য-রসিক বলিয়া দিতে পারে, যে, কবির পূর্ব্বপুরুষ রাঁধুনী বামুন ছিলেন বলিয়া তাঁহারা ঠাকুর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, এবং তাহা তিনি তৃতীয় কোন বহিতে লিখিয়া বসিতেও পারেন! এইজন্য এখন হইতেই বলিয়া রাখা ভাল, যে, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য নহে। হাস্যরসিক-দিগকেও বলি, "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ," তাঁহারা অতীত কালের কবির এই প্রার্থনাটি যেন ভুলিয়া না যান।

রবীন্দ্রনাথের বংশ পিরালি, পিরালী বা পীরালী ব্রাহ্মণ। টম্‌সন্ বলিতেছেন, পিরালি শব্দের উৎপত্তি "পীর+আলি"—প্রধান মন্ত্রী হইতে, এবং পীর+আলি যে ফারসী, তিনি তাহাও বলিয়াছেন। আমি ফারসী জানি না; কিন্তু অভিধানে দেখিয়াছি, যে, পীর ফারসী কথা, মুসলমানদিগের সাধু পুরুষদিগকে পীর বলা হয়, এবং আলী আরবী শব্দ। বস্তুতঃ পিরালি শব্দের জনশ্রুতি-মূলক ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, "যশোহরের মুসলমান রাজা পীর আলীর অন্নস্পর্শজনিত, মতান্তরে অন্নের আঘ্রাণ জন্য দোষাশ্রিত ব্রাহ্মণশ্রেণী বিশেষ," বলিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধানে লেখা আছে; এবং আমরাও বরাবর এইরূপ শুনিয়া আসিতেছি।

টম্‌সন্ সাহেবের বহিতে মধ্যে মধ্যে এরূপ ইঙ্গিত আছে, যে, তিনি বাংলা ও ফারসী ছাড়া সংস্কৃতও জানেন। এরূপ বহুভাষাবিৎ লোককে ইংলণ্ডে যত সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে।

এখন টম্‌সনের গোটাকতক কথার অনুবাদ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করি।

তিনি "কবিওয়ালার" মানে লিখিয়াছেন, "poet-fellows"! তিনি জানেন না, যে, "কবি"র একটা মানে, "একশ্রেণীর গান; ইহাতে চিতান, পরচিতান, ফুকা, মেলতা, মহড়া ও খাদ এই কয় অংশ থাকে"; জানেন না, যে, "কবি" গাওয়া যায়, সুতরাং "কবিওয়ালা" মানে "কবি-গানকারী"। "কবি" যে এক শ্রেণীর গান, তাহার একটা প্রয়োগ দিতেছি। মেদিনীপুরের জাড়া গ্রামের জমীদারদের বাড়ীতে এক কবির লড়াই সম্বন্ধে গল্প আছে, যে, একদলের মূল গায়েন জাড়াকে গোলোক বৃন্দাবনের সহিত তুলনা করেন। তখন অন্যদলের অধিকারী উঠিয়া গাহিলেন,

"কি কোয়্যে বল্লি, অগা, জাড়া গোলোক-বৃন্দাবন!
কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড, কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড?
সাম্‌নে আছে মাণিককুণ্ড, কোর্‌গ্যে মুলো দরশন!—
কবি গাইবি, পয়সা নিবি, খোসামুদী কি কারণ?"

মাণিককুণ্ড জাড়ার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম। এখানে বড় বড় মুলা উৎপন্ন হয়। যিনি উতোর গাইয়াছিলেন, তাঁহার ব্যঙ্গের অর্থ সহজবোধ্য। গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন, কিন্তু জাড়ার নিকটবর্ত্তী মাণিককুণ্ডে থাকেন বড় বড় মুলা!

নববিবাহিত দম্পতির কথোপকথন বিষয়ক রবীন্দ্র-নাথের যে কবিতা আছে, তাহাতে বালিকা বধূ বলিতেছে, যে, সে আয়ী-মার কাছে শুইতে যাইতেছে। মাতামহীকে আয়ী বলে; কোথাও কোথাও মাতামহীর মাতাকে আয়ী-মা বলে। টম্‌সন্ আয়ী-মার মানে করিয়াছেন "nurse"

"নার্স" অর্থাৎ দাই বা ধাই। "আয়ী" ও "আয়া" যে এক নয়, ততটুকু জ্ঞানও তাঁহার নাই।

"চলিত ভাষা"র মানে তিনি করিয়াছেন "walking language" অর্থাৎ কিনা যে-ভাষা হাঁটিয়া বেড়ায়, বলা বাহুল্য ইহার অর্থ কথোপকথনের ভাষা, প্রচলিত ভাষা।

রবীন্দ্রনাথের একটি বহির নাম "শব্দতত্ত্ব"। "শব্দতত্ত্ব" কথাটির মানে টম্‌সনের মতে "sound and reality", অর্থাৎ "ধ্বনি ও সত্তা"। বলা বাহুল্য ইহার অর্থ শব্দ-বিজ্ঞান বা ভাষাবিজ্ঞান। টম্‌সন্ এইরূপ ভাণ করিয়াছেন, যে, তিনি রবিবাবুর সব বহি পড়িয়াছেন। যদি "শব্দ-তত্ত্ব" তিনি পড়িতেন, তাহা হইলে ঐ বহির নামটির এমন অদ্ভুত মানে করিতেন না।

"ছুটির পড়া" রবিবাবুর আর একটি বহি; ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছুটির সময় পড়িবার জন্য অভিপ্রেত। টম্‌সনের বহিতে ইহা ইংরেজীতে "Chhutir Pada" লেখা হইয়াছে। সুতরাং ইহা "ছুটির পদ"ও পড়া যায়। টম্‌সন্ ইহার মানে করিয়াছেন, "Verses in Leisure", অর্থাৎ "অবসর সময়ে রচিত পদ্য"! বলা বাহুল্য এই "পড়া"গুলি গদ্য।

"গীতপঞ্চাশিকা" রবিবাবুর আর একটি বহির নাম; টম্‌সন্ ইংরেজীতে লিখিয়াছেন "Gitapanchashika"। এই ইংরেজী অক্ষরসমষ্টি "গীত-পঞ্চ-শিকা"ও পড়া যায়। সুতরাং, আর যায় কোথা? টম্‌সন্ অমনি মানে করিলেন, "Five Loops of Song"! অর্থাৎ কিনা রবিবাবু শিকায় তুলিয়া রাখিবার জন্য কতকগুলি গান রচনা করিয়াছেন! সেগুলি, রূপকভাবে কিম্বা সত্য সত্যই, পাঁচটি শিকাতে ঝুলান থাকে! টম্‌সন্ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও অনেক বাঙালী কবির নাম করিয়াছেন, যেন সবই তাঁর নখদর্পণে! কিন্তু সত্য সত্যই যদি তিনি প্রচলিত সব বাংলা কাব্যের সহিত পরিচিত থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের চৌরপঞ্চাশিকা তাঁহার জানা থাকিত, এবং পঞ্চাশিকার মানে পঞ্চাশের সমষ্টি না করিয়া তিনি পাঁচটি শিকা করিতেন না।

"অরূপ রতন" আর একটি পুস্তকের নাম। টম্‌সন্ মানে করিয়াছেন, "The Ugly Gem" অর্থাৎ কিনা "কুৎসিত রত্ন।" বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ পরমপুরুষকেই রূপহীন নিরাকার রত্ন বলিয়াছেন।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। যে-ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বহির নামেরই এমন অদ্ভুত মানে করিয়াছে, সে যে তাঁহার সব বই পড়িয়াছে, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? অক্সফোর্ড অতি প্রাচীন সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে অনেক বিদেশীভাষার অধ্যাপক আছেন। তাঁহাদেরও বিদ্যা কি টমসনের মত? তাহা হইলে ত অক্সফোর্ড পণ্ডিতের জায়গা না হইয়া পণ্ডিতমূর্খের জায়গা হইবে।

অরবিন্দ ঘোষ যখন হাজতে ছিলেন, তখনকার বৃত্তান্ত কাগজে লিখিয়াছিলেন। তাহার এক জায়গায় বলিয়া-ছিলেন, জেলে তাঁহাকে একটি বাটী দেওয়া হইয়াছিল। ইহা জল খাইবার জন্য, ডাল খাইবার জন্য, স্নানের জন্য, শৌচাগারের জন্য, প্রভৃতি সব কাজের জন্যই ব্যবহার করিতে হইত; অতএব তাঁহার মতে ইহা ভারত-বর্ষের ইংরেজ সিবিলিয়ানদের মত। কেন না এই সিবিলিয়ান্‌রা সকল রকম সরকারী কাজ চালাইবার যোগ্য বিবেচিত হন। অরবিন্দ টম্‌সনের বহি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, শুধু ইংরেজ সিবিলিয়ানরা নয়, কোন কোন ইংরেজ পাদরীও অনায়াসে সব কাজ করিতে সমর্থ।



নৃত্য

নৃত্য কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার জন্য দশরূপক বলিয়াছেন—

"গাত্রবিক্ষেপমাত্রেণ সর্বাভিনয়বর্জিতম্ ।
আঙ্গিকোক্তপ্রমাণেন নৃত্যং নৃত্যবিদো বিদুরিতি ॥
অন্যদ্ভাবাশ্রিতং নৃত্যং নৃত্যং তানলয়াশ্রিতম্ ।
উদ্ধতং তাণ্ডবং প্রোক্তং লাস্যন্তু সুকুমারকম্ ॥"

তালমান রসাশ্রয়ে বিলাসসমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপকে নৃত্য বলে। নানা-প্রকারে অঙ্গ হৃত হয়—চালিত হয় বলিয়া নৃত্যের আর-একটি নাম হইয়াছে 'অঙ্গহার'। নৃত্য মানুষের স্বভাবসিদ্ধ; কেননা, তালের দিকে ঝোঁক, আর তালে তালে অঙ্গবিক্ষেপের দিকে ঝোঁক মানুষের প্রকৃতিতে দৃঢ়সম্বদ্ধ। মানুষ যখন নিতান্ত অসভ্য অবস্থায় ছিল, তখনও মানুষ নৃত্য করিয়াছে। সভ্যতার প্রথম স্তরে নৃত্য সকল জাতির মধ্যেই উত্তেজিত ভাবদ্যোতক ছিল। যে অনুকরণ-পদ্ধতির প্রয়োগে নাটকের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাই আবার অনুকরণশীল নৃত্যের (pantomime) জনক। অতি প্রাচীনকালে দেশাত্মবোধের ভাব বা ধর্ম্মভাব প্রকাশ করা নৃত্যের রীতি ছিল।

শারীরবিজ্ঞানবিদেরা বলেন, মনে আনন্দ হইলে শরীরের উপর যে-সব ক্রিয়া হয়, নৃত্যেও সেইসমস্ত শারীরিক ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। নৃত্যে শরীরের ভিতর যে তেজের সঞ্চার হয়, তাহা সমস্ত শরীরে চারিয়ে থাকে। কাজেই নৃত্যে দেহের অপকার সাধন না করিয়া পুষ্টিসাধনই করিয়া থাকে। শারীরিক ব্যায়ামে দেহের যেরূপ বিকাশ ও পরিণতি হয় নৃত্যেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

শাস্ত্র নৃত্যকে 'দৃশ্যসঙ্গীত' নাম দিয়াছে। এই দৃশ্য-সঙ্গীত বা নৃত্য চায় না কে? এমন যে গম্ভীর প্রকৃতির দার্শনিক সোক্রাটেস্ (Socrates) তিনিও নিজে নৃত্য করিতেন; তবে তাঁর নৃত্য ছিল ব্যায়ামের অবলম্বন। সারা দুনিয়ার মধ্যে এক্ষেত্রে বেয়াদবী করিয়াছেন শুধু একজন পণ্ডিত; তাঁর নাম Cecero; তিনি বলেন, মাতাল বা পাগল না হইলে কোন ভদ্রলোকে নৃত্য করে না।

ডেভিড যখন ফিলিষ্টাইন্স্ (Philistines) ধ্বংস করিয়া ফিরিয়া আসেন, তখন হীব্রুরমণীরা নৃত্য করিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়াছিলেন। ডেভিড্ খৃষ্টের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন, যখন তিনি শিলো (Shiloh) হইতে Ark ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। সেভিলের (Seville) কাথিড্রালে (Cathedral) উচ্চ বেদির (High Altar) সম্মুখে মে বা জুন মাসের শেষে যখন খৃষ্টদেহের (Corpus Christi) উৎসব হয়, তখন বালকেরা নাচে। প্রাচীন গ্রীসে মৃতব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখাইবার সময় নৃত্যের ব্যবস্থা হইত। আড্রাস্টুসের (Adrastus) পূজায় সিসিয়নে (Sicyon) নাচের খুব ধুম হইত। মৃতব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য একটি উৎসবেরও অনুষ্ঠান হইত। এই উৎসবের নাম ছিল 'আন্থেস্টেরিয়া' (Anthesteria)। ইহাতে আমাদের রাসের নৃত্যের মত মণ্ডলাকারে রমণীরা নাচিত।

বর্মায়, চীনে, জাপানে আরও কত জায়গায় মৃতদের সম্মানের জন্য নাচের সরঞ্জাম বেশ আমোদজনক।

মহাদেব সকল সময় নৃত্য করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'নটরাজ'। এপর্য্যন্ত যত 'নটরাজ' মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সবই নৃত্যশীল। গণেশও কতকটা বাপের ধাত পাইয়া সময়ে সময়ে নাচিয়া থাকেন। তাঁর এই নৃত্যশীল মূর্ত্তির নাম "নৃত্যগণেশ"। কার্ত্তিকের নৃত্যমূর্ত্তি কোথাও পাওয়া যায় না। 'নৃত্তলক্ষ্মী' 'নৃত্তসরস্বতী'র নৃত্য বড়ই সুন্দর। কৃষ্ণও নাচিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার রাসের নৃত্য ভারত-বিখ্যাত। কবি জয়দেব 'নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং' প্রভৃতি পদে তাঁর নৃত্যমূর্ত্তি ভক্তের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। কৃষ্ণের নৃত্যগোপালমূর্ত্তি রসজ্ঞদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াই থাকে। কালীয়-সর্পের মস্তকে কৃষ্ণের জয়সূচক নৃত্যে কত তত্ত্বই নিহিত। স্বর্গের দেবতারাও নাচ খুব ভাল বাসেন। উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরা তাঁহাদের আমোদ দিয়া থাকেন। গন্ধর্ব্ব-কন্যারা নাচকে তো পেশা করিয়াই রাখিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইতেন, গান করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেও ছাড়িতেন না। প্রাচীন ভারতে নৃত্য গৃহস্থাশ্রমে খুব প্রচলিত ছিল। ঋষিরা গীতবাদ্যের সঙ্গে নৃত্যেরও অনুমোদন করিয়াছেন। আমোদের জন্য স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলাকারে নৃত্য করিত। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন, রমণীরা তাম্রবর্ণের সুরাপাত্র হাতে করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতেছে—"যদ্ উদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।" তখন সুরাপাত্রের একটি নাম ছিল 'ঘটী'। ভীষ্ম মৃত্যুশয্যায় যুধিষ্ঠিরকে নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আগেকার সভাসমিতিতে নৃত্য-গীত আলোচনা প্রধান বিষয় ছিল। স্ত্রীপুরুষের একসঙ্গে নৃত্য করাও অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। অর্জ্জুন যে নাচ-গানের ওস্তাদ ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। কৃষ্ণ বলরাম নৃত্য-গীতে খুব পটু ছিলেন। শান্তনুপত্নী গঙ্গা স্বামীর সম্মুখে নৃত্য করিতেন। যাদবরমণীরা নৃত্য করিতেন। বলরাম রেবতীকে নিয়া নাচিতেন, কৃষ্ণ সত্যভামার সঙ্গে, অর্জ্জুন সুভদ্রার সঙ্গে নাচিতেন। যাদবেরা নিজের নিজের বধূর সঙ্গে নাচিতেন। সুন্দরী রমণীরা রামচন্দ্রের সম্মুখে নাচিতেন। কচ ও দেবযানী তপোবনে থাকিতেন; তাঁরা সেখানে নাচিতেন, গায়িতেন, বাজাইতেন।

বৈদিকযুগেও স্ত্রীপুরুষে একসঙ্গে নৃত্য করিয়াছে। ধর্ম্মের জন্যও লোকে নৃত্য করিত। বৈদিক অনুষ্ঠান 'মহাব্রতযজ্ঞে' স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলাকারে নৃত্য করিত। মহাব্রতে নাচ গান বাজনার অবধি ছিল না। ঋগ্বেদে মন্দিরা বাজাইয়া নাচের কথা আছে, মন্দিরাকে তখন 'আঘাটি' বলিত।

প্রাচীন ভারতের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে নৃত্যকলার বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। নৃত্য সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ। বিলাতে যে নাচে সে গান বা অভিনয়ের ধার নাও ধারিতে পারে, তবু সে একজন বড় নৃত্যকারী হইতে পারে। ভারতের নৃত্যে কিন্তু সেরূপ হইবার যো নাই। গীত ও নাট্যকে বাদ দিয়া নৃত্য হইতেই পারে না। নৃত্যের অনন্যস্বাতন্ত্র্য নাই। আমাদের দেশে যিনি নৃত্যকুশল হইবেন তাঁহাকে গীতজ্ঞও হইতে হইবে, অনেক সময় অভিনয়েও পারদর্শী হইতে হইবে। গানের সঙ্গে নৃত্যের মূর্চ্ছনা এদেশে স্বতই প্রকট। ভারতীয় নৃত্য বুঝিতে হইলে শব্দভঙ্গী ও অঙ্গ-ভঙ্গীর শাস্ত্র ভাল করিয়া জানিতে হয়; কেননা, নৃত্যের আখ্যানবস্তু বা অর্থ গানে প্রকাশ না হইলেও, হাবভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িবেই। ভারতীয় অন্যান্য কলার ন্যায় যদিও নৃত্যবিদ্যার আজ অবনতি হইয়াছে,

তবুও একমাত্র নৃত্যই প্রাচীন ভারতীয় কলাবিদ্যাকে আজও সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুরা জানিতেন যে, জীবন শুধু বেঁচে থাকা নয়—শুধু নিছক অস্তিত্বের স্পন্দন নয়, তাহার ভিতরে জ্ঞাতব্য জ্ঞাতব্য কিছু আছে।

নৃত্যকে ছাড়িয়া সঙ্গীত হয় না। নৃত্যই সঙ্গীতকে ভাব ও মূর্ত্তি দিয়া গড়িয়া তোলে। ভারতীয় জীবন ও সামাজিক অনুশীলনের উপর নৃত্যের প্রভাব যথেষ্ট, কিন্তু সেই নৃত্যের মৃত্যু অযথভাবে ঘটিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার অভিব্যক্তিতে নৃত্য যে-সাহায্য করিয়াছে তাহা অমূল্য। কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার আওতায় পড়িয়া নৃত্য পথহারা হইয়াছে। নৃত্যকলা অবহেলিত হওয়ায় আমরা ভারতের গুহা ও মন্দিরস্থিত চিত্র ও স্থাপত্যমূর্ত্তির সঙ্কেতসূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডে প্রাচীন নৃত্যের উদ্দেশ্যাদি ভুলিতে বসিয়াছি বা ভুলিয়াই গিয়াছি। নৃত্যের উদ্দেশ্য ভুলিতে ভুলিতে সৃষ্টির প্রাক্কালে হরপার্ব্বতীর তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের অর্থ আমরা গুলাইয়া ফেলিয়াছি।

(সুবর্ণবণিক্ সমাচার, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪) শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—

বিধবা-বিবাহ-সমস্যা

আমরা চাহি না, যে ভারতবর্ষে পরিণতবয়স্কা সন্তানবতী বিধবারা পুনরায় বিবাহ করে এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মতন ভারতবর্ষের বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহে সেরূপ আগ্রহ হইবে না। কিন্তু আমাদের ধারণা যে, ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার তুলনায় বিধবার সংখ্যা অত্যধিক এবং আমরা আশা করি যে, উহা ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। ইংলণ্ড ও ওয়েলস্-এর সহিত তুলনায় আমাদের দেশের বিধবার বয়সানুযায়ী একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রতি হাজারে বিধবার সংখ্যা

বয়স	ভারতবর্ষে ১৯২১ সাল	ইংলণ্ড ও ওয়েলসে ১৯২১ সাল
সকল বয়সের	১৭৫·০	৭৩·২
৫ বৎসর পর্য্যন্ত	৭	—
৫ হইতে ১০ বৎসর	৪·৫	—
১০ হইতে ১৫	১৬·৮	—
১৫ হইতে ২০	৪১·৪	—
২০ হইতে ২৫	৭১·৫	১·৫
২৫ হইতে ৩৫	১৪৬·৯	১৩·১
৩৫ হইতে ৪৫	৩২৫·২	৫০·৫
৪৫ হইতে ৬৫	৬১৯·৪	১৯৩·৩
৬৫ বৎসরের উপর	৮৩৪·০	৫৬৫·৯

বাংলাদেশে মোট হিন্দু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৯৫০৮২৫ এবং মোট মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১২৩৮১৮১৭, মোট হিন্দু বিধবা (২৫২৮৮০৩) মোট মুসলমান বিধবা (১৯২৪০১১) অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, বাংলার হিন্দু বিধবার সংখ্যা মোট হিন্দু স্ত্রীলোকের সিকিরও অধিক।

বিধবার পুনর্ব্বিবাহ, অন্ততঃ পক্ষে অক্ষতযোনি বিধবার পুনর্ব্বিবাহ, যে হিন্দু-শাস্ত্র সম্মত তাহা প্রমাণিত করিবার আর প্রয়োজন হইবে না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহা বহুপূর্ব্বে প্রমাণিত করিয়াছেন।

বালবিধবাদিগের প্রতি ন্যায়বিচার ও সহানুভূতির ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল জাতির লোকেরই উহাদিগের পুনর্ব্বিবাহের জন্য যত্ন ও চেষ্টা এবং উহা সমর্থন করা উচিত। কিন্তু সহানুভূতি এবং ন্যায় বিচারের ভাব এতই অল্প যে, যদিও বিপত্নীকগণ সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও নির্ব্বিবাদে বিবাহ করে এবং অনেক সময়ে তাহাদিগের নাতনীর সমবয়স্কা ছোট বালিকাকে বিবাহ করে, বালবিধবাদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রত ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যখন বালবিধবাদিগকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিবার কোন চেষ্টা হয় না এবং যখন পারিবারিক এবং সামাজিক আদর্শ ভোগ এবং কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা তখন উহাদিগের জন্য সন্ন্যাসের ব্যবস্থা নিষ্ঠুর এবং নিরর্থক।

প্রাপ্তবয়স্কা নিঃসন্তান বিধবাদিগের মধ্যেও কেহ কোনও কারণে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে কাহারও বাধা দেওয়া উচিত নয়। এমন কি সন্তানবতী বিধবাদিগের মধ্যেও যদি কাহারও বিবাহের ইচ্ছা হয় তাহাও আমাদের বন্ধ করা উচিত নয়।

হিন্দুদিগের বিবাহ সমজাতীয়দের মধ্যে হইয়া থাকে। অতএব ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক যে, প্রত্যেক জাতি অথবা অনেক জাতির মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্য এরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাযুক্ত পৃথক তালিকা প্রস্তুত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে, ১৯২১ সালে প্রকাশিত বঙ্গদেশের Census Report-এর ১৬৬ পৃষ্ঠার তালিকা অনুসারে বৈষ্ণব ও বাউরি-দিগের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। আমরা যে মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছি তদনুসারে যে-সকল জাতির মধ্যে পুরুষের সংখ্যা অধিক ঐ সকল জাতি অপেক্ষা বৈষ্ণব ও বাউরিদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধে কড়া নিয়ম থাকা উচিত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহাদের মধ্যেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত। নিম্ন-লিখিত জাতির মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক।

বাগ্দি, বৈদ্য, বারুই, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, ব্রাহ্মণ, চামার, চাষাধোবা, ধোব, ডোম, দোসাদ, গন্ধবণিক, গোয়ালা, হাড়ি, যুগী, যোগী, কাহার, মাহিষ্য, আদি কৈবর্ত্ত, কুলু, কামার, ক্যাওড়া, কপালী, কায়স্থ, কোচ, কুমার, কুর্ম্মী, মালী, মালো, ময়রা, মুচী, নমঃশূদ্র, নাপিত, মুনিয়া, ওরাওঁ, পোদ, রাজবংশী, রাজপুত, সদ্গোপ, সাঁওতাল, সাহা, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর, তাম্বুল, তাঁতি, তন্ত্র, তেলী, তিলি, তিয়ার।

কোন কোন প্রদেশে (সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাব) পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার এত পার্থক্য যে, কনে এবং অপর স্ত্রীলোকের রীতিমত আমদানী রপ্তানি, এমন-কি কখনও কখনও বেআইনী আমদানী রপ্তানি চলে। ১৯২১ সালের Census অনুসারে যে-সকল জাতির মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী ঐ সকল জাতির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

জাতি	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বারুই	৯৬৫৩২	৮৯৩৩৮
ভুঁইয়া	৩২৯৭৮	২৬৪১০
ব্রাহ্মণ	৭০৯৮১০	৫৯৯৭২৯
চামার	৯২৬৮৮	৫৯৬৮৭
ধোবা	১১৮৮৭৬	১০৮৫৯২
দোসাদ	২৮৩১৪	১১৮০৭
গন্ধবণিক	৭৫০৭৬	৬৬৮১০
গোয়ালা	৩২৩২২৯	২৬০৭৪১
যুগী ও যোগী	৬৮৬১৬৬	১৭৯৭৪৪
কাহার	৭৫৫৪৯	৪৬৩৪৯
মাহিষ্য	১১১৩৬৫৮	১০৯৭০২৬

জাতি	পুরুষ	স্ত্রীলোক
আদি কৈবর্ত্ত	১৯৮২৭৪	১৮৫৭৭৫
কলু	৫০৪৩০	৪৫৪৭১
কামার	১৩৩৪৯৫	১২৩০৯২
কায়স্থ	৬৭৮৯০৭	৬১৮৮২৯
কুমোর	১৪৬৮৩০	১৩৭৮২৩
কুর্ম্মী	১০৩৫১২	৭৭৯৩৫
ময়রা	৬৪৫০৭	৫৭০২৭
মুচী	২২৫০৮২	১৯১৬১২
নমঃশূদ্র	১০১৯০৫৭	৯৮৭২০২
নাপিত	২৩০৫২১	২১৩৬১৭
মুনিয়া	৩৬৯১৯	২১৮০৩
পোদ	৩০০০৩৪	২৮৮৩৬০
রাজবংশী	৮৯৭০৩৫	৮৩০০৭৬
রাজপুত	৮০৫৩৮	৪৪৯৭৫
সদ্গোপ	২৭০২১১	২৬৩০২৫
সাহা	১৮৪১৯০	১৭৫৫৪১
সোণার বেনে	২৫৭৬৩	২০৪৭৮
সূত্রধর	৮৭৬৭১	৮০৯০৬
তাঁতি ও তন্ত্ব	১৬৯৯০১	১৪৯৭১২
তেলি ও তিলি	২০৮১৭৫	১৮৭৭৫১

যে-সকল জাতি, সম্প্রদায় বা প্রদেশে স্ত্রীলোকের ভাগ বেশী সেখানে যদি বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে যেখানে পুরুষের ভাগ বেশী সেখানে বিধবা-বিবাহের প্রচলন সমর্থন এবং তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের যে-সকল জাতি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে তাহা নিবারণের প্রধান উপায় বিধবা-বিবাহ। অন্যান্য প্রদেশের কতক জাতির পক্ষেও ইহা সত্য।

১৯২১ সালের census অনুসারে ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের (কেবলমাত্র যাহাদের সহিত আমাদের এই প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট) মধ্যে পুরুষের তুলনায় প্রতি হাজারে ৯৫৪ স্ত্রীলোক আছে। প্রদেশ বা রাজ্য অনুযায়ী তালিকা দৃষ্টে উপরোক্ত census অনুসারে দেখা যায় যে, আসাম, বঙ্গদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বরোদা, বোম্বাইষ্টেটস্, মধ্য-ভারত, গোয়ালিয়র ষ্টেট, কাশ্মীর, মহীশূর, পঞ্জাব ষ্টেটস্ এবং রাজপুতানা, অর্থাৎ ভারতের অধিকাংশ স্থানেই হিন্দু স্ত্রীলোক অপেক্ষা হিন্দু পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের বিরুদ্ধভাব পত্নীত্বের উচ্চ আদর্শ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা যথার্থই বিধবা তাহাদের সম্বন্ধেই এরূপ বিরুদ্ধভাব প্রযোজ্য; শিশু বা বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে; এবং সামাজিক পবিত্রতা এবং ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত সামাজিক নীতির খাতিরে যখন কাহাকেও চিরকাল বিপত্নীক থাকিতে সমাজ বাধ্য করে না তখন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক এমন কোন বিধবার চিরবৈধব্যের ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।

১৯১১ সাল হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ভারতের হিন্দুর সংখ্যা হাজার প্রতি ৫টি কমিয়াছে এবং মুসলমানের সংখ্যা প্রতি হাজারে ৫১টি বাড়িয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, হিন্দু বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে নিষেধ বিধি এবং সেজন্য অনেক স্ত্রীলোকের গর্ভবতী হইবার বয়সে সন্তান না হওয়া হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

বালবিধবাদিগের দুর্দ্দশা নিবারণ করিবার উপায় যাহাতে বালবিধবা না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা; অর্থাৎ যদি বাল্যবিবাহের প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইত কিম্বা উহা অপ্রচলিত হইত; যদি বালিকাদিগের অন্যূন ১৮ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ না হইত তাহা হইলে একটিও বালবিধবা থাকিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এইরূপ অবস্থা হওয়া সুদূরপরাহত, সুতরাং সমস্ত বালবিধবার বিবাহ দেওয়াই অন্যতম সদুপায়। চিরকুমারী অপেক্ষা পবিত্র ভালবাসার ফলে মাতৃত্ব কম পবিত্র নহে।

(বিশ্ববাণী, বৈশাখ ১৩৩৪) শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

—

পৃথিবীর জন্ম-কথা

পৃথিবী কিরূপে জন্মলাভ করিল, এবিষয়ে অধুনা তিনটি প্রধান মত বা প্রকল্প (থিওরি) দেখা যায়, যথা—(১) নীহারিকা-প্রকল্প (Nebular hypothesis), (২) উল্কাপিণ্ড-প্রকল্প (Meteoritic hypothesis) এবং (৩) গ্রহ-প্রকল্প (Planetesimal hypothesis)।

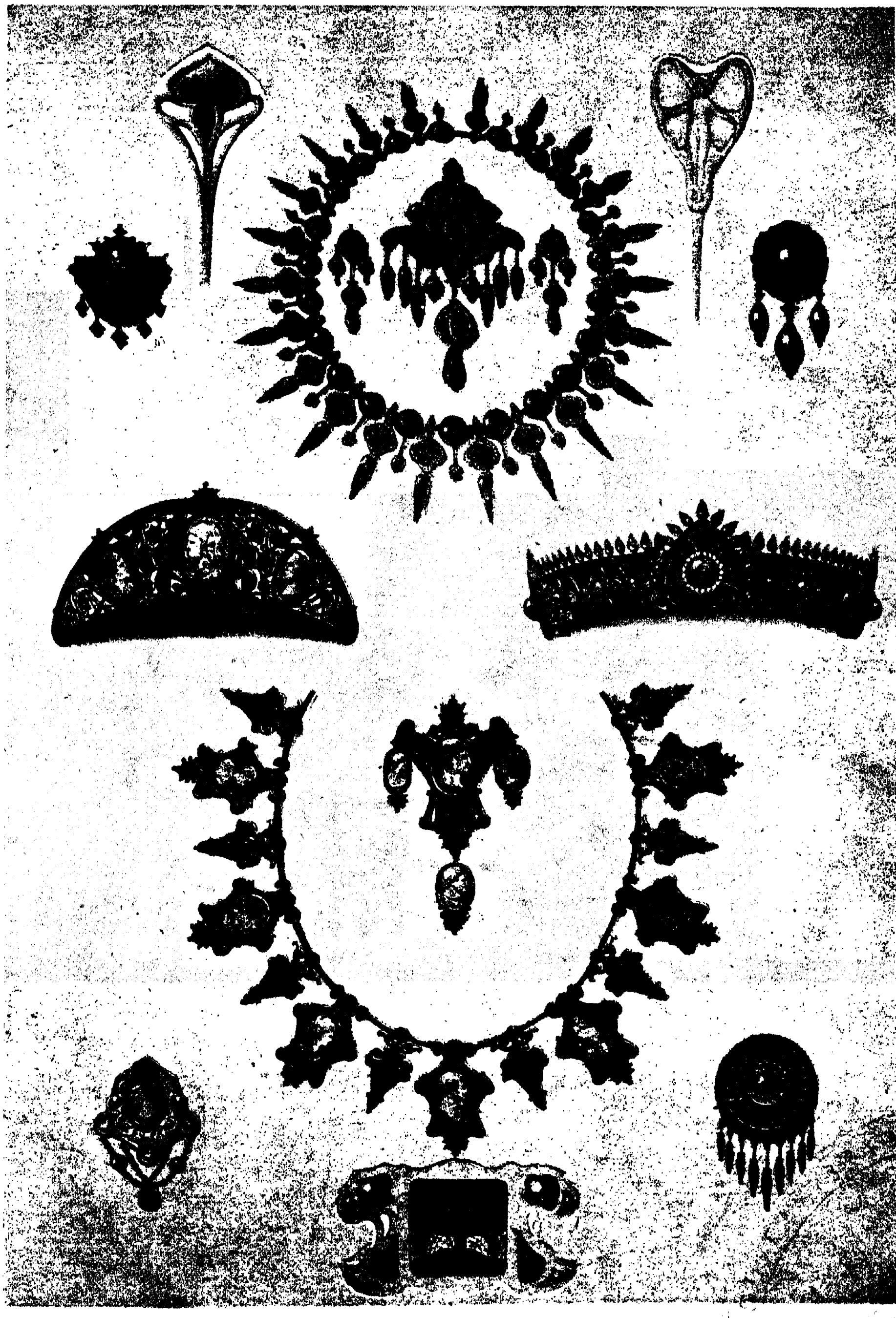
(১) নীহারিকা-প্রকল্প :—

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী লাপলাস্ (Laplace)কেই এই প্রকল্পের উদ্ভাবয়িতা বলা যাইতে পারে। এই মতানুসারে আমাদের এই সৌর-জগৎ আদিতে অতীব উত্তপ্ত গ্যাস বা নীহারিকা-পিণ্ড ছিল, আর ঐ পিণ্ড ধীরে ধীরে ঘূর্ণিত হইত। উহার ব্যাস ছিল ৬০০০,০০০,০০০ মাইলেরও অধিক, অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান সৌরজগৎ যতটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে, ততটা স্থান জুড়িয়া ঐ পিণ্ড অবস্থিত ছিল।

উত্তপ্ত পদার্থমাত্রই যেমন তাপ বিকিরণ করিয়া ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে ও আকারে ছোট হইয়া যায়, ঐ উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ডও সেইরূপ শূন্যে তাপ বিকিরণ করার ফলে কালক্রমে তাপহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আকারেও ক্ষুদ্র হইতে থাকে এবং বাহিরের অংশটা একটা অঙ্গুরীয়কের আকার ধারণ করে। পরে আবার অভ্যন্তরের শেষ দিকে আর-একটি নূতন অঙ্গুরীয়ক উৎপন্ন হয়। এইরূপে একটির পর একটি করিয়া ঐককেন্দ্রিক (concentric) অঙ্গুরীয়কের আবির্ভাব ঘটে।

ঐ গ্যাস-অঙ্গুরীয়কগুলির সর্ব্বাংশ যে সমান পরিমাণে ঘন ছিল, তাহা নহে। যে-সকল স্থান অপেক্ষাকৃত গাঢ় ছিল, আয়তনের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের চতুর্দ্দিকে গ্যাসকণাগুলি জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে কতকগুলি গ্যাস-গোলকের (spheres) সৃষ্টি হয়। এই-সকল গোলক এক একটি মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে এবং সেই সঙ্গেই আদিম গ্যাস-পিণ্ডের ঘূর্ণনের (rotation) অনুরূপ আবর্ত্তিত (revolution) হইতে থাকে। সুতরাং প্রত্যেক গোলকেরই দুইটি করিয়া গতি উৎপন্ন হয়—একটি ঘূর্ণন, অপরটি আবর্ত্তন। এই দুইটি গতিই অবশ্য আদিম গ্যাস-পিণ্ডের ঘূর্ণনের ফল মাত্র। এইসকল গ্যাস-গোলকই আমাদের আধুনিক গ্রহসমূহ। উপগ্রহগুলি আবার এক-একটি গ্রহ-দেহ হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ; আর চন্দ্র পৃথিবীরই একটি উপগ্রহ মাত্র।

কালক্রমে ঐ সকল উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড বা গ্রহগুলি যতই শীতল হয়, উহাদের আকারও ততই ছোট হইতে থাকে। উহাদের অধিকাংশই গ্যাস হইতে তরল ও তরল হইতে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আদিম সুবৃহৎ গ্যাসপিণ্ডের কেন্দ্রস্থল আজিও জ্বলন্ত অবস্থায় সূর্য্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালে তাপ-হ্রাস হইয়া অত্যধিক উত্তাপকে নিঃশেষ করা দূরে থাকুক, উহার বিশেষ কিছু ক্ষতিও করিতে পারে নাই।



আধুনিক ও অত্যাধুনিক 'প্যারিফ্যাশন' শ্রেষ্ঠ গহনার নিদর্শন

অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া সূর্য্যের তাপ বিশেষ হ্রাস হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় চন্দ্র জমিয়া একেবারে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি, উহার সমুদ্রও জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। ঐ বরফরাশির উপর সৌর-কিরণ প্রতিফলিত হয় বলিয়াই আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই। চন্দ্রের কলঙ্ক—অনালোকিত পর্ব্বত-গহ্বর বা ছায়াময় প্রদেশ মাত্র বুঝিতে হইবে। এমন কি, চন্দ্রের বায়ুমণ্ডলেও বাষ্পরাশির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কিন্তু বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি (Jupiter) এখনও এত উত্তপ্ত রহিয়াছে যে, উহার বায়ুমণ্ডলে জল ও বায়ুর মূল উপাদান দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের এই পৃথিবী চন্দ্র ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরভাগ এখনও অত্যন্ত উষ্ণ গ্যাস অবস্থায় আছে; কিন্তু উপরিভাগ বা ভূপঞ্জর (crust) নীরেট ও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আর ইহার বায়ুমণ্ডল ও জলরাশি (hydro-sphere) এই কঠিন আবরণের (litho-sphere) উপরে অবস্থান করিতেছে এবং এই কঠিন ভূপঞ্জরের নীচেই তরল পদার্থ অবস্থিত;—বহুকাল যাবৎ এই মতটি প্রচলিত ছিল; কেহ ইহার আপত্তি করেন নাই। কিন্তু আজকাল অনেক পণ্ডিত উক্ত মতবাদে সন্দিহান হইয়া অন্য মত প্রচার করিয়াছেন।

(২) উল্কাপিণ্ড-প্রকল্প :—

এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, সৌরজগতের সর্ব্বত্র উল্কাপিণ্ড-কণা বিরাজমান। উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের মাত্রা এত প্রচণ্ড যে, আঘাতজনিত উত্তাপের প্রভাবে উহারা গ্যাসে পরিণত হইয়া থাকে। এইসকল উল্কাপিণ্ড ক্রমশঃ একত্র হইয়া যতই আকারে বড় হইতে থাকে, ততই উহাদের অপর উল্কাপিণ্ডকে আকর্ষণ করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ আকর্ষণের ফলে, ঐ পিণ্ড ক্রমাগত বড় হইয়া পড়ে ও ঘাতপ্রতিঘাতের ফলস্বরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই-রূপে সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাপবিকিরণ করার ফলে, ক্ষুদ্রতর পৃথিবী অধুনা এই কঠিন অবস্থায় পৌঁছিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল হইলেও অভ্যন্তরভাগ এখনও অত্যন্ত উষ্ণ।

(৩) গ্রহ-প্রকল্প :—এই প্রকল্প অনুসারে পৃথিবী প্রথমে শীতল ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ ঈষদুষ্ণ হইয়াছে। এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই সৌরজগৎ নীহারিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নীহারিকা-পিণ্ডের মধ্যে গাঢ়তর স্থানের (knots) চতুষ্পার্শ্বে নীহারিকাকণাগুলি পুঞ্জীভূত হইয়াই গ্রহাদির সৃষ্টি করিয়াছে। স্তরে স্তরে নীহারিকা স্থাপিত হওয়ায় আমাদের এই পৃথিবী ক্রমশঃ এতাদৃশ বৃহদাকার ধারণ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে উত্তাপ আসিল কোথা হইতে?—এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন যে, আভ্যন্তরীণ আকুঞ্চনের ফলে তাপ উৎপন্ন হইয়াছে। আর এই তাপ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হইতে ক্রমশঃ পরিধির দিকে বিস্তৃত। এইসকল পণ্ডিতেরা আরও বলেন যে, পৃথিবী যখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ফলে কেন্দ্রদেশের উত্তাপ ভূপৃষ্ঠে আনীত হইয়াছিল।

যদি স্বীকার করা যায় যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং উহা শীতল ভূপঞ্জর দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অভ্যন্তরভাগ হইতে ঐ উত্তাপ ধীরে ধীরে ভূপঞ্জরে সংক্রমিত হইতেছে এবং তথা হইতে উহা শূন্যে বিকীর্ণ হইতেছে। কাজেকাজেই সমস্ত পৃথিবীও ধীরে ধীরে ক্রমশঃ আকারে ছোট হইয়া পড়িতেছে। আর পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ আকুঞ্চনের ফলে যত ছোট হইতেছে, অপেক্ষাকৃত শীতল বহির্ভাগ কিন্তু তত আকুঞ্চিত হইতে পারিতেছে না। সুতরাং অধিকতর আকুঞ্চিত অভ্যন্তরভাগের উপরে থাকিতে গিয়া বৃহত্তর বহির্ভূপঞ্জর তুবড়াইয়া উঁচুনীচু হইতেছে।

এই আকুঞ্চনই ভূপঞ্জরের উত্থানপতন ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের প্রধান কারণ।

আকুঞ্চন-প্রকল্প স্বীকার করিলে ভূ-পৃষ্ঠ যে ধীরে ধীরে বসিয়া যাইতেছে, এ-কথাও অংশ্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সকলেই জানেন যে, বৃষ্টির ফলে স্থলভাগের ধৌত মাটি নদীপথে, পরিশেষে সমুদ্রতলে আসিয়া নিয়ত সঞ্চিত হয়। তাহার ফলে সমুদ্রতল কম্পপ বা কাস্পীয়ান হ্রদের তল-দেশের ন্যায় ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠে। আর এই ধোয়াট মাটির অভাবে স্থলভাগের উপরি পৃষ্ঠ ক্রমাগত নীচু হইয়া যায়। সুতরাং স্থলভাগের ভার অপেক্ষাকৃত কম ও সমুদ্রতলের ভার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে। কাজেকাজেই ভূপৃষ্ঠের সাম্যভাব রক্ষার জন্য সমুদ্রতল হইতে তীরস্থ স্থল-ভাগের দিকে একটা পার্শ্ব-চাপ (lateral thrust) প্রযুক্ত হয়। তাহার ফলে স্থলভাগের উপরে স্থানে স্থানে উপত্যকার সৃষ্টি ঘটে; কোথাও কোথাও বা ভূপৃষ্ঠ তুবড়াইয়া উঠে ও পর্ব্বতশ্রেণীর আবির্ভাব হয়। অধিকন্তু যে-স্থানটা বসিয়া যায়, তাহার চাপের ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত তরল প্রস্তররাশির মধ্যেও একটা প্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং দূরবর্ত্তী ঊর্দ্ধগামী স্থানের দিকে ও উহার তলদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই-জন্যই সচরাচর উচ্চ পর্ব্বতের নিম্নদেশে আগ্নেয় প্রস্তরস্তর (batholitic mass) দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রকল্প অনুসারে পর্ব্বতের উৎপত্তি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনার ব্যাখ্যা সহজবোধ্য হইলেও ইহার কয়েকটি দোষ দেখা যায়; যথা—

(১) এই প্রবাহের বেগ যতই অল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ হউক না কেন, উহা বর্ত্তমান পর্ব্বতশ্রেণীর উন্নয়নের (elevation) পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া কখনই বিবেচিত হইতে পারে না।

(২) এসিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমাভিমুখী পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যত্রও যে পর্ব্বতমালা না আছে, এমন নহে। এই আকুঞ্চন-প্রকল্পের সাহায্যে প্রশান্ত-মহাসাগরের অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালার উৎপত্তি সম্ভবপর হইলেও বহুদূরবর্ত্তী হিন্দুকুশ, ককেশস্ প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণীর উদ্ভব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

(৩) এমন-কি, প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরস্থ পর্ব্বতশ্রেণীরও আকার দেখিলে মনে হয় উহা জলভাগের চাপের ফল নহে। এসিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের ধনুকাকার পর্ব্বতমালাকে দেখিলে মনে হয় যে, উহারা ভূপঞ্জরের উল্টা অর্থাৎ সমুদ্রাভিমুখী চাপের ফল, স্থলাভিমুখী গতির ফল নহে। ফলতঃ এইসকল পর্ব্বতমালার চক্রাকার (loop) ভাবকে সমুদ্র হইতে স্থলাভিমুখী ভূপঞ্জরের পার্শ্বচাপের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত দুরূহ।

(৪) এই মত অনুসারে কোন একস্থানে পর্ব্বতশ্রেণীর উৎপত্তি এবং কিছুকাল পরে উহার পরিহারেরও ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

(৫) পৃথিবীর তরুণ অবস্থায় যেমন ঘন ঘন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। ইহার কারণও আকুঞ্চন-প্রকল্পের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৬) কিরূপে দীর্ঘকাল পরে ভূপঞ্জর চালিত হইতে পারে, তাহাও এই মতের সাহায্যে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

(৭) রৌদ্র, বৃষ্টি ও ঝড়ের প্রভাবে অনেক উচ্চ পর্ব্বতও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমতলপ্রায় হইয়া পড়ে। ভারতের প্রাচীন আরাবল্লী, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতগুলি এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইসকল উচ্চ অথচ ঢালু সমতলকে প্রায়-সমতল (pene-plain) বলে। ইহাদের উৎপত্তিও আকুঞ্চন-প্রকল্প দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগের মত :—পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে ইঁহারা যে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা এই—

(১) তাপবিকিরণের ফলে পৃথিবী বর্ত্তমান শীতল অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। অত্যুষ্ণ সুবৃহৎ গ্যাসপিণ্ডের পক্ষে শীতল হইতে অবশ্যই সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হওয়াই সঙ্গত। ইঁহারা মনে করেন, বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে পৃথিবীর পক্ষে কোটি কোটি বৎসরই যথেষ্ট।

(২) সূর্য্যোত্তাপের কাল।—সূর্য্য নাকি দুই কোটি বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া পৃথিবীকে বর্ত্তমান হারে তাপ বিতরণ করিতে পারে না।

(৩) পৃথিবীর আহ্নিক গতির উপর জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব।—সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে সমুদ্রে জোয়ার ভাটার উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চন্দ্র ক্ষুদ্রতর হইলেও অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাহার প্রভাবই বলবত্তর। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগ বেশী ছিল, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার কম সময়েই পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিতে পারিত। জোয়ারের বিপরীত টানের ফলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগ ক্রমশঃ কমিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই অবস্থায় আসিতে এক কোটি বৎসরের কম সময় লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত :—অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে পৃথিবীর বয়স ছয় হইতে দশ কোটি বৎসর।

(প্রকৃতি, বসন্ত সংখ্যা ১৩৩৩) শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

—

জলের রোগারোগ্যশক্তি

মস্তিষ্ক-প্রদাহে মস্তকে শীতল জল ধারা ধারা প্রদান করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। নাসিকা হইতে রক্তপাতে শীতল জলের নস্য-গ্রহণে সুফল দর্শে।

প্রত্যহ প্রত্যুষে জলের নস্য লইলে, পীনস স্বরবিকৃতি ও কাসাদিরোগ প্রশমিত হয়।

বাত বা অজীর্ণগ্রস্ত রোগী বা যাঁহাদের অন্ত্র ক্রিয়াশীল নহে, তাঁহাদের পক্ষে বস্তিকর্ম্ম বা মলদ্বারে শীতল জলের পিচ্‌কারী প্রয়োগ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

পেট ব্যথা হইলে পেটের উপর একখানা মোটা কাপড় রাখিয়া একটি বোতলে ফুটন্ত গরম জল ভরিয়া সেক দিলে শীঘ্রই বেদনা কমিয়া যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে, রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে শীতল জল ও প্রত্যুষে গরম জল পান করিলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূরীভূত হয়। বসন্ত প্রভৃতি চর্ম্মরোগে শীতল জলে ভিজান কাপড় শরীরে জড়াইলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

গরম জল পান করিলে বমি হইয়া থাকে। শিশুদিগের আক্ষেপ (convulsion) রোগে মস্তকে বরফ বা শীতল জল প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়।

নাসারোগ, সর্দ্দি ও মাথাধরা রোগে 'নাসাপান' উপকারী। নাসিকা দিয়া জল টানিয়া লইয়া নাসারন্ধ্র পরিষ্কৃত রাখা উচিত ; ইহাতে নাসিকায় দুর্গন্ধ হয় না ও নাসারন্ধ্রে কোনো ময়লা জমিতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদ মতে, সূর্য্যের অনুদয়ে দুইসের পর্য্যন্ত শীতল জল পান করিলে, বাত্তিক ও পৈত্তিক রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া মনুষ্য শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন।

শৈত্য মাত্রেই স্থানীয় পরমাণু সকলের নৈকট্য বৃদ্ধি করে ও রক্তকে সংযত করিয়া থাকে। সুতরাং রক্ত-রোধার্থ শীতল জল ও বরফ উপকারী।

সংজ্ঞাহীন রোগীর মুখে শীতল জলের ছাট দিলে রোগী শীঘ্রই চৈতন্য লাভ করে। কোনো স্থানে আঘাত লাগিলে জলপট্টি উত্তম ব্যবস্থা।

হাত পা মচকাইলে শীতল জলের ধারায় বা সজল সুরাসারের পট্টিতে ব্যথা কমে। কঠিন আঘাতজনিত স্বাভাবিক অবসাদে রোগীকে মাথা নীচু করতঃ শায়িত করিয়া গরম জলের দ্বারা উপযুক্তরূপে তাপ যোগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

নবজাত শিশুর শ্বাসরোধে একটি ভাণ্ডে গরমজল ও একটিতে শীতল জল রাখিয়া অল্পক্ষণের জন্য উষ্ণজলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া অব্যবহিত পরে শীতল জলে পূর্ব্বোক্তরূপে নিমজ্জিত করিলে, শিশু শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে।

সন্ধিগত বাতরোগে প্রথমতঃ উত্তপ্ত বাষ্পে ও পরে শীতল জলে সেই অংশ নিমজ্জিত রাখিলে চমৎকার ফল দর্শিয়া থাকে।

সর্দ্দিরোগে গরম জলে স্নান উপকারী। নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ শীতল জলে স্নান করিলে শরীর সবল ও লাবণ্যযুক্ত হয়।

পিষ্টক ভক্ষণজনিত অজীর্ণে শীতল জল পান করিলে অজীর্ণতা দূরীভূত হয়।

(আয়ুর্ব্বিজ্ঞান, বৈশাখ ১৩৩৪) শ্রীচিত্তরঞ্জন আচার্য্য

—

কনোজরাণী রাজ্যশ্রী

রাজ্যবর্দ্ধন যখন হূণদিগকে পরাজিত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন মাতাপিতা কেহই আর ইহলোকে নাই। ছোট ভাই হর্ষবর্দ্ধনের অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে হইল।

তিনি প্রথমেই গৌড়রাজ শশাঙ্কের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া মৌখরিরাজ গ্রহবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন এবং রাণী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করিয়া লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

মৌখরিরাজ্য অধিকার করিয়া দেবগুপ্ত শ্রীকণ্ঠরাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজ্যবর্দ্ধন ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ সেনাপতি ভণ্ডির অধিনায়কত্বে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তকে অতি অনায়াসেই পরাজিত করিলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে গৌড়রাজ শশাঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্যবর্দ্ধনকে প্রলোভন দেখাইয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া নিজ গৃহে আনাইয়া তাহাকে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত করেন। হর্ষবর্দ্ধন বহু সৈন্য লইয়া কান্যকুব্জের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই বীর বালকের বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর। পথে সেনাপতি ভণ্ডির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভণ্ডি সজলনয়নে তাঁহাকে রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা এবং অভাগিনী বন্দিনী রাজ্যশ্রীর দুঃখের কাহিনী জানাইয়া বলিল, রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জের কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কয়জন মাত্র সঙ্গিনী লইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের দিকে চলিয়া গিয়াছেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বিন্ধ্যপর্ব্বতে পৌঁছিয়া ভগিনীর অনুসন্ধান করিতে করিতে হর্ষবর্দ্ধন দিবাকর মিত্র নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, নিকটেই অরণ্য মধ্যে এক রমণী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। হর্ষবর্দ্ধন তৎক্ষণাৎ দিবাকর মিত্রকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহারই ভগিনী রাজ্যশ্রী স্বামীর মৃত্যু-শোকে অধীর হইয়া

অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রাজ্যশ্রী প্রিয় ভাই হর্ষ ও স্বামীর বন্ধু দিবাকরের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজ্যশ্রী আত্মবিসর্জ্জনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশ্রীকে লইয়া কান্যকুব্জে ফিরিলেন বটে, কিন্তু মৌখরিরাজ্যে কিরূপে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা যায় তাহা লইয়া বড়ই মুস্কিল বাধিল। রাজ্যশ্রী এসময় মাত্র তেরো বৎসরের বালিকা। কান্যকুব্জের মন্ত্রীরা তাই হর্ষবর্দ্ধনকেই মৌখরি রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন কিন্তু কিছুতেই ভগিনীকে বঞ্চিত করিয়া কান্যকুব্জের রাজা হইতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু অবশেষে তিনি ভগিনীর সহিত একযোগে রাজ্যের আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। রাজ্যশ্রীই এই রাজ্যের যথার্থ অধিকারিণী। তাই হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জের সিংহাসনেও আরোহণ করিলেন না এবং মহারাজ উপাধিও গ্রহণ করিলেন না; তিনি শুধু রাজপুত্র শিলাদিত্য উপাধিতেই সন্তুষ্ট রহিলেন।

এই সময় হইতে হর্ষবর্দ্ধন শ্রীকণ্ঠরাজ্যের শাসন-কার্য্য কান্যকুব্জ হইতেই চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে বর্দ্ধন বংশের শ্রীকণ্ঠ রাজ্য এবং মৌখরিবংশের রাজ্য সংযুক্ত হইয়া একটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হইল। পরবর্ত্তী কালে হর্ষবর্দ্ধন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যশ্রী কনৌজের রাণী হইলেন। সেই সময় রাজ্যশ্রী স্বামী-পুত্রহীনা তেরো বৎসরের বালবিধবা। তাঁহার দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠ ভাই হর্ষবর্দ্ধনই তাঁহার একমাত্র সহায়। যুদ্ধ বিগ্রহ-রাজ্যশাসন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য হর্ষবর্দ্ধনই করিতেন। রাজ্যশ্রী তখন হইতে ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়নেই মনোনিবেশ করিলেন। ইহাই তাঁহার বৈধব্যগ্রস্ত জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইল। এইরূপে রাজ্যশ্রী পরবর্ত্তীকালে পরম বিদুষী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। সম্মিতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জে একটি ধর্ম্ম মহাসভা আহ্বান করেন। সেই সভায় দেশ বিদেশ হইতে সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন, আর ছিলেন বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক মহাপণ্ডিত হিউএন্থ সাঙ। সেই সভায় হিউএন্থ সাঙ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রায় একুশ দিন এই ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিবিধ ধর্ম্মমত লইয়া এই সভায় মহা মহা পণ্ডিতগণের মধ্যে তুমুল তর্ক ও আলোচনা হইত। শ্বেতবসনা বৈধব্যবেশধারিণী রাজ্যশ্রী প্রত্যহই এই সভায় হর্ষবর্দ্ধনের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মালোচনা শুনিতেন এবং মাঝে মাঝে অসঙ্কোচে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মের এইসমস্ত জটিল তর্ক বুঝিবার মত বিদ্যা তাঁহার ছিল। আর এই কথাও মনে রাখা উচিত যে, সেই সময় ভারতবর্ষে মেয়েদের অবরোধ-প্রথা আজকালকার মত এমন তীব্র ছিল না।

রাজ্যশ্রীর পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন ছিলেন সূর্য্য-উপাসক। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন ছিলেন একনিষ্ঠ বৌদ্ধ। দ্বিতীয় পুত্র হর্ষবর্দ্ধন প্রথমে ছিলেন শৈব, পরে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মা ছিলেন বৌদ্ধ, এবং রাজ্যশ্রী নিজেও ছিলেন বৌদ্ধ ব্রতাবলম্বিনী এবং বৌদ্ধ সম্মিতীয় মতবাদই তাঁহার সব-চেয়ে প্রিয় ছিল।

(বেণু, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪) শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

প্রাচীন ভারতের কয়েকটি রঞ্জক পদার্থ

নীল রংয়ের ব্যবহার আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। "গাথা-সপ্তশতী" হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশের মেয়েদের কাঁচুলি নীল রংয়ে রঞ্জিত হইত, কিন্তু মদন মহোৎসবের সময় কুসুম ফুলের রং ব্যবহৃত হইত। নীল রংয়ের শাড়ী আমাদের দেশের মহিলাগণ বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আদরের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

ভারতীয় রঞ্জকগণ মঞ্জিষ্ঠা হইতে টুক্‌টুকে লাল রং প্রস্তুতের প্রণালী শিখিয়াছিলেন। ভারতীয় মঞ্জিষ্ঠা এবং বিলাতী ম্যাডার (madder) একই জিনিষ।

মঞ্জিষ্ঠার মূল জলে ভিজাইয়া রাখিলে ঐ জল প্রথমতঃ রুবারিথ্রীক (Ruberythric) এসিডে পরিবর্ত্তিত হইয়া পরে এলিজারিণে পরিণত হয়। এই রাসায়নিক উপাদান এলিজারিনই লাল রং উৎপন্ন করে।

অনেক মাঙ্গলিক ক্রিয়া-কলাপে আমাদের দেশে হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র আজকালও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সেকালে কুসুম ফুল হইতে লোকে সুন্দর রং প্রস্তুত করিত। আজকালও পশ্চিম ভারতে অনেক আনন্দ উৎসবে কুসুম ফুলের দ্বারা রং করা বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

খদির-বৃক্ষের বন্ধল জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত হইত এবং সেই কাথ দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত হইত।

অধুনা Ferrous Sulphate ও Nitric Acid এর সংমিশ্রণে যে Nankin Yellow বা Iron Buff Colour প্রস্তুত হয় তাহা সেকালের লোকে গেরী মাটির সাহায্যে করিতেন।

লাক্ষা হইতে যে লাল রং প্রস্তুত হয় তাহার ইংরেজী নাম 'Crimson Red'। পূর্ব্বকালে মহিলাগণ লাক্ষারসে চরণযুগল রঞ্জিত করিতেন।

কাপড়ে রং-বে-রংয়ের ছাপা দেওয়ার পদ্ধতিও প্রথম আমাদের দেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

আমাদের দেশীয় জিনিষ বিদেশে পাঠাইয়া হয় ত আমরা প্রতিযোগিতায় পারিব না, কিন্তু আমরা যদি স্বদেশী রং ব্যবহার করি তাহা হইলে বিদেশী রং যে এদিকে আসিতে সাহস পাইবে না তাহাও ধ্রুব সত্য।

(বাঁশরী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪) শ্রী সুরেশচন্দ্র দাস

মাছি

অনেক বাড়ীতে দেখা যায় যে, দিনের বেলায় সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে মাছি ঢাকিয়া বসিয়া থাকে এবং রাত্রিতে দেয়ালের উপর আল্‌কাতরার প্রলেপের মত অসংখ্য মাছি। কতক বাড়ীতে ইহার অপেক্ষা কম মাছি দেখা যায়। তাহার কারণ, ঐ-সব বাড়ীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আছে এবং বাড়ীর লোকে কোন খাদ্যদ্রব্যই অনাবৃত রাখিয়া দেয় না ও দিনে অন্ততঃ একবার মাছি তাড়াইয়া দেয়।

মাছি যে কেবল জ্বালাতন করে তাহা নয়, মাছি অতি নোংরা জীব। কোন মৃত জন্তু বা পচা জিনিষের উপর হইতে উঠিয়াই সরাসরি ইহারা বাড়ীতে আসিয়া ঢুকে। আসিবার আগে হাত-পা মুছিয়া আসে না; একবারে আমাদের খাবারের উপর বা আমাদের হাত, মুখ ও কাপড়ের উপর আসিয়া বসে এবং ময়লার কণা ও রোগের বীজ রাখিয়া যায়। ইহাদের পায়ে সরু সরু ছোট ছোট চুল থাকায় পাগুলি ময়লা বহনের খুব উপযোগী।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মাছিতে টায়ফয়েড, যক্ষ্মা, কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য অনেক রোগের বীজ বহন করিয়া লইয়া যায়। এক-একটি মাছি প্রায় আড়াই লক্ষ রোগবীজাণু বহন করিয়া বেড়ায়। কেবল যে পা ও অন্যান্য অঙ্গের সহিত রোগবীজ যায় তাহা নহে; মাছি বসিলে পর যে কালো দাগ পড়ে সেই দাগেও রোগবীজ থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এইরূপ একটি কালো দাগে প্রায় পাঁচ হাজার বীজাণু পাওয়া গিয়াছে।

রান্নাঘরে, খাবার জায়গায় বা খাবারের দোকানে যাহাতে মাছি না ঢোকে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। মাছি মারিবার একপ্রকার আঠালো কাগজ পাওয়া যায়, সেই কাগজ অথবা মাছি-ধরা ফাঁদ কিম্বা তরল বিষাক্ত দ্রব্য দিয়া মাছি তাড়াইবার ব্যবস্থা হইতে পারে। তরল বিষাক্তের মধ্যে formalin মিশ্রিত জল একটি। আধ গেলাস জলে formaldehyde সলিউশনের (40 per cent solution) এক চামচ ঢালিয়া ইহা তৈয়ারী করা যায়। একটি থালায় এই জল রাখিয়া যেখানে মাছির উপদ্রব বেশী সেখানে বসাইয়া রাখিবে। তবে এই জলে ছেলেমেয়েরা যেন হাত না দেয়, ইহা বিষাক্ত। মাছি মারিবার আর-একটি তরল জিনিস হইতেছে দুই আউন্স জলে এক ড্রাম potassium bichromate ঢালিয়া তাহাতে একটু চিনি মিশাইয়া দেওয়া। ইহা বিষাক্ত নহে। এই জল ছোট ছোট ডিশে করিয়া বাড়ীতে নানা জায়গায় রাখিবে। Pyrethrum powder ঘরে পুড়াইলে মাছি আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া যায়। তাহার পর ঝাঁট দিয়া সেগুলিকে পুড়াইয়া ফেলিলেই হইল।

মরা ইঁদুর, পরিত্যক্ত খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি বাড়ীতে জমিয়া পচিলেই তাহা হইতে মাছি জন্মায়। প্রতিদিন এইসব জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত। অনেক সময় জমিতে দিবার জন্য গাদা করিয়া সার রাখা হয়। তাহাতেও মাছি জন্মায়, ইহা নিবারণ করিতে হইলে Chloride of lime বা Sulphate of iron আধ সের আন্দাজ এক গ্যালন জলে মিশাইয়া সেই জল সার-গাদার উপর ছিটাইয়া দিবে।

(ওরিয়েণ্টাল ওয়াচ্ম্যান্ এণ্ড হেরাল্ড অব হেল্থ)

আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ

অনেকেই জানেন যে, বর্ত্তমানে আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ অনেক বিষয়ে পরস্পর সদৃশ। অন্যান্য বিষয়ে যতই সাদৃশ্য থাকুক না, একটি বিষয়ে পরস্পরের সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট। সে সাদৃশ্য এই যে, আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়েই গ্রাম-প্রধান দেশ। বর্ত্তমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুইটি দেশই আজ গ্রাম্য সভ্যতাকে হারাইয়া বসিয়াছে। এই জায়গায় উভয়ে সমান; কিন্তু প্রভেদ এই যে, আয়ার্ল্যাণ্ড আজ আপনার গ্রামগুলিকে সুসংস্কৃত করিয়া তুলিয়াছে, আর ভারতবর্ষ সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে মাত্র।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের লোপ অতিরিক্ত করভার, ধর্ম্মদ্রোহ, সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, দেশত্যাগ, অর্থনৈতিক অধঃপতন, সুশিক্ষার দৈন্য, শিল্পকলার অভাব, ইত্যাদি নানা ক্লেশ আয়ার্ল্যাণ্ডের উপর দিয়া গিয়াছে; ভারতও সে-সবে অভিজ্ঞ। আয়ার্ল্যাণ্ড কিন্তু গোড়া হইতেই তাহার দারিদ্র্য দূর করিয়া দেশবাসীর মনে নূতন ভাব জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

দুগ্ধ হইতে ঘৃত ও মাখন তুলিবার কারখানা, কৃষি সমিতি, ঋণদান সমিতি, পশুপালন সমিতি, ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান বেশ সাফল্যের সহিত পরিচালিত হয়। হাতে বুননের কাজ, লেস্ তৈরীর কাজ, নানাবিধ কারুকার্য্য ইত্যাদি সমবায় প্রণালীতে করা হয়। বহু স্থানে সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যও সমবায় প্রণালীতে হইতে থাকে।

ইহার ফলে দেশে ধনবৃদ্ধি হইতে থাকে। অধিবাসীদের পরস্পরের দায়িত্ববোধ বাড়িতে থাকে। আয়ার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি ভারতবর্ষের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হইবে।—

"সমবায় আন্দোলনের ফলে সামাজিক একটা জাগরণ আসিয়াছে এবং যে-সব লোক এক পল্লীতে বাস করে তাহাদের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থের ঐক্য-বোধ জাগিয়াছে। জাতি, ধর্ম্ম, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় লোকের মনকে এত বিক্ষিপ্ত করে যে, এক ক্ষেত্রে সকলের মিলন অসম্ভব মনে হয়। অনেকে বলে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিলে সমস্যা আরো জটিল হইয়া পড়িবে। অপর কাহারও সহিত মতভেদ না থাকিলে আইরিশম্যান যেন বাঁচিবে না। এইসব কারণে সমবায়-প্রচেষ্টার উন্নতির পথে বিপদ ছিল অনেক। অনেক সময় প্রচণ্ড বাগ্-বিতণ্ডা ও রাগারাগির মধ্যে সভাসমিতি করিতে হয়। তবুও সব বিপদই কাটিয়া গিয়াছে। আজ আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীর মনে এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, জাতি, ধর্ম্ম বা রাজনীতি কিছুতেই মানুষের সহযোগে কর্ম্ম করিবার শক্তিতে বাধা দিতে পারে না। যে-সমস্ত বিভিন্ন কর্ম্ম দ্বারা মানুষের জীবন পরিপুষ্ট হয় তাহা আজ যথাযোগ্য পাত্রেন্যস্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বার্থের যে সাম্য দেশবাসীর মধ্যে তাহার উপলব্ধি হইয়াছে।

(রুর‍্যাল ইণ্ডিয়া) কে, এস, রামস্বামী শাস্ত্রী

—

[বাংলা ভাষায় পুরাতন মাসিকপত্রিকাসমূহে এমন অনেক প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, যেগুলি আজ অবধি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, অথচ যেগুলির সারবত্তা যথেষ্ট এবং যেগুলি সর্ব্বকালের পাঠকের পক্ষেই সমান উপযোগী। এমন অনেক প্রবন্ধ আছে যেগুলির লেখক হয়ত খ্যাতনামা নন, অথচ প্রবন্ধগুলি শিক্ষাপ্রদ। আমরা এখন হইতে কষ্টিপাথর বিভাগে পুরাতন পত্রিকা হইতে ঐ জাতীয় প্রবন্ধসমূহের সার প্রবন্ধকারগণেরই ভাষায় সংকলন করিয়া দিতে থাকিব। এবার নিম্নে পুরাতন একটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।]

প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা

কোন্ আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোন্ প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোন্ বীরের উদ্দীপনায়, কোন্ ভক্তের ভক্তি-সাধনায় ভাষার উদ্ভব কে স্থির করিবে?

কবি, গায়ক, লেখক ও ভাবুকের কাব্যস্রোত গীতস্রোত, রচনাস্রোত এবং চিন্তাস্রোত মিলিয়া ভাষার কলেবরপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ব-বিদের গবেষণার লক্ষ্য—এই প্রাচীন কবি গায়ক লেখক ভাবুকের কাব্য-গীতরচনা-চিন্তার সংগ্রহ। তাঁহার আলোচনার বস্তু এই প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম। ভাষাতত্ত্ব-

বিদ্ বুঝেন যে, এসকল না বুঝিলে ভাষার কলেবরপুষ্টি বুঝা যাইবে না। আর ভাষার কলেবরপুষ্টি না বুঝিলে ভাষার প্রবাহ বুঝা যাইবে না। সেইজন্যই প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তা বুঝিবার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদের এত শ্রম ব্যয় আয়াস ও অধ্যবসায় স্বীকার।

নবীন সাহিত্যের আলোচনায় যে ফল, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায়ও সেই ফল অনেক পরিমাণে সাধিত হয়। এ ফল কি, কাব্যামোদী মাত্রেরই বিদিত আছে। এ ফল হৃদয়ের একটা প্রসার, জ্ঞানের একটা বিস্তৃতি, চিন্তের একটা গভীরতা, সুখের একটা পরাকাষ্ঠা, একটা ভূমানন্দ লাভ। অধিকন্তু প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা আবেগ, একটা প্রথম উদ্দীপনার নব ভাব, একটা সারল্য স্বাভাবিকতা অকপটভাব আছে, যাহা নবীন সাহিত্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এইটুকু অধিক ফল।

নবীন সাহিত্য সম্যক্রূপে বুঝিতে হইলে তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের বিবর্ত্তনরূপে বুঝা চাই; অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের কোন্ বীজ কিরূপে, কত দিনে ক্রমবিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখা কাণ্ডে পরিণত হইল, তাহা বুঝা চাই।

নবীন সাহিত্যের ভাব ভাষা ছন্দোবন্ধ শব্দবিন্যাস রচনাপ্রণালী বুঝিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের ভাব ভাষা ছন্দোবন্ধ শব্দবিন্যাস রচনা-প্রণালীর পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বৈদিক সংস্কৃত হইতে ভাষাসংস্কৃত, ভাষাসংস্কৃত হইতে গাথা, গাথা হইতে পালী, পালী হইতে প্রাকৃত মাগধী, মাগধী হইতে আদ্য বাঙ্গলা, আদ্য বাঙ্গলা হইতে মধ্য বাঙ্গলা, মধ্য বাঙ্গলা হইতে আধুনিক বাঙ্গলার প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস। এই ভাষার ইতিহাসজ্ঞান প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞানসাপেক্ষ। অতএব ভাষার ইতিহাসজ্ঞানের জন্য প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার আলোচনার প্রয়োজন।

ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শিরা স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সুসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য পাঠের লক্ষণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

আর যাহাকে ভাষাবিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত।

কোন ভাষার প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধান সংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা চাই।

পাশ্চাত্যেরা যাহাকে তন্তুবিচ্ছেদ বলেন, ভাষার উদ্দামযৌবনে প্রায়ই তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা। শিক্ষাবিস্তারের সহিত ভাব ও ভাষার একটা আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের আরম্ভ হয়। তাহার ফলে জাতীয় সাহিত্য বিজাতীয় আদর্শের অনুগামী হইয়া বিকৃত হইয়া পড়ে। অবশ্য বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাতীয় সাহিত্যের অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়; কিন্তু প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের যে সংযোগ তন্তু, যে ধারাবাহিক ক্রম, তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের সংযোগতন্তু অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক।

জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিরূপ। কত সহস্র বৎসর বৈদিক-যুগ অতীত হইয়াছে; সে বৈদিক ঋষি, বৈদিক যাগ, বৈদিক জীবন, বৈদিক আচার-ব্যবহারের চিহ্ন মাত্র নাই; কিন্তু বেদের সূক্তে তৎসমুদয়ের কেমন সুস্পষ্ট ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব অতীত যুগের জাতীয় জীবন, সেই কালের সামাজিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিবার জন্য তখনকার রীতিনীতি, আচারবিচার, প্রণালীপদ্ধতি জানিবার জন্য, প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন—প্রাচীন কাব্যগীতরচনা-চিন্তার বহুল আলোচনার প্রয়োজন।

সেইজন্য বলিতেছিলাম, প্রয়োজন যথেষ্টই আছে; আর প্রয়োজন এক নহে, অনেক। প্রথম, প্রাচীন কাব্যাদির অকপটভাব ও স্বাভাবিকতার আস্বাদ; দ্বিতীয় নবীন সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের বিকাশের ঐতিহাসিক ক্রমনির্ণয়; তৃতীয়, ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ-সংকলন এবং ভাষাবিজ্ঞানরচনা; চতুর্থ, প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধানপ্রণয়ন; পঞ্চম, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ; শেষ, জাতীয় অতীত জীবনের ইতিবৃত্তজ্ঞান। এইসকল প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার আলোচনা অপরিহার্য্য।

(সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩০১)

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্তর বৎসর

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

২৪

আমাদের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হইত—গ্রামে। পূজার সময় আমরা সকলেই বাড়ী যাইতাম। আমি একটু বড় হইলেই পূজার ফুল তুলিয়া, বিল্বপত্র বাছিয়া তাহার অংশীদার হইয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে আরত্রির সময় ধূপ-ধুনা জ্বালাইতাম। মণ্ডপে ঢুকিবার অধিকার ছিল না, কিন্তু বারান্দায় উঠিয়া বড় বড় ধুনুচিতে ধূপ দিয়া মণ্ডপ-ঘর প্রায় অন্ধকার করিয়া তুলিতাম। খড়-মাটি দিয়া প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, স্বচক্ষে দেখিতাম, ইহা সত্য। কিন্তু বিল্ব-ষষ্ঠীর রাত্রি পর্য্যন্ত এই প্রতিমাতে পুত্তলিকা-বুদ্ধি থাকিলেও সপ্তমী দিন প্রত্যূষে পুরোহিত যখন 'কলাবধূকে' স্নান করাইয়া মন্ত্রপূত করিয়া দুর্গা-প্রতিমার পাশে আনিয়া

রাখিতেন, তখন হইতে প্রতিমাতে আর প্রতিমা-বুদ্ধি থাকিত না। পূজার ক'দিন এ'যে মাটির পুতুল, কিছুতেই ইহা ভাবিতাম না। নবমী দিন সন্ধ্যা-আরতির সময় মনে হইত, যেন বিজয়ার আসন্ন-বিরহ ভাবিয়া দেবী বাস্তবিক কাঁদিতেছেন। বিজয়ার সন্ধ্যার পরে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলে প্রাণে ঘোর অবসাদ আসিত। এখন, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া, এ অবসাদ কেন হয়, তাহা বুঝি। তিন দিনের নিরবচ্ছিন্ন উল্লাস ও উৎসাহের পরে উৎসবের অবসানে, এ প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য্য। কিন্তু বাল্যে এ জ্ঞান হয় নাই, হওয়ার কথাও ছিল না। সুতরাং বিজয়ার অবসাদ যে দেবতার বিরহ হইতে হয় নাই, ইহা বুঝিতাম না। তখনও দেবতায় বিশ্বাস ছিল, তবে এ দেবতা যে কি বস্তু এ প্রশ্নই মনে কখনও উঠে নাই। দেবতা মানুষের মতনই, অথচ মানুষ নহেন, এতটুকু ধারণা হইয়াছিল।

এইসকল পারিবারিক পূজাপার্ব্বণের ভিতর দিয়া যা-কিছু ধর্ম্মশিক্ষা লাভ হইয়াছিল। এ শিক্ষা মতের শিক্ষা ছিল না, ভাবের শিক্ষা এবং অনুভূতির শিক্ষাই ছিল। প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা বেশী কিছু বোধ জন্মে নাই; তার পরেও জন্মিয়াছে কি না, সাহস করিয়া এ কথা বলিতে পারি না। এইসকল পূজা-পার্ব্বণের ভিতর দিয়া অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস সাধন করিয়াছিলাম। এই সাধনই ধর্ম্মসাধনের গোড়ার কথা। আমরা চোখে যাহা দেখি, কাণে যাহা শুনি, এসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা গ্রহণ করি, তাহার অতীতেও যে-বস্তু আছে, ইহাই ধর্ম্মসাধনের বুনিয়াদ। প্রাচীন হিন্দু-সমাজে প্রচলিত পূজাপার্ব্বণের ভিতর দিয়া ধর্ম্মজীবনের এই ভিত্তি গাঁথা হইয়াছিল, এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। আর এইজন্যই নিজে সে-সকল পূজাপার্ব্বণ বর্জ্জন করিয়াও আমার মা-বাবা যে-সকল পূজা করিতেন, তাহা যে পাপ-কার্য্য, এ অপরাধের কথা কখন কল্পনাও করি নাই। আমার পক্ষে এখন এসকল পূজার অনুষ্ঠান পাপ হইতে পারে; পাপ হইবে, মিথ্যা আচরণ বলিয়া, যাহা আমি বিশ্বাস করি না তাহার ভাণ করিব বলিয়া; কিন্তু আমার পিতৃ-মাতৃকুলের গুরুজনেরা ঐ সকল প্রতিমাপূজাতে যে পাপাচরণ করিতেন, ইহা কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

আমাদের শ্রীহট্টের বাসায়ও প্রায় সর্ব্বদাই ব্রত-পূজা প্রভৃতি হইত। প্রতি শনিবারে শনির সেবা হইত। মা প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেন। এছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসে মা সাবিত্রীর ব্রত করিতেন। সারা মাঘমাস প্রতি রবিবারে সূর্য্যের ব্রত করিতেন। এসকল ব্রতের "কথা" মায়ের কাছে বসিয়া আমিও শুনিতাম। আর ব্রতশেষে প্রসাদের ভাগ ত পাইতামই।

২৫

শ্রীহট্ট সহরে মাঝে মাঝে যাত্রাগান হইত। আমাদের বাসাতেও হইত, প্রতিবাসীদের বাড়ীতেও হইত। আমি প্রায় সর্ব্বত্রই এসকল যাত্রা শুনিতে যাইতাম। আমার বাল্যকালে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রা ব্যতীত রাম-বনবাস, নিমাই-সন্ন্যাস প্রভৃতি যাত্রাও হইত। কিন্তু আমাদের বাসায় মা কিছুতেই নিমাই-সন্ন্যাস বা রাম-বনবাসের পালা হইতে দিতেন না। আমি তাঁর একমাত্র পুত্র, বোধ হয় এইজন্যই রামের বনবাস বা নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শুনিতে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত। কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে ঢাকার ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের 'স্বপ্নবিলাস,' 'রাই-উন্মাদিনী' এবং 'বিচিত্র বিলাস'—এই তিনটি পালার কথাই বিশেষ মনে আছে। এসকল পালা মহাজন-পদাবলীর অনুকরণে রচিত। অনেক সময় গোস্বামী মহাশয়, বোধ হয়, তাঁহার সঙ্গীতে প্রাচীন পদ যোজনা করিয়া দিতেন। রসের অনুভূতিতে এসকল পদ মহাজন-পদাবলী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। শ্রীহট্ট সহরে সেকালে মাঝে মাঝে ভদ্রলোকদিগের বাসায় পুরাণ-পাঠও হইত। কিন্তু এই পুরাণ-পাঠে কোন প্রকারের লোক-শিক্ষা হইত না। অনেক স্থলে একখানা পুথি জলচৌকির উপরে রাখা হইত। আর তাহারই সম্মুখে থালা বা রেকাবী থাকিত। আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া ঐ বাঁধা পুথিকে প্রণাম করিয়া ঐ থালার উপরে নিজেদের প্রণামী রাখিয়া দিতেন। এই পুরাণ-পাঠটা অনেক সময় গৃহস্থের পুরোহিত বা গুরুঠাকুরের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ-সংগ্রহের একটা উপায় মাত্র ছিল।

আমাদের বাড়ীর পুরোহিত ঠাকুর যখন নিজে আসিতেন, তখন তিনি এই পুরাণ-পাঠ উপলক্ষে "অধ্যাত্ম রামায়ণ" কিছু কিছু পড়িতেন, অন্যসময়ে তাঁহার পুথিখানা বাঁধিয়া জলচৌকির উপর সাজাইয়া রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে আমাদের বাসায় যখন পুরাণ-পাঠ হইত, তখন কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পর্য্যন্ত এইরূপে বাঁধা থাকিত না। আমার মনে পড়ে, দু একবার আমার জেঠতুত ভাই—ইনি বাবার মুহুরী ছিলেন এবং বাবার সংসারের কাজ-কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন—বাংলা নজীর খাড়োয়া দিয়া মুড়িয়া পুরাণ বলিয়া এই পাঠের সময় রাখিতেন। এই প্রচ্ছন্ন নজীরকেই লোকে প্রণাম করিয়া প্রণামী দিয়া যাইতেন। কখনও কখনও—আমাদের পরিবারে হয় নাই—কিন্তু অন্যত্র এমনও শুনা গিয়াছে যে, দুষ্ট বালকেরা ছেঁড়া চটি এইরূপ মুড়িয়া পুরাণের আসনে স্থাপন করিত। লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস কতটা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এইসকল ঘটনা এবং কাহিনীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণ পাঠের উদ্দেশ্য ছিল, অর্থ-সংগ্রহ করা।

সহরে যখন যেখানে পূজাপার্ব্বণ হইত অথবা যাত্রা-গানাদি হইত সেখানেই নিমন্ত্রিতদিগকে নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী প্রণামী দিতে হইত। যাঁহারা নিজেদের বাড়ীতে পূজা-পার্ব্বণ বা যাত্রাগানাদির ব্যবস্থা করিতেন তাঁহারা এই সূত্রে তাঁহাদের প্রণামীর টাকা ফেরত পাইতেন। যাঁহাদের বাড়ীতে যে বৎসর পূজাপার্ব্বণ বা যাত্রাগানাদি হইত না, তাঁরা এই পুরাণ পাঠের উপলক্ষে এই টাকা ফেরত পাইতেন। কেহ কেহ পুরাণপাঠের প্রণামী নিজেরাই আত্মসাৎ করিতেন; কিন্তু অধিকাংশ সম্পন্ন গৃহস্থেরা এই প্রণামীর টাকা নিজেদের গুরুপুরোহিতকেই দান করিতেন।

২৬

শ্রীহট্টে থাকিতেই আমি হিন্দুয়ানীর বন্ধন ছিঁড়িতে আরম্ভ করি। আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা নহে। ফলতঃ তখন পর্য্যন্ত আমার অন্তরে কোন ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উদয়ই হয় নাই। জিজ্ঞাসা জাগে সন্দেহ হইতে। তখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমার অন্তরে বাস্তবিক কোন সন্দেহ জাগে নাই। কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতা সত্যই আছেন কি নাই; এ প্রশ্ন মনে ওঠে নাই। পরজীবনেও কখনও উঠিয়াছিল কি না মনে নাই। ঈশ্বর আছেন একজন, যিনি দুনিয়ার মালিক, সকল হিন্দুতেই এ বিশ্বাস করেন। আমার বাবাও এই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। এই একেশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতায় বিশ্বাসের যে কোন বিরোধ আছে, ইহা তিনি ভাবিতেন না। ফলতঃ যখন তিনি দুর্গোৎসবের সময় দুর্গাপ্রতিমার নিকটে প্রণাম করিতেন, তখন এই দেবতা যে ঈশ্বর নহেন এই সন্দেহই তাঁহার অন্তরে জাগিত না। আবার কালীপূজার সময়ে কালী যে ঈশ্বর নহেন, ইহা তিনি ভাবিতেন না। দোলের সময় রাধাকৃষ্ণ যে ঈশ্বর নহেন, এরূপ কল্পনাও করিতেন না। যখন যাহার পূজা করিতেন, তখন তাহাকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন, অথবা ঈশ্বরের শক্তি জ্ঞান করিতেন। এই হাওয়ার মধ্যেই আমি বাড়িয়া উঠিয়াছিলাম। যেমন হিন্দুর দেবদেবী সম্বন্ধে তেম্নি মুসলমানের উপাস্য সম্বন্ধেও বাবার ঈশ্বর-বুদ্ধি দৃঢ় ছিল। ঈশ্বর যে এক, এই ঈশ্বর যে মাটী ও খড়ের প্রতিমা নহেন, এই ঈশ্বর যে রক্তমাংসের মানুষ নহেন, এসকল সামান্য কথা তিনি জানিতেন ও বুঝিতেন। মোস্লেম সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করা সম্ভব ছিল না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে কোন বিরোধ আছে, তাঁহার কথায়-বার্ত্তায় কখনও এ ভাব প্রকাশ পাইত না। মুসলমানের ঈশ্বর এক ও হিন্দুর ঈশ্বর অন্য, এ কল্পনা তিনি কখনও করেন নাই। এইজন্য মুসলমানের পর্ব্বাহে তিনি মুসলমান বন্ধুদিগের সঙ্গে স্বচ্ছন্দচিত্তে লৌকিকতার আদান-প্রদান করিতেন। বকর্-ঈদের সময় প্রতিবাসী মুসলমান জমীদারের বাড়ীতে ভেট পাঠাইতেন। বোধ হয়, খৃষ্টমাসের সময়ে জজসাহেবের বাড়ীতেও আমাদের বাড়ী হইতে এইরূপ ভেট যাইত।

২৭

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাস না জন্মিলেও, হিন্দুর আচারবিচারের বাঁধাবাঁধির বিরুদ্ধে অতি অল্পবয়স

হইতেই আমি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলাম। কহিয়াছি, আমাদের শ্রীহট্টের বাসায় প্রতি শনিবারে শনির সেবা হইত। শ্রীহট্টে খুব উৎকৃষ্ট কলা পাওয়া যায়। কলা, দুধ, চিনি এবং আতপ চাউল শনির ভোগে লাগিত। সোমবার ও শুক্রবার শ্রীহট্টে হাটবার ছিল। এই দুই দিন চারিদিকের পল্লী হইতে তরী-তরকারী ফল ও অন্যান্য পণ্য হাটে আসিয়া জমা হইত। প্রতি শুক্রবারের হাট হইতে আমাদের বাসায় শনির সেবার জন্য যখনকার যে ফল তাহা যত্ন করিয়া কিনিয়া আনা হইত। কলা বারমাসই আসিত। একবার শনিবারে পুরোহিত শনির ভোগ সাজাইতে গিয়া কলা পাইলেন না; চাকরকে ডাকিলেন। সে বলিল, হাট হইতে সে শনির বরাদ্দ কলা কিনিয়া আনিয়া রাখিয়াছিল। মা তখন সহরের বাসায় ছিলেন না, আর মা যখন বাসায় থাকিতেন না, তখনই আমার ভাগ্যে যত অনর্থ ঘটিত। বাবার কাণে শনির কলা নাই, একথাটা গেল। অমনি তিনি মাজেরাস্থলে গিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। চাকরের উপরে তম্বী আরম্ভ হইল। সে কৈফিয়ৎ দিল, কলা সে আনিয়াছিল, সে কলা কি হইয়াছে, এখন সে জানে না। বোধ হয় সে ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছিল যে, আমিই শনির সে কলা খাইয়াছি। দেবতার নৈবেদ্যের কলা বা অন্য কোন ফল আমি যে খাইতে পারিতাম না, এমন নহে। এসকল বিষয়ে দেবতার ভয় অপেক্ষা আমার লোভ তখন খুব বেশী হইয়া গিয়াছে। আর হওয়ারই কথা। দুর্গাপূজা বা কালীপূজার সময়ে যে ছাগ-শিশু বলি দিবার জন্য আনা হইত, বলির পূর্ব্বে যে তাহাদের প্রতি অনেকের লোভ পড়িত না, এমন কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। শনির সেবার কলাতে আমার লোভ হয় নাই, এ কল্পনা করি না। বোধ হয় আমিই এই কলা খাইয়া ফেলিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমিই যে এ অপরাধে অপরাধী, বাবা কথাটা শোনামাত্রই ধরিয়া লইয়াছিলেন, এবং আমি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র খড়ম তুলিয়া আমাকে মারিতে যান। আমি এই আক্রমণের মুখে ছুটিয়া পালাইলাম। বাবাও আমার পিছনে পিছনে ছুটিলেন। আমাদের হাতাতেই আমার এক পিসতুত ভাই ছিলেন। আমি একেবারে ছুটিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে বধূ ঠাকুরাণীর ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। আমাদের অঞ্চলের প্রাচীন হিন্দু-আচারে মামাশ্বশুরের পক্ষে ভাগিনেয়-বধূর মুখদর্শন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ঘটনাক্রমে মামাশ্বশুর ভাগিনেয়-বধূর মুখ দেখিলে তখনই স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত। সুতরাং বাবা আমার পিছনে পিছনে আমার পিসতুত ভাইয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; আমিও সেদিন তাঁহার প্রহার হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

২৮

প্রহারের ভয়ে মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস গড়িয়া উঠে না। ভিতরে যার দুষ্কর্ম্মের প্রবৃত্তি আছে, সে-প্রবৃত্তিও কখন নষ্ট হয় না। আহারাদির সম্বন্ধে হিন্দুয়ানীর বিধিনিষেধ আমি কোন দিন মানিতাম বলিয়া মনে পড়ে না। যাদের জল চল নাই, তাদের ছোঁয়া পানীয়ের বা খাদ্যের প্রতি কোন দিন আমার কোন প্রকারের বিতৃষ্ণা ছিল না। অতি শৈশবে এসকল নিষিদ্ধ খাদ্যাদি খাইতাম না। কিন্তু খাইতে কোন দিন ভিতরে কোন অপ্রবৃত্তি ছিল না। একটু বড় হইলে এসকল বিধিনিষেধ অনর্থক বন্ধন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মানুষ যাহাকে বন্ধন ভাবে, তাহাকে কখনই আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে পারে না। আমিও একটু বড় হইবার পরে পানাহার সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দু-সমাজের ছুঁৎমার্গকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করি। আমার বাবা এসকল মানিয়া চলিতেন। কিন্তু ইস্‌লাম সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া এসকল সম্বন্ধে তাঁহার কোন সরল শ্রদ্ধা থাকা সম্ভব ছিল কি না, সন্দেহ হয়।

আমার মুসলমানের তৈরী লেমনেড খাওয়ার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই লেমনেড খাইতে আমার মনে কেশাগ্র পরিমাণ দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। বাবার কঠোর শাস্তিতেও মুসলমানের ছোঁয়া জলের প্রতি আমার অন্তরে বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণার উদয় হয় নাই। কালী দুর্গা প্রভৃতি যখন মানিতাম, প্রাণ খুলিয়া দুর্গোৎসবের সময় পূজার অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম; আর্ত্ত হইলে চোখ বুঝিয়া কালীর

নিকটে মানত করিতাম; তখনও হিন্দু-আচারে যাহাকে অভক্ষ্য বলে তাহা ভক্ষণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হই নাই। আমার বাল্যকালে শ্রীহট্টে একটি মাত্র পাঁউরুটীবিস্কুটের দোকান ছিল। এই দোকানেই আবার আটা ও ময়দা পাওয়া যাইত। এই সময়ে আমাদের দূর সম্পর্কে এক ভাগিনেয় কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া গিয়া আমাদের শ্রীহট্টের বাসায় আসিয়া উঠেন। ইনি আমার অপেক্ষা বয়সে একটু বড় ছিলেন। বোধ হয় ইঁহার স্বজনেরা কলিকাতায় সামান্য ব্যবসায় করিতেন। সেই উপলক্ষে তিনি কিছুদিন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইনি মুসলমানের পাঁউরুটি-বিস্কুট যথেচ্ছ খাইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটেই আমার ও আমাদের বাসার অন্যান্য বালকদের এই অভক্ষ্য ভক্ষণে দীক্ষা লাভ হয়। খাতা-পত্র বাঁধিবার জন্য কাই দরকার হয়। এই কাই প্রস্তুত করিবার জন্য ময়দা কিনিবার অছিলায় আমরা সহরের পাঁউরুটীবিস্কুটের দোকানে ঢুকিতাম। আর এক পয়সার ময়দা কিনিয়া হাতে ধরিয়া লোককে দেখাইতে দেখাইতে এই দোকান হইতে বাহির হইতাম; কিন্তু জামার পকেটে অথবা ধুতির ভিতরে গরম গরম রুটী-বিস্কুট লইয়া আসিতাম; এবং অভিভাবকেরা রাত্রে শুইতে গেলে এগুলি বাহির করিয়া সকলে খাইতাম। এইরূপে শ্রীহট্টে থাকিতেই আমার জাত-বর্ণের বিচারের বন্ধন ভিতরে ভিতরে একেবারে ভাঙিয়া যায়।

২৯

শ্রীহট্টে অনেক দিন হইতেই একটা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। কে ইহার স্থাপয়িতা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় যেন কালিকাদাস দত্ত মহাশয় প্রথম যৌবনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। ইনি পরে কুচবেহারের দেওয়ান হন। যাঁরা শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপন করেন, বোধ হয় কালিকাদাস দত্ত মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে শ্রীহট্টে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। শ্রীহট্টে আমার পঠদ্দশার সময়ে, কালিকাদাস দত্ত মহাশয়, মৈমনসিংহে বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাঁহার উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি। সে ১৮৫৩-১৮৬৩ ইংরাজীর মধ্যে। আমি শ্রীহট্টে যাই ১৮৬৬ ইংরাজীতে। শ্রীহট্টের ব্রাহ্ম-সমাজের আমার প্রথম স্মৃতি—রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে এক বক্তৃতা হয় তাহার সঙ্গে জড়িত। এই বক্তৃতা হয় নয়াসড়ক স্কুলে। আবছায়ার মত মনে পড়ে যেন বক্তা ছিলেন গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়। সে বক্তৃতা বুঝিবার আমার তখনও বয়স হয় নাই। বক্তৃতার কথাও কিছু মনে নাই। কেবল মাত্র এটুকু মনে আছে যে, সে বক্তৃতা শুনিতে অনেক লোক গিয়াছিলেন, আমিও সে-সভায় উপস্থিত ছিলাম। ইহার কিছুদিন পরে বোধ হয় ১৮৬৮-৬৯ ইংরাজীতে, শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত মহাশয় শ্রীহট্টে যাইয়া আমাদের ইস্কুলে আমি যে শ্রেণীতে পড়িতাম, সে শ্রেণীতেই ভর্ত্তি হ'ন। সীতানাথ-বাবু এখন সীতানাথ তত্ত্বভূষণ; সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বর্ত্তমান সভাপতি। সীতানাথ-বাবুর বাড়ী শ্রীহট্টে, আমাদেরই অঞ্চলে। ইঁহার এক পিতৃব্য কলিকাতায় বড়বাজারে কড়াই-পটিতে ব্যবসা করিতেন। সেই সূত্রে শ্রীহট্টে যাইবার পূর্ব্বেই সীতানাথ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার জেঠতুত ভাই শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্ব হইতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রথম শিষ্যদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। শ্রীনাথ-বাবুর সংসর্গে সীতানাথ বালক হইলেও কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীহট্টে যাইয়া সীতানাথ আমার সহপাঠীদিগের মধ্যে কতকটা নেতৃত্ব লাভ করেন। তাঁহার উদ্যোগে শ্রীহট্টে একটি ছাত্রসমাজ বা ছাত্রদিগের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পর্য্যন্ত শ্রীহট্টে ব্রাহ্ম সমাজের নিজের কোন বাড়ী হয় নাই। স্থানীয় বাংলা বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মদিগের সামাজিক উপাসনা হইত। এই-খানেই এই ছাত্র-সমাজেরও সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস আমার সহপাঠী ছিলেন। বোধ হয় ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। সুন্দরীমোহনের বড় দাদা ব্রাহ্মসমাজ-ঘেঁসা

ছিলেন। সুন্দরীমোহন বোধ হয় তাঁহার নিকট হইতেই ব্রাহ্মমতে প্রথম দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সুন্দরীমোহন সীতানাথের এই ছাত্রসমাজের সভ্য হন। আমাদের ইস্কুলের আরও কতকগুলি বালক ও যুবক ইহাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন। এইরূপে একটা ছোট ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়া উঠে। কিন্তু আমি ইহাঁদের সঙ্গে যোগ দেই নাই। সীতানাথ এবং সুন্দরীমোহন আমাদের ক্লাসে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। আমি কোনদিনই পড়াশুনাতে ভাল ছিলাম না। ইস্কুলে ইহারা যখন প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বসিতেন, আমি তখন অনেক দূরে ও নীচে পড়িয়া থাকিতাম। সুতরাং ইহাঁদের সঙ্গে কোনপ্রকারের ঘনিষ্ঠ সখ্যের যোগ ছিল না। মতামত লইয়া আমি তখনও মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করি নাই। হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রবল অবিশ্বাস তখনও জন্মে নাই। সুতরাং ধর্ম্মের মতবাদের দিক্ দিয়া সীতানাথ প্রভৃতির ব্রাহ্মসমাজ আমাকে টানিতে পারে নাই। হয়ত পারিত, সহজ বাল্যবন্ধুত্বের আকর্ষণে। কিন্তু সে বাঁধনের তখনও সূত্রপাত হয় নাই। সীতানাথ, সুন্দরীমোহন আমাকে ও আমার মত পড়ায় অপটু সমপাঠীদিগকে আমলেই আনিতেন না। তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার কোন প্রকারের সংস্রবে আসার ব্যাঘাত জন্মায়। অভিমান অভিমানকে জাগায়; বিনয়কে জাগাইতে পারে না। পড়াশুনায় তাঁহাদের সঙ্গে আমি আঁটিয়া আসিতাম না; সে আকাঙ্ক্ষাও ছিল না, সে চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু তাঁরা ইহার সঙ্গে যে আবার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা জুড়িয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, ইহা সহ্য হইল না। সুতরাং যাহারা ইহাঁদের উপাসনা-প্রভৃতিকে উপহাস করিত, আমি তাহাদের দলে ভিড়িয়া গেলাম। যেমন একদিকে কতকগুলি নূতন ইংরাজী-নবীশ কেশবচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইরূপ আবার এক শ্রেণীর ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী কেশবচন্দ্রের বিরোধী এবং বিদ্বেষী হইয়াও উঠিয়াছিলেন। ইহারা শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজের খুব কুষ্টি কাটিতেন। ইহাদের মুখে ব্রাহ্মসমাজের বিদ্রূপ এবং কুৎসা শুনিয়া আমি বেশ আনন্দ লাভ করিতাম; এবং ব্রাহ্মসমাজের কথা উঠিলেই এসকল বিদ্রূপ ও কুৎসার আবৃত্তি করিয়া আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিতাম। ইহার মূল কারণ ছিল আমার সহপাঠী ব্রাহ্ম বালকদিগের ধর্ম্মাভিমান।

তবে আহারাদির আচারবিচারে যেমন কার্য্যতঃ হিন্দুয়ানীর সমর্থন করিতাম না সেইরূপ ধর্ম্মের মতবাদ সম্বন্ধেও কোন দিন গোঁড়ামির পক্ষপাতী ছিলাম না। ব্রাহ্মসমাজের কথা বিশেষ তখনও জানি নাই। তবে প্রাচীন হিন্দুয়ানী ও নবীন ব্রাহ্মসমাজের মাঝখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া আছেন, এ কথাটা ছাত্রাবস্থায় শ্রীহট্টে থাকিতেই শুনিয়াছিলাম। দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না। লোকমুখে কেবল এই মাত্র শুনিয়াছিলাম যে, তিনি আদিম বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার যুবক অনুচরেরা যে-ভাবে ও যে-পরিমাণে ইংরাজের অনুকরণে একটা নূতন ধর্ম্ম ও সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন দেবেন্দ্রনাথ তাহার বিরোধী হইয়াছেন। এইজন্য আমার শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি দেবেন্দ্রনাথের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীহট্টের যুবক ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বাদ বিতণ্ডায় আমি গোঁড়া হিন্দুয়ানীর পক্ষ অবলম্বন না করিয়া মহর্ষির মধ্য পথের উল্লেখ করিয়াই কেশবচন্দ্রের নূতন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপক্ষতা করিতাম। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমার তখনকার মনোভাব প্রকাশ পাইত। কেশবচন্দ্রের যুবক অনুচরদিগের ধর্ম্মাভিমানের উত্তাপই ইহারও মূলেও ছিল।

৩০

কহিয়াছি যে, আমার বাল্যশিক্ষায় বাবা চাণক্য-নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। এইজন্য আমার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে সুস্থ অবস্থায় কখনও কঠোর শাসন ব্যতীত আর কিছু পাই নাই। এই সময়ে কোনদিন আমার হাতে এক কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পড়ে নাই। কাগজ কলম বই খাতা যখন যাহা প্রয়োজন হইত বাবা তাহা বাজার হইতে আনাইয়া দিতেন। বছরে এক জোড়া জুতা বরাদ্দ ছিল। কেবল এই জুতা কিনিবার

সময় কোন বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে বাজারে যাইতে পাইতাম। নতুবা অন্য সময়ে কখনও বাজারমুখো হইতে পর্য্যন্ত পারিতাম না। ১৮৭২ ইংরাজীর পূজার সময়ে আমি যোল বছরে পা দিয়াছি আর এই সময়েই সর্ব্বপ্রথম বাবা আমার হাতে পূজার বাজারের কোন কোন সাজ-সজ্জা কিনিবার জন্য কিছু টাকা দেন। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বেলোয়ারী লণ্ঠন ও দেওয়ালগির ও শামাদানই যৎসামান্য ছিল। পূজার সময়ে মোমবাতির আলো দিয়াই যথাসম্ভব রোশনাই করা হইত। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে কলাগাছ পুঁতিয়া তার সঙ্গে চেরা বাঁশ বিঁধিয়া সারি সারি মাটির প্রদীপ দিয়া সন্ধ্যা-আরতির সময় আলোকমালা রচিত হইত। তখনও কেরোসিন তেলের আমদানী আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু বহুল ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। এই বৎসরই (১৮৭২) প্রথমে আমার হাতে টাকা পড়াতে আমাদের বাড়ীতে হিঙ্ক্‌সের ডবলউইক্ ওয়াল ল্যাম্প যায় (Hink's Double Wick Wall Lamp)—সেই আনন্দের স্মৃতি এখনও জাগিয়া আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে আমার দুর্গোৎসবের স্মৃতি লিখিয়াছিলাম। এই দীর্ঘ জীবনে নানা প্রকারের বহু আনন্দ-উৎসব দেখিয়াছি ও ভোগ করিয়াছি—কিন্তু আমাদের বাড়ীতে যে দুর্গোৎসব হইত তার মতন আনন্দ-উৎসব জীবনে কখনও দেখি নাই। এখনও তার আমেজ প্রাণে লাগিয়া আছে। শরতের প্রাতঃ-সূর্য্যের আলোকে এখনও প্রাণে সে-আনন্দের সাড়া জাগে। দুর্গোৎসবের পূর্ব্বের পক্ষকে পিতৃপক্ষ কহে। আজিকালিকার বালকেরা বোধ হয় পিতৃপক্ষের কোন পরিচয়ই পায় না। আমার বাল্যে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যূষে প্রায় সকল ভদ্র গৃহস্থই প্রাতঃস্নান করিয়া আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন। সেই তর্পণের মন্ত্রে পল্লীর সমস্ত জলাশয়ের তীর মুখরিত হইয়া উঠিত। সে-দৃশ্য ও সে-মন্ত্রের ধ্বনি এখনও যেন চোখে ভাসিতেছে ও কাণে জাগিতেছে। পিতৃপক্ষ আসিলেই আমরা বুঝিতাম, পূজার আর দেরী নাই। মহালয়ার দিন হইতেই দেওয়ানী আদালত বন্ধ হইত, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্কুলেরও ছুটী হইত। বাবা নিয়মিতরূপে মহালয়ার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতেন, কোন বৎসর বা সহরেই এই শ্রাদ্ধ করিয়া পরে পূজার জন্য বাড়ী যাইতেন; কোন কোন বৎসর বা বাড়ীতে যাইয়াই এই শ্রাদ্ধ করিতেন। সেই বাড়ী যাওয়ার আনন্দ জীবনে ভুলিব না। বৎসরান্তে আমাদিগকে পাইয়া গ্রামবাসীর কি আনন্দ! আর পূজার আনন্দ! তার তুলনা দিতে পারি পর-জীবনে এমন কিছু পাই নাই। পৌত্তলিকতা কাহাকে বলে, তখনও তাহা জানি নাই। কিন্তু ওই প্রতিমা দেখিয়াই অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতাম। তার পর পূজার সময়ের অতিথিঅভ্যাগতের অভ্যর্থনার আনন্দ। বোধন হইতে প্রতিদিনের চণ্ডীপাঠ। অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতাম না। কিন্তু সেই পাঠের ধ্বনিই যেন "হৃৎকর্ণ রসায়ন" ছিল। পূজার পূর্ব্ব হইতেই গ্রামে গ্রামে গানের দল গড়িয়া উঠিত। সখের যাত্রার দল নহে। আমাদের দেশে এসকলকে "সখী-সংবাদের" দল কহিত। ইহারা একরূপ পদাবলীই গান করিত। তখন জানি নাই এখন বুঝিয়াছি যে, এইসকল সখের কীর্ত্তনের দল কখনও বা মান, কখনও বা বিরহ, কখনও বা কুঞ্জভঙ্গ পালাই গান করিত। দুই তিন দল মিলিয়া এক আসরে পরস্পরের প্রতিযোগিতা হইত। কলিকাতা অঞ্চলেও এক সময়ে এইরূপ গান হইত। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "একাল ও সেকাল"-এ ইহার বর্ণনা আছে। মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের সর্দ্দারেরা একে অন্যের সঙ্গে "কবির লড়াই" করিতেন। পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া বাবা আমাদের বাড়ীতে নবমীদিন রাত্রির পূর্ব্বে কখনও এই কবিগান হইতে দিতেন না। দশমী দিনই আমাদের বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে "গ্রাম নিমন্ত্রণ" হইত। সে-কথা স্মরণ করিয়া আমাদের প্রাচীন গ্রাম্য সমাজে জাত বর্ণের বিচার সত্ত্বেও কতটা সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহা বুঝিতে পারিতেছি। জাত কুলের মর্য্যাদা ছিল, কিন্তু জাত্যভিমান ছিল না। একই জাতের বা শ্রেণীর মধ্যে কুলমর্য্যাদা লইয়া রেষারেষি হইত

বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বা জাতের মধ্যে কোন প্রকারের প্রতিযোগিতা ছিল না। আর অতি নিম্নজাতির লোকের মধ্যেও একটা অপূর্ব্ব আত্মসম্মান বোধ ছিল। গ্রামের যে-সকল অসহায় গরীবেরা বার মাস প্রয়োজন মত অকুণ্ঠা সংকারে আমাদের বাড়ী হইতে চাল, ডাল, নুন, তেল চাহিয়া লইয়া যাইত, পূজার সময় অথবা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে যে ভাবে ও যে লোকের মারিফতে গ্রামের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকদিগের নিমন্ত্রণ হইত সেই ভাবে ও সেই লোকের মারিফতে গ্রামের নিম্নতম শ্রেণীর লোকদিগের নিমন্ত্রণ না হইলে তাহারা কখনও আমাদের বাড়ীতে পাত পাড়িতে আসিত না। আর বাবা যেমন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকদিগের ভোজনের সময়ে একরূপ গললগ্নীকৃতবাসে যাইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, সেই মত যাহাদিগকে অস্পৃশ্য কহে তাহারা যখন আপনাপন জাতের পংক্তি করিয়া উঠানে খাইতে বসিত, তখন বাবাকে তাহাদেরও অভ্যর্থনা করিতে হইত। আমি বড় হইলে পরিবেশনের ভার আমার উপরেও পড়িয়াছিল, আর সে-সময়ে মনে আছে, মা আমাকে সর্ব্বদা কহিয়া দিতেন, এসকল গরীব লোকদের বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করিবে। তাঁর সে কথাগুলি পর্য্যন্ত মনে আছে। তিনি কহিতেন—"তোমার বাড়ীতে ভদ্রলোকেরা যাঁরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন তাঁরা খাইতে আসেন না। তাঁরা নিজের বাড়ীতে যা খাইতে পান না এমন কিছু তুমি ইঁহাদিগকে দিতে পার না। আর ইঁহারা কি খাইলেন না খাইলেন সে-কথা লইয়া কখনও জটলা করিবেন না। গরীবেরা নিমন্ত্রণ বাড়ীতেই ভাল জিনিষ খাইতে পায়। আর তাদের মুখেই ভদ্রপরিবারের সুনাম-দুর্ণাম রটে। তারা তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলে তাদেরই বেশী করিয়া যত্ন ও আদর করিবে।"

প্রাচীন গ্রাম্য জীবনের সাম্য সম্বন্ধে আরেকটা কথা মনে পড়িল। আমাদের গ্রামের নিকটেই একজন খুব বড় জমিদার ছিলেন, জাতিতে তেলী বা কলু। আমাদের অঞ্চলের তেলীদিগের মধ্যে সামাজিক পংক্তিভোজনে এই প্রথা ছিল যে, তাহারা এক-একটা মোটা মুলীবাঁশের উপরে দশ পনর জন করিয়া সার দিয়া খাইতে বসিত। কলা-পাতায় খাদ্যাদি পরিবেশন হইত, আর কাঁসার বা পিতলের ঘটীতে পানীয় জল থাকিত, এক এক ঘটি হইতে চারি পাঁচ জন মিলিয়া পান করিত। একবার এই জমিদার জ্ঞাতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পিঁড়ি পাতিয়া থালা গ্লাশ সাজাইয়া করযোড়ে যাইয়া তাহাদিগকে আহার-স্থলে ডাকিয়া আনিলেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জ্ঞাতিবর্গ খাইতে চলিলেন। খাবার-ঘরের দরজায় যাইয়া ইঁহারা দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৃহস্বামী করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে বসিতে অনুরোধ করিলেও ইঁহারা নড়িলেন না। তখন তাঁর কি অপরাধ হইয়াছে ইহা জানিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে একজন সকলের মুখপাত্র হইয়া কহিলেন যে,"তুমি কি আমাদিগের অপমান করিবার জন্য এই নিমন্ত্রণ করিয়াছ? তুমি ধনী, তোমার ঘরে বিস্তর থালা গ্লাস আছে—আমরা গরীব, তোমাকে যখন আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিব, তখনত এইরূপ পিঁড়ি সাজাইয়া খাইতে দিতে পারিব না। এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমাদের আর সামাজিকতা চলে না; আমরা তোমাদের বাড়ীতে আর জলগ্রহণ করিতে পারি না।" জমিদার-মহাশয়ের তখন চৈতন্য হইল। টাকার জোরে যে তিনি স্বজনবর্গের চাইতে উঁচু হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বিফল হইল। পরে প্রাচীন রীতি অনুসারে মুলীবাঁশ ও কলাপাতা আনিয়া খাওয়াইবার আয়োজন করিতে হইল।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(৬)

চঞ্চলা যখন ঘরে আসিয়াছে গৌরী তখনও ঘুমায় নাই। অনিমার হাত বাঁধা হইয়া যাইবার পর তাহার ঘরে গৌরী গিয়াছিল। সেখানে আপনার উপস্থিতিটা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া বেশ খানিকটা বিরক্ত হইয়াই সে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। বিরক্তিটা আরও একটু বাড়িল যখন শুনিল, ঘরের ভিতর একলা চঞ্চলার কাছে সঞ্জয় তাহার আট বৎসর আগেকার কি সব স্মৃতির কথা ব্যথিত স্বরে বলিয়া যাইতেছে। তবু গৌরী মনে করিয়াছিল যে, চঞ্চলা হয়ত এখনই ফিরিয়া আসিবে এবং আপনা হইতেই এমন দুই চারিটা কথা বলিবে যাহাতে গৌরীর মনের সমস্ত বিরক্তিটা কাটিয়া যাইবে।

কিন্তু চঞ্চলা ত ফিরিয়া আসিল না। কলেজের বই-খাতাগুলা লইয়া পাতা নাড়া-চাড়া করিয়া গৌরী অনেকক্ষণ পড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু চঞ্চলা বুঝি এই আসে এই আসে করিয়া বইয়ের পাতায় তাহার মন এক বিন্দুও বসিল না। কৌতূহল ও একটা বিরক্তিতে তাহার মনটা ছট্‌ফট করিতেছিল। এত রাত্রি হইয়া যাইতেছে তবু চঞ্চলা আসে না কেন? আশ্রমের বাড়ীতে রোগীর ঘরে ডাক্তারের সঙ্গে এত রাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা বলার অর্থ লোকচক্ষে যে কি চঞ্চলা কি তাহা জানে না? গৌরীর ইচ্ছা করিল আর একবার সে ঘরে গিয়া চঞ্চলাকে একটা ডাক দেয়; কিন্তু এ কয়দিন চঞ্চলার সঙ্গে তাহার কথাবার্ত্তা খুব বেশী নাই বলিয়া কাজটা শোভন হইবে কিনা তাহার সন্দেহ হইল। সে শ্রান্ত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। রাত্রে সে খাইত না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া এবং চঞ্চলার সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব বিচিত্র কল্পনা করিয়া গৌরীর যখন মনে হইতেছিল রাত বুঝিবা ভোর হইয়া যায়, তখন চঞ্চলা ধীর পাদক্ষেপে ঘরে ঢুকিল। সঞ্জয় যাইবার পর বাস্তবিক তখন ঘণ্টা দুই মাত্র কাটিয়াছে। গৌরীর অধীর মনের কাছে তাহাই সারারাত্রি বলিয়া মনে হইতেছিল।

চঞ্চলা মনে করিয়াছিল গৌরী ঘুমাইয়াছে। অনিমার ঘরে বুড়ী ঝিকে শুইতে বলিয়া সে এতক্ষণ হৈমবতীর ঘরের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপনার উন্মত্ত মনটাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। একটা দুরন্ত হিংসা ও রাগে তাহার বুকের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে আপনাকে আর সাম্‌লাইতে না পারিয়া রুদ্ধ ক্রন্দনের বেগ চাপিয়া বিছানায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু ভিতরটা কি তাহার শুকাইয়া গিয়াছিল? কাঁদিয়া মনের জ্বালাটা নিভাইয়া দিতে ত সে পারিল না! কান্নাটা ভিতরে ভিতরে গুম্‌রাইয়া যেন বজ্রের মত জ্বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতে চাহিতেছিল; তাহাতে বর্ষণের চিহ্ন নাই।

চঞ্চলা বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। সমাজ সংসার মানুষ ধর্ম্ম সকল কিছুকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে পারিলে যেন আজ তাহার মনের শান্তি হয়। মনে পড়িল আজ ছয় সাত বৎসর আগেকার কথা।

তাহার পিতা তখন তাহাকে দুই এক মাস অন্তর দেখিতে আসিতেন। সে তাঁহাকে বলিত "কাকাবাবু"। সেই সদা-হাস্যময় স্নেহার্দ্র মুখের ছবি তাহার চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল। তাহাকে কাছে টানিয়া মাথায় একটা থাব্‌ড়া দিয়া প্রায়ই তিনি বলিতেন, "চঞ্চল, তুই বড় হ'য়ে ডাক্তার হবি?" সে বলিত, "ভয় করে, কাকাবাবু।" কেমন আশ্বাসভরা স্বরে তিনি বলিতেন, "ভয় কি রে? তুই ডাক্তার হ'লে আমাদের সব অসুখ সারিয়ে দিবি।" স্নেহভরে এম্‌নি কত কথাই তিনি তাহাকে বলিতেন।

প্রতিবার তাঁহার সঙ্গে তাহার জন্য আসিত নূতন কাপড় জামা খেলনা বই কত কি!

কিন্তু একটা আঘাতেই সেই অতদিনের সম্পর্ক সেই রক্তের বন্ধনও অনায়াসে ছিন্ন হইয়া গেল। এই কি পিতার প্রাণ? কই সঞ্জয়কে আজ এম্‌নি করিয়া ছাড়িয়া যান দেখি তিনি!

চঞ্চলা কি অপরাধ করিয়াছিল? যিনি সত্য অপরাধী তাঁহারই অপরাধের বোঝা দিন দিন যেন আরও ভারী না হয়, এক মিথ্যাকে ঢাকিতে শত মিথ্যার সৃষ্টি যেন না করিতে হয়, এইজন্য সে মিথ্যার বন্ধন কাটিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল মাত্র। সেই অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া নিরাশ্রয়া বালিকা কন্যাকে তিনি অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিলেন।

কিন্তু সঞ্জয় যদি আজ সত্যই তাঁহাকে অপমানও করে, মহা অপরাধেও তাঁহার ও বিশ্বের কাছে অপরাধী হয় তবু কি তিনি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন? হীনতম পঙ্কে পড়িলেও এই সন্তানকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য তাঁহার সমস্ত দেহ মন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিবে। মানুষ বাৎসল্যের কত গান গাহিয়াছে, কত বন্দনা করিয়াছে, সে বাৎসল্য কি প্রাণ হইতে উৎসারিত রসধারা না সুবিধাবাদীর অবসর বিনোদন? রক্তের বন্ধনে না হইলে এমন হিসাব আসে কোথা হইতে?

এই যে বৈষ্ণব সাহিত্যে পরের সন্তানকে আপন করিয়া বাৎসল্যের সুরধনী বহাইয়া দিয়াছে, সে কি সমস্তই ভুয়া কথা ও ধ্বনির মালা দিয়া তৈয়ারী? এ মিথ্যার সঙ্গীত কি করিয়া এত দীর্ঘকাল টিঁকিয়া রহিল? স্বার্থে মানে এতটুকু ঘা লাগিলে যেখানে আপনার সন্তানকে মানুষ অনায়াসে ছাঁটিয়া ফেলে সেখানে পরের সন্তানকে লইয়া একি বাৎসল্য না সখের খেলা?

কত অল্প আঘাতে কাচের শৃঙ্খলের মত তাহার চারিধারের এই বাৎসল্যের বন্ধন ভাঙিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল তাহাই মনে করিয়া আজ চঞ্চলার ঠোঁটে ক্রূর বিদ্রূপের হাস্য খেলিয়া যাইতেছিল। মানুষের ভালবাসার চেয়ে পশুর ভালবাসা সত্য বেশী অটল বেশী। অসহায় সন্তানকে সে ত্যাগ করে না। এইত মাত্র কয়বৎসর আগে হৈমবতী তাঁহার এক বন্ধুকে হাঁসপাতালে পীড়িত অবস্থায় দেখিতে যাইবার জন্য চঞ্চলা নিস্তারিণী প্রভৃতি দুই তিন জনকে সঙ্গে করিয়াই বাহির হইয়াছিলেন। হাঁসপাতালে একটা সুন্দর স্বতন্ত্র ঘরে একলা শুইয়া সুন্দরী একটি মহিলা অসহিষ্ণু ভাবে কাহার জন্য যেন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হৈমবতী গিয়া পাশের চেয়ারে বসিলেন। চঞ্চলা ঘরের শেষপ্রান্তে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী ক্ষীণ স্বরে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এদিকে এস না, মা! দেখি তোমার কেমন চেহারা!"

রোগীর অদ্ভুত খেয়ালে একটু হাসিয়া চঞ্চলা কাছে আসিল। তাহার আজও মনে আছে কি করুণ চোখে রোগিণী তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। হঠাৎ চঞ্চলার হাতখানা চাপিয়া ধরিতেই চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। হৈমবতী শুধু বলিলেন, "ছি, অমন কান্নাকাটি করে না।" রোগিণী অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "কেঁদে আর কি হবে? তাকে ত আর পাব না।" চঞ্চলার হাতখানা তিনি যেন ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন।

তারপর তাহারা আর বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়ায় নাই। হৈমবতী চঞ্চলাকে বাড়ী আনিয়া নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "চঞ্চলা, মেয়েটির কান্না দেখে মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল, না?"

চঞ্চলা বলিল, "হাঁ মাসিমা, বেচারীর বুঝি মেয়ে ম'রে গেছে?"

হৈমবতী বলিলেন, "মরেনি, পর হ'য়ে গেছে?"

চঞ্চলা বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিল। হৈমবতী বলিলেন, "চঞ্চলা, তোমারই মা আজ তোমার জন্যে কাঁদ্‌ছিলেন।"

চঞ্চলা চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, "না, না, না, কাকা-বাবু বলেছেন, আমি যখন এখানে আসি তারপরই আমার মা মারা গেছেন।" কিছুতেই চঞ্চলা এ কথা বিশ্বাস করিতে চায় নাই। ছেলেবেলাকার দেখা সেই মা'র জন্য তাহার নিঃসঙ্গ মন বারবার কাঁদিয়াছে, তাহাকে পাইবার জন্য কত অসম্ভব কল্পনা করিয়াছে, মৃত্যু অকস্মাৎ স্বপ্নের মত মিথ্যা হইয়া গেলে কি আনন্দ হয় ভাবিয়া মাতৃস্নেহবঞ্চিত শিশু মনকে আপনি ভুলাইয়াছে, কত

বার ভাবিয়াছে হয়ত মা আসিয়া অকাস্মাৎ একদিন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিবে,"ওরে, আমি মরিনি, তোর কাকা-বাবু ভুল করেছিল। আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম।" কিন্তু আজ যখন শুনিল এই তাহার মা বাঁচিয়া রহিয়াছে তখন মনে বিশ্বাস জাগিল কই? মা! এই কি মা? সত্য মায়ের ছবি তাহার মন হইতে কবে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু বঞ্চিত তৃষিত শিশু যে মাতৃমূর্ত্তি গড়িয়া মনে মনে ভালবাসিয়াছিল, সেত এমন নয়। সে অপরূপ রূপে ঘর আলো করিয়া মধুর হাস্যে সকল জ্বালা জুড়াইয়া দুই বাহুর নিবিড় বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়া বুকের ভিতর তাহাকে লুকাইয়া অজস্র স্নেহের প্লাবনে তাহাকে ডুবাইয়া দিবে। সেই মহীয়সী সাম্রাজ্ঞী-মূর্ত্তি কই? একি দীন মাতৃ-স্নেহ? একবার তাহার হাতখানা মাত্র স্পর্শ করিয়াই ছাড়িয়া দিল।

হৈমবতী তাহার অবিশ্বাস দেখিয়া তখন আর কিছু বলেন নাই। কিন্তু কথাটা চঞ্চলার মনে ঘুরিতেছিল। তখন তাহার বাহিরের শৈশব বহু দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই অন্তরের শিশুকে সে বুঝাইতে চেষ্টা করিত। হইতেও পারে,এই ম্লানমুখী করুণ-নয়না সুন্দরীই হয়ত বা তাহার মা। কেন তাহার মা তাহাকে ছাড়িয়া গেলেন জানিতে ইচ্ছা করিত।

চঞ্চলা হৈমবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, মাসিমা, সত্যিই যদি তিনি আমার মা, তবে আমাকে কোনো দিন কাছে নিয়ে যান না কেন?"

হৈমবতী বলিলেন, "তুমি তাতে অশেষ দুঃখ পাবে মা, তাই নিজেকে বঞ্চিত ক'রে তোমার মা তোমাকে পরের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ তাঁর স্বেচ্ছাকৃত প্রায়শ্চিত্ত।"

চঞ্চলা বুঝে নাই। বহু বেদনা দিয়া ও পাইয়া হৈমবতী সে-কথা চঞ্চলাকে বুঝাইয়াছিলেন। অবশেষে চঞ্চলা বুঝিল; কিন্তু তাহার সমস্ত ভালবাসা আক্রোশ হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। মা ত তাহাকে আপনা হইতেই ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু মিথ্যার ভাণ করিয়া যে পিতা তাহার সত্য সম্পর্ককে দয়ার অবমাননা করিতে আসে কোনো সম্পর্ক রাখিতে চায় না সে তাহার সঙ্গে। সে বলিল, "আমার বাবা যদি আমাকে মেয়ে ব'লে ঘরে স্থান না দিতে পারেন, সম্বন্ধটুকুও স্বীকার কর্‌তে না চান তাহ'লে আমি তাঁর এক পয়সাও আর চাই না। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

একথা শুনিয়াই হৃষিকেশ আসা-যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। একটা বোঝাপড়াও করিতে চাহিলেন না; কেবল মাসের শেষে তাহার জন্য কিছু টাকা পাঠাইয়া দিলেন। চঞ্চলা বলিল, "মাসিমা, আপনি আমাকে অনেক দিয়েছেন, কিছুদিনের জন্যে যদি আমার অন্নের ভারটুকুও নেন, তাহ'লে আমার আর এ অপমান সইতে হয় না। আপনার স্নেহের ঋণ আমি প্রাণ দিয়ে শোধ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব, কিন্তু ও টাকা আমি ছোঁব না।"

টাকাও বন্ধ হইয়া গেল। নাট্যশেষের মত পিতাও কন্যার মাঝখানে একটা দুর্ভেদ্য যবনিকা পড়িয়া গেল। তাহার পর কেহ আর কাহারও খোঁজ রাখে নাই। তাহার পিতার স্নেহের এই পরিণাম; এই ভালবাসা, এই দায়ীত্ব-বোধ!

চঞ্চলার রাত্রি এম্‌নি করিয়াই ভোর হইল। তাহার একটু দূরেই আপনার বিছানায় পড়িয়া কত রাত পর্য্যন্ত গৌরী চঞ্চলার অধীর দেহমনের আক্ষেপ অনুভব করিয়াছে। ঘুম তাহারও চক্ষে আসিতেছিল না; কিন্তু তবু চঞ্চলাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও তাহার হইতেছিল না।

গৌরী নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। চঞ্চলা তাহার কে যে রাত জাগিয়া তাহার জন্য সে মাথা ঘামাইয়া মরিতেছে? সে এখানে আসিয়াছে আপনার উন্নতির জন্য এবং পরসেবার জন্যও বটে। কিন্তু যে পরের সঙ্গে সকল সম্পর্কই সে চুকাইয়া দিতে চায় এবং গৌরীর ভাবনায় চিন্তায় যাহার কিছুই আসে যায় না সেই পরের চিন্তায় এত মত্ত হইয়া উঠাও কি একটা পাগলামি নয়? এমন পাগলামি ত তাহার কোনো দিন ছিল না। আজ হঠাৎ তাঁহাকে ইহা পাইয়া বসিল কেন?

ভাবিতে ভাবিতে মাঝরাত্রে গৌরী ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোর বেলা যখন তাহার ঘুম ভাঙিল দেখিল ঘরে চঞ্চলা নাই।

(৭)

সকালবেলা জানালা দিয়া মুখ বাহির করিতেই চূর্ণ বৃষ্টির কণায় গৌরীর মুখ ও মাথার চুল ভিজিয়া গেল। মেঘলা আকাশের ফিকা রৌদ্র ও ভিজা বাতাসে দিনের চেহারাটা অনেকখানি স্নিগ্ধ দেখাইতেছিল। বাহিরে তাকাইতেই গৌরীর মনে হইল যেন কাহার স্নেহসিক্ত হাতের শীতল স্পর্শে তাহার সমস্ত অবসাদ কাটিয়া গিয়াছে। শরীরের অবসাদের সঙ্গে মনের বিরক্তিও অনেকখানিই দূর হইয়া গিয়াছিল বলিয়া চঞ্চলার প্রতি মনটাও তাহার অনেকখানি সদয় হইয়া উঠিল। সারা রাত্রি এমন করিয়া কাটাইয়া সকালবেলাই সে কোথায় গেল একটু খোঁজ করিতে ইচ্ছা করিল।

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া গৌরী অনিমার ঘরে গিয়া দেখিল চঞ্চলা অনিমার চুল ও বেশ-ভূষার একটু সংস্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে। দীর্ঘ জাগরণের ক্লান্তিতে তাহার সতেজ ও সুন্দর মুখশ্রী রোদপোড়া ফুলের মত শুকাইয়া গিয়াছে। এক রাত্রির ঝড়ে তাহার ভিতরে বাহিরে কি যেন একটা প্রলয় হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখের হাসি নিভিয়া গিয়া তাহাকে চেনা যায় না প্রায়। গৌরীর সমস্ত মনটা করুণায় ভরিয়া গেল। তাহারই এত কাছ দিয়া কাল সারারাত যে ঝড়টা বহিয়া গেল, তুচ্ছ কি একটা অভিমানের বশে সে তাহা ফিরিয়াও দেখে নাই। তাই আজ কল্পনার চোখে অন্ধকার রজনীর কোলে সেই একান্ত নিঃসঙ্গ সন্তপ্ত মানুষটির বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাসের ছবি ফিরিয়া দেখিয়া নিজের হৃদয়হীনতায় সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

মনে পড়িয়া গেল নিজের জীবনের সেই প্রথম দুঃখ-বোধের দিনের কথা, যেদিন পিতার মুখে আপনার মন্দভাগ্যের কথা সে শুনিয়াছিল। পিতা-মাতার স্নেহ-ক্রোড়ে বসিয়াই সেদিন সমস্ত বিশ্বটা তাহার কাছে শূন্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। পৃথিবীর যা কিছু সুখশান্তি, আনন্দ আরাম, মানমর্য্যাদা যেন সেই একটা কথার জ্বালায় কে পুড়াইয়া দিয়াছিল। তবু তখনও বৈধব্যের প্রকৃত মর্ম্ম সে বোঝে নাই, অনাথ অসহায়ের জীবন-কি তা' কল্পনাও করিতে জানে না। তারপর দিনে দিনে তিলে তিলে যত সে বুঝিয়াছে, জগৎকে চিনিয়াছে, আপনার ভাগ্যলিপি স্পষ্ট করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, ততই সে অন্তরের আগুন তাহার বঞ্চিত জীবনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তবু আজও তাহার পৃথিবীতে আপনার বলিবার মানুষ আছে। কিন্তু চঞ্চলার ত কেহ নাই। যাহারা আছে তাহারা ত থাকিয়াও নাই। মৃত্যু যাহাকে নিঃসঙ্গ করে সে পাইয়া হারায়; কিন্তু এ যে না পাইয়াই হারানো। চিররঞ্চিতা চঞ্চলা!

চঞ্চলার যে মন্দভাগ্যের ইতিহাস একদিন গৌরীকে তাহার প্রতি বিরূপ করিয়াছিল, আজ তাহাই তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল। সর্ব্বক্ষেত্রে অগ্রবর্ত্তিনী গর্ব্বিতা তেজস্বিনী চঞ্চলার প্রতি গৌরীর মনে একটা ঈর্ষা জাগিয়াছিল। তাহার ইতিহাস সেই ঈর্ষার উপর বিতৃষ্ণা জুড়িয়া গৌরীকে সম্পূর্ণ বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। আজ ব্যথাতুরা চঞ্চলার ম্লান মুখ গৌরীর মনে বাৎসল্য জাগাইয়া তুলিল।

কাল রাত্রে চঞ্চলাকে সে যখন দেখিয়াছিল উৎফুল্ল মুখে সঞ্জয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে, তখন ত তাহার মুখে এই ঝঞ্ঝার কোনো ছায়া দেখে নাই; ফিরিয়া যাইতে যাইতে সে যাহা শুনিল তাহাও ত বন্ধুজনের স্মৃতি-কথার মধুর আলোচনা মাত্র। কিন্তু তাহার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, চঞ্চলার দেখা নাই। গৌরী কল্পনার সে অদেখা মুহূর্ত্তগুলির ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিল। সঙ্গীহীনা চঞ্চলার মনে বাল্যস্মৃতি জাগাইয়া সঞ্জয় তাহার বন্ধুত্বকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। কিন্তু বাল্যের ভিত্তিমাত্রের উপর যৌবনের বন্ধুত্ব কি সকল সময় গড়া যায়? তাহাতে অন্য মাল-মশলা আপনি আসিয়া পড়ে। এখানেও কি আর তাহা হয় নাই?

গৌরী মানসচক্ষে দেখিল, চঞ্চলার মন্দভাগ্যই এখানে তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সঞ্জয়ও চঞ্চলার মাঝখানে দাঁড়াইয়া এই অদৃশ্য শত্রু চঞ্চলার সকল সুখ-শান্তি শুষিয়া খাইতেছে। চঞ্চলার মন্দভাগ্যের ইতিহাস

কেবল কাণে শুনিয়া গৌরীর দেহের ব্রাহ্মণ-রক্তধারা অশুচিতার আশঙ্কায় শিহরিয়া সরিয়া গিয়াছিল, আজ চোখে তাহার ক্লিষ্ট বেদনাহত মূর্ত্তি দেখিয়া সেই মন্দ-ভাগ্যের প্রতিই গৌরীর অন্তরের ব্রাহ্মণ্য তাহার দাক্ষিণ্য ও করুণা জাগাইয়া তুলিল।

কাছে আসিয়া একেবারে অকস্মাৎ চঞ্চলার হাতখানা ধরিয়া গৌরী বলিল, "চঞ্চলা, তোমার মুখখানা যে, ভাই, একেবারে শুকিয়ে গেছে। তুমি একটু শোও গিয়ে, তোমার কাজগুলো আমি ক'রে দিচ্ছি।"

চঞ্চলা বিস্মিত হইয়া গৌরার মুখের দিকে তাকাইল। এই গৌরীই না আজ কতদিন তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছে? আজ আবার সে এত কাছে আসে কেন? চঞ্চলা একবার হাতখানা সরাইয়া লইতে গেল, কিন্তু পারিল না। গৌরী তাহাকে গলা জড়াইয়া একেবারে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, "ইস্, কি হ'য়ে গেছ! কাল সারারাত ঘুমোও নি, আমি টের পেয়েছি। যাও শীগ্‌গির মুখ-হাত ধুয়ে ঘরটা অন্ধকার ক'রে শুয়ে পড় গিয়ে। আমি তোমার খাবার নিয়ে যাব এখন। আর মাসিমাকে বল্‌ব যে, তোমার আজ শরীর খারাপ আছে।"

চঞ্চলাকে প্রায় টানিয়া গৌরী ঘরের বাহির করিয়া দিল। তাহার পর ফিরিয়া অনিমার কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইয়া চুল আঁচড়াইয়া মুখ ধোওয়া খাওয়া ব্যাণ্ডেজ দেখা ইত্যাদি সারিয়া একটা বাংলা গল্পের বই এক হাতে দিয়া তাহাকে জানালার ধারে বসাইয়া দিল।

সারাদিন চঞ্চলার খুঁটি-নাটি সমস্ত কাজ গৌরী করিয়া বেড়াইল। হৈমবতীকে বলিয়া তাহার সমস্ত খাবার ইত্যাদি উপরে পৌছাইয়া দিয়া আসিল; চঞ্চলাকে মোটে ঘর হইতে বাহির হইতে দিল না।

সন্ধ্যায় সঞ্জয় আসিল অনিমাকে একবার দেখিতে এবং নাইট ইস্কুলের ছেলেদের তদারক করিতে। আজ তাহার একলার আসিবার পালা ছিল, কিন্তু সে কোথা হইতে অপূর্ব্ব ও সঞ্জয়কে জোগাড় করিয়া দলে বেশ ভারী হইয়া আসিয়াছে। অনিমার হাতটা যেভাবে ভাঙিয়াছে তাহাতে আর একজন ডাক্তার আনিবার যে বিশেষ দরকার ছিল তাহা মনে হয় না; বাস্তবিক হাতখানা ভাঙেই নাই, শুধু হাড়টা সরিয়া গিয়াছে মাত্র। কিন্তু তবু সঞ্জয় শঙ্করকে সঙ্গে না করিয়া অনিমার ঘরে ঢুকিল না।

ঘরের ভিতর কে যে আছে সঞ্জয় হয়ত মুখ তুলিয়া দেখিতই না, যদি না শঙ্কর গৌরীকে দেখিয়া কথা বলিয়া উঠিত। শঙ্কর বলিল, "কি হয়েছে রে, গৌরী, অমন ক'রে প'ড়ে গেল কি ক'রে, বেচারী?"

গৌরী বলিল, "বৃষ্টিতে সিঁড়িটা বড় পিছল হয়েছিল, তাই—"

গৌরীর গলার স্বরে সঞ্জয় চমকিয়া মুখ তুলিয়া তাকাইল। গৌরী দেখিল ঝড় কেবল এক জায়গাতেই বহে নাই, সঞ্জয়ের মুখের সমস্ত দীপ্তি এবং হাসিও তাহা নিভাইয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে ঝড়েতে শুধু সে যে নুইয়া পড়িয়াছে তাহা নয়; তাহাকে দেখিলে মনে হয় সারারাত্রি সে যেন কোনো দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। তাহার মুখের আনন্দ ও উৎসাহের দীপ্তি নিভিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু চোখে আগুনের হল্‌কা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গৌরী কল্পনায় যে নাট্যলীলার ছবি দেখিয়াছিল, সঞ্জয়কে দেখিয়া তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো সন্দেহ রহিল না। যৌবনের মাধুর্য্য বাল্যস্মৃতির রসে মধুরতর হইয়া এই দুইটি মানুষকে যে পরস্পরের কাছে টানিয়া আনিতেছিল তাহা বুঝিতে আর বাকি কি আছে? কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা অন্তরালে বসিয়া যে বজ্র হানিয়াছেন তাহার আঘাত কি ইহারা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, না পারিবার কোনো উপায় আছে?

চঞ্চলা চপলা ও গৌরী যখন ছেলেদের সঙ্গে এই কাজে নামিয়াছিল তখন গৌরীর বিশ্বাস ছিল কাজে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দেখাইয়া কাজ কাহাকে বলে সে সকলকে দেখাইয়া দিবে। কিন্তু চঞ্চলার মত চট্‌ করিয়া সকল কাজের হালটা আগে আসিয়া ধরিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না বলিয়া মনের ইচ্ছা যতই প্রবল হোক এবং কাজে নিষ্ঠা যতই গভীর হোক, সঞ্জয় ও শঙ্করের চোখে সে চঞ্চলার পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল। নিজের আচার নিষ্ঠা বজায় রাখিতে গিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্বের

গৌরবের যে আরও হানি করিয়া বসিতেছিল। অথচ এম্‌নি করিয়া ক্রমশ পিছন হইতে পিছনে চলিয়া যাইতে তাহার আত্মসম্মানেও লাগিতেছিল। যে শঙ্কর এত আশা করিয়া তাহাকে আনিয়াছিল সেই শঙ্করের চোখেও যে ইহাতে সে ছোট হইয়া যাইতেছে, তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা দলিত করিয়া ফেলিতেছে—এই লজ্জাও ভিতরে ভিতরে কয়দিন ধরিয়া তাহাকে খোঁচা দিতেছিল। সে ত সংসারকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সংসারও আপনার প্রয়োজনের গণ্ডীর ভিতর হইতে তাহাকে অতি শৈশবেই ছাঁটিয়া দিয়াছে, তবে সংসারের তুচ্ছ আচার-বিচারকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া বাহিরকে কেন সে প্রাচীর তুলিয়া আড়াল করিতে চায়? গঙ্গাজল তাম্র-কলসের বন্ধনীতে বাঁধা পড়িলে ঘর পদে পদে তাহার পবিত্রতা বাঁচাইয়া চলে, কিন্তু বাহিরের চলন্ত স্রোতস্বিনী অপরের অঙ্গের সকল অশুচিতা ও অপবিত্রতা বুক পাতিয়া লইয়া তাহাদেরই পবিত্র করিয়া দেয়; ইহাতে তাহার অশুচি হইবার কোনো ভয় নাই।

গৌরীকে যে আপনার ব্যক্তিত্বের আড়ালে ফেলিতে বসিয়াছিল আর যাহার চোখ দিয়া তাহার নিজের ভাইও তাহার বিচার করিতে সুরু করিয়াছিল সেই চঞ্চলা ও সঞ্জয় দুইজন মানুষকেই আজ নিষ্ঠুর বিধাতার হাতে ক্রীড়নকের মত অসহায় দেখিয়া গৌরী যেন অকস্মাৎ তাহাদের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সঞ্জয়ের দিকে তাকাইয়া আপনা হইতেই গৌরী বলিল, "সঞ্জয়বাবু, আমরা রুগীকে দিয়ে রুগী দেখাই না। আপনার যে-রকম চেহারা দেখ্‌ছি তাতে আজ ত ঘর থেকেই আপনার বেরোনো উচিত ছিল না। ছোড়দাই আজ ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি দেখ্‌বে এখন; আপনি এখানে ব'সে একটু জিরোন দেখি; মাসিমাকে ব'লে আপনার তদ্বিরের একটা ব্যবস্থা ক'রে আসি।"

গৌরীকে এমন সপ্রতিভভাবে এতগুলা কথা বলিতে দেখিলে অন্যদিন হইলে সঞ্জয় বিশেষ বিস্মিতই হইত; কিন্তু আজ চঞ্চলার বদলে গৌরীকে এখানে দেখিয়া সে এতটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, তাহার কথার নূতনত্বের দিকে নজর দিবার অবসরই তাহার হয় নাই। চঞ্চলার আসন্ন উপস্থিতির ভয় হইতে মুক্তি পাইয়া সে তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল। খানিক পরে গৌরী নিজের হাতেই একগেলাস ঘোলের সরবৎ ও এক রেকাবী আম ও সন্দেশ লইয়া ঘরে ঢুকিল। সঞ্জয়ের সম্মুখে সেগুলা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "নিন, এই ক'টা খেয়ে ফেলুন। খেটে খেটে নিজেদের প্রাণগুলোই যদি বার ক'রে ফেলেন তবে বিশ্বের যে কাজগুলো ঘাড়ে করেছেন সেগুলো কর্‌বেন কি ক'রে বলুন দেখি! সত্যি, পৃথিবীতে যে মানুষদের সবচেয়ে নিজের যত্ন করা উচিত, তারাই যে কেন সকলের চেয়ে নিজেকে তাচ্ছিল্য করে আমি ভেবে পাই না।"

এতক্ষণে সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, "যত্ন করাই যাঁদের কাজ তাঁরা এইরকম বোকা লোকদেরই বেছে বেছে বেশী যত্ন করেন ব'লে ওতে আমাদের একটা মস্ত লাভও হয়।"

শঙ্কর বলিল, "গৌরী, তোর ঘোলের সরবতের বাহাদুরী আছে; সঞ্জয়ের প্রলয়-গম্ভীর মুখে আজ যে হাসি ফোটাতে পারে সে কম লোক নয়। আমি আজ যখন ওর বাড়ীতে গেলুম তখন ওর মুখ দেখে মনে হয়েছিল বোধহয় কাল রাত্রের ঝড়ে একসঙ্গে ওর স্ত্রীপুত্রকন্যা সব বাড়ীচাপা প'ড়ে মারা গেছে। সেই রাগে ও পারে ত স্বয়ং বিধাতাকেই ধ'রে গলা টিপে দেয়।"

সঞ্জয় আর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হাসিটা তাহার গাম্ভীর্য্যের চেয়েও গৌরীকে বেশী দমাইয়া দিল। গৌরীর মনে পড়িয়া গেল কতকাল আগের দেখা তাহার পিতার মুখের সেই ম্লান হাসি। সিঁদুর লোহা পরা লইয়া মার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সে যখন বাবার কাছে রায় লইতে গিয়াছিল, তখন তিনি এম্‌নি হাসি হাসিয়াই গৌরীকে ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গৌরী বুঝিল, সঞ্জয়ের দুঃখটা নিতান্ত একটা চোখের নেশার রোমান্সের ব্যাপার নয়; ইহাতে গভীর কিছু আছে। পিতার বেদনাক্লিষ্ট মুখের হাসি দেখিয়া তাহার বুকটা যেমন টন্‌টন্ করিয়া উঠিয়াছিল তেম্‌নি করিয়াই আজ তাহার বুকটা হঠাৎ ব্যথায় কাঁপিয়া উঠিল, এতকাল পরে ঠিক সেই তন্ত্রীটিতে আঘাত পাইয়া।

গৌরী বলিল, "স্ত্রীপুত্র ম'রে যাওয়ার চেয়েও বড় দুঃখ মানুষের আছে। এমন দুঃখও আছে মৃত্যুশোকই একমাত্র যে দুঃখকে শেষ ক'রে দিতে পারে।"

চঞ্চলার মুখখানাই গৌরীর বারবার মনে পড়িতেছিল। সঞ্জয়কে যদি সে কোনো বন্ধনে বাঁধিয়া থাকে তবে তাহার ফলে বেদনা ছাড়া আর কি মিলিবে দুজনের ভাগ্যে? যদি সে-বন্ধন সত্য বন্ধন হয় তবে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু কি সে বন্ধন-ব্যথা ঘুচাইতে পারিবে?

সঞ্জয় একবার গৌরীর মুখের দিকে তাকাইল। দেখিল শঙ্করের মত পরিহাসের হাসির লেশমাত্র তাহাতে নাই, পরের বেদনায় লোকদেখানো সহানুভূতির নকল গাম্ভীর্য্যও নাই; সে মুখে যাহা ফুটিয়াছে তাহা প্রকৃতই দরদীর ব্যথা। উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারার তাড়নায় সঞ্জয়ের মুখ চোখ সমস্ত লাল হইয়া উঠিল। সে নিতান্ত পুরুষমানুষ, তাহাতে রোগীর ঘরের ডাক্তার তাই কোনো প্রকারে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল।

গৌরী দেখিল আলোচনাটা ঠিক পথে যাইতেছে না; সঞ্জয়ের বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করাই ত কেবল প্রয়োজন নয়; তাহার মনটাকে অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিতে হইবে।

বাহিরে পড়ুয়া ছেলেরা আসিয়াছিল, ছোট্ট অনিমার ব্যাণ্ডেজও বাঁধা হইয়া গিয়াছিল। গৌরী বলিল, "দেখুন, কাল যে আপনি আমার নূতন ছাত্রটিকে দেখ্‌বেন বলেছিলেন, চলুন আজ তাকে দেখাই। আপনি তাকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পারবেনই না, এমন কি তার ত্রাণকর্ত্তা অপূর্ব্ব-বাবুও তাকে চিন্‌তে পার্‌বেন না।"

বাহিরে টিনের চালের তলায় বারাণ্ডায় ছোট ছেলে-মেয়েরা পরস্পরের বই খাতা চুল ধরিয়া টানাটানি করিয়া বিরাট একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিয়াছিল। গৌরীদের বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহারা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কেবল একটা মিহি গলা শোনা গেল, "গুরুমা, ভেংচা কেন আমার শেলেটে নিকে দিলে?"

গৌরী সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া ডাকিল, "তারাচাঁদ।"

বারাণ্ডার খুঁটির আড়ালে দূরে অন্ধকারে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া একটি ছোট ছেলে দাঁড়াইয়াছিল, গৌরীর ডাকে সে অগ্রসর হইয়া আসিল। দিব্য সাদা ধপ্‌ধপে ধুতি কোর্ত্তা পরা, নূতন বই খাতা শ্লেট হাতে, সর্ব্বাঙ্গ সাবান দিয়া মাজা ঘসা চক্‌চকে। ছেলেদের মাঝখানে অপূর্ব্ব দাঁড়াইয়াছিল; সে লাফ দিয়া সাম্‌নে আসিয়া বলিল, "কিরে তারা, তোকে এমন বাবুসাহেব সাজিয়ে দিলে কে? নেংটি-পরা মূর্ত্তি থেকে একেবারে এত বড় প্রোমোশান?"

তারাচাঁদ সব ক'টা দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "এজ্ঞে, গুরুমা কাপড়, সাবং, তেল মত দিয়েছেন।"

সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, "কে বল্‌বে মেথরের ছেলে? একেবারে যে বামুনঠাকুরটি বানিয়ে তুলেছেন।"

গৌরী বলিল, "তারাচাঁদের একটা ছোট বোন আছে, কাল থেকে সেটাকেও আন্‌তে বলেছি। একবার ত আমার জাত গেলই, দুবার ক'রে যখন যেতে পার্‌বে না, তখন নির্ভয়ে যত খুসী অনাচার কর্‌তে পার্‌ব। মরার বাড়া ত গাল নেই; জাত যখন মরেইছে তখন তার আর বেশী ক্ষতি কি হবে?" শঙ্কর বলিল,"রাতারাতি তুই এতবড় রিফর্ম্মার হ'য়ে উঠ্‌লি, তোর হ'ল কি?"

গৌরী বলিল, "রাতারাতি ভূমিকম্প হ'লে দেবালয় আর চামারের ঘর এক হ'য়ে যায়, আমার জাত ত নেহাৎ ছোট কথা।"

ছেলেরা সার বাঁধিয়া দুলিয়া দুলিয়া নাম্‌তা পড়িতে আরম্ভ করিল; সঞ্জয় বলিল, "আজ আমি যাই, এরাই আপনার সাহায্য কর্‌বে এখন।"

গৌরী যেন নিতান্ত অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, "একটু দাঁড়ান, চঞ্চলার কাল থেকে শরীরটা খারাপ। তাকে একটু দেখে একটা ওষুধ দিয়ে যেতে হবে।"

সঞ্জয় একটু যেন ভীতভাবে বলিল, "শঙ্করকে বলুন না?"

গৌরী বলিল, "না, না, ছোড়দার ডাক্তারীতে আমার একফোঁটাও বিশ্বাস নেই; আপনি আসুন। তা ছাড়া মাসিমা ছোড়দাকে মেয়েদের ডাক্তারী করার অনুমতি ত দেননি।" সঞ্জয় আপত্তি করিতে পারিল না। গৌরীর সঙ্গে তাহাকে যাইতে হইল।

(ক্রমশঃ)

আষাঢ়-শেষে

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

তরুণ আষাঢ় আজি ফিরে যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভগ্ন প্রাণে পুঞ্জ মেঘ-উপহার লয়ে !
শুধু হায় এনেছিল ব'য়ে
নবীন আশার বাণী, তাই গেল নীরবে কহিয়া
রজনীগন্ধার কাণে যূথিকার মৃদু পরিমলে।
কণ্টকিত কেয়া-বনে, পল্লবিত ভুঁইচাঁপাদলে।

আর কা'র লাগি'
এনেছিল কোন্ অর্ঘ্য সুদূরের মায়াপুরী হ'তে,
সুপিঙ্গল ঘন কেশে তীব্র হেসে ব্যাকুল মরতে,
কেহ নাহি জানে। তাই সে বিরাগী
সঞ্চিত বেদনা তা'র দিল মেঘে, দিল বরিষণে,
পুষ্পিত কদম্ব-তলে, পরিম্লান রেণু-পরশনে !

আজি তা'র যাত্রা-পথে ঘন ঘন বাজিছে মাদল ;
বিরহীর দল
দাদুরীর উচ্চ রোলে ব্যথাঘন বরষা-নিশীথে,
বিদায়-পথিকে দিল ঘন অশ্রু-বাষ্প-উপহার।
আজি তাই বিষণ্ণ আষাঢ়
বিদায়-বেদনা-ভরে সকরুণ গীতে,
শ্রাবণ-সখারে তা'র ডাকি' দিল সজ্জিত সভায়।
তা'র পরে ধীরে ধীরে মাগি' নিল প্রশান্ত-বিদায়।

কোথায় সে কতদূর শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির শিরে—
উত্তরের পথে,
সজহীন দীর্ঘশ্বাসে কামচারী পুঞ্জ মেঘরথে,
আষাঢ় চলিল ফিরে নয়নাশ্রুনীরে,
পুঞ্জিত বেদনা বহি' রিক্ত দীন বিরহীর বেশে,
আজি তা'র বিদায়ের আয়োজন-শেষে,

কেহ নাই শুধাবার ;—
হে বিরহী তরুণ আষাঢ়,
আজি মোরে কহ ধীরে,
কা'র লাগি' চলিয়াছ ফিরে
তপস্যার আয়োজনে বিদ্যুতের বহ্নিজ্বালা বহি'—
হে কিশোর মিত্র মোর, যাও মোরে কহি' !
কোথায় সে প্রিয়া তব, যা'র লাগি' চলিয়াছ খুঁজি'
দেশ হ'তে দেশান্তরে, নদীগিরি কন্দর লঙ্ঘিয়া
অশ্রু-বাষ্পে শূন্যতল ভরি',

আতুর বনজ-বায়ু নবপুষ্প-সৌরভ আহরি'
তোমার ধূসর-কেশে ম্লান হেসে দিল সুরভিয়া !
বিমুগ্ধা প্রিয়ার লাগি' বলিয়াছ আজি তাই বুঝি—
দূরে দূরে ঘুরে মরি' ক্লান্ত-কায়ে আঁখিজলধারে।
প্লাবিয়া পর্ব্বত-নদী তবু হায় দেখা হ'ল নারে !
হে চির-তরুণ বন্ধু, আজি তব বিদায়ের দিনে,
চাহি' দূর ছায়া-ম্লান শ্যামল বিপিনে,
বিরহ-ছায়ায় মোর ভরি' উঠে সকল অন্তর।
শ্রাবণ আসিছে জানি ভরি' নদ-কান্তার-প্রান্তর
দিশে দিশে কলরোল তুলি'
নীপশাখা নীরবে আকুলি'
আজিকে চলিলে তুমি বারিসিক্ত বনবীথি দিয়া
মন্থর গমনে,
বহি' মনে মনে
ব্যাকুল চিন্তার ভার, রহি' রহি' কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বেদনার দীর্ঘশ্বাসে নিখিলের চিত্ত আকুলিয়া
[illegible] পরিচয়ে,
নিঠুর দয়িতা লাগি' নব-প্রেম, নব-বাণী ল'য়ে !

গহনা

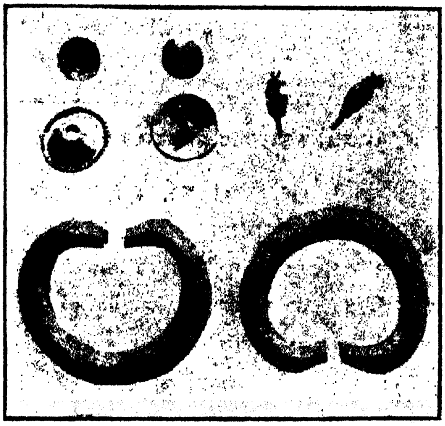
শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

দেহের শোভা বৃদ্ধির কৃত্রিম উপায় বসন ও ভূষণ। ভূষণের মধ্যে গহনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভূষণের প্রতি এই আকর্ষণ মানুষের কত কাল হইতে রহিয়াছে, তাহা বলা অসম্ভব।



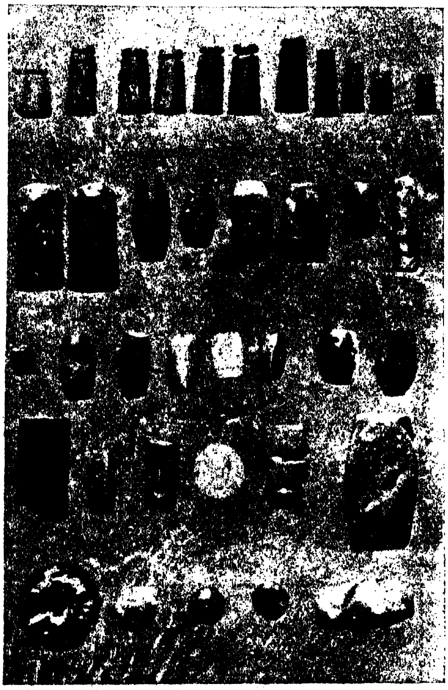
প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগে গৃহিণীর মনোরঞ্জন

ভূষণের প্রতি আকর্ষণের কারণ কি? ফ্রেজার ফ্রয়েড হইতে রাম শ্যাম যদু সকলেই তারস্বরে বলিবেন, "আমি জানি, আমি জানি"। তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহা গল্পের কবিরাজ মহাশয়ের গো-সন্তান হইতে যুদ্ধ জয় পর্য্যন্ত সর্ব্ব ব্যাপারে হরীতকী ব্যবস্থার মত নানা-মতাবলম্বী মনস্তত্ত্ববিৎ মহোদয়গণ নিজ নিজ মত অনুসারে পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় ব্যাপারের উৎপত্তির কারণ বলেন। হইতে পারে তাঁহাদের কথাই ঠিক, হইতে পারে হরীতকীর সর্ব্বরোগদুঃখহারী ক্ষমতা আছে। এ বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকার, স্পর্দ্ধা বা স্পৃহা, কোনটাই লেখকের নাই।



মোহেঞ্জো দড়ো।- "মল" ও কর্ণফুল

আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে এরূপ "কেন"র বিচার করা অসম্ভব। কেননা, সাধারণতঃ সমাজে গহনার সম্পর্কে যে সব পরস্পরের প্রকৃতিবিরুদ্ধ নানা প্রকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির খেলা দেখা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে বিচারের ক্ষমতা আমাদের নাই। অক্ষয়কুমার দত্তের বিচারক্ষমতা সকলের থাকে না। তবে মোটামুটি দেখা যায়, যে,— তস্কর, খাঁইযুক্ত বরকর্ত্তা, ও পলাতক দেউলিয়ার গহনার



মোহেঞ্জো দড়োতে প্রাপ্ত মণিকারের কারুকর্ম্ম নিদর্শন

প্রতি যে আকর্ষণ, তাহা স্বর্ণ, রৌপ্য, বা কাগজের মুদ্রার প্রতিনিধি বলিয়া। কন্যাকর্ত্তার গহনার প্রতি আকর্ষণ সর্পের প্রতি পক্ষীশাবকের আকর্ষণের ন্যায়। মহিলাদিগের ও ভারতীয় নৃপতিগণের গহনার প্রতি আকর্ষণ প্রধানতঃ "লোক দেখান"র জন্য (to show off)। যাহারা উক্ত মহিলা বা রাজন্যবর্গের গহনার সংস্থান যোগায়, স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাদের ঐ সকল গহনার প্রতি আকর্ষণ থাকে না। মস্তিষ্কবিকৃতি হইলে আকর্ষণ হইতে পারে।

সে যাহাই হউক, ইহা প্রামাণিক সত্য, যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে মানব ভূষণ হিসাবে গহনার ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তবে অতি প্রাচীনকালে যে সকল পদার্থ অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত হইত, সে সকলের মধ্যে অনেক কিছুই এখন বিপরীত সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

আদিম মানব যে দেহের শোভা বৃদ্ধির চেষ্টা করিত, তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। প্রমাণ প্রধানতঃ দুই প্রকার। প্রথম, আদিম মানব-রচিত চিত্র বা মূর্ত্তি, দ্বিতীয়, তাহার ব্যবহৃত গহনা। এই সকল দেখিলে মনে হয়, যে, প্রাচীনকালের গৃহকর্ত্তাকে পরিবার পরিজনের অলঙ্কারের সংস্থান করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। মসৃণ প্রস্তর বা উপলখণ্ড, কুক্কুর বা অন্য কোন



উত্তর ভারতের ঝুম্‌কা। প্রাচীন পরিকল্পনা

শ্বাপদের নখ ও দন্ত, ভল্লুক-আদি হিংস্র জন্তুর চোয়াল ঝিনুক বা শুক্তি ইত্যাদিতে ছিদ্র করিয়া, পশুলোম বা পশুচর্ম্ম নির্ম্মিত সূতার সাহায্যে অলঙ্কার-অভিলাষী ব্যক্তির অঙ্গে তাহা সংলগ্ন করিয়া দিলেই কাজ হাসিল হইয়া যাইত। সে গহনার না ছিল যাচাই, না ছিল বানী।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ আদর্শ গহনার ব্যবহার চিরস্থায়ী হইল না। মানুষের "টক্কর দেওয়া" রোগ অতি প্রাচীন ও অতি সংক্রামক। সুতরাং সহজলভ্য পত্থর-অস্থি বা উপলখণ্ডে লোকের বাসনার তৃপ্তি হইল না। ক্রমেই উজ্জ্বলবর্ণযুক্ত প্রস্তর বা উপল, দুর্লভ হস্তিদন্ত ইত্যাদি, কুক্কুর দন্ত বা ঝিনুকের স্থান অধিকার করিল। পরে ধাতু ও অগ্নিপ্রয়োগ দ্বারা ধাতু গলান ইত্যাদির আবিষ্কার হইলে পর ধাতুনির্ম্মিত গহনার ব্যবহারও প্রচলিত হইল।



মোহেঞ্জো দড়ো। উপরে কর্ণফুল নীচে স্বর্ণখচিত উপরত্নের হার



উদয়গিরি (উড়িষ্যা কটক), গলায় নূতন ধরণের দোলক। বাহুতে নূতন ধরণের "বাজুবন্দ", গলায় বৃহৎ মুক্তামালা (স্বর্ণনির্ম্মিত মুক্তাগোলক), মস্তকে শিরস্ত্রাণ স্বরূপ মুকুট

অবশ্য কারুকার্য্যের ক্ষমতার বিকাশ প্রস্তর-যুগের মনুষ্যেরও হইয়াছিল। সুতরাং সে সময়ের শিল্পীও শিল্প-নৈপুণ্যের সাহায্যে সাধারণ পদার্থকে অসাধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং স্থলে স্থলে সে প্রয়াস বিশেষ ফলপ্রদও হইয়াছিল।

প্রস্তর যুগের পর তাম্র, বর্ত্ত-লৌহ বা কাংস যুগ। (Copper or Bronze Age)। এ সময়ের অলঙ্কারে শিল্পীর প্রভাববিস্তারের সূত্রপাত হয়, এবং বোধ হয় সেই সময় হইতেই মানুষের গৃহস্থালীতে গহনা অনর্থের কারণ হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতে স্বচ্ছন্দবনজাত শিকারের পশুর অস্থি বা সহজলব্ধ নদীতটজাত উপলের দ্বারা গৃহিণীর মনোরঞ্জন ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কেননা, ধাতুখণ্ডকে বিশেষ আকৃতিযুক্ত বা ধাতুর পাতের উপর চিত্রাঙ্কন না করিলে তাহা সহজে অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত হইত না।

কাংস-যুগেই শিল্পী প্রস্তর কর্ত্তন, ধাতুর উপর প্রস্তর সংযোজন ইত্যাদির কৌশল উদ্ভাবন করে। পরে লৌহ-যুগে এই শিল্প বিশেষ অগ্রসর হয়। কাচ, মিনা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শিল্পের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গহনারও রূপ, আকার ও বর্ণের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। তাহার পর, ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে গহনার ব্যবহার ও গহনা নির্ম্মাণ ও রচনা, কলাবিশেষে পরিণত হয়। এখনও সেই বিদ্যা বর্ত্তমান রহিয়াছে, যদিও তাহার অবনতি হইয়া তাহা ফ্যাশন-(fashion) রূপ ছদ্মনামে পরিচিত।

মনুষ্যচরিত্রের একটি বিশেষত্ব এই যে, যে-জিনিষটি যতই দুষ্প্রাপ্য সেটি মনুষ্যের নিকট ততই বাঞ্ছনীয়, সুতরাং ততই মূল্যবান। এই কারণে যে অলঙ্কারের উপাদান যত দুষ্প্রাপ্য বা যে গহনার শিল্পকার্য্য যত



ভারুট (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী), স্থূল হস্ত ও পদের গহনা। অন্ত গহনায় সমরেখাপাত (চণ্ড যক্ষিনী)

দুঃসাধ্য, সেই গহনা ততই বাঞ্ছনীয় ও মূল্যবান মনে করা হয়।

অবশ্য ইহা সত্য, যে, সুরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ বলিয়া দুইটি নিগূঢ় সূক্ষ্ম জ্ঞান বা গুণ মানুষের আছে। কিন্তু সংসারে (অন্ততঃ পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে) প্রভূত অর্থবলের পরিচয় দিবার ইচ্ছা এই নিগূঢ় সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রকাশকে সহজেই অভিভূত করিয়া ফেলে। "আপরুচি খানা, পররুচি পরনা" এ তো প্রায় খনার বচনের সামিল হইয়া গিয়াছে। গহনা-ব্যবহার শাস্ত্রে পররুচি শব্দের অর্থ পরকে "তাক লাগিয়ে দেওয়া", এবং সে কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানের ধার অপেক্ষা অর্থবলের ভার অধিক কার্য্যকর।



দেওগড় (খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী), মুকুট, ও কণ্ঠা (দৃঢ়সংবদ্ধ) ও হারের পরিকল্পনায় ভগ্নরেখাপাত। নীচের সর্ব্ব দক্ষিণের স্ত্রীলোকের নূতন ধরণের মেখলা। (বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা)

সুরুচিসঙ্গত গহনা শতকরা দুই এক জনের অঙ্গে দেখা যায়, "মানানসই" ও সুরুচিসঙ্গত, যুগপৎ এই দুই গুণ যুক্ত গহনা সহস্রে একজনেরও হয় কি না সন্দেহ। এরূপ হইবার আরও একটি কারণ আছে। স্কচ কবি বর্ন্স্ (Burns) বলিয়া গিয়াছেন—

Some hae meat but canna eat,
Ithers hae na that wad eat it.

অর্থাৎ যাহার সঙ্গতি আছে তাহার ভোগ করিবার ক্ষমতা নাই, আবার ভোগ করিবার যাহার ক্ষমতা আছে তাহার সঙ্গতি নাই।

দুষ্প্রাপ্য সুতরাং মূল্যবান হওয়াই যে গহনার উপাদানের

প্রধান উপযোগিতার পরিচয়, তাহার উদাহরণ কাচ। এই কাচ অথর্ব্ববেদের সময় অশ্বমেধ যজ্ঞে বলির অশ্বের অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, চরকের সময় স্ফটিক অপেক্ষা অধিকগুণসম্পন্ন বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে এবং চাণক্যের সময় কাচমণি নামে রাজরত্নাগারে স্থান পাইয়াছে। এখন গহনানির্ম্মাণের ক্ষেত্রে কাচের স্থান কোথায়?

অনেকে বলিবেন, যে, যে-মণি যত মহার্ঘ, তাহার শোভা, দ্যুতি ও স্থায়িত্ব (কাঠিন্য ইত্যাদি গুণের জন্য) ততই অধিক। ইহা সত্য, যে, হীরক, পদ্মরাগ (চুণী), নীলমণি (নীলা) ইত্যাদি মণি, গোমেদ বৈদুর্য্য ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত সুলভ মণি অপেক্ষা অধিক দ্যুতি ও শোভা-যুক্ত এবং কঠিন। কিন্তু চুণী ও নীলা একই পদার্থ, কেবল



যাজপুর (উড়িষ্যা)। পদে নূপুরযুক্ত "মল"। কর্ণে বিরাট অখণ্ড (জোড়হীন) কুণ্ডল (গণেশ)



বাদামী (খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) উপরের যুগল মূর্ত্তির ও নীচের বিরাট মূর্ত্তির গহনায় অল্প আদিম ও নূতন পরিকল্পনার মিশ্রণ (বিষ্ণু)

মাত্র বর্ণের প্রভেদ। তবে চুণী অধিক মূল্যবান ও অধিক আদৃত কেন? উত্তর এই, যে, চুণী নীলা অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য। মুক্তা অপেক্ষা পুলকমণি (opal) রূপে, বর্ণে, দ্যুতিতে, স্থায়িত্বে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে আয়তনের পুলকমণির মূল্য দশ মুদ্রা, সেই আয়তনের মুক্তার মূল্য অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশমুদ্রা। কারণ মুক্তা পুলকমণি অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য।



সারনাথ, (খৃঃ অষ্টম—দশম শতাব্দী) কণ্ঠের মণিখচিত হার। গুণ্ডাকৃতি দোলক সমষ্টির সন্নিবেশ। বাহু ও গুল্‌ফে দৃঢ়সংবদ্ধ স্বর্ণালঙ্কার কোনার্কের গহনার সহিত সাদৃশ্য। (বোধিসত্ত্ব ?)

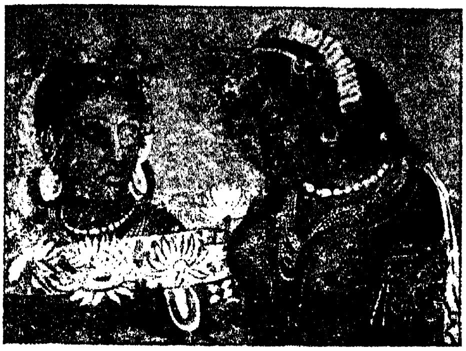
উপরোক্ত কারণ বা যে কারণেই হউক, মনুষ্য-সমাজে শ্রেণীবিভাগের ন্যায় ভূষণসামগ্রীর উপকরণের মধ্যে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ হইয়া গিয়াছে; যথা, ধাতুমধ্যে স্বর্ণ, প্লাটিনম্ (বিদেশে পালাডিয়মও) উত্তম, রৌপ্য মধ্যম ও কাংসতাম্র ইত্যাদি অধম। খনিজ প্রস্তর ইত্যাদির মধ্যে হীরক সর্ব্বোত্তম (স্বভাবকুলীন); পদ্মরাগ নীলমণি মরকত (পান্না) উত্তম; বৈদূর্য্য, পুলক, গোমেদ, ফিরোজা, পুষ্পরাগ বৈক্রান্ত, কর্কেতন ইত্যাদি মধ্যম; স্ফটিক, রাজাবর্ত্ত, ব্রহ্মসূত্রময়, তামড়া ইত্যাদি অধম। প্রাণীজ পদার্থমধ্যে মুক্তা উত্তম; প্রবাল, বিশেষ প্রকার কচ্ছপের খোলা (tortoise shell), হস্তিদন্ত, মুক্তাশুক্তি (Mother of pearl) মধ্যম; শঙ্খ, শৃঙ্গ, অস্থি ইত্যাদি অধম।

ইহা ভিন্ন অম্বর (amber), জেট (jet, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কঠিন অঙ্গার বিশেষ) ইত্যাদি কয়েকটি পদার্থ গহনার ক্ষেত্রে মধ্যম শ্রেণীতে স্থান পায়। বিদেশে পক্ষিপালক অতি সভ্য ও অতি অসভ্য উভয়েরই অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে। এই সকল শ্রেণীবিভাগ আধুনিক সময়ের মতানুসারে দেওয়া হইল। প্রাচীন কালে এইরূপ ভাগ ছিল না। এককালে ইস্পাত ও লৌহবিশেষ মণিকাঞ্চনের সমান স্থান পাইত। এখনো বাঙ্গালী হিন্দু সধবার মণিবন্ধে লৌহ অতি আদরের স্থান পায়।

দেশ ও কালের প্রভেদে রুচিরও পরিবর্ত্তন যথেষ্ট দেখা যায়। যাহা একদেশের মতে সুন্দর তাহা অন্য দেশে কুৎসিত, এককালে যাহা সৌন্দর্য্য ও রুচিবোধের পরিচায়ক ছিল, এখন তাহাকে হেয় জ্ঞান করা হয়। পাশ্চাত্য রমণীর পালকের শিরঃসজ্জা এদেশে কুরুচির পরিচায়ক; আবার এদেশের পায়ের গহনা—বিশেষে মাড়বারদেশীয়—বিদেশে হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া গণ্য। সুবৃহৎ নথ ও নাকছাবি আমাদের চক্ষের উপর দিয়াই সামান্য ত্রিশ-বৎসরের মধ্যে আভিজাত্যের স্থান হইতে অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। আবার তাগা, বাজুবন্দ ইত্যাদি যাহা লম্বাহাত জ্যাকেটের অত্যাচারে অন্তর্হিত হইয়াছিল, হাতকাটা ব্লাউসের কৃপায় সে সকল পুনর্ব্বার নূতনরূপে দেখা দিতেছে। চন্দ্রহার ত ফ্যাশন-রাহুর কবলে গিয়াছে। ওদিকে পাঁইজোর শিশুদের চরণে ফের দেখা দিয়াছে।

তবে কি মার্জ্জিত রুচি ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের ভিত্তি কোনও চিরন্তন সত্যের উপর স্থাপিত নাই? এ দুরূহ প্রশ্নের বিচারের ভার মনস্তত্ত্ববিদ্ ও ললিত-কলা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের উপর দেওয়াই উচিত। তবে সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, যে, সুরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ যদিও দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে পৃথক্ হয় এবং একই দেশে একই সময়ে ও সমাজে ভিন্ন-রুচির্হিলোকঃ দেখা যায়—কারণ সমাজ, পরিবার ও শিক্ষাস্থলের আপেক্ষিক প্রভাবের উপর লোকের রুচিবোধ অনেক খানি নির্ভর করে—তবুও একথা সত্য, যে, পৃথিবীতে এমন অনেক স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সুন্দর জিনিষ আছে যাহার সৌন্দর্য্য, দেশকালপাত্রনির্ব্বিশেষে অধিকাংশ সভ্য লোকেরই (অর্থাৎ যাঁহারা সুন্দর ও অসুন্দরের প্রভেদ বুঝেন) রুচিতে ভাল লাগে। কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাশ্মীর উপত্যকা, তাজমহল বা উদয়পুরের প্রাসাদ যে-কোন দেশের সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি-যুক্ত ব্যক্তির নিকট সুন্দর লাগে ও বহুকাল ধরিয়া লাগিয়া আসিতেছে।

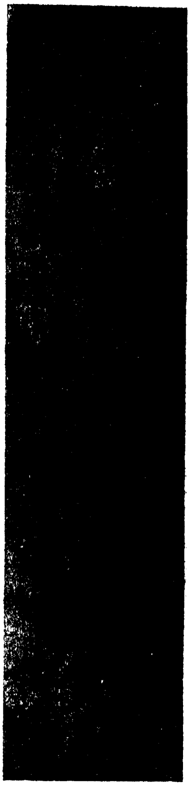
আবার ইহাও দেখা যায়, যে, যাঁহারা এই দেশে বা বিভিন্ন দেশে সুরুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান যুক্ত বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদের মধ্যে কোনও কোনও স্থলে প্রচণ্ড মত-বৈষম্য উপস্থিত হয়। যথা, বিদেশে প্রাগ্‌ রাফেল ও রাফেলপরবর্ত্তী চিত্রকলা, এপষ্টাইনের ভাস্কর্য্য কলা, এদেশে ভারতীয় চিত্রকলা ইত্যাদি।



অজন্টা। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী। মুকুট ও বাহুর গহনার রচনা কারু-কৌশল ও পরিকল্পনা দ্রষ্টব্য



গ্রথিত গহনা। পরিকল্পনা ও রচনা সুন্দর। যক্ষিণী। বাটানমারা, ভারুট।



গুলফে ও হস্তে গহনার বাহুল্য। উক্ত দৃঢ় সংবদ্ধ গহনায় কারুকর্ম্মের ও কল্পনার অভাব। গ্রথিত গহনা সুপরিকল্পিত ও কারুকার্য্য যুক্ত। (অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছাঁচে ঢালাই ও ডাই কাটা (Die cutting) প্রক্রিয়ার জ্ঞানের অভাব?) ভারুট সুদর্শনা যক্ষিণী।

এই সকল কারণে মনে হয়, যে, সুরুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার কতক অংশ স্বভাবজাত এবং কতক অংশ ক্রমবিকশিত। এই শেষাংশ কোন্‌ পথে, কি ভাবে এবং কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, তাহার উপর মানুষের রূপ-উপলব্ধির (perception of beauty) মাত্রা, সূক্ষ্মতা ও তদ্বিষয়ক মতাবলী (degree, fineness and creed) নির্ভর করে। যিনি স্বাধীনচেতা ও যাঁহার স্বভাবজাত রুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রবল, তাঁহার রূপ-উপলব্ধির স্বভাবজাত ও অর্জ্জিত (acquired) অংশ, দুই-ই পরস্পরকে পরিপোষণ করে; যাঁহারা গুরুবাদী, তাঁহাদের গুরুর উপর স্বভাবজাত অংশের নির্ব্বাণ বা পরিপোষণ দুইই নির্ভর করে।

সকল জ্ঞান—ও জ্ঞানী লোক—যেমন বিকারের পথে যাইতে পারে, সেইমত রূপরসজ্ঞানেরও বিকৃতি হয়। চিত্তের অবসাদ দূর করার জন্য, কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার চেষ্টায়, বা বিকারগ্রস্ত মনের তৃপ্তির নিমিত্ত—এইগুলির মধ্যে যে-কোন কারণেই হউক, নিত্য নূতনের চেষ্টায় মানুষ অনেক কিছু জিনিষ বা প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে যাহার সঙ্গে সৌন্দর্য্যজ্ঞান, রুচি বা প্রকৃত গুণীর কল্পনার বিকাশের অল্পই সম্পর্ক থাকে বা কিছুই থাকে না। দুঃখের বিষয় এই, যে, এই প্রকার সৃষ্টি, প্রকৃত গুণীর সৃষ্টি অপেক্ষা পরিমাণে বহু শত গুণ অধিক, এবং সেই কারণে এই প্রকারে সৃষ্ট পদার্থের চলও অধিক। কেননা, মনুষ্য-সমাজে সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার অভাব আছে এবং ললিতকলার ক্ষেত্রে এই অভাব অতি দারুণ।

কখনও কখনও বহুকাল পরে পরে এরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় যাঁহাদের একাধারে, স্বাভাবিক রূপরসবোধ, মার্জ্জিত রুচি, স্বাধীন চিন্তা, সুস্পষ্টভাবে স্বপ্রকাশ করিবার প্রবল ক্ষমতা, ও নেতৃপদের উপযুক্ত প্রচণ্ড যুদ্ধংদেহি ভাব থাকে। ইঁহাদের প্রভাবে দেশে সুরুচির ভাব আবার জাগ্রত হয় ও বিস্তর আবর্জ্জনা দূর হইয়া যাহা প্রকৃতই সুন্দর ও যাহা প্রকৃতই মহান্, তাহা যথাস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকট



তক্ষশীলায় প্রাপ্ত মণিখচিত স্বর্ণের দুল। খৃঃ ৩য় শতাব্দী

হয়। এই সকল মহাপুরুষের জ্ঞান ও চিন্তার প্রকাশের ফলেই মানবের রূপরসজ্ঞান সজীব ও ক্রমোন্নতিশীল হইয়া থাকে। কারণ, লোকসভ্যতা ও লোকরুচি (culture and taste of the mass) চিরকাল সর্ব্বদেশেই পশ্চাৎমুখী—যাহা অতীত যাহা গত তাহারই উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে—এবং সেই কারণে উহা ক্রমেই স্থাণু হইয়া বিকৃত ও আবর্জ্জনাপূর্ণ হয়। কারণ, যে শক্তি কেবল মাত্র পশ্চাৎমুখী, তাহা কালের প্রবাহে ভাসিয়া অগ্রসর হইলেও তাহার বিকাশ ও বৃদ্ধি অসম্ভব, তাহার বিকার ও ক্ষয় অনিবার্য্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এক কথায়, ললিতকলার ক্ষেত্রে সাধারণের মত বা রুচি জড়তা ভিন্ন অন্য কিছুই আনে না।

অলঙ্কারের ক্ষেত্রে এই জড়তা ভিন্ন ধনগর্ব্ব নামক

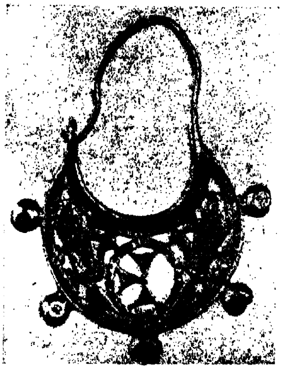


মঞ্জুশ্রী। সারনাথ। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী। গলদেশের ও কটিবন্ধের গহনা। গহনা শিল্পে পরিকল্পনা ও রচনা শক্তির উৎকর্ষের নিদর্শন

আরও একটি মারাত্মক বিষ আছে, যাহার কারণে এই শিল্পের অবনতি সকল দেশেই অতি সহজে হয়। গহনার ব্যবহার যতই চলিত হউক, তবুও ইহা সত্য, যে, বিশেষ অর্থবল না থাকিলে ইচ্ছামত গহনা গড়ান সম্ভব নহে, এবং বিশেষ অর্থশালী ক্রেতার সাহায্য ভিন্ন কোনও শিল্পীর পক্ষে গহনার কার্য্য করাও সম্ভব নহে। এখন, ইহা সর্ব্বজনজ্ঞাত, যে, প্রভূত ধনবল ও উর্ব্বর কল্পনা বা সুরুচি একত্র সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। সুতরাং ধনীর কল্পনাবর্জ্জিত গতানুগতিক মত অনুসারে গহনা নির্ম্মাণ ভিন্ন শিল্পীর অন্য গতি নাই। সে প্রকার গহনায় সুরুচি বা

সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় কতটুকু থাকে, তাহা বলা বাহুল্য।

সমাজেও সাধারণতঃ গুণীর গহনা অপেক্ষা ধনীর গহনারই অধিক খ্যাতি হয়। তাহার কারণ, অলঙ্কারের যাচাই বা আদর হয় কেবল মাত্র মূল্যের দ্বারা। প্রসিদ্ধ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত চিত্র সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যবান হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ শিল্পীর পরিকল্পিত বা নির্ম্মিত গহনার সেরূপ মূল্যাধিক্য এদেশে কেহ শুনিয়াছেন কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, গহনার ক্ষেত্রে—অন্ততঃ পক্ষে এদেশে—শিল্পীর সুরুচি, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, কল্পনা, বা কারুকৌশলের বিশেষ আর্থিক সার্থকতা নাই; অতএব তাহার বুদ্ধিচাতুর্য্য বা কলাকৌশল প্রয়োগের নিমিত্ত প্রলোভনও নাই।



খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর বাইজান্টীয় দুল (Byzantine)

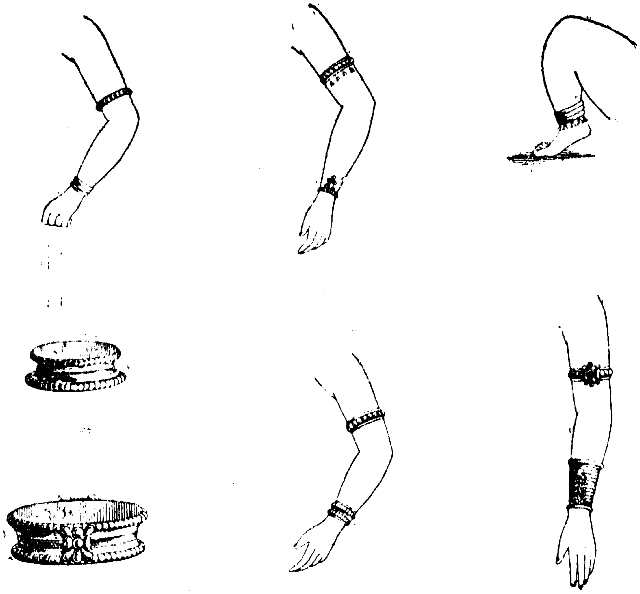
সভ্যতর দেশে—অর্থাৎ যে-সব দেশে রূপরসজ্ঞানের সমাদর আছে—গহনা-শিল্পের অবস্থা ঠিক এরূপ নহে। ধনীর সমাদর সে-দেশেও আছে এবং সে-দেশেও গহনার বিষয়ে ধনগর্ব্বের অসংস্কৃত বর্ব্বরোচিত পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সে পরিচয় সে দেশের সমাজে সম্ভ্রমের সহিত গৃহীত বা আদৃত হয় না।

এদেশ ও পাশ্চাত্য দেশের এই প্রভেদের কারণ এইমাত্র, যে, সে সকল দেশে প্রকৃত রূপরসজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক এবং তাহাদের প্রভাবও এদেশের অপেক্ষা অনেক অধিক। এই প্রভাব যে চিরকালই



অজন্টা। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী

ছিল বা চিরস্থায়ী হইবে, তাহা নয়। সে দেশেও প্রথম প্রথম যাঁহারা জনসাধারণকে ললিতকলা বা রূপরসজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন পথ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে এদেশের অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক তীব্র শ্লেষ, বিদ্রূপ, সমালোচনা



খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর উড়িষ্যার হস্ত ও পদের গহনা। স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ-চাতুর্য্য ও চারু-পরিকল্পনার (elegance in design) অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন



খৃঃ দশম শতাব্দীর বাইজাণ্টীয় দুল (Byzantine)

ও বাধা সহ্য করিতে হয়। কারণ, সে সকল দেশে অল্প শিক্ষা বা বিকৃত শিক্ষা যুক্ত "সবজান্তার" সংখ্যা এদেশ অপেক্ষা শতগুণ অধিক।

কিন্তু সে সকল দেশের সৌভাগ্য এই যে, যে সকল জ্ঞানী এইরূপ পথ-প্রদর্শন-ব্রত ধারণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই প্রকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন, সুদক্ষ, নির্ভীক ও অমিত-তেজা ব্যক্তি নেতৃপদ ধারণ করেন। সুতরাং জন-সাধারণের অন্ধ মত যতই প্রবল হউক, তাহাকে আক্রমণ ও অভিভূত করা তাঁহাদের শক্তির অসাধ্য হয় না।

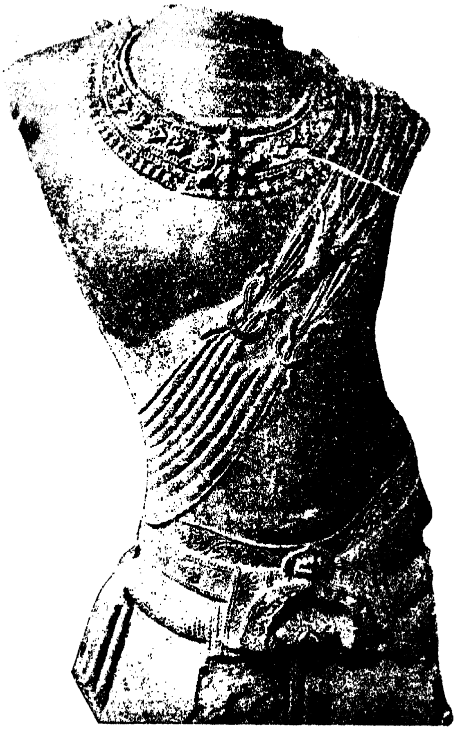
এ অভাগা দেশে যাহার জ্ঞানের লেশমাত্রও আছে, তাহার হয় উৎসাহের অভাব, নয় আয়াসকাতরতা ঘটে। সুতরাং এদেশে আছে কেবলমাত্র হয় পাশ্চাত্যের অন্ধ ও ততোধিক অনিপুণ অনুকরণ, ফলে কিম্ভূত-কিমাকারের জন্ম—নহিলে অতীত রীতির (রূপরস বা কলাকৌশলের নহে) সমাধিমন্দিরধ্বংসস্তূপের পূজারূপ "কবর পরস্তি।"

জাগ্রত রূপরসজ্ঞানের বিষয়ে এদেশের নিজস্ব যাহা কিছু অতীতে ছিল, তাহা লুপ্তপ্রায়, নূতনের ক্ষীণ আভাস মাত্র পাওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডেও বিগত শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত তিন শতাব্দী ব্যাপী এইরূপ জড়ভাব ছিল। চিত্রকলায় ইটালীর অন্ধ অনুকরণ এবং অন্যান্য শিল্পে ও ললিতকলায় ইয়োরোপের নানা দেশের—বিশেষে ফ্রান্সের ও অষ্ট্রিয়ার—অনুকরণই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া গণ্য হইত।

এই জড়তা ও মৌলিকত্বের অভাবের বিরুদ্ধে গত শতাব্দীর শেষে ঐ দেশের কয়েকজন মনীষী ব্যক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে জন রস্কিনের নাম করা উচিত। ইঁহার অক্লান্ত প্রয়াস, তীব্র ও নির্ভীক সমালোচনা এবং রূপরসজ্ঞানে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রদর্শনের ফলে ঐ দেশে লোকমত জাগ্রত হয়। রস্কিনের পরেই উইলিয়াম মরিস্, দান্তে গাব্রিয়েল রসেটি, এডওয়ার্ড বরন্ জোন্স, মিলে, এই কয়জনের নাম উল্লেখ করা উচিত। মরিস অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থাতেই এক ভ্রাতৃমণ্ডল (Pre-Raphaelite Brotherhood) গঠন করেন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল ললিতকলা ও শিল্পে মৌলিকত্বের অনুশীলন।

এই প্রসিদ্ধ ভ্রাতৃমণ্ডলের প্রধান সভ্য ছিলেন মরিস্ ও এডওয়ার্ড বরন্ জোন্স।

অক্সফোর্ড হইতে শিক্ষালাভের পর মরিস স্থাপত্য কার্য্য (architect) শিক্ষার জন্য ষ্ট্রিট নামক স্থপতির নিকট শিক্ষা-নবিশরূপে কার্য্য করেন। সেই সময়ে ইনি ও বরণ জোন্স্ অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ ম্যাগাজিন নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ঐ পত্রিকা অল্প দিন পরেই উঠিয়া যায়; কেননা ইংলণ্ডের "শিক্ষিত" জনসাধারণের মতের সহিত উহার মতামতের মিল ছিল না। কিন্তু এই পত্রিকা প্রকাশের ফলে রসেটি ইঁহাদের সঙ্গে যুক্ত হন।



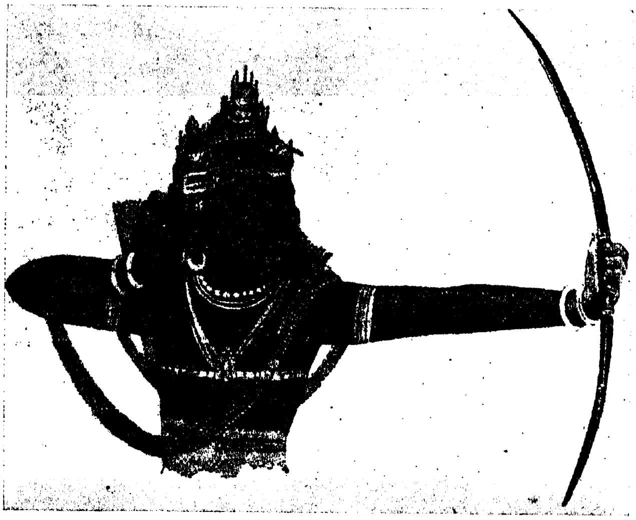
সারনাথ বোধিসত্ত্ব (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। গলদেশের হার সকলে চারি প্রকার পরিকল্পনা। মধ্যস্তরে মণিখচিত স্বর্ণপুষ্পমালা ও তাহার কেন্দ্রে বৃহৎ জড়োয়া "ধামি"। মুক্তামালার সঙ্গে সর্ব্বনিম্নস্তরে স্বর্ণঘণ্টার সারি। কটিবন্ধে বক্র ও ভগ্নরেখাপাতে কারুকার্য্য। ("ছাচে ঢালাই" ও "ডাই কাটা" প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ ?)

রস্কিনের প্রচণ্ড আক্রমণ ও এই রূপরসজ্ঞ কবি ও শিল্পিসংঙ্ঘের চেষ্টা, এই দুইয়ের ফলে আধুনিক ইংলণ্ডে ললিতকলা ও শিল্পের ক্ষেত্রে যাহা কিছু মৌলিক বা নিজস্ব, সে সকলের সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডের কলা ও রূপরসজ্ঞান বিষয়ে ইঁহাদের মতামতের ছাপ গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

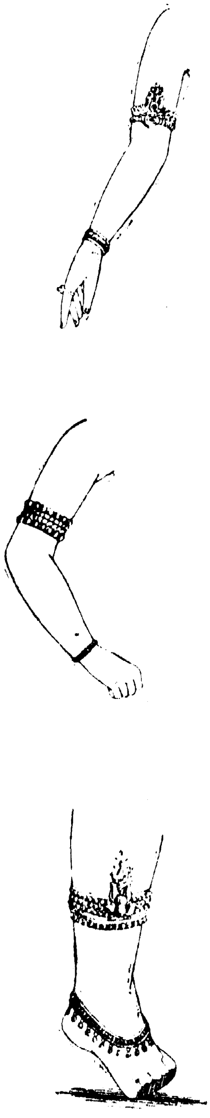
অন্য সকল সভ্য দেশেই ললিতকলা বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। কারণ, জাতির মধ্যে প্রাণ থাকিলেই যাহা নূতন, যাহা সজীব, তাহার বিদ্রোহ, বিকাশ, ও জয় অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশে গহনার ব্যাপারে ঠিক্ এই প্রকার অবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীন লুপ্ত ঐতিহাসিক যুগের (মোহেঞ্জো দড়োতে) যে সকল গহনা-পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, স্বর্ণকার ও মণিকারের কারুকৌশল তখনই এদেশে বেশ অগ্রসর হইয়াছিল—যদিও উহা কাংসযুগের (অর্থাৎ লৌহব্যবহার আবিষ্কারের পূর্ব্বের সময়কার)। মোহেঞ্জো দড়ো সম্বন্ধে বিশেষ এখনো কিছু জানা যায় নাই, সুতরাং ভারতীয় শিল্পের ধারাবাহিক উৎকর্ষের ক্রমে উহা আসিবে কিনা, তাহা বলা যায় না। তবে সেখানে গহনা যাহা পাওয়া গিয়াছে, সে সকলের অনুরূপ অনেক গহনা এদেশে এখনো প্রচলিত আছে।

ঋগ্‌বেদে দেবতাদের গহনার বর্ণনা অনেক আছে। রুদ্রের বর্ণনায় উজ্জ্বল স্বর্ণাভরণের জ্যোতিযুক্ত পিঙ্গল দেহকান্তি, সুন্দর সমহারশোভিত ইত্যাদি কথা পাওয়া যায়। অসুরদিগের বিষয়েও বর্ণনা আছে, যে, তাহাদের মণিকাঞ্চনের গহনা প্রচুর ছিল। রামায়ণ মহাভারতে কুণ্ডল, কবচ, কিরীট, বলয় ইত্যাদির ছড়াছড়ি আছে। তবে এসকল গহনার উপাদান ও নাম কি ছিল, তাহাই কেবল জানা যায়; আকৃতি বা আয়তন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। অবশ্য অধিকাংশ নাম অনেক কাল পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল ও তাহাদের আকৃতি ইত্যাদি আমরা প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি ও বিগ্রহ বা অজন্টা, ইলোরা, বাঘ ইত্যাদি স্থানের প্রাচীরগাত্রের চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে দেখিতে পাই।



অজন্টা। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী। যোদ্ধৃবেশে নৃপতি বা অন্য সম্ভ্রান্ত পুরুষ। মুকুটে অতিবৃহৎ মণি (বা মিনা ? মিনা হওয়াই সম্ভব) বক্ষোপরি লম্বমান মণিময় ধাতু (স্বর্ণ) রজ্জুর তূণীর-বন্ধনীরূপে ব্যবহার।



উড়িষ্যা। কোণার্ক। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দী। কঙ্কন, বলয়, বাজু, পাঁইজোর ও পদভূষণ। মণি-সংযোজিত দৃঢ়সংবদ্ধ গহনার নিদর্শন।



অমরাবতী। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় হইতে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দী। গহনার আদিম পরিকল্পনা ও গহনাবাহুল্য

অর্থশাস্ত্রে কয়েকটি মুক্তাহারজাতীয় গহনার বর্ণনা আছে। যথা—

"শীর্ষক (মধ্যে একটি বৃহৎ দুই পার্শ্বে সমান মুক্তা সম্বলিত), উপশীর্ষক (মধ্যে পাঁচটি বৃহৎ দুই পার্শ্বে সমান মুক্তা সম্বলিত), প্রকাণ্ডক (মধ্যে একটি বৃহৎ দুই পার্শ্বে ক্রমে ক্ষুদ্রায়তন মুক্তা যুক্ত), অবঘাটক (সকল মুক্তা সমান), ও তরল প্রস্থিবদ্ধ (মধ্যে কর্ত্তিত হীরা দুই পার্শ্বে মুক্তা), এই কয় প্রকার মুক্তার যষ্টি (মালা) হইয়া থাকে।



অজন্টা। আদিমযুগ (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) বিপুল কঙ্কন ও বাজু। বৃহৎ ধাতুহার। উপরে বৃহৎ হারের আধুনিক নিদর্শন (দার্জ্জিলিং ভুটিয়া স্ত্রীলোক)

"একহাজার ও আট যষ্টি (ছড়া) মুক্তার মালায় ইন্দ্রচ্ছন্দ হার নির্ম্মিত হয়। তার অর্দ্ধসংখ্যায় বিজয়চ্ছন্দ। চৌষটি যষ্টিতে অর্দ্ধহার। চুয়ান্ন যষ্টিতে রশ্মিকলাপ। বত্রিশ যষ্টিতে গুচ্ছ। সাতাইশ যষ্টিতে নক্ষত্রমালা। চব্বিশ যষ্টিতে মানবক, তদর্দ্ধে অর্দ্ধমানবক।

"ঐ হার সকলের কেন্দ্রে একটি মণিযুক্ত হইলে ঐ সকল নামের সহিত মানবক শব্দ যোগ করিতে হয়, যথা ইন্দ্রচ্ছন্দ মানবক।

"যদি হারের সকল মুক্তার ছড়া শীর্ষক প্রকৃতির হয়, তবে সেই হারকে 'শুদ্ধহার' বলা হয়, বা হারের সকল ছড়া যদি একই প্রকৃতির হয় (অর্থাৎ কেবল শীর্ষক অথবা কেবল উপশীর্ষক ইত্যাদি; একটি শীর্ষক, অন্যটি উপশীর্ষক, আরেকটি অবঘাটক, এইরূপ নহে) তবে তাহাকেও শুদ্ধহার বলা হয়। কেন্দ্রে মণিযুক্ত হারকে অর্দ্ধমানবকও বলা হয়।

"কেন্দ্রে তিনটি বা পাঁচটি ফলকাকৃতি মণিযুক্ত হারকে ফলক হার বলা হয়। এক ছড়া মুক্তার মালার নাম শুদ্ধ একাবলী। তাহার মধ্যস্থলে একটি মণি যুক্ত হইলে তাহার নাম যষ্টি। তাহা স্বর্ণমণি (সোনার মটর দানা) মিশ্রিত হইলে তাহার নাম রত্নাবলী। একটি মুক্তা একটি স্বর্ণমণি (সোণার মটর দানা) পরপর স্থাপিত হইলে তাহার নাম অপবর্ত্তক।

"হারের মুক্তার যষ্টির মধ্যে স্বর্ণসূত্র (এক ছড়া মুক্তা, একটি সোণার তার, আবার এক ছড়া মুক্তা) থাকিলে সেই হারের নাম সোপানক। ঐ প্রকার হারের কেন্দ্রে মণিমাণিক্য থাকিলে তাহার নাম মণিসোপানক।

"উপরোক্ত বিবরণে শির, হস্ত, পাদ, কটি ইত্যাদি স্থলের গহনা গঠনের উপায় দত্ত হইল।"

ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার গহনার বর্ণনা অর্থশাস্ত্রে নাই, যদিও মণি-সংযোজন (জড়োয়া) কার্য্য ইত্যাদির যে প্রকার বর্ণনা আছে, তাহাতে মনে হয়, যে, স্বর্ণকার ও মণিকারের শিল্প তখনই অনেক খানি অগ্রসর হইয়াছিল। স্বর্ণকারের বিবিধ প্রকার কার্য্যের এইরূপ বর্ণনা আছে যথা:—

"ঘন (নিরেট), ঘন সুষির (নিরেট শূন্যগর্ভ, যথা বাটি গেলাস) সংযুক্ত্য (ঝাল দেওয়া Soldering), অবলেপ ('প্রলেপ দেওয়া), সজ্ঘাত্য (বেষ্টন কার্য্য, যথা কটিবন্ধ), বাসিতকং (গিলটি করা), এই কয় প্রকার কারুকর্ম্ম।"

ইহা ভিন্ন স্বর্ণালঙ্কারের প্রকৃতি অনুসারে নাম



প্রাচীন ও আধুনিক। প্রাচীন খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর কেশবন্ধন ও শিরোভূষণ এবং কর্ণের দুল। (উড়িষ্যা)। আধুনিক—মধ্যে আধুনিক চীনদেশীয়া মহিলা। দক্ষিণে ফরাসী মহিলা, শিরে টায়রা কর্ণে ঝুমকা দুল, গলদেশে মুক্তামালা। বামে ইংরাজ মহিলা, শিরে চ্যাপলেট (chaplet), কর্ণে দুল।

আছে; যথা—পৃষিত (ফাঁপা), ত্বষ্ট মণিসংযোজন (jewel setting) ইত্যাদি।

সে সময়ে জড়োয়ার কার্য্যে যে প্রকার স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত তাহা দশভাগ স্বর্ণে চারভাগ রৌপ্য বা তাম্র মিশ্রিত (১৭ ক্যারাট), বা সমান ভাগে মিশ্রিত স্বর্ণ ও তাম্র (১২ ক্যারাট)।

অর্থশাস্ত্রের সমসাময়িক ভারতে গহনা-শিল্পের কারুকার্য্য বেশ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; যদিও ঐ গহনাগুলির আকার ও আয়তনে বেশ কিছু আদিম (archaic) ভাব পাওয়া যাইত। যথা, গলায় স্থূল বেলনাকার (cylindrical) কারু-কার্য্য খচিত ধাতুখণ্ডের মালা, হস্তে অতিপ্রশস্ত (overwide) ব্রেস্‌লেট, পায়ে বৃহৎ "বাঁকমল" ও গুল্‌ফ হইতে জঙ্ঘা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পেঁচান মল, কর্ণে প্রকাণ্ড ঝুলান কুণ্ডল, এই সকল গহনা তখনকার দিনে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তখনই অনেক সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত গ্রথিত গহনা ব্যবহৃত হইত, ও এই সকল গহনার মধ্যে কয়েকটি অতি সুন্দর-আকৃতি ও কারুকার্য্যভূষিত ছিল।

মণি কর্ত্তন ও মসৃণ করণ, ছিদ্র করা ইত্যাদ কার্য্যে এদেশের মণিকারগণ তখনই অতি আশ্চর্য্য কুশলী ও বিদগ্ধ ছিল। তাহার প্রমাণ এখনও পিপারোয়া পাত্র (Piparawa Vase) মধ্যে প্রাপ্ত নিদর্শন সকলে বর্ত্তমান এবং প্রাচীন বিদেশীয় লেখকগণও সেকথা প্রশংসার সহিত বলিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে খাঁটি এদেশীয়, ও বিদেশী প্রভাবযুক্ত—যথা গ্রীক (গান্ধার), পারসীক—এদেশজাত অনেক প্রকার গহনার ব্যবহার প্রচলিত হয়। ক্রমেই গহনার আকৃতি ও আয়তন সংস্কৃত ও মার্জ্জিত-ভাবাপন্ন হয়। ওজন অপেক্ষা রচনা ও কারু-কৌশলের আদর সে সময় বাড়িতে থাকে। অজণ্টার চিত্রাবলী, এবং মথুরা, উড়িষ্যা, ইত্যাদির ভাস্কর্য্য-শিল্পে একই অঙ্গে পরিহিত নানা প্রকার গহনার পরিকল্পনা ও রচনা দেখা যায়।

এই সকল গহনার প্রকৃত রূপ গঠন ইত্যাদি আমরা অজণ্টা, বাঘ ইত্যাদি গুম্ফা মন্দিরের প্রাচীরচিত্রে এখনো দেখিতে পাই। সেই সকল চিত্রে ও সমসাময়িক মন্দিরগাত্রস্থ মূর্ত্তির অঙ্গে যে সকল গহনার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, যে, ঐ সময়ে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণকার ও মণিকার ইত্যাদির কারুকৌশল সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে হিন্দু অলঙ্কার-শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। আকারে, প্রকারে, রচনানৈপুণ্যে সে সময়ে অলঙ্কারের বৈচিত্র্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।*

খৃঃ সপ্তম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত গহনা-শিল্পের ঐরূপ উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু ঐ সময়ের গহনায় ক্রমবিকশিত শিল্প-কৌশল ও নিখুঁত ভাব ভিন্ন কোনও বিশেষত্ব ছিল না। কারণ, বোধ হয় তখনই পূর্ব্বকালের শিল্পীর কার্য্যের উৎকৃষ্ট অনুকরণ এবং সেই দ্রব্যের আরও সংস্কৃত নিদর্শন প্রস্তুত

* তুলনার জন্য ঐ সময়ের বাইজাণ্টীয়—প্রাচীন ইয়োরোপের সভ্যতম শিল্পীজাতি—দুইটি নিদর্শনের চিত্র দেওয়া হইল।

করাই শিল্পীর আদর্শ হইয়া পড়ে, যাহার ফলে শিল্পীর কল্পনায় জড়তা আসে।

অজন্টা গুহাচিত্রাবলীতে এদেশীয় গহনা-শিল্পের নয় শত বৎসরের ইতিহাস (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃঃ সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত) অঙ্কিত আছে। ঐ চিত্রাবলীর গহনা যে কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতের শিল্পের নিদর্শন নহে, তাহার প্রমাণ এই, যে, উহার মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন (৯ম ও ১০ম গুহা), তাহার সহিত সমসাময়িক আর্য্যাবর্ত্তের (সাঁচি ও ভারুট) ভাস্কর্য্য শিল্পে অঙ্কিত গহনার সাদৃশ্য অতি সুস্পষ্ট। প্রথম যুগেই যখন এত সাদৃশ্য, তখন পরবর্ত্তী কালের গহনাও একই প্রকার হওয়া স্বাভাবিক। কেননা কালের প্রবাহের সহিত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদান ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল।

প্রথম যুগের (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় হইতে খৃঃ প্রথম) গহনা অতি স্থূল, ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য অপেক্ষা গঠনবৈচিত্র্য বিষয়েই অপূর্ব্ব। অতি বৃহৎ আকার ও গঠন দেখিয়া মনে হয়, যে, ঐ সকল গহনা ফাঁপা তাম্র পিত্তল কাংস বা স্বর্ণপাতের নির্ম্মিত ছিল। নিরেট হইলে সাধারণ ধাতু হিসাবেই উহা ভারী স্বর্ণ হইলে ত অসম্ভব গুরুভার; কর্ণাভরণ নিরেট হইলে কান ছিঁড়িয়া যাইত।

ইহার পরের যুগের গহনা অনেক অধিক কারুকার্য্য-যুক্ত হয়। বিশেষে গ্রথিত গহনা—মুক্তা বা নল, বর্ত্তুল বা অন্য কোন আকৃতির ছিদ্রযুক্ত ধাতুখণ্ড—অতিশয় প্রচলিত হয়। এইরূপ গ্রথিত (মালা গাঁথা) গহনা সর্ব্বাঙ্গে ব্যবহৃত হইত। ক্রমে ঐ ধাতুখণ্ড মণিমুক্তা-সম্বলিত হইতে থাকে। মণিমুক্তার ব্যবহার অবশ্য পূর্ব্বকালেও ছিল (শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই সময় (খৃঃ প্রথম শতাব্দী) ঐ সকলের আকার ও আয়তন অনুসারে বিন্যাসের কার্য্য অতি নিপুণতার সহিত সম্পন্ন হইতে থাকে। মণিসকলের কর্ত্তনে কোণশূন্য আকারই আদর্শ ছিল (cutting en cabochon)।

ইহার পর বিশেষ আকারযুক্ত দৃঢ়সংবদ্ধ (গাঁথা নহে) বা এক খণ্ডে প্রস্তুত গহনা—যথা বলয়, কবচ, কুণ্ডল ইত্যাদি—ব্যবহৃত হইতে থাকে, ও ঐ সকলের আকৃতিবৈশিষ্ট্যও আরম্ভ হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ধাতু-সূত্র (wire), "পেটাই কাজ", ধাতুরজ্জু (twisted wire) ও সঙ্গে সঙ্গে মণিসংযোজিত ধাতুর (জড়োয়া) গহনার ব্যবহারও দেখা যায়। ক্রমে গহনার আকৃতি, নির্ম্মাণপদ্ধতি (যথা অতি সূক্ষ্ম স্বর্ণ বা রৌপ্যের "কটকি কাজ" (filigree) মণিমুক্তা দ্বারা বর্ণ-বিন্যাস, মণিকর্ত্তন-পদ্ধতি (মিনার ব্যবহারও বোধ হয় এই সময়ের) ইত্যাদিতে বিশেষ লালিত্য, বৈচিত্র্য ও নিপুণ পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। অজন্টার শেষের যুগের (খৃঃ পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দী) গহনার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।

নৃপতিদিগের মুকুট, স্ত্রীলোকদিগের শিরোভূষণ, উচ্চপদস্থ পুরুষদিগের কাঞ্চী বা মেখলা (অনেকের মতে সম্ভবতঃ ইহা যজ্ঞোপবীতের আবরণ, কেননা ইহার ব্যবহারও ঐরূপ; ইহা পদস্থ যোদ্ধাদিগের তূণীর-বন্ধন ছিল*), কিন্তু বোধ হয় গল-দেশের হার, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কটি-বন্ধ—সম্মুখে বন্ধনী-(brooch) যুক্ত-স্ত্রীলোকদিগের মেখলা, চন্দ্রহার, ইত্যাদিতে অতিশয় মার্জ্জিত রুচি, নিপুণ শিল্পীর কারুকৌশল, জ্ঞানী কলাবিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও রূপরসজ্ঞের পরিকল্পনা একাধারে সকলই পাওয়া যায়। গহনায় স্থূল ও সূক্ষ্মের বিচার, আয়তনের সংমিতি (proportion), সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং মণি সংযোগে আকার আয়তন ও বর্ণচ্ছায়ার বিচার ও বিন্যাস, এই সকল উচ্চ অঙ্গের শিল্পজ্ঞান, ঐ সুদূর প্রাচীন কালের ভারতে কিরূপ প্রখর ছিল, তাহার সাক্ষ্য অজন্টার চিত্রাবলী আজও দিতেছে।

আশ্চর্য্য এই যে, সমগ্র অজন্টার চিত্রাবলীতে কোথাও নাসিকার (নথ, ফুল, নোলক, নাকছাবি ইত্যাদি), পদাঙ্গুলির গহনা (চুটকি, নূপুর বা আংটি) দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও কর্ণের "মাকড়ি দুল", মণিবন্ধের বলয় ব্রেস্‌লেট, ও বাজু তাবিজ অঙ্গুরীয়ক (আংটি) ইত্যাদি গহনার বিভিন্নপ্রকার নিদর্শন পাওয়া যায়।

কোণযুক্ত মণিকর্ত্তন পদ্ধতিরও কোনও বিশেষ পরিচয় অজন্টায় পাওয়া যায় না।

* অজন্টা চিত্রাবলীতে যোদ্ধ পুরুষের অঙ্গের তূণীর বন্ধন দ্রষ্টব্য।



অজন্টা। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দী। গহনায় সুরুচি, বাহুল্যদোষ বর্জ্জন ও পরিকল্পনায় সূক্ষ্মভাবের বিকাশ।
দৃঢ়সংবদ্ধ গহনা নির্ম্মাণে দক্ষতার পরিচয়।

অজন্টার শেষের যুগে গহনার ব্যবহারে ও ধারণ-পদ্ধতিতে বিশেষ মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। গহনার বাহুল্য বা অশোভন ব্যবহার কোথাও পাওয়া যায় না। পায়ের গুল্‌ফের গহনা (মল-পাইজোর বা নূপুর) সাঁচি বা অমরাবতীর মূর্ত্তির ন্যায় স্থূল বা বহুসংখ্যক নহে এবং সর্ব্ব অঙ্গের গহনার মধ্যে সামঞ্জস্য (অসামঞ্জস্য-দোষবিহীনতা) আছে।

সাঁচি (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) ও অমরাবতীর (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় হইতে খৃঃ প্রথম শতাব্দী) গহনা এবং অজন্টার প্রথম যুগের গহনায় (নবম ও দশম গুহায়, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) বাহুল্য, অসামঞ্জস্য ও গঠনবিকৃতি এই তিনই আছে, কিন্তু অজন্টার ও অমরাবতীর কোন কোন গহনার (যথা "বাজুর" গহনা ও কুণ্ডল) কারুকার্য্যের ও গঠনের বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট।

ভারুটের (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) গহনায় দৃঢ়সংবদ্ধ যাহা কিছু, তাহার মধ্যে রচনা বা গঠনের বিশেষত্ব কিছুই নাই, বরং গুল্‌ফের গহনা অনিপুণ ও বাহুল্যদোষযুক্ত। কিন্তু ধাতুহারের রচনায় ঘনচতুরস্র নলখণ্ডের (rectangular hollow pieces চারকোণা নলের খণ্ডের) বিন্যাস সুন্দর ও শোভন, সন্দেহ নাই।

ঐ সময়ের উড়িষ্যার উদয়গিরি রাণীগুম্ফার গহনা অতি স্থূল ও কদাকার।

খৃঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি স্বর্ণময় গহনা এক বৌদ্ধ স্তূপে পাওয়া গিয়াছে। তাহা কর্ণাভরণ (ঝুমকা-জাতীয়) বিশেষ: উহাতে তখনকার শিল্পীর সূক্ষ্ম কার্য্যের ও পরিকল্পনার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর (কুষান যুগের) গহনার পরিচয় মথুরার ঐ কালের ভাস্কর্য্য শিল্পে আমরা পাই। তাহাতে হার ভিন্ন অন্য গহনার বিপুল আকার ও বাহুল্য এই দুই দোষ আছে। কিন্তু হারের গঠন ও রচনা দুই সুন্দর।



অমরাবতী। স্থূল গহনা ও গহনার বাহুল্যের আদিম অসংস্কৃত রুচির নিদর্শন (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় হইতে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দী)

খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর ভাস্কর্য্য-শিল্পে (দেওগড়, উদয়গিরি, গোয়ালিয়র ও বিহার) গহনার নিদর্শনে দেখা যায়, যে, বাহুল্য ও বিপুল আকার এই দুই দোষ দূর হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গের গহনায় শিল্পীর কল্পনা ও অপূর্ব্বতার (originality) পরিচয় পাওয়া যায়। দৃঢ়সংবদ্ধ কণ্ঠাভরণ, মুকুটের নূতন পরিকল্পনা, ইত্যাদির সূত্রপাতও এই সময়ে লক্ষিত হয়। দেওগড়ের একটি মূর্ত্তিতে স্ত্রীলোকের নূতন প্রকার মেখলা (চন্দ্রহার) ও মেখলাবন্ধনার নূতন পরিকল্পনা দেখা যায়।

খৃঃ পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দীর গহনার নিদর্শন, পশ্চিম ভারতে অজন্টা, বাদামা, এলুরা ও এলিফ্যাণ্টা, এবং উড়িষ্যার মুক্তেশ্বর মন্দিরে পাওয়া যায়। ইহাই বোধ হয় পরিকল্পনা, উদ্ভাবন ও অপূর্ব্বতার হিসাবে হিন্দু গহনাশিল্পের চরম উৎকর্ষের যুগ। ইহার পরবর্ত্তী যুগের কোণার্ক ভাস্কর্য্য-শিল্পের গহনার রচনা ও নির্ম্মাণ-কৌশল অত্যুৎকৃষ্ট, কিন্তু সে-সকল গহনার পরিকল্পনা ইত্যাদির প্রশংসার অধিকাংশ ঐ পূর্ব্ব যুগের শিল্পীদের প্রাপ্য। তাহাদেরই কল্পিত ও উদ্ভাবিত কলার ক্রমোন্নতি হইয়া কোণার্ক যুগের হিন্দু গহনা-শিল্পের আবির্ভাব হয়। এই যুগের (খৃঃ পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী) গহনার পরিচয় অজন্টার বিবরণীতেই দিয়াছি।

কোণার্কের (খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী) গহনার বিশেষ পরিচয় কি দিব? সে যুগের প্রত্যেকটি গহনা তখনকার ললিতকলার রত্নকল্প-উজ্জ্বল নিদর্শনবিশেষ। কারুকার্য্যের নৈপুণ্যে, সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় রেখাপাতে, লালিত্যে ও গঠনকৌশলে সে-সকল অতুলনীয়। দৃঢ়-সংবদ্ধ, গ্রথিত, মুদ্গরতাড়িত (hammered), মণি-সংযোজিত, পুষ্পিত (ফাঁপা) ইত্যাদি সকল পদ্ধতির অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ঐ সময়ের শিল্পে পাওয়া যায়।

মণিকর্ত্তন, মিনা ইত্যাদি অল্প কয়েকটি বিশেষ অঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য বা পূর্ব্বদেশীয় গহনাশিল্পী অজন্টা ও কোণার্ক যুগের শিল্পীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, ইহা নিঃসন্দেহ; এমন-কি এযুগের শিল্পী তাহাদের সমকক্ষ কি না, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তুলনার জন্য পাশ্চাত্য গহনা-শিল্পের রাজধানী প্যারিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গহনা-শিল্পের (প্যারিস ইত্যাদি প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত) কয়েকটি নিদর্শন ও মহারাণী আলেক্জান্দ্রার বিবাহের যৌতুক রূপে দত্ত (অতএব অত্যুৎকৃষ্ট) ভারতীয় গহনার কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হইল। অজন্টার শেষ যুগের ও কোণার্ক ইত্যাদির গহনার সহিত পাঠক তুলনা করিয়া দেখিবেন।

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহা বুঝা যায়, যে, গ্রথিত বা সংশ্লিষ্ট (linked) অলঙ্কারের ব্যবহার এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিত। অর্থশাস্ত্রের মালা-নির্ম্মাণ বিবরণ এই প্রবন্ধেই লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মপদে (খৃঃ পূঃ বা খৃঃ ১ম শতাব্দী) রাজকোষাধ্যক্ষের কন্যার জন্য মেখলা নির্ম্মাণের বিবরণ আছে। ঐ অলঙ্কারের প্রধান অংশ একটি স্বর্ণময় মণিযুক্ত ও মণিখচিত ময়ূর। ময়ূরের দুই পাশে পাঁচশত করিয়া এক সহস্র লোহিত স্বর্ণময় ময়ূরপক্ষ (পালক) ছিল। অতএব সেই গহনায় অন্তত পক্ষে ১০০১টি মণিমাণিক্য ও কারুকার্য্য-খচিত অংশ ছিল। সুতরাং স্বর্ণের উপর কারুকর্ম্মে এদেশের শিল্পী তখনই অতিশয় দক্ষ।

একখণ্ডে নির্ম্মিত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গহনা (যথা বলয়, অনন্ত, হাঁসুলি) কিন্তু ঐ আদিযুগে বিশেষ সুদৃশ্য বা সুগঠিত হইত না। ভারুট সাঁচি অমরাবতীর ঐ প্রকার গহনা অতি বৃহৎ ও কুৎসিত। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায়, যে, ঐ যুগের শিল্পী বোধ হয় সূক্ষ্ম ঢালাই ও কুন্দন (কোঁদা, turning, lathework) কার্য্যে ততটা সিদ্ধহস্ত ছিল না, সুতরাং স্থূল ঢালাই করিয়া হাতুড়ী ও ছেনী বাটালী দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিত। ঠিক ঐ কারণেই বোধ হয় কণ্ঠহার ইত্যাদিতে প্রথমতঃ সমস্ত অংশ সমরেখায় রচিত



উড়িষ্যা। খৃঃ দশম শতাব্দী। অশোকবৃক্ষ-দলনরতা যুবতী

হইত। পরে কুন্দন ও সূক্ষ্ম ঢালাইয়ে দক্ষ হইলে শিল্পী তাহার পরিকল্পনায় ভগ্ন রেখা, শুণ্ডাকৃতি লম্বমান অংশ ইত্যাদির সমাবেশ করে।

স্বর্ণ-রৌপ্যের সংঘাত (ঝাল দেওয়া) বিদ্যাও এদেশে বহুপ্রাচীন ; সুতরাং স্বর্ণসূত্রনির্ম্মিত (filigrain) অলঙ্কার-নির্ম্মাণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

এই প্রবন্ধের ত্রিবর্ণ চিত্রগুলির পরিচয়

ইয়োরোপীয় গহনা—

চিত্রের সর্ব্বোপরিভাগে—দুইটি অত্যাধুনিক চুলের কাঁটা (ফরাসী পরিকল্পনা)। উপকরণ স্বর্ণ, মুক্তাশুক্তি (Mother of pearl), মিনা এবং উপরত্ন (Semi-precious stones)।

উপরি মধ্যভাগ—কণ্ঠাভরণের চিত্র। চিত্র মধ্যে দুইটি "দুল" এবং একটি দোলক (pendant ধুক্‌ধুকি)। কণ্ঠাভরণের শুণ্ডাকৃতি দোলকসকলও কোণার্কের পরিকল্পনার মত। মণিসংযোজনও প্রাচীন ভারতীয় প্রথার। মণিগুলি কোণশূন্যভাবে কর্ত্তিত। দুল ও দোলকের পরিকল্পনা মণিসংযোজন ইত্যাদি সমস্তই ভারতীয় মতে। গহনার প্রস্তুতকারক পেটিটো নামক প্রসিদ্ধ পারী নগরস্থ অলঙ্কারনির্ম্মাতা (ফরাসী)।

মধ্যভাগে—একটি চিরুণি ও একটি মুকুট (Tiara)। মণিকর্ত্তন-প্রথা ভারতীয় প্রথার সদৃশ কিন্তু পরিকল্পনা ও চিরুণিতে "কামিও" (Cameo) সন্নিবেশ ফরাসী "এম্পায়ার" আদর্শ অনুযায়ী।

অধোমধ্যভাগ—"এম্পায়ার" আদর্শের কণ্ঠাভরণ ও দোলক (ফরাসী)।

অধোদক্ষিণভাগ—ভারতীয় আদর্শের দুল (ফরাসী প্রসিদ্ধ জহুরী নির্ম্মিত)।

সর্ব্বনিম্নে—ব্রুচ্ (বন্ধনী) স্বর্ণনির্ম্মিত, ভারতীয় প্রথায় নানাবর্ণের মণিখণ্ড (কোণশূন্য) সন্নিবেশে উপলচিত্র (Mosaic) অঙ্কন। অত্যাধুনিক ইংরাজী পরিকল্পনা।

উপরোক্ত গহনাগুলি প্রদর্শনী সকলে পুরস্কার প্রাপ্ত।

ভারতীয় গহনা—

উপরে ঝুমকা। স্বর্ণ, মুক্তা, মিনা এবং কোণবিহীনভাবে কর্ত্তিত মণি দ্বারা নির্ম্মিত। কোণবিহীন মণি সমাবেশে বর্ণের স্নিগ্ধভাব দ্রষ্টব্য। ১৮শ শতাব্দীর দিল্লীর গহনা।

অন্য সকল গহনা, মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক মহারাণী আলেকজান্দ্রাকে বিবাহযৌতুকরূপে প্রদত্ত ভারতীয় অলঙ্কার। বর্ণসমাবেশের লালিত্য, পরিকল্পনার স্পষ্ট প্রকাশ ও কঠোর জ্যোতিস্ফুরণবিহীনতা দ্রষ্টব্য। তাবিজ, মোহনমালা ও হার

অজণ্টা। রাজ্ঞীর প্রসাধন, রাজ্ঞীর অঙ্গের গহনা—শিরে মুকুট (তাম্র ও স্বর্ণ নির্ম্মিত) বর্ত্তুলাকার মণি-সংযোজিত। গলদেশে বৃহৎ মুক্তামালা (মণিযুক্ত) বাজুবন্দ, মেখলা, বলয় (দৃঢ়সংবদ্ধ ও গ্রথিত)। পায়ে কারুকার্য্যবিহীন "মল"। চামরধারিণীর মণিবন্ধে বৃহৎ গহনা (আধুনিক উড়িষ্যার গহনা)।

অজণ্টায় নাসিকার গহনার চিত্র নাই। ত্রয়োদশ খৃঃ পর্য্যন্ত অন্য কোন এদেশীয় মূর্ত্তি বা চিত্রে ও তাহার নিদর্শন পাই নাই। সুতরাং নাসিকার গহনা অহিন্দু বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ *

বাণী যাঁর অতিক্রমি' সুন্দরের সহস্র তোরণ
শান্ত-শিব-রূপোত্তমে ধ্রুবলোকে করিল আরতি,
মন্ত্রে যাঁর উদীরিত মধুচ্ছন্দা বিশ্বের ভারতী
ভারত-ভারতী-মুখে, তাঁরে আজ করি গো বরণ,—
অতীত-কীর্ত্তির কূলে ভারতের বাণী-আহরণ,
তারি যোগ্য পুরোধার পদে। মোরা ক্ষুদ্র স্বল্পমতি,
উৎসাহ-অধীর,—সত্য-সুন্দরের হে যজ্ঞ-সারথি!
হোমভস্ম-পূত হস্ত রাখ শিরে শঙ্কা-নিবারণ।

হেরিয়াছ তুমি, কবি, হেথা মহামানব-সাগরে
বিরাট মিলন মেলা!—ভারতের সে তীর্থ-প্রমাণ
দেখি মোরা দেশে দেশে লেখা আছে অক্ষয় অক্ষরে!
সসাগরা ধরিত্রীরে নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণ সমান
একদা হেরিল যারা, তাহাদেরি শ্রেষ্ঠ বংশধরে
পূজে আজ এই 'মহা-ভারতে'র নব প্রতিষ্ঠান।

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

তিমির-গহন পূর্ব্ব গগন করি' মন্থন জ্যোতির্ম্ময়
দৃপ্ত দান্ত দীপ্ত কান্ত ঘোর দুরন্ত কে নির্ভয়
রশ্মি-শায়কে দীপ্তি-পাবকে বিনাশি' দৈত্য অন্ধকার
পূত নির্ম্মল হেম-উজ্জ্বল জাগিল মহান্ নির্ব্বিকার?
দশ দিক্ যার স্নেহসম্ভার লভি' বন্দনা করিছে গান,
ক্ষুদ্র ক্লিন্ন অধম খিন্ন জ্যোতির পরশে লুপ্ত-প্রাণ,
সুপ্ত গোপন সজাগ চেতন, অন্যায় শিরে হানিছে কর,
অজীবে জীবন, কলুষ-নাশন কে রে এ ভীষণ শক্তিধর?
জগৎ-জীবন জগৎ-পোষণ রবি রবি এরে জ্যোতির্ম্ময়,
করি' মন্থন পূর্ব্ব গগন সর্ব্ব জগৎ করিল জয়।

* * * *

মধু-বঙ্কিম দৃঢ়-ভঙ্গিম ঊষা পুষা দুই অগ্রদূত
বঙ্গ-গগন-তিমির-হরণ দুই দিগ্‌জয়ী কী অদ্ভুত
রবি-পন্থার ভাতি-সঞ্চার করিয়া ঘোষিল সুপ্রভাত,
ফুল্ল-নয়ন দৃপ্ত-গমন রবি করে পিছে নয়নপাত,
হাসে দশ দিক্, হাঁকে কুহু পিক, হাসিল ভুবন তৃণ ও ফুল,
বঙ্গ-ভারতী কিরণ-আরতি লভিয়া তুলিল মুখ রাতুল,
তাহার গোপন যতেক বেদন করিল হরণ রবির কর,
ভারতী-বক্ষ বঙ্গ-কক্ষ আঁধারবিহীন সুভাস্বর,
মানব-চিত্ত-নিহিত-বিত্ত জগৎ-নয়নে সমুজ্জ্বল,
ত্রাসিত ক্লিষ্ট স্বপনাবিষ্ট হইল প্রবল যা দুর্ব্বল,
কাব্য-কমল মেলি' শত দল হর্ষমত্ত ফুল্লমুখ,
নিরাশা-তিক্ত কান্তি-রিক্ত মানব আজিকে পূর্ণসুখ!
জগৎ-জীবন জগৎ-পোষণ উদিয়াছে রবি জ্যোতির্ম্ময়,
করি' মন্থন পূর্ব্ব গগন সর্ব্ব জগৎ করিল জয়।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

* রবীন্দ্রনাথের যবদ্বীপ গমন উপলক্ষে বৃহত্তর ভারত পরিষদের পক্ষ হইতে রচিত।



বিদেশ

ফরাসী রাষ্ট্রনেতার ইংলণ্ড-ভ্রমণ—

ফরাসী রাষ্ট্রের সভাপতি ম্যঁসিয়ে ডুমার্জ (M. Doumergue) সম্প্রতি রাজ-অতিথিরূপে ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া এই ভ্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য পরিলক্ষিত হয় নাই বরং সময় সময় উভয় শক্তিতে রাষ্ট্রীয় মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড এই মনোমালিন্য ঘুচাইবার প্রয়াস পান ও তাঁহার চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হয়। সেই চেষ্টার ফলেই বিভিন্ন রাষ্ট্র আঁতাত করডিয়াল্ (Entente Cordiale) সৃষ্ট হয় এবং তিনি "ইউরোপের শান্তি-স্রষ্টা" রূপে খ্যাতি লাভ করেন। এই সৌহার্দ্দ্য-বন্ধনের ফলেই বিগত মহাসমরে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড মিত্রশক্তিরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। কাজেই ফরাসীরাষ্ট্রপতির ইংলণ্ডের বাকিংহাম প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণকে ইংরেজ জাতি ও ইংরেজী কাগজগুলি পূর্ণমাত্রায় ভাল ভাবে গ্রহণ করিয়াছে ও তাঁহাকে "Britifh Nation's Guest of Honour" (ইংরেজ জাতির মাননীয় অতিতিরূপে) আখ্যা দিয়াছে।

ফরাসী জনসাধারণ ও ফরাসী কাগজগুলিও রাষ্ট্রপতির এই সম্মানে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের মতে এই আদান-প্রদানে আঁতাত কর্ডিয়ালের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হইল। এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া একখানি ফরাসী কাগজ লিখিয়াছে, "ইহাতে মনে হইতেছে যেন দুইটি পুরাতন মিত্র বহুবর্ষ ছাড়াছাড়ির পর আবার একে অন্যকে খুঁজিয়া পাইয়াছে।"

সোভিয়েট-ইংলণ্ড সংঘর্ষ—

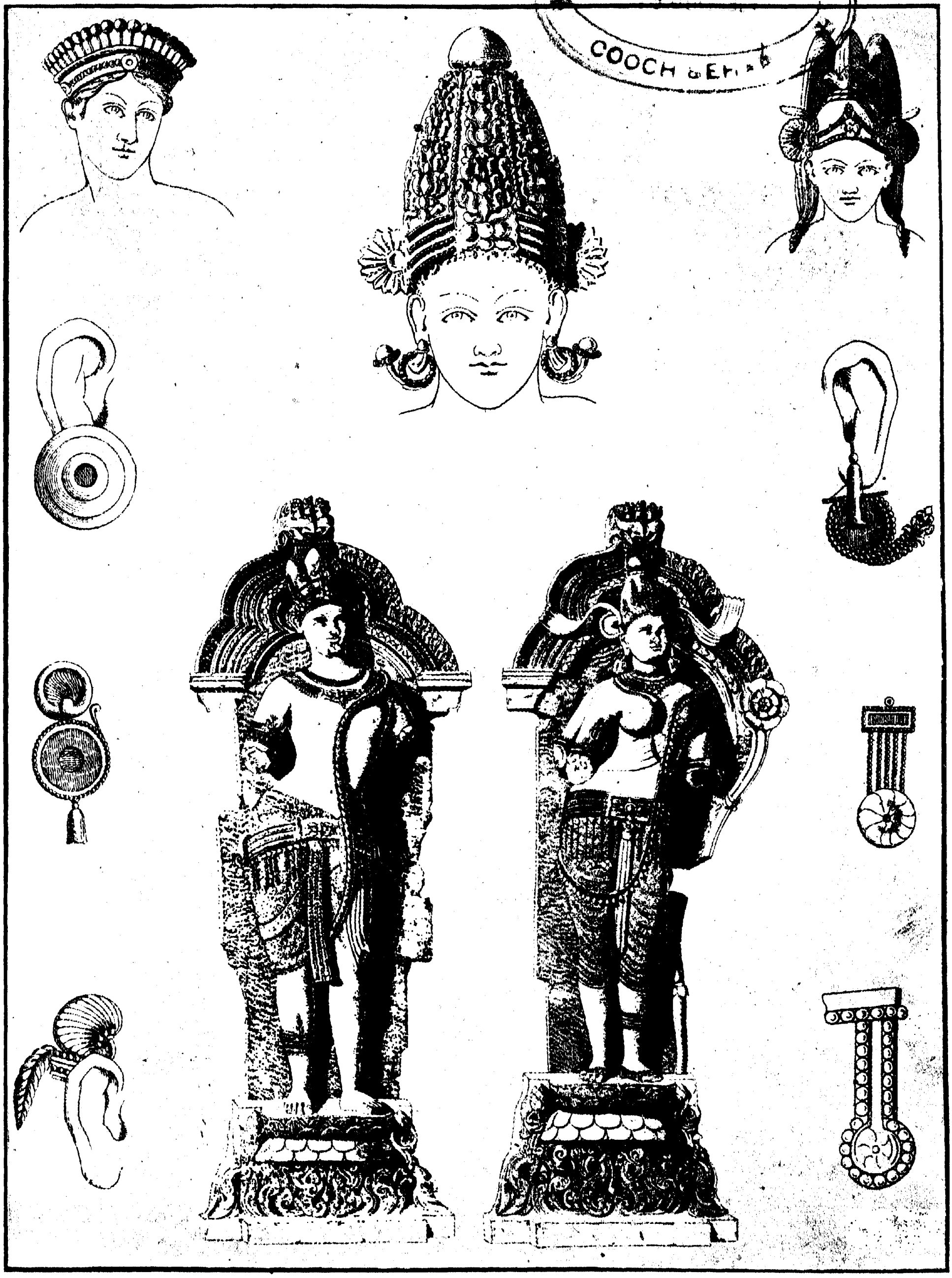
ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বহুদিনের বিস্মৃত বন্ধুর মত একে অপরের করকম্পন করিল—কিন্তু হঠাৎ সেই সময়েই ইংলণ্ড-সোভিয়েটে সংঘর্ষের সূচনা দেখা দিল। বিগত ২৪শে মে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বাল্‌ডুইন পার্লামেণ্টে ইংলণ্ড-সোভিয়েট সন্ধির অবসান হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। কিছুদিন হইতে সকলের মনেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিবে বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল। ইংলণ্ড যে সোভিয়েটের কার্য্য-কলাপ ভাল চক্ষে দেখিতেছে না তাহার নিদর্শনও কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল। কিন্তু এই সংঘর্ষের আসন্ন কারণ হইতেছে ইংরেজদের দুইখানি দরকারী রাষ্ট্রনৈতিক দলিল অপহরণ। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করেন, দলিলগুলি ইংলণ্ড-স্থিত সোভিয়েট আডডা আর্কসে লুকায়িত আছে। সেই সন্দেহের বশে আর্কস-আডডা খানাতল্লাসী হয়, কিন্তু দলীল দুখানি পাওয়া যায় নাই। সরকারের সন্দেহ হইয়াছে যে, খানাতল্লাসীর সময় দলীল দুইখানি পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, খানাতল্লাসীতে এমন অনেক কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে যাহাতে নাকি প্রমাণিত হয় যে, আর্কস দরকারী দলিল-পত্র সরাইবার একটি আডডা। সোভিয়েট সরকার আর্কস-আডডার কার্য্য-কলাপ সমর্থন করায় ইংলণ্ড-সরকার তাহার সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইলেন। এই সংঘর্ষে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল কাগজগুলি খুব খুসী হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদল এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছে। এই সংঘর্ষের ফলে বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে এবং আরও অন্য প্রকারের অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

এই বিরোধের অব্যবহিত পরে আর-একটি ঘটনা ঘটায় ঐ আশঙ্কা আরও প্রবল হইয়াছে। ইংলণ্ড ও সাম্রাজ্যবাদী দুই একটি শক্তির চাল-চলনে সোভিয়েট সরকারের মনে সন্দেহ হইয়াছে যে, উহারা তাহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। ঘটনাটি এই :—পোল্যাণ্ডস্থিত সেভিয়েট রাজদূত মস্কোএ আসিবেন বলিয়া যখন দূতাবাস হইতে বাহির হইতেছিলেন, তখন একটি তরুণ রুশ গুলি করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। এই হত্যাকাণ্ড ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বোস্‌নিয়া সহরে একটি সার্ব যুবক কর্ত্তৃক অষ্ট্রীয়ার যুবরাজের হত্যার কথা মনে করায়। সেই হত্যাকাণ্ডের ফলে সারা ইউরোপে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেভিয়েটদূতকে যে যুবকটি হত্যা করিয়াছে সে নাকি রাজতন্ত্রবাদী। ইহাতে ফ্রান্সের হাত আছে মনে করিবার কারণ এই যে, পোল্যাণ্ড ফ্রান্সের নিকট অনেক ঋণী। মহাযুদ্ধের অবসানে যখন অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মানী ও রুশিয়া ভাঙিয়া পোল্যাণ্ড নূতন করিয়া সৃষ্ট হয় তখন ফ্রান্স তাহাকে সাহায্য করে।

রুশ সরকারের কৈফিয়তের প্রত্যুত্তরে পোল্যাণ্ড জানাইয়াছে যে এই হত্যাকাণ্ডের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং এইজন্য তাহারা সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিবে। সোভিয়েট সরকার এই ব্যাপারে ইংলণ্ডকেও সন্দেহ করিতেছে। তাহারা বিদেশী গুপ্তচরদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে। মস্কোর ইংরেজ রাজদূত এই গুপ্তচরদিগের সহিত দূতাবাসের সম্পর্ক অস্বীকার করা সত্ত্বেও সোভিয়েট সরকার সে কথায় প্রত্যয় পান নাই। কারণ বিলাতের পার্লামেণ্টে "আর্কস খানাতল্লাসী "লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রমিক সদস্য ও ভূতপূর্ব্ব সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ পন্‌সন্‌বী স্বীকার করিয়াছেন যে, গুণ্ডার নিয়োগ, জাল-জুয়াচুরী প্রত্যেক দেশের (ইংলণ্ডেরও) পররাষ্ট্র বিভাগের কার্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ।" এই ইংলণ্ড-সেভিয়েট মনোমালিন্য ও সংঘর্ষের ফলে কি ঘটিবে তাহা অচিরেই দেখা যাইবে।

চীনের দাবী—

সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রগুলির মিথ্যা প্রচারের ফলে চীনের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত কথা জানা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ-চালিত বিশ্বদূত রয়টার কিছুদিন পূর্ব্বে আজগুবি সংবাদ দেয় যে, চীনের জাতীয়দল (কুয়োমিংটাং) দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। এ সংবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। জেনারেল চ্যাং কাইসেক ও জেনারেল ফেঙ উসিয়াং উভয়ে বিভিন্ন দলভুক্ত হন নাই। তাঁহারা পরস্পরের সহযোগীতায়



খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর উড়িষ্যার শির ও কর্ণের গহনা।   পুরুষ ও স্ত্রীর গহনা সজ্জা।

ভারতীয় গহনা-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন

জাতীয় শত্রু চ্যাংসোলিনের বিরুদ্ধে পূর্ণবেগে অভিযান চালাইতেছেন এবং পিকিং দখল করিবার জন্ম চেষ্টিত হইয়াছেন।

বিলাতের "ল্যান্স্‌বারী উইক্‌লী" নামক একখানি শ্রমিক কাগজে জেনারেল ফেঙ্‌উসিয়াং চীন দেশের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও জাতীয় দলের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। চীনের জাতীয়দলের দাবী কি ইহা পাঠেই স্পষ্ট হইবে। তিনি লিখিতেছেন :—

"(১) আমরা চাই ব্রিটিশ নৌবহর ও সেনানীর অবিলম্বে চীন পরিত্যাগ। আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে বিদেশীর হস্তক্ষেপ আমরা সহ্য করিব না।

(২) আমরা চাই ব্রিটিশ সরকার, মিশনারীগণ ও বণিকগণ চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেন অযথা হস্তক্ষেপ না-করে।

(৩) প্রত্যেক ব্রিটিশকে আমরা বুঝাইতে চাই যে, অ-সম সন্ধির যুগ অতীত হইয়াছে। এইসব সন্ধি-সর্ত্তের মূলে যে ঘোর অন্যায় ও অবিচার আছে তাহা চীনারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং উহা লোপ করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে। ব্রিটিশ-সরকার ৪০ কোটি চীনার এই সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে যেন চেষ্টা না করেন।

(৪) আমরা চাই ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশী জাতি চীন দেশে চীনাদের অনভিপ্রেত পণ্য যেন বিক্রয় না করে। চীনারা তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য কিনিবে। বাণিজ্যে তাহাদের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে এবং তাহাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তাহারা বাণিজ্যশুল্ক নির্দ্ধারিত করিবে। এ ব্যাপারে বিদেশীর হস্তক্ষেপ তাহারা সহ্য করিবে না।

(৫) চীনের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে সমস্ত বাধাকে তাহারা দূর করিতে চায়। কিন্তু একথাও আমরা বলিতে চাই যে, আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার শত্রু নহি, কিম্বা বিদেশীদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই। যদি গ্রেটব্রিটেন বা অন্য কোন দেশের জাতীয় প্রতিনিধিরা আমাদের দেশে আসিতে চান, তবে আমরা ভ্রাতৃ-ভাবে পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিব এবং আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইবার জন্ম সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিব।"

ইংলণ্ডের শ্রমিকদল চীনের জাগরণে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে। শ্রমিকদলের কতিপয় বিখ্যাত সদস্য কুয়োমিংটাং সমিতির নিকট এক পত্রে জানাইয়াছেন :—

"গ্রেটব্রিটেনে শুধু সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকেরাই যে আপনাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এরূপ নহে—অন্যান্য নরনারীও আপনাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহারাও চীনের ন্যায্য দাবী স্বীকার করিতেছেন।"

চীনের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী অবগত হওয়া সত্ত্বেও যে-সকল সাম্রাজ্যবাদী চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চায় ও অন্যায়ভাবে তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহাদিগকে মানব-স্বাধীনতার শত্রু আখ্যা দেওয়া ঠিকই হইবে।

প্রবাসী ভারতবাসীদের কথা—

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও দক্ষিণ আফ্রিকা—

দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যাসমাধান-সূচক সর্ত্তগুলি সেখানকার সমস্ত শিক্ষিত ভারতীয়ের মনঃপূত হয় নাই। সেই মীমাংসা-সর্ত্তে ভারতীয়দের সমস্ত দাবী গ্রাহ্য হয় নাই। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয়দের দাবী-দাওয়া লইয়া যে তুমুল আন্দোলন সুরু হইবে একথা বলাই বাহুল্য। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় এই সর্ত্তকে "সম্মান-সূচক" বলিয়া আখ্যা দেওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষিত ভারতবাসীরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আফ্রিকান ক্রনিকেলের সম্পাদক মিঃ সুব্রহ্মণ্য আয়ার ইণ্ডিয়ান ভিউস্‌ নামক কাগজে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কোন ভারতীয়ই এই সন্ধি-সর্ত্তকে ভূয়া ভিন্ন অন্য আখ্যা দিবে না।" যাহা হউক শাস্ত্রী মহাশয় দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ভারতীয়দের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিবে বলিয়া অনেকেই আশা করেন।

পূর্ব্ব-আফ্রিকা—

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভারতীয়-নির্য্যাতন উপশম হয় নাই। ইণ্ডিয়ানস্‌ এব্রড্‌ পুস্তিকায় মোম্বাসা (পূর্ব্ব-আফ্রিকা) হইতে একজন ভারতীয় পত্র-প্রেরক লিখিতেছেন :—

১৯১৯ সালের অর্থনৈতিক কমিশনের সুপারিশের ফলে ভারতীয়দের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। ইহার সুপারিশের ফলে এশিয়াবাসীদের এ-অঞ্চলে আসা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভারতীয় বণিক, ভারতীয় মজুরদের চেষ্টার ফলে এই প্রদেশের সম্পদ বাড়িয়াছে। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষের প্রবল ঢেউ সে-সব কথা চাপা দিয়াছে।

অন্যান্য আরও কয়েকটি বে-আইনি বিধান পূর্ব্ব-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের বিশেষ অসুবিধাকর হইয়া উঠিয়াছে। ১৯২৩ সালের একটি আইনের বলে ভারতীয়দিগকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে ও তাহাদিগকে উচ্চভূমিতে বসত বাড়ী নির্ম্মাণ অথবা বসবাস করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মোমবাসাতে ভারতীয়গণকে জমী বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে এবং নাইরোবিতে ভারতীয় হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ কল্পে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—ইউরোপীয়ানদের প্রতিবাদের ফলে তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সেখানে ভারতীয় শ্রমিকদিগকে জোরপূর্ব্বক খাটাইবার ব্যবস্থাও হইতেছে।

ব্রিটিশ গায়না—

ব্রিটিশ গায়নার সম্পদ আহরণ করিবার মানসে ইংরেজগণ কিছুদিন হইল সচেষ্ট হইয়াছেন। সম্প্রতি সেখানে ভারতীয় শ্রমিক আমদানী করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কন্‌ওয়ার মহারাজ সিংহ ভারতীয় শ্রমিকদিগের স্বার্থসংরক্ষণার্থ একটি স্কিম দিয়াছিলেন। কিন্তু পার্লা-মেণ্টের দুইজন সদস্য অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, ঐ স্কিম কার্য্যে পরিণত করিতে-হইলে বহু খরচা পড়িবে এবং স্কিমে ভারতীয়দের সম্বন্ধে যে-সকল সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রাজী হওয়াও সুকঠিন। তাঁহাদের ইচ্ছা গায়না-সরকার দক্ষিণ-আফ্রিকা, পূর্ব্ব-আফ্রিকা প্রভৃতির ন্যায় অল্প খরচায়, ভারতীয়দিগকে কোন প্রকার সুবিধা না দিয়া তাহাদের পরিশ্রমেই দেশটি সম্পদশালী করিতে চাহেন। কিন্তু ভারতীয় শ্রমিক পুনরায় ঠকিতে চায় না। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বেনারসী দাস চতুর্ব্বেদী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ব্রিটিশ গায়নার ভারতীয় শ্রমিক বসাত করিবার কল্পনা জলাঞ্জলি দিতে হইবে কারণ কনওয়ার মহারাজ সিংহের ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে ভারতীয়েরা সেখানে যাইতে কোন মতেই রাজী হইবে না।"

ফিজী—

কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বেনারসী দাস চতুর্ব্বেদী তাঁহার একটি ইংরেজ বন্ধু লিখিত একখানি পত্র ছাপাইয়াছেন। পত্রখানিতে ফিজীতে ভারতীয়দের অবস্থার কথা উল্লেখ আছে। তাহার মর্ম্মার্থ এই :—

ফিজীতে প্রায় ৬০ হাজার ভারতবাসীর বাস। তাহাদের অধিকাংশ

চিনির ব্যবসায়ে কাজ করে। ইহাদের মধ্যে ৭ হাজার মুসলমান, ২০ হাজার তামিল এবং বাকি সমস্ত হিন্দু। হিন্দুদের অধিকাংশ মধ্য প্রদেশের অধিবাসী। এখানে অনেকগুলি বোম্বাই ও পাঞ্জাবী দরজী কাজ করে। শ্রমিকদের অধিকাংশই কৃষি-দ্রব্য, চিনি, তূলা, কলা, উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত। অনেকে ষ্টোর্কিপার ও মোটর চালকের কাজ করে। প্রত্যেক শ্রমিকের দৈনিক আয় গড়ে দুই শিলিং।"

পত্রলেখকের মতে ফিজীতে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সদ্ভাব দিন দিন বেশী হইতেছে। দুঃখের বিষয়, সেখানেও হিন্দু মুসলমানে মনোমালিন্য দেখা গিয়াছে। তিনি বলেন, ফিজী-প্রবাসী ভারতীয়দের শিক্ষা ব্যাপারে আরও সুব্যবস্থা হওয়া দরকার।

রোডেশিয়া—

রোডেশিয়ায় ভারতীয় নির্য্যাতন সম্পর্কে মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ জুলাই মাসের মডার্ণ রিভিয়ু ও অন্যান্য ভারতীয় কাগজে ভয়াবহ সংবাদ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, রোডেশিয়ার মিউনিসিপ্যাল সমিতি "লাইসেন্সিং বিল্" নামক একটি আইন প্রণয়ণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। আইনের একটি ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে।

"কোন দোকান-স্থাপনের লাইসেন্স দিবার পূর্ব্বে যদি ইহা সপ্রমাণিত হয় যে, প্রার্থিত দোকানটি স্থাপিত হইলে সেইপল্লীর আশ-পাশের সম্পত্তির মূল্য হ্রাস হইবে তবে সেই দোকানদারকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।" মিউনিসিপ্যাল সভার সদস্য সকলেই ইউরোপীয় বণিক। তাহাদের সকলেরই জন্মগত বিশ্বাস যে, ভারতীয়দের স্থাপিত দোকানের আশ-পাশের (ইউরোপীয়) দোকানের মূল্য নিশ্চয় কম হইবে, কাজেই এই আইনের ফাঁকিতে ভারতীয় দোকানদারগণকে একঘরে করা হইতেছে।

দক্ষিণ রোডেশিয়াতেও বর্ণবিদ্বেষ চরম মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। যদিও "জাম্বেসী নদীর দক্ষিণে সকল সভ্য অধিবাসীর সমান অধিকার" বাণীর প্রবর্ত্তক সিসিল রোড্‌সের নাম অনুযায়ী এই প্রদেশের নামকরণ হইয়াছে কিন্তু এই সাম্যবাদীদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে যখন শ্রীমতী নাইডু এই প্রদেশ ভ্রমণ করেন তখন তথাকার ভারতীয়দের এত দুর্গতি ছিল না। কিন্ত এই তিন বৎসরের মধ্যেই তাহাদের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাহার কারণ দক্ষিণ রোডেশিয়ায় দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন (Responsible Govt.) ও দক্ষিণ-আফ্রিকা-নিবাসী কতকগুলি ইউরোপীয়ের দক্ষিণ রোডেশিয়ায় গমন। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় দায়িত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ইউরোপীয়গণ ভারতীয়দিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ অথবা নির্দ্দিষ্ট করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। কারণ বোধহয় এখানে স্বাধীনতার আস্বাদন পাইলে তাহারা সর্ব্বত্র এই-প্রকার দাবী উত্থাপন করিবে। ভারতীয়দিগকে একঘরে করিবার প্রচেষ্টাও যে সেখানে না হইতেছে তাহা নহে। তাহার একটি নিদর্শন পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। মিঃ এণ্ড্রুজ শীঘ্রই দক্ষিণ রোডেশিয়া যাত্রা করিবেন। তাঁহার প্রচেষ্টার ফলে কি হয় তাহা দেখা যাক্।

কেনিয়ায় ভারতীয়ের জীবনের মূল্য—

কেনিয়া হইতে সম্প্রতি নিম্নলিখিত সংবাদটি আসিয়াছে :—

কোন এক রবিবারে রাত্রিকালে কেনিয়ার মিণ্টা নামক জনৈক প্ল্যাণ্টারের গোলাবাড়ীতে ভারতীয় কুলীরা নৃত্য-গীত করিতেছিল। ইহাতে মিণ্টনের গোলবাড়ীর পার্শবর্ত্তী গোলাবাড়ীর অধিকারী অ্যালেন নামক আর একব্যক্তির মাতা ও স্ত্রীপুত্রের ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় অ্যালেনে নৃত্য-গীত বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দেয়। কিন্তু কুলীরা বলে যে, তাহারা মিণ্টনের গোলাবাড়ীতে নৃত্য-গীত করিতেছে, কাজেই অ্যালেনের কথায় তাহারা নৃত্য-গীত থামাইতে বাধ্য নহে। ইহাতে শ্বেতাঙ্গটি রাগে আত্মহারা হইয়া উঠে এবং নিজের বন্দুকে গুলি ভর্ত্তি করিয়া মিণ্টনের গোলা-বাড়ীতে গিয়া কুলীদের কুঠিরের উপর গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। তাহার এই-প্রকার আচরণে মাথুনামক একব্যক্তি বাহির হইয়া আসিয়া বলে, "ইহা মিণ্টনের গোল-বাড়ী, আপনি চলিয়া যান"। তাহার এই প্রকার উক্তিতে অ্যালেন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং মাথুকে বন্দুকের বাট দিয়া গায়ে ও মাথায় আঘাত করিতে থাকে। ফলে মাথুর কয়েকদিন পরে মৃত্যু হয়,—বিচারের সময় আসামী বলে যে, মাথু ভয়ানক মাতাল হইয়া তাহকে ছুরি মারিতে আসে এবং সে নিজের আত্মরক্ষার জন্য মাথুর মাথায় বন্দুক দিয়া আঘাত করে। ইউরোপীয় জুরীগণ অ্যালেনের কথাই বিশ্বাস করিয়াছেন এবং আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন।

বিদেশে ভারতীয় ছাত্র—

সম্প্রতি বিলাতের ভারতীয় ছাত্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইণ্ডাস্ পত্রিকায় মিঃ ভারুচা লিখিতেছেন :—

জাপানী ও চীনা ছাত্রেরা শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ও নিজেদের দেশের-সমস্যা সমূহের সমাধানের উপায় নিরূপণের জন্য ইউরোপের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে। তাহারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ডেনমার্ক প্রভৃতি নানাদেশে উপযুক্ত গুরুর অধীনে শিক্ষা পাইবার জন্য উৎসুক। আফ্‌গান সরকার আফ্‌গান ছাত্রদের মধ্যেও ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতেছেন; ভারতীয় ছাত্রেরাই শুধু শুধু অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন, এডিনবরা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় কি জন্য যে অযথা ভীড় করে তাহার কারণ বোঝা দুষ্কর। সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত শিক্ষাভিলাষী ভারতীয় যুবক কি জন্য যে লণ্ডনে অথবা অক্সফোর্ডে আসে তাহা আশ্চর্য্য! তাহারা কি জানে না যে, সে-বিষয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ডেনমার্কে তৎপরে ফ্রান্স অথবা জার্ম্মেনীতে যাওয়া দরকার!

আমেরিকার হিন্দুস্থানী ষ্টুডেণ্ট (The Hindustanee Student, 500 Riverside Drive, New York City, U. S. A.) আমেরিকায় গমনাভিলাষী ভারতীয় ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান-সমূহের সম্পাদকের নিকট হইতে তথাকার সংবাদ লইতে নির্দ্দেশ দিতেছেন :—

American Academics Club, Jehangir Wadia Bldg., Ist Floor, Esplanade Road, Fort, Bombay; The American Club, 121 Esplanade Road, Calcutta; The Indian Students Union, 221 Gower Street, W. C. I., London, England; Association des Hindus de Paris, 17 Rue de Sommerard, Paris, V France; Verein der Inder in Zentral Europa E. V., Knesbeck-Str,, 8-9 Berlin, Germany. Also consult American Express Company's offices.

—

ভারতবর্ষ

চীনে ভারতীয় মিশন—

বোম্বাই-এর ২৩শে জুনের খবরে প্রকাশ, হিন্দুস্থানী সেবাদলের জেনারেল সেক্রেটারী ডাক্তার হার্দ্দিকার স্ত্রী প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, চীনে বর্ত্তমানে যে মিশন পাঠান হইতেছে, তাহাতে

মহিলাদিগকে লওয়া অসম্ভব, এজন্য মহিলাদের দরখাস্তগুলি সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা হয় নাই। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে মিশনের জন্য লোক বাছাইয়ের নিমিত্ত একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। মোট ২০৯ খানা দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল। দরখাস্তকারীদের মধ্যে ৩৪ জন মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট, ১৬ জন আর্ট এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের গ্রাজুয়েট, ১৫ জন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কম্পাউণ্ডার, ৮ জন মেডিক্যাল ছাত্র এবং ১২ জন শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। প্রথম বাছাইয়ে ৬০ জন লোককে বাছাই করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিস্তৃত খবর জানিতে চাওয়া হইয়াছে। পরে চূড়ান্ত বাছাই হইবে। ছাড়পত্র লইবার জন্য সেবাদলের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী গভর্ণমেন্টের সহিত লেখালেখি চালাইতেছেন; ছাড়পত্র পাইলে শীঘ্রই মিশন চীনে রওনা হইবে।

নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ে দান—

নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী শ্রীমতী মনোরমা লেটি উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য ৪০০০০ টাকা দামের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। শ্রীমতী মনোরমা তাঁহার বিবাহ-উৎসব উপলক্ষেও বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ৬৮০০ টাকা দিয়াছেন।

—

বাংলা

কচুরী-পানা ধ্বংস—

স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হাজী গজনভী সাহেব সম্প্রতি "কচুরী"-পানা সমস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। কচুরী পানা বহুদিন যাবৎ বাংলাদেশের, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের, সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিতেছে। কচুরী পানা রক্তবীজের ঝাড়—শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ কোন স্থানেই হইতে ইহাকে একেবারে উচ্ছেদ করা যায় নাই। বঙ্গদেশ হইতেও যে ইহা একেবারে দূর করা সম্ভব হইবে মন্ত্রী মহাশয় ইহা আশা করেন না।

কি উপায় অবলম্বন করিলে কচুরীপানার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কি ভাবে কচুরী দেশের অনিষ্ট করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেন্ট মিঃ কালীপদ মৈত্রকে স্পেশাল অফিসাররূপে নিযুক্ত করেন। তাঁহার রিপোর্টে কচুরীপানার ধ্বংস লীলার যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভয়াবহ। রিপোর্টে প্রকাশ:—

"এই কচুরীপানা যে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসিগণের কি পরিমাণ ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহা কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা ধারণাই করিতে পারিবেন না। এই কচুরী পানা পূর্ব্ববঙ্গের জলপথসমূহ প্রায় রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। স্থানে স্থানে কচুরী এত বেশী জমা হইয়া থাকে যে, একশত ফিট পরিমিত জলপথের কচুরীপানা পরিষ্কৃত করিতে অনেক সময় একঘণ্টারও অধিক সময় লাগিয়া থাকে। অথচ পূর্ব্ববঙ্গে জলপথই হইল একমাত্র যাতায়াতের পথ। অনেক ক্ষেত্রে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কচুরীপানায় পথ আটকাইয়া যাওয়ার দরুন চাউলাদির আমদানী-রপ্তানীর বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে।

"ঢাকা বিভাগের অষ্টগ্রাম, নীলকী ও মিঠামাইন নামক থানাত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রায় ১০০ বর্গ মাইল চাষের জমি কচুরীপানার অত্যাচারের জন্যই কৃষকগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং বহু কৃষক ভিটামাটি ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। কচুরীপানা কেবল চাষের জমির অনিষ্টসাধন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অনেক স্থলে ঘাসের জমিও নষ্ট করিয়াছে। প্রথম কৃষকগণ ঘাসের পরিবর্ত্তে কচুরীপানা গরুকে খাইতে দিত; কিন্তু অনেক গরুই উহা সহ্য করিতে না পারায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

"পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানেই কচুরীপানা পানায় জলের পুষ্করিণীর উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়া ঐ সকল গ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিতেছে। আজ এই কচুরীপানার জন্যই পূর্ব্ববঙ্গে জলপথ রুদ্ধ, কৃষিক্ষেত্র পরিত্যক্ত।"

কচুরীপানার ধ্বংস সাধনের নিমিত্ত এপর্য্যন্ত অনেক কমিটী কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বরিশালের ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের কথায় বলিতে হয় যেন সরকার এই সমস্যা লইয়া খেলা করিতেছেন। আচার্য্য বসুর নেতৃত্বে যে তদন্ত সমিতি বসিয়াছিল তাহার সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু গ্রীফিত্‌স্ নামক একজন ইংরেজ আবিষ্কৃত "স্প্রে"র দরুন বাংলা সরকার অযথা অজস্র অর্থব্যয় করিলেন। কিন্তু এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে। মিঃ মৈত্র তাঁহার রিপোর্টের একস্থলে বলিতেছেন—"গত দশ বৎসর এসম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই। যদি একই সময় কচুরীপানা ধ্বংসের চেষ্টা না করা হয়, তাহা হইলে উহা কিছুতেই ধ্বংস করা যাইবে না। অবশ্য অনেকে ভাবিতে পারেন যে, একটি আইন প্রণয়ন করিলেই কচুরীপানা ধ্বংস করা যাইবে; কিন্তু কচুরীপানা আজ গারোপাহাড় হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; কাজেই কাজটি খুব সোজা নহে, তাহা ছাড়া আইন প্রণয়ন করা সহজ কিন্তু তাহা কাজে লাগান খুবই কঠিন। অনেকে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বঙ্গের ইরিগেশন ডিপার্ট-মেন্টকে জলপথ ও বিলসমূহ কচুরীমুক্ত করিবার ভার দেওয়া হউক। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জলপথ ও বিলসমূহের কচুরী আক্রান্ত-স্থানের পরিমাণ ৯,৮১১২০ একর। প্রতি একর কচুরী পরিষ্কৃত করিতে ২০ টাকা দরকার। এই হিসাবে ৯৮১১২০ একর কচুরী মুক্ত করিবার খরচ লাগিবে প্রায় দুইকোটী টাকা এবং এই টাকা গবর্ণমেন্টের পক্ষে দেওয়া বখনই সম্ভবপর নহে।"

বর্ত্তমান মাসে ঢাকায় "কচুরী" পানা সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য একটি মজ্‌লিস বসিবে। হয়ত এইজন্য নূতন কর ধার্য্য হইবে। কারণ মিঃ মৈত্র তাঁহার রিপোর্টে আভাস দিয়াছেন:—

"কচুরী-আক্রান্ত স্থানসমূহ হইতে প্রেরিত মালের উপর ট্যাক্স বসান ও ঐ ট্যাক্সের টাকা দিয়া জলপথসমূহ পরিষ্কার রাখা উচিত। এতদ্ভিন্ন মালবাহী নৌকার উপর ট্যাক্স বসান দরকার। কচুরীপানা ধ্বংস সম্বন্ধে একটি সেণ্ট্রাল বোর্ড গঠিত হইবে এবং উহাতে দশজন সদস্য থাকিবে। এই বোর্ডই ট্যাক্সের হার নির্দ্ধারিত করিবেন। এই সেণ্ট্রাল বোর্ড কর্ত্তৃক ইরিগেশন বিভাগ, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতিকে কোন্ স্থানের কচুরী পরিষ্কার করিবার ভার লইতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত হইবে।"

মন্ত্রী মহাশয় যাহাতে কচুরীপানার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া সফলকাম হইতে পারেন এবিষয়ে দেশবাসী নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন।

বাংলা সরকারের জেল রিপোর্ট—

বাংলা সরকারের ১৯২৬ সালের জেল শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে প্রকাশ, আলোচ্যবর্ষে বাঙ্গলার জেলগুলিতে কয়েদীর সংখ্যা সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। কলিকাতা, ঢাকা এবং পাবনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পটুয়াখালি জেলে সত্যাগ্রহী কয়েদীদের ভিড়ই প্রধানতঃ ইহার কারণ। জেলে কয়েদীদের সংখ্যার দৈনিক গড়—১২৭৭২ জন ছিল। ১৯২০ সাল হইতে ধীরে ধীরে কয়েদীদের সংখ্যা কমিয়াছে। এ বৎসর জেলে কয়েদীর সংখ্যা ১৩৩৫৭

জন ছিল। মেয়ে কয়েদী এবং ধেতাঙ্গ কয়েদীদের সংখ্যা প্রায় সমানই ছিল।

কয়েদীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রিপোর্টে প্রকাশ, কয়েদীদের স্বাস্থ্যের আরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

আলীপুরের জুভিনাইল জেলে ১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের স্কুল প্রতিষ্ঠা এই বৎসরের একটি প্রয়োজনীয় সংস্কার। কিশোর-বয়স্ক কয়েদীদের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত, তাহাদিগকে সত্বরই বাঁকুড়ায় পাঠান হইবে। তথায় তাহাদের জন্য ইংলণ্ড এবং মাদ্রাজের আদর্শে বোরষ্টাল স্কুলের অনুরূপ স্বতন্ত্র জেল করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য একটি বোরষ্টাল স্কুল বিলের মুসাবিদা করা হইয়াছে।

বিশ্বভারতীতে দান—

মিশরের রাজা ফোঁদ বিশ্বভারতীকে আরবী ভাষায় লিখিত পুস্তক সহ একটি পুস্তকাগার প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্বভারতীতে ইসলাম সভ্যতা-চর্চ্চার উদ্দেশ্যে একজন অধ্যাপক নিয়োগের জন্য হায়দ্রাবাদের নিজাম এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

বাংলায় নূতন কংগ্রেস দল—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নূতন নির্ব্বাচনের ফলে শাসমল-ব্যানার্জ্জী দল কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটিতে স্থান লাভ করেন নাই। প্রকাশ ঐ দল আবার কংগ্রেসে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য একটি নূতন দল গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই কয়েকটি সভায় এই নূতন দল কি ভাবে কার্য্য করিবে, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। এই নূতন দল কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া কার্য্য করিবে এবং এই দল "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কংগ্রেস দল" নামে পরিচিত হইবে। এই দলের উদ্দেশ্য হইতেছে কংগ্রেসের কার্য্য ও গঠন-পদ্ধতি এরূপভাবে সংস্কৃত করা যাহাতে কংগ্রেস প্রকৃতভাবে দেশের ও দশের মঙ্গল করিতে পারে, কৃষক ও শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং কংগ্রেস কর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিবার জন্য কংগ্রেসের ভিতরে ভিতরে যে একটা আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে বাধা দেওয়া। এতদ্ভিন্ন জিলা কংগ্রেস কমিটিগুলি যাহাতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে তজ্জন্যও এই দল বিশেষ চেষ্টা করিবে। যদি এই দলের উদ্দেশ্য কতকাংশে সফল হয় তাহা হইলে আগামী নবেম্বর মাসে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির নব নির্ব্বাচনে এই নূতন দল ও বর্ত্তমান কংগ্রেস অধিকারী দলের মধ্যে যে আবার ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নূতন দল আশা করে যে, যখন এই দল সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইবে তখন এই দল মাদ্রাজ বোম্বাই এবং যুক্ত প্রদেশ হইতে সমর্থনকারী পাইবে।

বাঁকুড়া অভয় আশ্রম গ্রন্থাগার—

এক বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া অভয় আশ্রমের গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। সুখের বিষয় যে, প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। এই আশ্রম সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য চাহিতেছেন।

পরলোকগত জগন্নাথ দেব—

আসামের প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ, শিলচর নর্ম্মালস্কুলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যক্ষ, শিলচর গবর্ণমেণ্ট হাই-স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীজগন্নাথ দেব বি-এ, বি-টি, মহাশয়ের বিগত ৭ই জুন তারিখে মৃত্যু হইয়াছে। আজীবনকাল তিনি "শ্রীহট্ট-কাছাড়-অনুসন্ধান-সমিতির" সহযোগী সম্পাদক ছিলেন তিনি "প্রাচীন কাছাড়" "সেকালের লোকশিক্ষা" প্রভৃতিও কাছাড়ের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। তিনি শিলচর-শিক্ষা-পরিষদের এবং তাহার মুখপত্র "শিক্ষা-সেবক" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। "কমলা" "শ্রীভূমি" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাতে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় তিনি "বাংলা ভাষার ইতিহাস" নামক তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও সাহিত্যিক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গত ৩রা জুলাই ৬৪ বৎসর বয়সে বাঁকুড়াতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন শাস্ত্রে এম্-এ উপাধি লাভ করিয়া প্রথম জীবনে স্কটিশচার্চ্চ কলেজে অধ্যাপকতা করেন। তিনি শ্রীশ্রী পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের একজন নিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি কিছু দিন "অলৌকিক রহস্য" নামক একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বীর শশীমোহন দে—

শ্রীহট্ট জেলায় ফয়েজউদ্দিন নামক একজন লম্পট অনেক নারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। অবশেষে পবিত্র পাটনী নাম্নী একটি



শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে

তেজস্বিনী যুবতীর উপর তাহার কুদৃষ্টি পড়ে। দুরাত্মা ফয়েজ তাহার বাড়ীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলে পর সে নিহত হয়। এই হত্যাপরাধে শ্রী শশীমোহন দে নামক একজন অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক ও তাহার তিনটি সঙ্গী দায়রা সোপর্দ্দ হয়। জজ ও জুরী একমত হইয়া শশীমোহনকে

নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া খালাস দিয়াছেন, এ-সংবাদ আমরা গত মাসে দিয়াছি। বাংলার সর্ব্বত্র অত্যাচরিতা নারীগণের করুণ ক্রন্দনে পরিপূর্ণ। যদি বাংলার যুবকগণ বীর শশীমোহনের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন তবে নারীর সতীত্বনাশকারী নরপশুদের অত্যাচার দূর হইবে।

বঙ্গে বিধবা-বিবাহ—

মৈমনসিংহ

কিশোরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী সাবিত্রী দাসী নাম্নী একটি বাল-বিধবার সহিত মহেন্দ্রচন্দ্র করণ নামক এক যুবকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

২০ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান্ মনোহর নমঃদাসের সহিত আলসা সাকিনের জনৈকা ১৬ বৎসর বয়স্কা বাল-বিধবা কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

গত ৩০শে বৈশাখ গাবতলা গ্রামে ৩০ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান্ বসন্তকুমার সরকারের সহিত মৃত নরোত্তম নমঃদাসের ১৬ বৎসর বয়স্কা বাল-বিধবা স্ত্রীর বিবাহ হইয়াছে।

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার টাঙ্গাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাসের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র দাসের সহিত করয়া নিবাসী পরলোকগত হরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের বাল-বিধবা কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভার শুভ পরিণয় টাঙ্গাইলে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

টাঙ্গাইলের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকস্থ পাথরাইল গ্রামের সন্নিকটে গ্রামে নমঃশূদ্র সমাজে ২টি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

২৪ পরগণা

বারাকপুর দেবীপ্রসাদ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরদেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্থানীয় ৺নন্দলাল পাল মহাশয়ের অষ্টাদশ বয়স্কা বিধবা কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীকে যথাবিধি হিন্দুমতে বিবাহ করিয়াছেন।

ফরিদপুর

পাংসা বিধবা-বিবাহ সমিতির চেষ্টায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত গজরা গ্রামে গত ১৪ই আষাঢ় তারিখে ইনাতপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র হালদারের বিধবা কন্যা শ্রীমতী বিপদাসুন্দরীর সঙ্গে গজরা গ্রামের শ্রীযুক্ত হেমলালচন্দ্র হলদারের বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। বর ও কন্যার বয়স যথাক্রমে ৩০ ও ১৪।

মেদিনীপুর

গত ৯ই আষাঢ় রবিবার দিবস তিলন্তপাড়া বিধবাবিবাহসভার প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সবঙ্গ থানার এলাকাধীন তিলন্তপাড়া গ্রামনিবাসী মাহিষ্য জাতীয় ৺সিদ্ধেশ্বর মাইতির পুত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্র মাইতির (বয়স ২৫ বৎসর) সহিত নবরঙ্গপুর গ্রামের ৺শিবনারায়ণ মাইতির বিধবা কন্যা (বয়স ১৮ বৎসর) শ্রীমতী বিধুমুখী দাসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বাঙালা রাজবন্দী—

ব্রহ্মদেশে ও বাংলায় আবদ্ধ (জেলে এবং অন্তরীণ) রাজবন্দীদের অনেকেরই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ একেবারে মরণের সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ইনসিন জেলে মরণাপন্ন কাতর সংবাদ পাইয়া তাঁহার বৃদ্ধা জননী, বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্টের নিকট মৃতপ্রায় পুত্রকে ভিক্ষা করিয়া এক আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদন-পত্রের উত্তরে সরকার মামুলীভাবে জানাইয়াছেন, তাঁহার দরখাস্ত 'চীফ সেক্রেটারীর' নিকট প্রেরিত হইল। অতঃপর এ বিষয়ে তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে হইবে। উপায়হীনা বিধবা বৃদ্ধা জননী, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কোন আশা-ভরসা পাইলেন না। রাজবন্দী জীবনলাল, হরিকুমার প্রভৃতি অনেকেই দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছেন।

মেদিনীপুরের ভীষণ দুরবস্থা—

কেলেঘাই বন্যা-সাহায্যকমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মহাপাত্র, পোষ্ট মঙ্গলামাড়ো, জেলা মেদিনীপুর (রেল ষ্টেশন—বালিচক্) হইতে লিখিতেছেন,—"গত ১৯২৬ সালে কেলেঘাই নদীর বন্যা-পীড়িত মেদিনীপুর জেলার পট্টাশপুর, ভগবানপুর, সবঙ্গ, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি থানার বহু গৃহ ভূমিসাৎ ও সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হইয়া এ অঞ্চলকে অন্তঃসারশূন্য করিয়াছিল। গত ৪ঠা জুনের প্রবল ঝড়-বৃষ্টি এদেশের যে কি ভীষণ ক্ষতি করিয়াছে, তাহার পূরণ হইতে যে আরও কতকাল লাগিবে, তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। এ অঞ্চলের প্রায় সমস্তই কাঁচা ঘর। বিচালীর চাল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে; বাতাসের বেগে বহু গৃহ ভূমিসাৎ ও অর্দ্ধপতিত হইয়া মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। পানের চাষে বহু শ্রমজীবী কালাতিপাত করিত; এ অঞ্চলের প্রায় শতকরা ৯৫।৯৬ পানের মাচা বা বরোজ ভূমিসাৎ হইয়া গৃহস্থের ও শ্রমজীবী সকলেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। মে মাসের শেষে প্রত্যহ ২।১ পশলা হিসাবে বৃষ্টি হওয়ায়, দরিদ্র কৃষকগণের অতিকষ্টে সংগৃহীত ৭।৮ টাকা মণ দরে খরিদ যে বীজ-ধান্য প্রায় সমস্ত মাঠে বপন করিয়াছিল, অতিরিক্ত বৃষ্টি হেতু প্রায় সমুদয় মাঠ ১৫।১৬ দিনেরও অধিককাল ২।৩ ফুট জলের নীচে থাকায় সে সমস্ত একেবারে নষ্ট হইয়াছে, আর দরিদ্র কৃষকগণ নিরুপায় হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।"

"গত বৎসর বন্যাপ্লাবনের পর, রিলিফপার্টি সমূহ চলিয়া যাওয়ার পর যথাসময়ে লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড ও পুলবন্দী বিভাগের বাঁধ মেরামতাদি রিলিফ কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় অনেক শ্রমজীবী ও দরিদ্র কৃষক জমি-জায়গা, গরু-বাছুর ও তৈজসপত্রাদি বন্ধক দিয়া ও বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে বীজধান্য সংগ্রহ করিয়াছিল ও সংসার প্রতিপালন করিতেছিল। এখন সকলেই নিরুপায়। এ বৎসর বীজধান্যের অভাবে শতকরা অন্ততঃ ৭০।৭৫ বিঘা জমি অনাবাদি থাকিবে। উহাতে দেশের ভাবী অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে, ভাবিবার কথা। এ অঞ্চলের পালপাড়া নামক একটি অপেক্ষাকৃত উন্নতাবস্থাযুক্ত গ্রামের ১৫৪৪ জন লোকের মধ্যে ৮৪৬ জন লোক প্রতিমাসে ১২ দিনও খাইতে পাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট ও সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্য ব্যতীত এদেশ একেবারে শ্মশানে পরিণত হইবে। আমরা যে কোনও রিলিফ পার্টিকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত আছি।"



পীতাম্বর সাণ্ডেল

শ্রীভাবকুমার কাঞ্জিলাল লিখিত ✤ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গুড় চিত্রিত

সকাল বেলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াই পীতাম্বর ওরুফে পিতোমবাবু একটা দেড় বিঘত আন্দাজ হাই তুলিয়া ও সেই সঙ্গে চিনে পটকা ছোঁড়ার মত তিনটা তুড়ি দাগিয়া স্বগত বলিলেন, "হন্দে হ'য়ে উঠেছি। কি কুক্ষণেই যে পুন্নাম নরক 'এভয়েড' কর্‌বার জন্যে এ কাজ কর্‌তে গিয়েছিলাম—উঃ, কেঁদে, কোকিয়ে, গালিয়ে, চেঁচিয়ে গিন্নি যেন 'মেনিন্‌জাইটিসে'র মত মাথার ভিতরটা ছারখারে দিতে ব'সেছে; আর ছেলেটা "আওয়ারে", "হাফ-আওয়ারে", "কোয়াটারে" গির্জ্জের ঘড়ির মত হাঙ্গামা ক'রে ঘুমের পাট একেবারেই তুলে দিয়েছে! এর পর একদিন কিছু একটা ক'রে বস্‌ব ব'লে রাখ্‌ছি—পিতোম সাণ্ডেল রাগ করে না, করে না, করে না; কিন্তু করে যখন···তখন হুঁ``` ম্‌ ম্‌···।"

পাশের ঘর থেকে নারীকণ্ঠে কে বলিল, "ওগো, এখানে অন্ধকারে সিন্দুকটার ভিতর অবধি ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি না, এটা একটু বারান্দায় বার ক'রে দাও ত। রিং থেকে সেফ্‌টিপিনটা যে কোথায় খুলে পড়্‌ল—কিছুতে যদি হাতড়ে পাচ্ছি।"

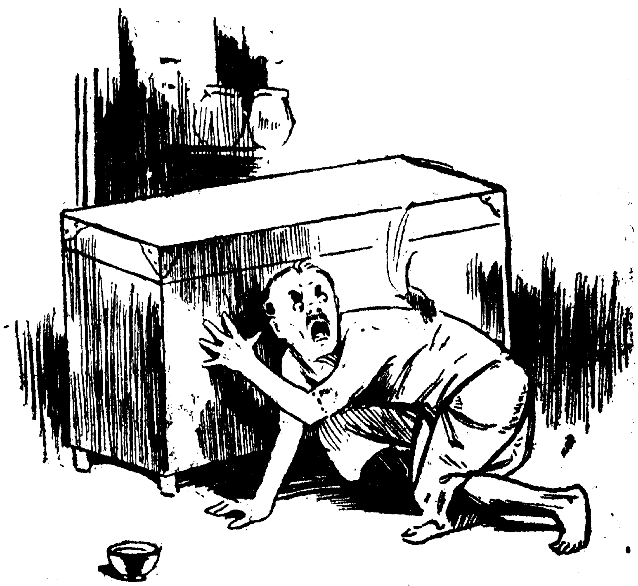
পিতোমবাবু মনে মনে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "অত্যাচার, অনাচার, অরাজকতা! সেফ্‌টিপিন পাচ্ছ না ব'লে আমি এখন ঘুমের চোখে তোমার পিতামহের আমলের জাহাজী সিন্দুকটা কাঁধে ক'রে দৌড়াদৌড়ি করি! জাহান্নমে যাক্‌ তোমার সেফটিপিন।"

বাহিরে মিহি গলায় বলিলেন, "মেধোকে ডেকে বলনা সিন্দুকটা বার ক'রে দিতে; আমার শরীরটা ভাল নেই তেমন।"

নারীকণ্ঠ কিছু উচ্চে উঠিল, "বেলা ৬টা হ'য়ে গেল এখনও বিছানায় শুয়ে গা মোড়ামুড়ি দেওয়া হচ্ছে। আমার খেটে খেটে প্রাণ গেল আর উনি শুধু আরাম কর্‌বেন। এস বল্‌ছি শিগ্‌গীর বাইরে, নইলে কুরুক্ষেত্র হবে!'

পিতোমবাবু একবার নেপথ্যে পরোলোকগতা মাতৃদেবীকে স্মরণ করিয়া সুড় সুড় করিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভাঁড়ারের সিন্দুকটি নিরামিষ চালডাল ও আমিষ ইঁদুর-আরশুলায় বেশ পুরা দুই কি আড়াই মণ হইবে। পিতোমবাবু তাহা তুলিতে চেষ্টা করিয়া, না

পারিয়া তাহাতে কাঁধ দিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দরজার আলোর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই আকস্মিক আন্দোলনে ভীত হইয়া একটি নেংটি ইঁদুর এক ছিদ্রপথে সিন্দুক হইতে তড়াক্ করিয়া বাহির হইয়া পিতোমবাবুর গলার উপর অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার শিরদাঁড়া বাহিয়া নামিয়া গেল। পিতোমবাবু, "আরে, আরে" বলিয়া ইঁদুরটিকে তাড়াইতে গিয়া একটু বেসামাল হইয়া মেঝের উপর গিন্নির রক্ষিত একবাটি সরিষার তেলের উপর বসিয়া পড়িলেন।



আড়াইমণ সিন্দুকটি— কাঁধ দিয়া দরজার আলোর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

গিন্নি তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এক ফোঁটা কাজ করতে এসে অমনি পোয়াখানেক তেল উল্টে বস্‌ল! বাবারে বাবা, আমি ত আর পারিনে—সেই কোন্ রাজ্যি থেকে নম্ব খুড়োকে সেধে সেধে ঘানির তেল আনাই; তার হ'য়ে গেল! বলি, রোজ যে এক গজা গিলে উজাড় কর, তা যায় কোথায়? একটা কাঠের বাক্স নেড়ে সরাতে গিয়ে যে হাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তেলের বাটি উল্টে গোল্লায় গেলে একেবারে?"

পিতোমবাবু, "এ্যাডিং ইন্‌সাল্ট টু ইন্‌জুরী" বলিয়া কি-একটা বলিতে গেলেন; তাহাতে উল্টা উৎপত্তি হইল। গিন্নি আবার হাঁকিয়া উঠিলেন, "আরে রেখে দাও তোমার ইন্‌জিরী—ইন্‌জিরী আদালতে বলো গিয়ে;—এক পয়সার যার দেহে সামর্থ্য নেই সে আবার ইন্‌জিরী বলে, মুখে আগুন অমন ইন্‌জিরীর!"

পিতোমবাবু অনুযোগের সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আরে বাবা..." কিন্তু কে সে-কথা শোনে? গিন্নি আরও খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, "তোমার বাবাকে যা বলতে চাও, তাঁকে গিয়ে বলো। আমি কিসে তোমার বাবা হ'লাম শুনি? এক বাটি তেল উল্টে আবার রস কর্‌বার চেষ্টা হচ্ছে! দূর হও এখুনি আমার ভাঁড়ার থেকে, নইলে ঐ বাকি তেলটুকুনও মাথায় ঢেলে দেবো বল্‌ছি।"

পিতোমবাবু দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী সত্য সত্যই কিছু উত্তেজিতা হইয়াছেন। তিনি তাই গেঞ্জির উপর তেলের ছোপটুকুকে পরাজয়ের টীকারূপে বহন করিয়া অক্ষত দেহে অবিলম্বে ভাণ্ডার-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

স্নান করিতে করিতে পিতোমবাবু ভাবিতে লাগিলেন,—এ কি? স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই যে ব্যবহার ইহাই কি চিরন্তন? সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, বেহুলা কি তবে পত্নী-সম্মার্জ্জনী-পীড়িত কবির পরিহাস মাত্র? 'পতি পরম গুরু' এ মন্ত্র কি স্ত্রীলোকের মর্ম্মে স্থান না পাইয়া অবশেষে তাহার চিরুণীতে আশ্রয় লইয়াছে? দেহ-গোদের উপর এ কি নিদারুণ বিষ-ফোঁড়া! পিতোমবাবু নিজ চিন্তার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া মাথায় ঘটির পর ঘটি জল ঢালিয়া চলিয়াছেন—চৌবাচ্চা নিঃশেষ, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। হঠাৎ স্নানাগারের বাহির হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে বলিল; "খুব যে নবাবী ক'রে সব জলটুকু খরচ ক'রে রাখছ—কলেতে জল

নেই—আমরা কি সব শালপাতায় গা হাত পা পুঁছে স্নানের কাজ সারব নাকি? রাস্তার কল থেকে ৪।৫ বাল্‌তি জল তুলে তবে তুমি আফিস যাবে, বুঝলে?"

পিতোমবাবু আতঙ্কে স্নানের জল ছাপাইয়া ঘামিয়া উঠিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া অন্যমনস্কতার দোহাই দিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নির্দ্দয় নারী-হৃদয়ে তাঁহার সে বেদনাপূর্ণ আবেদন "ন্যাকামো" বলিয়া অভিহিত হইল। অগত্যা তিনি বাল্‌তি হস্তে রাস্তায় জল আনিতে বাহির হইলেন। ভাবিয়াছিলেন মেধোকে উৎকোচ-দানে বশ করিয়া উন্মুক্ত রাজপথে বাল্‌তি হস্তে বিচরণ করার অপযশ হইতে আত্মসম্মান রক্ষা করিবেন।



এমন সময়ে পিছনে কে "হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ" করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। পিতোমবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন নেপেন ভাদুড়ী।

কিন্তু মেধো তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া সিঁড়ির পথে "মা ঠাকরুণ ডাক্‌তেছেন" বলিয়া উপর তলায় উধাও হইয়া গেল। প্রথম দুই বাল্‌তি জল পিতোমবাবু লোক-চক্ষুর অন্তরালে বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। কিন্তু তৃতীয় বাল্‌তি লইয়া তিনি সবে দরজার গোড়ায় পা দিয়াছেন এমন সময় পিছনে কে "হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ," করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। পিতোমবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন নেপেন ভাদুড়ীকে। নেপেন ভাদুড়ী তাঁহার সহিত এক আফিসে কাজ করে—এবং সময় পাইলেই অবান্তর কথা বলিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করে। এই ভাবে ধরা পড়িয়া পিতোমবাবু লজ্জায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। নেপেনবাবু বলিলেন, "আরে সাণ্ডেল মশায়, দিন দুপুরে জল চুরী ক'রে কোথায় পালাচ্ছেন?"

পিতোমবাবু কোন উপায়ে আত্ম-সম্মান বজায় রাখিবার জন্য বলিলেন, "আর ভাই, চাকর বেটা পালিয়েছে, দুর্দ্দশার পার নেই—ব'ল কেন?"

উপরের বারান্দা হইতে ঘন কৃষ্ণ দেহখানি অর্দ্ধেকের অধিক বাহির করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেধো চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবু, শিগ্‌গির করুন, মা-ঠাকরুণের চানের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে।"

"হে ধরণী দ্বিধা হও! এ কি নিদারুণ অপমানের আগুনে আমায় পুড়িতে হইল!" পিতোমবাবু এক-মিনিটে তিন চার বার রং বদ্‌লাইয়া করুণ নেত্রে নেপেন-বাবুর দিকে চাহিয়া কোনো কথা না বলিয়া বাল্‌তিটা তুলিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেলেন। নেপেনের অট্টহাস্যে পথ-ঘাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে-ধ্বনি যেখানে পিতোম-বাবু স্ত্রীর নিকট এক বাল্‌তি জল কম আনার জন্য জবাবদিহি করিতেছিলেন সেখানেও পৌঁছিল। পিতোমবাবু ক্ষণেকের জন্য কি যেন একটা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "ও আবার কি রকম ঢং কর্‌ছ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "কিছু না, আফিসের বেলা হ'য়ে গেছে।"

স্ত্রী বলিলেন, "ঐখানে ভাত বাড়া আছে নিয়ে খেয়ে আফিসে বেরও। ফের্‌বার পথে দুটো ডাব কিনে এনো—মেধো বল্‌লে, তোমাদের আফিসের কাছে পাওয়া যায়।"

দুই হস্তে দুইটি ডাব লইয়া নিজে আফিস হইতে গৃহাভিমুখে যাইতেছেন ও নেপেন ভাদুড়ী তাঁহার সহকর্মী-দিগের নিকট উক্ত ঘটনার সরস ব্যাখ্যা করিতেছে, এই

চিত্র অন্তরে অঙ্কিত করিয়া পিতোমবাবু কম্পিত চরণে আফিসের দিকে রওয়ানা হইলেন।

আফিসে ঢুকিয়াই তিনি দেখিলেন, নেপেন ভাদুড়ী জন দশেক ছোকরা-গোছের কর্ম্মচারী পরিব্যাপ্ত হইয়া কি যেন একটা অভিনয় করিতেছে। পিতোমবাবু বুঝিলেন যে, তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সহিত এ অভিনয়ের খুব নিকট কোন যোগ আছে। তিনি মুখ ফিরাইয়া কোন কল্পিত সরল রেখা অনুসরণ করিয়া সটান নিজের টেবিলে গিয়া বসিলেন। নেপেন ভাদুড়ী যে-সকল কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া জটলা করিতেছিল, তাহারা একে একে নিজের নিজের টেবিলে গিয়া বসিতে লাগিল। কেহ কেহ পিতোমবাবুর টেবিলের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া, "বাক্ আপ্ পিতোমবাবু" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া গেল,—যেন পিতোমবাবু তাহাদের নিকট সান্ত্বনার জন্য কখনও আবেদন করিয়াছিলেন। একজন বলিয়া গেল, "ব্রাদার, তোমার শুন্‌ছি বড় দুঃসময় চলেছে।—আমাদের পাড়ার ভুটানী বাবার একটা মাদুলী জোগাড় ক'রে ধারণ কর না; দেখ অব্যর্থ গ্রহশান্তি হবেই হবে—বল্‌ব বাবাকে তোমার কথা?"

পিতোমবাবু নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, "না, না, তোমায় অত পরোপকার কর্‌তে হবে না।" বলিয়া ব্যস্ততা দেখাইবার জন্য একটা আধমণে লেজারে টান দিতে যাইয়া টেবিলে ও নিজের ধুতিখানার উপর একটা লালকালির দোয়াত উন্টাইয়া ফেলিলেন। রাগে ক্ষোভে পিতোমবাবু পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। কাপড়ে কালি লাগা দেখিলে সুভাষিণী, অর্থাৎ পিতোমবাবুর গৃহিণী, তাঁহাকে কি যে না বলিয়া লাঞ্ছিত করিবেন তাহা পিতোমবাবু ভাবিতেই পারিলেন না। তাঁহার মানসিক অবস্থা যখন পত্নীভয়বিত্রস্ত কোনো এক আগ্নেয়গিরির ন্যায় ধূমায়িত, কম্পিত ও বিচলিত ঠিক সেই সময় নেপেন ভাদুড়ী আসিয়া পিতোমবাবুর মুখ নিতে হাত দিয়া গাহিয়া উঠিল—

দাদারে আমার,
দরগায় লাগাও সিন্নি,
পীরের কৃপায় হবেন গিন্নি
তোমা পরে সদয়া…ভাইরে সদয়া আ আ…।"

পিতোমবাবু বহু বর্ষের অনভ্যাস ভুলিয়া হঠাৎ পম্পিয়াই-বিধ্বংসী ভিসুভিয়সের মত সংহারমূর্ত্তি ধরিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। একবার "দি লাষ্ট ষ্ট্র" বলিয়া সিংহনাদ করিয়াই পিতোমবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া টেবিলের নীচ হইতে "ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট"টা তুলিয়া লইয়া নেপেন ভাদুড়ীকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন। নেপেন আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। পিতোমবাবু তাহার পশ্চাতে "রাস্কেল, রাস্কেল" বলিয়া চীৎকার



ধর্ষিত নেপেনের উপর উদ্যত-ওয়েষ্টপেপার পিতোমবাবু, উদ্যতবজ্র ইন্দ্রের ন্যায়ই শোভা পাইতে লাগিলেন। এমন সময় তিনতলার সিঁড়ি বাহিয়া আফিসের ছোট সাহেব নামিয়া আসিলেন।

করিতে করিতে ছুটিয়া সিঁড়ির নিকট তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। ধর্ষিত নেপেনের উপর উদ্যত-ওয়েষ্টপেপার পিতোমবাবু উদ্যত-বজ্র ইন্দ্রের ন্যায়ই শোভা পাইতে লাগিলেন। এমন সময় তিনতলার সিঁড়ি বাহিয়া আফিসের ছোট সাহেব নামিয়া আসিলেন।

তাঁহার মেম সাহেব সে-দিন তাঁহাকে গল্‌দা চিংড়ির সহিত তুলনা করিয়া কি বলাতে তাঁহার চিত্ত কথঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত ছিল। সম্মুখে এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া তিনি ভীষণ চটিয়া গেলেন ও বড়বাবুকে ডাকিয়া নেপেন ভাদুড়ীর ৫৲ ও পিতোমবাবুর ১০৲ জরিমানার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পিতোমবাবু অনেক করিয়া সাধ্য-সাধনা করা সত্ত্বেও সাহেবের কঠিন প্রাণে দাগমাত্র পড়িল না।

(২)

জরিমানার কথাটা পিতোমবাবু গিন্নির কাছে অনেক দিন ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু মাসান্তে সুভাষিণী যখন তাঁহার নিকট হইতে বেতনের টাকা গুণিয়া লইতেছিলেন তখন ১০৲ কম দেখিয়া পিতোমবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, "এ কি ১০৲ কম কেন ?"

পিতোমবাবু, "আমি এই কি না......" বলিয়া কি একটা বলিতে গিয়া ভুল পথে ঢোক গিলিয়া বিষম খাইয়া বসিলেন। তিনি পুনর্ব্বার স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিলে পর গিন্নি আবার তাড়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সত্যি কথা ব'ল বলছি নইলে অনর্থ হবে! রেস খেলেছ ? বাজি হেরেছ ? কি করেছ ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "না জরিমানা দিয়েছি। সেদিন কি রকম মাথাটা গরম হ'য়ে উঠ্‌ল......"

"তাই কি রাস্তায় মারপিট করেছিলে ? ওমা কি হবে গো! বুড়ো বয়সে শেষকালে মারামারি ক'রে থানা পুলিস বল্লে! ওগো মাগো, আমায় কিনা এও শুন্‌তে হ'ল!"

পিতোমবাবু যতই বলেন, "আরে না না, থানা নয়, পুলিশ নয়, আফিসে..." গিন্নির ততই শোক বাড়িয়া চলে, "ওগো তুমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালে শেষকালে —মুখে চূণ-কালি মাখলে, আমার এ কি লজ্জা হ'ল!"

এমন সময় নস্থ খুড়া আসিয়া পড়ায় গিন্নি পিতোমকে ছাড়িয়া তাঁহার পায়ের কাছে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন ও ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ও নস্থ-খুড়ো, বুড়ো বয়সে মারপিট..."

নস্থ-খুড়ো গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "ইস্টুপিড, পাষণ্ড কোথাকার, তুমি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোল!"

পিতোমবাবু দেখিলেন তিনি ক্রমে গভীর হইতে অতল জলে গিয়া পড়িতেছেন। তিনি এবার প্রাণপণ করিয়া গিন্নির কান্না খুড়ার গর্জ্জন সব ডুবাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পুলিশেও যাইনি, সুভাষিণীকেও মারিনি। ন্যাপা ভাদুড়ীকে সিঁড়ির মোড়ে চেপে ধ'রেছিলাম ব'লে সাহেব জরিমানা করেছে।"

গিন্নি বলিলেন, "ও, আফিসে গিয়ে বুঝি ঐ সবই করা হয় ?"

নস্থ-খুড়া বলিলেন, "তা আগে বলনি কেন ?"

সুভাষিণী এতক্ষণ পুলিশ-সংক্রান্ত কলঙ্ক-ভীতি হইতে সাম্‌লাইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি এখন ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছেলেছোকরাদের মত ধস্তাধস্তি কর্‌তে তোমাদের একটু ঘেন্নাও কি হয় না? দশ দশটা টাকা! এখন কি তোমার বাঁদুরেপনার জন্যে খোকার দুধ বন্ধ কর্‌ব, না, সকলে নিরিমিষ খেয়ে দিন কাটাব ?"

নস্থ-খুড়া বিচারকার্য্যনিরত সলোমনের ন্যায় মুখ করিয়া বলিলেন, "না না, শিশুর দুগ্ধপান বন্ধ করা কদাপি উচিত হইবে না। তদ্ব্যতীত, পীতাম্বর অনবধানতাবশত যে অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহার উচিত হইবে আগামী এক মাস কাল ট্রামে আফিস যাতায়াত না করিয়া পদব্রজে গমনাগমন করা।"

সুভাষিণী অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে পাইয়া আনন্দে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, নস্থ খুড়ো! হেঁটে হেঁটে আফিসে যেতে হ'লে, ওনার রসের কেঁড়ে একটুখানি হাল্কা হ'য়ে আস্‌বে—ছেব লামী কর্‌াও একটু বন্ধ হবে।"

পিতোমবাবু নস্থ খুড়োর দিকে একবার বিষনেত্রে তাকাইলেন ; কিছু বলিলেন না। সুভাষিণী খুড়া মহাশয়ের রায়ে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি খুসী মনে স্বামীকে বলিলেন, "তুমি যাও ত গো ছ-পয়সার

কচুরী নিয়ে এসগে। মেধো খোকাকে খেলা দিচ্ছে। নস্থ-খুড়ো একটু ব'সে চা-টা খেয়ে যাও।"

নস্থ-খুড়া একটা নিকেলের ডিবা বাহির করিয়া তাহা হইতে একটিপ তীব্রগন্ধ নস্থ গ্রহণ করিয়া একটি মাসাধিক-কাল রজকদর্শন-বঞ্চিত রুমালে নাক মুখ মুছিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ, তা তোমরা যদি বলো, তাহা হইলে কি আমি তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি?"

পিতোমবাবু ছয়টি পয়সা হস্তে লইয়া খাবারের দোকানে কচুরী আনিতে চলিলেন। মনে হইল কচুরী না হইয়া যদি নস্থ খুড়ার জন্ম বিষ আনিবার জন্ম এ যাত্রা হইত তাহা হইলে তাঁহার অন্তরে অন্তত কিছু সুখের সঞ্চার হইত। যে-ব্যক্তি পুরুষ হইয়া উৎপীড়িত পুরুষের বেদনা বুঝে না, বরং তাহার যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার বিষই, কচুরী নহে। হঠাৎ মনে হইল কচুরী খাইয়াও ত কেহ কেহ কলেরা হইয়া মারা যায়—নস্থ-খুড়াকেও বাসী দেখিয়া কচুরী খাওয়াইতে পারিলে তাঁহারও হয়ত একটা ভালমন্দ ঘটিতে পারে। দোকানে পৌঁছাইয়া পিতোমবাবু বলিলেন, "বেশ ভাল রকম বাসী কচুরী আছে?"

দোকানদার অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; বলিল, "সে কি মশাই—বাসী কচুরী কি আবার কেউ বিক্রি করে নাকি?" যেন কলিকাতার ময়রার অভিধানে বাসী বলিয়া কোন শব্দই নাই।

পিতোমবাবু বলিলেন, "আরে বাপু, কুকুরকে খাওয়াতে হবে—সস্তা টস্তা ক'রে দাওনা, থাকে ত।" ময়রা অগত্যা, যেন খুবই অনিচ্ছার সহিত, তাঁহাকে এক ঠোঙা কচুরী বাহির করিয়া দিল। পিতোমবাবু সানন্দে কচুরী লইয়া গৃহে চলিলেন। মনে মনে বলিলেন, "কলেরা না হোক্ অন্তত দু চার দিনের জন্ম ঘর থেকে বেরনো বন্ধ হবে ত।"

একখানা কচুরী মুখে দিয়াই নস্থ-খুড়া বলিলেন, "থুঃ, থুঃ, ছ্যা, ছ্যা, এই কি অন্তকার কচুরী না কি? বাবাজি, তোমাকে ময়রা ঠকাইয়াছে। এ কচুরী নিদেন পক্ষে তিন দিবসের বাসী মাল।"

গিন্নি বলিলেন, "বলি, তুমি কি চোখের মাথা খেয়ে দোকানে গিয়েছিলে নাকি? যাও শিগ্‌গির খাবারটা বদ্‌লে নিয়ে এস। এদিকে চায়ের জল ফুটে উঠ্‌ল; কোনো কাজ কি তোমায় দিয়ে হবে না?"

পিতোমবাবু নিজের সযত্নকল্পিত প্রতিহিংসার পথ এমন করিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইতে দেখিয়া মরীয়া হইয়া বলিলেন, "না, না, ও কিছু তেমন বাসী নয়; হাত-গরম না হ'লেই কি খাবার বাসী হয়; খান না, খুড়ো মশায়; কিছু হবে না।"

খুড়া শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "না বাবাজি, আমার আর বাসী খাইবার বয়স নাই।"

গিন্নি হাঁকিলেন, "শি···গ্‌গি···র যাও বল্‌ছি। নইলে তোমায় রাত্রে ভাতের বদলে ঐ কচুরী খেয়েই থাক্‌তে হবে।"

পিতোমবাবু হতাশ হইয়া পুনর্ব্বার ঠোঙা হস্তে পথে বাহির হইলেন। মুখখানা তাঁহার হস্তস্থিত বাসী কচুরী অপেক্ষাও শুষ্ক, ম্লান।

(৩)

ট্রামের পয়সা না পাওয়াতে আজকাল পিতোমবাবু আফিসে প্রায়ই 'লেট' হইতে আরম্ভ করিলেন। বড়বাবু তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, একথা সাহেবের কাণে গেলে মুস্কিল হইবে। পিতোমবাবু তাঁহাকে বলিলেন যে, কোন ঘোর বিপদে পড়িয়া তাঁহার বর্ত্তমানে ট্রামে যাতায়াত করিবার সংস্থান নাই—কি করিবেন? বড়বাবু বলিলেন, যেমন করিয়া হউক আফিসে সময়ে না পৌঁছাইলে বিপদ অনিবার্য্য।

পিতোমবাবু গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আফিসে 'লেট' পৌঁছানতে বড়বাবু শাসিয়েছেন 'রিপোর্ট' কর্‌বেন, বুঝ্‌লে?"

গিন্নি বলিলেন, "কেন, পথে কি খেলা ক'র নাকি? দেরী হয় কেন?"

"সকালে বাজার ক'রে, তোমার ফুট-ফরমাস খেটে, ভাত পেতে দেরী হ'য়ে, তারপর যদি ট্রামের পয়সা না পাই তা হ'লে 'পাংচুয়াল' হ'তে হ'লে আফিসে দৌড়ে যেতে হয়।"

সুভাষিণী বিষকণ্ঠে উপদেশ দিলেন, "তবে এক'টা দিন দৌড়েই যেও।"

হতাশা ও গত্যন্তরবিহীনতা পিতোমবাবুকে পাগলের মত করিয়া তুলিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "না, ট্রামেই যাব; আলবাৎ যাব!"

গিন্নি আরও জোরে বলিলেন, "অমন ক'রে জানোয়ারের মত চেঁচাচ্ছ কেন? মারবে না কি?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ মারব, যদি ফের আমার কথার উপর কথা ব'ল ত মারই খাবে।"

গিন্নি বোঁ করিয়া ঘুরিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়া ধড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি আজ নিশ্চয় মদ খেয়ে এসেছ! তা নইলে আমায় মারতে ওঠ! থাক আজ ঐ ঘরে বন্ধ হ'য়ে,আজ তোমার খাওয়া-দাওয়া বাদ; নেশা ছুটলে পর আমার কাছে মাপ চাইবে, তবে তোমায় আমি ছাড়ব। ঝাঁটা মার অমন পুরুষমানুষের মুখে! চামারের মত কথা শোন একবার; বলে কি না মারবে! ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি"

পিতোমবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খোল বলছি দরজা, তা নইলে লাথি মেরে ভেঙে ফেলব।"

"ভাঙনা ক্ষেমতা থাকে ত। তারপর বাড়ীওলাকে গুণকার দিও।"

পিতোমবাবু দড়াম্ করিয়া দরজায় একটা লাথি মারিলেন। পায়ে লাগিল বটে, তবে দরজার কিছুই হইল না। ডাকিলেন, "মেধো, মেধো!" শুনিলেন গিন্নি বলিতেছেন, "ওদিকে যাস্ যদি মেধো ত ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব।"

পিতোমবাবু হতাশ হইয়া একটা বেতের চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। আফিস হইতে ফিরিয়া কিছু খাওয়া হয় নাই; কি করিবেন? একখানা "প্রবাসী" পড়িয়াছিল তুলিয়া লইলেন। প্রথমে চোখে পড়িল একটি প্রবন্ধ, "নরনারীর সমান অধিকার।" পিতোমবাবু ভাবিলেন, "হায়রে, সে-রকম সুদিন কি আমাদের কখন হবে?"

তিন চার ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়াও সুভাষিণীর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একবার "তোপ্‌সে" মাছ ভাজার একটা উগ্রমধুর গন্ধ দমকা হাওয়ার সহিত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পিতোম-বাবুর রসনায় বান ডাকাইয়া দিয়া আবার মিলাইয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওগো, লক্ষ্মীটি, দরজা খোল, খিদেয় প্রাণ গেল, আমি দৌড়েই আফিস যাব, দরজা খোল।" শুনিলেন ভর্জ্জিতমৎস্যজড়িত জিহ্বায় নসু খুড়া সুভাষিণীকে বলিতেছেন, "না, না, খুলিয়া কাজ নাই। মাতাল মানুষ পুনরায় যদি প্রহার আরম্ভ করে, আমি এ বয়সে রোধ করিতে পারিব না।"

দরজা বন্ধই রহিল। পিতোমবাবু "প্রবাসীর" গল্প ও প্রবন্ধ শেষ করিয়া বিজ্ঞাপনগুলি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ দেখিলেন একখানা ছবি। একজন লোক আদেশ করিবার ন্যায় ভঙ্গিতে হস্ত প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান। চক্ষু দিয়া তাহার অপূর্ব্ব জ্যোতি নিঃসারিত হইতেছে। তাহার সম্মুখে দলে দলে লোক—কেহ কর-জোড়ে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া, কেহ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণত। এক পার্শ্বে গুটিকয়েক হস্তী ও অশ্ব উক্তরূপে আত্মসমর্পণ-মুদ্রায় উপস্থিত রহিয়াছে। ছবিটির নীচে বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

অদ্ভুত ইচ্ছা-শক্তি

পথহারা চলৎশক্তিরহিতপ্রায় পথিক মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ "ওয়েসিস্" দেখিতে পাইলে যেমন নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে পুনর্জ্জন্মের আশ্বাস পাইয়া পুনর্ব্বার চাঙ্গা হইয়া উঠে, পিতোমবাবু বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া তেমনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, বন্দিদশা, নসু খুড়া, তোপসে মাছ সব ভুলিয়া আধভাঙা বেতের চেয়ারখানার উপর যতটা পারেন সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার অন্তরে যেন কোটি বিহঙ্গম কোনো এক নূতন উষার আশা-সূর্য্যের পানে চাহিয়া গাহিয়া উঠিল, "আর ভয় নাই; দুখ হ'ল অবসান।"

পিতোমবাবু পাঠ করিলেন :—

অদ্ভুত ইচ্ছা-শক্তি

"ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে মানুষ কি না করিতে পারে? পৃথিবীতে এই যে এত বিফলতার ক্রন্দন, এত উৎপীড়িতের

ব্যাকুল আর্ত্তনাদ, ইহার মূলে রহিয়াছে ইচ্ছাশক্তির অভাব বা অশিক্ষিত ভাব। শিক্ষিত ইচ্ছা-শক্তি মানুষকে তেম্‌নি করিয়াই ক্ষমতাশালী ও অপরের মনের উপর প্রভাবাপন্ন করিয়া তোলে যেমন করিয়া শিক্ষিত-মাংসপেশী কুস্তিগির বা যুযুৎসু-যোদ্ধা অকাতরে অপরের উপর শারীরিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। আমাদের শিক্ষা অনুসারে চলিলে আপনি বর্ত্তমানে যতই পরনির্ভরশীল, কাপুরুষ ও অপরের উপর প্রভাবহীন হউন না কেন, তিন মাসের ভিতর আপনার কথায় লোকে উঠিবে বসিবে, আপনার চোখের চাহনির সম্মুখে উদ্যত-ছোরা গুণ্ডাও হটিয়া যাইবে, অদম্য আত্মনির্ভরশীলতা আপনাকে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসীন করিয়া দিবে।

"এ শক্তি লাভের জন্য আপনাকে কিছু খাইতে হইবে না, কিছু ধারণ করিতে হইবে না। নিছক মানসিক শক্তির উপযুক্ত ব্যায়ামের দ্বারা আপনি দিনে দিনে অধিক হইতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন।

"এ শক্তি আপনার ভিতরেই আছে। আমরা মাত্র তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিব।

"নীচের ঠিকানায় পত্র লিখুন—

শ্রী প্রভাবানন্দ স্বামী

পোষ্ট বক্স্ ৩৩১৩, কলিকাতা।"

পিতোমবাবু ভাবিলেন, "কি আশ্চর্য্য; আর আমি একটা সামান্য নারীর দ্বারা উৎপীড়িত হ'য়ে কি করব তা ভেবে কূল পাচ্ছি না! কালই আমি স্বামীজিকে চিঠি লিখে সব ঠিক ক'রে ফেল্‌ব।"

গভীর রাত্রে ঘরের দরজা খুলিয়া সুভাষিণী দেখিলেন, তাঁহার স্বামী অঘোরে নিদ্রা দিতেছেন। মুখ তাঁহার কি একটা বিজয়ানন্দের আলোকে উদ্ভাসিত। সুভাষিণী মনে মনে বলিলেন, "মদের এমনই গুণ বটে! পেটে ভাত পড়েনি একটাও, ঘুমের ঘোরে মুখ করেছে যেন ওকে কে লাটের গদিতে বসিয়ে দিয়েছে।"

(৪)

প্রভাবানন্দ পিতোমবাবুকে লিখিলেন,

"আপনি যে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে আমি সপ্রশংস সম্ভাষণ করিতেছি। আপনি এই পত্র লিখার সঙ্গে-সঙ্গেই শক্তিলাভের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন।

"এখন আপনাকে বলি, ইচ্ছা-শক্তি কি। "আমরা যখন সজ্ঞানে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করি বা কোনোরূপ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করি তখন একথা আমরা কদাচ মনে করি না যে, আমাদের জ্ঞানের অন্তরালে কোন কিছু আছে যাহার উপর আমাদের কার্য্য বা ইচ্ছা কোন-রূপে নির্ভর করে। বস্তুত আমাদের যে মন তাহার মধ্যে সজ্ঞানতার ক্ষেত্র অতিশয়ই স্বল্প-পরিসর। আমাদের যে অনভিব্যক্ত-অননুভূত মনঃক্ষেত্র তাহা সর্ব্বদাই আমাদের সজ্ঞান চিন্তা ও কার্য্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করিতেছে। যে ব্যক্তি বহুকাল কোন কার্য্য সম্বন্ধে কোন এক প্রকার মনোভাব পোষণ করিয়াছে সে যদি কখনও জোর করিয়া তাহার বিপরীত কিছু করিতে যায়, তাহা হইলে সজ্ঞানতার ক্ষেত্রে তাহার সেইরূপ কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে তাহা করিতে পারিবে না; কারণ তাহার মনঃক্ষেত্রের প্রত্যেক আপাতঅননুভূত প্রান্ত হইতে সে বিপরীত দিকে আকর্ষিত হইবে। এইজন্য সজ্ঞানে কোনো প্রকার কার্য্য চিন্তা বা ব্যবহার উত্তমরূপে করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের সমগ্র মনঃক্ষেত্র উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

"আপনি যদি অপরের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অক্ষম হ'ন, তাহার কারণ এই যে, আপনি আজন্ম কাল সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে এই ধারণাই মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন যে, আপনি অপর হইতে অধম। এ মনো-ভাব আপনাকে দূর করিতে হইবে।

* * * *

"আপনি পত্রোত্তরে ১৩॥০ টাকা আমায় পাঠাইলে আপনাকে আমি মৎলিখিত পুস্তক "অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি" পাঠাইয়া দিব। পুস্তকানুগত নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিলেই আপনি ক্রমে ক্রমে প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীকে পদতলে আনিতে পারিবেন।"

পিতোমবাবু অবিলম্বে নিজের ঘড়িটি বন্ধক দিয়া ১৫৲ সংগ্রহ করিয়া স্বামী প্রভাবানন্দকে টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

"অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি" আসিল। ছাদের ঘরে লুকাইয়া বসিয়া পুস্তকের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়া পিতোমবাবু বুঝিলেন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি আছে অনেক, কিন্তু তাহা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই ছত্রভঙ্গ ইচ্ছাশক্তি একত্র করিতে হইলে তাঁহাকে কোন কঠিন কার্য্য প্রত্যহ একাগ্রমনে কিয়ৎকাল ধরিয়া করিতে হইবে। যথা, সূতার জট ছাড়ান। অনেকটা সূতা জট পাকাইয়া তাহা একমনে খুলিতে থাকিলে বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাশক্তি শীঘ্রই ঐ জটের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। পিতোমবাবু গিন্নির "ক্রোশের" সূতার বাণ্ডিল একটি অপহরণ করিয়া ছাদের ঘরে লইয়া খুলিয়া জট পাকাইয়া ফেলিলেন। তারপর জট ছাড়াইবার পালা। পিতোমবাবু যতই একদিক খুলেন উহা ততই অপর দিকে দ্বিগুণ জট পাকাইয়া যায়। তিন দিন ধরিয়া পিতোমবাবু তাঁহার বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাশক্তির কণাগুলি একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াও দেখিলেন সূতায় যে জট সেই জট।

গিন্নি তাঁহাকে ঘন ঘন ছাদের ঘরে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশে-পাশে সব গেরস্ত মানুষের বাড়ী; বৌ-ঝিরা ছা'দে বড়ি দিতে, চুল শুকুতে ওঠে; তুমি ছাদে কিসের জন্য ঘোরাঘুরি ক'র, ব'ল ত?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "না ঘোরাঘুরি ত করি না; এই একটু বিশ্রাম হয়।"

সন্দিগ্ধচিত্ত গৃহিণী সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া একদিন হঠাৎ যখন স্বামী এক মনে সূতার জট খুলিতে ব্যস্ত, সেই সময় ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাশীকৃত সূতা দেখিয়া ত তাঁহার চক্ষু স্থির। তিনি বলিলেন, "ওমা, বুড়ো বয়সে তুমি কি শেষে ঘুড়ি উড়ুতে আরম্ভ করলে না কি? ছি, ছি, লোকে বল্‌বে কি? খবরদার আর তুমি ছাদে উঠে এ সব করবে!"

স্বামী বলিলেন, "ঘুড়ি আবার কোথায় উড়াই; একি ঘুড়ির সূতো?"

"তাইত, এ দেখ্‌ছি আমার বুন্‌বার সূতো! এ তুমি কোথায় পেলে? আমি ব'লে সূতো নেই দেখে খোকাকে মারধোর করলাম, মেধোকে কত গাল দিলাম। দেখ দিখিন; আর তুমি সূতোটুকু নিয়ে এখানে খেলা করছ। ওমা কি ঘেন্না; তুমি ফের যদি আমার সূতোয় হাত দেবে ত দেখতে পাবে।" বলিয়া তিনি জট পাকানো সূতার রাশি লইয়া চলিয়া গেলেন।

পিতোমবাবু অতঃপর আফিসে অবসর সময় টোয়াইন সূতা জট পাকাইয়া ও খুলিয়া দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রথম পাঠ শেষ করিলেন।

(৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম "আমি"।

স্বামীজি লিখিয়াছেন "আমি কে? আমি সব। আমি সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু, আমি পালনকর্ত্তা ব্রহ্মা, আমি সংহারক মহেশ্বর। আমার মধ্যেই সৃষ্টি, আমিই সৃষ্টি, আমিই স্রষ্টা। আমি ছাড়া আর কিছু নাই।"

দ্বিতীয় পাঠের উদ্দেশ্য ছাত্রকে নিজের উপর বিশ্বাসবান করা। উপায় প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে ১০০ হইতে ১০০০ বার "আমি মাহাত্মা" সূচক কোন মন্ত্র জপ করা। ইহাতে সজ্ঞানে অজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে মানসক্ষেত্র আত্মবিশ্বাস-বারিতে সিক্ত সরস হইয়া উঠে।

প্রথম সাতদিন পিতোমবাবু জপ করিলেন, "আমি বেলুন অপেক্ষা ঊর্দ্ধগামী, নায়েগারা অপেক্ষা প্রবল, সমুদ্র অপেক্ষা বিশাল ও গভীর, হিমালয় অপেক্ষা উচ্চ, তুষার হইতে শুভ্র, সূর্য্য হইতে প্রখর; আমি সর্ব্বাপেক্ষা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।"

তারপর পনের দিন তিনি মনে মনে পৃথিবীর সকল বস্তু ও মানবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমা অপেক্ষা তুমি বহুনিম্নে। হে জলধর, হে পর্ব্বত, হে বৃক্ষ, আমা অপেক্ষা তোমরা ক্ষুদ্র। হে স্যাণ্ডো, হে হাকেনস্মিট, হে গামা ও ইমাম বক্স, তোমরা আমা হইতে বহুস্বল্পবল। হে নেপোলিয়ান, তোমা হইতে আমি বড় যোদ্ধা; চাণক্য, আমি তোমাপেক্ষা বিচক্ষণতর রাজনীতিবিদ্; কালিদাস, তোমা হইতেও আমি বড় কবি; সেক্ষপীর, তোমা হইতেও আমি বড় নাট্যকার। হে ধরণীর অধিবাসী, তোমরা আমার পদে প্রণত হও।"

এইরূপে পিতোমবাবু বহু অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া অবশেষে সেই পাঠে আসিলেন যাহাতে কি করিয়া

অপরকে নিজইচ্ছানুরূপ কার্য্য করান যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমতঃ যে-ব্যক্তিকে বশ করিতে হইবে তাহার অলক্ষিতে তাহার ঘাড়ের ঠিক মধ্যদেশে এককালীন ৫।১০ মিনিট কাল একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে হইবে ও মনে মনে বলিতে হইবে, "তুমি আমার দাস (বা দাসী), তুমি আমার কথামত কাজ করিবে, —অন্যথা করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। তুমি আমার ইচ্ছাশক্তির অধীন, আমার আজ্ঞাবহ; তোমার নিজের বলিয়া কোন ইচ্ছা নাই।" তৎপরে(কয়েক দিবস এইরূপ করিবার পরে)একদিন তাহার চোখে চোখে চাহিয়া তাহাকে ধীর শান্ত কণ্ঠে, সকল তীব্রতাবর্জ্জিত ভাষায় বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাহার পক্ষে তাঁহার আদেশ মত কার্য্য না করা স্বভাবতই অসম্ভব। ইহার পর তাহাকে যাহা বলা যাইবে সে তাহাই করিবে।

পিতোমবাবু দিন কনের আড়ালে আড়ালে সুভাষিণী ও মেধোর ঘাড়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহাদের দাসত্বে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন তিনি মেধোকে সিঁড়ির নিকট ধরিয়া একদৃষ্টে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া ধীর শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "হে মাধব, আমি তোমার প্রভু, তুমি আমার দাস। পরমপিতা ভগবান তোমাকে আমাপেক্ষা নিম্নাসন অলঙ্কৃত করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, হে মাধব, তুমি তোমার ভাগ্যনিয়ন্তার নির্দ্দেশ অনুসরণ কর। এই পাদুকা-যুগল বহন করিয়া তুমি আমার কক্ষে স্থাপন কর।"

মেধো বাবুর কথা একটাও বুঝিতে না পারিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাবু বুঝিলেন মেধোর ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে ও সে তাঁহারই ইচ্ছায় এখন নড়িবে চড়িবে। তিনি আবার বলিলেন, "মাধব।" মেধো এবার সত্যই ভয় পাইয়া বলিল, "আজ্ঞে বাবু কি বলছেন?"



পিতোমবাবু—"রে নারী, সৃষ্টিতে তোমার স্থান……ইত্যাদি"
সুভাষিণী—"আ মরণ,………"

পিতোমবাবু বলিলেন, "জুতোজোড়া নিয়ে ঘরে রেখে এস।"

মেধো তাঁহার পা হইতে জুতাজোড়া খুলিয়া লইয়া ঘরের দিকে চলিল; তাহার পশ্চাতে পিতোমবাবু বিজয়োল্লাস-গর্ব্বিত বদনে বুক ফুলাইয়া অগ্রসর হইলেন।

গিন্নি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিলেন। তিনি জুতাহস্তে ভৃত্য ও তৎপশ্চাতে খালি পায়ে বাবুর এই অপরূপ মিছিল দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপরে পিতোমবাবুকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?"

পিতোমবাবু গৃহিনীর মুখে এরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, সময় হইয়াছে। এইবার তাঁহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হইবে। তিনি মেধোর হস্ত হইতে চটিজোড়া লইয়া পায়ে দিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "রে নারী, সৃষ্টিতে তোমার স্থান কোথায় তাহা বুঝিয়াছ কি? তাহা আমার পদতলে। আইস আপন প্রকৃতি দত্ত স্থান পূর্ণ কর। অন্যথা হইবার নহে, তুমি আমার দাসী, আমার আজ্ঞা পালনেই তোমার জীবনের সার্থকতা।"

সুভাষিণী প্রথম একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল স্বামী সম্ভবতঃ কোন "অ্যামেচার" থিয়েটারের পালায় নামিয়াছেন; এ তাহারই "রিহার্সাল" হইতেছে। তাঁহার মেজাজটাও আজ একটু ভালই ছিল, তাই তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আ মরণ, রস করবার ইচ্ছে ত সঙ্গে চাকর বাকর নিয়ে বেরিয়েছ কেন? চল ঐ ঘরে, তোমার পালা শুনিগে।"

পিতোমবাবু বলিলেন, "প্রিয়ে, এ যে-সে অভিনয় নহে। ইহা জীবন-নাট্য। তুমি আমার দাসী—চিরকালের—আমার আজ্ঞা পালনেই তোমার পূর্ণতা ও স্থিতি।"

গিন্নি নিজের ভুল বুঝিলেন। বলিলেন, "ও, তাই না কি? আচ্ছা দেখা যাবে কে কার মুনিব।"

পিতোম বাবু একটা ঘরের দরজার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'যাও।"

গিন্নি বলিলেন, "তুমি যাও না।"

পিতোমবাবু হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যাও বল্‌চি এক্ষুনি।"

গিন্নি ভাবিলেন হয়ত স্বামী আবার নেশা-টেশা করিয়াছেন তাই আত্ম-রক্ষার্থে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন ও ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিলেন।

একাধারে এরূপ দুইটি জয়ের আনন্দে পিতোমবাবু বিভোর হইয়া ছাদে গিয়া পাইচারী করিতে লাগিলেন। ঘণ্টা খানেক পরে আফিসের কাপড় পরিবার জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিলেন, দ্বার বন্ধ। বহু চীৎকার করিলেন, বহু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অগত্যা, বাসার কাপড়ে ও বাজারের খাবার খাইয়া পিতোমবাবু আফিসে গেলেন। জয়ের মধ্যেও পরাজয়ের ভেজাল পাইয়া আনন্দটা তাঁহার কিছু কমিয়া গেল।

বৈকালে গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন বাড়ীতে কেহ নাই, শুধু মেধো। সে একটা তালা ও চাবী তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ বাপের বাড়ী গেছেন, আমায় ছুটি দিয়েছেন, আমি চল্লুম।"

পিতোমবাবু বলিলেন, "সে কি? আর খাওয়া-দাওয়া, তার কি ব্যবস্থা?"

মেধো বলিল, "বাড়ীতে চাল-ডাল নুন-তেল কিছুই নেই; মা ঠাকরুণ টাকা পয়সাও কিছু দিয়ে যান নি।"

পিতোমবাবু পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন মাত্র সাড়ে তিন আনা পয়সা আছে। তিনি মেধোকে বলিলেন, "তুমি যাও।" মেধো চলিয়া গেল।

উপরে উঠিয়া পিতোম বাবু দেখিলেন, ঘরে বাক্স-প্যাঁটরা কিছুই নাই—মায় বিছানাপত্র আয়না চিরুণী সব লইয়া গিন্নি শুধু ঘরে খালি তক্তপোষটা ও একখানা চেয়ার মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ভাঁড়ারে ঢুকিয়া দেখিলেন একটা টিনে কয়েকটা আদা আর শুকনা লঙ্কা রহিয়াছে, আর রহিয়াছে এক ঝুড়ি ঘুঁটে। পিতোমবাবু হতাশ হইয়া সাড়ে তিন আনা পয়সা-পকেটে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বশুরালয় ঠাকুর-পুকুর; ট্রামে ও গাড়ীতে অনেক মাইল ও অনেক পয়সার মামলা। দারুণ ক্ষুধা, ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেই পয়সা কটা ফুরাইয়া গেল; তারপর পিতোমবাবু যূথভ্রষ্ট কোন উষ্ট্রের ন্যায় শ্বশুরালয়ের পথে দেহটাকে টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন।

পথে বহুবার বিশ্রামের জন্য ও জল খাইবার জন্য বসিয়া ও শেষের দিকে একটা আলু-বোঝাই গরুর গাড়ীর চালকের কৃপায় তাহার উপর চড়িয়া রাত্রি ২টার সময় পিতোমবাবু শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলেন। স্বয়ং শ্বশুরমহাশয় তাঁহাকে দরজা খুলিয়া আলো ধরিয়া শয়নাগারের দিকে আগাইয়া দিলেন। শুধু একবার তিনি অনুযোগের সুরে বলিলেন, "ছিঃ বাবাজি, অন্ততঃ ছেলেটার মুখের দিকে চেয়েও তোমার ওসব নেশা-টেশা করা উচিত নয়।"

পিতোমবাবু ক্লান্তি ও অবসাদের তাড়নায় তাঁহার কথার প্রতিবাদও করিতে পারিলেন না। অথবা

কলঙ্কের বোঝা বহিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "কি গো মুনিব ঠাকুর, এসেছ? বলি হেঁটে হেঁটে ত পায়ের নড়া খইয়ে এসেছ—এখনও কি আমি তোমার দাসী-বাঁদী?" পিতোমবাবু সকল ইচ্ছাশক্তি পত্নার পদে বিসর্জ্জন দিয়া বলিলেন, "না গো না; আর কখনও অমন কথা আমি মুখে আন্‌ব না। ঘরে কিছু খাবার আছে?"

(৬)

পিতোমবাবু 'অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি' গ্রন্থটি রাজপথে নিক্ষেপ করিয়া আজকাল আবার ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় স্ত্রীর কথামত ঘুম হইতে ওঠেন, বাজারে যান, ছেলেকে খেলা দেন, আপিস যান, মাহিনা আনিয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া দেন, ওঠেন বসেন। কিন্তু, প্রাণে তার দারুণ অশান্তি। গিন্নি তাঁকে বড়ই কড়া শাসনে রাখেন, তার সিগারেট খাওয়া বারণ—সান্ধ্যভ্রমণের জন্য এক ঘণ্টার অধিক বাহিরে থাকা বারণ—কোন প্রকার বদহজমের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মুখরোচক খাদ্য খাওয়া বারণ—বন্ধু-বান্ধবকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা বারণ—আরও কত কিছু বারণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে মেধোর, খোকার, নস্থ খুড়ার, আরও কতলোকের মন জুগাইয়া চলিতে হয়,—প্রত্যহ শতবার শুনিতে হয় তিনি অকর্ম্মা, নির্লজ্জ, বেহায়া ও নির্ব্বোধ।

মরিয়া হইয়া শেষাবধি পিতোমবাবু একদিন পরম শত্রু নেপেন ভাদুড়ীর শরণাপন্ন হইলেন। বলিলেন, "ভাই নেপেন, জানইত ভাই, আমার কেমন ক'রে দিন কাট্‌ছে। কি ক'রে, ভাই, বাড়ীতে একটু নিজের মত সুখে শান্তিতে থাক্‌তে পারি তার একটা উপায় বল্‌তে পার? তুমি বুদ্ধিমান লোক, ইচ্ছে কল্লে পারবে একটা উপায় ব'লে দিতে।"

নেপেনবাবু তাঁহাকে বহু প্রশ্ন করিয়া অবশেষে একটা পরামর্শ দিলেন।

দিন কয়েক পরে একদিন রাত্রে তরকারীতে নুন বেশী হইয়াছে বলায় সুভাষিণী পিতোমবাবুর পাতে এক হাতা গরম জল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "এবার খাও কম নুন লাগ্‌বে এখন। কাজ নেই কোন, শুধু খুঁতধরা বাই হয়েছে। এরপর তুমি হোটেলে গিয়ে চারগণ্ডা পয়সা দিয়ে ভাত খেও।"

পিতোমবাবু রাগ করিয়া না খাইয়া উঠিয়া গেলেন। খাবার ঘরের বাহিরে গিয়াই কিন্তু তাঁহার মুখ কি একটা অপূর্ব্ব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই সুভাষিণী দেখিলেন পিতোমবাবু মশারীর দিকে পা তুলিয়া, "মা মা" বলিয়া ডাকিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষিতেছেন। প্রথমে তিনি, তর্জ্জন, গর্জ্জন, গালিগালাজ দিয়া দেখিলেন কিছুই হইল না। পিতোমবাবু তক্তপোষের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া এক বিরাটাকৃতি দৈত্য-শিশুর ন্যায় হাত পা ছুঁড়িয়া ক্রমাগত "মা মা" করিতে লাগিলেন। গিন্নি ভয় পাইয়া নস্থ খুড়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

খুড়া আসিয়া টানাটানি করিয়া পিতোমবাবুকে মেঝেতে নামাইয়া দিতেই পিতোমবাবু হামা দিয়া ঘরময় "দুদু, কাব; দুদু, কাব," বলিয়া ঘুরিতে লাগিলেন।

গিন্নি এবার সত্য সত্যই ভয় পাইয়া মহা কান্নাকাটি জুড়িয়া দিলেন। নস্থখুড়া দৌড়াইয়া গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার এরূপ ব্যায়রাম কখনও দেখেন নাই। তিনি নিজ অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য বলিলেন, "এ্যাকিউট নার্‌ভাস ব্রেক-ডাউন, রুগীকে কোন প্রকার নাড়া চাড়া বা উত্তেজিত করিবে না। দু'ধ চাহিতেছে, দুধ খাওয়াইয়াই রাখ। পরে আসিয়া দেখিব, কি হয়।"

সকলে ধরাধরি করিয়া পিতোমবাবুকে খাটের উপর শোয়াইয়া দিলেন। তিনি শুইয়া শুইয়া কখন হাত পা ছুঁড়িতে লাগিলেন কখন বা "গ, গ, গ, গ," বলিয়া চীৎকার বা অযথা হাস্য করিতে লাগিলেন। শিশুরা যেমন ক্রমাগত চিৎ হইতে উবুড়, উবুড় হইতে চিৎ হইয়া দৈহিক "এনার্জির" সদ্ব্যবহার করে, পিতোমবাবুও সেইরূপে ব্যায়ামের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। একবার নস্থখুড়া অনবধানতা-বশত পিতোমবাবুর পায়ের কাছে আসিয়া বসাতে ক্রীড়া-নিরত পিতোমবাবুর পদসঞ্চালনে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

কেহ দেখিল না যে, পিতোমবাবুর মুখখানা ইহাতে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সুভাষিণীর কেশ ধরিয়া একবার পিতোমবাবু সহাস্য বদনে ঝুলিয়া পড়িলেন। সুভাষিণীকে বহুকষ্টে সেই দৈত্য-শিশুর কবল হইতে রক্ষা করা হইল।



...'ফিডিং বট্‌লে' দুধ খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন।

খাওয়া লইয়া আর এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। ঘরময় দুগ্ধের ঢেউ খেলিয়া গেল, দুই তিনটি পেয়ালা, তিন চারিটি বাটী খণ্ড বিখণ্ড হইয়া মেঝেতে গড়াইতে লাগিল; পিতোমবাবু সেই দুগ্ধস্রোতে ছপাৎ ছপাৎ করিয়া হামা দিয়া বেড়াইয়া বিছানার উপর হইতে টানিয়া সুভাষিনীর আদরের লক্ষ্ণৌ ছিটের নতুন লেপখানা সেই দুগ্ধকর্দ্দমে ফেলিয়া মাথামাখি করিয়া এক নব দক্ষযজ্ঞের সূচনা করিলেন। সুভাষিনী আজ জীবনে প্রথম বিপদের মুখে পরাজিত হইয়া ছল ছল নেত্রে এই তাণ্ডব অভিনয় নির্ব্বাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

সুভাষিণী বাটি করিয়া দুধ খাওয়াইতে না পারিয়া পিতোমবাবুকে অগত্যা খোকার "ফিডিং বটলে" দুধ খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন। নস্যখুড়া নস্য লইতে লইতে বলিলেন, 'দুর্গা দুর্গা'।

তিন চারদিন অতিশয় যত্নের সহিত শুশ্রূষা করিয়া পিতোমবাবুকে ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। সকলেই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। সুভাষিণী শয়নকালে তাঁহার পা টিপিয়া দেন। নস্যখুড়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাওয়া করেন। ডাক্তার বলিয়াছেন, "সম্পূর্ণ শান্তি ও আরাম দেওয়া চাই; নতুবা পাগল হইয়া যাইবার ভয় আছে।"

(৭)

কয়েক দিন হইল পিতোমবাবু আবার আপিস যাইতেছেন। নেপেনবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভায়া, আছ কেমন? মনেত হচ্ছে খেয়ে দেয়ে তোফা ফুলছ।"

পিতোমবাবু নিজের বাম চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত করিয়া বলিলেন, "হুহু।"

বৃহত্তর ভারত*

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যবদ্বীপ যাবার পূর্ব্বাহ্নে যে অভিনন্দন আপনারা আমাকে দিলেন তাতে আমার মনে বল সঞ্চার করবে। আমরা চারিদিকের দাবীর দ্বারা আমাদের প্রাণশক্তি আবিষ্কার করি। যার যা দেবার তা বাইরের নেবার ইচ্ছা থেকে আমরা দিতে সক্ষম হই। দাবীর আকর্ষণ যদি থাকে তবে আপনি সহজ হ'য়ে যায় দেওয়ার পথ।

বাইরে যেখানে দাবী সত্য হয়, অন্তরে সেখানেই দানের শক্তি উদ্বোধিত হ'য়ে ওঠে। দানের সামগ্রী আমাদের থাকলেও আমরা দিতে পারিনে সমাজে যতক্ষণ প্রত্যাশা না সজীব হ'য়ে ওঠে। আজ একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জেগেচে, যে-আকাঙ্ক্ষা ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো ক'রে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেচে। সেই আকাঙ্ক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করচে। এই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।

বর্ব্বরজাতীয় মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, তার আত্মবোধ সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। তার চৈতন্যের আলো উপস্থিত কালে ও বর্ত্তমান অবস্থায় যেরটুকুকেই আলোকিত ক'রে রাখে ব'লে সে আপনাকে তার চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রে জানে না। এইজন্যেই জ্ঞানে কর্ম্মে সে দুর্ব্বল। সংস্কৃত শ্লোকে বলে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" অর্থাৎ ভাবনাই হচ্চে সাধনার সৃষ্টিশক্তির মূলে। নিজের সম্বন্ধে, নিজের দেশ সম্বন্ধে বড়ো ক'রে ভাবনা করবার দরকার আছে, নইলে কর্ম্মে জোর পৌঁছয় না, এবং অতি-ক্ষীণ আশা ও অতি ক্ষুদ্র সিদ্ধি নিয়ে অকৃতার্থ হ'তে হয়। আপনার কাছে আপনার পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা। আপনার পরিচয়কে সঙ্কীর্ণ দেশকালের ভূমিকা থেকে মুক্তিদানই হচ্চে এই চেষ্টার লক্ষ্য।

যখন বালক ছিলুম ঘরের কোণের বাতায়নে ব'সে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোট পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইরের দিক থেকে দেশের এমন কোনো মূর্ত্তি দেখিনি যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে। বিদেশী বণিকের হাতে-গড়া কলকাতা সহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা সুগভীর ও সুদূর-বিস্তৃত। সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম ব'লেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

এমন সময়ে আমার আট নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছু কালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহুদেশ বহুকাল ও বহুচিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়-বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞান ধর্ম্ম তপস্যার স্মৃতিযোগ-সূত্র।

তার পর আর কয়েক বৎসর পরেই পিতা আমাকে সঙ্গে ক'রে হিমালয় পর্ব্বতে নিয়ে যান। আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেচি, আর হিমালয় পর্ব্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয়ে এমন একটি চিরন্তন রূপ, যা সমগ্র ভারতের; যা একদিকে দুর্গম, আর একদিকে সর্ব্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা চিন্তায় পূজায় কর্ম্মে প্রত্যহ প্রাণময় হ'য়ে দেখা যাচ্ছিল যা সর্ব্বকালীন্, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্য-মাত্র নেই।

তারপর অল্প বয়সে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়্‌তে সুরু করলাম। তখন আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ ক'রে ক্লাইভের

* বৃহত্তর ভারত পরিষদ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বিদায়-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে।

আমল পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষ বারবার কি-রকম পরাস্ত অপমানিত হ'য়ে এসেছে এই কাহিনীই দিনক্ষণ তারিখ ও নামমালা সমেত প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করেছি। এই অগৌরবের ইতিহাস-মরুতে রাজপুতদের বীরত্ব কাহিনীর ওয়েসিস্ থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ত্ব পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হ'ত। সকলেই জানেন সে সময়কার বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস কি রকম দুঃসহ ব্যগ্রতায় টডের রাজস্থান দোহন করতে বসেছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় দেশের মধ্যে আমাদের পরিচয়-কামনা কি রকম উপবাসী হ'য়ে ছিল। দেশ বল্‌তে কেবল তো মাটির দেশ নয়, সে যে মানবচরিত্রের দেশ। দেশের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের দেহটাকে গড়ে বটে, কিন্তু আমাদের মানবচরিত্রের দেশ থেকেই প্রেরণা পেয়ে আমাদের চরিত্র গ'ড়ে ওঠে। সেই দেশটাকে যদি আমরা দীন ব'লে জানি তাহ'লে বিদেশী বীরজাতির ইতিহাস প'ড়ে আমাদের দীনতাকে তাড়াবার শক্তি অন্তরের মধ্যে পাইনে।

ঘরের কোণে আবদ্ধ থেকে ভারতের দৃশ্যরূপটাকে বড়ো ক'রে দেখবার পিপাসা যেমন মনের মধ্যে প্রবল হয়েছিল, তেমনি তখনকার পাঠ্য ভারত-ইতিহাসের অগৌরব-অধ্যায়ের অন্ধকার কোণের মধ্যে ব'সে ব'সে ভারতের চারিত্রিক মহিমার বৃহৎ পরিচয় পাবার জন্য মনের মধ্যে একটা ক্ষুধার পীড়ন ছিল। বস্তুত এই অসহ্য ক্ষুধাই আমাদের মনকে তখন নানা হাস্যকর অত্যুক্তি ও অবাস্তবতা নিয়ে তৃপ্তির স্বপ্নমূলক উপকরণ রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। আজও সেদিন যে একেবারে চ'লে গেছে তা বল্‌তে পারিনে।

যে তারার আলো নিবে গেছে, নিজের মধ্যেই সে সঙ্কুচিত। নিজের মধ্যে একান্ত বদ্ধ থাক্‌বার বাধ্যতাকেই বলে দৈন্য। এই দৈন্যের গণ্ডীর মধ্যেও তার প্রতি মুহূর্ত্ত-গত কাজ হয় তো কিছু আছে, কিন্তু উদার নক্ষত্রমণ্ডলীর সভায় তার সম্মানের স্থান নেই। সে অজ্ঞাত, অখ্যাত, পরিচয়হীন। এই অপরিচয়ের অবমাননাই কারাবাসের মতো। এর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় আলোকের দ্বারা। অর্থাৎ এমন কোনো প্রকাশের দ্বারা যাতে ক'রে বিশ্বের সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে, এমন সত্যের দ্বারা যা নিখিলের আদরণীয়।

আমাদের শাস্ত্রে বারবার বলেছে, যিনি নিজের মধ্যে সর্ব্বভূতকে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। অর্থাৎ অহং-সীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়। ব্যক্তিগত মানুষের জীবনের সাধনায় এ যেমন একটা বড় কথা, নেশুনের ঐতিহাসিক সাধনাতেও সেইরকম। কোনো মহাজাতি কি ক'রে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে এই তপস্যাই তার তপস্যা। যে পার্‌লে না বিধাতা তাকে বর্জ্জন করলেন। মানব-সভ্যতার সৃষ্টি-কার্য্যে তার স্থান হ'ল না। রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন কাঠ-বেড়ালীরও স্থান হ'য়েছিল সেই কাজে। সে তখন শুধু গাছের কোটরে নিজের খাদ্যান্বেষণে না থেকে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই দুই তটভূমির বিচ্ছেদ-সমুদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজে যোগ দিয়েছিল। সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করাই পৃথিবীতে সকল মহৎ সাধনার রূপক। সেই সীতাই ধর্ম্ম, সেই সীতা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি; সেই সীতা সুন্দরী, সেই সীতা সর্ব্বমানবের কল্যাণী। নিজের কোটরের মধ্যে প্রভূত খাদ্য-সঞ্চয়ের ঐশ্বর্য্য নিয়ে এই কাঠবেড়ালীর সার্থকতা ছিল না, কিন্তু সীতা-উদ্ধারের মহৎ কাজে সে যে নিজেকে নিবেদন করেছিল এইজন্যেই মানবদেবতা তার পিঠে আশীর্ব্বাদ-রেখা চিহ্নিত করেছিলেন। প্রত্যেক মহাজাতির পিঠে আমরা সেই চিহ্ন দেখতে চাই, সেই চিহ্নের দ্বারাই সে আপন কোটর-কোণের অতীত নিত্যলোকে স্থান লাভ করে।

ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে, তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা,—সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড় বড় অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করেনি।

আমাদের দেশেও দিগ্বিজয়ের পতাকা হাতে পর-

জাতির দেশ জয় করবার কীর্ত্তি হয়ত সেকালে অনেকে লাভ ক'রে থাকবেন ; কিন্তু ভারতবর্ষ, অন্য দেশের মতো, ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করে না। বীর্য্যবান দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয়নি।

অহংকেই যে-মানুষ পরম ও চরম সত্য ব'লে জানে সেই বিনাশ পায় ; সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রী-ভাবনাতেই এই অহং-ভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটি আত্মার আলোক। এই আলোক-দীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারে-নি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ড-সীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তাহ'লেই আমরা ধন্য। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তি মন্ত্রের ভারতবর্ষে, সে এই তপস্যার ভারতবর্ষে। এই কথাটি যদি ধ্রুব ক'রে মনে রাখতে পারি তাহ'লে আমাদের সকল কর্ম্ম বিশুদ্ধ হবে, তাহ'লে আমরা নিজেকে বিশেষ ক'রে ভারতবাসী বলতে পারব, সেজন্যে আমাদের নতুন ক'রে ধ্বজা নির্ম্মাণ করতে হবে না।

ক্ষুধা হ'লেই মানুষ অন্নের স্বপ্ন দেখে। আজকাল আমাদের দেশে পোলিটিক্যাল আত্মপরিচয়ের ক্ষুধাটাই নানাকারণে সব-চেয়ে প্রবল হ'য়ে উঠেচে। এইজন্যে নিরন্তর তারি ভোজটাই স্বপ্নে দেখ্‌চি। তার চেয়ে বড়ো কথাগুলিকেও অপ্রাসঙ্গিক ব'লে উপেক্ষা করবার তর্জ্জন আজকাল প্রায় শোনা যায়।

কিন্তু এই পোলিটিক্যাল আত্মপরিচয়ের ধারা খুঁজতে গিয়ে বিদেশী ইতিহাসে গিয়ে পৌঁছতে হয়। সেই ব্যগ্রতার তাড়নায় আপনাকে স্বপ্নে-গড়া ম্যাট্‌সিনি, স্বপ্নে-গড়া গারিবাল্ডি, কাল্পনিক ওয়াশিংটন ব'লে ভাবনা করতে হয়। অর্থতত্ত্বেও তাই, এখানে আমাদের কারো কারো কল্পনা বল্‌শেভিজ্‌ম্, কারো সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্, কারো বা সোস্যালিজ্‌মের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্চে। এসমস্তই মরীচিকার মতো, ভারতবর্ষের চিরকালীন জমির উপরে নেই—আমাদের দুর্ভাগ্য-তাপদগ্ধ হাল আমলের তৃষার্ত্ত দৃষ্টির উপরে স্বপ্ন রচনা করচে। এই স্বপ্ন সিনেমার কোণে কোণে মাঝে মাঝে "Made in Europe"-এর মার্কা ঝলক মেরে এর কারখানাঘরের বৃত্তান্তটি জানিয়ে দিয়ে যাচ্চে।

অজানা পথে অবাস্তবের পিছনে আমরা যেখানে ঘুরে বেড়াচ্চি সেখানে অভিভূতি-বিহ্বলতার মধ্যে আমাদের নিজের পরিচয় নেই। অথচ, পূর্ব্বেই বলেচি, নিজের ব্যক্তি-স্বরূপের সত্য পরিচয়ের ভিত্তির উপরেই আমরা সিদ্ধিকে গ'ড়ে তুলতে পারি। পলিটিক্‌স্ ইকনমিক্‌সের বাইরেও আমাদের গৌরব-লোক আছে একথা যদি আমরা জানি তবে সেইখানেই আমাদের ভবিষ্যৎকে আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। বিশ্বাসহীনের মতো নিজের সত্যে অশ্রদ্ধা ক'রে হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশ-কুসুম চাষ করবার চেষ্টা করলে ফল পাব না।

ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিন্ধুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায়নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয়নি তাতেই তার পরিচয়। অন্যকে সত্য ক'রে দিতে পারার মূলেই হচ্চে অন্যকে আপন ক'রে উপলব্ধি। আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেচে, বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেচে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্য্যকে জানতে হ'লে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে ব'সে ধূলি-কলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ক'রে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম, দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল, যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হ'য়ে

উঠেচে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয়নি, এই যোগ উদ্যত তরবারীর জোরেও নয়—এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়, নিজে দুঃখস্বীকার ক'রে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে-সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্য ভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েচে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্‌সের ইতিহাসে স্থান পায়নি ব'লে আমরা এ'কে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিনে। কিন্তু এ'কে বিশ্বাস কর্‌বার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও র'য়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানীর সুগভীর ধৈর্য্য, আত্মসংযম, তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন একথা কতবার শুনেছি যে, এই-সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্ম্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেচে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হ'ল। সত্যের যে-বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুইকূল উপচিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল, ভারতবর্ষের প্রবাহিনীতে আজ তা তলায় নেমে আস্‌চে, কিন্তু তার জল-সঞ্চয় আজো দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হ'য়ে আছে। এই কারণেই, সেইসকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেইসব জায়গাতেই।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের ধর্ম্মবিরোধ ঘটেছিল। সেইসময়ে ধারাবাহিকভাবে এমন সকল সাধু-সাধকদের জন্ম হয়েছিল—তাঁদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলেন—যাঁরা আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্ম্ম-বিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধন কর্‌তে বসেছিলেন। তাঁরা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজন-মূলক পোলিটিকাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য ব'লে কল্পনাও করেননি। তাঁরা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়েছিলেন যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা ধ্রুব। অর্থাৎ তাঁরা ভারতের সেই মন্ত্রই গ্রহণ করেছিলেন যাতে আছে, যারা সকলকে আপনার মধ্যে এক ক'রে দেখে তারাই সত্য দেখে। তখনকার দিনের অনেক যোদ্ধা অনেক লড়াই করেচে, বিদেশী ছাঁচেঢালা ইতিহাসে তাঁদেরই নাম ও কীর্ত্তি লিখিত হয়েচে। সে-সব যোদ্ধারা আজ তাঁদের কৃত কীর্ত্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ ধূলিস্তূপের মধ্যে মিশিয়ে আছেন—কিন্তু আজো ভারতের প্রাণ-স্রোতের মধ্যে সেইসকল সাধকের অমর বাণী-ধারা প্রবাহিত আছে। সেখান থেকে আমাদের প্রাণের প্রেরণা যদি আমরা নিতে পারি তাহ'লে তারি জোরে আমাদের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কর্ম্মনীতি সবই বল পেয়ে উঠতে পারে।

সত্যবাণী যখন আমাদের প্রাণকে গভীর ভাবে উদ্বোধিত করে তখন সেই প্রাণ সকল দিকেই নিজের প্রকাশকে সার্থক করে। তখন সেই প্রাণ সৃষ্টির উদ্যমে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। চিত্তের উপর সত্যের সংঘাতের প্রমাণ হচ্ছে এই সৃষ্টি-শক্তির সচেষ্টতা।

বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখি তারই প্রবর্ত্তনায় গুহা-গহ্বরে চৈত্যবিহারে বিপুল শক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপর্য্যাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে, তখন বুঝতে পারি বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষের অন্তরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েচে যা তার সমস্ত প্রকৃতিকে সফল করেচে, যা তার স্বভাবকে পঙ্গু করেনি। ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষ যেখানে তার মৈত্রীর সোনার-কাঠি দিয়ে স্পর্শ করেচে সেখানেই শিল্পকলার কি প্রভূত ও পরমাশ্চর্য্য বিকাশ হয়েচে। শিল্পসৃষ্টি-মহিমায় সে-সকল দেশ মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেচে।

অথচ সেখানকার লোকের সমজাতীয়দের দেখ, দেখবে তারা নরঘাতক, তারা শিল্পসম্পদহীন। এমন সকল নিরালোক চিত্তে আলো জ্বাল্‌লে দয়াধর্ম্ম ত্যাগধর্ম্ম মৈত্রী-ধর্ম্মের মহতী বাণীর দ্বারা। সেখানকার লোকে সামান্য বেশভূষা ভাষার পরিবর্ত্তনের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পেয়েচে তা নয়; সৃষ্টি কর্‌বার সুপ্তশক্তি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে—সে কি পরমাদ্ভুত সৃষ্টি! এইসকল দ্বীপেরই আশে পাশে আরো তো অনেক দ্বীপ আছে সেখানে আমরা "বরবুদর" দেখিনে কেন, সে-সব জায়গায় আঙ্করবট-এর সমতুল্য বা সমজাতীয় কিছু নেই কেন? সত্যের জাগরণ-মন্ত্র যে সেখানে পৌঁছায়নি। মানুষকে অনুকরণে প্রবৃত্ত করার মধ্যে গৌরব নেই, কিন্তু মানুষের সুপ্ত শক্তিকে মুক্তিদান করার মতো এতবড়ো গৌরবের কথা আর কি কিছু আছে?

লোকে যখন দরিদ্র হয় তখন বাইরের দিকে গৌরব খুঁজে বেড়ায়। তখন কথা ব'লে গৌরব করতে চায়, তখন পুঁথি থেকে শ্লোক খুঁটে খুঁটে গৌরবের মাল-মসলা ভগ্নস্তূপ থেকে সঞ্চয় করতে থাকে। এমনি ক'রে সত্যকে ব্যবহার থেকে দূরে রেখে যদি গলার জোরে পুরাতন গৌরবের বড়াই করতে বসি তবে আমাদের ধিক্! অহঙ্কার করবার জন্যে সত্যের ব্যবহার সত্যের অবমাননা। আমার মনের একান্ত প্রার্থনা এই যে, সত্যবাণীকে কাঁধে ঝুলিয়ে জয়ঢাক ক'রে তাকে যেন বাজিয়ে না বেড়াই; বাইরের লোককে চমক লাগাবার জন্যে যেন তাকে অলঙ্কার মাত্র না করি, যেন নিজেরই একান্ত আন্তরিক প্রয়োজনের জন্যেই তার সন্ধান ও সাধনা করতে পারি।

জাভায় যখন যাব তখন মনকে অহংকারমুক্ত ক'রে সত্যের অমৃতমন্ত্রের ক্রিয়াটি দেখে যেন নম্র হ'তে পারি। সেই মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজের মধ্যেই পাওয়া চাই তাহ'লেই আমার চিত্তে যেখানে অরণ্য সেখানে মন্দির উঠবে, যেখানে মরুভূমি সেখানে সৌন্দর্য্যের রসবৃষ্টি হবে, জীবনের তপস্যা জয়যুক্ত হ'য়ে সার্থক হ'য়ে উঠবে।

সম্পাদকের চিঠি

(১০)

ভিয়েনাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, নির্ম্মলকুমারী দেবী ও আমি ইম্পীরিয়াল হোটেলে ছিলাম। বার্লিনে ও প্রাগে যে যে হোটেলে ছিলাম, ভিয়েনার এই হোটেলের বিল তার চেয়ে কম হয় নাই; কিন্তু অন্য দু-জায়গার হোটেলের মত সুবিধা এখানে আমি সব বিষয়ে পাই নাই।

আগের চিঠিতে লিখিয়াছি, প্রাগ হইতে ভিয়েনা আসিবার পথে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ বোধ করেন। ভিয়েনায় আসিয়া দেখা গেল, তাঁহার জ্বর হইয়াছে। তথাকার বিখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক ওয়েঙ্কেব্যাক্‌কে ডাকা হইল। তিনি আসিয়াই কবির ভিয়েনায় যে-বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং পোল্যাণ্ড ও রুশিয়া যাইতেও নিষেধ করিলেন। ঐ দুই দেশে যাইবার জন্য প্রাগ হইতে পাসপোর্ট লওয়া হইয়াছিল। কবি ও তাঁহার সঙ্গে সাত জন লোকের রুশিয়া যাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। তাহার মধ্যে আমিও ছিলাম। কবির যাওয়া বন্ধ হওয়ায় আমারও যাওয়া বন্ধ হইল। কিন্তু কবি যদি যাইতেন, তাহা হইলেও আমার যাওয়া ঘটিত না; কারণ আমি কয়েক দিন পরেই পীড়িত হই। আমার আর কখনও ইউরোপ যাইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং এ যাত্রা রুশিয়া দেখা না হওয়ায় আর হয়ত সে-দেশ দেখা হইবে না। সেখানে মুটে মজুর কারিকর চাষারা এখন অন্য কোন শ্রেণীর লোকদের চেয়ে নিকৃষ্ট বিবেচিত হয় না; সকলের রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান, সামাজিক মর্য্যাদাও সমান। কাগজে এইরূপ পড়িয়াছি। এরূপ দেশের প্রকৃত অবস্থা কি-প্রকার এবং সকল রকম কাজকর্ম্ম কেমন চলিতেছে, তাহা সাক্ষাৎ দেখিবার জিনিষ; কিন্তু দেখা হইল না।

অধ্যাপক ওয়েঙ্কেব্যাক্‌ কেবল চিকিৎসক নহেন। নানা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে, এবং তাঁহার কথোপকথনের ক্ষমতা তাঁহার লোক-প্রিয়তার অন্যতম কারণ। বস্তুতঃ তিনি কবিকে দেখিতে আসিয়া এত গল্প করিতেন, যে, তাঁহাকে খুব বড় ডাক্তার বলিয়া না জানিলে লোকে মনে করিতে পারে, যে, তাঁহার অবসর অসীম, কোন কাজ-কর্ম্ম নাই। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য ও কথোপকথন-প্রিয়তা কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধতম ডাক্তারের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। একদিন তিনি কবিকে দেখিতে আসিয়া

প্রথমতঃ ৪০।৪৫ মিনিট গল্প করিলেন; তাহার পর বলিলেন,"একবার আপনার নাড়ীটা দেখিতে পারি কি ?" তাহার পর আবার গল্প। ২০।২৫ মিনিট পরে বলিলেন, "আপনার পিঠটা একবার খুলিবেন কি ?" তিনি ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রাম্য ডাক্তার ছিলেন, এখন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির সভাপতি ও ভিয়েনার প্রধান চিকিৎসক। তিনি বলিলেন, "আমি চিকিৎসাব্যবসায়ে কৃতী হইয়াছি বটে,কিন্তু কবি হইলে,যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর তাহার দর্শন পাইলে আনন্দিত হইতাম।" তাহার পর বলিলেন, যে, তাঁহার একটি ছেলে আর্টিষ্ট হইয়াছে, ভাস্করের কাজ করে; তাহাতে তাঁহার নিজের অভিলাষ কতকটা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার পুত্র যে তাঁহার একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "Even my wife says it is good," "এমন কি আমার স্ত্রীও বলেন, মূর্ত্তিটা ভাল হইয়াছে!" একদিন তাঁহার সহিত কথা-প্রসঙ্গে কবিতার বহি বিক্রী কিম্বা কবিদের ঐরূপ কোন অর্থাগমের কথা উঠায় (আমার ঠিক মনে নাই), রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে বলিলেন, "কবিদের একটা কৃতিত্বের জন্য দুটা পুরস্কার পাইবার কোন দাবী নাই।" তাঁহার ব্যবহৃত শব্দগুলি আমার ঠিক মনে নাই। কিন্তু যখন শুনিয়াছিলাম, তখন এই বুঝিয়াছিলাম, যে, কবিদের যে অন্তরের চোখ খুলিয়া যায়, ইহাই তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়; সুতরাং যশ বা অর্থাগম যথেষ্ট না হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এইরূপ অতি গভীর অর্থযুক্ত কথা বলিবার ক্ষমতায় ডাক্তার ওয়েঙ্কেব্যাক্ চমৎকৃত হন।

তিনি একদিন কবিকে এমন একটা ঔষধ দিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার আরোগ্যলাভের সুবিধা হইলেও দুর্বলতা খুব বাড়িবার সম্ভাবনা ছিল। পর দিন তিনি আসিয়া দেখিলেন, রবীন্দ্রনাথের রোগের উপশম অনেকটা হইয়াছে, কিন্তু তিনি দুর্ব্বল হন নাই। ইহাতে ডাক্তার বিস্মিত হইয়া এই মত প্রকাশ করেন, যে, তাঁহার দেহের বুনিয়াদ খুব মজবুত। ইহাতে আমরা খুব আশান্বিত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

আগের চিঠিতে বলিয়াছি, আমার রাত্রে বড় ঘাম হইত। এইজন্য ডাক্তার ওয়েঙ্কেব্যাকের পরামর্শ লওয়া স্থির ছিল। তাঁহাকে বলাতে বলিলেন, "আমার রোগীদর্শন-কক্ষে যাইবেন না। সেখানে রোগীদের এক লম্বা ফর্দ্দ আছে; তার নীচে আপনার নাম টুকিয়া লইলে আপনার পালা আসিবার পূর্ব্বেই হয়ত আপনাকে চলিয়া যাইতে হইবে; আর যদি উপরের দিকে কোথাও আপনার নামটা ঢুকাইয়া দি,তাহাহইলে অন্য রোগীরা অসন্তুষ্ট হইবে ও রাগ করিবে। সুতরাং আমি আপনাকে হোটেলেই দেখিয়া যাইব।" একদিন তাহাই করিলেন। দেহের আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রে কোন খুঁত পাইলেন না। অন্য নানা রকম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যথা—"আপনার মানসিক জ্বালা যন্ত্রণার কারণ কিছু আছে কি ?" "আপনার বাড়ীর জন্য মন কেমন করে কি ?" যাহা হউক, তিনি একটা ঔষধ দিলেন, এবং বলিলেন, যে, শীত পড়িবার পূর্ব্বেই শীঘ্র ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়া ভাল; যদি তাহা না পারি, তাহা হইলে ইতালীর বা ফ্রান্সের দক্ষিণে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে বলিলেন। সেখানে আমার কোন পরিচিত লোক নাই, জেনীভাতে আছেন, বলায় জেনীভাতেই থাকিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিয়াছিলাম। ডাক্তার ওয়েঙ্কেব্যাকের ফী বেশী নয়।

কানের একটা দোষ থাকায় আমি ভিয়েনার বড় গলা-কান-নাক চিকিৎসক অধ্যাপক নয়ম্যানের চিকিৎসা-কক্ষে যাই। দু-দিনের চিকিৎসাতেই একটু উপকার হইয়াছিল। এই ডাক্তারটি বেশ একটু মজার লোক। প্রত্যেক দিনের চিকিৎসার পর তিনি আমার মুখে একটা লজঞ্জুস্ পুরিয়া দিতেন। শুধু আমার মুখে নয়;—শ্রীমান্ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আমাকে তাঁহার চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইতেন, তাঁহার মুখেও লজঞ্জুস্ দিতেন। শুনিয়া আমোদ বোধ করিয়াছিলাম, যে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার চিকিৎসাধীন হওয়ায়, তাঁহার মুখেও লজঞ্জুসের প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল। ডাক্তার নয়ম্যানও ফী বেশী লন নাই।

ভিয়েনা সহরেই গলা-নাক-কানের চিকিৎসার জন্য

৩৮টি চিকিৎসালয় আছে। সেখানে যে ঐসব রোগ বেশী বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা নহে; পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা কোন রকম রোগ, বৈকল্য, অসুবিধাকে অদৃষ্টের দোষ বলিয়া মানিয়া লয় না; প্রতিকারের চেষ্টা করে। আমরা একটি চিকিৎসালয়ে গিয়া দেখিলাম, রোগবশতঃ এক প্রৌঢ় ব্যক্তির বাগ্‌যন্ত্র কাটিয়া ফেলিতে হওয়ায় তাহার জায়গায় কৃত্রিম বাগ্‌যন্ত্র বসান হইয়াছে এবং তাহার সাহায্যে লোকটিকে দু-একটি করিয়া কথা বলিতে শিখান হইতেছে। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন লোকটি এক সঙ্গে ছয়টি মাত্রার (syllable) শব্দ বা শব্দসমষ্টি উচ্চারণ করিতে পারিত, তাহার পরই হাঁফ ছাড়িত। একটি সুস্থকায় যুবক স্বভাবতঃই তারস্বরে কথা বলে। তাহার স্বরটি সাধারণ লোকদের মত করিবার চেষ্টা হইতেছে। একটি হৃষ্টপুষ্ট সুস্থদেহ যুবতী স্ত্রীলোকের স্বর স্বভাবতই ভাঙাগলা লোকদের মত। তাহার স্বর সাধারণ লোকদের মত করিবার চেষ্টা হইতেছে। একটি গরীব পরিবারের পাঁচটি ছেলে। বড়টি নয় দশ বৎসরের, ছোটটি দুই বৎসরের হইবে। তাহাদের মা তাহাদের চিকিৎসার জন্য আনিয়াছেন, দেখিলাম। তাহাদের কেহই "র" ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহার জায়গায় একটা অনুনাসিক শব্দ করে। তাহাদের পিতারও এই দোষ ছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রটি জন্মিবার আগেই তাহার সেই দোষ সারিয়া যায়। সুতরাং ডাক্তার বলিলেন, ছেলেগুলির এই দোষ অনুকরণ হইতে উৎপন্ন নহে, পিতার নিকট হইতে দৈহিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছেলেগুলির এই "র" উচ্চারণের অক্ষমতার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। যাহা করিতেছেন, তাহা আমাদিগকে দেখাইলেন, এবং "র" ও অনুনাসিক ধ্বনির মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে, তাহারও আলোচনা করিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি ডাক্তারকে বলিয়াছিলাম, যে, "ল" ও "র" এর অদল-বদল হয়, আবার "র" ও "ড়" এর অদল-বদল হয়। মূর্দ্ধণ্য "ণ" এর উচ্চারণ "ড়ঁ" র মত। তা ছাড়া ইহাও বলা যায়, যে, স্থল বিশেষে "র" ও "ন" এর অদল বদল হয়। যেমন কোন কোন জেলায় "রাঁড়ী"কে "নাড়ী" বলে, এবং শুনিয়াছি খুলনা অঞ্চলে খেজুর-রস বিক্রেতারা "নস নাখবা" অর্থাৎ "রস রাখবা" (রস রাখিবেন) বলিয়া খেজুর-রস ফেরী করে।

"র" উচ্চারণে অসমর্থ পাঁচ ভাইয়ের ছোটটি অনেক লোকের সামনে অন্য ভাইদের মত রবারের নলের মুখে কথা বলিতে কোন মতেই রাজী হইল না। ডাক্তার তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিয়া তাহার মেজাজ ভাল করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছেলেগুলি খুব গরীব পরিবারের। কিন্তু ইউরোপে জাতিভেদ না থাকায় ডাক্তার তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা আদির বিচার না করিয়া ছোটটিকে কোলে লইয়া আদর করিতে পারিয়াছিলেন।

আমি ইউরোপের যে কয়টি দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এক মাত্র ভিয়েনাতেই রাস্তায় ও সার্ব্বজনিক বাগানে কৃশ ও বিবর্ণ শিশু দেখিয়াছিলাম, যদিও তাহারাও আমাদের দেশের সাধারণ শিশুদের চেয়ে সুস্থ সবল। ভিয়েনাতেই প্রথম আমি রাস্তায় ভিখারী দেখিলাম। তাহাদের হাতে একটা করিয়া টিনের বাক্স এবং তাহাতে জার্ম্মান ভাষায় কিছু লেখা রহিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ হয়ত কোন পরহিতসাধক প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে, যেমন আমাদের দেশে কেহ কেহ ট্রামে ও রেলগাড়ীতে বাক্স-হাতে করিয়া থাকে। কিন্তু নিজের জন্য ভিক্ষাও অনেকে করিতেছে, মনে হইল। একজন পাদরী একটি অন্ধাশ্রমের জন্য ভিক্ষা করিতে আমাদের হোটেলেও আসিয়াছিলেন।

এইসব দেখিয়া বুঝিলাম, গত মহা যুদ্ধে ইউরোপের মধ্যে অষ্ট্রিয়া খুব দুঃখ ভোগ করিয়াছে। দারিদ্র্যও তাহার খুব বাড়িয়াছে। অষ্ট্রিয়ার বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল। এখন উহা একটি ক্ষুদ্র দেশ। হাঙ্গেরী আলাদা হইয়া গিয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়া আলাদা হইয়া গিয়াছে। ইটালী কিছু ভূখণ্ড নিজের বলিয়া দখল করিয়াছে। পোল্যাণ্ড স্বাধীন হইয়াছে। ইত্যাদি। কিন্তু অষ্ট্রীয়া এখন ছোট হইলেও উহার পূর্ব্বেকার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় এখনও ভিয়েনার শোভা-সমৃদ্ধিতে পাওয়া যায়। আমি ইউরোপে যে কয়টি সহর দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে ভিয়েনা সুন্দরতম মনে হইয়া-

ছিল। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আগে ভিয়েনা দেখিয়াছিলেন; তিনি আমাকে দুই এক দিনে যতটা দেখা যায় দেখাইলেন। ভিয়েনার প্রধান রাস্তা রিংষ্ট্রাসে খুব প্রশস্ত ও সুন্দর। ইহা পাদচারী পথিকদের জন্য চারিটি ও মোটর আদি যানের জন্য তিনটি পথে বিভক্ত। মাঝখানের পাদপথ দুটির প্রত্যেকের দুই পাশে গাছের সারি এবং এক-একটি গাছ ঘিরিয়া ফুলের কেয়ারী আছে। আলোকস্তম্ভগুলির লণ্ঠনের কিছু নীচে ফুলগাছ ঝুলান আছে। অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের ঐতিহাসিক পুরাতন প্রাসাদের বাগান সাম্রাজ্যের সময়ও সর্ব্বসাধারণের জন্য মুক্তদ্বার ছিল। তাহার পাশে যুবরাজের জন্য সুশোভন ও বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। কিন্তু তাহাতে বাস করিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। এখন অষ্ট্রিয়া সাধারণতন্ত্র। ইহার প্রাসাদগুলি মিউজিয়ম ও চিত্রশালা-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বেলভেডিয়্যার্ নামক প্রাসাদের ভিতর আমি গিয়াছিলাম। অট্টালিকাটি চমৎকার। তাহাতে রক্ষিত বড় বড় তৈলচিত্র, আসবাব প্রভৃতি খুব সুন্দর। বাগানে সরোবর, ফোয়ারা প্রভৃতি এখনও সুরক্ষিত অবস্থায় আছে।

চিত্রশালাগুলির ভিতর ও বাহির অতি সুন্দর। যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া পরাজিত হওয়ায়, শুনিলাম, অনেক ছবি অন্য কোন কোন দেশ দাবী করিয়া লইয়া গিয়াছে। তথাপি, যাহা আছে, তাহাও দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। চিত্রশালা-গুলির অভ্যন্তর মূল্যবান্ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ভিয়েনার পার্লেমেণ্ট গৃহের সম্মুখভাগ দেখিলে মনে সম্ভ্রমের উদয় হয়। আমি ভিয়েনার সব দ্রষ্টব্য হর্ম্ম্য, প্রতিষ্ঠান, ও স্থান দেখি নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহারও একটি একটি করিয়া বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা বলিতেই হইবে। এখানে শিক্ষা ভালই হয়—বিশেষতঃ চিকিৎসা বিদ্যার। কতকগুলি ভারতীয় ছাত্রের ভিয়েনা যাওয়া উচিত। আমি যে জাহাজে বোম্বাই হইতে ভেনিস্ যাই, তাহাতে একজন ভারতীয় আই-এম্-এস্ ডাক্তার ছুটি লইয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, গলা-নাক-কানের রোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি ভিয়েনা যাইবেন। সেখানে আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতেও আমার এই ধারণা হয়, যে, ঐসব ইন্দ্রিয়ের রোগের চিকিৎসা ভিয়েনায় ভাল শিক্ষা করা যায়। সেখানে থাকিতে হিসাব করিয়া-ছিলাম, মাসিক ১২০।১৫০ টাকা খরচে ভারতীয় ছাত্রেরা ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। জানি না, অন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময়ের হারের পরিবর্ত্তন বশতঃ এখনও ঐ টাকায় চলিতে পারে কি না। ভিয়েনায় শিক্ষা লাভ করিতে হইলে অবশ্য জার্ম্যান শিখিতে হইবে। কিন্তু বিজ্ঞান শিখিবার মত জার্ম্যান কয়েক মাসেই শিখিয়া ফেলা যায়।

আমরা একদিন ভিয়েনার কয়েকটি বড় গির্জ্জা দেখিতে গিয়াছিলাম। জার্ম্যান না জানায় উপাসনায় যোগ দিবার সম্ভাবনা আমাদের ছিল না; আমরা কেবল গির্জ্জার বাহির ও ভিতর দেখিলাম, এবং কত লোক উপাসনার জন্য আসিয়াছে দেখিলাম। সবগুলিরই অভ্যন্তরে বড় বড় খৃষ্টীয় ছবি আছে। উপাসনার সময় খুব মোটা ও লম্বা মোম বাতি জ্বালা হয় এবং পাদরী মহাশয় সম্ভ্রমোৎপাদক পরিচ্ছদ পরিধান করেন। কোন গির্জ্জাতেই লোক বেশী দেখিলাম না, যদিও সে দিন রবিবার ছিল।

একদিন আমরা চারজন বাঙালী হোটেলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও স্বদেশীর অনুকূলে বাংলা দেশের আন্দোলনের প্রথম সময়কার কথা বলিতেছিলাম। সে-সময়ে আমি এলাহাবাদে থাকিতাম। এইজন্য অনেক কথা আমার নূতন লাগিতেছিল। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত কিভাবে যুক্ত ছিলেন, তাহার খাঁটি খবর তাঁহার মুখ হইতে শুনিতে খুব ভাল লাগিতেছিল। ইহা তখনকার অলিখিত ইতিহাসের এক অধ্যায়। আমরা যে দিন হোটেলে এইসব কথা বলিতেছিলাম, সেটা যে ৩০ শে আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবর, রাখীবন্ধনের দিন, তাহা আমাদের মনে ছিল না; পরে তাহা আমার মনে পড়ে।

একদিন হাঙ্গেরীর লোকদের একজন প্রতিনিধি ইম্পীরিয়্যাল হোটেলে উপস্থিত; উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিয়া তিনি কবে হাঙ্গেরী যাইবেন তাহার প্রতিশ্রুতি লওয়া। কবি অসুস্থ থাকায় ডাক্তার ওয়েঙ্কেব্যাক্ কোন মতেই তাঁহাকে কবির সহিত দেখা

করিতে দিলেন না। ভিয়েনার বক্তৃতাও তখনকার মত ডাক্তার মহাশয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, যদিও আমরা পৌঁছিয়া দেখিয়াছিলাম, উদ্যোক্তারা সহরময় দেওয়ালে বড় বড় ইস্তাহার দিয়াছে এবং খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দিয়াছে। বক্তৃতা বন্ধ হওয়ায় আশাভঙ্গজনিত উত্তেজনাও হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার ওয়েঙ্কেব্যাক্ সব দায়ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে লইয়াছিলেন। কবি পরে ভিয়েনায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন, হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেস্থেও গিয়াছিলেন। সেখানকার অধিবাসী হাঙ্গেরীয়গণ বংশত হূন ও প্রাচ্য। এইজন্য তাহারা রবীন্দ্রনাথকে নিজের লোক বলিয়া দাবী করে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ তথায় যেরূপ সংবর্দ্ধনা পাইয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়।

কয়েকদিন ভিয়েনায় থাকিবার পর আবার জেনীভা যাইবার সময় হইল। একদিন সন্ধ্যার পর ট্রেনে উঠিলাম। শ্রীমান্ প্রশান্ত আমার নিকট হইতে পাঁচ শিলিং লইয়া ট্রেনের কণ্ডাকটর্‌কে দিলেন এবং আমাকে প্রাতে এক পেয়ালা কোকো এবং দিনের বেলা অল্প পানীয় খনিজ জল দিতে বলিলেন। তাহার দাম পাঁচ শিলিং হয় না। কিন্তু বাকীটা সে ব্যক্তিকে বক্‌শিশ দেওয়া হইল, ইহা উহ্য রহিল। সে পরদিন সকালে এক পেয়ালা কোকো দিয়াছিল, ছোট এক বোতল খনিজ জলও দিয়াছিল, কিন্তু দুপুর বেলা জুরিকে ট্রেন বদলাইবার সময় বলিল, "আপনি কোকো ও জলের দাম বাবতে আমার তিন শিলিং ধারেন, আপনার বন্ধু আমাকে যে পাঁচ শিলিং দিয়াছিলেন সেটা আমার বক্‌শিশ।" লোকটার সঙ্গে দরদস্তর করিতে ভাল না লাগায় তাহাকে তিন শিলিং দিলাম।

বলিয়াছি, দুপর বেলা জুরিক্ পৌঁছি। তাহার আগে ভোর রাত্রে জীবনে প্রথম তুষার-আচ্ছাদিত ভূমি ও বৃক্ষাবলী এবং তুষারপাত দেখি। পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম পাহাড়ের গা শাদা। আর একটু আলো হইবার পর দেখিলাম, পাইনগাছের ডালপালাগুলাও শাদা এবং সমতলভূমির উপরও কে যেন চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়াছে। তখন আমার মনে হইল, বোধ করি রাত্রে তুষারপাত হইয়াছে। কিন্তু তখন অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ চলিতেছে। তখন কি আল্পসের পার্ব্বত্য অঞ্চলেও এত শীত হইতে পারে? এইজন্য মনে সন্দেহ হইতেছিল, যে, সত্য সত্যই তুষার পড়িয়াছে কি না। কিন্তু যখন প্রভাতে সেণ্টএণ্টন য়্যাম এলেবর্গ ষ্টেশনে ট্রেন থামিল, তখন আর সন্দেহ রহিল না; দেখিলাম পাতলা পেঁজা তুলার মত হাল্কা তুষার রেলের কর্ম্মচারীদের লম্বা লম্বা কাল কাল কোটের উপর পড়িতেছে। পরে জেনীভায় চিঠি পাইয়া জানিতে পারি, যে, আমি ভিয়েনা ছাড়িবার দুদিন পরে সেই সহরেও তুষার পড়িয়াছিল।

ভিয়েনা হইতে যে-ট্রেনে জেনীভা যাইতেছিলাম, তাহার গাড়ীগুলা উষ্ণবাষ্পবাহী নলের দ্বারা গরম রাখা হইতেছিল। জুরিক্ পৌঁছিবার পর, একটা জেনীভা-গামী গাড়ী কাটিয়া ষ্টেশনের সুপ্রশস্ত ময়দানে রাখিয়া দিয়া, ট্রেনটা অন্যদিকে চলিয়া গেল। অন্য ট্রেন সেই গাড়ীটাকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া জেনীভা যাইবে।

ট্রেন হইতে বিচ্ছিন্ন গাড়ীটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। আমি দীর্ঘকাল গরম গাড়ীতে থাকার পর সেই ঠাণ্ডা গাড়ীতে প্রচণ্ড শীতে প্রায় দেড়ঘণ্টা রেলের ময়দানে দিলাম। যখন প্রায় রাত্রি নয়টার সময় জেনীভা পৌঁছিলাম, তখন বৃষ্টি হইতেছিল। ষ্টেশন হইতে নামিয়া হোটেলে যাইবার সময়ও কিছু ভিজিয়াছিলাম। জেনীভা পৌঁছিবার পরদিন সন্ধ্যার আগে বেড়াইবার সময় খুব জোরে বৃষ্টি আসিয়াছিল। তাহাতেও হয়ত ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার বিষ আগেই কোথাও হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

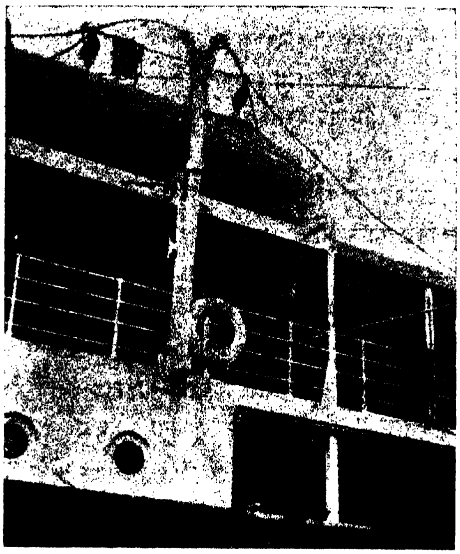
জেনীভায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইল। তাহা পরে ডবল্ নিউ-মোনিয়ায় পরিণত হয়। প্রথম বার জেনীভা থাকা কালে যে-হোটেলে ছিলাম, এবারেও সেইখানেই ছিলাম। এই হোটেলের নিরিখ অন্য অনেক হোটেলের তুলনায় কম হইলেও আমি এই হোটেলে যেরূপ যত্ন পাইয়াছিলাম ও আরাম পাইয়াছিলাম, অন্য কোথাও তাহা পাই নাই। ইহার অধ্যক্ষের ভাল খৃষ্টিয়ান্ বলিয়া খ্যাতি আছে এবং প্রত্যেক কামরায় ইংরেজী

জর্ম্যান ও ফরাসী বাইবেল রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস ও তাঁহার স্ত্রী হোটেলের অধ্যক্ষকে একজন ভাল ডাক্তার ডাকাইতে বলিলেন। ডাক্তারটি বেশ ভাল চিকিৎসাই করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার ফী আমাদের মুদ্রায় সাড়ে পাঁচ টাকার সমান। কোন কোন দিন তিনি দু'বার আসিতেন। তা ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা শুশ্রূষাকারিণী নার্স রাখা হইয়াছিল। কিন্তু নার্সের দ্বারা বিশেষ কিছু হইত না, যদি রজনীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী খুব যত্ন না করিতেন। রজনীবাবুর স্ত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী সোনিয়া চব্বিশ ঘণ্টা নার্সের সহিত পাশের একটি ঘরে থাকিতেন এবং আমার জন্য যাহা কিছু করা দরকার সব করিতেন। তিনি আমার কন্যাদের মত আমার সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর ঋণ আমি কখনও শোধ করিতে পারিব না। পীড়ার সময় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমান্ প্রশান্ত আমার খোঁজ খবর লইয়া ও অন্যান্য প্রকারে আমার সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

আমি আরোগ্য লাভ করিবার আগে হইতেই ডাক্তার বলিয়াছিলেন, যে, আরোগ্যলাভ করিবার পরই আমি যেন দেশে ফিরিয়া যাই। আমি পীড়িত হইবার পূর্ব্বে একটি জার্ম্যান্ জাহাজে দেশে ফিরিবার জন্য তাহাতে যায়গা লইয়াছিলাম ও সিকির অধিক অগ্রিম ভাড়া দিয়াছিলাম। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও কামরা লইয়াছিলেন। কিন্তু উঁহার ইউরোপ হইতে রওনা হইবার দেরী ছিল। সুতরাং আমি উহার কামরা ছাড়িয়া দিলাম, তাহাতে আমার অনেক টাকা লোকসান হইল। টেলিগ্রাফ করিয়া একটা ফরাসী জাহাজে স্থান লইলাম। ইহা মার্সেঈ হইতে ৫ই নবেম্বর (১৯২৬) কলোম্বো যাত্রা করে। আমি তখনও একা রেলে যাইবার মত বল পাই নাই। এইজন্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ আমাকে মার্সেঈ পৌঁছাইয়া দিতে রাজী হইলেন। তাঁহার নিকট আমি অন্যান্য সাহায্যের জন্যও ঋণী। ৪ঠা জেনীভা হইতে রওয়ানা হইলাম। ট্রেনে একজায়গায় সত্যেন্দ্র বলিলেন, "দেখুন ত, আমাদের পাশের কামরায় একটি মহিলা রহিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বাঙালী। একজন ভদ্রলোক রহিয়াছেন, তাঁহাকে ইটালিয়ানের মত দেখাইতেছে।" আমি গিয়া দেখিলাম, স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কন্যা এবং তাঁহার জামাতা মিঃ বি সি সেন। তাঁহাদের সঙ্গে আগে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও নাম-জানাজানি ছিল। ট্রেনে দেশের নানা কথা হইল—নিজনিজ গৃহে রসগোল্লা প্রস্তুত করা হইতে ১৯২৬ সালের এপ্রিল মে মাসে কলিকাতা ও বঙ্গের অন্যান্য জায়গার দাঙ্গা হাঙ্গামা পর্য্যন্ত।

সন্ধ্যার ঘণ্টা দুই পরে মার্সেঈ পৌঁছিলাম। সেন মহাশয়েরা জেনীভা হইতেই হোটেল ঠিক্ করিয়া আসিয়াছিলেন। আমরা তাহা করি নাই বলিয়া এবং পরদিন ৫ই ভিন্ন ভিন্ন লাইনের অনেক জাহাজ বন্দর ছাড়িবে বলিয়া হোটেলগুলিতে অনেক আগন্তুকের আমদানী হওয়ায় আমাদের কোন হোটেলে জায়গা পাইতে দেরী হয়। শেষে আমরা ব্রিষ্টল হোটেলে গেলাম।

পর দিন আমি আমাজোন্ নামক ফ্রেঞ্চ জাহাজে উঠিলাম। সত্যেন্দ্র পৌঁছাইয়া দিলেন। জাহাজ ছাড়িবার আগে তিনি ডেকে দণ্ডায়মান আমার একটা ফোটোগ্রাফ জেটী হইতে লইলেন। একটি ফরাসী স্ত্রীলোক জেটীতে গান করিতে ও একজন ফরাসী পুরুষ বেহালার মত একটা বাজনা বাজাইতে লাগিল। জাহাজের যাত্রীরা তাহাদিগকে কিছু কিছু বক্‌শিশ ছুড়িয়া দিতে লাগিল। জাহাজ ছাড়িল। ডেকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, যতক্ষণ আমাকে দেখা যায় সত্যেন্দ্র ততক্ষণ জাহাজের দিকে তাকাইয়া আছেন। তাহার পর তিনিও অদৃশ্য হইলেন, আমিও অদৃশ্য হইলাম! তাঁহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—বাঙালী বলিয়া এত টান। আগেই জানিয়াছিলাম, জাহাজে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় ভারতীয় লোক কেহ নাই। তাহার জন্য এবং আমি ফরাসী না জানায়, দেহের দুর্ব্বল অবস্থায় মনটা বড় বিষণ্ণ ছিল। পরে জানিতে পারি তৃতীয় শ্রেণীতে বল্‌সারা নামক একটি পার্সী যুবক ও কৃষ্ণ নামক একটি অক্সফোর্ডের পাশকরা মান্দ্রাজী যুবক আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দু একবার দেখা কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল; কিন্তু জাহাজের কণ্ট্রোলার তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর ত্রিসীমায় আসিতে



আমাজোন জাহাজের ডেকে দণ্ডায়মান প্রবাসী-সম্পাদক

নিষেধ করিয়া দেওয়ার পরে কেবল তাঁহাদিগকে দূর হইতে কোন কোন দিন নমস্কার করিতে পারিতাম, কথাবার্ত্তা আর হইত না।

জাহাজে আমি কিরূপ নিঃসঙ্গ ছিলাম, মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আগেই একবার প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছি। পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ফ্রেঞ্চ জাহাজটিতে খাইবার ঘরে বা অন্যত্র বিন্দুমাত্রও জাতিভেদ বর্ণভেদ ছিল না, এইটি উহার প্রশংসার কথা। অন্যান্য বিষয়ে উহার কোন উৎকর্ষ দেখি নাই। আমার কামরায় যে ফরাসী ভদ্রলোকটি ছিলেন, তিনি সৈনিক কর্ম্মচারী। বেশ ভদ্র। ইংরেজী কথার মধ্যে জানেন 'ফিনিশ।' আহারের সময় নিদ্রার সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে ও অন্যান্য সাধারণ কোন কোন বিষয়ে আমাদের ইঙ্গিতে ইসারায় ঠারেঠোরে কথা হইত।

আমি জাহাজে ও ইউরোপ প্রবাসকালে নিয়মিত ডায়রী লিখি নাই, দু তিন দিনের সামান্য দু একটা কথা লেখা আছে, আর সমস্ত স্মৃতি হইতে লিখিতে হইয়াছে। ডায়রী রাখিলে ভাল করিতাম।

জাহাজে একজন জাপানী যাত্রীর চালচলন বেশ মজার লাগিয়াছিল। লোকটি ইংরেজী ও ফরাসী বলিতে পারে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয় রকমের যাত্রীদের সঙ্গেই নিজে উদ্যোগী হইয়া আলাপ পরিচয় করিতেছিল। কথাবার্ত্তা যে খুব গুরুতর বিষয়ে তাও নয়। একদিন এক ইংরেজীভাষিণী স্ত্রীলোককে নিজের পোষাকের কাপড়টা যে কত টেকসই তাই বলিতেছিল। লোকটি কিন্তু খাঁটি ইউরোপীয় নহে এরূপ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছিল না। ডেকে আমার সঙ্গে একই বেঞ্চীতে কোন কোন দিন দীর্ঘকাল বসিয়াছিল, কিন্তু একবারও আমার সঙ্গে কথা বলে নাই। এ গেল জিনিষটার একটা দিক্। অন্যদিকে, আমি নিজে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পরাধীন দেশের লোকের সঙ্গে কেন লোকে যাচিয়া আলাপ করিবে?

এক চীনদেশীয় যাত্রী আপনা হইতে আমার সহিত কথাবার্ত্তা জুড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার উচ্চারণ এমন, যে, আমি কষ্টে তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহার কাছে এই একটা নূতন ঐতিহাসিক সংবাদ শুনিলাম, যে, ১৩৩ বৎসর আগে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ চীনের অধীন ছিল, তাহার পর ইংলণ্ডের অধীন হইয়াছে! এইরূপ ঐতিহাসিকজ্ঞানসম্পন্ন লোক চীনে আরও আছে কি?

কষ্টে আঠারটা দিন কাটাইয়া শেষে কলোম্বোর কাছাকাছি আসিলাম। যেদিন প্রাতে কলোম্বো পৌঁছিব তার আগের রাত্রে গভীর অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিলাম। ঘুম সাধারণতঃ ভাল করিয়া হইত না, কিন্তু পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত শুইয়া থাকিতাম ও তাহার পর স্নান করিতে যাইতাম। কলম্বো পৌঁছিবার দিন কিন্তু অনেক রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিলাম। বাহিরে আসিয়া দূরে আলোকমালা দেখিয়া বুঝিলাম, সিংহলের নিকটে আসিয়াছি। ডাঙার কাছে আসিয়াছি, অশ্বেত মানুষের দেশের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, ভাবিয়া বড় আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পোষাক আঁটিয়া বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কখন জাহাজ বন্দরে লাগিবে, কখন ডাক্তারের

দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া জাহাজ হইতে নামিতে পারিব। শীঘ্রই তাহা ঘটিল। জেনীভা হইতে আমি শ্রীমান্ প্রশান্ত মহলানবীশের পরামর্শ অনুসারে কলম্বোর বাণিজ্যশুল্ক আফিসের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সিন্নাটাম্বীকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। আনন্দ কলেজের চিত্রবিদ্যাশিক্ষক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তকেও চিঠি লিখিয়াছিলাম এবং এখানে বাড়ী হইতেও তাঁহার কাছে তার গিয়াছিল। ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হইবার পর বাহিরে আসিবামাত্র একটি যুবক আমাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মিঃ চাট্যার্জ্জি? আমি সিন্নাটাম্বী।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তখন জিনিষপত্র লইয়া তাঁহার সহিত একটি নৌকায় বাণিজ্যশুল্ক আফিসে গেলাম। সেখানে জেটিতে নৌকা লাগিবার আগেই দেখি, মণীন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়া আছেন। বহুদিন পরে বাংলা কথা বলিয়া বড় সুখ হইল। মণীন্দ্রবাবু আগে হইতেই সূতা ও কাপড়ের কলের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাসায় আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাণিজ্যশুল্ক আফিসে একটুও দেরী হইল না। তাহার পর শ্রীযুক্ত সিন্নাটাম্বী আমাকে ভূপেন্দ্রবাবুর বাসায় পৌঁছাইয়া দিলেন। ভূপেনবাবু তখনও মিল হইতে বাড়ী আসেন নাই। তাঁহার পত্নী কল্যাণীয়া শ্রীমতী আভাময়ীর সহিত পরিচিত হইলাম। দেখিয়াই বুঝিলাম, তিনি আমার কন্যাদের চেয়ে ছোট। তথাপি "আপনি" বলিয়া কয়েকবার কথা বলিলাম। তিনি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমাকে আপনি বলিবেন না।" তখন হইতে "তুমি" আরম্ভ হইল। ভূপেন বাবুর বাড়ীতে তাঁহাদের গুণে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত ছিলাম। দীর্ঘকাল পরে বাঙালীর বাড়ীতে থাকিতে পাইয়া বড় আরাম বোধ হইল। গুরুতর পীড়ার পর জাহাজে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসায় আমার বিশ্রাম করিতেই তিন দিন কাটিয়া গেল, কলম্বো দেখা হইল না। ২৫শে নবেম্বর সন্ধ্যার পর কলম্বো ষ্টেশনে রেলগাড়িতে চড়িলাম। পর দিন প্রাতে তালাইমান্নার ষ্টেশন পৌঁছিলাম। সেখান হইতে জাহাজে অল্পপরিসর প্রণালী পার হইয়া ভারতবর্ষের ধনুষ্কোটি বন্দরে আসিতে হয়। এই জাহাজে আমাদের দেশী লোকেরা যেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া আমার জিনিষপত্র উল্টাপাল্টা করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিল এরূপ ইউরোপে কোথাও কেহ করে নাই। ধনুষ্কোটিতে রোদে ট্রেন দাঁড়াইয়াছিল। কোথাও গাছ পালা বা অন্য কিছুর ছায়া নাই। তৃষ্ণা পাওয়ায় বরফ লেমনেড চাহিলাম। ট্রেনের লোক দুই তিন বার বলিল, আন্‌ছি আন্‌ছি, কিন্তু আনিলনা। কলম্বো হইতে টমাস কুকের মারফৎ তার করিয়া গাড়ীতে জায়গা রিজার্ভ করিয়াছিলাম, এবং ইহাও নিশ্চিত, যে, সে তার ধনুষ্কোটি পৌঁছিয়াছিল; কেননা, রেলের একটি কর্ম্মচারী আমাকে পারের ষ্টীমারেই আপনা হইতে বলিয়াছিলেন, "আপনার তার পাওয়া গিয়াছে।" কিন্তু গার্ডকে জিজ্ঞাসা করায় সে তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল সে কিছু জানে না। বাস্তবিকও দেখিলাম, অনেক গাড়ীতে অনেক ইংরেজের নাম লেখা কার্ড লাগান রহিয়াছে, কিন্তু যে কর্ম্মচারীটি জাহাজে আমাকে আমার তার প্রাপ্তির সংবাদ দিয়াছিলেন তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমার নামযুক্ত কার্ড কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন ঐরূপ একটা কার্ড একটা খালি গাড়ীতে লাগাইয়া দিলেন। পারের জাহাজে বাণিজ্যশুল্ক বিভাগের দেশী কর্ম্মচারীদের ব্যবহার (ইংরেজদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার হয় নাই), ষ্টেশনে গার্ডের তাচ্ছিল্য, ট্রেনের ভোজনকক্ষের বরফলেমনেডওয়ালাদের অমনোযোগ, ইত্যাদি হইতে বুঝিতে বাকী রহিল না, যে, আমি আবার "আমার দেশ" নামক ভূখণ্ডে আসিয়াছি; নতুবা এত সম্মান আদর আর কোথায় সম্ভবে?

সেতুবন্ধরামেশ্বরের মন্দিরের এক পাণ্ডা যাত্রী সংগ্রহ করিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মোতীরাম। আমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন; কিন্তু আমি তখন ঘরমুখো। এ যাত্রা রামেশ্বরম্ দেখিবার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম। মোতীরাম দয়া করিয়া আমার জন্য একজন বরফলেমনেডওয়ালা ডাকিয়া দেওয়ায় আমার তৃষ্ণানিবৃত্তি হইল ও আমি তাঁহাকে কিছু বকশিস্ দিলাম।

ধনুষ্কোটি হইতে যে ট্রেনে মান্দ্রাজ আসিতে হয়, তাহার গাড়ীগুলার ঝাঁকরানি বড় বেশী। বালুকাকীর্ণ অঞ্চল দিয়া রেলগাড়ী আসে বলিয়া ধূলা ও গরম বড় বেশী।

যাহা হউক, কোন প্রকারে মাদুরা পর্য্যন্ত আসিয়া তথাকার এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয়ের সৌজন্যে গরম গরম ভাত তরকারী দই মিষ্টান্ন আদি পাইয়া তৃপ্ত হইলাম। মণীন্দ্রবাবু তাঁহাকে কলম্বো হইতে তার করিয়া দিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে মান্দ্রাজ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলাম আমার জ্যেষ্ঠ জামাতার ভ্রাতা রামচন্দ্র আমার জন্য মোটর লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সহিত তাঁহাদের মাতুল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। সুতরাং বলা বাহুল্য খুব আরামেই একদিন সেখানে বিশ্রাম করিলাম। তাহার পর আবার রেলে উঠিয়া ৩০শে নবেম্বর হাবড়া পৌঁছিলাম।

মুক্তি

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরসুন্দর,
দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ, দাও মুক্তি নিরন্তর
প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণ-পতন পীড়া হ'তে,
দিয়োনা দুলিতে মোরে তরঙ্গিত মুহূর্ত্তের স্রোতে,
ক্ষোভের বিক্ষেপ-বেগে। শ্রাবণ-সন্ধ্যার পুষ্পবনে
যে সাহস দিলে তুমি সুকুমার যূথীর জীবনে,—
নির্ম্মম বর্ষণঘাতে শঙ্কাশূন্য প্রসন্ন মধুর,
মুহূর্ত্তের প্রাণটিতে ভরি' তোলে অনন্তের সুর,
সরল আনন্দহাস্যে ঝরি' পড়ে তৃণ শয্যা'পরে,
পূর্ণতার মূর্ত্তিখানি আপনার বিনম্র অন্তরে
সুগন্ধে রচিয়া তোলে ; দাও সেই অক্ষুব্ধ সাহস,
সে আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ
আপনার সুন্দর সীমায় ;—দ্বিধাশূন্য সরলতা
গাঁথুক্ শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা॥

১ জুলাই, ১৯২৭

(২)

আপনার কাছ হ'তে বহুদূরে পালাবার লাগি',
হে সুদূর, হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি,
তোমার আহ্বান-বাণী। আজ তব বাজুক বাঁশরী,
চিত্তভরা শ্রাবণ-প্লাবনরাগে,—যেন গো পাসরি
নিকটের তাপতপ্ত ঘূর্ণিবায়ে ক্ষুব্ধ কোলাহল,
ধূলির নিবিড় টান পদতলে। রয়েছি নিশ্চল
সারাদিন পথপার্শ্বে ; বেলা হ'য়ে এল অবসান,
ঘন হ'য়ে আসে ছায়া, শ্রান্ত সূর্য্য করিছে সন্ধান
দিগন্তে অন্তিম শান্তি। দিবা যথা চলেছে নির্ভীক
চিহ্নহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পথের পথিক
আপনার কাছ হ'তে অন্তহীন অজানার পানে
অসীমের সঙ্গীতে উদাসী,—সেই মতো আত্মদানে
আমারে বাহির করো, শূন্যে শূন্যে পূর্ণ হোক্ সুর,
নিয়ে যাক্ পথে পথে, হে অলক্ষ্য, হে মহাসুদূর॥

২ জুলাই, ১৯২৭



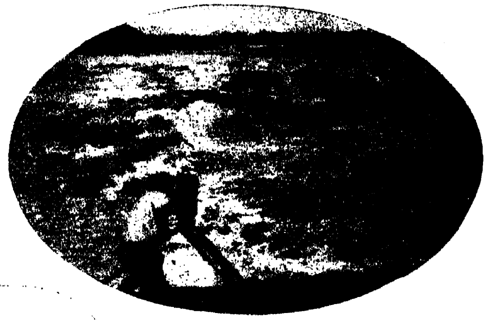
মিসিসিপি বন্যা—

কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকার মিসিসিপি নদীতে যে ভীষণ বন্যা হইয়াছিল সাময়িক সংবাদ-পত্রাদিতে আমরা তাহার সংবাদ পড়িয়াছিলাম। এমন ভীষণ বন্যা পৃথিবীতে কম হয়। কত ঘরবাড়ী, পশু-পক্ষী ও মানুষ যে এই বন্যায় নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমেরিকার বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্বেও মিসিসিপি নদীকে কিছুতেই ইঁহারা বাগ মানাইতে পারিতেছেন না। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই নদীতে ১৩ বার এইরূপ ভীষণ বন্যা হইয়াছে। মনে হয় এই দুর্দ্দান্ত জলস্রোতের কাছে মানুষের সকল শক্তি পরাজিত হইয়াছে। মিসিসিপির খামখেয়ালীপনার সহিত পরিচিত থাকা সত্বেও এতাবৎকাল নদীতীরবর্ত্তী সহরগুলিকে বাঁচাইবার কোন ব্যবস্থা কেহ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র উঁচু বাঁধ দিয়া সহরগুলিকে



মিসিসিপি বন্যায় জলমগ্ন সহর

ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু প্রবল জলের তোড়ে সকল বাঁধই ভগ্ন হইয়াছিল ও নিউঅর্লিন্স প্রভৃতি সহরগুলি কিছুকাল প্রায় জলমগ্ন হইয়া ছিল। পাশে জলমগ্ন সহরের একটি ছবি দেওয়া হইল। এই সহরকে রক্ষা করিবার জন্য ডিনামাইটের সাহায্যে সহরবাসীরাই বাঁধের নানা অংশ উড়াইয়া দেয় এবং সেইসকল পথে উন্মত্ত জলস্রোত সমুদ্রের দিকে যাইতে থাকে। এইরূপ একটি জলস্রোতের ছবিও এখানে দেওয়া হইল। যাঁহারা এই স্রোত স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, এই ক্ষুরধার জলস্রোতের সহিত তুলনায় বিখ্যাত নায়গারা প্রপাতও অকিঞ্চিৎ-



মিসিসিপি বন্যার উন্মত্ত জলস্রোত

কর মনে হইয়াছিল। কিরূপে ভবিষ্যতে এরূপ বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিকেরা তাহার চেষ্টায় আছেন।

—

নিউইয়র্কের অভ্রংলিহ প্রাসাদ ও অগ্নিকাণ্ড-সমস্যা—

আমেরিকার ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যেন মাটির পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আকাশের সহিত নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তলার পর তলা উঠাইয়া বাড়ীতে বসিয়াই তাহারা আকাশের নাগাল পাইতেছে। পাঁচতলা দশতলা বাড়ী নিউইয়র্কে খোলা-বাড়ীর সামিল। ৫০ তলা বাড়ী তুলিতে পারিলে তবু কতকটা মনের শান্তি হয়। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের বারম্বার নিষেধ সত্বেও আকাশ-ধরার এই নেশায় মাতিয়া আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে এই সকল গগনচুম্বী প্রাসাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। এইসকল সুউচ্চ বাড়ী নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে এতদিন হাতেকলমে কোন ভাল প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি এইরূপ একটি বাড়ীর ৩৮ তলার উপর আগুন লাগায় ও আগুনের কোন প্রতিবিধান না হওয়াতে আমেরিকাবাসীরা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীটি নূতন নির্ম্মিত হইতেছিল। ৩৮ তলা পর্য্যন্ত তৈরী হইবার পর আরো উপরে কাঠের ভারা বাঁধিয়া কাজ চলিতেছিল। একদিন সন্ধ্যার পর এই কাঠের ভারায় আগুন লাগে। বাড়ীটির যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও সেদিন রাত্রে নিউইয়র্কের লোকেরা প্রায় আকাশের উপর আগুনের এই তাণ্ডব লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ফায়ার ব্রিগেড সকল রকম সরঞ্জাম লইয়া গিয়াও এই আগুনের নাগাল পায় নাই; জলের পাইপ অত উপরে নেওয়া যায় না, জলের চাপও এত অধিক করা যায় নাই যাহাতে ৩৮ তলার উপরে জল উঠিতে পারে।



অত্যংলিহ প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড

চারঘণ্টা কাল আগুন জ্বলিয়া আপনিই নিবিয়া যায়। পাশের ছবিতে দেখুন প্রজ্বলন্ত কাঠের টুকরা কিরূপ ভাবে নীচে পড়িতেছে।

চীনের ভাগ্যদেবতা বা অদৃষ্ট—

আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে চলিত গল্প ও উপাখ্যানে অদৃষ্ট ও পুরুষকার নামে দুই দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। ইঁহারা সর্ব্বদাই পরস্পরের সহিত বিরোধে ব্যস্ত এবং নানা ভাবে একে অন্যের উপর প্রাধান্য প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। এই দুইজনের কলহে মধ্যস্থ হইতে গিয়া দুয়ের মধ্যে একজনের ক্রোধ উদ্রেক করিয়া মর্ত্ত্যের কত রাজাই যে বিপদে পড়িয়াছে যাত্রাগানে আমরা তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু প্রাচীন চিত্রকরেরা কেহই এই অদৃষ্ট-দেবতার চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া যান নাই।



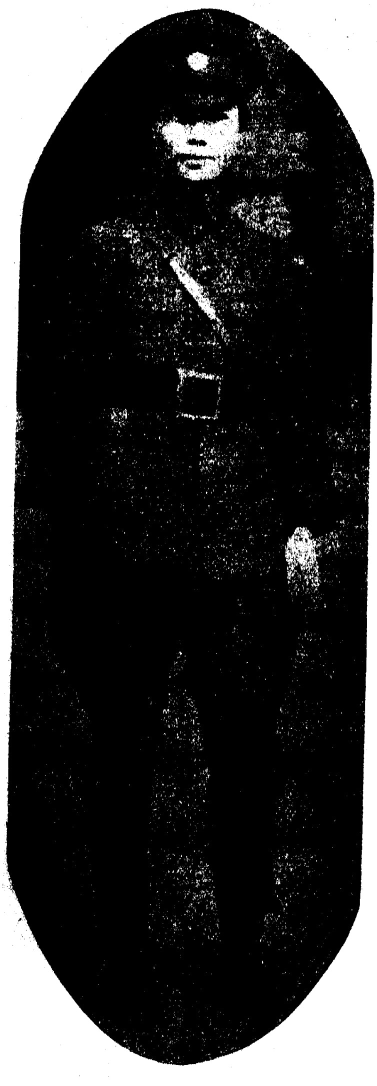
চীনা 'অদৃষ্ট'

যাত্রাগানেও তাঁহাকে শান্ত মানুষের মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। চীন মহাদেশে অদৃষ্ট-দেবতার মূর্ত্তি বিভিন্ন—তিনি রুদ্র ভয়ঙ্কর। সেখানকার কবি ও চিত্রকরগণ অদৃষ্টের যে মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা পাশের ছবিতে কতকটা বুঝা যাইবে। বহুকাল যাবৎ চীনের বুকের উপর মৃত্যু ও হত্যার যে ভীষণ লীলা সুরু হইয়াছে এই দেবতার মূর্ত্তির সহিত সে-সকলের কিছু যেন সামঞ্জস্য আছে।

যাহা হউক, আমেরিকার বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে লোকের হাঁ করিয়া আগুনের শোভা দেখা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

মিস্ ফু ফু ওং—

অধুনা চীনে যে রাষ্ট্রীয় জাগরণ সুরু হইয়াছে তাহাতে চীনামহিলাদের প্রভাব খুব বেশী। সুবিখ্যাত সান্‌ইয়াৎ সেনের পত্নী জাতীয় দলের



মিস্ ফু ফু ওং

নেতা। অনেক মহিলাও সৈন্য-দলে নাম লিখিয়াছেন। মিস্ ফু ফু ওং ক্যান্টনে জাতীয় দলের একজন সেনাধ্যক্ষ। ইনি সৈন্যপরিচালনায় যথেষ্ট দক্ষতা ও ধীরচিত্ততার পরিচয় দিতেছেন।

—

চলচ্চিত্রে জানোয়ার—

সভ্যজগতে বায়োস্কোপই এখন মানুষের চিত্তবিনোদনের বড় খোরাক জোগাইয়া থাকে। বায়োস্কোপকে সাধারণের চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য ইহাতে অনেক ভয়ঙ্কর জিনিষ দেখাইতে হয়। এরোপ্লেন হইতে ঝাঁপাইয়া পড়া, বড় বড় বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড, জাহাজডুবি, মারামারি, যুদ্ধ ইত্যাদির ব্যবস্থা না থাকিলে সাধারণের মন ভোজে না। জানোয়ার-জগৎও বায়োস্কোপে চিত্রিত হইয়া লোকের আনন্দ বিধান করে। এইসকল জানোয়ারদের বশ করিবার জন্য বায়োস্কোপ পরিচালক-দিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয় ও অনেক বিপদ-আপদের মুখে পড়িতে



শান্ত জল-মহিষ



বিম্বো

হয়। হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার সর্প গরিলা গিবন ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র ও বিশালকায় জন্তুরা যেমন বেগ দেয় তেমনই অর্থোপার্জ্জনেরও সাহায্য করে। আগে লোকে জন্তুদের মুখোস পরিয়া ও চামড়া গায়ে দিয়াই কাজ সারিত, কিন্তু তাহাতে দর্শকদের মন উঠে না, তাহারা 'জলজ্যান্ত' প্রাণীদের ছবি দেখিতে চায়। শুধু বায়োস্কোপে ছবি তুলিবার জন্যই আজকাল দলে দলে ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা-আমেরিকার গভীর জঙ্গলে হানা দিতে সুরু করিয়াছে। যাহাদের ব্যবসা-বুদ্ধি প্রখর তাহারা নানা প্রকার হিংস্র জানোয়ার ধরিয়া আনিয়া রীতিমত চিড়িয়াখানা করিয়া সেখানে রাখে ও তাহাদের নানা ধরণের শিক্ষা দেয়; এবং বায়োস্কোপ পরিচালকদিগকে জন্তু ভাড়া দিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন



ভল্লুকের হাসি

করে। এখানে আমরা বায়োস্কোপের তিনটি জানোয়ারের ছবি দিলাম। অরণ্যে যাহারা ভীষণ ও নরঘাতী, মানুষের হাতে পড়িয়াই তাহারা শান্তশিষ্টভাবে মানুষের নির্দ্দেশমত মুখভঙ্গী করিয়া ছবি তুলাইতেছে। প্রথমটি একটি বন্য মহিষের ছবি—ইহাদিগকে জলমহিষ বলে। ইহারা অত্যন্ত হিংস্র, মানুষের সান্নিধ্য ইহাদের অসহ্য, অথচ এই বেচারা একটি মেয়েকে কাঁধে লইয়া শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দ্বিতীয় ছবিটি গিবনজাতীয় একটি বনমানুষের; হাস্যরসিক বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। ইহার নাম বিম্বো। তৃতীয়টি একটি কৃষ্ণভল্লুকের ছবি। হাস্যরসের ভূমিকায় ইনি বিম্বোর সহিত পাল্লা দিতে সুরু করিয়াছেন।

—

বিখ্যাত ভাস্কর ফ্রেডারিক হিবার্ডের ভাস্কর্য্য-নিদর্শন—

বিখ্যাত ভাস্কর ফ্রেডারিক হিবার্ড শিকাগোর ষ্টিভেন্স হোটেল সজ্জিত করিবার ভার পাইয়াছেন। এই হোটেলটি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় হোটেল বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাড়ীটি ২৯ তলা, ৪ তলা মাটির নীচে ও ২৫ তলা মাটির উপরে, হোটেলটি তৈয়ারী করিতে ১২ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। ইহাতে ৩০০০ ঘর আছে। এই হোটেলের আস্‌বাব-পত্রাদির কিছু তালিকা এই—চেয়ার ৭ হাজার, প্লেট ১ লক্ষ ৩৪ হাজার, ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টেবল্ ক্লথ, ৩ লক্ষ তোয়ালে, ৪৮ হাজার মদের পেয়ালা, ৩৬ হাজার ফুট ছবির ফ্রেম, ৬ হাজার ছবি। হোটেলের চাকর ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার।



হিবার্ডের ভাস্কর্য্য-নিদর্শন

ফ্রেডারিক হিবার্ড সমস্ত হোটেলটিকে আপনার খুসীমত সাজাইয়াছেন ও স্থানে স্থানে তাঁহার ভাস্কর্য্যের নিদর্শন স্থাপিত করিয়া হোটেলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা হোটেলের ড্রয়িংরুমে রক্ষিত একটি প্রস্তর-মূর্ত্তির ছবি এখানে দিলাম। এই মূর্ত্তিটি সর্ব্বজনপ্রশংসিত।

—

মানুষেরর গতি (যন্ত্রের সাহায্যে নয়) কি চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে?—

দেহতত্ত্ব-বিশারদ ইংরেজ অধ্যাপক এ ভি হিলের ধারণা—'কালিফোর্ণিয়ার চার্লস্ ভরিট প্যাডকের ৯ মিনিট ৫ সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়ের পর একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মানুষের দৈহিক গতিবেগ চরমে পৌঁছিয়াছে। মানুষের শরীরের বর্ত্তমান নির্ম্মাণ-কৌশল বিবেচনা করিলে ইহা অপেক্ষা দ্রুতগতি মানুষের আয়ত্ত নহে।' হিল সাহেব এ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। শরীরতত্ত্বের গবেষণা দ্বারা তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাঁহার কথা উড়াইয়া দিবার নহে। তিনি দৌড়বাজে সেরা খেলোয়াড়দের শরীর ও



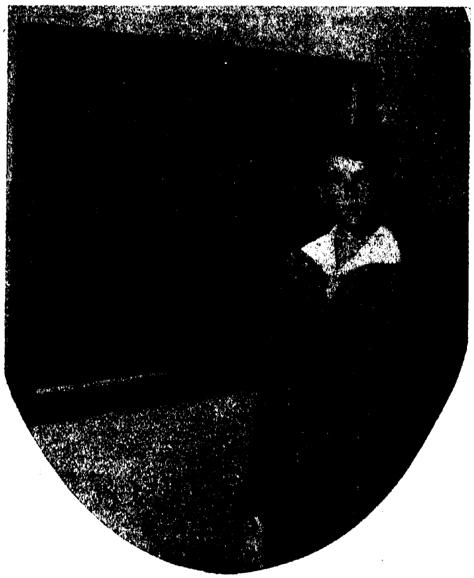
বিখ্যাত দৌড়বাজ প্যাডক্

গতি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্যাডক যে গতিবেগ দেখাইয়াছে ভবিষ্যতে কেহ কেহ হয়ত সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ দিয়া তাহাকে পরাজিত করিতে পারে—অর্থাৎ ১০০ গজ দৌড়াইতে প্যাডকের যে সময় লাগিয়াছে কেহ হয়ত তাহা অপেক্ষা এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ কম সময়ে ১০০ গজ দৌড়াইতে পারে কিন্তু তাহার চেয়ে আরো কম সময়ে ১০০ গজ দৌড়ান অসম্ভব। প্যাডক যে বেগে দৌড়াইয়াছে মাইল হিসাবে তাহা ঘণ্টায় সাড়ে চব্বিশ মাইল। ইহাই মানুষের গতির শেষ। এখানে আমরা দৌড়ের মুখে প্যাডকের ছবি দিলাম। অধ্যাপক হিল দেখাইয়াছেন যে এই সময়ে তাহার দেহে ৯ 'অশ্ববল' (হর্স পাওয়ার) শক্তি কার্য্য করিতেছিল।

—

অষ্ট্রিয়ার নির্ব্বাসিত রাজপুত্র—

বিগত মহাযুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী যুক্তরাজ্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছে আমরা সকলেই তাহা অবগত আছি। সেই সম্মিলিত মহারাষ্ট্র এখন টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছে, চেকোস্লোভাকিয়া, জুগোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি নূতন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর কোন কোন অংশ বৈদেশিক শক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। প্রাচীন রাজতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ্ হইয়া গিয়াছে। রাজবংশ নির্ব্বাসিত। আমরা এখানে নির্ব্বাসিত রাজপুত্র 'অটোর' ছবি দিলাম। রাজ-পরিবারের সহিত ইনিও স্পেনে নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতেছেন। যিনি



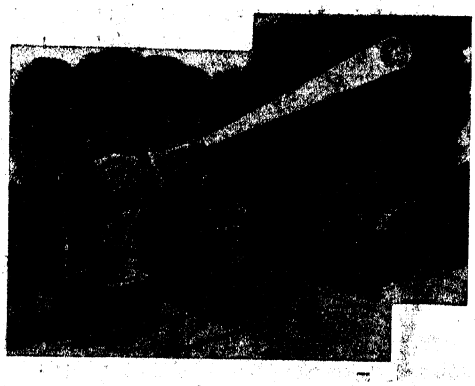
নির্ব্বাসিত রাজপুত্র অটো

একদা সম্রাট পদবাচ্য হইতেন তিনি এখন বীজগণিতের সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত। ইহাকেই বলে রাজ-ভাগ্য!

—

বিজ্ঞাপনের নূতন পদ্ধতি—

আজকাল ব্যবসায়ের মূলকথা হইতেছে বিজ্ঞাপন। জিনিষ ভাল হউক মন্দ হউক বিজ্ঞাপনের উপরেই জিনিষের কাটতি নির্ভর করে। পাশ্চাত্যদেশে প্রতিদিন বিজ্ঞাপন দেওয়ার নানা অদ্ভুত উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। বিজ্ঞাপনদাতারা অনেক সময় আমাদের চরম কল্পনাকে



অভিনব বিজ্ঞাপন

পর্য্যন্ত পরাস্ত করে। মানুষের মুখ, টাক কিছুই বাদ যাইতেছে না। আমরা এখানে অভিনব বিজ্ঞাপনের আর একটি নমুনা দিলাম, সার্চ্চলাইট কামানের সাহায্যে আকাশে বা মেঘের গায়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রথা অন্য সকল প্রথাকেই পরাজিত করিয়াছে।

—

সুবিখ্যাত জাপানী গায়িকা—

অতি অল্পকালের মধ্যে জাপান যেরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ সেরূপ পারে নাই। জাপানের রাষ্ট্র ও বাণিজ্য ব্যাপারে বৈদেশিক প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট; এমন কি কলাশিল্পেও জাপান অধুনা পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণ করিতেছে। আমেরিকা ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশের রঙ্গমঞ্চে আজকাল



ভিয়েনায় জাপানী গায়িকা

অনেক জাপানী অভিনেতা অভিনেত্রী, গায়ক গায়িকা, নর্ত্তক নর্ত্তকী দেখা যায়। ইঁহাদের অনেকেই প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। এখানে যে জাপানী মহিলাটির ছবি দেওয়া হইল তিনি জোভিতা ফুয়েণ্ডেস্ এই স্পেনদেশীয় নামে এখন জগদ্বিখ্যাত। ইনি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা সহরে সম্প্রতি ইতালীয় গানে যথেষ্ট নাম করিয়াছেন।

—

স্বভাব-সেতু—

প্রকৃতিও যে মাঝে মাঝে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিয়া মানুষের সুবিধা করিয়া দেয় পাশের ছবিতে তাহারই একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। আরিজোনার



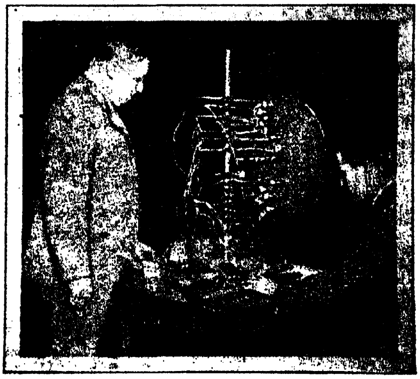
স্বভাব-সেতু

অনতিদূরে এই সেতু অবস্থিত। যে পাহাড় দ্বারা এই সেতু নির্ম্মিত তাহা বালু-প্রস্তর জাতীয়। সম্ভবতঃ বালু-প্রস্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এই চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

—

আলোক-সঙ্গীত—

নিউইয়র্কের বৈদ্যুতিক সমিতি একটি নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রে কেবল মাত্র আলোকরশ্মির সাহায্যে চমৎকার সুরলয়যুক্ত বাদ্য হয়। একটি ঘূর্ণ্যমান ধাতুচক্রের স্থানে স্থানে ছিদ্র



আলোক-সঙ্গীত-যন্ত্র

আছে, এই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক দীপের আলোকরশ্মি সঞ্চালিত করিয়া যে ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয় তাহা হইতেই এই সুরের উদ্ভব। ইচ্ছামত ছিদ্রের সংখ্যা কম বা বৃদ্ধি করিয়া সুরেরও তারতম্য করা হয়।

—

নাড়ী পরীক্ষার যন্ত্র—

ভাল রকম নাড়ী দেখা চিকিৎসাবিদ্যার সবচাইতে বড় অঙ্গ কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতের অনুভূতি এত অধিক নহে যে ঠিকমত নাড়ীর গতি সব সময় বুঝিতে পারে। এইজন্য নাড়ী দেখিবার একটা সহজ বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কারে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী সচেষ্ট ছিলেন। সম্প্রতি বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার রুডল্‌ফ্‌ গোল্‌ড্‌স্‌মিট্‌ এই যন্ত্র-নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছেন। একটি মহিলার নাড়ী পরীক্ষারত ডাক্তার গোল্‌ড্‌স্‌মিটের ছবি এখানে দেওয়া হইল। ইনি ভূতপূর্ব্ব কাইজারের বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা ছিলেন। এই যন্ত্রের একটি অংশ পরীক্ষার্থীর কব্জিতে বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং



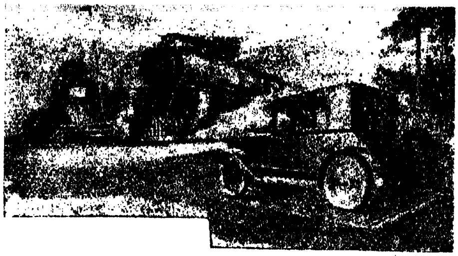
নাড়ী-পরীক্ষার যন্ত্র

নাড়ীর চলাচল ইত্যাদি যন্ত্র সাহায্যেই একটি কাগজে রেখার অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়। স্নায়ুমণ্ডলের সমস্ত ক্রিয়া ইহাতে নিভুর্লভাবে ধরা পড়ে। এই যন্ত্রদ্বারা বিস্ময়, ভয়, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি মনের অবস্থাগুলিও সঠিক নির্দ্ধারিত হয়। মদ্য, কফি চা সিগারেট প্রভৃতি মাদকদ্রব্য মানুষের দেহের কি অনিষ্ট করে এই যন্ত্রের দ্বারা তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে।

—

মোটর ও রেলের সংঘর্ষ নিবারণ—

রেল লাইনের উপর দিয়া যে সকল জায়গায় মোটরের রাস্তা গিয়াছে সে সকল স্থানে অনেক সময় গুমটির লোকের অসাবধানতার জন্য দুর্ঘটনা ঘটে, ক্রম ক্রমে রাস্তার গেট বন্ধ না করাতে অনেক সময়ই ট্রেন ও মোটরে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনা নিবারণকল্পে ওহিওর একজন বৈজ্ঞানিক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। যন্ত্রটি একটি বৃহৎ লোহার পাতের মত, রেলরাস্তা ও মোটর রাস্তার সংযোগ-স্থলে মোটর রাস্তার উপর এটিকে রাখা হয়। লোহার পাতের উপর লম্বা লম্বা গোলাকার রুল বসান আছে। যখন রাস্তা পরিষ্কার অর্থাৎ ট্রেন আসিবার সম্ভাবনা নাই, তখন রুলগুলি সম্মুখের দিকে ঘুরিয়া মোটরকে সামনের দিকে যাইতে দেয়। কিন্তু লাইনের উপর ট্রেন আসিলেই যন্ত্রকৌশলে বেলারগুলি উল্টা দিকে ঘুরিতে সুরু করে, সেই অবস্থায় কোন মোটর



মোটর ও রেলের সংঘর্ষ-নিবারণী যন্ত্র

আসিয়া পড়িলে তাহা কিছুতেই সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। সর্ব্বত্র এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইলে অনেক অকারণ দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

—

চীন ও শ্বেত-জাতিসংঘ—

আয়ার্ল্যাণ্ডের একজন চিত্রকর এই ব্যঙ্গ চিত্রটি আঁকিয়াছেন। ছবির ভাবটি এই—শ্বেতজাতিসংঘ চীনের মত অতিকায় জন্তুকে কাবু করিতে পারিতেছে না এই দৃশ্যটি তুরস্ক, আরব, ভারতবর্ষ, মিশর প্রভৃতি প্রাচ্য



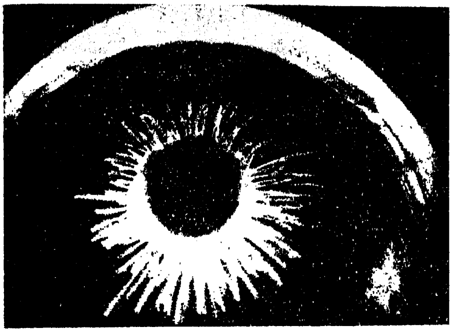
চীন ও শ্বেত-জাতি-সংঘ

জন্তুরা খাঁচার বাহিরে আসিয়া দেখিতেছে ও ভাবিতেছে শ্বেতকায় জাতিদের ক্ষমতা কি কমিয়া আসিয়াছে।

—

উত্তাপহীন আলো—

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গৃহ-আলোকিত করিবার পদ্ধতিও উন্নত হইতেছে। চকমকি ঠুকিয়া কাঠ জ্বালাইয়া ঘর আলো



জেলি-মাছের শোভা

করা হইতে, তৈলদীপ, কোরোসিন আলো, চর্ব্বির আলো ইত্যাদিই ক্রমবিবর্ত্তনে গ্যাসের আলোক ও বৈদ্যুতিক আলোক দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে আলো ভাল হইতেছে বটে কিন্তু জ্বালানি বস্তুর অধিকাংশ শক্তি উত্তাপরূপে নষ্ট হওয়াতে বৈজ্ঞানিকেরা সন্তুষ্ট নহেন। সকল ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতেছি উত্তাপ যত বেশী আলোও তত উজ্জ্বল, অর্থাৎ উত্তাপরূপে যত শক্তি নষ্ট হইবে আলোও তত বেশী হইবে। অলোকের জন্য উত্তাপরূপে শক্তি নষ্ট হইতে দিতে বৈজ্ঞানিকগণ নারাজ, তাঁহারা উত্তাপহীন আলোর আবিষ্কারে চেষ্টিত আছেন। বিজ্ঞান একাজে এখনও সফলতা লাভ করে নাই বটে কিন্তু প্রকৃতি যে এই ধরণের আলোক বিতরণ করে তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। জোনাকি পোকা যে আলো দেয় তাহাতে উত্তাপ বিন্দুমাত্র নাই, অর্থাৎ সমস্ত শক্তিই এখানে আলোকে রূপান্তরিত হয়। বিখ্যাত প্রজ্বলন্ত জেলি মৎস্যের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকদিগের উত্তাপহীন আলো আবিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা এখানে সেইরূপ একটি জেলিমাছের ছবি দিলাম। সারগ্যাসো সমুদ্রে ইহারা হাজারে হাজারে বাস করে এবং ইহাদের গায়ের আলোকে সমুদ্র উদ্ভাসিত থাকে। ছবিতে দেখুন মাছের গায়ের আলো জলকণার উপর পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব 'শোভা' বিস্তার করিয়াছে। এক একটি জেলিমাছ এত অধিক পরিমাণ আলো দেয় যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, অথচ ইহাদের দেহ ঠিক সাধারণ মাছের মতই ঠাণ্ডা। জোনাকিপোকা বা মাছের দেহের এই আলোকের কারণ যথাযথ নির্দ্ধারিত হইলেই উত্তাপহীন আলোকও সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে, বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ বিবেচনা করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার কবকেঞ্জ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিতেছেন।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

উইলিয়ম আর্চার নামক ইংরেজ লেখকের কয়েক রকমের বহি আছে। একখানা ভারতবর্ষে বেড়াইয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লেখা; নাম "ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ফিউচ্যার," অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও ভবিষ্যৎ। লেখকের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার তিনখানা নাটক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন নামজাদা ইংরেজ লেখক জর্জ বার্নার্ড শ। আর্চার তাঁহার ভারতবিষয়ক বহিতে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম্ম, ললিত-কলা প্রভৃতির নিন্দা করিয়া ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন। শ তাঁহার ভূমিকায় আর্চারের এই মনোভাব ও মতের সমর্থন ও প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভূমিকায় এক জায়গায় বলিতেছেন, "If western civilization is not more enlightened than Eastern we have clearly no right to be in India"; "যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্ঞান ও নীতি বিষয়ে প্রাচ্য সভ্যতা অপেক্ষা উন্নততর না হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই আমাদের ভারতবর্ষে থাকিবার কোন অধিকার নাই।" এইরূপ ধরণের কথা তিনি আরও বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তিগুলির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বলা দরকার, যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংলণ্ডীয় সভ্যতা সব বিষয়ে এক জিনিষ নয়; ইংলণ্ড কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা কম সভ্য; ভারতীয় সভ্যতারও অন্যান্য প্রাচ্য সভ্যতা হইতে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে।

শ ও আর্চার ধরিয়া লইয়াছেন, যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ভারতীয় লোকদিগকে স্বীয় উৎকৃষ্টতর

সভ্যতা দিবার জন্য। এখনও যে এই মিথ্যা ধারণার প্রতিবাদ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইতেই বুঝা যায় ইংলণ্ডের নামজাদা লেখকরা পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ দখল, ভারত শাসন ও ভারতে থাকিবার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কত অজ্ঞ। যাহারা ঠিক কথা জানে, তাহাদেরও কেহ কেহ ঐ সব বিষয়ে কিছু বলিবার সময় অপ্রকৃত কথা বলে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসিয়াছিল টাকার জন্য, ব্যবসার দ্বারা ধনী হইবার নিমিত্ত। রাজশক্তিও অর্জ্জন করিয়াছিল ধনী হইবার নিমিত্ত। এখন ইংরেজরা ভারতবর্ষে আছে টাকার জন্য, ব্যবসা বাণিজ্য রক্ষার জন্য, প্রভুত্ব রক্ষার জন্য। 'আমি প্রভু' এই বোধেই একটা সুখ আছে ; তা ছাড়া, রাজনৈতিক প্রভুত্ব থাকিলে অধীন দেশের বড় বড় সরকারী পদ দখল করিয়া বেশ রোজগার হয় ; তার চেয়ে নিম্ন পদে নিযুক্ত করিয়াও বিস্তর ইংরেজের বেকার অবস্থা ঘুচান যায়, এবং নিজের দেশের ব্যবসাবাণিজ্যেরও খুব সুবিধা করিয়া দেওয়া যায়। চীন ভারতবর্ষের চেয়ে বড় দেশ এবং তার লোকসংখ্যাও ভারতের চেয়ে বেশী। অথচ চীনে ইংরেজ নিজের তত জিনিষ বিক্রী করিতে পারে না এবং নিজের তত কারখানা স্থাপন করিতে পারে নাই, যত ভারতবর্ষে পারে ও করিতে পারিয়াছে। তাহার একটা প্রধান কারণ, ভারত ইংরেজের অধীন, চীন নয়। ইংরেজদের ভারত দখল করিয়া বসিয়া থাকিবার আর একটা প্রধান কারণ এই, যে, ভারতেশ্বর বলিয়াই ইংরেজ এত বড় সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষের সৈন্য ও ভারতবর্ষলব্ধ টাকার জোরে ইংলণ্ড আরও অনেক দেশকে অধীন করিতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষ গেলে প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্রাজ্য বলিতে ইংলণ্ডের বিশেষ কিছু থাকিবে না, বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যও থাকিবে না।

সুতরাং, ইংরেজরা বেশী সভ্য বলিয়া ভারতবর্ষকে নিজের মত সভ্য করিবার নিমিত্ত এদেশে আসিয়াছিল ও এদেশে আছে, এই দুইটাই মিথ্যা কথা। ইংরেজরা যে যে উপায়ে ভারতের প্রভু হইয়াছে, তাহাও যে উৎকৃষ্টতর সভ্যতার পরিচায়ক, তাহা বলিতে পারি না। তাহাদের কোন কোন শক্তি ও গুণ যে ভারতীয়দের চেয়ে বেশী ছিল, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য ; নতুবা তাহারা প্রভু হইতে পারিত না। কিন্তু এই সব গুণই যে সদ্‌গুণ ছিল এবং এই সব শক্তিই যে উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মনীতিপ্রসূত, তাহা নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। কৌতূহলী পাঠক মেজর বামনদাস বসুর লেখা ইংরেজদের ভারত দখল করিবার ও রাজত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার ইংরেজী ইতিহাস পড়িতে পারেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনও প্রথমতঃ ইংরেজদের দ্বারা হয় নাই। পরে যখন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষার জন্য কিছু টাকা দিল ও ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল, তাহারও প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সস্তায় কর্ম্মচারী পাওয়া, বিলাতী জিনিষের কাট্‌তি বাড়ান, এবং শিক্ষিতদের মনোভাব বিজাতীয় রকমের করিয়া দিয়া স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহের সম্ভাবনা কমান।

ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার জন্য ইংরেজরা এদেশে আসে নাই, এবং এখনও তাহাদের ভারতবর্ষে থাকিবার কারণ ও উদ্দেশ্য আমাদিগকে সভ্য করা নহে। তাহারা এখানে আছে টাকার জন্য, প্রভুত্বের জন্য, এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা ও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ দখল করিয়া থাকা একান্ত আবশ্যক বলিয়া। ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার নিমিত্ত ইংরেজদের আসিবার প্রয়োজন এই জন্য ছিল না, যে, ভারতবর্ষ অসভ্য দেশ ছিল না, এখনও নহে। তাহার সভ্যতার প্রকৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে কতকটা ভিন্ন। উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার এখন করিব না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ জীবনযাত্রা-প্রণালী, মত, বিশ্বাস, আদর্শ, সামাজিক ব্যবস্থা প্রভৃতির দোষ ও গুণ উভয়ই আছে। মোটের উপর কোন্‌গুলা ভাল, হঠাৎ তর্কের ঝোঁকে বলিলে ভুল হইতে পারে। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় মহাদেশের গত শতাব্দীর দুএক জন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, খিশুর উপদেশ সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়াছিলেন, সতীদাহ নিবারণের জন্য তখনকার বড়লাটের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং তখনকার গোঁড়া হিন্দুরা তাঁহাকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও পাষণ্ড মনে করিতেন। তিনি কিন্তু প্রতীচ্য অপেক্ষা প্রাচ্য সভ্যতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া

মানিয়া লন নাই; বরং প্রাচ্যের নিন্দার দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

যে সামান্য কয়জন ইংরেজ ও অন্য পাশ্চাত্য লোকেরা ভারতীয় সভ্যতায় কিছু ভাল দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছেন, শ তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, "the occidental renegades who swell the heads of our Indian students by assuring them that we are crude barbarians compared to .them"। "পাশ্চাত্য স্বদলত্যাগী অধম লোকগুলা যাহারা ভারতীয় ছাত্রদিগকে এই বলিয়া অহঙ্কৃত করিয়া তুলে যে আমরা তাহাদের তুলনায় অসভ্য।" ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে এরকম "স্বদলত্যাগী" কোন লোকের মত উদ্ধৃত করিব না। কারব স্যার টমাস মনরোর মত, যিনি একজন প্রধান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যসংস্থাপক ও সাম্রাজ্যগঠক ছিলেন। আজকালকার শাসনকর্ত্তাদের মত তিনি প্রজাদের হইতে দূরে থাকিতেন না, তাহাদের সহিত খুব মিশিতেন এবং সেই জন্য তাহাদের দোষগুণ ভাল করিয়া জানিতেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে একটি পার্লেমেণ্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় তিনি হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধীয় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন :—

I do not exactly understand what is meant by the 'civilization' of the Hindus. In the higher branches of science, in the knowledge of the theory and practice of good government, and in an education which, by banishing prejudice and superstition, opens the mind to receive instruction of every kind from every quarter, they are much inferior to Europeans. But if a good system of agriculture, unrivalled manufacturing skill, capacity to produce whatever can contribute to either convenience or luxury, schools established in every village for teaching reading, writing and arithmetic, the general practice of hospitality and charity among each other, and, above all, a treatment of the female sex, full of confidence, respect and delicacy, are among the signs which denote a civilized people—then the Hindus are not inferior to the nations of Europe, and if civilization is to become an article of trade between the two countries, I am confident that this country (England) will gain by the import cargo.

তাৎপর্য্য। হিন্দুদের সভ্যতার (বা হিন্দুদিগকে সভ্য করার) মানে কি, আমি ঠিক বুঝি না। বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখাসমূহে, দেশসুশাসনের তত্ত্ব ও তাহার অনুসরণ, এবং যাহা পূর্ব্বসংস্কার ও কুসংস্কার দূর করিয়া সকল দিক্ হইতে সর্ব্বপ্রকার উপদেশ লাভ করিবার জন্য মনকে মুক্তদ্বার করে এরূপ শিক্ষা—এই সকল বিষয়ে তাহারা ইউরোপীয়দের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু কৃষির উৎকৃষ্ট প্রণালী, পণ্যশিল্পের কাজে অপ্রতিম নৈপুণ্য, সুবিধা ও বিলাসের সকল সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষমতা, পড়া লেখা ও হিসাব শিখাইবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, পরস্পরের মধ্যে আতিথেয়তা ও প্রীতির সার্ব্বজনিক অনুসরণ, এবং সর্ব্বোপরি, নারীজাতির প্রতি বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার, যদি জাতির সভ্যতা-ব্যঞ্জক লক্ষণের মধ্যে গণিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুরা ইউরোপীয় জাতিদের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, এবং যদি সভ্যতা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের সামগ্রী হয়, তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইংলণ্ড আমদানী মাল দ্বারা লাভবান্ হইবে।

মনরো যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার পর এক শতাব্দীর উপর সময় অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের উন্নতি অবনতি দুই-ই হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মোটের উপর ভারতবর্ষ সম্ভবতঃ অসভ্য হইয়া যায় নাই।

পাশ্চাত্যেরা আমাদিগকে সভ্য বলিলেই আমরা সভ্য, অসভ্য বলিলে অসভ্য হইয়া যাইব, এমন নয়; আমাদের সভ্যতা বা অসভ্যতা তাহাদের মত-নিরপেক্ষ। তবে, যে, আমি মনরোর মত উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ এই, যে, বার্নার্ড শ বলিতেছেন, পাশ্চাত্যেরা ভারতীয়দের চেয়ে সভ্য না হইলে তাহাদের ভারতে থাকিবার কোন অধিকার নাই। কিন্তু মনরো বুঝিয়াছিলেন, যে, কোন কোন বিষয়ে হিন্দুরা ইংরেজদের চেয়ে সভ্যতর, অথচ তিনি তল্পিতল্পা বাঁধিয়া অবিলম্বে বিলাত চলিয়া যান নাই। তিনি তিন দিন, তিন সপ্তাহ বা তিন মাস ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বনিয়া যান নাই। ১৭৮০ সালে ভারতবর্ষে আসিয়া ১৮০৭ পর্য্যন্ত এদেশে থাকিয়া বিলাত যান। ১৮১৫ পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া আবার ভারতে আসেন। ১৮১৯ সালে মান্দ্রাজের গবর্ণর মনোনীত হন। ১৮২৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। হায়দার আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মহীশূরের নূতন বন্দোবস্ত, কানাড়া শাসন, রায়তওয়ারী জমীর বন্দোবস্ত, ইংলণ্ডে ভারতীয় আইন প্রণয়নে সাহায্য ইত্যাদি নানা কাজ তিনি করিয়াছিলেন। এই জন্য ভারতে শীতকালে পরিব্রাজকদের চেয়ে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাক্ষাৎজ্ঞানহীন বার্নার্ড শ অপেক্ষা তাঁহার মতের মূল্য আছে। যে যে বিষয়ে তিনি ভারতীয়দিগকে ইউরোপীয়দের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন, সেই সব বিষয়ে তিনি ও তৎকালীন ইংরেজরা ভারতবর্ষকে নিজেদের সমান শ্রেষ্ঠ করিবার চেষ্টা করেন নাই, অথচ

নিজে ভারতের অন্নের মায়া কাটাইতেও পারেন নাই, স্বদেশবাসীদিগকেও ভারত ত্যাগ করিতে বলেন নাই। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষকে সভ্য জানিয়াও তিনি, বার্নার্ড শ'র পরামর্শ অনুযায়ী, ভারত ত্যাগ করেন নাই; যে যে বিষয়ে ভারতবর্ষ তাঁহার বিবেচনায় নিকৃষ্ট সেই সব বিষয়ে উৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টাও করেন নাই; অথচ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন নাই। তাহা হইলে তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা কেন ভারতবর্ষে ছিলেন? নিশ্চয়ই, অন্ততঃ অংশতঃ, প্রভুত্ব করিবার জন্য ও ধনী হইবার জন্য।

বার্নার্ড শ'র সব কথার আলোচনা করিবার জায়গা নাই, দরকারও নাই। আরো দু-একটা কথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

Archer went to see for himself, and instantly and uncompromisingly denounced the temples as the shambles of a barbarous ritual of blood sacrifice, and the people as idolaters with repulsive rings through their noses.

তাৎপর্য্য। আর্চার (ভারত-অনুরাগী পাশ্চাত্যদের কথায় না ভুলিয়া) নিজের চোখে ভারত দেখিতে গেলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কোন রফা না করিয়া দেবমন্দিরগুলাকে রক্তমাখা বলিদান রূপ অসভ্য ক্রিয়াকলাপের কসাইখানা বলিয়া এবং ভারতবর্ষের লোকগুলাকে নাকে কুৎসিৎ গয়না-পরা পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করিলেন।

ভারতবর্ষের মুসলমানাদি অহিন্দুদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। হিন্দুদের কথাই বলি। তাহাদের দেবমন্দির-সমূহের মধ্যে কালীদুর্গা প্রভৃতি শাক্ত মন্দিরেই পশু বলি হয়, অনেক জায়গায় পশু বলি না দিয়াও দুর্গাপূজা হয়। বাকী অসংখ্য দেবমন্দিরে পশুবলি হয় না। সুতরাং, যদি মন্দিরে বলি হইলে তাহাকে কসাইখানা বলিতে হয়, তাহা হইলেও সমুদয় হিন্দুমন্দিরকে কসাইখানা বলা ঠিক্ নয়। বলিদান হিন্দুমুসলমান ইহুদী যিনিই করুন, তাহা আমরা বীভৎস বলিয়া মনে করি। কিন্তু বলিদান না করিয়া কেবল উদরপূর্ত্তির জন্য পশুবধই কি বলিদানের চেয়ে ভাল? যে পশুগুলা হত হয়, তাহাদের পক্ষে বলিদানের জন্য হত হওয়া বা কেবল মানুষের ভোজনের জন্য হত হওয়া একই কথা। তাহারা বলিতে পারে, "প্রভু, তোমরা আমাদিগকে মন্দিরে মার, মসজিদে মার, কসাইখানাতে মার, সব জায়গাতেই মৃত্যু মৃত্যুই।" ভারতবর্ষে সমুদয় শাক্ত-মন্দিরে যত পশু বলি হয়, ভারতীয় ইংরেজ ফিরিঙ্গীদের প্রাত্যহিক আহারের জন্য তাহা অপেক্ষা কম পশু হত হয় না, বরং বেশী হয়। বলির পশুর মাংস মানুষে খায়, দেবতা খান না; কসাইখানার পশুর মাংসও মানুষে খায়। সুতরাং ইংলণ্ডে কোন মন্দিরে পশু বলি হয় না, ভারত-বর্ষে কোন কোন মন্দিরে পশু বলি হয়, বলিয়া ভারতবর্ষটা ইংলণ্ডের চেয়ে অসভ্য দেশ, এটা বাজে কথা। আসল কথা, কোন্ দেশে কত পশুবধ হয়? ইংলণ্ড ভারতবর্ষের চেয়ে ছোট দেশ। অথচ সেখানে, ভারতবর্ষের হিন্দু যত পশু বলি দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশী পশু কসাই-খানায় হত হয়; কারণ, মাংস বিলাতের লোকদের প্রধান খাদ্য

কিন্তু তর্ক উঠিতে পারে, দেবতা পশুবধে তৃপ্ত হন, এই বিশ্বাসটা কি কুসংস্কার ও অসভ্য বিশ্বাস নহে? আমরা মনে করি, ইহা কুসংস্কার ও অসভ্য বিশ্বাস, এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে প্রাচীন উপনিষদ্গুলি, তাহা এরূপ কুসংস্কার সমর্থন করে না।

এতটুকু বলিয়া পাশ্চাত্যদিগকেও একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই। নরহত্যা পশুহত্যা অপেক্ষা ভাল, ইহা পাশ্চাত্যরা বলিতে পারিবেন না। তাঁহারা কিন্তু, স্বদেশরক্ষার জন্য নয়, নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নয়, অন্য দেশ ও জাতিকে অধীন করিবার জন্য ও তাহাদের ধনে ধনী হইবার জন্য যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য মানুষের প্রাণবধ করিয়াছেন, এবং এখনও এই হত্যা কার্য্য চলিতেছে। পাশ্চাত্যদের ভূমিক্ষুধা, প্রভুত্বলালসা ও অর্থগৃধ্নুতার ফলে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার কত জাতি নির্ম্মূল বা প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। পাশ্চাত্যদের পক্ষ-সমর্থনকারী কেহ বলিতে পারেন, কিন্তু এগুলা ত বলি —নরবলি—নয়; ভারতবর্ষে যে মন্দিরে, দেবতার প্রীত্যর্থ, পশুবলি হয়। তাহার উত্তরে আমি বলি, পশু-হত্যার সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ, দেবতার যোগ, এইটাই ত আপ-নারা দোষের বিষয় মনে করেন? আচ্ছা; যুদ্ধে নরহত্যার সঙ্গে ত আপনারাও আপনাদের ধর্ম্মের যোগ স্থাপন করিয়াছেন। যুদ্ধে যাইবার আগে গির্জ্জায় উপাসনা হয়; যুদ্ধ-

জয়ের পর গির্জ্জায় গড্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া হয়; যুদ্ধে জিত বা যুদ্ধজয়ে ব্যবহৃত পতাকা গির্জ্জায় রক্ষিত হয়। কেন তাহা করা হয়? কার্য্যতঃ এই বিশ্বাসে নহে কি, যে, যুদ্ধে যাইবার আগে গড্‌কে স্তুতি করায় তিনি খুসি হইয়া তাঁহার পূজকদিগকে শত্রুপক্ষীয় মানুষেরহত্যায় কৃতিত্বের পুরস্কার দিয়াছেন? সেই পুরস্কারের জন্যই ত তাঁহাকে ধন্যবাদও দেওয়া হয়। অথচ শত্রুপক্ষীয় লোকেরাও মানুষ, এবং প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যদের সব বা অধিকাংশ অভিযান ধর্ম্মসংগত কারণে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

যে-সব গির্জ্জায় যুদ্ধের পূর্ব্বে যুদ্ধজয়ের জন্য প্রার্থনা হয়, এবং যুদ্ধজয়ের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয়, যুদ্ধপতাকা রক্ষিত ও প্রদর্শিত হয়, যুদ্ধে হত "বীর"দের নাম মর্ম্মর-ফলকে খোদিত থাকে, তাহাতে রক্তের কোন দাগ পড়ে না, বীভৎস রক্তগঙ্গা বহে না বটে; কিন্তু দেবতার সহিত হত্যার সম্পর্করূপ যে কারণে পশুবলির নিন্দা পাশ্চাত্যেরা করিতেছেন, তদপেক্ষা গুরুতর নরহত্যারূপ কার্য্যের যোগ গডের সহিত ঐসব গির্জ্জায় স্বীকৃত হয় না কি? নরহত্যার সহিত গডের সম্বন্ধ স্থাপন কি পশুহত্যার সহিত দেবতার সম্বন্ধ স্থাপন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সভ্যতার পরিচায়ক?

ভারতবর্ষের সব হিন্দু (পুরুষ ও স্ত্রীলোক) নাকে নথনোলকবেশর-পরা পৌত্তলিক, এটাও একটা আবিষ্কার বটে! পুরুষদের মধ্যে কেহই নথ ও বেশর পরে না। পুরুষজাতীয় শিশুদের এক আধ জনকে নোলক পরিতে দেখা যায় বটে। মেয়েদের নাকের গয়না পরা এখনও কতকটা চলিত আছে, কিন্তু কমিয়া আসিতেছে। এবং শ নিজেই যাহা বলিয়াছেন, "the eastern toleration of noserings is not justified by the western toleration of earrings," "পাশ্চাত্য দেশে ইয়ারিং বরদাস্ত করা হয় বলিয়া প্রাচ্যের নথবেশরনোলক বরদাস্ত করা যাইতে পারে না," তাহার অনুকরণে আমরা কি বলিতে পারি না, "পাশ্চাত্য মেয়েরা ইয়ারিং দুল আদি ব্যবহার করে বলিয়া প্রাচ্য মেয়েদের নথবেশর প্রভৃতিকে অসভ্যতর মনে করা যাইতে পারে না?"

নাকের গয়না সম্বন্ধে আরো একটা কথা বলা দরকার। "গহনা" প্রবন্ধে শ্রীমান্ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন, যে, প্রাচীন ভারতে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, নথ বেশর নোলক বা অন্য কোন নাকের গয়না প্রচলিত ছিল না। সুতরাং ইহা মনে করা যাইতে পারে, যে, উহা ভারতীয় আর্য্যদের উদ্ভাবিত বা ব্যবহৃত অলঙ্কার নহে, অন্য কোথাও হইতে আমদানী।

পৌত্তলিকতা সম্বন্ধেও দু-একটা কথা বলি। আমি মূর্ত্তিপূজা কিম্বা মূর্ত্তির সাহায্যে পূজা করি না। কিন্তু সেই কারণে, যাঁহারা তাহা করেন, তাঁহাদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করি না। মৃত ও জীবিত অনেক মূর্ত্তিপূজক বা মূর্ত্তির সাহায্যে পূজকের বিষয় অবগত আছি, যাঁহাদের সাধুতা ও ভক্তি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। মূর্ত্তিপূজকদের কোন পূজানুষ্ঠানে বীভৎস বা নীতিবিগর্হিত কিছু থাকিলে তাহা অবশ্যই সাতিশয় নিন্দনীয়। তান্ত্রিকদের, কাপালিকদের কোন কোন ক্রিয়াকলাপ, দক্ষিণ ভারতের দেবদাসী উৎসর্গ প্রথা এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু সে সব অনুষ্ঠান বাদ দিলে হিন্দুদের মূর্ত্তিপূজা, রোমান ক্যাথলিকদের মূর্ত্তিপূজার সদৃশ। ক্যাথলিকদের মধ্যে পাদরীর কাছে পাপ স্বীকার, আগেকার সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মঠ, প্রভৃতি সম্পর্কে কুৎসার কথা ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু এই সকলের জন্য পাশ্চাত্য জাতিদিগকে শ বা আর্চার অসভ্য বলেন নাই। পাশ্চাত্য বলিতে প্রধানতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার লোকদিগকে বুঝায়। খৃষ্টিয়ান বলিয়া পরিচিত লোকদের সংখ্যা ইউরোপে ২৭,৪৭,৬০,০০০। তাহার মধ্যে ১৮,১৭,৬০,০০০ অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ ক্যাথলিক সুতরাং মূর্ত্তিপূজক। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় খৃষ্টিয়ান বলিয়া পরিচিত লোকদের সংখ্যা ১৩,৯৩,০০,০০০ তাহার মধ্যে ৭,৩৯,০০,০০০ অর্থাৎ অর্দ্ধেকের উপর ক্যাথলিক অর্থাৎ মূর্ত্তিপূজক। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্য জাতিদের অধিকাংশ লোক মূর্ত্তিপূজক। তাহা সত্ত্বেও যদি পাশ্চাত্যেরা অসভ্য বলিয়া পরিগণিত না হয়, তাহা হইলে হিন্দুরাই বা পৌত্তলিক বলিয়া অসভ্য বিবেচিত কেন হইবে?

মূর্ত্তির পূজা অপেক্ষা জঘন্য পৌত্তলিকতা টাকার পূজা ও সাম্রাজ্যবাদের পূজা। তাহা পাশ্চাত্য জাতিদের খুব আছে।

শ সহমরণ প্রথার এবং জগন্নাথের রথের চাকায় আত্ম-বলিদানের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুটির কোনটিই এখন প্রচলিত নাই। আগে কি কি নিষ্ঠুর রীতি বা কুরীতি কোন্ দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার দ্বারা জাতিবিশেষের সভ্যতা অসভ্যতার বিচার হইতে পারে না। স্ত্রীর, দাস-দাসীর, কর্ম্মচারীর, ও অন্যান্য লোকের সহমরণ অতীত কালে ইউরোপেও অন্য সব মহাদেশে প্রচলিত ছিল। সমাজ-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক বহিতে তাহার বৃত্তান্ত আছে। ভারতবর্ষে আদিম যুগে ইহার প্রচলন ছিল। বৈদিক সময়ে সহমরণের পরিবর্ত্তে বিধবার দ্বিতীয় পতি গ্রহণ প্রচলিত হয়। তাহার পরবর্ত্তী কোন সময়ে, স্বামীর চিতা হইতে উঠিয়া বিধবাকে "অগ্রে" যাইবার যে আদেশ আছে, তাহা স্বার্থপর লোকেরা "অগ্নেঃ" যাইবার, আগুনে পুড়িয়া মারবার, আদেশে পরিবর্ত্তিত করে। সহমরণ এই প্রকারে আবার প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু ইহা প্রধানতঃ বাংলা, অযোধ্যা ও রাজপুতানায় প্রচলিত হয়, দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে ইহা নিষিদ্ধ ছিল, পঞ্জাবেরও সীমান্ত প্রদেশ সকলে চলিত ছিল না। আকবর বাদশাহের আমলে ইহা নিষিদ্ধ হয়। ইংরেজদের আমলে রাজশক্তি তাহাদের হাতে ছিল বলিয়া তাহারা ইহা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তখনকার হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ রামমোহন রায় এবিষয়ে ইংরেজের সহায় ছিলেন, এবং সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিয়াছিলেন। রাজশক্তি তাঁহার মত লোকদের হাতে থাকিলে, কোনও বিদেশীর সাহায্য ব্যতিরেকেও ইহার উচ্ছেদ সাধিত হইত।

বার্ণার্ড শ অসভ্যতার প্রমাণ স্বরূপ সতীদাহের উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও তাহার মধ্যে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় মরণ অনেক ছিল (যাহার সমর্থন আমি একটুও করি না)। কিন্তু তিনি অমেরিকায় লিঞ্চিং নামে পরিচিত নৃশংস নিগ্রোদাহ রীতির জন্য আমেরিকার পাশ্চাত্য লোকদিগকে কেন অসভ্য বলেন না, এবং তাহাদিগকে সভ্য করিবার জন্য ইংরেজদিগকে আমেরিকা দখল করিয়া বসিয়া থাকিতে কেন বলেন না ?

আগে আগে জগন্নাথের রথের নীচে বৎসরের মধ্যে একবার বা দুইবার কোন কোন লোক নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া আত্মহত্যা করিত। তাহাদের সংখ্যা অল্প ছিল। সে-রীতিও এখন আর নাই। তথাপি আমাদের অসভ্যতার প্রমাণ স্বরূপ শ তাহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে কারখানা চালাইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর ৬।৭।৮।১০ বৎসরের শিশুদের দ্বারাও তথায় অমানুষিক পরিশ্রম করাইয়া তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্পায়ু করা হইত। প্রধানতঃ লর্ড শ্যাফ্‌ট্‌সবেরী (মৃত্যু ১৮৮৫) প্রভৃতির চেষ্টায় এই সব নিষ্ঠুরতা নিবারিত হয়। মানুষ ভ্রান্ত ধর্ম্মবুদ্ধি বা কুসংস্কার বশত আত্মহত্যা করিলে তাহাও অবশ্যই গর্হিত কাজ এবং অসভ্যতার লক্ষণ ; কিন্তু টাকার জন্য আবালবৃদ্ধ-বনিতা অপরের অঙ্গবৈকল্য, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু ঘটাইলে তাহা কি উহা অপেক্ষাও গর্হিত কাজ ও অসভ্যতার চিহ্ন নহে ?

শ রোমানদের দ্বারা বৃটনদের পরাজয়ের সহিত ইংরেজদের দ্বারা ভারতীয়দের পরাজয়ের তুলনা করিয়া নিজের বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা কত বেশী এবং সেই জন্য তাঁহার তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা কত বেশী, তাহা এই তুলনা দ্বারাই বুঝা যায়। রোমান-বিজয়ের সময় ব্রিটনরা ছিল আদিম অবস্থায়। তাহাদের না ছিল সাহিত্যদর্শনাদি, না ছিল সভ্যজনোচিত পরিচ্ছদ, না ছিল অন্যান্য সভ্যতার অঙ্গ। হিন্দুদের এই সব যাহা ছিল, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন কালে হিন্দুরা নিজেদের দেশের বাহিরে সমগ্র ইউরোপ অপেক্ষা বিস্তৃত ভূখণ্ডে নিজেদের সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিল, এবং বিস্তর বর্ব্বর নরখাদক জাতিকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাচীন ব্রিটনরা সেরূপ কিছু করে নাই। এ বিষয়ে অধিক লিখিব না। শ ইংরেজদের একজন প্রধান লোক। তিনি যখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন গণ্ডমূর্খ, তখন অন্যে পরে কা কথা ?

কোন্ দেশের লোকদের কি কি বদ্‌গুণ, দোষ, সামাজিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কুরীতি আছে, কেবল তাহার দ্বারা তাহাদের সভ্যতা অসভ্যতার বিচার করা যায় না।

কেবল মন্দ খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহা সব দেশেই খুব বেশী পাওয়া যাইতে পারে। দেখিতে হইবে, কোন্ দেশের সভ্যতার আদর্শ ও লক্ষ্য কি। তদনুসারে বিচার করিলে মানব-জাতির মধ্যে হিন্দুদের স্থান নীচে হইবে না। পাশ্চাত্য জাতিরা পরের দেশ দখল ও তাহাদের ধন প্রাণ মান স্বাধীনতা হরণ করিয়া সাম্রাজ্যের ও ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করা গৌরবের বিষয় মনে করে। হিন্দুরা কখন পরদেশ জয়, লুণ্ঠন, উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি করে নাই, বলিতেছি না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও ধন পুঞ্জীভূত করা তাহাদের সভ্যতার আদর্শ ছিল না, এখনও নাই। সত্যের উপলব্ধি, জ্ঞান আহরণ, আত্মার উৎকর্ষ সাধন, তাহাদের সভ্যতার লক্ষ্য। যে-শ্রেণীর লোকদের জীবনের ইহাই প্রধান সাধনা, হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধদের সমাজে তাহাদেরই প্রধান স্থান, অন্য কাহারও নহে। এই আদর্শের বিকৃতি খুব হইয়াছে, হইতেছে, কিন্তু অনুসরণও খুব হইয়াছিল, এখনও কিছু হইতেছে। পাশ্চাত্য সমাজে এরূপ আদর্শের কোন লোক নাই, বলিতেছি না। কিন্তু সেরূপ আদর্শ পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার অস্থিমজ্জাগত নহে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়; তাহা করিবার মত যোগ্যতার দাবী আমি করি না। এখানে কেবল এই কথা বলিতে চাই, যে, আমাদের আদর্শ পাশ্চাত্যদের আদর্শের চেয়ে খাট নয়।

কোন জাতি বিজাতির বিদেশীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা তাহার সভ্যতা পরখ করিবার একটা কষ্টিপাথর। পাশ্চাত্য জাতিরা বিদেশের বিজাতিকে পরাজিত করিয়া হয় তাহাদের উচ্ছেদ করিয়াছে, নয় তাহাদিগকে অধীন রাখিয়া তাহাদের শ্রম ও ধন আত্মসাৎ করিয়াছে এবং শোষিত বা অপহৃত ধন স্বদেশে আনিয়াছে। হিন্দুরা চম্পা, কাম্বোজ, জাভা, সুমাত্রাদিতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তথাকার আদিম নিবাসীদিগের উচ্ছেদসাধন করে নাই, তাহাদের ধন ভারতবর্ষে লইয়া আসিয়া তাহাদিগকে বর্ব্বর দরিদ্র অবস্থায় রাখে নাই। তাহাদিগকে সভ্য করিয়া,তাহাদের শক্তির বিকাশ করিয়া তাহাদিগকে এরূপ স্থাপত্যভাস্কার্য্যাদি কীর্ত্তি স্থাপন করিতে হিন্দুরা সমর্থ করিয়াছিল, যাহা দেখিয়া এখনও পাশ্চাত্যেরা বিস্মিত হয়, এবং যাহার তুলনা হিন্দুদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষেও নাই। শ্বেত পাশ্চাত্য জাতিরা ত অনেক অশ্বেত অসভ্য জাতিকে অধীন করিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহাদের অধীন এমন একটিও অশ্বেত জাতি দেখাইতে পারিবে কি যাহারা তাহাদের প্রভাবে সভ্য হইয়া এমন কিছু করিয়াছে যাহাতে জগৎ বিস্মিত হয় এবং যাহার তুলনা শ্বেতজাতিদের নিজের দেশে মিলে না?

বঙ্গের প্রতি গবর্ন্মেণ্টের অবিচার

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সমগ্র ভারতের কংগ্রেস কমিটি গত বোম্বাইয়ের অধিবেশনে কতকগুলি প্রস্তাব ধার্য্য করেন। তাহার একটি এই, যে, প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দুদের ও মুসলমানদের সংখ্যা যত, আবশ্যক বোধ হইলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহাদের সেই (লোক) সংখ্যার অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। অর্থাৎ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের দেড়গুণ হয়, তাহা হইলে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যার দেড়গুণ হইবে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অনুসারে তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত, কংগ্রেস্ কমিটি এই নীতির সমর্থন করেন। যদি এক এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে এক এক প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার সমষ্টি অনুসারে, অর্থাৎ এক এক প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের অর্থাৎ নির্ব্বাচিত সভ্যদের সংখ্যা যেরূপ আছে, তাহা প্রাদেশিক লোকসংখ্যা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। নীচে ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকসংখ্যা এবং ভারতীয়দের প্রতিনিধির সংখ্যা দেখান হইতেছে।

প্রদেশ।	লোকসংখ্যা।	ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা।	ইউরোপীয় প্রতিনিধির সংখ্যা।
মাদ্রাজ	৪,২৩,১৮,৯৮৫	১৫	১
বোম্বাই	১,৯৩,৪৮,২১৯	১৪	২
বাংলা	৪,৬৬,৯৫,৫৩৬	১৪	৩
আগ্রা-অযোধ্যা	৪,৫৩,৭৫,৭৮৭	১৫	১
পঞ্জাব	২,০৬,৮৫,০২৪	১২	০
বিহার-ওড়িষা	৩,৪০,০২,১৮৯	১২	০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,৩৯,১২,৭৬০	৬	০
আসাম	৭৬,০৬,২৩০	৩	১
দিল্লী	৪,৮৮,১৮৮	১	০
ব্রহ্মদেশ	১,৩২,১২,১৯২	৩	১
আজমের-মেরোআরা	৪,৯৫,২৭১	১	০

ইউরোপীয়েরা ভারতীয়দের প্রতিনিধি নহে; বরং তাহারা ভারতীয়দের বিরুদ্ধাচরণই করিয়া থাকে। উপরের তালিকায় দৃষ্ট হইবে, যে, বঙ্গদেশের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহার লোকসংখ্যার অনুরূপ নহে। অধিকন্তু, বাংলাদেশে ইউরোপীয় প্রতিনিধির সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। তাহার ফল দাঁড়াইতেছে এই, যে, বাংলা দেশের পক্ষ হইতে কথা বলিবার যথেষ্টসংখ্যক লোক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে ত নাই-ই, অধিকন্তু যে কয়জন আছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বেশীসংখ্যক ইউরোপীয় প্রতিনিধি বঙ্গের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। বঙ্গের ইউরোপীয়দের প্রতিনিধির সংখ্যা অন্য যে-কোন প্রদেশের ইউরোপীয়দের প্রতিনিধিদের চেয়ে বেশী করিবার কারণ এই বলা হইবে, যে, বঙ্গে ইউরোপীয়দের খুব বেশী মূলধন খাটিতেছে। কিন্তু তাহার জন্য তাহারা ত বাংলা দেশ হইতে খুব বেশী ধন শোষণ করিতেছে; তাহাই ত বঙ্গের আলস্য অকর্ম্মণ্যতা অমনোযোগের যথেষ্ট শাস্তি। তাহার উপর আবার বাঙালীদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য বেশীসংখ্যক ইউরোপীয় প্রতিনিধি বঙ্গের ঘাড়ে চাপান কি অন্যায় শাস্তি নয়?

প্রত্যেক প্রদেশের লোকসংখ্যা অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উহার প্রতিনিধিসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইলে, কোন্ প্রদেশের কত প্রতিনিধি হওয়া উচিত, তাহা দেখাইতেছি। ইহা গণনা করিবার জন্য যে-কোন প্রদেশের বর্ত্তমান প্রতিনিধি-সংখ্যা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অর্থাৎ আদর্শ বা মান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আমরা বোম্বাইকেই মান ধরিয়া গণনা করিব। বোম্বাইকে মান ধরিবার কারণ, উহার লোকসংখ্যা প্রেসিডেন্সী ও প্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম। উহার ইউরোপীয়সমেত মোট প্রতিনিধিসংখ্যা ১৬; লোকসংখ্যা ১,৯৩,৪৮,২১৯ অর্থাৎ মোটামুটি দুই কোটি। তাহা হইলে বোম্বাইয়ের প্রতি সাড়ে বার লক্ষ অধিবাসীর জন্য এক এক জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়, ধরা যাইতে পারে। এই নিয়ম সর্ব্বত্র খাটাইলে কোন্ প্রদেশের প্রতিনিধির সংখ্যা কত হওয়া উচিত এবং এখন কত আছে, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

প্রদেশ	বর্ত্তমান প্রতিনিধি সংখ্যা।	যাহা হওয়া উচিত।
মাদ্রাজ	১৬	৩৪
বোম্বাই	১৬	১৬
বাংলা	১৭	৩৭
আগ্রা-অযোধ্যা	১৬	৩৬
পঞ্জাব	১২	১৬
বিহার-ওড়িষা	১২	২৭
মঃ প্রঃ-বেরার	৬	১১
আসাম	৪	৬
দিল্লী	১	০
ব্রহ্মদেশ	৪	১০
আজমের-মেরোয়ারা	১	০

যাহা হওয়া উচিত, সেরূপ হইলে মোট নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১৯৩ হয়। বিলাতের মত ছোট দেশে হাউস্ অব্ কমন্সের সভ্যসংখ্যা ৬১৫; তাহার তুলনায় ভারতবর্ষের মত বড় দেশের ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৩ জন প্রতিনিধি কম বই বেশী নয়।

কংগ্রেস-কমিটি ত ধর্ম্মসম্প্রদায় দুইটির প্রতিনিধির সংখ্যা তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট করিতে রাজী। সঙ্গতি (consistency) ও ন্যায়ের অনুরোধে তাঁহাদের এই প্রস্তাবও ধার্য্য করা উচিত, যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে নির্দ্ধারিত হউক। তাহা করিবার মত ন্যায়পরায়ণতা ও সাহস কমিটির আছে কি?

বর্ত্তমানে প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের যে-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা গবর্মেণ্ট করিয়াছেন, তাহার জন্য কংগ্রেস্ দায়ী নহেন। আমরা দেখাইয়াছি, লোকসংখ্যার অনুপাতে ঐ সংখ্যাগুলি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ঠিক্ কি নিয়মে বা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কিরূপ যোগ্যতা অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বলিতে পারি না। কিন্তু লিখনপঠনক্ষম লোকদের সংখ্যা অনুসারে যে উহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহাও নীচের তালিকায় দেখাইতেছি। এই তালিকাতেও বোম্বাইকে মান ধরিয়াছি। তাহাতে

এক এক লক্ষ লিখনপঠনক্ষম লোকের এক এক জন প্রতিনিধি হয়।

প্রদেশ।	লিখন-পঠনক্ষম।	ইংরেজী লিখনপঠনক্ষম।	বর্ত্তমান প্রতিনিধিসংখ্যা।	কত হওয়া উচিত।
আসাম	৪,৮৩,১০৫	৭০৮০৯	৪	৪
বাংলা	৪২,৫৪,৬০১	৭৭৩১৬১	১৭	৪২
বিহার-ওড়িষা	১৫,৮৬,২৫৭	১৩২০৬২	১২	১৫
বোম্বাই	১৬,৪৫,৫৩৩	২৭৬৩৩৩	১৬	১৬
ব্রহ্মদেশ	৩৬,৫২,০৪৩	১১৩৪১৩	৪	৩৬
মঃ প্রঃ—বেরার	৬,৩৩,২৯৩	৬২৭৩৬	৬	৬
মান্দ্রাজ	৩৬,২১,৯০৮	৩৯৮৮৮৩	১৬	৩৬
আগ্রা-অযোধ্যা	১৬,৮৮,৮৭২	১৭৫২৩৯	১৬	১৬
পঞ্জাব	৮,৩৩,৪৯২	১৩৯৫৩৫	১২	৮

এই তালিকা অনুসারেও, অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক যোগ্যতা, শিক্ষার বিস্তৃতি ও লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইলেও, বঙ্গের প্রতি যে অবিচার হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট।

যে প্রদেশ হইতে মোট রাজস্ব যত আদায় হয়, তদনুসারেও প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। কোন্ প্রদেশ হইতে মোট রাজস্ব কত আদায় হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের যে-সব আয়-ব্যয়ের হিসাব সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল য়্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্টে প্রকাশিত হয়, তাহাতে কোথাও প্রদেশগুলির প্রত্যেকটিতে আদায়ী সকল রকম রাজস্বের সমষ্টি দেখান হয় নাই। প্রত্যেক রকম রাজস্বেরও আদায় প্রদেশ অনুসারে দেখান নাই। এইজন্য, উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত, কেবল কয়েক রকম প্রধান প্রধান রাজস্বের পরিমাণ সঙ্কলন করিয়া তাহার সমষ্টি নির্ণয় করিয়াছি। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ আমি জলসেচন (ইরিগেশ্যন) বিভাগের আয় ধরি নাই, এইজন্য, যে, বাংলা দেশে জলসেচনের জন্য নির্ম্মিত লাভজনক সরকারী খাল একটিও নাই। সামান্য কয়েক মাইল যাহা আছে, অন্যান্য অনেক প্রদেশের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। তাহা আমি পরে দেখাইতেছি। জলসেচন-বিভাগের আয় ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে, যে, সমুদয় প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হয়। যদি জলসেচন-বিভাগের আয় ধরা যায়, তাহা হইলেও বাংলা দেশে আদায়ী রাজস্ব কেবলমাত্র বোম্বাই অপেক্ষা কয়েক লক্ষ টাকা কম হয়। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজস্ব বাংলা অপেক্ষা অনেক কম হইবে, যদি ঐ দুই প্রদেশে ও বঙ্গে মদ্যপান ও অন্যান্য নেশা উঠিয়া যায়, এবং সুতরাং আবগারী বিভাগের আয় নামমাত্র হইয়া যায়।

১৯২৪-২৫ সালে পাঁচটি প্রদেশে কয়েকটি প্রধান বাবতে যে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

বাবত।	মান্দ্রাজ।	বোম্বাই।	বাংলা।	আগ্রা-অযোধ্যা।	পঞ্জাব।
পাট রপ্তানী শুল্ক।	০	০	৩৭৫৬৩৯২০	০	০
ইন্‌কাম্‌ ট্যাক্স।	১৩১৫৬৩৬৫	৪০৩৭৭০৯৪	৫৫৪৭৩৯৩৩	৭৮৮০০৮৯	৬০৬৭১০২
লবণ-শুল্ক।	১৮৯৯১৭২৭	১৭৩৩৩৯০২	২৩৫৯০৮৯৭	৭০০০০০০ *	৩০০০০০০ *
জমীর খাজনা।	৬১৫০৫৮৬৭	৫১৬৫২৮১৫	৩১০৭৩৫৮৭	৬৭১০৮৫৩৪	৫৫৩৬৮১২০
আবকারী।	৪৯০৫৯০৭১	৪১৫০৯১৩২	২১৫৫৩৪৪৩	১৩২২৯৭৯২	১১৯৪৭৪৯০
ষ্ট্যাম্প্‌।	২৪১০১২৭৪	১৭৮০৬৪৮৪	৩৩৬৬৭৭৫৭	১৭৪৪০০৩১	১১৬৬১৩৭৭
অরণ্য-বিভাগ।	৫৫৭৩৭৬১	৭৩০৭৯৬৪	২৪৭৫৫২৯	৬৯২১৯৮৭	৩৭২৭৩১২
কার্পাস শিল্পশুল্ক।	৯০৩৭৬৪	১৮৭০৩৩৮৩	২৬২৫১৮	৬৮৮৫৫৮	১৯২৬৮
মোট।	১৭৩৩৪১৮২৯	১৯৪৬৯০৭৭৪	২০৫৬৬১৫৮৪	১২০২৭৫৯৯১	৭১৭৯০৬৬৯
জলসেচন।	২৮২৫৪২৩৪	১২৮৫১৯১৫	২৩৬১৩	১৩১৯৩৮৪৪	৬৮৬১৬৪২৮
একুনে।	২০১৫৯৬০৬৩	২০৭৫৪২৬৮৯	২০৫৮৯৯১৯৭	১৩৩৪৬৯৮৩৫	১৪০৪০৭০৯৭

* আগ্রা-অযোধ্যার ও পঞ্জাবের লবণশুল্ক বাবতে আদায়ী টাকা সরকারী হিসাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখান নাই; উত্তরভারতীয় লবণরাজস্ব বিভাগের আয় বলিয়া মোট ১০৭০৫৩৮৬ টাকা লিখিত আছে। ইহার মধ্যে উত্তরপশ্চিমসীমান্ত, পঞ্জাব, আগ্রা-অযোধ্যা প্রভৃতির লবণশুল্কের আয় আছে। আমি লোকসংখ্যা অনুসারে ঐ টাকাটির আনুমানিক যত আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাবের হইতে পারে, তাহা বসাইয়া দিয়াছি। অনুমানে বরং বেশী ধরিয়াছি, তবু কম নহে।

তালিকাতে পাঠক দেখিবেন, যে, আমি জলসেচন-বিভাগের আয় প্রথমে ধরি নাই। তাহার কারণ বলিতেছি। বাংলা দেশের বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় জল-সেচনের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রায় কিছুই করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৃত্রিম খাল কাটিয়া জলসেচনের ব্যবস্থা বাংলা দেশে গবর্ণ্মেণ্ট কত কম করিয়াছেন, তাহা বুঝিবার সুবিধার জন্য ঐরূপ খালের জল পাঁচটা প্রদেশের কত একার করিয়া জমীতে যোগান হয়, তাহা দেখাইতেছি। অঙ্কগুলি ১৯২৪-২৫ সালের। মান্দ্রাজ ৩৫২৯৪৬১ একার, বোম্বাই ৩৩৩৪১১৩ একার, বাংলা ১৫০৬০৭ একার, আগ্রা-অযোধ্যা ১৮৭৮৯৪৮, পঞ্জাব ৯২৭১৭৮৫। যাহা লাভজনক এরূপ কৃত্রিম জলসেচনের ক্যান্যাল বা খাল বঙ্গে এক মাইলও নাই; মান্দ্রাজে ৪০৫৯ মাইল, বোম্বাইয়ে ৫৬৭৮ মাইল,

আগ্রা-অযোধ্যায় ১৪১৯ মাইল ও পঞ্জাবে ৩৪৩৮। এগুলি প্রধান ও শাখা খালের দৈর্ঘ্য; বিতরণের খালের দৈর্ঘ্য আরও অনেক বেশী। অতএব বলিতে হইবে, জলসেচন বিষয়ে বাংলা দেশের প্রতি সরকার বাহাদুরের বিশেষ কৃপা আছে। যে প্রদেশে জলসেচনের খাল কাটা প্রায় হয়ই নাই, সেখানে জলসেচনের রাজস্ব খুব কম পাইলে তাহা গবর্ণমেণ্টের দোষ, প্রদেশের লোকদের দোষ নহে। সুতরাং জলসেচন-রাজস্ব কম বলিয়া তাহার প্রতিনিধির সংখ্যা এই কম্‌তির অনুপাতে কম হইতে পারে না।

আবকারীর আয় সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হইবে। প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলার লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা বাংলার অর্দ্ধেকেরও কম, অথচ তাহার আবকারীর আয় বঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ। মান্দ্রাজের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে ৪৪ লক্ষ কম, অথচ আবকারী আয় বঙ্গের দ্বিগুণেরও বেশী। আবকারীর আয় কম বলিয়া আয়ের এই কম্‌তির অনুপাতে বঙ্গের প্রতিনিধির সংখ্যা কম হইতে পারে না।

যাহা হউক, জলসেচন ও আবকারীর আয় সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহার যুক্তিযুক্ততা যদি ধর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, যে, বঙ্গে মোট রাজস্ব যত আদায় হয়, তাহার প্রতিনিধির সংখ্যা তদনুরূপ নহে। জলসেচনের আয় বাদ দিলে দেখা যাইবে, পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে পঞ্জাবের আয় সকলের চেয়ে কম। পঞ্জাবের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহার রাজস্ব অনুসারে যদি ১২ হয়, যাহা বর্ত্তমানে আছে, তাহা হইলে বঙ্গের ৩৫ হওয়া উচিত; কিন্তু এখন আছে ১৭, অথবা ইউরোপীয় বাদ দিলে ১৪। যদি জলসেচনের রাজস্ব মোট রাজস্ব গণনায় ধরা হয়, তাহা হইলে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে আদায়ী রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। তাহার বর্ত্তমান প্রতিনিধি-সংখ্যা ১৬। তাহা হইলে বঙ্গের রাজস্বের আধিক্য বিবেচনা করিলে তাহার প্রতিনিধির সংখ্যা হওয়া উচিত ২৪ জন। অবশ্য, রাজস্বের অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইলে মান্দ্রাজ বোম্বাইয়েরও প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়িবে।

আমি দেখাইলাম, কি লোকসংখ্যা, কি দেশী ভাষায় ও ইংরেজীতে লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা, কি মোট রাজস্বের পরিমাণ, যে দিক দিয়াই দেখা যাক্‌, বাংলা দেশের যত প্রতিনিধি পাওয়া উচিত, আমরা তত পাই নাই। বাংলা দেশকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং পরোক্ষভাবে উক্ত সভার বাহিরে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত প্রভাবহীন করিবার নিমিত্ত তাহার প্রতিনিধির সংখ্যা কম রাখা হইয়াছে, আমার এই সন্দেহ গোপন করিতে চাই না। ভারতশাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না, এবং আবশ্যক হইলে কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত যে কমিশন বসিবে, তাহার সম্মুখে যে-সব বাঙালী সাক্ষ্য দিবেন, তাঁহারা এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিলে ভাল হয়। বঙ্গের প্রতি অবিচারে সমস্ত ভারতবর্ষও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কারণ, বাংলা দেশ এখনও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান বিষয়ে নগণ্য হয় নাই।

বঙ্গের আবকারীর আয়ের অল্পতা যদি সম্পূর্ণরূপে এপ্রদেশে নেশার জিনিষের অল্পব্যবহারজনিত হইত, তাহা হইলে সন্তোষের বিষয় হইত। কিন্তু বঙ্গের আবকারী রাজস্বের অল্পতার তাহাই একমাত্র কারণ নহে। এ প্রদেশে কোন কোন নেশার জিনিষের উপর আবকারী ট্যাক্স অন্য কোন কোন প্রদেশের হার অপেক্ষা কম। কাট্‌তি বাড়ান ইহার উদ্দেশ্য কিনা বলিতে পারি না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে হইতে পারে না। কেবল ইহাই বক্তব্য, যে, বঙ্গে সব নেশার জিনিষের উপর ট্যাক্সের হার অন্যান্য প্রদেশের উচ্চতম হারের সমান হইলে আয়ও বাড়ে এবং নেশার জিনিষের ব্যবহার কিছু কমে। অবশ্য, আমি চাই, ঔষধার্থে এবং বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে ভিন্ন, নেশার জিনিষের বিক্রী ও ব্যবহার একেবারে বন্ধ হওয়া। যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন খুব বেশী ট্যাক্স বসাইয়া কাট্‌তি কমান ও যথাসম্ভব আয় বাড়ান কর্ত্তব্য।

বঙ্গের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের আর এক দৃষ্টান্ত অনেক বার দিয়াছি। এখন আর একবার, মোট আদায়ী রাজস্বের তুলনায় বাংলা দেশ কত সামান্য টাকা সরকারী সব রকম কাজ চালাইবার জন্য ভারত গবর্ণ্মেণ্টের নিকট হইতে পায়, তাহা বলিতে চাই। অনেক বার বলিয়াছি, বঙ্গের লোকসংখ্যা অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী, বোম্বাইয়ের ও পঞ্জাবের দ্বিগুণের চেয়েও বেশী, আগ্রা-অযোধ্যার ও মান্দ্রাজের চেয়ে বেশী। অথচ বাংলা দেশকে তাহার খরচের জন্য ভারত গবর্ণ্মেণ্ট এই বড় পাঁচটা প্রদেশের মধ্যে সব চেয়ে কম টাকা দেন। নীচের তালিকায় ১৯২৪-২৫ সালে প্রত্যেক প্রদেশের মোট আদায়ী রাজস্ব এবং ১৯২৭-২৮ সালের জন্য মোটবরাদ্দ আয় দেখাইলাম। মোট রাজস্ব উপরের ছত্রে জলসেচন-রাজস্ব বাদ, নীচের ছত্রে ঐ রাজস্বসমেত দেখান হইয়াছে।

প্রদেশ।	মোট রাজস্ব।	বজেটে বরাদ্দ আয়।
মান্দ্রাজ	১৭৬৩৪১৮২৯	১৫৫৪৮০০০০
	২০১৫৯৬০৬৩	
বোম্বাই	১৯৪৬৯০৭৭৪	১৫০৮০০০০০
	২০৭৫৪২৬৮৯	

প্রদেশ।	মোট রাজস্ব।	বজেটে বরাদ্দ আয়।
বাংলা	২০৫৬৬১৫৮৪	১০৭৩৩৯০০০
	২০৫৮৯৯১৯৭	
আগ্রা-অযোধ্যা	১২০২৭৫৯৯১	১২৯৭৫০০০০
	১৩৩৪৬৯৮৩৫	
পঞ্জাব	৭১৭৯০৬৬৯	১১১৩০০০০০
	১৪০৪০৭০৯৭	

এই তালিকায় পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে, যে-সব প্রদেশের মোট আদায়ী রাজস্ব বাংলা দেশের চেয়ে কম, তাহাদিগকে নিজের নিজের ব্যয়ের জন্য ভারত গবর্মেণ্ট বাংলা দেশের চেয়ে বেশী টাকা রাখিতে দিয়াছেন।

এইরূপ একটা কথা শুনা যায়, যে, মোট আদায়ী রাজস্ব হইতে কোন্ প্রদেশ কত টাকা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিতে পাইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার ভার পড়ে লর্ড মেষ্টনের উপর। তিনি সিবিলিয়ান্, পূর্ব্বে আগ্রা-অযোধ্যার লাট ছিলেন। শুনা যায়, বাংলা দেশের উপর তাঁহার অপ্রসন্নতার কারণ থাকায় তিনি এরূপ ভাবে টাকা বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে বহু পরিমাণে উপবাসী থাকিতে হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বর্মা অয়েল কোম্পানীর দান

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকে অনেক দান করিয়াছেন, করিতেছেন; এ পর্য্যন্ত সকলের চেয়ে বেশী দান করিয়াছে বর্মা অয়েল কোম্পানী। তাহার দানের পরিমাণ এক লক্ষ পৌণ্ড, বর্ত্তমান মুদ্রা-বিনিময়ের হারে প্রায় ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। এই টাকাটা যদিও কোম্পানীর ইংরেজ অংশীরা ইংলণ্ডে তাহাদের পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে আনিয়া দেয় নাই, তথাপি ইহা প্রশংসার যোগ্য। কোম্পানী কোথা হইতে এই টাকাটা দিল, তাহার খাঁটি খবর জানিয়া রাখা ভাল। কলিকাতার ইউরোপীয় বণিক্‌দের অন্যতম মুখপত্র কমার্স লিখিয়াছে, যে, ১৯২৬ সালে বর্মা অয়েল কোম্পানীর লাভ হইয়াছে পঁচিশ লক্ষ দুই হাজার আট শত পনের পৌণ্ড, এবং এই লাভ ১৯২৫ সালের লাভের চেয়ে প্রায় এক লাখ পৌণ্ড বেশী। কাহারও বার্ষিক আয় পঁচিশ লাখ হইলেই যে, সে অনায়াসে এক লাখ টাকা দান করিয়া ফেলে, এমন নয়। কিন্তু যে কোম্পানীর বার্ষিক আয় ২৫ লক্ষ পৌণ্ড অর্থাৎ সওয়া তিন কোটি টাকার উপর, তাহার পক্ষে তের চৌদ্দ লক্ষ টাকা একবারের মত দেওয়া কঠিন নয়। এবং যে-টাকাটা কোম্পানী দিয়াছে, তাহাও আগেকার লাভের চেয়ে অতিরিক্ত লাভের টাকা। বৎসর বৎসর এই সওয়া তিন কোটি টাকার উপর কোম্পানী ব্রহ্মদেশ হইতে লাভ পাইতেছে। তা ছাড়া, ইহার ইংরেজ কর্ম্মচারীরা মোটা মোটা বেতন হিসাবে অনেক টাকা পায়। ব্রহ্মদেশ স্বাধীন থাকিলে এবং বর্ম্মারা আধুনিক বিজ্ঞান ও কলকারখানার কাজ শিখিলে এই সমস্ত টাকা তাহাদের হইত। তাহার পরিবর্ত্তে একবারের মত রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় তের লাখ টাকা পাইল। এই টাকার অনেকটা অংশ বড় বড় বাড়ী নির্ম্মাণে খরচ হইবে। তাহার অনেক উপাদান বিলাত হইতে আসিবে; এঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদাররা খুব সম্ভব হইবে ইংরেজ। কোম্পানীর টাকায় স্থাপিত হইবে একটি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। তাহার বড় অধ্যাপকরা হইবে ইংরেজ, যন্ত্রপাতি আসিবে বিলাত হইতে। অতএব, এই দানটার অনেক অংশ ইংরেজই ফিরিয়া পাইবে। সুতরাং ইহা রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিতের শিক্ষার জন্য প্রায় সর্ব্বস্বদানের সমতুল্য কিছু নয়।

কোম্পানীর দানটা ব্রহ্মের গবর্ণর স্যার হারকোর্ট বাটলারের চাপের ফল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। কাগজে দেখিতেছি, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকা তুলিবার নিমিত্ত সরকারী কর্ম্মচারীরা নাচগান জুয়াখেলা প্রভৃতির প্রশ্রয় দিতেছে। সুতরাং ভিতরে ভিতরে টাকা আদায়ের জন্য লোকের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে মনে করা অসঙ্গত নহে।

সংবাদপত্রের প্রকাশের আগে পরীক্ষণ

সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে উহা একজন রাজকর্ম্মচারীকে দেখাইবার নিয়ম কোন কোন দেশে কখন কখন প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহাকে সেন্সর

বলা হয়। তিনি খবরের কাগজ প্রকাশিত হইবার আগে সব পড়িয়া দেখেন এবং যাহা আইন-বিরুদ্ধ কিম্বা তাঁহার বিবেচনায় অন্য কারণে প্রকাশযোগ্য নহে, তাহা বাদ দিয়া দেন। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট "নায়ক" কাগজের নামে রাজদ্রোহের মামলায় সম্পাদককে খালাস দিয়াছেন। বলিয়াছেন, যে, "লর্ড লিটন কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামা দেড় মাস চলিতে দেওয়ায় ইংরেজের চিরন্তন ভেদনীতি (divide and rule policy) অনুসরণ করিয়াছেন, এইরূপ লেখায় 'নায়ক' অন্যায় অপ্রকৃত কথা বলিয়াছে বটে, কিন্তু উহা সিডিশুস্ বা রাজদ্রোহকর নহে।" তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, যে, বিলাতে এর চেয়ে শক্ত কথা মিস্টার কুক্ মিস্টার বল্ডুইনকে বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন, যে, বিলাতে যেটা আপত্তিজনক নহে, সেটা যে ভারতেও আপত্তিজনক হইবে না, এমন নয়। এরূপ আপত্তিজনক কথার প্রকাশ ও প্রচার তিনি সেন্সর নিয়োগের দ্বারা বন্ধ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বিলাতে যাহা আপত্তিজনক নয়, সেটা কেন এখানে আপত্তিজনক, বিচারক তাহা না বলিলেও বুঝা কঠিন নয়। বিলাতে কখন এক রাজনৈতিক দল প্রবল হইয়া "গবন্মেণ্ট" নাম লইয়া দেশ শাসন করে, কখন অন্য রাজনৈতিক দল প্রবল হইয়া তাহা করে; কিন্তু "গবন্মেণ্ট" যাহারাই হউক, এবং তাহারা পরস্পরকে যত আক্রমণই করুক এবং পরস্পরের প্রতি যত মন্দ অভিসন্ধির আরোপই করুক, তাহাতে বিলাত দেশটা ইংরেজদের হাতছাড়া হইয়া পরাধীন হইবার সম্ভাবনা ঘটে না। কিন্তু ভারতে যদিও সরকারী ইংরেজদের সমষ্টি একদল, এবং দেশের লোকেরা আর একদল, তথাপি ইংরেজরাই "গবন্মেণ্ট", আমরা কখনও "গবন্মেণ্ট" হই না। আমরা যদি ক্রমাগত অবাধে গবন্মেণ্টনামধেয় ইংরেজদের দোষ দেখাইতে ও আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত তাহাদের সকল অভিসন্ধি জনসমাজে প্রচার করিতে পাই, তাহা হইলে দেশটা ইংরেজদের হাতছাড়া হইতে পারে, এবং আমরাই নিজেদের দেশের গবন্মেণ্ট গঠন করিয়া ফেলিতে পারি; এই আশঙ্কা ইংরেজদের আছে। এইজন্য, ইংলণ্ডে যাহা আপত্তিজনক নহে, ভারতে তাহা আপত্তিজনক। বিচারক এই প্রকার আপত্তিজনক লেখার প্রচার বন্ধ করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা সদুপায় নহে। ইহাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নষ্ট হইবে, এবং সম্পাদকদের নিজে নিজেই বিচারপূর্ব্বক লেখনীচালনার শক্তিবিকাশে বাধা ঘটিবে। এইজন্য আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

—

"ফরোয়ার্ডে"র রাজদ্রোহের মামলা

"ফরোয়ার্ডে"র নামে রাজদ্রোহের অভিযোগে সম্পাদক ও মুদ্রাকরের যে শাস্তির হুকুম হইয়াছিল, হাইকোর্টের জজেরা আপীলে মোটের উপর তাহা কমাইয়া দিয়া এবং সম্পাদকের কারাবাস সশ্রমের পরিবর্ত্তে শ্রমব্যতিরিক্ত করিয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন। একেবারে বেকসুর খালাস দিলেই ঠিক্ হইত। সম্পাদক ও মুদ্রাকর ত্রুটি স্বীকার করিলে খালাস দেওয়া হইত, তাহা বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষের ইঙ্গিতে বুঝা যায়। কিন্তু যাঁহার ধারণা, যে, তিনি কোন দোষ করেন নাই, তাঁহার পক্ষে ত্রুটিস্বীকার মিথ্যাচরণ ত হইতই, আত্মাবমাননাও হইত। বিচারপতি ঘোষের সহিত য়্যাডভোকেট জেনারেলের উত্তর-প্রত্যুত্তরে মনে হয়, যে, ভারতীয় রাজনীতির মর্ম্মকথা ঘোষ মহাশয়ের অনুভূতির বাহিরে নহে। তথাপি যে সম্পাদকের সাজা হইল, তাহা কি কেবল আইনের বাধ্যতাবশতঃ? যাহাই হউক, কথার ও লেখার রাজদ্রোহ যে কার্য্যগত রাজদ্রোহ নহে, কার্য্যগত রাজদ্রোহে উত্তেজনাও নহে, অতএব তাহার জন্য লঘু দণ্ডই যথেষ্ট, ইহা যে পরোক্ষভাবে জজদের রায়ে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা মন্দের ভাল।

গবন্মেণ্ট ইহা জানেন কিনা জানি না, যে, ফরোয়ার্ডে পাবনায় দাঙ্গাহাঙ্গামা লুটতরাজ সম্পর্কে যেরূপ অভিপ্রায়ের কথা লেখা হইয়াছিল, ঠিক্ তাহা না হইলেও কতকটা ঐ রকমের সরকারী অভিসন্ধি ছিল বলিয়া দেশের বিস্তর শিক্ষিত লোক মনে করে। হইতে পারে, যে, শিক্ষিত লোকেরা ভুল বুঝিয়াছে। কিন্তু সত্য খবর যাহা তাহা মুদ্রিত করিলাম।

যে মানুষগুলির সমষ্টিকে গবন্মেণ্ট বলা হয়, তাঁহারা ঠিক অন্য মানুষদেরই মত। সুতরাং তাঁহাদের ভুল ভ্রান্তি দোষ ত্রুটি হইতে পারে; অপকর্ম্মও তাঁহাদের দ্বারা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা ইহা স্বীকার করিতে চান না। যাহা হউক, নানা মোকদ্দমার রায় হইতে এখন এতটুকু বুঝা যায়, যে, অন্ততঃ পক্ষে সরকারী বিচারকদের মতে গবন্মেণ্টনামধেয় লোকদের ভুল ভ্রান্তি দোষ ত্রুটি হইতে পারে, এমন কি তাঁহাদের দ্বারা অপকর্ম্মও হইতে পারে, সমালোচনা উপলক্ষে এত দূর পর্য্যন্ত বলা রাজদ্রোহ নহে। ফরোয়ার্ড মামলার রায়ে দেখা যাইতেছে, যে, গবন্মেণ্টনামধারী ব্যক্তিরা কোন দুরভিসন্ধি বা গর্হিত উদ্দেশ্যবশতঃ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন বা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা বলিলে রাজদ্রোহ হয়। জজেরা আইনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ঠিক্ ব্যাখ্যা কিনা বলিবার মত আইনজ্ঞান আমাদের

নাই। আমরা কেবল এই টুকু বুঝি, যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং সাধু চরিত্রের জন্য জগতে যে-সব মহাপুরুষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও কোন কোন কথায় ও কাজে লোকে মন্দ অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছে,—তাঁহাদের ভুল দোষ ত্রুটি ধরা, সে ত আরও বেশী হইয়া থাকে। যাঁহারা এদেশে ও বিদেশে গবর্মেণ্ট নামে অভিহিত হন, তাঁহারা ঐ সকল মহাপুরুষদের চেয়ে উন্নতচরিত্র নহেন। সুতরাং তাঁহারা যে কখন কখন দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া কাজ করিবেন, এরূপ সন্দেহ বা বিশ্বাস করা কি নিতান্ত অসঙ্গত?—বিশেষতঃ যখন তাঁহাদিগকে স্বশ্রেণীর অস্বাভাবিক প্রভুত্বপদবী যেনতেনপ্রকারেণ রক্ষা করিতেই হইবে? আমাদের ত তাহা মনে হয় না। তাহা হইলে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক যদি কোন অভিসন্ধিতে বিশ্বাস করে, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিলেই বেআইনী কাজ হয়, এই বুঝিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা লাভ করিতে হইবে। সমস্ত একটা জাতিকে বা সম্প্রদায়কে রাজদ্রোহ অপরাধে জেলে পুরা যায় না; এইজন্য মুখফোড় বক্তা বা অসতর্ক লেখকের ঘাড়ে সকলের শাস্তির বোঝা চাপিয়া বসে। জজরা নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের রায়ের একটা রিপোর্টে দেখিলাম :—

"Writers could not, under the guise of criticism of public affairs, be allowed to indulge in attributing base, improper or dishonest motives to those who were carrying on the work of the government of the country."

তাৎপর্য্য। লেখকদিগকে, সরকারী কাজকর্ম্মের সমালোচনার ছলে, যাহারা দেশের শাসনের কাজ চালাইতেছে, তাহাদের প্রতি নীচ, অন্যায় বা অসাধু অভিপ্রায় আরোপ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

সরকারী বা বেসরকারী কোনও লোকেরই প্রতি নীচ অন্যায় অসাধু অভিপ্রায়-আরোপ করা উচিত নয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই, যে, যে কোন সরকারী লোক দেশের শাসনকার্য্য চালায়, তাহার প্রতি ঐরূপ অভিসন্ধির আরোপ করিলে তাহা রাজদ্রোহ বলিয়া দণ্ডনীয় কিনা। যে সব রাজপুরুষ স্বয়ং বা যাহাদের সমষ্টি "গবর্মেণ্ট" নামে আইনতঃ গণনীয়, তাহাদের সমালোচনা বা নিন্দাবাদ বা তাহাদের প্রতি কুঅভিসন্ধি আরোপ হয়ত রাজদ্রোহ হইতে পারে। কিন্তু যে কেহ দেশশাসন-কার্য্য চালায়, তাহার প্রতি কুঅভিসন্ধি আরোপ করিলে তাহা রাজদ্রোহ হইবে, এ বড় বিপজ্জনক মত। উচ্চতম হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য পঞ্চায়তের সভাপতি ও সভ্য কন্‌ষ্টেবল ও চৌকিদার প্রভৃতি সব সরকারী শাসনকর্মীর নিন্দা যদি কালক্রমে রাজদ্রোহ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে সম্পাদকদের এখন হইতে পাততাড়ি গুটান ভাল। অবশ্য, চৌকিদার প্রভৃতি সকলেই দরকার বোধ করিলে মানহানির জন্য সম্পাদকদের নামে নালিশ করিতে পারেন। কিন্তু রাজদ্রোহ ও ব্যক্তিবিশেষের মানহানি এক জিনিষ নহে। জজেরা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগকেই লক্ষ্য করিয়া আলোচ্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের কথাগুলির ব্যাপকতর অর্থ হইতে পারে।

আপীল শুনিবার সময় আদালতে একটা কথা উঠে, যে, খবরের কাগজে গবর্মেণ্টের সমালোচনা রাজনৈতিক যুদ্ধজাতীয়; অর্থাৎ সম্পাদকেরা এক পক্ষ, নিজেদের কথা বলিলেন, এবং সরকার পক্ষ অনুরূপ বলিলেন—যেমন স্বশাসক দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাপারটা ত তেমন নয়। সম্পাদকদের অস্ত্র কাগজ কলম ছাপার অক্ষর ইত্যাদি। সরকার পক্ষেরও কম্যুনিক ও বার্ষিক শাসনরিপোর্টরূপ ঐ জাতীয় অস্ত্র আছে। কিন্তু তাঁহারা ত তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন; তাঁহাদের আসল অস্ত্র কারাগার প্রভৃতি। যাহা হউক, এ প্রসঙ্গে ইহা আমাদের প্রধান বক্তব্য নহে। রাজনৈতিক যুদ্ধের কথাটা উঠায় সরকার পক্ষ হইতে এই মর্ম্মের কথা বলা হয়, যে, সাংবাদিকরা ত যুদ্ধ করে না, তাহারা গুপ্তহন্তার (assassin এর) মত আঘাত করে। আমরা কোন প্রকার বীরত্ব বা সাহসিকতার দাবী না করিয়া বলিতে পারি, যে, আমাদের কাজের এই বর্ণনাটা ইন্‌করেক্ট অর্থাৎ অযথার্থ; কারণ আমরা সম্পাদকরূপে যাহা কিছু বলি, তাহা ছাপিয়া সরকার বাহাদুরকে ও সর্ব্বসাধারণকে জানাই। আমাদের বাক্যবাণ যদি অস্ত্রাঘাত বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলেও তাহা গোপনে, আঁধারে, আড়ালে থাকিয়া আঘাত নহে; তাহা প্রকাশ্য দিবালোকেই করা হয়।

—

বিশ্বভারতীতে নিজামের দান

বিশ্বভারতীতে নিজামের এক লক্ষ টাকা দান সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন :—

"বোলপুর বিশ্ব-ভারতীতে" হায়দ্রাবাদের নিজামের একলক্ষ টাকা দানের সংবাদে আমরা খুব সুখী হইতে পারি নাই। শুনিতেছি যে, নিজাম নাকি এই সর্ত্তে দান করিয়াছেন যে, ঐ টাকায় বিশ্বভারতীতে "মুসলমান সভ্যতা" শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। অর্থাৎ তাহার ফলে বিশ্ব-ভারতীতে মুসলমান অধ্যাপক ও মুসলমান ছাত্রেরাও হয়ত প্রবেশলাভ করিবে। নিজাম সমস্ত ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম্ম প্রচারের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন এবং খাজা হাসান নিজামী এই ধর্ম্ম প্রচারের ব্যাপারে তাঁহার সঙ্গে কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহা কাহারও

অজ্ঞাত নহে। 'বিশ্বভারতী'তে এই লক্ষ টাকা দান যে, মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারেরই একটি অঙ্গ নহে, তাহা কে বলিবে? বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার পরিচালকগণ এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

নিজামের ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের উৎসাহ আছে, ইহা সত্য; কিন্তু তিনি ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যেই বিশ্বভারতীতে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ দেখিতেছি না। তিনি কি সর্ত্তে টাকা দান করিয়াছেন, তাহা আমরা এখনও জানি না। যখন জানিতে পারিব, তখন প্রয়োজন হইলে আলোচনা করিব। এখন পর্য্যন্ত যাহা জানি তাহা এই। ইউরোপের অনেক লোক সংস্কৃত ও পালি শিখিয়া ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ ও অন্যান্য সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, কিন্তু তাঁহারা হিন্দু জৈন বা বৌদ্ধ হইয়া যান না। ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা আরবী ও ফারসী শিখিয়া ইস্‌লামিক সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করেন, তাঁহারা মুসলমান হইয়া যান না। বিশ্বভারতীতে ইস্‌লামিক সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতির চর্চ্চার জন্য নিজাম টাকা দিয়াছেন। এইরূপ চর্চ্চা কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়। সরকারী টাকায় হয়।

আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষের সব ধর্ম্মসম্প্রদায় পরস্পরের ভাল যাহা আছে তাহা জানিতে পারিলে পরস্পরকে ঠিক্ বুঝিবার ও শ্রদ্ধা করিবার সুবিধা হইবে। এই কারণে, কেহ যদি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হায়দরাবাদের ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু সভ্যতার চর্চ্চার ব্যবস্থা করাইতে পারেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

বিশ্বভারতীতে বিদেশী ও দেশী খৃষ্টিয়ান অধ্যাপক আগে ছিলেন এবং এখনও আছেন, কিন্তু কেহ খৃষ্টিয়ান হন নাই। মৌলানা জিয়াউদ্দীন নামক একজন মুসলমান অধ্যাপকও আগে ছিলেন। এখন বোধ হয় নাই। মুসলমান ছাত্রও বরাবরই দু-একজন ছিল, এখনও হয়্যত আছে।

—

বিশ্বভারতীতে মিশরের রাজার দান

মিশরের রাজা ফুয়াদ বিশ্বভারতীতে অনেকগুলি ভাল ভাল আরবী বহি দিয়াছেন। ইহার সদ্ব্যবহার হইলে সুখের বিষয় হইবে। রামমোহন রায় বেশ ভাল আরবী জানিতেন, কিন্তু তিনি মুসলমান হইয়া যান নাই। হিন্দুসমাজভুক্ত অন্য অনেক বাঙালীও বেশ আরবী জানেন।

—

উচ্চ বর্ণের হল-চালন

বাংলা দেশে ব্রাহ্মণাদি কোন কোন জাতির লোকদের স্বহস্তে লাঙ্গল দেওয়ার রীতি নাই। তাঁহাদের পক্ষে হল-চালন কেন নিষিদ্ধ হইয়াছে, জানি না। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা বেতনভোগী পাচকের কাজ, আদালতে পিয়াদা চাপরাসীর কাজ, প্রভৃতি করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের কোন সামাজিক লাঞ্ছনা হয় না, হওয়া উচিতও নয়। অতএব নিজে লাঙ্গল দিলেও সামাজিক অমর্য্যাদা না হওয়াই উচিত। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় শিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা সব রকম ভাল কাজেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হল-চালনা তাহার মধ্যে একটি। এখন যে কোথাও কোথাও আবার সেইরূপ চেষ্টা হইতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ।

গ্রীক পুরাণে একটি গল্প আছে, যে, য়্যাণ্টিয়স্ নামক এক দৈত্য দীর্ঘকাল অজেয় ছিল; কেন না, যতবার সে তাহার মাতা পৃথিবীকে স্পর্শ করিত, ততবারই তাহার দেহে নূতন শক্তির সঞ্চার হইত। অবশেষে গ্রীক্ বীর হার্কিউলিস্ তাহাকে মাটি হইতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন। সব দেশের পৌরাণিক গল্পের মধ্যে কখন কখন গূঢ় অর্থ নিহিত থাকে। এই গ্রীক গল্পটিতেও আমরা এইরূপ অর্থ অনুমান করিতে পারি। মাটির সহিত যে দেশের লোক, বা যে শ্রেণীর লোক যত কম সম্পর্ক রাখে, তাহারা তত শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই কারণে, বিলাতের লোকেরা কল-কারখানার সাহায্যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিয়া তাহা বিক্রয় দ্বারা প্রভূত ধনশালী হওয়া সত্ত্বেও চাষে উৎসাহ দিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। বিলাতের লোকদের টাকা বেশী আছে। কিন্তু ফ্রান্সের লোকেরা, জার্মেনীর লোকেরা, ডেন্মার্কের লোকেরা, নিজেদের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া, তাহারা বিলাতের লোকদের চেয়ে সকল অবস্থায় অধিক স্বাবলম্বী ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। অন্য সব কাজ ছাড়িয়া দিয়া সবাই লাঙ্গল ধরুন, এ পরামর্শ আমরা দিতেছি না; দিলেও কেহ শুনিবে না। মাষ্টারী, ওকালতী, কেরানীগিরি প্রভৃতির চেয়ে চাষবাস আরামের কাজ, তাহাও বলিতেছি না। আমাদের বর্ত্তমান বক্তব্য কেবল এইটুকু, যে, চাষের কোন কাজই অন্য কোন কাজের চেয়ে অসম্মানজনক নহে, এবং আমরা ভ্রান্তিবশতঃ চাষাদিগকে যতই কেন অবজ্ঞা করি না, তাহারাই আমাদিগকে পালন করে, তাহারাই আমাদের অন্নদাতা। বাঙালীরা যে পরিমাণে কেবল কাগজকলমকেতাবজীবী বাক্য ও লিপিনিপুণ বাবুর জাতি হইতেছে, সেই পরিমাণে তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পরাধীন ও গোলাম হইতেছে।

আমরা যদি বাঁচিতে চাই, তাহা হইলে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন একান্ত আবশ্যক।

—

মফঃস্বলের দুইচারি কথা

আমি কলিকাতার মানুষ নহি, মফঃস্বলেই আমার বাড়ী; কিন্তু প্রথমতঃ ছাত্ররূপে, এবং তাহার পর বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষ্যে আমাকে জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতাতেই কাটাইতে হইতেছে। এইজন্য যদিও আমার অবসর অত্যন্ত কম, যৌবনসুলভ শক্তিও নাই, তথাপি যাঁহারা আমাকে বঙ্গের নানা স্থান দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা অনুভব করি এবং জানাইতেছি।

রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমি মেদিনীপুর জেলার বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর গিয়াছিলাম। এই সম্মিলনীর কাজ অনেক বৎসর ধরিয়া নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহার একটি মাসিক কাগজও আছে। সম্মিলনীর কর্ম্মীরা প্রশংসা-ভাজন। উহার অধিবেশন উপলক্ষ্যে কোন কোন কর্ম্মী যাহা বলিলেন, তাহাতে মনে হইল, তাঁহারা কাজ চালাইবার জন্য যথেষ্ট টাকা পান না। অথচ মেদিনীপুরে অল্প অল্প টাকা দিবার লোক যথেষ্ট আছেন। সম্মিলনীর মাসিক পত্রটিরও অনেক গ্রাহক হওয়া উচিত। কেন না, মেদিনীপুর বেশ বড় জেলা। যে-জেলায় প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহা ভক্তি-ভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কার্য্যক্ষেত্র ছিল, তথায় সাহিত্যানুরাগী লোকের অভাব হওয়া উচিত নয়। অধিবেশন উপলক্ষ্যে দেখিলাম, জেলার ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বসিবার জায়গা অন্য সকল শ্রোতাদের মধ্যে না হইয়া সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট মঞ্চে হইয়াছিল। তিনি বেশ সৌজন্যের সহিত কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ কবিতাদি পাঠের শেষ পর্য্যন্ত বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, তাঁহার ধৈর্য্য প্রশংসনীয়। তাঁহার ব্যবহার ভদ্রলোকের যেমন হওয়া উচিত, তেমনই হইয়াছিল। সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার নাই। প্রকাশ্য সব রকম সভাতে সকল লোকেরই নিমন্ত্রণ হইতে পারে, হওয়াও উচিত। যে-সভার যাহা কাজ, সে বিষয়ে উৎসাহী লোকের জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে বিশেষ সম্মানও অবিধেয় নহে। কোন ইংরেজের বাংলা সাহিত্যে অনুরাগ এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান ও কৃতিত্ব থাকিলে বাংলাসাহিত্যবিষয়ক সভাতেও তাঁহার বিশেষ স্থান থাকা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু এই ম্যাজিষ্ট্রেটটির তাহা আছে কি না, জানি না। শুধু ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া বাংলাসাহিত্যসভায় কাহারও বিশেষ নিমন্ত্রণ বা সম্মানের কারণ নাই। একজন বক্তা নিমন্ত্রিত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির অনুপস্থিতি এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন, যে, "দেশী হাকিমরা দেখুন, এই সভা সিডিশ্যাস্ নহে, স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত আছেন।" তাহাতে আমার মনে হইয়াছিল, তবে কি ম্যাজিষ্ট্রেট সমুদয় কার্য্যকলাপ বক্তৃতাদি নির্দ্দোষ হইতেছে কি না তাহা সাক্ষাৎ ভাবে জানিবার জন্য কিম্বা স্বীয় উপস্থিতির প্রভাব দ্বারা নির্দ্দোষ রাখিবার জন্য সভাস্থলে উপস্থিত আছেন? ইহাও মনে হইয়াছিল, যেমন গোবর জল ছড়া দিয়া অশুদ্ধ স্থানকে শুদ্ধ করা হয়, তেমনি আমাদের মত লোকদের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক হিসাবে অশুদ্ধ স্থানকে ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতি দ্বারা শুদ্ধ করা হইয়া থাকিবে।

আমি মৌখিক যাহা বলিয়াছিলাম, স্থানীয় কলেজের একজন অধ্যাপক তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইয়াছিলেন। মোটের উপর ঠিক্ই লিখিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের বেশ ক্ষমতা আছে।

মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছু পরে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী ইলসোবা-মোণ্ডলাই ইংরেজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে সেখানে গিয়াছিলাম। গ্রাম দুটি দেখিয়া কষ্ট বোধ হইয়াছিল। আগে তথাকার লোকদের অবস্থা ভাল ছিল বোধ হয়। এখন পুরাতন বেমেরামত বাড়ী ও অসংস্কৃত, পানায় আচ্ছাদিত ছোট বড় পুকুর বিস্তর। তা ছাড়া, আগাছা ও জঙ্গল সর্ব্বত্র। দুটি নলকূপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রামের লোকদের ভাল পানীয় জল পাইবার সুবিধা হইয়াছে। গ্রাম দুটির এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও, বাঙালী জাতির শিক্ষানুরাগ প্রবল বলিয়া এখানে গ্রামবাসীরা একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় চালাইতেছেন। তাহার ছাত্রসংখ্যা একশতের কিছু বেশী। ছাত্রবেতন বেশী নয়। বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যও অধিক পান না। তথাপি যে স্থানীয় লোকেরা ইহা চালাইতেছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে ও শিক্ষকদের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা। বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ীও নির্ম্মিত হইয়াছে। শিক্ষাডিরেক্টর ওটেন সাহেবের মত এই, যে, ছোট ছোট আর্থিকঅসচ্ছলতাগ্রস্ত অনেক ইস্কুল থাকা অপেক্ষা সেরূপ অনেকগুলা উঠাইয়া দিয়া বড় বড় কতকগুলি ইস্কুল রাখা উচিত। আমাদের মত সেরূপ নয়। যে সব ইস্কুলে ছাত্র অনেক বেশী, আমাদের দেশে সেসব ইস্কুলে ছাত্রেরা ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষকদের নিকট আবশ্যকমত উপদেশ, পরামর্শ পায় না; ছোট ইস্কুলে তাহা সম্ভব। অতএব, ছোট

ইস্কুলগুলিকে বেশী করিয়া সাহায্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখা উচিত। তাহার আরও একটা কারণ এই, যে, পল্লীগ্রাম-সকলের লোকদের অবস্থা এরূপ নহে, যে, তাহারা অনেক টাকা খরচ করিয়া শিক্ষার জন্য সহরে ছেলে পাঠাইতে পারিবে। ছোট ইস্কুলগুলিতে সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ ধনী লোকদের, সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ইলসোবা-মোণ্ডলাই স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল বোধ হইল না। ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত জায়গায় বালকবালিকাদের স্বাস্থ্য ভাল রাখা কঠিন। কিন্তু নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে ত চলিবে না। তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল করিয়া তাহাদিগকে শক্তিমান করিবার জন্য সকল রকম চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার কিছু চেষ্টা আছে দেখিলাম;—ম্যালেরিয়ানিবারিণী সমিতি একটি আছে।

ইলসোবা-মোণ্ডলাই যাওয়ার কিছুদিন পরে আমি রাজশাহী জেলার নওগাঁ গিয়াছিলাম। তথাকার যুবকসমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে, সেখানকার বাসিন্দা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সান্যাল মহাশয় আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। নওগাঁ জায়গাটি ছোট, কিন্তু অনেকগুলি ব্যাঙ্ক আছে। ইহার রাস্তাগুলি বর্ষায় নিশ্চয়ই খুব খারাপ হয়। রাস্তা ভাল করা এবং রাস্তায় ভাল করিয়া আলো দেওয়া দরকার। শুনিলাম, ইহার সমৃদ্ধির প্রধান কারণ গাঁজার চাষ ও ব্যবসা। গাঁজা একটা নেশা, কিন্তু ঔষধেও কাজে লাগে। সুতরাং যদি কখনও এদেশে সৌভাগ্যক্রমে কেবল ঔষধ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহার ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সকল রকম নেশার জিনিষ উৎপাদন ও বিক্রী নিষিদ্ধ হয়, তখনও গাঁজা কাজে লাগিবে এবং নওগাঁ একেবারে গরীব হইয়া যাইবে না। অন্য চাষও এখানে খুব আছে। জমী খুব উর্ব্বরা। নওগাঁয়ে একটি জিনিষ দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। এখানে হিন্দুমুসলমান যুবকরা এক সঙ্গে মিলিয়া দেশহিতকর কাজ করেন। সমিতির উৎসব উপলক্ষ্যে যে একটি মহাভারতীয় নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে সমিতির উৎসাহী ও কর্ম্মিষ্ঠ সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ শাহজাহান কবীর যুধিষ্ঠির সাজিয়াছিলেন। অন্য কয়েকজন অভিনেতার মত ইঁহারও অভিনয় বেশ হইয়াছিল। ইঁহার এক ভাই শ্রীমান্ হুমায়ুন কবীর উদীয়মান লেখক ও কবি, বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যুবক-সমিতি ব্যায়াম, সাহিত্যচর্চ্চা, বালিকাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া, অভিনয়, আবৃত্তি, রোগীর সেবা ও অন্য প্রকারে লোকহিতসাধন প্রভৃতি নানা কাজে হাত দিয়াছেন। এখানে গিরিজামোহন বাবুর পিতার নামে প্যারীমোহন বালিকাবিদ্যালয়, প্যারীমোহন টাউন হল ও লাইব্রেরী, প্রভৃতি আছে। বালিকাবিদ্যালয়টির বিশেষত্ব এই, যে, ইহার পরিচালকগণ সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন না, বিনাবেতনে হিন্দুমুসলমান সব সম্প্রদায়ের বালিকাদিগকে শিক্ষা দেন, এবং উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশের অনেক জায়গায়, এমন কি শান্তিনিকেতনেও দেখিয়াছি, ভাল আবৃত্তি করিতে পারে এরূপ বালকবালিকার সংখ্যা কম। সেইজন্য নওগাঁতে তিনটি বালিকাকে অপেক্ষাকৃত ভাল আবৃত্তি করিতে শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম। এখানে মহিলা ও বালিকাদের শিল্পপ্রদর্শনীটিও বেশ লাগিল। নওগাঁতে আর একটি ভাল জিনিষ দেখিলাম, নিকটবর্ত্তী বলিহারের জমীদার শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু রায় ও মহাদেবপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী সকল জনহিতকর কাজে যোগ দেন, কলিকাতায় বসবাস করিয়া আমোদপ্রমোদে টাকা উড়ান অপেক্ষা নিজ নিজ গ্রামে প্রজাদের মধ্যে বাস করাই শ্রেয় মনে করেন। আমি এক দিন বলিহার গিয়াছিলাম, এবং অনুরুদ্ধ হইয়া কিছু বলিয়াছিলাম। বলিহার যাইবার রাস্তা ভাল নয়। ইহার উন্নতি হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ সরকারী রাস্তা যাহা আমি এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, তাহা পদ্মা পার হইয়া আরিচাঘাট হইতে মাণিকগঞ্জ যাইবার রাস্তা। তাহার বর্ণনা পরে করিতেছি। নওগাঁর পর আমি মাণিকগঞ্জের সাহিত্য-সভার বার্ষিক উৎসবে গিয়াছিলাম। সেখানে শ্রীমান্ কালিদাস নাগ লণ্ঠনসহযোগে ছবি দেখাইয়া বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মাণিকগঞ্জ জায়গাটি ছোট, কিন্তু শিক্ষিত লোক অনেক আছেন। দুঃখের বিষয়, আমি কেবল রাত্রিসমেত ঘণ্টা ত্রিশ ছিলাম বলিয়া অধিকাংশের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে পারি নাই। এখানেও সাহিত্যোৎসাহ বেশ আছে। আমি তথাকার সাহিত্যোৎসাহী লোকদিগকে একটি ছোট মাসিক কাগজ চালাইবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। বার্ষিক মূল্য একটাকা রাখিয়া আনুমানিক চারিশত গ্রাহক পাইলেই ইহা চলিতে পারিবে। যেসব পুরাতন জিনিষের সংগ্রহ, যেমন অপ্রকাশিত গান, ছড়া, গাথা প্রভৃতি, কেবল গ্রামের লোকেদের দ্বারাই হইতে পারে, তাহা সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার দিকে বেশী নজর দেওয়া এইরূপ মাসিকের পরিচালকদের কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া, সাধারণতঃ মাসিকপত্রে যাহা থাকে, তাহাও থাকিবে। মাণিকগঞ্জে ঐতিহাসিক ৺রজনীকান্ত গুপ্তের বাড়ী। তা ছাড়া অধ্যাপক দীনেশ-চন্দ্র সেনেরও উহার সহিত সম্পর্ক আছে। সুতরাং মাণিকগঞ্জনিবাসীদের সাহিত্যসেবার নজীর আছে বলিতে হইবে। বিনা নজীরেও অবশ্য সাহিত্যসেবা করা চলে। ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতির কোন পূর্ব্বপুরুষ বা

প্রতিবেশী সাহিত্যিক ছিলেন বলিয়া জানা নাই। শেক্সপীয়রের পূর্ব্বপুরুষদের কেহ কখন কোন বহি লেখেন নাই। মানিকগঞ্জের সভার দুই অধিবেশনে একটি ছোট মেয়ে গান করিয়াছিল। শুনিলাম, এত ছোট মেয়ে সভায় গান করাতেও তথাকার কতকগুলি লোক অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ও প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন! নওগাঁ এবিষয়ে ভাল। সেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের সম্ভ্রান্ত হিন্দুবাড়ীর বালিকারা আবৃত্তি করিয়াছিল এবং কেহ কেহ সঙ্গীত-প্রতিযোগিতাতেও যোগ দিয়াছিল।

আরিচাঘাট হইতে মাণিকগঞ্জ ষোল মাইল পথ। যাইবার দিন কোনপ্রকারে মোটর বাস্ চলিয়াছিল ও তাহাতে ঘণ্টা-দুই আড়াই লাগিয়াছিল। যে দিন মানিকগঞ্জ হইতে আসি, সে দিন খুব বৃষ্টি হইতেছিল। এইজন্য তথাকার বন্ধুরা আমাদিগকে রওনা হইতে দিতে খুব অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আমাদের বিশেষ জরুরী কাজ থাকায় আসিতেই হইল। মোটর চলিবে না বলিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া লওয়া হয়। যাঁহারা আমাদের যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যথাসাধ্য সব রকম সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মেঘের উপর তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব ছিল না, এবং রাস্তা ভাল করা ও রাখার মালিকও তাঁহারা নহেন। রাস্তায় ৭।৮ জায়গায় আমাদিগকে গাড়ী হইতে নামিয়া আধ মাইল সিকি মাইল করিয়া খালি পায়ে কাদায় হাঁটিতে হইয়াছিল, এবং মধ্যে মধ্যে রাস্তা অপেক্ষা তাহার নীচের মাঠ ভাল থাকায় গাড়োয়ান গাড়ী মাঠে নামাইয়া এক আধ মাইল করিয়া হাঁকাইয়াছিল। বৃষ্টিতে কতকটা ভিজিয়া যাওয়া, এবং প্রায় দেওয়ালের মত খাড়া সাঁকোয় উঠা ও তাহা হইতে নামার সময় গাড়ীতে বসিয়া অনিচ্ছাকৃত কুস্তি করা বহু স্থানে ঘটিয়াছিল। এই প্রকারে অন্যূন পাঁচ ঘণ্টায় ষোল মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আরিচাঘাটে পৌঁছি। সেখানে পায়ের কাদা ধুইতে আমাদের এক একজনের দুই দুই ছোট বাল্‌তি জল লাগিয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যেরা, লোক্যাল বোর্ডের সভ্যেরা, ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনীয়ার, বা অন্য যে কেহ এই রাস্তাটি ভাল অবস্থায় রাখিবার জন্য দায়ী, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে মানিকগঞ্জের এই রাস্তায় গাড়ী টানিতে বা গাড়ী ঠেলিতে বলিলে তাঁহাদের মত মহামান্য ব্যক্তিদের অপমান করা হইবে; ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের নাম এ প্রসঙ্গে করি, এমন বেয়াদবী ত আমার নাই-ই। কিন্তু তাঁহারা যদি বর্ষার দিনে এক একবার এই রাস্তায় বাষ্পীয় যান অশ্বযানাদিতে আরোহণপূর্ব্বক সফর করেন, তাহা হইলে আশা করা যায়, যে, তাঁহাদের পৈত্রিক হাড় ক'খানা আস্ত থাকিতে পারে। কারণ, আমাদের আছে, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় কোন পীড়া হয় নাই। আরিচাঘাটে পারের জাহাজ অনেক দেরীতে আসায় আমরা পার হইতে পারিয়াছিলাম। যাইবার সময় ও আসিবার সময় আরিচাঘাটে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের কর্ম্মচারীরা থাকিয়া আমাদের জলযোগাদির সব রকম সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যেখানে যেখানে গিয়াছি, সর্ব্বত্র বাস ও আহারের বন্দোবস্ত খুব ভাল হইয়াছিল। ইহা বলিবার কারণ এই, যে, সর্ব্বত্রই আহারের বন্দোবস্ত প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী হইয়াছিল। তাহাতে এই দুঃখ ও লজ্জা হয়, যে, বিশেষ কিছু করিতে ত পারি না, অথচ ভদ্রমহোদয়েরা কত যত্ন ও ব্যয় করেন। আর একটা দুঃখও হয়, যে, যখন খাওয়া চলিত তখন এত নিমন্ত্রণ পাইতাম না। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালকে এই কথা বলায় তিনি বলিলেন, "রয়্যাল ট্র্যাজিডি!" পরিহাস ছাড়িয়া দিয়া ইহা বলা দরকার মনে করি, যে, বৃদ্ধদের পক্ষে সাদাসিধা অল্প ভোজ্যের বন্দোবস্তই যথেষ্ট এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল; এবং সাধারণতঃ আমাদের আতিথেয়তা ও পরিবেষণ-রীতির জন্য বড় অপচয় হইয়া থাকে।

মফঃস্বলে গান শিখাইবার ও শিখিবার বন্দোবস্ত ভাল নাই। যেখানে যেখানে গান শুনিলাম, সেখানেই আমার মত আনাড়ির কানেও পরিচিত গান বেসুরা লাগিল। কলিকাতাতেও যে এরূপ না হয়, তাহা নহে। তথাপি এখানে গান শিক্ষার ও গানের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। ইহাকে কেবলমাত্র সৌখীনতার একটা অঙ্গ মনে না করিয়া এবিষয়ে প্রগাঢ় গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন।

আমি যে চারিটি জায়গায় গিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে তিন জায়গায় থিয়েটারের গৃহে সভা হইয়াছিল। এই ঘরগুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত, যে, ভাল করিয়া বায়ুচলাচল হয় না। অনেক লোক একত্র হইলে বায়ু দূষিত হয়। দূষিত বায়ুর মধ্যে, দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়, কষ্টের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। তা ছাড়া, বায়ু দূষিত হইলে তাহার মধ্যে বক্তৃতা, অভিনয়, গান আবৃত্তি যতটা ভাল হইতে পারিত, তাহা অপেক্ষা অন্ততঃ কিছু মন্দ হয়। এইজন্য ঘরগুলির এ বিষয়ে উন্নতি দরকার। আর এক বিষয়ে উন্নতির আবশ্যক আছে। ঘরগুলিতে মহিলাদের বসিবার জায়গা বেশীর ভাগ উপরে ও পশ্চাৎদিকে, এবং কিছু জায়গা উপরে দুই পাশে। ইহাতে একটি মহিলাও সামনের পুরুষদের সমান সুবিধা পান না। এবং মোটের উপর সমুদয় মহিলা পুরুষদের চেয়ে কম সুবিধা পান। অবরোধ-প্রথা প্রচলিত থাকায় আমাদের দেশের মহিলারা একঘেয়ে জীবন যাপন করেন, বাহিরের জগতের অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছু হয় না। পুরুষদের জীবন তাঁহাদের চেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ।

অতএব মহিলারা ন' মাসে ছ' মাসে যদি কোথাও কিছু দেখিতে শুনিতে যাইবার একটু সুযোগ পান, সে ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে পুরুষদের চেয়ে অধিক সুবিধা দিলে বা সমান সুবিধা দিলে খুব বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখান হইবে, বা তাঁহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, মনে হয় না। যাহাতে মেয়েদের দেখিবার শুনিবার সুবিধা হয়, মফঃস্বলের পূর্ব্বোক্ত থিয়েটার ঘরগুলির তদ্রূপ পরিবর্ত্তন এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার সাধ্যাতীত নহে।

—

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া রসায়নী বিদ্যার অধ্যাপকতা করিতেন। পরে ঔপন্যাসিক ও নাটককার হয়েন। তাঁহার অনেক নাটক রঙ্গমঞ্চে বহুদিন ধরিয়া বারবার অভিনীত হইত। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হইল। শিক্ষা একরূপ এবং জীবনের প্রধান কাজ অন্যরূপ, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ ব্যাপারের তিনি একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল নহেন। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কলেজে শিখিয়াছিলেন প্রধানতঃ বিজ্ঞান, এবং জীবনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত রসায়নীবিদ্যার অধ্যাপকও ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাম থাকিবে সাহিত্যিক বলিয়া।

—

লালা স্যার গঙ্গারাম

লালা স্যার গঙ্গারাম পঞ্জাবের একজন বিখ্যাত লোক। সম্প্রতি বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সেখানে রাজকীয় কৃষি কমিশনের সভ্যরূপে গিয়াছিলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া লণ্ডনে হিন্দুমতে হইয়াছে। তিনি বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার ও কৃষিবিৎ ছিলেন। তিনি নানা-প্রকার সৎকাজে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিধবাদের বিবাহদান ও অন্য নানাপ্রকারে তাহাদের সাহায্য করা প্রধান। লাহোর বিধবাবিবাহ সহায়ক সভার পণ্ডিত দীননাথ সিদ্ধান্তালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন তাঁহার সম্বন্ধে বলেন :—

"তিনি একজন বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজের, বিশেষতঃ বিধবা ও অন্য স্ত্রীলোকদিগের উন্নতিকল্পে ৩০ লক্ষ টাকারও অধিক অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা একটি। এই সভার বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতে প্রায় ৭০০ শাখা আছে। হরিদ্বার, মথুরা ও লাহোরে ৩টি বিধবা-আশ্রম আছে। গত ১৩ বৎসরের মধ্যে এই সভা হইতে হিন্দুসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর ১২ হাজারের অধিক বিধবার বিবাহ হইয়াছে। বারাণসী, হরিদ্বার, বৃন্দাবন এবং অন্যান্য তীর্থস্থানে বাঙ্গালী বিধবাদের অবস্থা কিরূপ, সে বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। তাহাদের দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গলার অনেক খ্যাতনামা নেতার নিকট পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে কোন সাড়া না পাওয়ায় তিনি ১৯২৫ সালে কলিকাতায় লাহোর-সভার একটি শাখা খুলেন। এই শাখা বাংলার প্রকৃত হিত করিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে রাজকীয় কৃষিকমিশনের সদস্যরূপে তিনি যখন এখানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নবদ্বীপের বিধবাদের দুঃখের কথা তাঁহাকে জানান হয়। তাহাদের দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া স্যার গঙ্গারামের হৃদয় আর্দ্র হয় এবং তিনি নবদ্বীপে একটি বিধবা-আশ্রম খুলিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। এই মহান্ দয়ার্দ্র ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার জন্য আমরা বাঙালী হিন্দুদের নিকট তাঁহাদের বিধবা ভগ্নী ও কন্যাদের দুর্দ্দশা দূর করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি।"

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই অনুরোধের সমর্থন করিতেছি।

—

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা

রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্যে মালয় উপদ্বীপ শ্যাম কাম্বোজ যবদ্বীপ ও বলী দ্বীপ যাইতেছেন, তাহা পাঠকেরা অবগত আছেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে বৃহত্তর ভারত পরিষদের উদ্যোগে এক সভার অধিবেশন হয়। বৃহত্তর ভারত পরিষদের যে কাজ, সেরূপ কাজ করিবার সঙ্কল্প প্রথমে তাঁহারই মনে উদিত হয় ;—পরিষদের ও ইন্‌ষ্টিটিউটের সভার সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বলেন, যে, দশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এমন একজন শিক্ষিত যুবক জুটাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন যিনি যবদ্বীপ ও বলী-দ্বীপের ভাষা শিখিয়া তথায় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ ও তাহার ইতিহাস রচনার সাহায্য করিতে পারিবেন। অতএব পরিষদই যে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহা যথাযোগ্য কাজ হইয়াছিল। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার তাঁহাকে বৃহত্তর ভারতের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন কার্য্যে পুরোধা বলিয়াছেন—চীনজাপানে ভ্রমণ করিয়া তিনি এই কাজের সূত্রপাত আগেই করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কার্য্যতঃ যাহা ছিলেন, বৃহত্তর ভারতপরিষদের সভ্যত্ব স্বীকার করিয়া নামেও সেই পুরোধা পদবী গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন।

সভারম্ভে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবির কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া ও মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা ছুঁয়াইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন ও তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দেন। তাহার পর তিনি একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। তিনি নীচু গলায় কথা বলাতে বৃহৎ হলে তাঁহার কথা শুনা যায় নাই, সুতরাং কোন কাগজে তাঁহার বক্তৃতা বাহির হয় নাই। তিনি প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখান,

কত বাঙালী ধর্ম্মোপদেষ্টা স্বদেশের মায়া কাটাইয়া ও স্বদেশের হিতসাধনার্থ দেশে থাকিবার প্রবল কারণ সত্ত্বেও তিব্বৎ মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কবির সংস্কৃত প্রশস্তি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ীও স্বরচিত সংস্কৃত কবিতা পাঠ করেন। পনর শত বৎসর পূর্ব্বে কুমারজীব চীনে গিয়া চীনভাষায় যে-সব কবিতা রচনা করেন, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাহার একটি, চীন অক্ষরে লিখিয়া ইংরেজী অনুবাদ সহ কবিকে উপহার দেন। অতঃপর অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, ইংরেজীতে কেন বলিবেন বাংলায় তাহার কারণ দেখাইয়া, ইংরেজী বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহাতে তিনি কবিকে পূর্ব্বতন ঋষিদের স্থানাভিষিক্ত অধুনাজীবিত একমাত্র ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। এই বক্তৃতা ইংরেজী বহু দৈনিকে বাহির হইয়াছে। ইহার পর প্রবাসী-সম্পাদক কিছু বলিবার পর কবি অভিনন্দনের উত্তর দেন। এই উত্তর বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত তল্লিখিত প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে। কবির বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রচলিত রীতি অনুসারে ধন্যবাদ প্রদান উপলক্ষ্যে কয়েকটি সুচিন্তিত কথা বলেন। সর্ব্বশেষে কবি বৃহত্তর ভারত পরিষদের যুবা কর্ম্মীদিগকে সস্নেহ আশীর্ব্বাদ করেন।

—

রবীন্দ্রনাথের যবদ্বীপ যাত্রা

২৭শে আষাঢ় ১২ই জুলাই রবীন্দ্রনাথ হাওড়া ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়াছেন। ট্রেন ছাড়িবার আগে ও ছাড়িবামাত্র সিনেমার জন্য ছবি লওয়া হইয়াছে। ২৯ শে আষাঢ় তিনি মান্দ্রাজ হইতে একটি ফ্রেঞ্চ জাহাজে সিঙ্গাপুর যাইবেন। সেখানে পৌঁছিতে ছয় দিন লাগিবে। তাঁহার সঙ্গে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব-ভারতী কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষ চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর এবং চিত্রবিদ্যাশিক্ষার্থী শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা যাইতেছেন। হল্যাণ্ড দেশের সঙ্গীতজ্ঞ শান্তিনিকেতন-প্রবাসী ডাঃ বাকে এবং তাঁহার পত্নী আগেই রওনা হইয়াছিলেন। তাঁহারা রেঙ্গুনে নামিয়া তথাকার বিখ্যাত প্যাগোডা (বৌদ্ধ মন্দির) প্রভৃতি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। ফিরিবার মুখে সংগীতের আনন্দ রেঙ্গুনবাসী বন্ধুদিগকে দিবার অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন।

—

ভারতশাসনসংস্কারবিষয়ক রাজকীয় কমিশন

নানা কাগজে এইরূপ জল্পনা চলিতেছে, যে, ১৯২৯ সালে ভারতশাসনসংস্কারআইন পরিবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত যে কমিশন বসিবার কথা, তাহা তৎপূর্ব্বে শীঘ্রই বসিবে। বিলাতের রক্ষণশীল গবর্মেণ্টের পর শ্রমিক দলের লোকেরা শাসনক্ষমতা পাইতে পারে। পাছে তাহারা ভারতবর্ষকে বেশী কিছু আত্মশাসন-ক্ষমতা দিবার উদ্দেশ্যে কমিশনে খুব ন্যায়বান্ ও সদাশয় সভ্য নিযুক্ত করে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি রক্ষণশীলেরা ১৯২৯এর আগেই কমিশন বসাইবে মনে হইতেছে। উহার সভাপতি ও সভ্যবৃন্দ কাহাদের হওয়া উচিত, সে বিষয়ে নানা কাগজে নানা রকম মত প্রকাশিত হইতেছে। বিলাতী কতকগুলা কাগজ এই ধুয়া তুলে, যে, উহার সভ্য কেবল এইরূপ ইংরেজদের হওয়া উচিত, যাহারা কখনও ভারতে কাজ করে নাই কিম্বা ভারতবর্ষের সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, এবং ভারতীয় কাহাকেও ইহার সভ্য করা উচিত নয়! ভারতবর্ষের নুন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যে না-খাইয়াছে, এমন ইংরেজ খুঁজিয়া বাহির করা সোজা নয়; আর ভারতের নিমকের এমনই গুণ, যে, যে-সব ইংরেজ তাহা খায় তাহাদের অনেকেই ভারতবর্ষের (বদ্-) গুণ গায়।

রাজকীয় কমিশনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী ও শাসনকার্য্যের উৎকর্ষবিধান। কি হইলে যে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য খুব ভাল হইতে পারে, তাহা ভারতীয়েরা যেমন জানে ও বলিতে পারিবে, তেমন আর কেহ নহে। আমাদের দেশের কাজ সকলের মঙ্গলের জন্য নির্ব্বাহিত হওয়ায় আমাদের যতটা স্বার্থ আছে, এবং আগ্রহ থাকিবার কথা, ইংরেজদের ততটা থাকিবার কথা নহে; বিশেষতঃ যখন তাহাদের স্বার্থের সহিত আমাদের মঙ্গলের বিরোধ রহিয়াছে। সেইজন্য আমাদের বিবেচনায় কমিশনের, সব না হউক, প্রায় সব

সভ্যই ভারতীয় হওয়া উচিত—অবশ্য প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন জো-হুকুমদের বাদ দিয়া। ইংরেজরা অবশ্য বলিবে, ভারতীয়েরা নিজেদের দিকে টানিয়া কথা বলিবে অতএব তাহাদিগকে সভ্য নিযুক্ত করা উচিত নয়। কিন্তু স্বদেশের দিকে ঝুঁকিয়া কথা বলাটা ত অপরাধ নয়। যদি স্বদেশের জন্য কিছু করিতে গিয়া বিদেশীর নিজের দেশের জমী ভূগর্ভস্থ সম্পত্তি ও অন্য ধন, তাহাদের নিজের দেশে তাহাদের কোন অধিকার, এই সকলে হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহা দোষের বটে। কিন্তু আমরা ত তাহা করিতে যাইতেছি না।

তবে, যদি ইংরেজরা এমন একটি কমিশন চান, যাহার সভ্যদের ভারতীয়দের স্বার্থ সম্বন্ধে অনুকূলতা প্রতিকূলতা কিছুই নাই, তাহা হইলে তাহা সম্ভব কিনা বলিতে পারি না। সেরূপ সভ্য পাইতে হইলে রাজনৈতিকজ্ঞানসম্পন্ন এমন একটি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য জাতি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহার লোকেরা বাণিজ্য দ্বারা ভারতবর্ষকে শোষণ করিতেছে না, বা করিতে চায় না, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ভারতবর্ষের পণ্যশিল্পবাণিজ্যিক অধীনতা স্থায়ী করিতে এবং সেই হেতু পরোক্ষভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাও স্থায়ী করিতে ইচ্ছুক নহে। কারণ, আমাদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকিলে আমরা ইচ্ছা করিলে নিজেদের পণ্যশিল্প-বাণিজ্যিক অধীনতারও উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিব। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ অনুকূলতা-প্রতিকূলতা-বিহীন, ইংরেজের লোভভয়প্রদর্শনের প্রভাবের অতীত এইরূপ কোন জাতি থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে সমুদয় সভ্য নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি হইবে না।

গণিকালয় হইতে বালিকাদের উদ্ধার

দুশ্চরিত্র লোকদের জন্য বেশ্যারা নিজেদের ব্যবসা বজায় রাখিবার নিমিত্ত ছোট ছোট মেয়ে সংগ্রহ করে, এবং তাহারা কিছু বড় হইলে তাহাদিগকে পাপকার্য্যে নিযুক্ত করে। অপ্রাপ্তবয়স্কা এইরূপ বালিকাদিগকে গণিকালয় হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা পুলিশের আছে, এবং পুলিশ অনেককে উদ্ধার করিয়াও থাকে। ইহা পুলিশের লোকদের সৎকাজ। কিন্তু তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া কোথায় রাখা যাইবে? তাহাদের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন নাই, থাকিলেও তাহাদের সন্ধান কেহ জানে না, সন্ধান জানিলেও তাহারা হিন্দুসমাজভুক্ত হইলে অভিভাবকদের গৃহে স্থান পায় না। খৃষ্টীয় মিশনারীরা তাহাদিগকে আশ্রয় ও শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে কথা উঠিবে, রাজশক্তির সাহায্যে পরোক্ষভাবে খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা বাড়ান হইতেছে। বস্তুতঃ, ইহা ঠিকও বটে, যে, নাবালক ছেলেমেয়ে যে-ধর্ম্মসম্প্রদায়ে জাত, সাবালক হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদের ভিন্ন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কোন পন্থা না-করা ভাল;—তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে লইয়া যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, সে কথা স্বতন্ত্র। তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, গণিকালয় হইতে পুলিশ কর্ত্তৃক আনীত স্বস্ব সম্প্রদায়ের বালিকাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজ তাহা এখনও করেন নাই। জজ গ্রীভস্ সাহেবের চেষ্টায় এইরূপ বালিকাদের জন্য একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব লাট লিটনের চেষ্টা সত্ত্বেও, তাহার জন্য যথেষ্ট টাকা উঠে নাই। তখন লর্ড লিটন কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তকে ইহার জন্য একটি ফণ্ড্ খুলিতে ও তাহার নিমিত্ত টাকা সংগ্রহ করিতে বলেন। বঙ্গের বর্ত্তমান লাটকে সভাপতি করিয়া সে দিন কলিকাতার টাউন হলে এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বসাধারণের সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

বিদেশী রাজশক্তির কোন পরোক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকেও এই অত্যাবশ্যক সদনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট টাকা উঠিলে হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাইত এবং সম্মানরক্ষা হইত। কিন্তু হিন্দুসমাজের জাগরণ না হওয়ায় তাহা যখন হয় নাই, তখন অন্য উপায়েও কাজ উদ্ধার করিতে আপত্তি করিলে চলিবে না। এখন মেয়রের ফণ্ডে যথেষ্ট টাকা উঠিলে একটা সামাজিক অকল্যাণ বিনাশের একটি উপায় কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বিত হইতে পারিবে। অনুমিত হইয়াছে, যে, কেবল কলিকাতা সহরেই দুই হাজার অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা গণিকালয়গুলাতে আছে। তাহাদের সকলকে সৎপ্রভাবের মধ্যে রাখিয়া

সুশিক্ষা দিতে হইলে অনেকগুলি আশ্রম চাই এবং অনেক টাকা চাই। কিন্তু বৃহত্তম ও কঠিনতম কার্য্যেরও আরম্ভ ক্ষুদ্র ভাবেই হইয়া থাকে। অন্ততঃ একটি আশ্রমও আপাততঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে আশান্বিত হইতে পারা যাইবে।

আশ্রমে পালিতা ও শিক্ষিতা বালিকাদের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহাও চিন্তনীয়। কেহ কেহ শিক্ষা পাইয়া অবিবাহিতা থাকিয়া শিক্ষা, শুশ্রূষা, ডাক্তারী প্রভৃতি কাজ করিতে পারে বটে। কিন্তু নরনারী উভয়ের অধিকাংশের পক্ষে যাহা সাধারণ ব্যবস্থা—বিবাহ—তাহা ইহাদের জন্যও না করিতে পারিলে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইবে না। খৃষ্টিয়ান সমাজে ও মুসলমান সমাজে এরূপ বালিকার বিবাহে বিশেষ কোন বাধা নাই। হিন্দুসমাজে বাধা রহিয়াছে। তাহারা কোন্ জা'তের মেয়ে প্রথমত তাহা ঠিক্ করিতে হইবে। তাহা স্থির হইলে সেই জা'তের পাত্র স্থির করিতে হইবে। কিন্তু এখন ভিন্ন ভিন্ন জা'তের (caste এর) বরকন্যার বিবাহ বৈধ করিবার আইন হইয়াছে; তাহারা হিন্দু থাকিয়াই বিবাহ করিতে পারে। তাহা সুসাধ্য করিবার জন্য অবশ্য সামাজিক মত অনুকূল হওয়া দরকার। তাহা গঠিত করিবার জন্য সমাজনেতা ও সাংবাদিকগণ চেষ্টা করুন। যাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছকটিকের গল্পটি জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন, যে, সমাজের ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি কোন জাতিভুক্তা নহেন অথচ শিক্ষিতা ও স্বভাবগুণে শ্রদ্ধেয়া বসন্তসেনার সহিত শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ চারুদত্তের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং সেকালে, যখন হিন্দুরা এখনকার চেয়ে হিন্দুনামের অধিকতর যোগ্য ছিলেন, এইরূপ বিবাহ হইতে পারিত।

—

নারীরক্ষা

বাংলা দেশে যে সকল বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কা নারী ধর্ষিতা হন, এবং এখনও যেরূপ অত্যাচারের সংবাদ প্রত্যহ খবরের কাগজে দেখা যাইতেছে, তাহার সম্বন্ধে কলিকাতার মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আগে কি মত ছিল, তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। গণিকালয় হইতে উদ্ধৃতা বালিকাদের আশ্রমের জন্য টাকা তুলিবার নিমিত্ত টাউন হলের সভায় তাঁহার বক্তৃতায় দেখিতেছি, নারীনিগ্রহের প্রকৃত স্বরূপ এখন তিনি স্বীকার করিতেছেন, এবং তাহা দমনের জন্য বঙ্গের লাটের সাহায্য চাহিতেছেন। মেয়র নারীধর্ষক নরপিশাচদের সশ্রম কারাদণ্ডে সন্তুষ্ট নহেন, অধিকন্তু প্রকাশ্যস্থানে তাহাদের বেত্রাঘাত দণ্ডের ব্যবস্থা চান। সশ্রম কারাদণ্ডের উপর, নারীধর্ষকদিগের নৈতিক উন্নতির জন্য আমরা তাহাদের ভাসেক্টোমি (Vasectomy) নামক অস্ত্রচিকিৎসার সমর্থন করি। আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্রে আইন অনুসারে ইহার ব্যবস্থা আছে। স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, টাউন হলের সভায়, ধর্ষিতা নারীদিগকে গবর্ন্মেণ্ট হইতে উকীল ব্যারিষ্টারের সাহায্য দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম।

নারীহরণ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি নানা প্রকার নারীনিগ্রহ মুসলমানদের দ্বারা বেশী হয় বটে; কিন্তু অনেক হিন্দুও নারীধর্ষণ করে। মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার অনেক হয়। হিন্দুর দ্বারা মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার একটিও হয় না, এমন নয়। খৃষ্টিয়ান ফিরিঙ্গী ও ইংরেজের দ্বারাও এইরূপ দুষ্কার্য্য হয়। ইহা দমন করিবার জন্য সকল জাতির ও ধর্ম্মের সৎ লোকদের সম্মিলিত চেষ্টা আবশ্যক। সকল মুসলমান এরূপ কাজের সমর্থন করে, মনে করা ঠিক্ নয়। কুষ্টিয়ার কুপ্রসিদ্ধ নারীনিগ্রহব্যাপারে নারীদের রক্ষার জন্য সফল চেষ্টা কোন হিন্দু করে নাই, মধু শেখ নামক একজন মুসলমান করিয়াছিল। ঢাকায় একজন হিন্দু জমীদারের পত্নীকে অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য এক মুসলমান যুবক নিজেকে বিপন্ন করিয়া চেষ্টা করিয়াছিল; তাহার নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। নারী রক্ষার চেষ্টা অন্যত্রও মুসলমানেরা কোথাও কোথাও করিয়াছে।

মুসলমানেরা, সম্ভব হইলে, ধর্ষিতা হিন্দুনারীকে বিবাহ করিয়া বা বিবাহ দিয়া নিজেদের সমাজে স্থান দেয়, এবং তাহাতে তাহাদের সংখ্যা বাড়ে, ইহা নারীধর্ষণের পক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্ত লোকদের প্রলুব্ধ হইবার ও প্রশ্রয় পাইবার একটা কারণ। অন্য দিকে হিন্দুসমাজে ধর্ষিতা নারীরা

পরিত্যক্তা হয়। তাহাতে তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার করা হয়, এবং হিন্দুর সংখ্যা কমে। এখন কোন কোন স্থলে ধর্ষিতা হিন্দুনারী হিন্দুসমাজে স্থান পাইতেছে। আত্মহত্যা বা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে ধর্ষিতা নারীদিগকে বাধ্য করা অপেক্ষা তাহাদিগকে সমাজে স্থান দেওয়া শ্রেয়ঃ ও অবশ্যকর্ত্তব্য।

নারীনিগ্রহ বন্ধ করিতে হইলে হিন্দুসমাজের অন্তঃপুরে নারীর উপর অত্যাচারও বন্ধ করিতে হইবে। তাহার এক উপায় শিশুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করিয়া দৈহিক মানসিক ও নৈতিক সুশিক্ষা দ্বারা বিবাহের পূর্ব্বেই নারী-দিগের দৈহিক ও মানসিক বল পূর্ণ বিকশিত হইবার সুযোগ দেওয়া। তাহা হইলে তাহাদের উপর অত্যাচার কম হইবে। অত্যাচারের চেষ্টা হইলে তাহারা বাধা দিতে অধিক সমর্থ হইবে। অন্তঃপুরে নিগ্রহ যে কোন কোন স্থলে মুসলমান ও হিন্দু দুর্বৃত্তদিগকে অন্তঃপুরিকা-দিগকে প্রলুব্ধ ও প্রতারিত করিবার সুযোগ দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কখন কখন যে হিন্দু অন্তঃপুরিকারা আত্মহত্যা করে, তাহার একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত সে দিন রেলেতে মাথা পাতিয়া দুটি বধূর আত্মহত্যার চেষ্টা; একটির মাথা কাটা গিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়,অন্যটি গুরুতর আঘাত পায়। হিন্দুনারী রক্ষাকার্য্যে খুব বেশী উৎসাহী ও পরিশ্রমী একজন প্রবীণ লোকের নিকট হইতে আমরা জানিয়াছি, যে, তিনি এমন ঘটনার বিষয় অবগত হইয়াছেন, যে, "বিধবা, এমন কি সধবা হিন্দুনারী আত্মীয়দের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছায় মুসলমানের সহিত ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে।" মুসলমান দুর্বৃত্তদের পক্ষে ওকালতী করিবার কিম্বা হিন্দু সমাজের ঘাড়ে অন্যায় করিয়া কলঙ্কের বোঝা চাপাইবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই। কিন্তু নারীদের মঙ্গলের জন্য আমাদের লজ্জা ও কলঙ্কের কথা এই নিমিত্ত বলিতে হইতেছে,যে, হিন্দুর নিজের ঘর সামলানও দরকার; কেবল মুসলমানকে গালি দিলে চলিবে না। অন্তঃপুরে অত্যাচার মুসলমান নারীদের উপরেও হয়; কিন্তু স্থল-বিশেষে অত্যাচরিতা মুসলমান নারী তালাক দিয়া অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইতে পারেন; কিন্তু হিন্দু নারীর সে উপায় নাই। নিরুপায় যে, তাহার প্রতি খুব সহৃদয় খুব ন্যায়ানুগত, খুব শিষ্ট ব্যবহার করা প্রকৃত ভদ্রতা ও সাত্ত্বিকতার লক্ষণ। এইজন্য নিরুপায় হিন্দু অন্তঃ-পুরিকাদের প্রতি ব্যবহার সকল দেশের সকল জাতির নারীদের প্রতি ব্যবহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত।

নারীরক্ষার জন্য পুরুষের পৌরুষ চাই, তাহা নানা কাগজে ও বক্তৃতায় শতশতবার বলা হইয়াছে। নারী-রক্ষার জন্য নারীশক্তির পূর্ণ বিকাশ যে দরকার, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। তন্নিমিত্ত অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন আবশ্যক। তাহার কতকগুলি কারণ আমরা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণতঃ ইহা ঠিক্ কথা, যে, বেশীর ভাগ সময় ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে নারীরা জড়সড় ও আত্মরক্ষায় অসমর্থই থাকিবেন; অধিকন্তু তাঁহারা যে পুরুষদের লোভের 'জিনিষ এই চিন্তাটা পুরুষদের ও তাঁহাদের মনে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। ইহা আন্তরিক সাত্ত্বিকতা ও বাহ্য সামাজিক সুনীতির অনুকূল নহে। এসব কথা বিস্তারিত ভাবে জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে লিখিয়াছি। পাঠকদের মনে না থাকিলে আর একবার পড়িবেন। পুনরুক্তি করিব না।

—

অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে কমাল পাশার মত

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে ঐ সকল কথা প্রকাশিত হইবার পর আমরা, মুস্তাফা কমাল পাশা কেন তুরস্কে পর্দ্দা ও অবগুণ্ঠন প্রথা তুলিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণগুলি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে টিট্‌বিট্‌স্ হইতে উদ্ধৃত দেখিয়াছিলাম। তাহা এই :—

The wearer of the veil not only feels that she is the incarnation of virtue and modesty, but that the women without the veil are immodest and indecent. The veil has become a cover for hypocrisy, which I shall tear to shreds.

The veil is insanitary. Very few Turkish women are ruddy-complexioned. Hiding their faces for centuries, they have grown sallow and palefaced.

My second reason for outlawing the veil is moral. In Anatolia our men never saw a woman outside of their own immediate families of Christian women. I have lived in the European provinces of Turky where Turkishmen were accustomed to see a little more of women, and I have lived in

Western countries, where men see women every hour of the day.

My observation convinced me that among those three classes of men, those of our Anatolian provinces who came into very little contact with women, were by nature more sensuous.

My third charge against the veil is that it has always shielded the criminal. For years some of the most cunning criminals have issued forth, masqueraded in the commodious *zai* (flowing white robe worn by Turkish women), heavy veil completely hiding their identity. In the three years of the Republic's life, the law has apprehended four thousand criminals, who were operating behind a woman's veil.

Any woman apprehended wearing a veil is charged with misconduct (punishable by a fine); a second offence is considered as a misdemeanour (punishable by a fine or imprisonment, or both); and a third offence is considered a felony punishable by death—"Titbits."

তাৎপর্য্য। অবগুণ্ঠিতা নারী কেবল যে মনে করেন, যে, তিনি মূর্ত্তিমতী সতীত্ব ও লজ্জাশীলতা তাহা নহে কিন্তু ইহাও ভাবেন, যে, অনবগুণ্ঠিতা নারীরা লজ্জাহীনা ও অভব্যা। অবগুণ্ঠন ভণ্ডামির আবরণ হইয়াছে বলিয়া আমি তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব।

অবগুণ্ঠন অস্বাস্থ্যকর। তুর্ক নারীদের মধ্যে অল্পেরই মুখের রং স্বাস্থ্যের জন্য লাল টক্‌টকে। বহুশতাব্দী ধরিয়া তুর্কনারীদের মুখ লুকান থাকায় তাহারা ফ্যাকাসে এবং ম্লান পীতবর্ণ হইয়াছে।

অবগুণ্ঠনকে বেআইনী করিবার আমার দ্বিতীয় কারণ নৈতিক। আনাটোলিয়াতে আমাদের পুরুষেরা তাহাদের অব্যবহিত প্রতিবেশী খৃষ্টিয়ান পরিবারের মেয়ে ছাড়া স্ত্রীলোক কখন দেখে না [অবশ্য নিজেদের পরিবার ছাড়া]। তুরস্কের যে-সব ইউরোপীয় প্রদেশে তুর্ক পুরুষেরা আরও একটু বেশী স্ত্রীলোক দেখিতে অভ্যস্ত, তথায় আমি বাস করিয়াছি। এবং পাশ্চাত্য দেশেও আমি বাস করিয়াছি যেখানে পুরুষেরা প্রত্যহ প্রতি ঘণ্টায় স্ত্রীলোক দেখে।

আমার পর্য্যবেক্ষণ আমার এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাইয়াছে, যে, উক্ত তিন শ্রেণীর পুরুষদের মধ্যে আমাদের আনাটোলিয়া প্রদেশের পুরুষেরা, যাহারা স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে খুব কম আসে, তাহারাই স্বভাবতঃ অধিকতর ইন্দ্রিয়সুখ-পরতন্ত্র।

অবগুণ্ঠনের বিরুদ্ধে আমার তৃতীয় অভিযোগ, ইহা, আইনদ্রোহী অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার ও শাস্তি হইতে রক্ষা করে। বহু বৎসর ধরিয়া চতুরতম বদমায়েসদের অনেকে সুবিধাজনক তুর্কনারীদের শ্বেতপরিচ্ছদ পরিয়া অবগুণ্ঠনে আত্মগোপন করিয়া দুষ্কর্ম্মের জন্য বিচরণ করিয়াছে। তুরস্ক-সাধারণতন্ত্রের তিন বৎসরের জীবনের মধ্যে আইন চারি হাজার বদমায়েসকে গ্রেপ্তার করিয়াছে যাহারা নারীর অবগুণ্ঠনে ছদ্মবেশী হইয়া কাজ করিত।

কোন নারী অবগুণ্ঠন ব্যবহারে ধৃতা হইলে জরিমানার দ্বারা দণ্ডিত অপরাধে অভিযুক্ত হয়। এই দ্বিতীয় অপরাধ করিলে জরিমানা বা কারাদণ্ড, বা উভয়ই হয়। তৃতীয়বার এরূপ অপরাধ করিলে মৃত্যুদণ্ড হয়।

তুরস্কে এরূপ কড়া আইন কেন হইয়াছে, তাহা আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও এবং তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে না পারিলেও, অবরোধ ও অবগুণ্ঠন যে তুরস্কের খুব অনিষ্ট করিয়াছে, ইহা ঠিক, নতুবা কমাল পাশা এত কঠোর হইতেন না, তাহা বুঝিতে পারি।

অবগুণ্ঠনের সাহায্যে এদেশেও বদমায়েসরা দুষ্কার্য্য করে কি না, তাহা আমাদের এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যিনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের বিশ্বস্ত কেরাণী ছিলেন। তিনি বলিলেন, এরূপ অপরাধ অনেক হয় ও কিছু ধরা পড়ে।

—

বাংলার রাজস্বে বাংলার অংশ

আমরা কয়েক বৎসর হইতে মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে দেখাইয়া আসিতেছি, যে, বাংলার লোকসংখ্যা ও আদায়ী রাজস্ব বেশী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে সরকারী খরচের জন্য বড় বড় সব প্রদেশের চেয়ে কম টাকা রাখিতে দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সংখ্যাতেও এক প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা ছাপা হইয়া গিয়াছে। আজ ২৯ শে আষাঢ়ের কাগজে দেখিতেছি, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাজনসভার পক্ষ হইতে বঙ্গের লাটকে অন্যান্য কথার মধ্যে এই রূপ কথা বলিয়াছিলেন এবং লাটসাহেব তাহার উত্তরে বলেন :—

There is, I think, general agreement that Bengal has cause for complaint of the financial settlement arrived at under what is known as the Meston Award. As regards finance the experience of this Presidency during the years of the Reforms has more and more demonstrated that it is impossible to be content with a theoretical demarcation of spheres of taxation, provincial and central. Practical working has shown that for the proper administration of this Industrial Province some share of the revenues now allotted to central finance must be allocated to the Province.

তাৎপর্য্য। মেস্টন বিলি নামে পরিচিত আর্থিক বন্দোবস্তে যে বঙ্গের অভিযোগের কারণ আছে, সে বিষয়ে, আমি মনে করি, সাধারণ ঐকমত্য আছে। আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে শাসনসংস্কার আইনের কয় বৎসরে বঙ্গের এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে, যে, রাজস্বের কোন্ কোন্ বাবদ প্রাদেশিক আর কোন্ গুলাই বা সমগ্রভারতীয় হইবে, তদ্বিষয়ে কোন রকম একটা মতবাদঅনুযায়ী পার্থক্যরেখা টানিয়া সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব। কার্য্যলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে, যে, পণ্যশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র এই প্রদেশের কার্য্যনির্ব্বাহ যথাযোগ্য ভাবে করিতে হইলে, ভারত-গবর্ন্মেণ্টকে যে যে বাবদের রাজস্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহার কতক অংশ এই প্রদেশকে দিতে হইবে।

মেস্‌টন বিলিতে বঙ্গের প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, সে বিষয়ে যদি সাধারণ ঐকমত্য বাস্তবিকই থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিকার কেন হয় নাই, জানিতে কৌতূহল হয়।

শুনা যায়, বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী আইন দ্বারা নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব করিবেন। তিনি বাংলা হইতে সংগৃহীত বাংলার রাজস্বের ন্যায্য ভাগ পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিনা, জানিতে ইচ্ছা করি।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমানপরীক্ষার্থী

কোন কোন মুসলমান কাগজে এইরূপ অভিযোগ দেখা যায়, যে, মুসলমান বলিয়াই কোন কোন পরীক্ষার্থীকে কম নম্বর দেওয়া হইয়াছে, বা অন্য প্রকার অবিচার হইয়াছে। পক্ষপাতিত্ব বা অবিচার কখন হইতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু মুসলমান বলিয়াই অবিচারের কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদের মুসলমানদের প্রতি এইরূপ বিরুদ্ধভাব থাকিলে মুসলমান পরীক্ষার্থী (যেমন হুমায়ুন কবীর) বা মুসলমান পরীক্ষার্থিনী (যেমন হাবলুলমতীন-সম্পাদকের কন্যারা) কোনও পরীক্ষায় প্রথম স্থান কি প্রকারে অধিকার করিতে পারিয়াছেন।

—

চাকরীর ভাগ

কতকগুলি উচ্চ চাকরী পাইতে হইলে হিন্দুদিগকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হইবে; কিন্তু মুসলমান, ফিরিঙ্গী ও ইউরোপীয়দিগকে তাহা দিতে হইবে না। মুসলমানেরা বিনা পরীক্ষায় "ন্যূনতম যথেষ্ট" যোগ্যতা থাকিলেই শতকরা ৪৫টি চাকরী পাইবে। বলা বাহুল্য, আমরা ইহার বিরোধী। সকল ধর্ম্মের লোকদের নিয়োগ সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক হইলে, যত ভাল কর্ম্মচারী পাওয়া যাইত, এই ব্যবস্থায় তাহা পাওয়া যাইবে না; সুতরাং সরকারী কাজ যতটা ভাল করিয়া চালান সম্ভব, তাহা হইবে না। অধিকন্তু অনেক খুব যোগ্য লোক, মুসলমান ফিরিঙ্গী বা ইউরোপীয় নহে বলিয়া কাজ পাইবে না। ইহার দ্বারা প্রকারান্তরে বলা হইতেছে, তোমরা মুসলমান হও কিম্বা নাম ভাঁড়াইয়া বিদেশী নাম লইয়া ফিরিঙ্গী সাজ।

প্রতিযোগিতাত্মক পরীক্ষা হইলে মুসলমানেরা চাকরী পাইবে না, এই উহ্য কথাতে তাহাদের যে অপমানটা নিহিত রহিয়াছে, তাহা মুসলমান নেতারা মাথা পাতিয়া লইতেছেন—কারণ, "পেটে খেলে পিঠে সয়"। কিন্তু আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কোন সৎপরামর্শ দিলে তাঁহারা তাহা দুরভিসন্ধিপ্রসূত মনে করিবেন। কিন্তু তাঁহারা নিজের সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য এই নিয়ম করাইতে পারেন না কি, যে, মুসলমানেরা যতগুলি চাকরী পাইবেন, তাহা কেবল মাত্র মুসলমানদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফল অনুসারে দেওয়া হইবে? তাহা হইলে অন্ততঃ যোগ্যতম মুসলমান যুবকরা কাজ পাইবেন, তাঁহাদের আত্মসম্মানবোধ বাড়িবে, এবং খোসামোদ ও মোসায়েবী কিছু কমিবে।

—

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ ও ভারতীয় সভ্যতা

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র ভারতীয় সভ্যতার উপর মন্তব্য প্রকাশে এদেশে বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। ইঙ্গ ভারতীয় সংবাদপত্রের দল এই সুযোগে শ'র মত তাঁহাদের স্বপক্ষে "নজীর" বলিয়া নৃত্য করিয়া বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষের সভ্যতা ইত্যাদি কখনো ছিল না, এখনো নাই। এদেশীয়েরা ত অনেকে খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

অন্যদেশে এপ্রকার মতামতের বিচার হয়, যাহার মত, তাহার সেবিষয়ে অধিকার এবং জ্ঞান কতটা আছে তাহার যাচাই করিয়া। আশ্চর্য্যের বিষয় এদেশে সেরূপ প্রথা কিছুই নাই। এখানে যে কোন বিষয়ে একজন লোক বড় হইলেই তিনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ইহা মানিয়া লওয়া হয়—বোধ হয় ইহা সিবিল সার্ব্বিস-রূপ সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ-মণ্ডলীর প্রভাবে।

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তিনি নির্ভীক ও স্পষ্টবক্তা ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু তিনি মনে যাহা ভাবেন তাহাই মুখে ব্যক্ত করেন, এরূপ ভাবিবার কোনও কারণ এ পর্য্যন্ত দেন নাই। ন্যায়-বিচার ও সত্যবাদিত্বের দোষ তাঁহাকে স্পর্শায় নাই। তাঁহারই এক নাটকের নায়ক এক জায়গায় বলিয়াছেন, "Who am I, that I should be just?" "আমি আবার কি এমন মহাত্মা যে আমায় ন্যায়-বিচার করিতে হইবে?" ইহা বোধ হয় শ' মহাশয়ের জীবনের মূলমন্ত্র। তবে তিনি যাহা বলেন অতি স্পষ্টভাবেই বলেন এবং তাঁহার আর এক নায়কের মতও "I never retract," "আমি কথা ফিরাইয়া লইনা"—মানিয়া চলেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কতটা, তাহার পরিচয় এই সংখ্যায় অন্য প্রবন্ধে আছে। কিন্তু কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে যে, সেবিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার একথা শ' কখনো স্বীকার করেন নাই এবং ভারত সম্পর্কে অন্য অনেক মহারথীও মানেন না।

শ' নিজের দেশের লোকদের বিচারে কি তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় প্রকাশ পাইবে—

তাঁহার এক বন্ধু (Sir James Barrie কিংবা Charles Frohmann) দীর্ঘ দশ বৎসর আমেরিকা প্রবাসের পর ইংলণ্ডে ফিরেন। সেই উপলক্ষে Sir F. Carruthers Gould (প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পী) ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেট নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজে এক ব্যঙ্গচিত্র দেন। চিত্রে শ মাথা নীচে পা উপরে করিয়া রহিয়াছেন (standing on his head) এবং পাশে তাঁহার বন্ধু স্তম্ভিত ও দুঃখিত অবস্থায় দণ্ডায়মান। চিত্রের নীচে লেখা—was shocked to see the dear fellow still in the same position as he was when he left,—অর্থাৎ তাঁহার বন্ধু, শ'কে দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসে যাইবার সময়, যে অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া সেই অবস্থাতেই দেখিয়া স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ইহাই বোধ হয় শ'র প্রকৃত পরিচয়।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চাকরীর ভাগ

মুসলমানেরা সমগ্র বঙ্গে মোট সংখ্যায় বেশী বলিয়া, কলিকাতায় খুব কম ও পশ্চিম বঙ্গে কম হইয়াও, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির শত করা ৪০টি কাজ চান, এবং যত দিন ঐ অনুপাত না হয়, তত দিন তার চেয়ে বেশী চান। এই নীতি অনুসারে, তাহা হইলে, বঙ্গের কোন গ্রাম নগর জেলাতেই অমুসলমানরা সংখ্যায় খুব বেশী এবং যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ হইলেও ন্যায়ানুযায়ী চাকরী পাইবে না।

এই নীতিটা আর একটু ব্যাপক করা যাইতে পারে। বাংলা দেশের কয়েকটা জেলায় মুসলমানেরা বেশী বলিয়া যদি অন্য সব জেলা ও নগরে তাহারা বেশী বেশী চাকরী পাইবার অধিকারী হয়, তাহা হইলে বাংলা প্রদেশে তাহারা সংখ্যায় বেশী বলিয়া অন্য সব প্রদেশে কেন বেশী বেশী চাকরী পাইবে না? অতএব এই নিয়ম হউক, যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিনা পরীক্ষায় মুসলমানরা অন্ততঃ অর্দ্ধেক চাকরী পাইবে।

বঙ্গের মুসলমান নেতারা রসিকতা বর্জ্জিত নহেন। তাঁহারা মিউনিসিপালিটির মেথর ঝাড়ুদার প্রভৃতি কাজের শত করা ৪০টি ৫০টি চান না; এই একান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু অল্প বেতনের কাজগুলি তাঁহারা সদাশয়তা পূর্ব্বক অমুসলমানদিগকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত। তাঁহারা বাজে কিন্তু বেশী বেতনের কাজগুলিতে ভাল রকম অংশ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিবেন।

—

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বিবাহ

পুনায় মালিনীবাঈ পনশীকরের সহিত গুলাব খানের বিবাহ হওয়ায় মহারাষ্ট্রে খুব আন্দোলন, কাগজে লেখা-লেখি গালাগালি, বৃহৎ প্রতিবাদ-সভা ইত্যাদি হইতেছে। তাহার ঢেউ বাংলা দেশেও পৌঁছিয়াছে। এই বিষয়টির আলোচনা করিতে হইলে কয়েকটি তথ্য জানা দরকার। মালিনীবাঈর মাতা স্বর্গীয় স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের কন্যা ছিলেন, বিধবা হইবার পর পুনর্ব্বিবাহিতা হন। মালিনীবাঈ এই পুনর্ব্বিবাহের অন্যতম সন্তান। স্বর্গীয় ভাণ্ডারকর মহাশয় প্রার্থনা-সমাজের নেতা ছিলেন, সংকীর্ণ অর্থে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন না; জা'ত মানিতেন না। মালিনীবাঈ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-এ ও বি-টি। তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর; শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। গুলাব খাঁ

বোম্বাইয়ের বি-এ ও বি-টি। তিনিও শিক্ষকের কাজ করেন; বয়স মালিনীবাঈ অপেক্ষা বছর দশ বেশী। বিবাহ গোপনে হয় নাই, হঠাৎ হয় নাই; ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে প্রকাশ্য নোটিস্ দিয়া রেজিষ্টরী করিয়া হইয়াছে। মালিনীবাঈ মুসলমান হইতে দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন। তাঁহাকে ও গুলাব খান্‌কে, তিন আইন অনুসারে, মুদ্রিত এই উক্তিতে স্বাক্ষর করিতে হইয়াছে, যে, তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন। অন্য কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও ইঁহাদের বিবাহ হয় নাই। কেবল রেজিষ্ট্রীর দ্বারা হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে হিন্দুমুসলমান বিবাহ বলা যায় না। গত মার্চ্চ মাসে দিল্লীতে বোম্বাই হিন্দুসভার শ্রীযুক্ত জয়াকর প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যে, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় দ্বয়ের মধ্যে কার্য্যকর একতার জন্য পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হওয়া দরকার।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের মত এই, যে, যাহাদের ধর্ম্মমত বাস্তবিক আলাদা, যাহাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা রীতিনীতি চালচলন শিক্ষা দীক্ষা আলাদা তাহাদের মধ্যে বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে। তাহার কারণ, এরূপ বিবাহে দৈনন্দিন খিটিমিটিতে অসদ্ভাব ঘটিবার খুব সম্ভাবনা থাকে, এবং সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষা চালচলন চরিত্র গঠন কিরূপ হইবে তাহা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু কোনও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী ও পুরুষ যদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়জাত হইয়াও বিবাহ করিতে চান, তাহা হইলে তাহা আইন-সিদ্ধ করিয়া নির্ব্বাহিত হইলে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

ধর্ম্মবিষয়ক নিন্দাকুৎসা

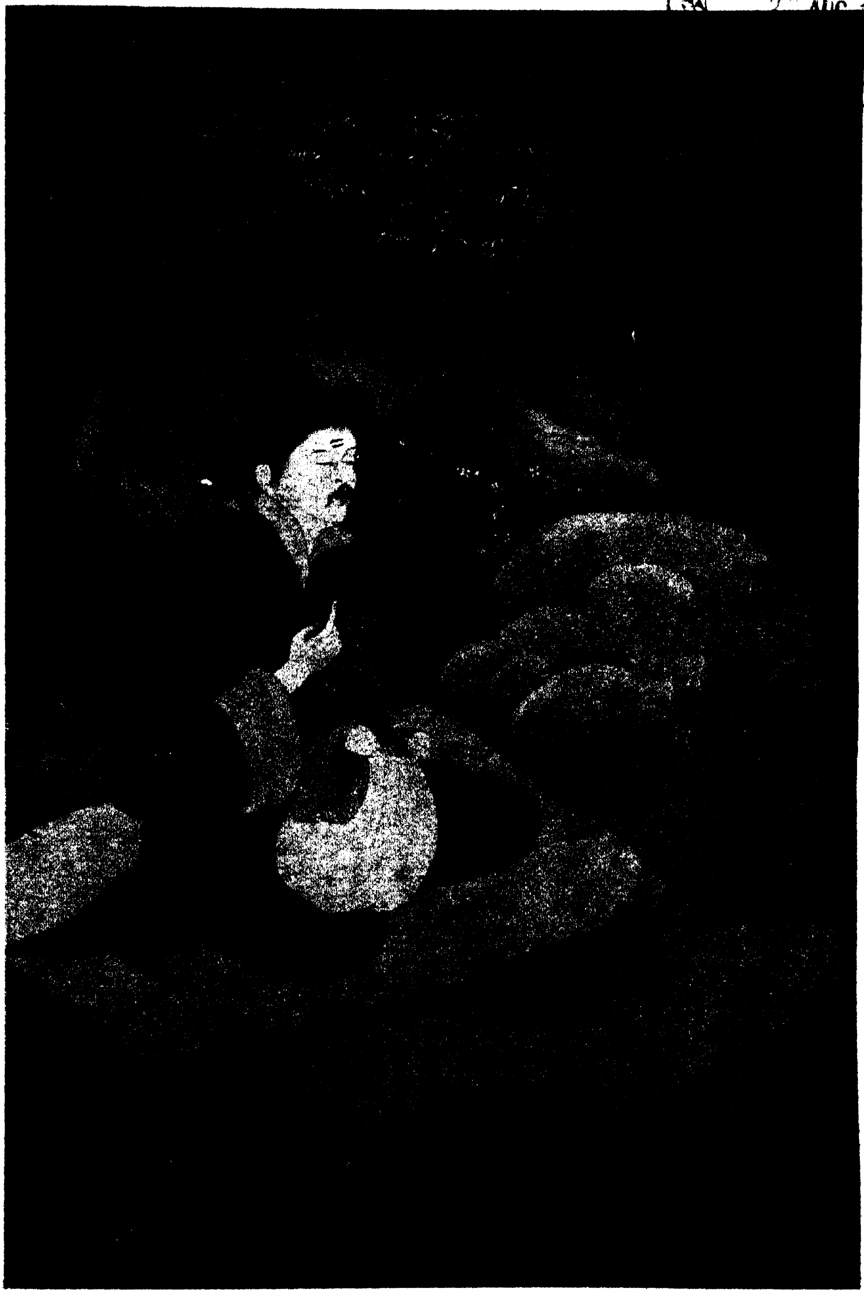
পঞ্জাবের মুসলমানরা যে ভাবে জজ দলীপ সিংহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছেন, তাহা আমরা অন্যায় ও অনাবশ্যক মনে করি। জজ স্বয়ং খৃষ্টিয়ান; হিন্দু বা শিখ নহেন। তিনি "রঙ্গীলা রসুল" বহি খানা (যাহাতে মহম্মদের কুৎসা ছিল) খুব খারাপই বলিয়াছিলেন। তিনি কেবল এই কারণে উহার লেখককে আপীলে খালাস দিয়াছিলেন, যে, যে-ধারা অনুসারে তাহার সাজা হইয়াছে, তাহা তাহার প্রতি খাটে না। অতএব, মুসলমানরা তাঁহার পদচ্যুতি প্রভৃতির জন্য আন্দোলন না করিয়া কেবল এইরূপ ভাবে আইন পরিবর্ত্তনের দাবী করিতে পারিতেন, যেন রঙ্গীলা রসুলের মত বহি লেখা দণ্ডনীয় হয়।

কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কেন, কোন ব্যক্তিরই কুৎসা করিয়া কিছু লিখিয়া ছাপান উচিত নহে। কিন্তু মৃত ধর্ম্মোপদেষ্টাদের কুৎসা নিবারণ জন্য আইন করিতে হইলে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে সংযত ও গম্ভীর ভাবে ধর্ম্মমতের, ধর্ম্মশাস্ত্রের ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক প্রভৃতির চরিত্রের আলোচনা চলিতে পারে। ইহা মানবজাতির ক্রমোন্নতির জন্য আবশ্যক। পঞ্জাবে আন্দোলনের মুখে মুসলমানরা যে স্মরণ করিতেছেন ও করাইতেছেন, যে, তাঁহাদের শাস্ত্র অনুসারে মহম্মদের নিন্দাকারীর প্রাণবধ করা উচিত, ইহাতে বিপদ আছে। শুধু বিপদ নয়, এই ব্যবস্থা আমরা যুক্তিসঙ্গত ও আধুনিক জগতের উপযুক্ত মনে করি না। ঈশ্বর সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের চেয়ে বড়। কাহারও নিন্দাকারীর প্রাণদণ্ড বিধেয় হইলে, ঈশ্বরনিন্দুকের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আগেই ঈশ্বর স্বাভাবিক নিয়মানুসারে করিতেন। কিন্তু অতীত কাল হইতে এপর্য্যন্ত যত নাস্তিকের জন্ম হইয়াছে, কেহই নাস্তিক্য প্রকাশ বা প্রচার করিবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই।

কথিত আছে, এলাহাবাদে স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসুর মাতা খৃষ্টিয়ান্ মিশন স্কুলের হিন্দু বালিকাদিগকে,

"তোদের কৃষ্ণ চোর কৃষ্ণ ননী চুরী করে,
মোদের খৃষ্ট যিশুখৃষ্ট ভবের ত্রাণ তরে।"

এই কবিতা সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে শুনিয়া পুত্রকে হিন্দু বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বলিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে দেবনিন্দকদের প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলে ও তদনুসারে কাজ হইলে বহু খৃষ্টীয় মিশনারীর প্রাণ যাইত। সুখের বিষয়, যে, ওরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। তাহা না থাকায় হিন্দুদের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় নাই। "তোমরা যে গোরুর পূজা কর, আমরা তাহাকে ভোজন করি," পাদরী বিশেষের এরূপ বক্তৃতা শুনিয়া হিন্দুরা হাসিয়াছে, তাহার প্রাণ বধ করিবার চেষ্টা করে নাই।



কালিম্পং-এর ভুটিয়া ভিখারী
শিল্পী শ্রী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৩৪

৩য় সংখ্যা

নববর্ষ

(শান্তিনিকেতন)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

সম্বৎসর ধ'রে গাছের পাতা সূর্য্যকিরণ প্রতিদিন পান করেছে, গাছের মজ্জায় তার তেজ গোপনে জমিয়ে তুলেছে, পৃথিবীকে দিয়েছে তার ছায়া, আকাশকে দিয়েছে ঋতুতে ঋতুতে তার শ্যামলতার বৈচিত্র্য—যা তার দান করবার তা সম্পূর্ণ ক'রে অনায়াসে আজ বিদায় নিয়েচে—তার চ'লে যাওয়ার মধ্যেও শান্তি ও সৌন্দর্য্য। নবীনকে স্বীকার ক'রে নমস্কার ক'রে সে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নবকিশলয়ে বনভূমি আনন্দিত।

আমাদের বয়স থেকে যে-বৎসরটি গেল, সেই বৎসরের প্রসারিত পল্লবের ভিতর দিয়ে যা কিছু আনন্দের রস ও দুঃখের তাপ জীবনের মজ্জার মধ্যে সঞ্চয় করেছি, তা সার্থক হোক্। কিন্তু পাতাটি সহজেই যাক্ ঝ'রে। পুরাতনের সেই সহজে যাওয়ার মধ্যেই নতুনের সহজে আসার ভূমিকা হোক্। মনের মধ্যে কোনো বিরুদ্ধতা কোনো গ্লানি না থাকে যেন, মিথ্যে সব নালিশ ধুলার মধ্যে জীর্ণ হ'য়ে যাক্। নইলে নতুনের রং ঠিক ধরবে না, তাতে জরার কালিমা পড়্‌বে। দ্বার উদ্‌ঘাটিত ক'রে দাও, নববর্ষের সূর্য্যকিরণ অন্তরে প্রবেশ করুক। আজ এই বিকশিত শিরীষ-বনের গন্ধ-হিল্লোলে অমরযৌবন দেবতার যে উত্তরীয়ের স্পর্শ বিকীর্ণ হচ্চে উদাসীন চিত্তকে সে জাগ্রত করুক।

২

বাইরের যা কিছু ঘটনা তাকেই চরম ক'রে জানে পশু। তাই বাইরে যখন কৃপণতা তখন তারা কোনো উপায় খুঁজে পায় না, তারা বিনাশ পায়। বাইরেই তাদের অবস্থান, বাইরেই তাদের ধ্বংস।

মানুষ আত্মাতে সৃষ্টিশক্তি অনুভব করে। তাই,

আপন মহিমাতে সে আশ্রয় নেবে এ কথা ভুল্‌তে পারে না। তার পক্ষে অক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা ভিক্ষুকতা, অক্রিয়ভাবে আঘাত পাওয়া কাপুরুষতা, অক্রিয়ভাবে অন্যকে অবলম্বন করা অধীনতা। মানুষই বলেছে—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।

অর্থাৎ পরবশতায় বাহিরের আরাম থাক্‌তে পারে কিন্তু আত্মার দুর্গতি। কেননা স্বকর্তৃত্ব আত্মার ধর্ম্ম। লোভে, ভয়ে বা অভ্যাসে যার সেই নিজের ভিতরকার ধর্ম্ম ম্লান হয়েছে সে জীবলোকে বেঁচে আছে পশুপক্ষীদের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে, কিন্তু সে মরেচে যে-ক্ষেত্রে মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি ক'রে ধন্য। বিশ্ববিধাতাকে পাই তাঁর সৃষ্টিশক্তিতে—আত্মারও পরিচয় পাওয়া যায় তার সৃষ্টির উদ্যোগে।

সেই পরিচয়ের উৎকর্ষ কখন হয়? যখন দেখি সৃষ্টি-কর্ত্তা তাঁর সৃষ্টির উপকরণের চেয়ে বড়। উপকরণকে তিনি আপনার অনুকূল ক'রে নেন্। নিজের জীবনকে মানুষ নিজে সৃষ্টি করবে, এইখানে তার আত্মার কর্তৃত্ব। তার সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি, খ্যাতি নিন্দা, যা-কিছু বাইরে থেকে তার ভাগ্যের দান, এসমস্তকে উপকরণরূপে সে পেয়েচে, এই নিয়ে তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হ'বে। চিত্রশিল্পী যে-রেখা, যে-বর্ণ, যে-পট, যে-তুলি, এমন-কি যে-বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেন সেগুলিকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখ্‌লে তারা তুচ্ছ। আংশিক আকারে তাদের অর্থ নেই, স্থায়িত্ব নেই, তারা আবর্জ্জনা। কিন্তু রূপকার তাদের সমস্তকে নিয়ে যখন তাঁর চিত্তের কোনো একটি ধ্যানকে রূপের সম্পূর্ণতা দেন—তখন তারা নিত্যতার মহিমা লাভ করে। তখন তারা কেউ বাইরের মূল্য দাবী ক'রে আপন আংশিকতাকেই উগ্র ক'রে দেখায় না। উপকরণ তুচ্ছ হ'লেও গুণী তাকে নিয়ে যখন আপনাকে প্রকাশ করেন তখন সেই সমগ্ররূপের সৃষ্টি নিত্যধর্ম্ম লাভ করে, যে নিত্যধর্ম্ম সূর্য্যচন্দ্রে, সৃষ্টিকর্ত্তার হাতের কাজের যে-রস সেই রস ফুটে ওঠে ছবিতে। আমাদের জীবনকেও যে পরিমাণে সম্পূর্ণতা দিই সেই পরিমাণে আপন সুখ দুঃখ, আপন ধনসম্পদের চেয়ে সে বড় হ'য়ে ওঠে, সুতরাং সে-সমস্ত ঢাকা পড়ে। তখন সেই জীবনের মধ্যে নিত্যধর্ম্ম প্রকাশ পায়। নিজের জীবনসৃষ্টিতে যাঁরা গুণী তাঁদের আমরা বলি অমর।

এই অমরতা বাহ্যকালের অমরতা নয়। যা পূর্ণ, যা সুন্দর, তা যতক্ষণই থাকে ততক্ষণই নিত্যকে প্রকাশ করে। একটি ছোট বনফুল, সে নিত্যেরই রূপ, সে অল্পকালের মধ্যে ঝ'রে গেলেও চিরকালের ধন। তেম্‌নি যে মানুষের মধ্যে আত্মা সমস্ত বাহ্য উপাদানকে আত্মসাৎ ক'রে জীবনকে নিজের ক'রে প্রকাশ করেছে, তার খ্যাতি থাক্ আর না থাক্, কালকে সে বিস্তৃত আকারে অধিকার করুক আর না করুক তার মধ্যে নিত্যেরই প্রতিরূপ দেখা দেয়। যে-কাল খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যুর ছায়া, সেই অসম্পূর্ণ কালকে সে জয় করে।

এই শিরীষ ফুল, এ যে সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে এই এর সার্থকতা—অনাদর নিন্দা বা মৃত্যু কিছুতেই এই সার্থকতাকে নষ্ট করতে পারে না। সৃষ্টির ইতিহাসে এই যে নিত্যের লীলা, সীমার মধ্যে অসীমের আবির্ভাব, এর আর অবসান নেই। সেই লীলার সঙ্গে আত্মার সৃষ্টিকর্ম্মের যদি সুর তাল মেলাতে পারি তাহ'লে প্রত্যেক নিমিষেই অমৃতের স্বাদ পাব।

আজ নববর্ষে এই কথাটি আমাদের মনে ধ্বনিত হোক্ যে, যেন বাহিরের অবস্থার উপরে জয়ী হ'তে পারি। যেন আত্মশক্তিতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হয়, বহু বিষয়ে পরাসক্ত হ'য়ে না থাকে। অন্তরে আছেন যে-প্রভু বাহিরে দাস যেন তাঁকে অবমানিত না করে। বাধাবিঘ্ন দৈন্যের মধ্যে চিত্ত বারবার ম্লান হয়, বারবার আপনাকেই অবিশ্বাস করি, বাহিরের উপরই আস্থা রাখি, আত্মার এই পরাভবকে একান্ত সত্য ব'লে যেন না মানি। আত্মার গতিপথে উত্থানটাই সত্য, পতনটা চরম নয়—এই বার্ত্তাকেই আজ নববর্ষের কাছ থেকে গ্রহণ করি, আর জন্মমৃত্যু-ক্ষতির কুহেলিকা-অন্তরালে যে জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন, প্রাণের যাঁর ক্ষয় নেই, ঐশ্বর্য্যের যাঁর অন্ত নেই, আনন্দের উৎস যিনি, তাঁকে আজ নমস্কার করি।

১ বৈশাখ, ১৩৩৪।

গোতমের ধর্ম্মে আত্মার স্থান

শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ

প্রথম প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, গোতম একজন পুগ্ গল বা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই পুরুষই কর্ম্ম করে, কর্ম্মফল ভোগ করে; এই পুরুষই ইহলোক পরলোকে বিচরণ করে।

এস্থলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—কর্ত্তা, কর্ম্ম, কর্ম্ম-ফল ভোগই কি গোতমের শেষ কথা? কর্ত্তৃরূপে প্রকাশিত পুরুষই কি পুরুষের প্রকৃতরূপ?

না, ইহা গোতমের চরম কথা নহে; ইহা সংসার-তত্ত্ব, সংসার-তত্ত্ব চরম তত্ত্ব নহে। সম্ + সৃ ধাতু হইতে 'সংসার' শব্দ। 'সৃ' ধাতু গতিসূচক। সংসার নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, জীবজন্তু পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের অধীন হইয়া ধাবিত হইতেছে। সংসার গতিশীল, কখন স্থিতিশীল নহে। মনুষ্যলোক দেবলোক প্রভৃতি যাহা কিছু কালের অধীন, সে সমুদায় লইয়াই সংসার। ইন্দ্র, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও সংসারের অন্তর্ভূত। কিন্তু এসংসার অনিত্য ও অশাশ্বত। যতদিন দেবমনুষ্যাদি এই অনিত্য সংসারে আবদ্ধ থাকে, তত দিন তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া বাস করে, সংসারে কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মফল ভোগ করে। অনাদি কাল হইতে এইভাবে সংসার চলিয়া আসিতেছে।

কল্প

এক এক কল্পের প্রারম্ভে, এক এক সংসারের আরম্ভ, কল্পান্তে ইহার বিনাশ। নূতন কল্পে আবার নূতন সংসার এবং প্রলয়ে ইহার বিনাশ। কেবল পার্থিব জীবেরই যে উৎপত্তি ও বিনাশ তাহা নহে—ইন্দ্র ব্রহ্মাদিও কল্পারম্ভে জন্মগ্রহণ করে—কল্পান্তে আবার লীন হইয়া থাকে। এইরূপ কল্প-কল্পান্তরে সংসারের উৎপত্তি ও বিলয় হইতেছে। এক এক কল্প কি সুদীর্ঘ কাল তাহা কল্পনা করা অসম্ভব। কল্প-পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য গোতম কয়েকটি উপমা দিয়াছেন, একটি উপমা এই :—

লৌহপ্রাচীর-বেষ্টিত একটি নগর; দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতায় ইহা এক যোজন। ইহা সর্ষপ-বীজে পরিপূর্ণ। একজন লোক যদি শতবৎসর পর পর এক-একটি সর্ষপ-বীজ গ্রহণ করে, এইরূপে কালে নগরের সর্ষপ-কণিকার সংখ্যাও নির্ণীত হইবে, কিন্তু তখনও কল্প শেষ হইবে না।

(সংযুত্ত ২।১৮২, ইং সং)

এই প্রকার শত সহস্র কল্প অতীত হইয়াছে। সংসারও কল্প-কল্পান্তর চলিয়া আসিতেছে। কে ইহার আরম্ভ কল্পনা করিতে পারে?

সংসার অবিদ্যামূলক

এই যে অনাদি সংসার, ইহা কর্ম্মমূলক। যে দুষ্কর্ম্ম করে, তাহার হয় হীন গতি, আর যে সাধু কর্ম্ম করে, সে সুগতি লাভ করে। ব্রহ্মাদি দেবগণও কর্ম্ম-ফলে নিজ নিজ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। মানবলোক, স্বর্গ-লোক সমুদায়ই কর্ম্মের ফল।

ভারতের প্রায় সমুদায় দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য—কিসে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। গোতমের ধর্ম্মেরও মুখ্য উদ্দেশ্য সংসার হইতে মুক্তিলাভ। তাঁহার ধর্ম্মে যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা এই পৃথিবীতেই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহা-দিগকে আর সংসার-গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে না। এ ধর্ম্মে যাহারা নিম্ন-সাধক, তাহারাও মুক্তি লাভ করিবে, তবে এ জন্মে নহে। এক মাত্র সিদ্ধ পুরুষই মুক্ত, আর সকলেই বদ্ধ। কেবল মানবই যে বদ্ধ তাহা নহে; ইন্দ্র, প্রজাপতি, ব্রহ্মাদি দেবগণও সংসার-আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। সংসার অবিদ্যা-প্রসূত। যাহারা সংসারে বিচরণ করিতেছে তাহারা সকলেই অবিদ্যা-গ্রস্ত। এমন-কি মহাব্রহ্মাও অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনিও নিত্য নিত্য বিবেক-বিহীন। তিনিও অনিত্য ও

অশাশ্বত বস্তুকে নিত্য ও শাশ্বত বলিয়া মনে করেন (মজ্‌ঝিম ১।৩২৭—৩২৮ ; সংযুত্ত ১।১৪২ ইত্যাদি)। একমাত্র মুক্ত পুরুষই অবিদ্যাকে অতিক্রম করিয়াছেন।

পুরুষ কে ?

তাহা হইলে মুক্ত পুরুষও আছেন, অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষও আছে। বদ্ধ পুরুষও পুরুষ এবং মুক্ত পুরুষও পুরুষ।

এখানে প্রশ্ন তবে পুরুষ কে ? বুদ্ধের সমসাময়িক ধর্ম্মাচার্য্যগণ বলিতেন আত্মাই পুরুষ। এবিষয়ে বহু মত-ভেদ ছিল। দেহ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার প্রভৃতিকে বহু আচার্য্য আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। গোতম দেহাদিকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

সৎকায়-দৃষ্টি

সে-সময়ের একটি প্রচলিত মতকে গোতম "সক্কায় দিট্‌ঠি" (= সৎকায়-দৃষ্টি) নাম দিয়াছেন। সক্কায় = সৎকায় 'সৎ' অর্থে অস্তিত্ববান। 'সক্কায়' অর্থাৎ দেহাদি সৎ। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে কায় বলিতে সাধারণতঃ রূপ (অর্থাৎ দেহ), বেদনা (ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ, সুখ দুঃখ বেদনা, Sensation), সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই কয়েকটি বুঝায়। দেহ বিষয়ে সৎকায়-দৃষ্টি এই—(১) দেহই আত্মা, (২) আত্মা দেহবান, (৩) আত্মাতে দেহ এবং (৪) দেহে আত্মা। দেহ বিষয়ে এই চারি প্রকার দৃষ্টি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চারিটির প্রত্যেকটির বিষয়েই ঐপ্রকার দৃষ্টি, যথা (১) বিজ্ঞানই আত্মা, (২) আত্মা বিজ্ঞানবান, (৩) আত্মাতে বিজ্ঞান এবং (৪) বিজ্ঞান আত্মা।

রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ ; প্রত্যেকটিতে চারি প্রকার দৃষ্টি। সুতরাং বিংশতি প্রকার সৎকায়-দৃষ্টি হইতে পারে (পটি-সম্ভিদা মগগ, ১।১৪৩-১৫১)। গোতম এই মতকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন (মজ্‌ঝিম ৩।১৭ ১৮ ; সংযুক্ত ১৫৮-১৫৯, ইত্যাদি)। তাঁহার মতে দেহাদির সহিত আত্মার মৌলিক কোন সম্বন্ধ নাই।

আত্মা কি নহে

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরই গোতম পাঁচ জন ভিক্ষুকে এবিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই :—

"হে ভিক্ষুগণ ! দেহ আত্মা নহে। দেহ যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইত না। (ক) এবং তাহা হইলে দেহ বিষয়ে বলিতে পারিতাম 'আমার দেহ এই প্রকার হউক, আমার দেহ এপ্রকার না হউক'। (খ) যেহেতু দেহ আত্মা নহে, সেইজন্য দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং সেইজন্য দেহ বিষয়ে বলিতে পারি না যে 'দেহ এই প্রকার হউক, বা এই প্রকার না হউক'।"

ইহার পরে গোতম বেদনা (= সুখ দুঃখাদি বেদনা), সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান বিষয়ে উক্ত প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়া, উক্ত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই করিয়াছিলেন।

ইহার পরে তিনি বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ ! তোমরা কি মনে কর—দেহ নিত্য না অনিত্য ?"

"হে ভদন্ত ! অনিত্য।"

"যাহা অনিত্য, তাহা সুখ না দুঃখ ?"

"হে ভদন্ত ! দুঃখ।"

"যাহা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্ম্মা, তাহার বিষয়ে কি এই প্রকার বলা যায় যে, 'ইহা আমার', 'আমি ইহা', ইহা আমার আত্মা ?" (গ)।

"হে ভদন্ত ! না।"

ইহার পরে বেদনা, সংজ্ঞা সংস্কার এবং বিজ্ঞান-বিষয়েও উক্ত যুক্তি অবলম্বন করিয়া উক্ত ভাষাতেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, এ সমুদায় আমার নহে, এ সমুদায় আমি নহি এবং এ সমুদায় আমার আত্মা নহে।

ইহার পরে তিনি আরও বলিলেন—এ সমুদায় অতীতই হউক বা অনাগতই হউক বা বর্ত্তমানই হউক, অধ্যাত্মই (অর্থাৎ অন্তরস্থ) হউক বা বহিঃস্থই হউক, বৃহৎই হউক বা ক্ষুদ্রই হউক, হীনই হউক বা শ্রেষ্ঠই হউক, দূরস্থই হউক বা নিকটস্থই হউক—এসমুদায়ের কোনটির বিষয়েই বলিতে পারি না—'ইহা আমার', 'ইহা আমি', 'ইহা আমার আত্মা'।

বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ ১।৬।৩৮—৪৫ ; সংযুত্তনিকায় ৩।৬৭, ৬৮ ইং সং)।

গোতম এস্থলে বলিলেন, দেহাদি পঞ্চস্কন্ধ আত্মা নহে।

দেহাদি আছে ইহা অপরেও স্বীকার করিত, গোতমও স্বীকার করিতেন। পার্থক্য এই—অপরে বলিত, দেহাদি আত্মা; গোতম বলিতেন, দেহাদি আত্মা নহে। 'দেহ আমার আত্মা'—ইহার অর্থ এই যে, দেহই আমার বিশেষত্ব, দেহই আমার স্বরূপ, দেহ না থাকিলে আমি থাকিব না। বেদনা বিজ্ঞানাদি আমার আত্মা ইহার অর্থ এই সমুদায়ই আমার বিশেষত্ব, আমার স্বরূপ; এ সমুদায় না থাকিলে আমি থাকিব না। অপরে দেহ-বিজ্ঞানাদিকে পুরুষের বিশেষত্ব এবং স্বরূপ বলিয়া মনে করিত, কিন্তু গোতম তাহা মনে করিতেন না। সাধারণ মতের সহিত গোতমের মতের পার্থক্য এই স্থলে।

আত্মা নিত্য

কোন কোন পণ্ডিত বলিতেছেন যে, উদ্ধৃত অংশে গোতম আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। এ কথা যে কোথায় আছে, আমরা তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, গোতম এস্থলে আত্মার নিত্যত্ব, অবিকারিত্ব ও সুখময়ত্বই ঘোষণা করিয়াছেন।

আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। উদ্ধৃত স্থলে আমরা তিনটি অংশকে (ক), (খ), (গ), দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছি। দেহ বেদনাদি কেন আত্মা নহে—এ সমুদায়স্থলে তাহারই যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই তিনটি যুক্তি নিম্নে সরল ভাষায় ব্যক্ত হইল।

(ক) যাহা ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে তাহা আত্মা নহে।

(খ) যাহার উপরে আমার পূর্ণ কর্তৃত্ব নাই, তাহা আমার আত্মা নহে।

(গ) যাহা অনিত্য, দুঃখময় এবং পরিবর্ত্তনশীল তাহা আত্মা নহে।

গোতম যখন বলিলেন, ব্যাধিগ্রস্ত বস্তু আত্মা হইতে পারে না, তখনই বুঝিতে হইবে যে, আত্মা ব্যাধির অতীত। যখন বলা হইল যাহার উপরে আমার কর্তৃত্ব নাই, তাহা আমার আত্মা নহে, তখনই বুঝিতে হইবে আমার আত্মা আমার সম্পূর্ণ অধীন। আর যখন বলা হইল অনিত্য, দুঃখময়, এবং পরিবর্ত্তনশীল বস্তু আত্মা নহে, তখনই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, আত্মা নিত্য, সুখময় এবং অবিকারী।

গোতম যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার উপায় নাই। গোতম আত্মা স্বীকার করিতেন এবং এই আত্মা স্বাধীন, নিত্য, নির্ব্বিকার এবং সুখ স্বরূপ।

অপর দিক হইতে বিচার করা যাউক। কল্পনা কর একব্যক্তি গোতমকে এইপ্রকার প্রশ্ন করিল:—

"ভগবন্! এই সংসারে যদি এমন একটি বস্তু পাওয়া যায় যাহা ব্যাধির অতীত, যাহার উপর আমার পূর্ণ কর্তৃত্ব, যাহা নিত্য, সুখময় এবং অবিকারী—সেই বস্তুকে কি আমি আমার আত্মা বলিতে পারি?"

গোতম নিশ্চয়ই বলিবেন, "ইহা নিশ্চয়ই তোমার আত্মা।"

কিন্তু আমরা বাস করিতেছি সংসারে; সংসারে যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়ই অনিত্য এবং বিকারী। সুতরাং গোতমকে কেহই ঐ নিত্য বস্তু দেখাইয়া দিতে পারিত না।

অনিত্য সংসারে নিত্য বস্তু দেখান যায় না; ইহাতেই কি বলিতে হইবে নিত্য বস্তুই নাই? সাহারাতে শ্বেত ভল্লুক নাই, ইহাতেই কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে শ্বেত ভল্লুক বলিয়া কোন প্রাণীই নাই? সাহারাতে শ্বেত ভল্লুক না থাকিতে পারে কিন্তু অন্যত্র আছে। এইরূপ অনিত্য সংসারে নিত্য বস্তু দৃষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু নিত্য জগতে নিত্য বস্তু থাকিতে পারে।

গোতম কখন বলেন নাই যে, নিত্য জগৎ নাই বা নিত্য জগতে ঐ প্রকার নিত্য আত্মা নাই। যখনই তাঁহার নিকট আত্মার বিষয় প্রশ্ন উঠিত, তখন দেহাদিকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ প্রশ্ন উঠিত, এবং গোতম দেহাদি বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই আত্মতত্ত্ব ও অনাত্মতত্ত্বে ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, দেহাদি আত্মা নহে এবং কোন কোন স্থলে এপ্রকারও বলিয়াছেন যে, এই বাহ্য জগৎও আমার আত্মা

নহে। এই সমুদায় আলোচনার মধ্যে যদি 'আত্মা নাই' এই প্রকার কোন অংশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং কেহ যদি সমগ্র আলোচনা হইতে ঐ অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া জনসমাজকে প্রদর্শন করেন এবং বলেন—এই যে গোতম বলিতেছেন—'আত্মা নাই'—ইহার উত্তরে আমরা বলিব দেহাদিতে আত্মা নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়াই গোতম ঐ স্থলে বলিয়াছেন—'আত্মা নাই'। 'নিত্য আত্মা অসৎ' এই প্রকারের কোন কথা কোন স্থলে তিনি বলেন নাই।

আর যদি ইহাও কল্পনা করা যায় যে, তিনি স্বতন্ত্র ভাবেও কোন স্থলে বলিয়াছেন যে, 'আত্মা নাই' তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, পরিবর্ত্তনশীল সংসারে 'আত্মা নাই' অর্থাৎ এই সংসারে এমন বস্তু দেখান যায় না যাহা নিত্য, সুখময় এবং যাহা আমার সম্পূর্ণ অধীন।

আত্মা আছে

গোতম এক সময়ে এই উপদেশ দিয়াছিলেন :—

"হে ভিক্ষুগণ! যাহা তোমাদের নয়, তাহা বর্জ্জন কর; তাহা বর্জ্জন করিলে চিরকাল তোমাদের হিত ও সুখ হইবে।"

কি তোমাদের নয়?

হে ভিক্ষুগণ! দেহ তোমাদের নয়, ইহা বর্জ্জন কর; ইহা বর্জ্জন করিলে চিরকাল তোমাদের হিত ও কল্যাণ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! বেদনা…সংজ্ঞা…সংস্কার……বিজ্ঞান তোমাদের নয়, ইহা ত্যাগ কর; চিরকাল তোমাদের হিত ও কল্যাণ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! যদি কেহ এই জেতবনে তৃণ কাষ্ঠ শাখা পলাল-সমূহ সংগ্রহ করিয়া দগ্ধ করে বা সে সমুদায় লইয়া যাহা ইচ্ছা করে, তোমরা কি বলিবে এই ব্যক্তি আমাদিগকে সংগ্রহ করিতেছে, দগ্ধ করিতেছে এবং আমাদিগকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতেছে?"

ভিক্ষুগণ বলিল, "হে ভদন্ত! না।"

"কি জন্য নয়?"

"কারণ এ সমুদায় আমাদের আত্মাও নয়, আত্মকীয়ও নয়।"

"সুতরাং হে ভিক্ষুগণ! দেহ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান বর্জ্জন কর, এসমুদায় তোমাদের নহে। এসমুদায় বর্জ্জন করিলে তোমাদের হিত ও সুখ হইবে।" (মজ্‌ঝিম ১।১৪০-১৪১; সংযুত্ত ৩।৩৩-৩৪। সংযুত্ত ৪।৮১-৮২ অংশে আরও বিস্তৃত)।

এস্থলে বলা হইতেছে যে, দেহ বেদনাদি আত্মাও নহে, আত্মকীয়ও নহে। এ সমুদায়কে বর্জ্জন করিতে হইবে। যখন বলা হইল এ সমুদায় বর্জ্জন করিলে চিরকাল হিত ও সুখ হইবে, তখন বুঝিতে হইবে এ সমুদায় বর্জ্জন করিলেও পুরুষ বর্ত্তমান থাকে।

তৃণ-কাষ্ঠের উপমাটির প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক। তৃণ-কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করিলে আমাকে দগ্ধ করা হয় না। কারণ তৃণ-কাষ্ঠাদি আমি নহি। তৃণ-কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করিবার পরেও আমি বর্ত্তমান থাকিব। গোতম বলিতেছেন, দেহাদির সঙ্গেও আমার এই প্রকার সম্বন্ধ। যদি দেহাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তথাপি আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব না, দেহাদি ধ্বংস হইবার পরেও আমি বর্ত্তমান থাকিব। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—আমি দেহবিজ্ঞানাদির অতিরিক্ত কিছু। দেহবিজ্ঞানাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও যাহা বর্ত্তমান থাকে, তাহাই আমি। অর্থাৎ আমরা যাহাকে আত্মা বলি আমি সেই আত্মা। গোতম আত্ম-বাদী। অথচ দেহাদিকে অনাত্ম বস্তু বলিয়া বর্ণনা করাতেই জগতে ডঙ্কা পড়িয়া গিয়াছিল—"গোতম আত্মা মানেন না।"

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, এখন Mrs. Rhys Davids (মিসেস রিস্ ডেভিড্‌স্) মনে করেন পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ দ্বারা আত্ম-বাদই সমর্থিত হয়। এক সময়ে তিনি অন্যরূপ মনে করিতেন। পূর্ব্বমত বিষয়ে এখন বলিতেছেন, "I was very blind" অর্থাৎ "আমি অতি অন্ধ ছিলাম (Buddhist Psychology: Supplementary Essays, পৃঃ ২০৪, পাদটীকা; ১৯২৪ সংস্করণ)।

অহং এবং অস্মি

গোতমের ধর্ম্মে 'অহং' এবং 'অস্মি' এতদুভয়ে পার্থক্য করা হইয়াছে।

অহং = আমি;

অস্মি = আমি আছি; আমি হই (এই প্রকার)।

জ্ঞান এবং আত্ম-জ্ঞান এই দুই এক নহে। পাশ্চাত্য দর্শনেও Consciousness এবং Self-consciousness এ পার্থক্য করা হইয়াছে। জ্ঞান বলিলেই যে আত্মজ্ঞান বুঝিতে হইবে তাহা নহে। জ্ঞানে আত্ম-ভাব নাই। এইরূপ অহং বলিলে বুঝিতে হইবে কেবল 'আমি'; ইহার মধ্যে 'আমি আছি' কিংবা 'আমি এইপ্রকার' এ প্রকার ভাব নাই। 'অস্মি' বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে আত্ম-জ্ঞান আছে। 'অস্মি'তে জ্ঞাতৃত্ব-ভাব বর্ত্তমান, কিন্তু 'অহং'এ জ্ঞাতৃত্ব-ভাব নাই। অহং = বিশুদ্ধ 'আমি', 'নির্গুণ আমি', 'আত্ম-জ্ঞান-বিরহিত আমি'; 'অস্মি'র স্তরে আত্ম-জ্ঞান প্রকাশিত। যখন 'অহং' বুঝিতে পারে যে 'আমি আছি' বা 'আমি এই প্রকার' তখনই 'অহং' 'অস্মি'তে পরিণত হয়।

এই বিষয়ে এক সময়ে খেমক নামক ভিক্ষুর সহিত অপরাপর ভিক্ষুর আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে খেমক বুদ্ধের অনুশাসনই (ভগবতো সাসনং) ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে অনূদিত হইল। অনেক স্থলে 'অহং' এবং 'অস্মি' অনূদিত হয় নাই।

ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আয়ুষ্মান্ খেমক কি মনে করেন যে রূপাদি পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই আত্মা বা আত্মকীয়?'

খেমক। আমি এ সমুদায়কে আত্মা বা আত্মকীয় মনে করি না।

ইহার পরে তিনি আরও বলিলেন—"আমি এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধে অস্মি ভাব উপলব্ধি করিয়াছি; কিন্তু আমি মনে করি না যে 'অস্মি' এবং 'অহং' এক।

ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে 'অস্মি'," ইহা কি? রূপই কি এই 'অস্মি' কিংবা এই 'অস্মি' রূপ হইতে ভিন্ন?"

এই বিষয়ে এক সময়ে ভিক্ষুগণের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল।

ইহার পরে পঞ্চস্কন্ধের অবশিষ্ট চারিটি স্কন্ধের বিষয়েও ঠিক ঐ ভাবেই প্রশ্ন হইয়াছিল। নিম্নে চারিটি পৃথক পৃথক প্রশ্নকে একসঙ্গে সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

ভিক্ষুগণ বলিলেন—

এই যে 'অস্মি' ইহা কি বেদনা, না সংজ্ঞা, না সংস্কার, না বিজ্ঞান; কিংবা ইহা ইহার প্রত্যেকটি হইতেই পৃথক্?

খেমক বলিলেন—না, কোনটিই নয়, পৃথক্ও নহে।

ইহার পরে খেমক ভিক্ষুগণকে এই প্রশ্ন করিলেন।

উৎপল বা পদ্ম বা পুণ্ডরীকের গন্ধ বিষয়ে কি বলা যায় যে, ইহাদিগের পত্রই গন্ধ বা বর্ণই গন্ধ বা কেসরই গন্ধ?

ভি। না, এ প্রকার বলা যায় না।

খে। তবে কি বলিলে ইহাকে সম্যক্ ব্যক্ত করা যায়?

ভি। ইহা পুষ্পের গন্ধ এই প্রকার বলিলেই ইহা সম্যক্ ব্যক্ত করা যায়।

ইহার পরে খেমক বলিলেন—

"এই প্রকার আমিও বলি না যে রূপই 'অস্মি'; কিংবা 'অস্মি' রূপ হইতে পৃথক্। ইহাও বলি না যে, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ইহার প্রত্যেকটিই 'অস্মি'; কিংবা প্রত্যেকটিই 'অস্মি' হইতে পৃথক্।

সমগ্র পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে এই 'অস্মি' ভাব পাইতেছি; কিন্তু আমি মনে করি না যে, 'অস্মি' এবং 'অহং' এক (পঞ্চসু উপাদানখন্ধেসু অস্মীতি অধিগতং; অয়ং অহং অস্মীতি চ ন সমনুপস্সামি) সংযুত্ত ৩।১২৯—১৩০।

এ স্থলে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হইল—

(১) দেহ বেদনাদি পঞ্চ, উপাদান স্কন্ধ।

(২) 'অস্মি'।

(৩) অহং।

দেহাদি হইতে 'অস্মি' ভাব উৎপন্ন হয় কিন্তু 'অহং' এবং 'অস্মি' এক নহে।

পারমার্থিক ও ব্যবহারিক

'অহং' এবং 'অস্মি'—এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য দেখান হইল—ইহার মধ্যে গভীর দার্শনিকতত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে। এস্থলে আমরা বেদান্তের রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। 'অহং' অর্থ 'আমি' 'বিশুদ্ধ আমি'। 'অস্মি'র মধ্যে 'আমি আছি' বা 'আমি হই এই প্রকার' এইরূপ জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে।

বেদান্তের ভাষায় অহং পারমার্থিক আত্মা; এবং 'অস্মি' মূলক আমি ব্যবহারিক আত্মা।

পারমার্থিক আত্মা অব্যবহার্য্য, ইহা দেশ-কালের অতীত; সুতরাং ইহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই। কিন্তু ব্যবহারিক আত্মা কালের অধীন, সুতরাং ইহা পরিবর্ত্তন-শীল। পারমার্থিক আত্মা স্বরূপে অবস্থিত; কিন্তু ব্যবহারিক আত্মা অবিদ্যা-গ্রস্ত।

এই সমুদায় স্থলে আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই—এবং এই প্রকার আলোচনায় গোতম 'আত্মা' শব্দ ব্যবহারও করেন নাই। বেদান্তের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়াই আমরা 'আত্মা' শব্দ ব্যবহার করিলাম। ভাষা যাহাই হউক না কেন কথাটা এই—'অহং' অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা—সমুদায় পরিবর্ত্তনের মধ্যে ইহা অবিকারীরূপে বর্ত্তমান। আর 'অস্মি' ভাব পঞ্চস্কন্ধমূলক; ইহার উৎপত্তি আছে, পরিবর্ত্তন আছে এবং বিনাশও আছে।

'অহং' নিত্য এবং পরিবর্ত্তন-রহিত; আর 'অস্মি' ভাব পরিবর্ত্তনশীল। 'অহং' এও 'আমি' এবং 'অস্মি'তেও আমি। অপরিবর্ত্তনশীল 'অহং' হইতে কি প্রকারে পরিবর্ত্তনশীল 'অহং' এর উদ্ভব হইল—তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

অবিদ্যা

অদ্বৈত বেদান্তের মতে এ জগৎ অবিদ্যামূলক এবং আমরা যাহাকে ব্যবহারিক আত্মা বলি তাহাও অবিদ্যা-গ্রস্ত। গোতমও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন; তবে তিনি সব সময়ে বেদান্তের ভাষা ব্যবহার করেন নাই। উৎপত্তি বিষয়ে গোতম একটি নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—সেটি পটিচ্চ-সমুপ্পাদ; ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ'। কি প্রকারে বিজ্ঞানাদির উৎপত্তি হয়, ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। উৎপত্তির ক্রম এই :—

(১)	প্রথমে	অবিদ্যা—
(২)	ইহা হইতে	সংস্কার,
(৩)	„	বিজ্ঞান,
(৪)	„	নাম-রূপ,
(৫)	„	ষড়ায়তন,
(৬)	„	স্পর্শ
(৭)	„	বেদনা,
(৮)	„	তৃষ্ণা,
(৯)	„	উপাদান,
(১০)	„	ভব,
(১১)	„	জন্ম,
(১২)	„	জরা-মরণাদি।

এস্থলে উৎপত্তিবাদের ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। কেবল এই মাত্র জানা আবশ্যক যে, মানবজীবনের মূলে অবিদ্যা। যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা অবিদ্যা হইতেই উৎপন্ন হয়। আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই—গোতম যাহাকে 'অহং' বা 'আমি' বলেন, তাহা প্রতীত্য-সমুৎপাদের বাহিরে।

সাংখ্য-দর্শনের মতে সমুদায় উৎপত্তির মূলে 'প্রকৃতি'। এই প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধি, অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি। সাংখ্যের পুরুষ এসমুদায়ের বাহিরে।

সাংখ্য-দর্শন বেদান্ত-দর্শনের উপরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উভয় দর্শনের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাংখ্যের পুরুষ বহু এবং বেদান্তের আত্মা এক। বহু বৈদান্তিক সাংখ্যের বহু পুরুষের স্থলে এক আত্মা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাংখ্যের প্রকৃতি-তত্ত্বকে বৈদান্তিক মতে পরিণত করিয়াছেন। বেদান্তে প্রকৃতির বহু নাম; সর্ব্বজনবিদিত নাম অবিদ্যা। বেদান্তের আত্মা অবিদ্যার বাহিরে।

এখন গোতমের মত, সাংখ্য-মত এবং বেদান্ত-মত—এই কয়েকটি মতের সাদৃশ্য দেখান যাইতে পারে।

(১) গোতমের প্রতীত্য-সমুৎপাদ, সাংখ্যের প্রকৃতির বিকার এবং বেদান্তের অবিদ্যার বিবর্ত্ত একই শ্রেণীর।

(২) গোতমের 'অহং' বা 'আমি', সাংখ্যের পুরুষ এবং বেদান্তের আত্মা—একই শ্রেণীর। এই তিনটিই নিত্য ও অবিকারী এবং বিকার বিবর্ত্তাদির বাহিরে।

অমীমাংসিত তত্ত্ব

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, তিন মতেই একদিকে পরিবর্ত্তন প্রবাহ; অপর দিকে অবিকারী নিত্যবস্তু। এস্থলে প্রশ্ন এই :—সাংখ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং অবিকারী; তখন সে কেন প্রকৃতিতে জড়িত হইয়া সংসারদশা প্রাপ্ত হয়? বেদান্তের আত্মা এক নিত্য, নিষ্ক্রিয় এবং অবিকারী। এই আত্মাই বা কি প্রকারে অবিদ্যার বশবর্ত্তী নানাপ্রকার সংসারগতি লাভ করে? এ পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের কোন প্রকার সন্তোষদায়ক উত্তর পাওয়া যায় নাই এবং কখন পাওয়াও যাইবে না। যদি আমরা কল্পনা করিয়া লই যে, একটি বস্তু নিত্যই অবিকারী, কোন প্রকার যুক্তি দ্বারাই এই অবিকারীর বিকারত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না। এ সমস্যা সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই।

গোতমও ইহার কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মে একদিকে নিত্য অবিকারী 'অহং' বা আত্মা; অপর দিকে অবিদ্যামূলক পঞ্চস্কন্ধ। এই দুইয়ের সংযোগে কি প্রকারে 'অস্মি' ভাব উৎপন্ন হইল? আর এই দুইয়ের সংযোগই বা কি প্রকারে সম্ভব?

'অনমতগ্গ' প্রকরণে (সংযুক্ত ২।১৭৮—১৯৩) গোতম বলিয়াছেন যে, এই সংসার অনাদি; ইহার আরম্ভ কল্পনা করা অসম্ভব। তিনি বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, মানব-জীবনের আরম্ভ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অবিকারী 'অহং'এর 'অস্মি' ভাব-প্রাপ্তি তর্কগম্য নহে; অনাদিকাল হইতে 'অহং' এর এই 'অস্মি' ভাব চলিয়া আসিতেছে। আমরা 'অস্মি' ভাবমূলক পুরুষকে দেখিতেছি এবং সাধারণ ভাবে ইহার প্রকৃতিও জানিতেছি। কিন্তু 'অহং' বস্তুটি কি? এইমাত্র উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, ইহাই পুরুষের স্ব-রূপ। মুক্তপুরুষ স্ব-রূপে অবস্থিত। কিন্তু স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ দেব-মানব সকলেরই দৃষ্টির অতীত।

মুক্ত পুরুষ দৃষ্টির অগোচর

মানুষ দেহ, বেদনা, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া সংসারে বাস করে এবং মনে করে দেহ বেদনা বিজ্ঞানাদিই আমি, দেহবিজ্ঞানাদি আমার এবং এই সমুদায়ই আমার আত্মা। গোতম বলেন, এই বিশ্বাস অজ্ঞানতা-প্রসূত—মানবের সংসারাবস্থা অবিদ্যা-মূলক। এই সংসারাবদ্ধ জীবকে দেখিয়া মানবের পারমার্থিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা দেহ-বিজ্ঞানাদিকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারা ইহজীবনেই সম্যক্ দর্শন করেন, সম্যক্ অনুভব করেন যে, দেহাদি আমি নহি, দেহাদি আমার নহে এবং দেহাদি আমার আত্মা নহে। এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ অনুভব করিয়া তাঁহারা অনাসক্তভাবে সংসারে বাস করেন। ইঁহারাই মুক্তপুরুষ, ইঁহারাই তথাগত।

দেহাদির কার্য্য দেখিয়াই মানুষ মানুষের বিচার করে। কিন্তু মানুষ দেহাদিকে অতিক্রম করে, তখন দেহাদির কার্য্য দেখিয়া তাহাকে কি প্রকারে বিচার করিবে, তাহাকে কি প্রকারে দেখিবে, কি প্রকারে তাহাকে অনুভব করিবে? এ প্রকার মানুষ মানব-জ্ঞানের অগোচর। গোতম বলেন, দেবগণও এপ্রকার পুরুষের সন্ধান পান না।

যমককে সম্বোধন করিয়া গোতম বলিয়াছিলেন,

"এই দৃষ্ট পৃথিবীতেই প্রকৃতপক্ষে সত্যসত্যই মুক্ত পুরুষকে উপলব্ধি করা যায় না" (সংযুক্ত ৩।১১২ পৃঃ)।

অনুরাধ নামক ভিক্ষুকেও তিনি ঐ কথাই বলিয়াছিলেন (সংযুক্ত ৩।১১৮; ৪।৩৮২ পৃঃ)।

উদান নামক গ্রন্থে গোতমের এই উক্তিটি পাওয়া যায় :—

"যাঁহার অন্তরে কোপ নাই, যিনি জন্ম-জন্মান্তর অতিক্রম করিয়াছেন। যিনি বিগতভয়, সুখী এবং অশোক, তিনি দেবগণেরও দৃষ্টির গোচর হয়েন না" (উদান ২।১০)।

মুক্ত পুরুষের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করিয়া গোতম একস্থানে এইপ্রকার বলিতেছেন :—

"ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি ও অপর সমুদায় দেবগণ অন্বেষণ করিয়া বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর সন্ধান পান না, (অর্থাৎ এপ্রকার সন্ধান পান না) যে মুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান (এই বিশেষ বস্তুকে) * আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এ প্রকার কেন? হে ভিক্ষুগণ! আমি বলি এই দৃষ্ট পৃথিবীতেই মুক্ত পুরুষ জ্ঞান-গোচর নহেন।" (মজ্‌ঝিম ১।১৪০; অলগদ্দূপম সুত্ত)।

পুরুষ যতক্ষণ দেহাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে,ততক্ষণই জ্ঞান-গোচর হয়। মুক্ত পুরুষ অনাশ্রিত, তিনি দেহাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন না; এইজন্য তাঁহার সন্ধানও পাওয়া যায় না। তিনি দেবগণের দৃষ্টিরও অগোচর।

মজ্‌ঝিমনিকায় হইতে গোতমের যে উক্তি উদ্ধৃত হইল—ঠিক উহার পরই গোতম বলিতেছেন :—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি এই প্রকার বলি, এই প্রকার ব্যাখ্যা করি; কিন্তু তবুও কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসৎ, তুচ্ছ, মৃষা ও অসত্য বাক্যে অন্যায়রূপে এই দোষারোপ করে যে 'শ্রমণ গোতম বিনায়ক (অর্থাৎ বিনাশক); তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ বি-ভব (অর্থাৎ অনস্তিত্ব) প্রচার করেন'। হে ভিক্ষুগণ! আমি যাহা নহি, আমি যাহা বলি না সেই বিষয়ে এই সমুদায় ভদ্র শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অসৎ, তুচ্ছ, মৃষা ও অভূত বাক্যে আমার প্রতি এই দোষারোপ করে যে, শ্রমণ গোতম বিনায়ক, তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বি-ভব প্রচার করেন" (মজ্‌ঝিম ১।১৪০ পৃঃ)।

প্রকৃতপক্ষে গোতম 'বিনায়ক' নহেন; তিনি যে কেবল ব্যবহারিক আত্মার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে, তিনি দেশকালাতীত পারমার্থিক আত্মার অস্তিত্বও স্বীকার করিতেন। দেশকালাতীত বলিয়া আত্মার স্বরূপ দৃষ্টির অগোচর। ইহার বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে বেদান্তের ভাষায় কেবল বলা যায় 'নেতি', 'নেতি' ইহা নয়, ইহা নয়।

উপসংহার

আলোচনা করিয়া আমরা গোতমের মত বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম :—

(১) আত্মা নিত্য, নির্ব্বিকার ও সুখস্বরূপ। ইহা বেদান্তেরও মত।

(২) সংসার অবিদ্যামূলক। সাংসারিক পুরুষ অবিদ্যা-গ্রস্ত। কি প্রকারে নিত্য নির্ব্বিকার আত্মা বিকার-গ্রস্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করে। তাহা মীমাংসা করা যায় না। বেদান্তেরও এই মত।

(৩) অবিদ্যা-গ্রস্ত পুরুষ কেবল বিজ্ঞান-প্রবাহ নহে; ইহা নিত্য আত্মারই ব্যবহারিক রূপ।

(৪) মুক্ত আত্মা দেশ কালের অতীত। দেশ কাল-মূলক ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দেশকালাতীত বস্তুকে জানা যায় না। এইজন্য মুক্ত আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

সুতরাং বৈদান্তিকগণের ন্যায় গোতমও আত্মবাদী। গোতম আপনাকে আত্মবাদী বলেন নাই; কিন্তু তিনি যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে আমরা আত্ম-বাদী বলিতে পারি।

*আমরা পূর্ব্বে (প্রবাসী,১৩৩২ চৈত্র, পৃ ৮৬৩) শিলাচারের অনুসরণ করিয়া অন্য প্রকার পদবিভাগ করিয়াছিলাম। অদ্যকার পদবিভাগ অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

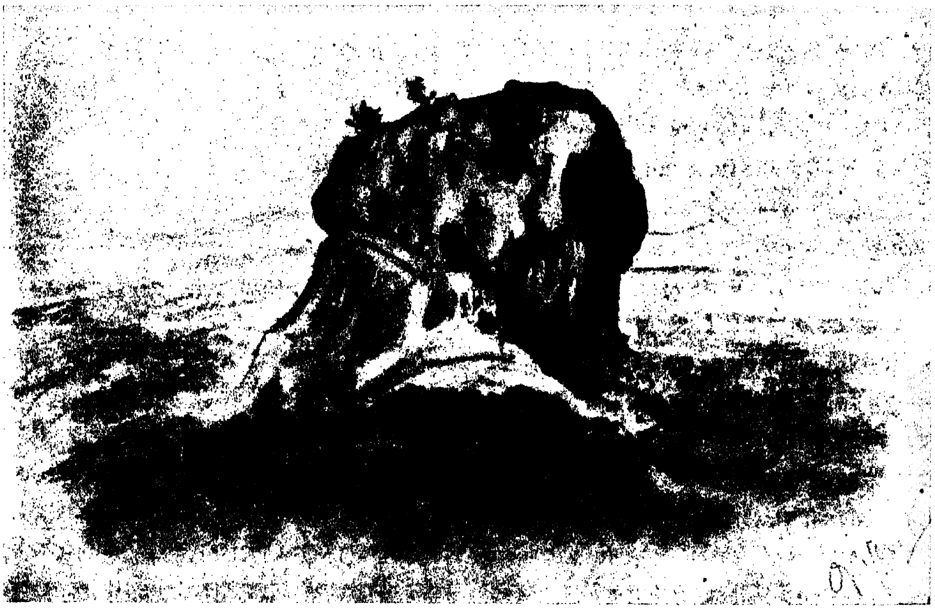
সিংহলের প্রাচীন চিত্রকলা

শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ভারতের সভ্যতা ভারতের বাহিরে বিস্তৃত হ'য়ে বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টি করেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বিরাট বোধিদ্রুম-তলে ভারতীয় শিল্পকলা বেড়ে উঠেছিল। ভারতের পরিচয় সিংহলের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে চিত্রে পরিস্ফুট। সিংহলের রাজারা বিহার, স্তূপ নির্ম্মাণ করা এবং মন্দিরের দেওয়াল এমন কি ছাদ পর্য্যন্ত—বৌদ্ধচিত্রে ভ'রে ফেলা পুণ্যকার্য্য মনে করত।

এবং চেষ্টার নিয়োগ করতে হ'ত না, তাই তারা তাদের আবেষ্টনকে এমন কি দৈনিক ব্যবহারের নগণ্য তৈজস-পত্রকেও সৌন্দর্য্যে ভ'রে তুলতে পেরেছিল।

এই প্রবন্ধে সিংহলের বৌদ্ধবিহারের চিত্র সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি। সিংহলের চিত্রকলাকে মোটামুটি তিন যুগে ভাগ ক'রে ফেলা যেতে পারে।



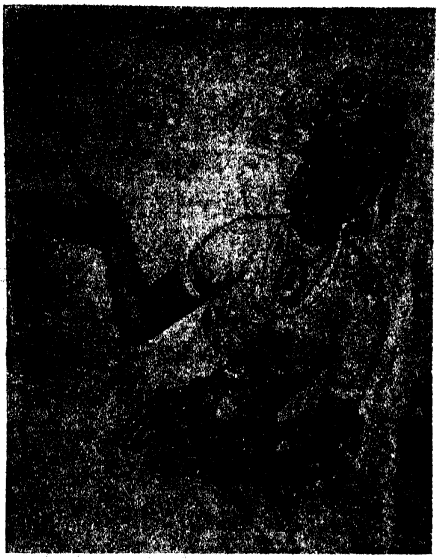
সিগিরিয়া শৈলের দৃশ্য (দূর হইতে)

সিংহলের প্রাচীনকালের সামাজিক শ্রেণীবিভাগে শিল্পী এবং কারুদের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। ভরণ-পোষণের জন্য তারা রাজার নিকট হ'তে বিনা-করে জমি ভোগ করত; কিন্তু রাজার আহ্বানে যখন কাজ করত তখন বিনাপরিশ্রমে কাজ করতে হ'ত। তখন লোকদের অবসর ছিল অনেক। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সকল শক্তি

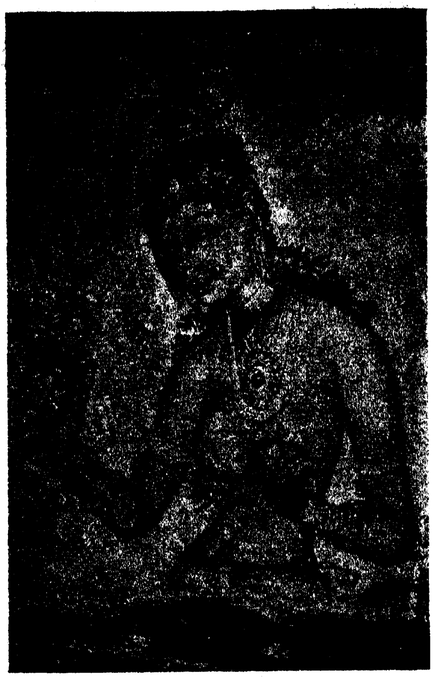
১ম যুগের চিত্র—৭ম শতাব্দীর সিগিরিয়ার ফ্রেস্কো চিত্র।

২য় যুগের চিত্র—পোলানারুয়াতে ডেমল মহাসেয়ার ১২শ শতাব্দীর ফ্রেস্কো চিত্র।

৩য় যুগের চিত্র—১৮শ শতাব্দী থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন মন্দিরের চিত্রাবলী।



সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ফটো

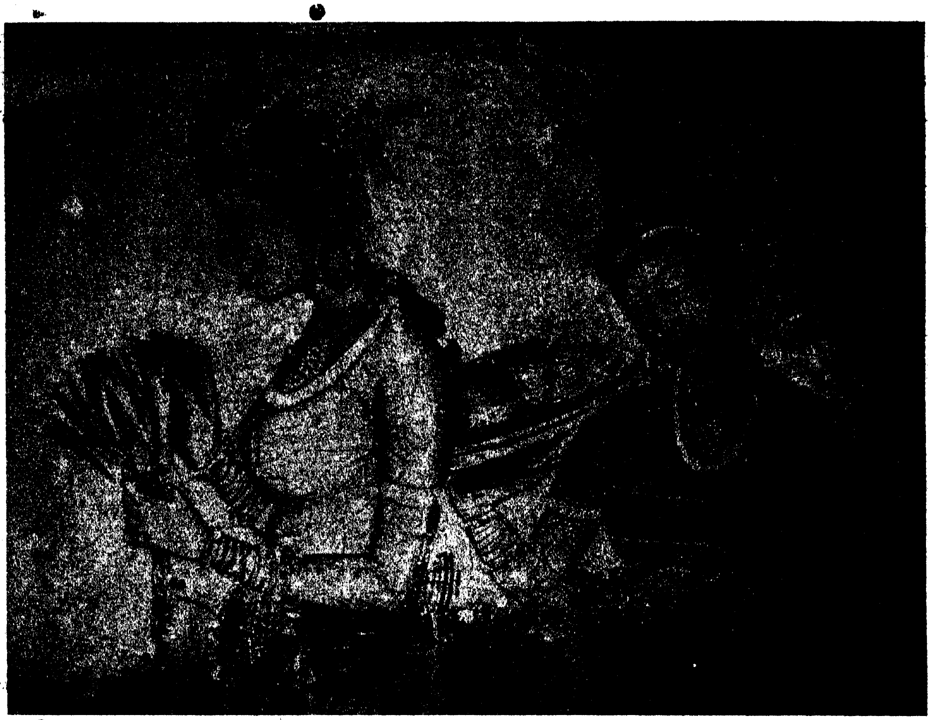


সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ফটো

এটা উল্লেখ করা দরকার, যে, প্রথম দুই যুগের চিত্রকে ফ্রেস্কো চিত্র ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে; কিন্তু শেষ যুগের চিত্রকে ফ্রেস্কো ব'লে উল্লেখ করা হয়নি। এর কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ফ্রেস্কো চিত্র সাধারণ চিত্র থেকে পৃথক্ জিনিষ। অজন্টা ও বাগের চিত্রাবলী ফ্রেস্কো চিত্রের উত্তম উদাহরণ। ইটালীতে চার্চ্চের প্রাচীন খৃষ্টীয় চিত্রসকল ফ্রেস্কো চিত্র। ফ্রেস্কো চিত্র এমন কোনো প্রথায় আঁকা, যাতে রংটা স্থায়ী হয়। রোদ বৃষ্টিতে বহুশত বৎসর খোলা থাকলেও ছবি সহজে নষ্ট হয় না। ফ্রেস্কো চিত্রে দেওয়ালে প্রথম একটা আস্তর দেওয়া হয়। এই আস্তরের বিশেষ একটা গুণ এই, যে, রংটা এর ভিতর ব'সে যায় তাতে রং সহজে চ'লে যায় না। ডাক্তার আনন্দকুমারস্বামী মধ্যযুগের সিংহলী শিল্পগ্রন্থে (Mediaeval Sinhalese artএ) এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ফ্রেস্কোচিত্রের টেক্‌নিক বা কারিগরির বর্ণনা এই বইতে পাওয়া যাবে। অন্য চিত্র খালি দেওয়ালের উপর আঁকা। দেওয়ালে লেগে থাকার জন্য রংয়ের সঙ্গে আঠা দেওয়া হয়। গঁদ, তেঁতুলবিচি, শিরিষ, ভাতের মাড় ইত্যাদি আঠা রংয়ের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। সিংহলে ভাতের মাড় ব্যবহার করা হয়। এই চিত্র ফ্রেস্কোচিত্রের ন্যায় স্থায়ী হয় না, এবং বৃষ্টির জল লাগলে উঠে যায়।

সিংহলের অন্য সকল চিত্র থেকে সিগিরিয়ার চিত্রই বেশী পুরাতন, এবং বেশী বিখ্যাত। সিগিরিয়া বা সিংহ-গিরি, নাম থেকেই বোঝা যায় সিগিরিয়া শৈলের ইটের তৈরী মস্ত বড় একটা সিংহের মূর্ত্তির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে। সিংহের মূর্ত্তি পূর্ব্বে কিরূপ ছিল এখন কল্পনা কর্‌তে পারি না, কারণ প্রকাণ্ড দুই থাবা ছাড়া অন্য অংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হ'য়ে গেছে।

রাজা কাশ্যপ তার পিতা ধাতু সেনকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করে। সে ভাইয়ের প্রতিশোধ এড়াবার জন্য সিগিরিয়া শৈলের উপর একটি দুর্গপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করে। এই শৈল-দুর্গ থেকে কাশ্যপ ১৮ বৎসর চারিদিকের প্রদেশের উপর



সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ফটো। (৭ম শতাব্দী)*

রাজত্ব করে। কিন্তু অবশেষে তাকে শত্রুসৈন্যের সাম্‌নে যেতে হয়েছিল। তার ভাই বিপুল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে। কাশ্যপ যখন দেখ্‌ল পরাজয় নিশ্চিত, তখন শত্রুর হাত হ'তে নিষ্ঠুর মৃত্যু এড়াবার জন্য নিজের গলা কেটে ফেলে আত্মহত্যা করে। সিগিরিয়ার ইতিহাস রহস্যে পূর্ণ।

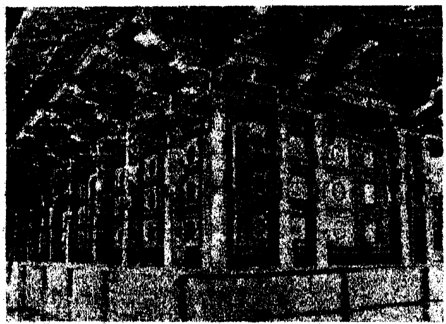
সিগিরিয়া পাহাড়ের উপরিভাগ একেবারে সমতল। পুরাতন অট্টালিকা এখন আর নাই, কেবল তার ভিত্তি-মাত্র অবশিষ্ট আছে। কষ্টিপাথরের দুইটি সিংহাসন আছে। এখানে রাজা সভাসদদের নিয়ে বস্‌তেন এবং প্রার্থীদের দর্শন মঞ্জুর কর্‌তেন। রাজার জীবিতকালে কর্ম্মচারী প্রহরী সৈন্য শিল্পী প্রভৃতিদের আনাগোনায় যায়গাটি নিশ্চয়ই খুব কোলাহল-মুখর ছিল, কিন্তু এখন সব নিস্তব্ধ। রাজবৈভবের মহিমা চিরকালের জন্য লোপ পেয়েছে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে নিসর্গের বিচিত্র বর্ণ-ব্যঞ্জনায়, পাখীর সুমধুর সঙ্গীতে প্রকৃতির উৎসব নিত্য অবিরাম চলেছে।

সিগিরিয়া জঙ্গলের ভিতর থেকে হঠাৎ ৮০০ শত ফুট খাড়া উঠে গেছে। পাহাড়ের উপর থেকে দৃশ্য অতিশয় মনোরম দেখায়। সবুজ বনের ঢেউ দিগন্তে মিশে গেছে। নির্জ্জন প্রান্তরে সিগিরিয়া একা জেগে আছে।

কুমারসম্ভবে কালিদাস দেবতাত্মা হিমালয়কে অমর করেছেন। কত কবির লেখনী কত চিত্রকরের তুলি জাপানের ফুজিকে ধন্য করেছে। সিগিরিয়ার মহিমা কীর্ত্তন কর্‌তে কি কোন কবি নেই? একবারের জন্য চোখে পড়লেও এর মাধুর্য্য ভোলা যায় না। ভোর বেলায় দূর থেকে একে দেখলাম, ডাম্বুল পাহাড়ে ওঠবার

* সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ছবিগুলি সিংহলের আর্ট ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সি, এফ, উইন্‌সরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সময়। কি ভীমকান্ত ছবি! দিক্‌চক্রবালে কুয়াশা-ঢাকা নীল ছায়া। শিবের যেন ধ্যানী মূর্ত্তি। সন্ধ্যায় রেস্‌ট্‌ হাউসের বারান্দায় ব'সে দেখছিলাম। রেস্ট হাউস পাহাড়ের তলা থেকে আধ মাইল দূরে। নীল আকাশের পটের উপর সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত সিগিরিয়া। মাঝে মাঝে শ্যাওলা-ধরা শিলা, তারি উপর সূর্য্যাস্তের দীপ্তি প্রতিহত হ'য়ে ঝলসিত হচ্ছিল। শিলার উপর যে লাল আভা, তা বদলে হ'ল কমলা রং, আর কমলা হ'ল



কাণ্ডির দালদা মালিগাওয়া বা দন্ত বিহারের স্তম্ভের সারি এবং চিত্রাবলী
৩য় যুগের চিত্র অথবা ১৮শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের চিত্র

বেগুনী, বেগুনী হ'ল পরে নীল। অবশেষে অন্ধকারে গেল ডুবে আলোকের খেলা। অন্ধকার ঘনিয়ে যখন রাত এল, কালো আকাশে রূপালী ছড়িয়ে দিল দেখা ক্ষীণ চন্দ্রকলা। সিগিরিয়ার কালো সিলউয়েট মূর্ত্তি তখন আকাশের রজতপটে। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা শব্দ। মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীর বিকট আওয়াজ আকাশের বিরাট নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত কর্‌ছিল। অন্ধকারে ডানা ঝাপটিয়ে কোথায় তারা চলেছিল!

এ পর্য্যন্ত সিগিরিয়ার চিত্র সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এমন চমৎকার যে, চিত্রের সঙ্গে প্রকৃতিও যেন আর্টের একই কাজ।

সিগিরিয়া কাল এবং মানুষ উভয়েরই দৌরাত্ম্য থেকে সুরক্ষিত। কারণ খুব উঁচু এবং দুর্গম স্থানে ছবি আঁকা হয়েছে। ছবি এক প্রকোষ্ঠের মধ্যে আঁকা হয়েছিল; বাইরের দেওয়ালটা বহু পূর্ব্বে ধ্বসে গিয়েছে। ছবি যে-পাহাড়ের গায়ে আঁকা, তা ভিতরের দিকে হেলান। কাজেই রোদ বৃষ্টি ছবিতে পড়তে পারে না। আগে ছবির কাছে ত একেবারেই যাওয়া যেত না। এখন



ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো (পোলানারুয়া) ১২শ শতাব্দীর চিত্র

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কৃপায় সেখানে যাওয়া কতকটা সুগম হ'য়েছে। দড়ির মই বেয়ে সেখানে যেতে হয়। কিন্তু এত উঁচু থেকে দড়ির মই ঝুল্‌ছে যে, উপরে ওঠবার সময় নীচে তাকালে মাথা ঘুরে যেতে পারে। পাহাড় সেখানে একেবারে দেওয়ালের মতন খাড়া নেবে গেছে। যারা মাথা ঠিক রাখতে পার্‌বে না, তাদের এখানে ওঠবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

কিন্তু একবার উপরে উঠতে পার্‌লে আর ভয় নেই। ছবির ঠিক নীচেই কাঠের প্লাটফর্ম্ম দেওয়া আছে।



সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ফটো

বাইরের দিক্ তারের জালে ঘেরা কাজেই সেখানে নির্ভয়ে ঘুরে ফিরে ছবি দেখা যেতে পারে।

মোট ২১টি রমণীমূর্ত্তি আছে। রাণী এবং পরিচারিকা-দের ছবি প্রায় প্রমাণ আকারের মানুষের সমান কেবল কোমর পর্য্যন্ত আঁকা, শরীরের উপরিভাগ সম্পূর্ণ খোলা বা পাতলা আঁট জ্যাকেট দেওয়া। চোখের চাহনী শরীর-গঠন এবং ভঙ্গিতে খুব বেশী রকমের স্ত্রীসুলভ ভাব। অ্যানাটমী ঠিক, এবং খুব সম্ভবতঃ অজন্টার চিত্র অপেক্ষাও বেশী শুদ্ধ। এর থেকে মনে হয়, সিগিরিয়ার চিত্রকরেরা যে নিছক কল্পনার জোরেই ছবি এঁকেছে, তা নয়; নিশ্চয়ই জীবন থেকে অধ্যয়ন করেছে।

সিগিরিয়ার সৌন্দর্য্য তার জোয়াল এবং সুনির্দ্দিষ্ট রেখায়। শিল্পী যে রেখা টেনে গেছে কোথাও ভয় বা সন্দেহ নেই। ফ্রেস্কোতে একবার ভুল এঁকে ফেলে তা শোধরাবার উপায় নেই। যা আঁক্‌বার একেবারেই এঁকে ফেল্‌তে হয়। সিগিরিয়াতে দু এক জায়গায় ভুল ড্রইং রয়েছে, তা বোঝা যায়। ভুল ড্রইংএর উপর কালো লাইন টেনে শুদ্ধ করা হ'য়েছে। কাজেই ভুল শুদ্ধ দুরকম ড্রইংই একসঙ্গে চোখে পড়ে। অজন্টার রংয়ের প্রাচুর্য্য; সিগিরিয়ার রংয়ের দৈন্য গেরিমাটী এবং ফিকে লাল হচ্ছে প্রধান। যেখানে গভীর রংয়ের প্রয়োজন হয়েছে, যেমন, চুল ভ্রূ চোখের তারা ইত্যাদি, সেখানে সবুজ রং ব্যবহার করা হ'য়েছে। কলম্বোর যাদুঘরে সিগিরিয়া চিত্রের প্রতিলিপি রাখা হ'য়েছে। নকল মূল চিত্রেরই অনুরূপ হ'য়েছে।

সপ্তমশতাব্দী থেকে একেবারে দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে পড়তে হয়। মাঝের এই লম্বা ফাঁকে চিত্রের নিদর্শন



ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো (পোলানারুয়া) ১২শ শতাব্দীর চিত্র

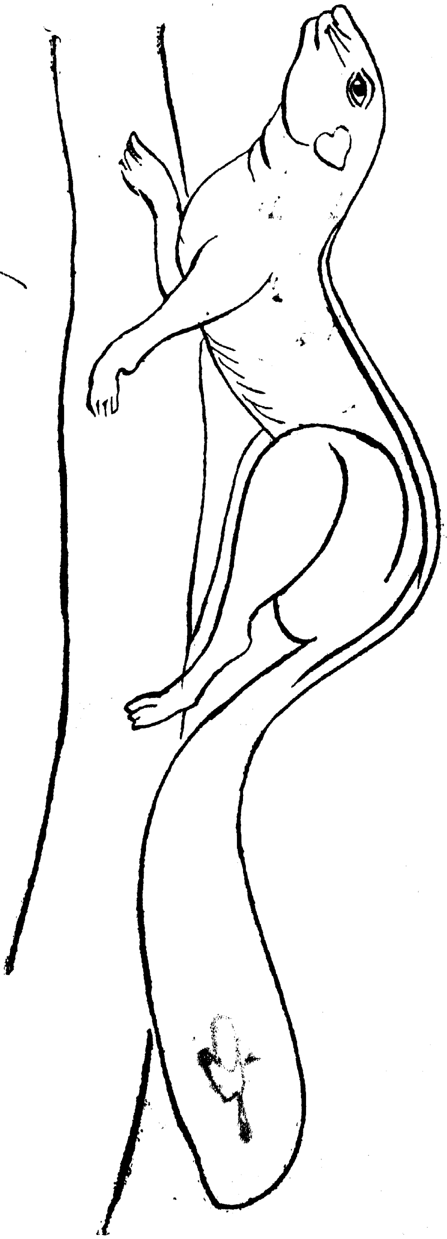


ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো (পোলানারুয়া) ১২শ শতাব্দীর চিত্র

পাই না। দ্বাদশ শতাব্দীর ফ্রেস্কোর একমাত্র নিদর্শন পোলানারুয়ার [ডেমলমহাসেয়া বিহারে। এ সময়কার অধিকাংশ বিহারই ইটের তৈরী। ইটের দেওয়ালে আঁকা ফ্রেস্কো পাথরের উপর আঁকা ফ্রেস্কোর ন্যায় তেমন স্থায়ী হয় না, কাজেই ডেমলমহাসেয়ার চিত্র ছাড়া এসময়কার ফ্রেস্কো লোপ পেয়েছে। ডেমলমহাসেয়া বিহারের চিত্র বহু শত বৎসর রোদ এবং বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই করেছে, কারণ এর ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। আবর্জনা স্তূপ পরিষ্কার ক'রে চিত্র উদ্ধার করা হ'য়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে এখন এর যত্ন করা হচ্ছে, কিন্তু অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। ছবি একেবারে অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে কলম্বোর যাদুঘরে এর যে প্রতিলিপি রাখা হ'য়েছে, তা একেবারেই কিছু হয় নাই। মূলের যে সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য আছে তা এর ভিতরে একেবারেই নেই। মূলের রেখায় যে ছন্দ এবং কমনীয়তা আছে, প্রতিলিপিতে তা মোটেই ধরা পড়ে নাই। আর্টের একটি বড় নিদর্শন



ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো (পোলানারুয়া) ১২শ শতাব্দীর চিত্র



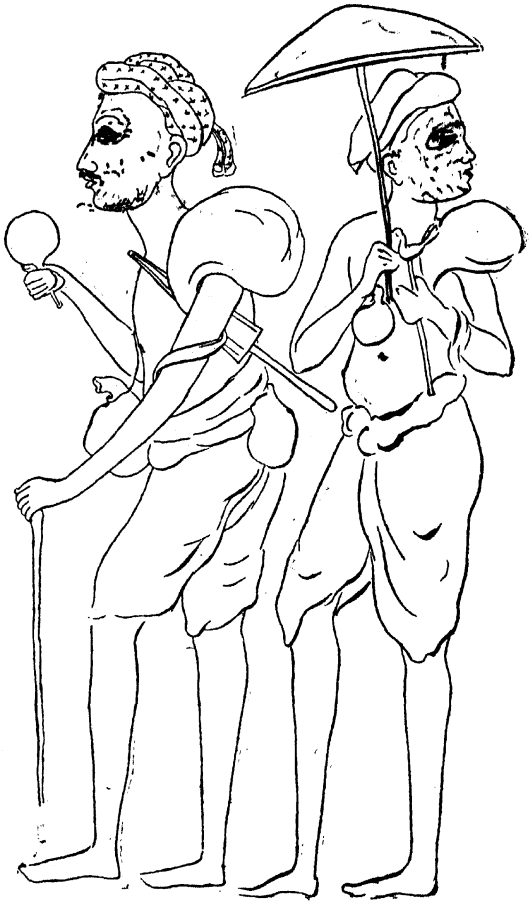
ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো (পোলানারুয়া) ১২শ শতাব্দীর চিত্র

যা অজণ্টার শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিরও প্রতিদ্বন্দ্বী, চিরকালের জন্য একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেল।

আর্কিওলজিকাল রিপোর্ট লিখেছে—"পোলানারুয়ার মধ্যযুগের এই বিহারে যেমন আশ্চর্য্য রকমের বৌদ্ধ চিত্র রহিয়াছে, সিংহলের অন্য কোথাও প্রাচীন বিহারে, অন্ততঃ যেসব বিহার এখনও বর্ত্তমান আছে, খুব সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আর নাই। সাঞ্চি, ভারহুত, অমরাবতী, বরভূদর প্রভৃতি স্থানের পাথরের খোদাই যেই অসম্পূর্ণ বস্তু দেয় তাহাই এখানে রঙীন চিত্রে স্বাভাবিক ভাবে নিপুণ তুলিকার অঙ্কনে সব আখ্যান যথার্থ এবং স্পষ্ট ভাবে বলিতেছে। ডেমল মহাসেয়াতে এখনো এমন সকল চিত্র আছে যাহা অজণ্টার শ্রেষ্ঠ চিত্র সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে।"



সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ফটো



তীর্থ-যাত্রী
কেলানী বিহার (কেলানী) ৩য় যুগের চিত্র

আর্কিওলজিকাল রিপোর্ট কিছু অত্যুক্তি করেনি। ডেমল মহাসেয়ার চিত্রগুলি যদি সম্পূর্ণরূপে থাকৃত অজণ্টার ন্যায় এগুলিও আর্টের জগতে অপূর্ব্ব জিনিষ হ'তে পারৃত। ছবিগুলি এখন একেবারে অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে কিছুই বোঝবার জো নেই। ৩।৪টা মূর্ত্তির ট্রেসিং আমি নিজে নিতে পেরেছিলাম। এই বিহারের চিত্রের কথা আমি পূর্ব্বে শুনিনি। ভাঙা মন্দিরে ঢুকে যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে এই অপূর্ব্ব জিনিষ দেখলাম তখন বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম। সিগিরিয়ার শৈলী (ষ্টাইল) অজন্তা থেকে আলাদা রকমের; কিন্তু এই বিহারের শৈলী অজণ্টার খুবই কাছাকাছি।

শেষযুগের চিত্র যা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয়েছে, তা খুব conventional এবং ওর ভিতর জীবনের গতি নেই; কিন্তু এর ভিতর শিল্পের আলঙ্কারিক দিকৃটা পূরো মাত্রায় রয়েছে, শিল্পীদের এবিষয়ে বংশানুক্রমে একটা স্বাভাবিক বৃত্তি আছে যাতে তারা অতি সহজেই কৃতকার্য্য হয়। দেওয়ালের সমস্ত জমিতে চিত্র এবং তার ফাঁক (space) ঠিক ভাবে ভাগ করা আছে। ছবির সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণ এই ফাঁকের উপর নির্ভর করে। ফাঁকই ছবির বিভিন্ন অংশের সমান ওজন ঠিক রেখে ছবিটিকে সংহত করে।

এযুগের মানুষের চিত্রে দেখা যায় অনেক সময় তার মাপ জোক ঠিক নেই এবং প্রায়ই প্রাচীন মিশরের চিত্রের ন্যায় আড়ষ্ট। চিত্র ছাড়াও সিংহলের হালের মাটীর অনেক রকম পুতুলে মিশরের প্রভাব সুস্পষ্ট।



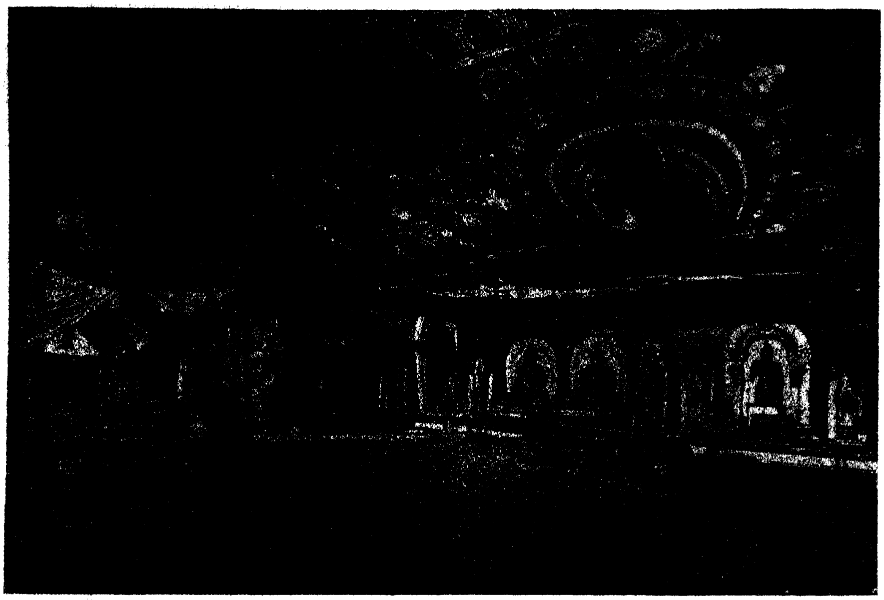
সিগিরিয়া ফ্রেস্কোর ফটো

যাক্ ; মানুষের অ্যানাটমীর কথা বল্‌ছিলাম। তার মাপ জোক ঠিক না হ'লেও এই ভুলটা তেমন চোখে পড়ে না। কারণ চিত্রের বিশেষ কোনো বস্তুর বা বিশেষ কোনো অংশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিশেষ ক'রে অনুভূত হয় না। যদি কোনো এক অংশে দৃষ্টিপাত না ক'রে দূর থেকে সমগ্রটা একেবারে দেখা যায়, তবে বোঝা যাবে সমস্ত দেওয়ালের বিভিন্ন চিত্র ডুবে গিয়ে একটা নক্সা চিত্রে পরিণত হয়েছে। এবিষয়ে ভাল উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কলম্বো থেকে ৬ মাইল দূরে কেলানী বিহারের চিত্রে।

এযুগের শিল্পীদের বলা যেতে পারে কারিগর আর প্রথম যুগের শিল্পীরা হ'ল আর্টিষ্ট। এযুগের শিল্পীদের বাংলার পোটোদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এরা হচ্ছে folk আর্টিষ্ট। বাংলার পোটোদের চিত্র সিংহলী কারিগরদের চেয়ে অনেক বেশী মোলায়েম, কিন্তু আলঙ্কারিক শিল্পে ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে তারা সিংহলীদের চেয়ে হীন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্র হ'ল ডাম্বুল বিহারের চিত্র। এই চিত্র এই সময়কার অন্যান্য বিহারের চিত্র থেকে কিছু পৃথক্। কাণ্ডির রাজা কীর্ত্তিশ্রী অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিহার সংস্কৃত ও চিত্রিত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই বিহারের চিত্র কিরূপ ছিল জান্‌বার জো নেই। কারণ পুরাতন চিত্র আর নাই, সমস্ত বিহারই নতুন ক'রে আঁকা হয়েছে।

ডাম্বুল বা কাণ্ডি অঞ্চলের চিত্রে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব আছে। এর কারণ কাণ্ডির রাজারা, যাদের জন্য এই শিল্প উৎসাহিত হয়েছে, সিংহলের লোক নয় ; তারা দাক্ষিণাত্য



ডাম্বুলবিহারের ছাদের চিত্রাবলী, ১৮শ শতাব্দী

থেকে সিংহলে এসেছে রাজত্ব করতে। কাণ্ডির বিহারের নাম দালদা মালিগাওয়া বা দন্ত বিহার (এখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে), আশগিরিয়া বিহার, মালওয়াও বিহার, গঙ্গারাম বিহার, আদাহন মালুয়া বিহার, লঙ্কা তিলক বিহার। শেষের বিহারটি কাণ্ডি সহর থেকে ৬ মাইল দূরে, অপর গুলি সহরের ভিতরে।

মাডালের আলু বিহার বা আলোক বিহারের চিত্রও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাল উদাহরণ। ত্রিপিটকের বিখ্যাত টীকাকার বুদ্ধ ঘোষ এই বিহারে বাস করতেন। এই যুগের চিত্রের উদাহরণ পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত স্থানে। এসব স্থান সবই সমুদ্রের ধারে। কালুতারা, ছিককাডুয়া, ডোডানডুয়া, আহাঙ্গমা ইত্যাদি।

এটা খুব আশ্চর্য্য যে দেশের লোকেরা এবং বিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এইসকল প্রাচীন চিত্রের মর্য্যাদা বোঝে না; তারা প্রাচীন চিত্র তুলে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় জমকাল কুৎসিৎ রংয়ের ছবি আঁকতে পছন্দ করে।

বর্ত্তমান কালের চিত্র সম্বন্ধে দুয়েক কথা ব'লে উপসংহার করি।

হালের চিত্রকরদের হাতে বৌদ্ধচিত্র অবনতি এবং দুর্গতির চরম সীমায় নেবেছে। বুদ্ধ একজন মোটাসোটা ইংরেজরূপে উপস্থিত; পোষাকেই কেবল তফাৎ, হ্যাট কোটের পরিবর্ত্তে চীবর পরা। নৃপতি শুদ্ধোদনের পরিবারের মহিলাদের ছবি নাচওয়ালী মেয়েদের ন্যায়; মুখে রং ঘষা। অঙ্কন-রীতির দিক থেকে বিচার করলে রং, রেখা ও ছন্দের লেশমাত্র নাই। কাজেই এই চিত্রের মূল্য কানা কড়িও নয়। রংয়ের যে অসামঞ্জস্য এবং ভীষণ রকম জমকালো ভাবে, যেন ভাঙ্গা টীনের কেনেস্তারা বাজিয়ে চীৎকার করছে। বাড়ীতে যে সব বৌদ্ধ চিত্র রাখা হয়, তা ভীষণ রকমের জার্ম্মাণ ওলিওগ্রাফ। তার আর বর্ণনা না করলাম।

কাণ্ডি অঞ্চলে এখনও সাবেকী ধরণের বংশানুক্রমিক

আর্টিষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু মন্দির চিত্র করতে তাদের আর ডাক পড়েনা। তাদের কাজ দেশের লোকেরা পছন্দ করে না। কাজেই তারা পশ্চিমের কিউরিও শিকারীদের জন্য ছোট খাট জিনিষ তৈরী ক'রে থাকে। কাঠের পাটায় আঁকা এদের ছবি পাওয়া যায়। ছোট খাট বাক্স কৌটা এরা সুন্দর ক'রে চিত্রিত ক'রে থাকে।

সিংহলবাসীরা তাদের নিজের সব হারিয়েছে। শিক্ষায়, দীক্ষায় শিল্পে, সঙ্গীতে, এবং জীবনের প্রাত্যহিক প্রত্যেক খুঁটি নাটি ব্যাপারে পশ্চিমের অনুসরণ ক'রে থাকে। তারা তাদের বেশ বদলিয়েছে, ব্যক্তিগত নামও অধিকাংশ স্থলে ইউরোপীয় অথবা দেশী বিলাতী মেশান, যেন ডেনিয়েল গুণ বর্দ্ধন। এরা নিজেদের সমস্ত ঘুচিয়ে পুরাপুরি সাহেব হ'য়ে যেতে চায়—কোনে রকমের দেশী পরিচয় যেন লজ্জার কারণ। অন্ধ পরানুকরণই হচ্চে এখন একমাত্র জাতীয় উদ্দেশ্য। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাই এক বক্তৃতায় সিংহলকে ছোট ইংলণ্ড (Little England) ব'লে উল্লেখ করেছিলেন।



সিগিরিয়া শৈলে উঠিবার সিড়ি চিহ্নিত স্থানে প্লাটফর্ম দেখা যাইতেছে
এখান হইতে ফ্রেস্কো দেখা যায়

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

ভবানীর ফিরিতে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। পিসিমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে ঠিক করিল ভানুমতীর সন্ধ্যার জলযোগের ফল, মিষ্টি প্রভৃতি কিনিয়াই লইয়া যাইবে, কারণ বাড়ী গিয়া ফের আসিতে হইলে একেবারেই সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। অতএব বাড়ীর দিকে না গিয়া সে সোজা দোকানের দিকে চলিল।

বাড়ী ফিরিতেই ভানুমতী বলিল, "বাপ রে বাপ, গল্প পেলে আর তুই কিছু চাস্ না। আমাকে আজ খেতেও দিবি না নাকি?"

ভবানী হাসিয়া বলিল, "দিচ্ছি গো দিচ্ছি, তবু ভাল যে খাবার কথাটা মনে আছে। এমনিতে ত দশবার বললে একবার খেতে চাও না, আজ একটু দেরি হয়েছে কিনা তাই।"

ভবানী তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার খাবার ঠিক করিয়া

আনিল। ভানুমতী খাইতে বসিলে, সে তাহার কাছে বসিয়া পিসিমার বাড়ী কি কি দেখিয়া এবং শুনিয়া আসিল, তাহারই বর্ণনা আরম্ভ করিল।

সব শুনিয়া ভানুমতী বলিল, "ওমা, তুই এ টাকার কথা জান্‌তিস্ না? আমি কবে শুনেছি।"

ভবানী বলিল, "তোমরা না বল্‌লে আর আমি জান্‌ব কোথা থেকে বাছা? ভগবান করুন, এখন ভালয় ভালয় একটি বেটা ছেলে হ'য়ে যায়, তাহ'লেই সব দিক্ রক্ষা হয়।"

ভানুমতী বলিল, "বেটা ছেলে না হ'য়ে মেয়ে হ'লেই কি আর? তবে ছেলে হ'লে শ্বশুরের, স্বামীর বংশ থাকবে, মেয়ে হ'লে সেটা থাক্‌বে না এই যা।"

ভবানী রাগিয়া বলিল, "তোমার এক কথা! কেন মেয়ে হ'লে ক্ষতিটা কম কি? ছয় লাখ টাকা হাতছাড়া হ'য়ে যাবে, সেটা বুঝি কিছু না? আর যে চিরকাল তোমার দুষ্‌মনী করল, সেই চোখের সাম্‌নে ব'সে দুহাতে তোমার হক্কের ধন ওড়াবে, তা দেখতে পারবে?"

ভানুমতী ভবানীর রাগে হাসিয়া বলিল, "বাবাঃ, তোরা রাজপুতরা বড় হিংসুটে কিন্তু। যাকে দেখতে পারিস না, তার নামেই জ্বলে যাস্। এইজন্যেই ইতিহাসে তোদের কথা এত লিখেছে।"

ভবানী বলিল, "তা বাছা, আমরা গরম দেশের মানুষ আমাদের মেজাজ গরম। যে দুষ্‌মনী করে, আমরাও তার দুষ্‌মনীই করি, আর যে ভাল করে দরকার হ'লে তার জন্যে জানও দিতে পারি। তোমার ঐ লক্ষ্মীছাড়া দেওর যদি টাকা পায়, তা হ'লে আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে যাবে। ভগবান কখনো এমন অন্যায় হ'তে দেবেন না।"

ভানুমতী বলিল, "ও কথা বলিস্ না রে। ভগবানের ন্যায়-অন্যায় মানুষে বোঝে না। তা না হ'লে আমার অমন দেবতার মত স্বামী চ'লে গেল।" সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল।

ভবানী নীচে নামিয়া গেল, যদিই রান্নাঘরের দিকে কোনো কাজ থাকে। সে দুই দণ্ড বসিয়া থাকিতে পারিত না, নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ হইয়া গেলে, অন্যের কাজ কাড়িয়া লইয়া করিতে বসিত। এইজন্য বাড়ীর অন্য ঝি চাকরেরা তাহাকে বেশ খানিকটা খাতির করিয়া চলিত, যদিও তাহার চড়া মেজাজ এবং কট্‌কটে কথার জন্য আড়ালে সবাই তাহার নিন্দা করিতেও ছাড়িত না। শোভার মেয়ে দুর্গার কল্যাণে এই ক'দিন অবশ্য তাহার সময় কাটাইবার উপায়ের বিশেষ অভাব ছিল না।

নীচে গিয়া ভবানী দেখিল, রান্নাঘরের কাজ একরকম হইয়াই গিয়াছে, দুর্গাও নিতান্ত লক্ষ্মী মেয়ের মতন মায়ের পাশে বসিয়া ইন্‌জিন্ গাড়ী লইয়া খেলিতেছে। তাহাকে লইয়া এখনি যে পাগলের মত দিক্‌বিদিকে ছুটাছুটী করিতে হইবে, তাহার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। অগত্যা ভবানী ঘর হইতে এক রাশ কাপড়, সুতা ছুঁচ কাঁচি প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল, এবং রান্নাঘরের দরজার কাছে বসিয়া একখানা অর্দ্ধসমাপ্ত ছোট কাঁথা লইয়া দ্রুতগতিতে সেলাই করিতে সুরু করিল।

শোভাবতী বলিল, "বুড়ো হয়েছিস্ কে বল্‌বে? চোখের ত দিব্যি তেজ আছে। রাত্রেই সেলাই কর্‌ছিস্? আমি ত পারি না।"

ভবানী বলিল, "আমি নামেই বুড়ী বাছা। বয়সই হয়েছে, শরীরের ত ক্ষয় হয়নি? সেই চৌদ্দ বছর বয়সে রাঁড় হয়েছি, স্বামীর ঘরও কর্‌তে হয়নি, ছেলেপিলে মানুষও কর্‌তে হয়নি। কাজেই গতরে শক্তি আছে।"

বাহিরের দরজার কড়াটা সজোরে বাজিয়া উঠিল। ভবানী সেলাই ফেলিয়া সেইদিকে চলিল। দরজা খুলিয়াই দেখিল উদয় দাঁড়াইয়া। সঙ্গে তাহার আর একটি কে ভদ্রলোক, তাহাকে ভবানী পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

অভ্যাগতদ্বয়কে ভিতরে আহ্বান করিবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া ভবানী বলিল, "কাকে চান?"

উদয় জিজ্ঞাসা করিল, "মহেশবাবু বাড়ী নেই?"

ভবানী বলিল, "বাবু এখনও বেড়িয়ে ফেরেন-নি।"

উদয় বলিল, "আচ্ছা, তা বৌঠানকে খবর দাও, এলাম যখন একটু দেখা ক'রে যাই।"

ভবানী অম্লানবদনে বলিল, "ওমা, ভানুও বাড়ী নেই। মেজ দিদিমণির সঙ্গে আজ তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে একটু ঘুরে আস্‌তে গেছে।"

উদয় চৌকাঠের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,

ভবানীর অভ্যর্থনার আতিশয্যে অগত্যা আবার বাহির হইয়া গেল। ভবানী দরজাটা ভেজাইয়া দিল। খিল লাগাইয়া আসিবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় শুনিল উদয় তাহার সঙ্গীটিকে বলিতেছে, "বৌঠানরূপ গোলাপ ফুলটির চারপাশে এই যে কাঁটার বেড়াটি, একে পার হওয়া শক্ত। ইচ্ছা করে এক থাপ্পড় দিতে, কি মুরুব্বীআনা চাল!"

বন্ধু বলিল, "হ্যাঁ, রূপসী কৈকেয়ীর সঙ্গে বাপের বাড়ীর ঝি কুঁজী মন্থরা ত থাক্‌বেই। বেটির চেহারা দেখনা, যেন ফৌজের সেপাই। কে বল্‌বে মেয়েমানুষ? তোমায় বোধ হয় তু'লে আছাড় দিতে পারে।"

ভবানী দাঁতে দাঁত ঘষিয়া মনে মনে বলিল, "ভগবান দিন দেন ত দেখিয়ে দেব যে সত্যিই তু'লে আছাড় দিতে পারি। নচ্ছার, হতভাগা ছোঁড়া, মুখের ওপর বল্‌তে সাহস হয় না? দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে আমাকে শোনান হ'ল। তোর বাড়াভাতে ছাই না দিই ত আমি রাজপুতের বেটী নই।"

সে ফিরিয়া আসিয়া আবার সেলাই লইয়া বসিল। সময় আর বেশী নাই, অথচ কাজ প্রায় সবই পড়িয়া আছে। ভানুমতী নিজে কিছুই করে না, তাহার যা মনের অবস্থা তাহাকে জোর করিয়া কিছু বলাও চলে না। শোভাবতী দুদিনের জন্য আসিয়াছে, তাহার উপর দুর্গা তাহাকে সারাক্ষণই এত ব্যস্ত করিয়া রাখে যে, তাহার দ্বারা আর কিছু হইবার জো-টি নাই। ভানুমতীর মা থাকিলে কথা ছিল না, তিনি না থাকাতে মায়ের সব কর্ত্তব্যই প্রায় ভবানীর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে ইচ্ছা করিয়াই এ ভার লইয়াছে, সুতরাং ইহা লইয়া কাহারও সহিত ঝগড়া চলে না।

কাঁথাখানা প্রায় শেষ করিয়া তবে ভবানী উঠিল। ভানুমতীকে খাওয়াইতে হইবে, তাহার বিছানা করিতে হইবে। কর্ত্তার খাওয়ারও সব ব্যবস্থা সে না করিয়া দিলে চলিবে না। রাঁধুনীটা নূতন, সে গুছাইয়া কোনো কাজ করিতে জানে না। ভবানী নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "বুড়ী মর্‌লে এদের কি হ'বে কে জানে? ভানু ত রুটো ভেজে দুখান কর্‌তে পারেনা, সে কর্‌বে ছেলে মানুষ! তার ওপর রাজ্যের যত দুষমন্ তার পেছনে। যাক্, যতদিন আমি আছি কোনো বেটার সাধ্যি নেই তার চুলের আগা ছোঁয়। তার একখানা হাড়ও আস্ত রাখব না আমি।" উদয়ের উদ্দেশ্যে যত রকম গালাগালি তাহার জানা ছিল, সব ক'টা বর্ষণ করিতে করিতে সে আপনার কাজে চলিয়া গেল।

দিনগুলা একটার পর একটা, প্রায় একই ভাবে কাটিয়া চলিল। ভানুমতী শুইয়া, বসিয়া, বোনের সঙ্গে গল্প করিয়া, দুর্গাকে লইয়া খেলিয়া কোনোরকমে সময় কাটায়। ভবানী দিনরাত কাজে ব্যস্ত, সুবিধা পাইলেই পিসিমার বাড়ী গিয়া বৃদ্ধা ঠাকুরাণীর সঙ্গে চীৎকার করিয়া খানিক গল্প করিয়া আসে। তিনি অনবসর থাকিলে বিজনের সঙ্গেই গল্প করে। বুড়ীর কাছে উদয়ের প্রশংসা করে আর বৌয়ের কাছে প্রাণ খুলিয়া তাহার নিন্দা করে। তবে এমন সময় দেখিয়া যায়, যাহাতে উদয়ের সামনে না পড়িতে হয়। উদয় সেই যে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভবানীকে গাল দিয়া বিদায় হইয়াছিল, তাহার পর আর মহেশবাবুর বাড়ীর ছায়া মাড়ায় নাই। মহেশবাবুর প্রতি তাহার বিরাগ বিশেষ কিছু ছিলনা, কিন্তু ভবানী এখন খোলাখুলিভাবে শত্রু পক্ষে দাঁড়ানোতে, তাহার যে আর গিয়াও কোনো লাভ নাই তাহা সে বুঝিয়াই লইয়াছিল। মাঝে-মাঝে আপশোষ করিয়া ভাবিত, "ধুত্তোর, রাগের মাথায় সেদিন বুড়ী বেটীকে না চটালেই পার্‌তাম।"

আর এক জায়গায় ভবানীকে প্রায়ই দেখা যাইত, কিন্তু তাহার খবর সে ভানুমতী বা শোভাবতীকে দিত না। লেডী ডাক্তার মিসেস্ মিত্র সন্ধ্যার পর বড় একটা আর কাজে বাহির হইতেন না। তাঁহার বয়সও হইয়া পড়িয়াছিল কিছু বেশী, টাকা-কড়িরও বেশী কিছু অভাব ছিল না। কাজেই সহজে নিজের আরামের ব্যাঘাত তিনি ঘটিতে দিতেন না। সন্ধ্যার পর ছাদের উপর মাদুর বিছাইয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িতেন, দাসী বসন্ত তাঁহার গা হাত পা টিপিয়া দিত। বসন্তকুমারী ছাড়াও বাড়ীতে আর একটি ঝি ছিল, সে রান্নাঘরের কাজ করিত। বাহিরের কাজ তিনি কোচম্যান সহিসের দ্বারাই করাইয়া লইতেন, বাড়ীতে চাকর রাখা পছন্দ করিতেন না।

বসন্ত এবং মিসেস্ মিত্র, দুইজনের সঙ্গেই ভবানী খুব ভাব জমাইয়া লইয়াছিল। তাহার নানারকম গল্প এবং আদবকায়দাদুরস্ত কথায় লেডীডাক্তার খুসি ছিলেন। বসন্ত খুসি ছিল অন্য কারণে। মনিবটি কিছু কড়া এবং হিসাবী হওয়াতে, তাহার পান দোক্তা, সুগন্ধী তেল, সাবান প্রভৃতির খরচ চালানো মাঝে-মাঝে মুস্কিল হইয়া উঠিত। ভবানীর বদান্যতায় আজকাল তাহার কপাল ফিরিয়াছিল। এ সব ত সে চাহিলেই পাইত, এমন কি ভবানী তাহাকে কথা দিয়া রাখিয়াছিল যে ভানুমতীর যদি ছেলে হয় তাহা হইলে বসন্তকে একখানা গরদের শাড়ী ত দিবেই, হয় ত বেনারসীও দিতে পারে।

বসন্ত বলিত, "দিদি, তোমার ভাই বরাত-জোর আছে, খাসা মুনিব পেয়েছ। কে বল্‌বে যে তুমি বাড়ীর ঝি। যেন তোমারই ঘর সংসার। টাকা পয়সা যত খুসি খরচ কর, কোনোদিন তোমায় না বলেনা। আর দশা দেখ আমার। কাজ ভারী নয় বটে, কিন্তু একটি পয়সা নাড়বার জো নেই, মাগী তখুনী ধ'রে ফেলে।

"ছেলে না পিলে। কার জন্যে পয়সা জমাচ্ছে জানিনা। একখানা ভাল কাপড় শুদ্ধ কিনে পরে না, হাতে ত এসে ইস্তিক দেখ্‌ছি ঐ মরা সোনার বালা দুগাছি। বাক্সেও নেই কিছু। কোথাও যদি যেতে হ'ল, তা বার কর্‌লে সেই সেকেলে এক লালপেড়ে গরদ, দেখে দেখে চোখ প'চে গেল।"

ভবানী বলিত, "আমার ভানু বেঁচে থাক। কোনোদিন আমায় ওরা ঝিয়ের চোখে কি দেখেছে? জামাই শুদ্ধ কখনো একটি কড়া কথা কোনদিন বলেনি। পোড়াকপাল আমাদের বাছা, তাই অমন ছেলে অকালে বেঘোরে মারা গেল।"

বসন্ত একদিন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা দিদি, ওরা তোমায় মাইনে দেয় কত ক'রে? খাওয়া পরা, ধোপা, সব খরচাই ত দিচ্ছে?"

ভবানী হাসিয়া বলিল, "মাইনে আমায় কে দেবে লো? সংসারই ত আমার হাতে! ভানু মাসে মাসে যে দেড় হাজার করে টাকা পায়, তার কি একটা সে আঙুল দিয়ে ছোঁয়? বাবু এ'নে আমার কাছে দেন, আমি আবার বাবুর হাতে দিয়ে ব্যাঙ্কে জমা পাঠাই। যা দু দশ টাকা খরচ লাগে, আমিই করি, কোনদিন সে খোঁজও নেয় না। শ্বশুরবাড়ী যখন ছিল, জামাই মাসে মাসে তাকে একশ' টাকা ক'রে হাতখরচা দিত। তাও কি মেয়ে কখনও নিজের হাতে নাড়াচাড়া করেছে? আমিই তার কাপড়-চোপড় করাতুম, যখন যা দরকার কিনেকেটে আন্‌তুম। আমার হাতে মানুষ কিনা, মা মাসীর মতই আমায় মানে, ঝি ব'লে ত কোনো দিন অমান্যি করেনি।"

বসন্ত বলিল, "বেশ আছ তুমি দিদি। দেড় হাজার টাকা আমরা কখনও এক সঙ্গে চোখেও দেখিনি।"

ভবানী উঠিয়া পড়িল। বলিল, "যাই ভাই, এখন। আর এরপর ত এত ঘন ঘন আস্‌তে পার্‌ব না। এতদিন মেজদিদি ছিল, ভানুকে ফে'লে আস্‌তে পারতুম যখন তখন। তা কাল সে শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাচ্ছে, এখন আর কার কাছে রে'খে আস্‌ব? তা তুই যাস্ মাঝে মাঝে।"

শোভাবতী তাহার পর দিনই চলিয়া গেল। শ্বশুরবাড়ী হইতে জোর তলব আসিয়াছিল। শাশুড়ীর কাজ চলেনা বউ ঘরে না থাকিলে, এবং শাশুড়ীর ছেলেরও মন ভাল থাকেনা। কাজেই একজন প্রকাশ্যে এবং আর একজন গোপনে নিজের নিজের মতামত ব্যক্ত করিতে বড় উৎসাহের সঙ্গেই লাগিয়াছিল। অগত্যা শোভাবতীকে শ্বশুরবাড়ী ফিরিতে হইল। ভবানীকে বলিয়া গেল, "সময়মত খবর দিস্। যেমন ক'রে পারি আস্‌ব।"

ভানুমতী বলিল, "তোর স্বামী বড় স্বার্থপর মেজদি, নিজের অসুবিধাটুকুই দেখল। আজ না হয় কাল, তুই ত যেতিস্‌ই, কিন্তু আমার কথাটা একটু সে ভেবে দেখলনা। আমার ত সারাজীবন একলাই কাটাতে হ'বে, তবু তুই ছিলি, গল্পগাছা ক'রে দুদণ্ড নিজের পোড়া কপালের কথা ভু'লে থাকতুম, এখন সারাদিন একলা ব'সে কি ক'রে সময় কাটবে?"

শোভাবতী মুখ ম্লান করিয়া বলিল, "কি কর্‌ব ভাই, মেয়েমানুষের জীবন পরাধীন, হুকুম তামিল না ক'রে ত উপায় নেই। নইলে তোকে এই অবস্থায় একলা ফেলে আমি কখনও যাই? পুরুষ মানুষে কি আর আমাদের মানুষ ভাবে? আমরা কেবল তাদের আরাম সুবিধার

জন্য আছি। আমাদেরও যে কিছু দরকার থাকতে পারে তা তাদের মাথায়ই আসেনা। খাওয়া পরা আর থাকবার জায়গা জুটলেই মেয়ে মানুষের ঢের হ'ল, তার আবার কিসের দরকার? যাই হোক, খবর পেলে আমি যেমন ক'রে পারি চ'লে আসব। শাশুড়ী তখন আর না করতে পারবেনা।"

শোভাবতীর গাড়ী চলিয়া গেল। ভানুমতী চোখ মুছিতে মুছিতে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। ভবানীকে বলিল, "কি ছাই-ভস্ম সব শেলাই করছিলি, আমায় কিছু কিছু দেনা? হাঁ ক'রে সারাদিন ব'সে থেকে থেকে আমি এইবার পাগল হ'য়ে যাব। মাগো, একটা দিনও যে আমার আর কাটতে চায় না! এখনও সারাজীবন প'ড়ে রয়েছে।"

ভবানী তাহাকে কতকগুলি সেলাই আনিয়া দিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "এই ছেলেটি হ'য়ে গেলেই অনেকটা ভাল লাগবে, দেখো এখন। একটা নাড়বার চাড়বার জিনিষ হ'লেই সময় হু হু ক'রে কোথা দিয়ে চ'লে যাবে।"

দিন দশ বারো কাটিয়া গেল। হঠাৎ মাঝরাত্রে ভানুমতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ভবানীকে ঠেলিয়া ডাক দিল, "ও ভবানী, ভবানী ওঠ, আমার শরীর বড় খারাপ লাগছে।"

ভবানী বিদ্যুদ্‌স্পৃষ্টের মত ঝট্ করিয়া খাড়া হইয়া বসিল। আলো জ্বালিয়া ব্যস্ত হইয়া ভানুমতীর কাছে আসিয়া তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া চলিল, উত্তর দিবার অবকাশও তাহাকে দিল না।

ভানুমতী বলিল, "অতশত আমি জানি না, বাপু, তুই বাবাকে খবর দে, তিনি মিসেস্ মিত্তিরকে ডেকে পাঠান। মাগী ক'সে গাল দেবে এখন আমাকে, মাঝরাত্রে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম।"

ভবানী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা, গাল দেবে না আর কিছু! টাকাগুলি গুণে নেবার বেলা কিছু কম নেবে নাকি? ঐ হ'ল ওদের কাজ, অত রাত বিরাত বাছতে গেলে ওদের চলে নাকি? ধাইয়ের কাজ ক'রে ক'রে বুড়ী ত হ'য়ে গেল।"

ভানুমতী ভীত কণ্ঠে বলিল, "বড় ভয় করছে কিন্তু রে। মেজদিদিটা বলেছিল খবর দিলে আসবে। এতরাত্রে এখন তাকে কে খবর দেয়?"

ভবানী তখন ডাকাডাকি করিয়া বাবুর ঘুম ভাঙাইতে ব্যস্ত ছিল, সে ভানুমতীর কথার কোনো উত্তর দিল না। মহেশবাবুকে তুলিয়া দিয়া নীচে চলিল, রঘুয়া চাকরের সন্ধানে। ভানুমতী ভয়ে, আশায়, উৎকণ্ঠায় ঘরময় ঘোরাঘুরি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এই বাড়ীটির অন্ততঃ সকলের ঘুম ছুটিয়া গেল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলিল, রান্নাঘরের উনানে আগুন পড়িল। মিসেস মিত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসিয়া পড়িলেন, পিছনে তাঁহার ব্যাগ হাতে শ্রীমতী বসন্ত।

মহেশবাবু তাঁহাকে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, নমস্কার করিয়া বলিলেন, "এই যে আসুন আসুন, বড় ভাবনায়ই পড়েছি। ভানু উপরের ঘরে রয়েছে। আর কাউকে খবর দেবার দরকার আছে কি? কোনো ডাক্তার কি নর্স?"

মিসেস মিত্র তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিছু দরকার নেই। আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার মেয়ের বয়স ঠিক, স্বাস্থ্যও মোটের ওপর ভালই; আমি ত কোনো বিপদের আশঙ্কা করি না।"

ভবানীর সঙ্গে তিনি উপরের ঘরে চলিলেন, ব্যাগ হাতে বসন্তও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মহেশবাবু তাঁহাদের পিছন পিছন আসিতে আসিতে বলিলেন "ও ভবানী, ভানুর পিশশাশুড়ী ঠাকরুণের বাড়ী একবার খবর দিলে হ'ত না? হাজার হোক, তারা নিজের লোক, খবর দেওয়াটা উচিত।"

ভবানী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না বাবু না, এখন ওসবে দরকার নেই। এতরাত্রে কেউ আসবেও না, কাল সকালে খবর দিলেই চলবে। মেজদিদির বাড়ী সকালে যাবে রঘুয়া, সেই সঙ্গে ওবাড়ীতেও ব'লে আসবে এখন।" তাহার ভয় ছিল পাছে সংবাদ পাইয়াই উদয় আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং কিছু অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে।

মিসেস্ মিত্র হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপরের ঘরে আসিয়া পৌছিলেন। ভানুর মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে

দেখিয়া বলিলেন, "ভয় পেয়ে গিয়েছ দেখি মা লক্ষ্মী। কিছু ভাবনা নেই। এ ত আর অসুখ-বিসুখ নয়, সাধারণ জিনিষ, ঘরে ঘরেই হচ্ছে।"

ভানুমতীও হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "মাঝরাত্রে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম, খুব অসুবিধা হয়েছে নিশ্চয় আপনার?"

লেডী ডাক্তার আর একপালা আপ্যায়নের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসের অসুবিধা মা? আমাদের কাজই হ'ল এই। বাচ্চারা কি আর আমার টাইম্ দেখে আস্‌বে, তারা নিজের টাইমেই আস্‌বে। শীতকাল হ'লে একটু অসুবিধা হয় বটে, না হ'লে আর কি? এইত দিন দুই আগে একটা কেস্ ক'রে এলুম মাঝ রাতে। সে বেটী বড় ভুগিয়েছে। তাকে শেষ অবধি—" তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে হওয়ায় থামিয়া গেলেন। বসন্তকে তাড়া দিয়া বলিলেন, "নে নে চট্ ক'রে সব গোছগাছ করে নে, সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভবানীকে জিগ্‌গেস কর্ না কোথায় কি আছে। ঘরখানা একবার ফিনাইল জলে ধুয়ে নিলে হয়; তা এত রাত্রে কি সুবিধা হবে?"

ভবানী বলিল, "কেন হবে না মা? যা যা দরকার তুমি বল, এখনি সব করাচ্ছি। বাঘের দুধ দরকার হয় মেয়ের জন্যে তাও এনে দেব। তোমার উপরই ভরসা মা, দেখ আমার বাছার যেন কোন বিপদ-আপদ না হয়।"

মিসেস মিত্র বলিলেন, "বিপদ হবে কিসের দুঃখে? নিজের মুখে নিজের কথা বল্‌তে নেই বাছা, কিন্তু এই পঁচিশ বছর প্র্যাক্‌টিশ কর্‌ছি, কখনও একটি কেস্ বিগড়ায়নি আমার হাতে। তবে প্রথমবার একটু টাইম্ নিতে পারে এই যা। তাতে ঘাবড়াবার কি আছে?"

বাকি রাতটুকু দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। রঘুয়া খবর লইয়া শোভাবতীর শ্বশুরবাড়ী গেল। ফিরিয়া আসিল একলাই। ভবানী ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে মেজদিদি এল না?"

রঘুয়া বলিল, "না বুড়ী মাইজির বড্ড অসুখ, তাঁকে ফেলে আস্‌তে পারল না। আবার বিকেলে খবর দিতে বলেছে, জামাইবাবুও আস্‌বেন বিকালে খবর নিতে।"

"তবে ত কেতাথ হলুম," বলিয়া ভবানী রাগ করিয়া চলিয়া গেল। দু-মিনিট বাদে ফিরিয়া আসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "পিসিমার বাড়ী গিয়েছিলি?"

রঘুয়া জানাইল যে সে গিয়াছিল। মাইজি অল্প পরেই আসিবেন।

সমস্ত দিনটা আশায় উৎকণ্ঠায় একরকম কাটিয়া গেল। মহেশবাবু কন্যার মমতায় তাহার ঘর হইতে বেশী দূরে যাইতেও পারিতেছিলেন না, আবার তাহার কাতরানিতে ঘরের কাছে টিঁকিতেও পারিতেছিলেন না, পাগলের মত কেবল এ-ঘর ও-ঘর উপর নীচ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ভবানী একলাই দশটা মানুষের কাজ করিতেছিল, এবং সবাইকে বকিয়া ভূত ছাড়াইতেছিল। পিসিমা আসিয়া একবার দেখিয়া গিয়াছেন, শোভাবতী আসিতে পারে নাই। মাথার দিব্য দিয়া তাহাকে কখন কি হয় খবর দিতে বলিয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা মিসেস্ মিত্র ও বসন্ত খাইয়া দাইয়া আসিলেন বাড়ী গিয়া। ভবানীকে চুপিচুপি বলিলেন, "রাতটাও নেবে হয়ত বাছা, এখানেই আমার বিছানা ক'রে দাও।"

রাত একটা প্রায় হইবে। আঁতুড় ঘরের স্ত্রীলোক ক'টি ছাড়া সবাই শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেই সময় ধাত্রী ঝি সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মিসেস্ মিত্র বলিলেন,"যাক্, শিগ্‌গির হ'য়ে গেলেই ভাল, কষ্টে মেয়েটার আর জ্ঞান নেই। ভয় পেয়োনা বাছা, ভয়ের কিছু নেই।"

হঠাৎ শিশুর ক্ষীণ ক্রন্দন শোনা গেল। ভবানী ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, তাহার পর মাথায় হাত দিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "হায় ভগবান শেষে মেয়েই হ'ল।"

লেডী ডাক্তার ভবানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওকি বাছা! মেয়ে ছেলে কি সন্তান নয়? সবে জন্ম নিয়েছে, তাকে দেখে ওরকম কর্‌তে আছে? এই বেঁচে থাক্, দেখো মায়ের কত আদরের ধন হবে। কি

সুন্দর দেখতে হয়েছে দেখ, ঠিক যেন গোলাপের কুঁড়িটি।"

ভবানী বলিল, "সে কি বুঝি না মা? মেয়ে, ছেলের চেয়ে কম কিসে? আর যদি পাঁচটা হবার আশা থাকৃত ভানুর, তা হ'লে একে ত মাথায় ক'রে নিতুম। কিন্তু এই যে সব মা, আর ত হবে না! ভানুর যে সর্ব্বস্ব যাবে, তার চার দিকে শত্রু, এখন তারা ত আরো পেয়ে বস্‌বে। লাখ লাখ টাকা যাবে তাদের হাতে, তখন তারা কি আর এদের আস্ত রাখবে? পথের কাঁটা, দূর কর্‌বার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগ্‌বে। এতদিন যে কিছু করতে পারেনি, হাতে পয়সা ছিল না ব'লেই না? হে ভগবান, এ কি কর্‌লে?"

মিসেস্ মিত্র সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "কি আর কর্‌বে বাছা, এখন ওঠ, মেয়েকে দেখ। যা হ'য়ে গেছে তার ত চারা নেই, এ ত মানুষের হাত না?"

ভবানী হঠাৎ তাঁহার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দোহাই মা, তুমি ইচ্ছা কর্‌লে এর বিহিত কর্‌তে পার একটা। যা চাও তুমি তাই দেব।"

লেডী ডাক্তার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি কি কর্‌ব গা? আমি ত আর বিধাতা নই যে মেয়েকে ছেলে ক'রে দেব? এখন ছাড়, পোয়াতিকে দেখি, তার এখনও হুঁস্ হয়নি ভাল ক'রে। ও বসন্ত, নে নে শিগগির ক'রে তোর কাজ সেরে নে।"

ভবানী বলিল, "ওর এখন হুঁস্ হয়ে কাজ নেই মা, আমি যা বল্‌ছি শোন। তোমার কোনো পাপ হবে না মা, যা হবার আমারই হবে। তোমায় হাজার টাকা দেব, দু হাজার চাও, দুহাজার দেব। এ মেয়েকে তুমি নিয়ে যাও, তোমার বাড়ীতে দু দিনের যে খোকাটি রয়েছে, মা মরা, তাকে এখানে দিয়ে যাও। আমরা তিন প্রাণী ছাড়া কেউ জান্‌বে না, সব দিক রক্ষে হ'বে। সেও কায়স্থের ঘরের ছেলে, কোন অন্যায় হবে না। এ মেয়েকে তুমি রাখ মা, পাল্‌তে যত টাকা লাগে, আমি দেব।"

মিসেস্ মিত্র গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "তুমি বল কি বাছা! এমন কথা বাপের জন্মে শুনিনি! শেষে কি বুড়ো বয়সে জেল খাট্‌ব?"

ভবানী বলিল, "কে তোমায় জেলে দিচ্ছে মা? জান্‌বে কে? বাড়ীর সকলে ত মড়ার মত ঘুমচ্ছে, ভানুরও এখনও জ্ঞান হয়নি। জান্‌বার মধ্যে তুমি, আমি আর বসন্ত। তা ও বেটীকে ঠাণ্ডা রাখবার ভারও আমি নিলুম। দোহাই মা তোমার, অমত কোরো না। তোমায় হাজার টাকা এখনি গুণে দিচ্ছি। বসন্তকে দুশ' দিচ্ছি।"

বসন্ত এতক্ষণ ভানুমতীকে লইয়া ব্যস্ত ছিল; সে ছুটিয়া আসিয়া তাহার মনিবের কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "নিয়ে নাও মা, নিয়ে নাও। এক বছরেও তোমার এত রোজগার হবে না। আর আমার কথা যদি বল, আমায় চারটুকরো ক'রে কাট্‌লেও একথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। গিয়ে নিয়ে আস্‌ব খোকাটাকে?"

মিসেস্ মিত্রের মনে তখন ধর্ম্মবুদ্ধি এবং লোভের প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ভবানী দেখিল সময় বহিয়া যায়, ছুটিয়া পাশের ঘরে গিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাড়া তাড়া নোট বাহির করিয়া আনিল। এবার টাকা আর সে ব্যাঙ্কে পাঠায় নাই, প্রসবের সময় যদিই প্রয়োজন হয়, বলিয়া ঘরেই হাজার দুই টাকা জমা করিয়া রাখিয়াছিল। মিসেস্ মিত্রের হাতে হাজার টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও মা, আরো চাও আরো গিয়ে কাল দিয়ে আস্‌ব।" বসন্তর হাতেও দুশো টাকার নোট গিয়া পড়িল।

গরীব ছোট লোকের মেয়ে সে এত টাকা কখনও একসঙ্গে হাতে পায় নাই। পাছে ইহা হাত-ছাড়া হইয়া যায়, এই ভয়ে সে পাগলের মত হইয়া উঠিল। নিজের কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া লইতে লইতে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হেই মা, অমত কোরোনা, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌তে নেই। যাই খোকাকে নিয়ে আসি?"

লেডী ডাক্তার মাথা হেলাইয়া সম্মতি দিলেন। বসন্ত দরজা খুলিয়া তীরের মত বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভবানী সদ্যোজাতা শিশুটিকে লইয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া এই কঠোরহৃদয়া প্রৌঢ়ারও চোখ বারবার জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। রাজার নন্দিনী হইয়া যে জন্মিল,

তাহাকে আজ স্বার্থের খাতিরে সে কোথায় নির্ব্বাসিত করিতেছে? কিন্তু ভানুর স্বার্থ তাহাকে দেখিতে হইবে, এবং উদয়ের থোঁতা মুখ ভোঁতা করিতে হইবে। পাপ যাহা হইবার হউক, ভগবান বা মানুষে তাহাকে যে শাস্তি বিধান করুক, সে তাহা মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। রাজপুতের মেয়ে ভয়ে কখনও পিছায় না।

মিসেস্ মিত্র ভানুকে ঔষধ দিতে দিতে বলিলেন, "রাঁধুনী মাগীকে ভোর না হতেই কোনো গতিকে বিদায় কর্‌তে হবে। তাকেই রেখে এসেছি কিনা বাড়ীতে, তা সে কুম্ভকর্ণের বেটী এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে বাড়ী ফাটাচ্ছে। এখন কিছু জান্‌বে না, কিন্তু পরে খোকার জায়গায় খুকী দেখলে নানা কথা তুল্‌তে পারে। মাইনে পায় নি এক-মাসের ব'লে, যাব যাবও করছে। দেখ ত বসন্ত এল বুঝি?"

বসন্ত যেমন দ্রুত গতিতে গিয়াছিল, তেমনিই দ্রুত গতিতে ফিরিয়াছে। সদর দরজা খোলার সামান্য শব্দটুকু শোনা যাইতে না যাইতে সে আসিয়া উপরের তলায় উপস্থিত হইল। কোলে তাহার কম্বলে জড়ানো শিশুটি।

মিসেস্ মিত্র ঝট্ করিয়া ছেলেটিকে তাহার কোল হইতে টানিয়া লইয়া ভবানীকে বলিলেন "কি জামা টামা তোমরা শেলাই করেছ বাছা, গোটা দুই দাও একে। আর বসন্ত, মেয়ে নিয়ে তুই এখুনি বেরো, তোকে এখন আর আস্‌তে হবে না। পথে বেরিয়েই গাড়ী কর্‌বি, বাছার যেন ঠাণ্ডা কিছুতে না লাগে। বাড়ী গিয়ে ওকে ঢাকাঢুকি দিয়ে শুইয়ে রাখবি, রাঁধুনী মাগী ভোরে উঠ্‌তেই তাকে গাল মন্দ দিয়ে খুব একটা ধুম ঝগড়া বাধিয়ে দিবি। আমি গিয়েই তাকে বিদায় কর্‌ব, খুকীর কাছে তাকে যেতেও দিস্ না, তাহ'লে দশ কথার সৃষ্টি কর্‌বে। যা বেরো এখন শিগ্‌গির।"

বসন্ত শিশু কন্যাটিকে উত্তমরূপে কম্বল ও কাঁথায় জড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। খোকাকে নূতন জামা, মোজা প্রভৃতি পরাইতে পরাইতে ভবানী বলিল, "ছেলে দেখতে ত মন্দ না, তবে রং তেমন ফরসা নয়।"

লেডী ডাক্তার বলিলেন, "বেটা ছেলে, রং নিয়ে কি হবে? তবু খুব কালোও না। বাঙালীর ঘরে যেমন হয়, মাঝামাঝি তাই হয়েছে। ওমা, মা লক্ষ্মী যে চোখ খুলে তাকাচ্ছ দেখি! দেখ, দেখ, কেমন সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে। ভবানী, এদিকে নিয়ে এস, আলোর কাছে। এই দেখ মা।"

ভানুমতী শিশুর দিকে তাকাইয়া বলিল, "ভবানী খুব খুসি হয়েছিস্, না? ওকি, কাঁদ্‌চিস্ নাকি? এখন আর কাঁদ্‌বার কি?"

ভবানী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না মা, আর কাঁদ্‌ব না। আহা, আজ জামাই বেঁচে থাক্‌লে!"

মিসেস্ মিত্র বলিলেন, "ওসব কথা এখন আর কেন গো? যে গেছে সেত গেছেই, এখন যে এল তাকে নিয়ে আনন্দ কর। কৈ শাঁখ টাঁখ বাজাও, বাড়ীর লোক ত এখন অবধি জান্‌লই না।"

ঘোররোলে পাড়া কাঁপাইয়া শাঁখ বাজিয়া উঠিল। মহেশবাবু বিছানা ছাড়িয়া আলুথালু বেশে ছুটিয়া আসিলেন। "কি হল ভবানী, কি হল? মা আমার ভাল ত?"

ভবানী খোকাকে তাঁহার সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া বিজয়ের হাসি হাসিয়া বলিল, "খোকা হয়েছে বাবু, আপনার বাড়ী রাজা এসেছে। কৈ গিনি বার করুন।"

দুই আঙুল দিয়া শিশুকে একটু আদর করিয়া মহেশ-বাবু হাসিয়া বলিলেন, "গিনিত দুহাতে ক'রে ও ছড়াবে ভবানী, গরীব দাদামহাশয় আর ওকে একটা গিনি দিয়ে কি কর্‌বে? তবু নিয়ম মেনে চলা ভাল, এই নাও দাদা-মণি," বলিয়া তিনি শিশুর গোলাপী মুঠির মধ্যে দুটি গিনি ঢুকাইয়া দিলেন। খোকা হওয়ার আশায় তিনি গিনি পকেটে করিয়াই শুইতে গিয়াছিলেন। ভানুমতীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা আমার ভাল আছে ত?"

মিসেস্ মিত্র বলিলেন, "দিব্যি আছে, ওর সেরে উঠ্‌তে কিছু দেরী হবেনা। আচ্ছা, আমায় তাহ'লে একটা গাড়ী ডেকে দিন, এখনও রাত রয়েছে, সঙ্গে একটা লোক হ'লে ভাল হয়। এই ওষুধ রে'খে গেলাম, এক দাগ খাইয়ে দিয়েছি, তিন ঘণ্টা পরে আর এক দাগ। সকালেই আমি

এসে পড়ব এখন। ভবানী ত রইল, ও প্রায় ধাত্রীর কাজ আমার সমানই জানে; মা লক্ষ্মীর কোনো অসুবিধা হবেনা।"

বাড়ীর ঝি চাকর সবাই শাঁখের শব্দে উঠিয়া পড়িয়াছিল, দরজার কাছে তখন রীতিমত ভীড়। সবাই খোকা দেখিতে ব্যস্ত। রঘুয়া গাড়ী ডাকিতে চলিল। মহেশবাবু মিসেস্ মিত্রকে বলিলেন, "আপনার ফিটা?"

মিসেস্ মিত্রের হ্যাণ্ডব্যাগটি তখন প্রায় পেট ফাটিয়া মরিতেছে। তিনি সেটিকে হাতে করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আহা সে হবে এখন। তার জন্যে তাড়া কিসের? আমি ত এখনো দশ বারো দিন আস্‌ব। আচ্ছা, আসি এখন। আপনার চাকরটা একটু চলুক তবে আমার সঙ্গে।" মহেশবাবুও লেডী ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গেলেন।

পূবের আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিল। তার পর ফিকা গোলাপী,তারপর ডগ্‌ডগে সিঁদূরে লাল। রাস্তাঘাট সজীব হইয়া উঠিল। ঘোড়ারগাড়ী চলিল,ফেরীওয়ালার ডাক শোনা গেল। এ বাড়ীর সকলে মাঝরাতে জাগিয়া এখন ঘুমে ক্লান্ত হইয়া চোখ রগড়াইতে লাগিল। ভবানী সকলকে কাজে লাগাইয়া দিল, তাড়াহুড়া দিয়া। রাঁধুনী বলিল, "তোমার মুখ চোখ যা হয়েছে দিদি, আয়নায় দেখ গিয়ে। সব ধকল যেন তোমাকেই পোয়াতে হয়েছে।"

ভবানী বলিল, "নে নে, উনুনে আঁচ দিগে যা। আমার ভাবনা ভাবতে হবে না। এখুনি হাঁড়ি হাঁড়ি গরম জল দিতে হবে।"

হঠাৎ সদর দরজার সাম্‌নে ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া প্রকাণ্ড এক মোটারকার আসিয়া থামিল। গাড়ীর দরজা খুলিয়া এক লাফে বাহির হইয়া আসিল উদয়, তাহার পিছন পিছন একজন ইংরাজবেশধারী ব্যক্তি, ও একটি কালো মেমসাহেব। দুজনেরই হাতে ব্যাগ।

কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া উদয় এক ধাক্কায় সদর দরজা খুলিয়া সকলকে লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। সে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াই আসিয়াছিল যে, কাহারও পরোয়া সে আজ করিবে না। সিঁড়ির মুখের কাছে আসিতেই মহেশবাবুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এস বাবা এস, এ রা কে?"

উদয় পরম গম্ভীর মুখে বলিল, "ইনি এখানকার এক জন খুব বড় midwiferyর Specialist, আর ইনি নর্স। জ্যাঠামশায় টেলিগ্রাম করেছেন এঁদের যেন বৌঠানের জন্যে রাখা হয়। কাল আমার খবর পেতে বড় দেরি হ'ল, তা না হ'লে কালই আস্‌তাম। বৌঠান কোথায়, এখনও কি খুব কষ্ট পাচ্ছেন?"

মহেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "না বাবা, এখন ভালই আছে। ভালয় ভালয় কাল রাত্রেই তার ছেলেটি হ'য়ে গেছে, খুব বেশী কষ্ট পায়নি। ধাত্রী যিনি ছিলেন, তিনি খুব বিচক্ষণ মানুষ, কোন বিপদ হয়নি তাঁর হাতে। এস না, খোকাকে দেখবে?"

খোকাকে দেখিতে উদয়ের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। তাহার মুখে একবারে যেন কে কালি মাড়িয়া দিল। কি করিবে তাহাই যেন সে স্থির করিতে পারিতেছিল না। হতবুদ্ধির মত সিঁড়ির মুখেই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে এক ঠেলা দিয়া সচেতন করিয়া বাঙালী সাহেবটি বলিল, "We had better get a move on. Our services are not required, it seems," কালো মেম সাহেবটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উপর হইতে ভবানী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ইহাদের কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছিল। উদয় যখন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইহাদের লইয়া ফিরিয়া চলিল, তখন সে মনে মনে বলিল, "যাক্, তোর এমুখ যে দেখতে পেলাম, সেও আমার এক সান্ত্বনা। পাপ যা করবার তাত করলুমই।"

সমস্ত দিন ধরিয়া খোকার দরবার চলিতে লাগিল। বুড়ী পিসিমা আসিলেন, বিজনবালা আসিল, বাড়ীর ছেলেরাও আসিল। এমন কি শোভাবতী শুদ্ধ আসিয়া জুটিল, শাশুড়ীর অসুখ এবং গালাগালি উপেক্ষা করিয়া। ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল, "দেখি দেখি, আমাদের রাজপুত্তুরকে। ওমা, ভাসুর রং মোটেও পায়নি। কি যে ছাই আমাদের ছেলে মেয়েগুলো হচ্ছে, সব কালো। তা বেটা ছেলে, ওর কিছু ব'য়ে যাবেনা। আমার মেয়েটারই বিয়ে দিতে আমার জিব বেরিয়ে যাবে। ভবানী, খোকার জন্যে এই ফ্রক, টুপী আর মোজা এনেছি, উঠিয়ে রাখ। টুপী একটু বড়ই হবে বোধ হচ্ছে।"

ভবানী বলিল, "তা হোক, ও কি আর এইটুকুই থাক্‌বে নাকি? বড় হ'য়ে পর্‌বে। তোমার শাশুড়ী কেমন আছে?"

শোভাবতী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আছে একরকম ভালই, তবু কাউকে বাড়ী থেকে নড়তে দেবেনা। তাকে না ব'লেই এক রকম পালিয়ে এসেছি, গিয়ে গাল খাব এখন।"

খোকা চারিদিকের আনন্দ কোলাহল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে লাগিল। দুপুরের দিকে তাহার দর্শনপ্রার্থীর দলও কমিয়া আসিল। মিসেস্ মিত্র স্নানাহার সারিয়া, এক মুখ পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া দর্শন দিলেন। ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো এখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি নাকি? বড় যে শুক্‌নো দেখাচ্ছে। পো-পোয়াতি ভাল ত?"

ভবানী বলিল, "ভালই আছে মা। এতক্ষণ লোক জনের ভীড়ে নাইবার খাবার সময় পাইনি।" তারপর ফিশ ফিশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুকী কেমন আছে?"

মিসেস মিত্র বলিলেন, "দিব্যি ঘুমচ্ছে, বেশ ষ্ট্রং বাচ্চা, তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। গিয়েই রাঁধুনী মাগীকে বিদায় করেছি, এরপর আর কাকপক্ষীও জান্‌বেনা। চল এখন রুগীকে দেখি।"

রোগিনী ভালই ছিল, তাহাকে বেশী কিছু দেখিতে হইলনা। খানিকক্ষণ গল্পস্বল্প করিয়া লেডী ডাক্তার বিদায় লইতে উঠিলেন। ভবানী তাঁহাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "বাকি টাকাও নিয়ে যাও মা, দেনা পাওনা শিগগির শিগগির চুকিয়ে নেওয়া ভাল।" বলিয়া সে টাকা বাহির করিতে লাগিল।

মিসেস মিত্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা দাও বাছা, মেয়েটার জন্যে নিলুম। তা না হ'লে আমি আর পাপের বোঝা বাড়াতুমনা। আমি ত বড় মানুষ নই, একটা বাচ্চা ভাল ক'রে মানুষ কর্‌তে খরচ কত।"

ভবানী কাঁদিতেছিল, বলিল, "রাগে আর লোভে প'ড়ে মহাপাপ করেছি মা, রাজার মেয়েকে পথে বসিয়েছি। তার যাতে কোনদিক দিয়ে কষ্ট না হয়, তুমি দেখো। টাকার জন্যে ভেবোনা, যত টাকা লাগে আমি যেমন ক'রে পারি জুটিয়ে দেব।"

মিসেস মিত্র বলিলেন, আর বাছা, কেঁদে কি হবে? যা হবার তা হ'য়ে গেছে। অযত্ন অনাদর কিছুই হবে না, যতদিন আমি বেঁচে আছি। তারপর ভগবানের ইচ্ছা।" তিনি টাকা লইয়া বিদায় হইয়া গেলেন।

ভানুমতী ভবানীকে ডাকিয়া বলিল, "হ্যাঁরে, সবাই চ'লে গেল নাকি? মেজদি কোথায়, ডাক্‌না একটু গল্প করি।"

ভবানী বলিল, "বেশী কথা তোমার এখন না বলাই ভাল বাছা। আচ্ছা, দিচ্ছি ডেকে শোভাকে।"

শোভাবতী আসিতেই ভানু বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, খোকার কি নাম হবে ভাই? খুব সুন্দর দেখে একটা নাম বল না?"

শোভাবতী বলিল, "রোস্, একটু ভেবেত বল্‌তে হবে? তোর শ্বশুরবাড়ীর ধাঁচের নাম রাখ্‌বি নাকি?"

ভানুমতী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, ও সব মেয়েলী নাম, আমার একটুও ভাল লাগেনা। ছেলের নাম হবে ঠিক ছেলের মত। বড় হ'য়ে যেন লোকের কাছে নাম বল্‌তে লজ্জা না পায়।"

শোভাবতী বলিল, "তবে ঘটোৎকচ কি বীরবাহু এই রকম একটা রাখ কিছু। মেঘনাদও রাখতে পারিস্ ইচ্ছা কর্‌লে। ছেলের যা গলা হয়েছে, এনামটা দিব্যি মানাবে।"

ভানুমতী বলিল, "যা যা, সব তাতে চালাকি! কেন শুন্‌তে সুন্দর অথচ বেশ ছেলের মত নাম ভূভারতে নেই নাকি? আচ্ছা বেশ, বীরবাহু না হোক, আমার ছেলের নাম রইল সুবীর।"

শোভাবতী বলিল, "বেশ ত, মন্দ কি? তা বীর-পুরুষ যে ভয়ানক চেঁচাচ্ছে, ওকে একটু ঠাণ্ডা কর।"

কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। খবর পাইয়া প্রমদারঞ্জন রোগজীর্ণ শরীর টানিয়া কোন গতিকে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি আকবরী মোহরের মালা দিয়া শিশুর মুখ দেখিয়া, তাহাকে কোলে লইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখে জল চক্ চক্

করিতে লাগিল। খানিক পরে সুধীরকে ভবানীর কোলে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,"বেহাই মশায়, আপনার পরামর্শই ঠিক। বৌমা খোকাকে নিয়ে কিছুকাল এখন এখানেই থাকুন। ছোট ছেলে, কখন কি দরকার হয়, মফঃস্বলে, সহর হ'লেও সব জিনিষ সব সময় পাওয়া যায়না। যত্ন আদরের কোনো ত্রুটীই এখানে হবেনা, তা জানি। আর টাকা যখন দরকার আমাকে জানালেই তারপর দিন পাবেন।"

মহেশবাবু বলিলেন, "আর ক'টা দিন থেকে যান না? খোকার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক, ভাল ক'রে।"

প্রমদাবাবু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আর মায়ার বন্ধনে জড়াব না নিজেকে। খোকা বেঁচে থাক, ভাল থাক, দূর থেকেই তাকে আশীর্ব্বাদ করব। উদয় আসে-টাসে এদিকে?"

মহেশ বাবু বলিলেন, "কৈ না, খোকা যেদিন হল, সে-দিন একবার এসেছিল ডাক্তার আর নর্স নিয়ে। তখন আর দরকার নেই শু'নে চ'লে গেল, ছেলেকে দেখেও যায়নি।"

উদয়ের জ্যাঠামশায় বলিলেন, "ছ' লাখ টাকা হাত ছাড়া হওয়ার দুঃখটা খুবই লেগেছে দেখছি। যেমন বাপ তার তেমন বেটা। সারদা আর ঐ লক্ষ্মীছাড়া মিলে যদি যত বদ খেয়াল ক'রে নিজেদের জমিদারীর অংশটা না খোয়াত তা'হ'লে আজ আর ছোঁড়াকে পরের টাকার প্রত্যাশায় হাঁ ক'রে থাকতে হ'ত না। এককালে বাজে খরচ আমরাও কি না করেছি? কিন্তু সময়ে সাম্‌লেও গেছি।"

মাসখানিক কাটিয়া গেল। ভানুমতী আজকাল বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। খোকার জন্য নিত্য নূতন গহনা আর পোষাকের ফরমাস করিয়া বাড়ী শুদ্ধ লোককে সে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। মহেশবাবুর কোন পছন্দ নাই বলিয়া তিনি মেয়ের কাছে ক্রমাগত বকুনি খাইতেছেন। ভবানী গাল খাইতেছে অন্য কারণে। বুড়ো বয়সে তাহার নাকি ভীমরতি হইয়াছে, সে কেবল টাকা জমাইবার চেষ্টা করে। খোকার সিল্কের জামা যদি প্রতি মাসেই ছোট হয়, এবং প্রতি মাসেই করাইতে হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার কি মাসে দশ বিশ টাকা পোষাকে খরচ করিবার যোগ্যতাও নাই? টাকা কড়ির ভার ইহার পর ভানুকে নিজের হাতেই লইতে হইবে দেখা যাইতেছে। ভবানী হাঁসে, কথা বলেনা।

এক দিন সন্ধ্যার পর ভবানী কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিল। ভানুমতী বলিল, "কোথায় গিয়েছিলি? ছেলেটা ভারি চেঁচাচ্ছে, কিছুতেই তাকে রাখতে পারছি না।"

ভবানী বলিল, "তোমার ধাত্রী যে চল্‌ল গো, তাই একটু তার ওখানে গিয়েছিলুম, দেখা করতে।"

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছে সে? আর আস্‌বেনা?"

ভবানী বলিল, "আর আস্‌বেনা বোধ হয়। বলে, বুড়ো ত হলুম, আর কতকাল খাটব? ছেলেপিলেও কিছু নেই। কে তার এক পিসি মরেছে, ওর নামে এক বাড়ী রেখে গেছে গিরিডিতে, সেইখানে গিয়ে থাক্‌বে বল্‌লে।"

ভানুমতী বলিল, "ওমা আমার সঙ্গে আর দেখাই হ'লনা তবে? বেশ মানুষটা, ঠিক মায়ের মত ক'রে আমায় যত্ন করেছে। খোকার ভাতে তাকে সোনার হার দেব ঠিক করেছিলুম, ভাল বেনারসী শাড়ী দেব।"

ভবানী বিষন্ন মুখে বলিল, "টাকা পাঠিয়ে দিও মা, তারা সেখান থেকেই খোকাকে আশীর্ব্বাদ করবে। সেই ঝি মাগী বসন্ত, তাকেও কিছু দিও, সেও খুব যত্ন ক'রে তোমার কাজ করেছে।"

ভানুমতী বলিল, "তা দেব বৈ কি, সকলকে দেব। তোকে ত খোকা বিয়েই করবে, কাজেই সব চেয়ে বেশী লাভ তোর।"

ভবানী হাসিবার চেষ্টা করিল, তারপর ভানুর অলক্ষ্যে চোখ মুছিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন

শ্রী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(৫)

স্বরলিপির দ্বারা ধ্রুপদ নষ্টই হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতেছে। "সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতা নগরীতে সঙ্গীত-চর্চ্চা উত্তমই হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ মাসিক পত্রিকাতে একবার একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি। "শুভ সগন শুভ লগন" বলিয়া একটি গান আছে। ইহা 'মোবারক বাদী' অর্থাৎ আশীর্ব্বাদী এবং জন্ম-উৎসব অথবা বিবাহ অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষে গীত হইয়া থাকে। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে 'কোকব বেলাবল' বলিয়া শিক্ষা করিয়াছিলাম এক্ষণে উহা 'শুক্ল বেলাবল' বলিয়া শুনিতেছি। কেবল ইহাই নহে; বোল বাণীও পরিবর্ত্তিত ও অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়। গানটি উক্ত পত্রিকাতে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে:—

শুভ লগন শুভ লগন ছত্র ধরো মাই।
শোভাজি পণ্ডিত লগন ধরো মাই॥
নন্দনন্দন কি যুগ যুগ জিএ।
এয়সি মোবারক চন্দ্র মোবারক।

আমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা এইরূপ:—

শুভ সগন শুভ লগন ছত্র ধরাউঁ।
আজ মিলি পণ্ডিত লগন ধরাউঁ॥
নন্দনন্দন তুম যুগ যুগ জিবো।
অ্যায়সো বড়ো ব্যায়সে চন্দ্র মোবারক॥

ইহার স্বরগ্রাম:—

কোকব—ঝাঁপতাল।

র গ	স স র	গ মা	গ গ গ
শু ভ	স গ ন	শু ভ	ল গ ন
র র	প প ধ	মা মা	গ গ গ
ছ •	ত্র • •	ধ রা	উঁ • •
			। । ।
স স	মা গ মা	প প	স স স
আ জি	মি • লি	প ণ	ডি • ত
ধন প	প ধ মা	মা মাপ	গ গ গ
ল গ	ন • •	ধ রা	উঁ • •
		। ।	। । ।
ন ধ	ন ধ ন	স স	স ন গ
ন ন্	দ • ন	ন্দ ন	তু • ম
। ।।	। । ।	। ।	। । ।
স গর	গ গ মা	গ র	স স স
যু গ	যু • গ	জী •	বো • •
। ।			। । ।
স স	মা গ মা	প প	স স স
অ্যায়	সো • •	ব ড়ো	ব্যা য় সে
ধন প	প ধ মা	মা মাপ	গ গ গ
চন্	দ্র • •	মো বা	র ক •

রাত্রের যেমন কল্যাণ-জাতীয় রাগ আছে (অর্থাৎ কেদারা, হাম্বীর, পুরিয়া, ইমনকল্যাণ, ভূপালী) সেইরূপ দিনের বেলাবল জাতীয় রাগ আছে; ইহারা দিনের কল্যাণ। ইমন বেলাবল, দেবগিরি, দেবশাল, কোকব, আলাহিয়া, শাখী প্রভৃতি বেলাবল জাতীয়। উক্ত গানটিকে কোকব বলিয়া শিখিয়াছি। এই রাগ সম্পূর্ণ; ইহার গান্ধার বাদী, এবং ঋষভ বিবাদী। অনেকে বিবাদীকে 'বর্জ্জিত' বলেন, কিন্তু, স্থির বুদ্ধিতে বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবেন যে বিবাদী অথবা কোন একটি সুর বর্জ্জিত করিলে সম্পূর্ণ রাগ জাতিগত হইতে পারে না। এবং যেখানে দুইটি সুর বর্জ্জিত সেখানে দুইটিকেই বিবাদী বলিতে হইবে। বিবাদী শব্দে রাগ-ভ্রষ্টকারী বুঝায়, অর্থাৎ যে সুর প্রয়োগে বাদী সুর নষ্ট হয় তাহাই বিবাদী। উক্ত রাগে গান্ধারী বাদী এবং নিষাদ সম্বাদী; ঋষভ বিবাদী, ভৈরব ঋষভের সমশ্রুতি হেতু বিবাদিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বরগ্রাম দেখিলে সুরের স্থূলরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; কণ্ঠে পরিষ্কার দেখায়। বাদী, বিবাদী, সম্বাদী, অনুবাদী এই চারিটি বিষয় তন্ত্রকারগণই তন্ত্রীযুক্তযন্ত্রে তন্ত্রীর দ্বারায়ই ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন কারণ বাদী ও বিবাদী অথবা বাদী ও সম্বাদী একসঙ্গে দুটি তার অথবা সারিকা দ্বারায় যন্ত্রেই দেখান যায়, কণ্ঠে দুটি সুর এক সঙ্গে বাহির হয় না। মন্দ্রতার, মন্দ্রমধ্য অথবা মধ্যতার বামহস্তের তর্জ্জনী ও

অনামিকা দ্বারায় বীণাতে বাজান হইয়া থাকে, অন্য যন্ত্রে হইতে পারে না; সেইরূপ বাদী, বিবাদী প্রভৃতি বিষয়-গুলিও বীণাযন্ত্রে বুঝান যায়; অন্যথা অসম্ভব। তত্রাপি এইসকল বিষয় লইয়া গায়কেরা তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। সম্বাদপত্রেও যে-সকল স্বরলিপি বাহির হইতেছে তন্মধ্যে কেবল বাদী ও সম্বাদী (নিতান্ত অশাস্ত্রীয়ভাবে) দেখা যায়; বিবাদী, অনুবাদীর উল্লেখ দেখা যায় না। তাহার কারণ বিবাদীও বর্জ্জিতই হইয়াছে ও অনুবাদী 'বুঝিয়া' লইতে হইবে। যে-সমস্ত বিষয় সাধনার অন্তর্গত, এমন-কি সাধনা করিলেও সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না, স্বরলিপি দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করা প্রতারণার নামান্তর মাত্র।

উক্ত পত্রিকাতে ভৈরব রাগ সম্বন্ধে কোন মহাপুরুষ লিখিয়াছেন যে ভৈরব রাগে কোমল নিষাদ লাগিবে। আমরা বহু গুণী ও তন্ত্রকারদিগের গান বাজনা শুনিয়াছি কিন্তু কোথাও ভৈরবে কোমল নিষাদ শুনি নাই। তবে বোধ হয় যে 'গমান' এই তিনটি সুর মীড় দিয়া লইতে গেলে নিষাদের স্বরটির একটু নরম হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ পুরা মীড় গান্ধার হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত দেওয়া কঠিন বলিয়া উক্ত লেখক ভৈরব রাগের রূপ পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন। কোন কোন লেখক হিন্দীভাষা শিক্ষার্থে উপদেশ দিয়াছেন যে, দুই একটা ভজন লিখিলেই হিন্দী ভাষা আয়ত্ত হইবে এবং "ব" কে "ওয়" ও "ষ" কে "খ" বলিলেই হিন্দীভাষার জ্ঞান হইবে এবং হিন্দী গানও গাওয়া যাইবে। হিন্দী ভাষাতে দুটি 'ন', দুটি 'জ', ও তিনটি 'শ' এর ব্যবহার বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ দ্বারায় শুদ্ধ হয়; বাঙ্গলা ভাষাতে ষত্ব, ণত্ব জ্ঞান বহুপরে হয় অর্থাৎ ব্যাকরণ না পড়িলে জ্ঞান হয় না। সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে নবীন গায়কেরা ব্যাকরণ ও ভাষা লইয়া উক্ত পত্রিকাতে অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছেন; তাই আমিও আত্মকাহিনী ছাড়িয়া এত কথা বলিলাম।

কৃষ্ণধনবাবু চারি মাস কাশীতে ছিলেন এবং প্রত্যহ রামদাসবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আমাদিগকে দিয়া ভাল ভাল গানগুলি গাওয়াইতেন এবং নিজে স্বরলিপি করিতেন, কিন্তু অবশেষে তিনি একটি গানও না শুনাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সে বৎসর মহাপ্রদর্শনী সভা কলিকাতায় হইয়াছিল। আমাদেরও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু "বহু সমারোহ" যেখানে গুরুদেব সেখানে যাইতেন না, কারণ, ঐ সকল স্থানে গেলে তাঁহার মাথা ঘুরিত। মহাপ্রদর্শনী-সভা ভঙ্গ হইয়া গেলে রামদাসবাবু আমাদিগকে লইয়া শ্রীরামপুরে গিয়াছিলেন। সে-সময়ে অনেক গায়ক ও গুণী কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল এবং দুতিন মাস বড়ই আনন্দে কাটিয়াছিল। গুণীদিগের মধ্যে মহেশবাবু খেয়ালী এবং তাঁহার শিষ্য শ্যাম লাহিড়ী যে খেয়াল গাহিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা এতাবৎ পাই নাই। অলী বক্স্ ধামারী ও তাঁহার শিষ্য অঘোর চক্রবর্ত্তী নানাপ্রকার সুরের কাজ দেখাইয়া গিয়াছেন। গোপাল মল্লিক মৃদঙ্গী ও তাঁহার পুত্র বিপিন (আমার বাল্যবন্ধু) কি মৃদঙ্গই বাজাইয়া গিয়াছেন! এখন অধিকাংশ বোল যেন ঢোলের বাজনার মত শুনা যায়; ইহাদের বোল বাজনা দক্ষিণী ধরণের অর্থাৎ বড় কড়া। কলিকাতা হইতে অনেকে শ্রীরামপুরে আসিতেন এবং কেবল যে গানবাজনা হইত তাহা নহে, সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা প্রশ্নোত্তর হইত ও আমাদেরও শিক্ষা হইত। তখন শিখাইতে পারিলেই যেন বোঝা হালকা হইয়া যায় গুরুর এরূপ মনের ভাব ছিল এবং শিষ্যেরাও শিক্ষা করিয়া আনন্দ পাইতেন।

যথাসময়ে আমরা কাশীতে ফিরিয়া আসিলাম। শিক্ষা ক্রমে ক্রমে অল্প হইয়া আসিতে লাগিল। গুরুদেবের শরীর ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে লাগিল। তথাপি তিনি শুইয়া শুইয়াও "গৌড় মল্লারের ওখানটা দেখে নেও ত; মেঘ মল্লার ও মিঞা মল্লার এবং দরবারী কানাড়ার খোঁচগুলো দেখে শুনে নেও" এইরূপ বলিতেন। এমন গুরুই বা আজকাল কোথায়? পীড়িত অবস্থাতেও ৩।৪ বৎসর অল্প অল্প করিয়া শিক্ষা দিতেন। আমারও পেটের চিন্তা আরম্ভ হইল; চাকরী করিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দিন পরে গোস্বামী মহাশয়ের কাশীলাভ হয়; আমিও টেলিগ্রাফ অফিসের চাকরী লইয়া স্থানান্তরে বদলি হইয়া যাই; গান-বাজনাও এক হিসাবে শেষ হইল।

(৬)

চাকরী উপলক্ষে ১৯।২০ বৎসর নানাস্থানে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। অনিয়মিত চাকরী করিতে হইত বলিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা নিয়মিতভাবে হইতে পারে নাই। কলিকাতায় যে দুই তিন বার ছিলাম তাহাতে সেখানে ভবানীপুর, বহুবাজার, ইটালী, সিমলা প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে গান-বাজনা হইয়াছিল। তখন দুই চারি জন ভাল গায়ক এবং মৃদঙ্গী এমন দেখা গিয়াছিল যাঁহারা স্বরলিপির গায়ক ছিলেন না। তখন হারমোনিয়ম যন্ত্রটি মাত্র দুই এক স্থানে দেখা দিতেছে, কিন্তু স্বরলিপি প্রথাও আরম্ভ হইয়াছে। ওস্তাদেরা যেমন গুরুমুখে শিক্ষা করিয়াছেন সেইরূপ গান করেন; স্বরলিপি দেখিয়া কেহ গান করেন না। কলিকাতা হইতে মজঃফরপুরে আসিয়া স্বরলিপির প্রাধান্য দেখিলাম। এ স্থানের একজন জমিদার শ্রীযুক্ত চারুচরণ মুখোপাধ্যায় উক্ত স্বরলিপির বড়ই পক্ষপাতী। তিনি স্বরলিপি করিয়া গান করিতে পারিতেন; কৃষ্ণধনবাবুও ঐরূপ ছিলেন, কিন্তু তিনি হারমোনিয়ম বাজাইতে পারিতেন না। চারুবাবু হারমোনিয়মে সেইগুলি নকল করিয়া লইতেন, পরে এস্রাজে তুলিতেন। আমার নিকট হইতে প্রায় একশত ধ্রুপদ গান স্বরলিপি করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন; গাহিতেও পারিতেন কিন্তু তাঁহার পুস্তক দেখিয়া কেহ ঐগুলি শিক্ষা করিতে পারে নাই। যে বিদ্যা সাধন-সাপেক্ষ, সাধন করিলেও যে সকলেই সফলমনোরথ হইবেন তাহা নহে, সেই বিদ্যা পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা করা যায় না। এসম্বন্ধে আমি চারুবাবুকে বহু প্রকারে বুঝাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বুঝিয়াও পুস্তকে ছাপাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও শিক্ষা দিতে সমর্থ হন নাই। বোধ হয় তাঁহার স্বরলিপি-পুস্তক বৃথাই হইল।

মজঃফরপুর হইতে কাশীধামে চাকরীর শেষ কয়েক বৎসর কাটাইলাম। মনে করিয়াছিলাম যথাসময়ে চাকরী হইতে অবসর লইয়া সঙ্গীত-চর্চ্চা উত্তমরূপে করিব এবং দুই একটি ছাত্র তৈয়ার করিব, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ পরিশ্রমে অসমর্থ হওয়ায় তাহা হইল না। ১০।১৫ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব স্থির করিয়া "স্বরলিপি-সংগ্রহ" পুস্তক লিখিতেছি এমন সময়ে শুনিলাম কাশীতে "সঙ্গীত মহাসম্মেলন" হইবে। শুনিয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বরোদা ও দিল্লার সভার কথা মনে হওয়াতে সম্মেলন সভা একটা বাহ্য আড়ম্বর মাত্র মনে হইল। বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু লিখিবার বা বলিবার নিমিত্ত অনুরোধ করায় আমি একটি ছোট লেখা সভার কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনোনীত না হওয়ায় উক্ত লেখাটি (স্বরলিপি প্রথার বিরোধী) সভায় পঠিত হয় নাই। আমি উহা পুস্তকাকারে "প্রাচ্য সঙ্গীত-তথ্য" নামে সাধারণকে জ্ঞাত করিয়াছি। কর্ত্তৃপক্ষেরা হিন্দু-সঙ্গীতকে ইংরাজী ছাঁচে ঢালাই করিতে চাহেন। তাহাতে যে আমাদের সামগ্রীটির স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিতেছেন না। আমার বক্তব্যের সারাংশ এই যে, স্বরলিপির দ্বারা আমাদের সঙ্গীতের আসল রূপটি প্রকাশ হইতে পারে না এবং যাহা রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা কাগজে কলমে থাকিলেও কণ্ঠে কেহ ঠিক বাহির করিতে পারেন না। প্রথমে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, পরে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার পরে চারুচরণ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেকে স্বরলিপি দ্বারা নিজেদের শিক্ষার উপায় করিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্য কেহ সে উপায় অবলম্বনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গুরুহীন বিদ্যা কখনো হইতেই পারে না এবং স্বরলিপিকর্ত্তাগণ অত্যাবশ্যকীয় পরিশ্রম ও সাধনার (গুরু সমক্ষে এবং স্বাধীনভাবে) লাঘব করিবার তথাকথিত একটি উপায় বাহির করিয়া ধ্রুপদের ধ্বংস করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন; এই আমার ধারণা।

কাশীতে মহাসম্মেলনের সময় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে মহাশয় আসেন এবং আমার নিকট চারখানি ধ্রুপদ (চারি রাগের) স্বরলিপি দ্বারা শিক্ষা করেন। আমি তাঁহাকে গান করিতে বলায় তিনি "পরে হইবে" বলিয়া চলিয়া যান। পরে তিনি অনেকবার এদিকে

আসিয়াছেন, কিন্তু আমাকে গানগুলি শুনান ত দূরের কথা, আমার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি যখন ঐ গানগুলি ৪।৫ দিন ধরিয়া আমার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনের ভাব "বিদ্যা প্রচার" ছিল, পরে যখন প্রচার-কার্য্য কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করায় "পরে হইবে" উত্তর পাওয়া গেল তখনই বুঝা গেল যে ইনিও পুঁথি বোঝাই করিতে চাহেন এবং গুরুর নাম করিতে না হয় তাহারই চেষ্টায় আছেন।

কয়েক বৎসর পরে উক্ত সম্মেলন সভা লক্ষৌ মহানগরীতে বসিবার কথা শুনা গেল। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, কোথায় কার কাছে ভাল গান আছে, কোথায় কে ভাল ঠুংরী গাহিতে পারে ইত্যাদি প্রকারের canvassing আরম্ভ হইল। আমার নিকট তিন চারিখানি পত্র আসিল, তন্মধ্যে একখানির উল্লেখ করা কর্ত্তব্য মনে করি। পত্র-লেখক লক্ষ্ণৌএর একজন জমিদার এবং সঙ্গীতজ্ঞ, নাম ঠাকুর নবাবআলি খাঁ। তিনি আমাকে লেখেন, "শুনিয়াছি আপনার নিকট উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত ধ্রুপদগুলি যদি পাঠান তবে উপকৃত হইব। আমি অনেক ধ্রুপদ ছাপাইয়াছি (স্বরলিপি করিয়া) তন্মধ্যে যদি আপনার ধ্রুপদগুলি থাকে তবে সেগুলি বাদে অন্যগুলি লইব এবং বাকী ফেরৎ দিব।"—এই ভাব। তাঁহার উত্তরে আমি জানাইলাম যে, আমি সমস্ত ধ্রুপদ গান এবং সরগম যাহা শিক্ষা করিয়াছি পুস্তকাকারে ছাপাইতেছি এবং ছাপা হইলেই পাঠাইয়া দিব। সময়ান্তরে আমি ঠাকুর সাহেবকে বইগুলি পাঠাই এবং তন্মধ্য হইতে কিয়দংশ সভায় পঠিত হইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করি। তাহা ত হয়ই নাই; পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ পর্য্যন্ত তিনি দেন নাই। অপিচ একটি বালক চন্দ্রশেখরকে তিনখানি ধ্রুপদ শিখাইয়াছিলাম এবং উক্ত সম্মেলন সভায় যখন সে যায় তখন আমি তাহার মাতুলকে বলিয়া দিয়াছিলাম যেন ঐ তিনখানি গান সেখানে তাহাকে দিয়া গাওয়ান হয়। তাহাও হয় নাই। ইহাতে কি বুঝা যায়? উক্ত মহা সম্মেলন বসিবার সময় ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গৌরীপুরের রাজা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী মহাশয় কাশীধামে ছিলেন। তাঁহারও ধারণা—স্বরলিপি প্রথাতে গান শিক্ষা হইতে পারে। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহারই আত্মীয় দ্বারা ৮।১০ টি ধ্রুপদ আমার নিকট হইতে স্বরলিপি করিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি আমাকে শুনান হয় নাই। আমার বিশ্বাস যে, ঐ গানগুলি তাঁহার পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া একেবারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ঐ ধ্রুপদগুলি আদায় করিতে এবং সাধন দ্বারায় লয়ে সুরে তৈয়ার করিতে দুই তিন বৎসর লাগে, কিন্তু স্বরলিপি করিতে গেলে ৪।৫ দিনেই হয় এবং তাহাই হইয়াছে। পুস্তক মধ্যে বিদ্যা থাকে না। শিক্ষা দ্বারাই উহা রক্ষিত হয়। স্বরলিপি পুস্তকে বর্ণ অথবা বোল থাকে, সুর কোথায়?

সাধনা না হইলে সিদ্ধি হইতে পারে না এবং সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে একাগ্রতা চাই, পরিশ্রম চাই, একনিষ্ঠতা চাই এবং পথ-প্রদর্শক জীবন্ত গুরু চাই। সঙ্গীতের আসল স্বরূপ দেখিতে হইলে কোন প্রকারের ফাঁকি চলিবে না। তাই যে ভীষণ পরিবর্ত্তন বিগত ৫০ বৎসরে চক্ষের সম্মুখে দেখিলাম তাহার বিরুদ্ধে দুই চারিটি কথা বলিলাম। স্বরলিপি দ্বারা আমাদের সঙ্গীতের স্বরূপ দেখান যায় না এবং সঙ্গীত শিক্ষা কখনো হইতে পারে না। ইহাই আমার ধারণা।

সমাপ্ত

লাটের স্পেশাল

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

মাঘের দ্বিপ্রহর। আঙ্গিনায় রৌদ্রের দিকে পিঠ করিয়া বেণু সর্দ্দার সম্মুখে একখানি পাথরের থালায় এক রাশ সরুচাকলি, লইয়া মাধ্যাহ্নিক জলযোগের উপক্রম করিতেছিল। রঙ্গীন ভিজ্জা গামছা-খানিতে মাথায় আধ ঘোমটা টানিয়া স্ত্রী বিরাজ পিঠার কাঠ হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় আহ্বান আসিল, "সর্দ্দারের পো! বাইরে এসতো একবার।"

দফাদারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বেণু উঠিয়া পড়িতেছিল, বিরাজ তাড়াতাড়ি কহিল, "মুখের 'গাস্' টা খেয়ে যাও গো।"

"দু'খানা খেয়ে আমার পেট ভর্‌বে নারে, বিরাজ! তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক্, আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।"

বেণু হাত ধুইয়া উঠিয়া গেল।

মিনিট দশ পর ফিরিয়া আসিয়া হতাশস্বরে বেণু কহিল, "আমার আর তোর হাতের সরুচাকলি খাওয়া অদেষ্টে নেইরে, বিরাজ! দে দিকিন্ পাগড়ীটা এখুনি আবার বেরোতে হ'বে।"

"এই ভর দুপুরে আবার কোন্ পোড়ার মুখোর মুখ পুড়েছে যে, তোমায় যেতে হ'বে?" বিরাজ কহিল।

"চেঁচাস্‌নিরে পাগলী। লাটের গাড়ী আস্‌ছে, পাহারায় যেতে হ'বে। দে পাগড়ীটা। দাঁড়াও গো দফাদার দা, পাগড়ীটা বেঁধে যাচ্ছি।" দ্বারের দিকে চাহিয়া বেণু কহিল।

বাহির হইতে জবাব আসিল, "একটু চট্‌পট্ সেরে নাও, সর্দ্দারের পো! যেতে হ'বে আবার পাকা ছ'কোশ।"

পাগড়ী বাঁধা শেষ হইলে বিরাজ দু'খানা সরুচাকলি হাতে করিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিনতি করিয়া কহিল, "আমার মাথা খাও, এই দু'খানি গালে দিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে যাও। সেদিনও গড়েছিনু, খেলে না, কোথায় মড়া আগ্‌লাতে গেলে! আজ—"

"এখন খেলে আর হাঁট্‌তে পার্‌ব নারে, বিরাজ। সাঁঝে গাড়ী পার ক'রে দিয়ে পহর রাতেই ফিরে আস্‌ব। তুই উনুনে একটু জল বসিয়ে রাখিস্ পিঠেগুলো ভালো ক'রে ঢেকে রাখ্‌গে।" বলিয়া পিষ্টক-স্তূপের দিকে একটি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লাঠি হাতে বেণু চৌকীদার বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর এই খাদ্যটি অনেক দিন চেষ্টা করিয়াও সে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে পারিল না! পিঠাগুলি গুছাইয়া তুলিয়া বিরাজ গামছায় চোখ মুছিল।

ঘরের বিঘ্নটিকে তো বেণু কোনমতে কাটাইয়া আসিল, কিন্তু পথে আর এক বিঘ্ন উপস্থিত, একটি স্বল্পজল অন্ধকার ডোবার ধারে বেণুর সাত বছরের পুত্র মনাই বঁড়শী নাচাইয়া 'চ্যাং' মাছ ধরিতেছিল। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে এইটি ছিল তাহার নিত্যকর্ম্ম। বেণু তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অতি লঘুপদে আসিতেছিল কিন্তু মনাইকে ফাঁকি দিতে পারিল না। পিতার পরিচিত নীল পাগড়ী সে দূর হইতেই দেখিয়াছিল, কিন্তু পিতা অন্য পথে চলিয়া যাইবে ভয়ে ভাবে ভঙ্গীতে কোনো রূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। বেণু সতর্ক পদে নিকটে আসিতেই, সে ছিপ ফেলিয়া এক লম্ফে পথের মাঝখানে উঠিয়া আসিল এবং তাহার পোষাকের প্রান্ত মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল, "কোথা যাচ্ছ, বাবা?" বেণু বিপদে পড়িল। সত্য কথা বলিলে মনাই সঙ্গে যাইবার জিদ্-ধরিবে। একটু ভাবিয়া কহিল, "কালীতলায়।"

জগতে মনাইয়ের ভীতির একমাত্র স্থান ছিল এই বারোয়ারী কালীতলা। সেখানে যত ভূত আর প্রেতের আড্ডা, কোন সূত্রে এই তত্ত্বটি তাহার শিশু মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া বাসা বাঁধিয়া ছিল। কালীতলার নাম শুনিয়া সে এক পা

পিছাইয়া গিয়া কহিল, "সাঁঝের আগে ফিরবে বাবা, জান্‌লে ?"

পুত্রের শঙ্কাবিহ্বল দৃষ্টি দেখিয়া বেণু কহিল, "সাঁঝের আগেই ফির্‌ব মনাই, তুই ঘরে যা!" তাহার পর পুত্রকে একটি চুমা দিবার অভিপ্রায়ে দুইহাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে তুলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পিছনে দফাদার কহিয়া উঠিল, "পথে দাঁড়িয়ে আর দেরী কোরোনা, সর্দ্দারের পো, বেলা ভাটিয়ে আস্‌ছে।"

অগত্যা মাথা নীচু করিয়া পুত্রের গালে তাড়াতাড়ি একটা চুমা দিয়া বেণু কহিল, "ঘরে যা মনাই তোর মা পিঠে নিয়ে ব'সে আছে।" পিঠার কথা শুনিয়া সে ছিপগাছি তুলিয়া লইয়া বিনাবাক্যে বাড়ীর পথ ধরিল এবং কিছুদূর গিয়া গলির মোড়ের বেত-ঝোপের আড়াল হইতে মুখ বাহির করিয়া পিতাকে অবশ্য অবশ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরে ফিরিবার জন্য দ্বিতীয় বার উপদেশ দিয়া গেল।

(২)

শীতের ছোট শেষ বেলাটি অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রতি চল্লিশ হাত অন্তর চৌকীদার নাম ধারী এক-একটি মানব-সন্তান লাঠি ঘাড়ে করিয়া লাটের স্পেশালের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া খোলামাঠের তীব্র হাওয়ায় শীতে কাঁপিতেছিল। গাড়ী আসিবার সময় ছিল সন্ধ্যায়, কিন্তু রাত্রি, প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল গাড়ী তখনও আসিল না। বেণু অধীর হইয়া উঠিল। দিব্য চক্ষে সে দেখিতে পাইল, পাথরের থালায় সরুচাকলি সাজাইয়া এতক্ষণে বিরাজ প্রদীপ জালিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। বেণু জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ীর খবর কি, দফাদার দা ?"

দফাদার নিজেও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, "মালিক হুজুরের হুকুম তামিল কর্‌তে এসেছি। থানা থেকে ব'লে দিলে সাঁঝ বেলায় যাবে গাড়ী, এখন তো রাত এক পহর। কাঁথাখানাও আনিনি!" দফাদার মাথার পাগড়ী খুলিয়া গায়ে জড়াইল। শীত তখন ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছিল।

বস্তুতঃ গাড়ী ছাড়িবার সময় ঘণ্টা পাঁচেক পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু গণ্ডগ্রামের চৌকীদারের কাছে সে সংবাদ পৌঁছে নাই।

এমন সময় মেঘ করিয়া আসিল। চৌকীদারের দল প্রমাদ গণিল। ইহার পর যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহা হইলে প্রাণ লইয়া গৃহে ফেরা অসম্ভব, এ কথা দফাদারকে স্পষ্ট-ভাষায় জানাইতে কেহই দ্বিধা করিল না। দফাদার একটি ছোট পুঁটুলী উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিল; "শীতের ওষুধ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আয় দেখি।" ইঙ্গিতটা সকলেই বুঝিল, পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে "বোম্ বোম্ ভোলানাথ" শব্দে স্থানটি মুখর হইয়া উঠিল এবং গঞ্জিকার ধূমে অন্ধকার আরও জমাট বাঁধিয়া গেল। দফাদার ডাকিল, "সর্দ্দারের পো, কোথায় গা ?"

বেণু জবাব দিল "উঁহু! আমি খাব না, দফাদার দা।"

এক কালে সে পুরাদস্তুর গঞ্জিকা-সেবী ছিল কিন্তু বৎসর তিনেক হইল বিরাজ তাহাকে তাহার শাঁখা সিঁদুরের দিব্য দিয়া নেশা ছাড়াইয়াছে; সেই অবধি বেণু গাঁজার কলিকা স্পর্শ করে নাই। শীতের ওষুধ সেবন করিয়া চৌকীদারের দল কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইল। কেবল মাত্র বেণু দুই হাঁটু মুড়িয়া তাহার উপর মুখ রাখিয়া শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হুস্! হুস্!

"উঠে দাঁড়া সব। লাঠি ঘাড়ে ঠিক্ হ'য়ে সাম্‌নে চেয়ে থাক্।"

দফাদার হাঁকিল।

হুস্! হুস্! গাড়ী চলিয়া গেল—মাল-গাড়ী।

বিরক্ত হইয়া চৌকীদারেরা অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিল। দফাদার কহিল, "শীতের ওষুধ আর একবার তৈরী করে' নাও দেখি, শীত ভয়ে ভাগবে।"

ঔষধ সেবন চলিতে থাকিল, দূর হইতে বেণু ধূম-কুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিল, নড়িল না।

রাত্রি দশটায় দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। বেণু কোনো ক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল যে, সঙ্গীরা চার পাঁচ জন করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ভূমি-শয্যায় আশ্রয় লইয়াছে।

বেণুর মনে হিংসা হইল। সর্ব্বাঙ্গ তখন অসহ্য শীতে আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল; পদতলের পাথরের নুড়িগুলি মনে হইতেছিল বরফের টুক্‌রার মত। কিছু দূরে তারের

বেড়ায় হেলান দিয়া দফাদার ঘুমাইতেছিল। বেণু কিছুক্ষণ কি ভাবিল তাহার পর দফাদারের গাঁজার সরঞ্জামের পুঁটুলীটি বাহির করিয়া আনিল। কলিকায় আগুন দিয়া সে মৃদু স্বরে কহিল, "কিছু মনে করিস্‌নি, বিরাজ! তোর শাঁখা-সিঁদুর অক্ষয় হোক্! আজ এক টান না টান্‌লে আর বাঁচব না। বোম্! বোম্!"

অনেক দিনের অনভ্যাস, কলিকায় বার দুই দম দিতেই বেণুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল, লাইনের দিকে ঠিক্‌রিয়া পড়িয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাথায় একটু জল দাও গো, দফাদার দা! সারা পিরথিম ঘুরছে।" তাহার আড়ষ্ট-কণ্ঠ হইতে কথাগুলি বাহির হইল অতি ক্ষীণস্বরে, তাহাতে দফাদারের নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

মধ্য রাত্রি। হিমসিক্ত আচ্ছাদনের নীচে কুণ্ডলী করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীর দল কাঁপিতেছিল। এমন সময় দূরের কোনো সজাগ প্রাণীর কণ্ঠ শোনা গেল, "লাটের গাড়ী! লাটের গাড়ী!"

প্রদীপ্ত আলোক-ফলকে নিশীথের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া রক্ত-চক্ষু লৌহ দানব ছুটিয়া আসিল। চৌকীদারের দল কাঁপিতে কাঁপিতে ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেবল উঠিল না একজন। যেখানে বেণু সর্দ্দার পাহারায় ছিল সেখান হইতে অতি ক্ষীণ একটি আর্ত্তনাদ শোনা গেল—মুহূর্ত্তের জন্য; এঞ্জিন কোনও অজ্ঞাত বস্তুতে বাধা পাইয়া একটু দুলিল কিন্তু তাহার গতি মন্থর হইল না।

স্পেশাল চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইল যে লাটের গাড়ী নিরাপদে সহরে পৌঁছিয়াছে।

* * *

বেণু সর্দ্দারের নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ড যখন সহরের 'মর্গ' হইতে শতদীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিল তাহার পূর্ব্বেই বিরাজের সরুচাকলি শুখাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।

চম্পায় হিন্দু-উপনিবেশ

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপনের পর থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আলোচনা চল্‌ছে। তখন থেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষত্বটি জান্‌বার চেষ্টা হচ্ছে। সেই আলোচনায় ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের অনেক কথা আমরা জান্‌তে পেরেছি। কিন্তু ভারতীয় প্রতিভা যে সেই সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মকে ভারতের গণ্ডীর বাইরেও প্রচার করেছিল, সেই কথাটাই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি। যদিও সময়ে সময়ে যবদ্বীপে বা শ্যামে বৌদ্ধ মন্দির লোকচক্ষুর গোচরে পতিত হয়েছে, যদিও জাপান বা চীনে অনেক ভারতীয় বৌদ্ধ মূর্ত্তি অনেক সময় দেখা গেছে, যদিও বালিদ্বীপে এখনও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া গেছে, তবু সে সব চিহ্নকে ঐতিহাসিকরা অগ্রাহ্য করেছিলেন বহুকাল। তাঁরা সেই সবকে ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ব'লে মান্‌তে চাইলেন না। এ সম্বন্ধে শেষে কাজ আরম্ভ করলেন ফরাসী ও ডাচ্ পণ্ডিতরা। চীন, জাপান, শ্যাম, চম্পা, কাম্বোডিয়ায় যে এক সময়ে "বৃহত্তর ভারত" স্থাপিত হয়েছিল, তার সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন ফরাসী পণ্ডিতরা। আর যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ সম্বন্ধে ডাচ্ পণ্ডিতরা অনুসন্ধান সুরু করলেন। যখন এইসব দেশে "বৃহত্তর ভারত" সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছিল, তখন ভারতবর্ষ সে-বিষয়ে একেবারে নির্ব্বিকার ছিল। তার কারণ হচ্ছে এই যে, সে-বিষয়ের আলোচনা ইংরেজ তখনও

আরম্ভ করেননি। ইংরেজীতে এ-বিষয়ে কোন বই লেখা হয়নি ব'লে, ভারতবর্ষীয়দের দৃষ্টি এখনও সেদিকে পড়েনি।

দ্বিতীয় রাজবংশ

(পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা বলেছি কি ক'রে ভারতীয়গণ চম্পারাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করলে ও ক্রমশঃ কি ভাবে সেখানে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হ'ল। এখন আমরা সেই হিন্দুরাজ্যের ক্রমবিকাশের কথা বলব।) চম্পার প্রথম রাজবংশ "শ্রীমার" দ্বারা স্থাপিত হয়। সেজন্য তাঁর রাজবংশ "শ্রীমার রাজকুল" নামে খ্যাত। সেদেশে দ্বিতীয় রাজবংশ আরম্ভ হয় খৃঃ অব্দ ৩৩৬ থেকে ও ৪২০ অব্দ পর্য্যন্ত থাকে। দ্বিতীয় রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম—"ধর্ম্ম মহারাজ শ্রীভদ্র বর্ম্মণ।" এদেশের ইতিহাসে আমরা ভদ্রবর্ম্মন নামে আরও রাজা পাই। সেজন্য এই রাজাকে আমরা ১ম ভদ্রবর্ম্মন ব'লে উল্লেখ করছি। তাঁর এক শতাব্দী আগে চম্পায় হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়েছে। তার ফলে হিন্দু সভ্যতা সেখানে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। হিন্দু সভ্যতার যা যা অঙ্গ সে সকলই চম্পায় এসে স্থান পেলে। এটা হওয়া খুব স্বাভাবিক, কারণ প্রথমে চম্পায় হিন্দু বণিকরা এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছে, ক্রমশঃ তারা বসবাসও আরম্ভ করল। শেষে যখন রাজশক্তিও হিন্দুদের হাতে এল, তখন সেখানে হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু আচার-ব্যবহার গিয়ে হাজির হ'ল। রাজার উৎসাহ পেয়ে সেখানে হিন্দুদেব-দেবীর জন্যে মন্দিরও স্থাপিত হ'তে লাগল, রাজা দেবপূজার জন্যে যথেষ্ট ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে ভারতবর্ষের স্বাভাবিক গণ্ডী ছাড়িয়ে ভারতের বাইরে গিয়েছিল, সে কথা আজকাল অনেকেই জানেন ও তার প্রমাণও চীন, জাপান, তিব্বতে রয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম যে, কখনও ভারতবর্ষের বাইরে যেতে পারে এধারণাই অনেকের ছিল না। কিন্তু ইতিহাস আলোচনা ক'রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হিন্দুধর্ম্মও শ্যামদেশ, চম্পা, যবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হয়েছিল। চম্পায় যখন প্রথম রাজবংশ স্থাপিত হয়েছিল তখনই হিন্দু-মন্দির সেখানে তৈরী হ'তে সুরু হয়। দ্বিতীয় রাজবংশের ধর্ম্ম মহারাজ শ্রীভদ্রবর্ম্মণ যখন রাজা হন, তখন তিনি সেদেশে শিবমন্দির স্থাপন করেন। প্রথম ভদ্রবর্ম্মণের নামে তিনখানি শিলালিপি পাওয়া গেছে, ফরাসী ঐতিহাসিক M. Finot সেগুলির পাঠোদ্ধার করেছেন। সেই শিলালিপির অক্ষর দেখে পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, প্রায় ৪০০ খৃঃ অব্দে শিলালিপিগুলি প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি শিবের উপাসক ছিলেন। শৈব ধর্ম্মের বিস্তার চম্পাদেশে তাঁরই সময় আরম্ভ হয়। শিবপূজার জন্য বা অন্য অন্য দেবপূজার জন্য সেদেশে তখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়েছিল। সম্ভবতঃ সেদেশে তখন যেসব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁরাই পুরোহিতের কার্য্য করতেন। ভারতবর্ষ থেকে শুধু পূজার জন্য কোন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় চম্পায় গিয়েছিল কিনা তার কোন ইতিহাস এখনও আমরা পাইনি। হয়ত চম্পাদেশে যারা হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণের স্থান কেহ কেহ গ্রহণ করেছিল। শিলালিপিতে আমরা অনেক ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাই।

আগে বলা হয়েছে যে, ধর্ম্মমহারাজ শ্রীভদ্রবর্ম্মণ শিবের উপাসক ছিলেন। তিনি Mi-son'তে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, সেই শিবের নামকরণ হয় ধর্ম্ম মহারাজ ভদ্রবর্ম্মণেরই নাম অনুসারে "ভদ্রেশ্বর।"। প্রতিষ্ঠাতা রাজার নাম অনুসারে দেবমূর্ত্তির নাম রাখা প্রথা চম্পা-দেশে খুব প্রচলিত ছিল। ভদ্রবর্ম্মণ রাজার আর-একটি শিলালিপিতে আমরা এই ভদ্রেশ্বর শিবের উল্লেখ পাই। তাতে লিখিত আছে "ভদ্রেশ্বর-স্বামিপাদপ্রসাদাৎ।" চম্পাদেশে শিবপূজার প্রচলন খুব বেশী হয়েছিল। শিবকে আমরা চম্পায় নানারূপে ও নানা নামে দেখতে পাই, যেমন 'রুদ্র, মহেশ্বর, পশুপতি, ঈশান'। সেদেশে শিবের স্থান যে খুব উচ্চে ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, চম্পার রাজধানী চম্পাপুরের রক্ষক দেবতা হ'লেন—মহাদেব। রাজা ভদ্রবর্ম্মণ "ভদ্রেশ্বর" শিব স্থাপন করেন। শিব-মন্দিরের কাছে যে জমি ছিল তা দেবোত্তর স্বরূপে দান করেন ও ঘোষণা করেন যে, সেই জমির আয়ের ছয় অংশ রাজা গ্রহণ করবেন ও বাকি দশ অংশ

শিবপূজার জন্য ব্যয়িত হবে। তিনি ভবিষ্যৎ রাজাদের উদ্দেশ ক'রে এই কথা বলেন যে, যেন কোন রাজা এই দেবোত্তর দানের উপর হস্তক্ষেপ না করেন। সুখের বিষয়—তাঁর এই প্রার্থনা বিফল হয় নি, কারণ আমরা জানি তাঁর পরে অনেক রাজা ঠিক এই জায়গায় অনেক মন্দির স্থাপন করেছেন ও সেইসব মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আরও অনেক দেবোত্তর জমি ও অর্থদান করেছেন। সেই-সব মন্দিরের ধংসাবশেষ এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই রকমে হিন্দুধর্ম্ম, বিশেষতঃ শৈবধর্ম্ম, চম্পাদেশে প্রাধান্য লাভ করল। চম্পায় হিন্দুধর্ম্মের এই যে বিস্তার, তার কারণ হয়ত এই যে, হিন্দুধর্ম্ম সে সময় এই হিন্দু উপনিবেশে রাজধর্ম্ম হয়েছে। হিন্দুধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম হওয়াতে, সেখানকার সাধারণ লোকেদের মধ্যে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করবার একটি আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। আর হিন্দুধর্ম্ম বোধ হয় সাধারণ লোকেদের মনকে তার পূজাপদ্ধতি ও উৎসবের মধ্য দিয়ে জয় করতে পেরেছিল।

এতক্ষণ আমরা চম্পাদেশকে "হিন্দু উপনিবেশ" ব'লে বর্ণনা ক'রে এসেছি। কিন্তু এখানে উপনিবেশ ঠিক বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ভারতবর্ষ থেকে প্রথমে একদল বণিক সে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যায়, পরে একদল ভারতবাসী কোন উপায়ে সেখানকার রাজশক্তি হস্তগত করে। সেখানে এই রকমে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হ'বার পর, সেইসব হিন্দুদের কিন্তু স্বদেশের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রইল না। ভারতবর্ষের কোন রাজা বা সম্রাট তাঁর প্রজাদের দ্বারা স্থাপিত এই রকম কোন উপনিবেশের উপর নিজের অধিকার বিস্তার করেন নাই। সেখানকার হিন্দুরাও স্বদেশের কোন রাজার সঙ্গে যোগ রাখ্‌বার চেষ্টা করেন নি। এই রকমে শ্যামদেশ বল, বা কাম্বোডিয়া বল, বা চম্পা বল, সবদেশই স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যরূপে গ'ড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বড় বড় রাজা বা একছত্রাধিপতি সম্রাট যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁদের রাজ্য ভারতবর্ষের বাইরে বোধ হয় বিস্তৃত হয়নি। আর তাঁদের রাজ্য বা সাম্রাজ্যও তাঁদের মৃত্যুর পর অধিককাল স্থায়ী হয়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাই যেন আলাদা আলাদা ছোট ছোট রাজ্য গ'ড়ে উঠা; সেই ধারা ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েও হাজির হয়েছিল। তাই যখন হিন্দুরা ভারতের বাইরে গিয়ে রাজ্য বা উপনিবেশ স্থাপন করলে, তখন সেগুলি পৃথক্ রাজ্য রূপে পরিণত হ'ল। তারা সে সময়কার নিজেদের দেশের কোন রাজাকে অধিপতি ব'লে স্বীকার ক'রে নিল না, বরং নিজেদের স্বাধীন ব'লে ঘোষণা করেছে। তার ফলে এই হয়েছে যে ভারতবর্ষ তার উপনিবেশের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ রাখ্‌তে পারেনি। সেইজন্যে ভারতবর্ষ যে তার সন্তানদের এদেশের বাইরে কোন উপনিবেশ স্থাপন করতে পাঠিয়েছিল ভারতবর্ষে তার কোন প্রমাণ আমরা এখন খুঁজে পাচ্ছি না। যা কিছু প্রমাণ তা আমরা পাচ্ছি সেই উপনিবেশের মন্দিরে, শিলালিপিতে ও সাহিত্যে।

তবে সুখের বিষয় আমরা একটা উদাহরণ পাই, যা থেকে আমরা জানতে পারি যে, চম্পাদেশের এক রাজা নিজের রাজ্য ত্যাগ ক'রে ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হন। সেই রাজার কথা আমরা আগে একবার উল্লেখ করেছি অন্য প্রবন্ধে,তাঁর নাম—গঙ্গারাজ। তিনি প্রথম ভদ্রবর্ম্মণের পুত্র। তাঁর কথা আমরা শিলালিপিতে পাই, চীনা হইতেও পাই। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, গঙ্গারাজের রাজোচিত গুণ, "বীর্য্য" "শ্রুতি" ছিল। যদিও রাজ্যত্যাগ করা শক্ত ("রাজ্যং দুস্ত্যজং") তবুও তিনি কোন কারণে নিজের রাজসিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর রাজ্য-ত্যাগের কারণ আমরা শিলালিপিতে পাই না, সেটা চীনা বই থেকে পাওয়া যায়। চীনা বই থেকে আমরা জানি যে, তাঁর ভাই কোন অজানা কারণ বশতঃ তাঁর মাতার সঙ্গে রাজধানী থেকে চ'লে যান। তিনি আর ফিরে আসেননি ব'লে, গঙ্গারাজ নিজের রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তখন হঠাৎ তিনি স্থির করলেন যে, সেই সুদূর চম্পাদেশ থেকে ভারতবর্ষে আস্‌বেন। এ আসার উদ্দেশ্য বোধহয় গঙ্গানদী দেখা। সম্ভবতঃ তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হ'য়েছিল, তাই তিনি গঙ্গানদী দেখে পাপক্ষয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রবাসী ভারতবাসীর বোধ হয় এই একমাত্র উদাহরণ যখন প্রবাস থেকে ভারতবাসী তীর্থযাত্রায় ভারতে এসেছেন। তবে তিনি কোথায় এলেন ও তাঁর পরিবর্ত্তী ইতিহাস কি সে-সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শাসন-পদ্ধতি

চম্পার রাজবংশ হিন্দুরাজবংশ, সুতরাং তার শাসন-পদ্ধতিও ভারতীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। চম্পা বা শ্যাম দেশের শাসন-পদ্ধতি দেখ্‌লে আমাদের দেশের আগেকার কালের শাসন পদ্ধতির কথা মনে হয়। ঠিক যেন হিন্দু দণ্ডনীতি সমুদ্রপারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চম্পার রাজসভা ঠিক যেন হিন্দু রাজসভা, সেখানে পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী ও পণ্ডিতদের আমরা দেখতে পাই। হিন্দুরাজারা যেমন শাস্ত্র-শাসনে পরিচালিত হ'তেন, চম্পার রাজারাও সেই-রকম শাস্ত্রবাক্যকেই প্রধান স্থান দিতেন। আর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁদের পরামর্শদাতা, অবশ্য সব সময়েই রাজা যে ব্রাহ্মণের পরামর্শ অনুসারে চল্‌তেন তা নয়।

শাসনের সুবিধার জন্য চম্পাদেশটি তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইসব প্রদেশ-গুলির নাম একেবারে ভারতীয়। এটি ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বল্‌তে হবে। প্রদেশগুলির নাম :—(১) অমরাবতী—উত্তর চম্পায়। এ প্রদেশে ইন্দ্রপুর সহর ছিল, সেটি এক সময়ে চম্পার রাজধানী ছিল।

(২) বিজয়—মধ্য চম্পায়। এখানকার প্রধান সহর, ১০০০ অব্দ থেকে চম্পার রাজধানী হয়েছিল।

(৩) পাণ্ডুরঙ্গ—দক্ষিণ চম্পায় অবস্থিত।

প্রত্যেক প্রদেশে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। এই তিনটি প্রদেশ তৃতীয় হরিবর্ম্মণের রাজত্বকালে ৩৮ অংশে বিভক্ত ছিল। তৃতীয় হরিবর্ম্মণ ১০৭৬ অব্দ থেকে ১০৮০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সেই সময়ে সারা চম্পারাজ্যে ৩০,০০০ পরিবার ছিল। শিলালিপি থেকে আমরা জমির দুটো ভাগের নাম পাই—(১) প্রমার ও (২) বিজয়। শাসনের জন্য যে বিভাগ সেটির নাম প্রমার, ও সামন্তদের যে বিভাগ সেটির নাম বিজয়। চীনা বই থেকে জানা যায় যে, এক-একটি গ্রাম বা সহরের লোক-সংখ্যা তিন থেকে ৫০০ পরিবার ছিল, অনেক সময় ৭০০ পরিবারও থাকৃত। রাজধানীতে আরও বেশী পরিবার বাস করৃত, যেমন ১০৬৯ খৃঃ অব্দে বিজয়ে ২৫৬০টি পরিবার বাস করৃত। আর-একটি বিভাগের নাম আমরা পাই, সেটি হচ্ছে—বিষয়। পাল ও গুপ্ত রাজাদের শিলা-লিপিতেও আমরা "বিষয়ের" উল্লেখ পাই, সেখানে বিষয় "জেলা" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এইভাবে চম্পায় হিন্দু শাসন-প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। সেই শাসন-প্রথা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। যখন ভারতবর্ষে মুসলমান রাজারা প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করৃছিল, সে-সময়ও চম্পায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। যখন ভারতবর্ষে তোগলক বংশের তথা পাঠান সাম্রাজ্যের পতন হ'য়ে আস্‌ছিল, সেই সময়ই চম্পায় হিন্দুরাজ্যের বিলোপ হয়।

সত্তর বৎসর

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

সামাজিক চিত্র। (শ্রীহট্ট সহরে)

(১৯)

শ্রীহট্ট সাহাপ্রধান স্থানে। সহরে সাহারাই ধনসম্পদে হিন্দু সমাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমার বাল্যকালে আমরা সাহাদিগকে শুঁড়ি বলিয়া ভাবিতাম। এইজন্য সহরের ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোকেরা ইঁহাদিগের সঙ্গে পানাহার করিতেন না।

"হস্তিনা তাড়িতেনাপি ন গচ্ছেৎ শুণ্ডিকালয়ম্"

এই প্রাচীন অনুশাসন স্মরণ করিয়া নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ

কায়স্থাদি ভদ্রলোকেরা সাহাদের বাড়ীতে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেন না। আমরা, বালকের দল, প্রায় সর্ব্বদাই জ্যেষ্ঠদিগের মুখে এই শ্লোকটা শুনিতাম। আমার বাবা সাহাদিগের বাড়ীর পুকুরে পা পর্য্যন্ত ধুইতেন না। সহরের বড় বড় ধনী সাহারা তাঁহার মক্কেল ছিলেন। ইঁহারা কর্ম্মোপলক্ষে আমাদের বৈঠকখানা ঘরে আসিলে যতক্ষণ ফরাস হইতে হুঁকো না সরান হইয়াছে, ততক্ষণ তাহাতে বসিতেন না। মুসলমানদিগের জন্য যেমন ফরাসের সম্মুখে স্বতন্ত্র কেদারা বা চেয়ার সাজান থাকিত, সাহাদিগের জন্যও সেই ব্যবস্থা ছিল। ইঁহারা আজিকালিকার কথায়, "অস্পৃশ্যজাতি" বলিয়া গণ্য ছিলেন। অথচ বিদ্যাবুদ্ধিতে, কিংবা ধনসম্পদে ইঁহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের অপেক্ষা হীন ছিলেন না। শ্রীহট্টের সাহারা সেকালে প্রায়ই বৈদ্যকায়স্থদিগের ছেলেমেয়ে আনিয়া নিজেদের পুত্রকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেন। দরিদ্র বৈদ্যকায়স্থেরা টাকার লোভে উপযুক্ত মূল্য লইয়া সাহাদিগকে নিজেদের পুত্রকন্যা বিক্রয় করিতেন। বিক্রয় বলিতেছি এইজন্য যে ইহা স্বজাতির মধ্যে বিবাহের যে বরপণ বা কন্যাপণ গৃহীত হয় সেরূপ ছিল না। সাহাদের পরিবারে কোন কায়স্থবৈদ্য বালক-বালিকার বিবাহ হইলে তাহারা আর কায়স্থবৈদ্য সমাজে থাকিতে পারিত না। পিতৃপরিবারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চিরদিনের মতন ছিন্ন হইয়া যাইত। মেয়েরা বিবাহের পরে বাপের বাড়ী আসিতে পারিত না; ছেলেরাও নিজেদের পিতৃমাতৃকুলের স্বজনদিগের সঙ্গে পানাহার করিতে পাইত না। মুসলমান বা খৃষ্টীয়ান হইলে হিন্দু যেমন একেবারে জাতিচ্যুত হয়, সাহাদিগের বাড়ী বিবাহ করিয়া বৈদ্যকায়স্থ ছেলেমেয়েরাও সেইরূপ হইত। অধিকাংশ স্থলে গোপনেই এসকল সম্বন্ধ হইত। মাবাপ লুকাইয়া কন্যা বিক্রয় করিতেন। সাহারা দেখিতে বৈদ্যকায়স্থ অপেক্ষা হীন নহেন। বিশেষতঃ ইঁহাদের স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই রূপের মোহে অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্ক কায়স্থবৈদ্য যুবকেরাও নিজেদের অভিভাবকদিগের অজ্ঞাতে সাহা বাড়ীতে যাইয়া লুকাইয়া বিবাহ করিতেন। আমার বাল্যকালে শ্রীহট্ট সহরের কায়স্থবৈদ্যেরা নিজেদের পরিবারস্থ বালকদিগের জন্য এই কারণে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। কোন কারণে কোন বালক বা যুবক স্কুল হইতে যথাসময়ে বাড়ী না ফিরিলে ইঁহাদের মুখ শুখাইয়া যাইত।

একদিন আমাদের বাসাতেও এইজন্য একটু উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। আমার এক মাস্‌তুতো ভাই তখন আমাদের বাসায় থাকিয়া শ্রীহট্টের জিলাস্কুলে পড়িতেন। ইনি আমা অপেক্ষা তিনচার বছরের বড় ছিলেন। চিক্কণ শ্যামকান্তি, টানা চোখ, উন্নত নাসিকা, সুগোল সুঠাম দেহযষ্টি, প্রথম যৌবনের সাড়া পাইয়া তখন অতি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। একদিন শনিবারে তিনি স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিলেন না। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাঁহার খোঁজ-খবর নাই। মা প্রথমে নিজেই চারিদিকের আত্মীয় কুটুম্ব বাড়ীতে তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। ইহাতে কোন ফল হইল না। তখন অগত্যা বাবার কানে কথাটা তুলিতেই হইল। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে দুই একটি কায়স্থ বালক এইরূপে স্কুল হইতে পলাইয়া গিয়া গোপনে সাহাবাড়ীতে বিবাহ করিয়াছিল। আমাদেরও সেই আশঙ্কা হইল। অনেক খুঁজিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। পরদিন রবিবার। সেদিনও তাঁহার খোঁজখবর মিলিল না। এই দুই দিন মায়ের চোখের জল থামে নাই। সোমবার পূর্ব্বাহ্নে স্কুলে যাইবার সময় ভায়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত! বাবা ভয়ে কোন কথা বলিলেন না। মা, ছেলে নিরাপদে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া চোখের জল সম্বরণ করিলেন। ফলতঃ সে-সময়ে শ্রীহট্টের কায়স্থবৈদ্য পরিবার সকল সাহাদের ভয়ে একরূপ জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ভয়ে নিজেদের ছেলেদিগকে শাসন করিতে পর্য্যন্ত সাহস পাইতেন না, কি জানি তারা গোসা করিয়া সাহার বাড়ীতে যাইয়া জন্মের মত জাতিচ্যুত হইয়া পড়ে।

এখন আমরা জানিয়াছি যে, সাহারা এবং সুবর্ণবণিকেরা কোনদিন নীচ জাতি ছিলেন না। প্রাচীন বর্ণবিভাগে ইঁহারা বৈশ্য ছিলেন, অথচ ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বর্ণাশ্রমই মানিতেন না। যুগাবতার ভগবান বুদ্ধদেব প্রাচীন বৈদিক সমাজের ব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দিয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞ এবং যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব

একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নূতন বৌদ্ধ সমাজে বর্ণভেদ ছিল না। শ্রমণ ও গৃহস্থ, বৌদ্ধেরা এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িলে এবং বৌদ্ধ সমাজের শক্তি নষ্ট হইলে আধুনিক অথবা মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের প্রতিষ্ঠা হয়। এই যুগসন্ধি সময়ে যে-সকল নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ নিজেদের শীল ও সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন নাই, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য করিলেন। এই ভাবেই সাহা, সুবর্ণবণিক, যোগী প্রভৃতি আধুনিক হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য হইলেন। নতুবা কুলে, শীলে, বিদ্যায় বা বিনয়ে, সদাচারে বা সাংসারিক সম্পদে ইঁহারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না এবং হীন নহেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণের নিকটে নিজেদের ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং সমাজ-ব্যবস্থা বিসর্জ্জন দিতে নারাজ হইয়াই ব্রাহ্মণ্য-প্রধান হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য হইয়াছিলেন। বিগত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে আমাদিগের দেশের পণ্ডিতেরাই এসকল তথ্য প্রচার করিয়াছেন। আমার বাল্যকালে এসকল কথা কারও জানা ছিল না, সুতরাং তখনকার লোকে সাহাদিগকে শুঁড়ি ভাবিয়াই সমাজের বাহিরে রাখিয়াছিল। হিন্দু সমাজ এখনও প্রকাশ্যভাবে এই পুরাতন অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। তবে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে একদিকে যেমন বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ সাহা, সুবর্ণবণিক এবং যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্যতার মূল কারণ জানিয়া তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা এখন আর ইঁহাদিগকে আগেকার মতন হীন চক্ষে দেখেন না।

(২০)

সহরের হিন্দু সমাজে সাহা এবং একদিকে অন্যপক্ষে কায়স্থবৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোক দিগের মধ্যে বেশ একটা রেষারেষি ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন প্রকারের কৌমগত (communal) বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল না। জমী-জেরাৎ লইয়া যেমন হিন্দুতে হিন্দুতে সেইরূপ হিন্দু মুসলমানেও মাঝে মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইত। কিন্তু ধর্ম্ম লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও কোন ঝগড়াঝাটি হইত না। শ্রীহট্ট সহরের, এবং বোধ হয় সমগ্র জেলার মধ্যেই, সহরতলীর মজুমদারেরা মুসলমান সমাজের অগ্রণী ছিলেন। আমার বাল্যকালে সৈয়দ বক্‌ত মজুমদার মহাশয় এই পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন। ইনি অতি নিষ্ঠাবান্ পুরুষ ছিলেন। একাধিকবার "হজ" করিয়া হাজী উপাধি পাইয়াছিলেন। ধনে, মানে, বিদ্যায়, শীলতায় ইঁহারা সহরে অতিশয় সম্ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইঁহাদের বাড়ীতে সহরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইমারৎ ছিল। যেমন প্রাসাদ, সেইরূপ তার সাজসজ্জাও ছিল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান। ভিতরে বেলোয়ারী ঝাড়লণ্ঠন-শোভিত বৈঠকখানা, ইংরেজী ফ্যাসানে সজ্জিত। বড় বড় ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা শ্রীহট্টে যাইলে ইঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। তখন শ্রীহট্ট বাংলার ছোটলাটের এলাকাভুক্ত ছিল। লাটসাহেব সফরে যাইয়া শ্রীহট্টে উপস্থিত হইলে মজুমদার মহাশয়দের বাড়ীতে সমারোহ সহকারে অভ্যর্থিত হইতেন। আসামে একটা পৃথক্ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইলে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৩ ইংরেজীতে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। সে-সময়ে, আমার মনে আছে, মজুমদার সাহেবেরা খুব ঘটা করিয়া তাঁহাকে ভোজ দিয়াছিলেন।

কিন্তু সেকালে শ্রীহট্টের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই জানিত যে, মজুমদার মহাশয়দের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। হিন্দু সমাজে তাঁহাদের উপাধি ছিল দাস দস্তিদার। দস্তিদার নবাবী উপাধি। দাস কৌলিক পদবী। আমার মায়ের মাতামহ বংশ দাস ছিলেন। ইঁহাদেরও দস্তিদার উপাধি ছিল। হরমণি দস্তিদার নামে আমার এক মাতুল ছিলেন। তিনি সচরাচর গ্রামের বাড়ীতেই বাস করিতেন। সহরে আসিলে আমাদের বাসাতেই উঠিতেন। সে সময়ে প্রায়ই মজুমদার সাহেবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তাঁহারা নিজেদের জ্ঞাতি বলিয়াই অভ্যর্থনা করিতেন।

শ্রীহট্টের উপকণ্ঠেও এক ঘর দাস দস্তিদার ছিলেন। শ্রীহট্টের হিন্দু সমাজে ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ আসন ছিল।

মজুমদার সাহেবদের মতন না হউক, ইহারাও গণ্যমান্য জমিদার ছিলেন। হরমণি দস্তিদার মহাশয় ইঁহাদেরও জ্ঞাতি ছিলেন। তখন আমরা জানিতাম মজুমদার এবং দস্তিদার, উভয় পরিবার একই বংশের। এক শাখা কোন কারণে মুসলমান হইয়া পড়েন, আর-এক শাখা হিন্দুই থাকিয়া যান। দস্তিদারদের তখনকার একমাত্র কুল-প্রদীপ নবকৃষ্ণ দস্তিদারের এক ক্লাশে আমি পড়িয়াছি। তখন ইহার সঙ্গে স্বল্প-বিস্তর ঘনিষ্ঠ বান্ধবতাও জন্মিয়াছিল। কিছু দিন হইল নবকৃষ্ণ দস্তিদার মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন।



স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ দস্তিদার

তাঁহার পুত্রদের মধ্যে এখন বোধ হয় একজন আসামে হাকিমি করেন, প্রাদেশিক সার্ভিস ভুক্ত। আর একজন কিছু দিন পূর্ব্বে নূতন আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ছিলেন। মজুমদারেরা যে এককালে ইঁহাদের জ্ঞাতি ছিলেন, দস্তিদারেরা ইহা স্বীকার করিতেন। সে-কালে মজুমদারেরাও এসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিতেন না। বাল্যকালে আমরা জানিতাম যে, শ্রীহট্টের মুসলমান মজুমদারেরা এবং হিন্দু দস্তিদারেরা উভয়েই হবিগঞ্জের অন্তর্গত দাস পাড়া গ্রাম হইতে আসিয়া সহরতলীতে বাড়ী করেন।

(২১)

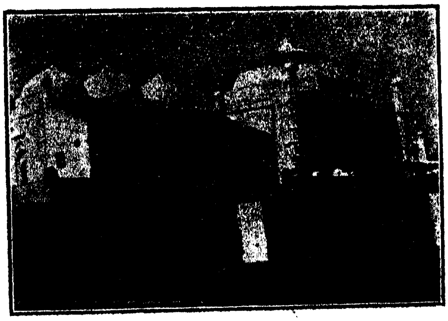
সহরের দক্ষিণে নদী। এই নদীর নাম সুর্ম্মা, সুরমা নহে। অনেকে সুর্ম্মাকে সুরমা ভাবিয়া থাকেন। সুর্ম্মা ফার্সী শব্দ, অর্থ কাজল। এই কাজল অর্থ-দ্যোতক ফার্সী সুর্ম্মা শব্দের নামেই আমাদের নদীর নাম হইয়াছিল। এই নদী যখন মুসলমানদিগের নিকট প্রকাশিত হয় তখন তাহার জল নাকি কালিন্দীর জলের মতন কজ্জল বর্ণের ছিল। শ্রীহট্টের দক্ষিণ দিয়া এই সুর্ম্মা নদী প্রবাহিত। নদীর পরপারে খিত্তা নামে একটা বড় গণ্ড মুসলমান গ্রাম আছে। খিত্তার মুসলমানেরা সে অঞ্চলে অতি প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহাদের লাঠির প্রতাপে নিকটবর্ত্তী হিন্দু মুসলমানেরা উভয়েই সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। মহরমের সময় ইহারা যখন ভাবোন্মত্ত হইয়া লম্বা লম্বা লাঠি উঁচাইয়া, দীন দীন রবে সহরের মাঝখান দিয়া তাজিয়ার কবর দিবার জন্য ইদ্‌গার ময়দানের দিকে ছুটিয়া যাইত, তখন বাস্তবিকই লোকে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। অন্যান্য গ্রামের তাজিয়ার সঙ্গে পাঁচজন কনেষ্টবল ও একজন হেড্‌ কনেষ্টবলই শান্তিরক্ষার জন্য থাকিতেন, কিন্তু খিত্তার আখড়ার তাজিয়া যখন বাহির হইত তখন পুলিশসাহেব স্বয়ং এবং মাটি দিবার দিনে আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত ঘোড়ায় চড়িয়া এই মুসলমান-বাহিনীর সঙ্গে ছুটিতেন। এই উপলক্ষে মাঝে মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে হইত না তাহা নহে, কিন্তু সে মাথা ফাটাফাটি হইত মুসলমানে মুসলমানে, লাঠালাঠি হইত এক আখড়ার সঙ্গে আর-এক আখড়ার, হিন্দু মুসলমানে কোন দিন কোন বিবাদ হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমরা সহরের অন্যান্য হিন্দুদিগের সঙ্গে ইদ্‌গার ময়দানের চারিদিকের ছোট ছোট টিলাতে যাইয়া জনতা করিয়া বসিতাম। মাঝখানে লাঠিখেলা আগুনখেলা প্রভৃতি হইত। নির্ভয়ে, শান্তিতে, ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে লইয়া এই তামাসা দেখিতাম।

তখন মুসলমানের পর্ব্ব উপলক্ষে এসকল আমোদ-প্রমোদে হিন্দুরা নির্ব্বিঘ্নে যোগদান করিতেন। আর মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের পর্ব্বাহে তাহাদের আমোদ-প্রমোদে অকুণ্ঠা সহকারে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতেন।

(২২)

শ্রীহট্ট বহুশতাব্দী হইতে মুসলমানদিগের একটা পীঠস্থান হইয়া আছে। সহরের উপকণ্ঠে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু সাহজালালের সমাধি আছে। এই সমাধির সংস্রবে একটি মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ইহাকে সাহ্‌ জালালের দরগা বলিয়া জানেন। সাহ জালাল চিরকুমার ছিলেন। জীবনে নাকি কখনও তাঁহার এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হয় নাই। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রমণীমুখ দর্শন করেন নাই। এইজন্য তাঁহার মরণের শতাধিক বর্ষ পরেও তাঁহার কবরের নিকটে কিংবা কবরসংলগ্ন মসজিদের চত্বরে স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশ-অধিকার নাই। স্ত্রীলোকেরা মসজিদের নীচে, দরগার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া পীর সাহেবের উদ্দেশে নিজেদের ভক্তি-অঞ্জলি অর্পণ করেন এবং দরগায় সিন্নি দেন। মুসলমান এবং হিন্দু মহিলা উভয়েই সমভাবে সাহ-জালালের মস্‌জিদ দেখিতে যাইয়া এইরূপে এই দরগা পরিক্রমণ করিয়া থাকেন।

শ্রীহট্টের সাহজালালের দরগা যেমন একটা মুসলমনেদিগের পীঠস্থান, দুর্গাবাড়ী সেইরূপ হিন্দুদিগেরও একটি ছোটখাট পীঠস্থান। কেহ কেহ কহেন যে, তন্ত্রোক্ত ৫২ পীঠের মধ্যে শ্রীহট্ট একটা পীঠ। সতীদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া চারিদিকে পড়িয়া এসকল পীঠস্থানের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীহট্টে সতীর হাত পড়িয়াছিল। শ্রী হস্ত হইতেই শ্রীহট্ট নাম হইয়াছে। অনুমান সত্য কি মিথ্যা জানি না। তবে আমার বাল্যকালে কথাটা শোনা ছিল। আর এইজন্যই শ্রীহট্টের দুর্গাবাড়ী সে-অঞ্চলে হিন্দুদিগের নিকটে একটা পীঠস্থান হইয়াছিল। হিন্দু যাত্রীরা শ্রীহট্টে যাইয়া একদিকে যেমন দুর্গাবাড়ীতে পূজা দিতেন, অন্যদিকে সেইরূপ সাহ্‌জালালের মসজিদ



সাহজালালের মস্‌জিদ্‌

পরিক্রমণ না করিয়া এবং সাহজালালের দরগাতে সিন্নি না দিয়া ফিরিতেন না।

ফলতঃ সে অঞ্চলের হিন্দুরা সাহ্‌ জালালকে নিজেদের দেবতার আসনে না তুলিয়া ছাড়েন নাই। সাহ জালালকে তাঁহারা মহাদেবের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু সন্ন্যাসী এবং মুসলমান ফকির মিলিয়া গাঁজা দিয়া সাহজালালের সিন্নি দিতেন। এই গাঁজার সিন্নি দিবার সময়ে একটা পদ গান করা হইত।

"হো! বিশ্বেশ্বর লাল!
তিনলাখ পীর সাহ জালাল!"

হিন্দু দেবতা মহাদেবের সঙ্গে শাহ জালালের সম্পর্ক থাকুক আর না থাকুক, আমার বাল্যকালে শ্রীহট্টের সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে একটা কাহিনী প্রচলিত ছিল, যাহাতে মুসলমান তীর্থ-স্থান মক্কার সঙ্গে শিবের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক মহাশক্তিশালী শিব-লিঙ্গ নাকি কা'বার মন্দিরে বন্দী হইয়া আছেন। কিন্তু মহাপ্রলয়ের শক্তি রাখিলেও এই শিব-লিঙ্গ মৃত। তবে ইহার মাথায় যদি কোনও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু একটি বিল্বপত্র দিতে পারে, তাহা হইলে ইনি অমনি প্রলয়-হুঙ্কারে জাগিয়া উঠিয়া দুনিয়ার সমুদায় মুসলমানকে নিঃশেষে নষ্ট করিবেন। কিন্তু মুসলমানের দেবতাও শিবের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকেন। কোনও উপায়ে কোনও শিবোপাসক হিন্দু মক্কার চতুঃসীমানার মধ্যে যাইবা মাত্র কা'বার মন্দির চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। তখন মুসলমানেরা চারিদিক অন্বেষণ করিয়া সেই হিন্দুর

সন্ধান পাইয়া তাহাকে নষ্ট করিয়া নিজেদের ধর্ম্ম ও সমাজকে বাঁচাইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশের আর কোথাও এ কাহিনী প্রচলিত আছে কি না জানি না। আমার বাল্যে শ্রীহট্টে ইহা খুবই প্রচলিত ছিল। আর এও একটু একটু যেন মনে পড়ে, হিন্দুর শিবকে এই "তিন লাখ পীর" সাহজালালই মক্কায় নিয়া বন্দী করিয়া রাখেন, একথাও তখন শুনিয়াছিলাম। গাঞ্জার সিদ্ধি ও মন্ত্রের সঙ্গে ইহার কোনও নিগূঢ় যোগ আছে কি ?

(২৩)

শ্রীহট্ট সহরে বহুদিন হইতে একটা মণিপুরী উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথম মণিপুর যুদ্ধের পরে ইংরেজ মণিপুরের পরাজিত রাজা গম্ভীর সিংহকে শ্রীহট্টে আনিয়া রাজবন্দী করিয়া রাখেন। গম্ভীর সিংহ যে-বাড়ীতে ছিলেন আমার বাল্যকালে শ্রীহট্টের লোকেরা তাহাকে মণিপুরী রাজবাড়ী কহিত। গম্ভীর সিংহকে আমি দেখি নাই। তাঁহার কোন ছেলেপিলে ছিল কি না তাহাও জানি না। তবে আমার বাল্যকালে সহরে অনেকগুলি মণিপুরী বাস করিতেন। সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে নদীর ধারেও একটা বড় মণিপুরী পাড়া ছিল। সহরের প্রায় মাঝখানেই মণিপুরী রাজবাড়ী ছিল। ইহার আশেপাশেও অনেকগুলি মণিপুরী বাস করিতেন। মণিপুরীরা বোধ হয় একসময়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। পরে বৈষ্ণব হইয়া যান। সমগ্র মণিপুর এখন বৈষ্ণব, রাধা-কৃষ্ণের উপাসক—শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর পন্থাবলম্বী। শান্তিপুর ও নবদ্বীপের গোঁসাইয়েরা মণিপুরীদিগের গুরু, নবদ্বীপ ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। মহাপ্রভুর জন্মতিথি, দোল-পূর্ণিমায় বিস্তর মণিপুরী যাত্রী প্রতি বৎসর নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন। অন্যান্য বৈষ্ণব পর্ব্বাহেও আসেন। মণিপুরের আধুনিক সামাজিক ইতিহাস হিন্দু সমাজের এবং হিন্দু ধর্ম্মের প্রচার-প্রচেষ্টার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত-স্থল। বৈষ্ণব গোস্বামীপাদেরা সমগ্র মণিপুর সমাজকে নিজের মন্ত্র-শিষ্য এবং বৈষ্ণব-আচারে প্রবর্ত্তিত ও বৈষ্ণব সাধনে দীক্ষিত করিয়া হিন্দু সমাজের গভীর ভিতরে আনিয়াছিলেন। মণিপুরের প্রাচীন কথা কিছুই জানি না। তবে তাহাদের বর্ত্তমান স্বভাব, প্রকৃতি ও রীতি-নীতি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের ভিতরে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব পুরুষ-পরম্পরায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে মহাপ্রভুর "অনর্পিতচরী" উন্নতোজ্জ্বল রসশ্রী ভক্তিলাভে ইহাদের বিশেষ অধিকার ছিল। রসের অনুশীলন মণিপুরীদিগের সহজসিদ্ধ। মনে হয় ইহারা চিরদিন, এমনই সহজ সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল। মণিপুরীদিগের বাড়ী দেখিলে দেবালয় বলিয়া মনে হইত এমনই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। গাছপালা এমনই সযত্নে রক্ষিত, তৈজসাদি এমনই ঘসা মাজা ও যা সামান্য আসবাব থাকিত তাহা এমনই পরিপাটী করিয়া বারাণ্ডায় ও ঘরের ভিতরে সর্ব্বদা সাজান থাকিত যে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। যেমন ইহারা ইহাদের ঘরবাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, সেইরূপ কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই নিজেদের এই দেহপুরীকেও সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত। আমার বাল্যকালে কখনও নোংরা মণিপুরী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ফুল দিয়া নিজের অঙ্গ সাজাইয়া রাখিত। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কাণে ফুলের দোল পরিত। পুরুষেরা কখনও কখনো ফুলের এবং কচি পল্লবের মালা ধারণ করিত। আর রমণীদের ললাটে চন্দন-তিলক এবং পুরুষদিগের ললাটে চন্দনের ছাপ ত থাকিতই—ইহা ছাড়া বাহু এবং বক্ষও প্রায় সর্ব্বদাই চন্দনচর্চ্চিত থাকিত। মণিপুরীরা দেখিতে গৌরবর্ণ, কেহবা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ মণিপুরী পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ইহাদের দেহ সুগোল সুঠাম, চোখ কোমল ও স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হইত। মুখের গঠন মঙ্গোলিয়া জাতিদিগের ছাঁচে গড়া। চক্ষু আকর্ণায়ত হইলেও নাক খাঁদা, কিন্তু ইহাতে মণিপুরীদিগের সহজরূপকে নষ্ট করিত না। মণিপুরীদিগের সমাজে—এখন কিরূপ জানি না—ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বাল্য বিবাহ ছিল না। চৌদ্দ-পনেরর ত কথাই নাই, আঠার-উনিশ বছর পর্য্যন্ত মণিপুরী বালিকারা অনূঢ়া থাকিত। এ অবস্থায় মণিপুরী সমাজে বরকন্যার পছন্দ অপছন্দ উপেক্ষা করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। বোধ হয় ইহাদের মধ্যে একপ্রকারের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ প্রচলিত ছিল। মণিপুরী সমাজে স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। অবরোধ-প্রথা ত ছিলই না, বরঞ্চ মণিপুরী মহিলারা, আজকাল যাহাকে ইংরেজীতে ইকনমিক ফ্রীডম্ কিংবা আর্থিক স্বাধীনতা কহে, ইহাও ভোগ করিতেন। ইঁহারা নিজেদের স্বামীর বা পুত্রের কিংবা পরিবারের অন্যান্য পুরুষদিগের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। বরঞ্চ এমনও শোনা যাইত যে, মণিপুরে মহিলারাই পরিবারের ভরণ-পোষণ করিতেন, পুরুষেরা এক-প্রকার নিজনিজ পরিবারের অন্নদাস হইয়াই থাকিতেন। শ্রীহট্টের মণিপুরী সমাজেও ইহার কতকটা প্রমাণ পাইতাম। অন্ততঃ কোন মণিপুরী স্ত্রীলোক যে কেবল ঘরে থাকিয়াই গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতেন, অর্থোপার্জ্জনে স্বামীর সহায় ছিলেন না, এমন দেখি নাই। মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা ঘরে যেমন গৃহকর্ম্ম করিতেন, সেইরূপ নিজেদের অথবা পরিবারের পুরুষ-দিগের তৈয়ারী পণ্য মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রী করিতেন। সন্তানবতী জননীরাও মাথায় মোট ও পিঠে কাপড় দিয়া নিজেদের দুগ্ধ-পোষ্য শিশুকে বাঁধিয়া বাড়ী বাড়ী জিনিষ ফিরি করিয়া বেড়াইতেন। শ্রীহট্টের মণিপুরী "খেস" ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। মণিপুরীরা সস্তা মশারীও বুনিতেন। ইহা ছাড়া কাঠের কাজে ইঁহাদের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সহরের চেয়ার টেবিল ইঁহারাই জোগাইতেন। বাঁশ এবং বেত দিয়া মোড়া, পেটি প্রভৃতিও মণিপুরীরাই প্রস্তুত করিতেন। এই সকল শিল্পে ইঁহারা অসাধারণ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টে রথ-যাত্রার দিন খুব সমারোহ হইত। শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা মণিপুরীদিগের একটা বিশেষ পর্ব্ব ছিল। প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন মণিপুরী গৃহস্থের বাড়ী হইতেই এক এক খানা রথ রাজপথে বাহির হইত। এমন হাল্কা, এমন সুন্দর সজ্জিত, এমন রসকলার নিদর্শন বোধ হয় ভারতের অন্য কোন প্রদেশের রথে দেখা যায় না। মণিপুরীরা বাঁশ দিয়া এই রথ নির্ম্মাণ করিতেন। চাকাও বাঁশেরই হইত কি না মনে পড়ে না। ইহা অসম্ভব হইলে, এসকল রথের চাকাতেই কেবল যা কিছু কাঠ থাকিত, আর সবই বাঁশের ছিল। রথের ঠাট বাঁশের, কিন্তু তাহার আস্তরণ পাতার। কাঁটাল পাতা দিয়াই অধিকাংশ স্থলে রথের চালা ও বেড়া গাঁথা হইত। আর কচি আমের পল্লব কিংবা বকুলের ডালে মাঝে মাঝে চাঁপা ও অন্য সুগন্ধ ফুল গাঁথিয়া রথ সাজান হইত। চন্দনচর্চ্চিত দেহে, গুলঞ্চের মালা পরিয়া মণিপুরীরা যখন হরিধ্বনি করিয়া, খোল কর্ত্তাল সঙ্গে কীর্ত্তন গাহিয়া সারি সারি রথ রাজপথে টানিয়া লইয়া যাইতেন, তখন সহরের এক আশ্চর্য্য শোভা হইত। এসকল রথ এমন হাল্কা বলিয়া যে ভারসহ ছিল না এরূপ নহে। এই রথের উপরেই মানুষ চড়িয়া কলা, আনারস প্রভৃতির হরির লুঠ দিতে দিতে যাইতেন। কিন্তু মণিপুরী রাস শ্রীহট্টের মণি-পুরী সমাজে সর্ব্বপ্রধান উৎসব ছিল। এ রাস এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ছিল। মণিপুরীরা অত্যন্ত-সঙ্গীত-রসজ্ঞ এবং সঙ্গীত-রসলিপ্স। সঙ্গীতের চর্চ্চা ঘরে ঘরে। মহিলারা প্রায় সকলেই নৃত্যগীত শিখিয়া থাকেন। এই রাসযাত্রায় ইঁহারা বাংলা দেশের মতন মূর্ত্তি রচনা করেন না। নিজেরা রাস-লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। কোন সম্পন্ন গৃহস্থের প্রাঙ্গণে বা নাট মন্দিরে পল্লীর সকল বালক-বালিকা মিলিয়া এই অভিনয় করেন। বৃত্তাকারে সুসজ্জিত বালক-বালিকারা প্রাঙ্গণটা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া যান। আট নয় বছরের বালক বালিকা হইতে আঠার বছরের অনূঢ়া যুবতী পর্য্যন্ত এই অভিনয়ে সামিল হইয়া থাকেন। বৃত্তের বাহিরে ইঁহাদের পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরু-জনেরা মিলিয়া খোল কর্ত্তাল সহকারে রাসলীলা কীর্ত্তন করেন, আর ইঁহাদের বালক-বালিকারা হাতে হাতে ধরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অতি মৃদুমধুর নৃত্যকলা সহকারে এই লীলার অভিনয় করেন। যারা রাসে নাচে তাহাদের একটি করিয়া কৃষ্ণ সাজে ও তাহার দু পাশে দুইটি করিয়া রাধা সাজিয়া থাকে। দেশে বিদেশে অনেক নাচ দেখিয়াছি কিন্তু এই মণিপুরী নাচের মতন এমন সুন্দর, এমন নির্ম্মল, এমন নিপুণ নৃত্যকলা কোথাও দেখি নাই। আমার বাল্যকালে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রার সময়ে এই জীবন্ত মণিপুরী রাস দেখিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত।



শেষ মধু

বসন্ত বায় সন্ন্যাসী হায়
চৈৎ-ফসলের শূন্য ক্ষেতে,—
মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায়
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে :—
আয়রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
চৈত্র যে যায় পত্র-ঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা।

সজনে ঝুলায় ফুলের বেণী,
আমের মুকুল সব ঝরেনি,
কুঞ্জপথের প্রান্তধারে
আকন্দ রয় আসন পেতে।
আয়রে তোরা মৌমাছি, আয়,
আসবে কখন শুক্‌নো খরা,
প্রেতের নাচন নাচবে তখন
রিক্ত নিশায় শীর্ণ জরা।

শুনি যেন কানন-শাখায়
বেলা-শেষের বাজায় বেণু ;
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণভরা গন্ধ-রেণু।
কাল যে-কুসুম পড়বে ঝ'রে
তাদের কাছে নিসগো ভ'রে
ওই বছরের শেষের মধু
—এই বছরের মৌচাকেতে।
নূতন দিনের মৌমাছি, আয়,
নাইরে দেরি, করিস্ ত্বরা,
শেষের দানে ঐরে সাজায়
বিদায়-দিনের দানের ভরা।।

চৈত্রমাসের হাওয়ায় কাঁপা
দোলন-চাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়-দাহের রৌদ্রতাপে
বৈশাখে আজ ফুটবে, জানি।
যা-কিছু তার আছে দেবার
শেষ ক'রে সব দিবি এবার,
যাবার বেলায় যাক্ চ'লে যাক্
বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে।
আয়রে, ওরে মৌমাছি আয়,
আয়রে, গোপন মধুহরা,
চরম দেওয়া স'পিতে চায়
ঐ মরণের স্বয়ম্বরা।।

(সবুজপত্র, বৈশাখ ১৩৩৪) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেদ-কথা

২। মন্ত্র

বেদের অন্তর্গত মন্ত্র ত্রিবিধ—ঋক্, যজু ও সাম। শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন এই ত্রিবিধ মন্ত্রের এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন :—যাহার অক্ষর, চরণ ও অবসান নিয়মবদ্ধ তাহাই ঋক্। অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ বাক্য, এ কালে যাহাকে পদ্য বলে, তাহাই ঋক্। যথা—

"আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো
ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাং।
সংক্রন্দনোঽ নিমিষ একবীরঃ
শতং সেনা অজয়ৎসাকমিন্দ্রঃ ॥" (১০।১০৩।১)

এই মন্ত্রটি ঋক্, ইহার ছন্দের নাম ত্রিষ্টুপ্, উহার চারি চরণ, প্রত্যেক চরণে এগার অক্ষর।

যে মন্ত্রের অক্ষর চরণ বা অবসান সম্বন্ধে কোনই নিয়ম নাই, তাহা যজুঃ। অর্থাৎ এ কালে যাহাকে গদ্য বলে, তাহাই যজুঃ, যথা—

"ব্রহ্ম সন্ধত্তং তন্মে জিন্বতং।"
(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১ কাণ্ড, ১ প্রপাঠক, ১ অনুবাক।)

ইহার অক্ষর বা চরণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই।

"দেবস্যাহং সবিতুঃ প্রসবে বৃহস্পতিনা বাজজিতা বাজং জেষম্।"
(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।৩।৬)

এই আর-একটি যজুমন্ত্র। ইহাও ঐরূপ গদ্য।

যে মন্ত্রবাক্য গান করা যায়, তাহাই সাম। ঋক্‌মন্ত্র সুর দিয়া গান করিলেই উহা সামে পরিণত হয়, যথা—

'অভিত্বা শূর নোনু মোহ দুগ্ধাইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্রতস্থুষঃ ॥"

ইহা একটি ঋক্, ইহার ঋষি বশিষ্ঠ, দেবতা ইন্দ্র। ঋগ্বেদ সংহিতার ৭ মণ্ডলের ৩২ সূক্তের মধ্যে ২২ সংখ্যক মন্ত্র এইটি। গান করিবার সময় ইহাতে মাঝে মাঝে অক্ষর বসাইতে হয়, অনেক অক্ষর বিকৃত হয়, তখন উহা সাম মন্ত্রে পরিণত হয়। যথা এই ঋকটি রথন্তর নামক সামে গীত হইলে এইরূপ দাঁড়ায়।

প্রস্তাব। হম্। আভিত্বা শূর নোনুমো বা।
উদ্গীথ। ওমা দুগ্ধা ইব ধেনব ঈশানমস্য জগতঃ
সুবা ঈশাং ॥
প্রতিহার। আ ঈশান মা ইন্দ্রা।
উপদ্রব। সুস্থুষা ওবা হা হুবা।
নিধন। অস্।

গানটির পাঁচ অংশ—উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা নামক তিনজন ঋত্বিক্ ইহা গান করেন। প্রস্তোতার অংশ প্রস্তাব, উদ্গাতার অংশ উদ্গীথ, প্রতিহর্ত্তার অংশ প্রতীহার। উপদ্রব উদ্গাতার গেয়, আর নিধনাংশ তিন জনে মিলিয়া গান করেন।

এই সামটির নাম রথন্তর। এ কালে যাহাকে রাগ-রাগিণী বলে, সাম তাহারই তুল্য।

শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন আর-এক রকম মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নাম নিগদমন্ত্র বা প্রৈষমন্ত্র। ঋত্বিকেরা পরস্পর সম্বোধন-কালে বা পরস্পর অনুজ্ঞা আদেশ দিবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। বেদের ব্রাহ্মণাংশে এইরূপ প্রৈষমন্ত্র অনেকগুলি উল্লিখিত হইয়াছে যথা—"অগ্নয়ে মথ্যমানায় অনুব্রূহি" ইত্যাহ অধ্বর্য্যুঃ। অগ্নিমন্থনের সময় অধ্বর্য্যু হোতাকে অনুজ্ঞা দিবেন—মথ্যমান অগ্নির অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর—"অগ্নয়েমথ্যমানায় অনুব্রূহি" এই অনুজ্ঞাটি একটি প্রৈষমন্ত্র, অতএব ইহা যজুর্মন্ত্রেরই অন্তর্গত। সাধারণ যজুঃ হইতে ইহার প্রভেদ এই যে, সাধারণ যজুর্মন্ত্র প্রয়োগকালে উপাংশু (অনুচ্চে) উচ্চারণ করিতে হয়, আর প্রৈষমন্ত্রের উদ্দেশ্যই যখন আদেশ দেওয়া, তখন প্রৈষমন্ত্র উচ্চস্বরে বলিতে হয়। সাধারণ যজুর্মন্ত্র সকল সংহিতা মধ্যে নিবদ্ধ আছে, প্রৈষমন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণের মধ্যেই পাওয়া যায়। ফলে ঋক্ যজুঃ সাম, পদ্য গদ্য ও গান। এই তিন প্রকারের ভিন্ন চতুর্থ প্রকারের মন্ত্র হইতে পারে না।

এই ঋক্-যজু-সামময়ী বেদ-বিদ্যার নাম ত্রয়ী বিদ্যা। মন্ত্র ত্রিবিধ ভিন্ন চতুর্বিধ হইতে পারে না, কাযেই ত্রয়ী নামের সার্থকতা।

বৈদিক সমাজে এই ত্রিবিধ মন্ত্র যজ্ঞ-কর্ম্মে ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদী ঋত্বিকেরা ঋক্মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে প্রশংসা করিতেন, দেবতাকে আবাহন করিতেন; যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক যজুর্মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে হব্যদান করিতেন বা বিবিধ কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেন। সামগ ঋত্বিকেরা সামগান করিয়া দেবতার স্তুতি করিতেন।

এইসকল মন্ত্র ঋত্বিক-সমাজে মুখে মুখে প্রচারিত হইত। বেদশাস্ত্র লিখিত হইত না, সম্ভবতঃ লেখন-প্রণালী তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বেদ-মন্ত্র মুখে মুখেই রক্ষিত হইত। কালক্রমে ঐ সকলের একত্র সঙ্কলন আবশ্যক হইয়া উঠিল। একত্র সঙ্কলন না করিলে মন্ত্রগুলি লোপের আশঙ্কা ছিল। অনেক সময়ে অনেক বেদ লোপ পাইয়াছে, এইরূপ স্মৃতি আছে। প্রসিদ্ধি আছে—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই মন্ত্র সকল সঙ্কলন ও বিভাগ করিয়া সংহিতাকারে নিবদ্ধ করেন। পৌরাণিক মতে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন আপনার চারিজন শিষ্যকে ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ বিভাগ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন; তাঁহারা আপনাদের শিষ্যগণকে ঐ আপন আপন বেদ শিক্ষা দেন। কালে কালে ঐ সকল বেদ শিষ্যপরম্পরা-ক্রমে বহু শাখায় ও উপশাখায় বিভক্ত হইয়া যায়।

এই পুরাণ-কথার মূলে যে ঐতিহাসিক কিংবদন্তী আছে, তাহার কতটুকু প্রামাণিক তাহা নিরূপণের কোন উপায় নাই। বেদের অধ্যাপকগণ বহু দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেদ তাঁহারা মুখে মুখে রাখিতেন ও তাঁহাদের শিষ্যেরাও অধীত বেদ মুখে মুখেই প্রচারিত করিতেন। দেশভেদে ও কালভেদে এইরূপে বেদের নানা পাঠভেদ জন্মিয়া গিয়াছে। এই পাঠভেদে বিবিধ শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

পুরাণে এইরূপ পাঠভেদে উৎপন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে প্রচারিত বিবিধ শাখার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণাদিতে কিরূপে বেদের শাখাবেদ উৎপন্ন হইল তাহার সবিস্তর বিবরণ দেওয়া আছে। ঐসকল ইতিহাস কতদূর প্রামাণিক, তাহা বিতর্কের বিষয়। কূর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে, ঋগ্বেদের মোটের উপর ২১ শাখা, যজুর্ব্বেদের ১০০ শাখা, সামবেদের ১০০০ শাখা ও অথর্ব্ববেদের ৯ শাখা। বস্তুতঃ এতগুলি শাখা কোনও কালে ছিল কি না এখন প্রতিপন্ন করা কঠিন।

চরনব্যূহ নামক গ্রন্থে ঋগ্বেদের কেবল পাঁচটি শাখার নাম আছে—শাকল, বাস্কল, অশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন ও মাণ্ডুকায়ন। চরনব্যূহ (কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয়) যজুর্ব্বেদের ৮৬ শাখার উল্লেখ করিয়াছেন, সামবেদের ১২ শাখার ও অথর্ব্ব বেদের ৯ শাখার নাম দিয়াছেন। চরনব্যূহকারের সময়েই অনেক শাখা বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের যে এক কালে ২১ শাখা বর্ত্তমান ছিল, তাহা বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, শাকল্য (শাকল মুনির শত শিষ্যের মধ্যে পাঁচ জন—শিশির, বাস্কল, সাংখ্য, বাৎস্য ও অশ্বলায়ন)—ঋগ্বেদের শাখাভেদ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে শাকল শিষ্যদিগের নাম মুদ্গল, গোস্বলু (গালব), বাৎস্য, শালীয়, শিশির। বায়ুপুরাণে নাম মুদ্গাল, গোলক (গালক?), খালীয়, মাৎস্য, শৈশিরেয়। শাকল প্রতিহার নামক টীকাগ্রন্থে নাম মুদ্গাল, গেকুন (গোখুন?), বাৎস্য, শৈশির, শিশির (শারীর?)। বলা বাহুল্য লিপিকর-প্রমাদ বহু স্থানে নাম প্রভেদের কারণ।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪) ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সভাপতির অভিভাষণ

(বিহার-বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন)

সারা ভারতবর্ষটা এক ক'রে আঁকড়ে ধর্‌বার মত প্রশস্ত বক্ষঃস্থল আমার নেই, তাই আমার সমস্ত ভালবাসাটা চিরজীবন ধ'রে বাংলার নামে—বাঙালীর নামে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে রেখেছি।

বহুশত বর্ষের মুসলমান সংঘর্ষে বিহার ভাব ও ভাষায় বঙ্গদেশের সঙ্গে এখন যতটা বিভিন্ন হ'য়ে পড়েছে, একদিন যে ততটা ছিল তা মনে হয় না। অতীতের ভূগোলে একটা বিস্তীর্ণ প্রদেশ ছিল যার নাম গৌড়; মিথিলা ও বঙ্গদেশ সেই পঞ্চ-গৌড়েরই অন্তর্গত; সেই মিথিলাই—মগধ, ক্রমে বিহার; সুতরাং একদিন মৈথিলী ভাষাগত সুধাস্রোতই সুরধুনী তরঙ্গিণীর সহিত প্রবাহিত হ'য়ে আদি বঙ্গ-কবিগণের কাব্যকে অলঙ্কৃত ক'রেছিল।

জগতের প্রচলিত ভাষা সকলের মধ্যে বঙ্গভাষা তেজে, মাধুর্য্যে, অর্থবোধক সারল্যে ও সহজ সৌন্দর্য্যে কিছুতেই হীনশক্তিধারিণী মন্দমনোহারিণী নয়।

বঙ্কিমবাবুর দৈবী-শক্তির প্রভাব যে বাংলা ভাষাকে কেবলমাত্র সর্ব্বজনবরেণ্য ক'রে দিয়ে গেছে তা নয়, যে বাঙ্গালী এক সময়ে জমি ক্রয় করার পাট্টার দেড়শত কথার মধ্যে অন্ততঃ পঁচানব্বইটা জওজে, ওয়ালদে, খোস মেজাজে, বহাল তবিয়তে গোছের না থাকলে দলিলখানা আদালত-গ্রাহ্য ব'লে মনে ক'র্‌তেন না,—পরে আবার পিতা-পুত্রে পত্র-ব্যবহারে ইংরাজি ভাষা প্রয়োগ না ক'র্‌লে সভ্যতার ত্রুটি হয় মনে কর্‌তেন, তাঁদের বিশুদ্ধ বাংলা শিখ্‌তে লিখ্‌তে পড়্‌তে প্রবৃত্ত করে সেই বঙ্কিমের প্রভাবই।

বিকৃত পার্শী-মিশ্রিত অতি গ্রাম্য গদ্যের দিন গেছে; সংস্কৃতও এখন আর কচি ছেলে মনে ক'রে বাংলা ভাষাকে ধমকের চোটে "এইখানে ব'সে থাক্, খবরদার দাওয়াটুকু ছেড়ে উঠানে নামিস্‌নি" না ব'লে তার সঙ্গে একত্রে ব'সে আপনাদের সুখ-দুঃখের কথা কয়; কিন্তু সম্প্রতি ধীরে ধীরে এক নূতন উৎপাত—নূতন ভূতের উপদ্রব বাংলা-সাহিত্য-

সংসারের মধ্যে দেখা দিয়েছে। লেখক মাত্রেরই সাধ নিজের একটা মৌলিকত্ব—নিজের একটা বিশিষ্টতা প্রদর্শন করা ; তা ব'লে মা সরস্বতীর হাত-পা ভেঙে ঘাড় মুচ্‌ড়ে দেওয়া ত মৌলিকত্বও নও—বিশিষ্টতাও নয়, আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কলা প্রদর্শনও নয়।—"তখন ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল আমাদের গিরিবালা"—এ মন্দ নয়—মন্দ নয় কেন, বেশ। তবে "সন্ধ্যার প্রদীপ অন্ধকারের বুকখানা একটু নরুণ দিয়ে চিরে যখন-উঠানের এক পাশে দাঁড়ান বৌ'-ঠানের বাঁ-দিককার গালে আলোর ঈষৎ তপ্ত চুম্বন পৌঁছে দিলে, তখন নীহার-বালানাথের মনের ভেতর একটা যে চমকের বেহাগ বেজে উঠ্‌ল তা সে কোন মতেই ঠ্যাকাতে পার্‌লো না, কদলীকান্ত বন্ধুর মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে শব্দহীন ভাষায় নীরবে বোল্লো—তা'লে আমি যাব চ'লে কিন্তু এখান থেকে, ঐ দেখ -এখুনি আসছে এখানে ঝড়ের বেগে মনু ও টুনু দুলিয়ে এলো চুল।" সাহিত্য-জগতের এ সব বিক্রমাদিত্য যে গাঁজায় মশগুল। ওর সঙ্গে আবার দ্বিতীয় উৎপাত প্রত্যেক জেলার লোকের যেন একটা জিদ্ দাঁড়িয়েছে যে, জোর-জবরদস্তি যা ক'রে পারি নদীয়া-ইক্ কি যশোর-ইক্ কি ঢাকা-ইক্ ক্রিয়া কর্ম্মকর্ত্তাগুলোকে ধ'রে নিয়ম-ভঙ্গের পঙ্‌ক্তি-ভোজে বসিয়ে দি।

বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির কথা-প্রসঙ্গে অনেক বিজ্ঞ লোকই ব'লে থাকেন যে, উন্নতি ত ছাই পাঁশ, কেবল উপন্যাসের ছড়াছড়ি। যদি সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে দিয়ে আপনারা আপনাদের ঘর সাজাতে চান তবে শিশুপাঠ্য, বালক-বালিকা-পাঠ্য, কিশোর-কিশোরী-পাঠ্য উপন্যাস যথাসাধ্য চেষ্টায় রচনা করতে প্রবৃত্ত হোন। লজ্জার কথা নয় কি—এই সাহিত্য-সম্রাটের ছড়াছড়ির দিনে—নভেল কাবুলী বীরের আস্ফালনের যুগে Robinson Crusoe, Gulliver's Travels, Midshipman Easy, Peter Simple, Twenty Thousand Leagues under the Sea, A Trip to the Moon গোছের উপন্যাস লেখক এমন বাঙালী একজনও জন্মান-নি। এই রকম বই হ'লে ছেলে-মেয়েদের ডেকে আর জোর ক'রে পড়্‌তে বসাতে হবে না, আনন্দপ্রদ ব'লে তা'রা বই ছেড়ে সময়-সময় ভাত খেতেও যাবে না। অথচ কত নূতন বিষয় জান্‌বার জন্য তাদের মনে কৌতূহল জন্মাবে।

এই বিহারে ব'সে সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-কাব্যাদি রচনায় কত মনীষী যে বঙ্গমাতার পবিত্র অঙ্গ অলঙ্কৃত করেছেন বা করছেন, তার সঠিক তালিকা আমার জানা নেই। পাটনার কথা মনে হ'লে আমার স্মৃতিতে প্রথমে মূর্ত্তিমান হন স্বর্গগত বলদেব পালিত মহাশয়। বলদেব-বাবু সংস্কৃত ছন্দে বাংলা পদাবলী লেখার একটি চেষ্টা করেন। 'ললিত কবিতাবলী' ব'লে একটি পুস্তিকায় সেগুলি প্রকাশিত হয়।

বক্সারে ব'সেই ডাক্তার তারকনাথ গাঙ্গোপাধ্যায় বাংলাকে তাঁর "স্বর্ণলতা" দান ক'রে গেছেন।

স্বর্গীয় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের প্রতিভার কাছে, বঙ্গ, বিহার উভয় প্রদেশই ঋণী। কঠোর দর্শনশাস্ত্রকে অতি প্রিয়-দর্শন ক'রে তিনি সাহিত্য-মন্দিরের সুষমা বৃদ্ধি ক'রে রেখে গেছেন। পাটনা কলেজের একজন বাঙালী পণ্ডিত নবীনচন্দ্র শর্ম্মা "বারুণী-বিলাস" ব'লে একখানি নাটক রচনা ক'রেছিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় যদিও তাঁর অমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশই ইংরাজি ভাষায় লিখেছেন, কিন্তু প্রবন্ধ-পুষ্পহারে তিনি আজও বাংলার অনেক মাসিক-পত্রকে সুগন্ধে আমোদিত করছেন। তাঁর পূর্ব্বে বিহারে ব'সে ঐতিহাসিক-তত্ত্ব এত আলোচনা কেহই করেননি। তবে যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের নাম অবশ্য উল্লেখযোগ্য। ভাগলপুর থেকে হাত পাকিয়েই আমার পরম স্নেহের ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক হন। ইদানীং উপন্যাস প্রকাশে যাঁদের নাম প্রসিদ্ধিলাভ ক'রেছে তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিহার অঞ্চলেই অনেক দিন কাটিয়েছেন। উপন্যাসকারদের মধ্যে যাঁর নাম আজকাল বাংলার পাঠক-সমাজে অতি পরিচিত, সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই বিহার থেকেই লেখার বাহার ফলিয়ে তুলেছেন। আমার পরম স্নেহভাজন সুহৃদ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মিষ্ট গল্পগুলির কল্পনার সূতিকাগার গয়া।

আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চির-কল্যাণীয়া অনুরূপা দেবী নামটি কাঞ্চনোজ্জ্বল অক্ষয় অমর অক্ষরে লিখিত থাকবে।

আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি, বঙ্গভাষা অতি নিকট ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে সার্ব্বজনীন শিষ্ট ভাষা ব'লে আদৃত হবে। বাংলার ধুতি চাদরের সঙ্গে বাংলার সাহিত্যের প্রভাব সুদূর পাঞ্জাবের পঞ্জরের মধ্য পর্য্যন্ত সরলা দেবীর প্রতিভার বৈভব-বলে প্রবেশ লাভ করেছে।

(উত্তরা, চৈত্র ১৩৩৩) শ্রীঅমৃতলাল বসু

মেদিনীপুর সাহিত্য-সভা

অতীতকালের মেদিনীপুরের সাহিত্যের দাবী এই যে, কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম এই মেদিনীপুরেই চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। এই মেদিনী-পুরেই ঘনরাম তাঁর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। শিবায়ণের গ্রন্থকার কবি রামেশ্বরও মেদিনীপুরের অধিবাসী।

আধুনিক যুগে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম স্মরণ করলে হৃদয়-মন পবিত্র হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের যে উপকার করেছেন তাহা চিরস্মরণীয়। সাহিত্যিক নন্, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক রাজনারায়ণ বসু এখানে জন্মগ্রহণ না করলেও মেদিনীপুর বহু বৎসর তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল।

যে মানুষ অন্ন-চিন্তায় বা রোগের জ্বালায় বিব্রত থাকে তার দ্বারা সাহিত্য, ভাস্কর্য্য বা চিত্রের সৃষ্টি হয় না। আমাদের দেশের লোকের সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টি করবার মত উদ্বৃত্ত শক্তি আছে কিনা তাই দেখ্‌তে হবে। গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান ক'রে এবং রোগের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যে শক্তি উদ্বৃত্ত থাকে তার দ্বারাই আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করি।

যাঁরা সমাজ-বিজ্ঞানের (Sociology) চর্চ্চা ক'রে থাকেন তাঁরা জানেন যে, মানুষের উত্তরাধিকার দুই প্রকার—দৈহিক ও সামাজিক। সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে, কোন বংশে জন্মলাভ করেছি ব'লে আমরা যতটা দৈহিক দোষ-গুণ (Physical inhertiance) পাই, অজ্ঞাত অনুকরণ ও অনুসরণে (Social) তার চেয়ে বেশী দোষগুণ লাভ করি।

সঙ্গলাভের দোষগুণ অনেক ; দেশে জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তার করতে পারলে আমাদের বাড়ীর শিশুরা আরও বেশী পরিমাণ মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করবে। শিক্ষার বিস্তারে সাহিত্যের প্রসার বাড়ে, গভীরতা ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়।

আমাদের সাহিত্য শিক্ষিত ভদ্রলোকের দ্বারাই সৃষ্ট হয়। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোক মানব-জীবনের অনেক সংগ্রাম, দুঃখ, তাপের সহিত অপরিচিত। মুটে মজুর প্রভৃতির সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তাহারা নিজে যেমন জানে, শিক্ষিত ভদ্রলোক তেমন বোঝেন না। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা কল্পনায় অবশ্য অপরের সুখ-দুঃখ কতকটা বুঝ্‌তে পারেন, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা ও কল্পনায় জানার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।

ষারা সব রকম শ্রমের কা/ করে তারা জ্ঞানবান্ হ'লে সাহিত্যে নূতন রসের সৃষ্টি হ'ত—বাংলা সাহিত্য অনেক উৎকৃষ্ট হ'ত।

স্কটল্যাণ্ডের কবি বার্নস্ চাষীর ছেলে। সকলেই জানেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে লিখিত তাঁহার অনেক কবিতা কত সুন্দর ও আন্তরিকতাপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র এইরূপ ২১ জনের কথা ব'লে আমরা অহঙ্কার ক'রে থাকি। কিন্তু ঐরূপ গৌরবেও লজ্জা আছে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরও আধ্যাত্মিক ভাব বুঝ্‌বার ক্ষমতা আছে। সুতরাং আমরা শিক্ষা পেলে যে আরও কত উন্নত হ'তে পারতাম তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে গর্ব্ব কর্‌তে গিয়ে স্মরণ করা দরকার, শিক্ষা পেলে আরও হয়ত কেহ কেহ ঐরূপ হ'তে পারত।

একটা দেশের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম লোক বেশী হ'লে সাহিত্যের প্রসারও বেশী হয়। আমাদের দেশে কোন একখানা ভাল বহিরও এক সংস্করণ বিক্রী হ'তে কয়েক বছর লাগে।

জাপানের সম্রাট ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অনুশাসন প্রচার করেন যে, তাঁর রাজ্যে বিদ্যালয়হীন গ্রাম থাকবে না, বা অশিক্ষিত কোন লোক থাক্‌বে না। আজকাল সেখানকার শতকরা ৯৯ জন বালক-বালিকা স্কুলে যায়। সেখানে রিক্‌শওয়ালারাও খবরের কাগজ পড়ে। ইউরোপের অনেক দেশের চেয়ে জাপানে বইএর দোকানও নাকি বেশী। আসাহী নামে জাপানের একখানা দৈনিক খবরের কাগজ আছে। সেখানকার কাট্‌তি প্রতিদিন ২১ লক্ষ। আমাদের দেশের সমুদায় দৈনিক কাগজের বিক্রীও ২১ লক্ষ হ'বে না।

সম্প্রতি আমি ইউরোপ ভ্রমণ ক'রে এসেছি। আমাদের দেশে যে-সব বই ছাপা হয় তার মধ্যে বেশীর ভাগ স্কুল-পাঠ্য পুস্তক। প্রতি বছর জার্ম্মেনীতে যত বই ছাপা হয়, ভারতবর্ষে তত হয় না—অথচ জার্ম্মেনীর লোকসংখ্যা আমাদের দেশের লোক-সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র। জার্ম্মেনী ও চেকো-স্লোভেকিয়াতে জার্ম্মেন ও চেক ভাষা প্রচলিত। কিন্তু আমি ঐ দুই ভাষার কোনটিই জানি না। সে-সব দেশে রেলওয়ে ষ্টেশন দেখলাম, কোন কোন কুলীও একটু একটু ইংরেজী বোঝে। ফ্রান্স বা অন্য অন্য যায়গায় ভ্রমণকালে রেলে Seat Reserve করেছি। ইউরোপে বার্থ রিজার্ভ কর্‌তে হ'লে তার জন্য আলাদা টাকা দিতে হয়। এদেশে তা' নয়। ইউরোপে রেলে বস্‌বার জায়গাও রিজার্ভ করতে পারা যায়। দীর্ঘপথ ভ্রমণ করতে হ'লে আমি সীট রিজার্ভ করতাম। রেলের সব মজুরয়াই পড়্‌তে পারে। তারা সীটএর নম্বর দেখে, যাত্রীর জিনিষপত্র ঠিক জায়গায় রেখে দেয়। রবীন্দ্রনাথ জার্ম্মেনীর বার্লিন ও ড্রেস্‌ডেনের হোটেলে থেকে সে দেশে বক্তৃতা করেছিলেন। সেইসব হোটেলে Waiters, Porters ও Liftmen প্রভৃতিও জার্ম্মেন ভাষায় অনূদিত রবিবাবুর বই পড়েছে এবং সে-সব পুস্তকে তাঁর দস্তখত নিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করত। প্রতিদিন তাঁর টেবিলের উপর অনেক Visting Card, বই ও তাঁর ফটো জড় হ'য়ে থাক্‌ত। তিনি অবশ্য এই সব গুলিতেই নিজের নাম দস্তখত ক'রে দিতেন। আনন্দের বিষয় এই যে, সে-দেশের চাকর-চাকরানীরাও ভদ্রলোকদের মতই একজন বিদেশের কবির বই পড়ে এবং তাঁর নিজের হাতের স্বাক্ষর পাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। চেকো স্লোভেকিয়াতে ঠিক এই রকম ব্যাপার। জার্ম্মেনী ও চেকো-স্লোভেকিয়াতে সাহিত্য খুব প্রসার লাভ করেছে।

কোন জাতি মহৎ হ'লে তাদের সাহিত্যও মহৎ হয়। আবার সাহিত্য মহৎ হ'লে জাতিও মহৎ হয়। প্রতিভাশালী লোকের লেখায় জাতি বড় হয়। কোন্ যুগে আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত রচিত হয়েছিল, তার দ্বারা এখনও যে কত লোকের চরিত্র গঠিত হচ্ছে তার তুলনা নেই। কোন কোন ইউরোপীয়ান বলেছেন যে, তুলসী-দাসের রামায়ণ দ্বারা হিন্দীভাষী লোকদের চরিত্রের উপর যতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, বাইবেল ক্রিশ্চানদের উপর এত প্রভাব বিস্তার করে নাই। ব্যাস, বাল্মীকি ও তুলসীদাসের জন্ম ইহাই প্রমাণ করে যে, আমাদের জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল।

আমরা গর্ব্ব ক'রে থাকি যে, বাঙ্গলা সাহিত্য ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, ইংরেজী সাহিত্য বাঙ্গলা সাহিত্যের চেয়ে অনেক উন্নত। তবুও ইংরেজেরা অনেক পুস্তকের অনুবাদ ক'রে থাকেন। অসভ্য জাতির ছড়া গান প্রভৃতির অনুবাদ ক'রেও তাঁরা নিজেদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলেন। কিন্তু আমরা অনুবাদ করি না। অনুবাদের দ্বারা সাহিত্য পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে। আমরা গাছের ফল ফুল, পাতার তারিফ করি, কিন্তু মাটির রসের প্রশংসা করি না। রসই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যে ফল ফুল, পাতায় পরিণত হয় সে-কথা আমাদের মনে হয় না। সাঁওতাল, জুলু বা হটেণ্টটদের ছড়া বা গানে সাহিত্যিক বিশেষত্ব না থাকলেও তার রস রূপান্তরিত হ'য়ে বিশিষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টির সাহায্য করে।

ভারতবর্ষে হিন্দী-ভাষীর সংখ্যা ৮ কোটী এবং গুজরাটী ভাষা বলে ১ কোটী ৬৮ লক্ষ। কিন্তু তবুও হিন্দী সাহিত্যের চেয়ে গুজরাটী সাহিত্যের বৈচিত্র্য বেশী। পার্শী ও ভাটিয়ারা enterprising জাতি। এই কারণে হিন্দীর চেয়ে গুজরাটী সাহিত্য বেশী সমৃদ্ধ। কেহ কেহ "খাঁটি বাঙ্গলা সাহিত্য" সৃষ্টির পক্ষপাতী; তাঁরা আমাদের সাহিত্যের উপর বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব চান না। তাঁদের অভিলাষকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্য যে এখন বিদেশী প্রভাব বর্জ্জিত হ'তে পারে বা হওয়া উচিত, ইহা আমি শ্রদ্ধেয় বা সত্য ব'লে মনে করি না।

প্রত্যেক মানব মানবের বন্ধু। মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাবে জাতি-ভেদ নাই। তাই আমরা সকলে মিলে তা উপভোগ করতে পারি। যদি সে-রকম না হ'ত তবে আমরা সেক্সপীয়ারের সৃষ্ট সাহিত্য বুঝ্‌তাম না বা ইংরেজ বাল্মীকির রামায়ণ বুঝ্‌ত না। অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করলেই সাহিত্য বিজাতীয় ভাবের খিচুরী হ'বে, তাহা মনে করা ভুল।

বাঙ্গলা নাটক সংস্কৃত নাটকের ধারায় সৃষ্ট নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শে রচিত। বাঙ্গলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও উপন্যাস বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু তবু তা বাঙ্গালীর ঘরেরই জিনিষ।

পূর্ব্বেই বলেছি, মানসিক উদ্বৃত্ত শক্তি থেকে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বোধ হয় বাঙ্গলার জীবনী-শক্তি কমে যাচ্ছে। চেষ্টা করলে আমরা তা বাড়াতে পারি। ১৯২১ সালের Censusএ বাঙ্গলার লোক-সংখ্যা ১৯১১ সাল থেকে কমেছে ব'লে দেখা যায়। আমি যে-জেলার অধিবাসী সেই বাঁকুড়া জেলাতেই সব-চেয়ে বেশী কমেছে। নীচের তালিকা থেকে এ বিষয়টা স্পষ্ট বুঝা যাবে।

জেলার নাম	প্রতি হাজারে লোক-সংখ্যা কত কমেছে
বাঁকুড়া—	১০৪
বীরভূম—	৯৪
মুর্শিদাবাদ—	৮০
নদীয়া—	৬৫
মেদিনীপুর—	৫৫
পাবনা—	২৭
মালদহ—	১৮
যশোহর—	১২
হুগলী—	৯

কমেছে বেশী পশ্চিম বঙ্গে,—হিন্দুপ্রধান জেলায়। মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ববঙ্গে লোক-সংখ্যা বেড়েছে। মোটের উপর বাঙ্গলাদেশে লোকসংখ্যা অল্পই বেড়েছে। এর প্রতিকার যে কি তা অনেক স্থলে বলা হয়েছে; এখানে নূতন ক'রে আর কিছুই বলব না। এর প্রতিকার না হ'লে সাহিত্যের সৃষ্টিতে বাধা পড়বে। যে জাত ম'রে যেতে বসেছে তারা কি সৃষ্টি করবে? জীবনীশক্তি না বাড়লে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

বাঁকুড়া সহরে লোক বেড়েছে। কিন্তু জেলার লোক কমেছে। গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, চিকিৎসা হয় না। বাঙ্গলা দেশ গ্রাম-প্রধান। স্বদেশহিতৈষীর গ্রামের উপর নজর দিতে হবে। বাঙ্গলাকে বড় করা মানে গ্রামকে বড় করা। গ্রামের উন্নতি না হ'লে সাহিত্যের উন্নতি হবে না। সাহিত্যের উন্নতি করবার উপায়, গ্রামবাসীর সাহিত্যসৃষ্টির সুযোগ ক'রে দেওয়া।

কেবল শিক্ষিত বাবুর দ্বারা জাতির উন্নতি হবে না। আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যু খুব বেশী। মায়েরা স্বাস্থ্যতত্ত্ব না জানলে এই শিশু-মৃত্যুর নিবারণ হবে না। অন্যান্য বহু কারণের মধ্যে এইজন্যও নারী-জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার বেশী দরকার।

মিউনিসিপ্যালিটী স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কড়া আইন করতে পারে। কিন্তু অশিক্ষা নানা দোষের আকর। শিক্ষা না হ'লে কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যালিটীর কড়া আইনের দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে না।

মনুসংহিতার শাসন আমরা পালন করি না। মনুর ব্যবস্থা অনুসারে জলাশয়ে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা এবং অন্যান্য প্রকারে জলাশয় দূষিত করা নিষিদ্ধ; অথচ এই কাজটি বাঙ্গালীই বেশী করে।

শিশুদের শিক্ষা মায়েদের দ্বারাই বেশী হয়। জেসুইটদের মধ্যে একটা কথা আছে, শিশুদের ১০ বছর পর্য্যন্ত আমাদের স্কুলে দাও, তার পরে যেথানেই তারা যাক্ গ্রাহ্য করি না। প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছেই হয়। মানবজীবনের প্রভাতে শিক্ষার মূল্য বেশী। তাই মায়েদের দ্বারা শিক্ষার মূল্যও বেশী। সুতরাং মায়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে সে-শিক্ষার অন্তরায় অনেক। যেমন, (১) মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ; (২) মেয়েদের স্কুলের গাড়ীর খরচ বেশী। শিক্ষা রিপোর্টে দেখতে পাই, ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবারে মেয়েদের মধ্যে প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষাভিমানী বাঙ্গলা দেশের চেয়েও বেশী। গোওয়ালের ঠাকুর সাহেব (রাজা) নিয়ম করেছেন যে, তাঁর রাজ্যে বালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে—কিন্তু বালকদের নয়। এর কারণ তিনি বলেন, পরিবারের গৃহিণী শিক্ষিত হ'লে বালকবালিকারা অশিক্ষিত থাকবে না। কেবলমাত্র পরিবারের পুরুষ শিক্ষিত হ'লে শিশুরা অশিক্ষিত থাকতে পারে। স্ত্রী শিক্ষিত হ'লে লজ্জায় স্বামীও শিক্ষিত হবে। গোণ্ডালের রাজা হিন্দু।

আমাদের দেশে অনেক কাব্য, অনেক নাটক এবং বহুসংখ্যক অন্যান্য বহি অতীতকালে রচিত হয়েছে। তার সংখ্যা নেই। পিকিনের ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে ২৫,০০০ সংস্কৃত, পালি বা তাহা হইতে অনূদিত গ্রন্থ আছে। কোন বাঙ্গালী অধ্যাপক আমাকে বলেছেন, ২০,০০০ জৈন গ্রন্থ তাঁর জানা আছে। এই সব দৃষ্টান্ত হ'তে পুরাকালে আমাদের দেশের সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে শিক্ষাবিস্তার কিরূপ ছিল তা Census না থাকায় জানা যায় না। কোম্পানীর আমলে প্রথমে আমাদের নিজেদের ইউনিভার্সিটি বা কলেজ ছিল না, কিন্তু পাঠশালা ছিল। মিষ্টার এ্যাডামস্ কোম্পানীর আমলে দেশী যত পাঠশালা ছিল বলেন, এখন স্কুল ও কলেজ সমস্ত মিলেও তত নাই। শুধু লিখবার পড়বার ক্ষমতা তখন অনেক লোকের ছিল। সাহিত্যও তখন তাই প্রসার লাভ করেছিল। গোবিন্দ দাস জাতিতে কামার ছিলেন। তাঁহার কড়চা সকলের উপভোগের জিনিষ। সে-যুগে এম-এ, পি এইচ ডি, ডি, এস্-সি না থাক্‌লেও সাধারণ লেখাপড়া জানা লোক বেশী ছিল। বৈষ্ণবদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য-মঙ্গল বাঙ্গলা ভাষায় রচিত। তা পড়বার জন্য অনেকে লেখা-পড়া শিখতেন। নারীরাও লেখা-পড়া শিক্ষা করতেন। বৈষ্ণব স্ত্রীলোকরা আজকালকার ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীদের মত অন্তঃপুরে শিক্ষা বিস্তার করতেন।

এইটি সাহিত্য-সভা। এইজন্যে এই কথা ব'লে বক্তৃতা শেষ করি, যে, জাতির উদ্বৃত্ত শক্তি ও জীবনী-শক্তি বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক নৈতিক ও কৃষি শিল্প সম্বন্ধীয় যা কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তা করতে হবে। এইরূপে সকল দিক্ দিয়ে, উন্নতি করতে পারলে আমাদের সাহিত্যিক চেষ্টা সফল হবে।

(মাধবী, ফাল্গুন ১৩৩৩) শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামায়ণে সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ

কর্ম্মী ও আদর্শ জনগণের নিদ্রাভঙ্গ যে-সময় শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে রাজারাও নিদ্রা হইতে উত্থিত হইতেন। পাছে ঠিক সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ না হয়, এজন্য নিদ্রাভঙ্গ করিবার বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বৃত্তিধারী বন্দী (বন্দনাকারী) সূত, মাগধ, স্তুতিপাঠক-পাণি-বাদক ও গায়কগণ রাজভবনে সমাগত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজগুণাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকিত। ইহার উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপর্য্যুপরি দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে থাকিত।

রাজ-অন্তঃপুরে স্ত্রী ও নপুংসক পরিচারকগণের ব্যবস্থা ছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা স্নান-কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত তাহারা স্নানের জল আনয়ন করিয়া যথারীতি স্নানার্থীর স্নান-কার্য্যের সহায়তা করিত। বস্ত্র-রক্ষার ভারপ্রাপ্ত পরিচারক বা পরিচারিকা বস্ত্র লইয়া উপস্থিত থাকিত।

অগ্নিহোত্র সমাধান তখন কেবল রাজপুত্রদিগের নয়—প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই বোধ হয় মুক্তির কারণ বলিয়া বিশ্বাস ছিল।

জ্যেষ্ঠদিগকে প্রতিদিন প্রভাতে প্রণাম করিতে হইত। গুরুজনের সহিত যতবার সাক্ষাৎ হইত, ততবারই নিজ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে হইত।

গুরুব্যক্তি কোন বস্তু প্রদান করিলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাহা গ্রহণ করিয়া মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক দাতাকে প্রণিপাত করিবার বিধি ছিল।

গুরুজন স্নেহের পাত্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতেন।

প্রণামের নানাপ্রকার রীতিই প্রচলিত ছিল। গুরুজনকে ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম বিধি ছিল। সাধারণ জনগণ অসাধারণ জনকে মস্তক নত করিয়া মস্তকে হস্ত স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিত। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মানিত ব্যক্তি দুই হস্ত যুক্ত করিয়া তাহা মাথায় বদ্ধ রাখিয়া সম্মান দেখাইতেন; বিভীষণ এইরূপে বদ্ধাঞ্জলি মস্তকে আবদ্ধ রাখিয়া সীতাকে সম্মান অভিভবাদন জানাইয়াছিলেন। অনুচরেরা স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিত। হনুমান রামকে এরূপেও প্রণাম করিতেন। উচ্চ সভাসদ্ বা কর্ম্মচারিগণও দূরে বাহন রাখিয়া পদব্রজে রাজসভায় আসিয়া রাজার পাদ বন্দনা করিয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিতেন। অতিথি বিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া গণনীয় হইতেন।

করমর্দ্দন প্রথাটি বৈদেশিক প্রথা নহে। রাম সুগ্রীব এইরূপে করমর্দ্দন করিয়াই পরস্পর আত্মীয় করিয়া লইয়াছিলেন। দশরথও রামকে হস্ত ধরিয়াই গ্রহণ ও সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। শুধু রামায়ণে

নহে, বৈদিক সাহিত্যেও এই প্রথার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নকর্ত্তা আর্ত্তভাগকে বলিতেছেন—আমার হস্তে তোমার হস্ত অর্পণ কর, চল নির্জ্জনে যাই। এইরূপ ভাব হইতেই যে পরে করমর্দ্দন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোলাকুলি বা আলিঙ্গন প্রথাও সুপ্রাচীন।

রাজা রাজপুত্র অথবা তেমনই ব্যক্তিরা পুরতর কোন শ্রে প্রবেশে রাজপুরী হইতে শঙ্খ-দুন্দুভি ধ্বনিত হইত।

জন্মস্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান করিবার রীতিও সে কালের সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুনি ঋষিদিগকে অভ্যর্থনা করা ও কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার রীতি একটু পৃথক্ ছিল। রাজা ও ঋষি সাক্ষাৎ হইলে সে সঙ্গমে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ও রাজনীতি এই উভয় চর্চ্চাই হইত।

ঋষিরা রাজদর্শনে আশীর্ব্বাদ করিতেন, কিন্তু সাধারণ লোক রাজদর্শনে শ্রদ্ধার সহিত উপঢৌকন প্রদান করিত। কোথাও গমন কালে সম্মানিত ব্যক্তিকে অগ্রে করিয়া যাইবার রীতি ছিল। ভারতের নদী উত্তরণ কালে সর্ব্বাগ্রে গুরু পুরোহিত তারপর রাজকীয় মহিলাবর্গ, অতঃপর রাজ-মন্ত্রীদিগের পত্নীরা গমন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতে কিন্তু স্ত্রীর সম্মান সংসারের সকলের চেয়ে উপরে ছিল। স্ত্রী গৃহকর্ত্রী হইলেও সমাজের নৈতিক বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য স্ত্রীকে ধর্ম্মপ্রভাবে স্বামীর অধীন ও অনুবর্ত্তিনী থাকিবার ব্যবস্থা ছিল।

কুসংস্কার সকল সমাজেই অল্প-বিস্তর আছে।

এখন স্ত্রীলোকেরা বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিয়া রোদন করিয়া থাকেন। কিন্তু রামায়ণের যুগে উদরে করাঘাত করিয়া রোদনের রীতি ছিল। সূর্পণখা উদরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিয়াছিল। সীতা এক স্থলে বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়াও রোদন করিয়াছেন।

শপথ করিবারও এইরূপ নানা কুসংস্কারজনক বিধান ছিল। বালী সুগ্রীবকে পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করাইয়াছিলেন। হনুমান মলয়, মন্দর, বিন্ধ্য, সুমেরু, দর্দ্দুর পর্ব্বতের নাম ও ফলমূলের উল্লেখ করিয়া শপথ করিয়াছিল। কৈকেয়ীও ভরতের নামে শপথ করিয়াছিলেন।

অপবিত্র অবস্থায় শয়ন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হইত।

আমরা বিপদে আশ্রয়স্থলে তুচ্ছ তৃণখণ্ডের উল্লেখ করি। রাবণ যখন নিঃসহায়া সীতার সম্মুখে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তখন জানকী রাবণ ও তাঁহার নিজের দূরত্বের মধ্যে একখণ্ড তৃণ রাখিয়া নির্ভয়ে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন।

যাত্রাকালে দক্ষিণ পদ অগ্রে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার রীতি আছে, কিন্তু গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে যে বাম পদ অগ্রে স্পর্শ করাইতে হয় তাহার রীতি এখন নাই। হনুমান প্রথম বামপদ অর্পণ করিয়া লঙ্কাপর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ সংস্কারের যুক্তি—পণ্ডিতেরা বলেন, শত্রুপুরীতে বাম পদ অর্পণই শত্রু-জয়ের নিদান।

লৌকিক আমোদ-প্রমোদ বা নীতি-বিরুদ্ধ কোন খেলা-ধূলার কথা রামায়ণে এক রকম নাই, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পুরাণ কীর্ত্তন ও গীত-নাটক ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের আভাস রামায়ণে পাওয়া যায়।

বঁড়শি দ্বারা মৎস্য শিকার একটি সুপ্রাচীন রীতি। রামায়ণে এই প্রথার চিত্র না থাকিলেও রূপক-ছলে এক স্থানে তাহার উল্লেখ আছে।

রামায়ণে প্রায় কোন স্থলেই রাজ-অন্তঃপুরের মহিলাগণ যে রন্ধন করিতেন তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই না। কিন্তু মহিলাগণ যে একেবারেই রন্ধন-কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না তাহা নহে। সীতা বনে যে নিজ হস্তে রন্ধন করিতেন রামায়ণের এক স্থলে তাহার আভাস আছে।

(সৌরভ, ফাল্গুন ১৩৩৩)　　৺কেদারনাথ মজুমদার

সভ্যতায় বর্ব্বরতার বীজ

গাধা ও ঘোড়া একই পরিবারের, কারণ এদের পরস্পর মিশ্রণ (inter-breed) সম্ভব। গাধার পরিবর্ত্তন একটুও হয় নাই। এরা অতি প্রাচীন কালেও যা ছিল এখনও ঠিক তাই আছে।

আগে গাধার খুব কদর ছিল; যেখানে চাকা চল্‌ত না সেখানেই গাধা বাহকের কাজ করত। ভারতবর্ষে এখনও মহিষের খুব কদর। এরা মাল টানে ও দুধ দেয়, কিন্তু জগতের অন্যান্য স্থানে এদের আর চল্ নেই।

গাধার ও ঘোড়ার মিলে খচ্চর হয়েছে। গাধার মত তার সহ্যগুণ ও অবিচল পদক্ষেপ এবং ঘোড়ার মত তার আকার, গতি ও সামর্থ্য। স্পেন, যুক্ত-রাজ্য, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে এদের চল্ খুব বেশী।

আমেরিকায় এক জাতীয় বুনো মোষ ছিল, তাদের বলত বিষণ (Bison)। এরা মেইন নদীর ধার থেকে রকী পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করত। এরা এখন প্রায় নাশ হ'য়ে গেছে। ভারতে বুনো মোষও অনেক। আফ্রিকার মোষ এখনও পোষ মানেনি। এরা যেমন প্রকাণ্ড তেমনি বলবান ও নির্ভীক।

আমেরিকার বিষণরা শ্যামল ক্ষেত্র ভালবাসে, ইউরোপের বিষণরা ভালবাসে জঙ্গল; কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়ার বিষণরা ভালবাসে জলাভূমি। দেখা যায়, ষাঁড়েরা এখনও তাদের পূর্ব্বাভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি। পোষ মানালেও এখনও তারা জঙ্গল জলা-ভূমি ভালবাসে।

আগে ষাঁড় সাধারণতঃ ভারবাহী (draft) রূপে ব্যবহৃত হ'ত। এখন কিন্তু গরু ও ষাঁড় মানুষ পোষে তাদের দুগ্ধ ও মাংসের জন্যে। ভারতবর্ষে কিন্তু ষাঁড় এখনও ভারবাহী। গো-জাতির আর একটি বিশেষ শ্রেণী মুলি (Mulley)। এদের সিং নেই। মানুষ এদের কৃত্রিম নির্ব্বাচনের দ্বারা (Artificial selection) তৈরী করেছে।

ছাগল ভেড়া হচ্ছে পার্ব্বত্য জানোয়ার। সব মহাদেশের দুরধিগম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে এরা বাস করে। ভালুক ও নেকড়েরা এদের তাড়িয়ে সমতল ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে। এদের পূর্ব্বপুরুষেরা এশিয়ায় বাস করত। আমেরিকায় এদের নিয়ে আসা হয়েছে। এশিয়া হচ্ছে মানবের বাল্য ক্রীড়াভূমি ও সভ্যতার আদি স্থান। একটা সময় ছিল যখন মানুষের পশুপালনই একমাত্র ব্যবসায় ছিল। ছাগল ভেড়ার যে বহুবিধ উন্নত অবস্থা আমরা দেখ্‌তে পাই তা মাত্র আজ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মানুষ তৈরী করেছে। মানুষ এদের কোনও বুদ্ধির কাজে লাগায়নি। দুধ ও পশমের জন্যে এদের এত আদর। অনুশীলনের দ্বারা মানুষ মেটা এদের খুব বাড়িয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি একটুও বাড়াতে পারেনি।

পোষা শুয়ার, ইউরোপ এশিয়া-মাইনর এবং আফ্রিকার যে বুনো শুয়ার দেখতে পাওয়া যায় তাদেরই বংশধর। পোষা হ'লেও খুব শীঘ্র এরা ফের বুনো হ'য়ে যায়। সাধারণতঃ আমরা যাকে বুনো শুয়ার বলি, তারা গ্রাম্য—পালিয়ে গিয়ে বুনো হ'য়ে গ্যাছে। এরা ছোট ছোট দল বেঁধে থাকে, এবং পরস্পরের প্রতি এদের খুব সহানুভূতি। কিন্তু খাবার সময় এরা ভয়ানক স্বার্থপর।

বন্য হরিণ শীতল প্রদেশে বাস করে। ইউরোপ, এশিয়া এবং আমেরিকার উত্তর মেরু অঞ্চলে এদের বাস। আমেরিকার বন্য হরিণ

একটু পৃথক জাতীয়। সেদেশে এদের কারিবাউ (Caribou) বলে। সাইবেরিয়া এবং ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এদের দুধ মাংসও খায় এবং এদের ভারবাহিরূপে ব্যবহার করে।

মরু-সমুদ্রের জাহাজ হচ্ছে উট। এরা বাস করে উত্তর-আফ্রিকা, মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ায়। বন্য অবস্থায় এদের এখন পাওয়া যায় না।

আরবী উটের একটা কুঁজ এবং ব্যাক্‌ট্রিয়ার উটের দুটো ক'রে কুঁজ থাকে। প্রথমোক্তদের বাস আরব এবং উত্তর-আফ্রিকায় এবং দ্বিতীয় জাতির বাস কৃষ্ণসাগরের উপকূল থেকে সাইবেরিয়া, তিব্বত চীন পর্য্যন্ত। কোনও উট চড়বার উপযোগী, কোনও উট মরুভূমির, কোন উট বরফান দেশের, কোন উট পার্ব্বত্য প্রদেশের উপযোগী।

উটের মেরুদণ্ড ঘোড়া এবং গরুর মত সোজা। উঁচু কুঁজ দুটো হচ্ছে চর্ব্বি দিয়ে তৈরী। উটের ধৈর্য্য অতি অদ্ভুত।

অনাদি কাল থেকে এরা একই রকমের আছে। এরা রাগ্‌লে গায়ে থুতু দেয়। বোঝা তোলার সময় হাঁটু গেড়ে বসে। বোঝা বেশী ভারি হ'লে চীৎকার ক'রে, আর উঠ্‌তে চায় না। দক্ষিণ আমেরিকাতে লামা ব'লে এক রকমের উট আছে। এবং পেরুতে এর আর এক রকমের জাত আছে তাদের বলে আলপাকা।

হাতী দু রকমের—ভারতবর্ষের (Elephas Indicus) এবং আফ্রিকার (Elephas Africanus)। আফ্রিকার হাতী কার্থেজিয়ানরা ছাড়া আর কেহ পোষ মানায়নি। এদের কান মস্ত মস্ত, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দাঁত আছে, কপাল নিচু (convex) এবং স্বভাব অতি ভয়াবহ।

কত কালের লালন-পালনের ফল একটা—কুকুর। কিন্তু একটা হাতীকে জঙ্গল থেকে ধ'রে এনে কয়েক মাসের মধ্যে তাকে গ্রামের উপযোগী করা যায়।

এক অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া সব মহাদেশে হাতী ছিল। এখন ইউরোপে হাতী না থাকলেও ম্যামথ (Mammoth) এবং উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকায় ম্যাসটোডন (Mastodon) হাতীর হাড়গোড় পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ববিদেরা (Geologists) বলেন, পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পর থেকেই তারা অন্তর্দ্ধান হয়েছে। যতদূর ইতিহাসের দৃষ্টি চলে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সর্ব্বপ্রথম হাতী ইওসিন যুগে (Eocene) ইজিপ্টে বাস করতো। তখন এর চেহারা ছিল একটা ছোট ঘোড়ার মত, দাঁত—ছোট বুনো শূয়ারের মত, কিন্তু শুঁড় খুব দীর্ঘ ছিল।

(উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪) বাসুদেবানন্দ

"প্রাচীন ভারতে রাজ-কোষবিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা"*

(Administration of Finance in Ancient India)

শ্রী রাধাগোবিন্দ বসাক

কোষ—সপ্তাঙ্গ রাজ্যের এক অঙ্গ বা "প্রকৃতি"

প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজনীতিশাস্ত্রকারগণ রাজ্যকে সপ্তাঙ্গ বা সপ্ত-প্রকৃতিক বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। রাজ্যের সেই সাতটি অঙ্গ বা প্রকৃতির নাম—(১) স্বামী, (২) অমাত্য, (৩) জনপদ বা রাষ্ট্র (৪) দুর্গ, (৫) কোষ, (৬) দণ্ড বা বল ও (৭) মিত্র বা সুহৃৎ। এই প্রত্যেকটি সুস্থ বা অবিকল না থাকিলে রাজ্যের কল্যাণ নাই। শুক্রাচার্য্য এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যকে মানুষী-তনুর প্রতিকৃতিরূপে কল্পনা করিয়া স্বামী বা রাজাকে এই রাজ্যদেহের মস্তকরূপে, অমাত্যবর্গকে নেত্ররূপে, মিত্র বা সুহৃৎকে কর্ণরূপে, কোষকে মুখরূপে, দণ্ড বা বলকে মনোরূপে, দুর্গকে হস্তরূপে ও রাষ্ট্র বা জনপদকে ইহার পাদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মুখদ্বারা আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিয়া মানুষ শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। রাজ্যের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যও কোষরূপ মুখের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। ইংরেজীতে আমরা রাজার যে শক্তিকে "Majesty" বলি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই প্রতাপ বা প্রভাব নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"স প্রতাপঃ প্রভাবশ্চ যত্তেজঃ কোষদণ্ডজম্"—রাজার কোষ ও দণ্ড হইতে সমুত্থিত যে তেজঃ, তাহাই তাহার প্রতাপ বা প্রভাব। কোষ ও সৈন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুব্যবস্থিত রাখিতে পারিলেই রাজার "Majesty" বা প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। আজ আমরা এখানে কেবল কোষ-সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

* ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের নিমন্ত্রণে, ঢাকা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে Public Lectureরূপে বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে পঠিত প্রবন্ধ।

প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়

বর্ত্তমান সময়ে ভারত-সরকারের সহিত প্রাদেশিক-সরকার সমূহের রাজস্ব লইয়া যেরূপ সম্পর্ক ও সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে বা থাকা উচিত—আমরা এই প্রবন্ধে প্রাচীন উত্তরাপথের বা দক্ষিণাপথের কোন বৃহৎ সাম্রাজ্যের সহিত তদধীন খণ্ড খণ্ড সামন্ত রাজমণ্ডলের সেরূপ কোন সম্পর্ক বা সম্বন্ধ ছিল কি না তাহার কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। প্রাচীন ভারতে যে কোন রাজতন্ত্র-প্রদেশের ভিতর কিরূপভাবে রাজস্ব-বিভাগ পরিচালিত হইত, এখানে তাহাই যথাসাধ্য বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে যে যে বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান—(১) নানাবিধ রাজস্ব, ভাগধেয়, কর, বলি ও শুল্কের উৎপত্তি-কাহিনী ও তাহার তত্ত্বকথা; (২) কোন কোন বিষয়ে করাদি আদেয় ছিল ও তাহার হার; (৩) করসংগ্রহকারী ও তদ্‌বিনিয়োগকারী রাজ-পুরুষগণের ক্রিয়াকলাপ; (৪) আপদ্ সময়ে নূতন করাদি প্রবর্ত্তনের বিধি; (৫) সরকারী আয়ব্যয়ের তালিকা ও তাহার হিসাবরক্ষকগণের করণীয় ব্যবস্থা; ও (৬) রাজ্যের আয়ব্যয়ের দায়িত্ব-ভার। এই বিষয়গুলি ছাড়া আরও প্রসঙ্গ-প্রাপ্ত অন্যান্য কথার যথা-সম্ভব উল্লেখ করা গিয়াছে।

কোনও এক প্রসঙ্গে [১।১৩ অধ্যায়] নীতিবিশারদ্ মহামতি কৌটিল্য রাজার প্রথম উৎপত্তি ও প্রজার সহিত তাঁহার কিরূপ সংবিৎবাপন (রফা) থাকিবে তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মাৎস্যন্যায়াভিভূতাঃ প্রজা মনুং বৈবস্বতং রাজানং চক্রিরে। ধান্যষড়্‌ভাগং পণ্যদশভাগং হিরণ্যং চাস্য ভাগধেয়ং প্রকল্পয়ামাসুঃ। তেন ভৃতা রাজানঃ প্রজানাং যোগ ক্ষেমবহাঃ। তেষাং কিল্বিষং দণ্ডকরা হরন্তি যোগক্ষেমবহাশ্চ প্রজানাম্। তস্মাদুঞ্ছষড়্‌ভাগমারণ্যকা অপি নিবপন্তি—তস্যৈতদ্ ভাগধেয়ং যোঽস্মান্ গোপায়তীতি"।

প্রথম কর-সৃষ্টির কল্পনা

এই উদ্ধৃত সন্দর্ভে ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে রাজা ও প্রজার মধ্যে রক্ষণমূল্য ভাগধেয় বা কর লইয়া যেপ্রকার এক চুক্তিনামা চলিয়া আসিতেছে তাহার পরিষ্কার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকের এই পণ্ডিত যখন এত স্পষ্টভাবে এই চুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—তখন তদপেক্ষা প্রাচীনতর সময় হইতেই রাজনীতিশাস্ত্রের এই মত-বাদ যে চলিয়া আসিতেছিল এইরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান সময়েও আমরা রাজার বা সরকারী শাসন-প্রণালীর কোন দোষ বা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের কার্য্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়া থাকি—"প্রজারা নানাপ্রকার কর-শুল্কাদি দিয়া থাকে, সুতরাং রাজা প্রজা হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিনিময়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন না কেন? রাজা ত প্রজার ভৃতিতে ভৃত-অতএব তিনি প্রজার সেবক বা ভৃত্য। এখন দেখা যাউক কৌটিল্যের বাক্যের অর্থ কি। তিনি লিখিতেছেন—প্রজাগণ মাৎস্যন্যায়ে বা অরাজকতায় ক্লেশ-ভোগ করিয়া বৈবস্বত মনুকে সর্ব্বপ্রথম রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থা করিলেন যে, তদীয় রক্ষা-কার্য্যের বেতন জন্য তিনি প্রজা কর্ত্তৃক উৎপন্ন ধান্যের ষষ্ঠ অংশ ও পণ্যের (বিক্রেয় দ্রব্যাদির) দশম অংশ ও অন্যান্য কারণে রাজপ্রাপ্য তৎ-তৎ-প্রদেশ-প্রসিদ্ধ হিরণ্য (নগদ মুদ্রা) ভাগধেয়রূপে প্রজার নিকট হইতে পাইবেন। এই ভাগধেয়-রূপ ভৃতি গ্রহণ করিয়া তিনি প্রজাগণের যোগ ও ক্ষেম সাধন করিতে পারিবেন। ["অলভ্যলাভো যোগঃ স্যাৎ ক্ষেমো লব্ধস্য পালনম্" ইতি যাদবঃ।] রাজার আদেয় দণ্ড (অর্থদণ্ড লব্ধ ধন) ও কর রাজ্যের কিল্বিষ (চৌর্য্যাদিজনিত নানারূপ পাপ) দূর করিতে ও প্রজার যোগ-ক্ষেম-সাধক হইতে পারে। এই নিমিত্ত আরণ্যক ঋষিগণও তাঁহাদের উঞ্ছবৃত্তি লব্ধ ধান্যাদির ষষ্ঠ ভাগ রাজাকে প্রদান করিতেন এবং ভাবিতেন—"এই ভাগধেয় তাঁহারই লভ্য—যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন"। রাজা করদায়ীকে রক্ষা করেন তাই গৌতমও ধর্ম্মসূত্রে রাজাকে "তদ্রক্ষণ-ধর্ম্মী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রজার রক্ষা বিধানের মূল্যরূপেই রাজা রাজস্ব বা কর পাইয়া থাকেন। তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য হইল প্রজার রক্ষাকার্য্য এবং উহার মূল্য স্বরূপ হইল প্রজা-প্রদত্ত করে বা ভাগধেয়ে তাঁহার অধিকার। কিন্তু তাহাতে অধিকারী বলিয়া তিনি প্রজার দুঃখ-দৈন্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উৎপীড়ন সহকারে যথেচ্ছভাবে মূলোচ্ছেদনপূর্ব্বক যদি

নিজপ্রাপ্য আদায় করিয়া লয়েন, তাহা হইলে সে রাজাকে নিজ কর্ত্তব্যবিমুখ, সুতরাং অপ্রশংসার পাত্র, বলিয়া মনে করা হইত।

করতত্ত্ব

প্রাচীন ভারতে রাজার প্রধান লক্ষ্য থাকিত—স্বরাজ্যের প্রজা-সমূহ "দণ্ড-করসহ" কি নয়, অর্থাৎ রাজবিধেয় দণ্ড ও করের মাত্রা তাহারা সহ্য করিতে পারিবে কি না। এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াই দণ্ড-করাদির প্রণয়নও সংগ্রহ করা হইত। মহাভারতের একস্থানে কোষোৎপাদনে রাজার উৎপীড়ন ক্ষমাই বলিয়া উল্লিখিত হইলেও—

"নাত্মান পীড়য়িত্বেহ কোশঃ শক্যঃ কুতোবলম্।
তদর্থং পীড়য়িত্বা চদোষং প্রাপ্তুং ন সোঽর্হতি॥" ১৩০।৩৩

তাঁহাকে কখনই অত্যুৎপীড়ক হইতে হইবে না এইরূপ শতশত উপদেশও মহাভারতের অন্যত্র ও নীতিশাস্ত্রে ও স্মৃতি প্রভৃতিতে উল্লিখিত পাওয়া যায়। "তুমি মালাকার পুষ্পোদ্যানে যাইয়া পুষ্প তুলিয়া আনিলেই তোমার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, পুষ্পবৃক্ষটি উন্মূলিত করিবার অধিকার তোমার নাই। গোপালকে বৎসপানোপযোগী দুগ্ধ রাখিয়া দোহন করিতে হইবে। মধুকর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তোমাকে অল্পাল্প কর সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত রাখিয়া প্রজার হিতকর কার্য্যে ব্রতী থাকিতে হইবে। অন্যথা প্রজার বিরাগে তোমার রাজ্যনাশ ধ্রুব, তোমার সিংহাসনচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী"—এইপ্রকারেই প্রাচীন শাস্ত্রকরগণ রাজস্ব-সংগ্রহ সম্বন্ধে রাজাকে সর্ব্বদা অপ্রমাদী থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রথম প্রথম কল্পিত কর প্রজাকে সহ্য করাইতে পারিলে তিনি ক্রমশঃ করবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ব্যাঘ্রী নিজ অপত্যজাতকে তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা দংশন করিয়া বহন করিয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু অপত্য-স্নেহবশতঃ সেই তীক্ষ্ণদংশনেও এমন একটা মৃদুতা থাকে যে, অপত্য তজ্জন্য কোন বেদনা ভোগ করে না। জলোকা মানুষের রক্ত পান করে বটে, কিন্তু মানুষকে তাহা বুঝিতে দেয় না। মূষিকও অনেক সময় নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থিত মাংস কাটিয়া লইয়া যায়, কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তি তাহাতে জাগ্রতও হয় না। এইভাবেই নরপতি প্রজাবর্গকে নিজ প্রজা বা সন্ততিরূপে মনে করিয়া মৃদু উপায়ে করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া কর-সংগ্রহকারী রাজকর্ম্মকরদিগকে উপদেশ দিয়া দিতেন। তাই মহাভারতকার পুনরায় একস্থানে লিখিয়াছেন—

"অল্পেনাল্পেন দেয়েন বর্দ্ধমানং প্রদাপয়েৎ।
ততো ভূয়স্ততো ভূয়ঃ ক্রমবৃদ্ধিং সমাচরেৎ॥" ৮৮।৭

প্রথমতঃ অল্প অল্প করিয়া প্রদান করিলে পর যখন প্রজা সমৃদ্ধতর হইবে, তখন বর্দ্ধিত হারে তাহার নিকট হইতে রাজা আদায়ের উপায় করিয়া লইবেন। 'তারপর আরও একটু অধিক তারপর আরও একটু অধিক' এইরূপে ক্রম-বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন। আপদ্‌কাল ব্যতীত অন্য কোনও সময়ে রাজা কখনও অশাস্ত্রীয় কর লইতে পারিতেন না। সর্ব্বপ্রকার করাদি ও তাহার হার নিয়মিত ছিল। তাহার ব্যতিক্রম রাজা করিতে পারিতেন না। কর-প্রণয়নে ও তৎসংগ্রহে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা খাটিত না। শাসন-প্রণালীর সৌকর্য্যার্থ প্রজাগণও ধর্ম্মবিহিত করাদি প্রদান করিতে বাধ্য হইত।

বর্ত্তমান সময়ে ভারত-সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আয়ের পথ ভূমি-কর (Land-revenue) এবং তাহা নগদ টাকায় সংগৃহীত হয়। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে অধুনাতন ভূমিকরের মত কোনও কর প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ভূ-স্বামিত্ব কাহার? রাজার না, প্রজার? এই সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নের বিচার এই প্রবন্ধে চলিতে পারে না, কারণ ইহার সমাধানে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রাচান কালের যে, সমস্ত ভূমি-বিক্রয় সম্পর্কীয় বা ভূমি-দান বিষয়ক তাম্র-শাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম নিপুণভাবে গ্রহণ করিলে এই উপলব্ধি হয় যে, বোধ করি, তখনকার দিনে প্রজারাই ভূমির প্রথম স্বত্বাধিকারী বলিয়া গণ্য হইত। পরে, ক্রমশঃ রাজাকে ভূমিপতি বলা হইতে থাকে। ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষি-প্রধান দেশ, তাই কৃষ্ট ভূমির প্রধান উৎপাদ্য যে ধান্যাদি তাহার ভাগ দেওয়াই সর্ব্বপ্রথম প্রধান কর বা বলি ছিল এবং কৃষ্টভূমির

অতিভোগ, মধ্যম ভোগ ও অল্প ভোগ অনুসরণ করিয়া এই ভাগধেয় হার দশমভাগ, অষ্টমভাগ বা ষষ্ঠভাগরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহা কিন্তু অতি প্রাচীন সময়ের কথা—কিন্তু পরে সাধারণতঃ ধান্যাদির ষড্‌ভাগই বলিরূপে ধার্য্য হইয়া গৃহীত হইত। প্রথম কোনও পতিত ভূমিখণ্ডে জনপদ নিবেশকালে রাজাকে দেখিতে হইত যে, প্রত্যেক নূতন গ্রামে ১০০ হইতে ৫০০ কুল বা গৃহস্থের বাস থাকে এবং গ্রামটি শূদ্র-জাতীয় কর্ষকবহুল হয়। এইপ্রকার ১০টি, ২০০টি, ৪০০টি ও ৮০০টি গ্রাম-সমষ্টির যথাক্রমে নাম ছিল "সংগ্রহণ," "কার্বটীক" (cf. Thana Town), "দ্রোণমুখ" (cf. S. D. Town) ও "স্থানীয়" (cf. D. T. Town)। এইসমস্ত স্থানে রাজা ঋত্বিক্, আচার্য্য, রাজা পুরোহিত ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে "ব্রহ্মদেয়" সংজ্ঞক ক্ষেত্রভূমি দণ্ড-কর রহিত করিয়া দান করিতেন। রাজকীয় বিভিন্ন শাসন-বিভাগের অধ্যক্ষগণ, সংখ্যায়ক প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ, "গোপ" নামক দশ-গ্রামাধিপতি ও "স্থানিক" নামক নগর চতুর্ভাগাধিকারী ও অন্যান্য বড় বড় কয়েকজন রাজভৃত্যও বিক্রয় ও আধানের অধিকার বর্জ্জনে বিনাকরে এইরূপ ক্ষেত্রাদি ভোগজন্য পাইয়া থাকিতেন। কৃষকগণের মধ্যে যাহারা শাস্ত্রবিহিত রাজদেয় ভাগাদি কররূপে দিতে স্বীকৃত থাকিত তাহারাই "কৃত-ক্ষেত্র" (কর্ষণ-বপন-যোগ্য) পাইত এবং যাহারা "অকৃত" (সাধ্য সৌষ্ঠব) ক্ষেত্র কর্ষণ-যোগ্য করার চেষ্টা করিত, তাহাদিগের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লওয়া হইত না বরং সে-ক্ষেত্রকে হল-প্রয়োগের উপযোগী না করিতে পারিলে তাহারা ক্ষতিপূরণ জন্য রাজাকে কিছু দিত। এমনকি, সেই অবস্থায় অনেক সময় রাজা তাহাদিগকে ধান্য, পশু ও হিরণ্য (নগদ টাকা) দিয়াও অনুগ্রহ করিতেন। কিন্তু এইরূপ পরিহার (exemption) ও অনুগ্রহ করিতে যাইয়া রাজাকে লক্ষ্য রাখিতে হইত যেন তদ্দ্বারা রাজ্যের কোষ-ক্ষয় না ঘটে।

শুল্কবিধি ও তাহার হার

ঠিক বর্ত্তমান কালের প্রথাতে প্রজার স্বোপার্জ্জিত আয়ের উপর যেভাবে যত হারে কর নির্দ্দিষ্ট হইতেছে প্রাচীন সময়ে তদ্রূপ আয়কর বিহিত না থাকিলেও প্রায় প্রত্যেক প্রজাকেই কোনও না কোন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কর দিতে হইতই। কি পশুরক্ষক, কি হিরণ্যের বৃদ্ধি-প্রযোক্তা (সুদখোর), কি পণ্যব্যবহারী বণিক্, কি ফলমূলাদি বিক্রেতা সকলকেই নিয়মিত হারে নানা প্রকার শুল্কাদি দিতে হইত। নিষ্ক্রাম্য (exported) ও প্রবেশ্য (inported) উভয়বিধ পণ্যজাতের উপরই শুল্কের ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন ভারতে কোন পণ্যই ইহার জাতি-ভূমিতে অর্থাৎ উৎপত্তিস্থানে বিক্রীত হইতে পারিত না। এই বিধি একটু কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা মধ্যবর্ত্তী ক্রেতৃগণের হস্ত-পরিবর্ত্তন হইতে পণ্যের রক্ষা সাধন করিয়া তাহার মূল্য সহনোপযোগী করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত। পরদেশজাত পণ্য রাজার নিজ জনপদে বা নিজের জনপদ-জাতপণ্য স্বরাজ্যস্থিত দুর্গে, নগরে ও নিগমে প্রবেশ্য হইলে তৎ-তৎ-পণ্যের যাহা মূল্য তাহার পঞ্চভাগ রাজাদেয় শুল্ক—ইহাই সামান্যবিধি। কিন্তু পুষ্প, ফল, শাক, শুষ্ক মৎস্য ও মাংসাদির শুল্ক ষষ্ঠভাগ; ক্ষৌম, দুকূলাদী সূক্ষ্ম বস্ত্র, লৌহময় ও ধাতুজ দ্রব্যাদি, চন্দনাদি, সুরা, গজদন্তনির্ম্মিত ও চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদির শুল্ক দশভাগ বা পঞ্চভাগ; এবং অন্যান্য বস্ত্র, চতুষ্পদ ও দ্বিপাদাদি জন্তু, সূত্র, কার্পাস, গন্ধদ্রব্য, ভৈষজ্য, কাষ্ঠ, মৃদ্ভাণ্ডাদি, তৈলাদি স্নেহময় পদার্থ, ক্ষার, লবণ ও পক্কান্নাদির শুল্ক বিংশতি ভাগ অথবা পঞ্চবিংশতি ভাগ বিধেয় ছিল। শঙ্খ, হীরক, মণিমুক্তা প্রবালাদির উপর কোন শুল্কের ভাগ রাজবিধি নির্দ্দিষ্ট থাকিত না,—জহুরী বা তল্লক্ষণবিদ্‌গণ এইপ্রকার পণ্যের উপর যে শুল্ক ধার্য্য করিয়া দিতেন—তাহাই রাজার প্রাপ্য ছিল। নানারূপ অপরাধ প্রমাণিত হইলে রাজবিহিত যে অর্থদণ্ড অপরাধীকে দিতে হইত তদ্দ্বারাও রাজকোষের বেশ আয় হইত। শুল্ক প্রসঙ্গে এইরূপ আয়ের একটু পরিচয় দিতেছি। লৌহ লবণাদি খনিজ বস্তুর তৎতৎ-খনিতে ক্রীত হইলে ক্রেতাকে ৬০০ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত, পুষ্পবাট ও ফলবাট হইতে পুষ্প বা ফল গৃহীত হইলে ৫৪ পণ, শাকাদির ক্ষেত্র হইতে শাকাদি লইলে ৫২ পণ এবং অন্যান্য শস্যও তৎতৎক্ষেত্রে বিক্রীত হইলে গ্রহীতাকে ৫৩ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। যে-দ্রব্যের যে-

শুল্ক বিহিত ছিল, তাহার পঞ্চভাগ লওয়ারও একটা বিধান ছিল। তাহার সংগ্রহের ভার দ্বারাধ্যক্ষের উপর অর্পিত ছিল। এবং সেইজন্যই এই করের নাম ছিল "দ্বারাদেয়"। তবে উপবি উল্লিখিত শুল্ক-সম্বন্ধে কাহাকেও কোন প্রকার অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতা রাজাতে ন্যস্ত থাকিত।

সেকালে অনেকগুলি শিল্প-বাণিজ্য রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল। নৌনির্ম্মাণ, খনি, দারু প্রভৃতির বন, হস্তিবন ও অন্যান্য আরও কতকগুলি বিভাগের কেবল যে রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল তাহা নহে, সেইসমস্ত বিভাগে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দ্বারা প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যাদির কারবারও রাজকীয় ছিল, এমন-কি ইহার মধ্যে যত কারবার রাজার একমুখ অর্থাৎ একচেটে ছিল। রাজার হস্তে ন্যস্ত এইসকল একমুখ কারবার দ্বারা প্রজার বহুমুখ উপকার সাধিত হইত। রাজকীয় কারখানা বা কর্ম্মান্তে অনেক লোক কর্ম্মকর নিযুক্ত হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইত। বর্ত্তমানকালীন মধ্যবিত্ত প্রজার অনিয়োগ সমস্যা (unemployment question) বোধ হয় এই কারণেই তদানীন্তন রাজাদের আলোচন ও পূরণ করিতে হইত না। সে যাহা হউক, খনিজ দ্রব্যসমূহের মধ্যে লবণ একটি প্রধান দ্রব্য ও মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুজাতের মধ্যে অন্যতম। প্রত্যেক প্রজাকে যেমন এখন রাজপ্রণীত লবণ-শুল্কের কিছু পরিমাণে ভাগ অপ্রত্যক্ষভাবে বহন করিতে হয় প্রাচীনকালেও প্রায় তদ্রূপই ছিল। লবণ কিম্বা অন্য বস্তুর আকর কর্ম্মান্তের কার্য্য বহুব্যয়সাধ্য ও বহুলোকের প্রযত্নসাধ্য বিবেচিত হইলে রাজারা তাহা ভাগে বা প্রক্রয়-প্রথায় পত্তন বা ইজারা দিতেন এবং লঘু ব্যয়সাধ্য ও লঘু প্রযত্নসাধ্য আকরগুলি নিজ অধ্যক্ষগণের পর্য্যবেক্ষণেই রাখিয়া দিতেন। আকরজাত লবণ কর্ম্মান্ত হইতে ব্যবহারোপযোগী হইয়া নিষ্পন্ন হইলে লবণাধ্যক্ষকে নিয়মিত ভাগ সংগ্রহ করিতে হইত ও নিজ বিভাগে প্রস্তুত লবণের বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইত। পূর্ব্ব-বর্ণিত নির্দ্দিষ্ট ভাগ ও প্রক্রয়লব্ধ লবণ সম্বন্ধে ব্যাজী নামক শুল্ক তাহাকেই সংগ্রহ করিতে হইত। এই ত গেল রাজার নিজ রাজ্যোৎপন্ন লবণ সম্বন্ধে বিধি। আগন্তু অর্থাৎ পরদেশজাত লবণের কারবার যাহারা করিত তাহারা প্রথম ক্রয়-সময়ে ব্যাজী ও রূপিক নামে প্রসিদ্ধ শুল্ক দিয়াই খরিদ করিত এবং প্রজাদের মধ্যে যাহারা পরদেশ-জাত লবণ ব্যবহার জন্য খরিদ করিত তাহারাও শুল্ক দিয়া ও রাজ-পণ্যের ছেদ-জনিত ক্ষতির পূরণার্থ বৈধরণ নামক এক-প্রকার শুল্ক দিতে বাধ্য ছিল। বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কেহ রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে লবণের কারবার করিলে তাহাকে উত্তমদণ্ড অর্থাৎ ১০০০ পণ মুদ্রা অর্থ-দণ্ডরূপে দিতে হইত। স্বদেশজাত আকরজ ও খনিজ দ্রব্যাদি ও তন্নির্ম্মিত পণ্য দ্রব্যাদির রক্ষা (protection) সম্বন্ধে পূর্ব্বতন রাজগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন বলিয়াই প্রজারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে তত কিছু ক্লেশ ভোগ করিত না। তাহার প্রমাণ এই লবণের কারবার।

রূপ-বিভাগ (Mint) ও লক্ষণাধ্যক্ষ

পণ্যাদির ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারেও রাজদেয় কর-দণ্ডাদির পরিশোধে ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা বা টাকার ব্যবহার ভারতে চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। সুবর্ণ, রজত ও তাম্রময় মুদ্রার ব্যবহারই প্রাচীন কালে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। দীনার, পণ, অর্দ্ধপণ, পাদপণ, অষ্টভাগ পণ, মাষ, অর্দ্ধ মাষ, কাকণী, অর্দ্ধ কাকণী প্রভৃতি মুদ্রার বহুবিধ নাম ছিল—স্বরূপতঃও ভারতের নানা প্রদেশে তৎতৎ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। দীনার সুবর্ণ-নির্ম্মিত, পণ্যাদি চতুষ্টয় রূপ্যনির্ম্মিত এবং মাষাদি তাম্র-নির্ম্মিত ছিল। বিশুদ্ধ সুবর্ণাদি দ্বারা কখনই মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত না। রাজদণ্ডাদি পণ—নামক মুদ্রা দ্বারাই অধিকতর ভাগে সংখ্যাত হইত। এই পণ নামক "রূপ্য-রূপে" (অর্থাৎ রূপার মুদ্রাতে) চারি ভাগ তাম্র ও কালায়স রঙ্গ (রাঙ) সীস বা রসাঞ্জনের এক ভাগ এবং একাদশ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্য থাকিত। উল্লিখিত অন্যান্য মুদ্রাতেও এই অনুপাতেই খাদ মিশ্রিত থাকিত। বিশুদ্ধ ধাতু দ্বারা মুদ্রাসকল নির্ম্মিত হইত না বলিয়া লক্ষণাধ্যক্ষ বা টঙ্কশালাধ্যক্ষের বিভাগ হইতেও রাজার বেশ আয় হইত। এখনও মুদ্রার মল্য নির্ণয়

লইয়া ভারতবর্ষে কত গোলযোগ চলিতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। রাজার আদেশে নির্ম্মিত লাঞ্ছনযুক্ত এই মুদ্রা কারবারে বা রাজকোষের জমার জন্য, কোনও সাধারণ লোকের বা রাজপুরুষের গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না [অর্থাৎ ইহা legal tender রূপে ব্যবহৃত হইত]। ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার পরীক্ষা জন্য একজন রাজ-কর্ম্মচারী থাকিত, তাহার নাম 'রূপ-দর্শক'। একশত পণে আটপণ (রূপিক সংজ্ঞক) পাঁচ পণ (ব্যাজী সংজ্ঞক) বা সাড়ে বার পণ পারীক্ষিক সংজ্ঞক বাটার ব্যবস্থা দেওয়ার ভার এই রূপ-দর্শকের উপর ন্যস্ত থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি হইলে শাসন-সরকার যে-রীতি অবলম্বন করিয়া পত্র মুদ্রা বা কাগজ মুদ্রার প্রচলনের ব্যবস্থা করেন এবং যে মুদ্রাতে অধুনাতন লক্ষণাধ্যক্ষ সরকার পক্ষে মুদ্রাতে উল্লিখিত টাকার সংখ্যা তদ্গ্রাহককে চাওয়া মাত্র ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাদ্বারা পরিশোধের অঙ্গীকার করিয়া থাকেন—তদ্রূপ কাগজ মুদ্রার প্রথা প্রাচীনভারতে কখনও ছিল বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু এখন আমরা কখনই এরূপ বুঝি না যে, যত টাকা মূল্যের পত্রমুদ্রা সরকারী আফিস হইতে বাজারে প্রচলন জন্য নিষ্ক্রান্ত হয় তদনুরূপ ধাতুমুদ্রা রাজকোষে নাই।

বিবিধ আয়-মুখ

নিম্নে উল্লিখিত দুর্গাদিসংজ্ঞায় পরিচিত সাতটি বিষয় রাজস্বোৎপত্তির স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট। এই সপ্তায়তন আয় শরীরের মধ্যে সপ্তষষ্টি প্রকারের আয়ের পথ উল্লিখিত আছে। যথা—

(ক) ১। ঘট্টদেয়াদি নানারূপ শুল্ক। ২। নানা-প্রকার রাজদণ্ড-লব্ধ আয়। ৩। তুলা ও মান সংক্রান্ত আয়। ৪। নাগরিক বিভাগের আয়। ৫। লক্ষণাধ্যক্ষের অর্থাৎ টঙ্কশালার আয়। ৬। মুদ্রাধ্যক্ষ বিভাগের [pass-port বিক্রয় জন্য] আয়। ৭। সুরাবিভাগের আয় (Excise)। ৮। সূনা বিভাগের (slaughter house) আয়। ৯। সূত্রাধ্যক্ষের আয়। ১০-১২। এবং তৈল, ঘৃত ও ক্ষার বস্তুর কারবার-সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার ব্যতিক্রমজনিত আয়। ১৩-১৪। রাজ-সৌবর্ণিক ও রাজপণ্যশালার আয়। ১৫। বেশ্যাদের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থদ্বারা আয়। ১৬। ও দ্যূত বা জুয়াখেলার নিয়ম-জনিত আয়। ১৭। বাস্তুবিদ্যোপজীবিগণ (architects) হইতে লব্ধ আয়। ১৮-১৯। ও কারু শিল্পীগণের দেয় শুল্কাদি হইতে আয়। ২০। নগর দেবতাধ্যক্ষের আয়। ২১। দ্বারা দেয়। ও ২২। বাহিরিক অর্থাৎ নট-নর্ত্তকাদি হইতে গ্রাহ্য শুল্ক দ্বারা আয়। এই দ্বাবিংশতি উপায় দ্বারা লভ্য রাজস্ব দুর্গসংজ্ঞক।

(খ) ১। সীতা বা কৃষিসম্ভূত আয়। ২। প্রসিদ্ধ ধান্যাদির ষড়্‌ভাগ। ৩। বলি-নামক ধর্ম্ম দেবতা বিষয়ক কর। ৪। ফলবৃক্ষাদি সম্বন্ধীয় রাজদেয় কর। ৫। বণিকদের দেয়। ৬। নদীপাল বা ঘাটরক্ষকদের দ্বারা প্রাপ্য আয়। ৭। তর-নামক (জল-কর)। ৮। নৌ-বিভাগের আয়। ৯। ছোট ছোট পট্টন নামক নগর সঞ্জাত আয়। ১০। এবং বিবীত বা ব্রজভূমি সঞ্জাত আয়। ১১। বর্ত্তনী (পথকর)। ১২। রজ্জু নামক কর (বিষয়পতিদিগের ভূমির জরিপ জন্য কর)। এবং ১৩। চোর রজ্জু নামক কর (সম্ভবতঃ গ্রামদেয় চৌকিদারী টেক্স)। এই ত্রয়োদশ উপায়ে লব্ধ রাজস্ব রাষ্ট্র-সংজ্ঞক।

(গ) স্বর্ণ, রজত, হীরক, মণি, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ, লোহ, লবণ, ভূমিধাতু (সম্ভবতঃ কয়লা প্রভৃতি), প্রস্তর ধাতু ও রসধাতু এই দ্বাদশ খনিজ পদার্থের রাজকীয় কারবার-জনিত রাজস্বোৎপত্তি। এই আয় খনি-সংজ্ঞক।

(ঘ) কুঙ্কুমাদি কুসুমবাট, ফলবাট, পূগাদি ষণ্ড, কেদার (ধান্যাদি ক্ষেত্র) ও মূলবাপ (হরিদ্রা, আদ্রক প্রভৃতি ক্ষেত্র) এই ছয়টি স্থানে উৎপন্ন বস্তু হইতে প্রাপ্ত আয়। আমেরিকায় এইরূপ বহুলভাবে সরকার পরিচালিত ফলমূলাদির উৎপত্তি ও ব্যবসায়ের ব্যবস্থা অদ্যাপি আছে। এই আয় সেতু-সংজ্ঞায় পরিচিত।

(ঙ) পশুবন, মৃগবন, দ্রব্যবন (প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠাদির বন) ও হস্তিবন, এই চারি স্থান হইতে লভ্য আয় বন-সংজ্ঞায় পরিজ্ঞাত।

(চ) গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব ও

অশ্বতর (বেসর) এই আটটি পশুর রক্ষণ পোষণ বর্দ্ধন দ্বারা যে রাজকীয় কারবার (Farm) তাহা হইতে লব্ধ আয়। ইহা ব্রজ-সংজ্ঞায় অভিহিত।

(ছ) স্থলপথ ও জলপথ এই দুইটি উপায়ে যে রাজস্ব লাভ হইত তাহা বণিক্ পথ-সংজ্ঞায় জ্ঞাত ছিল। নগর হইতে নগরান্তরে পণ্যবাহী বণিকদের যাতায়াতের জন্য যে রাজমার্গ বিস্তৃত ছিল তদ্ব্যবহার জন্য তাহাদের নিকট হইতে এবং সমুদ্র-ব্যবহারী বণিকদিগের নিকট হইতে রাজার যে রাজস্ব উৎপন্ন হইত তাহাই এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপরি উল্লিখিত উপায়ে উৎপন্ন রাজস্ব দ্বারা রাজার মূলধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহার নাম মূল আয়। ধান্যাদি ভাগ দ্বারা লভ্য আয়ের নাম ভাগ। দ্রব্যাদি মাপিয়া লইবার সময় নিয়মিত হারে কিছু বেশী লইবার দরুণ যে আয় তাহার নাম ব্যাজী। নদী প্রভৃতির ঘাটে দেয় বা ঐ শ্রেণীর যে যে আয় তাহা পরিঘ নামে পরিচিত। সমগ্র গ্রামাদি হইতে প্রাপ্য যে হিরণ্য বা ধান্যাদি প্রতিনিয়ত ছিল তাহার নাম ক্লৃপ্ত। লবণাদি দ্রব্য হইতে শত প্রস্থে যে অষ্টভাগাদি গৃহীত হইত তাহার নাম রূপিক এবং রাজদ্বারে প্রমাণিত অপরাধ-জনিত দণ্ডাদি হইতে যে আয় তাহার নাম প্রত্যয় আয়। এইরূপ আরও বহুপ্রকার কর ও শুল্কের পারিভাষিক নাম প্রাচীন অর্থ-শাস্ত্রে ও নীতি-শাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা, পিণ্ডকর, সেনা-ভক্ত, উৎসঙ্গ, পার্শ্ব, পরিহীনক, তর, চৌরগ্রহণিক, হট্ট, উদকভাগ, নৌকা-হাটক প্রভৃতি। শিল্পিগণকে শুল্কের পরিবর্ত্তে মাসে একদিন করিয়া রাজাকে খাটিয়া দিতে হইত। সেই দিন-কার্য্যই তাহাদের শুল্ক বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই কার্য্যের দিনে তাহারা রাজবাড়ী হইতে ভক্ত বা অন্ন আহারার্থ পাইত। ইহার অপর নাম "বিষ্টি"। এখন রাজকোষ হইতে যে যে ভাবে অর্থ ব্যয়িত হইত তাহার একটি তালিকা দিতেছি।

নানাবিধ ব্যয়মুখ

১। দেবপূজা (যজ্ঞাদি) পিতৃপূজা ও পর্ব্বাদি সময়ে ব্রাহ্মণ, বাল, বৃদ্ধ, আতুর ও অনাথদিগকে দান করার জন্য ব্যয়।

২। রাজ্যের মঙ্গল জন্য স্বস্তিবাচন ব্যয় অর্থাৎ শান্তিক ও পৌষ্টিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যয়।

৩। অন্তঃপুরস্থিত মহাদেবী (পাটরাণী) ও অন্যান্য দেবীগণ এবং রাজকুমারদিগের ভরণপোষণ ও ভোগ-বিলাস নিমিত্ত ব্যয়।

৪। রাজপাকশালার ব্যয়।

৫। দূতবিভাগীয় ব্যয়।

৬-১০। কোষ্ঠাগার, আয়ুধাগার, পণ্যাগার, কুপ্যগৃহ ও নানাদ্রব্যের কর্ম্মান্ত বা কারখানার কার্য্যজন্য ব্যয়।

১১। বিষ্টি অর্থাৎ আকস্মিক ক্রিয়া আপতিত হইলে কর্ম্মকর দ্বারা সেই কার্য্য নিষ্পাদন জন্য ব্যয়।

১২-১৫। হস্তি, অশ্ব, রথ, ও পদাতি এই চতুরঙ্গ সেনার রক্ষণাদি ব্যয়।

১৬। গো-মহিষাদি পশু রক্ষণ জন্য ব্যয়।

১৭-২০। পশু, মৃগ, পক্ষী, ও সিংহব্যাঘ্রাদি ব্যাল জন্তুর বাট রক্ষণাদি ব্যয়।

২১-২২। কাষ্ঠ তৃণবাটের রক্ষণাদি ব্যয়।

এই দ্বাবিংশতি প্রকার ব্যয় উপদ্রব-শূন্য সময়ে শাসন-প্রণালী অক্ষুণ্ণভাবে চালাইবার জন্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ব্যয়গুলি বহন করিতে রাজসরকার কি পরিমাণ অর্থ রাজকোষ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন তাহার প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়। রাজভৃত্যগণের বেতন নির্দ্দেশ সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া কৌটিল্য একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম (দানাদিক্রিয়া) ও অর্থের (লোক-হিতকর ব্যয়বহুল কার্য্যের) প্রতিবন্ধ উৎপাদন না করিয়া, ও সর্ব্বপ্রকার আয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পুরদুর্গ ও জন-পদের শক্তি-সামর্থ্য পর্য্যালোচনা করিয়া রাজাকে রাজ্যের সমগ্র আয়ের একপদ অর্থাৎ চতুর্থাংশ দ্বারা ["সমুদয় পাদেন"] যাবতীয় বিভাগের রাজপাদোপজীবিগণের বেতনাদি খরচ নিষ্পন্ন করিতে প্রয়াসবান হইতে হইবে। সর্ব্বদা আয়ব্যয় সম্যক্‌রূপে অবেক্ষণ করিয়া রাজসরকারকে রাজ্য চালাইতে হয়। এই কথা সত্য বটে যে, দণ্ড বা

সৈন্যের বলে বলীয়ান্ থাকিলে শাসনপ্রণালী ঠিক চলিবার সম্ভাবনা, কিন্তু সৈন্যবিভাগ ঠিক রাখিতে হইলে কোষের প্রয়োজন অধিক। কোষ ও বল সপ্তাঙ্গরাজ্যের এই দুই প্রকৃতির সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রবিদ্‌গণ তাহা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন।

সামরিক বিভাগের ব্যয়

"বল-মূলো ভবেৎ কোশঃ কোশমূলং বলং স্মৃতম্" শুক্র-নীতির এই বাক্যটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হওয়া অসঙ্গত নহে যে, রাজাকে বা রাজসরকারকে সৈন্যবিভাগের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রতিবৎসর খরচ করিতে হয় ও তাহা করাও উচিত। কিন্তু এইমাত্র বলিয়াছি যে, কৌটিল্যের মতে সৈন্যবিভাগ প্রভৃতি সমস্ত সরকারী বিভাগের মোট খরচ রাজ্যের সমগ্র আয়ের এক চতুর্থাংশ দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া বিধেয়। কেবল সৈন্য-বিভাগের খরচ কুলাইবার জন্য মোট রাজস্বের প্রায় একতৃতীয়াংশ বা ততোধিক অংশ ব্যয় করিবার প্রয়োজন, বোধ হয়, ভারতের অতীত নৃপতিগণ বা তাঁহাদের মন্ত্রীপরিষৎ বা রাজস্ব-সচিবগণ কখনই অনুভব করিতেন না।

রূপ ও আলাপ

সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দোল রাগের ছয়টি রাগিণীর মধ্যে গত পৌষ সংখ্যায় পুরিয়ার রূপবর্ণন, আলাপ ও গান প্রকাশ হইয়াছে। এবারে জয়ন্তী (জয়েৎ) রাগিণীর রূপবর্ণন আলাপ প্রভৃতি প্রকাশিত হইল।

জয়ন্তী

ধ্যান অথবা রূপ বর্ণন

কাঞ্চনচারু কমনীয়বদনা
মুখারবিন্দ-মধুর-গীত-রম্যা
পতিং স্মরন্তী নিত্য-ধ্যান-নিমগ্না
সা জয়ন্তী হিন্দোলস্ত বরাঙ্গনা॥

ভাবার্থ—

যাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় ও মুখ কমনীয়, যাঁহার কমল-বদন হইতে মধুর গীত ক্ষরিত হইতেছে এবং যিনি নিত্য ধ্যানমগ্না তিনিই হিন্দোলের পত্নী জয়ন্তী।

ঠাট বা কড়ি কোমল ইত্যাদির বিষয় বর্ণন।

জয়ন্তী ষাড়ব-প্রোক্তা
পঞ্চম-স্বর-বর্জ্জিতা
গান্ধার-স্বর-বাদিনাং
সংবাদী ধৈবত-স্বরঃ
তীব্র-মধ্যম-সংযুক্তা
ঋষভঃ কোমলঃ স্বরঃ॥

ভাবার্থ—

জয়ন্তী খাড়ব জাতি, 'প'-বর্জ্জিত, 'গ'-বাদী, 'ধ'-সংবাদী, কড়ি-ম এবং 'ঋ' কোমল

অস্থায়ী।

সন্‌া সা গা -া হ্মা ধা না ধা হ্মা গা -া গা ঋা গা
তেo o না o তো o o o o o ম্ না o o

ঋা -া সা -া সা ন্‌া ধ্‌া হ্ম্‌া ধ্‌া সা -া সা হ্মা গা
o o o o তা o o o o o o না তে o

ন্‌া সা গা হ্মা -া গা -া গঋা গা ঋা -া সা -া
o o o o o o o লাo o o o নে o

সা সা সা সন্‌া সন্‌া সা ঋা -া সা -া ॥
তে রে না তেo নাo o তো o o ম্

অন্তরা।

গা হ্মা ধা না র্সা -া র্সা র্সা -া র্সনা র্সা র্গা -া
তো o o o o ম্ নে না o তেo o না o

র্গা া র্ঋা -া র্সা -া -া র্সা না ধা হ্মা -া গা া -া
নে o o o রি o o রে o o o o o o o

গা হ্মা ধা -া র্ঋা না ধা হ্মা গা -া ন্‌া সা গা হ্মা গা
না o o o o o o তে না o তে o o o o

ঋা গা -া ঋা সা -া "সা সা সা সন্‌া সন্‌া
না o o o নে o তে রে না তেo নাo

ঋা -া সা -া" ॥
o o তো ম্

সঞ্চারী।

হ্মা -া গা গঋা গা ঋা সা -া সা ন্‌া ধ্‌া সন্‌া গা
তে o রে নাo o o নে o হো o o o ম্

গা -া গা হ্মা গা -া সা গা হ্মা ধা হ্মা গা -া
না o তা o না o নে তে রে o o o o

গা ঋা -া সা -া ।
নে o o রি o

আভোগ।

হ্মা গা হ্মা ধা র্সা -া র্সা র্সা র্সনা র্ঋা র্সা -া
না o o o o o নে তে তোo ম্ না o

র্সা না ধা র্সাঃ সঃ ধা হ্মা গা -া হ্মা ধা হ্মা গা -া
তা o o o o না o o o নে o o না o

গা হ্মা হ্মা গা -া গা ঋা -া সা সা সা সা
তে o o o o না o o নে "তে রে না

সন্‌া সন্‌া ঋা -া সা -া ॥
তেo নাo o o তো ম্

জয়ন্তী—চৌতাল।

(ধ্রুপদ)

ভাঁত ভাঁতকে ভড়ে ঘড়ে
ঐ সো বেধ না কুঁ ভার।
একন উত্তম নবাবত, একন মধমনাবত,
একন নেক্ক গুনাবত
একন রাখো খানী কর মিকদার।
একন দেত রিঝত, একন লেত রিঝত,
একন কো ফরোরম দয়ে, একন কো হাত টাপর দয়ে
মাগত ভিখ দ্বার দ্বার।
একন কো নরক দেত, একন কো স্বরগ দেত,
তানসেন প্রভু রচ্যো সংসার ॥ তানসেন।

"সঙ্গীত চন্দ্রিকা"।

অস্থায়ী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ‖ ১´ ০
গা ঋা । গা গা । ঋা সা । সা -া । সা ন্া । ঋা সা । সা -া । সা গা ।
ভাঁ ০ ত ভাঁ ০ ত কে ০ ভ ড়ে ০ ০ ঘ ০ ০ ০

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
ঋা গা । ঋা ধা । ঋা গা । ঋা -া । গা ঋা । সা সা । ন্া ধ্া ।
০ ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ ০ ঐ ০ ০ ০ সো ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
ঋ্া ঋ্া । ধ্া সা । ন্সা সা । গা ঋা । ধা না । ধা ঋা ।
০ বে ধ না ০০ কুঁ ভা ০ ০ ০ ০ ০

০ ৩ ৪
গা ঋা । ঋা গা । ন্া ঋা ।
০ ০ ০ ০ ০ র

অন্তরা।

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা ধা । ধা ঋা । র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্সা না । সা র্সা ।
এ ০ ক ন ০ উ ত্ত ম ন বা ব ত

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা -া । র্গা র্গা । র্ঋা র্সা । না ধা । না ধা । ঋা গা ।
এ ০ ক ন ম ধ ম না ০ ব ত ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা ধা । ঋা ঋা । গা গা । গা ঋা । সা সন্া । সা সা ।
এ ০ ক ন নে ক গু না ০ব০ ০ ত

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা । । গা গা । -া গা । হ্মা ধা । হ্মা ঋর্া । র্সা র্সা ।
এ ০ ক র্ন ০ রা খো ০ ০ ০ খা লী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সনা ঋর্া । না ধা । হ্মা গা । গা হ্মা । ঋা গা । ন্া ঋা ॥
ব০ ০ র মি ০ ক দা ০ ০ ০ ০ র

সঞ্চারী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
হ্মা গা । গা গা । ঋা সা । সা -া । সা সন্া । সা সা ।
এ ০ ক ন ০ ০ দে ০ ত রি০ ঋ ত

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
ন্া ধ্া । হ্মা ধ্া । সা সা । সা গা । গা গা । ঋা গা ।
এ ০ ক ন ০ ০ লে ০ ত রি ঋ ত

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
গা হ্মা । হ্মা ধা । ধা না । ধা হ্মা । হ্মা গা । ঋা গা ।
এ ০ ক ন কো ০ ক রো র ন দ য়ে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
গা -া । গা হ্মা । ধা র্সা । র্সা -া । র্সা র্সনা । র্সা র্সা ।
এ ০ ক ন ০ কো হা ০ ত টা০ প র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা না । ধা হ্মা । গা গা । গা ঋা । গা ঋা । সা সা ।
দ য়ে ০ মা ০ গ ত ০ ০ ভি ০ থ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা সা । সা গা । হ্মা গা । হ্মা ধা । হ্মা গা । ঋা সা ॥
দ্বা ০ ০ ০ ০ র দ্বা ০ ০ ০ ০ র

আভোগ।

১´ ০ ২ ০ ৩ ২
{গা হ্মা । ধা র্সা । র্সা সা । র্সা না । র্সা র্সা । র্সা র্সা ।
এ ০ ক ন ০ কো ন র ক দে ০ ত

৯´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সা -া । র্সা না । ধা র্সা । না ধা । না ধা । হ্মা গা }।
এ ০ ক ন ০ কো স্ব র গ দে ০ ত

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
গা -া । গা হ্মা । ধা ঋর্া । না ধহ্মা । ধা হ্মা । হ্মা গা ।
তা ০ ন সে ০ ন প্র ভু র চ্যো ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
হ্মা ঋা । না ধা । হ্মা গা । গা হ্মা । ঋা গা । ন্া ঋা
সং ০ ০ ০ ০ ০ সা ০ ০ ০ ০ র

অগুস্ত্ রদ্যাঁর শিল্প-পরিচয়

শ্রী নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ

কবি ও শিল্পীর দেশ নাই, জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, কাল নাই; সমস্ত দেশ ও জাতি, কাল ও ধর্ম্মের অতীত এক অভিনব জগতে বাস করিয়া তাঁহারা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের ও সকল কালের মানব জাতির জন্য অনন্ত সুধার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া অফুরন্ত রসের সৃষ্টি করেন। বাঙলা দেশের কবির সুরটি শুনিবামাত্র এক মুহূর্ত্তেই সুইট্সারল্যাণ্ডের পথচলা পথিকের প্রাণটি সমবেদনা, সহানুভূতি ও একাত্মবোধে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, অন্তরের একটি কোণ হঠাৎ বেদনায় পীড়িত হয়; রেণেসাস্ যুগের ইটালীর তরুণ চিত্রকর র‍্যাফেলের "মাতৃমূর্ত্তিটি দেখিবামাত্র বাঙলা দেশের মায়ের চিত্ত আপন সন্তানটিকে কোলে লইয়া চুম্বন করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় পীড়িত হইয়া উঠে; নবম শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতের নটরাজের নৃত্যরূপ দেখিয়া বিংশ শতাব্দীর ফরাসী ভাস্কর রদ্যাঁর অন্তরে বিচিত্র ভাবোন্মাদনায় নৃত্য সঞ্চারিত হয়। এই করিয়াই অতীত ভারতের কালিদাস, ইংলণ্ডের শেক্স্‌পীয়ার, জার্ম্মাণীর গায়টে, ইটালীর দান্তে দুস্তর কাল-সমুদ্র পার হইয়া আমাদের নিতান্ত আপনার জন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহারই জোরে বাঙলা ও ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথকে যতখানি দাবী করে, ঠিক ততখানি দাবীই আজ ইটালী করিতেছে, জার্ম্মাণী করিতেছে, করিতেছে আমেরিকা, করিতেছে জাপান।

এই নিয়মেই আজ শিল্পী অগুস্ত রদ্যাঁও পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজিত ও সমাদৃত হইবার দাবী করিতেছেন; ভাস্কর রদ্যাঁর শিল্পীপ্রাণের মধ্যে ভারতবর্ষের শিল্প-ধারা পরমাতিথ্যে ও সৌহার্দ্দ্যে পাশ্চাত্য শিল্পধারার সঙ্গে সখীত্ব-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছিল। রদ্যাঁ শিল্প-সৌন্দর্য্যের আত্মাটিকে অনেক সাধনায়, অনেক আরাধনায় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন; কাজেই যে আয়াস পাশ্চাত্য শিল্প-ধারার সঙ্গে তাঁহার পরিচয়-সাধন করাইয়া দিয়াছিল, সেই আয়াসই ভারতবর্ষের শিল্প-ধারার মধ্যে। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচন করিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছিল।

য়ুরোপ-ইতিহাসের মধ্যযুগের অবসানে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলার পুনরুদ্ধারের জন্য এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল —ইহার কেন্দ্রস্থল ছিল ইটালী ও পরে হল্যাণ্ড। এই বিরাট আন্দোলন সমগ্র পাশ্চাত্য জগতকে নূতন করিয়া গড়িয়াছে; য়ুরোপের এই নবোদ্বোধন পাশ্চাত্য শিল্পকলাকেও নূতন রূপ দিয়াছে এবং তাহার মধ্যে বিচিত্র প্রাণরসের সঞ্চার করিয়াছে। এই নবরূপ ও প্রাণরসের স্রষ্টা ছিলেন জিয়োটো, বটিচেলি, এঞ্জেলো, র‍্যাফেল, র‍্যামব্রাণ্ট, ইত্যাদি শক্তিশালী ভাস্কর ও চিত্রকরেরা। ইঁহারা শুধু পাশ্চাত্য জগৎকে নয়, সমগ্র পৃথিবীকে রসে ও সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং অনাগত যুগের জন্য অফুরন্ত সুধাভাণ্ড পূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। নবোদ্বোধন যুগের এঞ্জেলো-র‍্যাফেলসঞ্চারিত শিল্পকলার যে-ধারা য়ুরোপের পুঞ্জীভূত মরুবালিরাশির মাঝখানে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, ফরাসী শিল্পী রদ্যাঁ সেই ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন এবং সেই স্রোতে নবরসধারা বহাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার শিল্পভাষার সহিত হয়ত ভারতীয় শিল্পভাষার কোন মিল নাই কিন্তু তিনি যে অক্ষয় রসভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে অমৃতরস পান করিলে আমাদের জাতিভ্রষ্ট হইবার কোনো আশঙ্কা নাই; বরং আমাদের প্রত্যেকের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারটি নবরসধারার সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হইবার আশা আছে। মানব জীবনকে সুধায় ও সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করিবার ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন রদ্যাঁ তাঁহাদের অন্যতম।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং তাহার পর

জীবনের প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া রদ্যাঁ শিল্পসৃষ্টির জগতে প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। ইহার আগে তাঁহার প্রতিভা বিকাশের অবকাশ কোথাও পায় নাই বরং সকল দিক হইতে নিন্দায়, বিরূপ সমালোচনায় তাঁহার স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা অকালে ঝরিয়া পড়িবার আশঙ্কায় বারংবার চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। রদ্যাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভা শত জনের সহজ দৃষ্টিকে ভাস্করের মত তীব্র জ্যোতিঃপাতে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার সাধনার প্রথম বিকাশকে কেহ উড়াইয়া দিয়াছে নকল বলিয়া, কেহ বা তুচ্ছ করিয়া এড়াইয়া গিয়াছে কুৎসিত বলিয়া, কেহ বা বলিয়াছে তক্ষণশিল্পের প্রাথমিক নিয়মগুলিই ইহার আয়ত্ত হয় নাই। রদ্যাঁ প্রথম হইতেই অতি পুরাতন শিল্পধারাকে এমন নূতন করিয়া নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা তৎপ্রবর্ত্তিত ধারাকে এমন একটা নবরূপ দিয়াছিল যাহাতে তাঁহার শিল্পসৃষ্টি প্রথম হইতেই সহজ গতানুগতিক পন্থাকে পরিত্যাগ করিয়া একটা বিশিষ্ট পথে যাত্রা করিয়াছিল। তাঁহার নিজস্ব নবপ্রবর্ত্তিত এই ধারা পশ্চিমের কথাসমালোচকদের অভিধাননিবদ্ধ সূত্রগুলিকে অতিক্রম করিয়া শিল্পজগতে এক নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি করিল।

সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে রদ্যাঁ প্যারীর প্রদর্শনীতে প্রথম তাঁহার শিল্প-নিদর্শন প্রেরণ করিলেন। পূর্ণ সুগঠিত দেহ, উলঙ্গ দণ্ডায়মান একটি মানব মূর্ত্তি, গ্রীক ধরণের গড়ন, প্রত্যেকটি শিরা উপশিরা যেন দেহের প্রতি গতিছন্দের সঙ্গে নাচিতেছে, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য যেন মাংস-বহুল ঢেউ খেলানো পেশীগুলির উপর দিয়া উপছাইয়া পড়িতেছে। রেখার সেই কোমল লতানো ভঙ্গিমা নাই, শিল্পীর হাতুড়ির প্রত্যেকটি নিয়মিত আঘাত ইহার প্রতি অণুকে শরীরের প্রত্যেকটি বিভিন্ন অংশকে জীবন্ত করিয়াছে। কিন্তু জীবন ইহার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে লীলায়িত হইয়া উঠে নাই। এযেন এই মাত্র ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া গা মোড়া দিয়াছে, এখনও তাহার নিমীলিত নয়নে ও মুখে স্বপ্নাবেশ—এক হাতে চুলগুলিকে মুঠি করিয়া ধরিয়া, আর একহাত সজোরে সঙ্কুচিত করিয়া নিদ্রার জড়তা ভাঙ্গিবার চেষ্টা যেন সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রদ্যাঁ প্রথম ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'The man awakening to Nature'—জাগরণোন্মুখ মানুষ—নামটিতে অতি সুন্দর করিয়া তাঁহার মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। চারিদিকে এই যে জীবন নানান ছন্দে, নানান রূপে লীলায়িত ইহারই সাড়া পাইয়া এই আদিম মানব অভিনব স্পন্দনে জাগিয়া উঠিয়াছে। রদ্যাঁ নিজেও যে এই জীবন ও সৌন্দর্য্যের নবানুভূতিতে জাগিয়া উঠিলেন, তাহারও প্রতীক হইয়া উঠিল এই মূর্ত্তিটি।

কিন্তু প্রদর্শনীতে যাঁহারা ছিলেন বিচারক তাঁহাদের প্রাণ কবিত্বপূর্ণ কল্পনায় সাড়া দিল না। রদ্যাঁ নাম বদলাইলেন "তাম্রযুগের মানুষ"। কর্ত্তৃপক্ষদের চোখে মূর্ত্তিটি ভাল লাগিল কিন্তু তাঁহারা যে মতামত প্রকাশ করিলেন তাহাতে রদ্যাঁর শিল্পীচিত্ত একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রদ্যাঁকে তাঁহারা 'প্রতারক' বলিয়া গালি দিলেন, জালিয়াত বলিয়া কলঙ্কটীকা পরাইয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন,"মূর্ত্তিটি নকল, আসলের ছাঁচ মাত্র, নহিলে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তি হইতে পারেনা। ব্রসেল্‌স্ প্রদর্শনী হইতেও একই জবাব আসিয়াছিল কিছু দিন আগে। সকলের সন্দেহ-দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া রদ্যাঁর বিকাশোন্মুখ প্রতিভা এইভাবে মসীলিপ্ত হইল। দুই বৎসর পরে কর্ত্তৃপক্ষদের চোখে তাহাদের অন্যায় অবিচার ধরা পড়িল কিন্তু যে ভাবে তাঁহারা তাঁহাদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তাহাতে রদ্যাঁর প্রতি সুবিচার করা হইল না।

এই ব্যাপারের পর হইতে মৃত্যুর শেষদিনটি পর্য্যন্ত রদ্যাঁর শিল্পসৃষ্টি লইয়া সমগ্র য়ুরোপীয় শিল্পজগতে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল। একদিকে নিন্দায় শতমুখ সমালোচককুল, অন্যদিকে প্রশংসায় মুখর রসিক সুজন—সংখ্যায় দুইই প্রবল। ধ্যানলব্ধ বাণীদ্বারা অনুপ্রাণিত ও তাহার প্রচারে আগুয়ান তাঁহার St. John the Baptist ভাস্কর শিল্পের প্রাথমিক নিয়মকে অতিক্রম করার অপরাধে নিন্দিত হইল। লণ্ডনে রয়্যাল য়্যাকাডেমিতে তাঁহার শিল্পসৃষ্টি কোন স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইল না। ইংলণ্ডে যাঁহারা আর্টে স্বাস্থ্যরক্ষার কর্ত্তা তাঁহারা চীৎকার

করিয়া উঠিলেন, "রদ্যাঁকে সাম্‌লাও"—জোলা ফরাসী সাহিত্যে যে দুর্নীতির প্রচার করিয়াছেন, রদ্যাঁ আর্টে তাহাই করিতেছেন। আমেরিকায় এই অভিযোগই প্রতিধ্বনিত হইল। শিকাগোতে তাঁহার "চুম্বন" মূর্ত্তি একটি গোপন প্রকোষ্ঠে অর্গলবদ্ধ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখা হইল। ষ্টকহোলমের প্রদর্শনী রদ্যাঁর স্বেচ্ছার একটি দান অগ্রাহ্য করিয়া ফেরৎ পাঠাইলেন।

কিন্তু একদিকে যেমন এই অজস্র নিন্দা ও গালিবর্ষণ, অন্যদিকে তেমনি য়ুরোপের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত খ্যাতি ও প্রশংসা। ইংলণ্ডে এক বিরাট শিল্প সম্মিলনীতে তাঁহাকে প্রকাশ্যে অভিনন্দিত করা হইল; প্রাগের মন্দির-চত্বরে তাঁহার অপূর্ব্ব শিল্পসৃষ্টি 'চিন্তামগ্ন' বিরাট্ সমারোহে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তথাকার শিল্পীকুল রদ্যাঁর গাড়ীর ঘোড়া বন্ধনমুক্ত করিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া গেল। মহাযুদ্ধের ভেরী-নির্ঘোষে সমগ্র য়ুরোপীয় জগৎ যখন কম্পিত তখন ফরাসী দেশ তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিল্পীসন্তানকে শ্রেষ্ঠতম সম্মান প্রদান করিল সরকারী চিত্রশালায় (Museum) তাঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং তাঁহার শিল্পসৃষ্টিগুলিকে একটা বিশেষ স্থান দান করিয়া।

চিরাচরিত পন্থার অনুসরণ ও অনুকরণকেই যাঁহারা শিল্পচর্চ্চার একমাত্র পথ বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি ও বিচার নূতন সৃষ্টি, নূতন বিকাশ এবং প্রতিভার প্রথম চরণপাতে এম্‌নি করিয়াই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠে; কিন্তু ছিদ্রান্বেষী বিচারকের উদ্ধত বাক্য ও স্পর্দ্ধিত লেখনী জ্বলন্ত প্রতিভার সমক্ষে লজ্জায় অবনমিত হইয়া পড়ে। আসল কথা হইতেছে, সূক্ষ্ম শিল্প ও সাহিত্য সাধনায় 'ডেমক্রেসী' বলিয়া কোন জিনিস নাই, জনসাধারণ কখনও প্রতিভাবান্ রসস্রষ্টার সুবিচারক হইতে পারে না কিংবা সূক্ষ্ম রসাস্বাদনের স্বতঃস্ফূর্ত্তবৃত্তি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। শিল্পী কিংবা কবির সৃষ্টি জনসাধারণের বোধশক্তির কিংবা গ্রহণ শক্তির পরিমাপকে গ্রাহ্য করিয়া চলে না, সে চলে আপন পন্থা অনুসরণ করিয়া। পাঠক ও দর্শক যদি তাঁহার সঙ্গে সমপদবিক্ষেপে চলিতে না পারে এবং সেই জন্যেই নিন্দায় শতমুখ হইয়াও উঠে তাহাতে শিল্পী কিংবা কবির কিছু যায় আসে না। তাঁহাকেই বলি শিল্পীগুরু অথবা কবিগুরু যিনি পাঠকের বোধ-শক্তির বা গ্রহণ-শক্তির সমভূমিতে নামিয়া আসেন না বরং শত নিন্দামুখর কণ্ঠকে অগ্রাহ্য করিয়া দিনে দিনে জনসাধারণকে আপন প্রতিভাদ্বারা আকর্ষণ করেন এবং সর্ব্বশেষে তাহাদিগকে স্বীয় বোধ ও অনুভব-শক্তির সমুন্নত শিখরে উন্নীত করেন। সেই হিসাবে রদ্যাঁকে বলি শিল্পীগুরু।

রেণেসাঁস্ যুগের শিল্পসাধনার মুক্তধারা বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; মরানদীর বদ্ধজলে যে পাশ্চাত্য শিল্প বিকাশ লাভ করিল প্রাণরস বলিয়া তাহার কিছু ছিল না। যাহা কিছু আপাতমধুর, যাহা কিছু তালে লয়ে মুহূর্ত্তে মনকে চঞ্চলতায় নাচাইয়া তুলে, যাহা কিছু সহজবোধ্য এবং বর্ণোজ্জ্বল, যাহা কিছু কৌতুহলোদ্দীপক, যাহা কিছু পৌরাণিক তাহারই মধ্যে শিল্পসাধনা বন্দী হইয়া পড়িয়াছিল; জনসাধারণের সৌন্দর্য্যবোধ সেই সীমার মধ্যেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক দেশেই শিল্প ও সাহিত্যে এমন সময় আসে যখন তাহার স্বাধীন মুক্তধারা কতকগুলি ব্যাকরণের নিয়মসূত্র এবং গতানুগতিক পন্থার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহারই মধ্যে রস ও সৌন্দর্য্যের সন্ধান লাভ হইয়াছে মনে করিয়া শিল্পী সাহিত্যিক ও জনসাধারণ আত্মপরিতৃপ্তি লাভ করে। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর রোমকশিল্পের ইতিহাসে এই ব্যাপারটিই ঘটিয়াছিল। দশম একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া মোগলশিল্প সাধনার বিকাশ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের শিল্পইতিহাসে ইহারই পুনরাবৃত্তি হইল। প্রাচীন রোমে অথবা হিন্দু ভারতে ধ্বংসের প্রতি নিবৃত্তি আর হইল না, কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপে রদ্যাঁ প্রমুখ প্রতিভাবান্ শিল্পীরা সেই ধ্বংসপথযাত্রী শিল্পধারায় মৃতসঞ্জীবনীসুধা সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। রদ্যাঁ বুঝিলেন, সমসাময়িক শিল্পীকুল শিল্পের জীবন-উৎস হইতে অনেকদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি দেখিলেন, জীবনের চারিধারে যাহা অতি তুচ্ছ

অথচ অতি প্রিয় ও নিকটতম, যাহা অতি অবহেলায় সহজ দৃষ্টির অগোচরে পড়িয়া আছে অথচ যাহা অতি স্বাভাবিক, যাহা প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের এবং তাই বলিয়া মানুষের বুদ্ধি ও দৃষ্টিকে চম্‌কাইয়া দেয় না—তাহারই মধ্যে অনন্তরস ও সৌন্দর্য্য-সুধার উৎস আত্ম-গোপন করিয়া আছে। রদ্যাঁর শিল্প প্রচেষ্টায় ইহারাই নবরূপে ফুটিয়া নবচ্ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিল। সৌন্দর্য্য যে ব্যাকরণের সূত্রের মধ্যেই লুকাইয়া নাই, একথা তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই প্রথম হইতেই তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও যাইতে পারিয়াছিলেন। জানিয়া শুনিয়াই নয়, নিজের কবিচিত্তের সৃজনী শক্তির প্রেরণাতেই তাঁহার অনুভূতি অভিনব সৌন্দর্য্যে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এ হিসাবে রঁদ্যাকে অতীত মিশর, ভারত, গ্রীক ও চীনদেশের শিল্পীদের সঙ্গে একাসনে স্থান দিতে পারা যায়।

ভগবানের সৃষ্টি-লীলা নানাভাবে, নানাদিকে বিচিত্র-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; তাঁহার সৃষ্টি প্রকাশ ত আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি-হস্তটি আমরা দেখিয়াছি কি? রঁদ্যা তাঁহার কল্পনা দৃষ্টিতে সেই অপরূপ হস্তটি দেখিয়াছেন এবং তাহাকে শিল্পরূপ দিয়া ইন্দ্রিয় জগতে অভিষিক্ত করিয়াছেন। সে হস্ত কোনো অতীন্দ্রিয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় নয়, কোনো অপার্থিব রহস্য দ্বারা তার ইন্দ্রিয়রূপ আবৃত নয়, এর রূপ ও সৌন্দর্য্য, এর অর্থ ও অনুভূতি, দেখিবামাত্রই আঁখির ভিতর দিয়া মর্ম্মে গিয়া সাড়া জাগায়, আঁখি নিবিষ্ট করিয়া দেখিবার মত বিশেষ কিছুই নাই; একটি বন্ধুর কর্কশ প্রস্তরখণ্ড, তাহারই মধ্য হইতে যেন একটি সুপুষ্ট, সুদৃঢ় সবল জীবন্ত হস্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; কোমল অথচ দৃঢ়, রূপে উজ্জ্বল এবং সুস্পষ্ট রেখায় সুডৌল গড়নে ও সৃষ্টিলীলায় লীলাময় এই হস্তটি! এর সঙ্গে যেন বন্ধুর পাথরটির একটা প্রাণের যোগ আছে, রূপে ও অরূপে, সুন্দরে ও বন্ধুরে যেন নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া আছে। ভগবানের এই করবিধৃত যে লীলাপদ্মটি ফুটিয়া রহিয়াছে ইহারই মধ্যে যাবতীয় সৃষ্টির মূল সুরটি অপূর্ব্ব রাগিনীতে অনাদিকাল হইতে অনন্ত রূপে ধ্বনিত হইতেছে। মনে হইতেছে, সুন্দর হাতটির মধ্যে আর একটি প্রস্তরখণ্ড; তাহারই মধ্য হইতে ফুটিয়াছে একটি সদ্যোজাত ফুলের মত শুভ্র সুকোমল শিশু—প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন তার 'নবনী ছানিয়া' গড়া হইয়াছে। ভ্রূণান্ধ-কারের মধ্যে যে কুঁড়ি এতকাল সুপ্ত ছিল, ভগবানের সৃষ্টি-হস্তটি তাহাকেই আজ এতদিন পরে সূর্য্যালোকের মধ্যে বাহির করিয়া আনিয়াছে। নবারুণালোকে শিশুর আঁখি ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে, দুই হাত দিয়া সে তাই সমস্ত মুখপদ্মটিকে আবরিয়া রাখিয়াছে; ধরণীর বায়ুস্পর্শে তার জীবন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, পা দুটি সে তাই এদিক ওদিক ছুঁড়িতেছে। এই ত সহজ বিষয়টি কিন্তু সমস্ত শিল্পবস্তুটি কি অপরূপ রূপে মণ্ডিত; ভাবে ও রূপে ইহার প্রত্যেকটি অণু প্রাণবান্।

একদিকে রঁদ্যা যেমন করিয়া রূপাতীত বস্তুকে রূপ দিলেন এবং তাহা অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিল, তেমনি আর একদিকে এই জীবজগতের প্রতিদিনের একটি সংগ্রাম এমন সুকৌশলে অথচ এত সহজে রঁদ্যার শিল্পীহস্তে রূপলাভ করিয়াছে যে তাহাকে দেখিবামাত্র প্রত্যেকটি মানবের প্রতিদিনের সুরাসুর সংগ্রামের চিত্রটি চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে। মানুষের মধ্যে এই যে দেবাসুরের সংগ্রাম—মানুষের যে আত্মা সে চাহে সংসারের সকল পঙ্কিলতা হইতে মুক্তি। অসীমের দিকে তার যাত্রা, সে চাহে ইন্দ্রিয়াতীতকে লাভ করিতে। যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর তাহারই উদ্দেশ্যে সে আপনাকে ঊর্দ্ধমুখীন্ করিয়া রাখে। আর রক্তমাংসের যে দেহ সে চাহে তার পঙ্কিলতার মধ্যে আত্মাকে টানিয়া ডুবাইয়া রাখিতে, সে নিজেও চাহে ইন্দ্রিয়-ভোগের পশুত্বের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে—এই যে সংগ্রাম ইহা চলিয়াছে অনাদি কাল হইতে। কত কবি, কত শিল্পী ত ইহাকে লইয়া শিল্পসৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু এত সহজে, এমন সুন্দর করিয়া কেহ বলিতে পারিয়াছে কি? রদ্যাঁর এই শিল্প সৃষ্টিটিতে মানুষের যে ঊর্দ্ধমুখীন আত্মা তাহা রূপ লইয়াছে মানুষেরই দেহের রূপে এবং

রক্তমাংসের যে দেহ তাহা রূপ লইয়াছে পশুর দেহে। মানব দেহরূপী যে আত্মা তাহা কি প্রচণ্ড শক্তিতে পশুদেহ হইতে মুক্তি কামনা করিতেছে! দুটি হাত সজোরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত দেহটিকে তাহারই সঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া পশুদেহ হইতে বিচ্যুত হইবার কি অদ্ভুত প্রয়াস! সমস্ত মুখটির উপর শক্তি ও সংগ্রামের কি অপূর্ব্ব লীলা! সমস্ত শিরা উপশিরা ও ও মাংসপেশীগুলির কি অদ্ভুত নর্ত্তন! আর পশুদেহটির —মানুষের মধ্যে যাহা অসুর—ঠিক উল্টো গতি। সে কিছুতেই আত্মাকে তাহার মধ্য হইতে মুক্তি দিতে চাহিতেছে না; পিছনের পা দু'টি দিয়া সজোরে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া সমস্ত দেহভার পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া সে আত্মার উর্দ্ধমুখীন্ গতিকে ব্যাহত করিতেছে। ঐ সম্মুখ ও পিছনের পা চারিটির এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগের মাংসপেশীগুলির গড়নে প্রতিরোধের ইঙ্গিত অদ্ভুত রূপ লাভ করিয়াছে। আত্মার উর্দ্ধগতির সঙ্গে দেহ যেন কিছুতেই প্রতিরোধের সমতা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। প্রচুর শক্তি প্রয়োগ করিয়াও পশুর পা গুলি কিছুতেই যেন স্থিতিলাভ করিতেছে না। ভাষা এই শিল্প সৃষ্টিটি বর্ণনার কতটুকু দাবী রাখে?

"দেহ ও আত্মা" যদি হইয়া থাকে রূপক, "ঝড়কে" তাহা হইলে বলিব ঝড়েরই সত্যরূপ। ঝড়ের যে বিকট উল্লাস, প্রচণ্ডবেগ, বাধাবন্ধহারা উদ্দামগতি তাহাকে এমন করিয়া পাথরের মধ্যে রূপ দিল কে? শিল্পে ত নটরাজ ছাড়া ইহার তুলনা কোথাও খুঁজিয়া পাই না। স্থিতিশীল অচল পাথরের মধ্যে এমন গতি-বেগের সঞ্চার শিল্পীর কি অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয়! সম্মুখ পানে ইহার গতি, চোখে মুখে কপালের কুঞ্চনে সর্ব্বত্র ইহার উৎকণ্ঠার উৎকট লীলা, মুখের গড়নে ক্লিষ্টতার সুপরিস্ফুট আভাস, পশ্চিমের ঝড়ো বাতাস ইহার উদ্দাম কেশরাশিকে লইয়া কি উন্মাদ নৃত্যই না জুড়িয়া দিয়াছে, কোথায় কোন্ দিগন্ত যেন ইহাদের সব উড়াইয়া লইয়া যাইবে। অথচ থোকা থোকা চুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার লুকোচুরী এই ঝড়ের উদ্দামতার মাঝেও যেন একটা একটানা সুরের মতন বাজিতে থাকে।

বুঝা গেল রদ্যাঁর আর্টের প্রথম বিশেষত্বই হইতেছে শিল্পবস্তুর সঙ্গে দ্রষ্টার সহজ আত্মীয়তা বোধ; শিল্পী যাহা বলিতে চাহেন, যে ভাব প্রকাশ করিতে চাহেন অতি সহজেই কি করিয়া তাহা মানুষের মর্ম্মে গিয়া সাড়া জাগায়, কি করিয়া সে ভাবজগতে শিল্পীর সহিত এক হইয়া যায়, রদ্যাঁর শিল্প সৃষ্টিগুলি দেখিলে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই যে সহজ ও সরল ভাব-বোধ, ইহা সকল দেশের সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। ইহাকেই রূপ দিতে গিয়া রদ্যাঁ দেহের সৌন্দর্য্যের দিকেও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং এই সৌন্দর্য্যকে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন মানুষের দেহের সহজ গতি ও লীলা-ভঙ্গিমার মধ্যে এবং চর্ম্মের শুভ্র আলোকোজ্জ্বল্যের মধ্যে। নগ্ন দেহের উপর সূর্য্যালোক যে আনন্দে নাচিয়া বেড়ায়, শুভ্র চর্ম্মের উপর যে স্বচ্ছ ঔজ্জ্বল্য দিনের আলোকের প্রতি মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আপন ধর্ম্ম বজায় রাখে, তাহাকেই তিনি অপূর্ব্ব কৌশলে রূপ দিতে শিখিয়াছিলেন দেহের প্রতি অঙ্গের গঠন ভঙ্গিমার (Modelling) ভিতর দিয়া। এই শিল্প কৌশল তাঁহাকে ভাবসৃষ্টির দিক দিয়া বেশীদূর অগ্রসর করিয়া দিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু মানব-দেহের যেসহজ দৈহিক সৌন্দর্য্য চিরকাল মানুষের চোখ ও মনকে পরিতৃপ্ত করিয়া আসিয়াছে সেই সৌন্দর্য্যকে রদ্যাঁ কখনও তুচ্ছ বলিয়া ভাবেন নাই। নানাভাবে নানারূপে দেহের সেই সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তোলার প্রচেষ্টা, তাঁহার সৃষ্টিতে কি অপূর্ব্ব সার্থকতাই না লাভ করিয়াছে। এই হিসাবে তিনি কোথাও কোথাও গ্রীক্ অথবা রেণেসাঁস্ শিল্পী-দিগকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। রদ্যাঁ কখনও সৌন্দর্য্যকে পৃথক পৃথক ভাবে পদার্থতত্ত্ববিদের মত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই; তাঁহার শিল্পদৃষ্টি মানুষকে দেখিয়াছে সমগ্র ভাবে—সেই সমগ্র ভাব ও সৌন্দর্যটিকে মনের মতন করিয়া প্রকাশ করিতে গিয়া হয়ত কোনো অঙ্গ বিশেষ অথবা ভঙ্গি বিশেষকে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রাধান্য দিতে হইয়াছে। এই হিসাবে রদ্যাঁ বিশেষ করিয়া ভারতীয় শিল্পপদ্ধতিকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং এইখানেই

ভারতীয় শিল্পধারার সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা আমরা অনুভব করিতে পারি। "ইভ্" "ঝড়" "চিরবসন্ত" "জরাগ্রস্ত রূপোপজীবিনী" "চুম্বন" "সন্দেহ" "রোমিয়ো জুলিয়েৎ" প্রভৃতি শিল্প-নিদর্শনগুলি একটু তলাইয়া দেখিলেই উপরোক্ত কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি করা সহজ হইবে।

কলাবিদের সত্যদৃষ্টি হইতেছে সহানুভূতির দৃষ্টি, কল্পনার দৃষ্টি ; রূপরসগন্ধসৌন্দর্য্যময় এই পৃথিবীর রোগজরাজীর্ণ ক্লেদপঙ্কিলতাময় এই পৃথিবীর অফুরন্ত ভাবের ও রূপের প্রতি অপার মমত্ববোধের দৃষ্টি। এই দৃষ্টি দিয়া যিনি এই পৃথিবীর সব কিছুকে দেখিয়াছেন, পটের উপর তাঁহার তুলি অবলীলায় খেলিয়া যায়, পাথরের উপর তাঁহার বাটালী আপন মনে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া চলে। শিল্পী যে দৃষ্টিতে, যে ভাবে ও রূপে এই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতকে দেখিয়াছেন, ভাব রূপ ও দৃষ্টির সেই সমভূমিতে সকলকে দাঁড় করাইবার প্রয়াস হয়ত শিল্পীকে করিতে হয় না এবং হয় না বলিয়াই শিল্পীর ভাবদৃষ্টির মধ্যে আমরা অনেক সময়ই প্রবেশ করিতে পারি না এবং সেই হেতু শিল্পসৃষ্টিকেও বুঝিতে ভুল করি। রদ্যাঁকেও সেই হেতু অনেকে ভুল বুঝিয়াছেন, তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার শিল্প-সৃষ্টিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। কেহ হয়ত বলিয়াছেন, 'তিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমতা (proportions) রক্ষা করিয়া চলেন নাই, তিনি নর-নারীর নগ্ন দেহকে সৌন্দর্য্য জগতে অভিষিক্ত করিয়া আর্টে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছেন ; সহজ দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে যে ভাবে দেখে রদ্যাঁ তেমন করিয়া তাহাদের রূপ দান করেন নাই, অনেক সময়ই তাহা বিকৃত বলিয়া মনে হয় ; "রূপোপজীবিনী"র হাতগুলি অত্যধিক পরিমাণে লম্বা, তা ছাড়া মানব জীবনের এমন একটা কুৎসিত কল্পনাকে এমন করিয়া রূপ দিবার দরকারই বা ছিল কি ? মানুষের জীবন ত এমনি নানান দুঃখে কুশ্রী পঙ্কিলতায় ভারাক্রান্ত হইয়া আছে, সে বোঝা বাড়াইয়া লাভ হইল কি ?' এই রকম কত কথাই বলা হইয়াছে। ইহারা শিল্প-সমালোচনায় ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, কলাকৌশলের বিচারই করিয়াছেন কিন্তু শিল্পের যা অতীন্দ্রিয় রহস্য, দেখার অতীত যে রূপ, সেই রূপ ও রহস্যের সন্ধানে ইহাদের চিত্ত আকুল হয় নাই। সে সন্ধান যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন রদ্যাঁর সৃষ্ট সৌন্দর্য্য জগতের মধ্যে, তাঁহার অতীন্দ্রিয় রহস্যজগতের মধ্যে কি করিয়া বহুদিন ডুব মারিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায়।

কিন্তু সত্যই কি রদ্যাঁ নগ্ন-দেহকে রূপ দিতে গিয়া দুর্নীতির প্রশ্রয় ও কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন ? সত্যই কি তিনি নগ্ন-দেহের সৌন্দর্য্যকে, নর-নারীর প্রেমলীলাকে লালসার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন ? এই শিল্প-সৃষ্টিগুলি যাঁহারা হৃদয়ের অনুভূতি দিয়া দেখিয়াছেন, মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যকে যাঁহারা প্রকৃতির বিচিত্র লীলারই এক রূপময় প্রকাশ বলিয়া জানিয়াছেন,নর-নারীর প্রেম প্রীতিকে যাঁহারা সহানুভূতির দৃষ্টিতে অন্তরে অনুভব করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের গতিভঙ্গী, তাঁহাদের চোখা-চোখি, তাঁহাদের নিবিড় প্রেমের নিবিড়তম আলিঙ্গন, হাস্যে ও স্পর্শে পুলক-শিহরণ, তাঁহাদের স্বপ্নালস দৃষ্টি, ইত্যাদিকে যাঁহারা সুমধুর সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন রদ্যাঁ কখনও নর-নারীর লালসাবহ্নিতে ইন্ধন যোগান নাই। বরং রক্তমাংসের সহজ সত্য সম্বন্ধকে প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করিয়া মানুষের অনুভূতিকে উন্নত ও প্রশস্ত করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। রদ্যাঁ মানুষের যৌবনকে অস্বীকার করেন নাই। তাহার সমস্ত লীলাকে তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

রদ্যাঁ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমতা (Proportions) সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়া চলেন নাই। হয়ত হাতটা-পা'টা বাস্তবিকই লম্বা কিন্তু রদ্যাঁ কখনও তাঁহার সৃষ্টিতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতির দিকে মনোযোগ দেন নাই। ইহারা তাঁহার শিল্প-দৃষ্টিতে বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। তিনি খুঁজিয়াছিলেন শিল্পবস্তুর প্রাণ এবং সেইটিকে রূপ দেওয়াই ছিল তাঁহার সুকঠিন প্রয়াস এবং প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রয়াসই থাকে তাহা। কথাটাকে রদ্যাঁর "জরাগ্রস্ত রূপোপ-

জীবিনী"র প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে; কুব্জপৃষ্ঠ, লোলচর্ম্ম, বিগত-সৌন্দর্য্য, পক্ব রুক্ষকেশ এই বৃদ্ধা মরণ সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে বসিয়া অতীতের কত কথাই না ভাবিতেছে। তাহার বেদনাময় স্মৃতি তাহাকে পীড়িত করিতেছে, সমস্ত মুখটির উপর তাহারই ছায়া। যে কুশ্রীতার একটা স্বচ্ছ আবরণ ইহার সমগ্র দেহকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং যাহা সাধারণ দৃষ্টিকে হঠাৎ বিদ্রোহী করিয়া তোলে তাহাকে শুধু কুশ্রী বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় কি? ইহার লোল কুঞ্চিত তাপদগ্ধ চর্ম্ম কত বৎসরের কত ঘটনাবহুল ইতিহাস আপাত-কুৎসিত আবরণের আড়ালে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; ইহার শুভ্র রুক্ষ বিরলকেশ মস্তিষ্কের উপর দিয়া কত গ্রীষ্মের খর রৌদ্র, কত বর্ষার ঝড় ও বারিপাত, কত শীতের কুহেলি-সম্পাত, বহিয়া গিয়াছে। তাহারই শুদ্ধ ইতিহাস ইহার প্রতি অণুতে অণুতে মুখর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। হয়ত ইহার সঙ্গীতে, ইহার নৃত্যে, ইহার আঁখির চপল কটাক্ষে, ইহার দেহের বিলোল ভঙ্গীতে কত রাজার বিলাস মজলিস্, কত ধনীর প্রাসাদ, কত রসিকের প্রমোদ ভবন মত্ত ও মথিত হইয়াছে—হয়ত ইহার সেবায়, ইহার আত্ম-বিলোপে, ইহার পরিচর্য্যায় কত ক্লিষ্ট ও পীড়িত জন শান্তি পাইয়াছে। কিন্তু এসব আজ দূর অতীতের কথা; জীবনের যাহা সব চাইতে ভয়ানক, সব চাইতে ভীষণ যে জরা আজ তাহারই ছায়া ইহার উপর পড়িয়াছে; মরণ-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ইহার জীবনতটে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের "কঙ্কাল" যেমন করিয়া তাহার চিকিৎসাবিদ্যার পাঠকটিকে বলিয়াছিল তার বিগত যৌবনের কথা, এই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধাও তেম্‌নি করিয়া আমাদের বলিতে পারে, 'সময় ছিল যখন আমার ছিল এই পটল চেরা চোখ, যাহার বিলোল কটাক্ষে লুব্ধ হইয়া তোমাদের মত কত পতঙ্গ আমার রূপ-বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়া মরিতে আসিয়াছে। আমার এই শুভ্র দেহের মধু-সুগন্ধে কত কুঞ্জবীথিকা ভরিয়া উঠিয়াছে, আমার প্রাণরসের উচ্ছ্বসিত পেয়ালা কত তৃষ্ণার্ত্তজন পান করিয়াছে। আজ তোমরা যাহা দেখিতেছ চিরকাল আমি তাহাই ছিলাম না'। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার রূপ-সৌন্দর্য্যময় যৌবনই সত্য, আর এই জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্য ইহাই মিথ্যা একথা কে বলিবে? দুইই সত্য, যৌবনকে যদি স্বীকার করি, মৃত্যু-প্রতীক্ষায় স্থির বার্দ্ধক্যকেই বা তাহা হইলে অস্বীকার করিব কি করিয়া? রদঁ্যাও তাহাকে অস্বীকার করেন নাই, এবং করেন নাই বলিয়াই বার্দ্ধক্যের এই আপাত-কুৎসিত রূপ তাঁহার নিকট সত্যই কুৎসিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। ইহার জরাগ্রস্ত রূপ যে ভাবরহস্যকে নিরন্তর দেখা দিতেছে, রদঁ্যা সেই রহস্যেই মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তাহাকেই সকলের সমক্ষে রূপদান করিয়াছেন।

"রূপোপজীবিনী"র মূর্ত্তিটি দেখিয়া কাহারও চিত্ত যদি ভয়ে ভীত হইয়া থাকে, "বিদায়ের" বিষাদ প্রতিমাটি দেখিলে তাহার চিত্ত করুণায় শান্ত ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইবেই। একটি রুক্ষ কর্কশ প্রস্তরখণ্ড ভেদ করিয়া যে মুখ-পদ্মটি ফুটিয়াছে, কি করুণ কি বিষাদময় তাহার দৃষ্টি। বাক্য তাহার স্তব্ধ, দৃষ্টি তাহার সজল, যে প্রিয়-বস্তু হইতে সে বিদায় লইতেছে তাহার চক্ষু তাহারই উপর নিবদ্ধ, কম্পিত ওষ্ঠপুটের উপর অঙ্গুলি দুটি রাখিয়া এক দৃষ্টে সে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে: সমস্ত প্রস্তর-খণ্ডটির, তাহারই মধ্যে রূপায়িত অবিন্যস্ত কেশদামের এবং সমস্ত দেহটির গতি ঐ প্রিয় বস্তুটির দিকে, কিন্তু তাহার নিকট হইতে বিদায় তাহাকে লইতেই হইবে। বাহিরে এই শান্ত মুখশ্রী এবং ভিতরে এই বিচ্ছেদের দুঃসহ বেদনা এই মূর্ত্তিটিকে কি অপূর্ব্বরূপে মণ্ডিত করিয়া আছে!

প্যারির রদঁ্যা-মিউজিয়মটি না দেখিলে, তাঁহার শিল্প-সৃষ্টিগুলির অতীন্দ্রিয় রহস্যের মধ্যে চিত্তকে স্বেচ্ছা-বিহার করিতে না দিলে শিল্পাচার্য্য রদঁ্যাকে কিছুতেই ভাল করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইয়া উঠিতে পারা যায় না। য়ুরোপীয় ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে, নবোদ্বোধন যুগের এঞ্জেলোর পরে যদি কোনো ভাস্করের নাম করিতে হয় তবে রদঁ্যার নামই করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে আজও কেহ এই শিল্পাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। অনাগত যুগের কোলে হয়ত রদঁ্যা অপেক্ষাও প্রতিভাবান্ শিল্পী নীরবে

শিল্প সাধনায় নিযুক্ত আছেন, *। তিনি যেদিন আত্ম-প্রকাশ করিবেন সেদিন হয়ত রদ্যাঁর জ্যোতি তাঁহার আড়ালে পড়িয়া ম্লান হইয়া যাইবে; কিন্তু রদ্যাঁর সৌন্দর্য্য-জগতে যাহা দান তাহা সত্য এবং শাশ্বত, চিরদিন অম্লান জ্যোতিতে তাহা আপনি উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

* ইটালী দিয়াছে এঞ্জেলোকে, ফরাসী দিয়াছে রদ্যাঁকে; শুনা যাইতেছে নরওয়ে তাহার নিভৃত ক্রোড়ে আর এক শিল্পীকে সযত্নে লালন করিতেছে—গুস্তাভ্ ভীগ্‌লাণ্ড (Gustav Vigeland) তাঁহার নাম। কেহ কেহ বলিতেছেন যেদিন তাঁহার শিল্পসৃষ্টিগুলি লোকচক্ষুর সমক্ষে প্রকাশিত হইবে, সেদিন রদ্যাঁর প্রতিভা ম্লান হইবে।

দুই বার রাজা

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বাজে-পোড়া ঠুঁটো তালগাছটা উঠোনের পাশে দাঁড়িয়ে, যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আকাশকে ঠাট্টা কর্‌ছে। অথচ ম্রিয়মান, বিষণ্ণ।

বুকের মধ্যে যেন একটা হাপর আছে, উঁচু তাকিয়াটায় ঘাড় গুঁজে উবু হ'য়ে শুয়ে অমর হাঁপানির টান্ টান্‌ছে। ডাক্তার খানিকটা ন্যাকড়ায় কি একটা ঝাঁঝালো ওষুধ ঢেলে দিয়ে ব'লে গিয়েছিল শুঁক্‌তে। তাতে টান কমা দূরে থাক্, রগ দুটো বাগ্ না মেনে একসঙ্গে টন্‌টন্ ক'রে উঠেছে। বন্ধু সরোজ কতগুলি দড়ি পাকিয়ে মাথার চারপাশটা সজোরেই বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল। এখন ভীষণ লাগছে তাতে। কিন্তু দড়িগুলি খুলে ফেল্‌তে পর্য্যন্ত জোরে কুলোয় না।

বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগাতে ইচ্ছে কর্‌ছে না। পরিক্লান্ত ঘুমন্ত করুণ মুখখানি—।

প্যাকাটির মতো লিক্‌লিকে দেহ,—একটা টিক্‌টিকি যেন। এই একটুখানি টিকে থাকার বিরুদ্ধে সমস্তটা দেহ ষড়্‌যন্ত্র কর্‌ছে! তার কী আর্ত্তনাদ! যেন একটা ভূমিকম্প বা বন্যা!

মার, বিষাদস্নিগ্ধ মুখখানির পানে চেয়ে অমরের মনে পড়্‌ল হঠাৎ, কবে কার মুখে গান শুনেছিল—'সে যে আসে আসে আসে'; শেলিও এ কথা বিশ্বাস ক'রে সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল—তারপর একশ বছর এক এক ক'রে খসেছে। দিন আর এলো না। বসন্ত যদি এলই,—মহামারি নিয়ে এল, নিয়ে এল চৈত্রের চোখ ভ'রে রৌদ্রের রোদন!

'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে'—। সেদিনও পল্লবমর্ম্মরে কোটি কোটি ক্রন্দন অনুরণিত হবে। প্লেটোও ত' কত আগে স্বপ্ন দেখেছিল, বার্ণার্ডশও দেখেছে। 'সে ক'বে গো কবে?'

অমরের হঠাৎ ইচ্ছে কর্‌ল একটা কবিতা লিখ্‌তে—সমস্ত বিশ্বাসকে বিদ্রূপ ক'রে। ভুয়ো ভগবান আর ভুয়ো ভালবাসা। যেমন ভুয়ো ভূত!—মনে পড়ে, বায়রণ, মনে পড়ে সোপেন-হার।

যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হ'য়ে অমর বাইরে বেরিয়ে এল, উঠোনে। সেই ঠুঁটো তালগাছটার গুঁড়ি ধ'রে হাঁপাতে লাগ্‌ল। দুজনে যেন মিতা; একসঙ্গে আকাশের তারাকে মুখ ভেঙচে ভয় দেখাচ্ছে।

সমস্ত আকাশে কিন্তু নিস্তরঙ্গ ঔদাসীন্য।

ঝড়ের পর যেমন অরণ্য।—টান্‌টা পড়েছে।

মা বল্লেন—নাই বা গেলি কলেজে আজ। একটা ছাতাও ত নেই। যে রোদ্—

অমর বল্লে—হাজিরা থাক্‌বে না। তা ছাড়া মাইনে না দেওয়ার দরুণ কি দাঁড়িয়েছে অবস্থাটা দেখে আসি।

অবস্থা আর এর বেশী কি সঙ্গীন হবে? দু'মাসের মাইনে দেবার শেষ তারিখ উৎরে গেছে দেখে নাম লাল কালিতে কেটে দিয়েছে।

সরোজ বল্লে—তুমি ফ্রি না?

দু' হাত দিয়ে বুকের ঘাম মুছে অমর বল্লে—তা হ'লে সুপারিশ লাগে,—ঐ যে মোড়ের তেতলা বাড়ীর বারান্দায় ব'সে যিনি মোটা চুরুট টানেন তাঁর। তিনি আর প্রিন্সিপ্যাল ত আমার মার এই ছেঁড়া কাপড়, বন্ধক দেওয়া দু-খানি সোনার বালা, এই ঝুল-ঝোলা নোংরা দাঁত-বের-করা খোলার ঘরটা দেখতে আসেন নি। অ'বৃজি একটা করেছিলাম বটে, সুপারিশ ছিল না ব'লে বাতিল হ'য়ে গেল। সোজা হ'য়ে আজো যেন দারিদ্র্য তার সত্য পরিচয় দিতে শেখেনি। আর মহীনকে চেন ত?—বাইকে যে আসে—ফ্রি। বাড়ী থেকে মাইনে বাবদ যা টাকা আসে, তা দিয়ে 'পিকাডিলি' টিন কেনে, সেলুনে ব'সে দাড়ি কামায়।

মা হতাশ হ'য়ে বল্লে—উপায় কি হবে তবে?

যেন হঠাৎ একটা বাড়ীর ভিৎ ধ'সে গেল; কাদায় ব'সে গেল চলন্ত গাড়ীর চাকা।

অমর বল্লে—ভিজিট পাবে না জেনে ডাক্তার যখন ন্যাকড়ায় ভোঁটকা-গন্ধওলা খানিকটা নাইট্রিক এসিডের মতো কি ফেলে ব'লে গিয়েছিল এ রোগে কেউ মরে না, তখন আশ্বস্ত হ'য়ে আমাকে তোমার বুকে নিয়ে কি বলেছিলে? বলেছিলে—ঠাকুর তোকে বাঁচিয়ে রাখুন, এইটুকুই শুধু চাই। বেশ ত, আবার কি! কাল যদি ফের টান ওঠে, তোমার এ ভূতুড়ে হাতুড়ে ডাক্তার না ডাক্‌লেও বেঁচে উঠব।

পরে ঢোঁক গিলে ফের বল্লে—তোমার সেই ঠাকুর উড়ে ঠাকুরদের মতই বাজে রাঁধুনে মা। হয় খালি ঝাল, নয় খালি নুন। পরিবেশন করতে পর্য্যন্ত ভালো শেখেনি।

জামাটা খুলে ফেল্লে। ছাব্বিশ ইঞ্চি বুক, কঞ্চির মত হাত পা, পিঠটা কুঁজো, মাথার চুলে চিরুণী পড়ে না, —তবু মনে হয় যেন একটা উদ্ধত তর্জ্জনী।

মা পাখা ক'রে ঘামটা মেরে বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। যেমন ক'রে পুরুত তার নারায়ণ শিলা গঙ্গাজলে ধোয়;—ততখানি যত্নে।

সরোজ বল্লে—তা কি হয়? সামান্য কটা টাকার জন্য "কেরিয়ার" মাটি করার কোনো মানে নেই। আমি দেব টাকা, মাইনে দিয়ে দিয়ো ফাইনশুদ্ধু।

মা'র বুকের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে অমর বল্লে—কিছু লাভ নেই তাতে। তা ছাড়া পার্সেণ্টেজও নেই। হপ্তায় দু' বার ক'রে টান ওঠে—। বানান ভুল নিয়ে ঘোষ-মাষ্টারের সঙ্গে তর্ক করা অবধি প্রক্সিও চলে না আর, খালি আমাকে জব্দ করার চেষ্টা। 'গোষ্ট'কে যদি অনবরত 'ঘোষ্ট' ব'লে চলে একঘণ্টা ধ'রে,—তা আর যার সহ্য হোক্, আমার হয় না ভাই। বিনয় সহকারে প্রতিবাদ করলাম, মাষ্টার ত রেগেই লাল। প্রিন্সিপালকে গিয়ে নালিশ—আমি নাকি অপমান করেছি। আমি বল্‌লাম—'উনি 'গোষ্টকে' বলেন 'ঘোষ্ট', 'পিয়াস'কে বলেন 'পায়াস',—। তাই শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম ও উচ্চারণগুলি কি ঠিক? উনি ভাবলেন, ওঁর বাড়ী বরিশাল ব'লেই বুঝি ঠাট্টা করছি আমি।

সরোজ বল্লে—প্রিন্সিপ্যাল কি বল্লেন?

—বল্লেন, প্রোফেসার তোমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। তাঁকে করেক্ট করবার তোমার রাইট নেই। ফের এমন বেয়াদবি কর ত ফাইন করব। অদ্ভুত! তাছাড়া, আমি বিরক্ত হ'য়ে গেছি, সরোজ।

একটু থেমে বল্লে—আমি কি বিরক্ত হ'য়ে যে গেছি, তুমি তা ভাবতেও পারবে না। আমাদের যিনি পোয়েট্রি পড়ান, তিনি আবার উকিল। চাপকান প'রে ছুট্‌তে-ছুট্‌তে হাজির, এক গাদা পানে মুখটা ঠাসা,—কীট্‌সের 'নাইটিঙ্গল্' পড়াবেন। ডাক্তার যেমন ছুরি দিয়ে মড়া কাটে ভাই, তেম্‌নি ক'রে কবিতাটা দ'লে পিষে দুমড়ে চটকে একেবারে কাদা-চিংড়ি ক'রে ছাড়্‌লেন। ওঁর ব্যাখ্যা শুনে এত ব্যথা লাগল, যে মনে হ'ল বেচারা কীট্‌স যদি ছাত্র হ'য়ে শুনত ওঁর পড়া, ত বেঞ্চিতে কপাল ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করত। কি সে চেঁচানি, পানের ছিবড়ে ছিটকে পড়ছে,—ভয়ে নাইটিঙ্গলের প্রাণ থ হ'য়ে গেছে। 'রুথ' এর কথা যেখানে আছে, সেখানটায় এসে ওঁর কি

বিপুল হাত ছোড়া—ও-জায়গাটা মুখস্ত ক'রে এসেছিল নিশ্চয়ই। রুথ-এর গল্প কি, বাইবেলের সঙ্গে কোথায় তার অমিল এই নিয়ে তুমুল তর্ক, তুমুল আস্ফালন। 'খুব সোজা' ব'লে বই মুড়ে কৌটোর থেকে গোটা চার পান মুখে পুরে প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন আলপাকার পাল তুলে। বোধ হয় অনেকদিন বাদে একটা মোকদ্দমা পেয়েছিলেন।—তখনো ভালো ছাত্রেরা বইয়ের ধারে-ধারে মাষ্টারের শব্দার্থ টুকে রাখছে ও পরস্পরে রুথের শ্বশুরবাড়ী নিয়ে পরামর্শ করছে। ভাই সরোজ, আর জ্যোৎস্নারাতে কীট্‌স্ পড়া চল্‌বে না কোনোদিন।

পরে মাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে বল্লে—তুমি ভাবছ মা যে তোমার ছেলে বি-এ পাশ করতে পারল না ব'লেই ব'য়ে গেল? নয় মা, নয়। জান?—যারা খুব বড় হয়েছে তাদের শব্দের অর্থ জান্‌তে মা'র গয়না বন্ধক দিয়ে কলেজে পড়তে আস্‌তে হয়-নি। এ দিন যাবে, এ কথা ত তুমিই বেশি বিশ্বাস কর। দিন যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি তারপর কালো ঝড়ো রাত্রিই আসে, তাতেও ভড়্‌কাবার কিছু নেই। আমাকে জন্ম থেকে এমন পঙ্গু পক্ষাহত ক'রে বানিয়েছেন ব'লে জবাবদিহি দিতে হবে বিধাতাকেই।

মা মিশ্রির জল ছেঁকে দুই কাঁচের গ্লাসে ক'রে দুই বন্ধুকে ভাগ ক'রে দিলেন। বল্লেন—আর একটা গয়নাও ত নেই—

—খবরদার মা। আমার কলেজে পড়া এইখেনে খতম্। আমি এই ফাটা ফুস্‌ফুস্ নিয়েই লড়ব। তুমি আমার মা, আর ঐ তালগাছটা আমার ছেলেবেলার বন্ধু,—কতকালের চেনা।

সরোজ জিজ্ঞেস্ করলে—কি করবে তা হ'লে এখন?

—কবিতা লিখব। তুমি হেসো না, সরোজ। কথাটা ভারি বেতালা শোনাচ্ছে, জানি। কিন্তু আমি সত্যিই লিখব এবার। আমার সমস্ত প্রাণ চেঁচিয়ে উঠতে চাইছে।

সরোজ হেসে বল্লে—তা হ'লে আর কবিতা হবে না।

—না হোক্। সোজা সত্য কথা বুক ঠুকে আমি খুলে ব'লে দিতে চাই। সৌন্দর্য্যের আবরণ দিয়ে কুৎসিত নগ্নতাকে ঢেকে রাখার জন্যেই না তোমরা ভগবান বানিয়েছ! যে কথা কন্‌ফুসিয়াস্, বায়রণ, সুইন্‌বার্ণ বা হুইটম্যান্ পর্য্যন্ত ভাবতে পারেনি—

তেমন আবার কি কথা আছে?

—দেখো। যে কথা ভেবেছিল খালি চ্যাটার্‌টন্।

সরোজ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সহসা পাংশু হ'য়ে বল্লে—খবরদার, অমর। ও রকম মারাত্মক ঠাট্টা করোনা।

অমর উদাসীনের মত বল্লে—মারাত্মক ঠাট্টাই বটে। জান, বিধাতা যদি তোমাদের প্রকাণ্ড কবি হন্ ত এই পৃথিবীটা তাঁর প্রকাণ্ড ছন্দপতন।

কিন্তু না, সত্যি সত্যিই সে রাতে অমর কালি কলম আর কাগজ নিয়ে বস্‌ল কবিতা লিখতে। মেটে মেঝের ওপর ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে মা ঘুমিয়ে পড়েছে, ম্লান বাতির আলোয় সেই মুখখানির যেন তুলনা নেই। ঐ মা'র মুখখানি নিয়েই একটা কবিতা লেখা যায় হয়ত,—যেন বহু জন্মের হাসি-কান্নার ধন!

সল্‌তে ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে,—কিন্তু একটা লাইনও কলমের মুখে উঁকি মারছে না। 'বিট্'-এর পুলিশ খানিক আগে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ ক'রে জুতোর ভারী শব্দ ক'রে চ'লে গেছে। আবার সেই নিঃশব্দতা,—প্রকাশ করতে না পারার ব্যাথার মতোই অপরিমেয়।

অমরের মনে হ'ল, ভাষা ভারি দুর্ব্বল, খালি ভেঙে পড়ে। লিখতে চাইছিল—এই জীর্ণ পৃথিবী, এই দানবী সভ্যতা,—সব কিছুই প্রকাণ্ড ভুল বিধাতার,—এঁচড়ে-পাকা ছেলের ছিবলামি। এঞ্জিন-ড্রাইভার যেমন ভুল পথে গাড়ি চালিয়ে হায় হায় ক'রে ওঠে,—তেম্‌নি অকারণে ভুল ক'রে খেলাচ্ছলে এই পৃথিবীটা বানিয়ে ফেলে ভগবান তারায় তারায় চীৎকার ক'রে উঠেছেন,—অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন।

এত বড় যে ব্যবসাদার,—সেও দেউলে হ'ল ব'লে। কবে লালবাতি জল্‌বে,—প্রলয়ের? তারই কবিতা।

লেখা যায় না। খালি সল্‌তেটা পুড়ে পুড়ে নিঃশব্দে হ'লে দীপ নিবে যায়।

বিকেলের দিকে অমর সরোজের বাড়ী গেল। পাশেই বাড়ী,—লাগাও টিনের ঘরে একটা গাড়ি পর্য্যন্ত আছে।

শ্বেত পাথরের মেঝে,—দুটো দেয়াল প্রায় বইয়ে ভরা,—ছবি খান তিন চার, সেক্সপীয়র, শেলি আর বার্ণার্ড শ'র। একটা চেয়ারের ওপর বই গাদা করা,—মেঝেতে কাৎ হ'য়ে শুয়ে সরোজ, একৃজামিনের পড়া পড়ছে। আর ঘরের এক কোণে ষ্টোভ্ জালিয়ে তার বোন্ চায়ের জল গরম করছে আর দাদাকে বকছে সিগারেট খায় ব'লে।

অমরকে ঘরে ঢুক্তে দেখে মেয়েটি আরো খানিকটা জল কেটুলিতে ঢেলে দিয়ে বল্লে—যাই বল দাদা, বোহিমিয়াটা আর যাই হোক্ আমাদের বহরমপুরের মতোই খানিকটা। নইলে—

সরোজ উঠে প'ড়ে বল্লে—এস, অমর বসো।……তুই লক্ষ্মী দিদি, পরেটা ভেজে দিবি আমাদের? দেখ না চট ক'রে—

বোন্ চ'লে গেলে সরোজ তাড়াতাড়ি দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে শুধোল—এম্নিই কি এসেছ, না কোনো কাজ আছে?

অমর সোজা হ'য়ে বল্লে—আমাকে কয়েকটা টাকা দাও,—এই গোটা কুড়ি।

সরোজ হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—লুসাই, লুসাই, ও লুসী!

বোন্ দু'হাতে ময়দার ড্যালাটা নিয়ে এসে পর্দ্দার ফাঁকে চোখ রেখে বল্লে—কি হুকুম মশাইয়ের?

সরোজ বল্লে—চাবিটা দিয়ে দেরাজ থেকে কুড়িটে টাকা বার ক'রে দে ত শিগ্‌গির।

ঘরে ঢুকে ময়দা চট্‌কাতে-চট্‌কাতে লুসী বল্লে—কিসের জন্যে শুনি?

—উড়োতে। তুই দে খুলে। ফফরদালালি করিস্ নে।

দেরাজ খুল্তে খুল্তে লুসী বল্লে—দাঁড়াও না। দিচ্ছি এবার। ঠিক মতো হিসাব দিতে না পার্লে রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কে চা ক'রে দেয়, দেখব।

ব'লে চ'লে গেল। পর্দ্দাটা খানিক দুলে স্থির হ'ল।

টাকা দিয়ে সরোজ বল্লে—যদি আবার বিপদে পড় বল্তে সঙ্কোচ ক'র না।—

চা খেতে-খেতে অমর ভাবছিল সংসারে এ একটা কি চমৎকার ব্যাপার? উজ্জ্বল স্বাস্থ্য,—স্বচ্ছল অবস্থা,—কল্যাণী বোন্! নাম তার লুসী!

পেছন থেকে কে অতি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্‌ছিল—একটা নতুন কাগজ বেরিয়েছে, যদি নেন্—

সরোজ মুখ ফিরিয়ে দেখলে—অমর। খালি পা, যে ন্যাকড়া দিয়ে কালি-পড়া লণ্ঠন মোছে তেম্নি কাপড় পরনে,—হাঁপানির টানে ঝর্‌ঝরে পাঁজর দুটো ঝেঁকে উঠছে,—কথা কইতে পার্‌ছে না।

সরোজ তক্ষুনিই কাগজটা নিয়ে দাম দিল, কথা কইল না কোনো। বরঞ্চ ভারি লজ্জা কর্‌তে লাগল ওরই।

ট্রাম চল্‌ল। চলন্ত গাড়ি থেকে নাম্‌তে গিয়ে অমর পা পিছলে প'ড়ে যেতেই সবাই রোল ক'রে উঠল। হাঁটুটা চেপে ধ'রে 'কিছু-না' ব'লে অমর কাগজের বাণ্ডিলটা নিয়ে কাশতে লাগল। পরে ভিড়ের মধ্যে কোথায় উধাও হ'য়ে গেল। সরোজ নেমে আর খোঁজ পেলে না তার।

ফুস্‌ফুসটা যেন কে চুষে শুষে ফেলেছে।

অমর একটা গাছতলায় দুটো হাত মাটিতে চেপে টান্ হ'য়ে ব'সে আকাশের বাতাস নেবার জন্যে গলাটা উঁচু ক'রে ধরেছে। কে যেন ওর টুটিটা টিপছে, ভিজা গামছার মতো ফুস্‌ফুস্‌টা চিপে ফেল্‌ছে।

কাগজের বাণ্ডিলটার ওপর মাথা রেখে শুতে যেতে দেখে—পাশাপাশি দুটো বিজ্ঞাপন। একটা এক ছাত্র পড়াবার জন্যে, আরেকটা কোন্ অরক্ষণীয়া পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। যেমন-কে-তেমন হ'লেই চলে—ঠিক এই কথা লেখা আছে।

টান্‌টা যদি একটু পড়ে বিকেলের দিকে,—অমর ভাবছিল,—তবে কোথায় গিয়ে আগে আর্জি পেশ কর্‌বে? টিউশানির খোঁজে, না পাত্রীর?

আগে ভাবত—এক মুটো ভাত একখানি কুঁড়ে ঘর, আর-একটি নারী। এখন মনে পড়ছে আরোও কত কথা। হাঁপানিতে ভুগবে না, ঝড়ে কুঁড়ের চাল উড়ে যাবে না, ভাতে রোগের বীজ থাক্‌বে না, নারীর ঠোঁটে কালকূট থাক্‌বে না। এত! তবে।—

ক্লান্ত কাক ককায়, আর ককায় ও কাশে মাটির ওপর মায়ের ছেলে।

পাঁজরা ছুটো খানিক জিরোলে তারপর কষ্টে পথ চল্‌লে। চল্‌তে চল্‌তে প্রথম ঠিকানাটাতেই ঠিক ক'রে এল—যেখানে মাষ্টার চায়।

বাড়ীর কর্ত্তা ঘাড় বাঁকিয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ ক'রে শুধোলেন—কদ্দূর পড়া হয়েছে?

অমর বল্লে—বি-এ পড়ছি।

—কাল্‌কে আই এর সার্টিফিকেটটা নিয়ে এস। দেখা যাবে।

একদিন খুব জোরে হাঁপানি উঠলে মা রাগ ক'রে অমরের গলার সবগুলি মাছুলি ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল, আর অমর রাগ ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছিল—ম্যাট্রিক আর আই-এর সার্টিফিকেট্ ছুটো।

মাছুলিগুলির মধ্যে একটা সোনার ছিল বলে' মা তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন, অমরও ভালো হ'য়ে এক সময়ে সার্টিফিকেট ছুটোর ছেঁড়া খণ্ডগুলি কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিল একটা চোকো-লেফাফায়। আঠা দিয়ে সেই সার্টিফিকেট আজ জোড়া দিতে বস্‌ল।

কর্ত্তা বহুক্ষণ সার্টিফিকেট্‌টা নেড়ে চেড়ে দেখে জাল নয় প্রতিপন্ন করে' বল্লেন—কিসে ছিঁড়ল?—

—একটা ছোট্ট দুষ্ট বোন আছে,—নাম লুসাই,—দুষ্টুমি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছে।

কর্ত্তা ঘাড়টা বার চারেক দুলিয়ে বল্লেন—আচ্ছা বাপু, বানান্ কর ত' থাইসিস্'।

পরে বল্লেন—বেশ। বল ত' ডেনমার্কের রাজধানীর নাম কি? আকবর কত সালে জন্মেছিল? এখান থেকে কি করে' ডিব্রুগড় যেতে হয়?

অমর বল্লে—আমি ত পড়াব ইংরিজি আর অঙ্ক। আমাকে এ সব প্রশ্ন কেন করছেন?

কর্ত্তা খাপ্পা হ'য়ে বল্লেন—আজ-কালকার ছেলেগুলো ছু-পাতা মুখস্ত ক'রেই পাশ মারে। আমাদের সময় আমরা কত বেশী জান্‌তাম।

কর্ত্তার ছেলে পাশেই ছিল। একটু বেয়াড়া রকমের। বল্লে—যা যা জান্‌তে তাই বুঝি জিজ্ঞেস করছ বাবা। মাষ্টারদের যে প্রশ্নটা ভালো করে' জানা থাকে, সেইটেই পরীক্ষায় দেন, আমি বরাবর দেখছি। যেন কাগজ দেখবার সময় অসুবিধায় পড়তে না হয়।

বাপ একটু দ'মে গিয়ে বল্লেন—আচ্ছা, একটা ইংরেজি রচনা লেখ ত,—দেখি তোমার ইংরিজির কত দৌড়। একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয় ত' টুনু।

অমর বল্‌লে—কি লিখব? ক পাতা?

কর্ত্তা বল্লেন—লেখ, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি। একশ শব্দের বেশি নয়। এরকমই আসে পরীক্ষায়।

টুনু একটু হেসে বল্লে—বাবা, যোলো 'থিয়োরেম' থেকে একটা 'এক্সট্রা' দাও না কষতে।

বাপ চ'টে বল্‌লেন—যা, ও সব কি দেব? দেক মানসাঙ্ক।

টুনু জোরে হেসে বল্‌লে—ওটা বুঝি তুমি জান না?

কর্ত্তা রচনার কি বুঝলেন, তিনি জানেন,—তবে দেখলেন হাতের লেখাটা বেশ পরিষ্কার। বল্‌লেন—বেশ। তবে কি না, ইতিমধ্যে একজন বহাল হ'য়ে গেছে। নইলে তোমাকেই নিতুম।

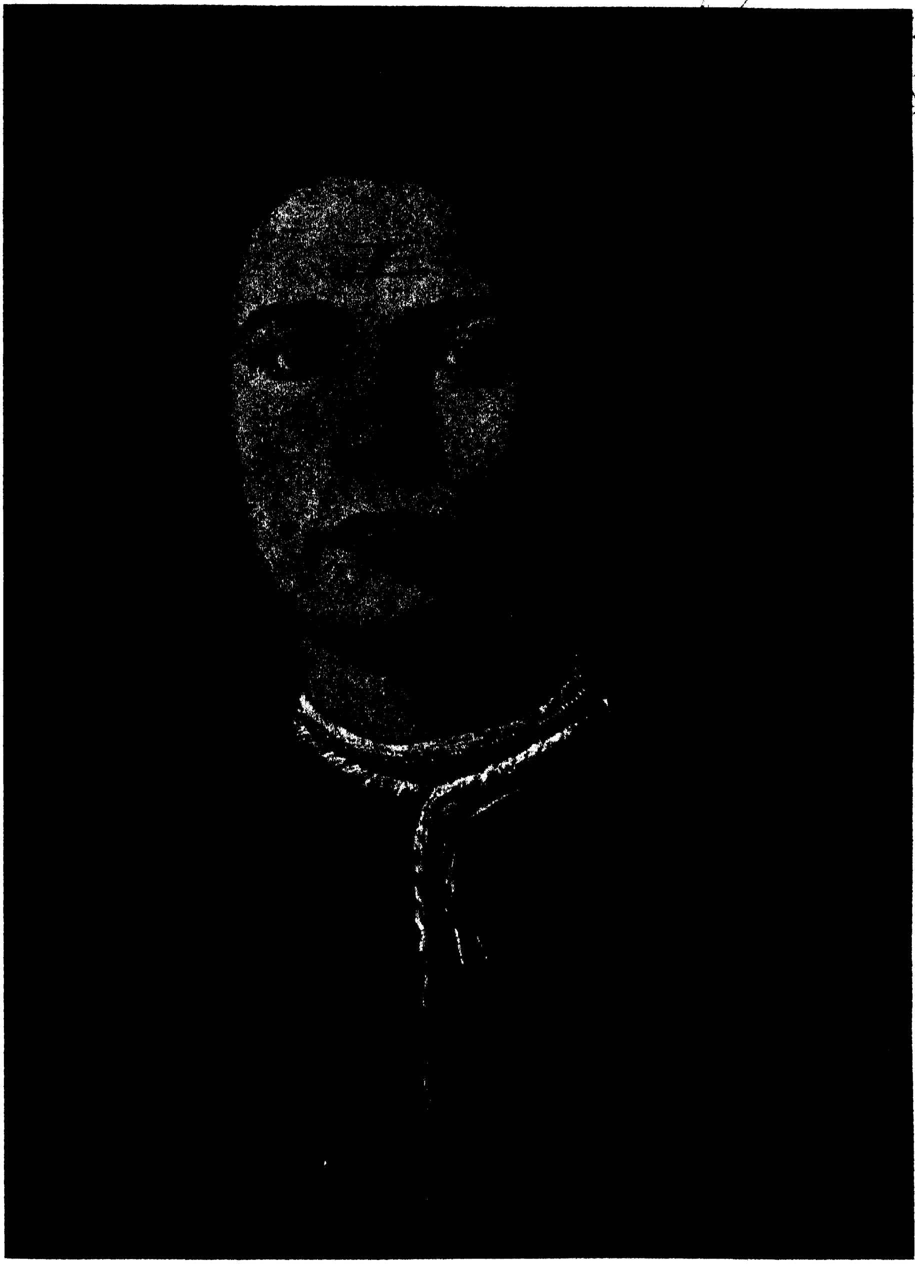
টুনু অস্ফুটস্বরে বল্‌লে,—কিন্তু বাবা, ইনি ভালো, এঁকে আমার—

অমর শুধু বল্‌তে পার্‌লে—এ সব কেন লেখালেন তবে?

কর্ত্তা বল্‌লেন—লেখা ত তোমাদের অভ্যেস্ হ'য়ে আছে। কালে ত জীবনের পেশাই হবে। বরঞ্চ সাবেক কালের এণ্ট্রান্স পাশ করা বুড়োর কাছে একটা রচনা দেখিয়ে নিয়ে তোমার লাভই হ'ল। একটু প্রাক্‌টিস্‌ও হ'ল লেখার। তা ছাড়া রচনার 'সাব্‌জেক্ট' টা ত খুবই ভাল,—কি বল? জান হে বাপু, সে-কালের এণ্ট্রান্স তোমাদের এ কালের পাঁচটা এম্-এর সমান,—সেটি মনে রেখো।

অমর বল্লে এবার—উনি কততে পড়াবেন?

—পনেরো টাকা।



কিশোর

শিল্পী সান্দ্রো বত্তিচেল্লী

(১৪৪৪-১৫১০ খৃষ্টাব্দ)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

—আমাকে দশটা টাকা দেবেন না হয়। দরকার হয় দু' বেলা এসেই পড়াব দু'ঘণ্টা ক'রে।

টুনু বল্লে—হ্যাঁ বাবা, এঁকেই—

কর্ত্তা বল্লেন—বেশ আস্‌বে কাল। আর শোন, এ ফোর্থ ক্লাশে পড়লে কি হবে, এদের ইংরিজিটা বেশ একটু দাঁত-কামড়ানো। বাড়ী থেকে একটু প'ড়ে আস্‌বে রোজ। আর আমি কাল সকালবেলাই একটা রুটিন্ ক'রে রাখ্‌ব,—কবে আর কখন কি পড়াতে হবে। বুঝলে? একটু ঝিমিয়ো কম।

রোজ শেষ রাত্রেই টান্‌টা টেনে আসে। তাই নিয়েই অমর বেরিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি, পাছে আগের ঠিক করা মাষ্টার চেয়ার বেদখল ক'রে নেয়,—দশটাকা থেকে নটাকা বারো আনায় নেবে।

কেওড়া-কাঠের একটা থুথ্‌রো তক্তপোষ,—ওপরে একটা চাটাই পর্য্যন্ত নেই। ফাঁকে ফঁকে ছারপোকাদের বৈঠকখানা বসেছে।

কর্ত্তা একটা জল-চৌকি টেনে নিয়ে কাছে ব'সে বল্লেন—এই রুটিন্ ক'রে দিয়েছি, দেখে নাও। ঐ চারঘণ্টা ক'রেই রইল,—সকালে দুই, বিকালে দুই। নইলে ত সেই মাষ্টারকেই রাখতাম,—দিব্যি চেহারা, দেখলেই মনে হয় ছেলে মানুষ কর্‌তে পার্‌বে। এম্-এ পাশ।

পরে বিড়বিড় ক'রে বল্লেন—এখুনিই এসে পড়বে হয়ত। একটা ভাঁওতা মেরে দিতে হবে।

দর্‌জা ঠেলে ভেতরে যে এল,—অমর তাকে দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে গেল,—মহীন্। বোধ হয় বেচারা অনেকদিন আউটরাম ঘাটে গিয়ে চা খেতে পারেনি, তাই বুঝি এ চাক্‌রিটা বাগাতে চেয়েছিল।

অমর প্রশ্ন কর্‌লে—তুই কবে এম-এ পাশ কর্‌লি মহীন্?

মহীন্ সিল্কের রুমাল বা'র ক'রে ঘাড়ের ঘাম মুছে বল্লে—তুই পাশ করিস্‌নি নিশ্চয়। পনেরো তা হ'লে আর জোটেনি। 'থাইসিস্' বানান পেরেছিলি ত?

ব'লেই বাইকে ক'রে ছুট দিলে।

কর্ত্তা বল্লেন—দেখলে কাণ্ডটা। ভাঁড়িয়ে জোচ্চুরি ক'রে ঠকাতে এসেছিল,—ভাগ্যিস রাখিনি। পরে চৌকিটা আরো একটু কাছে টেনে বল্লেন—পড়াও ত বাপু, শুনি।

ছেলে বল্লে—তুমিও আমার সঙ্গে পড়বে নাকি বাবা?

কর্ত্তা বল্লেন—দেখি না কেমন পড়ায়,—মানেগুলো সব ঠিক বল্‌তে পারে কি না। হ্যাঁ, আরম্ভ ক'রে দাও,—

অমর বল্লে—কি ভাবে আরম্ভ কর্‌ব, তাও যদি ব'লে দেন।

কর্ত্তা ঘাড় চুল্‌কে বল্লে—তা হ'লে আর তোমাকে মাষ্টার রেখেছি কেন?

—কি হ'লে আপনার মনোমত হবে, তাও ত একান্ত জানা দরকার দেখছি। নইলে—ছেলে রেগে বল্‌লে—আমি আজ কিছুতেই পড়ব না বাবা, তুমি এরকম কর্‌লে। তুমি যাও চ'লে।

তৃতীয় পক্ষের ছেলে। বাপ জলচৌকিটা নিয়ে চ'লে গেল।

যাওয়া মাত্রই ছেলে উঠে দরজায় খিল্ এঁটে একটা বালি-কাগজের ছেঁড়া খাতা বার ক'রে বল্লে—একটা কবিতা লিখেছি মাষ্টার মশাই। শুনবেন? একটা হাঁস দুই সাদা ডানা মেলে জলে ভাস্‌ছিল,—কতগুলি পাজি ছেলে তাকে ধ'রে কেটেকুটে কাটলেট বানাচ্ছে—

সুকুমার ছেলে—দুটি কালো চোখে সুগভীর সুদূর কৌতূহল, যেন দুটি মণির প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকারে কি অনুসন্ধান কর্‌ছে।

অমর শুধু বল্লে—এখন ওসব থাক্। এবার পড়ি এসো।

ছেলে অবাক্ হ'য়ে বল্লে—কেন বলুন ত,—বাবা কবিতার নাম শুনে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খড়ম নিয়ে তেড়ে আসেন, মা প'ড়ে প'ড়ে কাঁদেন,—আর আপনিও কবিতা ভালোবাসেন না? তবে, আমাদের বইয়ে এত কবিতা লেখা কেন? শুনেছি, আমাদের দেশে এক প্রকাণ্ড কবি আছেন, তিনি না কি ছেলেবেলায় আমার মতো ইস্কুল

পালাতেন। আমার ইস্কুল একটুও ভালো লাগে না,—যেন খানিকটা কুইনিন্।

গায়ে খাঁকি সার্ট, পরনে ফিন্‌ফিনে কাপড়, কুচকুচে কালো পাড়,—খালি পা,—চোখের পাতার ওপরে বড় একটা তিল।

অমর জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার নাম কি ভাই?

—কিশলয়। বড়দি রেখেছিল। বড়দিই ত আমাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছিল। ওঁর মরার পর আমি একটা লিখেও ছিলাম,—দেখবেন সেটা? উনি দেখে গেলে কত সুখী হতেন যে, অন্ত নেই।

—তুমি কি আজ পড়বে না?

—রোজই ত পড়ি।—দেখুন ছেলেবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম,—তারার বিষয়, ইংরিজিতে। আমার ভালো লাগেনি। তারাকে আমার কি মনে হয় জানেন? যেন কারা অনেকগুলি বাতি জ্বালিয়ে নীচের মানুষদের খুঁজছে, যারা বড়দির মতো কেঁদে কেঁদে ম'রে গেল। আমার এক এক সময় মনে হয় ঐ বড় তারাটা যেন বড়দি। এখান থেকে একজন যায়, আর আকাশে একটি ক'রে বাড়ে। আমি ঐ তারাটাকে নিয়ে কতদিন একটা কবিতা লিখব ভাবছি, পারি না। হয় না।

অমর অঙ্কের খাতাটা মুড়ে রেখে বল্লে—নিয়ে এস ত ভাই তোমার কবিতার খাতাটা।

পুরো মাস গুজরানো হয়নি,—দিন বারো পড়ানো হয়েছে মাত্র। পয়লা তারিখ অমর হাত পাতলে মাইনের জন্য।

কর্ত্তা বল্লে—সাত তারিখের আগে হবে না। হ'তে হ'তে সতেরো তারিখে এসে ঠেক্‌ল।

অমর অবাক্ হ'য়ে বল্‌লে—বারো দিনের মাইনে এই তিনটাকা সাড়ে তিন আনা?

কর্ত্তা ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লে—কেন হিসেবের এক চুলও ভুল বার করতে পারবে না। নিয়ে এসো ত কাগজ, একটা রুল অফ থ্রি ক'রে ফেল। দু'দিন আসনি,—তা ছাড়া একদিন সাত মিনিট আর দু'দিন সাড়ে চার মিনিট লেট ক'রে এসেছিলে—

অমরের ইচ্ছা হ'ল মারে ছুঁড়ে টাকা তিনটা। কিন্তু মার পরনের কাপড়টা একেবারে ছিঁড়ে গেছে—পুরোনো বইয়ের দোকানে সস্তায় একটা খুব ভালো বই দেখেছিল, যাবার সময় সেটাও কিনে নিয়ে যেতে পারে।

সকাল বেলাতেই হাঁপানি উঠেছিল সেদিন। তবুও কুঁজো হ'য়ে ঢিকোতে ঢিকোতে পড়াতে চল্‌ল। কিশলয় বল্লে—আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে? বুকে হাত বুলিয়ে দেব।

—দাও।

কতগুলি বই গাদা ক'রে তার ওপর মাথাটা রেখে অমর শোয় আর কিশলয় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্প শোনে—

শেলিকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বায়রণকে দেশ থেকে। ন্যুট হামসুন ট্রাম-কণ্ডাক্টারি করত। ডস্টয়ভস্কিকে ফাঁসি কাঠে তুলে নামিয়ে দিয়েছিল,—গোর্কি থাকত উপোস ক'রে,—মুসোলিনি ভিক্ষা করত পুলের তলায় ব'সে।—

কিশলয় উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে শুনতে বুকের আরো অনেক কাছে এগিয়ে আসে।

অমর ঐ সুকোমল সুচারু বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির পানে চেয়ে চেয়ে অনেক কথা ভাবে,—হয়ত এর মধ্যে ভবিষ্যতের ঋষি কবি তন্ময় হ'য়ে আছেন।

হঠাৎ দু'জনে শিউরে আঁৎকে উঠল—জানালায় কার পকোনো ঝাঁঝালো দুই চক্ষু দেখে।

কর্ত্তা বন্ধ দরজায় পা দিয়ে ধাক্কা মেরে বল্লেন—খোল্ দরজা শিগগির—

কিশলয় ভয়েভয়ে দরজা খুলে দিলে।

কর্ত্তা এক ঝাঁকানিতে অমরের হাতটা টেনে শোয়া থেকে তুলে দিয়ে দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ব'লে উঠলেন, না পড়িয়ে শুয়ে শুয়ে উনি কবিতা শোনাচ্ছেন। গরচা পয়সা দেওয়া হয় কিসের জন্য শুনি? নবাবজাদার মতো তক্তপোষে গা ছড়িয়ে জিরোবার জন্য নয়। যাও বেরিয়ে এক্ষুনি—

অমর বল্লে—তবে বাকি মাইনেটা দিয়ে দিন—

—মাইনে দেবে না, আরো কিছু। যা বাকি ছিল,

সমস্ত এই বেয়াদবির জন্য ফাইন,—কিছু পাবে না, যাও চ'লে।

দেনা টাকাটা দিয়ে নিশ্চয় আরেকবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে।

পশলার বৃষ্টির পর ঘোলা আকাশে চাঁদ উঠেছে,—মরা, মিউনো,—পথের পাঁককে ঠাট্টা করতে।

হাঁপানির টানে কাঁকড়ার মতো কুঁকড়ে অমর নিঃশ্বাসের জন্য ফুসফুসের কসরৎ করছিল।

চোখ বুজে খালি একটি ছবি আজও দেখছে—বিষণ্ণ, অথচ একটি সুকোমল ছবি।

বন্ধু মৃত্যু শয্যায়। অমর দেখতে গিয়েছিল। শেফালির মতো শাদা ধবধবে বিছানা,—তার ওপর এলিয়ে আছে ক্লান্ত তনুর কমনীয় কান্তি,—ভাটায় জল-স্রোত যেন জিরোচ্ছে। চারপাশে রাশি রাশি ফুল স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে,—বাতাস মন্থর হ'য়ে গেছে তাই। কারো মুখে একটি রা নেই, সবাইর মুখে নম্র বেদনার শীতল একটি ছায়া,—সমস্ত গৃহে বিষাদপূর্ণ একটি মহাশান্তি। শিয়রের ধারে খান কয়েক বই,—আত্মীয়ের মত শুদ্ধ বেদনায় ঘেষাঘেষি ক'রে বসেছে, আর কয়েকখানি পুরোনো চিঠি। নিষ্ঠুর ডাক্তার পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা ক'রে আছে—মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে।

শুধু, পায়ের ওপর দুটি হাত রেখে একটি দুঃখী মেয়ে বোবার মতো ব'সে আছে,—যেন বিসর্জ্জনের প্রতিমা। মুখখানি ভারি মলিন ও উদাস, তাইতে এত সুন্দর।—মা নয়, বোন্ নয়, বউ নয়, যেন আর কেউ।

অমরের সেদিন মনে হয়েছিল,—মৃত্যুও একটা বিলাসিতা। মেয়েটির বুকের ব্যাথাটি যেন এক অমূল্য বিত্ত। এ ত মরা নয়, মিশে যাওয়া। যেমন মিশে যায় ফুলের গন্ধ বাতাসে,—যেমন গ'লে যায় সূর্য্যাস্তলালিমা অন্ধকারে।

সন্ধ্যায় টান্‌টা ফের পড়লে অমর বালিশের তলা থেকে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি বের ক'রে ঠিকানা ঠাহর করতে চলল।

মা প্রশ্ন করলেন—কোথা যাচ্ছিস্?

—পাত্রীর খোঁজে। তোমার কতদিনের ইচ্ছা। অপূর্ণ রাখা অনুচিত মনে হচ্ছে।

এককালে অবস্থা ভালো ছিল; বাড়ীর চেহারা দেখলে বুঝা যায়। এখন একেবারে গঙ্গাযাত্রী বুড়ি।

এখনো পাত্র জোটেনি। অমরের যেন একটু আসান হ'ল।

বহু কথা-বার্ত্তার পর শ্যামাপদবাবু বল্লেন—ছেলেটি কি করেন? কত চাহিদা?

—বি-এ পড়ে। এতদিন মা'র গয়না বাঁধা দিয়ে চল্‌ছিল—আর চলেনা। চাহিদা,—পড়া খরচ দু' বচ্ছর,—আর নগদ হাজার খানেক টাকা।

শ্যামাপদবাবু তাতেই স্বীকৃত ছিলেন। তার কারণ আছে,—দরাদরি করতে গিয়ে কেবলই দাঁও ফস্‌কেছে। তা ছাড়া মেয়ের ইতিহাসও বড় ভালো নয়; দেখতে ত নিতান্ত কুরূপাই,—এত কুৎসিত, যে, ঘাটের মড়ার পর্য্যন্ত নাকি দাঁতকপাটি লাগে।

অমর বল্লে—ছেলেটির কিন্তু এক ব্যারাম আছে,—হাঁপানি। প্রায়ই ভোগে।

শ্যামাপদ বাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে—এমন আর কি শক্ত ব্যায়রাম। ওতে ত আর কেউ মরেনা। বয়েস কালে সেরেও যেতে পারে। তা, আপনি কি ছেলের বন্ধু, মেয়ে দেখে যাবেন একেবারে?

অমর বললে—আজ্ঞে না, আমিই পাণিপ্রার্থী,—ওটা একেবারে বিয়ের রাতে সেরে ফেললেই চলবে। দিন ঠিক ক'রে খবর দেবেন আমাদের, ঠিকানা রইল।

শ্যামাপদ-বাবুর মনে অনেক প্রশ্ন ঘুলিয়ে উঠলেও কোনোটাই আমোল দিলেন না। খালি মেয়ে পার করতে পারবেন,—তাও অবশ্যি বাষট্টি বছরের বুড়োর কাছে নয়,—এই খবর গিন্নির কানে দিতেই গিন্নি উলু দিয়ে উঠলেন। বাড়ীতে সোরগোল প'ড়ে গেল। বাড়ীর এক কোণে একটি কুৎসিত কালো মেয়ে দীপশিখার মতো কেঁপে উঠল খানিক।

মা বললেন—জানা শোনা নেই, কেমন না কেমন মেয়ে,—একেবারে কথা দিয়ে এলি?

অমর রাগ ক'রে বল্‌লে—আর তোমার ছেলেই বা কি গুণধর মা, যে একেবারে পরী তার ডানা দুটো স্বর্গে ফেলে রেখে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফিটনে চ'ড়ে তোমার পদ্মবনে এসে দাঁড়াবেন। শাঁখ বাজাও মা। গুণে গুণে হাজারটি নগদা টাকা,—আর দু' বচ্ছর পড়া খরচ।

মা অপর্য্যাপ্ত খুসি হ'য়ে গেলেন। বিয়ে হ'য়ে গেলে কাশী যাবেন, এমন সঙ্কল্পও সম্ভব হ'ল।

অমর বল্‌লে—তোমার ছেলের এই ত চেহারা,—একটা আরশুলার চেয়েও অধম। তার ওপর বুকের পাঁজরায় ঘুন্ ধরেছে। যা পাও, তাই হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ো।

মা বল্লেন—মেয়ে যদি খোঁড়া হয়?

—কি যায় আসে তাতে? তোমার ছেলে যে কুঁজো। টাকাগুলি ত' চকচকে হবে।

সরোজ বল্‌লে—কবে প্রেমে·পড়লে হঠাৎ? ফর্‌দা হাওয়ায় পর্দ্দা বেফাঁস হ'য়ে গেল বুঝি?

লুসী সে ঘরে ব'সেই সেলাইর কল চালাচ্ছিল, বল্‌লে—কবে পড়েছেন উনি পাঁজি দেখে তারিখ লিখে রেখেছেন কি না! আর জন্মে পড়েছিলেন, এ-জন্মে পেলেন।

সরোজ বল্‌লে—পড়তে মন যাচ্ছিল না মোটেই, ঘুম পাচ্ছিল। লুসীকে বল্‌লাম,—কল চালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে দিদি। এবার থামাতে পারিস্, আমি অমরের সঙ্গে বেরোচ্ছি। দে ত চাবিটা।

দুই বন্ধু বেরিয়ে গেল।

পিঠের ওপর চুল মেলা, মান্দ্রাজি মেয়েরা যেমন ক'রে শাড়ী পরে তেমনিই ধরণ শাড়ী পরার, দুটি হাতে সোনার কঙ্কন, স্ঁচে স্তো পরাবার সময় চোখের কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ললাটে আভা।

ঘুরে ঘুরে অনেক জিনিষই সওদা করলে দু'জন,—বাক্স বোঝাই ক'রে। টোপর পর্য্যন্ত। তিনটে মুটে।

ফের্‌বার মুখে আরেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বয়সে কিছু বড়।

অমরকে জিজ্ঞাসা করলে—কি করছ আজকাল?

—বিয়ে কর্‌ছি। চূড়ান্ত। আর তুমি? টিউশানি পেলে?

—পেয়েছি একটা। যৎসামান্য। ঐ গলির বাঁকের লাল বাড়ীটা।

—ও! কত দেয়?

—কিঞ্চিৎ। ল-কলেজের মাইনে সাড়ে সাতটাকা।

সরোজ চোখ বড় ক'রে বল্‌লে—সাড়ে সাতটাকা?

লজ্জিত না হ'য়েই বল্‌লে বন্ধু—হ্যাঁ, তাই সই। মাইনেটা ত' চ'লে যায়। আর কি বেয়াড়া এঁচড়ে-পাকা ছেলেই পড়াতে হয়, ভাই। এইটুকুন্ বয়েস থেকেই পদ্য মেলাতে শিখেছে। ভাগ্যিস্ বাপ মা'র 'নাই' নেই এতে, নইলে উচ্ছন্নে যাবার সুড়ঙ্গ খোঁড়া হচ্ছিল আর কি! মা ব'লে দিয়েছেন, ফের পদ্য মেলালে বেত মার্‌তে। তিনটে খাতা প্রায় ভর্‌তি ক'রে ফেলেছে ভাই। সব গুলি পুড়িয়ে ফেলেছি কাল।

অমর বল্‌লে—খুব কাঁদ্‌লে?

—বাপের চড় চাপড়ও ত কম খায়নি। মা তার হাতের শিল নিয়ে পর্য্যন্ত তেড়ে এসেছিল। কবিতা লিখতে গিয়েই না ছেলেটা এবার অঙ্কে একেবারে গোল্লা পেলে।

অমরের মনে পড়্‌ছিল, সেই খাকি সার্ট, কোমরে কাপড়ের সেই ছোট আল্‌গা বাঁধুনিটি,—সেই তরল জ্যোৎস্নার মতো দুটি চোখ, সেই বালি-কাগজের ছেঁড়া-খোঁড়া খাতাটা, পেন্সিল দিয়ে লেখা কবিতা, নাম "বড়দি বা বড় তারা",—একদিন ছোট্ট কচি হাতখানি দিয়ে বুকটা আস্তে একটু ড'লে দিয়েছিল।

অমর ডাক্তারের কাছে গিয়ে বল্‌লে—রোজ শেষ রাত্রেই হাঁপানিটা চেগে আসে। একটা ইন্‌জেকশান দিয়ে দিন, যাতে অন্ততঃ আজ রাতটা রেহাই পাই। আজ আমার বিয়ে কি না।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন বটে। যাবার সময় অমর টেবিলের ওপর একটা নিমন্ত্রণপত্রও রেখে গেল।

বউ-ভাতে ত' কাউকে খাওয়াতে পারবে না, তাই যার

সঙ্গে একটি দিনের জন্যেও প্রীতি-বিনিময় হয়েছিল তাকে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করলে। টাইম্-অনুসারে একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া ক'রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করতে কি সুখ!

রাজা।

কেন নয়? সবাইর চেয়ে উঁচু জায়গায় আসন, সামিয়ানা খাটানো, তাতে তিনটে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে, ফুলদানিতে বিস্তর ফুল, গলায় প্রকাণ্ড মালা, গায়ে সিল্কের দামী জামা, জীবনে এই প্রথম পরেছে, পায়ে চৌদ্দ টাকা দামের জুতো,—দু-মাস টিউশানি ক'রে যা জোটেনি।

ছেলেরা চেঁচামিচি করছে, মেয়েরা প্রজাপতির মতো উড়ছে ও বর্ষার জলধারার মতো কলরব করছে। বন্ধুরা এসে ঠাট্টা ইয়ার্কি ক'রে যাচ্ছে। চিকের পেছনে বর্ষীয়সী মেয়েদের ভিড় লেগে গেছে,—উলু দিয়ে দিয়ে গলা ভেঙে ফেলছে। উলু দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বরটা বিকৃত হ'য়ে গেল দেখে একটি মেয়ের স্রোতের মতো কি স্বচ্ছ হাসি!

এ বাড়ীতে আজ যেখানে যা হচ্ছে সবই ত অমরের জন্য। খাবার নিয়ে আস্তাকুঁড়েতে কুকুরগুলি যে লড়াই বাধিয়েছে, তাও। যা কিছু বাজনা, যা কিছু হাসি, যা কিছু কোলাহল!

ঐ যে নিভৃতে দাঁড়িয়ে একটি কিশোরী ওর দুটি হাত তুলে ওর চুলের খোঁপাটা ঠিক ক'রে গুছিয়ে নিচ্ছে, চুলের কাঁটাগুলি ফের ভালো ক'রে গুঁজে দিচ্ছে,—সেও ত তারই জন্য!—অমর ভাবছিল। নইলে আজ রাত্রে মেয়েটি কখনো এই নীল শাড়ীটি পরত না, মাথায় কখনো গুঁজত না ঐ শ্বেতপদ্মের কুঁড়ি।

শুভদৃষ্টির সময় সবাই বললে বটে, কিন্তু অমর ঘাড় গুঁজে রইল, মুখ তুলে চাইল না। পাছে ভুল ভেঙে যায়! খালি একটি কথাই মনে পড়ছিল তখন।

লুসী জিজ্ঞাসা করেছিল—কি নাম আপনার বউয়ের?

অমর বলেছিল—অনুপমা।

লুসী খপ ক'রে ব'লে ফেলেছিল—ওমা! আমারো ভালো নাম যে তাই। ব'লেই রাঙা হ'য়ে উঠে মুচকে হেসেছিল একটু।

পাছে তেম্‌নি রাঙা হ'য়ে উঠতে না পারে। পাছে—

অনুপমা নিজে কুৎসিত হ'লেও আশা করেছিল ছবির পাতায় রাজপুত্রের যে ছবি দেখেছিল,—পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া না হ'লেও তেম্‌নিই সুকান্ত হ'বে তার প্রিয়তম! ভাবলে—ক'ড়ে আঙুল দিয়ে কপালে এক টোকা মারলেই ঘাড়গুঁজে প'ড়ে যাবে বুঝি।

তবুও ত স্বামী। ডাক্তার এসে আর দড়ি দিয়ে কপাল বেঁধে দেয় না, সারারাত্রি অনুপমাই কপাল টিপে দেয়। কখনো অনাবশ্যক বল প্রয়োগ ক'রে বসে। রাগ ক'রেই হয়ত।

অমর সব চেয়ে ঘৃণা করত নিজের এই কদর্য্য ব্যাধি-টাকে। আর ঘৃণা করে, যে মুখটা তার সত্যিই বত্রিশটা দাঁত আছে কিনা অন্যকে গুণে দেখবার জন্য সর্ব্বদাই মেলে রয়েছে,—সেই মুখটাকে। অনুপমা নাম বদলে নাম রেখেছে তিলোত্তমা!

মা কেঁদেছিলেন বটে একটু, এক ফাঁকে এক এক ক'রে নোটগুলি গুণেও নিয়েছিলেন বার চারেক।

হঠাৎ একদিন কয়েকখানি আঁচলের খুঁটে বেঁধে কাশী চ'লে গেলেন। ব'লে গেলেন—বউ ত হয়েছে। রেঁধেও দেবে, বুকে মালিশও করবে। আমি দিন কতক ধর্ম্ম ক'রে আসি, জিরিয়েও আসি।

শ্যামাপদবাবু এসে মেয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। অমর আপত্তি করলে না। বললে—এ ক'দিন না হয় কোনো একটা মেসেই থাকব। কারো হাত বুলিয়ে না দিলেও চলবে। তবে শিগগিরই যেন আসে।

বাড়ী ফিরে এসে শ্যামাপদবাবু মনে মনে বলছিলেন —এবার মর্, মর্, বিধবা হ,—বাবাঃ, কাঁটাটাত' খসেছে গলা থেকে! বন্ধুদের বল্লেন—ছুম'ণ বস্তাও পিঠে ক'রে বওয়া যায়—কিন্তু এই কুৎসিত মেয়েটা কি হায়রানি ক'রেই মেরেছিল! তবু যদি—

তারপরের ব্যাপারটা একটু আকস্মিক বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

সন্ধ্যার দিকে রাস্তাতেই খুব জাঁক ক'রে হাঁপানি উঠে গেল। একটা গাড়ি ঠিক করতে রাস্তার মধ্যে আস্তেই বেহুঁসের মত একটা মোটর অতি আচমকা একেবারে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল কাঁধের উপর। তার পর ঘষড়াতে ঘষড়াতে—

শ্যামপদবাবুর কাছে খবর গেল। অনুপমা একবার যেতেও চাইল কেঁদে। বাপ বুঝিয়ে বল্লেন—এখন গিয়ে কি আর এগোবে বল? গঙ্গায় না হোক্ কলতলাতেই শাঁখা ভাঙলে চল্‌বে। পানটা আর চিবোস্‌নি, মা।

মা'র কাছে তার পৌঁছল না। ঠিকানা বদল করেছেন।

আরো একবার রাজা। সবাইর কাঁধের ওপর।

ওর জন্যই ত আজকের সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। ওর জন্যই ত লুসীর চোখে এক বিন্দু অশ্রু!

যক্ষ-কবি

শ্রী কালিদাস নাগ

কবি কবি,
তুমি নাকি এঁকে গেছ চিরন্তন বিরহের ছবি
মেঘদূত-পটে?
এ ধরার চিরন্তন বিরহের গান
চিররাত্রি দিনমান
বাজিয়া বাজিয়া নাকি উঠে তব মেঘমন্দ্র শ্লোকে?
যুগে যুগে বিরহীর দল
নিবিড় বেদনাঘাতে হইয়া বিহ্বল
পেয়েছে সান্ত্বনা নাকি তোমার ও অমর সঙ্গীতে?
এই প্রশ্ন কখন্ চকিতে
জাগিয়া উঠিল এক বিরহীর বুকে
কর্ম্মহীন স্বপ্নভরা এক আষাঢ়ের
অশ্রান্ত বর্ষণে;
বহুবার অধ্যয়নে ম্লান ছিন্ন মেঘদূতখানি
বুকের উপরে নিল টানি,
হৃদি-রক্ত-নর্ত্তনের শুব্ধ মন্দ তালে
মন্দাক্রান্তা ছন্দ গাঁথা পরিচিত শ্লোক
নির্জ্জনে পড়িয়া গেল।
পাঠ পরিহরি'
সহসা ভ্রুকুটি করি'
অতৃপ্তি-বেদনা-মাখা সুরে
ব'লে গেল স্বর্গবাসী কবি যক্ষবরেরে উদ্দেশি':
বিরহের এ বিরাট কাব্য-সৃষ্টি মাঝে
জীবন্ত বিরহ কোথা কবি?
স্বরগের অধিবাসী এঁকে গেছ স্বর্গভোগ ছবি;
বর্ষব্যাপী মর্ত্ত্যের প্রবাসে
শিখ নাই বুঝ নাই মর্ত্ত্যের বিরহ।
সৃজিয়াছ মায়া-অলকার কল্পলোক
যেথা অহরহ
অভ্রংকষ মণিদীপ্ত প্রাসাদের মাঝে
স্নিগ্ধ সুগম্ভীর সুরে গুমরি' গুমরি' গীত বাজে,
সুমোহন ইন্দ্রধনু স্বপনের মত!
সুরে বর্ণে সুষমায় করে একাকার
চারিধার ভ'রে গেছে নিত্যবসন্তের মহোৎসবে,—
নিত্যপুষ্পপাদপের কাছে
উন্মত্ত ভ্রমর পায় নিত্যনিমন্ত্রণ,
পদ্মগন্ধা পুষ্করিণী—মরালের মালা গাঁথা বুকে;—
নিত্য উঠে কেকারব ভবন-শিখীর
নিত্য তার কলাপ-বিকাশ,
নিত্যজ্যোৎস্না ভরেছে আকাশ!
চুরি করি' চপলার চারু চপলতা
তড়িৎ চাহনিখানি দিগ্বিদিকে হানি'

দলে দলে অলকার অলোক সুন্দরী
আনে অঙ্গ ভরি'
ছয়টি ঋতুর উপহার :
শরত দিয়াছে লীলা কমল-কলিকা
হেমন্ত দিয়াছে কুন্দ-কুসুম-মালিকা
অলকানারীর অলকায়
লোধ্র পুষ্প রেণুর প্রলেপে
পাণ্ডুশ্রীটি ফুটাল আননে
শান্ত শীত ঋতু ;
অশান্ত বসন্ত এসে
কুটিল ভ্রমরকৃষ্ণ কেশে
চূড়াপাশে গেঁথে দিল নব কুরুবক
গ্রীষ্ম দিল বর্ণ-মূলে শিরিষ কুসুম
বর্ষা-শেষে দিয়ে গেল সীমন্ত প্রদেশে
সারা প্রকৃতির শুদ্ধ শিহরণখানি
কদম্ব কুসুমে !

দিব্য রাসলীলা-মত্ত নায়ক নায়িকা
অনন্ত-যৌবন-রসে উন্মত্ত বিহ্বল
বিহরিছে নিশিদিন নিত্য-প্রেমোৎসবে
কল্পতরু বিরাজিছে এই কল্পলোকে,
হেথা নাই অতৃপ্তি অভাব,
অশ্রু হেথা আনন্দেই ঝরে,
তাপ শুধু প্রেমের উত্তাপ
যৌবনেই বয়সের অচঞ্চল স্থিতি
বিরহ সে প্রণয়কলহ !
এ হেন ভোগের স্বর্গে
যুগ যুগান্তর ধরি' যক্ষবর করিলে বিহার
প্রেমের অমূল্য হার
পরাইল যক্ষিনী প্রেয়সী ;
তবু যবে ভাগ্যশশী
আচম্বিতে রাহুগ্রস্ত হ'ল একদিন
কি দৈন্য-পাথার মাঝে হইলে পতিত !
জান—তবু জান তুমি
প্রেমের আশ্রয়-ভূমি

তোমাগতপ্রাণ সেই প্রিয়তমা তব
কি ভাবে কাটায় কাল
তোমারি বিরহে নিশিদিন
রবির বিরহে ম্লান বিশুষ্ক মলিন
শিশির মথিত পদ্মপ্রায়,
মলিন করেছে আঁখি বিরহের ভূরি অশ্রুজল,
দীর্ঘশ্বাস হরিয়াছে বিম্বোষ্ঠের স্নিগ্ধ বর্ণোচ্ছ্বাস
কখনো সে বিরহিনী দেবতা সকাশে
যাচে প্রিয় মিলনের বর
কভু তুলিকায় বর্ণে সযত্নে বিকাশে
বিরহ-বিকৃত ক্ষীণ তব মূর্ত্তি চিত্র পটে তার
বারম্বার
কভু উন্মাদিনীপারা
তোমার মধুর কথা প্রিয় শারিকারে যায় পুছি
কখনো টানিয়া তার মৌন বীণাখানি
চাহে গাহিবারে তব নামাঙ্কিত গান
কে জাগাবে তান ?
অজস্র অশ্রুর ধারা অবিশ্রাম সাধিতেছে বাদ,
আর্দ্র তন্ত্রী মাঝে হায় সুর নাহি ফুরে,
বৃথা খোঁজে ঘুরে
বিস্মৃত মূর্চ্ছনাগুলি বিকল-হৃদয় !
হেন প্রেয়সীর স্নিগ্ধ প্রেমামৃত-ধারা
যুগ যুগান্তর করি' পান
কোন্ বলে বলীয়ান
হইয়াছ হে যক্ষ-প্রবর ?
মাত্র সম্বৎসর
প্রিয়ার মধুর সঙ্গে বঞ্চিত হইয়া
উন্মত্তের প্রায়
ভোগস্বর্গ অলকায়
ভোগস্মৃতি শৃঙ্খল বাহিয়া চাও যেতে ?
তোমাদের স্বরগেতে
প্রেম বুঝি শুধু চাওয়া আর সদা প্রাণ পূরে পাওয়া ?
ভোগী দেবতার দল
তাই বুঝি সর্ব্ব কার্য্যে এমন দুর্ব্বল ?
অভাব-মরণ-ভরা মরতের শিশু

কি সহিষ্ণু সহজ সবল সর্ব্ব কর্ম্মে সর্ব্ব প্রেমে,
দেখে যাও শিখে যাও স্বর্গ হতে নেমে
দাঁড়ায়ে এ ধরণীর ধূলির উপরে ;
মর্ত্ত্য বিরহের এই মৃত্যু-যজ্ঞ হ'তে
বুঝে যাও কোন্ মতে
না দিয়েও দেওয়া যায়, না পেয়েও পাওয়া যায়,
না বেঁচেও বাঁচা যায় অনন্ত জীবনে,
বিরহের মিলনের জনমের মরণের
আদিহীন অন্তহীন উদ্বাহ বন্ধনে !

আমাদের মাটি-মা'র ভাব-তনু-খানি
অন্তহীন অভাবেতে গড়া।
জননীর অন্তরের মৌন স্নেহ-ধারা
সবুজের উৎস হ'য়ে ফুটে ওঠে লতায় পাতায়
সহসা বিবর্ণ হ'য়ে যায় !
ভরি' দিয়া দিগ্বিদিক সুষমা-সৌরভে
একান্ত নীরবে ফোটে ফুল
ক্ষণতরে আমাদের করিয়া আকুল
সহসা অজ্ঞাতে ঝ'রে পড়ে !
জাগে সুর—ক্ষণতরে এ জীবন করিয়া মধুর
আচম্বিতে থেমে যায় ;
রেখে যায় প্রাণে শুধু অতৃপ্তির রেশ
এই ভাবে সব হয় শেষ
সুখ-শান্তি-সৌন্দর্য্য-সম্ভার
চকিত পরশ দিয়ে চকিতে মিলায় বারবার !
ফুলেরই মতন
ফুটে ওটে অতর্কিতে আমাদের হৃদয়ের ধন,
ক্ষণতরে বুকে ধরি, দিই তারে ক্ষণিক চুম্বন,
দিনান্তের পুষ্পসম সহসা কখন ঝ'রে পড়ে !
অতৃপ্তি অভাব দুঃখ বিরহ মোদের
নিত্য সত্য নির্ম্মম একান্ত সত্য নহেক কল্পনা
নহে মাত্র বর্ষব্যাপী শাপ-পরিহাস।
জন্মে জন্মে এই ভাবে মোরা সবে আছি
তা'ব'লে কি যাচি,
হে স্বর্গ-প্রবাসী যক্ষ !

মোদের মর্ত্ত্যের 'পরে তোমাদের স্বর্গ আনিবারে ?
কখনো না—কখনো না !
করিয়াছি বৃথা চেষ্টা জনমে জনমে
পশিয়াছি স্বর্গলোকে নিজের পৌরুষে,
প্রাণ-শূন্য হ'য়ে গেছি
ভ্রান্তিহীন দ্বন্দ্বহীন গতিহীন স্বর্গের রৌরবে
ঝাঁপায়ে পড়েছি পুনঃ অসহ্য তৃষ্ণায়
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দুঃখ-ভরা ধরণীর বুকে
দেবত্বের মৃত্যুহীন জড়ত্ব বর্জ্জিয়া
জাগায়েছি পুনরায় দুর্ব্বার আবেগে
মৃত্যু-ভরা নরত্বের অমর মহিমা !
অন্তহীন পরমায়ু পাই নাই মোরা
তাইত এ জীবনের মুহূর্ত্তেরে অনন্ত করেছি
আবেগের তীব্রতায়।
আমাদের সুখ শান্তি রূপ সৃষ্টি চকিতে মিলায়
তাই ত মোদের কবি
যুগে যুগে এঁকে যায় মৃত্যুহীন ছবি
চকিত মুহূর্ত্ত-পটে ক্ষণিকের বক্ষ-রক্ত-রক্তিমা-উচ্ছ্বাসে।
তাই ত বিকাশে
আমাদের গুণী শিল্পী সুরজ্ঞের হাতে
মর্ত্ত্যের অপূর্ব্ব এই মৃত্যুহীন রূপ !
জীবন ত অন্তহীন দুরাশার স্তূপ
তাই ত মোদের চাওয়া এমন নিবিড়—
গাছ পাতা ফুল পাখী করে আসে ভিড়
আসে আলো আসে ছায়া আসে জ্যোৎস্না আসে অন্ধকার
মৌন সুরে যেন বলে যায় বারম্বার,
"এখুনি যে ঝ'রে যাবো ম'রে যাবো হায়
দেখে নাও শুনে নাও ভালবেসে নাও—"
আস্তম আবেগ-ভরে তাই
ক্ষুদ্র তুচ্ছ সবাকারে বুকে নিতে ধাই।
যুগযুগান্তর ধরি' অন্তহীন ভালবাসাবাসি
মৃত্যুহীন লোকে—
সে কেমন বুঝিতে চাহি না।
শুধু দেখি একদিন অন্ধ মনে পথে যেতে যেতে
অচিন্ত্য অসীম এক মাহেন্দ্রক্ষণেতে

চকিতে ভাসিয়া উঠে একখানি মুখ
আচম্বিতে বলে উঠি—"ভ'রে গেল—
ভ'রে গেল বুক" !
তারপরে কত হাসি কত অশ্রু আশা নৈরাশ্যের
জালবোনা !
ঐ ছুটি আঁখি যদি শুধু ক্ষণতরে পড়ে এই মুখ 'পরে
জাগে যদি তাহে মৌনভাষা
সারাটা জীবনভরা অতৃপ্তি নিরাশা
আনন্দে সহিয়া যাই
পাই আর নাহি পাই—
নিমেষের বোঝাপড়া বেঁধে দেয় বুকে
নিষ্ঠার দুর্ভেদ্য বর্ম্ম,
জীবনের সর্ব্ব কর্ম্ম
সর্ব্ব সার্থকতা আর সকল ব্যর্থতা
অমর বিশ্বাসভরে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
শেষ দিনে শেষ নিঃশ্বাসের সাথে ছোটে
"চির প্রাণ চির প্রেম"—মহা জয়গান।

হে স্বর্গ-বিরহী !
মর্ত্ত্যের মিলন-লীলা শুনাব তোমায়,
আছে ধৈর্য্য শুনিবারে মর্ত্ত্যের বিরহ-যজ্ঞ-গাথা ?
এখানেও মরণ মহান্
আমাদের চিরসঙ্গী ;
মৌন ধীর প্রেমিকের মত চুপে চুপে
যে শিখাল মিলন-মেলায়
সামান্যের অসীমতা—তুচ্ছের গরিমা,
যে বুঝাল সীমার মহিমা —
মৃত্যুর মাধুরী এই অন্তহীন জীবন-প্রবাহে—
সেই মৃত্যু রহি রহি অকস্মাৎ উন্মত্ত উৎসাহে
চূর্ণ করি' ধ্বংস করি' আশা নিষ্ঠা বিশ্বাস নির্ভর
ইন্ধন যোগায় এই অনির্ব্বাণ বিরহ-পাবকে ;
তার সে প্রচণ্ড তাপ
সেই জ্বালা ভীষণ দাহন—
যদি সহিবারে পার—
এস তবে স্পর্শ ক'র মর্ত্ত্যের বিরহ-যজ্ঞ-পূত হুতাশন।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(৪)

হৈমবতীর রান্নাঘরের উল্টাদিকে একখানা ঘর ছিল কাঠের ; তাহার মুখ বাড়ীর ভিতর দিকে নয়, বাহিরে। কে একজন জমিদার তাহার আস্‌বাবপত্র গুদাম করিয়া রাখিবার জন্য ঘরটা ভাড়া লইয়াছিল। দিবারাত্রি তাহা বন্ধ পড়িয়া থাকিত। ঘরের গায়ে করোগেটেড আয়রণে ঢাকা সানের মেঝে দেওয়া একটা বারাণ্ডা ছিল ; ভিতর দিকে তাহার মুখ।

হৈমবতীর মেয়েদের কাজে বড় উৎসাহ আর এই বারাণ্ডাটা অকারণ পড়িয়া নষ্ট হয় দেখিয়া শঙ্কর ও সঞ্জয় সেখানে পাড়ার গরীবলোকের ছেলে-মেয়েদের একটা নাইটস্কুল করিবার আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছিল। মেয়েদেরই পড়াইবার কথা, কিন্তু প্রথম দুই এক সপ্তাহ সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য হৈমবতীর অনুমতি লইয়া ছেলেরা যাওয়া-আসা করিত। কাজে উৎসাহ ছিল সকলের চেয়ে চপলা, চঞ্চলা ও গৌরীর। ইহারাই বিশেষ করিয়া কাজের ভার লইয়াছিল।

ইস্কুলের আস্‌বাবের মধ্যে ছিল তিনটি বড় বড় হ্যারিকেন লণ্ঠন। কোমরে ছোট ছোট গামছা কিম্বা কাপড় জড়াইয়া নগ্নগাত্র তিনদল ছোট ছেলেমেয়ে দড়িবাঁধা শ্লেট পেন্‌সিল ও ছিন্নমলাট বই খাতা লইয়া তিনটি আলো ঘিরিয়া মেঝের উপর মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে বসিত।

তাহাদের একজনের মাথার ছায়ায় আর একজনের বই অন্ধকার হইয়া যায়। ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করিয়া কোনো রকমে একটু আলো খুঁজিয়া পিছনের দল বই দেখে। গায়ে গায়ে বসার দরুণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সমস্তক্ষণ ঠেলা-ঠেলি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে নালিশ চলে।

ছেলেমেয়েদের আসিবার সময় হইয়াছিল; অল্পক্ষণ আগেই একটা প্রচণ্ড দম্‌কা হাওয়ায় চারিদিকে ধূলাবালি খড়কুটা উড়াইয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল। বারাণ্ডাটা জলে জলময় হইয়া গিয়াছে। ছেলেরা কোথায় বসিবে সেই ভাবনায় সকলে ব্যস্ত। গৌরী কোমরে কাপড় জড়াইয়া একটা মস্ত ঝাঁটা লইয়া জলটা ঝাঁটাইয়া উঠানে ফেলিতে-ছিল, চপলা একখানা ছেঁড়া তোয়ালে দিয়া অবশিষ্ট জলটুকু মুছিয়া তুলিতেছিল। চঞ্চলার দেখা নাই।

বাহিরের দরজায় কড়া নড়িয়া উঠিল। বুড়ী ঝি নেড়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দরজা খুলিয়া দেখে শঙ্কর, সঞ্জয় ও অপূর্ব্ব। সে ফোক্‌লা মুখে একটু সলজ্জ হাসির রেশ টানিয়া বলিল, "দিদিমণি গো, মাষ্টারবাবুরা সব এয়েছে।"

গৌরী বলিল, "ভিতরে আস্‌তে বল।"

চওড়া লালপাড় দেওয়া একটা মারাঠি চাদর গলায় জড়াইয়া অপূর্ব্ব সকলের আগে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ বড় একটা মুস্কিলে পড়া গেছে। আপনাদের কার কি মত হ'বে জানি না, তবু জিনিষটা ব'লে রাখি। সকালে ছেলেদের শ্লেট কিনে' এই পথে কেষ্টার জিম্মা করে' দিতে আস্‌ছিলাম,এমন সময় এ-পাড়ার মেথরাণী আমায় গ্রেপ্তার করলে। সে বলে, 'বাবু আপনারা গরীব দুঃখীকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন; ওরা ত সব ভাল জাত, ওদের সবাই শেখাতে পারে; কিন্তু আমার ছেলেটার এত বুদ্ধি; ছোটজাত ব'লে কেউ তাকে এক অক্ষর শেখাবে না। আপনার পায়ে ধরৃছি বাবু, একে একটু মানুষ ক'রে দিন।' এখন কি করা যায় বলুন।"

সকলের আগে চপলা বলিল, "ওমা, সে মেথরের ছেলে, তাকে নিয়ে কি ক'রে চলবে?"

গৌরী কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। তাহার মনে হইল ঠিক উচিত কথাটা হয়ত সে বলিতে পারিবে না।

অপূর্ব্ব অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "আপনারা দেশের কাজ করতে নেমে যদি মেথর চামার বিচার করেন, তাহ'লে এদেশের আশা যে কতখানি তা বোঝাই যাচ্ছে।"

সঞ্জয় বলিল, "বিচারের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু কথা হচ্ছে যে, ঐ একটি ছেলেকে যদি ক্লাশে নি তাহ'লে বাকী চল্লিশটিকে ত্যাগ করতে হ'বে।"

অপূর্ব্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিন্তু অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে দেশের সেবা কি প্রকৃত সেবা?"

শঙ্কর বলিল, "যারা অবুঝ অজ্ঞ, তাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ ক'রে দিয়ে একজন মাত্র মেথরের ছেলেকে নিয়ে কাজ করায় দেশের অপকার বই উপকার নেই। এরা যদি কিছু বুঝত তাহ'লে এদের কথা মেনে চলাটাকে আমি অন্যায় বলতুম। এখন বলতে পারি না, কারণ ওদের সংস্কার মজ্জাগত।"

গৌরী বলিল, "কিন্তু পুঁথি প'ড়ে বুঝলেও দেশের ও মনের সংস্কার কি একদিনেই ছাড়া যায়? এতকাল ধ'রে রক্তে যে-সব সংস্কারের বীজ জমা হয়েছে তাকে একদিনে ছেড়ে দেওয়া কি সহজ?"

সঞ্জয় মুখ তুলিয়া গৌরীর দিকে চাহিয়া বলিল, "সহজ না হ'লেও জ্ঞানীকে তা ছাড়তে হ'বে। বিশেষতঃ সমাজের দণ্ড যাঁরা বিনা অপরাধে সহ্য করেছেন তাঁরাই যেন আবার অপরকে বিনা দোষে দণ্ড না দেন তা দেখতে হ'বে।"

গৌরী বলিল, "শক্তির অভাবে কোনো মানুষ যদি একটু স'রে দাঁড়ায়, তাতেও ও কি তার অপরকে দণ্ড দেওয়া হয়?"

গৌরীর মনে কেবলি চঞ্চলার কথা ঘুরিতেছিল। অপূর্ব্ব বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়! যে কাজ একের বেলা অনায়াসে করব, সে কাজ অপরকে প্রত্যাখ্যান করা মানেই তাকে বঞ্চিত করা এবং দণ্ড দেওয়া। এ ত ভীরুতার রূপান্তর মাত্র।"

সঞ্জয় গৌরীকে বিব্রত দেখিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ভীরুতা এটা হ'তে পারে স্বীকার করি। কিন্তু সমাজ ও সংস্কারের

খাতিরে, অভ্যাসের ও স্বভাবের দোষে এইরকম সহস্র ভীরুতা কি আমরা প্রত্যহ কর্‌ছি না? তাতে যদি আপাত-দৃষ্টিতে কারো কোনো ক্ষতি দেখা না যায় তবে আমরা সেগুলোকে অপরাধ ব'লে গণনা করি না, কারণ হাজার হোক মানুষ মানুষমাত্র, দেবতা নয়। তার কাছে আমরা পরিপূর্ণতা আশা কর্‌তে পারি না। তবে যদি এই ভীরুতার জন্যে কোনো মানুষকে আমরা তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করি তাহ'লে সে ভীরুতাকে খুব সহজে মার্জ্জনা করা চলে না।"

অপূর্ব্ব সঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এই বিশুদ্ধ বক্তৃতাটা কি তোমার নিজের মনের কথা?"

গৌরী লজ্জিত হইয়া বলিল, "সঞ্জয়বাবু আমাকে নেহাৎ অসহায় দেখে একটু সাহায্য কর্‌ছিলেন। যে কাজটাকে আপনি ভীরুতা ব'লে বোঝেন সেটাকে মানুষের দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়ে আপনি যে আঁকড়ে প'ড়ে থাকেন না তা আমি জানি।"

সঞ্জয় কথা ঘুরাইয়া বলিল, "যাক্, বাজে বক্তৃতায় কোনো কাজ হবে না। কাজের কথাটা আসলে দরকার। ছেলেটার পড়ানোর কি করা যায় সেইটা ভাব্‌তে হবে। আর সকলকে আমরা ছাড়তে পার্‌ব না, কিন্তু ওরও একটা ব্যবস্থা করা চাই।"

শঙ্কর বলিল, "খুব সহজ একটা ব্যবস্থা হচ্ছে —ওকে একলা আলাদা পড়ানো। তাতে অবিশ্যি সময় যাবে।"

অপূর্ব্ব বলিল, "রোজ আবার অতটা সময় কে 'স্পেয়ার' কর্‌তে পার্‌বে?"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "ওঃ, ভারি ত সময়! কুড়িমিনিটে ওর প্রচুর পড়া হ'য়ে যাবে। গৌরী, তুই নে না ছেলেটাকে। খুব ত নিষ্ঠাবতী আছিস্, দেখি সত্যি একটা কাজে তোর কতখানি সাহস!"

গৌরী লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি? বাড়ীতে সকলে শুন্‌লে কি বল্‌বে?"

শঙ্কর বলিল, "কে তোর বাড়ীতে বল্‌তে যাচ্ছে? আর প্রতি কথায় যদি অত বাড়ীকেই মেনে চল্‌তে হয়, তবে বাড়ীর লোকের অমতে এখানে না এসে বাড়ীতে থাক্‌লেই ত হ'ত।"

অপূর্ব্ব বলিল, "আমি নিতে পার্‌তাম কাজটা। কিন্তু বরাবর ত আমার এখানে প্রবেশাধিকার থাক্‌বে না।"

সঞ্জয় বলিল, "আমার বাড়ী বড় দূর, নাহ'লে আমার ওখানে যদি রাত ন'টার পর যেতে পার্‌ত ত আমি পড়িয়ে দিতুম ওকে।"

বারবার তাহাকেই সবলে লজ্জায় ফেলিতেছে দেখিয়া গৌরী বলিল, "আচ্ছা, আমি কালকে ঠিক ক'রে বল্‌ব, তার আগে আপনারা কেউ ভার নেবেন না।"

চপলা বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "মাগো, গৌরী, এত বাছ বিচারের পর শেষে মেথর চেলা জোটালে?"

ছেলেরা আস্তে আস্তে একটি একটি করিয়া আসিয়া জুটিতে লাগিল। আজ নাম লেখাইবার পালা। ঝাঁঝ মল ও ডুরে শাড়ী পড়া ছোট একটি মেয়ে আসিয়া চপলার আঁচল টানিয়া বলিল, "গুরুমা, আমার নাম ফেলী লিখোনি। মা বলেছে আমার নাম মেনকা সুন্দরী দাসী।"

চপলা বলিল, "তোর বাবার নাম কি?"

ফেলী বলিল, "তা জানি নি। মা ব'লে দেবে অখন।"

ছোট ছোট লাল গামছা পরা তিনটি ছেলে আসিয়া খুব মিহি ও ভাঙা স্বরে চেঁচাইয়া বলিল, "আর গুরুমা, আমাদের নাম বাঁকা, টেরা আর ভেংচু। ঠাকুমা বল্‌লে ওতেই হবে, আর ভাল নাম নেই।"

ফর্‌সামত একটি মেয়ে তেলকালী মাখা ছেঁড়া একটা সিল্কের ফ্রক পরিয়া আসিয়া বলিল, "গুরুমা গো, আজকে মাসি আর মা এমন মারপিট করেছে যে বাবা তাদের ঘরে খিল দিয়ে দিয়েছে। ঘরের ভিতর খুব গালাগালি কর্‌ছে, তাই আমি পালিয়ে এলুম।"

ছেলে মেয়েদের পড়া আরম্ভ হইলে হৈমবতী একবার সহাস্যে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর শঙ্করকে ডাকিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

হৈমবতীর ঘরে গিয়া শঙ্কর একটা ছোট জল-চৌকির উপর বসিল। মাদুরের উপর পা ছড়াইয়া দেওয়ালে পিঠ

দিয়া হৈমবতী বলিলেন, "দেখ গৌরীকে নিয়ে একটা মুস্কিলে পড়েছি। তোমার সাহায্য না নিলে উপায় নেই।"

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল, "গৌরী এতকাল ত বেশ সহজই ছিল, আজকাল আবার কি মুস্কিল বাধাচ্ছে?"

হৈমবতী বলিলেন, "বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু তবু আশ্রমের দিক দিয়ে একটু অসুবিধার কথা। তুমি চঞ্চলাকে দেখেছ ত?"

শঙ্কর বলিল, "হাঁ, ওই যিনি পড়াতে আসেন, খুব বুদ্ধি আছে আর কথার খুব ধার।"

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ সেই। গৌরী এসে পর্য্যন্ত ওর সঙ্গেই থাকৃত। এক এক ঘরে দুটি তিনটি ক'রেই মেয়ে থাকে। কাল হঠাৎ সে বল্লে যে, একলা একখানা ঘর চায়। চঞ্চলা মেয়ে ভাল, তার সঙ্গে যদি কিছু গোলমাল হ'য়ে থাকে সহজেই মিটে যাবে। কিন্তু কি যে হয়েছে তা গৌরী নিজেও বল্‌বে না, চঞ্চলাকেও জিজ্ঞাসা করতে দেবে না। এতে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ওর সঙ্গেই কিছু হয়েছে। তুমি একটু খোঁজ নিয়ে আমাকে বল।"

ছোট ছেলেরা কাহার কয় পাতা পড়া এবং না পারিলে কে কি শাস্তি পাইবে তাহারই আলোচনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছিল। ভেংচা বলিল, "গুরুমা হাতছড়ি কর্‌বে না, আমি জানি।"

ফেলী বলিল, "কোটি কোটি কালীর দিব্যি বল্‌ছি—গুরুমা টেকুকে বাল বেঁউচিতে দাঁড় করিয়ে দেবে।"

টেকু বলিল, "বেঁউচি যে নেই রে।"

ফেলী বলিল, "তবে কেলাসে নামিয়ে দেবে।"

টেকু বলিল, "ইস্ দিলেই হ'ল! আমার নীচে আর কেলাসই নেই।"

তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে-শুনিতে গৌরী ও চপলা ঘরে ফিরিতেছিল। শঙ্কর বাহিরে আসিয়া বলিল, "গৌরী, একবার এদিকে শুনে যা।"

গৌরী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আবার কি শুনতে হবে? এই একপাল গরু তাড়িয়ে এলাম; এখন আবার আমি তোমার মেথরের ছেলেকে পড়াতে যেতে পারব না।"

শঙ্কর বলিল, "না, না, তোকে কিছু করতে হবে না। আগেই চট্‌চিস্ কেন? আমার সঙ্গে অবিশ্যি আজন্ম তোর ঝগড়ার সম্পর্ক, বকাবকি করতে পারিস্, কিন্তু পরের কাছে এতকাল ত তোর সুনামই ছিল, আজ কাল আবার ঝগড়াঝাঁটি আরম্ভ করেছিস যে?"

গৌরী বলিল, "আবার কার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে গেলুম! আমার অত তোমার মত কুঁদুলে নাড়ী নেই।"

শঙ্কর বলিল, "নেই যদি তবে চঞ্চলা না উজ্জ্বলা কার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ কি নিয়ে?"

গৌরী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "আমি তার সঙ্গে এক ফোঁটাও ঝগড়া করিনি। বিশেষ একটা কারণে কেবল আলাদা থাকতে চেয়েছি।"

শঙ্কর বলিল, "সে ত মেয়ে খুব ভাল শুনেছি।"

গৌরী বলিল, "ভাল হ'তে পারে; তাই ব'লেই ত এতদিন জানি, কিন্তু শুধু নিজে ভাল হ'লেই ত জগতে চলে না। আত্মীয়স্বজন যদি ভাল না হয়, তাহলে কি সমাজে মানুষকে কেউ গ্রহণ করে?"

শঙ্কর বলিল, "ওবাবা, আমার মেজপিসে ত অনেক লোকের টাকা মেরেছেন, আরো অন্যান্য সৎকার্য্যও প্রচুর করেছেন, তা'ব'লে কি আমি একঘরে হ'ব?"

গৌরী রাগিয়া বলিল, "ছোড়দা,—তোমাকে আর ন্যাকামি করতে হবে না। যেন দিন দিন কি হচ্ছে? তুমি নিশ্চয়ই সব বুঝ্‌তে পেরেছ, শুধু শুধু আমাকে জালিও না।"

শঙ্কর বলিল, "আচ্ছা, ধর্‌লাম যেন সবই বুঝেছি। কিন্তু চঞ্চলার মা বাবা যদি মন্দই হয়, তাতে চঞ্চলার কি? তার এই প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠেও ভাল হওয়ার কি তোমরা এই পুরস্কার দেবে?"

গৌরী বলিল, "সেইজন্যেই ত আমি চঞ্চলাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে বারণ করেছিলাম; শুধু আমি আস্তে আস্তে দূরে স'রে গেলে কারুর ত কোনো ক্ষতি হ'ত না।"

শঙ্কর বলিল, "কিন্তু তোরই বা কি লাভ হ'ত? মানুষকে ত্যাগ করার দুটো কারণ থাকৃতে পারে। এক হচ্ছে তাকে কোনো অপরাধের জন্ম শাস্তি দেওয়া, আর এক হচ্ছে নিজেকে তার স্পর্শ কি সঙ্গদোষের হাত হ'তে রক্ষা করা। তুমি তাকে শাস্তি দিতে চাও না, কারণ জিনিষটা গোপনে করৃছ এবং তার সঙ্গকে তোমার পক্ষে ক্ষতিকর ব'লে বিশ্বাস কর না; তবে তোমার কাজটার উদ্দেশ্য কি হ'তে পারে?"

গৌরী রাগিয়া বলিল, "অত শত তর্কের কথা আমি জানি না, বাপু। আমার যেন কেমন লাগে।"

শঙ্কর বলিল, "গৌরী, তুই সংসারে বড় হবি ব'লে তোকে নিয়ে কত বাধা ঠেলে আমি বেরিয়েছি। এমনি ক'রে কি তুই আমার শ্রম সার্থক করৃবি? আমি সঞ্জয়দের মত বিশ্বের হিত করৃতে পারৃব না, কিন্তু তবু তাদের সামনে আমার মুখ উঁচু ক'রে আমি চল্‌তে পারি এই গৌরবে যে, আমাদের মত পরিবারের থেকে তোর মত মেয়েকে এনে আমি সকল তুচ্ছতা ও সংকীর্ণতার উপরে তুল্‌বার আশা রাখি। সে কথা তুই ভুলে যাস্ নে।"

গৌরী চুপ করিয়া গেল। শুধু শঙ্কর নয়, সেও ত অপূর্ব্ব সঞ্জয়ের কাছে ছোট হইতে লজ্জাবোধ করে। জন্মগত শুচিবায়ুকে সে ছাড়িতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু ইহাদের কাছে ছোট হইয়া যাইতেও যে আত্মসম্মানে বড় বেশী ঘা লাগে। আর শঙ্কর যে তাহার শ্রেষ্ঠ বন্ধু প্রকৃত হিতার্থী, তাহাকে সে ব্যথা দেয় কি করিয়া?

শঙ্কর বলিল, "বল্ আর গোলমাল বাধাবি না! সেদিন সঞ্জয় বল্‌ছিল যে, চঞ্চলার মত সাহসী মেয়ে সে দেখেনি। কোনো কাজে যেন তার ভয় ব'লে জিনিষ নেই। এই প্রশংসাটা তোর নামে যদি শুনতে পেতুম ত আমার অনেক দুঃখ সার্থক হ'ত।"

গৌরীর কেমন একটা ঈর্ষা হইল। যে চঞ্চলাকে সে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিতে চায়, সে অনায়াসে যাহা পাইল, গৌরী এতদিনের সাধনায় ত তাহা সঞ্চয় করিতে পারিল না। নিজেকে সর্ব্বদা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিলে কখনও সে তাহা পারিবে না।

গৌরী বলিল, "তুমি ভয় পেও না, দাদা; আমি তোমার মুখ হেঁট করৃব না।"

(৫)

ভোর না হইতে আকাশ কালো করিয়া মেঘ নামিয়াছে। তাহার সঙ্গেই এই গ্রীষ্মের দিনে তীব্র তীক্ষ্ণ বাতাস যেন মানুষের সর্ব্বাঙ্গে ছুঁচ ফুটাইতেছে। গাছপালা তাহার আঘাতে অবিশ্রাম কাঁদিয়া চলিয়াছে। দরজা-জানালা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, মনে হয় যেন কোন পথহারা পথিকের দল এই ঘোর দুর্য্যোগে মানুষের করুণা ভিক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে দ্রুত কর হানিয়া ফিরিতেছে। সন্ধ্যা হইয়া গেল তবু প্রকৃতির এ প্রলয় খেলার শেষ নাই। বাহিরের আকাশে দৃষ্টি চলে না। ঘন মেঘের গায়ে কেবল মাঝে মাঝে দীর্ঘ সুপারি-গাছের দীর্ঘ পাতাগুলি ঝড়ের বেগে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে, যেন ভীত শিশুর দল হাত বাড়াইয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিতেছে। পথে দুটি একটি লোক।

ঘরের আলো প্রলয়ের কালিমায় মলিন হইয়া আছে। তাহার উপর কাণে আসিতেছে একটা না একটা চাপা কাতরানির শব্দ। আশ্রমের ছোট একটি মেয়ে পিছলে পড়িয়া গিয়া হাতখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। হৈমবতী সকালে বাহির হইয়া গিয়াছেন এখনও ফেরেন নাই। কোথাও বোধ হয় ঝড়ে আটক পড়িয়াছেন।

অবিবাহিত তরুণ চিকিৎসক সঞ্জয়কে দিয়া হৈমবতী মেয়েদের চিকিৎসা সচরাচর করাইতেন না পাছে লোকে কিছু কুৎসা রটনা করে, কিন্তু আজ এই দুর্য্যোগের সন্ধ্যায় আর কাহাকেও সহজে পাওয়া যাইবে না বলিয়া চাকরটা গিয়া তাহাকেই ধরিয়া আনিয়াছে। চঞ্চলা ছোট মেয়েটির হাতখানা ধরিয়া বসিয়াছিল, পাছে সে টানা হেঁচ্‌ড়া করিয়া কিছু করিয়া বসে।

সঞ্জয় আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ক্রমাগত বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া শুশ্রূষাকারিণী মাথাটা রোগিনীর বালিশের উপর রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছে। মুখ দেখা যায় না। সঞ্জয় বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিল। কে এ? তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

ঘরের ভিতর জুতার শব্দ পাইয়াই চঞ্চলা উঠিয়া বসিল। সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, "ওঃ আপনি! আমি কি রকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।"

চঞ্চলা বলিল, "কেন? আপনি কি এখনও ছেলেবেলার মত অন্ধকারে শাঁখচুন্নীর ভয় করেন নাকি?"

সঞ্জয় বলিল, "শাঁখচুন্নী দেখলে ত ধ'রে ঘাড় মট্‌কে দিতাম। হঠাৎ মনে হয়েছিল স্বর্গ থেকে দয়া ক'রে কে নেমে এসেছে, তাই ভয়ে চম্‌কে উঠেছিলাম।"

চঞ্চলা সলজ্জহাস্তে মুখখানা নামাইয়া লইল। কিন্তু বিস্মিতও হইল; কি বলে এ যুবক? রোগী দেখিতে আসিয়া রোগীর সম্মুখে এরকম প্রলাপ বাক্য ত ইহার মুখে শোভা পায় না। ইহার মুখে এমন কথা শুনিতে সে কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই।

সঞ্জয় তাহার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনি আমাকে পাগল-টাগল কিছু ভাব্‌ছেন, না? ভয় পাবেন না, আমি পাগল নই। আপনাকে দেখে আজ এমন একজনকে মনে প'ড়ে, গেল যে, আমি নিজকে সাম্‌লাতে পার্‌লাম না। আমার একমাত্র বোন, আমাদের সকলের দিদি ছিলেন যিনি, তিনি কাজ কর্‌তে কর্‌তে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে ঠিক আপনার মত এমনি ক'রে হাতের কাজ হাতে রেখে শুধু মাথাটা বালিশে দিয়ে জিরিয়ে নিতেন। তাঁর হেঁট-করা মাথা ঘাড় সমস্তর ভঙ্গী অবিকল আপনার মত ছিল। কোনোখানে একটু প্রভেদ নেই। যাক্ সে কথা, এখন আমার কাজটা আগে সেরেনি।"

সঞ্জয় ছোট মেয়েটির হাতখানা তুলিয়া লইল। তারপর চঞ্চলার সাহায্যে যথাসাধ্য পরিপাটি করিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া তাহাকে একটা ঘুমের ঔষধ দিয়া দিল। চঞ্চলা ক্ষিপ্রহস্তে তাহার সমস্ত কার্য্যে সাহায্য করিয়া যাইতেছিল। ইতিমধ্যে ঘরে গৌরী আসিয়া পড়িল। দুইজনে একমনে কাজ করিতেছে দেখিয়া সে আর কিছু করিতে অগ্রসর হইল না; তাহার কেমন যেন মনে হইল ইহারা তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি চায় না। গৌরীর একটু বিরক্ত লাগিল। তাহার পর সে নিজেকেই বুঝাইল;—ইহা ত স্বাভাবিক জিনিষ মাত্র। বিশেষ মানুষ বিশেষ মানুষের সঙ্গ চায়, তৃতীয়ের উপস্থিতি সে সঙ্গ-সুখ ত মাটি করিয়াই দিতে পারে। গৌরী বলিল, "অনিমার ত হাত বাঁধা হ'য়ে গেছে দেখ্‌ছি; তবে আমি আর অকারণ দাঁড়িয়ে কি কর্‌ব? যাই, কালই ত আবার দেখা হ'বে।"

সঞ্জয় বলিল, "হ্যাঁ, কাল আপনার বিশেষ ছাত্রটিকেও একবার দেখে যাব। ওকে নিয়ে আপনি আমাদের অশেষ উপকার করেছেন। আপনার সদৃষ্টান্তে অনেক কাজ হ'বে।"

গৌরী নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে শুনিল—সঞ্জয় বলিতেছে, "আসি তবে। সেই ছেলেবেলাকার কচি মনটা আজ আট বৎসর পরে যেন আবার জেগে উঠ্‌ল। মনে প'ড়ে গেল কেমন ক'রে সেদিন কেঁদেছিলুম।"

গৌরী আর দাঁড়াইল না। ভাবিল, পরের কথা আমার কি শোনা উচিত?

চঞ্চলা উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল, "তিনি কোথায় গেলেন?"

সঞ্জয় বলিল, "আমরা পাটনায় থাক্‌তেই তিনি মারা গিয়েছেন। সবে দু বচ্ছর তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কে জানে হয়ত আপনার সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কোনো যোগ আছে!" নইলে আপনার প্রত্যেটি চলা-ফেরা পর্য্যন্ত দিদির মত কেন?

চঞ্চলা মুখখানা নামাইয়া বলিল, "সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব আর না থাকাই ভাল।"

সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, "কেন, আমার মত ভবঘুরের সঙ্গে সম্পর্কও রাখ্‌তে চান্ না নাকি? দিদি ছাড়া আমার আর বোন নেই, তাই আমার কিন্তু ওদিকে একটু লোভ আছে।"

চঞ্চলা বলিল, "আমাকে আপনি চেনেন না তাই বল্‌ছেন; চিন্‌লে আর ওকথা বল্‌তেন না।"

সঞ্জয় বলিল,"আপনাকে ত খুব ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না। চিন্‌লেই ভয়ে ছুট মার্‌ব এমন আকাঙ্ক্ষা আমার মোটেই হচ্ছে না। পরিচয়টা দিয়েই ফেলুন না। অবশ্য তার আগে আমার নিজের পরিচয় দেওয়া উচিত। আমার বাবা হৃষিকেশ গাঙ্গুলী ওইদিকেই ওকালতী কর্‌তেন।

বহুকাল বেহারেই ছিলেন। এখন কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়ে দেশে রয়েছেন।"

সঞ্জয় দেখিল, চঞ্চলার মুখ আরক্ত ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার কি ঘটিল সে বুঝিল না। সে বলিল, "আপনি কি আমার উপর বিরক্ত হ'লেন? এত অল্পদিনের আলাপে এত আত্মীয়তা পাতানো আমার বোধ হয় অন্যায় হচ্ছে। আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।"

চঞ্চলা সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "না, আপনার কোনো অন্যায় হয়নি। অন্যায় আর একজনের হয়েছিল, সে কথা আপনাকে বল্‌ব কিনা বুঝতে পার্‌ছি না। অপরের অন্যায়ের জন্য আপনার উপরই রাগ হয়েছিল, সেটা আমারই দোষ হয়েছে।"

সঞ্জয় বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া বলিল, "নিশ্চয় আমারও কোনো দোষ আছে যার জন্যে আপনি বিরক্ত হয়েছেন। দয়া ক'রে সেটা কি আমাকে বল্‌বেন?" অপরের দোষ ব'লে সেটাকে চাপা দিতে চেষ্টা কর্‌বেন না।

চঞ্চলা বলিল, "আপনার বাবাকে আমি চিনি।"

সঞ্জয় চুপ করিয়া তাকাইয়া রহিল। চঞ্চলা বলিতে লাগিল,"তিনি বহুকাল আমার অভিভাবক ব'লে পরিচিত ছিলেন। এখানে তিনিই আমাকে রেখে যান।"

সঞ্জয় খানিকটা ভীত ও খানিকটা আশান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আপনি আমারই কোনো আত্মীয়া?"

চঞ্চলা আরক্তমুখে বলিল, "হ্যাঁ, অত্যন্ত নিকট আত্মীয়া। আমার অভিভাবকই যে আমার পিতা তা আমি পরে জান্‌তে পারি।" আপনি হয়ত এখনও সেকথা জানেন না।

সঞ্জয়ের মাথা ঘুরিতে লাগিল। একি রহস্য? সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে না জাগিয়া আছে? চঞ্চলার অস্তিত্বের কথা তাহার পূজনীয় পিতার জীবনের এ রহস্যাবৃত অধ্যায়ের কথা সে ত কোনো দিন শোনে নাই। চঞ্চলার কথা মিথ্যা নয় ত? কিন্তু কেন অকারণে বিশেষ করিয়া তাহার পিতার নামে সে এ মিথ্যা কথা রটাইবে? পিতা কি বিবাহ করিয়া চঞ্চলার মাতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন না তার চেয়েও অন্যায় কিছু করিয়াছিলেন? সঞ্জয় সাহস করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। শুধু বলিল, "আমার পিতা আপনার ও আপনার মা'র উপর কতখানি অন্যায় করেছিলেন আমি জানি না। কিন্তু আপনার কথা সত্য হ'লে অন্যায় যে করেছেন সে নিশ্চয়। আমি পিতার সমস্ত অপরাধের জন্য আপনার ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছি। আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন কি?"

চঞ্চলা কথা বলিল না। ভালবাসা ও আক্রোশের একটা দ্বন্দ্ব তাহার মনের ভিতর চলিতেছিল। এই সঞ্জয় আত্মীয় স্বজন বন্ধু আশ্রিত সকলের আদৃত, সকলের সম্মানার্হ, হয়ত একদিন দেশের সুপুত্র বলিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হইবে; অথচ ইহারই ভগিনী হইয়া সে আজ লোকের কাছে নিজের পরিচয় পর্য্যন্ত দিবার অধিকারী নয়। কেন, কেন? সঞ্জয়েরই বা এ সমাদর লাভে কি নিজস্ব কৃতিত্ব আছে, আর তাহারই বা কি পাপে সে এমন বঞ্চিতা? ইচ্ছা করিতেছিল এখনই সঞ্জয়কে এখান হইতে দূর করিয়া দেয়, লোক-সমক্ষে বলিয়া বেড়ায় কেমন পিতার পুত্র সে। কিন্তু আবার সেই সঞ্জয়ের উপরই মনটা তাহার ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। বয়সে সে চঞ্চলার চেয়ে বেশ বড়, তবু ছোট ভাইটির মত কেমন 'দিদি' বলিয়া একদিনের এই কয়েকটা মুহূর্ত্তেই কত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে! খুব শৈশবে সে মাকে চিনিত, ভালবাসিত, কিন্তু তারপর হইতে কই আর কোনো দিন আত্মীয়ের দেখা কি ভালবাসার কোন স্পর্শ সেত পায় নাই। আজ এতদিন পরে যাহাকে পাইল, সে ত সত্যই তাহার আত্মীয়, তাহার আপনার ভাই। তাহাকে সে কেমন করিয়া দূর করিয়া দিবে? কোনো রকমে ইহাকে কি ধরিয়া রাখা যায় না? এ সম্বন্ধ কি লোকচক্ষেও চিরস্থায়ী করা যায় না? চঞ্চলার মনের ভিতরটা হাজার চিন্তায় কল্পনায় সম্ভব অসম্ভব কত কি ভাবের ধাক্কায় তোলপাড় করিতেছিল। সে অনেক কষ্টে বলিল, "আজ আমাকেও ক্ষমা কর্‌বেন, আমি বেশী কথা বল্‌তে পার্‌ছি না। যেদিন ভাই ব'লে ডাক্‌তে পার্‌ব কিম্বা সকল সম্পর্ক ভু'লে যেতে পার্‌ব সেদিনই আবার আপনার সঙ্গে অনায়াসে সহজভাবে কথা বল্‌ব।"

চঞ্চলা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। তাহার দুই চোখ

দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আবার বৃষ্টি জোরে নামিয়া আসিল। গাছপালা দুলিয়া দুলিয়া মাথা নাড়া দিয়া বিশ্বকে যেন পথে বাহির হইতে মানা করিতেছিল। সঞ্জয় তাহারই ভিতর বাহির হইয়া পড়িল। কোনো মানুষ তাহাকে বারণ করিল না। কেবল তীব্র বৃষ্টিধারা বাতাসের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতে লাগিল—'না' 'না' 'না'।

পূবে হাওয়ার দাপটে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ একবার উড়িয়া যায়, এক টুকরা নির্ম্মল আকাশের আলো হাসিয়া উঠে; আবার উন্মত্ত বর্ষণে সমস্ত বিশ্ব কুয়াসায় লুপ্ত হইয়া যায়। পথ নাই, আলো নাই, সঙ্গী নাই। সঞ্জয় একবার থামে একবার চলে। ভিতর-বাহিরের এই অশান্ত ঝটিকা জলধারায় ক্ষণে ক্ষণে স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছিল; মনে পড়িতেছিল চঞ্চলার আরক্ত মুখের উপর অশ্রুর প্লাবন।

(ক্রমশঃ)

কাব্য-আলোচনা*

অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার দে, ডি-লিট্ (লণ্ডন), পি-আর-এস

কবি মোহিতলাল তাঁর নূতন কাব্যগ্রন্থ 'বিস্মরণী'তে যে স্বতন্ত্র সুরটি জাগিয়ে তুল্‌তে চেয়েছেন, তার গতি ও প্রকৃতি দু-একটি কথায় নির্দ্দেশ করা যায় না। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি তাঁর প্রথম কবিতার অর্ঘ্য রচনা ক'রে' সন্তর্পণে বঙ্গবাণীর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি অতি বিনীতভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়েছিলেন—

করি দ্বারে দ্বারে স্বপনের ফিরি—
স্বপন-ব্যাপারী আমি!

তখন কবি শুধু ভাব-বিলাসী প্রীতি-কল্পনার আনন্দে আত্মহারা! কিন্তু এই স্বপ্নমুগ্ধ স্বপন-পসারী তাঁর নিঃসঙ্গ হৃদয়-বীণায় যে আনন্দের সুর বাজাতে সুরু করেছিলেন, আজ সেটি যেন বেদনার মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে অপরূপ ঝঙ্কার তুলেছে—

ত্রিযামা যামিনী খুঁজে-খুঁজে ফিরি
মণি সে বিস্মরণী!
কামনার ফুলে গাঁথিলাম মালা—
বেদনার বন্ধনী!

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর সমস্ত আনন্দের সুধারস এই বেদনার প্রাণস্পর্শী নিগূঢ় আভাসে আরও সুন্দর হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু এইটি বিস্ময়কর ও অচিন্তনীয় যে, কবি-জীবনের প্রারম্ভেই তিনি কামনার শতনরী-হারে বেদনার বিস্মরণী-মণি গাঁথ্‌তে চেয়েছেন! শিব-সাধনার চেয়ে শব-সাধনার নেশা তাঁকে অধিকতর আকুল করেছে—

সুখের সোয়াদ পাইনে মোটে, দুখের নেশায় ঘুর লেগেছে;
আলোর আশা আর করিনে, অন্ধকারে সুর জেগেছে!
মড়ক-মরার মুখ যে হাসে—কোথায় আছে তেমন হাসি?
শিবের চেয়ে শবের শোভা!—শিব যে হেথায় মূর্চ্ছা গেছে!

এই অধ্যাত্মগভীর নৈরাশ্যের ছায়া তাঁর প্রথম রচনায় যে পড়েনি, এ কথা বলা যায় না; কিন্তু তাঁর নবীন হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ সেই মনোরম ছায়ার উপর অমৃতের রেখা টেনে দিয়েছিল। কিন্তু এই ভাবাতিরেকের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তার আভাসও তিনি তাঁর প্রথম রচনায় অনুভব করেছিলেন। স্বপ্নের মধ্যে বাস করলেও, স্বপ্নের পর যে নির্ম্মম জাগরণ আছে, সেই আসন্ন জাগরণের আশঙ্কাও তাঁকে নিশ্চিন্ত হ'তে দেয়নি।

এই আশঙ্কা, এই সন্নিহিত বেদনার ছায়া তাঁর বর্ত্তমান রচনায় আরও ঘনিয়ে উঠেছে। প্রথম প্রাবৃটের শ্যাম-সমারোহ, মেঘমন্ত্র শ্রাবণের স্নিগ্ধ-নিবিড় অন্ধকারে পরিণত হয়েছে। 'বিস্মরণী'র কবি এখনও স্বপন-পসারী; কবি-প্রকৃতির অনুবন্ধী কল্পনা-প্রবণতাকে তিনি সম্পূর্ণ এড়াতে পারেননি। ছন্দ ও ভাষার অপূর্ব্বতার ভিতরে এই ছন্দকুশলী ও শিল্পী-কবি কাব্য-লক্ষ্মীর যে রঙীন রসরূপটি ফুটিয়ে তুল্‌তে চেয়েছেন, তার চিরচঞ্চল প্রতিচ্ছায়া, আকাশের বহুরূপী নীলিমার মত, গানের মুকুরে স্পষ্ট ও জাগ্রতরূপে প্রতিফলিত হ'লেও, তাঁর নিজের কাছে চিরদিন অনায়ত্ত ও অপরিমেয়—

গানেরি আড়ালে সাড়া দেয় শুধু
সে অপ্সরা,
বাহির ভুবনে এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা!

ইহাই বুঝি সমস্ত কল্পনাবিলাসী কবির, ভাবপ্রাণ idealist-এর অন্তরের আক্ষেপ! অন্তর ও বাহিরের, বাস্তব ও অবাস্তবের এই দ্বন্দ্ব চিরন্তন, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব তখনই প্রবল হ'য়ে ওঠে যখন স্বপনবিলাসী তাঁর ধ্যান-সাধনার অশরীরী বাণীকে অন্তরের পদ্মাসন থেকে বাহিরের সুখ-দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেন। স্বপন-পসারী হ'লেও কবি রূপের উপাসক, তিনি জীবনকে সৌন্দর্য্যের চক্ষে দেখেছেন; কারণ তিনি রূপের মধ্যেই রূপাতীতের, জীবনের মধ্যেই মহাজীবনের আভাস পেয়েছেন। তিনি শুধু নিজের মনোরাজ্যে অপূর্ব্ব একলোক সৃষ্টি ক'রে,

* বিস্মরণী— শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। প্রবাসী-কার্য্যালয়। মূল্য ২৷৹ টাকা।

বাস্তব জীবন ও জগতের সংযোগ হারিয়ে, অতীন্দ্রিয় ভাবের খেলা নিয়েই বিভোর হননি, একটা অপরিস্ফুট গীতোচ্ছ্বাসেই তাঁর কাব্য-সাধনা পরিসমাপ্ত হয়নি। যিনি এরূপ রূপের উপাসক, তাঁর দেবতা সুন্দর—পূজা চান্ না, ভালবাসা গ্রহণ করেন। এ ভালবাসা শুধু কল্পনার জিনিষ নয়; এই আত্মার আনন্দ দেহের তৃষ্ণাতেই জেগে ওঠে!

হৃদয়ে হৃদয় রাখি', ওষ্ঠে শুষি' সব রস
—কণ্ঠ-সিক্ত গীত-রসায়নে,
ও রূপ-দীপক-রাগে দাহ করি' অপযশ,
দেহ-দীপ জ্বালায়ু যতনে!

এই দেহ-বাদ বা বস্তু-বাদ আমাদের কবির বর্ত্তমান রচনায় আরও নিবিড়রূপে দেখা দিয়েছে। যেমন আত্মা ছেড়ে দিয়ে দেহের মুক্তি নেই, তেমনই দেহ ছেড়ে দিয়ে আত্মার মুক্তি অসম্ভব। বস্তু-জগৎটা কবির কাছে ছায়াময় হয়নি ব'লেই, তাঁর মানস-প্রতিবিম্ব অপরূপ কায়া-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়েছে। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে' শুধু কাল্পনিক মানস-প্রতিমার দিব্যস্তুতিতে তাঁর গান পর্য্যবসিত হয়নি; বরং, তিনি চোখে রূপ, দেহে স্পর্শ, অন্তরে অনুভূতি নিয়ে মৃণ্ময়ী প্রতিমার মধ্যে যে জ্যোতির্ম্ময় দেব-আত্মা আছে, তাঁকেই দেহ-ভূমি থেকে মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আধুনিক সময়ের গীতি-কবিতায় মন যে দেহকে ছাড়িয়ে উঠেছে তা' নয়; আধুনিক কবিতা দেহকে অস্বীকার করে' বাস্তব জগৎ ও জীবনকে অপমান করেছে। এই কবিতায় মানস-আত্মার অসার অতৃপ্তি আছে, কিন্তু দেহ-আত্মার তীব্র ক্ষুধার ক্রন্দন নেই! এই নিরুদ্বেগ, ভাবপন্থী, আধুনিক গীতিকবিতাকে লক্ষ্য ক'রে আমাদের কবি তাঁর নূতন "মোহ-মুদ্গর" নিক্ষেপ করেছেন—

উর্দ্ধমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকা-মাধবী
নেহারিয়া নীহারিকা ছবি,—
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি' নীরক্ত অধরে,
উপহাসি' দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,
বুভুক্ষু মানব লাগি' রচি' ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
কতদিন ভুলাইবে মর্ত্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব,
হে কবি-বাসব?

এই কবিতায় শ্মশানকে উদ্দেশ ক'রেই আমাদের কবি ক্ষুব্ধ-চিত্তে বলেছেন—

কভু বা করিবে নৃত্য শব্দহীন অর্দ্ধরাতে
নিশাচরী বিজন অঙ্গনে,
ঝঙ্কারিবে অলঙ্কার মালিনী কি প্রদ্ধরাতে
কঙ্কালের কেয়ূরে কঙ্কণে!
তার মাঝে কোথা তুমি? হা অভাগ্য পুরোহিত!
কোথা আশা কোথা সে পিপাসা?
প্রাণযজ্ঞে দেহ কোথা? কোথা রক্ত সুললিত?
সঞ্জীবন-শক্তি-মন্ত্র-ভাষা?

এ কথা সত্য যে, দেহের বন্ধন থেকে মানস-মুক্তি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিল্পের আদর্শ; কিন্তু দেহকে স্বীকার ক'রে না নিলে এ দেহ-মুক্তির উপায় নেই। যেমন শ্রীমন্দিরে ঢুকতে হ'লে প্রথমে নাট-মন্দিরের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, তেম্‌নি আত্মায় পৌঁছিবার পথেও এই দেহই সুখ-দুঃখের নাট-মন্দির। দেহ-বাস্তবের ক্ষুদ্র অনুভূতির উপরই বৃহত্তর শাশ্বত সাহিত্যের ভিত্তি। সেইজন্য আমাদের কবি দেহকে উপেক্ষা করেননি, শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছেন। দেহ সত্য ব'লেই জীবনের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিকট সত্য। ধরণীর রূপরসে তাঁর প্রাণ মাতোয়ারা—

দেহ ভরি' কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাখি' খুঁড়ি' লও কামনার কাচমণি-হীরা।
অন্ন খুঁটি লব মোরা কাঙালের মত,
ধরণার স্তনযুগ করি' দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন আঘাতে করিব জর্জ্জর—
আমরা বর্ব্বর!

কিন্তু এই দেহ-বাদ প্রকৃতপক্ষে দুঃখ-বাদ, কারণ যেখানে সসীমের সত্তা সেখানেই বেদনার অনুভূতি। দার্শনিক Schopenhaur মানবের এই চিরন্তন বেদনার বন্দনা গান করেছিলেন ব'লেই, কবি তাঁহাকে নমস্কার করেছেন; কিন্তু কবি এ বেদনা হ'তে মুক্তি চান না! দেহ-ধর্ম্মকে রোধ করে', শুধু জ্ঞানের ভিতর দিয়ে প্রাণহীন শিলার মতন নির্ব্বিকার চিত্তে বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকা নয়, ম'রে যাওয়া। দার্শনিক দিব্যচক্ষে দেখেছেন যে, এই জীবনের নিগূঢ় সত্য-দুঃখ, কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেই যে সুখ আছে, এই মৃত্যুর মধ্যেই যে অমৃতের আস্বাদ আছে, তা' বুঝি জ্ঞানযোগী দার্শনিক কখনও পাননি!

যূপবদ্ধ পশু আমি?—ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে? না, না, সে যে মধুর উৎসার!
দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার!

ধরণীর মৃৎপাত্রে মানুষ যা' জীবনের রস বলে' পান করছে, তা' বুঝি সুধা নয়, কালকূট—তার প্রেমও বুঝি "মোহের মঞ্জরী ভরা বিষ-বীজ ধরার অঞ্চলে,।"

তবুও এই ধরণীর রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধের উন্মাদনা মানুষ অস্বীকার করতে পারে না; দেহ ও প্রাণের রক্তময় বেদনাকে উপেক্ষা করা যায় না।

জীবনের দুঃখসুখ বারবার ভুঞ্জিতে বাসনা
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো!
যাতনার হাহারবে গাই গান, তৃষ্ণার্ত্ত রসনা
বলে, "বন্ধু! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো!
তাই আমি রমণার মায়ারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আর বার না নিবিতে গোধূলির আলো!
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো।

*   *   *

কোথা হ'তে আসি কিবা কোথা যাই—কি কাজ স্মরণে?
চলিয়াছি এই সুখ! সঙ্গে চলে ওই গ্রহতারা!
ভয়, পাছে থেমে যাই গতিহীন অবশ চরণে,
দিক্-চক্র-অন্তরালে হ'য়ে যাই উদভ্রান্ত-হারা!
আমারে হারাই যদি! যদি মরি সুধীর মরণে!
ব্যথা আর নাহি পাই শেষ হয় নয়নের ধারা!
বল, বল হে সন্ন্যাসী! এ চেতনা চিরতরে হবে না' ত' হারা।

*   *   *

সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির মরণ-পিপাসা।
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ স্বপন!
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথা নাই অমৃতের আশা
ফিরে ফিরে আসি তাই ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ!

এই জন্ম-মালিকার—মৃত্যু সূচী, ডোর ভালবাসা—
প্রকৃতি যোগায় ফুল নারী গাঁথে করিয়া চয়ন—
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত-নয়ন।

এই কবিতা দুটির আলোচনা একটু বিস্তৃতভাবে করা গেল, তার কারণ এই মূলভাবটি অবলম্বন ক'রে কবির অনেকগুলি রচনা বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেছে। "স্পর্শরসিক" কবিতায় এই ভাবটিই নূতন পাত্রে নূতন ক'রে পরিবেশন করা হয়েছে। অন্ধের কাছে সমস্ত জগতের অনুভূতি রূপে নয় স্পর্শে, গন্ধে, শব্দে। কিন্তু শুধু স্পর্শের মধ্যে যার সমস্ত চেতনা সীমাবদ্ধ এইরূপ কোন দৃষ্টিহীন স্পর্শরসিককে কল্পনা ক'রে কবি তার মুখে ইন্দ্রিয়-চেতনায় চেতন দেহীর স্নিগ্ধ বেদনার আভাস দিয়েছেন—

অন্ধ আমি, গন্ধ তাই দিশে দিশে করে দিশাহারা,
চিরদিন মধু করে মধুর বঞ্চনা—
করাঙ্গুলি ক্ষত হয়, হেরি না যে কাঁটার পাহারা,
দৃষ্টিহীনে করে সবে বৃথাই গঞ্জনা।
সে বেদনা কণ্ঠে মোর গীত হ'য়ে বাজে,
ব্যথায় বৃহৎ হ'য়ে সে ফুল বিরাজে,
অশ্রুজলে আর্দ্র হয় জীবনের এ মরু সাহারা,
প্রাণের পীরিতি মোর হয় নিরঞ্জনা!

কবি তাঁর মৃত্যু-শোক কবিতায় এই দেহদেবতার যে-বন্দনা করেছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব। দেহ নশ্বর, কিন্তু প্রেম কেন দেহের কাঙ্গাল? প্রত্যেক দেহের একটি যে নিজস্ব গঠন আছে, তার মত সুন্দর জগতে আর কিছু নেই, তাই—

একবার হ'লে গত,
এ ছায়া-আলোকে আর গড়িবে না
কায়াখানি তার মত।
সেইজন্যই মনের মমতা দেহের জন্য পাগল।
তোমারেই চিনি হে দেহ-দেবতা।
প্রলয়ের একাকার,
তুমিই রুধিছ বহুবিধ রূপে
তোমারে নমস্কার।
দেহে দেহে তুমি এত অভিনব।
দেহের বাহিরে কোথা বাস তব?
হাসি ক্রন্দন তব উৎসব।
পীরিতির পারাবার।
অধরে, উরসে, চরণ-সরোজে
আরতি যে অনিবার।

আর্টের দিক্ থেকে, এই দেহ-বাদ বা দুঃখ-বাদ আমাদের কবির রচনায় সোনার ফসল ফলিয়েছে। এই বেদনার প্রেরণা কবিকে বহির্জগতের দিকে উদ্বুদ্ধ ও উন্মুখ ক'রে দিয়েছে; অনুভূতির শক্তি তীব্র হয়েছে ব'লে Pre-Raphaelite কবিদের মত তাঁর বহির্দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে। সেইজন্য তাঁর ধ্যান সুরময়, তাঁর চিন্তা চিত্রময় হ'য়ে উঠেছে।

To think in terms of the concrete ভাবকে রেখা ও বর্ণের সীমানার মধ্যে ধরা, চিরচঞ্চল কল্পনার প্রতিচ্ছবি ভাষা ও ছন্দের পটে প্রত্যক্ষ ক'রে তোলা,—তাঁর আর্টের এই বিশেষত্বটি তাঁর পূর্ব্বোক্ত ভাবচিন্তার অনুবন্ধী। এই অপূর্ব্ব চিত্রাঙ্কণশক্তি তাঁর রচনার সর্ব্বত্র দেখা যায়, কিন্তু ইহার সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়, তাঁর দুইটি কবিতায়। "শিউলির বিয়েতে" শুধু স্বভাবাঙ্কন নয়, সমস্ত কবিতাটি পড়্‌তে পড়্‌তে যে মধুর চিত্রটি সজীব হ'য়ে ফুটে ওঠে, তার পরিকল্পনার মিষ্টতা ও নির্ম্মাণ-শিল্পের নৈপুণ্য দুএকটি উদ্ধৃত ছত্র থেকে বোঝা যাবে না। "দীপশিখার" সমস্তটি কতকগুলি নিপুণ চিত্রের সমাবেশ।

এইরূপ অনেকগুলি কবিতায় এই রূপরসমুগ্ধ আর্টিষ্ট চেষ্টা করেছেন শুদ্ধ একটা ছবি আঁক্‌তে—সেই ছবির মধ্যে ভাবটি ধীরে ধীরে দীপ্ত হ'য়ে আপনি ফুটে উঠেছে। তাঁর "বাঁধন" "মৃতপ্রিয়া" "ঘুঘুর ডাক" "কন্যা শরৎ" ও "কালাপাহাড়" এই শ্রেণীর রচনা। এইসকল কবিতায় তাঁর উদ্দেশ্য একটি অবস্থা, একটি mood বা একটি atmosphere-এর আলোখ্য-সৃষ্টি। ইতিহাস-বর্ণিত কালাপাহাড়কে উপলক্ষ্য ক'রে কবি শুধু march of the Iconoclastএর একটা ছবি আঁক্‌তে চেষ্টা করেছেন। মানুষের জীবনে, সমাজে ও ধর্ম্মে স্তূপাকার আবর্জ্জনার মত, যে-সব প্রাণশক্তিরোধী অনাচার ও কুসংস্কার যাকে বেকন্ idol বা অসত্যের প্রতীক বিগ্রহ বলেছেন—

আদি হ'তে যত বেদনা জমেছে বঞ্চনাহত ব্যর্থশ্বাস—

সেই সমস্ত পুঞ্জীভূত অসত্য ও অপমান এই বিগ্রহধ্বংসী, কালপুরুষের মত নির্ম্মম, অসত্যদেবতার চিরন্তন শত্রুর করাল দণ্ডের আঘাতে চূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে—

ভেঙ্গে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া, দারু শিলা কর নিমজ্জন।
বলি-উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জ্জন।
নাই ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ যবন, নাই ভগবান্—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে। মানুষের বুকে রক্ত চাই।

যা' ভঙ্গুর তা' ঝটিকার মুখে ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু এই প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অপূর্ব্ব ধ্বংসলীলার মধ্যে নব সৃষ্টির আয়োজনও রয়েছে।

ব্রাহ্মণ-যুবা যবনে মিলেছে, পবন মিলেছে বহ্নি সাথে।
এ কোন্ বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির প্রলয়-রাতে।
মরুর মর্ম্ম বিদারি' বহিছে সুধার উৎস পিপাসা-হরা।
কল্লোলে তার বন্যার রোল। কূল ভেঙ্গে বুঝি ভাসায় ধরা।
ওরে ভয় নাই। মুকুটে তাহার নবারুণ ছটা, ময়ূখ-হার।
কাল নিশিথিনী লুকায় বসনে। সবে দিল তাই নাম তাহার
কালাপাহাড়।

ইতিকথার এইরূপ নূতন imaginative interpretation-এর চেষ্টা তাঁর নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর কবিতাতেও দেখা যায়।

পূর্ব্বে যা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যাবে যে, কবির মনের মধ্যে যে objectivity বা বস্তুপ্রাণতা রয়েছে, তাতে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ কল্পনাপ্রবণতায় এক অভিনব পরিণতি ঘটেছে। একদিকে কেবলমাত্র ভাবোন্মাদনা, অন্যদিকে কেবলমাত্র বস্তুমোহ… এই বাস্তব কল্পনার বিবাদ উত্তীর্ণ হ'য়ে তাঁর আর্ট একটি সরল ও সুস্থ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাব্যলক্ষ্মী তাঁর চক্ষে কল্পনার দিব্যাঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু দেহ বাস্তবের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ সংযোগ তাঁকে অপূর্ব্ব শিল্পী ক'রে তুলেছে। কবির স্বভাব-ধর্ম্মকে তিনি খাটো করেননি, কিন্তু সেইসঙ্গে শিল্পীর সংযমকেও তিনি বরণ ক'রে নিয়েছেন। সেইজন্য, মুখ্যতঃ কাঠামোটা lyric হ'লেও, তাঁর কবিতা অনেকটা narrative বা dramatic এর দিকে ঝুঁকেছে। সুতরাং "নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর" "মৃত্যু ও নচিকেতা" প্রভৃতি কবিতায় তিনি অসামান্য সিদ্ধিলাভ করেছেন। খুব উঁচু কথা, খুব সূক্ষ্ম বিচার,

খুব উদার তত্ত্বচিন্তা কবিতার কাজে লাগে না, যদি সেগুলি কবির অনুভূতির ভিতর দিয়ে শিল্পীর নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যে আত্মপ্রকাশ না করে। "যম ও নচিকেতা"র উপনিষদের ইতিহাসের ছায়াটুকু গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু ইহাতে মৃত্যুযজ্ঞের যে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা আছে, সেটি মোটেই দার্শনিক বিচার, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বা সমস্যার সমাধান নয়। কবি যা বল্‌তে চেয়েছেন সেটি নিত্য অনুভূত সামান্য কথামাত্র; কিন্তু বৈদিক যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা মানসিক setting-এর ভিতর দিয়ে সেই শাশ্বত কথাটি বিচিত্র হ'য়ে ফুটে উঠেছে। যার হৃদয় দুর্ব্বল ও মলিন, মৃত্যু তার মহাভয়, যূপবদ্ধ পশুর মত জীবযজ্ঞভূমে সে সহস্রবার মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে; কিন্তু যে মহাপ্রাণ আপনার প্রাণধন বিশ্বের প্রাণে বিলাইয়া দেয়, আপনাকে আপনি জগতের যজ্ঞরূপে বলিদান করে, সেই মৃত্যুকে আত্মার আরাম ব'লে বুঝতে পারে, সেই নিঃশেষে ম'রে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়। যজ্ঞের পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে এই কথাটি অতি নিপুণতার সঙ্গে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এইখানেই কবি ও শিল্পীর পরিচয়।

কবি মোহিতলালের নিখুঁত লিপিকুশলতার পরিচয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব।

তবে মোহিতলাল বাঙ্গালী পাঠকের অপরিচিত নন। তিনি ছন্দকৌশলে ও শব্দমন্ত্রে অসাধারণ সিদ্ধিলাভ ক'রে সকল সাহিত্যানুরাগীর মন আকর্ষণ করেছেন। নিরর্থক বাক্যাড়ম্বর বা কথার অসদ্ব্যবহার তাঁর অজ্ঞাত এবং শব্দের ঝঙ্কার বা ধ্বনি সম্বন্ধে তাঁর কাণ অভ্রান্ত। এইজন্য অমিত্রাক্ষরছন্দে এবং stanza form-এ তিনি তিনি যে-বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তা খুবই সফল হয়েছে। বাস্তবিক, শব্দনির্ব্বাচনে বা ধ্বনির সৃষ্টিতেই শিল্পীর পরিচয়, কারণ এই gift of phrasing বা শব্দসৃষ্টির শক্তিই প্রকৃত প্রতিভার লক্ষণ। এই হিসাবে তিনি তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতায় যে-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা আজকালকার বাঙ্গালা কবিতায় বড় বেশী দেখা যায় না। কিন্তু এই techniqueএর সৌষ্ঠব সার্থক হ'ত না, যদি তাঁর ভাব ও ধারণার স্পষ্টতা ও বৈচিত্র্য না থাকৃত।

রোমান্টিক ভাবে অনুপ্রাণিত হ'লেও, নিখুঁত কারিগরি হিসাবে মোহিতলালের কবিতাগুলি ক্লাসিক আর্টের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়। Concrete details বা খুটিনাটির দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য আছে ব'লেই শব্দচয়নের গাঢ়তা ও গৌরবে তাঁর কবিতার ভাব-কল্পনা শাণোল্লিখিত হীরক-খণ্ডের মত পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। বিদেশী কবিদের মধ্যে Landor ও Tennyson এবং দেশী কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় বড়ালের প্রভাবই তাঁর কবিতায় বেশী দৃষ্ট হয়। এইসমস্ত কবির কাছ থেকে তাঁর শিক্ষা হয়েছে—শিল্প-সৌন্দর্য্য, বিন্যাস-নৈপুণ্য ও নির্ম্মাণ-কৌশল।

কবি নিজেই আক্ষেপ করেছেন যে, তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর পূর্ণ রূপটি ছন্দ ও ভাষার পটে ধরা পড়ে না। এ কথা তাঁর পক্ষে একেবারে সত্য না হ'তে পারে। কিন্তু তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করতে যাওয়া যে বিড়ম্বনা তাতে সন্দেহ নেই। আমরা এ প্রবন্ধে তার চেষ্টা করিনি; শুধু তাঁর অপূর্ব্ব রচনাগুলির মধ্যে যে-আনন্দ উপভোগ করেছি, এবং সেই উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে-সব কথা মনে হয়েছে, তারই কিছু আভাস এখানে দিতে চেষ্টা করেছি মাত্র।

নির্ব্বাণষট্‌ক

শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু

মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত আমি নই,
নহি ব্যোম ভূমি না বা তেজ বায়ু হই,
নহি শ্রোত্র জিহ্বা আমি নহি নেত্র ঘ্রাণ,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ১

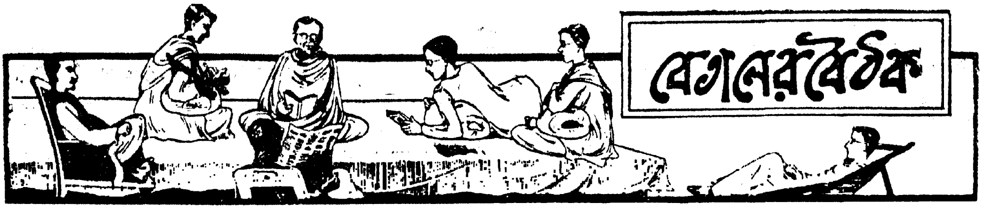
নহি সপ্তধাতু আমি নহি পঞ্চ বায়ু,
নহি বাক্ পাণি পাদ না উপস্থ পায়ু,
নহি পঞ্চকোষ আমি নহি আমি প্রাণ,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ২

নাহি দ্বেষ রাগ মোর লোভ মোহঘোর,
নাহি মদভাব নাহি মাৎসর্য্য মোর,
নাহি ধর্ম্ম অর্থ কাম নাহি মোক্ষ প্রাণ,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ৩

না পুণ্য না পাপ নাহি সুখ দুঃখ ভোগ,
না তীর্থ না মন্ত্র নাহি বেদ যাগ যোগ,
না ভোজন না ভোক্তা না ভোজ্য উপাদান,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ৪

না বন্ধু না মিত্র নাহি গুরু শিষ্য ধ্যান,
পিতা নাহি মাতা নাহি নাহি জাতি জ্ঞান,
নাহি শঙ্কা নাহি জন্ম নাহি তিরোধান,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ৫

আমি নির্ব্বিকল্প মোর নাহি রূপকায়,
সকল ইন্দ্রিয়ে বিভু আমি সমুদায়,
নাহি অসঙ্গত নহি মুক্তি পরিমাণ,
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান। ৬



জিজ্ঞাসা

(১২)

পশু-পক্ষী সম্বন্ধীয় পুস্তক

পশু-পক্ষী সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ কোন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে কিনা? হইয়া থাকিলে তার দাম কত ও কোথায় পাওয়া যাইবে?

শ্রী জহিরুল এস্‌লাম

(১৩)

ষ্টীম্‌-লাঙ্গল

এমন কোন অল্পদামের ষ্টীম্‌-লাঙ্গল আছে কি যাহাতে ২১১ শত একার জমী অল্প খরচে চাষ দেওয়া চলে? উহাতে খুব বর্ষাতে কাজ চলে কি? যদি থাকে কোথায়—এবং দাম কত? এ, সি, ডে

(১৪)

"আল্‌কাত্রা"র দাগ

কাপড়ে "আল্‌কাত্রা"র (Coaltar) দাগ কিরূপে উঠান যাইতে পারে। কেহ জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

শ্রী কোমলেন্দুকুমার সেন রায়

(১৫)

মাছের আঁশের মুক্তা

মাছের আঁশ হইতে যে নকল মুক্তা প্রস্তুত হয়, তাহা আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় কিনা? তাহার প্রস্তুত-প্রণালী কেহ জানাইলে বাধিত হইব। শ্রী শিবপ্রসাদ দাস চৌধুরী

—

মীমাংসা

(গত বৎসরের ৭৩ নং)

কাপড়-কাটা পোকা

পিপীলিকা কেরোসিন তৈল প্রয়োগে অতি সহজে তাড়াইয়া দেওয়া যায়। দোকানের আলমারীর খুঁটীগুলির তলায় কেরোসিন তৈল দিলে কখনও আর পিপীলিকা উপরে উঠিবে না। ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। অনেকেই এরূপ প্রয়োগে বেশ ফল পাইয়াছেন। একটা কাপড়ের টুকরায় কেরোসিন তৈল ভিজাইয়া সর্ব্বদা খুঁটীর মধ্যে লাগাইয়া রাখিলেই হইবে। শ্রী বীরেশলোচন সেন

(গত বৎসরের ৭৪ নং)

খেজুর গুড়

খেজুর গুড় তৈয়ার হইলে পর উহার মধ্যে কিছু তেঁতুল দিলে আর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তেঁতুল অল্প পরিমাণে দিতে হয়, তাহা না হইলে মিষ্টতা নষ্ট হইয়া যাইবে। তেঁতুল ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যেখানে বেশী পরিমাণে গুড় হয়, সেখানে সহজলভ্য তেঁতুলই সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। শ্রীমতী ইলাবতী সেন

(২)

বাংলা শর্টহ্যাণ্ড

বাংলা শর্টহ্যাণ্ডের হরফ সীসার অক্ষরে ছাপা মোটেই সুবিধাজনক নহে এবং তাহার ব্যবস্থাও কোথাও নাই। লিথো এবং ব্লক এই দুই উপায়ে মাত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত বাংলা শর্টহ্যাণ্ডের যে উৎকৃষ্টতম প্রণালী আছে আমি তাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি সুতরাং এসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুকে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় জানাইতে পারি। ৭ রাজাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় আমার সহিত পত্রালাপ করিলে সুখী হইব। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল, বাংলা শর্টহ্যাণ্ড প্রকাশ করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

শ্রী প্রভাতকিরণ বসু

(৬)

প্রবাদ বাক্য

খয়ের খাঁ,—এই শব্দটিই অশুদ্ধ। কোন খাঁ সাহেবের সহিত ইহার সংস্রব নাই। শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ "খায়ের খাহ্‌"। ইহা ফরাসী ভাষার একটি যৌগিক শব্দ।

খায়ের=শুভ, মঙ্গল।

খাহ্‌—ইচ্ছা করা।

সুতরাং খায়ের খাহ্‌—শুভেচ্ছু।

মো-সাহেবগণ সর্ব্বদাই প্রভুর শুভেচ্ছু বলিয়া নিজকে প্রকাশ করিতে থাকে, তাই তাহারা—খায়ের খাহ্‌।

পার্শি অনভিজ্ঞগণ ইহার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। অর্থ না বুঝার দরুন্‌ 'খাহ্‌' শব্দকে তাহারা 'খাঁ' মনে করিয়াছে এবং তাহা হইতেই "খয়ের খাঁ" শব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

(২)

যত দোষ নন্দ ঘোষ

বাল্যে শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না এবং সর্ব্বদাই অত্যাচার উৎপীড়নাদিতে রত থাকিতেন। তাঁহার উৎপাতে ব্রজবাসীগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। তাহাদের মনে এরূপ একটা ধারণা জন্মিল যে, নন্দ ঘোষের ছেলে ব্যতীত কেহ কোন অন্যায় আচরণ করিতেই পারে না। সুতরাং অন্য দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন অন্যায় কার্য্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করিয়া নন্দ ঘোষের নিকট অভিযোগ করিত। এরূপ নালিশ প্রায় সর্ব্বদাই চলিত। নন্দ ঘোষ যখন জানিতে পারিলেন যে, সকল কার্য্যের জন্যই কৃষ্ণ দোষী নয় তখন তিনি এরূপ মিথ্যা অভিযোগে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"যত দোষ নন্দ ঘোষ"।

সেই হইতেই এ প্রবাদের সৃষ্টি হয়।

পটল তোলা—অর্থাৎ মরিয়া যাওয়া। পটল—চোখের পাতা। মৃত্যুর সময় চোখের পাতা উল্টিয়া যায় সুতরাং পটল তোলা অর্থে মৃত্যু।

শ্রী শিবপ্রসাদ চৌধুরী

(১১)

নারিকেলের খোলা

নারিকেলের খোলা দ্বারা আমাদের দেশে বোতাম এবং হুঁকার খোল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারায়ণগঞ্জে (ঢাকা) ইহার বোতামের ফ্যাক্টরী আছে; তথায় ইহার দ্বারা কোর্টের জন্য কাল বোতাম প্রস্তুত হয়। তাঁহারা এবং যশোহরের অন্তর্গত বেদিয়ারা ও কুমিল্লায় হুঁকার ফ্যাক্টরী হইতে এই নারিকেলের খোলা পাইকারী দরে ক্রয় করা হয়। এই সমস্ত স্থানে পত্র লিখিলে মূল্যাদির বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায়। আমাদের দেশে বোধ হয় ইহার দ্বারা শাঁখা ইত্যাদি প্রস্তুত হয় না।

শ্রী প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়



[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক ; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—সম্পাদক]

রেলওয়ে যাত্রী দিবস

প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় রেল-যাত্রীদের বিবিধ অসুবিধার বিষয় বিবিধ প্রসঙ্গ নিবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

এই বিষয়ে আমি একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। যাত্রীদের গমনাগমনের ও বহু অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি অবশ্য রেল কোম্পানী উদাসীন। কিন্তু যাত্রীবৃন্দের আত্মকৃত কর্ম্মের ফলও অপর যাত্রীদের পক্ষে কম অনিষ্টজনক হয় না। প্রত্যেক গাড়ীর উভয় পার্শ্বে প্রশস্ত জানালা থাকা সত্ত্বেও বহুলোক গাড়ীর মধ্যেই থুথু, কাশি, ও নাকের সিক্‌নি ফেলিয়া থাকে। ইহা যে অন্যের পক্ষে কত ঘৃণাজনক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর তাহা কেহই বিবেচনা করে না। যদি গাড়ীতে থুথু ফেলিবার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট জরিমানার আদেশ থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় কেহ থুথু ফেলিতে সাহস করিত না।

তাহার উপর ভিড়ের দিনে যদি কেহ একবার গাড়ীতে উঠিতে পারিল তবে যাহাতে আর কেহ সে গাড়ীতে উঠিতে না পারে তাহার জন্য দরজায় ধাক্কা, চলন্ত গাড়ী হইতে লোককে ঠেলিয়া ফেলা আমি নিজে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এমন কি নারী হইলেও অনেকে উঠিবার সময় সাহায্য করেন না।

রেল কোম্পানীকে তাহাদের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য অভিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে অবশ্য নিজেদের দোষগুলি সংশোধন করা আবশ্যক।

রেলওয়ের বহু ষ্টেশনে পানীয় জলের বন্দোবস্ত নাই। এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে পানীয় জলের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। যশোহর ই, বি, রেলের একটা বড় ষ্টেশন, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত আমি এ বিষয়ে ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াও জলের কোন বন্দোবস্ত করাইতে পারি নাই।

অনেক ষ্টেশনে ট্রেণ ২।১ মিনিটের অধিক দাঁড়ায় না। একটি বা দুইটি মাত্র দরজা দ্বারা মেয়েদের উঠা এবং নামা দুই করিতে হয়। সহযাত্রী পুরুষ ব্যক্তি যদি একটু অধিক ক্ষিপ্রতা অবলম্বন না করে তবে হয় জিনিষের কিয়দংশ, না হয় মেয়েরাই নামিতে পারে না। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় যদি উঠা নামার সময় একটু লক্ষ্য করেন তবে ট্রেণ ক্ষণকাল বিলম্বে ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু কার্য্যতঃ কোন ষ্টেশনে কোন মাষ্টার মহাশয় সে দিকে লক্ষ্য করেন না। "সম্পাদকের চিঠি" প্রবন্ধে দেখিলাম ইউরোপেও নারী বা প্রাচীন ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন হইলে ট্রেণ বিলম্ব করে। আমাদের দেশে তাহা নিতান্তই অভাবনীয়।

গঙ্গাস্নান বা এইরূপ কোন যোগের সময় মালগাড়ীতেও গোরু ভেড়ার ন্যায় লোক বোঝাই করা হয়। মুখে ভিন্ন কার্য্যতঃ ইহার কোন প্রতিবাদ হয় না। যদি কেহ মাল গাড়ীতে না উঠেন তবে যাত্রী-গাড়ী অতিরিক্ত পাইবেনই ইহা বুঝাইবার কোন ব্যবস্থা থাকে না। অজ্ঞ লোককে পরিচালন করিবার প্রতিষ্ঠান না থাকায় আমাদের মনুষ্যত্বের অভাব-সূচক বহু উদাহরণ প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ হইতেছে।

শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার।

"নানাজাতীর আদর্শ প্রার্থনা"

(প্রত্যুত্তর)

এই শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক নমাজ বিশ্লেষণ করিয়া নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। মৌলবী দানেশ আহম্মদ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত মুসলমানদিগের প্রার্থনাও সার্ব্বভৌমিক। এ বিষয়ে প্রবন্ধলেখকের বক্তব্য এই :—

(১) লেখক নমাজের যে অনুবাদ দিয়াছেন, সে অনুবাদ যে ভুল মৌলবী সাহেব তাহা বলেন নাই। সুতরাং তিনি স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন যে অনুবাদ ঠিকই হইয়াছে। অনুবাদ যখন ঠিক এবং মন্তব্য যখন ঐ অনুবাদ-সঙ্গত, তখন ঐ মন্তব্য বিষয়ে কোনপ্রকার যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।

(২) মৌলবী সাহেব 'সুরা ফাতেহা'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সুরা নামাজ নহে। ইচ্ছা করিলে ইহা বর্জ্জন করা যাইতে পারে। নমাজের পূর্ব্বে কেহ এই অংশ পাঠ করেন, কেহ করেন না।

এ অংশ পাঠ না করিলে কোন প্রকার অপরাধ হয় না বা নামাজ অশুদ্ধ হয় না। শাস্ত্র পাঠ ও 'নামাজ' এক জিনিষ নহে।

(৩) মৌলবী সাহেব উক্ত সুরার যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক। ঐ সুরার একটা অংশ এই :—

"আমাদিগকে সরল সত্য পথ দেখাও"।

মৌলবী সাহেব বলেন "আমাদিগকে" অংশের অর্থ "পৃথিবীর সমুদায় মানব জাতিকে"।

মৌলবী সাহেব বিশ্বপ্রীতিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া সমুদায় মানব জাতির জন্য প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত। এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা যে ভুল তাহা পূর্ব্বোক্ত সুরা হইতেই প্রমাণিত হয়। উক্ত সুরাতে দুই শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইয়াছে।

প্রথমতঃ—এক শ্রেণীর লোকের প্রতি ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন। ("যাহাদিগের প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর"—সুরার এই অংশ হইতে সিদ্ধান্ত)।

দ্বিতীয়তঃ—আর এক শ্রেণীর লোকের প্রতি ঈশ্বর বিরক্ত ("যাহারা তোমার বিরাগ ভাজন"—সুরার এই অংশ হইতে সিদ্ধান্ত)।

উক্ত সুরাতে অবশ্যই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের জন্য প্রার্থনা করা হয় নাই। ইহারা 'পথভ্রষ্ট' ও ঈশ্বরের বিরাগ ভাজন হইয়াই রহিল।

লেখক মূল প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ক্লোয়ান্‌ঠেস্ দুর্ম্মতিগ্রস্ত লোকদিগের জন্তও প্রার্থনা করিয়াছেন।

(৪) নামাজে কাফেরগণ বর্জ্জিত ও অভিশপ্ত হইয়াছে এবং 'সুরা ফাতেহা'তেও কাফেরগণ (বা পথভ্রষ্ট লোক) বর্জ্জিত হইয়াছে। এই প্রকার প্রার্থনা অবশ্যই সর্ব্ববাদি-সম্মত হইতে পারে না। লেখক সর্ব্ববাদি-সম্মত প্রার্থনাকেই 'সার্ব্বভৌমিক' প্রার্থনা বলিয়াছেন। মৌলবী সাহেব ইহার অন্ত প্রকার অর্থ করিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন।

(৫) লেখক হিন্দু কি অহিন্দু ইহা বিচার না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, তিনি মুসলমান ধর্ম্মের মতেও 'কাফের' নহেন। অন্ততঃ তাঁহার মুসলমান বন্ধুগণ এবং পরিচিত মুসলমানগণও এই প্রকার বলেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

—

সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন

গত বৈশাখ সংখ্যা হইতে প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত "সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন" নামক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। এই প্রবন্ধটির নাম "সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন" কিন্তু ইহাতে পরিবর্ত্তন বা সে বিষয়ে জানিবার কিছুই নাই।

প্রথমতঃ কাসিম আলি খাঁ কাশীপুর রাজদরবারে ছিলেন না। তিনি ত্রিপুরা রাজদরবারে ছিলেন। স্বর্গীয় যদুভট্ট মহাশয় প্রথমে সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন তৎপরে গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। পশ্চিমের ঢং হইতে পৃথক্ "বিষ্ণুপুরের ঢং" বলিয়া তিনি একটা কথা লিখিয়াছেন কিন্তু এ কথার কোন অর্থই হয় না। বিষ্ণুপুরের শিক্ষা পশ্চিমের শিক্ষা। বিষ্ণুপুরের মহারাজ তানসেনের বংশধর বাহাদুর সেনকে আনাইয়া রাজদরবারে রাখিয়া বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত প্রচার করেন।

হরিনারায়ণ-বাবু বিষ্ণুপুর যাইয়া "রামশঙ্কর মিশ্র মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বারা অভ্যর্থিত হন এইরূপ লিখিয়াছেন।" লেখক সঙ্গীত-গুরু স্বর্গীয় রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে রামশঙ্কর মিশ্র করিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের কথা লিখিয়াছেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধে। কারণ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন কালেই ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল না। আর এক কথা রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গান যদি তিনি শুনিয়াছেন তাহা হইলে হরিনারায়ণ বাবুর বয়স ১০০ এক শত বৎসর হওয়া উচিত। "কৃষ্ণধনবাবু স্বরলিপি সাহায্যে ধ্রুপদগুলি রক্ষা করিতে গিয়া সেগুলি ধ্বংস করিয়াছেন"—এইরূপ উক্তি বিংশ শতাব্দীর একজন শিক্ষিত বৃদ্ধ ব্যক্তি যে লিখিতে পারেন তাহা আমাদের ধারণারই অতীত।

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য

—

সিংহলে প্রবাসী বাঙালী

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত সিংহল প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে একটু ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন আমি সেখানে "ধম্মপদ" পড়িতে গিয়াছিলাম। বাস্তবিক তাহা নহে, বিশ্ব-ভারতী হইতে আমাকে বৃত্তি দিয়া "অভিধম্ম" অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্র পড়িবার জন্য সেখানে পাঠান হয়। আমি সেখানে এক বৎসর থাকিয়া "অভিধম্ম" পাঠ করিয়া উৎকৃষ্ট প্রমাণ-পত্র পাইয়াছি। শান্তি-নিকেতনে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মত বৌদ্ধ-শাস্ত্রবিৎ আচার্য্যের নিকট হইতে সিংহলে "ধম্মপদ" অধ্যয়ন করিতে যাওয়া অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার।

শ্রী নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথের চিঠি*

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু

কর্ম্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কখনই আপনার প্রবৃত্তির উপর জয় লাভ করা যায় না। কর্ম্ম হইতে দূরে থাকিয়া প্রবৃত্তিকে চাপা দিলে তাহাকে মনের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখা হয়, তাহার হাত হইতে যথার্থ ভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। অতএব তুমি সর্ব্বদাই মঙ্গলকর্ম্মে নিজেকে নিযুক্ত রাখিবে—যখনই দেখিবে তোমার অহঙ্কার বা ক্রোধ উদ্যত হইয়া উঠিতেছে তখনি বুঝিবে তোমার কর্ম্ম মিথ্যা হইতেছে—নিজেকে মোহমুক্ত করিবার এইত একমাত্র উপায়। বনের মধ্যে তাড়া পাইলে তবেই যেমন শিকার-গুলা বাহির হইয়া পড়ে এবং তখনি যেমন তাহাদিগকে বধ করিবার উপযুক্ত অবসর—তেমনি কর্ম্মের তাড়নাতেই আমাদের মনের গোপনতা হইতে রিপুগুলি বাহির হইয়া পড়ে—সেই সময়েই তাহাদিগকে মারিবে বলিয়া যদি লক্ষ্য রাখ তবেই তাহারা ধ্বংস পাইবে নহিলে অস্থিমজ্জার মধ্যে তাহারা জড়াইয়া থাকিবে।

বিলাত-যাত্রার বিবরণ তোমরা আমার পত্রে প্রায় জানিতে পারিবে। যাত্রারম্ভের পূর্ব্বপত্রখানি এবার

*এই পত্রগুলি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়কে লিখিত হইয়াছিল।

শিলাইদহে বসিয়া লিখিয়াছি ছুটির পরে তোমরা তাহা দেখিতে পাইবে।

পরশ্ব শুক্রবারে আমরা যাত্রা করিব। তোমরা আমার বিদায়কালের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি—

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কোনো জীবকে কোনো কারণে কাহারো মারিবার অধিকার আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কেন না প্রাণের প্রতি প্রাণের একটি স্বাভাবিক মমতা আছে। সেদিন একটা বিষাক্ত সাপ মারিয়া আনিয়াছিল দেখিয়া আমি মনে আঘাত পাইলাম। আমাদের এ বাড়ীতে বড় বড় ইঁদুর অত্যন্ত অনিষ্ট করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে একটা খাঁচায় ধরা পড়িয়া বিষম ভীত ও বিপন্ন হইয়াছিল দেখিয়া আমার মনে বড় লাগিয়াছিল। কিন্তু এটা গেল হৃদয়ের কথা। কিন্তু ব্যবহারের দিক্ থেকে দেখিতে গেলে দেখা যায় কোনো প্রাণীকে কোনো কারণেই মারিব না একথা বলিলে কাজ চলিবে না। মশা মারিব না, ছারপোকা মারিব না, সাপ বাঘ মারিব না বলিলে নিজে মরিতে হইবে। এমন উপদেশ দিলেও কেহ মানিবে না। পাহাড়ের ক্ষেতে ফসল পাখীতে নষ্ট করে এখানকার চাষারা গুলি করিয়া ক্ষেত রক্ষা করে—আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু একথাও বলিতে পারি না মানুষ আপনার অন্ন পাখীকে দিয়া নষ্ট করাইয়া দুর্ভিক্ষে মরিবে। মানুষের শক্তি বিচিত্র, সে নানা কাজে প্রবৃত্ত—তাহার সেই কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে বনের পশুর আবির্ভাব তাহার পক্ষে বিষম ব্যাঘাতকর। এককালে যখন পেটাভেলের ঘরটাতে আমরা ছিলাম তখন ব্যাঙের উৎপাতে ঘরে বাস করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছিল। এই সব কারণে মানুষের সঙ্গে পশুর এক জায়গায় বিরোধ আছেই। মানুষ যেখানে সহর বানাইয়াছে সেখান হইতে পশু তাড়াইয়াছে। যেখানে তাহার চাষের ক্ষেত সেখানে এককালে পশুদের আবাস ছিল। পৃথিবীতে যতটা জায়গা মানুষ অধিকার করিয়াছে সে জায়গায় কত পশু থাকিত তাহার সীমা নাই—তাহারা স্থান ও আহার না পাইয়া মরিয়াছে। এ সকল কারণে তোমার এ সমস্যার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। অবশ্য বিনা কারণে পশু হত্যার কোনো সমর্থন করা যায় না সে-কথা বলাই বাহুল্য। আসল কথা আমার বিশ্বাস একদিন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ পশুদিগকে আঘাত না করিয়া নিজের সভ্যতার প্রয়োজনকে রক্ষা করিতে পারিবে। পশু-জীবনের সঙ্গে মানব-জীবনের একটা পূর্ণতর সামঞ্জস্য সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতে থাকিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তাহা না ঘটিলে আমাদের সভ্যতা অসম্পূর্ণ থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল মাত্র হৃদয় দিয়া সেই সামঞ্জস্য সাধন হইবে না; উপায়-উদ্ভাবনা বুদ্ধির দ্বারা করিতে হইবে। নতুবা পশুর ভিড়ে মানুষের অগ্রসর হইবার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। ইতি। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

The Dingle
Darjeeling

কল্যাণীয়েষু—

প্রত্যেক মানুষেরই বিশেষত্ব আছে, সন্দেহ নাই। জীবনের দুঃখে তাপে নৈরাশ্যে সেই বিশেষত্বই বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। যাহাকে আমরা প্রতিকূলতা বলি তাহাই যদি আমাদের আনুকূল্য না করে তবে আমরা ভীরু, আমরা অপদার্থ, আমাদের আত্মা যে আমাদের অবস্থার চেয়ে অনেক বড় ইহাই সকল দুঃখ-দুর্ঘটনার মধ্যে আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে।

আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি। ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

সত্যে মিথ্যায় মিলাইয়া মানুষ জীবন বহন করে সেটা কেবল তাহার দুর্ব্বলতার জন্য। সেটা যে তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য এমন কথা কেহই বলে না।

কেবল একটা বিচার করিবার আছে তাহা এই—বাহিরে মিথ্যার মত দেখিতে এমন অমিথ্যা অনেক আছে যেমন পরিহাস, কিম্বা কল্পনার স্বেচ্ছাকৃত লীলা, কিম্বা উন্মত্তকে বিপদ বা অন্যায় হইতে বাঁচাইবার জন্য কৌশল। অর্থাৎ যে মিথ্যা অন্যায় করিবার জন্য সত্য গোপন তাহা ষোলো আনা মিথ্যা। কিন্তু ভাল করিবার জন্য মিথ্যার বিপদ আছে। কারণ কোন্‌টা যথার্থই ভাল অনেক সময়েই আমরা নিজের সুবিধার দ্বারা তাহার বিচার করি এবং উপস্থিত মত যাহা ভাল, পরিণামে তাহা মন্দ হইতে পারে। কিন্তু মিথ্যার চেয়েও মন্দ আছে যেমন নরহত্যা সেখানে অন্তরের মধ্যে আপনিই বুঝিতে পারা যায় যে, অন্যায় বা নিষ্ঠুর হত্যা বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা বলা যায়। বস্তুত সত্যকেও যেখানে আমরা বিসর্জ্জন দিব সেখানে বড় একটা সত্যের খাতিরেই তাহা করিতে হইবে। কোন্ সত্যটা সেই পরিণামেই বড় তাহা সত্যপ্রিয় সত্যপরায়ণ ব্যক্তি আপনই বুঝিতে পারে—কিন্তু যে মানুষ সহজেই প্রত্যহই তুচ্ছ কারণে সত্যকে নষ্ট করিতে অভ্যস্ত তাহার পক্ষে এ কথাটা বোঝা অসম্ভব। তোমার প্রশ্নটি নিতান্ত সহজ নহে। কথাটা পরিষ্কার করিতে হইলে সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন করে। ইতি। ২০শে কার্ত্তিক ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

তুমি যে প্রশ্ন করেছ সে-সম্বন্ধে মুখে মুখে আলোচনা না হ'লে কথা পরিষ্কার হ'বে না। অতএব সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'বে। বড় চিঠি লেখবার মত সময় পাইনে।

মোটের উপর কথাটা হচ্ছে এই যে, কোন একটা বিশেষ বাক্যকে সত্য বলে না—জগতের নানা পদার্থের সঙ্গে আমাদের নানা সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধটি সম্পূর্ণ সত্য হ'লেই আমাদের জীবন সত্য হয়—সেই সকল সম্বন্ধে আমরা যদি প্রবঞ্চক কপট কৃপণ ভীরু বা স্বার্থপর হই তাহ'লেই সমস্ত জীবন দিয়ে আমরা মিথ্যা। কিন্তু বিষয়টি বড়। সংক্ষেপে সব কথা বলা চল্‌বে না। ইতি। ২১ কার্ত্তিক ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

অধ্যাপক ফুশে প্রভৃতি অতিথিদের নিয়ে কয়েকদিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম। আজ তাঁরা চ'লে গেছেন, এখন কতকটা ছুটী পেয়েছি।

তুমি নিজের সঙ্গে যে সংগ্রামের কথা লিখেছ সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েইত চল্‌তে হ'বে। কবেই বা নিষ্কৃতি পাব? আমাদের দেহের প্রাণ রক্ষাও ত নিরন্তর সংগ্রাম। আমাদের চরিত্রও একটা মানসিক প্রাণক্রিয়া—আমাদের মধ্যে যেটা মন্দ তারই সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমাদের মধ্যে যেটা ভাল সে বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠে। এই লড়াই একেবারেই যদি না থাক্‌ত তাহ'লে আমাদের চরিত্র নির্জ্জীব হ'য়ে পড়্‌ত। হার্‌তে হার্‌তেও আমরা জিৎব।

এসম্বন্ধে বাহির থেকে কোনো পরামর্শ দেওয়া শক্ত। তবু একটা কথা এই বলা যায়—চরিত্রকে সত্য ও সবল করার একমাত্র উপায় কর্ম্ম। প্রত্যেক মানুষকে অন্যান্য কর্ম্মের মধ্যে এমন একটি কর্ম্ম করতে হ'বে যেটি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ কল্যাণ-কর্ম্ম। এই কর্ম্মেই ধীরে ধীরে বন্ধন ক্ষয় করে নইলে কেবল মনে মনে বিতর্ক ক'রে আমরা বল পাইনে। ইতি—১ জানুয়ারী ১৯২০

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুদ্রিত পুরাতন পুস্তক

শ্রী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

কেবল নূতন বস্তু ও নূতন বিষয়ের প্রতিই যে মানুষ আকৃষ্ট হয় তাহা নহে। পুরাতনের প্রতিও স্বভাবতঃ মানুষের আকর্ষণ আছে। আমরা পুরাতন আত্মীয় স্বজনের সম্মিলনে আনন্দ লাভ করি। বহুদিন পরলোকগত পিতৃ পিতামহের ব্যবহৃত কোন বস্তু বা তাঁহাদের হস্তাক্ষর দর্শনে পুলকিত হইয়া থাকি। প্রাচীনতার প্রতি মানুষের এই যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ও কৌতূহল ইহাই পুরাতত্ত্ব জ্ঞানের মূল।

সম্প্রতি আমার পুস্তকালয়ের আলমারী পরিষ্কার করিবার সময় কয়েকখানি পুরাতন পুস্তক দেখিতে পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। পুস্তকগুলির কোনখানি ৫৩ বৎসর কোন খানি ৪০।৪৫ বৎসর যাবৎ আমার অধিকারে রহিয়াছে। আমার বহু পুরাতন গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি পোকায় কাটিয়াছে। কতকগুলি কেহ কেহ না বলিয়া লইয়াছেন এবং দুঃখের বিষয় কেহ কেহ পুস্তক পড়িতে লইয়া আর ফেরত দেন নাই। হিন্দিতে একটি প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি অন্যকে পুস্তক পড়িতে দেন তিনি নির্ব্বোধ। এবং যিনি অন্যের নিকট পুস্তক হাওলাত লইয়া ফেরত দেন, তিনি অধিকতর নির্ব্বোধ। যাহা হউক, আমি কর্ম্মসূত্রে নানাস্থানে নীত হইয়াছি, নানা প্রকার লোকের সংস্রবে আসিয়াছি, তথাপি এখনও যে কতকগুলি পুরাতন গ্রন্থ ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থাতেও আমার নিকট রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকখানির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি গ্রন্থ। পুস্তকখানি ১০৩ বৎসরের পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। অক্ষর দেখিয়া মনে হয় সিসার টাইপ নহে—কাঠের টাইপ, গ্রন্থের আখ্যাপত্র নাই, ভূমিকার কিয়দংশ মাত্র আছে। বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া গ্রন্থের নাম জানিবার উপায় নাই। রাজার গ্রন্থাবলীর সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম, একখানি "পথ্য প্রদান" নামে আখ্যাত। বিজ্ঞাপনের শেষাংশে "১২৩০ সাল ১৫ই পৌষ" লেখা আছে। গ্রন্থাবলীতে ইহার যে ইংরেজী বাংলা আখ্যাপত্র (Title page) সংলগ্ন আছে তাহাতে বাংলায় "শকাব্দা ১৭৪৫ ও ইংরেজীতে ১৮২৩" লিখিত আছে, সুতরাং গণনায় ১২৩০ সাল মিল হইতেছে।

গ্রন্থখানির বহুস্থানে হস্তাক্ষরে সংশোধন করা আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজার জীবন চরিতে বাংলায় রাজার নাম স্বাক্ষরের যে প্রতিলিপি আছে, এবং মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের "The Last Days in England of the Raja Ram Mohun Roy." গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ১৩৪ পৃষ্ঠার পর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়কে লিখিত রাজার যে একখানি বাঙলা পত্রের প্রতিলিপি (লিথো) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে আমাদের নিকট রক্ষিত গ্রন্থের সংশোধনগুলি যে রাজার নিজ হস্তাক্ষর তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থখানির শেষাংশে ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি শুদ্ধিপত্র আছে। সে সময়ে ছাপাখানার উন্নতি হয় নাই। বহুসংখ্যক ছাপার ভুল থাকিলে গ্রন্থ প্রকাশ বিফল হইতে পারে বোধ হয় এইজন্যই রাজা কেবল শুদ্ধিপত্রসংযোজন পর্য্যাপ্ত নহে মনে করিয়া হাতে লিখিয়া সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তর্কস্থলে একথা বলা যাইতে পারে যে, রাজা এই শ্রমসাধ্য কার্য্য অন্যের দ্বারাও করাইতে পারেন, এবং লেখকের হস্তাক্ষর হয়ত রাজার হস্তাক্ষরের অনুরূপ ছিল।

২। এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানিও উক্ত মহাত্মার রচিত। একখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

"পরমাত্মনে নমঃ।

প্রশ্নচতুষ্টয় এবং তদুত্তর

বিতরণার্থ

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল

২৫ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭০

কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল।"

সুতরাং এখানি ৭৯ বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। রাজার গ্রন্থাবলীতে এখানি "চারি প্রশ্নের উত্তর" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাবলীতে ইহার কোন আখ্যা-পত্র ছাপা হয় নাই। গ্রন্থের শেষে "ইতি বৈশাখ ৩০ শক ১৭৪৪" লিখিত আছে সুতরাং ২৬ বৎসর ৩ মাস পরে ইহা দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এই গ্রন্থ আর মুদ্রিত হয় নাই। বোধহয় ইহার কারণ এই যে, প্রথম প্রচারের ৭।৮ বৎসর পরেই ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা বিলাত গমন করেন। বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনীপাড়ার জমিদার ছিলেন। তৎকালে দেশের যে সকল সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ সুশিক্ষিত লোক রাজার প্রধান সহযোগী এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভার (যাহা পরে কলিকাতা ব্রহ্মসমাজ ও এক্ষণে আদিব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত হইয়াছে সহিত বিশিষ্ট রূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। পরে তিনি তেলিনীপাড়াতেও উপাসনার জন্য ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

৩। সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সম্বলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ। এখানি আশী বৎসর পূর্ব্বে ছাপা হইয়াছিল। আখ্যাপত্র ইংরেজী ও বাঙ্গালাতে লিখিত। বাঙ্গালা আখ্যাপত্র এইরূপ—

"বোপ দেবীয়ং

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণং।

শব্দ সাধন মুক্তাবলী।

প্রথম খণ্ডঃ।

চৌতাড়া নিবাসি শ্রীলশ্রীমৎ শিবচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি

কর্ত্তৃক সংশোধিতঃ।

শ্রীমত্তারকনাথ চট্টকুলজ প্রোন্মীলিতোদ্দীপনী।

নাম্না শেষ বিশেষ বোধনকরী জ্ঞানাঙ্কুরা রোপনী।

বালানাং ঝটিতি প্রবোধ জননী সংস্কার সম্পাদিনী।

ধীর শ্রীজয়শঙ্করাবকলিতা ভূয়াৎ সতাম্মোদিনী।

১৭৬৯ শকাব্দে

শ্রীরামপুরে চন্দ্রোদয় যন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৫৪ সাল।

এই গ্রন্থ উক্ত যন্ত্রালয়ে কিম্বা কলিকাতা নগরে ভাস্কর যন্ত্রে অথবা মেং রোজেরো সাহেবের পুস্তকাগারে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।"

ইহার মুখবন্ধ বা বিজ্ঞাপনটি এই স্থানে অবিকল উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ ইহাতে ৮০ বৎসর পূর্ব্বের পণ্ডিতী বাঙ্গালার নমুনা দেখিতে পাইবেন।

"শ্রীহরিঃ।

পাতুবঃ।

মহামহিম মহোদয় শ্রীলশ্রীমদ্বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু

শান্ত দান্ত মান্য গণ্য মহাশয় সমূহ সমীপেষু।

যথা যোগ্য বিনয় পুরঃসর

নমস্কারাশীর্নিবেদন মিদং।

এতদ্দেশের মধ্যে সংপ্রতি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া অনেক মহাশয় কৃতী বুদ্ধিমান ধনবান হইয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরীয় যে মূল সংস্কৃত ভাষা যাহা হইতে তাবৎ সাধুভাষা নির্গতা হইয়াছে এবং যে ভাষাদ্বারা ভদ্রলোকের দৈব-কৃত্যের পবিত্রতা এবং সভ্যত্ব পাণ্ডিত্য শুদ্ধাশুদ্ধ যত্ব ণত্ব হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বিবেচনা হয় তাহার প্রতি যত্ন পূর্ব্বক অনুশীলন করাতে প্রায় অনেকের উৎসাহ নাই, যেহেতুক শব্দ সাধন গ্রন্থ ব্যাকরণাভিধানাদি অতি কঠিন জ্ঞান করিয়া বাল্যকালাবধি আলস্য প্রযুক্ত পাঠ করেন নাই। তাহা পঠিত না হইলেও সংস্কার হইতে পারে না। সংস্কার শব্দের অর্থ শুদ্ধ লিখন পঠন ও অশুদ্ধ শোধন শক্তি। পরমেশ্বর স্বীয় অচিন্ত্য সৃষ্টির মধ্যে কোটি কোটি পদার্থ

প্রকাশ করিয়াছেন যদ্যপি তাহার প্রত্যেকের নাম সকল মনুষ্যের জানিবার প্রয়োজন নাই তথাপি যৎকিঞ্চিৎ যাহা সভ্য সমাজে ব্যবহার আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে হয়। অতএব হে বন্ধু মহাশয় সকল। এই বিবেচনা করিয়া বালক শিক্ষার নিমিত্তে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মঙ্গলাচরণ অবধি অব্যয় শব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক লক্ষণ দর্শাইয়া প্রত্যেক পদ ও তৎসাধন প্রকার এবং মূলের সকল সূত্র প্রকৃত অর্থের সহিত সাধু ভাষায় সংগৃহীত হইল। বিজ্ঞগণ সমীপে প্রার্থনা যে স্বীয় স্বীয় গুণ দ্বারা এতৎ পুস্তক সংগ্রাহকের ভ্রান্তি এবং অনবধানতাদি জন্য সম্ভাবিত দোষ গ্রহণ না করেন। এই পুস্তক যদি আদরপূর্ব্বক সকলের গ্রহণ হয় তবে এই গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ এই রীতি ক্রমে প্রকাশ হইবেক ইতি।

উত্তরপাড়া নিবাসি শ্রীতারকনাথ শর্ম্মণঃ।"

এই গ্রন্থখানি ১২৮১ সাল হইতে অর্থাৎ ৫৩ বৎসর যাবৎ আমার পুস্তকালয়ে রহিয়াছে।

সম্পাদকের চিঠি

(৯)

জেনীভায় এক দিন সকাল বেলা অন্যত্র কিছু কাজ সারিয়া হোটেলে ফিরিতেছি, এমন সময় দুটি লোক ফরাসী ভাষায় আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল। সঙ্গে সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ ছিলেন। তিনি তাহাদের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। ব্যাপারটা এই। রাস্তায় এক পক্বকেশ বিদেশীকে দেখিয়া লোক দুটির কৌতূহলের উদ্রেক হয়। তাহাদের মধ্যে এক জন চিত্রকর, অন্য জন তাহার সহকারী, বা পুস্তকপ্রকাশক, বা ঐরূপ আরোকিছু। লীগ অব নেশুন্সের বৈঠক উপলক্ষে নানা দেশের যে সব প্রতিনিধি ও অন্য লোক তখন জেনীভায় আসিয়াছিল, তাহাদের ছবি আঁকিয়া ও প্রকাশ করিয়া বিক্রী করা তাহাদের উদ্দেশ্য। আমারও ছবি তাহারা আঁকিয়া প্রকাশ করিতে চাওয়ায় আমাকে রাজী হইতে হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে হোটেলে আসিয়া চিত্রকর অস্কার লাজার ছবি আঁকিল। তাহার পর জিজ্ঞাসিল, আমি সমুদয় ছবিযুক্ত এল্‌বাম ক'খানা কিনিব, নিজের ছবিই বা ক'খানা কিনিব। আমি উত্তর দিবার পর তাহারা চলিয়া গেল। কিছু দিন হইল, এল্‌বামগুলি ও ছবিগুলি আসিয়াছে। আমার ছবির সহিত আমার সাদৃশ্য নাই, সকলেই বলিতেছে। যাহা হউক, চিত্রকর ও প্রকাশকের টাকা রোজগার উদ্দেশ্যটা সফল হইয়াছে। সে বিদ্যাটা তাহাদের জানা আছে। তাহাদের এল্‌বামে নানা দেশের ১১১ জন মহিলা ও ভদ্রলোকের ছবি আছে।

লীগ য্যাসেম্ব্লী সভার অধিবেশন শেষ হইয়া যাওয়ায় আমি জেনীভা হইতে প্রস্থান করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। তখনও লীগ কৌন্সিলের (অর্থাৎ লীগের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির) অনেক অধিবেশন হইতে বাকী ছিল। কিন্তু লীগের নানাবিধ কমিটি সমিতি প্রভৃতির মীটিং সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই হইয়াছিল, তাহাতে আমার আরো বেশী দিন জেনীভায় থাকিবার উৎসাহ জন্মে নাই।

ইউরোপে নিজের নিজের পোষাক ছাড়া আর সব দরকারী জিনিষ হোটেলওয়ালারা দেয়। রেল-গাড়ীতেও রাত্রে ঘুমাইবার বিছানা বালিশ কম্বল রেলের কর্ত্তৃপক্ষ দেয়। এই জন্য ইউরোপ বেড়াইতে হইলে বেশী জিনিসপত্র সঙ্গে না লওয়াই ভাল। আমি কিন্তু গ্রীষ্ম থাকিতে থাকিতে ভারতবর্ষ হইতে রওনা হইয়াছিলাম বলিয়া গ্রীষ্মের উপযোগী পোষাক ও অন্য নানা রকম বিস্তর জিনিষ আমার সঙ্গে ছিল। সেগুলা সঙ্গে লইয়া ইউরোপ ভ্রমণে অসুবিধা হইবে বলিয়া আমি তাহা দেশে ফেরত

পাঠাইবার উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলাম। এমন সময়, এলাহাবাদস্থিত কায়স্থ পাঠশালার আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসুর সহিত জেনীভায় দেখা হইল। তিনি ১৫ বৎসর আমেরিকায় ছিলেন, তথায় শিক্ষা সমাপনানন্তর কারখানার বড় কাজ করিতেছিলেন। জামশেদপুরে তাতা কোম্পানীর লোহা ও ইস্পাতের কারখানায় হাজার টাকা বেতনে কাজ পাইয়া দেশে ফিরিতেছিলেন। পথে তাঁহার বন্ধু জেনীভাপ্রবাসী ডাক্তার রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমার গোটাকয়েক বাক্স প্যাঁটরা তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি রাজী হইলেন। আমি কলিকাতা পৌঁছিবার মাসাধিক পূর্ব্বে তিনি জিনিষগুলি আমার বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

জেনীভা হইতে বার্লিন রেলে প্রায় ২২ ঘণ্টার পথ। একদিন প্রাতে প্রায় ১১টার সময় জেনীভা ছাড়িয়া তার পর দিন প্রায় ৯টার সময় জার্ম্মেনীর রাজধানী বার্লিনে পৌঁছিলাম। বার্লিনের ষ্টেশন একটা নয়। আমি কোন্‌টায় নামিব স্থির করিতে পারি নাই। ট্রেনের কণ্ডাক্টার জার্ম্যান হইলেও অল্প স্বল্প ইংরেজী বলিতে পারিতেন। কাইজার হোফ হোটেলে যাইব বলায় তিনি আমাকে ঠিক্ জায়গায় নামাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী মার্কিন মহিলা শ্রীযুক্তা চট্টোপাধ্যায়জায়া আমাকে ষ্টেশন হইতে হোটেলে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অন্য ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। এইজন্য আমি হোটেলে পৌঁছিবার পর তিনি যখন ফিরিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে বলিতেছিলেন, "রামানন্দ বাবু আসেন নাই," তখন আমার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তাঁহার সৌজন্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমি যে শনিবার বার্লিন পৌঁছি, সে দিন রবিবাবু সেখানে ছিলেন না; তখন তিনি জার্ম্মেনীর নানা সহরে বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সোমবার তাঁহার ড্রেস্‌ডেনে বক্তৃতা করিবার কথা।

ভেনিস্, প্যারিস, লণ্ডন ও জেনীভায় অন্যান্য মুসাফিরদের মত আমারও গাঁটরী প্যাঁটরা চুঙী আফিসের কর্ম্মচারীরা পরীক্ষা করিয়াছিল। বার্লিনে এরূপ কোন উপদ্রব দেখিলাম না। ষ্টেশন হইতে সোজা হোটেলে গেলাম। পর্য্যটকদিগকে এই প্রকারে ত্যক্ত না করাটা জার্ম্যানদের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। পর্য্যটকরা ক্রেতা, বিক্রেতা নয়। তা ছাড়া, জার্মেনীতে জার্ম্যান জিনিষের চেয়ে সস্তা মাল বিক্রী করিবার জন্য দু চারটা ব্যাগে করিয়া জিনিষ লুকাইয়া আনিবে, এরকম বেকুব মুসাফির বেশী নাই।

জার্ম্যান ভাষার বহি ও কাগজ অনেক দেখিয়াছিলাম। এক একটা জার্ম্যান শব্দের দৈর্ঘ্য এবং জার্ম্যান ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমার ভয় ছিল, না জানি কথিত জার্ম্যান কিরূপ কটমট হইবে। কিন্তু যখন জার্ম্যান কথিত হইতে শুনিলাম, তখন কর্কশ মনে হইল না, বরং কাহারও কাহারও মুখে ভালই লাগিল। বস্তুতঃ জার্ম্যান শ্রুতিকটু ভাষা না হইবারই কথা। জার্মেনীতে বহু জগদ্বিখ্যাত সংগীত-নায়ক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ দেশের ভাষার গীতোপযোগিতা থাকিবারই কথা। কিন্তু ইহা কেবল মোলায়েম নহে; ইহাতে খুব জোরও আছে।

ড্রেস্‌ডেনে রবিবাবুর বক্তৃতা শুনিবার এবং জার্ম্যান ভাষায় "ডাকঘর" নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য আমি সোমবার প্রাতে শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মোহন বসুর সঙ্গে বার্লিন হইতে রওনা হইলাম। সেখানে দুপরের পর পৌঁছিয়া সোজাসুজি কবির হোটেলে গেলাম না, আগে সহরটা কতক কতক দেখিয়া লওয়া স্থির হইল। বক্তৃতা সন্ধ্যার পর, এবং তাহার পর অভিনয়। প্রথমে আমরা ষ্টেশনের নিকটস্থ রেস্তর্‌াঁতে মধ্যাহ্নের আহার সারিয়া লইলাম।

ড্রেস্‌ডেন্ পুরাতন সহর, স্যাক্সনি রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহা এল্‌বের উভয় তীরে অবস্থিত। সহরের দুই অংশে যাতায়াতের জন্য কয়েকটি সুন্দর সেতু আছে। তন্মধ্যে আলবার্ট্ সেতু স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অট্টালিকা ও সেতুসমূহের স্থাপত্য, চিত্রশালা,

উদ্যানাবলী, নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রভৃতির জন্য ড্রেস্‌ডেন্‌ বিখ্যাত। আমরা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রথমে গেলাম চিত্রশালা দেখিতে; উহা মিউজিয়মের অন্তর্গত। চিত্রশালার প্রবেশদ্বারে প্রায় পৌঁছিয়াছি, এমন সময় একজন ফোটগ্রাফার চট্‌ করিয়া ক্যামেরা খাটাইয়া আমাদিগকে একটু দাঁড়াইতে বলিল। হয়ত সে ভাবিয়াছিল রবীন্দ্রনাথকে পাকড়াও করিয়াছে। তাহা না হইলেও, সাড়ীপরিহিতা হিন্দুমহিলার ছবি তোলা ত তাহার ভাগ্যে হয় ত আর ঘটিবে না। সে ছবি তুলিয়া লইল; আমাদিগকে বার্লিনে একখানা পাঠাইতে বলিয়াছিলাম, তাহা পাঠায় নাই।

ড্রেস্‌ডেনের চিত্রশালা, ইটালীর বাহিরে, ইউরোপের বৃহত্তমগুলির মধ্যে একটি। ইহাতে প্রায় ২৪০০ ছবি আছে; অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ইটালীয় ও ফ্লেমিশ চিত্রকরদের আঁকা। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী স্বয়ং চিত্রশিল্পী; কোন ছবি তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিলে আমাকেও দেখিতে বলিতেছিলেন। রাফেলের সিষ্টিন্‌ ম্যাডোনা (মাতৃমূর্ত্তি) চিত্রশালার অমূল্য সম্পত্তি বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহা অন্যান্য ছবির সঙ্গে দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখা হয় নাই; একটি আলাদা কামরায় কেবল এই ছবিটি রাখা হইয়াছে। এখানে সর্ব্বদাই বহু দর্শক বসিয়া বসিয়া ইহা দেখে। কেহ কেবল ছবিটির সৌন্দর্য্য দেখে, কিন্তু অনেকেই যিশুর মাতার ও যিশুর ছবি বলিয়া ভক্তির সহিত ইহা দর্শন করে। চিত্রশালায় আরো কয়েকটি সুবিখ্যাত ছবি আছে। কিন্তু উহাতে রক্ষিত বড় বড় কয়েকটা ফ্লেমিশ চিত্রের স্থূলকায় নগ্ন স্ত্রীলোকদের চিত্র ললিতকলার দিক্‌ দিয়াও আমার ভাল লাগে নাই।

আমরা যখন ছবি দেখিয়া দেখিয়া কক্ষে কক্ষে ঘুরিতে ছিলাম, তখন একটি জার্ম্যান স্ত্রীলোক আমাকে ইংরেজীতে বলিল, "আপনার সহিত দুএক মিনিট কথা কহিবার অনুমতি পাইতে পারি কি?" আমি বলিলাম, "আপনি ভুল করিতেছেন;—আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নহি, যদিও তাঁহার দেশে আমারও বাড়ী, এবং তাঁহার পুত্রবধূ আমাদের সঙ্গে আছেন বটে।" স্ত্রীলোকটি তখন তাহার সঙ্গী অন্য কতকগুলি স্ত্রীলোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা বলিতেছিল, 'না; উনি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ'।" চিত্রশালা হইতে আমরা রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম। এখন সেখানে কোন রাজা নাই, সমগ্র জার্মেনী সাধারণতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। প্রাসাদটি আমরা কেবল বাহির হইতে দেখিলাম, ভিতরে ঢুকিবার সময় তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বেশ জমকাল। প্রাসাদসংলগ্ন যে বাড়ীতে মণিমুক্তা স্বর্ণরৌপ্য হস্তিদন্তের দ্রব্যাদি রাখা হয়, তাহা খোলা ছিল। তাহার সমৃদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। একজন রক্ষী আমাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত জহরাৎ দেখাইল। ভারতবর্ষ কত দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু নিজে দরিদ্র।

চিত্রশালা হইতে আমরা একটি অন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। ইহাতে ইউরোপের সব দেশের এবং আমেরিকার বহুসংখ্যক আধুনিক ছবি দেখান হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে কোন ছবি যায় নাই। অল্পসংখ্যক ছবি আমার মন্দ লাগে নাই। কিন্তু অধিকাংশ ছবিই অতি আধুনিক রীতিতে অঙ্কিত বলিয়া এবং চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন জ্ঞান না থাকায়, আমি তাহাদের রস গ্রহণে সমর্থ হই নাই। কতকগুলি ছবি এরূপ ছিল, যে, সেগুলি কোন্‌ বাস্তবিক বা কল্পিত জিনিষ, প্রাণী, ভাব বা দৃশ্যের ছবি তাহা অনুমান করিতে পারি নাই। এইটুকু কেবল বুঝিলাম, যে, রং ফলাইয়াছে ভাল। অন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর হাতায় একটি উদ্যান ও পুষ্পের প্রদর্শনীতে পৃথিবীর নানা দেশের বিখ্যাত উদ্যান-সমূহের ছোট ছোট প্রতিরূপ রক্ষিত হইয়াছিল। তা ছাড়া, কল্পিত নানাবিধ সুন্দর বাগানের নমুনাও সেখানে ছিল। ফুলের প্রদর্শনীর শোভা বর্ণনার যোগ্য, কিন্তু বর্ণনার ক্ষমতা আমার নাই।

প্রদর্শনী দুইটি দেখা হইবার পর আমি ট্রামে হোটেল ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথের নিকট গেলাম। ট্রামে খুব বেশী ভিড় ছিল, অনেকে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বৃদ্ধ বিদেশীকে গাড়ীতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দু-একটি বালিকা ও অন্য কোন কোন যাত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমার জন্য জায়গা করিয়া দিল। বিদেশী ও অপরিচিত হইলেও, বয়োবৃদ্ধের সুবিধা করিয়া দিবার

শিষ্টাচার জার্মেনীতে আছে দেখিয়া প্রীত হইলাম। কবির হোটেলে তখন তিনি ছাড়া তাঁহার সঙ্গে পণ্ডিত তারাচাঁদ রায়, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ লাল, শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ এবং শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী দেবী ছিলেন।

সন্ধ্যার সময় বক্তৃতার কিছু পূর্ব্বে আমরা একটি প্রকাণ্ড হলে গেলাম। দেখিলাম, হলে একটুও জায়গা খালি নাই, কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে, শ্রোতাদের মধ্যে বেশী রকম একটি অংশ স্ত্রীলোক। ইংরেজীতে বক্তৃতা বুঝিবার লোক সেখানে অনেক ছিল, কিন্তু বোধ হয় ইংরেজী না-জানা লোকের সংখ্যাই বেশী ছিল। তাহারা পণ্ডিত তারাচাঁদ রায় কথিত অনর্গল জার্ম্যান অনুবাদ হইতে কবির বক্তৃতা বুঝিল। পণ্ডিতজীর গলাও বেশ দরাজ। রিপোর্টার অনেক ছিল। তাহাদের মধ্যেও স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম নয়। একজন নারী রিপোর্টারই সকলের চেয়ে কম বাদ দিয়া রিপোর্ট লিখিতেছিলেন মনে হইল। বক্তৃতার পর কবি তাঁহার কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিলেন। এগুলি, বিশেষতঃ "দি ক্রেসেণ্ট মুনের" কবিতাগুলি, শ্রোতাদের এত ভাল লাগিয়াছিল, যে, কবি যত কবিতা আবৃত্তি করিবেন, মনে করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আবৃত্তি তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল।

বক্তৃতা ও আবৃত্তির পর আমরা ভিড় ঠেলিয়া কষ্টে গাড়ীতে উঠিলাম এবং থিয়েটার গৃহে গেলাম। সেখানেও একটুও জায়গা খালি ছিল না। অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাহারও কাহারও পোষাক বেশ মজার হইয়াছিল;—বিশেষতঃ সুধার সাড়ী। ইউরোপীয়েরা বাঙালীদের পোষাক যত দেখে, আমরা তাহাদের পোষাক তার চেয়ে অনেক বেশী দেখি। তথাপি আমরাও বোধ করি ইউরোপীয় পোষাক অনেক সময় ঠিক্ মত পরিতে পারি না—ফ্যাশন ত খুব আধুনিক প্রায়ই হয় না। অমল সাজিয়াছিল একজন অভিনেত্রী। যে-সব বালক অমলের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছিল, তাহারাও অভিনেত্রী। প্রাগের চেক্ ও জার্ম্যান থিয়েটারদ্বয়ের "ডাক ঘর" অভিনয়েও অভিনেত্রীরা ঐ ঐ ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিল। কবি ড্রেস্‌ডেন ও প্রাগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বালকেরা কেন এই সব বালকের ভূমিকার অভিনয় করে না। উভয় সহরেই উত্তর পাইলেন, বালক অভিনেতা পাওয়া যায় না বলিয়া। কিন্তু বাঙালী অনেক ছেলে অমলের ভূমিকার বেশ অভিনয় করিয়াছে। ড্রেস্‌ডেনে অভিনয়ের পর থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ সাতিশয় সম্মানের সহিত কবির উদ্দেশে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন এবং দর্শকেরাও তাঁহার প্রতি বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

ড্রেস্‌ডেন সহরের স্থাপত্য বার্লিনের স্থাপত্য অপেক্ষা আমার উৎকৃষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ মনে হইয়াছিল।

ড্রেস্‌ডেনে দেখিলাম, কবিকে সকাল সন্ধ্যা তাঁহার নানা বহির জার্ম্যান সংস্করণে অজস্র স্বাক্ষর করিতে হইতেছে, তাঁহার ফোটোগ্রাফে সহি করিতে হইতেছে, মুলাকাতের তাসে (ভিজিটিং কার্ডে) দস্তখত করিতে হইতেছে। হোটেলের চাকর চাকরানী প্রভৃতি সামান্য অবস্থার লোকরাও তাঁহার বহি কিনিয়া দস্তখত করাইতেছে। তাছাড়া ফোটোগ্রাফার ও চিত্রকরও কাহাকেও কাহাকেও আসিতে দেখিলাম। একজন চিত্রকর অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার ছবি আঁকিল। সেটা ঠিক্ না হওয়ায় আবার আঁকিল। সেটাও ঠিক্ হইল না। কবি আমাকে বলিলেন, "দেখুন ত, এটা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছবি হইয়াছে কি না!" বলিয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। বস্তুতঃ তাহা রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা মাইকেলের ছবি বলিয়াই সহজে চালান যায়।

ড্রেস্‌ডেন হইতে কবির সহিত আমরা সকলে বার্লিনে ফিরিয়া আসিলাম। ট্রেনে অনেক কথা হইয়াছিল, অধিকাংশই ভুলিয়া গিয়াছি। অল্পস্বল্প যাহা মনে আছে, তাহা বলিতে গেলে ভাষাটা হইবে আমার, সুতরাং সে চেষ্টা করিব না। দু-একটা কথার কেবল উল্লেখ করিব। কবি বলিলেন, "সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্, সব ঋতুতে বাংলা দেশের বা ভারতবর্ষের সব অংশের প্রতি তেমন প্রযোজ্য নহে, যেমন ইউরোপের অনেক অংশের প্রতি প্রযোজ্য।" আমি ইউরোপের যতটুকু দেখিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে আমারও ঐ কথা মনে হইয়াছে। পৃথিবীর যে-ভূখণ্ডে দেবতার এমন সুপালন, তাহার অধিবাসীদের

সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা করা সোজা নয়, যদিও অসাধ্যও মোটেই নয়। কবিকে তাঁহার কোন ইউরোপীয় কৃতী সম্পাদক বন্ধু বলেন, যে, ভারতবর্ষের সমসাময়িক ঘটনা ও সমস্যাদি বিষয়ে কোন ভারতীয় লেখককে যদি তিনি পৃথিবীর ঘটনাস্রোত ও অবস্থাচক্রের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া প্রবন্ধাদি লিখাইয়া পাঠান, তাহা হইলে তাহা মুদ্রিত হইবে, এবং ভারতবর্ষের ঠিক্ অবস্থা বুঝিতে পাশ্চাত্যদের সুবিধা হইবে। ট্রেনে কবির সহিত কথা হইতেছিল, আমাদের দেশের কাহার কাহার দ্বারা এই রকমের প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। কাহারও নাম করিয়া আমরা কোন আলোচনা করি নাই। অন্যান্য কথার মধ্যে আমি একটা কথা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিতেছি। আমি বলিয়াছিলাম, আমরা নিজেদের পরাধীনতা ও নানা দুঃখদৈন্যে এমন অভিভূত, কিম্বা যাঁহারা অভিভূত নহেন, তাঁহারাও তৎসমুদায়ের প্রতিকার-চিন্তায় ও প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে এত ব্যাপৃত, যে, পৃথিবীর সমস্যাসকলের জ্ঞানলাভের এবং আমাদের সমস্যাগুলিকে তৎসমুদায়েরই একটা অংশ মনে করিয়া সমগ্র সমস্যার আলোচনা করিবার আমাদের অনেকেরই প্রবৃত্তি, অবসর ও অভ্যাস নাই। এইজন্য ইউরোপীয় সম্পাদক ঠিক্ যে ভাবের প্রবন্ধ চাহিয়াছেন, তাহা লিখিবার বহু লোক অনায়াসেই পাওয়া যাইবে, মনে হয় না। কবি আমার কথায় সায় দিয়াছিলেন।

বার্লিন স্বভাবতঃ বালুকাস্তীর্ণ অনুচ্চ এক ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত; বাল্টিক সাগরের পৃষ্ঠদেশ হইতে উহা কেবলমাত্র একশত ফুট উঁচু। সুতরাং বার্লিনের স্বাভাবিক দৃশ্যের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। কিন্তু মানুষের যতটা সাধ্যায়ত্ত, বার্লিনের জন্য তাহা করা হইয়াছে। ইহার কলকারখানা, পণ্যশিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষালয়, চিত্তবিনোদনের নানা স্থান ও উপায়, সভ্যতার উৎকর্ষসাধনের নানা ব্যবস্থা, ইহাকে জগতের নগর-সমূহের মধ্যে উচ্চস্থান দিয়াছে। ইহার লোকসংখ্যাও খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইহা ১,৮২,১৫৭ জন মানুষের বাসস্থান ছিল। ১৯১৯ সালে লোক সংখ্যা বাড়িয়া ১৯,০২,৫০৯ হয়। ১৯২০ সালে সহরতলীর কতকগুলি স্থান ইহার সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার লোক সংখ্যা ৩৮,০৩,৯০১ হয়। সহরের মাঝখানটা এখন প্রায় কেবল বাণিজ্যের জন্যই ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ বাড়ী ইষ্টকনির্ম্মিত। অনেক বড় বড় অট্টালিকা আছে বটে, তবে স্থাপত্য একঘেয়ে রকমের। সহরের সকলের চেয়ে ভাল রাস্তার নাম উণ্টের্ ডেন্ লিণ্ডেন্, অর্থাৎ "লেবু বীথিকা"—যদিও লেবু ছাড়া অন্য গাছও এই রাস্তার ধারে আছে। বার্লিনের বৃহত্তম লাইব্রেরীতে ১৭,৫০,০০০ মুদ্রিত পুস্তক এবং ৫০,০০০ হস্তলিপি আছে। সহরটি জাতীয় নানা বিখ্যাত ব্যক্তির মূর্ত্তিতে শোভিত। নানা প্রকার স্কুলের সংখ্যা খুব বেশী। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যতম না হইলেও, উহা ১৮০৯ সালে স্থাপিত হইয়া থাকিলেও, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সকলের মধ্যে উহার স্থান উচ্চ। সুবিখ্যাত বহু অধ্যাপক এখানে শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন। বর্ত্তমানে ইহার অধ্যাপক সংখ্যা মোটামুটি ৬০০ এবং ছাত্র সংখ্যা ১২০০০। নৃতত্ত্ববিষয়ক ও অন্য নানাবিধ মিউজিয়ম এখানে আছে। চিত্রশালাও অনেকগুলি। পণ্যশিল্প শিক্ষা দিবার উচ্চতম ও বৃহত্তম বিদ্যালয় শার্লটেনবুর্গে স্থিত। ইহা বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম।

কাইজার হোফ হোটেলে দেশী বিদেশী কয়েকজন অপরিচিত ও পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়। টলষ্টয়ের বন্ধু ও চরিতাখ্যায়ক পল্ বিরুকফ্কে এখানে দেখি। তিনি অতি বৃদ্ধ, ভ্রূ পর্য্যন্ত শাদা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অথর্ব্ব নহেন। তিনি সম্ভ্রান্তবংশজাত, কিন্তু শ্রমিক দলে যোগ দিয়াছেন। বলিলেন, অধ্যাপক কালিদাস নাগ বিশ্বভারতীর জন্য রুশিয়ায় প্রকাশিত যে সব সংস্কৃত গ্রন্থ চাহিয়াছিলেন, তাহা একত্র করিয়া রাখা হইয়াছে; কি উপায়ে পাঠাইতে হইবে, জানিতে পারিলেই প্রেরিত হইবে। বিরুকফ মহাশয়ের মুখে রুশিয়ার অবস্থা শুনিয়া আমাদের ঐ দেশ দেখিবার ইচ্ছা প্রবলতর হয়। হোটেলে নরওয়ের অধ্যাপক ষ্টেন্ কোনো ও তাঁহার পত্নীর সহিত দেখা হইল। শান্তিনিকেতনে ইঁহাদের প্রতিবেশী ছিলাম বলিয়া ইঁহাদের সহিত আগে হইতে পরিচয় ছিল। ইঁহার শ্বশুর বাড়ী বার্লিনে। সেখানে অধ্যাপক কোনো রবীন্দ্র-

নাথ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে একদিন সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজ এবং গল্প বেশ জমিয়াছিল। আমি যখন লণ্ডন যাই, তখন বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার পত্নী সেখানে ছিলেন; কিন্তু সেখানে তাঁহাদের সহিত দেখা হয় নাই। দেখা হইল বার্লিনের কাইজার হোফ হোটেলে। কিছু কথাবার্ত্তাও হইল। দেশে থাকিতে ঘোষজায়া মহাশয়ার সহিত আমার পরিচয়-সৌভাগ্য ঘটে নাই; এখানে তাহা হইয়া গেল। এই হোটেলে হায়দরাবাদের স্বর্গীয় বিজ্ঞানাচার্য্য অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিতও পরিচয় হইল। ইনি কি কারণে দেশে আসিতে পারেন না, তাহা নূতন করিয়া বলিবার দরকার নাই। দেশে আসিবার ইচ্ছা উঁহার আছে; তবে হৃদয়-মনের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে হয় এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া মাতৃভূমি দর্শন করিতে চান না। কথাবার্ত্তায় তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, দেশভক্তি এবং জগতের বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তৃত জ্ঞানের পরিচয় পাইলাম। এই হোটেলে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর জামাতা ব্যারিষ্টার রণজিৎ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে, তিনি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ কেদারনাথের সহিত লণ্ডনে একজায়গায় থাকিতেন ও তাহার সহিত বন্ধুত্ব আছে।

১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় বার্লিনের মহিলা চিত্রশিল্পী কাথে কল্‌ভিজ্‌ ও তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি সাধারণতঃ জার্মেনীর জনসাধারণের জীবনের, তাহাদের দুঃখদারিদ্র্যের, এবং তাহাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের ছবি আঁকিয়া থাকেন। অতীত কালের ছবিই বোধ হয় বেশী। চট্টোপাধ্যায়-জায়া একদিন শ্রীমতী প্রতিমাদেবীকে ও আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করাইবার জন্য লইয়া গেলেন। বার্লিনের যে অংশে গরীব লোকেরা থাকে, তিনি সেই অংশে বাস করেন। এই অংশে কিন্তু কলিকাতার ইংরেজ পাড়া অপেক্ষা কম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হইল না। শ্রীযুক্তা কাথে কল্‌ভিজ্‌ অতিশয় যত্নের সহিত আমাদিগকে তাঁহার সব ছবি দেখাইলেন। তিনি পুত্রহীনা বৃদ্ধা, একটি নাতির ফোটাগ্রাফ আমাদিগকে দেখাইলেন। তাঁহার আঁকা ছবি জার্মেনীর দুঃখী ও উৎপীড়িত লোকদের অবস্থার জীবন্ত চিত্র। দেখিলে প্রাণে তাহাদের প্রতি সমবেদনা জাগে, এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যাহারা এই দুঃখ ও উৎপীড়নের কারণ, তাহাদের প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয়। যখন জার্মেনী সাধারণতন্ত্র হয় নাই ও তাহার সম্রাট সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন এক চিত্রপ্রদর্শনীতে এই মহিলার অঙ্কিত চিত্রাবলী থাকায়, সম্রাট বলেন, যে, সেগুলি অপসারিত না হইলে তিনি প্রদর্শনী দেখিতে যাইবেন না। ইহা হইতেই তাঁহার শক্তি ও কৃতিত্বের কতক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বার্লিনের সুন্দর সহরতলীতে নদীর তীরে উদ্যান-শোভিত একটি বাড়ীতে মেণ্ডেল নামক এক যুবা ডাক্তার থাকেন। বয়স ২৯। বাড়ীটি তাঁহার বিধবা শাশুড়ীর। ডাক্তার এই মহিলার একমাত্র কন্যাসন্তানকে বিবাহ করিয়াছেন। চিকিৎসায় ডাক্তার মেণ্ডেলের বেশ পসার হইতেছিল। তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। কিরূপে গবেষণা করিতেছেন এবং কি ফল পাইয়াছেন; তাহা আমাদিগকে দেখাইলেন, এবং অনুরোধ করিলেন, যে, এ বিষয়ে তিনি নিজে কিছু ছাপিবার পূর্ব্বে আমি যেন কিছু না লিখি। ডাক্তার মেণ্ডেলের একটি ৫।৬ বৎসরের খুব হৃষ্টপুষ্ট ছেলে ও ২।৩ বৎসরের একটি মেয়ে আছে। ছেলেটি তাহার বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "বাবা, যদি তুমি ইঁদুরগুলার ব্যারাম ভাল করতে চাও, তা হ'লে তাদের শরীরে রোগের বিষ কেন ঢুকিয়ে দাও?" ইঁদুরের শরীরে ক্যান্সার রোগ সংক্রামিত করিয়া তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করা হয় বলিয়া ছেলেটি এই প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহার বাবা কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। ছেলেটি তাহার মায়ের সঙ্কেত অনুসারে আমাকে নমস্কার করায় আমি তাহাকে কোলে লইতে গেলাম। তাহার মা বলিলেন, "আপনি ওকে কোলে নেবার চেষ্টা করবেন না, ও বড় ভারী।" আমি বলিলাম, "আমার ভারী ছেলে কোলে

নেওয়ার অভ্যাস আছে ; আমার এক নাতনী খুব ভারী।” এই কথা ছেলেটির মা তাহাকে জার্মেন ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ায় আমার প্রতি ছেলেটির সম্মান ও প্রীতির ভাব খুব বাড়িয়া গেল। যাহার নাতনী তাহারই মত ভারী, সে ত তবে সামান্য লোক নয়!

আমি যখন বার্লিনে ছিলাম, তখন তথায় একটি পুলিস্‌প্রদর্শনী হইতেছিল। প্রদর্শনীর একটা বিষয় ছিল বিপ্লবচেষ্টা কেমন করিয়া দমন করা ও ব্যর্থ করা যায়। এই প্রদর্শনীর কোন কোন অংশ কেবল দেশী ও বিদেশী পুলিস্ কর্ম্মচারীদিগকে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল।

গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মেনীর দুঃখদারিদ্র্য কিরূপ বাড়িয়াছিল এবং এখনও তথায় কিরূপ দুঃখদারিদ্র্য আছে, তাহা আমরা খবরের কাগজে অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু ড্রেস্‌ডেন ও বার্লিন সহরে আমি ত দারিদ্র্যের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখিলাম না। রাত্রিকালে ত বার্লিন ইন্দ্রপুরী মনে হইত। রেলে জার্ম্মেনীর ভিতর দিয়া যাতায়াতের সময়ও দারিদ্র্যের কোন চিহ্ন দেখিলাম না। ইহার কারণ দুরকম হইতে পারে। জার্ম্মাণ জাতি খুব বুদ্ধিমান্, শিক্ষিত, পরিশ্রমী ও শিল্প-নিপুণ। তাহারা সম্ভবতঃ যুদ্ধ শেষ হইবার পর এই কয় বৎসরে তাহাদের পূর্ব্ব অবস্থার খুব কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে; সুতরাং এখন আর দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে, যে, আমরা ভারতবর্ষে যাহাকে দারিদ্র্য বলি, ঘোরতর যুদ্ধের সময়ও সেরূপ দারিদ্র্য জার্ম্মেনীর হয় নাই ; সুতরাং তাহার কোন চিহ্ন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সম্ভবতঃ এই দুটা কারণেই আমি জার্ম্মেনীতে দারিদ্র্যের কোন চিহ্ন দেখি নাই। বস্তুতঃ, ইউরোপ অনেক স্থলে যাহাকে দারিদ্র্য বলে, আমাদের দেশের কোটি কোটি লোক সেরূপ অবস্থায় পৌঁছিলে আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিবে।

জার্ম্মেনীর লোকদের খুব মানসিক আতিথেয়তা আছে। সকল রকমের মত, চিন্তা, ভাব, আদর্শ তাহারা বুদ্ধিযোগে বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে, ইচ্ছুক। সব রকমের মত চিন্তা-আদির কম বেশী শ্রোতা ও পাঠক জার্ম্মেনীতে পাওয়া যাইতে পারে। প্রচলিত মত বিশ্বাস চিন্তাধারার বিপরীত বলিয়াই কোন কিছু জার্ম্মেণীতে অগ্রাহ্য,অশ্রাব্য, অপাঠ্য হয় না। অবশ্য সকল জার্ম্মান্ পরমতসহিষ্ণু ও পরমত সম্বন্ধে কৌতূহলী নহে। কিন্তু ঐরূপ লোক তাহাদের মধ্যে অনেক আছে, ইহাই আমার বক্তব্য। অন্ততঃ কতকগুলি এইরূপ লোক যে জাতির মধ্যে নাই, তাহারা হৃদয় মন আত্মার কৃষ্টিতে (কাল্‌চ্যারে) বড় হইতে পারে না।

ড্রেস্‌ডেন ও বার্লিনের রাস্তায় ইস্তাহারে 'Verbotten' কথাটা যেন একটু বেশী দেখিলাম। শুনিলাম, সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে ইহা আরও বেশী ছিল। ইহার মানে “নিষিদ্ধ”। নিষেধের মাত্রাটা জার্ম্মেনীতে বোধ হয় আগে বেশী ছিল, যেমন আমাদের দেশে আছে।

বার্লিনে এক দিন এক মহিলার বাড়ীতে শ্রীমতী প্রতিমাদেবীর ও আমার সান্ধ্য আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁহার স্বামী এক জন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, কিছু দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। তিনি স্বয়ং এক জন বিদুষী ও বিখ্যাত অভিনেত্রী। তাঁহার স্বামীর গ্রন্থ সংগ্রহে এবং নানাদেশের মূর্ত্তি সংগ্রহে খুব উৎসাহ ছিল। বলী দ্বীপের হিন্দু শিল্পীদের নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রথম ইহাঁদের বাড়ীতে দেখিলাম। ইহাদের লাইব্রেরীও বেশ বড়। ইনি অন্ততঃ এক দিন জার্ম্মেনীর কোন একটি ভাল নাটকের অভিনয় দেখিতে আমাকে অনুরোধ করেন, এবং আমার জন্য একটি বক্স ভাড়া করেন। কিন্তু আমি ইউরোপপ্রবাসকালে ৮টার মধ্যে রাত্রির আহার শেষ করিয়া ঘুমাইবার নিয়ম রক্ষা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম বলিয়া অভিনয় দেখা হয় নাই।

বার্লিন হইতে আমরা চেকোস্লোভাকিয়া সাধারণতন্ত্রের রাজধানী প্রাগ্ যাই। চেক্ ভাষায় ইহাকে প্রাহা বলে। ইংরেজী ও ইটালীয় ভাষার অনেক শব্দ লাটিন হইতে উৎপন্ন। ইংরেজী ও জার্ম্যানের অনেক কথা একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইংরেজী ও ফরাসীর অনেক শব্দ লাটিন ধাতু হইতে উৎপন্ন। এইজন্য ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মেনীতে রাস্তা ঘাট রেলওয়ে ষ্টীমার দোকানের ইস্তাহারের অনেক কথা আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত বোধ হয় নাই। কিন্তু প্রাগে আসিয়া প্রথম

মনে হইল, একেবারে এক নূতন দেশে আসিয়াছি। কারণ, চেকভাষার সহিত পূর্ব্বোক্ত সব দেশের ভাষার খুব দূর সম্বন্ধ। হোটেল, টেলিগ্রাফ, রেডিও, প্রভৃতি জগদ্ব্যাপী কয়েকটা কথা ছাড়া এখানে আমার জানা অন্য কোন কথা চোখে পড়িল না। কতকগুলি রুশীয় দোকান এখানে দেখিলাম। তাহার সাইনবোর্ডে রুশীয় অক্ষরে নাম লেখা রহিয়াছে। রুশীয় অক্ষর দেখিতে রোমক অক্ষরের মত, কিন্তু কোন কোনটা যেন ইচ্ছা করিয়া রোমক অক্ষর উল্টা করিয়া বানাইয়া লওয়া হইয়াছে! ছোট ছেলেরা প্রথম ইংরেজী অক্ষর চিনিবার পর উহার ছাপার অক্ষর লিখিতে গিয়া যেমন মধ্যে মধ্যে উল্টা করিয়া লিখিয়া ফেলে, রুশীয় অক্ষর কখন কখন সেইরূপ মনে হয়।

প্রাগ ষ্টেশনে রবিবাবুকে প্রত্যুদ্‌গমন করিবার নিমিত্ত অধ্যাপক ভিণ্টার্নিজ্ ও অধ্যাপক লেজনী আসিয়াছিলেন। ভিণ্টারনিজ প্রাগের জার্ম্মান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক, লেজনী উহার চেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক। ইঁহারা উভয়েই কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সেই উপলক্ষে ইঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল।

শীতের জন্য যদিও রাত্রে কম্বল ব্যবহার করিতাম, তথাপি ড্রেস্‌ডেন ও বার্লিনে রাত্রে খুব ঘাম হইত। প্রাগেও তাহাই হইতে লাগিল। জ্বর হইত না, শারীরিক দুর্ব্বলতাও অনুভব করিতাম না। কিন্তু ঘাম এত বেশী হইত, যে, রাত্রে একবার উঠিয়া ভিজা নিদ্রার পোষাক বদলাইয়া পুনর্ব্বার আর এক প্রস্থ নিদ্রার পোষাক পরিতে হইত। এই জন্য একজন ভাল ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া স্থির করিলাম। অধ্যাপক ভিণ্টার্ণিজের কনিষ্ঠ পুত্র মাক্স ডাক্তার। তিনি আমাকে প্রাগের অভিজ্ঞতম ডাক্তারের নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার ফী খুব বেশী নয়। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেহ পরীক্ষা করিলেন, প্রশ্নও অনেক করিলেন, কিন্তু কোন যান্ত্রিক বিকৃতি বা অন্য কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। বলিলেন, হয় ত যথেষ্ট পুষ্টি হইতেছে না, কিম্বা জেনীভায় যে দন্তরোগের চিকিৎসা করাইয়াছিলাম, সেই রোগের চিকিৎসার পূর্ব্বে বিষাক্ত জিনিষ রক্তের সহিত মিশিয়া থাকিবে। একটা ঔষধও তিনি দিলেন। রাত্রে পশমী নিদ্রার পোষাক ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। আমি সূতী সব পোষাক আগেই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসুর সহিত বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। এইজন্য আবার সূতী পোষাক কিনিতে হইল। মাক্স বলিলেন, তাঁহার মা কিনিয়া দিবেন। অধ্যাপক-পত্নী আমার একটা পশমী রাত-পোষাক লইয়া সেই মাপের দুটা সূতী* পোষাক আনিয়া দিলেন। দোকানদার বেশী দাম লয় নাই। ভিণ্টার্ণিজ পরিবারের সকলেই বড় ভদ্র ও সহৃদয়।

প্রাগের একটা বিশেষত্ব এই, যে, ইহার অনেক প্রতিষ্ঠান চেক্ ও জার্ম্মান্‌দের জন্য আলাদা আলাদা; বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা, থিয়েটার আলাদা, বক্তৃতার হল আলাদা। শুনিয়াছি, রেলওয়ে ষ্টেশনও আলাদা, কিন্তু আমি তাহা নিজে লক্ষ্য করি নাই। রুশীয়দেরও কিছু আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, যেমন ১৯২১ সালে স্থাপিত উক্রেন্ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয় খুব পুরাতন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহার ছাত্রসংখ্যা দশ হাজার ছিল। চেক্ ও জার্ম্মান্‌দের সব প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা হওয়ায় রবিবাবুকে তাহাদের জন্য আলাদা করিয়া বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রেই খুব জনতা ও উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল। "ডাক ঘর" চেক্ ও জার্ম্মান্ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। চেক্ থিয়েটারের দৃশ্যপট ও পোষাক বেশী দামী বোধ হইল। চেকোস্লোভাকিয়ায় জার্ম্মান্‌দের চেয়ে চেক্‌দের সংখ্যা বেশী। উচ্চ সরকারী চাকরী পাওয়া জার্ম্মান্‌দের পক্ষে সহজ নহে। সরকারী সাহায্য জার্ম্মান প্রতিষ্ঠানগুলি কম পাইয়া থাকে। সব বিষয়েই জার্ম্মান্ ও চেক্‌দের মধ্যে রেষারেষি আছে মনে হইল। আগে চেকোস্লোভাকিয়া অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। অষ্ট্রিয়ানরা জার্ম্মান্, তাহাদের ভাষাও জার্ম্মান্। চেক্‌রা দীর্ঘকাল এই অষ্ট্রীয়ান জার্ম্মানদের অধীন থাকিয়া সেই সময়কার অসুবিধা ভুলিতে পারিতেছেন না। রবীন্দ্রনাথের একদিনকার আবৃত্তির আগে অধ্যাপক লেজনী

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটি অনাবশ্যক লম্বা প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। তিনি বাংলা জানেন।

চেক্‌রা রবীবাবুকে যে সান্ধ্য ভোজ দেয়, তাহাতে অধ্যাপক লেজ্‌নী তাঁহাকে বাংলায় অভিনন্দিত করেন। সভাস্থলে কেবল আর একজন ইউরোপীয় বাংলা বুঝিতেন। তিনি আগে বোম্বাইয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার কন্সাল বা বাণিজ্যদূত ছিলেন। নাম মিন্টার ও পার্টোল্‌ড্‌। তাঁহার স্ত্রী ভারতীয় লেখিকাদের সম্বন্ধে একখানি বহি লিখিতেছেন। অধ্যাপক লেজ্‌নী আমাকে পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার বাংলা বক্তৃতাটা কেমন হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম, মন্দ নয়, কিন্তু উচ্চারণ ভাল হয় নাই। তিনি বলিলেন, উচ্চারণ ঠিক হইবে এ আশা তিনি করেন নাই। এই ভোজের সময় এক বর্ষীয়সী চেক মহিলা আমার পাশে বসিয়া ছিলেন। কোন্‌টা নিরামিষ কোন্‌টা আমিষ দ্রব্য, তিনি তাহা বলিয়া দেওয়ায় তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁহার একটা প্রশ্ন নিমন্ত্রিত ভারতীয়কে জিজ্ঞাস্য বলিয়া আমার মনে হয় নাই। তিনি শুধাইলেন, "ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগকে অকালে বুড়ো দেখায় কেন?" তাঁহার সামনেই এক ভারতীয় মহিলা বসিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও অভ্যাগতকে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা তিনি শিষ্টাচারসঙ্গত মনে করিলেন। "আমিও পাল্টা জবাব শুধাইতে পারিতাম, "ইউরোপে অনেক বুড়ীও কেন কৃত্রিম উপায়ে বয়স লুকাইতে চায়, ইউরোপে স্ত্রীলোকদের বয়স জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ কেন", ইত্যাদি। কিন্তু আমার সেকেলে প্রাচ্য আদবকায়দায় বাধা দিয়াছিল। আমাদের দেশে কৃত্রিম প্রসাধনের সাহায্য ব্যতিরেকেও অনেক মেয়েকে তাহাদের প্রকৃত বয়স অপেক্ষা ছোট দেখায়। অকালবার্দ্ধক্যও যে অনেকের না হয়, তা নয়। এই ভোজ ছাড়া অধ্যাপক ভিণ্টার্নিজ ও অধ্যাপক লেজ্‌নী আলাদা আলাদা দিনে রবিবাবু ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয় দিনেই সহরের বিস্তর মান্যগণ্য পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। খাবার ছিল নানা রকমের ও প্রচুর। সংগীতের আয়োজনও বেশ ছিল। ভিণ্টার্নিজ মহাশয়ের চা-পার্টিতে পিয়ানোতে ক্রইটসার সোনাটা শুনিলাম। আমি পাশ্চাত্য সংগীত বুঝি না। রবিবাবু খুব প্রশংসা করিলেন। অধ্যাপক লেজ্‌নীর পার্টিতে এক চেক্‌ ভদ্র লোক গান করিলেন। তাঁহার গলা এমন মোটা ও জোরাল, যে, মনে হইতেছিল যেন ঘর ফাটিয়া যাইবে। তিনি পরে নিজেই পরিচয় দিলেন, যে, তিনি ফুটবল খেলোয়াড়। গলাটা পালোয়ানের মত বটে।

ভিণ্টার্নিজ পরিবারে আমাদের সকলের একদিন মাধ্যাহ্নিক আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। ইহা সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাপার। অধ্যাপক-পত্নী হিন্দু গৃহিণীর মত আমাকে সব জিনিষ বেশী করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ইংরেজী জানেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার মাক্স বলিলেন, মা বলিতেছেন আপনি কিছু খান না, সেই জন্য আপনার রাত্রে ঘাম হয়। আমি বলিলাম, তুমি আমার ডাক্তার; তুমি তোমার মাকে তোমার রোগীর গোপন কথা কেন বলিলে? মাক্স হাসিয়া বলিলেন, মাকে রোগীর এরূপ গোপন কথা বলায় দোষ নাই। অতঃপর অধ্যাপকপত্নী পায়সের মত একটা জিনিষ খুব বেশী করিয়া আমার পাতে ঢালিয়া দিলেন।

আর এক দিন আমরা এক ধনী চেক্‌ কবির নিমন্ত্রণে রবিবাবুর সঙ্গে তাঁহার উদ্যানবাটিকা ও লাইব্রেরী দেখিতে গিয়াছিলাম। লাইব্রেরীর বাড়ীটি এবং বহিগুলির বাঁধাই বেশ সুন্দর। এখানে চেক্‌ কবি রবিবাবুকে বৃষ্টির মধ্যে বাগান দেখিতে লইয়া যাওয়ায় তিনি ভিজিয়া যান ও পরে অসুস্থ হন। এই উদ্যানবাটিকা প্রাগ্‌ হইতে অনেক মাইল দূরে। যাইবার সময় দুই দিকে দেখিলাম ছোট ছোট গ্রামেও সুন্দর দুতলা তেতলা হোটেল রহিয়াছে। মাঠে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা আপাদমস্তক মোটা শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া ও ভারী ভারী বুট পরিয়া চাষের কাজ করিতেছে। সেইরূপ পোষাকপরা লোকদিগকে মাঠ হইতে গরুর গাড়ীতে ও ঘোড়ার গাড়ীতে শস্য আনিতেও দেখিলাম। এলুবে নদীর আঁকা বাঁকা স্রোত এক জায়গায় নূতন কৃত্রিম সোজা খালে চালাইয়া নৌচালনের সুবিধা করা হইয়াছে, দেখিলাম।

প্রাগের একটি ইস্কুল আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। এখানে রাস্তায় কুড়ান অনাথ ও বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদের গান ও নৃত্য বড় সুন্দর। নানারকম সুন্দর কারুকার্য্য দ্বারা তাহারা রোজগারও করে। জন্মাবধি উভয়হস্তহীন একটি ১৮।১৯ বৎসরের ছেলে কেবল পায়ের সাহায্যেই সুন্দর কারুকার্য্য করিতেছে দেখিলাম। কৌতুক দেখাইবার জন্য সে পায়ের দ্বারাই দিয়াশলাইয়ের বাক্স ধরিল, কাঠি বাহির করিল, বাক্সর পাশে ঘষিয়া জ্বালিল, মুখে চুরুট তুলিল, এবং তাহাতে আগুন ধরাইল। আমাদের দেশে এইরূপ অঙ্গহীন অনাথ ছেলেদের কি দশা হয় ?

প্রাগ খুব পুরাতন ও সুন্দর সহর। ৭২২ ঈশাব্দে উহা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। আমি কিন্তু উহা ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই। নানাকারণে মন ভাল ছিল না। তা ছাড়া, কতকটা অধ্যাপক লেজনীর উপর নির্ভর করিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি একদিন ঠিক সময় নির্দ্দেশ করিয়াও আসিতে ও কিছু দেখাইতে পারেন নাই। যখন জেনীভায় ছিলাম, তখন তিনি আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রাগে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাদের সুন্দর প্রাহা দেখিবেন না কি ?" প্রাগে আমার কোন সাহায্য করিতে পারিলে তিনি সম্মানিত ও আহ্লাদিত হইবেন লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি কিছু করিতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার আত্যন্তিক বৃদ্ধি ইহার দারিদ্র্যের প্রধান কারণ বলিয়া ইংরেজরা বর্ণনা করেন। কিন্তু অন্যান্য দেশে ত লোকসংখ্যা খুব বাড়িলেও দারিদ্র্য হয় না। আগে বার্লিনের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কথা লিখিয়াছি। প্রাগের কথাও বলি। ১৮৮০ সালে উহার লোকসংখ্যা ছিল ২,৯৩,৮২২ ; ১৯২১ সালে উহা হয় ৬,৭৬,৬৫৭। যখন গত (১৯২৬) অক্টোবর মাসে সেখানে যাই, তখন অধ্যাপক লেজনীর মুখে শুনিলাম লোকসংখ্যা আট লাখের উপর হইয়াছে। কিন্তু দারিদ্র্যের চিহ্ন কোথাও দেখিলাম না। রাস্তায় একটাও ভিখারী নাই। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের জন্য যথেষ্ট ঘরবাড়ী তাড়াতাড়ি তৈরী করা কঠিন। এইজন্য দূর হইতে দেখিলাম কতকগুলা পুরাতন রেলগাড়ী বাসগৃহ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

নানারকম কল, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া ও কার্পাসের নানাবিধ জিনিষ, দস্তানা প্রভৃতি প্রাগে তৈরী হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া ভারতবর্ষে চিনি এনামেলের জিনিষ, কাঠের জিনিষ, কাপড় প্রভৃতি চালান করে। আমরা ইউরোপের কোন্ দেশে কি জিনিষ তৈরী করিয়া পাঠাই ?

প্রাগের একখানি প্রধান চেক্ সংবাদপত্রের দুজন প্রতিনিধি ভারতবর্ষের অবস্থা জানিবার জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে অনেক কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা কি টুকিয়া লইলেন, কিই বা ছাপিলেন, বলিতে পারি না।

রাত্রে ঘাম হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে আমি প্রাগ হইতে জেনীভায় ফিরিয়া আসিয়া সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া দেশে ফিরিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় খুব ভাল ডাক্তার আছেন, এই কারণ দেখাইয়া শ্রীমান্ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ আমাকে ভিয়েনা পর্য্যন্ত যাইতে বলিলেন। সুতরাং ভিয়েনা পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির করিলাম। ট্রেনে রবিবাবু অসুস্থ হন। শ্রীমান প্রশান্ত, শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী দেবী ও আমি খাইবার গাড়ীতে বসিয়াছি, এমন সময় সেই গাড়ীতেই উপবিষ্ট এক জাপানী ভদ্র লোক উঠিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিনা, জিজ্ঞাসিতে পারি কি ?" আমি বলিলাম, "আমি রবীন্দ্রনাথ নহি। তিনি এই গাড়ীতেই নিজের কামরায় আছেন।" তখন জাপানীটি ফিরিয়া গিয়া নিজের জায়গায় বসিলেন।



বিদেশ

প্রবাসী ভারতবাসীদের কথা—

দক্ষিণ-আফ্রিকা

দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসীদের ভারতীয়দের সুখ-সুবিধা, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ভারত সরকার মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে তথাকার এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। এ সংবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসীরাও এই নিয়োগে সুখী হইয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ভারতের যোগসূত্র স্থায়ী হইবে। তত্রত্য 'আফ্রিকার ভয়েস' নামক সুবিখ্যাত দৈনিক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় একজন ভারতীয় হাই কমিশনার নিয়োজিত হইলে ইন্দো-আফ্রিকান বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবে।

ডাঃ সুধীন্দ্র বসু

আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত আইওয়া ষ্টেটের অধ্যাপক ডাঃ সুধীন্দ্র বসুর পরিচয় আমাদের পাঠকবর্গের নিকট নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বহুদিন আমেরিকা প্রবাসী। যদিও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হয় নাই তথাপিও ইংরেজ সরকার নানা ছলে তাঁহার ভারতে আগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

সম্প্রতি কতকগুলি ভারতীয় সংবাদপত্র অভিযোগ করিয়াছেন যে তিনি (ডাঃ বসু) "ঔদ্ধত্য সহকারে" ভারত সরকারের "মহৎ প্রস্তাব" উপেক্ষা করিয়া "স্বেচ্ছায়" ভারতের বাহিরে রহিয়াছেন। ডাঃ বসু একখানি পত্রে লিখিয়াছেন * সংবাদ পত্রগুলির এই অভিযোগ একেবারে ভুয়া। তিনি লিখিয়াছেন শ্রমিক সদস্য মিঃ বিয়েটি গত ফেব্রুয়ারী মাসে পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রশ্ন করেন যে তাঁহাকে (ডাঃ বসু) ভারতে প্রবেশ করিতে কেন বাধা দেওয়া হইতেছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত তথাকথিত অভিযোগগুলির পূর্ণবিচার হইবে কি না। উত্তরে সরকার পক্ষীয় মন্ত্রী বলেন মিঃ বসু যে কোন সময় ভারত প্রবেশের অনুমতি পাইতে পারেন। ইহার পর হইতে বহুবার আবেদন করিয়াও তিনি ভারত প্রবেশের অনুমতি পাইতেছেন না। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ডাঃ বসুর তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে দেখিবার জন্য ভারতে আসিবার অনুমতি চাহিয়াও পান নাই।

তাঁহার উক্ত চিঠিতে ডাঃ বসু আরও লিখিয়াছেন যে বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার এখন হঠাৎ তাঁহাকে ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজ রাজদূতের নিকট জানান যে, তিনি একবৎসরের ছুটি লইয়া বিদেশে যাইবেন তাঁহাকে যেন ভারত হইতে নিরাপদে আসিতে দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে ইংরেজ রাজদূত জানাইয়াছেন যে তাহা সম্ভব হইবে না। এই জন্য ডাক্তার বসু প্রশ্ন করিতেছেন…

"আমি ইংরেজের প্রজা নহি এবং পাঁচ বৎসর ভারতে বাস না করিলে ইংরেজের প্রজারূপে গণ্য হইতেও পারিব না…কাজেই কোন্ আইনের বলে ভারতের ইংরেজ সরকার অন্য দেশের নিরপরাধ অধিবাসীকে ভারতবর্ষে আটকাইয়া রাখিতে চান? ইহাতে মনে হয় আমি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ভয়াবহ দোষ করিয়াছি এবং আদালতে বিচারের পূর্ব্বেই দণ্ডিত হইয়া রহিয়াছি।" এরূপ বিচার প্রহসন না করিয়া প্রকাশ্য আদালতে বিচার করিবার সাহস কি অভিযোগকারীদের নাই?

স্কটল্যাণ্ডে বর্ণ-বিদ্বেষ

এডিনবারার (স্কটল্যাণ্ড) ভারতীয় ছাত্র সঙ্ঘের সম্পাদক সংবাদপত্রে একখানি পত্র লিখিয়া তথাকার ভারতীয়দিগের দুর্দ্দশার কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পত্র হইতে জানা যায় যে, স্কচ্ দিগের তথাকথিত সভ্য দেশে ভারতীয়েরা নানাভাবে কি প্রকার অবমাননা, লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন। ভারতে জন্মান যদি একটি অপরাধ হইয়া থাকে, তবে সেই অপরাধের শাস্তি ভারতীয়গণ স্বাধীন দেশে গিয়াও পাইতেছেন।

ছাত্র-সঙ্ঘের সম্পাদক জানাইতেছেন যে,—এখানে আসিলে উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গদিগের জাতি-বিদ্বেষের চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং যাঁহারা বড় আশা লইয়া গ্রেটব্রিটেনে অধ্যয়ন করিবার জন্য আগমন করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্র হইতে তাঁহাদের যেন চোখ ফুটে। ইহার পরেও যদি গ্রেটব্রিটেনে আসিতে সাধ হয়, তবে সমস্ত প্রকার নির্য্যাতনের জন্য প্রস্তুত হইয়াই যেন তাঁহারা এখানে আগমন করেন।

এখানকার ভারতীয়গণ সামাজিকভাবে অস্পৃশ্যদিগের মতই জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হন। শুধু একটিমাত্র ব্যাপার হইতেই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। গত ৩০শে এপ্রিল "স্কচ্ ম্যান্" নামক এডিনবারার এক সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে যে, ১১নং চামাস ষ্ট্রীটে বাসস্থানের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু তথায় ভারতীয়গণকে গ্রহণ করা হয় না।

এখানকার সামান্য একজন বাড়ীওয়ালী কিম্বা অতি সাধারণ অবস্থার শ্বেতাঙ্গ পর্য্যন্ত ভারতীয়দিগের সহিত আদানপ্রদান করিতে ঘৃণা বোধ করে। স্কটল্যাণ্ড হইতে ভারতীয়দিগকে কালচামড়ার অপরাধে

---

* এই পত্রখানি জুন মাসের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বহিস্কৃত করিবার জন্য যেন একটা সুনিয়ন্ত্রিত অভিযান চলিয়াছে। এডিনবারার একটি প্রধান রেস্তোরাঁ ভারতীয় ছাত্রসঙ্ঘের সদস্যদিগকে জানাইয়াছেন—"২৩শে তারিখ হইতে কোন ভারতীয়কে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।" কারণ তাহারা কৃষ্ণকায়।

দুর্দ্দশার ইহাই চরম নহে। এমন কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পর্য্যন্ত বর্ণ-বিদ্বেষ রূপ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে। এখানকার স্কচ ছাত্রগণ যেন ভারতীয়দিগের সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান করে। কোন সামাজিক ভাবে মেলামেশা দূরের কথা, তাহারা ভারতীয়দিগের সহিত কথাই বলে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সামাজিক সম্মিলনে ভারতীয়দিগের প্রবেশাধিকার থাকা সত্ত্বেও দুইজন ভারতীয়কে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই।

ভারতীয়দিগকে বর্ণের অপরাধের জন্য রয়েল মেডিকাল সোসাইটিতে, সি-টি-সিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তরণ-স্নান ক্রীড়ায় যোগ দিতে দেওয়া হয় না।

—

ভারতবর্ষ

তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রী—

রেলওয়ে বোর্ড আগামী বৎসর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের নানারূপ সুবিধার জন্য দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

শিশুরক্ষা বিল—

মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে মাননীয় মিঃ তাম্বে ১৯২৭ সনের "শিশুরক্ষা বিল" নামক একটি বিল উত্থাপন করিবেন। এই বিল উপস্থিত করার উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে মিঃ তাম্বে বলিয়াছেন :—

ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের অপরাধীদের হিসাবনিকাশ হইতে জানা যায় যে, অভ্যস্ত অপরাধীদের অধিকাংশই ২৫ বৎসর বয়স্ক হইবার পূর্ব্ব হইতেই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যাঁহারা ট্রেণে ভ্রমণ করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন যে, সামান্য মাত্র পোষাক পরিয়া কদাকার, রুগ্ন এবং জরাজীর্ণ কতকগুলি বালক-বালিকা দুই এক পয়সা সাহায্যের জন্য যাত্রীদিগকে প্রতি ষ্টেশনেই বিরক্ত করিয়া থাকে। প্রত্যেক বড় বড় সহরেই দেখা যায় যে, গৃহহীন, সম্বলহীন এবং অকর্ম্মণ্য বালক-বালিকার সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য কোন কাজ করে না ; কেবল জনসাধারণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটায়। রাত্রিকালে চুরি করিয়া ট্রেণে চড়িয়া এই সমস্ত ভিক্ষুক এক সহর হইতে অপর সহরে যাইয়া আশ্রয় লইয়া যখন কোনপ্রকারেই আহার জুটে না তখন ইহারা অন্যায় কার্য্য আরম্ভ করে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, কতকগুলি দুষ্টলোক আছে যাহারা এই সমস্ত হতভাগ্য বালক-বালিকাদিগকে দুষ্কার্য্য শিক্ষা দেয়, এবং তাহাদের দ্বারা দুষ্কার্য্য করাইয়া লইয়া লব্ধ জিনিষের একটা অংশ গ্রহণ করে। এই সমস্তের প্রতিকার করাই বর্ত্তমান বিলের উদ্দেশ্য।

যে সমস্ত বালকবালিকা অসহায়, গৃহহীন, অন্নহীন এবং বস্ত্রহীন তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে হইবে। যাহারা এই হতভাগ্য বালক-বালিকাদিগকে মন্দকার্য্যে প্ররোচিত করে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া যথোচিত শাস্তি দিতে হইবে। তারপর ইহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেই স্কুলে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে হতভাগ্য বালকবালিকাগণ নিজেদের জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। এতদ্ভিন্ন যুবক-অপরাধীদের অপরাধের বিচার করিবার জন্য বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং ইহাদের বিচার ও শাস্তির জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়ের কথা ঐ-বিলের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

মহিলার কৃতিত্ব—

বিহার সরকার এই বৎসর ছয় জন ছাত্রকে শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে প্রেরণ করিবেন। তন্মধ্যে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নয়না দেবী মনোনীত হইয়াছেন। বিহারী মহিলাদিগের মধ্যে তিনিই শিক্ষালাভের জন্য প্রথম বিদেশে যাইতেছেন।

অহিফেন—

দেশীয় রাজ্যগুলিতে অহিফেনের চাষ কমাইবার জন্য এবং যাহাতে দেশীয় রাজ্যে উৎপন্ন অহিফেন, ব্রিটিশ ভারতে এবং পূর্ব্ব-এশিয়ায় অবৈধভাবে চালান না হইতে পারে, সেজন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণকে লইয়া সিমলায় এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। এই বৈঠকে বড়লাট এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় অহিফেন সম্পর্কে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলিকে অহিফেনের চাষ কমাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

ইউরোপে জাতি সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে জগদ্ব্যাপী বৈধ ও অবৈধ অহিফেন ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য অথবা বহুল পরিমাণে অহিফেন চাষ কমাইবার জন্য ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যে বৈঠক বসিয়াছিল, ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত থাকিয়া ভারতের অহিফেন ব্যবসায় বন্ধ না করিলেও সংযত করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণকে সে কথা বড়লাট স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং যুক্তপ্রদেশে এবং রাজপুতনায় অহিফেনের চাষ যে গবর্ণমেণ্ট বহু কমাইয়া দিয়াছেন, সে কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, পূর্ব্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে এবং ভারতেও অহিফেনের চাহিদা এত অধিক যে, লোকে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অহিফেনের অবৈধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। ইহা রোধ করা কঠিন হইলেও তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

মহারাণা প্রতাপ জয়ন্তী—

জব্বলপুরের ক্ষত্রিয় সভা এবং হিন্দু নেতাদের উদ্যোগে গত মাসে মহাসমারোহে মহারাণা প্রতাপের জন্মতিথি-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে মহারাণার একখানি বৃহৎ চিত্র সুসজ্জিত করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া প্রায় দশ হাজার লোক এক মিছিল বাহির করে।

—

বাংলা

বাঁকুড়ায় সাঁওতাল সমিতি—

পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত করণার্থ বাঁকুড়া জেলার সাঁওতালগণ এক সমিতি গঠন করিয়াছে। গ্রামের মণ্ডলগণ এই সমিতির সভ্য। তাহারা গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া স্থির করিয়াছে—

১। কোন সাঁওতাল নরনারী আর বাঙ্গালীর ন্যায় পাতলা কাপড় পরিধান করিবে না।

২। কোন সাঁওতাল আর শুঁড়ির দোকানে মদ খাইবে না।

৩। কোন সাঁওতাল স্ত্রীলোক আর বাঙ্গালীর অনুকরণে চুড়ি হাতে দিবে না।

৪। সাঁওতাল স্ত্রীলোকেরা আর সাঁওতাল ভিন্ন অন্য কোন জাতির বাড়ীতে নাচ গান করিতে যাইবে না।

এই চারিটি নিষেধের মধ্যে যে কোন একটি নিষেধ লঙ্ঘন করিলে তাহাকে ৫০৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি দেখাইয়া দিবে যে কোন সাঁওতাল শুঁড়ির দোকানে বসিয়া আছে সে ২৫৲ টাকা পুরস্কার পাইবে।

উক্ত বিধি নিষেধগুলি তাহাদের মুখের কথা নহে। তাহারা তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। প্রতিনিয়ত সন্তর্পণে সকল দিক লক্ষ্য রাখিয়া নিষেধ অমান্যকারীর জরিমানা করিতেছে।

সামাজিক শাসন বড়ই গুরুতর। যে জরিমানার টাকা সঙ্গে সঙ্গে না দিবে সকল সাঁওতালই সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহিত সকল সংস্রব-ত্যাগ করিবে। এই শাসনের ভয়ে টাকাও আদায় হইতেছে।

আমরা এইসকল কথা শুনিয়া কয়েকটি সাঁওতাল বস্তীতে গিয়া শুনিলাম যে প্রত্যেক নরনারী ঐ বিধি নিষেধ রক্ষার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছে।

—বাঁকুড়া-দর্পণ

অন্ধ ছাত্রের কৃতিত্ব—

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে। তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয় হইতে শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপকতা করিতেছেন।

বঙ্গীয় জেলতদন্ত কমিটি—

বঙ্গীয় জেল তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুপারিশ করিয়াছেন :—

(১) ওয়ার্ডারদের কার্য্যের অবস্থার উন্নতি সাধন ; (২) ওয়াডার এবং অন্যান্য জেল কর্ম্মচারীদের শিক্ষিত করিবার জন্য স্কুল স্থাপন ; (৩) কয়েদীদিগকে কর্ম্মচারী নিয়োগের হ্রাস বিধান ; (৪) জেলারের কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, কেরাণীর কাজ এবং জেল শাসনের কাজ পৃথকীকরণ ; (৫) বড় বড় জেলে কয়েদীদিগকে একত্র করণ ; (৬) বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েদীদিগকে পৃথক করণ ; (৭) সকল জেলে সেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করণ ; (৮) জেলের মধ্যে চরিত্র সংশোধনের উপায় বিধান ; এবং (৯) মুক্তির পর কয়েদীদের জন্য যত্ন লওয়া।

রবীন্দ্র জয়ন্তী—

পঁচিশে বৈশাখ রবিবার সান্ধ্যদীপালোকে ময়মনসিংহ রবীন্দ্র সঙ্ঘের উদ্যোগে সূর্য্যকান্ত টাউন হলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুষ্পপল্লব শোভিত আলোক মণ্ডিত উৎসব বেদীর একান্তে কবিগুরুর তৈলচিত্র স্থাপিত ছিল। সভায় রবীন্দ্র সাহিত্যামোদী বহু নরনারী উপস্থিত ছিলেন। শঙ্খধ্বনি সহকারে ঋত্বিক বরণের পর সুরলয় সংযোগে একটি বৈদিক মন্ত্র গান হয়। তারপর উদ্‌বোধন সঙ্গীতান্তে কবিগুরুর শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপক কবিতাটি পঠিত হয়।

সভায় কবিগুরুর কতিপয় কবিতা আবৃত্তি হয়। মধ্যে মধ্যে ঐক্যতান বাদন হইয়াছিল।

স্বস্তি বচনে সভাপতি বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বাঙলা ভাষার ক্রম-বিকাশের ধারা আলোচনা করিয়া একটি সুললিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মহৎ দান—

(১) হুগলী জেলায় তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বাহিরখণ্ড গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ভড় মহাশয় তাঁহার বাস-ভবনের নিকটে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ স্থানে প্রায় ২০।২২ খানি গ্রামের বালকদের শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ছিল। ভড় মহাশয় তাঁহার অশেষ করুণাগুণে ঐ স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্পে স্কুল ফণ্ডে দশ হাজার টাকা এবং স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য প্রায় ২০ হাজার টাকা দান করিতেছেন। তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে ২০।২২ খানি গ্রাম প্রভৃত উপকৃত হইল। অশিক্ষিত গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষালাভের এই সুযোগ প্রদান করিয়া তিনি সমগ্র দেশেরই মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

(২) চিত্তরঞ্জন হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ ২৪ নং গোরাচাঁদ রোড হইতে জানাইতেছেন যে, মিঃ বিপিনচন্দ্র মল্লিকের মারফৎ মিঃ তেজপাল যমুনাদাস ১ হাজার টাকা উক্ত হাঁসপাতালে দান করিয়াছেন। এবং হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ উহা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিতেছেন।

ঢাকা অনাথ আশ্রম—

অমুসলমান অনাথ বালক বালিকাদিগকে এই আশ্রমে প্রতিপালন, অন্নবস্ত্র এবং লেখাপড়া এবং জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। এ-পর্য্যন্ত আশ্রমের অনেক বালক প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে এবং ১০টি বালিকা বিবাহিতা হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বর্ত্তমানে এক মাস হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক ১১টি বালক ও ১৯টি বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে—আরও ১০।১২টির স্থান আছে। আশ্রমের সভ্য ও সহানুভূতিকারিগণের নিকট নির্ব্বন্ধাতিশয় নিবেদন যে নিম্নলিখিত কোন প্রকারে সাহায্য করেন :—(১) অর্থ বা বস্ত্র বা খাদ্য দান অথবা ইহা সংগ্রহ এবং নূতন সভ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। (২) ৮ বৎসরের ন্যূন নিরাশ্রয় বালক বালিকা পাঠাইলেও বাধিত হইব। (৩) প্রধান অভাব এক মাস শিশুর জন্য একটি দুগ্ধবতী গাভী।

শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম—

আমরা শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ১৩৩৩ সনের বার্ষিক বিবরণী পাইয়াছি। বিগত বর্ষে আশ্রমের কার্য্যের প্রসার হইয়াছে ও বিভিন্ন বিভাগে উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

বঙ্গে বিধবা-বিবাহ—

ময়মনসিংহ

বর্ত্তমান সনের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার মদন থানার

এলাকাধীন জজীপুর গ্রাম নিবাসী মৃত বৈদ্যনাথ কৈবর্ত্তদাসের বিধবা কন্যা শ্রীমতী অমৃতসুন্দরী দাসীর সহিত উক্ত গ্রামের শ্রীমান গিরিশচন্দ্র দাসের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০০ লোক উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত বিবাহে যোগদান দিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলে এই প্রথম বিধবা-বিবাহ। শ্রীযুক্ত গয়ানাথ চৌধুরী ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ বিধবা-বিবাহ ও ধর্ষিতা নারীর সমাজে গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ চাষী কৈবর্ত্ত সমাজে ৫টি বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই সমাজ বহু বিস্তৃত এবং অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল।

১। বর শ্রীঅধর চন্দ্র দাস পিতার নাম ৺দ্বারকানাথ দাস বয়স ৩৫ বৎসর, সাং কাগমারী। কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী পিতা শ্রীসীতানাথ দাস সাং টাঙ্গাইল। বয়স ১৭ বৎসর।

২। বর শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস, বয়স ৩০ বৎসর, পিতা ৺দীননাথ দাস সাং বেড়াডোমা। কন্যা শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী। বয়স ১৭ বৎসর পিতা শ্রীকুমুদচন্দ্র দাস সাং আশকপুর।

৩। বর শ্রীতারিণীচরণ দাস বয়স ২৮ বৎসর, পিতা শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস সাং বাসা। কন্যা শ্রীমতী রাজেশ্বরী বয়স ১৪ বৎসর, পিতা হরচন্দ্র দাস সাং পোড়াবাড়ী।

৪। বর শ্রীপঞ্চানন দাস বয়স ৪৬ বৎসর, পিতা ৺শ্রীকান্ত দাস সাং চালান। কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী বয়স ১৮, বৎসর পিতা ৺বেহারীলাল দাস সাং বেড়াডোমা।

৫। বর শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দাস বয়স ৩০ বৎসর, সাং দাইন্যা। কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী বয়স ১৪ বৎসর, পিতা গয়ানাথ দাস (৮ বৎসরে বিবাহ ৯ বৎসরে বিধবা হয়।) এই সমাজে বাল্য-বিবাহ অর্থাৎ ৭।৮ বৎসরেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া থাকে।

বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ টাঙ্গাইল মহকুমায় মির্জ্জাপুর থানার অধীন করড়া কাউলজানী নামক গ্রামে নমঃশূদ্র সমাজের ভিতর একটি বিধবা-বিবাহ সুনির্ব্বাহ হইয়াছে।

ঢাকা

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ "বিক্রমপুর যুবক-সম্মিলনীর" প্রচেষ্টায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানায় এলাকাধীন নোয়াদা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র রাজবংশীর বিধবা কন্যার (বয়স ১০ বৎসর) সহিত গোবিন্দপুর নিবাসী শ্রীগদাধরচন্দ্র রাজবংশীর সহিত বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত সমাজে আরও ২টি বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

মেদিনীপুর

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার তিলন্তপাড়া বিধবা-বিবাহ-সভার উদ্যোগে মেদিনীপুর জেলার, সবং থানার কাপাসদী গ্রামে তেলী জাতীয় শ্রীঝড়ু রাম সাউর পুত্র ২০ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান কুমারনারায়ণ সাউর সহিত মোহাড় নিবাসী ৺বৈকুণ্ঠনাথ সাউর কন্যা ১৪ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতী শান্তবালা দাসীর সহিত বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ-সভার তিলন্তপাড়া বিধবা-বিবাহ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ মাইতি ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মাইতি ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রায় ২০০।৩০০ লোক উপস্থিত ছিলেন।

নদীয়া

গত ২৮শে বৈশাখ, বুধবার নদীয়া-জেলা দত্তপলিয়া গ্রামের ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ গঙ্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দধবল নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাইকপাড়া—রাণীরোডে এই বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তারকবাবুর (কন্যার পিতা) সমাজস্থ বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ বিবাহ-বাসরে উপস্থিত থাকিয়া শুভ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন এবং বরপক্ষীয় বন্ধুবান্ধবগণও উপস্থিত ছিলেন।

পাবনা

গত ১১ই বৈশাখ বেড়া থানার অন্তর্গত সিংহাসন জোয়ারিপাড়া নিবাসী শ্রীঅনাথবন্ধু প্রামানিকের সহিত রাকসা নিবাসী শ্রীলক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের বিধবা কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দাসীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্র পাত্রী নমঃশূদ্র জাতীয়। স্থানীয় নমঃশূদ্র সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ভদ্রলোক বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া এই বিবাহ অনুমোদন ও সমর্থন করিয়াছিলেন।

সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিতেছেন :—

সকল দিক্ হইতে বিধবা বিবাহের উপযোগীতা প্রতিপন্ন হইলেও একদল লোক আজও আইনের কূটতর্ক তুলিয়া এই সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য অনেকস্থলে তাহাদের এই চেষ্টাও সফল হইয়া থাকে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৬ সনে আইন প্রণয়ন করিয়া বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। এখন এইরূপ বিবাহের সন্তান তাহার পিতার বিত্তের আইনসম্মত উত্তরাধিকারী বলিয়াই বিবেচিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিরাটের অধিবাসী মিঃ রাধেলাল তাঁহার বিধবা কন্যাকে পুনরায় বিবাহ দেন। পণ্ডিত ঘাসিরাম তাঁহাকে সাহায্য করেন। ইহাতে তথাকার পণ্ডিত সমাজে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। মিরাটের প্রতিপত্তিশালী লোকগণ এক সভায় সমবেত হইয়া এই দুষ্কার্য্যের জন্য মিঃ রাধেলাল ও পণ্ডিত ঘাসিরাম প্রভৃতিকে সমাজচ্যুত করেন। অতঃপর ইঁহাদের বাড়ীতে সকলের খাওয়াদাওয়া এবং যাওয়া-আসা বন্ধ হইয়া যায়।

ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পণ্ডিত ঘাসিরাম এবং মিঃ রাধেলাল ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ধারা অনুসারে উপরোক্ত মোড়লদের নামে একটি অভিযোগ উপস্থিত করেন। নিম্ন আদালত পঞ্চায়েতের প্রধান ব্যক্তিকে ৩০০৲ টাকা জরিমানা এবং তাহা পরিশোধ না করিলে চারিমাস কারাদণ্ডের আদেশ হয় এবং সেই সঙ্গে আরও দুইজনের ২০০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড এবং তাহা পরিশোধ না করিলে তিন মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অতঃপর দায়রা আদালতে আপীল করা হয়। এখানেও মামলার সাবেক রায় বাহাল থাকে। আপীলকারীগণ তখন আবার হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্যাগট তাঁহার রায়ে নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন। এইরূপে বার বার ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিধবা বিবাহের প্রতিবাদীদল মনের দুঃখে নিরস্ত থাকিয়া দণ্ডভোগ করিতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে দেশের উচ্চতম বিচারালয়ের বিধানে স্থিরকৃত হইল যে, বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী প্রচেষ্টাকে জব্দ করিতে যাওয়া সর্ব্বতোভাবে বে-আইনী। আশা করি, ইহার পর বিধবা বিবাহ সম্পর্কে আইনের ভীতিমূলক আর কোনও প্রকার ভ্রান্ত-ধারণা বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাঙালী—

বিহারের শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় বর্ত্তমান বর্ষে ভারতবর্ষে গৃহীত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এ সংবাদ



শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়

পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষায় তিনি একুনে ১২১৪ নম্বর পাইয়াছেন। এ-পর্য্যন্ত উক্ত পরীক্ষায় কেহই অত বেশী নম্বর প্রাপ্ত হন নাই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার—নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাপড়া নিবাসী ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়লাল মজুমদার



শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার

মহাশয়ের পুত্র, উক্ত পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান ও বাঙ্গালা হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি আই, এস্, সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান ও বি, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলা হইতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কুমারী অপর্ণা দাশগুপ্তা—

গত মাসে আমরা কুমারী অপর্ণা দাশগুপ্তার রাজকীয় বৃত্তি-প্রাপ্তির সংবাদ দিয়াছিলাম। কুমারী অপর্ণা প্রবেশিকা হইতে সমস্ত পরীক্ষাতেই বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ১৯২২ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথমবিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ



কুমারী অপর্ণা দাশগুপ্তা

হন। এই পরীক্ষায় তিনি ৫১৭ নম্বর পাইয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে মধ্য পরীক্ষাতেও তিনি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিংশ স্থান অধিকার করিয়া ৪৫০ নম্বর পান। বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত শতকরা প্রায় ৬০ নম্বর পাইয়া উত্তীর্ণ হন। তিনি এম্, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

বাঁকুড়া অভয় আশ্রম—

আশ্রমের জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণীতে প্রকাশ যে গত মাসে কর্ম্মীগণ ধানবাদ, আসানসোল, বালীগঞ্জ, আগ্রা, রাঁচি, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে খদ্দর প্রচারকল্পে ভ্রমণ করিয়াছেন।

কৃতী বাঙালী ছাত্র—

পাটনা নিউ কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত ডি, কে, মুখোপাধ্যায় ইংলণ্ডের



মিঃ ডি, কে, মুখোপাধ্যায়

কারুশিল্প বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বিহার ওড়িসা শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতেন। এ পর্য্যন্ত আর কোন ভারতবাসী এই ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন নাই।

যশোহর-খুলনা যুবক সম্মেলন—

গত মাসে সংবাদিক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে যশোহর-খুলনা যুবক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালী রাজবন্দী ও মুক্তি আন্দোলনে বাঙ্গালী যুবকগণের কার্য্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া যুবকদিগকে অনুরোধ করেন :—

"বিস্তর কাজ পড়িয়া আছে। শুধু কর্ম্মীর অভাব। সকল স্থানে যে, একই বাঁধাবাঁধি নিয়মে কাজ করিতে হইবে, এমন কোন স্থায়ের বিধান নাই। প্রথম কাজ, বিভিন্ন স্থানে যুবকদিগের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া সেই সকল স্থানের উপযোগী যে সকল কাজ করা সম্ভব বা প্রয়োজন, সেই সকল হাতে লইতে হইবে। যুবকদিগের নিজেদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করা প্রকৃত কাজের ভিত্তি। যাঁহারা কাজ করিবেন, তাঁহাদিগের যদি দেশের সম্বন্ধে, অপর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কি প্রকারে জ্ঞানের বিস্তার করিবেন বা কাজের প্রকৃত পথ বাহির করিবেন? আমি মনে করি যুবক সঙ্ঘের সর্ব্বপ্রথম কাজ হইবে জ্ঞাতব্যবিষয়পরিপূর্ণ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পুস্তকালয় স্থাপন করা।"

মাতৃজাতি সেবক-সমিতি—

গতমাসে কলিকাতায় শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর সভানেতৃত্বে মাতৃজাতি সেবক সমিতির ৭ম বার্ষিক সভাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কার্য্য-বিবরণীতে জানিতে পারা যায় যে, সমিতি ক্রমেই বেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কার্য্য-বিবরণী পাঠের পর বক্তারা মাতৃজাতির প্রকৃত সুশিক্ষার ব্যবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বর্ত্তমান সময়ে যাহাতে নারীগণ সর্ব্বতোভাবে শিক্ষিতা, স্বাবলম্বী ও শারীরিক শক্তিসম্পন্না প্রকৃত গৃহিণী হইয়া উঠিতে পারেন, এজন্য সকলকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন।

বঙ্কিম-ভবন—

বঙ্গের সুসন্তান ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী কাঁটালপাড়া, নৈহাটি ষ্টেশনের নিকটে। ই, বি, রেলওয়ে বহুদিন যাবৎ এই সম্পত্তি অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে। মধ্যে ইহার প্রতিবাদকল্পে সাহিত্য-পরিষদ চেষ্টা করিতেছিলেন এবং একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলাফল জনসাধারণ জ্ঞাত নহেন। সম্প্রতি রেলওয়ে কোম্পানি ইহা দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সাধারণের দিক্ হইতে এই পুণ্য স্থান রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। আশা করা যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় আবাসস্থল রক্ষা করিতে বাঙ্গালী পশ্চাদপদ হইবে না।

খুলনা জেলা সম্মিলন—

গত মাসে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে খুলনা জেলা সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। বাঙালার গ্রাম সমূহের দুর্দ্দশার কথা বিবৃত করিয়া আচার্য্য রায় বলেন "আজকাল রাজনীতিক্ষেত্রে নানাপ্রকার মতভেদ দেখা দিয়াছে। অনেকেই অনেক প্রকার কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পল্লীগঠন বিষয়ে সকলেই একমত, এই পল্লীই আমাদের সাধারণ মিলন ক্ষেত্র। এস্থলে আমরা সকলেই রাজনৈতিক মতভেদের কথা বিস্মৃত হইয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি—একযোগে কাজ করিতে পারি। এই জন্যই আমি দেশের নামে, দেশমাতৃকার নামে সকলকে আহ্বান করিতেছি,—আপনারা পল্লীর উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হউন।"



['পুস্তক-পরিচয়ে'র সমালোচনার সমালোচনা না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—প্রবাসী-সম্পাদক]

কাব্য-দীপালি…(কবিতা-সংগ্রহ)—শ্রী নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত, কলিকাতা, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ২৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

এই পুস্তকখানি হাতে লইয়াই ইহার সাইজ, সুচিত্রিত ঢাকুনি, (আবরণী) সোনার জলে চিত্রিত মলাট (প্রচ্ছদপট), কাগজ, ছাপার অক্ষর, মার্জ্জিন ও স্পেশ (space) এবং মাঝে মাঝে পৃষ্ঠারম্ভে ও পৃষ্ঠাশেষে চিত্রিত এক-রঙা ছবিগুলি দেখিয়া মনে হইল সম্পাদক নরেন্দ্রবাবু ও প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স এই বইখানিকে বিবাহাদি ব্যাপারে প্রিয়জনকে উপহার দিবার উপযুক্ত করিতে চেষ্টা, যত্ন ও অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হন নাই। ভিতরের টাইটেল পেজখানি (নামলিপি) সুচিত্রিত, কিন্তু কাগজের রঙের জন্য একটু দৃষ্টিকটু হইয়াছে। ১৭খানি রঙিন চিত্রও পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটির উপরের আবরণীতে রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো কবিতার দুই এক ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল ও অন্যান্য দুই একখানি ছাড়া কোনো ছবিই আমাদের ভাল লাগিল না। এইসকল চিত্র দ্বারা কবিতাগুলির গৌরবহানিই হইয়াছে।

বইখানিতে ছাপার ভুলও যথেষ্ট আছে।

এই গেল বাহিরের দিক। ভিতরের বিচার কবি ও কাব্য লইয়া; ইহাতে মতভেদ আছে। নরেন্দ্র-বাবু নিজের রুচি ও বিচার অনুযায়ী কবি ও কবিতা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না, যদি তিনি গদ্যে ও পদ্যে চার পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাটি না লিখিতেন। তখন এইটুকু লিখিলেই সমালোচকের কর্ত্তব্য শেষ হইতে যে, "নরেন্দ্রবাবু এই পুস্তকে আপনার খুসীমত ৭৩ জন বঙ্গ-কবির ১৫০টি কবিতা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, উপহার দিবার পক্ষে বইখানি চমৎকার হইয়াছে।" কিন্তু সম্পাদক মহাশয় গদ্যে লিখিয়াছেন—"একালের কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় একত্র করবার চেষ্টা করেছি। বর্ত্তমান যুগের ও সর্ব্বযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে আমি একেবারে আজকের দিনের সদ্য-সমাগত কয়েকটি তরুণ কবির সুন্দর রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।" এবং পদ্যে লিখিয়াছেন,

"আমার দেবীর দেউলের দ্বারে এ যুগের যত কবি
এনেছে তাদের পূজার অর্ঘ্য…………
তাদেরই ভাবের সাগর ছানিয়া মনের মাণিক তুলি
গড়েছি আমার এই দীপালির দীপ্ত প্রদীপগুলি।"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া তরুণতম রাধারাণী দত্ত (সম্পাদকের স্নেহাস্পদা অনুজা—যার কবিখ্যাতি নাকি "ইতিমধ্যেই সবিশেষ প্রচারিত হ'য়ে প'ড়েছে")—পর্য্যন্ত সকল কবির শ্রেষ্ঠ রচনা এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। নরেন্দ্রবাবুর সংগৃহীত কবিতাগুলি যদি বাঙলা কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়, তাহা হইলে বাঙলা কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এইসকল শ্রেষ্ঠ কবিতা ছাড়াও এইসকল কবিদের এমন অনেক কবিতা আমরা দেখিয়াছি যাহাতে আমাদের কাব্য-সাহিত্য সমৃদ্ধ মনে হয়। এই সংগ্রহ দেখিয়া কেহ যেন ক্ষুণ্ণ না হন।

বহু মাথা ঘামাইয়াও কবিতাগুলি কি ভাবে সজ্জিত হইয়াছে ঠাহর করিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ যদি শুরু হন (সময় হিসাবে) তাহা হইলে স্বর্ণকুমারী তাঁহার পরে আসেন কি করিয়া? যদি স্বর্ণকুমারীই আসিলেন তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাদ গেলেন কেন? কবির বয়স ও জন্মকাল ধরিয়া যে কবিতা সজ্জিত হয় নাই তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। কবি-খ্যাতি হিসাবেও যে এই কবিতা সজ্জিত হয় নাই তাহাও মনে হইতেছে। এরূপ 'এলো পাতাড়ি' ভাবে কবিতা সাজাইয়া সম্পাদক মহাশয় অসংযমের পরিচয় দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ হইতে রাধারাণী দত্ত পর্য্যন্ত ৭৩ জনের স্থান হইল, চেনা চেনা কয়েকটা নাম ইহার মধ্যে পাইলাম না। যেমন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, গিরিজা মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, নিরুপমা দেবী, নরেন্দ্র দেব ইত্যাদি। সম্ভবতঃ ইঁহারা কবিতা ছাপিতে অনুমতি দেন নাই। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন সকলে অনুমতি দেন নাই, সুতরাং এসম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই।

কয়েকটি কবির কবিতা-নির্ব্বাচন মোটেই ভাল হয় নাই। সংক্ষেপে ইহার বিচার করা কঠিন। আমরা নামমাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। রবীন্দ্রনাথের কবিতানির্ব্বাচন দুরূহ। বিশ্বভারতীর প্রকাশিত চয়নিকাতেও তাঁহার কবিতা ভাল মত নির্ব্বাচিত হয় নাই। এখানেও হয় নাই। শ্রীমতী কামিনী রায়ের নির্ব্বাচন একেবারেই ঠিক হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ সেনের নির্ব্বাচন ভাল হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কবিতা আরো দেওয়া উচিত ছিল। আমাদের মতে অন্যান্য কবিদেরও অনেক ভাল কবিতা বাদ পড়িয়াছে ও অপেক্ষাকৃত খারাপ কবিতা স্থান পাইয়াছে। মনে হয় যেন সম্পাদক মহাশয় ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ সকল কবির সকল পুস্তক সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, এই ধরণের নির্ব্বাচনে কবিদিগকে অপমান করাই হইয়াছে—তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রমথ চৌধুরীর যেগুলি 'কবিতা' নহে, সেইগুলিই দীপালিতে স্থান পাইয়াছে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সম্বন্ধে বলিতে পারি না, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের দুই-একটি ভাল কবিতা খোঁজ করিলে পাওয়া যাইত।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা নির্ব্বাচন ছন্দের দিক দিয়া করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেগুলিতে ছন্দের কোন কসরৎ দেখান হইয়াছে এমন কবিতাই লওয়া হইয়াছে, তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচায়ক কবিতাগুলি স্থান পায় নাই।

তরুণ কবিদের অনেকগুলি কবিতাও কাব্য-সংগ্রহে দিবার উপযুক্ত হয় নাই, কয়েকটি কবিতার রুচিও ভাল নহে। বিদেশী ও স্বদেশী কবিদের অন্ধ ভাবানুকরণ ও ছন্দের মার-প্যাঁচ ছাড়া অনেক-গুলিতে কবিতা একেবারেই নাই। তবে যাঁহারা বীজ দেখিয়া বৃক্ষ কল্পনা

করিতে পারেন তাঁহারা হয়ত এইগুলিতেই এইসকল কবিদের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া লইবেন।

মোটের উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, এতগুলি পয়সা ব্যয় করিয়া এত সুবিধা লইয়া যেখানে কাজ হইয়াছে সেখানে একটুকু পরিশ্রম করিলেই এবং পাঁচজন রসজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ লইয়া কাজ করিলেই একখানি চমৎকার কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করা যাইত। এরূপ ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে প্রকাশিত গ্রন্থখানি সম্পাদকের অধিক নিন্দার কারণ হইবে। তবে তাঁহার চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। প্রকাশকের চেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার্হ।

ন

আরতি—শ্রী বিমলাচরণ মৈত্রেয়। ডি, এম্ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ১৬৮। ১৩৩৪।

বাঙলার সাহিত্যিক-মহলে শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ মৈত্রেয় সম্পূর্ণ অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি মাঝে মাঝে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কবি—তাহা আমাদের অজ্ঞাত ছিল। তাঁহার রচিত এই কাব্য-গ্রন্থ পাইয়া আমরা প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম—কিন্তু আমাদের বিস্ময় বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। 'আরতি'র কবিতাগুলি সুন্দর হইয়াছে এবং সেগুলি পাঠ করিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। এই কাব্যগ্রন্থ কবিকে চিরদিন কবি-মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে।

গ্রন্থখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

দরিদ্রের ক্রন্দন—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। দি বুক্ কোং, লিঃ ৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹। পৃঃ ৩৩২। ১৩৩৪। (২য় সং)

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে যখন এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখনই এই তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল।

বাঙলার পল্লীগুলি দিন দিন ধ্বংসের পথে যাইতেছে। পল্লীর উত্থান-পতনের উপর দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই গ্রন্থে লেখক পল্লীগুলির অবনতির পরিণাম, কৃষকগণের প্রকৃত অভাব-অভিযোগের কথা ও জগৎজোড়া শিল্প-বিপ্লব কি ভাবে আমাদের গ্রাম্য রীতিনীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিথিল করিয়া মজুরদের চারিত্রিক ও দৈহিক অনিষ্ট সাধন করিতেছে সেইসকল সমস্যার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা আশা করি পল্লীগঠন ও সংস্কার সম্বন্ধে যে আদর্শ এই পুস্তকে প্রচারিত হইয়াছে দেশের পল্লীসেবকগণ তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হইবেন। পুস্তকের ছাপা, বাঁধা ও প্রচ্ছদপটের চিত্র সুন্দর হইয়াছে।

ত্রিলোচন (উপন্যাস)—এস্, জি, মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক দি বুক্ কোং লিঃ, ৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

মজুমদার মহাশয় নূতন লেখক। কিন্তু এই বইখানিতে তাঁহার সুনিপুণ লিপি-চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়াছি। উপন্যাসের প্লটটি ভাল ও লেখকের বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। আমরা আশা করি, তাঁহার প্রথম গ্রন্থখানিই পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করিবে। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি চমৎকার হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

প্র



শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
ইনি আই,সি,এস্ পরীক্ষায় বাঙলা হইতে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হইয়াছেন

বিদ্যুৎ

শ্রী অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

খ-দ্যুতি, নভোদূত,
অপরূপ, অদ্ভুত
বিদ্যুৎ ঝিক্‌মিক্
চমকে ওই ;
হাওয়া ডাকে শন্‌শন্,
গুরু দেয়া গরজন,'
দিন হ'ল আঁধিয়ার,
পান্থ কই !
ক্রূর হাসি মুখে কা'র,
কা'র বাঁকা তলোয়ার,
কা'র বেঁধা বক্ষের
রক্তদাগ ;
কা'র পদনখ-রুচি,
কা'র মণিমালা শুচি,
কোন্ দূর দেবতার
বহ্নিযাগ !
ওকি সেই সবনাশা
বজ্রের আগ্‌ভাষা,
ধূর্জ্জটি-নয়নের
তীক্ষ্ণ শর ;
ওকি কাল আঁখি-কোণে
চেয়ে দেখা আন্ মনে
স্মরহর-সর্ম্মিত,
বিম্বাধর।

ক'ার চলা ওই পথে
দুর্গম পর্ব্বতে—
কোন্ দূর অজানার
অন্বেষণ ;
পুণ্যের ভোগ শেষে
ফিরে মর্ত্ত্যের দেশে
ধ্বজা তুলে যাত্রীকে
হর্ষমন !
ওকি আনে মেঘজল,
ওকি আনে ফুল ফল,
ওকি আনে সব-ভাঙা
ঝঞ্ঝা-রোল ;
ওকি আনে শ্যামলতা,
ওকি আনে কলকথা
ওকি আনে প্লাবনের
অশ্রু-দোল !
খ-দ্যুতি, নভোদূত,
অপরূপ, অদ্ভুত
বিদ্যুৎ ঝিক্ মিক্,
চমকে ওই ;
হাওয়া ডাকে শন্ শন্,
গুরু দেয়া গরজন,
দিন হল আঁধিয়ার,
পান্থ কই !

দারুশিল্প

শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বহু পাশ্চাত্য দেশে প্রবাদ আছে, যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু কুকুর; কেননা, আদিম অবস্থায় মনুষ্যের প্রধান সহায় ছিল ঐ জন্তুটি এবং এখনো মানুষের গৃহস্থালীর মধ্যে নিজগুণে স্থান পায় ঐ জীবটি। সেই মত বলা যায়, যে, সভ্যতার প্রধান সহায় কাষ্ঠ।

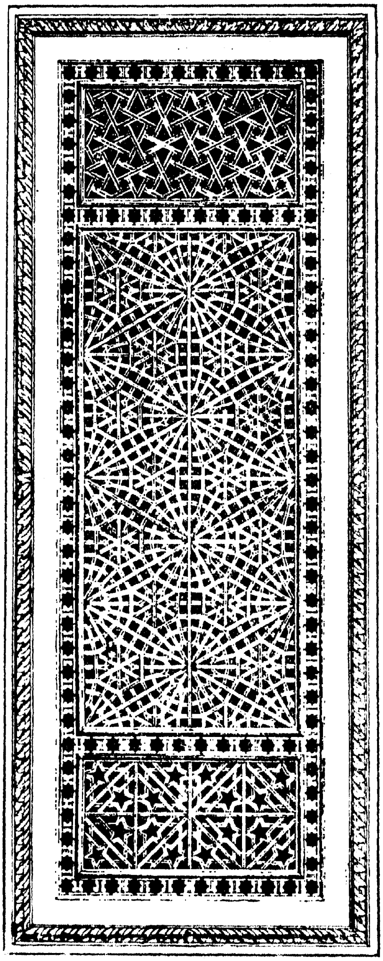


ত্রিবাঙ্কুড়ী চন্দন কাষ্ঠের বাক্সের ডালার উপর খোদাই

সভ্যতার আরম্ভ হয় অগ্নিপ্রজ্জ্বালনের সঙ্গে সঙ্গে। কবে, কখন, কে ইহা আবিষ্কার করে, তাহা জানা যায় নাই; কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই, যে, মনুষ্য-প্রজ্জ্বালিত অগ্নির প্রথম ইন্ধন ছিল কাষ্ঠ। এবং সেই সুদূর অতীতকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত মনুষ্য-জগতে নানারূপে কাষ্ঠের ব্যবহার প্রায় সমান ভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

কাষ্ঠের গুণাবলী অশেষ এবং তাহার ব্যবহারের ক্ষেত্রও অগণিত। একটি প্রবন্ধের মধ্যে তাহার এক শতাংশও বিবৃত করা যায় না। সুতরাং এখানে সে চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র ললিত শিল্পে তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিব।

মনুষ্যসমাজে যেমন রূপের বিচার হয় বর্ণ আকৃতি ও অঙ্গসৌষ্ঠব দ্বারা, দারুশিল্পে সেইরূপ কাষ্ঠের বিচারও



উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবের জালির (পিঁজরা) কাজ।
খোদাই নক্সা করা শিশু কাষ্ঠের ঝাঁপ (Movable Screen)

হয় বর্ণ আকৃতি—যথা স্বাভাবিক রেখাপাত বা আলেখ্য—ও গঠন দ্বারা।

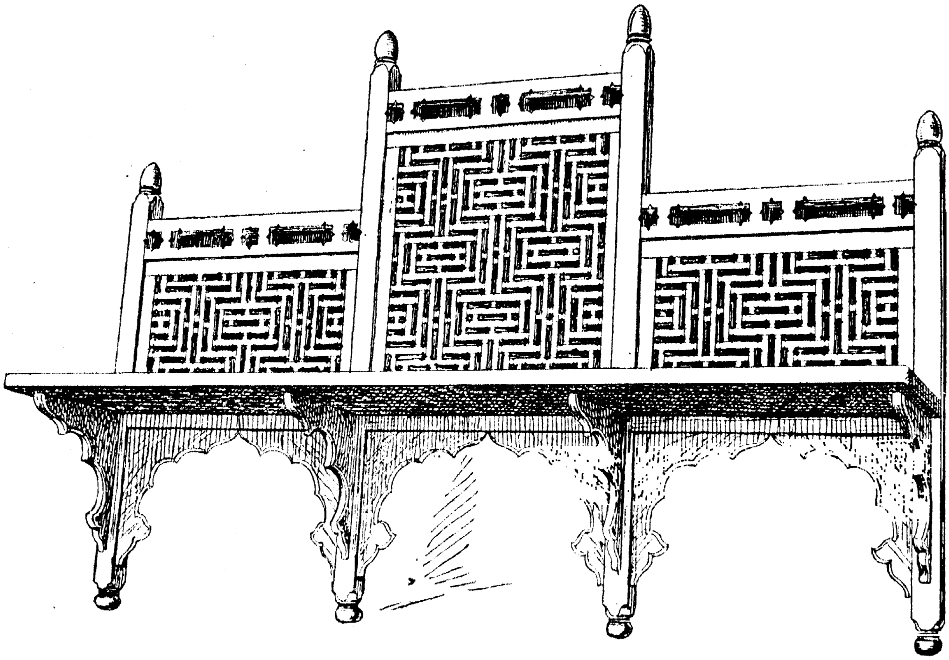
প্রশ্ন হইতে পারে, এস্থলে গঠন অর্থে কি বুঝায়। কাষ্ঠের অঙ্গ গাঁইট-, ফাটল-, বা ব্রণ-বিহীন, আঁশ সূক্ষ্ম, সকল অংশের গুরুত্ব সমান এবং গাত্র সহজে মসৃণ (পালিশ) হইলে, ইহাই উত্তম গঠনের লক্ষণ এবং প্রধানতঃ ইহার উপরই কাষ্ঠের কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। অবশ্য ইহা ভিন্ন অন্য অনেক গুণের জন্য বিভিন্ন প্রকার কাষ্ঠের আদর হয়; যথা স্থিতিস্থাপকত্বের জন্য বিলাতি অ্যাশ্, উইলো, হিকরি ইত্যাদি খেলার সরঞ্জামের (যথা ক্রিকেট, ব্যাট্) জন্য, সবদিকে সমানে ও সহজে কাটা যায় বলিয়া মুদ্রাঙ্কনের খোদাই (উড্‌কাট্) কার্য্যে বক্স কাষ্ঠ, সুগন্ধের জন্য চন্দন ও কর্পূর, ইত্যাদি।

যাহা হউক, সাধারণতঃ গৃহস্থালীতে ব্যবহার ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য যে সকল কাষ্ঠের ব্যবহার হয় এবং শিল্পীর কারুকৌশল যে প্রকার কাষ্ঠে সুন্দর ও স্থায়ী ভাবে প্রদর্শিত হয়, তাহার জন্য দৃঢ়, সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত, স্থায়ী (উই বা ঘুণ যাহাতে সহজে ধরে না), যাহা অত্যধিক কঠিন নহে (যাহাতে কর্ত্তন বা খোদাই বিশেষ শ্রমসাধ্য না হয়), যাহাতে স্ক্রু বা জোড় লাগাইলে ফাটিয়া যায় না, এইরূপ কাষ্ঠের আদর বেশী।

যে সকল কাষ্ঠের এই সকল রূপ ও গুণ আছে, সে সবই যে সাধারণের নিকট পরিচিত, তা নয়। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপ অনেক কাষ্ঠের ব্যবহার প্রচলিত। যথা, বৃহৎসংহিতা-লেখক নিম্নলিখিত কাষ্ঠের ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন :—

আসন	পিয়াশাল Pterocarpus Marsupium
স্পন্দন	Abies Pindrow (silver fir ?)
চন্দন	চন্দন Santalum Album
হরিদ্র	হলদু Adina Cordifolia ?
সুরদারু	দেবদারু Cedrus Lebani Deodara
তিন্দুকী	আবলুস্, তেন্দু Diospyros Ebenum
শাল	শাল Shorea Robusta
কাশ্মর্য্য	কাশ্মল ? Odina Wodier
অঞ্জন	অঞ্জন Hardiwickia Binata
পদ্মক	পদম, ধূপ Juniper Macropoda
শাক	সেগুন, টীক Tectona Grandes
শিংশপা	শীতসার, শিশু Dalbergia Latifolia and Dalbergia Sissoo

এই সকলের মধ্যে এখন প্রচলন আছে চন্দন, দেবদারু, আবলুস্, শাল (অল্প বিস্তর), সেগুন ও শিশুর। ইহার মধ্যে সেগুন ও শিশু কাষ্ঠই এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা



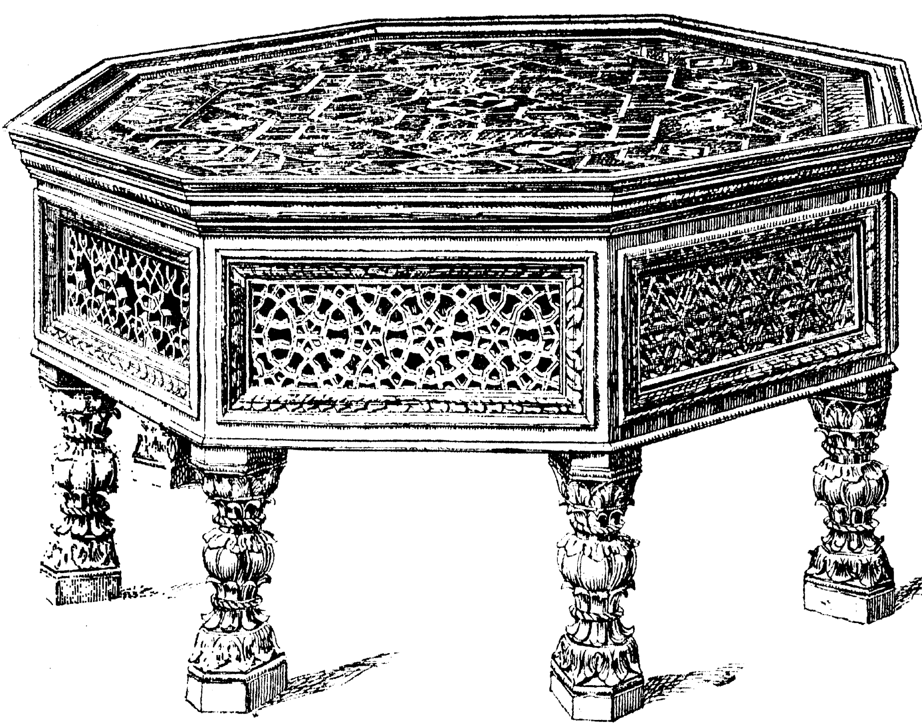
পঞ্জাবের "পিঁজরা" কাজের কুলুঙ্গী (Bracket)

অধিক ব্যবহৃত হয়। কেননা, এই দুইটি সর্ব্বপ্রকার শয্যাধার, আসন ও অন্যান্য কাষ্ঠদ্রব্যাদির উপযুক্ত, যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং ইহাতে কাজ করা সহজ।

আবলুস্, চন্দন, শীতসার (Rosewood বা Blackwood), আখরোট ইত্যাদি মূল্যবান কাষ্ঠ, সুতরাং সাধারণের পক্ষে এগুলির ব্যবহার সম্ভব নহে। আমাদের দেশে আরো কতকগুলি কাষ্ঠ আছে, যাহার আদর হওয়া উচিত কিন্তু লোকে তাহার গুণাবলি না জানায়, সেগুলির ব্যবহার যথেষ্ট হয় না; যথা গাম্ভার (Gmelina arborea), ভেরু (Chloroxylon Sweetania), শিরীষে (Albizzia Lebbek), পানিসাজ (Terminalia Myriocarpa) ইত্যাদি।

বিদেশী অনেক কাষ্ঠের যথেষ্ট সুনাম আছে; যথা মেহগ্‌নী, ওক্, বিভিন্ন প্রকার পাইন, বিলাতী আখরোট (Walnut) ইত্যাদি। তন্মধ্যে মেহগনী কাষ্ঠের খাতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং সেইজন্য এদেশেও লোকে মেহগনীর নামে অজ্ঞান হয়। অনেকেরই জানা নাই যে, মেহগ্‌নী দুই প্রকারের হয়; বেউড বা হণ্ডুরাস (Baywood বা Honduras Mahogany) এবং স্পানিশ্ (Spanish বা San Domingo Mahogany)। ইহার মধ্যে প্রথম প্রকারের কাষ্ঠ নামেই মেহগ্‌নী, আসল দাম বেশী নয়, এবং, এমন কোনও আশ্চর্য্য রূপ বা গুণও নাই যাহা অন্য সাধারণ আস্‌বাবী কাষ্ঠে নাই, আছে কেবল মাত্র নামের মোহ। স্পানিশ্ মেহগ্‌নী অতি সুন্দর এবং উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের এদেশীয় উৎকৃষ্ট শীতসার এবং শিশু উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভিন্ন কোন বিষয়েই নিকৃষ্ট নহে।

আরও আশ্চর্য্য এই, যে, আমাদের দেশী শীতসার (black wood) বিলাতে চালান যাইয়া বিলাতফেরৎ হইয়া যখন রোজউড্ (Rose wood) নামধারণ করেন, তখন সকল দেশেই তাহার স্থান মেহগ্‌নীর উপরে হইয়া থাকে।



পঞ্জাবী চৌকী। খোদাই, সংযোজন ও "পিঁজরা" জালির কাজ। শিশুকাষ্ঠ

যাহা হউক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, যে, প্রত্যেক রকমের দারুশিল্পের উপযোগী কাষ্ঠ আমাদের দেশেই পাওয়া যায়। না পাওয়া আশ্চর্য্য; কেননা, এদেশে, ইন্ধন ভিন্ন অন্য কাজের উপযোগী (অর্থাৎ কাষ্ঠ হিসাবে ব্যবহৃত) প্রায় ১৬০০ প্রকার বৃক্ষ আছে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ স্যার জে ডি হুকার বলিয়াছেন*, যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে উদ্ভিদ সম্পদে সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী।

দারুশিল্পের বিভিন্ন প্রণালী ও উপায়ের মধ্যে এই কয়টি প্রধান; যথা:—

১। বর্ণবিন্যাস—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম

২। উৎক্ষেপ বা ক্ষোদন (বাটালীর কাজ)

৩। কর্ত্তন, সংযোজন ও তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য ছুতার মিস্ত্রীর কার্য্য (cabinet-making)।

নিপুণ শিল্পী চিত্রে কাষ্ঠের দ্রব্যটির পরিকল্পনা করিলে ঐ উপায়গুলির দ্বারা তাহার নির্ম্মাণ সম্ভব হয়।

বর্ণবিন্যাস—স্বাভাবিক। এদেশে নানাবর্ণের কাষ্ঠ পাওয়া যায়, যাহাদের স্বাভাবিক সুন্দর রং আছে। সেই সকল কাষ্ঠ সুবিচার করিয়া সংযোজন করিলে বিচিত্র বর্ণবিন্যাস করা যায়। এইরূপ কয়েকটি কাষ্ঠের বর্ণনা নিম্নে লিখিত হইল।

শ্বেত—চন্দন, ডেরু (অতি উত্তম আস্‌বাবী কাষ্ঠ, মান্দ্রাজী), গাম্ভার (উত্তম আস্‌বাবী কাষ্ঠ), বুক।

পীত—হলদু, কাঁঠাল।

লোহিত ও রক্তাভ } রক্তচন্দন (মান্দ্রাজী), পাডৌক (আন্দামান ও ব্রহ্ম দেশস্থ) আন্দামানী পাডৌক অতি

* Sir J. D. Hooker, Flora of British India......... "perhaps the richest and certainly the most varied Botanical area on the surface of the globe."



আবলুস কাষ্ঠে হাতীর দাঁতের "বসান" (inlaid) কাজ (টেবিলের উপরিভাগ)। দেশী মুসলমানী নক্সা

উৎকৃষ্ট আসবাবী কাষ্ঠ), টুন (হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলের কাষ্ঠ)।

কৃষ্ণ—আবলুস।

পীতাভ পাটল—সেগুন, চাঁপা, জারুল।

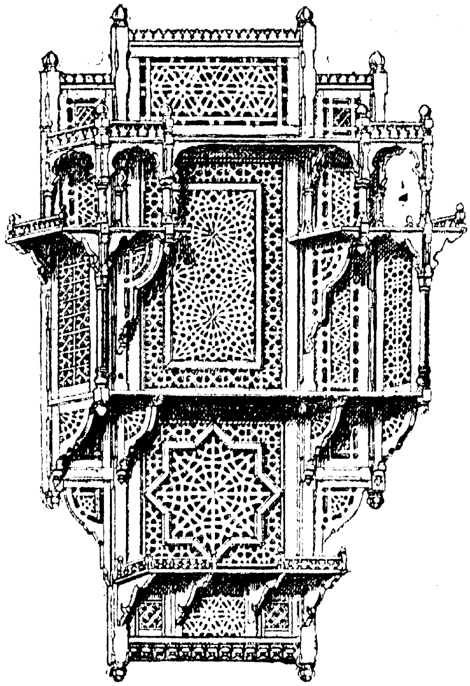
আখরোট বা খদিরবর্ণ—আখরোট (কাশ্মীর)।

কৃষ্ণাভ গাঢ় লোহিত—শিশু, শীতসার

গাঢ় বেগুনি—শীতসার (কাষ্ঠ অতি সুন্দর আলেখ্য-যুক্ত)

শ্বেত ও কৃষ্ণ বা পীত ও কৃষ্ণ মিশ্রিত—শিরীষ, আন্দামানের জেব্রা আবলুস।

কৃত্রিম উপায়ে যে কোন কাষ্ঠকে যে কোন বর্ণে রঞ্জিত করা যায়। তবে সে বর্ণ স্থায়ী হয় না এবং কাষ্ঠ-



পিঁজরা কাজের ব্রাকেট্‌

গাত্রের রেখাপাত ও আলেখ্য (grain and figuring) তাহাতে ঢাকা পড়ে বলিয়া অধিকাংশ স্থলে কৃত্রিমবর্ণ সৌন্দর্য্যের হানিই করে। ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠের সংযোজনে প্রস্তুত দ্রব্যের সৌন্দর্য্য স্থায়ী এবং সেগুলিতে কাষ্ঠগাত্রের শোভাহানি হয় না। তবে এইরূপ কাষ্ঠ সংযোজন বিশেষ সাবধানে করা কর্ত্তব্য, যাহাতে কঠিন ও নরম, শুষ্ক পরিপক (seasoned) ও কাঁচা কাষ্ঠ একসঙ্গে যুক্ত না হয়।

কাষ্ঠে খোদাই কাজ দারুশিল্পের একটি প্রধান অঙ্গ। খোদাই প্রায় সকল প্রকার আসবাবী কাষ্ঠেই চলে, কিন্তু আঁশ অত্যন্ত মিহি এবং সমান না হইলে বাটালী সকল দিকে সমান চলে না এবং কাষ্ঠ কঠিন না হইলে সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য বাটালীর কোপের সঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায়। বলা বাহুল্য, কাষ্ঠগাত্র নির্ম্মল এবং গাইট বা ফাটল শূন্য হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

খোদাই কার্য্যের যন্ত্রপাতির মধ্যে কয়েক প্রকার বাটালি, কম্পাস, কাঁটা ও শলাই প্রধান। এক ইঞ্চির ষোড়শ অংশ হইতে এক ইঞ্চি প্রমাণ চওড়া, সরল ও বক্র মুখের ১২ হইতে ৭০।৮০টি এই প্রকার বাটালি ও শলা এইরূপ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এদেশের কারিগররা ২০।২৫টিতেই কার্য্য চালাইয়া লয়।

বাটালীর কার্য্য সামান্য আঁচড় কাটা হইতে অতি গভীর, এমন কি সম্পূর্ণভাবে কাষ্ঠ ভেদ করিয়া জালির কাজ পর্য্যন্ত, সমস্তই একই প্রক্রিয়ায় হইয়া থাকে।

এই প্রকার কারু-কার্য্যে শিল্পীর হস্ত-কৌশল, পরি-কল্পনা এবং সামঞ্জস্য-জ্ঞান, তিনটি সমান থাকা উচিত। যথা, প্রশস্ত কাষ্ঠখণ্ডে স্থূল ও গভীর কার্য্য যেরূপ শোভন হয়, অল্প আয়তনের কাষ্ঠে সেরূপ হয় না। আবার সূক্ষ্ম কার্য্য বিশেষ সমীচীন ভাবে ও সামঞ্জস্য রাখিয়া না করিলে, তাহা পরিমাণে যতই অধিক হইবে, ততই সমস্ত কার্য্যটি জঙ্গল ঝোপের মত দেখাইবে।

পরিকল্পনায় রেখাপাত যতটা সম্ভব দৃঢ়, স্থূল ও ঋজু (firm and even) রাখা উচিত। "অষ্টাবক্র" রেখা-পাত কারুকার্য্যে পরিণত হইবার পর সুদৃশ্য না হইয়া চক্ষুর কষ্টদায়ক হওয়াই সম্ভব, যদিও ঐ প্রকার রেখা সমীচীন ভাবে সমান্তরালে স্থাপিত হইলে রেখাসমষ্টি সুদৃশ্য হইয়া থাকে।

প্রত্যেক দেশের শিল্পীর কোন না কোন প্রকার বিশেষ কাষ্ঠের উপর "টান" আছে। ইহার কারণ, যে শিল্পী যে কাষ্ঠের উপর কাজে অভ্যস্ত, অন্য প্রকার কাষ্ঠ তাহা অপেক্ষা অধিক কঠিন বা নরম হওয়ায়, সে বাটালির চাপের আন্দাজ পায় না, সুতরাং প্রতি কোপে তাহার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এদেশে কাশ্মীরী কারিগর আখরোট কাষ্ঠে, সাহারানপুর, পঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ ও বোম্বাইয়ের শিল্পী শিশু বা শীতসারে, দক্ষিণ মান্দ্রাজ মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুড়ের শিল্পী চন্দন কাষ্ঠে কাজ করা ভাল মনে করে। ব্রহ্মদেশে সেগুন আবলুস্‌ থিট্‌ মিন ইত্যাদি ও সিংহলে আবলুসের চলন আছে।*

বিদেশে ওকের, বিশেষ বিলাতী ওকের, প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা

* আধুনিক "শিক্ষিত" সমাজে (কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি সহরে) সেগুন ও মেহগনী এই দুইটি মাত্র প্রচলিত। তাহার কারণ ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের বুদ্ধি বিবেচনায় এই দুইটি কাষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।

অধিক। তাহার পরে আখরোট্, মেহগ্নী, সিকামোর, ও সস্তার কাজে পীত পাইনের ব্যবহার প্রচলিত।

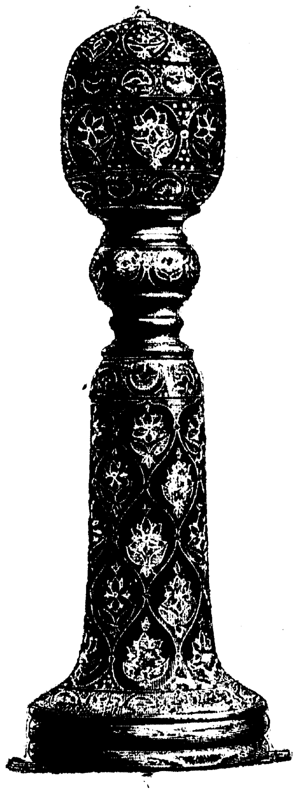
খোদাইয়ের কাজ পালিশ করা উচিত নহে। ইহাতে সূক্ষ্ম শলাকার ও বাটালীর কার্য্যের সৌন্দর্য্যহানি হওয়া সম্ভব। সকল দেশেই এই প্রকার কার্য্যে বিশেষ নক্সা ও ক্ষোদনের রীতি প্রচলিত আছে; যথা, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরল জ্যামিতির রেখাপাতে "পিঞ্জরা" কাজ। এই সকল রীতি প্রধানতঃ সে-দেশের প্রস্তর-ভাস্কর্য্যের প্রথার উপর নির্ভর করে।

সর্ব্বশেষে আস্বাবী ও সাধারণ কর্ত্তন সংযোজনের ব্যাপার (ছুতারের কাজ)। আস্বাবের পরিকল্পনায় সরল রেখা ও সমতল গাত্রের সন্নিবেশ যত বেশী হয়, ততই জিনিষটি দেখিতে সুন্দর হয়। বক্র রেখা বা ঢালু গাত্রের পরিকল্পনায় সামঞ্জস্য ও অনুপাত রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বিশেষ নিপুণ শিল্পী ও বিশেষ দক্ষ কারিগর ভিন্ন অন্ত কাহারো পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। এদেশে অনেক আধুনিক আস্বাব বিলাতী চিপেনডেল ধাঁচে তৈরী করার চেষ্টা হয়। ফলে "মাকড়সার ঠ্যাং" জাতীয় অপূর্ব্ব দোআঁশলা জিনিষের সৃষ্টি হইয়া যায়।

এ দেশে প্রাচীনকালে আস্বাব পত্রের বিশেষ ব্যবহার ছিল না। খাট পালঙ্ক ও পিঁড়া চৌকি বাদে ছিল কেবলমাত্র রাজাদের সিংহাসন। কিন্তু ঐরূপ যে সকল প্রাচীন জিনিষের আকার আমরা প্রাচীন চিত্রে বা মন্দির-গুহা ইত্যাদির ভাস্কর্য্য শিল্পে দেখিতে পাই, সে সকলে সরল ঋজু দৃঢ় রেখার সন্নিবেশের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কার হিসাবে বক্র বা তির্য্যক্ রেখার মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আস্বাব-পত্রে অলঙ্কার হিসাবে খোদাই ইত্যাদি কারুকার্য্য অতি সংযমের সহিত করা উচিত। চারিহাত উচ্চ ও দুইহাত চওড়া আলমারিতে একহাত কার্ণিস ও আদ্যোপান্ত খোদাইয়ের কাজ থাকিলে আলমারীটি "দামী" হইতে পারে, কিন্তু কোন কোন প্রদেশের সালঙ্কৃতা মহিলার মত তাহাও চক্ষুশূল বিশেষ মাত্র।

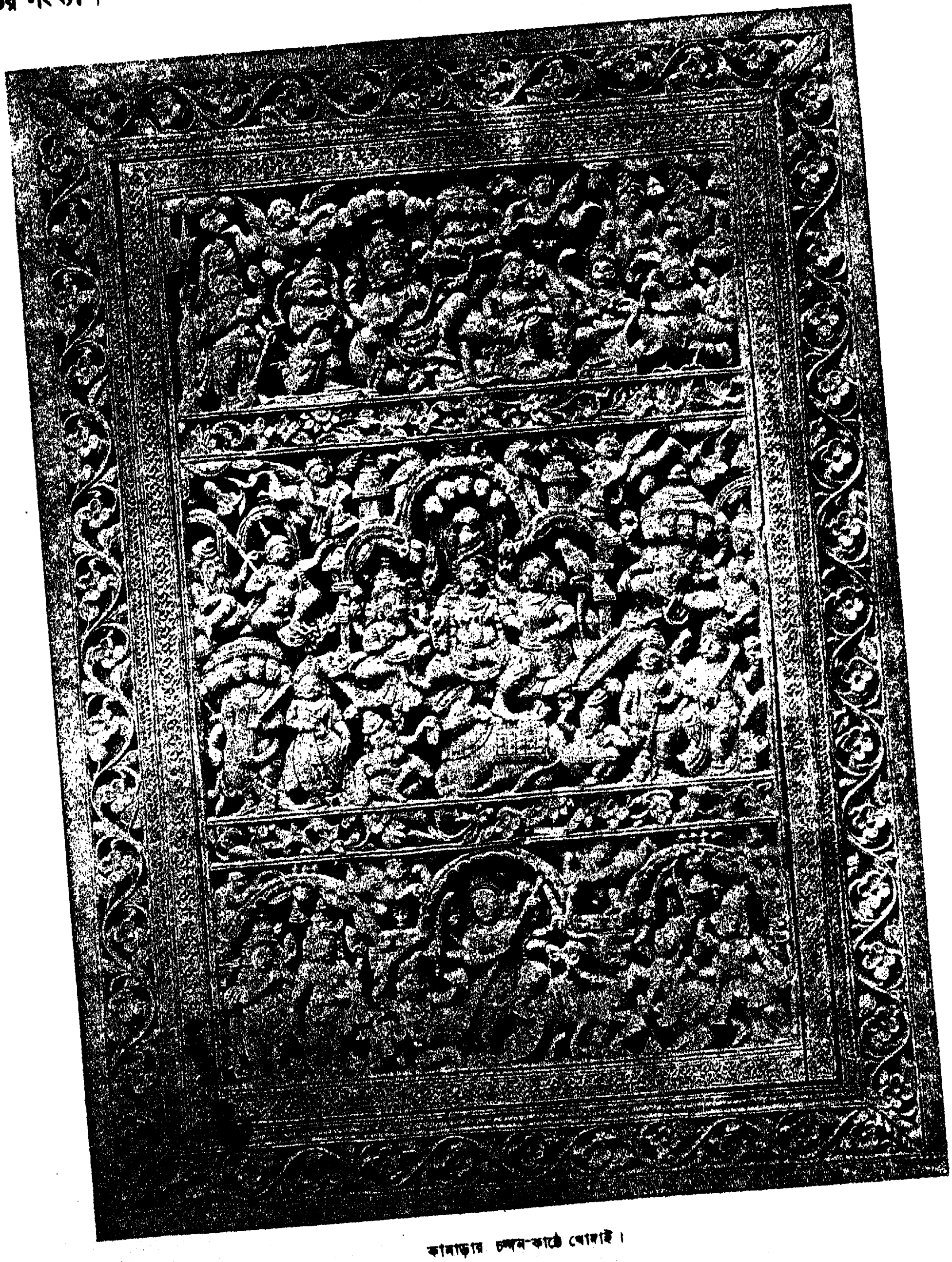
গৃহসজ্জায় রুচির মূল্য অনেক। দুঃখের বিষয় অনেকের ধারণা রুচির অর্থ 'অর্থব্যয়" এবং "সাহেবী দোকান"। এখানকার অধিকাংশ সাহেবী ফ্যাশানের আস্বাব, এদেশের বা বিদেশের, কোনখানেরই রুচি-সঙ্গত নহে। বিশেষে অনেকগুলি আসবাবের দ্বারা গৃহসজ্জা হয়। সেগুলির পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য ও সমতা থাকা উচিত। অল্প জিনিষে —সুদৃশ্য ও সুরুচি সঙ্গত হইলে—গৃহের যা শোভা হয়, গৃহকে আসবাবের দোকানে পরিণত করিলে তাহা সম্ভব নহে।



লাক্ষালেপন দ্বারা কৃত্রিম বর্ণেচিত্রিত (lacquered) পালঙ্কের পায়া। মান্দ্রাজী

কাষ্ঠের উপর বিশেষ প্রকার তৈলবর্ণের সাহায্যে চিত্রাঙ্কনের (lacquering) কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

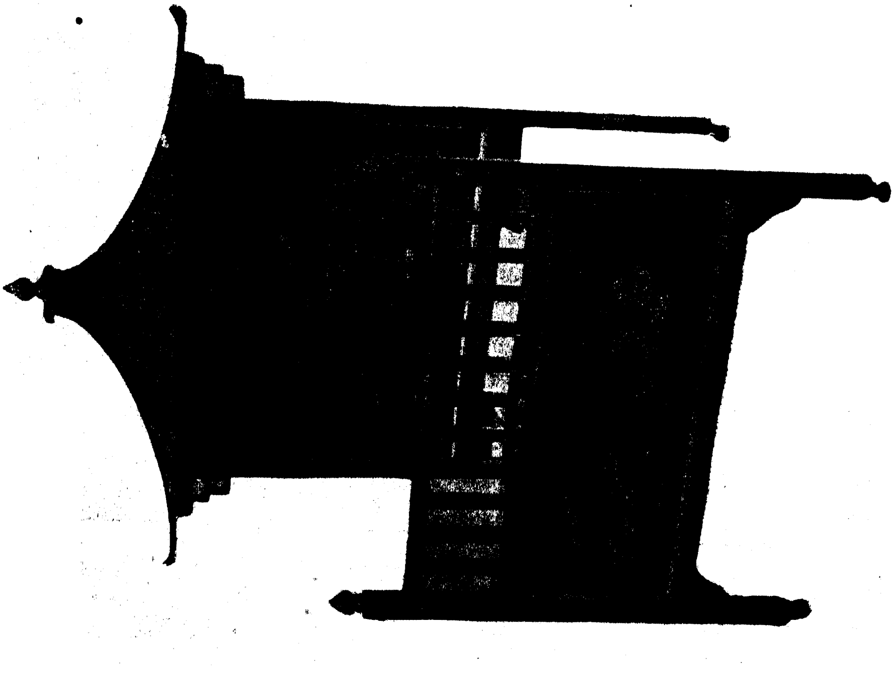
জাপান, চীন ইত্যাদি মঙ্গোলীয় দেশে এবং আমাদের দেশেও কাষ্ঠের গাত্র প্রথমে কোন এক প্রকার বর্ণের "জমী" দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহার উপর বিভিন্ন বর্ণে তুলির সাহায্যে চিত্রাঙ্কনের প্রথা আছে। চিত্রটি অঙ্কিত হইবার পর আর এক পর্দ্দা স্বচ্ছ তৈল পালিশ দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া দিতে হয়। এই প্রকার



কানাড়ায় চন্দন-কাষ্ঠে খোদাই।



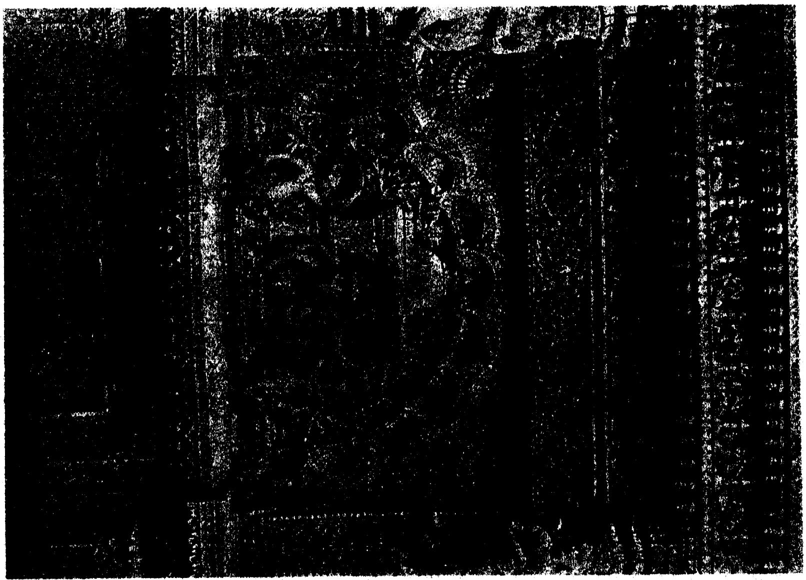
শীতলপার কাঠে খোদাই। আহমেদাবাদ। ঝাঁপের অংশ (Movable Screen)



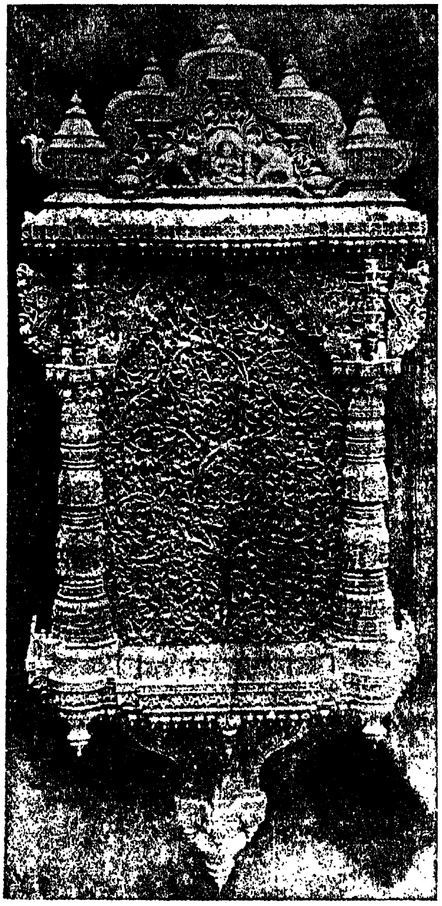
পালঙ্ক। জাপানী পরিকল্পনা ও কৃত্রিম বর্ণে চিত্রাঙ্কন
(Japanese lacquer work bedstead)



আধুনিক জার্ম্মানীর আসবাব্‌-পরিকল্পনা। বইয়ের আলমারী, লিখিবার টেবিল, চেয়ার ও আরামচেয়ার। ঘরের একপাশে সমস্ত সাজান।



শীতসার কাঠে খোদাই। আহমেদাবাদ। ঝাঁপের অংশ (Movable Screen)

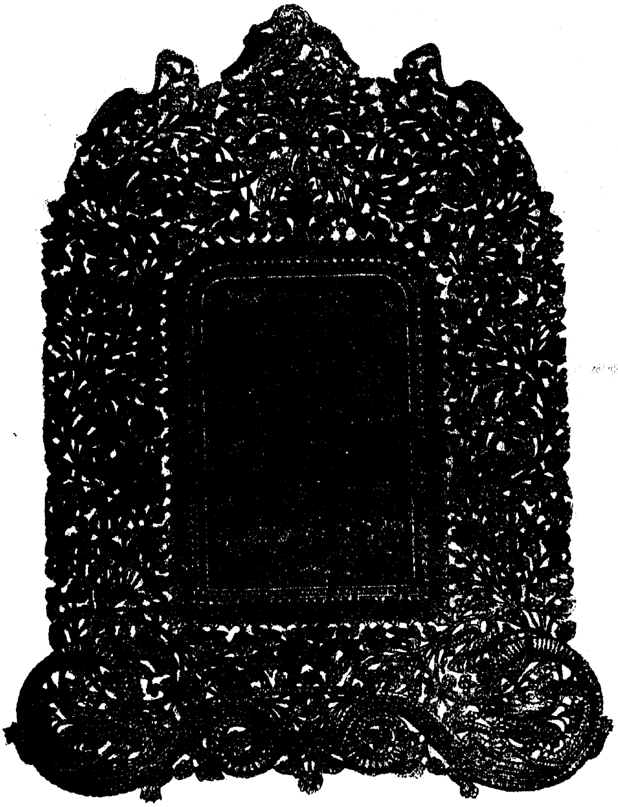


দেয়ালের কুলুঙ্গী। আহমেদাবাদী শীতসার কাঠে খোদাই।
বক্ররেখা-সন্নিবেশ।





ব্রহ্মদেশের টীক কাঠে খোদাই। যুদ্ধ-অভিযান।



আহমেদাবাদী ছবির ফ্রেম। শীতসার কাঠে বক্ররেখা জালীর কাজ

চিত্রাঙ্কনের অনেক ভিন্ন উপায় আছে। সে সকল এস্থলে বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

এদেশের ঐ প্রকার চিত্রণ স্থায়ী নহে এবং অধিকাংশ স্থলে চিত্রের পরিকল্পনাও বিশেষ সরল নহে। কেবলমাত্র বর্ণসমাবেশ হিসাবে সেগুলি অতি সুন্দর। কাশীর কাঠের খেলনা এই প্রকার কার্য্যের নিকৃষ্ট উদাহরণ।

এই সকল উপরোক্ত প্রথা, যাহার অধিকাংশ এখনো এদেশে প্রচলিত আছে, তাহার সন্নিবেশে নিপুণ শিল্পী অনেক সুন্দর আস্‌বাবের পরিকল্পনা করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় দক্ষ কারিগরের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। তাহার কারণ এদেশে তাহাদের আদর নাই। বিদেশে যথেষ্ট আছে, কিন্তু যাহাদের মারফৎ এই দেশের কারিগরের দ্রব্যাদি বিদেশে পৌঁছায়, তাহারাই সমস্ত লাভ গ্রহণ করে। কারিগরের অবস্থা পূর্ব্ববৎ অন্নাভাবক্লিষ্টই থাকে।

এ দেশের রাজা রাজড়া জমীদারবর্গ অনেক অর্থব্যয় করিয়া যেরূপ আস্‌বাব দ্বারা প্রাসাদ বা গৃহ সজ্জিত করেন, বিদেশী সমঝদার ব্যক্তিদের নিকট তাহা হাস্যকর ও আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন প্রথমে হীরক আবিষ্কৃত হয়, তখন সে দেশস্থ আদিম কাফ্রীগণ পুরানো হ্যাট, ছিন্ন কোট ও টাই ইত্যাদির বদলে বহুমূল্য হীরক দিত। তাহাদের নিকট ছিন্ন জীর্ণ বিদেশী বস্তু স্বদেশী হীরক অপেক্ষা অধিক মূল্যবান মনে হইত।

আমাদের দেশে ঐরূপ বুদ্ধিযুক্ত অর্থশালী লোকের অভাব নাই।

পক্কশস্য

চীনের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক নেতৃবৃন্দ—

ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর চীন মহাদেশে অনেক শক্তিশালী পুরুষ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জীবনই অনুধাবনযোগ্য। গতবারের পক্কশস্যে আমরা দুই একজনের আংশিক পরিচয় দিয়াছি। ডাঃ সেনের সুযোগ্য পত্নী ও তাঁহার পুত্র



সেনাধ্যক্ষ—ফেং য়ুশিয়াং

সান্ ফুর প্রভাব চীনে এখন খুব বেশী। অন্যান্য নেতার মধ্যে সৈন্যাধ্যক্ষ চিয়াং কাইশেক, মার্শাল ফেং য়ুশিয়াং ও পররাষ্ট্রসচিব ইউজিন চেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা তিনজনেই জাতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। চীনের ইতিহাসে ইঁহাদের নাম চিরদিন অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিবে। চ্যাং সোলিন ও য়ুফু—ইঁহারাও শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়ক হইলেও দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ স্ব স্ব প্রভুত্বের জন্য চেষ্টিত হইতেছেন। ইহাতে তাঁহারা দেশের শত্রু হইয়া পড়িয়াছেন।

ফেং য়ুশিয়াং—জাতীয় সৈন্যদলের সৈন্যাধ্যক্ষ, একজন অতি দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ পুরুষ। তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার প্রাণ নিয়ত উন্মুখ, তিনি অতি দরিদ্রের মত বাস করেন। তিনি বলেন—চীনে সর্ব্বপ্রধান আবশ্যক সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, লিখিতে পড়িতে পারে না এমন একজনও যাহাতে দেশে না থাকিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি কেবলমাত্র



চিয়াং কাইশেক



ইউজিন চেন

কৃষক সম্প্রদায় হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন, পূর্ব্ব প্রথায় শিক্ষিত সৈন্যদের তিনি আমল দেন না।

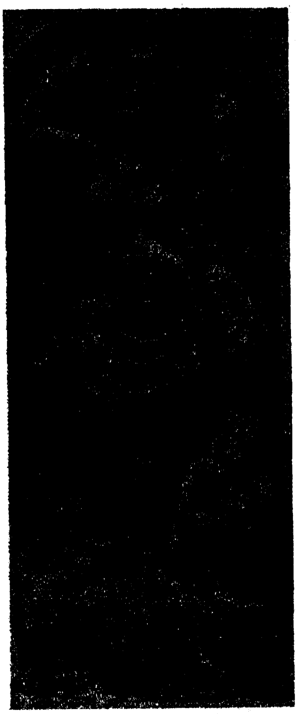
চিয়াং কাইশেক—এই মহাশক্তিশালী সৈন্যাধ্যক্ষকে দেখিলেই চীনের সৌভাগ্য-সূর্য্য যে উদিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে সরল প্রকৃতির লোক, তাঁহার মুখখানি সদাহাস্যময়, অথচ এই লোকই কর্ত্তব্য-কার্য্যে কিরূপ অবিচলিত ও কঠোর, দেখিলে অবাক হইতে হয়।

ইউজিন চেন—পররাষ্ট্র-সচিব। ইনি পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নির্ভীক মহাপুরুষ। চীনার বৈদেশিক রাষ্ট্রতন্ত্র ইনি আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন।

—

দুর্গা—

বৈদিক উপাখ্যানে উষা, সরস্বতী প্রভৃতি দুই একটি ব্যতীত নারী-দেবতাদের সহিত আমাদের বিশেষ সাক্ষাৎ ঘটে না। তবে মাঝে মাঝে ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণী—এই ধরণের সাধারণ উল্লেখ আছে। কিন্তু তৎকালীন বহু প্রচলিত অনার্য্য-তন্ত্রে দেবীদেরই অত্যন্ত প্রাধান্য দেখা যায়। পুরুষ দেবতাদের অপেক্ষা তাহারা সংখ্যায় বেশী। বর্ত্তমান যুগের হিন্দু-ধর্ম্ম অনেকটা এই অনার্য্য ধর্ম্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত। আদিম যুগে এই সকল অনার্য্য দেবীদের সত্তা ও ক্ষমতা কিরূপ ছিল তাহা আমরা সঠিক অবগত নহি, তবে সাধারণতঃ বলা যায় যে ওই সকল দেবীর অধিকাংশই ভীষণা. এই সকল ভয়ঙ্করী দেবীরাই ক্রমবিবর্ত্তনে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে একটি প্রবল বলশালী দেবীরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে; তিনি স্বতই শক্তি-রূপিনী অথবা পুরুষদেবতাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন। ইনিই এক আদ্যাশক্তিরূপে পরিকল্পিত এবং কল্পে কল্পে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হন। ইঁহার উপাসকেরা শাক্ত নামে অভিহিত। তান্ত্রিক ধর্ম্মও এই মহাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর সকল কর্ম্মের, সকল বিকাশ ও প্রকাশের মূলে ইনি। দেবতাদের মধ্যে শিবের সহিত ইঁহাকে স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে যুক্ত করা হইয়াছে। দেবতাদের ও মানবের মুক্তির নিমিত্ত ইঁহাকে মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হইতে হয়। 'শক্তি'র এই সকল লীলা বহু হিন্দু পুরাণের বিষয়। দুর্গতি হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া ইনি দুর্গা।



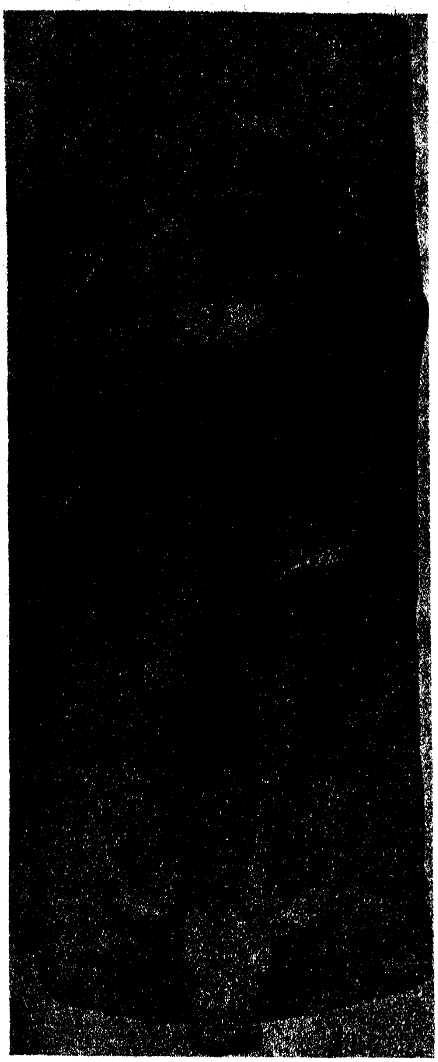
মহিষ-মর্দ্দিনী. জাভা, ১৩শ শতাব্দী

শক্তি ও দুর্গা ব্যতীত অন্যান্য নামেও ইনি সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন। চণ্ডিকা. চণ্ডী, কাত্যায়নী. কালী, মহাকালী, করালবদনী প্রভৃতি ইঁহারই নাম। কালী অন্ধকারের দেবতা হইলেও আদি জননী।

দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করিয়া মহিষমর্দ্দিনী বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার যে রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে এইখানে প্রকাশিত ছবিগুলি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। এটি একটি প্রস্তর মূর্ত্তির ছবি, সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিটি জাভাতে পাওয়া গিয়াছিল এবং সম্প্রতি বিখ্যাত মিঃ রস কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া বোষ্টান যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। বহুহস্তা দেবী মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ নিরতা। দেবী মহিষের মস্তক কাটিয়া ফেলিলে অসুর নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া লড়িতেছে। ইহাই হইল মূর্ত্তির বিষয়।

রস সাহেব আরো একটি মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা মূর্ত্তি বোষ্টানের যাদুঘরে উপহার দিয়াছেন। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। মূর্ত্তিটির প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ ভারতবর্ষ। সেই মূর্ত্তিটির ছবিও এখানে দেওয়া হইল।

এই মূর্ত্তিটি কালো ও কর্কশ বালুপ্রস্তরে নির্ম্মিত। স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে; একটি বাহু নাই। দেবী অষ্টবাহু ও কর্ত্তিত মহিষমুণ্ডের



দুর্গা, দাক্ষিণাত্য, ৭ম শতাব্দী

উপর দণ্ডায়মানা। একটি বাহুতে অভয়হস্ত মুদ্রা, অন্য একটিতে তর্জ্জনী মুদ্রা। অন্যান্য হাতে, খড়্গ, তীর, চক্র, ত্রিশূল, খেটক শঙ্খ ও ধনু বিধৃত। দুই স্কন্ধেই তূণ। মস্তকে মুকুট, হস্তে কঙ্কণ, বক্ষে কাঁচুলি ও পরনে ধুতি। এই বৃহৎ মূর্ত্তিটির ভাস্কর্য্য-শিল্প অতীব মনোহর এবং বোষ্টোন যাদুঘরে এই মূর্ত্তিটিই ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

—

বিখ্যাত চীনা অভিনেতা—

চীনের রাষ্ট্রীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদিতেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শিল্পকলা ও নাট্য-জগতের পরিবর্ত্তনও বিশেষ আশ্চর্য্য-জনক। চীনা অভিনয় চীনে যথেষ্ট সমাদৃত হইলেও এতদিন বাহিরের লোকে ইহার তেমন প্রশংসা করিত না। সম্প্রতি



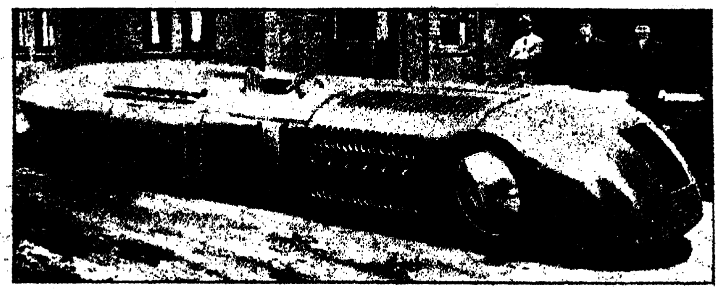
চীনা অভিনেতা মি ল্যাং ফ্যাং

পিকিংয়ে একজন এমনি প্রতিভাবান অভিনেতার আবির্ভাব হইয়াছে যে পাশ্চাত্য জগৎও চীনের অভিনয় সম্বন্ধে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। ইঁহার নাম মি ল্যাং ফ্যাং। অভিনয় করিয়া সম্ভবতঃ ইনিই পৃথিবীর সবচাইতে বেশী উপার্জ্জন করেন। সম্প্রতি ইনি আমেরিকায় নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

—

জগতের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মোটরগাড়ী ও তাহার চালক—

পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত ছবিতে পৃথিবীর মধ্যে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মোটরকার ও তাহার চালকের ছবি দেওয়া হইল। মোটরখানি 'সিঙ্গি সান্‌বিম' জাতীয়। চালকের নাম মেজর এইচ, ও, ডি, সিগ্রেভ। ইনি ঘণ্টায় ২০৩ মাইল বেগে এই গাড়ীখানি চালাইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে

দ্রুততম মোটরগাড়ী ও তাহার চালক

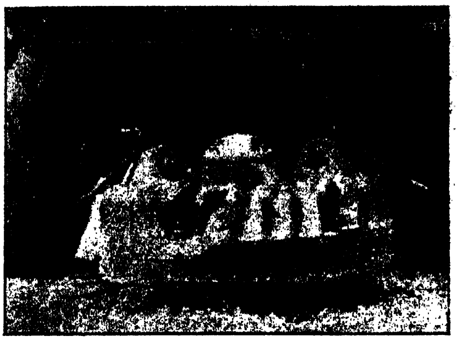
দ্রুততম মোটরগাড়ী ঘণ্টায় ১৫৬ মাইলের অধিক বেগে দৌড়াইতে পারে নাই। আমরা নিম্নে সকল প্রকার যন্ত্রযান ও প্রাণীর দ্রুত দৌড়ের যে রেকর্ড আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার তালিকা উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে মেজর সিগ্রেভ কি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। ইহা সমগ্র জগতের রেকর্ড, কোন বিশেষ প্রদেশের মাত্র নহে।

যন্ত্র বা প্রাণী	চালক	কোন দেশীয়	গতিবেগ
১। বিমান পোত	বন্নেট	ফ্রান্স	ঘণ্টায় ২৭৮'৫ মাইল
২। মোটর কার	মেজর সিগ্রেভ	... ...	,, ২০৩'৭৯ মাইল
৩। রেল গাড়ী	... ...	ফ্লোরিডা	,, ১২০ মাইল
৪। মোটর নৌকা	... ...	ইংলণ্ড	,, ৮০ মাইল
	... ...		
৫। জাহাজ ইউ, এস, এস, কোলে	... ...	... ...	,, ৪৩'৭৫ মাইল
৬। ঘোড়া	রোমার	আমেরিকা	১ মিনিট ৩৪ চারের পাঁচ সেকেণ্ডে এক মাইল
৭। মানুষ	পি নুর্ম্মি	ফিনল্যাণ্ড	৪ মিনিট ১০'৪ সেকেণ্ডে এক মাইল

—

অভিনব উপায়ে রাস্তা পরিষ্কার—

বড় বড় সহরের প্রত্যেক রাস্তায় প্রায়ই ঘোড়ার নাল, পেরেক ইত্যাদি নানাপ্রকারের লৌহখণ্ড পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, খালি পায়ে যাহারা পথ চলে তাহাদের পক্ষে এবং মোটর গাড়ীর চাকার পক্ষে এইগুলি অনেক সময় মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। এই আপদ দূর করিবার জন্য নেভাদার একজন বৈজ্ঞানিক এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। একটি বৃহৎ কাঁচা লৌহকে (Soft Iron) চাকার উপর বসাইয়া ও বিদ্যুৎ সংযুক্ত করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। বিদ্যুৎসংযোগে লৌহখণ্ডটি একটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয় এবং ছোটবড় সকলপ্রকারের লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া লয়। এই যন্ত্রদ্বারা শুধু যে পথের



পথ-পরিষ্কারক যন্ত্র

বিপদই দূর হইয়াছে তাহা নহে; সংগৃহীত লৌহখণ্ডগুলি নানাভাবে ব্যবহৃত হওয়াতে আয়ও দাঁড়াইতেছে।

—

আমরা কাঁদি কেন—

লস এঞ্জেলসের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সেসিল ই রেনল্ডস্ মানুষের কান্না সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ আধুনিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

কান্না জিনিষটা প্রাণীজগতের আত্মপরায়ণতার পরিচায়ক; হাসি মনুষ্যহৃদয়ের সামাজিকতা ও পরপরায়ণতা সূচনা করে অর্থাৎ আমরা নিজের জন্য কাঁদি ও পরের জন্য হাসি। নবজাত শিশু সংসারে অবতীর্ণ হইয়াই ক্রন্দন করে বলিয়া মনে হয়। চীৎকার করিয়া না কাঁদিলেই সকল শিশুই যে কাঁদিবার মত দুঃখের ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে সকল ক্ষেত্রেই আমরা তাহা দেখিয়াছি। মাতৃগর্ভের অন্ধকার হইতে বাহিরের জগতের সূর্য্যালোক ও দীপালোক চোখেমুখে পড়িয়া তাহাকে প্রথমটা পীড়া দেয় এবং তাহার প্রথম প্রকাশ হয় মুখমাংস ও পেশীর সঙ্কোচনে, ইহাকেই আমরা কান্না নামে অভিহিত করিয়া থাকি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুরা সশব্দে ক্রন্দন করে। শিশু মানবের প্রথম ভাষার স্ফুরণ এই বিরক্তি জ্ঞাপন করে। এই চীৎকার



কান্নার ছবি

কান্না নহে, কান্নার প্রকাশ মুখমাংসের সঙ্কোচন বিকোচনে। আলোক-রশ্মি হইতে চক্ষুকে বাঁচাইতে গিয়া শিশুর মুখে এই ভাব ফুটিয়া উঠে এবং সাধারণ মুখভাবের এই বিকৃতিতেই চক্ষে অশ্রু উদ্গত হয়।

বস্তুতঃ কান্না হইতেছে মানুষের অসহায় অবস্থাজ্ঞাপক। পূর্ব্বে আমরা অশ্রুকে ক্লান্তি বা অবসাদের ফল বলিয়া মনে করিতাম কিন্তু বহু গবেষণা করিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি যে উহার সহিত মনের বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। মুখের মাংস ও পেশীর সঙ্কুচনের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু আপনিই আসিয়া থাকে। একটু অল্প আয়াসেই যে কেহ চক্ষে জল আনিতে পারে।

দুইটি শিশুর কান্নার ছবি এখানে দেওয়া হইল। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে দুইটি মুখে প্রায় একই প্রকার সঙ্কোচন বিকোচন হইয়াছে।

—

নিউইয়র্কে চীনা-শোভাযাত্রা—

চীনের জাতীয় জাগরণ যে আরম্ভ হইয়াছে তাহার একমাত্র প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র, কি স্বদেশে, কি বিদেশে সকল চীনবাসীর মনে স্বদেশের স্বাধীনতার এক বিরাট স্বপ্ন জাগিয়াছে। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক চীনদেশীয় সকল লোকেরই এখন একমন একপ্রাণ। চীনের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তাহার প্রমাণ এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রকৌশল চীনে টিকিল না। জাপানেও এককালে চীনের মত বৈদেশিক প্রভাব বিরাজ করিত কিন্তু যেদিন বৈদেশিক প্রভুরা বুঝিতে পারিল যে জাপানে এক সর্ব্বব্যাপী জাতীয়তার উদ্বোধন হইয়াছে তখন শুধুমাত্র কায়িক শক্তি দেখিয়াই নহে, জাপানের মনের সেই একাগ্রতা দেখিয়াই বৈদেশিক শক্তিরা একে একে সরিয়া পড়িল। চীনেও সেই মানসিক শক্তি জাগিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের অনেক জাতিই চীনকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহার অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। নিউইয়র্কের প্রবাসী চীনারা একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়া চীনের স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের ঐকান্তিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বহু আমেরিকান এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া চীনের এই জাগরণকে সম্মান করিয়াছেন। 'চীন—চীনবাসীদের জন্য' একথা তাঁহারা বলাবলি করিতেছেন, ভারতবর্ষ কবে ভারতবাসীর হইবে আমরা ব্যথিত হইয়া তাহাই ভাবিতেছি।



নিউইয়র্কে চীনা শোভাযাত্রা

—

ইতালীর জননায়ক মুসোলিনী—

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বেনিতো মুসোলিনীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন সাধারণ কামার ছিলেন এবং মুসোলিনীকে অত্যন্ত কড়া-শাসনে রাখিতেন। তিনি যখন রক্তোত্তপ্ত লৌহখণ্ডে হাতুড়ির ঘা মারিতেন ও আগুনের ফুলকি চারিদিকে ছুটিতে থাকিত তখন বালক মুসোলিনীর ভয়ে চোখ বুজিবার বা অন্যদিকে চাহিবার জো ছিল না। এক দৃষ্টে সেই জলন্ত আগুনের দিকে তাঁহাকে চাহিয়া থাকিতে হইত।



মুসোলিনী-জায়া

এই ভাবে তাহার 'ডিসিপ্লিন' সুরু হয়। পিতার কড়া শাসন সত্ত্বেও বালক মুসোলিনী অত্যন্ত দুষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। তাঁহার অত্যাচারে তাঁহার সহাধ্যায়ীরা উত্যক্ত হইয়া উঠিত। তাঁহার মা ছিলেন গ্রামের পাঠশালার শিক্ষয়িত্রী, তাঁহার নিকটেই মুসোলিনীর শিক্ষার পত্তন হয়। তিনি বহু কষ্টে তাঁহার দুষ্ট সন্তানটিকে সামলাইয়া চলিতেন। সেই শিশু বয়স হইতে তাঁহার দৃষ্টিতে এমন একটা ভয়ঙ্কর একাগ্রতা ও কঠোরতা ফুটিয়া উঠিত যে তাঁহার কোন কাজে বাধা দেওয়া সম্ভবপর ছিল না।

পিতার কামার-শালায় শিক্ষা-নবিশী করিয়া তিনি যন্ত্রের শক্তিতে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। যন্ত্র ও বুদ্ধি-কৌশলে প্রকৃতিকে শাসন করিবার একটা মোহ শৈশব হইতেই তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। শৈশবের কঠোর শিক্ষা ও একাগ্রতা তাঁহাকে ভবিষ্যৎ জীবনে এমন নির্ভীক ও শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মৃত্যুভয় কাহাকে বলে মুসোলিনী তাহা জানেন না।

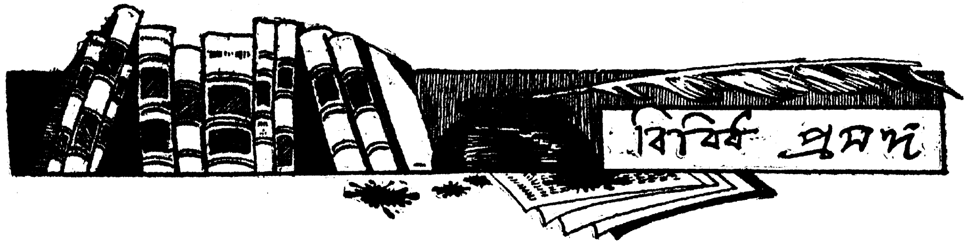
ছবিতে আমরা সাধারণতঃ মুসোলিনীর যে কঠোর মুখ দেখিয়া থাকি সাধারণ অবস্থায় তাঁহার মুখখানি একেবারেই সেইরূপ নহে। তিনি ফটোতে নিজের মুখখানি কঠোর করিয়া তুলিতে ভালবাসেন। সহজ অবস্থায় তাঁহার মুখে একটা নারীসুলভ কমনীয়তা সর্ব্বদা বিরাজ করে; তাঁহার চক্ষু স্বপ্নময়, দৃষ্টি গভীর, আকৃতি হ্রস্ব। বক্তৃতা দিবার সময় তাঁহার দৃষ্টি উগ্র হইয়া উঠে। তখন তাঁহার চোখ দুটি ছাড়া আর কিছুই যেন লক্ষিত হয় না। তাঁহার গলার স্বর গম্ভীর ও সুমিষ্ট। তাঁহার ন্যায় বক্তৃতাদক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে এখন কম আছে। লোকের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহারও অত্যন্ত সুন্দর। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। তাঁহার সব চাইতে বড় গুণ তাঁহার সতেজ মনুষ্যত্ব ও ঐকান্তিক দেশ-প্রীতি। ফাকি কাহাকে বলে তিনি জানেন না; দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় 'ফাসো পার্টে'র জন্য তিনি সর্ব্বদা মরিতে প্রস্তুত। অতীত ইতালীর প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা; ভবিষ্যৎ ইতালী গড়িয়া তুলিতে তিনি বদ্ধপরিকর।

তাঁহার কথায়—

"অনেকে বলেন আমি নিজের প্রভুত্বের জন্য সব কিছু করিতে পারি, আমি ইহা অস্বীকার করি। আমার স্বদেশ ও স্বজাতিকে আমি কৃতদাস করিবার জন্য দেশের শাসনভার হস্তে লই নাই, আমি দেশ জননীর বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত তাঁহার সেবার ভার লইয়াছি। দেশের সেবাকে আমি আমার চরম ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করি, আমার ভক্তির মধ্যে ফাঁকি নাই। মাঝে মাঝে যে কঠোরতা আমাকে অবলম্বন করিতে হয় তাহা আমি খেলাচ্ছলে খুসীমত করি না; আমি ব্যথিত চিত্তে কঠোরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হই, দেশের মুক্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য আমি বর্ত্তমানে মাঝে মাঝে কঠোর না হইয়া পারি না। সকল মানুষ কায়িক পরিশ্রম করিবে ইহাই আমার কাম্য। আমি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি সেখানে সবাই পরিশ্রমী, পরমুখাপেক্ষীর স্থান সেখানে থাকিবে না। আমার কামনা খুব অধিক নহে, আমার প্রতিদিনের সাধনা একটি লক্ষ্য ধরিয়া চলিয়াছে। আমার সমস্ত জীবনও সেই লক্ষ্য লাভের চেষ্টায় ব্যয়িত হইবে।—সেই কাম্য এই—ইতালীর লোককে আমি সবল, সুস্থ, সমৃদ্ধ, মহৎ ও স্বাধীন করিতে চাই। ঈশ্বর আমার ঐকান্তিক চেষ্টাকে সফল করুন, আমার সাধনাকে জয়যুক্ত করুন।"



মুসোলিনীর বংশধরদ্বয়



প্রবর্ত্তক সংঘ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা

প্রবর্ত্তক সংঘ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা বিষয়ে আমরা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজী দৈনিকের মন্তব্য পড়িয়া লিখিত হইয়াছিল। প্রবর্ত্তক সংঘ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তখন পাই নাই, দেখি নাই; উহা আমাদের নিকট পরে আসিয়াছে। উহা পড়িয়া বুঝিলাম, যে, প্রবর্ত্তক সংঘ, প্রথমে অরবিন্দ তাঁহাদের আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাহার পর গান্ধী, এবং তাহার পর রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন, ইহাই বলিয়াছিলেন; ইঁহাদের শ্রেষ্ঠতার ক্রম নির্দ্দেশ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা তাঁহারা করেন নাই। আমরা আমাদের ভ্রমের জন্য দুঃখিত।

ইংরেজী দৈনিকটিতে যেরূপ মন্তব্য বাহির হইয়াছিল, তাহার কারণ ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, অভিনন্দনপত্রটির ভাষা এরূপ, যে, উহা কাহাকেও পড়িতে শুনিলে, স্বয়ং না পড়িলে, উহার অর্থ সম্বন্ধে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

নির্ব্বাচনাদি সম্বন্ধে কংগ্রেস্ কমিটির নির্দ্ধারণ

গত মে মাসের মাঝামাঝি বোম্বাইয়ে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি ব্যবস্থাপক সভার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের বর্ত্তমান রীতি এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কংগ্রেস কমিটির এই সব নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে খবরের কাগজে অনেক লেখালেখি হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকেও কিছু লিখিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে, কেবলমাত্র জাপান ব্যতীত, পৃথিবীতে আর যত শক্তিশালী দেশ বা রাষ্ট্র আছে, তাহার সবগুলিই ইউরোপে অবস্থিত, কিংবা ইউরোপীয় লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত। এই পাশ্চাত্য শক্তিশালী দেশগুলি কি প্রকারে শক্তিশালী হইয়াছে? এই সব দেশের সব লোকের ধর্ম্মমত এক নহে, শ্রেণীগত সংকীর্ণ স্বার্থও এক নহে। সত্য বটে, পাশ্চাত্য সব দেশই খৃষ্টিয়ান্ দেশ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু খৃষ্টিয়ানদের মধ্যেও ক্যাথলিক আছে এবং নানা শাখায় বিভক্ত প্রটেষ্টাণ্ট আছে। সকলের সাধারণ নাম খৃষ্টিয়ান হইলেও, ধর্ম্মমতের বিভিন্নতার জন্য পুড়াইয়া মারা বা অন্য প্রকারে প্রাণবধ করার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানদের দাঙ্গা মারামারির মত "ধর্ম্ম" হইতে উৎপন্ন দাঙ্গা মারামারি পাশ্চাত্য দেশসকলে আগে ত খুবই হইত, এখনও অল্পস্বল্প হইয়া থাকে। ধর্ম্মমতের পার্থক্য ছাড়া অন্য রকমের মতভেদ এবং স্বার্থের পার্থক্যও পাশ্চাত্য দেশসকলে আছে। ধনী কারখানার মালিক এবং কারখানার শ্রমজীবী মজুরদের মধ্যে সদ্ভাব নাই। তাহার জন্য দাঙ্গা মারামারিও কখন কখন হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের মত দেশে ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে স্বার্থের বিরোধ বশতঃ খুব মনোমালিন্য ছিল, এবং তাহা অনেক সময় সাংঘাতিক আকার ধারণ করিত। আয়ার্ল্যাণ্ডে গবর্ণ্মেণ্ট কর্ত্তৃক ভূস্বামীদের সমুদয় স্বত্ব ক্রীত হইয়া কৃষকদিগের হস্তে অর্পিত হওয়ায় এই বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়াছে, কিন্তু সকল পাশ্চাত্য দেশে এখনও তাহা হয় নাই।

পাশ্চাত্য দেশসকলে ধর্ম্মমত ও অন্যান্য নানা বিষয়ে মতভেদ ও স্বার্থভেদ থাকা সত্ত্বেও তাহারা সকলেই স্বাধীন, এবং অনেকগুলি দেশ খুব শক্তিশালীও হইয়াছে। তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই, যে, যে সকল বিষয়ে দেশের সকল লোকের স্বার্থ এক, তাহা

পাশ্চাত্য দেশগুলি একে একে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং সেই সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহারা সম্প্রদায়গত মতভেদ ও শ্রেণীগত স্বার্থকে নিম্নস্থান দিয়া সাধারণহিত সাধনে ও সাধারণ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। সর্ব্বোপরি, তাহারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার বা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছে। এই যে বোধ, মনের এই যে ভাব এবং এই যে তাহার বাহ্য প্রকাশ, তাহাকে সংক্ষেপে স্বাজাতিকতা বা ন্যাশ-ন্যালিজম্ বলা যাইতে পারে। এই স্বাজাতিকতার বিকার বশতঃ অনিষ্টও খুব হইয়াছে। স্বাজাতিকতার প্রভাবে অনেক দেশের লোক অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, উহার ধন লুণ্ঠন ও শোষণ করিয়া আসিতেছে, এবং উহার অধিবাসীদিগকে মনুষ্যত্বের উচ্চ আসন হইতে অবনমিত করিয়া দ্বিপদ পশুবিশেষে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু স্বাজাতিকতা ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে কেবলমাত্র স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা বা পুনরুদ্ধার ও স্বদেশের হিত সাধনে ব্যাপৃত থাকিলে, তাহা দোষের বিষয় ত নয়ই, পরন্তু এই-রূপ স্বজাতিকতা ব্যতিরেকে কোন দেশেরই মঙ্গল হইতে পারে না।

আমাদের দেশেও স্বাজাতিকতা ব্যতিরেকে কখনও জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব পূর্ণ স্বাধীনতার আকার ধারণ করিবে, কিম্বা শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বরাজের নামান্তর হইবে, তাহার বিচার এখানে করিব না। কেবল ইহা বলাই এখানে যথেষ্ট, যে, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে হইলেও স্বাজাতিকতার প্রয়োজন।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ প্রভৃতির রাষ্ট্রীয় ও ঐহিক স্বার্থ আলাদা আলাদা কিনা, জমীদার ও রায়তের স্বার্থ আলাদা কিনা, ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থ আলাদা কিনা, মহাজন ও খাতকের স্বার্থ আলাদা কিনা, তাহার বিচারও এখানে করিব না। স্বীকার করা যাক্, যে, এইসকল ভিন্ন ভিন্ন মানবসমষ্টির পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থ আছে। তাহা স্বীকার করিয়াও ইহাই বলিতে চাই, যে, এইসকল সংকীর্ণতর স্বার্থের উপরে দেশের সাধারণ স্বার্থ একটি আছে, যাহা রক্ষা করিতে হইলে সংকীর্ণতর স্বার্থগুলিকে দ্বিতীয় স্থান দিয়া সাধারণ স্বার্থের জন্য একতাবদ্ধ হইতে হইবে। কোনও সম্প্রদায় বা শ্রেণীর সংকীর্ণতর সব স্বার্থও বিদেশীর প্রভুত্বে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ বিদেশী প্রভুরা,আমাদের কোন একটা সমষ্টির স্বার্থের দিকে বরাবর দৃষ্টি না রাখিয়া কখনও এক সম্প্রদায় বা শ্রেণী, কখন বা অন্য সম্প্রদায় বা শ্রেণীর দিকে ঝুঁকিয়া ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া রাখাই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আবশ্যক মনে করিবে, এবং বরাবর তাহাই করিয়া আসিতেছে। অতএব বিদেশীর প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে দেশী লোকদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দেশী ব্যবস্থাপক ও শাসকসমষ্টি কেবল মাত্র কোন এক বা দুই সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা গঠিত না হইয়া, যোগ্যতা অনুসারে নানা সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা যাহাতে গঠিত হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত। ইংলণ্ডে ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে খুব ঝগড়া আছে, রোমান কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদের মধ্যে মতভেদ আছে, ভূস্বামী ও কৃষকদের স্বার্থভেদ আছে, কৃষক ও বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীকারী লোকদের মধ্যে স্বার্থের পার্থক্য আছে ; তাছাড়া, র‍্যাডিক্যাল, লিবার‍্যাল, শ্রমিক, টোরী প্রভৃতিদের রাজনৈতিক মতভেদ আছে। তথাপি তথাকার পার্লেমেণ্ট অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভায় এই সব ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টির জন্য আলাদা আলাদা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা নাই, সুতরাং এক একটি সমষ্টির দ্বারা নিজেদের আলাদা প্রতিনিধিদের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থাও নাই। এইজন্য সকল সমষ্টির সকল ভোটার বা নির্ব্বাচককে একত্র ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হয়। ফলে কখনও টোরী বা রক্ষণশীল, কখনও বা লিবার‍্যাল বা উদারনৈতিক মতের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী হয় ; পার্লেমেণ্টে কোন সমষ্টিরই সংখ্যাধিক্য ও প্রভুত্ব স্থায়ী হয় না। ইংলণ্ডের ইতিহাসে একবার শ্রমিক প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্যও হইয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন, যে, আগামী নির্ব্বাচনে পার্লেমেণ্টে আবার শ্রমিকদের জিত হইবে। ইংলণ্ডে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের যে নিয়ম চলিত আছে, তাহাও নিখুঁত নহে ; কিন্তু তাহা আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-রীতি অপেক্ষা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট। কারণ, তাহা ইংরেজদিগকে এই শিক্ষা দেয়, যে, তাহাদের একটি সর্ব্বোচ্চ সাধারণ স্বার্থ আছে, যাহা রক্ষিত না হইলে ইংলণ্ডীয় প্রটেষ্টাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক, ভূস্বামী, কৃষক, শ্রমিক, ধনিক, প্রভৃতি কাহারও মঙ্গল নাই। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের প্রথায় গবর্ন্মেণ্ট মুসলমানদিগকে, খৃষ্টিয়ানদিগকে এবং অন্য কাহাকেও কাহাকেও স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দিয়া এই শিক্ষা দিতেছেন, যে, দেশবাসী সকল লোকের কোন একটি সাধারণ সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ নাই, মুসলমানের স্বার্থ আলাদা, খৃষ্টিয়ানের স্বার্থ আলাদা, ইত্যাদি। ফলে মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, হিন্দু, প্রভৃতি সকলেই গোলাম হইয়া আছে, কাহারও দাসত্ব ঘুচিতেছে না।

অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রথা লর্ড মিণ্টোর আমলে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। উহার প্রবর্ত্তনের আগে ঐ বড় লাটের তরফ হইতে কয়েকজন মুসলমান নেতাকে এই

সংকেত পাঠান হয়, যে, তাঁহারা তাঁহার নিকট গিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এই দাবী করুন, যে, যেহেতু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ আলাদা, অতএব তাঁহাদিগকে নিজেদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হউক, এবং তাঁহাদের 'রাজনৈতিক গুরুত্ব' অনুযায়ী তাঁহাদিগকে তাঁহাদের লোকসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কিছু অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি দেওয়া হউক। এই প্রকারে সাম, দান, দণ্ড, ভেদ, এই নীতিচতুষ্টয়ের শেষ নীতি অবলম্বিত হয়। ভারতসচিব লর্ড মর্লীর জীবন-স্মৃতিতে দেখিতে পাই, তাঁহার একটি চিঠিতে তিনি বড়-লাট মিণ্টোকে লিখিতেছেন, "you started the Muhammadan hare," "আপনিই ত মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দাবী করিতে প্ররোচিত করেন।" মৌলানা মহম্মদ আলীও কংগ্রেসের সভাপতি রূপে কথিত তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "It was a command performance," "লর্ড মিণ্টোর নিকট স্বতন্ত্র প্রতিনিধির দাবী লইয়া মুসলমান নেতারা যে গিয়াছিলেন, তাহা সর্‌কারী হুকুম অনুসারেই করা হইয়াছিল।"

যাঁহারা স্বতন্ত্র প্রতিনিধি পাইয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক উন্নতি কতটা হইয়াছে, তাহার বিচার তাঁহারা করিবেন। আমরা কেবল ইহাই বলিব, যে, এই প্রথা দ্বারা দেশের কোন উপকার হয় নাই, দেশী লোকের রাজ-নৈতিক অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব বাড়ে নাই, স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াও মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান ইংরেজের সমান হইতে পারেন নাই, হিন্দুর যে গোলামী তাঁহাদেরও সেই গোলামীই আছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসী সমুদয় সমষ্টির লোকেরা যদি একত্র তাঁহাদের সমুদয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যে এক, এই বোধ জন্মিবে, রক্ষিত হইবে ও দৃঢ়তর হইবে। তদ্দ্বারা স্বাজাতিকতা বদ্ধমূল হইবে।

অনেকে মনে করেন, যে, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিগণের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন হইতে একলম্ফে ঐরূপ স্বাজাতিকতায় পৌঁছা যাইবে না। সেইজন্য তাঁহারা চান, যে, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী স্বতন্ত্র প্রতিনিধি থাকিবে, কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন, সকল সম্প্রদায়ের ভোটারদের দ্বারা, এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু ইহাতেও সাম্প্রদায়িক আলাদা আলাদা স্বার্থের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হইতেছে। এইজন্য এইরূপ ব্যবস্থায় আপত্তি আছে। যাহা হউক, যদি মুসলমানেরা ইহাতে রাজী হন, তাহা হইলে ইহা কয়েক বৎসরের জন্য পরীক্ষিত হইতে পারে। পরীক্ষার সময় ছয় বৎসর অপেক্ষা বেশী হইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু দশ বৎসরের পর আর কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি থাকিবে না, এইরূপ নিয়ম হওয়া উচিত।

—

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মমত প্রচলিত। জা'ত এবং শ্রেণীও অনেক। শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত ও অন্যান্য সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য যদি সাম্প্রদায়িক আলাদা আলাদা প্রতিনিধির দরকার হয়, তাহা হইলে সকলের চেয়ে কম শিক্ষিত, সকলের চেয়ে দরিদ্র, সকলের চেয়ে স্বার্থরক্ষায় অসমর্থ যাহারা, তাহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষে কোল ভীল মুণ্ডা সাঁওতাল প্রভৃতি যে-সব আদিম জাতি আছে, তাহারা এইরূপ লোক। হিন্দু সমাজের বাউরী প্রভৃতি জাতি এইরূপ লোক। কিন্তু ইহাদিগকে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার না দিয়া, দেওয়া হইয়াছে অধিকতর শক্তিশালী ও শিক্ষিত মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদিগকে। আমরা কাহারও জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধির ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি না। কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টির জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধির ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক স্বতন্ত্র সমষ্টির স্বতন্ত্র প্রতিনিধি থাকা উচিত, নতুবা ব্যবস্থা কখনও ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। যদি বলেন, যে, প্রত্যেক সমষ্টির জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা কার্য্যতঃ অসম্ভব, তাহা হইলে আমরা বলিব, অন্ততঃ দুর্ব্বলতম, অশিক্ষিততম, দরিদ্রতম যাহারা তাহাদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করুন। তাহা করা হয় নাই, এবং হইবেও না। বর্ত্তমান স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রথা যে কিরূপ অসঙ্গত ও অন্যায়, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

ধর্ম্মসম্প্রদায় ভেদে সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের আমরা বিরোধী তিনটি প্রধান কারণে। প্রথমতঃ, ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদে মানুষের রাষ্ট্রীয় ও ঐহিক স্বার্থ আলাদা নহে; দ্বিতীয়তঃ, সমুদয় সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়া হয় নাই ও কার্য্যতঃ দেওয়া অসম্ভব; এবং তৃতীয়তঃ, সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্র স্বার্থ স্বীকার করিয়া লইলে, যে-সব নিরক্ষর, গরীব, অসহায় লোকদের স্বার্থ-রক্ষার সব-চেয়ে বেশী দরকার, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি না দিয়া দেওয়া হইয়াছে ও হইবে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও শক্তিশালী কোন কোন সমষ্টিকে।

—

ভারতের প্রতি হিন্দুমুসলমানের মনের ভাব

ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্ম্মসম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান। অন্য যে-সব সম্প্রদায় আছে, তাহারা সংখ্যায় ন্যূন। ভারতীয় স্বাজাতিকতা যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে, তাহার জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতিই অধিক অনুরক্ত হওয়া আবশ্যক। হিন্দুদের পক্ষে তাহা সহজ; কারণ, হিন্দুর ধর্ম্ম, সভ্যতা, বাস প্রভৃতি সমস্তই ভারতবর্ষজাত ও ভারতে স্থিত। জৈন, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতিদের পক্ষেও তাহা ঐ কারণে সহজ। দেশী খৃষ্টিয়ানদের পক্ষে তাহা তত সহজ নহে; কারণ, তাহাদের ধর্ম্ম বিদেশ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু এখন আর পাশ্চাত্য কোন খৃষ্টীয় দেশের লোকেরা নিজের দেশ অপেক্ষা প্যালেষ্টাইনের প্রতি অধিক অনুরাগ অনুভব বা প্রদর্শন করে না। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, আধুনিক খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত স্বাজাতিকতার বিরোধ নাই। ভারতীয় খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে ভারতীয় নানা প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্ম, সাহিত্য, সভ্যতা, প্রভৃতির চর্চ্চা অনেকে করিতেছেন। অধিকন্তু, ভারতীয় খৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা বেশী না হওয়ায়, তাঁহারা যদি সম্পূর্ণ বিদেশীভাবাপন্ন হইতেন, তাহা হইলেও ভারতীয় স্বাজাতিকতায় খুব বেশী ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিতেন না। ভারতে হিন্দুর নীচেই মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। তাঁহাদের ধর্ম্ম বিদেশ হইতে আগত। সভ্যতা ও সামাজিক রীতিনীতি কতকটা বিদেশী, কতকটা ভারতীয়। অতএব, ভারতীয় স্বাজাতিকতার সর্ব্বসম্প্রদায়ব্যাপিতা মুসলমানদের মনের ভাবের উপরই অধিক নির্ভর করে। ইহার মানে ভাল করিয়া বুঝা দরকার। ইহার মানে অনেকে এইরূপ বুঝেন, যে, মুসলমানেরা ভারতের স্বরাজ্যলাভে সম্মতি না দিলে ভারতবর্ষ কখনও আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিবে না। আমরা ঠিক তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি, মুসলমানেরাও যদি দরদস্তুর না করিয়া স্বরাজপ্রচেষ্টায় অন্তরের সহিত যোগ দেন, তাহা হইলে স্বরাজলাভ অপেক্ষাকৃত সোজা হইবে। কিন্তু যদি যোগ না দেন, তাহা হইলেও স্বরাজ অর্জ্জিত হইবে, কিন্তু এই কৃতিত্বের গৌরব হইতে এবং এই কৃতিত্বের জন্য যে দৃঢ় দেশহিতব্রত চরিত্রের প্রয়োজন, সেই চারিত্রিক সাধনার অংশ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন।

অনেকে মনে করেন, মুসলমানদের আন্তরিক ও কার্য্যতঃ যোগ ব্যতিরেকে, অন্ততঃ বাহ্য সম্মতি ব্যতিরেকে, স্বরাজ লব্ধ হইবে না। ইহার মধ্যে এইটুকু সত্য আছে, যে, স্বাজাতিক প্রচেষ্টার সহিত মুসলমানদের অন্ততঃ বাহ্য যোগ না থাকিলে, শাসক ইংরেজ জাতি এই ওজর করিতে থাকিবে, যে, যেহেতু মুসলমান ও হিন্দুর মত এক নহে, অতএব স্বরাজ দেওয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু আমরা বলি, এই ওজর করা সত্ত্বেও, অধিকাংশ ভারতীয় দৃঢ়তার সহিত স্বরাজলাভের সংকল্প করিলে ইংরেজকে ভারতীয় স্বরাজে রাজী হইতেই হইবে। ভারতীয়েরা সামান্য যতটুকু রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য চেষ্টা সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানেরা ত সামান্যই করিয়াছেন, হিন্দুদের মধ্যেও অধিকাংশ হিন্দু চেষ্টা করেন নাই; কারণ, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত বলিয়া এই অধিকাংশ ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন নাই। শতকরা যে ৬.১ জন লিখনপঠনক্ষম, তাঁহাদেরও অনেকে জাতীয় প্রচেষ্টায় যোগ দেন নাই। মোটের উপর হাজারে একজন যোগ দিয়াছেন কি না সন্দেহ। তথাপি কিছু ফল লব্ধ হইয়াছে।

এই কারণে আমরা বলি, মুসলমান ও অন্য সব সম্প্রদায়ের লোককে স্বাজাতিকতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা চলিতে থাক্, "ভারতবর্ষ আমাদের হিন্দুদের দেশ, মুসলমানরা বিদেশী, দেশের উপর তাহাদের কোন দাবী নাই," এইরূপ মনেরর ভাব পরিত্যক্ত হউক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কল্পও সকলের মনে দৃঢ় হউক, যে, "যদি আর একজনও আমার সঙ্গে যোগ না দেয়, তাহা হইলেও আমি গন্তব্য পথে চলিব, এবং দেশের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব।"

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মোট অধিবাসীর সংখ্যা এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে নীচে লিখিত হইল।

মোট অধিবাসীর সংখ্যা	২৪,৬৯,৬০,২০০
মোট হিন্দু	১৬,৩১,৪৪,৭০০
ব্রাহ্মণ্য হিন্দু	১৬,২৭,১২,১৮৮
আর্য্যসমাজী	৪,২৬,৬৮২
ব্রাহ্ম	৫,৮৩০
শিখ	২৩,৬৭,০২১
জৈন	৪,৫৫,৮৫৫
বৌদ্ধ	১,:৪,৯০,৮১৫
পারসী	৮৮,৪৬৪
মুসলমান	৫,৯৪,৪৪,৩৩১
খৃষ্টিয়ান	৩০,২৭,৮৮১
ইহুদী	১৯,২২১
আদিম অধিবাসী	৬৯,০৪,১৬৭
অন্যান্য	১৭,৭৪,

উপরে বলিয়াছি, হাজারে একজন ভারতীয় রাষ্ট্রী

অধিকার লাভ প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছে কিনা, সন্দেহ। যাহারা যোগ দিয়াছে, তাহারা প্রধানতঃ অমুসলমান, এবং মুসলমানদের যোগ দেওয়া না দেওয়ার কথা না ভাবিয়াই তাহারা কাজ করিয়াছে। তাহাতেও কিছু ফল ফলিয়াছে। সুতরাং সব হিন্দুরা যদি চেষ্টা করে, সে চেষ্টা সফল হইবেই। মুসলমানেরা যোগ দিলে ভাল, না দিলে দুঃখের বিষয়; কিন্তু তাঁহারা যোগ না দিলে বিশ্বরথের চাকা অচল হইয়া থাকিবে না। যাহারা আইনবিরুদ্ধ উপায়ে দেশকে স্বাধীন করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে, দ্বীপান্তরিত হইয়াছে, জেলে গিয়াছে, তাহারা সবাই অমুসলমান। তিন নম্বর রেগুলেশ্যন ও বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে যাহারা বিনা বিচারে বন্দী হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, স্বাস্থ্য হারাইয়াছে, স্বাধীনতা হারাইয়াছে, তাহারা সবাই অমুসলমান। "মুসলমানেরা প্রাণপণ করিতেছে না, অতএব আমরা প্রাণপণ করিব না; মুসলমানেরা বঙ্গের শতকরা ৫৪ জন, অতএব ফাঁসী, ক্ষয়রোগ আদিতে মৃত্যু, দ্বীপ চালান, বিচারান্তে কারাদণ্ড, এবং বিনাবিচারে স্বাধীনতালোপ যাহাদের হইবে তাহাদের শতকরা ৫৪ জন মুসলমান হউক, তবে আমরা দেশের জন্য নিজেকে বিপন্ন করিব," এরূপ প্যাক্‌ট বা চুক্তি বেহিসাবী প্রাণখরচী বাঙালী যুবকেরা কেহ চায় নাই। তাহারা বিজ্ঞজনোচিতও ভাল কাজ করিয়াছে কিনা, তাহা এখন বিচার্য্য নহে। এখন বক্তব্য এই, যে, তাহারা যাহাকে অন্যায় অত্যাচার অবিচার মনে করিয়াছিল, তাহাতে প্রাণে তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সব সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের কার্য্যে যোগ দিতেছে কিনা, তাহারা তাহা ভাবে নাই। ভারতবর্ষ অল্প যাহা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইয়াছে, তাহা আইনসঙ্গত ও বেআইনী-উভয়বিধ চেষ্টার সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ফলে এবং ঘাত-প্রতিঘাতে পাইয়াছে, এবং মুসলমানরা হিন্দুদের সহিত যোগ না দেওয়া সত্ত্বেও পাইয়াছে। অতএব, মুসলমান যোগ দিলে ভাল, নতুবা অমুসলমানরাই স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টা করিবে, এইরূপ মনোভাব লইয়া কাজ করাই উচিত। স্বরাজ স্থাপনের দায়টা যদি হিন্দুরই হয়, কিন্তু স্বরাজের ফলভোগ করার অধিকারটা যদি মুসলমানেরও হয়, ত, তাহাই হউক। বৃটিশ-শাসিত ভারতের ২৪,৬৯,৬০,২০০ জন অধিবাসীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হিন্দু, মুসলমান সিকিরও কম। মুসলমানেরও চেষ্টার মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু হিন্দুর চেষ্টার কি কোনই মূল্য নাই?

ভারতীয় সকল মুসলমানের মনের ভাব কিরূপ, জানি না, বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাদের অনেকে যে ভারতীয় অমুসলমান ও ভারতীয় মুসলমান অপেক্ষা বিদেশী মুসলমানদিগকে অধিকতর আত্মীয় মনে করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার একটা সোজা প্রমাণ এই, যে, যুদ্ধে ব্যাপৃত কিম্বা যুদ্ধে বিপন্ন তুর্কের জন্য ও রিফের জন্য বিস্তর ভারতীয় মুসলমান টাকা দিয়াছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষাদিতে বিপন্ন ভারতীয় হিন্দুর কথা দূরে থাক্, ভারতীয় মুসলমানের জন্যও টাকা দেয় না। অথচ বিদেশী মুসলমানরা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটা কানাকড়িও খরচ করে না, তাহাদের প্রতি কোন দরদ বা শ্রদ্ধা দেখায় না। যাহারা গোলামী করে, এবং স্বাধীনতার চেষ্টায় যোগ দিবার আগে দরদস্তুর করে, তাহাদিগকে শাসকশোষক-জাতির ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন স্বাধীন জাতির লোক মৌখিক সম্মানও দেখাইতে পারে না, আন্তরিক শ্রদ্ধা ত দূরের কথা। কমাল পাশা ভারতীয় মুসলমানদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা বেশ বক্তৃতা করিতে পার বটে, কিন্তু যুদ্ধের সময় আমাদের জন্য না লড়িয়া আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের শত্রু ইংরেজদের ফৌজভুক্ত হইয়া লড়িয়াছিলে। আমরা সুলতানকে রাখিব কি না, খলিফা রাখিব কি না, সেটা আমাদেরই ভাবিবার কথা। তোমাদের কথা শুনিবার আমাদের দরকার নাই তোমরা নিজেদের চরখায় তেল দাও গিয়া।" তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ। ভারতবর্ষে আর থাকিবেন না বলিয়া যে-সব মুসলমান আফগানিস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই মহাজরিনদিগের কি দশা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। ইবন সাদের নেতৃত্বে হেজাজে সমগ্র মুসলমান জগতের যে মন্ত্রণাসভা হইয়াছিল, তাহাতে মৌলানা মহম্মদ আলির মুরুব্বিয়ানা ত ঘটেই নাই, অধিকন্তু ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ কোন খাতির হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবর্গের "ষ্টার" (*The Star*) নামক কাগজের জন্য একজন সাংবাদিক রিফ্‌দের বন্দী নেতা আব্দুল করিমের সহিত রিইউনিয়ন দ্বীপে দেখা করেন। তাঁহার এই সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্তে, সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে আব্দুল করিমের জেলার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ছাপা হইয়াছে। যথা—

"I don't think Krim will see you, much less talk to you", said Captain Sagnes, and he went on to say : "He prefers to plough a lonely furrow. So far he has not been interviewed by anybody, and he firmly refused to see or have anything to do with the Moslems who are Indians." They sent a delegation to interview him, but Krim threw up this hands and said : "Send them away. I will have nothing to say to them or their people."

তাৎপর্য্য। জেলার বলিলেন, "করিম তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন

বলিয়া বোধ হয় না, কথা বলা ত দূরের কথা। তিনি একান্তে থাকা পছন্দ করেন। কেহ এপর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে পারে নাই; এবং যে-সব মুসলমান ভারতবর্ষীয়, তাদের সঙ্গে দেখা করিতে বা তাদের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখিতে তিনি দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিয়াছেন।" তাহারা তাঁর সঙ্গে মুলাকাতের জন্য প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল, কিন্তু করিম হস্ত উৎক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তাহাদিগকে তাড়াইয়া দাও, বিদায় দাও; আমি তাহাদিগকে বা তাহাদের স্বজাতীয় সধর্ম্মীদিগকে কিছুই বলিতে চাই না।"

ভারতীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে বিদেশী মুসলমানদের তাচ্ছিল্যের ভাব থাকা সত্ত্বেও, ভারতীয় মুসলমানরা অনেকে বিদেশী ভাইদের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহারা বরং বিদেশী মুসলমানদের দ্বারা ভারতবর্ষ বিজিত দেখিবে, তবু হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া ভারতবর্ষকে অন্য দেশের সমকক্ষ করিবে না। আমরা যত দূর জানি, সব ভারতীয় মুসলমানের মনের ভাব এরূপ নহে, কাহারও কাহারও বটে। কয়েক দিন হইল লাহোরের মুস্‌লিম আউটলুক্ নামক কাগজ লিখিয়াছে, যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেই মুসলমানরা ভারতবর্ষ দখল করিবে। কিন্তু মুস্‌লিম আউটলুকের মতে ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতবর্ষের রাজা হইবে না, আফগানরা ভারত আক্রমণ করিয়া দখল করিবে! ইহা লিখিয়া মুস্‌লিম আউট্‌লুক বড়ই আরাম ও স্ফূর্ত্তি বোধ করিতেছে। কিন্তু চীনের, আফগানিস্থানের, তুর্কিস্থানের, পারস্যের, সীরিয়ার, আরবের, তুরস্কের, মিশরের, এবং মরক্কোর মুসলমানেরা অন্য কোন দেশের মুসলমানদের দ্বারা স্বদেশ বিজিত দেখিতে চায় না, তাহারা স্বাধীন হইতে ও থাকিতে চায়। ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের অনেকের মতি-গতি অন্য রকম। এক জন ভারতবর্ষীয় মুসলমান লণ্ডনের "দি ইণ্ডাস্" (*The Indus*) নামক কাগজে লিখিয়াছেন :—

We, Mussalmans, may be callously indifferent to the gravest events at home, but every gentle rustle of leaves in far-off Turkey or Africa is accompanied by the wildest and most unnatural breaking of our dear, sympathetic hearts. Millions of our own poor countrymen are dying of exposure and starvation. We cannot clothe or feed them: we are too poor. But we can afford to send millions of rupees to support wars in distant lands in which we have no interest except that they concern some people who also happen to call themselves Mussalmans. Such is our wholehearted generosity that we do not even mind not getting simple thanks for the "widow's mite" we can so ill-afford. Our co-religionists' affection for us is so deep and sincere, that they cannot bear to go through the futile and awkward formality of displaying their gratitude in any way; they content themselves with just feeling it! This is the most remarkable part of the whole heartbreaking business. As a Mussalman somewhat bitterly remarked: "They don't care a damn for us. They see that we are fools, idiots and naturally take advantage of the fact. But apart from that, we don't exist for them. And we go on running after them like a pack of snivelling dogs. Damn fools, that's what we are." I wish I could disagree. No one can fail to observe that this great "Muslim brotherhood" exists only for us, Indian Mussalmans. No one else has a notion of it. Turkey may go to the dogs, but the fact does not trouble either the Moroccans, or the Egyptians, or the Persians, or the Afghans, or anyone else. Yet our Indian Mussalmans butt in and "kick up an infernal row." The poor, gallant Riffs were fighting for their very lives. The Indian Mussalman made some futile demonstration of sympathy, otherwise not a Mussalman from Egypt to China raised his little finger. Were the English out of India to-day and we fighting the Hindus, not a "brother" would come to our aid, unless for purely personal reasons. And yet---. I put forward a test question before a Punjabi Muslim friend of mine, I asked him what he would do in the event of India (Indian India, that is to say) being attacked, say by the Afghans! After an unsuccessful attempt, to avoid a direct answer, he confessed that he would take the Afghan side! This sort of fanaticism is even more prevalent among the newly converted than among the older Mussalmans. It is perfectly comic how a person, whose, perhaps, father became a Mussalman, or quite possibly who has himself just embraced Islam, waxes eloquent about "our great Muslim culture," "our great Muslim tradition," and of course, "our great Muslim brotherhood."

The whole position is entirely false, utterly impossible.

তাৎপর্য্য। আমরা ভারতবর্ষের মুসলমানেরা নিজের দেশের গুরুতম ঘটনা সম্বন্ধে হৃদয়হীনভাবে-উদাসীন থাকিতে পারি, কিন্তু সুদূর তুরস্ক বা আফ্রিকার গাছের পাতার মৃদু সরসর্ শব্দে আমাদের সমবেদনাপূর্ণ আদুরেগোপাল হৃদয়গুলি অস্বাভাবিক রকমে ভাঙ্গিয়া যায়। আমাদের নিজের দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব লোক অন্নবস্ত্রগৃহাভাবে মারা যাইতেছে; আমরা তাহাদিগকে খাইতে পরিতে দিতে পারি না। কিন্তু আমরা দূর দেশে যুদ্ধের সাহায্যার্থ লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠাইতে পারি; সে-সব যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই; সম্বন্ধ কেবল এইটুকু, যে, তাহাতে যাহারা জড়িত তাহারা আপনাদিগকে মুসলমান বলে। আমাদের বদান্যতা এমনই পূর্ণহৃদয়প্রসূত, যে, যাহাদিগকে আমরা টাকা পাঠাই তাহারা যে আমাদিগকে ধন্যবাদও দেয় না, তাহা আমরা গ্রাহ্য করি না। আমাদের প্রতি আমাদের বিদেশী সধর্ম্মীদের ভালবাসা এত গভীর ও আন্তরিক, যে, তাহারা আমাদের প্রতি কোন প্রকার ব্যর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাহ্য লৌকিকতার কষ্টও সহ্য করিতে পারে না; তাহারা শুধু কৃতজ্ঞতাটুকু অনুভব করিয়াই সন্তুষ্ট! আমাদের বিদেশী সধর্ম্মীদের জন্য হৃদয়ভঙ্গ ব্যাপারের এইটাই সকলকার চেয়ে চমৎকার অংশ। একজন মুসলমান তিক্ততার সহিত মন্তব্য করিয়াছিলেন, "তারা আমাদের জন্য বিন্দুমাত্রও কেয়ার করে না। তারা দেখে যে, আমরা বেকুব আহাম্মক, সুতরাং স্বভাবত আমাদের বোকামি হইতে যতটা সুবিধা পাইতে পারে, তাহা ছাড়ে না। কিন্তু এই প্রকারে তাহাদের লাভের কারণ হওয়া ছাড়া তাহাদের কাছে আমাদের অস্তিত্বই নাই। আর আমরা তাহাদের পেছনে পেছনে কুকুরের মত নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটি। গোল্লায় যাবার উপযুক্ত বেকুব যাকে বলে, আমরা তাই।" আমি ইহাঁর সঙ্গে একমত হইতে না পারিলে সুখী হইতাম। এটা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন,

যে, দুনিয়াজোড়া "মুস্‌লিম বেরাদরী" কেবল আমাদের ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই আছে। আর কোন দেশের মুসলমানদের এরূপ কোন ধারণা নাই। তুরস্ক গোল্লায় গেলেও মরক্কো, মিশর, আফগানিস্থান পারস্য বা অন্য কোথাওকার মুসলমানের কোন কষ্ট হয় না; কিন্তু আমাদের ভারতীয় মুসলমানরা মহা সোরগোল উপস্থিত করে। বেচারা সাহসী রিফরা প্রাণপণ করিয়া লড়িতেছিল। ভারতের মুসলমানেরা তাদের সহিত বৃথা সমবেদনার বাহুলক্ষণ দেখাইয়াছিল; তা ছাড়া চীন হইতে মিশর পর্য্যন্ত কোন দেশের মুসলমান তাদের জন্য একটা কড়ি আঙুলও তুলে নাই। যদি আজ ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, এবং আমরা হিন্দুদের সঙ্গে লড়ি, তাহা হইলে কোন 'ভাই বেরাদর' আমাদের সাহায্য করিতে আসিবে না—যদি কেহ আসে, সে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্যই আসিবে। কিন্তু তথাপি—। আমার এক পঞ্জাবী মুসলমান বন্ধুকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়াছিলাম। আমি সুধাইয়াছিলাম, 'আফগানরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে তুমি কি করিবে?' বন্ধু প্রথমে সোজাসুজি উত্তর না দিবার বিফল চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন, 'আমি আফগানদের দলে ভিড়িব।' এই রকমের ধর্ম্মান্ধতা বুনিয়াদী মুসলমানদের চেয়ে নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। হয়ত যাহার বাবা কিম্বা সে নিজেই মুসলমান হইয়াছে, সে যখন বাগ্মিতার সহিত "আমাদের মহান্ মুস্‌লিম সভ্যতা," "আমাদের মহৎ মুস্‌লিম ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত মত বিশ্বাস," এবং, অবশ্য, "আমাদের জগৎজোড়া মুস্‌লিম বেরাদরী"র বিষয়ে বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে থাকে, তখন ব্যাপারটা চূড়ান্তরকম হাস্যকর হইয়া উঠে।

সমুদয় ব্যাপারটা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ও অসহ্য।

এই ভারতীয় মুসলমান লেখকের পঞ্জাবী মুসলমান বন্ধু ভারতবর্ষ আফগানদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আফগানদের সঙ্গেই যোগ দিবেন! তিনি এবং মুস্‌লিম আউট্‌লুকের সম্পাদক বোধ হয় ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে, মুসলমান মোগল ও মুসলমান পাঠানের যুদ্ধটা মিথ্যা কথা, মোগল কেবল হিন্দুকেই মারিয়াছিল, পাঠানও কেবল হিন্দুকেই মারিয়াছিল, এবং নাদির শাহের আদেশে যখন দিল্লীতে লুট ও হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল, তখন দিল্লীর বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন একজন মুসলমানেরও কোন ক্ষতি বেইজ্জতি হয় নাই, প্রাণ ত যায়ই নাই, কেবল হিন্দুদের ধন প্রাণ গিয়াছিল এবং তাহাদের বাড়ী হইতে লুণ্ঠিত সব ধন নাদির শাহ্ দিল্লীর মুসলমানদিগকে নিঃশেষে দান করিয়া ফকীর হইয়া মক্কায় হজ করিতে গিয়াছিলেন!

ভারতীয় জাতি গঠনে মুসলমানরা খুব প্রয়োজনীয় উপাদান। দেশ যেমন হিন্দুদের, তেমনি মুসলমান খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি সকলেরই। উহা কোন দলিলের জোরে বা বংশের জোরে কাহারও হইতে পারে না। যে-কেহ খাটিয়া স্বার্থত্যাগ করিয়া বিপদের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করিয়া উহার সমৃদ্ধি শ্রী স্বাস্থ্য সভ্যতা স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিবে রক্ষা করিবে, উহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অতীত অপেক্ষাও গৌরবময় করিবে, সেই, কেবল সেই, ভারতবর্ষকে "আমার দেশ" বলিবার অধিকারী, অন্য কেহ নহে। এই উচ্চ সাধনার দ্বারা এই উচ্চ অধিকার লাভ করিতে কেহ যদি অগ্রসর না হন, বঞ্চিত কৃপাপাত্র তিনিই হইবেন, কিন্তু বিধাতার কাজ বন্ধ থাকিবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই হইবে।

—

পৃথিবীর নানাজাতির লোকসংখ্যার অনুপাত

"জিওপলিটিক্" নামক ইউরোপীয় কাগজ হইতে কলিকাতার "দি উঈক্" একটি তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, পৃথিবীতে কোন্ সালে কোন্ জাতির মানুষ শতকরা কত ছিল। যথা:—

জাতি।	১৮০০ সালে।	১৯০০ সালে।	১৯২৫ সালে।
শ্বেতকায়	২৩.৯	৩৩.৯	৩৫.৩
ভারতীয়	২১.৯	১৭.৩	১৭
প্রাচ্য	৭.৭	৫.৮	৫.৪
পূর্ব্বএশিয়াজাত	৩৭.৪	৩২.৯	৩০.৯
নিগ্রো	৫.২	৫.৯	৫.৮
মালয়, লাল ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি	৩.৯	৪.৯	৫.৬
	১০০	১০০	১০০

ভারতীয়েরা যে সংখ্যায় কমিয়া গিয়াছে, তাহা নহে, সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু অন্য কোন কোন জাতি, বিশেষতঃ শ্বেতকায়েরা, অধিকতর রকম বৃদ্ধি পাওয়ায়, ভারতীয়দের অনুপাত কম হইয়া গিয়াছে। শ্বেতকায়েরা খুব বেশী বাড়িয়াছে এইজন্য, যে, তাহারা পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখণ্ডের মালিক, এবং সর্ব্বত্র অবাধে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে; রোগে মৃত্যু তাহাদের মধ্যে কম, অনশনে অর্দ্ধাশনে মৃত্যু নাই বলিলেও চলে। ভারতীয় লোকেরাও অতীতকালে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে এবং জাভা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিত। এখন যে বহুকাল হইতে ভারতীয়েরা আর বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে না, তাহার নানা কারণ আছে। সমুদ্রযাত্রায় পাতিত্য ঘটে, এই বিশ্বাস একটা কারণ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লোপ পাওয়ায় সকল দিকেই উদ্যমশীলতার হ্রাস আর একটা কারণ। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতীয় জাহাজ-নির্ম্মাণ ব্যবসা এবং সমুদ্রপথে যাত্রী ও মালবহন ব্যবসা নষ্ট করা হয়। তাহার পর বিলাতী অন্য ইউরোপীয় ও জাপানীদের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এই দুই ব্যবসাতে নিজের পূর্ব্ব স্থান আর অধিকার করিতে পারে নাই। তৃতীয় কারণ, ভারতবর্ষীয়দিগকে ইংরেজের উপনিবেশ সকলে কুলি করিয়া লইয়া গিয়া

তাহাদের পরিশ্রমে শ্বেতকায়েরা ধনী হইলেও, তাহাদিগকে, "কাজের সময় কাজী কাজ ফুরোলেই পাজী," নীতি-অনুসারে পরে নানা উপায়ে অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া হয়। চতুর্থ কারণ, ইংলণ্ডের কোনও উপনিবেশে এবং আমেরিকায় ভারতবর্ষীয়েরা অবাধে গিয়া বসবাস করিতে পারে না, বা নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার পায় না। ভারতীয়দের সংখ্যার যথেষ্ট বৃদ্ধি না হওয়ার কয়েকটি কারণ শিশুমৃত্যুর আধিক্য, নিবার্য্য রোগ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব, অনেকের আজীবন অন্নকষ্ট, এবং ঘনঘন দুর্ভিক্ষ।

—

যুবকদের জন্য কাজ ও প্রাথমিক শিক্ষা

সাধারণতঃ আমাদের দেশে বেকার-সমস্যা যে খুব একটা কঠিন সমস্যা, তাহা অনেকে অনেক বার বলিয়াছেন। অনেকে একথাও বলিয়াছেন এবং বলিতেছেন, যে, নেতাদের আহ্বানে যুবকেরা দেশের কাজ করিবার জন্য ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু নেতারা নিজের নিজের কাজ হাসিল করিলেন বটে কিন্তু যুবকদিগকে কোন কাজ দিলেন না, যদিও তাহারা পেটভাতায় খাটিতে রাজী ছিল।

আমরা একটা কাজের কথা বলিতে চাই, যাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

যে-দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অশিক্ষিত, এরূপ কোন দেশ কোন দিকেই বেশী উন্নতি করিতে পারে না। যে কোন দিকেই উন্নতি করিতে চান, শিক্ষার আবশ্যক। কোন দেশের সকল ছেলে-মেয়ে ও প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী লিখনপঠনক্ষম ও শিক্ষিত হইলে, তাহা নিরক্ষর ও অশিক্ষিতের দেশ অপেক্ষা উন্নত ও শক্তিশালী হইবেই। দেশকে শিক্ষিত করিতে হইলে সব বালক-বালিকার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহার গোড়াপত্তন হয়, প্রাথমিক শিক্ষায়। মোটামোটি ইহা ধরা যাইতে পারে, যে, পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা পায়। ব্রিটিশশাসিত বাংলা দেশে এরূপ বালকবালিকাব অর্থাৎ ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা ১৯২১ সালের সেন্সাস অনুসারে ৭৩,৪২,৫৫৮। ১৯২৫-২৬ সালের সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টে দেখিতে পাই, ১৯২৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ বঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলে ১৬,৫০,৫৫৫টি বালকবালিকা পড়িতেছিল। অর্থাৎ যত ছেলেমেয়ের পড়া উচিত, তাহার সিকিরও কম পড়িতেছিল। যাহারা পড়িতেছিল তাহাদের জন্য পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৫০,৯২৩। মোটামোটি আরও দুই লক্ষ পাঠশালা হইলে বাকী ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বন্দোবস্ত হইতে পারে। এই দুই লক্ষ পাঠশালা যদি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রত্যেকটির জন্য অন্ততঃ একজন করিয়া পণ্ডিত বা গুরুমহাশয় আবশ্যক ধরিলেও দুইলক্ষ শিক্ষিত বেকার লোকের এখনই অন্নসংস্থান হয়, এবং প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তাররূপ দেশের মহা উপকার সাধিত হয়। ইহা সাক্ষাৎ ভাবে স্বরাজ, দেশমাতৃকার পূজা, দেশের জন্য আত্ম-বলিদান প্রভৃতি কোন উত্তেজক উন্মাদক ব্যাপার নহে; সামান্য পাঠশালার কথা। কিন্তু ইহা বড় বড় আর সব জিনিষের ভিত্তি। এইজন্য এই কাজটি করিতে হইলে কত টাকা লাগিবে, তাহারও একটি হিসাব দিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত সরকারী শিক্ষারিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে, পাঠশালায় এক একটি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিবার বার্ষিক ব্যয় ৩৻৫। ১৯২১ সালে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়ে বঙ্গে ৭৩,৪২,৫৫৮ ছিল, এখন হয়ত ৭৫,০০,০০০ হইয়াছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকের শিক্ষার ব্যয় আরও কিছু বেশী ধরা যাক্, যাহাতে উহা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে। ৩৻৫ এর জায়গায় মাথা পিছু ৪৲ ধরিলে পঁচাত্তর লক্ষ ছেলেমেয়ের বার্ষিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় তিন কোটি টাকা হয়। অর্থাৎ বার্ষিক তিনকোটি টাকা ব্যয় করিলে ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে একটি পয়সাও বেতন না লইয়া বাংলাদেশের সমুদয় ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়, অধিকন্তু বর্ত্তমানে বেকার ন্যূনকল্পে দুই লক্ষ লোককে জনহিতকর কাজ দেওয়া যায়। দুই লক্ষ কম করিয়া ধরিয়াছি। তিন লক্ষ বেকার লোকের কাজ হইবে, বলিলে আরও ঠিক বলা হইত।

কেবল এই দুই বা তিন লক্ষ লোকেরই যে কাজ হইবে, এমন নয়। পঁচাত্তর লক্ষ ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য বিস্তর পুস্তক চাই, কালি কলম কাগজ চাই, শ্লেট পেন্সিল চাই। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে আরও অনেক লোকের কাজ জুটিবে। গ্রন্থকার, ছাপাখানার লোক, পুস্তকবিক্রেতা, কাগজনির্ম্মাতা ও বিক্রেতা, কালিকলম শ্লেটপেন্সিল নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা প্রভৃতির কাজ ও আয় বাড়িবে।

প্রাথমিক শিক্ষা যাহারা পাইবে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছেলেমেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে, কতকগুলি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত যাইবে। সুতরাং উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা বাড়িবে, শিক্ষক ও অধ্যাপক আরও নিযুক্ত করিতে হইবে, এবং পুস্তক কালি কলম কাগজ পেন্সিল আদির কাট্‌তি বাড়ায় গ্রন্থকার মুদ্রাকর কাগজ-ওয়ালা প্রভৃতির সংখ্যা ও আয় বাড়িবে।

এখানে কথা উঠিতে পারে, যে, কেবল কেতাবী

শিক্ষার বিস্তার হইলে কেরাণীগিরির উমেদার ও বেকারের সংখ্যা বাড়িবে। তাহা নহে। যত বেশী লোক শিক্ষা পাইবে, তাহাদের কতক অংশ শিক্ষালয় সকলেই কাজ পাইবে। তা ছাড়া, আমরা ত কোথাও বলি নাই, যে, কেবল কেতাবী শিক্ষাই দিতেই হইবে। কৃষি শিক্ষা দিতে হইবে, শিল্পবাণিজ্য শিক্ষা দিতে হইবে। কতক বৃত্তি শিক্ষা আছে যাহা প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপযোগী, কতক মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের উপযোগী, কতক উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপযোগী। প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যাহা হউক, আমরা এখানে বৃত্তি শিক্ষার কথা বলিলাম কেবল আপত্তি নিরসনের জন্য। এখানে আমাদের প্রধান বক্তব্য প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে। তাহার আনুমানিক ব্যয় তিন কোটি টাকা নূতন ট্যাক্স না বসাইয়াও কিরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে তাহা বলিতেছি।

বাংলার লোকসংখ্যা অন্য যে-কোন প্রদেশের লোক-সংখ্যা অপেক্ষা বেশী, এবং সরকারী ট্যাক্স খাজনা আদির মোট আদায়ও অন্য কোন প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে কম হয় না। অথচ বড় বড় প্রদেশগুলির মধ্যে ভারত গবর্মেণ্ট যে বাংলার গবর্মেণ্টকেই সকলের চেয়ে কম টাকা প্রাদেশিক সরকারী খরচের জন্য রাখিতে দেন, তাহা নীচের তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

প্রদেশ।	১৯২১ সালে লোক-সংখ্যা।	১৯২৭-২৮ সালে আয়।
বাংলা	৪,৬৬,৯৫,৫৩৬	১০,৭৩,৩৯,০০০
মাদ্রাজ	৪,২৩,১৮,৯৮৫	১৬,৫৪,৮০,০০০
বোম্বাই	১,৯৩,৪৮,২১০	১৫,০৮,০০,০০০
আগ্রা-অযোধ্যা	৪,৫৩,৭৫,৭৮৭	১২,৯৪,৫০,০০০
পঞ্জাব	২,০৬,৮৫,০২৪	১১,১৩,০০,০০০

ভারত গবর্মেণ্ট মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে আদায়ী যত টাকা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্মেণ্টকে রাখিতে দেন, বাংলা গবর্মেণ্টকে অন্ততঃ তত টাকা রাখিতে দিলে বাংলা দেশে সব ছেলেমেয়ের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিন কোটি টাকা অনায়াসেই খরচ করা চলে। আপত্তি উঠিতে পারে, যে, বাংলা গবর্মেণ্টের হাতে এই আরও তিন কোটি টাকা দিলে ভারত গবর্মেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে কেমন করিয়া। কিন্তু যে-কোন বৎসর আফগানিস্থান বা অন্য কোন সীমান্তে বা অন্যত্র যুদ্ধ হইলে ভারত গবর্মেণ্ট অনায়াসেই কুড়ি পঁচিশ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করেন। মহাযুদ্ধের সময় গরীব ভারতবর্ষকে গবর্মেণ্ট দেড়শত কোটি-টাকা "স্বেচ্ছাকৃত" দান করাইয়াছিলেন ধনী গ্রেটব্রিটেনকে! সুতরাং ইহা বুঝা খুবই সোজা, যে, ভারত গবর্মেণ্ট অনায়াসেই বাংলা গবর্মেণ্টের হাতে পৌনে এগার কোটি টাকার পরিবর্ত্তে পনের ষোল কোটি-টাকা থাকিতে দিতে পারেন।

শুধু তাই নয়। সমগ্র ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের ৫ হইতে দশ বৎসর বয়সের সব ছেলেমেয়ের অবৈতনিক শিক্ষার জন্য যে পনের ষোল কোটি-টাকা বার্ষিক ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহাও ভারত গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে অনায়াসে করিতে পারেন। সভ্য স্বাধীন দেশ সকলের গবর্মেণ্ট শিক্ষাকে যেরূপ আবশ্যক মনে করেন, বিদেশী ভারত গবর্মেণ্ট সেইরূপ মনে করিলে, অন্যান্য কম প্রয়োজনীয় বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অনায়াসেই শিক্ষার জন্য ব্যয় বাড়ান যায়।

বাংলা গবর্মেণ্টের আয় বৃদ্ধিই যে একমাত্র উপায়, তাহা নহে। ব্যয়-সংক্ষেপও অনেক হইতে পারে। বাংলা দেশের পাঁচটি ডিবিজনে পাঁচজন কমিশনার ও তাঁহাদের আফিস ও আমলা আছে। এই পদগুলি উঠাইয়া দিলে শাসন-কার্য্যের কোনই ক্ষতি হয় না, অথচ কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় কম হয়। ভারতের কমিশনারহীন কোন প্রদেশ বঙ্গ অপেক্ষা কুশাসিত নহে। প্রত্যেক জেলার পুলিশের উচ্চতম কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব। তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেক জেলায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছে। ২৭টি জেলার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরদের বেতন কিছু কিছু বাড়াইয়া দিয়া অনাবশ্যক কতকগুলা উপরের কাজ ছাঁটিয়া দিলে খুব ব্যয় সংক্ষেপ হয়, অথচ শাসনকার্য্যের কোন ক্ষতি হয় না।

আমরা এত ক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা করা না-করা গবর্মেণ্টের ইচ্ছাসাপেক্ষ বটে; কিন্তু অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, দেশের লোক একমত হইয়া তাহা বলিলে এবং শিক্ষামন্ত্রী এইরূপ টাকার দাবী করিলে ফল হইতে পারে। গবর্মেণ্ট শিক্ষামন্ত্রীর কথা না শুনিলে তিনি ইস্তফা দিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ আদর্শপরায়ণ তেজস্বী মন্ত্রী এপর্য্যন্ত বঙ্গে কেহ হন নাই।

এক্ষণে, আমরা নিজে কি করিতে পারি, দেখা যাক্। সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টে দেখিলাম, এক একটি পাঠশালার জন্য গড়ে বার্ষিক ১২২।৵৫ খরচ হয়। এই ১২২।৵৫ স্বয়ং দিতে পারেন, এরূপ বিস্তর লোক দেশে আছেন। তাঁদের প্রত্যেকের নিজের ব্যয়ে এক একটি পাঠশালা চালান উচিত। তাঁহারা যদি কোন সরকারী বা সরকারীসাহায্য-প্রাপ্ত কলেজে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহারা দেশের লোকের কাছে দেনদার হইয়া আছেন। সেই

দেনা শোধ করা উচিত। বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ১৯২৫-২৬ সালের সরকারী রিপোর্টে, এই সব কলেজের ছাত্রপ্রতি বার্ষিক খরচ এবং তন্মধ্যে সরকারী টাকার অংশের পরিমাণ লিখিত হইয়াছে। ছাত্রদত্ত বেতনাদি হইতে ব্যয় সঙ্কুলন না হওয়ায় সরকারী টাকা দিতে হয়। নীচের তালিকায় ১৯২৫-২৬ সালে ছাত্রপ্রতি মোট খরচ এবং সরকারী অংশের পরিমাণ দৃষ্টি হইবে।

কলেজ	ছাত্রপ্রতি মোট বার্ষিক ব্যয়	সরকারী অংশ
প্রেসিডেন্সী	৫০৭	৩৬৬
ঢাকা ইণ্টারমীডিয়েট	৪১৫৮১	৩২৫।৯
হুগলী	৫২৪॥৪	৪৩৩৸৶০
সংস্কৃত	৬১৪॥৵৩	৫৬৪৵৩
কৃষ্ণনগর	৫৯৪৸৶০	৪৯৬।৬
চট্টগ্রাম	২১৭৶৫	১২৬॥৵১০
রাজশাহী	২০৭॥৴২	১১১।১১
সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ সমূহ	১০৮৵০	২৩৶২

গবর্মেণ্ট যে টাকা দেন, তাহা প্রজাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ট্যাক্স হইতে দেন, এবং এই ট্যাক্স সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বহু পরিমাণে কৃষক কারিগর ও অন্যান্য শ্রমজীবী লোকদের পরিশ্রম হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং আমরা যাহারা সরকারী বা সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে পড়িয়াছি, তাহারা সকলেই শ্রমিকদের নিকট ঋণী। তাহাদের ও তাহাদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়া এই ঋণ শোধ করা আমাদের উচিত। আমরা তাহাদের শিক্ষার জন্য কিছু ব্যয় করিলে তাহা অনুগ্রহ নহে, ঋণশোধ মাত্র।

যিনি যত বৎসর যে কলেজে পড়িয়াছেন, তদনুসারে হিসাব করিয়া ঋণের পরিমাণ স্থির করিয়া ও তাহাতে ন্যায্য সুদ যোগ দিয়া যদি ঠিক্ মোট সেই টাকাটি দেশের লোকদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন, তাহা হইলেও ঋণশোধ হইবে না। ছাত্রাবস্থায় ঐ টাকার সাহায্য পাইয়া আমরা যে যে-দিকে যত উন্নতি করিয়াছি, সমুদয়ই অংশতঃ ঐ সাহায্যপ্রাপ্তির ফল। এইজন্য ঐ সাহায্যের মূল্য ঠিক্ টাকা আনা পাইয়ে নির্দ্ধারণ করা যায় না। কেহ যদি ২০।২২ বৎসর পর্য্যন্ত পিতামাতা কর্ত্তৃক পালিত হইবার ঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত, পিতৃগৃহের ঘরভাড়া, মাতৃদুগ্ধের মূল্য, গোদুগ্ধের মূল্য, পিতামাতার পরিশ্রম, খাদ্যের মূল্য, শিক্ষার সর্ব্ববিধ ব্যয়, প্রভৃতির সমষ্টি নির্ণয় করিয়া থোক্ টাকাটা সুদসমেত পিতামাতাকে দিয়া মনে করে, পিতৃঋণ মাতৃঋণ শোধ হইল, তাহা হইলে সে জনসমাজে নির্বোধ বলিয়া হাস্যাস্পদ এবং অকৃতজ্ঞ বলিয়া ঘৃণিত হয়। অন্যেরা পিতামাতার মত আমাদের হিতসাধন না করিলেও, তাহাদের কৃত সাহায্যের মূল্যও টাকা আনা পাইয়ে পরিমিত হইতে পারে না।

যাঁহারা সরকারী বা সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে পড়েন নাই, সম্পূর্ণ বেসরকারী কলেজে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের যে কোন ঋণ নাই, তাহা নহে। বেসরকারী কলেজের ছাত্রেরা সস্তায় প্রায় সেইরূপ শিক্ষা পান, যাহার জন্য অন্যত্র অনেক বেশী খরচ হয়। এই জন্য তাঁহারা অল্পবেতনভোগী বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের নিকট ঋণী।

স্কুল কলেজের শিক্ষা ছাড়া আমরা সভ্য সমাজে থাকার দরুন অজ্ঞাতসারে অনুকরণ দ্বারা যে শিক্ষা পাই, তাহার নিমিত্ত সমাজের নিকট ঋণী। এই অজ্ঞাতসারে প্রাপ্ত শিক্ষার পরিমাণ ও মূল্য খুব বেশী। শৈশবে নেকড়ে বাঘ বা ভালুকের দ্বারা অপহৃত ও পালিত কোন কোন মানবশিশুর বৃত্তান্ত আমরা অনেকে পড়িয়াছি। তাহারা মানব সমাজে বড় হইতে না পারায় মানুষের মত হইতে পারে না, কতকটা জন্তুর মতই থাকিয়া যায়। ইহা হইতে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে, যে, মানুষের সন্তান হইলেই মনুষ্যোচিত সব গুণ ও শক্তি লাভ করা যায় না, মানবসমাজের পরিবেষ্টনেরও প্রয়োজন। সমাজ হইতে আমরা আশৈশব অজ্ঞাতসারে যত প্রকারে উপকৃত হই, তাহার জন্য ঋণী থাকি। জনহিতসাধন দ্বারা সেই ঋণশোধ করিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। সার্ব্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সেই ঋণশোধের অন্যতম উপায়।

অন্য অনেক লোকে যেরূপ আয় ও আরামের জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, জমীদারেরা বিনা পরিশ্রমে সেইরূপ আয় ও আরাম পান। ইহার জন্য

তাঁহারা কৃষক ও অন্য শ্রমিকদের নিকট ঋণী। অতএব জমিদারীর প্রত্যেক গ্রামে পাঠশালা চালান প্রত্যেক জমিদারের কর্ত্তব্য। জমিদারেরা যদি এই প্রকারে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে নিজেরাও উপকৃত ও লাভবান্ হইবেন। জমিদার ও রায়তদের বর্ত্তমান সম্বন্ধ এবং জমীর বর্ত্তমান বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইবে না। পরিবর্ত্তন হইবেই। জমিদাররা যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও হৃদয়বান্ হন, তাহা হইলে এই পরিবর্ত্তন বিনা মনোমালিন্যে, বিনা বিবাদে, বিনা রক্তপাতে হইবে ; তাহা না হইলে পরিবর্ত্তন অবাঞ্ছিতরূপে ঘটিবার সম্ভাবনা।

অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরই একা একা বার্ষিক ১২২।৶৫ খরচ করিয়া এক একটি পাঠশালা চালাইবার সামর্থ্য নাই। তাঁহারা ন্যূনকল্পে একটি ছাত্র বা ছাত্রীকে বার্ষিক ৩৸৴ ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দিবেন---অবশ্য নিজেদের বাড়ীর ছেলেমেয়ে ছাড়া। এইরূপ মাসিক পাঁচ আনা সদ্ব্যয় করিতে অনেকে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা তাহাও পারিবেন না, তাঁহারা স্বয়ং বাড়ীতে নিজ পরিবারবর্গের বাহিরের অন্ততঃ একজন লোককে প্রাথমিক শিক্ষার সমান কিছু লেখাপড়া শিখাইয়া দিবেন।

—

নেপাল ও আফগানিস্থান

আমরা হিন্দুমুসলমানের মনের ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, যে, কোন কোন ভারতবর্ষীয় মুসলমান আফগানদের দ্বারা ভারত জয় ও দখল অবাঞ্ছনীয় মনে করেন না, বরং প্রার্থনীয়ই মনে করেন। আফগানিস্থানের লোকসংখ্যা হুইটেকারের পঞ্জিকায় এক জায়গায় আছে পঞ্চাশ লক্ষ, আর এক জায়গায় আছে ছেচল্লিশ লক্ষ। চেম্বার্সের এন্সাইক্লোপীডিয়ার মতে উহার লোকসংখ্যা চৌষট্টিলক্ষ, ভারতীয় সেন্সাস্ রিপোর্টের মতে ৬৩,৮০,৫০০। সকলের চেয়ে বেশী আন্দাজটা অর্থাৎ চৌষট্টি লক্ষই ধরিলাম। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা মোটামুটি ৩২০০ লক্ষ, অর্থাৎ আফগানিস্থানের পঞ্চাশ গুণ। অথচ এহেন ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা আফগানিস্থানকেও ভয় করেন এবং আফগানদের নাম করিয়া আমাদিগকেও জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকেন ; ইহার কারণ কি? আফগানিস্থানের ৬৪ লক্ষ লোকদের মধ্যে স্ত্রীলোক, শিশু ও অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি আছে। তাহারা যুদ্ধ করিবে না। ঊর্দ্ধসংখ্যা ৩০ লক্ষ আফগান যুদ্ধ করিবে। ভারতবর্ষে যাহাদিগকে ইংরেজেরা অযোদ্ধা বলেন এবং যাহাদিগকে অযোদ্ধা বানাইবার বা অযোদ্ধা করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহারা দায়ী, তাহাদিগকে বাদ দিলেও শিখ, জাট, রাজপুত, ডোগরা, গাঢ়োয়ালী, মরাঠা, পূরুবিয়া, গুরখা প্রভৃতি আছে। ইহাদের মধ্য হইতেই ত ত্রিশলক্ষের অনেক গুণ বেশী যোদ্ধা পাওয়া যাইতে পারে। অস্ত্রশস্ত্রের ও সরঞ্জামের এবং যুদ্ধশিক্ষাদানের জন্য টাকার প্রয়োজন। তাহাও আফগানিস্থানের চেয়ে ভারতবর্ষের বেশী আছে। তবে কেন এত আফগানের ভয়? একটা কারণ, রুশিয়া আফগানিস্থানের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। আর একটা কারণ, আফগানরা স্বাধীন বলিয়া যত উৎকৃষ্ট যুদ্ধশিক্ষা ও অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম তাহাদের হইতে পারে, ইংরেজ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের সৈন্যদিগকে তত উৎকৃষ্ট যুদ্ধশিক্ষা ও অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম দেয় না। আর একটা কারণ, স্বাধীন আফগান স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিতে যে তেজ দেখাইবে, বেতনের দাস সিপাহীরা তাহা না দেখাইতে পারে। আর একটা এই সন্দেহ ইংরেজদের আছে, যে, ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয় মুসলমানেরাও সন্তুষ্ট নহে বলিয়া তাহারা আফগানদের সহিত যোগ দিতে পারে। ভারতবর্ষের সব জাতির সমর্থ পুরুষদিগকে যুদ্ধ শিখিবার সুযোগ দিলে, অন্ততঃ যোদ্ধা বলিয়া স্বীকৃত জাতিদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যুদ্ধশিক্ষা এবং অস্ত্রশস্ত্রের সরঞ্জাম দিলে এবং দেশের লোক যাহাতে সন্তুষ্ট হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তদ্রূপ পরিবর্ত্তন হইলে, ভারতবর্ষের কোনও প্রতিবেশীকে ভয় করিবার কারণ থাকে না। যুদ্ধবিষয়ে আফগানিস্থানের কোন চিরন্তন শ্রেষ্ঠতা নাই। আকবর বাদশাহের আমলে উহা ভারতের অধীন ছিল, রাজা মানসিংহ উহার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেনাপতি হরী সিং নালুয়ার নেতৃত্বে শিখরাও উহা জয় করিয়াছিল।

যে-সব ভারতবর্ষীয় মুসলমান আফগানদের দ্বারা ভারতবর্ষ-জয় কামনা করেন, তাঁহারা ভারতের রাজত্বে

অংশীদার জুটাইতে চাহিতেছেন কেন? তাঁহারাও ত বীরপুরুষ; এবং তাঁহাদের সংখ্যা আফগানদের দশগুণেরও বেশী। আফগানরা রাজা হইলে সুখসম্পত্তির প্রধান অংশটা তাহারাই লইবে। তার চেয়ে ভারতীয় মুসলমানরাই সব কিছু একচেটিয়া করিয়া ফেলিলে মন্দ হয় না।

ভারতবর্ষের সীমার একদিকে আফগানিস্থান যেমন স্বাধীন, আর এক দিকে নেপালও তেমনি স্বাধীন। আফগানিস্থানের নৃপতির মত নেপালের নৃপতিও "হিজ্ ম্যাজেষ্টী" বলিয়া ইংরেজীতে উল্লিখিত হন। নেপালের লোকসংখ্যা হুইটেকারের পঞ্জিকা অনুসারে ৫৬,৩৯,০৯২, চেম্বার্সের এন্সাইক্লোপীডিয়া অনুসারে ৫৫ লাখ এবং ভারতীয় সেন্সাস্ রিপোর্ট অনুসারে ৫৬ লাখ; মোটামুটি আফগানিস্থানের সমান। সাহস,রণনৈপুণ্য ও যুদ্ধানুরাগেও গুর্খারা আফগানদের চেয়ে একটুও নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে একজনও কখনো সানন্দে বলে নাই, যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে নেপালীরা ভারতবর্ষ জয় করিবে। ওটা ভারতীয় হিন্দুদের কল্পনাজল্পনার বিষয়ই নহে। ভারতীয় হিন্দুরা মনে করে, যে, ইংরেজরা চলিয়া গেলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, এবং আফগানিস্থান ও নেপাল, তিব্বত ও চীন প্রভৃতির সহিত বন্ধুভাবে বাস করিবে। স্বদেশের স্বাধীনতা কামনা সবাই করে। অনেক ভারতীয় মুসলমানও নিশ্চয়ই করেন। কোন কোন ভারতীয় মুসলমান যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখা অপেক্ষা আফগানের অধীন দেখিতে ইচ্ছুক, তাহার কারণ কি এইরূপ একটা চিন্তা বা ভাব, "আমরা যখন ভারতবর্ষে প্রধান বা প্রভু হইতে পারিব না, কারণ হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী, তখন বরং আমাদের ধর্ম্মভাই আফগানরা হিন্দুদের রাজা হউক, তবু যেন হিন্দুরা স্বাধীন বা প্রধান না হয়"? এইরূপ হিংসুটে স্বভাব চীনদেশের মুসলমানদের নয়। ভারতীয় মুসলমানরা ভারতবর্ষের অধিবাসী-সমূহের মধ্যে শতকরা যত জন, চীনের মুসলমানরা চীনের মোট অধিবাসীর তার চেয়ে অনেক কম অংশ। ভারতবর্ষে মুসলমানদের যতটা প্রভাব প্রতিপত্তি, চীনে মুসলমানদের তার চেয়ে অনেক কম। তথাপি চীনের কোন মুসলমান নিজের দেশকে আফগান, পারসীক, আরব বা তুর্ক দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছে বলিয়া কখন কোথাও পড়ি নাই, শুনি নাই।

অনেক ভারতীয় মুসলমানের এই যে পরদেশী পরদেশী ভাব, ইহার জন্য আমরা কেবল মাত্র মুসলমানদিগকেই দোষ দি না। তাঁহাদের দোষ আছে। তাঁহাদের অনেকে ভারতীয়ের বংশধর বলিয়া প্রকৃত পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা বিদেশীর বংশধর বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দেওয়া পছন্দ করেন। অনেকেরই স্বদেশী মুসলমান ও হিন্দু অপেক্ষা বিদেশী মুসলমানের প্রতি কার্য্যতঃ দরদ বেশী। কিন্তু অনেক হিন্দু যে ভারতবর্ষকে কেবল নিজেদেরই দেশ মনে করেন, সেটা তাঁদের ভুল ও দোষ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে মুসলমানদিগকে অবজ্ঞেয় ও অস্পৃশ্য এবং সমান সমান ব্যবহারের অযোগ্য মনে করেন, সেটাও তাঁহাদের দোষ ও ভুল।

—

মুসলমানভূয়িষ্ঠ প্রদেশের সংখ্যা বৃদ্ধি

এমন প্রদেশ ভারতবর্ষে কয়েকটি আছে, যাহার অধিবাসীদের মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক মুসলমান। যেমন বাংলা, পঞ্জাব। উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশেও মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী, কিন্তু উহার শাসনকর্ত্তার পদ গবর্ণরের মত নহে এবং উহার ব্যবস্থাপক সভাও নাই। বালুচীস্থানও ঐরূপ প্রদেশ। এই দুটি প্রদেশকে গবর্ণরশাসিত ও ব্যবস্থাপকসভাযুক্ত প্রদেশে পরিণত করা হউক, মুসলমানদের এই একটি দাবী। সিন্ধুদেশে মুসলমানের সংখ্যা অর্দ্ধেকের উপর। উহা এখন বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত এবং বোম্বাইয়ের লাট ও ব্যবস্থাপক সভার অধীন। মুসলমানরা চান, যে, সিন্ধুকে বোম্বাই হইতে আলাদা করিয়া উহার একজন স্বতন্ত্র গবর্ণর নিযুক্ত করা হউক এবং উহার আলাদা ব্যবস্থাপক সভাও হউক। এই তিনটি নূতন গবর্ণরশাসিত ও ব্যবস্থাপকসভাযুক্ত প্রদেশের দাবীর একটা কারণ এই, যে, হিন্দুরা এই প্রকারের অনেকগুলা প্রদেশে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ, অতএব মুসলমানদেরও আরও কতকগুলা এইরূপ প্রদেশে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হওয়া চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নূতন তিনটা "গবর্ণরের প্রদেশ"

গঠিত হইলেও হিন্দুভূয়িষ্ঠ প্রদেশের সংখ্যা মুসলমানভূয়িষ্ঠ প্রদেশের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী থাকিবে। হিন্দুভূয়িষ্ঠ থাকিবে ছয়টি; যথা—মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার-ওড়িষা, ও আসাম। মুসলমানভূয়িষ্ঠ প্রদেশ হইবে পাঁচটি; যথা—বাংলা, পঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচীস্থান, উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ।

কংগ্রেস কমিটির দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবে আছে, যে,সিন্ধুর ভাষা আলাদা বলিয়া সিন্ধুকে আলাদা প্রদেশ করা হউক, এবং সেই কারণে অন্ধ্রদেশ ও কর্ণাটককেও আলাদা প্রদেশ করা হউক। তাহা হইলে হিন্দুভূয়িষ্ঠ প্রদেশ হইবে আটটি। উৎকল, অন্ধ্রদেশ ও কর্ণাটক অপেক্ষা আগে হইতে স্বতন্ত্র গবর্ণর ও ব্যবস্থাপক সভার দাবী করিয়া আসিতেছে, এবং চারিটা প্রদেশে ছড়াইয়া থাকায় উৎকলীয়দের অসুবিধাও বেশী। সুতরাং ন্যায়ানুসারে উৎকলকেও আলাদা প্রদেশ বানাইতে হইবে। তাহা হইলে হিন্দু-ভূয়িষ্ঠ প্রদেশ হইবে নয়টি। তাহার পর যদি গুজরাতী, মরাঠী, তমিল, মলয়ালম, প্রভৃতি ভাষাভাষীরা নিজেদের এক একটা প্রদেশ চায়, তাহা হইলে এইগুলা সবই হিন্দুভূয়িষ্ঠ প্রদেশ হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষে যতগুলা হিন্দুভূয়িষ্ঠ প্রদেশ, মুসলমানভূয়িষ্ঠ প্রদেশও ততগুলা চাই, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা নাই। তবে যদি কালক্রমে প্রত্যেক প্রদেশে, অন্ততঃ অধিকাংশ প্রদেশে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া যায়, তখন কাহারও চালবাজি ব্যতিরেকেও মুসলমানভূয়িষ্ঠ প্রদেশই বেশী হইবে। মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার করুন, অন্য ধর্ম্মের সমালোচনাও করুন; তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বলপ্রয়োগ, ছেলে চুরি বা নারীর উপর অত্যাচার কিম্বা অন্যবিধ অবৈধ উপায়ে দল বাড়াইবার চেষ্টা যেন কোন মুসলমান না করেন। এই উপায়গুলা গর্হিত ও জঘন্য; ইহাতে মুসলমান সমাজের প্রকৃত কোন লাভ হয় না। কেহ যেন মনে না করেন, আমরা কতকগুলা কাল্পনিক দোষের উল্লেখ করিয়া মুসলমানদের নিন্দা করিতেছি। আমরা জানি পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক ধার্ম্মিক মুসলমানের চরিত্র ও সৎকার্য্যের প্রভাবে, এবং মুসলমানসমাজে অনেকটা সামাজিক সাম্য থাকায় মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছে। কিন্তু বলপ্রয়োগাদি দ্বারা এবং বিজিত জাতির নারীদিগকে বাজেয়াপ্ত করিয়াও যে মুসলমানের সংখ্যা বাড়ান হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ ইতিহাসে আছে। সেরূপ প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

—

প্রস্তাবিত নূতন প্রদেশগুলির লোকসংখ্যা, ভাষা ও আয়

বালুচীস্থানকে একটি গবর্ণরশাসিত ব্যবস্থাপকসভা-সমন্বিত প্রদেশ করিবার প্রস্তাবে কংগ্রেস কমিটি সম্মতি দিয়াছেন। কি ন্যায্য কারণে সম্মতি দেওয়া হইয়াছে, বুঝিলাম না। কংগ্রেস ভাষার ভিত্তি অনুসারে ভারত-বর্ষকে নূতন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বিভক্ত করিতে রাজী। তদনুসারে কংগ্রেস কমিটি সিন্ধু, অন্ধ্র ও কর্ণাটকের আলাদা আলাদা গবর্ণরশাসিত প্রদেশ হওয়ায় সম্মত। কিন্তু ব্রিটিশশাসিত বালুচীস্থানে প্রচলিত প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে পষ্‌তো ভাষাই সকলের চেয়ে বেশী লোকে বলে, এবং তাহার প্রায় একতৃতীয়াংশ অন্য লোক বালোচী ভাষায় কথা বলে। অতএব ভাষার ভিত্তি অনুসারে প্রদেশ পুনর্গঠন করিতে গেলে বালুচীস্থানকে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের সামিল করাই উচিত। কারণ, শেষোক্ত প্রদেশেরও প্রধান ভাষা পষ্‌তো।

ব্রিটিশশাসিত বালুচীস্থানকে যাঁহারা একটি গবর্ণর-শাসিত প্রদেশ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন এবং যাঁহারা তাহাতে সায় দিয়াছেন, কোন পক্ষই উহার লোক-সংখ্যার বিষয় অবগত আছেন মনে হয় না। উহার লোকসংখ্যা কেবল মাত্র ৪,২০,৬৪৮। অর্থাৎ উহাতে কলিকাতার পাঁচ আনা রকম লোক বাস করে, এবং দার্জিলিং ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল ছাড়া বাংলার ছোট ও বড় প্রত্যেকটি জেলার লোকসংখ্যা উহার অনেকগুণ বেশী। জিজ্ঞাসা করি, যদি ব্রিটিশ বালুচীস্থানের জন্য একজন আলাদা গবর্ণর ও একটা আলাদা ব্যবস্থাপক সভা চাই, তাহা হইলে মৈমনসিং জেলা কি দোষ করিল? উহার লোকসংখ্যা ৪৮,৩৭,৭৩০, ব্রিটিশ বালুচীস্থানের বার গুণ। ব্রিটিশ বালুচীস্থানের লোকেরা কি এতই ধনী,

তাহারা কি এতই বেশী ট্যাক্স দেয়, যে, গবর্ণরের বেতন, সেক্রেটারিয়েটের খরচ, ব্যবস্থাপক সভার খরচ, এবং অন্যান্য সব খরচ তাহারা দিতে পারিবে ?

শিক্ষার বিস্তার তথায় কিরূপ হইয়াছে, তাহারও খবর লওয়া দরকার। কারণ, রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবার জন্য শিক্ষিত লোক চাই। ব্রিটিশ বালুচীস্থানের প্রধান জাতিদের মধ্যে মোট পুরুষ কত, এবং তাহাদের মধ্যে দেশভাষা ও ইংরেজী লিখিতে পড়িতে জানে মোট কয় জন, তাহার তালিকা নীচে দিতেছি।

জাতি	পুরুষের সংখ্যা	লিখনপঠনক্ষম	ইংরেজী-জানা
সৈয়দ	১০৫৬৭	৪৪৩	১৫
লাসী	১২৩৬৫	২২৮	০
পাঠান	৯৫৮৮৯	১২৫১	৭৮
জাট	'৩৫০৯৫	৩৬৬	২
ব্রাহুই	৮৮৯৬১	৭৮৩	১৪
বালোচ	৯৫৫৬৩	৮০৬	২১

সমুদয় প্রদেশটাতে প্রধান জাতিদের মধ্যে অল্পস্বল্প ইংরেজী জানে মোট ১৩০ জন! এই এক শত ত্রিশজন (না হয় ধরুন ২০০) সামান্যইংরেজী-জানা লোক কেরানীগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও সভাপতি, শাসনপরিষদের সভ্য, মন্ত্রী প্রভৃতি একটা প্রদেশের সব পদের রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবে!

ব্রিটিশ বালুচীস্থানকে গবর্ণরশাসিত প্রদেশ করিবার প্রস্তাব যাঁহারা উত্থাপন ও অনুমোদন করিয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞতায় ও অবিবেচনায় অবাক্ হইয়াছি।

উহার সওয়া চারি লক্ষের কম অধিবাসীরা রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। তাহাদিগকে এই ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভারত গবর্ন্মেণ্টের খুব বেশী সাহায্য লইতে হইবে। তাহার মানে, ভারত গবর্ন্মেণ্ট অন্যান্য প্রদেশের লোকদের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে ব্রিটিশ বালুচীস্থানে কিছু দান খয়রাৎ করিবেন। এইরূপ অন্যায় খরচ করিবার অধিকার কোন গবর্ন্মেণ্টের নাই; এবং ব্রিটিশ বালুচীস্থানেরও এইরূপ পরের ধনে পোদ্দারি করিবার কোন অধিকার নাই।

ব্রিটিশ বালুচীস্থান হইতে রাজস্ব আদায় কত সামান্য হয়, তাহারও কিছু আন্দাজ দিতেছি। ভূমির কর মোট রাজস্বের একটা প্রধান অংশ। ব্রিটিশ বালুচীস্থান হইতে গবর্ন্মেণ্ট ভূকর পান কেবল ৯,৩২১,৩২ টাকা; এর চেয়ে অনেক জমীদারের বেশী আয় আছে। গবর্ণর-শাসিত সব প্রদেশের মধ্যে আসামের মোট ভূকর সকলের চেয়ে কম; তাহাও কিন্তু ১,০৫,৫৩,২৪৭। তাহার পর ধরুন ইন্‌কম্ ট্যাক্স বা আয়কর। ১৯২৪-২৫ সালে বালুচীস্থান ২৮,৫৭৯ টাকা ইন্‌কম্ ট্যাক্স দিয়াছিল। গবর্ণর-শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে আসাম সকলের চেয়ে কম আয়-কর দিয়াছিল; তাহাও কিন্তু ২৩,৭৯,৫৬০ টাকা তার পর দেখুন আবকারীর আয়। ১৯২৪-২৫ সালে উহা আসামে ৬৫,৯৫,৯৩৮, বালুচীস্থানে ৬,৪২,৮১৭ হইয়াছিল। যে-প্রদেশ হইতে গবর্ন্মেণ্টের আয় এত কম, তাহার গবর্ণরের বেতনাদি ব্যয়নির্ব্বাহে অসামর্থ্যের অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক।

উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশকেও গবর্ণরশাসিত ও ব্যবস্থাপকসভা সমন্বিত প্রদেশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহার লোকসংখ্যা মোটে ২২,৫১,৩৪০ মাত্র অর্থাৎ বাংলা দেশের মৈমনসিং, ঢাকা, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, বাখরগঞ্জ ও রংপুর জেলা অপেক্ষা এবং অন্যান্য প্রদেশের সারন, মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, দক্ষিণ আর্কট, তাঞ্জোর, মালাবার ও গোরখপুর জেলা অপেক্ষা উহার লোকসংখ্যা কম। বালুচীস্থান ও উ-প-সীমান্ত প্রদেশ গবর্ণরশাসিত ও ব্যবস্থাপকসভা সমন্বিত হইলে তাহাদের নিজের নিজের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ত হইবেই, অধিকন্তু তাহাদের প্রত্যেকের কয়েকজন করিয়া প্রতিনিধি দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে থাকিবে। কিন্তু অধিকতর লোকসংখ্যা, অধিকতর শিক্ষা ও সভ্যতা, অধিকতর ট্যাক্স দান সত্ত্বেও বঙ্গের ও অন্যান্য প্রদেশসমূহের উল্লিখিত জেলাগুলির ঐ সব অধিকার নাই! তাহা হইলে মানেটা এই দাঁড়াইতেছে, যে, বালুচীস্থান ও উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের লোকেরা অতিমানব, তাহাদের প্রত্যেকের সর্ব্বপ্রকার শক্তিসামর্থ্য ও অধিকার ভারতের অন্যান্য জায়গার এক এক ব্যক্তির শক্তিসামর্থ্য ও অধিকার অপেক্ষা বহু বহু গুণ বেশী!

একথা ছাড়িয়া দিয়া এখন দেখি, গবর্ণর ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি ঠাট বজায় রাখিবার মত টাকা উ-প-সী প্রদেশের আছে কি না। আসাম সকলের চেয়ে কম আয় বিশিষ্ট গবর্ণরশাসিত ও ব্যবস্থাপকসভাসমন্বিত প্রদেশ। কেবল উহার সহিত তুলনা করিলেই চলিবে। আসামে ভূকর আদায় হয় ১,০৫,৫৩,২৪৭ টাকা, উ-প-সী প্রদেশে হয় ২৩,১২,২২৪ টাকা, অর্থাৎ আসামের সিকিরও কম। আসামে আয়কর আদায় ১৯২৪-২৫ সালে হইয়াছিল ২৩,৫৯,৫৬০ টাকা, উ-প-সী প্রদেশে ৬,৫৪,৮১৬ টাকা। আসামে ঐ সালে আবকারীর আয় হইয়াছিল ৬১,৯১,৯৩৮ টাকা, উ-প-সী প্রদেশে ৫,৩৮,১১২ টাকা। আয়ের এই কয়টা দফা হইতেই বুঝা যাইবে, গবর্ণর, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ করা উ-প-সী প্রদেশের পক্ষে অসম্ভব হইবে, উহাকে ভারত গবর্মেণ্টের সাহায্য লইতে হইবে। কিন্তু অন্য সব প্রদেশের টাকা লইয়া তাহা হইতে উ-প-সী প্রদেশকে দান করিবার অধিকার ভারত গবর্মেণ্টের নাই—বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে, ঐ অন্য প্রদেশগুলির প্রত্যেকটিতেই টাকার অভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য অবহেলিত হইতেছে।

উ-প-সী প্রদেশকে স্বতন্ত্র একভাষাভাষী বলিয়াও আলাদা গবর্ণরশাসিত প্রদেশ বানাইবার প্রস্তাব সমর্থন করা যায় না। এখানে পষ্‌তো বলে ১২,০২,৩২৬ জন, পঞ্জাবী বলে ১০,০০,২৫৫ জন; অর্থাৎ প্রায় সমান সমান। পষ্‌তোর হিসাবে বালুচীস্থানের সহিত, পঞ্জাবীর হিসাবে পাঞ্জাবের সহিত ইহাকে জুড়িয়া দেওয়া উচিত।

শিক্ষায় এই প্রদেশ অত্যন্ত অনগ্রসর। ইহার সওয়া দুই লক্ষ লোকের মধ্যে দু লাখের উপর মুসলমান। তাহাদের সম্বন্ধে সেন্সস্‌ রিপোর্টে লেখা হইয়াছে,

"The local Muhammadans, 'who are mainly Pathans, though handy enough with the rifle or sword, are by no means addicted to penmanship; in every thousand of each sex only 24 males and 1 female can read and write."

"স্থানীয় মুসলমানরা প্রধানতঃ পাঠান; তাহারা বন্দুক তলোয়ার চালাইতে বেশ পারে, কিন্তু কলমের প্রতি আসক্তি তাহাদের কোনমতেই নাই। প্রতি হাজার পুরুষে ২৪ জন ও প্রতি হাজার স্ত্রীলোকে একজন লিখিতে পড়িতে পারে।"

আফিস আদালতের কাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবার জন্য কমবেশী ইংরেজী জানা দরকার। কিন্তু উ-প-সী প্রদেশের ২০ ও তদূর্দ্ধ বয়সের ইংরেজী জানা পুরুষদের সংখ্যা ২,২৬৬ জন মাত্র! বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায় এবং অনেক সহরের প্রত্যেকটিতে এর চেয়ে বেশী ইংরেজীজানা লোক আছে।

সিন্ধুদেশের লোকসংখ্যা (৩২, ৭৯, ৩৭৭) মৈমনসিংহের লোকসংখ্যা (৪৮, ৩৭, ৭৩০) অপেক্ষা কম, ঢাকার লোকসংখ্যার (৩১, ২৫, ৯৬৭) প্রায় সমান। সিন্ধুর প্রধান ভাষা সিন্ধী বলা হয় বটে, কিন্তু নিজেদের ভাষা বলিয়া তথাকার হিন্দুরা হিন্দী চালাইতে ও মুসলমানরা উর্দ্দু চালাইতে ব্যগ্র; ফলে সিন্ধীভাষীর সংখ্যা ১৯১১ সালে ৩০,০৭,০০০ হইতে ১৯২১ সালে কমিয়া ২৬,১৮,০০০ হয়।

সিন্ধুদেশের সরকারী আয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র হিসাব সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল য়্যাবষ্ট্রাক্টে দেওয়া নাই। কিন্তু বোম্বাইয়ের ও সিন্ধুর কোন কোন খবরের কাগজে দেখিয়াছি যে, এখন উহার স্বতন্ত্র গবর্ণর ও ব্যবস্থাপক সভা না থাকা সত্ত্বেও উহার আয় হইতে উহার ব্যয় সংকুলান হয় না। সকর নামক স্থানে সিন্ধুনদে বাঁধ বাঁধিয়া কৃত্রিম খাল দ্বারা উহার জল বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে সেচন করিলে সিন্ধুদেশে ফসল বেশী হইবে ও উহার আয় যথেষ্ট বাড়িবে, এইরূপ আশা অনেকে করিতেছেন। কিন্তু অনেকে আশঙ্কাও করিতেছেন, যে, এরূপ সুফল না হইতেও পারে। যদি হয়ও, তাহা হইলেও এখন বাঁধ দিতে ও খাল নির্ম্মাণ করিতে যে বহু কোটি টাকা লাগিবে, তাহা কিম্বা তাহার সুদ দিতে সিন্ধুদেশ অসমর্থ; তাহা বোম্বাই গবর্মেণ্টকে দিতে হইবে।

আমরা গবর্ণরশাসিত নূতন প্রদেশ বানাইবার প্রস্তাবটি আলোচনা প্রধানতঃ লোকসংখ্যা, ভাষা, ও আয়ের দিক্‌ দিয়া করিলাম। যেমন কেহ স্বতন্ত্র ঘরকন্না পাতিতে চাহিলে সংসারখরচের টাকাটা একান্ত আবশ্যক, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও তাহাই। ইহাই আয়ের কথা তুলিবার কারণ। যদি টাকাই না জুটে, তাহা হইলে অন্য যুক্তি বা আপত্তির আলোচনা অনাবশ্যক।

শ্রীনিকেতনে শিক্ষানবিশ গ্রহণ

বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনে উন্নতপ্রণালীর কৃষি, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি, হাতের তাঁতে ধুতি সাড়ী তোয়ালে সতরঞ্চ আসন বোনা, ভেড়ার লোম হইতে কম্বল বোনা, রঙে কাপড় ছোপান, বৃন্দাবনী জয়পুরী প্রভৃতি ধরণে কাপড় চিত্রিত করা, চামড়া কষ করা, ডিমের ব্যবসা, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল কাজের শিক্ষানবিশ লওয়া হয়। বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রীনিকেতনের শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসুকে বীরভূম জেলার সুরুল ডাকঘরের ঠিকানায় চিঠি লিখিলে পাওয়া যাইবে।

—

রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ যাত্রা

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অনেক কাগজে এই সংবাদ বাহির হয়, যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডচ্ গবর্ন্মেণ্ট জাভা দ্বীপে আগমন করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং তিনি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মত লোককে ডচ্ গবর্ন্মেণ্টের নিমন্ত্রণ করা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ডচ্ জাতি শাসকশোষক সাম্রাজ্যাধিপতি জাতি এবং জাভাতে গতবৎসর বিদ্রোহও হইয়া গিয়াছে। তাহাদের আদর্শের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন মানবিক আদর্শের কোন মিল নাই। এইজন্য এ বিষয়ে ঠিক খবর জানিবার নিমিত্ত আমরা রবীন্দ্রনাথকে শিলঙে চিঠি লিখি। জানিতে পারি, যে, ডচ্ গবর্ন্মেণ্টের নিমন্ত্রণ ও তাঁহার তাহা গ্রহণের সংবাদ মিথ্যা। প্রকৃত সংবাদ যাহা তাহা আমরা মডার্ন্ রিভিউ কাগজে ছাপিয়াছি। কিন্তু আমরা যত দূর জানি, যাঁহারা আগে ভুল সংবাদ ছাপিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ভ্রম সংশোধন করেন নাই। একমাত্র ঢাকার ঈষ্ট বেঙ্গল টাইম্‌স্ মডার্ন্ রিভিউয়ে মুদ্রিত ঠিক খবর ছাপিয়াছেন। প্রকৃত সংবাদ নীচে দিতেছি।

বলী দ্বীপে হিন্দুসভ্যতা আলোচনার জন্য কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তথায় লইয়া যাইবার অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। সেখান হইতে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও সে সম্বন্ধে তথায় গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করিবারও তাঁহার ইচ্ছা আছে। তিনি নিজে বোধ হয় সেখানে অল্প দিনই থাকিবেন; সম্ভব হইলে কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য রাখিয়া দিয়া আসিবেন। কাজটিকে তিনি গুরুতর প্রয়োজনীয় মনে করেন। জাভা গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সেখান হইতে যাঁহারা এই বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছেন, তাঁহারা পুরাতত্ত্ববিৎ; আমাদের দেশের পণ্ডিতের সহযোগিতা পাইলে তাঁহাদের সন্ধান কার্য্যের সুবিধা হইতে পারিবে।

রবীন্দ্রনাথ যতই ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখিবেন, তাহাতে বাংলা দেশের এবং জগতের সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক লাভ হইবে। এইজন্য, তাঁহার বিদেশ ভ্রমণের অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও, তাহা বাঞ্ছনীয়। বলী দ্বীপের হিন্দুসভ্যতা আলোচনা, তথা হইতে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও তথায় সে সম্বন্ধে গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা উপযুক্ত কর্ম্মী সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবে। যাঁহাদের এবিষয়ে অনুরাগ, বিদ্যাবত্তা, কার্য্যতৎপরতা এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ বিচার করিবার শক্তি আছে, এরূপ লোক অপ্রাপ্য না হইলেও খুব সহজে প্রাপ্য নহে। আশা করি, রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অন্ততঃ দুইএক জন লোকও পাইয়াছেন।

তিনি যে নিজে বেশীদিন বাহিরে থাকিবেন না, ইহাও ভাল খবর। কারণ, বিশ্বভারতীর বিধিব্যবস্থা প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও, আমাদের দেশের অন্য অনেক কাজের মত ইহারও সাফল্য এখনও ইহার প্রতিষ্ঠাতার মনোযোগ এবং কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। তিনি ইহার প্রাণ, এবং তাঁহাতে কর্ম্মিষ্ঠতা, বিদ্যাবত্তা, মনস্বিতা, কবিপ্রতিভা, সাত্ত্বিকতা ও মানবপ্রেমের একত্র সমাবেশ বশতঃ তিনি ইহার সকল কার্য্য ও চেষ্টার ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমর্থ। অধিকন্তু আমরা জানি, ইহার অধ্যাপক ও ছাত্রেরা তাঁহার সান্নিধ্যের আনন্দ ও উপকার হইতে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকিতে চান না।

—

জাভার ডচ্ শাসন কিরূপ

জাভার ডচ্ গবন্মেণ্টের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ ও তাঁহার তাহা গ্রহণের সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিতে আমরা কেন ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তাহা একটু খুলিয়া বলা দরকার। ডচ জাতি সাম্রাজ্যাধিপতি শাসকশোষক জাতি। তাহারা পৃথিবীর লোককে নানা উপায়ে এই মিথ্যা কথা জানাইতেছে, যে, তাহাদের প্রবর্ত্তিত উপনিবেশশাসন-প্রণালী পৃথিবীর মধ্যে আদর্শস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সত্য এই, যে, তাহাদের অধীনস্থ জাভা সুমাত্রাদির অধিবাসীরা নিজেদের দাসত্ব ও দুর্দ্দশার উচ্ছেদ সাধনের জন্য গত বৎসর বিদ্রোহী হইয়াছিল। এই স্বাধীনতা-লাভ-চেষ্টা আপাততঃ ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার পর প্রায় দুই হাজার "বিপ্লবপ্রয়াসী" কারারুদ্ধ হইয়াছে;—পশ্চিম সুমাত্রায় ১০০, জাভায় ১৩০০। জাভার ডচ আইন অনুসারে বিচার হইলে ইহারা দণ্ডিত হইতে পারিত না; তথাপি তাহাদের শাস্তি হইয়াছে। আমাদের দেশে যেমন গবন্মেণ্ট বিনা বিচারে ৩নং রেগুলেশ্যন ও বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে নিজেদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে লোকের স্বাধীনতা হরণ করিতে সমর্থ, জাভাতেও তেমনি তথাকার ডচ্ গবর্ণর জেনার‍্যাল, যাহাদের দ্বারা "দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা" অর্থাৎ বিদেশীর শাসন ও প্রভুত্বের অনিষ্ট বা বিনাশ ঘটিবার আশঙ্কা করেন, তাহাদিগকে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন। সেই জন্য প্রায় ৮০০ লোককে (ঠিক সংখ্যা জানা নাই) নিউগিনি দ্বীপের একটা নরমাংস-ভোজী অসভ্য লোকদের অধ্যুষিত ম্যালেরিয়া-পূর্ণ অংশে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। অনেকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। কতকগুলি লোককে মুসা-কাম্বাঙ্গানে ডাকাত ও নরহন্তা কয়েদীদের সঙ্গে জেলে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্য অনেকের ১০ হইতে ২০ বৎসরের কারাদণ্ড হইয়াছে।

জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতির "বিদ্রোহী"রা ইহা সত্ত্বেও দমিয়া যায় নাই, বা নিরাশ হয় নাই। তাহারা মনে করে, এই বিফল চেষ্টা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা ভবিষ্যতে আরও শৃঙ্খলার সহিত ও যথেষ্ট আয়োজন করিয়া কাজ করিতে সমর্থ হইবে, এবং স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে।

ডচ্‌দের অত্যাচারের কাহিনী জানিয়া শুনিয়া ডচ্ গবর্ন্মেণ্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমরা পেশাদার সাংবাদিক হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর অনেক গুরুতর খবর সম্বন্ধে যখন অজ্ঞ, তখন অনেক খবর রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত থাকা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না, এই ভাবিয়া তাঁহার জাভা যাত্রা সম্বন্ধে ঠিক্ খবর জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং জানিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, যে, ডচ শাসনতন্ত্রের সহিত তাঁহার ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দর্শনের কোন সম্বন্ধ নাই।

—

শশীমোহন দের অব্যাহতি

শ্রীহট্ট জেলার ফয়েজ উদ্দীন নামক একটা দুরাত্মা অনেক নারীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। শেষে পবিত্রা পাটনী নাম্নী এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবতী বধূর সতীত্বনাশ করিতে গিয়া সে নিহত হয়। তাহার হত্যার অপরাধে শশীমোহন দে নামক একজন আঠার বৎসরের বালক এবং তাহার তিনজন সঙ্গী দায়রা সোপর্দ্দ হয়। বিচারে তাহারা সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা সাতিশয় সন্তোষের বিষয়। নারীর সতীত্ব নাশে চেষ্টিত দুরাত্মার প্রাণবধ করিয়াও নারী রক্ষা একান্ত আবশ্যক পুণ্যকর্ম্ম। ইহার জন্য শাস্তির পরিবর্ত্তে পুরস্কার হওয়াই উচিত। বঙ্গের সর্ব্বত্র খড়্গবাহাদুর ও শশী-মোহনের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছে।

—

বঙ্গে নারীনির্য্যাতন

অন্তঃপুরে ও ঘরের বাহিরে নারীনির্য্যাতন অবিরাম চলিতেছে। হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু নির্য্যাতন বন্ধ করা প্রকৃত কাজ। তাহার চেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে হইতেছে না। বাংলা দেশে এত পশুপ্রকৃতির মানুষ, এত ভীরু কাপুরুষ আছে ভাবিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়াই আছে। উৎপীড়িতা, অত্যাচরিতা, ধর্ষিতা

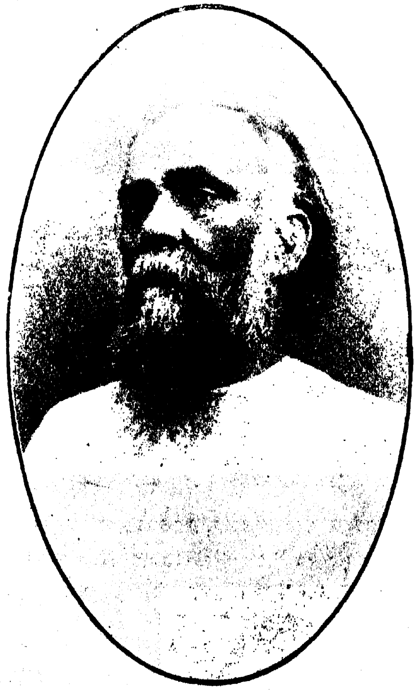
বালিকা ও যুবতীদের ক্রন্দন ও দীর্ঘনিঃশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে। বঙ্গের অধিকাংশ পুরুষ বধির, বা শুনিয়াও শুনিতেছে না। অন্তঃপুরিকাদের নিকট খবর পৌঁছাই কঠিন, পৌঁছিলেই বা পিঞ্জরের পাখী তাঁহারা কি করিবেন? শিক্ষিতা ও কতকটা অবরোধমুক্তা নারীর সংখ্যা বেশী নয়, এবং তাঁহারা এখনও অধিকাংশ স্থলে শিক্ষিত পুরুষদের উপহাসবিদ্রূপের পাত্র। কেহ কেহ আবার নিজেদের আরাম ফ্যাশন প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত।

এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যেও অল্পসংখ্যক ন্যায়বান সহৃদয় সাহসী লোকের অত্যাচার দমন চেষ্টা দ্বারা উৎসাহিত হইয়া নারীহিতৈষীদিগকে কাজ করিতে হইবে। সকল গ্রামে নারীরক্ষাসমিতি স্থাপিত হওয়া উচিত।

—

"পাগল হরনাথ"

"পাগল হরনাথ" বা "ঠাকুর হরনাথ" নামে পরিচিত স্বর্গীয় হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাইয়ের "হরনাথ সমিতি"



"পাগল হরনাথ"

তাঁহার সম্বন্ধে যে ইংরেজী কাগজ পত্র পাঠাইয়াছেন, তদনুসারে তাঁহার জন্মের তারিখ ১৮৬৫ সালের ৩রা জুলাই। "বাঁকুড়াদর্পণ "সময়" হইতে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তারিখ ১৮৭০ সালের ১৮ই আষাঢ় লিখিত হইয়াছে। "সময়" বলেন :—

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ইনি বাঁকুড়া জিলার কুচিয়াকোল ইনষ্টিটিউসন হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান রাজ কলেজ হইতে তদানীন্তন ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ইহার পর তিনি কলিকাতা মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে বি-এ পড়েন। কিন্তু ধর্ম্মের দিকে তাঁহার চিত্ত এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল, যে, লেখাপড়া আর ভাল লাগিতেছিল না। ফলে তিনবার বি-এ পরীক্ষা দিয়াও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি বাঁকুড়া জিলার কোনও একটি স্কুলে ৬ মাসের জন্য শিক্ষকতা করেন। তৎপরে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর ষ্টেটে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া কাশ্মীর গমন করেন। এই কাশ্মীর হইতেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বিকাশ হয় ও তিনি সাধারণে পরিচিত হন। বহু ভক্ত তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ক্রমে ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাঁহার আশ্রম স্থাপনের আবশ্যকতা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, পুরী প্রভৃতি স্থানে তাঁহার আশ্রম আছে।

ইঁহার বাঙালী, গুজরাতী, মান্দ্রাজী, বিহারী ও হিন্দুস্থানী ভক্তেরা সর্ব্বসাধারণের জন্য ইঁহার সম্বন্ধে অলৌকিক-ঘটনাবর্জ্জিত বহি লিখিলে ভাল হয়।

—

সুভাষচন্দ্র ও উইণ্টার্টন

বিলাতী পার্লেমেণ্টে সহকারী ভারতসচিব লর্ড উইণ্টার্টনের মুখ দিয়া বিনাবিচারে বন্দীকৃত বাঙালীদের সম্বন্ধে অনেক বহুবার কথিত মিথ্যাকথা নিঃসৃত হইয়াছে। উইণ্টার্টন জানিয়া শুনিয়া মিথ্যাকথা বলিতে অসমর্থ সাধু পুরুষ কিনা, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে, যে, ভারতবর্ষের সরকারী আফিস-বিশেষ হইতে তাঁহার কাছে যে-সব মিথ্যা কথা প্রেরিত হয়, তাহাই তিনি বাইবেলবাক্যের মত বিশ্বাস করিয়া আবৃত্তি করেন। উইণ্টার্টন বলিয়াছেন, "এই সব বন্দীদের অপরাধ সম্পূর্ণরূপে (আপ্ টু দি হিল্ট্) প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।" ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এই সব রাজবন্দী-দের বিরুদ্ধে কণামাত্র প্রমাণও কখনও কোন আদালত বা বিচারকের সম্মুখে স্থাপিত হওয়া দূরে থাক্, বন্দীদের নিকটও উপস্থিত করা হয় নাই। উইণ্টার্টন বলেন, অন্য বন্দীদিগকে একজন, সুভাষ বসুকে দুইজন জজের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। ইহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সহকারী ভারতসচিব বলেন, "এই সব লোকের বিচার প্রকাশ্য আদালতে এই জন্য করা হয় না, যে, তাহা

হইলে সাক্ষীদিগকে বিপ্লবীরা খুন করিবে।" ইহা বহুবারখণ্ডিত পুরাতন মিথ্যা যুক্তি। ইহার অসত্যতা "বিপ্লবীদের" বহু আধুনিক প্রকাশ্য বিচারে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কাকোরী ষড়যন্ত্রের মামলা। ইহার বিচার এক বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া চলিয়াছিল। আড়াই শত লোকের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কেহ নিহত হওয়া দূরে থাক্, কাহারও গায়ে নখের আঁচড়টা পর্য্যন্ত লাগে নাই।

শাসক জাতিসকলের সেনাদল অস্ত্রশস্ত্র অর্থবল এবং স্বার্থরক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল দলবদ্ধতা ও একতা আছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তাহারা ভীরু। যাহারা সত্য ও ন্যায়কে পদদলিত করে, তাহারাও সত্য ও ন্যায়ের শক্তি ও শ্রেষ্ঠতা কার্য্যতঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়; কারণ, তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে, যে, তাহারা ন্যায় ও সত্যের অনুগত আচরণ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের লোকেরা যে কিরূপ প্রকৃত নেতৃত্ববিহীন, কিরূপ একতাশূন্য, তাহাদের কিরূপ ছত্রভঙ্গ অবস্থা, তাহা এই রাজবন্দীদের ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়। রাজনৈতিক যত রকম মত ও দল দেশে আছে, তাহার সংবাদপত্রসমূহে বিনাবিচারে কাহাকেও বন্দী করা নিন্দিত হইয়াছে। অথচ এবিষয়ে সকল দলের সম্মিলিত কর্ত্তব্য নির্ণয়ের কোন চেষ্টা হয় নাই। হইবে কেমন করিয়া? দেশের কল্যাণ, দেশের সম্মানরক্ষা ত প্রথম, প্রধান, বা একমাত্র লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য দলকে বড় করা, এবং "নেতাদের" ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও স্বার্থ রক্ষা করা।

আমাদের নৈতিক অধঃপতনেরও অনেক প্রমাণ আছে। একটা এই:—

মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত বলিয়াছেন, বাংলাদেশে যে-সব নারী গুণ্ডাদের দ্বারা অপহৃতা ও অত্যাচরিতা হয়, তাহাদের সকলে বা অধিকাংশ আগে হইতেই ভ্রষ্টা ছিল বলিয়া এরূপ হয়। লর্ড লিটন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভারতনারীদের এরূপ কোন নিন্দা নহে, এবং তিনি পরে ভারতনারীদের সতীত্বগৌরব কোন প্রকার "যদি" বা "কিন্তু" বর্জ্জিত ভাবে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার প্রতি সকল দলের সকল কাগজে ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে কত কটু কথা বর্ষিত হইয়াছিল। মিঃ সেনগুপ্ত উক্ত প্রকার জঘন্য কথা যে বলিয়াছেন, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই, কিম্বা তাহার জন্য ত্রুটি স্বীকার করেন নাই। ইহা তিনি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ডাঃ সৈফুদ্দীন কিচলু প্রভৃতির সম্মুখে বলিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার নিন্দা কয়খানি কাগজে, কত বক্তৃতামঞ্চ হইতে হইয়াছে? "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়", প্রবাদের ইহা একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

—

সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তি

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে যে কোন প্রকার সর্ত্তে আবদ্ধ না করিয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতীব সন্তোষের বিষয়। ইহা সরকার বাহাদুরের দয়া নহে। কারণ, যে ব্যক্তি কোন দোষ করে নাই, তাহাকে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখাটাই অস্বাভাবিক ব্যাপার। অস্বাভাবিক



শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু

ব্যবহার হইতে স্বাভাবিকতার দিকে অগ্রসর হইলে তাহাকে দয়া বলে না। ইহা সরকার বাহাদুরের ন্যায়নিষ্ঠার দৃষ্টান্তও নহে। কারণ, যদি সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করা অন্যায় হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহাকে সরকার খালাস দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বাস্থ্যভঙ্গের ওজুহাতে খালাস দেওয়া হইত না; বলা হইত, তিনি নির্দ্দোষ, অতএব খালাস দেওয়া গেল। স্বাস্থ্যভঙ্গের ওজুহাতটাও সম্পূর্ণ সত্য মনে হয় না; কারণ,

তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে বলিয়া ত তাঁহার মুক্তির অনেক পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল। তখন কেন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই? তদ্ভিন্ন স্বাস্থ্যভঙ্গই যদি মুক্তির একমাত্র বা প্রধান কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহারই মত বা তাঁহার চেয়েও বেশী মারাত্মক পীড়াগ্রস্ত বিনাবিচারে বন্দীকৃত অন্য লোকদিগকে কেন খালাস দেওয়া হয় নাই?

বাস্তবিক ঠিক কি কারণে যে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, জানি না। তিনি বিখ্যাত লোক। তাঁহার কথা ভারতে ও ভারতের বাহিরে লোকে জানিয়াছে। বন্দীদশায় তাঁহার মৃত্যু হইলে ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর অন্য কোন কোন দেশের অনেক লোক ভারতের কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারীকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী মনে করিবে, এই আশঙ্কা কোন কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর হইয়া থাকিবে। হয়ত ইহা সুভাষচন্দ্রের মুক্তির একটি কারণ। যাহা হউক, তিনি শীঘ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া আবার লোকহিতে রত হইতে সমর্থ হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

—

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি দয়া

রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা যে রকম গাড়ীতে বসিতে দাঁড়াইতে যতটুকু জায়গা পায় এবং তাহাদের অন্য সুবিধা (অর্থাৎ অসুবিধা) যত, তাহা বিবেচনা করিলে তাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের চেয়ে বেশী ভাড়া দেয়। যাত্রীগাড়ী হইতে রেল কোম্পানীর লাভ প্রধানতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া হইতেই হয়। তথাপি অপমান লাঞ্ছনা ও নানা দুঃখ ভোগ তাহাদের একচেটিয়া। তাহাদের প্রতি রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কেমন সদয়, তাহার একটা উদাহরণ ১৯২৫-২৬ সালের রেলওয়ের একাউণ্ট্যান্ট-জেনার‍্যালের রিপোর্টে পাওয়া যায়। যে ষ্টেশনে ট্রেনে যাত্রীদের টিকিট সচরাচর দেখা হয় না, সেখানে হঠাৎ একদিন টিকিট চেক্ করায় দেখা গেল, ১৫ জন প্রথম শ্রেণীর ১১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর, ৩০ জন ইণ্টারমীডিয়েট শ্রেণীর এবং ১৬০ জন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বিনা টিকিটে সফর করিতেছে। তাহার মধ্যে ২৭ জন ইণ্টারমীডিয়েট ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর নামে রেলওয়ে আইন অনুসারে মোকদ্দমা হইয়াছিল। কিন্তু অধিকতর ধনী ও ভাড়া দিতে অধিকতর সমর্থ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাহারও বিরুদ্ধে কেন মোকদ্দমা করা হইল না, তাহার কারণ রিপোর্টে লেখা নাই।

—

ওলাউঠার টীকা

বঙ্গের স্বাস্থ্যবিভাগের পরিচালক বেণ্ট্‌লী সাহেবের দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে আন্তরিক ইচ্ছা আছে। কিন্তু তিনি যে সমুদয় লোককে ওলাউঠার টীকা দিয়া দেশ হইতে, অন্ততঃ কলিকাতা হইতে, ওলাউঠা তাড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা সমীচীন মনে করি না। ওলাউঠার টীকা যে উহার নিশ্চয়ই নিবারক, তাহা এখনও নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয় নাই। দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জল ও খাঁটি তাজা ভেজালবিহীন খাদ্য জোগাইবার বন্দোবস্ত আগে চাই। নদীর জল, পুকুরের জল, কূপের জল ও কলের জল যাহাতে মলমূত্র দ্বারা ও রোগবীজ দ্বারা দূষিত না হয়, তদুপযুক্ত শিক্ষা ও ব্যবস্থা চাই। যাহাতে মলমূত্রের দ্বারা রোগ সংক্রামিত না হয়, তৎসমুদয় এরূপ ভাবে নিক্ষিপ্ত, রক্ষিত, প্রোথিত ও ব্যবহৃত হওয়া চাই। এইরূপ সমুদয় ব্যবস্থা না করিয়া শুধু টীকা দ্বারা ওলাউঠা কোন্ দেশ হইতে নির্মূল করা হইয়াছে, জানিতে চাই।

—

পূর্ব্ববঙ্গে রেল বিস্তার

পূর্ব্ববঙ্গে নদী খাল সব ক্রমে ক্রমে মজিয়া অব্যবহার্য্য হওয়ায়, কচুরী পানায় আচ্ছাদিত হওয়ায়, ঐ অঞ্চলের নানা অনিষ্ট হইতেছে। মাল ও যাত্রীর জন্য পূর্ব্ববঙ্গে জলপথ ও জলযানই যথেষ্ট হইত, যদি জলপথ রক্ষা ও উন্নতির ব্যবস্থা হইত। তাছাড়া, ভাল রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া মোটর গাড়ী চালাইলেই হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ বৎসরে তথায় ৪০০ মাইল রেলপথ হইবে। ইহাতে যাতায়াতের ও বাণিজ্যের যে সুবিধা হইবে, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই ৩১৫ লক্ষ টাকার দুই তৃতীয়াংশ বিলাতের লোক পাইবে; বিলাতী পার্লেমেণ্টের মেম্বর মিঃ সুইফ্‌ট্‌ ম্যাক্‌নীল পার্লেমেণ্টে ১৮৯০ সালের ১৪ই আগষ্ট বলিয়াছিলেন, "হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, যে, ভারতে রেল বিস্তারের জন্য ব্যয়িত প্রত্যেক শিলিঙের মধ্যে ৮ পেনী বিলাতে আসিয়া পৌঁছে।*" বাণিজ্য-

* "It has been computed that out of every shilling spent in railway enterprise [in India], 8d. makes its way to England." Hansard's Parliamentary Debates, Vol. 248, p. 1051.

বিস্তার যাহা হইবে, তাহা প্রধানতঃ বিলাতী জিনিষেরই হইবে, এবং তাহার দ্বারা গ্রাম্য কারিগরদের অন্ন মারা যাইবে। ম্যালেরিয়া বাড়িবে। নৌকানির্ম্মাণ ও বহায় নিযুক্ত বিস্তর লোকের অন্ন মারা যাইবে। জলপথের অবনতি হওয়ায় আরও নানা প্রকারে দেশের অবনতি হইবে।

কলিকাতার ভাইস্-চ্যান্সেলারের উপর আক্রমণ

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ভাইস্-চ্যান্সেলার হইয়া নানাদিকে যথাসাধ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার নিয়োগে যে দলের লোকদের চাঁইগিরি যায় যায় হইয়াছে, তাহারা নানা মিথ্যা কথা রটাইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেছে। যে সব মিথ্যা কথা ফরোআর্ড লিখিয়াছিল, অন্য অনেক কাগজে তাহা খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু ফরোআর্ড দোষ বা ভ্রম স্বীকার করে নাই। ভাইস্-চ্যান্সেলারের অঙ্গুলিনির্দ্দেশে পরীক্ষায় পাশ ফেল বেশী হয়, এই যে ধারণা, ইহাকেই ভিত্তি করিয়া ফরোআর্ড যদুবাবুকে আক্রমণ করিয়াছিল। চাঁইয়েরা ইহার দ্বারা যে নিজেদের দেবতাকেই অপদস্থ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। আগেকার কর্ত্তার আমলে পরীক্ষায় খুব বেশী পাশ তাঁহার আদেশে হইত বলিয়াই, এখন এই মিথ্যা কথা রটান হইয়াছিল, যে, যদুবাবুর আদেশে ফেল বেশী হইতেছে। সত্য কথা কিন্তু এই, যে, যদুবাবুর এ বিষয়ে কোনই আদেশ ছিল না, থাকিতে পারে না, এবং মোটের উপর ফেলও বেশী হয় নাই। যদুবাবুর নিয়োগে অনেকের চাঁইগিরি গিয়াছে, এবং তাহাদের আশ্রিত অনেকের "উপরি পাওনা"ও গিয়াছে; আক্রোশের ইহা অন্যতম কারণ।

—

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর দান

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশী বিদেশী অনেকে লাখ দুলাখ টাকা দান করিয়াছে। সকলের চেয়ে বড় ও প্রশংসনীয় দান বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ১৫ লাখ টাকা। কলিকাতা ক্লাইব ষ্ট্রীটের বিলাতী কর্ত্তারা, এবং বড়বাজারের ক্রোড়পতি মাড়োয়ারী-ভাটিয়ারা দেখিয়া শিখুন।

কলিকাতায় বকরীদ

এবার কলিকাতায় বকরীদ, মানুষদের পক্ষে, শান্ত ভাবে অতিক্রান্ত হইয়াছে—গোরুদের পক্ষে নয়। ষ্টেটস্‌ম্যান বলিতেছেন, ইহা পুলিসের অর্থাৎ টেগার্ট সাহেবের বন্দোবস্তের ফলে যতটা হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাবের ফলে ততটা নহে। সুতরাং ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে, গত বৎসর যে কয়েক বার কলিকাতায় সাংঘাতিক দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহা নিবারণ করাও পুলিসের সাধ্যায়ত্ত ছিল, কিন্তু নিবারণের যথেষ্ট বন্দোবস্ত হয় নাই। কেন হয় নাই?

—

এডিনবরায় বর্ণবিদ্বেষ

এডিনবরায় নাচের হলে ও কতকগুলা ভোজনালয়ে অশ্বেতকায় বলিয়া ভারতীয়দিগকে যাইতে দেওয়া হইবেনা, ঐসকল স্থানের কর্ত্তারা এরূপ নিয়ম করায় এডিনবরা-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের ও এখানকার ভারতীয়দের ক্রোধ হইয়াছে। হইবারই কথা। পৃথিবীতে, ইউরোপে, এডিনবরার মত বা তার চেয়ে সস্তায় উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টতর শিক্ষার জায়গা অনেক আছে। আমাদের ছাত্রেরা যেন সেই সব জায়গায় যান। ভারতীয় বলিয়া ভারতীয়দিগকে নৃত্যশালায় যাইতে না দেওয়াটা অপমানকর বটে; কিন্তু বিলাতী নৃত্যশালাগুলায় গেলে বিদ্যা বাড়ে না চরিত্রের উন্নতি হয় না; সুখ লাভের উহা অপেক্ষা নির্দোষ ও উৎকৃষ্ট উপায় এবং জায়গাও আছে।

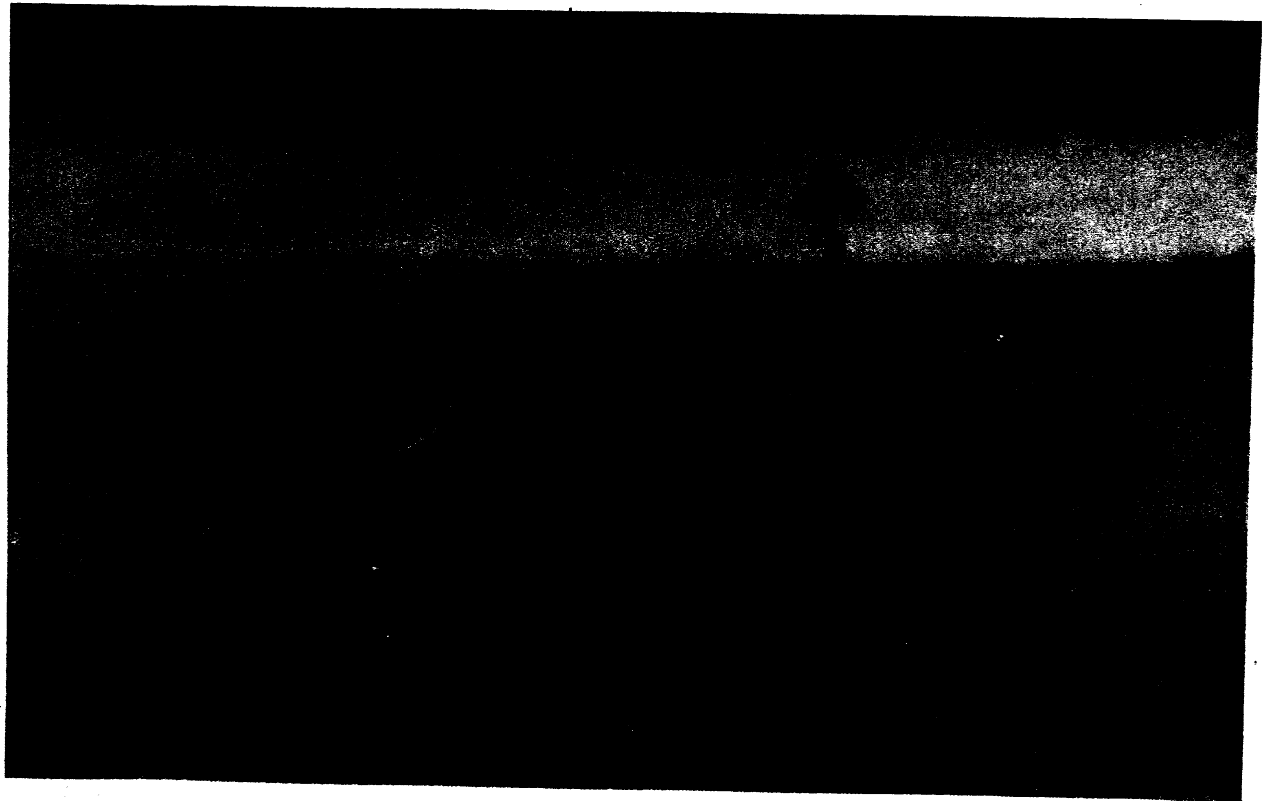
শ্বেতকায়েরা আমাদের গায়ের রং ময়লা বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করায় আমরা চটি। কিন্তু যে-মেয়ে ফরসা নয়, তার বিয়েতে জামাই বাবাজিরা ও জামাইয়ের বাপমায়েরা বেশী দাম আদায় কেন করেন? সে গুণবতী এবং তার গঠন ও মুখ চোখ নাক সুন্দর হইলেও করেন। কাল পাঁচপাঁচি মেয়ের ত কথাই নাই। এটা কি বর্ণবিদ্বেষ বা বর্ণঅবজ্ঞা নয়? তখন বাবু সাহেবরা চটেন না কেন?

—

ভ্রম সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর পুস্তক-পরিচয়ে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের (Origin and Development of the Bengali Language and Literature) সমালোচক শ্রী জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস—ভ্রমক্রমে-মুদ্রিত শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য নহেন।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। P. 116-27



গোচারণের মাঠ
শিল্পী শ্রী অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

২য় সংখ্যা

বর্ষ-শেষ

যাত্রা হয়ে আসে সারা,—আয়ুর পশ্চিম পথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।
অস্তসূর্য্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ রন্ধ্র টুটি'
ছড়ায় ঐশ্বর্য্য তার ভরি' দুই মুঠি।
বর্ণ-সমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা,
জীবনের হেরিনু মহিমা।

এই শেষ কথা নিয়ে নিঃশ্বাস আমার যাবে থামি',
—কত ভালোবেসেছিনু আমি।
অনন্ত রহস্য তারি উচ্ছলি' আপন চারিধার
জীবন মৃত্যুরে দিলো করি' একাকার ;
বেদনার পাত্র মোর বারম্বার দিবসে নিশীথে
ভরি' দিলো অপূর্ব্ব অমৃতে ॥

দুঃখের দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেছি একাকী,
হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী।

কতদিন সঙ্গীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা,
তারি মাঝে অন্তরেতে পেয়েছি ইসারা।
নিন্দার কণ্টকমাল্যে বক্ষ বিঁধিয়াছে বারে বারে,
বরমাল্য জানিয়াছি তারে॥

আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্ণিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে-লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম-উপবনে,
পেয়েছি তাঁহার স্পর্শ সর্ব্ব অঙ্গে মনে।
যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে,
তারে আমি ধরেছি বাঁশীতে।

যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্ব্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার।

লভিয়াছি জীবলোকে মানব-জন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্ম্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি'
জানি তাহা সকলের বলি'।

ধূলির আসনে বসি' ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।

যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ,
　　আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধ-মুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
　　তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে,
　　স্থান মোর সেই ইতিহাসে॥

শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ যিনি যতবার ভুলি কেন নাম,
　　তবু তাঁরে করেছি প্রণাম।
অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্ব্বাদ;
　　উষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ।
এ আশ্চর্য্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
　　মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হ'বে॥

আজি এই বৎসরের বিদায়ের শেষ আয়োজন,
　　মৃত্যু, তুমি ঘুচাও গুণ্ঠন।
কত কি গিয়েছে ঝ'রে, জানি জানি কত স্নেহ প্রীতি
　　নিবায়ে গিয়েছে দীপ রাখে নাই স্মৃতি।
মৃত্যু, তব হাত পূর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন ক্ষণে,
　　ওগো শেষ, অশেষের ধনে॥

৩০শে চৈত্র ১৩৩৩

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের পত্র *

(১)

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার জন্মদিনের জন্যে তিনটে ধাঁধাঁ চেয়ে পাঠিয়েছ। কিন্তু তুমি নিজেই এমন একটি ধাঁধাঁ তৈরি করেছ যে, আমি তার কিনারা করতে পারছিনে। তোমার চিঠি যখন এল তখন তোমার জন্মদিন পেরিয়ে গেছে—তোমার সেই গেল-জন্মদিনে আমার ধাঁধাঁ পৌঁছবে কি ক'রে? তা ছাড়া আর-একটা মুস্কিল আছে—আমি অনেক রকম লেখা লিখেছি, কিন্তু জেনে শুনে ইচ্ছে ক'রে ধাঁধাঁ লিখিনি। আমার অনেক লেখা অনেক লোকে ধাঁধাঁ ব'লে মনে করে, কিন্তু সেরকম ধাঁধাঁ ত কারো ভালো লাগে না। কিন্তু রোসো—মনে পড়ছে অনেক দিন আগে যখন তুমি জন্মাওনি, হয়ত তোমার মাও জন্মাননি, তখন ছেলেদের জন্যে কখনো কখনো হেঁয়ালি তৈরি করেছি। তারি থেকে তিনটে তোমাকে পাঠাই—আসছে বছরের জন্মদিনের আগে হয়ত তুমি পাবে।

(১) তিন অক্ষরের কথা। প্রথম ও শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে কাণ থাকে না। শেষ দুটো অক্ষর ছেড়ে দিলে মান থাকে না। সমস্তটা ছেড়ে দিলে প্রাণ থাকে না।

(২) চার অক্ষরের কথা। প্রথম দুটো অক্ষর একটি প্রাণী, শেষ দুটো অক্ষর তার বন্ধন। সমস্ত কথাটার মানে হচ্ছে বাঁধা পড়লে সেই প্রাণীর অবস্থা।

(৩) তিন অক্ষরের কথা। তার প্রথম অংশটাকে ইংরেজি শব্দ ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। তারো যা মানে বাকি অংশটারও সেই মানে, সমস্ত কথাটারই সেই একই মানে॥ ইতি ১২ বৈশাখ ১৩৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী
"রবি-বাবু"

(২)

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি আর ফুলদিদি দুই বোনে আমার দুই ধাঁধাঁর উত্তর ঠিক বের ক'রে দিয়েছ। কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার বাবা ধাঁধার উত্তর বের করবার বয়স পেরিয়ে গেছেন। আমার তৃতীয় ধাঁধাঁর উত্তর হচ্ছে সংগীত। Song গীত। প্রথম অংশটাকে ইংরিজি শব্দ ব'লে ধ'রে নিলে তারও যা মানে, তার পরের অংশেরও সেই মানে, সমস্ত কথাটারও সেই মানে।

আমি কেমন আছি জানতে চেয়েছ। খুব ভালো আছি। ছেলে-বেলায় অসুখ করলে খুসি হতুম, ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হ'ত। কিন্তু তখন শরীর এত সুস্থ ছিল যে, শরীরের উপর ভারি রাগ হ'ত। এখন শরীরটাকে অত্যন্ত সুস্থ ব'লে কেউ দোষ দিতে পারবে না—বেশ অনেক দিন ধ'রে অসুখ ক'রে আছে। ছুটি পেয়েছি। প্রায় সমস্ত দিন, রাত্র দুপুর পর্য্যন্ত বাইরে ব'সে থাকতে পাই—কেউ বক্তৃতা করতে ডাকে না, তুমি ছাড়া কেউ ধাঁধাঁ চেয়ে পাঠায় না, চিঠি লিখলেও জবাব দিইনে। ছেলেবেলায় ছুটির দিনে খেলা ছিল মাটির উপর ধুলো নিয়ে, আজ ৬৫ বছর বয়সে আমার খেলা নীল আকাশের উপর ভাবনা নিয়ে। কিসের ভাবনা? সেই বয়সে মন ফিরে গেছে ব'লেই তোমার বয়সের মেয়ের চিঠির জবাব দিতে

* "প্রবাসী" এবং অন্যান্য মাসিকপত্রে বিজ্ঞাপনের উত্তরে ছোট একটি মেয়েকে লেখা কবির এই কয়খানি চিঠি আমরা পাইয়াছি। শেষ কবিতাটি রচনা করিয়া কবি তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার ঋণশোধ করিলেন।

—সম্পাদক, "প্রবাসী"

ডাক্তারের নিষেধ মানিনে। আমার একটি সঙ্গিনী আছে, তার বয়স তিন—তাকে দিনের মধ্যে পাঁচ ছ বার বাঘের গল্প বল্‌তে হয়। আমার অন্য সব কাজ গিয়ে এই একটাতে এসে ঠেকেছে। আমার মনিবটি বড় শক্ত, কিছুতে ছুটি দেয় না।

আমার জন্মদিনের জন্যে যে খাতাটি পাঠিয়েছ ঠিক দিনে সেটি খুল্‌ব। আমাদের দেশে দোকানদাররা বৎসরের প্রথম দিনে নতুন খাতা খোলে। আমিও আমার ৬৫ বছর বয়সের দিনে তোমার হাতের দেওয়া নূতন খাতা খুল্‌ব। কিন্তু আজকাল খাতা ভর্ত্তি কর্‌বার মত মূলধন বেশি নেই। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ডাক্তারের কড়া হুকুমে চিঠিপত্র লেখা কমিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু তুমি লিখেছিলে এক বছরের মধ্যে তুমি ভালো মেয়ে হ'য়ে উঠ্‌বে তাই শুনে তোমাকে আমার এই শেষ আশীর্ব্বাদ পাঠাচ্ছি। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়ে উঠলে সবাই আমার চিঠির গুণব্যাখ্যা কর্‌বে এ লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লুম না।

তা ছাড়া তুমি আমাকে আরো একটা মস্ত লোভ দেখিয়েছ। আমাকে বলেছ, আমি "খুব ভালো লোক।" তোমাকে আমি চিঠি লিখেছি এই হচ্ছে তার একটিমাত্র প্রমাণ। এত সহজে এত বড় খ্যাতি আমার জীবনে আর কখনো পাইনি। এ জগতে দুঃসাধ্য ভালো কাজ ক'রেও "ভালো" উপাধি সব সময়ে মেলে না। তাই তোমার কাছ থেকে আমার "ভালো" উপাধি আরো পাকা ক'রে নেবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখ্‌লুম। অতি অল্প দিনের মধ্যেই জাহাজে চ'ড়ে সমুদ্রে পাড়ি দেব। অতএব এ চিঠির উত্তরে তোমার কাছ থেকে দ্বিতীয় প্রশংসাপত্র পাবার আশা নেই। ফিরে এসে যদি কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হয় তা'হ'লে দেখতে পাবে "রবিবাবু" তোমাদেরই মত ছোট ছেলে-মেয়েদের বন্ধু। ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। ইতি ৭ আগষ্ট ১৯২৫

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪)

লিখ্‌তে যখন বলো আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি, কাঁচা কলম
নাচ্‌বে আজও আমার হাতে।
সেই কলমে আছে মিশে
ভাদ্রমাসের কাশের হাসি,
সেই কলমে সাঁঝের মেঘে
লুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশি।
সেই কলমে শিশু দোয়েল
শিস্ দিয়ে তার বেড়ায় উড়ি'।
পারুল দিদির বাসায় দোলে
কনক চাঁপার কচি কুঁড়ি।
খেলার পুতুল আজো আছে
সেই কলমের খেলা-ঘরে;
সেই কলমে পথ কেটে দেয়
পথহারানো তেপান্তরে।
নতুন চিকন অশথ-পাতা
সেই কলমে আপ্‌নি নাচে।
সেই কলমে মোর বয়সে
তোমার বয়স বাঁধা আছে॥

৮ই বৈশাখ ১৩৩৪ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীনিকেতন

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসন্তের বাণী অংশের সব জায়গাতেই প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণ সমীরণে; হয়ত কোনো গাছ নির্জ্জীব, এই আহ্বানের সে জবাব দিলে না—সে তার পত্রপুষ্প বিকশিত করলে না, সে মূর্চ্ছিত হ'য়েই রইল। যে গাছের অন্তরে রসের ধারা আছে বসন্তের রস-উৎসবের নিমন্ত্রণে সে পত্র পুষ্পে বিকশিত হ'য়ে উঠে। বিশ্বপ্রাণের আহ্বানে যখন বিশেষ প্রাণের মধ্যে তরঙ্গ ওঠে তখনই ত উৎসব।

আমাদের দেশেও নিয়ত ডাক পড়ছে, দৈববাণী আকাশে বাতাসে নিয়তই নিঃশ্বসিত। যেখানে সে-বাণী সাড়া পায়, প্রাণ জেগে ওঠে, সেখানেই আমাদের উৎসব-ক্ষেত্র রচিত হয়; সৃষ্টি-কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্ত আপনাকে উপলব্ধি করতে থাকে।

আমাদের শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে একদিন এই আহ্বানধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই আহ্বানকে যে পরিমাণে স্বীকার করা হয়েছে সেই পরিমাণে আমাদের সকলকে উপলক্ষ্য ক'রে একটি সৃষ্টির সূচনা হ'ল। কোথায় যে তার শেষ তা কেউ বলতে পারে না। সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে পর্ব্বতশিখরে নিশ্চল কঠিন তুষার যেদিন গ'লে যায়, সেদিনকার স্রোতের ধারা যে কোন্ কোন্ দেশকে ফল-শালী ক'রে সাগরে গিয়ে পৌঁছবে সেদিন তা কেউ নিশ্চিত জানে না। কিন্তু গতি যেই সঞ্চারিত হয় অমনি সে তার আপন বেগে আপনার ভাগ্যকে বহন ক'রে চলে। কত বিচিত্র শাখায় যে তার পরিণতি হ'বে সে তার অগোচর, এইটুকুতেই তার সার্থকতা যে, তার রুদ্ধশক্তি মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তির একটি রূপ আমাদের এই প্রান্তরে একদা দেখা দিয়েছিল। এখানে একদিন আমরা কোনো একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছিলাম, তাই নিয়ে আত্মাভিমানের ছোট কথাটি আজকের কথা নয়। আমা-দের আনন্দ হচ্ছে এই যে, এইখানে পরম ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার মিলন হ'বার চেষ্টা জেগেছে; সেই মিলন-সাধনের তপোভূমি প্রস্তুত।

আজ তপস্যার দীক্ষাগ্রহণের স্মরণের দিন। আজ মনকে নম্র কর, আপনার মধ্যে যে-দীনতা রয়েছে তার বন্ধন ছিন্ন কর—আনন্দে এবং গৌরবে। আজকে বিচার ক'রে দেখতে হবে যে-কাজের ভার নিয়েছি তার প্রকৃতি কি। আমাদের উদ্বৃত্তটু নিয়ে আমরা দাতা বৃত্তি করতে চাইনি। দেশের মধ্যে যে প্রাণ-শক্তি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে তাকে সতেজ করবার সঙ্কল্প আমাদের। এই প্রাণের দৈন্যই আমাদের সকলের চেয়ে বড় অপমান—বাইরের অপমান তারই আনুষঙ্গিক।

পশ্চিম মহাদেশে আমরা দেখেছি যে, সেখানে মানুষ বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে আপন শক্তিকে সংহত করে। প্রধানত সেখানকার সহরগুলিই তার প্রাণের আধার। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য দেশে, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে ও চীনে প্রাণ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল গ্রামে গ্রামে সকল দেশে। সামাজিক দায়িত্ব-বোধের স্বতঃশ্চেষ্ট স্নায়ুজাল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু আমাদের কোন্ ভাগ্য দোষে সমাজের সেই ব্যাপক ব্যবস্থার সূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল। রাজশক্তি আমাদের সেই সমাজশক্তির স্বাধীন স্ফূর্ত্তিকে চারদিক থেকে নিরস্ত ক'রে দিলে। তার প্রাণের প্রবাহ আপনার যে-খাদে সহজে সঞ্চরণ করত, ব্যবসা বাণিজ্য ও শাসনকার্য্যের সুবিধা করবার জন্যে তারই মাঝে মাঝে বাঁধ তুলে দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলে। এই বাঁধগুলিই হচ্ছে সহর। এ আমাদের দেশের প্রাণ-প্রকৃতির মূলে ঘা দিয়েছে। সহরের সমারোহ আপন কৃত্রিম আলোর তীব্রতায় দেখতেই দিচ্ছে না, তার বাহিরে ঘন দুঃখের ছায়া কিরূপ অন্তহীন। অন্ন নেই, জল নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, আনন্দ নেই; আলোর পর আলো একে একে নিবল। যদি দেখতুম যা হারিয়েছি,

সঙ্গে তা বহুগুণিত আকারে ফিরে পেলুম তাহ'লেও সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু যা পাওয়া গেল সেত কলকারখানার জিনিষ, আপিস আদালতের জিনিষ, বেচা-কেনার জিনিষ, সে ত স্বপ্রকাশ প্রাণের জিনিষ নয়। তাতে সুবিধা আছে, কিন্তু শক্তির স্বকীয়তা নেই। দেশ সেখানে আপনাকে উপলব্ধি করে না,—সেখানে যেটুকু মহিমা, সে তার নিজের মহিমা নয়। এই পরকীয়ের অভিসারে সে আপন কুল খোয়াতে বসেছে।

এ দুর্গতি কিসে দূর হ'বে?

ছোট ছোট আনুকূল্যের দ্বারা ত হ'বে না। বাইরের থেকে একটা একটা অভাবের তালিকা প্রস্তুত করে দেখা সমস্যাকে খণ্ড ক'রে দেখা। যে মূলের থেকে তারা সকল অভাব শাখায়-প্রশাখায় ছড়াচ্ছে, সে হ'চ্ছে প্রতিহত চিত্তধারার শুষ্কতা। মানুষের চিত্ত যেখানে সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থকে আপন শক্তির যোগে উদ্বোধিত করে। তার থেকে সে যা-কিছু ফল পায় সে-ফল তত মূল্যবান নয় যেমন মূল্যবান তার এই সচেষ্ট আত্মশক্তির উপলব্ধি। এতেই তার সকলের চেয়ে বড় আনন্দ, কেননা মানুষের সকলের চেয়ে বড় পরিচয় হ'চ্ছে, সে সৃষ্টি-কর্ত্তা। আমাদের এই আপন সৃষ্টি-শক্তির মধ্যে আমরা বিশ্বস্রষ্টার স্পর্শ পাই। তার সঙ্গে সহযোগিতাতেই আমাদের গৌরব, আমাদের কল্যাণ। যেখানে সেই সহযোগিতার বিচ্ছেদ, সেইখানেই আমাদের যত কিছু দুর্গতি। যেখানে বিশ্বসৃষ্টিতে আমাদের কাজের বিধান নেই, কেবল ভোগের বরাদ্দ, সেইখানে ত আমরা পশু। মানুষ আপন ভাগ্যকে আপনি গ'ড়ে তোলে, সেই তার আপন জগৎ। আত্মকর্তৃত্বের, আত্মসৃষ্টির সেই জগৎ যদি হারিয়ে থাকি, তবে সবই হারিয়েছি। মানুষের মধ্যে যিনি ঈশ্বর আছেন তাঁর উদ্বোধন করতে হ'বে। আমরা এই গ্রামের দ্বারে এসে সেই দেবতাকে ডাক্‌ছি, অন্তরের মধ্যে রুদ্ধ-দ্বার হ'য়ে রয়েছেন ব'লে যাঁর পূজা হচ্ছে না। মানুষ জড়ের মতন হ'য়ে রয়েছে শুষ্ক কাষ্ঠের মতন, যার ফল নেই, ফুল নেই। মনুষ্যত্বের এত বড় অবমাননা ত আর হ'তে পারে না।

প্রশ্নকারী বল্‌তে পারেন, তেত্রিশ কোটির তোমরা কি করতে পার? কিন্তু বিধাতা তো তেত্রিশ কোটির ভার আমাদের হাতে দেননি? তিনি শুধু একটি প্রশ্ন করেন তুমি কী করছ? যে কার্য্যক্ষেত্র তোমার সেখানে তুমি নিজেকে সত্য করেছ কিনা? তেত্রিশ কোটির কি করতে পারি, এ প্রশ্ন যাঁরা করেন তাঁরা সত্যকাজের পথকে রুদ্ধ করেন। দুঃসাধ্য সাধনের চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু অসাধ্য সাধনের চেষ্টা মূঢ়তা। যারা আমাদের চারদিকে রয়েছে তাদের মধ্যে যদি সত্যকার আগুন জ্বল্‌তে পারি, তবে সে আগুন আপনি আপনার শিখার পতাকাকে বহন ক'রে চল্‌বে। আমাদের সাধনাকে যদি ছোট জায়গায় সার্থক ক'রে তুলি, তাহ'লে বিশ্বের বিধাতা স্বয়ং সেখানে আসেন, এই ক্ষুদ্র চেষ্টার মধ্যে তাঁর শক্তি দান করেন। সংখ্যায় আয়তনে বিশ্বাস ক'রো না। সত্য ক্ষুদ্রায়তন হ'লেও দিগ্বিজয়ী। আপনার অন্তরের দীনতাকে দূর করো; তপস্যাকে সার্থক ক'রে তোল; তাহ'লে এ ক্ষুদ্র চেষ্টা দেশের সর্ব্বত্র প্রসারিত হ'বে—শাখা থেকে প্রশাখায় বিস্তৃত হবে, বৃহৎ বনস্পতি হ'য়ে ছায়াদান করতে পারবে, ফলদান করতে পারবে।*

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* শ্রীনিকেতন সাম্বৎসরিক উৎসবোপলক্ষ্যে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম। বক্তা কর্তৃক লিখিত।

খোয়াজা ইমাম্ অবুলফতেহ ওমর-বিন-ইব্রাহীম-অল-খৈয়ামী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রী অমৃতলাল শীল

আজকাল বাঙ্গালী পাঠকেরা সকলেই ওমর খৈয়ামের নাম শুনিয়াছেন। তাঁহার কতকগুলি রুবাঈ [চতুষ্পদী কবিতা] ইংরাজি কবিতায় অনুবাদ করিয়া ১৮৫৯ ঈশাব্দে ফিটস্‌জিরল্‌ড্ (Fitzgerald) তাঁহাকে আপনার দেশবাসী ও ভাষাভাষীদের কাছে ইরানের কবি রূপে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর নানা ভাষাতে ঐ কবিতাগুলি অনুবাদিত হইয়াছে; অন্য ইউরোপীয় কবিরাও খৈয়ামের মূল কবিতা আপনার আপনার ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বঙ্গীয় কবিরা ফিটস্‌জিরল্‌ডের কবিতাগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। খৈয়ামের দেশবাসীরা, কিন্তু, তাঁহাকে কোন কালে কবির আসন দেন নাই। প্রাচীন কাল হইতেই ইরানে পার্সী ভাষায় তজকরাৎ-উল শোয়রা [কবিদের বিবরণ] অনেকগুলি লেখা হইয়াছে; এরকম কোনও পুস্তকে কোনও লেখক তাঁহাকে কবি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কয়েকখানি তারীখ-উল-হুকমাতে [দার্শনিকদের ইতিহাসে] তাঁহার নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়। যে প্রাচীনতম গ্রন্থে তাঁহার বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা ১১৫৫ ঈশাব্দে রচিত; ও তাহার নাম চহার-মকালা। তাহার প্রণেতা কবি নিজামী উরূসী খৈয়ামের কাছে দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, তিনি বাল্যাবস্থা হইতেই খৈয়ামকে ভাল করিয়া জানিতেন। খৈয়াম সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের দেখা কথা, পরের কাছে শোনা কথা নহে, অতএব বিশ্বসনীয়। তিনি খৈয়ামের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে একমত না হইলেও তাঁহাকে একজন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বান, বৈয়াকরণ, দার্শনিক, ইতিহাসজ্ঞ, কারী, (১) চিকিৎসক, ও গণিত এবং ফলিত জ্যোতিষী রূপে জানিতেন।

চহার-মকালা শব্দের অর্থ চার পর্ব্ব, উহা চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিজামী বড় বড় গদ্য-লেখকদের কথা, দ্বিতীয় ভাগে পদ্য-লেখক কবিদের, তৃতীয় ভাগে নজুমী [ফলিত জ্যোতিষী]-দের ও চতুর্থ ভাগে চিকিৎসকদের কথা লিখিয়াছেন। তিনি কেবল তৃতীয় ভাগে ফলিত জ্যোতিষীরূপে খৈয়ামের কয়েকটি গল্প দিয়াছেন। তাঁহার পর জমাল উদ্দীন কফতী, শহর জোরী, দওলৎ শাহ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখকেরা খৈয়ামকে হকীম [দার্শনিক] ও নজুমীরূপেই বর্ণিত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই খৈয়ামের সম্বন্ধে হুজ্জৎ-উল-হক [হুজ্জৎ = প্রমাণ। হক = সত্য। সত্যের প্রমাণ স্বরূপ, Authority, যে বিদ্বানের বচন বা অবজ্ঞা সত্যের প্রমাণ স্বরূপ, যাঁহার আদেশের উপর আর তর্ক করা চলে না] অ-অল্লম্-ইলম্-ইউনান [ইউনান দেশের বিদ্যায় অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়] ও অল্লামা- জমা [সেকালের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিদ্বান, greatest scholar of the age] শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কবি বলেন নাই।

ইরানে বিদ্বান মাত্রেই পদ্যরচনা করিতে অভ্যাস করেন ও পদ্যে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করেন। যে কিছু পদ্য রচনা করিয়াছে সে-ই যদি কবি হয় তবে অবশ্য খৈয়াম কবি ছিলেন। একজন ইউরোপবাসী পারসী ভাষায় পণ্ডিত ইরানের শ্রেষ্ঠতম সূফী কবি (mystic poet Moulana Room) মওলানা রূমের শ্রেষ্ঠতম কাব্য গ্রন্থ মসনবীর অনুবাদ করিয়া পরে ঐ কবিতার সহিত খৈয়ামের কবিতার তুলনা করিয়াছেন, ও নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, খৈয়ামের কবিতাতে মওলানা

(১) বেদ যেমন সুর করিয়া পড়িতে হয়, সেইরূপ কোরাণও বিশেষ সুর ও উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হয়। ইহা এক বিশেষ প্রকার বিদ্যা (Science)। এবিদ্যাকে "কিরয়ৎ" ও পাঠককে 'কারী' বলে। কোরাণ সাত প্রকার সুরে পড়া যায়। খৈয়াম সকল প্রকার সুরে পড়িতে পারিতেন, ও এবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

রুমের কবিতার মত সূক্ষ্ম ও উচ্চ ভাব নাই, ও খৈয়াম সুরা সম্বন্ধে এত কবিতা লিখিয়াছেন যে তাঁহাকে অহঙ্কারী সুরোন্মত্ত ও মাতাল কবি (A Study in vanity and Dipsomania এবং Bacchanalian Poet) বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার সমালোচনা দেখিয়া বোধ হয়, তিনি খৈয়ামের ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মওলানা রুমের মস্‌নবীর সহিত খৈয়ামের কবিতার তুলনা করিয়া সমালোচক নিজেই হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, কেননা অনেক সমালোচকের মতে ঐ মস্‌নবীখানি জগতের শ্রেষ্ঠতম কাব্যের মধ্যে একখানি, ও খৈয়ামকে তাঁহার ভাষাভাষীরা কবি বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। অরবী, পার্সী ও উর্দ্দু কবিতা বিশেষতঃ গজল হইতে, 'সুরা, সাকী, গুল ও বুল বুল' এই চারটি শব্দ তুলিয়া লইলে, কবিতার কবিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচ্য কবিরা সুরা শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহার করেন। ভারতের বৈষ্ণব ভক্ত কবিরাও বলেন, "হরি-রস-মদিরায় মাতিল সকলে।" এখানে মদিরা যে বাস্তব সুরা (alcohol) নহে তাহা ইউরোপীয়েরা সহজে বুঝিতে পারেন না। পার্সী ও উর্দ্দু কবিদের মধ্যে যাঁহারা কখনও সুরা স্পর্শ করেন নাই, তাহার আস্বাদ কিরূপ জানেন না, তাঁহাদের কবিতাও সুরার গুণবর্ণনা-পূর্ণ। ইরানে নিজ হাতে ঢালিয়া সুরাপান প্রায় কেহ করে না। ধনবানদের গৃহে অতিথি আসিলে একটি সুন্দরী যুবতী দাসী বাদা [বড় পাত্র Decanter] হইতে জামে (wine-glass) ঢালিয়া একটি খোয়ানে [tray] রাখিয়া গৃহ-কর্ত্তার সম্মুখে ধরে। সম্মানিত অতিথিকে গৃহকর্ত্তা স্বহস্তে জাম দেন, সমান পদের লোককে দিতে হইলে দাসীকে দিতে আজ্ঞা করেন। এই পরিবেশন-কারিণী দাসীকে সাকী বলে। সুরা-বিক্রয়ের দোকানেও সাকী (Bar maid) থাকে। ভারতে এপ্রথা নাই; ভারতের কবিরা কখনও সাকী দেখেন নাই, তথাপি উর্দ্দু গজলে সাকী ও শরাব শব্দের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইরানের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে খোরাসান প্রদেশ, তাহার প্রধান নগর নেশাপুর একটি বহু প্রাচীন বিদ্যা-কেন্দ্র। নেশাপুরের একটি পাঠশালায় ঈশীয় একাদশ শতকের মাঝামাঝি খৈয়ামকে বিদ্যার্থীরূপে দেখিতে পাই। এই নগরেই তাঁহার জন্ম, বাস, ও মৃত্যু হইয়াছিল। পরে, ইরানের সম্রাট জলাল উদ্দীন মলিক শাহ যখন প্রাচীন পঞ্জিকা সংস্কার করিয়া আপনার নামে নূতন সম্বৎ চালাই-বার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি মান-মন্দির স্থাপন করিলেন, তখন খৈয়ামকে তিন জন প্রধান গণিতজ্ঞ জ্যোতিষীদের মধ্যে একজন রূপে দেখিতে পাই। এই জ্যোতিষীরা মিলিয়া যে সারণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার নাম "জীচ মলিক শাহী" [Malikshahi Astronomical Tables] রাখা হইয়াছিল; কিন্তু যে-কারণেই হউক, ঐতিহাসিকরা ঐ সারণী প্রস্তুত করিবার সম্মান একমাত্র খৈয়ামকে দিয়াছেন। মলিক শাহের সংস্কৃত জলালী সম্বৎ (Jalali Era) ১০৭৯ ঈশাব্দের সায়ন মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন আরম্ভ হইয়াছে ও এখনও প্রচলিত আছে। তাহার পর খৈয়ামকে নেশাপুরে দার্শনিক পণ্ডিত ও নজুমী [ফলিত জ্যোতিষী] রূপে দেখিতে পাই। তিনি বোধ হয় রাজ-সরকার হইতে বিদ্বানরূপে কিছু বৃত্তি পাইতেন। তিনি আপনার গৃহে বসিয়া দর্শনের অধ্যাপনা করিতেন। এরূপ অবস্থায় অধ্যাপকরা ছাত্রদের কাছে এখনও বেতন স্বীকার করেন না। তাঁহাকে অন্য কোনও অর্থকরী কার্য্য করিতে দেখি না। ফলিত জ্যোতিষের বিচার করাইতে দূর দেশ হইতেও তাঁহার কাছে লোক আসিত তাহাতে বোধ হয় কিছু হদিয়া [দক্ষিণা] পাইতেন। ইসলাম-জগতে দর্শন-শাস্ত্র বড় আদৃত ছিল না। খৈয়ামের সমসাময়িক একজন ফকীহ [ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্] দর্শনের মত খণ্ডন করিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা এখনও ইসলাম-জগতে সম্মানিত। দর্শনের ঈশ্বরবাদ কোরানের মতের বিরুদ্ধ, সেইজন্য রাজক্ষমতাবলে বলীয়ান মোল্লারা তাঁহাকে কাফের বলিয়া পীড়ন করিতে ছাড়েন নাই।

খৈয়াম অন্তরে দার্শনিক ছিলেন; তিনি যতদূর সম্ভব মুসলমানদের আচার ও শাস্ত্রের আজ্ঞা মানিয়া চলিতেন; যখন ইচ্ছা হইত নমাজ উপাসনা করিতেন, রোজাও করি-তেন; কিন্তু এগুলিকে ফর্জ [অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম] ও স্বর্গে যাই-বার একমাত্র পথ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। কখন কখন বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না, যেমন তিনি বলিয়াছেন :—

"আমাকে যদি উপাসনার প্রতিফল স্বরূপ স্বর্গ দাও, সে ত বেতন হইল, তোমার করুণা ও দয়ার দান কোথায়?" আবার কোরাণের নিষেধ সত্ত্বেও সুরাপান করিতেন।

কোরাণে ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে মুসলমান প্রত্যহ পাঁচবার নমাজ উপাসনা করিতে বাধ্য। নমাজের সময় হইলে মসজিদের মিনার বা কোনও উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া একজন লোক উপাসকদের উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে। এই ব্যক্তিকে "মোয়জ্জন" ও ঐ ডাককে "অজান" বলে। অজানের শব্দ শুনিতে পাইলে সহস্র প্রয়োজনীয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া মসজিদে যাইতে হয় ও সকলকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একত্রে একই ভাবে, একই ভাষায়, কখন দাঁড়াইয়া, কখন বসিয়া, কখন প্রণত হইয়া উপাসনা করিতে হয়। খৈয়াম মসজিদে গিয়া উপাসনাও করিতেন, আবার বলিতেন, 'ঈশ্বর কি ঘড়ীর অধীন? একস্থানে একত্রিত হইয়া একই প্রকার ব্যায়াম করিয়া একই সময়ে একই ভাষায় উপাসনা করা বাহ্য প্রতারণার রূপান্তর মাত্র, ঈশ্বর এত সহজে ভুলিবার পাত্র নহেন।' তাঁহার এইরূপ উক্তি বা বিদ্রূপ শুনিয়া লোকে তাঁহাকে নিরীশ্বর কাফের ভাবিত। পরকাল সম্বন্ধেও তিনি কোরাণের আজ্ঞা বিশ্বাস করিতেন না।

কোরাণে আছে যে, মওমিনেরা [বিশ্বাসী মুসলমানেরা] বহিশ্‌তে [স্বর্গে] যাইবে। বহিশ্‌তে একটি নির্ম্মল-শীতল-জলপূর্ণ তড়াগ থাকিবে, তাহার নাম "কওসর" বা কৌসর; তাহার চারিদিকে নানাপ্রকার সুদৃশ্য গায়ক পক্ষীপূর্ণ ফল ও ফুলের সুন্দর বাগান থাকিবে; বাগানে চারটি নহর [ছোট নদী] থাকিবে, তাহাতে বিশুদ্ধ সুরা, মধু, দুগ্ধ ও মিষ্ট শীতল জল প্রবাহিত হইবে; বাগানে মোমনদের জন্য নানা রত্নখচিত সুবাসিত অট্টালিকা থাকিবে; মোমিনেরা আপনার কর্ম্মানুসারে এক হইতে আটটি কৃষ্ণ-নয়না স্থির-যৌবনা হূর পাইবে ও উৎকৃষ্ট মূল্যবান বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া ঐ অট্টালিকায় অনন্তকাল বাস করিতে পাইবে, ও নানাপ্রকার উপাদেয় সুস্বাদু খাবার পাইবে; এইরূপে সকল প্রকার শারীরিক সুখ ও ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে পাইবে। এই বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করিয়া তিনি বলিয়াছেন :—

"লোকে বলে, স্বর্গে কৃষ্ণনয়না হূর থাকিবে ও সেখানে বিশুদ্ধ সুরা ও মধু থাকিবে। তবে আমি যে সুরা ও কামিনী পূজা করি, তাহা উচিত কার্য্য করি। কেননা পরলোকেও ত ইহাই থাকিবে॥"

"সাধুরা বলেন, হূরের সহিত বহিশৎ ভাল। আমি কিন্তু বলি, ইহাপেক্ষা আঙ্গুরের সুরা অনেক ভাল॥ যাহা নগদ পাইতেছ তাহা লও ও ভবিষ্যতের ধারের আশা ছাড়িয়া দাও। কেন না ঢাকের বাদ্য দূর হইতে শুনিতেই ভাল। [ভাবিষ্যতে বা ধারে নদীপূর্ণ সুরা পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া এখন নগদ যে এক ক্ষুদ্র পাত্র সুরা পাইতেছ তাহা খাইয়া লও, ভবিষ্যতের আশার কথা, ঢাকের বাদ্যের মত, দূর হইতে শুনিতেই ভাল।]"

কোরাণের আজ্ঞানুসারে পরকালে যে স্বর্গে এরূপ স্থূল শারীরিক সুখভোগের দ্রব্য থাকিবে তাহা খৈয়াম বিশ্বাস করিতেন না। তিনি কোরানের পরলোক, স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন—"সুরাপান করিলে স্বর্গ কিম্বা নরকে যাইবে? (এই প্রশ্ন করিতেছ?) কে বা নরকে গিয়াছে? কে বা স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে?" "হায়! পরলোক হইতে কেহ ফিরিয়া আসিল না, আসিলে তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতাম। পরলোকের যাত্রীদের পরিণাম কি হইল?"

তিনি যে সময়ে ইরানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে-সময়ে সে-দেশে মুসলমানদের দুই প্রধান শাখা শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। আবার, শিয়াদেরও নানা সম্প্রদায়ে যুদ্ধ হইতেছিল, দেশ রক্তারক্তি ও অশান্তি-পূর্ণ ছিল, কিন্তু তিনি নিজে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার উক্তিদ্বারা জানা যায় না। প্রবল-পরাক্রান্ত খলীফদের বংশধর তখন নামে ইসলাম-জগতের প্রধান হইলেও কার্য্যতঃ ইরানের প্রবল সম্রাটদের আজ্ঞাকারী ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব ক্ষমতা পাইবার জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। কোন্ ধর্ম্ম ভাল, কোন্ পথ স্বীকার করা উচিত, সে-কথা লইয়া সকলেই তর্কবিতর্ক করিত। এই তার্কিকদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন :—

"কতগুলি (লোক) ধর্ম্ম ও মার্গ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে। কতগুলি লোক বিশ্বাস ও সন্দেহের দোলায়

দুলিতেছে॥ হঠাৎ গুপ্তস্থান (আকাশ) হইতে একবাণী শুনিতে পাইল। রে অজ্ঞান! সত্য পথ ইহাও নহে, উহাও নহে॥"

দেশের দু'তিনটি মোল্লার উত্তেজনায় একবার নেশাপুরের জনসাধারণ খৈয়ামকে কাফের স্থির করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তিনি কিছুকালের জন্য পলাইয়া মক্কার প্রধান মসজিদে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি মোল্লাদের উপর রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"দুই তিনজন মূর্খ এমন ভাবিয়া থাকেন। মূর্খতার দ্বারা বিবেচনা করেন, তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান॥ যদি কেহ গাধামিতে তাঁহাদের মত গাধা না হয়, তবে তাহাকে তাঁহারা কাফের ভাবেন॥"

খৈয়াম মসজিদগামী উপাসকদের শ্রদ্ধা করিতেন না; তাঁহারা যে সত্য সত্যই উপাসনা করিতে যায়েন তাহা বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহাদের বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন :—

"আমি মসজিদে আসিয়াছি বটে, কিন্তু অভাবে পড়িয়া আসিয়াছি। ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি নমাজ উপাসনা করিতে আসি নাই। একদিন আমি একখানি সজ্জাদা [ছোট দরি, যাহা পাতিয়া নমাজ পাঠ করে] চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানি হারাইয়া গিয়াছে তাই আবার আসিয়াছি।"

তিনি সাধুরূপী ভক্তদের বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

"সুরা পান কর না বলিয়া তুমি গর্ব্ব করিয়া থাক। কিন্তু এমন শত কার্য্য কর, সুরা যাহার দাস মাত্র। [সুরাপান করা অপেক্ষা অনেক বড় পাপ কর।]"

তিনি বর্ত্তমান সময় আনন্দে কাটাইতে বলিয়াছেন, ভূত, ভবিষ্যৎ ও পরকাল চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। "যে দিন গত হইয়াছে, তাহাকে স্মরণ করিও না। আগত কল্য, যাহা এখনও আসে নাই, তাহার জন্য চিন্তা করিও না। যাহা এখনও আসে নাই ও যাহা গত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিও না। বর্ত্তমানে আনন্দে থাক ও জীবন নষ্ট করিও না।"

তিনি অল্পে তুষ্ট ছিলেন, বেশীর লোভে সংসারে লিপ্ত হইতে অথবা পরের সেবা করিতে চাহিতেন না। তিনি বলিয়াছেন—"এই পৃথিবীতে যাহার কাছে আধখানি রুটি আছে। যাহার বসিবার একটি আচ্ছাদন আছে॥ যে কাহারও সেবক নহে। বা যে কাহারও প্রতিগ্রাহী নহে, সেই ব্যক্তিই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী॥"

তিনি পুরুষকে ত্যাগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। "যতক্ষণ তোমার ধন, বস্ত্র, সুন্দরী কামিনী ও সুরার পাত্রের অভিলাষ আছে। অথবা ঢোলের বাদ্য অথবা বাঁশরীর তান শুনিবার ইচ্ছা প্রবল আছে॥ ঈশ্বর জানেন এসকলই কামনার লোভ উৎপাদক। যতক্ষণ তুমি এগুলিকে ত্যাগ করিতে না পার পুরুষ নও।"

তিনি জানিতেন এরূপ ত্যাগের উপদেশ দিলে ধনবান ভোগীরা বিরক্ত হয়, তাই তাহাদের বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন—"এই বড় লোকেরা যাঁহাদের অনেক বিষয় আছে। তাঁহারা ক্রোধ ও দুঃখে আপনার জীবনের প্রতিই সর্ব্বদা বিরক্ত থাকেন॥ কিন্তু যাহারা তাঁহাদের মত লোভের বশীভূত নহে। মজার কথা যে তাহাদের মানুষ বলিয়াই গণনা করেন না॥"

খৈয়াম ঈশ্বরে ও অদৃষ্টে নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁহার নির্ভরতা ভারতের আকাশমার্গী অপেক্ষা কম নহে। "যদি তুমি চাও যে তুমি ঈশ্বরের রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর। কখনও এমন পছন্দ করিও না যে কোনও জীব তোমার দ্বারা পীড়িত হউক॥ মৃত্যুকে ভয় করিও না আহারের জন্য চিন্তা করিও না। এই দুইটি আপনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিশ্চয় আসিবে।"

"বিচারক [বিধাতা] যে আহারীয় তোমার ভাগে (অদৃষ্টে) দিয়াছেন। তাহাপেক্ষা এক অণু প্রমাণ কম হইবে না। অথবা বেশী হইবে না॥ যাহা অদৃষ্টে নাই, তাহার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নহে। যাহা আছে তাহাতেই স্বাধীনভাবে থাকা উচিত॥"

খৈয়াম অবু-অলী-সীনার (Avecenna-৯৮৩-১০৩৬ঈ) মতাবলম্বী দার্শনিক ছিলেন। কোরাণে মাদক দ্রব্য মাত্রেই অস্পৃশ্য, অতএব সুরাপান নিষিদ্ধ। খৈয়াম সুরাপান করিতেন, কিন্তু সুরাপান করিতেন বলিয়া তাঁহাকে

বদ্ধ মাতাল (Bacchanalian poet) বিবেচনা করা ঠিক হয় না। যাঁহারা সুরাকে অপবিত্র বিবেচনা করেন না, ও সুরাপান করেন, তাঁহাদের সকলকেই মাতাল বলা যায় না। তিনি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমানকেই সুরাপান করিবার অধিকারী বলিয়াছেন।

"যদিও সুরা হরাম, কিন্তু জান কি? কে খাইবার অধিকারী? কোন্ স্থানে? কতটা? কাহার সহিত খাওয়া উচিত? এই চারটি কথা যে বুঝিতে পারে না, সে যেন সুরাপান না করে। কেবল বুদ্ধিমানেরা সুরাপান করিবার অধিকারী।"

সুরাপান করিবার অধিকারী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "সম্রাট, হকীম [মহামহোপাধ্যায় বিদ্বান্ Doctor] ও মত্ত মাতালের সুরাপান করিবার অধিকার। যদি এই তিনটির এক প্রকার না হইতে পার, তবে খাইও না, কেন না উহা শত্রু। [সম্রাট সকলে হইতে পারে না, হয় বিদ্বানদের মত অল্প মাত্রায় খাও, নয় মত্ত মাতালের মত খাইয়া মাতলামি কর। মাতালের মত খাইলে উহা শত্রু।]"

তিনি সুরার পরিমাণও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। "যদি তুমি সুরাপান করিতে চাও, তবে বুদ্ধিমানের সহিত খাও। অথবা প্রিয়ার সহিত হাসিতে হাসিতে খাও। বেশী খাইও না, বারবার খাইও না, গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না (অর্থাৎ এত খাইও না যে মনের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেল)। অল্প খাও, কখন কখন খাও, একান্তে বসিয়া খাও (অথবা লুকাইয়া খাও)।"

"যদি সুরাপান করিতে চাও, দেখিও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইও না। জ্ঞানশূন্য হইও না, দুষ্ট ও মূর্খের সহিত এক প্রকোষ্ঠে হইও না॥ যদি ইচ্ছা কর যে সুরা তোমার পক্ষে হলাল হউক, তবে কাহাকেও কষ্ট দিও না ও পাগল হইও না। [কোরানের আজ্ঞানুসারে সুরা সকল অবস্থাতেই হরাম, খৈয়াম সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিতেছেন, অল্প পরিমাণে খাইলে হলাল, বেশী খাইলে হরাম।]"

দার্শনিক অবু-অলী সীনা সুরাপান করিতেন; তিনিও সুরার গুণ গান করিয়াছেন—"সুরা মত্ত মাতালের শত্রু ও বুদ্ধিমানের বন্ধু। উহা অল্প মাত্রায় তিরিয়াক [সর্ব্ব-রোগ-হর ঔষধ] ও বেশী মাত্রায় কালকূট। বেশী খাইলে তাহার দোষ অল্প নহে, কিন্তু অল্প খাইলে তাহার গুণ অনেক।"

খৈয়ামকে সম্মান করিয়া নিমন্ত্রণ না করিলে তিনি কোথায়ও যাইতেন না, তিনি রাজাদের দ্বারেও অনাহূত যাইতেন না। দেশের সম্রাট ও প্রাদেশিক রাজারা তাঁহাকে সম্মান করিয়া আপনাদের সহিত সমান মস্‌নদে বসিতে স্থান দিতেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি সামান্য গৃহস্থ-সন্তান ও সুরাপায়ী হইলেও বিদ্বান দার্শনিক রূপে সমাজে ও দেশে সম্মানিত ছিলেন; তিনি বদ্ধ মাতাল (Bacchanalian poet) হইলে এ সম্মান পাইতেন না। তিনি যেমন উদার দার্শনিক ছিলেন, সেইরূপ ভণ্ডামি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি ভণ্ড সাধুদের বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন—

"একজন সাধু এক বেশ্যাকে দেখিয়া বলিলেন, তুই মাতাল। তুই কেবল অন্য লোকদের আপনার ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিস্॥ স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল, আমাকে প্রকাশ্যে যাহা দেখিতেছ, আমি ঠিক তাহাই। কিন্তু তোমার যেমন বাহ্য বেশ, তুমিও কি তাহাই?"

ইস্‌লামের অধর্ম্ম বিষয়ক আইন অনুসারে কেহ কোরানে বর্ণিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলে সে কাফির; কেননা কোরানের আজ্ঞাগুলি স্বয়ং ঈশ্বরের উক্তি; তাহাদের কেহ মিথ্যা বলিতে পারে না। বলিলে তাহার একমাত্র শাস্তি শিরচ্ছেদন। খৈয়াম দার্শনিক, অতএব তাঁহার মত কোরান বিরুদ্ধ; কিন্তু মনে যাহাই ভাবুন বা বিশ্বাস করুন, তিনি সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না। সেইজন্য তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন:—

"জাতের গূঢ় রহস্য যাহা আমার মস্তিষ্কে সংগ্রহ করা আছে। বলিতে পারি না, কেননা তাহা হইলে আমার বিপদ হইবে॥ সংসারী জীব মধ্যে (অর্থাৎ শাসক ফকীহ সম্প্রদায়ে) যখন কেহ উপযুক্ত লোক নাই। তখন আমার মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না॥"

তিনি মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে এই কবিতাটি রচনা

করিয়াছিলেন, ও শেষ কয় দিবস প্রায়ই আবৃত্ত করিতেন :—

"হে ঈশ্বর, আমি আপনার জীবনে তৃপ্ত হইয়াছি। আপনার দুঃখিত মন ও রিক্ত হস্ততেই তৃপ্ত হইয়াছি॥ তুমি যখন শূন্য হইতে সৃজন করিয়া থাক [নাস্তি হইতে অস্তি করিয়া থাক] তখন আমাকে আমার এই অনস্তিত্বের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া আপনার মহান্ অস্তিত্বের কাছে লইয়া যাও॥"

মৃত্যু

খৈয়ামের ছাত্রদের মধ্যে অনেকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বান্, ঐতিহাসিক, গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার এক ছাত্র, ঐতিহাসিক অবু-উল-হসন অল-বেহকী তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তিনি একদিন সুস্থ শরীরে বু-অলী-সীনার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "অল শিফা" পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ পুস্তকের পাঠস্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন, ও আমাকে বলিলেন, "ছাত্রদের ডাক আমি ওসীয়ৎ, (১)করিব।" ছাত্রেরা আসিলে কিছু উপদেশ দিলেন, পরে সকলকে সঙ্গে লইয়া নমাজ উপাসনা করিলেন। নমাজের পর প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে আমার জ্ঞান ও ক্ষমতা মত চিনিতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহা ছাড়া তোমার কাছে যাইবার আমার অন্য সম্বল নাই, অতএব ইহা দ্বারাই আমাকে ক্ষমা ও উদ্ধার কর।" এই প্রার্থনার পরই তাঁহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিল; মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার কোনও প্রকার রোগ হয় নাই, কিন্তু বোধ হয় তিনি আসন্ন-মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

সময়

খৈয়ামকে ৪৬৭ হিজরা [১০৭৪-৭৫ ঈ] মলিক শাহের নব প্রতিষ্ঠিত মান-মন্দিরে প্রধান গণিতজ্ঞ জ্যোতিষী রূপে দেখিতে পাই। ইহার পূর্ব্বে তিনি নেশাপুরে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া হকীম [দার্শনিক] ও গণিতজ্ঞ রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্মের সময় অথবা বয়স সম্বন্ধে নিশ্চয় রূপে কিছুই জানা নাই। ১০৭৯ ঈশাব্দে জলালীসম্বৎ প্রচলিত হইলে ও মলিক শাহী সারণী গণিত হইলে তিনি মানমন্দিরের কাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন কি না কিছুই জানা নাই। ৫০৮ হিজরাতে [১১১৪-১৫ ঈ] তিনি বোখারার রাজার জন্য ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা বিচার করিয়া শিকারে যাইবার দিন ও সময় স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর চহার-মকালা প্রণেতা কবি নিজামীতে [৫৩০ হিঃ ১১৩৫ ৩৬ ঈ] তাঁহার গোর দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার 'কয়েক' বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কাল হইয়াছিল। অন্যান্য গ্রন্থ হইতে তাঁহার মৃত্যু সময় ৫১৭ হিঃ [১১২৩-২৪ ঈ] সন্দেহ করা হয়, কিন্তু মৃত্যুর বৎসর নিশ্চয় রূপে জানা নাই।

বংশ

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বা বংশ সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। তবে 'খৈয়াম" শব্দ দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা বস্ত্রাবাস (tent) প্রস্তুত করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। তাঁহার আদি বাসস্থান সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কেহ বলে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বলখ প্রদেশের শমশাদ নামক গ্রামবাসী ছিলেন; কেহ বলে অস্ত্রাবাদবাসী ছিলেন; আবার কেহ বলে নেশাপুরেই বাস করিতেন। তবে সকলেই স্বীকার করেন যে, তাঁহার জন্ম নেশাপুরে হইয়াছিল সেইখানেই চিরজীবন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যার উল্লেখ কেহ করে নাই, অতএব কিছুই জানা নাই।

খৈয়াম কবি ছিলেন না। ইরাণে বিদ্বান মাত্রেই আপনার মনের ভাব পদ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনিও তাহাই করিয়াছিলেন। আত্মতুষ্টি ছাড়া পরকে তুষ্ট করা কোন কালে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। কতকগুলি পার্সী ও অল্প কয়েকটি অরবী রুবাঈ ছাড়া তিনি আর কোনও প্রকার পদ্য রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবিতাবস্থায় বা অল্প পরে কেহ তাঁহার উক্তিগুলি একত্রিত করে নাই। প্রাচীনতম সংগ্রহে মাত্র ১৫৮টি রুবাঈ ১৪৬০ ঈশাব্দে লেখা পাওয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার রচিত বলিয়া প্রচলিত রুবাঈর সংখ্যা অনেক

(১) যে উপদেশ উপদেশকের মৃত্যুর পর প্রতিপালিত হয় তাহাকে ওসীয়ৎ বলে। Will.

বাড়িয়া গিয়াছে। ফিটস্‌জিরাল্‌ড্‌ই (Fitzerald) সর্ব্বপ্রথমে ১৮৫৯ ঈশাব্দে খৈয়ামকে কবি বলিয়া ইউরোপ ও আমেরিকাতে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। যে কবিতাগুলি বহু কাল খৈয়ামের রচিত বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে অনেকগুলি আজকালকার অনুসন্ধানে অন্য লোকের উক্তির সংগ্রহে পাওয়া গিয়াছে, অতএব এখন ঐগুলিকে সন্দেহাত্মক বলা হয়। কোন্‌গুলি খৈয়ামের রচনা নিশ্চয়রূপে বলা অসম্ভব। রুবাঈতে ভণিতা দিবার নিয়ম নাই। খৈয়ামের জীবিতাবস্থায় তিনি স্বয়ং অথবা অন্য কেহ তাঁহার রচনা সংগ্রহ করে নাই, অথবা করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করে নাই। এখন কেবল ভাষা অথবা ভাব দেখিয়া বিচার করা নিরাপদ নহে। তাঁহার এক রুবাঈ হইতে বোধ হয় তিনি সুরাপান করিতেন ও সে কথা লুকাইতেন না।—

"লোকে বলে আমি সুরা-পায়ী—হাঁ আমি তাহাই। লোকে বলে আমি উন্মত্ত মাতাল—হাঁ আমি তাই॥ আমি যদি সুফী হই, মসজীদ্‌গামী হই, বিধর্ম্মী হই বা নিরীশ্বর হই। ঈশ্বর জানেন ও আমি জানি, আমি যাহা আছি তাহাই॥"

তাঁহার সকল রুবাঈ সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে যে, নিশ্চয়রূপে কিছুই জানা নাই তবে তাঁহার রচিত বলিয়াই এগুলি প্রসিদ্ধ। তাঁহার নানা প্রকার উক্তি (যাহা খৈয়ামের রচিত বলিয়া প্রচলিত) এখানে লেখা হইল, এখন পাঠক মহাশয়েরা স্বয়ং বিচার করিয়া বলুন তিনি কি ছিলেন। তিনি স্বয়ং ত বলিয়া গিয়াছেন

মন্ দানম্ ব ও, চুনাঁ কি হস্তম্ হস্তম্।

আমি জানি ও ঈশ্বর জানেন, আমি যে-প্রকার আছি, তাহাই আছি॥

[পার্সী পদ্যের অনুবাদগুলি যতদূর সম্ভব এক-একটি শব্দ ধরিয়া literal করা হইয়াছে, কেবল ভাব গ্রহণ করা হয় নাই।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।]

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

(৩)

রাজধানীতে সবে বসন্তের হাওয়া দিতে সুরু করিয়াছে। খাটি সহরের মধ্যে অবশ্য ঋতু-রাজের আবির্ভাবের চিহ্ন বিশেষ দেখা যায় না; কিন্তু ভবানীপুর, বালিগঞ্জ প্রভৃতির মাঠ, ঘাট, পথের ধারের গাছে পাতায় তাঁহার রঙ্গীন উত্তরীয় ক্ষণে ক্ষণে বাতাসে ঝিলিক্ হানিয়া যাইতেছে। শীতকালের সন্ধ্যার অসহনীয় ধোঁয়ার যবনিকা খানিকটা অন্ততঃ সরিয়া যাওয়াতে আবালবৃদ্ধ-বনিতা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এখন তবু নিঃশ্বাস লইয়া প্রাণ একটু জুড়ায়; নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আধ সের করিয়া কয়লার গুঁড়া ত ফুসফুসের ভিতর টানিয়া লইতে হয় না।

বাড়ীখানি মাঝারি গোছের। ভবানীপুরের নিরালা এক পথের উপরেই। রাস্তার ওপারে একসার কৃষ্ণচূড়া ও বলরামচূড়া গাছ, তাহাতে রঙের আগুন ধরিয়া গিয়াছে। অল্পদূরে ছোট একটি পুকুর, কয়েকটা হাঁস তাহার জলে খুব ব্যস্তভাবে ডুব মারিয়া মারিয়া কিসের যেন সন্ধান করিতেছে। পথটায় পথিকের সংখ্যা বিশেষ অধিক নয়। গাড়ী বা মোটর অনেক পরে পরে এক-একখানা চোখে পড়ে।

বাড়ীর ছাদের উপর দুইটি যুবতী দাঁড়াইয়া। একটির বয়স বছর বাইশ তেইশ হইবে, সীমন্তে চওড়া সিন্দুরের রেখা, গৌরবর্ণ কপালেও মস্ত বড় একটি সিন্দুরের টীপ,

পরিধানে একখানি পেঁয়াজী রঙের শাড়ী ও সেই রঙেরই একটি লেশভূষিত সেমিজ। চুল বেশ পরিপাটী করিয়া বাঁধা। গায়ে গহনা বেশী নাই।

আর একটি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা ভানুমতী। কয়েকদিন হইল সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। শরীর তাহার আগের চেয়ে কিছু সারিয়াছে; মুখ চোখ কিন্তু আগেরই মত বিষণ্ণ, শ্রীহীন। অন্য যুবতীটি তাহার বড় বোন, কলিকাতাতেই ইহার বিবাহ হইয়াছে। অভাগিনী ভগিনীর আগমন-সংবাদে, কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করিয়া মাস খানিকের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া সেও বাপের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। সঙ্গে আসিয়াছে তাহার একমাত্র শিশুকন্যা দুর্গা। তাহার আর্ত্তনাদে ব্যতিব্যস্ত থাকায় এতক্ষণ সে বোনের কাছে আসিতে পারে নাই; এখন চাকরের সঙ্গে তাহাকে বেড়াইতে পাঠাইয়া সে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বোনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভানুমতীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া শোভাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছিস্, ভাই?"

ভানুমতী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কি আর ভাব্ব, মেজ্‌দি? আমার ত ভাল কথা ভাববার কিছু নেই! নিজের অদৃষ্টের ভাবনা ছাড়া আমার আর ভাবনা কি?"

শোভাবতী বলিল, "অত মন খারাপ ক'রে থাকিস্ না বোন্; ওতে পেটের ছেলের অনিষ্ট হয়। তোর যা হবার তা হয়েছে, এখন ছেলের যাতে কোনো দিক দিয়ে খারাপ কিছু না হয়, তা তোকে দেখ্‌তে হ'বে। এমন কি সেদিন যে খ্রীষ্টানী ধাত্রী মাগীর উপর অত রাগ কর্‌লি মাছ খেতে বলেছিল ব'লে, আমার মনে হয়, দরকার হ'লে তোর তাও খাওয়া উচিত।"

ভানুমতী ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ছি, ছি কি বলিস্, মেজ্‌দি? কলকাতায় থেকে থেকে তুইও খ্রীষ্টান হ'য়ে গেছিস্ দেখ্‌ছি। আমি বিধবা, এমন অনাচার কর্‌লে আমার স্বর্গগত স্বামীর অপমান করা হ'বে না?"

শোভাবতী বলিল, "তা যা বলিস্ ভাই, অত আচারের খুঁৎখুঁত আমার নেই। যাদের ভালমন্দ আমাদের কাছে সবার বাড়া, তাদের জন্যে অনাচার কর্‌তেও আমি পেছুই না। আচার বড় না মানুষ বড়? এই ত সেবার ওঁর অসুখের সময় ডাক্তারে মুরগীর জুস্ ক'রে দিতে বল্লে; শাশুড়ী ত শুনে ঝাঁটা নিয়ে মার্‌তে এলেন। আমি লুকিয়ে কলের ঘরে ষ্টোভ জ্বেলে ক'রে দিলুম। তাতে কি আমার খুব বেশী পাপ হয়েছে? আর হ'য়ে থাকে ত হয়েছে।"

ভানুমতী বলিল, "তুই স্বামীর জন্যে করেছিস্। তিনি খুসি হয়েছেন, এই তোর ঢের। হিন্দুর মেয়ের কাছে স্বামীর চেয়ে বড়ত আর কিছুই নেই! কিন্তু আমি যদি এখন মাছ-মাংস খাই, আমার স্বামীর আত্মা কি তাতে অসন্তুষ্ট হ'বে না?"

শোভাবতী বলিল, "কে বল্লে তোকে যে অসন্তুষ্ট হ'বে? সে কি চায় না যে তার বংশের একমাত্র দুলাল সুস্থ সবল হ'য়ে জন্মাক্? তুই নিজের ঠিক মত যত্ন না কর্‌লে ছেলে সুস্থ হ'বে না। মায়ের দুধ না পেলে তার গায়ে বল হ'বে কোথা থেকে? এসব ত ভে'বে দেখতে হয়? না শুধু আচার নিয়ে থাক্‌বি, তারপর যা হয় হ'বে? শেষে কি দেখতে চাস্ যে লক্ষ্মীছাড়া মাতাল উদয়টাই জ্ঞানদার ঘরদোর দখল ক'রে বসেছে, আর দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে?"

ভানুমতীর দুই চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি বেঁচে থাক্‌তে তা হ'তে দেব না। আর কেউ না জানুক, আমি জানি যে আমার স্বামীর মরার মূলে ঐ হতভাগা। সে যেন তাঁকে মারবার জন্যে ব্রত নিয়েছিল। রাত্রিদিন কেবল তাঁর অনিষ্ট চিন্তা করেছে এক মনে, ওঁকে দেখ্‌লে সে যে কি ক'রে তাকাত, সে যদি দেখতে! ওঁর যা কিছু সবের উপর মুখ-পোড়ার লোভ। তোকে বল্‌ব কি দিদি, আমারই বল্‌তে মুখে আস্‌ছে না, আমার উপর কুদৃষ্টি দিতেও সে ছাড়েনি। উনি আমাকে বারণই ক'রে দিয়েছিলেন একলা ওর সাম্‌নে যে'তে।"

ভবানী তাহাদের পিছনে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "ভগবান আছেন দিদি, ভগবান

আছেন। কার সাধ্য নিজে ঠিক থাক্‌লে সতীলক্ষ্মীর কোনো অনিষ্ট করে? এই নখে ক'রে তার গলা ছিঁড়ে ফেল্‌তুম না?"

শোভাবতী বলিল, "এখন ভালয় ভালয় ছেলেটি হ'য়ে যায় তবেই বাঁচি। শাশুড়ীকে অনেক ব'লে ক'য়ে ত রেখেছি, দেখি সে-সময় আস্‌তে দেয় কি না। মা নেই আমাদের, বড় বোন না দেখলে আর কে দেখবে? অবিশ্যি ভবানী ত রয়েইছে; সে মায়ের চেয়ে কম কিছু করবে না। তবু আমি এলে, তোর মনটা একটু ভাল থাকত। প্রথমবার মানুষ ভয়েই আধমরা হ'য়ে থাকে।"

ভবানী বলিল, "কিছু ভেবোনা বাছা; যতক্ষণ আমি বুড়ী বেঁচে আছি, ততক্ষণ ভানুর যত্নের কোনো ত্রুটী হবে না। বাবু বল্‌ছিলেন খ্রীষ্টানী নর্স আন্‌বেন। আমি মুখের উপরই ব'লে দিলাম, 'কেন আমি কি কোন নর্সের চেয়ে কাজ কম জানি?' এই যে তোমরা এতগুলি ভাই বোন হ'লে জংপুরে; ক'টা খ্রীষ্টানী এসেছিল তোমার মায়ের জন্যে?"

ভানুমতী বলিল, "সে কথা ঠিক ভাই, মেজদি। ভবানী যতটা প্রাণের টানে করবে, এমন কোনো মাইনে-করা নর্স করবে না। তার উপর সব নর্সের ভাই, কাজ ভাল না, বড় যন্ত্রণাও দেয় এক একটা। সে দিন ভাদুড়ীদের সেজ বৌ বল্লে এক নর্সের কাহিনী—"

এমন সময় দুর্গা চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া জোটাতে শোভাবতী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গেল। ভবানীরও নীচে কাজ ছিল, সে নামিয়া গেল। ছাদের উপর ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল একাকিনী ভানুমতী।

দিনের বেলাটা তাহার একরকম করিয়া কাটিয়া যাইত। শোভাবতী ও ভবানীর অবিশ্রাম চেষ্টায় সে এক্‌লা বসিয়া ভাবিবার বড় একটা অবসর পাইত না। নিতান্ত কার্য্যগতিকে শোভাবতীকে সরিয়া যাইতে হইলেও সে দুর্গাকে বোনের ঘাড়ে ফেলিয়া যাইত। মেয়েটি এমনই লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ অবতার যে তাহাকে সাম্‌লাইতে গিয়া তাহার মাসীর প্রায় নিজেরই নাম ভুলিয়া যাইবার অবস্থা হইত, তা সে অন্য কথা চিন্তা করিবে কি? পাড়ার মেয়েরাও মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসিত। কাজেই দিনের বেলাটা সঙ্গিনীর অভাব ভানুমতীর প্রায়ই হইত না। কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতরটাও যেন আঁধারে ভরিয়া উঠিত। তাহার বিগত জীবনের সুখের স্মৃতি সার বাঁধিয়া তাহার চোখের সাম্‌নে ছায়া-চিত্রের মত নাচিতে আরম্ভ করিত। কাঁদিতেও তাহার ইচ্ছা হইত না। শোক যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিত। ইচ্ছা হইত কোনো রকমে এই আশাহীন দুর্ব্বহ জীবনকে শেষ করিয়া দেয়। বাঁচিয়া থাকিয়া তাহার আর লাভ কি? সে যতটা পাইয়া হারাইল, এমন জগতে কয়টা মেয়ের অদৃষ্টে জোটে? পাইবার যোগ্যতা তাহার কিছুই ছিল না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের চার মেয়ের এক মেয়ে সে; পিতা টাকাকড়ি কিছু অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহার পিছনে ঢালিয়া দিতে পারেন নাই। তবু ত সে রাজরাণী হইয়া শ্বশুরগৃহে পা দিয়াছিল। তাহার সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসায় বুক ফাটে নাই এমন মানুষ সেদিন কয়টা ছিল?

এই কথা মনে আসিতেই সর্ব্বপ্রথম তাহার মনে আসিত উদয়ের মুখ। এই লোকটি যেন তাহার অদৃষ্টাকাশে ধূমকেতুর মতই উদিত হইয়াছিল। তাহাকে দিয়া প্রমদারঞ্জনের বংশের কাহারও কোনো ভাল কোনো দিন হয় নাই, এবং হইবেও যে না সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। জ্ঞানদার প্রতি তীব্র ঈর্ষা তাহার প্রতি কথায় কাজে এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিত যে, নিতান্ত জড় বুদ্ধিরও তাহা চোখে লাগিত। ভানুমতীর বিবাহের সময় অবশ্য ঘরের ছেলের দাবীতে সে অবাধে উৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছিল; কিন্তু ইহার মনে যে কোনো কল্যাণ-ইচ্ছা নাই তাহা নববধূর নূতন চোখেও ধরা পড়িয়াছিল। তাহার পরত সে স্বামীর কাছে সব কথা শুনিলই। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিত্য অনিষ্ট-কামী এই দেবরটির প্রতি ভানুমতীর একটা তীব্র বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল।

উদয় একটু মুস্কিলেই পড়িয়াছিল। আগে জ্যাঠা মহাশয়ের বাড়ীতে তাহার বিশেষ গতিবিধি ছিল না, তাহাকে কেহ যে ভাল চোখে দেখে না সেটা তাহার

বিশেষ রূপে জানা ছিল বলিয়াই। কিন্তু ভানুমতীর অপূর্ব্ব সুন্দর মুখের যে একটা আকর্ষণ ছিল, সেটা এড়াইয়া চলিবার ক্ষমতা তাহার অসংযত মনের ছিল না। সুতরাং কারণে অকারণে সে যখন তখন আসিয়া জুটিত, এবং ভানুমতীর ঘরের সামনে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করিত। ভানুমতী অবশ্য তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করিত না; এমনকি ঘর হইতে বাহিরও হইত না; তবু পরদার ফাঁকে যদি তাহাকে দু চারবার দেখা যায় তাহাতেই উদয় কৃতার্থ হইয়া যাইত। জ্ঞানদা ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল, রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত। চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে উদয়কে কিছু বলিতে পারিত না; কিন্তু রাগটা একেবারে হজমও করিতে পারিত না। তাহার ঝাঁঝ একটু-আধটু ভানুমতীকেই পোহাইতে হইত। ইহা লইয়া দু চারটি খণ্ড যুদ্ধও হইয়া যায়। সন্ধি হইতে অবশ্য বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু ভানুমতীর মনে উদয়ের প্রতি যে গভীর ঘৃণা আর ক্রোধ জমা হইতেছিল, তাহার পরিচয় পাইলে উদয়ের উৎসাহ সম্ভবতঃ অনেক পরিমাণেই কমিয়া যাইত। ভানুমতী নিজের ইচ্ছায় এবং স্বামীর নিষেধে, কোনোদিনই উদয়ের সঙ্গে নিতান্ত বাধ্য না হইলে কথা বলিত না; বলিলেও দুই চারিটার বেশী নয়; কাজেই উদয়ের গতিবিধি একই রকম চলিতেছিল।

ভবানী আসিয়া খবর দিল, "ওগো ভানু,! শুনছ? তোমার গুণের দেওর যে তোমার খোঁজ নিতে কলকাতা অবধি ধাওয়া ক'রে এসেছেন?"

ভূত দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, ভানুমতীও সেই রকম চমকিয়া উঠিল। একি, তাহার চিন্তাই শেষে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আসিল নাকি?

ভবানীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "বাবাকে বল্‌গে না, আমায় ব'লে কি হবে? হতভাগা এখানে এল কি করতে?"

ভবানী নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "কেন তা কি জানি? বাবুও তাকে মহা আদর ক'রে বসিয়ে কথাবার্ত্তা কইছেন, -সে ত একবার তোমাকেও দে'খে যেতে চায়; কর্ত্তামশায় নাকি তাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন।"

'বয়েছেন না ছাই," বলিয়া ভানুমতী সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। মাথায় কাপড় ছিল না, সেটা বেশ দীর্ঘ করিয়া টানিয়া দিল।

নীচে ভানুমতীর পিতার শয়ন-কক্ষে বসিয়া উদয় তাঁহার সহিত কথা বলিতেছিল। তাহাকে উত্তমরূপে জলযোগও করানো হইয়াছে যে তাহার চিহ্ন ঘরে ঢুকিয়াই ভানুমতী পাইল। পিতার অতি ভদ্রতায় তাহার গা জ্বলিয়া গেল। ইহাকে এত আদর দেখাইবার কি প্রয়োজন ছিল? শোভাবতীই সম্ভবতঃ জলখাবার গোছাইয়া দিয়াছে। তাহার সহিত খুব একপালা ঝগড়া করিবে বলিয়া মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিল।

ভানুমতীকে দেখিয়া উদয় মহা ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গভীর ভক্তিভরে একটা প্রণাম করিয়া ফেলিল। পাছে সে পা ছুঁইয়া ফেলে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সাত হাত পিছাইয়া গিয়া ভানুমতী বলিল, "থাক্ থাক্, আপনি বসুন।"

উদয় বসিল। বসিয়া বলিল, "আপনার শরীর ত বিশেষ ভাল দেখছি না, বৌঠান। জ্যাঠামশায় ভারি ব্যস্ত হয়েছেন, বল্লেন 'চিঠিতে ত ঠিক খবর কিছু পাওয়া যায় না, উদয়। তুমি নিজে গিয়ে মাকে একবার দেখে এসো।'"

ভানুমতী মনে মনে বলিল, "জ্যাঠামশায় পাঠিয়েছেন না তোমার মুণ্ড।" মুখে বলিল, "না, আমার শরীর আগের চেয়ে ঢের ভাল আছে; শ্বশুর মশায়কে বল্‌বেন।"

ভানুমতীর পিতা মহেশবাবু বেহাইয়ের বদান্যতায় একেবারে গলিয়া গিয়া বলিলেন, "তা ত তিনি পাঠাবেনই বাবা; তিনি যেমন মানুষ তাঁর উপযুক্ত কাজই করেছেন। তাঁর ঘরে মেয়ে দিয়ে কি আমি কম অভয় পেয়েছিলুম? নিতান্ত বিধাতার বিধান! তা মায়ের আমার শরীর নিতান্ত খারাপ যাচ্ছে না ত। মোটের ওপর আগের চেয়ে ভালই আছে। তবে চেহারা আর ভাল কি দেখ্‌বে বল? তোমরা ওকে কি দেখেছ আর এখন কি দেখছ!" এই বলিয়া তিনি ঘনঘন চোখ মুছিতে লাগিলেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ভানুমতীকে অতি উত্তমরূপে

দেখিয়া লইয়া উদয় বলিল, "বসুন না বৌঠান, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?" মহেশবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওঁকে ডাক্তার-টাক্তার দেখান হয়েছে ত? প্রথমবার অনেক রকম বিপদের আশঙ্কা থাকে, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল।"

মহেশবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কই, তেমন ভাল ডাক্তার ত দেখানো হয়নি? পাড়াতেই একজন লেডী ডাক্তার আছেন, অনেককাল কাজ ক'রে তাঁর বেশ অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই একদিন এসে দে'খে গেছেন। তাঁকেই ডাকব মনে করেছিলাম। তা তুমি যদি বল ত—"

উদয় মহা ব্যস্ত হইবার ভান করিয়া বলিল, "না, না, ও সব লেডী ডাক্তার-ফাক্তারের কর্ম্ম নয়। ওরা জানেই বা কি? ভাল দেখে স্পেষালিষ্ট আন্‌তে হবে; ট্রেন্‌ড্‌ নর্স আন্‌তে হবে। এখন থেকে সব ঠিক করা দরকার। আমার জানা বেশ ভাল লোক আছে, আপনি অনুমতি দেন ত আমি আজই গিয়ে সব ঠিক কর্‌তে পারি।"

মহেশবাবু যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন, বলিলেন, "বেশ ত বাবা, তা হ'লে ত আমি বেঁচে যাই। গিন্নি নেই, কি ক'রে যে কি হ'বে ভগবানই জানেন। তবু ভাল ডাক্তার, নর্স থাক্‌লে অনেকটা ভরসা। তোমার জানা যদি ভাল বিচক্ষণ লোক থাকেন, তুমি তাঁদেরই ঠিক কর।"

উদয়ের আত্মীয়তা এবং পিতার ভদ্রতার আতিশয্যে ভানুমতীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। এ হতভাগাকে কোথায় ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করা হইবে, না তাহাকে লইয়া যত ঘরের কথা! বুড়া হইলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না যে বলে, তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়। নিজের নিযুক্ত ডাক্তার ও নর্স যে উদয় কি মতলবে আনিতে চাহিতেছে, তাহাই বা কে জানে? কোনো শুভ ইচ্ছা কি তাহার মনে থাকা কখনও সম্ভব? যদিও উদয়ের সাম্‌নে বেশী কথা বলিবার তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দায়ে পড়িয়া সে বলিয়াই ফেলিল, "সে কি বাবা, মিসেস্‌ মিত্তিরকে কথা দিয়ে রাখা হয়েছে; এখন অন্য ডাক্তার কি ক'রে ঠিক কর্‌বেন? তাঁকে না জানিয়ে কিছুই করা চলে না।"

উদয় মুখ গম্ভীর করিল। মহেশবাবু টাকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "ও তাইত, তাইত, আমার মনে ছিল না। এখন ত আর কাউকে বলা চলে না।"

পাছে তাহার আসন্ন মাতৃত্বের আলোচনা আরো বেশী উদয়ের সাম্‌নে হয়, এই ভয়ে ভানুমতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় ইচ্ছা করিয়াই উদয়কে কোনো বিদায় সম্ভাষণ করিল না। বাবা তাহার সহিত যত খুসি আত্মীয়তা করুন, কিন্তু ভানুমতীকে সে ভুলাইতে পারিবে, একথা যেন স্বপ্নেও মনে না করে।

বাহিরে আসিয়াই সে ভবানীর খোঁজ করিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। শোভাবতীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়া দেখিল, সে পাশের বাড়ীর এক বৌএর সঙ্গে দিব্য জমাইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। অগত্যা সে আবার ছাদেই ফিরিয়া গেল; উত্তেজনায় তাহার তখনও পা কাঁপিতেছিল, ছাদেরই এক কোণে সে বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ একলাই বসিয়া রহিল।

শোভাবতী তাহার খোঁজে আসিয়া বলিল, "ওমা, একলাটি অন্ধকারে কি করছিস্‌ ব'সে?"

ভানুমতী বলিল, "কর্‌ব আর কি? তোমরা যা ঘটা ক'রে অতিথিসৎকার আরম্ভ করেছ, আমার ত দে'খে দুই চোখ একেবারে জুড়িয়ে গেছে।"

শোভাবতী তাহার কথার ঝাঁঝে হাসিয়া বলিল, "তা যাই বলিস, কুটুম ত? একটু আদর আপ্যায়ন না কর্‌লে তোর শ্বশুরই বা ভাব্‌বেন কি? তিনিই পাঠিয়েছেন যখন?"

ভানুমতী বলিল, "কক্ষনো তিনি পাঠাননি। ও মুখপোড়া মিছে কথা বল্‌ছে। তিনি আর ওকে চেনেন না?"

ভবানী সিঁড়ি হইতে ডাকিয়া বলিল, "ওগো, শোভা, তোমার মেয়ে কেঁদে কেটে অনর্থ করছে, বাছা! সে আর কারো হাতে খাবে না, ঘরময় ভাত ছিটচ্ছে।"

"আঃ, কি লক্ষ্মী মেয়েই হয়েছে আমার!" বলিয়া শোভাবতী নামিয়া গেল। ভবানী আসিয়া ভানুমতীর কাছে বসিল।

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ? তোকে খুঁজে-খুঁজে ত হায়রান হ'য়ে গেলুম।"

ভবানী বলিল, "গিয়েছিলুম একটু নিজের কাজে। তোমার গুণধর দেওর কোথায় এসে উঠেছে, কি কর্‌তে এসেছে, সব খোঁজ নিয়ে এলুম।"

ভানুমতী বলিল, "আচ্ছা মেয়ে তুই বাপু। পুলিশে কাজ নিলেই পারিস্। অত খোঁজ কোথায় কার কাছে পেলি?"

ভবানী হাসিয়া বলিল, "আমরা রাজপুতের মেয়ে বাছা, বাঙালীর ভাত খাচ্ছি ব'লেই কি আর ঘরের কোণের বৌ হ'য়ে থাকতে পারি? দরকার হ'লে আমরা জশটা মরদকে মেরে শুইয়ে দিতে পারি।"

ভানুমতী বলিল, "কি খবর আন্‌লি তাই বল্ না!"

ভবানী বলিল, "রোস, এখন কি আর সব জান্‌তে পেরেছি? সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম, ছোঁড়া বেরিয়ে কোন্ দিকে যায়, দেখবার জন্যে। দেখলুম বেরিয়ে গাড়ীটাড়ী নিলে না, পায়ে হেঁটেই চলল। কাছেই কোথাও থাকে বুঝলুম। পেছন পেছন খানিকদূর গেলুম, আন্দাজই করেছিলুম তোমার পিসশাশুড়ীর ওখানে উঠেছে। সঙ্গে হতভাগা নবাও এসেছে দেখলুম। যেমন গুণের মনিব, তার তেমনি গুণের চাকর। আমায় দেখে জিগ্‌গেস করলে, 'কিগো দিদি, ভাল আছ?' এদিকে কোথায় চলেছ? আমি বললুম 'এই যাচ্ছি দু পয়সার পান আন্‌তে। তোরা কবে এলি, কতদিন থাকবি?' বল্‌লে 'এসেছি ত কাল সবে, এখনও অনেকদিন থাকব, ছোটবাবু জরুরী কাজে এসেছেন।' ভাবলুম "দাঁড়াও, বুড়ী পিসি ঠাকরুণের সঙ্গে কোনো গতিকে ভাব করতে হচ্ছে, তা না হ'লে হরদম এখানে যাওয়া আসা চল্‌বে কি ক'রে! ছোটবাবুর জরুরী কাজের খবর নিতে হবে ত!"

ভানুমতী উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আমি গোড়ার থেকেই জানি লক্ষ্মীছাড়া মিছে কথা বলছে। শ্বশুরমশায় আমায় দেখ্‌তে পাঠিয়েছেন না আরো কিছু! নিজের কোন্ কুমৎলবে এসেছে কে জানে? বাবার কাছে এসে সে কি ঘটা আত্মীয়তার! সে নাকি ভাল ডাক্তার ঠিক ক'রে দেবে, নর্স ঠিক ক'রে দেবে। বাবাও যেমন মানুষ চেনেন না।"

ভবানী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "দেখ বাছা, ভাল চাও ত ওসবের ধার দিয়ে যেয়ো না। তোমার একটা ভাল মন্দ ঘটিয়ে দিতে পার্‌লে ও ছোঁড়া ত এখন রাজার রাজত্বি পাবে। তারই চেষ্টায় আছে, ওকে কিছুতে কোনো কিছুর মধ্যে হাত দিতে দিও না। কোথা থেকে ডাক্তার আন্‌বে কে জানে? ঘুষ্ খেয়ে ডাক্তারেই কত জায়গায় কেলেঙ্কারী করেছে, তার ঠিকানা আছে? মেজদিদি আসে ভাল, না হয় এই বুড়ী আর ধাই মিলে তোমার সব কাজ ক'রে দেব। দেখো এখন, একবিন্দু অযত্ন হবে না। আশা ভরসা সব তোমার এই সন্তানের ওপর, কত সাবধানে এখন চল্‌তে হবে! দাঁড়াও না, দুদিনের মধ্যে সব খবর আমি নিচ্ছি। পিসি ঠাক্‌রুণ বোকা-সোকা মানুষ আছেন, তাঁর পেট থেকে কথা বার করতে বেশী দেরী হ'বে না।"

ভানুমতী বলিল, "তিনি আর কি জানেন, বুড়ো মানুষ। তাঁকে কি আর কিছু বলেছে?"

"অল্পস্বল্প কিছু ত জানবে? বাকিটা আমি আঁচ ক'রে নিতে পারব।"

ভানুমতী বলিল, "দেখ্, তোকে আগের থেকে ব'লে রাখছি। তখন ত আমি থাকব শুয়ে প'ড়ে, যদি ঠাকুরপো ছেলে দেখতে আসে, কি কোলে নিতে চায়, কখনও দিবি না। তাতে যে যা ভাব্‌বার ভাববে। ওর চোখে বিষ আছে। অত বড় জলজ্যান্ত মানুষটাকে খেলো।"

ভবানী হাসিয়া বলিল, "যাও বাছা তুমি আর আমাকে শিখোতে এসো না। আমি তোমার চেয়ে মানুষ কম চিনি নাকি? যেমন কুকুর তার তেমন মুগুরের ব্যবস্থা করতে আমি জানি। চল এখন নীচে, সন্ধ্যাটা ছাদে থাকা ভাল না।"

(৪)

দুপুর বেলা খাইয়া-দাইয়া উদয় বলিল, "ও পিসিমা, আমি একটু কাজে বেরুচ্ছি; ফিরতে হয়ত রাত হবে।

আমার জন্যে ব'সে থেকো না। ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে দিও ; নবা রাত্রে আমায় বেড়ে দেবে এখন।"

পিসিমা বৃদ্ধা হইয়াছেন, চোখেও ভাল দেখেন না, কানেও কিছু কম শোনেন। তিনি তখন হাঁড়ি, শিশি, বোতল প্রভৃতিতে মজুদ আচার চাটনী প্রভৃতি বাহির করিয়া রোদে দিতে ব্যস্ত ছিলেন ; উদয়ের কথায় উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "কি বল্লি রাত্রে নবা ভাত রাঁধবে ? কেন আমি কি মন্দ রাঁধি তার চেয়ে ? আজ মাছের ঝালটার কেমন স্বাদ হয়েছিল ! বুড়ো একথাল ভাত খেল শুধু তাই দিয়ে।"

উদয় হাসিয়া বলিল, "কি আপদ ! নবা রাঁধলেই হয়েছে আর কি ! তা নয় গো তা নয়," বলিয়া পিসির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "বল্‌ছি কি যে আমার আজ ফির্‌তে রাত হবে, ভাত ঢাকা দিয়ে রেখো। নবা বেড়ে দেবে, তুমি আর আমার জন্যে ব'সে থেকো না।"

পিসীমা এবার শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "ও তাই বল্‌ ! আচ্ছা তা রেখে দেব এখন। হ্যাঁরে, কাল যে বৌমাকে দেখ্‌তে গেলি, কেমন দেখে এলি ? সেই আস্‌বার পর একদিন গিয়েছিলুম, তারপর কাজের ধান্দায় আর যেতে পারিনি। শরীর কেমন আছে ?"

উদয় বলিল, "বিশেষ ভাল ত কিছু দেখলুম না। আগের চেয়ে রোগা ঠেকল, রংও আগের চেয়ে ময়লা হ'য়ে গিয়েছে মনে হ'ল।"

পিসিমা বলিলেন, "ওমা, তাই নাকি ? তাহ'লে ত বেটা ছেলে হবে। আমার ভুবন যে বছর হ'ল, সে বছর আমার রং কি হ'ল, ঠিক যেন হাঁড়ির কালি, শরীর কেমন হ'ল, ঠিক যেন সল্‌তেটি। আর ক্ষীরির বেলা, এই মোটা হ'লুম। রং হ'ল হল্তেলের মত—"

পিসিমার রূপ বর্ণনায় বাধা দিয়া উদয় বলিল, "হাঁ, ওতে নাকি কিছু বোঝা যায়, পিসিমা। আমি বল্‌ছি দেখো মেয়ে হবে।"

পিসিমার বড় ছেলে ভুবন ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে তাহার কথার শেষাংশটুকু শুনিতে পাইল। হাসিয়া বলিল, "তুমি ত তা বল্‌বেই, মেয়ে হ'লে তোমার ত পোয়াবারো হে !"

উদয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "হাঁ তুমিও যেমন ! আমি কেবল সেই ভাবনাই ভাব্‌ছি আর কি ? পরের টাকায় আমার অত লোভ নেই। এক পেলে সবই পেতুম ত আলাদা কথা ছিল। ওসব ভাগাভাগির মধ্যে আমি নেই।"

ভুবন বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল," না তা কি আর আছে ? ছ'লাখ টাকা অমনি সহজ কথা কি না ? তুমি যে কত বড় শুকদেব গোস্বামী তা ত আর আমার জান্‌তে বাকি নেই। সারাক্ষণ বোধ হয় জপ কর্‌ছ মনে মনে বৌঠানের যেন মেয়ে হয়, বৌঠানের যেন মেয়ে হয়।"

উদয় বলিল, "তুমি মস্ত বড় thought reader হ'য়ে উঠেছ যে হে ! আর কি জপ কর্‌ছি, তাও জেনে ফেলেছ নাকি ? তা হ'লে ত ভয়ের কথা !"

ভুবন ঠাট্টা করিয়া বলিল, "কি, কোন চন্দ্রমুখীর মধুর নাম নাকি ?"

উদয় বলিল, "হ্যাঁ, সেই নামটি যেটি তুমিও সব-চেয়ে জপ কর। আচ্ছা, আমি এখন চল্লুম, ঢের কাজ প'ড়ে আছে।"

পিসিমা ইহাদের ঠাট্টা-তামাসা কিছুই শুনিতে পান নাই। নিজের শিশি, বোতল, লইয়াই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ ডাকিয়া বলিলেন, "ও বড় বৌমা, এখানে এসে একটু বসো না মা। বুড়ী মানুষ সব কাজ কি আমি একলাই কর্‌ব, আর তোমরা পটের বিবি হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে ? এই সকালের রান্নাটা ত একলাই প্রায় সার্‌লুম।"

ঘোমটা-দেওয়া একটি বউ তাড়াতাড়ি পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া শাশুড়ী বলিলেন, "এই খানটায় বোসো বাছা, দেখো যেন চড়াইয়ে কি কাকে মুখ-টুক না দেয় আচারে। আমি ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিই গিয়ে।"

শাশুড়ী গড়াইবার উদ্দেশ্যে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। বউ প্রথমে বারান্দায় শানের উপরেই বসিয়া পড়িল। তারপর এধার ওধার চাহিয়া নিজের শয়নকক্ষ

হইতে একটি ফুল লতা পাতা চিত্রিত মাদুর বাহির করিয়া আনিয়া বিছাইল; একখানি বাংলা উপন্যাস আনিতেও ভুলিল না। তাহার পর আরাম করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া উপন্যাস পাঠে মন দিল। মাথার কাপড়টা তাহার দেখিতে দেখিতে কখন খসিয়া পড়িয়া গেল।

এটি পিসিমার বড় ছেলে ভুবনের বৌ। মেজ ছেলে কাননেরও বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বউ এখনও ঘর করিতে আসে নাই। বড় বৌএর নাম বিজনবালা, মুখখানি মন্দ নয়, চোখ দুটি বেশ বড় বড়, তবে নাকটি কিছু চাপা। রংটাও নিতান্ত বাঙালীর ঘরে যেমন হইয়া থাকে তাই। বাপের বাড়ীর লোকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, শ্বশুর বাড়ীর লোকে বলে কালো।

উপন্যাস পড়া সবে মাত্র সুরু হইয়াছে, এমন সময় কে একজন পিছন হইতে আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। এ হাতের স্পর্শ ভুল করিবার নয়। বিজন ধড় মড় করিয়া উপন্যাস ফেলিয়া দিয়া, প্রাণপণে তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "আঃ, কি কর তার ঠিক নেই; এখনি যদি মা বেরিয়ে আসেন?"

ভুবন তাহার চোখ ছাড়িয়া দিয়া পাশে বসিয়া পড়িল। উপন্যাসখানা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "ওরে বাপরে! 'মাধবীকঙ্কণ?' তার চেয়ে কাশীরাম দাসের মহাভারত নিয়ে পড়না? এর চেয়ে আধুনিক কিছু জোটাতে পারলে না?"

বৌ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "আধুনিক বইয়েত তোমাদের বাড়ী ছেয়ে রয়েছে কিনা! আজ সকালে ঠাকুরপোর ঘরে এইখানা দেখলুম, তাই নিয়ে এলুম। তা না হ'লে এখানে ত ছাপার অক্ষরের নামও দেখবার জো নেই।"

ভুবন কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিল, "অ্যাঁ, উদয়ের ঘরে গিয়েছিলে কেন? এরই মধ্যে খুব ভাব জমিয়ে নিয়েছ দেখছি। তাই সে আমার মুখের ওপর ব'লে গেল যে, রাত্রি দিন তোমার নাম জপ করে।"

বিজনবালা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "থাক্, থাক্, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। উদয়ের ঘরে যাইনি গো, গিয়েছিলুম তোমার সহোদর ভ্রাতা কাননের ঘরে। আর উদয় ঠাকুরপো যা আমার নাম জপ করে তা আমার জানাই আছে। অমন অপ্সরীর মত বৌঠান ঘরের কাছে থাকতে আমার মত কাল পেঁচার নাম জপ করতে যাবে কেন?"

ভুবন তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, "আহা তোমার বড় আফশোষ্ হচ্ছে, না? বেচারা বৌঠান, সবাই মিলে কেবল তাকে হিংসাই করছে।"

বিজনবালা মুখ ছাড়াইয়া লইয়া বলিল," হিংসে আমি কিসের দুঃখে করতে যাব শুনি? তার রূপ আছে, তারই আছে। তুমি যদি আবিশ্যি তোমার গুণধর মামাতো ভাইটির মত তার রূপের ধ্যান করতে বসতে ত আলাদা কথা ছিল। সত্যি, ঠাকুরপোর রকম সকম বুঝি না কিছু। এদিকে ত হিংসেয় বাঁচেন না বেচারীর ছেলে হচ্ছে ব'লে, পারেন ত নখে ক'রে ছেঁড়েন। ওদিকে আবার টানও আছে বৌঠানের ওপর।"

ভুবন বলিল, "কি করে বল! মুস্কিলেই প'ড়ে গেছে। অতবড় জমিদারী হাতে আসতে-আসতে ফসকে গেল, এ কি কম আফশোষের কথা তার মত মানুষের কাছে। টাকার জন্যে ও নিজের বাপের গলায় ছুরী দিতে পারে, ভাইয়ের স্ত্রী ত চুলোয় যাক্। এখনও আশায় আশায় আছে যে জমিদারী গেলেও, নগদ ছয় লাখ তার হাতে আসতে পারে, যদি বৌঠান দয়া ক'রে ছেলের জন্ম না দিয়ে, মেয়ের জন্ম দেন।"

বিজনবালা কৌতূহলে চোখ বড় বড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গো, মেয়ে হ'লে সে টাকা পাবে না?"

ভুবন বলিল, "না, সে এক মস্ত ইতিহাস, জান না? টাকাটা ছিল বড় মামার জ্যাঠামশায়ের। বুড়ো জমিদারীর ভার ছোট ভাইয়ের ওপর দিয়ে পাটের না কিসের ব্যবসা করত। একেবারে টাকায় লাল হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুড়োর ছেলে ছিল না, থাকবার মধ্যে এক মেয়ে। সেই যে বিন্দুবাসিনী মাসি, মা এখনও যাঁর অত গল্প করেন। মেয়ের খুব ঘটা ক'রে বিয়ে দিয়েছিল বুড়ো, ঘর বর সব ভালরকম দেখে। গহনাই দিয়েছিল মেয়েকে পঞ্চাশ হাজার টাকার; নগদে আর জিনিষ-পত্রে আরো পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু জামাইটা ছিল পাজী

কিছু দিন পরেই জানা গেল যে, জুয়া খেলে, মদ খেয়ে, নগদ টাকা সবই সে খুইয়েছে, এখন গহনাগুলি নিয়ে বিক্রী কর্‌বার জন্যে স্ত্রীকে মারধোর সুরু করেছে। বুড়ো গেল বিষম চটে, মেয়েকে নিয়ে আস্‌তে সেইদিনই লোক গিয়ে উপস্থিত। বড় মানুষ বেহাইকে চটাতে মেয়ের শ্বশুর শাশুড়ী সাহস কর্‌লে না; দিলে পাঠিয়ে। মেয়ের গায়ে তখনও কালো কালো দাগ, স্বামীর ছড়ির চিহ্ন। সেইদিনই উকিল ডাকা হ'ল, উইল হ'ল। মেয়ের নামে কিছুই দিল না বুড়ো; নগদ টাকা যা ছিল সব লিখে দিল বড়মামার নামে। মাসির ছেলে পিলে হয়নি, হবারও সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই জমিদারী ত মামাদের হাতে এমনিই ফিরে এল। কিন্তু উইলে ব্যবস্থা রইল বংশে কোথাও ছেলে থাকতে, মেয়েতে ও টাকা পাবে না। এখন বৌঠানের ছেলে হ'লে অবশ্য উদয় ভায়ার অদৃষ্টে জুটবে কাঁচকলা, তাদের নিজেদের অংশের জমিদারী ত বাপ-বেটায় মিলে দিব্য ফুঁকে দিয়েছেন; এখন সংসার চালানই ভার। মেয়ে হ'লে ত নবাব হয়ে যাবে।"

বিজন বলিল, "এইজন্যে সারাক্ষণ কেবল কর্‌ছে 'বৌঠানের মেয়ে হবে বৌঠানের মেয়ে হবে'। ছেলে হ'লে বোধহয় মাথা কুটে মর্‌বে।"

ভুবন বলিল, "পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে হ'লে বোধহয় সাধু সন্ন্যাসীকে টাকা দিয়ে যাগ-যজ্ঞ লাগিয়ে দিত, যদিই তারা ছেলেটাকে মেয়ে ক'রে দিতে পারে।"

স্বামী স্ত্রীতে তাহারা বারান্দার যে অংশে বসিয়া কথা বলিতেছিল, তাহা সদর দরজার পাশেই। দরজাটা ভাল করিয়া বন্ধ ছিল না, ভেজান ছিল মাত্র। অনেকক্ষণ ধরিয়াই একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দরজার ওপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ইহাদের কথাবার্ত্তা সে ভাল করিয়া শুনিতে না পাইলেও, যা দুচার কথা শুনিতে পাইতেছিল তাহাতেই উত্তেজনায় তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। স্ত্রীলোকটি যে ভবানী তাহা বোধহয় না বলিয়া দিলেও চলে। সে পিসিমার সহিত আলাপ জমাইবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীর ভিতর ঢুকিবার আগেই গলার স্বর কানে আসাতে, বাহিরেই দাঁড়াইয়া গেল।

কিন্তু ভাল করিয়া ত সব কথা জানা দরকার? এখান হইতে তা শুনিবার সম্ভাবনা ছিল না। অগত্যা সদর দরজার কড়াটা বেশ জোরে জোরে নাড়িয়া সে ডাকিয়া বলিল, "কে আছো গো? দোরটা একটু খুলে দিয়ে যাও।"

ভুবন একহাতে স্ত্রীর কোমর জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলে মাথা দিয়া, লম্বা হইয়া মাদুরের উপর শুইয়া পড়িয়া ছিল। কিছু দূরে মাতার শয়নকক্ষ হইতে গভীর নাসিকাধ্বনির শব্দ তাহাদের জানাইয়াই দিতেছিল যে, এখন ওদিক হইতে কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই। হঠাৎ ভবানীর ডাকে ব্যস্ত হইয়া ভুবন একলাফে উঠিয়া পড়িল, বৌও ঘোমটাটা অত্যন্ত দীর্ঘ করিয়া টানিয়া দিয়া একাগ্র মনোযোগ সহকারে আচার, চাটনী হইতে মাছি তাড়াইতে বসিয়া গেল।

ভুবন দরজাটা টানিয়া খুলিয়া দিতেই ভবানী ভিতরে ঢুকিয়া আসিল। বিজনবালাকে দেখিয়া বলিল, "কি গো বৌমা, তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ ঘুমিয়েছেন নাকি?"

স্বামী উপস্থিত থাকাতে বিজনবালা কথার উত্তর না দিয়া মাথা হেলাইয়া জানাইল যে, তাহার পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন বটে। ভবানী তাহার কাছে আসিয়া, বসিয়া বলিল, "অন্য সময় ত ফুরসৎ পাই না। ভাবলুম এখন কাজকর্ম্ম নেই, একটু পিসিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। এক পাড়ায়ই থাকি, কিন্তু দেখাশোনা ত হয় না!"

ভুবন ভবানীর আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। দুপুর বেলাটা ঘুমাইবারও জো নাই তাহা হইলে শাশুড়ী উঠিয়া বকিয়া ভূত ছাড়াইবেন, সুতরাং জাগিয়াই যখন থাকিতে হইবে, এবং সব-চেয়ে প্রিয় সঙ্গীটিও অবস্থাগতিকে পলাতক, তখন গল্প করিবার একজন লোক পাইয়া বিজনবালা খুসিই হইল। মাথার কাপড় একটু খাটো করিয়া দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মা একটু শুয়েছেন। তা তুমি বোসো না! তিনি উঠ্‌বেন এই একটু পরেই। দিদি কেমন আছেন?"

ভবানী বলিল, "এখন ত মোটের ওপর ভালই। সবাই

বলা কওয়াতে এখন দুধ ঘি ফল টল ভাল ক'রে খাচ্ছে। যা চেহারা হ'য়ে গিয়েছিল। এখন তবু গায়ে কিছু সেরেছে।

বিজনবালা হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি? তবে যে ওবাড়ীর ঠাকুরপো দে'খে এসে বল্‌লে চেহারা বড় খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। মা শু'নে বল্‌লেন তাহ'লে ঠিক ছেলে হবে। ঠাকুরপো বল্‌লে, "না মেয়ে হবে'।"

ভবানীর শুনিয়াই রাগে গা জ্বলিয়া গেল। সে বলিল, "ছোট বাবু ত সে কথা বল্‌বেই মা, যার স্বার্থ যে দিকে।"

বৌ বলিল, "ওমা, সবাই এ খবর জানে দেখ্‌ছি, এক আমিই জান্‌তুম না। আজই শুনলুম।"

ভবানীরও এ খবর ভালভাবে কিছু জানা ছিল না। সে কথা বাহির করার ইচ্ছায় বলিল, "ভাল ক'রে আর কি জানি মা? এম্‌নি খানিক খানিক জানি। তা ছোটবাবু নগদ টাকা যখন অত পাচ্ছে, তখন আর আমার বাছাকে অত হিংসে করে কেন? এমনিত পোড়াকপালীর যা অদৃষ্ট!" সে বাহির হইতে ছয় লাখ কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল। তাই আন্দাজে একটা ঢিল মারিয়া দেখিল।

বিজনবালা বলিল, "টাকা পাচ্ছে কি রকম? এখনি কি ঠিক হ'য়ে গেছে নাকি? মেয়ে হয় যদি দিদির, তবেই পাবে ছেলে হলে ত আধপয়সাও পাবে না; তাই না কল্‌কাতায় এসে জুটেছে? দেশে বোধহয় আর টিঁক্‌তে পারল না! দিদির আর কত দেরি?"

ভবানী বলিল, "দেরী আর কি? মাস দেড় বড় জোর হবে!"

বিজনবালা বলিল, "ঠাকুরপো তার আগে বোধ হয় আর এখান থেকে নড়্‌ছে না। যদি শ্বশুর-বাড়ী যায়, দিন কয়েকের জন্যে যাবে।"

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, বৌ ঘরে আন্‌তে চায়না কেন, সোমত্ত বয়সের ছেলে? অতদিন যে ভাসুর শ্বশুর-বাড়ী কাটিয়ে এলুম তা দুবারের বেশী ত ছোটবাবুর বৌয়ের মুখ দেখিনি। চিরকালটা বাপের বাড়ীই থাক্‌বে নাকি বৌ?"

বিজন বলিল, "কে জানে বাছা, ঠাকুরপোর মতিগতি বুঝি না। বউ দেখ্‌তে ভাল না ব'লে নাকি মনে ধরে না। এমন কথাও ত ভদ্দরলোকের ঘরে শুনিনি। বাঙ্গালী গেরস্ত ঘরের মেয়ে কি আবার পরীর মত দেখ্‌তে হয়? দিদির মত চেহারা কালে ভদ্রে এক-আধটা দেখা যায়। এই ত আমরাও আছি কালো, তাই ব'লে কি আর আমাদের নিয়ে ঘর কর্‌ছে না?"

ভবানী বলিল, "কিসে আর কিসে, ধানে আর তুঁষে! তোমার সোয়ামী আর ঐ ছোটবাবু, একি এক কথা হ'ল? তোমাদের আপন লোক মা, তোমাদের কাছে বল্‌তে নেই, কিন্তু ছোটবাবুর রকমসকম ভাল না।"

বিজনবালা বলিল, "সে কথা সত্যি, ঝি। আমরা বৌ মানুষ, আমাদের ত আর বল্‌বার নেই কিছু, কিন্তু ওর চাল-চলন আমার কাছেও ভাল ঠেকে না।"

ভবানী বলিল, "ভাল হ'লে ত ভাল ঠেক্‌বে, মা? জামাই যতদিন বেঁচে ছিল, ভাসুকে ওর সাম্‌নে শুদ্ধ যেতে মানা ক'রে দিয়েছিল। তা তোমার শাশুড়ী ত এখনও উঠ্‌লেন না দেখ্‌ছি। আমি তবে এখন উঠি বাছা, তোমার আবার কাজ-কর্ম্ম আছে।"

বিজন বলিল, "না না, বোসো, কাজ আর কি? ও বেলার মাছ তরকারি আজ ঢের আছে, দুটো আলুভাতে ভাত সেদ্ধ ক'রে নেওয়া বইত নয়?"

ভবানী বলিল, "ওমা, সে বুড়ী রাঁধুনী মাগী পালিয়েছে বুঝি? নিজেদেরই এখন রাঁধ্‌তে হচ্ছে?"

বিজনবালা বলিল, "পালিয়েছে কি আজ? এখন আমিই হাঁড়ি ঠেল্‌ছি। কিছু বল্‌লে মা বলেন, আমার কি জমিদারী আছে না লাখ লাখ টাকা আছে, যে দশটা চাকর রাখ্‌ব? তোমার বাপকে বোলো রাঁধুনী রেখে দিতে।"

ভবানী হাসিয়া বলিল, "সত্যি মা, তোমাদের দেশে মেয়ে ছেলের বড় খোয়ার। ছেলেও বাপ মায়ের সন্তান যতখানি, মেয়েও তাই; কিন্তু মেয়ের অদৃষ্টে কিছুই জোটে না, তা লাখপতির মেয়ে হোক না কেন? তা না হ'লে তুমিই কি আর দশটা রাঁধুনী রাখ্‌তে পার্‌তে না? তোমার ভাইরা রাখ্‌ছে না?"

বাপের বাড়ীর ঐশ্বর্য্য-বর্ণনায় প্রীত হইয়া বিজনবালা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "রাখছে না আবার? যেমন পোড়া দেশে জন্মেছি। তা দিদির মেয়ে হ'লেও তার ভাবনা নেই। জমিদারী ত পাবে টাকা না হয় নাই পেল?"

ভবানী বলিল, "এটাও অন্যায় না, বাছা? মেয়ে ব'লে লাখ লাখ টাকা হাত ছাড়া হ'য়ে যাবে? ভগবান করুন যেন ছেলেই হয়। না; আমি উঠি, বেলা গেল।"

ভবানী উঠিয়াই পড়িল। বিজনবালা আচারের হাঁড়ি-কুড়ি তুলিয়া ভাঁড়ারে লইয়া চলিল।

বীরভূমের শর্করা-শিল্প

শ্রী গৌরীহর মিত্র

১—চিনি

আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে চিনি অন্যতম। আজকাল বিদেশীয় চিনি আমাদের স্বদেশী চিনিকে পরাজিত করিয়াছে। বেশী দিনের কথা নয়, এই অল্পদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইত। আজকাল কলকারখানায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা প্রকার শাকসবজী, গাছ-গাছড়া ও ফলমূল এমন-কি কয়লা এবং আল্‌কাতরা হইতেও চিনি প্রস্তুত হওয়ায় আমাদের দেশী চিনি একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। তবে কতকগুলি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুপরিবারে এখনও দেশীচিনি ব্যবহৃত হয় বলিয়া কোথাও কোথাও অতি সামান্য পরিমাণে আজিও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বীরভূমের বহু পল্লীতে চিনি প্রস্তুত হইত। বীরভূমে প্রায় বিদেশীয় চিনি কিনিবার প্রথাই ছিল না। দেশী চিনি না হইলে আমাদের ঠাকুরদেবতার ভোগই হইত না। আজকাল সকল জিনিষেই ভেজাল হইয়াছে। অল্প গুড় মিশান বিদেশী চিনি আজকাল দেশীচিনি বলিয়া বাজারে চলিয়া যাইতেছে। আমরা ধর্ম্মরক্ষার ভানে ঐরূপে প্রস্তুত চিনিকে দেশী চিনিরূপে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর দেবতার ভোগে লাগাইতেছি। এবং জানিয়া শুনিয়া এইরূপে ধর্ম্মরক্ষা হইল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছি।

আমাদের দেশ সোনার দেশ। এখানকার মাটি এমন সুন্দর যে, তাহাতে যে-কোন চাষেই বেশ ভাল ফসল পাওয়া যায়। আখের চাষ এখানে প্রায় সর্ব্বত্রই হয়, কিন্তু আমাদের অমনোযোগিতার জন্য তাহাতে লাভ হয় খুব কম। একটু চেষ্টা করিলে মাটির পাট ভাল করিয়া সার ও জলের সুব্যবস্থা রাখিয়া ভাল বীজ লাগাইতে পারিলে অতি অল্প আয়াসেই এখান হইতে প্রায় চারিগুণ অধিক ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বে এদেশে আখের চাষ খুব বেশী হইত—যত্নের জন্য ফসলও বেশী পাওয়া যাইত। এখন যত্নের অভাবে ভাল ভাল পুকুর পুষ্করিণী বুজিয়া যাওয়ায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রধানতঃ এই আখের গুড় হইতেই বীরভূমে চিনি প্রস্তুত হইত।

বীরভূমের কুঁখুটিয়া, দুবরাজপুর, পণ্ডিতপুর, তাঁতিপাড়া, রাজগঞ্জ, করমকেল, জামথলে, রামপুর, মল্লিকপুর, কালিপুর, মহুদরী, ভেড়ামারি, হজরতপুর, খোট্টালী, উপুন্দীকুড়ামিঠা, বোলপুরের সন্নিকট আদিত্য-পুর প্রভৃতি গ্রামে চিনি প্রস্তুতের কারখানা ছিল, এখন যে-সমস্ত কারখানা প্রায়ই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই-সমস্ত গ্রামের মধ্যে দুবরাজপুরের সন্নিকট কুঁখুটিয়া গ্রাম চিরদিনই চিনির জন্য দেশ-বিদেশে বিশেষ ভাবে পরিচিত। পূর্ব্বে এখানে খুব বড়রকমের চিনির কারখানা ছিল। দৈনিক ১০০/০ একশত ১৫০/০

দেড়শত মণ চিনি তৈয়ারি হইত। এখন এই বৃহৎ কারখানা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মাত্র দুই এক ঘরে চিনি প্রস্তুত হয়। বাকী যাহারা চিনি প্রস্তুত করিত, তাহাদের বংশধরেরা এখন ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। আমরা সম্প্রতি এই কুঁখুটিয়া গ্রামে গিয়া এই চিনির কারখানা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। এবং এতৎসম্পর্কে স্থানীয় চিনি ব্যবসায়িগণের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র রুজ মহাশয় ও অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং কারিকরগণের কারখানা পরিদর্শন ও তাঁহাদের সহিত এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলাপ আলোচনার ফলে যাহা জ্ঞাত হইয়াছি, এই স্থলে তাহাই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বিদেশে যেমন বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানার সাহায্যে দৈনিক লক্ষ লক্ষ মণ চিনি প্রস্তুত করা যায়, এখানে সেরূপ কিছুই হয় না। পূর্ব্বে এ জেলার লোকে ইক্ষু পেষণ করিয়া রস বাহির করিবার জন্য মহাশাল (কাষ্ঠনির্ম্মিত পেষণ-যন্ত্র) ব্যবহার করিত। এখন লৌহ-নির্ম্মিত রোলার ব্যবহার করা হয়। মহাশাল দ্বারা ইক্ষুদণ্ড ভালরূপ পেষণ হইত না। কাজেই বেশী রসও বাহির করা যাইত না। পেষণ করিবার অভাবে অনেক পরিমাণ রস ইক্ষুদণ্ডেই থাকিয়া যাইত। এখন এই লৌহ-নির্ম্মিত রোলার সেই অভাব কতক পরিমাণে দূর করিয়াছে। মহাশাল হইতে ৫০।৬০ ভাগ রস বাহির হইত কি না সন্দেহ। লৌহনির্ম্মিত রোলার দ্বারা ভাল ইক্ষু হইতে এখন ৮০ ভাগ রস বাহির করা যায়। এই রস হইতেই গুড় তৈয়ারি হয়।

যাহারা ইক্ষুর চাষ করিয়া গুড় তৈয়ারী করে তাহারা চিনি প্রস্তুত করে না। কুঁখুটিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ-চন্দ্র রুজ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ চিনির কারবার করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইনি স্বয়ংও কয়েক বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই কারবারে প্রবৃত্ত ছিলেন। সম্প্রতি এই কারবার একপ্রকার তুলিয়া দিয়াছেন। রুজ মহাশয় এই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি বলেন যে, চিনি প্রস্তুত করিতে গুড়কে রসে পরিণত করিতে হয়। ইক্ষু হইতেও প্রথমতঃ রস বাহির করিয়া গুড় তৈয়ারি করিতে হয়; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রবাদ এই যে, এই দুইবার রস লইয়া 'ভিয়ান' করা একান্তই প্রথাবিরুদ্ধ কার্য্য। এই নিমিত্ত তাঁহাদের গ্রামবাসিগণ বিদেশ হইতে আগত গুড় হইতেই চিনি প্রস্তুত করেন। নিজ কৃষিজাত গুড় হইতে তাঁহারা চিনি প্রস্তুত করেন না। ইহার হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, আখের চাষ করিয়া গুড় এবং চিনি দুইই করিতে গেলে আমাদের বংশ লোপ পাইবে, ইহাই আমাদের বংশপরম্পরায় প্রবাদ। এইজন্য তাঁহারা গুড় কিনিয়া চিনি তৈয়ারি করিতেন। সাঁওতাল পরগণা হইতে বন্য গুড় এখানে বিক্রয় করিতে আসিত। গ্রামের ছায়াশীতল প্রান্তরে হাজার হাজার গুড়ের গাড়ী একটি বড় রকমের মেলার ন্যায় মনে হইত। রুজ মহাশয় বলেন যে, তিনি এককালীন ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার গুড় ক্রয় করিয়া চিনি তৈয়ারি করিতেন। তাঁহার মত গ্রামের অনেকেই ঐরূপ টাকার গুড় কিনিয়া চিনি তৈয়ারী করিতেন। বুঝিয়া দেখুন এখানে কত বড় বৃহৎ চিনির কারখানা ছিল। এইসমস্ত চিনি কাঁন্দি, বোলপুর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইত; এবং অন্যান্য দেশ হইতে দাদন-কারীরা আসিয়া চিনি লইয়া যাইত।

বিভিন্ন উপায়ে চিনি প্রস্তুত-প্রণালী

(১) প্রথমতঃ ৩৲ তিন মণ গুড়কে নাদে চাপাইয়া জ্বাল দেওয়া হয়। পরে উহা হইতে রস তৈয়ারি হইলে তাহাকে ছাঁকিয়া অপর নাদে ঢালিয়া লওয়া হয়। এই রসের তিন ভাগের এক ভাগ পুনরায় নাদে ঢালিয়া জ্বাল দিয়া চিনির 'পাক' তৈয়ারি করিতে হয়। ঠিক মত 'পাক' হইলে পর তাহাকে ঘরের ভিতর ছিদ্রবিশিষ্ট বড় নাদে বা পাতনায় ঢালিয়া চারদিন ঠাণ্ডা হইতে দিতে হয়; এবং উহা ঠাণ্ডা হইলে বাঁশের মাচার উপর তুলিয়া পাটাশেওলা চাপা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে নীচের ছিদ্র খুলিয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে ক্রমশঃ গুড়ের তরল অংশ ঝরিয়া নীচের পাত্রে জমা হয়। পাটাশেওলার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা গুড়ের তরল অংশ সমস্তই নিষ্কাশিত করিয়া দেয়। নীচের

পাত্রের এই তরল অংশকে 'কোৎরা' গুড় বলা হয়। এই 'কোৎরা' গুড় পিঠা এবং মুড়ি দিয়া খাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। গুড়ের কঠিন অংশই চিনি। যতটা অংশ কঠিন অর্থাৎ চিনি হয় ততটা অংশ কুরিয়া বা চাঁছিয়া লইয়া পুনরায় পাটা-শেওলা চাপা দিয়া রাখা হয়। যে পর্য্যন্ত না নাদের সমস্ত অংশই চিনিতে পরিণত হয় সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করা হইয়া থাকে। নাদের সমস্ত অংশ চিনিতে পরিণত হইতে অন্ততঃ ২৫ পঁচিশ দিন সময় লাগে। চিনি তৈয়ারি হইলে তাহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া মুদ্গর দিয়া পিটাইয়া আউড়িতে (অন্ধকার শুষ্ক ঘর) বস্তা বন্দী করিয়া রাখা হয়। নাদের তলদেশ হইতে যে চিনি পাওয়া যায় তাহাকে ছিটনীর চিনি বলে। এই দেশী চিনির রঙ লাল আভাযুক্ত; এবং ইহা আস্বাদন কালে ঠিক চাঁপাফুলের সৌরভের সুঘ্রাণ অনুভূত হয়। ঐ তিন মণ গুড়ে ত্রিশ সের হইতে এক মণ পর্য্যন্ত চিনি পাওয়া যায়। বাকী সমস্তই 'কোৎরা' এবং 'গাদ'। 'গাদ' বিক্রীত হয় না। গরুর খাদ্যের জন্য কতক অংশ রাখিয়া অবশিষ্ট একেবারে অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। নিম্ন-প্রদত্ত হিসাব হইতে বোঝা যাইবে যে, কোৎরা গুড়ের মূল্যও নিতান্ত অল্প নহে। ঐরূপভাবে চিনি তৈয়ারি করিতে কারিকরের সঙ্গে আর একজন মজুরের প্রয়োজন হয়। সে দৈনিক ছয় আনা হিসাবে তাহার মজুরী পাইয়া থাকে। এখন ৩/০ তিন মণ গুড়ের দাম ২২৲ বাইশ টাকা এবং তাহা হইতে যে ৬০ ত্রিশ সের চিনি পাওয়া যায় তাহার দর ॥০ আট আনা সের হিসাবে ১৫৲ পনর টাকা। বাকী 'কোৎরা' বিক্রয় করিয়া ন্যূনাধিক ১২৲ বার টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং কারিকর ২২৲ বাইশ টাকার গুড় ক্রয় করিয়া পরে চিনি এবং 'কোৎরা' বিক্রয় করিয়া ২৭৲।২৮৲ সাতাশ আটাশ টাকা আন্দাজ পায়; এবং উহা হইতে পাটা-শেওলা, কয়লা, ক্ষার দুধ ও মজুরীর খরচ জন্য কিছু বাদ যায়। এই হিসাবে একজন কারিকর ২৫ পঁচিশ দিন পরিশ্রম করিয়া কারবার চালাইলে প্রত্যহ ১৲ ।১।০ এক টাকা পাঁচ সিকা হিসাবে উপায় করে।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রণালী ব্যতীত অন্য প্রকারেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(২) অল্পপরিমাণ চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে সাধারণতঃ বালি গুড়কে শক্ত কাপড়ে বাঁধিয়া একটি বড় পাটার উপর রাখিয়া প্রস্তরের চাপ দেওয়া হয়। এইরূপ করিলে গুড় হইতে তরল পদার্থ বা 'কোৎরা' বাহির হইয়া যায়। পরে কাপড় হইতে গুড়ের কঠিন অংশ লইয়া পাটার উপরে পিতলের মাপা সের বা ঘটির দ্বারা ঘষিতে হয়। এইরূপ পুনঃপুনঃ ঘর্ষিত হইলে ঐ কঠিন গুড় চিনিতে পরিণত হয়। এই চিনি প্রথমোক্ত প্রণালী মত প্রস্তুত চিনি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।

(৩) সময় সময় চুবড়ীতে গুড় রাখিয়া পাটা-শেওলা চাপা দিয়া রাখা হয়। ৭।৮ সাত আট দিন এইরূপ ভাবে গুড় থাকিলে তাহা হইতে 'মাৎ' (গুড়ের তরল অংশ) ঝরিয়া যায়। চুবড়ীর ভিতর যে কঠিন অংশ থাকে তাহাই চিনিরূপে পাওয়া যায়। ঐরূপভাবে প্রস্তুত চিনিকে 'দলো' চিনি বলে। চুবড়ীর নিম্নভাগে যে তরল গুড় থাকে তাহা এবং 'মাৎ' পুনরায় গরম করিয়া ঠাণ্ডা হইলে আবার ঐরূপ ভাবে পাটা-শেওলা চাপা দিয়া রাখিয়া 'গোড়' চিনি প্রস্তুত করা হয়। 'গোড়' চিনি প্রস্তুত করিবার সময় যে 'মাৎ' গড়াইয়া পড়ে তাহা গরম করিয়া 'চিটে' গুড় প্রস্তুত করা হয়। এই 'চিটে' গুড় তামাক মাখাইতে এবং মদ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

(৪) আবার সময় সময় গুড় 'চলিসায়' (এক বস্তা গুড়) শক্ত ভাবে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। তাহা হইতে গুড়ের তরল অংশ নীচের পাত্রে ঝরিয়া পড়ে। 'চলিসা' নামাইয়া তাহা হইতে ধূলা ময়লা ধুইয়া বাছিয়া পুনরায় শক্তভাবে 'চলিসা' বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। পরে গুড় শক্ত হইলে তাহাকে শুকাইয়া পিটাইয়া চিনি প্রস্তুত করে। তদনন্তর চিনি আউড়িতে বস্তাবন্দী করিয়া রাখা হয়।

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ১০।১২ দশ বার কোটি টাকা মূল্যের চিনি বিদেশ হইতে আমদানী হয়। পূর্ব্বে কুঁখুটিয়ায় গুড়ের মণ ২৲ দুই টাকা এবং চিনির মণ ৭।৮ সাত আট টাকা ছিল; এবং প্রতিযোগিতাও বেশী

ছিল না। তাই এখানে দৈনিক ১০০/০ একশত ১৫০/০ দেড় শত মণ চিনি তৈয়ারি হইত। এখন গুড়ের দর ছয় টাকা হইতে ৮৲ আট টাকা ; এবং এখানকার চিনি ১৬৲ ষোল টাকা হইতে ২০৲ কুড়ি টাকা মণ দরে বিক্রয় করিতে হয়। এখন বিদেশী চিনির মণ ১২৲ বার টাকা হইতে ১২॥০ সাড়ে বার টাকা। বিদেশী চিনির দর সস্তা বলিয়া কুঁখুটিয়ার চিনির কাটতি কমিয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই দেশী চিনির কারবার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এই গ্রামের যোগেন্দ্রচন্দ্র লাহা প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি আপনাদের ব্যবসায় পরিত্যাগ না করিয়া কুঁখুটিয়ার নাম ও পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতেছেন। এই স্থানের উৎপন্ন অধিকাংশ চিনি হেতমপুর রাজবাটীর ঠাকুর সেবা এবং অবশিষ্ট কতক অংশ অন্যান্য স্থানের দেব-সেবার জন্য সংগৃহীত হয়।

বর্ত্তমানে এখানে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তাহা খুবই অল্প। কারিকরের বেতনের এবং গুড়ের মূল্য ও পারিশ্রমিকের আধিক্যবশতঃ এখানকার চিনির দর বিদেশী চিনির দর অপেক্ষা অগত্যাই অত্যধিক বেশী হইয়া রহিয়াছে। মূলতঃ এই কারণবশতঃই বিদেশজাত চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া আমাদের দেশের চিনির কারবার আশু বিলোপের আশঙ্কায় মুমূর্ষু অবস্থায় রহিয়াছে। অতিশয় ক্ষোভ ও মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত আক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ-বাবু বলিলেন—"যদি মাটি এবং এই গ্রামের প্রান্তে প্রবাহিত নদী (সা) র বালি হইতে চিনি তৈয়ারি করা সম্ভবপর হয়, তবেই আমরা বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিব নতুবা আমাদের কারবার শেষ হইয়াছে এবং যাহা আছে তাহাও অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।"

২—মোরব্বা

বীরভূমের মোরব্বা একটি অতি উপাদেয় বস্তু এবং ইহার খ্যাতি দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন বিবিধ প্রকার ফল রক্ষার বহুবিধ প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে ; কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে বীরভূমের প্রাচীন রাজা তাঁহার রাজধানী নগর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু মোদক পরিবার স্থাপন করিয়া এই ফলরক্ষণ-প্রণালী ব্যপদেশে মোরব্বার সৃষ্টি করেন। নগর রাজধানীর সন্নিকটে সুদূর বিস্তৃত জঙ্গল মধ্যে হরীতকী, আমলকী, বেল, শতমূলী ও অন্যান্য বিবিধ ফল মূল সংগৃহীত করিয়া এই মোরব্বার কারবার প্রচলিত করেন। বীরভূমের রাজা নগর রাজধানীতেও বহুবিধ ফলের চাষ করিয়া তৎসমুদয়ের বহুবিধ উন্নতিসাধন করেন, এই নিমিত্ত নগরের কুল, বেল, আম প্রভৃতি ফল বীরভূমের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

বীরভূমে ইংরেজ আসিয়া নগরের পরিবর্ত্তে সিউড়িতে রাজধানী স্থাপন করেন। ফলে নগরের মোদক পরিবার মধ্যে অধিকাংশ সিউড়ীতে আগমন করিয়া অন্যান্য মিষ্টান্নের সহিত ঐ মোরব্বার কারবার সমভাবে চালাইতে থাকে। মোরব্বা তৈয়ারি করিতে হইলে পূর্ব্বে হরীতকী আমলকী প্রভৃতি স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলসমূহ প্রথমতঃ জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। পরে শর্করার সহিত পাক করিতে হয়। কিন্তু এই প্রাথমিক সিদ্ধ কার্য্যের জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট মোদক পরিবার ছিল। তাহারা এবং তাহাদের পরবর্ত্তী পরিবার ভিন্ন এই সিদ্ধ কার্য্য কেহই করে না। প্রবাদ—তাহা করিলে দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হইতে হয়। এই নিমিত্ত এখনও আমলকী হরীতকী ফল সেই প্রাচীন পরিবারবর্গ কর্ত্তৃক প্রথমতঃ সিদ্ধ হইয়া গাড়ী গাড়ী সিউড়ীতে চালান আইসে। স্থানীয় মোদকগণ তাহাই খরিদ করিয়া মোরব্বা প্রস্তুত করে।

এতদ্ব্যতীত স্থানীয় মোদকগণ শতমূলী পেঁপে, কুষ্মাণ্ড, পটল, উচ্ছে, লঙ্কা, পাতি ও কমলালেবু, ওল, বাঁশ, শালগম, আম, আদা, আনারস, মূলা, আলু, কামরাঙ্গা তেঁতুল, করঞ্জা, নাসপাতি, আপেল, নারিকেল প্রভৃতি ফল মূল হইতে মোরব্বা প্রস্তুত করে। এই মোরব্বা একপ্রকার সংরক্ষিত ফলমূলাদি (Preserved fruits) ইহা অনেকদিন পর্য্যন্ত আস্বাদ্য থাকে।

অধিকাংশ মোরব্বাই ॥০ আট আনা, ৸৴০ দশ আনা সের দরে বিক্রয় হয়। তবে ফলবিশেষে মূল্যের তারতম্য অনু-

সারে সেইসকল ফল হইতে প্রস্তুত মোরব্বার ও মূল্যের তারতম্য হয়। এমন কি সময় বিশেষে কোনো কোনো ফলের মোরব্বার ১৲ এক টাকা হইতে ১।০ পাঁচ সিকা দরে বিক্রয় হয়।

সিউড়ী সহরে সকল মোদকের দোকানে সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মোরব্বা প্রস্তুত থাকে। সাধারণতঃ এই মোরব্বার কারবারে সের প্রতি ৵ দুই আনা হইতে ৶ তিন আনা পর্য্যন্ত লাভ থাকে।

এই মোরব্বা অতি সুস্বাদু; তবে এ অঞ্চলে এই মোরব্বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর পথ্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। অন্যত্র ইহা সাধারণভাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩—মিষ্টান্ন

বীরভূমে প্রস্তুত যাবতীয় মিষ্টান্ন অপেক্ষা বীরভূম বালুসাই উৎকৃষ্ট। এই বালুসাইএর প্রতিযোগিতা করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হয় নাই। ইহার উপকরণ মূলতঃ ঘি, ময়দা ও চিনি এবং সামান্য কিছু মসলা।

৪—কাটা বাতাসা

বীরভূমের অন্তর্গত দুবরাজপুর একটি চৌকী ও গণ্ডগ্রাম। এখানে রেল ষ্টেশনও আছে, এই দুবরাজপুরে একপ্রকার অতি অল্প ওজনের বৃহদাকারের চিনির বাতাসা তৈয়ারি হয়। ইহাকে "দুবরাজপুরের কাটা বাতাসা" বলে। এক-একটি আধসের তিনপোয়া ওজনের বাতাসার ব্যাস দেড় হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। এই অতি বৃহদাকার বাতাসা বহু প্রদর্শনীতে বহু প্রশংসা পত্র লাভ করিয়াছে।

সিংহলে প্রবাসী বাঙ্গালী

শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

বাংলার পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি করিতেছে। বাংলাদেশ এখন তার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। বাংলায় যতই অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, অন্ন-সমস্যা, মশকের উৎপাত থাকুক না কেন, বাংলায় এমন জিনিষ আছে যাহা হইতে "গৌড়-জনেরা"নিরবধি আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। অর্থের অন্বেষণে বাঙ্গালী বিদেশে পড়িয়া থাকিলেও তাহার মনের কোণে সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা নদীমাতৃকা বাংলার ছবি প্রতিনিয়তজাগিয়া থাকে। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাংলা সঙ্গীত বাঙ্গালীদের সংহত করিয়া বাঁধিয়াছে। বাঙ্গালী যেখানেই থাকুক না কেন নিজেদের ভিতর মেলা-মেশা সামাজিকতা নানা বিষয়ে আলোচনা দ্বারা তাহাদের চারিদিকে বাংলার একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীগণের কর্ম্মকাহিনী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থে কেবল ভারতবর্ষের ভিতরে যে-সব বাঙ্গালী আছেন তাহাদের কথা লেখা হইয়াছে। বাঙ্গালীরা এখন ভারতের বাহিরে গিয়াও নিজেদের কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় দিয়াছে। এই প্রবন্ধে সিংহলের গুটিকতক প্রবাসী বাঙ্গালীর পরিচয় প্রবাসীর পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

১। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

সিংহলের প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বাসিন্দা। তাঁহার প্রবাস-কাল ১০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। জন্মস্থান বরাহ নগর, ২৪ পরগণা জেলায়। পিতার নাম ৺ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

ইনি কলিকাতায় জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে অধ্যয়নকরার পর বোম্বেতে ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউট-এ ভর্ত্তি হন। ১৯১০ সালে এখান হইতে ইলেক্ট্রিক্যাল



শ্রী ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা পান। পরে বোম্বে সহরেই ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্‌পোরেশনে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার এবং সিফ্‌ট্ ইঞ্জিনিয়ার-এর কাজ করেন। এ কাজে এক বছর থাকার পরে বোম্বাই বরোদা সেণ্ট্রালইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফ ইন্‌স্পেক্টর-এর কাজ করেন।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিংহলের পোষ্টাফিসের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ লইয়া আসেন। বর্ত্তমানে টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বিভাগে অস্থায়ী ভাবে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার-এর কাজ করিতেছেন।

২। শ্রীযুক্ত অজয়নাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত অজয়নাথ ঘোষ বি-এ মহাশয় সিংহলে প্রায় ৭ বৎসর যাবত আছেন। ইনি কলিকাতার মাণিক-বাগানের (বর্ত্তমান সিমলা বিডন ষ্ট্রীট) কাশী ঘোষের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ স্বর্গীয় যদুনাথ ঘোষ মহাশয়



শ্রী অজয়নাথ ঘোষ

বেঙ্গলী (Bengali) এবং হিন্দু পেট্রিয়ট (Hindoo Patriot) এর সম্পাদকতা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় মেট্রোপলিটান্ কলেজ (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরীক্ষার পর তমলুক হ্যামিল্টন্ স্কুলে শিক্ষক হইয়া যান। সেখানে ১৯১৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দেড় বছর কাজ করেন। ১৯১৬ সালে মহীশূরে সর্দ্দার লক্ষীকান্ত রাজার্স (বর্ত্তমান মহারাজের ভগ্নীপতি)-এর সেক্রেটারী হইয়া যান। সেখানে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাজ করেন। এর পর সিংহলে গলের পরমানন্দ স্কুলে অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। ৭ বছরের মধ্যে তিনি সিংহলের নানাস্থানে

বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কাণ্ডি সহরের নিকটে নওয়াল পিটিয়াতে অমুরুদ্ধ কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

অমুরুদ্ধ কলেজটি ঘোষ মহাশয় তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় গড়িয়া তুলিতেছেন। পূর্ব্বে এই বিদ্যালয় কেবল পাঠশালার আকারে ছিল। তাঁহার চেষ্টায় এখন ইহা সেকেণ্ড গ্রেড স্কুলে পরিণত হইয়াছে। এই কাজে তাঁহাকে নানা বাধা পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিয়া যান নাই। তাঁহার উৎসাহের জন্য অনেক ধনী এবং নেতৃস্থানীয় লোক তাঁহার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের নিজস্ব অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এই অট্টালিকা শেষ হইলে ইহা সহরের মধ্যে একটি সুরম্য গৃহ হইবে। বাড়ীর নক্সাতে ঘোষ মহাশয় সিংহলের প্রাচীন স্থাপত্যের সাহায্য লইয়াছেন। এই বিদ্যালয় শ্লাঘার বিষয় হইবে। কারণ ঘোষ মহাশয়ের প্রথম হইতে ইহা গড়িয়া তুলিতে হইতেছে। বিদ্যালয়টি সমাপ্ত হইলে বাঙ্গালীদের কিছু বলিবার থাকিবে।



শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ বসু

৩। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এখানে পাঁচ বৎসর আছেন। এঁর জন্মস্থান হাবড়া জেলায় গোবর্দ্ধনপুর গ্রামে। ইনি উলুবেড়ে হাইস্কুল ও বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীরামপুর গভর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল উইভিং ইনষ্টিটিউট হইতে পাশ করিয়া কিছুদিন বঙ্গলক্ষ্মী ও ভারত অভ্যুদয় মিলে কাজ করেন। ইহার পর বোম্বে, মেসার্স করিম-ভাই ইব্রাহিম ও মথুরা দাস গোকুলদাসের মিলে প্রথমে শিক্ষানবীশ ও পরে সহকারী রূপে পাঁচ বৎসর কাজ করেন।

বর্ত্তমানে সিংহলে সিংহল স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং (Cylon Spinning and Weaving Co.,)তে বয়ন শিক্ষকের (weaving master) কাজ করিতেছেন। এই মিল সিংহলে হইলেও ভারতের মূলধনে এবং ভারতীয় কারীগরের শ্রমে চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় মিলের যাবতীয় কাজ সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞ এবং মজুরদের বন্ধু; তাঁহার উপদেশ কলের মালিকেরা বহু বার গ্রহণ করিয়াছে, এবং কোম্পানী সেজন্য অনেকবার বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

৪। শ্রীযুক্ত দেবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দেবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলম্বোর টেকনিক্যাল কলেজে প্রায় ৩ বৎসর লেক্‌চারারের কাজ করিতেছেন। জন্মস্থান বাগনাপাড়া, জেলা বর্দ্ধমান; ইহার পিতামহ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ভূদেব-বাবুর বন্ধু ছিলেন। পিতার নাম শ্রীউত্তমলাল মুখোপাধ্যায়। ইনি ১৯১৪ সালে উত্তর পাড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজসাহী কলেজ

হইতে বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার জন্ত বিলাত যাত্রা করেন। শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পান। দেশে



শ্রী দেবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুজরাট প্রদেশের ব্যাধে সহরে ইলেকট্রিক্ সাপ্লাই কোম্পানিতে দুই মাস এ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করেন। পরে টাটা-কোম্পানীর কোচীন রাজ্যের অয়েল মিলের কারখানায় ৫ মাস কাজ করিয়া ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলম্বোর কাজ লইয়া আসেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শিক্ষকতা ছাড়াও অভিনয়ে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। এখানে ওয়াই, এম্, সি, এ (Y. M. C. A.)র ড্রামাটিক ক্লাবে একাধিকবার অভিনয় করিয়াছেন। কলম্বোর দৈনিক পত্র মর্ণিং লীডার তাঁহার নাট্য-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে।

৫। শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় বিক্রমপুরের তেলীরবাগ গ্রামের বিখ্যাত দাশগুপ্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ



ডাক্তার ভূপেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত

করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

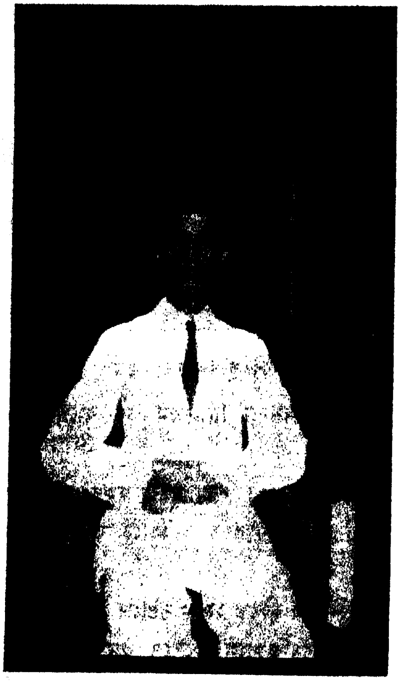
দাশগুপ্ত মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় করুণাকুমার দাশ গুপ্ত মহাশয় বরিশালে ওকালতি ব্যবসায়ে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ঢাকা কলেজ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার দরুণ বৃত্তি পান। এম-বি পাশ করিয়া বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে যুদ্ধ-বিভাগে যোগ দেন। এই কাজের জন্ত যুক্ত প্রদেশ পাঞ্জাবের নানা স্থান, উত্তর পশ্চিম

সীমান্ত ডেরা-ইসমাইলখান প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে হয়। পরে মেসোপটেমিয়ায় যান। সেখানে অবস্থান-কালে ইঁহাকে পারস্ত ও দক্ষিণ রাশিয়াতে যাইতে হইয়াছিল। দুই বৎসর যুদ্ধ-বিভাগে কাজ করিয়া বিলাতে শিক্ষার জন্য গমন করেন। বিলাতে D. T. M., H. D. P. H., M. R. C. P এবং L. M ডিগ্রী পান।

ইঁহার বিলাতে অবস্থানকালেই কলম্বো সহরের জন্য একজন হেল্‌থ্‌ অফিসারএর প্রয়োজন হয়। কলোনিয়াল সেক্রেটারীর কাছে একাজের জন্য আবেদন করিয়া ইনি কাজটি প্রাপ্ত হন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে কলম্বোয় কাজ লইয়া আসেন। বর্ত্তমানে সিংহলের দক্ষিণ প্রদেশের হেল্‌থ্‌ অফিসার হইয়া গল সহরে বাস করিতেছেন।



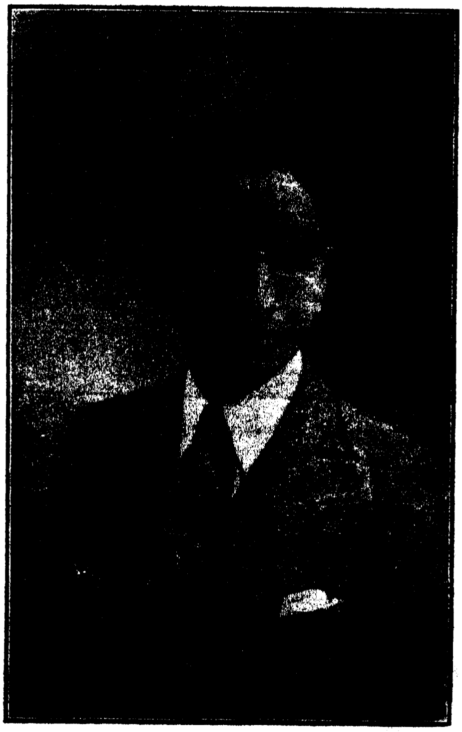
শ্রী হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারী রোগের উপশমের জন্য টিনকোমালে, গল, কাতরাগাম, হাম্বানটোটা প্রভৃতি স্থানে ইনি যে-কর্ম্ম করিয়াছেন সেজন্য কলম্বোর দৈনিক পত্রসমূহ ইঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছে।

৬। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইঁহার জন্মস্থান বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা জেলা। পিতার নাম নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮ বৎসর বয়সে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এখানে আসেন। এখন বেতার বিভাগে কাজ করিতেছেন। এখানেই তিনি টেলিগ্রাফের শেষ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীতজ্ঞ। বাঙ্গালীদের যখন কোন সম্মিলন হইয়া থাকে, তখন গান গাহিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদের আনন্দ দিয়া থাকেন।



অধ্যাপক ডাক্তার প্রভাতচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

৭। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী ডি-এস্‌সি

(লণ্ডন) পি-এইচ. ডি (লণ্ডন) সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ শাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক।

ইনি ঋষিকল্প ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর পৌত্র ও অধ্যাপক স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পুত্র, ও স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর ও পরলোকগত কর্ণেল্ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণা করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রয়েল কলেজ অব্ সায়ান্সে উদ্ভিজ্জানুতত্ত্বের গবেষণায় নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ডি-এসসি ও পি-এইচ্-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডবল ডক্টরেট ডিগ্রী পান এবং হাকস্‌লি স্বর্ণপদক পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৮ সালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাক্সলির স্মৃতিরক্ষার্থ এই স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবাসীর মধ্যে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিক্সেন পুরস্কার ও বৃত্তি, মোজলে পুরস্কার ও বৃত্তি, কার্ণেগী বৃত্তি প্রভৃতি ছয়টি পুরস্কার লাভ করেন। পরে বার্লিন ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটারিতে কয়েকজন মনীষির নিকট হইতে উদ্ভিজ্জানুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন, ও সুদীর্ঘ ছয় বৎসর ইংলণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় থাকিয়া উদ্ভিদের বংশানুবৃত্তি (Heridity of plants) সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বিলাতে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ইঁহাকে সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক নির্ব্বাচিত করিলে, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ১৯২৬ সালে সিংহলে আসেন। ছয় মাস পরে সিংহল হইতে সাম্রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেস বিটিশ বিজ্ঞান প্রসঙ্গে সমিতি, প্যারিস্ বিজ্ঞান একাডেমি (Congress of the Universities of the Empire, British Association Meetings for the Advancement of Science, Paris Academy of Sciences) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সভায় যোগদান করিবার জন্য তাঁহাকে লণ্ডনে ও প্যারিসে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি তথায় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার জন্য ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটি (Royal Society) ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকে একটি পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

তিনি নিজে যেরূপ উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের অনুশীলন করিতেছেন, ছাত্রদেরও তেম্‌নি এবিষয়ে অনুপ্রেরণা দিতেছেন।

সিংহলের প্রবাসী বাঙ্গালীদের পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হইল। অন্য যে-সব বাঙ্গালী ৬ মাস বা ১ বছর দেড় বছর থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। *

যামিনীকুমার ঘোষ, এম্-এসসি, বি-এল (ময়মনসিংহ) শিক্ষক—মানিপ্পা হিন্দু কলেজ (জাফনা), ৬ মাস।

প্রবোধ সেন, এম্-এ, (কলিকাতা) শিক্ষক—জাফনা হিন্দুকলেজ প্রায় এক বছর।

প্রভাত সেন বি-এ, (কলিকাতা) হেডমাষ্টার, কারা দ্বীপ হিন্দু হাইস্কুল, ৬ মাস।

(প্রবোধ সেন, এবং প্রভাত সেন দুই ভাই ছিলেন)।

রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি-এ (ঢাকা) শিক্ষক—প্রিয়রত্ন হাইস্কুল, ডোডানডুয়া ১॥০ বছর প্রায়। সুধাংশু বসু (বরিশালের বিখ্যাত নেতা স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাগনেয়) সিংহলের বিখ্যাত নেতা অনারেবল্ স্যার রামনাদনের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন—২ বছর প্রায়।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এম, এ, (কলিকাতা) বৌদ্ধ বালিকা কলেজ, প্রিন্সিপাল।

কালিদাস নাগ, এম-এ, (বর্ত্তমানে ডি-লিট) কলিকাতা, প্রিন্সিপাল—মাহিন্দ কলেজ (গল), ১০ মাস।

মিস্ গাঙ্গুলী এবং শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয় সভাসমিতিতে বাংলার গানের প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের সময় বিশেষ ভাবে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত "জন-গণ মন-অধিনায়ক" গানটির প্রচার হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয় কবির অনুমতি লইয়া "দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ" এই পদের

* এই অংশের জন্য আমি শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট ঋণী।—লেখক।

স্থলে—"দ্রাবিড় সিংহল বঙ্গ" করিয়া লইয়াছিলেন। সিংহলী ভাষার নাট্যকার জন ডি সিল্‌ভা তাঁহার নাটকের গানে স্থর দিতে কলিকাতা হইতে একজন বাঙ্গালী গায়ককে আনিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সংগ্রহ করিতে পারি ।

সিংহলীদের অন্যান্য অভাব হইতে গানের অভাবটা খুব চোখে পড়ে। সেক্‌স্‌পিয়রের বিখ্যাত উক্তি "যাহার হৃদয়ে সঙ্গীত নাই সে হত্যা করিতে পারে" খুবই সত্য এবং সিংহল সম্বন্ধে খাটে। সিংহলীরা সর্ব্বদাই বেল্টের সঙ্গে ছুরী রাখে; এবং সামান্য কারণেই ছুরীর অপব্যবহার করিয়া থাকে। খবরের কাগজেই প্রায়ই খুন-খারাবির খবর পাওয়া যায়। এটা বোধ হয় সঙ্গীতের অভাবেরই কারণ। সাধারণ লোকদের ভিতর গান ত একেবারেই নাই; ইংরেজী শিক্ষিতদের ভিতর যে-সব সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তা নিতান্ত তৃতীয় শ্রেণীর, খেলো ইংরেজী গান—ইংরেজীতে যাকে বলে Rag time song, যেমন We have no banana (আমাদের কদলী নাই—) এই গান কলম্বোতে সব-চেয়ে বেশী চলিত। অন্যান্য গানে "Why did I kiss that girl?" "Horse ye why do you put your tail up?" ইত্যাদি। গানের দিকহইতে বাঙ্গালী বোধ হয় সিংহলে স্থনাম অর্জ্জন করিতে পারে।

সিংহলে বাঙ্গালী ছাত্র

কলম্বোতে সময় সময় পালী, বা বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন কিংবা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যায়ের পরীক্ষার জন্য বাঙ্গালী ছাত্র আসিয়া থাকে।

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কলম্বোর বিদ্যোদয় পিরিবেন-এ বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর পালির অধ্যাপক পণ্ডিত নিতাইবিনোদ গোস্বামী ধম্মপদ অধ্যয়ন করিতে এখানে আসিয়াছিলেন।

দুই বছরের মধ্যে (১৯২৫-২৬) ৫ জন ছাত্র লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য আসিয়াছে।

সিংহলে বাঙ্গালী বৌদ্ধ

সমগ্র সিংহলে প্রায় ১০।১২ জন বাঙ্গালী বৌদ্ধ আছেন। ইঁহারা সকলেই ভিক্ষু। সকলেই চট্টগ্রাম-বাসী। একজনের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, ত্রিপুরা জেলায় লাকসামের কাছে কোনো গ্রামে। সে গ্রামে নাকি অনেক বৌদ্ধ আছেন। একজন ভিক্ষু কান্তির নিকট লঙ্কাতিনক বিহারে থাকেন। প্রায় ১৫ বছর ধরিয়া সিংহলে আছেন, পালি এবং সিংহলী ভাষা ভাল জানেন। আমার সঙ্গে বাংলা বলিতে তাঁহার কিছু কষ্ট হইতেছিল। বাংলার ভিতর খুব সিংহলী টান ছিল।

সিংহলবাসী ও বাঙ্গালা ভাষা

মাঝে মাঝে দুই-একজন লোক চোখে পড়ে, যাঁহারা বাংলা ভাষা জানেন। ইঁহাদের ভিতর অধিকাংশই ভিক্ষু। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। কলিকাতায় যে-সব সিংহলী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য আসে তাহাদের বাংলা শিক্ষা করিতে হয়; কিন্তু দেশে ফিরিয়া গেলে পর ইহারা বাংলা ভাষার চর্চ্চা রাখে না বলিয়া ভুলিয়া যায়।

কলম্বোর আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক বুদ্ধদাস মহোদয় বাঙালা ভাষা বেশ জানেন। বিদ্যোদয় পিরিবেনের অধ্যাপক রেভারেণ্ড দেবরক্ষিত সেরা বাংলা জানেন। প্রবাসী রাখিয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি পালির অধ্যাপক ছিলেন।

এক দৈনিক কাগজে পড়িয়াছিলাম, বিদ্যোদয় পিরিবেনএ বাংলার ক্লাস খোলা হইবে; এখনো হয় নাই। পরে হইতে পারে।

যাহারা বাংলা শিখিয়া থাকে, তাহারা বাংলা সাহিত্য বা রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করিবার জন্য শেখে না, কাজেই বাংলার প্রসারের তেমন সম্ভাবনা নাই। ইংরেজী শিক্ষিত যাহারা, তাহাদের বাংলা শিক্ষার আগ্রহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ ও সিংহল

রবীন্দ্রনাথ কয়েক বার সিংহলে আসিয়াছেন এবং বহুস্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। লোকেরা ৫৲ টাকা

খরচ করিয়া টিকিট কিনিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জানিতে বা তাঁর বই অধ্যয়ন করিতে লোকেদের আগ্রহ একটুও বাড়ে নাই। সময় সময় ইহারা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাম করিয়া থাকে, এবং তাহাকে বিখ্যাত প্রাচ্য কবি (Great Eastern poet) আখ্যা দিয়া থাকে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। খুব কম লোকেই তাঁহার বই পড়ে। আমার এক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি এখানকার এক বড় দোকান রবীন্দ্রনাথের Personality এবং Nationalism এই দুই পুস্তক ২০ কাপ করিয়া বিক্রী করিতে আনিয়াছিল। এই বই শেষ করিতে তাহাদের দু'বছর লাগিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে সত্য-সত্যই তাঁহার কত আদর, তাঁহার শিক্ষার আদর্শ এবং জাতীয়তার আদর্শের সহিত বর্ত্তমান সিংহলের আদর্শের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও সিংহল

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে বক্তৃতা করিতে যাইবার সময় কলম্বো হইয়া গিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ সোসাইটী নামে একটি সমিতি তাঁহার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে। এই সংলগ্নে একটি পুস্তকালয় ও হোষ্টেল আছে। জাফনার তামিল স্বামী বিপুলানন্দ বিবেকানন্দের শিষ্য। ইনি মাঝে মাঝে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাঁহার অধীনে গোটা দুই হিন্দু স্কুল আছে।

রামকৃষ্ণ মিশন হইতে এখানে বক্তা এবং কর্ম্মী মাঝে মাঝে পাঠান দরকার। ভারত হইতে মিশনারী যায় আমেরিকার খৃষ্টানদের হিন্দু করিতে, কিন্তু ঘরের কাছে সিংহলে হিন্দুদের আগে হিন্দু করা দরকার। যদিও তাহারাও দ্রুত সিংহলীদের মত সুসভ্য হইয়া উঠিতেছে, তবু এখনও তাহারা নিজেদের জাতীয়তা হারাইয়া ফেলে নাই। ইহারাই ভারতের ডাকে সাড়া দিবে। সিংহলীরা দিবে না।

সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন

শ্রী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(৩)

ইংরাজী ১৮৮০ সালের বৈশাখ মাসে আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে বৈশাখ-উৎসব-উপলক্ষে গান-বাজনা হইয়াছিল, আমাদের বাড়ীর নিকটেই তাঁহার বাড়ী; যখন সেখানে গান বাজনা হইত আমি সংবাদ লইতাম এবং সেখানে গিয়া শুনিতাম। গায়কের মধ্যে শ্রীরামপুরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার স্বর্গীয় রামদাস গোস্বামী এবং আর একজন পেন্‌শন্‌প্রাপ্ত ভদ্রলোক, তাঁহার নাম শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী (ইনি বিখ্যাত শিবনারায়ণ মিশ্রের শিষ্য)। রামদাস বাবু রসুল বক্সের শিষ্য। গান-বাজনা হইতেছিল; অন্যান্য শ্রোতাগণ ছিলেন, আমিও শুনিতে গিয়াছিলাম। গান-বাজনা বন্ধ হইলে পর, সেন মহাশয় আমাকে বলিলেন, "তোমার খেয়াল শিক্ষা হইল না বলিয়া দুঃখ করিও না। রামদাস-বাবুর নিকট তুমি ধ্রুপদ শিক্ষা কর; তিনি তোমাকে যত্ন করিয়া শিখাইবেন।" সেন মহাশয় খেয়াল অপেক্ষা ধ্রুপদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন এবং রসুল বক্সের ঘরের ধ্রুপদের তুল্য ধ্রুপদ আর নাই বলিয়া পরিচয় দিলেন। রামদাস-বাবুও আমাকে গান শিখাইবেন বলিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বলিলেন। পরদিন প্রাতে আমি গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার বাড়ীর নীচের ঘরে দুইজন ভদ্রলোক, একজন গান করিতেছিলেন

এবং অপরটি সেতার বাজাইতেছিলেন। আমি বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। রামদাস-বাবু নীচে আসিয়া আমার সুরবোধ আছে কি না জানিবার নিমিত্ত কণ্ঠে সরগম্ বাহির করিতে বলিলেন। আমার বাঁশী বাজান পূর্ব্বে অভ্যাস ছিল এবং গানও অল্প অল্প করিতে পারিতাম বলিয়া সুর বাহির করা কঠিন হইল না। যে দুইটি গান দুইজন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, রামদাস-বাবু সে দুইটি আমাকেও শিখাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রথম গানটি কোকব বেলাবল, "শুভ সগন শুভ লগন ছত্র ধরাউ, আজ মিলি পণ্ডিত লগন ধরাউ"; দ্বিতীয় গানটি সিন্ধু, "কঠিন দুখ পায়ো মোহন প্যারে তেহারে দরশন বিন ঘড়ি পল ছন দিন রয়ন পড়ত নহি চয়ন।" গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি গান দুইটি তিন চারি বার গাহিলাম; পরে আমি একলাই দুইটি আস্থায়ী গান করিলাম। সেদিন প্রাতঃকালে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল; রামদাস-বাবু আমাকে পুনরায় বৈকালে আসিতে বলিলেন, আমি যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম; গোস্বামী মহাশয় সে-সময়ে পাশা খেলিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া খেলিতে-খেলিতে গান দুইটির অন্তরা শিখাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গেই গান করিতে লাগিলাম, পাঁচ সাত বার গান করিবার পর আমি একলাই গান করিলাম। দুই একস্থানে ভুল হইল, কিন্তু তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া দিলেন। গুরুদেব তাম্বুরার সহিত গান করিতে বলিলেন। তাম্বুরা ধরিতেই পারি না, সুর কেমন করিয়া ছাড়িতে হয় জানি না, গান করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। প্রায় সপ্তাহ কাল পরে তাম্বুরার সুর ছাড়িতে পারিলাম এবং ঐ দুইখানি গান দুই তুকের বলিয়া এই কয় দিনে আদায় হইয়াছিল, তাহাও তাম্বুরার সহিত গান করিতে পারিলাম। তাল বড় ভাল হইল না, তালের জন্য তিনি বলিলেন, পরে হইবে।

পরদিন হইতে আমার গান শিক্ষা আরম্ভ হইল, গুরুদেবের আদেশ হইল প্রাতে দুই ঘণ্টা, অপরাহ্নে দুই ঘণ্টা এবং রাত্রে দুই ঘণ্টা শিক্ষা করিতে হইবে, প্রাতে সুরসাধনা অর্থাৎ মন্দ্র-সপ্তক-সাধন এবং অন্য সময়ে গান শিক্ষা এই বন্দোবস্ত হইল। আমি তদনুযায়ী শিক্ষা ও সাধনা করিতে লাগিলাম, মাস দুই মধ্যে চারি পাঁচখান আদায় হইল, কিন্তু সেগুলি সাধনাভাবে পরিষ্কার (অর্থাৎ 'সুরিলি') হইল না। ক্রমে ক্রমে সময়ে বাড়াইতে হইল এবং তাঁহার আদেশ মত এক-একখানি গান একশত বার করিয়া সাধন করিতে লাগিলাম। মুসলমান ওস্তাদেরা এক-একটি গান পাঁচ শত বার, এবং কোন কোন গান এক সহস্র বার গান করিয়া তৈয়ার করিয়া রাখে। এই নিমিত্তই উহাদের গান মিষ্ট, এক্ষণে আর এ-প্রথা নাই। আমাদেরও গানের পুঁজি যেমন যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সাধনার কালও অল্প হইতে লাগিল। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল, যেখানে গোস্বামী মহাশয় গান করিতেন সেখানে আমাকেও লইয়া যাইতেন এবং সঙ্গে গাওয়াইতেন। যে গান আমাকে শিখাইতেন সেই গান গাহিতেন এবং আমাকে কখনও একলা গাওয়াইতেন, কখন কখন সঙ্গে গান করিতে বলিতেন। এই সময়ে শ্রীরামপুর হইতে নিমাইচরণ ঘোষাল নামে একজন (আমারই সমবয়স্ক) গান শিখিবার নিমিত্ত গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইল। আমাদেরও শিক্ষার পক্ষে বড়ই সুবিধা হইল, একসঙ্গেই আমরা গুরুদেবের নিকট থাকিতাম এবং শিক্ষা ও সাধনা উত্তমরূপেই হইতে লাগিল। তিন বৎসর এইরূপ কঠোর পরিশ্রমের পর গুরুদেব আমাদিগকে শ্রীরামপুরে লইয়া যান এবং আমাদের গান শুনাইবার নিমিত্ত নিকটস্থ গুণীদিগকে আহ্বান করেন। তখন প্রাচীন গুণী ও গায়কমণ্ডলীর মধ্যে গোপাল চক্রবর্ত্তী (নুলো গোপাল), মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মধু বাঁড়ুয্যে এবং আরও দুই-চারিটি শ্রীরামপুরে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। আমরা একমাস সেখানে ছিলাম; প্রত্যহই সকালে, বৈকালে ও রাত্রিতে ধ্রুপদ গান হইত।

কাশী ফিরিবার সময় বিষ্ণুপুর, কাশীপুর, হেতমপুর প্রভৃতি রাজস্থান এবং গুণীদিগের গান বাজনা দেখিবার শুনিবার ইচ্ছা আমরা গুরুদেবকে জানাই এবং তদনুযায়ী তিনি তৎ তৎ স্থানে পত্র লিখিয়া জানাইলেন। আমরা

যথাসময়ে প্রথমে কাশীপুরে যাই; সেখানে কাসিম অলি খাঁ (রবাবী) ছিলেন। সন্ধ্যার সময় খাঁ সাহেবের বীণা-বাদন হইল। শ্রোতাগণের মধ্যে রাজা এবং আমরাই কয়জন। খাঁ সাহেব একঘণ্টা আলাপ করিয়া গান করিলেন এবং বিষ্ণুপুরের একজন মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বাজাইলেন। বীণার সঙ্গে গান বন্দে আলি খাঁর শুনিয়াছিলাম আর এই শুনিলাম; পরে আর শুনিতে পাই নাই।

পরদিন প্রত্যুষেই খাঁ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা অত্যন্ত সরল ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনিও প্রাতে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। আমাদের গান হইল ও খাঁ সাহেব বীণাতে সংগত করিতে লাগিলেন। আমরা "সুরিমন সুমরণ" ললিত রাগের গান করিলাম। খাঁ সাহেব বড়ই খুসী হইলেন এবং তিনিও "সঘন বন ছায়ো" ললিতের ধ্রুপদ গান করিলেন এবং বীণাতে সংগত করিতে লাগিলেন। রাজাও অত্যন্ত খুসী হইলেন। আহারান্তে পুনরায় বৈকাল বেলায় বীণা আরম্ভ হইল ও খাঁ সাহেব সাময়িক রাগ আলাপ ও গান করিলেন। সন্ধ্যার পর আহারান্তে রাজার সহিত রামদাস-বাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। কলাবিৎদিগের মতের সহিত কথকদিগের মত মেলে না, অনেক স্থলে কলহও হয়, অথচ খাঁ সাহেবরা হাতে-কলমে অর্থাৎ যন্ত্রে কিম্বা কণ্ঠে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেন। আমাদের গান এবং বিষ্ণুপুরের ঢঙ্গের গান বিভিন্ন রকমের হইলেও তাহাতে যে বিশেষত্ব নাই তাহা বলা যায় না। যদুভট্ট নামে একজন গায়ক সেখানে ছিলেন, তাঁহার কণ্ঠ ভাল ছিল এবং তিনি অসাধারণ মেধাবীও ছিলেন। কিন্তু ভাল মাথা থাকিলেই যে কাহারও নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিবেন না ইহা হইতে পারে না। রাজা এই সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়কে একটি ঘটনা শুনাইলেন। যদুভট্ট কোন সময়ে দরবারী কানেড়া গান করিতেছিলেন এবং কাসিম আলি খাঁ শুনিতেছিলেন। গান শেষ হইবার পর খাঁ সাহেব বীণাতে ঐ রাগের আলাপ করিলেন এবং পরে একখানি গান করিলেন। স্পষ্ট দেখা গেল, দুইজনের গানে বহু ভেদ। ভট্ট মহাশয় খাঁ সাহেবকে বলিলেন, আমাকে বীণা শিখান। খাঁ সাহেব বলিলেন, "বীণা নিজ বংশ (অওলাদ) ব্যতীত কাহাকেও শিখাইবার আদেশ নাই। তবে তুমি সেতার কিম্বা গান শিখিতে পার।" ভট্ট মহাশয় বলিলেন, "আমি বীণাই শিখিব; আপনি যদি না শিখান তবে অন্যত্র শিখিব।" ইঁহারা উভয়েই রাজ-দরবারে থাকিতেন; খাঁ-সাহেব যখন দরবারে বাজাইতেন ভট্ট মহাশয় রাজকর্ম্মচারীদের ঘরে লুকাইয়া থাকিয়া সেই বাজনা অভ্যাস করিতেন। এইরূপ পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গেল। খাঁ সাহেব কেবল গুণী ছিলেন না, তিনি একজন পণ্ডিত ছিলেন। সঙ্গীত দ্বারা যৌগিক উপদেশ দিবার শক্তি তাঁহাতে ছিল তাই তিনি মধ্যে মধ্যে রাজার বিনানুমতিতেই তাঁহার নিকট আসিয়া উপদেশ দিতেন। কোন সময়ে ভট্টজী সেতার বাজাইতেছিলেন এবং রাজা শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে খাঁ সাহেব হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ভট্ট মহাশয় তন্ময় হইয়া সেই-সকল তানগুলি বাজাইতেছিলেন যেগুলি লুকাইয়া শিখিয়াছিলেন। খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টজী, এই তানগুলি কোথায় শিখিলে?" ভট্টজী বলিলেন, "এগুলি আমাদেরই ঘরের।" খাঁ সাহেব বলিলেন, "এ বিষ্ণুপুরের ঢং কখনই নহে; তুমি চুরি করিয়া শিখিয়াছ।" একথা বলিয়া রাজাকে বলিলেন, "আপনার চাকরদের জিজ্ঞাসা করুন, ভট্টজী তাহাদের ঘরে লুকাইয়া থাকেন কি না এবং আমি যখন বাজাই তখন সেগুলি লুকাইয়া অভ্যাস করেন কি না।" অবশ্য ভট্টজী ধরা পড়িয়া গেলেন, সত্য কথা বলিলে হয়ত কাশীধামের অর্জ্জনজীর মত তিনিও খাঁ সাহেবেরই নিকট বিদ্যালাভ করিতে পারিতেন। চুরি করিয়া কেহ কেহ বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তথাপি গুরুর নাম লোপ করা কর্ত্তব্য নহে। রাজা এইরূপ কথোপকথনের পর আমাদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "গুরু-সমীপে থাকিয়া গুরুর সেবা করিয়া বিদ্যা শিক্ষা কর।"

পরদিন প্রাতেই আমরা কাশীপুর হইতে বিষ্ণুপুর যাত্রা করিলাম। সেখানে স্বর্গীয় রামশঙ্কর মিশ্র মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র (নাম স্মরণ নাই) আমাদিগকে অতিশয় যত্নের

সহিত আতিথরূপে গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার সময় স্থানীয় গায়ক ও বাদকদের আহ্বান করা হইয়াছিল এবং অনেকক্ষণ গানবাজনা হয়। আমাদের গানের সহিত তাঁহাদের গানের সুর মেলে না এবং বোল বাণীরও স্থানে স্থানে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তবে রামশঙ্কর মিশ্র মহাশয়ের স্বরচিত গানগুলি সুরে এবং লয়ে আমার ভাল বলিয়া বোধ হইল। আমি গুরুদেবের আদেশানুসারে ৩।৪ খানি গান মিশ্র মহাশয়ের একজন ছাত্রের নিকট শিক্ষা করি। সেখানকার একজন গায়ক একটি আশাবরী গান করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে উহা গোপাল চক্রবর্ত্তী (নুলো-গোপাল) মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। এটি রাগমালার গান, অর্থাৎ কল্যাণ, ভূপ, শঙ্করা ও হিন্দোল, এই চারি রাগে চারি পদ গাওয়া যায়। চারি তালেও চারি পদ গাওয়া যায়; এক-একটি রাগেও চারি পদ গাওয়া যায়। উহা মৎপ্রণীত অন্য পুস্তকে দিয়াছি বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। বৈজু পওয়ার গান কিরূপে নষ্ট হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই। আমি এই গান পরে উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করি।

বিষ্ণুপুর হইতে আমরা হেতমপুরে আসি, কিন্তু সেখানে কোন গায়ক (পশ্চিমের শিক্ষা) দেখিলাম না। সবই বিষ্ণুপুরী ঢং। একদিন গান-বাজনা হইয়াছিল; পরদিন আমরা কাশী রওনা হই।

(৪)

কাশী আসিয়া আমাদের শিক্ষা ও সাধনা পূর্ব্ববৎ হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে শুনা গেল কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নামক একজন গায়ক সশিষ্য কাশীতে আসিয়াছেন। তিনি ধ্রুপদ গানও করিতে পারেন এবং সেতারও বাজাইতে পারেন। বাঙ্গালীটোলায় আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার গান হইয়াছিল; আমরাও উপস্থিত ছিলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গলার সুর অত্যন্ত উচ্চ এবং মোটা; তাম্বুরার সুর নীচে থাকে; ক্রমে শুনা গিয়াছিল। তিনি ইংরেজী সঙ্গীত ভক্ত। যাহা হউক তাঁহার গান লয়ে সুরে ভাল বলিতে হইবে। আমাদের গানও হইল; গুরুদেব নূতন নূতন গান করিলেন, আমরা সঙ্গে সুর দিতে লাগিলাম। পরে আমি ও নিমাই জুড়িতে গান করিয়াছিলাম, কৃষ্ণধন-বাবু রামদাস-বাবুর গান শুনিয়া বলিলেন, "গোটা কতক ধ্রুপদ আমি স্বরলিপি করিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি; অনুমতি পাইলে আপনার নিকট যাইব।" গুরুদেব বলিলেন, "তাহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? তবে স্বরলিপি দ্বারা কি শিক্ষা হইবে বুঝিতে পারি না।" কৃষ্ণধন-বাবু তদুত্তরে একটি বক্তৃতা সংক্ষেপে দিলেন এবং বলিলেন যে, স্বরলিপি ভিন্ন বিদ্যা রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় নাই। গুরুদেব বলিলেন, "সুর পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা হয় না, গুরু-সমীপে সাধনার দ্বারা শিক্ষা হয়। তবে আপনারা যদি সুর সাধনা উঠাইয়া দিতে চাহেন তাহা হইলে ভিন্ন কথা।" কৃষ্ণধন বাবু বলিলেন, "এসমস্ত বিষয়ে আপনার বাটিতেই কথাবার্ত্তা হইবে। আমি কল্য আপনার বাড়ীতে প্রাতে যাইব।"

পরদিন যথাসময়ে কৃষ্ণধন-বাবু গুরুদেবের বাড়ীতে আসিলেন, আমরা "আনন্দী জগবন্দী" দেশকার রাগে শিক্ষা করিতেছিলাম। কৃষ্ণধন-বাবু স্বরলিপি করিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে গাহিতে অনুরোধ করায় তিনি গান করিলেন,—আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আমরা আবার গান করিলাম; কৃষ্ণধন-বাবু পুনরায় স্বরলিপি পরিবর্ত্তন করিলেন এবং তদনুযায়ী গান করিলেন। অনেকটা হইল বটে, কিন্তু সুর ও তাল কাটা কাটা বোধ হইতে লাগিল। গুরুদেব বলিলেন, স্বরলিপি সাহায্যে গান শিক্ষার কোনই সম্ভাবনা নাই, পরন্তু গানগুলির সুর জবাই করা হয়। কৃষ্ণধন-বাবু পুনঃপুনঃ নিজেরই কথা অর্থাৎ স্বরলিপি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই বুঝাইতে লাগিলেন। গুরুদেব অগত্যা এই কথাগুলি বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, "তাহা হইলে **সাধনা** ও **গুরু** এই দুইটি শব্দ তোমরা উঠাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছ।" কৃষ্ণধন-বাবু আরও দুই তিনখানি গান স্বরলিপি করিয়া সে-যাত্রা চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, "এক বৎসর পরে আমি পুনরায় আসিব এবং ভাল ভাল গানগুলির স্বরলিপি করিয়া লইব।"

কলিকাতায় মহাপ্রদর্শনী সভা যে-বৎসর হয় সেই বৎসরে কৃষ্ণধন-বাবু কাশীতে আসিয়াছিলেন। তিনি ১০।১৫

খানি ধ্রুপদ স্বরলিপি দ্বারা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলেন। গুরুদেব আমাদিগকেও ভাল ভাল ধ্রুপদগুলি (অর্থাৎ যেগুলি লয়ে সুরে ভাল) গাহিতে বলিলেন। গুরুদেব গানের খাতা বাহির করিয়া দিলেন এবং কৃষ্ণধন-বাবুকে ইচ্ছানুযায়ী গানগুলি বাছিয়া লইতে বলিলেন। গ্রীষ্মকাল চারিমাস ধরিয়া কৃষ্ণধন-বাবু ভাল ভাল গানগুলি আমাদিগকে গান করিতে বলিলেন এবং নিজে স্বরলিপি করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি কণ্ঠেও গান করিতেন। তিনি সেতার বাজাইতে পারিতেন বলিয়া যে যে স্থানে স্বরলিপিতে কুলায় না সেখানে কণ্ঠেই দেখিয়া লইতেন। গুরুদেব পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, যেখানে মীড়ের কাজ আছে সেখানে গুরুকরণ ও কণ্ঠে সাধন ভিন্ন আদায় হওয়া অসম্ভব। কিন্তু কৃষ্ণধন-বাবু 'না-ছোড়-বান্দা' হওয়ায় গুরুদেব তাঁহাকে ঐ প্রকার অবসর ও সুবিধা দিয়াছিলেন। তখন হারমোনিয়ম যন্ত্র বেশী ব্যবহার লোকে করিত না। ক্রমে ক্রমে যেমন যেমন স্বরলিপির প্রচার বৃদ্ধি হইল তেমনি হারমোনিয়ম যন্ত্রের ব্যবহারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কৃষ্ণধন-বাবু স্বরলিপি করিলেন বটে, কিন্তু গানগুলি কখনো শুনান নাই। তাঁহার পুস্তকে ধ্রুপদ-গুলি আছে বটে, কিন্তু কোন গায়ক ঐ পুস্তক দেখিয়া শিক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ৪০ বৎসর গত হইয়াছে; গানগুলি পুস্তকেই স্বরলিপি করা রহিয়াছে; শুধু তাহাই নহে; ধ্রুপদ গানগুলিও রাগান্তর ও ভাষান্তর করিয়া সঙ্গীত বিদ্যাটির মূলে তিনি একপ্রকার কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন।

যে সমস্ত ধ্রুপদ তিনি স্বরলিপি করিয়া পরে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন সে-সবগুলির তালিকা দেওয়া কঠিন; তবে কতকগুলি সাধারণের জ্ঞাপনার্থে এ স্থানে দিলাম।

১। "আনন্দী জগবন্দী"; ইমন কল্যাণ রাগের গান; গানটি চারি তুকের (পদের)। কৃষ্ণধন-বাবু স্বরলিপি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে সঞ্চারী, আভোগ নাই এবং আস্থায়ী ও অন্তরাতে বোল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এ গানটি দেশকার রাগেও গাওয়া যায়। গানের যে স্থান হইতে দেশকার রাগের সম্ভব সে স্থান কৃষ্ণধন-বাবুকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পুস্তকে এ কথার উল্লেখ করেন নাই।

২। "ধ ম গ মা গর"; ইমন কল্যাণের স্বরগ্রাম। ইহার আস্থায়ী, অন্তরাতে বোল পরিবর্ত্তিত। সঞ্চারীতে তান আছে, কিন্তু পুস্তকে তাহা দেওয়া হয় নাই। অনেকে বলেন ধ্রুপদে তান নাই বা তান চলে না; আমরা গমক তান শিখিয়াছিলাম এবং দিয়াও থাকি।

৩। "তেরো হি ধ্যান ধরত"; কল্যাণের গান। ইহার বোল বাণী পরিবর্ত্তিত এবং তানসেন কৃত বলিয়া পুস্তকে লেখা হইয়াছে। আমরা গোপাল নায়ক রচিত বলিয়া জানি।

৪। "তাকত হু তেহারি"; ইমন কল্যাণের গান। কৃষ্ণধন-বাবু ভূপালী রাগে কোথা হইতে পাইলেন? আমরা তাঁহার সম্মুখে ইমন কল্যাণ রাগেই গান করিয়া-ছিলাম।

৫। "আনন্দ ভয়ো মেরে"; কেদারা রাগের গান; কৃষ্ণধন-বাবু হাম্বির রাগে করিয়াছেন; বোলও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত। লক্ষ্মীবাবুও (বর্ত্তমানে কাশী নিবাসী) কেদারাতেই গান করিয়া থাকেন।

৬। "শ্যাম সি ঘনশ্যাম"; মেঘ রাগের গান এবং কৃষ্ণধন-বাবু মেঘরাগেই স্বরলিপি করিয়াছিলেন। পুস্তকে গৌড়মল্লার কি করিয়া করিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

৭। "নাদনগর বসায়ো"; দরবারী টোড়ির গান। এ গানের স্বরলিপি করিবার জন্য কৃষ্ণধন-বাবুকে সেতারের সাহায্য লইতে হইয়াছিল; ইহাতে মীড়ের কাজ অনেক আছে এবং সুরের ব্যবহার অতিশয় সুন্দররূপে আছে। তিনি ইহাকে গুর্জ্জরী টোড়ি করিয়াছেন এবং গানেরও বোল পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

৮। "বিঘ্নহরণ বুধ বিনায়ক"; তিলক কামোদের গান। কৃষ্ণধন-বাবু ইহাকে কর্ণাট রাগ কেমন করিয়া করিলেন?

এইরূপ অনেক গান আরও আছে যাহার বোল ও সুর পরিবর্ত্তন করিয়া "রাগের" নাম ও "গানের" সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পুস্তক বোঝাই করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহার নিকট

ঐগুলি পাইয়াছেন তাঁহার নাম একেবারে উল্লেখ করেন নাই। গানগুলি কিন্তু এখনো রসুল বক্সের বলিয়া অনেকে জানেন এবং সে-ঘরের ধ্রুপদ রামদাস-বাবুই গান ধরিতেন। আমি, নিমাই এবং উপেন্দ্রচন্দ্র রায় রামদাস-বাবুর শেষ ছাত্র। দুইজন পরলোকপ্রাপ্ত; আমি বর্ত্তমান আছি এবং বলিবারও সাহস রাখি। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল ধ্রুপদের যে-অবস্থা ছিল এবং এক্ষণে যে-অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে এই প্রমাণ হইতেছে যে, স্বরলিপি সাহায্যে ধ্রুপদগুলিকে রক্ষা করিতে গিয়া কৃষ্ণধন-বাবু ধ্বংসই করিয়াছেন। তিনি আহম্মদ খাঁর (সেতারী) নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও শিখাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুস্তক দেখিয়া যদিও কেহ কেহ শিক্ষা করিতে সাহস করিয়াছেন তাঁহারা সফলকাম হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমার মনে হয় স্বরলিপি প্রথা প্রথম এই শিক্ষা দেয় যে, "গুরুকরণ প্রথা অনাবশ্যক" এবং দ্বিতীয় কাজ এই করে যে, সুরগুলিকে তালের মধ্যে আনিয়া শুধু "তাল গান" করায়।

রামদাস-বাবু যে-সমস্ত ধ্রুপদ গান করিতেন সমস্তই উৎকৃষ্ট এবং বাছিয়া বাছিয়া রসুল বক্সের নিকট শিখিয়াছিলেন। এই কথা তিনি বলিতেন এবং লোক-পরম্পরায়ও ইহা শুনা গিয়াছে যে, রসুল বক্সের মত ধ্রুপদ আর শুনা যায় না। সেই বিশুদ্ধ সঙ্গীতের পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণধন-বাবুর যে কি লাভ হইল, তিনিই জানেন। কিন্তু গুরুর নাম স্বীকার না করায় তাঁহাকে গুরুধ্বংসী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। আমরা ইহাই জানি যে, একবর্ণ যাঁহার নিকট শিক্ষা করা যায় তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আজকাল ইহার বিপরীত দেখা যায়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

প্রকাশকের বিড়ম্বনা

শ্রী সরসীবালা বসু

এক

নেলী আট-বছর-বয়সে পিঠের উপর বেণী ঝুলাইয়া খাতা, পেন্সিল, শ্লেট, বই বগলে লইয়া যখন পাড়ার মিশনরী স্কুলে পড়িতে যাইত, তখন হইতেই সে পদ্য লিখিতে বা পয়ার বাঁধিতে শিখিয়াছিল। একদিন সে "কথামালা"র গল্প পড়িয়া নিজের বাদামী রঙের খাতায় বড় বড় অক্ষরে পদ্য লিখিয়াছিল :—

কুকুর সে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে,
ফেলে দিল মাংসখণ্ড যা ছিল তার মুখে।

তার দাদা হিরণ্ময় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাসের ছাত্র এবং বাঙ্গালা, ইংরেজী সাহিত্যের রসজ্ঞ সমঝদার। হিরণ্ময় তাহার পেন্সিল হারাইলেই ছোট্ট নেলীর খাতাপত্র খানাতল্লাসী করিতে আসিত। চোরাই মাল কখনো ধরা পড়িত, কখনো পড়িত না; ধরা পড়িলে সে নেলীকে ধমক দিয়া যখন বলিত,—"পোড়ারমুখী মেয়ে, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়—এ নীতিবাক্য যদি দু'বছর না পড়্‌তে পড়্‌তেই ভুলে যাস্, তা হ'লে তোর গতি কি হ'বে ?"

নেলী ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিত,—"বাঃ রে, আমি যে কুড়িয়ে পেয়েছি—দালানে পড়েছিল"।

কথাটা মিথ্যাও নয়, কিন্তু নেলীর আইন ও হিরণ্ময়ের আইন মিলিত না। নেলী বলিত—কুড়ান জিনিষ যে পায় তার। হিরণ্ময় বলিত—কখনই নয়, জিনিষ যার তারই দাবী, তা সে যে কেহই কুড়াইয়া পাক্ না কেন। ইহাতেও নেলী হার মানিতে না চাহিলে সে উদাহরণ

দেখাইত, "আচ্ছা, তোর পুতুলের হারছড়া একজন স্কুলের মেয়ে কুড়িয়ে পেলে তুই জান্‌তে পারলে কি করিস্?" নেলী স্বচ্ছন্দে উত্তর দিত—"সেই মেয়ের কাছ থেকে তখ্‌খনি সেই পুঁতিরমালা ছিনিয়ে নেই।" তখন হিরণ্ময় হাসিয়া "নিজের হারানো জিনিষ দেখিতে পাইবামাত্র কাড়িয়া লইবার" দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গেলেই কিন্তু বিপদ ঘটিত। অর্থাৎ চোরাই মাল উদ্ধার করিবার জন্যই তাহাকে কিছু ঘুষ দিতে হইত। যাহা হউক, অতঃপর একদা দ্বিপ্রহরে নেলীর অনুপস্থিতিতে হিরণ্ময় তাহার হারানো কলমটি খুঁজিতে গিয়া নেলীর বাদামীরঙের খাতা হাতড়াইয়া কলমের পরিবর্ত্তে সেই দুইছত্র কবিতা আবিষ্কার করিয়া বসিল এবং চোখেমুখে কৌতুকের এক ঝলক আভা লইয়া খাতা হাতে তখনকার মত নিজেরই পাঠগৃহে ফিরিয়া গেল। সেদিন ছিল হিরণ্ময়ের শনিবারের পুরা ছুটি। বেলা দু'টার সময় ঝির সহিত আরো কতকগুলি সঙ্গিনীপরিবেষ্টিতা নেলী গল্প-হাস্যে রাজপথ মুখরিত করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। হিরণ্ময়ের বিধবা পিসিমা এতক্ষণে ঘর-গৃহস্থালীর সমস্ত কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া জপতপ-অন্তে আহারে বসিয়াছিলেন; হিরণ্ময় নেপথ্যের সাড়া পাইয়া তৎক্ষণাৎ নিজের "মিল্টন" বন্ধ রাখিয়া নেলীর সেই খাতা লইয়া বসিল; এবং খুব ঝুঁকিয়া-পড়িয়া মনোযোগী ছাত্রের ন্যায় টানাস্বরে জোরে জোরে আবৃত্তি করিতে লাগিল:—

কুকুর সে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে,
ফেলে দিল মাংসখণ্ড যা ছিল তার মুখে।

"ওগো তোমাদের নেলীকে পৌঁছে দিয়ে গেনু"—বাড়ীর বাহির হইতে অভিভাবকের উদ্দেশে এই বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া মেয়ের দল লইয়া ঝি চলিয়া গেল। নেলী লাফাইতে-লাফাইতে বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই যেমন তার দাদার কণ্ঠের আবৃত্তি শুনিতে পাইল অমনি—'আঁ—মা—হাঁ—হাঁ' করিতে করিতে দাদার ঘরে ঢুকিয়া দাদার সহিত কাড়াকাড়ি সুরু করিয়া দিল। অবশ্য শারীরিক বলের অভাব পূরণ করিয়া ফেলিল কণ্ঠের প্রবল অনুনাসিক ধ্বনির দ্বারা। পিসিমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বলি হাঁ্যরে হিরণ্ময়, এই তিন'পর বেলা, এতক্ষণে যদি দুটো পিণ্ডির জোগাড়ে বস্‌লাম, তাও কি তোরা থির্ হ'য়ে গিল্‌তে দিবিনি? তুই বুড়ো খোকা ঐ একরত্তি মেয়ের সঙ্গে লেগেচিস্ কিসের জন্যে? অ সেজবৌ, তোকে আর ছেলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে হ'বে না, এসে নিজের বুড়ো খোকাখুকিদের সামাল্ দে। আমার এখন ওঠার জো নেই।"

সেজবৌর—ওরফে হিরণ্ময়ের মাতার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না; তিনি তখন খোকাকে ঘুম পাড়াইবার অজুহাতে নিজেই ঘুমে অচেতন। যাহা হউক, পিসিমার চীৎকারের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। হিরণ্ময় বিদ্রোহের সম্ভাবনায় ভীত হইয়া সহজেই সন্ধির প্রস্তাব সুরু করিল। সে বলিল, "আচ্ছা, সত্যি বল্ দেখি নেলী, আমার হাড়ের কলমটা তুই নিয়েছিলি কি না। খুব সত্যি কথা বল্, এই আমার চোখে চোখ রেখে। চোখের পলক পড়্‌লেই বুঝ্‌ব মিথ্যে বল্‌ছিস্।"

ঠিক্ এইসময় হিরণ্ময়ের সহপাঠী সুধেন্দু দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ইস্, কিসের জেরা চল্‌ছে?"

হিরণ্ময় বলিল,—"যা চ'লে থাকে মাঝে মাঝে, অর্থাৎ আমার হাড়ের কলমটি খোয়া গেছে।"

সুধেন্দু বলিল, "আর অম্‌নি তুমি নেলীকে ধ'রে পীড়ন সুরু ক'রে দিয়েচ, এ তোমার ভারি অন্যায়। ও ছেলেমানুষ, বোঝে না তাই। আমরা হ'লে মানহানির মোকদ্দমা কর্‌তাম।"

সুধেন্দুর ওকালতিতে অনেক সময় নেলী খুব সহজেই অব্যাহতি পাইত; সেজন্য সুধেন্দুকে সে প্রীতির চক্ষেই দেখিত। এখনও সে তার ভীতচকিত আঁখির দৃষ্টি সুধেন্দুর মুখের উপর ধরিয়া সহজেই তার কৃপাভিক্ষা করিল। সুধেন্দু নেলীর হাত-দুটি ধরিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল—"নেলী, সত্যি কথা বল, কলম নিয়েছ, কি না; তোমায় কালই আমি একটা হাড়ের কলম এনে দেব।"

নেলী মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিল লইয়াছে। সুধেন্দু কহিল, "কোথায় পেয়েছিলে?"

নেলী কহিল, "স্নানের ঘরে।"

হিরণ্ময় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ওহো, মনে প'ড়ে গ্যাছে। পরশু দিন স্নান করতে গিয়ে দেখি কানে কলম গোঁজা; খুলে চৌবাচ্চার পাড়ে রেখে আর মনেই ছিল না।"

সুধেন্দু নেলীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা, সে কলমটা নিয়ে এস গিয়ে দেখি।"

নেলী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

হিরণ্ময় কহিল, "যা না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

নেলী কহিল, "আমু সেটা নিয়ে নিয়েছে।" আমু নেলীর একজন বিশেষ বন্ধু। এমন-কি, শোনা যায়, নেলীর সহিত অল্প দিন পূর্ব্বে তার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

হিরণ্ময় রাগিয়া উঠিয়া কহিল,—"রাক্কুসী, আমার জিনিষ আমায় না ফিরিয়ে দিয়ে তাকে তুই দিতে গেলি কোন্ হিসেবে?"

এইবার নেলীর চোখদুটি জলে টল্‌টল্ করিয়া উঠিল।

সুধেন্দু কহিল, "দেখ বন্ধু, জগতে বেহিসেবী কাজও মাঝে মধ্যে ঘ'টে থাকে, সেগুলোর হিসেব চাওয়াই বেহিসেবী।"

হিরণ্ময় কহিল,—"দেখ সুধেন্দু, এ তোমার ঠিক ওকালতি হচ্ছে না। ও আমুকে আমার জিনিষ দিতে গেল কি জন্তে, তার জবাব কি?"

সুধেন্দু কহিল,—"জবাব এই যে, কলমটা পেয়ে আপাততঃ বেশ খুসী মনে নিজেরই বই-শ্লেটের সঙ্গে সাজিয়ে গুজিয়ে ও স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তুমি যখন খোঁজ করবে তখন ফিরে দেবার ইচ্ছে যে ছিল না, তাও নয়। এদিকে আমু কলমটা দেখে চেয়ে বসে—তখন প্রথমটা বার-দুই ও দিতে চায়নি—কিন্তু সে যখন বলে যে, তোর দাদা ত তোকে খুব ভালবাসে, দিয়ে দিলে কিছু বলবে না, তখন নিজের দাদার ভালবাসার মান রক্ষার জন্তেই কলমটা ও দান ক'রে বসে—এই হচ্ছে ওর সওয়াল জবাব।"

অবাক্ হইয়া হিরণ্ময় কহিল,—"এ ত উকীলের ওকালতী হে—আসামীর জবানবন্দী কই?"

মাথা নাড়িয়া সুধেন্দু কহিল,—আসামীরও এই জবানবন্দী—হয় না হয় নেলীকে জিজ্ঞেস্ কর—কি বল, নেলী?"

নেলী সহজেই স্বীকার করিল, অগত্যা হিরণ্ময় কহিল—"আচ্ছা সুধেন্দু, মান্‌লাম নেলীরও এই কথা—কিন্তু তুমি এ তত্ত্ব আগে হ'তে জান্‌লে কোত্থেকে?"

সুধেন্দু মুরুব্বিয়ানা ভাবে হাসিয়া কহিল—"ওহে, গল্প লিখ্‌তে হ'লে সাইকলজি অধ্যয়ন করতে হয়, অমনি নয়।" বলা দরকার যে, ইতি মধ্যেই বন্ধু-মহলে উদীয়মান গল্প-লেখকরূপে সুধেন্দু খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

যাহা হউক, হিরণ্ময় সুধেন্দুর দিকে চাহিয়া কহিল—"বেশ, এখন যে কলমটা তুমি সত্যি কথা বলার জন্তে নেলীকে পুরস্কার দিতে চেয়েছিলে সেটা তা হ'লে আমাকেই এনে দিও। যা নেলী—পিসিমা ডাকচেন।"

নেলী কিন্তু মুক্তি পাইয়াও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল না। তার খাতাখানি তখনও দাদার হাতে। সেই খাতার দিকে তৃষিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুধেন্দু ভিতরের খবর জানিত না। সে কহিল—"কলম আমি তোমাকেই এনে দেবো নেলী—তোমার ইচ্ছে হয় দাদাকে দিয়ো, না হয় দিয়ো না। দাদার ঢের পয়সা আছে, আবার কিনে নেবে।"

এ আশ্বাসবাণীতেও নেলী প্রস্থানোদ্যত হইল না। হিরণ্ময় মুচকি হাসিয়া কহিল—"দ্যাখ নেলি! পিসিমা এখনো খেয়ে ওঠেন্-নি। এক ছুটে গিয়ে ছাদ থেকে খানিকটা মিষ্টি কুলের আচার নিয়ে এসে দে। অবিশ্যি হাতটা ধুয়ে যাস্—নইলে পাপ হবে। তা হ'লেই এখুনি তোর খাতা ফেরত দেবো।"

অতঃপর হৃষ্ট মনে, ত্বরিত পদে নেলী দাদার প্রার্থিত জিনিষ আনিতে ছুটিল।

সুধেন্দু হাসিয়া কহিল—"নিজের আগেকার চুরিবিদ্যে আবার বোন্‌টিকেও শেখান হ'চ্ছে—এটা কিন্তু ভারি অন্যায় ভাই।"

হিরণ্ময় কহিল—"এ মোটেই চুরি নয়—না ব'লে চেয়ে আনা মাত্র। লেখক হ'তে চলেছ, এ জিনিষটা একটু

আধটু অভ্যেস্ করতে না শিখলে চল্‌বে কেন হে? এখন শোনো, আমার ভগ্নী কবিতা লিখেছেন :—

"কুকুর সে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে,
ফেলে দিল মাংসখণ্ড যা ছিল তার মুখে।"

ওহ হো—এই যে আর একটি কবিতা রয়েছে—এটা তো দেখিইনি—

এক ছিল এক শেয়াল তার ছিল তিনটি ছেলে,
একদিন সে গাছে কাঁঠাল পেকেছে দেখতে পেলে—

বাঃ বাঃ—কি ছন্দ, কি ভাব, কি মিল!"

সুধেন্দু কহিল—"তাই বুঝি বেচারী খাতাখানির জন্যে চুরি ডাকাতি করতেও রাজি হ'য়ে গেল। তা এ তোমার ভারি অন্যায় ভাই—তুমি না ব'লে পরের জিনিষ এমন ক'রে দেখ কোন্ অধিকারে? ছেলে-বেলাকার এই ছন্দমিলহীন কবিতাগুলিই ভবিষ্যতে হয়তো স্বচ্ছন্দে পরিণত হ'য়ে উঠবে।

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া হিরণ্ময় কহিল,—"তা হ'লে স্তুনিয়াময় ঘাসেরই মতন কবি গজাতো।"

সুধেন্দু কহিল,—"তা না জন্মালেও এটা ঠিক যে জন্মেই কেউ ছন্দ, ভাব, মিলযুক্ত কবিতা লিখতে শেখে না। ার অভ্যাসে ক্রমেই সে-শক্তি আয়ত্ত হয়। তবে হ্যাঁ, কবি-প্রতিভা প্রকৃতির দান। মানুষের নিজের উপার্জ্জন ওখানে বেশী নেই।"

নেলী আচার লইয়া ফিরিয়া আসিল। হিরণ্ময় খাতা ফিরাইয়া দিতেই সে খুসী মনে তখনি ছুটিয়া পলাইল,—চোরাই মালের ভাগ লইবার জন্যও অপেক্ষা করিল না। দুই বন্ধু আচার লইয়া তৃপ্তির সহিত উহার রসাস্বাদনে নিযুক্ত হইয়া কবিত্ব-রসেরও আস্বাদ লইতে মনোনিবেশ করিল।

দুই

বছর-দশ পরে পশ্চিমাঞ্চলের কোনো একটি সহরের সরকারী হাসপাতালের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ডাক্তার-বাবুর বাঙ্গলোবাড়ার অন্তঃপুরে দুটি তরুণী মধ্যাহ্ন অবসরে গল্প কথায় নিমগ্ন। জানালা দিয়া হেমন্তের শীতের স্বর্ণাভ সূর্য্য কি ঘরের মেঝেয় সুখসুপ্ত একটি পাঁচ সের শিশুর শয্যাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। শিশুর জননী আমাদের সেই দশবৎসর আগেকার নেলী, এখন সুন্দরী যুবতী। সঙ্গিনী আন্না এইখানেরই স্থানীয় একজন রাজকর্ম্মচারীর পুত্রবধূ; পাশাপাশি বাড়ী থাকায় দ্বিপ্রহরে দু'জনার প্রাত্যহিক মিলন ঘটিয়া থাকে। আন্না একখানি খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছিল, "এ গল্পটা ভারি চমৎকার হ'য়েছে, বোয়ান—তুই যদি একবার দিস্ তা হ'লে আমি ওঁকে দেখিয়েই তোকে ফেরৎ দিই।"

নেলী কহিল,—"ওসব হিজিবিজি কাউকে দেখাবার নয়, আন্না—তুই পাগলামী করিস্‌নি—দে খাতাখানা তুলে রাখি—তোরতো প'ড়ে আর পুরোনো হ'বে না।"

আন্না ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল, "নিজের বরকেও দেখাবিনা, অপরকেও দেখতে দিবি না। লিখেছিস্ বুঝি শুধু নিজের চিতা সাজাবার জন্যে? সত্যি, আমার এমন হিংসে হয়!"

হাসিয়া নেলী কহিল,—"হিংসেয় কি ইচ্ছে হয় শুনি?"

—"সবাইকে তোর এই গল্পগুলো জোর গলায় পড়িয়ে শোনাতে ইচ্ছে হয়। তোর ডাক্তার-বাবু কি মানুষ ভাই, হাড় মাংস কেটে কেটে রক্তমাংসের জ্যান্ত মানুষগুলোর মন ব'লে যে জিনিষটা আছে তা যেন বেমালুম ভুলে ব'সে আছে; এমন কাঠখোট্টা লোককে তুই ভালবাসিস্ কি ক'রে, বোয়ান্?"

আন্নার খোলা চুলের গোছায় ঈষৎ টান দিয়া নেলী কহিল,—"সতী হ'য়ে সতীর কানের কাছে পতিনিন্দা করিস্ কোন্ মুখে? তোর মেয়ে হ'লে তাকে আমি কখখনো বউ করতে পারব না।"

আন্না কহিল—"না করিস্ ব'য়ে যাবে। তোর ছেলে যদি বাপের ধারা পায় তো অমন কাঠ-গোঁয়ার ছেলেকে আমি মেয়েও দেব না।"

ঠিক এই সময় এক সঙ্গে দু'তিন জোড়া সজুতা পদধ্বনি হওয়ায় আন্না ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"তোর বর আর দেওর আস্‌ছে ভাই—আমি পালাই।"

নেলী আন্নার আঁচলে টান দিয়া কহিল,—"আগেতো

কথা কইতিস্—আজকাল দেখলেই ছুটে পালাস্ কোন্ হিসেবে ?"

আন্না কহিল,—"পালাতাম না এখনো—কিন্তু তোমার বর যখন তোমায় আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত বেড়াতে দিতে চান্ না, তখন আমিই বা কেন ওঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে নিজের মান খোয়াই।"

আন্নার সঠিক উত্তরের আঘাতে নেলীর মুখে কালো ছায়া পড়িল। ঠিক এই সময় বিকাশ বাহির হইতেই বলিয়া উঠিল—"বউদি, কলকাতার কুটুম্ব মশাইরা এসেছেন, দ্বার খোলো।"

আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া শশব্যস্তে দরোজা খুলিয়া দিয়া নেলী অতিথিদের আহ্বান করিয়া লইল। আগন্তুক হিরণ্ময় আর সুধেন্দু। আন্না ও নেলী তাহাদের দু'জনকেই প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। আন্না উভয়ের আগা-গোড়া সাজসজ্জা দেখিয়া লইয়া সপ্রশংসদৃষ্টিতে কহিল—"বাঃ সমস্ত খদ্দরের পরেছ যে !"

বিকাশ কহিল,—"yes, all খদ্দর।"

হিরণ্ময় কহিল,—"খদ্দর আমাদের সর্ব্বস্ব। খদ্দরই গতি, খদ্দরই মুক্তি।"

আন্না কহিল,—"একটু আস্তে বল, দাদা—এটা সরকারী হাঁসপাতালের ডাক্তার সাহেবের বাড়ী।"

হিরণ্ময় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তা বটে, কিন্তু আমরা যে খদ্দরেরই প্রচারক—সরকারী, বেসরকারী আমাদের ভুল হ'লে ত ক্ষতি নেই।"

বিকাশ কহিল—"আপনাদের ক্ষতি না হ'লেও এক পক্ষের হয়ত মারাত্মক ক্ষতি হ'তে পারে।"

সুধেন্দু কহিল—"আচ্ছা, ওকথা পরে হ'লেও চল্‌বে। এখন নেলি, কেমন আছ, নতুন খোকা কই ? বাঃ দিব্যি ফুটফুটেটি হয়েছে, দ্যাখ দ্যাখ হিরণ্ময়, যেন একটি মোমের পুতুল ঘুমুচ্ছে—উঠলে একটু চট্‌কাতে পারি যে।"

হিরণ্ময় কহিল—"পিসিমাতো নেলীকে আর খোকাকে নিয়ে যাবার জন্যে ভারি ব্যস্ত। ডাক্তার সাহেবকে তাই বলতে এসেছি। তারপর আন্না, তুমিও এখানে। বেশ দুই বন্ধু কাছাকাছি আছ, গল্পগুজব খুব চলে বোধ হয়।"

বিকাশ কহিল,—"তা খুব চলে। আন্না বউদিও ভারি ভাল মানুষ, প্রায়ই আমাদের ভাল ভাল পিঠে, খাবার, এইসব তৈরী ক'রে খাওয়ান।"

নেলী সচকিতে কহিল, "সত্যিইত, আমার একটুও হুঁস্ নেই, দাদাদের নিশ্চয় খাওয়া হয়নি। ঠাকুর-পো, তুমি একটু ঠাকুরকে হাঁসপাতাল থেকে ডেকে দাওনা ভাই ; এক্ষুনি দুটি ভাত চাপিয়ে দিক্।"

হিরণ্ময় কহিল—"ব্যস্ত হবার দরকার নেই ; জল্‌টল্ খেয়েছি ; একপ্রস্থ আরও খেতেও রাজি আছি। ভাত যে কোনো সময় হ'লেই চল্‌বে। ওহে বিকাশ-বাবু, ডাক্তার কোথায় ?"

বিকাশ কহিল, "এখুনি আস্‌বেন—আচ্ছা, আমি ঠাকুরকে ডেকে আনি।"

বিকাশ চলিয়া গেল। নেলীও আপাততঃ কিছু জল-খাবারের বন্দোবস্ত করিতে চলিল। হঠাৎ সেই খাতাখানার দিকে দৃষ্টি পড়ায় সুধেন্দু কহিল,—"ওহ্‌হো, আমার দেওয়া সেই খাতাখানা না ? মনে আছে নেলী, বলেছিলাম খাতা-খানা ভর্ত্তি ক'রে আবার আমাকেই ফেরত দিতে ?"

নেলী ক্ষিপ্রহস্তে খাতাখানা সরাইয়া ফেলিবার পূর্ব্বেই সেখানি আন্না তুলিয়া লইয়া সুধেন্দুর হাতে দিয়া কহিল, "খাতা কবে ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে, সুধেন্দু-দা ! আর সত্যি বল্‌ছি, গল্পগুলো এমন চমৎকার ! কোনোটা পড়লে চোখে জল আসে, কোনোটা পড়লে হাসিতে পেট ফেটে আসে, আবার কোনোটা—" নেলী হতাশ ভাবে আন্নার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"কেন আমায় জ্বালাস্, আন্না ?" তারপর সে ছলছল চোখে ঘরের বাহির হইয়া গেল। সামান্য কারণে নেলীর কণ্ঠে যে করুণস্বর বাজিয়া উঠিল, দুই বন্ধুরই কানে তাহা বড় বেসুরা বাজিল, বিস্মিত দৃষ্টিতে আন্নার দিকে চাহিয়া সুধেন্দু কহিল,—"গল্প লিখেছে, তার জন্যে এত লুকোচুরি কিসের তাতো বুঝলাম না। ছেলেবেলাকার পাগ্‌লামী এখনো যায়নি বুঝি ?"

আন্না চুপি চুপি কহিল, "না, তা নয়। ডাক্তারবাবু ওসব পছন্দ করেন না। একবার নেলী তাঁকে আমোদ ক'রে বলেছিল যে, সে মাসিক কাগজে গল্প লিখ্‌বে, সে য

ডাক্তারবাবুর রাগ—বল্লেন্, মেয়েমানুষ, কুলের কুলবধূ হ'য়ে যার তার কাছে নাম বের করা, এসব ভারি দোষ।"

হিরণ্ময় হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "বেশ মানুষ ত। এ লোকের দেখ্‌ছি নিজেরই ব্যায়রাম আছে, তা আবার অন্যের চিকিৎসা করে কি?"

সুধেন্দু ততক্ষণে খাতাখানি খুলিয়া প্রথম পৃষ্ঠা পড়িতে মন দিয়াছে। বেশ পরিষ্কার মেয়েলী অক্ষরে লাল কালীতে লেখা :—

"বড়দা, সুধেন্দুদা—

ছেলেবেলাকার　　হিজি বিজি লেখা
পড়ে হেসেছিলে কত;
আজিকে আবার　　কালীর আঁচড়
ছড়ানো কুড়ান যত;
সব জমা ক'রে　　ধ'রে দিনু পায়,
হাসি মুখে লও তু'লি';
অপটু হাতের　　ভুল্ চুক্ যাহা
স্নেহ-ভরে যেও ভুলি'।

—তোমাদের আদরের নেলী।"

সুধেন্দু স্মিতমুখে পাতার পর-পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। হিরণ্ময় কহিল,—ছেলেবেলায় সেই শেয়াল-কুকুরের কবিতা-লিখিয়ে নেলী দেখছি সত্যিই গল্প লিখতে শিখে গেছে। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'য়ে গেল, হে সুধেন্দু!"

সুধেন্দু কহিল,—"লিখতে হিজিবিজি ত সবাই পারে। এ দেখছি কলমের জোর আছে। বেশ ঝর্‌ঝরে ভাষা লিখতে পেরেছে। মেয়েটার ক্ষমতা আছে। বাড়ী নিয়ে গিয়ে আগাগোড়া পড়তে হবে।"

হিরণ্ময় কহিল,—"না হে না, খাতাখানা নিয়ে যেয়ো না। ছেলেবেলাকার সেই ব্যাপার মনে আছে তো? এখুনিত দেখলে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল।" সুধেন্দু কহিল,—"এখনকার কান্নার ভেতর গলদ আছে—আমার কথা শুন্‌লে তো?"

নেলী দুই থালা খাবার আনিয়া মেঝের রাখিয়া কহিল,—"মুখ-হাত ধুয়ে একটু জল খাও, দাদা। ভাতও চাপিয়ে দিচ্ছে। উনি আস্‌বেন এইবার।"

"পালাই আমি—"বলিয়া, আন্না প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সাথীর দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া গেল। নেলী কিন্তু তার অর্থ বুঝিল না।

ডাক্তার ঘরে আসিয়া অতিথিদের সাদরসম্ভাষণ করিয়া তখন পর্য্যন্তও জলযোগ না করার জন্য অনুযোগ করিলেন। অগত্যা দুইবন্ধু খাবারের থালার সম্মুখে বসিয়া গেল। তার পর কথায়-কথায় হিরণ্ময় নেলীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। অমনি ডাক্তারের অতিথিসৎকারের উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল; তিনি কহিলেন—"বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, আমার ত রাত দিনের অধিকাংশ সময় হাঁসপাতালেই কাটে। বিকাশ, প্রকাশ এদের দেখাশোনা করে কে? তারপর ছোটখোকা এখানেই জন্মেছে,—হঠাৎ কল্‌কাতায় গিয়ে সেখানকার জলহাওয়ায় লিভারের দোষ হওয়া খুব সম্ভব।"

হিরণ্ময় নিজের সুগঠিত, বলিষ্ঠ দেহখানির দিকে তাকাইয়া কহিল—"কল্‌কাতার জলবাতাসেই কিন্তু এই কাঠামোখানা তৈরী হয়েছে, মশাই। কল্‌কাতার নিন্দে কোরো না—দিনকতকের জন্য যাবে বই ত নয়।"

ডাক্তার মুখ কালো করিয়া কহিলেন,—"একেত কল্‌কাতায় আজকাল যে হুজুগ চলেছে। আপনারা বাড়ী-শুদ্ধ লোক ত নন্-কো-অপারেশনে মেতে আছেন। এদের দেখাশোনা"—

বাধা দিয়া হিরণ্ময় কহিল,—"ওহো, তোমার বুঝি সেই ভয়। আমরা নন্-কো-অপারেটার, তা বাড়ীর ভেতর মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক কি?"

সুধেন্দু খোঁচা দিয়া কহিল, "আহা, বুঝতে পারছ না, ইনি সরকারের চাকর। ওঁর স্ত্রী যাবে নন্-কো-অপা-রেটারদের বাড়ী, যদি সরকার একটা কৈফিয়ৎ তলব ক'রে বসেন?"

হাসিতে ঘর ভরাইয়া হিরণ্ময় কহিল,—"যত সব পাগলামো।"

ডাক্তার বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা মশাই, যে সরকারের অনুগ্রহে আপনারা রামরাজত্বে বাস করছেন, জন-কতক লোক হৈ-চৈ ক'রে তাদের পেছনেই ফেউ

লেগেছেন কেন? এগুলো কি পাগলামি বা মাতলামি নয়?"

হিরণ্ময় আবার হাসিয়া কহিল,—"ডাক্তার, তোমার বুদ্ধি আছে। আমার পাগলামীটা তুমি মায় সুদশুদ্ধো মাতলামি যোগ ক'রে ফিরিয়ে দিলে। ব্যস্ এই পর্য্যন্ত—তোমার ঘরে ব'সে আর স্বদেশী-আন্দোলন ক'রে তোমায় বিব্রত করতে চাই না। আপাততঃ তুমি ধড়া চুড়োগুলো খুলে একটু বাঙালী সেজে বোসো। স্নানাহারের উদ্যোগ কর—কথাবার্ত্তা পরে হবে। আমরা কিন্তু রাতের ট্রেণেই ফিরব।"

তিন

মাস-পাঁচ-ছয় পরে। হাঁসপাতাল হইতে বেলা একটার সময় ডাক্তার যখন বাঙলোয় ফিরিতেছেন সেইসময় ডাকপিয়ন কয়েকখানা চিঠি ও একটি রেজিষ্ট্রি বুক পোষ্ট দিয়া সহি লইয়া চলিয়া গেল। ডাক্তার কৌতূহলভরে তিনখানি চিঠিই স্ত্রীর নামে অপরিচিত হস্তাক্ষরের দেখিয়া খুলিয়া ফেলিলেন।

একখানিতে লেখা :—

মহাশয়া,

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের "সহযোগিনী" পত্রিকার জন্য একটি গল্প পাঠাইলে বাধিত হইব।

বিনীত সম্পাদক

আর একখানিতেও ঐ ধরণের লেখা।

তৃতীয়খানির লেখক হিরণ্ময়—

নেলি!

বই পেয়ে তুমি খুব আশ্চর্য্য হবে জানি। সেইটেই চাই। তোমার খাতাখানি সুধেন্দু আগাগোড়া প'ড়ে ভারী খুসী হ'য়ে একজন প্রকাশককে দেখাতে সে আগ্রহ ক'রে ছাপ্তে চাইলে, বল্লে বেশ লেখা, আর বেশ সময়োপযোগী, এ বাজারে খুব কাটবে। বইখানা দু'মাস হ'ল বেরিয়েছে। আমরা কল্কাতায় ছিলাম না, দেশের কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তাতেই তোমায় এক কাপি পাঠানো হয়নি। ডাক্তারকে দেখিয়ো—সে নিশ্চয় প'ড়ে খুসী হবে। খোকাবাবু কেমন আছে? ইত্যাদি।

সুধেন্দু এককোণে লিখিতেছে—

চিরায়ুষ্মতীষু—

তোমার সাহিত্যসাধনা সফল হোক্! প্রথম রচনাই বেশ আশাপ্রদ। আশা করি বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবায় তুমি দিন দিন কৃতিত্ব দেখাতে পারবে। বইর নাম "কালীর আঁচড়"ই রেখেছি; এ আঁচড় কিন্তু সহজেই বুকে পড়ে।

—সুধেন্দুদা

বইখানার আবরণ খুলিয়া ডাক্তার দেখিলেন মরক্কো-চামড়ার বাঁধাইএর উপর সোনার জলে লেখা "কালীর আঁচড়"। লেখিকার নাম নীচে জলজল্ করিতেছে,—শ্রীমতী নীলা মিত্র। ডাক্তারেরও চক্ষু দু'টা জ্বলিয়া উঠিল—আনন্দে নয়, রাগে—অভিমানে।

তিনি যাহা ভালবাসেন না, অবিশ্বাসিনী পত্নী তাহাই করিয়া বসিল। অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দুকুলবধূ আজ হাজার লোকের আলোচনার বিষয়, তার পবিত্র নাম আজ যে-সে উচ্চারণ করিবে! পরপুরুষ, অপরিচিত রাম-শ্যাম আজ স্বচ্ছন্দে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া পত্র লিখিয়াছে। হায়, হায়, নারীমর্য্যাদা, সতীর পবিত্রতা,—অকলঙ্ক শুভ্র ফুলের সহিত যাহার তুলনা, এইসব বহির্জ্জগতের উত্তাপে তার সে সৌন্দর্য্য টিকিবে আর কি প্রকারে! মনের মধ্যে খুব খানিক উষ্মা লইয়া ডাক্তার অন্তঃপুরে আসিলেন। নেলী তখন ঘরের মধ্যে বসিয়া সদ্য-জাগ্রত খোকাবাবুর তুষ্টিসম্পাদনে নিযুক্ত ছিল। তাহার কোলের কাছে বইখানা ও চিঠিগুলা ফেলিয়া দিয়া ডাক্তার রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন,—"যা ভালবাসি না তাই। আমার ঘরে ব'সে, আমারই অন্ন খেয়ে, আমার সঙ্গেই লুকোচুরি। এতো যদি নাম জাহির করবার ইচ্ছে, যাও কেন না থিয়েটারে, সার্কাসে, বায়োস্কোপে, খুব নাম হবে। —ছিঃ ছিঃ, অবশেষে আমার নাম ডুবলে—ঝাঁটা মার এইসব স্বাধীন জেনানাদের মাথায়। দেশের লোক আবার এদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করছেন। গুষ্টির পিণ্ডি পাড়ছেন।"

স্বামীর অনুযোগ কান পাতিয়া লইবার মধ্যেই চিঠিগুলি নেলী পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিল এবং বইখানি

দেখিয়া বুঝিতে তার বাকী রহিল না যে, স্নেহময় দাদারা তাহাকে অতিমাত্রায় চমৎকৃত করিবার জন্যই ঘুণাক্ষরেও তাহাকে কোনো কথা না জানাইয়া বই ছাপাইয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক, আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য এবং কতকটা সত্য স্বীকারের জন্য সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমায় বৃথা দোষ দিচ্ছ। আমি কোনো কথাই জানি না। দাদারা আমাকে কিছু ব'লে যায়নি ত।"

মেঝেয় সশব্দে জুতা ঠুকিয়া স্বামী কহিলেন, "ন্যাকা সাজ্‌তে ভারি পটু। বলি সোহাগ ক'রে লেখাগুলি দাদাকে দিয়েছিলে, তবেই ত সে পেয়েছিল, না তারা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে? তা যদিই হয়, এখুনি তাদের আমি জেলে দিতে পারি। তাছাড়া, এসব মাথামুণ্ডু তোমার লেখবারই বা কি দরকার ছিল, শুনি? খেয়েদেয়ে কি আর কোনো কাজ পাওনি? দুনিয়ায় যারা নেহাৎ হতচ্ছাড়া ভবঘুরে তারাই ব'সে ব'সে এইসব রাবিশ জিনিষ লেখে, আর পড়ে যারা তারাও এদেরই জুড়িদার।"

একটি কথা না কহিয়া নেলী নীরবে উঠিয়া স্বামীর স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে গেল। স্নানান্তে আহারে বসিয়াই ডাক্তার মাছের ঝোল ভাতে মাখিয়া একগ্রাস মুখে দিয়াই ঝোলের বাটী ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "হিন্দুস্থানী ঠাকুরে আর কত ভাল রাঁধবে; বাড়ীর গিন্নি লেখাপড়াতেই ব্যস্ত, এসব সংসারের কাজে চোখ দেবার তাঁর অবসর কই?"

যাহা যউক, অতঃপর ডাক্তার আহারান্তে বিশ্রাম করিতে গেলে নেলী আর-একবার তার প্রথম সাধনার ফল সেই বইখানিকে কোলে লইয়া বসিল। স্বামীর নিকট অপরিসীম লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কারণ হইলেও, এই তার মানসজাত ভাবশিশুগুলির নবকলেবর তার মনে নূতন আনন্দের শিহরণ জাগাইতেছিল—সংসারের কাজকর্ম্মের অবসরে, নিরালা রজনীর কর্ম্মহীন ক্ষণে, সে এগুলিকে কলমের মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তার কল্পনাদৃষ্টি প্রত্যক্ষ-সংসারের পারপার্শ্বিক গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া কত কি দেখিয়াছে, অনুভব করিয়াছে। তাহারি চিত্র সে আপন মনে সরল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছে, তাহাতে যে কুলনারীর কি মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় তাহা সে বুঝে নাই,—চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারে নাই। তাই স্বামীর কঠোর মন্তব্যগুলি স্মরণ করিতে করিতে তার ডাগর চোখ দুটিতে জল ভরিয়া আসিতে লাগিল।

চার

ডাক্তার ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ডের উপর লেখা "মিত্র এণ্ড রায়, পুস্তকপ্রকাশক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট" দেখিয়াই দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, অর্দ্ধবয়স্ক একজন ভদ্রলোক টেবিলের সম্মুখস্থ চেয়ারের উপর বসিয়া নিকটেই উপবিষ্ট দুইজন ভদ্র লোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন,—"আসুন মশাই কি বই চান?"

ডাক্তার কহিলেন,—"আজ্ঞে 'কালীর আঁচড়' বইখানা কি আপনার দোকানে পাওয়া যাবে?"

ভদ্রলোক কহিলেন, "পাবেন বৈ কি, খুব পাবেন। আমরাই এই বইখানার প্রকাশক—সোল এজেন্সি আমাদের হাতে। বসুন মশাই—আর কিছু বই চাই?"

আজ্ঞে না, বলিয়া ডাক্তার বেঞ্চির একপাশে বসিয়া পড়িলেন, ইতিমধ্যে ভদ্রলোকদের একজন প্রকাশককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বইখানার বেশ কাট্‌তি, মশাই। অথচ আপনি বল্‌ছিলেন এ বইখানি লেখিকার প্রথম রচনা, আর বয়সও তাঁর বেশী নয়।"

প্রকাশক কহিলেন, "সে সত্যি কথা। চেষ্টা কর্‌লে আর হাত পাকলে উনি একজন নাম-করা লেখিকা হ'তে পার্‌বেন। এই দেখুন, আজকালকার ডাল (dull) বাজারেও তিনমাসের মধ্যেই এ বই ছ'শো কেটে গেছে। স্বদেশী গল্প যে দু'টো লিখেছেন, খুব প্রাণ ঢেলে না লিখ্‌লে অমন লেখা কলম থেকে বেরোয় না।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক কহিলেন,—"খুব লেখাপড়া জানা, পাশ-টাস্ করা বোধ হয়—থাকেন কোথা?"

প্রকাশক কহিলেন,—"থাকেন শুনেছি মফঃস্বলে। কলেজেপড়া মোটেই নন্। বাড়ীতেই লেখাপড়া শিখেছেন। এই নিন মশাই আপনার বই—দাম দেড়টাকা।"

দাম দিয়া বই লইয়া ডাক্তার দোকান হইতে বাহির হইয়া ফুটপাথের উপর আসিলেন। তাঁহার মনে হইল —কি ভয়ানক, কুলের কুলবধূ, বই লিখিয়া এখন তার পরিচয় লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। এমন-কি, বয়স লইয়া পর্য্যন্ত আলোচনা, ইহাপেক্ষা নারীর অপমান আর কি হইতে পারে? এখনি ইহার উচিত বিধান করিতে হইবে।

কিছু পথ অতিক্রম করিয়া হ্যারিসন্ রোডের মোড়ের উপর একখানি লালরঙের বাড়ীর সম্মুখে পিতলের ফলকে "হিমাকর ব্যানার্জি, এম-এ, বি-এল, উকীল, হাইকোর্ট" দেখিয়াই ডাক্তার সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। জনৈক ব্যক্তি বাঁ-হাতি একখানি সুসজ্জিতগৃহে একাকী বসিয়াছিলেন। বলিয়া উঠিলেন—"কি চান্ মশাই?"

ডাক্তারের সহিত চোখোচোখি হইতেই আবার বলিয়া উঠিলেন,—"সুভাষ যে—আরে, তুমি কোত্থেকে? কালই তোমার কথা হচ্ছিল। এসো, এসো, ঘরে এসো।"

ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আজ সকালেই এসেছি। মহতাশ্রমে নেমেছি। একটা জরুরি কাজ আছে। একটা উকীল ঠিক ক'রে দিতে পার?"

হিমাকর কহিলেন,—"আরে ভায়া, আমিতো নিজেই উকীল। কি কর্‌তে হবে বল না?"

ডাক্তার কহিলেন,—"না ভাই এসব পয়সাকড়ির মামলায় বন্ধুবান্ধবকে উকিল দেওয়া আমার প্রিন্সিপল্ নয়। তুমি তোমার জানা একটি উকীল ঠিক ক'রে দাও। আজই দরকার—পাঁচদিনের ছুটি নিয়ে আমি এসেছি।"

হিমাকর সুভাষের সহপাঠী, সুভাষের পাঠ্যাবস্থার খামখেয়ালীভাব তাহার খুব জানা ছিল। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কহিল,—"বেশ, আমার সঙ্গে কাছারী চল, ঠিক ক'রে দিচ্ছি। তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ত? স্বচ্ছন্দে আমার এখানে এসেই উঠতে পার্‌তে। তা না হোটেলে উঠ্‌তে গেলে। নাও, একটা সিগারেট খাও।"

ডাক্তার কহিলেন, "হোটেলে খেয়ে এসেছি; এই সিগারেটই যথেষ্ট। বেলাতো এগারোটা বেজে গেছে, কোর্টে যাবে কখন?"

"এই যে, পোষাকটা প'রে আসি। খেয়ে একটু বিশ্রাম না ক'রে ধাঁ ধাঁ ক'রে দৌড়লেই অসুখ হয়। বোসো তুমি। হাতে ওখানা কি বই হে? "কালীর আঁচড়" আজকাল যে-থা ক'রে গল্পের বই পড়তে শিখেছ তা হ'লে? ষ্টুডেণ্ট্-লাইফে ও সবের উপর তুমি যে খড়্গ-হস্ত ছিলে।"

ডাক্তার উত্তর দিলেন না। হিমাকর-বাবু কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্দরমহল হইতে পোষাক পরিয়া আসিয়া বন্ধুকে লইয়া রাস্তার মোড়ের মাথায় ট্রাম ধরিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

পাঁচ

দিনতিনচার পরে রবিবারের দ্বিপ্রহরে আবার বন্ধু-ভবনে হিমাকরবাবুর সহিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ। হিমাকর বন্ধুসন্দর্শনে খুব খুসী হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "এসো, এসো, সেই দেখা ক'রে গিয়ে একেবারে ডুব মেরেছিলে যে। বোসো, বোসো, খবর কি? "কালীর আঁচড়" বুঝি শ্রীমতীর লেখা।—এমন সুখবরও লুকুতে হয়? I congratulate you on your having such an enlightened wife."

বন্ধুর প্রসারিত করখানি ঠেলিয়া দিয়া ডাক্তার ম্লানমুখে কহিলেন—"মকদ্দমা যে টেকে না হে! স্ত্রীর জবানবন্দী চায়—তাকে কি আমি কোর্টে এনে দাঁড় করাতে পারি!"

হিমাকর কহিলেন, "ব্যাপারটাতো আমার কাছে তুমি আগাগোড়াই লুকিয়ে রাখলে। তা আমি কি করি, বল? তোমার স্ত্রীর অমতে manuscript (পাণ্ডুলিপি) পাব্‌লিশার্ ছেপেছে, এই অজুহাতে তুমি যেন নালিশ কর্‌লে। কিন্তু পাব্‌লিশারতো স্পষ্টই আদালতে বলেছে যে, হিরণ্ময় ঘোষ (লেখিকার ভাই) manuscript (পাণ্ডুলিপি) তাকে দিয়েছিল। এক্ষেত্রে হিরণ্ময়-বাবুর সঙ্গেই আগে তোমার দেখা করা

উচিত। আর, সত্যিই তাই, নইলে পাব্লিশার্ লেখা পেলে কোথা ? শ্রীমতী কি বলেন ?"

ভিতরের কথা ফাঁস করিবার ইচ্ছা ডাক্তারের আদৌ ছিল না। শ্যালকদের নিকটে গিয়া এসবের জবাবাদিহি চাহিলে কোনো ফলই হইত না ; কেবল একটা হাসির গর্‌রা উঠিত মাত্র। ডাক্তারের উদ্দেশ্য—বইখানির প্রচার বন্ধ করা। সেক্ষেত্রে প্রকাশককেই জব্দ করিবার ফন্দি লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রেও কিন্তু মতলব অনুযায়ী কাজ হইল না। প্রকাশক আদালতে হিরণ্ময় ঘোষ ও সুধেন্দু রায়কে দায়ী করিতেছে। উপরন্তু আদালত লেখিকার সাক্ষ্য তলব করিয়াছে। "অগত্যা মহাবিপদ !" বন্ধুর প্রশ্নে বিবর্ণ মুখে ডাক্তার জবাব দিলেন।

"শ্রীমতী আর কি বল্‌বেন ? মোট কথা, বইখানার আমি বিক্রি বন্ধ কর্‌তে চাই। আর স্ত্রীকে দশের সাম্‌নে আন্‌তেও আমি রাজি নই।"

হিমাকরের চক্ষে আলোক ফুটিল, তিনি কহিলেন, "তুমি কি তোমার স্ত্রীর লেখার পক্ষপাতী নও ?"

ডাক্তার কহিলেন—"মোটেই না ; তুমি তো জানই গল্পের ওপর ছেলেবেলা থেকেই আমি চটা। এখন সেই উৎপাত কি না আমারই ঘরে !"

হিমাকর কহিলেন,—"বেশ, তা প্রকাশকের কাছে গিয়ে আপোষে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও। মকদ্দমা চালাবার দরকার নেই। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি সুভাষ, আজ আমার তোমার ভাগ্যের ওপর হিংসে হচ্ছে। যদি বদ্‌লাবার ব্যবস্থা থাকৃত, তা হ'লে আমার গৃহিণীটিকে বুঝতে পারছ কি না—, তিনি পড়াশোনার নামেই আঁৎকে ওঠেন। ছেলের আখ্যানমঞ্জরীর পড়া, তাও ব'লে দিতে অক্ষম।"

কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ডাক্তার কহিলেন—"নিশ্চয়ই তিনি রন্ধনে দ্রৌপদী,—তরকারীতে নুন মশলা নিশ্চয়ই তিনি ওজন ক'রে দিয়ে থাকেন।"

হিমাকর কহিলেন, "সে-কথা অপলাপ কর্‌লে পাপ হয়। সে পাপ কর্‌তে আমি রাজি নই—কিন্তু একথাও মিথ্যা নয় যে, মধ্যে মধ্যে তাঁর তরকারী নুনেও পুড়ে যায়, আলোনাও হ'য়ে থাকে। দুধও ধ'রে যায় বা কুকুরেও হাঁড়ি খায়। তা উঠ্‌লে কেন হে ? শ্রীমতীর গল্প দু'একটা ক'রে যাওনা, শুনি।"

"আবার দেখা হবে"—বলিয়া ছাতা লইয়া ডাক্তার তৎক্ষণে বাড়ীর বাহির হইয়া প্রকাশকের দোকানের পথ ধরিলেন, প্রকাশক সৌভাগ্যবশতঃ একাই ছিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া নিতান্ত ভদ্রতার দায়ে কহিলেন,—"আসুন মশাই, কি খবর ?"

ডাক্তার বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "দেখুন মশাই, মকদ্দমা আমি চালাতে চাই না। আপনি কেবল দয়া ক'রে "কালীর আঁচড়" বইএর সব কাগজ আমায় দিয়ে দিন। বই আমি বাজারে বিক্রী কর্‌তে রাজি নই।" নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রকাশক কহিলেন,—"এই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, প্রথম দিনেই তা আপনি এসে আমার একথা জানাতে পার্‌তেন।—মিথ্যা আদালতের হায়রাণটা আর হ'ত না।—দু'দিন দোকান বন্ধ ক'রে আমায় সেই কোর্টে ছুটোছুটি কর্‌তে হয়েছে। বিক্রি-সিক্রি সব বন্ধ, বাজারেও দুর্নাম রটেছে যে manuscript (পাণ্ডুলিপি) চুরি ক'রে ছেপেছি। আমরা এই ব্যবসা ক'রে খাই মশাই—কত বড় বড় লোকের সঙ্গে কাজ-কারবার। মিথ্যে আমায় এ দুর্নামের ভাগী কর্‌লেন। আজ সকালেই হিরণ্ময়বাবুকে খুব দশ কথা শুনিয়ে এসেছি। আর চশমা চোখে সেই সুধেন্দুবাবু, তাঁর দু-দুখানা বই আজ তিন বছর নাগাদ ছেপে বিক্রি কর্‌ছি—জিজ্ঞেস্ করুন তাঁকে আমার কথা—"

দীর্ঘ বক্তৃতার অবকাশে হাঁফাইয়া উঠিয়া ডাক্তার কহিলেন—"যা হবার তা হ'য়ে গেছে, মশাই। আমায় এখন আপনি কাগজগুলি দিতে পার্‌বেন ?"

—"স্বচ্ছন্দে—এই যে বাঁধাই আছে। এই ঝাঁকামুটে এদিকে আয়তো ?"

তৎক্ষণাৎ একটি মুটের মাথায় আবাঁধা কাগজের বোঝা প্রকাশক তুলিয়া দিয়া আলমারিতে যে পঁচিশখানা বাঁধাই বই ছিল তাহাও—দিয়া দিলেন।—অতঃপর হিসাবের বহি

বাহির করিয়া তাহার উপর চোখ বুলাইয়া যেমন তিনি চোখ তুলিয়াছেন, দেখিলেন ডাক্তার ফুটপাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। প্রকাশক হাঁকিলেন—"অ—মশাই, একটু দাঁড়িয়ে যান্, হিসেবটা মিটিয়ে দিই—গোটা পঞ্চাশ টাকা আপনার দেনা দাঁড়িয়েছে।" "এটা আপনি রাখবেন—আপনার ক্ষতিপূরণ সমেত" একখানা একশ টাকার নোট আগাইয়া দিয়া এই কথা কয়টি বলিয়া ডাক্তার ত্বরিতপদে পথ হাঁটিতে লাগিলেন।

ছয়

গ্রীষ্মের প্রখর জ্বালাদীপ্ত দিবসের শেষে তখনও ধরণীর দেহ মন্দসমীরণের স্নিগ্ধবীজনে মোটেই শীতল হয় নাই। পশ্চিম-আকাশে শুক্লা-সপ্তমীর চাঁদ রূপার জ্যোতিতে ফুটিয়া উঠিতেছে মাত্র।—হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডের বাগানে আধফোটা বেল মল্লিকার মৃদুগন্ধ ঈষৎ আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যগ্র।—সেই সময় নেলী নিজের শয়নগৃহের জানালায় দাঁড়াইয়া কম্পাউণ্ডের হাতার মধ্যে প্রজ্বলিত একটি অগ্নিস্তূপের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহসা পিছন হইতে আন্না আসিয়া তার কাঁধে হাত রাখিয়া প্রশ্ন করিল—

"হ্যাঁ ভাই, এই গরমে আগুন পোহাবার সখ হ'ল কার—ডাক্তারবাবুর, না রোগীদের?"

তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার সে বলিয়া উঠিল,—"ওমা, রাশি রাশি কাগজপত্র পোড়ানো হচ্ছে যে, হাঁস্পাতালের পুরোনো নথিপত্র নাকি?"

বড় জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নেলী কহিল,—"আমার চিতা-সাজানো হয়েছে, আন্না। একদিন না বলেছিলি, 'লিখে লিখে খাতা বোঝাই কর্‌চিস্ কার জন্তে—নিজের চিতা সাজাবার জন্যে কি?' এখন বোঝ্ সে কথা সত্যি কিনা।"

আন্না যেন চাবুক খাইয়া লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, "তোর সেই লেখার সমাধি হচ্ছে বুঝি। আর তুই স্বচ্ছন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্?"

কান্নাভরা হাসি হাসিয়া নেলী আর্ত্তকণ্ঠে কহিল—"কি কর্‌ব তুই বল্‌তে চাস্?"

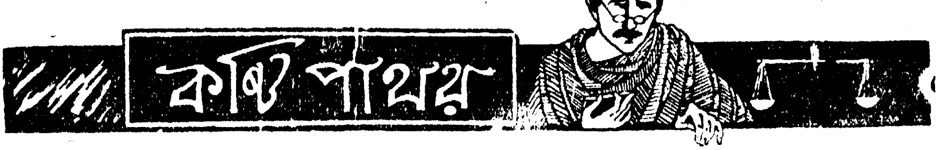
উগ্রকণ্ঠে আন্না কহিল—"কি আবার কর্‌বি, বিদ্রোহ কর্‌বি—মাপ্ করিস্ বোন্, এ অত্যাচার পশুতেই করে, আর নির্ব্বিচারে সয়ে যায় যারা তারাও পশু ছাড়া আর কিছুনা।"

নেলী মৃদুস্বরে কহিল,—"তা জানি আন্না, কিন্তু বিদ্রোহের আগুন তারই জ্বালানো সাজে যে সেই আগুনে সব কিছু অসত্য বা অন্যায়কে পোড়াবার শক্তি রাখে—সে-শক্তি সবার মধ্যে নেই বোন্।

আন্না অবাক্ হইয়া কহিল,—"কিন্তু এই যে একটা খাম খেয়ালের বশে একজন অবিবেচক তোমার প্রতিভার উন্মেষকে এমন ক'রে হত্যা কর্‌লেন, এর বিরুদ্ধে বল্‌বার কি তোমার কিছু নেই, নেলী?"

চাকর আসিয়া খোকাকে দিয়া গেল। নেলী খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তার চোখে মুখে চুমা লইয়া বলিয়া উঠিল,—"এই খোকার মুখ চেয়ে আমি সব ভুল্‌ব আন্না—আর যদি আমার আশা না ব্যর্থ হয়, তা'হ'লে যে সাধ, যে মুকুলিত কামনা আজ আমার বুকের মধ্যে আগুনের হল্কায় মুষড়ে গেল, এই শিশুর জীবনে তাকেই আমি ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।"

আন্না সে কথায় কান না দিয়া অদূরে প্রজ্বলিত অগ্নির লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিজেও অকারণে রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল।



বেদ-কথা

[স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যখন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ প্রকাশ করেন সেই সময়ে বৈদিক যাগযজ্ঞগুলির তাৎপর্য্য বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য উক্ত অনুবাদ-গ্রন্থের একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া মূল গ্রন্থকে স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। ভূমিকা লেখাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। যতদূর লেখা হইয়াছিল তাহাতে বেদ এবং তদন্তর্গত যাগযজ্ঞগুলির সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ভূমিকার কিয়দংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে পুনর্লিখিত হইয়া সেনেট হলে পঠিত হয় এবং আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর "যজ্ঞ-কথা" নাম দিয়া সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকার অবশিষ্টাংশ এতদিন পাওয়া যায় নাই। অল্পদিন হইল তাঁহার লাইব্রেরীর অসংখ্য পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি খাতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি বৈদিক প্রবন্ধ আছে। অনুমান হয়, ঐ প্রবন্ধগুলিই সেই ভূমিকার অবশিষ্টাংশ। এইরূপ মূল্যবান প্রবন্ধগুলি কালে কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যায়—এই আশঙ্কায় বেদ-কথা নাম দিয়া ধারাবাহিক ভাবে সেগুলি "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকায় তাহাদের স্থানে স্থানে সামান্য অসঙ্গতি ও পুনরুক্তি দোষ লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা অপরিহার্য্য সংশোধনেও উপায় দেখি না। বিশেষজ্ঞ সুধীমণ্ডলীকে এবিষয়ে মনোযোগী দেখিলে সুখী হইব। —শ্রী জগদীশ বাজপেয়ী।]

১। বেদের বিভাগ

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভেদে বেদবাক্য দ্বিবিধ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেওয়া কিছু কঠিন। স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে দেবতার স্তুতিকর বাক্যের নাম মন্ত্র; এবং যে-বাক্যে ঐ মন্ত্রের বিনিয়োগ, তাৎপর্য্য বা প্রশংসা বলা হয় তাহাই ব্রাহ্মণ।

"ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুর এতা তে অস্তু। অথে মবস্য বর আ পৃথিব্যা আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ব্ববীরঃ॥

তৈত্তিরীয় সংহিতা।২।৩।১

এই একটি মন্ত্র; সোম নামক দেবতা উহার উদ্দিষ্ট। ঐ মন্ত্রে সোমকে বলা হইতেছে, "অহে সোম, তুমি ভদ্র (অর্থাৎ মঙ্গলময়) এই স্থান হইতে শ্রেয়ঃ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) অবস্থানে প্রয়াণ কর. বৃহস্পতি তোমার পুরোগামী হউন, তখন পৃথিবীর মধ্যে বর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) স্থানে তোমার অবস্থিতি ঘটিবে; তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বীর, তুমি (সেইখানে থাকিয়া) শত্রুগণকে দূরে অপসারিত কর।" এই মন্ত্রটি ঋক্ মন্ত্র হইলেও ঋগ্‌বেদ সংহিতায় যে শাকল শাখা এখন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইহার স্থান নাই। পরন্তু যজুর্ব্বেদ সংহিতার তৈত্তিরীয় শাখা মধ্যে এই ঋক্ মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রে সোম দেবতাকে স্তুতি করা হইতেছে ও তাঁহাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে।

এখন দেখিতে হইবে এই মন্ত্রটি কোন যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে কিরূপে বিনিযুক্ত হয় এবং কেনই বা সেই অনুষ্ঠানে বিনিযুক্ত হয়।

অগ্নিষ্টোম নামক সোম যজ্ঞে দেবগণের উদ্দেশে সোমরসের আহুতি দিতে হয়। তজ্জন্য সোমলতা ক্রয় করিয়া শকটে চাপাইয়া সমারোহের সহিত যজ্ঞভূমিতে লইয়া যাইতে হয়। সোমলতাকে শকটে চাপাইয়া লইয়া যাইবার সময় হোতা নামে ঋত্বিক কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করেন। 'ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি' ইত্যাদি মন্ত্রটি তন্মধ্যে প্রথম। এ বিষয়ে ঐতরেয় নামক ঋষি বলিতেছেন—'সোমায় ক্রীতায় প্রোহ্যমানায় অনুব্রূহি ইত্যাহ অধ্বর্য্যুঃ'।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩য় অধ্যায়, ২য় খণ্ড।

অর্থাৎ সোম ক্রয় করিয়া যখন শকটে বহন করা হয়, তখন সেই সোমের উদ্দেশে বহন-ক্রিয়ার অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর—অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক হোতা নামক ঋত্বিককে এই আদেশ দিবেন। তৎপরে ঐতরেয় বলিতেছেন "ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি' "ইত্যন্বাহ' (অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর আদেশ পাইয়া) হোতা "ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি", ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করিবেন। ঐ মন্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য কি তৎসম্বন্ধে ঐতরেয় ঋষি বলিতেছেন—

"অয়ং বাব লোকো ভদ্রস্তস্মাদসাবেব লোকঃ শ্রেয়ান্, স্বর্গমেব তল্লোকং যজমানং গময়তি।'

ঐ মন্ত্রে যে ভদ্র এই বিশেষণ পদটি আছে উহাতে এই লোককে অর্থাৎ এই ভূলোককেই ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গলময় বলা হইতেছে। ঐ যে শ্রেয়ঃ পদ আছে—স্বর্গ-লোকের বিশেষণ। স্বর্গলোককেই শ্রেয়ান বলা হইতেছে। অর্থাৎ ভূলোক ত ভদ্র বটে, স্বর্গলোক তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ—অহে সোম, তুমি এই ভূলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে চল। সোমলতা—সোমদেবতা যাহাতে বর্ত্তমান সেই সোমলতা এতক্ষণ যজ্ঞভূমির বাহিরে ছিল, সেই স্থান ভূলোকের সদৃশ। এখন সোমকে যজ্ঞভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে, ঐ যজ্ঞভূমি স্বর্গের সদৃশ। সোমকে যেন প্রার্থনা করা হইতেছে, তুমি এতক্ষণ ভূলোকে ছিলে, এখন স্বর্গলোকে চল। এই মন্ত্রের এই এই অংশের ঐ তাৎপর্য্য। অতএব সোমকে শকটে চাপাইয়া যজ্ঞভূমিতে লইয়া যাইবার সময় ঐ মন্ত্রের সার্থকতা। বস্তুতই মন্ত্রটি এই অনুষ্ঠানে বিনিয়োগের উপযুক্ত। এই অনুষ্ঠানে ঐ মন্ত্রটি বিনিয়োগের ফল কি? "স্বর্গমেব তল্লোকং যজমানং গময়তি'—ঐতরেয় ঋষি বলিতেছেন, সোমকে এই সময় ঐ মন্ত্রদ্বারা এইরূপে প্রার্থনা করিলে যজমানকেই স্বর্গলোকে লইয়া যাওয়া হয়। উহার ফল যজমানের স্বর্গলাভ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে আছে 'বৃহস্পতিঃ পুর এতা তে অস্তু' - বৃহস্পতি তোমার (অর্থাৎ সোমের) পুরোগামী হউন। এই মন্ত্রাংশ সম্বন্ধে ঐতরেয় বলিতেছেন যে 'ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিঃ ব্রহ্মৈব আস্মা এতৎ পুরোগবমক ন বৈ ব্রহ্মবৎ রিষ্যতি,—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণজাতি—বৃহস্পতি দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয়। বৃহস্পতি সোমের পুরোগামী হইলে বর্ত্তমান অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকেই শকটবাহিত সোমের পুরোগামী করা হয় এবং যে

অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ সহায় থাকেন সে অনুষ্ঠানে কোন রিষ্ট [অনিষ্ট] জন্মে না। কাজেই বৃহস্পতিকেই সোমের পুরোগামী হইতে প্রার্থনার সার্থকতা।

ঐ মন্ত্রের তৃতীয় চরণ সম্বন্ধে ঐতরেয় বলেন, "অথেমবস্ত বর আ পৃথিব্যা ইতি দেবযজনং বৈ বরং পৃথিব্যৈ দেবযজন এব এনং তদবসায়য়তি' অর্থাৎ পৃথিবীতে দেব-যজনই (যজ্ঞভূমি) শ্রেষ্ঠ স্থান। মন্ত্রের এই অংশ পাঠে সোমকে দেবযজনেই স্থাপন করা হয়।

চতুর্থ চরণ সম্বন্ধে বলেন, "আরে শত্রূন কৃণুহি। সর্ব্ববীর ইতি দ্বিষন্তমেব অস্মৈ তৎপাপানং ভ্রাতৃব্যং অপবাধতে"—ঐ চরণ পাঠে যজমানের দ্বেষ্টা পাপকারী শত্রুকে পরাস্ত করা হয়।

উক্ত দৃষ্টান্ত হইতেই মন্ত্রের সহিত ব্রাহ্মণের সম্পর্ক বুঝা যাইবে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদবাক্য। মন্ত্রদ্বারা দেবতার স্তুতি হয়, দেবতাকে প্রার্থনা জানান হয়। সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি, কোন্ অনুষ্ঠানে উহা প্রযোজ্য, কেন উহা সেই অনুষ্ঠানে প্রযোজ্য, উহার প্রয়োগের ফল কি ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বুঝাইয়া দেন।

ব্রাহ্মণের আবার দুই অংশ—বিধি এবং অর্থবাদ। "সোমায় ক্রীতায় প্রোহ্যমানায় অনুব্রূহি ইত্যাহ অধ্বর্য্যু।" সোমক্রয়ের পর বহন-কালে তদনুকূল মন্ত্র পাঠ কর—এই মর্ম্মে অধ্বর্য্যু [হোতাকে] অনুজ্ঞা দিবেন। ইহা বিধি। আবার "ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি ইত্যন্বাহ"—ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি ইত্যাদি মন্ত্র হোতা পাঠ করিবেন, ইহাও বিধি। ব্রাহ্মণের তৎপরবর্ত্তী অংশ—যাহাতে ঐ বিধির সার্থকতা ও উদ্দেশ্য বুঝান হইতেছে 'অয়ং বাব লোকো ভদ্রস্তস্মাদসাবেব লোকঃ শ্রেয়ান্ স্বর্গমেব তল্লোকং যজমানং গময়তি" ইত্যাদি অংশ ঐ বিধি সম্পর্কে অর্থবাদ।

যদ্দ্বারা মনন করা যায়—দেবতার উদ্দেশে মনন করা যায়—তাহাই মন্ত্র। কোন্ সময়ে কোন্ উপলক্ষে সেই মন্ত্রটি বিনিয়োগ করিতে হইবে তাহা না জানিলে কেবল মন্ত্রটি জানিয়া লাভ নাই। ব্রাহ্মণ সেই সময় ও সেই উপলক্ষ বিধিবাক্য দ্বারা বলিয়া দেন। কর্ম্মকাণ্ড মতে মন্ত্রের ইহা ভিন্ন অন্য প্রয়োজন নাই। সেইজন্য কল্পসূত্রকারেরা বলিয়াছেন, মন্ত্র কর্ম্মকরণ মাত্র। যাহার সাহায্যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই মন্ত্র।

বিধিবাক্য ও অর্থবাদ বাক্যের নাম ব্রাহ্মণ হইল কেন, স্থির উত্তর দেওয়া কঠিন। উত্তরকালে ব্রহ্ম শব্দে জগৎকারণ আত্মা বুঝাইত। বেদান্ত মধ্যে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ আত্মা—যাহা বৃহৎ তাহা ব্রহ্ম। আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অতএব আত্মাই ব্রহ্ম। ইহা জ্ঞানকাণ্ডের কথা। কর্ম্মকাণ্ডে ব্রহ্ম শব্দে বেদবাক্য মাত্র বুঝায়। বেদবাক্যই ব্রহ্ম। যে-সকল ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবাদী বলিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'ব্রহ্মবাদী' এই উপাধিটি নাই, কিন্তু তাঁহাদের মতামতের সমালোচনা বহু স্থানে আছে। যে-সকল ঋত্বিক বা যাজক যজমানের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তাঁহার নাম ছিল ব্রহ্মা। হোতা ঋগ্‌বেদ সম্পৃক্ত অনুষ্ঠান করিতেন, অধ্বর্য্যু যজুর্ব্বেদ-সম্পৃক্ত কর্ম্ম করিতেন, উদ্গাতা সামগান করিতেন। কিন্তু ব্রহ্মাকে ইঁহাদের সকলেরই উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হইত। সকলকেই অনুজ্ঞা দিতেন, সকলেরই ভ্রম সংশোধন করিতেন। সকল বেদেই তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকিত। ব্রহ্মবাক্যের যথাযথ তাৎপর্য্য তিনিই বুঝিতেন। এইজন্যই তাঁহার নাম ছিল ব্রহ্মা। হইতে পারে অতি প্রাচীনকালে চতুর্ব্বেদবিৎ ব্রহ্মা নামক ঋত্বিকেরা যে-সকল বেদবাক্য কহিয়াছিলেন তাহাই ব্রাহ্মণ।

অতি প্রাচীন কালেই বেদপন্থী সমাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল। উপরে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে অর্থবাদ বাক্য উদ্ধৃত করা গিয়াছে। তাহাতে আছে "ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিঃ ব্রহ্মৈব আত্মা এতৎ পুরোগবমকঃ"—ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য এ স্থলে ব্রহ্ম শব্দে ব্রাহ্মণ বর্ণ বুঝিয়াছেন। বৃহস্পতি দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ (বর্ণের দেবতা) ছিলেন, (তাঁহার নামান্তর ব্রহ্মণস্পতি)। ঐ, মন্ত্রাংশ উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণকে [ব্রাহ্মণ বর্ণের ব্যক্তিকে] সোমের পুরোগামী করা হয়। ব্রহ্ম বাক্যের তাৎপর্য্যে বিশেষজ্ঞ বলিয়াই ব্রাহ্মণবর্ণ ব্রাহ্মণ নাম পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই।

কর্ম্মকাণ্ড মতে বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্র ছাড়িয়া অবশিষ্ট বেদবাক্য সমস্তই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ দ্বিবিধ—বিধি ও অর্থবাদ। বিধি আবার দ্বিবিধ। কোন বিধির উদ্দেশ্য অপ্রকৃত প্রবর্ত্তন, কাহারও উদ্দেশ্য অজ্ঞাত জ্ঞাপন।

"অগ্না বৈষ্ণবং পুরোডাশং নির্বপতি দীক্ষণীয়ায়ম্"—দীক্ষণীয়া ইষ্টিযাগে অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে পুরোডাশ নির্বপন করিবে ইত্যাদি কর্ম্ম কাণ্ডগত বিধিবাক্য অপ্রকৃত প্রবর্ত্তক। 'আত্মা বা ইদমেকাগ্র আসীৎ' ইত্যাদি জ্ঞানকাণ্ডগত বিধিবাক্য অজ্ঞাত-জ্ঞাপক।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪)

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

—

হিন্দু জাতি

এই হিন্দুজাতি যুগ যুগান্ত ধ'রে নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে অন্ততঃ ১০,০০০ বৎসর জীবিত রয়েছে। প্রায় সকল প্রাচীন জাতিই বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু হিন্দু জাতি আজও তার প্রাচীন বুনিয়াদের উপর খাড়া রয়েছে।

প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হ'ল, এক হিন্দুজাতি জীবিত রইল কেন ?

এমন দিন ছিল যখন আমরা নিজের দেশের ইতিহাস, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাধনা, বিশিষ্টতা, বৈলক্ষণ্য সব ভুলে যাচ্ছিলাম, হৃদয়কে বন্দী করলে যেমন দশা হয় আমাদের তেমনি দশা ঘটছিল। কিন্তু এখন আমরা কি দেখ্‌তে পাচ্ছি ? যে-রকম ক'রে হিন্দু সভ্যতা ভারতের ইতিহাসে আটশত বৎসর সংগ্রামের পর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আবার সেইসব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এর মানে এ নয় যে ইউরোপের শিক্ষা, দীক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, আমরা কিছুই নেব না—সমস্তই ত্যাগ করব ; তা নয়। বর্জ্জন ভারতের ধা'ৎ নয়। ভারতবর্ষের ভিতর যে একটা বিরাট্ গ্রসিষ্ণুতা আছে, সেই বুভুক্ষা-শক্তির বলে সে সমস্ত জিনিষকে গ্রাস ক'রে আত্মসাৎ ক'রে নেয়। পশ্চিমের দর্শন বিজ্ঞানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করব না—তাদের ভারতীয় ভারতীর শুদ্ধদাসী ক'রে রাখ্‌ব। ত্যাগ করলে কি হ'ল ? বিগত ৩০০০ বৎসরের মধ্যে কত কত জাতি এদেশে প্রবেশ করেছে, তারা এসে নিজেদের সভ্যতা এই ভারতে প্রোথিত করবার চেষ্টা করেছে।

হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সামঞ্জস্য, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি—এক কথায় বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠা করা। সেইজন্য হিন্দু মনকে সংগ্রাহক মন (synthetic mind) বলে। ঐ মন বর্জ্জন করে না, গ্রহণ করে ; প্রত্যাখ্যান করে না, সমাধান করে। সে মন বিবিধকে বিলুপ্ত করে না, বিচিত্রকে মথিত করে না, নানাত্বকে ব্যাহত করে না। ঐ মনের স্বধর্ম্ম নানাকে ঐক্যসূত্রে গ্রন্থন ক'রে, বৈচিত্র্যকে সংহত ক'রে, বহুকে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংবদ্ধ ক'রে সকলের মধ্যে রাখি-বন্ধন রচনা করা। হিন্দু মনের এই বৈশিষ্ট্যের নিদান কি ? হিন্দুজাতির ঐ চিত্তনদীর উৎস কোথায় ?

উৎস ভগবানের ব্যাপকতা ও জীবের ঘনিষ্টতা (Immanence of God and Solidarity of Man) সম্বন্ধে তার চিরবদ্ধমূল নিরূঢ় সুদৃঢ় সংস্কার।

হিন্দু সাধনার চরম কথা—চরাচর স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিশ্বের মধ্যে ব্রহ্মের অনুস্যূতি।

ইউরোপ আমাদের শেখাচ্ছে বটে "All men are born equal"—'সব মানুষ জন্মগত সমান'। এ'কথা হয়তো সম্পূর্ণ ঠিক নয়; কারণ আধারের আবিলতায় অনেক ক্ষেত্রে ব্রহ্ম-জ্যোতির স্পষ্ট প্রকাশ হয় না। কিন্তু তাহা হ'লেও মূলতঃ, তত্ত্বতঃ সব জীবই ব্রহ্ম।

একথা যদি ঠিক হয়, প্রত্যেক জীব যদি শিব হয়,—তবে যে আমরা মুষ্টিমেয় উচ্চস্তরের অভিজাত হিন্দু আভিজাত্যের অভিমানে কোটি কোটি নিম্নস্তরের হিন্দুকে অবজাত—এমন কি অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছি, এর সমর্থন কোথায়? দেশের এই দুর্দ্দশার দিনে নিম্নবর্ণের হিন্দু যা-দিগকে আমরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখি এবং যাদের untouchable (অস্পৃশ্য) ক'রে রেখেছি—তারা যদি হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ ক'রে মুসলমান বা খৃষ্টান হ'য়ে যায়, তবে হিন্দুদের আরও বলক্ষয় হবে।

যতদিন প্রকৃত হিন্দুভাব হিন্দুজাতির মজ্জাগত ছিল, ততদিন এই অস্পৃশ্য সমস্যা মস্তক উত্তোলন করতে পারে নাই। এমন কি এই সকল অবজাতের মধ্যেও অনেক সাধু মহাত্মা আবির্ভূত হ'য়ে উচ্চবর্ণের পূজা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। এ'জন্য আমার মনে হয়, যদি অস্পৃশ্য-সমস্যার প্রকৃত সমাধান করতে হয়, তবে আমাদের সেই প্রাচীন যুগের উদার ভাবে ভাবিত হ'তে হবে।

এ প্রসঙ্গে শুদ্ধির কথা কিছু বলতে চাই। বর্ত্তমানে ভিন্নধর্ম্মী ব্যক্তি—মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি—যদি স্বেচ্ছায় শুভ বুদ্ধির প্রেরণায় হিন্দু হ'তে চায়, তবে তাকে আমরা গ্রহণ করব কি না? আমি আমাদের মুসলমান ও খৃষ্টান ভ্রাতৃগণকে বলতে চাই যে, তারা যদি হিন্দুদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে দীক্ষিত করবার অধিকার স্বাধীন ভাবে পরিচালন করবার দাবি রাখেন, তবে হিন্দুদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন কেন?

আমাদের নিজের দিক হ'তে কেহ কেহ হয়ত আপত্তি করবেন—এ তোমরা করচ কি? হিন্দু ধর্ম্মত কোনোদিন প্রচারক ধর্ম্ম (proselytising religion) ছিল না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি একি হিন্দুর উপযুক্ত কথা? আর জিজ্ঞাসা করি একি ভারত-ইতিহাসের সমঞ্জস কথা? রাজপুতনার অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়, কোকনের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের শাকদ্বীপী বিপ্রের কথা নাই বা তুলিলাম। কিন্তু গারো নাগা কোল ভিল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি এবং কেরল কুরুম্বা প্রভৃতি আর্য্যেতর জাতির কথা মন থেকে কি ক'রে মুছে ফেলি? সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে যখন আর্য্যজাতি এই ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হ'ল, তখন তারা একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির ও ভিন্ন রকমের সভ্যতার সংস্পর্শে এল। কিছুদিন দ্রাবিড়দের সঙ্গে খুব সংঘর্ষ চলল—অনার্য্য জাতি 'দাস' 'দস্যু' এই সব আখ্যায় আখ্যাত হ'তে লাগল। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই অনার্য্যেরা আর্য্য-সমাজের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভ করলে—এমন কি অনার্য্য দেবতারা পর্য্যন্ত আর্য্যদের মণ্ডলীর মধ্যে আসন পেতে বসল।

কেহ কেহ আশঙ্কা করছেন যে, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করলে ও শুদ্ধির প্রচলন করলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হ'বে। এ আশঙ্কা আমি অমূলক মনে করি। যে বিকৃত বর্ণাশ্রমের ফলে ধর্ম্ম ঠাকুরঘর ছেড়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করেছেন (স্বামী বিবেকানন্দ যাকে ছুঁৎধর্ম্ম বলতেন), হয়ত ঐ বিকৃত ধর্ম্মের গায়ে একটু আধটু আঁচ লাগতে পারে; কিন্তু প্রকৃত বর্ণাশ্রম ঋষিদের প্রতিষ্ঠিত বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের এ'তে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণতা হবে না। আমি স্বয়ং বর্ণাশ্রমের পক্ষপাতী। আমার মতে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজই আদর্শ সমাজ। গীতায় ভগবান্ বলেছেন:—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"—

একথা যদি সত্য হয় তবে সমস্ত জগতে চতুর্ব্বর্ণ থাকতেই হবে। সকল সমাজেই এমন সব লোক আছেন, যাঁদের ভিতর সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁরা ব্রাহ্মণ। যাদের মধ্যে রজোগুণ প্রধান তারা ক্ষত্রিয়। যাদের রজোগুণে তমের অনুবেধ, তারা বৈশ্য। আর যারা তমঃপ্রকৃতি, তারা শূদ্র। শূদ্র প্রকৃতি—শূদ্র জাত নয়। ঐ চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুণ-বৈষম্যই কর্ম্ম-বিভাগের ভিত্তি।

আরও স্মরণ রাখবেন প্রাচীন ভারতের সুবর্ণ যুগে—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যখন একটা সজীব প্রতিষ্ঠান ছিল, তখন এই বর্ণবিভাগ সমাজের পক্ষে একটা কঠিন নাই-নড়ন-চড়ন নিগড়-শয্যা ছিল না। তখন উচ্চ তিন বর্ণের প্রত্যেকের পক্ষে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের আলোচনা করলে দেখা যায়, কয়েকজন ক্ষত্রিয় বিপ্রত্বলাভ ক'রে বেদ-বিভাগে সহায়তা করেছিলেন—এমন কি কেহ কেহ বেদমন্ত্রের ঋষি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মেধাতিথি, হিরণ্যনাভ এবং কণ্বের—উল্লেখ করা যেতে পারে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দেখতে পাই স্নাতক-ব্রতধারী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষেও ব্যবস্থা ছিল যে, তিনি কৃতদাস, গোপালক, নাপিত, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরী—ইহাদের পৃষ্ট পক্বান্ন গ্রহণ করতে পারতেন।

এখন আমরা রাঢ়ী, বারেন্দ্র এক পংক্তিতে ভোজন করি না, কিন্তু মহাভারতের সভাপর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞের বিবরণে দেখতে পাই ব্রাহ্মণ-ভোজনে শূদ্র দাসেরা অন্নাদি পরিবেশন করছে।

(ব্রহ্মবিদ্যা, চৈত্র ১৩৩৩) শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

হজরত মুহম্মদের প্রতিভা

বিশ্ব যখন সত্যপথ হারিয়ে ফেলে অন্ধ এক পূতিগন্ধময় দুর্গম পথে অভিযান-চালিয়ে দেয়, বিশ্ব-মানব যখন মানব ধর্ম্ম ছেড়ে নানারূপ জড়-ধর্ম্মপন্থী হ'য়ে পড়ে, তখনি মহাপুরুষগণ স্বর্গের শান্তি নিয়ে আসেন মানবের কল্যাণার্থে, বিশ্বকে মুক্তি দিতে। হজরত মুহম্মদকে বুঝতে হ'লে তিনি সমগ্র ইস্‌লামকে কতটুকু সত্য দিয়ে খাঁটি ক'রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেটুকু বুঝতে হবে।

আমরা ইস্‌লামের যে-সকল আদেশ নিষেধের প্রচলন দেখতে পাই, এগুলো হ'ল জীবাত্মার আনন্দ উপভোগের এক সুখপ্রদ পন্থা। এই আদেশ নিষেধ সমুদয়কে নিতান্ত বিকৃত ক'রে পালন করার মত বিড়ম্বনা আর নাই। আধুনিক মুসলমান, বিশেষ ক'রে বাঙলার মুসলমান কিন্তু এসব আদেশ নিষেধের বড় একটা ধার ধারে না। তারা ইসলামের আদর্শ সত্যটুকুকে কত ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে নিবদ্ধ ক'রে রেখেছে।

মুসলমান হজরত মুহম্মদকে আদর্শ ধ'রে জীবন যাত্রা সুরু করে ব'লে তা'দের গর্ব্ব। কিন্তু বিরাট যে মহাপুরুষ, যিনি তপস্যার কর্ম্মে, প্রেমে এবং বিচিত্রতায় জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম, কয়জন তাঁকে সত্যিকার ক'রে জানে? তাঁর ভিতরের সৌন্দর্য্য, চিত্তের উদারতা আর মানবত্বকে আমাদের কল্পনা নিতান্ত আড়াল ক'রে চলেছে।

বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ হজরত মুহম্মদকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। হয়ত একথা শুনে অনেকে আঁৎকে উঠবেন। মহাপুরুষের পায়ে জীবনের সব লক্ষ্য উজাড় ক'রে দিলে, তাঁকে শ্রদ্ধা করা হয় না; তাঁকে সত্যকার

শ্রদ্ধা করা হয় তখন যখন তাঁর সাধনাকে প্রাণের আবেগদিয়ে গ্রহণ ক'রে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করা হয়। মুসলমান সমাজ হজরত মুহম্মদকে এতটুকু শ্রদ্ধা ক'রে নিজেকে গৌরবান্বিত করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাদের প্রাণ নাই ; এজন্য তারা মহাপ্রাণের আদর করতে জানে না। মহামনা হজরত মুহম্মদের বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংসারিক জীবন বিশ্বমানবের দৈনন্দিন কর্ম্মে, যোগে, সাধনায় যতখানি অবলম্বনযোগ্য মুসলমানদের বিচারবুদ্ধিতে আজিও তা যেন ধরা পড়ে নাই।

(শিখা, ১৩৩৩) শামসুল হুদা

—

কনোজরাণী রাজ্যশ্রী

প্রাচীন ভারতবর্ষের হিন্দুযুগের ইতিহাসেও কয়েকজন রাণীর কথা জানা যায়। যাঁহারা নিজ শক্তিতে বা নিজ অধিকারেই রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সিংহলের রাণী অনুলা (১৬ খ্রীষ্টাব্দ) এবং কাশ্মীরের রাণী সুগন্ধা (৯০৪—৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ) ও দিদ্দা দেবীর (৯৮০—১০০৩ খ্রীষ্টাব্দ) নাম করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের কন্যা রাণী প্রভাবতী খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রদেশে রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান দিল্লীর একটু উত্তরে ছিল শ্রীকণ্ঠরাজ্য, রাজধানী স্থাণ্বীশ্বর বা থানেশ্বর। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী প্রভাকর বর্দ্ধন। তাঁহার উপাধি ছিল প্রতাপশীল। এই প্রভাকর বর্দ্ধনের কন্যাই রাজ্যশ্রী। রাজ্যশ্রীর দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল—রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন। তাঁহাদের মায়ের নাম ছিল যশোমতী।

প্রভাকর বর্দ্ধন মৌখরিরাজ অনন্তবর্ম্মার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং মৌখরি রাজপুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজকুমারী রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিলেন। এইরূপে রাজ্যশ্রী কনোজের রাণী হইলেন।

রাজ্যশ্রীর জন্ম হয় ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে। সে সময় তাহার বড় ভাই রাজ্যবর্দ্ধনের বয়স ছিল ছয় বৎসর এবং হর্ষবর্দ্ধনের বয়স ছিল দুই কি আড়াই বৎসর। এই তিন ভাই বোনের নির্ম্মল আনন্দে রাজপরিবার সুখময় হইয়া উঠিয়াছিল। পরে তাহাদের আরও তিন জন সঙ্গী জুটিয়াছিল। প্রথমে আসিল তাহাদের মামাতো ভাই ভণ্ডি ; এই সময় হইতে ভণ্ডি এই পিসতুতো ভাই বোনের সঙ্গেই থাকিত। তারপর আসিল মালব রাজকুমার মাধবগুপ্ত ও কুমারগুপ্ত। এই দুই রাজপুত্রও এখন হইতে এই পরিবারেই থাকিতে লাগিল।

তারপর রাজ্যশ্রীর যখন কিছু বয়স হইল তখন তাহাকে বিদ্যাচর্চ্চাও করিতে হইয়াছিল। রাজ্যশ্রী অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্র ও কলাবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। তাঁহাকে চিত্রবিদ্যা, গীতবাদ্য ও নৃত্য শিখাইবার জন্য তাহার পিতা প্রভাকর বর্দ্ধন উপযুক্ত শিক্ষক রাখিয়া দিয়াছিলেন। আজকালকার দিনে আমাদের মেয়েরা চিত্র, গীত ও বাদ্য শিখিলে বিশেষ দোষের হয় না ; কিন্তু ভদ্র পরিবারের মেয়েদের পক্ষে নৃত্য অতি দূষণীয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের পক্ষে নৃত্য করা মোটেই দূষণীয় ছিল না।

যাহা হৌক, তেরো বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই মৌখরিরাজপুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হইয়া গেল। ইহা হইতেই বোঝা যায়, বাল্য-বিবাহ প্রথা সেই কালেও প্রচলিত ছিল। বিবাহের পরও আট দশ দিন শ্বশুরালয়ে থাকিয়া গ্রহবর্ম্মা রাজ্যশ্রীকে লইয়া কনোজে ফিরিয়া গেলেন।

(বেণু, বৈশাখ ১৩৩৪) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

—

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য কিসে ভাল হইতে পারে

বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের অবনতির ২টি প্রধান কারণ। ১। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব। ২। ব্যায়াম বিমুখতা।

বাঙ্গলার মৃত্যুহার বাড়িতেছে—১৮৮৫ সনে বাঙ্গলায় হাজার-করা ২২·৭৮ জন লোক মারা গিয়াছিল। ১৯১৫ সনে হাজার করা ৩১·৮ জন লোক মরিয়াছিল।

জন্মহার কমিতেছে—১৮৯০ সনে বাঙ্গলায় হাজার করা ৫১·৮ জন লোক জন্মিয়াছিল। ১৯১৫ সনে হাজার করা ৩১·৮ জন লোক জন্মিয়াছে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান হাজার-করা জন্মহার......২৭·২
 ,, ,, ,, ,, মৃত্যুহার......৩৭·২
জাপানের ,, ,, ,, জন্মহার......২৪·১
 ,, ,, ,, ,, মৃত্যুহার......১৫·৩
জাপান গড়ে জন প্রতি দৈনিক আয়.........৪৷৶০
ভারতবর্ষে ,, ,, ,,............/১০

এখন কর্ত্তব্য কি ?—

বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর ব্যায়াম-চর্চ্চা ও কার্য্যতৎপরতা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং খাদ্যের বহু আবশ্যক। উপাদান লুপ্ত হইয়াছে। খরচ বিশেষ না বাড়াইয়া বাঙ্গালীর খাদ্য অনেক সংশোধিত করা যাইতে পারে (নিম্নে তালিকা দেখুন)।

আহারের তালিকা (পূর্ণ বয়স্ক লোকের)

খাদ্য	পরিমাণ	(আনুমানিক মূল্য)
ছোলা-আদাসহ (ভিজা অঙ্কুরিত অবস্থায়)	১৷ ছটাক	৫
	মধ্যাহ্নে	
চাউল { ঢেঁকিতে ছাঁটা (কারণ কলে ছাঁটা চাউলের উপকারিতা কম) }	৩ ছটাক হইতে ১ পোয়া (শারীরিক পরিশ্রম অনুসারে)	৶০—৶১০
ডাল ...	১ ছটাক	
মাখন ও ঘৃত ...	৵ তোলা	
সরিষার তৈল (তরকারীর সহিত)	৵ ,,	
মাছ বা ছানা	১ ছটাক	
তরকারী	১ ,,	
	বৈকালে	
মুড়ি	১৷ ছটাক	১০—১৫
ছোলা ভাজা অথবা কাঁঠাল বীচি পোড়া ...	১ ছটাক	
নারিকেল	আধ ,,	
	রাত্রে	
চাউলের পরিবর্ত্তে আটার রুটি—	১ পোয়া	৶০—৶১০
অন্যান্য উপাদান মধ্যাহ্নের মত		

ইহা ব্যতীত প্রত্যেক লোকেরই অবস্থানুযায়ী প্রত্যহ কিছু না কিছু ফল খাওয়া উচিত। উপরে দরিদ্র অবস্থার লোকের আহারের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক লোককেই অন্ততঃ ।/০—।৶০ দৈনিক আহারের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। যদি সে পয়সা না থাকে, তবে

অর্থোন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। কারণ সকল অবস্থায় জাতিকে রাখিতে হইলে ইহা অপেক্ষা খাদ্যের উপাদান আর কমান যাইতে পারে না।

যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তাঁহারা ভাত ও রুটী কমাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ডিম, মাংস বা দুধ খাইতে পারেন এবং সকালে মুগের ডাল ভিজা—১ ছটাক, মাখন, ১ তোলা ও মিছরি ও ১॥ ছটাক ও বিকালে নিম্ন তালিকাদ্বয়ের যে কোন একটা অনুসারে ভাল খাবার খাইতে পারেন।

১। চিড়া	... ...	১ ছটাক	মূল্য---৵০
কলা	... ...	২ টা	
দুধ	... ...	১ পোয়া	
গুড়	... ...	॥ ছটাক	
২। মোহন ভোগ (সুজি ১ ছটাক	...		মূল---৵০
চিনি—১ ছটাক, ঘি ॥ তোলা	—		
আটার পাঁউরুটী	...	১ ছটাক	
কমলা লেবু	...	১ টা	

বালকদিগের পক্ষে দুধ, ছানা, ডিম, মাখন বেশী আবশ্যক। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান খাদ্য দুধ-ছানা-ডাল জাতীয় জিনিষ, মাংস এবং ফল উপযুক্ত পরিমাণে নাই। এইসকল উপাদান কম থাকিলে শরীরের যথোচিত পুষ্টি হয় না।

(আর্থিক উন্নতি, ভাদ্র ১৩৩৩) শ্রীঅমূল্যচরণ উকিল

—

ওমর-গুরু আবু আলি সিনা

পারস্যদেশে আবু আলি সিনার মত চিন্তাশীল লেখক, সাহিত্য স্রষ্টাকার, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, দার্শনিক ও সুকবি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ওমর, আবু আলি সিনাকে গুরুপদে বরণ করিয়া, তাঁহারই অসমাপ্ত বাণী প্রচার দ্বারা পারস্য দেশে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া ছিলেন।

আবু আলি সিনা পারস্যের বোখারা শহরে ৩৭৩ হিজরাব্দে (৯৮০ খ্রী:) জন্মগ্রহণ করেন। ইবন খালি খান (১) বলেন, দশ বৎসর বয়সের সময় আবু সিনা সমগ্র কোরাণ, সাহিত্য, মুসলিম ধর্ম্মতত্ত্ব, পাটীগণিত, বীজগণিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, ইউক্লিড, ও মিশর দেশীয় পণ্ডিত টলেমির গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়া এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, সতের বৎসর বয়সে সমানন্দ বংশীয় রাজকুমার মনসুরের চিকিৎসার জন্য রাজপ্রাসাদে তাঁহার আহ্বান হইয়াছিল।

রাজকুমার আবু আলি সিনার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে নিজ গৃহ-পাঠাগার ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করেন।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি বোখারা ত্যাগ করিয়া খাওয়ারজাম নগরে গমন করেন। তত্রত্য রাজা মামুন সবিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে আবু আলি সিনাকে রাজ-দরবারে আহ্বান করেন। এই সময়ে মামুনের রাজ-সভা বিদ্বানমণ্ডলীর মিলন-মন্দিররূপে পরিণত হইয়াছিল।

গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষের ইতিহাসে লুণ্ঠন-হত্যাকারী দস্যু বলিয়া পরিচিত হইলেও স্বদেশে নানা সদ্গুণবিমণ্ডিত ছিলেন। তিনি যেমন বিদ্যানুরাগী বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যিক ও বিদ্বানগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন, তেমনি অন্য রাজার রাজ্য হইতে প্রসিদ্ধ বিদ্বানদিগকে ছলে বলে কৌশলে নিজ রাজ-দরবারে আনিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। সুলতান মামুদ আবু সিনার পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বরাবরই অন্তরে অন্তরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তাঁহাকে আপন রাজসভায় পাইবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টাও করিয়াছিলেন।

আবু সিনা বুখারার রাজকুমার কর্ত্তৃক অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়া মামুন খাওয়ারজাম শাহের রাজদরবারে আশ্রয় পাইয়াছেন শুনিয়া সুলতান মামুদ আবু আলি সিনাকে সত্বর তাঁহার রাজসভায় প্রেরণ করিবার জন্য পত্রসহ একজন দূত প্রেরণ করেন।

আল বিরুনী, আবুল হাসান খাকার, এবং আবু নাসার আরাক্ এই তিন জন বিদ্বান সুলতানের উদারতা ও আশ্রিত-বাৎসল্যের কথা জানিতেন। ইঁহারা তিন জনে সুলতান মামুদের রাজসভায় যোগদান করিবার সম্মতি প্রদান করেন। আবু আলি সিনা ও আবু খায় মাস ইহি অসম্মতি প্রকাশ করিয়া গোপনে পলায়ন করেন। সুলতান মামুদ বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া অধৈর্য্য হইয়া বলপূর্ব্বক খাওয়ারজাম্ রাজ্য অধিকার করেন। আবু সিনা পলাতক শুনিয়া তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরণ করেন এবং ঘোষণা করেন, যিনি আবু আলি সিনাকে বন্দী করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার ও রাজ-সম্মানে ভূষিত করিবেন।

আবু সিনা খাওয়ারজাম শহর হইতে পলায়ন করিয়া আত্ম-গোপন করিয়া বাস করিতে থাকেন।

তিনি কুবাসের রাজার এক আত্মীয়কে কঠিন পীড়া হইতে মুক্ত করেন। রাজআত্মীয় তদীয় চিকিৎসক আবু আলি সিনাকে রাজদরবারে উপস্থিত করেন। রাজা প্রথম দর্শনেই সুলতান মামুদ প্রেরিত চিত্র হইতে আবু সিনাকে চিনিতে পারেন। তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত আবু সিনাকে নিজ দরবারে আশ্রয় দেন। তিনি এই সময়ে কুবাস রাজের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হয়েন। কুবাস শহরে অবস্থানকালে তিনি প্রত্যহ দুই পৃষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ "সীফা" রচনা করেন।

সুলতান মামুদের অত্যাচারের ভয়ে তিনি অল্পদিন পরেই রাজ-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রায় নগরে অবস্থান করেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভ্রাম্যমাণ জীবন তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠে। মরুভূমি অতিক্রম করিবার সময় হঠাৎ উদরের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ৪২৭ হিঃ অব্দে (১০৩৭ খৃঃ) হামদান নগরে ৫৪ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবু আলি সিনার গ্রন্থ-সংখ্যা আজিও স্থিরনিশ্চয় করিয়া কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার যতগুলি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একশত চল্লিশ, গণিত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দশখানি, দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে পনেরখানি, উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্বন্ধে পাঁচখানি, কুড়িখণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বকোষ, ইহা ব্যতীত সুপণ্ডিত আরিষ্টটলের গ্রন্থাবলীও তিনি গ্রীক হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

আবুসিনার পারস্য ও আরবী ভাষায় লিখিত কবিতা মূর্ত্তিমান "বিদ্রোহ"। এই বিদ্রোহ-অভিযান দেশাচার, সুফীধর্ম্ম, ভণ্ডামী গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে। আবুসিনা অত্যন্ত পিয়ালা-বিলাসী ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতা সুরা সুরাপাত্র ও নারীর প্রশংসাবাদে পূর্ণ।

(কল্লোল, ফাল্গুন ১৩৩৩) শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী

শাসন

শ্রী ইন্দুভূষণ দেব

শৈশবে পিতৃহীন হইয়া এবং অর্থ ও অভিভাবকের অভাব অতিক্রম করিয়াও বৎসরের পর বৎসর যখন জেলা স্কুল হইতে পদক পারিতোষিক প্রভৃতি সম্মান লাভ করিতে লাগিলাম তখন স্নেহান্ধ জননী কেন, বিস্মিত অনেক প্রতিবেশীরও মনে হইয়াছিল, কালে আমি একটা কেষ্ট-বিষ্টু হইবই। তাঁহারা অধিকতর বিস্মিত হইলেন যখন আমি বি-এ পরীক্ষায় সরস্বতীর দ্বারে লাঞ্ছিত হইয়া কেষ্টত্ব ও বিষ্টুত্ব এই উভয় পদেরই দাবী পরিত্যাগপূর্ব্বক সুদূর পল্লীগ্রামে এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে নীচু আঁকের মাষ্টারের পদে বৃত হইলাম। দেবত্ব-ত্যাগে ক্ষুণ্ণ মনকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইলাম, দেশমাতৃকার এই দুর্দ্দশার দিনে ওসব বিলাসিতা বিসর্জ্জন দিয়া মাষ্টাররূপী স্বার্থশূন্য "নেশন-বিল্ডার" হওয়াই ত প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের কর্ত্তব্য।

বেতন ধার্য্য হইয়াছিল ২৩৸৶০,—ষ্ট্যাম্পের অজুহাতে এক আনা কাটা হইত। পড়াইতে হইবে শুনিলাম, ৭ম শ্রেণীতে ইতিহাস, ৬ষ্ঠতে ভূগোল, ৪র্থতে ইংরেজী ব্যাকরণ এবং ৩য়তে অঙ্ক শাস্ত্র। মাসিক পারিশ্রমিকের অনুপাতে দৈনিক পরিশ্রমের অসামঞ্জস্য দেখিয়া সামান্য অসন্তোষ প্রকাশ করায় প্রবীণ প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমাকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন যে, এইরূপ অল্প বেতনে ঐরূপ বিবিধ বিষয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ একটা পরম সৌভাগ্য। সুচারু রূপে কার্য্য সম্পাদন করিলে মাত্র তিন বৎসর পরে আমার দক্ষিণা ২৫৲ অর্থাৎ নগদ ২৪৸৶০ হওয়া যে একেবারে অসম্ভব নহে, সে-বিষয়েও ইঙ্গিত করিলেন; এহেন সুযুক্তি এবং প্রলোভন প্রদর্শনেও কিন্তু আমার নবীন মন কেবলই আর-একটু অধিক বেতন ও শিক্ষাদানের আর-একটু অল্প সুযোগ লাভকেই শ্রেয় বলিয়া মানিতে লাগিল।

যাহা হউক, যখন স্বার্থ বলি দিয়া 'নেশন্-বিল্ডার' হইতে আসিয়াছি তখন অত তুচ্ছ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া মনকে খর্ব্ব করা অনুচিত। অতএব ২৩৸৶০ আনাতেই জাতিগঠন বেশ জোরে চলিতে লাগিল। কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা লাভেই বুঝিলাম অল্প বেতনে অধিক বিষয়ে অধ্যাপনার সুযোগই আমাদের একমাত্র সুযোগ নহে; আরো বহু সুযোগই আমাদের ভাগ্যে ঘটে। এই সুযোগের সুলভতার গুণে কর্ম্মপ্রাপ্তির প্রায় এক বৎসরের মধ্যে 'রুটিন'-চিহ্নিত বিরাম ঘণ্টার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। অনুপস্থিত শিক্ষক-দিগের অনুপস্থিতির গুরুভার উপস্থিত শিক্ষক-দিগের অনিচ্ছুক স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া স্কুলের নিয়ম ছিল, এবং তাহার ফলে পূর্ব্বাহ্নে কিছুমাত্র আভাস না পাইয়াই সম্পূর্ণ অতর্কিতে কখনও ২য় শ্রেণীর সংস্কৃত ব্যাকরণের 'তদ্ধিত,' ৮ম শ্রেণীর চাণক্য-শ্লোকের ব্যাখ্যা, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর 'কন্‌ভারসেসন্' আবার কখনও বা ৩য় শ্রেণীতে ইংরেজী পদ্য 'বোডেসিয়া', ও ১ম শ্রেণীতে সংস্কৃত পদ্যে 'সীতা-হরণ' পর্য্যন্ত করিতে হইত; এমনকি সুকুমারমতি শিক্ষার্থীদিগকে চিত্রাঙ্কণ বিদ্যাতেও পারদর্শী করিবার অবসর ঘটিত। শরীরের সামর্থ্যের ও মনের জোরের একান্ত অভাব না ঘটিলে, মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবকে সাক্ষী রাখিয়া বিদ্যালয়-সংলগ্ন অপরিসর প্রাঙ্গণে বালকদিগকে সারিবদ্ধ করিয়া বিবিধ ও বিচিত্র ভঙ্গী সহকারে অঙ্গ-চালনা দ্বারা তাহাদের অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট ও ব্যাধি-দীর্ণ দেহযষ্টিগুলিকে সুপুষ্ট করিবার ব্যর্থপ্রয়াসের সুযোগেরও অভাব ঘটিত না। একথায় দক্ষিণার বহর যাহাই হউক পাকা নেশন-বিল্ডার হইবার সর্ব্ববিধ সম্ভব ও অসম্ভব সুযোগ সর্ব্বদা সকল শিক্ষকের সমভাবে জুটিত।

অদৃষ্টের পরিহাস কিন্তু এমনই যে, কর্ত্তৃপক্ষের এবম্বিধ সর্ব্বাঙ্গীন সুব্যবস্থা সত্ত্বেও আমার জাতিগঠনের কার্য্য সহজে সুসম্পন্ন হইতে পায় নাই। আমার এই মহতী

প্রচেষ্টার স্বচ্ছন্দ গতি প্রতিহত হইল তাহাদেরই দ্বারা, যাহাদের শুভার্থে এই সুদূর পল্লীগ্রামে অত অল্প বেতনে অত অধিক বিষয়ে শিক্ষাদানে আমি স্বীকৃত হইয়াছিলাম। বিদ্রোহী-বৃন্দের প্রায় সকলেরই নাম ক্রমে স্মৃতির পিচ্ছিল পথ হইতে অপসৃত হইয়াছে, বাকি আছে মাত্র বিশেষ কয়েকটির। এই কয়েকটির মধ্যে আজ সকলের চেয়ে মনে পড়ে দুটিকে—"নোলক-পাঁচু" ও "গোদাবরী"। বৎসরের পর বৎসর নবকুমার ক্রোড়ে ধারণ করিয়াও কোনটিকে দীর্ঘকাল বক্ষে ধারণ করিতে অসমর্থা হইয়া মৃতবৎসা জননী 'পাঁচু ঠাকুরের' তৃপ্তিসাধন-মানসে তাঁহার নবজাত শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন 'পঞ্চানন', এবং যমকে ভুলাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টায় তাহার কচি নাকে নোলক দুলাইয়া দিয়াছিলেন। মাতৃ দত্ত নাম 'পঞ্চাননে'র সহজ অপভ্রংশ 'পাঁচু'র সহিত তাঁহারই উপস্থত নোলকটিকেও চিরস্মরণীয় করিয়া ছাত্রসংসদে তাহার নূতন নামকরণ হইয়াছিল—নোলক-পাঁচু। দ্বিতীয় বালকটির অভিনব নামকরণের ইতিহাস সঠিক মনে নাই, তবে 'গোদাবরী' নামটি পৈতৃক নহে, স্বোপার্জ্জিত বা সতীর্থ-প্রদত্ত. শরীরের অপর অঙ্গের সহিত পদযুগলের অসামঞ্জস্যেই হয়ত সেটির উৎপত্তি। নামকরণের ইতিহাস যাহাই হউক, এই 'গোদাবরী'ই ছিল পালের গোদা। প্রতি শ্রেণীতেই বৎসরাধিক অবস্থানের ফলে বিদ্যা-বুদ্ধির বৃদ্ধি তাহার যতই হউক, অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার বয়স এবং দুঃসাহস। এদুটির কল্যাণে দুর্বিনীতদের দলপতি সে সহজেই হইয়াছিল। সকল প্রকার অশিষ্ট আচরণের মূলে ছিল এই 'গোদাবরী' ও তাহার সুপটু শিষ্য 'নোলক পাঁচু'।

আমার কর্ম্মলাভের কয়েক দিনের মধ্যেই ইহারা নানা উৎপাত করিয়া আমাকে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিল এবং সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিল যে, বিনাযুদ্ধে আমার বশ্যতা স্বীকার করিতে তাহারা একান্ত অনিচ্ছুক। তাহারা দুজনেই তখন ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। অভদ্র উপদ্রব করিয়া অধ্যাপনায় বিঘ্ন ঘটাইয়া প্রত্যহ তাহারা শান্তি ভঙ্গের চেষ্টা পাইত। একদিন তাহাদের শ্রেণীতে বাঙ্গলা হইতে ইংরেজীর তর্জ্জমা শিখাইতে-ছিলাম; "'নোলক-পাঁচু'কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে খায় কি এর ইংরেজী কি? "সে কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই 'গোদাবরী' তাহাকে শিখাইয়া দিল, 'এই বল্ না, সে খায় ঘাস।" ছাত্র-শিক্ষকের "এই সপ্তাহব্যাপী অশোভন দ্বন্দ্বের একটা চরম নিষ্পত্তি করিতে সেদিন পূর্ব্বাহ্ণেই স্থির করিয়াছিলাম। সুতরাং দলপতিকে দলিত করিবার মানসে পাঁচুর পরিবর্ত্তে তাহাকেই বলিলাম, "বেশ তুমিই বল।" সে বলিল, "ওকেত জিজ্ঞেস্ করেছেন, ও বলুক।" আমি বলিলাম, "এতক্ষণ ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, কিন্তু এখন তোমাকে বলতে বল্‌ছি, তুমিই বল।" তাহাতে সে বীরদর্পে বলিল, "সে কে এবং খায় কি তা আমি জানব কি করে? হয়ত ঘাস খায়।"—তাহার এই উত্তর সমাপ্তির পূর্ব্বেই তার পৃষ্ঠে মস্তকে এবং সর্ব্বাঙ্গেই সরবে ও সবলে মুষ্টি প্রয়োগ আরম্ভ হইল। কোনও ছাত্রকে শারীরিক শাস্তি দিবার নিষেধবিধি বা তাহা ভঙ্গের কুফল তখন আদৌ স্মরণ ছিল না। বাস্তবিকই কয়েক দিবসের বিরক্তি ও সেদিনের উত্তেজনায় আমি প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া সকল কথাই বিস্মৃত হইয়াছিলাম; মনে ছিল কেবল মাত্র 'গোদাবরী'কে এবং সেই প্রাচীন ঋষি বাক্য "Spare the rod" ইত্যাদি। এই সারগর্ভ উপদেশবাণীর বিরাম-বিহীন অনুসরণ কতক্ষণব্যাপী হইয়াছিল মনে নাই, কেবল মনে পড়ে আমি সচেতন হইয়াছিলাম 'গোদাবরী'র সকরুণ আর্ত্তনাদে। এইরূপে অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া এবং কমা-ফুলষ্টপ্-হীন অনর্গল মুষ্টি-বৃষ্টিতে চাপা পড়িয়া প্রথমতঃ সে হতভম্বপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। পরে নিজের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া বিকৃত স্বরে গোঁঙাইতে লাগিল, "আর কখ্‌খনো করবো না সার, এবারটা মাপ করুন।" তাহার এই কাতর সন্ধি-প্রার্থনায় নিবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, অন্যান্য ছাত্রেরা, মায় 'নোলক পাঁচু' পর্য্যন্ত আতঙ্কে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ভয়-মলিন মুখ ও স্পন্দন-বিমুখ শরীর দেখিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'এর তাৎপর্য্য ও সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সেই দিন হইতে শান্তিভঙ্গের কোনও চেষ্টা আর লক্ষিত হয় নাই এবং স্বয়ং 'গোদাবরী' বলিয়াছিল, "এটা ক্ষ্যাপা মাষ্টার, বকুনির ধার ধারে না, কোন্ দিন সত্যিই মেরে ফেলবে, যে গোঁয়ার রে

বাবা।" প্রহারের বহর ত' সে নিজেই যাচাই করিয়া দেখিয়াছে এবং আমার সুপুষ্ট শরীরটা সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতে না হইলেও সেদিক্ হইতে দেখিলে নেহাৎ তাচ্ছিল্য করিবার ছিল না।

কিন্তু এই 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' নীতিতে বাগ মানিল না যে ছেলেটি সেটি নারাণ মিত্র। পাত্‌লা ছিপ্‌-ছিপে চেহারা, রংটা উজ্জ্বল না হ'লেও শ্যাম বর্ণ। বড় বড় চোখদুটি বুদ্ধিতে চঞ্চল এবং মুখে সব সময়ই দুষ্টামির হাসি। ৩য় শ্রেণীতে তখন সে পড়ে। বয়স তার মোটে তের, কিন্তু পাকামিতে ছিল একেবারে প্রবীণ। দুষ্টামির ধারা তার ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নিদ্রালস পণ্ডিতের বিনা-অনুমতিতে শিখাচ্ছেদ বা পাদুকা অপহরণ, শিক্ষকের সহিত বাক্‌যুদ্ধ বা অনর্থক অবাধ্যতা, প্রভৃতি শান্তিভঙ্গের সাধারণ উপদ্রবগুলিকে সে নিতান্ত সেকেলে ইতরামি বলিয়া মনে করিত এবং যাহারা ঐ পথ অবলম্বন করিত তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। ছাত্রদের অদ্ভুত নামকরণ তাহারই কল্পনা-প্রসূত এবং সকল শিক্ষকেরই শারীরিক বা অন্য ত্রুটি অবলম্বনে সে একটি ছড়া রচনা করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সে তাহার আধুনিক ভদ্র-রসিকতায় সহপাঠীদিগকে মোহিত ও শিক্ষকবৃন্দকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিত। শুনিয়াছিলাম একবার পণ্ডিত মহাশয় অধ্যাপনাকালে শেষের ঘণ্টায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলে সকল ছাত্রকে কক্ষ হইতে বাহির করিয়া দিয়া এবং সন্তর্পণে সকল দ্বার ও জানালা রুদ্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া সে চলিয়া যায়। বিদ্যালয়ের ছুটির কোলাহলেও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ ঘটে নাই, এমনই সযত্নে দ্বার-সমূহ রুদ্ধ হইয়াছিল। সেই নির্জ্জন গৃহে শ্রান্তদেহে পরম শান্তিতে সুখনিদ্রায় তিনি শ্রান্তিদূর করিতেছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিদ্রাভঙ্গে তিনি সেই অন্ধকারে গৃহের দ্বার-অন্বেষণে টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতিতে যথেষ্ট বাধা ও আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তারস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকেন। তাঁহার ভয়-কম্পিত আর্ত্তস্বরে আকৃষ্ট হইয়া মালী আসিয়া পড়াতে ব্রাহ্মণ শীঘ্রই উদ্ধার পান। পরদিবস বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট অভিযুক্ত হইলে নারাণ মিত্র সমস্তই স্বীকার করিয়া বলে, সে কোনও অসদভিপ্রায়ে ঐরূপ করে নাই, সমস্ত দিন দারুণ পরিশ্রমের পর পণ্ডিত মহাশয়ের নিদ্রাকর্ষণ হইলে তাঁহার অবাধ সুনিদ্রার জন্যই সে ঐ প্রকার সুব্যবস্থা করিয়াছে, সুতরাং ইহাতে দোষ কিছু হইতে পারে বলিয়া সে মনে করে নাই। যাহা হউক প্রধান শিক্ষক তাহাকে বলিয়া দিলেন অধ্যাপনা কালে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে নিদ্রাভঙ্গই বিধেয় এবং ওরূপ আচরণ আর যেন কখনও সে না করে।

কয়েক মাস পরে পণ্ডিত মহাশয়ের আর একদিন নিদ্রার উদ্রেক হইলে সে সকল ছাত্রদের বলিল, "তোরা সব চুপ কর"। ক্ষণকাল পরে পণ্ডিত মহাশয়ের নিদ্রা একটু গভীর হইলে তাঁহাকে জাগরিত করিবার অছিলায় সে এত জোরে নাড়া দিতে লাগিল যে নিদ্রাভঙ্গ তাঁহারত হইলই, উপরি যথেষ্ট সন্দেহ হইল যে, শরীরের আরও কিছু ভঙ্গ, হইয়াছে। এই নিদ্রাভঙ্গের ফলে তিনি তিন দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহার নিদ্রা আর তিন রাত্রি জোড়া লাগে নাই। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ভর্ৎসনায় সে বলে, "আজ্ঞে আপনিইত ঘুম ভাঙাতে বলেছিলেন; একটু অসাবধান হ'য়ে পড়েছিলাম তাই লেগে গেছে মাপ করবেন।"

আর একবার শুনিয়াছিলাম কোনও এক শিক্ষককে জব্দ করিবার অদ্ভুত ফন্দী। তামাকু সেবন তাঁর একটু বেশী প্রিয় ছিল বলিয়া প্রতি ঘণ্টার শেষে তিনি ধূমপান করিতেন এবং তৎসংক্রান্ত আয়োজনের নিমিত্ত মালীর মাসিক সন্তোষ বিধান তাঁহাকে করিতে হইত। তাঁর ঘণ্টায় নারাণ মিত্র সেদিন জল খাইতে বাহিরে আসিয়া মালীকে সশব্যস্তে বলিল, "সার তামাক চাচ্ছেন শীগ্‌গির সেজে নিয়ে যা, আমাদের ক্লাশে আছেন।" পরে মালীকে তামাক লইয়া ক্লাশের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সটান প্রধান শিক্ষকের নিকট গিয়া বলিল, "আমাদের ক্লাশে ছাত দিয়ে বড় জল পড়্‌ছে, সার আপনি একবার চলুন।" তারপর সে নিজের জায়গায় গিয়া শান্ত ছেলের মত বসিল। শিক্ষক ত তখন মালীকে বকিতেছেন। সে বেচারী থতমত হইয়া বলিতেছে, "আপনি ত মোটে এইমাত্র তামাক চাইলেন।" এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া যেই সে হুঁকাটি দিতে যাইবে অমনি প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রবেশ

করিলেন। ছাদ পর্য্যবেক্ষণের কথা বিস্মৃত হইয়া তিনি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া গেলেন। শিক্ষকটির লজ্জায় মাথা নত হইয়া গেল। বুঝিলেন নারাণকে কয়েক দিন পূর্ব্বে শাস্তি-বিধানের ফলে তাঁর এ দুর্গতি। এইরূপে অভাবনীয় উপায়ে লাঞ্ছিত হইয়া শিক্ষকগণ নারাণের সহিত অবশেষে অহিংসা অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন। ফলে তাহাকে বিরক্ত না করিলে সেও বড় একটা কিছু করে না।

তাহার এই নিস্পৃহতা দূর করিতে চেষ্টা করিল 'গোদাবরী'। আমার প্রহারপ্রভাবে পরাভব স্বীকার করিলেও, উপযুক্ত প্রতিশোধের সুযোগ সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাই নারাণ মিত্রের শরণাপন্ন হইয়া আমার বিরুদ্ধে তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। নারাণ অনর্থক ভদ্রলোককে কষ্ট দিতে চাহিল না। গোদাবরী বলিল, "দূয়ো, মারের ভয়ে পেছোস্ কাপুরুষ কোথাকার!" নারাণ মিত্র বলিল, "মার-টারের কি ছাই ভয় দেখাস্, ওসব এ শর্ম্মা থোড়াই কেয়ার করে।" এটা যে তার বৃথা অর্থশূন্য আস্ফালন নহে তা পরীক্ষা করিবার সুযোগ আমার শীঘ্রই মিলিল।

গ্রীষ্মাবকাশের ৩।৪ দিন পরে তাদের শ্রেণীতে আঁক কষাইতেছিলাম। ছুটির আঁক যে সব ছেলে আনে নাই তাদের শাস্তি দিয়াছি, ৩॥ টার পর আটক থাকিয়া প্রত্যহ অন্যূন ৩টা করিয়া আঁক কষিয়া শোধ দিতে হইবে। দণ্ডিত ছাত্রদিগের মধ্যে নারাণ মিত্র অন্যতম। কিন্তু অন্য ছাত্রেরা যখন যথাসাধ্য অঙ্ক কষিতেছিল সে নির্ব্বিকার নির্লিপ্তভাবে বসিয়াছিল। তাহা দেখিয়া ক্রমেই আমার ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিতেছিল। ৪॥টার পর যখন সকল ছাত্রই একে একে অঙ্ক দেখাইয়া চলিয়া গেল, তখনও দেখি সে পূর্ব্ববৎই অটল। কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিলাম, "নারাণ, তুমি ছুটিতে একটা আঁকও কষনি কেন?"

সে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "আজ্ঞে সময় পাইনি।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "প্রায় মাস দেড়েকের ছুটিতে একটা আঁক কষিবার সময় পেলে না?"

সে পূর্ব্ব-গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলিল, "আজ্ঞে না।"

আমি তখন ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, "এখন ত সময় পাচ্ছ, কষ্‌ছ না কেন শুনি?"

সে বিজ্ঞভাবে জবাব দিল, "আজ্ঞে, ছুটির জন্য যখন আঁক কষা এবং আমি আঁক যখন কষছি না, তখন বুঝতেই পার্‌ছেন ছুটির আমার বিশেষ দরকার নেই।"

আমি ঠোঁট চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তার মানে?"

সে অম্লান বদনে বলিল, "আজ্ঞে তার মানে হচ্ছে, ছুটির পর বাড়ীতে গিয়াও ব'সে থাক্‌ব, তা এখানেও আছি; বাড়ীতে বরং নিঃসঙ্গ থাক্‌তে হ'বে, এখানে তবু আপনার সঙ্গলাভ ঘট্‌বে।" এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলা! কথা শেষ করিতে না দিয়াই তাহার প্রত্যেক অঙ্গে আমার সঙ্গলাভের বিপুল পুলক বেশ ঘনিষ্ঠ-ভাবেই অনুভব করাইতে লাগিলাম। 'গোদাবরী'র প্রহারের দ্বিতীয় ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ চলিতে লাগিল। নারাণ কিন্তু কোনওরূপ কাতরতা বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। কিছু পরে দেখি হাতের বেতটা ফাটিয়া তাহার মস্তকের একস্থানে আঘাত করাতে সে স্থানটা রক্তাক্ত। রক্ত দেখিয়াই বেতটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। নারাণ তখন পরম আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে, আর একটা এনে দেব সার?" মনের ক্ষোভে ও রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে আমি নির্জ্জন লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিলাম।

প্রহারের মাত্রা অত্যধিক হওয়াতে বাস্তবিকই আমার অনুতাপ হইতেছিল। শাসনে অকৃতকার্য্যতার ক্ষোভে এবং এই অনুতাপে এখানে সকল চক্ষুর অন্তরালে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। একটু পরে নারাণ মিত্র সেখানে আসিয়া আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। আমি আর্দ্রস্বরে বলিলাম, "নারাণ, কেন অত মার খেলি?"

সে চকিতে নত হইয়া আমার পা দুটো ধরিয়া সকাতরে বলিতে লাগিল, "আপনি দুঃখ কর্‌ছেন কেন সার, আমার কিছু লাগে নি।"

সেই দুর্বিনীত বালকের এই কাতর কণ্ঠ শুনিয়া দুঃখটা আমার হঠাৎ বাড়িয়া গেল।

তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, "কেন নিজে কষ্ট পেলি, আর আমাকেও দিলি?"

সে বলিল, "আপনার অবাধ্য আর কখখনো হ'ব না সার; কালই সমস্ত আঁক আপনাকে দেখাব।" তখনও সে পা ছাড়ে নাই; মিনতির স্বরে বার বার বলিতে লাগিল "আপনি সার মিছে কষ্ট করছেন, এরকম মার আমার প্রায়ই হয়; সত্যি বল্‌ছি, সার, আমার লাগেনি। আজ, সার, আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি আপনার অবাধ্য আর কখনো হ'ব না।"

পরদিনই সে সমস্ত অঙ্ক আনিয়াছিল এবং তদবধি আমার এতটা জীবনে তার মত শান্ত, বাধ্য ও ভদ্র ছাত্র আর দেখি নাই। তার এই বাধ্যতায় ছাত্রেরা বিদ্রূপ করিলে সে বলিত, "কি জানিস্? মাষ্টার মশাই খালি বাবার মত মারে না, মেরে আবার মার মত কাঁদে যে।" আমি তাহার কাছে কাঁদিয়াই জিতিয়াছি তাহাতে লজ্জা নাই।

সে আমার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, সে পূর্ব্বে মেধাবী ছাত্র বলিয়া সুপরিচিত ছিল। কিন্তু তার মাতৃ-বিয়োগের পর পিতার শাসন ও মাতার স্নেহ, এদুটির স্থান কেবল প্রথমটি অধিকার করিল। পরে আবার বিমাতার শুভানুগমনে ও শুভানুধ্যায়ে সে শাসন অমানুষিকতায় পরিণত হইল। তখন হইতে সুবুদ্ধি অপেক্ষা দুর্ব্বুদ্ধি পরিচালনে সে কৃতী হইয়া উঠে। সকল শাসনকেই সে অগ্রাহ্য করিয়া চলিত এবং কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিত না। কিন্তু আমার নিকট সেদিন এতটুকু স্নেহের আভাষ পাইয়াই সে আমার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। তার পর প্রায় সমস্তক্ষণই আমার বাড়ীতে থাকিয়া সে পড়া শুনা করিত। আমিও তার মিষ্ট ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লগিলাম। তাহার সুপ্ত মেধা ক্ষিপ্র স্ফুরিত হইতে লাগিল।

* * * *

তিন বৎসর পরে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাতে সুসজ্জিত বিদ্যালয় ভবনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় ভদ্র ব্যক্তিগণের সমাবেশ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের প্রকৃতই সেদিন সুপ্রভাত। তাহারই একটি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুউচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তাহাকে গৌরব মণ্ডিত করিয়াছে। কৃতী ছাত্রটিকে সম্মানিত করিবার জন্য এই সুন্দর আয়োজন। অস্ফুট আনন্দ-কলরবের মধ্যে ছাত্রটি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া সভাস্থ অন্য সকলকে সসম্ভ্রম অভিবাদন করিল। ছাত্রবৃন্দ বিরাট জয়োল্লাসে তাহাদের বিজয়ী বন্ধুকে বরণ করিয়া লইল। আমার প্রতি নারাণের এই শ্রদ্ধার পরিচয়ে ও তাহার বিপুল গৌরবে আমার চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

এখন সে উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী। তথাপি এ দরিদ্র শিক্ষকই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়। তাহাকে দেখিলে আমার কেবলই মনে পড়ে বেত্রাঘাতের শাসনের চেয়ে স্নেহের শাসন কত শ্রেয়।

সত্তর বৎসর

(১৮৫৭—১৯২৭)

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

শ্রীহট্টে পঠদ্দশায় —১৮৬৬-১৮৭৪ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১১)

এই প্রথম লেমনেড খাওয়ার প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা মনে পড়িল। সেই বছরেই বোধ হয়, কিংবা তার পরের বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে একদিন হঠাৎ অতি প্রত্যুষ হইতে আমার পাৎলা দাস্ত আরম্ভ হয়। বাবা এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিবারবর্গের খবর রাখিতেন। কাহারও অতি সামান্য অসুখও প্রায় তাঁহার চক্ষু এড়াইতে পারিত না। এ সময়েও মা শ্রীহট্টের বাসায় ছিলেন না। আমি বাবার কাছেই শুইতাম। অত ভোরে পায়খানায় যাইতেছি দেখিয়া বাবা শশব্যস্ত হইয়া আমার সঙ্গে উঠিয়া আসিলেন। চৈত্র-বৈশাখ মাসে শ্রীহট্টে প্রায় সর্ব্বদাই বিসূচিকার উপদ্রব হইত। এ বছরও সহরে কলেরা দেখা দিয়াছে। আমার সামান্য পেটের অসুখেই বাবা অত্যন্ত ভয় পাইলেন। সেদিন কাছারীতে গেলেন না। এইজন্য আমার অসুখের কথা সহরময় ছড়াইয়া পড়িল। অপরাহ্ণে আদালতের যত উকীল, হাকিম, ও অন্যান্য কর্ম্মচারী আমাকে দেখিতে আসিলেন। লোকে বাড়ী ভরিয়া গেল। আমার দাস্ত তখন প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বেশ পিপাসা আছে। এই পিপাসার উপশমের জন্য ডাক্তার আমাকে লেমনেড দিতে বলিলেন। অমনি বাজার হইতে লেমনেড আসিল। অবশ্য মুসলমানের কলে, মুসলমানেরই তৈয়ারী, মুসলমানের ছোঁয়া লেমনেড। বাবা কিন্তু নিজের হাতেই সেই লেমনেড গ্লাশে ঢালিয়া আমার মুখে ধরিলেন। এই লেমনেড খাইয়া যে মার খাইয়াছিলাম, তখনও সে-কথা ভুলি নাই। এবার বাবার উপরে তারই শোধ তুলিবার জন্য সেই ঘর ভরা লোকের মাঝখানে, মুসলমানের ছোঁয়া জল কিছুতেই মুখে লইব না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। বাবা কহিলেন, "এ'তে দোষ নাই। ঔষধেতে এসকল আচার বিচার চলে না। ঔষধ সকল অবস্থাতেই নারায়ণের প্রসাদ বা চরণামৃতের মতন—ঔষধরূপে নারায়ণ।" এইরূপে অনেক সাধ্য-সাধনার পরে আমি অনেক কেঁদেলি করিয়া শেষে বাবার নিজের হাতে মুসলমানের লেমনেড খাইলাম।

(১২)

বাবা একদিকে আমার জাতকুল রাখিবার জন্য ইংরেজী পড়া বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। আবার অন্যদিকে এই লেমনেড খাওয়ার কিছু দিন পূর্ব্বে বা পরে, পুত্র-স্নেহ-পরবশ হইয়া অজ্ঞাতসারে আমাকে নিজের হাতে সাহেবীয়ানায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ-সাহেব নামে এক ইংরেজ শ্রী'ট্টের জজ ছিলেন। তিনি সপরিবারে কিছু দিন শ্রীঃট্টে বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয় শ্রীঃট্ট হইতেই অবসর লইয়া বিলাতে চলিয়া যান। শ্রী ট্ট ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার "বাংলার" যাবতীয় ভারী ভারী আসবাব নীলাম হয়। বোধ হয় শ' সাহেবের এগারো বার বছরের একটি বালক ছিল। জজ সাহেবের আস্‌বাবের মধ্যে এই বালকের ব্যবহারের উপযোগী ছোট চেয়ার, টেবিল, আল্‌না, টেপয় বা ত্রিপদী প্রভৃতি ছিল। বাবা এই নীলামে সাহেব বালকের এই আসবাবগুলি আমার জন্য কিনিয়া আনেন। ইহার ফলে আমি এগারো বার বছর বয়স হইতেই চেয়ার টেবিল প্রভৃতি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হই। মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য আস্‌বাবের ও বাহিরের পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে তাহার মনের সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ বাবা

ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই। অতি অল্প লোকেই এই মোটা কথাটা সচরাচর তলাইয়া দেখেন। ইংরেজ বালকের ব্যবহারোপযোগী টেবিল ও চেয়ারের ভিতর দিয়া বাল্যকালেই আমার ভিতরে সাহেবীয়ানার দিকে একটা ঝোঁক জন্মিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজী সাহিত্যের চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যৌবনে এই আসক্তিটা কতকটা উৎকট আকারেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে কথা যথা সময়ে কহিব।

(১৩)

কহিয়াছি যে আমরা বৈষ্ণব গোঁসাইদিগের শিষ্য হইলেও আমাদের আত্মীয় কুটুম্বেরা প্রায় সকলেই ঘোর শাক্ত ছিলেন। কেবল আমার মাতৃকুলই যে শাক্ত ছিলেন তাহা নহে, বাবার মাতৃকুলও শাক্ত ছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ কর্ম্ম উপলক্ষে সহরে বাস করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে বাবার একজন আপনার মাসতুত ভাই ছিলেন। ইঁহাকে আমি জ্যেঠামশাই বলিয়া ডাকিতাম। আমাদের বাসার নিকটেই আমার এই জ্যেঠামহাশয় তাঁর এক আত্মীয়ের একই হাতায় বাস করিতেন। এঁরা দুজনে সহরের "কারণ-সাধকদিগের" একরূপ দলপতি ছিলেন বলিলেও হয়। এমনও শোনা গিয়াছে যে, জ্যোৎস্না রাত্রে রাজপথে চলিতে চলিতে ইঁহারা মাঝে মাঝে নদী ভ্রমে শুখনা ডাঙ্গায় সাঁতার কাটিবার প্রয়াস পর্য্যন্ত করিতেন। একবার নাকি ইঁহাদের একজন বাতাসা ভাবিয়া 'টিকিয়া' চিবাইয়া "মা! এ কি করিলে, বাতাসার স্বাদ পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলে" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। আমার জ্যেঠামহাশয় একবার শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের যাত্রার পালা দেখিতে যাইয়া যে বালককে চণ্ডী সাজাইয়া আসরে নামান হইয়াছিল তাহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া 'মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।

ইঁহাদের বাসায় "কারণের"এতটা ব্যবহার ছিল বলিয়া আমি আমার জ্যেঠাইমায়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের ওখানে যাইয়া খাইতে সর্ব্বদাই বড় নারাজ ছিলাম। তিনি আমার জন্ত কত যত্ন করিয়া বিবিধ ব্যাঞ্জনাদি রন্ধন করিতেন, কিন্তু খাইতে বসিয়াই আমার মনে হইত যে, এসকল ভাল ভাল তরকারীতেই বুঝি মদ দেওয়া হইয়াছে। মাকে আসিয়া একথা বলিতাম। মা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু, এত মদ যাঁরা খান তাঁদের খাদ্যে মদ দেওয়া হয় না—ইহা আমার ধারণাতেই আসিত না। বাল্যকাল হইতে সেই যে মদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল ইহাতেই আমাকে এই দীর্ঘ জীবনে অশেষ প্রলোভনের মধ্যেও সুরা পানের অভ্যাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। বস্তুত প্রলোভন বলিলাম এও কেবল একটা কথার কথা মাত্র। কারণ মদের প্রলোভন যে কি ইহা আমি এ জীবনে অনুভব করি নাই।

(১৪)

১৮৬৯ ইংরেজীতে শ্রীহট্টে আবার গভর্ণমেণ্ট ইস্কুল স্থাপিত হয়। পাদ্রীদের ইস্কুল ছাড়িয়া যাহারা হিন্দুধর্ম্মের



মনারায়ের টিলা

(প্রাচীন সরকারী ইস্কুল-গৃহ ১৮৬৯-১৮৭৫)

ও হিন্দু সমাজের ইজ্জত রাখিবার জন্য নিজেরা নূতন ইস্কুল করিয়াছিলেন তাঁহাদের চেষ্টাতেই এই গভর্ণমেণ্ট ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। আমার বাবা ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ইস্কুল প্রতিষ্ঠার সময়ে দুর্গাকুমার বসু মহাশয় সেখঘাট মিশনারী ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনিই নূতন গভর্ণমেণ্ট ইস্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক হন। সেখঘাট ইস্কুলের অন্যান্য শিক্ষকেরাও গভর্ণমেণ্ট ইস্কুলে আসিয়া শিক্ষক হন। ইহার ফলে সেখঘাট ইস্কুল একরূপ উঠিয়াই যায়। একরূপ বলিতেছি এই জন্য যে, তখনই ঐ ইস্কুল একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল কিনা ঠিক মনে

নাই। আর এও অনুমান হয় যে, গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষেরা পাদ্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই এই নূতন গভর্ণমেণ্ট



প্রাচীন সরকারী ইস্কুল-গৃহের পশ্চাদ্ভাগ

ইস্কুল স্থাপন করেন নাই। পাদ্রারাও বোধ হয় আর এই ভার বহন করিতে পারিতেছিলেন না।

বলিয়াছি যে, শ্রীহট্ট সহরের নিকটে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। ইহারি একটির উপরে একটা বড় পাকা কোঠা ছিল। এই কোঠাতে তখন বারিক আফিস বা পাবলিক্ ওয়ার্কসের দপ্তর ছিল। এই বাড়ীতেই গভর্ণমেণ্ট ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পাহাড়কে 'মনারায়ের টিলা' কহিত। এখন গভর্ণমেণ্ট ইস্কুল আর সেখানে নাই। সহরের মাঝখানে নদীর ধারে উঠিয়া আসিয়াছে। স্থানটি অতি মনোরম। সহরের কোলাহল হইতে দূরে। একেবারে উত্তর প্রান্তে বলিলেই হয়। টিলার নীচ হইতে একটা পাকা সিঁড়ী কোঠার বারাণ্ডা পর্য্যন্ত গিয়া উঠিয়াছে। ইস্কুলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সমস্ত সহরের দৃশ্যটা আমরা দেখিতে পাইতাম। পাহাড়ের নীচে খানিকটা সমতল ভূমি ছিল। সেটাই আমাদের খেলার মাঠ ছিল। দক্ষিণ দিকে টিলার গা বাহিয়াও আমরা ইচ্ছা হইলে উপরে উঠিতে পারিতাম। নামিবার সময় সিঁড়ি দিয়া না নামিয়া অনেকেই পাহাড়ের গা দিয়া ছুটিয়া নামিত। উত্তরদিকে একটা গভীর খাদ ছিল। সেই খাদ দিয়া ঝর্ণার জল কল কল করিয়া দিবানিশি প্রবাহিত হইত। ইহারি পূর্ব্বদিকে আর একটা অপেক্ষাকৃত নীচু টিলা ছিল, এখনও আছে। আমার বাল্যকালে এই টিলায় জজ সাহেব থাকিতেন। সুতরাং আমরা বালকের দল সে দিকে বড় যাইতাম না। বোধ হয় ১৮৭৯ কি ১৮৮০ ইংরেজীতে গভর্ণমেণ্ট ইস্কুল মনারায়ের টিলা হইতে উঠিয়া সহরের মাঝখানে, লাল-দিঘী নামে একটা বড় দিঘী আছে তাহার পশ্চিম পাড়ে উঠিয়া আসে। এখান হইতে এখন নদীর ধারে উঠিয়া গিয়াছে।

(১৫)

আমাদের ইস্কুল সহরের এক প্রান্তে হইলেও আমরা হাঁটিয়াই ইস্কুলে যাইতাম। সেকালে শ্রীহট্টে দুখানা মাত্র গাড়ী ছিল। একখানা টম্‌টম্, আর একখানা সাধারণ চার চাকার গাড়ী। দুখানাই দুইজন উকিলের ছিল। একজন নিজেই তাঁহার টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আদালতে যাইতেন। ইহাঁর বংশধরেরা এখন কে কোথায় আছেন জানিনা। অন্য গাড়ীখানা ছিল ৺ব্রজনাথ চৌধুরী মহাশয়ের। ইনি একজন খুব বড় জমীদার ছিলেন। ইহাঁর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রায় সুখময় চৌধুরী বাহাদুর এখন সহরের একজন গণ্যমান্য লোক। অনারারি মেজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। ব্রজনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অন্যতম পৌত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী আসাম ব্যবস্থাপক সভায় কিছুদিন পূর্ব্বে স্বরাজ্যদলের দলপতি ছিলেন। আমার বাল্যকালে শ্রীহট্টে দুর্গাচরণ চৌধুরী ও ব্রজনাথ চৌধুরী এই দুজনের দুখানা গাড়ী ছিল। তবে ইহাঁরাও যে সর্ব্বদা গাড়ী চড়িয়া আদালতে যাইতেন, তাহা নহে। সহরের সকল সম্ভ্রান্ত লোকেরাই পায়ে হাঁটিয়া নিজেদের কর্ম্মস্থলে যাইতেন। তবে হাকিম এবং উকিলদের সঙ্গে একজন লোক খুব বড় বাঁশের ছাতা তাঁহাদের মাথার উপরে ধরিয়া যাইত। এ ছাতার পরিধি সাত আট হাত হইবে। ইহারাই নথী-পত্রের বোচ্‌কাও পিঠে বাঁধিয়া লইয়া যাইত। এই ছাতাই সেকালে আমাদের সহরে বড়লোকের নিদর্শন ছিল। এখন যেমন, তখনও সেইরূপ, সাড়ে দশটায় ইস্কুল বসিত ও চারিটায় ছুটী হইত। মাঝখানে দেড়টা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত আধ ঘণ্টা খেলার ছুটী হইত। এই ছুটীর সময়ে এখনকার মত আমার বাল্যকালে ইস্কুলের হাতায় কোন খাবার জিনিষ বিক্রী হইত না। ছেলেরা বাড়ী হইতে কোন জলপানির পয়সাও পাইত না। ছুটীর

পরেই বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগকে যা কিছু খাইতে হইত। আমার বাল্যকালে শ্রীহট্ট সহরেও এখনকার মতন সন্দেশ রসগোল্লা বা লুচী, কোচুরী, গজা প্রভৃতি খাবার মিলিত না। ছানার সংবাদ তখনও সে দেশে পৌঁছায় নাই। বাজারে এক জিলাপী মাত্র পাওয়া যাইত। আটা ময়দা মিলিত না, সহরেও প্রস্তুত হইত না, বাহির হইতেও আমদানি হইত না। নারিকেলের মিষ্ট দ্রব্যই গৃহস্থেরা বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে বা যজ্ঞাদিতে ব্যবহার করিতেন। এই সকল মিষ্টান্নে সুনিপুণ স্ত্রী-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যাইত। নারিকেলের চিঁড়া জিরা এবং গঙ্গাজলী নামে সন্দেশ আজিও পূর্ব্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ। আমার বাল্যকালে এছাড়া আর কোন মিষ্টান্ন আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। আর এ সকল বাজারে মিলিত না। বালকেরা চারিবেলাই ভাত খাইত। প্রাতঃকালে গরম ভাত এবং ঘিই আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল। ইহার সঙ্গে মাঝে মাঝে হঁসের ডিম ভাতে কিম্বা কোন তরকারী ভাতেও পাইতাম। দশটার সময় স্নানান্তে আবার ভাত ডাল ও একটা মাছের তরকারী দিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া ইস্কুলে যাইতাম। ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৈকালে আবার ভাতই খাইতাম। এ সময় নিরামিষ ব্যঞ্জনাদিই বেশী থাকিত। আমার এক জ্যেঠাইমা আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমার আপনার জ্যাঠা বা কাকা কেউ ছিলেন না। এই জ্যাঠাইমা আমাদের পরিবারভুক্ত ঠিক ছিলেন না। তবে তাঁহার সন্তানাদি কেউ ছিল না। অসহায় বৈধব্যে বাবা তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া থাকিতে অনুরোধ করেন। এই ভাবেই ইনি আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়া যান এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতেই অতিবাহিত করেন। ইহার পাকশালে যে নিরামিষ রান্না হইত আমাদের ইস্কুল হইতে আসিয়া খাইবার জন্য তাহা রাখা হইত। এইরূপে মধ্যাহ্ন আহার অপেক্ষা এই বৈকালের আহারেই বেশী তরিতরকারী মিলিত।

(১৬)

আমাদের বাসায় আমরা প্রায় আট দশ জন বালক-ছিলাম। অনেকেই আমাদের সম্পর্কিত; দু একজন একেবারে নিঃসম্পর্কিতও ছিলেন। সহরে থাকিয়া লেখা-পড়া শিখিবার কোন ব্যবস্থা ইহাদের ছিল না বলিয়া ইহাদের অভিভাবকেরা বাবাকে আসিয়া ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থার সুবিধা করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। আমাদের প্রাচীনেরা অন্নদান অপেক্ষাও বিদ্যাদানকে পুণ্যতর কর্ম্ম বলিয়া ভাবিতেন। এ সম্বন্ধে বাবা কোনদিন কোন অনুরোধ সাধ্যাতীত না হইলে অগ্রাহ্য করিতেন না। এইজন্য আমার নিজের ভাই না থাকিলেও সম্পর্কিত এবং অসম্পর্কিত প্রায় আট দশজন বালক আমাদের বাসায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতেন। প্রতিদিন ইস্কুল ছুটি হইলে আমরা সকলে একসঙ্গে খাইতে বসিতাম। মা প্রায়ই নিজের হাতে আমাদিগের সকলকে খাওয়াইয়া দিতেন। একটা বড় গামলায় একরাশ ভাত লইয়া বসিতেন আমরা বৃত্তাকারে তাঁহার সম্মুখে ও পাশে বসিয়া যাইতাম। আমার ভগিনীও আমাদের সঙ্গে বসিয়াই খাইত। এ খাওয়ানর কথা জীবনে ভুলিব না। মরণেও ভুলিয়া যাইব কিনা জানিনা। কারণ এ কেবল সামান্য ভাত-ডাল খাওয়ান ছিল না। ইহা আমাদের পরিবারে একরূপ প্রতিদিনের বাৎসল্য-উৎসব ছিল।

আর এ কথা মনে আছে ও চির দিন মনে থাকিবে এইজন্য যে, এই খাওয়ানের ভিতর দিয়া আমার মায়ের চরিত্রের একটা দিক আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কত বছর ধরিয়া এইরূপে দিনের পর দিন ইস্কুল হইতে আসিয়া সকলে মিলিয়া মায়ের হাতে খাইয়াছি। কিন্তু একদিনও আমি মায়ের সন্তান বলিয়া এক কণা মাছ বা অন্য সুস্বাদু বস্তু অপর অপেক্ষা বেশী পাই নাই। ক্ষুধায় অধীর হইয়া খাইতে বসিয়াছি, মুহূর্ত্ত বিলম্ব সয়না, কতবার চাহিয়াছি, যে প্রথম গ্রাস আমার মুখে পড়ুক, কিন্তু সেই বৃত্তের মধ্যে আমি পাশেই বসি আর মাঝখানেই বসি, যেখানেই বসিনা কেন, সর্ব্বদাই অপর সকলের পরে মায়ের হাত আমার মুখের কাছে আসিত। ইহাতে আমি চটিয়া যাইতাম। মা কেবল এই খাওয়াইবার সময় নহে অন্য সময়েও বাড়ীতে কোন বিশেষ খাবার হইলে বা বাবার মক্কেলদিগের নিকট হইতে

কোন মিষ্টান্নের বা ফলাদির ভেট আসিলে আর সকলকে না দিয়া কখনও আমাকে, তার একটুও দিতেন না। মার এই ব্যবহারে আমি কেবল চটিয়া যাইতাম তাহা নহে, কিন্তু ক্রমে আমার এই ধারণা হয় যে, ইনি আমার বিমাতা। আমার নিজের মা আমার শৈশবেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বড় হইয়াও এ সন্দেহটা একেবারে যায় নাই। তখন মা একদিন আমাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁর কথাগুলি কতকটা এখনও আমার মনে আছে। মা কহিলেন—

"এখন তুই বড় হইয়াছিস্, এখনও কি বুঝিবি না, কেন আমি তোর আগে অপর ছেলেদের যত্ন ও আদর করি। তাদের মা এখানে নাই। আমার আদর-যত্নে একটু ক্রটী হইলে তাদের প্রাণে কত লাগিবে। তোমাকে ইচ্ছা করিলেও আমি অযত্ন করিতে পারি না। তাহাদের অযত্ন হওয়া অতি সহজ।"

আমি কহিলাম—"তা যেন হ'ল। কিন্তু কৃপা (আমার ছোট ভগিনী) যত যত্ন পায় আমি ত তাও পাই না। আমার আগে কৃপা সর্ব্বদাই খাইতে পায় কেন?"

মা কহিলেন—"এসংসারে যা আছে সকলি তোমার ও তোমারি থাকিবে। কৃপা ত দু'দিন পরে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে। এও কি বুঝ না?"

যখন ইহা বুঝিলাম তখন মাকে একথা বলিবার আর অবসর পাইলাম না।

(১৭)

আজিকালি বাংলার তথাকথিত ভদ্র হিন্দু সমাজে আহারে ব্যবহারে জাতিবিচার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতাতেও এবিষয়ে এতটা উদারতা বা ঔদাসীন্য দেখা যায় নাই। শ্রীহট্টের মতন প্রান্তিক জেলায় জাতের খুবই কড়াকড়ি ছিল। তবে আমাদের সমাজে কোনওদিনই যে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব ছিল এমন বোধ হয় না। আমার বাল্যে শ্রীহট্টের হিন্দু সমাজে উচ্চশ্রেণীকে "ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোক" কহিত। কলিকাতা অঞ্চলে যে-অর্থে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের গ্রাম কথাটা ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে আমার বাল্যকালে আমাদিগের মধ্যে "ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোকের" গ্রাম এই কথা ব্যবহৃত হইত। ভদ্রলোক বলিতে আমরা কায়স্থ ও বৈদ্যকেই বুঝিতাম। ব্রাহ্মণ ইঁহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র এই ভাবটাই ছিল। কিন্তু ইঁহারা যে, কায়স্থ বৈদ্য হইতে শ্রেষ্ঠ এই ভাবটা ছিল না। ইহার একটা কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, ঢাকার এত কাছে হইলেও আমাদের অঞ্চলে বল্লালী কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণেরা সকলেই "বৈদিক"। বরেন্দ্র বা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সে জায়গায় নাই। কিম্বা রাঢ় বা বরেন্দ্রভূমি হইতে কোন ব্রাহ্মণ পরিবারের পূর্ব্ব পুরুষ আদিতে শ্রীহট্টে গিয়া থাকিলেও নূতন সমাজে এসকল ভেদ জাগাইয়া রাখেন নাই, কিংবা রাখিতে পারেন নাই। আমার বাল্যকালে রাঢ়ী বারেন্দ্র এসকল কথা পর্য্যন্ত শুনি নাই। আমাদের ব্রাহ্মণেরা যে "বৈদিক" শ্রেণীর ইহাও জানিতাম না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই এই মাত্র জানা ছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে আবার শ্রেণী-বিভেদ আছে ইহা সাধারণ লোকে জানিত না। তবে সকল ব্রাহ্মণেরা যে সকল ব্রাহ্মণের হাতে খান না ইহা জানা ছিল। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে সমাজের সকল ব্রাহ্মণের যখন নিমন্ত্রণ হইত তখন প্রায় প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র পাকশাল প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। এসকল নিমন্ত্রণে কলিকাতা অঞ্চলে যাহাকে ফলার বলে তাহার ব্যবস্থা ছিল না। দই, চিঁড়া কিংবা ভাতেরই ব্যবস্থা হইত। ইতর শ্রেণীর জন্যই দই-চিঁড়ার আয়োজন হইত। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা বৈদ্য-দিগের জন্য ভাতেরই ব্যবস্থা করিতে হইত। আর তখন প্রায় প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের জন্য পৃথক্ "হাঁড়ির" সংস্থান না করিলে চলিত না। এই যে ব্রাহ্মণেরা একে অন্যের হাতে খাইতেন না, ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যেও একটা জাত-বিচার ছিল। তবে কে কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ একথা সাধারণ লোকে জানিত না, এ প্রশ্নও তারা করিত না। ব্রাহ্মণেরা প্রায় সকলেই পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ছিলেন। কায়স্থ, বৈদ্যাদি তখন আমাদিগের সমাজে মোটামুটি শূদ্র পর্য্যায়েই পড়িতেন। কায়স্থেরা যে পতিত ক্ষত্রিয়, এ কথা তখনও উঠে নাই। শ্রীহট্টের বৈদ্যদিগেরও উপনয়ন সংস্কার হইত না। তাঁরা উপবীত

ধারণ করিতেন না। বৈদ্যে কায়স্থে আদান-প্রদান হইত। এইসকল কারণে সকলেই শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। আর লৌকিক বিদ্যায় এবং ধন-সম্পত্তিতে ইহারাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা নিজেদের জীবিকার জন্য ইঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন। শূদ্রের বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় ইহা আমরা কখনও জানিতাম না। আমাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদিতে দেবতার নিকটে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণেরাই ভোগ রাঁধিতেন এবং আমাদের পুরোহিতেরা নিঃসঙ্কোচে আমাদের বাড়ীতে দেবপূজা উপলক্ষে দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কলিকাতা অঞ্চলে শুনিয়াছি ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই কেবল দেবতাকে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ দেওয়া যায়। কায়স্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির নাকি এ অধিকার নাই। তাঁরা কেবল দেবতাকে কাঁচা ভোগই দিতে পারেন। আমরা এ অদ্ভুত কথা শুনি নাই। আমাদের জেলায় এরূপ ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব পূর্ব্বে কখনও ছিল না। কালবশে এখন এই ভাবটা নব্য-শিক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে "অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী" হইতে পারিলে ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব যে রক্ষা পাইত এ কথাটা জানা ছিল, এবং এমন দুই একটি ব্রাহ্মণ পরিবার আমাদের অঞ্চলে ছিলেন, যাঁহারা "শূদ্রের অন্ন" গ্রহণ করিতেন না। তবে ইঁহারা সকলেই বিষয়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহাদের ছোটখাট জমিদারী ছিল। টাকা লগ্নি করিয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের যে শাস্ত্রীয় ব্যবসায় বা কর্ম্ম-অধ্যয়ন-অধ্যাপন, ইহারা তাহা অবলম্বন করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিতেন না। নিজেদের জমীদারীর জোরে ব্রাহ্মণ্যকে ঠেকা দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। আমার বাল্যকালে কেবল একটি মাত্র ব্রাহ্মণ পরিবারের কথা জানিতাম, যাঁহারা কায়স্থ-বৈদ্যদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ মোহান্ত ব্রজবিদেহী শান্তদাস বাবাজী এই পরিবারের লোক ছিলেন। পূর্ব্বাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী। ইনি আমার সতীর্থ ছিলেন। একই বৎসর শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট ইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য আসিয়া ভর্ত্তি হই। তারাকিশোর-বাবুর পরিবারের লোকে শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতেন না। বেশ একটু জমিদারী তাঁহাদের ছিল, এবং কুসীদ-ব্যবসায়ও করিতেন বলিয়া ইঁহারা "অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী" হইতে পারিয়াছিলেন। এরূপ আরও দু পাঁচটি বিষয়ী ব্রাহ্মণ পরিবার ছিলেন, যাঁহারা শূদ্রের দান গ্রহণ করিতেন না। এ ছাড়া শ্রীহট্টে প্রায় সকল ব্রাহ্মণই শূদ্র-মুখাপেক্ষী ছিলেন। অন্ন-ঋণে ব্রাহ্মণেতর ভদ্র লোকদিগের নিকটে আবদ্ধ হইয়া ইঁহারা সে-কালে আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। যজন-যাজন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও ইঁহারা অধিকাংশ স্থলেই সেই ব্যবসায়ের উপযোগী শিক্ষাও লাভ করিতেন না। পূজা-পদ্ধতির হাতে লেখা পুঁথি ইঁহাদের বাড়ীতে থাকিত। সেই পুঁথি মুখস্থ করিয়াই ইঁহারা যজমানদিগকে মন্ত্র পড়াইতেন, নিজেরাও দেবতার পূজায় পৌরোহিত্য করিতেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ বা অভিধানের সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক ছিল না বলিলেও হয়। বড় বড় ভদ্র লোকদিগের গ্রামের টোল ছিল। এসকল টোলে ভিন্ন গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণ বালকেরা আসিয়া ব্যাকরণ এবং স্মৃতি পড়িতেন। কিন্তু যাঁহারা টোলে পড়িয়া কোন উপাধি পাইতেন, তাঁহারা সাধারণ যজন-যাজন ব্যবসা অবলম্বন করিতেন না। হয় নিজেরা টোল খুলিতেন, না হয় দুর্গোৎসবাদিতে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাড়ীতে "তন্ত্রধারকের" কর্ম্ম করিতেন। এসকল বৃহৎ যজ্ঞাদিতে পুরোহিত ছাড়া এক একজন তন্ত্রধারক থাকিতেন। তন্ত্রধারকেরা পুরোহিতকে মন্ত্র পড়াইয়া পূজার অর্ঘ্যাদি দেওয়াইতেন। এই সাধারণ পুরোহিতেরা অতি অল্পই লেখাপড়া জানিতেন। পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সংগৃহীত পুঁথি মুখস্থ করিয়াই ইঁহারা পৈতৃক ব্যবসায় রক্ষা করিতেন।

(১৮)

ঐসকল অবলম্বনে নানা কৌতুককর গল্পেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। একটা গল্প সেদিন শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। এক ব্রাহ্মণ যুবক একবার

সাবিত্রীব্রত করাইতে যান। তাঁহার পিতাই এসকল ব্রত করাইতেন। কিন্তু এদিনে অসুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি ব্রতের পুঁথি হাতে দিয়া পুত্রকে পৌরোহিত্য করিতে যজমানের বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। পুত্র এই পুঁথি লইয়া যজমান-বাড়ী যাইয়া ব্রত করাইতে লাগিলেন। সাবিত্রী-ব্রতের অনুষ্ঠানে এক জায়গায় লেখা ছিল "সপ্তস্যুত্রেন বেষ্টয়িত্বা"...ইত্যাদি। অর্থাৎ সাতটা সুতো দ্বারা ব্রতের স্থানকে বেষ্টন করিতে হইবে। পুরোহিত-পুত্র হাতের লেখা পুঁথিতে 'স' 'কে' 'ম' পড়িয়া বসিলেন। সুতরাং সপ্ত সূত্রেন না পড়িয়া সপ্তমূত্রেন বেষ্টয়িত্বা পড়িলেন। পড়িয়া ব্রতকারিণীকে কহিলেন, "ঠাকুরাণী, একটু উঠিতে হইবে এবং এই বেদীর চারিদিকে সাতবার মূত্রত্যাগ করা প্রয়োজন। মহিলাটি আরও পূর্ব্বে এই ব্রত করিয়াছিলেন।" সুতরাং পুরোহিত-পুত্রের বিদ্যার এই পরিচয় পাইয়া তাঁহার আর এই বার ব্রত-সমাপন করিতে হইল না।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষের পরাধীনতার স্বরূপ

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষ নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিল না কেন, কেন ভারতবর্ষ এই দীর্ঘ সাত শত বৎসর ধরিয়া পরাধীন রহিয়াছে,—দেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর পাওয়া গিয়াছে কি? অনেকেই এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের সম্যক্ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেও এ-বিষয়ের পুরাপুরি আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে অনেকেই এই সম্বন্ধে অনেক আংশিক সত্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমিও আংশিক ভাবেই কয়েকটি তথ্যের আলোচনা করিব।

প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজারা যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে জানিতেন না, অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতেন না তাহা নহে। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীনতম কাল হইতেই ভারতের ক্ষত্রিয় রাজারা যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেই নিজেদের বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এমন-কি অহিংসবাদী বৌদ্ধ রাজারাও সমর-ক্ষেত্রে রক্তপাত করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, বরং গৌরবই মনে করিতেন; বাঙ্গালার বৌদ্ধ পাল রাজাদের ইতিহাসই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতের হিন্দু রাজারা যে কর্ত্তব্যবোধেই যুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়াই নিরস্ত হইতেন তাহা নহে। যুদ্ধ করিয়া পরের রাজ্য অধিকার করা ও নিজের রাজ্য বিস্তার করাই ছিল পরম গৌরবের বিষয়; বহু নরপতিকে পরাভূত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করাই ছিল ভারতীয় রাজাদের পক্ষে চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ঐন্দ্রমহাভিষেক, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে; সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করাই ছিল এইসকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা 'সর্ব্বক্ষত্রান্তক' 'একরাট্' মহাপদ্মনন্দ এবং 'সর্ব্বরাজোচ্ছেত্তা' সমুদ্রগুপ্তের কথা স্মরণ করিতে পারি। তক্ষশিলা-বিজয়ী কুরুরাজ 'সর্ব্বভূমি' জনমেজয় শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্র (দ্বিরশ্বমেধ-যাজী) এবং সাতবাহনরাজ 'দক্ষিণাপথপতি' শাতকর্ণি নিজেদের বহু-বিস্তৃত বিজয়-কীর্ত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই দুই দুইবার করিয়া অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

বস্তুত দিগ্বিজয়ী হওয়ার অনন্যসাধারণ যশোলাভই ছিল প্রাচীন ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তির চরম আদর্শ। কিন্তু

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতের ক্ষত্রিয় রাজারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জয়-পরাজয় লইয়াই শত শত বৎসর কাটাইয়া দিলেন, অথচ একজন ক্ষত্রিয় বীরও আপনার বিজয়বাহিনী লইয়া বহির্ভারতে বিশ্বজয়ে বাহির হওয়া দূরে থাকুক, ভারতের সীমা-রেখাটি পর্য্যন্ত অতিক্রম করিলেন না। অবশ্য ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া এই সাধারণ উক্তির দুই চারিটি ব্যতিক্রম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের (খৃঃ ৭৩৩-৬৯) বিজয়-অভিযানের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি তুখার বা তুরস্করাজ্য এবং তিব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু কতখানি স্বীয় রাজ্যরক্ষার অনুরোধে ও কতখানি বিজয়-গৌরব লাভের অভিলাষে তাঁহার এই সমরাভিযান, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কাশ্মীরের ইতিহাস ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র; এবং কাশ্মীর ভারতের এক সীমা-প্রান্তে অবস্থিত ও প্রায় তিন দিকেই বহির্ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যের দ্বারা বেষ্টিত। সুতরাং কাশ্মীররাজ কর্ত্তৃক দুই এক বার বহির্ভারতে যুদ্ধযাত্রা ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাসের ব্যতিক্রম বলিয়াও সঙ্গতরূপে ধরা যায় না। এই গেল স্থল-পথের কথা। জল-পথেও যে ভারতবর্ষ দুই এক বার রাজ্য-বিস্তারের প্রয়াস করে নাই তাহা নয়। এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে তামিল দেশের চোল রাজাদের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তামিল-সম্রাট্ প্রথম রাজেন্দ্র চোলের (খৃঃ ১০১৮-৩৫) নৌবাহিনী বঙ্গ সাগর অতিক্রম করিয়া নিম্ন ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পেগু ও মার্ত্তাবান নামক স্থান দুইটি তামিল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল; আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জও তামিল নৌবাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। তথাপি স্থল-পথেই হোক্ বা জল-পথেই হোক্ ভারতীয় সৈন্যদল কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বাহিরে রাজ্যজয়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই বলিলেই চলে। ভারতীয় রাজারা চিরকালই পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও যুদ্ধ-বিগ্রহে অর্থাৎ আত্ম-কলহেই ব্যাপৃত ছিলেন, এ কথা অনায়াসেই বলা যায়। আমি জানি, এইখানে অনেকেরই মালয়-উপদ্বীপ (বৌদ্ধ মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত), কাম্বোজ (দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বংশোদ্ভব শৈব ধর্ম্ম-মহারাজগণ), বর্ণিও (রাজা মূলবর্ম্মন্), যবদ্বীপ, সুমাত্রা (শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র রাজবংশ), এবং মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ-সমূহের কথা মনে হইবে। সত্য বটে এইসকল স্থানে ভারতীয় হিন্দুরা উপনিবেশ স্থাপন ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিল এবং তথায় নূতন নূতন রাজবংশেরও উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল দেশ কোনও ভারতীয় রাজশক্তির দ্বারা বিজিত হয় নাই; ভারতীয় জনসাধারণ বাণিজ্যের জন্যই হোক্, ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই হোক অথবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক্, ঐসকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং সেই সূত্রেই সে-সকল স্থানে তাহাদের আধিপত্যও স্থাপিত হইয়াছিল। ফলে তথায় নব নব রাজবংশেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এইসকল ঔপনিবেশিক রাজ্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ ভারতীয় ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল; ভারতীয় রাজশক্তির সহিত ইহাদের কোন সংস্রব ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুবর্ণ দ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় নরপতি শ্রীবালপুত্র দেব খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নালন্দায় একটি বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে বাঙ্লার তৎকালীন পাল রাজা দেবপাল উক্ত বিহারবাসী ভিক্ষুসঙ্ঘের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, এইরূপ দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ অতি সামান্য সম্পর্ককে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাহা ছাড়া এইসকল দেশ সভ্যতায় ও শক্তিতে অপেক্ষাকৃত অবনতই ছিল; এবং তথায় উপনিবেশ ও হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ভারতবাসীদের যে খুব বেশী যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ পাই না। সুতরাং এইসমস্ত ঔপনিবেশিক রাজ্য-সমূহকে কিছুতেই দিগ্বিজয়লিপ্সু ভারতীয় রাজ-শক্তির বিজয়-প্রচেষ্টার ফল বলা যাইতে পারে না।

বস্তুত ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বিশেষত্বই এই যে, এখানকার প্রবল প্রতাপশালী সম্রাটগণেরও দিগ্বিজয়

ও রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভের সমস্ত আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম আগাগোড়াই ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের বাহিরেও যে দেশ আছে, সেখানেও যে দিগ্বিজয়, রাজ্যবিস্তার ও সমর-গৌরব লাভ করা যাইতে পারে একথাই কখনও এদেশের নরপতিগণের মনেই উদিত হয় নাই; এই আকাঙ্ক্ষাই কখনও তাহাদের প্রাণে জাগে নাই। কেন জাগে নাই, তাহার অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল। ভারতবর্ষের বিশালতাই যে, এই বিশেষ বিজয়-বিমুখতার একটি প্রধান কারণ তাহা সহজেই বোঝা যায়। স্বদেশেই যখন বিজয়-গৌরব-লিপ্সা চরিতার্থ করিবার যথেষ্ট অবকাশ থাকে, তখন স্বভাবতই বিদেশ-বিজয়ে প্রেরণা থাকে না। ভারতীয় রাজারা ভারতবর্ষেই তাঁহাদের বিজয়-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবার প্রচুর অবসর পাইয়াছিলেন, তাই বিদেশের দিকে সমর-বাহিনী পরিচালনা করিবার দুর্দ্দমনীয় প্রেরণা তাঁহারা কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহাদের এই গৃহপরায়ণতার আর-এক কারণ ভারতবর্ষের অতুল ঐশ্বর্য্য। দেশের সম্পদ্‌রাশিই বৈদেশিক বিজেতার অস্ত্রশক্তিকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করিয়া লয়, এই কথা ভুক্তভোগী ভারতবাসীকে আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কাজেই রত্নগর্ভা ভারতভূমির রাজকীয় বিজয়লিপ্সা যে কখনও কোন বিদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ভারতীয় রাজশক্তির এই আত্মস্থতার তৃতীয় কারণ ভারতবর্ষের সীমা-রক্ষক সুদুর্গম পর্ব্বত-শ্রেণী। যে অভ্রভেদী গিরি-শ্রেণী পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের দ্বাররক্ষকরূপে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই গিরি-শ্রেণীই চিরকাল ভারতবর্ষের বিজয়-কামী ক্ষাত্রশক্তিকে বহির্দ্দেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যেই সংহত করিয়া রাখিয়াছে। চতুর্থ কারণ এই যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় ভারকেন্দ্র অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেশের পূর্ব্ব ভাগে নিবদ্ধ ছিল। উত্তর ভারতে যে কয়টি হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তার কেন্দ্র ছিল হয় পাটলিপুত্রে, না হয় কান্যকুব্জে; পুরুষপুর অর্থাৎ পেশোয়ারের কুষণ সাম্রাজ্যকে যথার্থ হিন্দু সাম্রাজ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। পাটলিপুত্র বা কান্যকুব্জ হইতে ভারতের বহির্ভাগে সাম্রাজ্য বিস্তৃত করা অনায়াসসাধ্য ছিল না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এইসমস্ত কারণও ভারতবর্ষের এই অসাধারণ বহির্বিমুখতার যথোচিত হেতু নির্দ্দেশ করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। চীনদেশ বিশালতায় ও সম্পদ্‌শালিতায় ভারতবর্ষ হইতে হীন নহে এবং মধ্য-এশিয়ার পর্ব্বতসমূহও ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমা-রক্ষক গিরি-শ্রেণী হইতে কম দুর্গম নহে। তথাপি এক সময় চৈনিক রাজ-শক্তি সুদূর কোরিয়া হইতে পারস্য পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল; বর্ত্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত কিপিন বা কপিশাও ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এমন-কি ভারতবর্ষের অন্তর্গত কাশ্মীর, চিত্রাল প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরাও তখন চীন-সম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আর-এক দিকে পারস্য-সম্রাটেরাও এক সময় বাহ্লীক হইতে মিশর দেশের পশ্চিম প্রান্ত, পারস্যোপসাগর হইতে কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম তীর এবং সিন্ধুনদ হইতে গ্রীস্ দেশ, এই বিশাল ভূখণ্ডের উপর রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইসকল ঐতিহাসিক তথ্যের কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, যে দুর্দ্ধর্ষতা ও অমিত পরাক্রম মানুষকে সাগরগিরি লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায় এবং মরুভূমি অতিক্রম করিতেও অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে, সেই দুর্দ্ধর্ষতা ও সেই পরাক্রম বুঝি সুখ-সম্পদের লীলানিকেতন ভারতবর্ষের মাটিতে কখনও উদ্ভূত হয় নাই। যে শৌর্য্য-প্রভাবে মহাবীর হানিবল স্পেন, ফরাসী ও আল্পস্ অতিক্রম করিয়া ইতালিতে বহু বৎসর যাবৎ রোমের অদ্বিতীয় শক্তিকেও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, যে দুর্দ্দম বিজয়াকাঙ্ক্ষা ফিলিপ-তনয় আলেক্‌জাণ্ডারকে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেগে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর ও বিশাল পারস্য-সাম্রাজ্যের উপর দিয়া বিপাশার তীর পর্য্যন্ত ছুটাইয়া আনিয়াছিল, সে শৌর্য্য ও সে বিজয়াকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখিতে পাই না। বস্তুত চীন, পারস্য, রোম বা আরবের মত সাম্রাজ্য গড়িবার প্রতিভা এবং আলেকজাণ্ডার, হানিবল্, নেপোলিয়ানের মত অসাধারণ বীরত্ব ও পরাক্রম

ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষে কখনও বীরত্বের চর্চ্চা হইত না, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। ঋগ্বেদের সংগ্রাম-কাহিনী, মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের বীরত্ব-গাথা, এবং মহাপদ্মনন্দ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন ও পুলকেশী, রাণাপ্রতাপ ও শিবাজীর ইতিহাস স্মরণ করিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু এই বীরত্বের বিশেষত্বই ছিল এই যে, ইহা বরাবরই ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ; ইহা কখনও বিশ্বজগৎকে চমকিত করিয়া দেয় নাই। অর্থাৎ ভারতবর্ষ কখনও আপন বীরত্বের প্রভাবে বিশ্বচেতনার মধ্যে বিস্ময়ের আসন গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই, তাহার কয়েকটি কারণ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমার মনে হয় এই কারণগুলিও যথেষ্ট নহে। ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তির এই বিশ্ব-বিমুখতার প্রধান কারণ বোধ হয় আর্য্য মনোবৃত্তি। ভারতবর্ষের শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়গণের মনে এমনি এক অদ্ভুত আত্মতুষ্টি, আর্য্যত্বের গর্ব্ব বা আত্মাভিমান ছিল, যার ফলে তাহারা স্বভাবতই বিদেশের প্রতি বিমুখ ছিল এবং কখনও কোন বিদেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করে নাই। কারণ যাহাই হোক্, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতীয় রাজশক্তি কখনও বিদেশ-জয়ের উদ্যম করে নাই। এই নিষ্ক্রিয়তার যে কি ফল হইয়াছিল তাহাও আলোচনা করিয়া দেখা দরকার।

ভারতবর্ষ কখনও বিদেশ আক্রমণ করে নাই বলিয়া বিদেশীয়েরা যে ভারতবর্ষকে নিষ্কৃতি দিয়াছিল তাহা নহে। বৈদেশিক বন্যাস্রোতের মুখে খাইবার, বোলান প্রভৃতি গিরিসঙ্কট যে কতবার ভারতবর্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিল, এবং কতবার যে শক-যবন-পহ্লব, হুণ গুর্জ্জর ও তুর্কী মোগলের আবিল স্রোতে ভারতের শ্যামল ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, এ দেশের বৈদেশিক-আক্রমণ-সঙ্কুল ইতিহাস পাঠকের কাছে তাহা অবিদিত নহে।

শিহাবুদ্দিন্ মহম্মদ ঘোরী যে-দিন থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী তরাইন ক্ষেত্রে আজমীর-পতি পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিলেন (খৃঃ ১১৯২), সেই দিন হইতে আমরা সাধারণত ভারতবর্ষের অধীনতার দিন গণনা করিয়া থাকি। মুসলমান-বিজয়ের সময় হইতেই আমাদের পরাধীনতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে এবং সাত শত বৎসরের পর আজও আমাদের সেই অধীনতার অবসান হয় নাই, এসম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা কিছুতেই সত্য নহে যে, মুসলমানের অধীনতাই ভারতবর্ষের প্রথম অধীনতা। মুসলমানের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ বহুবার অল্পাধিক পরিমাণে বৈদেশিকের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। ভারতবর্ষের অধীনতার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে এবং মুসলমান ও ইংরেজের অধীনতার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে প্রাক্-মোস্লেম যুগের অধীনতা সম্বন্ধেও সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

অতি প্রাচীনকালে কোনো সময় অসুর বা আসিরিয়-গণ ও তৎপরে মিদিয়গণ সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত জয় করিয়া লইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক যুগে পারস্যরাজ কুরুষের আক্রমণকেই প্রথম বৈদেশিক আক্রমণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। তৎপর দারয়বৌষ অথবা দরায়ুস (খৃঃ পূঃ ৫২২-৪৮৬) গন্ধার এবং সিন্ধুনদের উপত্যকা, এই দুই প্রদেশ পারস্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং গ্রীক্‌বীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ-সময় পর্য্যন্ত এই প্রদেশ দুইটি পারস্যের অধিকারেই ছিল। তার পর ঘোর দুর্য্যোগের মত ভারতের বক্ষে ছুটিয়া আসিল ম্যাসিডোনিয়ার বিজয়-বাহিনী এবং দুই বৎসরের জন্য (খৃঃ পূঃ ৩২৭-২৫) হিন্দু-কুশের পাদদেশ হইতে বিপাশার তীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ধ্বংসের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই এই আক্রমণের সমস্ত স্মৃতি ভারতের অন্তর হইতে যেন পরম দুঃস্বপ্নের মতোই বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু যে গ্রীক্ একবার ভারতের সম্পদ্-ভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়া গেল, তাহার হৃদয় হইতে দুরাকাঙ্ক্ষার অগ্নিশিখা নিবিয়া গেল না। সে অগ্নিশিখা বার বার ভারতের অভিমুখে লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের বিশ বৎসর পরেই (৩০৫ খৃঃ

পূঃ) সেলুকাস্ ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সসৈন্যে উপস্থিত হইল ; কিন্তু এবার ভারতীয় বীর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের নিকট দুর্দ্ধর্ষ গ্রীক্ শৌর্য্যকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইল। তার প্রায় একশত বৎসর পরেই আবার সুযোগ বুঝিয়া বিজয়-লোলুপ গ্রীক্ অস্ত্র ভারতের প্রতি উদ্যত হইয়া উঠিল। প্রথমেই (২০৭ খৃঃ পূঃ) সিরিয়ার সম্রাট্ এন্টিওকাস্ হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া সুভাগ সেন নামক একজন ভারতীয় নরপতিকে পরাজিত করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হন। আর ঠিক্ এই সময়ই ভারতের ক্ষাত্রশক্তি নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল। কাজেই এন্টিওকাস্ এবার যে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া গেলেন, সেই দ্বার-পথে বৈদেশিক আক্রমণের খরস্রোত দুর্নিবার বেগে ভারতের দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই প্লাবন দীর্ঘ ছয় শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতের সুখ-শান্তিকে অপহরণ করিয়া লইয়াছিল। এই সময়ই ডিমিট্রিওস্, ইউক্রেটাইডিস্ প্রমুখ "যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ" "যুগদোষদুরাচারঃ" দুষ্টবিক্রান্ত যবনেরা সমগ্র উত্তর ভারতকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উত্তর-ভারতের কেন্দ্রবর্ত্তী মধ্যমিকা (চিতোর) এবং সাকেত (অযোধ্যা) ও ইহাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। তার পর ইহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া আসিল শক, পহ্লব, ইউচি-কুষণ, হূন গুর্জ্জর ও তুর্কী। ইহাদের আক্রমণের ইতিহাস ভারতের অতি গভীর বেদনার কাহিনী। সে-বেদনা ভারতবর্ষকে বহু যুগ ধরিয়া পরম ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে হইয়াছিল। সে-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। শুধু এইটুকু মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুলতান মহমুদের আক্রমণ অথবা মোহাম্মদ ঘোরীর ভারত-বিজয়ের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষকে বার বারই বৈদেশিক বাহুবলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল ; বারবারই ভারতবর্ষকে বিজেতার হস্ত হইতে অধীনতার দুঃখ-যন্ত্রণা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পারসীকদের আক্রমণ রাজপুতানার মরুভূমির সীমা-প্রান্তেই ব্যাহত হইয়াছিল ; কিন্তু আলেকজাণ্ডার গ্রীক্‌বাহিনী-সহ বিপাশার পশ্চিম তটে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং সে-স্থান হইতে সিন্ধুনদের মোহনা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশকে অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গ্রীক্‌গণের (ডিমিট্রিওস্, মিনান্দার প্রভৃতি) আক্রমণ কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া দক্ষিণে চিতোর এবং পূর্ব্বে অযোধ্যাকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। তৎপরে শকরা উত্তরাপথে গন্ধার, পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা, মথুরা, মালব ও গুজরাত এবং দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র ও কোঙ্কণ প্রদেশ পর্য্যন্ত করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। আর পশ্চিমে হিন্দুকুশ হইতে পূর্ব্বে গাজিপুর পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ এক সময় কুষণদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, শুধু তাই নয়, অসভ্য বর্ব্বর হূণরাও এক সময় উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মধ্য ভারত পর্য্যন্ত সমগ্রদেশের উপর এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং দেখিতেছি পরাধীনতার দুঃখভোগ ভারতবর্ষের ভাগ্যে নূতন নয় ; পারস্যরাজ কুরুষের (খৃঃ পূঃ ৫৫৮-৫২৯) সময় হইতে গজনীপতি সুলতান মহমুদের (খৃঃ ৯৯৭) সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বহুবার পরাধীনতার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে।

কিন্তু একথা ভুলিলে কিছুতেই চলিবে না যে, দুঃখই দুঃখের শেষ নহে ; দুঃখ মাত্রই অকল্যাণ নহে। দুঃখকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করি তাহার উপরই আমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভর করে। পরাধীন হওয়াটাই তেম্‌নি চরম দুর্গতি নয়। চরম দুর্গতি হয় তখনই, যখন আমরা দুঃখকে সাধনার দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারি না। পরাধীনতাও মৃত্যু বহন করিয়া আনে তখনই, যখন আমরা তাহাকে আমাদের শুভ সাধনার দ্বারা কল্যাণগামী করিয়া লইতে অসমর্থ হই।

এখন দেখা যাক্, ভারতবর্ষ তাহার এই পৌনঃপুনিক পরাজয় ও পরাধীনতাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কখনও দুঃখকে একান্ত করিয়া স্বীকার করে নাই ; ভারতবর্ষ চিরকালই আত্মাকে দুঃখের উপর জয়ী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তাই ভারতবর্ষের অন্তর হইতে এই শাশ্বত-বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল—

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" কল্যাণকৃৎ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। আমরা দেখিতে পাই রাষ্ট্রীয় জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ তার কল্যাণকে কখনও ম্লান হইতে দেয় নাই। কল্যাণ-

সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় পরাজয়কেও অকল্যাণের গ্লানি হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিল। শুধু তাই নয়, অস্ত্রনিপুণ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও ভারতবর্ষ কল্যাণ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একান্ত আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিল। তাই দেখিতে পাই যবন ধর্ম্মদেব, শক ঋষভদত্ত, কুষণ বাসুদেব ভারতবর্ষের কল্যাণ-ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া লইয়া ভারতবর্ষেরই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। তাই দেখিতে পাই, যে "যুগদোষ-দুরাচারঃ" যবনেরা একদিন প্রলয়-শঙ্খ ফুৎকার করিতে করিতে ভারতের সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই যবনেরাই আর-এক দিন শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে মৈত্রীমন্ত্রের উদ্গাতা শাক্য ঋষির মূর্ত্তি নির্ম্মাণে নিবিষ্ট হইয়াছে; তাই বিদিশা নগরের এক প্রান্তে যবন-দূত হেলিওডোরাস্ ভক্তিনম্র হৃদয়ে স্বীয় উপাস্য দেবতা ভগবান্ বাসুদেবের উদ্দেশ্যে গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছে এবং "দমত্যাগোঽপ্রমাদঃ" ভারতের এই মহামন্ত্রকেই সত্যধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। যে দুর্দ্দান্ত শকগণের প্রবল সংঘাতে একদিন উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসন প্রকম্পিত হইয়াছিল, আর-এক দিন সেই শকরাই ভারতীয় ধর্ম্ম-প্রতিভার নিকট মস্তক অবনত করিয়া ভারতের কল্যাণ-কর্ম্মে অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই মহাক্ষত্রপ রাজুলের পত্নী "নন্দসি অকসা" ভগবান্ শাক্যমুনির উদ্দেশ্যে স্তূপ এবং সর্ব্বাস্তিবাদী সঙ্ঘের জন্য বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন; দীনীকপুত্র নহপান-জামাতা শক উসবদাত (ঋষভদত্ত) ব্রাহ্মণদিগকে গো-সুবর্ণ দান করিতেছেন, তীর্থস্থানে আশ্রয়শালা এবং পথিকদের জন্য "আরাম তড়াগ-উদপান" নির্ম্মাণ করাইতেছেন। সেইজন্যই যখন দেখা যায়, ম্লেচ্ছ কুষণরাজ কণিষ্ক নাগার্জ্জুন, অশ্বঘোষ, বসুমিত্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য্যদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন ও সমগ্র বৌদ্ধ জগতের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া বৌদ্ধ মহাসঙ্গীত আহ্বান করিতেছেন, তখন আমরা বিস্ময় প্রকাশ করি না। এইরূপে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দ্বারা বিজেতাকেও জয় করিয়া লইয়াছিল। যে বিজেতৃগণ ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তিকে পরাভূত করিয়া ভারতবর্ষকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতে ত্রুটি করে নাই, সেই বিজেতৃগণই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সহিত ভারতের ধর্ম্মশক্তির নিকট বিজয়গর্ব্বকে অবলম্বিত করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এইরূপে ভারতবর্ষ কল্যাণ-ধর্ম্ম দ্বারা বহু পরাজয় ও পরাধীনতার মধ্যেও নিজেকে গ্লানি ও দুর্গতি হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিল। শুধু তাই নয়, এইরূপেই ভারতবর্ষ ধর্ম্মবিজয়ের দ্বারা অস্ত্রবিজয়ের গৌরবকে ম্লান করিয়া দিয়া বিজেতাকেও জয় করিয়া লইয়াছিল। ইহাই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব, ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের শিক্ষা।

যে-সময় ভারতবর্ষের ক্ষাত্রশক্তি সফলতার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল, যে-সময় ভারতবর্ষের বাহুবলের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া গ্রীক্‌বীর সেলুকাস্‌কেও হিন্দুকুশের অপর পারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল এবং যে-সময় গন্ধার হইতে তাম্রলিপ্তি এবং হিমাচল হইতে কৃষ্ণা পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ পাটলিপুত্রের রাজসিংহাসনতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সে-সময় অকস্মাৎ ভারতবর্ষের সৈন্যাবাস-সমূহে বিজয়-ভেরী নীরব হইয়া গেল, রণ-তুরঙ্গের হ্রেষাধ্বনি দিগন্তের বাতাসে মিলাইয়া গেল। সেদিন ভারতের ঋষি সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোক জয়স্কন্ধাবার পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শাক্যমুনির ধর্ম্মসঙ্ঘে আশ্রয় লইয়া বজ্রকণ্ঠে দিকে দিকে ঘোষণা করিলেন—

"এষে চ মুখমুতে বিজয়ে দেবানাং প্রিয়স যো ধ্রমাবিজয়ো।"

অর্থাৎ অস্ত্রের দ্বারা যে বিজয়লাভ তাহা অতি তুচ্ছ, ধর্ম্মের দ্বারা যে-বিজয় সেই বিজয়ই শ্রেষ্ঠ বিজয়। যেদিন এই মহাবাণী উদ্ঘোষিত হইল সেইদিন হইতে ভারতের ইতিহাসে এক মহান্ যুগান্তর উপস্থিত হইল। সেইদিন হইতে ভারতের নগরে প্রান্তরে "ভেরী-ঘোষ" সংগ্রামবার্ত্তা রটনা না করিয়া ধর্ম্মবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। সেইদিন হইতে ভারতের দূতগণ ছুটিয়া চলিল দেশে বিদেশে সমরঘোষণা লইয়া নহে, ধর্ম্মের বাণী শান্তির বাণী লইয়া। তাহারা গেল সমস্ত দেশে "ছয় শত যোজন দূরে" গেল সিরিয়ায়, মিশরে, সাইরিনিতে, এপিরাসে মৈত্রীর বাণী লইয়া; তাহারা চোল, চের, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র ও তাম্রপর্ণিতে (সিংহল) আর গেল সুবর্ণভূমিতে (ব্রহ্মদেশ)। সেইদিন হইতে

ভারতের নেশা ধরিয়া গেল ধর্ম্মবিজয়ে—; সেই নেশায় ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়া জয় করিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছে। নেশা ধরিল কেন? কারণ, ভারতের সেই রাজর্ষি বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্ অশোক বলিয়াছেন, "যো চ লধে এতকেন হোতি সবতা বিজয়ে পিতিলসে সে; লধা সা হোতি পিতি ধম্মবিজয়যি।" অর্থাৎ এই যে বিশ্ববিজয়ের প্রেরণা তার মূলে রহিয়াছে প্রীতি-রস, আর এই প্রীতি লাভ হয় ঐ ধর্ম্ম-বিজয়ের দ্বারাই। এই যে "প্রীতি-রসের" নেশা, এই যে মৈত্রীলাভের দুর্নিবার কামনা, তাহারই তাড়নায় ভারতবর্ষ বিশ্বজয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। আর রাজর্ষি অশোকের অনুপ্রাণনায় ভারতবর্ষ একবার যে প্রীতি-রসের স্বাদ পাইল সমগ্র এশিয়া জয় করিয়া তবে তাহার এই স্বাদ-লিপ্সা চরিতার্থ হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষ কখনও বহির্ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে প্রয়াস করে নাই; ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস খুঁজিয়াও এমন একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, সাম্রাজ্যের তৃষ্ণায় কোনো ভারতীয় নরপতি সৈন্য-বাহিনী লইয়া ভারতের বাহিরে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মের দ্বারা বিশ্ববিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ভারতবর্ষের চিত্তকে কখনই পরিত্যাগ করে নাই; একটা বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপনের বৃহৎ কামনা ভারতবর্ষের অন্তরে চির-জাগরূক হইয়া বিদ্যমান ছিল।

তাই দেখিতে পাই, যে-সময় শক পহ্লবী কুষণ হূণরা দস্যুদলের মত পুনঃ পুনঃ আসিয়া ভারতের দ্বারে করাঘাত করিতেছে, ঠিক সেই সময়ই অপর দ্বার দিয়া ভারতের সাধকগণ বিশ্ববিজয়ে বাহির হইতেছেন। যে-সময় বৈদেশিক আক্রমণকারীদের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময়ই ভারতের ধর্ম্মবাণীর উদ্‌গাতারা ধর্ম্মের বিজয়-কেতন উড়াইয়া বিশ্বজয়-যাত্রায় অগ্রসর হইয়াছেন। যে-সময় যুযুৎসু সৈনিকগণের সংগ্রাম-কোলাহলে ভারতের গগন মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল, মুমূর্ষু যোদ্ধার রক্ত-স্রোতে ভারতের মাটি প্লাবিত হইতেছিল এবং দারুণ রাষ্ট্র-বিপ্লবে দেশে প্রলয়-সূচনা হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ই ভারতবর্ষ এশিয়ার ধর্ম্ম ক্ষেত্র বা তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল; এবং বিদেশগামী ভারতীয় সাধক ও ভারত-গামী বৈদেশিক তীর্থযাত্রীদের পাদস্পর্শে বিশ্ব-মৈত্রীর পথ প্রশস্ত হইতেছিল। এইরূপে চীন, জাপান, তিব্বত, কোরিয়া, শ্যাম-কাম্বোজ, বলী-সুমাত্রা, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ ও মধ্য এশিয়ায় ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের সভ্যতা চির প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের সহিত, মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রহিল। এমন-কি, যে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুরা ভারতবর্ষকে শুধু অস্ত্রাঘাতই করিয়াছিল, ভারতবর্ষ তাহাদিগকেও ধর্ম্মদানের দ্বারা আপন করিয়া লইল। কারণ ভারতের সেই ধর্ম্মবিজয়ী ঋষি-সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোক ভারতবর্ষকে বলিয়াছিলেন—

"নাস্তি এতারিসং দানং যারিসং ধংমদানং * * ধংমসম্বন্ধো বা" অর্থাৎ ধর্ম্মদানের ন্যায় দান আর নাই, ধর্ম্ম সম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধ আর নাই। ভারতবর্ষ তাহার শ্রেষ্ঠ সম্রাটের এই মহাবাণী ভুলিতে পারে নাই। তাই শত্রুকেও অস্ত্রাঘাতের বিনিময়েও ধর্ম্ম দান করাই তাহার সাধনার অঙ্গ এবং বিশ্বের সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করাই ছিল তাহার আদর্শ। তাই সমগ্র এশিয়া একদিন ভারতবর্ষকে পরম আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল; সেই মৈত্রীকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্যই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান, হিউএন্থসাঙ, ইৎসিঙ; আর ভারত হইতে গিয়াছিল কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষ, কুমারজীব ও গুণবর্ম্মন, পরমার্থ ও দীপঙ্কর। আর ভারতের ঐ ধর্ম্মদানের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষেরই সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল আমাদের বৈদেশিক শত্রু মীনান্দার ও হেলিওডোরাস, কণিষ্ক ও বাসুদেব, উষবদাত ও রুদ্রদামন্।

এই "ধর্ম্মদান" ও "ধর্ম্মসম্বন্ধের' ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষ বহু দিন পরাজয়কেও জয়ে পরিণত করিতে পারিয়াছিল, বিজয়োল্লাসকেও লজ্জিত করিয়া দিয়াছিল এবং অধীনতার মধ্যেও কল্যাণকে গ্লানিমুক্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কিন্তু তার পর একদিন আসিল যখন ভারতবর্ষের অন্তরে কলুষ প্রবিষ্ট হইল, ভারতবর্ষ তাহার উচ্চ আদর্শ

হইতে ভ্রষ্ট হইল এবং তাহার শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ মহর্ষি অশোকের বাণী বিস্মরণের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। সেই-দিন হইতে পরাজয় ও পরাধীনতা ভারতবর্ষে দুর্গতিকেই বহন করিয়া আনিয়াছে; তখন হইতেই আমাদের দুঃখ-দুর্ভাগ্য একান্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। যে আত্মার শক্তিতে ভারতবর্ষ একদিন দুঃখ-দুর্ভাগ্যকেও কল্যাণপ্রদ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল, ভারতবর্ষ আর-এক দিন সেই শক্তিকেই হারাইয়া বসিল। তাই তাহার নিজের সামাজিক বিধানও উদ্বন্ধনের নিগড়রূপেই আত্ম-প্রকাশ করিল; তাহার ধর্ম্মবিধান তাহাকে অধর্ম্মের অন্ধকারের দিকেই পথ নির্দ্দেশ করিল; এবং সেইজন্যই বৈদেশিক বিজেতার বিজয়ধ্বনি ভারতবর্ষের পথে প্রান্তরে মৃত্যুর প্রলয়-শঙ্খের মতই শোনা গেল। তাই মহম্মদ বিন্ কাশিম, সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, মহম্মদ খিলজি প্রভৃতির ভারত-বিজয়-কাহিনী আমাদের জন্য এত লজ্জা, এত অপমান ও এত লাঞ্ছনা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যেদিন এইসব বিজেতা ভারতবর্ষে দেখা দিল, সেদিন ভারত-বর্ষের আত্মা হীনবল, তাহার বাণী বিস্মৃত ও তাহার আদর্শ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। তাই সেদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যথার্থ "ধর্ম্ম-সম্বন্ধ" স্থাপিত হইতে পারে নাই এবং সেইজন্যই এই উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে এতখানি বেদনা ও এতখানি অপমান নিহিত ছিল।

আজও আমাদের সেই বেদনা ও সেই অপমানের অবসান হয় নাই। কারণ আমাদের মধ্যে এখন আর সেই "ধর্ম্মের দীপনা" নাই; সেই ধর্ম্মদান ও ধর্ম্মবিজয়ের আকাঙ্ক্ষা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা আজ নিজেদের মধ্যেই যথার্থ ধর্ম্ম-সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আর সেইজন্যই ভারতবর্ষের যাহা প্রকৃত স্বারাজ্য তাহাও আজ আমাদের কাছে দুর্ল্লভ হইয়াই রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ যে বৈদেশিকের পশুশক্তি বা অস্ত্রশক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে ইহাই দুঃখের বিষয় নহে। ভারতবর্ষ যে অস্ত্রশক্তির উপরেও আত্মার শক্তিকে জয়ী করিয়া রাখিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাই দুঃখের বিষয়। বাহির হইতে যে অধীনতা আমাদের উপর চাপিয়া বসিয়াছে তাহাই আমাদের অন্তরকে ব্যথিত করিতেছে না। আমাদের বেদনার মূল কারণ, আমরা আর আমাদের চিত্তের স্বাধীনতা দ্বারা বাহিরের গ্লানিকে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না, বাহিরের অধীনতাকে চিত্তের প্রবল অস্বীকারের দ্বারা বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারিতেছি না। আমাদের আত্মা বলহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাই বাহিরের অধীনতাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। আমরা আজ পরের হাত হইতে অধীনতাকে পাইয়াছি, ইহাই সত্য কথা নহে। সত্য কথা এই যে, আজ আমরা আমাদের অন্তর হইতে যথার্থ স্বাধীনতাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, আমরা আজ আমাদের মহামুক্তির বাণীকেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি।

ভারতবর্ষকে আবার স্বাধীনতা লাভ করিতেই হইবে। কিন্তু কেবল অন্ধ আক্রোশে বাহিরের নিগড়-টাকে আঘাত করিতে থাকাই সে স্বাধীনতা-লাভের প্রশস্ত উপায় নহে। চিত্তকে মুক্তি দান করাই বাহ্য মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ, অধীনতা মাত্রই মোহ বা মায়া। আর আঘাতের দ্বারাই মায়ার বন্ধন ছেদন করা যায় না, সে বন্ধন ছেদন করার একমাত্র অস্ত্র জ্ঞান, চিত্তের উদ্বোধন। আমরা যদি আজ অন্তরের ভিতর হইতে স্বাধীনতাকে লাভ করিবার সাধনা না করিয়া পরাধীনতাকে দূর করিবার তীব্র কামনায় কেবল পরকে আঘাত করিতে থাকি, তবে বাহিরের নিগড় যতই ছিন্ন হোক না কেন আমরা উর্ণনাভের মত বারে বারেই আমাদের বন্ধনজাল নিজেরাই রচনা করিতে থাকিব।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

(২)

গৃহকর্ত্রী হৈমবতী সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, সম্ভ্রান্ত ঘরেরই বধূ। তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর বৃহৎ পরিবার ছিল ; তাহাদের চাল-চলন সমস্তই সনাতন কালের। এই পরিবারে শৈশব উত্তীর্ণ হইয়াই তাঁহাকে পা দিতে হইয়াছিল। বহু দুঃখবেদনার স্মৃতি বহু অপমান ও গঞ্জনার ব্যথা তাঁহার সে-পরিবারের সহিত জড়িত। সে-সকল বেদনা ও ব্যথা যে কেবল তাঁহার আত্ম-মর্য্যাদা ও অহমিকাতেই ঘা দিয়াছিল তাহা নয়, তাঁহার মাতৃস্নেহের উৎস মূলেও নির্ম্মম আঘাত করিয়াছিল। অল্পবয়সেই হৈমবতী তিনটি সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। কিন্তু সূতিকা-গৃহের অত্যাচারে এক মাস বয়স না হইতেই দুইটি শিশুই তাঁহার কোল শূন্য করিয়া বিদায় লইয়াছিল। হৈমবতী তখন গৃহের বধূ মাত্র ; ছেলে দুটি যাওয়াতে তাঁহার মনে সূতিকাগৃহের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ জাগিয়াছিল অভিভাবিকাদের নিকট তাহা তাঁহার প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল না। তবু মাতৃস্নেহের বশে সে-কথা না বলিয়া তিনি পারেন নাই। শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠারা বধূর এই লজ্জাহীনতা ও অকাল-পক্কতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। বেহায়া বৌএর ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিদান দিতেও তাঁহারা ছাড়েন নাই। তবু হৈমবতীর তৃতীয় সন্তান সকল আচার ও অত্যাচারের হাত এড়াইয়া কোনো প্রকারে বাঁচিয়া উঠিল। সকলে বলিল, "মেয়ে সন্তান যমের অরুচি, ও ত বাঁচবেই।" দুইটি সন্তান হারাইয়া যাহাকে পাইয়াছিলেন স্বভাবতই তাহার উপর হৈমবতীর ক্ষুধিত ও বঞ্চিত মাতৃস্নেহের সমস্ত উচ্ছ্বাস গিয়া পড়িল। বাড়ীর লোকের চোখে ইহা অসহ্য ঠেকিত। "একটা কালো রোগা মেয়ে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কিসের ? তার ওষুধ রে পথ্যি রে জামা রে কাপড় রে, একটা না একটা লেগেই আছে।"

মেয়েটি অত্যন্ত দুর্ব্বল ক্ষীণজীবী ছিল, কিন্তু এই-সব বাক্যজ্বালার ভয়ে হৈমবতী একদিনের জন্যও প্রাণ খুলিয়া তাহার যত্ন-আদর করিতে পারেন নাই। যতটা মন চাহিত তাহার অর্দ্ধেক করিবার আগেই ভয়ে লজ্জায় ও বাক্যবর্ষণের চোটে তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইত। মেয়েকে বুকে চাপিয়া তিনি তাঁহার সন্তান-সেবার সকল ত্রুটির জন্য যেন তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতেন। কিন্তু সে মেয়েও মার দুঃখ বুঝিয়া বেশীদিন বাঁচিল না। আট নয় বৎসর বয়স হইতেই মাতার কোল চিরশূন্য করিয়া দিয়া সেও একদিন তাহার ভাইদের পথে চলিয়া গেল। কিন্তু মার বুকে তীব্র অনুশোচনার একটা জ্বালা রাখিয়া গেল। স্বামীর অর্থ ছিল, ক্ষমতা ছিল, তবু যে হৈমবতী কন্যাকে বাঁচাইবার জন্য প্রায় কোনো চেষ্টাই করিতে পারেন নাই, ইহাকে তিনি আপনার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ বলিয়াই ধরিয়া লইলেন। তাঁহার এই বিশ্বাস ক্রমশ তাঁহার স্বামীর মনেও সংক্রামিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীকে লইয়া তিনি বাড়ী ছাড়িয়া গেলেন। কোথা হইতে পরের একটি মেয়ে ঘরে আনিয়া জুটাইলেন। মেয়েটির যত্ন-আদরের যে ঘটা পড়িয়া গেল বাঙ্গালীর কোনো মেয়ের ভাগ্যে ইতিপূর্ব্বে তেমন জুটিয়াছিল কি না সন্দেহ।

আপনাদের অজ্ঞাতে এমনি করিয়া তাঁহারা কন্যা পালনের যেন ব্রত লইয়াই বসিলেন। কোথায় কাহার মেয়ের মা মরিয়াছে, হৈমবতীর স্বামী তাহাকে কুড়াইয়া আনিলেন—আমার স্ত্রী মেয়ে বড় ভালবাসেন! কোথায় কাহার মেয়ের সমাজে স্থান মিলিল না, হৈমবতী বলিলেন, "আহা থাক্, ও আমার মেয়েই হ'য়ে থাক্।" দিনে দিনে কন্যাহীনার শূন্যগৃহ কন্যায় কন্যায় ছাইয়া গেল।

কিন্তু মানুষের সামর্থ্যের ত একটা সীমা আছে। স্বামী-

স্ত্রীর দৈহিক ও আর্থিক শক্তিতে যখন আর কুলাইল না, তখন তাঁহারা তাঁহাদের খেয়ালের খেলায় একটা গণ্ডী টানিতে বাধ্য হইলেন। মানুষ কিন্তু তাঁহাদের সহজে নিষ্কৃতি দিল না। হৈমবতীর প্রাণঢালা সেবা-যত্নে মাতৃক্রোড়চ্যুতা এই মেয়েগুলি মায়ের অভাব কোনো দিন বোঝে নাই। লোক-সমাজে তাহারা যেন ক্রমে হৈমবতীর গুণপনার জীবন্ত প্রশংসাপত্র হইয়া উঠিল। মেয়ে লইয়া যে যেখানে যে-কারণে অসুবিধায় পড়ে সেই তাঁহার শরণ লইতে চায়। অর্থ দিয়াও লোকে তাঁহার কাছে মেয়ে রাখিয়া যাইতে লাগিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর এই কন্যাআশ্রমই তাঁহার জীবনের অবলম্বন হইল। জীবনে তিনি বহু দুঃখ পাইয়াছিলেন, নারীজন্ম লাভের জন্যই। তাই মেয়েদের দুঃখমুক্তির পথের পাথেয় যোগাইতে যথাসাধ্য করাই হইল এখন তাঁহার একমাত্র ব্রত। বয়স হইয়া গিয়াছিল বলিয়া শিশুকন্যাদের পালন করার ভার আর তিনি লইতেন না। এখন তাঁহার আশ্রমে আসিত সেই মেয়েরা জীবন-সংগ্রামে যাহারা সহায়হীন হইয়া যুঝিবার শক্তি পাইতেছে না।

নানা ঘূর্ণীর ভিতর দিয়া ঘুরিয়া গৌরীও একদিন এইখানেই আসিয়া জুটিল। প্রথম যখন শঙ্কর তাহার শিক্ষাদীক্ষার ভার লইয়া দেখিল, সংসারের মাঝখানে থাকিয়া কেবল দিনে একবার শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়িয়া গৌরীর কোনো লাভই হইতেছে না, তখন সে বলিল, "গৌরী, তুই ইস্কুলে পড়বি চল্। এই পঞ্চাশ জন মানুষের মাঝখানে একলা তোর কিছু হওয়া শক্ত। বাড়ীতে যতগুলি মেয়ে আছে তার মধ্যে একজনও ত এসবের ধার ধারে না; তুই মাঝ থেকে কিছু করতে গেলে নিজেও অনভ্যাসের লজ্জায় পেরে উঠ্‌বি না, পরেও ঠাট্টা করবে। তা ছাড়া এখানে তোর সুবিধা ও অসুবিধা কেউ বুঝ্‌বে না, এমন-কি তুই নিজেও না। মানুষ হ'তে হ'লে আর যারা সে-পথে চল্‌ছে তাদের সঙ্গে একটু যোগ রাখা দরকার।"

গৌরী বলিল, "হ্যাঁ, তা আমি বেশ বুঝি। এখানে ত আমার সকল কাজের উৎসাহ-দাত্রীটি দিনে একবার এসে আমায় পাখীপড়া পড়িয়ে যান। অর্দ্ধেক জিনিষ ত তিনি নিজেই বোঝেন না। ওঁকে দেখ্‌লেই আমার সমস্ত উৎসাহ উবে যায়। ওঁর অপরাধই বা কি? একটা মানুষের ত আর সব শক্তি থাকে না।"

বাড়ীর অনেকের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শঙ্কর ও হরিকেশব জোর করিয়াই গৌরীকে একটা বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তাহার নিরীহ শিক্ষয়িত্রীর কাজটা হাত-ছাড়া হইয়া যাওয়াতে তিনি বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। দুই তিন দিন ধরিয়া বাড়ী বসিয়া সব বইগুলি ব্যাখ্যা পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন তিনি পড়াইতে কোনো খানে ভুল করেন নাই। বুঝিলেন না তবু তাঁহার এ শাস্তি কেন?

গৌরী এতবড় বিদ্যালয় ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই ইস্কুলটা তাহার মনে বেশ একটা স্থায়ী ও গভীর রকম ছাপ আঁকিয়া দিল। ইস্কুল বলিতে তাহার মনে অতি শৈশবের যে অস্পষ্ট স্মৃতিটুকু ছিল, সে দেখিল ইহার সহিত তাহার মিল খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত তাহার বিবাহের পূর্ব্বে ছয় সাত বৎসর বয়সের সময় বাড়ীর কাছেই একটা বিদ্যালয়ে মাসে চার আনা মাহিনা দিয়া সে পড়িতে যাইত। রোজ দশটার সময় ময়লা কাপড়-পরা একটা ঝি তাহাদের উঠানে আসিয়া "ও গৌরী ইস্কুলে চল্‌সে" বলিয়া ডাক দিত। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বই শ্লেট হাতে নোলক মাকড়ী মলপরা সিঁথি তুলিয়া ঝুঁটিবাঁধা ছোপানো ও কোঁচানো শাড়ী পরা খালিপায় কতকগুলি ছোট ছোট মেয়েও উঠানে ঢুকিয়া পড়িত। গৌরী তাহাদের সহিত তাহাদেরই মত বেশভূষা করিয়া ইস্কুলে যাইত। সে ইস্কুলে একখানিমাত্র ঘরে চার পাঁচটি ক্লাশ হইত। একজন বিধবা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তিনি একলাই সব ক্লাশের মেয়েদের পড়াইতেন। এক ক্লাশের মেয়েদের সেলাই কিম্বা অঙ্ক কিম্বা হাতের লেখা করিতে দিয়া তিনি অন্য ক্লাশে চলিয়া যাইতেন। যেন সব কটা মেয়েকে কোনো রকমে খানিক বসাইয়া রাখাই যথেষ্ট। সেখানে ঘণ্টা বিভাগের কোনো বালাই ছিল না। ছোট ছোট মেয়েরা যদি নিতান্তই গোলমাল করিত ত উপরের ক্লাশ হইতে

একটি ১১।১২ বছরের মেয়েকে তাহাদের শান্ত করিয়া পাঠে মনোযোগী করিতে পাঠাইতে হইত। গুরুমা সময় মত তাহার পাঠটা পরে লইতেন।

এখানে আসিয়া গৌরীর মনের শৈশবের সে ইস্কুলের স্মৃতি লজ্জায় যেন কোথায় লুকাইয়া গেল। সকাল হইতে মস্ত মস্ত পাঁচ ছয় খানা গাড়ী মেয়ে বোঝাই করিয়া ক্রমাগত যাওয়া-আসা করিতেছে; তিন চার খানা বাড়ী জুড়িয়া দুইতিন শ মেয়ে ঘরে ঘরে পনের ষোল জন শিক্ষয়িত্রীর কাছে কত রকম বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে; কোথাও গান হইতেছে, কোথাও ড্রিল হইতেছে। মস্ত মস্ত ঘণ্টা দিনে পাঁচ সাত বার বাড়ী কাঁপাইয়া বাজিয়া উঠিতেছে, এত অর্থ ও শক্তির সমবায়ে এত বিরাট আয়োজন! না জানি এখানকার মেয়েরা কি আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতীই হইয়া উঠে! গৌরী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবিও ফুটিয়া উঠিল। মনটা আনন্দে নৃত্য করিয়া বলিল, "আমার জীবন আজ হইতে সার্থক হইতে চলিল।"

সে দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইল যে,ইস্কুলে পড়িতে আসার পক্ষে তাহার বয়সটা কিছু আশ্চর্য্য রকম বেশী নয়। তাহার চেয়ে অনেক বড় মেয়েরাও এখানে আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া নেহাৎ ছেলে মানুষের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। যে-বয়সের মেয়েদের সে বাড়ীতে দুই তিন ছেলের মা হইতে দেখিয়াছে তাহারাও যে এমন শিশুর মত হাসিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতে পারে গৌরী তাহা কোনোদিন ভাবে নাই। দেখিয়া তাহার মনের অকাল বার্দ্ধক্যটাও যেন খসিয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

ইস্কুলের যাহারা শিক্ষয়িত্রী তাহাদের অধিকাংশেরই বয়স অল্প হইলেও গৌরীর চক্ষে তাহা অসম্ভব রকম বেশী ঠেকিতে লাগিল। দুইচার জন ত সত্যসত্যই তাহার মায়ের বয়সী। এত বয়সেও যে মেয়েমানুষ অবিবাহিত থাকিয়া লেখাপড়ার চর্চ্চা ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে এরকম ধারণা গৌরী স্বপ্নেও করিতে পারিত না। সে পিতার মুখে শুনিয়া বলিয়াছিল বটে যে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবে। কিন্তু গৃহসংসারের বাহিরে এমন একেবারে সম্পূর্ণ নিজের হাতে নিজের সমস্ত ভার লইয়া যে মেয়েরা কখনও থাকিতে পারে তাহা গৌরীর কল্পনার অতীত ছিল। তাহার কল্পিত আত্মনির্ভর ও এই আত্মনির্ভরে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহা সে দুই চার দিন দেখিয়াই বুঝিল। পুরুষের সাহায্য একেবারে না লইয়াও যে স্ত্রীলোক স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে বাঁচিয়া থাকিতে পারে দেখিয়া গৌরীর মন হইতে দুর্ভাবনার একটা বোঝা নামিয়া গেল। কেমন একটা গর্ব্বে মনটা ভরিয়া উঠিল।

প্রথম পরিচয়ে বিদ্যালয়ের যে আশ্চর্য্য সুন্দর ও মহান্ রূপ গৌরী দেখিল তাহা তাহার নিজের চোখের দৃষ্টির গুণ হইলেও তাহাই তাহার নূতন জীবন-পথের একটা উজ্জ্বল আলোক-স্বরূপ হইয়া জ্বলিতে লাগিল। এ আলোকে সে তাহার গন্তব্য স্থানে অনায়াসেই পৌছিবে ভাবিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল। ইস্কুলের অন্যান্য মেয়ের মত খাওয়াদাওয়া হাসি-খেলার সঙ্গে পড়াশুনাকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া সে দেখিতে পারিল না। ইহা তাহার কাছে একটা ব্রত হইয়া দাঁড়াইল, গুরুবাক্য তাহার বেদ-বাক্য হইয়া উঠিল।

সে বাড়ী আসিয়া শঙ্করকে বলিত, "দাদা, এক-একটা ক্লাশে এক বছর ক'রে কেন থাকতে হয়? যে যেমন তাড়াতাড়ি পারে, তা'কে তেমন ক'রে এগিয়ে যেতে দেয় না কেন?"

শঙ্কর বলিত, "তাতে তোর লাভটা কি হ'বে?"

গৌরী উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিত, "না হ'লে আমি সকলকে দেখাব কি ক'রে যে আমিও নিজের সব ভার নিজে নিতে পারি? বড় যে দেরী হ'য়ে যাবে। তুমি জান না ত, আমাদের ইস্কুলের হেমনলিনী দিদি আর তাঁর বোন দু'জনে মিলে কত রোজগার করেন? তাঁরা একখানা বাড়ীই ক'রে দিয়েছেন নিজেদের মাকে। অবিশ্যি তাঁর বোন ডাক্তার ব'লে বেশী রোজগার করেন। তাঁর আবার গাড়ী আছে, তা ছাড়া ভাইকে বিলেত পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের বাড়ীতে একজনও পুরুষ মানুষ নেই। কি আশ্চর্য্য বল ত।"

শঙ্কর বলিত, "হ্যাঁ, আশ্চর্য্যি বটে! তাই বুঝি তোরও

সখ হয়েছে আমাকে বিলেত পাঠাবার! আচ্ছা তা না হয় কিছুদিন পরেই পাঠাস্। আমি বেশী বুড়ো হ'য়ে যাব না।"

কিন্তু গৌরীর নিজের উৎসাহ যতখানি বাড়িয়া যাইতেছিল, আর সকলের কাছে সেই পরিমাণ উৎসাহ ত সে পাইলই না, বরং নানাদিক্ দিয়া বাধা পাইতে লাগিল। সে পিতামাতার আদরিণী কন্যা হইলেও বাড়ীর বড় মেয়েদের মধ্যে সেই একমাত্র নির্ঝঞ্ঝাট; কাজেই সংসারে সকলেই তাহার কাছে একটু সাহায্যপ্রার্থী ছিল। যখন এ ভাবিত, 'আমার ছেলেটা একবার ধর্‌লে বাঁচি', সে ভাবিত, 'আমার সেলাইটা একটু শেষ ক'রে দিলে কাল কাজে লাগে', আর একজন ভাবিত, 'ভাঁড়ারটা একহাতে গোছাচ্ছি একটু এসে হাতও দেয় না', তখন গৌরী বই খাতা লইয়া ঘরের কোণে গিয়া লুকাইলে সকলেই বিরক্ত হইত। নরম করিয়া হইলেও দুইচার কথা শুনাইতে তাহারা ছাড়িত না। বলিত, "বাবা, আমরা উদয়াস্ত সংসারে হিম্ সিম্ খেয়ে ম'রে গেলাম, তুই বেশ আছিস্; বিবিটি সেজে ইস্কুলে গেলি, আবার বাড়ী এসেই নিজের বই মুখে দিয়ে বসলি। শাশুড়ী-ননদের ভয় ত নেই যে কারুর মুখ চেয়ে চল্‌তে হ'বে।"

গৌরীর এই সাধনাকে যে সকলে বিবিয়ানার রূপান্তর মাত্র ভাবিত, ইহাতে অপমানে ও বেদনায় তাহার মনটা একেবারে মুসড়াইয়া যাইত। সে আগের তুলনায় বেশভূষা অনেক কমই করিত, কিন্তু প্রতিদিনই ইস্কুল যাইতে হইত বলিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হইলে চলিত না। তাছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদের যে অঙ্গগুলি ভদ্রবেশের নামে চলিত, সেগুলির কোনোটি বাদ দিয়াই বা ইস্কুলে যায় কি করিয়া? তবু সকলের কথায় দুঃখ পাইয়া সে যথাসাধ্য বাহুল্যবর্জ্জিত পোষাক করিয়াই ইস্কুল যাওয়া সুরু করিল। প্রথম দুই একদিন কেহ কিছু বলিত না; কিন্তু শিক্ষয়িত্রী ছাত্রী সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি যে তাহার উপর আসিয়া পড়িত ইহা বুঝিতে গৌরীর দেরী হইত না; সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। শেষে একদিন একজন মেয়ে তাহাকে ডাকিয়াই বলিল, "দেখ ভাই, তুমি আগে কখনও ইস্কুলে পড়নি, তাই তোমায় ব'লে দিচ্ছি। তোমার মত বড় মেয়েদের এরকম ক'রে ইস্কুলে আসা ভাল দেখায় না। লোকের সাম্‌নে দিয়ে রাস্তায় গাড়ীতে ওঠ, এখানে এত লোকজনের মধ্যে আস, আমাদের মত কাপড়চোপড় তোমার পরা উচিত।"

গৌরীর যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল। সে অন্য মেয়েদের মতই পোষাক-পরিচ্ছদ ধরিল। বাড়ীতে সকলেই বলিতে লাগিল, "গৌরী ইস্কুলে পড়্‌তে গিয়ে দিনকার দিন মেম হ'য়ে উঠ্‌ছে।"

গৌরী নয়টার সময় ইস্কুল যাইত, পাঁচটায় বাড়ী ফিরিত। এই দীর্ঘকালটার ভিতর জলস্পর্শও তাহার করা হইত না। মা সঙ্গে খাবার দিতে চাহিলে ঠাকুরমা পিসিমা বাধা দিতেন। "ইস্কুলের ঝিগুলো খিরিষ্টান; তাদের জল খাইয়ে আর অধর্ম্মের ভার বাড়িও না।" গৌরী কিছু বলিত না; কারণ আজকাল সে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সকল বিচার মানিয়াই চলিত।

ইস্কুলে যে সেলাই শিখাইত, সে ছিল মুসলমান দরজি। "একে পুরুষমানুষ তাতে মুসলমান-এর কাছে বিধবা মেয়ে সেলাই শিখবে?" ঠাকুরমা গেলেন ক্ষেপিয়া। নানা গোলমালে ইস্কুলে গিয়া পড়াশুনা করা গৌরীর দায় হইয়া উঠিল।

গৌরী বলিল, "আমি বোর্ডিংএ গিয়ে থাকব; বাড়ীতে আমার পড়াশুনা হয় না।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "ওমা, সেখানে ছত্রিশ জাতের সঙ্গে তুই খাবি দাবি কি ক'রে? একেবারেই কি ম্লেচ্ছ হ'য়ে উঠ্‌লি?"

শুধু এই সামান্য কারণে মা বোনকে চটাইতে হরি-কেশব চাহিলেন না। গৌরীকে আর কোথাও রাখা যায় কি না চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে এক হিন্দুবিধবাশ্রমে জায়গা পাওয়া গেল। সেখান হইতে ইস্কুলে পড়িতে যাইবার অনুমতিও সংগ্রহ করা হইল।

ছোট একটি দোতলা বাড়ী। আসবাবপত্র কিছুই নাই; মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া মেয়েরা পড়াশুনা করে, তাহারই উপর আবার বিছানা পাতিয়া ঘুমায়। সমস্ত কাজকর্ম্মই মেয়েদের নিজেদের করিতে হয়।

কেবল পোড়া বাসন মাজিয়া দিবার ও বাজার করিয়া দিবার জন্ম একটি ঝি আছে !

গৌরীর এত কাজকর্ম্ম করা ও এমন ভাবে থাকা কোনো দিন অভ্যাস ছিল না। তবু সে ইহাতেই রাজি হইল; ভাবিল স্বাবলম্বন ও সরলজীবনযাত্রাপ্রণালীই তাহার মত মেয়েদের আদর্শ হওয়া উচিত !

আশ্রমের কর্ত্রী সধবা। তাঁহাকে দেখিয়াই কিন্তু গৌরীর প্রথম খট্‌কা লাগিল। মেয়েদের কাপড়-চোপড় সবই মোটা থান, মার্কিনের সেমিজ ও বোম্বাই চাদর; কিন্তু কর্ত্রীর পরণে রঙিন ঢাকাই সাড়ী, লেস-দেওয়া পেটিকোট, জরিদার ব্লাউস ইত্যাদি। জুতা, মোজা, গহনা, এসেন্স, পাউডার পমেটম কিছুরই ক্রটী নাই। চেয়ার টেবিল, আয়না আলমারি, খাট, সকল আস্‌বাবই ঘরে শোভা পাইতেছে। শ্মশানে বাসরের মত ইহা গৌরীর চোখে বিসদৃশ ঠেকিল। মেয়েগুলির সবই অল্প বয়স, তাহাদের দীনবেশের ও ম্লান মুখের পাশে তাহাদের মাতৃস্থানীয়ার এরকম সালঙ্কারা মূর্ত্তি দেখিলে মনে হইত কে যেন একটা প্রহসন অভিনয় করিবার জন্য এই মা ও মেয়েগুলিকে সাজাইয়া আনিয়াছে।

চোখের দৃষ্টিতে যাহা কিছু মন্দ লাগে তাহাকেই বর্জ্জন করিতে গেলে সংসার চলে না। সুতরাং গৌরীকে থাকিতেই হইল। কিন্তু সে দেখিল একত্রে বৈধব্যের নিষ্ঠা ও স্বাবলম্বন চর্চ্চা করিতে গেলে বিদ্যাচর্চ্চাটা তাহাকে বাদ দিয়াই চলিতে হয়। ব্রাহ্মণের মেয়ে বলিয়া রান্নার পালাটা তাহারই বেশী করিয়া পড়িত, কারণ অন্য জাতের মেয়েদের হাতে সকলে খায় না। ঝি চাকর নাই, কাজেই কর্ত্রীর ঘরের কাজ-কর্ম্ম, চা দেওয়া, এমন-কি মাছ রাঁধা পর্য্যন্ত মেয়েদেরই করিতে হইত। তাহার উপর ছিল কাপড় কাচার পালা, সেলাইয়ের পালা ও হিসাব রাখার পালা ইত্যাদি। যে মেয়েরা সেইখানে থাকিয়া সেইখানেই পড়িত তাহারা কাজ-কর্ম্ম সারিয়া সময়মত নিজেদের পড়াশুনা করিতে পারিত। কিন্তু যাহাকে সারাদিন ইস্কুলে কাটাইতে হয় তাহার পক্ষে ইহা শক্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কুদৃষ্টান্তে মেয়েদের অপকার হইবে বলিয়া কর্ত্রী গৌরীকে একটা কাজও মাপ করিতেন না। তিনি বলিতেন, "এক জায়গায় থাক্‌তে হ'লে সবাইকে একচালে চল্‌তে হ'বে। তুমি বড় মানুষের মেয়ে ব'লে তোমার জন্যে ত আমরা আলাদা নিয়ম কবৃতে পারি না। এখানে সবাইকেই গরীব হ'তে হ'বে।"

এক হাত গহনা বাজাইয়া কর্ত্রী উপদেশ দিয়া চলিয়া যাইতেন; গৌরীর তাহা পালন করিতেই নয়টা বাজিয়া যাইত। ইস্কুলে যাইবার আগে অর্দ্ধেক দিন তাহার ভাত খাওয়া হইত না।

পরীক্ষার সময় আসিয়া পড়িল। গৌরী আর এখানে কিছুতেই থাকিতে চায় না। তাহার বড় ভয় পাছে সে ফেল হইয়া যায়। শঙ্কর তাহার জন্য ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

এমনই দিনে সঞ্জয় তাহার মাসিমার খবর আনিয়া শঙ্করকে দিল। শঙ্কর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া সেই দিনই হৈমবতীর সঙ্গে দেখা করিয়া গৌরীর বিষয় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিল।

(৩)

সকাল-বেলার রোদ আসিয়া ছাদে পড়িয়াছে। হৈমবতী মেয়েদের লইয়া আচার রৌদ্রে দিতেছিলেন। ঘরের কোলের সরু বারান্দায় একটা পাটি বিছাইয়া নিস্তারিণী দক্ষিণের হাওয়ায় একটু আরাম পাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এইটি হৈমবতীর চিররুগ্না পোষ্যা। কাল রাত্রে তাহার বাতের ব্যথা ও হাঁপানি অত্যন্ত বাড়িয়াছিল বলিয়া সারা রাত সে ঘুমাইতে পায় নাই। সকালে শরীরটা হাল্কা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তি ও তন্দ্রায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার আর এক কোণে বসিয়া চপলা ও চঞ্চলা একটা পোষাক তৈয়ারি করিতেছিল; একজন কাটিয়া ও টাঁকিয়া দিতেছে আর একজন কল চালাইয়া সেলাই করিতেছে। গৌরী সেই-খানে দরজার মুখে একটা মোড়া পাতিয়া কলেজের বই ও খাতা লইয়া নোট মিলাইতেছিল।

হৈমবতী বলিলেন, "চপলা, তোমার ত আজ ছুটি আছে। বাড়ীর কাজ-কর্ম্মগুলো একটু দেখো। আমাকে

এখুনি বেরোতে হবে, সেই মেয়েটির অসুখের আজ বড় বাড়াবাড়ি। যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা আজ সারাদিনের মধ্যে ক'রে ফেল্‌তেই হ'বে।"

গৌরী খাতা ও বইটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "মাসিমা, আমরা আপনার কিছু সাহায্য কর্‌তে পারি না?"

মাসিমা বলিলেন, "না মা, এ তোমাদের মত কচি মেয়ের কাজ নয়। আমাদের পোড়-খাওয়া হাড়েই এসব কাজ সাজে।"

চঞ্চলা হৈমবতীর ঘর হইতে একটা মোটা চাদর ও ছোট ব্যাগ আনিয়া দিল। হৈমবতী ব্যাগটা কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া চাদরটা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন; সঙ্গে গাড়ী কিম্বা লোকজন কিছুই লইলেন না। আজ দশ বৎসর এই ভাবে একলা একলাই তিনি পথে ঘাটে ঘুরিয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলিতেন "গাড়ী চড়তে আর লোকের মাইনে দিতে আমার যা খরচ হ'বে, তাতে আমার তিনটে মেয়ের খরপোষ কুলিয়ে যায়।"

হৈমবতী বাহির হইয়া গেলে চঞ্চলা বলিল, "মাসিমার কিন্তু ধন্যি সাহস ভাই! ওই এঁদোপড়া গলির ভিতর রাজ্যের মুসলমান বস্তি পেরিয়ে দিনের পর দিন একলাটি হেঁটে যাওয়া-আসা কর্‌ছেন। আমরা হ'লে ভয়েই মরে ভূত হ'য়ে যেতাম।"

গৌরী বলিল, "গরীবের দেশে কাজ কর্‌তে হ'লে এমনি ক'রেই কর্‌তে হয়। ঢাকাই শাড়ী প'রে মোটর চ'ড়ে দরোয়ান পাইক সঙ্গে ক'রে যত দিন আমাদের দেশের মেয়েরা সৌখীন দেশোদ্ধার করবে তদ্দিন দেশের কোনো আশা নেই।"

চপলা বলিল, "মেয়েদেরই শুধু শুধু গাল দিচ্ছ কেন? আমাদের দেশের পুরুষরা যে পুরুষত্বের বড়াই করেন, তাঁরা ত সব দেশের কাজ কর্‌তে গিয়ে ট্রাভলিং এলাওন্স' যত নেন, চাকরী কর্‌লে তার সিকিও মাইনে পেতেন না।"

চঞ্চলা বলিল, "নিস্তারিণীদিদি, তুমি যদি ভাই, একটু খাড়া হ'য়ে উঠতে পার্‌তে, তাহ'লে তোমাকে একটা দেশোদ্ধারের চাকরী আমি কোনো রকমে জুটিয়ে দিতাম। বেশ দু পয়সা হাত ক'রে নিতে পার্‌তে। পরকালের জন্যে আর ভাবনা থাক্‌ত না।"

নিস্তারিণী অতি সহজ অল্পবুদ্ধি মানুষ। সে বলিল, "ও বাবা! আমি ভাই, ক অক্ষর জানি না, দেশোদ্ধার কর্‌ব কোথা থেকে?"

চঞ্চলা বলিল, "ওমা, তাও জান না, নিস্তারিণী-দি? লেখাপড়া শিখলেইত মেম হ'য়ে যাবে। যে যত মুখ্যু হয়, সেই তত সহজে দেশোদ্ধার কর্‌তে পারে। এই সনাতন প্রথা।"

নিস্তারিণী বলিল, "কেন ভাই, বোকা মানুষ দেখে ঠাট্টা কর্‌ছ? ওসব তোমাদের কাজ তোমরাই কোরো। অনেক দুঃখু ভোগ করেছি; আবার নূতন জালে জড়াতে চাই না।"

গৌরী বলিল, "নিস্তারিণী দিদি, তোমার কিন্তু এক দিকে কপাল ভাল। কোথাকার চাটগাঁয়ের মেয়ে তুমি, কল্‌কাতা সহরে মাসিমার কাছেই বেছে বেছে এসে জুট্‌লে কি ক'রে?"

নিস্তারিণী বাতগ্রস্ত শরীরটা অনেক কষ্টে গৌরীর দিকে ঘুরাইয়া বলিল, "সে-কথা আর বল কেন ভাই? আর জন্মের অনেক পাপের সঙ্গে একটা কিছু বড় পুণ্যি করেছিলুম যার জোরে এমন লক্ষ্মীর পায়ে ঠাঁই মিলেছে। দেখ্‌তে একে কুচ্ছিত ছিলুম, তার উপর আবার একটা পা বাঁকা; কাজেই সহজে যে পার করা যাবে না তা বাপ মা বেশ জান্‌তেন। বাবার সাতটি মেয়ের শেষে জন্মেছিলুম যেমন রূপ তেম্‌নি কপাল নিয়ে। ছয় মেয়ের বিয়ে দিতে দিতেই বাবার বাড়ীখানা বাঁধা পড়ল, মার হাতে শাঁখা সম্বল হ'ল, জমিজমা সব বিক্রী হ'য়ে গেল। তার উপর স্যাকরা আর মুদির তাগিদে ত বাড়ীশুদ্ধর প্রাণান্ত হ'বার যোগাড়। অত ঠেলা আর সইবে কেন? বাবা শেষে মরে হাড় জুড়োলেন; কিন্তু ভাইগুলিকে গেলেন পথে বসিয়ে। সর্ব্বস্ব বেচলেও ধারশোধ হ'বার উপায় রইল না। যে বোনগুলোর জন্যে তাদের এমন দশা হ'ল তারা তখন সবাই বেশ চাকুরে স্বামীর ঘর কর্‌ছে,

তাদের পায় কে? কাজেই ভায়েদের যত রাগের চোট এসে পড়ল আমার উপর।"

চঞ্চলা বলিল, "বেশ যাহোক, নিস্তারিণী-দি! তোমাকে কি উপন্যাসের প্লট দিতে কেউ বলেছে? মাসিমার কাছে কি ক'রে এলে তাই ব'ল না!"

নিস্তারিণী গল্পে বাধা পাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "তাই ত বল্‌ছিলুম। আগের কথাটা না বল্‌লে টপ্ ক'রে ডিঙিয়ে এসে কি শেষের কথা বলা যায়? আমি বাপু বোকা মানুষ, অন্য রকম বল্‌তে জানি না।"

গৌরী বলিল, "তুমি ভাই, ওদের ক্ষেপানো শুনো না। যেমন বল্‌ছিলে তেমনি ব'লে যাও।"

নিস্তারিণী শ্রান্ত শরীরটা একটু মোড়া দিয়া হাই তুলিয়া বলিল, "তারপর যা বরাতে ছিল তাই ঘট্‌ল। পাড়ার মুদির দোকানে খাতা লিখ্‌ত একটা মা-বাপে-খেদানো ছেলে; তাকেই ধ'রে এনে আমার ভাইরা বিনে-পরচায় আমাকে গছিয়ে দিলে। সেই থেকে যত খোয়ার সুরু হ'ল। আমার একটা কথা একটা কাজ যদি অপছন্দ হ'ত ত অমনি ছাতার বাড়ি লাঠির বাড়ি পিঠে পড়তে থাক্‌ত। এমনি নির্লজ্জ মানুষটা যে পাশের বাড়ী বাড়ী ছাদে ছাদে মেয়ে-পুরুষ আমার কান্না শুনে জমা হ'য়ে গেলেও খোলা দরজার সাম্‌নে আমার উপর অত্যাচার করতে তার এতটুকু বাধ্‌ত না। অত ব্যথার মধ্যে আমি লজ্জায় ম'রে যেতুম, তবু তার লজ্জা হ'ত না। মারধোর ক'রে অত-গুলো মানুষের সাম্‌নে দিয়ে দিব্যি গট্ গট্ ক'রে বেরিয়ে চ'লে যেত। পাশের বাড়ী থেকে ছাদের আল্‌সে ডিঙিয়ে মেয়েরা এসে আমার চোখে মুখে জল দিয়ে তুল্‌ত।

"বোকার মত একদিন বলেছিলুম—স্বামী হ'য়ে তুমি আমার এমন হেনস্তা কর লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারি না। তাতে বল্‌লে কি—'বেশ ত! স্বামীর হেনস্তা ভাল না লাগে, আর কারুর হেনস্তায় যদি মুখ খুব উঁচু হ'য়ে ওঠে তবে তারির চেষ্টা দেখো। আমার তোমাকে কিছু দরকার নেই।'

"ওমা, সত্যি সত্যি তার পরদিন সকালে উঠে দেখি বাড়ীভাড়া মুদির ধার সব ফেলে রেখে কোথায় চ'লে গেছে। এই আসে, এই আসে, ক'রে সারাদিন পথ চেয়ে ব'সে রইলুম, কিন্তু কারুর আর দেখা পাওয়া গেল না। বাড়ীওয়ালা খবর পেয়ে বলে—'এখুনি আমার ভাড়া চুকিয়ে উঠে যাও'; মুদি বলে—'আমার সব পাওনা গণ্ডা না পেলে আমি ঘরের ঘটি বাটি উঠিয়ে নিয়ে যাব।'

"আমি ত কেঁদে মরি, কোথায় যাব কি করব ভেবেই পাই না।"

চঞ্চলা বলিল, "মাগো, স্বামী নয় ত দুষমন্! অমন স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। গৌরী, তুই, ভাই ঢের নিশ্চিন্ত আছিস্।"

নিস্তারিণী জিভ কাটিয়া বলিল, "ছিঃ, অমন কথা বল্‌তে নেই। আমার যা করেছে, তা করেছে তবু যেখানে আছে বেঁচে-বর্ত্তে থাক্। মাসিমা যতদিন আছেন আমার কোনো ভাবনা নেই। মাসিমার এক মামাতো বোন আর ভগ্নীপতি থাক্‌তেন আমাদের পাশের বাড়ীতে। আমার কান্নাকাটি শুনে তাঁরা বল্‌লেন, যে, এর একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হ'বে। দুপুর রাত্রে খিড়কীর দরজা খুলে তাঁদের বাড়ী পালিয়ে এলুম, আবার ভোর না হ'তেই তাঁরা দিলেন আমায় কল্‌কাতায় চালান ক'রে! এমনি ক'রে স্বামীর ঋণ আর পরের অপমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।"

চপলা বলিল, "সত্যিই ভাই, তোমার নামে গল্প লেখা যায় দেখছি। আমার দেখ না, একেবারে সোজাসুজি ইতিহাস, মা গেল ম'রে, বাপ এনে মাসিমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন।"

গৌরী বলিল, "আর চঞ্চলা, তোমার ইতিহাসটা কি? আরব্যোপন্যাসের মত সবাই নিজের নিজের কাহিনী ব'লে ফেল।"

চঞ্চলার চঞ্চল জিহ্বা হঠাৎ থামিয়া গেল। মুখখানা একবার মুহূর্ত্তে রাঙা হইয়া উঠিল। তারপর একটু থামিয়া মুখটা ভার করিয়া সে বলিল, "আমার মা আমাকে বেঁচে থেকেই বিদায় ক'রে দিয়েছে। সে কাহিনী সকলের চেয়েই সংক্ষিপ্ত।"

চপলা চঞ্চলার ইতিহাস সমস্তই শুনিয়াছিল। চঞ্চলার পিতা বেহারের একজন স্বনামধন্য আইনজীবী ছিলেন,

মা বাঙালী অভিনেত্রী। পিতামাতা দুইজনেরই ইচ্ছা ছিল চঞ্চলাকে ভদ্রসমাজে পালন করিয়া বিবাহ দেওয়া; কিন্তু পিতার সংসারে ত চঞ্চলার স্থান ছিল না, কাজেই তিনি কন্যার লালন-পালনের উপযুক্ত অর্থ দিয়া হৈমবতীর কাছে কন্যাটিকে রাখিয়া যান। দুই এক বৎসর অন্তর মাঝে মাঝে দেখিতেও আসিতেন। ছেলেবেলা চঞ্চলা ইঁহাকে কাকা বলিত। বড় হইয়া সব জানিবার পর সে আর এই মিথ্যা সম্পর্কের অভিনয় করিতে রাজি হয় নাই; তাই তখন হইতে তাহার অভিভাবকের আসা যাওয়াও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কোন খবরই প্রায় আজকাল আর সে পায় না।

চঞ্চলার মুখ দেখিয়া ও কথা শুনিয়া গৌরীর তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সে অনেক দিন এখানে আসিয়াছে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে পরিচয়টা বেশীর ভাগই তাহার উপর-উপর ছিল; কাহার অন্তরে যে কি বেদনা লুকাইয়া আছে তাহা সে জানিত না। আজ নিস্তারিণীর দুঃখের ইতিহাস শুনিয়া সে সত্যই ব্যথিত হইয়াছিল। নিজেকে সে অতি ভাগ্যহীনা বলিয়াই ভাবিত। কিন্তু বাহিরে যতই নূতন-নূতন মানুষ দেখিতেছে ততই তাহার এ বিশ্বাস টুটিয়া যাইতেছে। দেখিতেছে জগতে তাহার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখের বোঝাই মানুষ বহে। তাহাতেও মানুষ বাঁচিয়া আছে, কাজ করিতেছে, ভাঙিয়া পড়ে নাই। সাংসারিক সুখের আশা তাহার জীবনে হয়ত শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই যে সব দুঃসহ দুঃখের জ্বালা ইহা ত তাহাকে কোনো-দিন সহ্য করিতে হয় নাই। তাহার দুর্ভাগ্যের জন্য পিতা-মাতা শোক করিয়া সেটাকে তাহার চক্ষে যত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, হৈমবতীর জীবনব্যাপী সংগ্রাম, ও নিস্তারিণীর আজন্ম নিপীড়নের সহিত তুলনা করিলে তাহা কি আর তেমন থাকে? গৌরীর নিজের কাছেই নিজের দুর্ভাগ্য ক্রমে অনেক ছোট হইয়া আসিতেছিল।

চঞ্চলা দুইটা কথা বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। গৌরীই তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, সুতরাং এই ব্যাপারটাতে সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। চপলা গৌরীকে একটু আড়ালে ডাকিয়া বলিল, "তুমি ভাই, চঞ্চলাকে ওকথা না জিগ্‌গেষ কর্‌লেই পার্‌তে! ওর কথা কি কিছু শোননি?"

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কৈ, না! আমি ত কিছু জানি না।"

চপলা তাহাকে সমস্ত কথাই বলিল। শুনিয়া গৌরী আপনার প্রশ্নের জন্য লজ্জিত হইল বটে; কিন্তু চঞ্চলার উপরও তাহার কেমন একটা রাগ আসিল। চঞ্চলা গৌরীর সহিত এক ঘরে থাকিত, একই জিনিষপত্র ব্যবহার করিত। তাহার অতীত ইতিহাস শুনিয়া গৌরীর বাল্যের সংস্কার মাথা জাগাইয়া উঠিল। মনে হইল চঞ্চলার স্পর্শে তাহার সমস্ত অশুচি হইয়া গিয়াছে। ছেলেবেলার বিলাসের আড়ম্বর ছাড়িয়া এখন সে ব্রহ্মচর্য্যের সকল নিয়ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিত। আজ মনে হইল তাহার কঠিন ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত গৌরব এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। লুকাইয়া তাহার সাহত এতখানি মাথামাখি করার অপরাধের জন্য গৌরীর সমস্ত মনটা চঞ্চলার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। এত বড় একটা দুঃখ ও অপমানের ইতিহাস যে তাহার পিছন হইতে সমস্তক্ষণ তাহাকে বিঁধিতেছে—সে-কথা ভাবিয়া মনটাকে তাহার প্রতি একটুও সদয় করিতে গৌরী পারিতেছিল না। মানুষের কত বিচিত্র রকমের দুঃখ আছে; দিন দিন তাহার পরিচয় পাইয়া নিজের দুঃখটাকে সে অনেক ছোট মনে করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু চঞ্চলার এই নূতন দুঃখের ব্যথায় তেমন সমবেদনা ত তাহার জাগিল না। যে দুর্ভাগ্য লইয়া সমাজে সে জন্মিয়াছে এবং যাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার আজন্ম চেষ্টার ফলেও সে কৃতকার্য্য হয় নাই তাহার জন্য গৌরী যেন চঞ্চলাকেই অপরাধী স্থির করিল।

চপলা বলিল, "চঞ্চলা বড় অভিমানী মেয়ে। ও হয়ত মনে করবে জেনে-শুনেই তুমি ওকে অমন প্রশ্ন করেছ। তুমি যে জান্‌তে না সেটা ওকে গিয়ে একবারটি বল।"

গৌরীর আপত্তি ছিল না। কিন্তু বলিতে গিয়া সে যাহা বলিবে তাহাতে চঞ্চলার অভিমান যে আরোই আহত হইবে না এবিষয়ে তাহার নিজেরই সন্দেহ ছিল। সেই ভয়ে চপলার কথায় সে ঠিক সায় দিতে পারিল

না। কেবল বলিল, "আজ থাক্ ভাই, ও সব নিয়ে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।"

চপলা চলিয়া গেলে গৌরী হৈমবতীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর শ্রান্তদেহে হৈমবতী ফিরিয়া আসিয়া ছাদে বসিয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার স্নান ও মধ্যাহ্ন-আহার হয় নাই। মেয়েদের মধ্যে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। একজন পাখা আনে, একজন জল আনে, একজন বা ছাতা-চাদর তুলিয়া রাখিতে দৌড়ায়। হৈমবতী বলিলেন, "তোমরা এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? যার যার নিজের কাজ করো গে, আমি আপনি জিরিয়ে নাওয়া-খাওয়া কর্‌ব এখন।"

খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া সকলে সরিয়া গেল। গৌরী ধীরে ধীরে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। হৈমবতী বলিলেন, "কি গৌরী, তোমার কি চাই?" গৌরী বলিল, "আপনি শ্রান্ত হ'য়ে এসেছেন; আপনাকে বেশী ব্যস্ত কর্‌ব না। শুধু একটা কথা বল্‌তে এসেছি। আমার সকলের সঙ্গে থাকায় নানা অসুবিধা হয়। আমাকে একটা ছোট খাট আলাদা ঘর দেওয়া যায় কি না, একবার দেখবেন।"

মাসিমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "চঞ্চলার সঙ্গে তোমার অসুবিধা হ'বার ত কথা নয়। কি হয়েছে বল দেখি! আমি চঞ্চলাকেও জিজ্ঞাসা কর্‌ব।"

গৌরী বলিল, "না মাসিমা, দয়া ক'রে চঞ্চলাকে এবিষয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। আপনি যা হয় ভেবে আমাকে বল্‌বেন।" (ক্রমশঃ)

সৃষ্টি-রহস্য

[ঋগ্বেদ সংহিতা, দশম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত]

শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্-এ, বি-এল

১

যাহা নাই তাহা ছিল না তখন, যাহা কিছু আছে
তাহাও নয়;
ছিল না পৃথ্বী, ছিল নাকো ব্যোম—যার 'পর' আর
নাহিক হয়।
কোথা কার স্থান? কিছু কি আছিল, আবরণ করি'
রহিত যাহা?
ছিল কি অন্ত গহন গভীর? কোথায়, কেমনে থাকিবে
তাহা?

২

মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, রাত্রি ছিল না, ছিল না দিন;
কোথায় তাহারা, কোথায়? তখন দিবস রজনী
প্রভেদহীন।
অনিঃশ্বসিত-বায়ু সেই এক আত্মা-মাত্র—ছিল না দেহ,
শ্বসিত শুধুই স্বধায়; অন্য ছিল না কিছুই, ছিল না কেহ।

৩

তমসারে শুধু তামসে ঘিরিয়া ছিল যে অগ্রে তমস, আর
অপ্রভিন্ন সলিল ব্যাপ্ত, কোথায় বিশেষ নাহিক যার।
শূন্যে আছিল যে আচ্ছন্ন বিরাট সর্ব্ব শূন্যতায়,
সেই এক, সেই সর্ব্বব্যাপী জন্ম লভিলা তপস্যায়।

৪

কামনার হ'ল উদয় অগ্রে, যা হ'ল প্রথম মনের বীজ।
মনীষী কবিরা পর্য্যালোচনা করিয়া করিয়া হৃদয় নিজ
নিরূপিলা সবে মনীষার বলে—উভয়ের সংযোগের ভাব,
অ-সৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব।

৫

ঊর্দ্ধে ও অধে, অথবা পার্শ্বে তির্য্যক্‌ভাবে বিতত, সারা
দিগদিগন্তে বিথারি' পড়িল ইহাদের সেই রশ্মিধারা;
রেতোধা যাহারা, মহিমা যাহারা, সম্ভব হ'ল তাদের, সদা
উপরে প্রযাত রহিল, এবং নিম্নে তাহার রহিল স্বধা।

৬

কে জানে প্রকৃত? ইহলোকে এর তত্ত্ব কহিবে কে-ই
বা সে-ই?
কেমন করিয়া, কোথা হ'তেই বা, এল বিচিত্র সৃষ্টি এই?
কোথা হ'তে হ'ল সম্ভব এর? কে বলিতে পারে
সে সন্ধানে?
দেবতারা হ'ল সৃষ্টির পর; কোথা থেকে এল? কেই
বা জানে?

৭

এই যে সৃষ্টি—এ হ'ল কিরূপে? কেহ কি করিল,
অথবা—নয়?
কাহা হতে হ'ল? কে জানে স্বরূপ? সেখানে
পরমব্যোমে যে রয়,
সে-ই জানে এর যে অধ্যক্ষ, তার চেয়ে আর জানে
না কেও,
সেই জানে সব সুনিশ্চিত; কে জানে—হয়ত জানে
না সেও!



[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না-হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—সম্পাদক]

"কবি"

গত চৈত্রের প্রবাসীতে শ্রীযুত হীরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের "কবি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। লেখাটিতে পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে দেখিলাম। সাধারণতঃ তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও উত্তর বঙ্গের কবিদের সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গেও যে কবির বিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার যথাযথ অনুসন্ধান হইলে এখনও প্রমাণ মিলিবে। বসু মহাশয় লিখিয়াছেন পুরাকালে কবি-গান হইত। কিন্তু উহা যথার্থ নহে; কলিকাতাতে বর্ত্তমানে কবি গান না হইতে পারে—পূর্ব্ববঙ্গে এখনও এই গানের সমধিক প্রচলন আছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—

হিন্দু-সমাজ কি আত্মহত্য করিবে?

চৈত্র মাসের প্রবাসী পত্রিকায় কাশীধামের এক সভার কথা "হিন্দু সমাজ কি আত্মহত্যা করিবে?" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের উক্তি বলিয়া যে-কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। অসত্য কথা এই, "শাস্ত্রের মধ্য দিয়া অনুন্নতদিগের অধিকার দিলে শাস্ত্রের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে।..." ইত্যাদি।

কাশীধামে 'আর্য্য সম্মেলন' নহে, "আর্য্য সম্মেলন" সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি ছিলেন। তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, "শাস্ত্রের, মধ্য দিয়া অনুন্নতদিগকে অধিকার প্রদান চিরন্তন সদাচার, আমি যে এই অধিকার প্রদান শব্দ ব্যবহার করিতেছি --তাহা উন্নতি বিধান অর্থে প্রযুক্ত। যে-সকল অনুন্নত জাতির সুরাপান ব্যভিচার দস্যুতা প্রভৃতি দোষ অত্যধিক ছিল, তাহাদিগের সেই-সমস্ত দোষ নিবারণ সদাচারসম্পন্ন সমাজই 'শাস্ত্রের মধ্য' দিয়াই করিয়াছেন। পানাহারে একাকারতা উন্নতি বিধান নহে, তাহা শাস্ত্রের মধ্য দিয়াও হয় না। শাস্ত্রের মধ্য দিয়া, কথাটা ব্যবহার করিয়া যথেচ্ছ অধিকার দানের ব্যবস্থা করিলে শাস্ত্রের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে।"

তর্করত্ন মহাশয় কৃত 'ধর্ম্মসিদ্ধান্ত' নামক স্মৃতি সংগ্রহ ১৩১৩ সালে বঙ্গবাসী শাস্ত্র-প্রকাশ বিভাগে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সর্ব্বজাতির উন্নতি বিধানার্থ শাস্ত্রীয় মত তাহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সর্ব্বজাতির পূজা-অর্চ্চনাদি পদ্ধতি প্রকাশের জন্য তিনি এখনও ব্যস্ত আছেন। তিনি বলেন, শাস্ত্রসিদ্ধ স্বধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তিই জাতীয় উন্নতির মূল। শাস্ত্রের মনগড়া ব্যাখ্যা, কল্পিত স্বধর্ম্ম, আত্মদ্রোহ এবং জাতি-বিদ্বেষ উন্নতির হেতু নহে।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

—

নানা জাতির আদর্শ প্রার্থনা

বিগত ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত "নানা জাতির আদর্শ প্রার্থনা" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম।

তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সমগ্র মুসলমান সমাজে একই প্রার্থনা (নামাজ) ও তাহার অনুবাদ এই—

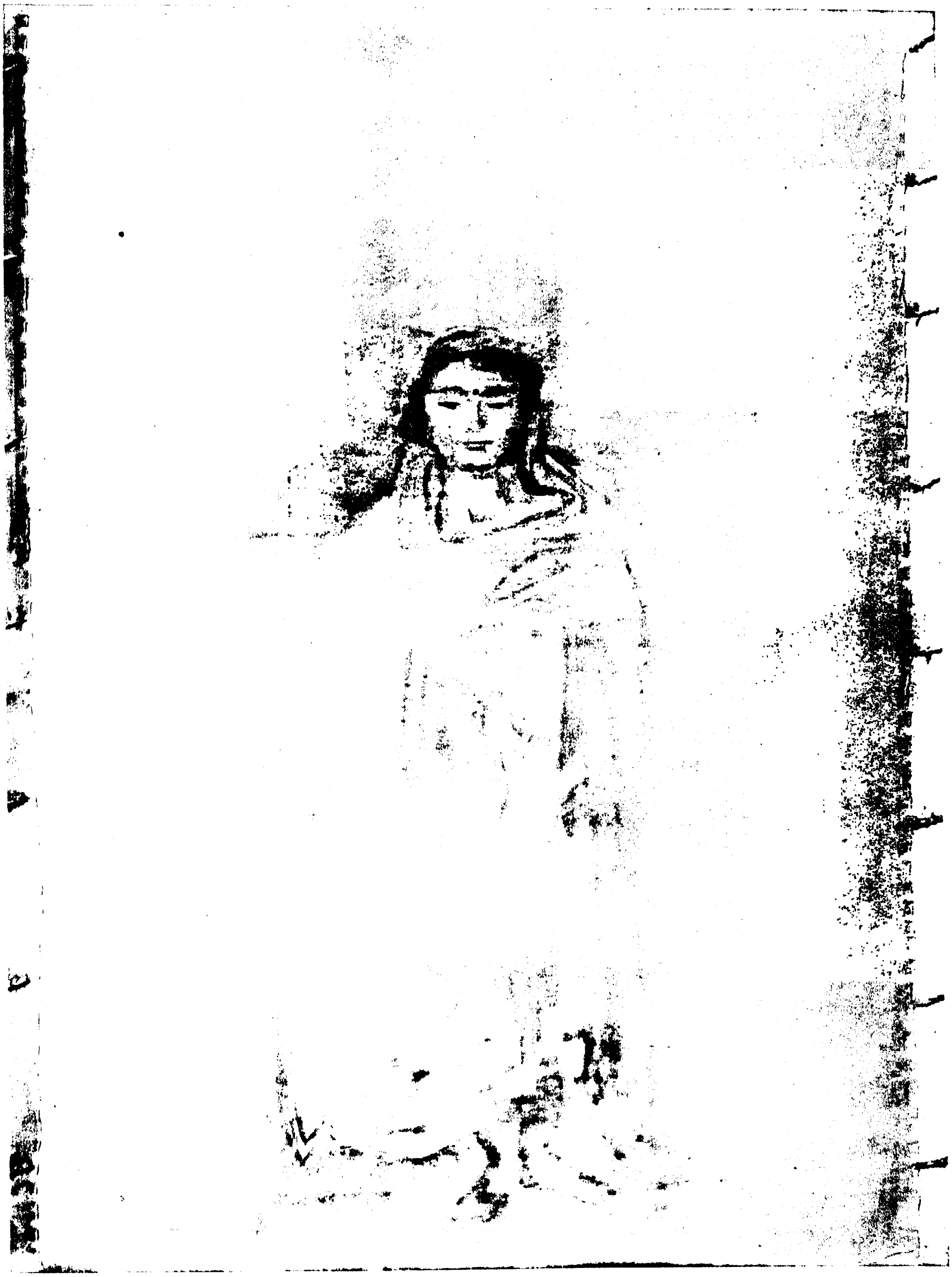
"আমি নিশ্চয়ই তাঁহার সম্মুখীন হইলাম। যিনি দৌ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি কখনও মনে করি না যে তাঁহার অংশী আছে। ঈশ্বর অতি মহান্...।

হে ঈশ্বর, নিঃসন্দেহ তোমা হইতেই আমরা সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। তোমা হইতেই আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। আমরা অকৃতজ্ঞ নহি। যাহারা আমার অবাধ্য তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকি ও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি। হে ঈশ্বর, আমরা তোমারই অর্চ্চনা করিতেছি। তোমাকেই প্রণিপাত করিতেছি। তোমারই উপাসনা করিতেছি। আমরা তোমারই কৃপাভিখারী। তোমারই শাস্তি আমাদিগের ভয়। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি কাফেরগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট।"

কিন্তু উপরোক্ত অনুবাদের নমুনা দ্বারা নমাজের কিছুই বোঝা যায় না। লেখক হিন্দু। ঈসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান থাকে তবে নমাজ সংক্রান্ত যে কোন প্রমাণিত পুস্তকে দেখিতে পারেন যে, কোরাণের "সুরাফাতেহাই" নমাজের প্রকৃত মূলমন্ত্র। অথচ লেখকের অনুবাদ-গুলির আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, সেই "সুরাফাতেহার" অনুবাদটি কোথাও নাই।

উচ্চতম আদর্শ প্রার্থনা বলিয়া নমাজের যে উপরোক্ত অনুবাদগুলি লেখক দিয়াছেন তাহা তিনি কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন ও কিরূপে অবগত হইলেন যে, ঐগুলিই নমাজের আদর্শ উচ্চতম প্রার্থনা?

এক্ষণে প্রকৃত নমাজ কি, সে-সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রকৃত নমাজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া



ঈশার চিত্রের খস্‌ড়া

শিল্পী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা]

পবিত্রভাবে পবিত্রস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া মনে একাগ্রতার জন্য আল্লার প্রশংসা-বাচক বন্দনা করা। তৎপর 'সুরাফাতেহা" যাহা নমাজের মূলমন্ত্র তাহা ধীর স্থির চিত্তে পাঠ করা এবং তাহার সহিত কোরাণের যে-কোন অংশ পাঠ করা ও অপরাপর ক্রিয়া-কলাপাদি সম্পাদন করা।

এক্ষণে "সুরাফাতেহার" অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমস্ত প্রশংসাই খোদার। তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, তিনি অতি দয়াশীল ও ক্ষমাশীল। তিনি বিচারদিনের অধিপতি। হে ঈশ্বর আমরা তোমারই উপাসনা করিতেছি ও তোমারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সত্য সরল পথ দেখাও। যাহাদিগের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ তাহাদিগের পথে চালিত কর। কিন্তু যাহারা তোমার বিরাগ-ভাজন ও পথভ্রষ্ট হইয়াছে তাহাদিগের পথে আমাদিগকে চালিত করিও না।

ইস্লামের নমাজকে সাম্প্রদায়িক বলা যাইতে পারে না। কারণ প্রত্যেক স্থানেই প্রত্যেক প্রার্থনাকারী কেবল নিজের ও তাহার সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা করে না। সমস্ত মানবজাতির মুক্তির জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করে। হিন্দুধর্ম্মের যে প্রার্থনাটিকে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় প্রার্থনা বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে তাহার সহিত আমদের "সুরাফাতেহা" নামক মন্ত্রটির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, উহাতে প্রত্যেক স্থানে বলা হইয়াছে যে "আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও" ইত্যাদি ; কিন্তু আমাদের মন্ত্রটিতে বলা হইয়াছে "আমাদিগকে অর্থাৎ পৃথিবীর সমুদায় মানব জাতিকে সরল সত্য পথ দেখাও।" ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কোন্ মন্ত্রটি সাম্প্রদায়িক, অনুদার ও বিশ্বপ্রেমিকতা পূর্ণ। এবং কোন প্রার্থনাটি সার্ব্বভৌমিক প্রার্থনারূপে গৃহীত হইতে পারে।

দানেশ আহম্মদ

—

হিন্দুর ভবিষ্যৎ

বৈশাখ সংখ্যা "প্রবাসীর" ১৪৬ পৃষ্ঠায় বিবিধ প্রসঙ্গ নিবন্ধে মাননীয় সম্পাদক মহাশয় "হিন্দুর ভবিষ্যৎ" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা এবং প্রবন্ধটির অধিকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহার উল্লেখে সম্পাদক মহাশয়ের অজ্ঞাতে একটু ভুল হইয়াছে। "হিন্দুর ভবিষ্যৎ" প্রবন্ধটি আমি "আত্মশক্তিতে" প্রেরণ করি। আত্মশক্তির ৪ঠা চৈত্র তারিখের ৪৭শ সংখ্যার ৯ পৃষ্ঠায় ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পর মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর হইতে প্রকাশিত শান্তিবার্ত্তা নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয় সম্ভবতঃ এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উহা তাঁহার নিজের লিখিত নহে।

প্রবন্ধের আলোচ্য স্থান মৈমনসিংহ জেলা নহে, যশোহর জেলা।

কামার, কুমার, তাঁতি, ধোপা, বেহারা, নাপিত প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি ক্রমশঃই অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহাদের সংখ্যা-হ্রাসের প্রতি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য প্রদান করা একান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

যশোহর জেলার জমিদার নড়াইলের শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এবং নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমথ-ভূষণ দেব রায় এবং বর্ত্তমান মন্ত্রী মাগুরার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ যদি কামার, কুমার প্রভৃতি সম্প্রদায় মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলন এবং কন্যাপণ বিষয়ে আন্দোলন করেন তবে যথার্থই ফল হইতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি কয়েকটি নাপিত যুবক বিধবা বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সামাজিক উৎপীড়নের ভয়ে আর কেহই অগ্রসর হইতেছে না।

বহু ৩০।৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিও বিবাহ করিতে পারিতেছে না। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সংখ্যা হ্রাস। গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনায় দেখা গিয়াছিল, যশোহর জেলার লোক-সংখ্যা ১৭,৪৩,৩৭১ জন। তৎপরে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনায় লোক-সংখ্যা ১৭,২২,১৭৪ জনে আসিয়া পৌছিয়াছে। এই দশ বৎসর কাল মধ্যে যশোহর জেলায় ২১১৭৩ জন লোক হ্রাস পাইয়াছে।

নড়াইলের ধীরেন-বাবু নমঃশূদ্রদের উন্নতি-কল্পে সচেষ্ট দেখা যাইতেছে, কিন্তু কেহই হতভাগ্য নাপিত, ধোপা, কামার, কুমার, তাঁতী, বেহারা প্রভৃতিদের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন না।

যশোহরের তাঁতের কাপড় এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। বহু দূরদেশে পর্য্যন্ত যশোহরের কাপড়, গামছা প্রভৃতি চালান যাইত। আজ তাঁতীর বংশই লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। যশোহরের নিকটবর্ত্তী নীলগঞ্জ পাড়াটি তাঁতী দ্বারাই পূর্ণ ছিল, আজ তাহা যথার্থই শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বহু সন্ধানেও ৪টি বেহারা কোথাও একত্রিত করা যাইতেছে না। দশ গ্রামে একজন কামার মিলে না। লোকের অভাবে কুম্ভ-কারের ব্যবসায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে। দিন দিনই মৃন্ময়-পাত্রের অভাব অনুভূত হইতেছে। লোক না থাকিলে ব্যবসায় চালাইবে কে? বঙ্গীয় হিন্দু সভা কি এই উপেক্ষিত সম্প্রদায়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিবেন? ব্রাহ্মণ-সভা ইহাদের বিধবা বিবাহে সম্মতি প্রদানে বা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দানে কি সচেষ্ট হইবেন? হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না করিলে আর কে রাখিবে?

দেশীয় শিল্পী-সম্প্রদায় লুপ্ত হইলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও বিদেশীর হস্তগত হইবে; হইতেছেও তাহাই। যশোহরের মামুদপুর থানায় কাগজী নামক এক সম্প্রদায় ছিল, তাহারা দেশীয় প্রথায় কাগজ তৈরী করিত। আজ যশোহর জেলার কোথাও তাহাদের সন্ধান মিলে না। মিলের কাগজ আমদানী হইলেও জিনিষপত্র বাঁধিতে এবং নানা বাজে কাজে তুলট কাগজ প্রচলিত ছিল। শিল্পীর লোপে সে ব্যবসাও বিনষ্ট হইয়াছে।

ভিন্ন জেলা এমন-কি বাঙ্গলার বাহিরের লোক আসিয়া ধুনুরীর কাজ করিতেছে। বাইতি নামক এক হিন্দু সম্প্রদায় আছে, যাহারা, মাদুর প্রস্তুত করিত, ক্রিয়াকর্ম্মে ঢোল বাজাইত এবং শীতকালে লেপ তোষক প্রস্তুত করিত, তাহাদের কাজ মুসলমানে অধিকার করিয়াছে। কারণ ইহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে বিলুপ্তপ্রায়।

বঙ্গের সুধীবৃন্দ বিবেচনা করুন হিন্দুর ভবিষ্যৎ প্রকৃতই তমসাচ্ছন্ন কি না।

শ্রী অবলাকান্ত মজুমদার

—

ছাতনায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বক্তব্য

গত চৈত্রের প্রবাসীতে 'ছাতনায় চণ্ডীদাস' বাহির হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য—

১। ছাতনার বাসলী আসল নহে। যে-ধ্যানে তাঁহার পূজা হয় সে-ধ্যানে শবের উল্লেখ নাই। মূর্ত্তি কিন্তু শবারূঢ়া। বৈজ্ঞানিক বিদ্যানিধি মহাশয় সে-সম্বন্ধে কিছু না বলায় প্রবন্ধে বিষয়ত্তার অভাব ঘটিয়াছে। বিশালাক্ষীর ধ্যানের সঙ্গে ঐ মূর্ত্তির মিল আছে।

২। 'বাসলী-মাহাত্ম্য' বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বসন্ত-রঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ছাতনাহইতে বাসলী-মাহাত্ম্যের একখানি পুঁথি আনিয়াছেন। রাধানাথ দাস ছাতনার লোক, তিনি কবিতায় পুঁথিতে বাসলীর প্রায় সব কাহিনীই লিখিয়াছেন। তাহাতে বর্গীর হাঙ্গামার সময় দেবীদাস ছাতনায় গিয়াছিলেন। পুঁথিতে চণ্ডীদাসের কোনো প্রসঙ্গ নাই। ছাতনার লোক হইয়া রাধানাথ এত বড় ভুল করিলেন কেন? আর সংস্কৃতের লেখক একেবারে বাপ-মায়ের নাম ধরিয়া কবি বলিয়া এই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় এত জোর দিল ইহার অর্থ কি সুস্পষ্ট নয়? পুঁথির লেখা হালের।

৩। পদাবলীর মধ্যে ২৯৩, ৩১০, ৩৪৩ পদেও রজকিনীর উল্লেখ আছে। কেবল একটি পদেই 'রজকী-সঙ্গতি' আছে একথা ঠিক্ নহে।

৪। নলপুর বা নল নগর হইতে নান্নুর নাম হইয়াছে একথা আমি বলি নাই। নলপুরের প্রবাদ আছে সুতরাং হইতে পারে বলিয়াছি। নলপুর হইতেও নান্নুর যে একেবারে হয় না এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? তার পর জ্ঞানপুর হইতে নান্নুর হইতে পারে। নাম্মপুর হইতে, নম্নপুর হইতে নান্নুর হইতে পারে। চন্দ্রবংশীয় শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্র-শাসনে নাম্ম-মণ্ডলের উল্লেখ আছে। ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে ভগবান নম্ন নারায়ণ নাম পাওয়া যায়। মিথিলায় রাজা ছিলেন নান্য-দেব। সুতরাং একটা গ্রামের নাম নাম্মপুর বা নম্নপুর থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি!

৫। নুন্নুর হাট হইতে নন্নুর নাম কেবল অবিশ্বাস্য নহে, হাস্যোদ্দীপক! ছাতনার দেঘরিয়ারা পূর্ব্ব পুরুষের নাম, কাহিনী সব মনে রাখিল আর অত বড় কবির বাসস্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিল না, নাম মনে রাখিল না! আজ নুন্নুর হাট খুঁজিয়া তাহার বাসভূমির কল্পনা করিতে হইল! আজ চারশো বছর ধরিয়া বৈষ্ণব কবিরা কি নুন্নুর হাটের বন্দনা রচিয়া আসিয়াছেন? মানুষ কতটা জেদী হইলে তবে এইসব অবান্তর কথা সাহিত্যক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পারেন আমি ভাবিয়া পাই না। আমরা এ কাজ করিলে লোকে বলিত চন্দ্রাধিক্য!

৬। বাসলী ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতা হইয়াছেন কতদিন? হাজার বৎসর আগে অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ মালিনী-বিজয় তন্ত্রে বাসলী দেবীর নাম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—বাগীশ্বরী হইতে বাসলী হইতে পারে। খৃঃ ২য়, ৩য় শতাব্দীতে বাগীশ্বরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মঞ্জুশ্রীর শক্তি। বাসলী বাগীশ্বরী হইলে নান্নুরের মূর্ত্তিই ঠিক্। আমাদের নব প্রকাশিত বীরভূম বিবরণ ৩য় খণ্ডে আমরা এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

৭। ছাতনায় নিত্য নূতন প্রবাদ গজাইয়া উঠিতেছে। ইহার মধ্যেই সেখানে চণ্ডীদাসের মেলা বসিয়াছে, সুতরাং প্রবাদ সৃষ্টির পথ খোলা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ একরকম প্রবাদ শুনিয়াছিলেন, আমি একরকম শুনিয়া আসিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে সাহানা মহাশয় একরকম শুনিয়াছিলেন, আজ বিদ্যানিধি আর একরকম শুনাইলেন।

৮। ছাতনার ইঁটের লেখা দেখিয়া মনে হয় হামীর উত্তর ও উত্তর এক ব্যক্তি। ১৪৭৬ শকে অর্থাৎ ১৫৫৪ খৃঃ তিনি ছিলেন। ছাতনায় চণ্ডীদাস যদি কেহ থাকেন তিনি ঐ সময়েই ছিলেন। নান্নুরের মহা-কবির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নাই।

৯। বিদ্যানিধি মহাশয় ক্রমাগত এক উহের পর যেরূপ আর এক উহ চাপাইয়াছেন তাহাতে ২৫ পৃষ্ঠা প্রবন্ধের ৭৫ পৃষ্ঠা আলোচনা করিলে তবে গলদ পরিষ্কার হয়। মুসলমানে রাজাকে ধরিয়া লইয়া গেল, আর চণ্ডীদাস গান করিতে করিতে ও দেবীদাস বিল্বপত্র হস্তে তার অনুগমন করিলেন, মুসলমানে রাজাকে ছাড়িল দেবীদাসকে (বোধ হয় বংশ-রক্ষার জন্য) ছাড়িল, চণ্ডীদাসকে হত্যা করিল। আর সবাই সে কথা ভুলিয়া গেল, কেবল একজন লোক মনে রাখিল। এইসব রায় বাহাদুরে উহ! বৈষ্ণব দাস গঙ্গাতীরে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মিলনের কথা বলায় তিনি শ্লেষ করিয়াছেন এবং নিজে পুরীযাত্রার কল্পনা করিয়া গঙ্গাজলে যাহা শুদ্ধ হয় নাই, স্বীয় বিজ্ঞানামৃতে তাহা বিশুদ্ধ করিয়াছেন। ২৫ পৃষ্ঠা জুড়িয়া এমন উহ অনেক আছে। কিন্তু আর নয়।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বোশেখ শেষের মাঠ

জসীম উদ্দীন

বোশেখ শেষে বালুর চরে বোরোধানের থান
সোনায় সোনা মেলিয়ে দিয়ে কাড়িয়ে নেছে প্রাণ।
বসন্ত সে বিদায়-বেলা বুকের আঁচলখানি
গেঁয়ো নদীর দু'পাশ দিয়ে রেখায় দেছে টানি'।
চৈত্র-দিনের বিধবা চর সাদা থানের 'পরে
নতুন বরষ ছড়িয়ে দিল সবুজ থরে থরে।
না জানি কোন্ গেঁয়ো তাঁতী গাঙ চলিবার ছলে
জল-ছোঁয়া তার শাড়ীর পাশে পাড় বুনে যায় চ'লে।

মধ্য চরে আউস ধানের সবুজ পারাবার
নদীর ধারে বোরোধানের দোলে সোনার পাড়।
চৈত্র-দিনের বৈরাগিনী সবুজ আঁচল-কোণে
মুখখানিরে আবছা ঢেকে সাজল বিয়ের কনে।
মাথায় তাহার বক-শিশুরা মেলিয়ে কোমল ডানা
সাদা সাদা মেঘের মত উড়ায় চাদরখানা।
গেঁয়ো পথে চল্‌তে আজি অনেক মায়া লাগে,
বকের 'পর পা [illegible] কোক।

অমন সবুজ অমন কোমল মাটির সাথে মিশে
কে পার ভাই চল্‌তে তারে পায়ের তলে পিষে!
হাটে যাওয়ার পথটি ত তাই অনেক হ'ল ঘোর—
কাজল তলার ও পাশ দিয়ে দিগ্‌নগরের মোড়।
তার পরেতে হালট গেছে একটু আঁকা বাঁকা
গরুর পায়েব খুরে খুরে ছবির মত আঁকা।
সেখান দিয়ে চল্‌তে চাষী সকল কথা ভোলে
বন্ধু ভাইএর কাঁধটি ধ'রে ধানের কথা তোলে।
সাত পুরুষেও এমন ফসল দেখিনি কেউ চোখে
মেঘ যেন কেউ বিছিয়ে দেছে তাদের গেঁয়ো চকে।
চাষীর মুখে তারিফ শুনে ধান শিশুরা তাই
হেসে দুলে লাজে আকুল নাই লুকোবার ঠাঁই।
আকাশ ছিল সুনীল যখন ছিল না মেঘ লেখা
তখন চাষী শুক্‌নো মাঠে দিয়ে লাঙল-রেখা;
আকাশের ওই দেবতা সাথে পেতেই যেন আড়ি
ধুল্ ধুলা ধুল্ চোতের ধুলোয় ধানকে দিল ছাড়ি'।
তারা যেন সৈন্য তাহার পাতাল-পাথার ফাঁড়ি'
আন্‌ল অথই মেঘের বাহার সবুজ স্নেহে কাড়ি'।

আকাশ হ'তে নাম্‌ল না মেঘ পাতাল হ'তে আনি'
সারা মাঠের বুকের 'পরে হর্ষে দিল টানি।
দেবতা যেন হারার ভয়ে সুনীল আকাশ মেঘে
চাষার সবুজ ক্ষেতের মেঘে বর্ষে থেকে থেকে।
ও গো চাষী, গাঁয়ের চাষী, সেলাম তোমার পায়,
বাড়ী তোমার উজানচরে কিম্বা গফর-গাঁয়;
ম্যালেরীয়ায় মরুছ তুমি রুগ্ন জবুথবু
সারাটাদিন মরুছ খেটে পাওনি খেতে তবু!
লক্ষ টাকা দেশকে দিয়ে হয়নি তোমার নাম;
দেশের তরে প্রাণ দেওয়াটাও নয়কো তোমার কাম।
একলা যে কোন্ বনের ধারে নাম-না-জানা গাঁয়ে,
সারাটা দিন রৌদ্রে পুড়ে সাজাও মেঠো মায়ে।
সব দুনিয়ার খোরাক জোগাও নিজেই থেকে ভুক,
অভাগারা! তাও বোঝে না এইটে বড় দুখ।
খোদার ছোট যদিও তুমি, অনেক ছোট নয়,
সৃষ্টি করার চাইতে পালন তুচ্ছ কেবা কয়।
তোমার গেঁয়ো মাঠটি আমার মক্কা হেন স্থান,
সাধ ক'রে আজ লুটিয়ে সেথা জুড়াই সকল প্রাণ॥

অরূপ রতন

কথা ও সুর—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রী সাহানা দেবী

বাহিরের ভুল হান্‌বে যখন
অন্তরের ভুল ভাঙবে কি,
বিষাদ- বিষে জ্বলে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙবে কি?
রৌদ্র দাহ হ'লে সারা
নাম্‌বে কি ওর বর্ষাধারা?
লাজের রাঙা মিট্‌লে হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি?

যতই যা'বে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হ'য়ে
টান্‌বে নাকি ব্যথার টানে ?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল-হাওয়া লাগ্‌বে বেগে
নয়ন-জলের আবেগ তখন
কোনই বাধা মান্‌বে কি ?

II { সা রা পা । মা জ্ঞা রা । সা রসঃ মঃ জ্ঞা । রা সা (না) -া । II
বা হি ০ রের্ ভু ল্ হা ০০ ন্ বে য খ ন্ ন্

সা গা গা । গা গা সা । জ্ঞা -া মা । জ্ঞমা পমা জ্ঞরা } II
অ ০ স্ত রের ভু ল ভা ঙ্ বে কি ০ ০ ০ ০ ০

II মা পা -া । পা পা -া । ণা ণা -া । ধা পা -া । মপা মা জ্ঞা । রা সা রা ।
বি ষা দ বি ষে ০ জ লে ০ শে ষে ০ তো০ মা র প্র সা দ্

ন্সা ন্া সা । নসা রজ্ঞা রা II II
মা ঙ্ বে কি০ ০০ ০

II { মা পা পা । পা পা -া । পা পা -া । পা পা ণা । ধা -া ণা । ধা ণা -া ।
রৌ ০ দ্র দা হ ০ হ' লে ০ সা রা ০ না ম্ বে কি ও র
অ ভি ০ মা নে র্ কা লো ০ মে ঘে ০ বা দ ল হাও য়া ০

ধা র্সা র্ণা । ধা পা ধা } । মা পা -া । পা পপা ধনা । পধা পা মা । গা মা -া ।
ব ০ র্ষা ধা রা ০ লা জে র রা ঙা০ ০০ মি টু লে হৃ দ য়
লা গ বে বে গে ০ ন য় ন জ লে০ ০র্ আ বে গ ত খ ন্

মপা সা জ্ঞা । রা সা রা । ন্সা ন্া সা । নসা রজ্ঞা রা II II
প্রে০ মে র র ঙ্গে ০ রা০ ঙ্ বে কি০ ০০ ০
কো০ ন ই বা ধা ০ মা॰ ন্ বে কি০ ০০ ০

{ না ন্া -া । না মূপা না । ন্া সা -া । স্না সা -া । সপা পা -া । মগা মা -া ।
{ য ত ই যা বে ০ দূ রে র পা০ নে ০ বাঁ ধ ন ত॰ ত ই

মপা মা জ্ঞা । রা জ্ঞা -া । রা মা জ্ঞা । রা সা রা । ধন্া না ধণা । ন্া সা -া ।
ক॰ ঠি ন হ য়ে ০ টা ন্ বে না কি ০ ব্য থা র টা নে ০

সম্পাদকের চিঠি

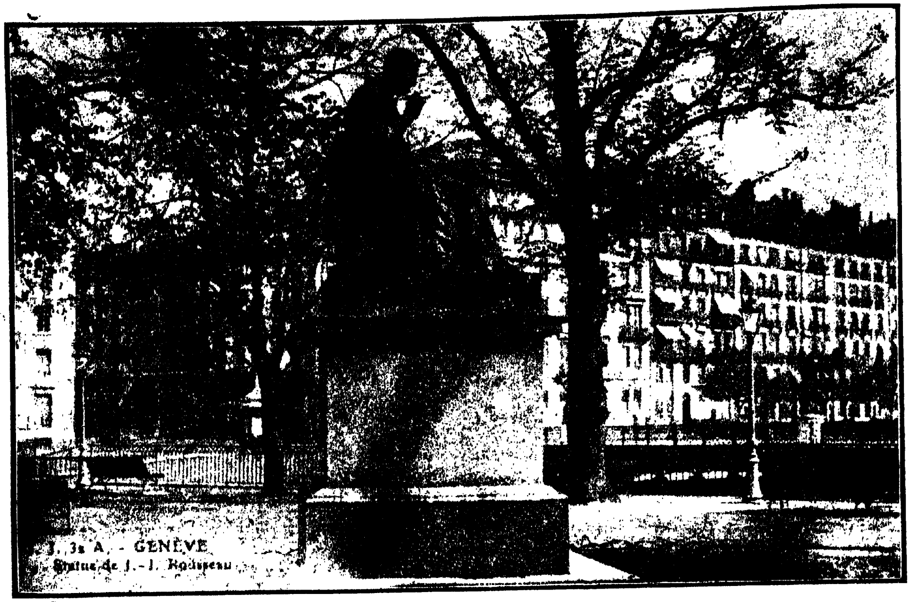
(৮)

জেনীভা সহর জেনীভা হ্রদের তীরে অবস্থিত। সহরটি যেখানে অবস্থিত, হ্রদ সেইখানে শেষ হইয়াছে। রোন্ নদী হ্রদটির জননী। উহা হ্রদের পূর্ব্ব প্রান্তে হ্রদে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম প্রান্ত দিয়া যেখানে বাহির হইয়াছে, জেনীভা সহর সেইখানে অবস্থিত। জেনীভা হ্রদের অন্য নাম লেমান। হ্রদটির জল অতিশয় স্বচ্ছ এবং নীলবর্ণ। শীতকালে ইহার জলে ৩৩ ফুট গভীর স্থানেও একটি শাদা চাকৃতি রাখিলে তাহা দেখা যায়; গ্রীষ্মকালে জল কিছু ঘোলা হওয়ায় তাহা ২১ ফুট গভীরতা পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর থাকে। পুরাকালে অপেক্ষাকৃত অসভ্য যুগে ইউরোপের অনেক স্থানে লোকে নিরাপদ থাকিবার জন্য হ্রদের জলে খুঁটি পুতিয়া তাহার উপর ঘর বাঁধিয়া তাহাতে বাস করিত। এইরূপ ঘরগুলিকে হ্রদ-গৃহ (Lake Dwellings) বলা হয়। জেনীভা হ্রদের তীরে এইরূপ কতকগুলি হ্রদ-গৃহের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। জেনীভা হ্রদে কখন কখন মরীচিকা দৃষ্ট হয়।

জেনীভা খুব প্রাচীন সহর। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ইহা প্রাচীরে ঘেরা ছিল। রাস্তাগুলি তখন সংকীর্ণ ছিল, ও তাহা হইতে জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে র‍্যাডিকাল্ অর্থাৎ আমূলসংস্কারক দলের ক্ষমতা লাভের পর নগরটি আধুনিক প্রণালীতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন নগরপ্রাচীর ভাঙিয়া সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, রাস্তাগুলিকে প্রশস্ত ও পাকা করা হইয়াছে এবং হ্রদ ও নদীর তীরে পাকা পোস্তা ও ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে। রোন্ নদীর যে-অংশ জেনীভা সহরের ভিতর দিয়া গিয়াছে, তাহাতে দুটি ছোট দ্বীপ আছে। একটিতে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য বাগান করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাতে বিখ্যাত লেখক ও শিক্ষা-নীতিকার রুসোর মূর্ত্তি আছে। এই স্থানটিতে কয়েকবার বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

১৯২০ সালে জেনীভার লোক-সংখ্যা ১,৩৫,০৫৯ ছিল; এখন কিছু বাড়িয়াছে। তা ছাড়া, এখানে লীগ অব নেশুন্স্ প্রভৃতির অধিবেশনের সময় প্রতি বৎসর কিছু দিনের জন্য নানা দেশের লোক আসায় লোকসংখ্যা কিছু বাড়িয়া যায়। জেনীভা ধর্ম্মতত্ত্ব, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। ইহা বহু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ও সাহিত্যিকের জন্মস্থান বা বাসভূমি। এখানে কয়েকটি প্রাচীন গির্জ্জা, শিক্ষায়তন প্রভৃতি আছে। সেন্ট পীটারের গির্জ্জাটি ১১২৪ ঈশাব্দে নির্ম্মিত। যে শিক্ষায়তনটি ১৮৭৩ ঈশাব্দে জেনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, তাহা ধর্ম্মোপদেষ্টা ক্যাল্ভিন্ কর্ত্তৃক ১৫৫৯ ঈশাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থসংগ্রহ বেশ বড়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্মুখে নানা জাতির খৃষ্টীয় ধর্ম্মসংস্কারকদের মূর্ত্তি আছে। রুশীয় গির্জ্জা, বড় ডাকঘর, এবং অনেকগুলি মিউজিয়ম দেখিবার জিনিষ। রুসো মিউজিয়মটি ছোট। ইহাতে রুসোর নানা রকম ছবি, তাঁহার নানা গ্রন্থের নানাবিধ সংস্করণ প্রভৃতি আছে। তাঁহার কোন কোন বহির হস্তলিপি প্রভৃতিও আছে। জেনীভার মানমন্দিরটি উৎকৃষ্ট। সহরটিতে পণ্যশিল্প শিখাইবার অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। তাহাতে ঘড়ি নির্ম্মাণ, রসায়নীবিদ্যা, ঔষধ প্রস্তুত করিবার বিদ্যা, বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান হয়। এখানে হাঁসপাতাল প্রভৃতি জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান অনেক আছে। জেনীভার কাছে সাত শত বৎসর আগে হইতে বৎসরের মধ্যে কয়েকবার মেলা বসে। তাহাতে ইটালীয়, সুইস্ ও ফরাসী দোকানদারেরা নানারকম জিনিষ বিক্রী করে।

জেনীভা হ্রদ ও রোন্ নদী দ্বারা সহরটি দুইভাগে বিভক্ত। সাতটি সেতুদ্বারা উভয় অংশ সংযুক্ত।

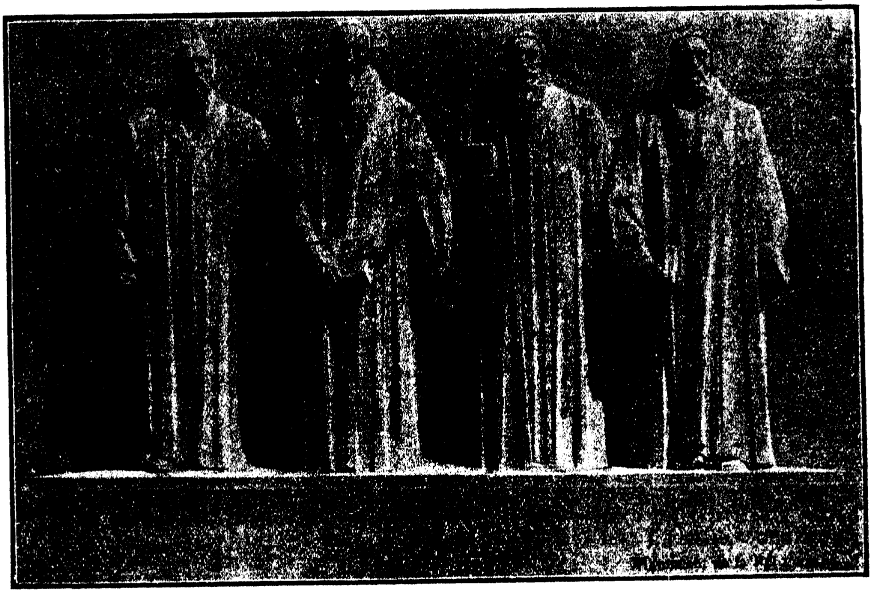


জেনীভায় রুসোর প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি

জেনীভা হ্রদের পোস্তার সমান্তরাল রাস্তাটির উপর অনেকগুলি হোটেল আছে। এইগুলির সামনে কোন ঘরবাড়ী নাই এবং এইগুলি হইতে হ্রদ ও পর্ব্বতের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় বলিয়া, ধনী ও ফ্যাশনেবল্ লোকেরা এইসব হোটেলে থাকে। তন্মধ্যে একটিতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমি একদিন চা-পান ও একদিন মাধ্যাহ্নিক আহার করিয়াছিলাম। হোটেলটির কামরা, হল প্রভৃতি বড় বড়, আস্‌বাবও উৎকৃষ্ট; কিন্তু খাদ্যদ্রব্য, আমি যে অপেক্ষাকৃত সস্তা ছোট হোটেলটিতে ছিলাম, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে হয় নাই।

হ্রদের উত্তরতীরস্থিত পোস্তা ও ঘাটগুলির সমান্তরাল রাস্তার কিয়দংশের পাশ দিয়া সুন্দর গাছের সারি আছে। এই পোস্তায় ও রাস্তায় অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় স্ত্রী পুরুষ বালকবালিকা দলে দলে বেড়াইতে আসে। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে ত খুবই ভিড় হয়। এই সব দিনে ষ্টীমার ও অন্য সব রকম ছোট বড় জলযানে এত ভিড় হয়, যে, মনে হয় যেন সারা সহরের লোক আমোদ-প্রমোদের জন্ম বাহির হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের স্ফূর্ত্তি বাড়ে, স্বাস্থ্য ভাল হয়, সুতরাং কর্ম্মশক্তিও বাড়ে। অবরোধ-প্রথা না থাকায় মেয়েরাও পূর্ণমাত্রায় উপকৃত ও আনন্দিত হইবার সুযোগ পায়। আমরা যখন পাশ্চাত্য লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে চাই, তখন মনে রাখিতে হইবে, যে, আমাদের প্রতিযোগিতা এমন সব জাতির সঙ্গে যাহাদের নরনারী উভয়েই সুস্থ, শিক্ষিত ও সর্ব্ববিধ কার্য্যনির্ব্বাহে সমর্থ। জেনীভা হ্রদের উভয়তীরে ঘাটে ঘাটে বিস্তর চা কফি ও খাবারের দোকান আছে। ঘাটে ষ্টীমার নৌকা প্রভৃতি লাগিবা মাত্র, যাত্রীরা, যাহার যেখানে ইচ্ছা, নামিয়া যায় এবং ছায়াতরুর নীচে রক্ষিত চেয়ারে বসিয়া "জলযোগ" করে, এবং তাসখেলা, পড়া প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা করিতে থাকে। এই প্রকারে খোলা স্বাস্থ্যকর জায়গায় প্রায় সমস্তটা দিন কাটাইয়া তাহারা অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসে। জলযান ছাড়া অনেকে রেলেও যাতায়াত করে। যাহাদের নিজের মোটর গাড়ী আছে, তাহারা তাহাতে বেড়াইতে যায়।

জেনীভা যে ক্যান্টন বা জেলার প্রধান সহর, সেই

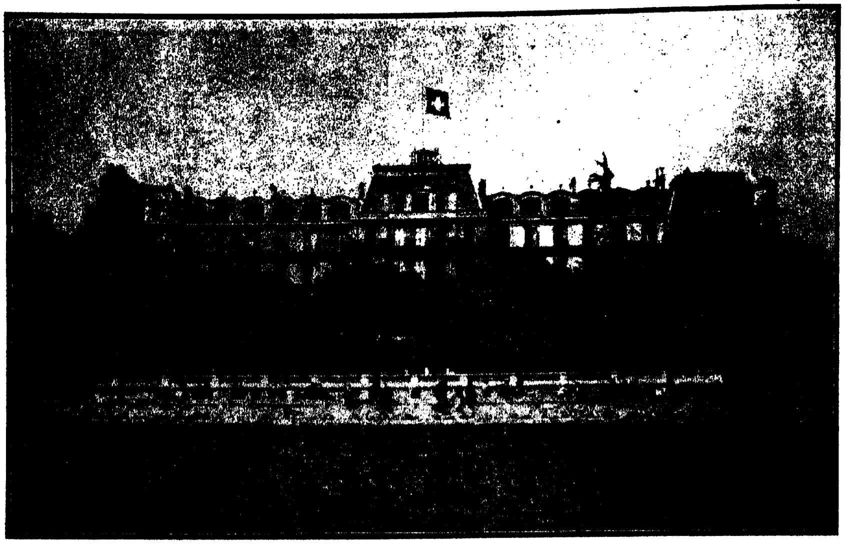


জেনীভায় রিফর্‌মেশন্ স্মৃতি-মূর্ত্তি

জেলার জমী স্বভাবতঃ উর্ব্বর না হইলেও অধিবাসীদের পরিশ্রমে উর্ব্বর হইয়াছে। এইজন্য তরি-তরকারীর বাগান, নানাবিধ ফলের বাগান, দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রভৃতি দ্বারা এই ক্যান্টনের লোকেরা খুব রোজগার করে। একদিন বিকালে ছোট একটি মোটর-নৌকায় হ্রদ পার হইয়া দক্ষিণতীরে অবস্থিত একটি চা-কফির দোকানে "জলযোগ" করিয়া বন্ধুদের সঙ্গে একটি সরু রাস্তা দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তাহার ধারে কয়েকটি ছোট ছোট ফলের বাগান দেখিলাম। সামান্য এক আধ কাঠা জমীতে কত ছোট ছোট ফলের গাছে কত ফল ফলিয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যে-সব গাছের ডাল লতানিয়া নয়, সেইরূপ অনেক গাছকেও বেড়ার তারের উপর দিয়া লতার মত শাখা বিস্তার করান হইয়াছে। এক একটি ডালে এত ফল ধরিয়াছে, যে, মনে হয় যেন ভাঙিয়া পড়িবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করাহয় বলিয়া সুইজার্‌ল্যাণ্ডে সব জেলাতেই দ্রাক্ষাক্ষেত্র, ফলের বাগান প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সুইসরা চাষ ছাড়া অন্য অনেক কাজের দ্বারাও উপার্জ্জন করে; যথা, ঘড়ি নির্ম্মাণ, মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ, গণিতযন্ত্র নির্ম্মাণ, বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ, ইত্যাদি।

জেনীভা মোটের উপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অট্টালিকাগুলি মন্দ নয়। তবে, তাহাতে স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য, নৈপুণ্য বা বৈচিত্র্য বেশী কিছু নাই। সহরটি যত বড়, সে হিসাবে হোটেলের সংখ্যা অনেক বেশী। তাহার কারণ, সুইজারল্যাণ্ডে পৃথিবীর সব মহাদেশ হইতে লোক আসে উহার সৌন্দর্য্য দেখিতে, স্বাস্থ্যলাভ করিতে, এবং নানা অন্তর্জাতিক সভাসমিতিতে যোগ দিতে।

আমি যখন জেনীভা যাই, তখন তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময়। সুতরাং আমি কেবল অট্টালিকাগুলির বহির্দ্দেশ এবং কয়েকটি কামরা দেখিয়াছিলাম, কর্ম্মনিরত অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ দেখি নাই। হলে অনেক অধ্যাপকের আবক্ষ মূর্ত্তি দেখিলাম। তাঁহাদের মুখ বুদ্ধির পরিচায়ক। দেখিবার সময় মুখগুলির উগ্রতাবিহীন শান্ত সংযত ধীর ভাব বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদের



জেনীভা জাতিসংঘের সম্মিলন-গৃহ

অনেকের মুখ দেখিলে মনে হয়, যেন, মানুষগুলা চটিয়া রাগিয়াই আছে, যেন কাহাকেও আক্রমণ করিতে বা বশ্যতাস্বীকার করাইতে যাইতেছে। ইউরোপে ঠিক এই ধরণের চেহারা বেশী চোখে পড়ে নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। এদেশে ইউরোপীয়রা বিশেষতঃ, ইংরেজরা, অনুভব করে, যে, তাহাদের অস্বাভাবিক প্রাধান্য ও প্রভুত্ব রক্ষার একটা প্রধান উপায় বাহ্য ও মানসিক মারমূর্ত্তি পরিহার না করা। কিন্তু তাহাদের নিজের দেশে—স্বাধীন দেশে, তাহাদের এরূপ ব্যবহার অনাবশ্যক, এবং তথায় চোখরাঙানি সহ্য করিবার লোকও খুব কম।

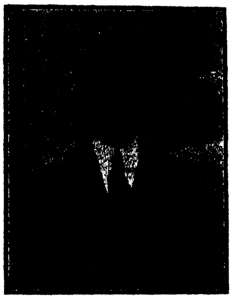
নানাজাতির খৃষ্টীয় ধর্ম্মসংস্কারকদের মূর্ত্তিগুলি গম্ভীর-ভাবোদ্দীপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে একটি উচ্চ ও দীর্ঘ প্রস্তর-প্রাচীরের গাত্রে এই মূর্ত্তিগুলি উৎকীর্ণ। প্রাচীরটির একটি অংশের ছবি দেওয়া হইল। ক্যালভিন্, জন নক্স, হুস্ প্রভৃতির এই মূর্ত্তিগুলির নীচে বাইবেল হইতে উদ্ধৃত বচন খোদিত আছে। প্রাচীরটির পাদ-দেশে একটি কৃত্রিম জলস্রোত প্রবাহিত। তাহার জল স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। তাহাতে শ্বেতপদ্মের মত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া আমার কবিঋষিদের বর্ণিত প্রেম-ভক্তিকমলশোভিত অনন্ত জীবনস্রোতের কথা মনে পড়িয়াছিল।

জেনীভার অন্য একটি স্মারক প্রস্তরমূর্ত্তি স্বাধীনতা-প্রিয় সুইস্‌দের ইতিহাসের একটি ঘটনার কথা লোককে ভুলিতে দেয় না। ১৫১৯ ঈশাব্দে ফিল্‌বের্ত্যার্ বার্তেলিয়ে নামক এক বীর পুরুষের ফাঁসী হয়। যেখানে তাঁহার ফাঁসী হয়, এখন সেখানে একটি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই কারণে বোধ হয় ফাঁসীর ঠিক জায়গাটিতে তাঁহার মূর্ত্তি রাখিবার জন্য তাহা বাড়ীটির প্রাচীরসংলগ্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। ফিল্‌বের্ত্যার্ বার্তেলিয়ে নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিসম্মত মত প্রকাশের অধিকার ত্যাগ না করায় তাঁহার ফাঁসী হয়। যে তারিখে তাঁহার ফাঁসী হইয়াছিল, প্রতি বৎসর সেই তারিখে জেনীভার নাগরিকেরা মূর্ত্তি-টিকে পুষ্পমাল্যবিভূষিত করিয়া এবং বক্তৃতাদি করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

লীগ অব্ নেশ্যন্‌সের সেক্রেটারিয়্যাটের (দপ্তরখানার) জন্য জমী কেনা হইয়াছে, বাড়ী এখনও নির্ম্মিত হয় নাই। এখন যে-সব বাড়ীতে লীগের আফিসাদি আছে, তাহা

অন্ত উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। লীগের ইণ্টার-ন্যাশন্যাল লেবার আফিস (অন্তর্জাতিক শ্রমসম্পর্কীয় আফিস) তাহার জন্য নির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত। ইহা বৃহৎ, কিন্তু ইহার স্থাপত্যের প্রশংসা করিতে পারা যায় না। ইহার একটি সোপানাবলীর পার্শ্বস্থিত দেওয়ালে রঙীন কাচের বৃহৎ ছবি আছে। তাহাও আমার উৎকৃষ্ট মনে হইল না। বাহিরে যে কয়েকটি প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তাহাও মূর্ত্তিশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নহে।

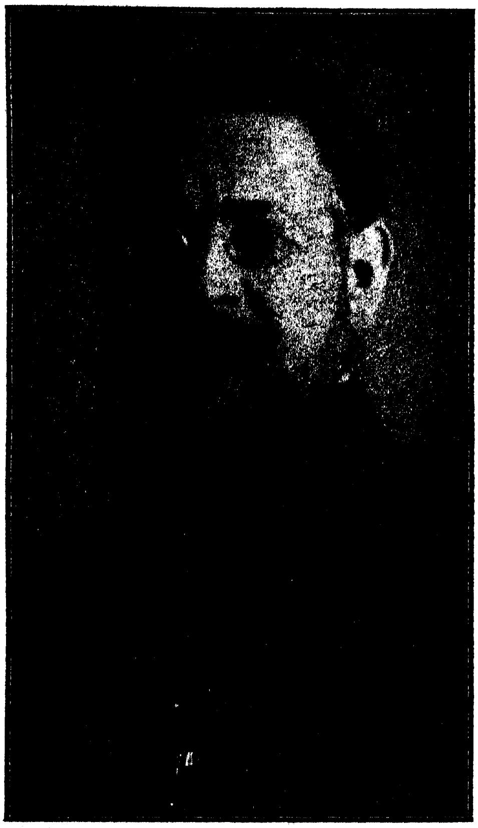
এই লেবার আফিসে আমি দুই একবার মাত্র গিয়াছিলাম। তাহা হইতে ইহার সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক মত প্রকাশ করা যায় না। তবে, আমি যেমন ইউরোপের কোন কোন দেশে কয়েকদিন মাত্র থাকিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি, তেমনি কোন প্রতিষ্ঠান দুই একবার দেখিয়াও যাহা মনে হইয়াছিল, তাহা বলা চলিতে পারে—তাহার মূল্য যাহাই হউক। একটা ধারণা আমার এই হইয়াছিল, যে, এই আফিসে প্রাচ্য-দেশের লোক খুব কম। এটা শুধু ধারণা নয়, ইহার অকাট্য প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জাপান ও ভারতবর্ষের কথা বলিতেছি। জাপান স্বাধীন দেশ, পৃথিবীর প্রবলতম চারিটি দেশের একটি। লীগে জাপান টাকাও দেয় বিস্তর। কিন্তু দেখিলাম, একটি ছোট কামরায় কেবল দু'জন জাপানী ভদ্রলোক কাজ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে আমি বলিলাম, জাপানের পক্ষ হইতে যত লোকের আফিসে কাজ করা উচিত তত লোক নাই। তাঁহারাও বলিলেন, যে, জাপান সম্বন্ধে রিপোর্টাদি লিখিবার জন্য দুটি মানুষ যথেষ্ট নহে। ভারতবর্ষেরও কেবল দুটি মানুষ অত বড় আফিসে কাজ করেন। তাহার মধ্যে আবার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস অস্থায়ীভাবে কাজ করিতেছিলেন। কোন স্থায়ী কাজ তিনি পাইবেন কি না, এখনও ঠিক্ হয় নাই। রিপোর্ট লেখা তাঁহার কাজ। তাহার জন্য তাঁহাকে আফিসের সময় ছাড়া অন্য সময়েও খাটিতে হইত, দেখিয়াছি। কুরিয়ান্ নামক আর-একটি ভারতীয় লোক এই আফিসে কাজ করেন। ইনি ত্রিবাঙ্কুড়ের লোক। ইঁহার কাজ স্থায়ী। এই আফিসের ইউরোপীয় কতকগুলি কর্ম্মচারীকে গল্পগুজব করিয়া সময় কাটাইতে দেখিয়াছিলাম।



ডাঃ রজনীকান্ত দাস

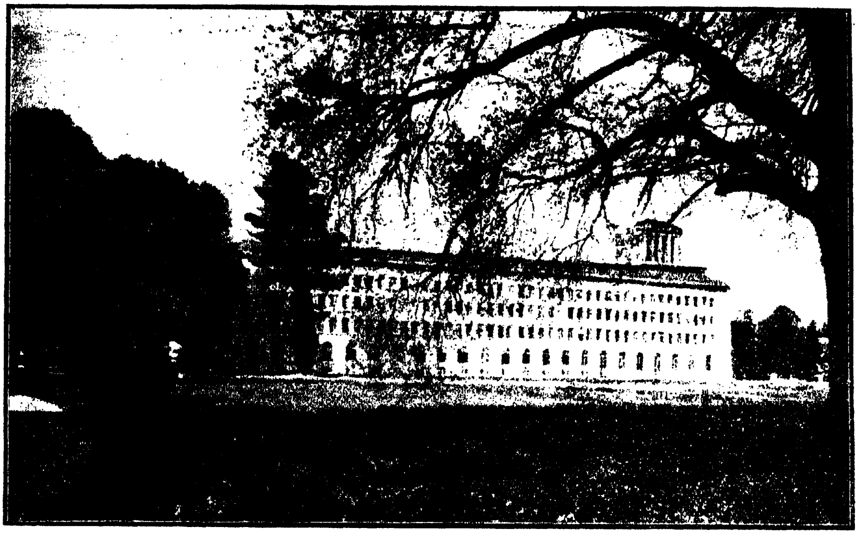
আগে হইতে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া একদিন এই আফিসের ডিরেক্টর মস্যু আল্‌বেয়ার্ টমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। ইনি ফ্রান্সের লোক। মস্যু টমা নমস্কার ও করকম্পনানন্তর তাঁহার কামরায় আমাকে বসাইলেন। কথা বড় বেশী হইল না। তিনি অবাধে দ্রুত ইংরেজী বলিতে পারেন না। সাধারণ নানাবিষয়ে ২।৩ মিনিট কথা হইবার পর তিনি এরূপ ভঙ্গী করিলেন মনে হইল, যে, তিনি নিজের কাজে প্রবৃত্ত হইতে চান। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম, আপনারা বড় ব্যস্ত লোক, আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। তাহাতে তিনি সায় দিলেন! বলিলেন না, "না মশায়, এমন আর কি ব্যস্ত? বসুন না," ইত্যাদি। ভদ্রতা অনেক সময় আমাদিগকে প্রকৃত মনোভাব গোপন করিতে বাধ্য করে। তিনি যে তাহা করিলেন না, ইহা এক দিক্ দিয়া ভাল বটে। কিন্তু আমি বিদেশ হইতে লীগের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম; স্বদেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হইলেও, সম্পূর্ণ অজ্ঞও নহি; সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি আমাকে এক-আধটা প্রশ্নও করিতে পারিতেন। কিন্তু ইঁহার সেরূপ কোন কৌতূহল দেখিলাম না। বোধ হয় সর্কারী রিপোর্ট এবং ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয়দের লেখা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও অন্যান্য বহিই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ইঁহারা যথেষ্ট মনে করেন।

অন্তর্জাতিক শ্রম আফিসের ডেপুটী ডিরেক্টার মিস্টার



ফ্রান্সের মিঃ এলবার্ট টমাস—জেনীভার অন্তর্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল

বাট্‌লার ইংরেজ। টমা সাহেবের সঙ্গে মুলাকাৎ শেষ করিয়া ইঁহার নিকট গেলাম। ইঁহার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল কথা হইয়াছিল; কিন্তু ইনিও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজে হইতে আমাকে কোন প্রশ্ন করেন নাই। ইঁহাদের মনের মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই ভাব বিদ্যমান, যে, ভারত সম্বন্ধে খাঁটি খবর যাহা কিছু জানিবার আছে, তাহা শ্বেতাঙ্গদের মুখ ও লেখনী হইতে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়। কথাপ্রসঙ্গে আমি বাট্‌লার সাহেবকে বলিলাম, ভারতবর্ষ স্বশাসন-ক্ষমতা লাভের যে রাষ্ট্রনৈতিক চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে কলেজের বিতর্ক-সভাগুলি উহার যেরূপ সাহায্য করিতে পারে, লীগও সেইরূপ পারিবে। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, হাঁ না কিছুই বলিলেন না। আমার বলা উচিত ছিল, লীগ তাহাও পারিবে না। কারণ, কলেজের বিতর্ক-সভাগুলিতে ছাত্রেরা তবু ভারতবর্ষের স্বরাজ, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে, লীগ তাহাও পারে না। অন্তর্জাতিক শ্রম আফিস সম্বন্ধে আমি বলিলাম, এই আফিস যদি ঠিক্ ঠিক্ কাজ করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের কিছু উপকার হইতে পারে। কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা কম নয়। সেইজন্য আমি বলিলাম, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের অভাব অভিযোগ দুঃখ সব সময় জানিতে বুঝিতে পারে না, কিম্বা তাহা জানাইতে ইচ্ছুক বা ব্যগ্র হয় না; এই-জন্য স্ত্রীলোকদের পক্ষ হইতে তাহাদের কথা জানাইবার নিমিত্ত কোনও ভারতীয় শিক্ষিত ও যোগ্য স্ত্রীলোককে স্ত্রীজাতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিরূপে জেনীভায় পাঠান উচিত। আমি বলিলাম, এ যাবৎ ভারতীয় পুরুষ ও স্ত্রী-জাতীয় শ্রমিকদের জন্য পুরুষ প্রতিনিধিরা যে-প্রকারে যাহা বলিয়াছেন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মত শিক্ষিতা মহিলা স্ত্রীলোকদের জন্য তাহা বলিতে পারিবেন। বাগ্মিতা, সাহস এবং এতদ্বিষয়ক জ্ঞান, কিছুরই তাঁহার অভাব হইবে না। কিন্তু, আমি ইহাও বলিলাম, ভারত গবর্মেণ্টের ইঁহার মত কোন মহিলাকে পাঠাইবার সম্ভাবনা নাই। তখন মিঃ বাট্‌লার বলিলেন, শ্রমিক আফিস স্বাধীন ও সাক্ষাৎভাবে কোন মহিলা প্রতিনিধিকে আহ্বান করিতে পারেন। কিন্তু আমি দেখিতেছি, এ বৎসরও কোন ভারতীয় মহিলাকে আহ্বান করা হয় নাই। ভবিষ্যতেও হইবে কি না, বলা যায় না। সম্ভাবনা কম। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও যে নারী শ্রমিকদের প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত একমাত্র শিক্ষিতা নারী, তাহাও নহে, শ্রমিকদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও তাহাদের হিতসাধনে নিরত শিক্ষিতা নারীও আছেন। যেমন, আহমেদাবাদের শ্রীমতী অনসূয়া বাই। ভারতীয় শ্রমিকদের কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে কথা উঠায় আমি বলিলাম, তাহারা যে অপেক্ষাকৃত কম কার্য্যক্ষম, তাহার একটা প্রধান কারণ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা। অবশ্য যথেষ্ট

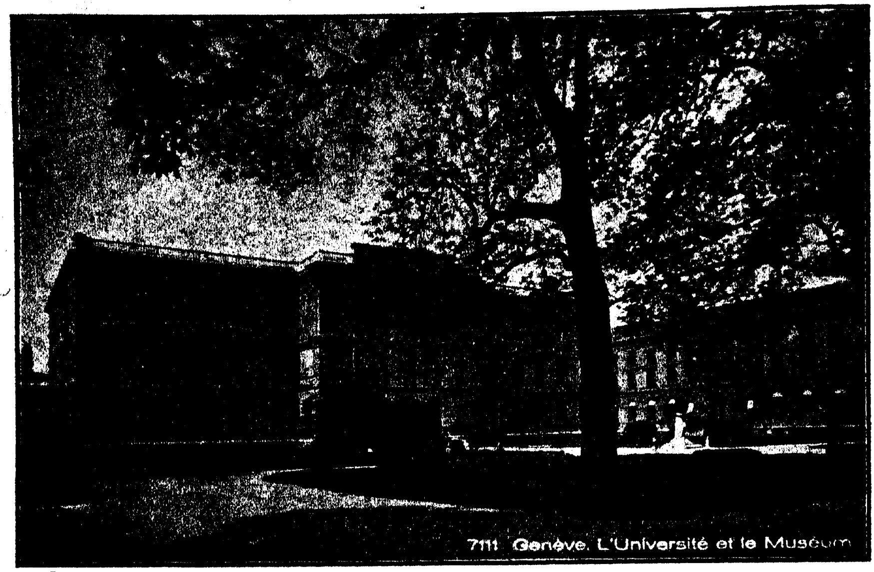


অন্তর্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘের নবনির্ম্মিত গৃহ (জেনীভা)

খাদ্যাভাব এবং অসুস্থতাও অন্যতম প্রধান কারণ। আমি বলিলাম, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে গবর্ন্মেণ্ট এপর্য্যন্ত কোন উৎসাহ দেখান নাই, বরং কখন কখন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে, যে সৈন্যদলে শিক্ষিত সৈনিক বেশী, তাহার রণদক্ষতা বেশী। সুতরাং শ্রমের ক্ষেত্রে যে শিক্ষা শ্রমিকদিগকে অধিকতর কার্য্যদক্ষ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? মিস্‌টার্ বাট্‌লার বোধ হয় চতুর লোক; কেন না, তিনি কথা বলিতেছিলেন কম, শ্রোতার কাজটাই ভাল করিয়া করিতেছিলেন। এখন কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "ভারতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সার্ব্বজনীন শিক্ষার চাহিদা (demand) আছে কি?" আমি বলিলাম, "আছে।" ইহার বেশী আমি তখন কিছু বলি নাই। কিন্তু প্রশ্নটা আমার মনে বিঁধিয়া আছে। বাস্তবিকই কি একটা ভাল বা ভাল বলিয়া স্বীকৃত জিনিষের চাহিদা না থাকিলে গবর্ন্মেণ্ট্ কোন দেশে তাহার বন্দোবস্ত করেন না? ধরুন, বসন্তের জন্য টীকা দেওয়া। ভারতবর্ষে ইহা চালাইবার খুব চেষ্টা হইয়া আসিতেছে; কিন্তু অনেক প্রদেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহার চাহিদা ত নাই-ই, বরং প্রতিকূল ভাব আছে। ইংলণ্ডেও প্রথম প্রথম ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। শিক্ষার কথা ধরুন। জাপানে যে সার্ব্বজনীন শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা চাহিদার দরুন নহে; সম্রাট মুৎসুহিতো নিজেই তাহা করাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেও গত শতাব্দীতে যে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাও চাহিদার জন্য নহে।

মিঃ বাট্‌লার শ্রমিক আফিস হইতে প্রকাশিত কিছু বই ও রিপোর্ট দিতে চাহিয়াছিলেন; তাহা দেশে ফিরিবার পর পাইয়াছি। শ্রমিক আফিস হইতে প্রকাশিত ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ নামক মাসিক পত্রের সহিত মডার্ণ রিভিউ ও ওয়েলফেয়ারের বিনিময়ে মস্যা টমা রাজী হওয়ায় ঐ কাগজ আমি পাইতেছি এবং আমাদের দুখানি পাঠাইতেছি।

অন্তর্জাতিক শ্রম আফিসের লাইব্রেরী মূল্যবান্। শ্রম, শ্রমিক, পণ্যশিল্প, কলকারখানাদি বিষয়ক নানাদেশীয় পুস্তক, রিপোর্ট ও সর্ব্ববিধ সংবাদের ইহা সংগ্রহাগার। এইসকল বিষয়ে যাঁহারা গবেষণা করেন, তাঁহারা এখানে



জেনীভা বিশ্ববিদ্যালয়

যত উপকরণ পাইবেন, অন্য কোন একটি লাইব্রেরীতে বোধ হয় তত পাইবেন না। ইহার আস্‌বাবের সব বা অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় কাঠ হইতে নির্ম্মিত। তাহার জন্য ধন্যবাদটা ভারতবর্ষ পাইয়াছে, কি মনিব ইংলণ্ড পাইয়াছে, মনে পড়িতেছে না। লীগের নিজের লাইব্রেরীতেও, বেশী না হইলেও, বিস্তর বহি আছে। সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কালে উহা বড় লাইব্রেরী হইবে। ইহার জন্য কি কি রকম বহি কেনা হয়, উপহার দিলেই বা কি কি রকম বহি ইহাতে রাখা হয়, জানি না, বুঝিতে পারি না। গ্রন্থকার মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের সম্মতিক্রমে গত বৎসর ৯ই মার্চ্চ আমি ডাকে রেজিষ্টরী করিয়া নিম্নলিখিত বহিগুলি লীগ লাইব্রেরীতে উপহার পাঠাইয়াছিলাম :—

Rise of the Chirstian Power in India, in five volumes ; Story of Satara ; History of Education in India under the Rule of the East India Company ; Ruin of Indian Trade and Industries ; and Colonization in India.

কিন্তু যখন আমি সেপ্টেম্বর মাসে লীগের লাইব্রেরী দেখি, তখন বহিগুলি আমার চোখে পড়ে নাই। কোন কোন বহি লীগ লাইব্রেরীতে রাখা না রাখা কি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের কোন প্রকার নির্দ্দেশ অনুসারে হয় ?

একমাত্র ভারতবর্ষীয়েরাই যাহার পরিচালক ও মালিক এরূপ কোন ভারতবর্ষীয় মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজ লীগ দেশের লাইব্রেরীর পাঠকক্ষের টেবিলে দেখিলাম না। অন্যান্য বহু বহু সাময়িক পত্র রহিয়াছে দেখিলাম। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের প্রভাব যে প্রতিষ্ঠানে খুব বেশী, তাহাতে মডার্ণ রিভিউ না থাকিতে পারে। কিন্তু হিন্দুস্থান রিভিউ এবং ইণ্ডিয়ান রিভিউও দেখিলাম না। যুবকদের খ্রীষ্টিয়ান্ সভার মুখপত্র ইয়ং মেন্ অব্ ইণ্ডিয়া নামক মাসিকটি টেবিলে দেখিলাম। কেবলমাত্র দেশী খ্রীষ্টিয়ানরা উহার পরিচালক, মালিক বা কর্ত্তা নহেন ; বিদেশী লোকও আছেন। ভারতীয় সাপ্তাহিকের মধ্যে পুনার সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া টেবিলে রহিয়াছে দেখিলাম। ইহা খুব যোগ্যতার সহিত পরিচালিত। আমি লীগের তথ্য-প্রচার বিভাগের (Information Sectionএর) প্রধান কর্ম্মচারী মিষ্টার কামিংস্‌কে বলিয়াছিলাম, ভারতীয় সংবাদ-পত্র ও সাময়িকপত্র-সমূহের প্রতিনিধিস্থানীয় উপযুক্তসংখ্যক

কাগজ লাইব্রেরীর টেবিলে রাখা হয় না ; ভারতীয় যে-সব সাময়িক পত্রিকার সব-চেয়ে বেশী কাট্‌তি, তাহার একটিও সেখানে নাই ; অধিকাংশ রকম রাজনৈতিক মতের মুখ-পত্রও তথায় নাই। তিনি বলিলেন, "আমি ফরোআর্ড পাই" (যদিও তাহা টেবিলে রাখা হয় না)। আমি বলিলাম, "আমি মাসিক ও ত্রৈমাসিকের কথা বলিতেছি।" তিনি বলিলেন, "যে-সব কাগজের প্রকাশকেরা লীগকে বিনামূল্যে কাগজ পাঠান, তাঁহাদেরই কাগজ রাখা হয়।" তদনুসারে আমি লীগ-লাইব্রেরীতে মডার্ণ-রিভিউ এবং ওয়েল্‌ফেয়ার পাঠাইতেছি। কিন্তু সে দুটি টেবিলে রাখা হইতেছে কি না, জানি না।

একদিন আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত ভিল্‌নভ্‌ নামক স্থানে রম্যাঁ রলাঁ মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সেখানে ভিলা অল্‌গা নামক ভবনে তাঁহার পিতা ও ভগিনীর সহিত বাস করেন। ভিল্‌নভ রেলে জেনীভা হইতে প্রায় ৫৬ মাইল। প্রায় দুই ঘণ্টার পথ। ষ্টীমারেও যাওয়া যায়, এবং তাহা অধিকতর প্রীতি-করও বটে ; কিন্তু তাহাতে সময় বেশী লাগে। লজানে আমাদিগকে ট্রেন বদ্‌লাইতে হইল। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গিয়াছিলাম। গাড়ী ও বেঞ্চিগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভারতবর্ষের তৃতীয় বা মধ্যম শ্রেণীর মত নোংরা নয়। ভারতবর্ষে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অন্য যে-সব অসুবিধা আছে, তাহারও কিছুমাত্র সুইজার-ল্যাণ্ড বা ইউরোপের অন্য কোন দেশে দেখি নাই। কারণ, দেশগুলি স্বাধীন। আমাদের দেশে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে হইলে টিকিট ক্রয়, সংকীর্ণ ফাটক দিয়া প্লাটফর্মে প্রবেশ, এবং তৎকালে কখন কখন ঘাড়-ধাক্কা প্রহারসম্ভোগ, ধাক্কাধাক্কি করিয়া গাড়ীতে প্রবেশ, তথায় স্থানাভাব, গাড়ী ও বেঞ্চিগুলির অপরিষ্কার অবস্থা, পায়খানার নোংরা অবস্থা ও জলাভাব, ইত্যাদি হইতে নরকের কিছু ধারণা জন্মে। এরূপ অবস্থার জন্য আমরা যে কতকটা দায়ী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু রেলের কর্ত্তৃপক্ষ যদি সব বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করেন, যথেষ্ট জল যোগান, এবং পরিচ্ছন্নতার প্রতি কড়া নজর রাখেন, তাহা হইলে ক্রমশঃ উন্নতি নিশ্চয়ই হইতে পারে।

ভিল্‌নভ্‌ ষ্টেশনে নামিয়া কিছুদূর হাঁটিয়া ভিলা অল্‌গা পৌঁছিতে হয়। ভিলা অল্‌গার অব্যবহিত নিকটের রাস্তাটির দুদিকে এমন ঘনপত্রাবলীবিশিষ্ট দুই সারি ছায়াতরু আছে, যে, রোদ ত দূরে থাক, অল্প বৃষ্টি হইলে তাহাও বোধ করি গায়ে লাগে না। রম্যাঁ রলাঁ ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী মাদ্‌লিন্‌ আমাদিগকে তাঁহাদের বাগানে বসাইলেন। আমার জামাতা শ্রীমান্‌ কালিদাস নাগের নিকট হইতে তাঁহারা আমার নাম শুনিয়াছিলেন। কালিদাস ফ্রান্সে অধ্যয়ন করিবার সময় রলাঁ মহাশয়কে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনায় কিছু সাহায্য করিয়া-ছিলেন। এই সূত্রে রলাঁ পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। রলাঁর বয়স ষাটের উপর। তখন অল্প দিন আগে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইতে সবে আরোগ্য লাভ করিয়া-ছিলেন। এইজন্য স্বাস্থ্য ভাল দেখাইতেছিল না। তাঁহার চক্ষু সুনীল, প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। মুখে দাম্ভিকতা বা তদ্রূপ কিছুর লেশমাত্র নাই। তিনি ইংরেজী বলেন না, তাঁহার ভগিনী বলেন। তাঁহার সহিত অল্প যাহা কথাবার্ত্তা হইয়া-ছিল, তাহা শ্রীমতী মাদ্‌লিনের মধ্যবর্ত্তিতায়। তাঁহাদের অধ্যয়নকক্ষের টেবিলে শ্রীমান্‌ কালিদাস ও শ্রীমতী শান্তার ফোটোগ্রাফ দেখিয়া আমি আহ্লাদ প্রকাশ করায় শ্রীমতী মাদ্‌লীন্‌ হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে দেখাইবার জন্য উহা ওখানে রাখা হয় নাই ; উহা এমনিই সব সময় টেবিলের উপর থাকে।" রম্যাঁ রলাঁর বৃদ্ধ পিতা ভারতবর্ষের লোক আসিয়াছে শুনিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ও আমাদের সহিত করকম্পন করিলেন। তাঁহার বয়স নব্বই পার হইয়াছে। সেরূপ বয়সের পক্ষে তিনি এখনও বেশ সোজা ও শক্ত আছেন। তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভ যে আনন্দ ও সম্মানের বিষয়, তাহা তাঁহাকে ইংরেজীতে জানাইলাম। তাঁহার কন্যা তাঁহাকে তাহা ফরাসীভাষায় বলিলে তিনিও আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

রম্যাঁ রলাঁর গ্রন্থাবলীর ভারতবর্ষে কিরূপ প্রচার, সে-বিষয়ে কথা উঠিলে, আমি বলিলাম, ভারতবর্ষে ফ্রেঞ্চ বেশী লোক জানে না, এই জন্য জ্যাঁ ক্রিস্তফ (জন ক্রিষ্টো-ফার) প্রভৃতি বহির ইংরেজী অনুবাদ ইংরেজী-জানা অনেক লোকে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধীয় তাঁহার ফ্রেঞ্চ

বহির যে ইংরেজী অনুবাদ ভারতবর্ষে বাহির হইয়াছে, তাহারও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে। তাহার পর বোধ হয় আমিই বলিলাম, জ্যাঁ ক্রিস্তফের বাংলা অনুবাদও ক্রমশঃ বাহির হইতেছে। তখন শ্রীমতী মাদ্‌লিন্ বলিলেন, "হাঁ, উহা 'কল্লোলে' বাহির হইতেছে বটে।" তাহাতে আমাদের দলের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বাংলা জানেন? কেমন করিয়া শিখিলেন?" তিনি বলিলেন, "অল্পস্বল্প জানি, কালিদাস কিছু শিখাইয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথের ইটালী-ভ্রমণ সম্বন্ধে কথা উঠিলে, আমরা জানিতে পারিলাম, তথায় দার্শনিক ক্রোচের সহিত রবীন্দ্রনাথের যাহাতে সাক্ষাৎকার না হয়, তাহার জন্য কিরূপ চেষ্টা হইয়াছিল, এবং কি প্রকারে সে চেষ্টা ব্যর্থও হইয়াছিল। ক্রোচে মুসোলিনির দলের লোক নহেন বলিয়া এই চেষ্টা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীরা যখন ভিল্‌নভে হোটেল ডি বায়রনে ছিলেন, তখন তাঁহাদের যে ফোটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল, শ্রীমতী মাদ্‌লিন আমাদিগকে তাহা দেখাইলেন। আমরা অবগত হইলাম, রলাঁ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের ইটালীয় অনুবাদ পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন, শরৎচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, এবং জিজ্ঞাসিলেন, তিনি আর কি কি বহি লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম। জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক কার্য্যের কথা উঠিলে রলাঁ বলিলেন, "তাঁহার কবি-জনোচিত কল্পনা-শক্তিও আছে।" তাহাতে আমাদের দলের এক জন এই মর্ম্মের কথা বলিলেন, যে, ভারতবর্ষে কবি-প্রতিভা, দার্শনিক প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রভৃতির কার্য্য আলাদা আলাদা করিয়া সম্বন্ধবিহীন ভাবে দেখা হয় না; সমুদয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া জাগতিক সকল বিষয়ের একটি সমন্বয়ীভূত ধারণা করাই ভারতবর্ষের আদর্শ ও লক্ষ্য। তখন রলাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আদর্শানুযায়ী পুস্তক কোন ভারতীয় লিখিয়াছেন কি? আমি বলিলাম, "আমি ত জানি না।" তিনি জানিতে চাহিলেন, "তেমন উপযুক্ত লোক কেহ আছেন?" আমি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নাম করিলাম। রলাঁ জানিতে চাহিলেন, তিনি এখনও কেন লেখেন নাই। অবশ্য এরূপ প্রশ্নের উত্তর শীল মহাশয়ই দিতে পারেন। আমি কেবল বলিলাম, "হয়ত তিনি নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান, অথবা হয় ত তিনি মনে করেন ইহার জন্য এখনও তিনি প্রস্তুত হইতে পারেন নাই, কিম্বা ক্রমাগত নূতন অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা তাঁহার ধারণা অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইত্যাদি।"

রলাঁদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলাম। ঘড়ি দেখিয়া বুঝা গেল, শীঘ্র ট্রেন ছাড়িবে। সুতরাং দ্রুত চলিতে লাগিলাম। আমাদের দলে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ। তিনি দৌড়িয়া আগেই গাড়ীতে উঠিলেন। রজনী-বাবুও উঠিলেন। তাঁহার স্ত্রী পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। আমি বুড়া মানুষ, দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ; সুতরাং, বলা বাহুল্য, আমি অনেক দূরে সকলের পশ্চাতে ছিলাম। সিটি দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কিন্তু রজনী-বাবুর স্ত্রী দূর হইতে হাত নাড়িয়া গাড়ী থামাইতে অনুরোধ করিলে, কণ্ডাক্টর মহিলা দেখিয়া গাড়ী থামাইলেন এবং বলিলেন, শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন। তখন রজনী-বাবুর স্ত্রী আঙুল বাড়াইয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, আমার জ্যাঠা মহাশয়কে আমি কেমন করিয়া ফেলিয়া যাইব? তখন কণ্ডাক্টর আরো কিছুক্ষণ গাড়ী থামাইল এবং আমি গাড়ীতে উঠিতে সমর্থ হইলাম। তাড়াতাড়ি গাড়ী উঠার ব্যাপারটির বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ইহা দেখান যে, বিদেশে কোথাও কোথাও কখন কখন অপরিচিত সাধারণ লোকদের জন্যও কণ্ডাক্টাররা এক-আধ মিনিট গাড়ী থামায়। আমাদের দেশে প্রকৃত বা স্থানীয় হোমরাচোমরা ইংরেজ বা ফিরিঙ্গীর জন্য কখন কখন ট্রেন অপেক্ষা করে বটে, কিন্তু দেশী লোকদের জন্য নয়।

গত সেপ্টেম্বরের যে-দিন লীগের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনের শেষ বৈঠক বসে, তাহার আগের দিন "ভারতীয়" প্রতিনিধিরা মাধ্যাহ্নিক ভোজে কয়েকজন ভারতীয় ও অন্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে আমিও ছিলাম। নিমন্ত্রণ-পত্রে লেখা ছিল, সওয়া একটার সময় ভোজ আরম্ভ হইবে। ভারতীয়দের সময়জ্ঞান ও নিয়মনিষ্ঠা কম, ইউরোপ-প্রবাস-কালে এরূপ

অপবাদের কারণ না জন্মাইবার চেষ্টা আমি বরাবরই করিতাম। সুতরাং, ইউরোপীয় রান্না আমার পক্ষে মুখরোচক না হওয়া সত্ত্বেও এবং ক্ষুধা না থাকিলেও, আমি ঠিক সময়ের আগেই গিয়াছিলাম। কিন্তু পরিবেষণ আরম্ভ আর হয় না। তাহার কারণ পরে বলিতেছি। "ভারতীয়" প্রতিনিধিদলের একজন অতিবৃদ্ধ পলিতকেশ ইংরেজ বোধ হয় বড়ই ক্ষুধিত হইয়াছিলেন। তিনি বারবার বলিতেছিলেন, "I wonder if we are to have any lunch at all to-day," "আজকের মধ্যাহ্ন-ভোজনটা অদৃষ্টে আছে কিনা, বুঝতে পারুচি না"। এই ভদ্রলোকটি কথা-প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীগ্ অ্যাসেম্ব্লীর বৈঠকগুলা লাগ্‌ছে কেমন?" আমি বলিলাম, "দু একটা ভাল বক্তৃতা শোনা মন্দ নয়; কিন্তু ক্রমাগত বক্তৃতা ও তাহার অনুবাদ বড় একঘেয়ে লাগে—ঠিক যেন ইস্কুলে অনুবাদের পাঠচর্চ্চা।" * তিনি বলিলেন, "কতকগুলি বক্তার সম্বন্ধে আমার একটি প্রস্তাব আছে—তাহাদিগকে একটি নৌকায় করিয়া জেনীভা হ্রদের মাঝখানে লইয়া গিয়া টুপ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া!"

ভোজ আরম্ভ হইতে দেরী থাকায় আমি একজন ভারতীয় প্রতিনিধির সহিত কথা কহিতেছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, সুইজারল্যাণ্ডে কোন্ কোন্ জায়গা দেখিলেন। আমি বলিলাম, ভিল্‌নভে রমঁ্যা রলাঁর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, রমঁ্যা রলাঁ কে? আমি বলিলাম, তিনি ফ্রান্সের একজন প্রতিভাবান্ গ্রন্থকার ও বিশ্বপ্রেমিক, জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়া স্বদেশ-বাসীদের অপ্রিয় হইয়াছেন, সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, ইত্যাদি। ইহাতেও তিনি "গা করিতেছেন" না দেখিয়া আমি বলিলাম, রলাঁ মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে একখানি বহি লিখিয়াছেন যাহাতে রবীন্দ্র-নাথের আদর্শের আলোচনাও আছে। তখন ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসিলেন, "বহিখানা ইংরেজী, না ফ্রেঞ্চ?" আমি বলিলাম, "ফ্রেঞ্চ, কিন্তু আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে, এবং তাহার অনেক সংস্করণ হইয়াছে।" ভদ্রলোকটির শেষ প্রশ্ন এই—"বহিখানি কি আপনি জেনীভা আসিবার পর প্রকাশিত হইয়াছে, এবং উহার বিষয় কি আপনি এখানে আসিয়া শুনিয়াছেন?" উত্তর—"উহা দুই তিন বৎসর হইল বাহির হইয়াছে, এবং অনুবাদও আমি ইউরোপ আসিবার অনেক আগে, পূর্ব্ব বৎসর, বাহির হইয়াছে।" এইরূপ কথোপকথনের পর আমার অনেক বার মনে হইয়াছে, যাঁহাদের বিশ্বসাহিত্যের অন্ততঃ খবরগুলাও জানা নাই, তাঁহাদের মত লোকের বিদেশে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়া যাওয়া সুবিধাজনক নহে।

অবশেষে বেলা ২৷৷০ টার কিছু আগে বা পরে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুধিত বৃদ্ধ ইংরেজ বলিয়া উঠিলেন, "Here at last they come—like royalty!" "এতক্ষণে এঁরা আস্‌ছেন—রাজারাজড়ার মত।" তাঁহারা ভাইকাউণ্ট সেসিল ও লেডী সেসিল। তাঁহারাই ছিলেন প্রধান অতিথি। ভোজ আরম্ভ হইল। আগে হইতে এক একটি কার্ডে প্রত্যেক অতিথির নাম ছাপিয়া প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট চেয়ারের সাম্‌নে টেবিল রাখা হইয়াছিল। আমি পাশ্চাত্য আদবকায়দা ও ভোজনরীতিতে অনভ্যস্ত। সুতরাং আমাকে দুই ইংরেজমহিলার মাঝখানে স্থান দেওয়ায় আমি সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুই জনেই অতিশয় ভদ্র; আমার ভুলচুক যাহা হইতেছিল, তাহা তাঁহারা গ্রাহ্যও করেন নাই। একদিকে ছিলেন লেডী সেসিল। তিনি বর্ষীয়সী, স্বাস্থ্যও খারাপ মনে হইল। সম্পূর্ণ বধির; কিছু শুনিতে হইলেই কানের নিকট যন্ত্র ধরেন। আমি কিছু বলিতে চাহিলে আমার দিকে টেলিফোনের কথা কহিবার কলের মত জিনিষটি আগাইয়া দিতেন। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "ভারতবর্ষ দেখিতে ইচ্ছা আছে, বর্ত্তমান্ রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরুইন্ আমাদিগকে নিমন্ত্রণও করিয়াছেন।" তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, "কিন্তু, মিস্টার চ্যাটার্জ্জি, আমার সাপের ভয় ভয়ানক বেশী!" আমি বলিলাম, "মহাশয়া, আমার বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে; মফঃস্বলেই বাড়ী; কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি, সাপুড়েদের কাছে অনেকবার সাপ

* লীগে ইংরেজীতে বক্তৃতা হইলে ঠিক্ তাহার পরেই ফ্রেঞ্চ অনুবাদ এবং ফ্রেঞ্চে বক্তৃতা হইলে ঠিক্ তাহার পরেই ইংরেজী অনুবাদ হয়।



ফিলিবার্ট বার্থিলিয়ারের মনুমেণ্ট

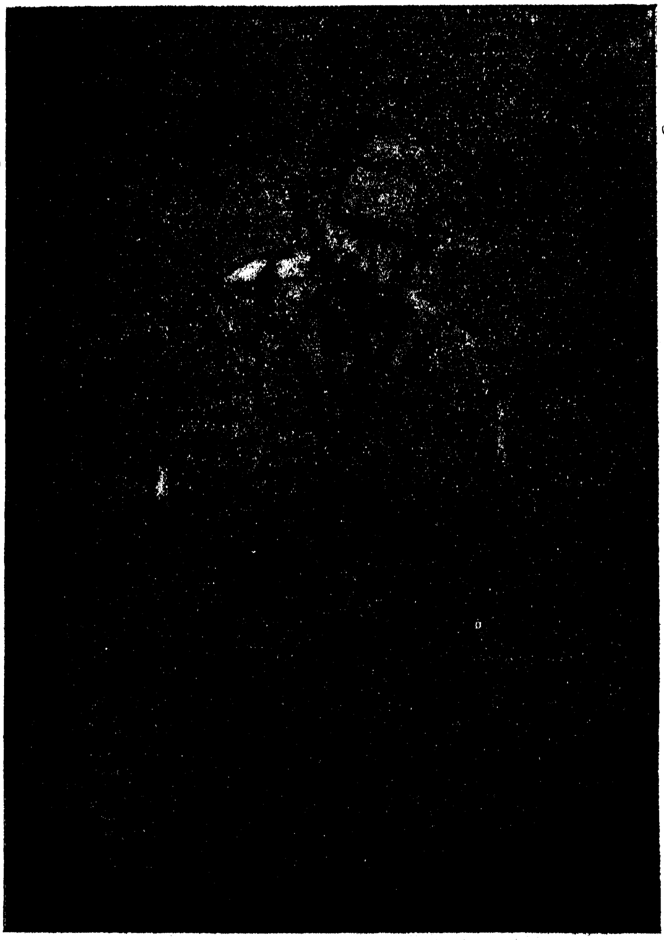
দেখিলেও, বন্য অবস্থায় সাপ দেখিয়াছি বোধ হয় দু তিন-বার মাত্র। আপনি ভারতবর্ষে গেলে আপনাকে খুব ভাল ভাল জায়গাই দেখান হইবে; সাপের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকার হইবার সম্ভাবনা কম!" আমার ডান দিকে যে মহিলাটি ছিলেন, তিনি মিস বেঞ্জ, এম্-এস্‌সি, অষ্ট্রেলিয়ার ডেলিগেট্। প্রৌঢ়া। ভারতবর্ষে তিন সপ্তাহ বেড়াইয়াছেন। জয়পুর দেখিয়াছেন। আবার অধিকতর দিনের জন্য এদেশে আসিবেন বলিলেন। পূর্ব্বোক্ত ক্ষুধিত ইংরেজটির স্থান হইয়াছিল ঠিক আমার সম্মুখে। তিনি দেখিলাম খুব ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ডিশের পর ডিশ সাফ করিতেছেন।

পুঃ—একটা কথা যথাস্থানে লেখা হয় নাই। আমি মডার্ণ রিভিউয়ের জন্য জেনীভা হইতে প্রথম যে এক কিস্তি বিবিধ প্রসঙ্গ পাঠাই, তাহা লীগ্ ডাকঘরে রেজিষ্টরী করিয়া পাঠান হয়। রেজিষ্টরী করিবার ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, প্যাকেটটাতে কি আছে। উত্তরে বলা হয়, সংবাদপত্রের জন্য লেখা ও ফোটোগ্রাফ। তাহাতে সে প্যাকেটটি রসীদ দিয়া গ্রহণ করে। এক বৃহস্পতিবারে ইহা ঘটে। তাহাই ভারতবর্ষে ডাকে কিছু পাঠাইবার দিন। পরবর্ত্তী শনিবারে প্যাকেটটি ফেরত আসে—এই ওজুহাতে যে উহাতে চিঠি আছে! বলা বাহুল্য, উহাতে চিঠি ছিল না। ডাকের পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মী বা অন্য কেহ উহা খুলিয়াছিল। এই খোলার কাজটা রেজিষ্টারীর রসীদ দিবার আগে করিলেই ঠিক হইত। তাহা হইলে তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইত, যে, উহাতে চিঠি নাই, এবং প্যাকেটটির কলিকাতা পৌঁছিতে এক সপ্তাহ বিলম্ব হইত না। এক সপ্তাহ বিলম্ব হওয়ায় আমার লেখাগুলি অক্টোবরের কাগজে বাহির না হইয়া নবেম্বরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। অবশ্য, প্যাকেটটি কে খুলিয়া-ছিল এবং খুলিবার উদ্দেশ্য কি ছিল, বলিতে পারি না।

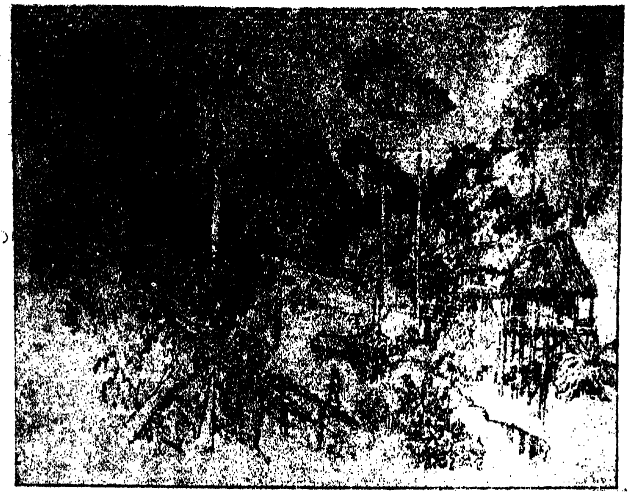
পঞ্চশস্য

জোশেফ পেন্নেল—

১৯২৬ সালের ২৩এ এপ্রিল তারিখে ফিলাডেলফিয়ার "হুইসলার" "খামখেয়ালী" চিত্রকর জোসেফ পেন্নেলের মৃত্যু হইয়াছে। পেন্নেল হুইসলারের একজন ভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্ধ অনুকরণ করিতেন না। চিত্রশিল্পে পেন্নেল আপন বিশেষত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ঘরে বসিয়া আপন কল্পনার সাহায্যে চিত্রশিল্পে দক্ষতা লাভ করেন; তাঁহার এই সহজাত গুণটিকে তিনি অন্য কাহারও দ্বারা সংস্কৃত হইতে দেন নাই। তিনি আপন মনে সম্পূর্ণ নিজস্ব ষ্টাইলে



জোসেফ পেন্নেল
(তাঁহার ছাত্র হেনরী জিপিয়ার কর্ত্তৃক অঙ্কিত)।



পানামা খাল



নায়গারা জলপ্রপাত

এমন চমৎকার ছবি আঁকিতে ও 'এচিং' করিতে লাগিলেন যে চারিদিকে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ে ও বিখ্যাত ভ্রমণকারীরা তাঁহার দ্বারা তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত চিত্রিত করিবার জন্ত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকেন। এই ভাবে তিনি অনেক ভ্রমণকাহিনী চিত্রিত করিয়াছেন। বার্ণার্ড শ সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি চমৎকার ছবি আছে। হেনরী জেম্‌সের অনেকগুলি বই ইনি চিত্রিত করিয়াছেন। এখানে আমরা তাঁহার দুটি এচিংয়ের প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম, পানামাখাল ছবিখানি সম্বন্ধে কলাবিদেরা বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকেন।

—

চীনের জাগরণ—

আজ মহাচীনের মহাজাগরণ সুরু হইয়াছে; যে গাঢ় ঘুমে সে আচ্ছন্ন ছিল ১৯১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সে-ঘুম তাহার প্রথম ভঙ্গ হইয়াছে এবং সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত চীনে অন্তর্বিপ্লব, বহির্বিবাদ লাগিয়াই আছে। খৃঃ পূঃ ২৮০০ সন হইতে চীনদেশের ইতিহাস সংগৃহীত আছে। চীন মহাদেশ পৃথিবীর প্রাচীনতম সুসভ্য দেশ। কিন্তু সেই অতীতযুগ হইতে আজ পর্যন্ত চীনের আবালবৃদ্ধবনিতা তেমন উদ্বুদ্ধ হয় নাই যেমন হইয়াছে ১৯১২ সন হইতে—যখন চীনেরই এক মহাপুরুষ স্যান-ইয়াৎ-সেন সমগ্র চীনে এক সাধারণ প্রজাতন্ত্র গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং সুপ্ত চীনকে পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। আজ গৃহ-বিবাদ, অন্তর্বিপ্লব দাবানলের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে, দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ সহর সাংঘাইয়ের ধন-জন-সম্পত্তি আজ বিদেশী শক্তির করায়ত্ত এবং বিদেশী নৌবহর পীতসাগরের উপকূলে কামান দাগিবার উদ্দেশে মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, চীনের এই জাগরণের সহিত 'রেড' রুষিয়ার বিশেষ যোগ আছে এবং পাকা-পোক্ত রাজতন্ত্র ছাড়িয়া সহসা একেবারে প্রজাতন্ত্রের চরম বিকাশ এই বোল্‌শেভিজমের মোহে পড়িয়া চীন ধ্বংসের পথেই চলিয়াছে। চীনের বাহিরের লোকেরা যাহাই মনে করুক চীনের গণতন্ত্রবাদীরা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিতেছেন যে, বোলশেভিক বা অন্য কোনো বিদেশীয় প্রভাব এখানে টিকিবে না, চীন চীনই থাকিবে। তাঁহারা ইহাও বলিতেছেন যে, আজ উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীন পরস্পর বিরোধী হইলেও উভয় দলেরই ভিতরের উদ্দেশ্য এক;—চীন হইতে সমস্ত বৈদেশিক শক্তিকে বিতাড়িত করিতে উভয় দলই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

চীনে আজ যে বোলশেভিক প্রভাব লক্ষিত হইতেছে তাহার মূলে আছেন মস্কোর এক দীন দরিদ্র শিক্ষক—বোরোডিন। ইনি বহুকাল পূর্ব্বে ডাঃ স্যান-ইয়াৎ-সেনের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া চীনের শিক্ষা বিস্তারকল্পে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তিনি চীনকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ্চ তারিখে ডাঃ স্যান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পরও বোরোডিন ডাঃ স্যান-ইয়াৎ-সেন প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার যুবক-পুত্র সান ফু কর্ত্তৃক পরিচালিত কুয়োমিনটাং দলের প্রাণস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। ইনিও উত্তর চীনের সামাজ্যতন্ত্র উচ্ছেদ করিবার জন্য উৎসুক। মাত্র দিন কয়েক পূর্ব্বে ইহার পত্নী উত্তরচীনের (পিকিং রাজসরকার) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য ধৃত হইয়াছেন।

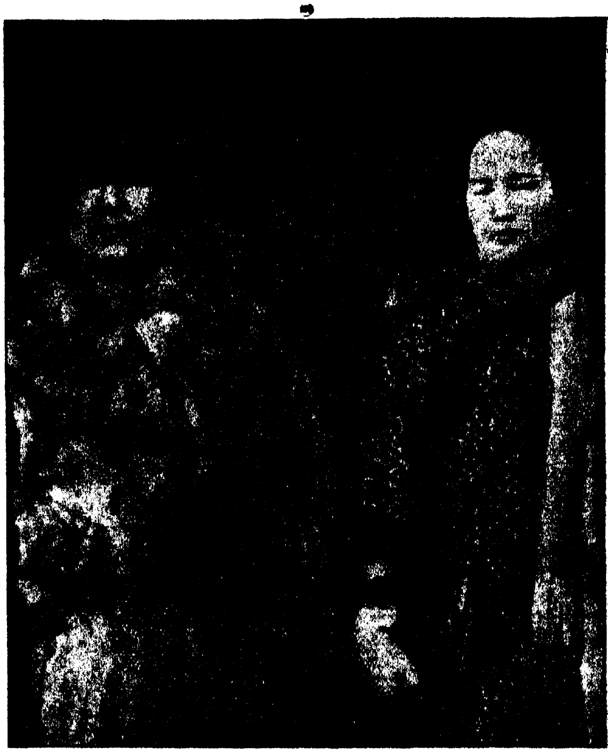
চীনের বর্ত্তমান মনোভাব বুঝিতে হইলে চীনের অধিবাসীদের নিকট হইতেই তাহা জানা আবশ্যক। শুধু পাশ্চাত্য সংবাদপত্র-সেবীদের কল্পিত বা অর্দ্ধসত্য কথা শুনিলে ভুল করা হইবে। অধুনা চীনে কি কি ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, পিকিংয়ের সিং-হু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক বিখ্যাত পণ্ডিত এস, ইউই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তাহা এইরূপ—

"চীনে বর্ত্তমানে যে যুগ চলিতেছে তাহা যুদ্ধ-বিবাদের যুগ—বৈদেশিক শক্তির কবল হইতে চীনকে মুক্তি পাইবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইতেছে। এবং ভিতরের দিকে চীনদেশে চীন-রাজতন্ত্রের যথেচ্ছাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ১৯১১ সাল হইতে অন্তর্বিদ্রোহ চলিয়াছে। যতদিন চীনে সমস্ত বৈদেশিক শক্তি বিতাড়িত হইয়া এক সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন এই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে।

'শিল্প-কলা-জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক কথায় 'কাল্‌চারে'র দিক হইতে চীনের জাগরণ সুরু হইয়াছে ১৯১৭ সন হইতে। চীনের অশিক্ষা দূর করিয়া সাধারণের মনোবৃত্তি জাগ্রত করিবার বিপুল আয়োজন চলিয়াছে এবং চীনে একটিও অশিক্ষিত লোক থাকা পর্য্যন্ত এই আন্দোলন বন্ধ হইবে না।

"কিন্তু বৈদেশিক শক্তি-সমূহের কূট সন্ধি-সর্ত্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চীন বিশেষভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বিগত ৮০ বৎসর ধরিয়া এইভাবের অন্যায় সন্ধি-বন্ধনে চীন 'আষ্টে-পৃষ্টে' বাঁধা পড়িয়াছে। যতদিন না বৈদেশিক শক্তিসংঘ চীনের প্রতি এই আন্তর্জাতিক অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার করিয়া পৃথিবীর জাতিসংঘে চীনের ন্যায্য স্থান ছাড়িয়া দিবে ততদিন পর্য্যন্ত চীন এই অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে প্রাণপণ করিবে।

"চীন আজ কোনো বৈদেশিক শক্তির নিকট কোনো বিশেষ অধিকার ভিক্ষা করিতেছে না, তাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা প্রাপ্ত হইলেই সে সন্তুষ্ট থাকিবে।"



ডাঃ সেনের সুযোগ্যা পত্নী (ফার-কোট গায়ে) ও তাঁহার পুত্র মেয়র সান-ফুর পত্নী।



সাংঘাই বন্দর
(অধুনা ইংরেজ, ফরাসী ও ইতালিয়দের দ্বারা সুরক্ষিত)।

চীনের ঐক্য-বন্ধন আজ অনেকটা দৃঢ় হইয়াছে। চীনের চল্লিশ কোটি অধিবাসীই আজ কুয়োমিনটাং দলের পররাষ্ট্রসচিব ইউজিন চেনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে যে, "বৈদেশিক সাম্রাজ্য-তন্ত্রের অত্যাচারের প্রতীকার করিতে চীন কখনই ছাড়িবে না।"

ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকান প্রভৃতি শ্বেত-কায় জাতিসমূহ এতকাল চীনে যে প্রভুত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল এখন তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। চীনের জাগ্রত প্রজাশক্তির কাছে তাহাদের কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই। তাহারা প্রায় সকলেই সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হৃদয়ে সুরক্ষিত সাংঘাই সহরে আশ্রয় লইতেছে।

সহরে সহরে খুন জখম গুপ্ত হত্যা অবাধে চলিতেছে এবং যতদিন না একদল আর একদলকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে পারে ততদিন এইরূপ চলিতে থাকিবে। চীনের সমস্ত বড় বড় বন্দরে এতকাল বৈদেশিক শক্তির একছত্র অধিকার ছিল। বর্ত্তমানে চীনের জনসাধারণ এইগুলি অধিকার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বৈদেশিক

শক্তিরা কাঁটার বেড়া দিয়া সমস্ত বন্দরগুলি ঘেরিয়া ফেলিয়াছে ও কামান বন্দুক লইয়া সব সময় প্রস্তুত আছে।

১৯১২ সালে ডাঃ স্যানইয়াৎ-সেনের জীবিতাবস্থায় কুয়োমিন্‌টাং দল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ চীনের শতকরা ৫৫ জন লোক এই দলের অন্তর্ভুক্ত এবং অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র চীনই যে এই দলভুক্ত হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কুয়োমিন্‌টাং দল হ্যাঙ্কোতে ইংরেজ শক্তিকে বিশেষ লাঞ্ছিত করিয়া সম্প্রতি সাংঘাই বন্দর অবরোধ করিয়াছে কারণ এই সাংঘাই বন্দরই অন্তর্জাতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল একথা তাহারা জানে।



ক্যাণ্টনে জাতীয় সম্মিলনী-গৃহে ডাক্তার স্যান-ইয়াৎ-সেনের প্রতিকৃতি। এখানে প্রতি সোমবার প্রাতে ডাঃ সেনের স্মৃতির উদ্দেশে জাতীয় দল অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া থাকেন।



বামদিক হইতে—মাইকেল বোরোডিন—কুয়োমিনটাং দলের মন্ত্রী, অন্য একজন রুষীয় মন্ত্রী; জেনারেল ষ্টালেন—রুষীয় এবং সেনাধ্যক্ষ চিয়াং কাই শেক।

কুয়োমিন্‌টাং দলের প্রচারকগণ দলেদলে চীনের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া ফিরিতেছে ও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে চীনের জনসাধারণকে



ক্যাণ্টন হইতে উচাং-এর পথে কুয়োমিনটাং সৈন্যদল

উত্তেজিত করিতেছে। এইসকল বৈদেশিক শক্তির সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই আছে—ইহারা চীনের সমস্ত বন্দর দখল করিয়া খুসীমত শুল্ক আদায় করিতেছে, সমস্ত জলপথে যথেষ্ট নৌকা ষ্টীমার প্রভৃতি চালাইয়া চীনের বহির্বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে এবং চীনের কোনো আইন মানিয়া চলিতে ইহারা প্রস্তুত নহে। ইহারা নিজেদের মনগড়া আইন অনুযায়ী চলিতেছে ফিরিতেছে।

অথচ, এই বৈদেশিকগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র চীনসম্বন্ধে এমনভাবে সংবাদ প্রেরণ করিতেছে যেন চীনের জনসাধারণ তাহাদিগের উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও অকারণ হত্যা সুরু করিয়াছে। এই ওজুহাতে ইতিমধ্যেই প্রেসিডেণ্ট কুলিজ চীনে আমেরিকার অধিবাসীদের রক্ষাকল্পে এক বিরাটবাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন। ফরাসী ও ইংরেজরাও সৈন্য লইয়া প্রস্তুত আছে।

কিন্তু কুয়োমিন্‌টাং দল দমিবার নহে; তাহারা স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণ করিয়াছে; ইহারা বক্সার দলের মত ধর্ম্মের ভাণ করে না—ইহারা একটি মাত্র দোহাই পাড়ে—তাহা স্বদেশের স্বাধীনতা। চীনদেশকে শাসন করিবার ন্যায্য অধিকার ইহারা দাবী করে।

এই দলের একাগ্রতা ও মৃত্যুপণ দেখিয়া বৈদেশিক শক্তিসমূহ প্রায়ই সন্ধিবিগ্রহের কথা তুলিতেছেন, কিন্তু চীনের বন্দরসমূহ দখলে না আসিলে কুয়োমিন্‌টাং দল সন্ধি করিবে না।

সব-চাইতে মুস্কিল হইয়াছে জাপানের; প্রাচ্য ও প্রতিবেশী এই জাতির বিরুদ্ধে যাইবে কি না ইহা লইয়া সে মহাভাবনায় পড়িয়াছে; অথচ ইংরেজ ও আমেরিকানরা তাহাকে ন্যায়ধর্ম্মের ওজুহাতে চীনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে।

চীনের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার সময় আসে নাই; চীনের সংবাদ বিকৃত হইয়া আসিতেছে—তবে এইমাত্র স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই কুয়োমিন্‌টাং দলের প্রভাবে চীন আজ যেভাবে জাগিয়াছে এমন জাগরণ তাহার কখনো হয় নাই এবং সম্ভবতঃ চীনের চিরন্তন স্বাধীনতার ইহাই সূত্রপাত।

'কুয়োমিন্‌টাং' শব্দের অর্থ এই—কুয়ো অর্থে দেশ, মিন—জনসাধারণ ও টাং—সঙ্ঘ; অর্থাৎ জনসাধারণের কবলে দেশকে আনিবার জন্য সঙ্ঘ। দেশপ্রেমই এই সঙ্ঘের মূলমন্ত্র।

কুয়োমিনটাং দলের উদ্দেশ্য—এই তিনটি—

১। দেশবাসীর সত্য অধিকার স্থাপন—চীন মহাদেশকে সকল বৈদেশিক শক্তির কবল হইতে মুক্ত করা; কামানের মুখে যে-সকল অন্যায় সন্ধি-সর্ত্তে চীন স্বীকৃত হইয়াছিল সেগুলির উচ্ছেদ করা।

২। প্রজাতন্ত্র স্থাপন—দেশের লোককে শিক্ষিত করা ও সত্য প্রজাতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে সকলকে জ্ঞানদান করা।

৩। দেশবাসীর জীবনযাত্রা—দেশবাসীর জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নততর করা; ব্যবসা বাণিজ্যে শ্রমিকের অধিকার সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করা; চীনের স্ত্রী ও বালক শ্রমিকদল বর্ত্তমানে যে বৈদেশিক কলকারখানায় সামান্য বেতনে দৈনিক ১৫ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করে তাহা বন্ধ করা।

স্বর্গীয় ডাক্তার স্যান-ইয়াৎ-সেন সর্ব্বপ্রথমে এইসকল মতবাদ প্রচার করেন এবং তিনি চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি হইয়া এই কুয়োমিন্‌টাং-দল প্রতিষ্ঠিত করেন। চীনের বর্ত্তমান জাগরণের মূলে একমাত্র তাঁহার বিপুল উদ্যম ও কর্ম্মশক্তি নিহিত রহিয়াছে। আমরা আষাঢ় সংখ্যায় এই মহাপুরুষের জীবনী প্রকাশ করিব। বর্ত্তমান



সাংহাইয়ের ইংরেজ-ভৃত্য ভারতীয় সৈন্যদল

সংখ্যা প্রবাসীর অন্যত্র কুয়োমিনটাং দলের জাতীয় সঙ্গীতের একটি অনুবাদ বাহির হইয়াছে। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়।

কুয়োমিন্‌টাং-দল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ইহার সভ্যসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে; সর্ব্বপ্রথমে চীনের ছাত্রসম্প্রদায় ইহার সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হয় এবং ডাঃ স্যান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পরই ক্যান্টন সহর ইহাদের অধিকারে আসে। টি ভি সুং নামক একজন সুযোগ্য ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের রাজস্ব সচিব হইয়া এই দলের ধনবল বৃদ্ধি করিতে সুরু করেন।

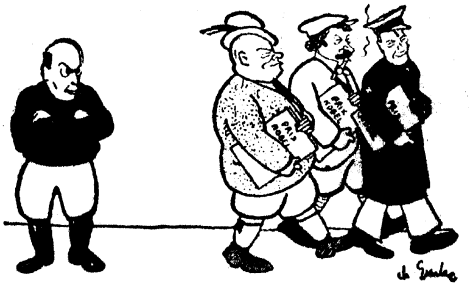
ডাঃ সেন জীবিতাবস্থায় যাহা করিতে পারেন নাই তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার অনুচরেরা সেই কার্য্য করিতে সক্ষম হন; অতি দ্রুত দলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ডাঃ সেনের সুযোগ্য পত্নী ও পুত্র সান-ফু, এই দলের সুযোগ্য সেনাপতি চ্যাং কাই শেক, পররাষ্ট্রসচিব ইউজিন চেন প্রভৃতি প্রবল বিক্রমে ডাঃ সেনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মৃত্যু ও দৈহিক ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া ক্যান্টন হইতে সর্ব্বত্র বিজয়যাত্রা করেন এবং দক্ষিণের সকল খণ্ডনেতাকে পরাজিত করিয়া সাংহাইয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। এই পরাজিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উ-পি-ফু একজন। এদিকে পিকিং হইতে বিতাড়িত খ্রীষ্টিয়ান সেনাপতি ফেংও সদলবলে ইহাদের সহিত যোগদান করেন। কুয়োমিনটাং দলের ন্যায় ফেংএর দলও রুষিয়ার সমর-পদ্ধতিতে শিক্ষিত। এখন ইহাদের বিরুদ্ধে তিনটি প্রবল দল যুদ্ধ করিতেছেন; প্রথম—উত্তর চীনের পিকিং সরকার, দ্বিতীয়—খণ্ডনেতা চ্যাং সো লিন—বৈদেশিক শক্তিরা ইহাকে সাম্রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া কুয়োমিন্‌টাংদলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে; পরাজিত সেনাপতি উ-পি-ফু ইহার সহিত যোগ দিয়াছেন, এবং তৃতীয় বৈদেশিক শক্তিসমূহ। কিন্তু যেভাবে কুয়োমিন-টাং দলের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় অদূর-ভবিষ্যতে সমগ্র চীনে এই কুয়োমিন্‌টাং দল ছাড়া অন্য কোনো শক্তি থাকিবে না। আমরা ভবিষ্যতে চীনে বোলশেভিক প্রভাব সম্বন্ধেও আলোচনা করিব।

—

পৃথিবীর শান্তিরক্ষায় ইংরেজ ও ফরাসী—

পাশের ব্যঙ্গচিত্র দুইটিতে গতবৎসরের নোবেল শান্তি-পুরস্কার লইয়া কৌতুক করা হইয়াছে। ইহার প্রথমখানি কোনো ফরাসী চিত্রকরের অঙ্কিত ও দ্বিতীয়টি মস্কোর ইজভেষ্টিয়া নামক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম ছবিখানির ভাব এইরূপ—ইংরেজ চেম্বারলেন, ফরাসী ব্রিয়ঁা এবং জার্ম্মান ষ্ট্রেসম্যান পৃথিবীর শান্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কিছুই করেন নাই বরঞ্চ সমস্ত পৃথিবী এখন অশান্তির আকর হইয়া আছে।



মুসোলিনি—তোমরা ত নোবেল-শান্তি-পুরস্কার পাইলে! আমি বেচারা কি দোষ করিলাম!



শান্তি পুরস্কার পাইয়া ক্লান্ত হইয়া ইংরেজ চেম্বারলেন ও ফরাসী ব্রিয়ঁা একটু বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় চীন, সিরিয়া ও মরক্কোর তরফ হইতে তিনজন প্রতিনিধি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতে আসিয়াছে। এই তিনটি দেশই এখন যুদ্ধ ও অন্তর্বিপ্লবে পূর্ণ।

ইঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা নিজেদের দেশের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্যই করিয়াছেন। মুসোলিনিও ঠিক তাহাই করিতেছেন অথচ তাঁহাকে অত্যাচারী, অশান্তিকারী ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া

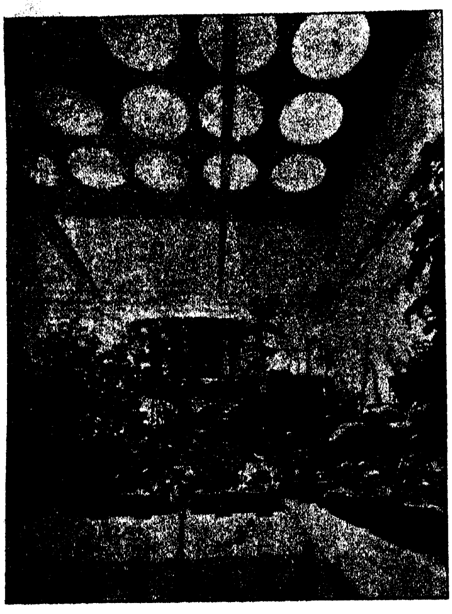
হইয়াছে। এই তিন জনকে শান্তি পুরস্কার পাইতে দেখিয়া মুসোলিনি বলিতেছেন—"তোমরা ত পাইলে; কিন্তু আমি বেচারা কি দোষ করিলাম!"

দ্বিতীয় ছবিখানিতে চেম্বার লেন ও ব্রিয়াঁকে চীন, সিরিয়া ও মরক্কোর প্রতিনিধিরা ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছেন। ছবিখানির বক্তব্য এই যে, চীনে, সিরিয়াতে ও মরক্কোতেও তোমরা অন্যায় অত্যাচারের চূড়ান্ত করিতেছ এবং এই তিনটি দেশকে শোষণ করিবার কোন চেষ্টারই ত্রুটি দেখিতেছি না, অথচ তোমরাই শান্তি-পুরস্কার পাইলে!

—

কৃত্রিম আলোকে বৃক্ষপালন—

শীতপ্রধান দেশে যথেষ্ট আলোক ও উত্তাপের অভাবে অনেক বৃক্ষলতা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না অথচ বৃক্ষতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে হইলে সকলপ্রকার গাছের সঙ্গে পরিচয় রাখা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নিউইয়র্কের বয়েস টমসন ইনষ্টিটিউটে কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে



কৃত্রিম আলোকে বৃক্ষ পালন

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বৃক্ষসমূহকে সঞ্জীবিত রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। পাশে সেই ইনসটিউটের একটি কৃত্রিম আলোকপূর্ণ কক্ষের ছবি দেওয়া হইল। ছাদের ছিদ্র দিয়া আলোক-রশ্মি আসিয়া একটি কাঁচের আবরণে প্রতিহত হইয়া চারিদিকে সমান ছড়াইয়া পড়ে ও এই আলোক ও উত্তাপে গাছগুলি সজীব থাকে। কিন্তু আলোক ও উত্তাপের মাত্রাধিক্য ঘটিলে গাছগুলি মরিয়া যায়।

—

শক্তিমানের জয়—

ইংরেজীতে survival of the fittest বা যোগ্যতমের জয় বলিয়া একটা কথা আছে। পাশের ছবিতে তাহারাই একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। একটি দুর্ব্বল 'ডাগলাস্ ফার' গাছকে তাহারই কোনো শক্তিমান প্রতিবেশী গ্রাস করিয়া নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া ফেলিয়াছিল। বড়গাছটিকে কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ছবির



গাছের ভিতরে গাছ

ভিতরের ও বাহিরের অংশ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের গাছের। প্রথম গাছটি শতাধিক বৎসর ধরিয়া এইভাবে আক্রমণকারীর ভিতরে আবদ্ধ ছিল। বড়গাছটি ইহাকে কেন্দ্র করিয়া এতকাল বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

—

মিঃ জে, ডব্লিউ লেগ ও তাঁহার নূতন আবিষ্কৃত ক্যামেরা—

আমেরিকার ওয়েষ্টিংহাউস কোম্পানীর ইলেক্ট্রিক রিসার্চ ইঞ্জি-



বিদ্যুৎ-ঝলকের আলোকচিত্র

নয়ার মিঃ, জে, ডব্লিউ লেগ একটি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ক্যামেরা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ক্যামেরায় সেকেণ্ডে ২৬০০ ফোটোগ্রাফ লওয়া যায় এবং বিদ্যুৎঝলককে পর্য্যন্ত যথাযথ চিত্রে ধরিতে পারা যায়। আজ পর্য্যন্ত আর কেহ বিদ্যুৎঝলকের ছবি তুলিতে সমর্থ হন নাই, একটি চলিত প্রবাদই আছে 'বিদ্যুতের মত দ্রুত'। এখন এই প্রবাদবাক্যের কোনো সার্থকতা রহিল না। এই ক্যামেরার সাহায্যে বিদ্যুৎঝলকের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও সমাপ্তি সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়। পাশের ছবিতে এই ক্যামেরায় তোলা একটি বিদ্যুৎঝলকের চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

—

আমেরিকার দুই মনীষী—

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্ত্তা এডিসনের অশীতিতম জন্মদিনে আমেরিকার অপর আবিষ্কর্ত্তা ক্রোড়পতি মনীষী হেনরী ফোর্ড তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলেন। এই একটিবার মাত্র দুই মনীষী একত্রে ছবি তুলাইয়াছেন। পাশাপাশি এই দুই বৈজ্ঞানিকের ছবি আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।



এডিসন ও ফোর্ড

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

(৭)

কুমারিল ভট্ট

শঙ্করাচার্য্যের গুরু কুমারিল ভট্ট সম্বন্ধে কোন বাংলা বই আছে কি, থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রীকমলেশ্বর চলিহা

(৮)

বারুণী-স্নান

মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত হইলে, সেই দিবসে বারুণী স্নান হয়। ঐ দিবস যদি শনিবার হয় তাহা হইলে মহা-বারুণী হয় এবং ইহার সহিত আরও কয়েকটি যোগ মিশ্রিত থাকিলে মহা-মহা-বারুণী হয়। এই বারুণী স্নান কোন্ সময় হইতে এবং কি কারণে এতদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে?

"অনাদি"

(৯)

গরুর আড়ালে যুদ্ধ

মুসলমানগণের ভারতে আগমনের সময় হইতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মুসলমানগণ হিন্দুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময়, সম্মুখে গরু রাখিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল? কোন্ কোন্ ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে? শুনা যায় ইংরেজ ভরতপুরের এবং মণিপুরের যুদ্ধে গরু সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করিয়া অতি অল্পশ্রমে যুদ্ধ জয় করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ আছে?

শ্রীভূমানন্দ

(১০)

আকবর কর্তৃক মন্দির নির্ম্মাণ

ভি, এ, স্মিথ সাহেব তাঁহার "আকবর" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন বৃন্দাবনের প্রধান মন্দির, "গোবিন্দ মন্দির", "মদনমোহন মন্দির," এবং "গোপীনাথের মন্দির" আকবরের আজ্ঞায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্য পুস্তকে দেখিতে পাই বাঙ্গালার হিন্দুগণ (চৈতন্যের যুগে) ঐ সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কোন্ সিদ্ধান্ত সত্য?

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল।

(১১)

নারিকেলের খোলা

নারিকেলের খোলা কি কাজে লাগে এবং তাহার পাইকারী ক্রেতা কাহারা? কি দরে বিক্রয় হয়? ইহা দ্বারা শাঁখা ইত্যাদি তৈয়ারী এ-দেশে হয় কি না?

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সেন

—

মীমাংসা

(১)

লাইব্রেরী পরিচালনা

লাইব্রেরী পরিচালনা সম্বন্ধে বাংলায় এখনো কোনো পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। মারাঠী, গুজরাতী, কন্নাদ ও তেলুগু ভাষায় এই বিষয়ের কতকগুলি পুস্তক আছে। ইংরেজীতে এই সম্বন্ধে বহু পুস্তক আছে। বিশেষ ভাবে আমাদের দেশের জন্ত লিখিত নিম্নলিখিত বইগুলি কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে দেখিতে পাওয়া যাইবে :

Borden (W. A.) "*Scheme of Classification for the Libraries of Baroda State,*" Baroda, 1911 (দাম জানা নাই)

Dickinson (A. D.) "*Punjab Library Primer*" (Punjab University Publication.) Lahore, 1914. দাম ২৲ টাকার মতন হইব।

Dutt (Newton M.) "*Baroda Library System*" (Pamphlet) Baroda, 1917. Baroda Central Library তে লিখিলে ইহা বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।

Guha (S. C.) "*On Classification of Books in our Libraries.*" Madras (Srinivas Varadachari) 1921. *Out of print.*

Kudalkar (J. S.) "*Baroda Library Movement*" Baroda Central Library; 1919. মূল্য ২৲ টাকা।

"*Library Miscellany* (Trilingual Quarterly, in English, Marathi and Gujarati) Now out of print. 3 or 4 vols, 1912-14 প্রতি খণ্ড ২৲ টাকা।

Mehta (B. H.) "*Hints on Library Administration in India*" Surat ("Santi Sadan") 1913. ২৲ টাকা।

Watkins (L. T.) "Libraries in High Schools" (Bureau of Education Pamphlet N. 8) Calcutta (Govt. Ptg). মূল্য চারি আনা।

[এতদ্ব্যতীত "*Principles of Book-Selection in a Library Institute* নামক যে প্রবন্ধ Modern Review ডিসেম্বর ১৯২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা *Manual of Indian Librarianship* নামক আরব্ধ পুস্তকের এক অধ্যায়। (ঐ পুস্তক আজিও প্রকাশিত হয় নাই।)

বিদেশী পুস্তকগুলির মধ্যে A. L. A. *Manual of Library Economy* নামক ক্রমশ প্রকাশ্য পুস্তকের যে অধ্যায় বাহির হইয়াছে তাহা প্রথমেই দেখিয়া লওয়া ভাল। প্রতি অধ্যায়ের দাম পূর্ব্বে ছিল ১০ সেন্ট, এখন ২৫ সেন্ট বা ৵০।৶৴০আনা। Chicago, (American Library Association) 1911-27.

বর্গীকরণ (অর্থাৎ Classification of Books) বিষয়ে বিদেশে Dewey (M.) "Decimal Classification" অনুসারেই অনেক লাইব্রেরী চলে। ঐ পুস্তকের দাম ৬ ডলার; কিন্তু ইংলণ্ডে ২ পাউণ্ডের কমে বড় বিক্রয় হয় না। আমাদের দেশের গরীব লাইব্রেরীগুলি ঐ পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (Abridged edition $ 1. 50) লইতে পারে।

ভারতে লাইব্রেরী পরিচালন বিষয়ে বরোদা, মহীশূর, পাঞ্জাব ও অন্ধ্রদেশ বাংলাদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। All Bengal Library Association একটা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা যদি বাংলায় ঐ সম্বন্ধে একখানিও গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতেন তবে কিছু কাজ হইত।

গ্রন্থাগারিক

(৩)

মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক হৃষিকেশ বসু লিখিত "চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী" দুই খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ এই প্রথম। দুই খণ্ডের দাম বারো টাকা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর আর কোন প্রকার ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই।

১৩১৫ সালের "নব্যভারতে" শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য চণ্ডী সম্বন্ধে কয়েকটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

শ্রী সুরেশচন্দ্র দাস
শ্রী সুকুমার চক্রবর্ত্তী
শ্রী যতীন্দ্রনাথ বসু

(৫)

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি

বাঙলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। গত ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসের 'Calcutta Review' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, মহোদয়ের লিখিত 'History of the Bengali Stage' নামক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার দে এম্‌-এ, ডি-লিট্ মহাশয়ের "প্রাচীন বাংলা নাটক ও তাহার অভিনয়" শীর্ষক সুচিন্তিত প্রবন্ধ এই বৎসরের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় দ্রষ্টব্য। তিনি তাঁহার রচিত 'History of Bengali Literature in the Nineteenth Century' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় খণ্ডও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ ফরওয়ার্ড (Forward) পত্রিকায় লেখেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস
শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী

(৬)

প্রবাদ-বাক্য

(২) অস্থির পঞ্চানন—পঞ্চানন (মহাদেব) হিন্দুদের দেবতা, তাঁহার কোন সময় ভাবের বিরাম নাই, সর্ব্বদাই অস্থির ; কখনও যুদ্ধ করিয়া শত্রু দমন করিতেছেন, আবার কখনও বা গায়ে ভস্ম মাখিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে শ্মশানে বিচরণ করিতেছেন। আমাদের মধ্যেও দুই একজন এইরূপ ধরণের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কোন মতের স্থিরতা নাই অর্থাৎ সর্ব্বদাই নানাপ্রকার কাজ লইয়া ব্যস্ত। তাহাদিগকেই "অস্থির পঞ্চানন" বলে।

(৭) আদা জল খেয়ে লাগা—সকালে আদা ও নুন খাইলে শরীর ভাল থাকে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা অনেকটা কম বোধ হয় এবং তাহা হইলেই কাজ করিতে একাগ্রতা আসে। যে ব্যক্তি কষ্ট স্বীকার করিয়া কার্য্য সিদ্ধিকল্পে যত্নবান্ হয় তাহার উদ্দেশে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

(৮) আষাঢ়ে গল্প—আষাঢ় মাস বৃষ্টি বাদলার মাস, বাহিরের কোন কাজ করা যায় না, তখন দিন কাটাইবার প্রধান অবলম্বন—নানা প্রকার খেলা ও নানা প্রকার খোস গল্প করা। যে ব্যক্তি কাজের সময়ে নানা-প্রকার খোস গল্প বলিয়া সময় নষ্ট করে, তাহার গল্পকে আষাঢ়ে গল্প বলে।

(১১) লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন—বাঙ্গলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে হুগলীর অন্তর্গত বালি নামক গ্রামে(কাহারও মতে বহরমপুরে)সেন পরিবারে গৌরী সেন বসবাস করিতেন। তিনি জাতিতে সুবর্ণ বণিক, তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ মুরারিধর। তিনি নিজ ভাগ্য বলে ও দৈবানুগ্রহে অতুল ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং, সেই ধনের সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিয়া দীনদুঃখীদিগকে এবং সাধারণের হিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতেন। যাহারই অর্থের প্রয়োজন হইত তিনিই গৌরী সেনের নিকট অর্থ সাহায্য পাইতেন, কেহই কোন দিন তাহার নিকট হইতে বিমুখ হন নাই। ইহা হইতেই 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' কথার উৎপত্তি। (Hooghly Past and Present)

(১২) ফোতো বাবু—পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ এবং ধনীব্যক্তিগণ রাজসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া নানা প্রকার সাজসজ্জা করিয়া তথায় যাইতেন। মূর্খগণ এবং দরিদ্রগণ তথায় যাইবার অনুমতি পাইত না, তজ্জন্য তাহারা নানাপ্রকার সাজসজ্জা করিয়া লোক দেখাইবার জন্য পথে পথে বেড়াইয়া বেড়াইত। এখনও যাহারা ভিতরে গরীব, কিন্তু বাহিরে বাবুগিরি করে তাহাদের ফোতো বাবু বলে।

(১৪) ভবি ভোলবার নয়—ভবি বা ভবানী নামে একটি বালিকা তাহার মাতাপিতার নিকট অন্যায় আবদার করিয়াছিল। তাঁহারা তাহাকে ভুলাইবার জন্য কতরকম জিনিষ দিলেন শেষে প্রহার পর্য্যন্ত করিলেন, তথাপি সে নিজের জেদ ছাড়িল না, বলিল, "তোমরা যাই দাও, যাই কর, ভবি ভুলবার নয়।" কেহ কোন জেদ ধরিলে বহু প্রলোভনে বা বহুবিঘ্নপাতেও তাহা পরিত্যাগ না করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

—সরল বাঙ্গালা অভিধান

(১৬) পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হ'লো—এক ব্যক্তি পেঁয়াজের ক্ষেতে ঢুকিয়া পেঁয়াজ চুরি করিতেছিল। এমন সময় ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহাকে পাদুকাদ্বারা রীতিমত প্রহার করিয়া পেঁয়াজগুলি কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দিল। তখন সে মনের দুঃখে বলিয়াছিল, আমার পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হ'লো।

(১৭) নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা—এক গ্রামে এক ছুতার বাস করিত, সে দৈনিক প্রায় ১৲।১॥• টাকা আয় করিত, এবং তাহা হইতে কিছুই সঞ্চয় না করিয়া ঐ টাকার দ্বারাই তাহার এবং তাহার স্ত্রীর ভোজন ব্যাপার সমাধা করিত। ঐ ছুতারের এক সুবর্ণ-বণিক বন্ধু ছিল। ঐ বণিকের পুকুরে প্রতিদিন ছুতারের পত্নী জল আনিতে যাইত এবং বণিক পত্নীর সহিত তাহাদের ভোজনের পারিপাট্যের কথা বলিত, কিন্তু বণিক-পত্নী লজ্জায় তাহাদের শাকান্নের কথা ব্যক্ত করিত না। সে বাটীতে আসিয়া ভৎর্সনা করিত ও বলিত—ছুতার রোজ আনে রোজ খায়, তাহার এত আহারের পারিপাট্য আর তাহাদের এত অর্থ থাকিতেও শাকান্ন ভোজন ! ইহার প্রতিকারকল্পে বণিক একদিন সন্ধ্যার পর ছুতারের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল এবং গোপনে একটি টাকার তোড়া ছুতারের বিছানার উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। বন্ধু চলিয়া গেলে ছুতার উহা দেখিয়া মনে করিল, উহা তাহার বন্ধু রাখিয়া গিয়াছে এবং তখনই বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া বণিকের নিকট ঐ টাকার কথা বলিলে সে উহা নিজের বলিয়া স্বীকার করিল না। তখন ছুতার ঘরে ফিরিয়া ঐ টাকা গণিয়া দেখিল উহাতে ৯৯ টা টাকা রহিয়াছে, তখন সে মনে মনে ভাবিল, আমি কিছু সঞ্চয় করিতে পারি নাই ; এক্ষণে ঈশ্বর আমাকে এই টাকাগুলি দিয়াছেন। কাল ইহাতে এক টাকা দিয়া ইহাকে পূরা একশত করিব। পর দিন ছুতার যাহা আয় করিল, তাহা হইতে একটাকা সঞ্চয় করিয়া বাকী কয় আনার মধ্যে আহারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিল। তারপর সেই একশত টাকাকে দুইশতে পরিণত করিবার জন্য তাহার বাসনা হইল এবং প্রতি দিন কিছু কিছু সঞ্চয় করায় তাহা ক্রমে চারিশত হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন আর তাহার ভোজনের পারিপাট্য আর নাই এখন বণিকের যে দশা, তাহারও সেই দশা। বণিক ইহা শুনিয়া একদিন হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভাই এবার আমাকে সেই নিরানব্বুই টাকা ফিরাইয়া দাও।" ছুতার বলিল, সে কিরূপ ? তখন বণিক সকল কথা খুলিয়া বলিল,"তোমাকে নিরানব্বুইএর ধাক্কায় ফেলিবার জন্যই আমি স্বেচ্ছায় তোড়াটি ফেলিয়া দিয়াছিলাম।" ছুতার বন্ধুর টাকাগুলি ফেরত দিল, কিন্তু তাহাকে এই নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা সামলাইতে আজীবন পরিশ্রম করিয়া অনেক টাকা জমাইতে হইয়াছিল। এই গল্প হইতে "নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা" এই প্রবাদের উৎপত্তি। সরল বাঙ্গালা অভিধান।

লাইব্রেরীয়ান্, তরুণ শক্তি সাহিত্য মন্দির
কাশীপুর।
শ্রীবিধুভূষণ শীল
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু



ভারতবর্ষ

ত্রিশতবার্ষিক শিবাজী উৎসব—

এবার ভারতের নানা স্থানে ত্রিশতবার্ষিক শিবাজী উৎসব হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রে বাংলায় ১২০৩।৫ সালে এই উৎসব খুব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এবারেও কলিকাতায় ও বাংলার নানা-জেলায় উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বোম্বাই সরকার এই উৎসবের মিছিলে কড়াকড়ি করায় উদ্যোক্তাগণ কোনরূপ মিছিল বাহির করেন নাই। সুরাটে, বরোদায় ও ঢাকায় মিছিল লইয়া হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ হইয়াছিল।

দশমবার্ষিক হিন্দু মহাসভা—

গত মাসে পাটনায় ডাঃ মুঞ্জের সভাপতিত্বে ১০ম বার্ষিক হিন্দু মহাসভার সম্মিলন হয়। সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ—

মুসলমান গুণ্ডাগণ এতদ্দেশে বিশেষতঃ বাঙ্গলায় নারী ও শিশু হরণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মহাসভা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। এজন্য হিন্দু মহাসভা বাঙ্গলার হিন্দু সভার নেতাদিগকে এতৎসম্পর্কে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া হিন্দু মহাসভাকে জানাইতে অনুরোধ করিতেছে এবং যুবকসঙ্ঘ সমূহ গঠন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই অত্যাচার বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ও যাহাতে প্রতি ক্ষেত্রে এই সমস্ত অপরাধীগণ ন্যায্য দণ্ড পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছে। এই সভা হিন্দু সাধারণকে সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে হিন্দু নারী ও শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ গঠন করিতে ও অন্যান্য কার্য্যে হিন্দুদিগকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছে।

এই সভা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগকে, অস্পৃশ্যদিগকে বিদ্যালয়ে, মন্দিরে অবাধ অধিকার দানের জন্য, কূপ স্পর্শের অধিকার দানের জন্য অনুরোধ করিতেছে।

হিন্দু মহাসভা বিধবাদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে যে, (ক) যাহাতে বিধবাগণ সতীধর্ম্মের আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন ও বাকী জীবন সসম্মানে যাপন করিতে পারেন এজন্য বাড়ীতে অথবা আশ্রমে বিধবাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

(খ) হিন্দু সংসারের অনেক উৎসবাদিতে বিধবাদিগের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয় ইহা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(গ) ইঁহারা যাহাতে কুপথে না যান এবং অন্য ধর্ম্মের কবলে পতিত না হন এজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর রেল যাত্রী—

বিগত ৫ঠা মে কলিকাতায় ও ভারতের অন্যান্য স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যাত্রীদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণার্থ নানা বিষয় সভায় আলোচিত হয়। কলিকাতার সভায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বোম্বাইএ শ্রীযুক্ত নাসিম সভাপতি হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ভারত সরকার কর্ত্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই সুখী হইয়াছেন, দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীরাও ইহাতে আনন্দ-জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী যে এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য লোক, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেম, জীবন-ব্যাপী ত্যাগ ও সাধনা তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে; তারপর এই প্রৌঢ়বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েক বৎসর থাকিতে সম্মত হইয়া তিনি নূতন করিয়া যে ত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিলেন, তাহা তাঁহাকে লোকচক্ষে আরও মহৎ করিয়া তুলিবে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর চেষ্টায় প্রবাসী ভারতবাসীদের অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া আশা হয়।

ভারত শাসন সংস্কার তদন্ত—

দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইম্‌স্ পত্রে মেজর গ্রেহাম পোল একখানা চিঠিতে জানাইয়াছেন যে লর্ড হিউয়ার্ট ভারতীয় শাসন সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সভাপতি হইবেন বলিয়া গুজব। লর্ড রেডিং ভারতে বড়লাট হইয়া আসিলে লর্ড হিউয়ার্ট ইংলণ্ডের লর্ড চীফ জাষ্টিসের পদ পাইয়াছিলেন। মিঃ গ্রেহাম পোল আরও জানাইয়াছেন যে এই কমিশন সম্বন্ধে রক্ষণশীলদলের কাগজগুলির সুরেরও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। স্যাটারডে রিভিউ পত্র মন্তব্য করিয়াছেন যে এই পর্য্যন্ত ভারতীয় শাসন সংস্কারে দেশীয় রাজাদের অবস্থা এবং ভারতীয় সৈন্য বিভাগের বিষয় অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে এই দুইটি বিষয়কে আর অবহেলা করিলে চলিবে না।

ভারতীয় ছাত্রীর কৃতিত্ব—

পণ্ডিত শ্যামলাল নেহরুর কন্যা কুমারী শ্যামকুমারী নেহরু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

লাহোরের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দাশ গুপ্তা লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষা সসম্মানে পাস করিয়া সম্প্রতি ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করিতেছেন। সেখানে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে গবেষণা করিবেন।

—

বাংলার

পূর্ব্ববঙ্গে ঝড়—

পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি স্থানে ঝড়ে বিষম ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, চট্টগ্রাম

প্রভৃতি স্থানে ঝড়ের প্রকোপ খুবই বেশী হইয়াছিল। বহু লোকের ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। নোয়াখালিতে বোধ হয় ঝড়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে। এখানে লোকের প্রায় দেড়লক্ষ নষ্ট হইয়াছে। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমা হইতেও ঘূর্ণীবাত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সব স্থানের বিপন্ন লোকদের সাহায্য অত্যাবশ্যকীয়।

জলাভাব—

বাংলার নানা স্থান হইতে ভীষণ জলাভাবের সংবাদ আসিতেছে। সহযোগী বাঁকুড়া-দর্পণ বাঁকুড়ায় অত্যন্ত জলাভাবের সংবাদ দিয়াছেন। উত্তর বঙ্গের অনেক জেলার কাগজেও ঐরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

খাদি-প্রতিষ্ঠান—

প্রতিষ্ঠানের ১৩৩৩ সালের বার্ষিক "হিসাব-নিকাশ"এ প্রকাশ "প্রতিষ্ঠানের কাজের হিসাব-নিকাশ খতাইয়া দেখিলে একথাটা অতি সহজেই ধরা পড়ে যে, প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলায় বস্ত্র-শিল্পের সমস্ত অভাব দূর করিতে না পারিলেও বস্ত্রশিল্পে সাফল্য লাভের পথ অসম্ভবরূপে সুগম করিয়া তুলিয়াছে।

"এই বৎসরেই সোদপুরে মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠানের কলাশালার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। এই কলাশালাটির প্রতিষ্ঠা সমগ্রভারতের দিক্ হইতেই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এখানে অত্যন্ত আধুনিকতম বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে খাদির উন্নতি বিধানের চেষ্টা চলিতেছে।"

তিন বৎসর আগে খাদিপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাসে ২০ মণ মাত্র বর্ত্তমানে তাহার মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৭০ মণ। বিক্রয়ের দিক্ দিয়াও এই উন্নতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠান মাসে ৭ হাজার টাকার বেশী খাদি বিক্রয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ ২২ হাজার টাকা।

খাদির কাজের কেন্দ্রও ধীরে ধীরে সারা বাঙ্গলায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। তিন বৎসর আগেও খাদির কাজ বাঙ্গলার দুই একটি জেলা ছাড়া আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু এখন প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই প্রতিষ্ঠানের অন্ততঃ একটি করিয়া কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। বিক্রয়-কেন্দ্রের পরিমাণ তাহার সর্ব্বশুদ্ধ ১৮টি এবং উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১৩টির কম নহে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাঙালী—

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ভারতে গৃহীত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নিম্নলিখিত তিন জন বাঙালী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া চাকুরীর জন্য মনোনীত হইয়াছেন—

১। অন্নদাশঙ্কর রায় (বিহার-ওড়িষা ; ইনি প্রথম হইয়াছেন)
২। ধীরেন্দ্রলাল মজুমদার (বাংলা)
৩। এইচ, বন্দ্যোপাধ্যায় („)

বাঙ্গলার বেকার সমস্যা—

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে কর্ম্মচারী সমিতির সেক্রেটারী বাঙ্গলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ গজনভীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনা করেন। মিঃ গজনভী মনোযোগপূর্ব্বক ইঁহার কথা শুনেন, এবং বলেন যে আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি শুধু ক্রমাগত কেরাণীই সৃষ্টি করিতেছে, ঐ জন্যই বাঙ্গলার বেকার সমস্যা এত বাড়িয়া চলিয়াছে ও বেকারদের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্যকরী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক। সমবায় প্রণালীতে উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর-শিল্পের প্রচলনের উপরই এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। মিঃ গজনভী বলেন, তিনি ইতঃপূর্ব্বেই এতৎসম্পর্কীয় কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন। পল্লীবাসীদের খাদ্য ও সাধারণ স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় বিষয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সেক্রেটারীকে মিঃ গজনভী বেকার-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তাঁহার কি যুক্তিপদ্ধতি আছে, তাহা তাঁহাকে জানাইতে বলেন এবং আশা দেন যে, এই সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী—

গত মাসে হাওড়া জেলার অন্তর্গত মাজুগ্রামে দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ডাক্তার প্রমথনাথ নন্দী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

সম্মিলনীতে অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

(১) বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধিত আইন ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন রেগুলেশন অনুসারে সরকার বহু সংখ্যক দেশবাসীকে আটক রাখিয়াও ভারতের অর্থও অন্য দেশে চলিয়া যাওয়ায় দেশের যে ক্ষতি হইতেছে—এই দুইটি বিষয়ের প্রতিবাদ স্বরূপ ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা হউক।

(২) এই সম্মিলনী সূত্র-প্রস্তুত কার্য্যকে গঠনমূলক কার্য্য বিবেচনা করেন এবং সকলকে খদ্দর পরিধান করিতে অনুরোধ করেন।

(৩) সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের ফলে বহুস্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে। সম্মিলনীর অনুরোধ কংগ্রেসের সভ্য ও কর্ম্মীগণ ঐ মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

(৪) বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের আবশ্যকতা এই সম্মিলনী স্বীকার করেন। কিন্তু দেশবাসী সরকারের ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে সেপ্টেম্বরের ৩২২২ নং প্রস্তাবে শঙ্কিত হইয়াছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমুদায় বিষয় সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিলে শিক্ষা কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া সম্মিলনীর অভিমত সরকার ঐ উদ্দেশ্যে যে কর স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, এই সম্মিলনী তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

(৫) মহিলার সম্মান রক্ষার জন্য খড়্গসিংহ বাহাদুরের আত্মত্যাগের প্রশংসা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৬) চীনদেশে সৈন্য প্রেরণের জন্য সরকারের নীতির নিন্দা এবং চীনদেশবাসীগণের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়।

আগামী বৎসরে চব্বিশ পরগণায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর বৈঠক হইবে।

বাঙালার রাজবন্দী ও বাঙালী—

পঞ্জাবের গুরুদ্বার আন্দোলন সংস্রবে যে সমস্ত শিখ কারারুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগের মুক্তির উদ্দেশ্যে শিখ নেতাগণ গুরুদ্বার সংস্কার আইন কার্য্যে পরিণত করিতে সহায়তা করিয়াছেন এবং পঞ্জাব প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে সেই মর্ম্মে সর্ব্ববাদিসম্মত মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সমস্ত শিখবন্দীকে অব্যাহতি না দেওয়াতে সেই মন্তব্য অবজ্ঞাত হইয়াছে এবং তাহার প্রতিবাদস্বরূপ আইন পরিষদের শিখ সদস্যগণ একযোগে সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মৈমনসিংহের চারুমিহির লিখিতেছেন—

"কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ভারতের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া স্বদেশবৎসল বহু যুবককে অদ্যাপি কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এই আচরণের বিরুদ্ধে বাংলার নেতৃবর্গের কি আর কোনও কর্ত্তব্য নাই ?"

আরও লজ্জার বিষয়—

"বাঙ্গলার রাজবন্দীদের বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখার জন্য নাগপুরে প্রতিবাদ হইতেছে। শুধু কথার প্রতিবাদ নহে। যতদিন পর্য্যন্ত আটক বন্দীদের মুক্তি না হয় বা তাহাদের অপরাধের প্রকাশ্য আদালতে বিচার না হয় ততদিন পর্য্যন্ত নাগপুরবাসী অস্ত্র-আইন অমান্য করিবে। এই অস্ত্রআইন অমান্য উপলক্ষে নাগপুরে ২৪শে এপ্রিল তারিখে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। ৬ হাজার লোক তাহাতে যোগদান করিয়াছিল,কতিপয় মহিলাও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অস্ত্রআইন অমান্য করিবার জন্য দুইজন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছিল, ঐ দিন প্রাতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা মিছিল পরিচালিত করিতেছিলেন। ২৬শে এপ্রিল সহরের বড় বড় রাস্তা দিয়া মুক্ত তরবারীধারিণী ২ জন মহিলাকে বিরাট শোভাযাত্রা সহ লইয়া যাওয়া হয়।"

বাংলায় কলেরা—

বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এবার কলেরার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯২৫ সনে বাঙ্গলা দেশে কলেরাতে ৩৪০০০ হাজার লোক মারা গিয়াছিল, ১৯২৬ সনের মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছিল প্রায় ৬০০০০ হাজার। এবারকার মৃত্যুসংখ্যা আরও বেশী হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। ম্যালেরিয়া,কালাজ্বরের পড়েই কলেরাতে বাঙ্গলা দেশে মৃত্যুসংখ্যা বেশী। গত ৩০ বৎসরের হিসাবে প্রকাশ যে গড়ে বার্ষিক ১ লক্ষ লোক বাংলা দেশে কলেরাতে মারা গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, পল্লীতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবই কলেরা বিস্তারের প্রধান কারণ। এই গ্রীষ্মকালে পল্লীর খাল, বিল, নদীনালা সব শুকাইয়া যায় এবং এবং পল্লীর লোকেরা 'কাদা গোলা' জল খাইতে বাধ্য হয়। ফলে কলেরা ও আমাশয় অনিবার্য্য। তাহার উপর বর্ষায় জল পড়িলে এই রোগ আরও প্রবল হইয়া উঠে। অতএব কলেরা দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গলার পল্লীতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী মহাশয় কলেরার টিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু ইহাতেই কি এই মহামারীর প্রকোপ কমিবে ?

দিনাজপুর ও আসামে শুদ্ধি—

হিন্দু মিশনের সহকারী সম্পাদক ব্রহ্মচারী বিজয়কৃষ্ণ জানাইয়াছেন দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাটে গত ২৯শে এপ্রিল ৩ শত খৃষ্টিয়ান ও জড়বাদী পরিবার সোৎসাহে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। স্বামী সত্যানন্দজী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ও সকলকে দীক্ষা দিয়াছেন।

গত ৩০শে এপ্রিল স্বামীজি শুদ্ধি সংগঠন ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্বন্ধে রংপুরে পাইবাজার এক হিন্দুসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলে সন্তোষ লাভ করিয়াছেন—সকলেই হিন্দু মিশনের কাজ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

উত্তর গৌহাটীর শ্রীযুক্ত গোস্বামী এপ্রিল মাসের শেষ ১৫ দিন আসাম কামরূপ জেলায় ভ্রমণ করিয়া ১২টি কাওরাণী পরিবারকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারের ফলে অনেক উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শুদ্ধি উৎসবে পৌরহিত্য করিয়াছেন।

ঢাকায় নমঃশূদ্র সভা—

সম্প্রতি ঢাকা জেলার চৌকীঘাটা নামক স্থানে নমঃশূদ্রগণের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। সভাপতি শ্রীযুত মুকুন্দবিহারী মল্লিক মহাশয় নমঃশূদ্রদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং তাহাদের সন্তানদিগকে শিক্ষা প্রদানে যত্নবান ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও আইন সভা, লোকালবোর্ড, জিলা বোর্ড প্রভৃতিতে নমঃশূদ্র সদস্য মনোনয়ন এবং অধিক সংখ্যায় তাহাদিগকে চাকুরীদান করার জন্য সরকারের নিকট প্রার্থনা করিয়া একটি প্রস্তাব উক্ত সভায় গৃহীত হয়।

বাধ্যতামূলক ব্যায়াম—

বাঙ্গালার স্কুল ও কলেজে শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা ও ডাক্তারী পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বাংলা সরকার তাঁহাদিগের ব্যায়াম সম্পর্কীয় পরামর্শদাতার সাহায্যে এক কার্য্যপদ্ধতি তৈয়ারী করিয়াছেন। যে সকল বালকবালিকা বিদ্যালয়ে যায়, যাহাতে তাহাদিগের প্রত্যেককে সাধারণভাবে ব্যায়াম-শিক্ষা দেওয়া হয় ও উহা যাহাতে বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠ্যের অংশীভূত করা হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই কার্য্যপদ্ধতি গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জিমনাষ্টিক, সাঁতার কাটা, খেলা-ধূলা প্রভৃতি যে-সমস্ত ব্যায়াম দ্বারা শারীরিক উন্নতি সাধিত হয় সেগুলি ইহাতে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। যাহাতে ব্যায়াম প্রত্যেক বালক-বালিকা বয়োপযোগী হয়, ব্যবস্থা সেই ভাবে হইবে। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই যাহাতে সম্যক্ পরিচালিত হয়, সেই রকম ব্যায়াম প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। এই সম্পর্কে বিনা ব্যয়ে এই দেশে যে সমস্ত ব্যায়াম প্রচলিত আছে, সেগুলি সম্বন্ধেও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। প্রতি বৎসর শিক্ষকদিগকেও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া কার্য্যপদ্ধতিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র ডাক্তারের পরীক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগের পক্ষে শরীরচর্চ্চা ইতঃপূর্ব্বেই বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। মহিলাদিগের পক্ষেও যে শরীর চর্চ্চা আবশ্যক তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ড্রিল কিম্বা অন্য কোনরকম ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। শরীর-চর্চ্চা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। সরকার সেই প্রস্তাবানুসারে কাজ করিতে সম্মত করিয়াছেন। প্রকাশ, এই উদ্দেশ্যে প্রচার কার্য্য পরিচালিত করিবার জন্য সরকার হইতে অর্থব্যয় করা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবেন এবং কলেজের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার এক প্রস্তাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী—

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের বাৎসরিক আয় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসর

তাহাদের মাত্র ১৩২৭২৩ পাউণ্ড আয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববৎসর ২১৯০৪৪ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল।

ডাইরেক্টারগণ বলিতেছেন যে, মোটরবাস সমূহের প্রবল প্রতিযোগিতার জন্য এবং কলিকাতায় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দাঙ্গার জন্যই ট্রাম-কোম্পানীর এত অধিক কমিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ট্রামের ভাড়া কমান হইয়াছে এবং তাহার ফলে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শান্তি-সঙ্ঘ—

শান্তি-সঙ্ঘের সম্পাদক নিম্নলিখিত নিবেদনটি প্রেরণ করিয়াছেন :—

নরপশু কর্ত্তৃক ধর্ষিতা এবং সমাজ কর্ত্তৃক অবহেলিতা মাতৃজাতির উদ্ধারের জন্য "শান্তি সঙ্ঘ" আজ জাতির সেবা করিতে সমুৎসুক। আশা করি, উক্ত সঙ্ঘকে সেবা-কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রত্যেক সহৃদয় দেশবাসীই উপযুক্ত অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে কার্পণ্য করিবেন না। মাতৃ-জাতির উপর দিয়া আজ যে অত্যাচার-উৎপীড়নের বন্যা বহিয়া যাইতেছে তাহা আর নূতন করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। নারী-জাতির তপ্তশ্বাসে ও অভিশাপে হিন্দু সমাজ আজ ধ্বংসের পথে পা দিয়া বসিয়াছে। মাতৃজাতির সতীত্ব রক্ষা করিয়া এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে বাঁচাইতে হইলে কর্ম্মের বন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব হিসাবে এ কার্য্য খুব শক্ত হইলেও "শান্তি সঙ্ঘ" তাহার ক্ষুদ্র শক্তি মায়ের সেবায় নিয়োজিত করিয়া কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহা শিশু হইলেও ইতঃমধ্যেই দুইটি নির্য্যাতিতা রমণীর উদ্ধার সাধনে হস্তক্ষেপ করিয়া সফলকাম হইতে পারিয়াছেন।

এখন আমাদের সানুনয় অনুরোধ—জনসাধারণ সর্ব্বতোভাবে "শান্তি সঙ্ঘকে" সাহায্য করিয়া আমাদিগকে এই মহান কার্য্যে প্রোৎসাহিত করেন। এই উদ্দেশ্যে চাই ত্যাগী, ব্রহ্মচারী ও সমাজহিতকারী সন্ন্যাসীর দল যাঁহারা মায়ের সেবার পূজারী হইতে চাহেন। ৯।১০, বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেনে খোঁজ লইলে সঙ্ঘের সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

বিধবা বিবাহ—

মেদিনীপুর—

মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত তিলন্তপাড়া মধ্য ইংরেজী স্কুল-প্রাঙ্গণে বিগত ৪ঠা বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ন ৩টার সময় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মাইতি, বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভান্তে গোকুলচক্-নিবাসী মাহিষ্য জাতীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ বেরার পুত্র শ্রীমান্ সদয়চরণ বেরার সহিত শ্রীমতী চম্পাবতী নাম্নী নবম-বর্ষীয়া বিধবার শুভ পরিণয় সংঘটিত হইয়াছে। উপস্থিত অনেকে বিবাহান্তে আহারাদি করিয়াছিলেন।

পাবনা—

পাবনা জেলার বেড়ার থানায় অন্তর্গত পুকুরপার হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন রায় লিখিতেছেন—

"হিন্দু সমাজের মধ্যে অনেকে আপন আপন বিধবা কন্যার ও ভগিনীর পুনরায় বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু স্বজাতি ও পুরহিতগণ পৌরোহিত্য করিতে অস্বীকার করায় তাঁহারা বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এবং হিন্দুসভা অবহিত হইয়া এই কার্য্যের সত্বর ব্যবস্থা করুন।"

বাঙ্গালী ভাস্কর ৺ফণীন্দ্রনাথ বসু—

১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে আমরা বাঙ্গালী ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম ও তাঁহার তৈয়ারী কয়েকটি



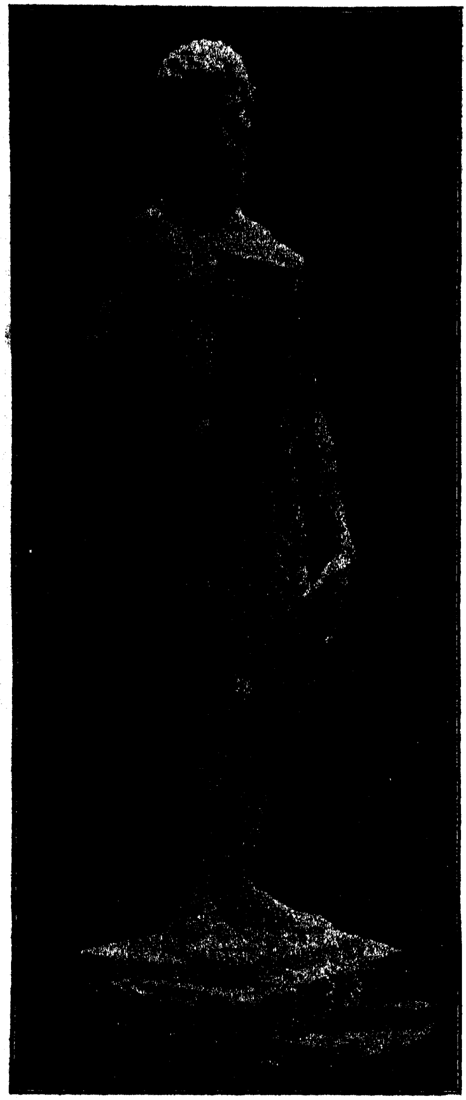
সেণ্ট্ জন স্মৃতি-গীর্জ্জার অংশবিশেষ
(৺ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত)

প্রস্তর-মূর্ত্তির ছবিও প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৮৮ খৃঃ ২রা মার্চ্চ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বহর গ্রামে রায় চৌধুরী বংশে ফণীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় তারানাথ বসু রায় চৌধুরী, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ যখন ৯।১০ বৎসরের বালক তখনই তাহার ভিতরে কৃতিত্বের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মাটি দিয়া পুতুল ইত্যাদি প্রস্তুত করাই তাহার খেলা ছিল। স্কুলে অঙ্ক না কষিয়া সে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়া বসিয়া থাকিত। স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার পি, মিত্র মহাশয় ফণীন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যায় এইরূপ পারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "তারানাথ-বাবু, আপনার এই পুত্রটিকে আমাকে দান করুন, আমি ইহাকে বিলাতে পাঠাইয়া মানুষ করিয়া আনি।"

ফণীন্দ্রনাথ যখন নওগাঁ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, তখন তাঁহাকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলিকাতা বউবাজার-আর্টস্কুলে ভর্ত্তি করান হয়। সেখানে ১ বৎসরের মধ্যে সমস্ত কোর্স শেষ করিয়া তিনি গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখানেও এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত



জন্ দি ব্যাপটিষ্ট

(৺ফণীন্দ্রনাথ বসু নির্ম্মিত ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি)



সেণ্ট জর্জ্জ স্মৃতি-গীর্জ্জার আর-একটি অংশ

কোর্স শেষ করিয়া ফেলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি দুবল-হাটীর রাজকুমারদের কয়েকখানি ছবি আঁকিয়া দেন এবং কুমারেরা হইতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি উচ্চতর আর্ট-শিক্ষার প্রবল ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া অন্য কিছু পুরস্কার না লইয়া বিলাত যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং সেজন্য



শিকারী ও কুকুর
(৺ফণীন্দ্রনাথ বসু নির্ম্মিত)

একটি বৃত্তি প্রার্থী হন। মুক্তাগাছার কুমারদ্বয় এ-প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে মাসিক ৭৫৲ টাকার একটি বৃত্তি ও বিলাত যাইবার অর্দ্ধেক খরচ দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৯০৪ সনে, ফণীন্দ্রনাথ নিজ চেষ্টা ও উদ্যোগে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে সুদূর ইতালী দেশে গমন করেন। তখন তিনি ইংরেজী ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না এবং ইতালীয় ভাষাও কিছুই জানিতেন না। ইতালীতে কিছুকাল থাকিয়া একজন শিক্ষকের পরামর্শে ফণীন্দ্রনাথ স্কট্‌লাণ্ডের এডিনবরা সহরে শিক্ষালাভ করিতে গমন করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানকার রয়েল ইনষ্টিটিউসনে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ তাঁহাকে "Clever Bose" বলিয়া ডাকিত এবং তিনি বিখ্যাত ভাস্কর পার্সি পোর্টস্‌মাউথ (Percy Portsmouth, A. R. S. A.) সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি অনেকগুলি বৃত্তি ও মেডেল পাইয়াছিলেন। ইহার এক বৎসর পরে পার্সি পোর্টস্‌মাউথ সাহেবের পরামর্শে ফণীন্দ্রনাথ ভাস্কর্য্য শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৯০৭ সনে তাঁহার "শিকারী" ও "বাজ-খেলোয়াড়" মূর্ত্তি দুইটি স্কটিস চিত্র এবং শিল্প প্রদর্শনীতে (Scottish Arts and Industrial Exhibition) প্রদর্শন করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। অল্প কয়েক বৎসর পরেই তিনি নিজের কৃতিত্বে ২।৩টি বৃত্তি পাইয়া নিজ ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হন। তিনি এডিনবরা হইতে বৃত্তি পাইয়া প্যারিস নগরে শিল্পী রোঁদ্যার নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে ইটালীর বড় বড় ভাস্করের শিল্পকলা দেখিয়া এডিন্‌বরা সহরে ফিরিয়া আসেন এবং ১৯১৩ সনে নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এইরূপ ২০ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে ফণীন্দ্রনাথ স্কটিস একাডেমীর (Scottish Academy) শ্রেষ্ঠ উপাধি A. R. S. A. উপাধিতে ভূষিত হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। ইতিপূর্ব্বে স্কচ ব্যতীত কোন বিদেশী কোন লোক A. R. S. A. উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। এই উপাধির সহিত মাসিক ৩০০ শত টাকার একটি বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন-নগরে ফণীন্দ্রনাথের তৈয়ারী "শিকারী" মূর্ত্তিটি বরোদার গাইকোয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাইকোয়ার এই তরুণ শিল্পীকে বরোদার রাজপ্রাসাদ কয়েকটি প্রস্তর-মূর্ত্তিতে সজ্জিত করিবার জন্য ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। ১৯১৪ সনে গ্রীষ্মকালে ফণীন্দ্রনাথ বরোদায় আসেন। কিন্তু কাজের নানারূপ অসুবিধায়, তিনি পুনরায় বিলাত গমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তিনি মহারাজার কাজ শেষ করেন। তাঁহার তৈয়ারী মূর্ত্তিগুলি বরোদার লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদে রক্ষিত আছে।

দেশের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এদেশে তিনি কখনও বিদেশী জিনিষ ক্রয় করেন নাই। আরও কয়েক বৎসর অর্থ সঞ্চয় করিয়া বাকী জীবন ভারতবর্ষে বাস করিবার এবং ভারতের লুপ্ত শিল্প জাগাইবার প্রবল বাসনা তাঁহার অন্তরে ছিল। *

ময়মনসিংহে বিধবা বিবাহ—

বিগত ৩০ শে শ্রাবণ ময়মনসিংহ-হিন্দু হিতসাধিনী সভার উদ্যোগে গফরগাঁওর জমিদার শ্রীশতদলবিহারী চাকলাদারের অর্থ-সাহায্যে এক বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ-সভায় সহরের ছোট, বড় প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। পাত্রীর পিতার নাম হরকিশোর সরকার, নিবাস সহরের এলাকায় রায়পালা গ্রামে; পাত্রের নাম মনোমোহন দত্ত, নিবাস টাঙ্গাইল, আড়রা গ্রামে। উভয়েই কায়স্থ। রায় শশধর ঘোষ বাহাদুর ও পণ্ডিত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ এম্-আর-এ-এস্ সাহায্যে শীঘ্রই এ জেলায় আর দু' একটি বিধবা বিবাহ হইবে।

এই সম্পর্কে হিন্দু মিশন যথেষ্ট কার্য্য করিতেছেন।

বাঁকুড়া অভয় আশ্রম—

বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ২২ শে ও ২৩ শে চৈত্র আশ্রম সেবকগণ খদ্দর বিক্রি করেন। জেলা সম্মিলনের বিষ্ণুপুর অধিবেশনে বাঁকুড়া অভয় আশ্রমের উদ্যোগে একটি খদ্দর প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রদর্শনীতে বাঁকুড়া জেলায় উৎপন্ন খদ্দরও দেখান হয়। বিষ্ণুপুরে মোট ২০০ টাকার খদ্দর বিক্রি হয়।

বালিগঞ্জ চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়—

আমরা উক্ত বিদ্যালয়ের ১৯২৫ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি।

* পরলোকগত ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথের আত্মীয়া শ্রীযুক্তা সুনীতি বসুর লিখিত একটি বিবরণের সার সঙ্কলন।

আলোচ্য বৎসরে বিদ্যালয়ে ৯০ জন ছাত্র ছিল। ছাত্র-বিভাগ ও শিল্প-বিভাগ দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। এই বিদ্যালয়টি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও একটি ছাত্র পরিষদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক—

কলিকাতার মার্ব্বেল প্যালেসের অধিকারী বিখ্যাত চিত্র-রত্ন সংগ্রাহক ও দাতা পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পৌত্র কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের গত মাসে মৃত্যু হইয়াছে।

কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক বাল্যজীবনে হিন্দুস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি সৌন্দর্য্যগ্রাহী এবং কলাবিদ্যার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। পিতামহের সংগুণ সমূহের তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি চিত্র-শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার জগৎ-বিখ্যাত মার্ব্বেল-প্যালেসের চিত্রসম্ভার তাঁহার চেষ্টায় অনেক পুষ্ট হইয়াছিল।

জয় স্বাধীনতা জয়

(বর্ত্তমান চীনের জাতীয় সঙ্গীত)

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হে বিমুক্তি, স্বাধীনতা, বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ,
শান্তি সাথে মৈত্রী করি' আনো আনো বিচিত্র সংবাদ;
মূর্ত্ত কর পৃথ্বীতলে দশেক সহস্র নব রূপ।
দানব সমান দৃপ্ত, প্রেতাত্মা সমান সৌম্য ভূপ
সর্ব্বশীর্ষে ঊর্দ্ধব্যোমে বিস্তারিয়া মহিমা মহান
এস হে নীরদ-রথে—বায়ু তাহে অশ্ব বেগবান,
এস এস হে রাজন্, তেজস্বর্য্যে বিতাড়ো আঁধার,
ঘুচাও এ দাসত্বের অন্ধকার নরক-আগার।

শ্বেতচর্ম্মা ইউরোপা, বিধাতার হে দুলালী সুতা,
গৃহ তব দৈন্যহীন—সুপ্রচুর-অন্ন-মদ্য-যুতা।
আমি ভালবাসি মুক্তি, মুক্তি মোর প্রিয়া মোর বধূ,
দিবসে সে চিন্তা মোর, রজনীতে স্বপ্ন সেই মধু।

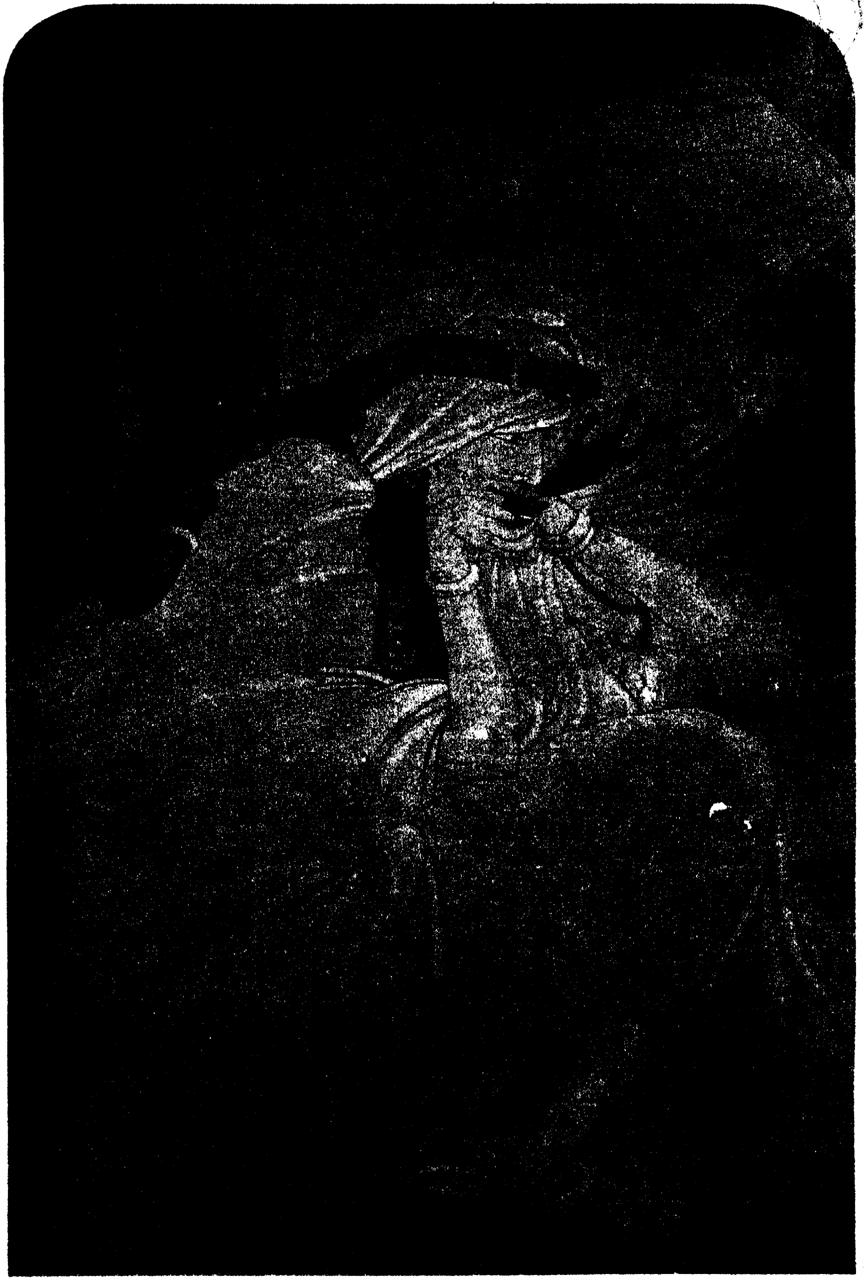
পিতৃভূমি প্রিয়তম, তোমার বেদনা দেয় ব্যথা!
মুক্তি আশে ছুটি তাই, ছুটি লভিবারে স্বাধীনতা।
চঞ্চল সে স্বাধীনতা মুঠি হইতে ছুটিয়া পালায়!
দুঃখম্লান লক্ষ ভ্রাতা দাসত্ব-পেষণে গুমরায়!

বায়ু বহে মনোরম, শিশির শোভিছে ঝলমল,
স্নিগ্ধ গন্ধে পুষ্পদল সুবাসিত করে ধরাতল,
কত নর হেরি ঐ রাজ্য লভি' ভুঞ্জে শত সুখ,—
কেমনে ভুলিব তবু স্বদেশের যন্ত্রণা ও দুখ?
পিকিংএ হোথায় হের ব্যাঘ্র সম হিংস্রক সম্রাট
প্রণতি মাগিছে দম্ভে বিলুণ্ঠিয়া সিংহাসনপাট!
অসহ্য বেদনা! হায়, মৃত আজ মৃত স্বাধীনতা!
সমৃদ্ধ এশিয়া আজ মরুভূমি—বিশাল শূন্যতা!

এ বিংশ শতাব্দী মোরা গড়িয়া করিব নব যুগ;
আজি ভরি' বীর্য্যবন্ত দৃপ্ত শত মানবের বুক
জাগিছে একক আশা, ধ্বনিয়া উঠিছে এক সুর—
"গড়িব নূতন পৃথ্বী, নব স্বর্গ, গ্লানি করি' দূর।"
দাসত্ব-বিনত পিষ্ট লক্ষ চিত্ত স্বদেশের মম
জাগুক অত্যুচ্চ গর্ব্বে ক্রোয়াংটাং হিমালয় সম।

নাপলেওঁ*, ওয়াশিংটন, বিমুক্তির দুর্জ্জয় সন্তান,
এশিয়ার কোটী চিত্তে মূর্ত্ত হও, করো শক্তিমান;
হে চিয়ান, আদি পিতা, কোথা পথ, দাও হে অভয়,
এস মুক্তি, স্বাধীনতা, করো ত্রাণ, জয় তব জয়।

* Napoleon



খেলা
শিল্পী শ্রী সারদাচরণ উকিল

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]



['পুস্তক-পরিচয়ে'র সমালোচনার সমালোচনা না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—প্রবাসী-সম্পাদক]

সর্ব্বহারা—(কবিতাপুস্তক) নজরুল ইস্‌লাম প্রণীত। বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা ছয় আনা।

কাজি নজরুল ইস্‌লামের কবিতার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক আছে কি? তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার একখানি বইই যথেষ্ট। ভগবান পাখীকে একটিমাত্র সুর দিয়াছেন। সে তাহার সেই একটানা সঙ্গীত অশ্রান্ত, অক্লান্ত ভাবে গাহিয়া যায়। শ্রোতার ভাললাগা মন্দলাগার অপেক্ষা রাখে না। একদিক হইতে দেখিতে গেলে, নজরুল ইস্‌লাম সাহেবও বিহঙ্গের সমতুল্য। তাঁহারও একঘেয়ে হইবার ভয় নাই।

আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া তিনি আমাদিগকে যে বিদ্রোহ, বিপ্লব, স্বাধীনতা ও রক্তপাতের গান শুনাইয়া আসিতেছেন "সর্ব্বহারা" তাহারই নূতনতম কিস্তি। প্রথম বারে "অগ্নিবীণার" গর্জ্জন শুনিয়া তাঁহার বিস্মিত ও চমকিত দেশবাসীরা ভাবিয়াছিল যে, এত দিনে আমাদের দেশেও বুঝি আ্যাঙ্গোরার বিজয়বাদ্য অথবা মস্কোর রণভেরী বাজিয়া উঠিল। কিন্তু সেই একই সুরের দ্বাদশতম পুনরাবৃত্তিতে লোকে বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই বাদ্য বাংলা দেশের চিরপরিচিত, সনাতন, নিষ্করুণ ঢাকের বাদ্য মাত্র।

দুধের সাধ যেমন ঘোলে মিটে না, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও তেম্‌নি এই বিদ্রোহের খেলা খেলিয়া পূর্ণ হইবার নহে। কাজি সাহেব শিশুর মত বেলোয়ারী জিনিষ ভাঙ্গিয়া ভাবেন যে, ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিলাম। ধর্ম্ম ও নীতি হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা ভাষার ব্যাকরণ পর্য্যন্ত সকল বন্ধনের উপর তাঁহার নিদারুণ আক্রোশ। এই সাম্যবাদী কবির মতে সব মানুষ সমান।—"আদম হইতে সুরু ক'রে এই নজরুল তক্ সবে"—অর্থাৎ সৃষ্টির আদিম হইতে চরমবিকাশ পর্য্যন্ত সকলে—"কমবেশী ক'রে পাপের ছুরীতে পুণ্য করেছে জবেহ।" সুতরাং তাঁহার কাছে "চোর ডাকাত", "মিথ্যাবাদী" "বারাঙ্গনা", "কুলীমজুর", "নারী", "রাজ-প্রজা" সাধারণ মনুষ্য সকলেই মাসতুত ভাইবোন। 'বারাঙ্গনা'কে দেখিলেই তাঁহার মনে হয়:—

"আমাদেরই কোনো বন্ধু স্বজন আত্মীয় বাবা কাকা
উহাদের পিতা; উহাদের মুখে মোদেরই চিহ্ন আঁকা।
অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা, মেরী হ'তে পারে দেবী—
তোমরাও কেন হবে না পূজ্য বিমল সত্যসেবী—"

এইসকল প্রলাপ বাক্যের কৈফিয়ৎ হিসাবে কাজি সাহেব অবশ্য বলিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার মনের অবস্থা আর স্বাভাবিক নাই। "দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।" কিন্তু তিনি কি দেখিয়া কি শুনিয়া ক্ষ্যাপামির এই চরম সীমায় পৌঁছিলেন? তাঁহাকে একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখকের একটি উক্তি মনে রাখিতে অনুরোধ করি। "মানুষকে ভালবাসিতে হইলে তাহার কাছ হইতে বেশী কিছু প্রত্যাশা করিতে নাই।"—সে টাকা হিসাবেই হউক কিম্বা যশ হিসাবেই হউক।

কাজি নজরুল ইস্‌লামের ভাষা তাঁহার ভাবেরই মত বিদ্রোহী। যাঁহারা চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কবিদের রচনা পড়িয়া বাংলা ভাষার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এই নূতন ভাষা অবোধ্য। একথা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, "কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমিই কি বুঝি তার কিছু?" আমরা অবাক্ হইয়া ভাবি এই সত্য কথাটা জানিয়াও তিনি অকাতরে কবিতা লিখিয়া যাইতে পারেন কি করিয়া? কিন্তু নজরুল সাহেব সংক্রান্ত সব ব্যাপারই এক একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালি। তাঁহার কাব্য হেঁয়ালি; তাঁহার কবিবৃত্তি হেঁয়ালি; তাঁহাকে যে তাঁহার ভক্তবৃন্দ "নবযুগরবি" বলিয়া থাকে তাহাও একটা হেঁয়ালি; সবচেয়ে বড় হেঁয়ালি এইটা, কি দেখিয়া বাংলা-দেশের সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক সম্প্রদায় বিনা বাক্যব্যয়ে এই অসম্বদ্ধ প্রলাপভাষীকে কবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

ন

রসজলনিধি—রসাচার্য্য কবিরাজ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এম,-এ প্রণীত। প্রথমভাগ। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ভারতবর্ষে—ছয় টাকা। বিদেশে—দশ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি ভারতীয় রসশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। গ্রন্থকার আশা দিয়াছেন, ভারতীয় রসসমুদ্র মন্থন করিয়া এইরূপ আরো নয়টি রত্ন আহরণ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিবার বাসনা রাখেন। এরূপ উৎসাহ প্রশংসনীয় হইলেও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে অপাত্রে ন্যস্ত হইতেছে।

আলোচ্য পুস্তকে উদ্ধৃত বা রচিত সংস্কৃত শ্লোকের নিম্নে ইংরাজী তর্জ্জমা দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি তন্ত্রশ্রেণীভুক্ত অথবা প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার নিদর্শন ইহা নির্ণয় করিতে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হয়। তন্ত্রশ্রেণীভুক্ত হইলে অতান্ত্রিক আমরা দূর হইতেই শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিয়া বিদায় লইতাম; কিন্তু গ্রন্থকার ইহাকে জড়বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পুস্তক বলিয়াই মনে করেন। ভারতের বৈজ্ঞানিক সাহিত্য নিতান্তই তরুণ অবস্থায়; এই জাতীয় পুস্তকের আবির্ভাব স্বতঃই আশার উদ্রেক করে।

প্রথমেই মুখবন্ধ আলোচনা করা যাক্। গ্রন্থকারের মতে—১৯৫........ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রসবিদ্যার প্রচলন ছিল। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে এই মত যতই শাস্ত্রসম্মত হউক না কেন আধুনিক ভূতত্ত্ব ইহার সমর্থন করে না, বলাই বাহুল্য। নৈসর্গিক ব্যাপারে অনুসন্ধান না করিয়া আপ্তবাক্যে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি আধুনিক বিজ্ঞানের ধারার পরিপন্থী। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যাচাই করিয়া লইবে, ইহাই হইল নব্য-বিজ্ঞানের লক্ষ্য। সুতরাং যে-সকল পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক আদিম মানবের জন্মক্ষণ নিরূপণ করিতে চাহেন সেগুলি খণ্ডন না করিয়া শুধু দার্শনিক আলোচনা করিলে প্রশ্নের সমাধান হয় না, বলাই বাহুল্য। বৈজ্ঞানিক মত-বাদ ধ্রুব সত্য নহে, পরীক্ষালব্ধ সত্যকে কোনরূপে ব্যাখ্যা করাই মতবাদের লক্ষ্য—অজ্ঞাতপূর্ব্ব পরীক্ষালব্ধ সত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মতবাদও বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মত ভ্রান্ত হইতে পারে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত গ্রন্থকার বা অন্য কেহই এমন কোন প্রামাণিক তথ্য উপস্থাপিত করেন নাই যাহাতে পৌরাণিকমতকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি।

আধুনিক ভূতত্ত্বানুযায়ী পৃথিবীর বয়স কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের নাম যথাক্রমে, প্রাগাধুনিক, অল্পাধুনিক, মধ্যাধুনিক, বহ্বাধুনিক, অন্ত্যাধুনিক, উপাধুনিক ও আধুনিককাল।* ইহার মধ্যে বহ্বাধুনিক তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৎসর ও উপাধুনিক কাল একলক্ষ বৎসর পূর্ব্বের। বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস মানবের জন্ম সময় এই দুই সময়ের মধ্যবর্ত্তী। সুতরাং কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় সভ্যতার কল্পনা করিয়া গ্রন্থকার যে-গৌরব অনুভব করিয়াছেন তাহার অংশীদার হইবার সৌভাগ্য সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

আর্য্যগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত প্রচলিত আছে, কিন্তু কেহই সম্ভবতঃ এতদূর অগ্রসর (?) হইতে পারেন নাই। পুরাণের নজির দেখাইলে আমাদিগকে নির্ব্বাক্ থাকিতে হইবে; কিন্তু গ্রন্থকার সামান্য একটু ভুল করিয়াছেন। যদি তিনি বলিতেন যে, এই কলিকাতা সহরই কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন রসবিদ্যার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা হইলে বিষয়টি বেশ জমকাল হইত। যাহা হইক এই "শাস্ত্রসম্মত" মতের স্বপক্ষে তিনি যে প্রমাণ উপস্থিত করিতেছেন, দুঃখের বিষয় তাহা নিতান্তই অশাস্ত্রীয় হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দুরসায়ন সম্বন্ধীয় বহুমূল্য গ্রন্থে রসেন্দ্র-চিন্তামণি নামক বৌদ্ধযুগে লিখিত একখানি পুস্তকের উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ বৌদ্ধশ্রমণ ধুণ্ডুকনাথ—কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থকর্ত্তার নাম গুরুবংশীয় রামচন্দ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন রসায়ন সম্বন্ধীয় সাহিত্যে রসেন্দ্র-চিন্তামণি একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। শ্রুতিকটু বশতঃ হউক অথবা অনবধানতা বশেই হউক বেচারা ধুণ্ডুকনাথ গ্রন্থকারের হস্তে দণ্ডকনাথে পরিণত হইয়াছেন এবং যে হেতু হিন্দুর পরমারাধ্য দেবতা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যরক্ষার্থ চতুর্দ্দশবর্ষকাল দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন সুতরাং সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র ভিন্ন এ গ্রন্থের রচয়িতা আর কে হইতে পারে? এরূপ প্রমাণ অকাট্য, ইহার বিপক্ষে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ইহার পরই গ্রন্থকার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যে-ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অমার্জ্জনীয়। আচার্য্যের অঙ্গে এ মসীর প্রলেপ লাগিবে না সত্য, কিন্তু এরূপ বেয়াদবি বরদাস্ত অন্যের পক্ষে অসাধ্য। যাঁহার হিন্দুরসায়ন রাসায়নিক-ঐতিহাসিক সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিল, বার্থলোর ন্যায় ঐতিহাসিক রাসায়নিক, সিল্‌ভ্যাঁ লেভীর ন্যায় প্রাচ্য-ভাষাবিৎ এবং সম্প্রতি আর্হেনিয়াসের ন্যায় মহারথী যে-গ্রন্থের প্রশংসায় শতমুখ হইয়াছিলেন তাহার গ্রন্থকারকে অশিক্ষিত ছাত্র (untrained student), অপটু সমালোচক (amateur critic) প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান বিষয়ের শিক্ষক, এম-এ উপাধিধারী (ত্রয়ী) কবিরাজ ভূদেব মুখোপাধ্যায় যে সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। যিনি ধুণ্ডুকনাথকে দণ্ডকনাথ বলিয়া ভুল করেন, বৌদ্ধভিক্ষুকে রামচন্দ্র সাজাইয়া দেন সেই পরম-পণ্ডিত গ্রন্থকারের পক্ষে মূর্থ প্রফুল্লচন্দ্রকে এইভাবে অভিহিত করা বেশ শোভা পায়!

শুধু ইহাই নহে, মুখবন্ধটি আরো অনেক মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ; পুস্তকখানি যেন প্রফুল্লচন্দ্রের অজ্ঞতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে। অর্কপ্রকাশ নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; গ্রন্থকারের বিশ্বাস ইহার রচয়িতা লঙ্কেশ্বর রাবণ। প্রাচীন প্রামাণিক রাসায়নিক কোন গ্রন্থে 'অর্ক' শব্দের উল্লেখ মাত্রও নাই, ইহা পারস্য শব্দ আরকের রূপান্তর মাত্র। এই গ্রন্থে ফৈরিঙ্গ রোগ অর্থাৎ ফিরিঙ্গি বা পর্ত্তুগীজগণের আনীত সিফিলিস্ রোগের নিদান ও ঔষধ বর্ণিত আছে। সুতরাং ইহাকে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফেলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র কোনই ভুল করেন নাই। এই গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি আরকের (এসিডের) উল্লেখ নাই। ইহা গ্রন্থকারও স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং অজৈব আরক (mineral acid) প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল, পর্ত্তুগীজ বা অন্য কোন বৈদেশিক জাতি এদেশে পরবর্ত্তী কালে ইহার প্রচলন করে ইহা বলিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কোন মারাত্মক ভুল করেন নাই নিশ্চয়। এক শুধু অর্ক-প্রকাশের উপর নির্ভর করিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের ভুল ধরিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতার কাজ হইয়াছে। যে-গ্রন্থের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যাহাতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদেশিক জীবনের প্রতিচ্ছায়া বর্ত্তমান, তাহাকে রাবণ-বিরচিত গ্রন্থ বলিয়া বড়াই করিলে মিথ্যা জাত্যাভিমান বর্দ্ধিত হইতে পারে, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না নিশ্চিত। আর যে-গ্রন্থের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য গ্রন্থকার পনেরো পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকার অবতারণা করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কবিরাজ ভূদেব মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা বিজ্ঞতর লোকে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুরসায়নের ইতিহাস প্রকাশিত হইলে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় এই গ্রন্থ সাদরে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বার্থলো বলিয়াছেন,

"বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন মনোজ্ঞ অধ্যায় সংযুক্ত হইয়াছে।"

ডারহাম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার প্রফুল্লচন্দ্রকে সম্মানসূচক "বিজ্ঞানাচার্য্য" উপাধিতে ভূষিত করিবার সময় বলেন, "* * রাসায়নিক জগতে তাঁহার (প্রফুল্লচন্দ্রের) প্রতিপত্তি মুখ্যতঃ হিন্দুরসায়নের ইতিহাস সম্বন্ধীয় বিশাল গ্রন্থে বিন্যস্ত রহিয়াছে;" "এই গ্রন্থ বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া তুল্যসম্পদশালী। অন্য কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে একথা না বলা চলিলেও, ইহার সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, এবিষয়ে চরম মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।"

পাশ্চাত্য রসায়নে ঘোর অভক্ত কবিরাজ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্ভবতঃ রাসায়নিক জগতের পিতামহ, সুইডেনের নোবেল একাডেমীর তত্ত্বাবধায়ক আর্হেনিয়াসের নাম জ্ঞাত নহেন। আর্হেনিয়াসের কীর্ত্তি, কলাপ ঘোষণা

* Eocene, Oligocene, Myocene, Pliocene, Pleistocene, Subrecent and Recent.

করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। আর্হেনিয়াসের রচিত পুস্তক "আধুনিক জীবনে রসায়নের প্রভাব" (Chemistry in Modern life) নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টি প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দুরসায়নের মোটামুটি বিবৃত্তি বলিলেও চলে এবং আর্হেনিয়াসও পুস্তকের মধ্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। মধ্যযুগের কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতা উভয়ে সম্মিলিত হইয়া যে বিচিত্র সাহিত্য ইউরোপে সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা তাহারি ভারতীয় আদিম অপকৃষ্ট সংস্করণ। ৩০০ পৃষ্ঠার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে।

"ভুধুকমণ্ডুক বসা বসা কচ্ছপ সম্ভবা।
কর্কোটি শিশু-মারক গো-শূকর নরোদ্ভবা॥
অজোষ্ট্র খর মেষাণাং মহিষস্য বসা তথা।
মূত্রাণি হস্তিকরভ মহিষীথর বাজিনাম্।
গোজাতীনাং স্ত্রিয়ঃ পুংসাং পুষ্পং বীজং তু যোজয়েৎ॥"

ম্যাক্‌বেথের বর্ণিত মায়াবিনীর কটাহের (Witche's Cauldron) উৎপত্তি কি এই শ্লোক হইতেই? যাহা হউক আধুনিক যুগে যে কোন লোক বিশেষতঃ তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত কেহ এরূপ সুরুচিসম্পন্ন শ্লোক সাধারণের পাঠ্য পুস্তকে উদ্ধৃত করিতে পারেন তাহা সম্ভবতঃ অনেকেরই ধারণার বাহিরে। আলোচ্য গ্রন্থে হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার কয়েকটি প্রক্রিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি লওয়া যাউক।

"দশ টঙ্কমিতো গন্ধো ঘৃতেন সহ গালিতঃ।
কণ্যকাদ্রব মধ্যে তং নিক্ষিপেদ্বার পঞ্চকম্॥
অস্মিন্ শুদ্ধে দৃঢে গন্ধে ত্রিটঙ্কং নব সারকম্।
মরিচানি তু পিষ্টানি পঞ্চতোলানি বারিণি॥"

ইত্যাদি ইত্যাদি।
৩২৪ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ গন্ধক, ঘৃত, নবসারক ও মরিচ প্রভৃতির সমন্বয়ে নানা প্রকার প্রক্রিয়ার পর স্বর্ণের উৎপত্তি হয়। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকারের কথায় ভুলিয়া অথবা দেবনাগরীর পুরকের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যদি কেহ এ পরীক্ষা আরম্ভ করেন তবে ফল যে কি দাঁড়াইবে তাহা অবশ্য বলিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু শ্লোকটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নবসারকম্ ও বাংলা নিশাদল একই পদার্থ। কোন প্রচীন প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। ইহা পারস্য নৌসাদর শব্দের সংস্কৃত অপভ্রংশ সুতরাং মুসলমান রাজত্বের সময় শব্দটি সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্ত হয় এরূপ মনে করিলে মারাত্মক ভুল নাও হইতে পারে। যাহা হউক এসকল শ্লোকের প্রামাণিকতা লইয়া অযথা কলহ করিবার আবশ্যকতা নাই। এই জাতীয় পুস্তক প্রকাশের ফল যে কি হইবে তাহা গ্রন্থকার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি না জানি না। দরিদ্র বাঙ্গালীর হয়ত এত অধিক মূল্য দিয়া পুস্তক কিনিবার সামর্থ্য নাই কিন্তু অর্দ্ধ বা অশিক্ষিত অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী মহলে ইহা বেশ কাটিবে। স্বর্ণ-করণের মিথ্যা প্রলোভনের আশায় এই জাতীয় লোকে অনেকেই পুস্তক কিনিতে আরম্ভ করিবে, ফলে পরীক্ষার পরিণাম যাহাই হউক গ্রন্থকারের তহবিল পূর্ণ হইয়া আসিবে। মুখবন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু যে-সকল প্রক্রিয়ার সাহায্যে তিনি এই ইন্দ্রজাল সাধিত করিতে চাহেন তাহাদের স্বরূপ যে কোন রাসায়নিকের নিকট সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। গ্রন্থকারের মতে পারদ যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণকে "উদরস্থ" করিলেও তাহার ভার বৃদ্ধি হয় না (মুখবন্ধ XIV)। অন্যত্র ৩১৯ পৃষ্ঠায় ইহারই সালঙ্কার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, নব্যরসায়নের জন্মদাতা আঁতোয়ান্ লোরাঁ লাভোজিয়ের (Lavoisier) জন্মের পূর্ব্বে কেহ একথা বলিলে হয়ত লোকে চিন্তা করিয়া দেখিলেও দেখিতে পারিত কিন্তু সূক্ষ্ম তুলাযন্ত্র আবিষ্কারের পর একথায় লোকে উপহাস ভিন্ন আর কিছুই করিবে না। যাহা পরীক্ষালব্ধ সত্যের বিরোধী তাহা জাহির করিবার কি আবশ্যকতা আছে? গন্ধক ও পারদ সম্মিলিত হইয়া যে-পদার্থের সৃষ্টি করে তাহা বাহির হইতে দেখিলে স্বর্ণ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহাতে একরতি পরিমাণও স্বর্ণ নাই।

যাহা হউক গ্রন্থকারের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার যুগে এ জাতীয় পুস্তক শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত হইতে পারে না। প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাস হিসাবে ইহার মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু জড় বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ইহার মূল্য কতটুকু? বিদেশেও শিক্ষিত ভারতবাসীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এই পুস্তক অতিশয় হীন ধারণা পোষণের সহায়তা করিবে। আশা করি, গ্রন্থকার এই জাতীয় অন্য কোন পুস্তকে শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় না করিয়া মহত্তর উদ্দেশ্যে সঞ্চিত রাখিবেন।

শ্রী সুবোধকুমার মজুমদার

শ্রীভাগবতামৃত-কণা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত, কবিরাজ শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী সম্পাদিত। শ্রীঠাকুর কানাই সেবা সমিতি, ভাজনঘাট, পোঃ নদীয়া হইতে প্রকাশিত। দেবকীনন্দন প্রেস—মাণিকতলায় পাওয়া যায়। মূল্য ৵০

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী কৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীভাগবতামৃত-কণা নামক এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। শ্যামলাল গোস্বামী মহোদয় ইহার বঙ্গানুবাদ করেন। শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয় শ্যামলাল-বাবুর অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া মধ্যে মধ্যে শাস্ত্র-সম্মত তাৎপর্য্যাদি যোগ করিয়া এই গ্রন্থকে আরও মূল্যবান করিয়াছেন। ইহাতে, যিনি উপাস্য তাঁহার স্বরূপ কি, তিনি উপাস্য কেন—ইত্যাদি প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে।

সটীক বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থ—৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় সংগৃহীত ও চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা অনুবাদিত। প্রকাশক স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রাপ্তিস্থান শ্রীঅমূল্যরতন ভট্টাচার্য্য ৩০নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, বিডনষ্ট্রীট পোঃ, কলিকাতা, মূল্য ১।৹

স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহায়তায় কৃষ্ণার্চ্চনচন্দ্রিকা, মন্ত্র মহোদধি, তন্ত্ররাজ, পিঙ্গলাতন্ত্র; যামল প্রভৃতি ৭৪ খানি গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিষ্ণুবিষয়ক সমস্ত ক্রিয়া-কলাপই লিখিত আছে। বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্বন্ধে এমন প্রামাণিক গ্রন্থ আর নাই বলিলেই চলে। বাঙলা ভাষায় অনুবাদ খুব প্রাঞ্জল হইয়াছে—সাধারণের বুঝিবার পক্ষে কোনো অসুবিধা হইবে না। পুঁথির আকারে চমৎকার কাগজে সুন্দর ছাপা।

স

শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি-কল্যাণ—শ্রীনিশিকান্ত বসু। প্রাপ্তিস্থান বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী, ৭০, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ডাঃ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় কর্তৃক পরিচালিত বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী বাংলাদেশের অশেষ কল্যাণ করিয়া আসিতেছেন। এই মণ্ডলীর সেবকরূপে লেখক মহাশয় গ্রামে গ্রামে চিত্র-সাহায্যে প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষা, আলোক-বাতাস-পূর্ণ আঁতুড় ঘর, আঁতুড় ঘরের পরিচ্ছন্নতা, জন্ম হইতে স্বাস্থ্যকর উপায়ে শিশুর পরিচর্য্যা প্রভৃতি বিষয়ে নানা বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। সেইসব বক্তৃতা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক নানা চিত্র-সংযোগে এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে শিশুর জন্ম-মৃত্যুর হার, গর্ভসঞ্চার, গর্ভিণীর কর্ত্তব্য, প্রসবের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য, প্রসবকালীন কর্ত্তব্য, প্রসূতি-পরিচর্য্যা, শিশু-পরিচর্য্যা, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুর ছোঁয়াচে রোগ ও তাহার প্রতিকার এবং শিশুর শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ আলোচনা আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় "প্রসূতি-পরিচর্য্যা" নামে এই জাতীয় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি ঐ বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বাঙালীর ঘরে শিশুমৃত্যু অত্যধিক, এবং দুই তিনটি সন্তানের জননীরা অধিকাংশ স্থলেই ভগ্নস্বাস্থ্য অথবা অকালে ইহলোক হইতে অপসারিত। বাঙালীর এ দারুণ গৃহ-যন্ত্রণা অনুভব করিয়া বাঙালী জাতিকে বাঁচাইবার ও সুস্থ করিয়া গড়িবার ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বাঙালীর পরম বন্ধু। যিনি বংশের দুলাল, ভবিষ্যতে যিনি বংশ রক্ষা করিয়া দেশের ও দশের সেবা করিবেন, এবং যে নারী জাতির ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছেন—সেই সন্তানের জন্ম ও সেই নারীর জাতি-জন্মদান-কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য আমরা এক পূতিগন্ধময় অন্ধকার গৃহ নির্দ্দেশ করি। ফলে, আজ বাঙালীর বংশধারা রুদ্ধগতি, বাঙালী নারী জীর্ণা ও বাঙালী জাতি জীবনের সর্ব্বপথে অনগ্রসর। প্রত্যেক বাঙালী পুরুষ ও নারী জানুন যে, প্রসূতিই দেশের জননী ও শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ। ইঁহাদিগকে সুপরিচর্য্যায় পালন করা কেবল কর্ত্তব্য নয়, ধর্ম্ম। এই জাতীয় পুস্তকে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইতেছে। সর্ব্বসাধারণকে আমরা পুস্তকটি পড়িতে অনুরোধ করি।

প্রাচীন ভারতে গোমাংস—স্বামী ভূমানন্দ। ১, মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার কলিকাতা। মূল্য তিন আনা।

ঋগ্‌বেদের যুগ হইতে মহাভারতীয় যুগ এমন-কি অশোকের যুগ পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া লেখক ভারতে গোমাংস প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভারত বেদকে যখন অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে তখন বৈদিক ক্রিয়া, আচার ও বেদানুমোদিত গোমাংস ব্যবহার ভারত আজ ত্যাগ করিতে পারে না। ভারত যখন সম্পূর্ণ বেদপন্থী ছিল তখন সে খাদ্যাখাদ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডী স্বীকার করে নাই এবং স্বীকার করে নাই বলিয়াই বিভিন্নাচারী শক, হুণ প্রভৃতিকেও সে আপনার সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। আজ গোমাংস-ভক্ষণের গণ্ডী টানিয়া ভারত মুসলমান ও খৃষ্টীয়ানকে আপনা হইতে ঘৃণায় দূরে রাখিতেছে। এই দূরীকরণ-চেষ্টার ফলে আজ মুসলমানের সঙ্গে তাহার বিরোধের শেষ নাই, ও হিন্দুসমাজ বিপর্য্যস্ত। এই বিপদ উত্তীর্ণ হইতে হইলে ও মুসলমান সমস্যা সমাধান করিতে হইলে হিন্দুকে গোমাংস সম্বন্ধে অত বেশী কঠোর হইলে চলিবে না। তাহারই শাস্ত্রে গোমাংস ব্যবহার অনুমোদিত; সুতরাং সে-সম্বন্ধে তাহাকে সংস্কারমুক্ত হইতে হইবে। তাহা হইলেই মুসলমানকে গ্রহণ করিবার ও হিন্দুসমাজের বলবৃদ্ধির সুযোগ ঘটিবে।

লেখকের উক্ত মন্তব্য হিন্দুসমাজের চিন্তনীয় ও বর্ত্তমান কালে ইহার আলোচনা খুবই বাঞ্ছনীয়। তবে লেখককে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতে মহাপুরুষ বুদ্ধের অহিংসা ধর্ম্মের যে অদ্ভুত প্লাবন আসে, তাহা একেবারে অভারতীয় নহে। সে উচ্চ ধর্ম্মাদর্শের আভাসও বৈদিক কাল হইতেই হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্র পশুবধও যেমন স্বীকার করিয়াছেন, পশুবধ না-করার উচ্চ মতকেও তেমনি অস্বীকার করেন নাই। আর মানুষের মধ্যে হিংসা-ভাবের প্রাধান্য থাকিলেও অহিংসভাবের অভাব নাই। গোমাংস গ্রহণে মুসলমানকে স্বীকার করার সুবিধা হয়ত ঘটিতে পারে, কিন্তু ভারতের প্রকৃতি সে-বিষয়ের কতটা সহায়ক তাহা বিবেচনা ও আলোচনার বিষয়। তাহা ছাড়া কেবলমাত্র গোমাংসই কি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায়?

রমানাথ—শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, এম এ, বি-এল। প্রাপ্তিস্থান চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লি, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বইখানিকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। ইহা একটানা একটি গল্পের মত। কিন্তু গল্পও ভাল জমে নাই।

গুপ্ত

(১) সরল ধাত্রীশিক্ষা ও কুমারতন্ত্র—ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ২৲ টাকা।

(২) শিশুমঙ্গল প্রথম শিক্ষা—ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস প্রণীত। মূল্য ।৵০;—

প্রাপ্তিস্থান ১০৯ আপার সার্কিউলার রোড, কলিকাতা

দশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবে শিশু-মড়ক নিবারণের উপায় স্বরূপ উত্তর কলিকাতায় একটি শিশুমঙ্গল কেন্দ্র ও দুগ্ধ-ভাণ্ডার সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির নিকট দশ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন। সে-সময় মিউনিসিপ্যালিটি সে-কথায় কর্ণপাত করেন নাই। জনপ্রিয় ডাক্তার বেণ্টলী, সরকারকে শিশুমঙ্গলের ব্যবস্থার জন্য অনেকবার অনুরোধ করেন। তাঁহার কাগজপত্র জঞ্জালের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ১৯২০ সালে সুন্দরীবাবু দুইজন সদস্য দ্বারা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয় প্রশ্ন করাইয়াছিলেন। তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট একটি শিশুমঙ্গল কমিটী নিযুক্ত করেন। স্যার নীলরতন তাহার সভাপতি, ডাক্তার বেণ্টলী সম্পাদক, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সদস্য। এই কমিটী কর্ত্তৃক যখন একটি শিশুমঙ্গল ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী খোলা হয়, সভাস্থলে তদানীন্তন গভর্ণর কমিটীর প্রস্তাবিত শিশুমঙ্গলের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সরকারী তহবিলে সে টাকার সুদ বাড়িতেছে।

সুন্দরীবাবুর সরল ধাত্রী শিক্ষা ও কুমারতন্ত্র গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশু-পালনের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। সম্প্রতি এই গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পচ্ছলে গ্রন্থকার ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুপালনের তত্ত্বগুলি এমন সহজভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যে অতি অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরাও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া গর্ভিণী পরিচর্য্যা, প্রসব ও শিশুপালন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছেন। ইডেন হাঁসপাতাল, ডাফরীন হাঁসপাতাল, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীন ধাই-শিক্ষা-শ্রেণী-সমূহে এই পুস্তক পঠিত হইতেছে।

গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় ধাত্রীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ রহিয়াছে। সেই কর্ত্তব্য লঙ্ঘনের ফলে যে এই বাঙ্গালা দেশে প্রতিবৎসর আড়াই লক্ষ শিশু ও ত্রিশ হাজার জননী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, সে-কথাটা গ্রন্থকার পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। চরিত্রহীনতার দরুণ কুৎসিত রোগ হয় এবং ঐজন্য প্রসূতি ও শিশু মারা যায়, এই বিষয় প্রমাণ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

"বয়স্থ মেয়ে ও পুরুষদের সাবধান ক'রে বল্‌বে যে, চরিত্রহীন হ'লে যে কেবল নিজের সর্ব্বনাশ হয় তা নয়, কিন্তু শিশুহত্যার ভাগী হ'তে হয়। এই রোগের অনেক সময় বাহিরে লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অথচ রোগ ভিতরে থাকে, তাই থেকে অন্যের শরীরে যায়। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত এর জের থাকে, এমন ঘটনাও জানা আছে।"

শিক্ষিত ধাত্রীর সংখ্যার অল্পতা বা অভাব বশতঃ অনেকে এখনও অশিক্ষিত দেশী ধাই দ্বারা প্রসব করাইয়া থাকেন। তাহাদের শিক্ষার জন্য সুন্দরী-বাবু "শিশুমঙ্গল প্রথম শিক্ষা" নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। জরায়ু প্রভৃতির প্রতিকৃতি ও ছবির সাহায্যে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এই গ্রন্থে তাহার সঙ্কেত রহিয়াছে। যাহাতে গ্রামে গ্রামে ডিষ্টিক্টবোর্ড কিম্বা পল্লীমঙ্গল সমিতির অধীনে ঐরূপ শিক্ষার অনেকগুলি কেন্দ্র হয় গ্রন্থকারের এবং ডাক্তার বেণ্ট্‌লির এই অভিপ্রায়।

আমরা আশা করি, প্রত্যেক ডিষ্টিক্ট বোর্ড ও সেবাসমিতি এই পুস্তক দুইখানি ক্রয় করিয়া বিতরণ করিবেন এবং শিক্ষিত ধাত্রী ও অশিক্ষিত ধাই শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। ঘরে ঘরে এই পুস্তকগুলি গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় পঠিত হওয়া উচিত।

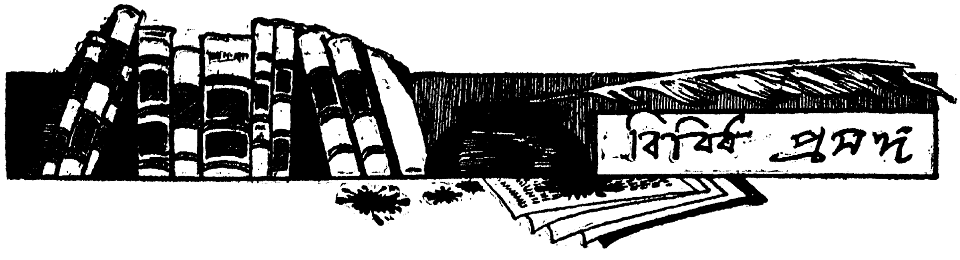
হ

বাঙ্গালা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ—"The Origin and Development of the Bengali Language" নামে দুই খণ্ডে অষ্টাংশিত ফুলস্ক্যাপ আকারের শতোত্তর সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থ বহিঃ-সৌন্দর্য্যে যেমন নয়নানন্দ হইয়াছে, অন্তঃ-সৌন্দর্য্যেও—বিষয়-গৌরবে আলোচনা-পদ্ধতিতে এবং লিপিকৌশলে—তেম্‌নি চিত্তহারী হইয়াছে। গ্রন্থের লেখক সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সম্বলিত বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে এত দিন পরে বঙ্গভাষা-তাত্ত্বিকগণের গবেষণা ও আলোচনার বহুবিঘ্নসঙ্কুল সংকীর্ণ পথটি আজ পরিষ্কৃত ও রাজপথে পরিণত হইল। কিরূপে যে কোল-দ্রবিড় তিব্বতী-বর্ম্মী নারদী ভাষায় ডালপালা—হো-মুণ্ডারী মাল্‌তো-ওঁরাও লেপচা-ভোট কোচ-মেচ গারো ম্রু কুকী চীন লুশাই-খাসী প্রভৃতি ম্লেচ্ছ, অসাধু, ইতরাখ্য কথ্য-গ্রাম্য-উপ-অপাদি-নামক উপেক্ষিত ভাষার এবং আর্য্য-ভারতের সংস্কৃত প্রাকৃতের তদ্ভব ও তৎপর্য্যা ভাষাগুলির শব্দ-সাগরে স্নান করিয়া আর্য্যানার্য্য বাঙ্গালার মৌলিন্য ঘুচিয়া বর্ত্তমান কৌলীন্য লাভ হইল, শব্দবিজ্ঞানবিৎ সুনীতিবাবু তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে তাহা সুস্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষাকে স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী সংস্কৃতের তৎসমা দুহিতা বা দৌহিত্রী জ্ঞানে যাঁহারা আজিও আর্য্যামির মোহে মাতৃভাষায় অনার্য্য সংস্রব সহ্য করিতে পারেন না, বাঙ্গালাভাষায় ঠিকুজি-কুলুজিকার এমন অনেকেরই দৃষ্টি এই ভাষাবিজ্ঞানের ধারানিবদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাকরণখানি বিশেষভাবেই আকর্ষণ করিবে। তাঁহারা দেখিবেন যে, বাঙ্গালীর অত্যতীতের পূর্ব্বপুরুষগণের অনার্য্য প্রভব আর্য্যসংস্কারপূত সেই বাঙ্গালীই কোন্ কোন্ রসায়ন সংযোগে আজ বিশ্বসাহিত্যের এই বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। পাণিনি মুগ্ধবোধের তদ্ভব ও তৎসম ছাঁচে ঢালা বাঙ্গালা-ব্যাকরণকারগণও দেখিবেন যে, তাঁহাদের বাঙ্গালা ব্যাকরণ লেখা হয় নাই, কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন তাঁহার "গৌড়ীয় ব্যাকরণে" ঠিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে যে আদর্শ দেখাইয়াছিলেন এবং যাহা কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শব্দতত্ত্ব" হইতে বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণের পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় বৈয়াকরণিক লেখমালার ভিতর দিয়া অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে, সুনীতিবাবুর লেখনীমুখে সেই ব্যাকরণই আজ পর্য্যাপ্ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা লাভ করিল। গ্রন্থকার ইহাতে ভারতীয় আর্য্যানার্য্য শব্দ ব্যতীত পর্ত্তুগীজ ইংরেজী আরবী-পারসীক প্রভৃতি বহু বৈদেশিক ভাষায় শব্দসংস্রব বিশদ ভাবে প্রদর্শন করিয়া প্রায় দশ সহস্র বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি আলোচনা ও ধ্বনি-বিচার করিয়াছেন।

এপর্য্যন্ত এই বিভাগের যতগুলি পুস্তক, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সকলগুলিরই আলোচনা অল্পাধিক আংশিক, এবং phonology ও morphologyর আলোচনায় বৈজ্ঞানিক সূত্রের সাহায্যে অল্পাধিক বিচারিত হইলেও তৎসমস্তই অনুসরণ-পদ্ধতি ও শৃঙ্খলায়, ধ্বনি এবং গঠন বিজ্ঞানের ধারানিষ্ঠতায় অননুগত ও অকিঞ্চিৎকর; তাহাদের অধিকাংশই একমার্গী ও সংস্কৃত-মূলান্বেষী। পারিপার্শ্বিক অনার্য্য-ভাষানুশীলন-প্রবণতায় অভাবই যে, এরূপ সংস্কারবদ্ধ-সিদ্ধান্তের হেতু তাহা বলাই বাহুল্য। সুখের বিষয়, উপস্থিত গ্রন্থের লেখকে তাহার সদ্ভাব, বহুভাষায় সংস্রবজাত জ্ঞানের বিকাশ ও মুক্ত সংস্কারের ফলে আমরা এমন একখানি গ্রন্থ হাতে পাইলাম, যাহা ভারতীয় কোনও প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যে অদ্যাবধি লিখিত হয় নাই এবং যাহার গৌরবে আজ বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী গৌরবান্বিত। আমরা ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই ঐতিহাসিক ব্যাকরণ-খানির বাঙ্গালা সংস্করণ দেখিবার আশায় রহিলাম।

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।



বঙ্গে নারীনির্য্যাতন

গত বৎসর আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন একজন হিন্দুস্থানী ছাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাংলা দেশেই নারীদের উপর অত্যাচারের সংবাদ বেশী কেন শুনা যায়?" ইহার উত্তর দিতে পারি নাই। কেহ এরূপ প্রশ্ন করিলে, অন্যান্য প্রদেশেও এরূপ অত্যাচার হয় কি না, অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু যে দোষ, কলঙ্ক, লজ্জা আমাদের আছে, তাহা অন্যেরও থাকিলে—এমন কি অন্যের তাহা অধিকতর পরিমাণে থাকিলেও, আমাদের দোষ, কলঙ্ক ও লজ্জার ক্ষালন বা অপনোদন হয় না, কিংবা আমাদের দোষ, গুণে পরিণত হয় না। সুতরাং নিজেদের দোষ কমাইবার নিমিত্ত, অন্যান্য প্রদেশে কি হয়, তাহার খবর লওয়া অনাবশ্যক ও অনুচিত, কিন্তু যদি এরূপ হয়, যে, অন্যান্য প্রদেশে আগে এইরূপ ঘটনা ঘটিত, কিন্তু এখন ঘটে না; কিম্বা এখন ঘটিলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়; তাহা হইলে, কি কি কারণে এবং কি কি উপায় অবলম্বন দ্বারা অন্যান্য প্রদেশে এরূপ অত্যাচার অতীত ইতিহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, বা বর্ত্তমানে অন্যান্য প্রদেশে এরূপ অত্যাচার ঘটিলে তাহা দমনের কি কি উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা তত্তৎপ্রদেশ-নিবাসী আমাদের কোন বাঙালী পাঠক জানিলে সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইলে বঙ্গদেশের সাহায্য ও উপকার হইতে পারে।

ডাক্তার মুঞ্জে অল্পদিন হইল, পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট তথাকার কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, যে, পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গে নারীনির্য্যাতন সম্বন্ধে উদাসীন, এবং কোন প্রকার সাহায্য করে না। পূর্ব্ববঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ, এবং পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া যে কোন ঔদাসীন্য আছে, তাহা আমাদের মনে হয় না। কিন্তু সমস্ত দেশই যে ইহার প্রতিকারে যথেষ্ট সচেষ্ট নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাক্তার মুঞ্জের মুখে ইহাও শুনিলাম, পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকদের সহানুভূতি ও সাহায্য চান। সহানুভূতি অনেক সময় ফাঁকা কথামাত্র। প্রকৃত সহানুভূতি থাকিলেও অনেক সময় কেহ কেহ কার্য্যতঃ কোন সাহায্য করিতে পারেন না বটে। তথাপি সাধারণতঃ ইহা মনে করা ভ্রম নহে, যে, সহানুভূতি খাঁটি কিনা ও তাহার পরিমাণ কত, তাহা সাহায্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ হইতে বুঝা যায়। এই জন্য, নারীনির্য্যাতনের প্রতিকারকল্পে বঙ্গের কোন এক অংশের লোক সেই অংশের লোকদের নিকট এবং অন্যান্য অংশের লোকদের নিকট কি কি প্রকারে কিরূপ সাহায্য চান, তাহার কেজো রকমের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অত্যাচরিতা ও অত্যাচারীর জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই দৌরাত্ম্য ও পাপ দেশ হইতে উন্মূলিত হওয়া চাই। কেহ যেন মনে না করেন, ইহা অসম্ভব।

আমাদের দেশে অনেকে মনে করে, যে, নরনারীর সম্পর্ক-বিষয়ক নীতিতে আমরা ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই ধারণা-সত্য কিনা, তাহার বিচার করা এখন অপ্রাসঙ্গিক। এস্থলে আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, নারীর উপর অত্যাচার বিষয়ে ইউরোপ ভারতবর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইউরোপে নরনারীর সম্বন্ধ বিষয়ক যে দুর্নীতির কথা তথাকার অনেক মোকদ্দমা হইতে প্রমাণিত হয়, তাহা অন্য রকমের। একা বা দল বাঁধিয়া কুমারী, সধবা, বিধবা নারী হরণ ও তাহার উপর পাশব অত্যাচার, তাহাকে লুকাইয়া রাখা, তাহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সরাইয়া সরাইয়া লইয়া যাওয়া, অত্যাচারের পর তাহার প্রাণবধ—এপ্রকারের ঘটনা আধুনিক ইউরোপের কোথাও ঘটে বলিয়া পড়ি নাই, শুনি নাই। গত বৎসর কিছুকাল ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন

দেশে ছিলাম। অনেক সময় তথাকার খবরের কাগজও পড়িয়াছি, কিন্তু এরূপ একটি ঘটনার সংবাদ কোন কাগজে দেখি নাই। আমাদের দেশে যত অত্যাচার হয়, তাহার অনেকগুলার খবর কাগজে বাহির হয় না, মোকদ্দমা তদপেক্ষাও কম ঘটনা লইয়া হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, কাগজে যাহা বাহির হয়, তাহা অত্যন্ত বেশী। পক্ষান্তরে, এরূপ ঘটনা ইউরোপে ঘটে না।

ইউরোপেও আমাদের দেশে এই প্রভেদের কারণ কি, আমরা তাহার সম্পূর্ণ উত্তর দিতে হয় ত অসমর্থ। কিন্তু দুই একটা কারণ যাহা মনে হইতেছে, তাহা বলিব।

পাশ্চাত্য দেশসকলে দুশ্চরিত্রতা নাই, এমন নয়; খুব আছে। সেই জন্য সেই সব দেশেও বেশ্যাবৃত্তি আছে, তাহার জন্য "শ্বেতদাস ব্যবসা" (White Slave Traffic) আছে। নানা উপায়ে ও কৌশলে অল্পবয়স্কা ও পূর্ণ-বয়স্কা যুবতীদিগকে ভুলাইয়া প্রতারণা করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে নানাস্থানে চালান করিয়া তাহাদিগকে পাপ-ব্যবসায় নিযুক্ত করা হয়। পাশ্চাত্য দেশসকলে নারীর এইপ্রকারের দুর্গতি আছে; এবং তাহা আমাদের দেশেও আছে। যাহা ইউরোপে নাই, তাহা এই বাংলাদেশের সেই সব ভীষণ পৈশাচিক বলপ্রয়োগসাধিত অত্যাচার যাহার এক বা একাধিক সংবাদ বাংলা কাগজের প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় পাওয়া যায়। ইউরোপ ও বাংলাদেশের এই প্রভেদেরই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা যে-সব কারণের কথা বলিব, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে, কিংবা আমাদের কোন ভ্রম হইতে পারে না, আমরা এরূপ মনে করি না। কিন্তু যাঁহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত মনে করিবেন, তাঁহাদের মতে যাহা প্রকৃত কারণ তাহা নির্দ্দেশ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে।

ইউরোপীয় সমাজে নারীরা এরূপ শিক্ষা ও সুযোগ প্রাপ্ত হন, যে, তাঁহারা কেবল তাঁহাদের স্ত্রীত্ব দ্বারাই পরিচিত নহেন। অর্থাৎ কেহ ভাল লেখক বলিয়া পরিচিত, কেহ সাংবাদিক, কেহ শিক্ষক, কেহ টাইপ-লেখক, কেহ কেরাণী, কেহ কারিগর, কেহ দোকানদার, কেহ বণিক, কেহ দর্জ্জি, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ ঐতিহাসিক, কেহ অধ্যাপক, কেহ মন্ত্রী, কেহ ব্যবস্থাপক, কেহ ধর্ম্মোপদেষ্টা, কেহ চিত্রকর, ইত্যাদি। এই জন্য ইউরোপে, নারী দেখিলেই, বা কোন নারীর উল্লেখ হইলেই, সেই জীবটি যে কেবলমাত্র স্ত্রীজাতীয় জীব এবং সমাজে স্ত্রীত্বই তাহার একমাত্র বৃত্তি বা কার্য্য, অন্ততঃ সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি বা কার্য্য, একমাত্র এই চিন্তাই স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য হয় না;—যেমন পৃথিবীর কোন দেশেই কোন নর দেখিলে বা তাহার উল্লেখ হইলেই সে যে পুংজাতীয় দ্বিপদ প্রাণীবিশেষ, ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য চিন্তা নহে, বরং ইহাই জিজ্ঞাস্য হয়, যে, এই দ্বিপদ প্রাণীটির সমাজে স্থান কি, কাজ কি, ইত্যাদি। এই অবস্থায় আমাদের দেশের চেয়ে ইউরোপে নারীর স্ত্রীত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্বের দিকে চিন্তা কিছু অধিক ধাবিত হইবার কথা। পুরুষের পুংজাতীয়ত্ব ও নারীর স্ত্রীত্বের দিকেই যদি চিন্তা বেশী ধাবিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যত্ব না বাড়িয়া জান্তবতা বাড়ে, সুতরাং ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাও বাড়ে। অন্যদিকে, যদি সমাজে নারীর স্ত্রীত্ব ছাড়া অন্য কার্য্য ও বৃত্তিও থাকে, তাহা হইলে আত্মা ও হৃদয়মন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে নারীর মর্য্যাদা নির্ণয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে। বলা বাহুল্য, আমরা নারীদিগকে সহধর্ম্মিণীত্ব ও মাতৃত্ব ত্যাগের হাস্যকর উপদেশ দিতেছি না। পুরুষরা পরিবারের কর্ত্তা হইলেও যেমন কেবল তাহাই নহেন, নারীদেরও তেমনি পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব ছাড়াও মনুষ্যত্ব কিছু আছে, তাহাই বলিতেছি।

অনেকে ইউরোপের সামাজিক অবস্থা অতি জঘন্য মনে করেন। তাহা হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণিত হয় না, যে, আমাদের অবস্থা খুব ভাল। কে ভাল, কে মন্দ, সে চিন্তা আপাততঃ মন হইতে দূর করিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি। কেবল আমাদেরই দুর্গতি ও দুরবস্থার কারণ শান্ত ও ধীর ভাবে নির্ণয় করিতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

ইউরোপে অবরোধ প্রথা নাই, ঘোমটা দিবার প্রথা নাই। এই দুই প্রথার সপক্ষে যাহা বলা যায়, তাহা অবগত আছি। ইহা হইতে যে কুফলের উৎপত্তি হইয়াছে এখন তাহাই আমাদের বক্তব্য। ইহা ব্যতিরেকেও যে হিন্দুত্ব থাকিতে পারে, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রদেশ, সারা দাক্ষিণাত্য

তাহার প্রমাণ। ইহা যে ইস্‌লামের সহিত অভিন্ন নহে, নব্য তুরস্ক তাহা দেখাইয়াছে, এবং ভারতবর্ষেও বোম্বাই অঞ্চলের কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার দেখাইয়াছেন। ইহার কুফল প্রত্যক্ষ করিয়া নব্য তুরস্কের নেতারা ইহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন।

অবরোধ প্রথা এবং মুখখানি সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখার উদ্দেশ্য নারীর পবিত্রতা রক্ষা করা, এইরূপ কথিত হয়। এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। তাহা নারীরা বলিলেই ভাল হয়। অবরোধ ও অবগুণ্ঠন নারীর স্ত্রীত্বের উপরেই ঝোঁক দেয়—পুরুষ ও নারী উভয়ের সাধারণ মনুষ্যত্ব বিস্মৃত হইয়া যেন কেবল নরনারীর জান্তব সম্বন্ধটাই মনে রাখে। ফলে অবরোধ ও অবগুণ্ঠন যে কৌতূহলকে সদা জাগ্রত রাখে, তাহাতে সাত্ত্বিক ও পবিত্র চিন্তার সহায়তা করে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে নারীদেরও মানসিক ক্ষতি হয়। তাঁহারা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিলে জড়সড় হইয়া পড়েন, সামান্য বিপদেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন, এবং অন্য চিন্তা অপেক্ষা কেবল যেন এই চিন্তা লইয়াই বিব্রত থাকেন, যে, কোন্ দুষ্ট পুরুষ তাঁহাদের উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এরূপ মানসিক অবস্থা সাত্ত্বিকতার ও শান্তধীরচিত্ততার সহায়ক নহে। অবরোধ ও অবগুণ্ঠন নারীদের সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং মানসিক বল বৃদ্ধির অন্তরায়। ইহা যে-সব দেশে প্রচলিত, তথাকার পুরুষদের স্বভাবের উৎকর্ষেরও ইহা পরিচায়ক নহে। ইহা হইতে অনুমান করা অন্যায় নহে, যে, তথাকার পুরুষেরা ঈর্ষ্যান্বিত। যে-নারীদিগকে অবরুদ্ধ ও অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখা হয়, তাঁহাদের আত্মীয়দের সম্বন্ধে এই অনুমান করা অস্বাভাবিক নহে, যে, অন্তঃপুরের বাহিরে নারীর রক্ষায় তাঁহারা অক্ষম; এবং ঐ নারীদের অনাত্মীয় পুরুষদের সম্বন্ধেও স্বভাবতঃ এই অনুমান হইতে পারে, যে, তাহারা এরূপ দুশ্চরিত্র, যে, তাহাদের হাত হইতে নারীদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় অবরোধ ও অবগুণ্ঠন। এই দুইটি অনুমান একত্র করিলে, অবরোধ ও অবগুণ্ঠনের দেশসমূহের পুরুষদের স্বভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি পায় না। যাহাদের দেশে অবরোধ নাই, তাহারা যদি জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের দেশের পুরুষেরা যদি মোটের উপর সচ্চরিত্র, তাহা হইলে নারীদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখ কেন?" তাহা হইলে কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে? "তোমাদের যদি নারীরক্ষার সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে অবরোধ তুলিয়া দাও না কেন?' এই প্রশ্নেরই বা উত্তর কি? বস্তুতঃ অবরোধ প্রথা না থাকিলে পুরুষ ও নারী উভয়েরই সাহস বাড়িবার সম্ভাবনা। অবশ্য, ইহা সত্য নহে এবং ইহা বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে, যে, আমাদের দেশের সব পুরুষ পৌরুষহীন বা চরিত্রাংশে নিকৃষ্ট। আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহা অবরোধের সমর্থকদের বিবেচনার জন্য লিখিতেছি। অবরোধ না থাকিলে নারীরা কুচরিত্র হইবেন, এই মিথ্যা সন্দেহের জবাব নারীরা দিবেন। আমরা কেবল বলিব, "মহারাষ্ট্রের নারীরা সকলে বা বেশীর ভাগ কুচরিত্রা নহেন, অথচ তথায় অবরোধ নাই।"

নারীরা যে পুরুষের লোভের বস্তু, অতএব তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখা দরকার, অবরোধ ও অবগুণ্ঠন যেন জোর গলায় ইহাই বলে; যুক্তিসঙ্গত শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইলে নারীরা যে ঘরের বাহিরেও লোকহিতসাধনাদি করিতে পারেন, তাহা বলে না। যাহা লোভের বস্তু বলিয়া লুকাইয়া রাখা হয়, মানুষের প্রবৃত্তি সেই দিকে বেশী ধাবিত হইবার কথা। এইজন্য যে-সব দেশে ও সমাজে অবরোধ ও অবগুণ্ঠন যত বেশী প্রচলিত, তথাকার পুরুষদের জান্তব প্রবৃত্তি বিশেষ এবং নারীলালসা তত প্রবল হইতে পারে। বাংলা দেশে যে সম্প্রদায়ের মধ্যে অবরোধ ও অবগুণ্ঠনের চলন যত বেশী, তাহার অন্তর্ভূত পুরুষদের চরিত্র তদনুরূপ কিনা, এবং তাহাদের দ্বারা নারীনির্য্যাতন তত বেশী হয় কিনা, পাঠকেরা মিলাইয়া দেখিবেন। অবরোধ ও অবগুণ্ঠন না থাকিলে নারীরা যে অধিকসংখ্যায় শিক্ষিতা ও জনহিতসাধিকা হইতে পারেন, বাংলা দেশের সহিত দক্ষিণভারতের তুলনা করিলে তাহা বুঝা যাইবে।

অবরোধ ও অবগুণ্ঠন আমাদের দেশে—বিশেষতঃ বড় সহরে, নারীদের স্বাস্থ্যহানি, দৈহিক দুর্ব্বলতা এবং অকাল মৃত্যুর একটি কারণ। ইউরোপের কোন সহরে একদিন

কাটাইয়া তথাকার নারীদের দৃঢ় পদক্ষেপ এবং পা দুখানার বলিষ্ঠ পুষ্ট গঠন দেখিলেই বুঝা যায়, তাহাদের স্বাস্থ্য আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য অপেক্ষা কত ভাল। স্বাস্থ্য ভাল হইলে শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। শারীরিক বল থাকিলে নারীদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য জন্মে।

ইউরোপে নারীদের কেবল মাত্র বা প্রধানতঃ স্ত্রীত্বের উপর ঝোঁক না দিয়া তাহাদের সাধারণ মনুষ্যত্বের চিন্তাও যে সর্ব্বসাধারণে করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার কারণ, তথাকার নারীরা দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা পাইয়া নানা বিষয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ পান। শিক্ষার সুযোগ তাঁহারা আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে বেশী পান, নানা কারণে। পাশ্চাত্য দেশে, মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের দেশের মত এতটা বেশী ভ্রান্ত ধারণা নাই বলিয়া তথাকার লোকেরা উহার উপকারিতা ও প্রয়োজন অধিক অনুভব করে। মোটের উপর দেশের লোকেরাই ইউরোপে শিক্ষানীতির ও শিক্ষাপ্রণালীর নিয়ন্তা বলিয়া তাহারা এই উপকারিতা ও প্রয়োজন-বোধ অনুযায়ী কাজ করে। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত তথায় ভাল। দ্বিতীয় কারণ, শৈশবে বা অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয় না বলিয়া তাহারা উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে। তৃতীয় কারণ, তথায় অবরোধ প্রথা না থাকায় শিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প-ব্যয়সাধ্য; ছাত্রীদের স্কুল যাতায়াতও গাড়ীর উপর নির্ভর করে না। চতুর্থ কারণ, দেশের স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া মেয়েরা দেহমনের শক্তি আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে শিক্ষালাভে অধিক পরিমাণে নিয়োগ করিতে পারে।

নারীদিগকে রক্ষা করা পুরুষদের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না করিলে বা করিতে না পারিলে পুরুষ যে পুরুষ নামেরই যোগ্য নহে, তাহা ভীরুরাও লজ্জার খাতিরে স্বীকার করিবেন। কিন্তু পুরুষরা যদি খুব সাহসী ও বলিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও তাহারা ত সব সময়ে সব জায়গায় নারীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত থাকিতে পারেনা। যেখানে ও যে সময়ে তাহারা উপস্থিত থাকে না, সে ক্ষেত্রেও তাহাদের বিক্রমের খ্যাতি নারীরক্ষার কতকটা সহায়তা করে বটে, কিন্তু তাহাতেও নারীদের রক্ষা সম্পূর্ণরূপে হয় না যদি তাঁহাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবার উপযুক্ত সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মানসিক বল, ও দৈহিক শক্তি না থাকে। তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত যাহারা নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারে।

দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পাইয়া পাশ্চাত্য নারীরা নানাদিকে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এই কৃতিত্ব শুধু বুদ্ধি ও কল্পনা-শক্তির নহে। নানা বিপৎসঙ্কুল অরণ্যের, মরুভূমির, অসভ্য জাতিদের দেশের ভিতর দিয়া একাকী দীর্ঘকাল ধরিয়া ভ্রমণ করিবার সাহস ও সামর্থ্য তাহারা দেখাইয়াছে। এইরূপ নানাবিধ কৃতিত্বে তাহাদের নিজের উপর বিশ্বাস জন্মিয়াছে। অধিকন্তু সামাজিক পরিবেষ্টন তাহাদের সহায়। বঙ্গের নারীদের ঐরূপ কোন শিক্ষা নাই, কৃতিত্বও নাই। সামাজিক মত, পরিবেষ্টন ও প্রথা তাহাদিগকে পঙ্গু ও সাহসহীন করিয়াছে। তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে অবলা; তাহাদিগকে রাখাও হইয়াছে অবলা করিয়া। তর্কস্থলে এবং উল্লেখের স্থলে কোন কোন জাতির নারীকে দেবী বলা হয় বটে। কিন্তু তাঁহারা অন্তঃপুরে ও বাহিরে সচরাচর যে ব্যবহার পান, তাহা দেবীর উপযুক্ত নহে। দেবীর যে শক্তি ও তেজ থাকিবার কথা তাহা বঙ্গীয় সমাজ নারীদের হৃদয়মন হইতে পিষিয়া বাহির করিয়া তাহাদের পরিচারিকাত্ব, স্ত্রীত্ব ও জননীত্ব টুকু বাকী রাখে। জননীত্ব তাহাদের থাকে, কিন্তু মাতৃত্বের উপযুক্ত হইবার মত সুযোগ ও ব্যবহার তাহারা পায় না।

তার্কিকরা বলিবেন, বঙ্গনারীদের সকলেই এরূপ নহেন, সকলেই এরূপ ব্যবহার পান না। আমরাও তাহা বলিতেছি না। যেরূপ নমুনা অনেক বেশী পাওয়া যায়, তাহা হইতেই সমাজবিশেষের বিচার হয়। অনেক অন্তঃপুরে নারীদের উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়, তাহার অল্প সংবাদই খবরের কাগজে বাহির হয় ও আদালত পর্য্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই বঙ্গীয় সমাজকে কলঙ্কিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ইহা গেল ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা। কিন্তু সামাজিক সম্মানবৃদ্ধির জন্য এবং লোকাচার দেশাচারের অনুসরণ করিবার জন্য যাহা করা হয়, তাহা কম নিষ্ঠুরতা নহে। কলিকাতা সহরে ও অন্য অনেক সহরে পুরুষ অপেক্ষা নারীর মৃত্যুর হার অনেক বেশী। এই কারণে কলিকাতার স্বাস্থ্যকর্ম্মচারী ইহাকে মাতৃহন্তা নগর বলিয়াছেন। এরূপ ভীষণ মৃত্যুর হারের কারণ যথেষ্ট আলো ও বাতাসহীন গৃহে দিন রাত বাস, বাল্য-মাতৃত্ব, অপকৃষ্ট সূতিকাগার, সন্তান হইবার পর যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়া, রোগের সময় উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা না হওয়া ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন, জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিয়া অমানুষ করিয়া রাখা আর এক নিষ্ঠুরতা।

এইরূপ নানাপ্রকারে বঙ্গনারী নগণ্য-বিবেচিতা ও অবহেলিতা হওয়ায় নিজেদের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে আস্থা-হীন হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যদি স্বয়ং নারী-নির্য্যাতনের প্রতিকার চেষ্টা করিতে না পারেন, তাহা ততটা তাঁহাদের দোষ নহে, যতটা সমাজের।

বাঙালী পুরুষেরা কেন নারীরক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন বা অসমর্থ, তাহারও অনেক কারণ আছে। অধিকাংশ বাঙালী গ্রামে বাস করে, সহর বাংলা দেশে খুব কম। অধিকাংশ বাঙালী কৃষিজীবী ও নিরক্ষর। যাহাদের নারীদের উপর অত্যাচার হয়, তাহারা অধিকাংশস্থলে "নিম্ন"শ্রেণীর গ্রাম্য লোক, কৃষিজীবী ও নিরক্ষর—যদিও সব স্থলে নহে। ইহারা নানা কারণে দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য হইয়াছে। সামাজিক চাপে তাহারা পিষ্ট। "নিম্ন" শ্রেণীর লোকেরা "উচ্চ" শ্রেণীর সামাজিক শাসনে ও লোকাচার-দেশাচারে পিষ্ট; তাহাদের মাথাটা নত এবং শিরদাঁড়াটা বাঁকা হইয়াই আছে; তাহাদের নিকট অত্যাচার দমনের তেজের প্রত্যাশা করেন কেন? "উচ্চ" শ্রেণীর গ্রাম্য লোকেরাও সমাজ, লোকাচার, দেশাচারের ভয়ে আড়ষ্ট। গ্রাম্য লোকদের উপর দ্বিতীয় চাপ জমীদারদের ও তাহাদের নায়েব গোমস্তা নগদী প্রভৃতির। তৃতীয় চাপ, পুলিসের চৌকদার, কনষ্টেবল, জমাদার প্রভৃতির। এবং সর্ব্বোপরি বিদেশী শাসন-যন্ত্রের চাপ ত সকলের উপর আছেই। এই প্রকারে নিষ্পেষিত লোকদের কাছে বীরত্ব ও তেজস্বিতার আশা করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। আর একটা কারণেরও এখানে উল্লেখ করা দরকার। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দীতে বাঙালীরা সৈনিক হইয়া যুদ্ধ করিত কিনা, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক; বর্ত্তমানে গ্রাম্য কৃষিজীবী নিরক্ষর বাঙালী সিপাহী হয় না, ইহারই উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক। যুদ্ধে অনভ্যস্ত হওয়ায় অস্ত্রাঘাত ও রক্তপাতের ভয় বাঙালীর বেশী। মুসলমান বাঙালীর অস্ত্রভয় ও রক্তপাতের ভয় অপেক্ষাকৃত কম এই জন্য, যে, তাহারা অধিকতর মাংসাশী এবং জবাই করিতে ও শিকার করিতে অভ্যস্ত। আমি স্বয়ং নিরামিষাশী ও শিকারে অনভ্যস্ত হইলেও, যেরূপ অভ্যাসের ফল যাহা তাহা লিখিতে বাধ্য। হিন্দু বাঙালী ও মুসলমান বাঙালীতে আর একটা প্রভেদ এই, যে, মুসলমানেরা জাহাজে লস্কর হইয়া বিদেশে যায়, হিন্দুরা লস্কর হয় না। তাহাতেও উদ্যম ও সাহসের তারতম্য হয়।

নগরবাসী "উচ্চ" শ্রেণীর বাঙালীরা গ্রামবাসিনী নারীদের উপর অত্যাচারে কতটা ব্যথিত বা উদাসীন ঠিক্ জানি না। তাহারা যে কতকটা উদাসীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার একটা কারণ, মমত্ব-বোধের অভাব। বহুবৎসর পূর্ব্বে যখন রবীন্দ্রনাথ একবার পঞ্জাব গিয়াছিলেন, তখন সীমান্তের পাঠানেরা একটি পঞ্জাবী হিন্দু বালিকাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এবিষয়ে পঞ্জাবী ভদ্রলোকদের ঔদাসীন্য দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করায় এক জন বলিলেন, "সে বেনের মেয়ে" (বানিয়াকি লড়্‌কী)—যেন তাহা হইলে "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুদের তাহার সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য নাই। এইরূপ একটা ভাব বাঙালী "ভদ্র" লোকদের মনের কোণে লুকাইয়া আছে কি না, জানি না। অর্থাৎ আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য; তারা মাহিষ্য, যোগী, বেহারা, বৈরাগী, ইত্যাদি; তাহাদের মেয়েদের উপর অত্যাচার হইলে আমাদের কি?

নারীনির্য্যাতনের সংবাদ প্রতিনিয়ত পাইয়া বাঙালী সম্পাদকেরা, যে সব অঞ্চলে এইরূপ ঘটনা ঘটে, তথাকার অধিবাসীদের উদ্দেশে অনেক ধিক্কার ও উত্তেজনাবাক্য

প্রয়োগ করেন। তাহা করা স্বাভাবিক এবং তাহার জন্য সম্পাদকেরা দোষী নহেন। নারীদিগকেও ইতিহাসপ্রথিত রাজপুত বীরাঙ্গনা ও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই সব ধিক্কার ও উত্তেজনাবাক্য পড়ে কে? দেশ যে নিরক্ষর—বিশেষতঃ গ্রামবাসীরা। আর ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈ ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়া, যাঁহাদের মধ্যে অবরোধ ও অবগুণ্ঠন নাই। ধিক্কার ও উত্তেজনাবাক্যাদি হইতে যদি কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আগে তাহা পড়িবার ক্ষমতা জন্মান চাই। সুতরাং সার্ব্বজনীন শিক্ষা চাই।

পুরুষ বা নারী বিপন্ন অবস্থায় একাকী নিতান্ত অসহায় হইলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস কখন কখন সাহসের সঞ্চার করে। এই কারণে এরূপ ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন যাহাতে মানুষ কোন অবস্থাতেই আপনাকে নিঃসঙ্গ বোধ না করে।

আমরা বৈশাখের প্রবাসীতে বলিয়াছি, যে, অত্যাচরিতা নারীরা যে সবাই বিধবা তাহা নহে। তথাপি ইহা সত্য, যে, সধবারা বালবিধবাদের চেয়ে অন্ততঃ একজন বেশী রক্ষী-বিশিষ্ট। তদ্ভিন্ন, বালবিধবারাও মানুষ বলিয়া প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী। বাল্যমাতৃত্ব না ঘটায় তাহাদের স্বাস্থ্য ও চেহারা সমান বয়সের সধবাদের চেয়ে সাধারণতঃ ভাল। এই সব কারণে দুর্বৃত্ত লোকেরা তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে ও তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে অধিক প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং নারী-নির্য্যাতন হ্রাস করিতে হইলে, বাল্যবৈধব্যের উচ্ছেদ সাধন তাহার একটি উপায়। ইহা দুই প্রকারে সাধিত হইতে পারে; বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিয়া, এবং বাল-বিধবাদের বিবাহ দিয়া।

সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে যে-যে কারণে বাংলা দেশে নারীনির্য্যাতন হইয়া থাকে, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিলাম। এই সব কারণ শীঘ্র লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা কম। তত দিন কি আমরা নারীরক্ষার কোন চেষ্টা করিব না? অবশ্যই করিব। তাহার নানা উপায়ের আলোচনা অনেক কাগজে অনেকবার করা হইয়াছে। আমরাও করিয়াছি। এরূপ অত্যাচার নিবারণ নিশ্চয়ই মানুষের সাধ্যায়ত্ত। এই বিশ্বাসে সাহস ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আমরা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্যসাধন করিতে সমর্থ হইব। বর্ত্তমানে নারীরক্ষার জন্য যে কয়টি সমিতি আছে, তাহার সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক, সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধিও আবশ্যক।

—

শিবাজীর ত্রিশতবার্ষিক জন্মোৎসব

শিবাজীর ত্রিশতবার্ষিক জন্মোৎসব ভারতবর্ষের নানাস্থানে সম্পন্ন হইয়াছে।

শিবাজী হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হিন্দুত্বকে বড় করিয়া ভারতীয়ত্বকে খাট করিলে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। যে সব হিন্দু তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের তাহা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহা করিয়াও, তাঁহারা যদি এই সব প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের উপর জোর দিতেন, যে, তিনি হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে যোগ্য লোকের গুণগ্রাহী ছিলেন; তাঁহার অনেক উচ্চ ও নিম্ন পদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী ছিল; তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের সাধুলোকদিগকে দান করিতেন; কোরান্ কোথা পাইলে তাহার কোন অসম্মান না করিয়া সম্মান করিতেন; হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন; মুসলমানের উচ্ছেদসাধন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; এবং মুসলমান শাসকেরা স্বদেশী প্রজাপালকের মত শাসন না করিয়া অত্যাচারী বিদেশী বিজেতার মত শাসন করায়, স্বদেশী স্বাধীন ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে তাঁহাকে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল; তাহা হইলে ঠিক্ হইত। অনেক বক্তা তাহা করিয়াছিলেন।

কোন মানুষ সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে না। কিন্তু যিনি যে ধর্ম্মেরই লোক হউন, ভাল কাজ করিলে সকল ধর্ম্মের লোকেরই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। অশোক ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু তিনি আদর্শ ভারতীয় নৃপতি ছিলেন বলিয়া সকল ধর্ম্মের ভারতীয়দের শ্রদ্ধাভাজন, কেবল বৌদ্ধদের নহে। শিবাজীকেও তদ্রূপ ভারতীয়

বার বলিয়া সকল ধর্ম্মের লোকের শ্রদ্ধা করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে যদি কোন খ্রীষ্টিয়ান্ বা মুসলমানের নেতৃত্বে ইংরেজদের প্রভুত্ব নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই খ্রীষ্টিয়ান্ বা মুসলমান নেতা হিন্দুদেরও শ্রদ্ধাভাজন হইবেন।

শিবাজী উৎসবের উদ্যোক্তারা কোথাও কোথাও একটি ভুল করিয়াছিলেন—যেমন কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। যাঁহারা শিবাজীকে দেবতা-বিশেষের অবতার বা অংশ মনে করেন, তাঁহাদের তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উৎসবের ইহা একটি অঙ্গ হওয়া উচিত নয়; কারণ সকল সম্প্রদায়ের লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বা অংশ বোধে পূজা করে না। এই জন্য প্রয়োজন মত পূজার বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র স্থানে হিন্দুদের জন্য রাখিয়া, সার্ব্বজনিক উৎসবের জন্য অন্য স্থান নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উৎসবে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার পূর্ণ প্রতিবেদন খবরের কাগজে বাহির না হওয়ায় আমি আমার কথিত একটি বিষয়ের আলোচনা এখানে করিতেছি।

শিবাজীর প্রতি আগে আগে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বড় অবিচার করিয়াছে। কিন্কেড ও রলিন্সনের মত আধুনিক ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সেরূপ অবিচার করেন নাই। কিন্কেড লিখিয়াছেন :—

Shivaji has, by a curious fate, suffered more at the hands of historians than any other character in history. They have, one and all, accepted as final the opinion of Grant Duff, which again was based on that of Khafi Khan. And while judging Shivaji with the utmost harshness, they have been singularly indulgent to his enemies. The thousand basenesses of Aurangzeb, the appalling villanies of the Bijapur and Ahmednagar nobles have been passed over with a tolerant smile. The cruel trick, by which Ghorpade betrayed Shivaji, has provoked no comment. Shivaji, however, is depicted as the incarnation of successful perfidy, a Caesar Borgia," etc.

কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক এই প্রকারে শিবাজীর প্রতি ন্যায় বিচার করিলেও, ইংরেজী বিশ্বকোষ-গুলি এখনও তাঁহার প্রতি অবিচার করিতেছে। সকলের চেয়ে বড় ইংরেজী বিশ্বকোষ এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার শেষ সংস্করণে আছে :—

By dint of playing off his enemies against each other and by means of treachery, assassination and hard fighting, Sivaji won for the Mahrattas practical supremacy in western India. In 1659 he lured Afzal Khan, the Bijapur General, into a personal conference, and killed him with his own hand, while his men attacked and routed the Bijapur army......Sivaji was an extraordinary man, showing a genius both for war and for peaceful administration. But he always preferred to attain his ends by fraud rather than by force."

শিবাজীর কোনই দোষ ছিল না, ইহা কোন ঐতিহাসিক বলিবেন না—কোন সাম্রাজ্যসংস্থাপক সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক অহিংস উপায়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। শিবাজী তাঁহার শত্রুদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিতেন, তাঁহার এই নিন্দা উদ্ধৃত অংশে করা হইয়াছে; কিন্তু ইংরেজরা যে ভারতবর্ষ দখল করিবার জন্য অনেকস্থলে একই পরিবারের লোকদের মধ্যে, জ্ঞাতি ও আত্মীয়দের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা মেজর বামনদাস বসুর লিখিত "ভারতবর্ষে খ্রীষ্টিয়ান শক্তির অভ্যুদয়" নামক ইংরেজী ইতিহাসে দেখান হইয়াছে। এক ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ করিলে তৎসদৃশ অন্যকৃত কোন কাজ সৎকাজ হয় না। কিন্তু ইংরেজরা অন্যেরা নিজেদের কৃত অপকৃষ্টতর কাজ গোপন করিয়া অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করিলে তাহা পক্ষপাতদুষ্ট হয়। শিবাজী যে বলপ্রয়োগ অপেক্ষা প্রতারণাই বেশী পছন্দ করিতেন, তাহা সত্য নহে; ইংরেজ সাম্রাজ্যস্থাপকদের পক্ষে তাহা সত্য হইতে পারে। তাঁহার সৈন্যবল, অর্থবল, তাঁহার শত্রুদের চেয়ে কম ছিল; সুতরাং সম্মুখ যুদ্ধ সব সময়ে তিনি করিতে পারেন নাই, কখন কখন কৌশলে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ কৌশল সব সেনাপতিরা আধুনিক রণনীতির অংশরূপে শিক্ষা ও অবলম্বন করিয়া থাকেন। আফজাল খাঁর সহিত তাঁহার ব্যবহারের কথা পরে বলিতেছি।

চেম্বার্সের এন্সাইক্লোপীডিয়া এখনও শেষ পর্য্যন্ত বাহির

হয় নাই ; উহা এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা অপেক্ষা নূতন। তাহাতে শিবাজী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"The founder of the Mahratta power was Sivaji, a freebooter or adventurer, whose father, Shahji Bhonsla, was an officer in the service of the last King of Bijapur. By policy or by force, he eventually succeeded in compelling the several independent Hindu chiefs to acknowledge him as their leader and with the large army then at his command overran and subdued a large portion of the emperor of Delhi's territory."

এখানে শিবাজীকে বলা হইতেছে দস্যু, এবং ভাগ্যান্বেষী। বিজেতা মাত্রেই শত্রুর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া থাকে, তাহাদের দোষগুণের বিচার এখানে করিতেছি না। কিন্তু শিবাজী দস্যু ছিলেন না, এবং নিজের জন্য ধনসঞ্চয়ের চেষ্টাও করেন নাই।

আফ্‌জাল খাঁর সহিত তাঁহার ব্যবহারের প্রকৃত বৃত্তান্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার সমুদয় মারাঠি, ফারসী ও ইংরেজী মৌলিক উপাদান পড়িয়া লিখিয়াছেন। ইংরেজদের রাজাপুরের ফ্যাক্টর অর্থাৎ কুঠিয়ালরা সুরাটস্থিত কৌন্সিলকে ১৬৫৯ ঈশাব্দের ১০ই অক্টোবর যে চিঠি লেখেন, তাহা সমসাময়িক। সরকার মহাশয় তাহাও ব্যবহার করিয়াছেন। আফজাল-বধের প্রকৃত বৃত্তান্ত তল্লিখিত ইংরেজী শিবাজী-চরিতের তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। তাহা হইতে অল্প একটু নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The command of the expedition against him (Shivaji) went abegging at the Bijapur Court, till Afzal Khan accepted it. Afzal Khan did not prefer an open contest with Shiva. . . . Indeed he was instructed by the Dowager Queen to effect the capture or murder of Shiva by *pretending friendship* with him and offering to secure his pardon from Adil Shah. . . . The Bijapuri General had accepted the command in a spirit of bravado, and even boasted in the open Court that he would bring Shiva back a captive without having once to dismount from his own horse.. . . . . then came Afzal's envoy with the invitation to a parley. . . . Shiva sent the envoy back with Gopinath Pant, his own agent, agreeing to Afzal's proposal of an interview, provided that the Khan gave him a solemn assurance of safety. . . . Through Gopinath Pant Shiva vowed that no harm would be done to Afzal, during the interview, and Afzal, on his part, gave similar assurance of his honesty of purpose. . . . Shiva mounted the raised platfrom and bowed to Afzal. The Khan rose from his seat, advanced a few steps, and opened his arms to receive Shiva in his embrace. The short slim Maratha only came up to the shoulders of his opponent. Suddenly Afzal tightened his clasp, and held Shiva's neck in his left arm with an iron grip, while with his right hand he drew his long straight-bladed dagger and struck at the side of Shiva. Shiva groaned in agony as he felt himself being strangled. But in a moment he recovered from his surprise, passed his left arm round the Khan's waist and tore his bowels open with the blow of the steel claws. Then with his right hand he drove the *bichhwa* into the Khan's side".

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বক্তৃতায় আমি এইসব কথা বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলাম, যে, শিবাজী উৎসবের সভাসমূহ হইতে সভাপতিদিগের স্বাক্ষরযুক্ত এক একখানি চিঠিতে ইংরেজী এন্সাইক্লোপীডিয়া বা বিশ্বকোষগুলির ভ্রম নিরসন করিয়া তাহা এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার প্রকাশকদিগকে এবং চেম্বার্সের এন্সাইক্লোপীডিয়ার প্রকাশকদিগকে পাঠান হউক।

আমি ইহাও বলিয়াছিলাম, যে, শিবাজী কেবল হিন্দুদের বীর নহেন, সমগ্র ভারতীয় মহাজাতির বীর। আমার দেহে হিন্দুর রক্ত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া যে আমি ইহা বলিতেছি, তাহা নহে ; বিদেশী অহিন্দুবংশজাত লোকেরাও অনেকে ইহা স্বীকার করেন। বিখ্যাত বিদ্বান খ্রীষ্টিয়ান পাদরী ডাক্তার ম্যাক্‌নিকল্ (Rev. Dr. N. MacNicol, M. A., D. Litt) বলেন :—

"Shivaji belongs to no class or caste. He is a national possession. India has every right to set the Maratha warrior-king in a high place among those whom she remembers with gratitude."

—

রেলওয়ে-যাত্রীদের দিবস

ভারতবর্ষে রেলওয়ে ও ষ্টীমারের যাত্রীদের—বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের নানা দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা আছে।

এই সকলের প্রতি সর্ব্বসাধারণের ও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকার চেষ্টা করিবার নিমিত্ত একটি প্রস্তাব হয়, যে, ৪ঠা মে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এইজন্য সভা হইবে। বোম্বাইয়ের সভায় বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। তথাকার সমিতির লোকবল এবং আয়ও বেশ আছে। কলিকাতার সভায় লোক খুব কম হইয়াছিল। বিখ্যাত বক্তাদের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রেলের যাত্রীদের অসুবিধা দূরীকরণার্থ তিনি যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়াছিলেন, সবগুলিই সমীচীন। সকল রাজনৈতিক দলের বহির্ভূত বাগ্মিতাবিহীন প্রবাসী-সম্পাদককে সভাপতি নির্ব্বাচন করা সভাস্থলে লোক বেশী না-হওয়ার একটি কারণ। অন্য কারণ, আলোচ্য বিষয়টি রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক কোন প্রশ্ন বা সমস্যা নহে, সুতরাং তাহা হইতে কোন উত্তেজনা ও হুজুকের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহার একটা রাজনৈতিক দিকও আছে। সভাস্থলে তাহার উল্লেখও করিয়াছিলাম।

আমাদিগকে যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন অবস্থা-ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া উচিত নয়, যাহাতে অপমান, লাঞ্ছনা, দুর্ব্যবহার সহ্য করা আমাদের অভ্যস্ত হইয়া যায়। কারণ, তাহা অভ্যস্ত হইয়া গেলে, যে-সব অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্ব্যবহার পরাধীনতার আনুষঙ্গিক, মানুষ প্রকারান্তরে তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়া যায়; সুতরাং তাহার হেঁট মাথাটা উঁচু এবং বাঁকা শিরদাঁড়াটা সোজা হইতে চায় না। রাজনৈতিক স্বাধীনতাটা আকাশ হইতে পড়িবে না। পরাধীনতাটা অবশ্য সব-চেয়ে বড় জাতীয় অপমান। কিন্তু ছোট ছোট অপমান অত্যাচারগুলা দূর করিবার চেষ্টা যদি আমরা না করি, তাহা হইলে সকলের চেয়ে বড় অপমানটাকে যে আমরা সত্য সত্যই অপমান মনে করি, তাহার প্রমাণ কি? অপমান, লাঞ্ছনা, দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে করিতে মানুষের তেজস্বিতা লুপ্ত হইয়া যায়, ব্যক্তিগত ও জাতীয় আত্মসম্মান-বোধ সম্বন্ধে সে অসাড় হইয়া যায়। সেইজন্য রেলওয়ের টিকিট ক্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া অতিরিক্ত যাত্রীতে ঠাসা গাড়ীতে মালের মত বোঝাই হওয়া পর্য্যন্ত তৃতীয় ও অনেক সময়ে মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদিগকে ধাক্কাধাক্কি, গালাগালি, প্রভৃতি যাহা সহ্য করিতে হয়, তাহার প্রতিকার-চেষ্টা না করিলে আমরা যে দাসত্ব ভিন্ন অন্য কোন অবস্থার উপযুক্ত তাহা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হইবে।

তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে পায়খানা, জল, ও আলোর সুবন্দোবস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গ্রীষ্মকালে বৈদ্যুতিক পাখা থাকা উচিত। হাবড়ার মত বড় বড় যে সব ষ্টেশনে যাত্রী বেশী, তাহাতে প্লাটফর্ম্মে যাইবার ফাটক খুব বড় করিয়া দিয়া ঠেলাঠেলি এবং পাহারাওয়ালা ও টিকেটগ্রহীতাদের দুর্ব্যবহার নিবারণ করা উচিত। রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত যাত্রীদের বিক্রেতা ও ক্রেতার সম্পর্ক। তোমাদের যাতায়াতের বন্দোবস্তের বিনিময়ে আমরা তোমাদিগকে পয়সা দি। অন্য সব ব্যবসাতে বিক্রেতারা ক্রেতাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করে। কিন্তু রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীর এক একটা পথে একচেটিয়া ব্যবসা থাকায় বিক্রেতা হইয়াও তাহাদের কর্ম্মচারীরা টিকিটক্রেতা যাত্রীদিগকে অপমান ও কখন কখন প্রহারও করে। একচেটিয়া ব্যবসাই অবশ্য ইহার একমাত্র কারণ নহে। রেল ও ষ্টীমারের কর্ত্তৃপক্ষেরা রাজার জা'ত বলিয়া উদ্ধত এবং দুর্ব্যবহার করিতে সাহসী। এইজন্য যাত্রীদের দুঃখ-লাঞ্ছনার চূড়ান্ত প্রতিকার পূর্ণ স্বরাজ লাভে। কিন্তু তাহার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

থ্রু ট্রেণ অর্থাৎ যে-সব ট্রেন বহুদূরগামী এবং যাহাতে যাত্রীদিগকে রাত্রিযাপন করিতে হয়, তাহাতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরও শুইবার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ইহাদের টিকিটের পয়সাতেই যাত্রীগাড়ীর লাভ হয়। ইহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া লাভ দেখাইবার কোন অধিকার রেল কর্ত্তৃপক্ষের নাই। বাসগৃহ, আফিস, আদালত, স্থলযান, জলযান, আকাশযান, কোনটিরই এমন কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত বা অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত নয়, যাহাতে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হয়। বিলাসের উপকরণ না থাক্, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চাই। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা যে আড়া

দেয়, তাহা তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার যতগুণ, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীগুণ জায়গা দখল করে ও সুবিধা ভোগ করে। ইহা অন্যায় এবং অবাঞ্ছনীয়।

—

বর্ব্বর বিবাহ ও আধুনিক বিবাহ

বোধহয় সব দেশেরই অসভ্যযুগে কোন কোন স্থলে অবিবাহিতা পাত্রীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিবার রীতি ছিল এবং হয়ত কোন কোন স্থলে ইহাতে পাত্রীর সম্মতি উহ্য থাকিত। এইজন্য কোন কোন অসভ্য সমাজে এখনও বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের যুদ্ধের অভিনয় হইয়া থাকে। কন্যাহরণপূর্ব্বক বিবাহ নিশ্চয়ই অসভ্য ও অভদ্র, কিন্তু অন্য অনেক অসভ্য প্রথার মত ইহা হইতেও কিছু শিখিবার আছে। অসভ্য সমাজে যে যুবক কন্যাপক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্ত্রীসংগ্রহ করিত, সে তাহার দ্বারাই প্রমাণ করিত, যে, সে আবশ্যক হইলে অত্যাচারীর হাত হইতে স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারিবে, এবং স্ত্রীর অপমানকারীকে শাস্তি দিতে পারিবে। বাংলাদেশে অনেক নারী হৃতা ও ধর্ষিতা হয়। এইজন্য বরের অন্যান্য গুণের পরীক্ষার সঙ্গে, স্ত্রীকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাহার আছে কি না, তাহারও পরীক্ষা হওয়া দরকার। এমনই ত বরের দর বড় চড়া; সুতরাং এরূপ পরীক্ষার কথা কোন কন্যার পিতা তুলিতে সাহসী হইবেন মনে হয় না। কিন্তু বরদের নিজেরই আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য নারীরক্ষার সামর্থ্য অর্জ্জন করা উচিত। বাংলা দেশের পুরুষদের অনেকের যথেষ্ট পৌরুষ না থাকায় লজ্জার সহিত নারীদিগকেও আত্মরক্ষার সামর্থ্য লাভ করিতে অনুরোধ করিতে হইতেছে।

—

ধর্ষিতা নারীর আত্মীয়দের পাতিত্য

হিন্দুসমাজে এপর্য্যন্ত এই দস্তুর চলিয়া আসিতেছিল, যে, কোন নারী ধর্ষিতা হইলে—বিশেষতঃ অহিন্দু কর্তৃক ধর্ষিতা হইলে, সমাজে আর তাহার স্থান হইত না। এখন কোথাও কোথাও মন্দের ভাল এই হইয়াছে, যে, প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাহাকে সমাজে লওয়া হয়। ইহা নূতন নহে। সিন্ধুদেশ বিদেশী মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হইবার পর যে-সব হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোক অগত্যা মুসলমান হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম পুনরবলম্বন-প্রার্থীদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হিন্দুসমাজে স্থান দিবার জন্য দেবল স্মৃতি রচিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে যাঁহারা ধর্ষিতা নারীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা ন্যায়নিষ্ঠ নহেন। এরূপ নারীর কোনই দোষ নাই। পাতিত্য যদি কাহারও হওয়া উচিত, তাহা হইলে নারীরক্ষা-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ধর্ষিতা নারীর স্বামী ও অন্য আত্মীয়দের হওয়া উচিত। গুণ্ডাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা সকলের না থাকিতে পারে। কিন্তু ধর্ষিতা বা অপহৃতা নারীদের আত্মীয় যে সব পুরুষ প্রমাণ করিতে পারিবেন না, যে, তাঁহারা নারীরক্ষার জন্য বা অপহৃতা নারীর উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদেরই পাতিত্য ঘটা উচিত, ধর্ষিতা বা অপহৃতা নারীদের নহে।

—

রবীন্দ্রনাথের নূতন সম্মান

আমরা পাশকরা বাঙালীরা মনে মনে এই সন্তোষটুকু লাভ করিতে পারিতাম, যে রবীন্দ্রনাথ যত বড়ই হউন, তাঁহার মনে মনে নিশ্চয়ই এই দুঃখটা আছে, যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারদর্শিতা অনুসারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। এবার তাঁহার সে-দুঃখ দূর হইল, এবং আমাদেরও লুক্কায়িত উল্লাস চূর্ণ হইল। কাগজে দেখিলাম, সম্প্রতি প্রবর্ত্তকসংঘের উৎসবে তাঁহাকে যে অভিনন্দিত করা হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, তিনি নিতান্ত মন্দ ছেলে নন—পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম হইয়াছেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, এবং দ্বিতীয় শ্রী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এই খবরটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পরীক্ষা কি কি বিষয়ে হইয়াছিল এবং পরীক্ষক কে কে হইয়া-

ছিলেন, তাহা জানিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও ভক্তগণ কৌতূহলী হইবেন।

প্রবর্ত্তকসংঘ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নূতন অভিনন্দন-রীতি অন্যত্র অনুসৃত হইবে কি না, তাহাও অনুমানের বিষয় হইবে।

—

শান্তিপুরে শিক্ষকসমিতির অধিবেশন

শান্তিপুরে বঙ্গীয় শিক্ষকসমিতির যে অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় তাহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি, শিক্ষালয়গুলির উন্নতি, শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষার উন্নতি প্রভৃতি নানাবিষয়ে অনেক বিবেচক জনোচিত কথা ছিল। আমাদের দেশে শিক্ষকদের—বিশেষতঃ অধস্তন শ্রেণীর শিক্ষকদের, বেতন বড় কম। যাঁহারা নিজের ও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় নিতান্ত বিব্রত, তাঁহাদের সমুদয় শক্তি কখনও কর্ত্তব্য-সম্পাদনে নিয়োজিত হইতে পারে না। এইজন্য নিম্নতম শ্রেণীর শিক্ষকদেরও এমন একটা ন্যূনতম বেতন নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত, যাহাতে তাঁহারা সপরিবারে সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। আগে আমাদের দেশে শিক্ষকদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, তাহা ভাবিয়া কোন লাভ নাই। সে কালও আর নাই, সুতরাং সেরূপ ব্যবস্থাও আর প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না।

মৈত্রেয় মহাশয় বিদ্যালয়ের জন্য ও ছাত্রাবাসের জন্য বহুব্যয়সাধ্য গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্ কথা। ঘর বাড়ীর আদর্শ খুব উঁচু করিলে শিক্ষার আসল জিনিষটার দিকে দৃষ্টি দিবার সামর্থ্য না থাকিতে পারে। ছাত্রেরা স্বাস্থ্যকর বাড়ীতে থাকে, ইহা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা ছাড়া, তাহাদিগের পক্ষে এরূপ বাড়ীতে থাকিবার অভ্যাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, যেরূপ বাড়ীতে তাহারা পিতৃগৃহে থাকে না, পরেও হয়ত থাকিবে না।

বিদ্যালয়ে গবর্ণ্মেণ্ট্ যে-সব সর্ত্তে সাহায্য দিয়া থাকেন, তদনুসারে টাকা লইবার সামর্থ্য অনেক বিদ্যালয়ের কমিটির থাকে না। সুতরাং সর্ত্তগুলি অপেক্ষাকৃত সহজে পালনীয় করা উচিত।

আগে আগে গবর্ণ্মেণ্ট্ ধনী লোকদিগকে শিক্ষার জন্য দান করিতে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতেন। শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির এখনও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহার জন্য যত টাকার আবশ্যক, গবর্ণ্মেণ্টের তাহা দিবার প্রবৃত্তি নাই, সামর্থ্যও সম্ভবতঃ নাই। সুতরাং ধনী লোকদিগকে পূর্ব্ব রীতি অনুসারে উৎসাহিত করা উচিত। মৈত্রেয় মহাশয় এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন।

—

ছাত্রদের দৈহিক উন্নতির চেষ্টা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয়ে ছাত্রদের দৈহিক উন্নতির জন্য ব্যায়ামক্রীড়াদির যেরূপ বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, যত শীঘ্র তদনুসারে কাজ হয় ততই ভাল। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের একবার জলযোগের ব্যবস্থা হওয়ার আবশ্যক। অন্য অনেক রকম ব্যয় আছে, যাহা না করিলেও চলে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য ব্যয় করা গবর্ণ্মেণ্টের ও দেশের লোকদের কর্ত্তব্য। দৈহিক শিক্ষা তাহার একটি অবর্জ্জনীয় অঙ্গ। সকল রকম ব্যায়াম ও ক্রীড়া সকল ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী নহে। এইজন্য ডাক্তার ও ব্যায়াম-শিক্ষকের পরামর্শ অনুসারে প্রত্যেকের উপযোগী ব্যায়াম-ক্রীড়াদির ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইহা ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এই সদ্ব্যয় না করিলে চলিবে না।

কলেজের ছাত্রদের নিমিত্ত সামরিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করা উচিত কি না, সে-বিষয়ে মত-ভেদ আছে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, এরূপ শিক্ষা সকলেরই হওয়া উচিত, যাহাতে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রব্যবহারে সামর্থ্য ও দক্ষতা জন্মে এবং অস্ত্রাঘাতের ভয়টা দূর হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়াও আমরা দাঙ্গা-ভঙ্গ ও জনতা-ভঙ্গের ওজুহাতে গুলিবর্ষণের কৃপায় বুঝিতে পারিতেছি, গুলি যত নিক্ষিপ্ত হয় মানুষ তত মরে না। ইহা হইতে এরূপ অনুমান

করা অযৌক্তিক নহে, যে, অন্য অস্ত্রের প্রয়োগও অব্যর্থ নহে—যাহার উপর তলোয়ার, বর্শা বা ছোরা চালান হইবে, সেই মরিবে, এটা অমূলক ভয়। তবে কিনা ভীরুর তর্কশক্তি কম নয়। সে বলিবে, "গুলি ছুড়িলে বা অন্য অস্ত্রচালনা করিলে কেহ না কেহ মরে; যে মরিবে সে অন্য কেহ না হইয়া আমিই ত হইতে পারি, অতএব যঃ পলায়তি স জীবতি।" সাহসীর নিয়তিবাদ অন্য রকম। সে তুর্ক প্রবাদ অনুসারে বলে, "দুটি দিন মৃত্যু হইতে পলায়ন বৃথা—১ম, যে-দিন মৃত্যু অদৃষ্টে লেখা আছে; ২য়, যে-দিন উহা অদৃষ্টে লেখা নাই। তুমি পলাও আর যাই কর, নির্দ্দিষ্ট দিনটিতে মরিবেই; অনির্দ্দিষ্ট দিনটিতে তুমি কিন্তু মরিবে না—পলাইলেও মরিবে না, না পলাইলেও মরিবে না। অতএব, কোন দিনই পলানটা বেকুবী।"

যাহা হউক, অস্ত্র-চালন শিক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা করিলে এবং অস্ত্রাঘাতে শরীর হইতে অন্ততঃ ২।১ বার রক্তপাত হইলে ভয় ভাঙ্গে ও সাহস বাড়ে। অতএব যুবা বয়সের ছাত্র-ছাত্রী ও অন্য সকলের অস্ত্র শিক্ষা হওয়া ভাল।

—

রেজিষ্টারী-করা গ্রাজুয়েট্

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব গ্রাজুয়েট্ অর্থাৎ বি-এ প্রভৃতি উপাধিধারী প্রাথমিক ও বার্ষিক টাকা দিয়া রেজিষ্টারীভুক্ত হন, প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে তাঁহাদের অধিকার আছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এইরূপ নিয়ম আছে। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফী কত, নীচের তালিকায় তাহা দেখিলে বুঝা যাইবে, কলিকাতার ফী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। রেজিষ্টারীভুক্ত উপাধিধারীদের সংখ্যা কম রাখিবার উদ্দেশ্যেই ইহা করা হইয়াছে কিনা অনুমেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাথমিক ফী	বার্ষিক ফী	বিলম্বের ফী	কম্পাউণ্ডিং ফী
কলিকাতা	১০	১০	১০	১৫০
পাটনা	৫	৫	১০	৪০
এলাহাবাদ	৫	২	১০	২০
পঞ্জাব	১০	২	১০	২৫
বোম্বাই	৫	২	২	১০
মান্দ্রাজ	৩	১	১০	৫

যদি কেহ এককালীন কম্পাউণ্ডিং ফী দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর বার্ষিক ফী দিতে হয় না।

কেহ উপাধি পাইবামাত্রই রেজিষ্টারীভুক্ত হইতে পারেন না, অনেক বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে রেজিষ্টারীভুক্ত হইতে পারেন। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কত বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়, তাহার তালিকা নীচে দিলাম।

কলিকাতা	দশ বৎসর
পঞ্জাব	দশ বৎসর
মান্দ্রাজ	সাত বৎসর
পাটনা	ছয় বৎসর
এলাহাবাদ	তিন বৎসর

উপরের দুটি তালিকা হইতে দেখা যাইবে, অধিকসংখ্যক উপাধিধারী রেজিষ্টারীভুক্ত হওয়ায় কলিকাতা যত বাধা দেয়, অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাহার সমান বা তাহা অপেক্ষা বেশী বাধা দেয় না।

—

মহাজাতি-সংঘের চাকরী

যে-সব দেশ লীগ্ অব্ নেশ্যান্স অর্থাৎ মহাজাতি-সংঘের সভ্য, তাহাদিগকে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক চাঁদা দিতে হয়। লীগের মোট বার্ষিক ব্যয় যত, তাহা (১৯২৭ সালের জন্য) ১০:৫টি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। লীগের সভ্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ভাগ চাঁদা দিতে হয়। আমরা ১৯২৭ সালের লীগ্ বাজেট হইতে নীচের তালিকায় দেখাইয়াছি কোন্ রাষ্ট্র কতভাগ চাঁদা দেয়। পূর্ব্বে ১৯২৬ সালের বাজেট হইতে এইরূপ এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম। কোন্ রাষ্ট্রের কত লোক লীগের স্থায়ী চাকরী করে, তাহাও তালিকায় দেখাইয়াছি। তাহা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, ভারতবর্ষ চাঁদা দেয় বিস্তর (সাত লক্ষের উপর টাকা), কিন্তু ভারতীয় লোকেরা তদনুরূপ কাজ লীগ্ আফিস-গুলিতে পায় না; কোন প্রাচ্যজাতিই চাঁদার অনুপাতে কাজ পায় না।

রাষ্ট্র.	প্রদত্ত চাঁদার ভাগ-সংখ্যা	চাকরীর সংখ্যা
গ্রেটব্রিটেন (বিলাত)	১০৫	২০৭
ফ্রান্স্	৭৯	১৭৮
জার্মেনী	৭৯	১৫

রাষ্ট্র	প্রদত্ত চাঁদার ভাগ-সংখ্যা	চাকরীর সংখ্যা
ইটালী	৬০	৩৬
জাপান	৬০	৯
ভারতবর্ষ	৫৬	২
চীন	৪৬	৩
স্পেন	৪০	৮
কানাডা	৩৫	৭
পোল্যাণ্ড	৩২	১৩
আর্জেন্টিন্	২৯	১
ব্রাজিল	২৯	১
চেকোস্লোভাকিয়া	২৯	৮
অষ্ট্রেলিয়া	২৭	৪
হল্যাণ্ড	২৩	১২
রুমেনিয়া	২২	৩
সার্ব ক্রোট ও স্লোভেনীদের রাজ্য	২০	৬
বেলজিয়ম	১৮	১৭
সুইডেন	১৮	৪
সুইজার্ল্যাণ্ড	১৭	১৯৯
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৫	১
চিলি	১৪	০
ডেন্মার্ক	১২	৬
ফিন্ল্যাণ্ড	১০	২
আয়ার্ল্যাণ্ড	১০	১০
নিউজীল্যাণ্ড	১০	২
কিউবা	৯	১
নরওয়ে	৯	৬
পেরু	৯	০
শ্যাম	৯	১
অষ্ট্রিয়া	৮	১২
হাঙ্গেরী	৮	৪
গ্রীস্	৭	২
উরুগোয়ে	৭	১
কোলাম্বিয়া	৬	১
পোর্টুগ্যাল	৬	১

রাষ্ট্র	প্রদত্ত চাঁদার ভাগ-সংখ্যা	চাকরীর সংখ্যা
বুলগেরিয়া	৫	২
পারস্য	৫	১
ভেনিজুয়েলা	৫	১
বলিভিয়া	৪	০
লিথুয়ানিয়া	৪	৩
এস্থোনিয়া	৩	০
লাটভিয়া	৩	৪
আবিসীনিয়া	২	০
আল্বানিয়া	১	০
কষ্টারিকা	১	০
ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্র	১	০
গোয়াটিমালা	১	০
হাইটী	১	০
হাণ্ডুরাস	১	০
লাইবীরিয়া	১	০
লুক্সেম্বুর্গ	১	২
নিকারাগুয়া	১	০
পানামা	১	১
পারাগোয়ে	১	০
সাল্ভাডর	১	০
আমেরিকা	০	৭
আর্মেনিয়া	০	১
জুগোস্লাভিয়া	০	৬
রুশিয়া	০	৮
তুরস্ক	০	১
রাষ্ট্রহীন	—	১

জার্ম্মেনী গত বৎসর ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে লীগের সভ্য হইয়াছে ; প্রথম হইতে সভ্য থাকিলে জার্ম্মানরা নিশ্চয়ই ফ্রেঞ্চদের সমান চাকরী পাইত। জার্ম্মানদের জন্য এই বৎসর একটা নূতন আণ্ডার-সেক্রেটারী জেনেরালের পদ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং আরও কয়েকটা নূতন পদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষ গোড়া হইতেই সভ্য, এবং টাকা দেয় ৪টি পাশ্চাত্য ও ১টি প্রাচ্য দেশ ছাড়া সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু ভারতীয়েরা চাকরী পাইয়াছে মোটে দুটি।

ভারত অপেক্ষা অনেক কম টাকা দেয় এরূপ দেশের লোক অনেক বেশী চাকরী পাইয়াছে। যে-সব রাষ্ট্র লীগের সভ্য নহে এবং চাঁদা দেয় না, তাহাদেরও কোন কোনটির লোক ভারতীয়দের চেয়ে বেশী কাজ পাইয়াছে। কোন অন্-ইউরোপীয় দেশের প্রতি কর্ম্মে নিয়োগ সম্বন্ধে লীগ ন্যায়বান্ হইতে পারে নাই। জাপান ইটালীর সমান টাকা দেয়, কিন্তু কাজ পাইয়াছে ইটালীর সিকি। তাহা হইলেও,এবিষয়ে একটু লক্ষ্য করিবার জিনিষ আছে। চীন ভারতবর্ষ অপেক্ষা টাকা দেয় অনেক কম, কিন্তু কাজ পাইয়াছে বেশী। চীন ইংরেজদের অধীন নহে বলিয়া কি? শ্যামদেশ টাকা দেয় ভারতবর্ষের ষষ্ঠাংশেরও কম, কিন্তু কাজ পাইয়াছে ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক; পারস্য টাকা দেয় ভারতবর্ষের একাদশাংশেরও কম, কিন্তু কাজ পাইয়াছে উহার অর্দ্ধেক। এই দুটি প্রাচ্যদেশ স্বাধীন, ইংরেজদের অধীন নহে; ভারত ইংরেজদের অধীন। এইজন্যই কি ভারতবর্ষের প্রতি এইরূপ বিচার হইতেছে?

—

কুকুর ও চীনদেশের মানুষ

চীনদেশের সাংহাই সহরটা পাশ্চাত্য বিদেশীদের অধিকৃত; চীন অংশও একটি আছে, তাহা নগণ্য। তথাকার মিউনিসিপালিটী এই বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত। মিউনিসিপালিটীর বাগানে একটা ইস্তাহার আছে, "কুকুর ও চীনদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।" সম্প্রতি(চীনরা যুদ্ধ করিতে জানে দেখিয়া?) এই বিদেশীরা নিজেদের মহানুভবতা দেখাইবার জন্য একটা প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছে, যে, চীনদিগকে বাগানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। চীনেরা নিজের দেশের বাগানে ঢুকিতে পাইবে—কি বিস্ময়কর অপূর্ব্ব সদাশয়তা! কিন্তু হঠাৎ এত বেশী সদাশয় হওয়া ভাল নয় ভাবিয়া বিদেশীরা প্রস্তাবে দুটা সর্ত্ত জুড়িয়া দিয়াছে, যে, চীনে অশান্তি দূর হইলে এবং প্রস্তাবটি (বিদেশী) করদাতাদের আর এক সভায় অনুমোদিত হইলে, তদনুসারে কাজ হইবে। অতএব আপাততঃ বিদেশীদের মতে চীনেরা নিজেদের দেশে কুকুরদের সমশ্রেণীস্থই রহিল।

চীনেরা পাশ্চাত্য বিদেশীদিগকে যে পরদেশী পিশাচ (ফরেন ডেভিল্) মনে করে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

চীনেরা যে স্বদেশে কুকুরের সমান বিবেচিত হয় তাহাতে ভারতীয়েরা বিস্মিত হইবে না। কানপুরে যে সিপাহী যুদ্ধের ঘটনা-বিশেষের স্মারক কূপ আছে, তাহা দেখিবার জন্য ভারতীয়দিগকে ভিতরে যাইতে দেওয়া হয় না—অন্ততঃ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত দেওয়া হইত না। তাহাদিগকে যে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না, এরূপ কোন ইস্তাহার নাই বা ছিল না। যে ইস্তাহার ছিল বা আছে, তাহা "Dogs are not allowed", "কুকুরের প্রবেশ নিষিদ্ধ।" ভারতীয় কেহ ঢুকিতে চাহিলে পাহারাওয়ালা বলে বা বলিত, "হুকুম নেহি হ্যায়" এবং হুকুম দেখাইতে বলিলে ঐ "কুকুরের প্রবেশ নিষিদ্ধ" ইস্তাহারটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিত। গত খৃষ্টীয় শতাব্দী যখন নব্বইয়ের কোটায়, তখন মিস্টার কেন্ এই বিষয়ে বিলাতী পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

—

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় কেবল যে তাহার অংশীদারদের ও যাহাদের টাকা গচ্ছিত ছিল, তাহাদের ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, বাঙালীর চালিত কারবারের প্রতি লোকের বিশ্বাস কমিয়া যাওয়ায় সমগ্র বাঙালী জাতির ক্ষতি হইয়াছে। ইংরেজদের এবং অন্য সবজাতিরই কোন না কোন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সংবাদ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। কিন্তু তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্য বহুবিস্তৃত, এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত কারবার তাহাদের অনেক আছে। এই জন্য দু একটা কারবার দেউলিয়া হইলেও তাহাদের জাতীয় অক্ষমতা বা অন্য বদনাম হয় না। আমাদের তেমন কারবার অল্পই থাকায় আমাদের উপর অবিশ্বাস লোকের সহজেই হয়। মান্দ্রাজের আরবুথনটরা যখন ফেল হয়, তখন প্রতারণা অপরাধে তাহাদের বড় সাহেবের জেল হইয়াছিল। তিন বৎসর আগে ইংরেজদের এলায়েন্স ব্যাঙ্ক ফেল যে ব্যক্তিবিশেষের

জুয়াচুরীর জন্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ইংরেজদের ব্যাঙ্ক ফেল এইরূপ আরও বিস্তর হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের জাতীয় অক্ষমতা বা অবিশ্বাস্যতার কথা উঠে নাই। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার কারণ কাহারও জুয়াচুরী, এরূপ অপবাদ উহার শত্রুরাও দেয় নাই। সম্প্রতি যে ব্যাঙ্ক্ অব্ তেইওয়ান নামক বৃহৎ জাপানী ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করে, তাহাতেও জাপানীদের কোন বদনাম হয় নাই। অধিকন্তু জাপান স্বাধীন দেশ বলিয়া উহার গবর্মেণ্টের আদেশ ও সাহায্যে উক্ত ও অন্যান্য সব জাপানী ব্যাঙ্কের কাজ পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

অবশ্য, আমাদের দেশী মহাজনী কারবার না চলিলে বিদেশীরা খুব খুশী হয়। যখন পঞ্জাবের পীপ্‌লস্ ব্যাঙ্ক ফেল হয়, তখন কোন একটি সহরের ইংরেজরা ভোজ দিয়াছিল এবং যে-প্রদেশে ঐ সহর অবস্থিত তাহার লাট ভোজে-সভাপতির কাজ করিয়াছিল।

বাঙালীদের ব্যাঙ্ক প্রভৃতি খুব বেশী দক্ষতা, হুশিয়ারী ও সততার সহিত চালান উচিত, অংশীদার ও ডিপজিটর-দের স্বার্থরক্ষার্থ, দেশের কল্যাণ ও সুনামরক্ষার জন্য, এবং শত্রুদের বিদ্রূপ ও উল্লাসের কারণ না জন্মাইবার নিমিত্ত।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারদের রিপোর্টে দেখা যায়, গত এপ্রিল মাসে ব্যাঙ্ক হইতে খুব বেশী লোক খুব বেশী টাকা উঠাইয়া লইতে চাওয়ায় এবং ততবেশী নগদ টাকা উহার হাতে না থাকায়, টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। মুখে মুখে গুজব রটিয়াছিল এবং পরে খবরের কাগজেও দেখা গেল, যে, রাজনৈতিক দলাদলির জন্য ইহা ঘটিয়াছে। ইহা সত্য না হইলেই সন্তোষের বিষয় হইবে। বিস্তর নিরপরাধ লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া এবং জাতীয় অযোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়া রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা অতিশয় ছুঁচোমি। ইহা কেহ বা কোন দল না করিয়া থাকিলেই সুখের বিষয়। এবম্বিধ ও অন্য সব আলোচনা ও অনুমান বন্ধ করিয়া এখন যাহাতে ব্যাঙ্কটি আবার খোলা হয় ও ভাল ভাবে চলিতে পারে, তাহার আলোচনা ও চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য

আর্ল উইণ্টারটন সহকারী ভারতসচিব। তিনি পার্লেমেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, যে, একজন রাজ-বন্দী আত্ম-হত্যা করিয়াছে, এবং দু জনের যক্ষ্মা ছিল বা আছে বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। অন্য সকলের স্বাস্থ্যের খবর তিনি জানেন না। অথচ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই রকমের অজ্ঞ লোকেরাই ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা। তাঁহারাই বলেন, যে, ভারতের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য তাঁহারা দায়ী ও এই দায়িত্ব তাঁহারা ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করিতে ততদিন রাজী নন যত দিন তাহারা তাঁহাদিগকে নিজেদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট করিতে না পারিবে। আত্মহত্যা ছাড়া, বন্দী-দশায় সংক্রামিত ব্যাধিতে মৃত্যু কয় জনের হইয়াছে, মানসিক রোগ কত জনের হইয়াছে, যক্ষ্মা ছাড়া অন্য গুরুতর ব্যাধি কত জনের হইয়াছে, আর্ল উইণ্টারটন তাহা জানেন না, কিম্বা বলেন নাই। খবরের কাগজ খুলিলেই আজকাল দু'রকমের খবর চোখে পড়িবেই—প্রথম, নারীদের উপর অত্যাচারের সংবাদ, যাহার জন্য কোন কোন সামাজিক প্রথা ও কতক-গুলি লোকের ভীরুতা কিয়ৎপরিমাণে দায়ী এবং দুর্ব্বৃত্তদের পৈশাচিক স্বভাব অধিকপরিমাণে দায়ী; দ্বিতীয়, রাজ-বন্দীদের নানাবিধ রোগ ও অন্য অসুবিধার সংবাদ। প্রথম শ্রেণীর সংবাদের জন্য দেশের লোকরাই বেশী দায়ী হইলেও গবর্মেণ্ট ও কতকটা দায়ী এইজন্য, যে, নারী-নির্য্যাতন বন্ধ করিবার জন্য গবর্মেণ্ট বিশেষ কোনই চেষ্টা করিতেছেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর সংবাদের জন্য গবর্মেণ্ট সম্পূর্ণ দায়ী।

—

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব

বরিশালে স্যার আব্দার রহিমের সভাপতিত্বে মুসলমানদের যে কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নিম্ন-লিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে:—

"This conference is of opinion that a constitution should be devised for India on the basis of a federation of autonomous provinces with the dominion status, the function of the Central Government

being confined to the administration of subjects directly concerned with the whole of India, such as the Army, Navy and Air Force, foreign and interprovincial relations, communicating, currency, fiscal policy, relation between India and England and other dominions and between British India and the Native States."

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব সাবেক কংগ্রেসের এবং আধুনিক কংগ্রেসের একটি আদর্শ ও বুলি। এবিষয়ে একটি কথা ভাবিবার জন্য নীচে কিছু লিখিতেছি। মুসলমানদের কনফারেন্সে যে-প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে যে ডোমিনিয়ন্ ষ্ট্যাটাসের উল্লেখ আছে, তাহা প্রত্যেক প্রদেশের জন্য, না সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য, পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস মানে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির মত রাজনৈতিক অবস্থা ও অধিকার। যদি মুসলমান কনফারেন্স প্রত্যেক প্রদেশের এইরূপ অবস্থা চান, তাহা হইলে আমরা তাহার বিরোধী। কারণ প্রত্যেক প্রদেশের এরূপ অবস্থা ও অধিকার হইলে সমগ্রভারতের একতা, সংহতি (solidarity) এবং স্বাধীন হইবার ও থাকিবার শক্তি জন্মিবে না। তদ্ভিন্ন, এরূপ অবস্থায়, যে-সব প্রদেশে (যেমন বাংলায় ও সিন্ধুদেশে) মুসলমানদের সংখ্যা বেশী, তথায় তাহারা হিন্দুদের উপর এখনই যেরূপ অত্যাচার করিতেছে, সেই অত্যাচার আরও বাড়িবার সম্ভাবনা। হিন্দুরা যে-সব প্রদেশে সংখ্যায় বেশী কোথাও সেরূপ অত্যাচার করে নাই।

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব কোন কোন বিষয়ে আমরাও চাই। কিন্তু বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার ব্যবস্থা এমন ভাবে করা উচিত, যাহাতে তদ্দ্বারা ভারতীয় মহাজাতির একতা, সংহতি ও শক্তি হ্রাস না পায়। আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ১৮৫৮ সালের ১৩ই জুলাই বিলাতী পার্লেমেণ্টের ভারতে ইংরেজদের বসবাস করা সম্বন্ধীয় কমিটিতে জিজ্ঞাসিত কয়েকটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতে বুঝা যাইবে। প্রশ্ন মেজর জি উইন্‌গেটকে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং উত্তর তিনি দেন। যথা—

"7771, you speak of the dangers that arise from a central Government, and you say that it leads to a community of aims and feelings that might be dangerous ?—"Yes, I think that if there be any one subject in which the whole population of India would be interested, that is more likely to be dangerous to the foreign authority than if a question were simply agitated in one division of the empire ; if a question were agitated throughout the length and breadth of the empire, it would surely be much more dangerous to the foreign authority than a question which interested one Presidency only.

"7772, *Mr. Danby Seymour*.

Is what you mean this, that all the people of India might be excited about the same thing, at the same time ?—Yes."

তাৎপর্য্য। আপনি কেন্দ্রীভূত গবর্মেণ্ট হইতে যে বিপদ ঘটিতে পারে, অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদ ভারতীয়দের নহে। প্রবাসীর সম্পাদক) তাহার কথা বলিতেছেন; এবং আপনি বলিতেছেন, যে, ইহা হইতে যে লক্ষ্যের ও মনোভাবের একতা জন্মে তাহা বিপজ্জনক হইতে পারে?" "হাঁ, যদি এমন কোন বিষয় থাকে যাহাতে ভারতবর্ষের সব লোকের স্বার্থ জড়িত ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাহা ভারতসাম্রাজ্যের একটি মাত্র অংশে আন্দোলিত ব্যাপার অপেক্ষা, বিদেশী কর্তৃপক্ষের পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক হইতে পারে। যদি সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত একটি প্রশ্ন লইয়া আন্দোলন হয়, তাহা নিশ্চয়ই একটি মাত্র প্রেসিডেন্সীতে আন্দোলিত প্রশ্ন অপেক্ষা বিদেশী কর্তৃপক্ষের পক্ষে অধিক বিপজ্জনক হইবে।"

"মিস্টার ড্যানবী সীমুর—আপনার কথার অর্থ কি এই, যে, ভারতবর্ষের সব লোক একই সময়ে একই বিষয় লইয়া উত্তেজিত হইতে পারে?" "হাঁ।"

ভারতবর্ষের আসল শাসননীতি কি তাহা মহারাণীর ঘোষণাপত্র, লাট সাহেবদের দরবারী বক্তৃতা, এবং তদ্বিধ অন্য লোক-দেখান জিনিষ হইতে বুঝা যায় না; বুঝা যায় উপরে উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তরের মত জিনিষ হইতে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চান না, যে, সমুদয় প্রদেশের সমুদয় লোক একই সময়ে কোন একটা বিষয় লইয়া উত্তেজিত বা চঞ্চল হয়; তাঁহারা চান, আমরা গ্রামের, জেলার, বা, জোর, প্রদেশের বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকি। অতএব প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য এমন রকমের হওয়া উচিত, যাহাতে সমগ্র ভারতের সব লোকদের একত্র হইবার ও একত্র কাজ করিবার অনেক বিষয় থাকে। প্রত্যেক প্রদেশের ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্ হইলে তাহা হইবে না।

—

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব

বরিশালের মুসলমান কন্‌ফারেন্সে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন দুই রকমের হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। প্রতিনিধিরা যে ধর্ম্মাবলম্বী লোক হইবেন, কেবল সেই সম্প্রদায়ের ভোটারদেরদ্বারাই নির্ব্বাচিত হইবেন। ইহা গেল এক রকম সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব। দ্বিতীয় প্রকার নির্ব্বাচনে আর সব ঠিক থাকিবে, কেবল নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি সব সম্প্রদায়ের ভোটারদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। নির্ব্বাচন যে-রকমেরই হউক, আমরা এই সাম্প্রদায়িক জিনিষটারই বিরোধী। ইহা জাতিগঠনে এবং জাতীয় সংহতি ও শক্তি বর্দ্ধনে বাধা জন্মায়। ইহা মানুষকে নিজেকে সমগ্র জাতিটির অংশ ভাবিয়া সমগ্রজাতির হিত-চেষ্টা করিতে না শিখাইয়া, শিখায় নিজেকে ক্ষুদ্রতর একটি দলের অংশ বলিয়া ভাবিতে ও তাহারই জন্য চেষ্টা করিতে।

ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব জিনিষটা মোটের উপর একটা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ধর্ম্মভেদ অনুসারে ভিন্ন নহে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব নিষ্প্রয়োজন। শুধু তাই নয়। কোন সম্প্রদায় ক্ষুদ্র হইলেও যোগ্যতা ও দেশহিত চেষ্টা দ্বারা খুব প্রভাবশালী হইতে পারেন, এবং আত্মরক্ষা করিতে পারেন। এক লক্ষ পার্শিরা যদি ইহা করিতে পারিয়া থাকেন, সাতকোটী মুসলমান কেন পারিবেন না।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের আর-একটা গুরুতর দোষ এই, যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা ন্যায্য-সংখ্যক প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই, হইতে পারে না। যে সম্প্রদায় যত ছোট ও দুর্ব্বল, ন্যায়তঃ তাহারই স্বার্থরক্ষার জন্য তত বেশী ও ভাল বন্দোবস্ত ও চেষ্টা হওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষে হিন্দুদের নীচেই মুসলমানদের সংখ্যা বেশী; অথচ তাঁহাদের চীৎকার বেশী বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত করিতেছেন, প্রত্যেক প্রদেশের তদপেক্ষা ন্যূন সংখ্যক খ্রীষ্টিয়ান, ইহুদী, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, পার্শি, ব্রাহ্ম, আদিমনিবাসী প্রত্যেক জাতি, প্রভৃতির জন্য তাহা করিতেছেন না—করা সম্ভবপরও নহে। সমুদয় হিন্দুকে কেবল মাত্র একটা দল ভাবিলে চলিবে না। দক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণে দলাদলি আছে। দেশের বন্ধুরা বাংলা-দেশেও নমঃশূদ্রদিগকে অন্য নানা হিন্দুর বিরোধী করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন। এই প্রকারে ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায় ও দলকে খুশি করিতে হইলে ন্যূনকল্পে পাঁচ শত দলের জন্য আলাদা আলাদা প্রতিনিধির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন দেশে কখন হয় নাই, হইবেও না।

উপরে যে দ্বিতীয় রকমের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কথা অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের ভোটারসমষ্টি দ্বারা নির্ব্বাচনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মন্দের ভাল। কিন্তু তাহা চালাইতে হইলে এই আইনও হওয়া উচিত, যে, এই প্রথা দশ বৎসর পরে উঠিয়া যাইবে ও তখন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব থাকিবে না। এখন যাহাদের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার আছে, তাহাদের যখন মত হইবে তখন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব উঠিয়া যাইবে, ইহা কাজের কথা নয়। অনিষ্টকর জিনিষের আয়ু অনির্দ্দিষ্ট রকম দীর্ঘ হইতে না দিয়া তাহাকে নির্দ্দিষ্ট রকম অল্পায়ু করা উচিত।

—

সিন্ধুর জন্য স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা

মুসলমানরা আর-একটা দাবী করিতেছেন, যে, সিন্ধু দেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে আলাদা করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র গবর্ণরের ও ব্যবস্থাপক সভার অধীন একটি প্রদেশ করা হউক। তাহার কারণ সহজবোধ্য। সিন্ধুদেশে মুসলমানের সংখ্যা খুব বেশী; কিন্তু সমুদয় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সমগ্র অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানরা ন্যূন অংশ। সুতরাং মুসলমানরা চান এমন একটি প্রদেশ যাহাতে তাঁহারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইতে পারেন। বর্ত্তমান

ব্যবস্থাতেই সিন্ধুদেশে সংখ্যান্যূন হিন্দুদের উপর যে-অত্যাচার হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের এরূপ প্রস্তাবে অসম্মতিই স্বাভাবিক। তা-ছাড়া, সিন্ধুর মোট রাজস্ব যাহা, তাহাতে একটি আলাদা প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের ব্যয় চলিতে পারে না। বাকী টাকাটা কে দিবে?

অন্য একটা কথাও আছে।

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে উঠিয়া যাইবার অনেক আগে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আগে, প্রদেশ-বিভাগ যেরূপ ছিল, তাহাতে বঙ্গ বিহার ওড়িষা ছোট নাগপুর একটি প্রদেশ ছিল এবং তাহাতে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী ছিল। এখন মুসলমানদের সিন্ধু সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের মত হিন্দুরাও ত প্রস্তাব করিতে পারেন, যে, সাবেক সুবা বাংলার সেই সেই অংশ পুনঃসংযোজিত করা হউক যাহার দ্বারা হিন্দুরা নবগঠিত বঙ্গে আবার সংখ্যায় বেশী হইতে পারে। বর্ত্তমান বিহার-ওড়িষা প্রদেশের অনেক অংশে বাংলা কথিত ও পঠিত হয় এবং ওড়িষার শিক্ষিত লোক মাত্রেই বাংলা বুঝেন। এইরূপ প্রস্তাব সম্বন্ধে মুসলমানরা কি বলেন?

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের পঞ্জাব-সন্নিহিত কোন কোন জেলা বস্তুতঃ প্রাকৃতিক পঞ্জাবেরই অংশ। তাহা পঞ্জাবের সহিত যুক্ত হইলে পঞ্জাবে হিন্দুরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইতে পারে। এরূপ প্রস্তাব সম্বন্ধেই বা মুসলমানরা কি বলেন?

চালবাজিটা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে।

—

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠা ও ভারতশাসনসংস্কার আইন চালাইবার জন্যও মুসলমানরা দাবী করিতেছেন। এবিষয়েও জিজ্ঞাস্য, এরূপ শাসন-ব্যবস্থার খরচ দিবার ক্ষমতা ঐ প্রদেশের যখন নাই, তখন ঘাটতিটা পূর্ণ কে করিবে?

অন্য বক্তব্য এই, যে, ঐ প্রদেশ ভারত আক্রমণের পথে অবস্থিত এবং ভারতীয় সৈন্যদলে ভারতীয় সীমার পরপারের অধিবাসী লোক বিস্তর আছে এবং এপারের মুসলমান সিপাহীও বিস্তর আছে। সীমার উভয় দিকের লোকের লুটতরাজে সাহচর্য্য অনেকবার প্রমাণিত হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে আপনাদিগকে বিদেশীয় বংশধর বলিয়া প্রমাণ করিবার ঝোঁক খুব আছে, এবং ভারতীয় হিন্দু অপেক্ষা তাঁহারা বিদেশী মুসলমানদিগকে বেশী আপনার লোক মনে করেন। এ অবস্থায় ভারতসীমান্ত রক্ষার ভার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সীমান্তের মুসলমানদের হাতে যাহাতে বেশী পরিমাণে যাইয়া পড়ে, এরূপ কোন ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ভারতের সৈন্যদল যখন ভারতীয়দের তাঁবে আসিবে, এবং উহাতে সব প্রদেশের ভারতীয়রা নেতা ও সিপাহী রূপে অবাধে জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রবেশ করিতে পারিবে, তখন উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নূতন ব্যবস্থার কথা উঠিতে পারে। অবশ্য গবর্মেণ্ট এখনই মুসলমানদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু তাহা আমাদের সম্মতিক্রমে হইয়াছে, ইহা বলিবার সুযোগ আমরা দিতে চাই না।

—

স্যার আব্দার রহিমের বক্তৃতা

বরিশালে মুসলমান কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে স্যার আব্দার রহিম যে-বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার সুরটা ঠিক তাঁহার বিখ্যাত আলিগড়ের বক্তৃতার মত নয়;—কিছু নরম, একেবারে "যুদ্ধং দেহি" নহে। নরম হইবার কারণ বুঝা সহজ। পড়িতে শুনিতে ভাল এমন কথাও এই বক্তৃতায় আছে। কিন্তু সমস্তটি মন দিয়া পড়িলে সন্তুষ্ট হইতে পারা যায় না।

তিনি বলিয়াছেন, যে, পোনাবালিয়ায় মুসলমান জনতার উপর গুলিবর্ষণ দ্বারা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, যে, এদেশে রেস্পন্সিবল্ গবর্মেণ্ট অর্থাৎ জনসাধারণের নিকট দায়ী গবর্মেণ্ট নাই। কি আশ্চর্য্য আবিষ্কার! তিনি যখন গবর্মেণ্টের একটা অঙ্গ ছিলেন, তখন কি সরকার জনসাধারণের নিকট সব কাজের জন্য দায়ী হইতেন? তখন কি জুলুম, জবরদস্তী, "বে-আইনী আইন" জারী, এসব কিছুই হইত না? দায়িত্বপূর্ণ শাসনের কথা উঠেই বা কেন? ভারতশাসনসংস্কার আইন দায়িত্বপূর্ণ

গবর্মেণ্ট প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, একথা ত আমলাতন্ত্রেরও উক্তি বা দাবী নহে। উক্ত আইন অনুসারে দায়িত্বপূর্ণ গবর্মেণ্ট ক্রমোন্নতিসূত্রে অল্প অল্প করিয়া স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইবে, ইহাই বলা হইয়াছে।

রহিম সাহেবের ইহা একটা মস্ত অভিযোগ, যে, পটুয়াখালিতে হিন্দুরা সত্যাগ্রহ করিয়া হুকুম অমান্য করায় আদালতে বিচার করিয়া তাহাদের শাস্তি হইতেছে; অথচ পোনাবালিয়ায় মুসলমানরা হুকুম অমান্য করায় তাহাদের উপর গুলি বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভুলিয়া যাইতেছেন, পটুয়াখালিতে নিরস্ত্র দুটি চারিটি হিন্দু নিজেদের ধর্ম্মাধিকার স্থাপন জন্য নিরুপদ্রব ভাবে হুকুম অমান্য করিতেছে, কাহাকেও মারিতে যাইতেছে না। পক্ষান্তরে পোনাবালিয়ায় বহুসংখ্যক সশস্ত্র মুসলমান বাহুবলে ও অস্ত্রবলে হিন্দুদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে জনতাভঙ্গ করিতে বলায় তাহারা, আদেশ পালন করা দূরে থাক্, তাঁহাকে ও অন্য সরকারী লোকদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। এই দুই প্রকার আদেশলঙ্ঘনে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাহা বুঝা খুব সোজা। রহিম সাহেব বুঝিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে উপায় কি? পোনাবালিয়ায় ৩৭ রাউণ্ড গুলি নিক্ষেপের প্রতিবাদ আমরা করিয়াছিলাম, অন্য অনেক অমুসলমান সম্পাদকও করিয়াছিলেন; কিন্তু সশস্ত্র মুসলমান জনতার আচরণের সমর্থন করিতে পারি নাই।

মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য সম্বন্ধেও রহিম সাহেব অনেক আংশিক সত্য আংশিক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, যে, হিন্দুরা নামাজের সময় মসজিদের সামনে গীতবাদ্য বন্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল। তাহা হইলে আপোষে মিটমাট হইল না কেন? কারণ কি এই নহে, যে, তিনিও অন্য মুসলমান নেতারা ও তাঁহাদের অনুচরেরা এই জেদ ধরিয়াছিলেন, যে, সব মসজিদের সামনে সকল সময়েই গীতবাদ্য বন্ধ করিতে হইবে?

তিনি সাধারণভাবে বলিয়াছেন বটে, যে, দেশের সব সম্প্রদায়ের লোকদের সরকারী রাস্তা ব্যবহার করিবার অধিকার আছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা অন্যের সমান অধিকারে বাধা না দেয়, অপরের বিরক্তিকর বা অনিষ্টকর কাজ না করে, অপরের উপর উৎপাত না করে। কিন্তু মুসলমানরা যে কত মন্দির ও মূর্ত্তি অপবিত্র করিয়াছে, শবদাহে বাধা দিয়াছে, সংকীর্ত্তনদল আক্রমণ করিয়াছে, লোকদের নিজের গৃহাভ্যন্তরে পূজাপাঠে ভজন গানে বাধা দিয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই।

তাঁহার বক্তৃতার সব-চেয়ে জঘন্য, লজ্জাকর ও ঘৃণ্য অংশ সেইটা যেখানে তিনি নারীদের উপর মুসলমান নরপশুদের কৃত অত্যাচারসমূহকে সেক্সুয়েল ইরেগুলারিটি বা স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধীয় অনিয়ম বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে-সব অমুসলমান কাগজ নারীনির্য্যাতনের বিরুদ্ধে খুব বেশী লেখালেখি করেন, তাঁহারা অত্যাচারী ও অত্যাচরিতাদের জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই পাপ ও পৈশাচিকতার নিন্দা করেন; কিন্তু রহিম সাহেব মুসলমান নারীদের উপর মুসলমানের অত্যাচার সম্বন্ধেও কোন কড়া কথা বলিতে সাহস করেন নাই; অথচ এরূপ অত্যাচারের সংখ্যা কম নহে। রহিম সাহেব বলিয়াছেন, ব্যভিচার বলাৎকারাদি গর্হিত কাজের শাস্তির ব্যবস্থা ইস্‌লামীয় শাস্ত্রে যেমন কঠোর এমন আর কোন শাস্ত্রেই নহে। তাহা সত্য কিনা, জানি না; কারণ আমরা ইস্‌লামীয় শাস্ত্র পড়ি নাই। কিন্তু বঙ্গায় মুসলমানদের ব্যবহারে ত এরূপ ব্যবস্থার কোন পরিচয় পাই না। কি শাস্তির ব্যবস্থা আছে, জানিতে চাই। তাহা হইলে প্রয়োজন-স্থলে তাহার দাবী হইবে। মুসলমানরা বহুস্থলে হিন্দু নারীর উপর অত্যাচারী মুসলমানের আদালতে পক্ষসমর্থন জন্য চাঁদা তুলিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান দ্বারা অত্যাচরিতা মুসলমান নারীদেরও পক্ষাবলম্বন করিয়া মোকদ্দমা চালাইবার জন্য চাঁদা তুলিয়াছেন বা সমিতি গঠন করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, পড়ি নাই। অত্যাচরিতা হিন্দুনারীর পক্ষ তাঁহারা কেহ অবলম্বন করিবেন, এরূপ দুরাশা আমাদের নাই। মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারের প্রত্যেকটি সংবাদ যে সত্য, ইহা আমরা বলি না; কিন্তু এরূপ বিস্তর সংবাদ যে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহা পুনঃ পুনঃ আদালতে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ অত্যাচার যে মুসলমানরাই বেশী করে, অত্যা-

চরিতাদের বেশী অংশ যে হিন্দুনারী, এবং এই উপায়ে যে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই। অমুসলমান নারীরক্ষাসমিতি অত্যাচরিতা মুসলমান নারীর পক্ষ অবলম্বন ও সাহায্য করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। কুষ্টিয়ার মধু শেখ অত্যাচরিতা হিন্দুনারীর সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া অমুসলমান কাগজে তাঁহার প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।

অধিকাংশ ভারতীয়—বিশেষতঃ বঙ্গীয়—মুসলমান যে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ভারতীয় হিন্দুদের বংশধর, এই কথাটা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করায় রহিম সাহেব বড় চটিয়াছেন। তাঁহারা অনেকে নিজ নিজ প্রকৃত পূর্ব্বপুরুষদিগকে বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগকে আরব মোগল পাঠান তুর্কের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক সত্যের উদ্ঘাটন অপ্রীতিকর হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে অমুসলমানদের কোন বদ্ মতলব নাই; কারণ তাহারা আরব তুর্ক পাঠান মোগলদিগকে ভারতীয় হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে না। "শুদ্ধি"র জন্যও মুসলমানদিগকে হিন্দুর বংশধর প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, শক হুন গ্রীক্ ভারতীয় অনার্য্য আদিম জাতি প্রভৃতির বিস্তর লোক স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া আসিতেছে।

রহিম সাহেব বলিয়াছেন, যে, সংখ্যাবহুল হিন্দুরা তাহাদের ক্ষমতার কিরূপ ব্যবহার করিবে, সে-বিষয়ে মুসলমানদের উদ্বেগ আছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, মুসলমানের সংখ্যা কম। কিন্তু যে-কয়েকটি প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তথায় মুসলমানেরা হিন্দুর উপর যেরূপ যত অত্যাচার করিয়াছে, তাহার সমতুল্য তত অত্যাচারের দৃষ্টান্ত হিন্দুবহুল প্রদেশ সকল হইতে রহিম সাহেব বাহির করিতে পারেন কি? মালাবার, পাবনা, কোহাট, লড়কানা, প্রভৃতির মত হিন্দু-অত্যাচার-ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত দিতে পারেন কি? কল্পিত বাজে উদ্বেগের উল্লেখ নেতৃস্থানীয় কোন লোকের করা উচিত নয়। বড়োদাতে রাজা হিন্দু; মুসলমানরা তথায় সংখ্যায় কম। অথচ সেখানেও শিবাজী উৎসবে মুসলমানেরা উপদ্রব করিয়াছে।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত গণিত অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া যে-কথা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা যায়, ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্ট জজ ও শাসন-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভ্যের তেমন মিথ্যা কথা বলাটা নির্বুদ্ধিতা। রহিম সাহেব নিজ সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—"they are steadily declining in wealth, education and political influence।" কোন্ সম্প্রদায়ের ধন কিরূপ বাড়িতেছে কমিতেছে, তাহার কোন হিসাব নাই। রাজনৈতিক প্রভাবের হ্রাসবৃদ্ধিরও হিসাব নাই। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি যে মুসলমানদের মধ্যে হইতেছে, তাহার হিসাব আছে ও তাহা দেখাইতেছি। রহিম সাহেব বাংলা দেশে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুতরাং বাংলার কথাই বলি। ১৯২৫-২৬ সালের বঙ্গীয় শিক্ষা-রিপোর্টে দৃষ্ট হইবে, যে, ১৯২৪-২৫ সালে কলেজ-সমূহে মুসলমান ছাত্র ২৮৫৩ ছিল; ১৯২৫-২৬ সালে তাহা বাড়িয়া ৩১৭৮ হয়। সকল রকমের শিক্ষালয়ে মুসলমান ছাত্রছাত্রী ১৯২৪-২৫ সালে ১০১৮৫৯৩ ছিল; তাহা বাড়িয়া পর বৎসর ১০৫২৩৬৬ হয়। মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয় সকলে মুসলমান ছাত্রছাত্রী ১৯২৪-২৫ সালে যথাক্রমে শতকরা ১৪·৬ ও ১৭·২ ছিল; তাহা বাড়িয়া ১৯২৫-২৬ সালে শতকরা ১৫·০ ও ১৭·৬ হইয়াছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা এইরূপ ছিল:—

বৎসর।	হিন্দু।	মুসলমান।
১৯২৪-২৫	৫৯৭২৬৫	৬৮৭৩৯৯
১৯২৫-২৬	৬২২৭১৯	৬৯৬২৬৫

স্ত্রীশিক্ষার হিসাব লইলে দেখা যায়, ১৯২৫-২৬ সালে হিন্দু ছাত্রী ছিল ১৩৯৬১১, মুসলমান ছাত্রী ছিল ১৯১২৮৩। মুসলমান ছাত্রীরা সংখ্যায় এক বৎসরে শতকরা ৫·৫ বাড়িয়াছে; হিন্দু ছাত্রীরা সংখ্যায় তত বাড়িতে পারে নাই, কেবলমাত্র শতকরা ৩·৫ বাড়িয়াছে।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার অবস্থা ভাল নয় সত্য, কিন্তু তাহার অবনতি হইতেছে না, উন্নতিই হইতেছে।

রহিম সাহেবের বক্তৃতার আরও অনেক সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু আর জায়গা নষ্ট না করিয়া শেষ কথা একটা বলি। তিনি শেষের দিকে বলিয়াছেন:—

"Politics, whatever the cynic may say, is the **noblest** occupation of the ablest men of the **community**."

তিনি বলিতেছেন, সমাজের যোগ্যতম লোকদের মহত্তম চেষ্টার স্থল রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্র। এই কথাটা তিনি না বলিয়া অন্য কেহ বলিলে ভাল হইত। গোখলের মত লোক রোজগারের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে-পথ ছাড়িয়া দিয়া রাজনৈতিক কাজ করিয়াছিলেন। রহিম সাহেব বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যত রকম সরকারী চাকরী জুটাইতে পারিয়াছেন, করিয়াছেন। মন্ত্রিত্ব চাকরীটা না-পাওয়ায় তাঁহার বড় দুঃখ হইয়াছে। এখনও তিনি তাহা পাইলে করিবেন। এইজন্যই বলিতেছি, উদ্ধৃত কথাগুলি কোনও ত্যাগী লোকের মুখে শোভা পাইত। তবে যদি "অকুপেশুন্" কথাটা তিনি সেন্স রিপোর্টের অর্থে অর্থাৎ পেশা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। খিলাফৎ ফণ্ডের যেরূপ সদ্ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে রাজনীতি পেশাটা মন্দ বোধ হয় না। এইরূপ পেশা টিলক স্বরাজ্য ফণ্ড এবং বঙ্গের গ্রামপুনর্গঠন ফণ্ড সংস্থষ্ট কোন কোন অমুসলমান কর্ম্মীও অবলম্বন করিয়াছিলেন। রহিম সাহেব মুসলমানদের একটি খবরের কাগজের জন্য ছয় লক্ষ টাকা এবং তবলিগ ও তাঞ্জিমের জন্য ছয় লাখ টাকা চাহিয়াছেন। এই টাকা যদি সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহার সদ্ব্যয়ের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? উহা পেশাদার রাজনৈতিকদের হাতে পড়িবে কি?

—

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

ভারত গবর্ন্মেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবর্ষের এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। নামটা এজেণ্ট না দিয়া অধিকতর সম্মানজনক কোন নাম দিলে ভাল হইত। যাহা হউক, নির্ব্বাচন খুব ভাল হইয়াছে। রাজনৈতিক জ্ঞানে, ত্যাগে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠায়, বাগ্মিতায় ও চরিত্রে তিনি সর্ব্বাংশে এই কাজের উপযুক্ত। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া ভারতবাসীদের সম্বন্ধে কাহারও নিকৃষ্ট ধারণা হইবে না।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে স্বরাজী প্রভুত্ব

কলিকাতার মেয়র আবার স্বরাজী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তই হইলেন, এবং কমিটিগুলিতেও স্বরাজীদেরই প্রভুত্ব বজায় রহিল। সুরেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় নূতন কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনে দেশী লোকদের ক্ষমতাবৃদ্ধির পর হইতে স্বরাজী দলের হাতেই এই ক্ষমতা আছে। তাঁহাদের আমলে কলিকাতার চক্ষুগোচর ও নাসিকাগোচর কোন উন্নতি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই; যদিও ইহাও বলা উচিত, যে, তদ্রূপ কোন অবনতিও লক্ষ্য করি নাই। গুপ্ত কোন উন্নতি-অবনতি হইয়া থাকিলে তাহার বিষয় অবগত নহি। নানাদিকে উন্নতি খুব যে দরকার ও সম্ভব তাহা সবাই জানে। দেশীয় লোকদের প্রভুত্বে—বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেশভক্তির স্পর্দ্ধা যাঁহারা করেন তাঁহাদের প্রভুত্বে—যদি কেবল ইংরেজ পাড়াগুলিই ফিট্ ফাট্ থাকে, দেশী পাড়ার কোন উন্নতি না হয়, তাহা হইলে নূতন মিউনিসিপাল আইনের সার্থকতা কি?

স্বরাজী দলের একটা খুব সুবিধা এই ছিল, যে, তাঁহারা অন্য কোন দলের সাহায্য না লইয়া বা মুখাপেক্ষা না করিয়াও নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতেন। দলে এরূপ পুরু তাঁহারা ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও যে তাঁহারা কলিকাতার দেশী পাড়াগুলির উন্নতি করেন নাই, পূর্ব্ববৎ ইংরেজ পাড়াতেই টাকা ঢালিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের প্রশংসার বিষয় নহে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে অন্য কোন দলকে প্রাধান্য লাভ করিতে হইলে হয় ত ইংরেজদের সাহায্য চাই, হয় ত তাহাদিগকে কণ্ট্র্যাক্টআদি দিয়া খুশি করা চাই। দেশের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক নহে। অবশ্য দেশী লোকদের মধ্যে লুটের টাকার ভাগবাঁটোয়ারাও যে ভাল, তাহাও নহে। আমাদের বক্তব্য এই, যে, স্বরাজীদের প্রবলতা এক সময়ে এমন ছিল, যে, তাঁহারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ঘুষ না দিয়াও, কেবল সৎকর্ম্মশীলতার দ্বারাই, নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন। কিন্তু সেরূপ কৃতিত্বের প্রশংসা তাঁহারা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। এই তৃতীয় দফায় পারিবেন কিনা, বলিতে পারি না।

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভাগলপুরের স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী বাঙালাদের মধ্যে স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান। তাঁহার পিতার মাসিক আয় দশ টাকা মাত্র ছিল। ছাত্রাবস্থায় রাত্রিতে পড়িবার জন্য প্রদীপের তেল কিনিবার পয়সা না জুটায় রাস্তার বাতির আলোকে তিনি পড়িতেন। সরকারী বৃত্তি এবং সদাশয় লোকদের সাহায্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-এ ও বি-এল্‌ পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়িয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হন।



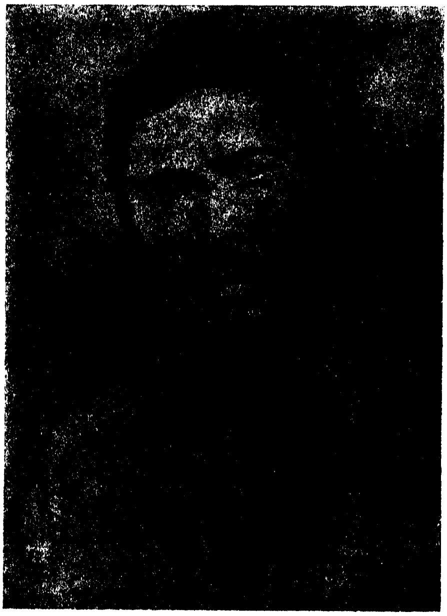
স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শিক্ষাবিভাগের কাজে প্রবৃত্ত হইয়া প্রধান শিক্ষক থাকিবার সময় তাঁহার মনে হইল, যে, তিনি বড় ক্ষমতা-প্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। এইজন্য তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া ওকালতীতে প্রবৃত্ত হন। কয়েক বৎসর ওকালতী করিয়া তাহা তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তাহাও তিনি ত্যাগ করেন। তিনি ভাগলপুরের নির্ব্বাচিত মিউনিসিপ্যাল ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান, এবং ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডেরও চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। এই সব পদের কাজ তিনি যোগ্যতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সহিত করিয়াছিলেন। সুরাপাননিবারিণী সভা, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, প্রভৃতি নানা সভাসমিতির সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি একাধিক উৎকৃষ্ট বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকের লেখক। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র কন্যা জামাতা দৌহিত্রাদি সকলের মধ্যে যে-কেহ চেষ্টা করিলে তাঁহার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত বাহির হইতে পারে।

—

উমাপদ রায়

স্বর্গীয় উমাপদ রায় মহাশয় কয়েক বৎসর হইল, সিটি-



স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত উমাপদ রায়

স্কুলের শিক্ষকতা হইতে অবসর লইয়াছিলেন। তিনি দক্ষ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। তিনি "জীবনালোক" "ভগিনী ডোরা", "পুরুষকার" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই তিনটি গ্রন্থ অনুবাদ; কিন্তু তাঁহার ভাষা ও রচনারীতি এরূপ ছিল, যে, এগুলি পড়িলে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। তিনি এই বৎসর এবং ইহার পূর্ব্বেও কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন।

বাংলাদেশে বিরলা পরিবারের দান

গত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে আমরা বিবিধ প্রসঙ্গে অনেক ধনী মাড়বারীর দান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদিগকে একটি চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি তাহা প্রকাশার্থ লিখিলে সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু তিনি তাহা ছাপিবার অনুমতি দেন নাই। তাহা পড়িয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আমরা অজ্ঞতা বশতঃ বিরলা পরিবারের প্রতি অবিচার করিয়াছি। তাহার জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা নিন্দনীয় হইলেও, বিরলা পরিবার যে প্রশংসা-ভাজন, তাহা সুখের বিষয়। মানুষের নিন্দা সত্য হওয়া অপেক্ষা প্রশংসা সত্য হওয়াই সুখকর।

পত্রলেখক বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছেন, যে, বিরলা পরিবার প্রতি বৎসর ন্যূনাধিক তিন লক্ষ টাকা জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করেন, এবং এই টাকার অধিকাংশই বাংলা দেশে ব্যয়িত হয়। এই প্রকার সদ্ব্যয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পত্রলেখক দিয়াছেন।

তাঁহার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। আশা করি, তাহাতে তাঁহার আপত্তি হইবে না।

"আর-একটি কথা এই, যে, রাজা বলদেব দাস বিরলা বাংলা হইতেই ধন আহরণ করিয়াছেন, ইহা ঠিক্ নহে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইঁহার আটটি মিল আছে, এবং বহু ব্যবসার কেন্দ্র আছে। এইসকল স্থান হইতেও তাঁহার প্রভূত ধনাগম হয়, যেমন বাংলা দেশ হইতেও হয়। সুতরাং, 'উপার্জ্জন-ক্ষেত্রেই দান করা উচিৎ,' এই নীতি যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দিল্লী এবং রাজপুতানার অনেক স্থান তাঁহার দানের উপর সমানভাবে দাবী করিতে পারে। কিন্তু শুনিয়াছি, যে, বাংলা দেশের জন্যই তাঁহারা বেশী অর্থব্যয় করেন। "...... একথাও ঠিক্ বলিয়া মনে হয় না, যে, বিরলা পরিবারের বাংলা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতি কম। বরং কথাবার্ত্তায় শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলার ও যুগলকিশোর বিরলার বাংলা দেশের প্রতি মমত্ববোধ দেখিয়াছি ......।" "বিবাহ সেই প্রদেশে হইয়াছিল বলিয়া সেই অঞ্চলের অথবা নিকটবর্ত্তী প্রদেশের প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁহারা এই লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি।"

—

লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

১। আমরা যত লেখা পাই, সমুদয় প্রকাশ করিবার জায়গা প্রবাসীতে হয় না, যদিও আমরা মধ্যে মধ্যে ১৪৪ পৃষ্ঠার অধিক পৃষ্ঠা দিয়া থাকি। এইজন্য অনেক লেখা ছাপিতে বহু বিলম্ব হয়। ইহাতে লেখকেরা স্বভাবতঃ বিরক্ত হন। এই কারণে আমরা একটি অনুরোধ করিতেছি। কোন লেখক যখন লেখা পাঠাইবেন, তখন তাহার উপর অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন, যে, কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত তাহা ছাপা না হইলে উহা ফেরত চাই। তা ছাড়া, যিনি যখন লেখা ফেরত চাহিবেন, তখনই তাহা তাঁহাকে ফেরত দেওয়া হইবে।

২। দীর্ঘ লেখা ছাপিতে অসুবিধা ও বিলম্ব হয়। এক-একটি লেখায় দুই হাজার অপেক্ষা বেশী শব্দ না থাকিলেই ভাল হয়। তাহা অপেক্ষা কম হইলে ক্ষতি নাই। যাহাতে আড়াই হাজার অপেক্ষা বেশী শব্দ আছে, এরূপ লেখা মনোনীত হইলেও প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা।

৩। প্রবন্ধাদি পাঠাইবার সময় তাহাতে কত শব্দ আছে লিখিয়া দিলে ভাল হয়।

৪। অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধ হাতে আছে। তাহা প্রকাশিত হইতে দেখিয়া কেহ যেন না ভাবেন, যে, দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা আমাদের রীতি এবং তাহা ছাপিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

—

কবিতা-চুরির অভিযোগ

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী লিখিয়াছেন, যে, শ্রীমনীশ ঘটক নামক একজন লেখক তাঁহার "পত্র-লেখা" নামক পুস্তকের "কর্ম্মচক্র" নামক কবিতাটি ঢাকার "শান্তি" নামক মাসিক পত্রিকায় নিজের বলিয়া ছাপাইয়াছেন। ইহার বিশেষ আলোচনা আবশ্যক মনে হইলে উক্ত পত্রিকাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসীর সম্পাদক।

—

চিত্র-পরিচয়

শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর রঙিন চিত্রখানি (মৃত্যুদূত) রেশমের উপর অঙ্কিত। যৌবনের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ইরাণী সুন্দরী পরপারের সম্বল 'মালা' ও প্রাণঘাতী ছুরিকার পসরা সাজাইয়া বসিয়াছে। প্রাণময় যৌবন প্রাণঘাতী দ্রব্যের পণ্য লইয়া মৃত্যুদূতের কঠোর মূর্ত্তি ধরিয়াছে—চিত্রে শিল্পীর এই ভাবটি চমৎকার ফুটিয়াছে।

৭১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। P. 95-27

সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান—এই
পাদানকে ভার বলা হয়।

ভারবাহী কে? ইহার উত্তরে
(গ্‌গল)—যাহাকে বলি এই আয়ুষ্মান্,
, এই যাহার গোত্র। হে ভিক্ষুগণ!
য় "ভারবাহী"।

ণ! ভার গ্রহণ কি?—এই যে তৃষ্ণা, যাহা
নয়ন করে, যাহা আনন্দ ও আসক্তির সহিত
করে, যাহা যেখানে-সেখানে সুখ অনুভব করে,
) এই যে কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা (জীবনে আসক্তি),
ভবতৃষ্ণা (জীবনের বিনাশে আসক্তি—ইহাকেই
'ভার গ্রহণ'।

হে ভিক্ষুগণ! 'ভার নিক্ষেপ' কাহাকে বলে? তৃষ্ণার এই যে সম্যক নিবৃত্তি, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জ্জন, মুক্তি, অনবস্থান—ইহাকেই বলা হয় 'ভারনিক্ষেপ'।"

গোতম ইহার পরে আরও বলিয়াছেন:—"পঞ্চস্কন্ধই ভার, পুরুষই ভারবাহী, লোকে—ভারগ্রহণই দুঃখ এবং ভারনিক্ষেপই সুখ। গুরুভার নিক্ষেপ করিয়া, অন্যভার গ্রহণ না করিয়া, তৃষ্ণাকে সমূলে বিনাশ করিয়া, নিস্পৃহ হইয়া (পুরুষ) পরিনির্ব্বাণ লাভ করে।" (সংযুত্ত ৩।২৫ ইং সং)।

এস্থলে বুদ্ধ বলিতেছেন, পুরুষই 'ভার-হার'; পুরুষই ভার নিক্ষেপ করে এবং যখন পুনরায় ভার গ্রহণ না করে, তখনই সে নির্ব্বাণ লাভ করে।

সুতরাং কর্ম্মও আছে কর্ত্তাও আছে। যে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম ক্ষয় করে, সেই তৃষ্ণা ক্ষয় করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করে।

(২)

দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, পুরুষই পরলোকে গমন করে। এ বিষয়ে গোতমের ভাষা সুস্পষ্ট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই:—

(ক) দুস্সীলো কায়স্স ভেদা......নিরয়ং উপ্পজ্জতি (দীঘ ২।৮৫) অর্থাৎ দুঃশীল ব্যক্তি দেহত্যাগের পর নরকে গমন করে।

(খ) সীলবা কায়স্স ভেদা সগ্‌গং লোকং উপ্পজ্জতি (দীঘ ২.৮৬) অর্থাৎ শীলবান্ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর স্বর্গলোকে গমন করে।

(গ) 'এই পুরুষ (পুগ্‌গল) নরক প্রাপ্ত হয়' (অঙ্গুত্তর ৪।২২৫)

(ঘ) এই পুরুষ (পুগ্‌গল) তির্য্যক্-যোনি প্রাপ্ত হয় (অঙ্গু ৪।২২৬)।

(ঙ) এই পুরুষ (পুগ্‌গল) প্রেতলোক প্রাপ্ত হয় (অঙ্গু ৪।২২৬)

বহুস্থলে এই প্রকার ভাষা। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, দেহত্যাগের পর পুরুষই পরলোকে গমন করে।

(৩)

তৃতীয় বক্তব্য এই যে, গোতম স্পষ্ট ভাষাতে বলিয়াছেন যে, পুরুষ যখন পরলোকে গমন করে, তখন কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে। একস্থলে তিনি এই প্রকার বলিয়াছেন—

"অন্তক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মানুষ যখন জীবন পরিত্যাগ করে, তখন কি তাহার আপনার হয় (সকং হোতি)? সে কি লইয়া গমন করে? পশ্চাৎধাবিনী (অনপায়িণী) ছায়ার ন্যায় কি তাহার অনুগমন করে?

মর্ত্ত্য এই পৃথিবীতে পাপ এবং পুণ্য যাহা কিছু করে, উভয়ই তাহার নিজের হয় (সকং হোতি)। তাহাই লইয়া সে গমন করে। অনপায়িণী ছায়ার ন্যায় তাহাই তাহার অনুগমন করে"। (সংযুত্ত নিঃ ১।৭২; ১।৯৩, ইং)

এস্থলে অনপায়িণী ছায়ার উপমা দেওয়া হইয়াছে। 'অনপায়িণী' শব্দের অর্থ 'যাহা দূরে চলিয়া যায় না' অর্থাৎ নিত্যসাঙ্গনী। ছায়া যেমন মানুষের অনুগমন করে, মৃত্যুর পরে পাপ-পুণ্যও তেমনি মানুষের অনুগমন করে।

(৪)

চতুর্থ বক্তব্য এই—পৃথিবীতে যে-ব্যক্তি কর্ম্ম করে; পরলোকে সেই ব্যক্তিই স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে। প্রমাণ এই:—

(ক)

নিম্নলিখিত ঘটনা গোতম বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমরা ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

দুষ্কৃতিবশতঃ একজন লোক নরকে নীত হইয়াছিল। বিচারের সময় নিরয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে যমের নিকট আনয়ন করিয়া বলিল, "হে দেবতা! এই পুরুষ (পুরিস) মাতাকে সম্মান করে নাই, পিতাকে সম্মান করে নাই, শ্রমণ ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করে নাই, কুলের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মান করে নাই। হে দেবতা! ইহার দণ্ড বিধান করুন।"

তখন যমরাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হে পুরুষ! মনুষ্যগণের মধ্যে যে প্রথম দেবদূত প্রকাশিত, তাহাকে কি তুমি দেখ নাই?"

সে বলিল—"হে ভদন্ত! আমি দেখি নাই।"

তখন যম তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, জরাই প্রথম দেবদূত। এই সঙ্গে সঙ্গে তিনি জরার লক্ষণও বর্ণনা করিলেন। ইহা শুনিয়া সেই পুরুষ বলিল "হাঁ, আমি দেখিয়াছি।" তখন যম তাহাকে বলিলেন তোমার কি এ প্রকার মনে হয় নাই যে "আমিও জরাধর্ম্মের অতীত নই, আমিও জরাগ্রস্ত হইব; সুতরাং কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কল্যাণ সাধন করি"।

সে, বলিল, প্রমাদ বশতঃই এ প্রকার চিন্তা আসে নাই।

তখন যমরাজা বলিলেন :—

"হে পুরুষ! প্রমাদবশতঃ তুমি কায়মনোবাক্যে কল্যাণ সাধন কর নাই। তুমি যেমন প্রমত্ত, তেমনি শাস্তি বিধান করিব। তুমিই এই পাপ কর্ম্ম করিয়াছ, তোমার মাতা করে নাই, পিতা করে নাই, ভ্রাতা করে নাই, ভগিনী করে নাই, বন্ধুবান্ধব করে নাই, রক্ত-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিও করে নাই, দেবতা করে নাই, শ্রমণ ব্রাহ্মণ করে নাই—তুমি নিজেই এই পাপ কর্ম্ম করিয়াছ এবং ইহার ফল তুমিই ভোগ করিবে।"

(ক)

ইহার পরে ব্যাধিরূপী দ্বিতীয় দূত এবং মৃত্যুরূপী তৃতীয় দূতের কথা উল্লেখ করিয়া ঠিক পূর্ব্বের ভাষা ব্যবহার করিয়াই তাহাকে বলিলেন যে, এ পাপ কর্ম্ম আর কেহ করে নাই, তুমিই নিজেই ইহা করিয়াছ এবং তুমি নিজেই ইহার ফল ভোগ করিবে। (অঙ্গুত্তর নিকায়, তিক নিপাত, ৫৩, দেবদূত বগ্গ)।

মজ্ঝিম-নিকায় গ্রন্থের দেবদূত সুত্তে ... এইপ্রকার ... ইং সং) এই আখ্যায়িকাটি পাওয়া যায়। ... দেবদূতের সংখ্যা পাঁচ জন। নতুবা উভয় ... প্রকার ভাষায় এবং ভাবে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ... পের চিহ্নিত অংশ অঙ্গুত্তর-নিকায়ে তিন বার এবং ... যুক্ত নিকায়ে পাঁচ বার উক্ত হইয়াছে।

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি :—

(১) পার্থিব কর্ত্তা এবং নরকের ভোক্তা একই পুরুষ।

(২) পুরুষ স্বকৃত কর্ম্মেরই ফল ভোগ করে।

(৩) পরলোকে গমন করিলেও পুরুষের পার্থিব স্মৃতি থাকে।

(খ)

রট্‌ঠপাল সুত্তে ইহাই অতি সংক্ষেপে এই ভাবে বলা হইয়াছে :—

"চোর যদি সন্ধিমুখে (অর্থাৎ সিঁদের মুখে) ধৃত হয় সেই পাপধর্ম্মা স্বকর্ম্মের জন্য (সকম্মনা) যেমন শাস্তি প্রাপ্ত হয়, মানবগণও তেমনি। যাহারা পাপধর্ম্মা, তাহারা মৃত্যুর পরে স্বকর্ম্মের জন্য (স্বকম্মনা) শাস্তি ভোগ করে"। মজ্‌ঝিম ২। ৭৪

এস্থলে 'সকম্মনা' শব্দটার প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক। মানুষ স্বকৃত কর্ম্মেরই ফল ভোগ করে।

(৫)

পঞ্চম বক্তব্য এই যে, গোতম অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন একই লোকের অসংখ্য জন্ম।

(ক)

অনমতগ্গ সংযুত্তে গোতম নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, সংসারের আরম্ভ কল্পনা করা যায় না। এই প্রকরণে তিনি মানবের জন্ম বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন—

"এক কল্পে একই পুরুষের (এক-পুগ্গলস্স) জন্ম-জন্মান্তরে যত অস্থি হইয়াছে তাহা যদি ধ্বংস না হইত এবং তাহা যদি কেহ সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহা হইলে

বেপুল্ল নামক পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ

সপ্তম বক্তব্য যুক্ত নিকায় ২।১৮৫)

পূর্ব্ব জন্মের এক পুগ্‌গলস্‌স' শব্দটির প্রতি প্রণিধান করা

এই ক্ষমতা একই পুরুষের অসংখ্য জন্ম।

গ্রন্থে এই

(খ)

"ে

প্র... টি অংশে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যাহা বলা হইয়াছে তা নিম্নে একসঙ্গে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। গোতম বলিতেছেন ঃ—

এপ্রকার সত্তা পাওয়া সহজ নহে, যে দীর্ঘকাল কখন (১) মাতা বা (২) পিতা বা (৩) ভ্রাতা বা (৪) ভগিনী বা (৫) পুত্র বা (৬) কন্যারূপে কখন জন্মগ্রহণ করে নাই। (সংযুক্ত ২।১৮৯—১৯০)

সংসারের আদি জানা যায় না—ইহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া গোতম ঐ 'অনমতগ্‌গ' সংযুত্তে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

সংসার অনাদি ; এইজন্য উদ্ধৃত অংশে 'দীর্ঘকাল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। একই মানবের অসংখ্য জন্ম। কোন না কোন জন্মে তাহাকে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র বা কন্যা হইতে হইয়াছিল।

এস্থলে একই মানবের বিভিন্ন জন্মের কথা বলা হইল।

(গ)

গোতম বলিতেছেন :—

"হে ভিক্ষুগণ দীর্ঘকাল তোমরা গো, মহিষ, মেষ, অজা, মৃগ, কুক্কুটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে ; এবং তোমাদিগের মস্তক ছেদন করা হইয়াছিল ; তোমাদিগকে চোর, গ্রাম-লুণ্ঠক, পরিপন্থী দস্যু বা পরদারিক রূপে ধৃত করিয়া তোমাদিগের শিরচ্ছেদন করা হইয়াছিল। ইহাতে যে রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা চারি সমুদ্রের জল অপেক্ষাও অধিক।" (সংযুত্ত ২।১৮৮)

(ঘ)

"হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘকাল নানাজন্মে মাতৃস্তন্যের যত দুগ্ধ পান করিয়াছ, তাহা চারি সমুদ্রের জল অপেক্ষাও অধিক"। (সংযুত্ত ২।১৮১)

(ঙ)

"তোমরা দীর্ঘকাল মাতৃমরণ, পুত্রমরণ, দুহিতৃমরণ, জ্ঞাতিগণের বিপদ, অর্থহানি, রোগ—এই সমুদয়ের জন্য যত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছ তাহা চারি সমুদ্রের জল অপেক্ষাও অধিক।" (সংযুত্ত ২।১৮০)

(চ)

"হে ভিক্ষুগণ! যখন তোমরা দুঃখ দেখিবে তখন এই-প্রকার চিন্তা করিবে—'আমরাও দীর্ঘকাল এইপ্রকার অনুভব করিয়াছি"। (সংযুত্ত ২।১৮৬)

(ছ)

"হে ভিক্ষুগণ! যখন তোমরা সুখ দেখিবে, তখন তোমরা এইপ্রকার চিন্তা করিবে—আমরাও দীর্ঘকাল এইপ্রকার অনুভব করিয়াছি"। (সংযুত্ত ২।১৮৬, ১৮৭)

পূর্ব্বোক্ত সাতটি অংশে আমরা অনমতগ্‌গ সংযুত্তের ১২টি স্থল বিচার করিয়াছি। প্রত্যেক স্থলেই বলা হইয়াছে, একই পুরুষ অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে একজন্মে কর্ত্তা, সেই অপর জন্মে ভোক্তা; আবার যে ভোক্তা সেই কর্ত্তা। এই সমুদায় অংশে গোতম কর্ত্তা ও ভোক্তার একত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

(৬)

ষষ্ঠ বক্তব্য এই যে, স্বর্গে বা নরকে গমন করিলেও সে-স্থলে পার্থিব স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে।

(ক)

দীঘনিকায়ের মহাপদান সুত্তন্তে গোতম স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গ-লোকে গমন করিয়াছিলেন। তখন দেবগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের পার্থিব জীবনের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিল—

"আমরা ভগবান্ বিপস্সীর নিকটে ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপন করিয়া সমুদয় আসক্তি ছিন্ন করিয়াছিলাম।" (দীঘ ১৪।৩।২৯)

ইহার পরে অপরাপর অনেক দেবতা আপনাদিগের মানবজীবনের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল।

দ্ধের সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সর্ব্বশেষে তাঁহারা বলিয়াছিলেন :—

"ভগবানের নিকট আমরা ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপন করিয়া আসক্তিশূন্য হইয়াছিলাম। এখন আমরা এই লোক প্রাপ্ত হইয়াছি।" দীঘ ১৪।৩।৩০

গোতম দেব-লোকে গমন করিয়াছিলেন কি না, তাহা বিচার্য্য নহে; বিচারের বিষয় তিনি মানব ও পরলোক বিষয়ে কি-প্রকার মত পোষণ করিতেন। পূর্ব্বোক্ত অংশ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, গোতম বিশ্বাস করিতেন পুণ্য কর্ম্ম করিলে মানব স্বর্গে গমন করে এবং স্বর্গে গমন করিলেও তাহার পার্থিব স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না।

ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে-মানব ইহলোকে কর্ম্ম করে, সেই মানবই স্বর্গলোকে স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে।

(খ) অজিতের ঘটনা

গোতম বলিতেছেন—

অধুনা অজিত নামক লিচ্ছবী সেনাপতির মৃত্যু হইয়াছে; তাহার পর সে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছে :—

"নগ্ন সন্ন্যাসী পাটিক-পুত্ত নির্লজ্জ; নগ্ন সন্ন্যাসী পাটিক-পুত্ত মিথ্যাবাদী। সে 'বজ্জিগণের' গ্রামে এই কথা বলিয়াছে যে, লিচ্ছবী সেনাপতি অজিত মহা-নিরয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি মহা নরকে জন্মগ্রহণ করি নাই—আমি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। (দীঘ, ৬।১৫ ইং)

অজিতের দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে যে, ইহলোকের কর্ত্তা ও পরলোকের ভোক্তা একই পুরুষ

(গ) ঘটিকারের কথা

ঘটিকার নামক এক জন পুরুষ মৃত্যুর পরে 'অবিহ' নামক স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এক সময়ে অবিহ লোক-হইতে গোতম-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। এইপ্রকার কথা-প্রসঙ্গে ঘটিকার গোতমকে বলিয়াছিল :—

"আমি পূর্ব্বে বেহলিঙ্গ নামক স্থানে ... ছিলাম; আমার নাম ছিল ঘটিকার। আমি ... গৃহস্থ শিষ্য (উপাসক) ছিলাম ইত্যাদি"। (১।৩৫, ৬০)

(ঘ) সেরির কথা

এক সময়ে 'সেরি' নামক এক দেব-পুত্র বুদ্ধ সমীপে উপস্থিত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে এইরূপ বলিয়াছিল :—

"পূর্ব্বে আমি এক রাজা ছিলাম; আমার নাম ছিল সেরি; আমি ছিলাম দাতা, ইত্যাদি ইত্যাদি"। (সংযুত্ত ১।৫৮)

(ঙ) অনাথপিণ্ডকের ঘটনা

মৃত্যুর পরে অনাথপিণ্ডক স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক রাত্রিতে তিনি দেবলোক হইতে জেত বনে উপস্থিত হইয়া গোতম-সমীপে ধর্ম্ম সাধন ও সারিপুত্র বিষয়ে এক গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে গোতম ভিক্ষুগণকে বলিলেন, এক দেবপুত্র রাত্রিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া এক গাথা উচ্চারণ করিয়াছিল। গোতম সেই গাথাও ভিক্ষুগণকে শুনাইলেন। তখন আনন্দ বলিলেন :—ইনি নিশ্চয়ই অনাথপিণ্ডক। তখন গোতম বলিলেন—

"সাধু, সাধু, আনন্দ! তর্ক দ্বারা যত দূর সত্য নির্ণয় করা যায়, তাহা তুমি করিয়াছ। আনন্দ! এই দেবপুত্র অনাথপিণ্ডকই"। (সংযুত্ত ২।৫৫,৫৬)

এই কয়েকটি ঘটনাতে দেখা যাইতেছে যে, স্বর্গে গমন করিলেও পার্থিব স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহলোকের কর্ত্তা ও পরলোকের ভোক্তা একই মানব।

(চ)

চতুর্থ বক্তব্যের তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই:—পরলোকে গমন করিলেও পুরুষের পার্থিব স্মৃতি থাকে। এস্থলেও দেখা যাইতেছে যে, ইহলোকের কর্ত্তা ও পরলোকের ভোক্তা একই পুরুষ।

(৭)

সপ্তম বক্তব্য এই যে, গোতমের মতে এ জন্মেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগ্রৎ করা সম্ভব। গোতম নিজে এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। সংযুক্ত-নিকায় নামক গ্রন্থে এইরূপ আছে :—

"ভিক্ষুগণ! আমি ইচ্ছা করিলেই আমার সর্ব্ববিধ পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারি। এক জন্ম, কি দুই জন্ম, কি তিন জন্ম, কি চারি জন্ম, কি পাঁচ জন্ম, কি দশ জন্ম কি বিশ জন্ম, কি ত্রিশ জন্ম, কি চল্লিশ জন্ম, কি পঞ্চাশ জন্ম, কি শত জন্ম, কি সহস্র জন্ম, কি শত-সহস্র জন্ম সংবর্ত্ত-কল্পে (প্রলয়-কল্পে,) বিবর্ত্ত-কল্পে (সৃষ্টি-কল্পে), সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত-কল্পে আমার এই নাম ছিল, এই গোত্র ছিল, এই বর্ণ ছিল, এই প্রকার আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এতদিন আমার আয়ু ছিল, সেই অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; বিস্তৃত ঘটনা ও বিবরণ সহ আমার সর্ব্ববিধ পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে পারি।

"হে ভিক্ষুগণ! কশ্যপও এই প্রকার স্মরণ করিতে পারে।" (সংযুক্ত, ২।২১৩ ইং)।

গোতম নিজে এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন, অপরেও সাধনবলে এই ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। (মজ্ঝিম ১.২২,৩৫, ৭০, ২৭৮, ৪৯৫, ২।২০, ২১,৩১; ৩।১২, ২৮ ইত্যাদি)।

এই স্মৃতি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, একই পুরুষ জন্ম-জন্মান্তরে জীবন ধারণ করে।

নানাদিক্ হইতে আলোচনা করিয়া গোতমের মত বিষয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি।

১। একজন পুরুষ আছে।

২। এই পুরুষই কর্ম্ম করে।

৩। দেহত্যাগের পরে পুরুষ পরলোকে গমন করে এবং কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে।

৪। পরলোকে ঐ পুরুষই স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে।

এ মতকে যে নামই দেওয়া যাউক না কেন আত্মবাদও যাহা, ইহাও তাহাই।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে অন্যদিক্ হইতে গোতমের আত্মবাদ ও অনাত্মবাদ বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীযুক্তা অবলা বসুর পত্রাবলী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত

1 Lavenders Gardens,
Clapham Common, S. W.
20th March, 1908.

কবিবরেষু,

অনেক দিন হইল আপনাকে পত্র লিখিব ভাবিয়াছি, কিন্তু নানা কারণে হইয়া উঠে নাই। চিঠিপত্র না লিখিলেও জানিবেন, আমাদের হৃদয় আপনার সমুদয় শোকদুঃখে আন্দোলিত ও ব্যথিত। আপনার বিপদে আমরা যেরূপ কষ্ট পাই, আপনার [illegible] ঈশ্বর-প্রীতি দেখিয়া আমরা সেইরূপ [illegible] আপনি যে-সব গুরুতর আঘাত পাইয়ে[illegible] সামলাইয়া প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিকের [illegible] গভীরতমভাবে সাধু কার্য্যে ও চিন্তাতে [illegible] করিতেছেন। ইহাকেই প্রকৃত ঋষিভাব বলা [illegible] আপনার অসামান্য সহগুণ দেখিয়া আমি [illegible] সেবার বড়দিনের ছুটীর সময় অশা[illegible] চঞ্চল।

লইয়া শিলাইদহে গিয়াছিলাম, আপনার সঙ্গে দুটি কথা বলিয়াই নবজীবন লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছিলাম। সে-কথা আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না।

যাহাকে এত যত্নে ও স্নেহে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, সে-সব আশা চূর্ণ করিয়া অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া মায়ের কোলে গেল। আপনি মনকে শান্ত সমাহিত করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে সমুদয় শক্তি ও চিন্তা দেশের কাজে অর্পণ করিতেছেন, ইহার উপরে আমাদের বাক্য ব্যর্থ। আপনাকে আর কি বলিতে পারি—আপনার মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হউক। আমরা ধন্য হই, জন্মভূমি ধন্য হোক্। প্রাদেশিক অধিবেশনে আপনার বক্তৃতা পড়িয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আপনি এই সঙ্কটের সময় দেশবাসী সকলকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বঙ্গদেশকে সকলের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন। কারণ, শুনিতে পাই, যে, অন্যদেশীয় দেশভক্তরা নাকি বাঙ্গালীর আবার একতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছে এবং বলিতেছে, তবে ইহারা কেন সুরাট কন্‌ভেন্স্যানে সহি করিলেন। যাহা হউক, আশা করি বঙ্গদেশে একতার ফল ফলিবে। আপনি কিন্তু বরাবর পৃথক্ [illegible] থাকিবেন এবং এখন যেমন কায করিতেছেন এমনি করিবেন। আপনার [illegible] হইতেই আপনার সংসর্গে থাকিয়া সেইসব লোক গঠিত হইবে, যাহারা আপনার আদর্শমত গ্রামে গ্রামে যাইয়া কায করিবে। আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু এদেশে যে-সব ছেলে আসে তাহাদের হইতে নাই— ছাড়া কোন কায আশা করা যায় না। এজন্যই করিয়াছি মনে হয়, আপনার স্কুলের ছেলেদের কত বেশী অজি[illegible]। তাহারা বিদেশে আসিয়া আরও বড় হইয়া কর্ত্তা ও প[illegible]

[illegible] সভাভঙ্গে কি বলিয়াছিলেন, তাহা কোন [illegible] দেখিলাম না। শুনিতে পাই তাহা খুব [illegible]স্পর্শী হইয়াছিল। অধ্যাপক-মহাশয়ের [illegible] খুব অসুস্থ ছিল; এখন অনেকটা সুস্থ বটে, [illegible]দয়ের অবসন্নতা গভীর। এখন বসন্তের পূর্ব্বাভাস, গাছপালা সবই নির্জ্জীব, [illegible] এইপ্রকার সাড়া দেয় না। তাহারা না জাগিলে [illegible] দূর হইবে না। [illegible]

রথী শরৎবাবুর কাছে অধ্যাপক-মহ[illegible] একটা চিঠি লিখিয়াছেন। তাহাতে জানা [illegible] ইলিনয় হইতে ওঁকে লেক্‌চ্যারার্ করিয়া ল[illegible] সম্ভাবনা আছে। হয়ত রথী আপনার [illegible] লিখিয়াছেন। এটা সুসংবাদ বটে।

আমরা লণ্ডনে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন [illegible] চাই। আপাততঃ বাড়ীতে বাড়ীতে করিলেই ভাল। এখানে উপযুক্ত লোক নাই। সেজন্য প্রস্তাব করিতেছি যে, যাঁহার বাড়ীতে উপাসনা হইবে তিনি ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিবেন। আপনার ইহাতে কি বক্ত[illegible] আছে কি? এবং আদিসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি একখানা পাঠাইতে পারেন কি? তাহা এই সমাজের সম্পত্তি হইবে। আরও অনেক লিখিবার ছিল, কিন্তু আজ এখানেই আসি। আবার যখন সকলে একত্রিত হইব তখন কত গল্প করা যাইবে। আশা করি, বেলা ও মীরা ভাল আছে। পিসিমা এখন কোথায় আছেন?

আপনাদের
শ্রীঅবলা বসু

C/o Mrs Ole Bull,
Studio House,
168, Brattle Street,
Cambridge, Mass, U.S.A.
20th Nov, 1908.

প্রিয়বরেষু—

লণ্ডন ছাড়িয়া আপনাকে পত্র লিখি নাই বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই আপনার কথা ভাবিতেছি এবং আমরা কত সময় আপনাকে নিকটে পাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। এ[illegible] সময় আপনি আমাদের সঙ্গে আমেরিকা থাকিতে পারিলে কত সুখী হইতাম। রথীদের ত যাইবার সময় হইয়াছে। আপনি কি আসিতে পারেন না? এত কথা জা[illegible], যে, আপনি এখানে থাকিলে খুব সু[illegible] থাকা যাইত। চিঠিতে

সপ্তম বক্তব
পূর্ব্ব জন্মের
এই ক্ষমতা
গ্রন্থে এই
"…
পূ…

…নের বহিতে আপনার ছবি দেখিয়া …হইয়াছি। এত খারাপ দেখাইতে …ার উচিত? আমি দেশে থাকিলে …ক এই ছবি ছাপাইতে দিতাম না। …ার করিবার কেহ নিকটে নাই বলিয়া … ছবি ছাপাইতে দিয়াছেন। এবার দেশে …াকে প্রতিজ্ঞা করাইব, যে, আপনি আমাকে না …যো কোন ছবি কাহাকেও দিবেন না। আমি জানি …নি বৃদ্ধ বয়সের ভাণ করিবেন, কিন্তু আমার কাছে …াহা করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, আমার স্বামী আপনা হইতে বড়। আমেরিকা আসিলে আপনি নিজকে বৃদ্ধ বলিতে লজ্জা বোধ করিবেন। কারণ, এখানে ৬০।৭০ বৎসরের পুরুষ ও মেয়েকে কিছুতেই ৫০এর বেশী মনে হয় না। এই ছবি দেখিয়া আপনাকে শারীরিক ও মানসিক অবসাদের প্রতিমূর্ত্তি মনে হয়। কিন্তু আমাদের কবিকে এই অল্প বয়সে অবসন্ন দেখিতে পারিব না। আপনাকে আরও কাজ করিতে হইবে, তাহা জানেন? আপনি ছেলেদের স্কুল করিয়াছেন, এখন মেয়েদের জন্য কিছু না করিয়া আপনাকে অবসন্ন হইতে দিব না। আপনি এবারে আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন; …মি এই কার্য্যে আমার শক্তি নিয়োগ করিতে চাই। মেয়েদের জাতীয় ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিবার সময় আসিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত আমাদের হাতে কাজ করিবার অনেক আছে। আপনি ছেলেদের স্কুলটাকে যে-রকম করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, আশা করি এই সময় লোকে তাহার মূল্য বুঝিয়া ছেলে পাঠাইতেছে। স্কুলে প্রবর্ত্তিত ঋতু-উৎসবগুলি খুব চমৎকার। এখানে একদিন স্কুলের ছেলেমেয়েরা গাছ পোঁতে, আমাদের ১লা বৈশাখ …া কোনদিন অমন একটা উৎসব করিলে বেশ সুন্দর হয়। বি…ষ যদি কার্পাস পোঁতা যায়।

…থাকি… রথীদের সঙ্গে এখনও দেখা হয় নাই, জানুয়ারীতে পড়া…ব। রথী ওঁর লেক্‌চার্ দেওয়া সম্বন্ধে খুব খাটিয়াছে। থাক… এত নিমন্ত্রণ আসিয়াছে যে, উনি সব রাখিতে পারিলেন না; কেবল ৫।৬টা প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবেন। এখানে বোষ্টন সহরে যে দুইটা বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে সকলেই খুব প্রশংসা করিয়াছে। এখানে ওঁর বই অনেক লোকে পড়িয়াছে ও ওঁর চিন্তার ধারার অনুবর্ত্তক এক মস্ত শ্রেণী আছে। তাঁহারা ওঁকে খুব অভ্যর্থনা করিতেছেন। আমেরিকাতে নিত্য নূতন দৃশ্য দেখিতেছি। এখানকার ইতিহাস পড়িলে ও ছোট ছোট ঘটনা শুনিলে মনে নূতন উৎসাহ ও উদ্যম আসে। অরবিন্দ ছুটিতে আপনার কাছে গিয়াছিল শুনিয়া খুসী হইয়াছি। সে খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছে। আশা করি, আপনার মেয়েরা ভাল আছে। শরৎকালে আপনার বোটে নিশ্চয় খুব সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছেন। এখানকার শরৎকালের নানাবর্ণের পাতাতে অতিশয় মনোরম শোভা হয়। আমরা একমাস নদীর পারে মিসেস্ বুলের একটা বাড়ীতে ছিলাম। জোয়ার ভাঁটা দেখিয়া গঙ্গার কথা স্মরণ হইত, যদিও এদেশে নদীর পাড় অতিশয় সুন্দর ও পরিষ্কার। এখানে কত কথা লিখিবার আছে, কিন্তু রথীরা অনেক লিখিয়াছে। সেজন্য আমার লেখার আবশ্যক নাই বোধ হয়। কিন্তু আপনার বিষয় অত্যন্ত চিন্তিত আছি জানিবেন। আপনি একলা একলা মনকে আরও ভারাক্রান্ত করিতেছেন এই ভয় হয়। একলা একলা শোক সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন। কাহাকেও বলিতে পারিলে ও সহানুভূতি করিবার লোক পাইলে অনেক লাঘব হয়। আমার চিরকাল স্মৃতিতে থাকিবে, শীতকালে আপনার বোটে আপনার কাছ থেকে কি রকম সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম। আপনাকে বুঝাইবার আমার কোন শক্তি নাই। কেবল এইটুকু বলিতে ইচ্ছা হয়, যে, সুখদুঃখ একই জিনিষের রূপান্তর মাত্র। এবং বঙ্গদেশের … সন্তান আপনার। তাহারা সকলেই আপনার মুখ… পথে আছে; ঈশ্বর আপনার একটিকে নিজ কোলে …টে গিয়াছেন, তাহার বদলে শত সহস্র শিশুসন্তান আপনার অপেক্ষায় আছে, তাহাদের কথা স্মরণ করিয়া …নে দূর করুন। দূর, বহুদূর হইতে আমাদের হৃদয়ের …ছে। ও স্নেহ আপনার কাছে গিয়া আপনাকে কতকটা …লে যেন করিতে পারে।

আপনার বৌঠাকুরাণী

অবলা বসু

93, Upper Circular Road,
Calcutta.
11th April.

কবিবরেষু,

অনেক দিন পর আপনি অধ্যাপক-মহাশয়কে পত্র দিয়াছেন। তাঁর চিঠির উত্তর তিনি নিজেই দিবেন।

আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই, আশা করি ভাল আছেন। আপনি যে আমাদের বোলপুরে চান না, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, আমাদের যাইতে লেখেন নাই। যাক্, আপনি অবসর মত আমাদের স্কুলের মেয়েদের জন্য যদি কোনরূপ খেলা লিখিয়া দেন, তাহা হইলে উপকার হয়। আপনাকে ইংরেজী কয়েকখানা বই পাঠাই। তাহা হইতে বুঝিবেন কিরূপ আ[illegible] 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র মতন কোন লেখা হইলে[illegible] এইপ্রকার আপনি যখন কলিকাতা আসেন, তখন কি মেয়েদের স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের সহিত দেখা [illegible] প্রকার সম্বন্ধে কিছু বলিবেন? বোলপুরে যে-সব বই [illegible] ক্লাসের কোথায় পাওয়া যায়? আমাকে একটা সিলেবাস্ [illegible]যুক্ত দিতে পারেন কি? সন্তোষকে যদি বলেন, [illegible] পাঠাইয়া দিবে। আমি মেয়েদের স্কুলে আপনা[illegible] পড়াইবার প্রণালী অনুসারে শিখাইতে চাই। আজ [illegible] আসি।

আপনাদের
শ্রী অবলা বসু

সত্তর বৎসর

বাল্য-স্মৃতি

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

ফেঁচুগঞ্জ—শ্রীহট্ট

১

[illegible]ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে বরিশালের অন্তর্গত কোটের [illegible] মহকুমায় আমার বাবা মুন্সেফি করিতেন। কয়েক [illegible]র পরে কোটের হাটের মহকুমা উঠিয়া গেলে সঙ্গে [illegible] বাবার কর্ম্ম যায়। এই অবসরেই বাড়ী আসিয়া না[illegible] আমার চূড়াকরণ করেন। এই সময়ে শ্রীহট্ট সহরের ক[illegible]টে ফেঁচুগঞ্জের মহকুমার মুন্সেফের পদ খালি হয়। [illegible] চূড়াকরণের পরেই বাবা এই পদ লইয়া ফেঁচুগঞ্জে [illegible]। মা তাঁহার সঙ্গে যান নাই। গ্রামের বাড়ীতে [illegible] আমার লেখাপড়া হইবে না, আর গ্রাম্যজীবনের [illegible]র মাঝে পড়িয়া কি জানি আমি যদি গ্রাম্যচরিত্র [illegible], এই ভয়ে বাবা আমাকে ফেঁচুগঞ্জে লইয়া গেলেন। প্রাচীনকাল হইতেই আমাদিগের দেশেও গ্রাম অপেক্ষা সহরেই শিক্ষা ও শিষ্টাচারের প্রভাব অনেক বেশী ছিল। বৈষ্ণব সাধনে বারংবার গ্রাম্য ভাব ও গ্রাম্য ভাষা বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ফেঁচুগঞ্জ ঠিক সহর ছিল না। কিন্তু একেবারে গ্রামও ছিল না। এখানে একটা মুন্সেফি আদালত ছিল বলিয়া কতকগুলি আম্‌লা নানা স্থান হইতে জুটিয়াছিলেন। কেহ বা ঢাকা কেহবা ত্রিপুরা বা ময়মনসিংহ হইতে আসিয়াছিলেন। এইভাবেই নানা দিক্‌দেশের লোকসমাগমে সর্ব্বত্রই সহরের সভ্য[illegible] শিষ্টাচারের একটা উদারতা জন্মিয়া যায়। [illegible] সর্ব্বত্র সহরগুলি সমসাময়িক সভ্যতা এবং [illegible] হইয়া কেন্দ্র হইয়া উঠে। গ্রাম্যজীবনের সঙ্কীর্ণতা [illegible] ফলে সহরে শুধ্‌রাইয়া যায়। এই সঙ্কীর্ণতা ও বর্ব্বরতার ভয়েই

য়ের কাছে গ্রামের বাড়ীতে রাখিয়া াও রাখিতে চাহেন নাই।

(২)

ঘটনা-বশে মায়ের সঙ্গে আমি কিছুদিনের দের গ্রামের বাড়ীতে ছিলাম। বোধ হয় মার বয়স আট বৎসর কি নয় বৎসর হইবে। থাকিয়া আমি সহজেই গ্রাম্য বালকদিগের সহিত য়া গেলাম। তাহাদের সঙ্গে সারাদিন হয় ফাঁদ তিয়া দোয়েল পাখী ধরিবার চেষ্টায়, কিম্বা মাঠে গিয়া াণ্ডা-গুলি খেলায়, অথবা ছোট খেলার ঘর তৈয়ারী করিয়া, কলাগাছ কাটিয়া চারিটা বাঁশের উপর বিঁধিয়া মহিষ কল্পনা করিয়া তার বলি দিয়া দুর্গোৎসবের অভিনয়ে দিন কাটাইতে লাগিলাম। সেদিনের কথা এখনও উজ্জ্বল রূপে মনে আছে। ষাট বাষট্টি বৎসর পরেও গ্রামের সেই খেলার সাথীদের চেহারা এখনও ভুলি নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। একজনও আছেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু সে খেলাধূলার কথা মনে করিয়া বার্দ্ধক্যেও প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিতেছে। সে গ্রাম্যপথ, সে গ্রামের মাঠ, সে হুড়োহুড়ি-মারামারি, খেলা করিতে করিতে হঠাৎ বিরোধের উৎপত্তি ও বহু যত্নে নির্ম্মিত, বহু আদরে সাজান, খেলার ঘর রাগের মুখে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফেলা,—সকলই মনে পড়িতেছে। মনে পড়িয়া সে রস আর ইহজীবনে আস্বাদ করিতে পারিব না ভাবিয়া আক্ষেপ হইতেছে। তখন এসকল খেলাধূলা ছাড়িয়া সহরে যাইয়া পাঠশালার শাসনের ভিতর বাঁধা পড়িতে মন কিছুতেই চাহিত না।

কিন্তু মা'ও কিছুতেই আমাকে গ্রাম্যজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতরে রাখিতে চাহিতেন না। তিনি নিজে লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু সন্তান মূর্খ হইয়া থাকিবে এ ভাবনা তাঁহার অসহ্য ছিল। আমার পড়াশুনায় মন নাই দেখিলেই সর্ব্বদা কহিতেন, মূর্খ হইয়া থাকা অপেক্ষা মরিয়া যাওয়াও ভাল। এবারেও আমার নিতান্ত অনিচ্ছা হইলেও মা আমাকে জোর করিয়া বাবার কাছে সহরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি কত কান্নাকাটি করিলাম, বাড়ী হইতে বাহির হইব না বলিয়া কখন বা ঘরের খুঁটি ধরিয়া, কখন বা মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু মা কিছুতেই ছাড়িলেন না। যাঁহার সঙ্গে সহরে যাইব, আমাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে তাহাকে হুকুম দিলেন। সে আমাকে কোলে তুলিয়া লইল। আমি কামড়াইয়া আঁচড়াইয়াও তাহার সে বাহুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম না। চীৎকার করিতে করিতে, হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে, তাহার বন্দী হইয়া সহরের পথে চলিলাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া না গিয়াছি, আর সহরে না গিয়া অব্যাহতি নাই বুঝিয়াছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কান্না ও হাত পা ছুঁড়াও থামিল না, সেও আমাকে কোল হইতে নামাইল না। মানুষ, শিশুই হৌক, আর বৃদ্ধই হৌক, যতক্ষণ অপ্রিয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনা আছে বোঝে, ততক্ষণই প্রাণপণে তাহার সঙ্গে জুঝিয়া চলে। কিন্তু যখন অব্যাহতি পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই দেখে, তখন নিরুপায় হইয়া অনিবার্য্যকে আপনা হইতেই বরণ করিয়া লয়। যখন বাড়ী ফিরিয়া যাইবার আর কোনই সম্ভাবনা রহিল না, তখন আমিও শান্ত-শিষ্ট হইয়া সহরের মুখে চলিতে লাগিলাম।

(৩)

ফেঁচুগঞ্জে মা বাবার সঙ্গে যান নাই, আমি গিয়াছিলাম। এই বোধ হয় জীবনে প্রথম আমি মাকে ছাড়িয়াছিলাম। ফেঁচুগঞ্জ কুশিয়ারা নদীর তীরে। এখনও কলিকাতা হইতে কাছাড়ের ষ্টীমারের পথে ফেঁচুগঞ্জ একটা বড় ষ্টেশন হইয়া আছে। ফেঁচুগঞ্জ-ঘাট আসাম-বেঙ্গল রেলেরও একটা ষ্টেশন। কিন্তু এখনকার ফেঁচুগঞ্জ দেখিয়া আমার বাল্যকালের ফেঁচুগঞ্জের স্মৃতি মনে জাগে না। সকলই যেন ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। নদীর উপরেই আমাদের বাসা ছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে। স্থানীয় ভাষায় এগুলিকে "টীলা" কহে। ফেঁচুগঞ্জেও কতকগুলি "টীলা" ছিল। একটা "টীলার" উপরে আমাদের বাসা ছিল। তাহারি সম্মুখে আর-একটা "টীলায়" মুন্সেফের কাছারী

ছিল। আমাদের বাসার টীলার আধখানা না কি এখনও আছে, বাকি আধখানা ও কাছারীর টীলা কুশিয়ারা-গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

ফেঁচুগঞ্জে আমাদের আপনার লোক বেশী কেহ যান নাই। আমার সমবয়স্ক কেহই ছিল না। আমি তখনও কোন পাঠশালায় যাই নাই। ফেঁচুগঞ্জে তেমন পাঠশালা ছিল কি না জানি না। বাবার কাছেই বাংলা লেখাপড়া করিতাম, এটুকু মনে আছে। হস্তলিপির উপর সেকালের লোকের খুব দৃষ্টি ছিল। বাবাও প্রতিদিন আদালতে যাইবার সময়ে আমাকে বাংলা লেখা মক্‌শ করিবার জন্য কাগজের মাথায় একটা লাইন লিখিয়া দিয়া যাইতেন। সেকালের পড়ুয়ারা প্রথম প্রথম কলাপাতায় মক্‌শ করিতেন। কতকটা লেখা অভ্যাস হইবার পরে তালপাতায় লিখিবার অনুমতি পাইতেন। তারপর, হাতের লেখা পাকিয়া উঠিলে, কাগজে লিখিতেন। এখনকার মত কাগজ এত সস্তা ছিল না, এবং পয়সাও এত সচ্ছল ছিল না। সুতরাং অযত্নলব্ধ কলাপাতাতেই লোকে নিজের হাতের লেখা মক্‌শ করিয়া পাকাইতেন। আমার বাল্যকালেও গ্রাম্যজীবনে এই পদ্ধতিই ছিল। তবে আমি নিজে আমার গ্রামের পাঠশালায় কখনও পড়ি নাই বলিলেই হয়। এইজন্য শৈশব হইতেই কলাপাতা ও তালপাতার পরিবর্ত্তে কাগজেই লেখা অভ্যাস করিয়াছিলাম।

(৪)

কহিয়াছি যে, শিক্ষানীতিতে বাবা চাণক্যের অনুসরণ করিতেন।

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ।"

আমার শৈশবে ও বাল্যে বাবা প্রায়ই এই শ্লোক আওড়াইতেন। কার্য্যেও এই উপদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোটেরহাটে ছিলাম। সুতরাং সেখানে বাবার নিকট হইতে আদরই পাইয়াছিলাম, কোন প্রকারের তাড়না পাই নাই।

কেবল একদিনের কথা মনে আছে। তখন আমি পাঁচ ছাড়িয়া ছয়ে পা দিয়াছি। ফাল্গুন মাস, দোল-পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন। আদালতের ছুটির পরে বাবার পেয়াদারা আসিয়া আমাদের বাহিরের উঠানের নিকট হইতে মাটী কাটিয়া দোলমঞ্চ তৈয়ার করিতেছিল। পর দিনের উৎসবের আনন্দের পূর্ব্ব-আস্বাদনে বাড়ীর সকলেই স্বল্প-বিস্তর মাতিয়াছিলেন। দোলমঞ্চ প্রস্তুত হইতে অনেক রাত হইয়া গেল। আমার কিন্তু চোখে ঘুম নাই। উৎসবের আয়োজন দেখিতে লাগিলাম। তার পর যখন আর জাগিয়া থাকা সম্ভব হইল না, তখন বাড়ীর ভিতরে যাইবার পথে একটা ঢালু জায়গায় উপরের দিকে মুখ করিয়া মূত্রত্যাগ করিতে বসিলাম। সেই মূত্র আমার পায়ের নীচ দিয়া গড়াইয়া পথে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমার এই মূর্খতা দেখিয়া বাবার ধৈর্য্য নষ্ট হইল। ভদ্রলোকের ছেলের ভদ্রবুদ্ধি হইবে না কেন? শীলতা এবং আচারের ত্রুটী হইবে কেন? ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না। বাবার হাতে বাল্যকালে যত মা'র খাইয়াছি তাহা লেখাপড়ায় অমনোযোগের জন্য নহে, কিন্তু এই শীলতা ও সদাচারের ত্রুটীর জন্য। এই দিনও এই কারণেই মার খাইয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে বাবা আমার গায়ে হাত তুলেন নাই বলিয়া, এই প্রথম দিনের কথা আজিও ভুলিতে পারি নাই।

(৫)

ফেঁচুগঞ্জে যখন যাই তখন আমার বয়স সাত কি আট বৎসর হইবে। এইখানেই আমার বাল্য-শিক্ষায় চাণক্য-নীতির দ্বিতীয় পর্ব্বের পূর্ণ প্রয়োগ আরম্ভ হয়। বাবা যে লেখা মক্‌শ করিতে দিয়া যাইতেন তাহা না করিয়া রাখিলে মার খাইতে লাগিলাম। তবে প্রতিদিনই যে এই দণ্ড ভোগ করিতাম তাহা নহে। প্রতিদিন বাবাও আমার লেখা হইয়াছে কি না ইহা তদারক করিতেন না। যেদিন করিতেন এবং লেখা হয় নাই দেখিতেন, সেদিন কিন্তু রেহাই ছিল না।

(৬)

ফেঁচুগঞ্জে আমাদের বাসার নীচেই নদী এবং পিছন দিকে একটা খাল ছিল। বাবার ছিপে মাছ ধরার সখ ছিল। অতি বাল্যকাল হইতে আমিও মাছ ধরিতে আরম্ভ করি। ফেঁচুগঞ্জে যাইবার আগে কখনও মাছ

ধরিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে না। ফেঁচুগঞ্জের কথা খুব মনে আছে। আর বিশেষ মনে আছে এইজন্য যে, এই মাছ-ধরার বাতিকেই তখন আমার লেখাপড়ার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিত। প্রাতঃকালে বাবা যতক্ষণ বাসায় থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহার ভয়ে হয় নাম্‌তা মুখস্থ না হয় লেখা মক্‌শ করিতে হইত। তবে মনটা পড়িয়া থাকিত সেই খালের ঘাটে। বাবা কাছারী চলিয়া গেলেই আমিও ছিপ লইয়া খালের ধারে যাইয়া বসিতাম। বাবা বাড়ী ফিরিবার সময় হইলেই আমিও বাড়ী আসিয়া শান্ত-শিষ্ট হইয়া লেখা মক্‌শ করিতে চেষ্টা করিতাম। বাবা ভাবিতেন যে, সারাদিনই আমি লেখাপড়া করিয়াছি। সুতরাং মুখ-হাত ধুইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজে মাছ ধরিতে যাইতেন। অন্য কি মাছ ধরিতাম মনে নাই, তবে প্রায়ই যে এইরূপে নদী বা খাল হইতে খলুই ভরিয়া পাব্‌দা মাছ লইয়া আসিতাম ইহা মনে পড়ে। ফেঁচুগঞ্জের স্মৃতির মধ্যে পিতা পুত্রে মিলিয়া এই মাছ ধরবার স্মৃতিটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর বলিয়া এই দীর্ঘকাল ধরিয়া এমন উজ্জ্বল হইয়া আছে।

ফেঁচুগঞ্জে বোধহয় বাবা পাঁচছয় মাস মাত্র ছিলেন। কেঁচুগঞ্জের কাজ স্থায়ী ছিল না। সেখানকার স্থায়ী মুন্সেফ- ছুটী হইতে ফিরিয়া আসিলে, বাবা অবসর লইয়া চিরদিনের মত মুন্সেফীর লোভ ছাড়িয়া শ্রীহট্টে যাইয়া জেলার আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। যতদূর মনে পড়ে, বোধ হয় ১৮৬৬ সালের মাঝামাঝি বা শেষভাগে বাবার সঙ্গে ফেঁচুগঞ্জ হইতে শ্রীহট্টে গিয়াছিলাম। এই-খানেই আমার সমগ্র বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। সে স্মৃতি-জড়িত হইয়া শ্রীহট্ট আমার জন্মভূমি না হইলেও এখনও পবিত্র তীর্থভূমি হইয়া আছে।

শ্রীহট্ট সহরে

(১)

বাবার এক মাতুল, রাজমোহন মুন্সী, সে-সময়ে শ্রীহট্টের জজ আদালতে ওকালতী করিতেন। আমরা প্রথমে শ্রীহট্টে যাইয়া তাঁহার বাসাতেই উঠি। তারপর বাবা নূতন বাসা করিয়া সেখানে উঠিয়া যান। আমরা শ্রীহট্টে যাইবার কিছুদিন পরেই রাজমোহন মুন্সী মহাশয়ের পরলোক হয়। সে-কথা এখনও আমরা বিশেষ ভাবে মনে আছে। জ্যেষ্ঠদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার বাহিরের বৈঠকখানা-ঘরে ফরাসের পাশে যে-সকল বাংলা নজীর জড় করা ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহারি ভিতরে কয়েকখানা হাজার টাকার নোট পাওয়া যায়। সেকালে লোকের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা যে কত কঠিন ছিল, চোর-ডাকাতের উপদ্রব কত বেশী ছিল, এই ঘটনাতেই তাহার প্রমাণ হয়। টাকাকড়ি লোকে সচরাচর সিন্দুকেই রাখিত। চোর-ডাকাতেরা সেইখানেই গৃহস্থের টাকাকড়ির খোঁজ করিত। সুচতুর মুন্সী মহাশয় এমন জায়গায় তাঁহার সঞ্চিত নগদ সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, যেখানে চোর-ডাকাতের চক্ষু পড়িবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তিনি একথা পরিবারের কাহাকেও বলিয়া যান নাই। সুতরাং দৈব কৃপাতেই কেবল তাঁহার আপনার লোকের হাতে এই নোটগুলি পড়ে।



শ্রীহট্টের দৃশ্য

(২)

এখন যেখানে শ্রীহট্টের একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে সেখানে একটা পুরানো পাকা বাড়ী ছিল। বহুদিন বোধহয় সে বাড়ীতে কোন লোকজন বাস করে নাই। চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল আর পিছনে একটা বিস্তৃত জলাভূমি ছিল। বাবা সেই বাড়ীটাকেই মাসিক আট টাকা ভাড়ায় বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। আমরা যখন প্রথমে সেই পুরানো পোড়ো বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম তখন সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতাম। তারপরে অল্পদিনের মধ্যেই সে-বাড়ীর হাতায় আমাদের দুই তিন জন আত্মীয় আসিয়া বাসা প্রস্তুত করেন। সেই পাকা বাড়ীরও আধখানা শ্রীহট্টের তদানীন্তন স্কুল ডেপুটী ইন্‌স্পেক্‌টার ৺নবকিশোর সেন মহাশয় আসিয়া দখল করেন। বাবা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহার শ্রীহট্টের বাসা নবকিশোর-বাবুর সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া এই পাকা বাড়ীতেই ছিল। এখন সে-বাড়ীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। যাঁরা আমার বাল্যজীবনের সাক্ষী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র একজন বাঁচিয়া আছেন। ইনি শ্রীহট্টের মুন্সেফী আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। এখন ওকালতী করেন না। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রুক্মিণীমোহন কর, মাতৃসম্পর্কে আমার আত্মীয়, মাতুল-পর্য্যায়ভুক্ত। এই অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীহট্টে আজিও শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী মারোয়াড়ী, ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভাজন হইয়া আছেন। প্রাচীন অর্থে ও প্রাচীন আদর্শে শ্রীহট্টে যদি এমন কোনও লোক-নায়ক বা সমাজপতি থাকেন, তাঁহার সেদিকে কোনও লোভের লেশ মাত্র নাই বলিয়া, সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে রুক্মিণীবাবুই সেই পদ ও সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। তিনি বড় জমিদার নহেন। তাঁহার কোনও তেজারতিও নাই। সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্র। কিন্তু শ্রীহট্ট সহরে বা জেলায় এমন কোনও জমিদার বা ধনী নাই, লোক-সমাজে যাহার কথার দাম রুক্মিণী-বাবুর কথা অপেক্ষা বেশি।

এইটা লেখা হইবার পরে, ২৮এ ফাল্গুন (১৩৩৩) তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ রজনীমোহনের পত্রে জানিলাম যে, ঐ মাসের ২৩এ তারিখ রুক্মিনীমোহন কর মহাশয় তাঁহার কর্ম্মোচিত লোক লাভ করিয়াছেন।



রুক্মিণীমোহন কর

৩

আমরা যখন প্রথম এই পড়ো বাড়ীতে যাইয়া উঠি তখন শ্রীহট্টে বাঘের ভয় ছিল। শ্রীহট্ট সহরের উত্তরে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এখন সেগুলিতে লোকের বসতি হইতেছে। আমার বাল্যকালে এই পাহাড়গুলি বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই জঙ্গল হইতে শীতকালে মাঝে মাঝে সহরে পর্য্যন্ত বাঘ আসিত। প্রায়ই সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা বড় বড় বাঘ মারিয়া কালেক্‌টারের কাছারীর সাম্‌নে আনিয়া ফেলিত।

আমাদের এই পোড়ো বাড়ী পর্য্যন্ত কখনও বাঘ আসে নাই। কিন্তু মনে পড়ে দু-একবার খুব বড় বুনো বিড়াল দেখিয়া বাঘের ছানা ভ্রমে আমরা বালকেরা ভয়ে ছুটিয়া পালাইয়াছিলাম। কেবল বুনো বিড়াল নহে, খট্টাসেরও উৎপাত অনেক ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপাত ছিল সাপের। প্রথম প্রথম পাশের জঙ্গল হইতে ডাঁড়াশ সাপ আসিয়া প্রায়ই ঘরের দুধ খাইয়া যাইত। কখনও কখনও আমাদের মালী বর্ষার প্রথমে যখন শাক-শব্‌জির বাগান করিত তখন ভীষণ গোক্ষুর সাপ ফণা তুলিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইত। আর সে "জয় মা বিষহরি! জয় মা বিষহরি!" বলিতে বলিতে ছুটিয়া পালাইত। মনসাকে আমাদের স্থানীয় ভাষায় বিষহরি বলিত। এত সাপের ভয় সে-অঞ্চলে ছিল বলিয়াই শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় ঘরে ঘরে মনসা পূজা হইত। পদ্মপুরাণেই এই মনসা পূজা প্রচার হয়। আর পূর্ব্ব-মৈমনসিংহেই এই পদ্মপুরাণের সৃষ্টি হয়।

(৪)

বিষহরি বা মনসা পূজা সেকালে আমাদের অঞ্চলে একটা অতি প্রধান পর্ব্বাহ ছিল। দুর্গোৎসব সম্পন্ন হিন্দু গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভব ছিল। সাধারণ লোকেরা নিজেদের বাড়ীতে এই চারিদিন ব্যাপী পূজার আয়োজন করিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু বিষহরি বা মনসা পূজা প্রায় ঘরে ঘরেই হইত। শ্রীহট্ট সহরে তেমন বেশী দেখি নাই। বোধ হয় সহর অঞ্চলে সাপের ভয় তেমন ছিল না বলিয়াই সেখানে সাপ-কুলের দেবতার পূজার তেমন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যে-সকল স্থান বর্ষার সময় জলে ভাসিয়া যাইত বলিয়া মাটজঙ্গলের সাপেরা গ্রামের ভিতরে যাইয়া উঠিত, যেসকল অঞ্চলে এই সাপের দেবতাকে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক ছিল। এইসকল নীচু জায়গায় বর্ষাকালে গোচারণের মাঠ একেবারে ডুবিয়া যাইত। এইজন্য বর্ষার জল নামিতে আরম্ভ করিলেই গ্রামের গোধন সকল গৃহস্থের বাড়ীতে আনিয়া বান্ধিয়া রাখিতে হইত। বর্ষার চার মাস গৃহস্থকে প্রতিদিন নৌকা করিয়া গিয়া জল-প্লাবিত মাঠ হইতে গরুর জন্য ঘাস কাটিয়া আনিতে হইত। এই ঘাস কাটা সর্ব্বদা নিরাপদ ছিল না। প্রায়ই শুনা যাইত যে, ঘাস কাটিতে যাইয়া মাঝে মাঝে লোক সর্পাঘাতে মরিয়াছে। এই সকল কারণেই আমাদের অঞ্চলে সেকালে বিষহরি বা মনসা পূজার এত প্রাদুর্ভাব ছিল। আর প্রায় সকলেই মনসার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিত। মনসার রং সাদা, প্রায়ই বাহন বিস্তৃত-ফণা কালনাগ ছিল; মনসার আভরণ ছিল সাপ, শিরে মুকুট ছিল সাপ, কাণে কুণ্ডল ছিল সাপ, হাতে বালা ছিল সাপ, বাহুতে বাজু, গলায় হার, কটিতটে মেখলা সকলই ছিল সাপ। মনসা-পূজার মন্ত্র কি ছিল মনে নাই। তবে পূজায় ছাগাদি বলির বিধান ছিল। শ্রাবণের সংক্রান্তিতে মনসা-পূজা হইত। ভাসানের দিন দেশময় নৌকার বাচ-খেলা হইত। আমাদের প্রান্তিক ভাষায় বাচ-খেলা শব্দ প্রচলিত ছিল না। আমরা ইহাকে নাও-দৌড়ান বা নৌকা দৌড় কহিতাম। জলাকীর্ণ পল্লীগ্রামে সকল গৃহস্থেরই ঘাসের নৌকা ছিল। এসকল নৌকা লম্বা ও হালকা। অনেকটা ছিপ্ নৌকার মতন। সুতরাং এসকল ঘাসের নৌকাতে যখন আট দশ জন, বা কখন কখন লম্বা নৌকা হইলে, ষোল কুড়ি জন পাশাপাশি বসিয়া তালে তালে বৈঠা ফেলিয়া বাহিয়া চলিত তখন এসকল নৌকা তীরের মতন ছুটিত। নৌকা-দৌড়ের সময় সারি গান হইত। প্রত্যেক নৌকাতেই একজন গলুইএ দাঁড়াইয়া সারি গানের মূল গায়ক হইত। প্রত্যেক সারি গানেই একটা মূল দোহা ছিল। সকলে সেটাই গাহিত। আর মূল-গায়ক অনেক সময় নিজে কবিতা রচনা করিয়া সেই দোহার সঙ্গে লাগাইয়া দিত। এসকল কবিতা অনেক সময় স্থানীয় সমাজের সুকীর্ত্তি-কুকীর্ত্তির কথাও প্রচার করিত। সারি গানের একটা দোহা মাত্র মনে আছে। বাড়ী ফিরিবার সময় সকলেই এই সারিটা গাহিয়া ফিরিত। সে দোহাটা এই :—

"ঘাটে লাগাওরে নাও ওরে ভাই মাঝি।
যে ঘাটে লাগাইবায় নাও দেখবায় ফুলের পানি॥"

ইহা হইতেই বুঝা যায় এই মনসা পূজা, মনসার ভাসান ও নৌকা-দৌড়ান এসকলের ভিতর দিয়া সেকালের আমাদের গ্রাম্যজীবনের কতটা আনন্দ উল্লাস উছলিয়া

উঠিত। মেয়েরা বা'চের নৌকার সঙ্গে যাইতেন না। কিন্তু এসকল নৌকা যখন সারি গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিত তখন ঘাটে ঘাটে পুরস্ত্রীরা আসিয়া দাঁড়াইতেন। এবং যেই একখানা নৌকা তাঁহাদের ঘাটের পাশ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে যাইত তখনই ইঁহারা উলু দিয়া আত্মপর নির্ব্বিশেষে সকল খেলোয়াড়কেই উল্লাসে অভিনন্দিত করিতেন। মাঝে মাঝে এই নৌকা-দৌড় উপলক্ষে মারামারি এবং রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইত। কিন্তু তাহাতে সচরাচর গ্রাম্য জীবনের সৌহার্দ্দ ও শান্তি নষ্ট হইত না। মনসাপূজা হিন্দুরই পূজা। কিন্তু মনসার প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিনে হিন্দু মুসলমান সকলে মিলিয়া এই নৌকা-দৌড়ের আনন্দ-উৎসবে মাতিয়া যাইতেন। এই বাচ-খেলায় কোন সম্প্রদায়িক ভাব বা ভেদ ছিল না। হিন্দুর নৌকাতে মুসলমান এবং মুসলমানের নৌকাতে হিন্দু উঠিয়া বৈঠা ধরিতেন। তখনকার দিনে ধর্ম্মের পার্থক্য থাকিলেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিকতার অভাব ছিল না। একে অন্যকে নিজের আত্মীয়-কুটুম্বের মতন দেখিতেন।

(৫)

শ্রীহট্টে যাইয়াই আমার রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ হয়। আমি কখনই বাংলা পাঠশালায় যাই নাই। একেবারেই ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হই। তবে শ্রীহট্টে যাইয়া বাবা প্রথমে আমাকে ফার্শি শিখিবার জন্য এক মৌলবীর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই মৌলবীর নিকটে যাইয়া ফার্শি বর্ণমালা শিখিয়া ছিলাম। হিন্দু যেমন সরস্বতীর নাম লইয়া লেখাপড়া আরম্ভ করিতেন, মুসলমানেরা সেইরূপ আল্লাঃ ও রসুলের নাম লইয়া—লা এলাহি এল আল্লাঃ মহম্মদ রসুল আল্লা—বলিয়া প্রতিদিনের পড়া সুরু করিতেন। মৌলবীর নিকটে যাইয়া আমাকেও অন্যান্য পড়ুয়ার মতন এই মুসলমানী মন্ত্র পাঠ করিয়াই আলেফ বে, তে, সে, পড়িতে হইত। বর্ণমালা শিখিয়া আমি "বন্দেনামা" পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু এইখানেই আমার ফার্শি পড়া শেষ হয়। বন্দেনামার প্রথম দু-চার লাইন মুখস্থ হইতে না হইতেই বাবা আমাকে মৌলবীর নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া ইংরেজী স্কুলে পাঠাইয়া দেন।

(৬)

আমি যখন ইংরজী স্কুলে যাই তখন শ্রীহট্টে কোন সরকারী স্কুল ছিল না। শুনিয়াছি পূর্ব্বে নাকি একটা সরকারী স্কুল ছিল কিন্তু খৃষ্টীয়ান পাদ্রীরা শ্রীহট্টে গিয়া বসিলে ক্রমে তাঁহাদের হাতেই লোক শিক্ষার ভার আসিয়া পড়ে। পাদ্রীদের স্কুল খোলা হইলে পরে পূর্ব্বকার সরকারী স্কুল উঠিয়া যায়। ১৮৬৬ ইং অব্দে আমি শ্রীহট্টে যাই। তখন সহরে দুইটা ইংরেজী এন্‌ট্রেন্‌স্ স্কুল ছিল। দুইটাই পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত। একটা সহরের পূর্ব্বদিকে আর-একটা ইহার প্রায় কম বেশী এক মাইল দূরে সহরের পশ্চিম প্রান্তে ছিল। পূর্ব্ব প্রান্তের নাম ছিল নয়াশড়ক। স্কুলেরও নাম ছিল নয়াশড়ক স্কুল। পশ্চিম প্রান্তের নাম ছিল সেখ্-ঘাট। স্কুলেরও ঐ নাম ছিল। যতদূর মনে আছে বোধ হয় সেখঘাটের স্কুলই বড় ছিল। নয়াশড়ক স্কুলে এন্‌ট্রেন্‌স্ পর্য্যন্ত পড়ান হইত কি না ঠিক মনে নাই সেখ্‌ঘাট স্কুলে পড়ান হইত জানি। নয়াশড়ক আমাদের বাসার নিকটে বলিয়া আমি প্রথমে নয়াশড়ক স্কুলে ভর্ত্তি হই। তাহার অল্পদিন পরেই সেখঘাট স্কুলে যাইয়া প্রবেশ করি।

শ্রীহট্টের আগেকার সরকারী স্কুলের কথা বেশী কিছু শুনি নাই; তবে শ্রীহট্টে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক ইংরেজ সরকার নহেন, কিন্তু পাদ্রীরাই, ইহা জানি। শ্রীহট্টের তখনকার ইংরেজীনবিশেরা রেভারেণ্ড ডব্‌লিউ প্রাইজ মহাত্মাকে শ্রীহট্টে আধুনিক শিক্ষা-গুরু বলিয়া আজিও সম্মান করেন। শ্রীহট্টে প্রথমে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন প্রাইজ সাহেব তাঁহাদের সকলেরই গুরু ছিলেন। আমি প্রাইজ সাহেবকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার নিকটে পড়ি নাই। বোধ হয় তখন তিনি শিক্ষকতা হইতে অবসর লইয়াছিলেন। আব্‌ছায়ার মতন তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত প্রশান্ত-প্রসন্ন মুখ এখনও স্মৃতিতে জাগে। শ্রীহট্টের শিক্ষিত লোকেরা সহরের সাধারণ পুস্তকাগারে প্রাইজ সাহেবের নাম ও স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছেন। প্রাইজ সাহেব বাস্তবিক পুণ্যশ্লোক ব্যক্তি

ছিলেন। কলিকাতার আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে ডেভিড, হেয়ারের যে-স্থান শ্রীহট্টের ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে প্রাইজ সাহেবেরও সেই স্থান। শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব্ব স্কুল-ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার স্বর্গীয় নবকিশোর সেন, উকিল সরকার স্বর্গীয় দুলালচন্দ্র দেব, ইঁহারাই শ্রীহট্টের ইংরেজী শিক্ষিতদের প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলেন। নবকিশোর সেন সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা পাস করিয়া ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হন। দুলালচন্দ্র দেব মহাশয় ইহার কিছুদিন পরে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, বি এ, ও পরে বি-এল, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহট্টে যাইয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইঁহারা দুই জনেই শ্রীহট্টের প্রথম ইংরেজী-নবীশদিগের সর্ব্বজনপ্রিয় নেতা ছিলেন। আর ইঁহারা দুজনেই নিজেদের জীবনের ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম প্রেরণা প্রাইজ সাহেবের শিক্ষা ও সস্নেহ সহবাস হইতে লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত, বাংলার খৃষ্টিয়ান সমাজের অন্যতম অধিনায়ক, হাইকোর্টের উকীল এবং ইণ্ডিয়ান্ খৃষ্টিয়ান্ হেরল্ড কাগজের সম্পাদক, পরোলকগত জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় শ্রীহট্টেরই লোক ছিলেন। ইনিও প্রাইজ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ফ্রি চার্চ্চ কলেজ হইতে একই বৎসরে বি-এ ও এম্-এ পাশ করেন। বোধ হয় ডাফ্ সাহেবের নিকটে ইনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের প্রথম প্রেরণা ইনি প্রাইজ সাহেবের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন

(৭)

আমি যখন সেখঘাট স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হই, প্রাইজ সাহেব তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। স্কুলে আর রীতিমত পড়াইতেন না। তবে উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রেরা তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার নিকটে ইংরেজী সাহিত্যাদি পড়িতেন ইহা মনে পড়ে। জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় একই বৎসরে বি-এ, ও এম-এ পাশ করিয়া, বি-এল, পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে, শ্রীহট্টে যাইয়া সেখঘাট স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়েন। তবে নিম্নতম শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। জয়গোবিন্দ-বাবু বেশীদিন শ্রীহট্টে শিক্ষকতা করেন নাই। বি-এল পরীক্ষা দিবার জন্য অল্পদিন পরেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইঁহার স্থানে স্বর্গীয় দুর্গাকুমার বসু মহাশয় সেখঘাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান। সেখঘাট স্কুলে আমি কতদিন পড়িয়াছিলাম, মনে নাই। তবে বছর-খানেকের বেশী বোধ হয় নহে। এই সময়ে, কি উপলক্ষে ঠিক মনে নাই, সহরের খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের সঙ্গে হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠীদিগের একটা বিরোধ বাধিয়া উঠে। খৃষ্টিয়ান পাদ্রীরা হিন্দু ধর্ম্মের অপমান করিতেছেন বলিয়া হিন্দু অভিভাবকেরা তাঁহাদের বালকদিগকে পাদ্রী স্কুল হইতে তুলিয়া লয়েন এবং নিজেদের একটা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। আমিও তখন সেঁখঘাটের স্কুল ছাড়িয়া এই হিন্দু স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হই।

(৮)

সেখঘাটের স্কুলের প্রাঙ্গণে একটা 'সূর্য্যঘড়ি' ছিল। সূর্য্যের গতি দিয়া এই ঘড়িতে সময় নিরূপণ হইত, কিন্তু মেঘলা দিনে ইহা সম্ভব হইত না। এইজন্য স্কুল-বাড়ীর ভিতরে একটা 'জল-ঘড়ি'ও ছিল। তখনও দেশে কলের ঘড়ি বেশী আমদানি হয় নাই। দামও এত বেশী ছিল যে, লোকে সচরাচর কিনিতে পারিত না। এই জল-ঘড়িতে একটা হাঁড়ি ও একটা পিতলের বা কাঁসার বাটি ছিল। এই বাটিতে একটা ছোট ছিদ্র ছিল। হাঁড়িতে জল পূরিয়া তাহাতে বাটিটা ভাসাইয়া রাখা হইত। বাটির ছিদ্র দিয়া জল উঠিয়া বাটিটা ভরিতে ঠিক এক ঘণ্টা সময় লাগিত। আর বাটি ডুবিয়া গেলেই ঘণ্টা পূর্ণ হইয়াছে বুঝা যাইত। এই হাঁড়ি ও বাটি স্কুলের লাইব্রেরী ঘরের এক কোণায় থাকিত। বৈকালে ৪টার সময় স্কুল ছুটি হইত। তখন ছোট ছোট ছেলেরা ছুটি পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিত এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নানা ছল করিয়া ঘড়ির জল ভরিতে কত দেরী আছে দেখিতে যাইত; আর এদিক ওদিক দুষ্কর্ম্মের সাক্ষী কেহ নাই দেখিলে পেন্‌সিলের খোঁচা দিয়া ঘড়ির গতি বাড়াইয়া দিত। আঙ্গুল দিয়া দিত না, কেননা ভিজা আঙ্গুলই দুষ্কর্ম্মের সাক্ষী থাকিত। আর ছুটির সময় আসিলে স্কুলের চৌকীদারকে ডাকিয়া ঘড়ির কাছে দাঁড় করাইত, যেন ঘড়ি ডুবিবামাত্র ছুটির ঘণ্টা বাজাইতে পারে।

(৯)

পাদ্রীদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সহরের হিন্দু অভিভাবকেরা একটা স্কুল খুলেন এবং আমি সেখঘাট স্কুল ছাড়িয়া এই স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হই, একথা কহিয়াছি। এই স্কুল সহরের উত্তর প্রান্তে একটা ছোট টীলার উপরে একটা বাংলাতে বসে। কিছুদিন পূর্ব্বেও সেই বাংলাটা ছিল। এখন বোধ হয় সেই টীলায় ঐ বাংলার ভিটাতেই ডাক্তার সাহেব বা সিভিল্ সার্জ্জন বাস করেন। এই স্কুলটা বোধ হয় কম বেশী বছরখানেক ছিল। এই স্কুলের সঙ্গে আমার বাল্য জীবনের একটা বিশেষ ঘটনার স্মৃতি জড়িত আছে। এই সময়ে শ্রীহট্টে সোডা-লেমনেডের একটা কল যায়। ছোট সহর, গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাস, এখানে সোডা-লেমনেডের কাটতি হইবার সম্ভাবনা বেশী ছিল না। তবে ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই শ্রীহট্টে চা-বাগান খোলা হয়। চীনেরা বহু দিন হইতেই চা পান করিয়া আসিতেছিল। চীন হইতে ইউরোপীয়েরা চা পান শিখিয়া নিজেদের দেশে চায়ের পাতা আমদানী করিতে আরম্ভ করেন। এরূপ গল্প আছে যে, প্রথম যখন বিলাতে চা আমদানি হয় তখন কোন কোন ইংরেজ-গৃহিণী চায়ের পাতা সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দিয়া পাতাগুলিই রোষ্ট মাংসের উপরে ছড়াইয়া দিতেন। ক্রমে কি করিয়া চা পান করিতে হয় ইহার বহুল প্রচার হইলে চায়ের ব্যবসার সূত্রপাত হয়। এই সময়েই প্রথমে আসামের জঙ্গলে চায়ের গাছ আবিষ্কৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই চা বাগানেরও সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। আমার শৈশবে কাছারে এবং শ্রীহট্ট সহরের আশে পাশে অনেকগুলি চা বাগান হয়। এসকল বাগানের মালিক ও মেনেজার সাহেব ছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীহট্টের উপকণ্ঠে কতকগুলি সাহেব যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের প্রয়োজনেই শ্রীহট্টের কোন ব্যবসায়ী আমাদের ক্ষুদ্র সহরেও একটা সোডা-লেমনেডের কল লইয়া যান। কল মাত্রই লোকের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করে। আমরা, বালকের দল, কি করিয়া কলে সোডা-লেমনেড প্রস্তুত হয় ইহা দেখিবার জন্য অনেক সময় এই দোকানের দরজায় যাইয়া ভীড় করিতাম। ক্রমে দু একজন এক-একটা সোডা-লেমনেড কিনিতেও আরম্ভ করেন। বোধ হয় ইহাতেই কলওয়ালার চোখ খুলিয়া যায়। সহরের ও সহরতলীর দশ পনর জন ইংরেজ ছাড়াও যে সোডা-লেমনেডের খরিদ্দার জুটিতে পারে ইহা বুঝিয়া সে আমাদের স্কুলে প্রতিদিন ঝুড়ী ভরিয়া সোডা ও লেমনেড পাঠাইতে আরম্ভ করিল। বন্দুকের মত শব্দ করিয়া ছিপিগুলি উড়িয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে বোতলের জল উথলিয়া উঠে, ইহা দেখিবার জন্য ছেলেরা চারিদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইত। আর অনেকেই লেমনেড কিনিয়া খাইতেও আরম্ভ করে। মুসলমানের ছোঁয়া জল খাওয়াতে জাত যায় একথা কাহারই মনে উঠে নাই। কাহারও কাহারও মনে উঠিলেও জাত রক্ষার জন্য তাহারা লেমনেডের লোভ ছাড়িতে রাজী ছিল না। সুতরাং প্রতিদিন এই নূতন হিন্দু স্কুলের বালকদিগের মধ্যে বিস্তর সোডা-লেমনেড বিক্রী হইতে আরম্ভ হইল। অভিভাবকেরা ইহার খোঁজও পাইলেন না, সন্ধানও করিলেন না। অজ্ঞাতসারে হিন্দুর জাতের মূল নষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। অভিভাবকেরা খবর পাইলে কি করিতেন তাহা বলা যায় না।

(১০)

এই সময়ে, অথবা ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে, বিস্কুট খাওয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী কাছারের হিন্দু সমাজে একটা তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। শ্রীহট্ট হইতে কাছার বোধ হয় সত্তর পঁচাত্তর মাইল দূরে। কিন্তু চলাচলের তেমন সুবিধা না থাকিলেও সর্ব্বদাই লোক দুই সহরের মধ্যে যাতায়াত করিত। কাছারের প্রায় সকল চাকুরিয়ারাই শ্রীহট্টের লোক ছিলেন। চায়ের ব্যবসা আরম্ভ হইলে শ্রীহট্টের লোকেরাই কাছারে যাইয়া চা-বাগানের কেরাণী হন। এইজন্য দেশের ব্যবধান থাকিলেও শ্রীহট্টের ও কাছারের সমাজের মধ্যে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাছারের নূতন ইংরেজীনবিশেরা যখন নিজেদের সখের বৈঠকে চায়ের সঙ্গে প্রথমে বিলাতী বিস্কুট খাইলেন, তখন সে-কথা কাছারেও চাপা রহিল না, শ্রীহট্টেও রাষ্ট্র হইতে দেরী হইল না। উভয় সমাজই এই অভাবনীয় অনাচারের উপরে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। অনাচারী বিদ্রোহীয়া

তখন যথারীতি মাথা মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজ-চ্যুতির নিদারুণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। সমাজ-পতিগণের মনের গতি যখন এরূপ ছিল, তখন শ্রীহট্টের হিন্দু বালকেরা দলে দলে মুসলমানের তৈয়ারী সোডা-লেমনেড পান করিতেছে—একথাটা রাষ্ট্র হইলে শ্রীহট্টেও একটা স্বল্পবিস্তর হুলুস্থুল বাধিয়া যাইত।

(১১)

সহরে রাষ্ট্র হয় নাই বটে, কিন্তু দুর্দৈব-বশে আমার এই দুষ্কর্ম্মের কথা বাবার কানে উঠিতে বেশীদিন লাগিল না। আমার ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত এক কপর্দ্দকও বাবা আমার হাতে দেন নাই। তখন যাহা প্রয়োজন হইত লোক দিয়া বাজার হইতে তাহা আনাইয়া দিতেন। মা'ও এবিষয়ে অত্যন্ত কড়া শাসন করিতেন। হাতে পয়সা পড়িলে ছেলে নষ্ট হইয়া যায়, তখনকার সমাজের সুশিক্ষিত অভিভাবকদিগের মধ্যে এই আশঙ্কাটা অতিশয় প্রবল ছিল। এইজন্য ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি কোন দিন হাতে পয়সা পাই নাই। অথচ লোভে পড়িয়া অন্যান্য বালকদিগের সঙ্গে স্কুলে লেমনেড খাইয়াছিলাম। সে লেমনেডের পয়সা দেওয়া হয় নাই। একদিন বাবার কাছারী যাইবার সময়, তিনি কাছারীর পোষাক পরিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময় এক অপরিচিত মুসলমান আসিয়া আমার খোঁজ করিল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? সে বলিল, স্কুলে লেমনেড খাইয়াছিলাম তার দাম বাকী আছে। বোধ হয় দু আনা কি তিন আনা তার পাওনা ছিল। বাবা আমাকে ডাকিয়া তাহার মোকাবেলা করাইয়া তখনই তাহার প্রাপ্য পয়সা তাহাকে দিয়া দিলেন। আর সে চলিয়া যাইবা মাত্র আমাকে বেদম্ প্রহার করিলেন। সেদিন হইতে আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। ধর্ম্ম নষ্ট হইবে বলিয়া পাদ্রী স্কুল হইতে তুলিয়া আনিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত নূতন হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। এখানেও যদি জাত-ধর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে, ইংরেজী পড়াই বন্ধ করিতে হইবে। আমার স্কুল বন্ধ হইল।

(১২)

সেবারে, কি কারণে মনে নাই, পূজার পরে মা বাবার সঙ্গে সহরে আসেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। মা যতদিন না সহরে আসিয়াছেন ততদিন আমার স্কুল যাওয়া বন্ধ ছিল। বোধ হয় মা চার পাঁচ মাস গ্রামের বাড়ীতেই ছিলেন। ইহার পরে যখন সহরে আসিয়া আমার লেমনেড খাওয়ার কাহিনী শুনিলেন ও এই অপরাধে আমার যে দণ্ড হইয়াছে দেখিলেন, তখন তিনি বাবাকে বুঝাইয়া আমার এই দণ্ড খণ্ডন করিলেন। ছেলেটাকে মূর্খ করিয়া রাখিয়া ফল কি? আর কালের গতিকে সমাজে কতই অনাচার ত চলিয়া যাইতেছে, লেমনেড খাওয়া ত সামান্য কথা। এইজন্য ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। সমাজের বাঁধন কতটা যে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল মা যতটা জানিতেন তখনও বাবার ততটা জানিবার অবসর হয় নাই। আমার মাতুলেরা এবং জ্যেঠতুত ও খুড়তুত ভায়েরা যে-সকল কথা মায়ের কাছে কহিতেন বাবার কাছে তাহা মুখে আনিবার সাহস হইত না।

(১৩)

এসম্বন্ধে একটা ঘটনা মনে আছে। একবার নবদ্বীপের একজন গোঁসাই শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। ইনি পদাবলী কীর্ত্তন করিতে পারিতেন। বোধ হয় ভাগবতেও কিছু কিছু দখল ছিল। বাহিরে বৈষ্ণবের আচরণীয় তিলক কণ্ঠী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া উপবীতও ছিল। কিন্তু জাতটাত মানিতেন না। বৈষ্ণব গোঁসাইরা নিরামিষাশী। কিন্তু এই গোঁসাই ঠাকুর দেখিতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন ভিতরেও তেমন সৌখীন ছিলেন এবং রূপের অনুরূপ নাগরিক প্রবৃত্তি এবং ভোগ-লিপ্সাও তেমনি ছিল। মদ্যপান করিতেন কি না জানি না। আমাদের জানিবারও অবসর ছিল না। কারণ বাবা সাত্ত্বিক বৈষ্ণব ছিলেন। আমাদের বংশে বোধ হয় কেহ কখন মদ্যপান করেন নাই। গোঁসাই ঠাকুর কিন্তু সুবিধা মত পাইলে মাছ মাংস ছাড়িতেন না। শ্রীহট্টের ভদ্র সমাজে বন্য-বরাহের মাংস একেবারে বর্জ্জনীয় ছিল না।

পাহাড়তলীতে, আর শ্রীহট্টের সর্ব্বত্রই বিস্তর বন জঙ্গল ও ছোট ছোট পাহাড় আছে, সে-সকল জায়গায়, এখানকার কথা বলিতে পারি না, আমার বাল্যকালে বন্য বরাহের খুবই উপদ্রব ছিল। কৃষকেরা বরাহের উৎপাতে আপনাদিগের শস্যাদি রক্ষা করিতে বিস্তর বেগ পাইত। মাঝে মাঝে দাঁতাল বরাহ গ্রামে ঢুকিয়া সুবিধা পাইলে মানুষকে পর্য্যন্ত আহত এবং হত করিত। সুতরাং শিকারীরা প্রায়ই পার্ব্বত্য অঞ্চলে বরাহ শীকার করিতেন। অন্ত্যজ জতিরা বন্য এবং গৃহপালিত উভয় জাতীয় শূকরের মাংসই স্বচ্ছন্দে ভোজন করে। কিন্তু বন্য বরাহ শীকার হইলে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতিও সুযোগ পাইলে ইহার উপরে ভাগ বসাইতে ছাড়িতেন না। শ্রীহট্ট সহরে মাঝে মাঝে শাক্ত ভদ্রলোকদিগের বাড়ীতে বরাহ-মাংস আমদানী হইত। বরাহের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু, কোমল ও স্নেহযুক্ত। এই গোঁসাই ঠাকুরের শ্রীহট্টে অবস্থিতি কালে একবার আমার জ্যাঠতুত ভাই কতকটা বরাহ-মাংস সংগ্রহ করিয়া আনেন। আমার পিতৃকুল বৈষ্ণব হইলেও মাতৃকুল ঘোর শাক্ত। আমার মাতামহীর পিত্রালয়ে এককালে রীতিমত মদ চোয়ান হইত। ইংরেজের আবগারী প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও একেবারে সেখানে এ কাজ বন্ধ হয় নাই। সে সমাজে বন্য বরাহের মাংস হিন্দুর অখাদ্য ছিল না। সুতরাং মা এই মাংস রাঁধিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তবে বাবাকে লুকাইয়া এ কাজটা করিতে হইল। গোঁসাই ঠাকুর বন্য বরাহের ব্যঞ্জনের সন্ধান পাইয়া তাহা আস্বাদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমার জ্যেঠতুত ভাই মাকে আসিয়া সে-কথা বলেন। মা প্রথমে ব্রাহ্মণ-সন্তানকে নিজের রান্না খাইতে দিতে রাজী হন নাই। বোধহয় শেষে দিয়াছিলেন। এইসকল ঘটনাতেই দেশে জাতটা যে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে মা ইহা বেশ টের পাইয়াছিলেন। আর এই কারণেই জাত রাখিবার জন্য ছেলের লেখাপড়া বন্ধ করা তাঁহার চক্ষে কিছুতেই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বাবাকে বুঝাইয়া আমাকে আবার স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। মা যদি এটি না করিতেন, তবে আমি আমরণ হয়ত গ্রাম্য জীবনের সঙ্কীর্ণতা এবং দলাদলির মধ্যেই পড়িয়া থাকিতাম। অথচ আমার মা বর্ণ-জ্ঞান লাভ করেন নাই।

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

"ভবানী, ও ভবানী!"

"কি গো? কেন ডাকছ?" বলিতে বলিতে ভবানী আহ্বানকারিণীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বেলা দশটা হইবে। শীতকালের রোদ খোলা জানালার পথে ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। এই মধুর উত্তাপটুকু উপভোগ করিবার জন্যই যেন একটি যুবতী জানালার পাশে ইজি-চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়াছে। তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখে রক্তের লেশমাত্র নাই, সম্প্রতি কোন পীড়া হইতে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মুখও শুষ্ক, বেশভূষারও তেমন পারিপাট্য নাই, অথচ ঘরখানির সজ্জা ও যে-প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার মধ্যে তাহার স্থান, সেটিকে দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই গৃহের অধিবাসীদের আর যাহারই অভাব থাকুক, অর্থের অভাব নাই।

ঘরখানি যুবতীর শয়নকক্ষ। তাহার এক দিকে মেহগনির প্রকাণ্ড জোড়াখাট, অন্য দিকে আয়না-

লাগানো একটি বড় আলমারী। দুখানি ইজিচেয়ার দুটি জানলার পাশে, ঘরের মাঝখানে কারুকার্যো ভরা একটি জয়পুরী পিতলের টেবল্ ও গুটিদুই ছোট চেয়ার। তাহার উপর কোন এক ব্যক্তির প্রাতরাশের অধিকাংশই এখনও পড়িয়া রহিয়াছে।

ভবানী যুবতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি ভানু, কেন ডাকৃছ ?"

যুবতী বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "কেন ডাকৃছি, তা কি এক লাখ বার বল্‌তে হ'বে ? কোনও তার কি চিঠি-পত্র এল ?"

ভবানী স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু তাহার লম্বা-চওড়া চেহারা, বলিষ্ঠ গঠন ও রুক্ষ মুখ দেখিলে মনে হয় পুরুষকেই কেহ স্ত্রীলোকের পোষাক পরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু ভানুমতীর কথায় তাহার মুখেও একটুখানি বিষাদের ছায়া পড়িয়া ক্ষণকালের মত মুখখানাকে একটু কোমল করিয়া তুলিল। সে বলিল,"কই, এসেছে ব'লে ত শুনিনি। আচ্ছা, তুমি ওঠ, মুখ হাত ধুয়ে, কাপড়-চোপড়গুলো ছাড়। কিচ্ছু ত খাওনি দেখ্‌ছি, যেমন যা রেখে গিয়েছি, তেমনই প'ড়ে আছে। ওমা, দুধটা শুদ্ধ খাওনি ? গরম ক'রে এ'নে দেব ? নিজের শরীর বোঝ না বাছা, যা খুসি তাই কর ! এমন কর্‌লে চলে কখনও ? নাও, ওঠ, মুখ ধোও, আমি কাপড় নিয়ে আসি। কাত্তিকে ডেকে দিচ্ছি, দুধটা গরম ক'রে আনুক।"

ভানুমতী একেবারে রাগের আতিশয্যে কাঁদিয়াই ফেলিল। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তুই বেরো ঘর থেকে, পোড়ারমুখি ! আমি মর্‌ছি নিজের জালায় জ্ব'লে, উনি এসেছেন এখন আমায় মুখ ধোয়াতে, দুধ খাওয়াতে ! যা তুই।"

ভবানীও একটু রাগিয়া বলিল, "তা ত বটেই, দাসী-বাঁদী মানুষ আমরা, ভাল কথা বল্‌লেও মন্দ হয়। শাশুড়ী কি বড় ননদ থাকলে কেমন কথা শুনতে না তাই দেখতাম। এই শরীর, এখন অযত্ন করা চলে কখনও ? আর এমন ক'রে দিনরাত না খেয়ে, না দেয়ে যে কান্নাকাটি কর্‌ছ,এতে স্বামীর অকল্যাণ হয় না ? ওঠ, লক্ষ্মী দিদি আমার, মুখ-হাত ধোও, আমি বাইরে দরোয়ানের কাছে গিয়ে আবার খোঁজ নিয়ে আস্‌ছি।"

ভানুমতী উঠিবার কোনও লক্ষণ না দেখাইয়া বলিল, "তুই যা আগে খোঁজ নিয়ে আয়, তারপর আমি উঠ ব।" তাহার দুই গাল বাহিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

ভবানী অগত্যা বাহির হইয়া চলিল। যাইতে যাইতে বলিল, "বলিহারী যাই জামাইয়ের আক্কেলকে ! এ দিকে ত এত আদরের ঘটা, বউ যেন মাথার মণি। আর এই যে আট দিন বাড়ী ছাড়া হ'য়েছিস্, মেয়েটাকে একটা খবর দিতে নেই গা ? ছি, ছি, ছি ! একেবারে শরীর পাত কর্‌তে বসেছে সে। বুড়ো বাপ প'ড়ে অসুখে ধুঁকছে, তার কথাও কি একবার ভাবতে নেই ?"

"কি ভবানী, জানদার কোনও খবর-টবর এলো ?" বলিতে বলিতে ইংরেজী পোষাকপরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"কই আর এল, ডাক্তার-বাবু ? আবার চলেছি দেউড়ীতে, দরোয়ানের কাছে খবর নিতে।"

ডাক্তার নিজের মাথার চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "তাইত, মহা মুস্কিল দেখ্‌ছি। ছেলেটা বড় নির্ব্বোধের কাজ কর্‌ছে। প্রমদা-বাবুর এই অবস্থা, তার উপর এমন ক'রে ভাবাচ্ছে। এর পর বুড়োকে টিকিয়ে রাখা শক্ত হ'বে।"

ভবানী মুখ নাড়িয়া বলিল,"আর ভানুর কথাও একবার ভেবে দেখুন দিখি। তাকে না পারৃছি নাওয়াতে, না পারৃছি খাওয়াতে, খালি ব'সে চোখের জল ফেলছে। এমন কর্‌লে মানুষের শরীর টেকে ?"

"আচ্ছা, বিপদেই পড়া গেল দেখ্‌ছি," বলিতে বলিতে ডাক্তার কর্ত্তা প্রমদারঞ্জনের শয়নকক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন।

প্রমদারঞ্জন পশ্চিমবঙ্গের একজন ধনবান জমিদার। তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা ও ধনের খ্যাতি আজ পর্য্যন্ত কালের প্রভাব এড়াইয়া অনেকটাই টিঁকিয়া আছে। এক কালে ধার্ম্মিক পরিবার বলিয়াও তাঁহাদের নাম-ডাক ছিল। কিন্তু প্রমদারঞ্জন যৌবনে লুকাইয়া মদমাংস খাইয়া, ও

আনুষঙ্গিক নানা অনাচার করিয়া সে-খ্যাতি অনেকটাই দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পুত্র জ্ঞানদারঞ্জনের ও-সকল উপসর্গ না থাকিলেও, তাহার উগ্র সাহেবীয়ানাকে সকলেই হিন্দুর ছেলের পক্ষে ঘোরতর অনাচার বলিয়া গণ্য করে। সে মদ না খাইলেও মাংস ও চুরুটের প্রতি ভক্তি তাহার অসাধারণ। পারতপক্ষে ধুতি সে পরে না, এবং স্ত্রী ভানুমতীর পায়ে চটি জুতার অভাব দেখিলে, তাহার সঙ্গে মহা ঝগড়া লাগাইয়া দেয়। ভানুমতী হিন্দু ঘরের মেয়ে হইলেও, স্বামীর পাল্লায় পড়িয়া নব্য ধরণে কাপড় পরিতে ও চুল বাঁধিতে, জুতা মোজা পরিতে, এবং চলনসই রকম ইংরেজী বলিতে বেশ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম ইহাতে বাড়ীতে ঘোরতর আপত্তি উঠিয়াছিল, এমন-কি প্রমদারঞ্জনের বিধবা ভগিনী ত লজ্জায় ঘৃণায় আকুল হইয়া কাশীই চলিয়া যাইতে চাহিলেন। কোনো রকমে বুঝাইয়া পড়াইয়া তাঁহাকে দেশের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে রাধা-গোবিন্দজীর পূজার তদারক করিয়া আশ্রিতা আত্মীয়া ও অনাত্মীয়াদের উপর প্রভুত্ব করিয়া এবং পরচর্চ্চা করিয়া তাঁহার দিন একরকম ভালই কাটিতেছে। এ দিকে পিসিমার সমস্তদিনব্যাপী আর্ত্তনাদ ও তিরস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জ্ঞানদারঞ্জন এবং ভানুমতীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। প্রমদারঞ্জনের বিশেষ কিছু লাভ বা লোকসান হইল না। বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থতা আসিয়া পড়াতে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে অধিকাংশ অনাচার ছাড়িতে হইয়াছিল, কাজেই ভগিনী কাছে থাকিলেও তাঁহার কোনো আপত্তি ছিল না। তবে একদিকে পুত্রের অবিশ্রান্ত নালিশ ও অন্যদিকে ভগিনীর অবিশ্রান্ত বিলাপের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া তাঁহারও একটু আরাম বোধ যে না হইল তাহা নহে।

জ্ঞানদারঞ্জন কয়েক দিন হইল এক বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছে। আমোদ-প্রমোদে চিরকালই তার অত্যন্ত রুচি, তাহার স্রোতে ডুবিয়াই বোধহয় সে-বাড়ীতে একটা খবরও দেয় নাই। এ দিকে বৃদ্ধ পিতা ও যুবতী পত্নী ত ভাবনায় চিন্তায় পাগল হইয়া যাইতে বসিয়াছে। ফিরিবার সময় জ্ঞানদারা সকলে জল-পথে ফিরিতেও পারে এমন একটা কথা ছিল, তাহারই জন্য ভানুমতীর ভাবনা হইয়াছে অধিক।

ভানুমতী সম্পন্ন গৃহস্থের মেয়ে হইলেও ধনে মানে তাহার শ্বশুর ও পিতৃকুলে অনেকটাই তফাৎ ছিল। রূপের জোরেই সে প্রমদারঞ্জনের একমাত্র সন্তানের ঘর আলো করিতে আসিয়াছিল। প্রমদারঞ্জনের পত্নীর গুণের অভাব না থাকিলেও রূপের অভাব যথেষ্টই ছিল, এবং তাহার জন্য তাঁহার নিজের মনে খেদের সীমা ছিল না। পুত্রের যাহাতে এই ভোগ ভুগিতে না হয়, তাহার জন্য তিনি অনেক দেখিয়া-শুনিয়া বৌ আনিয়াছিলেন। বাংলাদেশ খুঁজিয়া মনের মত পাত্রী মিলিল না বলিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানেও চর পাঠাইয়াছিলেন। ভানুমতীর পিতা রাজপুতানায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া বহুকাল যাবৎ বাস করিতেছিলেন। মেয়ের বিবাহ কি প্রকারে হইবে, এ ভাবনা তাঁহাদের নিতান্ত কম ছিল না। ধনে, মানে, কুলে, শীলে এমন অপ্রত্যাশিত রকম পাত্রের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা ত আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বিবাহ স্থির হইতে, এবং হইয়া যাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

ভানুমতী একরকম চিরকালের মতই পিতৃগৃহ ছাড়িয়া আসিল। সঙ্গে আসিল তাহার রাজপুত দাসী ভবানী।

ভবানী জাতিতে রাজপুত হইলেও বাঙ্গালীর সংসারে বহুকাল কাজ করার দরুন, বাঙ্গালীরই মত বাংলা কথা বলিতে পারিত। তবে তাহার ধরণধারণ একটু কাঠ-খোট্টা গোছের থাকিয়া গিয়াছিল। তাই বাড়ীর সকলে তাহাকে "রণচণ্ডী, মদ্দা ভগবতী" বলিয়া ক্ষেপাইত। ভানুমতী নিজেও ঠিক বাঙ্গালী মেয়ের মত নম্র বা লাজুক ছিল না, কিন্তু এই কারণেই জ্ঞানদারঞ্জনের তাহাকে বিশেষ রকম ভাল লাগিয়া গেল। বাবা তাহার জন্য একটি ছিঁচকাঁদুনে গোমূর্খ খুকী ধরিয়া আনিবেন এই ভয়টা তাহার অত্যন্তই ছিল, এখন ভানুমতীকে পাইয়া সে বাঁচিয়া গেল। স্ত্রীর ভিতর আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার যা অভাব ছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় সে তাহা দূর করিতে প্রবৃত্ত হইল। বাড়ী হইতে যেটুকু বাধা পাইল, তাহার বিরুদ্ধেও

প্রবলভাবে বিদ্রোহ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারই জয় হইল।

এইসকল কারণে ভানুমতী খুব শীঘ্রই স্বামীর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া উঠিল। বাড়ীর অন্য সকলে সাম্নে পিছনে তাহার নিন্দা করিত বলিয়া আর কাহারও কাছে সে বড় একটা ঘেঁষিত না। স্বামীই ছিল তাহার একমাত্র সম্বল। যতক্ষণ বাধ্য হইয়া তাহাকে স্বামী হইতে দূরে থাকিতে হইত, তাহার একটা মিনিটও যেন কাটিতে চাহিত না। বই পড়িয়া, শেলাই লইয়া বসিয়া, গোছানো ঘর দশবার করিয়া গোছাইয়াও সে অস্থির হইয়া উঠিত। আর কিছু না পাইলে ভবানীর সঙ্গে অকারণ ঝগড়া করিত, এবং জ্ঞানদার ভিতর বাড়ীতে আসিবার সময় পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হইয়া যাইতে না যাইতে বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিত। ভবানী এই ছেলে-মানুষের ছেলে-মানুষী দেখিয়া মনে মনে হাসিত, ভাবিত, "দু'দিন যাক্, ছেলে-পিলের মা হ'লে, এসব পাগলামী নিজের থেকেই যা'বে।"

দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ভানুমতীর বিবাহ হইয়াছিল প্রায় পনেরো বৎসর বয়সে, এখন তাহার বয়স কুড়ি। রূপ-যৌবনে তাহার সারা দেহ কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু কোল শূন্যই থাকিয়া গেল।

কর্ত্তা প্রমদারঞ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর চাকর দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই ইহা লইয়া ক্ষোভের সীমা ছিল না। বংশের একমাত্র দুলাল জ্ঞানদা, তাহার ঘর যদি শিশু-মুখের হাসিতে আলো না হইয়া উঠে, তাহা হইলে এই বিশাল পুরীর আঁধার ঘুচবে কেমন করিয়া? শেষে কি কর্ত্তার ভাইপো লক্ষ্মীছাড়া মাতাল উদয়টাই আসিয়া সব জুড়িয়া বসিবে নাকি?

ডাক্তার রমেন্দ্রবাবু কর্ত্তার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন বোধ কর্‌ছেন?"

প্রমদারঞ্জন তখনও বিছানা ছাড়িয়া উঠেন নাই। একখানি খবরের কাগজ চোখের সম্মুখ হইতে সরাইয়া বলিলেন, "ভাল আর আছি কই? ছেলেটা বড় ভাবিয়ে তুল্‌ল। এইমাত্র প্রিপেড্‌ টেলিগ্রাম কর্‌লাম বোসদের বাড়ী।"

রমেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের রকমই হ'য়েছে ঐ। আমোদ হ'লেই হ'ল। কোথায় বুড়ো বাপ খুড়ো খবরের জন্য হাঁপিয়ে মর্‌ছে, সে-কথা তাদের মনে থাক্‌লে ত।"

প্রমদাবাবু বলিলেন, "শুধু বুড়ো বাপ ত বাড়ী জুড়ে নেই, তার স্ত্রীও ত রয়েছে? তাকেও ত একটা খবর দিতে পার্‌ত! সে বেটী ত শুন্‌ছি একেবারে মর্‌তে বসেছে ভাবনায়।"

ডাক্তার বলিলেন, "হুঁ, বৌমার শরীর কিছু দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না শুন্‌ছিলাম। ছেলে-পিলে হবে নাকি?"

কর্ত্তা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি জানি, সে-রকম ত কিছু শুনিনি। অদৃষ্টে সে সুখ কি আছে যে নাতীর মুখ দেখে মর্‌ব? এত বড় বংশ জ্ঞানদার সঙ্গেই শেষ হ'বে নাকি কে জানে? উদয় হতভাগা এসে এ বাড়ীতে তার বারো ভূত নিয়ে রাজত্ব কর্‌ছে জান্‌লে আমার আত্মা ত শান্তি পাবে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "এরি মধ্যে হাল ছাড়ছেন? কি বা আপনার ছেলে বৌয়ের বয়েস? কপাল জোর থাকে ত এখনও ঘর-ভরা নাতী-নাতনী দেখে যেতে পার্‌বেন।"

প্রমদারঞ্জন বলিলেন, "ঘর ভরার আশা করি না হে ভায়া, এখন একটি দেখে যেতে পার্‌লেই আমার ঢের হয়।"

রমেন্দ্রবাবু উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "তা দেখবেন বই কি, নিশ্চয় দেখবেন। আচ্ছা, আসি আজ; মিক্‌শ্চারটা ঠিকমত খাচ্ছেন ত? এখনো গুটি পাঁচ রুগীর বাড়ী ঢু মেরে যেতে হবে।" ডাক্তার চলিয়া গেলেন এবং কর্ত্তা আবার খবরের কাগজ পাঠে মন দিলেন। একজন হিন্দুস্থানী চাকর ঘরের সব দরজা জানলাগুলি খুলিয়া ঘর ঝাঁট দিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

ভবানী বাহির হইয়া যাইতেই ভানুমতী উঠিয়া অস্থির ভাবে ঘরময় ঘুরিতে লাগিল। জ্ঞানদার অন্যায় ব্যবহারের কথা যত তাহার মনে হইতে লাগিল, ততই রাগে তাহার বুকের ভিতরটা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, অশ্রু যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিতে লাগিল। কি করিয়াছে সে, যে তাহার সহিত এমন ব্যবহার? কায়মনোবাক্যে স্বামীকে

তুষ্ট করিবার কোনো চেষ্টার সে ত্রুটী করে নাই। তিনি যখন যে-ভাবে চলিতে বলিয়াছেন সে তাহাই চলিয়াছে, আত্মীয় বন্ধু সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সব অগ্রাহ্য করিয়া। পিতামাতা সাগ্রহে বারবার আহ্বান করা সত্ত্বেও, সে একদিনের জন্যও বাপের বাড়ী যাইতে চাহে নাই। এত করিয়াও সে কি স্বামীর কাছে এম্‌নি অবহেলার জিনিষ থাকিয়া গেল যে, দু'দিন চোখের আড়াল হইতেই তিনি তাহাকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন? না, এ ব্যবহার একেবারে অসহ্য। এর শোধ সে তুলিবেই, যেমন করিয়া হোক্।

কিন্তু তাঁহার যদি কোনো বিপদ্ হইয়া থাকে? এই চিন্তা মনে আসিবামাত্র ভানুমতীর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। হায়রে, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে তাহার মত হতভাগিনী আর থাকিবে কে? অমন স্বামী কি কাহারও কখনও হয়? এমন করিয়া স্ত্রীকে আর কে ভালবাসে? জমিদার বংশের শত অনাচার-কদাচারের স্রোত তাহাকে ত একবিন্দুও স্পর্শ করে নাই, তাহার চরিত্র হীরকের মতই উজ্জ্বল নির্ম্মল থাকিয়া গেছে। আজ কি শুধু ধনের মানের জন্য ভানুমতী সকল আত্মীয়-আত্মীয়ার হিংসার পাত্রী? তাহার অসাধারণ স্বামীসৌভাগ্যই যে তাহাকে নারীকুলের সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছে। তাহার সন্তান হইল না বলিয়া পরের কাছে সে কত না কথা শুনিয়াছে, কিন্তু স্বামী ত তাহার এ ত্রুটী কোনোদিন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনেন নাই, হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন।

ভবানী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "না বাছা, কোনো খবর এখনও আসেনি। তবে কর্ত্তা তার করেছেন জবাবের টাকা দিয়ে, আজ বেলা বারোটা একটার মধ্যে ঠিক খবর আস্‌বে। নাও, এখন হ'ল ত? মুখ হাতগুলো ধোও এরপর। চাবিটা দাও, কাপড় জামা বার ক'রে দি।"

চাবির রিংটা ভবানীর গায়ে ছুড়িয়া দিয়া ভানুমতী বলিল, "ছাই হ'ল। কি খবর যে আস্‌বে তা মা দুর্গাই জানেন। নে, কি বার কর্‌বি কর্।"

ভবানী আল্‌মারী খুলিয়া একটি লেশ-বসানো সেমিজ একটি নীল ভায়েলা ফ্লানেলের জ্যাকেট এবং একখানি লাল পাড়ের ঢাকাই শাড়ী বাহির করিল। ক্রমাগত কান্নাকাটি করিয়া এবং ভবানীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ভানুমতী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে আর কাপড় ছাড়িতে বেশী আপত্তি করিল না। ফিরিয়া আসিয়া ইজি চেয়ারে বসিতেই ভবানী চিরুণী লইয়া পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার চুল আঁচড়াইতে সুরু করিল। আর একজন বৃদ্ধা ঝি আসিয়া সকালের পরিত্যক্ত খাবারগুলি উঠাইয়া লইয়া গেল, এবং খানিক পরে গরম লুচি, তরকারী, সন্দেশ, এবং একবাটী গরম দুধ রাখিয়া গেল। চুল বাঁধা শেষ হইতেই, ভবানী পিতলের টেবল্‌টি ভানুমতীর সাম্‌নে টানিয়া আনিল, এবং যতক্ষণ সে কিছু না খাইল তাহাকে কিছুতেই নিষ্কৃতি দিল না।

খাওয়া শেষ করিয়া, ভবানীকে বিদায় দিয়া ভানুমতী আবার ঘরের চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এমন এক ইঞ্চি স্থান নাই, যেখানে তাহার স্বামীর কোনো না কোনো চিহ্ন বর্ত্তমান। ঘরের ভিতর জ্ঞানদার ছবিই ঝুলিতেছে কম করিয়া বারো চৌদ্দখানা। তাহার পর তাহার বই, তাহার কাপড়, তাহার জামা, জুতা, ছড়ি, তামাকের পাইপ, ঘরময়। সবাই যেন মূক দৃষ্টিতে ভানুমতীর দিকে চাহিয়া আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে এ গৃহের অধীশ্বর কোথায়? সে সজল চোখে জিনিষগুলি একে একে স্পর্শ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একটা ছবির উপর তাহার চোখ পড়িল। ইহা তাহাদের বিবাহের বৎসরে তোলা। তখনও ভানুমতী ভাল করিয়া নব্য প্রথায় চুল বাঁধিতে, কাপড় পরিতে শিখে নাই। ছবি তুলিবার আগে জ্ঞানদা তাহাকে নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছিল, মনে করিয়া ভানুমতীর ঠোঁটের কোণে একটুখানি মধুর সলাজ হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক হানিয়া গেল।

বাহির হইতে কে একজন গলা খাঁক্‌রাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরেই নাকি, বৌঠাকরুণ?"

ভানুমতী পরদার ফাঁকে উঁকি মারিয়া দেখিল উদয় দাঁড়াইয়া আছে। অত্যন্ত দুশ্চরিত্র বলিয়া এ বাড়ীর কেহই উদয়কে দেখিতে পারিত না। জ্ঞানদা বিশেষ করিয়া স্ত্রীকে বারণ করিয়া দিয়াছিল সে যেন উদয়কে কোনো প্রকার আত্মীয়তা করিতে প্রশ্রয় না দেয়, এমন

কি সম্ভব হইলে তাহার সহিত কথা পর্য্যন্ত যেন না বলে। কিন্তু যতই উপেক্ষা-অনাদর লাভ করুক, উদয় সহজে দমিবার ছেলে নয়। ভানুমতীর সহিত আত্মীয়তা করিবার প্রবল চেষ্টা সে একদিনও ত্যাগ করে নাই। তবে ভানুমতী অসুস্থ থাকায় তাহার চেষ্টায় যে কিছু লাভ হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

বিরক্তিতে ভানুমতীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। এ হতভাগার কি একদিনও বাদ যাইতে নাই? উত্তর দিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় কাতি ঝি আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ছোট দাদাবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, বৌরাণীমা; আপনার খোঁজ কচ্ছেন।"

ভানুমতী ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "বল্‌গে যা যে তাঁর শরীর বড় খারাপ, শুয়ে আছেন।"

এই দাসীটি কোন অজ্ঞাত কারণে উদয়ের কিঞ্চিৎ বশীভূত ছিল। সে তখনই বিদায় না হইয়া বলিল, "কি দরকারী কথা আছে বল্‌লেন।"

ভানুমতী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "তাঁর দরকারী কথা শুন্‌বার আমার দরকার নেই। আমি এখন উঠ্‌তে পার্‌ব না।"

কাতিকে আর কষ্ট করিয়া এ খবরটা উদয়কে দিতে হইল না। সে দরজার খুব কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, ভানুমতীর কথা বেশ স্পষ্টই শুনিতে পাইল। পর্দ্দার কাছে আসিয়া বলিল, "বৌঠাকরুণ, কথাটা আপনার জানা দরকার, তাই আপনাকে বল্‌তে এলাম। শুধু শুধু আপনাকে রাগাবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই।"

ভানুমতী এবার আর না উঠিয়া পারিল না। মাথায় কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি কথা বলুন।"

উদয় মুখখানাকে যথাসাধ্য কাতর করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "দাদার সঙ্গে আমাদের পাশের বাড়ীর অমরও বোসদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়েছিল, আপনার মনে আছে বোধ হয়?"

ভানুমতী ঘাড় হেলাইয়া জানাইল, তাহার মনেই আছে।

উদয় বলিল, "আজ সকালে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এম্‌নি একটু তাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। শুন্‌লাম অমরের চিঠি এসেছে। দাদার কোনো খবর আছে কি না জিগগেস্ করাতে তারা বল্‌লে, বড় ভাল খবর নয়।"

ভানুমতীর পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দরজার কপাট ধরিয়া কোনমতে নিজেকে একটুখানি সাম্‌লাইয়া লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছে সে?"

"বিয়ের দু' তিন দিন পরে ওরা সবাই মিলে শিকারে যায়। সেখানে কেমন ক'রে জানি না একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট হ'য়ে গেছে। দাদার অবস্থা বোধ হয় বিশেষ সুবিধার নয়। এখনি এবাড়ীর থেকে কারো ওখানে যাওয়া উচিত। আমার হাতে একটা পয়সাও নেই, তা না হ'লে সকালের ট্রেনেই আমি চ'লে যেতাম।"

ভানুমতী টলিতে টলিতে ঘরের ভিতর গিয়া খাটের উপর অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় লুটাইয়া পড়িল। সে যেন ভাল করিয়া উদয়ের কথা বুঝিতেই পারে নাই। কাতির মুখে খবর পাইয়া ভবানী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে জড়াইয়া ধরিল। উদয় তখনও পর্দ্দার ওপাশে দাঁড়াইয়া। তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় সে বলিল, "কর্ত্তা মশায়ের ঘরে গিয়ে তাঁকে খবর দিন। এখানে দাঁড়িয়ে কি হ'বে?"

কর্ত্তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইবার ইচ্ছা যে উদয়ের খুব ছিল তাহা নহে। তবে ভানুমতীর অবস্থা দেখিয়া সে বুঝিল যে, এখানে দাঁড়াইয়াও খুব বেশী কিছু লাভ নাই। অগত্যা আস্তে আস্তে সে সরিয়া গেল। প্রমদারঞ্জনের কাছে নিজে না গিয়া একজন কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া, তাহার মারফতে আপনার বক্তব্য বলিয়া পাঠাইল। কিছুক্ষণ পরে গোটা তিন চার দশটাকার নোট পকেটে ভরিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরেই প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব আসিয়া পড়িল। বজ্রাহতের মত সারাবাড়ী যেন নীরব নিঃস্পন্দ হইয়া গেল। জ্ঞানদা মারা গিয়াছে।

প্রমদারঞ্জনের ঘরের দিকে ভয়ে ভয়ে আর কেহ পা বাড়াইল না। কেবল ডাক্তার রমেন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিয়া

তাঁহার ঘরের দরজায় করাঘাত করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। দরজা বন্ধই রহিল, ভিতর হইতে অশ্রুবিকৃত গাঢ় কণ্ঠে প্রমদারঞ্জন বলিলেন, "ডাক্তার, মৃত্যু যাদের স্বভাবিক, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা আর কোরো না। আমরা মরণকে তার ন্যায্য পাওনার থেকে বঞ্চিত করি ব'লে সে এম্‌নি ক'রেই আমাদের ওপর শোধ তোলে। আমার ছাব্বিশ বছরের ছেলে আমারই পাপে গেল।"

ভানুমতীর সেদিন জ্ঞানই হইল না। ভবানী হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত তাহাকে আগ্‌লাইয়া বসিয়া রহিল, কাহাকেও আর তাহার কাছে আসিতে দিল না। নিজেও সারাদিন সে জলস্পর্শ করিল না।

সন্ধ্যার সময় উদয় আসিয়া একবার করুণাবিগলিত-কণ্ঠে ভানুমতীর খবর জিজ্ঞাসা করিল। কাতি তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল। ভবানী দাঁতে দাঁত ঘসিয়া বিড় বিড় করিয়া বলিল, "বড় ফুর্ত্তিই হ'য়েছে মনে। কিন্তু হতভাগা তোর সব আশাতেই ছাই পড়বে, এই আমি ব'লে রাখলাম।"

উদয় বাহির হইয়া যাইতে-যাইতে আপন মনেই বলিল, "যাক্‌, টাকা চল্লিশটা আর বুড়ো এখন ফিরে' চাইবে না।"

(২)

দশ বারোটা দিন কোনো রকমে কাটিয়া গেল। জমিদার-বাড়ীর উপর শোকের কৃষ্ণ ছায়া গাঢ় হইয়া রহিল, তবু মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশে সকলেই এক এক করিয়া জীবনকে আবার এই নূতন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চাকর-ঝিগুলি এতদিন মনিবদের শোকের আওতায় একেবারে মুস্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। এখন তাহারাও অল্পে অল্পে কোলাহল সুরু করিল। বাকি রহিল কেবল ভবানী। তাহাকে আর হাসি গল্পে যোগ দিতে ডাকিবার সাহস কাহারও হইল না। কাতি মুখ ঘুরাইয়া অন্য দাসীদের কাছে বলিল, "ন্যাকাপানা দেখ, সোয়ামী মরেছে যেন ওঃই! অমন যে যার-পর-নেই বাপ, সেও সাম্‌লে উঠেচে, আর ঐ বুড়ী মাগীর রকম দেখ, বৌরাণীকে যেন ভূতের মত পেয়ে বসেছে। না দেয় বেরতে, না দেয় কারো সঙ্গে কথা কইতে। বিধবা কি আর কেউ হয় না? এই ত আমরা রয়েছি। যে গিয়েছে তার জন্যে নিজে ম'রে আর কি হ'বে? খাও, দাও, আপনার জান বাঁচাও, এই ত বুঝি বাপু!"

প্রমদারঞ্জন ভিতরে ভিতরে কতটা সাম্‌লাইয়া ছিলেন বলা যায় না, তবে বাহিরের চালচলন তাঁহার আবার প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কথা-বার্ত্তা আর আগের মত ততটা বলিতেন না। ভানুমতীর অর্দ্ধ-অচেতন ভাবটা এখনও ভাল করিয়া কাটে নাই। ভবানী তাহাকে শিশুর মত করিয়া আগলাইয়া রাখিত। নাওয়ানো, খাওয়ানো সবই আপন হাতে করিত। সে স্বভাবতই স্বল্পভাষিণী ছিল, এখন আর একেবারেই কথা বলিত না। কেবল উদয়কে দেখিলে তাহার মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিত, আপন মনে চাপা গলায় সে অভিশাপ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিত।

বেলা দশটা বাজে। ভানুমতীকে স্নান করাইয়া, তাহার জলযোগের সব আয়োজন করিতে ভবানী ঘরের বাহির হইতেছে, এমন সময় কর্ত্তার খাস চাকর কুবের আসিয়া খবর দিল যে, কর্ত্তাবাবু একবার তাহাকে ডাকিতেছেন।

কর্ত্তার ঘরে বিশেষ কখনও তাহার ডাক পড়ে না। কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া ভবানী বলিল, "সেখানে আর কে কে আছেন?"

কুবের বলিল, "ডাক্তার-বাবু, নায়েব-বাবু, আর ছোট দাদা-বাবু।"

মাথার কাপড় টানিতে টানিতে ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডেকেছেন জান কিছু?"

কুবের বলিল, সে খবর তাহার জানা নাই। দুধ, ফল, মিষ্টি গোছাইবার ভার আর-একজনের উপর দিয়া ভবানী আস্তে-আস্তে কর্ত্তার ঘরের দিকে চলিল। কি প্রয়োজনে যে তাহার ডাক পড়িতে পারে, তাহার মনের মধ্যে কেবল তাহারই জল্পনা চলিতে লাগিল।

প্রমদারঞ্জন খাট ছাড়িয়া একখানা বড় ইজি-চেয়ারে বসিয়াছিলেন। ডাক্তার ও নায়েব তাঁহার দুই পাশে বসিয়াছিলেন, এবং উদয় ছিল কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া। জ্যাঠা মহাশয়ের সাম্‌নে বসিবার সাহস তাহার কোনো কালেই হইত না, প্রয়োজন দেখিলেই যেন দৌড় মারা চলে, এমন ভঙ্গী করিয়া সে সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া থাকিত।

ভবানী আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। হাতের ইসারায় তাহাকে ভিতরে ঢুকিতে বলিয়া উদয় আরো একটু সরিয়া গেল। প্রমদারঞ্জন একখানা খোলা চিঠি হাতে করিয়া ছিলেন, সেই বিষয়েই বোধ হয় ডাক্তার এবং নায়েবের সঙ্গে তাঁহার কোনো পরামর্শ হইতেছিল। ভবানীকে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, "এই যে ভবানী! বৌমার শরীর আজ কেমন?"

ভবানী মৃদু গলায় বলিল, "অল্পে অল্পে সাম্‌লে উঠছে, বাবু। কাল রাত্রে বেশ ঘুমিয়েছে। এ ক'দিন ত চোখে-পাতায় এক করেনি।"

প্রমদারঞ্জন চিঠি হইতে চোখ তুলিয়া বলিলেন, "বৌমার বাবা কলকাতায় এসেছেন। তিনি মেয়েকে নিয়ে যেতে চান। বৌমার কি মত জানা দরকার। এখানে থাক্‌তে চান, যেমন আদরে চিরদিন ছিলেন তাই থাক্‌বেন, বাপের কাছে থাক্‌তে চান আমি কোনো আপত্তি কর্‌ব না। তাঁর শরীর যদি বেশী খারাপ না থাকে, তাঁকে একবার জিগগেস ক'রে এসো। আমার চিঠির জবাব পেলেই বেয়াই মশায় ওখান থেকে বেরিয়ে পড়বেন।"

ডাক্তার-বাবু বলিলেন, "কিন্তু একেবারে পাঠিয়ে দেওয়া আমি ঠিক মনে করি না। ছেলের অবর্ত্তমানে এখন তাঁরই ছেলের সব কাজ কর্‌তে হবে। কর্ত্তব্য ব'লে ত একটা জিনিষ আছে। আপনাকে দেখা-শোনাই তাঁর জীবনের অবলম্বন হওয়া উচিত এখন।"

জমিদারবাবু বলিলেন, "ওকথা আর বোলোনা, ভায়া। আমি কবে আছি কবে নেই। আমার ভাবনা ভাবতে ভগবান আছেন। ওর অল্প বয়েস, এমন ভয়ানক আঘাতটা পেল, এখন যা নিয়ে মনকে ভোলাতে পারে, তাকে তাই দেওয়া উচিত। বাপের বাড়ী থাকা আর এখানে থাকা এখন ওর একই কথা। ওখানে থাক্‌লেও টাকাকড়ির কোনো অভাব তাঁর হবে না, জ্ঞানদার জন্যে যে মাসহারা বরাদ্দ ছিল, তা বৌমাই পাবেন আজীবন।"

নায়েব মশায় এই জমিদারীতে কাজ করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি মাঝে মাঝে একটু মন খুলিয়া কথা বলিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বিধবা ভানুমতীকে মাসিক দেড় হাজার টাকা দিবার প্রস্তাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "অত টাকা, ছেলেমানুষ তিনি, তাঁর হাতে দেওয়া কি ঠিক হবে? বারোভূতে লুটে খাবে শেষে আমাদের দেশে মেয়েছেলের আর খরচ কি বলুন? বিশেষ ক'রে বিধবা মানুষের? দেড়শ দু'শ টাকা হ'লেই ভেসে যাবে। দান-ধ্যান করা বই আর তাদের খরচ কি?"

ভবানীর কাণ ছিল প্রমদারঞ্জনের ও তাঁহার সঙ্গীদের কথার দিকে, কিন্তু চোখ ছিল উদয়ের মুখের উপর। অতগুলি টাকা মাস মাস হাতছাড়া হইবে এই প্রস্তাব শুনিয়াই যেন উদয়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। যদিও প্রমদারঞ্জন এখনও মরেন নাই এবং উদয়ের সুখের কাঁটা ভানুমতীও এখনও বাঁচিয়া,তবু সে নিজেকে জমিদার বলিয়া একরকম ধরিয়াই লইয়াছিল। সুতরাং তাহার টাকা এমন ভাবে অপব্যয় করার প্রস্তাবে তাহার মুখ যে বিকৃত হইয়া উঠিবে সে আর বিচিত্র কি?

ভবানী অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক হইলেও মানব-চরিত্রে জ্ঞান তাহার অল্প ছিল না। বিশেষ করিয়া উদয় সম্বন্ধে তাহার কখনও ভুল হইত না। উদয়ের মনের কথা সে একরকম আঁচ করিয়াই লইল এবং ক্রূর দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া প্রমদারঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দিদিমণি ত যেতেই চাইবেন, কিন্তু এখন তাঁকে এত নাড়ানাড়ি করা কি ঠিক হ'বে? এই গাড়ী থেকে ট্রেন, ট্রেন থেকে ষ্টীমার, এত সব কি সইবে?"

প্রমদারঞ্জন উত্তর দিবার আগেই ডাক্তার বলিলেন, "তাতে বেশী কিছু অনিষ্ট হবে না। শরীর দুর্ব্বল, তা ফাষ্ট ক্লাশে যাবেন এখন,লোকের ভীড় পোহাতে হবে না।"

ভবানী গলা নীচু করিয়া বলিল, "তাঁর শরীরের কথা বল্‌ছি না ডাক্তারবাবু, কিন্তু বংশের দুলাল রয়েছেন তাঁর

পেটে, তাঁর কথা ভাবতে হবে। এখনও এত টানাটানি করবার মত হয়নি।"

ডাক্তার ও নায়েব আনন্দের আতিশয্যে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াই পড়িলেন। প্রমদারঞ্জন অতটা আনন্দ কিছু প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু তাঁহারও হাত হইতে বেহাইয়ের চিঠিখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। উদয়ের মুখ প্রায় অমাবস্যার আকাশের মত হইয়া উঠিল, তবুও সে ঘর ছাড়িল না, দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

প্রমদারঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ এ খবর ত আগে শুনিনি?"

ভবানী লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, "এত দিন ঠিক ক'রে ধরতে পারিনি বাবু, তাই বলতে সাহস করিনি; এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহ'লে এখন তাকে পাঠানোর কোনো কল্পনাই করা চলে না, অন্ততঃ আর দুটো মাস যাক্ তার আগে। যাক্, ভগবানকে ধন্যবাদ যে, এত গভীর শোকের মধ্যেও এইটুকু সান্ত্বনা তিনি আপনার জন্যে রেখেছিলেন। ছেলে যদি হয় তা হ'লে সেই আপনার ছেলের অভাব পূর্ণ করবে।"

কর্ত্তা কথা বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। নায়েব মশায় কয়েকখানা কাগজ-পত্র গুছাইয়া কর্ত্তাকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইয়া গেলেন, ডাক্তার আবার চেয়ার টানিয়া লইয়া জাঁকাইয়া বসিলেন। উদয়ের সন্ধানে চোখ ফিরাইয়া ভবানী দেখিল সে কখন নিঃশব্দে পলায়ন করিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া বলিল, "তোর বাড়া ভাতে যে, ছাই দিতে পারলাম হতভাগা, এর জন্যে হরির লুট দেব চার আনার।"

ভানুমতীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া ভবানী দেখিল, সে তখনও খায় নাই। দাসী তাহার জন্য দুধ মিষ্টি প্রভৃতি লইয়া তখনও দাঁড়াইয়া আছে। ভবানীর মনটা অনেককাল পরে একটু ভাল ছিল, সে সদয় কণ্ঠেই বলিল, "ওমা, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্ মুখী? যা, যা, আমি খাওয়াচ্ছি দিদিমণিকে।"

মোক্ষদা হাঁফ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ভানুমতীর ঘরে আজকাল ভবানী ছাড়া আর কেহ বড় আসিতে সাহস করিত না। তাহার পাথরের মত মুখ আর নিষ্প্রভ চোখের দিকে তাকাইলেই যেন তাহাদের বুকের রক্ত জল হইয়া আসিত। কাঁদা, কাটা, মাথা কোটা, এ সব তাহাদের অভ্যাস ছিল; সে-রকম কিছু দেখিলে পাশে বসিয়া নিজেরাও খানিক হাঁউ মাউ করিয়া চীৎকার করা চলে, কিন্তু এমন ধারা কাণ্ড তাহারা দেখে নাই। অমন ইন্দ্রতুল্য স্বামী যে মরিল, তাহার জন্য দশটা দিন কাঁদিতেও পারিল না গা? এ কেমন মেয়েমানুষ? ঐ বুড়ী মাগীই কিছু পরামর্শ দিয়া থাকিবে বোধ হয়, একদণ্ড তবোরাণীর ঘর ছাড়িয়া নড়ে না। তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবার সাহস কাহারও ছিল না। যা স্বভাব, কি জানি যদি দু' ঘা লাগাইয়াই দেয়? তাহার সঙ্গে জোরে পারিবারও কাহারও সম্ভাবনা ছিল না।

ভবানীর অনুরোধে ভানুমতী আস্তে আস্তে খাইতে আরম্ভ করিল। এই কয়দিনের মধ্যেই সে আরো অনেকখানি রোগা হইয়া গিয়াছে। শোকের আগুন তাহাকে ভিতরে ভিতরে পোড়াইতেছিল বলিয়াই যেন তাহার মুখের রং অনেকটা ছাইয়ের মত হইয়া আসিয়াছে, চোখ অর্থশূন্য জ্যোতিহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

তাহার পরিধানে সেমিজের উপর একখানা সরু কালো পাড়ের ধুতি, হাতে দু'গাছি বালা। একেবারে বিধবার বেশ পরাইতে ভবানী প্রাণ ধরিয়া পারে নাই। অবশ্য এ লইয়াও সমালোচনার অন্ত ছিল না। বিধবা মানুষের আবার এত গহনা পরা, খাটে শোওয়া কেন? কপাল যখন পুড়িলই, সেইমত থাকিলেই হয়?

ভবানী তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কলকাতার থেকে আমাদের বাবু চিঠি দিয়েছেন, কর্ত্তা আমায় ডেকে বললেন। তোমায় নিয়ে যেতে চান। কিন্তু আমি বলি, এখন তোমার এত নাড়ানাড়ি না করাই ভাল। মাস দুই পরে গিয়ে একবার দিন কতকের মত থেকে এসো।"

ভানুমতী হঠাৎ খাওয়া ছাড়িয়া সরিয়া বসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না ভবানী, আমি এখনি

যাব, আমায় নিয়ে চল্। এখানে আর দু'দিন থাকলে আমি পাগল হ'য়ে যাব। আমার কিছু হবে না, তুই কর্ত্তা মশায়কে ব'লে আয়, আমার যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে।"

ভবানী বলিল, "ছি, দিদি, এমন অবুঝের মত কাজ করে না। সন্তান রয়েছে পেটে, সেই তোমার আশা ভরসা সব। তার ভাল-মন্দ তুমি মা হ'য়ে দেখবে না।"

ভানুমতী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। খানিক পরে অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে বলিল, "আমার অদৃষ্টে কি কিছু ভাল টিকবে, ভবানী? তা না হ'লে এই দশা হ'ল আমার কুড়ি বছর যেতে না যেতে? আমার মা, ঠাকুমা সবাই বুড়ো বয়েসে পাকা চুলে সিঁদুর প'রে গেছে রে।"

ভবানী তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। "সকলের অদৃষ্ট সমান হয় না দিদি, যা কপালে ছিল ঘটল, কি করবে বল? মানুষের হাত ত নেই? এখন যেটুকু আশা ভগবান দিচ্ছেন, তাইতেই বুক বেঁধে থাক। দেখ, কর্ত্তা-মশায় শুদ্ধ আজ খবর শু'নে কত বল পেয়েছেন। তাঁরও ত কম যায়নি! এখন শ্বশুরের বংশ যাতে বজায় থাকে, তাই কেবল ভাব। নিজের কোন অযত্ন কোরো না।"

ভানুমতী আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল। সে আর খাইবে না দেখিয়া ভবানী পরিত্যক্ত খাবারের পাত্র উঠাইয়া লইয়া গেল। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া ঘরের সব আসবাব পালকের ঝাড়ন দিয়া মুছিয়া, ঘর ঝাঁট দিবার জোগাড় করিতে লাগিল।

ভানুমতী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, ঠাকুরপো ছিল সেখানে, যখন তুই কর্ত্তামশায়কে খবর দিলি?"

ভবানী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "ছিল না আবার? ক'দিন থেকে হতভাগা কি বাড়ীছাড়া হয়েছে, ঠিক যেন যক্ষির ধন আগলে বেড়াচ্ছে। তেম্'ন হয়েছে মুখের মতন জুতো! কখন্ যে শুট্ ক'রে পালাল দেখতেও পেলাম না।"

ভানুমতীর পাংশু মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, "আমার স্বামীকে ঐ খেল, সাংঘাতিক চোখ দিয়ে দিয়ে। তা না হ'ল অমন মানুষ বেঘোরে মারা যায়? এখন ছেলে খাবার চেষ্টায় লাগছে। কিন্তু আমায় না খেয়ে পারছে না, তা ব'লে রাখলাম দেখিস্।"

উত্তেজনায় তাহার সারা শরীর কাঁপিতেছে দেখিয়া ভবানী আসিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া খাটে শোওয়াইয়া দিল।　　　　(ক্রমশঃ)

সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন

শ্রী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(১)

ইংরেজী ১৮৭৪ কি ৭৫ শালে, তখন আমি কাশীর বাঙ্গালীটোলা স্কুলে পড়ি, বয়ঃক্রম ১৩।১৪ বৎসর হইবে, হঠাৎ শুনা গেল, একজন ভাল বাঁশী-বাজিয়ে কাশীতে আসিয়াছেন, আমার লেখাপড়ায় তত বিশেষ মনোযোগ ছিল না; বাঁশীর কথা শুনিয়া মন চঞ্চল হইল। আমি তাঁহার সন্ধান করিলাম এবং বাঁশী শিক্ষা করিব বলিয়া তাঁহাকে জানাইলাম। তাঁহার আরও ৩।৪ জন শিষ্য ছিল। এই বাঁশী বাজিয়ের নাম শ্রীযুক্ত অন্নদা-প্রসাদ মিত্র (বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌতে আছেন); দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ; হাতে বাঁশী লইলেই কৃষ্ণঠাকুরের মত দেখাইত বলিয়া আমরা তাঁহাকে "কালমাণিক" বলিয়া ডাকিতাম। বাঁশীতে আমার হাতেখড়ি হইল। "নি সা ধা নি প" বেহাগের গৎ আরম্ভ হইল। ইহার অন্তরা যখন

শিখিলাম তাহাতে কোমল নিষাদ পাইলাম। তখন উহাই শুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম (অর্থাৎ বেহাগের কোমল নিষাদই ব্যবহার হয়)। বেহাগের গৎ শেষ হইলে বিভাগের গৎ "সা রে গ গগ-প পপ্ রে গ ধ···" আরম্ভ হইল, ইহাতেও নিষাদ ছিল এবং তখন উহাই শুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম। এইরূপে চারি পাঁচ খানি গৎ শিখিলাম এবং আমাদের ছোট একটি কন্‌সার্ট পার্টি হইল। সে-সময়ে এখানে আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে নূতন খোলা হয়। সিকরোল ষ্টেশনে একজন বাঙ্গালী (সিদ্ধেশরবাবু) ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার একটি থিয়েটারের দল ছিল। সেই দলে আমারা কন্‌সার্ট বাজাইতাম। দুই এক বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল। ইত্যবসরে একজন মুসলমান ওস্তাদ (খেয়ালী) কাশীতে আসেন। মিত্র মহাশয় তাঁহার নিকট খেয়াল শিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা অর্থাভাবে শিক্ষা করিতে পারি নাই। ওস্তাদজি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাঁশী বাজান শুনিতেন। আমরা একদিন উক্ত বেহাগের গৎ বাজাইতেছিলাম। তিনি শুনিয়া হাসিলেন। আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি অস্থায়ী অন্তরাতে সুরের প্রভেদ বলিলেন। কোমল নিষাদ সব বেহাগে লাগে না; বেহাগ শুদ্ধ রাগ; বেহাগড়া, বেহাগ খাম্বাজ, অরুণ বেহাগ প্রভৃতি মিশ্র বেহাগ; তিনি আরও কত কি বলিলেন। তখন আমরা সঙ্গীতের কিছুই বুঝি না। তাঁহার কথাগুলি শুনিলাম, কিন্তু কোন কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। আর একদিন আমরা বিভাসের গৎ বাজাইতেছিলাম এবং কেহ কেহ গতের বোল মুখেও পড়িতেছিল। তিনি শুনিয়া তোবা তোবা বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, চারিটি বোল, অর্থাৎ সারে, মরে, গধা, ধসা," বাদ দিয়া তবে স র গ ম তৈয়ারী করা কর্ত্তব্য; কারণ এই কথাগুলি চলিত হিন্দীভাষায় অত্যন্ত শ্রুতিকটু। ক্রমশঃ সুরের একটু ব্যবহার, বিচার এবং বোধ করিতে লাগিলাম। শানাই, বাঁশী কিছুদিন বাজাইয়াছিলাম। ক্রমে গান শিখিতে ইচ্ছা হইল, বাঁশী ছাড়িয়া দিলাম।

ঐ সময়ে কাশীধামের দীঘাপতিয়ার রাজবাটীতে গায়ক বাদকদিগের সমাবেশ হইয়াছিল। তখন "মহাসম্মেলন" বলিয়া কেহ কিছু জানিত না। দীঘাপতিয়ার রাজা বোধ হয় গুণীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (নুলো গোপাল), তাঁহার ওস্তাদ স্বর্গীয় গোপাল-প্রসাদ মিশ্র; পশ্চিম প্রদেশ হইতে বন্দে আলী খাঁ বীণকার, কাশীধামের মহেশচন্দ্র সরকার, চিন্তামণি বাপুলী, রামদাস গোস্বামী প্রভৃতি গুণীগণ উপস্থিত ছিলেন। কাশীনাথ পণ্ডিত মৃদঙ্গী, গণেশ সিংহ মৃদঙ্গী এবং আরও অনেক গুণীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বন্দে আলি খাঁ বীণা বাজাইয়াছিলেন এবং গণেশ সিং মৃদঙ্গ বাজাইয়াছিলেন। তখন বিশেষ করিয়া কিছুই বুঝিবার শক্তি ছিল না। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, তাঁহারা কি করিয়া গিয়াছেন। বীণাযন্ত্রের সুর মিলাইবার প্রথা যাহা দেখিয়াছি তাহা এক্ষণে দেখা যায় না। কেহ কষ্ট স্বীকার করিয়া সুর মিলন করেন না। তিনি এক-একটি তার মিলাইয়া সেই তার ধরিয়া বীণাযন্ত্রটি তুলিয়া ধরিতেন। যদি তারটি নরম (বেসুরা) না হইত তবে সে তার রাখিতেন, নচেৎ অন্য তার চড়াইতেন। এই প্রথম প্রকরণ। সমস্ত তার এইরূপে পরীক্ষা করিয়া চড়াইতেন; পরে একটি ঝঙ্কার দিতেন। সব তারের সুর মিলিত হইয়া একটি সুর (ধ্বনি) যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহির না হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সুর মিলাইতেন। ইহা দ্বিতীয় প্রকরণ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা দেখিয়াছি এবং পঞ্চাশ বৎসর পরে অতি অল্পদিন হইল কাশীতে গৌরীপুর রাজার বাড়ীতে যমন খাঁরও ঐরূপ সুর মিলাইবার পদ্ধতি দেখিয়াছি। বন্দে আলি খাঁ সরস্বতীর স্তব ও প্রণামান্তে বীণা ঘাড়ে করিলেন এবং চারি প্রকার রীতি অনুসারে আলাপ করিতে লাগিলেন। পরে পরণ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং গণেশ সিং মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন। ইহার পরে গায়কদিগের ধ্রুপদ গান হইয়াছিল। গোপাল-বাবু প্রথমে গান করেন এবং গণেশ সিং মৃদঙ্গ বাজান। পরে রামদাসবাবু গান করেন এবং কাশীনাথ পণ্ডিত মৃদঙ্গ বাজান। ধ্রুপদ গান তখন বুঝি না, কেবল নানারূপ ভঙ্গী এবং

কম্পনযুক্ত সুর শুনিলাম। মনে মনে কিন্তু আনন্দ পাইলাম। ছেলেছোকরাদের মধ্যে আমাদের দল ছাড়া অন্য সকলে কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল, কেহ বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। গোপাল-বাবু "চরণ মেরে মাথে" কল্যাণের ধ্রুপদ গান করিয়াছিলেন। রামদাস-বাবু "গোরা গণেশ" কল্যাণের ধ্রুপদ গান করিয়াছিলেন। গোপাল-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি কেদামতী (প্রাচীন কালের) চিত্র ?" মহেশ-বাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কল্যাণের সনদী ধ্রুপদ দুই চারিটিই আছে।" বন্দে আলী খাঁ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কল্যাণ কা দো চার হী ধ্রুপদ সনন্দী, অওর সব রামানন্দী।" খাঁ সাহেব একটু কারণ করিতেন; তিনি হাসিতে হাসিতে "হাদিয়ে আল্লা" গান করিতে লাগিলেন এবং বীণা বাজাইতে লাগিলেন। আমি এই প্রথম বীণার সঙ্গে গান শুনিলাম; এবং পরেও একবার কাসিম আলী খাঁর গান বীণার সহিত শুনিয়াছি; আর তৃতীয় বার শুনি নাই। ৫০ বৎসরে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন ? এখনকার বীণাতে গৎ বাজান হইয়া থাকে এবং তার পরণ স্থানে ঠুংরী বাজান হইয়া থাকে।

গান শিখিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল; কিন্তু বলিবার সাহস নাই, কারণ স্কুলে পড়ি।

কিছুদিন পরে পুনরায় কাশীধামের মদনপুরায় স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী রায় বাহাদুর মহাশয়ের বাটীতে তন্ত্রকারদিগের সম্মেলন হইয়াছিল। বন্দে আলী খাঁ, সাদিক আলি খাঁ (উভয়েই বীণাকার); বাজ পাই সেতারী, অহম্মদ খাঁ সেতারী; স্থানীয় তন্ত্রকারদিগের মধ্যে মহেশবাবু (বীণকার), নকুড়-বাবু, মাণিক-বাবু (উভয়েই সেতারী); ইঁহারা সকলে নিজ নিজ যন্ত্র লইয়া উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবসায়ীরাই আপন আপন বাদ্যযন্ত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে গুণিগণ কাশীতে আসিলেই ধনী এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা গুণিগণের বিদ্যার পরিচয় লইবার নিমিত্ত ঐরূপে সকলকে আহ্বান ও সম্মান করিতেন। কেবল যে গুণের পরিচয় হইত তাহা নহে, গুণদাতা গুরুদিগেরও পরিচয় এবং গুণের বিচার হইত। সাধনার দ্বারা গুরুদত্ত দ্রব্য কতদূর কাহার লব্ধ হইয়াছে তাহারও পরিচয় প্রকাশ হইত। সকলে সভাস্থ হইলে কে অগ্রে যন্ত্র হাতে করিবেন ইহার নিমিত্ত পরস্পরের মধ্যে অনুরোধের আদান-প্রদান হইতে আরম্ভ হইল। আজকাল দেখা যায় যে, গৃহস্বামী তাঁহার মনোমত লোককেই আগে বাজাইতে বা গান করিতে বলেন। তখন লঘু গুরুজ্ঞান এবং বিচার করা কর্ত্তব্যবোধে কেহই আগে যন্ত্র হাতে লইতে সাহস করেন নাই। অবশেষে বন্দে আলী খাঁ কাশীর বৃদ্ধ বাজপেয়ী মহাশয়কে আগে বাজাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সেতার হাতে করিলেন এবং গণেশ সিং জী মৃদঙ্গ বাজাইলেন। বাজপেয়ী জী খর্ব্বাকৃতি লোক ছিলেন এবং তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার সেতার বড় দেখাইত। যখন বাম হস্তের সাহায্যে আলাপ করিতে লাগিলেন তখন বড়ই মধুর শুনাইয়াছিল। মীড়গুলি মর্ম্মভেদী এবং চিত্তাকর্ষক ছিল বলিয়া বন্দে আলী খাঁ বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রীতিমত আলাপ অর্থাৎ স্থায়ী আরোহী অবরোহী এবং সঞ্চারী এই চারি-বর্ণের আলাপ করিয়া তিনি পরণ বাজাইতে লাগিলেন; সেই সময়ে গণেশ সিং জীও মৃদঙ্গে ঐ পরণ বাজাইলেন। আজকালকার মত যেমন মৃদঙ্গ বাজান হইয়া থাকে তেমন নহে। আধুনিক মৃদঙ্গীরা কথায় কথায় তেহাই দিয়া থাকে, গায়কের মধ্যেও কেহ কেহ তেহাই দিয়া গান শেষ করিয়া থাকেন দেখা যায়। সে সময়ে নিয়ম ভিন্ন ছিল। যে বোল পরণ বীণাতে বাজান হয় সেই বোল পরণ মৃদঙ্গেও বাজান হয়; তাহা ছাড়া পরণেরও হিসাব আছে, অর্থাৎ সম্ কি তিন, সম্ কি ছয়, নও সম্ কি, সম্ কি বারহ। উপরন্তু আর একটি তেহাই আছে, তাহার নাম "বেমনঝা; ইহার উদ্দেশ্য যে শুনিলেই গায়ক গান অথবা তাল ভুলিয়া যাইবেন। তখন এই সমস্ত গুণ ও বিদ্যার পরিচয় দেওয়া ও লওয়া হইত। বাজপেয়ী জী সেতারে বাজাইলেন কিন্তু বীণার সমস্ত কাজই সেতারে দেখাইলেন; এই নিমিত্তই বন্দে আলি খাঁ অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন এবং বাজনা শেষ হইলে বাজপেয়ীজীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা এইরূপে

কাটিয়া যাওয়ায় সেদিন আর কাহারও কিছু হইল না। পর দিন বন্দে আলী খাঁর বীণা এবং অন্যান্য গুণীদিগের সেতার বাজনা হইয়াছিল, খাঁ সাহেবের বাজনার কথা আর কি বলিব? সে ঝঙ্কার যিনি শুনিয়াছেন তিনি ধন্য; এক্ষণে আর সেরূপ বীণাবাদন শুনা যায় না। তিনি বীণার আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং গণেশ সিং জী মৃদঙ্গ বাজাইলেন। পূর্ব্বদিবস অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক সঙ্গীত হইল; নানারূপ ছন্দ ও বাদ্যকৌশল উভয়েই দেখাইলেন। পূর্ব্ব দিবস চৌতালের তারপরণ বাজান হইয়াছিল; এদিন ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল চৌতালের মধ্যে সমাবিষ্ট করিয়া তারপরণ বাজান হইয়াছিল। গণেশ সিং জী অবলীলাক্রমে সংগত করিয়া খাঁ সাহেবকে সন্তুষ্ট করিলেন। খাঁ সাহেবও তাঁহার খুব প্রশংসা করিলেন। দুই ঘণ্টার পর সাদিক আলী খাঁর বীণা ও সেতার এবং অন্যান্য গুণীদিগের গান হইয়াছিল।

(২)

কাশীধামে মহেশচন্দ্র সরকার নামে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় বীণকার ছিলেন, ইনি বীণাশিক্ষা-ব্যাপারে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, একজন কারিকর বীণাযন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিল। সে আজ ৪০ বৎসরের কথা। বহুদূর দেশান্তর (চীন, জাপান প্রভৃতি স্থান) হইতে বংশ ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ইনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন এবং মনোমত বীণা প্রস্তুত না হইলে উহা নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। তিনি ছয়টি বীণা ছয় রকমের প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথমটি লাউ, দ্বিতীয় শ্বেতচন্দন, তৃতীয় গাম্ভার, চতুর্থ পিত্তল, পঞ্চম তাম্র, এবং ষষ্ঠ মিশ্র অর্থাৎ ফল কাষ্ঠ এবং ধাতু মিশ্রিত। কেবল ইহাই নহে; প্রত্যেক বীণার শয্যা এবং তৎপার্শ্বে রাগের ধ্যান লিখিত পালঙ্ক। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন এবং প্রথম রাত্রি, মধ্যরাত্রি ও শেষ রাত্রি—এই ছয়কালে তিনি ঐ ছয়টি বীণার পূজা করিতেন এবং ধ্যানস্তুতি করিয়া বীণা বাজাইতেন। কোন শ্রোতা সময়ানুসারে তাঁহার নিকট আসিলে তিনি সেই সময়ের বীণাই বাজাইতেন এবং অঙ্গুলি দর্শন করাইতেন ও শাস্ত্রীয় প্রথায় প্রস্তুত করিবার প্রণালী বুঝাইয়া দিতেন।

সরকার মহাশয়ের নিকট ব্যবসায়ী তন্ত্রকারেরা প্রায় আসিতেন। তন্মধ্যে আমরা যাঁহাদিগকে দেখিয়াছি তাঁহাদিগেরই নামোল্লেখ করিতেছি। বড় প্যার খাঁ, সাদিক আলী খাঁ, ছোট প্যার খাঁ, নিসার আলি খাঁ, এই কয়জনেই তন্ত্রকার। নিসার আলি খাঁ সুর শৃঙ্গার (রবাব) বাজাইতেন; ইনি কাশিম আলি খাঁর সহোদর ভাই ছিলেন। পঞ্চকোট অন্তর্গত কাশীপুর রাজবাটীতে কাশিম আলী থাকিতেন, পরে আগরতলা রাজবাটীতে ছিলেন। বিখ্যাত রবাবী বাসদ খাঁর বংশধর ইঁহারা ছিলেন এবং ইঁহারা সকলেই এখন লোকান্তরপ্রাপ্ত। নিসার আলী খাঁ সরকার মহাশয়ের বাটীতে ঘন ঘন আসিতে পারিতেন না, কারণ তিনি সহরের একপ্রান্তে থাকিতেন। প্যার খাঁ, সাদিক আলী খাঁ প্রত্যহই আসিতেন এবং সরকার মহাশয় তাঁহাদিগের নিকট হইতে তালিম পাইতেন। সরকার মহাশয় প্রথমে বাজপেয়ীজীর নিকট বীণা শিক্ষা করেন, পরে সাদিক আলি খাঁর নিকট হইতে বীণার হস্ত এবং অঙ্গুলির ব্যবহার শিক্ষা করেন। এই তন্ত্রকারদিগের প্রদত্ত কতকগুলি সরগম যাহা সরকার মহাশয় আমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন তাহা অন্যত্র পুস্তকে দিয়াছি। পান্নালাল নামে একজন কৈন ব্রাহ্মণ উক্ত নিসার আলী খাঁর নিকট সুরশৃঙ্গার শিক্ষা করিয়াছিলেন। পান্নালাল বড়ই উৎকৃষ্ট বাজাইতেন ও ধ্রুপদগানও করিতে পারিতেন। সেই সময়ে কাশীতে অর্জ্জুনজী বৈদ্য ছিলেন; ইনিও সেতার বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার রবাব শিখিবার ইচ্ছা হইলে নিসার আলি খাঁর নিকট প্রার্থনা করায় খাঁ সাহেব প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। বৈদ্যজী তীক্ষ্ণ-মস্তিষ্কবিশিষ্ট ছিলেন। যেখানে খাঁ সাহেবের বাজনা হইত বৈদ্যজী লুকাইয়া তাহা শুনিতেন এবং বাড়ী আসিয়া সেইগুলি নকল করিয়া বাহির করিতেন।

কোন সময়ে এক মজ্‌লিসে খাঁ সাহেব সেতার বাজাইয়াছিলেন। তাঁহার বাজনা শেষ হইলে অন্যান্য গুণীদিগেরও সেতার বাজনা হইয়াছিল; পরে বৈদ্যজীকে কেহ কেহ সেতার বাজাইতে অনুরোধ করায় তিনি যে-

সকল গৎ লুকাইয়া শ বয়াছিলেন সেইগুলি বাজাইলেন। খাঁ সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ গৎ কোথায় পাইলে?" বৈদ্যজী উত্তরে বলিলেন, "আপনারই নিকট শুনিয়া শিখিয়াছি।" খাঁ সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে শিখাইবেন বলিয়া তাঁহার বাটীতে যাইতে বলিলেন। গুরুশিষ্য এইরূপ কিছু কাল সাধনা করিতে লাগিলেন। অর্জুনজী কবিরাজী করিতেন এবং অবসর মত রাত্রিতে সুরশৃঙ্গার বাজাইতেন। পান্নালাল ব্যবসায়ী বলিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে পারিয়াছিলেন এবং ভাল বাজাইতেন। অনেকের ধারণা যে, মুসলমান ওস্তাদগণ সহজে কাহাকেও শিখাইতে চাহে না, কিন্তু আমরা বৈদ্যজীর মুখে উক্ত বিষয় শুনিয়াছি। অন্যান্য লোকের মুখেও ঐরূপ শিক্ষার কথা শুনিয়াছি। আমার ধারণা, শিষ্য উপযুক্ত হইলে গুরু শিক্ষা না দিয়া থাকিতেই পারেন না। সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়, অর্থাৎ শিষ্য মনে করিয়া থাকেন যে, "আমি শীঘ্র শীঘ্র গুরুর নিকট সমস্তই শিখিয়া লইব," কিন্তু সাধনার কথা উপস্থিত হইলেই গুরুশিষ্যে মনান্তর উপস্থিত হয়। অপর পক্ষে কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, গুরু শিষ্যকে হাতে রাখিয়া শিক্ষা দেন এবং পাছে শিষ্য তাঁহার সমস্ত বিদ্যা শিখিয়া লন এই নিমিত্ত শিষ্যকে অগ্রসর হইতে দেন না। শিষ্য শিক্ষা শীঘ্র সম্পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি জানেন না যে, গুরু কিরূপে ও কত কালে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কাজেই গুরু শিষ্যকে উপযুক্ত পরিশ্রম করাইয়া পাকা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। সময়ের গুণে শিষ্য অধীর হইয়া পড়েন বলিয়া গুরুর মত হইতে পারেন না, আমার এইরূপ ধারণা।

এই সময়ে কাশীতে বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি কাশীবাসের নিমিত্ত পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসেন। ইনি ছোট মিঞার (হাসু খাঁ) শিষ্য। হদ্দু খাঁ, হাসু খাঁ বিখ্যাত খেয়ালী ছিলেন। বাঙ্গালী-টোলায় সে-সময়ে আনন্দচন্দ্র সেন নামে একজন মৃদঙ্গী থাকিতেন; তাঁহার বাড়ীতে প্রতি বুধবারে গানবাজনা হইত। তখন আমি গান শিক্ষা করি নাই বটে, কিন্তু শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছা খুবই প্রবল ছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের খেয়াল শুনিয়া মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল, কিন্তু শিখিবার বাসনা পূর্ণ হইল না; সপ্তাহকাল মধ্যেই বৃদ্ধ ইহধাম ত্যাগ করিলেন। আজকাল অনেকেই খেয়াল গান করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহা পদ্ধতি-সম্মত তান তাহা দেন না, অথবা সেরূপ তানের সঙ্গে সংস্রব রাখেন না। খেয়ালে কেবল তান,—রকম রকম তান ও রকম রকম ছন্দ হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন লয়ে ভিন্ন ভিন্ন তান অর্থাৎ দুই তালের এক রকম তান, তিন তালের একরকম তান, সম হইতে গম পর্য্যন্ত একরকম তান; এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রকমের তান। রাগ বজায় রাখিয়া তাঁহারাই গান করিয়া গিয়াছেন। এখন আর সেরূপ শুনা যায় না; হয়ত যাইবেও না।

(ক্রমশঃ)

গ্রামের মেয়ে

(চিত্র)

শ্রী হেমমালা বসু

এবারের ছুটীতে কোথায় যাওয়া হইবে, এই আলোচনার আরম্ভ হইতেই আমি ছেলেদের বলিলাম, 'চল, আমার জন্মভূমি দেখে আসবে; কত বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে, বাবা মা'র মৃত্যুর পরে আমি আর সেখানে যাইনি। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে আমাদের জীবনের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে।'

খুড়তুত ভাই মন্টুকে ডাকিয়া মনের ইচ্ছা জানাইলাম; আমি দেশে যাইব শুনিয়া সে খুসী হইল ও তাহার স্ত্রীকে

পিত্রালয় হইতে আনিয়া আমাদের সঙ্গে সেই গ্রামে পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে চাহিল। শুনিলাম, দেশের বাড়ীতে কাকীমারা ছেলেদের লইয়া রহিয়াছেন, আমি সেখানে গেলে পরে পিসীমাও দেখা করিতে আসিবেন; শুনিয়া মনে বড় আনন্দ হইল, কত কাল পরে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে! তাহাকে বলিলাম, 'শুভস্য শীঘ্রম্—আজকের ট্রেনেই যাই চল; তা' হ'লে কালই সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারব।'

ট্রেন হইতে পাল্কী, পাল্কী হইতে ষ্টীমার, ষ্টীমার হইতে নৌকা এম্‌নি করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে দেশের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। বেলা অবসান হইয়া আসিল; এমন সুন্দর সন্ধ্যা যেন আর কোথাও দেখি নাই, সন্ধ্যার শান্ত সৌন্দর্য্য আমার মনকে এমন করিয়া আর কখনও অভিভূত করে নাই! এই সময়ে নৌকাখানি খাল ছাড়িয়া ইছামতী নদীতে আসিয়া পড়িল।

নৌকাখানা নদী ছাড়িয়া আবার খালে পড়িতেই মনু বলিয়া উঠিল, 'আর বেশী দেরী নেই দিদি, এইবারে এসে পড়েছি! আমাদের গাঁয়ের গাছগুলি ওই যে দেখা যাচ্ছে, চেয়ে দেখুন!'

'আর বেশী দেরী নেই'—একথা তো আমি বিকাল হইতেই শুনিতেছি, তবে এবারে গ্রামের গাছগুলি দেখা যাইতেছে, এই একটু ভরসা! ধীরে ধীরে চোখ তুলিয়া চাহিলাম, কিছুই তো দেখিতে পাইলাম না। আকাশ আঁধার করিয়া মেঘেরা জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, এ যে ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি আসিতেছে! মাঝীরা তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিতে লাগিল, যদি আমাদের ইহার পূর্ব্বে বাড়ী পৌঁছিয়া দিতে পারে। ঝড়ের আগে বাতাস 'গুম' হইয়া রহিয়াছে! দুই ধারে বন, তার মাঝখানে এই সরু খাল আর কি ভীষণ অন্ধকার! আমাদের নৌকাতে যা একটি আলো জ্বলিতেছে, দূরে ক্বচিৎ কোথাও গৃহস্থ-বাড়ীর আলো দেখিলেই সেই দিকে চাহিয়া থাকি, আর ভাবি এইটি যদি আমাদের বাড়ী হইত!

একটু পরেই ঝড় আরম্ভ হইল, খালের একধারে কয়েকখানা বাড়ীও এসময়ে দেখা গেল; মনু বলিল, 'দিদি, এইসব আমাদের প্রজাদের বাড়ী, দেখুন!' কি দেখিব, ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া শুধু একটুখানি আলো দেখা যায়, আর কিছুই নয়! বনের ভিতর তখন ঝড়ের হাওয়া সোঁ সোঁ করিয়া বহিতেছিল, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা টপ্‌ টপ্‌ করিয়া নৌকার ছাদের উপরে পড়িতে লাগিল। মনু নৌকা ভিড়াইতে মাঝিকে আদেশ করিয়া আমাকে বলিল, 'দিদি, এইবারে এসেছি!'

তাহার কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, এইবারে এসেছি! কে জানে কত যুগ আগে পৃথিবীর এইখানেই প্রথমে আমি আসিয়াছিলাম! হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির সহিত আমার রোদন-ধ্বনি মিশিয়া এই স্থানেরই আকাশ বাতাস পূর্ণ করিয়াছিল। আমাকে দেখিবার আগ্রহে, সেদিন প্রতিবেশিনীরা রাত্রি-শেষের নিদ্রাসুখ অগ্রাহ্য করিয়া দ্রুত পদে পল্লী-পথে ছুটিয়া আসিয়াছিল; আজও তো সেই আমি কত কাল পরে আসিয়াছি, এই ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া আজ কি কেহই আমাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিবে না!

নৌকা বাঁধা হইলে মনু ভৃত্য ও মাঝিদিগের মাথায় বাক্স বিছানা চাপাইয়া, হ্যারিকেনটি তাহাদের হাতে দিয়া বলিল, 'বড় বাড়ী, পাড়ায় জিজ্ঞাসা করিয়া যাইও। জিনিসগুলি রাখিয়া দুইটি আলো লইয়া শীঘ্র আসিও, তোমরা আসিলে পরে আমরা যাইব।' তাহারা বনের ভিতরে অদৃশ্য হইলে, দ্বিতীয় মাঝি একটি কেরোসিনের 'ডিবা' বাহির করিয়া তাহাই জ্বালাইয়া সেই ভীষণ আঁধার দূর করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এই অগ্নিশিখাটি আলো যতটা দিল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া আমাদের মুখে চোখে ধোঁয়া দিল তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী।

খানিক পরেই প্রবল বৃষ্টি ও ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল; মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের তর্জ্জন, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পতন, এ সব তো হইলই, ঘূর্ণী-ঝড়ে খালের ধারের গাছে গাছে যেন লড়াই বাধিয়া গেল। কেরোসিনের আলোটির ক্ষুদ্র প্রাণ ঝড়ো হাওয়ার একটি 'ঝাপ্‌টা'তেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঝড়-বৃষ্টি কমিলে ভৃত্যদের দর্শন পাওয়া গেল; কাকীমা রান্না চাপাইয়া দিয়াছেন শুনিয়া ক্ষুধার্ত্তগণ আশ্বস্ত হইয়া নৌকা ছাড়িয়া উঠিল; আমরা

এইবারে বাড়ী চলিলাম। সেই বনের পরেই একটি শুষ্ক খাল, তার ভিতরে আবার একটুখানি জলও দেখা যাইতেছে; পাহাড়ের মত ওঠা-নামা করিয়া অতি সাবধানে সেটি পার হইয়া মাঠে গিয়া পড়িলাম। উঁচু নীচু বন-পথ, মাঝে মাঝে জলপথ পার হইতে হইতে কত পথই যে চলিলাম একটি বড় পুকুরের পার দিয়া যাইতে যাইতে পা পিছলিয়া পড়িয়া গেলাম, গায়ে কিন্তু একটুও লাগিল না। এম্‌নি করিয়া ক্রমে বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম।

কলিকাতা হইতে কতকগুলি সরু সুতার 'ক্রুচেটবল' ও কুর্সীর কাঁটা আনিয়াছিলাম; এখানে তো লেখাপড়া হইবে না, আমার ঠাকুর-ঘরের দরজার জন্য একটা লেসের পর্দা প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে ছিল। সকাল-বেলা পুকুর-পাড়ে বসিয়া লেশ বুনি আর পাপিয়ার পিউ পিউ, বউ কথা কও, কোকিলের কুহুধ্বনি কান পাতিয়া শুনি। আমার সেই লেশ পল্লীবালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; সুতা ও কুর্সীর কাঁটা হাতে করিয়া কয়েকটি মেয়ে আসিয়া উহা শিখিতে চাহিল। তাহাদিগকে শিল্প শিক্ষা দিতে দিতে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে দেখিবার মত কি কি জিনিষ আছে, বল তো? শুধু এই পল্লীটির শান্ত সৌন্দর্য্য আর লতা, পাতা, ফুল, পাখী দেখেই কি আমি চ'লে যাব?'

একটি বালিকা বলিল, "সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ী দেখবেন চলুন।" "সেখানে পিসীমা এলে পরে যাব। আর দেখবার কি কিছুই নেই?" "ভিন্ গাঁয়ে আরও অনেক ঠাকুর-বাড়ী আছে।"

একটি চতুরা মেয়ে বলিল, "জন্মভূমি দেখতে এসেছেন, চোখ ভ'রে তাই দেখে যান; এর চেয়ে দেখবার জিনিস আর কি আছে বলুন।"

হাসিয়া বলিলাম, "তা ঠিক। দেখ, এখানে ব'সে ব'সে আমি ওপাড়ার বউদের রোজই দেখি, পুকুর থেকে জল তুলে কি বাসন মেজে নিয়ে যায়, একেবারে কলাবউটির মত সাত হাত ঘোমটা টেনে! আমায় দেখে অমন করে না তো?"

"না; ঘোমটার 'বহর' কম হ'লে মুখ দেখা যাবে যে; তা হ'লে এখানে নিন্দে হয়। এ গাঁয়ে আবার এমন বউও আছে যে নিন্দের ভয় করে না; তার সঙ্গে ঝগড়া কি মারামারিতে এখানকার পুরুষেরাও পারে না! তা'কে আপনি দেখবেন?"

"নিশ্চয় দেখ্‌ব! আমি সব দেখতে-শুন্‌তেই তো এসেছি; কে সে?"

"সে বাতাসীর মা; সিংপাড়ার গোরাচাঁদের বউ। আপনি এসেছেন শুন্‌তে পেলে সেই আপনাকে দেখতে আস্‌বে। ঘাসের মত রায়-বাবুর দাড়ী উপড়ে দিয়েছে সে, এত সাহস তার! তার পর থেকে এ গাঁয়ের সবাই তাকে ভয় ক'রে চলে।"

অবাক্ হইয়া শুনিলাম, এমন বীরাঙ্গনা বাঙ্গালীর ঘরেও আছে! এ দেশে এমন নারীর সংখ্যা যত বাড়ে ততই ভাল; নর-হস্তে নারী-নির্য্যাতনের কথা তাহা হইলে আর শুনিতে হইবে না, ইহার বিপরীত ঘটনাই না হয় ঘটিবে। এরূপ সাহসী ও শক্তিশালিনী নারী নিশ্চয়ই নারী সমাজের স্বপ্ন, বঙ্গমাতার কণ্ঠহারের রত্ন!

"বাতাসীর মাকে আজই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো, বুঝলে?" আগ্রহ-ভরে এই কথা বলিয়া বাড়ী চলিলাম।

বিকাল-বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া বসিয়া আছি, পাশের ঘরে তখন খুব তাস খেলা চলিতেছে; পিসীমা কখন উঠিয়া গিয়াছেন, জানি না। তিনি হয় ত তখন কাসুন্দী প্রস্তুত করিতেছেন, কিংবা মন্টু আজ কলিকাতা রওনা হইবে বলিয়া তাহার পথের খাবার গুছাইয়া দিতেছেন। আলস্য কাহাকে বলে ইহারা তাহা জানেন না। আমার খুড়তুতো বোন সরু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাতাসীর মা এসেছে, দিদি!"

ফিরিয়া নবাগতার দিকে চাহিলাম, এই বুঝি সেই বাতাসীর মা! যেমন শুনিয়াছি, ইহাকে দেখিয়া ত 'তেমনই' বলিয়া বোধ হইতেছে না। এই হাস্যময়ী নারীর মুখে তেজ কি গর্ব্বের ছায়া ত আমি দেখিতে পাইলাম না। উহার কোমল হাত দুইখানা যে শক্তিতে

পুরুষদিগকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা আমার বিশ্বাস হইল না।

সরু মাদুর বিছাইয়া দিলে সে বসিয়া বলিল, "আপনি এত কাল পরে দেশে এসেছেন দিদিঠাকুরুন, আপনাকে এখানকার কেউ এখন আর চিন্‌তেও পারবে না। আমারই মনে পড়ে না—সেই যখন ঠাকুরঝির সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে ওবাড়ীতে যেতেন, তখন আপনাকে দেখিছি, আর এই দেখলুম। অন্নপূর্ণাকে আপনার কি এখন মনে পড়ে, ছেলে-বেলায় কত খেলা করেছেন তার সঙ্গে। আমি তার বড় ভাজ।"

তখন অন্নপূর্ণা ও তাহার ছেলেমেয়ের কথা, কত কথা হইল। 'বীরত্বের' কথা উঠিতেই সে হাসিয়া বলিল, "আপনি এরি মধ্যে সবই শুনেছেন দেখছি! বেলা গেছে, আজ বাড়ী যাই; আর একদিন এসে আপনাকে এদেশের কথা বুঝিয়ে সুজিয়ে বল্‌ব।"

বাতাসী তখন আমার মেয়ে টুনুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল, সে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বাড়ী চলিল। আমি জানালার ধারে বসিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম, ক্রমে মা ও মেয়ে বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে রোগে পড়িয়া শরীর বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; সারাদিন চুপ করিয়া শুইয়া শুইয়া পাখীর গান শুনি, আর কত কথা ভাবি। দেশের কবিরাজের গুণেই আমার দুরারোগ্য রোগ সারিয়া আসিতেছে। দুর্ব্বলতার ভিতরেও এই রোগমুক্তির আনন্দ সর্ব্বক্ষণ আমার সারা দেহ-মন ঘিরিয়া থাকে; আমার দেশ! কত বড় দান তুমি আমাকে দিলে, আর আমি কি তোমাকে কিছুই দিতে পারিব না? ভাবিতে ভাবিতে মনের আবেগে কবিতা লিখিতে লাগিলাম।

"ওকি, অসুখ করেছে, তবু শুয়ে-শুয়েই যে লিখছেন, বড্ড দরকারী বুঝি?" এই প্রশ্নে সচকিতা হইয়া দেখিলাম, মেয়েরা লেশ ও সুতা হাতে করিয়া আসিয়াছে। হাসিয়া খাতা বন্ধ করিয়া বিছানার পাশে রাখিলাম। মেয়েটির কৌতূহল ইহাতে নিবৃত্ত হইল না, সে জিজ্ঞাসা করিল, "ও'তে কি লিখছিলেন আপনি?"

"ও কিছু নয়।"

"দেখ্‌ব" বলিয়া সে খাতা খানার পাতা উল্টাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "ও মা, আপনি কবিতা লিখছিলেন! দেখুন, এখানেও একটি কবি আছে; সে লিখ্‌তে পারে না, কিন্তু এমনি কথায় কথায় 'ছড়া' কাটে যে, শুন্‌লে অবাক হ'য়ে যাবেন। আমরা তা'কে 'কবি চণ্ডীদাস' ব'লে ডাকি। অসুখ সেরে গেলে আপনাকে একদিন তার বাড়ীতে নিয়ে যা'ব।"

আর-একটি মেয়ে বলিল, "থাম্! সে হ'ল ছোট লোক, যুগী, তার বাড়ী উনি কক্ষনো যাবেন না।"

প্রথমা বলিয়া উঠিল, "মহাত্মা গান্ধী বুঝি 'যুগী' জোলাদের ঘেন্না করতে তোকে ব'লে গেছেন? তিনি কি বলেননি যে, যাদের আমরা ছোট লোক ভাবি, তারা কেউ ছোট লোক নয়, তাদের হাতের জলও খেতে পারা যায়? তুই চুপ কর্‌ ত, তোকে কেউ কথা বল্‌তে ডাকেনি!"

দ্বিতীয়া নীরব রহিল দেখিয়া আমি বলিলাম, "তোমাদের কবিটির কি নাম? আজ তার কবিত্বের পরিচয়টাই কেন দাও না, কবিতা শুন্‌তে আমি খুব ভালোবাসি। কোথা থাকে সে?"

উৎসাহের সহিত উত্তর হইল, "আপনাদের বাড়ীর পেছনের পুকুরের ওপাড়ে যুগীপাড়া; চণ্ডী ঐখানেই থাকে, সে মহেশ যুগীর বউ। 'ছোট' জাত হ'লেও ওরা লোক খুব ভালো; আমাদের সেমিজের জন্যে রঙীন কাপড়, ব্লাউজপিস বল্‌লে পরেই বুনে দেয়। আর এমন চমৎকার নীলাম্বরী, দাঁতপাড় তাঁতের সাড়ী সব বোনে যে, দেখলেই কিন্‌তে ইচ্ছে করে। স্বদেশী হ'য়ে ওদের খুব ভাল হয়েছে।"

গরীবের উন্নতির কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল; মেয়েটির হাতখানা ধরিয়া বলিলাম, "আমার যদি অসুখ না থাক্‌ত, তবে আজই সেখানে যেতাম; তিন চার দিন পরেই বোধ হচ্ছে যেতে পারব, এখন শুধু কানে শুনেই সুখী হই। তোমাদের চণ্ডী কবির দু'একটা ছড়া-টড়া ব'ল না, শুনি; মনে আছে ত?"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "আছে বই কি, শুনুন!

একদিন আমি রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকুচ্ছিলুম, চণ্ডী ঐ দিক দিয়ে কোথা যাচ্ছিল, আমায় বল্লে, "এই 'খর' রোদে দাঁড়িয়ে কি কর্‌ছ গো মেয়ে?" আমি বল্লুম, 'যা কর্‌ছি, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছিস! হ্যাঁরে চণ্ডী, তোকে কখনো এ কাজ কর্‌তে হ'নি, না? মাথায় যে ক'গাছি 'কেশ' ভগবান দিয়েছেন, সে ত আপনিই শুকিয়ে যায়—' সে অম্‌নি হাত মুখ নেড়ে বল্লে কি জানেন—

'আমার ছিল কেশের রাশি—উকুনে খেয়েছে,
দেখেছে সব পাড়া-পড়সী, যারা মাথা চেয়েছে;
চাঁদ চাইলে কাঁধ পেয়েছে, শু'লে পেয়েছে পাটী,
ঝেড়ে ঝুড়ে বেঁধেছি যেই—এইটুকুন ঝুঁটি।'

আমাকে শুধু নয়, সবার সঙ্গেই সে এম্‌নি ক'রে কথা বলে; আর একদিন আমার মা চণ্ডীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন,'অমন হন্ হন্ ক'রে কোথা যাচ্ছিস্ চণ্ডী, দাঁড়া না একটু! তোর বউমার শুনলুম সেদিন ব্যথা উঠেছিল, কি ছেলে হ'ল? গাইটা ছাগীটিও না কি তোর বিইয়েছে, সত্যি নাকি?'

চণ্ডী হেসে বল্লে, 'সব সত্যি, বউঠাকরুণ—

ছাগীটির পাঁটা, বউমার বেটা,
আর 'লালীর' হয়েছে 'বকন',
আমি সুখের কথা কইব কখন!"

"বেশ মজার মানুষ ত!" আমি হাসিয়া বলিলাম, "কাল আর যাব না, পরশু তুমি আমায় ওদের বাড়ীতে নিয়ে যেও, কেমন?"

মেয়েটি বলিল, "ওদের বাড়ীর সবাই মজার; ওর বড় ছেলে মধু কলকাতায় কাজ শেখে। অনেক দিন মধুর খবর না পেয়ে তার বউয়ের বড্ড ভাবনা হ'ল। আমাদের সঙ্গে দেখা হ'লেই বল্‌তো, 'কলকাতা গিয়ে আর চিঠি দেয়নি, কেমন আছে কে জানে!' একদিন দেখ্‌লুম ওর দেওর সিধু একখানা চিঠি নিয়ে চলেছে ডাক-বাক্সে ফেলে দিতে। মধুর বউ এই চিঠি লিখেছে শুনে আমি তার হাত থেকে চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে দেখলুম, বাঁকা বাঁকা অক্ষরে খামের ওপরে লেখা রয়েছে—মধু যোগী, জেলা কলিকাতা।

আমি সেই অদ্ভুত ঠিকানা প'ড়ে চিঠিখানা পড়বার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লুম না। একটু জল দিয়ে খামখানা তখনি খুলে ফেল্লুম। তার ভেতরে সিধুর বইয়ের একখানা ছেঁড়া পাতায় এই ক'টি কথা লেখা ছিল—

চিন্তা করিতেছি অতিসারে আসিও।

এই বউটি তবু া ি গুলো লিখতে শিখে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করেছিল।

আমি চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে বউটিকে বল্লুম, "একি তুই লিখেছিস, বউ? মধু যেখানে থাকে সে বাড়ীর নম্বরও তো দিসনি; এ চিঠি তোর যাবে না।"

বউ কিছুতেই তা বোঝে না, বলে, "ডাকে দিলেই যাবে দিদি, তুমি চিঠিখানা ডাক-বাক্সে গে ফেলে দাও।' আমায় হাস্‌তে দেখে মিনতি ক'রে বল্লে, 'দেখো দিদি, চিঠিখানা যেন ডাকে ফেলে দিও; লিখতে কি জানি ছাই; বড় ভাবনা হয়েছে মনে তার খবরটা পাবার জন্যে, তাই ওটুকু লেখা। তুমি যদি চিঠিখানা ডাকে না দিয়ে আর কোথাও ফেল্‌বে, তবে আমার মাথা খাবে!' আমি উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, 'সে চিঠি কি তুমি ডাকে দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ; মধু বাড়ী এসে চিঠির কথা শুনে বল্লে, 'সে চিঠি-ফিটি কিছু পায়নি।' বউয়ের কি তা বিশ্বাস হয়, সে রাগ ক'রে বল্লে, 'লিখলে পরে সবাই ত চিঠি পায়, আর তুমিই শুধু পেলে না? পেয়েছ নিশ্চয়; জবাব দাওনি কি না তাই মিছে কথা বলছ।'

একদিন বিকালে পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। সঙ্গিনী আমার ছাত্রী। পাড়ার শেষ প্রান্তে ফুল-লতা-পাতা-ঘেরা একটি টিনের বাড়ী দেখাইয়া মেয়েটি বলিল, 'এই দেখুন, চণ্ডীর বাড়ী।' কবির উপযুক্ত বাসস্থানই বটে! এইটুকু পথ গেলেই আর কি, চণ্ডীদাসের দর্শন লাভ করিতে পারিব। গতির বেগ যথা সম্ভব বৃদ্ধি করিলাম; কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কবিত্বের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে বোধ হয় এম্‌নি বেগেই আসিয়াছিলেন। কিন্তু একি! ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইলাম, বাড়ীতে কে কাঁদিতেছে।

আমার শুষ্ক ভাব দেখিয়া মেয়েটি মৃদুস্বরে বুঝাইয়া

বলিল যে, মহেশ যুগী লোকটা নিতান্ত নীরস প্রকৃতির, সে কবির মর্য্যাদা সব সময়ে রাখিতে পারে না। তাহার সহিত বচসা হইলে চণ্ডীর ভাগ্যে যাহা ঘটে, আজও সেইরূপ কিছু হইয়া থাকিবে। আমি নীরবে সেই বাড়ীটির পিছনে দাঁড়াইয়া শুনিলাম, কবি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—

'আমি যাব বাপের বাড়ী
বাপের বাড়ী গেলে পরেই পায় ধরাতে পারি ;'
ওরে, ও—

স্বামীকে সে ইহার পরে যে-সব সম্বোধন করিতে লাগিল, কবিতা হইলেও আমি তাহা শ্রবণ করা অনুচিত মনে করিয়া, চক্ষুর তৃষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

পথের এপাশেই পড়িল সিংহপাড়া; আমাকে বাতাসীর মার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মেয়েটি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল।

আমি তাহাকে বলিলাম, 'তুমি বাড়ী যাও, আমি এখানে একটু বস্‌ব।' তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ঘরের দাওয়ায় শীতল পাটী বিছাইয়া আমাকে বসিতে বলিয়া বাতাসীর মা তুলসী-তলায় প্রদীপ দিতে গেল। মেয়েটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাড়ীতে আর কেহ তখন ছিল না, শুধু মা ও মেয়ে। বাতাসী রান্না-ঘরে কি করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া নিকটে আসিল; তাহার মা ফিরিয়া আসিলে সে তেমনি নীরবে চলিয়া গেল। বাতাসীর মা দাওয়ার উপরে দীপ রাখিতে চাহিলে আমি নিষেধ করিলাম।

আমি বলিলাম, 'আজ খুব বেড়িয়েছি, বাতাসীর মা। তবু তোমার বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে অম্‌নি চ'লে যেতে পারলুম না, এখানেও একবার বেড়াতে এলুম।'

সে ম্লান হাসিয়া বলিল, "আমি কখনও ভাবিনি যে, আপনি এ বাড়ীতে আস্‌বেন। দেশে এসেই আমার নামে যে-সব নিন্দে শুনেছেন, তা'তে ক'রে—

'তোমার নিন্দে।' আমি ভাবিয়া বলিলাম, 'শুনেছি বটে তুমি পুরুষদের একটু—আমি কিন্তু তা'তে নিন্দের কিছু দেখতে পাই না। দুষ্টকে যে দমন করে, বিশেষ মেয়ে হ'য়ে যে একাজ কর্‌তে পারে, আমি তার প্রশংসাই করি।'

বাতাসীর মা উৎসাহের সহিত বলিল, এইজন্যই ত আমার এত নিন্দে হয়, দিদি। আমি বুঝতে পারি না, এই দুটো জাতে এত তফাত হয় কেন? যদি একটা মেয়ে না বুঝতে পেরে কোনো দোষ ক'রে ফেলে, পাড়া শুদ্ধ সবাই ছুটে আসে তা'কে শাসন কর্‌তে; পুরুষরা যে কত অন্যায় করে, তা'তে কেউ কিছু বলে না, তাদের সব দোষ বেমালুম চাপা প'ড়ে যায়। বিনা দোষেও কত মেয়েকে ভুগতে দেখলুম; মহা অপরাধ ক'রেও ওরা কেমন বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। এইজন্যে ওজাতটার সঙ্গে আমার বিরোধ লেগেই রয়েছে। আমার সাম্‌নে কেউ কিছু করলে, তা তিনি গাঁয়ের জমিদারই হোন না কেন, আমি তা'কে এমনি শাস্তি দিই, যেন কিছুদিন সে-কথা তার মনে থাকে। দুষ্টদের দমন কর্‌লে ভগবান ত তুষ্ট হবেন। মানুষের মুখের কথায় আমার কি ক্ষতি হবে, দিদি?'

"সে তো সত্যি; কিন্তু তুমি এইসব 'দুষ্টদের দমন' যে কি ক'রে কর, আমি তা বুঝতে পারলুম না, বাতাসীর মা। সাহস থাক্‌লেই তো হ'বে না, ওদের সঙ্গে লড়তে হ'লে গায়ের জোরও খুবই দরকার। তোমার অবিশ্যি এত জোর নেই যে, একটা জোয়ান পুরুষকে হারাতে পারো।'

'কি যে বল, দিদিঠাকরুণ! মা কালী শুম্ভ, নিশুম্ভ, আরও অনেক ভীষণ বলবান দৈত্যদের বিনাশ করেছিলেন সে কি শুধু গায়ের জোরে? এসব কাজে সাহস আর বুদ্ধিরই বেশী দরকার, গায়ের জোর একটু অবিশ্যি চাই; ওদের গায়েই বা এমন কি জোর? দেখতেই সব এক-একটা হোমরা-চোমরা বুনো চেহারা, গায়ে এত কিছু জোর নেই যে, হারাতে পারা যাবে না। আরও একটা মজা দিদি, আমি লড়তে গিয়ে টের পেয়েছি, ওদের সইবার শক্তি একটুও নেই; যে-ব্যথা আমি অনায়াসে সইতে পারি, ওরা তাতে একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়ে! মেয়েরা সাহস নেই ব'লেই ত মরে, নইলে বুঝে ঘা দিতে পার্‌লে ওরা সহজেই কাবু

হ'য়ে পড়ে। আমাকে ত কই, কেউ এখনো হারাতে পারলে না।

আমি অবাক্ হইয়া শুনিতেছি দেখিয়া সে আবার বলিল, একটা ঘটনা শোনেন তো বলি। রাত হ'য়ে যাবে দিদিঠাকরুণ, তা আমি আপনাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসব। আপনি রায় পাড়া বেড়াতে গেছলেন কি? যদি ওদিকে যান, তবে—বাবুর বাড়ীতেও যাবেন। বউটি বেশ ভালো, কিন্তু বাবু ভারী খারাপ; তার ক্ষমতা আছে, জমিদার-বাবুর কুটুম কি না, যা ইচ্ছে তাই করতে যান। আমি দাড়ী ছিঁড়ে দিয়ে ওঁর স্বভাব অনেকটা শুধরে দিয়েছি!

'একদিন দিদি, ভোরের বেলা পুকুর-ঘাটে মুখ ধু'তে গিয়েছি; রায় বাবু তখন পুকুরের ওপারে পাইচারী করতে করতে এদিক পানে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছিলেন; হঠাৎ আমার নজর প'ড়ে গেল; মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, শশী তাঁতির বউও তখন বাসন মাজতে বসেছে। বেড়াল যেমন তার বড় চোখ আরও বড় ক'রে শিকারের দিকে চেয়ে থাকে, উনিও তেমনি জলন্ত দৃষ্টিতে সেই সুন্দরী বউটির আধ-ঘোমটা-ঢাকা মুখের পানে বিশ্রী ভাবে চেয়েছিলেন। তার পর থেকে রোজ সকাল-বেলা রায় বাবুকে পুকুরের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেতে লাগল। মেয়েদের কাজ করবার ঘাট—তা এখানকার পুরুষগুলো যা, কেউ তাঁকে কিছুই বলতে সাহস করল না।

রায় বাবু ক্রমে ক্রমে পুকুরের এপারে এসে, একে বারে শশীদের ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে, এই গাছগুলোর ভেতরে—কোনটা কোনটা তাঁর—ওর কোন্ ডাল কে কবে কেটে নিয়েছে, এই সবের তদারক করতে লাগলেন। বেগতিক দেখে বউটি আর বাড়ীর বার হ'ত না, তার শাশুড়ী তখন ঘাটের কাজ সারতে লাগল। রায় বাবুও ঘাট মাঠ ছেড়ে, শশীর বাড়ীর সামনের রাস্তায় এসে অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। রোজ রোজ তাঁর এইরকম ভাব দেখে দিদি, আমার তো একেবারে অসহ্য হ'ল; তবু গায়ে প'ড়ে আর ঝগড়া করলুম না, চুপ চাপ থেকে সব দেখে যেতে লাগলুম।

শশীর মা আর বউতে একদিন কি কথা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল, শশী তখন বাড়ী ছিল না। গোল বেড়ে চলেছে দেখে আমি আর পাঁচুর মা ওবাড়ীতে গেলুম দেখি যদি থামিয়ে দিতে পারি। ওমা, দেখি কি, রায় বাবু ওদের বাড়ীর ভেতরে হন্ হন্ ক'রে রান্না-ঘরে গিয়ে শশীর মাকে ধমকে বলছেন, 'ওকি করছিস বুড়ী? একলা পেয়ে বউটিকে তুই মেরে ফেলবি নাকি! শশীর মাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে যেমন তিনি বউয়ের সামনে যাবেন অমনি দেখলেন আমি শশীর বউকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে, রুখে উঠে তাকে বললুম, 'একি করছেন আপনি, বাবু। মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়া হচ্ছে, আপনি কেন তার ভেতরে এসেছেন? বাইরে যান শীগগির। তিনি প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে আমার পানে চাইলেন, তার পরেই বাঘের মত গর্জ্জে উঠলেন, কি, আমাকে তুই হুকুম করছিস? হারামজাদী, এত আস্পর্দ্ধা তোর!' এই ব'লে যেই ঘুসী তুলেছেন, আমিও অমনি ঝট ক'রে তাঁর দাড়ীর গোছা ধ'রে, ঘাসের মত সেগুলো পটাপট ছিঁড়ে ফেলতে লাগলুম। তখন আমার আর জ্ঞান ছিল না। পাঁচুর মা বললে, বাবুও আমার পিঠে দু চারটে 'চড়-চাপড়' বসিয়ে দিয়েছিলেন, আমি কিন্তু কিছু টের পাইনি। দাড়ীগুলোর অর্দ্ধেকটা উপড়ে ফেলতেই রায় বাবু ব্যাথায় অস্থির হ'য়ে ব'সে পড়লেন; রক্ত-মাখা তাঁর মুখখানা তখন যে কি ভীষণ দেখাচ্ছিল, দিদি! মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি তখন পেছন ফিরে দেখলুম, শশীর বউ লজ্জায় বেড়ার সঙ্গে যেন মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর সবাই অবাক্ হ'য়ে এই কাণ্ড দেখছে। উনুনে কি চাপানো ছিল, আমি তাই থেকে একখান পোড়া কাঠ নিয়ে বাবুর পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে বললুম, পালিয়ে যাচ্ছ? ওগো বাবু, যাও। এমন পিরবিত্তি নিয়ে আর কখনো এ পাড়ায় পা বাড়িও না—আজকের এ ঘটনা এ বেদনা যেন তোমার মনে থাকে।"

রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতেশুনিতে আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তোমায় যে ওরা অমনি ছেড়ে দিয়েছে বাতাসীর মা, আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। ঘরে আগুন ধরিয়ে

দেয়নি বা আর কোনো রকমে এর শোধ নিতে চেষ্টা করেনি? ধন্য সাহস তোমার, বাঘের সঙ্গে লড়তে চাও।" বাতাসীর মা হাসিয়া বলিল, "একথা সবাই বলে, দিদি। সাহস না থাকলে এসব দেশে বাস করা চলেও না; তবে আমি একটু বেশী দূর এগিয়ে যাই। সবাই ঘর সাম্‌লায়, আমি পর সাম্‌লিয়েও মরি। ভেবে দেখুন তখন যদি আমি ওকে তাড়িয়ে না দিতুম, ওই বউটিকে কি অপমানই করত সে।"

'কি ভয়ানক! বল বাতাসীর মা, তার পরে কি হ'ল?'

'এ কথা তো একেবারে চারদিকেই ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ী গিয়ে রায় বাবু বাকি সমস্ত দাড়ী টাড়ী ছেঁটে ফেলে ঘায়ে মলম লাগিয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে পড়লেন। শত্রুরা মজা দেখতে ভালো মানুষ সেজে তাঁর বাড়ীতে যেতে লাগল আর তাঁর মিন্সেরা মেয়ে-মানুষের স্পর্দ্ধা দেখে চটে মটে আমাদের জমিদার সেজ বাবুর কাছে আমার নামে নালিশ ক'রে এল।

'দু' দিন বাদে পরে বাইরের ঘরটায় ব'সে, কে এ বাড়ীর কর্ত্তাকে খুব কড়া কড়া কথা বল্‌ছে শুন্‌তে পেয়ে আমি দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলুম, সেজ বাবু এসেছেন। তিনি তখন বল্‌ছিলেন, 'তোমার স্ত্রীর অত্যাচারে দেখছি এ গাঁয়ে ভদ্রলোক আর বাস করতে পারবে না! রায় বাবুর কি করেছে সে শুনেছো? ওকে তোমার আচ্ছা ক'রে শাসন করা দরকার; যদি না পার, তবে বল; আমাকেই তা হ'লে এর বিচার করতে হ'বে।'

আমি ঘরে গিয়ে বললুম, "ওকে আপনি মিছে আদেশ করছেন বাবু, ও কিছু করতে পারবে না; আমার হাতের কাঁকণের দাগ ওর পিঠেই যে, কত রয়েছে! আপনি বিচার করতে চাইছেন, তাই করুন! কিন্তু দেখবেন, বিচারের নামে যেন অবিচার না হয়—রায় বাবু শশীর বউকে যে অপমান করতে গিয়েছিলেন, আগে তাঁর বিচার করুন ত, তার পরে আমায় যে শাস্তি দেবেন, আমি তা মাথা পেতে নেবো।"

'সেজ বাবু চম্‌কে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন, তার পরে আর কিছু না ব'লে সোজা বাড়ী চ'লে গেলেন। এ গোল এইখানেই মিটে গেল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা বাতাসীর মা, তুমি যে বল্‌লে, গোবরচাঁদের পিঠে তোমার হাতের কাঁকণের দাগ কত রয়েছে, এ কথাও কি ঠিক? তুমি স্বামীকে ও এই রকম শাসন-টাসন কর না কি?"

সলজ্জ হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া সে বলিল, "একথাও মিছে নয়, দিদি! লুকোব আর কেন? বড্ড ভাল মানুষ, একেবারে গোবেচারা। কখনো কারু সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না। তবু যে কেন তার ওপরেও একদিন একদিন আমার রাগ হ'য়ে পড়ে, তা আমি নিজেই বুঝতে পারি না! আমার মনে হয় দিদি, এবারে আমি এই করতেই জগতে এসেছিলুম! আমার স্বভাবই ওইরকম হ'য়ে গেছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'বেশ, ভালো! তোমার বীরত্বের কথা শুন্‌তে আমার বড্ড ভালো লাগছে, বাতাসীর মা, আরও কিছু থাকে ত বলো। তবে স্বামী বেচারীকে একটু রেহাই দিও।"

আমার কথা শেষ না হইতেই পিসীমার পুত্র মুকুন্দ হারিকেন হাতে লইয়া সেখানে আসিল, কাকীমা তাহাকে পাঠাইয়াছেন; আর এসব আশ্চর্য্য কাহিনী শোনা হইল না; উঠিয়া পড়িলাম। বাতাসীর মা আমার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া একটা গাছতলায় দাঁড়াইল, আর খানিক দূর গেলেই আমাদের বাড়ী। নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি; নির্জ্জন পল্লীপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া মুকুন্দ একটা স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে চলিল, তাহা শুনিতে-শুনিতে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া আমি ফিরিয়া দেখিলাম, একটি ছায়ার মত বাতাসীর মা, তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কে বলিবে ওই নম্র মূর্ত্তিটি এমন মহিষমর্দ্দিনীর!

বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, ছোট বাড়ীর ঠাকুরমা আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন; তিনি আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এত রাত এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারো, আর আমাদের বাড়ী একটি বার যেতে পারলে না? আমি দেখ তোমার জন্যে কখন্ এসে ব'সে আছি। কলকাতার 'সভ্য' মানুষেরা

বুঝি শুধু ছোট লোকদের সঙ্গে মিলে-মিশেই মজা পায় ?”

এই মৃদু তিরস্কারে আমি একটু লজ্জিতা হইয়া বলিলাম, ‘আপনাদের বাড়ী যাব বই কি ঠাকুরমা, এখানে ত বেড়াতেই আমি এসেছি। বাতাসীর মার সাহস আমায় অবাক্ করেছে কি না, তাই তার কাছে গিয়েছিলুম। আচ্ছা, পুরানো বাড়ীর সেজ বাবুও তাকে ভয় করলেন ?’

‘ওকে ভয় করে এখানকার সব্বাই, এতে আর অবাক্ হ’বার কি আছে, ভাই। এখন ত এই রকমই হয়েছে, জমিদাররা সব প্রজার ভয়ে শশব্যস্ত। কর্ত্তাদের আমলে প্রজারা বাবুদের সঙ্গে কথাটি কইতে সাহস পেত না; একটা কিছু অন্যায় করলে হয় ত তার ‘জানই’ নিয়ে বসতেন; ভিটে মাটি উচ্ছন্ন, সে ত কথায় কথায় করতেনই। এখনও আঁধি পুকুরের পাড় খুঁড়লে পরে কত মড়ার মাথা নর-কঙ্কাল বে’রিয়ে পড়ে। সেজ বাবুর বাবার সময় থেকেই সে-সব দিন গিয়েছে। তিনি ছিলেন ভারী ভয়কাতুরে। তারই ছেলে ত সেজ বাবু, তার কত সাহস হ’বে বল, বাতাসীর মা ওকে আর তুচ্ছ করবে না!

আমি বলিলাম, ‘কাউকে ভয় পেতে দেখলে ওরাই আবার ঠাট্টা ক’রে বলেন, ওতো মেয়েমানুষ; বাতাসীর মা এদেশের মেয়েদের এ অপবাদ ঘুচিয়েছে। রায় বাবু শুনেছি একটি ভয়ঙ্কর লোক, সে তাকেও কেমন জব্দ ক’রে দিয়েছে—শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে। তখন যদি আমি এখানে থাকতুম, এসব কাণ্ড দেখলে পরে বড্ড খুসী হতুম, ঠাকুরমা!’

‘বাতাসীর মা যে সেজ বাবুর জামাই তাড়িয়েছে, তা বুঝি তুমি এখনো শোননি? সে তার নন্দাইকেও এমনি শাস্তি দিয়েছে যা সে কখনো ভুলতে পারবে না! পুরুষদের ‘দোষ ঘাট’ সে কক্ষনো সহ্য ক’রে যায় না। শুধু সেজ বাবু কেন, সব বাবুই সেজন্য ওকে মনে মনে ভয় করে।’

‘বলুন ঠাকুরমা, কেন সে ওসব করেছিল, আমার শুনতে বড্ড ইচ্ছে করছে, বলিয়া আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। ‘ইচ্ছে করছে তো শোনো! আচ্ছা, ওদের বাড়ীর কথাটাই আগে বলি। বাতাসীর বড় পিসী অন্নপূর্ণাকে কি তোমার মনে পড়ে? ছেলেবেলায় তার সঙ্গে কত খেলা করছ; সে পড়েছে একটা হতভাগার হাতে। নিবারণ কিছু করে না, কাজেই ঘরে নিত্য অভাব। অন্নপূর্ণা ধান ভেনে, পরের বাড়ীতে রান্না ক’রে কোনো রকমে সংসার চালায়। নিবারণ বাবু সেজে ব’সে থাকে, নয়তো ছেলে কোলে ক’রে একটু বেড়ায়। কাজ করতে বললে একেবারে মারমুখো হ’য়ে ওঠে। মেয়েটাকে তো মেরে মেরে হাড় কখানা সার করেছে—’

ঠাকুরমা বলিয়া যাইতেছিলেন, ‘মা বাপ ম’রে গেলে সে আর এখানে বড় আসত না; যত কষ্টই হোক, সব স’য়ে স্বামীর কাছেই থাকত; একদিন বড় অসহ্য হ’তে ছেলে মেয়ে নিয়ে সেই অতদূর থেকে হেঁটেই এখানে এসে পড়ল। বাতাসীর মা ওদের দেখে তো খুব খুসী! “ওলো ছোটবউ বেরিয়ে এসে দেখ্ কে এসেছে; এত দিন পরে আমাদের কথা মনে পড়ল কি, ঠাকুরঝি! এসো ভাই, এসো’—ব’লে সে আদর ক’রে অন্নপূর্ণাকে ঘরে নিয়ে বসালে, ছেলেদের মুখ মুছিয়ে জল খেতে দিলে। ভাই-ভাজের কাছে যত্ন পেয়ে অন্নপূর্ণা সেখানে সুস্থির হ’য়ে রইল, তার শরীর ও আস্তে আস্তে বেশ সুস্থ হ’য়ে উঠল।

‘মাস দুই পরে একদিন বিকেলে নিবারণ এসে উপস্থিত; বাইরের ঘরে গিয়ে সে গোরাচাঁদকে বললে, ‘এদের নিয়ে যেতে এসেছি।’ বাতাসীর মা তাকেও অযত্ন করলে না, আপনি পাঁচ রকম রান্না-বান্না ক’রে নন্দাইকে বেশ ক’রে খাইয়ে, ওপাশের ঘরটায় ওদের শোবার ব্যবস্থা ক’রে দিয়ে তবে সে ঘুমুতে গেল।

অনেক রাত্রে অন্নপূর্ণার কান্না শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এরি মধ্যে ওদের খুব ঝগড়া হ’য়ে গেছে; এখানে এসেও নিবারণ ‘নিজ মূর্ত্তি’ ধরেছে! বাতাসীর মা তখনি এক গাছা বেত হাতে ক’রে ওঘরের দোর ঠেলে ডাকলে, বুড়ী, ওবুড়ী দোরটা একবার খোল্তো!’ বুড়ী মেয়েটা বাপের কাণ্ড দেখে ভয়ে কাঁপছিল, মামীর সাড়া পেয়ে উঠে এসে দোর খুলে দিলে।

নিবারণ তখন নাকি দাঁড়িয়ে ছিল। অন্নপূর্ণা বিছানার কোণে ব'সে, বাতাসীর মা ঘরে ঢুকেই আগে সেই ছিপ-ছিপে বেত গাছটা সপাসপ্ নিবারণের পিঠে বসিয়ে দিলে ঘা কতক! তার পর বল্লে, 'তোমার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! নিজের বাড়ীতে ঠাকুরঝিকে কত কষ্ট দাও, কত অপমান কর; এখানে এসেও ওর গায়ে হাত তুল্‌তে তোমার সাহস হ'ল? যার বাড়ীতে, এসেছ, তাকেই অপমান! যত বল্‌ছে, বেতগাছটি তত জোরে নিবারণের পিঠে, বুকে, মুখে কেটে কেটে পড়ছে। ব্যথায় অস্থির হ'য়ে সে তক্ষুনি লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে সোজা ছুট দিলে। বাতাসীর মার মনেও কি ভয়-ডর কিছু নেই! সে সেই নিশুতি রাতে তার পেছন পেছন তাড়া ক'রে বটগাছটার ওধার পর্য্যন্ত গেল। নিবারণকে তাড়িয়ে দিয়ে বাড়ী আস্‌তেই গোরাচাঁদ ওকে বকতে লাগল। বাতাসীর মা আর কথাটিও না ব'লে বাকী রাতটুকু অন্নপূর্ণার পাশে শুয়ে প'ড়ে রইল।"

"তার পরে নিবারণ কি আর ওখানে এসেছিল, ঠাকুরমা?"

"আস্‌বে না তো কি করবে? যারা অকারণ মানুষকে অপমান করে বোন, ওসব সইতেও তো তারাই পারে! চার পাঁচ মাস হ'য়ে গেল, অন্নপূর্ণা আর যায় না দেখে নিবারণ আবার এল। কুঁড়ে তো. কাজ ক'রে খেতে পারে না, ছেলেদের ছেড়ে থাকৃতেও চায় না! কত ব'লে ক'য়ে মাপটাপ চেয়ে তবে এবার তা'কে নিয়ে গেছে। এখন হয় তো অভাগীকে সে একটু 'যত্ন-আত্তি' করে, তার পর থেকে আর কিছু গোলমাল শুনতে টুনতে পাইনি। যাই ভাই, রাত হ'য়ে গেল; কাল পরশু তুমি একবার 'ছোট বাড়ীতে' যেও।"

'এখুনি যাবেন কি, ঠাকুরমা! সেজ বাবুর জামাই তাড়ানোর কথাটাও ব'লে যান, আমার শুনতে বড্ড ইচ্ছে করছে।'

'সে আর কি ক'রে বলি দিদি, সে হ'ল আমাদের ঘরের কথা; বিশেষ ওবাড়ীর কথা যে আমি তোমাকে বলেছি দেখো দিদি, তা যেন ওরা জানতে না পারে! তা হ'লে আমায় বড্ড মুস্কিলে পড়তে হ'বে। তুমি শুনতে চাইছ—নইলে ওদের কথা আমি কখনো আর 'দু'কাণ' করিনি।"

তাঁহার ভাব দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, 'না না, আপনি যা বল্‌বেন, আমি তা কখনও মুখেও আনবোনা এখন নির্ভয়ে বলুন।' ঠাকুর-মা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তা 'মুখে' আন্‌লেই বা এমন কি ক্ষতি! তুমি দেশে গাঁয়ে থাক না তাই, নইলে এসব কথা আর এখানকার কে না জানে? দেশের 'ভালো মন্দ' লোকের কাছে গল্প করবে বই কি, আমি যে তোমায় বলেছি, এইটুকুন শুধু চেপে গেলেই হবে।"

এইরূপে ভূমিকা শেষ করিয়া ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন, 'ঐ যে বোশেখে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়েছিল, গরীবদের কারু ঘরে আর 'চালা' ছিল না; কত লোক ঘর চাপা প'ড়ে ম'রেও গিয়েছিল সেই ঝড়-বৃষ্টির ভেতরে সেজ বাবু ঘটা ক'রে তাঁর মেয়ে মিনুর বিয়ে দিলেন। সুধীন ছেলেটি কুলীন, দেখ্‌তে মন্দ নয়, পয়সা আছে। আমরা দেখলুম এই! কিন্তু সেজ বাবু 'জাঁক' ক'রে ব'লে বেড়াতে লাগ্‌লেন, অমন তিনটে পাশ করা জামাই এ গাঁয়ে আর আসেনি। তা হ'বে? আমরা সব চুপ ক'রে শুনলুম, বড় লোকের কথায় আর কি জবাব দেব ভাই? তার পর থেকে জামাই তো এখানে বেশ যাওয়া আসা করে, পাড়ার পাঁচ জনার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলে, সবাই তাকে ভালোও বাসে। আমি কিন্তু তখুনি টের পেয়েছিলুম, মিনুর বর বড্ড 'মেয়ে-ঘেঁশা।' মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পেলে সে আর কিছু চায় না। ছোট লোকের মেয়েদের সঙ্গেও সেধে সেধে আলাপ করতে যায়। একদিন ঐ বাতাসীকে কি ঠাট্টাটাই করলে। সে তো মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল, ওর সঙ্গে কথাও কইলে না। আমার এসব দেখে শুনে কি রকম লাগত। তা কেউ যখন কিছু বলে না, তখন আমিই বা বলতে যাই কেন? একেই ত সেজগিন্নীর বিষ-নজরে প'ড়ে রয়েছি—কিছু বলতে গেলে তখনি তুমুল ঝগড়া করবে। কাজ কি? চুপ ক'রে থাকাই ভালো মনে ক'রে আমি ত মুখটি বুজে রইলুম। আগেকার

গিন্নীরা পাড়ার কারু কিছু অন্যায় দেখলে মুখের ওপরে ব'লে বস্‌ত, এখন আর সেদিন নেই, ভাই। ওই সেজ-গিন্নী—দেখেছ ত, মুখখানা যেন হাঁড়ীপানা। তার ভেতর থেকে যা কথা বেরোয়, গায়ে একেবারে বিষ ছড়িয়ে দেয়। আমার ত ভাসুরপো-বউ, খুড়-শাশুড়ী ব'লে আমার একটু মান্য করে না; তার ছেলে, মেয়ে, বউ, জামাই—কাউকে আমাদের কিছু বল্‌বার জোটি নেই—তেম্‌নি বাতাসীর মা দিয়েছে ওকে আক্কেল দিয়ে। সেবারে সুধীন যখন মিনুকে নিতে এল তখন সেজ বাবু কি তার ছেলেরা কেউ বাড়ীতে ছিল না; পাঁচ সাত দিন পরে জামাই যখন যেতে চাইলে, তখন গিন্নী তা'কে যেতে দিলে না, বল্‌লে, দিন কত এখানে থাক, তোমার তো এখন ছুটি; কর্ত্তা বাড়ী এলে মিনুকে নিয়ে যেও। সুধীনের ত একেবারে পোয়াবারো হ'ল। সে তখন কি আর করে! দুপুর বেলা ভাত খেয়ে পানের ডিবে আর খবরের কাগজ নিয়ে একলাটি বাহিরের ঘরে গিয়ে ব'সে-শুয়ে থাকে। পাড়ার মেয়ে কি বউরা তখন এবাড়ী সে-বাড়ী যায় কি না, তাই জানলা দিয়ে দেখে আর তাদের ডেকে ডেকে হাসি-ঠাট্টা করে।

একদিন হয়েছে কি, বাতাসীর মার বাপের বাড়ী থেকে কি দরকারী চিঠি এসেছে। সে কদমের হাতে এক-খানা খাম দিয়ে বল্‌লে, 'যা, ছোট বউমার কাছে থেকে এর জবাব লিখিয়ে নিয়ে আয়।'

বাতাসীর বোন কদমকে তুমি দেখনি। গেল বছরে তার বিয়ে হয়েছে, এই সে'দিন সে শ্বশুর বাড়ীতে গেল। বেশ দেখতে মেয়েটা, দোষের ভেতোর বড্ড বেশী বোকা!

কি কি লেখাতে হ'বে কদম যখন তাই ভাব্‌তে ভাবতে বাইরের ঘরের সাম্‌নে দিয়ে আস্‌ছিল, তখন কেউ কোথাও ছিল না, নিঝুম রাস্তা। সুধীন তাকে ডেকে বল্‌লে, 'কদম, একটা কথা শুনে যাও!'

মেয়েটা ত মহা মুস্কিলে পড়ল। ছেলে-বেলা থেকে ও বাড়ীর সকলের কথাই সে শুনে এসেছে; মেয়েদের ফরমাস খাটা, বউদের ছেলে রাখা, সেজগিন্নীর হুকুম 'তামিল' করা এতো তার নিত্যকার ব্যাপার আছে। আবার জমিদারদের জামাই তাকে ডাকৃছে—এদিকে মা মানা ক'রে দিয়েছে, 'পুরুষদের সামনে কখনো যেও না।' কি করবে বুঝতে না পেরে কদম যখন সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভাবছে, সুধীন আবার বল্‌লে, 'কদম, বাড়ীর ভেতরে তো যাচ্ছ, এই ডিবেটা হাতে ক'রে নিয়ে যাও না। ফের্‌বার সময় গোটা কত পান এখানে আমায় দিয়ে যেও।'

বোকা মেয়েটা সুধীনের চালাকী বুঝ্‌তে পার্‌লে না! বারাণ্ডায় উঠে ডিবে নেবার জন্যে যাই সে হাতটি বাড়িয়েছে, সুধীন অম্‌নি সেই হাতখানি ধ'রে টেনে তা'কে ঘরের ভিতরে নিয়ে দোরটা বন্ধ ক'রে দিয়েছে! এক-একটা খারাপ ঘটনা এম্‌নি অতর্কিতে হ'য়ে পড়ে, ভাই! কিন্তু ভগবান কেমন ক'রে যে তখনি তার বিহিত করেন, এই বার শোন!

মেয়ে তো এদিকে মস্ত বিপদে পড়েছে; মার মনে তখন হয়েছে কি, 'চিঠিখানা বড্ড দরকারী, কদম সব কথা হয়ত গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌বে না; যাই, আপনি গিয়ে চিঠি লিখিয়ে একেবারে ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে আসি।' এই ভেবে আস্‌তে-আস্‌তে বাতাসীর মা দূর থেকেই সব দেখতে পেলে; তাড়াতাড়ি সেজবাবুর বৈঠকখানার জানালার ধারে এসেই সে বল্‌লে, "বাবু, দোর খুলে কদমকে বাইরে আস্‌তে দাও।"

কদমের তখন একেবারে 'ভিরমী' যাবার অবস্থা, মার কথা শুনে তবে তার 'ধড়ে' প্রাণটা এল! এদিকে আবার জামাইবাবুরও ঠিক তেম্‌নি দশাই হ'ল। সে দোরটা খুলে দিয়েই লজ্জায় ভয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল। কদমকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে বাতাসীর মা তা'কে বল্‌লে, "বাবু, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, আমাদের জমিদারের জামাই; কত পয়সা খরচ ক'রে কলেজে গিয়ে লেখা-পড়া শিখেছ; শুনেছি, ও সব শিখ্‌লে নাকি জ্ঞান হয়। বাবু, তোমার এই জ্ঞান হয়েছে? অত শিখে তার এই ফল পেয়েছ? কি বল্‌ব, তুমি আমাদের গাঁয়ের অতিথি, নইলে আমি তোমায় যা শিখিয়ে দিতাম আজ—সে তোমার কলেজের শিক্ষার চেয়ে ঢের বেশী ভাল হ'ত। তোমার এই 'পিরবিত্তি'কে নষ্ট ক'রে দিয়ে তোমায় সে মানুষ কর্‌তে পার্‌ত। তোমার বড়-

মানুষ মা বাপ তা শেখাতে পারেনি ব'লেই ত তুমি এমন পশু হ'য়ে পড়েছ।" বাতাসীর মা সেই দিকে খানিকটা থুতু ফেলে বেরিয়ে এল।

সেদিন সেজগিন্নীদের অনেক রকম রান্না হয়েছিল, জামাই আস্‌বার পর থেকে রোজই ত তাই হ'চ্ছে। খাওয়া শেষ হ'তে বেলা প'ড়ে এল দেখে গিন্নী বউ দু'টোকে একটু জিরোতেও দিলে না; তক্ষুনি তাদের ডেকে নিয়ে বিকেলের খাবার কর্‌তে বস্‌ল। আমি বেড়াতে গিয়ে দেখলুম, গিন্নী উনুন ধরিয়ে একটি কড়া দুধ জ্বালে চড়িয়ে বউদের আর অদৃষ্টের নিন্দে কর্‌তে কর্‌তে ক্ষীর তৈরী কর্‌ছে। একটি বউ ময়দা ঠাস্‌ছে, আর-একটি নারিকেল কুড়িয়ে রেখে বাদাম পেস্তা ছাড়াতে বসেছে। এমন সময়ে বাতাসীর মা কদমের হাতখানা ধ'রে ভীষণ মূর্ত্তিতে সেখানে এসে দাঁড়াল। কদম তখন ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছিল। তার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে দেখে সেজগিন্নী জিজ্ঞেস কর্‌লে, "ওর কি হয়েছে গা, বাতাসীর মা! কেন তুমি ওকে অমন ক'রে টেনে নিয়ে আস্‌ছ?"

বাতাসীর মা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তখন সব কথাগুলো বল্‌লে; সব শুনে সেজগিন্নীর মুখখানা লজ্জায় একেবারে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, তার কড়ার ক্ষীরটুকুও অতক্ষণ নাড়া না পেয়ে তলা ধ'রে পুড়ে কালো হ'য়ে গেল; সে 'দুম' ক'রে কড়াখানা নাবিয়ে রেখেই বাইরের ঘর থেকে সুধীনকে ডেকে আন্‌বার জন্যে চাকর পাঠিয়ে দিলে। সে কি আর সেখানে থাকে? নদীর ধারে গিয়ে একখানা নৌকো ভাড়া ক'রে তখনি যে বাড়ীর দিকে 'পাড়ী' দিয়েছে! সেই থেকে সুধীন এ গাঁয়ে আর আসেনি।"

ঠাকুরমা চলিয়া গেলেও অনেক রাত্রি অবধি আমি সেখানে বসিয়া রহিলাম, ঘৃণায় আমার মন তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবকও এত নীচ হয়! ভদ্র বংশের মর্য্যাদা, ভাল-মন্দ জ্ঞান, কিছুই উহাকে এই কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না?

বাতাসীর মার সাহস ও শক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি শয়ন করিলাম। এই নারী বাস্তবিকই সিংহিনী! এই নারী আমার স্মরণীয়া হইয়া থাকিবে। যদি এইরূপ তেজস্বিনী নারীদিগকে লইয়া দেশে দেশে একটি করিয়া নারী সমিতি গঠিত করা হয়, তাহা হইলে 'নারী-নির্য্যাতন' দেশ হইতে দূর হইয়া যাইবে, পুরুষেরা নারীর সহিত সদ্ব্যবহার করিতে শিখিবে।

ক্রমে আমার বিদায় লইবার দিন আসিল।

সকলেরই মুখ বিষাদে গম্ভীর। আহার-শেষে শুনিলাম, খালের ধারে আমাদের নৌকা বাঁধা রহিয়াছে; সকলের নিকটে বিদায় লইয়া, ঠাকুর প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিলাম। কাকীমা, পিসিমা, ভাই-ভগিনীরা, বাড়ীর প্রায় সকলেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খালের ধারে চলিলেন; আর চলিল আমার 'শিল্পশালার' সেই চতুরা ছাত্রীটি; সবুজ-বসনা পল্লীরাণীর হরিৎশিরোভূষণের মতই এই সুশ্রী মেয়েটিকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, ইহার ম্লান মুখখানি দেখিয়া বুঝিলাম এও আমাকে একেবারে ভুলিতে পারিবে না!

বাতাসীর মা একটি সুন্দর ফুলের গুচ্ছ আমার হাতে দিয়া বলিল, "এইটি আপনি সেখানে নিয়ে গিয়ে যত্ন ক'রে রেখে দেবেন, দিদি, তা হ'লে কখনো আমাকে আপনার মনে পড়্‌বে।" আমি সেটি হাতে লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম, "আমার মেয়ের বিয়ের সময়ে এঁদের সঙ্গে তুমিও কলকাতা যেও, বাতাসীর মা, তা হ'লে আবার তোমাকে দেখতে পাব!"

পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছি। আমার দেশের কৃষকদিগের কুটীরগুলি ক্রমে ক্রমে দূরে মিলাইয়া যাইতেছে। ইহাদের নিকট হইতে আজ আমিও কত দূরে চলিয়া যাইতেছি! কে জানে আর কখনও এখানে আসিব কিনা!



দান

পুরাণো জানিয়া চেয়ো না আমারে
আধেক আঁখির কোণে
অলস অন্য মনে।
আপনারে আমি দিতে আসি যেই
জেনো, জেনো সেই শুভ নিমেষেই
জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই
ফেলে দেই পুরাতনে।।
আপনারে দেয় ঝরনা, আপন
দানসুখে উচ্ছলি'।
লহরে লহরে হয় যে নূতন
অর্ঘ্যের অঞ্জলি।
মাধবীকুঞ্জ বারবার করি'
বনলক্ষ্মীর ডালা দেয় ভরি',
বার বার তার দানমঞ্জরী
নবীন প্রতি ক্ষণে।।
তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমার
চির নূতনের সুর।
সব কাজে মোর সব ভাবনায়
জাগে চির সুমধুর।
মোর দানে নেই দীনতার লেশ,
যত নেবে তুমি নাহি পাবে শেষ,
আমার দিনের সকল নিমেষ
ভরা অশেষের ধনে।।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন ১৩৩৩) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

প্রবাসের চিঠি

(৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীকে লিখিত)

ওঁ

508, W. High Street,
Urbana,
Illinois, U. S. A.

কল্যাণীয়েষু,

আজ ৭ই পৌষ। কাল সন্ধ্যার সময় যখন একলা আমার শোবার ঘরে আলো জ্বালিয়ে বস্‌লুম আমার বুকের মধ্যে এমন একটা বেদনা বোধ হ'তে লাগল সে আমি বল্‌তে পারিনে, সে বেদনা শরীরের কি মনের তা জানিনে, কিন্তু আমাকে ব্যাকুল ক'রে তুল্‌লে। তখন আমার মনে পড়্‌ল ঠিক সেই সময়ে তোমাদের ভোরের বেলার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। কেননা এখনকার সঙ্গে তোমাদের সময়ের প্রায় বারো ঘণ্টা তফাৎ। তোমাদের সমস্ত উৎসব আমার হৃদয়কে বোধ হয় আকর্ষণ কর্‌ছিল। কাল রাত্রে ঘুম থেকে প্রায় মাঝে মাঝে জেগে উঠে ব্যথা বোধ কর্‌ছিলুম। স্বপ্ন দেখ্‌লুম, তোমাদের সকালকার উৎসব আরম্ভ হয়েছে—আমি যেন এখান থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁছেচি, কিন্তু কেউ জানে না। তুমি তখন গান গাচ্চ, "জাগো সকল অমৃতের অধিকারী।" আমি মন্দিরের উত্তরের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ছায়ার মত যাচ্চি তোমাদের পিছনে গিয়ে বস্‌ব—তোমরা কেউ কেউ টের পেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে উঠেছ। এমনতর সুস্পষ্ট স্বপ্ন আমি অনেকদিন দেখিনি, জেগে উঠে ঐ গানটা আমার মনে স্পষ্ট বাজ্‌তে লাগ্‌ল। হায়রে, এদেশে কি তেমন সকাল হয় না? সেই অমৃতের অধিকারের মধ্যে জেগে ওঠ্‌বার গান এখানকার আকাশে কি ঠিক সুরে বেজে উঠ্‌তে চায় না? এদেশে কেবলি কি election আর Balkan Wars, আর Suffrage movement? কলের ধোঁয়ায় আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্কলোককে একেবারে ঢেকে ফেল্‌লে যে! কেবল গায়ের জোর, কেবল গায়ের জোর,—কেবল আদব কায়দা আইনকানুন। সরল আনন্দের ছবি কোথায় দেখ্‌ব—একেবারে সম্পূর্ণ গরীব হ'য়ে মনের আনন্দে মাটিতে বস্‌বার সুখ এখানে পাওয়া যায় কোন্‌খানে? এখানে যে টাকাকড়ি না হ'লে এক মুহূর্ত্ত চল্‌বার জো নেই—তাই কত বোঝা বয়ে বেড়াতে হয় তার ঠিকানা নেই—কেবলি ঠেলাঠেলি ক'রে এগিয়ে চল্‌বার তাড়া! সেই স্বপ্নে যখন ভোরের রাগিণীতে শুন্‌লুম—"জাগো সকল অমৃতের অধিকারী", তখন আমার মনে হ'ল আমি যেন একেবারে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গেছি, ডাঙা থেকে আমার ডাক্ আস্‌চে—সেই ডাঙা যেখানে সূর্য্যের আলো আকাশ ভরা, যেখানে মাঠ মিশিয়ে গেছে নীলের কোলে, যেখানে পূজোর ফুল ফুটে ঝ'রে পড়্‌চে, যেখানে উদাস হাওয়া ক্ষ্যাপার মত বনে বনে একতারা বাজিয়ে চলেচে, যেখানে মাটি কোলে টানে, জল বুকে ক'রে নেয়, বাতাস গায়ে হাত বুলোয়, আকাশ কপালে চুমো খায়—সমস্ত যেখানে বুকের কাছাকাছি, জগৎ যেখানে বন্ধুর মত গলাগলি করে।

তখনো অন্ধকার যখন বিছানা থেকে উঠে এসে বস্‌লুম। তারা-লোকিত আকাশকে একটুখানি যে অভ্যর্থনা কর্‌লুম সে কেবল একটু জান্‌লা খুলে। সাড়ে পাঁচটা বাজ্‌ল, এখানে আমাদের উৎসবের সময় হ'ল। আমার শোবার ঘরের একপ্রান্তে একখানা কম্বল পেতে আমরা পাঁচ জনে বস্‌লুম। তোমাদের ওখানে তখন হয়ত সন্ধ্যার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। আমার এই বদ্ধ ঘরের অন্ধকার কোণের মধ্যে তোমাদের প্রান্তরলক্ষ্মী তাঁর সেই অরুণরাগরঞ্জিত সাড়িখানি প'রে প্রসন্নমুখে ক্ষণকালের জন্যে দেখা দিয়েছিলেন—তাঁর সেই শুভ্র দক্ষিণ হস্তের আশীর্ব্বাদ আমাদের ললাটকে একবার স্পর্শ করেছে। ৭ই পৌষের শুভদিন কি আমাকে একেবারে ঠেলে ফেলে যেতে পার্‌বে? আমার জীবনের মাঝখানে যে তার আসন পাতা হ'য়ে গিয়েছে। এই দিনটিকে যে আমি স্পর্শমণির মত আমাদের আশ্রম থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি—আমার যা কিছু আছে সমস্তকে একে একে সোনা ক'রে না নিয়ে কি

ছাড়ব? লোহার সিন্দুক বন্ধ হ'য়ে আছে, মরচে-ধরা তালা খুল্‌চে না ব'লে সব জায়গায় তার স্পর্শ পৌঁছচ্ছে না, নইলে কিছু কি বাকি থাকত? আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য যে, একটা কেন্দ্রকে সে আশ্রয় করতে পেরেছে; এখানে অনেকের মঙ্গলের সঙ্গে তার মঙ্গল; অনেকের আনন্দের সঙ্গে তার আনন্দ জড়িত হয়ে গেছে, এখানে সংসারের দিক থেকে অমৃতের দিকে সে মুখ তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এখানে অহোরাত্র ঝরণা ঝ'রে পড়বে, কালো পাথরগুলো যত কঠিন হোক যত প্রকাণ্ড হোক্ ক্ষয়ে ক্ষয়ে সমস্ত শেষ হ'য়ে যাবে বোঝা কিছুই বাকী থাক্‌বে না। আজ আমি এই দরবারেই জানিয়ে রেখে'চ, কিছু যেন চাপা না থাকে, সমস্ত যেন একেবারে ফুঁকে দিয়ে হাসিমুখে হাল্কা হ'য়ে চলে যেতে পারি। আমার ইচ্ছেটাকে দিনরাত্রি কাঁধে ক'রে নিয়ে আর যেন বেড়াতে না হয়, সেটাকে তাঁর কাছে ফেলে দিয়ে যেন একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বস্‌তে পারি। 'মা গৃধঃ' তিনি যা দেবার একেবারে পূর্ণ ক'রে দিয়ে রেখেছেন—আকাশ-ভরা দান, জীবন-ভরা যজ্ঞ—যা পেয়েছি তাও নিতে পারিনে ব'লেই লোভীর মতন এমন অন্নের জন্যে লালায়িত হ'য়ে বেড়াই—তিনি আমাকে নেবার শক্তি দিন, আকাশে যা' ঝ'রে পড়বে তা যেন আমি অঞ্জলি পেতে পান করতে পারি। তৃষ্ণা মিটে যাক্, দাহ জুড়বে যাক্—মলিনতা কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাক—সত্য সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক্—অমৃত-লোকের পথ অবারিত হোক এই জীবনের বৃন্তের উপরে চিরজীবনের শতদল বিকশিত হ'য়ে উঠুক্—অন্তরে বাহিরে প্রকাশমান্ হোক্ শান্তম্‌শিবমদ্বৈতম্।

তোমাদের ওখানে রাত্রের উৎসব এতক্ষণ শেষ হ'য়ে গেছে। লোকের কোলাহল শেষ হয়ে এসেছে—শুক্লাত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নায় তোমাদের প্রান্তর প্লাবিত হ'য়ে গেছে—শুভ্র শান্তি-জলে তোমাদের আশ্রমের অভিষেক হ'য়ে গেল—এক বছরের মত তোমাদের মঙ্গলঘট পূর্ণ হ'ল, তোমাদের নবজীবনের পাথেয় সঞ্চিত ক'রে নিলে—আজ তোমাদের রাত্রের নিদ্রা শুভ হোক্, পবিত্র হোক্।

আমার শরীর এবার রুগ্ন। তাই শিকাগো যাওয়া হ'ল না। রথী এবং বৌমা এইমাত্র দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে গেলেন। তাঁদের এখন কলেজের ছুটি। বোধ হয় ছুটি কাটিয়ে আস্‌বেন। শিকাগোতে এবার ছুটিতে এখানকার ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের একটা সম্মিলনী হ'বে, তাতে তারা আমাকে প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু আমার ত হুকুম হ'ল না। আজ ৭ই পৌষ কোথাও যাতায়াত আমার চল্‌বে না—আজ সমস্তদিন আমার মনের মধ্যে নহবৎ বাজাবার বায়না পেয়েছি—ফাঁকি দিয়ে কোথাও যাব এমন সাধ্য নেই। গত সপ্তাহ ধ'রে আমার রোগের আয়োজন এই আমার উৎসবের আয়োজন; ঝাঁট দিয়ে সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌লে; সমস্ত শুক্‌নো পাতা বেদনায় পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিলে।

আজ সকালে এই জান্‌লার কাছে ব'সে লিখ্‌ছি, আমার কিছুতেই মনে হচ্ছে না তোমাদের উৎসবের মধ্যে আমি ছিলুম না। আমি তোমাদের মুখরিত মাঠের কলরব শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের ছেলেদের আনন্দধ্বনি এখানকার বাতাসকেও নিবিড় ক'রে তুলেছে আমার সমস্ত মন উৎসবে ভ'রে উঠেছে। ইতি ৭ই পৌষ, ১৩১৯।

তোমাদের

(দীপিকা, পৌষ—মাঘ, ১৩৩৩) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

সভ্যতায় বর্ব্বরতার বীজ

বর্ত্তমান সভ্য মানবের মধ্যে বর্ব্বরতার বীজ যে নিহিত আছে তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখাবার পূর্ব্বে, গৃহপালিত পশুরাও যে তাদের বন্য জীবনের ব্যবহার একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি, আগে এইটে আমরা দেখাব।

আমাদের যত রকমের গৃহপালিত পশু আছে, তাদের সকলকেই জঙ্গল থেকে ধ'রে এনে পোষ মানান হয়েছে।

কতকগুলো পোষা জানোয়ার আছে, যাদের আমরা টপ ক'রে ধরতে পারি—কোন্ বন্য পশু থেকে তারা গ্রামে এসে বাস করছে। কিন্তু কতকগুলোর আদিম অবস্থার কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না।

অনেকে বলে থাকেন, বুনো অবস্থাটা অ-স্বাভাবিক। কিন্তু তা ঠিক নয়। মানুষ ও গৃহপালিত জীবের জীবন-প্রণালী হচ্ছে কৃত্রিম।

মানুষ তাদের কাজের বেশী উপযোগী করবার জন্য অনুশীলনের দ্বারা কতকগুলো গাছ ও জানোয়ারের দেহ ও মনের এত উন্নতি সাধন করেছে যে তাদের পূর্ব্বপুরুষদের আর চেন্‌বারই যো নেই। আর এই পরিবর্ত্তন ভবিষ্যতে আরও কত হবে।

এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় কি ক'রে? যোগ্যতমের নির্ব্বাচনের দ্বারা অর্থাৎ ভালগুলোকে বেছে নিয়ে চাষ করা। চাষারা বীজের জন্য সব-চাইতে পুষ্ট ধান ও আলুগুলো বেছে নেয়। সেই রকম যারা পশমের চাষ করে তারা যে-ভেড়াগুলোর লোমগুলো লম্বা ও নরম সেইগুলোকে বেছে নেয় এবং যারা পালক ও ডিমের ব্যবসায় করে তারা সেই পাখীগুলো বেছে নেয় যাদের পালক খুব সুন্দর, ডিম বড় এবং যারা ডিম পাড়ে বেশী।

প্রকৃতির একটা রহস্য আমরা দেখতে পাই যে, যদি আমরা দেহের বা মনের কোনও একটা বিশেষ দিকে জোর দেই তাহ'লে সেটাকে অনন্ত কাল ধ'রে বাড়ান যেতে পারে। ঠিক এই প্রণালী ধ'রে সবুজ গোলাপ তৈরী করা হয়েছে; আবার আঙ্গুর, আপেল, কমলা, কলা এবং আনারসের বীচিগুলো একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলা হয়েছে।

গৃহপালিত পশুদের মধ্যে বোধ হয় কুকুরই মানুষের সব-চাইতে প্রাচীন সঙ্গী। কুকুরের গৃহ-প্রবেশের ইতিহাসের তারিখ এত প্রাচীন যে তখনও মানুষের কোনও ইতিহাস লেখা হয়নি, ডারুইন বলেন যে, নানা জাতীয় নেকড়ে থেকে পৃথিবীর নানা অংশে নানা কালে নানা জাতীয় কুকুরের সৃষ্টি হয়েছে।

সর্ব্বসমেত ১৭৫ রকমের বিশেষ জাতীয় গৃহপালিত কুকুর আমরা দেখতে পাই। বিভিন্ন জাতীয় মানুষদের মধ্যে যেমন বুদ্ধির তারতম্য আছে কুকুরের মধ্যেও ঠিক তাই। মাংসাশী পশুদের মধ্যে কলি আর সেণ্ট বার্ণাড সব-চাইতে বেশী বুদ্ধিমান, পক্ষান্তরে এস্কিমো কুকুর আকারে একেবারে নেকড়ে।

স্কটলণ্ডের লোকেরা কলি কুকুর পোষে মেষ চরাবার জন্যে। সেণ্ট বার্ণাড কুকুরের মুখ-চোখের চেহারা অতি সুন্দর।

বুল ডগ প্রকাণ্ড গোঁয়ারের জন্য বিখ্যাত। একবার যদি তারা কিছু ধরে তাহ'লে গলা কেটে ফেল্‌লেও তারা কামড় ছাড়ে না। গোচারণের জন্যে এদের ব্যবহার হ'ত, বিশেষতঃ বজ্জাত ষাঁড়গুলোকে ঢিট করবার জন্যে। যখন মানুষ বেড়ার আবিষ্কার করেনি এবং গরুরাও এত বশ হয়নি তখন তাদের সাম্‌লে রাখা বড় কঠিন ছিল। সেইজন্যই মানুষ এইরকম বলবান কুকুর পুষতে আরম্ভ করে। এরা দুরন্ত গরুগুলোকে ভারি মজার উপায়ে সাম্‌লে রাখে। এরা লাফিয়ে গরুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং ভয়ানক চীৎকার ক'রে লাফিয়ে কান ধরবার চেষ্টা করে, কখন কখনও কান ধ'রে টেনে মাথা মাটিতে নামিয়ে দেয়।

বুল টেরিয়ার, বুল ডগের অপভ্রংশ। এর বিশেষ কোনও গুণ নেই। বরং ফক্স টেরিয়ার বুদ্ধি, সৌন্দর্য্যে এবং তৎপরতায় অনেক বড়। টার্ণস্পিট কুকুরের দেহ ও পা ছোট।

বিগত দেড়শো দুশো বছরের মধ্যে পয়েন্টাস এবং সেন্টাস কুকুরের সৃষ্টি হয়েছে।

কুকুর—নেকড়ে প্রভৃতি কোনও একটা জাত থেকে এসেছে এবং পোষমানার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আদিম অবস্থার দোষগুলো অল্প-বিস্তর অপসারিত হয়েছে। বর্ত্তমানে কুকুরের মত প্রভুভক্ত, স্নেহশীল এবং বিশ্বাসী জানোয়ার আর নেই; কুকুরের দেহযন্ত্র মানুষের দেহের চাইতে ঢের নিকৃষ্ট। কিন্তু এই নিকৃষ্ট দেহযন্ত্র নিয়ে তুলনায় সে মানুষের চাইতে ঢের সভ্য হয়েছে—মানুষের চাইতে সে তার বন্য স্বভাব ঢের বেশী ত্যাগ করতে পেরেছে।

পোষা-বিড়াল—বন-বিড়াল থেকে এসেছে।

বোধ হয় কুকুরের ঢের পরে বিড়াল পোষা হয়েছে এবং কুকুরের মত একে কখনও কোনও বুদ্ধির কাজেও লাগান হয়নি, মানুষ বরাবরই একে কেবল ইঁদুর মারবার জন্যে এবং সৌন্দর্য্যের জন্যে ব্যবহার করেছে।

মাংসাশী জন্তুর মধ্যে কেবল কুকুর ও বিড়াল পোষ মেনেছে।

বর্ব্বরতা থেকে সভ্যতা পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ শ্রান্তিময় পথ, একে অতিক্রম করতে মানুষকে ঘোড়ার মত সাহায্য নিতে হয়েছে এমন আর কিছুর নয়। যুদ্ধে, শান্তিতে সব সময় ঘোড়া মানুষের বন্ধু।

মানুষ ঘোড়াকে প্রথম পোষ মানায়, বোধ হয় মধ্য বা দক্ষিণ এসিয়ায়। মধ্য এসিয়ায় নানা দুর্গম স্থানে এখনও বন্য ঘোড়ার দল দেখা যায়। তারা দল বেঁধে থাকে, ঘাস খায় এবং ভয় পেলেই চকিতে ছুটে পালায়।

বোধ হয় সেই আদিম যুগে ঘোড়া একটা ছাগলের চাইতে বড় ছিল না।

(উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৩৩)

—

বাঙ্গালী বীর

সম্প্রতি বাঙ্গালী পালোয়ান গোবর গত ছয় বৎসরকাল যুক্তরাজ্য ও কানাডা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া ব্যায়াম, কুস্তি প্রভৃতি শারীরিক ক্রীড়াতে জগদ্বিখ্যাত বহু পালোয়ানকে পরাস্ত করিয়া দেশ-বিদেশে বাঙ্গালীর সবলতার প্রমাণ দিয়া আসিয়াছেন।

গোবর পালোয়ানের নাম যতীন্দ্রচরণ গুহ, ডাক নাম গোবর। যতীন্দ্রচরণ ১৮৯২ সনে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বাবু রামচরণ গুহ, হোর মিলার কোম্পানীর মুৎসুদ্দি তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুহ অম্বুবাবু নামে পরিচিত। অম্বুবাবু সেকালে প্রসিদ্ধ পালোয়ান ছিলেন এবং তাঁহার অন্যতম পুত্র, গোবরের জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় ক্ষেত্রচরণ গুহ একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। ক্ষেত্রবাবুই গোবরের শিক্ষা-গুরু। গোবরের বয়স এখন মাত্র ৩৫ বৎসর। এই বয়সেই তিনি অসাধারণ শক্তিলাভ করিয়াছেন। আজ সমগ্র জগৎ এই বাঙ্গালী যুবকের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

গোবরের শরীরের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ১ ইঞ্চি, বুক—৪৮ হইতে ৫০ ইঞ্চি, কোমর ৪২ ইঞ্চি, গলা ১৮।০ ইঞ্চি, জানু ৩০ ইঞ্চি, ওজন তিন মণ। তাঁহার দুই জোড়া মুগুর আছে; এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন ২৫ সের; আর-এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন একমণ দশ সের। তিনি যখন খোলা শরীরে এই দ্বিতীয় জোড়া মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিতে থাকেন তখন তাঁহার প্রকাণ্ডকায় চেহারা দেখিয়া সেকালের দৈত্যদের কথা মনে উদয় হয়। তাঁহার খাদ্যের পরিমাণ নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালীর সাধারণ দৈনিক খাদ্য ছাড়া গোবর বিদেশভ্রমণে যাইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় নিম্নলিখিতরূপ আহার করিতেন।—"তিন পোয়া ঘি মিশ্রিত মাংসের আকনি; ৪০০ বাদাম ও এক ছটাক ছোট এলাচ, দেড় সের বেদানার রস; এক টাকার সোনার পাত ও দু আনার রূপার পাত, বাদাম ও মসলা মিশ্রিত ঠাণ্ডাই ও এক সের দুধ এবং প্রত্যহ এক টাকার ফল।" খাদ্যের পরিমাণ শুনিয়া নহে, খাদ্যের মূল্যের কথা ভাবিয়া যে-সকল চিন্তাশীল মস্তিষ্ক বৃথা আলোড়িত হইবে তাহাদের অবগতির জন্য আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, গোবরের পিতামহ গোবরের উদর পালনের পক্ষে প্রচুর অপেক্ষাও অনেক বেশী সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। গোবর সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান।

মিঃ গুহ তাঁহার উপার্জ্জিত শিক্ষা বাঙ্গালী জাতিতে সংক্রামিত করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে কলিকাতাতে একটি ব্যায়ামাগার ও শারীরিক শিক্ষা-প্রদর্শনী স্থাপন করিতেছেন।

আমরা আশা করি বাঙ্গালী যুবক দলে দলে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া এইটিকে জয়যুক্ত করিবেন।

(সৌরভ, মাঘ ১৩৩৩)

—

পারস্য-সাহিত্য

পারস্য-সাহিত্য অতি বিস্তৃত, অন্যান্য সাহিত্য সাগর মন্থন করিয়া বহু আয়াসে যে-রত্ন লাভ করিতে পারা যায়, পারস্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারের যত্র তত্র বহুল পরিমাণে তাহা হইতেও উজ্জ্বল রত্নরাজি বিরাজিত আছে।

বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান যুগে এহেন পারস্য-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে বহু রত্নাহরণ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের শোভাবর্দ্ধন করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক লেখকমণ্ডলী এবিষয়ের সম্যক্ চর্চ্চায় আজিও উদাসীন।

আজ আমরা সুবিখ্যাত পারস্য কবি মহাত্মা 'নেজামী'র পবিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী লইয়া উপনীত হইতেছি।

কবির প্রকৃত নাম আবু মহম্মদ বেনে ইউসফ্ বেনে মুয়ীদ। তিনি সুধীমণ্ডলীর নিকট নেজামুদ্দীন (ধর্ম্মের নিয়ামক) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার রচিত কবিতাসমূহের ভণিতায় তিনি আপনাকে 'নেজামী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। পারস্যের "কুম" প্রদেশস্থ একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে ১১১৬খৃঃ কবি জন্মগ্রহণ করেন।

পারস্য কবিদের মধ্যে কল্পনার সাহায্যে অবাস্তব বিষয়ের বর্ণনায় লেখনী পরিচালনা করিতে ইনিই প্রথম পথ প্রদর্শক; এজন্য অনেকে তাঁহাকে কল্পনা-রাজ্যের প্রথম সম্রাট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধবিগ্রহাদির বর্ণনায় অমর কবি ফেরদৌসী, বিষয়-বৈচিত্র্য ও সজীব ভাব প্রকাশে 'মৌলানা রুমী' এবং সহজ ও সরল ভাষায় কবিতা লিখিতে মহাকবি সাদীর সমতুল্য ছিলেন।

কবি চিরদিন আড়ম্বরশূন্য, দারিদ্র্যপ্রিয় ছিলেন। সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, সন্তোষই সকল সুখের মূল।

কবি সর্ব্বদা নির্জ্জনবাসে ভগবদারাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তৎ সাময়িক পারস্যরাজ সোলতান্ নোসরাতুদ্দীন কবিকে যারপরনাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

দিগ্বিজয়-মানসে মহানুভব য়্যালেকজাণ্ডারের (সেকেন্দার) নানাদেশে যুদ্ধাভিযান ও রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে "সেকেন্দার নামা" নাম দিয়া কবি একখানি বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি পারস্যরাজ সোলতান নোসরাতুদ্দীনের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

কবি একস্থানে লিখিয়াছেন—''মান্ আঁ বোলবোলান্ কাজ এরাম জাখ্তাম্ চ বাগে তু আয়াম্গাহ্—সাখ্তাম নাওয়ায়ে সারাইয়াম্ জে আইয়াযেতু কে মানাদ্ বয়ো সালহা নামে তু মারাপীল বার্ আজ, তু মাবৃহ্নদ নিস্ত কে পীলে তু চঁ পীল মাহ্মুদ নিস্ত মারাদাদ্ তাওফিক সোকৃতান্ খোদায় তোরা বাদ পায়েন্দা কারহাঙ্গ ও রায় অর্থাৎ—আমি স্বর্গোদ্যানের সুকণ্ঠ বুলবুল, এক্ষণে উড়িয়া আসিয়া তোমার রাজ্যোদ্যানে আশ্রয় লইয়াছি, দেখিবে অচিরে আমার কণ্ঠনিঃসৃত গানের পীযূষ-ধারায় সাহিত্য-জগৎ প্লাবিত হইয়া যাইবে, সেই সঙ্গে তোমার নামও যাবচ্চন্দ্রদিবাকর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমি (ফেরদৌসীর ন্যায়) তোমার নিকট হস্তী-পৃষ্ঠে বোঝাই দেওয়া স্বর্ণ মুদ্রার প্রার্থী নহি, পক্ষান্তরে তোমার হস্তীও সোলতান মহমুদের হস্তীর ন্যায় (কবিকে পদদলিত করিবার আজ্ঞা-প্রাপ্ত) নহে! আমাকে সর্ব্বশক্তিমান অসাধারণ কবিত্ব-সম্পদ্ প্রদান করিয়াছেন, আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। আমি অন্য কোন সম্পদের ভিখারী নহি। হে রাজন্, তুমি এই প্রকার সুবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার সহিত চিরজীবী হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধনে রত থাক।

তাঁহার রচিত "মাখ্জানুল্ আসরার্" 'খোসরোভে' সিঁরী' 'হাফ্ত্পার্কার্' এবং বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'সেকেন্দারনামা' সাহিত্য-জগতে যারপরনাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

(মজলিশী, মাঘ ১৩৩৩) কাজী নওয়াজ খোদা

চণ্ডীমণ্ডপ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রকাণ্ড একটি বেলগাছ। তাহার ছায়ায় মোহন-ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপ। সম্মুখে আঙিনা, প্রথম রাত্রির পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় ধব্ ধব্ করিতেছে।

কোজাগরের পরের দিনের রাত্রি। চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন মোহনপুরের সমাজপতিদের বার্ষিক বৈঠক। সামাজিক দুষ্কৃতিকারীদের বিচার ও দণ্ডদানের সভা।

দেবীর আসনের চৌকীতে তখনও সিন্দুর জল্ জল্ করিতেছে। সেই আসনকে কেন্দ্র করিয়া কুশাসন এবং পাটি বিছাইয়া সমাজপতিরা বসিয়াছেন। আঙিনায় প্রকাণ্ড নিমের গুঁড়ি জ্বলন্ত, তাহার পাশে চিমটা হাতে দীর্ঘ-দেহ বংশী গোপ তামাক জোগাইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপে ডাবা থেলো ও বাঁধা হুঁকা অস্থাবর সম্পত্তির মত হস্ত হইতে হস্তান্তরে ঘুরিতেছে। পণ্ডিত মহাশয় মহিষ-শৃঙ্গের কৌটা খুলিয়া ঘন ঘন নস্য লইতেছেন। কাশি এবং হাঁচির শব্দে চণ্ডীমণ্ডপ মুখর।

"না হে, চক্কোত্তি, আর সওয়া যায় না। দিন কাল ক্রমেই খারাপ হ'য়ে আসছে। তোমরা গাঁয়ে থাক, রাঘবও রয়েছে—তোমাদেরই দেখা-শোনা উচিত, এখন হাল ছেড়ে দিলে শেষে সামলাতে পারবে না।"

"দেওয়ানজী যা বললেন ঠিক্! কিন্তু রাঘব করবে কি? মোহন-ঠাকুরের ছেলে হ'লেই তো হয় না, বয়সটা কি তার? আপনি থাকুন একটা মাস, দেখুন কি করি!"

সাহেবপুরের রেশমকুঠীর দেওয়ান হরি মুখুয্যে মেরজাইয়ের বোতাম খুলিয়া স্ফীতোদর বাহির করিয়া কহিলেন, "বুঝি তো সব দাদা, কিন্তু চাকর আর কুকুর। এই পনেরোটি দিন ছাড়া সাহেব ছুটি মঞ্জুর করে না তার কি? গাঁয়ে থাকতে গেলে চাকুরী ছাড়তে হয়, একবার ভাবি—"

ন্যায়রত্ন মহাশয় কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! তুমি আছ তবু মোহনপুরের গাজন-তলায় ঢাক বাজে হে, মুখুয্যে। চাকুরী তো তোমার একার নয়, দশ জনের। দশ জন খাচ্ছে। পালা-পার্ব্বণে অতিথ-বোষ্টম সেবা হচ্ছে। গোয়াল মালীরা টিঁকে আছে। দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাক, বাবা।"

হরি মুখুয্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পায়ের ধূলা লইয়া কহিলেন, "এটা কি একটা কথা, পণ্ডিত মশায়? আপনাদের আশীর্ব্বাদেই সব, দশ জনের বরাতেই হচ্ছে, আমি তো নিমিত্ত।"

দেওয়ানজী মেরজাইয়ের বোতাম আঁটিয়া দিলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আঙ্গিনায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইল এক বৃদ্ধ।

"কে, সাধুচরণ ?"

নিজের অপরাধের গুরুত্ব সে জানিত। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "আজ্ঞে, বাবা ঠাকুর।"

"ওরে বেটা হারামজাদা!"—শশাঙ্ক ঘোষাল হাঁকিলেন।

"খড়ম পেটা ক'রে তাড়াও ব্যাটাকে গাঁ থেকে! ধর্ম্ম নষ্ট করলি"—ন্যায়রত্ন মহাশয় নস্ত লইলেন। সাধুচরণ কাঁপিতে লাগিল।

দেওয়ানজী ডাকিলেন, "রাঘব কোথায় হে? কি করা যাবে এর এস দেখি শুনি।"

স্বর্গীয় মোহন-ঠাকুরের সন্তান রাঘব ঠাকুর। বছর ত্রিশেক বয়স। মাথায় বাবরী, বলিষ্ঠ সুপুষ্ট দেহ। কপালে সিন্দূরের ত্রিপুণ্ড; হাতে মোটা বাঁশের লাঠি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা! বয়সে সকলের ছোট বলিয়া সকলের পশ্চাতে এক কোণে বসিয়া কলিকায় তামাক খাইতেছিলেন। সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "বিচার আপনারা করুন, খুড়ো মশাই। আপনাদের যা মত হবে আমারও—"

"তা কি হয়? দেওয়ানজী কহিলেন, মোহন-ঠাকুরের ছেলে তুমি বাবাজী! বয়সে যাই হও মোহনপুরে তোমার কথাই আগে।"

রাঘব ঠাকুরের গম্ভীর তীব্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "সাধুচরণ!"

রাঘব ঠাকুরের দিকে ভয়ে সাধুচরণ চাহিতে পারিল না। চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় মাথা রাখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কহিয়া উঠিল, "আর করব না, বাবাঠাকুর! এবারকার মত—"

"বেটা হারামজাদা! এবারকার মত! মোহন-পুরের জেলে তুই বেটা তোর পাল্কীতে মুর্গী রেঁধে খেল সাহেব! মোহনপুরের মুখে কালী দিলি বুড়োকালে, হারামজাদা!"

সাধুচরণ রাঘব ঠাকুরের সম্মুখে নত নেত্রে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল মাত্র।

ন্যায়রত্ন মহাশয় নস্তদানী রাখিয়া খড়ম তুলিয়া লইলেন। সাধুচরণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "প্রাচিত্তির করব, বাবাঠাকুর!"

"প্রাচিত্তির! পয়সা পাবি কোথা রে? কে কে ছিলি সে-পাল্কীতে?"

কাঁপিতে কাঁপিতে আরও পাঁচজন নত মস্তকে কম্পমান গলায় সাধুচরণের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

জগু, মানকে, বৈকুণ্ঠ, বিপিন আর শ্যামাদাস!

"মুর্গী আর পেঁয়াজের গন্ধ বড় ভালো রে হতভাগারা! আবার তুলসীর মালা রেখেছিস্!"

জগু, মাণিক, বিপিন প্রভৃতি সমস্বরে কহিল, "আর হবে না, বাবাঠাকুর!"

"আর যদি কখনও হয় তো, দেখছিস্ লাঠি, পাঁজর ভেঙ্গে দেব। গত বচ্ছর সনাতনের কথা মনে আছে তো? যা সব! এবার কালীপুজোর দিন পাঁচ মণ মাছ জোগাতে হবে তোদের ছ' জনকে, দাম পাবিনি।"

ছয়টি প্রাণী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল।

"তোদের পাড়াশুদ্ধ ছেলে-মেয়েকে এখানে পাঠাবি সেদিন, দুবেলা প্রসাদ পাবে। যা বেটারা! আজ রাত-ভোর কীর্ত্তন ক'রে কাল সকালে স্নান ক'রে আস্‌বি, একটু শান্তি দিয়ে দেব।" রাঘব ঠাকুর লাঠি কোলের উপর রাখিয়া আসন লইলেন।

বৃন্দাবন বিশ্বাস আসিয়া দাঁড়াইল। অপরাধ গুরুতর। কায়স্থ পরিচয়ে পানীয় জল দিয়া সে এক সদ্ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, অভিযোগ। এইরূপ "পেন্নাম হই"—বৃন্দাবন যুক্তকরে প্রণাম করিল।

"কি রে, বেন্দা? বামুন-কায়েতকে জল খাওয়াতে সাধ হয় তো কণ্ঠি নিলেই পারিস্। এসব দুর্ম্মতি কেন রে বেল্লিক!" রাঘব ঠাকুরের কথা শুনিয়া নত শিরে বৃন্দাবন দাঁড়াইয়া রহিল, জবাব দিল না।

"বেটা! অধার্ম্মিক চণ্ডাল!" ন্যায়রত্ন মহাশয় চীৎকার করিয়া খড়ম ছুঁড়িলেন। বাঁ হাতে ললাটের রক্ত ধারা চাপিয়া বৃন্দাবন বসিয়া পড়িল। পর মুহূর্ত্তেই উঠিয়া খড়মখানিতে মাথা ঠেকাইয়া সসম্ভ্রমে সেখানিকে চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে তুলিয়া দিল।

"আর কে আছিস্?" রাঘবঠাকুর হাঁকিলেন। প্রাঙ্গণের অন্ধকার কোণ হইতে জন কয়েক লোক উঠিয়া আসিল। তাহাদের অঙ্গ কম্পমান, মুখ পাংশু।

"বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর!!" উন্মাদের মত একটি স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল।

"বাবাঠাকুর!"

"আরে ছুঁস্‌নি, ছুঁস্‌নি, বাগ্‌দী-বৌ! হোথা থেকেই বল্।"

বাগদী-বৌ ছাড়িল না, রাঘব ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিল। সমস্ত অঙ্গ অশুচি হইয়া গেল, রাঘব ঠাকুর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "দিলি ছুঁয়ে সন্ধ্যা-বেলায়!"

বাগ্‌দী-বৌ তথাপি পা ছাড়িল না—"বাঁচান, বাবাঠাকুর!"

"আরে উৎপাত, হ'ল কি বল্ দেখি তোর?"

"মান-সরম্ভ্রম সব গেল, বাবাঠাকুর! শেষ বেলায় ঘাটে গিয়েছিল নারাণী। নেয়ে আস্‌বার পথে ও গাঁয়ের রহিম সর্দ্দারের বেটা বলে কি না—। মেয়ে তো আমার কলসী ফেলে পালিয়ে এসেছে। লজ্জায় মাথা কাটা গেল, বাবাঠাকুর!"

চণ্ডীমণ্ডপ শুদ্ধ সমাজপতিরা হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আঙ্গিনায় বংশী গোপের হাতের চিম্‌টা ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বৃদ্ধ সাধু মাঝির ন্যুব্জ দেহ সহসা ঋজু হইয়া গেল। ক্ষতস্থানে খানিকটা ছাই লেপিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। বাম হস্তের বংশযষ্টি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া রক্তচক্ষু রাঘব ঠাকুর তিন লম্ফে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেলেন, অপরাধীর দল বিনা বাক্যে তাঁহার অনুসরণ করিল, চণ্ডীমণ্ডপের অঙ্গন শূন্য হইয়া গেল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্যামা বাগ্‌দীনীর হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন—

"ভয় করিস্‌নে, বাগদী-বৌ! আমরা আছি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা দেখে নেব। আজ রাতে দেওয়ানজীর বাড়ীতে নারাণীকে নিয়ে এসে শুয়ে থাক্‌বি। রামু, জগাই, বৈকুণ্ঠ যা বাগদী-বৌয়ের সঙ্গে—মা বেটীকে সাথে ক'রে দেওয়ান-বাড়ীতে পৌছে দে।"

* * * *

ইহার পর চল্লিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মোহন-ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপ দেনার দায়ে কয়েক হাত ঘুরিয়া শেষে দি মোহনপুর ড্রামাটিক ক্লাবে পরিণত হইয়াছে।

কোজাগরের পরের দিনের সন্ধ্যা। আগামী দীপান্বিতার দিন বারোয়ারী কালীতলায় প্রতাপসিংহের অভিনয় হইবে, তাহারই মহলা চলিতেছিল।

ক্লাব-ঘরে জন বিশেক লোক বালক এবং যুবক। কয়েক জোড়া তবলা, ডুগি, গুটি দুই হার্ম্মোনিয়াম, একখানা বেহালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; বেড়ার গায়ে খানকয়েক স্বদেশী ও বিদেশী অভিনেতার বিচিত্র মুখ-ভঙ্গীর ছবি, গুটি কয়েক বাবরী চুল, জরিদার চাপকান ও একখানি বড় আয়না।

হার্ম্মোনিয়ামে সুর দিয়া চপল কহিল, "আচ্ছা 'সি সার্পে' ধ'রে দাওতো দেখি।" জন কয়েক বালক মুখের জ্বলন্ত বিড়ি মাটিতে নামাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়, যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর।'"

"ও কি হচ্ছে আনন্দ! চিতোর বল্‌চ অমন ক'রে যে! তোমার 'ফিলিং' হচ্ছে না মোটে। চোখটা একটু বোজ—মিঠে, রকমের ঘাড়টা একটু কাৎ ক'র, বাঁ পা'টা একটু সাম্‌নে। ব্যস্। অনেকটা হ'য়েছে। মনে ভাবতে থাক তুমি সত্যিকার রাণা প্রতাপ, তাহ'লে ঠিক 'পস্‌চার' আস্‌বে। ওরে একটা সিগারেট দে।"

"মাষ্টার মশাইকে একটা সিগারেট দিয়ে যা কমল। আচ্ছা নাচগুলোতে আমাদের খুব সাক্‌সেস্ হবে, না? কি বলেন, মাষ্টার মশাই? অনঙ্গ উত্তরের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ভাবে মাষ্টারের দিকে চাহিল।"

মাষ্টার আশ্বাস দিয়া একবার গা মোড়া দিতে দিতে বলিলেন, "খুব সম্ভব। আমরা কল্‌কাতায় ছোক্‌রা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান, আর তোমাদের জেলে ছুতোর পাড়া থেকেই তিনটে প্রেম নাচের ছেলে জুটে যায়, তাও

বিনি পয়সায়! কি? ভাব, না, খাব না গলা ভেরে যাবে। তার চেয়ে চা আনো।"

"ওরে চায়ের জল চাপিয়ে দে।" তিন চার জন সমস্বরে আদেশ দিল।

একটি যুবক হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত।

অনঙ্গ কহিল, "কি প্রেম-কোরক, হাঁপাতে-হাঁপাতে আস্‌ছিস্ যে?"

"আর শুনো না, অনঙ্গ-দা! বুড়োরা সব বৈঠক বসিয়েছে, বল্‌ছে জাত গেল, ধর্ম্ম গেল! যত জেলে মালী ছোট জাতের ছেলে নিয়ে নাকি আমাদের কারবার, তাদের হাতের জল খেয়ে চা খেয়ে উচ্ছন্ন যাচ্ছি। হাঃ! হাঃ!"

প্রেম-কোরক হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল।

"ফুল্‌স্! ছোটজাত! আর ওঁরা সব বড় জাত! ওঁরাই তো সর্ব্বনাশ কর্‌লেন জাতটার! ও সব গোঁড়ামি—"

অনঙ্গ রুখিয়া উঠিল।

চপল হার্ম্মোনিয়ামে সুর দিয়া কহিল, "ছোট জাতই আমরা চাই, তারা থাক্‌লেই জাত থাক্‌বে।"

"ধা ধিক্কাড় ধা, ধিক্কার ধা ধা" বোল আওড়াইয়া সুধাংশু তবলায় চাঁটি দিয়া কহিল, "একবার তেরে কেটে তাক্ ক'রে দিতে পার না, অনঙ্গ-দা?"

"আর দু'টি বচ্ছর সবুর ক'র সুধাংশু, মোহনপুরের চেহারা একদম বদ্‌লে দেব, দেখে নিও।" অনঙ্গ সিগারেট ধরাইল।

অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল বিপিন মালী। তাহার দৃষ্টি শঙ্কিত।

"কি রে, বিপিন, অত শুকনো যে?"

"আজ্ঞে বাবু কি বল্‌ব, আপনাদের চরণে আছি।"

"ব্যাপার কি বল্‌তো দেখি। আবার বুঝি সমাজে 'ঠেকা' করেছে, না?"

"না, বাবু। বাড়ীর মেয়েদের তো ঘাটে যাওয়া বন্ধ হ'ল, বাবু। কাল আমার বোন্‌কে ঘাটের পথে ইসারায় ও পাড়ার কবির সেখ ডাক্‌ছিল, আজ আমার মেয়ের হাত ধ'রে টেনেছে। আর ভয় দেখিয়েছে যদি বোন্‌কে তাদের বাড়ী না পাঠাই তবে বাড়ীতে চড়াও কর্‌বে।"

"তুই কি করেছিস্?"

"গরীব মানুষ, আমি কি কর্‌ব, বাবু? আপনারা একটা বিহিত করুন।"

"চৌকীদারকে বলিস্ নি?"

"বলেছিনু। সে 'গা' কর্‌লে না। থানায় যেতে বলে। সে তো আবার দশ ক্রোশ পথ, ঘর ফেলে যাই কি ক'রে? আপনারা আছেন বাপের মত—" হাউ হাউ করিয়া বিপিন মালী কাঁদিয়া উঠিল।

"এই তোমাদের গাঁয়ের একটা মস্ত 'ড্রব্যাক'—কাছে থানা নেই।" বলিয়া মাষ্টার মহাশয় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

"সেটা ঠিক! যে-রকম অবস্থা, থানা কাছে না থাক্‌লে চল্‌বার আর উপায় নেই। কাগজে এসব নিয়ে লেখালেখি কর্‌বারও দরকার হ'য়ে পড়েছে দেখছি। শেষে কোন্‌দিন গুণ্ডাগুলো আমাদেরই মাথা ফাটিয়ে দিয়ে যাবে।

আচ্ছা তুমি যাও বিপিন, বাড়ীতেই থেকো কোথাও যেয়ো না। মেয়েদের আর ঘাটে জল আন্‌তে পাঠিও না। কাল সকালে একবার এসো। ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে। হঠাৎ তো কিছু করা যায় না।"

বিপিন চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা পরে সমবেত কণ্ঠস্বরে সমস্ত পল্লী মুখর হইয়া উঠিল—

"জ্বলিল যেখানে সেই দাবাগ্নি
—সে রূপ-বহ্নি পদ্মিনীর।
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে
যবন-সৈন্য ক্ষত্রবীর।"

বিশ্ব-সৃষ্টির রূপ*

শ্রী নিখিলরঞ্জন সেন

অন্ধকার রাত্রিতে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে তাহার গায়ে অসংখ্য জ্যোতিঃকণার সমষ্টি দেখিয়া মনে হয় ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড! পৃথিবীর উপর কয়েক হাত জমি আমাদের বাসের পক্ষে যথেষ্ট। দুই তিন ক্রোশ পথকে দূর বলিয়াই মনে হয় এবং তাহার বেশী হইলে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী না হইলে স্থান পরিবর্ত্তন দুঃসম্ভব হইয়া উঠে। এখনও একদেশ হইতে অন্যদেশ আমাদের নিকট বহুদূর বলিয়াই বোধ হয়, এবং যাতায়াতে মাসাধিক কালও লাগিয়া থাকে! ক্ষুদ্র কয়েক হাতই দূরত্বের পরিমাণকালে আমাদের মাপকাঠি। ইহার সাহায্যে পৃথিবীর গা মাপিয়া বলি তাহার পরিধি বা বেড় ২৪০০০ মাইল। তখন ভাবি চার পয়সার পোষ্ট-কার্ড যে এক মাসের মধ্যে ইহার অর্দ্ধেক পথ চলিয়া মানুষের পরস্পরের মনের ভাব পরস্পরকে জানাইয়া দেয় তাহা মানুষের অসীম বুদ্ধিশক্তি ও কার্য্যতৎপরতার পরিচায়ক। আজকাল রেডিওর প্রসাদে একদেশের বার্ত্তা মুহূর্ত্তে অন্যদেশে চলিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা দ্রুতগামী বাহন আর কিছু আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তাই জ্যোতির্ব্বিদ যখন বলেন যে, এই দ্রুত-বাহন ও নিকটবর্ত্তী কোন তারার খবর আমাদের নিকট পৌছাইয়া দিতে অনেক বৎসর লাগাইয়া দেয় তখন ব্রহ্মাণ্ড যে প্রকাণ্ড তাহাতে সন্দেহের কারণ আর কি আছে?

কিন্তু মানুষ বড়কে বড় এবং ছোটকে ছোট বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না। বড় হইলেও কত বড়, এবং দুইটি বড় বস্তুর তুলনা করিয়া একটি অপরটির কত গুণ বড়, তাহা না বলিলে উহাদের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা আমরা করিতে পারি না। অনেক বড় বস্তুর ক্ষেত্রেও উহাদের মধ্যে তুলনায় কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, কোন্‌টি ইহার চেয়ে বড়, এইরূপ শ্রেণী-বিভাগের সাহায্যে পরস্পরের সম্বন্ধকে সুস্পষ্ট করিয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। আকাশের দিকে তাকাইয়া যে-সকল জ্যোতিষ্ক আমরা দেখিতে পাই তাহাদেরও, তারতম্য অনুসারে, নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অধিকতর স্পষ্টভাবে জানিবার প্রয়াস আমাদের মধ্যে প্রবল। যদিও চক্ষে দেখিতে সবগুলি একই জিনিষ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, ইহাদের মধ্যেও তারতম্য যথেষ্ট আছে। ইহারা সকলে একই জাতীয় নহে। ইহাদের কতকগুলি একই আদিম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া চলিতেছে; আবার কতকগুলি ক্রমবিকাশের শেষ অবস্থায় আসিয়া শক্তির অপচয়ে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অসীম শূন্যে ইহারা নানাভাবে অবস্থিত। আকাশে তাহাদের বেশ একটা জিওগ্রাফিও আছে। এইসব বিষয়ে গত বিশ বৎসরের আলোচনার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ যে-সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন, আপনাদের নিকট তাহার কিছু আভাস দেওয়াই আজ আমার উদ্দেশ্য।

মানব-সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয় এবং সৌরজগৎ সম্বন্ধে অনেক তথ্যই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করেন। আমাদের পক্ষে সূর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত জ্যোতিষ্ক। চতুর্দ্দিকে আকাশে ইহা আলো ও তাপ বিকিরণ করে। এই আলো ও তাপশক্তি সূর্য্যের ভিতর কি প্রকারে উৎপন্ন হইতেছে, সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের এখনও নাই।

বিজ্ঞানের আলোচনা ও নানা অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, যাহাকে আমরা শক্তি

---

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ছাত্র-সঙ্ঘে, যাদবপুর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে পঠিত।

(Energy) বলি তাহার সৃষ্টি ও লয় অসম্ভব। শক্তি কেবল এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয় মাত্র। কয়লা পোড়াইয়া আমরা তাপশক্তি পাই। এই তাপশক্তি জলকে তরল অবস্থা হইতে গরম বাষ্পীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করে। এই বাষ্প-নিহিত শক্তিকে নানাপ্রকার ব্যবস্থার সাহায্যে গতিশক্তিতে পরিণত করিয়া রেলগাড়ী চালান হয়। কয়লার তাপশক্তি সমস্তই এই-রূপ গতিশক্তিতে পরিণত হইয়া যায় না। তাহার পূর্ব্বেই কিয়দংশ অন্যপ্রকারে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু মোটের উপর এইসব রূপান্তরিত শক্তি ও গতিশক্তি একত্র করিলে সম্পূর্ণ তাপশক্তির সমান হইবে। এই শক্তির অবিনশ্বরতা বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটি মূল কথা। আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। সূর্য্যের তাপশক্তি তাহার অন্তর্নিহিত কোন্ শক্তির রূপান্তর এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত এখনও কিছু নাই। এক শ্রেণীর পদার্থ আছে যাহা স্বতঃই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহারা ইংরেজীতে (Radioactive) তেজ-বিকিরক বলিয়া পরিচিত। বিখ্যাত রেডিয়াম্ এই শ্রেণীর একটি বস্তু। এইরূপ পদার্থ সম্ভবতঃ সূর্য্যেও আছে। এবং তাহাদের বিনাশও আপনা হইতেই চলিতেছে। কিংবা হয় ত সূর্য্যদেহের প্রচণ্ড তাপে তথাকার পদার্থ-সকল ক্রমান্বয়ে তাহাদের আদি অণু-পরমাণু অবস্থা অতিক্রম করিয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছে। পদার্থের সত্তা (mass) এবং শক্তি মূলতঃ অভিন্ন, ইহা বর্ত্তমান পদার্থবিজ্ঞানের একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সুতরাং একের রূপান্তরে অন্যের উৎপত্তি স্বাভাবিক। এই রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবিত্ব হেতু পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন যে, সৌরদেহের বিনষ্ট পদার্থ হইতে উৎপাদিত শক্তির সহিত তাহার তাপশক্তির যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।

যেমন পৃথিবী একটি গ্রহ, সূর্য্যের চারিদিকে বৎসরে একবার ঘুরিতেছে, এইরূপ আরও সাতটি গ্রহ সৌরমণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া প্রত্যেকেই কম বা বেশী সময়ে সূর্য্যের চারিদিকে এক একবার ঘুরিয়া আসিতেছে। কেহই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। ইহাদের মধ্যে শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে খালি চোখেই দেখা যায়। বুধ (Mercury) সূর্য্যের খুব নিকটে বলিয়া প্রখর আলোতে অদৃশ্য হইয়া থাকে। শনিগ্রহ অপেক্ষাও দূরে, সৌরমণ্ডলের প্রায় সীমানার দিকে, ইউরেনাস্ (Uranus) ও নেপ্‌চুন্ (Neptune) নামে আরও দুটি গ্রহ আছে। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া তাহাদিগকে কখনও দেখা যায় না। সেইজন্য প্রাচীনেরা এই গ্রহ দুইটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারীর রাত্রে ইতালীয় জ্যোতিষী গ্যালিলিও যখন তাঁহার দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের ভিতর দিয়া বৃহস্পতি দেখিতে পাইলেন তখন হইতে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ইতিহাসে এক নূতন যুগ আরম্ভ হইল। ইউরোপের সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মযাজকের চোখরাঙানি সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রমাণ হইয়া গেল যে, সূর্য্য সৌরমণ্ডলে স্থির হইয়া আছে এবং পৃথিবী প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহগণ তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে! শুধু তাহাই নয়। সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তমান গ্রহ যেমন একটি সমষ্টি, সেইরূপ পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহগুলি, প্রত্যেকেই নিজে নিজে কতকগুলি ক্ষুদ্রতর উপগ্রহ লইয়া, এক-একটি সমষ্টির সৃষ্টি করিয়াছে। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহা পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। এইপ্রকার বৃহস্পতি ও শনি প্রত্যেকের ৯টি করিয়া উপগ্রহ আছে—৯টি চন্দ্র বৃহস্পতি ও শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইউরেনাস্ ও নেপচুনেরও নিজ নিজ উপগ্রহ বর্ত্তমান। বৃহত্তর সৌরজগতের মধ্যে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগতের সমষ্টি একটি বিরাট বিস্ময়। ইহা ছাড়া আরও একটি আশ্চর্য্য রকমের শৃঙ্খলা সৌরজগতে বিদ্যমান। দূরবীক্ষণ ও গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে ক্রমশঃই তাহা আমাদের নিকট স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। কোন একটি বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া অন্য একটি বস্তু তাহার চারিদিকে দুই প্রকারে ঘুরিতে পারে—যথা ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেইদিকে, অথবা তাহার উল্টাদিকে। সূর্য্যের চারিদিকে যে-সকল গ্রহ ঘুরিতেছে, উহারা আপন আপন ইচ্ছা অনুসারে দুইদিকের যে-কোন দিকে ঘুরিতে পারিত; কিন্তু সকলেই যে দল বাঁধিয়া একদিকে ঘুরিতেছে ইহা একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কেবল তাহা নহে, প্রত্যেকটি গ্রহের উপগ্রহগুলিও ঠিক সেইদিকে নিজ নিজ গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রত্যেক গ্রহ কিংবা তাহার উপগ্রহের কক্ষা প্রায় একই সমতলে (plane)

অবস্থিত। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের ৯০০টি সমতল যে যেমন ভাবে থাকিতে পারিত, কিন্তু এই সমতলগুলির মধ্যে পরস্পর কোণ (angle) বেশ ছোট। খুব মোটামুটি ভাবে বলা যায়, কক্ষাগুলি প্রায় এক সমতলেই অবস্থিত। সৌরজগতে এই বিরাট্ শৃঙ্খলা কোথা হইতে আসিল, ইহা গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটি বিষম সমস্যা। এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত প্রচলিত আছে।

সৌরজগতের বাহিরে প্রকাণ্ড নক্ষত্র জগৎ। অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকাইলেই অসংখ্য তারা আমাদের চোখে পড়ে। কোনটি বা বড় ও উজ্জ্বল, আবার কোনটি বা ছোট ও ক্ষীণজ্যোতিঃ। পণ্ডিতেরা বহুপূর্ব্বেই গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহার প্রত্যেকটি আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে। সূর্য্যের মত ইহারাও আলোক ও তাপ বিকিরণ করে। সেইজন্য ইহাদের প্রত্যেকটিকেই এক-একটি সূর্য্য মনে করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সূর্য্যের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কতদূর ঘনিষ্ঠ, তাহা এই আলোচনা-প্রসঙ্গেই দেখা যাইবে। অনেকে মনে করেন, এইসব তারার অধিকাংশই সৌরজগতের মত গ্রহ-উপগ্রহ-বেষ্টিত। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু কারণ আছে। চোখে দেখিয়া আমরা প্রত্যেকটি তারাকেই একটি স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্ক বলিয়া মনে করি। কিন্তু দূরবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা দেখা যায় তাহাদের অনেকগুলিই দুইটি তারার সমষ্টি। এইপ্রকার তারাকে আমরা যুগল-তারা* বলিব। ক্রমাগত পর্য্যবেক্ষণে বোঝা যায় যে, দুইটি তারাই পরস্পরের চারিদিকে ঘুরিতেছে, অথবা দুই-ই তাহাদের ভারকেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই প্রদক্ষিণের সময় দেখিয়া গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহাদের একটি অপরটি অপেক্ষা কতগুণ ভারী তাহা নির্ণয় করা সম্ভব। কোন তারার নিকট একটি মানুষকে যদি আমরা কল্পনা করি, তবে সে সেস্থান হইতে আমাদের সূর্য্যকেও একটি তারার মত দেখিবে। গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, অন্যগুলি তাহার তুলনায় খুব ছোট। সেইজন্য তারার নিকট হইতে সূর্য্য ও বৃহস্পতিকে একত্রে একটি দূরবর্ত্তী যুগল-তারার ন্যায় দেখাইবে। কিন্তু তাহাদের একটির ওজন আরেকটির প্রায় হাজার গুণ। অথচ আমরা পৃথিবী হইতে যত যুগল-তারা দেখিতে পাই তাহারা সকলেই ওজনে একটি আর একটির প্রায় সমান কিংবা কয়েকগুণ মাত্র বড়। সূর্য্য ও বৃহস্পতির মত এত বড় বৈষম্য আর কোথাও লক্ষিত হয় না। অতএব সৌরজগতের মত জগতের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া এইপ্রকার জগৎ নক্ষত্র জগতে একেবারে নাই, একথা এখনই বলিলে কিছু বাড়াবাড়ি নিশ্চয়ই হইবে।

সৌরজগৎ ও নক্ষত্রজগতের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড শূন্য। ইহার মধ্যে আমাদের আর কোন পাড়াপ্রতিবেশী নাই। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সাধারণতঃ দূরের জিনিষ বেশ স্পষ্ট ও বড় দেখা যায়। গ্রহগুলি চোখে দেখিতে তারার মত, কিন্তু দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে বেশ বর্ত্তুলাকার মনে হয়। কিন্তু তারাগুলি সৌর-জগৎ হইতে এত দূরে যে, দূরবীক্ষণে তাহাদের একটুও বড় দেখায় না। সৌরজগৎ হইতে অল্প কয়েকটি তারার দূরত্ব ছাড়া, তারা সম্বন্ধীয় বিশেষতঃ তারাদেহের প্রায় সমস্ত রহস্যই গত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্রের আবির্ভাব ও ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রহস্য আমরা এখন ভেদ করিতে পারিয়াছি। এই আলোক-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি বর্ত্তমান জ্যোতিষশাস্ত্রের মেরুদণ্ড। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গত অর্দ্ধশতাব্দী হইতে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, আলোক একটি বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ। জলের উপর তরঙ্গ আমরা চোখে দেখিতে পাই। স্থির জলের কোথাও একটু নাড়া পড়িলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং এই তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই তরঙ্গের একটি বেগ * আছে। এক সেকেণ্ডে

* Double Star.

* ইং Velocity.

তরঙ্গ যতদূর বিস্তৃত হয় তাহাকেই উহার বেগ মনে করা যাইতে পারে। তরঙ্গের একটি দৈর্ঘ্যও আছে। বায়ুপ্রবাহেও জলের উপর তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, আবার প্রকাণ্ড আলোড়নেও হইয়া থাকে। কিন্তু দুইয়ের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। প্রত্যেক তরঙ্গে একটি চড়াই ও একটি উৎরাই থাকে। এক চড়াই হইতে পরবর্ত্তী চড়াই যত দূর তাহাকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলে। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দ্বারা তরঙ্গের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। কোন্‌টা কোন্ শ্রেণীর তরঙ্গ, তাহা তাহার দৈর্ঘ্য বলিলেই বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। তরঙ্গ-সৃষ্টির জন্য তাহার একটি বাহন দরকার, যাহার ভিতর তরঙ্গ বিস্তার লাভ করে। বৈজ্ঞানিকদের মতে ঈথর নামে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইহারই ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বহন করিবার ক্ষমতা ঈথরের আছে। কোন স্থানে আলো থাকিলে সেই স্থানের ঈথর-সাগরে একটা বৈদ্যুতিক কম্পন সৃষ্টি হয়। সেই কম্পন আসিয়া যখন আমাদের চোখে পড়ে তখন তাহা আমাদের মস্তকে আলোকের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। উত্তাপও সেইপ্রকার ঈথরেরই তরঙ্গ। বিভিন্নতা কেবল তরঙ্গদৈর্ঘ্য *। উত্তাপতরঙ্গের দৈর্ঘ্য আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু বড়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, দুইই খুব ছোট। আলোর রং তাহার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এমন কি রং ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে যদি একই জিনিষ মনে করি, তাহাতে আমাদের হিসাব ও গণনা সম্পূর্ণ নির্ভুল থাকিবে। সূর্য্যের শাদা আলো ত্রিশির কাচের † সাহায্যে নানা রঙের আলোতে বিভক্ত করা যায়। তাহার এক দিকে বেগুনি, অন্য দিকে লাল। ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কেবল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। তরঙ্গগুলি বেগুনি হইতে আরম্ভ করিয়া লালের দিকে ক্রমশঃ বড় হইয়া যাইতেছে—আরও বড় তরঙ্গগুলি চোখে দেখা যায় না।

* ইং Wave length.
† ইং Prism

তাহারা উত্তাপ সৃষ্টি করে। সূর্য্যের শাদা আলো নানা রঙের আলোর সমষ্টি মাত্র। রেডিও যে বিনা তারে বার্ত্তা বহন করে তাহাও এইপ্রকার ঈথরের তরঙ্গ। তবে তাহাদের দৈর্ঘ্য প্রকাণ্ড বড়। কিন্তু এই প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর তরঙ্গের বেগ একই। এই বেগই আলোর বেগ। পরীক্ষা দ্বারা স্থির নির্ণয় করা হইয়াছে যে, আলোক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল গমন করে অর্থাৎ আলোক-রশ্মি এক সেকেণ্ডে প্রায় আট বার পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে পারে। বিভিন্ন প্রকার আলোর সংমিশ্রণে যে যৌগিক আলোর সৃষ্টি হয় তাহাকে পৃথক্ করিবার নানা প্রকার ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকদের জানা আছে। আলোককে ত্রিশির কাচের ভিতর প্রবেশ করাইয়া তাহাকে বিভক্ত করিবার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক খণ্ড কাচের উপর যদি কঠিন পদার্থ দিয়া পাশাপাশি বহু রেখা টানা যায় তাহার উপর আলো পড়িলে তাহা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুসারে নানাবর্ণে বিভক্ত হইয়া যায়। এই-প্রকার যে-কোন আলোককে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যস্থিত বিভিন্ন রঙ বা আলোক-কম্পনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতি সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। এই আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্রের বর্ত্তমানে এত উন্নতি হইয়াছে যে, এক ইঞ্চির এক কোটি ভাগের এক ভাগকে মাপকাঠি করিয়া এখন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য স্থির করা হইয়া থাকে। সূর্য্য কিংবা নক্ষত্রের আলোককে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের অনেক রহস্য আজকাল উদ্ঘাটন করা হইতেছে।

সাধারণতঃ আমরা মনে করিয়া থাকি যে, সকল আলোই সমান। সূর্য্যের কিংবা তারার আলোতে কোনই প্রভেদ নাই। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যে পদার্থ জ্বলিয়া আলো বাহির হয়, তাহারই ধর্ম্ম সেই আলোকে বর্ত্তমান থাকে। রাসায়নিকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আমরা যে-সব পদার্থের সঙ্গে পরিচিত তাহাদের প্রায় সবগুলিই কতকগুলি মৌলিক পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। অম্লজান ও জলজানের যোগে জলের উৎপত্তি। অম্লজান ও জলজান এই দুইটি মৌলিক পদার্থ। অনেক ধাতুও মৌলিক পদার্থ, যথা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষায় সোডিয়াম্ ও পটাসিয়াম্ নামে

পরিচিত আরও দুইটি মৌলিক ধাতু আছে, ইহারা অনেক পদার্থে বর্ত্তমান। এইসকল মৌলিক পদার্থ জ্বলিয়া যে আলোক বিকিরণ করে, সেই আলোককে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। এই আলোক সাধারণতঃ কয়েকটি বিভিন্ন রংএর আলোকের সমষ্টি। বিশ্লেষণান্তে তাহা কয়েকটি বিশিষ্ট আলোক-দৈর্ঘ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং বিশ্লেষণ-যন্ত্রের যে স্কেলের উপর দৈর্ঘ্য মাপা হয়, তাহার উপর যথাস্থানে ব্যবস্থা অনুসারে কয়েকটি উজ্জ্বল কিংবা কালো রেখা রূপে প্রতীয়মান হয়। রেখার স্থান দেখিয়াই ইহা কোন দৈর্ঘ্যের আলোক তাহা বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইসব রেখাকে আমরা বিশ্লেষণ-রেখা * বলিব। এক একটি মৌলিক পদার্থ এক এক প্রকার বিশ্লেষণ-রেখার সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রায় সকল মৌলিক পদার্থেরই বিশ্লেষণ-রেখা নির্ণয় করা হইয়াছে। সুতরাং কোন নূতন পদার্থ হইতে নিঃসৃত আলোককে বিশ্লেষণ করিয়াই পূর্ব্বোক্ত রেখার তুলনা করিলে তাহাতে কি কি মৌলিক পদার্থ আছে বলা যাইতে পারে। এই বিশ্লেষণ যন্ত্র জ্যোতিষের হস্তে এখন এক মহা অস্ত্র। সুদূর শূন্যে যে তারা মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার অনেক গোপন-কাহিনী এই ক্ষুদ্র মূক যন্ত্রে আসিয়া ধরা পড়ে। কোন্ তারায় কি কি মৌলিক পদার্থ জ্বলিতেছে, এমন কি অনেক স্থলে তাহাদের তাপমান † পর্য্যন্ত এখন আর জ্যোতিষের নিকট লুক্কায়িত নাই। এই বিশ্লেষণ-যন্ত্রের ব্যবহার অতি আশ্চর্য্যজনক। ইহা দ্বারা তারার গতিও নির্ণয় করা যায়। কোন-একটি তারা সৌরজগতের দিকে কত বেগে আসিতেছে, বা কত বেগে বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছে, তাহাও এই বিশ্লেষণ দ্বারা বলিয়া দেওয়া সহজ। যে-বস্তু হইতে তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে তাহার সম্মুখ কিংবা পশ্চাৎ দিকে গতি অনুসারে তরঙ্গদৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। সেইজন্য যে-তারা সৌরজগতের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য আমাদের নিকট ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তাহার বিশ্লেষণ রেখাগুলি সেই তারার উপাদান-পদার্থের বিশিষ্ট বিশ্লেষণ-রেখা হইতে একটু বেগুনি রং এর দিকে সরিয়া যাইবে। বেগুনি রংএর দিকে সরার অর্থ তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট হইয়াছে। এই সঙ্কোচন কিংবা প্রসারণের মাপ হইতে গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে আলোক-উৎপাদক পদার্থের বেগ নির্ণয় করা যায়। অনেক তারা এবং তারাপুঞ্জের বেগ এই প্রকারে নির্ণয় করা হইয়াছে। আমাদের নিকটবর্ত্তী তারার কথা বলিতে গেলে (Cassiopeiae) ক্যাসোপিয়া নামক তারাটি সেকেণ্ডে ছয়মাইল বেগে সৌরজগতের দিকে আসিতেছে ; লুব্ধক * নামে আকাশের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারাটি সেকেণ্ডে প্রায় পাঁচ মাইল বেগে আমাদের নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে। এইপ্রকার সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী তারার গতি গড়ে সেকেণ্ডে ১০।১২ মাইল। কিন্তু এক-প্রকার তারাপুঞ্জ আছে তাহাদের বেগ বড় প্রবল। গড়ে সেকেণ্ডে প্রায় ১৫০ মাইল। এই বিষয়ে আলোচনা আমরা একটু পরে করিব।

আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া যায় যে, তাহাতে বেশীর ভাগ অম্লজান, জলজান, সোডিয়াম্, ক্যাল্‌সিয়াম্ (Calcium), ম্যাগ-নেসিয়াম্ (Magnesium) ও লৌহ ধাতু বর্ত্তমান। ইহা ছাড়াও আরো অনেক ধাতুর বিশ্লেষণ-রেখা দেখা গিয়াছে। যবক্ষারজান, আর্‌সেনিক, গন্ধক ও স্বর্ণ এই কয়টি সাধারণ পরিচিত পদার্থের অস্তিত্ব সূর্য্যে এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু সেজন্য সৌরদেহে তাহাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। সময়ের সঙ্গে এ বিষয়ের জ্ঞান আমাদের আরও বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। সূর্য্যের আলোকের প্রখরতা পরীক্ষা করিয়া যে-স্থানে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ জ্বলিয়া আলোক-তরঙ্গ সৃষ্টি হইতেছে তাহার তাপের পরিমাণ গণনা করা হইয়াছে। ইহা প্রায় ৬০০০ হাজার ডিগ্রি। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে, সূর্য্য একটি প্রকাণ্ড বর্ত্তুলাকার জ্বলন্ত পদার্থ। এই

* ইং Spectral lines.

† ইং Temperature.

* ইং Sirius

বর্ত্তুলের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা প্রায় ১০০ গুণ বড় এবং তাহার আকৃতি পৃথিবীর এক লক্ষ গুণ। এই ভীমাকার সৌরদেহের অভ্যন্তরে কি হইতেছে সে-বিষয়ে আমাদের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত কোন জ্ঞান নাই। সূর্য্যের মূল অবয়বের বাহিরে প্রকাণ্ড একটা জলন্ত বায়ু-মণ্ডল আছে, সেই বায়ু-মণ্ডলেই উপরোক্ত পদার্থগুলি বিদ্যমান এবং তাহারই খবর আমরা আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্রে জানিতে পারি।

আমাদের সূর্য্য যে আকাশের তারাগুলিরই জাতি তাহা আমরা এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। তারা হইতে যে-আলোক আসে তাহা বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে কতকগুলি বিশ্লেষণ-রেখা পাওয়া যায়। তাহাদের সঙ্গে সূর্য্যালোকের বিশ্লেষণ-রেখার নিকট-সম্বন্ধ আছে। নানা প্রকার পরীক্ষার ফল বিশদরূপে আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, আকাশের তারাগুলিকে মোটামুটি ৬ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, এবং এই শ্রেণীবিভাগের মূলে ক্রমবিকাশের ধারা বিদ্যমান। এই ছয়টি শ্রেণী জ্যোতিষী-গণের নিকট যথাক্রমে বি (B), এ (A), এফ (F), জি (G), কে (K), এম্ (M) * এই ছয়টি অক্ষর দ্বারা পরিচিত। বি শ্রেণীর তারা প্রায়ই বেশ একটু উজ্জ্বল; রং শাদা বরং একটু নীলাভ। আলোক-বিশ্লেষণে পাওয়া যায় যে, ইহাদের মধ্যে হিলিয়াম নামক পদার্থ বেশী আছে; অতি অল্প পরিমাণে জলযানের বিশ্লেষণ-রেখাও দেখা যায়। কোন ধাতু আছে বলিয়া মনে হয় না। তারাগুলি অতি উষ্ণ; তাপমানও খুব বেশী, প্রায় ১৬০০০ ডিগ্রি। ওরায়ান (B Orion) নামক তারা এই শ্রেণীর। এ শ্রেণীর তারায় হিলিয়াম প্রায় পাওয়া যায় না। দেখিতে শাদা; প্রচুর পরিমাণে জলজান বর্ত্তমান; সামান্য ধাতুর লেশও কখনও পাওয়া যায়—তাপমান প্রায় দশ হাজার ডিগ্রি। এফ শ্রেণীর তারায় জলজান ও কেল্‌সিয়াম্ বিদ্যমান; জলজানের রেখাগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; কেল্‌সিয়াম্ ও অন্যান্য ধাতুর রেখা স্পষ্টতর; তাপমান প্রায় ৭০০০ ডিগ্রি। এই উপরোক্ত তিন শ্রেণার তারাই শাদা। জি শ্রেণীর তারা দেখিতে একটু হল্‌দে; জলজানের রেখা অতীব ক্ষীণ; ক্যাল্‌সিয়ামের রেখা খুব প্রবল; লোহ, মেগনেসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর রেখাও বিদ্যমান, এবং ইহাদের সংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু। আমাদের সূর্য্য এই শ্রেণীর তারা। কে শ্রেণীর তারা গাঢ় হল্‌দে; জলজান একেবারে অন্তর্হিত; বহু পরিমাণে ধাতুর রেখা বিদ্যমান; তাপমান প্রায় ৪৫০০ ডিগ্রি। দুইটি বিখ্যাত তারা আর্কটরাশ (Arcturus) এবং অ্যালডিবেরন (Aldebaran) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এম্ শ্রেণীর তারা দেখিতে লাল; সূর্য্যে যে সব ধাতু আছে তাহার অনেকগুলি বিদ্যমান। যৌগিক পদার্থ * জলিয়া যে আলো নির্গত হয় তাহার বিশ্লেষণ-রেখা-গুলি একটু বিশেষ প্রকারের। তাহাতে অল্প কয়েকটি বিশ্লেষণ-রেখার পরিবর্ত্তে রেখা-সমষ্টির সৃষ্টি হয়। ইহারা এত কাছাকাছি যে, দেখিলে একটি মাত্র প্রশস্ত রেখা বলিয়া মনে হয়। এই রেখা-সমষ্টির আবির্ভাবে বোঝা যায় যে, যৌগিক পদার্থ হইতে আলো বাহির হইতেছে। এম্ শ্রেণীর তারার আলোতে এইপ্রকার রেখা-সমষ্টি পাওয়া যায়। এই তারাগুলি নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত শীতল। প্রথমোক্ত শ্রেণীগুলির তারা অতি উষ্ণ বলিয়া সমস্ত যৌগিক পদার্থ ভাঙ্গিয়া মৌলিক পদার্থে পরিণত হইয়াছে। এম্ শ্রেণীর তারার তাপমান প্রায় ৩৫০০ ডিগ্রি।

এই ছয় শ্রেণীর তারা পরীক্ষা করিয়াই মোটামুটি একটা ক্রমবিকাশের কথা মনে হয়। তারাগুলি অত্যন্ত উষ্ণ। বি শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আলোকের ও রঙের পরিবর্ত্তন হয়। ক্রমে বেশী শীতল হইলে তারকাস্থিত মৌলিক পদার্থগুলি একত্রিত হইয়া যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। পরে বোধ হয় সম্পূর্ণ শীতল হইয়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই মতবাদ অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি দশ বৎসর যাবৎ রাসেল্

* শ্রেণী বোধক এই ছয়টি অক্ষর B, A, F, G, K, M—ইহাদের কোন বিশিষ্ট বাংলা নামের প্রয়োজন নাই। কারণ, সকল বিভিন্ন দেশেই বিভিন্ন জাতির বৈজ্ঞানিকগণ এই অক্ষর কয়টিকেই পরিবর্ত্তন না করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

* ইং Compound

নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ অন্য একটি মতবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং তাহাই আজকাল বৈজ্ঞানিক-সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছে।

সকল তারা যে সমান উজ্জ্বল নয় তাহা চোখে দেখিয়াই বোঝা যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই তারার জ্যোতি * অনুসারে তাহাদের কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। আমরা এই জ্যোতির মাপকে তাহার মান † বলিব। প্রথম মানের তারা খুব উজ্জ্বল, এবং আকাশে ২০।১০টির বেশী নাই। দ্বিতীয় মানের তারা তাহা অপেক্ষা কম উজ্জ্বল। ষষ্ঠমানের তারা পর্য্যন্ত খালি চোখে দেখা যায়। তাহা অপেক্ষা ক্ষীণ তারা দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে হয়। বর্ত্তমানে আমেরিকার মাউণ্ট উইল্‌সন্‌ মানমন্দিরের ভীমকায় দূরবীক্ষণ দ্বারা উনবিংশমানের তারার আলোক চিত্র লওয়া হইয়াছে। তারার এই মান-পরিমাপ অতি সূক্ষ্ম। যে-কোন শ্রেণীর তারা অপেক্ষা তাহার ঠিক উর্দ্ধতন শ্রেণীর তারা হইতে আমরা প্রায় আড়াই গুণ বেশী আলো পাইয়া থাকি। যথা প্রথম মানের তারা দ্বিতীয় মানের তারা অপেক্ষা প্রায় আড়াইগুণ বেশী আলো দেয়; সুতরাং তাহার জ্যোতি ২॥০ গুণ বেশী। ফটোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে যে-কোন আলোর জ্যোতি অতি সূক্ষ্ম ভাবে মাপা যায়। তাহা দ্বারাই তারার জ্যোতি বা মান বিশুদ্ধভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। উল্লিখিত বি,এ,এফ, প্রভৃতি শ্রেণীতে কোন্‌ মানের কত তারা আছে তাহা রাসেল্‌ (Russel) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন। তাহাতে এই প্রমাণিত হয় যে, অনেক শ্রেণীর মধ্যেই খুব অল্প ও উর্দ্ধ মানের তারকা দুই-ই বিদ্যমান; অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীতেই খুব উজ্জ্বল ও ক্ষীণ তারা বর্ত্তমান। বি ও এ শ্রেণীতে উর্দ্ধমানের তারা প্রায় নাই। অতএব এই শ্রেণীর তারার জ্যোতি খুব প্রখর। এম্‌ শ্রেণীর গাঢ় লাল তারাগুলির মান অতি উচ্চ। ইহাদের জ্যোতি খুব অল্প। কে ও এম্‌ শ্রেণীর হলদে ও ঈষৎ লাল তারাগুলির মধ্যে প্রায় সবই হয় অতি প্রখর-জ্যোতি, কিংবা অতি ক্ষীণ-জ্যোতি। মধ্যম-জ্যোতির তারা অতি অল্প। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে মধ্যম-জ্যোতির তারার বাহুল্য আছে। রাসেল কে ও এম্‌ শ্রেণীর প্রখর-জ্যোতির তারাগুলিকে দুইটি নাম দিয়াছেন—জায়েণ্ট্‌ এবং ডোয়ার্ফ; * আমরা তাহাদিগকে 'দানবতারা' ও 'বামনতারা' বলিব। ১৯১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত বহু পরিমাণে বামনতারাই আমাদের জ্ঞাত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিশুদ্ধ ভাবে তারার মান নির্ণয় করার পর হইতে দানবতারার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

তারার মান তুলনা করিয়া তাহাদের আপেক্ষিক জ্যোতি মাপা যাইতে পারে। কিন্তু দূরত্ব হেতু তারার স্বজ্যোতির † ধারণা আমরা করিতে পারি না। যদি তারাটিকে ধরিয়া সূর্য্যের নিকট রাখা হইত তবে তাহার জ্যোতি সূর্য্যের জ্যোতির যতগুণ হইবে তাহাকে তারার স্বজ্যোতি বলিব। যে জ্যোতি আমরা পরীক্ষা দ্বারা মাপি তাহা তারার ঠিক স্বজ্যোতি নহে। দূরত্ব হেতু স্বজ্যোতি অনেক ম্লান হইয়া যায়। বস্তুতঃ আমাদের চোখে আসিয়া যে-আলো পড়ে তাহারই জ্যোতি আমরা মাপিয়া থাকি। কিন্তু তারার দূরত্ব জানা থাকিলে এই জ্যোতি হইতেই তারার স্বজ্যোতি অতি সহজে গণনা করা যাইতে পারে। অ্যাডামস্‌ (Adams) নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ তারার দূরত্ব নির্ণয় করিবার এক অদ্ভুত উপায় সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহার উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসারে এখন তারার মান হইতে তাহার স্বজ্যোতি নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। এই আবিষ্কারের পর হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইল যে, একই শ্রেণীর তারার মধ্যে স্বজ্যোতির বিশেষ তারতম্য আছে। কোনটি অতি

* ইং Brightness

† ইং Magnitude

* ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিদগণ Giants ও Dwarfs নামকরণ করেন। ফরাসী ও জার্ম্মান্‌ জ্যোতিষীগণ ইহা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া যথাক্রমে Geantes ও Naines এবং Giganten ও Zwerge ব্যবহার করিতেছেন। আমি 'দানব' ও 'বামন' নামে ইহাদের পরিচয় দিয়া, আশা করি, হাস্যাস্পদ হইব না।

† ইং Absolute brightness

স্বল্প-জ্যোতি, কোনটি তীক্ষ্ণজ্যোতি। সুতরাং একই শ্রেণীতে দানব ও বামন উভয়ই বর্ত্তমান। এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই রাসেল্ তাঁহার নূতন মত প্রচার করিলেন।

তারার বিভিন্ন প্রকার জ্যোতির কারণ কি? বি শ্রেণীর সাদা তারা যে অতি উজ্জ্বল তাহার এক কারণ নিশ্চয়ই যে, তাহারা অতি উষ্ণ। কিন্তু কে ও এম্ শ্রেণীর তারার উজ্জ্বলতা নিশ্চয়ই ভিন্ন। দানব ও বামনের জ্যোতির বিভিন্নতা থাকিলেও তাপমান ও উষ্ণতা প্রায় সমান। বিভিন্নতার কারণ এক এই হইতে পারে যে, দানবদের সত্তা বা ওজন বেশী, অর্থাৎ তাহাতে বহুপরিমাণে পদার্থ আছে, অথবা ইহাদের ওজন বামনেরই মতন কিন্তু ইহাদের আয়তন অতি বৃহৎ। যে-বস্তু হইতে আলো বাহির হইতেছে তাহার উপরিভাগের বিস্তৃতির * উপর সেই আলোর উজ্জ্বলতা নির্ভর করে। দানবদের শরীর যদি অতি বৃহৎ হয় তবে তাহাদের উপরিভাগও অতি বিস্তৃত। সেইজন্য সমান উষ্ণতা সত্ত্বেও বামনদের অপেক্ষা তাহাদের জ্যোতি অনেক বেশী হইবে। কিন্তু অন্য প্রকারে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দানব ও বামন তারার ওজন প্রায় এক প্রকার, তাহাতে বেশী তারতম্য নাই। দানব ও বামন তারার জ্যোতির বিভিন্নতা খুব বেশী। এক অঙ্কের প্রায় সহস্রগুণ। ওজনের বিভিন্নতার জন্যই যে এতবড় তারতম্য হইতে পারে না। ইহা বিশ্বাস করিবার অন্য কারণ আছে। অতএব দানবতারাগুলির বৃহৎ অবয়বের জন্যই নিশ্চয়ই এই জ্যোতির পার্থক্য লক্ষিত হয়। দানব তাহার নামের সম্পূর্ণই অধিকারী।

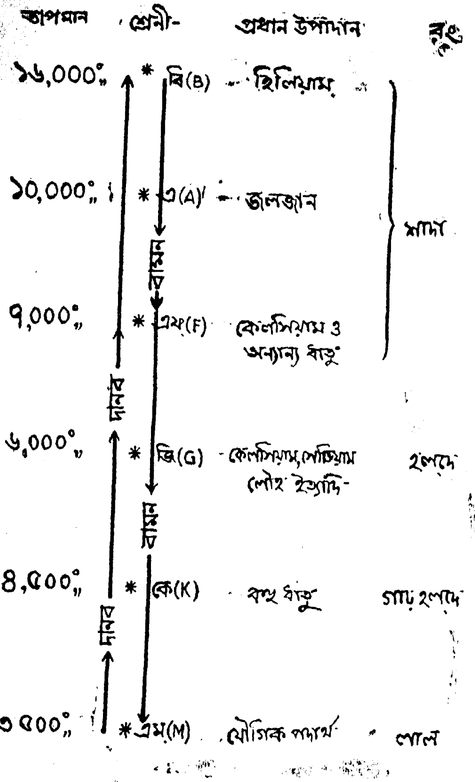
মাইকেল্‌সন্ (Michaelson) নামে আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিক আলোক-তরঙ্গের ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত যন্ত্রে তিনি তারার ব্যাস পর্য্যন্ত মাপিয়াছেন। একটি তারার বিভিন্ন স্থান হইতে দুইটি আলোক-রশ্মিকে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের লেন্সের দুইটি বিভিন্ন স্থান দিয়া প্রবেশ করাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। ইহাদের যোগে যে উজ্জ্বল ও অন্ধকার রেখার সৃষ্টি হয় * তাহা হইতে তিনি তারার ব্যাস নির্ণয় করিয়াছেন। এই প্রণালীতে এম্ শ্রেণীর অনেক দানবতারার ব্যাস নির্ণয় করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, এই ব্যাস অতি বৃহৎ, সূর্য্যের ব্যাসের অনেক গুণ; বামনদের ব্যাস সূর্য্যের ব্যাসের প্রায় সমান। দুইয়েরই ওজন প্রায় একপ্রকার, কিন্তু দানবদের ঘনত্ব† অতি সামান্য। জলের ঘনত্বের সহস্র, এমনকি কোন কোন স্থলে লক্ষ ভাগেরও কম। বামনতারার ঘনত্ব মোটের উপর প্রায় জলের সমান। ইহা হইতে মনে হয় যে, দানবতারাগুলি বৃহদাকার, কিন্তু প্রায় বাষ্পীয় পদার্থে পূর্ণ। বামনগুলি ক্ষুদ্র এবং অনেকটা জমাট বাঁধা; মোটের উপর ওজন দুইয়েরই প্রায় সমান। কালপুরুষ তারাপুঞ্জে বেটেলগিয়স্ (Betelgeuse) নামে যে লাল দানবতারাটি আছে, তাহার ব্যাস ২১॥ কোটি মাইল; অর্থাৎ সূর্য্যের ব্যাসের প্রায় ২৫০ গুণ। অ্যান্টারিস্ নামক দানবতারার ব্যাস ৪০ কোটি মাইল।

এইসকল তথ্য হইতে রাসেল্ সিদ্ধান্ত করেন যে, তারা মাত্রই এম্ শ্রেণীর দানবতারা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তখন তাহার রং লাল। অপেক্ষাকৃত শীতল এবং অবয়ব বৃহৎ। এই প্রকাণ্ড তারা ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে ও সেই হেতু তাপের উৎপত্তি হয়। তাপের সঙ্গে সঙ্গে তারাও উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইতে থাকে, রংএর পরিবর্ত্তন হয়। এদিকে সঙ্কোচনের ফলে আয়তনও কমিতে থাকে। এই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনে তারাটি কে, জি, এফ, এ, এইসকল শ্রেণী অতিক্রম করিয়া বি শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তারকা উষ্ণতম, রংও সাদা হয়। তাহার পর এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, অধিকতর সঙ্কোচনে উৎপন্ন তাপ অপেক্ষা বেশী তাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে এবং সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে তারাদেহ উষ্ণতর না হইয়া শীতল হইতে আরম্ভ করে। বস্তুতঃ তাপ

* ইং Surface

* ইং Interference

† ইং Density



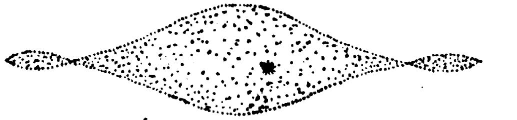
নক্ষত্রের ক্রমবিকাশ প্রণালী (রাসেল)

বিকিরণ সত্ত্বেও তারাটি প্রথম উষ্ণ হইয়া পরে যে শীতল হইতে পারে তাহা লেন্ (Lane) নামক একজন বৈজ্ঞানিক গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি গণিত-শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, তারার আদিম অবস্থায় ইহা যত তাপ বিকিরণ করে তত উষ্ণ হয়। ইহা পরে লেনের বিরোধাভাস (Lane's paradox) নামে খ্যাতি লাভ করে। বি শ্রেণীতে পৌছিবার পর সমস্ত তারা শীতল হইতে আরম্ভ করে। এম্ হইতে বি শ্রেণী পর্য্যন্ত উষ্ণতা বর্দ্ধনের কালই তারার দানবাবস্থা। তাহার পর শীতল হইতে হইতে তারাটি আবার যথাক্রমে এ, এফ, জি, কে, ইত্যাদি শ্রেণীর ভিতর দিয়া বিপরীত দিকে চলিতে থাকে এবং ক্ষীণজ্যোতি ও মৃতপ্রায় হইয়া পুনর্ব্বার এম অবস্থায় উপস্থিত হয়। এই বিপরীত দিকে ভ্রমণ-কালই তারার বামনাবস্থা। সকল তারা বি শ্রেণী পর্য্যন্ত পৌছায় না, তাহার পূর্ব্বেই বিপরীত ভ্রমণ আরম্ভ করে। এইজন্য বি শ্রেণীতে কেবল অতি বৃহৎ দানব তারাই পাওয়া যায়। এম ও কে শ্রেণী দুইটি প্রথম এবং শেষ অবস্থা বলিয়া ইহাদের মধ্যে দানব ও বামন বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মধ্যম মানের তারার সম্পূর্ণ অভাব। জি ও এফ শ্রেণীতে মধ্যম মানের তারা বেশী। আমাদের সূর্য্য জি শ্রেণীর বামন। ক্রমশঃ কে ও এম্ শ্রেণী অতিক্রম করিয়া জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। রাসেল্‌এর এই মতবাদ এখন বৈজ্ঞানিক-সমাজে গৃহীত হইয়াছে। গত কয়বৎসরে এই মতবাদের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এইসকল নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও অনেক বাড়িয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ আলোচনা এ স্থলে সম্ভবপর নয়।

তারার দূরত্ব কি করিয়া স্থির করা যাইতে পারে? পূর্ব্বে এসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বেশী ছিল না। খুব নিকটবর্ত্তী তারার দূরত্ব স্থির করার এক প্রথা ছিল। জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের কোন দেওয়ালের দিকে চাহিয়া একটু মাথা এপাশ ওপাশ নাড়িলেই মনে হইবে দেওয়ালের গায়ে জানালার শিকগুলি নড়িতেছে। কিন্তু অনেকদূরে দেওয়ালের পাশে যদি কোন জিনিষ থাকে, তবে মাথা নড়িলে দেওয়ালের গায়ে কোন স্থান-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু বেশী দূর এদিক ওদিক নড়িলে সামান্য পরিবর্ত্তন বোঝা যায়। কোন একটি তারার দূরত্ব মাপিতে হইলে তাহার নিকট একটি অতি ক্ষীণ তারা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তাহাকে আমরা উপরোক্ত উদাহরণের দূরস্থিত দেওয়াল মনে করিতে পারি। এই ক্ষীণ তারা হইতে অন্য তারাটির দূরত্ব ছ মাস অন্তর দুই দিন মাপা হয়। এই ছ মাসে

পৃথিবী তাহার কক্ষের ঠিক বিপরীত দিকে পৌঁছিয়াছে। অর্থাৎ প্রায় এক কোটী ছিয়াশী লক্ষ মাইল দূর হইতে দেখিলে তারার কতটুকু স্থান পরিবর্ত্তন হয় তাহা নির্ণয় করা হয়। ইহার সাহায্যে সূর্য্য হইতে তারার দূরত্ব অতি সহজে গণনা করা যায়। কিন্তু তারার দূরত্ব এত বেশী যে, এই ১ কোটি ৮৬ লক্ষ মাইল দূরে দুই স্থান হইতে দেখিলেও খুব অল্পসংখ্যক তারা ব্যতীত অন্য কোন তারারই স্থান পরিবর্ত্তন সামান্য মাত্রও লক্ষ্য করা যায় না। এই প্রকারে অল্প সংখ্যক তারার যে-দূরত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা দেখিয়াই বিস্মিত হইতে হয়। সেণ্টরি (Centawri) নামক তারা সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট। কিন্তু তাহার আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতে ৪ বৎসর ৩ মাস লাগে। আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল যায়। তারার দূরত্ব মাইলে প্রকাশ করিলে এক রাশ শূন্য ছাড়া কিছুই বোধগম্য হয় না। এইজন্য এখানে দূরত্বের মাপকাঠি অনেক বড় করিতে হইবে। অলোক এক বৎসরে যতদূর যায় তাহাকে আমরা এক 'আলোক-বর্ষ' বলিব। সিরিয়াস (Sirius) নামক বৃহৎ তারাটির স্বজ্যোতি সূর্য্যের ২৬ গুণ এবং দূরত্ব প্রায় ৯ আলোকবর্ষ। মাত্র ৪টি তারা সূর্য্য হইতে ১০ আলোকবর্ষের কম দূরে আছে। আর্কটরাস্ (Arcturus) সূর্য্য হইতে ৬০ গুণ বেশী উজ্জ্বল, দূরত্ব ৩০ আলোকবর্ষ। রিগেল্ (Rigel) নামক তারা সূর্য্যের ১৩০০০ গুণ উজ্জ্বল এবং পৃথিবী হইতে ৫০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। কালপুরুষে যে নীল নক্ষত্রপুঞ্জ আছে তাহাদের দূরত্ব ৬০০ আলোকবর্ষ। স্থান মাপিয়া তারামণ্ডলের দূরত্ব স্থির করার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া কালের সাহায্যেই তাহা প্রকাশ করিতে আমরা বাধ্য হই। এই স্থলে স্থানের মাপ কালেতেই পরিণত হইয়াছে। অ্যাডামস্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত তারার দূরত্ব নির্ণয় প্রণালীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই প্রণালী পূর্ব্ব প্রণালী অপেক্ষা অনেক সুন্দর। বহুদূরের তারার দূরত্ব ও অ্যাডামসের নিয়মানুসারে স্থির করা সম্ভব।

দূরত্ব নির্ণয়ের সঙ্গেই প্রশ্ন উঠে—এই নক্ষত্র-জগৎ কত বড়। গত শতাব্দীতে ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিদ্ হার্সেল্ নক্ষত্রজগৎকে তাঁহার নিয়মানুসারে মাপিয়া একটি ম্যাপ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার প্রণালী নির্দ্দেশ নহে; কিন্তু ম্যাপটি ঠিকই আছে, এবং আধুনিক উন্নত প্রণালী অনুসারে প্রাপ্ত ম্যাপটি ঠিক তাহারই অনুরূপ। অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের গায়ে অগণিত তারাশ্রেণীর একটি কটিবন্ধ দৃষ্ট হয়। তাহাতে কোন তারা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। কেবল একটি ঈষদুজ্জ্বল রেখা আমরা দেখিতে পাই। দূরবীক্ষণের সাহায্যে বোঝা যায় যে, ইহা একটি তারাপুঞ্জ দ্বারা গঠিত। ইহাকে ছায়াপথ বলে। আমাদের সূর্য্য ছায়াপথের নক্ষত্রপুঞ্জেরই একটি। সূর্য্য হইতে তারার দূরত্ব মাপিয়া যে-ম্যাপ তৈরী করা হইয়াছে তাহার আকৃতি একটি চেপ্টা ঘড়ির ন্যায়। দুইদিকে লম্বা কিন্তু চওড়া কম। ছায়াপথের এই দুই পার্শ্বেই আকাশের সকল তারা পুঞ্জীভূত হইয়াছে। তাহা অপেক্ষা উত্তর ও দক্ষিণে ছায়াপথের সমতলের বাহিরে তারা ক্রমশঃই সংখ্যায় অল্প। একটি পয়সাকে চেপ্টা করিলে যে-রকম দেখায় ছায়াপথের আকৃতিও প্রায় সেইপ্রকার। সূর্য্য তাহার প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। ছায়াপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০,০০০ আলোকবর্ষ এবং অন্যদিকে বিস্তার প্রায় ৩৭,৫০০ আলোকবর্ষ। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদের



নক্ষত্রজগতের আকৃতি।
✱ চিহ্নিত স্থান আমাদের সূর্য্য।

বিশ্বাস ছায়াপথ এতবড় কখনও নয়, এমন-কি ইহার দশমাংশ হইতেও পারে। নক্ষত্র-জগৎ কত বড় ইহা হইতে কিছু ধারণা করা যায়। এই বৃহৎ জগতের রহস্য এতদিন যে অন্ধকারে আবৃত ছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এবং সম্পূর্ণ রহস্য উদ্‌ঘাটনে যে আরো বহুযুগ লাগিবে তাহারও সন্দেহ নাই।

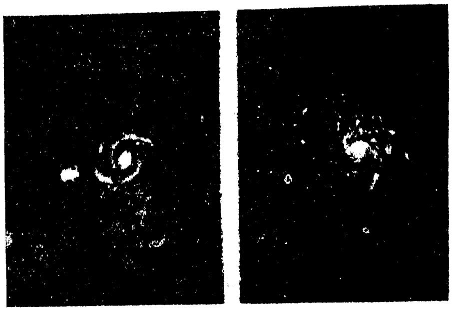
এই ছায়াপথের নক্ষত্র জগতের বাহিরে অন্য কিছু আছে কি না, তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও কিছু কিছু মত বিরোধ আছে। স্পাইরেল নেবিউলা (spiral



এণ্ড্রোমেডা নামক স্পাইরেল নেবিউলা

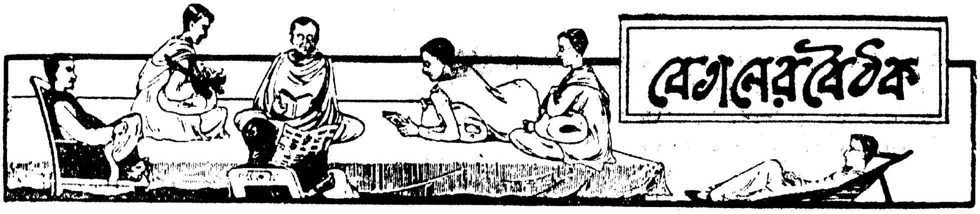
nebula) নামক একপ্রকার নীহারিকা পুঞ্জ দূরবীক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার প্রায় দশ লক্ষটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহারা দেখিতে নীহারিকা জাতীয় পদার্থ; অবয়ব সুন্দর; একটি স্পাইরেল বা প্যাচের মত। প্রত্যেকের দুইটি ডানা আছে। ইহারা আকাশের সকল স্থলেই দৃষ্ট হয়। ছায়াপথের পার্শ্বে সেই সমতলে কম, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বহুদূরে ছায়াপথের সমতলের বাহিরে অনেক বেশী। আলোক-বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাদের গতি নির্ণয় করিলে দেখা যায় ইহাদের বেগ অত্যন্ত বেশী, গড়ে সেকেণ্ডে প্রায় ১২৫ মাইল। সাধারণ নক্ষত্রের গতির বেগ গড়ে সেকেণ্ডে দশ বার মাইল মাত্র। ইহা হইতে মনে হয় ইহারা ছায়াপথের নক্ষত্র হইতে ভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ। ছায়াপথের সমতল হইতে অনেক দূরে অবস্থান ও তাহার পরিচায়ক। এইরূপ নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন যে, স্পাইরেল নেবিউলাগুলি ছায়াপথের বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র জগৎ। এই দ্বীপব্রহ্মাণ্ডগুলি শূন্যে অসীম বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের ছায়াপথও এইরূপ একটি দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ। ইহাতে কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন যে, স্পাইরেল নেবিউলাতে যেমন একটি মাথা আছে, যেখানে তারাপুঞ্জ অতিশয় ঘনীভূত হইয়া আছে, ছায়াপথে সেরূপ কোন স্থান নাই। কোন জ্যোতির্ব্বিদ আবার সেই স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমি এই প্রসঙ্গের আলোচনা এখানেই শেষ করিলাম।

এখন আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন ব্রহ্মাণ্ড সত্যই কি প্রকাণ্ড!



দুইটি স্পাইরেল নেবিউলা

অসীম শূন্যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র-জগৎ আপন আপন ভীমকায় দেহ বিস্তার করিয়া প্রচণ্ড বেগে চলিতেছে। কোটি-তারা-খচিত ছায়াপথ নামক আমাদের এই নক্ষত্রমণ্ডল তাহাদেরই ক্ষুদ্র একটি মাত্র। এই ছায়াপথের অতি নগণ্য বামন শ্রেণীর একটি বৃদ্ধ তারকা আমাদের সূর্য্য এবং তাহারই একটি ক্ষুদ্র গ্রহে আমাদের বাস!



জিজ্ঞাসা

(১)

লাইব্রেরী পরিচালনা

বঙ্গ বা ইংরেজী ভাষায় লিখিত সাধারণ পাঠাগার পরিচালনা বিষয়ক কোন পুস্তক আছে কি না ? থাকিলে দাম কত, কাহার কৃত এবং কোথায় পাওয়া যায় ?

শ্রী অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

(২)

বাংলা সর্টহ্যাণ্ড-শিক্ষা

আমাদের দেশে "সর্টহ্যাণ্ড"ছাপ বার হরপের আমদানি হয়েছে কি না ? যদি হয়ে থাকে, তবে কোথায় কোন্ ঠিকানায় অনুসন্ধিতব্য ? যদি এ দেশে ওরূপ কিছু না থাকে, তবে বাংলা "রেখাসঙ্কেতে"র অন্য কোনরূপে প্রকাশ-সাধন সহজ সম্ভব কি না ?

জনৈক সভ্য
পল্লী সাধনা-মন্দির
খড়দহ।

(৩)

মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কোনও সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা আছে কি না ? থাকিলে তাহা কাহার কৃত, কত মূল্য ও কোথায় পাওয়া যায় এবং একাধিক থাকিলে কোন্‌খানা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আদৃত হয় জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রী বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

(৪)

সাহিত্যিক উপাধি

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন অথবা টোলে সংস্কৃত কাব্য ব্যাকরণ ইত্যাদি পাঠ করিতেন তাঁহারাই কবিরত্ন, কবিভূষণ ইত্যাদি উপাধি লাভ করিতেন। আজকাল দেখিতে পাই, বাংলা সাহিত্যসেবীগণের মধ্যেও অনেকে টোল ইত্যাদিতে না পড়িয়া ও সাহিত্যবিশারদ, কবিভূষণ, সরস্বতী ইত্যাদি উপাধি লাভ করিতেছেন। এইসকল শেষোক্ত উপাধি সকল কোন্ কোন্ সভা, সমিতি বা প্রতিষ্ঠান হইতে দেওয়া হয় এবং ঐসকল সভা-সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের ওরূপ উপাধি বিতরণের অধিকার বা যোগ্যতাই বা কোথা হইতে লাভ হইল ?

শ্রী সত্যভূষণ সেন

(৫)

বাঙলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি

বাঙলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি (origin and gradual development) সম্বন্ধে কোন বই আছে কি ? যদি থাকে নাম কি ও লেখক কে ? দীনেশ-বাবুর History of Bengali Literature and Language'এ পাই নাই।

শ্রী ক্ষিতিনাথ সুর

(৬)

প্রবাদ-বাক্য

নিম্ন-লিখিত প্রবাদ বাক্যগুলির উদ্ভব কেমন করিয়া হইল ;—

(১) উত্তম মধ্যম দেওয়া। (২) অপ্সুর পঞ্চানন। (৩) খয়ের খাঁ। (৪) ধামাধরা। (৫) আক্কেল গুড়ুম। (৬) আক্কেল সেলামী। (৭) আদা জল খেয়ে লাগা। (৮) আষাঢ়ে গল্প। (৯) গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান। (১০) গদাই লস্করী চাল। (১১) লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। (১২) ফোতো বাবু (Fop ?)। (১৩) ফোঁপোল দালালি। (১৪) ভবি ভুল্‌বার নয়। (১৫) যত দোষ নন্দ ঘোষ। (১৬) পাঁচ-পয়জার দুই হওয়া। (১৭) নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা। (১৮) চম্পট দেওয়া। (১৯) হরি মটর। (২০) পটল তোলা। (২১) গোবর গণেশ। (২২) ভ্যাবা গঙ্গারাম।

শ্রী জ্যোৎস্না ঘোষ

—

মীমাংসা

১৩৩৩ সালের

(৬৯)

বিধবা-বিবাহ

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পূর্ব্বে রাজা রাজবল্লভ এবিষয়ে একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ শকাব্দে ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পলাশডাঙ্গা-নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাই এদেশে প্রথম বিধবা বিবাহ।

শ্রী প্রাণকৃষ্ণ মিত্র

(৭২)

বাউল সম্প্রদায়

বাউলগণ মহাপ্রভু চৈতন্যকে তাহাদের সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা বলিয়া প্রকাশ করে। এমন-কি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্যের মধ্যে কয়েকজন ছিল বাউল। সেই সময় হইতেই বাউল-ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে। মহাপ্রভু চৈতন্য পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সহজিয়া বাংলার একটি ভিন্ন সম্প্রদায়। ইহাদের সহিত বাউলগণের সাদৃশ্য থাকিলেও ইহারা বাউলগণ হইতে পৃথক্।

বাউলগণ তাহাদের সাধনপ্রণালী কাহারও নিকট প্রকাশ করে না অ-বাউলের নিকট সর্ব্বদাই গুপ্ত রাখে। নিম্নলিখিত পুস্তকদ্বয়ে উঁহাদের সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু জানা যায়।—

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়—৺অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত।

বাউল সম্প্রদায়—শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত।

শ্রী শিবপ্রসাদ চৌধুরী

(৭৪)

খেজুর-গুড়

যে মেটে হাঁড়ী বা কলসীতে গুড় রাখা হয়—গুড় ভরিবার পূর্ব্বে ঐ কলসীগুলি ধৌত করতঃ রৌদ্রে শুকাইয়া লউন—পরে হাঁড়ী বা কলসীর অভ্যন্তর ভাগে টাটকা কলিচুণ উত্তমরূপে মাখাইতে হইবে, চুণ বেশ শুকাইয়া, হাঁড়ীর গায়ে লাগিয়া গেলে গুড় ভরিয়া রাখুন। অথবা আরও একটু সাবধান হইয়া, হাঁড়ী বা কলসীর ঢাক্‌নায় ঐমত চুণ মাখাইয়া, একদম, পাত্রগুলি বন্ধ করিয়াও রাখিতে পারেন। সাধারণ অবস্থায় রাখা গুড় হইতে, এই গুড় ত অধিক দিন ভাল থাকিবেই, গাঁজিয়াও উঠিবে না।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খেজুর-গুড় দীর্ঘকাল ভাল অবস্থায় রাখিবার সহজ উপায় (ইহাতে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নাই) এই—খেজুর গুড়ের কলসীর তলদেশ লৌহশলাকার দ্বারায় ছিদ্র করিয়া দিয়া, সমস্ত তরলাংশ বাহির করাইয়া দিবেন। পরে সেই কলসী কোন শুষ্ক স্থানে রাখিয়া দিলে এক বা দেড় বৎসর কাল বেশ ভাল অবস্থায় থাকে। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

শ্রী হরিদাস বসাক

(৭৫)

"কুশীলব"

কুশীলব :—পুং (কুৎসিতংশীলং যস্য ইতি কুশীলঃ। কুগতীতিসমাসঃ অন্যত্রাপি দৃশ্যতে ইতি বঃ। যদা কুশীলং বাতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি যাবৎ। বা+কঃ।) চারণঃ ইত্যমরঃ নটবিশেষঃ কথকাদিঃ। ইত্যন্যে। দেশান্তরে কীর্ত্তিং প্রচারয়তি যো নটঃ। ইত্যন্যে ইতি ভরতঃ। ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ

"সর্ব্বপ্রথমে রামের পুত্র কুশ ও লব বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ গান করেন; বোধ হয় সেইজন্য সঙ্গীত-ব্যবসায়ীদিগের নাম কুশীলব হইয়াছে।"—প্রকৃতিবাদ অভিধান।

শ্রী কালীদাস ভট্টাচার্য্য

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্রের পুত্রদ্বয় কুশীলব প্রথম রামায়ণ গান করেন বলিয়া সঙ্গীতব্যবসায়ী, নাটক-অভিনয়কারী, চারণ, নট এবং নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতমুনিও "কুশীলব" এই নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এইজন্য নাটকের পাত্র-পাত্রীও "কুশীলব"।

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়

(৭৬)

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

চন্দ্রকোণা নামের সহিত বিষ্ণুপুররাজ চন্দ্রমল্লের কোন সম্পর্ক নাই। ১৮৮৩ সালের "কলিকাতা রিভিউ" নামক বিখ্যাত পত্রিকায় "ক্রনিক্‌ল্‌স্‌ অফ্‌ চন্দ্রকোণা" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে চন্দ্রকোণায় মল্লরাজত্ব ছিল; সে ৭৭২ শক বা ৮৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। খয়ের মল্ল নামে মাত্র একজন রাজার (শেষ) নাম পাওয়া যায়। চোহানবংশীয় চন্দ্রকেতু নামে একজন নরপতি ৺পুরীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বর্ত্তমান চন্দ্রকোণার সন্নিকটে দেবগিরি নামক জঙ্গলে কিছুকাল ছাউনি করিয়া থাকেন এবং পরে খয়ের মল্লকে পরাজিত করিয়া নিজের নামে চন্দ্রকোণা স্থাপন করেন। চন্দ্রকেতু হইতেই চন্দ্রকোণার নামকরণ হইয়াছিল—তাহা জনশ্রুতিতেও এখনও জানিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। মল্লেরা চন্দ্রকোণা হইতে ২৮।২৯ মাইল উত্তরে গিয়া নূতন এবং প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। চন্দ্রকোণার পূর্ব্ব নাম মানা বলিয়া জানা যায় এবং মল্লদের সময়ে ঐ নামেই বিখ্যাত ছিল বলিয়া ক্রনিকেল লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর নামক মহাদেব ও মল্লেশ্বরপুর (মল্লারপুর নহে) নামক পল্লী সেই প্রাচীন মল্লদিগের স্মৃতি আজও বজায় রাখিতেছে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদিগের চন্দ্রকোণা আক্রমণ বা আয়ত্ত করিবার ইতিহাস পাওয়া যায় না, এবং (চন্দ্রকেতু) কেতুবংশের পরবর্ত্তী ভানবংশীয় হরিনারায়ণ নামক নৃপতির সহিত শ্রীনারায়ণ মল্লরাজ-ভগিনীর পরিণয় হইয়াছিল তাহার নিদর্শন (শিলালিপি) পাওয়া যায়। এই হরিনারায়ণ হরিভানরাজা বলিয়া প্রকাশ।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

রবীন্দ্রনাথের **"ছিন্নপত্র"** বাঙালীর ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করিয়াছে। কবির বিভিন্ন সময়ে লেখা বহুসংখ্যক পত্র একত্র চয়ন করিলে সাহিত্যের দিক্ হইতে তাহা যে বিশেষ উপাদেয় হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মনে করিয়া সকলের কাছে আজ আমাদের অনুরোধ, রবীন্দ্রনাথের কোনো চিঠির সংগ্রহ যাঁহার আছে তিনি যেন তাহা যথাযথ নকল করিয়া তারিখশুদ্ধ আমাদের পাঠাইয়া দেন বা কোন মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত করেন।

মূল পত্রগুলি কেহ পাঠাইলে তাহা ফেরৎ দিবার সম্পূর্ণ দায়ীত্ব আমরা গ্রহণ করিব; এবং আপত্তি না থাকিলে পত্রগুলি যাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত যথাস্থানে তাঁহাদের নামোল্লেখ থাকিবে।

শ্রীঅমিয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন



সিংহল-দেশের উপকথা

শ্রী নির্ম্মলা রায়

সিংহল দেশের রাজার একটি মাত্র কন্যা ছিল। কন্যাটি তাঁর নয়নের মণি, জীবনের আনন্দ স্বরূপ। সেই কন্যাই আবার তাঁর পরম নিরানন্দের কারণও হ'ল। আনন্দ স্বরূপ ছিল—তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে প্রাণের অধিক ভালবাস্তেন। নিতান্ত শৈশবেই সে মাতৃহারা, মায়ের স্নেহ কি বস্তু তা জান্‌তে পায়নি। পিতার স্নেহে, আদরে সে অভাব বোধ কর্‌বার অবসরও তার হয়নি। তিনিই তাকে বুকে করে' এত বড়টি করে' তুলেছেন। রাজকন্যার বয়স হ'লে রাজা যখন বিয়ের আয়োজন কর্‌তে লাগলেন কন্যা তখন একেবারে বেঁকে বস্‌ল; বিয়ে কর্‌তে সে কোন মতেই রাজী নয়—ইহাই তাঁর নিরানন্দের কারণ।

রাজকন্যার যখন বয়স অল্প তখন থেকেই সে লেখা-পড়া নিয়ে থাক্‌তে ভালবাস্‌ত। একটু বড় হ'লে মেয়ের ইচ্ছা অনুসারে রাজা তাকে অতি উচ্চ একটি পাঠ-মন্দির প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছিলেন। নানা দেশ থেকে রাশি রাশি বই আনিয়ে সে সেই মন্দির প্রায় পূর্ণ করে' তুলেছিল। বইগুলি তার প্রিয় সঙ্গী ছিল। সেই মন্দিরে পুস্তকরাশির মধ্যেই দিনের অধিকাংশ সময় তার কাটত। সারাদিন ধরে' নানা রকম প্রশ্নের মীমাংসা করা—এই ছিল তার প্রধান আনন্দ। মন্দিরের গায়ে একটি দড়ির সিঁড়ি লাগান থাক্‌ত, রাজকন্যা মন্দিরে উঠে সেটা তুলে নিত যাতে আর কোন লোক গিয়ে তাকে বিরক্ত কর্‌তে না পারে।

রাজার একজন দূর সম্পর্কীয় ভাই ছিল, তার দৃষ্টি বরাবরই সিংহাসনের দিকে। সে লোকটি বড় ভাল ছিল না। এখন রাজার মনে মনে ভয় ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর সেই ভাই রাজকন্যাকে বঞ্চিত করে' নিজেই সিংহাসন দখল করে' বস্‌বে। রাজকন্যার বিয়ে হ'লে তার স্বামী তাকে রক্ষা করে' চল্‌তে পার্‌বে এই ভেবে তিনি তার বিয়ে দেবার জন্য আরও ব্যস্ত হ'য়েছিলেন। তাছাড়া সিংহল দেশে মেয়েদের চিরদিন অবিবাহিত থাক্‌বার রীতিও ছিল না। সেটা বড় নিন্দার বিষয় ব'লে সবাই মনে কর্‌ত। রাজার সভাসদগণ সকলেই উপযুক্ত কোনও রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দেবার জন্যে রাজাকে অনুরোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন। রাজ-ঘটকও তাঁকে ব্যস্ত করে' তুল্‌ল, কারণ রাজকুমারীর বিয়ে হ'লে তার প্রাপ্য টাকা সে পেতে পারে। কিন্তু রাজা কি কর্‌বেন, রাজকন্যা বিয়ে কর্‌তে মত না দিলে তিনি তো আর জোর করে' বিয়ে দিতে পারেন না। তিনি যখনই মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব কর্‌তে যান তখনই সে সে-কথা হেসে উড়িয়ে দেয় ও নানা কথা তুলে সে-বিষয় চাপা দিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করে। শেষ পর্য্যন্ত রাজকন্যাই পরাস্ত হ'ল। রাজা একদিন কোনও কথায় না ভুলে, তাকে ভাল করে' বুঝিয়ে দিলেন যে বিয়ে করাটা তার কর্ত্তব্য কাজের মধ্যে একটা। তা' না কর্‌লে তার দেশের এবং পিতার প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি করা হয়।

তখন রাজকন্যা বিয়ে কর্‌তে রাজি হ'ল। কিন্তু এই সর্ত্তে রাজি হ'ল যে—যদি কোনও রাজপুত্র এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারে যার মীমাংসা রাজকন্যা কর্‌তে পারে না তবেই তাকে সে বিয়ে কর্‌বে। তা ছাড়া যাকে তাকে বিয়ে কর্‌বে না। যে-সকল রাজপুত্র তার কাছে পরাস্ত হ'বে তারা কেউ আর ফিরে যেতে পার্‌বে না, সকলকেই প্রাণ দিয়ে যেতে হ'বে।

তখন রাজা চিত্রকর ডেকে রাজকন্যার একখানি ছবি তৈরী করালেন ও যে-পণে সে বিয়ে কর্‌তে মত দিয়েছে সেই পণের কথা ভূর্জ্জপত্রে লিখে হাতির দাঁতের ফ্রেমে

বাঁধিয়ে নিলেন। তার পর তাঁর এক বিশ্বস্ত সভাসদের হাতে রাজকন্যার সেই ছবি ও হাতির দাঁতের বাঁধান লিখনখানি দিয়ে তাকে দেশ-দেশান্তরে পাঠিয়ে দিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই নানা দেশ থেকে দলে দলে রাজপুত্র সিংহলে এসে উপস্থিত হ'তে লাগল। রাজকুমারী পরমা সুন্দরী ছিল। তার ছবি দেখা অবধি রাজপুত্রদের মনে আর শান্তি ছিল না। রাজকন্যা-লাভের আশায় ব্যাকুল হ'য়ে তারা আপন আপন ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে সিংহলের রাজসভায় উপস্থিত হ'তে লাগ্‌ল এবং মৃত্যুতে শান্তিলাভ কর্‌তে লাগ্‌ল। কারণ, রাজকুমারীকে প্রশ্নে পরাস্ত করা সহজ কাজ ছিল না।

রাজপুতনার রাজপুত্রও সে ছবি ও লিপি দেখেছিল। সে যখন তার বাপের কাছে গিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করল, যে সেও একবার সিংহলে গিয়ে চেষ্টা করে' দেখ্‌তে চায় রাজকুমারীকে লাভ কর্‌তে পারে কি না—তখন রাজা তাকে নিষেধ করে' বল্‌লেন—"তুমি কি পাগল হ'য়েছ, কুমার! যাকে লাভ কর্‌তে গিয়ে কত দেশের কত পুত্র প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে সেই রাজকুমারীর গলায় মালা দিতে গিয়ে কি তুমি মৃত্যুকে বরণ করতে চাও? আর বিশখানা দেশ নিয়ে আমায় এই যে রাজ্য যার উপর অতীতের কোন যুগ থেকে আমাদের এই বংশ একাধিপত্য করে' আস্‌ছে—আমার মৃত্যুর পর তা অপর কোন এক বংশের অধীনে চলে' যাক—এই কি তুমি ইচ্ছা কর্‌ছ?"

রাজার এই কথা শুনে রাজকুমার কিছুদিন চুপ করে' রইল, রাজকুমারীর কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। কিন্তু যতই সে রাজকন্যাকে ভুল্‌তে চেষ্টা করে ততই যেন তার মুখ মনের ভিতরে আরও ফুটে ওঠে। ঘুমের মধ্যে সে রাজকন্যাকে স্বপ্ন দেখে। তার চোখের মধ্যে যেন সে কি এক রহস্য দেখ্‌তে পায়, যে-রহস্য কেউ ভেদ কর্‌তে পারেনি। তার ঠোঁট দুখানি যেন তার সঙ্গে কথা বলে। কি তারা বলে? তারা যেন বলে—ঐ গভীর কালো আঁখি দুটির রহস্যের অর্থ তারা করে' দিতে পারে, রাজপুত্রের সুখের পথের সন্ধান তারা বলে' দিতে পারে।

না, রাজপুত্র আর চুপ করে' থাক্‌তে পার্‌ছ না, তার দিন আর কাটে না। তাকে একবার যেতেই হ'বে সিংহল দেশে। অবশেষে এই প্রতিজ্ঞা করে' সে তার বাপ, রাজার কাছ থেকে সিংহলে যাবার অনুমতি পেল যে, সে রাজকুমারীর সভায় গিয়ে তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে' পরাস্ত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে না।

যাবার সময় রাজা ছেলের সঙ্গে তিনটি অতি উজ্জ্বল মুক্তা দিয়া দিলেন; এই মুক্তা তিনটি এমন দীপ্তিশালী ছিল যে, বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া উপলক্ষে এইগুলি দিয়ে তিনি রাজগৃহ আলোকিত কর্‌তেন। রাজকুমার সযত্নে মুক্তা তিনটিকে তার পাগড়ীর ভাঁজের মধ্যে সেলাই করে' নিয়ে সামান্য ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে সিংহলেরই উদ্দেশ্যে যাত্রা কর্‌লেন। সেখানকার বন্দরে পৌছে দেখে, কত দেশ-বিদেশের জাহাজ যে সেখানে ভিড়েছে তার ঠিকানা নেই। দেশী ও বিদেশী লোকে রাজপথ পরিপূর্ণ,—কত রকমের অদ্ভুত পোষাক যে তারা পরেছে সে-সব রাজপুত্র কখন দেখেনি। কত ভাষায় যে তারা কথা বল্‌ছে সে তার কিছুই বোঝে না। সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুন্‌তে শুন্‌তে রাজপুত্র রাজবাড়ির দিকে চল্‌তে লাগ্‌ল। ফটকের সামনেও অত্যন্ত ভীড়। অনেক কষ্টে পথ করে' ভিতরে ঢুকে সে রাজকন্যার মন্দিরের নীচে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। সামান্য পথিক মনে করে' কেউ তাকে গ্রাহ্য কর্‌ল না।

সন্ধ্যার সময় রাজকুমারী দড়ির সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন ও পথিককে সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, সে কি চায়; পথিক উত্তর কর্‌লে—আমি বিদেশী পথিক, ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি, কিছু খাবার চাই।

রাজকুমারী তাঁর দাসীদের ডেকে পথিককে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার এনে দিতে বল্‌লেন। এবং মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লেন, একে দেখেতো তেমন ক্ষুধার্ত্ত বলে' বোধ হ'চ্ছে না। দেখ্‌তে হ'বে খাবার দিলে খায় কি না। আমার মনে হচ্ছে, এ ছদ্মবেশে কোন ধূর্ত্ত লোক হবে।

এই মনে করে' রাজকুমারী সিঁড়ি বেয়ে আবার উপরে উঠে গেল ও একটা ছোট জানালার আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগল পথিক কি করে। এদিকে দাসীরা খাবার নিয়ে এলে রাজপুত্র তার পাগড়ীর ভিতর থেকে একটা মুক্তা বের করল ও সেটাকে একটা পাথরের উপর রেখে মনের আনন্দে সেই-সব ভাল ভাল খাবার খেতে লেগে গেল এবং নিজের মনে বল্‌তে লাগল—আ, রাজকুমারী, তোমাকে আমি দেখলাম, তোমার ছবির চেয়ে তুমি আরও শতগুণ সুন্দরী। তোমাকে আমি জয় করে' নেবই, আর তা যদি না পারি তবে সেই চেষ্টাতেই এ জীবন আনন্দের সঙ্গে বিসর্জ্জন দেব।

রাজপুত্রের খাওয়া শেষ হ'লে রাজকুমারী উপর থেকে নেমে এসে তার কাছ থেকে সেই মুক্তাটি কিনে নিতে চাইলে।

রাজপুত্র বললে—"রাজকুমারী, আমার এ মুক্তা আমি বিক্রী করব না, তবে তুমি যখন চাইলে, তোমায় আমি দিতে পারি যদি তোমার পা দু'খানি আমায় চুম্বন করতে দাও।"

তারপর সেই মুক্তা নিয়ে রাজকন্যা তার বাপকে দেখাতে চলে' গেল।

পরদিন রাজপুত্র আবার মন্দিরের নীচে অপেক্ষা করতে লাগল ও রাজকুমারী নেমে এলে খাবার চাইলে। সেদিন আরও উজ্জ্বল ও বড় আর একটা মুক্তা বার করে' সে খেতে আরম্ভ করলে। রাজকন্যা সে মুক্তাটাও কিনতে চাইলে। আবার রাজপুত্র বললে—মুক্তা সে বিক্রীর জন্যে আনেনি, তবে দিতে পারে যদি রাজকন্যা তাকে তার সুন্দর কপালটিতে একটি চুম্বন দিতে দেয়।

রাজকুমারী উত্তর করলে—"তুমি বড় বেশী দাম চাইছ পথিক, অথচ বলছ মুক্তো বিক্রীর জন্যে নয়। যাহোক এ জিনিষ পাবার জন্যে আমি তোমায় দাম দিতে রাজী আছি।" সে তখন চারিদিকে চেয়ে একবার দেখে নিলে কেউ তাদের দেখছে কি না ও পথিককে তার কপাল চুম্বন করতে দিয়ে মুক্তা নিয়ে চলে' গেল।

তার পর দিন যখন সন্ধ্যা হ'য়ে আসে রাজকুমারী আশা করতে লাগল মন্দিরের নীচে পথিককে দেখতে পাবে। অন্ধকার ঘনিয়ে এল তবু পথিক আসেনি দেখে তার মন পথিকের জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কেন সে আজ এখনও এল না? ঐ যে, মন্দিরের নীচে পথিককে দেখা যাচ্ছে, তার হাতে উজ্জ্বল সাদা আলো, ওটা কিসের আলো? ও যে দেখছি আর-একটা মুক্তা। তাড়াতাড়ি দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে রাজকন্যা পথিকের হাত ধরে' তার বাপের কাছে নিয়ে গেল।

এবার রাজকন্যা তার অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়ে সেই মুক্তাটি কিনতে চাইলে, এ বারেও রাজপুত্র বললে—তার মুক্তা সে বিক্রী করবার জন্যে আনেনি তবে রাজকন্যাকে দিতে পারে যদি সে তার বক্ষস্থলে তাকে একটি চুম্বন দিতে দেয়।

রাজকন্যার বক্ষদেশ চুম্বন করে' শেষে মুক্তাটি তাকে দান করে' রাজপুত্র সিংহল ছেড়ে চলে' গেল।

রাজকন্যা প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় তার প্রতীক্ষায় মন্দিরের জানালায় বসে' থাকে। কিন্তু হায়, বৃথাই প্রতীক্ষা! দিনের পর দিন চলে' যায় পথিক আর আসে না। রাজকন্যা বসে' বসে' ভাবে কে এই পথিক? সে যে সামান্য একজন পথিক নয়, ছদ্মবেশে কোন বড় লোক হ'বে এ কথা নিজের মনে সে নিশ্চয় বুঝতে পারল। কিন্তু কে সে? এই একটা প্রশ্ন যার উত্তর সে দিতে পারছে না। তা সে যেই হোক না কেন তার জন্যে রাজকন্যার এত চিন্তা কেন? কেন সে প্রতিদিন তার আগমন-প্রতীক্ষায় বসে' থাকে? এই একটা রহস্য যার মীমাংসা সে করতে পারছে না। হায়, একি হ'ল? রাজকন্যার মনের সুখশান্তি কে হরণ করে' নিল? তার মনে হ'তে লাগল সেও যদি একজন সামান্য পথিক বালিকা হ'য়ে ঐ পথিকের সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে পারত তা হ'লে তার কত না আনন্দ হ'ত!

অনেক দিন পরে রাজকন্যা একদিন তার মন্দিরের জানালা থেকে দেখতে পেলে, অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়ল। শীঘ্রই রাজপ্রাসাদে সংবাদ এল রাজকন্যার নিকটে একজন রাজপুত্র আস্‌ছেন। তিনি রাজকন্যাকে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌বেন যার উত্তর রাজকন্যা দিতে পার্‌বেন না।

রাজকন্যা বিষণ্ণ মনে রাজপুত্রের জন্যে অপেক্ষা কর্‌তে লাগল। তার জন্য যে কত রাজপুত্রের প্রাণ নষ্ট হ'ল সে কথা চিন্তা করে' তার মন বড়ই বিমর্ষ হ'য়ে গেল। নিরুদ্দেশ পথিকের জন্যে চিন্তা করে' করে' তার মন অন্যের দুঃখ বুঝতে শিখেছিল।

অবশেষে রাজপুত্র তার পিতা রাজপুতনার রাজার সঙ্গে রাজকন্যার মন্দিরে এসে পৌঁছলেন এবং তাকে বল্‌লেন—"রাজকুমারী! আমার একটি প্রশ্ন আছে, তুমি যদি পার তবে তার মীমাংসা করে' দাও। আমার প্রশ্নটি এই :—

আমি একবার বিদেশে শিকার কর্‌তে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি চমৎকার হরিণী আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। আমি তার পদদ্বয় লক্ষ্য ক'রে তীর নিক্ষেপ কর্‌লাম। সে আহত হ'য়ে পলায়ন কর্‌লে। পরদিন সেইস্থানেই আবার তাকে দেখতে পেলাম, এবার তার কপাল লক্ষ্য করে' তীর নিক্ষেপ কর্‌লাম, সে আহত হ'য়ে পড়ে' গেল, কিন্তু আমাকে অগ্রসর হ'তে দেখে উঠে পালিয়ে গেল। তৃতীয় দিন ঠিক সেই স্থানেই আবার সেই হরিণীকে দেখলাম। এবার আমি তার হৃদয় লক্ষ্য করে' তীর নিক্ষেপ কর্‌লাম। আমার তীর তার হৃদয় ভেদ করে' গিয়েছে বলে' আমার ধারণা ছিল। কিন্তু যেখানে তাকে পড়তে দেখেছিলাম বলে' মনে হ'ল, সেদিকে যখন অগ্রসর হ'লাম তখন আর তাকে কোথাও দেখা গেল না।

তুমি কি এই রহস্যের মীমাংসা ক'রে দিতে পার?"

রাজপুত্রের কথাগুলি যখন রাজকন্যা মন দিয়ে শুন্‌ছিল তখনই সে বুঝতে পার্‌ল এ রাজপুত্র তার সেই পথিক ভিন্ন আর কেউ হ'তেই পারে না। সে তার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে কোনও চেষ্টাই না করে' পরাজয় স্বীকার করে' নিল।

তখন মহাসমারোহেই রাজপুতনার রাজপুত্রের সঙ্গে সিংহলের রাজকন্যার বিয়ে হ'য়ে গেল। দুই রাজাই পরম আনন্দ ও সন্তোষ লাভ কর্‌লেন। কিন্তু রাজপুত্র ও রাজকন্যা পরস্পরের মিলনে যেমন সুখী হ'য়েছিল এমন আর কেউ হয়নি—সে-সব কথা বলাই বোধ হয় বাহুল্য।

কারুশিল্পের পুনরুদ্ধার

শ্রী শান্তা দেবী

শিল্প বলিতে সচরাচর আমরা কখনও বা চারুশিল্প কখনও বা কারুশিল্পমাত্রকে বুঝি। আমাদের নানা শিল্পভবনগুলির সহিত চারুশিল্পের কোনো সংস্রব নাই, তবু আমরা সর্ব্বদাই তাহাদের শিল্পভবন বলি এবং ভুলিয়া যাই যে, শিল্পের নামটা চারুশিল্প হইতেই উৎপন্ন। চারুশিল্প সৃষ্টি যে করে সেই শিল্পী, কারুশিল্প রচনা করে কারিগর। সভ্যজগতে সকল দেশেই চারু ও কারু শিল্প পরস্পরের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে শিল্প বলিতে এই দুইটিকেই বোঝা উচিত।

এক শিল্প শব্দের দ্বারা এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি ও রচনাকে বোঝায় বলিয়াই যে, কেবল ইহাদের পরস্পরের সহিত যোগ তাহা নয়, ইহারা মানুষের সভ্য জীবনে পরস্পরের সহিত সকল দিক্ দিয়াই অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। মানুষের জীবনে আনন্দ ও প্রয়োজন দুইয়েরই সমান স্থান

এবং সমান মূল্য। যে-মানুষ প্রয়োজন বুঝে না কেবল আনন্দ চাহে তাহাকে আমরা বলি পাগল, যে-জীবনে আনন্দ ও হাসিকে বাদ দিয়া কেবল প্রয়োজন লইয়াই থাকিতে চায় তাহাকেও আমরা বলি পাগল। এক কথায় উভয় শ্রেণীর মানুষই মানসিকরোগগ্রস্ত। সমাজ এবং জাতিও অনেকাংশে মানুষেরই প্রতিরূপ। মানুষ আনন্দ ও প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিয়া সৃষ্টি করিয়া জীবনের পরিচয় দেয়, জীবনকে সার্থক করে ; সমাজ এবং জাতিও আনন্দ এবং প্রয়োজনের খাতিরে তাহার শক্তিকে নানাভাবে খেলাইয়া জীবনের পরিচয় দেয়। যে জাতি কিম্বা যে-সমাজ আনন্দের মূল্য না বুঝিয়া কেবল প্রয়োজন-সাধনেই ডুবিয়া থাকে অথবা যে জাতি চার্ব্বাকপন্থীর মত সুখই সর্ব্বস্ব করে সে যে রোগগ্রস্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। চিকিৎসা না করিলে এ জাতির রোগবৃদ্ধি ও মৃত্যু অনিবার্য্য।

মানুষের জীবনে প্রয়োজন এবং আনন্দের দুইটি বিভাগ আছে বটে ; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কড়া মাপকাঠিতে মাপিতে গেলে তাহাদের দুইটির মাঝখানের ভেদ-রেখাটি খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। বহির্জ্জগতে যেমন ফুলকে আমরা বলি সৃষ্টির আনন্দের বিকাশ এবং ফলকে বলি প্রয়োজনের রূপ, অথচ জানি যে ফলের সৃষ্টির জন্য ফুলের বিশেষ প্রয়োজনই আছে, এবং ফলের প্রয়োজনের মধ্যেও ফুলের সৌন্দর্য্য একেবারে মরিয়া যায় নাই ; তেমনি মানুষের অন্তর্জ্জগতেও প্রয়োজন এবং আনন্দ, গদ্য এবং কাব্য, উপকথা ও নীতিকথা পরস্পরকে অনেকখানি জড়াইয়া আছে। গদ্যকে আমরা কাব্যালঙ্কারে শোভিত করি, কাব্যে আমরা মোহমুদ্গর রচনা করি, সুয়োরাণী দুয়োরাণীর উপকথায় আমরা নীতি প্রচার করিয়া হেঁটে-কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া অপরাধীর শাস্তি বিধান করি, আবার হিতোপদেশে জরদ্গব ও লঘুপতনকের গল্প বলি। বিধাতা স্বয়ংও আমাদের লইয়া এমনি খেলা খেলিতেছেন, সুতরাং আমাদের পক্ষে তাঁহার অনুকরণ করা কিছুই বিচিত্র নয়। খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া মানুষের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে যে জিনিষ তাহাতে পাওয়া যায়, বিধাতা বিজ্ঞচিকিৎসকের মত সেগুলি শিশিতে ভরিয়া আমাদের জন্ম ত ডিস্পেন্সারি সাজাইয়া রাখেন নাই ; তিনি সেই খাদ্যকে রূপে রসে গন্ধে অনুপম করিয়া মানুষকে আনন্দ দিয়াছেন। কেননা আনন্দ আপাত দৃষ্টিতে প্রয়োজনাতীত বোধ হইলেও বাস্তবিক এক পক্ষে তাহাই অধিকতর প্রয়োজনীয় ; কারণ, যাহাতে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়, কিন্তু আনন্দ স্ফুরিত হয় না, এমন জিনিষ তাহার নীরসতার দোষে মানুষের বিতৃষ্ণা আনিয়া প্রয়োজন-সিদ্ধির পথেও ব্যাঘাত জন্মায়।

মানুষের আনন্দবোধ ও আনন্দপ্রকাশের প্রেরণা হইতেই চারু শিল্পের জন্ম। আনন্দের উৎস যে-জাতির শুকাইয়া গিয়াছে শিল্প তাহাদের মধ্যে মৃত অনাদৃত। জাতীয় অবনতির সঙ্গে-সঙ্গেই তাই শিল্পেরও অনাদর এবং সঙ্গে সঙ্গে অধোগতি হয়। কেবল খাইয়া আর পরিয়াই মানুষ বাঁচে না ; আনন্দই মানুষের প্রাণ, জাতির প্রাণ। সুতরাং কেহ যদি মনে করেন এই দরিদ্রদেশে শিল্পসৃষ্টির কোনো মূল্য নাই, কেবল চালের কল ও কটন মিল প্রতিষ্ঠা করিলেই দেশ উদ্ধার হইয়া যাইবে, তাহা হইলে তাঁহার মত ভ্রান্ত আর কেহ নাই। প্রাণের লক্ষণই বহু রূপে বহুমূর্ত্তিতে আপনাকে প্রকাশিত করা ; যে-জাতির প্রাণ তাহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত সেই শিল্প-সাহিত্যাদি নানা আনন্দের খেলার ভিতর আপনার স্ফূর্ত্তিকে ছড়াইয়া দিয়া আপনার আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করে। যে জাতির প্রাণ বুকের কাছে ধুক্‌ধুক্ করিতেছে, সেই নাড়ী টিপিয়া পাঁচনের হাঁড়িটুকুমাত্র আঁকড়াইয়া জড়ের মত পড়িয়া থাকে, অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করাকেও দৃষ্টিশক্তির অপচয় মনে করে। সুতরাং শিল্পের আদর করিতে গিয়া আমরা যদি কারুশিল্পকে বাঁচাইয়া চারুশিল্পকে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাই, তাহা হইলে গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া হইবে।

কারুশিল্পের জন্মই হইয়াছে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনের সহিত তাহার আনন্দজাত চারু-শিল্পের একটা সামঞ্জস্য করিবার জন্য। মানুষ তাই পটের উপর তুলি চালাইয়াই আপনার রসানুভূতিকে শেষ করে নাই। কার্পাসের ও পশমের সুতায় বোনা যে কোনো কাপড়ে মানুষের লজ্জা ও শীত নিবারণ হইত ; শিল্পী তাহাতে

সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; সে ঢাকাই মস্‌লিন, মছলিপটম-ছিট, জামিয়ার শাল, কিংখাব, কত কি সৃষ্টি করিল; কারিগরেরা শিল্পী গুরুর অনুকরণে বংশের পর বংশ ধরিয়া যন্ত্রশিল্পের ব্যবসায় চালাইতে লাগিল। ইহাতে মানুষের মনও খুসী হইল প্রয়োজনও সিদ্ধ হইল। শিল্পী যে আনন্দজাত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন তাহাকে সহজলভ্য করিয়া ঘরে ঘরে বিকাইবার জন্য এবং পণ্যজীবী যে কাজ-চালানো পণ্যে বাজার ছাইয়া দেন তাহাকে সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিবার জন্য কারিগরের কারুশিল্প। এইখানেই সৌন্দর্য্যের সহিত প্রয়োজনের যোগ, শিল্পের সহিত পণ্যের মিলন।

ভারতের কারুশিল্প প্রধানত কৃষিজ দ্রব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; তাহার দেহের খাদ্য ও মনের আনন্দ সমস্তই এই ভূমিলক্ষ্মীর ক্রোড় হইতে প্রাপ্ত। তাই তাহার অন্তরের কাব্যরস গ্রাম্য বাউলকবি ও কথকের মুখে মুখে আনন্দ বিলায় এবং শিল্পকলা কুটীরে কুটীরে গড়িয়া উঠে। গৃহের আবেষ্টনে বর্দ্ধিত এই কৃষিজ কুটীর শিল্প ভারতবাসীর জীবন যাত্রার সহিত জড়িত। এই কারুশিল্পের উন্নতি-অবনতির সহিত সখের কারিগরের মাত্র সম্পর্ক নয়, ইহার সহিত ভারতের শতকরা পঁচানব্বই জন কৃষিজীবীর ভাগ্য জড়িত। গ্রামে কার্পাসজাত সূতা কাটা হইত বস্ত্রের জন্য। মানুষ নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিবার জন্য তাহাকে মসলিনের মত সূক্ষ্ম করিয়া কাটিল; এ সূতা গ্রামেরই মেয়েদের চরকায় কাটা। তারপর গ্রামের তাঁতী কাপড় বুনিল, কেহবা তাহাতে জামদানি পাড় তুলিল কেহ নানা নক্‌সার বুটি তুলিল। সাদা কাপড় মানুষের চোখে একঘেয়ে হইয়া যায় বলিয়া দেশজ রঙে গ্রামের রঞ্জকই তাহাকে কত রঙে রঙাইত। আজও আমরা দেশী রঙীন ঢাকাই শাড়ী পরিতেছি বটে, কিন্তু সে শাড়ীর সূতাও বিদেশী, রংও বিদেশী। শুধু তাই নয়, সে-সকল শাড়ীর পাড়ের ও আঁচলের নক্‌সা পর্য্যন্ত বিলাতী ও ফ্রেঞ্চ সস্তা পর্দ্দা প্রভৃতির অনুকরণে বোনা; কারণ, কারিগর যদি বা দেশে আছে, শিল্পী এখন নাই, যে উচ্চদরের দেশী নক্‌সা তাহাদের কাজের জন্য আঁকিয়া দেয়।

ঘরের বারান্দার খুঁটি, দরজার কপাট হইতে আরম্ভ করিয়া খাটপালঙ্ক, বাক্স, খেলনা সমস্তই গ্রামের ছুতার তৈয়ারি করিত, এবং নানা কারুকার্য্যে সাজাইত। এখন দরিদ্রের ঘরের আমকাঠ শিমুলকাঠের দরজায় সৌন্দর্য্যের ত চিহ্নই নাই, বড়লোকে চীনা মিস্ত্রীর কাজের জন্যই বেশী লালায়িত। কাঠের খেলনার পাট ত প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে; তাহার বদলে সেলুলয়েড টিন এবং রবারের জর্ম্মান ও জাপানী খেলনাই ঘরে ঘরে বিরাজিত।

রেশম-শিল্পও মরিতে বসিয়াছে। আমরা যে বেণারসী পরি তাহার রেশম ও জরী সবই প্রায় বিদেশ হইতে আনা। দেশী কারিগর বুনিয়া দেয় এই পর্য্যন্ত। অনেক সময় বোনাও বিদেশী, কেবল জরির কাজটা দেশী। তাছাড়া বাংলার নানা গ্রামে গ্রামে তসর গরদ চেলি প্রভৃতির যে ছোট ছোট শিল্প-কেন্দ্র ছিল, তাহা আমাদের চোখের সাম্‌নেই দিন দিন এক এক করিয়া অনেকগুলি মরিয়া গিয়াছে; কারণ এসকল রেশমের চেয়ে অনেক সস্তা ফ্রেঞ্চ সিল্ক এবং তার চেয়েও সস্তা আলপাকা নামে চলিত নকল সিল্ক আজ বাজারের সমস্ত দোকান ছাইয়া দিয়াছে।

ধাতব শিল্পের ভিতর বাসন ও গহনা প্রভৃতির দুর্দ্দশাও সমান। গহনা অবশ্য আজকার মানুষ কিছু কম পরিতেছে না; কিন্তু সে গহনার কারিগরের সহিত শিল্পীর কোনো যোগ নাই বলিয়া তাহাও বিদেশী গহনার সস্তা নকলে অথবা দেশী বিলাতী সংমিশ্রণে খিচুড়ি নক্‌সায় মানুষের অঙ্গসৌষ্ঠব লাঘব করিতেছে।

কিন্তু নানা-প্রকার কুটীর-শিল্পের একটা তালিকা দেওয়া এবং তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করা ত আমার মত একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু বলিতে চাই যে, ভারতবর্ষব্যাপী অসংখ্য গ্রামে যে অগণ্য শিল্প একদিন ঘরে ঘরে গড়িয়া উঠিয়া গ্রামবাসীর জীবিকার সংস্থান ও দেশের লোকের প্রয়োজনসিদ্ধি এবং আনন্দবিধান করিতেছিল তাহাদের যে আজ কি অবস্থা তাহার কি কেহ খোঁজ রাখে? এই বিষয়ে খাঁটি বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্ত দেশজোড়া অনুসন্ধান হওয়া উচিত। কোন্ জেলায়, কোন্ গ্রামে কি কি শিল্প ছিল, তাহার কতগুলি আছে, কতগুলি মরিয়া গিয়াছে, কতগুলি উন্নত হইতেছে,

কতগুলির অধোগতি হইতেছে, এবং কোন্ জাতের কত মানুষ সেই সেই কাজে ব্যাপৃত ছিল এবং আছে, তাহাদের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষের স্থান কি ইত্যাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ-খবর লওয়া এবং পরে যথাবিহিত পথে কার্য্য করা দরকার। তাহা হইলে বোঝা যাইবে, কেন আমাদের শিল্পকলার এমন অনাদর ও অধোগতি।

এই কার্য্যের জন্য আমরা যদি গবর্ণমেণ্টের উপর ভার দিয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে কাজটি সুসম্পন্ন হওয়া শক্ত হইবে। আমাদের নিজেদেরও একাজে নামিতে হইবে। স্ব স্ব জেলা ও গ্রামের খবর আমরা ইচ্ছ করিলে যেমন ভাল ভাবে সংগ্রহ করিতে পারি, সরকারী বেতনভোগী লোকে সর্ব্বদা তেমন পারে না। তা ছাড়া একাজে যথেষ্ট অর্থেরও প্রয়োজন আছে, আমাদের এবং সরকারের তরফের দুই দলের লোকেরই এই অর্থ সরবরাহ করা উচিত।

বেহারে ১৯২৫ সালে লেডি হুইলার কুটীর-শিল্পের একটি প্রতিষ্ঠান ও ক্রয়বিক্রয়ের কেন্দ্র স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে এরূপ কোনো সরকারী কি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। খুব ছোটখাট ধরণের দুই-একটি যা আছে তাহাদের না ধরিলেও চলে।

যথেষ্ট ধনবল ও লোকবল থাকিলে আমরা দেশের জীবিত শিল্পগুলির সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। তাহাদের দোষগুণ রুচিবিকার প্রভৃতির কারণাদিও নির্ণয় করিতে পারি।

তারপর তাহাদের বিদেশী কলের মালের প্রতি-যোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অর্থ-সাহায্য ও বিক্রয়ের সুবিধা দান করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব, এবং দেশবাসীদের মনে স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করাইয়া দেশের ঘরে ঘরে তাহাদের প্রতিষ্ঠা করাও দরকার।

দেশে কারুশিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া শিল্পীদের ও শিল্পের উন্নতির জন্য আর একটা ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। এই যে সব কারুশিল্পগুরু গ্রামের অজ্ঞাত কোণে অনাহারে অর্দ্ধাহারে পড়িয়া নিজেরাও মরিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিদ্যাগুলিকেও লুপ্ত করিয়া দিতেছে, ইহাদের আমরা বলি, 'ছোটলোক'। এই তথাকথিত ছোটলোকদের তাহাদের অজ্ঞাত-বাস হইতে আবিষ্কার করিয়া আনিয়া অল্প বেতনেই আমরা আমাদের তথাকথিত ভদ্রলোকদের উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয়ে কারুশিল্প শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে দেশের লুপ্তপ্রায় শিল্পগুলি বাঁচিয়া যায় এবং ছাত্রছাত্রীদের এক-একটা অর্থকরী বিদ্যাও লাভ হয়। যাহার যা আজন্মের ব্যবসায় সে তাহার দোষগুণ যেমন করিয়া বুঝিয়া শিষ্যদের গড়িতে পারে, শিক্ষিত অর্থাৎ বর্ণজ্ঞানবান যে কোনো মাষ্টার-মহাশয় তাহা পারিবেন না। সুতরাং এই তথাকথিত ছোটলোকদেরই ভদ্রলোকদের গুরু বলিয়া মানিতে হইবে; তাহাতে লজ্জা বা অপমান বোধ করার মূর্খতা করিলে চলিবে না। তারপর স্কুল-সমূহে এইসকল শিল্পবিদ্যাকে রীতিমত পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া অবশ্য-শিক্ষণীয় করিতে হইবে। এবং হাতের কাজকে কেবল হাতে শিখিলেই হইবে না, মস্তিষ্কের সাহায্যে তাহার সকল আইন-কানুন ও মূল সূত্রগুলিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যেন শিষ্য কেবল গুরুর শিক্ষিত কোনো একটি শিল্পসৃষ্টির মাছিমারা নকল মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত না হয়। শিষ্যের মনে যাহাতে উদ্ভাবনী শক্তি জাগে, শিল্পের দোষসংশোধন ও গু. বর্দ্ধনের ক্ষমতা বাড়ে এবং মানুষের প্রয়োজন, অবস্থা রুচি ও অর্থবল বুঝিয়া জিনিষ সরবরাহ করিবার যোগ্যতা জন্মে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্রেতাদের সৌন্দর্য্য-বোধের বিকারকে অল্পে অল্পে সংশোধন করিয়া মার্জ্জিত সৌন্দর্য্যজ্ঞান তাহাদের মনে জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াসও এই নবীন শিল্পীদের থাকা উচিত। নতুবা শিল্পের উন্নতি না হইয়া ক্রমে অবনতিই হইবে।

প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেক স্কুলে অন্তত একটি করিয়া কারুশিল্প অবশ্য-শিক্ষণীয় করা দরকার। পাঠ্যবিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মত শিল্পবিদ্যায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরাও প্রাইজ ইত্যাদি পাইবে এবং অনুত্তীর্ণ ছাত্রদের বেলাতেও পাঠ্য বিষয়ে অনুত্তীর্ণদের মতই ব্যবস্থা হইবে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃস্থানীয়েরা বলেন যে, অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের একটা

বিদ্যা পরিপূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করা অপেক্ষা নানা বিদ্যা চাখিয়া দেখার প্রবৃত্তিই বেশী। এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া এবং একের ভিতরই বৈচিত্র্য আনিয়া শিল্প-বিদ্যাটিকে তাহাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবার হইতে আসিয়া থাকে। ইহাদের শিল্পবিভাগের হাতের কাজগুলি বিক্রয় করিবার জন্য প্রত্যেক স্কুলে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদি তাহা বিক্রয় করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদের পাঠ ও ভরণ-পোষণের ব্যয় সহজেই চলিয়া যায় এবং ছাত্রাবস্থা হইতেই উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারায় একটা আত্ম-সম্মানবোধ ও কার্য্যে উৎসাহ জাগে। প্রত্যেক বিদ্যালয় এবিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে উদ্যোগী ত হইবেনই, তাহা ছাড়া শিক্ষা-বিভাগ হইতে সমুদায় বিদ্যালয়জাত শিল্পদ্রব্যাদি বিক্রয়ের একটা কেন্দ্র যদি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বিক্রয়ের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আর একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ছাত্রদের ইহাতে অর্থলাভ ত হয়ই, উপরন্তু মানুষ যে তাহাদের হাতের জিনিষের আদর করিতেছে, এই আনন্দের খোরাকটুকুও জোটে।

সর্ব্বসাধারণের চোখের সম্মুখে গ্রামের আজন্মশিল্পী ও সহরের ছাত্রশিল্পী প্রভৃতির হাতের কাজগুলি ধরিবার জন্য ও মানুষের চোখের ভিতর দিয়া সকলের মনে তাহাদের স্থান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জেলায় জেলায়, সহরে ও গ্রামে মাঝে মাঝে শিল্প-প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি খোলা যে উচিত তাহা বলাই বাহুল্য। সামান্য একটু আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা থাকিলেই সেখানে লোকের ভিড়ের কমতি হইবে না। খরচ যা হইবে তাহা সমস্তই উঠিয়া গিয়া বরং লাভ থাকিবে।

ইহা ছাড়া ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্সের সহিত গ্রামজ কুটীর-শিল্পের যদি একটা যোগ স্থাপন করা যায়; দালালেরা যেমন প্রতি গ্রাম হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে তেমনি করিয়া যদি ইহাদের নিযুক্ত লোক প্রতি গৃহ হইতে সামান্য সামান্য শিল্পরচনাগুলি সংগ্রহ করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের কাছে আনিয়া ফেলিতে পারে এবং চাহিদা বুঝিয়া শিল্পীদের অর্থ ও কাঁচামাল দিয়া এই কাজে উৎসাহী করিয়া তুলিতে পারে তবে আমাদের দেশজ শিল্পগুলি ক্রমে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে।

আজ জাতীয় জাগরণের দিনে আমরা দেশের আনন্দ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ, অন্ন, দেশাত্মবোধ সকল বিষয়েই ভাবিতে বসিয়াছি; এমন দিনে দেশের কলালক্ষ্মীকে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই তাহা বলিয়া দিতে হইবে না, কারণ এই লক্ষ্মীর হস্তেই অন্ন, অর্থ, আনন্দ বিলাইবার ভার এবং অন্ন, অর্থ ও আনন্দ যাহার আছে, সেই স্বাস্থ্যে শিক্ষায় সুন্দর হইতে ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে।

সম্পাদকের চিঠি

(৭)

আমি মোটামুটি যে বারদিন ইংলণ্ডে ছিলাম, তার প্রত্যেক দিনের চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইলেও দেশটির বেশী কিছু দেখা হইত না। সুতরাং এটা দেখা হয় নাই, ওটা দেখা হয় নাই, বলিয়া দুঃখ করা বৃথা। কিন্তু আমি যে একটা আকস্মিক বাধা প্রযুক্ত ব্রিষ্টল গিয়া রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির ও তথাকার টাউনহলে রক্ষিত তাঁহার তৈলচিত্র দেখিয়া আসিতে পারি নাই, তাহার জন্য আমি দুঃখিত। ইংলণ্ডের অল্প যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা প্রধানতঃ শ্রীমান্ অরবিন্দমোহন বসুর দেখাইবার উৎসাহে ঘটিয়াছিল; সেই উৎসাহ আমার জড়তাকে পরাভূত করিয়াছিল।

জেনীভায় লীগ অব নেশন্সের য্যাসেম্ব্লীর অধিবেশন ৬ই সেপ্টেম্বর সোমবার আরম্ভ হইবে স্থির ছিল। এই

রবিবার, লীগের সব অফিস বন্ধ থাকিবে। লণ্ডনে স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সুপরামর্শ দিয়াছিলেন, যে, ২।১ দিন আগে গিয়া আবশ্যক মত লীগের কোন কোন কর্ম্মচারীর সহিত পরিচয় করিয়া লওয়া ভাল। সেইজন্য আমি ১লা সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে রওনা হইব ভাবিয়াছিলাম। সেই দিনের জন্য টিকিটও কেনা হইয়াছিল। যিনি টিকিট কিনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমার বসিবার জায়গা রিজার্ভ করিতেও বলিয়াছিলাম। কিন্তু কোন কারণে তাহা না হওয়ায়, বসিবার জায়গা না পাইতেও পারি ভাবিয়া, দোসরার জন্য জায়গা রিজার্ভ করিয়া তবে রওনা হই। বিদেশে অল্পদূর যাইতে হইলে আমি অধিকাংশ স্থলে তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতাম, দু'এক স্থলে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও গিয়াছি; কিন্তু বহুদূর যাইতে হইলে প্রথম শ্রেণীতে যাইতাম। যাহাদের বয়স বেশী এবং স্বাস্থ্যও খুব ভাল নয়, বিদেশে তাহাদের যথাসাধ্য সাবধান হওয়া ভাল। এইজন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়াও, আমি জায়গা রিজার্ভ না করিয়া রওনা হই নাই। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীমান্ শশধর সিংহ এবং আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত (বর্ত্তমানে রেঙ্গুন-প্রবাসী) শ্রীমান্ ডাক্তার সুবোধকুমার নাগ, এম-ডি, আমার জিনিষপত্র ওজন করাইয়া আমাকে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। লণ্ডনের ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত একটি আফিসের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীমান্ নলিনীকান্ত রায় গাড়ী ছাড়িবার আগেই আসিয়া জুটিয়াছিলেন। ইঁহারা ও অন্য ২।১ জন বাঙালী যুবক লণ্ডনে আমার অনেক সাহায্যও করিয়াছিলেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় আমেরিকা রওনা হইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন; তাঁহার নিকট হইতে আগেই বাসায় বিদায় লইয়াছিলাম।

যে ট্রেনটিতে উঠিলাম, তাহা ডোভার পর্য্যন্ত যাইবে। তাহার পর জাহাজে ইংলিশ প্রণালী পার হইয়া ক্যালেতে আর-একটা ট্রেনে উঠিয়া প্যারিস যাইতে হইবে। প্যারিস হইতে আবার আর-একটা ট্রেনে জেনীভা। ডোভার-গামী ট্রেনটি দেখিলাম বেশ আরামদায়ক। যাত্রীদের প্রত্যেকের জন্য খুব পরিষ্কার গদী আঁটা এক-একটি চেয়ার ও সামনে টেবিল। টেবিলে লেখাপড়া চলিতে পারে, আবার খাইবার সময় খাওয়াও চলে; অন্য ট্রেনের মত খাইবার জন্য ভোজনের গাড়িতে যাইতে হয় না। আমার যাহাতে বেশ রুচি হয়, এরূপ খাদ্য ট্রেনে কমই পাওয়া যাইত বলিয়া আমাকে যখন দুপুর বেলা একজন রেলের লোক খাইব কি না জিজ্ঞাসা করিল, তখন বলিলাম, না।

ডোভারে নামিয়া দেখিলাম, জাহাজে যাইবার পথে একটা ফাটকের কাছে সব যাত্রীরা একটা ছোট ফার্‌মে নাম ধাম জাতি গন্তব্যস্থান প্রভৃতি পূরণ করিতেছে। আমিও পূরণ করিয়া ফাটকের সমীপস্থ কর্ম্মচারীকে দিলাম। সে ব্যক্তি উহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, ব্রিটিশ ন্যাশন্যাল-দিগকে ঐ কার্ডটা পূরণ করিতে হয় না। আমি ইহাতে গৌরব অনুভব করিলাম না। বড়মানুষদের বাড়ীর আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি ও ভৃত্যবর্গ যদি আপনাদিগকে বড় ঘরানা মনে করে, তাহা হইলে ব্যাপারখানা যেরূপ দাঁড়ায়; আমরা আপনাদিগকে ব্রিটিশ ন্যাশন্যাল বা ব্রিটিশ সিটিজেন মনে করিলেও প্রায় সেইরূপ অবস্থা ঘটে।

জাহাজে ইংলিশ প্রণালী পার হইবার সময় আমার সামুদ্রিক পীড়া অর্থাৎ বমনেচ্ছা প্রভৃতি কিছু হয় নাই। জাহাজের ডেকে বসিয়া থাকিবার সময় আমার একটা ছোট ব্যাগ বেঞ্চির তলায় গড়াইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আমি সেটা তুলিয়া আমার অন্যান্য জিনিষপত্রের উপর রাখিলাম। আমাকে উহা তুলিতে যাইতে দেখিয়া একটি ইউরোপীয় মহিলা ও একটি ইউরোপীয় ভদ্রলোক তাহা তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলাম। তাঁহারা কোন্ দেশের জানি না। ক্যালে হইতে প্যারিস যাইবার ট্রেনেও এইরূপ শিষ্টাচার দেখিলাম। ট্রেনের যে কামরায় আমি ছিলাম, তাহাতে একটি প্রৌঢ়া বা বর্ষীয়সী ইউরোপীয় মহিলা ছিলেন ও একটি ইউরোপীয় যুবকও ছিলেন। যুবকটি বোধ হয় তাঁহার পুত্র। গাড়ীতে যতবার আমার গায়ে ও মুখে রোদ পড়িতেছিল, ততবার মহিলাটি যুবকটিকে পর্দ্দা টানিয়া আড়াল করিয়া দিতে বলিতেছিলেন। প্যারিস

ষ্টেশনে গাড়ী হইতে যখন নামিলাম, তখন মহিলাটি বিদায়সূচক নমস্কার করিলেন। ইঁহারা বোধ হয় ফরাসী-জাতীয়, কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না। এইসব সামান্য বিষয় উল্লেখ করিবার কারণ এই, যে, তদ্দ্বারা বুঝা যায়, সব জাতির মধ্যেই বিদেশী বৃদ্ধের প্রতি সৌজন্য দেখাইবার লোক আছে, এবং শ্বেতাঙ্গেরা যদিও এদেশে ভারতীয়দের প্রতি এরূপ সৌজন্য সচরাচর দেখায় না, তথাপি ইউরোপে ব্যক্তিগতভাবে এরূপ সৌজন্য দুর্লভ নহে। বিদেশী অ-শ্বেত জাতিদের প্রতি ইউরোপীয় শ্বেত জাতিদের জাতিগত ব্যবহারের আলোচনা অবশ্য এখানে করিতেছি না।

প্যারিস ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলাম, তথাকার সুপরিচিত ভারতীয় বণিক শ্রীযুক্ত সর্দ্দারসিংহজী রাণা, এবং শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ বসু ও শ্রীমান্ বিমলকুমার সিদ্ধান্ত নামক দুটি ভারতীয় ছাত্র আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আগের বারে যখন প্যারিসে আসি, তখনও রাণা মহাশয় আমার সহিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং বসু ও সিদ্ধান্ত আমাকে সহর দেখাইয়াছিল। যত শীঘ্র সম্ভব হোটেলে যাইবার জন্য আমি রসীদ দেখাইয়া জিনিষপত্র আনিবার নিমিত্ত পকেট হইতে রসীদটা বাহির করিতে গেলাম; কিন্তু কোন পকেটেই তাহা পাইলাম না। এ অবস্থায় কি করা উচিত, জানিবার জন্য রাণা মহাশয় রেলের কয়েকটা আফিসে ঘুরিলেন। শেষে জানিতে পারিলেন, আমাকে ষ্টাম্পযুক্ত কাগজে ফরাসী ভাষায় একটা দরখাস্ত লিখিতে হইবে ও তাহাতে দস্তখত করিতে হইবে, দুজন ফ্রান্সদেশীয় সাক্ষীকে দস্তখত করাইতে হইবে, এবং তারপর থানায় গিয়া পুলিস্ কর্ত্তৃপক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত হুকুম আনিতে হইবে; তবে আমি জিনিষ পাইব। দরখাস্ত যাহা লিখিতে হইবে তাহার মুদ্রিত একখণ্ড রেলের আফিস হইতেই পাইলাম। কিন্তু ইহাও জানিতে পারিলাম, যে, বেলা পাঁচটার মধ্যে থানায় যাওয়া দরকার। তখন কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সেদিন জিনিষ পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া আমি শ্রীমান্ বিমলকুমার ও বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে হোটেলে গেলাম। এই হোটেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়ায় অবস্থিত। ঐ পাড়ার হোটেলগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া আমাদের মত পর্য্যটকদের পক্ষে সুবিধাজনক।

সেপ্টেম্বরের গোড়ায় প্যারিসে মোটেই শীত ছিল না, অথচ আমি লণ্ডন হইতে বাহির হইয়াছিলাম গরম পোষাক পরিয়া। হাল্কা ও ঠাণ্ডা ঘুমাইবার পোষাক যাহা ছিল, তাহা ষ্টেশনে আমার বাক্স প্যাটরার মধ্যে ছিল। বিমলদের কাছে আমার যে চামড়ার বাক্সটা রাখিয়া লণ্ডন গিয়াছিলাম, তাহাতেও ছিল। কিন্তু তাহা চাহিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। গরম কোট ও প্যাণ্টালুন প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিলেও গুমটে রাত্রে ঘুম সামান্যও হইয়াছিল কিনা, এখন মনে পড়িতেছে না। বলা বাহুল্য, হোটেলের কোন কামরাতেই বৈদ্যুতিক বা অন্য কোন রকম পাখা ছিল না, ইউরোপের যে-সব গৃহস্থ বাড়ী ও হোটেলে গিয়াছি, কোথাও পাখার বন্দোবস্ত দেখি নাই। কিন্তু গ্রীষ্ম অনুভব অনেক জায়গায় করিয়াছি।

রাত্রিটা কোনপ্রকারে কাটাইয়া সকালে উঠিয়া কিছু খাওয়া-দাওয়া করিতে করিতেই বিজয়কৃষ্ণ বসু আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ছেলেটির নাম বাঙালীর মত, কিন্তু বাড়ী মালাবারে এবং বংশতঃ মালাবারী, বাল্যকাল হইতে প্রথমে শান্তিনিকেতনে ও পরে কলিকাতায় শিক্ষিত হওয়ায় বাঙালীর মত বাংলা বলিতে, লিখিতে পারে। শুনিয়াছি, ইটালীতে ও ফ্রান্সে তামাকের দোকানে ষ্টাম্প বিক্রী হয়। বসু ষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কিনিয়া আনিয়াছিল। তাহাতে মুদ্রিত দরখাস্তটি নকল করিয়া আমার সহি লইল, এবং পরে হোটেলের দু'জন কর্ম্মচারীর দস্তখত লইল। তারপর আমরা নিকটবর্ত্তী থানায় গেলাম। তখন বেলা নটা। থানার এক পুলিস কর্ম্মচারী বলিল, এখনত কিছু হইবে না, বারটার পর হইবে। বসু ফরাসী ভাষায় কিছুক্ষণ আমার পক্ষে ওকালতী করায় তাহার মনটা নরম হইল ও সে দরখাস্তখানা উপরওয়ালার নিকট লইয়া গিয়া তাহার হুকুম লিখাইয়া আনিল। তাহার পর আমরা গেলাম আবার ষ্টেশনে, এবং সেখানে কিছু ফী দিয়া জিনিষগুলি আনিলাম। বলা বাহুল্য, পর্য্যটক

বিভাগের লোকেরা দু' একটা প্যাটরা খুলাইয়া দেখিয়াছিল। এই সামান্য ব্যাপারের এত বড় বর্ণনা লেখা সঙ্গত নয়; কিন্তু আমার চিঠিগুলা প্রবন্ধ নয়, এবং আমার তুচ্ছ অভিজ্ঞতা হইতে অন্যে সাবধান হইতে পারিবেন, ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

এবার আমি প্যারিসে দু'রাত্রি ও একদিন ছিলাম। ইহার মধ্যে দুটি মহারাষ্ট্রীয় ছাত্র খবরের কাগজের পক্ষ হইতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। গণিতের ছাত্র টেণ্ডুলকর আসিয়াছিলেন, বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান্ ডেলী মেলের পক্ষ হইতে লীগ অব্ নেশ্যন্স সম্বন্ধে আমার মতামত জানিবার জন্য। কিন্তু আমি তখনও জেনীভা যাই নাই; সুতরাং সে-বিষয়ে বিশেষ কোন কথা হয় নাই। সাধারণ রকমের কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুবকটির নাম ধাবার্লে। ইনি প্যারিসে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ইনি বলিলেন, তথাকার বিখ্যাত দৈনিক কাগজ ল্য মাতিন্ (Le Matin) তাঁহাকে ভারতবর্ষের তাৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে পাঠাইয়াছেন। আমি তখন একমাসের উপর দেশছাড়া,দেশী কাগজ হইতে টাট্‌কা খবর জানিয়া কোন একটা মত গঠন ও প্রকাশ করিবার সুযোগ পাই নাই; সুতরাং এই ছোকরাটির সঙ্গেও সাধারণ কথাবার্ত্তা ছাড়া আর কিছু হইল না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আঁদ্রে কার্পেলেস্ নাম্নী একটি ফরাসী মহিলা কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তখন তাঁহার বিবাহ হয় নাই। পরে হগম্যান নামক এক সুইড ভদ্রলোককে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি চিত্রশিল্পী। তাঁহার আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি তৈলচিত্র বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে আছে। তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎপরিচয় না থাকিলেও সাহিত্যিক প্রয়োজনে তিনি কখন কখন আমাকে চিঠি লিখিতেন। শান্তিনিকেতনে থাকিবার সময় আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। আমি যখন প্রথম বার প্যারিস যাই, তখন তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল; শুনিয়াছিলাম তাঁহারও আমার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেবার দেখা হয় নাই। এবার প্যারিসের উপকণ্ঠে বোলোনে তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর বাড়ী গিয়াছিলাম। আমি বিদেশী বলিয়া তাঁহারা আমার হোটেলে আসিয়া আমাকে লইয়া যান। অনেক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তবে তাঁহাদের বাড়ী পৌছিতে হয়। প্যারিসের সীমায় পৌছিয়া একটা চুঙ্গী ঘরের কাছে আমাদের ট্যাক্সি থামিল। আঁদ্রে হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "আমরা ফরাসীরা অনেক বিষয়ে খুব অগ্রসর, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে মধ্যযুগে আছি। ট্যাক্সি-চালক যে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেট্রল লইয়া যাইতেছে না, তাহা চুঙ্গীর কর্ম্মচারীকে বুঝাইবার জন্য গাড়ী থামাইয়াছে।" বোলোন যাইবার পথ বেশ সুন্দর। রাস্তায় ধূলা নাই। দুধারে গাছের সারি। কতকটা রাস্তা অরণ্যের পাশ দিয়া গিয়াছে। আঁদ্রে বলিলেন, "অতীত যুগে এখানে নেকড়ে বাঘ ও ভালুক থাকিত। এখন কোন হিংস্র জন্তু সেখানে থাকে না, কিন্তু বড় বড় গাছ গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকায় বনভূমি সুন্দর দেখাইতেছে।"

আঁদ্রে ও তাঁহার স্বামী উভয়েই ভারতপ্রেমিক ও রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত। তাঁহাদের বাড়ীটির নাম রাখিয়াছেন "চিত্রা"। বাড়ীটি ছোট, সুন্দর, ও কতকটা প্রাচ্যধরণের আসবাবে সজ্জিত। শান্তিনিকেতনের নিকটস্থ সাঁওতাল পল্লী হইতে ক্রীত একটি দড়ি-ছাওয়া কাঠের মোড়া সযত্নে রক্ষিত দেখিলাম। আঁদ্রের চিত্রাঙ্কণকক্ষে তাঁহার নিজের আঁকা অনেকগুলি ছবি রহিয়াছে। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিটি বেশ হইয়াছে মনে হইল। রবীন্দ্রনাথের ছোট একখানি ছবিও মন্দ নহে। পেছন দিকে হাতদু'টি রাখিয়া ও সামনে ঝুঁকিয়া তিনি যেমন চলেন, সেই ভঙ্গীতে আঁকা হইয়াছে। তিনি সচরাচর যেমন হাঁটেন, ভঙ্গী কিন্তু তাহার অপেক্ষা কিছু দ্রুত মনে হয়। আঁদ্রে ও তাঁহার স্বামী বলিলেন, "আমরা মডার্ণ রিভিউ কাগজখানির প্রত্যেক সংখ্যার নিয়মিত পাঠক।" তাঁহার স্বামী বলিলেন, "উহা আমাদের দৈনিক অন্নজল। আঁদ্রে ত আর কোন কাগজই প্রায় পড়েন না; উহার বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত পড়েন। প্রবাসী পড়িতে পারেন না বলিয়া তাঁর

বড় দুঃখ; কেননা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর নিকট তিনি শুনিয়াছেন, যে, তাহাতে অনেক ভাল জিনিষ থাকে। আমি আপনার কনিষ্ঠা কন্যার সোনার খাঁচার ইংরেজী অনুবাদ পড়িতেছি।" দেখিলাম, তাঁহার অধ্যয়নকক্ষের টেবিলের উপর উহা খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। সুরুলে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ নিজের জন্য দুটি গাছের ডালের উপর একটি কাঠের ঘর নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। শ্রীমতী আন্দ্রে গল্প করিলেন, যে, তিনি, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা এক রাত্রি সেই কাঠের ঘরে ছিলেন। "চিত্রায়" রবীন্দ্রনাথের পৌত্রী নন্দিনীকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। সে বছর পাঁচ ছয়ের হইবে বোধ হয়। কয়েক মাস প্যারিসে থাকিয়াই অনায়াসে ফ্রেঞ্চ বলিতেছে, মাঝে মাঝে ফ্রেঞ্চ শব্দ না জুটায় দু'একটা বাংলা কথাও চালাইতেছে। শিশুরা যে এত সহজে ভাষা শিখে, তাহার কারণ তাহারা স্বাভাবিক প্রণালী অনুসারে অন্যকে কথা বলিতে শুনিয়া শিখে। কোন একটা কাগজের বা খামের টুকরার উপর পেন্সিলের দাগ কাটিয়া একটা টুকরীতে বা বাক্সে ফেলিয়া দিলেই তাহা তাহার দাদা মশায়ের কাছে পৌঁছিয়া যায়! সুতরাং দিনের মধ্যে অনেকবার জার্ম্মেনীতে ভ্রাম্যমাণ কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাতনীর চিঠি নিশ্চয়ই পাইতেন! "চিত্রায়" আমরা চা কফির পরিবর্ত্তে প্রাচ্য রীতি অনুসারে ফলের শরবৎ পান করিলাম।

৪ঠা সেপ্টেম্বর আমার জেনীভা রওনা হইবার কথা। রেলের টিকিট আগের দিন সহজেই কিনিয়াছিলাম। কিন্তু বসিবার জায়গা রিজার্ভ করা তত সোজা নয় দেখিলাম। তাহা ভিন্ন আফিসে করিতে হয়। সেখানে গিয়া দেখি, একজনের পেছনে আর একজন, তার পেছনে আর একজন, এইরূপে সারি বাঁধিয়া বিস্তর নারী ও পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। মুখে সন্তোষের চিহ্ন কাহারও বড় দেখিলাম না; কিন্তু সকলেই ধৈর্য্য ধরিয়া আছে, ঠেলাঠেলি করিতেছে না। ধৈর্য্যের সহিত এই রকমের সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার অভ্যাস আমাদের দেশেও প্রচলিত হওয়া উচিত। ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি অন্যায়, অশোভন, এবং তাহাতে অধিকাংশের অসুবিধাও হয়।

শ্রীমান্ বিমল ও বিজয় আমাকে সকালে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া গেলেন। আমার কামরায় কেবল একটি প্রৌঢ়া মহিলা ছিলেন। পরে জানিলাম, তিনি আমেরিকার এক সাংবাদিকের স্ত্রী, জেনীভা যাইতেছেন—বোধ হয় লীগ সম্বন্ধে লিখিবার জন্য কোন আমেরিকান্ কাগজের সংবাদপ্রেরক রূপে। তাঁহাকে দেখিয়া সুস্থ বোধ হইল না। শীর্ণ চেহারা। কিন্তু অন্নচিন্তা চমৎকারা। গাড়ী ছাড়িতেই দেখি, তিনি হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। বাড়ীতে ছেলেপিলে রাখিয়া আসিয়াছেন—কাঁদা আর বিচিত্র কি? তিনি ফরাসী হোটেলের লোকদিগকে ও ফরাসী জাতিকে অর্থগৃধ্নুতার অপবাদ দিতে লাগিলেন। আমি ভারতীয় জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন ও কি করিতেছেন। ইউরোপের নানা স্থানে, প্রধানতঃ রেল-গাড়ীতে, যে ২।৪ জন আমেরিকানের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক প্রচেষ্টার খবর জানিতে চাহিয়াছেন। ট্রেনে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। কেবল একটা ছোট কথা বলিব। দুপর-বেলা খাইতে বসিলাম, তিন জন ইউরোপীয়ের সহিত এক টেবিলে। ইউরোপের সব জায়গার জল পানযোগ্য নহে শুনিয়াছিলাম, মদও খাই না; সুতরাং এক বোতল খনিজ জল (মিনার‍্যাল ওয়াটার) চাহিলাম। টেবিলের ইউরোপীয় খানসামা আনিয়া দিল। তাহাকে উহার ছিপি খুলিয়া দিতে বলিলাম; দিল না। কিন্তু তাহার এক আধ মিনিট পরেই ঐ খানসামা আমার পাশের যাত্রীর একটা বোতল আপনা হইতেই খুলিয়া দিল।

আগেকার একটা চিঠিতে আমি লিখিয়াছি, জেনীভার ট্রেন হইতে নামিয়াই আমি আমার জিনিষপত্র কেন পাই নাই। তাহা আগেকার বেলগার্ড ষ্টেশনে পড়িয়াছিল। সে সব কথা আগেই বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস মহাশয় ও তাঁহার পত্নীর সৌজন্যে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। তাঁহারা আমার জন্য যে হোটেল ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, টাকাও বেশী দিতে হয় না।

অধিকন্তু সেখানে সব রান্না হয় মাখনে; অন্যত্র সচরাচর চর্ব্বিতে হয়, শুনিলাম।

এই হোটেলে একজন ভারতীয় মুসলমান সাংবাদিক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি সাধারণতঃ সুইজার্ল্যাণ্ডেই থাকেন। তাঁর কাগজের দু এক সংখ্যা জেনীভায় থাকিতে পাইয়াছিলাম। ভারতশাসক ইংরেজদের প্রতি তিনি খুব ভদ্র ভাষা প্রয়োগ করিলেন না। যাহারা হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া নিজেদের কাজ উদ্ধার করে, তাহাদিগকে ত তিনি খুবই গালি দিলেন। যে-সব ভারতীয় পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করিয়া বিদেশীদের পক্ষে ভারতশাসন ও ভারতশোষণ সহজ করে, তাহাদের প্রতি তিনি সাতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

লীগের য়্যাসেম্ব্লীর সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনের প্রথম বৈঠক হয় ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে। সভা আরম্ভ হইবার সময় ছিল বেলা এগারটা। কিন্তু এগারটা অপেক্ষা বারোটার কাছাকাছি সময়েই কাজ আরম্ভ হইল। তার আগে কিছুক্ষণ শৃঙ্খলার অভাব ও গোলমাল লক্ষিত হইয়াছিল। যে হলে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধি, দর্শক, সংবাদপত্রের রিপোর্টার প্রভৃতি কয়েক হাজার লোক ছিল। স্ত্রীপুরুষ প্রায় সকলেরই পোষাক ইউরোপীয়, যদিও দস্তুরমত কাল এবং কতকটা কাল রঙের মানুষ তাদের মধ্যে কিছু ছিল। সম্পূর্ণ প্রাচ্য বা কতকটা প্রাচ্য পরিচ্ছদ কেবল জন কতক মানুষের দেখিলাম। যেমন, পারস্যের প্রতিনিধি প্রিন্স্ আর্ফা, মান্দ্রাজের স্যার্ সি পি রামস্বামী আইয়ার (কেবল পাগড়ীটা ভারতীয়), সিন্ধুদেশের একজন দর্শক (কেবল পাগড়ীটা ভারতীয়), পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর এক কন্যা, আরও ২।১টি ভারতীয় মহিলা, এবং আমি। হলে ইউরোপীয় ও প্রাচ্য পোষাক পরা লোকদের অনুপাত যেরূপ, লীগে ইউরোপীয় ও অনিউরোপীয় লোকদের প্রভাবের অনুপাতও প্রায় সেইরূপ। যে কোন জাতির মাতৃভাষা কোন ইউরোপীয় ভাষা, তাহাদিগকে আমি ইউরোপীয় বলিতেছি। হলে প্রাচ্য চেহারা বেশী না থাকায় কোন কোন রিপোর্টার একটা কৌতুকজনক ভ্রম করিয়াছিল। যেমন, জেনীভার ল্য ত্রিবিউনের ৭ই সেপ্টেম্বরের কাগজে দেখিলাম :—

"A la tribune d'honneur on remarque un venerable personage a longue barbe grise qui n'est autre que le poete philosophe Rabindranath Tagore."

"সম্মানার্হদের উপবেশনের মঞ্চে একজন দীর্ঘশ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট ভক্তিভাজন ব্যক্তিকে দেখা গেল যিনি কবি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন আর কেহ নহেন।"

রবীন্দ্রনাথ তখন জেনীভায় ছিলেন না, সুইজার্ল্যাণ্ডের কোথাও ছিলেন না। যাহারা রবীন্দ্রনাথকে কখনও একবারও দেখিয়াছে, তাহাদের এরূপ ভুল হওয়া অসম্ভব। এইরূপ ভ্রমবশতঃ কপূরতলার মহারাজাও দীর্ঘশ্বেতশ্মশ্রু মানুষটিকে নমস্কার করিয়াছিলেন; যদিও সে ব্যক্তি সেলামটি আত্মসাৎ করে নাই। জার্ম্মেনীতেও এইরূপ ভুল কোন কোন জার্ম্যান পুরুষ ও স্ত্রীলোকের হইয়াছিল। সেই কারণে জার্ম্মেনীতে একদিন রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করিয়া বলিলেন, "মশায় রামানন্দ-বাবু, লেক্‌চার দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। আপনি আমার কয়েকটা লিখিত বক্তৃতা নিয়ে কোন কোন সহরে পড়ে দিন; তার পর পণ্ডিতজী মুখে মুখে তার জার্ম্যান্ অনুবাদ ক'রে দেবেন। বেশ চলে' যাবে; আমিও বেঁচে যাব।" বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীর অধ্যাপক পণ্ডিত তারাচাঁদ রায় নামক একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার জার্ম্যান অনুবাদ সভাস্থলে মুখে মুখে করিতেন। তাঁর গলার আওয়াজ বেশ উঁচু ও গম্ভীর, এবং তিনি বেশ দ্রুত সুন্দর জার্ম্যান বলিতে পারেন। তিনিই পণ্ডিতজী।

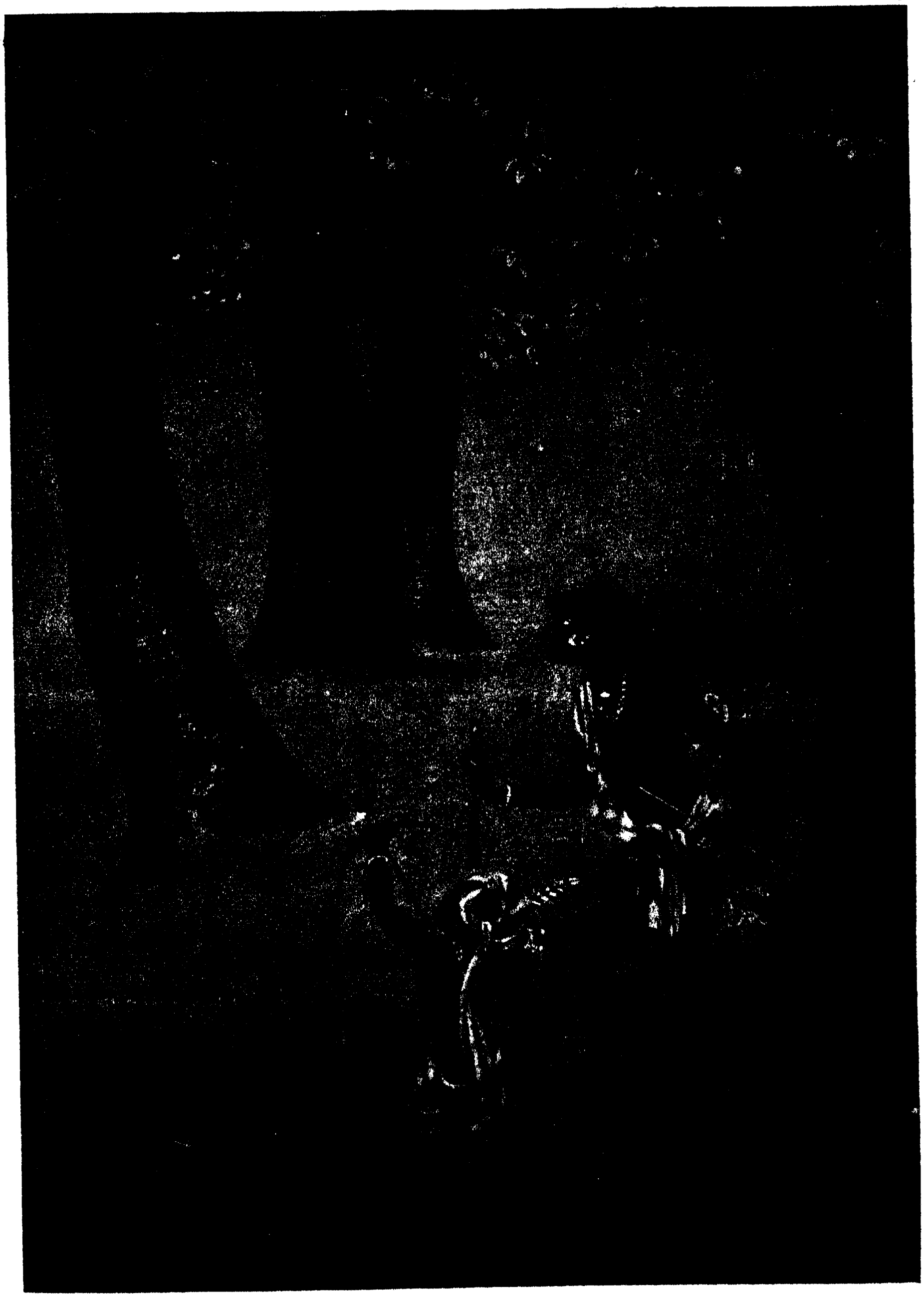
লীগের তথ্যজ্ঞাপন বিভাগের (Information Sectionএর) কর্ত্তা কামিংস্ সাহেব আমাকে টিকিট দেওয়ায় আমি য়্যাসেম্ব্লীর সব বৈঠকে যাইতে পারিতাম; কয়েকটাতে গিয়াছিলামও। কামিংস্ সাহেব প্রথম দিন নিজে হইতেই আমাকে একটা বিশেষ টিকিট দিবেন বলিয়াছিলেন, যাহা দেখাইলে লীগ্-কাউন্সিল,

কমিটি প্রভৃতির বৈঠকেও যাওয়া যায়। কয়েক দিন পরেও সেটা না পাওয়ায় আমার কোন বন্ধু তিন দিন তাহা আনিতে যান; কিন্তু কোন-না-কোন কারণে একদিনও মিস্‌টার কামিংসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নাই। তার পর ঐ বিশেষ টিকিট যে ক্ষুদ্র ঘটনার পর আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি।

জেনীভা হ্রদের ধারে অন্যান্য দিনের মত একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে ভারতীয় অন্যতম প্রতিনিধি খান্‌বাহাদুর শেখ আব্‌দুল কাদির এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের সাধারণ সেক্রেটারী মিস্‌টার প্যাট্রিকের সহিত দেখা হয়। নমস্কার কুশলজিজ্ঞাসাদির পর মিস্‌টার প্যাট্রিক বলিলেন, "কাল দ্বিতীয় কমিটিতে খান্ বাহাদুর বক্তৃতা করিবেন; আপনি শুনিতে যাইবেন না?" আমি বলিলাম, "আমি কি যাইতে পারি?" তিনি বলিলেন, "অবশ্যই পারেন।" সুতরাং আমি যাইতে স্বীকৃত হইলাম। পর দিন যথাসময়ে লীগ সেক্রেটারীয়েট ভবনে উপস্থিত হইলাম। সব-কমিটির অধিবেশন সেখানেই হইত। প্রথমে দ্বিতীয় কমিটির কামরা ঠিক্ করিতে না পারিয়া অন্য কামরায় গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে যে কার্ড ছিল, তাহা দেখাইলাম—ঢুকিতে দিল না; বোধ হয় সেটা য়্যাসেম্ব্লীর কার্ড বলিয়া। তার পর ঠিক্ কামরার দরজায় গেলাম। সেখানেও ঢুকিতে দিল না। প্যাট্রিক্ সাহেব বলিয়াছিলেন আমি ঢুকিতে পাইব, এইজন্যই গিয়াছিলাম। বুঝিলাম, তিনি ঠিক্ অবস্থাটা জানিতেন না। যাহা হউক, এখন অগত্যা কামিংস্ সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহাকে আমার নামের কার্ড পাঠাইলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি সাক্ষাৎকার-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "খান্ বাহাদুরের বক্তৃতা আমি শুনিতে পাইব, প্যাট্রিক সাহেব আমাকে এইরূপ বলায় আমি আসিয়াছি; কিন্তু আমি ঢুকিতে পাইলাম না। আপনি আমাকে যে বিশেষ কার্ড দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা না থাকাতেই বোধ হয় এইরূপ ঘটিয়াছে।" তখন কামিংস্ বলিলেন, "আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম," ইত্যাদি। একখানা মুদ্রিত টিকিট পাঠাইতে এত কি বেশী সময় লাগে, যে, খুব ব্যস্ত লোকেও একজন সুদূরাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে তাহা পাঠাইতে সময় পান না, বুঝিতে পারিলাম না। আমি যথাসম্ভব ঠাণ্ডা ভাবে বলিলাম, "আমার নিজের দেশে আমাকেও লোকে কতকটা অবসরশূন্য ব্যস্ত মানুষ মনে করে। নিমন্ত্রণ-পত্রে আমাকে সব সুবিধা দিবার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা যদি দেওয়া নাই-ই হইবে, তাহা হইলে, এত সময় ও এত অর্থ অপব্যয় করিয়া এত হাজার মাইল পথ বাহিয়া আসার পরিবর্তে, বাড়ীতে বসিয়া লীগের পুস্তক রিপোর্টাদি কয়েকটা টাকা খরচ করিয়া কিনিলেই ত হইত।" তখন ইংরেজ ভদ্রলোকটি কিছু থতমত খাইয়া আমাকে দ্বিতীয় কমিটির গৃহে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন। সেখানে দেখিলাম, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় অনেক লোক ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা এবং তাহার ফরাসী ও ইংরেজী অনুবাদ শুনিতেছেন। শ্রোতাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় এমন বয়সের কতকগুলি মানুষ দেখিলাম, যাহারা, স্কুলের না হউক, কলেজের ছাত্র হইবারই সম্ভাবনা। সুতরাং কমিটির সীটিঙে প্রবেশাধিকার দেবদুর্লভ বলিয়া মনে হইল না। যাহা হউক, কয়েকটি বক্তৃতা ও অনুবাদ শুনিবার পর খান্ বাহাদুরের বক্তৃতাও শুনিলাম। তাহা অন্য বক্তৃতাগুলি অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে হইল না। সে দিন আলোচ্য বিষয় ছিল, ইণ্টেলেকচুয়েল কো-অপারেশান অর্থাৎ জ্ঞানাহরণ শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে সব জাতির মধ্যে অভিজ্ঞতার আদান প্রদান, ইত্যাদি। তিনি পাঞ্জাবী মুসলমান, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় ভারতীয় প্রাচীনতম সভ্যতা সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছিল, এবং আলোচ্য বিষয়ে ভারতীয় যে-সব লোক কাজ করিয়াছেন বলিয়া তিনি নাম করিলেন, সবাই অমুসলমান।

সেই দিন হোটেলে সন্ধ্যার আগে কামিংস্ সাহেবের প্রেরিত বিশেষ টিকিটটি পাইলাম।

৬ই সেপ্টেম্বর লীগ য়্যাসেম্ব্লীর অধিবেশনের প্রথম দিনে সভাস্থলে যাইবার আগে আমি ঐ ইংরেজটির সহিত দেখা করিয়া ভারতবর্ষ ও লীগ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য



সাঁওতাল ছেলে

শিল্পী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

জানিতে চাহিয়াছিলাম। আমার জিজ্ঞাসা তিনি টুকিয়াও লইয়াছিলেন। কিন্তু সে-বিষয়ে তিনি পরে আমাকে কিছু লেখেন নাই। আমার জ্ঞাতব্য তথ্য পুস্তিকা ও রিপোর্টাদিতে থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাও আমি পাই নাই।

হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে দেখা করিবার অভ্যাস আমার নাই। অভ্যাসটা বদলাইতে উৎসাহ জন্মে, এরূপ কিছুও জেনীভায় ঘটে নাই। এই কারণে আমি উপযাচক হইয়া লীগের কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করি নাই। আমার দোষ বা গুণ বর্ণনাচ্ছলে ইহা লিখিতেছি না; কেবল তথ্য হিসাবে লিখিতেছি। ১৪ই সেপ্টেম্বর কামিংস্ সাহেব আমাকে লিখিয়াছিলেন, "যখন য়্যাসেম্ব্লীর সব বৈঠক শেষ হইয়া যাইবে, এবং সেক্রেটারিয়েটের লোকেরা অতিব্যস্ত থাকিবেন না, তখন আমি, আপনি লীগের যে-সব বিভাগের কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী, তাহার কর্ম্মীদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করাইয়া দিব।" এই চিঠি পাওয়ার পরও আমি তাঁহাকে দেখা-সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন অনুরোধ করি নাই। য়্যাসেম্ব্লীর শেষ বৈঠক হয় ২৫শে সেপ্টেম্বর। ২৮শে কামিংস আমাকে প্রাতে লিখিলেন, যে, যদি সে দিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তা ডাক্তার রাইক্‌ম্যানের সহিত দেখা করিবার আমার সুবিধা হয়, তাহা হইলে তাহার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে; এবং এই সাক্ষাৎকারের পরও যদি আমার সময় থাকে, তাহা হইলে লীগের সেক্রেটারী-জেনার‍্যাল স্যার এরিক্ ড্রামণ্ডের সহিত সাক্ষাৎকারেরও বন্দোবস্ত হইতে পারে। আমি উভয় বন্দোবস্তেই সম্মতি জানাইলাম, এবং যথাসময়ে তথ্যজ্ঞাপন বিভাগের আফিসে হাজির হইলাম। কামিংস্ ডাক্তার রাইক্‌ম্যানকে খবর দিতে গেলেন। আমি আফিসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছু ক্ষণ পরে আফিসের এক কর্ম্মচারী টেলিফোনে কাহার সহিত কথা কহিয়া আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার রাইক্‌ম্যান ভয়ানক ('frightfully") দুঃখিত যে আপনার সহিত এখন সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। তিনি একটা কমিটির কাজে ব্যস্ত আছেন।" কামিংস্‌ও ফিরিয়া আসিয়া ঐ কথা বলিলেন। এই ব্যাপারের জন্য কাহারও নিন্দা করিতে আমি ইচ্ছা করি না। কিন্তু একথাটা বলা দরকার মনে করি, যে, কমিটির অধিবেশনটা ত হঠাৎ হয় নাই; আগে হইতেই ইহার বন্দোবস্ত ছিল। ইহা অনুমান করাও অসাধ্য ছিল না, যে, উহার কাজ পাঁচটার মধ্যে শেষ না হইতেও পারে। সুতরাং আমার সহিত দেখা করিবার সময়নির্দ্দেশ তখন না করিলেই সুবিবেচনা-ও শিষ্টাচার-সঙ্গত কাজ হইত। অবশ্য যদি কেহ দেখা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি কাকুতি মিনতি করে, তাহা হইলে অনুগ্রাহক বা মুরুব্বি কখন কখন বলিয়া থাকেন বটে, "আচ্ছা, অমুক সময়ে এসো; সে সময় ফুরসৎ হলে দেখা যাবে।" কিন্তু আমি উমেদার ছিলাম না, কোন অনুগ্রহপ্রার্থনা করিতে জেনীভা যাই নাই; সুতরাং আমাকে আমার ভাগ্যপরীক্ষার সুযোগ দিবার নিমিত্ত কোন বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন ছিল না। যে-মানুষ দেখা করিবার কোন দরখাস্ত করে নাই, তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য সময় নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পর তাহাকে বলা, "আমার এখন অবসর নাই,"—এরূপ ব্যাপারের অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্ব্বে হয় নাই।

ডাক্তার রাইক্‌ম্যান আমার সহিত দেখা করিতে পারিবেন না বলিয়া ভয়ঙ্কর দুঃখিত, ইহা আমাকে জানাইবার পর কামিংস্ লীগের বড় কর্ত্তা সেক্রেটারী-জেনার‍্যালের সহিত দেখা হইতে পারে কিনা, জানিতে গেলেন। কিন্তু জানা গেল, তিনিও বড় ব্যস্ত, দর্শন মিলিবে না। তিনি তজ্জন্য ভয়ঙ্কর বা কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখিত কি না, তাহা জানিতে পারি নাই। অতঃপর কামিংস্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরদিন ঐ দুই ব্যক্তির সহিত দেখা করিবার সময় ঠিক করিবেন কিনা। আমি বলিলাম, আমি চিঠি লিখিলে করিবেন। পরে আমি তাঁহাকে এবিষয়ে কোন চিঠিই লিখি নাই। তাঁহার নিকট বিদায় লইবার পর তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে কামরার বাহিরে আসিলেন ও বলিলেন, "আপনার জেনীভা যাতায়াতের ও জেনীভায় থাকিবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছা লীগের বরাবরই ছিল। আপনি যদি রাজী হন, ত, টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত অবিলম্বে হইতে পারে।" আমি-

বলিলাম, ভারতবর্ষ হইতে রওনা হইবার আগেই আমি স্থির করিয়াছিলাম, যে, নিজেই নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিব। তাহার পর বলিলাম, লীগ যদি নিজের নানাবিধ কার্য্যসম্বন্ধীয় আমার দরকারী পুস্তকরিপোর্টাদি আমাকে দেন, তাহাই যথেষ্ট সৌজন্য মনে করিব। তিনি আমাকে কলিকাতায় আমার দরকারী পুস্তকাদি পাঠাইয়া দিতে রাজী হওয়ায় আমি লীগের পুস্তকাদির মূল্যতালিকায় দরকারী জিনিষগুলি দাগ দিয়া হোটেল হইতে লীগ্ আফিসে পাঠাইয়া দিয়া আসি। তন্মধ্যে কিছু আমি পাইয়াছি; পরে আরও কিছু কিছু পাইতে পারি। কিন্তু কতকগুলি যে পাইব না, তাহা নিশ্চিত। কারণ, কামিংস্ লিখিয়াছেন, "ম্যাণ্ডেট্‌স্ সম্বন্ধীয় মন্তব্যাদিগুলির পূরা সেট পাইলাম না", ইত্যাদি। ইহার ঠিক্ মানে বুঝিতে পারি নাই। মানে তিন রকম হইতে পারে। (১) ঐ জিনিষগুলির পূরা সেট আমাকে দিবার জন্য কামিংস্ লীগের কর্ত্তাদের নিকট হইতে পান নাই। তাহা হইলে ওগুলি আমাকে দেওয়া অবাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইয়াছে। (২) মন্তব্যাদির সবগুলিই ফুরাইয়া গিয়াছে; আর ছাপা নাই। ইহা সম্ভব বোধ হইতেছে না। আমি লীগ আফিস হইতেই প্রাপ্ত তালিকায় ঐ জিনিষগুলির উল্লেখ দেখিয়া দাগ দিয়াছিলাম। (৩) মন্তব্যগুলির কোন কোনটি ফুরাইয়া যাওয়ায় ও ছাপা না থাকায় এখন পূরা সেট পাওয়া যায় না। কিন্তু জিনিষগুলি এমন নয়, যে, কতকগুলির অভাবে অন্যগুলি অকেজো বা অবোধ্য হইবে। সুতরাং পূরা সেট পাওয়া না গেলেও, যাহা পাওয়া যায়, তাহা কেন আমাকে দেওয়া হইল না?

ম্যাণ্ডেট কথাটার ঠিক্ বাংলা প্রতিশব্দ কি হইবে জানি না। জিনিষটা এই। গত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মেনী তুরস্ক প্রভৃতির অধিকৃত নানা ভূখণ্ড জয়ী জাতিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। আগে আগে এই রকম দেশগুলাকে বিজিত ও তৎপর অধিকৃত বলা হইত। এখন সভ্যতর ভাষায় বলা হইতেছে, যে, এইগুলি সুশাসন করিবার অনুজ্ঞা অমুক অমুক জাতি পাইলেন, ও তজ্জন্য জবাবদিহি রহিলেন; ইত্যাদি। ইহারই নাম ম্যাণ্ডেট্। এই সমুদয় বন্দোবস্ত একটা মস্ত ভণ্ডামি বলিয়া পৃথিবীর বিস্তর নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান লোকের ধারণা। সুতরাং তদ্বিষয়ক কাগজপত্র আমাকে দিতে যদি লীগের অনিচ্ছা থাকে, তাহাতে বিস্মিত হইতে পারি না। তবে, আমাকে তাহা না দিবার উহাই কারণ কিনা, বলিতে পারি না।

যাহা হউক, আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে, যে, লীগ নিমন্ত্রণপত্রে আমাকে সব সুবিধা দিবার যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। লীগের বড় বড় কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সম্বন্ধে কামিংস্ আমাকে ২২ শে নবেম্বর তারিখের চিঠিতে লেখেন, "য়্যাসেম্ব্লীর পরে বড় বড় কর্ম্মচারীরা যখন অপেক্ষাকৃত একটু বেশী ফুরসৎ পাইয়াছিলেন, আপনি সেই সময়েই জেনীভা ছাড়িয়া যাওয়ায় দুঃখিত হইলাম; কারণ আপনার সহিত তাঁহাদের মুলাকাৎ ঘটাইতে আমি উৎসুক ছিলাম।" আমি তাঁহার ঔৎসুক্যের আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি না। কিন্তু আমি নিজেও ত খুব বেশী ফুরসতী লোক নই। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী জেনীভায় থাকা আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কবে কাহার অনুগ্রহ হইবে ও দর্শন পাইব, সে আশায় জেনীভায় বসিয়া থাকিতে পারি নাই; ইউরোপ অল্প স্বল্প দেখিবার ইচ্ছা ছিল। যদি কেবল বড় কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য য়্যাসেম্ব্লীর অধিবেশনের পর থাকিতাম, তাহা হইলে লীগ সম্বন্ধে সাক্ষাৎজ্ঞান কিছুই হইত না। অথচ সেইটাই বেশী দরকারী মনে করিয়াছিলাম। আর য়্যাসেম্ব্লীর বৈঠক ত ২৫শে সেপ্টেম্বর শেষ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ২৮শেও দুজন কর্ত্তা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দর্শন দেন নাই।

যাহা হউক, অতঃপর যদি লীগ ভারতীয় কোন দেশী সম্পাদককে নিজ কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে আহ্বান করা আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে যেন ভারত-গবন্মেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া লোক মনোনীত করেন (যাহা আমাকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় করা হয় নাই), এবং এমন কাহাকেও মনোনীত করেন যিনি লীগের নিকট হইতে টাকা লইবেন (একাধিক বার জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও যাহা আমি লই নাই)। জেনীভায় আমা অপেক্ষা এরূপ ব্যক্তির ভাগ্যবান্ হইবার সম্ভাবনা বেশী।

জীবনদোলা

শ্রী শান্তা দেবী

দ্বিতীয় খণ্ড

(১)

বাংলা পাড়া। বড় রাস্তার পর দুই তিনটা বড় ও ছোট গলির মোড় ফিরিয়া তবে সেখানে পৌঁছাইতে হয়। শেষ গলিটা এত সরু যে পাশাপাশি তিন চার জন মানুষের হাঁটা কষ্টকর। দুই পাশে বেশীর ভাগ দুতলা ও তিনতলা বাড়ী গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করিয়া সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের রাস্তার ধারের দরজা জানালা প্রায় সমস্তই বন্ধ। সুতরাং গলির ভিতর আলো বাতাসের ছড়াছড়ি বিশেষ নাই। তাহার উপর গৃহস্থদের গৃহের সমস্ত আবর্জ্জনা দরজায় দরজায় স্তূপ হইয়া উঠিয়া দুর্গন্ধে মানুষের দম আটকাইয়া দিবার যোগাড় করে। বাড়ীর ঝিরা আলস্য করিয়া ময়লার টিনে আবর্জ্জনা ফেলিতে কখনও যায় না; মনে করে নিজেদের দরজাটি বাঁচাইয়া ফেলিলেই শুচিতা রক্ষা হইবে। এমনি করিয়া পরস্পরে পরস্পরের দরজায় উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জন, এঁটোপাতা, ভাঙা হাঁড়ী, ছাই, মাছের আঁশ প্রভৃতি যত সুদৃশ্য ও সুগন্ধ জিনিষের বাজার বসাইয়া গলিটিকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে।

ইহারই মধ্যে বাড়ীর পাশে বাঁধানো রোয়াকে হুঁকা হাতে খালি গায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত ময়লা ধুতি পরা বাড়ীর বাবুরা, টেরিকাটা পানদোক্তারঞ্জিত মুখ, পাড়ার বয়াটে ছেলেরা, ও ঘর্ম্মাক্তকলেবর ঝি চাকরের কোলে ধূলি-ধূসরিত উলঙ্গ শিশুরা মাঝে মাঝে বসিয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতেছে। দুই একটা বাড়ী হইতে রান্নাঘরের ধোঁয়া তখনও পাক খাইতে খাইতে ঝুলকালিমাখা জানালার গরাদে ও জলনিষ্কাশনের নর্দ্দমার ফাঁক দিয়া গলির ভিতর আসিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিদেশের লোক অকস্মাৎ এ গলিতে আসিয়া পড়িলে মনে করিত জীবনযাত্রা-পথের সকল প্রকার কুশ্রীতা, কদর্য্যতা ও স্থূলতাকে সর্ব্বসাধারণের চোখের সামনে খুলিয়া ধরাই বুঝি বাঙালী জীবনের বিশেষত্ব। কোথাও যেন সুরুচির আবরণ দিয়া কদর্য্যতাকে ঢাকিবার প্রয়াস নাই। জীবনযাত্রার অতি স্থূল সকল নিদর্শন উৎকট রূপে পথের ধারে আসিয়া পড়িয়া মানুষের চক্ষু কর্ণ নাসায় জ্বালা ধরাইয়া দিতেছে।

গলির শেষপ্রান্তে একটুখানি ফাঁকা জায়গা অযত্নে আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। শেষ বাড়ীখানার গা ঘেঁসিয়া সেই জমিটুকুর কোলেই একটা কৃষ্ণচূড়া ও দুইটা দেবদারু গাছ মাথা জাগাইয়া উঠিয়াছে। গাছগুলার বয়স বেশী নয়, এখনও বাড়ীর মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। বসন্তের বাতাস দেবদারু গাছের কুঞ্চিত পাতায় পাতায় কাঁচা সোনার রং লাগাইয়া আর কৃষ্ণচূড়ার সর্ব্বাঙ্গে আবীর ছড়াইয়া এই অতি কুৎসিত গলিটার অস্তিত্ব মানুষকে একটুখানি ভুলিতে সাহায্য করিতেছে। গোধূলির আলো বর্ণোজ্জ্বল গাছগুলির মাথা হইতে ঠিকরাইয়া পড়িয়া গলির মুখ ও শেষ বাড়ীখানার ঘেরা ছাদটুকু কেমন একটা স্নিগ্ধ স্বর্ণাভ রঙে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। গলির ভিতর দিকটা সূর্য্যের আলোর অবসানে এবং গ্যাসের আলোর অনাবির্ভাবে তখনই অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। সমস্ত অন্ধকার পথটা মাড়াইয়া আসিয়া এখানে দাঁড়াইলে এমন স্নিগ্ধ আলোও চোখে হঠাৎ তীব্র লাগে।

স্বদেশী মোটা কাপড় ও চাদরে সজ্জিত অল্পবয়স্ক তিনটি সুদর্শন যুবক বাড়ীটার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুই জন গাছতলার দিকে একটু সরিয়া গেল; সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক দরজার কড়া দুটা খুব জোরে নাড়িয়া দিল। দুই একটা বাড়ীর উপরের জানালা হইতে দুই একটি মেয়ের মুখ একবার উঁকি মারিয়া বাহিরের দিকে

দেখিল, তাহার পরই জানালাটা টানিয়া দিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। একটি ছেলে বলিল, "এদের ত সাড়া-শব্দ নেই; আজ দেখ্‌ছি ফিরতে রাত হ'য়ে যাবে। আমার কাজ সব প'ড়ে রয়েছে।"

আর একজন হাসিয়া বলিল, "তোমার ত সর্ব্বদাই কাজ প'ড়ে থাকে। তোমার কাজ নেই এমন একটা দিন যেদিন আবিষ্কার করতে পারব, সেদিন আমি নগদ চার আনা পয়সার হরিরলুট দেব। সত্যি বল্‌ছি সঞ্জয় দা', তোমার কাজ করার জ্বালাতেই আমার কাজ করার মোহ একেবারে কে'টে গেছে। বাপ্‌রে, ভোর ছটা থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত কাজ ছাড়া কথা বল্‌বে না। ভোর বেলা যখন ঘুমটা বেশ নেশার মত চোখ দুটো জড়িয়ে রয়েছে, ইচ্ছে করছে খোলা জানলাটার পাশে ঘণ্টাখানেক আরো চোখ বুজে প'ড়ে থাকি; ঠিক তখ্‌খুনি প্রতিদিন সঞ্জয়দা' মহা উৎসাহে তক্তপোষ থেকে একলাফ দিয়ে উঠে হুড়াম্‌ ক'রে দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়্‌বে। একটা মানুষ যে ঘুমুচ্ছে তা ভ্রূক্ষেপও নেই। গায়ে যত জোর আছে সেটা তক্তপোষ আর দরজার হুড়কোর উপর ফলিয়ে এমন সব বিকট আওয়াজ তুল্‌বে যে আমার ঘুম বেচারী লজ্জায়ই দেশ ছেড়ে পালায়। কিছু বল্‌লে বলে, আজ বড় কাজের তাড়া; মনে ছিল না, কিছু মনে কোরো না। যেন আর কোনো দিন ওঁর কাজের তাড়া থাকে না। একটা কথা পাঁচ শ' বার বল্‌তে লজ্জাও করে না।"

সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, "আমার মত বেরসিককে রুম মেট ঠিক করেছিলে কেন?"

ছেলেটি বলিল, "কি করি বল? মা বাবা বল্‌লেন সঞ্জয়ের মত ভাল ছেলে ভূভারত খুঁজ্‌লেও নাকি মেলে না; একমাত্র সেই সঞ্জয় ছাড়া আর কারুর হাতে তাঁরা তাঁদের এমন অমূল্য রত্নটিকে ছাড়তে রাজি ছিলেন না। এদিকে অভিভাবকটি যে আমার ভোরের ঘুম ভাঙানো ছাড়া আর কোনো খবরই রাখেন না তা ত আর তাঁরা জানেন না। আমি যদি তোমার রুম-মেট না হ'য়ে ডিপ্রেস্‌ড্‌ ক্লাশের ভিখু কাওরা হতাম, তাহ'লে হয়ত তোমার সঙ্গে আমার দেখা শুনাটা আর একটু বেশী হ'তে পারত। বিশ্বের চামার মুচি মেথর ধাঙড় এ'সে সারাক্ষণ আমার দরজায় ব'সে সঞ্জীবাবুর খোঁজ ক'রে ক'রে ঘরটা শুদ্ধ অশুচি ক'রে দিলে। এপিডেমিকের ভ'য়ে মাসে আমার চার বোতল ফেনাইলই খরচ হ'য়ে যায়।"

সঞ্জয় বলিল, "সেত একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। নাহলে তোমাদের মেসের ঝি বছরে একদিনও ঘরে ঝাঁট দিত কি না সন্দেহ। দুটো টাকার বদলে ওটা কি কম লাভ?"

ছেলেটি রাগ দেখাইয়া বলিল, "শুধু কি দুটো টাকা? তাহ'লে ত ভাগ্যকে ধন্য বল্‌তাম। তোমার ভদ্দর বন্ধুদের চাঁদার খাতা নেই? সঞ্জয় দা' করবে বিশ্বপ্রেম, আর মারা পড়ব বেচারী আমি! জগতের সমস্ত হিত ত করতে হবে, কাজেই যে খাতা ধ'রে তাকেই সই ক'রে দিয়ে মনিব্যাগটিট্যাকে গুঁজে সঞ্জয় দা' বেরিয়ে পড়ে। আর আমি বেচারী ঘরে ব'সে নিজের কাজ করব কি দিবারাত্রি সব চাঁদার পেয়াদাদের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত। তারা তা শুনবেই বা কেন? বলে, 'মশায় শুধু হাতে ফিরে যাব? আপনিই না হয় দুটো টাকা দিয়ে দিন।'"

সঞ্জয় হাসিয়া বলিল, "কি করি বল ভাই? দাতা হবার সখ আছে অথচ পয়সা নেই; তাই তোমার দিকে সবাইকে লেলিয়ে দি। শঙ্কর, কি বল হে, কাজটা কিছু মন্দ? সোসিয়ালিজ্‌মের দিনে পরের টাকায় দাতা হওয়াই ত আদর্শ।"

শঙ্কর বলিল, "টাকাটা যখন আমার নয়, অপূর্ব্বর, তখন তোমার কথায় সায় দিতে আমার কিছু আপত্তি নেই। তোমার নাইট স্কুল, ফ্রিলাইব্রেরী, দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতি যত রকম পাগ্‌লামী আছে, সব যদি অপূর্ব্বর ঘাড় ভেঙে করতে পার তাহ'লেও আমি 'না' বল্‌ব না। তবে পরের দরজায় দাঁড়িয়ে আর বেশীক্ষণ তোমাদের বক্তৃতা শুনতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে।"

শঙ্কর আর একবার সজোরে কড়া দুইটা নাড়া দিল। ভিজা হাত আঁচলে মুছিতে মুছিতে একটি ঝি হাসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিয়া লজ্জিত ভাবে বলিল, "কলতলায় বাসন মাজ্‌তে বসেছিলুম, জলের হড়হড়ানিতে কিছু শুনতে পাইনি, বাবু, মাপ করবেন। মাকে এত বলি আর একটা লোক রাখ, তোমার বাড়ী অষ্টপহর লোক আসা

লেগে রয়েছে, কেষ্টা ছোঁড়া একবার বেরুলে দেউড়ী আগ্‌লাতে আগ্‌লাতে আমার প্রাণ যায়, তা মা কিছুতে শুন্‌বে না।"

দাসীর বক্তৃতায় আর উৎসাহ না দেখাইয়া সঞ্জয়, শঙ্কর ও অপূর্ব্ব বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। সদর দরজার পরেই উঠান, ডান পাশে বসিবার ঘর, বাঁপাশে রান্না, ভাঁড়ার ইত্যাদি, দরজার মুখোমুখি উঠানের উল্টা দিকে দোতলা অন্দর মহল। সদর দরজার দুই পাশের ঘরগুলি একতলা বলিয়া অন্দরের দুতলা হইতে দুইটি ছোট ছাদে আসা যায় এবং অনেকখানি আলো-বাতাসও পাওয়া যায়

ছেলেরা বসিবার ঘরেই বসিল। ঘরখানি বসিবার জন্যই ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু বসিবার ঘর বলিতে আজ-কাল যে গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য্য দেখাইবার ঘরগুলি দেখা যায়, ইহা সে-রকম কিছু নয়। ঘরের দুই পাশে দুইটি সরু তক্তপোষের উপর দুখানা সতরঞ্চি লক্ষ্ণৌ-ছিটের চাদর দিয়া ঢাকা, বাঁশের উপর বেত জড়ানো দুই তিনখানা হাল্কা চেয়ার, একটি সেইরকম ছোট টেবিল ঘিরিয়া মাঝখানে সাজানো এবং দেয়াল ঘেঁসা একটি ছোট কাঠের টেবিলের উপর একটি কেরোসিনের আলো, একটি ঘড়ি ও একটি ক্যালেণ্ডার বসানো। ঘরের সাজসজ্জার ভিতর দেয়ালে একখানা বিলাতী চিত্রকরের আঁকা 'প্রার্থনা' ছবি ছাড়া আর কিছু নাই, কিন্তু ঘরের দেয়াল, মেজে, দরজা, জান্‌লা এবং সামান্য আস্‌বাবগুলি প্রত্যহ সযত্নে ঝাড়া মোছা এবং ঘসামাজায় এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রথম দৃষ্টিতে ঘরখানা ধনীর ড্রয়িংরুম বলিয়াই ভ্রম হয়। মনে হয় যেন একেবারে নূতন ঘরে নূতন পালিশ করা জিনিষপত্র দিয়া এইমাত্র কে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।

সঞ্জয়রা তিনজনেই একখানা তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল। ঝি তাহাদের বসাইয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে ভিতর বাড়ীতে খবর দিতে গেল।

সঞ্জয় শঙ্করের সহপাঠী। তাহারই সহিত আজ বৎসর দুই মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। সকল নূতন ডাক্তারের মতই তাহারও পশার যেটুকু জমিয়াছে, তাহা বিনা পয়সায়; সুতরাং অবসর প্রচুর। কিন্তু কথায় বলিতে অবসর প্রচুর বলিয়াই কার্য্যত তাহার কিছুই অবসর নাই। দেশ-হিতৈষণার একটা খেয়াল তাহার মাথায় ছেলে-বেলা হইতেই ছিল। পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়াই তাই সে কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। যে মানুষ একটা কাজে মন দিয়া লাগে, এবং কিছু করিতে পারে, আমাদের দেশের নিয়ম হইয়া উঠিয়াছে দেশের সমস্ত কাজের মধ্যেই সেই মানুষটাকে ধরিয়া টানাটানি করা। সঞ্জয় অনেক যোগাড়যন্ত্র করিয়া একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খাড়া করিবার চেষ্টায় ছিল। যাহাদের ঔষধ ও চিকিৎসার প্রয়োজন আছে অথচ ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করে, এমন অনেক ভদ্র পরিবার খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের সাহায্য করাও তাহার খেয়াল ছিল। এই সূত্রে নানা মানুষ তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে শারীরিক ও মানসিক সকল রকম হিত-সাধন-প্রচেষ্টার সহিতই জড়াইয়া তুলিতেছিল। অবশ্য তাহার নিজের যে ইহাতে বিশেষ কিছু আপত্তি ছিল তাহা বলা যায় না। সেই রকমই একটা উপলক্ষে তাহারা এখানে আসিয়াছে।

শুভ্রবেশিনী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা একটি মহিলা কিছুক্ষণ পরে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, উন্নত, চোখ দুটি আয়ত, কপাল বিস্তৃত, মুখের কাটে কোথাও দুর্ব্বলতার চিহ্ন নাই। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের কাছাকাছি, চলাফেরা ও কথাবার্ত্তায় আত্মপ্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু মুখে এখনও নববধূর মত একটি সলজ্জ নম্র হাসি লাগিয়া আছে।

তিনি ঘরে ঢুকিতেই ছেলেরা তিনজন উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? এই যে আমিও বস্‌ছি।"

সঞ্জয় সকলের আগে বলিল, "মাসিমা, সে মেয়েটির কি হ'ল?"

মাসিমা বলিলেন, "কি আর হবে, বাছা? বিধবা মেয়ে, তাকে রাখ্‌তেও পারে না, ফেল্‌তেও পারে না। এমন ক'রে আর ফেলে রাখ্‌লে মরে'ই যাবে মেয়েটা। বাপ মা হ'য়ে সেটাও সহ্য কর্‌তে পার্‌ছে না, অথচ ডাক্তার ডাক্‌বার সাহসও নেই। আমি তোমাদের কথা বল্‌লাম,

তাতেও ভয়ে মরে। বলে 'জানাজানি হ'য়ে যাবে।' কি যে করব বুঝতে পারছি না। আমার এখানে লুকিয়ে নিয়ে এলে ত্যায়। বলেছে, 'কাদের মেয়ে কি বৃত্তান্ত না ব'লে আপনি ওকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান।' কিন্তু আমি যদি আনি, তাহ'লে আমার মেয়েদের অভিভাবকেরা গোলমাল করবে।"

সঞ্জয় বলিল, "আচ্ছা, আমরা আপনাকে একটা ঘর ভাড়া ক'রে দেব। আপনি দিন কতক তাকে নিয়ে সেইখানে থাকবেন চলুন।"

মাসিমা বলিলেন, "আমার মেয়েগুলোকে কার কাছে ফেলে যাব?"

অপূর্ব্ব হঠাৎ বলিল, "আচ্ছা, দিনের বেলা আপনি থাকবেন। রাত্রের জন্যে আমি ভাড়া করা নার্সের বন্দোবস্ত ক'রে দেব। আপনার বাড়ীর খুব কাছেই ঘর দেখে দিচ্ছি—যাতে আপনার যাওয়া-আসার কোনো অসুবিধা না হয়।"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "সঞ্জয় ত একটা নার্সিং ব্রাদার-হুড খাড়া করবার চেষ্টায় আছে; একটা সিষ্টারহুড করতে পারলে আর পয়সা খরচ হয় না।"

মাসিমা বলিলেন, "আমার মেয়েদের মধ্যে অনেকের কিন্তু সত্যি সত্যি এসব দিকে ঝোঁক আছে। কিন্তু এসব জায়গায় তাদের আমিও যেতে দিতে পারি না, বাপ মাও দেবে না।"

সঞ্জয় বলিল, "আপনার বাড়ীতেও ত একটি রুগী আছে। সে রুগীর খবর কি?"

মাসিমা বলিলেন, "সে বেচারা ত যতদিন সুস্থ ছিল, খেটেখুটে খাচ্ছিল, আমারও অনেক কাজে লাগছিল। এখন রোগে পড়েছে, কি ক'রে যে খরচ চলবে জানি না। স্বামীর খোঁজ ত অনেক ক'রেও পেলাম না। আর পেলেই বা কি? যে ইচ্ছা ক'রে ফেলে পালিয়েছে তাকে ধ'রে আনলেই কি আর সে মাথায় তু'লে নেবে? তোমরা আছ—তাই ওর ঔষধ-পথ্যটা জুটছে।"

সঞ্জয় বলিল, "মাসিমা, আপনার অনেক গুণ আছে, কিন্তু একটা মস্ত দোষ যে, নিজেকে আপনি কোথাও দেখতে পান না। আপনি যদি ওকে ঠাঁই না দিতেন তা হ'লে ঔষধ-পথ্য আমরা ত শূন্যে ঢালতে পারতুম না। যা দেখছি ওত চিররুগ্নই হবে; এবং আপনারই পোষ্য থাকবে। কিন্তু আপনি চিরকাল কি ক'রে ওকে বইবেন?"

মাসিমা বলিলেন, "চিরকাল যদি বাঁচতাম, বাবা, তা হ'লে না হয় চেষ্টা করা যেত, কিন্তু ম'রে গেলে কার ঘাড়ে ফেলে যাব তাই ভাবছি। বেচারীর পৃথিবীতে কোনো আশ্রয় নেই। ওকে নিয়ে কি করব ভাবতে ভাবতে রাত্রে ঘুম শুদ্ধ ভেঙে যায়। পঞ্চাশ বছর বয়স হ'ল, বাঙালীর মেয়ে আর ক'দিনই বা বাঁচব? এখন থেকে সব ব্যবস্থা ত ক'রে যাওয়া উচিত। তার উপর চপলা আর চঞ্চলা আছে; লেখাপড়া কাজকর্ম্ম অবশ্য সাধ্যমত শিখিয়েছি, ক'রে খেতে পারবে। কিন্তু বয়স অল্প, মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে, একটা যদি নিজের সংসার না গ'ড়ে দিতে পারি, বড় একলা পড়বে বেচারীরা।"

অপূর্ব্ব বলিল, "একলা থাকাই ত ভাল। পৃথিবীতে বন্ধন যত কম হয়, দুঃখও তত কম হবে। ছেলেবেলায় দুঃখ পেয়েছে ঢের, বড় হ'য়ে একটু সুখভোগ ক'রে নেবে।"

মাসিমা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাই ওকথা বলতে পারছ, অপূর্ব্ব। এখনও তোমার বন্ধনের বয়স আসেনি। আর একটু বড় হ'লেই দেখবে স্বেচ্ছায় যাদের জন্য দুঃখ বহন করতে চাও, তারাই তোমার প্রাণের সুখের কেন্দ্র এবং এই দুঃখ ও সুখ দেবার মানুষ জগতে যদি না থাকে তবে জীবনটা একেবারে শূন্য বোধ হবে।"

শঙ্কর বলিল, "তাই বুঝি, মাসিমা, বহু কন্যাদায়ের দুঃখ পাবার জন্য এতগুলি বোঝা সংগ্রহ করেছেন। আপনি নিজের আদর্শে সবাইকে বিচার করেন ব'লেই অমন কথা বলছেন। না হ'লে আপনার মত এই 'পরের বোঝার' ভিতর থেকেও অন্য লোকে সুখ সংগ্রহ করতে পারত না।"

মাসিমা বলিলেন, "ওটা একেবারে ভুল কথা। যে

কেউ আপনার হ'য়ে উঠ্‌তে পারে সেই মানুষকে সুখ দিতে পারে। সে কি আর তখন পর থাকে? তোমরা আমাকে অত বড় ত্যাগী ভেবো না। এই সমস্ত সংসার, এই সমস্ত সেবার খেলা, এ সবই আসলে আমার স্বার্থের জন্য। যাক্, আর বেশী কথা ব'লে সময় নষ্ট কর্‌ব না। সঞ্জয় ত নিশ্চয়ই সকাল থেকে না খেয়ে ঘুর্‌ছ, একটু সামান্য জল-টল খেয়ে যাও।"

শঙ্কর ও অপূর্ব্ব একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আমরা সকালে খেয়েছি ব'লে বিকালে বুঝি খেতে জানি না, মাসিমা।"

মাসিমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বড়র নাম ক'রে আন্‌লে সে কি আর একলাই খায়? ছোটরাও ভাগ পায় কিছু কিছু।"

শঙ্কর বলিল, "বাপরে, আমাকেও শেষকালে তোর প্রসাদ খেতে হবে, সঞ্জয়! তুই দেখ্‌ছি একেবারে মহাপুরুষ হ'য়ে উঠেছিস্।"

মাসিমা চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সঙ্গে একটি মসীকৃষ্ণ ভৃত্যকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার হাতে ট্রের উপর লুচি, পটলভাজা, আলুর চচ্চড়ি ও নারকেল-নাড়ু তিনখানা রেকাবীতে সাজানো। ট্রে নামাইয়া ভৃত্য ঊর্দ্ধশ্বাসে চা আনিতে দৌড় দিল।

গৃহকর্ত্রী শঙ্করের হাতে একখানা রেকাবী তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমরা সর্ব্বদা মা মাসীর হাতের জিনিষ খাচ্ছ, তোমাদের হাতে এসব দিতেই লজ্জা করে। আমি ত নিজে কিছু কর্‌তে সময় পাই না; মেয়েদের জলখাবার করার পালা আছে; তারা কিছু করে, কিছু চাকরটাই করে।"

শঙ্কর বলিল, "আপনার মেয়েরা রান্নার পরীক্ষায় প্রাইজ পাচ্ছে, তারা মন্দ রাঁধবে কি ক'রে?"

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। পাড়ার দুই-একটা বাড়ী হইতে শাঁখের আওয়াজ সন্ধ্যা ঘোষণা করিয়া থামিয়া গেল। পাশের একটা বাড়ীতে সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন হয়; সেখানে গায়কেরা গানের পূর্ব্বে সজোরে খোল ও করতাল ঝঙ্কার দিয়া ভাবটা জমাট করিবার প্রচণ্ড চেষ্টা জুড়িয়া দিল। লাল-কুর্ত্তা-পরা কৃষ্ণ-ভৃত্য ঘরের আলোটা জ্বালিতে আসিতেই সঞ্জয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনার অনেক সময় নষ্ট করেছি; আজ বোধ হয় আর জ্বালাতন আপনার সহ্য হবে না।"

গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "তোমার কাজ প'ড়ে রয়েছে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আমার ঘাড়ে আর কেন অপবাদ দিয়ে যাচ্ছ?" তারপর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শঙ্কর, কি গৌরীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে?"

শঙ্কর বলিল, "এসেছি যখন তখন একবার দেখে না যাওয়া কি আর উচিত? গৌরীই কি আর তা হ'লে আমাকে আস্ত রাখবে?"

গৃহকর্ত্রী সঞ্জয় ও অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'তুমি যদি একলা দেখা কর্‌তে চাও ত আমার সঙ্গে এস, শঙ্কর।"

শঙ্কর বলিল "একলা কেন? গৌরীর আর অত পর্দ্দায় কাজ নেই। সে এখানে এলেই ত পারে।"

দাসী রাখালীর মা'র ডাক পড়িল। সে গৌরী দিদিকে খবর দিতে ছুটিল। একবার পিছন ফিরিয়া লুব্ধদৃষ্টিতে বাবুদের থালার দিকে তাকাইয়া গেল। খানকয়েক লুচি পড়িয়া আছে। সে ফিরিতে না ফিরিতে কেষ্টা যদি আগে আসিয়া থালা সরায় তাহা হইলে ওগুলা আজ আর তাহার ভাগ্যে জুটিবে না। চাহিয়া লইলে অবশ্য অর্দ্ধেক পাইতে পারে, কিন্তু সে ছেলেপিলের মা, উঁচু জাত, চাহিয়া উচ্ছিষ্ট খাইতে কি পারে?

রাখালীর মার তাড়ায় গৌরীর আসিতে বিলম্ব হইল না। এই পাঁচ বৎসরে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। গৌরী আর সে বাপ মায়ের স্নেহের দুলালী আদরিণী গৌরী নাই। তাহার মধুর কৈশোরসৌন্দর্য্য, বয়স ও জীবন-সংগ্রামের ছাপ লাগিয়া শাণিত অস্ত্রের মত আরো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বেশভূষা সে-সৌন্দর্য্যকে অনেকখানি চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। ব্লাউস পেটিকোট ইত্যাদির উপর পুরুষদের মত একখানা সরু পাড় ধুতি তাহার

পরণে। হাতে দুইগাছা খুব সরু সোনার চুড়ি তাহার স্বর্ণাভ রঙের সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। আর কোনো অলঙ্কার তাহার গায়ে নাই। বুদ্ধির শ্রী সমস্ত মুখখানা আলো করিয়া রাখিয়াছে।

শঙ্কর বলিল, "কি রে গৌরী, কেমন আছিস্? এই সঞ্জয় আর অপূর্ব্ব। এদের পরিচয় ত আর নূতন ক'রে দিতে হবে না।"

অল্প কথাবার্ত্তার পর সকলে উঠিয়া পড়িল। সঞ্জয়, "মাসিমা, এই ওষুধের শিশি দুটো আর গোটা-দশেক টাকা রইল", বলিয়া টেবিলের উপর তাড়াতাড়ি সেগুলা রাখিয়া দিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

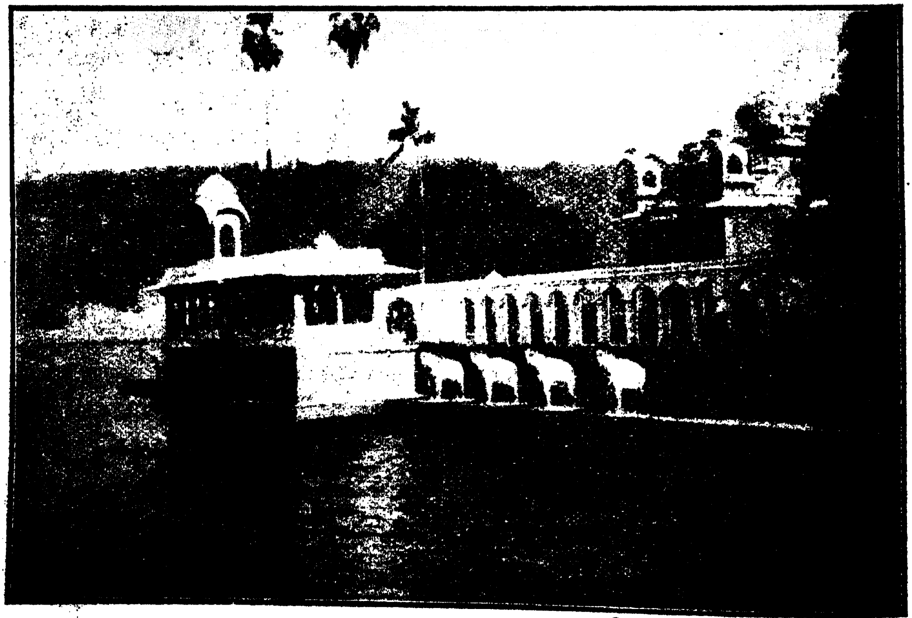
(ক্রমশঃ)

মেবার দর্শন

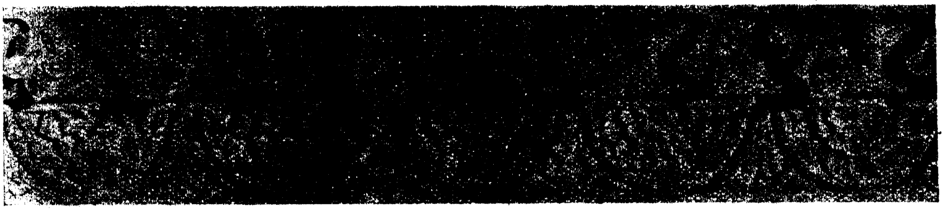
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা ছিল, যে, রাণা প্রতাপের দেশ একবার দেখে আসি। সে ইচ্ছা মনেই ছিল, কাজে পরিণত হ'বার কোনও লক্ষণ দেখা যায় নি। হঠাৎ গেল শীতকালে সে সুযোগ পাওয়া গেল। বন্ধুরা ত নানা কথাই বল্লেন। কেহবা আমি সেখানে সত্যিই যাব, একথা অবিশ্বাস করলেন; আবার অন্যেরা রেলের কষ্ট, থাকার কষ্ট, শীতের কষ্ট ইত্যাদি অনেক কিছুর ভয় দেখালেন।

যাই হোক, কয়েক দিন তোড়-জোড় করতে আর



জগনিবাস প্রাসাদ, পিছোলা হ্রদ, উদয়পুর



রাণা অমরসিংহের সমাধিগাত্রে প্রস্তরকারুকার্য্য, মহাসতী, উদয়পুর　　[লেখক কর্তৃক গৃহীত ফটো হইতে

কয়েক দিন যাই যাই ক'রে কাটিয়ে একদিন হঠাৎ "ব্যর্থ-রিজার্ভ" ক'রে ফেলা গেল। নানা মুনির নানা মত শুনে (এর মধ্যে মুনিশ্রেষ্ঠ হ'লেন হাওড়া ষ্টেশনের এনকোয়ারি অফিসের সবজান্তা সাহেব) ঠিক সব-চেয়ে খারাপ রেলযাত্রা যাতে হয়, তাই করা হ'ল। অর্থাৎ পাঞ্জাব মেলে "বুক্" ক'রে ফেল্লাম। তার পর সেই দিনই রাত্রি আটটা আন্দাজ গিয়ে "ব্যর্থ" খুঁজে বার ক'রে ট্রেনে সোয়ারি হওয়া গেল।

স্বনামধন্য পাঞ্জাব মেল এতই প্রসিদ্ধ, যে, অনেকে বৃদ্ধ বয়সেও মাসে পাঁচবার তাঁকে শুধু দর্শন কর্‌তে হাওড়া যান। সুতরাং ওসম্বন্ধে বিশেষ না বল্লেও চলে।

ট্রেনে ভিড় ছিল না। বেশ বিছানা পেতে কম্বলের আশ্রয় নিয়ে ঘুম দেওয়া গেল। সকালে পাটনায় উঠে মুখ-হাত ধুয়ে চায়ের জোগাড় দেখছি, এমন সময়ে খদ্দর-ভূষিত এক বেহারী ভদ্রলোক একটি ফ্রেমে বাঁধান বিজ্ঞাপন হাতে আমার গাড়িতে এলেন। আমি বিদেশী "রাত্রি পোষাক" (নাইট্‌সুট) প'রে কেল্‌নারের চা খাচ্ছি দেখে তিনি প্রথমে একটু ইতস্তত: কর্‌লেন—বোধ হয় আমি খাঁটি দেশী কি না ঠাওর কর্‌তে পার্‌ছিলেন না, খাঁটি বিদেশী যে নই সে-বিষয়ে আমার "বদনসীবি" গায়ের রং যথেষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছিল—তারপর নীরবে বিজ্ঞাপনখানি দেখালেন। বিজ্ঞাপনটি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-প্রসাদের খদ্দর শান্তি আশ্রমের জন্য সাহায্যের প্রার্থনা। তাতে আশ্রমের উদ্দেশ্য এবং যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর নাম ধাম এবং তাহার চাঁদা আদায়ের অধিকার লেখা ছিল। কথাবার্ত্তায় জান্‌লাম, যে, রেল ও ষ্টীমারের যাত্রীদের কাছ থেকে ইঁহারা প্রায় মাসিক পাঁচশ টাকা সাহায্য পান। কিছু চাঁদা দেওয়ায় তিনি ছাপান রসীদ দিয়ে পরের ষ্টেশনে নেমে গেলেন।

তারপর দুপুরে এলাহাবাদ পৌঁছালাম। দেখ্‌লাম, ষ্টেশনটি বিয়ের কনের মত সেজে রয়েছে। শুন্‌লাম বড়লাট আস্‌ছেন, তাই এত। "উলু" দেবার জন্য স্থানীয় হোম্‌রা-চোম্‌রার দল ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবে "পেয়াদা ফির্‌ছে দ্বারে," একথা পাছে কেউ ভুলে যায়, তাই একদল পাঠান সেপাই আর বেশ কিছু পুলিশও উপস্থিত আছে।

সন্ধ্যাবেলায় টুণ্ডলা পৌঁছালাম। নেমে গাড়ি বদল ক'রে আগরা ফোর্টের ট্রেনে উঠ্‌লাম। একজন রেল-কর্ম্মচারী টিকিট দেখে জান্‌তে চাইলেন, যে, আমি আগ্রা ফোর্ট থেকে রাত্রের গাড়িতে যাব কি না। যাব বলায় তিনি বল্লেন, যে, তাহ'লে তিনি আগ্রা ফোর্টের সেই গাড়িতে জায়গা রাখার জন্যে তার কর্‌বেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম যে, তারের খরচা দিতে হবে কি না। তিনি দরকার নাই বলায় একবার ভাব্‌লাম তাঁকে কিছু বকসীস করি, কিন্তু তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে বেশ বড় কর্ম্মচারী মনে হওয়ায় সেটা আর কর্‌লাম না। আগ্রা ফোর্টে পৌঁছে বুঝ্‌লাম যে, সেটা মস্ত ভুল করা হয়েছিল, কেননা তাঁকে "স্মৃতি-উত্তেজক" না দেওয়ায় তিনি আর কষ্ট ক'রে তার করার কথা মনে রাখেন নি। যাই হোক, কোন রকমে একটি গাড়ীতে ঢুকে উপরের "ব্যর্থ" দখল ক'রে বসা গেল। বসা গেল এই কারণে, যে, সমস্ত জিনিসপত্রও উপরের "ব্যর্থ"এ নিতে হয়েছিল; সুতরাং শোবার জায়গা ছিল না। নীচে রাখ্‌বার জায়গা ছিল না।

যদি কেউ বি-বি-সি-আই রেলওয়ের ঐ ট্রেনে



জগমন্দির প্রাসাদ, পিছোলা হ্রদ, উদয়পুর

সেকেণ্ড ক্লাসে যেতে চান, তাহ'লে বিছানা যা দরকার গায়ে জড়িয়ে নেবেন, আর অন্ত লটবহর তিন চারটি থামে পুরে পকেটে রাখাই শ্রেয়ঃ। এর বেশী জিনিষ হ'লে সারারাত ব'সে কাটাতে হবে।

যে-গাড়িতে আমি উঠেছিলাম, সেটি রেলগাড়ি-আবিষ্কারক মহাত্মা জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সনের আমলে তৈরী। আমার ঠাকুরমার বাসন রাখার জন্ত একটি সেকেলে ধরণের শালকাঠের সিন্ধুক ছিল। সেটির থেকে এরকম দু'খানি গাড়ি তৈরী করা চল্‌ত। কাঠও বোধ হয় কিছু বাঁচ্‌ত। সিন্ধুকটি এমন কিছু অত্যাশ্চর্য্য গোছের বড় ছিল না। সাধারণ সেকেলে ধরণের শালকাঠের বড় সিন্ধুক।

সারারাত জায়গার অভাবে ও শীতে আড়ষ্ট হ'য়ে ভোরে আজমীরে পৌছালাম। শরীরের গ্লানি দূর করার জন্ত [illegible]টিংক্রমে ঠাণ্ডা জলে স্নান কর্‌লাম। গায়ে জল [illegible] মনে হ'ল বুঝিবা আমি "আজ মর্ গয়া"। স্নানের পর প্রচুর গরম চা, রুটী, মাখন, ডিম ইত্যাদি খাওয়াতে রক্ত-চলাচল ফের আরম্ভ হ'ল।

আবার অন্য এক ট্রেনে উঠে ঘণ্টা পাঁচ ছয় শুক্‌নো পাহাড় আর শরের বন দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবার পর চিতোর গড়ে পৌছলাম।

ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে চিতোর দুর্গ। চারিধারে সমতল জমি ঘেরা চিতোরের পাহাড়, তার মাথায় মন্দিরের চূড়া, রাজপ্রাসাদ, রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভ, গলদেশে ছয় সার দুর্গপ্রাকার, রোদের আলোয় ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে,—সে এক অপরূপ দৃশ্য! ফির্‌বার পথে দেখা যাবে ঠিক ক'রে ট্রেনে উঠ্‌বার জোগাড় কর্‌লাম।

উদয়পুর-চিতোরগড় রেলওয়েটি আমাদের বারাসত-বসিরহাট বা হাওড়া-আম্‌তার মত ছোট মাপের।

ট্রেনে আমার সহযাত্রী ছিলেন বোম্বাইয়ের এক মাড়ওয়ারি জৈন পরিবার। ভদ্রলোকটি আমার বন্ধু। সঙ্গে ছিলেন তাঁর গৃহিণী, দুটি ছোট ছেলে এবং একটি



রাজপথে নৃত্যগীত—ঝুলনযাত্রা, উদয়পুর

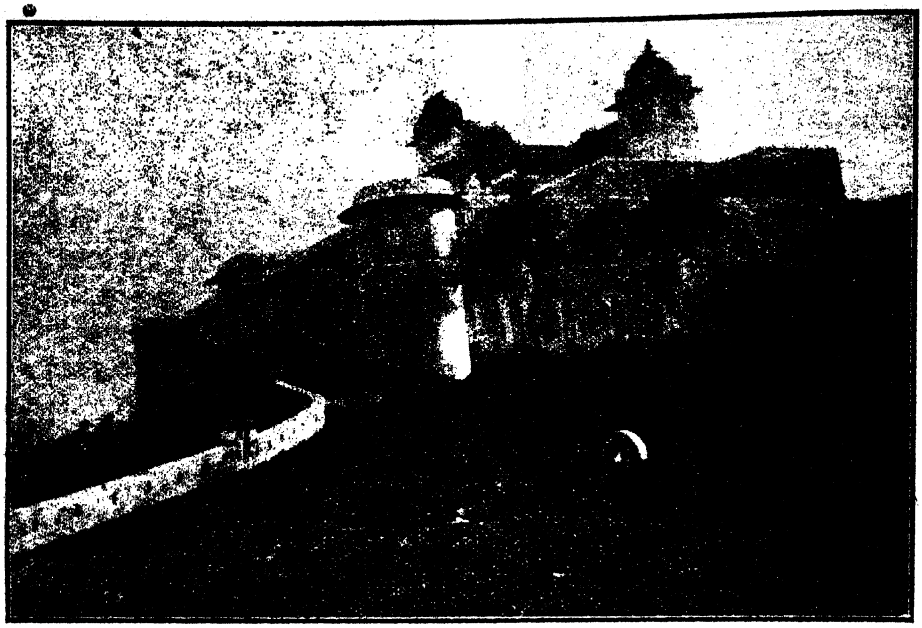
ছয় সাত বছরের মেয়ে। প্রথমে আমাকে ফিরিঙ্গী স্থির ক'রে এঁরা একটু জড়সড় হ'য়ে পড়েন। পরে বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দেওয়ায় এবং বোম্বাইয়ের ক্রীকেটের কথা জিজ্ঞাসা করায় বেশ আলাপ পরিচয় হ'ল। ভদ্রলোকটি ক্ষীণকায় ও নিস্তেজ; ভদ্রমহিলা বেশ সুস্থ ও সপ্রতিভ। বোম্বাইয়ে বাস করার দরুন্ মাড়ওয়ারি মেয়ের পর্দ্দা ঘুচে গেছে দেখে আশ্চর্য্য হ'লাম। "সাহেব, তোমার বিয়ে হয়েছে ?" "সাহেব, তোমার স্ত্রী কি রকম গয়না পসন্দ করেন ?" "তোমাদের দেশের মেয়েরা কি রকম গয়না পরেন ?" এইসব মেয়েলি কথা থেকে আরম্ভ ক'রে,"সাহেব, আমার তৈরী খাবার খাও," "আমার ছেলেটাকে ব'কে দাও ত, ও ওর বাপকে ভয় করে না," এইরকম সব কথা চল্‌ল। ভদ্রলোকটি ক্রমাগত বিদেশের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের কার্‌বারের কথা বল্‌ছিলেন। যথেষ্ট টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে কেন বিদেশে যান না জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন, যে, "স্ত্রী অনুমতি দেয় না"। তাঁর সংসারে শাসন-দণ্ড কার হাতে সেটা বোঝা গেল।

রেলপথের দু'ধারে প্রথমে বালি শর ও বাব্‌লার ঝোপে ভরা "ডাঙ্গা" জমি (অর্থাৎ মরুভূমি), পরে পাহাড়ের শ্রেণী আরম্ভ হ'ল। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড হ্রদের মত "তালাও"। ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল।

সন্ধ্যা সাতটার সময়, দু'দিন দু'রাত্রি ট্রেনে বাস ক'রে উদয়পুরে পৌছলাম। ষ্টেশনে দুটি বন্ধু এসেছিলেন। তাঁদের সাহায্যে জিনিষপত্র উদ্ধার ক'রে ও নিজে পুলিশ এবং চুঙ্গীওয়ালার হাত থেকে উদ্ধার হ'য়ে টাঙ্গা চ'ড়ে সহরের দিকে যাত্রা করা গেল।

ষ্টেশন সহর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে। সুতরাং আধঘণ্টা ধ'রে অন্ধকারে জঙ্গল ঝোপ, পোড়ো বাড়ি, ভাঙ্গা মন্দির এসব ছাড়িয়ে একটি ছোট নদী পার হ'য়ে সহরে পৌছান গেল। সহরে ঢুকেই রাস্তায় বিদ্যুতের আলো দেখে তাক্ লেগে গেল। পরে জানলাম, যে, সহর সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর পরিচায়ক একমাত্র ঐ বিদ্যুতের আলো।

ক্রমে গিয়ে ফুলচাঁদবাড়ি নামে এক পান্থনিবাসে পৌছান গেল। ফুলচাঁদ নামে সহরের এক উকিল এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন; মন্দিরের আয়ের জন্য তার



সজ্জনগড়, উদয়পুর

চারিধারে ঘরবাড়ি করেছেন। সে-সকল দিন, সপ্তাহ বা মাস হিসাবে ভাড়া পাওয়া যায়।

উদয়পুরে থাক্‌বার জায়গা উদয়পুর হোটেল (বিলাতি ধরণের) আর এই ফুলচাঁদবাড়ি। বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না।

শীত বেশ পড়েছে বোঝা গেল। বিলাত থেকে আসার পর এতটা শীত অনেক দিন পাইনি। থার্ম্মমিটারে দেখলাম ৬৮°। গরম জলে মুখ-হাত ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করা গেল। তার পর এক ঘুমে রাত কাবার।

সকালে উঠে বাড়ির ছাদ থেকে দেখি, যে, চারিধারে পাহাড়। কিন্তু মরুভূমির কোনও চিহ্ন নাই। সমস্তই বেশ সবুজ গাছ লতা পাতায় ভরা।

এর পর রোজনামচা হিসাবে দিনের হিসাব দিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হবে। সুতরাং সোজাসুজি বর্ণনা দেওয়াই ভাল।

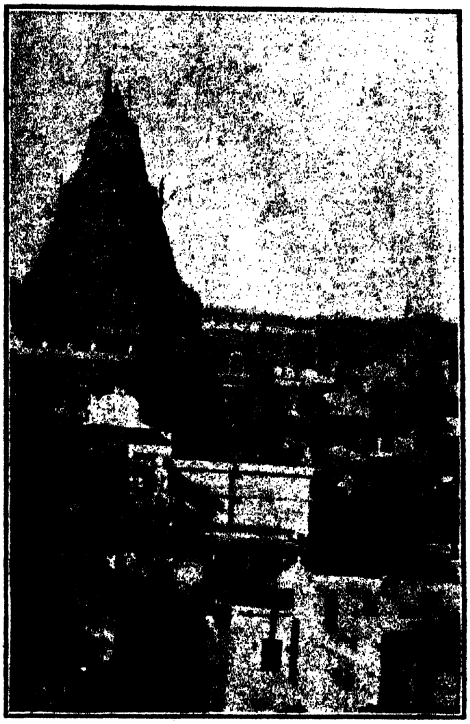
উদয়পুর সহরটি তিন দিকে উঁচু দেওয়াল ঘেরা। দেওয়ালের পরে একটি পরিখা আছে। দেওয়াল এখন শস্ত্রসজ্জাবিহীন। পরিখাটি সহর শুদ্ধ লোকে খিড়কির পুকুর হিসাবে ব্যবহার করে। সহরে ঢুক্‌বার জন্য কয়েকটি দ্বার আছে; যথা, হাতি পোল, চাঁদ পোল (পোল অর্থে দ্বার, না পরিখার উপর পুল তা জানি না) ইত্যাদি। অবশ্য একটি দিল্লী দরওয়াজাও আছে।

সহরটি প্রায় ৫০ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটি উপত্যকায় বসান। তবে উপত্যকা হওয়া সত্ত্বেও রাস্তায় চড়াই উতরাই যথেষ্টই আছে। সহরের ভিতরটি পশ্চিমের যে-কোনো পুরানো সহরের মত। আঁকা-বাঁকা রাস্তা, কোথাও চওড়া, কোথাও সরু, কোথাও পাথর-বাঁধান, কোথাও মেটে। বাড়ি ঘরও প্রায় সেই রকম, তবে জানলা দরজায় জাফরি-কাটা পাথরের কাজ আছে, আর বাইরের দেওয়ালে হাতি, উট, বা ঘোড়ায় সোয়ার রাজপুত বা রাজপুতনীর ছবি আছে।

সহরে মহারাণার আত্মীয় রাজা হিম্মত সিংজির প্রাসাদ ছাড়া খুব বড় বাড়ি আর নাই। তবে আছে মহারাণার প্রাসাদ। পৃথিবীর যেমন তিন ভাগ জল ও



দ্বিতীয় সংগ্রাম সিংহের সমাধি, মহাসতী, উদয়পুর



জগদীশ মন্দির, উদয়পুর

এক ভাগ স্থল, উদয়পুরেরও তেমনই তিন ভাগ রাজ-প্রাসাদ, আর-এক ভাগ বাকী সব।

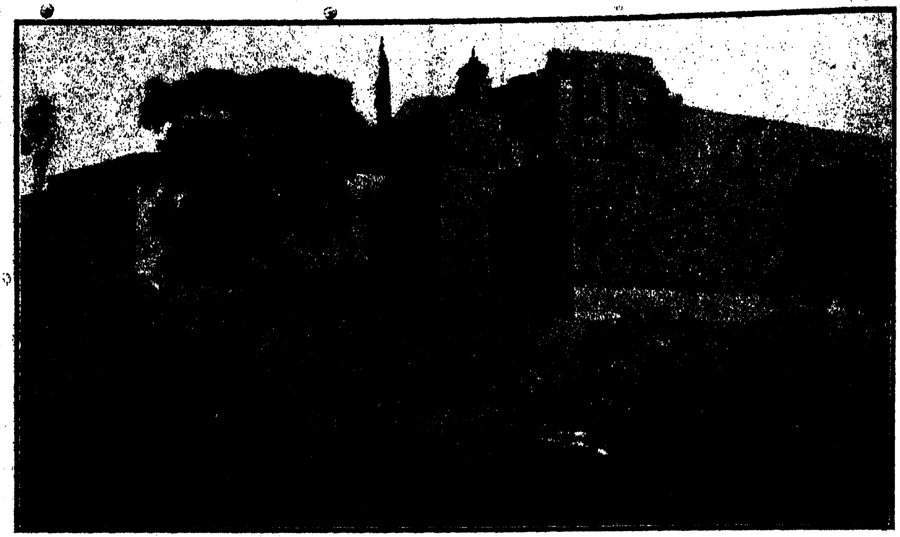
পাহাড়ের কোলে হ্রদের মালা, আর হ্রদের গায়ে প্রকাণ্ড গগনভেদী মর্ম্মরপ্রাসাদ-শ্রেণী,—এ দৃশ্য ভূভারতে অন্য কোথায়ও আছে কি না জানি না। ধূসর পাহাড়, নীল হ্রদ ও শ্বেত মর্ম্মরপ্রাসাদ; প্রাসাদে অসংখ্য তোরণ, গম্বুজ ও ছত্রী, আর সে-সকলই নিখুঁত জাফরী আর উৎক্ষিপ্ত (Bas-relief) কাজে ভরা—এ এক অপরূপ দৃশ্য। রাজপ্রাসাদ এত বড় যে, সহজে কল্পনা করা যায় না, কিন্তু সে সমস্তটাতেই এমন সুন্দর সামঞ্জস্য আছে, যে, দেখলে মনে হয়, যে, হিন্দুর গৌরবের মধ্যে স্থপতি-বিদ্যা অন্যতম।

উদয়পুর প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অনেক রাণায় করেছেন। তারমধ্যে প্রথম অবশ্য উদয়সিংহ। রাণা অমর সিংহ, করণ সিংহ, জগৎ সিংহ, রাজসিংহ, দ্বিতীয় সংগ্রাম সিংহ, ইঁহারা সকলেই একটি দুটি মহল জুড়ে দিয়ে ষান। মহারাণা শম্ভুসিংহ শম্ভু নিবাস ও মহারাণা সজ্জন সিংহ শিব নিবাস পৃথক ক'রে নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান মহারাণাও একটি মহল ও দরবার-গৃহ তৈরী করাচ্ছেন।

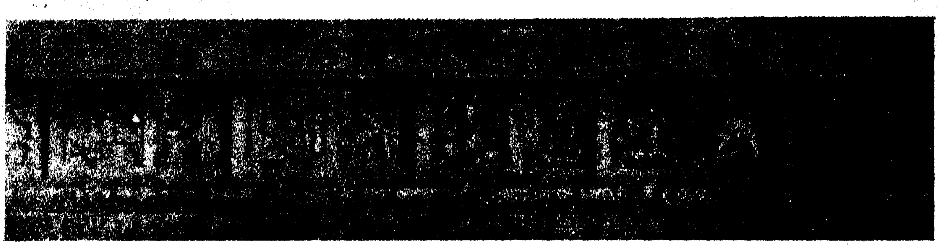
পুরানো প্রাসাদ সঙ্কীর্ণ অলি-গলি, সিঁড়ি ও খোপে ভরা। শিবনিবাস ও শম্ভুনিবাস তার তুলনায় অনেকটা প্রশস্ত মোগল ছাঁচে তৈরী।

এই প্রাসাদগুলির ভিতরের অংশও দ্রষ্টব্য জিনিসে ভরা। সাদা মর্ম্মর পাথরের ঘরের মধ্যে অতি সুন্দর খোদাই করা কাল শেল (shale) জাতীয় পাথরের কাজ, দেয়ালের গায়ে শিকার, যুদ্ধ, উৎসব ইত্যাদির উৎক্ষিপ্ত (Bas-relief) ছবি, পঙ্কের কাজে গড়া আশ্চর্য্য নিখুঁত পদ্মের ফুল মৃণাল ইত্যাদির নক্সা, আরও কত কিছু।

আমার বিশেষ ভাল লেগেছিল, রাণা করণ সিংহের দিল খুসাল মহলে ও মহারাণা দ্বিতীয় সংগ্রামসিংহের



বুনো শূয়র খাওয়ান, খাস্‌ওদি, উদয়পুর



স্মৃতি-মন্দিরের গায়ে পাথর খোদাই কাজ, মহাসতী, উদয়পুর [লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে

"বড়ী চিত্রশালী" মহলের দেওয়ালে এবং গবাক্ষে (জানালা বলা চলে না, কেননা এজিনিষটি বিলাতি Recessed Balcony" র মত) পুরানো রাণা-মহারাণাদের এবং তাঁদের আমলের শিকার নৃত্য যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদির ছবি। প্রত্যেকটি ছবিতে চিত্রকরের নাম, ছবির বিষয় ইত্যাদি নাগরী অক্ষরে লেখা আছে।

এ ছাড়া শস্ত্রাগারে পুরানো রাণাদের আমলের অনেক জিনিষ, যথা রাণাপ্রতাপের অসি, রাখা আছে।

প্রাসাদের ভিতর দেখতে হ'লে পায়ের জুতা ও মোজা দুই-ই খুলতে হয়। অবশ্য এ নিয়মটা দুর্ভাগ্য ভারতবাসীদের জন্যই। কাজেই যখন প্রাসাদ দেখতে-দেখতে হঠাৎ ক্যামেরা জুতা ও ছাতা শোভিত এক পাল শ্বেতকায় ভূপর্য্যটকের সঙ্গে দেখা হয়, তখন কি রকম বিশ্রী লাগে।

রাজপুতানায় পর্দ্দা মুসলমানী পর্দ্দার চেয়ে বেশী বই ত কম নয়। কাজেই প্রাসাদের অনেক অংশ দেখার উপায় নাই।

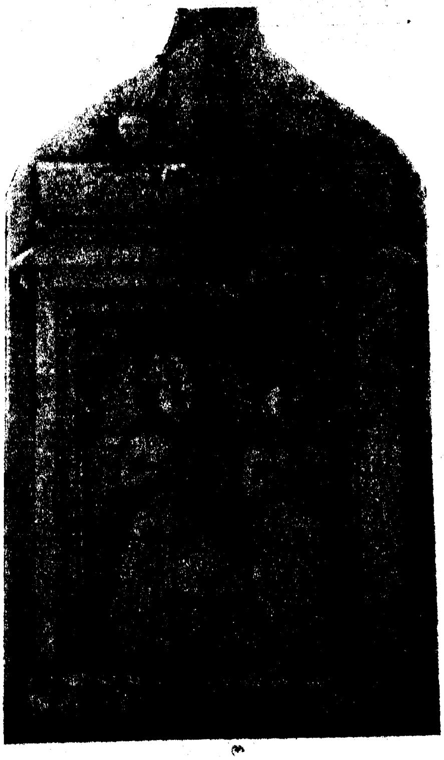
রাজ-প্রাসাদের কাছে একটু উঁচু জমিতে জগন্নাথ রায়জি বা জগদীশের মন্দির। মহারাণা জগৎ সিংহ এটি স্থাপন করেন। মন্দিরের দ্বারের সাম্‌নে একটি ছোট ছত্রির ভিতর কাঁসার গরুড় মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের চার পাশে সূর্য্য, দেবী, শিব, ও গণেশের চারটি ছোট মন্দির আছে। মন্দির সুন্দর খোদাই কাজ এবং



মহাসতীর পথে তোরণমালার গাত্রে মূর্ত্তি রচনা, উদয়পুর



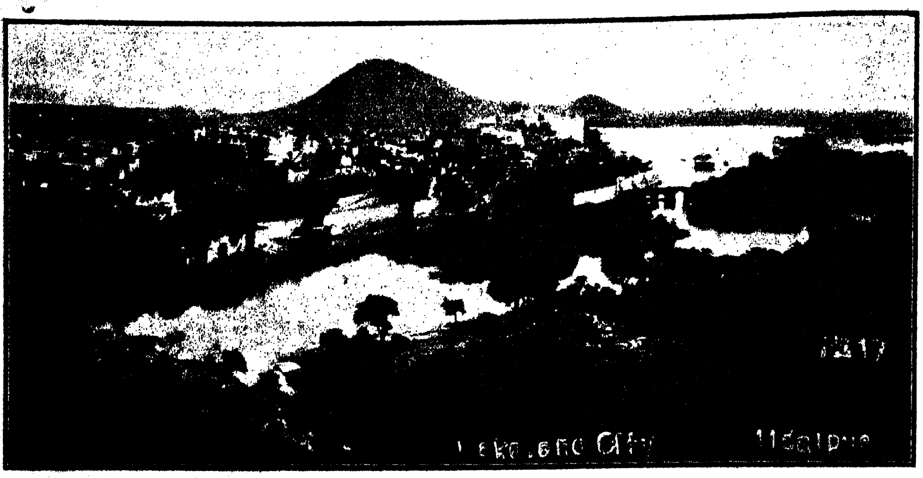
সমাধিতে স্মারক-ফলক, মহাসতী, উদয়পুর
(লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে)



সতীচিহ্নযুক্ত স্মারক-ফলক, মহাসতী, উদয়পুর
(লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে)

পাথরের মূর্ত্তি দ্বারা শোভিত। তবে তার খানিক অংশ আওরঙ্গজেবের শনির দৃষ্টির দরুন্ নষ্ট হ'য়ে গেছে।

প্রাসাদের নীচেই পিছোলা হ্রদ। এইসকল হ্রদ পার্ব্বত্য নদীতে বাঁধ দিয়ে তৈরী করা। নদীর জল জ'মে ক্রমে যত নাবাল জমি ছাপিয়ে প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত



উদয়পুর

হয়েছে। গল্প আছে যে, প্রথমে রাণা লখা (১৪শ শতাব্দী) এক বঞ্জারা জাতের শস্যব্যবসায়ী এই বাঁধ তৈরী করে। বর্ষাকালে তার শস্যবাহী বলদ নদী পার হ'তে পারত না ব'লে সে এই কাজ করে। যাহোক রাণা উদয়সিংহ প্রথমে পাকা বাঁধ তৈরী করেন। পিছোলা হ্রদটি অন্য কয়টি হ্রদের সঙ্গে যুক্ত। উদয়পুরের উপত্যকার সমস্ত নাবাল জমী এই হ্রদের মালায় পরিণত হয়েছে। হ্রদের দরুন উদয়পুরের জমি রাজপুতানার মধ্যে সবচেয়ে সরস এবং এখানের আব্‌হাওয়াও কিছু মৃদু।

পিছোলা হ্রদে তিনটি দ্বীপের উপর সাদা মর্ম্মর পাথরের প্রাসাদ আছে। তার মধ্যে জগনিবাস ও জগমন্দির বড় এবং অরাস বিলাস ছোট। জগমন্দির রাণা করণসিংহ এবং জগৎ সিংহের তৈরী, জগনিবাস জগৎসিংহের এবং অরসি-বিলাস রাণা দ্বিতীয় অরিসিংহের। রাণাদের এই জলবিলাস-নিকেতনগুলি কি স্থাপত্য-কৌশলে, কি প্রস্তর কারুকার্য্যে, সকল হিসাবেই ঠিক গল্পের মায়াপুরীর মত সুন্দর।

সত্য সত্যই উদয়পুরের এই পাহাড়, উপত্যকা, হ্রদ ও রাজপ্রাসাদ, এসবই পরস্পরের সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধি করেছে, যে, এসকলের সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য দেখে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। আমার পেশা হিসাবে আমি ঘোর বস্তুতান্ত্রিক। কবি, লেখক বা শিল্পী ইত্যাদি কল্পনা-রাজ্যের সামন্তদের মধ্যে কক্ষে পাওয়ার অধিকার আমার একেবারেই নেই। সুতরাং আমার বর্ণনা এই দৃশ্যের মোটেই উপযুক্ত হচ্ছে না। তবে এইটুকু বল্‌তে পারি যে, উদয়পুরের এই সৌন্দর্য্যসমষ্টি, বর্ণনার কেন, কল্পনারও অতীত। উদয়পুরে থাকার কষ্ট যথেষ্ট ছিল, খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল এক বেগার-সারা মুসলমান বাবুর্চ্চির হাতে, সুতরাং সেটাও খুব সুখের ছিল না; আর চক্কা-ফেরা এই পাহাড় বনজঙ্গলের দেশে ট্রাম-বাস ট্যাক্সী পূর্ণ কলিকাতার সমতলভূমিবাসী নিরীহ বাঙালীর ছেলের পক্ষে ঠিক যে বেশ আরামের ছিল তাও নয়। কিন্তু ধূসর পাহাড়ে ঘেরা শ্যামল উপত্যকার কোলে স্বচ্ছ নীল হ্রদের মালা, তার কূলে তোরণ গম্বুজ খিলান ছত্রি শোভিত বিরাট শ্বেতমর্ম্মর প্রাসাদ, এবং বুকে রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল জলবিলাস-মন্দিররাজী, প্রতি মুহূর্ত্তে আলো ও ছায়ার পরিবর্ত্তনে এ সকলের নূতন রূপ—এই দৃশ্য যেদিন যখনই দেখতাম তখনই মনে হ'ত, যে, সব কষ্টই সার্থক হয়েছে। সত্য সত্যই দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাসের মত উদয়পুর সম্বন্ধেও বলা যায়।

অগর্ ফিরদৌস্ বর্ রুহে জমীনস্ত্,
হমীনস্ত্, ওয়া হমীনস্ত, ওয়া হমীনস্ত্।

অর্থাৎ "ভূতলে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে সে এই স্থান



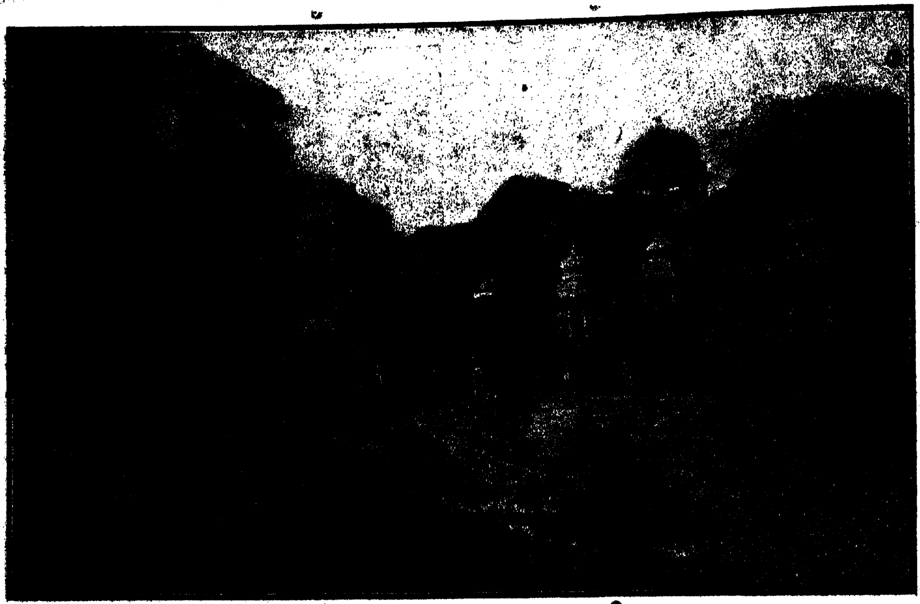
রাজসামান্দ হ্রদ

এই স্থান এই স্থান"। (আমি পার্শী একেবারেই জানিনা সুতরাং বয়েড ও তর্জ্জমা দুই হয়ত ভুল। তবে পারস্য-দেশজাত কবিতার অনুবাদের খুব চল্‌তি, এই জন্য লিখলাম। বিশেষ ভরসা এই, যে, অধিকাংশ অনুবাদকই ঐ ভাষায় আমারই মত পণ্ডিত।)

তবে এইখানে ব'লে রাখা ভাল যে, বেশীদিন থাক্‌তে হ'লে উদয়পুর বাস ঠিক স্বর্গবাস ব'লে মনে না হ'তেও পারে। কেননা, বিংশশতাব্দীর লোকের পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে থাকাটা উপন্যাস হিসাবে খুবই ভাল হ'তে পারে। বাস্তব জীবনে সেটা নির্ব্বাসন দণ্ড ব'লে মনে হওয়াই সম্ভব। উদয়পুর এখনও অষ্টাদশ শতাব্দীতেই রয়েছে। কেবল মাত্র সেদিন উনবিংশ শতাব্দীর দিকে মুখ ফিরিয়েছে।

পিছোলা হ্রদের জগমন্দির প্রাসাদে রাজকুমার খুরুম (পরে বাদশাহ শাহজহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর পলাতক অবস্থায় আশ্রয় পান। তিনি যে মহালে ছিলেন, তা এখনও প্রায় নূতনের মত ঝক্‌ ঝক্‌ কর্‌ছে। তিনি তাঁর আশ্রয়দাতা রাণা করণ সিংহের সহিত যে পাগড়ী বদল করেছিলেন, সেটা স্থানীয় জাদুঘরের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ।

পিছোলা হ্রদের দক্ষিণ কূলে পাহাড়ের উপর "খাস ওদি" নামে মহারাণার শিকারের বাড়ি আছে। এখানে চারিধার ঘেরা একটি উঠান আছে, সেখানে বাঘে ও বুনোশুওরে লড়াই হয়। দর্শকেরা উঁচু ছাতের উপর থেকে দেখে। শোনা গেল, যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে বাঘের জিত একবারও হয়নি। দুটি লড়ায়ে-শুওর ধরে রাখা হয়েছে দেখলাম। তাদের চেহারা ও চলাফেরা দেখে এবং গন্ধ পেয়ে মনে হ'ল, যে,



মহাসতী, উদয়পুর

বাঘের হার হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। এই জায়গাটির চারি ধারে জঙ্গল। প্রায়ই এখানে মহারাণার তরফ থেকে বুনো শূওরকে ভুট্টা বা বাজরি খাওয়ান হয়। বিকালের দিকে এই বাড়ির নীচে খোলা জায়গায় ভুট্টা ছড়ান হয়, তার পর শিকার খানার একজন ভীমকায় শিকারী এক রকম অদ্ভুত ডাক দেয়। শুনে এক দুই ক'রে চারি দিকের জঙ্গল থেকে শূওরের দল এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে। প্রথমে যখন তাদের আসা এবং তাদের কাছে শিকারী খানার লোকেদের যাতায়াত দেখলাম, তখন মনে হ'ল, যে, সেগুলো ঘরের পোষা, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন খাবার নিয়ে দাঁতালে দাঁতালে ঝগড়া বাধতে লাগল, তখন তাদের প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ দেখে বুঝলাম তাঁরা পোষা শূওর নহেন, তাঁরা বন্য বরাহ।

উদয়পুরের কাছে প্রত্যেক পাহাড়ের গায়ে এই রকম ছোট বড় শিকার ঘর আছে। তবে রাণা বা তাঁর প্রিয়পাত্র ভিন্ন আর কেউ শিকার কর্‌তে পায় না। উদয়পুর সহরের ভিতর শিকার ত দূরের কথা, জন্তু জানোয়ারের উপর অত্যাচারও বারণ। সেখানের পথে গরুর গাড়ির ছড়াছড়ি, কিন্তু কোথায়ও কলকাতার গরুর গাড়ির চালকের মত বলদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। আর রাস্তায় ঘাটে ময়ূর, পায়রা, বাঁদর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদি এমন ভাবে ঘুরে বেড়ায় যেন সহরটা তাদেরই। একদিন আমরা ছাতে বসে গল্প কর্‌ছি, এমন সময় এক কাঠবিড়ালি ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সেখানে এসে ছাতের পাশের গাছে উঠ্‌বার চেষ্টা কর্‌ল। গাছের একটা ডাল ছাতের উপর একটু উঁচুতে ছিল। কাঠবিড়ালিটা সেটা খানিক লক্ষ্য ক'রে আমার বন্ধুটির গা বেয়ে মাথায় চ'ড়ে সেখান থেকে লাফিয়ে গাছে চড়্‌ল।

উদয়পুরের হ্রদগুলির ওপারে যে-সব পাহাড় আছে তার সর্ব্বোচ্চটির চূড়ায় সজ্জনগড় নামে গ্রীষ্মাবাস (রাণা সজ্জনসিংহের তৈরী) আছে। হ্রদের পাড়ে আঁকাবাঁকা পথে মাইল চার টাঙায় ক'রে গিয়ে তার পর তিন মাইল



উদয়পুর রাজপ্রাসাদ ও পিছোলো হ্রদ

খাড়া চড়াই হেঁটে পাল্লা দিয়ে ঘোর শীতের মধ্যে গলদঘর্ম্ম অবস্থায় সেখানে পৌছান গিয়েছিল। এর ভিতরটি অতি সুন্দর। খিলান, থাম, এসব দেখলে মনে হয় হাতির দাঁতের কাজ—এত সূক্ষ্ম কিন্তু সরল রেখার কাজ। পাথরে খোদাই ও পঙ্কে গড়া নক্সাও চারিধারে।

সজ্জনগড় থেকে উদয়পুরের পাহাড়ের প্রাকার ঠিক দুর্গের প্রাকারের মত দেখায়। প্রথমে একসার পাহাড় তার পর খানিকটা উপত্যকা, আবার এক সার পাহাড়, এইরূপে যতদূর দেখা যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মত পাহাড় ও উপত্যকা। সজ্জনগড়ে জলের একান্ত অভাব ব'লে এখানে রাণা কখনও থাকেন না।

উদয়পুর থেকে কিছু দূরে ফতে সাগর নামে বর্ত্তমান মহারাণার বাঁধান হ্রদ আছে। এই হ্রদের দক্ষিণ কূলে নীচু পাহাড়ের উপর রাণা উদয়সিংহ প্রথমে যে প্রাসাদ দুর্গ তৈরী করিয়েছিলেন, তার ভগ্নাবশেষ আছে।

ফতে সাগরের অন্য পারে সহেলিয়াঁ-কি-বাড়ি (সখিদের বাড়ি) নামে সুন্দর প্রমোদ কানন ও বিলাস-ভবন আছে। এখানে দেখবার প্রধান জিনিষ ফোয়ারা, পদ্মে ভরা বাঁধান প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা এবং একটি ছোট ঘর যার দেওয়াল ছাদ প্রভৃতিতে সুন্দর পদ্ম, মৃণাল পদ্মপাতা ইত্যাদি আঁকা।

উদয়পুর সহরের বাইরে, ষ্টেশনের পথে, প্রায় তিন মাইল তফাতে, মহাসতী নামে রাজাদের শ্মশান ও স্মৃতি-মঠ স্থাপনের জায়গা আছে। এটি মেবারের শিশোদিয়া রাজপুতদের প্রথম বাসস্থান আড় গ্রামের সীমানার উপর রয়েছে। চিতোর ছাড়বার পর এ বংশের রাণাদের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন ও অন্তিমক্রিয়া সবই এখানে হয়েছে। তবে রাণা উদয়সিংহ আরাবল্লী পাহাড়ের মধ্যে গোগোণ্ডাহ নামক স্থানে এবং রাণা প্রতাপ যুদ্ধ করতে করতে দেশত্যাগী অবস্থায় ভীলেদের জঙ্গলী দেশে চাওয়ান্দে মারা যান।

সমাধিমন্দিরে রাণাদের স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নেই।



বর্ত্তমান মহারাণা ফতেসিংহজি



মহারাণা সজ্জনসিংহ

চিতাভস্ম দশদিনের জন্য সমাধিমন্দিরের কাছে রাখা হয়, পরে তা গঙ্গায় ফেলা হয়। তবে অধিকাংশে পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ স্থাপনা করা হয় ও সেগুলির পূজা আরতির জন্য পূজারী রাখা আছে। অনেকগুলিতে যাঁর নামে ছত্রি (মন্দির) তাঁর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরফলকে খোদাই করা আছে এবং যদি চিতায় সতীদাহ হ'য়ে থাকে তাহ'লে যে কয়জন স্ত্রী সহমৃতা হয়েছিলেন তাঁদের (কল্পিত ?) মূর্ত্তি ও সতী-চিহ্নও সেই ফলকে খোদাই করা হয়। সতী-চিহ্ন চন্দ্র সূর্য্য এবং সতীর যোড়হস্ত। এই রকম একটি ফলকে ১৭টি সতীর মূর্ত্তি খোদাই করা আছে।

এই সমাধি বা স্মৃতি মন্দিরগুলি প্রায় সবই এক ধরণের। তবে মন্দিরের গায়ে খোদাইয়ের বা ভাস্কর্য্য কাজের অনেক তফাৎ আছে। এ হিসাবে একটি ভাঙ্গা ছত্রির (বোধ হয় রাণা দ্বিতীয় সংগ্রাম সিংহের) গায়ে যা কাজ আছে, সেটি অতি সুন্দর। পদ্মের নক্সা, দেবদেবীর খোদাই করা প্রতিমূর্ত্তি, রূপক ছবি এ সব যা কিছু তাতে আছে, সবই অতি উৎকৃষ্ট কলাকৌশল-পরিচায়ক।

দুঃখের বিষয় এই, যে, মেবারের রীতি অনুসারে এসব স্মৃতিমন্দিরের মেরামত করা নিষিদ্ধ। কাজেই সব কটিই ধীরে ধীরে ধ্বংস হচ্ছে, দু-একটি প্রায় হ'য়ে গেছে।

মহাসতীর পথে দুটি বড় আধুনিক জৈন মন্দির আছে। সেগুলির বাইরের প্রাচীরের গায়ে এবং আশে-পাশের কয়েকটি বাড়ির দেওয়ালে সুন্দর খোদাই করা পাথরের ফলক ওলট পালট ক'রে বসান আছে। দেখে মনে হয়, যে, সেগুলি কোনও অতি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে নেওয়া। একটি প্রাচীন বিষ্ণু মন্দিরের



শাহজহানের মহল, জগমন্দির প্রাসাদ, উদয়পুর

ভগ্নাবশেষও কাছেই আছে। মন্দিরে কয়টি সাধু থাকেন। তাঁরা বল্‌লেন সেটি মীরা বাইয়ের মন্দির। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তিই মুসলমান বিজেতারা বিশেষ যত্ন ক'রে নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

উদয়পুরে সাধারণের জন্য একটি জাদুঘর আছে। ইমারত হিসাবে সেটি ইন্দ-ভারতীয় চক্ষুশূল। তবে তার ভিতরে পুরানো অস্ত্র-শস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ (যথা শাহজহানের পাগড়ি) ইত্যাদি অনেক দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে।

মেবার হ্রদ ও পাহাড়ের দেশ। হ্রদের মধ্যে যেগুলির বর্ণনা করা হয়েছে, তা ছাড়া রাণা রাজসিংহ প্রতিষ্ঠিত রাজসামান (রাজসমুদ্র) এবং দ্বিতীয় জয়সিংহের জয়সামান, এ দুটি প্রসিদ্ধ। আমাদের সেগুলি দেখার সুযোগ হয়নি; কেবলমাত্র রাজসামান দূর থেকে দেখেছিলাম।



একলিংজির মন্দির (লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো)

হল্‌দিঘাট দেখারও খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেখলাম, যে, উদয়পুরের অধিকাংশ লোকই হল্‌দিঘাট কোথায় তা জানে না। শেষে দেওয়ানজি প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুন্‌লাম, যে, কুড়ি মাইল ট্রেনে, পরে আঠারো মাইল মোটর লরী, তার পর সাত মাইল ঘোড়ায় এবং শেষের পাঁচ মাইল দুর্গম জঙ্গল ভেঙে হেঁটে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। অতএব উদ্দেশে নমস্কার করা ছাড়া আর কিছু হ'লনা। উদয়পুর থেকে সোজা পথ কিছুই নাই!

উদয়পুরে দু'সপ্তাহ আন্দাজ থাকার পর একদিন ভোরে টাঙ্গায় চ'ড়ে বাপ্পা রাওয়লের স্মৃতি ও কীর্ত্তি চিহ্ন একলিংজির মন্দির দেখতে রওনা হলাম। উদয়পুরের প্রাচীররূপ পাহাড়শ্রেণী পার হয়ে একলিংজির পথ চলেছে। পথে এমন ভীষণ চড়াই, যে, টাঙ্গার ভাড়া দিয়ে মাইল দেড়েক পাহাড় বেয়ে উঠ্‌তে হ'ল। পথের দুধারের দৃশ্য চমৎকার ক্রমে পাহাড় দেখতে দেখতে একটি ফাটক দেওয়া গিরিসঙ্কট পার হ'য়ে উতরাইয়ে এসে পড়া গেল। তারপর দুধারে পুরানো মন্দির ঘর বাড়ি কেল্লা ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ ছাড়িয়ে একটি প্রকাণ্ড দীঘির ধারে পৌছলাম। দীঘির আশে পাশে অনেকগুলি অতি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। দীঘির পর আবার পাহাড়ের গায়ে ফাটক এবং দুর্গপ্রাকার দেখা গেল। সেটি পার হ'য়ে, প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করার পর পাহাড়ের কোলে লুকানো একলিংজির মন্দির দেখা দিল।



কুম্ভজয়স্তম্ভ, চিতোর

এইখানেই হিন্দু জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধকুলের জন্মদাতার সৌভাগ্য-সূর্য্যোদয় হয়। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত এই একলিঙ্গ বিগ্রহ এইখানে প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর দেওয়ান হিসাবে বাপ্পা রাওয়ল অসিহস্তে রাজ্য গঠন ও বিজয় আরম্ভ করেন। সেই ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি কে ছিলেন, কোথা হ'তে এসেছিলেন, কেহই বোধ হয় সঠিক জানে না। অতীতের ধুলি-ধুসরিত, সহস্রাধিক বৎসরের জরাবিকৃত দু'চারটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা মাত্র আমরা পেয়েছি। কিন্তু আজও তাঁহার যুদ্ধবিক্রম ও দুর্দ্দমনীয় প্রতাপের খ্যাতি হিন্দুজগতে লোপ পায়নি।

দুর্গম, নীরস, প্রস্তরময় পাহাড়ে ঘেরা একলিংজির মন্দিরের একটা সুন্দর সৌম্য ও গম্ভীর ভাব আছে। যেন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রণনেতা বীর পুরুষ। মন্দিরের আকৃতি এদেশের যে-কোন অন্য মন্দিরের মত। কিন্তু বিরাট আয়তনে, মন্দিরের প্রস্তরের ধূসর বর্ণে, মন্দিরের গঠনের ঋজু রেখাপাতে (এবং বোধ হয় বাপ্পা রাওয়ালের স্মৃতির রুদ্র-জ্যোতির প্রভাবে) কি রকম যেন ইহার মধ্যে একটা দৃঢ় অটল পৌরুষের ভাব এসেছে।

মন্দিরের গায়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ, শিকার, নৃত্য-গীত, রাজসভা ইত্যাদি খোদিত আছে। মন্দিরের সম্মুখে পিতলের নন্দী ষণ্ডমূর্ত্তি—গায়ে ধনরত্নান্বেষী সুলতান বাবরের ছেনীকাটার দাগ—প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আশে-পাশে অনেকগুলি লিপিখোদিত পাথরের ফলকও রয়েছে। একলিংজি কালো কষ্টি-পাথরের পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ।

একলিংজির মন্দিরের পাশেই এবং একই প্রাচীরের ঘেরার মধ্যে মীরাবাই প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্দর বিষ্ণু-মন্দির এবং ছোট বড় আরও অনেকগুলি মন্দির আছে।

মেবারের মন্দিরগুলিতে একটু আশ্চর্য্য জিনিষ আছে। বিধর্ম্মী, ম্লেচ্ছ, বা "অস্পৃশ্য"দের মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। উদয়পুর পুরাতন প্রাসাদে সূর্য্যমন্দির দেখ্‌তে যে দিন গিয়েছিলাম, সেদিন আমাদের সঙ্গে একজন বাংলা দেশের মুসলমান ছিলেন। তিনি মন্দিরের কাছে যেতে ইতস্ততঃ ক'রে মন্দিরের প্রদর্শককে নিজের পরিচয় দেওয়াতে সে গম্ভীর ভাবে বল্‌ল, "তাতে কি? তুমি বিগ্রহ না ছুঁলেই হ'ল, আমাদের তোমাদের দেশের মত মুসলমান ভয় নাই"। একলিংজিতেও মন্দিরের এক দ্বারে এক স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে যেখান থেকে ভিন্নধর্ম্মীরা দেব দর্শন করতে পারেন। সে জায়গাটি লিঙ্গ থেকে দশ বার হাত মাত্র তফাতে।

একলিংজি দর্শনের পরই চিতোর দেখার এবং ফিরে আসার আয়োজন আরম্ভ হল।

সেইমতে একদিন বিকালে উদয়পুর ছেড়ে চিতোর গড়ের দিকে রওয়ানা হ'লাম।

ট্রেনে মাইল বারো চৌদ্দ যাবার পর দেবারী গিরিসঙ্কট

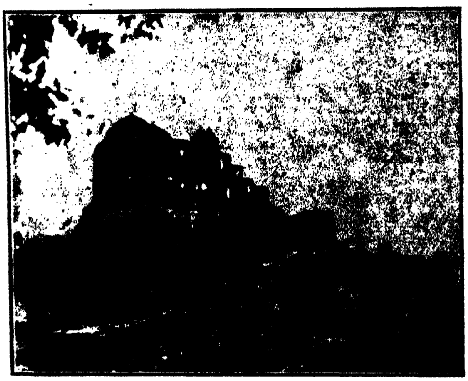


পদ্মিনী মহল, চিতোর   (লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো)

দেখা দিল। উদয়পুর আস্‌বার সময় রাত্রিবেলায় কিছুই দেখা যায়নি। এবার বেশ দিনের বেলায় পৌছান গেল। দেবারীর যুদ্ধক্ষেত্র ষ্টেশন থেকেই দেখা যায়। চারিধারে প্রস্তরসঙ্কুল পাহাড়ে ঘেরা শুক্‌নো মরু জমী। এই খানেই রাণা রাজসিংহের হাতে আওরংজেবের বিপুল সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়।

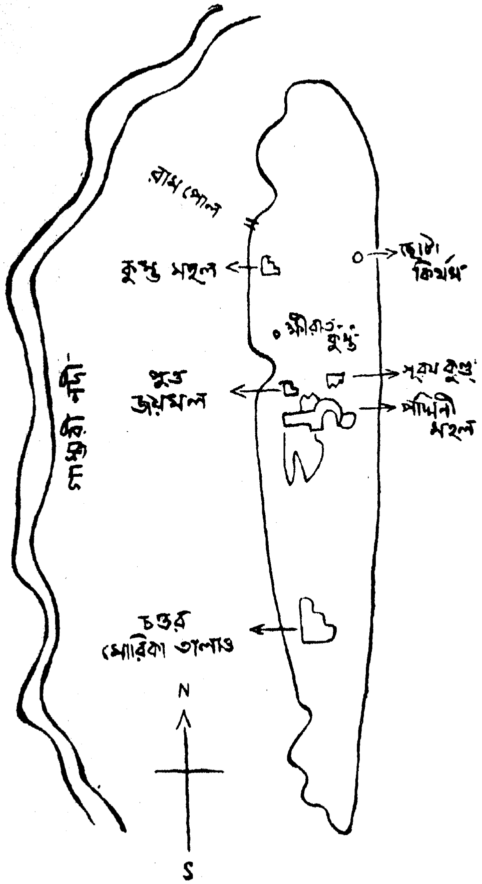
চিতোর গড় পৌছাতে রাত হ'য়ে গেল। ষ্টেশন থেকে কুলীর মাথায় জিনিষ-পত্র চাপিয়ে মাইল খানেক দূরে ডাক-বাংলায় গেলাম। গিয়ে শুন্‌লাম, যে, এক সপ্তাহের মত সেখানে জায়গা পাবার উপায় নাই; তার পর ফিরে মাইল দেড়েক হেঁটে রাজসরকারের সরাইয়ে এসে শুনলাম সেখানেও জায়গা নাই। এদিকে অন্ধকার রাত এবং বিষম শীত। শেষে সরাইয়ের অধ্যক্ষ অবস্থা বুঝে অনুগ্রহ ক'রে জেনানা মহলের এক অংশ সাফ করিয়ে দিলে পরে মনের অবস্থা কিছু ভাল হ'ল। সরাইয়ের ঘর দেয়াল ছাত মেজে সবই পাথরের তৈরী। সেই ঠাণ্ডা পাথরের মেজের উপর বিছানা পেতে রাত কাটানো গেল।

রাত্রেই কুলিদের মারফত টাঙ্গার বন্দোবস্ত ক'রে রাখা হয়েছিল। ভোর হ'তে না হ'তেই এক টাঙ্গাওয়ালা এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে ভাড়া ঠিক ক'রে, তাকে



জয়মল্ল ও পুত্তের বাড়ি, চিতোর (লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো)

দিয়ে জল আনিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে ঘরে জিনিষ পত্র রেখে তালা লাগিয়ে টাঙ্গাযোগে চিতোরের দিকে রওয়ানা হ'লাম। তখনো বেশ শীত। কাজেই ক্ষিদেও পেয়েছিল বেশ। টাঙ্গাওয়ালাকে বল্‌লাম, চা ও কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। সে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় শ্রেষ্ঠ হালুয়াইয়ের দোকানে নিয়ে গেল। পাশে এক চায়ের দোকান। হালুয়াইকে "পুরী"র অর্ডার এবং চাওয়ালাকে চায়ের ফরমাস ক'রে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে হ'ল। আমরা তিন জন বাঙালী ছিলাম। এই তিনটি ক্ষীণজীবী প্রাণীতে মিলে আমরা দেড় সের (৯০ সিক্কা সের) পুরী, তিন



চিতোর গড়ের মানচিত্র

পোয়া অতি উৎকৃষ্ট রাবড়ি, আধসের পেড়া, এক পোয়া "গোলাপ জামুন," উপযুক্ত পরিমাণ তরকারি চাট্‌নি ও চায়ের সঙ্গে পার ক'রে দিয়ে ফের টাঙ্গায় বস্‌লাম। দাম সবশুদ্ধ দিতে হয়েছিল নগদ এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা। এদেশ থেকে খাবারের জিনিষ রপ্তানী বারণ; কাজেই যা পাওয়া যায়, সবই সস্তা।

মাইল খানিক পথ পার হ'বার পর চিতোরগড় পরিষ্কার দেখা গেল। হিন্দীতে ছড়া আছে,

গড় তো চিতোর গড়, অওর সব গড়ইয়া!
রাণী তো কমলাবতী, অওর সব গধইয়া॥

রাণী কমলাবতা কে ছিলেন তা জানিনা; সুতরাং তাঁর তুলনায় জগতের অন্য সব রাণী গর্দ্দভীতুল্যা কিনা, বল্‌তে পারি না। তবে চিতোর গড়ের তুলনায় সব গড় যে এক কালে নগণ্য মনে হ'ত ভারতের ইতিহাসে সে কথা সুস্পষ্টভাবেই লেখা আছে।

এখন সে চিতোরের কঙ্কালও নাই, কয়েকটি অস্থি মাত্র প'ড়ে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দূরের থেকে চিতোরের দৃশ্য অত্যন্ত মহিমাব্যঞ্জক। চিতোর গড় একটি সাড়ে তিন মাইল লম্বা এবং আধ হ'তে তিনপোয়া চওড়া পাহাড়ের অধিত্যকার উপর স্থাপিত। এই পাহাড়ের চারিপাশে নীচু সমতল জমি। মাঝে দ্বীপের মত চিতোর গড় দাঁড়িয়ে আছে।

চিতোর উঠবার পথ তোলায়তি নামে একটি ছোট সহরের ভিতর দিয়ে। চিতোর গড় ষ্টেশন হ'তে পথে গাম্ভেরী নামে একটি ছোট নদী পার হ'য়ে তোলায়াতির দ্বারে পৌঁছান যায়। এই সহরের কাছারি থেকে চিতোর দেখার ছাড়-পত্র নিয়ে আমরা চিতোরে প্রবেশ কর্‌লাম।

চিতোর গড়ে পাঁচ ছয় সারি দেওয়াল আছে। তার মধ্যে তিন সার বেশ ভাল মেরামত করা। সাতটি প্রকাণ্ড দুর্গদ্বার পার হ'য়ে চিতোরের অধিত্যকায় পৌঁছাতে হয়। প্রত্যেকটি দুর্গদ্বার স্মারকলিপি ও স্মৃতিচিহ্নযুক্ত। তৃতীয় দ্বার (ফটা দরওয়াজা) এবং চতুর্থ দ্বারের (হনুমান পোল) মাঝে জয়মল্ল ও পুত্তের নামে উৎসর্গ করা মর্ম্মরনির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ আছে। এইখানে আকবরের চিতোর অবরোধের সময় ঐ দুই বীর যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্ত-জীবন লাভ করেন। এই রকম অনেক স্মৃতিচিহ্ন পার হ'য়ে শেষ দ্বারের (রামপোল) ভিতর দিয়ে আমরা চিতোরে পৌঁছলাম।

রামপোল অতি বিরাট ও সুন্দর দ্বার। রামপোলের প্রায় গায়ে লাগা প্রকাণ্ড সান্ত্রী ঘর আছে এবং তার পরই পুরানো দরীখানা অর্থাৎ দরবার গৃহ। প্রবাদ আছে, এইখানেই চিতোরের ভয়ঙ্কর অধিষ্ঠাত্রী দেবী "কাংড়া-রাণী" (দুর্গ প্রাকারকে কাংড়া বলে) "ময় ভুখা হুঁ" ব'লে অরিসিংহের সম্মুখে উপস্থিত হন।

দরবার ঘর ছাড়িয়ে তুলসী ভবানীর সুন্দর মন্দির। তারপরেই তোপখানা ও সেনানায়কদের মহল। তোপখানায় অনেকগুলি পুরাণো কামান আছে। আমাদের প্রদর্শক (একটি ১৬।১৭ বৎসর বয়সের ব্রাহ্মণ ছেলে) তার মধ্যে একটি রাণা প্রতাপের কামান ব'লে দেখাল। সেটি অষ্টধাতুর ব'লে শুনলাম। দেখে মনে হ'ল গন্ মেট্যাল্। আরো অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাণার কামান ব'লে প্রসিদ্ধ। এগুলির গায়ে সিন্দুর দেখে পূজা হয় ব'লে মনে হ'ল। তোপখানার প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে রাণা প্রতাপের মন্ত্রী ভীম শাহের বাড়ীতে গেলাম। সেটি এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র এবং যা আছে তাও দিন দিন ধ্বংস হচ্ছে।



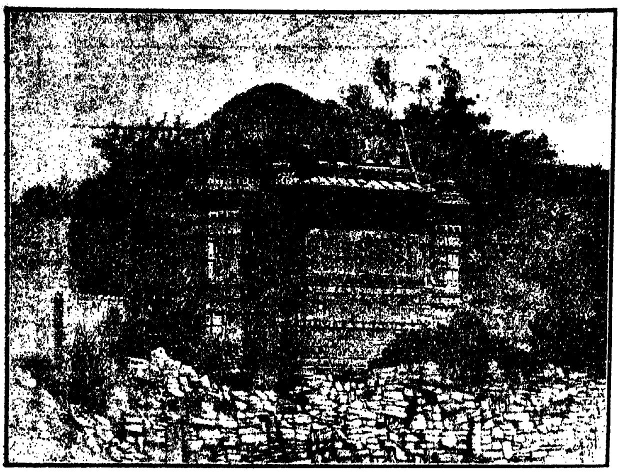
মীরাবাইয়ের মন্দির, চিতোর (লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো)

তোপখানার কাছেই নৌলাখাবিন্দার (নওলাখা ভাণ্ডার?) বা পুরাতন রাজকোষ। তারপর চিতোরের রাণাদের বিবাহমণ্ডপ সিঙ্গার ছাউড়ি। এটির গায়ে অদ্ভুত খোদাইয়ের কাজ করা আছে। ভিতরেও অতিসুন্দর কাজ করা বিবাহের বেদী, হোমকুণ্ড ইত্যাদি। তোপখানা ছাড়া এ সবই ধ্বংস হ'য়ে চলেছে।

তার পরই রাণাকুম্ভের প্রকাণ্ড প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। যেটুকু ঠিক আছে, তা গোয়াল ও আস্তাবল করা হয়েছে। অল্প একটু মেরামত হয়েছে দেখা গেল। শুনলাম সেটুকু মহারাণা সজ্জন সিংহ ক'রে গিয়েছেন।

কুম্ভ মহালের ধ্বংসাবশেষ যা আছে, তার থেকেই মুসলমান প্রভাবের পূর্ব্বে এদেশের রাজপ্রাসাদ কি আশ্চর্য্য স্থপতিকৌশলের নিদর্শন ছিল, তা বোঝা যায়। সম্পূর্ণ অবস্থায় এ যে কি ছিল, তা কল্পনাও করা যায় না। কুম্ভমহালের এক অংশে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। শোনা যায়, যে, পদ্মিনী অন্য রাজ-অন্তঃপুরের মহিলাদের সঙ্গে এইখানেই "জহরব্রত" পালন (অগ্নিপ্রবেশ) করেন।

কুম্ভ মহলের কিছু দূরে দুটি মন্দির আছে। একটি বোধ হয় ভবানী মন্দির, অন্যটি প্রসিদ্ধ মীরাবাইয়ের বিষ্ণু-মন্দির। মীরাবাইয়ের মন্দিরের ভিতর বাহির সমস্ত কারু-কার্য্যে ভরা। মুসলমান বিজেতার অত্যাচারের পরেও তার যা আছে, তাহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এই মন্দিরের কাছে একটি ছোট জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেই মন্দিরটি আয়তনে ছোট, কিন্তু স্থাপত্য-


সিঙ্গার ছাউরি, চিতোর

পাহাড়ের পথে কিছুদূর যাবার পর গোমুখী ধারা এবং পাথর বাঁধান প্রকাণ্ড জলাধার কুণ্ডে পৌছালাম। এই গোমুখীর পাশে পাহাড়ের গায়ে রাণী বিন্দার নামে গহ্বরের মুখ দেখা যায়। গহ্বরটি পাথরের দেওয়ালে বন্ধ করা। এইখানে চিতোরের বারো হাজার কুলললনা অগ্নি প্রবেশ ক'রে জোহরব্রত পালন করেন।

কিছু দূরে জয়মল্ল ও পুত্তের বাড়ী। এই দুই রাজপুত বীরের বাড়ীও ধ্বংসের পথে চলেছে। তার পর পদ্মিনী মহল। পদ্মিনী মহলের কিছু অংশ মেরামত করা হয়েছে।

কৌশলে, কারুকার্য্যে এবং সুঠাম গঠনে একটি রত্ন বিশেষ। আগ্রা বা দিল্লীর কেল্লা ইত্যাদিতে এর কাছে দাঁড়াতে পারে এমন কিছু নাই।

মন্দিরগুলির কাছেই চিতোরের সূর্য্যকুণ্ড। গোরক্তে কলুষিত হবার আগে এই কুণ্ড থেকে সপ্তাশ্বের আবির্ভাব হ'ত ব'লে কিম্বদন্তী আছে।

সূর্য্যকুণ্ডের কাছেই কুম্ভের জয়স্তম্ভ। ইহা হিন্দু স্থপতিবিদ্যার, ললিত কলার ও প্রস্তর কারুকার্য্যের জয়স্তম্ভ স্বরূপ। গঠন রেখা, অলিন্দ 'গবাক্ষ' খিলানের রচনাকৌশল, ভিতর ও বাহিরের প্রস্তর-খোদন কার্য্য, অসংখ্য মূর্ত্তি খোদন ও বিন্যাস এবং স্থাপত্য-কৌশল প্রদর্শন হিসাবে ইহার তুলনা জগতে নাই বোধ হয়। চিতোরে আর একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে। সেটিও অতি সুন্দর। কিন্তু তাহাতে কুম্ভ জয়-স্তম্ভের (খীরাৎকুম্ভের) বিরাট গাম্ভীর্য্য নাই।

কুম্ভের জয়স্তম্ভের নীচে ঢালু

অধিকাংশই এখানে সেখানে ধ্বংস হ'য়ে প'ড়ে যাচ্ছে। মেরামত অতি "হাতুড়ে" ভাবে করা হয়েছে দেখলে মনে হয়; না করলেই ছিল ভাল। মহলের সাম্‌নে প্রকাণ্ড পুকুর। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, যে, চিতোরের পাহাড় কোনখানেই নীচের সমতল জমীর থেকে চারশ ফুটের কম উঁচু নয়; অথচ এই সকল জলাশয়ে বারো মাস জল থাকে।


কুম্ভ মহাল, চিতোর

পদ্মিনী মহল ছাড়িয়ে বাদল মহলের ধ্বংসস্তূপ। তারপর জঙ্গলের আরম্ভ। স্থানীয় লোকের কাছে শুন্‌লাম, বাঘের উৎপাত যথেষ্ট আছে।

চিতোরের ভিতরে বর্ত্তমান মহারাণা অনেক লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকাণ্ড প্রাসাদ তৈরী করুছেন। প্রাসাদের কাজ এখনো শেষ হ'তে ঢের দেরী, কিন্তু এরি মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হ'য়ে গেছে।

প্রাসাদের চারিপাশে শত শত মন্দির, ঘরবাড়ী, মহাল, ধীরে ধীরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। বাপ্পা রাওয়াল, অরিসিংহ, ভীমসিংহ, পদ্মিনী, হাম্বীর সিংহ কুম্ভরাণা, মীরাবাই, পৃথীরাজ, জয়মল্ল, পুত্ত, বীরাঙ্গনা রাঠোরণী ও তাঁর পুত্রবধূ, রণনেতৃ সালুম্ব্রা পত্নী, রাণা সংগ্রাম, রাণা প্রতাপ ও শত সহস্র রাজপুত বীরের অক্ষয় কীর্ত্তিস্থল চিতোর এখন এক বিরাট শ্মশানে পরিণত।

ইহার ধ্বংসস্তূপের প্রত্যেক অণুপরমাণু মৃত্যুঞ্জয়ী, স্থিরকর্ত্তব্য মহাতেজা রাজপুত বীর পুরুষ ও ললনার গৌরবকীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানে এলে যে অবস্থা দেখা যায়, তাহাতে গৌরব অপেক্ষা বিষাদেরই উপলব্ধি অধিক হয়।

শত্রু-অত্যাচার-প্রপীড়িত, বর্ব্বর কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত চিতোর দেখলে মনে হয়, যেন কোন এক সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ যোদ্ধৃপুরুষ শত্রু কর্ত্তৃক মারাত্মক ভাবে আহত হ'য়ে নির্জ্জন শ্মশানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করুছেন।

পাশ্চাত্য জগতে একটি প্রবাদ আছে, যে, প্রাচীন গ্রীসের গৌরবের অনুভূতি হয় জার্ম্মানীতে। সেই রকম চিতোর ও মেবারের গৌরবের সম্যক্ অনুভূতি বোধ হয় বাংলা দেশেই হয়।

কাল-বৈশাখী

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

এমনি বাদল্ গেল, বৃষ্টি আর ঝড়ের দাপটে
ধ্রুব সপ্তঋষি ছবি মুছে গেল নভ-চিত্রপটে,
বিদ্যুৎশলাকা বিদ্ধ রুদ্ধ অন্ধ অযুততারকা
মুহুঃসহ বেদনায় অশ্রুজল জমাট করকা,
কাঁদে নীড়-ভাঙা পাখী; ছিন্নপত্র ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
নিরুদ্দেশ পথহারা, অরণ্যানী পরিত্রাহি ডাকে
অবিরাম নিরুপায় আর্ত্তনাদে, পল্লব-সম্ভারে
বক্ষে বাঁধি, ভগ্নশাখা লুটাইয়া পড়ে একেবারে।
অন্ধকার নেমে আসে ঘনকৃষ্ণ আর্দ্র যবনিকা,
নির্ব্বাপিত নিখিলের আলোকের প্রত্যেক কণিকা;
প্রলয়ের ক্ষণ স্মরি' সৃষ্টি কেঁপে ওঠে বারে বারে,
কাটে নিদ্রাহীন রাতি দীপহীন আঁধার আগারে,
প্রভঞ্জন এসেছিল পূরবের দূরপথ বাহি',
দক্ষিণে চলিয়া গেছে হেথা বাতায়ন-পথে চাহি'
দেখি' পড়ে দেবদারু ভগ্নরথ যোদ্ধার সমান,
পল্লবে প্রচ্ছন্ন পথ, তোরণের আচ্ছন্ন সোপান,
মরিয়াছে বুলবুল কামিনী-কুসুম-সমাহিত,
বিঁধে আছে বাতায়নে প্রজাপতি ঝটিকা-বাহিত,
কুসুমের লাজাঞ্জলি চারিদিকে অলিন্দে ছড়ায়ে,
ভেঙেছে মঙ্গল ঘট রচনার মালিকা জড়ায়ে।

পক্কশস্য

ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায় নারী—

মেয়েরা যে শুধু গৃহ-বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া স্বামী-পুত্র-ভ্রাতা প্রভৃতি পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের সেবা ও পরিচর্য্যা এবং সন্তান প্রতি-পালন করিতেই সৃষ্ট হইয়াছে, পুরুষ শাস্ত্রকার ও সমাজ পরিচালক-গণের দ্বারা প্রচারিত এই ধারণা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিল। মৃদু ও কোমলাঙ্গী নারী, অন্তঃপুরের কোণেই তাহার যথার্থ স্থান, গৃহের বাহিরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে রৌদ্রাতপ, ঝড়-বৃষ্টির সহিত যুঝিবার মত মনোভাব ও দেহ তাহার নহে, এইসকল কথা শুনিয়া শুনিয়া নারীরাও এত দিন আত্ম-বিস্মৃত ছিল। বহু শতাব্দীর এই অন্ধসংস্কার তাহাদের দেহমনে এমনই মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল যে ভগবানের অপূর্ব্ব দান আলো-হাওয়াও তাহারা অবাধে, নিঃসঙ্কোচে উপভোগ করিতে দ্বিধা করিত। মেয়েদের দৈহিক শক্তি থাকাটা দোষের বলিয়া গণ্য হইত। যে-মেয়ে যত দুর্ব্বল, কোমল ও অল্প আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিত, সেই তত সুন্দর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিত। কিন্তু এই ভাব চিরদিন থাকিবার নহে। পাশ্চাত্য দেশে এই মনোভাবের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে;



মিস ই-ট্রিকী



মিস কাসেল

আমাদের দেশেও ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আসিতেছে। জ্ঞানের আলোকে নারীরা এখন আপনাদের স্বরূপ বুঝিতেছে। শুধু সংসারের রাঁধা-বাড়া, সন্তানপালন ও একান্ত দাসীবৃত্তিই নারীর চরম ধর্ম্ম নহে। পুরুষের মত সমগ্র বিশ্বেও তাহার অধিকার আছে এবং সেই অধিকার আজ তাহারা দাবী করিতে বসিয়াছে। ভগবান মেয়েদের শরীর দিয়াছেন শুধু পেলবতা ও সৌন্দর্য্য-সুষমামণ্ডিত ক্ষণ-ভঙ্গুর পুতুল সাজিয়া থাকিবার জন্য নহে, এই অনুভূতি মেয়েদের মনে জাগরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতেছি, বাহিরের সকল কাজেই নারীরা যোগ দিতেছে। আকাশে, সমুদ্রে, আহারবিহারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শীকারে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সর্ব্বত্রই নারী পুরুষের যথার্থ সহচরী, কেবল মাত্র ভোগের উপচার নহে। দৈহিক শক্তি পরীক্ষায়, ব্যায়াম-ক্ষেত্রে নারীদের উন্নতি বিস্ময়কর। সন্তরণ, দৌড়-ঝাঁপ, বন্দুক ব্যবহার, টেনিস, ফুটবল এবং সাইকেল, মোটরকার, জাহাজ, এরোপ্লেন ব্যবহারেও আজকালকার শিক্ষিতা নারীরা পিছ্-পা নহেন। এই সকল ব্যায়াম দ্বারা মেয়েরা শরীর ও মনে যথেষ্ট শক্তি অর্জ্জন করিতেছেন ও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে,নারী কেবল মাত্র পুরুষের সম্পত্তি নহে,তাহার স্বতন্ত্র



মিস ক্রাইজ

অস্তিত্ব আছে। এই পঞ্চশস্য বিভাগে আমরা ইতিপূর্ব্বে শরীর ও মনের দিক্ দিয়া নারী-সমাজের অনেক কীর্ত্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। শারীরিক ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায়ও যে, নারী নিতান্ত পিছনে নহেন তাহা দেখাইবার জন্য এখানে তিনটি ব্যায়ামপটু মহিলার ছবি দিলাম, ইঁহাদের দুই জনে মিস ই ট্রিকী ও জাক্কার কাসেল লম্বা দৌড়ে যথাক্রমে হাজার মিটার ও ১০০ মিটারের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন। মিস্ ট্রিকী জাতিতে ইংরেজ, ইলফোর্ডের আধ মাইল দৌড়প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছেন। মিস কাসেল জার্ম্মান জাতীয়, ইনি ১২·৩ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড়াইয়াছেন। তৃতীয় ছবিটি জর্জ্জ-ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাইফেল দলের একজন নামজাদা সভ্য। ইঁহার নাম মিস্ এলিজাবেথ ক্রাইজ। রাইফেল ব্যবহারে ইনি একজন অদ্বিতীয় ওস্তাদ।

—

মার্কিন্ মিনার—

আকাশ-পোত হইতে মার্কিন দেশের বড় বড় সহরগুলি দেখিলে মনে হয় যেন সেগুলিতে আকাশের শরশয্যা পাতিয়া রাখা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই অভ্রংলিহ (Sky-Scraper) প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া আমেরিকার



মার্কিন মিনার

অধিবাসীরা যেন আকাশের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই আকাশ ধরার নেশা এমন ভাবে আমেরিকাকে পাইয়া বসিয়াছে যে, লোকে চল্লিশ তলা পঞ্চাশ তলা বাড়ী ছাড়া অন্ত বাড়ীগুলিকে বাড়ীই মনে করে না। আমেরিকার সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধ এডিসন্ এই ভয়ঙ্কর নেশাকে ধ্বংসের পূর্ব্ব-লক্ষণ জ্ঞানে বার বার তাঁহার দেশবাসীকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার কথা কেহ শোনা দূরে থাকুক্ এই মোহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে যে ছবিটি দেওয়া হইল সেটি একটি কল্পিত প্রাসাদের নক্সা। নিউইয়র্ক সহরে এটি নির্ম্মিত হইবে। ১১০ তলায় এটি সম্পূর্ণ হইবে। ইহার পাশে আমেরিকার অন্যান্য অভ্রংলিহ প্রাসাদগুলি নিতান্তই নগণ্য হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে ষাটতলা উলওয়ার্থ প্রাসাদই পৃথিবীর উচ্চতম প্রাসাদ; তাহার উচ্চতা ৭৯২ ফুট। এটি উলওয়ার্থ প্রাসাদ অপেক্ষা ৪১৬ ফুট অধিক উচ্চ হইবে অর্থাৎ ইহার উচ্চতা হইবে ১২০৮ ফুট। ইহার নির্ম্মাণে প্রায় ৮০ লাখ ইট ব্যবহৃত হইবে এবং ইহার কাঠামো নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ১১২০০০০ মণ লোহা লাগিবে। জমির দামও প্রাসাদ নির্ম্মাণ খরচ প্রায় ৫০০০০০০০০ টাকা পড়িবে। ইহার নাম হইবে মার্কিন-মিনার।

—

কমোডো দ্বীপের অদ্ভুত জানোয়ার—

স্যার্ এলান কব্‌হাম বিমানপথে সমস্ত পৃথিবী প্রায় দুইবার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৬০০০০ মাইল পথ অতিবাহন করিয়াছেন। তিনি আমাদের দেশেও আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব ভ্রমণের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ইষ্টইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কমোডো দ্বীপে এক অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলিয়াছেন। এই জানোয়ার লম্বায় ১০ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহাদের নখ আশ্চর্য্য রকম বড়, এই নখের সাহায্যে বড় বড় ঘোড়াকেও ইহারা চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারে। ইহাদের প্রকাণ্ড লেজের জোরও অসামান্য। এই লেজের এক বাড়িতেই গরু মহিষ শূকর মানুষ ইত্যাদির প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। এইগুলি গিরগিটি জাতীয় জীব। বৈজ্ঞানিকেরা সন্দেহ করিতেছেন যে, অতি-আদিমযুগের যে কয়েকটি জানোয়ার আজিও জীবিত আছে ইহারা তাহাদের অন্যতম। ইহারা অতি দ্রুত দৌড়াইতে পারে। এই জানোয়ারের দুইটি মাত্র সম্প্রতি ধৃত হইয়া আমেরিকায় নীত হইয়াছিল। একটি মারা গিয়াছে। এখানে সেই অদ্ভুত জানোয়ারের ছবি দেওয়া হইল।



কমোডো দ্বীপের অদ্ভুত জানোয়ার

—

প্যারাস্যুট ক্যামেরা—

জিমি ক্লার্ক নামক এক ব্যক্তি এক ধরণের ক্যামেরা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আকাশপোত হইতে প্যারাস্যুট যোগে অবতরণকালে ইহার সাহায্যে পৃথিবীর চলচ্চিত্র লওয়া যায়, ক্যামেরাটি বুকের উপর



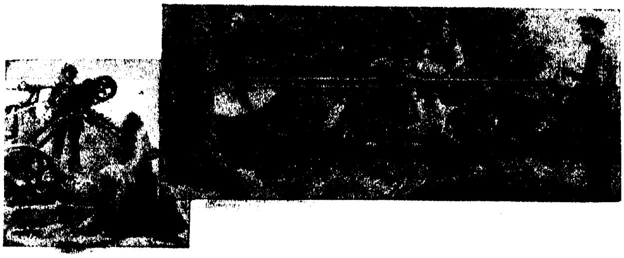
প্যারাস্যুট-ক্যামেরা

আঁটিয়া বাঁধা হয় ও এক হাতের সাহায্যে ছবি লওয়া যায়, ২৫০০ ফুট উপর হইতেও ইহাতে ছবি তোলা যায়।

—

এক ঢিলে দুই পাখী—

যন্ত্র লাঙ্গল (Tractor) দিয়া অতিসহজেই জমি চাষ করা যায়। যতই অনুর্ব্বর জমি হউক না কেন, যন্ত্রের মুখে কোনো বাধাই টিকে না। কিন্তু এতাবৎ কাল এই ট্র্যাক্টরের সাহায্যে কেবল মাটিই ভাঙ্গা হইত। সম্প্রতি ইহার সহিত একটি গোল করাত যন্ত্রসাহায্যে যুক্ত করিয়া দিয়া মাটি চষা ও গাছকাটা একসঙ্গে চলিতেছে। এই করাতটি



করাতযুক্ত ট্র্যাক্টর বা যন্ত্র লাঙল

সোজা, বাঁকা লম্বালম্বি যে-ভাবে ইচ্ছা চালানো যায়। এখানে করাত-যুক্ত লাঙ্গলের একটি ছবি দেওয়া হইল, পাশে করাতের সাহায্যে কর্ত্তিত গাছকে লম্বালম্বি ভাবে কি ভাবে কাটা হইতেছে তাহাও দেখান হইয়াছে।

—

মোটর-সাইকেল-নৌকায় পৃথিবী ভ্রমণ—

লণ্ডনের একজন যন্ত্রবিদ্ একটি মোটর-সাইকেল-নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি ইহার সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবেন। এই সাইকেলটি এমন মজবুত হইয়াছে যে, তিনি জলপথে বিশেষ



মোটরসাইকেল নৌকা

বিপদের আশঙ্কা করেন না। নৌকার ভিতরে খাদ্য পানীয় ইত্যাদি রাখিবারও ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজন হইলে হাঙ্গর কুমীর হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নৌকাটিকে আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলা যায়।

—

মায়া-সভ্যতা—

আমরা ইতিপূর্ব্বে এই বিভাগে মায়াসভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি ও মেক্সিকোর য়ুকাটান প্রদেশে আবিষ্কৃত এক নগরীর ধ্বংসাবশেষের কয়েকটি ছবি প্রকাশ করিয়াছি। এই মায়াসভ্যতা যে কত প্রাচীন তাহা আজিও ঠিক মত নির্দ্ধারিত হয় নাই, তবে মায়ানগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত সূর্য্যঘড়ি এবং প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি দেখিয়া মনে হয় যে, তখন লোকে সভ্যতার ও জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। মিশরের পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি হইতে এগুলি কোনো অংশেই হীন নহে। সম্প্রতি মায়া নগরীর পুরাতন ধ্বংসাবশেষ সংস্কার করিয়া এক নূতন নগরী পত্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই নগরীর আধুনিক নাম চিচেন-ইট্জা। অতীত যুগের জ্ঞান-গরিমা ও শিল্পকলার সাক্ষ্যস্বরূপ আবিষ্কৃত স্তূপ ও মূর্ত্তি ইত্যাদির সংস্কার সুরু হইয়া গিয়াছে। আমরা এখানে ধ্বংসের মধ্যে প্রাপ্ত দুইটি মূর্ত্তি

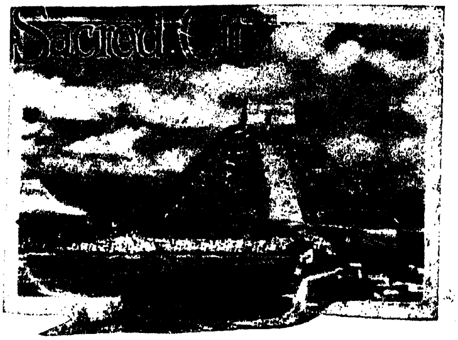


অজ্ঞাত দেবতার মূর্ত্তি

ও পিরামিডের উপরে বলি-মন্দিরের ছবি দিলাম। প্রথমটি নাগদেবতার মুখ। ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয়, এই মূর্ত্তির খুব বেশী প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ প্রায় প্রত্যেক গৃহেই একটি করিয়া এই মুখ প্রতিষ্ঠিত থাকিত। দ্বিতীয় প্রস্তর-মূর্ত্তিটি কোন্ দেবতার ছবি তাহা বুঝা যায় নাই। তবে এই মূর্ত্তির নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সন্দেহ করিতেছেন যে, এই ধরণের ভাস্কর্য্য সম্ভবতঃ সমুদ্র-পার হইতে আমদানি। কেহ কেহ বলেন, ইহা মিসর হইতে নীত হইয়াছিল। কাহারও মতে ভারতবর্ষের সহিত ইহার যোগ আছে।



নাগদেবতার মুখ



বলিমন্দির

বলি-মন্দিরটি কালের কোপ হইতে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করিয়াছে। পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মায়া রাজত্বে সুন্দরী কুমারীদিগকে জলদেবতার কাছে বলি দেওয়া হইত। নগরের লোক এই মন্দিরের উপর সমবেত হইয়া দেবতার পূজা অর্চনাদি করিয়া সমারোহ সহকারে উপর হইতে নীচের হ্রদে বলিকে ফেলিয়া দিত।

বর্ষশেষ

শ্রী চন্দ্রবিনোদ দাস

(১)

যেথা লক্ষ বর্ষমালা বিশ্ব ছাপি' চির স্রোত রূপে
চলিয়াছে কেবল চলিতে,—স্মরণের গন্ধধূপে
স্পর্শমাত্র করি' 'বর্ত্তমান'-ক্ষীণবিন্দু, দূরে দূরে
শুধু দূরে,—হে অজস্র পল-দল! শেষদলে পূরে
সেথা তব অভিযান। ফুটে উঠা হ'ল সম্পূরণ,
—বেলাতটে ঝরি' পড়। ঊর্ম্মি দেয় প্রথম চুম্বন।

(২)

জীবন অমর-পুরে মোরে ঘেরি' গেল নৃত্য করি'
তোমার পলের কক্ষে লক্ষ লক্ষ স্বপ্নের অপ্সরী;
তাদের সার্থক ওষ্ঠে আশা-তৃপ্ত প্রেমের লালিমা
প্রতিবিম্ব রচি' গেল, তব দলে রক্তিম গরিমা
ভাসে তাই; তাদের নিরাশা-হত অতৃপ্তি নিশ্বাসি'
সন্তাপে জ্বালায়ে দিল, শ্বেত পাণ্ডুদলে তা প্রকাশি'।

(৩)

আনন্দের গন্ধস্নান, বিষাদের ধূম্রদাহ লয়ে,
হে পূর্ণ বরষ-পুষ্প, বাসনার প্রেতমূর্ত্তি বয়ে
চলিয়াছ তুমি; প্রাপ্তির কাকলি-ধ্বনি কর্ণে আসে
এখনও এই পার্শ্ব-কক্ষ হতে; ছবি চোখে ভাসে
ব্যথামৌন অপ্রাপ্তির মুহূর্ত্তের আগে শুধু দেখা;
সমাপ্ত তথাপি, তব, জীবনের শেষ গণ্ডী-রেখা।

(৪)

চলিয়াছ তুমি,—কোথা? সেথা কি গো শাশ্বত কল্যাণ
সর্ব্বদৈন্য কণ্ঠে শুষি' নীলকণ্ঠ,—করিছে ধেয়ান।
অপূর্ণ! ম্লানিমাহীন তারি স্পর্শে পূর্ণ হ'য়ে ফুটি'
আনন্দের চিরগন্ধে পাদপদ্ম-প্রান্তে যাবে লুটি,
ধ্যান-স্থাণু-শ্রীচরণ-স্পর্শ-সুখে ধরি' বক্ষ-ডালা
লক্ষ লক্ষ বর্ষসনে সৃষ্টি করি' অমৃতের মালা।

(৫)

চলিয়াছ প্রেতলোকে? সেথা শুধু সংহার-উল্লাস,
ধ্বংসের অনন্ত ধূলি মসীপূর্ণ করিছে আকাশ,
ভৈরবের রুদ্রনৃত্যে দিকে দিকে বহ্নি উঠে জ্ব'লে,
আনন্দ-নৈরাশ্য-রাশি ভস্ম-কণা তব পদতলে।
সংহারের নৃত্য-ছন্দে তুমি কিগো নটরাজ রূপে
মৃত্যু মাঝে দেখাইবে ভূতিবেশে অনন্ত-স্বরূপে?

দেশ-বিদেশের কথা

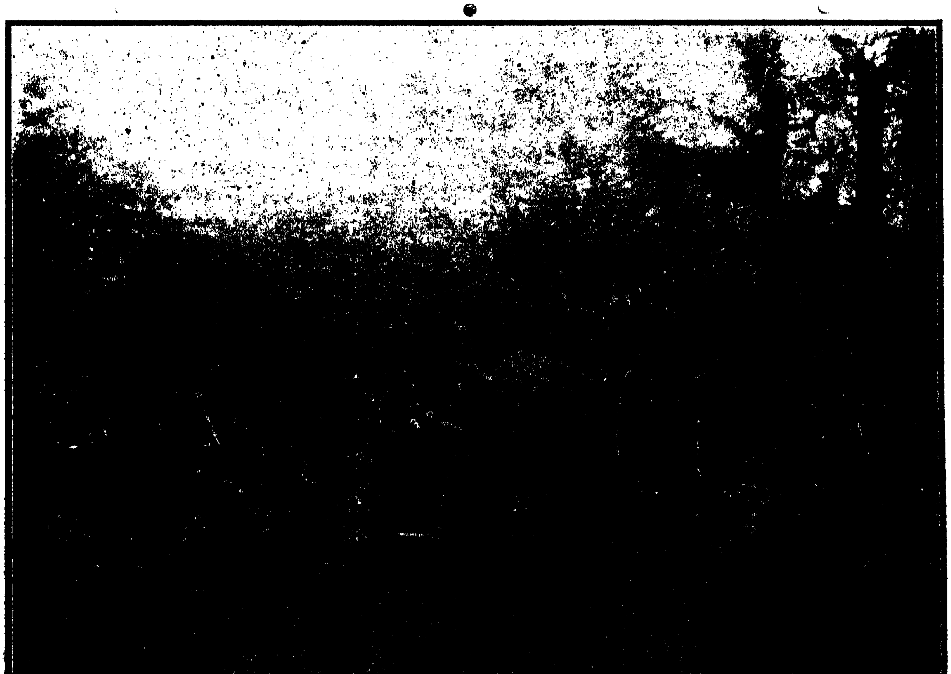
ভারতবর্ষ

দিল্লীতে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর ও ফাল্গুনীর অভিনয়—

দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন গত অধিবেশন উপলক্ষে যে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর ও ফাল্গুনীর অভিনয় হইয়াছিল। আমরা গত বৎসর মাঘ মাসের প্রবাসীতে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যে-সব বালকবালিকা অভিনয় করিয়াছিল, তাহাদের কতকগুলি ভাল ফোটোগ্রাফ আমরা পাইয়াছি। আগে একটি ছাপিয়াছিলাম ; এ মাসেও একটি মুদ্রিত করিলাম। এগুলি দেখিয়া অনুমান হয়, যে, অভিনয় ভালই হইয়াছিল। ফোটোগ্রাফারের দক্ষতাও প্রশংসনীয়।

সেনা-বিভাগে ভারতীয়ের নিয়োগ—

সেনা-বিভাগে অধিক সংখ্যক ভারতীয়ের নিয়োগ ও ভারতে সামরিক বিদ্যালয় স্থাপনার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্ম বিলাতের জেনারেল স্কীনের সভাপতিত্বে এক তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল। কমিটিতে মিঃ জিন্না, স্যার ফিরোজ সেথনা, মেজর জারোয়ার সিংহ, মিঃ রামচন্দ্র রাও, মেজর ডাফলে এই কয়জন ভারতীয় ছিলেন। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে ভারতীয় সেনা-বিভাগে ভারতীয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির পরিবর্তনের সুপারিস করিয়াছেন। কমিটির মতে রাজকীয় কমিসনের (King's Commission) জন্ম ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ করার বর্ত্তমান ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়াছে। সেনা-



"ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।"—দিল্লীতে ফাল্গুনী

বিভাগে ভারতবাসীদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাজ এপর্য্যন্ত মোটেই দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় নাই। ইহার নানা কারণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কমিটি বলেন—৮টি সেনাদলকে সম্পূর্ণ ভারতীয় করিয়া সেনাবিভাগে ভারতবাসীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাবনা হইয়াছে উহা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। ঐরূপ প্রস্তাবনা লইয়া কার্য্য করিতে গেলে শুধু যে তাহা শাসনের নানা বিভাগে ইংরেজ এবং ভারতবাসীদের সহযোগিতা-নীতির বিরোধী হইবে ইহাই নহে, সেনানী পদে যেসব ভারতবাসী নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে তাঁহাদের প্রতি উহাতে অবিচার করা হইবে। এখনই তাঁহাদিগকে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে কাজ করিতে হয়। ঐ প্রস্তাব বাতিল করিয়া সেনা বিভাগের উচ্চ পদে ভারতবাসীদের নিয়োগের সুবিধা বিশেষরূপে প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে। সেনাবিভাগে ভারতবাসীদের প্রাধান্য-দানের কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ঐরূপ বিস্তৃতভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

কমিটি এজন্য একটি প্রস্তাবনা উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সেনাবিভাগে যে-সব উচ্চপদ খালি থাকে, তন্মধ্যে ১০টি পদ বর্ত্তমানে যেন ভারতবাসীকে দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালে ঐ সংখ্যা দ্বিগুণ করা হউক এবং ১৯৩৩ সালে ভারতে ভারতীয় স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ৪টি করিয়া নিয়োগ বৃদ্ধি করা হউক। কমিটি এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, সেনাবিভাগের সকল পদই ভারতবাসীদের জন্য উন্মুক্ত করা হউক। তাঁহারা যে-প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য হইলে ১৯৫২ সালে ভারতীয় সেনাবিভাগের মোট পদের অর্দ্ধেক ভারতবাসী নিযুক্ত হইবে।

এই বিষয়ে কমিটির সদস্যবর্গের মধ্যে মতের মিল হয় নাই। মিঃ জিন্না, মিঃ রামচন্দ্র রাও এবং মেজর জারোয়ার সিং বলেন, ১৫ বৎসরের মধ্যে সেনাবিভাগের শতকরা ৬০টি পদে ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করা উচিত। স্যর ফিরোজ সেথনা এবং মেজর ডাফলে ২০ বৎসরে ঐ সংখ্যায় পৌঁছিতে চাহেন। শতকরা ৫০টি পদ ভারতবাসীর নিযুক্ত হইলে সেনানীপদে ভারতবাসী এবং ইংরেজ নিয়োগের অনুপাত কিরূপ হইবে কমিটি তৎসম্বন্ধে কোন সুপারিশ করেন নাই। সামরিক যোগ্যতা বজায় রাখিবার জন্য ভারতীয় সেনাদলে ইংরেজ সেনা রাখার আবশ্যকতা কমিটি স্বীকার করিয়াছে।

ভ্রাম্যমাণ সংবাদপত্রসেবী—

নেদিলকো নেকোভিচ নামক একজন সংবাদপত্রসেবী এবং ছাত্র মাদ্রাজে আগমন করিয়াছেন। ইনি সার্ভিয়ার অধিবাসী। দুই বৎসরকাল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া তিনি প্রায় ২৭০০০ মাইল স্থান অতিক্রম করিয়াছেন। প্রকাশ যে, এই সময়ের মধ্যে তিনি ২৫টি দেশ পরিদর্শন করিয়াছেন। মাদ্রাজ হইতে তিনি কলম্বো যাইবেন এবং তথা হইতে চীন ও জাপান অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

কাশী হিন্দু মহিলাশ্রম—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা বিনোদিনী দেবী নাম্নী একজন বঙ্গ-বিধবা দুইজন মাত্র সহকর্ম্মিণী লইয়া এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্তা প্রতিরূপা দেবী (৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী) এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি-কল্পে আত্মনিয়োগ করেন ও বহু অর্থ ব্যয় করেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য 'যাহাতে সহায়সম্বলবিহীন নারী বাহিরের সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে সযত্নে রক্ষিতা হইয়া সনাতন নীতি ও সেবা-ধর্ম্মে শিক্ষিতা হয়েন ও যাহাতে নানা প্রকার শিল্প-কার্য্য শিক্ষা করিয়া স্বাবলম্বিনী হইতে পারেন।" আশ্রমের কর্ম্মিগণ এ উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। আমরা আশ্রমের চতুর্থ বার্ষিক বিবরণী পাইয়াছি। তাহা পাঠ করিয়া আশ্রমের কার্য্যের প্রশংসা করিতেছি।

—

বাংলা

বাঙ্গলার জেলা-বোর্ড—

বাঙ্গলার জেলাবোর্ড-সমূহের ১৯২৫-২৬ সনের যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ—

আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি নূতন ইউনিয়ন্ বোর্ড সৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর উহাদের সংখ্যা ছিল ১৫০০ শত; কিন্তু আলোচ্য বর্ষে উহাদের সংখ্যা হইয়াছে ২২১৭। বিশেষভাবে ময়মনসিংহ, নদীয়া এবং চট্টগ্রাম জেলাতেই ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ড-সমূহ দলাদলির জন্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করেন, এই প্রতিষ্ঠানসমূহে আত্মনির্ভরতার ভাব বেশ সজীব আছে।

জেলা বোর্ডসমূহের ১ কোটী ৩৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল এবং খরচ হইয়াছে ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা।

সমগ্র প্রেসিডেন্সিতে বাৎসরিক লোক পিছু ২ আনা ৯ পাই কর ধার্য্য ছিল। কোনও কোনও জেলায় ১ আনা ৭ পাই হইতে ৮ আনা ১১ পাই পর্য্যন্ত করের তারতম্য হইয়াছিল।

শিক্ষা ব্যাপারে খরচ ৫৭ হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে সরকার ১৮ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। জেলা বোর্ডের সাহায্যে পরিচালিত উচ্চ ও নিম্নপ্রাথমিক স্কুলসমূহের সংখ্যা ৪১৪৯০ হইতে ৪১৯৯৮এ দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে বালক-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩১৪৯৩ ও বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৫০৫। এইসমস্ত স্কুলে ছাত্রীদের সংখ্যা ১৭৪৫৭টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে সাঁওতালদিগকে শিক্ষাদানের জন্য একটি নূতন বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

চিকিৎসক ও জনসাধারণের স্বাস্থ্য-বিভাগে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই বৎসরে ২০টি নূতন ডিস্পেন্সারী খোলা হইয়াছে। জেলাবোর্ডের অধীন ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা ৪৮৫ এবং সাহায্যপ্রাপ্ত ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা ৩১৯।

জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে—যেমন জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, যানবাহনাদি ইত্যাদিতে খরচ ৪৩০০০ হাজার হইতে বাড়িয়া ৬৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত প্রদেশ হইতেই এইরূপ অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে যে, মোটর ও বাস চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় রস্তাসমূহ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং জেলাবোর্ডসমূহ উহাদের রক্ষার জন্য টাকার সংস্থান করিতে পারিতেছেন না।

জল সরবরাহের খরচ ৯ লক্ষ ৯০ হাজার হইতে কমিয়া ৯ লক্ষ ১০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। মেদিনীপুর, হুগলী এবং হাওড়ার জেলাবোর্ডগুলি জল সরবরাহের জন্য যথেষ্ট টাকা খরচ করিয়াছেন। মফঃস্বলে জল সরবরাহ বিষয়ে নলকূপ সমূহ যথোপযুক্ত হইলেও বর্ত্তমানে এইগুলি সম্পর্কে কয়েকটি অসুবিধা দেখা দিয়াছে। এই বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের মতে বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুসারে জল সরবরাহের সমস্যা পূর্ণ হইতে পারে না।

আলোচ্যবর্ষে খরচাদি দিয়া বোর্ড সমূহের হাতে ২১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আছে পূর্ব্ববৎসর ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল।



রায়পুরে লর্ড সিংহ এবং তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ

রায়পুরে লর্ড সিংহের কার্য্য—

বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে লর্ড সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাঁহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনের সহযোগে তিনি তাঁহার গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে বৃত্তি শিক্ষাদানের অঙ্গস্বরূপ কৃষি এবং কুটীরশিল্প শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যেখানে বাঁধাকপির চাষ হইতেছিল, সেই ক্ষেতটি তিনি দেখিয়া বালকদের কাজের সফলতায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রদত্ত পুস্তকাবলীর সাহায্যে রায়পুর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের অধিবাসীদের ব্যবহারার্থ একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। তাহা হইতে গ্রামবাসীরা পড়িবার জন্য বহি বাড়ী লইয়া যাইতে পারেন। তাঁহার ব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকলের দরিদ্র রোগীরা এই চিকিৎসালয় হইতে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ পাইয়া থাকেন। তিনি অন্যান্য প্রকারেও নিজ গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক অর্থব্যয় করিয়াছেন। গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করিলে তিনি নিশ্চয়ই আরও অর্থ ব্যয় করিতেন।

গত জানুয়ারী মাসে তিনি রায়পুর গিয়াছিলেন। স্থানীয় যে-সকল বৃদ্ধ কৃষক বাল্যকালে তাঁহার খেলার সাথী ছিলেন, তাঁহাদের ও অন্যান্য কৃষকদের সঙ্গে কথোপকথনে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ—

গত মাসে বিপুল আড়ম্বরের সহিত যাদবপুরস্থিত কলেজ প্রাঙ্গণে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে।

সভায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সাহায্যে কার্য্যকরী শিক্ষার প্রসার করাই বর্ত্তমানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে এপর্য্যন্ত এই ইনষ্টিটিউটে তিনটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। যথা :—মিকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এতদ্ভিন্ন একটি কৃষি-বিভাগ খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। এইজন্য একশত বিঘা জমি চাই। কলিকাতা কর্পোরেশন এবং ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের নিকট এইজন্য আবেদন করা হইয়াছে।

আচার্য্য রায় ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"স্থায়ী আয়ের জন্য তোমরা বড় ব্যস্ত। একটি চাকুরী পাইলেই তোমরা বাঁচিয়া যাও। ইহা তোমাদের ভুল ধারণা। যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, নিজে নিজে ব্যবসায় করিতে শিখ। সেইজন্যই তো এখানে তোমাদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। চাকুরী খুঁজিতে গিয়া তোমরা এই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া থাক। তোমরা বলিবে মূলধন কোথায়? আমার মনে হয়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও একাগ্রতা থাকিলে মূলধনের অভাব হয় না। মনে রাখিবে—এই দুইটি গুণই জীবনে সাফল্যলাভের সোপান।"

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—

ত্রিপুরা জেলার অন্তঃর্গত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার সাবডিভিসনে বিরামপুর গ্রামে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রায় সাহেব সরোজিনী বর্দ্ধন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০খৃষ্টাব্দে তিনি সিটী কলেজ হইতে বি-এ, পাশ করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল্-এম্-এস্. উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সরকারী চাকরী লইয়া সিঙ্গাপুরে গমন করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড গমন করিয়া D. P. H. এবং D. T. M পরীক্ষা দিয়া মালাক্কার ডেপুটী প্যাথলজিষ্টের পদে নিযুক্ত হন। তিনি সিঙ্গাপুরে "আর্য্যসঙ্ঘ" সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। মহাসমরের সময় উত্তর ভারত রেডক্রস্ ফণ্ডের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রায়সাহেব' উপাধি পাইয়াছিলেন। প্রবাসে তিনি সকলের উপদেষ্টা ও অভিভাবকের মত ছিলেন. তিনি সততা, অমায়িকতা, দানশীলতা ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী ছিলেন। বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী কার্ব্বঙ্কল রোগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার উর্দ্ধতন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। চীন, জাপান, ও অন্যান্য দেশীয় বহুলোক

তাঁহার শবানুগমন করিয়াছিল। প্রকাশ, একটি ইংরেজ যুবক দাহকার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত শ্মশানে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

অনুন্নত হিন্দু সম্মিলনী—

গত মাসে ময়মনসিংহ জেলার আটপাড়া থানার অধীন খিলাপাড়া গ্রামে অনুন্নত ও জল অনাচরণীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় দুই সহস্রাধিক লোক যোগদান করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের জনৈক প্রচারক "ছায়াচিত্রে"র সাহায্যে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু জাতির বর্ত্তমান অবস্থা, অস্পৃশ্যতা ও বাল-বিধবার পরিণাম প্রভৃতির বিষয় অতি মর্ম্মস্পর্শী ও জলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা সকলকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। সভায় অনুন্নত ও জল অনাচরণীয় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সভায় নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব বিশেষভাবে আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে।

(১) জল অনাচরণীয় নমঃশূদ্র প্রভৃতিকে অতি সত্বর জলচল করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা।

(২) হিন্দু সমাজ মধ্যে বাল-বিধবার বিবাহ প্রচলন না থাকায় হিন্দু সমাজ কলঙ্কের ও ধ্বংসের পথে চলায় অনতিবিলম্বে বাল-বিধবার বিবাহের প্রচলন করা।

(৩) গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ইত্যাদি স্থাপনপূর্ব্বক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

বাঁকুড়ার অভয় আশ্রম :—

বাঁকুড়া অভয় আশ্রমের মাসিক বিবরণীতে প্রকাশ—এই জেলার বিভিন্নস্থানে ছায়াচিত্র সংযোগে সজোরে প্রচার কার্য্য চলিতেছে। বাঁকুড়া অভয় আশ্রম পল্লীতে ভারতের অতীত সম্পদ, পরাধীনতার সহিত আনুষঙ্গিক নৈতিক অবনতি, বিলাসপ্রিয়তা ও আনুষঙ্গিক দারিদ্র্য, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা, দেশ সেবার বাণী পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি জনৈক কর্ম্মী কামারপাড়া ও শিখরিপাড়া এই দুইটি স্থানে যথাক্রমে ছায়াচিত্র-সংযোগে বক্তৃতা দেন। এবং অপর একজন কর্ম্মী বেলবনী গ্রামে খদ্দর আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি বিশদ বক্তৃতা করেন। দেশীয় বস্ত্রশিল্প কি প্রকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তিনি তাহা বিবৃত করেন ও খদ্দরের বহুল প্রচার ও উৎপাদন কি প্রকারে দেশের বহুমুখী উন্নতি হয় তাহা বুঝাইয়া দেন। এই গ্রামে অভয় আশ্রমের একটি উৎপাদন কেন্দ্র আছে। কর্ম্মীরা স্থানে স্থানে ব্যায়ামাগার, গ্রন্থাগার ও পাঠভবন স্থাপন করিয়াছেন। রোগ শুশ্রূষা, অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ডে সাহায্য ইত্যাদি সেবা-কার্য্য করিয়াছেন।

বঙ্গনারীর বীরত্ব—

হুগলীতে একটি বৃদ্ধা জলে ডুবিয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল। তখন প্রমোদাসুন্দরী দাসী নামে একটি স্ত্রীলোক নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া তাহার উদ্ধার করে। এই বীরত্বের জন্য হুগলীর মহিলা সমিতি প্রমোদাকে একখানি পদক উপহার দিয়াছেন।

খড়্গ বাহাদুর ও শশীমোহন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্র খড়্গ বাহাদুর নামক একজন নেপালী যুবক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী হিরালাল আগরওয়ালাকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া হাইকোর্টের বিচারে আট বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ যে উক্ত মাড়োয়ারী খড়্গবাহাদুরের আত্মীয়া রাজকুমারী নামক একজন নেপালী যুবতীকে নেপাল হইতে অসদুদ্দেশ্যে কলিকাতায় আনিয়াছিল ও তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল। খড়্গ বাহাদুর রাজকুমারীর অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া হিরালালকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে আঘাত করে, ফলে তাহার মৃত্যু হয়। নিজ ভগ্নীর সতীত্বনাশকারী অত্যাচারীর শাস্তি বিধান করিতে গিয়া এই বীর যুবক আইনের চক্ষে অপরাধী হইয়াছে। দেশের নানাস্থান হইতে —ইংরেজ, ভারতবাসী, হিন্দু, মুসলমান নির্ব্বিশেষে—এই কঠোর শাস্তির তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। কতিপয় সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মহিলা বাঙ্গলার শাসন-পরিষদের সদস্য মিঃ মোবার্লির নিকট খড়্গ বাহাদুরের দণ্ড মকুবের প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রকাশ যে, এবিষয় এখন সরকারের বিচারাধীন।

এ দিকে শ্রীহট্টের জনশক্তিতে প্রকাশ—করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ইছামতি বাখা নিবাসী ফৈরাজ আলী নামক একটি লোকের মৃতদেহ ৫ই ফাল্গুন তারিখে এক মাঠের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, এই লোকটি নাকি অতিশয় বদমায়েস ছিল। পুলিশ তদন্তক্রমে উক্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী রঘুরচক্ গ্রামের শশীভূষণ দে ও তিন জন পাটনী জাতীয় লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উক্ত শশী ভদ্রলোকের ছেলে, তাহার বয়স ১৭ বৎসর হইবে। পুলিশের নিকট সে অম্লান বদনে স্বীকার করিয়াছে—"আমি এই অঞ্চলের মাতৃজাতির সতীত্ব নাশকারী শত্রুকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছি। এই লোকটি অধিক বলশালী ছিল, একা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার শক্তি আমার নাই ভাবিয়া উক্ত তিন জন পাটনীকে সাহায্যের জন্য সঙ্গে রাখিয়াছিলাম মাত্র। তাহাদের কোন অপরাধ নাই।"

বঙ্গে বিধবা-বিবাহ—

রাজবাড়ী আর্য্যমঙ্গল সমিতির চেষ্টায় গত ২৬শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার পাবনা জেলার অন্তর্গত সাতআনি নিবাসী শ্রীবনমালী পালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদ্বীপচন্দ্র পালের সহিত ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কবিরপুর গ্রাম নিবাসী মৃত রাইচরণ পালের বিধবা কন্যা শ্রীমতী নীরদাবালা দাসীর শুভবিবাহ যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ-সভায় প্রায় ৫।৬ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।—সুরাজ (পাবনা)

মাটিকাটা কৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীমাণিক মালর পুত্র শ্রীমান্ সুমন্ত মালর সহিত ভাওগাবাড়ী (সিরাজগঞ্জ) নিবাসী শ্রীচন্দ্রনাথ মালর বিধবা কন্যা শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দাসীর বিবাহ উক্ত মাটিকাটা গ্রামে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে।

জগৎকুড়া নিবাসী শ্রীমোহান্ত মালর পুত্রের সহিত সোনামই নিবাসী শ্রীকিনু মালর বিধবা কন্যার বিবাহ সোনামই গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৮শে ফাল্গুন তারিখে শুয়া-দাইর সাকিনের মৃত শিবনাথ মালর বিধবা কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দাস্যা মালর বিবাহ কৃষ্ণপুর সাকিনের মাণিকচন্দ্র মালর পুত্র শ্রীমান মহরচাঁদ মালর সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ৩০ বৎসর ও বিধবা কন্যার বয়স ১৬ বৎসর।

খামুরবাড়ী নিবাসী ধনী মহাজন শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ সরকার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশজাত এবং তিনি কার্য্যোপলক্ষে শিলংনাতেই অবস্থান করেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিধবা-বিবাহের জন্য কেহ তাহার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইলে তিনি ঐ টাকার কোন সুদ নিবেন না এবং তিনি এই ভাবে কয়েক জনকে টাকা ধার দিয়া বিধবা-বিবাহের সাহায্য

করিয়াছেন। এইরূপে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী মাসদের মধ্যে বিধবা-বিবাহে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। —টাঙ্গাইল হিতৈষী

বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ সঙ্ঘ—

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের উন্নতি সাধন ও তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশা নিবারণ উদ্দেশ্যে বঙ্গের বিভিন্ন জাতি-সমূহের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ সংগঠিত হইয়াছে। এক্ষণে সঙ্ঘ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। (১) বিবাহের পণপ্রথার উচ্ছেদ। (২) বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন। (৩) দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান। (৪) সর্ব্ববিধ শিক্ষার বিস্তার। (৫) স্বাস্থ্যের উন্নতি। (৬) ধর্ম্মভাব প্রসার। (৭) আর্ত্তসেবা ও বিপন্নের উদ্ধার। (৮) মামলা-মকর্দ্দমায় হ্রাস।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রী পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রী গণনাথ সেন, শ্রী চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রী আশুতোষ শাস্ত্রী, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা হৃষীকেশ লাহা, শ্রী যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রী হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত প্রভৃতি কার্য্য পরিচালনায় ভার লইয়াছেন।

কলিকাতায় মহিলা শিল্প প্রদর্শনী—

গত মাসে নারী-শিক্ষা-সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় এক মহিলা শিল্প প্রদর্শনী হয়। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনী তিন দিন খোলা ছিল। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, হাওড়া, হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে সুন্দর সুন্দর শিল্পদ্রব্য আসিয়াছিল। তিন দিনে প্রায় দুই হাজার দর্শক এই প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। প্রদর্শনীতে জন-সমাগম এত বেশী হইয়াছিল যে, দুই দিন সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা রাখিতে হইয়াছিল।

বহুবিধ পণ্যসম্ভারে প্রদর্শনী-ক্ষেত্র রীতিমত একটি মেলায় পরিণত হইয়াছিল।

কলিকাতায় উদ্ধারাশ্রম প্রতিষ্ঠা—

গত মাসে কলিকাতায় মেয়রের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সহরের অসৎ স্থান হইতে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকাদিগকে উদ্ধার করিয়া আশ্রয় দান করিবার জন্য একটি তহবিল খুলিবার ও উক্ত তহবিলের টাকা ব্যয় করিবার জন্য একটি কমিটী গঠন করার বিষয় সভায় আলোচনা করা হয়। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় ও মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মেয়র ও গবর্ণরের মধ্যে যে চিঠিপত্র চলিয়াছিল তাহা মেয়র সভায় পাঠ করেন। কলিকাতার বিশপের লিখিত চিঠিও পঠিত হয়। কিছুকাল আলোচনার পর সাব্যস্ত হয় যে, ঐ তহবিল উঠাইবার ও ব্যয় করিবার জন্য ১৫ জন লোককে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। মেয়র নিজ ইচ্ছানুযায়ী ঐ কমিটি নিযুক্ত করিবেন, ঐ কমিটির আবার সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার থাকিবে। ফণ্ডের পক্ষ হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষকে অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে এবং সংবাদপত্রগুলিকে ফণ্ডের আবেদন ও দাতা-গণের নাম ছাপাইতে অনুরোধ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে কর্পোরেশনের সেক্রেটারীই কমিটির সেক্রেটারী থাকিবেন। বঙ্গের গবর্ণর এই তহবিলে এক হাজার টাকা দিয়াছেন।

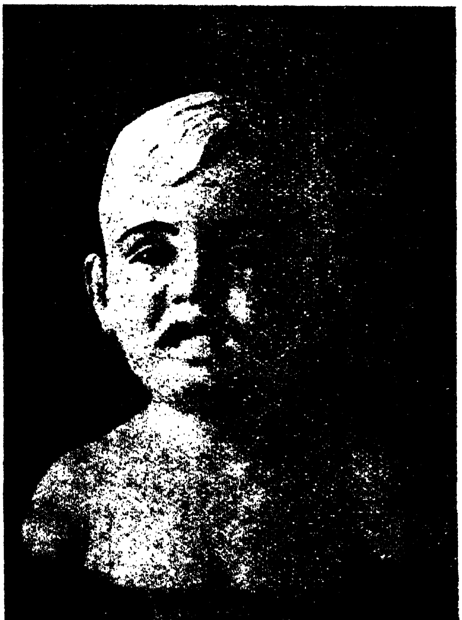
দান—

চকলের রাজা কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের সাধারণ ভাণ্ডারে এক লক্ষ টাকা এবং গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত নাগপুর থানার এলাকাস্থ সুদামপাড়া নিবাসী ডাঃ সামছউদ্দিন সাহেব তাঁহার পিতা সুবিখ্যাত গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক মৌলবী আবদুল কাদের সাহেবের নামে একটি জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপন উদ্দেশ্যে উক্ত সুদামপাড়া গ্রামস্থ তাঁহার আনুমানিক ১০০০০৲ দশ হাজার টাকার সম্পত্তি ও একটি বাগান বাটী দান করিয়াছেন। স্থানীয় মুসলমানগণ, উক্ত দানে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু টাকা চাঁদা দিয়া এই শিক্ষা-অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ডাক্তার সাহেব ইহা ভিন্ন পূর্ব্বে অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

বিলাত-প্রবাসী বাঙ্গালী ভাস্কর—

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বর্ম্মন রায় মৈমনসিংহের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তিনি দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া ভাস্কর্য্য শিখিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গিয়াছেন; এখনও সেই সংগ্রাম চলিতেছে। তিনি ব্রাডফোর্ডে আট বৎসর কাজ করিতেছেন। কোন কোন বিলাতী কাগজে তাঁহার নির্ম্মিত মূর্ত্তির ফোটোগ্রাফ বাহির হইয়াছে। আমরাও তাঁহার একটি মূর্ত্তির ছবি দিলাম। তিনি কৃতী হইলে সুখী হইব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি দিয়া সাহায্য করিতে পারেন।



একটি শিশুর মূর্ত্তি
[ভাস্কর বর্ম্মন রায়ের নির্ম্মিত]



ভাস্কর অশ্বিনীকুমার বর্দ্ধন রায়



ডাক্তার এস্ সি রায়

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপ্রদর্শনী ট্রেন—

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রদর্শনী ট্রেন এক মাস সফরের পর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এই প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ট্রেনখানি ব্রড্‌গেজের ত্রিশটি ষ্টেশনে গিয়াছিল। প্রত্যেক ষ্টেশনেই বহু দর্শক সমবেত হইয়া বক্তৃতা শুনিয়াছে এবং ছায়াচিত্র দেখিয়াছে। কৃষকদের কল্পনাশক্তি জাগ্রত করা এবং স্বীয় অবস্থার উন্নতির প্রতি অবহিত করাই এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অপরকে সাহায্য করার বাসনা জাগ্রত করাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। দুইটি উদ্দেশ্যই বিশেষ সফল হইয়াছে। এই প্রদর্শনী দর্শনে যে উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে তাহার ফলে অনেকেই গোচারণ ও পশু-চিকিৎসালয় স্থাপনকল্পে জমী এবং অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কৃষি, পশু-চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ব্যবহারিক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচার করা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের কো-অপারেটিভ বিভাগ যে সমস্ত হিতকর কার্য্য করিয়া থাকে তাহা প্রচার করা হইয়াছে। রেল কোম্পানী মনোরম স্থান-সমূহের যে চিত্রাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে লোকের মনে ঐ সমস্ত স্থান দর্শনের একটা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। এই দেশের স্থাপত্য বিদ্যা এবং শিল্প-নৈপুণ্যের প্রতিও লোকের একটা শ্রদ্ধা আসিয়াছে। ভারতবর্ষে এইরূপ প্রদর্শনী এই প্রথম। ইহার চেষ্টা বিশেষ সফল হইয়াছে এবং পল্লী-সংগঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

দুই জন কৃতী বাঙালী—

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র। ইনি পদার্থ-বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা করিয়া লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ডি-এস্‌সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রায় পালিত বিজ্ঞানমন্দির হইতে এম্-এস্‌সি পাস করেন এবং তথায় প্রায় দুই বৎসর ঘোষ-গবেষণা ছাত্ররূপে কাজ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইনি লণ্ডনে হুইটন লেবরেটরীতে (Wheastone Laboratory) কোমল রঞ্জনরশ্মি (Soft X-rays) ও আলোক বিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ (Photo-electricity) সম্বন্ধে মৌলিক পরীক্ষা সুরু করেন। ইনি রয়েল সোসাইটীতে তাপবিক্ষিপ্ত তড়িৎপ্রবাহ (Thermionics), আলোকবিক্ষিপ্ত তড়িৎপ্রবাহ (Photo-electricity) এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার (Chemical Re-activity) নিয়ম ও গুহ্যতত্ত্ব (Law and Mechanism) সম্বন্ধে অতি মূল্যবান্ মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। ডাক্তার রায়ের বিদ্যুৎপ্রবাহের থিওরি আমেরিকা ও জার্ম্মেনীর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কাগজে আলোচিত হইয়াছে। আলোকজাত রাসায়নিক ক্রিয়ার (Photo-Chemical Re-actions) রহস্য উদ্‌ঘাটন করার অভিলাষে গত বৎসর ফ্যারাডে সোসাইটী (Faraday Society) অক্সফোর্ডে, ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পদার্থবিৎ ও রাসায়নিকদের এক সভা আহ্বান করেন। ডাক্তার রায়ও এই সভাতে যোগদান করিবার জন্য আহূত হন। ডাক্তার রায়ের কৃতিত্ব সম্বন্ধে রয়েল সোসাইটীর য়ারো গবেষণাধ্যাপক প্রফেসর রিচার্ডসন ভারতের হাইকমিশনারের নিকট যে পত্র দিয়াছেন, তাহার অবিকল অনুবাদ এই,—"গত দুই বৎসর যাবৎ ডাঃ রায় আমার লেবরেটরীতে কাজ করছেন। কিন্তু এর পূর্ব্বেও আমি ডাঃ

রায়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহিত সুপরিচিত ছিলাম। এই তরুণ যুবকের ক্ষমতা অতি অদ্ভুত। পদার্থবিজ্ঞানে এঁর দৃষ্টি যেরূপ তীক্ষ্ণ, জ্ঞানও তেমনি বহুব্যাপ্ত। একাধারে এরূপ উচ্চদরের গণিতবিষয়ক ক্ষমতা, যান্ত্রিক নৈপুণ্য (experimental ability) এবং মৌলিকতার শুভ-সমাবেশ অতি বিরল। ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার পথে ইনি নিশ্চয়ই একজন মূল্যবান্ পথপ্রদর্শক হ'বেন।" ডাক্তার রায়ের বয়স এখন ২৭ বৎসর। সম্প্রতি ইনি ভারত সরকারের মেটিয়রলজিষ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জমশেদপুরে টাটার লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীর সহকারী চীফ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালা কলেজের একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯০৮ সালে বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেক্নিক্যাল ইন্স্‌টিটিউটের ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার লাইসেন্সিয়েট উপাধি লইয়া ১৯১০ সালে আমেরিকা যান, এবং সেখানে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে ১৯১৭ সালে তিনি মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন। দেশে থাকিতে জামালপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কারখানায় তিনি হাতে-হেতেড়ে যে কেজো শিক্ষা আরম্ভ করেন, কর্ণেলে শিখিবার সময়ও আমেরিকার নানা কারখানায় সেইরূপ শিক্ষা করিতে থাকেন; যথা ক্যাজেনোভিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানী, পেন্সিল্‌ভেনিয়া রেলওয়ে কোম্পানী, নিউইয়র্কের শেনেক্টাডীর জেনারাল ইলেক্ট্রিক কোম্পানী প্রভৃতির কারখানায়। ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত তিনি নিউইয়র্কের বিখ্যাত পেরিন মার্শ্যাল এণ্ড কোম্পানী এবং জে জি হোয়াইট এণ্ড কোম্পানীর এঞ্জিনীয়ারের কাজ করেন। ১৯২৬ সালের শেষ অংশে তিনি জমশেদপুর আসিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র বলিয়া এবং কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায় বসু মহাশয় আমেরিকার ও ইংলণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ারিং পরিষদ ও সমিতির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। আমেরিকায় তিনি শুধু কার্য্য-দক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন না; তাঁহার উচ্চ চরিত্রও তাঁহাকে প্রশংসাভাজন করিয়াছিল। তিনি যেখানে যেখানে কাজ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ব-বোধ তাঁহাকে আদরণীয় করিয়াছিল। নিউইয়র্কের প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট এবং অনেক আমেরিকানদের নিকটেও তিনি কর্ম্মিষ্ঠতা, সদাশয়তা এবং নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতার জন্য সুবিদিত ছিলেন।



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু

ভ্রম-সংশোধন

গত চৈত্রের প্রবাসীর 'ছাতনায় চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে কতকগুলি ছাপার ভুল হইয়াছে। 'স্তূপ' স্থানে 'স্তপ', 'বড়ু' স্থানে 'বড়', 'নান্নুর' স্থানে 'নান্নর' হইয়াছে। আর হইবে,

৭৭০ পৃষ্ঠা	২ পাটি		১১ পঙ্‌ক্তি	নান্নরের	নান্নুরের
৭৭২	২		২০	নান্নুর	নানূর
			২৮	নান্নর	নান্নুর
৭৭৪	১	টিপ	৫	১ সনেত্র	১, নেত্র
		,,	১৩	কমাগতি	বামাগতি
		,,	,,	এক বা কম	এক-কম
	২		১১	কাল	কোল
			;	শশূকর	শূকর
৭৭৫	১		৬	বাঁকুড়া (য়)	(বাঁকুড়ায়)
		টিপ	১১	আসীম	আদিম
	২	,,	৪	ছত্রী + ছাতনা	ছত্রী + না = ছাতনা
৭৭৬	১	,,	৫	গৃহে	গৃহের
				পাশে	নিকটে এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে
৭৮৫		ইটের ছাপ		২য়	১ম
৭৮৬		,,		১ম	২য়
৭৮৭		,,		১ম	২য়
৭৯১	২	টিপ	১	নান্নর হাট	নান্নুর হাট
			২	সুখোচর্ম্ম	সুখোচার্য্য
৭৯২	১		২	চণ্ডীদাস, ভক্তেরা	চণ্ডীদাস-ভক্তেরা



[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—সম্পাদক]

"অগ্রদানী" ও "আচার্য্য" ব্রাহ্মণ

শ্রীযুক্ত বিপিন-বাবু তাঁহার "বংশ ও গ্রাম পরিচয়" অংশে লিখিয়াছেন—

"আমাদের একজন 'ঘরস্থ' আচার্য্য বা গণক ছিলেন। ধোপা নাপিত যেমন তখনকার হিন্দুসমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল, গণকেরাও সেইরূপ প্রত্যেক গ্রামের গ্রাম্য জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিতেন। আমাদিগের অঞ্চলে ইঁহারা জ্যোতিষগণনা করিতেন, শ্রাদ্ধাদিতে অগ্রদান লইতেন।"

তাঁহার এই উক্তির মূলে দেখা যায়, আচার্য্য বা গণকই শ্রীহট্ট অঞ্চলে অগ্রদানগ্রাহী অগ্রদানী বা মহাপুরোহিত। কিন্তু তাঁহার এই ধারণা ভ্রমাত্মক।

"অগ্রদানী" ব্রাহ্মণ ও আচার্য্য ব্রাহ্মণ কখনও এক হইতে পারে না।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের শ্রাদ্ধাদিতে অগ্রদান-গ্রহণকারী ব্রাহ্মণকে অগ্রদানী বা মহাপুরোহিত বলিয়া থাকে।

এই অগ্রদানী পুরোহিত, আচার্য্য বা গণক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের গৃহে শ্রাদ্ধাদিতে পৌরোহিত্য করা অগ্রদানীর ব্যবসা এবং সূত্রধর বা 'সুতার' সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্য করাও আচার্য্য বা গণকের ব্যবসা। গ্রহগণনা ও শান্তি করেন বলিয়া গণকের অন্য নাম গ্রহাচার্য্য। উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণই শ্রীহট্টে বহু প্রাচীন কাল হইতে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাদের কাহারো কাহারো ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষেরও খবর পাওয়া যায়, কিন্তু ততদূর না গেলেও ৪।৫ পুরুষ যাবৎ এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিভিন্ন শ্রেণীর "যজমানের" পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত বিপিন-বাবুর জীবনের সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও যে শ্রীহট্ট অঞ্চলে অগ্রদানী পুরোহিত এবং আচার্য্য বা গণক দুইটি পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, ইহার প্রমাণ দেওয়া শক্ত নয়। বর্ত্তমানেও অপরাপর জিলার ন্যায় শ্রীহট্ট অঞ্চলে অগ্রদানী পুরোহিত এবং আচার্য্য বা গণক বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত।

বিপিন-বাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"এইরূপে গ্রহপূজা, জন্ম-পত্রিকা ও কোষ্ঠী গণনা এবং প্রতিমাদি নির্ম্মাণ আমাদের আচার্য্য বা গণকদিগের জাতি ব্যবসায় হইয়া উঠে। ক্রমে শ্রাদ্ধের অগ্রদান গ্রহণ করিয়া ইঁহারা পতিত হয়েন।"

সুতরাং বিপিন-বাবুর মতে 'অগ্রদান' গ্রহণ করিয়াই আচার্য্য বা গণকেরা (অর্থাৎ অগ্রদানীরা) পতিত হইয়াছেন।

আচার্য্য বা গণকেরা তাহাদের যজমান সূত্রধর-গৃহে শ্রাদ্ধাদিতেই অগ্রদান গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদির বাড়ীতে কোন সময়ই আচার্য্য বা গণককে শ্রাদ্ধীয় 'অগ্রদান' বা কোনও দান দেওয়া হয় না। অদ্যাপি বিপিন-বাবুর বংশ-পরম্পরাগত অগ্রদানী পুরোহিতগণ শ্রীহট্টের তরপ পরগণার অধীন 'দত্তপাড়া' গ্রামে বাস করিতেছেন। বিপিন-বাবুর জীবনে হয়ত তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার পিতামহ-প্রপিতামহের শ্রাদ্ধাদিতে 'অগ্রদান' উক্ত দত্তপাড়া নিবাসী অগ্রদানীদিগকেই দেওয়া হইয়াছে। এখনও তদ্বংশীয়েরা বা বিপিনবাবুর পিতৃনিবাস পৈলগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা কথিত অগ্রদানীদিগকেই দিয়া থাকেন।

শ্রীশশিভূষণ পাল, উকীল,

জজকোর্ট, শ্রীহট্ট।

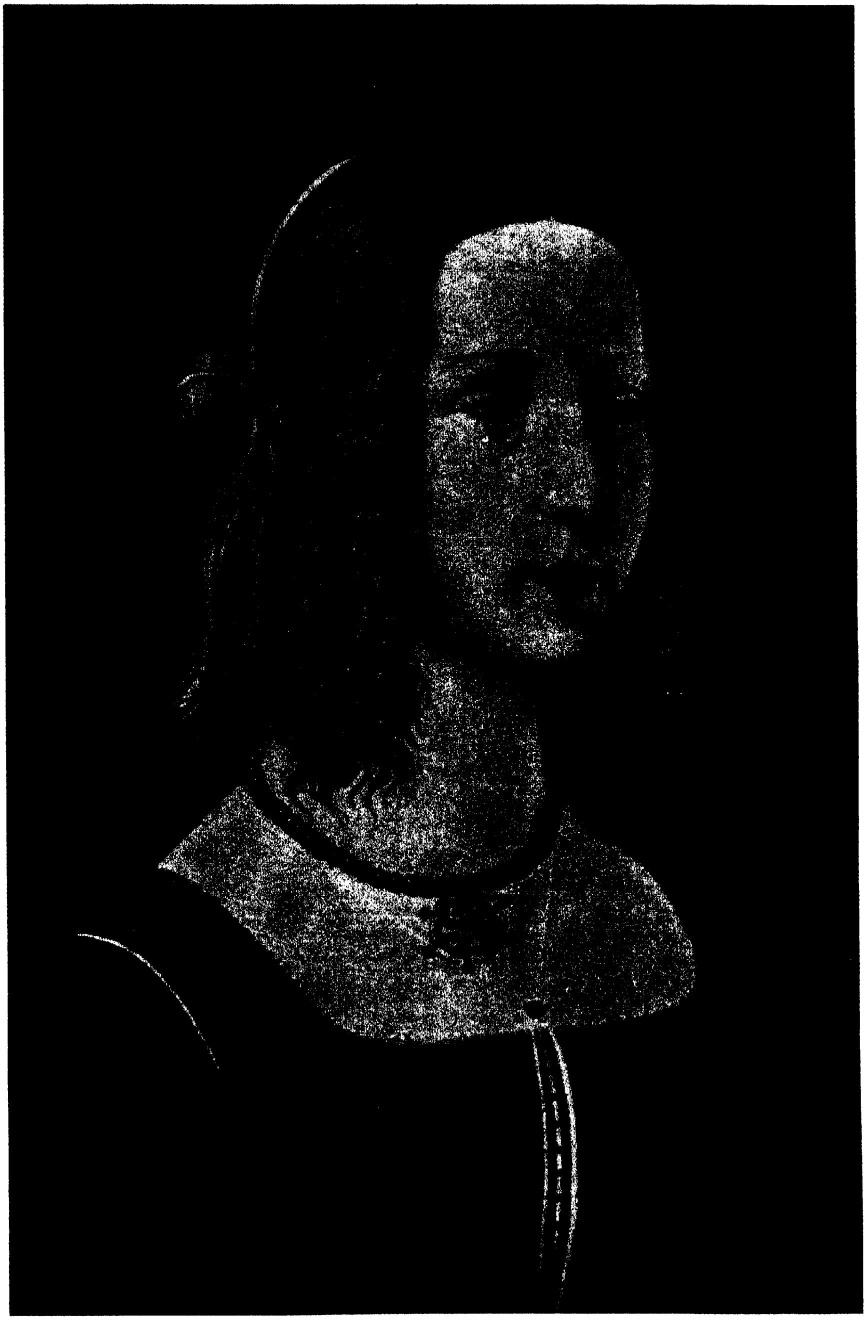
"বঙ্গ-ভাষায় বৌদ্ধ স্মৃতি"

(প্রতিবাদের প্রতিবাদ)

গত ফাল্গুনের প্রবাসীতে উক্ত প্রবন্ধের আমি যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিবাদ-কল্পে গত চৈত্রের প্রবাসীতে রমেশ-বাবু প্রতিবাদ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত স্থান প্রবাসীর আলোচনাস্তম্ভে নাই। যেহেতু, আলোচনা-স্তম্ভের স্থান অতি সংকীর্ণ, বিশদ আলোচনা তাহাতে সম্ভবপর নয়। অথচ যে-বিষয় লইয়া বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে, তাহার সুমীমাংসা করিতে হইলে বিস্তৃত প্রবন্ধের অবতারণা অবশ্যম্ভাবী। তাই, রমেশ-বাবুর নিকট এবং অন্যান্য সুধীবৃন্দের নিকট সানুনয় প্রার্থনা, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছুদিন সময় দিয়া বাধিত করিবেন। আমার বক্তব্য যাহা, তাহা যে আমার ধৃষ্টতামূলক নয় তাহা রীতিমত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে।*

শ্রী তারকেশচন্দ্র চৌধুরী

* এ বিষয়ে প্রবাসীতে আর আলোচনা হইবে না।—প্রঃ সঃ



কিশোরীর প্রতিকৃতি

শিল্পী ডোমেনিকো গীরলাণ্ডাইয়ো

১৪৪৯—১৪৪৯ খৃষ্টাব্দ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

পুস্তক পরিচয়

['পুস্তক-পরিচয়ে'র সমালোচনার সমালোচনা না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।—প্রবাসী-সম্পাদক]

ছোটদের গল্প—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১৷৵০।

গ্রন্থকার বহুকাল হইতেই ছোটদের জন্য গল্প ও কবিতা প্রভৃতি লিখিয়া আসিতেছেন। অতি শিশুকালে তাঁহার লেখা "মাসিমা" উপন্যাস ও অন্যান্য গল্প কবিতা "মুকুলে" আগ্রহের সহিত পড়িতাম, আজও মনে পড়ে। তাঁহার লেখা :—

"কল্যাণবরেষু

করেছ হুকুমজারি, যেমন করিয়া পারি, পদ্যে পত্র লিখিতেই হবে,
কাজেই কলম লয়ে কবির মতন হয়ে বসিয়াছি নির্জ্জনে নীরবে।"

কোন্ শৈশবে পড়িয়াছি, কিন্তু এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, আজও কণ্ঠস্থ আছে। এই পুস্তকে প্রকাশিত "ডেপুটি দীনেশ-বাবু বাড়ী তাঁর ঢাকা," কবিতাটিও আমাদের অতি প্রিয় ছিল। শিশুসাহিত্যে সুপরিচিত লেখকের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এই পুস্তকে ইংরেজি সুইস্ ফেমিলি রবিন্‌সন্ অবলম্বনে একটি গল্প ও মৌলিক কয়েকটি ছোট গল্প, কবিতা ও নাটক আছে। সকলগুলি সহজ ভাষায় চিত্তাকর্ষক করিয়া লেখা। নরেন, বিনোদিনী, জগদম্বা পিসি, ভৃত্য হলধর প্রভৃতি চরিত্রগুলি বেশ স্বাভাবিক। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে; সুতরাং ইহার যে আদর হইয়াছে তাহা বোঝাই যাইতেছে। ছবিগুলি গল্পের মত সুন্দর হইলে আরও ভাল হইত। তৃতীয় সংস্করণে 'মাসিমা'র ছবিখানি বাদ দিলেই বইটির সৌন্দর্য্য বাড়িবে।

শ

কুরঙ্গ (কবিতাপুস্তক)—মহম্মদ আজীজ উল্ সোভান্। প্রকাশক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লাভপুর, বীরভূম। ১৯২২। ৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

বীরভূমের প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে 'কবি-কথা' লিখিয়াছেন। কবির অদ্ভুত জীবনের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার বন্ধু কর্ত্তৃক সযত্ন-রক্ষিত কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়া কবির অকালমৃত্যুতে বেদনা অনুভব করিলাম। অপূর্ব্ব-প্রতিভা-সম্পন্ন এই অর্দ্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য কবি বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত আপনার প্রতিষ্ঠা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। এই খামখেয়ালী কবির জীবনই একটি সত্য কাব্য। ছন্দ, যতি, অলঙ্কারের বেড়া ভাঙিয়া কবি সহজ ভাষায় আপনার মনের কথা গাহিয়া গিয়াছেন, ইহার মধ্যে সংযত শিল্পীর কুশলতা বা চাতুর্য্য না থাকিলেও কবিমনের একটি অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়, কবির শান্ত অনুভূতি মনকে নাড়া দেয়, অলঙ্কারদর্পণ বা কাব্যপদ্ধতির দিক্ দিয়া এ কবির সমালোচনা চলে না। কবির খণ্ডিত জীবনের আংশিক আভাস দিবার জন্য আমরা কেবল তাঁহার লেখার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমাদের মনে হয়, এই ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কবির অকাল মৃত্যুতে প্রত্যেকেই বেদনা বোধ করিবেন। কবিতার নমুনা—

প্রান্তরে প্রান্তরে বনে কে আগুন জ্বেলে দিলি
চকিত কুরঙ্গ সম হৃদি,
আগুন লাগায়ে বনে কেন গো বেড়িলি পথ
কে বধিলি অনলে দগধি। (মর্ম্মকথা)

অনুরোধ প্রিয়জনে আমার মরণ-দিনে
সুন্দর সলিলে স্নান দিয়া,
মৃত্তিকা-শয়নে রাখি খুলে দেয় সুপ্ত আঁখি
মরে থাকি আকাশ চাহিয়া। (আস্তমে)
সে যে সেই লুকায়েছে, আসি, শুধু বলে গেছে
হ'ল বহু দিন,
গেছে কি জন্মের মত কি দোষ আমার এত
আসিবে না? দূরে দূরে রবে চিরদিন?
তা' কি হয়? এত কি কঠিন?
(এত কি কঠিন)

দম্পতি (যৌন তত্ত্ব)—শ্রীশশিকুমার সেন, বি-এ, এল-এম-এস প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান ৭৫।১ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৪৩ পৃষ্ঠা। মূল্য আড়াই টাকা।

বাঙলা ভাষায় যৌবনতত্ত্ব বিষয়ক যতগুলি পুস্তক আমাদের চোখে পড়িয়াছে, কোনোটিই সম্ভ্রম শুচিতা ও সংযম লইয়া লিখিত নহে। পুস্তকের কাট্‌তি বাড়াইবার জন্য রুচিবিগর্হিত ভাষায় ও ভাবে লিখিত বলিয়া এই ধরণের বহিগুলি দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হয় এবং এইসকল গ্রন্থের প্রচারও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। গ্রন্থকার এমন সংযত হইয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর তাঁহার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, এই পুস্তক পাঠে অপকারের কোনো সম্ভাবনা নাই। যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণের এমন বিকৃত ধারণা আছে যে, এরূপ একটি পুস্তকের অভাব ছিল। একজন চিকিৎসক এই কাজে হস্তক্ষেপ করাতে পুস্তকখানি এই অভাব পূরণ করিয়াছে। গ্রন্থকার সমস্ত বিষয় সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। তবে পুস্তকের ভাষা আরো একটু সরল হইলে ভাল হইত। গ্রন্থকার বাৎস্যায়নের কামসূত্রের সাহায্যে এই পুস্তক লিখিয়াছেন। আধুনিক মতামতও তৎসঙ্গে দিয়া তিনি বইখানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রী গীতা—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ সম্পাদিত ও ঢাকা প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে শ্রীঅনাথবন্ধু আদিত্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত পকেট সাইজ। ১০৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷০।

বাঙলা অক্ষরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূলের সহিত, অন্বয়-অনুবাদ, টীকা-টীপ্পনি, ভাষা-রহস্য ও নানা টীকাকারগণের বিভিন্ন মতের বিস্তৃত আলোচনা ও 'গীতার্থ-দীপিকা' ব্যাখ্যা সম্বলিত এই গীতাখানি প্রকাশ করিয়া সম্পাদক ও প্রকাশক সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ভূমিকাটি সুলিখিত। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

উজ্জ্বল-চান্দ্রিকা—প্রাচীন কবি শচীনন্দন বিদ্যানিধি কৃত 'উজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থের পদ্যানুবাদ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ

মল্লিক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। শ্রীশিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক টীকা সহ সঙ্কলিত। সিউড়ি বীরভূম হইতে শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১ টাকা।

বৈষ্ণব সাধনার রহস্য বুঝিতে গেলে শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত 'শ্রীশ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি' আয়ত্ত করিতেই হইবে। কিন্তু দুরূহ সংস্কৃতে লিখিত বলিয়া তাহা আয়ত্ত করা কঠিন। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা-ভাষায় আরো দুই-একটি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে; যেমন, ভানুদত্ত প্রণীত রসমঞ্জরী, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী ইত্যাদি, কিন্তু 'উজ্জ্বল-নীলমণি' সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় শচীনন্দনকৃত উজ্জ্বল-নীলমণির এই অনুবাদ উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা প্রকাশ করিয়া বাঙলার সাহিত্য-ভাণ্ডার পুষ্ট করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। পদাবলী-সাহিত্যও যথাযথ বুঝিবার জন্য এই রস-গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। পদকল্পতরু প্রভৃতি সকল পদাবলী সংগ্রহই রসের বিভাগ অনুযায়ী সজ্জিত। এরূপ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় সাধারণের খুব সুবিধা হইল। বৈষ্ণব সাহিত্যরসিক সকলেই উজ্জ্বলচন্দ্রিকা একখণ্ড সংগ্রহ করিবেন, সন্দেহ নাই।

নিরাশ্রয় উমেদার (কবিতা-পুস্তক)—স্বর্গীয় গোবিন্দ-প্রসাদ সরকার প্রণীত ও শ্রীরাধাবিজয় সরকার কর্ত্তৃক আদ্‌ড়া—বিজয় কুটীর, সানবাঁধা পোঃ, বাঁকুড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ পয়সা।

নিরাশ্রয় উমেদারের বর্ণনা সম্বলিত কয়েকটি ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা। অনেক স্থলে পড়িতে পড়িতে চোখে জল আসে।

নারী (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত প্রণীত ও নীরজনাথ দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

বহিখানির সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ফুটিয়াছে বটে, কিন্তু গ্রন্থকার কাব্যখানি গদ্যে লিখিলে ভাল হইত। নারীর মহিমা কীর্ত্তন যে, কবিতাতেই করিতে হইবে এমন কিছু বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। ছন্দ ও মিলকে কবি যে-ভাবে জবাই করিয়াছেন তাহাতে নারীর অর্ঘ্যও লাঞ্ছিত হইয়াছে। একটু নমুনা দিতেছি—

দ্বিতীয় কবিতায়—এসেছে, এসেছে আমার যৌবন,
নিখিল চিত্ত-মোহন!
এ কোন্ ঋষির তপস্যার আলো
চমকে হৃদয়ে গহন!
লহরে লহরে আকুলি', উছলি
মুখরে মুগধ মরম।
ওগো এসেছে আমার যৌবন!
এসেছে, এসেছে আমার যৌবন,
এযে—অপূর্ব্ব, অলোক কাহিনী!
আমি এ বারতা এ জগৎপুরে
কারেও এখনো বলিনি—

এমন মারাত্মক যৌবনের আগমনের বার্ত্তা কাহাকেও না বলিলেই ভাল হইত।

দম্পতি-সুহৃদ্—শ্রীরামচন্দ্র মিত্র প্রণীত ও কলিকাতা। ১৮নং রায় বাগান ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

পুরাণ-কাহিনী হইতে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গ্রন্থকার নবদম্পতীকে উপদেশ দিয়াছেন। এতদ্‌সঙ্গে কয়েকটি মুষ্টিযোগ ও অবসর-কুসুম নামক একটি কবিতাও পাইবেন।

স

বুকের বালাই—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম-এ প্রণীত প্রকাশক শ্রীনলিনচন্দ্র পাল, ১০৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

কবিতা-পুস্তক। অনেকগুলি কবিতা ইতিপূর্ব্বে নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে; কাজেই লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। কবি বলিতেছেন, "সুন্দর লয়ে কারবার মোর নিশিদিন বার মাস"। আমাদেরও মনে হয়, এই সুবিজ্ঞ কারবারীর ব্যবসা সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। নির্য্যাতিতা নারীদের উদ্দেশ্যে কবিতাগুলি বেশ হইয়াছে এবং সুখ-দুঃখের কবিতাগুলি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

মণিমুক্তা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ॥০। ১৩৩৩।

কৌতুক হাসি-তামাসার ভিতর দিয়া ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে জ্ঞাতব্য তথ্য শিক্ষা দিতে হইবে, একথা এখন সর্ব্ববাদীসম্মত। লেখক শিক্ষা-বিভাগে কাজ করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া শিশুদের জন্য এই হাসি-তামাসার বই লিখিয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই সুরচিত রচনাগুলি শিশুরা আহ্লাদের সহিত পড়িয়া যথেষ্ট শিক্ষা পাইবে।

প্র

(১) বুদ্ধের জীবন ও বাণী; (২) পঞ্চকন্যা; এবং (৩) বঙ্গগৌরব স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় —তিনখানিরই প্রণেতা শ্রীশরৎকুমার রায়। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায়, বি-এ। প্রাপ্তিস্থান ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস্, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে এক টাকা, বারো আনা ও দশ আনা।

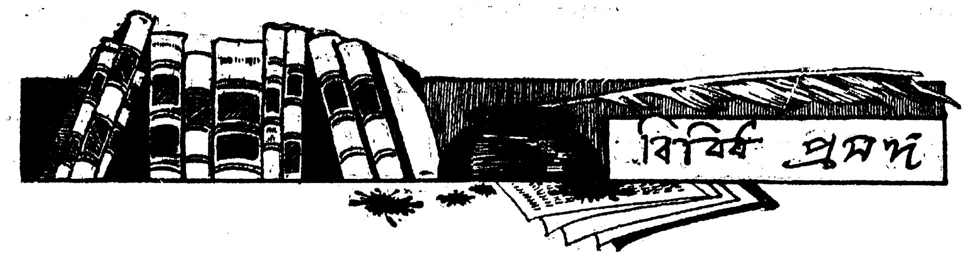
'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' তৃতীয় সংস্করণ লাভ করিয়াছে। ইহাই পুস্তকটির যথেষ্ট প্রশংসাপত্র। ভগবান বুদ্ধের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাঁহার ধর্ম্মের পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। বিবরণ সুবিন্যস্ত, সরল, বাহুল্যবর্জ্জিত এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। বহু বহু প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের উপর ভিত্তি রাখিয়া গ্রন্থকার এই চরিত-কথা রচনা করিয়াছেন। মহাপুরুষের প্রতি ভক্তির প্রাচুর্য্যে বিবরণ অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয় নাই, বরং মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বইটি প্রয়োজনীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে, কারণ, পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর ইহাতে মোটেই নাই।

'পঞ্চকন্যা' পুস্তকে সীতা, ভগবতী দেবী, রাবেয়া, ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল ও ভগিনী ডোরা—এই পাঁচটি ভারতীয় ও বিদেশীয় পুণ্যশ্লোকা মহিয়সী নারীর জীবন-কথা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের চিত্তের ঔদার্য্য ও বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মেয়েদের ইহা অবশ্য পঠনীয় পুস্তক হইয়াছে।

আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অন্যতম হইতেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার সরল, নিরহঙ্কার, তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ জীবন বাঙালীর অনুকরণীয়। এই মহৎ জীবনের সুন্দর আলেখ্য এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সুন্দর সরল ভাষায় সুলিখিত চরিতাখ্যান।

তিনখানি পুস্তকই গঠন-সৌষ্ঠবে, সুন্দর মুদ্রণে ও চিত্র-সংযোগে অত্যন্ত মনোহর হইয়াছে। পুস্তকগুলি কেবল উপহার দিবারই যোগ্য হয় নাই, বিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে।

গুপ্ত



"নিপাড়িত জাতিসমূহের কংগ্রেস"

গত ৯ই হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী অবধি বেল্জিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্ নগরীতে জগতের সকল "নিপীড়িত" জাতির প্রতিনিধিদিগের একটি মহাসভার অধিষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। জগতের প্রায় শত কোটি অধিবাসী নানান প্রকারে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ আছেন। ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম এসকল "নিপীড়িত" ব্যক্তিদিগের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া নিজেদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করিলেন। প্রায় দুই শত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন; এবং কংগ্রেসের ফলে অন্তর্জাতিক নিপীড়ন-নীতির উচ্ছেদ সাধনের জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, অধ্যাপক আইন্‌ষ্টাইন, আঁরি বারবুস্, রমাঁ্যা রলাঁ, সুন্-ইয়াৎ-সেনের পত্নী, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সভ্যদিগকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন,

"প্রিয় বন্ধুগণ,

উপনিবেশবাদ ও নিপীড়ন-নীতির বিরুদ্ধে যে



সীরিয়ার এম্ বকৃত্



ইন্দো-চীনের মহম্মদ হাট্টা



ক্যান্টন সৈন্যদলের অন্যতম সেনাপতি লু ৎসুং লিন্

কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে, তাহাতে আপনারা আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। "আমার দুঃখ এই, যে, ভারতে নিজের যা কাজ আছে, তাহা ফেলিয়া আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব না। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যে, আপনাদের শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক।"

বহু লোক, ইচ্ছা সত্ত্বেও, মহা সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই; কারণ অর্থের কিংবা পাসপোর্টের অভাব। কিন্তু তাহা হইলেও আফ্রিকা, মেক্‌সিকো, ইন্দো চীন, সুমাত্রা, জাভা, মিশর, ভারতবর্ষ, কোরিয়া, ফিলিপাইন্স, চীন, পারস্য, আল্‌জিরিয়া, টিউনিস, মরোক্কো, আরব প্রভৃতি নানা দেশের প্রতিনিধিগণ মহাসভায় উপস্থিত হন। ইহা ব্যতীত ইয়োরোপের, আমেরিকার ও জাপানের শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধিগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইংলণ্ডের নানান শ্রমিক সংঘের প্রায় কুড়ি জন ও চীনের কুও-মিং-টাং (জাতীয় দল), ক্যান্টন সৈন্যদল প্রভৃতির ত্রিশ জন প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীযুক্ত জওআহরলাল নেহরু ও তাহা ছাড়া আর অনেকগুলি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন। সিংহলের প্রতিনিধিকে সরকারী তরফ হইতে পাস্‌পোর্ট না দেওয়াতে, তিনি যাইতে পারেন নাই।

কংগ্রেসে প্রদত্ত অভিভাষণগুলির মধ্যে ভালো কথা ও ভাবিবার কথা অনেক ছিল। ফরাসী মনস্বী শ্রীযুক্ত আঁরি বারবুস্ তাঁহার অভিভাষণে বলেন, যে, বর্ত্তমান কালে জগতের অধিকাংশ লোক সঙ্গীনের ভয়ে অপরের দাসত্ব করিতেছেন। তাঁহাদের মুক্তির জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন এই বোধ হয়, যে, তাঁহারা মিলিত হইয়া কার্য্য করিলেই জয়ী হইবেন। শক্তির মূল মন্ত্র মিলন। মুক্তির ফল আর্থিক, আধ্যাত্মিক, সকল দিক্ দিয়া উন্নতি।

আমরা ভারতবাসীরা একথার সত্যতা সহজেই

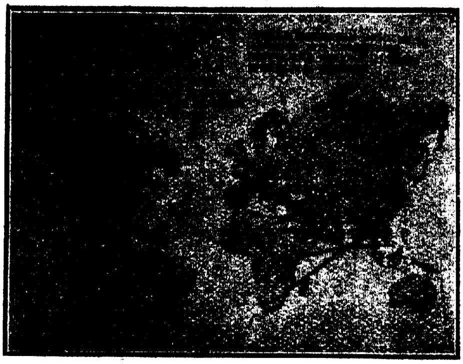


জার্ম্মান্ শ্রমিক নেতা জি লেডেবোর—বয়স ৭৬



শ্রীজওয়াহরলাল নেহরু

বুঝিতে পারিব। আমেরিকা হইতে চীন অবধি জাতীয় দাসত্বের রূপ সেই একই ভাবে বর্ত্তমান আছে। সকলের দেশেই ১৮৫৭ ঈশাব্দ ও জালিয়ানওয়ালা বাগ দেখা যায়, সর্ব্বত্রই মুখ বন্ধ ও লেখনী আড়ষ্ট, বে-আইনী আইন ও আইনের বে-আইনী ব্যবহার, ধনিকের শতকরা ৩০০ লাভ ও মজুরের দিনে ১৬ ঘণ্টা খাটুনী, শিশুমৃত্যু, অনাহার ও অন্যান্য অসংখ্য দুর্গতি। এই মহাসভায় নানা স্থান হইতে উৎপীড়নের বার্ত্তা বহন করিয়া লোক আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অভিযোগ প্রায় একই ধরণের ছিল। ইয়োরোপের ধনিকদের সংবাদপত্র-মহলে প্রথমে কংগ্রেসের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু ক্রমে সর্ব্বত্রই বক্তৃতার সারাংশ ও কংগ্রেস-সংক্রান্ত অপরাপর খবর বাহির হইতে আরম্ভ হয়। শেষ অবধি ব্যাপারটাকে সকলেই ক্ষুণ্ণ মনে মানিয়া লয়। পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু তাঁহার বক্তৃতায় দেখাইয়া দেন, যে, জগতের মুক্তির জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। কারণ, ভারতের শাসন-নীতি জগতের সকল সাম্রাজ্যশাসকের আদর্শ, ও ভারতের অর্থ ও লোকবলের সাহায্যেই ইংরেজ আজ আরও বহু স্থলে উপনিবেশ স্থাপন ও বলপূর্ব্বক ব্যবসা বিস্তার করিতেছে।



এশিয়া ও আফ্রিকার অধীনতার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। মানচিত্র



শ্রী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়



এইচ্. লিয়াউ ও চেন্ চুয়েন

ইংলণ্ডের স্বাধীন শ্রমিক দলের প্রতিনিধি ফেনার ব্রকোয়ে ভারতকে আশ্বাস দান করেন, যে, যদিও বিগত বিলাতী শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া ভারতের সহিত ধনিকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, ও অর্ডিনান্স প্রভৃতি দমনাস্ত্রের সমর্থন করিয়াছিলেন তথাপি যেন ভারত না ভাবেন, যে, ভবিষ্যতে শ্রমিক দল আবার গবর্ণমেণ্ট হাতে পাইলে পুনর্ব্বার ঐ রূপে আদর্শবিচ্যুত হইবেন। চীনকে তিনি বলেন, যে, যদি ইংরেজ চীনের সহিত লড়াই করে তাহা হইলে শ্রমিক দল চীনের দিকেই সহানুভূতি দেখাইবেন। অতঃপর এই শ্রমিক প্রতিনিধির সহিত চীনের কুয়ো-মিং-টাং এর প্রতিনিধি কর মর্দ্দন করেন। আমরা অবশ্য ইংরেজজাতীয় কোন লোকের কথার উপর নির্ভর করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক মনে করি না। কার্য্য দেখিলে তবে আমরা ইংরেজের কথার মূল্য স্বীকার করিব।

মেক্সিকোর প্রতিনিধি বলেন, যে, যদিও নিপীড়ন-নীতির কথা উঠিলেই লোকে এশিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তথাপি এশিয়া এই নীতি অনুসরণের পক্ষে বর্ত্তমানে আর শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র নাই। বর্ত্তমানে এশিয়ার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া এমন দাঁড়াইয়াছে, যে, লোভী লোকের আর সে দিকে ততটা নজর নাই। বর্ত্তমানে উপনিবেশ-ও পরস্বাপহরণ-বাদের শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি দক্ষিণ আমেরিকা।

বিলাতী পার্লেমেণ্টের শ্রমিক সভ্য শ্রীযুক্ত জর্জ্জ ল্যান্স্‌বেরী সকলকে আশার বাণী শুনান। তিনি বলেন, যে, "কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, কি জাপান, কাহারও এক্ষমতা নাই, যে, এই অত্যাচারকে চিরস্থায়ী করে। আমাদের জয় ও মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। দুই দিন সময় যাইতে পারে, দুই জন কি দুই হাজার



ফ্রান্সের আঁরি বার্বুস্



সেনিগ্যালের লামিন্ সেংঘর



বিলাতের জর্জ ল্যান্স্‌বেরী ও চীনের জাতীয় দলের হান্সিয়েন লিয়াউ

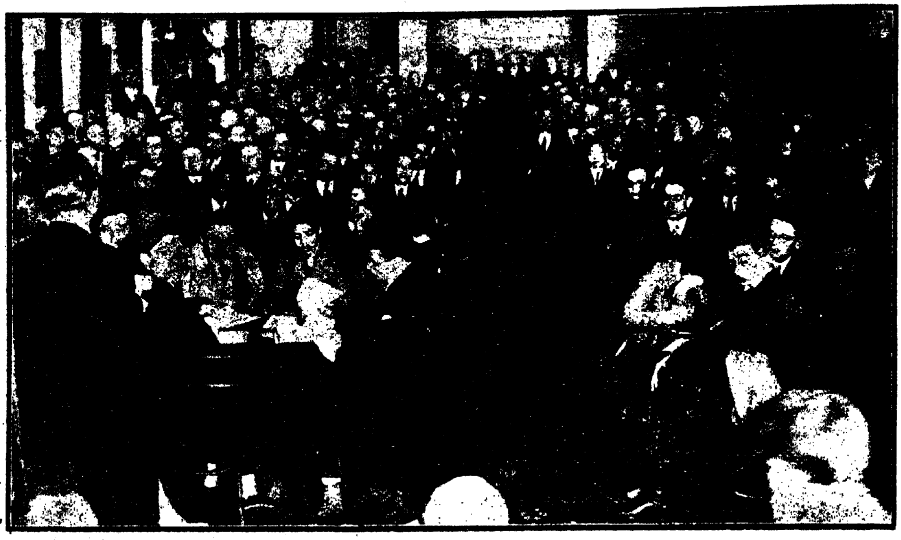
লোকের প্রাণ যাইতে পারে, কিন্তু শেষ অবধি আমাদেরই জয় হইবে। বর্ত্তমানের সাম্রাজ্যগুলির চেয়ে অনেক বড় বড় সাম্রাজ্য অতীতে অত্যাচার ও অন্যায় করিয়া ধূলিসাৎ হইয়াছে। অধর্ম্মের উপর স্থায়ী কিছু গড়া যায় না। আমরা সকল দেশের শ্রমিকদিগকে ক্রমশঃ শিখাইয়া আনিতেছি। শীঘ্রই তাহারা আর কোথাও সেনাদল-ভুক্ত হইবে না, বা যুদ্ধের মাল-মশলা প্রস্তুত করিবে না। তার পর আমাদের আর কেহ দাসত্বে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে পারিবে না।"

এই কংগ্রেসের আভাস মাত্র এখানে দেওয়া হইল। বিস্তারিত বিবরণ মডার্ন্ রিভিউ মাসিকে বাহির হইবে।



বামে পারস্যের মুরুক

যে অন্তর্জাতিক কংগ্রেসের কথা এখানে লিপিবদ্ধ হইল, তাহার উদ্দেশ্যের সহিত অবশ্য আমরা একমত; কিন্তু কংগ্রেস কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া পরাধীন জাতিদিগকে স্বাধীন হইতে বলেন এবং কি কি প্রকারেই বা এই কংগ্রেস অধীন জাতিদের সাহায্য করিতে পারেন, তাহা ভাল করিয়া না জানিয়া ইহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা মত প্রকাশ করিতে পারি না। পৃথিবীর যে সব জাতি এখন রাষ্ট্রীয়, বাণিজ্যিক ও আর্থিক দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা, তাঁহাদের মুক্তি হওয়া উচিত, এই মত যদি কংগ্রেস

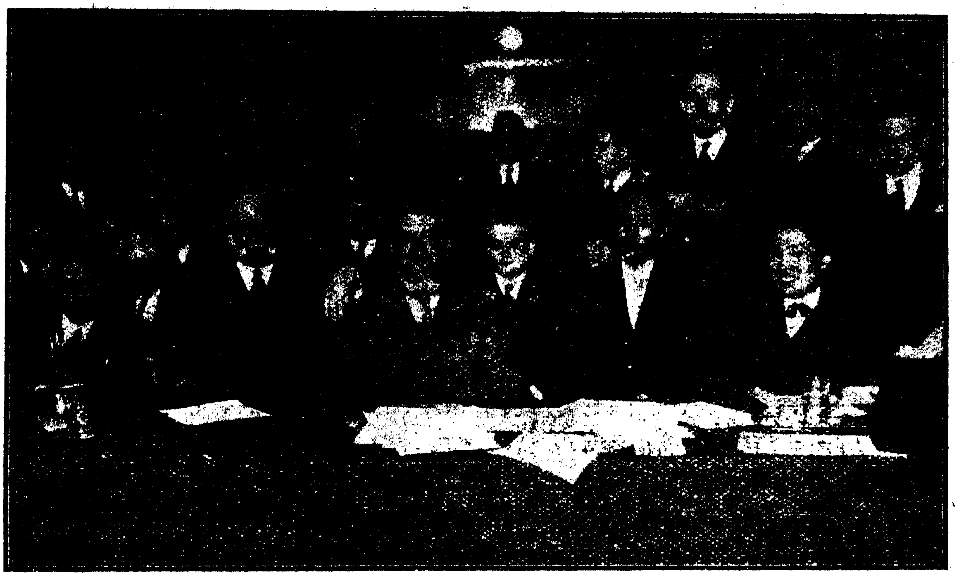


ব্রুসেল্‌স্ কংগ্রেসের সাধারণ দৃশ্য

সমুদয় সাম্রাজ্যশাসক, পণ্যশিল্পী ও বণিক্ জাতিদিগকে এবং অন্যান্য জাতিদিগকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করাইতে পারেন, তাহাও কম লাভ হইবে না। কিন্তু আমাদের যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে, যে, রাষ্ট্রীয়, বাণিজ্যিক ও আর্থিক মুক্তি লাভ করিতে হইলে তাহার জন্য প্রধান চেষ্টা ও দুঃখ-ভোগ—বলিতে গেলে প্রায় সমুদয় চেষ্টা ও দুঃখ-ভোগ—আমাদিগকেই করিতে হইবে। অন্যেরা আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিতে পারে না;—যাহার নিজের স্বাধীন হইবার ক্ষমতা নাই, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই। অন্য জাতিরা অবশ্য আমাদের সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু কেবল মাত্র তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকা অলস, ভীরু, ও মূর্খের কাজ।

এই কংগ্রেস সম্বন্ধে আর-একটি বিষয়েও আমাদের মত প্রকাশ করা দরকার। কংগ্রেস্‌টি প্রধানতঃ শ্রমিক-দলের প্রভাবের বশবর্ত্তী। পাশ্চাত্য সমুদয় দেশে শ্রমিক ও ধনিকদের মধ্যে খুব সংগ্রাম চলিতেছে। এরূপ একটা সংগ্রামের সূত্রপাত আমাদের দেশেও হইয়াছে। কিন্তু তাহা যাহাতে না বাড়ে, ধনিকেরা নিজেই যাহাতে শ্রমিকদের সহিত ন্যায্য বন্দোবস্ত করেন, তাহার চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়া ভারতবর্ষেও একটা স্থায়ী শ্রমিক-ধনিক যুদ্ধ খাড়া করা অনুচিত হইবে। এরূপ যুদ্ধের বিরুদ্ধে অন্য যে-সব যুক্তি আছে, তাহার কথা না তুলিয়া এই একটা যুক্তির কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের একযোগে কাজ করা যেমন আবশ্যক, তেম্‌নি জমীদার ও রায়ৎ, ধনিক ও শ্রমিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকদেরও একযোগে কাজ করা দরকার। ভারতবর্ষে ধর্ম্মগত, জাতিগত, শ্রেণীগত বিবাদ এমনিই বিস্তর আছে; তাহার উপর আর-একটা কায়েমী ঝগড়া যাহাতে বদ্ধমূল না হয়, সেই চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য শ্রমিকদের সম্বন্ধেও একটা কথা মনে রাখা উচিত। বিলাতের শাসকশ্রেণী প্রধানতঃ ধনিক-শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত। এই ধনিক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আছে, আবার বিলাতী শ্রমিক শ্রেণীরও অভিযোগ আছে। সুতরাং এখন এই পাশ্চাত্য শ্রমিকরা আমাদের প্রতি দরদ দেখাইতেছে। কিন্তু যখন পাশ্চাত্য ধনিক ও শ্রমিকদের ঝগড়া আপোসে মিটিয়া যাইবে, তখন আমরা তাহাদের কাহারও নিকট হইতে ন্যায্য ব্যবহার নিশ্চয়ই পাইব মনে করা ভুল। শ্রমিকদের



ক্রসেল্‌স্ কংগ্রেসের সভাপতির মঞ্চ

জীবিকা নির্ভর করে কারখানাগুলির লাভ ও স্থায়িত্বের উপর। তাহা নির্ভর করে উৎপন্ন মালের কাট্‌তির উপর। ভারতবর্ষ বিলাতী ও অন্য পাশ্চাত্য শিল্পজাত মালের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে আমাদের নিজেদেরই পণ্যশিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতি হওয়ায় আমরা আর পাশ্চাত্য দেশসকলের বর্ত্তমান সবরকম জিনিষের এত বড় ক্রেতা থাকিব না। সুতরাং তখন পাশ্চাত্য কোন কোন রকম মালের কারখানার অবনতি এবং তাহাদের বণিক ও শ্রমিক উভয়েরই ক্ষতির স[illegible]আছে। অতএব ঐহিক সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষা নীতির [illegible]লে বিলাতী শ্রমিকদল যে ভারতবর্ষকে নিশ্চ[illegible]তে দিবে, এমন মনে হয় না। অবশ্য, যেমন [illegible] জন মানুষের পক্ষে নিঃস্বার্থভাবে ন্যায্য কাজ করা সম্ভব, তেম্‌নি মানবসমষ্টিরও পক্ষে উহা, তত সহজে না হইলেও, অসম্ভব নহে। তথাপি কাজ না দেখিয়া কাহারও কথায় বিশ্বাস না করাই ভাল। অবিশ্বাস প্রকাশ করিবারও আবশ্যক নাই।

—

খড়্গবাহাদুর সিংহ

হীরালাল আগরওয়ালা নামক কলিকাতার একজন ধনী পশ্চিমা ব্যবসাদার নেপালী বালিকা রাজকুমারীকে ক্রয় করে। সে ও তাহার দুর্বৃত্ত সঙ্গীরা বালিকাটির উপর পাশবিক অত্যাচার করিত। রাজকুমারী হীরালালের বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়া পুলিসের সাহায্য চায় এবং প্রতিকারপ্রার্থী হয়। কিন্তু হীরালালের কোন শাস্তি হয় নাই। হীরালাল প্রভৃতির অত্যাচারে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া রাজকুমারীকে হাঁসপাতালে যাইতে হয়। খড়্গবাহাদুর সিংহ নামক একজন গুর্খা যুবক এইসকল বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং হাঁসপাতালে রাজকুমারীর রোগযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়া হীরালালকে শাস্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। একদিন হীরালালের আফিসে গিয়া খড়্গবাহাদুর তাহাকে কুকরী-দ্বারা আঘাত করেন। পরে হীরালালের মৃত্যু হয় এবং হাইকোর্টে খড়্গবাহাদুরের বিচার হয়। জজ তাঁহাকে আট বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন। আইন যেরূপ আছে, তাহাতে জজের রায় আইনবিরুদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু, ইহাও নিশ্চিত, যে, যেরূপ অবস্থায় ও যে

উদ্দেশ্যে খড়্গবাহাদুর হীরালালকে আঘাত করেন, তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ মুক্তি দিবার অধিকার রাজার আছে, এবং সেই ক্ষমতা ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনার‍্যাল ও প্রাদেশিক গবর্ণরদের আছে। বঙ্গের গবর্ণরকে খড়্গবাহাদুরের মুক্তির জন্য অনেক সভাসমিতি অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহার মুক্তি হইলে ভাল হয়। অন্ততঃ পক্ষে তাঁহাকে সাধারণ দুর্বৃত্ত কয়েদীদিগের সঙ্গে না রাখাই উচিত, কারণ, সেরূপভাবে রাখিলে তাঁহার উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবার সম্ভাবনা।

খড়্গবাহাদুরের উদ্দেশ্য যে খুব ভাল ছিল এবং তিনি যে সাহসের সহিত আদালতে বিচারের সময় নিজের কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এই মেধাবী যুবক সকলের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী। আমাদের দেশের যুবকেরা ও প্রৌঢ় ব্যক্তিরা এইরূপ সাহসী ও সদুদ্দেশ্যশালী হইলে, দেশে যে শত শত নারীর অপমান ও নির্য্যাতন অহরহ হইতেছে, তাহাদের জন্য খড়্গ-বাহাদুরের মত এইসকল পুরুষের প্রাণে ব্যথা লাগিলে, কত যে সামাজিক উন্নতি হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কোন নরপশু কোন নারীর উপর অত্যাচার করিতে যাইতেছে বা করিতেছে দেখিয়া যদি কেহ অত্যাচারীর প্রাণবধ করিয়াও অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করে, তাহা হইলে কর্ত্তব্যই করা হয়। এইরূপ চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, একটুও নিন্দনীয় নহে। বরং এরূপ চেষ্টা না করাই অপরাধ। সর্ব্ববিধ অত্যাচার নিবারণ ও দমনের ভার অবশ্য প্রত্যেক দেশের শাসনযন্ত্রের উপর আছে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে শাসকদের এই কর্ত্তব্য পালিত হইতে পারে না। কাহারও বাড়ীতে চুরি বা ডাকাতির উপক্রম বা চেষ্টা হইলে তখন পুলিশ ডাকিবার সময় নয়; তখন চোর ডাকাতদের নিরস্ত করিবার ও তাড়াইবার সময়। তেমনই অচিরাৎ নারীর উপর অত্যাচারের সম্ভাবনা বা চেষ্টা প্রত্যক্ষ করিলে তখন পুলিস ডাকিবার বা আদালতে নালিস করিবার সময় নয়, তখন, প্রয়োজন হইলে অত্যাচারীর প্রাণবধ করিয়াও, অত্যাচার নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

খড়্গবাহাদুর সিংহের কাজ ঠিক্ এই জাতীয় কর্ত্তব্য-পালন নহে। কারণ, অত্যাচারের অনেক পরে, অত্যাচার নিবারণের জন্য নহে, পরন্তু অত্যাচারীকে শাস্তি দিবার জন্য হীরালালকে তিনি আঘাত করেন। অতএব কাজটির বিচার অন্যভাবে করিতে হইবে।

সকল দেশ ও জাতির এক সময় এরূপ অবস্থা ছিল, যখন আইন-আদালত প্রভৃতি ছিল না; কেহ কাহারও কোন অনিষ্ট করিলে ক্ষতিগ্রস্ত বা আহত ব্যক্তি স্বয়ং বা পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গের সাহায্যে অনিষ্টকারীকে শাস্তি দিত। কেহ হত হইলে তাহার জ্ঞাতিরা হন্তাকে শাস্তি দিত। পরে সভ্যতার বিকাশ এবং আইনের প্রবর্ত্তন ও আদালতের প্রতিষ্ঠা হইলে, যাহার বিরুদ্ধে কেহ অপরাধ করে, সে বা তাহার জ্ঞাতিবর্গ স্বয়ং অপরাধীকে সাজা না দিয়া, বিচার করিবার ও সাজা দিবার ভার শাসনযন্ত্রের অঙ্গ স্বরূপ আদালতকে দিয়া আসিতেছে। অনেক স্থলে আদালত দ্বারা সুবিচার হয় ও অপরাধীর শাস্তি হয়, অনেক স্থলে হয় না। আইনের দোষে, পুলিসের দোষে, বিচার-প্রণালীর দোষে বা আদালতের দোষে যে-সব স্থলে অপরাধীর সাজা হয় না, সে-সকল স্থলে যাহাদের অনিষ্ট হইয়াছে তাহাদের, তাহাদের জ্ঞাতিবর্গের এবং সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য কি? সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে, এইসকল স্থলে নিজেরাই দণ্ডদাতা না হইয়া আইনের সংস্কার, পুলিসের সংস্কার, বিচারপ্রণালীর সংস্কার ও আদালতের সংস্কারের চেষ্টা করা উচিত; প্রয়োজন মত রাষ্ট্রীয় সংস্কার, সমাজ-সংস্কার এবং জাতীয় চরিত্রের সংশোধনও দরকার। এইরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ অনেকেরই মনঃপূত হইবে না, কিন্তু স্থায়ী এবং ব্যাপক প্রতিকার, সম্যক্ প্রতিকার, উক্ত সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন ব্যতিরেকে হইবে না।

খড়্গ বাহাদুর যে প্রকৃত বীরত্বের কাজ করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া আমাদের বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব। খড়্গ বাহাদুর যদি গোড়াতেই, হীরালালকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে অত্যাচারোন্মুখ দেখিয়া বা জানিয়া

তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আঘাত করিয়া নিবৃত্ত করিতেন এবং অত্যাচার নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কাজ নীতিবিরুদ্ধ বা আইনবিরুদ্ধ কিছুই হইত না। অত্যাচার হইবার পর তাহার কাহিনী শুনিয়া তিনি হীরালালকে যে-শাস্তি দিয়াছেন, তাহা বে-আইনী হইয়াছে, কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ হয় নাই। কেহ অন্যায় কাজ করিলে, তাহার শাস্তি হউক, এইরূপ একটা ইচ্ছা মানবপ্রকৃতিতে নিহিত আছে। শাসনযন্ত্র দ্বারা যদি হীরালালের শাস্তি হইত, তাহা হইলে এই স্বাভাবিক প্রতিশোধ-ইচ্ছা তৃপ্ত হইত। কিন্তু শাসনযন্ত্র তাহাকে স্পর্শ করে নাই। এইরূপ অবস্থায় খড়্গ বাহাদুরের কাজের দ্বারা হীরালালের শাস্তি হওয়ায়, "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল", ব্যক্ত বা অব্যক্ত এইরূপ মনোভাব বিস্তর লোকের হইয়াছে। অপরাধীর শাস্তির উদ্দেশ্য ও ফল সম্বন্ধে দণ্ডবিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক আলোচনা করিবার মত বিদ্যা আমাদের নাই; এ ক্ষেত্রে তাহা করাও সঙ্গত হইবে না। তবে, শাস্তিদানের জন্য যে যে উদ্দেশ্য আছে, তাহার কোন কোনটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপরাধীকে অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করা এবং তাহার চরিত্রের সংশোধন করা দণ্ডদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। আলোচ্য স্থলে, হীরালালের মৃত্যু হওয়ায় এই উদ্দেশ্য সাধনের কথা উঠিতে পারে না। তাহার শাস্তি বশতঃ তাহার দুর্বৃত্ত সঙ্গীরা অতঃপর সচ্চরিত্র হইবে এবং দুষ্কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে কি না, ইহাই এখন জিজ্ঞাস্য। ইহার কোন উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ। যদি তাহারা অতঃপর নিজ নিজ চরিত্র সংশোধন করে, তাহা হইলে খড়্গবাহাদুরের আত্মোৎসর্গ অনেকটা সফল হইবে।

কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু স্বাভাবিক ক্রোধ ও প্রতিহিংসাবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মানুষটাকে মারিয়া ফেলিলে দণ্ডদানের প্রধান উদ্দেশ্য যে দুর্বৃত্তের চরিত্রসংশোধন, তাহা সাধিত হয় না। এইজন্য অপরাধীকে প্রাণে না মারিয়া, পুনর্ব্বার সে যাহাতে অপরাধ করিতে না পারে, তাহার উপায় থাকিলে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত, এবং তাহার চরিত্র সংশোধনের বন্দোবস্ত করা উচিত। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেরূপ কোন কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই।

দুর্বৃত্ত লোকদিগকে শাস্তি দিবার ভার রাষ্ট্রীয় শাসন-যন্ত্রের উপর না রাখিয়া কেহ স্বয়ং সে ভার লইলে সভ্য সমাজের ভিত্তিতে এবং সভ্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের ভিত্তিতে আঘাত করা হয়। তদ্ভিন্ন কেহ স্বয়ং দণ্ড দিবার ভার লইলে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া ঘটিয়া উঠে না; সচরাচর অভিযোক্তার কথার উপর নির্ভর করিয়াই দণ্ড দেওয়া হয়। ইহাতে ভ্রমবশতঃ নিরপরাধের দণ্ড বা লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়া যাইতে পারে।

আমরা "বিজ্ঞ" সাজিয়া এইসব কথা বলিতেছি না। আমরা এবং আমাদের মত আরও অনেকে, যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা অমঙ্গলের অস্তিত্ব জানিয়াও সেই সব অমঙ্গলের কারণীভূত লোকদের স্বয়ং শাস্তি দিই না, তাহা সভ্য-সমাজের ভিত্তি বা সভ্য-শাসনযন্ত্রের ভিত্তিকে আঘাত না-করিবার জন্য নহে; আমরা যে নিশ্চেষ্ট থাকি, তাহার কারণ অনেক স্থলেই অন্য প্রকার, ইহা আমরা স্বীকার করি। অনেক সময় ঔদাসীন্য বশতঃ আমরা কিছু করি না, কখন কখন ভীরুতা বশতঃ কিছু করি না, এবং সাধারণতঃ কিছু করি না এইজন্য, যে, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অমঙ্গলের গুরুত্ব আমরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করি না, এবং ঐ সব অমঙ্গল হইতে যাহারা দুঃখ পায় তাহাদের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদে না। তথাপি, আমাদের দোষ দুর্ব্বলতা ত্রুটি স্বীকার করিয়াও, অমঙ্গলের মূল উচ্ছেদ কেমন করিয়া করা যায় এবং অমঙ্গলকারীর দণ্ডবিধান কাহার দ্বারা ও কি প্রকারে হইতে পারে, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিয়াছি। আলোচনা উপলক্ষে আমরা যাহা বলিতেছি, আমাদের মত "বিজ্ঞ" লোকদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা তাহার উদ্দেশ্য নহে; কারণ আমরা জানি, "বিজ্ঞ" উদাসীন অলস ও ভীরু লোকদের "বিবেচকতা" অপেক্ষা খড়্গবাহাদুরের মত যুবকের হৃদয়বত্তা, সাহস ও "হঠকারিতা" দ্বারা সমাজের ও রাষ্ট্রের অধিকতর উপকার হয়। যদি খড়্গ

বাহাদুরের মত হৃদয়বান্ সাহসী ও কর্ম্মতৎপর লোক অধিকন্তু ধীর এবং বিবেচকও হন, তাহা হইলেই আদর্শানুরূপ কার্য্য হয়, ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

খড়্গ বাহাদুরের কাজের দ্বারা এই একটি মহা উপকার হইয়াছে, যে, একটা ঘোর সামাজিক অমঙ্গলের প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

খড়্গবাহাদুর যাহা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কেবল একটা মাত্র দুর্বৃত্তের শাস্তি হইয়াছে। রাজকুমারীর সম্পর্কে পিতামহী বা মাতামহী যে বৃদ্ধা তাহাকে পদম্‌প্রসাদ নামক যে লোকটার হাতে দিয়াছিল, তাহার শাস্তি হয় নাই। পদম্‌প্রসাদ রাজকুমারীকে হীরালালের নিকট বিক্রী করিয়াছিল, কিন্তু তাহারও শাস্তি হয় নাই। হীরালালের দুর্বৃত্ত সহচরদেরও শাস্তি হয় নাই। বস্তুতঃ, কোন বাড়ীর সব দেওয়াল, আসবাব ও বিছানা হইতে এক-একটি করিয়া ছারপোকা বাহির করিয়া মারা যেমন দুঃসাধ্য ও ব্যর্থ চেষ্টা, দু-একটা বদ্‌মাইসের প্রাণবধ করিয়া সামাজিক দুর্নীতির জড় মারিবার চেষ্টাও তেমনই ব্যর্থ। তাহা করিতে হইলে সামাজিক নানা কুপ্রথার মূল উচ্ছেদ করিতে হইবে, নারীজাতি সম্বন্ধে পুরুষদের হীন ও জঘন্য ধারণা বিনষ্ট করিতে হইবে, নারীদিগকে শৈশব হইতে সুশিক্ষিত, সাহসী, আত্মনির্ভর-পরায়ণ এবং আত্মরক্ষায় সমর্থ করিতে হইবে, দুশ্চরিত্র পুরুষ খুব উচ্চপদস্থ ও ধনী হইলেও সমাজে তাহাদিগকে অবজ্ঞার পাত্র করিতে হইবে, এবং শৈশব হইতে পুরুষজাতীয় লোকদিগকে সচ্চরিত্র করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বয়সের নারীজাতীয়াদিগের বিরুদ্ধে যে-কোন দৈহিক অপরাধ বা অপরাধ-চেষ্টা হয়, তাহার শাস্তি বর্ত্তমান সব শাস্তি অপেক্ষা কঠোরতর হওয়া দরকার। নারীদের সম্মতির বয়সও স্বামী ভিন্ন অন্য সকল পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসর করা উচিত।

—

নিরাশ্রয় বালিকা, যুবতী ও অন্য নারীদের আশ্রম

কলিকাতার ও অন্যান্য সহরের বেশ্যাদের গৃহে অনেক অল্পবয়স্কা বালিকা আছে, যাহাদিগকে পালিকারা পাপ-ব্যবসায়ের জন্য রাখিয়াছে। কুস্থান হইতে এইসব বালিকাদের উদ্ধারসাধন করিবার ক্ষমতা পুলিসের আছে। কিন্তু উদ্ধার করিয়া রাখিবার জায়গা যথেষ্ট নাই। এইরূপ বালিকাদের বিবাহ মুসলমান সমাজে ও খৃষ্টীয় সমাজে হইতে পারে; কিন্তু হিন্দু সমাজে সচরাচর হয় না,—হইতে পারে না বলিতে পারি না। যাহা হউক, ইহাদের যাহাতে সুশিক্ষা ও সদুপায়ে বাঁচিয়া থাকিবার উপায় হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করা প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উচিত। এ বিষয়ে হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্যই সকলের চেয়ে কঠিন, কারণ, ভদ্র হিন্দুসমাজে এইরূপ বালিকাদের স্থান পাওয়া কঠিনতম।

এইরূপ বালিকা ছাড়া, যে-সব হিন্দু কুমারী, সধবা বা বিধবা ধর্ষিতা হন, তাঁহাদের আত্মীয়, স্বজন যদি তাঁহাদিগকে গ্রহণ না করেন, কিম্বা যদি এইরূপ কুমারী ও বিধবাদের বিবাহ না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের জন্যও সুপরিচালিত আশ্রমের প্রয়োজন আছে। তাহার জন্য হিন্দুসমাজকে উদ্যোগী হইতে হইবে। তদভাবে অগত্যা যদি ধর্ষিতা নারীরা মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান হইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের লোকদের চীৎকার করিবার কোন অধিকার থাকিবে না। তাঁহাদের কেহ কেহ যে বেশ্যাশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন, তাহাতে হৈ চৈ পড়ে না।

এইরূপ একটি আশ্রমের জন্য কলিকাতার মেয়র যে একটি ফণ্ড খুলিয়াছেন, দলাদলি ভুলিয়া এবং তিনি আগে কেন এরূপ কিছু করেন নাই, এবম্বিধ আপত্তি না তুলিয়া, তাহাতে সকলের যথাসাধ্য দান করা কর্ত্তব্য।

—

শশীমোহন ও বাঁশরীভূষণ

নানা খবরের কাগজে প্রকাশিত দুটি সংবাদের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। একটি খবর এইরূপ—

শ্রীহট্ট জেলার ইছামতী গ্রামের ফৈয়জ আলী নামক এক দুর্দ্দান্ত ও দুর্বৃত্ত ব্যক্তি কত নারীর যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাহার ভয়ে কেহ তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিত না, স্বয়ং শান্তিও

দিত না। রঘুর-চক নিবাসী শশীমোহন দে নামক একজন সাহসী যুবক কয়েক জন পাটনীজাতীয় লোকের সাহায্যে এক রাত্রিতে কোন পাটনী স্ত্রীলোকের গৃহে ঐ লোকটার প্রাণবধ করিয়াছেন। শশীমোহন হত্যাকার্য্য স্বীকার করিয়াছেন, ও, বলিয়াছেন, যে, ফৈয়জ আলী বলবান লোক বলিয়া দরকার হইলে পাটনী লোকগুলির সাহায্য লইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা কিছু করে নাই; হত্যাকার্য্যের জন্য তিনিই একা দায়ী। মোকদ্দমা চলিতেছে।

দ্বিতীয় খবরটি এই—

গত ২১শে ফাল্গুন শনিবার রাত্রি সাড়ে আটটার সময় শ্রীমতী সূর্য্যমণি দাসী নাম্নী একটি সধবা স্ত্রীলোক ইডেন গার্ডেন বেড়াইতে গিয়া সঙ্গীহারা হইয়া রাস্তার পাশে বসিয়া থাকেন। তখন একটা গোরা সৈনিক তাঁহাকে একলা দেখিয়া নিজের অসদিচ্ছা জানায়। সূর্য্যমণি অস্বীকার করায় দুর্বৃত্ত বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাকে কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইবার সময় স্ত্রীলোকটির ক্রন্দন শুনিয়া বাঁশরীভূষণ মুখোপাধ্যায় নামক এক যুবক লাথি মারিয়া গোরাটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সূর্য্যমণির উদ্ধার সাধন করেন। ইত্যবসরে নরপশুটা উঠিয়া পলায়ন করে।

এরূপ অবস্থায় সকল যুবকেরই এইরূপ প্রশংসনীয় কাজ করা উচিত।

—

লবণের শুল্ক

অধিকাংশ সভ্যের মতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রথমে লবণের শুল্ক মণকরা পাঁচ সিকার পরিবর্ত্তে দশ আনা করিয়া দেন। তাহাতে লবণের দাম সেরকরা এক পয়সা কমিত। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পরিষদের নিকট উপস্থিত করেন। ইহাতে গবর্ন্মেণ্টের ধামাধরা লোকের সংখ্যা অনেক। এই পরিষদ ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ উল্টাইয়া দিয়া পাঁচ সিকা শুল্কই বজায় রাখেন। তখন সরকার বাহাদুর বিষয়টি আবার ব্যবস্থাপক সভার নিকট পেশ করেন। ইতিমধ্যেই দেশের অবস্থা এত ভাল হইয়া গিয়াছে, যে, উহার অধিকাংশ সভ্য নিজেদের পূর্ব্ব নির্দ্ধারণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া শুল্ক আবার পাঁচ সিকাই করেন। এরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত লোকদিগকে দেশের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা মহা ভ্রম।

—

জাতীয় ভাষা

রাষ্ট্রীয় পরিষদে সম্প্রতি শেঠ গোবিন্দদাস এই প্রস্তাব করেন, যে, ভারত গবর্ন্মেণ্টের ব্যবস্থা-পরিষদে সভ্যদিগকে হিন্দী বা উর্দ্দুতে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হউক এবং তাহা ছাপাইবার ব্যবস্থা করা হউক। তিনি বলেন, জাতীয় ভাষা ব্যতীত স্বরাজ অর্থশূন্য হইবে, এবং দেশের সীমান্ত রক্ষা করা অপেক্ষা মাতৃভাষা রক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

সমগ্র ভারতের কিম্বা শুধু ব্রিটিশশাসিত ভারতের অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা হিন্দী বা উর্দ্দু নহে। যদি অধিকাংশের মাতৃভাষা তাহা হইত, তাহা হইলেও অল্পাংশের মাতৃভাষাগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া, ভোটের জোরে কেবল হিন্দুস্থানী চালান উচিত হইত না। ব্যবস্থাপক সভায় মাতৃভাষা না চালাইলেই যে তাহা রক্ষিত হইবে না, এমন নয়। লীগ্ অব্ নেশুন্সের কার্য্যনির্ব্বাহ ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় হয়। কিন্তু লীগের সভ্য সাতান্নটি দেশে আরও বিস্তর ভাষা প্রচলিত আছে। লীগে তাহা চলে না বলিয়া সেগুলি লোপ পাইতেছে না। মাতৃভাষার রক্ষা এবং উন্নতির চেষ্টা আমরাও অল্পস্বল্প করিয়া থাকি, কিন্তু সীমান্ত রক্ষা করা অপেক্ষা ব্যবস্থাপক সভায় মাতৃভাষা চালান গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি না। গুরুতর মনে করি বা না-করি, গুরু মনে করিতাম, যদি দেশের মাতৃভাষা একটাই হইত, এবং তাহা অবহেলা করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ইংরেজী চালান হইত।

ইহা সম্ভব, যে, ইংরেজী জানেন না এমন কোন কোন ব্যক্তি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হইয়াছেন বা হইতে

পারেন। ইংরেজী বক্তৃতা, প্রস্তাব ও তর্কবিতর্ক তাঁহারা বুঝিতে পারেন না বা পারিবেন না। কিন্তু হিন্দী বা উর্দ্দু বুঝিতে অক্ষম সভ্যের সংখ্যা ইংরেজী না-জানা সভ্যের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। সুতরাং হিন্দী উর্দ্দু চালাইলে কাজের অসুবিধা বেশী বই কম হইবে না।

সমগ্রভারতে প্রচলিত যদি কোন ভারতীয় ভাষা থাকিত, তাহা হইলে, "জাতীয় ভাষা ভিন্ন স্বরাজ অর্থশূন্য হইবে," শেঠজির এই উক্তির আলোচনা আবশ্যক মনে করিতাম। বর্ত্তমানে কিন্তু সেরূপ কোন দেশী ভাষা নাই। হিন্দীভাষীরা তাঁহাদের ভাষা ভারতব্যাপী করিবার যে-সব সুচেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়। হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন, ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দী শিখাইবার ব্যবস্থা করা, সুচেষ্টা। কিন্তু ভোটের জোরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশের বহু ভাষার মধ্যে কেবল মাত্র হিন্দুস্থানী চালাইবার চেষ্টাকে আমরা সুচেষ্টা মনে করি না, অন্ধ গোঁড়ামি মনে করি। অন্যান্য দেশী ভাষাগুলা কি অপরাধ করিল ?

—

সমগ্রভারতীয় প্রচেষ্টাসমূহে বাঙালীর স্থান

ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, পণ্যশিল্প, প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক সমিতি, কমিটি প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহার মধ্যে কোন-কোনটা গবর্ন্মেণ্টের দ্বারা গঠিত, অনেকগুলিই বেসরকারী নেতাদের দ্বারা গঠিত। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, তাহার অনেকগুলিতে বাঙালী মোটেই নাই; কিম্বা যদি থাকে ত বঙ্গের লোকসংখ্যার অনুপাতে যত থাকা উচিত, তত নাই। ইহার কারণ কি, বাঙালীদের ভাবিয়া দেখা উচিত। যদি বাঙালীদের অযোগ্যতাই ইহার কারণ হয়, তাহা হইলে যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য, অযোগ্যতা ছাড়া কোন কোন স্থলে অন্য কারণও থাকিতে পারে। যে কারণেই হউক, অনেক প্রদেশের লোকদের বাঙালীদের প্রতি মনের ভাব ভাল নয়। সেইজন্য কখন কখন বাঙালীদিগকে বাদ দিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টাও হইতে পারে। কিন্তু এরূপ চেষ্টা দ্বারা কেবল যে বাঙালীদের অনিষ্ট করা হয় তাহা নহে, সমগ্র ভারতেরও অনিষ্ট করা হয়। ভারতীয় মহাজাতির ক্ষুদ্রতম অংশও অবজ্ঞেয় বা বর্জ্জনীয় নহে। ভারতবর্ষের অল্পসংখ্যক ন্যায়বান্ বুদ্ধিমান্ লোক বহু পূর্ব্ব হইতে"অস্পৃশ্য" ও"অনাচরণীয়" লোকদিগকে মনুষ্যোচিত মর্য্যাদা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। পরে রাজনৈতিক দায়ে পড়িয়া অন্য লোকেরাও ইহাতে আন্তরিক বা মৌখিক যোগ দিয়াছেন। যাঁহারা বাংলাকে বাদ দিয়া অগ্রসর হইতে চান, এই দৃষ্টান্ত হইতে তাঁহাদের বুঝা উচিত, যে, পরে দায়ে পড়িয়া তাঁহাদিগকে বাংলার প্রতিও কৃপাকটাক্ষ করিতে হইবে।

সমগ্রভারতীয় যে-সব প্রচেষ্টা ভাল, বঙ্গের নেতৃস্থানীয় লোকদের তাহাতে যোগ দেওয়া উচিত, উদাসীন থাকা উচিত নয়।

—

ডাকমাশুল কেন কমিল না

ডাকমাশুল কমাইবার প্রস্তাব এবারও বজেট-বিতর্কের সময় করা হইয়াছিল ; কিন্তু না-মঞ্জুর হইয়াছে।

জাপানে লোকদের জনপ্রতি গড় আয় ও ব্যয় ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী ; বাঁচিয়া থাকিবার খরচ বেশী। তথাপি জাপানে এক-একটি পোষ্টকার্ডের দাম দেড় সেন্ বা দেড় পয়সা ; চিঠির নিম্নতম মাশুল তিন পয়সা ; খবরের কাগজের নিম্নতম মাশুল আধ পয়সা।

কর্ত্তারা বলিতে পারেন, জাপান ছোট দেশ, সেখানে সংবাদপত্র পোষ্টকার্ড ও চিঠি বেশী দূর লইয়া যাইতে হয় না ; সুতরাং কম মাশুলেই ডাকবিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। আচ্ছা, তাহা হইলে ভারতবর্ষ অপেক্ষা একটা বড় দেশেরই দৃষ্টান্ত লউন। ভারতবর্ষের আয়তন ১৮,০৩,০০০ বর্গ মাইল। আমেরিকার ইউনাটেড ষ্টেট্সের আয়তন ৩০,২৬,৭৮৯ বর্গ মাইল ; আলাস্কা প্রভৃতি ধরিলে ৩৭,৪৩,৫২৯ বর্গ মাইল। যাহা হউক, তাহা না ধরিলেও ইউনাটেড্ ষ্টেট্স্ ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ বড়। এত বড় দেশে পোষ্টকার্ডের মাশুল এক সেণ্ট অর্থাৎ দু পয়সা মাত্র। অথচ আমেরিকার এই দেশে মানুষদের সাংসারিক খরচ

ভারতীয়দের চেয়ে অনেক বেশী। তদনুরূপ বেশী বেতন দিয়াও যদি তত বড় দেশে দু পয়সায় পোষ্ট-কার্ড চালান যায়, তাহা হইলে তার চেয়ে ছোট দেশ ভারতবর্ষে উহার ডাক-বিভাগের অপেক্ষাকৃত অনেক কম বেতনভোগী দেশী কর্ম্মচারীদের দ্বারা এক পয়সার পোষ্ট-কার্ড কেন চালান যাইবে না?

বিরুদ্ধবাদীদের একটা আপত্তি এই, যে, ডাকমাশুল কমাইলে তাহার সুবিধা গরীব চাষাভুষারা পাইবে না এবং পোষ্টকার্ড ও খামের কাটৃতি বাড়িবে না। কিন্তু যে বাড়িবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। গরীব চাষা-ভুষাদের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানে, তাহাদের সুবিধা নিশ্চয়ই হইবে, কিন্তু জাপান বা আমেরিকার মত বেশী লোকের সুবিধা হইবে না বটে। তাহার জন্য দায়ী কর্ত্তারা স্বয়ং। দেশের সব লোককে লিখনপঠনক্ষম করিবার চেষ্টাও করিব না, অথচ বলিব, সস্তা পোষ্টকার্ডের সুবিধা গরীব চাষাভূষা ও শ্রমিকেরা পাইবে না, সুতরা ডাকমাশুল কমাইবার দরকার নাই; এ এক চমৎকার ভণ্ডামি!

ডাকমাশুল কমান-টাও শিক্ষাবিস্তারের একটা উপায়। শিক্ষাবিস্তারের সহায়তা করিতে হইলে চিঠি পোষ্টকার্ড ছাড়া পুস্তক পাঠাইবার ডাকমাশুল এবং খবরের কাগজ পাঠাইবার ডাকমাশুলও কমান উচিত। যেমন শিক্ষা-বিভাগটাকে গবর্মেণ্ট আয়ের উপায় মনে করেন না, ডাক-বিভাগকেও কতকটা সেইরূপ জাতীয় উন্নতির উপায় স্বরূপ মনে করিয়া তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলেও তাহাতে নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। এই বিভাগে মোটা মাহিনার ফিরিঙ্গী ও ইংরেজরা যে-কাজ করে, তার চেয়ে কম বেতনে ভাল ও বেশী কাজ করিবার দেশী লোক পাওয়া যায়। এই প্রকারে ব্যয়সংক্ষেপ করা উচিত।

ডাকবিভাগের কতকগুলি অন্যায় ব্যবস্থা আছে; তাহার সংশোধন করা উচিত। ন্যূনতম দু'পয়সা খরচে বহি বিদেশে যায়, ভারতবর্ষেও উহা বহির ন্যূনতম মাশুল; কিন্তু হওয়া উচিত ভারতের পক্ষে এক পয়সা। বিলাতে চিঠি পাঠাইতে হইলে আমাদিগকে দিতে হয় দুই আনা অর্থাৎ সওয়া দুই পেনী; কিন্তু ইংরেজ-দিগকে ভারতে চিঠি পাঠাইতে হইলে লাগে দেড় পেনী। অর্থাৎ ধনী দেশ কম খরচে যে-সুবিধা পায়, গরীব দেশ সেই সুবিধার জন্য অনেক বেশী ডাকমাশুল দিতে বাধ্য হয়। আমেরিকায় চিঠি পাঠাইতে হইলে আমাদিগকে দিতে হয় তিন আনা, কিন্তু আমেরিকার লোক ভারতবর্ষে চিঠি পাঠায় পাঁচ সেণ্টে অর্থাৎ মোটামুটি দশ পয়সায়। এ ক্ষেত্রেও ধনী দেশ কম খরচে যে-সুবিধা পাইতেছে, গরীব দেশকে সেই সুবিধার জন্য বেশী খরচ করিতে হইতেছে।

ডাকমাশুল সম্বন্ধে এবৎসর এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে-সব তর্কবিতর্ক হইয়াছে, তাহাতে উহা কমাইবার পক্ষে যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহারা জাপানের, আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের বা অন্য কোন-কোন দেশের দৃষ্টান্ত কখনও দিয়াছেন বলিয়া পড়ি নাই। অথচ কোন কোন দৃষ্টান্ত আমরা একাধিক বার আমাদের ইংরেজী ও বাংলা মাসিকে দিয়াছি। অন্য সম্পাদকেরাও দিয়া থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মত উচ্চপদস্থ লোকেরা মাসিক পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, এরূপ দুরাশা পোষণ করিবার আস্পর্দ্ধা আমাদের নাই; কারণ, আমরা দেখিয়াছি, যে-সব ভারতীয় ইংরেজী দৈনিকে সমসাময়িক মত (contemporary opinion) বলিয়া নানা কাগজের মত উদ্ধৃত হয়, তাহাতে পর্য্যন্ত মডার্ন রিভিউয়ের মত, প্রস্তর-যুগের বলিয়া, কখন উদ্ধৃত হয় না। কিন্তু ইংরেজীতে জাপান ইয়ার বুক, হুইটেকার্স য়্যালম্যানাক, ষ্টেটস্‌ম্যান্স্ ইয়ার বুক প্রভৃতি যাহা বাহির হয়, এবং দৈনিক কাগজে যাহা বাহির হয়, সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কোন ব্যবস্থাপকেরই মর্য্যাদাহানির সম্ভাবনা নাই।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকবিদ্যা শিক্ষা

এমন এক সময় ছিল, যখন বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাবের দেশী ইংরেজী খবরের কাগজের সম্পাদক অনেক স্থলে ছিলেন বাঙালী। এখন বাঙালী অপেক্ষা অন্যান্য প্রদেশের লোকই এইসব অঞ্চলে দেশী ইংরেজী কাগজের

সম্পাদকতা অধিক স্থলে করেন। প্রত্যেক প্রদেশের লোক যদি নিজেদের সব রকম কাজ নিজেরাই করিতে পারেন, তাহাই সাধারণতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা ও ব্যবস্থা। কিন্তু যদি কোন প্রদেশের লোককে কোন কাজের জন্য অন্য কোন প্রদেশের লোক আমদানী করিতে হয়, তাহা হইলে যে-প্রদেশ নিকটতর, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি দূরতর প্রদেশ হইতে লোক আনিতে হয়, তবে বুঝিতে হইবে নিকটতর প্রদেশের লোকের অযোগ্যতা বা অন্য কোন দোষ ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই, আগ্রা-অযোধ্যা, দিল্লী ও পঞ্জাবে, হয়ত বিহারেও, বাংলা ডিঙাইয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতে সাংবাদিকরা গিয়া কাজ করিতেছেন। অন্য যে-কোন প্রদেশের লোক যত উন্নতি করিতে পারেন করুন, তাহাতে সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষের কোন কারণ নাই। কিন্তু যখন আমরা দেখিতেছি, যে, যে-কারণেই হউক, উত্তর ভারতে বাঙালী সাংবাদিকের স্থান না হইয়া অন্য প্রদেশের সাংবাদিকের স্থান হইতেছে, এমন কি বাংলাদেশেই একজন মাদ্রাজী সাংবাদিক পঞ্চাশ টাকার রিপোর্টারী হইতে আরম্ভ করিয়া একখানি প্রাচীন ইংরেজী দৈনিকের অন্যতর সম্পাদক ও মালিক পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন, তখন বাঙালীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, কেন এরূপ হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি প্রধান অধ্যাপকের পদে কয়েকজন অবাঙালী অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারা যোগ্য কি অযোগ্য, তাহা বলিবার বা প্রমাণ করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যে, বাঙালী নিজের বাড়ীতে কেন পরাজিত হইলেন? সাংবাদিকের কাজেও তেম্নি বাঙালীদের পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান ও নির্ণয় করা আবশ্যক।

আমরা সম্প্রতি এলাহাবাদ গিয়াছিলাম। সেখানে শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী সুবিখ্যাত কোন অধ্যাপকের মুখে শুনিয়া আসিলাম, এলাহাবাদে যে সিবিলসার্বিসাদির জন্য সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার কোন ইংরেজ পরীক্ষক বলিয়াছেন, বাঙালী পরীক্ষার্থী ছেলেদিগকে দেখিয়া বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া ধারণা হয়; কিন্তু তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের বাহিরের অনেক জ্ঞাতব্য জিনিষ পড়ে নাই, জানে না, সমসাময়িক নানা জাগতিক ব্যাপারের বিষয় অবগত নহে। ইহা সত্য হইতে পারে। কারণ, আমাদিগকে একজন ভারতীয় পুস্তক প্রকাশক একবার বলিয়াছিলেন, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য জ্ঞানগর্ভ ইংরেজী বহি (অবশ্য বাজে উপন্যাসের কথা তিনি বলেন নাই) বাংলা দেশে সকলের চেয়ে কম বিক্রী হয়। ইংরেজী পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রী হইতে আমাদের নিজের যাহা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাও ঐরূপ। আমরা যে মডার্ন্ রিভিউ নামক মাসিক কাগজ বাহির করি, তাহার গ্রাহকও বাংলা দেশেই সবচেয়ে কম, যদিও ভারতবর্ষের দেশী সব ইংরেজী মাসিকের মধ্যে ইহারই কাটতি বেশী। ইহার সম্পাদকীয় লেখার অপকর্ষ বা উৎকর্ষের বিচারক আমরা নহি; কিন্তু ইহার প্রধান প্রধান লেখকদের যে-সব প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, এবং ইহাতে যত নির্ব্বাচিত প্রবন্ধাংশ ছাপা হয়, তাহা পড়িলে পৃথিবীর নানাবিষয়ে যত জ্ঞান জন্মে, অন্য কোন ভারতীয় মাসিক পড়িলে তত জ্ঞান জন্মে না বলিলে সত্য কথাই বলা হইবে। আমরা ইহা সম্ভব মনে করি, যে, বাঙালীর ছেলেরা মডার্ন্ রিভিউ ও অন্যান্য ভাল ইংরেজী মাসিক পত্র কম পড়েন, হয়ত প্রধানতঃ গল্পপ্রধান বিলাতী বা দেশী মাসিক পড়েন, ইহা তাঁহাদের জাগতিক সমসাময়িক বিষয়ে অন্য কোন কোন প্রদেশের ছেলেদের চেয়ে কম জ্ঞানের অন্যতম কারণ। যাহা হউক, কারণ সম্বন্ধে আমাদের হয় ত কিছু ভ্রম হইতে পারে, বিশেষতঃ মডার্ন্ রিভিউ প্রভৃতি মাসিক পত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয় ত কতকটা ভ্রান্ত হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, যে, বাঙালীর ছেলেদের বুদ্ধি যেরূপ, জাগতিক নানা বিষয়ের জ্ঞান সেরূপ নহে। সম্ভবতঃ তাহাদের জ্ঞানের এই অল্পতার জন্য তাহারা বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও অনেক স্থলে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়, এবং নানা বিষয়ে ওয়াকিফ-হাল না হওয়ায় তাহারা উৎকৃষ্ট সাংবাদিক হইতেও পারে না।

আগে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কলেজ ছিল না। এখন সকল প্রদেশেই এইরূপ কলেজ স্থাপিত

হইয়াছে। কিন্তু সেকালেও অনেক উৎকৃষ্ট শিক্ষক ছিলেন। তেম্নি, যদিও ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই সাংবাদিক প্রস্তুত করিবার কোন ব্যবস্থা নাই, তথাপি এ-পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কয়েকজন সাংবাদিক কৃতিত্ব দ্বারা সাফল্য লাভ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজের মৃত ও জীবিত কয়েক জন বাঙালী সম্পাদকও আছেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও ইহা স্বীকার করা যায় না, যে, শিক্ষাদান-বিদ্যা ও সাংবাদিক-বিদ্যা শিখাইবার প্রয়োজন নাই। রীতিমত শিক্ষা না পাইয়াও অনেকে ভাল শিক্ষকও ভাল সাংবাদিক হইতে পারেন বটে, কিন্তু শিক্ষকশ্রেণীর ও সাংবাদিকশ্রেণীর শ্রেণী হিসাবে উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। আগে আগে সব দেশেই নানাপ্রকার শিল্পী কারিগর ও মিস্ত্রী কার-খানায় দেখিয়া শুনিয়া হাতে-হেতেরে কাজ শিখিত; এইরূপ রীতির কতকগুলা সুবিধাও আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সব দেশেই শিল্প কারিগরী প্রভৃতি শিখাইবার নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা হইতেও সাংবাদিক-বিদ্যা শিখাইবার বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইবে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও আমি এরূপ শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করি। আমি প্রথম প্রথম সখ ও বাতিকের বশবর্ত্তী হইয়া সাংবাদিকের কাজ করিতাম। তাহার পর যখন কলেজবিশেষের কর্ত্তাদের সহিত মতের মিল না হওয়ায় অধ্যক্ষের পদ ছাড়িয়া দিলাম, তখন পেশাদার সাংবাদিক হইলাম। আমি দৈনিক কাগজ কখনও চালাই নাই, মাসিক চালাই। তাহাতেও কিন্তু শিক্ষার অভাব বরাবর অনুভব করিয়াছি, এখনও করিতেছি। রাষ্ট্রনীতি, আইন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, যুদ্ধ, মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য, চারু ও কারু শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্যের রীতিনীতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে লোকচলাচল, শ্রমিক-সমস্যা, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিবারণ, বেশ্যাবৃত্তির জন্য দেশবিদেশে স্ত্রীলোক আমদানী রপ্তানী নিবারণ, প্রভৃতি কোন বিষয়েরই চলনসই রকমেরও জ্ঞান না থাকায় আমাকে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিতে হয়। তবে, অনেকদিন এই কাজ করিতেছি বলিয়া কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া লইতে পারি। কিন্তু অতঃপর যাঁহারা সাংবাদিক হইবেন, তাঁহাদের হাতুড়ে হইলে চলিবে না। ভাল সাংবাদিক হইতে হইলে উক্ত নানা বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান এবং অন্ততঃ প্রথম চারি পাঁচটির মধ্যে একটির বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। ইহাও সঙ্কোচের সহিত বলিতেছি; কারণ, এমন কোন বিদ্যা হঠাৎ মনে পড়িতেছে না, যাহা সাংবাদিকের কাজে না লাগিতে পারে।

সাংবাদিকদের নিজের সুবিধার জন্যই যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা নহে। জগতের ও দেশের হিতের জন্যও ইহা আবশ্যক। সত্য বটে, আমাদের দেশে অনেক লোক অন্য কাজের ও অন্যবিধ শিক্ষার অভাবে শিক্ষকের বা সাংবাদিকের কাজ করেন (আমি স্বীকার করিতেছি আমিও তাহা করিয়াছি)। কিন্তু দেশের মঙ্গল করিতে হইলে, গালাগালি ও দলাদলিতে পারদর্শিতার পরিবর্ত্তে অন্যবিধ এবং শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। খবরের কাগজের সৃষ্টির পূর্ব্বে যে-শ্রেণীর লোক যতই প্রভাবশালী থাকুন না, বর্ত্তমান জগতে খবরের কাগজের প্রভাব খুব বেশী। বক্তাদেরও প্রভাব বেশী বটে, কিন্তু খবরের কাগজে তাঁহাদের বক্তৃতার অনুলেখন বাহির না হইলে তাঁহাদের প্রভাব স্থানে ও কালে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে। এইজন্য সংবাদপত্রে যাঁহারা লেখেন ও যাঁহারা কাগজ চালান, তাঁহাদের খুব যোগ্য লোক হওয়া দরকার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও উন্নতির জন্য স্যার মাইকেল স্যাড্‌লারের সভাপতিত্বে যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহাতে সাংবাদিক-বিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত প্রস্তাবিত হইয়াছে। সম্প্রতি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়টির বিবেচনা করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবিষয়ে পিছাইয়া থাকা উচিত নয়। টাকার অভাব ইহার আছে বটে। কিন্তু ইহার কয়েকটি অধ্যাপকের পদ আছে, যাহার বেতন খুব বেশী, কিন্তু কাজ কিছুই নাই বা অতি সামান্য। বস্তুতঃ এমন অধ্যাপকের নাম করা যাইতে পারে যাহার বা যাহাদের দ্বারা এপর্য্যন্ত একদিনও অধ্যাপনা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের

নায়কের অধীনে যুদ্ধ করিত। এখন দেশী সেনানায়কদের সে-অধিকার ত লুপ্ত হইয়াছেই, সিপাহীদের নেতৃত্বও ইংরেজ অফিসারদের হাতে গিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল, গুটিকতক দেশী লোককে এই নেতৃত্বের নিম্নতম ও নিম্নতর কয়েকটি কাজ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহা অতি সামান্য।

ভারতীয় সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ ভারতীয় করা নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু তাহা করিতে হইলে সিপাহীদের ছোট হইতে সকলের বড় পর্য্যন্ত সকল সেনানায়ক দেশী হওয়া চাই, গোরা সাধারণ সৈন্য ও ইংরেজ ছোট বড় সব সেনানায়ককে শীঘ্র শীঘ্র কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদায় দেওয়া চাই, এবং একমাত্র ভারতীয় সিপাহীদিগকে পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজী, আকাশযোদ্ধদল—সকল দলে, প্রবেশাধিকার ও শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হওয়া চাই। কিন্তু ইংরেজরা এরূপ স্বার্থান্ধ, যে, ভারতীয় সৈন্যদলের এইপ্রকার ভারতীয়তা-পাদন তাহারা অসম্ভব মনে করে। অনেক ইংরেজের এইরূপ অকপট বিশ্বাস থাকিতে পারে। কিন্তু যাহারা জানে, যে, ইংলণ্ডও এক সময় পরাধীন ছিল, ফ্রান্সও বিজিত হইয়াছিল, আমেরিকাও পরাধীন ছিল, অথচ এখন এইসব ও অন্য অনেক স্বাধীন দেশের সম্পূর্ণ জাতীয় সৈন্যদল আছে, তাহারা যদি বলে, যে, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণরূপ জাতীয় ফৌজ থাকা অসম্ভব, তাহা হইলে তাহাদের উক্তির অকপটতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

যে কারণেই হউক, ভারত গবর্মেণ্ট সিপাহী সৈন্য-দলের ভারতীয়তা-পাদনের জন্য একটা কমিটি বসাইয়াছিলেন। তাহার রিপোর্টের একটা সংক্ষিপ্তসার সরকার প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখিলাম, ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষে বিলাতী স্যাণ্ডহার্ষ্টের মত একটা সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কমিটি সুপারিস্ করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরের আগে কেন তাহা স্থাপিত হইতে পারে না, সংক্ষিপ্তসারে তাহা লেখা নাই। বিলম্বের এই একটা সুবিধা আছে, যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে লোকে কথাটা ভুলিয়া যাইতে পারে, এবং পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে ও জগতে যত ঘটনা ঘটিবে, তাহার মধ্যে ঐ কলেজটা স্থাপন না-করিবার পক্ষে যুক্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এই কলেজে ছাত্র লওয়া হইবে প্রধানতঃ প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া—সেরূপ পরীক্ষা দিবার অধিকার সকল প্রদেশের, জাতির, ধর্ম্মের ও শ্রেণীর লোকদের থাকিবে। কমিটির ইহা অন্যতম সুপারিস। ইহা সমর্থনযোগ্য।

এই কলেজে কমিটি প্রতিবৎসর যত ছাত্র লইবার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহারা যদি **সকলেই** ঠিক্ ঠিক্ সময়ের মধ্যে শিক্ষিত হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং কাজ পায়, তাহা হইলে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর পরে সিপাহীদের সেনানায়ক অফিসারদিগের অর্দ্ধেক হইবে ভারতীয়, অর্দ্ধেক ব্রিটিশ থাকিয়া যাইবে। তার পর কি হইবে, অর্থাৎ সমুদয় অফিসার ক্রমে ক্রমে কোন কালেও ভারতীয় হইবে কি না, সে-বিষয়ে কমিটি একেবারে চুপ! ভারতবর্ষের প্রতি এতটা ন্যায়বিচার ও বদান্যতা করিয়া ফেলিয়া কমিটি বোধ হয় স্তম্ভিত ও হায়রান হইয়া পড়িয়াছেন! তাই আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয় নাই। যাহা হউক, প্রত্যেক সামরিক ছাত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বা বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অফিসারদের অর্দ্ধেক ভারতীয় হইতে পঁচিশ বৎসরের পরিবর্ত্তে পঞ্চাশ বৎসর লাগিতে পারে। ততদিনে, জগতের পরিবর্ত্তনে, ইংরেজরা আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা থাকিবার মত শক্তিশালী থাকিবে কি না, কে জানে?

কমিটির আর-একটা সুপারিস এই, যে, ভারতীয় সৈন্যদিগকে গোলন্দাজী বিভাগ, আকাশযুদ্ধ বিভাগ প্রভৃতিতে প্রবেশাধিকার দিতে হইবে—অবশ্য ইংরেজরা যেরূপ যোগ্যতা দেখাইয়া এইসব দলে ভর্ত্তি হয় সেইরূপ যোগ্যতা দেখাইয়া। এই প্রস্তাবটিও ভাল।

কিন্তু কমিটি যেরূপ প্রস্তাবই করুন না, তাহা যে কার্য্যে পরিণত হইবে না, সরকারী সংক্ষিপ্তসারের ভূমিকাতেই গবর্মেণ্ট তাহার আভাস দিয়াছেন। বলিয়া-ছেন, কমিটির যে-সব বিষয় আলোচনা করিবার কথা নয় এবং অধিকার ছিল না, এরকম অনেক বিষয়

বিবেচনা করিতে হইবে। ব্যাপারটি ত শুধু ভারতবর্ষীয় নয়, ইহা ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ব্যাপার; অতএব কমিটির রিপোর্ট সাম্রাজ্যিক রক্ষা-কমিটি (Imperial Defence Committee) কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। মান্দ্রাজের স্যার শিবস্বামী আইয়ার একজন খুব বড় মডারেট বা উদারনৈতিক। তিনি যথাসাধ্য গবর্ন্মেণ্টের সুমৎলব ও সুকার্য্যের প্রশংসা করেন। তিনি ভারতীয় সৈন্যদলবিষয়ক সব প্রশ্ন ও সমস্যা উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার মত লোকও বলিতেছেন, গবর্ন্মেণ্টের গৌরচন্দ্রিকাটা হইতে মনে হয়, কাজে কিছু হইবে না।

যদি কমিটির সব সুপারিস কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলেও তাহা ভারতবর্ষের ন্যায্য দাবীর অনুরূপ হইত না। অতএব, কোন সুপারিস যদি কার্য্যে পরিণত না হয়, তাই ভাল। একটা মত আছে বটে, যে, যা পাওয়া যায় তা খুব কম হইলেও লওয়া ভাল, এবং পরে আরও বেশী চাওয়া ভাল। কিন্তু যাহা যথেষ্ট নয়, ন্যায্য পাওনার অনুরূপ নয়, তাহা লইলে ন্যায্য যাহা তাহা যাইবার পথে বাধা ঘটে। কর্ত্তারা যেমন বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাদি সম্পর্কে বলিতেছেন, "এইগুলা ভাল ছেলের মত সন্তুষ্টচিত্তে চালাইয়া দেখাও, যে, তোমরা লায়েক হইয়াছ, তারপর আরও কিছু দেওয়া যায় কি না, দেখা যাবে", তেমনি সামরিক কমিটির প্রস্তাবগুলা সম্বন্ধেও বলিতে পারেন, "১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত কি হয় দেখা যাক্‌, তোমরা কেমন রাজভক্ত থাক ও লায়েক হও দেখা যাক, তারপর বিবেচনা করা যাবে।" অতএব ভারতীয় কোন রাজনৈতিক দল যদি কমিটির সুপারিশগুলি অনুসারে কাজ হওয়ার জন্য দাবী করেন, তাহা হইলে মহাভ্রম করিবেন।

কাশীতে একশ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহাদিগকে পূর্ণভাণ্ডী বলে। তাঁহারা মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রটি পূর্ণ করিয়া দেওয়া চাই। এইজন্য তাঁহারা গৃহস্থের দ্বারে গিয়া বলেন, "বহী লেঙ্গে," "উহাই লইব", এবং কেহ পাত্রটি ভরিয়া দিলে "বহী লিয়া", "উহাই লইয়াছি" বলিয়া চলিয়া যান।

আমাদিগকেও পূর্ণভাণ্ডী হইতে হইবে। আমাদিগকে বরাবরই অল্প কিছু দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইংরেজ রাজনৈতিকদের আর-একটা চাতুরী আছে, যে, তাহারা অল্প কিছু দিলেই তাহাদের মধ্যে একদল চীৎকার জুড়িয়া দেয়, "সর্ব্বনাশ! মহাবিপদ উপস্থিত! ভারতবর্ষকে এমন কিছু দেওয়া হইতেছে যাহাতে মহা বিপ্লব ঘটিবে, এবং সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষ উচ্ছন্ন যাইবে!" ইত্যাদি। ইহাকে বলে রাজনৈতিক দোকানদারী। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, আমরা এই কোলাহল শুনিয়া যেন মনে করি, যে, অতি অপূর্ব্ব রত্ন আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে, এবং তাহার জন্য কাড়াকাড়ি করি। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, যে, ইংরেজরা কার্য্যতঃ আমাদিগকে যখন যাহা দিয়াছে, তাহার কিছুই আমাদের ন্যায্য পাওনার তুলনায় গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা অতি সামান্য, এবং তাহাতে বিস্তর অনিষ্টকর খাদ মিশান আছে।

—

বার্কেন্‌হেডের বিরক্তিকর পুনরুক্তি

ভারতসচিব লর্ড বার্কেন্‌হেড্‌ আবার তাঁহার পুরাতন বুলি ঝাড়িয়াছেন—"পূর্ণমাত্রায় আমাদের সহিত সহযোগিতা কর, ভারতশাসন-সংস্কার আইন অনুসারে যতটা কাজ হইতে পারে করিয়া দেখাও, তাহার পর তাহাতে আমাদের সন্তোষ হইলে আমরা আরও কি করা যাইবে বিবেচনা করিব," এইরূপ মর্ম্মের কথা। কিন্তু সহযোগিতা করিলে কর্ত্তারা কি আকাশের চাঁদ আমাদের হাতে তুলিয়া দিতেন, এবং কখন্‌ দিবেন, তাহা বলিবার নাম-গন্ধ নাই। কখন্‌ দিবেন, তাহা ত তিনি বলিতেই পারেন না; কারণ তিনি কোন তারিখের দাস নহেন ("not a slave to dates")। কিন্তু তারিখের দাসত্ব হইতে স্বাধীনতা সত্ত্বেও, ১৯২৯এর আগে যে ভারতশাসন-প্রণালী সম্বন্ধে বিবেচনা হইতে পারে, ভুলিয়াও তাহা বলিতেছেন না।

বার বার ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক খবরের কাগজে বলা হইয়াছে, যে, নূতন ব্যবস্থাপক সভার প্রথম তিন বৎসর ত পূর্ণ সহযোগিতা হইয়াছিল। তখন কর্ত্তারা কেন কিছু করেন নাই? স্বরাজ্য দলের ঘোষিত বাধাদান নীতি সত্ত্বেও তাঁহারা দ্বিতীয়বার গঠিত অধিকাংশ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে যে কার্য্যতঃ সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সভাগুলিতেও করিতেছেন, তাহাতে ভারতসচিবের মত বদ্‌লায় নাই। ভারতবর্ষে যত রাজনৈতিক দল আছে, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির যত নির্ব্বাচিত সভ্য আছেন, বিন্দুমাত্র বাধাদানের চিন্তাও যদি সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলেও কি আকাশের চাঁদ পাইবার কোন সম্ভাবনা আছে? কখনই না। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে ইংরেজ রাজনৈতিকরা বলিতে আরম্ভ করিবেন, "বাঃ, আমরা কেমন খাসা শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছি! কেহ আর বাধাদানের নামমাত্র করে না, সমালোচনার কথাটি মাত্র নাই, প্রজাকুল সন্তোষের গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন! অতএব ১৯১৯ ঈশাব্দে প্রবর্ত্তিত ভারতশাসনসংস্কার আইন অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতে থাকুক।"

—

"কংগ্রেস আর জাতীয় নাই"

বার্কেন্‌হেড আর-একটা বড় হাসির কথা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের কংগ্রেস্ নাকি এক সময়ে জাতীয় ছিল, এখন আর জাতীয় নাই! কিন্তু কংগ্রেস্ স্বরাজ্যদলের নামান্তর হইবার পূর্ব্বেও সরকার তাহাকে জাতির প্রতিনিধি মনে করিতেন না; অসহযোগ নীতি কংগ্রেসে গৃহীত হইবার পূর্ব্বেও তাহা জাতির প্রতিনিধি বিবেচিত হইত না। আরম্ভের দিক্ হইতে ধরিলে বলা যায়, সুরাটে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের বিচ্ছেদের আগে উহা দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া আমলাতন্ত্র দ্বারা উপহসিত হইত; ১৯০৭এর পর কয়েক বৎসর উহা চরমপন্থী বা গরমপন্থীদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিদ্রূপভাজন ও বিদ্বেষের পাত্র ছিল, এবং উহাতে উভয় দলের একত্র সমাবেশের পরও গবর্ন্মেণ্ট কখন উহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ন্যাশন্যাল লিবার্যাল ফিডারেশান বা জাতীয় উদারনৈতিক সংঘ জন্মিয়া অবধি বৈধ আন্দোলন করিতেছেন এবং বরলাভের আশা করিতেছেন। তাঁহাদের উপরও ত সরকারের নেক নজর হইল না।

যে-মাছটা পলায় সেইটায় যেমন বড়, অতীতও তেমনি মহিমাময়! কংগ্রেসের ইতিহাসে গবর্ন্মেণ্ট কখনও উহাকে জাতীয় মনে করেন নাই, উহার কথায় কান দেন নাই। সুতরাং এখন, উহা জাতীয় নয়, বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে বক্তা নিজেই হাস্যাস্পদ হন।

বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের অধিবাসী সব ধর্ম্মসম্প্রদায়, সব জাতি, সব শ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেস হউক বা না হউক, কংগ্রেসের প্রধান দাবী যে স্বরাজ, মুসলিম লীগেরও প্রধান দাবী তাহাই, জাতীয় উদারনৈতিক সংঘের প্রধান দাবীও তাহাই, অ-ব্রাহ্মণদলের প্রধান দাবীও তাহাই। অবশ্য অবান্তর বিষয়ে সকলের দাবীতে কিছু কিছু তফাৎ আছে। কিন্তু সকলেই যখন স্বরাজ বলিতে ঔপনিবেশিক আত্ম-শাসন-অধিকার বুঝে এবং তাহা চায়, তখন তাহাকেই জাতীয় দাবী মনে করা যুক্তিসঙ্গত। তাহাই জাতীয় দাবী বলিয়া মানিয়া লইয়া গবর্ন্মেণ্ট যদি বলেন, যে, সব দলের লোক একত্র হইয়া অবান্তর বিষয়েও প্রভেদবর্জ্জিত একটি রাষ্ট্রীয়কার্য্য পরিচালন বিধির খসড়া প্রস্তুত করুন, তাহা হইলে তাহা করা অসাধ্য হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করা ত ইংরেজ রাজনৈতিকদের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং তাঁহাদের খুঁৎ ধরিবার প্রবৃত্তিই সর্ব্বদা সক্রিয় হইয়া আছে।

—

"হিন্দুর ভবিষ্যৎ"

মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর হইতে প্রকাশিত শান্তিবার্ত্তা নামক কাগজে "হিন্দুর ভবিষ্যৎ" নাম দিয়া যে-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন জাতির লোকসংখ্যা যেরূপ কমিতেছে, আর ২৫ বৎসর সেইরূপ কমিতে থাকিলে তাহাদের "ধ্বংস অনিবার্য্য"। সম্পাদক বলিতেছেন,

এই সংখ্যা হ্রাসের একমাত্র কারণ প্রচলিত বিবাহপ্রথা। ইহাদের বিবাহযোগ্যা কন্যার সংখ্যা অতি কম। দুই বা আড়াই শত টাকা পণ না প্রদান করিলে কোন পুরুষই বিবাহ করিতে সক্ষম হয় না। পণ ব্যতীত আরও দেড় শত টাকা বিবাহের বস্ত্রাদি এবং সামাজিক বিধি পালন করিতে প্রয়োজন হয়। এই সাড়ে তিন বা চারিশত টাকা সংগ্রহ করা সকলের ভাগে৷ জুটিয়া উঠে না। সেজন্য প্রায় অর্দ্ধেক পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না, চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। যে অতি কষ্টে এই টাকা সংগ্রহ করিয়া বিবাহ করে, সেও বয়ঃপ্রাপ্ত উপযুক্ত মেয়ে পায় না। টাকা সংগ্রহ করিয়া ৩৫।৪০ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তখন স্ত্রীর বয়স অধিক হইলেও ৮।৯ বৎসর মাত্র। স্ত্রী যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন স্বামী বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়। কেহ বা মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। এই সকল কারণে ইহাদের সন্তানসংখ্যা অধিক হয় না। বালবিধবা বা বিধবার সংখ্যা অনেক বেশী। প্রকৃতির দুর্দ্দমনীয় শক্তিকে সংযত করিবার শক্তিও সকল বিধবার সমান থাকে না। সেজন্য ভ্রূণহত্যাও বিরল নহে।

আমাদের নিজ পল্লী যশোহরের ঢাকুরিয়ায় প্রায় ১০ ঘর নাপিত, ৫ ঘর কামার, ১৫ ঘর তেলি, ৩ ঘর ধোপা বাস করিত। ২০ বৎসর মধ্যে নাপিত ২ ঘর, কামার ১ ঘর এবং তেলি ৫ ঘর আসিয়া পৌছিয়াছে। নাপিতের মধ্যে যে দুই ঘর এখনো আছে, তাহাদের দুইজন মাত্র বিবাহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু দেনায় ব্যতিব্যস্ত। অপর জন বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর আর টাকার সংস্থান করিতে পারে নাই। একজন তেলি ৪৫ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছে, তাহার স্ত্রীর বয়স ৬ বৎসর মাত্র। ইহার পরিণাম সহজেই অনুমেয়। অধিকাংশ ধোপার বংশ লোপ পাইয়াছে, বর্ত্তমানে প্রয়োজন অনুরূপ ধোপাই মিলিতেছে না।

খাজুরার নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীতে ১২ ঘর বেহারা বাস করিত। জনসংখ্যায় তাহারা ছিল এক শতেরও উপর। বর্ত্তমানে মাত্র দুই ঘর আছে, আর সকলেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক বাড়ীতে তিন ভাই বাস করে, তাহাদের মধ্যে মাত্র জ্যেষ্ঠের বিবাহ হইয়াছে, তাহাও ৪০ বৎসর বয়সে। তিন ভাই চাকুরী ও চাষ করিয়া যে সামান্য টাকা জমাইতে পারিয়াছিল, তাহা ব্যতীতও একশত টাকা গ্রাম্য জমিদারের নিকট ধার করিয়াছিল। সেই টাকা তিন ভাই খাটিয়া আজ ৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে না পারিয়া গোপনে বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে পারিলে এইসকল সম্প্রদায় রক্ষা হইতে পারে। প্রত্যেকেই বিবাহ করিতে আগ্রহান্বিত, কিন্তু সামাজিক ভীতি তাহার প্রবল অন্তরায়। যদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ইহাদের বিধবা-বিবাহে উৎসাহ প্রদান করেন, তবে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। ইহার আর কোন সহজ উপায় নাই।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সম্প্রদায়ে বিবাহের পণ-প্রথা প্রচলিত আছে।

কিন্তু সে কন্যার বিবাহে। কন্যার বিবাহ বাধ্য হইয়া সকলকেই দিতে হয়। সেজন্য এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক দুর্দ্দশা ব্যতীত লোকসংখ্যা হ্রাসের ভয় নাই। কিন্তু নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত পণপ্রথায় হিন্দুর সংখ্যা প্রবল ভাবে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি কেন্দ্রে প্রচারক প্রেরণ করিয়া এইরূপ পুত্রপণের প্রথা রহিত করিবার প্রবল আন্দোলন করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, পণপ্রথা বন্ধ করা এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করা ব্যতীত বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আর কোনই আশা নাই।

ব্রাহ্মণসভা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ভাল হয়। মৈমনসিংহে অনেক শিক্ষিত ও দেশহিতৈষী জমিদার আছেন। তাঁহারা প্রতিকারচেষ্টা করিলে সুফল ফলিবে। মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় এবার বঙ্গীয় হিন্দুসভার অধিবেশনে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। এই বিষয়টির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তাঁহার পক্ষে কাজ করা একটুকুও কঠিন হইবে না।

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতেও এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান। কিন্তু সমুচিত প্রতিকার-চেষ্টা হইতেছে না। কিছুই হইতেছে না, বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না। বিধবাবিবাহ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইতেছে, কিন্তু পঞ্জাবের তুলনায় বঙ্গে বিধবাবিবাহ অল্পই হইতেছে।

—

বাঙালী বিধবার পঞ্জাবে বিবাহ

অনেক বাঙালী বিধবার পঞ্জাবীর সহিত বিবাহ হইতেছে। যে যে পুরুষ ও নারীর মাতৃভাষা এক, সচরাচর তাহাদের মধ্যে বিবাহই হইয়া থাকে, এবং তাহাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সচ্চরিত্র এবং পরিবার প্রতিপালনক্ষম যাহারই সহিত বিবাহ হউক, তাহাতে আপত্তি বা অসন্তোষের কোন কারণ নাই। অসৎ লোকের সহিত বিবাহ অবাঞ্ছনীয়—সে যে প্রদেশেরই হউক।

ভারতবর্ষে একটি প্রবল সুসংহত জাতি গঠিত হইবার বাধা অনেক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হয় না, সে এক বাধা। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে বিবাহ হয় না, তাহা আর-এক বাধা। পঞ্জাবে ও বঙ্গে ঔদ্বাহিক সম্বন্ধ হইলে এই বাধা কতকটা অতিক্রান্ত হইবে।

বাঙালীর কিন্তু ভাবিবার দুটি বিষয় আছে। পাত্রীর অভাবে বা মহার্ঘতায় বাংলা দেশে অনেক পুরুষের বিবাহ না হওয়ায় তাহাদের বংশলোপ, সুতরাং বাঙালী হিন্দুর সংখ্যাহ্রাস হইতেছে। বাঙালী বিধবাদের বিবাহ বঙ্গেই হইলে এই বংশলোপ ও সংখ্যাহ্রাস কতকটা নিবারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে-সব বিধবার বঙ্গে বিবাহ না হওয়ায় পঞ্জাবীর সহিত বিবাহ হইতেছে, তাঁহাদের মনে যদি তজ্জন্য বঙ্গের প্রতি বিরাগ ও দ্বেষের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে তাহা তাঁহাদের সন্তানদের মনেও সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা। ইহা প্রদেশে প্রদেশে সদ্ভাবের কিছু অন্তরায় হইতে পারে। যে-সব হিন্দু-বিধবা, যে-কারণেই হউক, মুসলমানী হন, তাঁহাদের নিজের হিন্দু-বিদ্বেষ ও তাঁহাদের মুসলমান সন্তানদের হিন্দুবিদ্বেষ উৎপন্ন হওয়া যেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তেমনি কোন বাঙালী হিন্দুবিধবাকে অগত্যা ভিন্ন প্রদেশে বিবাহ করিতে হইলে বাংলার প্রতি তাঁহার ও তাঁহার সন্তানদের অসন্তোষ জন্মিলে তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ইহা অবশ্য আমাদের অনুমান। কাহারও এরূপ অসন্তোষ জন্মে নাই জানিতে পারিলে আহ্লাদিত হইব। বাংলা, পঞ্জাব প্রভৃতি সব প্রদেশই ত ভারতবর্ষেরই অংশ।

—

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস

গত ২০শে চৈত্র যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবসের বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটিতে এখন প্রধানতঃ কয়েক প্রকারের বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা প্রায়ই চাকরী দ্বারা বা স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহে সক্ষম হন। ইহাতে দেশের উপকার হইতেছে। ইহার স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন :—

"বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সাহায্যে কার্য্যকরী শিক্ষার প্রসার করাই বর্ত্তমানে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে এপর্য্যন্ত এই ইনষ্টিটিউটে তিনটী বিভাগ খোলা হইয়াছে। যথা :—মিকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এতদ্ভিন্ন একটি কৃষি-বিভাগ খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। এইজন্য একশত বিঘা জমি চাই। কর্পোরেশন এবং ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের নিকট এইজন্য আবেদন করা হইয়াছে।"

"এখনও অনেক কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। লেবরেটারী পূর্ণাঙ্গ করার জন্য টাকার প্রয়োজন। আরও কতিপয় শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন এবং সর্ব্বোপরি ছাত্রাবাস সম্প্রসারণ দ্বারা সমস্ত ছাত্রের বাসস্থান এখানে করা প্রয়োজন। তাহা না করিতে পারায় আমাদের উদ্দেশ্যানুরূপ শিক্ষাদানের বিঘ্ন ঘটিতেছে। তার পর, এখনও শিক্ষা-পরিষদের ঋণের পরিমাণ প্রায় চারি লক্ষ। এইসমস্ত অভাব-অভিযোগ পূরণ করার ভার দেশবাসীর উপর। আমি আশা করি, দেশের ধনী, মানী ভদ্রমহোদয়গণ এদিকে মনোযোগ দিবেন এবং যাহাতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার উপায় করিবেন।"

জাতীয় এই প্রতিষ্ঠানটির অধ্যাপকেরা সরকারী কোন

শিক্ষালয়ের অধ্যাপকদের চেয়ে কম যোগ্য নন। অথচ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা বিদেশীদের পরিচালিত বা সরকারী কলকারখানায় কাজ পান না। আচার্য্য রায় এদিকে স্বদেশবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সরকার বাহাদুর এবং বিদেশী বণিকগণ আমরা বিদেশী পণ্য বর্জ্জন বা বয়কট করিলে বড় ক্রুদ্ধ হন; কিন্তু নিজেরা যে আমাদের প্রতিষ্ঠানাদিকে বয়কট করেন, তাহাতে দোষ হয় না। "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়।" সে যাহা হউক, আমাদের ভাল প্রতিষ্ঠানগুলির আমরা যেন সর্ব্বদা সমুচিত আদর ও সাহায্য করিতে ভুলিয়া না যাই।

ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া আচার্য্য রায় বলেন :—

'স্থায়ী আয়ের জন্য তোমরা বড় ব্যস্ত। একটি চাকুরী পাইলেই তোমরা বাঁচিয়া যাও। ইহা তোমাদের ভুল ধারণা। যত ছোট হোক না কেন, নিজে নিজে ব্যবসা করিতে শিখ। সেইজন্যই তো এখানে তোমাদিগকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। চাকরী খুঁজিতে গিয়া তোমরা এই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া থাক। তোমরা বলিবে মূলধন কোথায়? আমার মনে হয়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও একাগ্রতা থাকিলে মূলধনের অভাব হয় না। মনে রাখিবে, এই দুই গুণ জীবনে সাফল্যলাভের উপায়।"

—

বঙ্গে ও পাঞ্জাবে কাগজের কারখানা

কলে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য পঞ্জাবে একটি বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে। ইহার কোম্পানীর অংশ বিক্রীর জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ ইউরোপীয়দের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা দেশে আসাম বেঙ্গল পেপার মিলস্ কোম্পানী নামক কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। কতক টাকাও উঠিয়াছিল। যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে ক্রীত হইয়া আসিয়া শ্যামনগরে পড়িয়া আছে। কাগজে দেখিলাম, এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে না, কাজও চলিবে না। এই ব্যর্থতার কারণ কি? সফলতার ইতিহাস এবং বিফলতার ইতিহাস, দুই-ই কাজে লাগে। সফলতার ইতিহাস হইতে শিখা যায় কেমন করিয়া কার্য্য-সিদ্ধি হয়, বিফলতার ইতিহাস হইতে ভুল-ভ্রান্তি পরিহার করিতে শিখা যায়। এইজন্য আসাম ও বঙ্গের প্রস্তাবিত কাগজের কারখানাটি কেন অঙ্কুরে বিনষ্ট হইল, তাহার কারণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিংবা অন্য কোন বিশেষজ্ঞ প্রকাশ করিলে দেশের উপকার হইবে।

—

বঙ্গীয় নারীশিক্ষার মন্ত্রণাসভা

গত ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই, ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় দেশী ও ইউরোপীয় মহিলাদের যে-সভায় বঙ্গে নারীশিক্ষার বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, যে, ইহার উদ্যোক্তাগণ খুব কার্য্যতৎপর। চারি দিনের অধিবেশনে অনেকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হয়। সেগুলিও রিপোর্টে আছে। এইজন্য ইহা মূল্যবান্। সভাতে নারীদের নিম্নতম হইতে উচ্চতম শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাব ধার্য্য হয়। সবগুলিই বিবেচনার যোগ্য। আমরা কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, বঙ্গে বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সাতিশয় অসন্তোষজনক। ইহা অতি সত্য কথা। তাহার পর বলা হইয়াছে, যে, এই প্রদেশের প্রত্যেক বালিকা অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য, এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার বর্ত্তমান বন্দোবস্ত যে ভাল ও যথেষ্ট নয়, তাহাও ঠিক্ বলা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট প্রভৃতি যে-সব সভাসমিতির দ্বারা দেশের শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হয়, তাহাতে নারী সভ্য থাকা যে প্রয়োজন, ইহাও সত্য কথা। বালিকা ও তরুণীদের দেহের উন্নতি যাহাতে হয়, ব্যায়ামাদির দ্বারা তাহার ব্যবস্থার ঔচিত্য সম্বন্ধে সভায় যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অবিলম্বে তাহাতে মন দেওয়া গবর্ন্মেণ্টের ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য। ইউরোপের ছোট ছোট মেয়েদের স্বাস্থ্যের সহিত আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্যের তুলনা করিলে কান্না পায়। বঙ্গে অতীত কাল হইতে যে-সব কারুশিল্প চলিয়া আসিতেছে, তৎসমুদয়ের উন্নতির চেষ্টা, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রেখাঙ্কন শিক্ষা, এবং চারু ও কারু শিল্প গৃহস্থালীতে কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে পারা যায় তদ্বিষয়ক শিক্ষা, প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সভা সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই বিষয় সম্পর্কে প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত কারুশিল্পের পুনরুদ্ধার প্রবন্ধটি পঠিতব্য।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, যে, বালক বা বালিকাদের শিক্ষা, সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে, গবর্ন্মেণ্টের কিংবা খৃষ্টীয় মিশনারীদের হাতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যে-সকল শিক্ষিতা বাঙালী মহিলা এই সভার কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন, আশা করি, এবিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আছে।

—

বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলন

বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বক্তৃতা অতিশয় সারবান্ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। যাঁহারা কতকগুলি জাতির বংশগত অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার বিরুদ্ধে হিন্দুশাস্ত্রীয় যুক্তি চান, তাঁহারা তাহা এই বক্তৃতায় পাইবেন। এই বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত ও রক্ষিত হওয়া উচিত। সম্মেলনে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার মধ্যে আমরা কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

"অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখার বিরুদ্ধে এই সম্মেলন তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অস্পৃশ্যতা দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে বলিতেছে।"

"যে-সকল হিন্দু বলপূর্ব্বক অন্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহাদিগকে শুদ্ধি দ্বারা হিন্দুধর্ম্মে পুনগ্রহণের নিমিত্ত এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে।"

"অহিন্দুকর্ত্তৃক যে সকল হিন্দুনারী বলপূর্ব্বক অপহৃতা হইয়াছেন, সেইসকল নারীকে শুদ্ধিদ্বারা হিন্দুসমাজে পুনগ্রহণ জন্য এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে।"

—

কাকোরী ষড়যন্ত্রের মামলার রায়

প্রায় ২ বৎসর আগে লক্ষ্ণৌয়ের নিকটবর্ত্তী কাকোরীতে রেলওয়ে একটা ট্রেনে ডাকাতি হয়। তাহার তদন্তের ফলে এক বিস্তৃত রাজদ্রোহ ও বিপ্লবের ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। সরকারপক্ষ এইরূপ বলেন। লক্ষ্ণৌয়ে স্পেশ্যাল জজ হ্যামিল্টন সাহেব এই মামলার বিচার করেন। ভারতবর্ষে যে-সমস্ত ষড়যন্ত্রের মামলা হইয়াছে এই মোকদ্দমাটিকে তাহার মধ্যে বৃহত্তম বলা হইয়াছে। ইহাতে আসামীদের বিরুদ্ধে আড়াই শত সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। যে-সব লোককে গবর্মেণ্ট বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, প্রকাশ্য আদালতে তাহাদের বিচার না করিবার এই কারণ দেখান হয়, যে, তাহা করিলে আসামীদের বিরুদ্ধে যাহারা সাক্ষী দিবে, বিপ্লবীরা বা তাহাদের সঙ্গীরা তাহাদের প্রাণ বধ করিবে। বক্ষ্যমাণ মোকদ্দমা কিন্তু প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, এবং ইহাতে ২৫০ জন লোক সাক্ষী দিয়াছে। তাহাদের কাহারও প্রাণবধ হওয়া দূরে থাকুক, গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগে নাই। এখন গবর্মেণ্ট কি বলিতে চান?

এই মোকদ্দমায় ২২ জন আসামীর মধ্যে ৩ জনের প্রাণদণ্ড, এক জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, এক জনের ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, দুই জনের ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং ছয় জনের প্রতি ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আদেশ বে-আইনী হইয়াছে বলিতে পারি না, কারণ সমুদয় সাক্ষ্য পড়ি নাই। তবে, এতগুলি যুবকের এরূপ ভীষণ শাস্তি হইলে স্বভাবতঃ লোকদের সহানুভূতি তাহাদের দিকে যায়। এইজন্য জজ যদি সরকার পক্ষের মোকদ্দমা-পরিচালকের অনুরোধ অনুসারে অল্পবয়স্ক এবং ষড়যন্ত্রের সহিত গৌণভাবে লিপ্ত আসামীদের প্রতি দয়া করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। দেশকে স্বাধীন করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় অনেকে ডাকাতি আদি দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলে। উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা ভাল বলিয়া দুষ্কর্ম্মের শাস্তি হওয়া উচিত নয়, বলিতেছি না; দণ্ড কিছু লঘু হইলে ভাল হইত বলিতেছি।

—

চীনের স্বাধীনতা-সমর

চীনের দক্ষিণের অর্থাৎ ক্যাণ্টনের দল ও উত্তরের দলের গৃহবিবাদ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছে। দক্ষিণের দল চীনকে স্বাধীন ও বিদেশীদের সর্ব্বপ্রকার প্রভুত্ব-পাশ হইতে মুক্ত করিতে চায়। আমাদের আন্তরিক কামনা, তাহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক। তাহারা উত্তরের দিকে বহুদূর অগ্রসরও হইয়াছে। তাহারা চীনের সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইয়া চীনে এক অখণ্ড সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, চীনের, এশিয়ার ও জগতের কল্যাণ হইবে।

উত্তরের দলকে ইংরেজরা অনেক দিন হইতে সাহায্য করিয়া আসিতেছে, এরূপ কথা নানা সূত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা বিশ্বাসযোগ্যও বটে।

চীনে যুদ্ধের যত খবর ভারতবর্ষে আসিতেছে, তার প্রায় সবই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ছাঁকনীর ভিতর দিয়া। সুতরাং সত্য খবর কতটা আসিতেছে বলা কঠিন। ফরাসী কোন কোন কাগজ লোককে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, যে, বিলাতী কাগজে প্রকাশিত সব খবর যেন সত্য বলিয়া মানিয়া না লওয়া হয়। নান্কিনে ইংরেজরা যে গোলাবর্ষণ করে, চীনেরা বলে তাহার ফলে দু হাজার চীন মারা গিয়াছে, এবং অর্দ্ধেকটা সহর বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইংরেজ গবর্মেণ্টের মতে ইহা মিথ্যা কথা। কিন্তু বিধাতা একমাত্র ইংরেজদিগকেই সত্যবাদী এবং অন্য সকলকে মিথ্যাবাদী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই।

এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে আমেরিকা ও জাপান পুরামাত্রায় ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিবে মনে হয় না। কারণ, সেরূপ যোগ দেওয়ায় তাহাদের লাভ নাই। জাপান চীনে নিজের বাণিজ্য বাড়াইতে চায়, আমেরিকাও তাহা চায়। চীনদিগকে চটাইলে সে-

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনও ঘনাইয়া আসিতেছে। এখন যদি প্রেসিডেণ্ট কুলিজ ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার প্রতিযোগী দল দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে। তাহাতে তাঁহার পক্ষে কিছু ভোট কমিয়া যাইতে পারে।

—

সম্মিলিত নির্ব্বাচন

ব্যবস্থাপক সভায় দেশের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী এই, যে, যে-কোন ধর্ম্মের ও জাতির লোকেরা নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইতে পারেন, এবং যাঁহাদের পক্ষে বেশী ভোট হইবে, তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন। তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অথচ কিছু ভাল বন্দোবস্ত এই, যে, সাধারণ নির্ব্বাচন ছাড়া কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট কয়েক জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের ভোটারদের দ্বারা তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন। নিকৃষ্টতম বন্দোবস্ত, সাধারণ নির্ব্বাচন ছাড়া কেবল সম্প্রদায়বিশেষ দ্বারা তাহাদের নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। এই নিকৃষ্টতম বন্দোবস্তই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রধানতঃ মুসলমানদের ইচ্ছানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহাদের কয়েক জন নেতা বলিতেছেন, যে, তাঁহারা কয়েকটি সর্ত্তে দ্বিতীয়প্রকার নির্ব্বাচনে রাজী হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাব মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা অনুমোদিত হইলে পর তবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। কোন কোন সর্ত্ত এইরূপ:—

সিন্ধুদেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পৃথক্ করিয়া একটা আলাদা নূতন প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের অধীন করিতে হইবে। সিন্ধুদেশের অনেক হিন্দু ও মুসলমান এই প্রস্তাবের বিরোধী। আমরা বাহিরের লোক; আমাদের জিজ্ঞাস্য, একটা স্বতন্ত্র প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সিন্ধুদেশ পারিবে কি?

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা ও দ্বৈরাজ্য আদি ভারত-শাসনসংস্কার আইন অনুযায়ী সমুদয় বন্দোবস্ত চালাইবার সর্ত্তও করা হইয়াছে। আমরা বাহিরের লোক জিজ্ঞাসা করিতেছি, এইসব বন্দোবস্তের খরচ উক্ত প্রদেশ দিতে পারিবে কি?

ঐ দুই প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী। কোহাট ও লড়কানায় মুসলমানেরা যেরূপ সুশাসন-প্রিয়তা ও সভ্যজীবনযাপনেচ্ছার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে প্রস্তাবিত নূতন বন্দোবস্তে হিন্দুদের খুব আগ্রহ হইবার কথা নয়।

আর-একটি সর্ত্ত, পঞ্জাবে ও বঙ্গে লোকসংখ্যার অনুপাত অনুসারে মুসলমান ও অমুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ণীত হইবে; এবং বর্ত্তমান অন্য যে-সব প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা আছে, তাহাতে সংখ্যায় ন্যূন সম্প্রদায়দিগকে তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কিছু বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হইবে। এই সর্ত্ত অনুসারে কাজ হইলে ফল এই হইবে, যে, পঞ্জাবে ও বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী বলিয়া তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী হইবে, এবং অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম বলিয়া সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি পাইবে। সংখ্যায় ন্যূন সম্প্রদায়রা প্রত্যেক প্রদেশেই সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি পাইবে, এই নিয়ম হইলে পঞ্জাব ও বাংলার হিন্দুরাও তাহার সুবিধা পাইত, কিন্তু পঞ্জাব ও বাংলার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রস্তাব করা হইয়াছে। অন্য যে-সব প্রদেশে এখন ব্যবস্থাপক সভা আছে, তাহাতে মুসলমানরাই সংখ্যায় কম, সুতরাং তাহারা সংখ্যার অতিরিক্ত প্রতিনিধি পাইবে। এরূপ একপেশে বন্দোবস্তের আমরা বিরোধী। হয় সর্ব্বত্রই কেবল মাত্র সাম্প্রদায়িক সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হউক, কিম্বা সর্ব্বত্রই সংখ্যায় ন্যূনদিগকে কিছু বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হউক। কেবল মাত্র মুসলমানদের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোথাও একরকম সর্ত্ত, কোথাও অন্য রকম সর্ত্তের প্রস্তাব করিলে তাহা গ্রহণীয় হইবে না।

শিশু ও বালকবালিকারা নির্ব্বাচনে কোথাও ভোট দিবার অধিকারী নহে। বঙ্গে তাহাদিগকে বাদ দিলে প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানদের সংখ্যা অন্য সব সম্প্রদায়ের প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয় না। সুতরাং এই প্রদেশে মুসলমানদের বেশী প্রতিনিধি পাইবার দাবী ন্যায্য নহে। ইহা সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া মডার্ন্ রিভিউয়ে দেখান হইয়াছে।

—

বঙ্গে নারীনিগ্রহ

ঘরে বাইরে এই প্রদেশে নারীনিগ্রহ বহুবৎসর ধরিয়া চলিতেছে। বাংলা খবরের কাগজ খুলিলেই ইহার অন্ততঃ দুই একটা সংবাদ প্রত্যহ চোখে পড়ে। কোন কোন সংবাদ অতি ভীষণ। গবর্ন্মেণ্টের ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে ইহার আশু প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সঞ্জীবনীর প্রত্যেক সংখ্যায় ১৩২৯ সাল হইতে নারী-নিগ্রহের আনুপূর্ব্বিক তালিকা দেওয়া হইতেছে। কেবল ২৪শে চৈত্রের কাগজখানিতেই যে পঞ্চাশটি অত্যাচরিতা নারীর বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দৃষ্ট হয়, যে, তন্মধ্যে ২৯ জন সধবা, তিনজন বিধবা, চারিজন কুমারী, বাকী চৌদ্দজনের অবস্থা অজ্ঞাত। ইহা হইতে প্রতীত হয়, যে, বিধবাদের উপরই অধিকাংশস্থলে দুর্বৃত্ত লোকেরা অত্যাচার করে, এই ধারণা বর্ত্তমান তালিকা অনুসারে সত্য নহে। মোটের উপরও সত্য না হইতে পারে। অত্যাচরিতা পঞ্চাশটি নারীর মধ্যে ১৫ জন মুসলমান, ৩০ জন হিন্দু, বাকী ৫ জনের ধর্ম্ম অজ্ঞাত। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, নিগৃহীতাদের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যা কম নহে। সচ্চরিত্র ও বিবেচক মুসলমানেরা অবশ্য অত্যাচারী ও অত্যাচরিতাদের ধর্ম্মনির্বিশেষে পাশবিক অত্যাচারকে ঘৃণা করেন। কিন্তু যাহারা সাম্প্রদায়িক অন্ধতা বশতঃ মনে করে, যে, ধর্ষিতা নারী হিন্দু এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি মুসলমান হইলে সংবাদটাই মিথ্যা কিম্বা নারীটিরই দোষ ছিল, তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, যে, মুসলমান পুরুষেই মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার বড় কম স্থলে করে না। ৫০টি অত্যাচার-সংবাদের মধ্যে ২৫টিতে অত্যাচারীরা কেবল মুসলমান, ১০টিতে অত্যাচারীরা কেবল হিন্দু, তিনটিতে অত্যাচারীরা হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত দল, এবং বাকী ১২টির বিশেষ বৃত্তান্ত জানা নাই। ইহাতে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই ভাবিবার বিষয় এবং লজ্জার কারণ আছে। কেবল দুইটি ঘটনায় দুর্বৃত্ত হিন্দু মুসলমান নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে। তদ্বিষয়ক তদন্ত বা মোকদ্দমার ফল অজ্ঞাত। অধিকাংশ স্থলে অত্যাচারীরা মুসলমান এবং অত্যাচরিতারা হিন্দু। বঙ্গের মুসলমান ও হিন্দু পুরুষ ও নারীগণ জাগিয়া মাতৃভূমির কলঙ্ক অপনোদন করুন।

—

রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য

বিনা বিচারে যে-সকল লোককে রাজবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি তাহাদের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীরা কিরূপ মনোযোগী, খবরের কাগজে তাহাদের নানা ব্যারামের সংবাদ হইতে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। এবিষয়ে তাহাদের অভিযোগ যথাস্থানে পৌঁছে, না, মাঝপথে মারা যায়, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ৩রা এপ্রিল তারিখের বেঙ্গলী ও অন্য কোন কোন কাগজে ছাপা হইয়াছিল, যে, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ফতেগড় সেণ্ট্রাল জেলে আবদ্ধ পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত এবং নলিনীরঞ্জন রায় নানা ব্যাধিতে ভুগিতেছেন। কোন প্রকার ব্যায়ামের, এমন-কি ভ্রমণেরও বন্দোবস্ত না থাকায় তাঁহাদের পীড়া বাড়িতেছে। একটি সঙ্কীর্ণ জায়গায় তাঁহাদিগকে দিনরাত থাকিতে হয়। জেলের এলাকাভুক্ত স্থানে মুক্তবায়ুসেবনের কয়েকটি ভাল জায়গা থাকা সত্ত্বেও এবং জেলের অধ্যক্ষের নিকট বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, তাঁহাদিগকে ব্যায়াম ও মুক্ত বায়ু সেবনের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। শুনা যায়, যে, স্থানীয় কর্ম্মচারীরা বলেন, যে, বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের একটি হুকুমে তাঁহাদের হাত-পা বাঁধা। হুকুমটির তাৎপর্য্য এই, যে, বন্দীদের জন্য মুক্তবাতাস, খেলা ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের সম্মতিক্রমে করিতে হইবে। কিন্তু যদিও বহুসংখ্যক দরখাস্ত ও স্মারকলিপি বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে পাঠান হইয়াছে, তথাপি এই সম্মতি আসে নাই।

বেঙ্গলী প্রভৃতি কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা যদি নির্ভুল সংবাদ হয়, তাহা হইলে তাহা বড় চমৎকার ব্যাপার। রাজবন্দীদিগের স্বাস্থ্যের জন্য যাহা দরকার, তাহা করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু বাংলা গবর্ন্মেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা করিবার জো নাই। প্রথমতঃ, ইহাই ত এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। আর যদি ব্যবস্থা তাহাই হয়, তাহা হইলে দরখাস্ত ও স্মারকলিপি সত্ত্বেও সম্মতি দেওয়া হয় না কেন? বাংলা গবর্ন্মেণ্ট বলিতে অবশ্য বুঝায় সকৌন্সিল বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুর। দরখাস্ত আদি একাধিক তাঁহাদের কাছে পৌঁছায় না, হয় ত কোন কর্ম্মচারীর মারফতেও পৌঁছায় না। কোন সেক্রেটরী বা আণ্ডার্-সেক্রেটরী বা অধস্তন কর্ম্মচারী কি তাহা চাপা দিয়া রাখেন না, তাহার উপর একটা যা হোক কিছু নিষেধাত্মক হুকুম দিয়া কাজ খতম করেন? এই বিষয়ে কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান জার্ন্যালিষ্ট্‌স্ এসোসিয়েশনের সম্পাদকের বঙ্গীয় সেক্রেটারিয়েটের সহিত পত্র ব্যবহার করা উচিত।

রাজবন্দীদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য দৈনিক আহারের প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ হুকুম ত নাই, যে, বাংলা গবর্ন্মেণ্টের সম্মতি না যাইলে তাহাদিগকে খাইতে দিতে পারা যাইবে না। তাহা হইলে মুক্ত বাতাস, খেলা ও ব্যায়ামের বেলায় কেন এরূপ হুকুম করা হইয়াছে?

—

কলিকাতা অনাথ-আশ্রম

সম্প্রতি এই আশ্রমের সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার সম্পাদক রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়ের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, যে, আশ্রমটিতে এক শত অনাথ বালকের ভরণপোষণ হয়।

গত ৩০ বৎসর ধরিয়া আশ্রম এই সৎকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এই কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের সাহায্য করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ঠিকানা—বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—

সাইকেলে পৃথিবীভ্রমণ

শ্রীযুক্ত অশোক মুখোপাধ্যায় ও অন্য যে কয়জন বাঙালী যুবকের সাইকেলে আর্য্যাবর্ত্ত ও কাশ্মীর ভ্রমণের বৃত্তান্ত গত চৈত্রের প্রবাসীতে শেষ হইয়াছে, তাঁহারা সাইকেলে পৃথিবীভ্রমণের জন্য বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের গত ২০শে চৈত্র চাকলা জাহাজে করাচী হইতে ইরাক্ দেশে যাইবার এবং ২৪শে চৈত্র বসরা পৌঁছিবার কথা ছিল। বাঙালী জাতি তাঁহাদের এই সাহসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার উদ্যমের সাফল্য কামনা করিবে।

—

"ধাতুরূপ-মহার্ণব"

সংস্কৃত ভাষায় যত ধাতু আছে, সমুদয় পুরুষ, কাল, বাচ্য প্রভৃতিতে তাহাদের রূপ কোন বহিতে পাওয়া যায় না। এলাহাবাদের পাণিনি আফিস্ দেবনাগর অক্ষরে একখানি বৃহৎ পুস্তকে তৎসমুদয় মুদ্রিত করিতেছেন। সংস্কৃত অভিধান যেমন সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও চতুষ্পাঠীতে রক্ষিত হয়, এই গ্রন্থও সেইরূপ রক্ষিত হইবার যোগ্য। মূল্যাদি বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

—

লর্ড লিটনের পরামর্শ

লর্ড লিটন যে-বক্তৃতা দিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তাহাতে বলেন, হিন্দুমুসলমানের ঝগড়া ধর্ম্মবিষয়ক নহে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত। তিনি বলেন, শান্তির একমাত্র পথ, ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে দল গঠন না করিয়া রাজনৈতিক মত অনুসারে তাহা গঠন করা। ইহা শান্তির একটি উপায় বটে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা থাকিতে ইহা কেমন করিয়া অবলম্বিত হইবে?

—

নেপালে রেলওয়ে

নেপালের সীমার মধ্যে প্রথম রেলওয়ে খোলা সন্তোষের বিষয়। আশা করা যায়, ইহার দ্বারা নেপালের পণ্যশিল্পের উন্নতি ও বিস্তার হইবে, এবং লোকদের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে ও সংহতি বাড়িবে।

—

স্যার উইলিয়ম সিম্পসনের সাক্ষ্য

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে দেখিলাম, কলিকাতার অন্যতম ভূতপূর্ব্ব প্রধান স্বাস্থ্যকর্ম্মচারী সিম্পসন সাহেব বলিয়াছেন, যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভারতীয় ডাক্তারেরা তিন বৎসর পরীক্ষার পর পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ করেন, যে, ওলাউঠার টীকা শতকরা ৮০ জনকে ঐ ব্যারাম হইতে রক্ষা করে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তারদেরই সাহায্যে সিম্পসন আবিষ্কার করেন, যে, ওলাউঠা বাতাসের দ্বারা সংক্রামিত হয় না; দূষিত জল, দুধ ও মাছির দ্বারা হয়। ইহা ভারতীয় ডাক্তারদের প্রশংসার বিষয়।

—

ত্রিশতবার্ষিক শিবাজী উৎসব

সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশে নানা স্থানে ত্রিশতবার্ষিক শিবাজী উৎসব হইয়া গিয়াছে। যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যস্থাপক তাঁহার যে যশ আছে, তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধ উভয়েই জয়লাভের বন্দোবস্ত তিনি করিয়াছিলেন। কেবল যুদ্ধেই যে তাঁহার প্রতিভা খেলিত, তাহা নহে। সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রীয় কার্য্য সম্পাদনের বন্দোবস্ত তিনি করিয়াছিলেন। শত্রুমিত্র সধর্ম্মী বিধর্ম্মী নির্বিশেষে সকল নারীর সম্মান রক্ষা এবং পরধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বিষয়ে তিনি তাঁহার যুগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি সচরাচর হিন্দুদেরই বন্দনীয় বিবেচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মান পাইবার অধিকারী। কারণ, তাঁহার জীবন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহার মত এত বড় একটি মানুষের জন্ম দিবার সামর্থ্য সকল ধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয়দের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের আছে।

—

ভ্রম-সংশোধন

১২৪ পৃষ্ঠার রঙীন চিত্রের চিত্রকরের জীবিতকাল ১৪৪৯—১৫৪৯ স্থলে ১৪৪৯—১৪৯৪ হইবে।

১৪১ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ২৯ পংক্তি, "আইন" হইবে "স্বদেশীয় ও অন্তর্জাতিক আইন"। ১৪২ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ২৯ পংক্তির পর বসিবে, "অর্থনীতি ইতিহাসাদি বিষয়ের অধ্যাপনা সেইসকল বিষয়ের এম্-এ শ্রেণীর সহিত হইতে পারে"।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। P. 71·27